চিত্রসূচী

আষাঢ়

ত্রিবর্ণ চিত্র।

শ্রাবণ

পৃষ্ঠা।

বহুবর্ণের চিত্র।

ভাদ্র

বহুবর্ণ চিত্র।

পৃষ্ঠা।

আশ্বিন

বহুবর্ণ চিত্র।

কার্ত্তিক

বহুবর্ণ চিত্রসূচি।

অগ্রহায়ণ

বহুবর্ণ চিত্র

১ম বর্ষ | আষাঢ়, ১৩২০ । | ১ম সংখ্যা

স্বস্তিবাচন ।

(ঋগ্বেদীয় স্বস্তিসূক্ত)

ওঁ

স্বস্তি নো মিমীতামশ্বিনা ভগঃ

স্বস্তি দেব্যদিতিরনর্ব্বণঃ ।

স্বস্তি পূষা অসুরো দধাতু নঃ

স্বস্তি দ্যাবাপৃথিবী সুচেতুনা ॥ ১

অশ্বিনীকুমার নামে দেবতাযুগল,
ভগ-দেব আমাদের করুন মঙ্গল ;
অদিতি-দেবীও শুভ করুন বিধান ।
অনুকূল জন পাতা সকলের প্রাণদাতা
পূষা আমাদের স্বস্তি করুন প্রদান ;
সুশোভন-জ্ঞান-ধাত্রী স্বর্গ-মর্ত্ত-অধিষ্ঠাত্রী
দুই দেবী মোদের করুন স্বস্তি দান ।

স্বস্তয়ে বায়ুমুপ ব্রবামহৈ
সোমং স্বস্তি ভুবনস্য যস্পতিঃ।
বৃহস্পতিং সর্ব্বগণং স্বস্তয়ে
স্বস্তয় আদিত্যাসো ভবন্তু নঃ ॥ ২

স্বস্তি পাইবার তরে বায়ু দেবতায়
স্তব করি আমরা সবাই।
জগদ্-রক্ষক যিনি সেই সোম-দেবে
স্তব করি, স্বস্তি যেন পাই ॥
বৃহস্পতি দেব সহ সর্ব্ব দেবগণ,
দ্বাদশ আদিত্য হ'ন স্বস্তির কারণ।

বিশ্বে দেবা নো অন্থা স্বস্তয়ে
বৈশ্বানরো বসুরগ্নিঃ স্বস্তয়ে।
দেবা অবন্তৃভবঃ স্বস্তয়ে
স্বস্তি নো রুদ্রঃ পাত্বংহসঃ ॥ ৩

বিশ্ব-নামধারী দশসংখ্য দেবগণ
হউন মোদের আজি স্বস্তির কারণ।
সেবে ব'লে বিশ্ব নর,— নাম যার বৈশ্বানর,
বাস করাইয়া যিনি বসু নামধারী,
মোরা সেই অগ্নিদেবে স্তব করি, তিনি এবে
হ'ন আমাদের শুভকারী।

স্বস্তি মিত্রাবরুণা
স্বস্তি পথ্যে রেবতি।
স্বস্তি ন ইন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ
স্বস্তি নো অদিতে কৃধি ॥ ৪

করুন মঙ্গল দোঁহে মিত্র ও বরুণ।
নভোদেবি হে রেবতি, কল্যাণ করুন ॥
ইন্দ্র অগ্নি সুমঙ্গল করুন বিধান।
হে অদিতি, আমাদের কর গো কল্যাণ ॥

স্বস্তি পন্থামনু চরেম
সূর্য্যাচন্দ্রমসাবিব।
পুনর্দ্দদতাঽঘ্নতা
জানতা সঙ্গমেমহি ॥ ৫

শান্ত চন্দ্র সূর্য্য হেন, অবাধে এ পথে যেন
পারি মোরা করিতে গমন।
ইষ্টদাতা অহিংসক যত সাধুজন,
হন না কারেও যারা কভু বিস্মরণ,—
এ পথে তাঁদের সনে মিলি যেন হৃষ্ট মনে,
এই বর দি'ন দেবগণ ॥

শ্রীশ্যামাচরণ কবিরত্ন

ভারতবর্ষ।*

১

যে দিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননি! ভারতবর্ষ!
উঠিল বিশ্বে সে কি কলরব, সে কি মা ভক্তি, সে কি মা হর্ষ!
সে দিন তোমার প্রভায় ধরার প্রভাত হইল গভীর রাত্রি;
বন্দিল সবে, "জয় মা জননি! জগত্তারিণি! জগদ্ধাত্রি!"
ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণ-কমল করিয়া স্পর্শ;
গাইল, "জয় মা জগন্মোহিনি! জগজ্জননি! ভারতবর্ষ!"

২

সদ্যঃস্নান-সিক্তবসনা, চিকুর সিন্ধুশীকরলিপ্ত;
ললাটে গরিমা, বিমল হাস্যে অমলকমল-আনন দীপ্ত;
উপরে গগন ঘেরিয়া নৃত্য করিছে—তপন তারকা চন্দ্র;
মন্ত্রমুগ্ধ, চরণে ফেনিল জলধি গরজে জলদমন্দ্র।
ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণ-কমল করিয়া স্পর্শ;
গাইল, "জয় মা জগন্মোহিনি! জগজ্জননি! ভারতবর্ষ!"

* ইহার স্বরলিপি শেষে দ্রষ্টব্য

৩

শীর্ষে শুভ্র তুষারকিরীট ; সাগর-উর্ম্মি ঘেরিয়া জঙ্ঘা ;
বক্ষে দুলিছে মুক্তার হার পঞ্চ সিন্ধু যমুনা গঙ্গা।
কখন মা তুমি ভীষণ দীপ্ত তপ্ত মরুর ঊষর দৃশ্যে ;
হাসিয়া কখন শ্যামল শস্যে, ছড়ায়ে পড়িছ নিখিল বিশ্বে
ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণ কমল করিয়া স্পর্শ ;
গাইল, "জয় মা জগন্মোহিনি ! জগজ্জননি ! ভারতবর্ষ !"

৪

উপরে, পবন প্রবল স্বননে শূন্যে গরজি' অবিশ্রান্ত,
লুটায়ে পড়িছে পিককলরবে, চুম্বি তোমার চরণ-প্রান্ত ;
উপরে, জলদ হানিয়া বজ্র, করিয়া প্রলয়সলিলবৃষ্টি
চরণে তোমার, কুঞ্জকানন কুসুমগন্ধ করিছে সৃষ্টি !
ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণ-কমল করিয়া স্পর্শ,
গাইল, "জয় মা জগন্মোহিনি ! জগজ্জননি ! ভারতবর্ষ !"

৫

জননি, তোমার বক্ষে শান্তি, কণ্ঠে তোমার অভয়-উক্তি,
হস্তে তোমার বিতর অন্ন, চরণে তোমার বিতর মুক্তি ;
জননি ! তোমার সন্তান তরে কত না বেদনা কত না হর্ষ ;
জগৎপালিনি ! জগত্তারিণি ! জগজ্জননি ! ভারতবর্ষ !
ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণ কমল করিয়া স্পর্শ ;
গাইল, "জয় মা জগন্মোহিনি ! জগজ্জননি ! ভারতবর্ষ !"
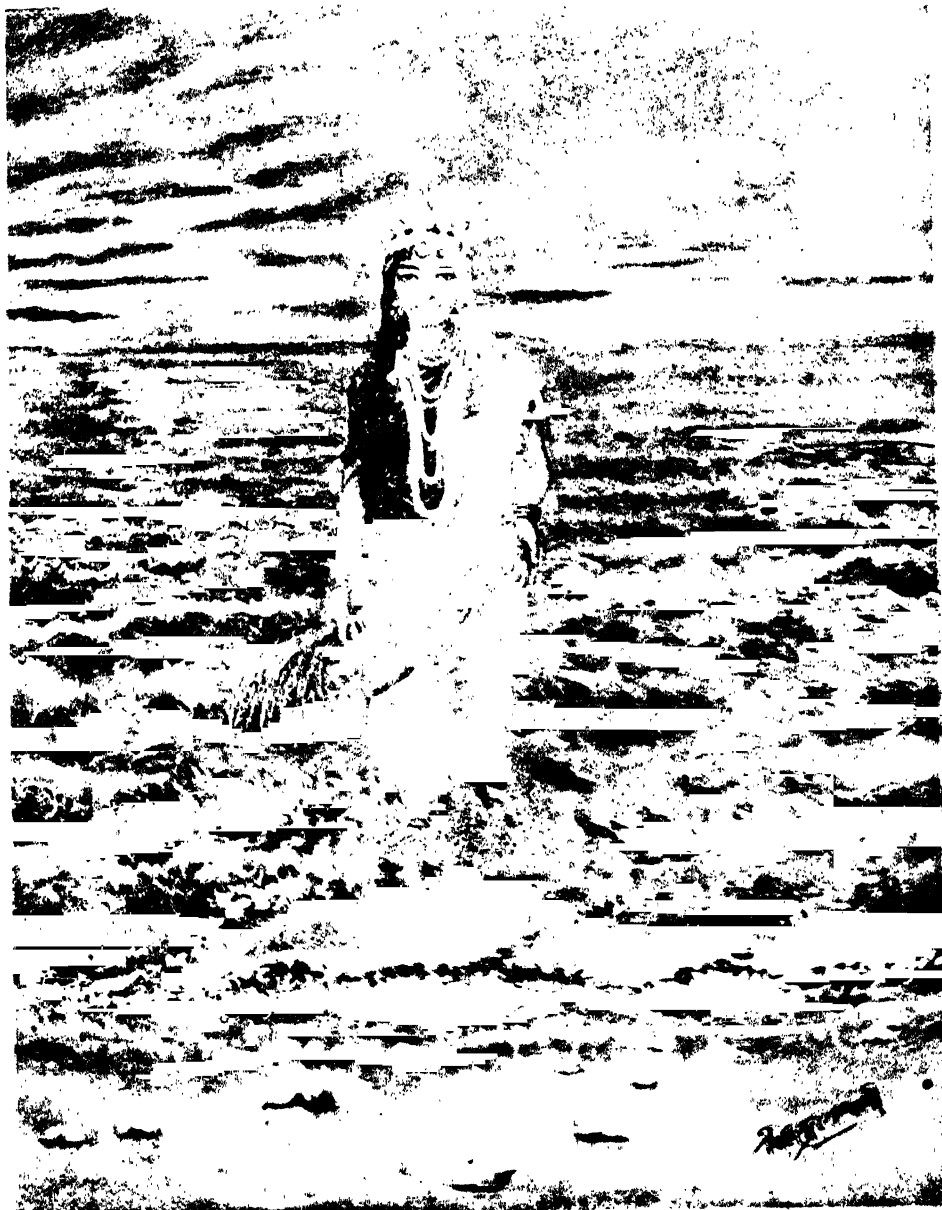
সূচনা

যে দিন স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা বাহির করিয়াছিলেন, সে দিন অলক্ষ্যে বৈজয়ন্তী উড়িয়াছিল, স্বর্গে দুন্দুভি বাজিয়াছিল, দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সেই কল্লোলিনী ভাব-মন্দাকিনী আজ প্রবাহিত হইয়া সহস্র ধারায় বঙ্গ-সাহিত্য-ক্ষেত্র উর্ব্বর করিতেছে। মাসিক পত্রিকায় মাসিক পত্রিকায় বঙ্গদেশ ছাইয়া গিয়াছে, নগরে নগরে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হইয়াছে, গ্রামে গ্রামে পাঠাগার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ভাবসাগরে আনন্দ-কল্লোল উঠিয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্র ও মাইকেলের সময় হইতেই বঙ্গভাষার নব যুগ। ইংরেজি সাহিত্য যেমন বিদেশীয় সাহিত্যের 'সঞ্জীবনৌষধি রসে' সঞ্জীবিত হইয়াছিল, যেন এক উত্তাল ভাব-সমুদ্রের বিরাট বন্যা আসিয়া জীর্ণ পুরাতনকে ভাঙ্গিয়া চূরিয়া ভাসাইয়া নূতনের জন্য ভূমি প্রস্তুত করিয়া গেল, বঙ্গ সাহিত্যও সেইরূপ সেই সময়ে ইংরেজি সাহিত্য দ্বারা গভীর ভাবে আলোড়িত হইয়া উঠিল। বঙ্গীয় লেখকের মুগ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে এক গৌরবময় নূতন ভাব-রাজ্যের মানচিত্র খুলিয়া গেল; বঙ্গভাষা নব যৌবন লাভ করিল।

বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গভাষায় উচ্চ মাসিক পত্র সৃষ্টি করিলেন, ঐন্দ্রজালিক শব্দবিন্যাস সৃষ্টি করিলেন, মনোহর উপন্যাস সৃষ্টি করিলেন, সুবিজ্ঞ সমালোচনা সৃষ্টি করিলেন, নূতন প্রণালীর ব্যাখ্যা সৃষ্টি করিলেন, সহজ-সরল বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ সৃষ্টি করিলেন, উচ্চ অঙ্গের রসিকতা সৃষ্টি করিলেন। মাইকেলও তেমনই অমিত্রাক্ষর কবিতা সৃষ্টি করিলেন, 'সনেট' সৃষ্টি করিলেন, মহাকাব্য সৃষ্টি করিলেন, খণ্ডকাব্য সৃষ্টি করিলেন, নাটক সৃষ্টি করিলেন, নূতন বৈষ্ণব কবিতা সৃষ্টি করিলেন। বলিলে অত্যুক্তি হয় না যে, বঙ্কিমচন্দ্র আধুনিক বাঙ্গলা গদ্য সাহিত্যের, ও মাইকেল আধুনিক বাঙ্গলা পদ্য-সাহিত্যের, সৃষ্টিকর্ত্তা। তাঁহাদের স্মৃতি অমর হউক।

যাঁহারা এই মনীষিদ্বয়ের রচনায় ইংরেজি ভাবের প্রভাব দেখিয়া ক্ষুব্ধ হন, তাঁহারা একটু অত্যধিক মাত্রায় 'স্বদেশী।' এই দুই ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ অতুল প্রতিভাশালী ব্যক্তি ছিলেন। প্রতিভা গৃহের দাসী নহে—সে গৃহের কর্ত্রী। সে শুদ্ধ পিতৃপুরুষের সম্পত্তি গ্রহণ করে না—সে নূতন রাজ্য সৃষ্টি করে। সে পুরাতনের কূপে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে চাহে না—সে মুক্ত বাতাসে পক্ষবিস্তার করিয়া উড়িতে চাহে। প্রতিভা পুরাতন আদর্শে আবদ্ধ থাকে না, পুরাতন ও নূতনে মিশাইয়া নূতন আদর্শ সৃষ্টি করে।

বিগত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে বঙ্গসাহিত্যের বিকাশ এক ভৌতিক ব্যাপার। ইহার গতি জলপ্রপাতের ন্যায়। এই সাহিত্য বাঙ্গালী জাতির মজ্জায় মজ্জায় প্রবেশ করিয়াছে। এই উদ্দাম স্রোতের ফেনিল তরঙ্গে বাঙ্গালী গা ভাসাইয়া দিয়াছে। বাঙ্গালী বঙ্গভাষাকে ভালবাসিতে শিখিয়াছে।

তথাপি বড় কষ্টে, বড় অবজ্ঞার পর্ব্বতভার ঠেলিয়া বঙ্গভাষাকে উঠিতে হইতেছে।

প্রথমতঃ, আমাদের দেশের শাসন-কর্ত্তারা বাঙ্গলাভাষা জানেন না, শিখিতেও চাহেন না। তাঁহাদের মতে বাঙ্গলা সাহিত্য দুই শ্রেণীতে বিভক্ত,—অর্থাৎ (১) যাহা রাজবিদ্বেষ মূলক, এবং (২) যাহা রাজবিদ্বেষমূলক নহে। প্রথমোক্ত শ্রেণীর সাহিত্য বুঝিবার জন্য তাঁহারা অনুবাদকের সাহায্য গ্রহণ করেন। শেষোক্ত শ্রেণীর সমস্ত সাহিত্য তাঁহাদের দ্বারা সমভাবে অবজ্ঞাত, উপেক্ষিত, বর্জ্জিত। আমাদের শাসন-কর্ত্তারা যদি বঙ্গসাহিত্যের আদর জানিতেন, তাহা হইলে বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র ও মাইকেল Peerage পাইতেন ও রবীন্দ্রনাথ Knight উপাধিতে ভূষিত হইতেন।

দ্বিতীয়তঃ, আমাদের দেশের রাজা মহারাজাদের মধ্যে অধিকাংশই বাঙ্গলা ভাষা সম্যক জানেন না ও তাহার আদর করেন না। তাঁহাদের সজ্জিত প্রাসাদের প্রশস্ত পাঠাগারে মহামূল্য আলমারিগুলি অপঠিত ইংরেজি গ্রন্থের ও মাসিক পত্রিকার উজ্জ্বল সমাবেশ সগর্ব্বে বক্ষে ধারণ করিতেছে। কিন্তু বাঙ্গলা গ্রন্থ ও মাসিক-পত্রিকা তাঁহাদের চরণ-প্রান্তেও স্থান পায় না। কোন বাঙ্গালী রাজা গর্ব্ব করিয়া বলিয়াছিলেন যে, তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস পাঠ করেন নাই! স্পষ্ট শুনিলাম যে, এই বঙ্গীয় যুবকের এই নির্লজ্জ উক্তি শুনিয়া বঙ্গভাষা লজ্জায় অধোবদন হইয়া বলিয়া উঠিলেন— "ভগবতি বসুন্ধরে! দ্বিধা হও, আমি প্রবেশ করি।" এ লজ্জা কি রাখিবার স্থান আছে!

আজ প্রধানতঃ মধ্যবিত্ত ও ছাত্র সম্প্রদায়ই বাঙ্গলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক। তাঁহারা বাঙ্গলা গ্রন্থ ও মাসিক পত্রিকা পাঠ করেন, বাঙ্গলা বক্তৃতা শ্রবণ করেন, বাঙ্গলা নাটকের অভিনয় করেন, বাঙ্গলা কবির সমাদর করেন। সে দিন বঙ্গদেশের এক অতি শুভদিন, যে দিন এই সম্প্রদায় সমবেত ভদ্রমণ্ডলীর সমক্ষে কবিবর রবীন্দ্রনাথের গলে বর-মালা পরাইয়া দিয়াছিলেন। সে সম্মানে সমস্ত বঙ্গভাষা সম্মানিত হইয়াছিল। তাঁহাদের জয় হউক।

কিন্তু বঙ্গভাষা সাবালিকা হইয়া ধীরে ধীরে নিজের স্বত্ব বুঝিয়া লইতেছে। আর তাহাকে উপেক্ষা করিবার উপায় নাই।

বঙ্গসাহিত্যের প্রতি এই সমাদর, জাতীয়ত্বের এই গভীর আলোড়ন, মাতৃভাষার প্রতি জাতির এই অচলা ভক্তি, শেষে গভর্মেণ্টের হৃদয়ের দ্বারে আঘাত করিয়াছে। মহামতি সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের উপদেশানুসারে এই অনাদৃত

বঙ্গভাষাকে গভর্মেণ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে আসন দিয়াছেন। সে দিন বঙ্গদেশের একটি স্মরণীয় দিন, যে দিন হইতে বাঙ্গলা ভাষা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবশ্যপাঠ্য বিষয় বলিয়া গণিত হইয়াছে। বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাসে আশুতোষের নাম অক্ষয় হউক।

রাজা মহারাজাদেরও বঙ্গভাষার প্রতি যথেষ্ট অনুরাগ লক্ষিত হইতেছে। তাঁহাদের মধ্যে এখন অনেকে বাঙ্গলা মাসিক পত্রিকা গ্রহণ করেন, এবং স্নানের পূর্ব্বে কদাচিৎ তাহা হাতে করিয়া বিজ্‌স্তন সহকারে তাহার চিত্রিত পৃষ্ঠাগুলির উপরে একবার চোক বুলাইয়া যান। সঙ্কটমুহূর্ত্ত উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। রোগী বাঁচিবে। আজকাল দেখি যে, দুই একজন মহারাজা সাহিত্যের জন্য অকাতরে অর্থব্যয় করিতেছেন। তাঁহারা দীর্ঘজীবী হউন।

আর মধ্যবিত্ত ও ছাত্র সম্প্রদায়! তাঁহাদের অশ্রান্ত সেবা আজ সার্থক হইয়াছে। তাঁহাদের স্নেহসেচিত অঙ্কুর আজ বর্দ্ধিত হইয়া শত শাখায় পল্লবিত, মুকুলিত হইয়াছে। তাঁহাদের যত্নে রক্ষিত গাভী আজ আসন্নপ্রসবা। তাঁহাদের আজ কি আনন্দ!

অগ্নি জ্বলিয়াছে। আর ভয় নাই। আমরা আজ কল্পনায় বঙ্গসাহিত্যের সেই উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ দেখিতে পাইতেছি। যে দিন এই উপেক্ষিত বঙ্গভাষা পৃথিবীর সমক্ষে সগর্ব্বে নিজের আসন গ্রহণ করিবে; যে দিন এই সাহিত্যের ঝঙ্কার সমস্ত ভারতবর্ষ উৎকর্ণ হইয়া শুনিবে, আর এই মাসিক পত্রিকার নামকরণ সার্থক হইবে; যে দিন এই ভাষায় নূতন বাল্মীকি গান ধরিবে, নূতন ভাস্করাচার্য্য জ্যোতিষ লিখিবে, নূতন গৌতম বিচার করিতে বসিবে, নূতন শঙ্করাচার্য্য ধর্ম্মপ্রচার করিতে ছুটিবে; যে দিন এই অবজ্ঞাত জাতির সাহিত্য পাঠ করিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে ঘিরিয়া বিস্মিত জগৎ জয়গান করিবে। সে দিন আসিবে। আর যদি ইংরেজশাসনের শান্তি এ সাহিত্যকে ঘিরিয়া রক্ষা করে, ত সে দিন বহুদূর নয়।

আমরা আশা করি যে, এই রাজপুরুষগণ যাঁহারা বাঙ্গলা ভাষা পড়েন না, তাঁহাদিগকে— এই বাঙ্গলা সাহিত্য পড়াইব, এবং প্রাচ্যভাবসম্পদে প্রতীচ্যকে সম্পৎশালী করিব। আমাদের ইচ্ছা যে রাজা মহারাজারা যাঁহারা এই সাহিত্যকে সগৌরবে অবজ্ঞা করেন, তাঁহাদিগকে চিত্রের উপবন দিয়া, কবিত্বের স্রোতস্বিনী দিয়া, উপন্যাসের জ্যোৎস্নাময় আকাশের নীচে দিয়া, চিন্তার দেশে লইয়া যাইব। আমাদের অভিলাষ, যে জনসাধারণকে ভাব ও রুচির অধঃস্তর হইতে এক মায়াময় রাজ্যে টানিয়া তুলিব, যেখানে ধর্ম্ম হাসে, বিজ্ঞান ভালবাসে, দর্শন গান গায়, চিন্তা ও কল্পনা হাত ধরাধরি করিয়া নৃত্য করে। আমাদের সাধনা যে আমাদের মাতৃভাষাকে সমবেত মানবমণ্ডলীর সম্মুখে গৌরবের সিংহাসনে বসাইয়া তাহার মাথায় মহামহিমার রাজমুকুট পরাইয়া দিব, এবং যে জাতির এই ভাষা, তাহাকে সমুচিত সম্মান করিতে জগৎকে আদেশ করিব।

বঙ্গভাষা পরাধীন দেশের ভাষা বলিয়া হতাশ হইবার কোন কারণ নাই। পরাধীন ইটালি ডান্তে ও পেট্রার্কের জন্ম দিয়াছিল। এই পরাধীন বঙ্গই চণ্ডীদাস ও মাইকেলের জননী। হতাশার কারণ নাই। চাই শুধু সাধনা। চাই শুধু অবিশ্রান্ত সেবা। চাই শুধু অটল বিশ্বাস, আর অচলা ভক্তি।

আমরা বঙ্গভাষার সেই সমুজ্জ্বল ভবিষ্যৎকে স্বাগত সম্ভাষণ দিতে আসিয়াছি। আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের অক্ষয় প্রদীপ হইতে এই ক্ষুদ্র দীপ জ্বালাইয়া লইয়া শঙ্খঘণ্টায় মাতার আরতি করিতে আসিয়াছি। আমরা অন্যান্য বহু যোগ্য সন্তানের সহিত মাতার চন্দনসুগন্ধি পবিত্র মন্দিরে পূজা দিতে আসিয়াছি। আমরা মাসে একবার করিয়া আসিয়া দূর প্রান্ত হইতে তাঁহার চরণারবিন্দে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিয়া যাইব। মাতা যদি তাঁহার ইন্দীবর নেত্রদুটি ফিরাইয়া স্মিতমুখে একবার আমাদের মুখপানে চাহেন, তাহা হইলেই আমাদের পূজা সার্থক হইবে।

আমাদের ভাগ্যবিধাতা দূরে অলক্ষ্যে বসিয়া আমাদের সেই উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গঠন করিতেছেন। আমরা যেন না পিছু হটি। আমরা যেন না ভয় পাই। আমরা যেন সাহিত্যের বাতাসকে পবিত্র রাখিতে পারি। আমাদের বন্দনায় যেন বিগলিত স্নেহা জননীর চক্ষু ফাটিয়া জল পড়ে। আমাদের গানে যেন জগৎ মাতিয়া ছুটিয়া আসিয়া আমাদিগকে ভাই বলিয়া আলিঙ্গন করে। আমরা যেন আত্মসম্মানকে বক্ষে রাখিয়া, অপবিত্রতাকে দূরে রাখিয়া, মনুষ্যত্বকে মাথায় রাখিয়া সাহিত্যের কুসুমিত পথে নির্ভয়ে চলিয়া যাই। তাহা হইলে আমাদের আর জগতের কাছে সম্মান ভিক্ষা করিতে যাইতে হইবে না। সে সম্মান দ্বারে আপনি আসিয়া পঁহুছিবে।

কাবেরী-তীরে।

কবি প্রশ্ন করিয়াছেন—"লুকোতে গিয়ে হাসি, হেসে পালায়; ও কেন চুরি ক'রে চায়?" কবির প্রশ্নের উত্তর বড় সহজ মনে হইতেছে না। যে বয়সের সাড়মরে পুষ্প-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই বসন্ত-লক্ষ্মী আসিয়া দেখা দেন; যে বয়সে বিহঙ্গের কলরব গন্ধর্ব্বলোকের স্বপ্ন রচনা করে, এবং যুবতীর প্রকৃতিসিদ্ধ লোলকটাক্ষ প্রীতি-সম্ভাষণ বলিয়া কল্পিত হয়, সে বয়সে কবির প্রশ্নের উত্তর দেওয়া অতি সহজ। কিন্তু চুরি করিয়া চাহিলে কিংবা লুকাইয়া হাসিলে যে, কেবল প্রেমে পড়া রোগেরই লক্ষণ সূচিত হয়, তাহা ত মনে হয় না। শ্মশ্রুরাজির কচিৎস্ফুরিত শুভ্র গৌরব অপনোদনের জন্য ক্রুপের ক্ষুরের আশ্রয়গ্রহণ করিবার পর, যে দিন ত্রিচিনাপল্লীর রেল ষ্টেসনে নামিয়া, শ্রীরঙ্গম্ মন্দির দর্শনের পূর্ব্বে কাবেরীস্নানের উদ্যোগে শত শত দ্রবিড়বাসীর দলের মধ্যে গিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম, সে দিন মেজাজটা বড় বসন্তস্বপ্নে মুগ্ধ হইবার মত ছিল না। আমি আমার কএকটি নিতান্ত জ্ঞাতব্য কথা জানিবার জন্য যখন সেই দক্ষিণাপথের লোকসঙ্ঘের মধ্যে ইহাকে উহাকে ইংরেজি ও হিন্দিতে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া বুঝিলাম যে, আমার ভাষা কেহই বুঝিতেছে না, তখন কোন কোন স্নাতা ও স্নানাগিনী দ্রবিড়সুন্দরী আমার দিকে চাহিয়া টিপি টিপি হাসিলেন; এবং হাসি লুকাইয়া হাসি-মাখা দৃষ্টিতে, আমার পানে চাহিলেন। কবির প্রশ্নের উত্তর যাহাই হউক, আমি কিন্তু বেশ বুঝিলাম যে, কেহ আমাকে দেখিয়া প্রেমে পড়েন নাই। পুরুষেরা ঠিক্ বুঝিয়াছিলেন যে, আমি বিদেশী; কাজেই দ্রবিড়ভাষায় কথা কহিতে না পারা আমার মূর্খতার পরিচয় নহে। কিন্তু সেই সুদূর দক্ষিণ দেশের ভামিনীরা বুঝি আমাকে একটা অদ্ভুত জন্তু মনে করিয়াছিলেন! তাঁহারা মুখের হাসি শিষ্টাচারের আবরণে ঢাকিতে গিয়া লুকাইয়া হাসিলেন। যাহারা মাদ্রাজ প্রভৃতি বড় বড় সহরের পেরিয়া খৃষ্টানদের "পায়রা ইংরেজি" শুনিয়া মনে করেন যে, ইংরেজিতে কথা কহিলেই মাদ্রাজ প্রদেশে চলিয়া যাইতে পারে, তাঁহারা বড়ই ভ্রান্ত, যে তামিল ভাষায় কথা কহিতে পারে না, অন্ততঃপক্ষে রমণীরা তাহাকে কৃপার পাত্র বলিয়া মনে করেন।

তখন আমি সবেমাত্র তেলেগু ও তামিল অক্ষরগুলির সহিত পরিচয় লাভ করিয়াছি, এবং পথে ঘাটে দুই চারিটি শব্দ কুড়াইয়া পাইয়াছি। নাপিতেরা আমার উচ্চারিত ইংরেজি কথা বুঝিতে পারিবে মনে করিয়া, নাপিতের খোঁজে নিজের গালেই হাত ঘষিয়া সপ্রশ্নদৃষ্টিতে "অম্বটুন্" কথাটি উচ্চারণ করিলাম; কেননা যদি আমার সংগৃহীত শব্দটীর ঠিক্ "নাপিত" অর্থ নাও হইত, তাহা হইলেও আকার ইঙ্গিতে আমার প্রয়োজন বুঝিতে কাহারও গোল হইবে না। কথাটি উচ্চারণমাত্রেই অনেক লোক এক সঙ্গে আমার দিকে চাহিয়া হাসিয়া উঠিল; এবং দুই একজন অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া "অম্বটুন" শব্দের সহিত আর কয়েকটি তামিল কথা বলিয়া একটি বাগান দেখাইয়া দিল। তীর্থযাত্রীদিগকে কিঞ্চিৎ আনন্দ-উপভোগের উপকরণ দিয়া আমি নরসুন্দর দর্শনাভিলাষে উদ্যানে প্রবেশ করিলাম। আমার নিজের ক্ষুর নিজের সঙ্গে না থাকিলে সে দিন ক্ষৌর-কর্ম্মবিধানের সম্ভাবনা ছিল না। বাগানের মধ্যে সাত আট জন নাপিত যে ভাবে ক্ষৌরকর্ম্মাভিলাষীদিগের গণ্ডদেশে ক্ষুরচালনা করিতেছিল, তাহা আদৌ সুশোভন মনে হইল না। ক্ষৌরকর্ম্মটা হিন্দুর বিচারে সর্ব্বত্রই অশুচি বলিয়া বিবেচিত হয়; দক্ষিণাপথে আবার এ অশুচি বিচারে একটুখানি বেশি কড়াকড়ি; তাহার উপর আবার প্রক্রিয়াটা তেমন শোভন নয় বলিয়া এ কার্য্যটি একটু দূরে (বাগান প্রভৃতি স্থানে) হইয়া থাকে। আমি যেখানে আসন পাইয়াছিলাম, তাহার পার্শ্বেই একজন লুঙ্গিপরিহিত যুবক ইংরেজি কায়দায় চুল ছাঁটাইতেছিলেন। ভরসা করিয়া তাঁহার সঙ্গে ইংরেজিতে কথা কহিলাম, এবং তিনিও ইংরেজিতে উত্তর দিয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আমার বন্ধু হইয়া উঠিলেন। কবি কালিদাস যথার্থই বলিয়াছেন—সম্বন্ধমাভাষণপূর্ব্বমাহুঃ। আমার এই উদ্যান-লব্ধ বন্ধু আয়ার মহাশয়ের সঙ্গে যখন কাবেরী নদীগর্ভে অবতরণ করিলাম, তখন মনে হইল, যেন আমি অনেক পুরুষরমণীর দৃষ্টিশরে বিদ্ধ হইতেছি। মনে হইতে লাগিল, লোকে বুঝি ভাবিতেছে, আমি জলাশয়-শূন্য দেশের লোক, বোধ হয় কি করিয়া ডুব দিতে হয়, জানিনা। আমি ডুব না

দিয়া একেবারে সাঁতার কাটিতে আরম্ভ করিলাম। এবারে আমার বন্ধু ছাড়া আরও কএকজন আমার সঙ্গী হইলেন।

আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে মকর বা মাঘমাস পড়িয়াছে। মাদ্রাজ প্রদেশে মেষ, বৃষ প্রভৃতি নামে খাটি সৌরমাসের গণনা হইয়া থাকে। আমরাও বঙ্গদেশে সৌরমাসের গণনা করিয়া থাকি; কিন্তু ব্যবহার করি চান্দ্রমাসের নাম। মকর রাশিতে সূর্য্যের সংক্রমণ হইলেও আমরা মঘানক্ষত্রযুক্ত চন্দ্রের নামেই মাসের নামকরণ করি। এই শীতকালেই মাদ্রাজে বর্ষাবৃষ্টি; নদী বাড়ে এবং ধান হয়। এক মাস পূর্ব্বেই যে ঝড়বৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল, তাহাতে সেবারকার কংগ্রেসের ছাউনিগুলি বেশিরভাগ উড়িয়া গিয়াছিল। যখন কাবেরীর কাদাগোলা শীতল জলে স্নানের পর কূলে উঠিলাম, তখন কেহ কেহ আমার বন্ধুকে আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন। বেশ লক্ষ্য করিলাম, অনেক সুবেশা সুন্দরী কিছু না শুনিবার মত ভঙ্গি করিয়া আমার পরিচয় শুনিতেছিলেন। এ দেশের ললনাকুলের পরিধেয় বসন যেমন সুন্দর, শাড়ী পরিবার রীতিটিও তেমনি মনোহর। একখানি অতিদীর্ঘ শাড়ীতে সর্ব্বাঙ্গ সুকৌশলে আচ্ছাদিত হইবার পর অঞ্চলভাগ যে ভাবে বিন্যস্ত হয়, তাহা ছবি তুলিয়া দেখাইবার উপযুক্ত। কাঁচুলি পরিবার প্রথা প্রচলিত থাকিলেও এ দেশের অনেক রমণী কেবলমাত্র একখানি শাড়ীতেই সর্ব্বাঙ্গ আবরণ করিয়া থাকেন।

মলয়ালম্ এবং কেরল প্রদেশের অতি ভদ্রঘরের মহিলারাও বক্ষ আবরণ না করা নির্লজ্জতা মনে করেন না; কিন্তু যে ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায় কেরলের প্রথম ব্রাহ্মণ অধিবাসী বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন, সেই সারস্বত গৌড় ব্রাহ্মণদিগের গৃহলক্ষ্মীরা একখানি শাড়ীর সাহায্যেই পরিচ্ছদের পূর্ণতাবিধান করিয়া থাকেন। এই ব্রাহ্মণবংশ বহু শতাব্দী ধরিয়া কানাড়ার দক্ষিণপশ্চিমভাগে বাস করিতেছেন; এবং ইঁহাদের বংশের ঐতিহ্য এই যে স্বয়ং পরশুরাম ইঁহাদিগকে সরস্বতীতীর এবং ত্রিহোত্রপুর বা ত্রিহুতের উত্তর-পশ্চিম হইতে আনিয়া দক্ষিণাপথের দক্ষিণ-প্রান্তে স্থাপন করিয়াছিলেন। পাঠকেরা জানেন যে, বিন্ধ্যের দক্ষিণভাগে কেবল পঞ্চ দ্রবিড় ব্রাহ্মণের স্থিতি, এবং উহার উত্তরভাগে পঞ্চগৌড় ব্রাহ্মণের আবাস। এই কোঙ্কন কেরলস্থ ব্রাহ্মণেরা যে দশটি গোত্রে বিভক্ত, সেই গোত্রনাম, গৌড় ব্রাহ্মণদিগের গোত্রনামের সহিত ঠিক্ মিলিয়া যায়, ইঁহাদের দশ গোত্র; যথা—ভারদ্বাজ, কৌশিক, বাৎস্য, কৌণ্ডিন্য, কাশ্যপ, বাশিষ্ঠ, জামদগ্নি, বিশ্বামিত্র, গৌতম এবং আত্রেয়। যখন তামিল ব্রাহ্মণীরা চোল পরিধান করেন, এবং এই সারস্বত গৌড় ব্রাহ্মণদিগের কামিনীরা বিস্মৃত প্রাচীন প্রথা অনুসারে কোন প্রকারের চোল পরিধান করেন না, তখন এই সারস্বত গৌড়ব্রাহ্মণ-ললনাদিগের পরিচ্ছদের সহিত উড়িশা, বাঙ্গলা এবং ত্রিহুতের অংশবিশেষে প্রচলিত এক শাটী পরিধান প্রথা মিলাইয়া দেখিতে কৌতূহল হয়। আমি কানাড়ার ভাষা জানি না; কিন্তু শ্রীযুক্ত অনন্তকৃষ্ণ আয়ারের অনুসন্ধানের উপর নির্ভর করিয়া বলিতে পারি যে, যদিও এই ব্রাহ্মণেরা সম্পূর্ণরূপে দ্রবিড়ভাষা অবলম্বন করিয়াছেন, তথাপি প্রায় ষষ্ঠ বা সপ্তম শতাব্দীতে আগত এই ব্রাহ্মণশ্রেণীর মধ্যে অনেক প্রাচীন মৈথিলী প্রাকৃত শব্দ প্রচলিত আছে। অতি দূর দেশের এই প্রমাণ হইতেও বুঝিতে পারা যায় যে, অযোধ্যা প্রদেশের গোণ্ডা গৌড় নামের পরিবর্ত্তিত আকারমাত্র এবং সেই স্থানের নাম হইতেই বঙ্গে গৌড় নাম বিস্তৃত হইয়াছে; এবং সেই স্থানের ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক লোক মাদ্রাজ প্রদেশে আসিয়া বাস করিতেছেন।* পরশুরাম কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠার প্রবাদসত্ত্বেও আমি ইঁহাদিগের উপনিবেশের সময় কেন যে ষষ্ঠ শতাব্দী বলিয়া উল্লেখ করিলাম, সে কথার বিচার এ স্থানে সম্ভব নয়। তামিল ব্রাহ্মণদিগের অপেক্ষা ইঁহারা অধিকতর সুন্দর বলিয়া বিবেচিত না হইলেও, সুন্দর বলিয়া ইঁহাদের খ্যাতি আছে।

আমরা স্নানের পর শ্রীরঙ্গম্ এর সুপ্রসিদ্ধ সপ্তপ্রাকার বেষ্টিত মন্দির এবং মন্দিরের অধিষ্ঠাতৃ অনন্তশায়ী বিষ্ণু দর্শন করিবার পর আহার শেষ করিয়া ত্রিচিনাপল্লীর শৈলদুর্গ বা শৈলমন্দির দর্শন করিলাম। বরং শ্রীরঙ্গম্ মন্দিরের বর্ণনা করা যাইতে পারে, কিন্তু এই শৈলদুর্গের শোভা বর্ণনাতীত, প্রাচীনকালে নগররক্ষার জন্য স্বতন্ত্র দুর্গ নির্ম্মিত

* J. R. A. S. 1909-10 দ্রষ্টব্য।

না হইয়া, দক্ষিণাপথের অনেক স্থানে যে পদ্ধতিতে মন্দির নির্ম্মিত হইত, রঙ্গনাথের মন্দির সেই শ্রেণীর। মন্দিরের সদর দরজা দিয়া প্রবেশ করিয়া বেষ্টনের পর বেষ্টন অতিক্রম করিয়া দেবমন্দিরে পঁহুছিতে হয়। এক, দুই, তিন, চারি করিয়া জাতিবিভাগ ও শ্রেণীবিভাগ অনুসারে বেষ্টনের পর বেষ্টনে বিবিধ জাতির লোক তাহাদের ব্যবসা বাণিজ্য করিতেছে, এবং কেন্দ্রস্থলে দেবতা অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। কেহ নগরাক্রমণ করিলে দশ বার হাজার বা অধিক সংখ্যক নগরবাসী যাহাতে মন্দিরের প্রাচীরের আবরণে প্রায় এক বৎসরকাল বাস করিতে পারে, এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া বিস্তীর্ণ মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। দেশের প্রজা এবং অন্য স্থানের যাত্রী কর্ত্তৃক উপহৃত অর্থ কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত দেবমন্দির নিকটে একটি গভীর এবং বিস্তীর্ণ কূপে নিক্ষিপ্ত হইত; প্রয়োজনের সময়ে রাজা আসিয়া দেবতার নিকট হইতে অর্থ ধার করিয়া লইতেন। বহির্ভাগের সৌন্দর্য্যে কুম্ভকোনম্ ও মাদুরার মন্দির, শ্রীরঙ্গম এর মন্দির হইতে উৎকৃষ্টতর; রামেশ্বরের মন্দিরাভ্যন্তরস্থ খিলানের গৌরবও রঙ্গনাথের মন্দিরে নাই; কিন্তু তবুও ইহার সৌন্দর্য্য দেখিয়া সকলকেই মুগ্ধ হইতে হয়।

ত্রিচিনাপল্লীর শৈলমন্দির

দুর্গরূপে পরিণত শৈলমন্দিরটি যে কি অপূর্ব্ব তাহা কেমন করিয়া বুঝাইব? একটা বড় রকমের পাহাড় এমন ভাবে কাটিয়া কাটিয়া মন্দিরমালায় পরিণত করা হইয়াছে যে, সেটা মন্দির কি পাহাড়, তাহা বুঝিবার উপায় নাই। ভিতরের সিঁড়ি দিয়া উঠিবার সময় মনে হয় যে পাহাড়েই উঠিতেছি; কিন্তু যেখানেই উঠি, সেখানেই দেখি যে আমরা মন্দিরের মধ্যেই দাঁড়াইয়া আছি।

প্রাচীনকালের নগরীর স্থলে এখন নূতন নগরী বসিয়াছে; লোকসংখ্যা বাড়িয়াছে; ব্যবসা বাণিজ্যও বাড়িয়াছে। এখন ত্রিচিনাপল্লী লক্ষাধিক অধিবাসী লইয়া একটি জেলার সদর ষ্টেসন হইয়া দাঁড়াইয়াছে; এখন মাদুরার পাণ্ডা-রাজাদিগের রাজত্ব বিস্মৃতপ্রায় হইয়াছে। পাণ্ডারাজাদিগের শেষ সময়ের যে রাজপ্রাসাদ এখনও প্রাচীন হিন্দু-শিল্পের গৌরবের সাক্ষী, তাহার কারুকার্য্যের অনুরূপ অনেক প্রস্তর-শিল্প শ্রীরঙ্গম্-মন্দিরের প্রবেশদ্বারে দেখিতে পাওয়া যায়। তাঞ্জোরের সুপ্রসিদ্ধ প্রাসাদ মাদুরার রাজ-প্রাসাদের অনুকরণে নির্ম্মিত; মাদুরার এই প্রাচীন কীর্ত্তি যাত্রিগণের দর্শনীয় বস্তুরূপে রক্ষিত হওয়া উচিত ছিল; কিন্তু জানি না, কি বিবেচনায় ব্রিটিশ গভর্মেণ্ট এই প্রাচীন স্মৃতির মন্দিরে জজসাহেবের কাছারি বসাইয়াছেন। প্রাচীন কীর্ত্তি স্মরণ করিয়া যখন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিবারই ব্যবস্থা আছে, তখন রাজপুরুষদিগের নূতন ব্যবস্থা উপলক্ষে না হয় একটা বেশি দীর্ঘশ্বাস ফেলিলাম। বোঝার উপর শাকের আটিতে আমাদের আর আপত্তি কি?

দীর্ঘনিঃশ্বাস না ফেলিয়া বরং একটু আধটু গান বাজনা

শ্রীরঙ্গমন্দিরের প্রবেশদ্বার

মকর বা মাঘ মাস ভারতবর্ষে বিবাহের জন্য বড় প্রশস্ত। প্রাচীন বৈদিক যুগে উত্তরায়ণ আরম্ভ হইলেই, উপনয়ন বিবাহ প্রভৃতির শুভ সময় উপস্থিত হইত; এই জন্য বাঙ্গলা হিসাবের ১১ই পৌষ হইতে ১০ই আষাঢ় পর্য্যন্ত সকল শুভকার্য্য সম্পন্ন হইত, এবং দক্ষিণায়ণের আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত সমগ্র কাল অশুদ্ধ বিবেচিত
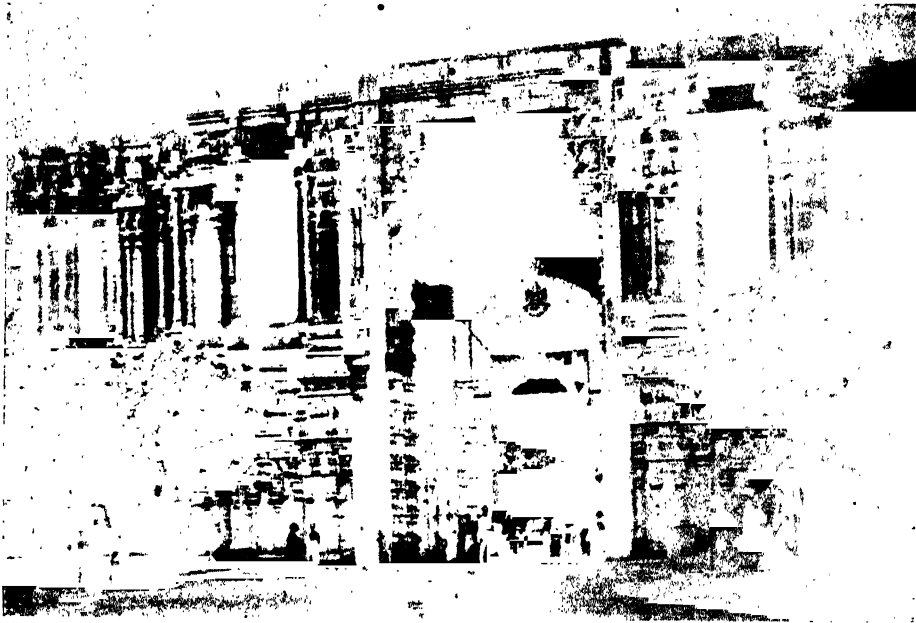
শোনা ভাল, মনে করিয়া মাদুরায় যে ব্যবস্থা করিয়াছিলাম, ত্রিচিনাপল্লীতেও সেই ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল। বর্ণনা করিতে পারিবনা বলিয়াও মন্দিরাদির সম্বন্ধে একটু আধটু বর্ণনা বরং করিয়াছি; কিন্তু এ দেশের সঙ্গীতের বর্ণনা কেমন করিয়া করিব? অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে হয়ত স্বরলিপি দ্বারা গান বুঝান যায়, কিন্তু অতি বাল্যকাল হইতেই দেবী বীণাপাণি আমাকে বেত্রাঘাতই করিয়াছেন; বীণায় ঝঙ্কার দিতে শেখান নাই। আমার কণ্ঠে গান গাহিবার উপযোগী স্বর নাই; কাণেও সুর ধরিবার উপযুক্ত কোন ব্যবস্থা নাই। তবে মাদুরা, তাঞ্জোর প্রভৃতি স্থানের গান শুনিয়া এইটুকু বুঝিলাম যে, হিন্দুর প্রাচীন ধরণের গীতি দক্ষিণাপথেই সুরক্ষিত আছে। গানে বেজায় কেকানি ও নাকীসুর বড় নাই; আর তাহা ছাড়া কোন কোন গানের সুরে বেশ জোর আছে বলিয়া অনুভব করিলাম। খৃষ্টোত্তর সপ্তম শতাব্দী হইতে আর্য্যাবর্ত্ত বিদেশীয়দিগের আক্রমণে ক্রমাগত পরিবর্ত্তিত হইতে হইতে খাট প্রাচীন কালের অনেক চিহ্নই হারাইয়াছে, কিন্তু বিদেশের সংস্পর্শ তেমন অধিক হয় নাই বলিয়া হিন্দুকীর্ত্তি দক্ষিণাপথেই অধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়।

হইত। আর্য্যাবর্ত্তে এ নিয়মের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে; কিন্তু দক্ষিণাপথে অংশতঃ এই নিয়মই রহিয়া গিয়াছে। আর্য্য অনার্য্য সকল জাতির মধ্যেই মকর ও কুম্ভ মাসে (মাঘ ও ফাল্গুনে) বিবাহ অনুষ্ঠান অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে।

ভারতবর্ষ পৃথিবীর সংক্ষিপ্তসার (epitome) বলিয়া বর্ণিত হয়। এ কথাও অনায়াসে বলা যাইতে পারে যে, দক্ষিণাপথ প্রাচীনকালের বহু শ্রেণীর আচার অনুষ্ঠানের মিউজিয়ম্ বা কৌতুকাগার। আমাদের পণ্ডিত পাঠকেরা সমাজবিজ্ঞান গ্রন্থে বিবাহের ক্রমবিকাশের যে সকল বিচিত্র স্তরের কথা পড়িয়া থাকেন, এদেশের অনেক সমাজের মধ্যেই তাহা সুস্পষ্ট লক্ষ্য করিতে পারা যায়। পিশাচ-রাক্ষস বিবাহের দৃষ্টান্ত ত আছেই, তাহা ছাড়া বিবাহের যে সকল অনুষ্ঠান ঐ প্রথার অভিব্যক্তির প্রথম স্তরে লক্ষিত হইবার কথা, সে সকল অনুষ্ঠানও দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমতঃ বৈবাহিক মিলনে যে কোন প্রকার অনুষ্ঠানই ছিল না, এবং তাহার পরে যে সকল অনুষ্ঠানের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা যে কেবলমাত্র নূতন সম্বন্ধজ্ঞাপক এবং স্ত্রীপুরুষের পরস্পরের ভবিষ্যৎ কর্ত্তব্যজ্ঞাপক

সাধারণ অনুষ্ঠান মাত্র, তাহা এখনও অনেক জাতির বিবাহ-পদ্ধতিতে দেখিতে পাওয়া যায়। স্পেনসার, লাবক্ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত দৃষ্টান্ত পড়িয়া, এ সকল কথা কেবল তোতা পাখীর মত মুখস্থ না করিয়া এ দেশের জীবন্ত দৃষ্টান্ত হইতেও পণ্ডিতদিগের উপপত্তি সুবিচারিত হইতে পারে।

দক্ষিণাপথের ব্রাহ্মণেরা যেমন আর্য্যভাষা ত্যাগ করিয়া দ্রবিড় ভাষা অবলম্বন করিয়াছেন, তেমনই বিবাহের অনুষ্ঠান প্রভৃতিতেও অনেক দ্রবিড়জাতির প্রথা-পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন। দ্রবিড় জাতীয়েরাও অনেক ব্রাহ্মণ্য প্রথা গ্রহণ করিতে ছাড়ে নাই। তামিল ব্রাহ্মণদিগের বিবাহে গায়ে হলুদ, জলসাধা, সপ্তপদী-গমন, হোম প্রভৃতি ত আছেই; তাহা ছাড়া অনেক অনার্য্য রীতিও দেখিতে পাওয়া যায়। দক্ষিণাপথের আর্য্যেতর জাতির মধ্যে মাতুলকন্যা বিবাহ এমনই প্রশস্ত যে, মাতুলকন্যা থাকিতে অন্য কাহাকেও বিবাহ করা গর্হিত বিবেচিত হয়; সে কন্যা বয়সে অনেক বড় হইলেও, অনেককে বাধ্য হইয়া তাহাকেই বিবাহ করিতে হয়, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়েরাও দক্ষিণাপথে গিয়া বহু পূর্ব্বকাল হইতেই মাতুলকন্যা বিবাহের চলন করিয়া লইয়াছেন। অতি প্রাচীন

মাদুরা প্রাসাদ
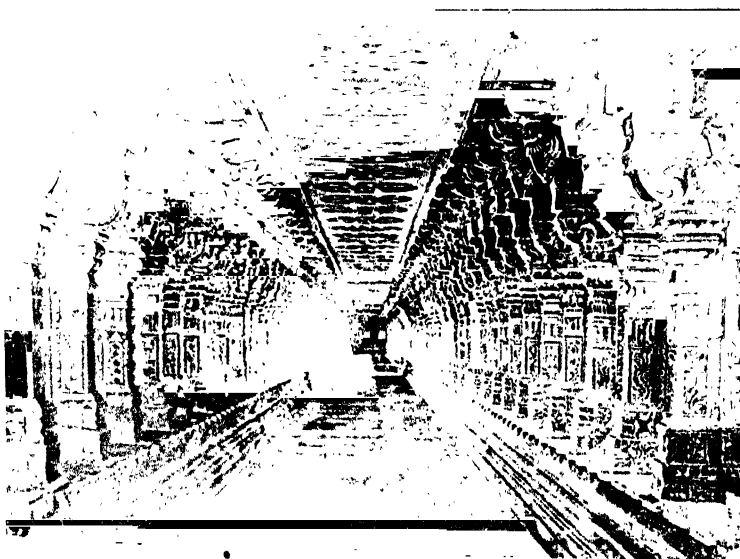
কালের স্মৃতিতেও এই দাক্ষিণাত্য নিয়ম দক্ষিণদেশে শুদ্ধ বলিয়া লিখিত হইয়াছিল। সকল দ্রবিড় জাতীয় লোকেরাই বিবাহের সময় যেরূপ কন্যার গলায় বৃত্ত, বা তালি নামক সূতা বাঁধিয়া দেয়, ব্রাহ্মণাদির বিবাহেও সেইরূপ সূত্র-বাঁধা প্রচলিত হইয়াছে।

তামিল ব্রাহ্মণ-বর যখন বিবাহ-সভায় আসেন, তখন তাঁহাকে তাঁহার উত্তরীয়-প্রান্তে আতপ চাউল প্রভৃতি বাঁধিয়া আনিতে হয়; হাতে তাল-পাতার পুঁথি আনিতে হয়। বৈদিক যুগে ব্রাহ্মণদিগকে বিবাহের পূর্ব্বে স্নাতক থাকিতে হইত; এ প্রথা

রামেশ্বর মন্দির

হয়ত উহারই অভিনয়। বিবাহ-সভায় আসিয়া বরকে বলিতে হয়— "আমি সংসার ধর্ম্ম করিব না; বিদ্যাভ্যাসের জন্য কাশীযাত্রা করিতেছি।" তখন কন্যার পিতা আসিয়া বলেন যে, কাশী গিয়া কাজ নাই; তিনি তাঁহার কন্যাটি দান করিতেছেন, এবং সে তাঁহার সাংসারিক সুখের সুবিধা করিয়া দিবে। কাশীযাত্রার নামই থাকুক, কিংবা আর যাহাই থাকুক, ঐ প্রথা যে বৈদিক কোন অনুষ্ঠানের ছায়া নহে, তাহা প্রাচীন গৃহ্যসূত্র এবং অন্যান্য স্মৃতিগ্রন্থ হইতেই বুঝিতে পারা যায়। ব্রাহ্মণদিগের প্রতিবাসী পল্লন্ জাতির মধ্যেও এইরূপ বৈরাগ্যের ভাণ করিবার প্রথা আছে। নেল্লোর জেলার বড় জাতির

তামিল মহিলা

কোঙ্কন ব্রাহ্মণ

মধ্যে বরের রাগের ছল করিয়া বিবাহ-সভা হইতে চলিয়া যাওয়া, এবং কন্যাপক্ষ কর্ত্তৃক ফিরাইয়া আনা প্রচলিত আছে। গঞ্জামের কন্দ জাতি হইতে আরম্ভ করিয়া মাদুরা জেলার অনেক জাতির মধ্যেও এই প্রথা প্রচলিত আছে যে, বর ও কন্যাকে বিবাহ-সভায় আপন আপন মাতুলের কাঁধে চড়িতে হয়। ঐরূপ তামিল ব্রাহ্মণদিগের বর-কন্যাকেও তাঁহাদের নিজ নিজ মাতুল কাঁধে লইয়া বিবাহ-সভায় নাচিয়া থাকেন। যেখানে মাতুলই শ্বশুর, সেখানে মাতুলের কোন ভ্রাতা "মামা ঘোড়া" হইয়া থাকেন।

বিবাহের আর একটি প্রথা বড়ই: কৌতুকাবহ। কন্যা কৃত্রিম রূপে বালকের বেশ পরিধান করে, এবং তাহার এক জন সঙ্গিনী বিবাহের কন্যা সাজিয়া আসে। বর যখন বিবাহের জন্য উপস্থিত হ'ন, তখন পুরুষ-বেশধারিণী কন্যা কড়ামেজাজী স্বরে তাঁহাকে নানারূপ তিরস্কার করিতে থাকে, এবং তাঁহাকে চোর বলিয়া সাব্যস্ত করে। বালক বেশধারিণীর সহচরী তখন চোরকে পাকড়াও করে, এবং সকলে এই অভিনয়ে তৃপ্তিলাভ করিলে কন্যার কৃত্রিম বেশ পরিহার করাইয়া তাহাকে শাড়ী পরান হয়, এবং কন্যার আঁচলে ও বরের উত্তরীয়-ভাগে গ্রন্থি বাধিয়া দেওয়া হয়।

বরকে চোর সাব্যস্ত করিবার প্রথা এদেশে অনেক জাতির মধ্যেই আছে। ক্ষেগ্‌গদে জাতির বিবাহে বরকে কন্যার অলঙ্কার চুরি করিয়া পালাইতে হয়, কন্যাপক্ষের লোকেরা চোরের অনুসন্ধান করিয়া বরকে ধরিয়া আনে, এবং বর বেচারা তখন সকলের সমক্ষে চুরি স্বীকার করে। বলিতে হইবেনা যে, তখন বিচারে বরকে প্রেমের কারাগারে যাবজ্জীবন বন্দী করিবার ব্যবস্থা করা হয়। এই চুরির খেলা কি প্রাণ-চুরির অভিনয়, না সত্য সত্যই প্রাচীন কালের কন্যা চুরির আনুষ্ঠানিক সূচনা?

সপ্তপদী প্রভৃতি অনুষ্ঠান শেষ হইবার পর বাসর ঘরের প্রথম ক্রীড়ার সময় তামিল-ব্রাহ্মণ-বর কন্যাকে

সম্বোধন করিয়া বিবিধ গৃহকার্য্য করিতে আদেশ দেন। কন্যা তখন কএকটি খেলার পুতুল দেখাইয়া বলেন—"আমার এত গুলি ছেলে মেয়ে; আমি ইহাদের দেখিব, না সংসারের অন্য কার্য্য করিব?" তখন খুব হাসির ধুম পড়িয়া যায়। বিবাহের অনুষ্ঠানে ভবিষ্যতের দৈনিক কর্ম্মের সূচনা করিয়া অভিনয় করিবার প্রথা বহু জাতির মধ্যে প্রচলিত আছে। পল্লি বললিয়ন্ জাতির বিবাহের একমাত্র অনুষ্ঠান এই যে, বর একখানি কোদালি লইয়া এক নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্রে কাজ করিবার ভাণ করিয়া যায় এবং কন্যা তাহার জন্য আহার লইয়া উপস্থিত থাকে। দুচারি মিনিটের মধ্যেই বর শ্রান্তির ভাণ করে, এবং কন্যা তাহার সমক্ষে আহার্য্য সামগ্রী রাখিয়া উভয়ে এক পাত্রে আহার করে। কর্ম্ম এবং মিলনের এই চিহ্ন সূচনাই বিবাহের একমাত্র অনুষ্ঠান। বিবাহে বংশ পরিবর্দ্ধন সূচনা করিয়া ব্রাহ্মণের বিবাহে যেরূপ একটি পাত্রে মৃত্তিকা এবং পঞ্চ শস্য নিক্ষেপ করিয়া শস্য অঙ্কুরিত হইলে জলে বিসর্জ্জন করিবার প্রথা আছে, সেইরূপ প্রথা অনার্য্য জাতির বিবাহেও দেখিতে পাওয়া যায়।

এই বার ব্রাহ্মণেতর কএকটি জাতির বিবাহ অনুষ্ঠানের কথা বলিব। আদিম যুগে বরকে বিবাহের পূর্ব্বে শারীরিক বলের যথেষ্ট ক্ষমতার পরিচয় দিতে হইত। পুরাকালে বাবিলন প্রভৃতি দেশে দেবমন্দিরবাসিনী যুবতীদিগের নিকট এই পরীক্ষা দিতে হইত। জয়পুরের পার্ব্বত্য জাতির মধ্যে এই পরীক্ষা ভাবীপত্নীই গ্রহণ করিয়া থাকেন। বিবাহের পূর্ব্বে যে কুর্গের বরকে এক কোপে একটি কলাগাছ কাটিতে হয়, এবং মালাবারে চেরুমনদিগের মধ্যে যে স্ত্রীলোকদিগকে লাঠি খেলায় উৎসাহিত করিতে হয়, তাহাও শারীরিক বল প্রদর্শনের দৃষ্টান্ত। মাদুরা ত্রিচিনাপল্লী প্রভৃতি স্থানে কল্লন্ নামে একটি চৌর্য্যব্যবসায়ী জাতি আছে। কল্লন্-বরকে কন্যার সমক্ষে একটি ষাঁড়ের শিঙ্গে দড়ি বাঁধিয়া টানিয়া আনিতে হয়। আমার সন্দেহ হয় যে, পূর্ণিয়া এবং ভাগলপুরের ধূর্ত্ত চোর এবং ভিক্ষুক কল্লার জাতি মূলতঃ এই দ্রবিড়ের কল্লন্ জাতি। বাঙ্গলার প্রদেশবিশেষের "কল্লা" শব্দ ঐ অর্থে সম্ভবতঃ কল্লন্ বা কল্লার জাতির নাম হইতে আসিয়াছে।

পুত্রার্থেই ভার্য্যার প্রয়োজন; কাজেই যে বিবাহে সন্তান হইল না, সে বিবাহ বিবাহই নয়। আর্য্যসমাজে পুত্র না হইলে অন্য বিবাহ করিবার ব্যবস্থা আছে। কোয়ম্বটুরের উরালি জাতির মধ্যে এই প্রথা আছে যে, বর-কন্যাকে অনেক দিনের জন্য স্থানান্তরে লুকাইয়া থাকিতে হয়, এবং সন্তান জন্মিবার পর তাহারা ফিরিয়া আসিলে বিবাহ হয়। তঙ্গলাল্ জাতির বর-কন্যা আপনাদের গৃহেই একসঙ্গে বাস করে; এবং সন্তান-জন্মের পর বর কন্যার গলায় তালি সূত্র বাঁধিয়া দিয়া বিবাহ-অনুষ্ঠান শেষ করে। উরালি জাতির মধ্যে কন্দদিগের বিবাহের মত কৃত্রিম যুদ্ধের অভিনয়ও আছে। বরকে কন্যা চুরি করিয়া পালাইতে হয় এবং কন্যাপক্ষের লোকদিগকে কৃত্রিমভাবে 'ধর ধর' বলিয়া পিছু পিছু ছুটিতে হয়। শুনিয়াছি যে, কোন কোন জাতির এই কৃত্রিম যুদ্ধে অনেককে অল্পাধিক পরিমাণে আহত হইতে হয়। এদেশের বিবিধ জাতির বিবাহ-বৈচিত্র্যের সকল কথা একটি প্রবন্ধে লেখা অসম্ভব। পাঠকদিগের জানিবার জন্য কৌতূহল হইলে এ সম্বন্ধে অনেক কথা পরে শুনাইব।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

বুদ্ধগয়া।

গয়া ষ্টেসন হইতে সাত মাইল দূরবর্ত্তী বোধগয়া বা উরুবেল গ্রাম ভারতবর্ষের মধ্যে বৌদ্ধগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুণ্যক্ষেত্র। এই স্থানে ন্যূনাধিক সার্দ্ধদ্বিসহস্র বর্ষ পূর্ব্বে মানব জগতের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সর্ব্বত্যাগী শাক্যরাজকুমার সম্যক্ সম্বুদ্ধ হইয়াছিলেন। অশেষ যাতনা সহ্য করিয়া,

বুদ্ধদেব

সহস্র প্রলোভন অতিক্রম করিয়া তিনি যে জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, তাহাই এখনও মানবজাতির তৃতীয়াংশের আরাধ্য। তিনি যে আসনে বসিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন তাহা বজ্রাসন নামে অভিহিত। যে অশ্বত্থ বৃক্ষতলে বজ্রাসন স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা জগতে মহাবোধিদ্রুম নামে বিখ্যাত ও সেই অবধি প্রাচীন উরুবিল্ব এবং বর্ত্তমান উরুবেলা ভারতবর্ষে মহাবোধি আখ্যা লাভ করিয়াছে। খৃষ্টীয় ১৯শ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগ সৃষ্টির পূর্ব্বে স্বর্গগত প্রত্নতত্ত্ববিদ্ সার আলেক্‌জাণ্ডার কানিংহাম দক্ষিণ মগধের গ্রাম্য কৃষকবর্গের নিকট বোধগয়ার পরিবর্ত্তে মহাবোধি নাম শ্রবণ করিয়া গিয়াছিলেন। খৃষ্টাব্দের আরম্ভ হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত যতগুলি খোদিত-লিপি বোধগয়ায় উৎকীর্ণ হইয়াছে তাহার অধিকাংশেই মহাবোধি নাম পাওয়া গিয়াছে।

চীন দেশীয় পরিব্রাজক হিওয়েনচঙ্গ—মহাবোধির প্রাচীন ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন যে, মৌর্য্য-সম্রাট্ অশোক মহাবোধিতে প্রথম বিহার বা মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছিলেন। খৃষ্টাব্দের দেড়শতবর্ষ পূর্ব্বে মহাবোধি বিহারের আকার যে অন্যরূপ ছিল তাহা স্বতন্ত্র প্রমাণ হইতে স্থিরীকৃত হইয়াছে। মধ্য-প্রদেশের নাগোড় করদরাজ্যের অন্তর্বর্ত্তী ভরহুত নামক একটি ক্ষুদ্র গ্রামে খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর একটি বৌদ্ধস্তূপের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই স্তূপের বেষ্টনীর স্তম্ভ সমূহে নানাবিধ খোদিত চিত্র আছে। তন্মধ্যে তৎকালীন মহাবোধি বিহার ও ধর্ম্মচক্রবিহারের চিত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই চিত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সে সময়ে বোধিদ্রুমের নিম্নে অবস্থিত বজ্রাসনই তীর্থযাত্রিগণের উপাস্য বস্তু ছিল; মূর্ত্তিপূজা তখনও আরম্ভ হয় নাই। বোধিদ্রুমের চতুষ্পার্শ্বে স্তম্ভোপরি স্থাপিত দ্বিতল পাষাণ-নির্ম্মিত গৃহ ছিল এবং এই গৃহের তোরণের সম্মুখে অশোক কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত স্তম্ভ সমূহের ন্যায় একটি শিলাস্তম্ভ ছিল। অশোকের স্তম্ভ সমূহের উপরে যেমন সিংহ, বৃষ প্রভৃতি নানাবিধ জীব জন্তুর মূর্ত্তি স্থাপিত হইত, সেইরূপ ইহার উপরেও একটি হস্তীর মূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছিল। ইহা যে মহাবোধির চিত্র সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই; কারণ, তোরণের উপরে বড় বড় অক্ষরে লিখিত আছে "ভগবতো সকমুনিনো বোধো" ভগবান্ শাক্যমুনির বোধি। মহাবোধিতে বর্ত্তমান মন্দির কোন্ সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহা নির্ণয় করিবার কোন উপায় নাই। সার আলেক্‌জেণ্ডার কানিংহামের মতানুসারে ইহা শকাধিকার-কালে শকরাজগণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল; কিন্তু তাঁহার উক্তির যাথার্থ্য

প্রমাণ করিবার কোন উপায় নাই। মন্দিরটি ইষ্টক-নির্ম্মিত এবং এক-কালে ইহা ত্রিতল ছিল। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে মন্দির-সংস্কারকালে ত্রিতলের কক্ষটির প্রবেশ-দ্বার বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। নানা সময়ে মন্দিরটি সংস্কৃত হইয়াছিল। মুসলমান বিজয়ের পরে ব্রহ্ম-দেশের কএকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আসিয়া খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর
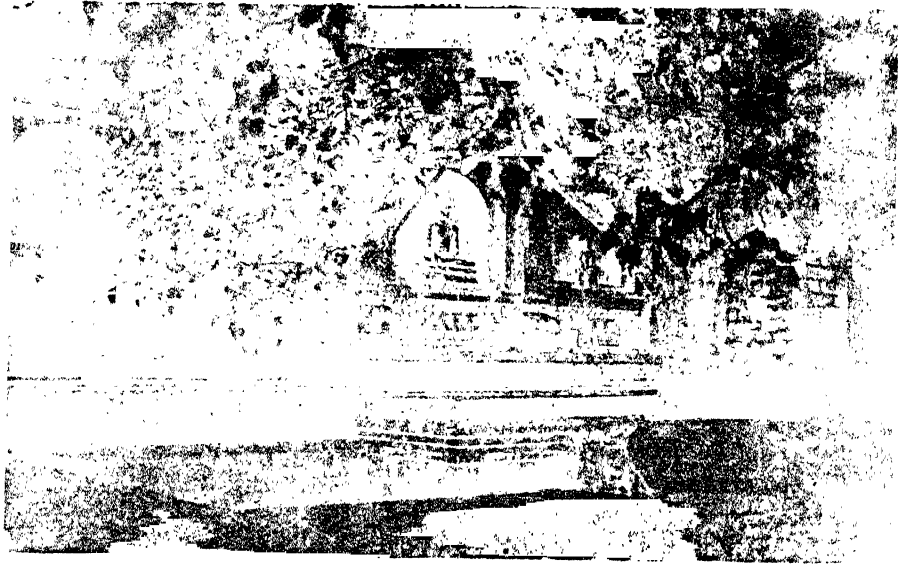
বজ্রাসনে সম্বুদ্ধ
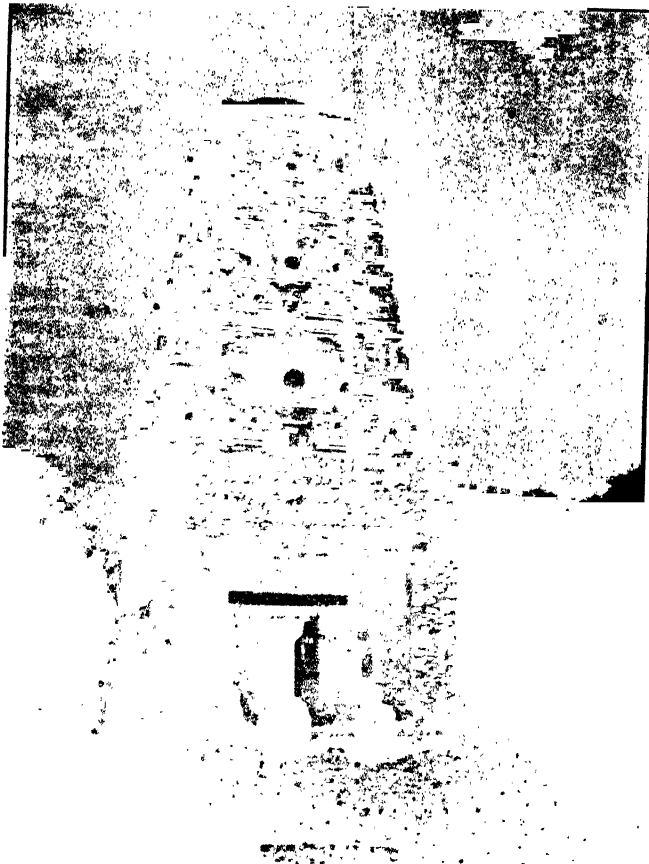
মধ্যভাগে মন্দিরের শেষ সংস্কার করিয়াছিলেন। চৈতন্যের আবির্ভাবের পরে গৌড়ীয় বৌদ্ধগণ যেমন বৈষ্ণবধর্ম্মের আশ্রয়লাভ করিয়াছিলেন মগধে সেরূপ হইতে পায় নাই। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ হইবার পূর্ব্বেই মগধের বৌদ্ধধর্ম্ম-মগধেই বিলুপ্ত হইয়াছিল। দুই তিন শত বৎসর কাল মহাবোধি জনশূন্য অবস্থায় পতিত ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে দশনামিক সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের গিরি-উপাধিধারী একদল সন্ন্যাসী মহাবোধিতে আসিয়া মঠ-স্থাপনা করেন। ক্রমে স্থানীয় জমিদারগণের নিকট হইতে ভূসম্পত্তি লাভ করিয়া মঠবাসিগণ মহাবোধির চতুষ্পার্শস্থিত ভূখণ্ডের অধিকারী হইয়াছিলেন। মোগল বাদশাহগণও তাঁহাদিগকে ভূমিদান করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে বুদ্ধগয়া মঠের মহান্ত গয়াজেলার একজন প্রধান ভূম্যধিকারী। তিনি মহাবোধি মন্দিরের অধিকারী। মন্দিরে হিন্দু ও বৌদ্ধের সমান অধিকার; ভিন্ন ভিন্ন মতানুযায়ী পূজায় কোন আপত্তি নাই। বর্ত্তমান মহান্ত কৃষ্ণদয়াল গিরি নেপালদেশীয় ব্রাহ্মণ-বংশজাত, সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপন্ন,

মহাবোধি-মন্দির

পাওয়া যায় যে, চতুষ্পার্শ্বস্থিত ভূখণ্ড অপেক্ষা পঞ্চাশৎ হস্ত উচ্চ মৃৎপিণ্ডের উপরে গ্রামটি নির্ম্মিত হইয়াছে। এই বৃহৎ মৃৎপিণ্ডটি প্রাচীন মহাবোধির ধ্বংসাবশেষ। ইহার কিয়দংশ খনন করিয়া মহাবোধি মন্দিরের প্রাচীর এবং নিম্ন তল আবিষ্কৃত হইয়াছে। গয়ার পথ ডাক বাঙ্গলার সম্মুখে আসিয়া শেষ হইয়াছে, এই স্থান হইতে সোপানাবলী অবলম্বন করিয়া অবতরণ করিলে মন্দির-প্রাঙ্গণে উপস্থিত হওয়া যায়। বর্ত্তমান সময়ে মন্দির প্রাঙ্গণটিকে পুষ্পোদ্যানে পরিণত করা হইয়াছে। শীত কালে স্থানটি বড়ই মনোরম হইয়া থাকে। বাঙ্গালা গভর্মেণ্টের আদেশে মহাবোধি মন্দির সংস্কৃত হইয়াছে। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে সংস্কার-কার্য্য আরব্ধ হইয়া ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে শেষ হইয়াছিল। প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের সহকারী অধ্যক্ষ মৃত জে, ডি, এন্ বেগ্লার সংস্কার কার্য্যের অধ্যক্ষতা করিয়াছিলেন। মন্দিরের প্রাঙ্গণ খননকালে দুই একটি প্রস্তর-নির্ম্মিত ক্ষুদ্র মন্দির আবিষ্কৃত হইয়াছিল। তদনুসারে মন্দিরের বহির্দ্দেশও আমল নির্ম্মিত হইয়াছে। মন্দিরের একটি মাত্র প্রবেশদ্বার আছে, মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রথম গৃহের উভয় পার্শ্বে দ্বিতলে উঠিবার দুইটি সোপান আছে, এই গৃহের আচ্ছাদনের প্রস্তর সমূহে খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ শতাব্দীর বৌদ্ধ তীর্থযাত্রিগণের খোদিত লিপি দেখিতে পাওয়া যায়, এই গৃহের প্রান্তে মন্দিরের গর্ভগৃহের দ্বার; মন্দিরের অভ্যন্তরটি অত্যন্ত অন্ধকার, সম্মুখে পাষাণ-নির্ম্মিত সুবৃহৎ বেদি এবং বেদির উপরে প্রস্তর-নির্ম্মিত সিংহাসনোপরি উপবিষ্ট ভূমিস্পর্শ মুদ্রাস্থিত বুদ্ধ-মূর্ত্তি। বেদির উপরে বর্ত্তমান যুগের তীর্থ যাত্রিগণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত শ্যাম ও ব্রহ্মদেশীয় বুদ্ধমূর্ত্তি রক্ষিত আছে। গর্ভ-গৃহের প্রাচীরে তিব্বত ও চীন দেশীয় নানা বিধ বর্ণের মন্ত্রপূত পতাকা লম্বিত আছে। অনেকের ধারণা আছে যে, মহাবোধি মন্দির-মধ্যে প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধমূর্ত্তিও

উদারচেতা এবং তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন। মৃত রামানুগ্রহ নারায়ণ সিংহ বুদ্ধগয়া মঠের একখানি ইতিহাস সঙ্কলন করিয়াছেন।

প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সৃষ্টির পূর্ব্ব হইতেই মহাবোধি নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া বোধগয়া আকার ধারণ করিয়াছে। স্বর্গীয় ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র নামটি শুদ্ধ করিয়া লইয়া বুদ্ধ-গয়া নামের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, এখনও ইহা বোধগয়া নামে পরিচিত। বোধগয়াতে একটি ডাকঘর, একটি ডাক-বাঙ্গলা, বৌদ্ধতীর্থযাত্রিগণের জন্য একটি অতিথিশালা এবং মঠে হিন্দু ও বৌদ্ধ সকল জাতির জন্যই মহান্তগণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি সুবৃহৎ ধর্ম্মশালা আছে। গয়া নগর অতিক্রম করিয়া অক্ষয়বট ও প্রপিতামহেশ্বর-মন্দিরের নিকটবর্ত্তী হইলেই মহাবোধির বর্ত্তমান মন্দিরের উচ্চচূড়া নয়নগোচর হয়। বোধগয়া গ্রামে প্রবেশ করিলে দেখিতে

আধুনিক অথবা চীন, বা জাপান হইতে আনীত। সামান্য চেষ্টা করিলে সকলেই দেখিতে পাইবেন যে, সিংহাসনের উপরে তিন ছত্রে একটি খোদিত লিপি আছে, তাহা হইতে জানা যায় যে, এই মূর্ত্তি ও সিংহাসন ছিন্দবংশীয় জনৈক রাজার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মূর্ত্তি এবং সিংহাসন বুদ্ধগয়ার মঠমধ্যে খনন কালে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। মহাবোধি মন্দির-স্থিত বুদ্ধমূর্ত্তি বৌদ্ধ জগতের সর্ব্বত্রই আদৃত ও পূজিত হইয়া থাকে। এইস্থানে প্রাচীন কালে শিল্পিগণ মন্দির মধ্যস্থিত মূর্ত্তির প্রতিকৃতি পাষাণে এবং মৃত্তিকায় নির্ম্মাণ করিয়া তীর্থযাত্রিগণকে বিক্রয় করিত।

পৃথিবীর নানাস্থানে এইরূপ পাষাণময়ী ও মৃন্ময়ী প্রতিকৃতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ব্রহ্মদেশে আবিষ্কৃত কতকগুলি মৃন্ময়ী প্রতিকৃতি কলিকাতার সরকারী চিত্রশালায় রক্ষিত আছে। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদেও ইহার কতকগুলি সংগৃহীত হইয়াছে। ঢাকার হেরাল্ড পত্রিকার কার্য্যালয়ে একটি পাষাণময়ী প্রতি-কৃতি রক্ষিত আছে। ইহার বর্ত্তমান অধিকারী সুধীবর শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেনের নিকট হইতে জানিতে পারিয়াছি যে, মূর্ত্তিটি রামপালের নিকটবর্ত্তী কোন স্থান হইতে আনীত হইয়াছিল, মন্দিরের চূড়ার ভাব দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, ইহা মহাবোধি মন্দিরের প্রতিকৃতি। মন্দির মধ্যস্থিত বুদ্ধমূর্ত্তি ধ্যানমগ্ন, মহাবোধি মন্দিরের বর্ত্তমান মূর্ত্তির ন্যায় ভূমিস্পর্শমুদ্রাস্থিত নহে। ভূমিস্পর্শ-মুদ্রা এবং ধ্যানমগ্ন-মুদ্রার মধ্যে প্রভেদ এই যে, ভূমিস্পর্শ-মুদ্রার মূর্ত্তির দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলিগুলি ভূমিস্পর্শ করিয়া থাকে এবং বাম হস্ত ক্রোড়ে নিক্ষিপ্ত থাকে; কিন্তু ধ্যান-মুদ্রায় উভয় হস্তই অঙ্কে সংস্থাপিত থাকে। মন্দিরের দ্বিতলে উঠিবার যে দুইটি সোপানশ্রেণী আছে, তাহার মধ্যস্থলে এক একটি দণ্ডায়মান বুদ্ধমূর্ত্তি আছে। দক্ষিণ দিকের সোপানে যে বুদ্ধমূর্ত্তিটি স্থাপিত হইয়াছে তাহা খৃষ্টীয় দশম বা একাদশ শতাব্দীতে সমতটবাসী স্থবির বীরেন্দ্র ভদ্র নামক জনৈক ব্যক্তি কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই মূর্ত্তির পার্শ্বে একটি শ্লোক উৎকীর্ণ আছে।

মন্দিরস্থিত বুদ্ধমূর্ত্তি

"অনেন শুভমার্গেন প্রবিষ্টো লোকনায়কঃ
মোক্ষমার্গপ্রকাশকঃ॥"

দ্বিতলে মন্দির মধ্যে বুদ্ধের একটি মন্দির আছে। মহান্তের অনুচরগণ যাত্রিগণকে বলিয়া থাকে যে, এটি বুদ্ধের মাতার মূর্ত্তি। মহাবোধি-মন্দিরের বহির্দ্দেশে যেখানে স্থান আছে সেই স্থানেই বুদ্ধ বা বোধিসত্ত্ব মূর্ত্তি অথবা চৈত্য স্থাপিত হইয়াছে। মন্দিরের গাত্রে মূর্ত্তি বা চৈত্যসমূহ শোভা বর্দ্ধন না করিয়া শোভা হানি করিতেছে। মন্দিরের পশ্চাদ্-ভাগে মহাবোধিদ্রুম এবং বজ্রাসন অবস্থিত। বোধিদ্রুম একটি নাতিবৃহৎ অশ্বত্থবৃক্ষ; ইহা মূল বোধিবৃক্ষের একটি বংশধর। মূল বোধিবৃক্ষ সম্রাট্ অশোক কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়াছিল। নয়শত বৎসর পরে গৌড়ের রাজা শশাঙ্ক নরেন্দ্র গুপ্ত আর একবার বোধিবৃক্ষ নষ্ট করিয়াছিলেন। কানিংহাম যে বোধিবৃক্ষ দেখিয়াছিলেন তাহা মন্দির

বুদ্ধমূর্ত্তি ধর্ম্মপাল কর্ত্তৃক আনীত

উপরে একটি প্রস্তর-নির্ম্মিত বুদ্ধমূর্ত্তি আছে, ব্রহ্ম ও তিব্বত দেশীয় বৌদ্ধ তীর্থযাত্রিগণ কর্ত্তৃক সুবর্ণবর্ণে রঞ্জিত হইয়া ইহা এক্ষণে অতি ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছে। বজ্রাসনের উপরিস্থিত প্রস্তর খণ্ড খৃষ্টীয় প্রথম বা দ্বিতীয় শতাব্দীর অক্ষরে লিখিত একটি খোদিত লিপির কিয়দংশ দেখিতে পাওয়া যায়। বজ্রাসনের নিম্নে ও মন্দির মধ্যস্থিত মূর্ত্তির সম্মুখে উপাসকগণের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক হইয়া থাকে। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে পৌষ মাসে আমি একজন তিব্বত দেশীয় শ্রমণকে বোধিবৃক্ষতলে বসিয়া প্রত্যহ একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ পাঠ করিতে দেখিতাম। তাঁহাকে পুস্তকের নাম জিজ্ঞাসা করায়, তিনি যাহা উত্তর দিয়াছিলেন, তাহা মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ পি এচ্ ডি মহাশয়কে দেখাইলে জানিতে পারিয়াছিলাম যে, উহা "প্রজ্ঞা-পারমিতা হৃদয়সূত্র"। মন্দিরের দক্ষিণে একটি দীর্ঘাকার অপ্রশস্ত বেদি আছে। এই বেদির উপরে ১৯।২০টি পাষাণ নির্ম্মিত পদ্ম আছে। কথিত আছে সম্বোধি লাভ করিয়া ভগবান্ বুদ্ধ এই স্থানে চিন্তামগ্ন হইয়া পাদচারণ করিয়াছিলেন। বেদির উত্তর পার্শ্বে কতকগুলি ঘটাকৃতি স্তম্ভপাদ আছে, তন্মধ্যে একটির উপরে একটি স্তম্ভের কিয়দংশ সংস্কারের পূর্ব্বে মরিয়া গিয়াছিল। বর্ত্তমান বোধিবৃক্ষের বয়স ত্রিশ চল্লিশ বৎসরের অধিক হইবে না। বৃক্ষের চতুষ্পার্শ্বে একটি উচ্চ বেদি আছে এবং বৃক্ষের সম্মুখে একটি প্রস্তর নির্ম্মিত প্রাচীন তোরণ বিদ্যমান আছে। বৃক্ষের পশ্চাতে অর্থাৎ বোধি-বৃক্ষ এবং মন্দিরের মধ্যস্থলে বজ্রাসন স্থাপিত আছে, ইহা পাষাণ-নির্ম্মিত একটি বৃহদাকার বেদি এবং ইহার উপরিভাগ একখণ্ড বৃহৎ প্রস্তর দ্বারা আচ্ছাদিত। বজ্রাসনের

অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। এই স্তম্ভ-গাত্রে একটি যক্ষীকে দণ্ডায়মান দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ অনুমান করেন যে, বেদির উপরে পূর্ব্বে একটি আচ্ছাদন ছিল এবং উহা এই স্তম্ভ-শ্রেণীদ্বয়ের উপরে স্থাপিত ছিল। হিও য়েনচঙ্গের মতানুসারে এই আচ্ছাদনটি মৌর্য্যবংশীয় সম্রাট্ অশোক কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। যে স্তম্ভপাদগুলি অদ্যাপি বিদ্যমান আছে, সে গুলিতে অশোকের সমসাময়িক বর্ণমালার এক একটি অক্ষর উৎকীর্ণ আছে। মৃত সার আলেকজাণ্ডার কানিংহাম এই স্থানে প্রাচীন ব্রাহ্মবর্ণমালার "ও" অক্ষরটি আবিষ্কার করিয়াছিলেন, ইহা পূর্ব্বে অপর কোন স্থানে দেখিতে পাওয়া যায় নাই।

মন্দির-প্রাঙ্গণ।

বর্ত্তমান মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে স্তম্ভ-শ্রেণীযুক্ত বেষ্টনী (Railing) নির্ম্মিত হইয়াছিল, ইহার অনেক গুলিতে খোদিত লিপি আছে। অধিকাংশ খোদিত লিপি একরূপ; "আয়ায়ে কুরগিরে দানং" আর্য্যা কুরগির দান। দুইটি খোদিত লিপি উল্লেখ-যোগ্য, ইহার মধ্যে একটি এক্ষণে কলিকাতার চিত্রশালায় আছে :—'বোধিরখিতস তবপনকস দানং' তাম্রপর্ণিক অর্থাৎ সিংহলবাসী বোধিরক্ষিতের দান। দ্বিতীয়টি যে স্তম্ভগাত্রে উৎকীর্ণ আছে তাহা অতি অল্পদিন পূর্ব্বে মহান্ত কৃষ্ণ-দয়ালগিরি কর্ত্তৃক গভর্ণরকে প্রদত্ত হইয়াছে :—"রাজো ব্রহ্মমিত্রস পাজাবতি এ চাপদেবায়ে দানং" রাজা ব্রহ্মমিত্রের পত্নী চাপদেবার
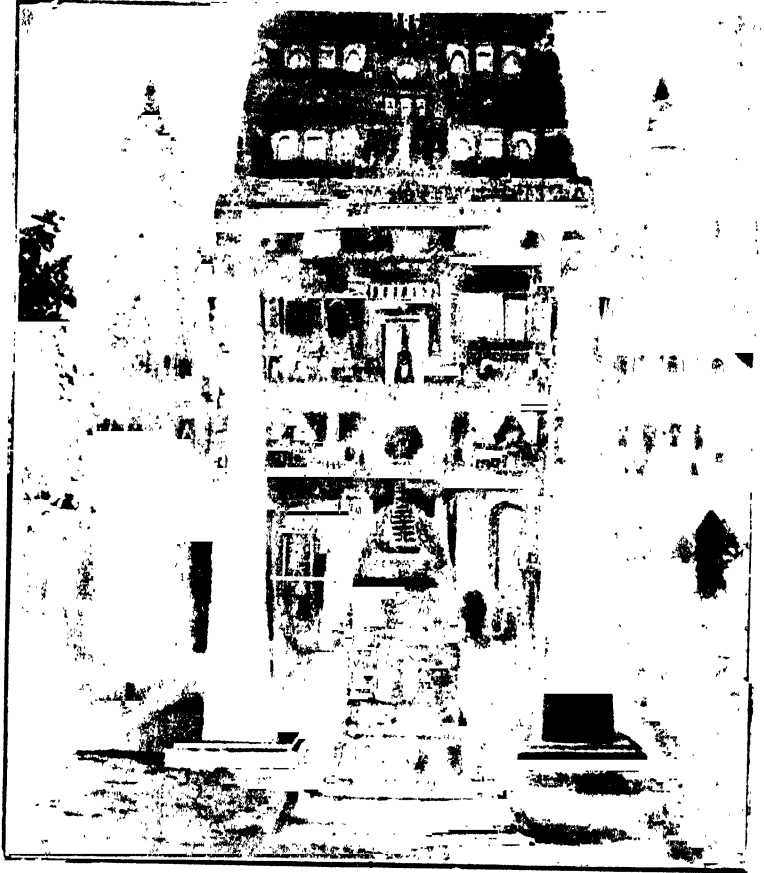
স্তম্ভশ্রেণীযুক্ত বেষ্টনী

দান। এই বেষ্টনীর অধিকাংশ স্তম্ভই স্থানচ্যুত এবং ভগ্ন হইয়াছে। বোধ-গয়া মঠের মহান্ত অতি অল্পদিন পূর্ব্বে যে স্তম্ভগুলি প্রদান করিয়াছেন, সে গুলি এখন মন্দির-প্রাঙ্গণে বেষ্টনীর ধ্বংসাবশেষের উপর স্থাপিত হইয়াছে। মন্দিরের সম্মুখে নেপাল ও তিব্বতীয় কতকগুলি ঘণ্টা আছে, সম্মুখে পাষাণ নির্ম্মিত বৃহৎ তোরণ এবং তোরণের বাম পার্শ্বে পুরাতন মহান্তগণের সমাধি। দক্ষিণ পার্শ্বে ইষ্টক নির্ম্মিত কতকগুলি ক্ষুদ্র গৃহমধ্যে পুরাতন মহান্তগণের সমাধি এবং কতকগুলি

বুদ্ধ-পুষ্করিণী

ত্রৈলোক্য-বিজয়
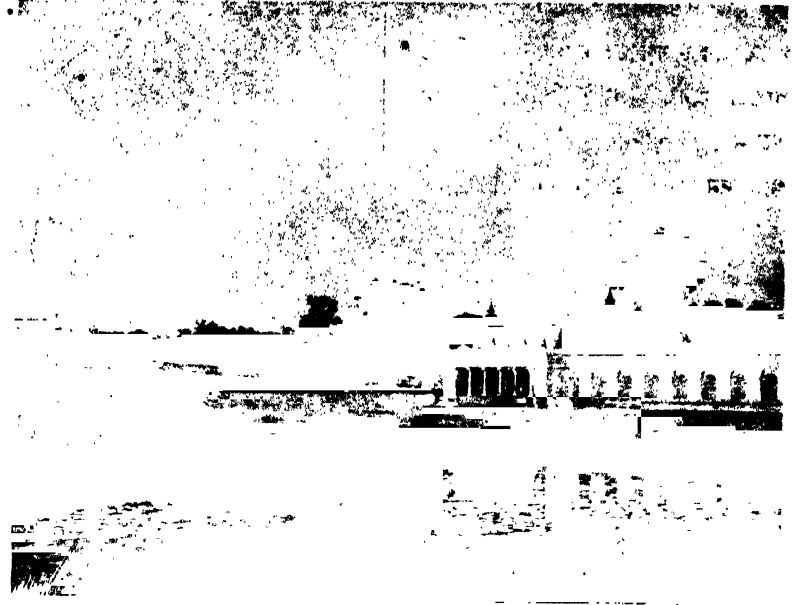
বুদ্ধমূর্ত্তি রক্ষিত আছে। একটি বুদ্ধমূর্ত্তি গৌড়ের রাজা প্রথম মহীপাল দেবের একাদশ রাজ্যাঙ্কে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বস্থিত স্থান ক্ষুদ্র বৃহৎ মন্দিরের এবং স্তূপ ও চৈত্যের ধ্বংসাবশেষে পরিপূর্ণ, চতুষ্কোণ ভিত্তিগুলি মন্দির বা বিহারের এবং গোলাকার ভিত্তিগুলি স্তূপের বা চৈত্যের ভিত্তি বুঝিতে হইবে। মন্দির-প্রাঙ্গণের দক্ষিণ দিকে একটি প্রাচীন পুষ্করিণী আছে, ইহার নাম বুধপোখর বা বুদ্ধ-পুষ্করিণী। কথিত আছে, গৌড়রাজ শশাঙ্ক নরেন্দ্র গুপ্তের মন্ত্রী এই পুষ্করিণী খনন করাইয়াছিলেন। মন্দিরের ঘাট এবং ছত্রী, ধ্বংসাবশেষ হইতে সংগৃহীত প্রস্তর খণ্ডে নির্ম্মিত।

মুসলমান বিজয়ের পরে বৌদ্ধধর্ম্মের নৈতিক অবনতি আরম্ভ হইলে, মহাবোধি বিহার নৈরঞ্জনের বালুকা-রাশিতে আচ্ছাদিত হইয়া গিয়াছিল। শত শত বৎসরের বায়ু-তাড়িত বালুকারাশি মন্দিরের নিম্নার্দ্ধ প্রোথিত করিয়া ফেলিয়াছিল। বহু পরিশ্রমে খৃষ্টীয় ১৯শ শতাব্দীর মধ্য-ভাগে বালুকারাশি খনন করিয়া মন্দিরের নিম্নদেশ ও গর্ভগৃহের উদ্ধার সাধিত হইয়াছে। মুসলমান বিজয়ের পূর্ব্বেও নৈরঞ্জনের বালুকা মহাবোধি বিহারের প্রাঙ্গণের

কিয়দংশ অধিকার করিয়াছিল। মন্দিরের সম্মুখে বালুকাস্তূপের উপরে খৃষ্টীয় একাদশ বা দ্বাদশ শতাব্দীতে মহাবোধি বিহারের অনুকরণে একটি ক্ষুদ্র মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। কানিংহামের মতানুসারে ইহা তারাদেবীর মন্দির। তারাদেবীর মূর্ত্তি বহুদিন স্থানান্তরিত হইয়া গিয়াছে, বর্ত্তমান সময়ে মন্দিরের মণ্ডপের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে কতকগুলি বুদ্ধমূর্ত্তি পতিত আছে, গর্ভগৃহের মধ্যে একটি বুদ্ধমূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে। বিগত তিনশত বৎসরের মধ্যে বুদ্ধগয়ায় যত মূর্ত্তি ও খোদিত-লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই মহান্তগণ কর্ত্তৃক মঠে সংগৃহীত হইয়াছে। যাঁহারা বোধগয়া দর্শন করিতে যাইবেন, তাঁহারা যেন মঠের অভ্যন্তর দর্শন করিতে বিস্মৃত না হন। মঠের মধ্যে বহু আশ্চর্য্যজনক বৌদ্ধমূর্ত্তি সংগৃহীত আছে। মঠের একটি তোরণের পার্শ্বস্থিত কক্ষে ত্রৈলোক্যবিজয় নামধারী একটি অদ্ভুত মূর্ত্তি রক্ষিত আছে। ইহা শৈবধর্ম্মের উপরে বৌদ্ধধর্ম্মের আধিপত্যের পরিচয়। যুগনদ্ধ হরপার্ব্বতীমূর্ত্তির উপরে চতুর্ম্মুখ অষ্টভুজ মূর্ত্তি প্রত্যালীঢ় ভাবে দণ্ডায়মান। নেপাল দেশীয় বৌদ্ধ-সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে ফরাসী পণ্ডিত ফুশে এই মূর্ত্তির ধ্যান আবিষ্কার করিয়াছেন ঃ—

পূর্ব্বোক্তবিধানেন সূর্য্যে নীলহুঙ্কারজং ত্রৈলক্যবিজয়ভট্টারকং নীলং, চতুর্ম্মুখং, অষ্টভুজং ; প্রথমমুখং ক্রোধশৃঙ্গারং, দক্ষিণং রৌদ্রং, বামং বীভৎসং, পৃষ্ঠং বীররসং ; দাভ্যাম্ ঘণ্টাবজ্রাঙ্কিতহস্তাভ্যাং হৃদি বজ্রহুঙ্কারমুদ্রাধরং, দক্ষিণত্রিকরৈঃ খড়্গাঙ্কুশবাণধরং, বামত্রিকরৈশ্চাপপাশচক্রধরং ; প্রত্যালীঢ়েন বামপাদাক্রান্ত মহেশ্বরমস্তকং দক্ষিণপাদাবষ্টব্ধ গৌরীস্তনযুগলং ; বুদ্ধস্রগ্দামমালাদিবিচিত্রাভরণধারিণং আত্মানং বিচিন্ত্য, মুদ্রাং বন্ধয়েৎ।

বৌদ্ধ তীর্থযাত্রিগণ বুদ্ধগয়ায় দেবযাত্রা শেষ করিয়া নৈরঞ্জনা তীরে ভিক্ষু ভোজন করাইয়া থাকেন। ১৯০৬

"ভগবতো সকমুনিনো বোধো"

খৃষ্টাব্দে ভামো-নিবাসী কয়েকজন আঢ্য বণিক নিজ ব্যয়ে কতকগুলি ব্রহ্মদেশীয় বৌদ্ধভিক্ষুকে আনয়ন করিয়াছিলেন, শেষ চিত্রে নৈরঞ্জনা তীরে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু-মণ্ডলীর চিত্র দেখিতে পাইবেন। মহাবোধি দর্শন করিলে বোধ হয় যে, মহাবোধি আমাদিগেরই ছিল, কিন্তু আমরা তাহা হারাইয়াছি। অদৃষ্টবশতঃ অদ্য আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষদিগের আরাধ্য বস্তু দেখিয়া আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া যাই। আমাদিগের তীর্থে বিদেশীয় তীর্থযাত্রী আসিয়া উপাসনা করিয়া যায়, এতদ্দেশবাসিগণ দূরে দণ্ডায়মান থাকে। ভারতের ধর্ম্ম ভারতবাসীর নিকট নূতন হইয়াছে। মাগধ শিল্পীর খোদিত মূর্ত্তি দেখিয়া মগধবাসী চিনিতে পারে না, বিস্মিত

নৈরঞ্জনা-তীরে ভিক্ষুমণ্ডলী

হইয়া চাহিয়া থাকে, আর মানব-জাতির তৃতীয়াংশ তাহার সম্মুখে আসিয়া নতশির হয়, কালের এমনই বিচিত্র মহিমা!

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ।

জম্মুতে বিবাহোৎসব।

বৈশাখ মাসে কলিকাতা হইতে জম্মু যাওয়া বড় সুখের যাত্রা নয়; কিন্তু কর্ত্তব্যের পালনে নিজের ইচ্ছামত সকল কাজ করিতে পারা যায় না। কলিকাতা হইতে লাহোর বারশো মাইলের উপর; লাহোর হইতে জম্মু আরও দেড়শো মাইল হইবে। পঞ্জাব মেলে হু হু করিয়া যেমন পথ কাটিয়া যায়, দেশ ও নিসর্গের বিচিত্রতাও সেইরূপ চক্ষে পড়ে। গ্রীষ্মের প্রকোপ কলিকাতায় তেমন অনুভব করিতে পারা যায় না, কিন্তু এপ্রিল মাসের শেষে মোগল-সরাই হইতে, আলিগড় পর্য্যন্ত ভয়ানক উত্তপ্ত হইয়া উঠে। ওদিকে পঞ্জাবে মে মাসের মাঝামাঝির পূর্ব্বে তেমন গ্রীষ্মাতিশয্য হয় না। রেলে যাইতে বাঁকিপুর ছাড়াইয়া যেমন যেমন সূর্য্যের উত্তাপ বাড়িতে লাগিল, অমনই গ্রীষ্মের প্রখরতা অনুভূত হইতে লাগিল। মির্জাপুর হইতে লু চলিতে আরম্ভ হইল; গাড়ীর দরজা জানেলা বন্ধ করিয়া অগ্নিকুণ্ডে বাস করিবার সুখ অনুভব করিতে লাগিলাম। একেবারে জানেলা বন্ধ করিলে বাহিরের কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না, অথচ বাহিরের মাঠ দেখিবার ইচ্ছাও প্রবল, শুধু কাচ তুলিয়া দিয়া বসিয়া দেখিতে লাগিলাম। মাঠের পর মাঠ দৃষ্টি-পথে পড়িতেছে, আবার অপসারিত হইতেছে। কোথাও গাছপালার মধ্যে গ্রাম, গ্রামে কূপ, স্ত্রীলোকেরা জল তুলি-তেছে, গ্রামপ্রান্তে গরু চরিতেছে। এলাহাবাদের কাছে দেখিলাম মহুয়া গাছের পাতা ঝরিয়া গিয়াছে, গাছে ফুল ধরিয়াছে। আরও আগে বড় চমৎকার দৃশ্য। অসংখ্য পলাশ গাছ, একেবারে নিষ্পত্র; গাছের আগাগোড়া লাল ফুল ফুটিয়া অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছে। এই কুসুমিত পলাশ-বনরাজি দেখিলে বুঝিতে পারা যায় কেন প্রাচীন কবি এই নিসর্গরূপে মুগ্ধ হইয়া বারংবার ইহার উল্লেখ করিতেন। গাছের কিছুই দেখা যায় না, আমূলশীর্ষ পাটলবর্ণের পুষ্প প্রস্ফুটিত,—এমন যোজনব্যাপী পলাশবন চারিদিকেই দেখা যাইতেছে; কিন্তু এই শোভা অধিক দিন থাকে না। বার তের দিন পরে আবার যখন এই পথে ফিরিলাম, তখন কোথাও পলাশ-ফুলের চিহ্নও নাই, গাছে কচি সবুজ পাতা

ধরিয়াছে, সমস্ত ফুল ঝরিয়া গিয়াছে। দিল্লী পঁহুছিতে রাত্রি ১টা; দিনমানের উত্তাপ তিরোহিত হইয়াছে, দিব্য ঠাণ্ডা, গায়ে কাপড় দিতে হয়। রাত্রিকালে দিল্লী আর অম্বালার মধ্যে সর্ব্বদাই শীতল থাকে, এমন কি বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে শীত অনুভব হয়। প্রাতঃকালে অম্বালা ছাড়িয়া গাড়ী পশ্চিমে চলিল। অম্বালা এখন পঞ্জাবের অন্তর্ভূত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে লুধিয়ানা হইতে পঞ্জাব আরম্ভ। শতদ্রর এক পাশে ফিলোর, অপর পাশে লুধিয়ানা। শিখ-যুদ্ধের সময় শিখ সৈন্য এই শতদ্রু নদ পার হইয়া ব্রিটিশ-রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিল। পঞ্জাবে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম এখনও গ্রীষ্মের কয়েক দিন বিলম্ব আছে; আগ্রা প্রদেশের মত এখনও সূর্য্যের উত্তাপ হয় নাই। গম প্রায় কাটা হইয়াছে, কোথাও ক্ষেতে গম পাকিয়া রহিয়াছে। বনের মধ্যে বাব্লাবন বেশী, কোথাও উষর মাটী, কোনরূপ চাসবাস হয় না। দ্বিপ্রহরের পর লাহোরে উপনীত হইয়া গাড়ী হইতে নামিলাম। লাহোর হইতে জম্মু রেলে পাঁচ ঘণ্টার পথ।

জম্মু ও কাশ্মীরের মহারাজা প্রতাপসিংহের সন্তানাদি নাই। পরলোকগত রাজা অমরসিংহ তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা। রাজকুমার হরিসিংহ তাঁহার একমাত্র পুত্র। হরিসিংহ পিতার অতুল ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং রাজ্যেরও উত্তরাধিকারী। তাঁহার বয়স আঠারো, আজমের রাজ কুমার কলেজে অধ্যয়ন করেন। মেজর বার নামে ইংরেজ-শিক্ষক আছেন। কাঠিয়াওয়াড়ে রাজকোটের নিকট ধর্ম্ম-পুর নামে ক্ষুদ্র রাজ্য। সেখানকার রাজার ভ্রাতুষ্পুত্রীর সহিত রাজকুমার হরিসিংহের বিবাহ স্থির হয়। সেই উপলক্ষে কাশ্মীরের মহারাজা অনেক লোককে জম্মুতে নিমন্ত্রণ করেন। কাশ্মীরের মহারাজা জাতিতে ডোগ্রা রাজপুত। ইতিপূর্ব্বে রাজপুতানার চন্দ্রসূর্য্যবংশীয় রাজপুত-দিগের সহিত তাঁহাদের বিবাহাদি প্রচলিত ছিল না। এই বার সে প্রথা লঙ্ঘন করিয়া প্রাচীন রাজপুতবংশে রাজকুমার হরিসিংহের বিবাহ স্থির হয়। রাজপুতানার রাজারা কেহ কেহ এই বিবাহের সমর্থন করেন, কেহ কেহ প্রতিকূল। কিষণগড়ের মহারাজা, ইদর ও যোধপুরের মহারাজা সার প্রতাপসিংহ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া জম্মুতে গমন করেন। রাজপুত-মহাসভার অনেক সভ্য এই বিবাহে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া নিমন্ত্রণ স্বীকার করিয়াছিলেন। লাহোরে দুই দিন বিশ্রাম করিয়া ২৯শে এপ্রিল জম্মু যাত্রা করি। পথে উজীরাবাদে গাড়ী বদল করিতে হয়। জম্মু পঁহুছিতে অপরাহ্ণ হইল। দূরে পাহাড়ে বরফ দেখা যাইতেছে, জম্মুর পাশে পাহাড়ের উপর বাহু দুর্গ, পশ্চাতে ত্রিচূড় ত্রিকূটা পর্ব্বত। এইখানে হিমালয়ের আরম্ভ। সাতপুরা ষ্টেশনে মহারাজার সৈন্য থাকে, তাহাদের বাসস্থান বারাকগুলি দিব্য পরিষ্কার। সাতপুরা পার হইলেই জম্মু বেশ দেখিতে পাওয়া যায়। চারিদিকে বহু সংখ্যক মন্দিরের চূড়া, উপরে স্বর্ণ কলস, সায়ংকালে সূর্য্য-কিরণে জ্বলিতেছে। মন্দিরের প্রাচুর্য্য দেখিয়া মনে হয় কোন তীর্থস্থানে আসিয়াছি। পাহাড়ের কোলে জম্মু নগরী, পদপ্রান্ত দিয়া তওয়ী স্রোতস্বিনী বহিয়া যাইতেছে। ষ্টেশনের সম্মুখেই পুল, পুল পার হইয়া নগরে যাইতে হয়। গাড়ী যখন ষ্টেশনে পঁহুছিল তখন কাশ্মীরের মহারাজা প্লাটফর্ম্মে দাঁড়াইয়া আছেন। ঝালাওয়ারের মহারাণা সেই গাড়ীতে ছিলেন— তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিতে আসিয়াছিলেন। আমাদিগকে দেখিতে পাইয়া মহারাজা সম্ভাষণ করিলেন। ষ্টেশনের বাহিরে রাজবাড়ীর গাড়ী দাঁড়াইয়া ছিল; আমরা তাহাতে আরোহণ করিয়া বাসায় উপনীত হইলাম। রেসিডেন্সি হাতার ভিতর একটি সুসজ্জিত বাঙ্গলায় আমাদের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল; আমরা সেইখানে গিয়া উঠিলাম। রাজকুমারের বিবাহ উপলক্ষে নগর সাজান হইয়াছে। চারিদিকে পতাকা ও নেতের শ্রেণী, বাড়ী সমস্ত চূণকাম করা, দেয়ালে আনন্দ ও অভিনন্দনসূচক লেখা। বাড়ীর ছাদে, পথের পাশে স্ত্রীলোকেরা দাঁড়াইয়া জনস্রোত ও নূতন লোকের সমাগম দেখিতেছে। ডোগ্রা স্ত্রীলোকেরা পরমাসুন্দরী। জম্মুর পাশের পাহাড়কে ডোগর পাহাড় বলে, সেই পাহাড়ে ডোগরাদিগের বাস। কাংড়া, কুলু ও সিমলা অঞ্চলে যেমন পাহাড়ী স্ত্রীলোক দেখিতে পাওয়া যায়, ডোগরা রমণীগণও দেখিতে অনেকটা সেই রকম; সেই রকম বেশ, চুড়িদার পায়জামা, লম্বা জামা, চাদরে মাথা ঢাকা। পাহাড়ী স্ত্রীলোকদিগের গড়ন বড় সুন্দর। স্থূলাঙ্গী প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না, তন্বী ও কৃশাঙ্গীর

নৈরঞ্জনা-তীরে ভিক্ষুমণ্ডলী

হইয়া চাহিয়া থাকে, আর মানব-জাতির তৃতীয়াংশ তাহার সম্মুখে আসিয়া নতশির হয়, কালের এমনই বিচিত্র মহিমা!

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ।

জম্মুতে বিবাহোৎসব

বৈশাখ মাসে কলিকাতা হইতে জম্মু যাওয়া বড় সুখের যাত্রা নয়; কিন্তু কর্ত্তব্যের পালনে নিজের ইচ্ছামত সকল কাজ করিতে পারা যায় না। কলিকাতা হইতে লাহোর বার শো মাইলের উপর; লাহোর হইতে জম্মু আরও দেড় শো মাইল হইবে। পঞ্জাব মেলে হু হু করিয়া যেমন পথ কাটিয়া যায়, দেশ ও নিসর্গের বিচিত্রতাও সেইরূপ চক্ষে পড়ে। গ্রীষ্মের প্রকোপ কলিকাতায় তেমন অনুভব করিতে পারা যায় না, কিন্তু এপ্রিল মাসের শেষে মোগল সরাই হইতে, আলিগড় পর্য্যন্ত ভয়ানক উত্তপ্ত হইয়া উঠে। ওদিকে পঞ্জাবে মে মাসের মাঝামাঝির পূর্ব্বে তেমন গ্রীষ্মাতিশয্য হয় না। রেলে যাইতে বাঁকিপুর ছাড়াইয়া যেমন যেমন সূর্য্যের উত্তাপ বাড়িতে লাগিল, অমনই গ্রীষ্মের প্রখরতা অনুভূত হইতে লাগিল। মির্জাপুর হইতে লু চলিতে আরম্ভ হইল; গাড়ীর দরজা জানেলা বন্ধ করিয়া অগ্নিকুণ্ডে বাস করিবার সুখ অনুভব করিতে লাগিলাম। একেবারে জানেলা বন্ধ করিলে বাহিরের কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না, অথচ বাহিরের মাঠ দেখিবার ইচ্ছাও প্রবল, শুধু কাচ তুলিয়া দিয়া বসিয়া দেখিতে লাগিলাম। মাঠের পর মাঠ দৃষ্টি-পথে পড়িতেছে, আবার অপসারিত হইতেছে। কোথাও গাছপালার মধ্যে গ্রাম, গ্রামে কূপ, স্ত্রীলোকেরা জল তুলি-তেছে, গ্রামপ্রান্তে গরু চরিতেছে। এলাহাবাদের কাছে দেখিলাম মহুয়া গাছের পাতা ঝরিয়া গিয়াছে, গাছে ফুল ধরিয়াছে। আরও আগে বড় চমৎকার দৃশ্য। অসংখ্য পলাশ গাছ, একেবারে নিষ্পত্র; গাছের আগাগোড়া লাল ফুল ফুটিয়া অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছে। এই কুসুমিত পলাশ-বনরাজি দেখিলে বুঝিতে পারা যায় কেন প্রাচীন কবি এই নিসর্গরূপে মুগ্ধ হইয়া বারংবার ইহার উল্লেখ করিতেন। গাছের কিছুই দেখা যায় না, আমূলশীর্ষ পাটলবর্ণের পুষ্প প্রস্ফুটিত,—এমন যোজনব্যাপী পলাশবন চারিদিকেই দেখা যাইতেছে; কিন্তু এই শোভা অধিক দিন থাকে না। বার তের দিন পরে আবার যখন এই পথে ফিরিলাম, তখন কোথাও পলাশ-ফুলের চিহ্নও নাই, গাছে কচি সবুজ পাতা

ধরিয়াছে, সমস্ত ফুল ঝরিয়া গিয়াছে। দিল্লী পঁহুছিতে রাত্রি ১টা; দিনমানের উত্তাপ তিরোহিত হইয়াছে, দিব্য ঠাণ্ডা, গায়ে কাপড় দিতে হয়। রাত্রিকালে দিল্লী আর অম্বালার মধ্যে সর্ব্বদাই শীতল থাকে, এমন কি বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে শীত অনুভব হয়। প্রাতঃকালে অম্বালা ছাড়িয়া গাড়ী পশ্চিমে চলিল। অম্বালা এখন পঞ্জাবের অন্তর্ভূত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে লুধিয়ানা হইতে পঞ্জাব আরম্ভ। শতদ্রু এক পাশে ফিলোর, অপর পাশে লুধিয়ানা। শিখ যুদ্ধের সময় শিখ সৈন্য এই শতদ্রু নদ পার হইয়া বিটিশ-রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিল। পঞ্জাবে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম এখনও গ্রীষ্মের কয়েক দিন বিলম্ব আছে; আগ্রা প্রদেশের মত এখনও সূর্য্যের উত্তাপ হয় নাই। গম প্রায় কাটা হইয়াছে, কোথাও ক্ষেতে গম পাকিয়া রহিয়াছে। বনের মধ্যে বাব্‌লাবন বেশী, কোথাও ঊসর মাটী, কোনরূপ চাসবাস হয় না। দ্বিপ্রহরের পর লাহোরে উপনীত হইয়া গাড়ী হইতে নামিলাম। লাহোর হইতে জম্মু রেলে পাঁচ ঘণ্টার পথ।

জম্মু ও কাশ্মীরের মহারাজা প্রতাপসিংহের সন্তানাদি নাই। পরলোকগত রাজা অমরসিংহ তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা। রাজকুমার হরিসিংহ তাঁহার একমাত্র পুত্র। হরিসিংহ পিতার অতুল ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং রাজ্যেরও উত্তরাধিকারী। তাঁহার বয়স আঠারো, আজমের রাজকুমার কলেজে অধ্যয়ন করেন। মেজর বার নামে ইংরেজ-শিক্ষক আছেন। কাঠিয়াওয়াড়ে রাজকোটের নিকট ধর্ম্মপুর নামে ক্ষুদ্র রাজ্য। সেখানকার রাজার ভ্রাতুষ্পুত্রীর সহিত রাজকুমার হরিসিংহের বিবাহ স্থির হয়। সেই উপলক্ষে কাশ্মীরের মহারাজা অনেক লোককে জম্মুতে নিমন্ত্রণ করেন। কাশ্মীরের মহারাজা জাতিতে ডোগ্‌রা রাজপুত। ইতিপূর্ব্বে রাজপুতানার চন্দ্রসূর্য্যবংশীয় রাজপুতদিগের সহিত তাঁহাদের বিবাহাদি প্রচলিত ছিল না। এইবার সে প্রথা লঙ্ঘন করিয়া প্রাচীন রাজপুতবংশে রাজকুমার হরিসিংহের বিবাহ স্থির হয়। রাজপুতানার রাজারা কেহ কেহ এই বিবাহের সমর্থন করেন, কেহ কেহ প্রতিকূল। কিষণগড়ের মহারাজা, ইদর ও যোধপুরের মহারাজা সার প্রতাপসিংহ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া জম্মুতে গমন করেন। রাজপুত-মহাসভার অনেক সভ্য এই বিবাহে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া নিমন্ত্রণ স্বীকার করিয়াছিলেন। লাহোরে দুই দিন বিশ্রাম করিয়া ২৯শে এপ্রিল জম্মু যাত্রা করি। পথে উজীরাবাদে গাড়ী বদল করিতে হয়। জম্মু পঁহুছিতে অপরাহ্ণ হইল। দূরে পাহাড়ে বরফ দেখা যাইতেছে, জম্মুর পাশে পাহাড়ের উপর বাহু দুর্গ, পশ্চাতে ত্রিচূড় ত্রিকূটা পর্ব্বত। এইখানে হিমালয়ের আরম্ভ। সাতপুরা ষ্টেশনে মহারাজার সৈন্য থাকে, তাহাদের বাসস্থান ব্যারাক্‌গুলি দিব্য পরিষ্কার। সাতপুরা পার হইলেই জম্মু বেশ দেখিতে পাওয়া যায়। চারিদিকে বহুসংখ্যক মন্দিরের চূড়া, উপরে স্বর্ণ কলস, সায়ংকালে সূর্য্যকিরণে জ্বলিতেছে। মন্দিরের প্রাচুর্য্য দেখিয়া মনে হয় কোন তীর্থস্থানে আসিয়াছি। পাহাড়ের কোলে জম্মু নগরী, পদপ্রান্ত দিয়া তাওয়ী স্রোতস্বিনী বহিয়া যাইতেছে। ষ্টেশনের সম্মুখেই পুল, পুল পার হইয়া নগরে যাইতে হয়। গাড়ী যখন ষ্টেশনে পঁহুছিল তখন কাশ্মীরের মহারাজা প্ল্যাটফর্ম্মে দাঁড়াইয়া আছেন। ঝালাওয়ারের মহারাণা সেই গাড়ীতে ছিলেন—তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিতে আসিয়াছিলেন। আমাদিগকে দেখিতে পাইয়া মহারাজা সম্ভাষণ করিলেন। ষ্টেশনের বাহিরে রাজবাড়ীর গাড়ী দাঁড়াইয়া ছিল; আমরা তাহাতে আরোহণ করিয়া বাসায় উপনীত হইলাম। রেসিডেন্সি হাতার ভিতর একটি সুসজ্জিত বাঙ্গলায় আমাদের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল; আমরা সেইখানে গিয়া উঠিলাম। রাজকুমারের বিবাহ উপলক্ষে নগর সাজান হইয়াছে। চারিদিকে পতাকা ও নেতের শ্রেণী, বাড়ী সমস্ত চূণকাম করা, দেয়ালে আনন্দ ও অভিনন্দনসূচক লেখা। বাড়ীর ছাদে, পথের পাশে স্ত্রীলোকেরা দাঁড়াইয়া জনস্রোত ও নূতন লোকের সমাগম দেখিতেছে। ডোগ্‌রা স্ত্রীলোকেরা পরমাসুন্দরী। জম্মুর পাশের পাহাড়কে ডোগর পাহাড় বলে, সেই পাহাড়ে ডোগরাদিগের বাস। কাংড়া, কুলু ও সিমলা অঞ্চলে যেমন পাহাড়ী স্ত্রীলোক দেখিতে পাওয়া যায়, ডোগরা রমণীগণও দেখিতে অনেকটা সেই রকম; সেই রকম বেশ, চূড়িদার পায়জামা, লম্বা জামা, চাদরে মাথা ঢাকা। পাহাড়ী স্ত্রীলোকদিগের গড়ন বড় সুন্দর। স্থূলাঙ্গী প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না, তন্বী ও কৃশাঙ্গীর

আদৰ্শ ইহাদের মধ্যে অনেক। দ্রুতপদে পাহাড়ে আরোহণ করিয়া শরীরে স্ফূর্ত্তি ও লঘুতা হয়, শরীর মাংসবহুল হইতে পায় না। ঘোমটার প্রথা পাহাড়ে কোথাও নাই; স্ত্রীলোকেরা মুখ খুলিয়া অসঙ্কোচে সর্ব্বত্র যাতায়াত করে। খুব টিকল মুখ, বর্ণ উজ্জ্বল গৌর, ঘনকৃষ্ণ ভ্রূর নীচে বড় বড় চক্ষু; অনেক সময় মনে হয় যে মূর্ত্তিময়ী স্বর্ণপ্রতিমা পথে সঞ্চরিত হইতেছে। অঙ্গে গহনার বাহুল্য নাই; তাহাতে রূপ আরও ফাটিয়া পড়ে। ডোগ্‌রা পুরুষেরাও খুব সুশ্রী। রাজকুমার হরিসিংহ স্বয়ং অত্যন্ত সুপুরুষ, যথার্থ রাজপুত্রের মত।

জম্মু ও কাশ্মীর দরবারের একটি বিশেষত্ব আছে, যাহা দেখিয়া আনন্দ হয়। আজকালের রাজারা ইংরেজি শিখিয়া প্রাচীন প্রথাসমস্ত ত্যাগ করিতেছেন। তাঁহাদের ইংরেজি-শিক্ষা বড় হয় না, কিন্তু ইংরেজ শিক্ষকের কাছে ইংরেজি কথা কওয়া অভ্যস্ত হয়, আর ইংরেজি আমোদ ও বিলাসিতা পূর্ণমাত্রায় শিক্ষা হয়। ফল হয় এই যে, সেকালের পদ্ধতি-গুলি উঠিয়া যাইতেছে, অথচ ইংরেজি-শিক্ষার সুফল কিছুই হয় না। কাশ্মীরে এখনও তাহা হয় নাই। মহারাজা নিজে খাটি হিন্দু, নিরামিষাশী, আড়ম্বরে বীতরাগ, কোন রকম সাহেবিয়ানা পছন্দ করেন না। মেজেতে ঢালা ফরাশের উপর বসিয়া থাকেন, সকলের সঙ্গে অসঙ্কোচে অমায়িক ভাবে কথাবার্ত্তা কহেন, সনাতন ধর্ম্মে বিশ্বাস অটল, স্বয়ং যেমন বিনয়ী তেমনই পরের গুণগ্রাহী। অপরদিকে সমাজের উন্নতির দিকে তাঁহার সর্ব্বদা দৃষ্টি আছে। রাজপুত-মহাসভার প্রস্তাবের অনুযায়ী উৎসবাদি উপলক্ষে বাঈনাচ বন্ধ করিয়া দিয়াছেন, এমন কি রাজকুমার হরিসিংহের বিবাহের সময় কোন নর্ত্তকী অথবা বাঈজীকে বায়না দেওয়া বা আহ্বান করা হয় নাই, কেবল কএকজন বিখ্যাত গায়ককে আনা হইয়াছিল। আজকাল রাজাদের বাড়ী উৎসবে সাহেবেদের প্রায় নিমন্ত্রণ হইয়া থাকে এবং তাঁহাদের পানাহারের জন্য প্রচুর আয়োজন হয়। কপূরতলার মহারাজের জ্যেষ্ঠ পুত্র টিক্কা সাহেবের বিবাহের সময় ফ্রান্স হইতে অনেক ফরাসী সাহেবের নিমন্ত্রণ হইয়াছিল এবং তাঁহাদের আতিথ্য-সৎকারে বিস্তর ব্যয় হইয়াছিল। জম্মুতে সে পাটই ছিল না। হিন্দু মুসলমান, বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী, পঞ্জাবী অনেকে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন; কিন্তু সাহেব নিমন্ত্রণ একেবারেই হয় নাই। রেসিডেণ্ট প্রভৃতি ঘরের লোক; তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে ধরা যায় না। ইংরেজদিগের জন্য স্বতন্ত্র বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। কাশ্মীরের প্রধান মন্ত্রী দেওয়ান অমরনাথ সান্ধ্যসমিতিতে সকল নিমন্ত্রিত ব্যক্তিকে আহ্বান করিয়াছিলেন। সেখানে দুই তিন জন মাত্র ইংরেজ উপস্থিত ছিলেন। লৌকিকতা লইবার প্রথাকে নেওন্দ্রা (নিমন্ত্রণ) বা তম্বোল বলে। সে উপলক্ষে দরবার হয়। দরবারে ইদর ও যোধপুরের মহারাজা প্রতাপসিংহ, কিষণগড়ের মাহারাজা, কপূরতলার মহারাজা প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। লাল কাপড়ে বা সাটিনে টাকা বাঁধিয়া তম্বোল দেয়। সেই রাত্রে কাশ্মীরের মহারাজা, রাজকুমার ও বরযাত্রীদিগের সমভিব্যাহারে রাজকোট যাত্রা করেন। নিমন্ত্রিত অতিথিগণও স্বস্থানে ফিরিলেন। বিবাহের উৎসবাদি সম্বন্ধে অপর রাজারাও যদি কাশ্মীরের মহারাজার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেন, ত দেশের মঙ্গল সাধিত হয়।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

মৌর্য্য-সাম্রাজ্য-বিলোপের কারণ।

মৌর্য্য-যুগের ইতিহাস-লেখকগণের মধ্যে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, অশোকের দেহত্যাগের অব্যবহিত পরেই অশোক-প্রবর্ত্তিত শাসনতন্ত্রের সহিত ব্রাহ্মণ্য শক্তির এক বিষম সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল, সেই সংঘর্ষের ফলে বিশাল মৌর্য্য সাম্রাজ্য অচিরে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম্মের বিরোধভাব প্রকাশ্যে কিংবা পরোক্ষে বহুদিন পর্য্যন্ত এই ভারতবর্ষে বিদ্যমান ছিল। তাঁহারা বলেন, অশোক স্বয়ং যে কেবল বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা নহে, নব ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার পক্ষপাতিত্ব অত্যধিক মাত্রায় প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি রাজ্যের সর্ব্বত্র যজ্ঞার্থ পশুবধ নিবারণ করিয়াছিলেন। এই নূতন বিধি কিন্তু ব্রাহ্মণদিগের নিকট প্রীতিকর হয় নাই; কারণ তাঁহারা তখনও যজ্ঞার্থে পশুবধের প্রবল পক্ষপাতী ছিলেন। ভারতবর্ষের একজন শূদ্র নরপতি যে তাঁহাদের বহুদিনের সঞ্চিত ধর্ম্মমতের মূলে ঈদৃশ আঘাত করিবেন, ইহা ব্রাহ্মণদিগের অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। ব্রহ্মগিরিনামক স্থানে উৎকীর্ণ শিলালিপিতে লিখিত আছে যে, "এতদিন যাঁহারা দেবতা বলিয়া পূজিত হইতেন, এক্ষণে তাঁহারা অলীক বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছেন।" অশোকের এই প্রকার উক্তি পাঠ করিয়া তাঁহারা বিবেচনা করেন ইহাদ্বারা ব্রাহ্মণদিগের প্রতিই কটাক্ষ করা হইয়াছে। সর্ব্বসাধারণের মধ্যে ধর্ম্ম এবং নীতি পর্য্যবেক্ষণ করা তৎকালে ব্রাহ্মণদিগেরই কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত ছিল। ব্রাহ্মণেরাই তৎকালে লোকের পাপ ও পুণ্যের পুরস্কার বিধান করিতেন। তাঁহাদের পরিবর্ত্তে ঐ কর্ম্মে অশোক ধর্ম্মমহামাত্র নামক কর্ম্মচারীদিগকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সর্ব্বাপেক্ষা অশোক প্রবর্ত্তিত "দণ্ডসমতা" ও "ব্যবহারসমতা" (অর্থাৎ জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে দোষ বিচারপূর্ব্বক সমুচিত দণ্ড প্রদান) ব্রাহ্মণদিগের নিকট একান্ত অপ্রীতিকর হইয়াছিল; কারণ তৎকালীন প্রচলিত হিন্দুসমাজের নিয়ম অনুসারে ব্রাহ্মণগণ সকল প্রকার দণ্ডের বহির্ভূত ছিলেন। যতই গুরুতর অন্যায় কার্য্য তাঁহাদের দ্বারা অনুষ্ঠিত হউক না কেন, নির্ব্বাসনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দণ্ড বলিয়া পরিগণিত হইত। ধর্ম্মাধিকরণে ব্রাহ্মণদিগের প্রতাপ ও ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ ছিল, সেই নিমিত্ত অশোক-প্রবর্ত্তিত "দণ্ডসমতা" ও "ব্যবহার সমতা" তাঁহাদের অসন্তোষের একটি প্রধান কারণ হইয়াছিল। অশোকের প্রবল প্রতাপের নিকট ব্রাহ্মণ্যশক্তি এতদিন নতশির হইয়াছিল। তাঁহার দেহত্যাগের পর পুনরায় ব্রাহ্মণগণ আপনাদিগের প্রাধান্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য যত্নবান হন। কিন্তু এই কার্য্যে ক্ষত্রিয়গণের সাহায্য একান্ত প্রয়োজন ছিল; কারণ, চিরদিনই ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণদিগের রক্ষাকল্পে নিযুক্ত ছিলেন। এক্ষণে নন্দবংশের রাজত্বকাল হইতে ক্ষত্রিয়কুল লোপ পাইয়াছিল। মৌর্য্যবংশের শেষ নরপতি বৃহদ্রথের সেনাপতি পুষ্যমিত্র (পুষ্পমিত্র) এই ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম রক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত হন। সৈন্য পর্য্যবেক্ষণ ছলে তিনি বৃহদ্রথকে বিনাশ পূর্ব্বক স্বয়ং মগধ-সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই সময় হইতে ব্রাহ্মণগণ পুনরায় স্থানে স্থানে প্রবল হইয়া উঠেন। যে পাটলিপুত্র হইতে কিছুদিন পূর্ব্বে যজ্ঞার্থে পশুবধ নিবারণের আদেশ ঘোষিত হইয়াছিল, সেই পাটলিপুত্র নগরেই পুষ্যমিত্রের (পুষ্পমিত্রের) সময়ে এক বিরাট্ অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়। পুষ্পমিত্রের পৌত্র বসুমিত্র যজ্ঞাশ্ব রক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত হন। এরূপ কথিত আছে সুবিখ্যাত মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি সেই যজ্ঞ-সভায় উপস্থিত ছিলেন। অশোকোৎকীর্ণ অনুশাসনগুলি বিশেষ মনোযোগ সহকারে পাঠ করিলে অশোক যে পশুবধ নিবারণ করিয়াছিলেন ও হিন্দুধর্ম্ম-বিদ্বেষী ছিলেন তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় না। এক্ষণে আমরা উৎকীর্ণ শিলালিপিগুলির আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

গিণার পর্ব্বতে উৎকীর্ণ প্রথম শিলালিপি পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, অশোক কোন পশুকে উৎসর্গ করিয়া তাহার দেহ লইয়া হোম করিতে নিষেধ করিয়াছেন। মূলে আছে—"ইধ ন কিঞ্চি জীবং আরভিপ্‌পা প্রজুহিতব্যং।" সমগ্র অনুশাসন মধ্যে যজ্ঞার্থে পশুবধ নিবারক এই একমাত্র উক্তি লক্ষিত হয়। তিনি পশুবধ যে সম্পূর্ণরূপে নিষেধ করিয়াছিলেন, ইহা হইতে তাহা অনুমিত হয় না। 'ইধ' অর্থে কেহ বলেন পাটলিপুত্র, আবার কাহারও কাহারও মতে গিণার, খালসি, ধৌলি, জুনাগড় এবং সাহাবাজ

গড়ি প্রভৃতি স্থান। সুতরাং যজ্ঞার্থে পশুবধ নিবারণ আদেশ যে সর্ব্বত্র ঘোষিত হইয়াছিল, নিঃসন্দেহে একথা বলা যায় না। আবার উহা যে সম্পূর্ণরূপে নিবারিত হইয়াছিল তাহাও বলা কঠিন; কারণ সেই লিপিতেই উক্ত হইয়াছে যে, "পূর্ব্বে দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজার রন্ধনশালায় তাঁহার ব্যঞ্জন প্রস্তুতের জন্য প্রত্যহ বহু সহস্র প্রাণী হত্যাকরা হইত। সম্প্রতি এই ধর্ম্মবিধি লিখনের সময় হইতে তিনটিমাত্র প্রাণীকে ব্যঞ্জন প্রস্তুতের জন্য নিহত করা হয়—দুইটি ময়ূর ও একটি মৃগ, সে মৃগও নিত্য নিহত হয় না। পরে আর এই তিনটি প্রাণীও হত্যা করা হইবে না।" ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, যদিও নরপতি পশুবধ নিবারণের প্রয়াস পাইয়াছেন, তথাপি সে উদ্দেশ্য তখনও সম্পূর্ণরূপে কার্য্যে সাধিত হয় নাই। তাঁহার অভিষেকের ষড়্‌বিংশতি বর্ষে উৎকীর্ণ পঞ্চম স্তম্ভ লিপিতেও অশোক অনেকগুলি জন্তুকে অবধ্য করিয়াছিলেন। কিন্তু সে স্থলে 'যজ্ঞ' কথার কোন উল্লেখ নাই।

অশোকের ধর্ম্মমত অত্যন্ত উদার, তাহাতে সঙ্কীর্ণতার লেশমাত্র ছিল না। সকল সম্প্রদায়কে নিজ নিজ ধর্ম্মমত পরিচালনে, তিনি পূর্ণ স্বাধীনতা দান করিয়াছিলেন। দ্বাদশ শিলালিপি (Toleration Edict) এ বিষয়ের প্রকৃষ্ট নিদর্শন; এই লিপির প্রত্যেক বাক্য তাঁহার উদার হৃদয়ের পরিচায়ক। দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা বলিতেছেন—"তিনি সকল ধর্ম্মাবলম্বী, কি সন্ন্যাসী কি গৃহস্থ সকলকে দান ও বিবিধ সম্মান সহকারে সম্বর্দ্ধনা করিয়া থাকেন। সেইরূপ দান বা পূজা দেবপ্রিয় উৎকৃষ্ট মনে করেন,—কিরূপ? যাহাতে (অন্তঃ) সার বৃদ্ধি (হয়) (যাহাতে সকল ধর্ম্মের উন্নতি হয়)। সকল ধর্ম্মাবলম্বীদিগের সার বৃদ্ধি বিভিন্ন প্রকারের। কিন্তু তাহার মূলে বাক্য-সংযম—কিরূপ? স্বধর্ম্মীর সম্মান ও পরধর্ম্মীর নিন্দা, সামান্য বিষয়ে যেন না হয়—এবং বিষয় বিশেষে যেন অতি অল্পই হয়। কোনও কোনও কারণে পরধর্ম্মীদিগের পূজা কর্ত্তব্য। ইহা দ্বারা স্বধর্ম্মীদিগের সমুন্নতি ও পরধর্ম্মীদিগের উপকার হয়, এরূপ না করিলে স্বধর্ম্মীদিগের ক্ষতি হয় ও পরধর্ম্মীদিগের অপকার হয়। যদি কেহ স্বধর্ম্মীদিগের প্রতি অনুরক্তি বশতঃ বা স্বধর্ম্মীদিগের গৌরব বর্দ্ধনার্থ স্বধর্ম্মীদিগের পূজা ও পরধর্ম্মীদিগের নিন্দা করে, সে বিশেষরূপে স্বসম্প্রদায়ের হানি করে; সুতরাং সমবায়ই (সামঞ্জস্য) ভাল,—কিরূপে? সকলে পরস্পরের ধর্ম্ম শ্রবণ করুক এবং উত্তরোত্তর শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করুক। দেবপ্রিয় এইরূপ ইচ্ছা করেন,—কিরূপ? সর্ব্ব ধর্ম্মাবলম্বীরাই বহু অধ্যয়ন সম্পন্ন এবং কল্যাণকর নীতিযুক্ত হউক। যাহারা যে যে ধর্ম্মে অনুরক্ত তাহাদিগকে বলা উচিত যে, দেবপ্রিয়ের সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বীদিগের সার বৃদ্ধি যেরূপ আদরণীয়, দান বা পূজা সেরূপ নহে। এই উদ্দেশ্যে ধর্ম্মমহামাত্রগণ ও অন্যান্য রাজকর্ম্মচারিগণ নিযুক্ত আছেন। উহার ফল তত্তদ্ ধর্ম্মাবলম্বীদিগের সমৃদ্ধি ও সদ্ধর্ম্মের বিকাশ।"

য়ুরোপের বর্ত্তমান ঐতিহাসিকগণ মহারাজ অশোককে ধর্ম্মান্ধতা ও বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি অত্যধিক অনুরাগ বশতঃ পক্ষপাতিত্ব দোষে দোষী করিয়াছেন, কিন্তু শিলালিপি ও স্তম্ভলিপি সকল মনোযোগ সহকারে পাঠ করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, এবম্প্রকার ধারণার কোনই কারণ নাই। শ্রমণদিগের সুখস্বচ্ছন্দতার জন্য, তিনি যেরূপ ব্যস্ত, ব্রাহ্মণদিগের মঙ্গলের জন্য তিনি তদ্রূপ মনোযোগী। সমাজের উচ্চস্থান হইতে ব্রাহ্মণদিগকে যে কখনও চ্যুত করিয়াছিলেন, এ প্রকারের উক্তি কোথাও পরিলক্ষিত হয় না। পক্ষান্তরে ব্রাহ্মণদিগের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তির নিদর্শন অনেক অনুশাসনেই দৃষ্ট হইয়া থাকে। কলিঙ্গ বিজয়ের পর দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী তাঁহার ধৌলি অনুশাসনে বলিতেছেন—"এক্ষণে তাঁহার বিশেষ রূপে ধর্ম্মপালনে ও ধর্ম্মোপদেশ দানে অতীব অনুরক্তি হইয়াছে এবং সাতিশয় ধর্ম্মানুরাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে, কলিঙ্গ-বিজয়ে দেবপ্রিয়ের অনুশোচনা হইয়াছে। কারণ অবিজিত দেশে বিজয়ের সময় হত্যা, মৃত্যু ও বন্দীকরণ অবশ্যম্ভাবী। সেই হত্যাদি দেবপ্রিয় অতিশয় গুরুতর (কষ্টকর) মনে করেন। দেবপ্রিয়ের সে সকল গুরুতর মনে করিবার কারণ যে তথায় ব্রাহ্মণ, শ্রমণ ও অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বী ধার্ম্মিকগণ এবং গৃহস্থগণ বাস করিয়া থাকেন ইত্যাদি…" এই প্রকার তাঁহার তৃতীয়, চতুর্থ এবং অষ্টম শিলালিপিতে দেখা যায় অশোক ব্রাহ্মণদিগের প্রতি তাঁহার যথোচিত

শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন। এমন কি, তাঁহার রাজত্বের ষড়্‌বিংশতি বর্ষে উৎকীর্ণ সপ্তম স্তম্ভ-লিপিতেও এই ভাব আরও উজ্জ্বল ভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। সকলস্থলেই অগ্রে ব্রাহ্মণদিগের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। যাঁহার হৃদয় এত উচ্চ, এত উদার তাঁহাকে কখনই সঙ্কীর্ণতা-দোষে দোষী করা যাইতে পারে না।

"এত দিন যাঁহারা দেবতা বলিয়া পূজিত হইতেন, এক্ষণে তাঁহারা অলীক বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছেন।" ব্রহ্মগিরি, সাসেরাম প্রভৃতি স্থানে উৎকীর্ণ, অশোকের এবম্প্রকার উক্তিদ্বারা ব্রাহ্মণদিগের প্রতিই কটাক্ষ করা হইয়াছে বলিয়া এই শ্রেণীর লেখকগণ মনে করিয়া থাকেন; কিন্তু এরূপ কল্পনা সম্পূর্ণ অনুমান মাত্র। মূলে আছে, "অমিসং দেবা সং, তে মুনিসা, মিসং দে রাজা" অর্থাৎ "এদেশে যে সকল সত্য দেবতা ছিলেন বা যে সকল দেবতা সত্য বলিয়া পূজিত হইতেন, তাঁহাদিগকে মিথ্যা ও মনুষ্যসমান সপ্রমাণ করিয়াছি"। এই প্রকার উক্তি হইতে ব্রাহ্মণদিগের প্রতি বিদ্বেষভাব যে কিপ্রকারে আরোপিত হইয়াছে বলিয়া তাঁহারা বিবেচনা করেন, তাহা বুঝিতে পারা যায় না।

অশোকের অব্যবহিত পরে হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম্মের মধ্যে যে সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল, মালবিকাগ্নিমিত্র বা মৃচ্ছকটিক-নাটকের বর্ণনা-প্রণালী বা নাটকান্তর্গত চরিত্রসমূহ হইতে তাঁহারা তাহা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা পাইয়া থাকেন। উক্ত নাটকদ্বয়ের রচনাকাল যে মৌর্য্যদিগের শেষ নরপতি বৃহদ্রথের সময় হইতে প্রায় ৩৪ শত বৎসর পরে,সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সেই সময় হইতে মহাযান বৌদ্ধমতের বিকৃতি আরম্ভ হইয়াছে, ধর্ম্মের মধ্যে গ্লানি ও মলিনতা প্রবেশ করিয়াছে। সেই সকল কারণেই বৌদ্ধমতবাদের উপর যে,সে সময়কার লেখকদিগের ধারণা মন্দীভূত হইবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সেই কারণে নাটকান্তর্গত বিষয়সমূহ অবলম্বনে মতামত প্রদান করা কখনই ভ্রমপ্রমাদশূন্য হইবে না।

রাজকার্য্যের সৌকর্য্যার্থে ধর্ম্মমহামাত্র নামক কর্ম্মচারি-নিয়োগ যে ব্রাহ্মণদিগের নিকট প্রীতিকর হয় নাই, এই শ্রেণীর লেখকগণ তাহাও বলিয়া থাকেন। সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে যাহাতে সাধারণ নীতিসূত্রগুলি প্রতিষ্ঠিত হয় ও সেই সকল উপদেশ যাহাতে কার্য্যে অনুষ্ঠিত হয় এবং সর্ব্ব জীবে দয়া বিতরিত হয়, এই উদ্দেশ্যে ধর্ম্মমহামাত্রগণ সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকিতেন। রাজবিচারালয়ে যদি কোন বৃদ্ধ বা নিরপরাধ ব্যক্তি অথবা বহুপোষ্য-পালক গৃহস্থ অন্যায়রূপে রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইতেছে, এইরূপ সংবাদ ধর্ম্মমহামাত্রগণের কর্ণগোচর হইত, তাহা হইলে, তৎক্ষণাৎ তাঁহারা উক্ত ব্যক্তিগণকে মুক্তি প্রদান করিতে পারিতেন। জাতি, বর্ণ নির্ব্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের উন্নতিকল্পে ধর্ম্ম-মহামাত্রগণ অশোক-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মবিধি প্রচার করিতেন। এরূপ সাধু-উদ্দেশ্য প্রণোদিত কার্য্য যে কাহারও সহজে অপ্রীতিকর হইতে পারে, তাহা সম্ভবপর নহে।

ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই অবগত আছেন যে, কলিঙ্গ-বিজয়ের পর হইতেই মহারাজ অশোক রাজশক্তি প্রসারের প্রতি আদৌ মনোযোগ করেন নাই। ধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ তাঁহার হৃদয়মন অধিকার করিয়াছিল। লোকহিত-সাধনই তাঁহার জীবনের প্রধান লক্ষ্য হইয়াছিল। তিনি এক স্থানে ত্রয়োদশ শিলালিপিতে বলিতেছেন,—"আমার পুত্র পৌত্রগণ নূতন দেশ জয় বাঞ্ছনীয় মনে করিবেনা, যদি কখনও তাহারা দেশবিজয়ে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা শমতায় ও নম্রতায় আনন্দ অনুভব করিবে। আরও তাহারা ধর্ম্মবিজয়কে যথার্থ বিজয় মনে করিবে, তাহাতে ইহ-পরকালে সুখ হইবে।" চতুর্থ অনুশাসনে বলিতেছেন, "দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শীর পুত্র পৌত্র এবং প্রপৌত্রগণ এই ধর্ম্মাচরণ কল্পান্ত পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত করিবে। তাহারা ধর্ম্মনিষ্ঠ ও সংস্বভাব হইয়া ইহার প্রচার করিবে। ধর্ম্মপ্রচার অতি শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম। দুঃশীলের ধর্ম্মাচরণ অসম্ভব।"

এই প্রকার মানসিক ভাব লইয়া, মহারাজ অশোক মগধ-সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। সম্ভবতঃ এই ঘটনা হইতে অশোকের পুত্র পৌত্রাদির মধ্যে দেশবিজয়ের স্পৃহা তিরোহিত হয় ও সঙ্গে সঙ্গে রাজশক্তি হ্রাস হইয়া পড়ে। আমাদের বিবেচনায় অশোকের দেহত্যাগের অব্যবহিত পরেই যে সকল রাষ্ট্রীয় ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল, তাহাই মৌর্য্য-রাজত্ব বিলোপের কারণ। অশোকের পৌত্র দশরথের অব্যবহিত পরে, যে কয় জন মৌর্য্য নরপতি

মগধ-সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়াছিলেন, তাহাদের শাসন-ক্ষমতা-পরিচায়ক কোন নিদর্শনই আমরা প্রাপ্ত হই না। এই সময়েই কলিঙ্গ, বিদর্ভ এবং অন্ধ্রদেশ স্বাধীন হইয়া মগধ সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। এই সকল কারণে পাটলিপুত্রের রাজ-সিংহাসন দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। এই সময়েই প্রতাপান্বিত গ্রীকগণ পঞ্চনদ অধিকার-পূর্ব্বক ভারতের মধ্যপ্রদেশ পর্য্যন্ত তাহাদের জয়-পতাকা উড্ডীয়মান করিতে সমর্থ হইয়াছিল, কিন্তু অবশেষে পুষ্যমিত্রের (পুষ্পমিত্র) * নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়া মধ্য-ভারত হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছিল। ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রই অবগত আছেন যে, এই সময়েই দুর্ব্বলচিত্ত নরপতি বৃহদ্রথ মগধ-সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন, সুতরাং এরূপ সময়ে যে নিজ বিজয়-গৌরবে স্ফীত পুষ্যমিত্র হীনবল বৃহদ্রথকে রাজসিংহাসন হইতে অপসারিত করিয়া স্বয়ং সাম্রাজ্য গ্রহণ করিতে অভিলাষী হইবেন, ইহাতে কিছুমাত্র বৈচিত্র্য নাই।

সাঁইত্রিশ বৎসর অপ্রতিহত প্রভাবে রাজদণ্ড পরিচালনার পর মহারাজচক্রবর্ত্তী অশোক খ্রীঃ পূঃ ২৩১ অব্দে দেহত্যাগ করেন। সঙ্গে সঙ্গে মৌর্য্য-কুলগৌরব ম্লান হইয়া পড়ে। অশোকের পর নিম্নলিখিত রাজগণ মৌর্য্য-সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন।

বিষ্ণু ও বায়ু পুরাণের মতে আনুমানিক রাজত্বকাল।			দিব্যাবদানের মতে।
দশরথ	খ্রীঃ পূঃ	২৩১	সম্পাদি
সংগত	”	২২৪	বৃহস্পতি
শালিশুক	”	২১৫	বৃষসেন
সোমশর্ম্মণ	”	২০৬	পুষ্পবর্ম্ম
শতধন্বা	”	১৯৯	
বৃহদ্রথ	”	১৮৪	

মৌর্য্যরাজগণ সর্ব্বশুদ্ধ একশত সাঁইত্রিশ † বৎসর (১৯১-১৮৪) মগধে রাজত্ব করিয়াছিলেন। অবশেষে খ্রীঃ পূঃ ১৮৪ অব্দে শেষ নরপতি বৃহদ্রথ তাঁহার সেনাপতি পুষ্যমিত্র কর্ত্তৃক নিহত হন। পুষ্যমিত্র বৃহদ্রথকে বিনাশ পূর্ব্বক স্বয়ং মগধ সিংহাসন অধিকার করেন ও সেই সময় হইতে পাটলিপুত্রে শুঙ্গ রাজ বংশের প্রতিষ্ঠা হয়। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি অশোকের ঐকান্তিক অনুরাগ বা ব্রাহ্মণ বিদ্বেষ মৌর্য্য সাম্রাজ্য বিলোপের কারণ হইতে পারে না। যদি কেহ সেরূপ অনুমান করেন, তাহা কোনরূপ ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। যে সকল যুক্তি উপরে প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, অশোকের অব্যবহিত পরবর্ত্তী কালের রাষ্ট্রীয় ঘটনা পরম্পরাই মৌর্য্য-সাম্রাজ্য-বিলোপের প্রধান কারণ।

শ্রীচারুচন্দ্র বসু।

কুলগ্রন্থের ঐতিহাসিকতা ও ভোজের নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসন। *

বঙ্গের পুরাবৃত্তের উপকরণ সংগ্রহ এই সাহিত্য-সম্মিলনের ১ম অধিবেশনের ১ম প্রস্তাব ছিল। এই প্রস্তাব উপস্থিত করিবার সময় আমি 'বঙ্গের পুরাবৃত্তের উপকরণ' সম্বন্ধে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলাম। সাহিত্য সম্মিলনের ১ম অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণীতে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। আমি সেই প্রবন্ধে বিশদভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি যে, আমাদের এই সুজলা সুফলা বঙ্গভূমির প্রকৃত ইতিহাস উদ্ধার করিতে হইলে এখানকার সর্ব্বজাতির কুলগ্রন্থগুলি আলোচনা করিতে হইবে। আমাদের ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য ও নানা শ্রেণীর বণিক্‌দিগের কুলগ্রন্থগুলি অধিকাংশ বিলুপ্ত বা নষ্ট হইলেও এখনও যাহা আছে, সমস্ত একত্র করিলে সহস্রাধিক হইবে। এই সকল

* ইনি অনেক স্থলে পুষ্পমিত্র নামেও অভিহিত হইয়াছেন। পুষ্পমিত্রের বিষয় অধিক জানিতে হইলে হর্ষচরিত ও মালবিকাগ্নিমিত্র নাটক দ্রষ্টব্য।

† বায়ু-পুরাণের মতে ১৩৩ বৎসর।

* চট্টগ্রাম-সাহিত্য-সম্মিলনে পঠিত।

গ্রন্থে বিভিন্ন জাতির সমাজ ও কুলপরিচয়ের সঙ্গে প্রসঙ্গক্রমে অনেক রাজার নাম, ধর্ম্মপরিচয় ও বিভিন্ন সময়ের আচার-ব্যবহারও লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তাহাতে রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক ও ধর্ম্মনৈতিক ইতিহাসের যথেষ্ট উপকরণ রহিয়াছে। যে দেশে আদৌ ইতিহাস ছিল না, সে দেশের ইতিহাস কেবলমাত্র প্রবাদ বা জনশ্রুতির সাহায্যে রচিত হইয়াছে। এরূপ গ্রন্থও পাশ্চাত্য সভ্যজগতে ইতিহাস বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু আমাদের কুলগ্রন্থগুলি কেবল প্রবাদ বা জনশ্রুতিমূলক নহে—ইহাতে ধারাবাহিক ও পর্য্যায়ক্রমিক কুলপরিচয় রহিয়াছে। কুলপরিচয় রক্ষা আর্য্যজাতির বিশেষত্ব।* তাই বংশ ও বংশানুচরিতকীর্ত্তন সকল পুরাণসমূহের প্রধান অঙ্গ বলিয়া আর্য্য-শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তাই বেদের সংহিতায় ঋষিবংশের সূচনা, সামবেদের বংশব্রাহ্মণ ও আর্ষেয় ব্রাহ্মণে ধারাবাহিক ঋষিবংশ বর্ণনা। তাই পুরাণে সকল প্রসিদ্ধ আর্য্যবংশের ধারাবাহিক বংশ-পরিচয় ও বংশানুচরিতের প্রসঙ্গ। তাই সুপ্রাচীন গৃহ্য-সূত্র, ধর্ম্মসূত্র ও পরবর্ত্তী স্মৃতিসমূহে বংশ ও বংশানুচরিতমূলক ভারতাখ্যান বা মহাভারত পাঠের বিধি। বিবাহকালে উভয়পক্ষের বংশাবলিকীর্ত্তন ধর্ম্মশাস্ত্রের একটি অঙ্গ। তাই মহর্ষি বাল্মীকি রামায়ণে রাজর্ষি জনকের মুখে বলাইয়াছেন—

"এবং ব্রুবাণং জনকঃ প্রত্যুবাচ কৃতাঞ্জলিঃ।
শ্রোতুমর্হসি ভদ্রং তে কুলং নঃ পরিকীর্ত্তিতম্॥
প্রদানে হি মুনিশ্রেষ্ঠ কুলং নিরবশেষতঃ।
বক্তব্যং কুলজাতেন তন্নিবোধ মহামতে॥"

(রামায়ণ ১।৭১।১-২)

সুতরাং বুঝিতে হইবে, ধারাবাহিক বংশপরিচয় রক্ষা আর্য্যসমাজের অবশ্য কর্ত্তব্য ছিল। তাই পরবর্ত্তী পুরাণসমূহেও মন্বন্তর-প্রসঙ্গে পরবর্ত্তী মুনিগণের ও ভবিষ্য-রাজবংশ-প্রসঙ্গে পরবর্ত্তী রাজগণের বংশধারা প্রদত্ত হইয়াছে।

পৌরাণিকী কথা ছাড়িয়া দিন, সমসাময়িক শিলালিপি ও তাম্রলিপিগুলি অনেকেরই মতে বৈজ্ঞানিক ইতিহাসের ভিত্তি, তাহাতেও আমরা পুরাণবাক্য-সমর্থক বংশ ও বংশানুচরিত লিপিবদ্ধ দেখিতেছি। ভারতের সর্ব্বত্রই যখন বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্মের প্রাধান্য, সে সময়েও ভারতবাসী আর্য্যসন্তানগণ সেই সনাতন প্রথা বিস্মৃত হন নাই। বেদের ব্রাহ্মণাংশে, রামায়ণে, মহাভারতে ও পুরাণাদিতে রাজবংশ ও ঋষিবংশের মধ্যেই বংশাবলি রক্ষা ও বংশানুচরিত কীর্ত্তন প্রথা পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু বৌদ্ধ ও জৈন প্রাধান্যকালে শ্রেষ্ঠবংশীয় আর্য্যসন্তান মাত্রেই বংশাবলি রক্ষার আবশ্যকতা বুঝিয়াছিলেন এবং প্রত্যেক সমাজের স্ব স্ব আচার্য্য বা গুরুপরম্পরাও লিপিবদ্ধ করা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়াই মনে করিতেন। ভারত হইতে বৌদ্ধ প্রভাব বিলোপের সহিত সেই সকল ধর্ম্ম ও সমাজমূলক বংশচরিত-কথা অধিকাংশ বিলুপ্ত হইলেও শত শত জৈন পট্টাবলি ও বহুতর জৈন পুরাণসমূহে এখনও সেই সনাতন পদ্ধতির ভূরি ভূরি নিদর্শন পরিলক্ষিত হইতেছে; বৌদ্ধ ও জৈন প্রভাবের অবসান হইলে বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত প্রভৃতি ধর্ম্মসম্প্রদায় মধ্যেও সেই পূর্ব্বরীতি চলিয়া আসিয়াছে, এখনও বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের গুরু-পরম্পরা নানা শাখা প্রশাখার ধারাবাহিক পরিচয় ভারতের সর্ব্বত্র বিভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায় মধ্যে প্রচলিত রহিয়াছে। এইরূপে ভারতের সর্ব্বত্রই ভট্টকবিগণ সম্ভ্রান্ত বংশীয়গণের ধারাবাহিক বংশপরিচয় ও গুণানুকীর্ত্তন করিয়া আসিতেছেন; তাঁহাদের নিকট ও পঞ্জীকারদিগের নিকট সম্ভ্রান্ত আর্য্যসন্তানগণের ধারাবাহিক বংশ-পরিচয় রক্ষিত হইতেছে। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, ধারাবাহিক বংশাবলি রক্ষা ও বংশ-কীর্ত্তন ভারতীয় আর্য্যসন্তানগণের বিশেষত্ব। এই সম্মিলনের সর্ব্বপ্রথম অধিবেশনে "বঙ্গীয় পুরাবৃত্তের উপকরণ" প্রসঙ্গে দেখাইয়াছি যে সকল আর্য্যসন্তান বঙ্গের বিভিন্ন জনপদে বিভিন্ন সময়ে আসিয়া বাস করিয়াছেন, সেই চিরন্তন প্রথা অনুসারে তাঁহারা স্ব স্ব কুল-পরিচয় ও সম্বন্ধ-বিবরণ রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। সেই বিশাল বিস্তৃত কুলগ্রন্থ সমূহে আমাদের বঙ্গের বিভিন্ন সমাজের সামাজিক ও পারিবারিক ইতিহাসের যথেষ্ট উপকরণ রহিয়াছে। কিন্তু নিতান্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, পাশ্চাত্য-সভ্যতার প্রভাবে, পাশ্চাত্য আদর্শে মুগ্ধ হইয়া কিছুদিন

* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, কায়স্থ কাণ্ডের সূচনায় এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে।

হইতে আমরা আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের গৌরবকীর্ত্তি প্রতিষ্ঠাপক ঐ সকল অমূল্য গ্রন্থের অনাদর করিয়া আসিতেছি। পুরুষপরম্পরায় ঐ সকল কুলগ্রন্থ যাহারা রক্ষা করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদেরও অবস্থা ও মতিগতি পরিবর্ত্তনের সহিত, এক্ষণে পূর্ব্ববৎ অংশবংশ লিপিবদ্ধ করিবার প্রথা এক প্রকার উঠিয়া যাওয়ায় অধিকাংশ প্রাচীন কুলগ্রন্থ বিলুপ্ত হইয়াছে, যাহা আছে, তাহাও উপযুক্ত যত্ন ও সমাদর অভাবে ধ্বংসের মুখে আসিয়া পড়িয়াছে। ইহার উপর আবার কতকগুলি নব্য ঐতিহাসিক বিজ্ঞানের চশমায় আমাজাতির ঐসকল শেষ নিদর্শনের অসারতা লক্ষ্য করিতেছেন এবং তাঁহাদের অনভিজ্ঞ লেখনীর সমালোচনার গুণে ঐ সকল গ্রন্থের ঐতিহাসিকতার উপর কাহারও কাহারও আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে। নব্য প্রত্নতাত্ত্বিকগণের সমালোচনা ও আশঙ্কা যে অমূলক, তাহা দেখাইয়া দিবার জন্যই এই প্রবন্ধটি উপস্থিত করিতেছি।

এই প্রবন্ধে দেখাইব, প্রাচীন কুলগ্রন্থগুলি একেবারে উপেক্ষার বিষয় নহে, পরবর্ত্তীকালে লিখিত হইলেও এবং বহুব্যক্তির হস্তে পড়িয়া মধ্যে মধ্যে বিকৃতি সাধন ঘটিলেও তন্মধ্য হইতেও এত ঐতিহাসিক সত্য বাহির করিবার সুযোগ আছে, যাহা অপর কোথাও পাইবার উপায় নাই। বঙ্গের তমসাচ্ছন্ন ইতিহাস-গগনে সেগুলি অনেকস্থলে ধ্রুবতারার ন্যায় পথ দেখাইয়া দিবে, সন্দেহ নাই। আধুনিক কুলগ্রন্থমধ্যে অনেক অজ্ঞ লেখকের দোষে অনেকস্থানে যে সকল বিকৃতি ঘটিয়াছে, সমসাময়িক তাম্রশাসন ও শিলালিপিসমূহ সেই সকল বিকৃতি বা দোষ দূরীকরণের প্রধান সহায়। তাম্রশাসনগুলি সাধারণতঃ প্রশস্তিমূলক, অধিকাংশ স্থলেই শাসনদাতার ও তাঁহার বংশের গৌরব বা প্রশংসা ঘোষিত করিবার জন্যই রচিত। কিন্তু প্রাচীন কুলগ্রন্থগুলি সমাজতত্ত্বপ্রকাশক ও সমাজের গুণদোষ সমালোচনামূলক। ইহা ব্যক্তিবিশেষের প্রশংসার জন্য রচিত হয় নাই। প্রধানতঃ অভিজাত-সমাজের গুণদোষ কীর্ত্তন করিবার জন্যও বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন সমাজের অবস্থা বিজ্ঞাপন করিবার জন্য লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে দেখাইব, আধুনিক বৈদিক কুলগ্রন্থে যে সকল বিকৃতি ঘটিয়াছে, নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসনের সাহায্যে সেই সকল সংশোধন করিবার সুযোগ উপস্থিত। আবার তাম্রশাসনে যে সকল অতি প্রয়োজনীয় বিষয় নিতান্ত অস্পষ্ট, কুলগ্রন্থের সাহায্যে সেই সকল অংশ বিশদভাবে বুঝিবার সুবিধা হইয়াছে। তাম্রশাসন হইতে পাইতেছি ;—

তাম্রশাসন ও বংশ পরিচয়।

কোন সময়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞাতিবংশীয় যাদবগণ, মৃগরাজ সিংহ যেমন গুহা আশ্রয় করিয়া থাকে, সেইরূপ 'সিংহপুর' আশ্রয় করিয়াছিলেন। (৩য় শ্লোক)। সম্ভবতঃ সেই স্থানে 'কোন সময়ে যাদবী সেনাগণের সমরবিজয়যাত্রার মঙ্গলস্বরূপ বজ্রবর্ম্মা আবির্ভূত হইয়াছিলেন।' (৬ষ্ঠ শ্লোক)। এই বজ্রবর্ম্মার পুত্র জাতবর্ম্মা বা জালবর্ম্মা।* এই জাতবর্ম্মার ঔরসে ও বীরশ্রীর গর্ভে সামলবর্ম্মার জন্ম। সামলবর্ম্মার পাটরাণী ত্রৈলোক্যসুন্দরী মালব্যদেবী, তিনি উদয়ীপুত্র জগদ্বিজয় মল্লের কন্যা। (১০।১২ শ্লোক)। সেই কন্যার গর্ভে সামলবর্ম্মার পিতৃকুল ও মাতৃকুল উভয়কুলদীপক ভোজবর্ম্মা নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। এই ভোজবর্ম্মাই তাম্রশাসন প্রদাতা।

একাধিক বৈদিক কুলগ্রন্থে সামলবর্ম্মার পরিচয় পাইয়াছি। তন্মধ্যে অনেকগুলির ভিতর পরবর্ত্তী ইতিহাসানভিজ্ঞের যথেষ্ট হাত পড়িয়াছে, আবার নকলকারীর অনবধানতায় কোন কোন কুলগ্রন্থ কিছু কিছু বিকৃত হইয়াছে।† এই সকল পুঁথির উপর নির্ভর না করিয়া, অল্পদিন হইল, আমি একখানি তালপত্রে লিখিত যে প্রাচীন পুঁথি পাইয়াছি, তাহা লইয়াই এখন আলোচনা করিব। এই পুঁথিখানি বশিষ্ঠ গোত্রীয় ঈশ্বরবৈদিক রচিত। কলিকাতার সহরতলী টালানিবাসী ৺গুরুচরণ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাটী হইতে সংগৃহীত

বৈদিক কুলগ্রন্থ।

---

* সাহিত্য—ভাদ্র সংখ্যায় এবং ঢাকা রিভিউ পত্রিকায় যথাক্রমে 'জাতবর্ম্মা' ও 'জেএবর্ম্মা' পাঠ প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু উভয় পত্রিকায় যে প্রতিবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে উভয় পাঠই নাই। বিশেষ মনোযোগপূর্ব্বক নামটি পর্য্যবেক্ষণ করিলে 'জোত্র' 'জাত্র' বা 'জাল' পাঠ স্বীকার করিতে হয়। এসম্বন্ধে অন্যত্র আলোচনা করিয়াছি। (ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন, ২য় খণ্ড, ৭ম সংখ্যা ৩১৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

† মৎসঙ্কলিত বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণকাণ্ড, ৩য় অংশে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

হইয়াছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় উক্ত ঈশ্বরবৈদিক হইতে ৯ম পুরুষ অধস্তন। এরূপ স্থলে উক্ত কুলগ্রন্থখানি ২৫০ হইতে ৩০০ বর্ষের মধ্যে রচিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে পাশ্চাত্য বৈদিক প্রসঙ্গে এই কুলগ্রন্থ আলোচিত হইয়াছে, কিন্তু তৎকালে মূল পুঁথিখানি আমার হস্তগত হয় নাই, ইহার নকল পাইয়াছিলাম। কথায় বলে "সাত নকলে আসল খাস্তা"। বাস্তবিক নকলকারীর দোষে ঠিক মূল পাইতে পারি নাই, একারণ পূর্ব্বে বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে বৈদিক বিবরণ প্রসঙ্গে যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে কতকগুলি গুরুতর ভ্রম ঘটিয়া গিয়াছে। এখন সেই মূল আদর্শ পুঁথি এবং এই তাম্রশাসন সাহায্যে সেই সকল ভ্রম সংশোধন করিয়াছি। গ্রন্থখানির নাম "বৈদিককুলপঞ্জী"। গ্রন্থের প্রারম্ভেই লিখিত আছে;—

"গৌরীশং গুণপুঞ্জমঞ্জুমমলং জ্ঞানোদয়ং জ্ঞানদং
গঙ্গাবীচিতরঙ্গরঞ্জিতজটাজুটৈক ॰ ॰ ॰ স্থিতং।
দেবং দেববরস্য মৌলিবিলসন্মন্দারমালাবলি
বন্দেমন্দমতিপ্রভাবসকলচ্ছেদায় ভাবগ্রহঃ॥
বিচার্য্য তন্ত্রমূলানি চালোক্য তাম্রশাসনম্।
ক্রিয়তে কুলপঞ্জীয়মীশ্বরেণ চ ধীমতা॥"

উদ্ধৃত শ্লোক হইতে জানিতেছি, কুলতত্ত্বসম্বন্ধীয় মূল গ্রন্থগুলি বিচার করিয়া এবং তাম্রশাসন দেখিয়া এই কুলপঞ্জী রচিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য বৈদিকগণের কুলগ্রন্থের পাতড়া মধ্যে অনেকস্থলে শ্যামলবর্ম্মার তাম্রশাসনের প্রতিলিপি পাইয়াছি, কিন্তু ঈশ্বরবৈদিক সেই তাম্রশাসনের আভাস দিলেও তাঁহার গ্রন্থমধ্যে এই শাসনলিপি উদ্ধৃত হয় নাই, সুতরাং তিনি কিরূপ পাঠ অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা ঠিক বুঝা গেল না।* তাঁহার গ্রন্থে ঠিক এইরূপ সামলবর্ম্মার বংশ-পরিচয় আছে—

"ত্রিবিক্রমমহারাজ শূরবংশসমদ্ভবঃ।
আসীৎ পরম ধর্ম্মজ্ঞো দেশে কাশীসমীপতঃ॥
স্বর্ণরেখা পুরী যত্র স্বর্ণযজ্ঞময়ী শুভা।
স্বর্গঙ্গা-সলিলৈঃ পূতা সল্লোকজনতোষিণী॥
অসৌ তত্র মহীপালো মালত্যাং নামতঃ স্ত্রিয়াং
আত্মজং জনয়ামাস নাম্না † কর্ণসেনকং॥
আসীৎ স এব রাজা চ তত্র পর্য্যাং মহামতিঃ।
কন্যা তস্য বিলোলা চ পূর্ণচন্দ্রসমদ্যুতিঃ॥
শ্রিয়াং তস্যাং হি দ্বৌ পুত্রৌ মল্ল-শ্যামলবর্ম্মকৌ।
সা এব জনয়ামাস ক্ষৌণী রক্ষকরা বভৌ॥
মল্লস্তত্রৈব প্রথিতঃ শ্যামলোঽত্র সমাগতঃ।
জেতুং শত্রুগণান্ সর্ব্বান্ গৌড়দেশনিবাসিনঃ।
বিজিত্য রিপুশার্দ্দূলং বঙ্গদেশনিবাসিনঃ।
রাজাসীৎ পরমধর্ম্মজ্ঞো নাম্না শ্যামলবর্ম্মকঃ॥
জিত্বা সর্ব্বমহীপতিং ভুজবলৈঃ পঞ্চাস্যতুল্যো বলী
শ্রীমদ্বিক্রমপুরনামনগরে রাজাভবন্নিশ্চিতং।" ইত্যাদি।

অর্থাৎ কাশীর নিকটস্থ প্রদেশে যেখানে স্বর্ণযজ্ঞময়ী মঙ্গলপ্রদা, সজ্জনতোষিণী ও স্বর্গগঙ্গার সলিল দ্বারা পবিত্রা "স্বর্ণরেখা" নাম্নী নগরী বিদ্যমান, তথায় বীরবংশীয় ত্রিবিক্রম মহারাজ আধিপত্য করিতেন। সেইস্থানে সেই মহীপাল মালতী নাম্নী স্ত্রীতে "কর্ণসেন" নামে এক আত্মজ উৎপাদন করিয়াছিলেন। সেই মহামতি কর্ণসেনও সেই পুরে রাজত্ব করিতেন। তাঁহার কন্যা পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় রূপবতী বিলোলা, সেই শ্রীর গর্ভে মল্ল ও শ্যামলবর্ম্মা পৃথিবীর রক্ষকস্বরূপ দুইটি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। সেই রাজধানীতেই মল্ল প্রথিত হইয়াছিলেন, শ্যামল এখানে (বঙ্গদেশে) আগমন করেন। গৌড়দেশনিবাসী সকল শত্রুকে জয় করিয়া এবং বঙ্গদেশবাসীর প্রধান রিপুকে পরাস্ত করিয়া পরমধর্ম্মজ্ঞ শ্যামলবর্ম্মা রাজা হইয়াছিলেন। সেই পঞ্চাননতুল্য বলশালী নিজ ভুজবলে সকল রাজাকে জয় করিয়া শ্রীমদ্বিক্রমপুর নামক নগরে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

* পাশ্চাত্য বৈদিকগণের সকল কুলগ্রন্থে "শ্যামলবর্ম্মা" পাঠ আছে, কিন্তু আমাদের আলোচ্য ঈশ্বরবৈদিক রচিত তালপত্রে লিখিত কুলপঞ্জীর মধ্যে "সামলবর্ম্মা" ও "শ্যামলবর্ম্মা" এই উভয় পাঠই দৃষ্ট হয়। অথচ এই পুঁথিখানিতে বর্ণাশুদ্ধি নাই বলিলেই চলে। এদিকে নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসনের সর্ব্বত্রই 'সামলবর্ম্মা' ও একস্থানে মূলের প্রতিকৃতিতে "শ্যামলবর্ম্মা" (৯ম পৃষ্ঠা ২১ পংক্তি) পাঠ আছে। ইহাতে মনে হয় যে, এরূপ কোন তাম্রশাসন ঈশ্বরবৈদিকের নয়নগোচর হইয়াছিল।

† এইরূপ অংশ অস্পষ্ট পড়িয়া গিয়াছে।

'শ্রীকর্ণসেন' শব্দের 'শ্রী' এবং 'ণ' র রেফটি উঠিয়া গিয়া তালপত্রে সম্ভবতঃ 'কণসেন' পাঠ হইয়াছে। সম্ভবতঃ শ্রীকর্ণদেবের স্থানে ঈশ্বর 'শ্রীকর্ণসেন' * নাম বসাইয়াছেন।

শাসন ও কুল-গ্রন্থ সমালোচনা।

ঈশ্বরবৈদিক বলিতেছেন যে, মল্ল ও শ্যামল এই উভয়ে কর্ণের দৌহিত্র, বিলোলা নাম্নী শ্রীর গর্ভজাত। তিনি পিতা ও পিতামহের নাম উল্লেখ না করিয়া মাতামহ ও প্রমাতামহের নাম উল্লেখ করিলেন কেন? নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসনে আমরা পাইতেছি যে, সামলবর্ম্মার পিতামহ "বজ্রবর্ম্মা" যাদবীচমূর সমর বিজয়-যাত্রার মঙ্গল স্বরূপ, রিপুগণের শমন ও বান্ধবগণের মধ্যে সোম স্বরূপ কবিদিগের মধ্যে কবি এবং পণ্ডিতগণের মধ্যে পণ্ডিত ছিলেন। (৬ শ্লোক) এই পরিচয় মধ্যে বজ্রবর্ম্মা কোন্ স্থানের রাজা ছিলেন বা কখন রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাহার আভাস নাই। তৎপরবর্ত্তী শ্লোকে জাতবর্ম্মার পরিচয় স্থলেও লিখিত হইয়াছে—

'শান্তনু হইতে গাঙ্গেয় (ভীষ্মের) ন্যায় জাতবর্ম্মা জাত হন। দয়াই যাঁহার ব্রত, রণই ক্রীড়া, এবং ত্যাগই যাঁহার মহোৎসব, বেণনন্দন পৃথুর শ্রীকে গ্রহণ করিয়া কর্ণের বীরশ্রীকে বিবাহ করিয়া, অঙ্গের শ্রীকে প্রথিত করিয়া, কামরূপ শ্রীকে পরাভব করিয়া, দিব্যের ভুজশ্রীকে নিন্দা করিয়া, গোবর্দ্ধনের শ্রীকে বিকল করিয়া, শ্রীকে শ্রোত্রিয়সাৎ করিয়া, যিনি সার্ব্বভৌম শ্রীবিস্তার করিয়াছিলেন।' এই পরিচয় মধ্যেও জাতবর্ম্মা কোন্ স্থানের রাজা ছিলেন, তাহা পাওয়া যাইতেছে না। তিনি একজন অদ্বিতীয় বীর ছিলেন, বহু বীরকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়াছিলেন, এবং সার্ব্বভৌম শ্রীবিস্তার বা বহু জনপদ জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, এই মাত্র পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

উক্ত জাতবর্ম্মারই পুত্র (কর্ণের কন্যা বীরশ্রীর বা বিলোলশ্রীর গর্ভজাত) সামলবর্ম্মা। তাম্রশাসনে ইঁহার পরিচয়-প্রসঙ্গে লিখিত আছে—

"বীরশ্রিয়ামজনি সামলবর্ম্মদেবঃ
শ্রীমাঞ্জগৎ প্রথম-মঙ্গল-নামধেয়ঃ।"

প্রথমে বজ্রবর্ম্মার পরিচয় স্থলে লিখিত হইয়াছে—

"অভবদথ কদাচিদ্ যাদবীনাং চমূণাং
সমরবিজয়যাত্রা-মঙ্গলং বজ্রবর্ম্মা।"

বজ্রবর্ম্মা যাদবী সেনাগণের সমর-বিজয়-যাত্রার মঙ্গল স্বরূপ; কিন্তু শ্রীমান্ সামলবর্ম্মা "জগতে প্রথম মঙ্গল নামধেয়" বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। এই "প্রথম মঙ্গল নামধেয়" শব্দ দ্বারা বুঝিতেছি যে, তিনিই বঙ্গে প্রথম রাজালক্ষ্মী লাভ করিয়াছিলেন। কুলপঞ্জীতেও তাই সামলবর্ম্মা বঙ্গবিজেতা ও এই বংশের প্রথম নৃপতি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

তাঁহার পিতা ও পিতামহ সম্ভবতঃ এদেশে রাজত্ব লাভ করেন নাই বলিয়া কুলপঞ্জিকায় তাঁহাদের নাম গৃহীত হয় নাই, কিন্তু তাঁহার মাতামহ ও প্রমাতামহ উভয়েই ভারত প্রসিদ্ধ নৃপতি ছিলেন। বিশেষতঃ পাশ্চাত্য বৈদিকগণ স্ব স্ব পিতৃপুরুষের জন্মভূমি বলিয়া যে স্থানের গৌরব করিয়া থাকেন, সেই কণাবতীর যাঁহারা অধীশ্বর, তাঁহাদের পরিচয় সর্ব্বাগ্রে প্রদান করিবেন না কেন? তাম্রশাসন ও শিলালিপিতে চেদিপতি কর্ণদেবের পিতার নাম গাঙ্গেয়দেব, কিন্তু কুলপঞ্জীবর্ণিত কর্ণের পিতার নাম ত্রিবিক্রম। হয় কুলপঞ্জীর ভ্রম, নয় ত্রিবিক্রম গাঙ্গেয়দেবের নামান্তর স্বীকার করিতে হইবে। সাময়িক শিলালিপি হইতে পাওয়া গিয়াছে, গাঙ্গেয়দেব দাহলের অধিপতি হইলেও তিনি মধ্যদেশ এমন কি হিমালয়ের নিকটবর্ত্তী তীরভুক্তি পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছিলেন। বামনাবতার বিষ্ণু যেমন স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল

* মূল পুঁথিতে এই নামটি অস্পষ্ট থাকায় পরবর্ত্তী অপর বৈদিক কুলপঞ্জীকারগণ কেহ 'বিমলসেন' কেহ বা 'বিজয়সেন' পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। ঈশ্বরের কুলপঞ্জীর পূর্ব্বে আমিও যে নকল পাইয়াছিলাম এবং বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে বৈদিক বিবরণ-প্রসঙ্গে যাহা উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতে 'বিজয়সেন' নামই উদ্ধৃত হইয়াছে। যিনি নকল করিয়া পাঠাইয়াছিলেন, তাঁহার বর্ত্তমান বাঙ্গালার ইতিহাসে অল্প জ্ঞান থাকায়, তিনি মূল পুঁথির পাঠ কাটিয়া উদ্ধৃত শ্লোকের এইরূপে পাঠ পরিবর্ত্তন করিয়াছেন

১ম 'শূরবংশ' স্থানে 'সেনবংশ', ২ "দেশে কাশীসমীপতঃ" স্থানে "কাশীপুরী সমীপতঃ", ৩ "স্বর্ণরেখা পুরী যত্র" স্থানে "স্বর্ণরেখা নদীযত্র", ৪ "শ্রীকর্ণসেনকঃ" স্থানে 'শ্রীবিজয়সেনক', ৫ "কন্যাতস্য বিলোলাচ" স্থলে "পত্নীতস্য বিলোলাচ" এবং আরও দুই একস্থলে অস্পষ্ট অংশ পূরণ করিয়া দিয়াছেন। পূর্ব্বে মূল পুঁথিখানি হস্তগত না হওয়ায় এই ভ্রম সংশোধন করিবার সুযোগ আসে নাই। এইজন্য শ্যামলবর্ম্মা সম্বন্ধে অনেক ভুল কথা লিখিত হইয়াছে। এক্ষণে ভ্রম স্বীকার করিতেছি।

অধিকার করিয়া 'ত্রিবিক্রম' উপাধি লাভ করেন; হয়ত গাঙ্গেয়দেবও সেইরূপ উত্তর, দক্ষিণ, ও মধ্যপ্রদেশ অধিকার করিয়া ত্রিবিক্রম উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। ভেরাঘাট হইতে প্রাপ্ত অহ্লনাদেবীর শিলালিপিতে উৎকীর্ণ আছে,—"কর্ণের ভয়ে কলিঙ্গের সহিত বঙ্গ কম্পমান ছিল।" * আবার অহ্লনাদেবীর পুত্র জয়সিংহদেবের শিলালিপিতে বিবৃত হইয়াছে,—"গর্ব্ব পরিত্যাগ করিয়া গৌড়াধিপ কর্ণের আদেশ পালন করিতেন।" † ইহাতে মনে হয় যে, কর্ণদেব গৌড়, বঙ্গ ও কলিঙ্গ পর্য্যন্ত জয় করিয়াছিলেন। এই দিগ্বিজয় উপলক্ষে কর্ণদেবের জামাতা ও সামলবর্ম্মার পিতা জাতবর্ম্মাই সম্ভবতঃ অধিনায়ক ছিলেন।

ঈশ্বরবৈদিক লিখিয়াছেন যে, সামলবর্ম্মার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মল্লবর্ম্মা স্বর্ণরেখাপুরে প্রথিত হইয়াছিলেন। স্বর্গঙ্গা বা অলকনন্দা এই নগরীর পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিতা। সুতরাং বুঝিতে হইবে—হিমালয় প্রদেশে যেখানে অলকনন্দা নদী, সেইরূপ স্থানে সামলবর্ম্মার জ্যেষ্ঠ সহোদর আধিপত্য করিতেন। এদিকে ভোজবর্ম্মার শাসনে লিখিত হইয়াছে,—"মৃগরাজ সিংহ যেমন গুহা আশ্রয় করিয়া থাকে, সেইরূপ (এই বর্ম্মবংশের পূর্ব্বপুরুষ) যাদবগণ সিংহপুর আশ্রয় করিয়াছিলেন।

বর্ম্মবংশের পূর্ব্ববাস সিংহপুরের অবস্থান।

হিমালয় প্রদেশে দেরাডুন জেলায় "মড়া" নামে একটি সুপ্রাচীন গ্রাম আছে; এই গ্রামের "লক্ষ্মণ-মণ্ডল" নামক মন্দিরটি অতি প্রাচীন। সেই মন্দিরে খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর অক্ষরে উৎকীর্ণ শিলালিপি আছে। সেই শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, এই হিমালয় প্রদেশে সিংহপুরে কলিযুগের প্রারম্ভ হইতে যাদববংশীয় বর্ম্মরাজগণ রাজত্ব করিতেন। ‡ উক্ত শিলাফলকে বর্ম্মবংশীয় ১২ জন রাজার নাম পাওয়া যায়, শেষোক্ত বর্ম্মরাজকন্যা ঈশ্বরা দেবীর মন্দির-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে উক্ত শিলালিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল। §

* Ephigraphia Indica Vol, VIII appendix.

† Ephigraphia Indica, Vol II. P. 11.

‡ Dr. Führer's Antiquarian Remains in N. W. P. P. 8.

§ Epigraphia Indica, Vol. I. P. 11.

খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে চীন-পরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়ং এই সিংহপুরে আসিয়াছিলেন। তাঁহার আগমনকালে এই সিংহপুর রাজ্য কাশ্মীররাজের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। * তৎপরে দীর্ঘকাল এখানকার বর্ম্মরাজগণ সামন্তনৃপতিরূপে কালযাপন করিতেন। বজ্রবর্ম্মার পুত্রই সম্ভবতঃ পাঞ্চজন্য-বাহিনী লইয়া দিগ্বিজয়ী গাঙ্গেয়দেব অথবা তৎপর দিগ্বিজয়ী কর্ণদেবের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন এবং অসাধারণ রণকৌশল, দয়া ও অপূর্ব্ব স্বার্থত্যাগ দেখাইয়া কর্ণদেবের কন্যা বীরশ্রীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাম্রশাসনে তাঁহাকে শান্তনুনন্দন ভীষ্মতুল্য বলা হইয়াছে। সম্ভবতঃ তিনি ভীষ্মদেবের ন্যায় দিগ্বিজয়ী মহাবীর হইয়াও রাজ্য গ্রহণ করেন নাই, এইজন্যই তাম্রশাসনে বর্ণিত হইয়াছে—

"রণঃ ক্রীড়া দয়া ব্রতং ত্যাগো যস্য মহোৎসবঃ।"

যাহা হউক, তিনি স্বার্থত্যাগ করিয়া নিজে রাজা না হইলেও কুলগ্রন্থ হইতে পাইতেছি যে, তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র মল্লবর্ম্মা পৈতৃকরাজ্যে স্বর্গঙ্গা অলকনন্দা প্রবাহিত হিমালয় প্রদেশে কাশীর নিকটস্থ স্বর্ণরেখাপুরীতে রাজত্ব করিতেন। এই স্বর্ণরেখাপুরীই সিংহপুর রাজ্যের রাজধানী হইতে পারে।

কাশীর উল্লেখ দেখিয়া কেহ মনে না করেন যে, এই কাশী আমাদের সুপ্রসিদ্ধ বারাণসী। পুরাণে তিনটি কাশীর উল্লেখ আছে—একটি উত্তর কাশী, হিমালয় প্রদেশে হরিদ্বারের উত্তরে। মধ্য কাশীই অসিবরণা ও গঙ্গাসঙ্গমে অবস্থিতা বারাণসীপুরী এবং দক্ষিণ কাশী মান্দ্রাজ প্রদেশে অধুনা তেন-কাশী নামে প্রসিদ্ধ। উত্তর-কাশীর নিকটেই স্বর্ণরেখাপুরী অবস্থিত ছিল।

কুলগ্রন্থের ভ্রম সংশোধন।

শিলালিপি ও তাম্রশাসন সাহায্যে জানা যাইতেছে উত্তর কাশীর নিকট সিংহপুরে সামলবর্ম্মার পিতৃকুল, এবং পুণ্যভূমি বারাণসী প্রয়াগ অঞ্চলে তাঁহার মাতৃকুল রাজত্ব করিতেন। পরবর্ত্তী কুলগ্রন্থকারগণ এই দুইটি স্থান ও বংশের পরিচয় স্থির করিতে না পারিয়া এক করিয়া ফেলিয়াছেন। যে সময়ের কথা লিখিতেছি, তৎকালে হিমালয় ও বিন্ধ্যাগিরির মধ্যবর্ত্তী অধিকাংশ জনপদ চেদিপতি কর্ণদেবের শাসনাধীন

* Watter's On Yuang Chuang, Vol. I. P. 248.

ছিল। সুতরাং অলকনন্দা প্রবাহিত উত্তর-কাশী ও গঙ্গা-প্রবাহিত বারাণসী উভয় পুরীই তাঁহার শাসনাধীন এবং কান্যকুব্জ প্রদেশও ইহার অন্তর্গত হইতেছে। এরূপ স্থলে সামলের পিতৃকুল, মাতৃকুল ও শ্বশুরকুলের পরিচয় দিতে গিয়া যে আধুনিক কুলজ্ঞগণ ভ্রমে পতিত হইবেন, তাহা বিচিত্র নহে। এজন্য কেহ কান্যকুব্জ বা কাশী শ্বশুরের রাজ্য, আবার কেহ কাশী তাঁহার পৈতৃক রাজ্য এবং স্বর্গঙ্গা প্রবাহিত কাশীর নিকটস্থ স্বর্ণরেখাপুরী, তাঁহার মাতামহ কুলের রাজধানী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

ভোজশাসনে পাওয়া যাইতেছে, সামলবর্ম্মা অনেক রাজপুত্রীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে জগদ্বিজয় মল্লের কন্যা ত্রৈলোক্যসুন্দরী মালব্যদেবীই অগ্র মহিষী বা পাটরাণী ছিলেন। তাঁহার অপর পত্নীগণের মধ্যে কুলপঞ্জীতে সুদক্ষিণা নাম্নী এক রাণীর পরিচয় পাওয়া যায়। এই সুদক্ষিণা কনোজ অঞ্চলের রাজা নীলকণ্ঠের কন্যা বলিয়া অভিহিতা। রাজা নীলকণ্ঠও "চন্দ্রবিস্তৃত-সন্তান প্রস্তভর্ম্মীশ্বররাজন্যকুমুদ প্রমোদকারণঃ" অর্থাৎ চন্দ্রবংশসম্ভূত সমস্ত রাজন্যকুল কুমুদগণের প্রমোদকারণ" বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

সামলবর্ম্মার বিবাহ।

ঈশ্বরবৈদিক এই নীলকণ্ঠের পিতৃনাম উল্লেখ না করিলেও বৈদিক 'কুলমঞ্জরী' নামক গ্রন্থে তিনি "হরিহর নৃপতেরাত্মজঃ কীর্ত্তিভাজঃ" অর্থাৎ হরিহর-রাজের পুত্র বলিয়া আখ্যাত। কান্যকুব্জের অন্তর্গত সীয়াডোনি নামক স্থান হইতে এক বৃহৎ শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে ১০২৫ সংবতে (৯৬৮ খৃষ্টাব্দে) হরিরাজ নামক এক সামন্ত নৃপতির পরিচয় পাওয়া যায়। † এই হরিরাজই কুলগ্রন্থোক্ত হরিহররাজ হইতে পারেন। * তাঁহার পৌত্রী সুদক্ষিণাও কনোজরাজ কন্যা বলিয়াই অভিহিতা। ঈশ্বরবৈদিক আরও লিখিয়াছেন যে, এই সুদক্ষিণার পাণিগ্রহণ করিবার জন্য সামলবর্ম্মা বহু সৈন্যসামন্তে পরিবৃত হইয়া সরস্বতী নদীতীরস্থ কনৌজ ব্রহ্মশাসন অতিক্রম করিয়া উত্তরাপথে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

সামলবর্ম্মার বিবাহোপলক্ষে বরাবর শ্বশুরের রাজ্যে না গিয়া সরস্বতী নদী পার হইয়া উত্তরাপথে যাইবার কারণ কি?

পূর্ব্বেই জানাইয়াছি, সিংহপুর রাজ্যে স্বর্গঙ্গা প্রবাহিত স্বর্ণরেখাপুরে সামলবর্ম্মার জ্যেষ্ঠভ্রাতা ও আত্মীয়স্বজন অবস্থান করিতেন। ইহাতে মনে হয়, আত্মীয়স্বজনকে সঙ্গে লইবার জন্যই যেন তিনি শ্বশুরগৃহে যাইবার পূর্ব্বে উত্তরাপথে যাত্রা করিয়াছিলেন।

বৈদিক কুলগ্রন্থে লিখিত আছে যে, কাশীরাজকন্যা সুদক্ষিণার পাণিগ্রহণ করিয়া বিক্রমপুরে ফিরিয়া আসিবার পর হঠাৎ একদিন সামলবর্ম্মার প্রাসাদে শকুনি আসিয়া পড়ে, তাহাতে রাজ্যমধ্যে নানারূপ উপদ্রব ঘটিতে থাকে। এই ব্যাপারে বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া তিনি সস্ত্রীক শ্বশুরালয়ে গমন করেন। কাশীপতি তাঁহাকে শান্তির জন্য উপযুক্ত বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ দ্বারা যজ্ঞ করিবার পরামর্শ দেন। কিন্তু এসময় বঙ্গে শাকুনসত্র করিবার উপযুক্ত সিদ্ধবাক্ ব্রাহ্মণ ছিলেন না। শ্বশুরের অনুরোধে তিনি কর্ণাবতী হইতে বেদবিদ্ যশোধর মিশ্রকে সপরিবারে সঙ্গে লইয়া আসেন। (১) তিনিই শাকুনসত্র করিয়া সকল উপদ্রব নিবারণ করেন। (২)

বৈদিক আগমন।

আধুনিক কুলগ্রন্থ-সমূহে লিখিত আছে, শৌনক যশোধর মিশ্র ব্যতীত, শাণ্ডিল্য-বেদগর্ভ, বশিষ্ঠ-গোবিন্দ,

† Epigraphia Indica, Vol. I p. 172, 178-179.

* উচ্চৈরুচ্চৈঃ করিবরগণৈর্বারিবাহ প্রবাহৈ-
রশ্বৈরুচ্চৈঃ পবনসদৃশৈরাবৃতঃ শ্যামলোঽসৌ।
আকাশঞ্চ ক্ষিতিতলমভূদ্ভাসিতং ব্যোমতুল্যং
কৃত্বা সৈন্যৈঃ সকলক্ষিতিপতিঃ সত্যমেব জগাম॥
সরস্বতী নদীতীরে কনোজব্রহ্মশাসনং।
সমুত্তীর্য্য সসৈন্যোঽসৌ প্রাবয দ্রবিণং পরং॥"
(ঈশ্বরবৈদিকের কুলপঞ্জী)

(১) ততঃ শ্যামলবর্ম্মা তু গত্বা কর্ণাবতীং সুধীঃ।
ন কর্ত্তুং সম্মতং যজ্ঞে শশাক পৃথিবীপতিঃ॥
কাশীরাজস্ততো গত্বা সংস্তূয় চ যশোধরম্।
চকার সম্মতং তস্মিন্ যজ্ঞে শ্যামলবর্ম্মণঃ॥
যশোধরঃ শশধর সুরবস্থ শূন্যবিধুমানে শাকে বৈশাখমাসীয় শুক্রদশম্যামাগমৎ গৌড়ে শ্যামলবর্ম্মা রাজধানীম্।"
(পাশ্চাত্য-বৈদিক-কুলপঞ্জিকা)

(২) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণকাণ্ড, ৩য় অংশে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

ভরদ্বাজ-জিতমিশ্র ও সাবর্ণ-পদ্মনাভও কর্ণাবতী হইতে এদেশে আসিয়া যশোধরের সহিত যজ্ঞে ব্রতী হইয়াছিলেন। কিন্তু প্রাচীন কুলপঞ্জীকার ঈশ্বরবৈদিকের মতে একমাত্র যশোধর মিশ্র আসিয়াই শাকুনসত্র সুসম্পন্ন করেন এবং তাঁহার পুত্রকন্যা বিবাহোপযুক্ত হইলে পর কনোজরাজ্য হইতে আরও কএকজন বৈদিক বিপ্র আসিয়াছিলেন।

যশোধর মিশ্রের নাম ও পরিচয় এবং পঞ্চগোত্রীয় বৈদিকাগমন সম্বন্ধেও আধুনিক কুলগ্রন্থকারগণ বড়ই গোলযোগ ঘটাইয়াছেন। বৈদিক পঞ্চগোত্রের মধ্যে বিভিন্নগোত্রীয় ব্রাহ্মণগণ বিভিন্ন সময়ে বঙ্গদেশে আগমন করিলেও সকলেই বঙ্গাধিপ সামলবর্ম্মার সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন বলিয়া গৌরব প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু বিভিন্ন গোত্রের লিখিত বিভিন্ন কুলগ্রন্থ ও ভিন্ন গোত্রের বংশলতা আলোচনা করিয়া এখন জানিতেছি যে, এক সময়ে সকল গোত্র এদেশে আগমন করেন নাই এবং বঙ্গাগত শুনক ও শৌনকগণের বীজপুরুষ যশোধর মিশ্রও এক ব্যক্তি ছিলেন না। আধুনিক কুলগ্রন্থে ৩টি যশোধর এক হইয়া গিয়াছেন। †

পাশ্চাত্য বৈদিকগণের সকল গ্রন্থেই প্রায় দেখা যায় যে, কর্ণাবতী-সমাজ হইতেই তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ এদেশে আগমন করেন। মহাদেব শাণ্ডিল্যের সম্বন্ধতত্ত্বার্ণবে এই কর্ণাবতীর অবস্থান সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে—

কর্ণাবতী সমাজ।

"বারাণসীপশ্চিমসন্নিধানে কর্ণাবতী নাম সমাজসংস্থম্।
ঋগ্বেদিনং সাঙ্গত্রিবেদবিজ্ঞং অধীতনিঃশেষিতপাণিনীয়ম্॥
তত্তুল্যবিদ্যান্বিতয়া বিনীতা যশোধরস্যাত্মসুতা বভূবুঃ।
ভূপালতুল্যা হরিরুদ্রগৌরী শর্ম্মাভিধেয়া সকুলপ্রদীপাঃ॥
শাকেন্দুশূন্যথবিধৌ শকাব্দে বৈশাখমাসস্য সিতে দশম্যাম্
প্রহর্ষিত স্তেন নৃপেণ সার্দ্ধং যশোধরং কুন্তলদেশমাগতঃ॥"

অর্থাৎ বারাণসীর পশ্চিমদিকে কর্ণাবতী নামক সমাজ অবস্থিত। তথায় ঋগ্বেদী বেদাঙ্গের সহিত তিন বেদে পারদর্শী, সমস্ত পাণিনি ব্যাকরণে অভিজ্ঞ যশোধর বাস করিতেন। তথায় যশোধরের আবার তত্তুল্য ত্রিবেদবিদ্যায় নিপুণ হরি,ভদ্র ও গৌরী নামধেয় তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ১০০১ শকে শুক্ল দশমী তিথিতে যশোধর (সপুত্র) কুন্তলদেশে আগমন করেন। পাশ্চাত্য বৈদিককুলপঞ্জিকাতেও লিখিত আছে,—

"বেদবিদাং যশোধরঃ শশধর সুরবর্ম্ম শূন্য বিধুমানে
শাকেবৈশাখে মাসীয়ঃ শুক্ল দশম্যামাগমৎ গৌড়ে
শ্যামলবর্ম্ম-রাজধানীম্।

উক্ত প্রমাণ হইতে বুঝিতেছি যে, কর্ণাবতী হইতে ১০০১ শকে (১০৭৯ খৃষ্টাব্দে) যশোধর মিশ্র বিক্রমপুরে শ্যামলবর্ম্মার রাজধানীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

বৈদিক কুলমঞ্জরীতেও লিখিত আছে—

"কর্ণাবত্যাং পুরা বাসো যেষামাসীদ্দ্বিজন্মনাম্।
পশ্চাদ্ বঙ্গং সমায়াতাঃ পাশ্চাত্যাস্তে প্রকীর্ত্তিতাঃ"॥

অর্থাৎ পূর্ব্বে যে সকল ব্রাহ্মণ কর্ণাবতীতে বাস করিতেন, তাঁহারাই পশ্চাৎ বঙ্গে আসিয়া 'পাশ্চাত্য' নামে প্রথিত হইয়াছেন।

মহারাজ সামলবর্ম্মার মাতামহ চেদিপতি কর্ণদেব প্রয়াগ হইতে পিতার সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে (৭৯৩ চেদিসংবতে) যে তাম্রশাসন দান করেন, তাহা কাশী হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহাতে লিখিত আছে, তিনি (নিজ নামে) 'কর্ণাবতী' নামে নগরী ও কাশীধামে 'কর্ণমেরু' নামে একটি সুবৃহৎ দেবালয় নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

পাশ্চাত্য-বৈদিক-কুল-পঞ্জিকাতেও এইরূপ লিখিত আছে,—

"ততঃ শ্যামলবর্ম্মা তু গত্বা কর্ণাবতীং সুধীঃ।
ন কর্ত্তুং সম্মতং যজ্ঞে শশাক পৃথিবীপতিঃ॥
কাশীরাজস্ততোগত্বা সংস্তূয় চ যশোধরম্।
চকার সম্মতং তস্মিন্ যজ্ঞে শ্যামলবর্ম্মণঃ॥"

রাজা শ্যামলবর্ম্মা নিজে কর্ণাবতীতে গিয়াও (যশোধরকে) যজ্ঞ করাইবার জন্য সম্মত করাইতে পারিলেন না। তখন কাশীরাজ স্বয়ং গিয়া যশোধরকে বিশেষরূপে স্তুতি করিয়া শ্যামলবর্ম্মার যজ্ঞে ব্রতী হইবার জন্য সম্মত করাইয়াছিলেন।

পাশ্চাত্য-বৈদিক-কুল-পঞ্জিকাকার উক্ত কাশীরাজের নাম করেন নাই। কোন কোন কুলপঞ্জীতে তিনি শ্যামলবর্ম্মার শ্বশুর বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন; কিন্তু তাহা প্রকৃত

† স্বতন্ত্র প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে সবিস্তার আলোচনা করিব।

নহে। ঈশ্বরবৈদিক কান্যকুব্জরাজ নীলকণ্ঠকে শ্যামলের শ্বশুর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহাকে আমরা কান্যকুব্জের অন্তর্গত সীয়ডোনি অঞ্চলের একজন সামন্ত-নৃপতি বলিয়া মনে করি। উক্ত কাশীরাজ অপর কেহ নহেন, সামলের মাতামহ কর্ণাবতী সমাজ-প্রতিষ্ঠাতা মহারাজাধিরাজ স্বয়ং কর্ণদেব। পূর্ব্বোক্ত ৭৯৩ চেদিসংবতে উৎকীর্ণ তাম্রশাসন হইতে পাইতেছি যে, তৎপূর্ব্বেই তিনি কর্ণাবতী-সমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। আমি কিছুদিন পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, কর্ণদেব ১০২৯ হইতে ১০৮৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে প্রায় ৬০ বর্ষ রাজত্ব করেন। * এদিকে পাশ্চাত্য-বৈদিক-কুলপঞ্জী হইতে পাইতেছি যে, ১০০১ শকে বা ১০৭৯ খৃষ্টাব্দে সামলবর্ম্মার আমন্ত্রণে কর্ণাবতী হইতে বেদবিদ যশোধর মিশ্র সামলের রাজধানী বিক্রমপুরে আগমন করিয়াছিলেন।

এই প্রবন্ধের প্রারম্ভেই লিখিয়াছি যে, কুলপঞ্জী লেখকের হস্তে পাশ্চাত্য বৈদিকগণের আদি ইতিহাস অনেকটা বিকৃত হইলেও বিক্রমপুরে সামলবর্ম্মার অধিষ্ঠান, তাঁহার আহ্বানে ১০০১ শকে এবং তৎপরবর্ত্তীকালেও কর্ণাবতী হইতে বৈদিকাগমন, কান্যকুব্জের সামন্তরাজকন্যা সুদক্ষিণার সহিত সামলবর্ম্মার বিবাহ ইত্যাদি ঘটনা ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া অনায়াসেই গ্রহণ করিতে পারি। ঈশ্বরবৈদিকের কুলপঞ্জীর তালপত্রে লিখিত প্রাচীন পুঁথি আলোচনা করিয়া প্রকাশ করিতে বাধ্য হইতেছি যে, আধুনিক ঘটকের মুখের কথা বা আধুনিক কুলজীর উপর নির্ভর না করিয়া ভবিষ্যতে প্রাচীন কুলপঞ্জীর সন্ধান ও আলোচনা করিতে হইবে। এখনও বঙ্গের নানাস্থানে হস্তলিখিত প্রাচীন কুলপঞ্জীর পুঁথিগুলি অনাদরে অযত্নে ধ্বংসের মুখে পতিত হইতেছে, এই সময়ে তাহাদের উদ্ধারের চেষ্টা করা একান্ত বাঞ্ছনীয়। তালপত্রের প্রাচীন কুলপঞ্জী হইতে আমরা বেশ বুঝিতে পারিতেছি যে, এইরূপ প্রাচীন সামাজিক ইতিহাস মধ্যে কত রত্ননিচয় প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। নানাস্থান হইতে আবিষ্কৃত তাম্রশাসন ও শিলালিপিসমূহের সহিত একযোগে তাহাদের আলোচনা করিতে পারিলে তবে আমরা গৌড়বঙ্গের প্রকৃত প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধারে সমর্থ হইব।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।

---

* ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন, ২য় খণ্ড, ৭ম সংখ্যা ; ৩১৬ পৃষ্ঠা।

শিল্পী

শ্রীযুক্ত আর্য্যকুমার চৌধুরীর আলোকচিত্র হইতে।

[ভারতবর্ষ—১ম সংখ্যা]

The Emerald Ptg. Works 6 Simla St., Calcutta.

ব্যথিত।

সতীশের বিবাহের তিন বৎসর পরে তাহার মাতাঠাকুরাণীর কাল হইল।

সতীশের স্ত্রী চারুর বয়স তখন পনর বৎসর। সতীশের একটি ছোট ভাই ছিল, সুরেশ। সুরেশ চারুর চেয়ে দুই বৎসরের ছোট।

চারুর দুই বৎসরের একটি সহোদর ছিল, তাহারও নাম ছিল সুরেশ। সে চারুর বিবাহের কিছু পূর্ব্বেই মারা গিয়াছিল।

চারু শ্বশুরবাড়ী আসিয়া তাহার এই প্রায় সমবয়স্ক দেবরটিকে ঘোমটার আড়াল হইতে প্রথম দিনই, কি জানি কেন, স্নেহের চক্ষে দেখিল। তারপর সে যখন জানিল, এই দেবরটির নামও সুরেশ, তখন তাহার চক্ষু অশ্রুনিষিক্ত হইয়া উঠিল।

"কেন আমি কি ব'লেছি যে, আপনার সঙ্গে কথা বল্‌ব না"।

নব বধূটিকে কথা বলাইবার জন্য সুরেশকে বেশী সাধিতে হইল না। কারণ চারু পূর্ব্ব হইতেই উৎসুক হইয়া বসিয়াছিল, কখন্ তাহার দেবর তাহাকে কথা বলিবার জন্য—একটিবার সাধিবে!

সুরেশ যখন আসিয়া বলিল, "বৌদি, আমার সঙ্গে কথা বল্‌বে না? বল্‌বে না? না বলত তোমার সঙ্গে আড়ি"—

তখন চারু মৃদু হাসিয়া বলিল, "কেন, আমি কি বলেছি যে, আপনার সঙ্গে কথা বল্‌ব না?"

সুরেশ জিতিল! কারণ চারু তাহাদের বাড়ীতে আসিয়া সর্ব্বপ্রথম তাহারই সঙ্গে কথা বলিয়াছিল! এর পূর্ব্বে আরও অনেকে সাধিয়াছিল,—কিন্তু চারু আসিয়া সুরেশকে দেখিয়াই স্থির করিয়াছিল, যে, সে প্রথম তাহারই সঙ্গে কথা বলিবে!

সুরেশ তাহার বিজয়গর্ব্ব লুকাইয়া রাখিতে পারিল না; বিজিতের প্রতি স্নেহবশতঃই হউক, বা অনুগ্রহ বশতঃই হউক, সুরেশ চারুকে কএকটা কালোজাম ও পেয়ারা তাহার প্রথম প্রীতি উপহার স্বরূপ প্রদান করিয়া, নূতন উপহারের সন্ধানে বাহির হইয়া গেল!

কিছু দিনের পরিচয়ের পর, চারু যেদিন সাশ্রুনয়নে সুরেশকে বলিল যে, তাহার একটি ছোট ভাই ছিল, এবং তাহারও নাম ছিল সুরেশ, সেদিন সুরেশের চক্ষু দুইটাও অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল!

সুরেশ সেইদিন হইতেই চারুর উপর তাহার আব্‌দারের মাত্রাটা বাড়াইয়া দিল, এবং চারুর সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য যতগুলি ব্যবস্থা তাহার বালকোচিত বুদ্ধিতে আসিতে পারে, তাহার কোনটাই সে অবলম্বন করিতে বাকী রাখিল না।

হঠাৎ একদিন স্কুল হইতে আসিয়া সে চারুকে ডাকিয়া গোপনে বলিল, "আচ্ছা বৌদি, তোমার সুরেশ তোমাকে কি বলে ডাকৃত?"

চারু বিষণ্ণমুখে বলিল, "দিদি"—

"আচ্ছা, আমি তো তোমায় 'বৌদিদি' বলেই ডাকি'—তা' 'বৌ' টুকু ছেড়ে দিয়ে, এখন থেকে 'দিদি' বলেই ডাকি না কেন? আর তুমি আমাকে নাম ধরেই ডেকো,—না হয়,—" সুরেশ একবার এদিক্ ওদিক্ চাহিল!

"না হয়' কি ঠাকুরপো?—" চারু স্নিগ্ধ স্বরে জিজ্ঞাসা করিল। তাহার শোকের তীব্রতা দূর করিবার জন্য এই বালকটির আগ্রহ দেখিয়া সে অন্তরের অন্তরে একটা সান্ত্বনা লাভ করিতেছিল।

"তা' তা' তোমার সুরেশকে 'না' বলে ডাক্‌তে!"—সুরেশ একটু সঙ্কোচের সহিত কথাটি বলিল।

এই আশঙ্কা করিয়াই বোধ হয় সে কুণ্ঠাবোধ করিয়াছিল। পাছে চারু তাহার মনের ভাবটা ঠিক না ধরিতে পারে!

"আমি তাকে' ভাইটি বলে ডাক্‌তাম"—চারুর কণ্ঠস্বর শোক-জড়িত হইয়া আসিতেছিল!

"তা' আমাকেও না হয়"—কেমন করিয়া হঠাৎ কথাটা বলিয়া ফেলিবে, সুরেশ একটু দ্বিধা করিতেছিল!

চারু বলিল—"ভাইটি বলিয়া?—আমার অনেক দিন ইচ্ছা হয়েছে, তা আপনি কি ভাববেন, আর লোকে শুন্‌লেই বা কি বল্‌বে, এই ভয়েই আপনাকে কিছু বলি নাই।"—চারুর কপোল বহিয়া বিন্দু বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল!

কথাটা বলিবার পক্ষে, যে লজ্জাটুকু সুরেশকে বাধা প্রদান করিতেছিল, চারু তাহা ফুটিয়া বলিয়া দূর করিয়া দিল; তখন সুরেশ ভারি একটা আরাম পাইল।

একটু কাছে সরিয়া আসিয়া সুরেশ চারুর হাত ধরিল,—তারপর আস্তে আস্তে বলিল, "দেখ দিদি, আমি তোমায় দিদি বলেই ডাক্‌ব—তুমি, যখন কেউ সাম্‌নে না থাকে তখন 'ভাইটি' বলে ডেকো, কেউ কাছে থাক্‌লে, 'সুরেশ' কি 'ঠাকুরপো' যা' হয় একটা কিছু বলে ডেকো! কেমন?—এই কথা রহিল,—ঠিক্ থাকে যেন! বুঝ্‌লে—বুঝ্‌লে? আর একটা কথা; তুমি আমাকে 'আপনি' বল্‌লে তোমার সঙ্গে এমন আড়ি—বুঝ্‌লে—বুঝ্‌লে?"

চারু এই অকপট স্নেহাভিব্যক্তির কাছে একেবারেই ধরা দিল। তাহার অতৃপ্ত ভ্রাতৃস্নেহের উৎস এতদিন এক-মাত্র ভ্রাতার অভাবে উন্মুখ হইয়া ছিল, আজি তাহা সুরেশকে বেষ্টন করিয়া পবিত্র গঙ্গোদকের ন্যায় শতধারায় প্রবাহিত হইল!

সুরেশ মার কাছে আসিয়া বলিল, "মা, আমার তো 'দিদি' নাই, আমি বৌদিদিকেই দিদি বলে ডাক্‌ব! কেমন?"

"আচ্ছা, বেশ ত!"—

দুই বৎসর পরে মাতা যখন মৃত্যুশয্যায় শায়িতা, তখন তিনি বধূকে ডাকিয়া বলিলেন, "মা, সুরু তোমারই ভাই, ওকে তুমিই দেখ্‌বে। তুমি বুদ্ধিমতী, তোমাকে আর বেশী কি বল্‌ব"—সুরেশকে কহিলেন, "সুরু, বৌমা এতদিন তোর দিদিই ছিল, এখন মার মত হ'ল, তোরা দুই ভাই বোন্ চিরদিন মিলে মিশে থাকিস্!"

[২]

শাশুড়ীর মৃত্যুর পর চারুকে বাধ্য হইয়া গৃহিণীর দায়িত্বপূর্ণ পদ গ্রহণ করিতে হইল!

সতীশ মেডিকাল কালেজে পড়িত। কালেজের তৃতীয় ও চতুর্থ বৎসরে খাটুনী বেশী; প্রায়ই 'ডিউটীতে' থাকিতে হইত; তাই সতীশ বড় একটা বাড়ী আসিতে পারে নাই। সে দুইবার আসিয়াছিল, তাহার মধ্যে প্রথমবার চারুর সঙ্গে কয়টি দিনের জন্য তাহার দেখা হয়; দ্বিতীয়বার সে যখন আসে তখন চারু পিত্রালয়ে গিয়াছিল, কাজেই দেখা হয় নাই; সুতরাং স্বামী স্ত্রীর ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়া উঠিবার সুবিধা কোনও দিনই তেমন ঘটে নাই। বিশেষ সতীশ তাহার ডাক্তারী শেখার দিকে একান্ত ভাবেই ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল! আর চারুও ছিল, হিন্দুর ঘরের লজ্জানতা বধূটী!

জননীর মৃত্যু হওয়ার পর চারু ও সুরেশকে লইয়া কলিকাতায় বাসা করিয়া থাকা ছাড়া সতীশের উপায়ান্তর রহিল না। পরিবারের মধ্যে আর কোনও লোক ছিল না, শুধু ইহারাই তিনজন। পল্লীগ্রামে যে বিষয়-সম্পত্তিটুকু ছিল তাহারই আয় হইতে সংসার চলিয়া যাইত। নায়েব মহাশয়ের উপর সম্পত্তি দেখিবার শুনিবার ভার দিয়া সতীশ, চারু ও সুরেশকে লইয়া কলিকাতায় চলিয়া আসিল।

নায়েব মহাশয় পুরাতন কর্ম্মচারী—বিশ্বাসী এবং সতীশের পিতার হিতৈষী বন্ধু ছিলেন। সম্পত্তির ভার তাঁহার উপর

থাকিলে যে কোনও অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা নাই, সতীশ তাহা জানিত।

সুতরাং সতীশ কলিকাতার বাসায় আসিয়া, তাহার নর-কঙ্কাল এবং সুরেশ ও চারুর পক্ষে নিতান্ত দুর্ব্বোধ্য প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ডাক্তারী পুঁথিগুলি লইয়া নিশ্চিন্ত মনে ব্যাপৃত রহিল!

চারু সতীশের পড়ার ঘরে আদবেই প্রবেশ করিতে চাহিত না। দেওয়ালের গায়ে ঝুলান বরফের ন্যায় সাদা নরকঙ্কালটা তাহার কাছে একটা কল্পনার প্রেতলোক সৃষ্টি করিয়া তুলিত! তাহার মনে হইত ঐ কঙ্কালটার চারি পাশ দিয়া একটা অতৃপ্ত আত্মা দিনরাতই 'হা হা' করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে! কঙ্কালের মায়া যেন সে আর কোন মতেই ছাড়িতে পারিতেছে না!

চারু এই সকল কথা লইয়া সুরেশের সঙ্গে যতই আলোচনা করিত, ততই সতীশের পড়ার ঘরটা তাহার কাছে একটা বিরাট্ ভীতির আবাসস্থল বলিয়া প্রতীয়মান হইত! সুতরাং সতীশ বাহির হইবার পূর্ব্বে তার পড়ার ঘরটা প্রতিদিনই চাবি দিয়া বন্ধ করিয়া রাখিয়া যাইত।

চারু একদিন সতীশকে তাহার পড়ার ঘর বন্ধ করিয়া রাখিয়া যাইবার জন্য অনুরোধও করিয়াছিল! সে হয় ত মনে করিত, সতীশ যতক্ষণ বাড়ী থাকে, ততক্ষণ কঙ্কালটা ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী সেই কল্পিত প্রেতাত্মাটি নিরীহভাবে থাকে, কিন্তু সতীশ বাহির হইয়া গেলে যদি কঙ্কালটা গা' নাড়া দিয়া উঠে,—ওমা,—তখন সুরেশ আর সে এই নিৰ্ব্বান্ধব বাসায় কি উপায় করিবে?

সতীশ কালেজে চলিয়া গিয়াছে। চারু তাহার ঘরে বসিয়া পান সাজিতেছে। একটা ঘুড়ির খানিকটা ছিঁড়িয়া গিয়াছে, সুরেশ তাহাই সারিয়া লইতেছে। পাশে হরিদ্রা-বর্ণের সুতা জড়ান 'লাটাই'টা পড়িয়া রহিয়াছে। হঠাৎ চারু জিজ্ঞাসা করিল,—

"মানুষ মরিয়া কি হয়, সুরু?"

"কেন, কঙ্কাল হয়"—বিজ্ঞের মত গম্ভীর ভাবে সুরেশ উত্তরটা দিল!

চারু যখন এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, সুরেশ তখন বিজ্ঞতা দেখাইতে ছাড়িবে কেন? বিশেষ ভুল ধরিবার কেহই ত সেখানে নাই!

"দূর, তুমি পার্‌লে না সুরু,"—

"বাঃ, পার্‌লাম না কেমন, তুমি বলত!"

হঠাৎ চারু জিজ্ঞাসা করিল, "মানুষ মরিয়া কি হয়, সুরু?"

চারু তাহার শান্ত চক্ষু দুইটি বিস্ফারিত করিয়া বলিল, "আমি জানি,"—

"তবে কি, বল না, দিদি!"

"মানুষ ম'রে স্বর্গে যায়;—"

"স্বর্গ,—হুঁ,—আমার মা তা' হ'লে স্বর্গে গেছেন?"

"নিশ্চয়ই,—"

"আমরাও ত যাব?"—

"যাব।"

"কে আগে যাবে দিদি ?—"সুরেশ ঘুড়ি সরাইয়া রাখিয়া চারুর মুখের দিকে উত্তরের জন্য চাহিল !

অনেকদিন পরে মার কথা উঠাতে সুরেশের বুকের মধ্যে যেন কেমন একটা করিয়া উঠিল ।

তখন চারু একটু মৃদু হাসিয়া বলিল, "আমি আগে যাব ভাইটি,"—

"ইস্, আমি আগে,"—

"না, আমি আগে,"—

সুরেশ দেখিল, এভাবে কথা চলিলে আর তর্কের মীমাংসা হইয়া উঠিবে না, তখন সে বলিল,

"আচ্ছা দিদি, এই কথা থাক, যে আগে স্বর্গে যাবে সে এসে যে বেঁচে থাক্‌বে তাকে দেখা দেবে"—

"আচ্ছা, এই কথা থাক্‌ল, কিন্তু তুমি ভয় পাবে না ত ?"

সুরেশ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল, "তোমাকে দেখে ভয় পাব, দিদি ? ভারি মজা ত !"

এমনই করিয়া সেই সরল বালক ও সরলা কিশোরীর দিন কাটিতেছিল !

[৩]

সতীশের প্রকৃতিতে একটা বিশেষত্ব ছিল। সে যখন যে কাজে লাগিত, তখন সে কাজটা তাহাকে একটা নেশার মত পাইয়া বসিত !

ডাক্তারি শেখার দিকে একটা ঝোঁক তাহার বাল্যকাল হইতেই ছিল। এফ্‌ এ পাশ করিয়া সে যখন মেডিকেল কালেজে প্রবেশ করিল, তখন ডাক্তারির পুঁথিগুলি, কঙ্কালগুলি, তাহার একমাত্র সঙ্গী হইয়া উঠিল। এখন শেষ-পরীক্ষার দিন কাছে আসিয়া পড়িয়াছে, বিশ্বসংসারে এমন কিছুই নাই, যাহার আকর্ষণ সতীশকে তাহার পাঠগৃহ হইতে টানিয়া রাখিতে পারে! গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত সে তাহার পড়ার ঘরে, নানা আলোচনায় নিযুক্ত থাকিত ! চারু যে তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে, একথা একটিবারও তাহার মনে উঠিত না ! চারু অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিত, ঘুমে তাহার চক্ষু ভরিয়া আসিত, তারপর কখন্ যে সে ঘুমাইয়া পড়িত, তাহা জানিতেও পারিত না।

ছয় মাসের উপর সে কলিকাতায় আসিয়াছে,—ইহার মধ্যে স্মরণযোগ্য কিছু যে সে স্বামীর কাছে পাইয়াছে, চারু তাহা মনেই করিতে পারিত না !

চারু, ছোট লাজুক মেয়েটি, একটু বেশী অভিমানিনী। কেমন করিয়া স্বামীর ভালবাসা আদায় করিয়া লওয়া যায়, সে কৌশলটি চারু একেবারেই জানিত না ! সে ভাবিত, "স্বামীর কর্ত্তব্য স্বামীর কাছে; আমার কর্ত্তব্য আমার কাছে ! স্বামী নিজ হইতে যতটুকু দিবেন, আমি তাহাই লইব, তার বেশী পাইবার জন্য কি নিজে যাইয়া লজ্জাহীনার ন্যায় ধরা দিব ? ছিঃ !"

কিন্তু ভিতরে ভিতরে তাহার তৃষিত নারী-প্রকৃতি, তাহার ন্যায্য প্রাপ্য কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া পাইবার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিতেছিল ! সতীশ যখন চারুর কাছে, তাহার অভাব আকাঙ্ক্ষা বুঝিয়া পরিবেশন করিতে আসিল না, তখন চারু কি অমৃতভাণ্ড লুণ্ঠন করিতে যাইবে ? না বলিবে, আমার পিপাসা, আমার ক্ষুধা, ওগো, তুমি মিটাও !

চারুর প্রার্থিত কি, সুরেশ সবটা পরিষ্কাররূপে না বুঝিলেও কতকটা বুঝিত। সতীশ যখন গভীর মনোযোগের সহিত তাহার ডাক্তারি শাস্ত্র-চর্চ্চায় নিযুক্ত থাকিত, তখন সুরেশ তাহার ছোট ঘরটি ছাড়িয়া মধ্যে মধ্যে উঠিয়া আসিত, এবং দাদার পড়ার ঘরের কাছে গিয়া দাঁড়াইত !

খোলা জানালার ফাঁক দিয়া বহুক্ষণ পর্য্যন্ত সে দাদার আনত মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত ! ঐ প্রকাণ্ড পুঁথিগুলার মধ্যে তাহার দাদা যে কি অমূল্য রত্ন পাইয়াছে, সুরেশ তাহা কোনক্রমেই বুঝিয়া উঠিতে পারিত না !

পাশে চারুর শয়নকক্ষ; স্তিমিতালোকে চারু শয্যার উপর বালিশে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া রহিয়াছে। সে কি ঘুমাইয়াছে ? না, কখনই না ! সুরেশের সমস্ত হৃদয় দাদার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠিত !

বারাণ্ডার উপর দিয়া জুতার শব্দ করিতে করিতে সে নিজের ছোট ঘরটিতে প্রবেশ করিত !

সুরেশের পায়ের শব্দ ও তাহার দুয়ার বন্ধ করার শব্দ শুনিয়া মুহূর্ত্তকালের জন্য সতীশের মনোযোগ ভঙ্গ হইত !

"কে, সুরু নাকি ?" কিন্তু সুরু ত উত্তর দেওয়ার জন্য শব্দ করে নাই। সতীশ উত্তর না পাইয়া আবার পড়িতে বসিত !

সুরেশ এখন একটু বড় হইয়াছে, কিন্তু ছেলেবেলার মত দিদির উপর আব্‌দার খাটানটুকু সে ঠিক্‌ বজায় রাখিয়াছে! সুরেশ তাহার দিদিকে স্নেহের দাবী পরিপূরণে নিযুক্ত রাখিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিত!

সতীশ যে তাহার দিদির প্রতি সুবিচার করে নাই, এজন্য সে যেন চারুর কাছে একটু কুণ্ঠা বোধ করিত! চারু কোন দিন সতীশের ঔদাসীন্যের সম্বন্ধে কোনও কথাই সুরেশকে বলে নাই! কিন্তু এমন কতকগুলি ব্যাপার আছে, বলার চাইতে, না বলাতেই যাহার তীব্রতাটা বেশী করিয়া ধরা পড়ে! চারু কোনও দিন কিছু বলে নাই, তবুও তাহার হৃদয়ের মধ্যে যে একটি যাতনাপূর্ণ অংশ অন্যের অলক্ষ্যে প্রচ্ছন্নভাবে রহিয়াছে, চারুর নীরবতাই, সেই অংশটাকে বেশী করিয়া ধরাইয়া দিত!

স্বর্গগত মা ও বাবার কথা স্মরণ করিয়া মধ্যে মধ্যে চারুর চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিত, সুরেশ সেই অশ্রুর অন্তরালে সতীশের উপেক্ষার অংশটাও সুস্পষ্ট দেখিতে পাইত! চারুর হৃদয়ের সবটুকু বেদনা দূর করা ত সতীশেরই কর্ত্তব্য ছিল!

সুরেশ কলিকাতার রাস্তায় বাহির হইয়া যেখানে যে কৌতূহলজনক দৃশ্য দেখিতে, বাসায় ফিরিয়া, চারুর কাছে তাহা বর্ণনা করা তাহার একটা দৈনিক কাজ হইয়া পড়িল! খুটিনাটী জিনিষ কিনিয়া কিনিয়া সে বাসার ঘরগুলি পূর্ণ করিয়া ফেলিল। প্রত্যহ একটা কিছু নূতন জিনিষ সে বাসায় আনিত! আর সেই জিনিষটির নির্ম্মাণ-কৌশলের প্রশংসা বা অপ্রশংসা লইয়া, এই দুইটি নিতান্ত অসহায় প্রাণীর অনেকটা সময় কাটিয়া যাইত!

সুরেশের শ্রদ্ধা ও একান্ত সহানুভূতি, চারুর হৃদয়ক্ষতের উপর একটা প্রলেপের মত লাগিয়া রহিল!

এদিকে সতীশের কালেজের শেষ পরীক্ষার দিন নিকট হইয়া আসিতে লাগিল। সতীশ পাঠের মধ্যে আপনাকে একেবারেই নিমগ্ন করিয়া দিল।

জানালার ফাঁক দিয়া চারু দেখিত, সতীশ নিবিষ্টমনে তাহার বইয়ের পাতা উল্‌টাইয়া যাইতেছে; বিশ্বের একদিক যদি ভূমিকম্পে ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হইয়াও যাইত, তাহা হইলেও বোধ হয় সতীশের ধ্যানভঙ্গ হইত না! তা' কোথায় চারু, কোন্‌ জানালার ফাঁক দিয়া তাহার দিকে শান্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছে, কেমন করিয়া আর তাহা সতীশের চক্ষে পড়িবে? বিশেষ চারুত ধরা দিতে যাইত না—সে দেখিতেই যাইত; সতীশ হয়ত দেখিতে পাইবে এমনটা বুঝিলে সে সরিয়া আসিত?

এমনই করিয়া এই অতৃপ্তহৃদয়া যুবতী তাহার আপনার স্ফুটনোন্মুখ যৌবনের সমগ্র সাধ ও আশা স্বামীর উদ্দেশ্যে নীরবে নিবেদন করিয়া দিতেছিল! কিন্তু তাহার একাগ্রচিত্ত-দেবতার সম্মুখে তাহার নৈবেদ্যটুকু অস্পৃষ্ট অবস্থায়ই পড়িয়া রহিল;—দেবতা তাহা স্পর্শও করিলেন না; বুঝি একবার চাহিয়াও দেখিলেন না!

[৪]

আজ সতীশের পরীক্ষা শেষ হইল। পাঁচবৎসর বসিয়া সে অনন্যমনে যে বোঝাটা টানিয়াছে, আজ পরীক্ষা-মন্দিরে সেই বোঝাটাকে নামাইয়া দিয়া সতীশ বেশ একটু আরাম বোধ করিতেছিল!

তখনও সন্ধ্যা হয় নাই! অস্তগামী সূর্য্যের সিন্দুর-রাগরঞ্জিত রশ্মি কলিকাতার বড় বড় বাড়ীগুলার মাথার উপর তখনও শোভা পাইতেছিল।

সতীশ রাস্তার জনতা ভেদ করিয়া বাসায় চলিয়া আসিল। চারুর শয়নকক্ষের পাশ দিয়াই তাহার পড়ার ঘরে যাইতে হয়। চারুর কক্ষের সম্মুখে আসিয়া সে দাঁড়াইল। কি যেন মনে করিয়া ডাকিল, "চারু"—

আজ পরীক্ষা অবসানের প্রথম মুহূর্ত্তেই, চারুকে অভিনন্দন করিবার জন্য বোধ হয় তাহার হৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল!

সুরেশ ঘরের মধ্য হইতে উত্তর দিল,—"দাদা, এখানে একবার আস্‌বে? দিদির ভারি জ্বর হয়েছে।"

চারুর জ্বরের কথা শুনিয়া সতীশ আর পড়ার ঘরে গেল না; পত্নীর শয্যার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিল "কখন্‌ জ্বর এসেছে?" সুরেশ শিয়রে

বসিয়া ধীরে ধীরে দিদির মাথা টিপিয়া দিতেছিল। সে বলিল "তুমি বেরিয়ে যাবার পরই জ্বর এসেছে, ক্রমেই বাড়্ছে।" চারুর সুগৌর মুখ খানি জ্বরের উত্তাপে লাল হইয়া উঠিয়াছিল!

"তুমি বেরিয়ে যাবার পরই জ্বর এসেছে, ক্রমেই বাড়্ছে।"

সুরেশ ডাকিল—"দিদি, দাদা এসেছেন"

চারু চক্ষু মেলিয়া চাহিল, তারপর মাথার কাপড়টা টানিয়া দেওয়ার চেষ্টা করিল।

"দিদি এর পূর্ব্বে বল্ছিল, সর্ব্বাঙ্গে বড় বেদনা হয়েছে। তুমি ভাল করে দেখ না দাদা,"—সুরেশের কণ্ঠস্বর মমতা ও বেদনাপূর্ণ। চারুর এমন জ্বর সুরেশ আর কোনও দিন দেখে নাই। সে বড়ই ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

চারুকে পরীক্ষা করিয়া সতীশের মুখ শুকাইয়া গেল এবং সে তখনই বাসা হইতে বাহির হইয়া গিয়া একজন বড় ডাক্তারকে সঙ্গে লইয়া অবিলম্বে ফিরিয়া আসিল।

ডাক্তার চারুকে পরীক্ষা করিয়া সতীশকে বাহিরে ডাকিয়া লইয়া কহিলেন, "আপনি যা' ধরেছেন তাই-ই—ছেলেটি কে? আপনার ভাই বুঝি? ওকে এখান থেকে আর কোথাও পাঠিয়ে দিন, আর এঁর উপর বিশেষ যত্ন নেবেন,—আপনাকে আর বেশী কি বল্ব!"—ডাক্তার 'প্রেস্‌ক্রুপশন' করিয়া চলিয়া গেলেন।

সুরেশকে একটু দূরে ডাকিয়া সতীশ বলিল, "সুরু, তোমার দিদির অসুখটা ভাল বোধ হচ্ছে না। তুমি আজ রাত্রে বিনোদ্‌দার বাসায়ই না হয় গিয়ে থাক"—এমন সময়ে চারু ক্ষীণকণ্ঠে ডাকিল,

"সুরু, ভাইটি,—সুরেশ ছুটিয়া আসিয়া দিদির কাছে বসিল, এবং মাথা নীচু করিয়া বলিল, "দিদি, এই ত আমি এখানেই আছি।"

চারু তাহার জ্বরতপ্ত হাতখানি বাড়াইয়া দিয়া সুরেশের হাত ধরিল, বলিল, "আমায় একটু জল দাও, ভাইটি"—

সুরেশ জল দিয়া দৃঢ়স্বরে সতীশকে বলিল, "আমি দিদির কাছ ছেড়ে কোথাও যাব না। দাদা—তুমি দিদির চিকিৎসার জন্য ভাল বন্দোবস্ত কর!"—

ডাক্তারের কথার ভাবেই সুরেশ বুঝিয়াছিল যে, চারুর প্লেগ হইয়াছে।

দিদির অসুখ; তাহাকে ফেলিয়া প্রাণ বাচাইবার জন্য সে অন্য বাসায় যাইয়া লুকাইয়া থাকিবে, এর অপেক্ষা মর্ম্মভেদী প্রস্তাব আর কি হইতে পারে, সুরেশ তাহা ভাবিয়াও স্থির করিতে পারিল না! তাহার শরীরের প্রত্যেক অণুটি পর্য্যন্ত বিদ্রোহী হইয়া উঠিল! যে দিদি তাহাকে মাতৃশোক পর্য্যন্ত ভুলাইয়া দিয়াছে,—সহোদরার মমতায় তাহাকে বেড়িয়া রাখিয়াছে, সেই স্নেহময়ী দিদিকে রোগশয্যায় ফেলিয়া সে প্রাণভয়ে পলাইয়া যাইবে?

সে আপনা আপনি বিপুল আবেগের সহিত বলিয়া উঠিল, "না না, তা হ'তেই পারে না—কিছুতেই না।"—

তারপর দুইদিন পর্য্যন্ত সুরেশ ও সতীশ অবিশ্রান্ত চারুর সেবা ও শুশ্রূষা করিল। কালেজের অধ্যাপকেরা ও কলিকাতার প্রায় সকল খ্যাতনামা ডাক্তারই চারুকে দেখিলেন। কিন্তু ভগবান্ যাহাকে কোলে তুলিয়া লইতেছেন, মানুষের চেষ্টা কেমন করিয়া তাহাকে বাঁধিয়া রাখিবে! পরদিন শেষ রাত্রে সুরেশ ও সতীশের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিয়া চারু স্বামীকে ফেলিয়া,স্নেহের ভাইটির স্নেহপাশ ছিন্ন করিয়া কোন্ অজানা দেশে চলিয়া গেল—একবার ফিরিয়াও চাহিল না!

[৫]

চারুর অসুখের সংবাদ পাইয়া গ্রাম হইতে নায়েব মহাশয়ও আসিয়াছিলেন। নায়েব মহাশয় চিরদিনই এই পরিবারের শুভাকাঙ্ক্ষী। সতীশ ও সুরেশ এই সরলপ্রাণ বৃদ্ধকে পিতার ন্যায় ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিত।

চারুর মৃত্যুর পর একমাস কাটিয়া গিয়াছে। বাহিরের একটা ঘরে বসিয়া সতীশ একখানি খবরের কাগজের পাতা উলটাইতেছিল। নায়েব মহাশয় সেখানে আসিলেন।

"সতু"—সতীশ অন্যমনস্ক ছিল, নায়েব মহাশয়ের স্নেহপূর্ণ কণ্ঠস্বর শুনিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

"ব'স বাবা, তোমাকে কয়টা কথা বলিতে আসিয়াছি।" নায়েব মহাশয় চৌকীর উপর বসিলেন, সতীশও চৌকীর একপ্রান্তে বিনীতভাবে বসিল। নায়েব মহাশয় বলিলেন, "এখন কি কর্ত্তব্য স্থির করিয়াছ?"—

"আজ্ঞে, কিছুই ত স্থির করি নাই। আপনি কি আদেশ করেন?"—

"আমি বলি তুমি কলিকাতাতেই ডিস্পেন্সারি খোল"—

"আমি মনে করিতেছিলাম, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে একটা সুবিধামত চাকরি পাই কি না দেখি!"—

সতীশের পরীক্ষার ফল তখনও বাহির হয় নাই। এ পর্য্যন্ত প্রতিবৎসরই সে প্রত্যেক পরীক্ষায় প্রথমস্থান অধিকার করিয়া আসিয়াছে,—গোপনে সন্ধান লইয়া কএকটা বিষয়ের ফলও সে ইতিমধ্যে জানিতে পারিয়াছে। সে যে এই শেষ পরীক্ষাতেও প্রথমস্থান অধিকার করিবে, সে বিষয়ে ছাত্র বা অধ্যাপক কাহারও সন্দেহ ছিল না।

সতীশের উত্তর শুনিয়া নায়েব মহাশয় একটু গম্ভীরভাবে কহিলেন, "সতীশ, মনের অস্থির অবস্থায় হঠাৎ কোনও একটা কাজ করা ঠিক নহে। বিশেষ আমি জীবিত থাকিতে ললিত চৌধুরীর পুত্রকে চাকরি করিতে দিতে পারিব না,—এ বুড়ো মরিয়া গেলে যা' হয় করিও। তোমার ডিস্পেন্সারি খুলিবার সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া আমি বাড়ী ফিরিব।"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া তিনি পুনরায় বলিলেন, "আমার হাতে এখন অনেক কাজ রহিয়াছে, আমি বেশীদিন আর কলিকাতায় থাকিতে পারিব না"—কথাগুলি বলিয়া নায়েব মহাশয় একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সতীশের মুখের দিকে চাহিলেন।

সতীশ, কাজটা কি, বুঝিল, কিন্তু ধরা দিল না; বলিল, "কাকা, সুরেশের কি করা যায়? সে যে বড় অস্থির হয়ে পড়্ল।"

হরকিশোর বাবু বহুকাল নায়েবি করিয়া চুল পাকাইয়াছেন; বুঝিলেন সতীশ ধরা দিবে না, তাই কথাটা বিষয়ান্তরে লইয়া যাইতেছে! কিন্তু বিষয়কার্য্যে দীর্ঘকাল যাঁহারা লিপ্ত থাকেন, প্রতিকূল অবস্থাটাকে প্রকারান্তরে অনুকূল করিয়া লইবার ক্ষমতা তাঁহাদের মধ্যে বহুল পরিমাণে দেখা যায়। হরকিশোর বাবু উত্তর করিলেন, "ছেলেমানুষ, মার কোল ছেড়ে অবধি বোনেরই বাধ্য হ'য়ে পড়েছিল; বড় আঘাত পেয়েছে! তা' আবার একটি সঙ্গী না পেলে ঠিক স্থির হ'তে পারবে না।"

সতীশ চুপ করিয়া রহিল; একটু অন্যমনস্ক ভাবে খবরের কাগজের একটু অংশ ছিন্ন করিয়া লইয়া সে তাহাই ভাঁজ করিতে লাগিল! সূর্য্যকরতপ্ত কুন্দকুসুমের ন্যায় চারুর জ্বরতাপ-ক্লিষ্ট সুন্দর মুখখানি আজি তাহার ক্রমাগতই মনে পড়িতেছিল! যে তরুণ লতিকা সতীশকে বেড়িয়া উঠিতে চাহিয়াছিল, সে তাহাকে আশ্রয় দেয় নাই! কেন দেয় নাই? সে প্রশ্ন সে নিজের কাছেও ত করিতে পারিতেছে না। চারুকে ত সে উপেক্ষা করে নাই! একটা তুচ্ছ পরীক্ষার অনুরোধে সে যে দীর্ঘকাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভুলিয়া দেবরাজ ইন্দ্রের মত তপশ্চর্য্যায় নিযুক্ত ছিল, একথা ত চারু বুঝে নাই! সেই অভিমানিনী বালিকা, কতবার তাহার পাঠগৃহের কাছ দিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গিয়াছে, কতবার সে জানালার ফাঁক দিয়া তাহার শান্ত স্নিগ্ধ দৃষ্টি উৎসারিত করিয়া চাহিয়া দেখিয়াছে, কিন্তু সতীশ ত

তাহাকে একটিবারও ডাকিয়া বলে নাই, "চারু, আমি তোমারই !"

কিন্তু তবু সতীশ চারুকে উপেক্ষা করে নাই ! কোথায় চারু, হায় কেমন করিয়া সতীশ তাহাকে সব চেয়ে খাঁটি এই সত্য কথাটি বুঝাইয়া দিবে !

ভুল করিয়া মানুষ যখন ক্ষমা চাহিবার জন্য প্রস্তত হয়, তখন যাহার উপর অন্যায় করা হইয়াছে, তাহাকে আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না ! এইটিই মানুষের সব্বাপেক্ষা বড় দুঃখ ! হায়, চারু !

সতীশের চক্ষু জলে ভরিয়া আসিতেছিল ! হরকিশোর বাবু তাহার মনের অবস্থা বুঝিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া গেলেন।

[৬]

সুরেশের কিশোর হৃদয়ে এই শোক অতি তীব্রভাবে আঘাত করিয়াছিল। সুরেশ ভাবিল, তাহার দিদি—সেই আনন্দময়ী স্নেহশালিনী দিদি, কোথায় গেল! তাহার ক্রীড়াকৌতুকের সঙ্গিনী, স্নেহনির্ঝরিণী দিদি, তাহাকে ভুলিয়া কোথায় যাইতে পারে? সে যে আর দিদিকে দেখিতে পাইবে না, আব্দারের দাবী পরিপূরণের জন্য আর তাহাকে ব্যস্ত করিয়া তুলিবেনা, সুরেশ একথা ভাবিতেও পারিত না!

সকালে সন্ধ্যায় তাহার ছোট ঘরটির জানালার কাছে বসিয়া বসিয়া সুরেশ ভাবিত ;—ঐ নক্ষত্রখচিত সান্ধ্য নীলাকাশ,—ঐ আকাশের দিকে চাহিয়া দিদির কথাই তাহার সর্ব্বাগ্রে মনে পড়িল ! দিদি একদিন বলিয়াছিল, মানুষ মরিলে পর নক্ষত্র হয়, আর অমনই করিয়া পৃথিবীর প্রিয়জনের দিকে অনিমেষে চাহিয়া থাকে !—দিদি কি নক্ষত্র হইয়াছে ? এতগুলি নক্ষত্রের মধ্য হইতে সে তাহার দিদিকে কেমন করিয়া বাছিয়া বাহির করিবে ?

তাহার বুকের মধ্যে ওলট-পালট করিয়া শুধু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাসজড়িত করুণ আহ্বান বাহির হইয়া আসিত,—"দিদি,—দিদি !"—

পাশের একটা বাড়ীর ছাতের উপর একটি ছোট বধূ প্রত্যহ কাপড় তুলিতে আসিত ! সুরেশ চাহিয়া চাহিয়া দেখিত, সে তাহার দিদিরই মত ছোট, তেমনই সুন্দর ! ছাদের উপর হইতে ডাকিয়া চারু কয়দিন তাহার সহিত আলাপ করিয়াছিল ! চারুর মৃত্যুর পরও বধূটি তেমনই প্রত্যহ ছাদে আসিত—সুরেশদের বাড়ীর দিকে চাহিয়া দেখিত। সে দেখিতে পাইত অশ্রুপ্লাবিত শূন্যদৃষ্টিতে সুরেশ জানালার কাছে বসিয়া রহিয়াছে,—তাহার সঙ্গিনী 'দিদি' তাহাকে ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে ! একটা রুদ্ধ বেদনায় বধূটির হৃদয় ভরিয়া উঠিত !

হৃদয়ে যে আঘাত পাওয়া যায়, তীব্র হইলে সে আঘাত শরীর সহ্য করিতে পারে না ! চারুর মৃত্যুর পর সুরেশ প্রথমতঃ শুকাইতে লাগিল, তারপর তাহার একটু একটু জ্বর দেখা দিল ! সুরেশ সকালে সন্ধ্যায় আর তেমন করিয়া জানলার কাছে বেশীক্ষণ বসিয়া থাকিতে পারিত না ! তাহার ছোট বিছানাখানির উপর সে যেদিন সন্ধ্যাবেলাও শুইয়া রহিল, সে দিন তাহার জ্বর অনেকটা বেশী হইয়াছে দেখা গেল !

সতীশ আসিয়া দেখিল, জ্বরতপ্ত হাত দু'খানি মুঠা করিয়া বুকের উপর রাখিয়া সুরেশ চক্ষু মুদিয়া শুইয়া রহিয়াছে !

সতীশ স্নেহকোমলস্বরে ডাকিল,—"সুরু"—

সুরেশ চাহিল,—তাহার দৃষ্টি অবলম্বন-বিহীনের ন্যায় উদাস, চকিত !

"জ্বর বেশী হ'য়েছে সুরু ?'—সতীশ সুরেশের ললাটে ও কপোলে ধীরে ধীরে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল ! সুরেশ চক্ষু বুজিল, উত্তর দিল না !

চারুর মৃত্যুর পর হইতে এ পর্য্যন্ত সুরেশ কোনও দিন সতীশের কাছে চারুর কথা উল্লেখ করে নাই ! চারুকে সতীশ যে তেমন করিয়া কাছে ডাকে নাই, সেজন্য চারুর মর্ম্মবীণায় যে একটা বেদনা ও অভিমানের সুর বাজিয়া উঠিয়াছিল, চারু খুলিয়া না বলিলেও, সুরেশ তাহা তীব্রভাবে অনুভব করিয়াছিল !

যাহারা অল্পবয়সে মাতৃহীন হয়, অভিমানের ভাবটা তাহারা বড় সহজেই ধরিতে পারে !

চারু চলিয়া গেল ; তখন সুরেশ আর কিছুতেই ভুলিতে পারিল না, যে, সতীশ তাহার উপর অন্যায় করিয়াছে। সে সতীশকে ক্ষমা করিতে পারিল না, মুখ ফুটিয়াও কিছু বলিল না। রুদ্ধ অভিমানের আগুনে শুধু নিজেই দগ্ধ হইতে লাগিল!

সুরেশের তরুণ হৃদয়ে কি আঘাত লাগিয়াছে, সতীশ তাহা বুঝিল। কিন্তু কেমন করিয়া সে তাহার হৃদয়-বেদনা দূর করিতে পারিবে, তাহার কোনও উপায় সে খুঁজিয়া পাইল না।

সুরেশের রোগশয্যার কাছে বসিয়া বসিয়া সতীশ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত! সরল শিশুর মত মুখখানি,—অন্তরবেদনার ছায়াপাতে ম্লান হইয়া উঠিয়াছে!

এ মাটীর পৃথিবীর সঙ্গে যেন তার আর কোনও বন্ধন নাই সম্পর্ক নাই! সংসারে আসিয়া, যে স্নেহ ছাড়া কিছু পায় নাই, অনভিজ্ঞ সতীশ কেমন করিয়া তাহাকে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিবে, কিছুতেই সে তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারিল না!

(৭)

পরদিন প্রাতঃকালে বাড়ী হইতে একটা টেলিগ্রাম আসিয়া সতীশের জীবনের হাল্‌কা ভাবটাকে একটু চাপিয়া দিল, এবং যে জীবন একটা সোজা পথ ধরিয়া চলিতেছিল, তাহাকে একটা নূতন বাঁকের মুখে উঠাইয়া দিয়া গেল।

নায়েব মহাশয় কোনও একটা সম্পত্তির ব্যবস্থার জন্য সতীশের সঙ্গে পরামর্শ করা আবশ্যক বলিয়া টেলিগ্রাম করিয়াছেন। সুরেশকে সঙ্গে লইয়া সতীশ বাড়ী গেল।

কুশল জিজ্ঞাসা ও অন্য দু'এক কথার পর নায়েব মহাশয় বলিলেন, "সুরুর অসুখটা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল, কি কর্ত্তব্য স্থির করিলে?—"

"আমি ওকে নিয়ে একটু পশ্চিমে যাব মনে ক'রেছি, আপনি কি বলেন, কাকা?"—

"তা' পশ্চিমে কোনও ভাল জায়গায় গিয়ে কিছুদিন থেকে আসা ভালই মনে করি,—কিন্তু"—নায়েব মহাশয় সতীশের মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিলেন, তারপর ধীরে ধীরে বলিলেন, "কিন্তু ওর অসুখ হ'ল মনে, মনটা সুস্থির করা দরকার"—

"তার কি করা যায় কাকা?"—সতীশের স্বর গাঢ়, বেদনাপূর্ণ!

"ওর একটি সমবয়স্ক সঙ্গী জুটিয়ে দিতে পারলে বোধ হয় কাজ হ'ত,"—

এতক্ষণে সতীশ কথাটা পরিষ্কার করিয়া বুঝিল! তা'র বুকের মধ্যে কেমন করিয়া উঠিল! একবার ইচ্ছা হইল বুকটা দুই হাতে চাপিয়া, সেই মেঝের উপর লুঠিয়া পড়িয়া একবার একটু কাঁদিয়া লয়! কিন্তু কাকা যে সেখানে!

নায়েব মহাশয় অন্যান্য কথার পর বলিলেন, "দেখ সতু, সুরেশের জীবন তোমার উপর নির্ভর করছে, তুমি বুড়ার কথাটা ফেল' না, বাবা"—

নায়েব মহাশয় চলিয়া গেলেন। সতীশ বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল।

সুরেশের সুস্থতার জন্য সে কি না করিতে পারে! সতীশের হৃদয়ে সুরেশের জন্য যে একটা নির্দ্দিষ্ট স্নেহতন্ত্রী ছিল, নায়েব মহাশয় সেই স্নেহতন্ত্রীটির উপর মৃদু আঘাত করিয়া যে সুর তুলিয়া দিয়া গেলেন, তাহার রেশ্ সতীশের কাণের কাছে ক্রমাগতই বাজিতে লাগিল!

চারু যখন জীবিত ছিল, তখন সতীশ কোনও দিন বুঝিতে পারে নাই যে, সে চারুর প্রতি অন্যায় করিতেছে। কিন্তু চারু যখন চলিয়া গেল, তখন সে বুঝিল, কোথায় তাহার অপরাধ!

সুরেশের নীরবতা ও পীড়া তাহাকে আরও অস্থির করিয়া তুলিতেছিল! যেমন করিয়াই হউক সুরেশকে প্রফুল্ল করিতেই হইবে,—বাঁচাইয়া তুলিতেই হইবে! সুরেশের সঙ্গে চারুর স্মৃতি এতটাই জড়িত যে, তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিলে, চারুরই কতকটা যেন রাখা যাইবে, এমনই একটা বিশ্বাস নিশিদিন সতীশের হৃদয়ে জাগিতেছিল! সুতরাং নায়েব মহাশয় তাহার উপর যে শাস্তির বিধান করিতেছেন, সুরেশেরই জন্য তাহাকে সে নিষ্ঠুর দণ্ড গ্রহণ করিতেই হইবে।

(৮)

ওয়াল্‌টেয়ারের একটা ছোট বাসায় প্রায় এক মাস হইল পীড়িত সুরেশ ও নববধূ সরযূকে লইয়া সতীশ বায়ু-পরিবর্ত্তনের জন্য আসিয়াছে।

সরযূর একটু বেশী বয়সেই বিবাহ হইয়াছিল! সতীশ একটু আধটু ইতঃস্ততের পর সরযূর নিকট চারু ও সুরেশের সমস্ত ইতিহাস ভাঙ্গিয়া বলিল। সরযূ সব শুনিল; এমন বেদনাপূর্ণ কাহিনী সে আর শুনে নাই! সুরেশের জন্য তাহার সমস্ত হৃদয় সহানুভূতিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল! প্রথমেই

তাহার এই কথা মনে হইল যে, সে যেমন করিয়াই পারে সুরেশের শোক ও অভিমান দূর করিয়া দিবে!

পীড়িত সুরেশের সেবা ও শুশ্রূষার ভার সরযূ এমন সহজভাবে গ্রহণ করিল, যেন সে সুরেশের বহুদিনের পরিচিত! প্রত্যেক কার্য্যের মধ্যে তাহার সেবা-নিপুণতা ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। সতীশ দেখিয়া শুনিয়া একটু আরাম পাইল, তাহার মনে হইল, সরযূর যত্ন এবং যত্ন যদি সুরেশকে বাঁচাইয়া তুলিতে পারে!

কলিকাতার বাসায়, যখন চারু জীবিত ছিল, তখন সতীশ ডাক্তারি আলোচনার দিকেই একান্তভাবে ঝুঁকিয়া পড়িয়া বাহিরের বিচিত্র বিশ্বকে একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিল। দ্বিতীয় বার বিবাহের পর প্রথম ওয়াল্‌টেয়ারের বাসায় আসিয়া সতীশ সরযূকে তেমন ভাবে গ্রহণ করে নাই! সেদিন সন্ধ্যার পর যখন সতীশ ছাদে একটা খাটিয়ার উপর পড়িয়া আকাশ পাতাল ভাবিতেছিল, তখন নীচের ঘরে, সারাদিনের কর্ম্মাবসানের পর, সরযূ একলাটি একটুও শান্তি পাইতেছিল না। রুগ্ন সুরেশ তাহার সঙ্গে এ পর্য্যন্ত কথা কহে নাই!

সরযূ আস্তে আস্তে ছাদে উঠিয়া গেল; সতীশকে দেখিল। সেই সন্ধ্যার বিরলান্ধকারের মধ্যে সতীশ একটি খাটিয়ার উপর পড়িয়া রহিয়াছে! সরযূর বুকের মধ্যে কেমন করিয়া উঠিল! সে কি এই বিষাদ-কালিমা দূর করিয়া দিতে পারিবে না!

সংসারের মধ্যে যাহাকে পরিচিত করিয়া দিবার কেহ না থাকে, তাহাকে বাধ্য হইয়া নিজের স্থান খুঁজিয়া লইতে হয়! বিবাহের পরদিন সরযূকে আশীর্ব্বাদ করিবার সময় বৃদ্ধ নায়েব মহাশয় যে কয়টি কথা বলিয়াছিলেন, তাহা হইতেই সে বুঝিয়া লইয়াছিল, এ সংসারে তাহাকে নিজেই নিজের স্থান করিয়া লইতে হইবে!

কয়দিন পর্য্যন্ত ভাবিয়া ভাবিয়া সে স্থির করিয়াছিল, আজ যেমন করিয়াই হউক, সে স্বামীর দুঃখের অংশ গ্রহণ করিবে!

এই সংকল্প বুকে লইয়া, সে অকম্পিত পদে ছাদে উঠিয়াছিল; কিন্তু যখন স্বামীর মূর্ত্তিখানি অন্ধকার ভেদ করিয়া অস্পষ্টভাবে তাহার চক্ষের সম্মুখে পড়িল, তখন নব-বধূসুলভ লজ্জা তাহাকে একেবারে চাপিয়া ধরিল! সে কি ফিরিয়া আসিবে, না অগ্রসর হইবে, বুঝিতে পারিতেছিল না! তাহার কাপড়ের একটু খস্‌খস্‌ শব্দ কিংবা তাহার গুরু-নিঃশ্বাস-পতন-শব্দ বুঝি সতীশের কাণে গিয়াছিল। সতীশ চকিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কে" ?—সতীশ চারুকেই ভাবিতেছিল। চারু আসিয়াছে কি ?

সমস্ত দ্বিধা সবলে দূর করিয়া সরযূ অগ্রসর হইল। একেবারে স্বামীর কাছেই গিয়া দাঁড়াইল।

"কে সরযূ!—ব'স!—" যে কথা বলিবার জন্য সতীশের বুকের মধ্যে এ কয়দিন ওলট্‌পালট্ করিতেছিল,—আজ তাহাই প্রকাশ

"সরযূ, আমি তোমার মধ্যে চারুকে পাইতে চাই।"

করিয়া বলিবার একটা সুযোগ এমন করিয়া অযাচিত ভাবে সতীশের কাছে আসিয়া পড়িয়াছে!

সরযূ স্বামীর পায়ের দিকে একটু ঘেঁসিয়া বসিয়া পড়িল!

উপরে মুক্ত নীলাকাশ! রাত্রির অন্ধকার পৃথিবীর উপর নিবিড়তর হইয়া নামিয়া আসিতেছে, আর এমনই সময়ে সরযূ, একটি অসহায় শিশুর মত তাহার দুইটি কোমল বাহুবল্লরী দিয়া তাহাকেই বেষ্টন করিয়া আশ্রয় পাইবার জন্য অযাচিতভাবে কাছে আসিয়াছে!

সতীশের হৃদয় পূর্ব্ব হইতেই আবেগে পরিপূর্ণ ছিল, সরযূ এমন সময়ে এমন করিয়া কাছে আসিয়া তাহার হৃদয়টাকে একেবারে উদ্বেলিত করিয়া দিল।

হঠাৎ উঠিয়া বসিয়া সতীশ সরযূকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিল,

"সরযূ, আমি তোমার মধ্যেই চারুকে পাইতে চাই"— এই একটি কথাতেই স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে সমস্ত দ্বিধা কাটিয়া গেল! চারুকে ভুলিয়া যদি সতীশ সরযূকে পাইতে চাহিত, তাহা হইলে সরযূ বুঝি কোন মতেই স্বামীর কাছে এমন করিয়া ধরা দিতে পারিত না! আজ অকুণ্ঠিত তৃপ্তির গৌরব সরযূকে তাহার নারী-জীবনের সর্ব্বপ্রধান সার্থকতা প্রদান করিয়া অভিনন্দন করিল!

তারপর হইতেই সরযূ ও সতীশ সুরেশের সেবার মধ্যে আপনাদিগকে একান্তভাবে নিযুক্ত করিয়া দিল! বাসায় কোনও কাজ নাই—শুধু সুরেশের সেবা করা! সে সেবার ভারটুকুও সরযূই সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিয়াছে! সুতরাং সতীশের হাতে একপ্রকার কোন কাজই ছিল না!

ভাবপ্রবণ হৃদয়ের লক্ষণই এই যে, সে তাহার ভাব রাশির কেন্দ্রস্বরূপে অবলম্বনের জন্য একটা না একটা কিছু চাহে! সতীশ চারুকে বিমুখ করিয়া যে ক্ষোভ পাইয়াছিল, আজি সরযূকে বেষ্টন করিয়া তাহা মিটাইতে চাহিল!

স্বর্গগতা চারুর বিরুদ্ধে সরযূ কোনও প্রকার বিদ্বেষ হৃদয়ে পোষণ ত করিতই না, বরং চারুর প্রতি তাহার একটা আন্তরিক শ্রদ্ধা দিন দিনই গভীরভাবে ফুটিয়া উঠিতেছিল!

সরযূর উপর সতীশের প্রেম বাধামুক্ত পার্ব্বত্য-স্রোতের মত আসিয়া তাহাকে ভাসাইয়া লইয়া যাইবার উপক্রম করিল! সরযূ বুঝিত, স্বামীর হৃদয়ের এই আবেগ চারুরই প্রাপ্য এবং স্বামী যে এই স্নেহধারা তাহার উপর এমন করিয়া ঢালিয়া দিতেছেন, সে শুধু তাহার মধ্যে চারুকে খুঁজিয়া পাইবার জন্য। তাহার হৃদয়ের মধ্যে কোন্ স্থানটা বেদনাপ্লুত হইয়া রহিয়াছে, সতীশ তাহা কিছুমাত্র গোপন না করিয়া সরযূকে দেখাইয়াছিল! সাধ্বী সরযূ স্বামীর হৃদয়ের সেই বেদনাপ্লুত অংশটি দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল; এবং আপনার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়া, যাহাতে স্বামীর এই কষ্ট, এই অতৃপ্তি, এই বেদনার সবটুকু মুছিয়া ফেলিতে পারে, তাহাই জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করিল!

রোগশয্যায় পড়িয়া সুরেশ দেখিত, যে অধিকার তাহার দিদি লাভ করিতে পারে নাই, সরযূ কেমন সহজে তাহা আয়ত্ত করিয়া লইয়াছে!

সতীশের অখণ্ড মনোযোগ পূর্ব্বে ডাক্তারিশাস্ত্র আলোচনার মধ্যেই আবদ্ধ ছিল, আজি তাহা ভিন্নপাত্রে অর্পিত হইয়াছে!

দাদা 'নূতন বৌ'কে ভালবাসুক, তাহাতে সুরেশের কোনও আপত্তি ছিল না; কিন্তু তাহার 'দিদি' কি অপরাধ করিয়াছিল? তাহার স্নেহশালিনী দিদি! সে ত কোন অপরাধই করে নাই!

দিদির কথা মনে করিয়া, করিয়া সুরেশ ক্রমেই শয্যার সঙ্গে মিশিয়া যাইতে লাগিল! সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাহার দিদিকে ভুলিয়া যাইতে পারে, কিন্তু সে কিছুতেই ত ভুলিবে না! কেহ ভুলাইয়া দিতে চাহিলেও তাহার বিরুদ্ধে সুরেশের হৃদয় বিদ্রোহী হইয়া উঠিত! হায়, সে যদি দিদিকে ভুলিয়া যায় তাহা হইলে মনে করিবার মত পৃথিবীতে আর কেহই ত তাহার থাকিবে না!

সরযূ যতই সুরেশকে স্নেহ দ্বারা, সেবা দ্বারা বেষ্টন করিয়া ধরিতেছিল, সুরেশের ততই মনে হইতেছিল, এ শুধু 'দিদিকে' ভুলাইয়া দিবার জন্য সরযূর একটা চতুর আয়োজন! সুতরাং সে কিছুতেই ধরা দিবে না বলিয়া

নিশিদিনই আপনার সমস্ত হৃদয়কে সচেতন ও বিদ্রোহী করিয়া রাখিল!

প্রায় চারিমাস পর্য্যন্ত ওয়াল্‌টেয়ারে থাকিয়াও সুরেশের পীড়ার কোনই উপশম দেখা গেল না! সতীশ তাহার ডাক্তারির অভিজ্ঞতায় বুঝিল, এমন ভাবে আর কিছুদিন চলিলে, সুরেশকে বাচাইয়া তোলা কষ্টকর হইবে!

[১০]

সেদিন ২৩শে ভাদ্র—চারুর মৃত্যু তারিখ! সুরেশ সমস্তদিন গতবৎসরের এই দিনটির কথা ভাবিতেছিল! আজ এক বৎসরের মধ্যে এক মুহূর্ত্তের জন্যও সুরেশ এই দিনের কথা ভুলিতে পারে নাই, তবু আজ তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়খানি যেন বেশী করিয়া উদ্বেলিত হইয়া উঠিল!

গত বৎসর ঠিক এমন দিনটিতে, এমন সময় পর্য্যন্তও তাহার দিদি জীবিত ছিল! সে দিনটি পৃথিবীতে তাহার দিদির জীবনে শেষ দিন, সে দিনটিকে ত সে কোন মতেই ভুলিতে পারে না!

সমস্ত দিন ধরিয়া সে তাহার মস্তিষ্কের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া শুধু তাহার দিদির কথাই চিন্তা করিতে লাগিল। সন্ধ্যার পর তাহার এমন বেগে জ্বর আসিল যে, বাজনরতা সরযূ ভীতা হইয়া উঠিল, এবং বাহিরের ঘর হইতে সতীশকে ডাকিয়া আনিল।

সতীশ সুরেশকে দেখিল; দেখিয়া প্রমাদ গণিল! সংবাদ পাইয়া অমূল্য ডাক্তার দেখিতে আসিলেন, কিন্তু তিনি বড় একটা আশার কথা বলিলেন না! জ্বর ত্যাগের সময় সাবধান থাকিতে বলিয়া তিনি চলিয়া যাইতেছিলেন, অমনই সরযূ সতীশকে ইঙ্গিত করিয়া ডাক্তারকে রাত্রির জন্য রাখিতে বলিল। অনুরুদ্ধ হইয়া ডাক্তার বলিলেন, "আমি ফিরে আস্‌ব এখনই,—একবার কেশব বাবুর ছেলেটিকে দেখ্‌তে হবে!"

সরযূ পার্শ্বে বসিয়া এক দৃষ্টিতে সুরেশের মুখের দিকে চাহিয়া আছে,—সরযূর মনে হইতেছিল, যেন সমস্ত অপরাধ তাহারই,—এই মৃত্যুশয্যাশায়ী কিশোর দেবরটির রোগক্লিষ্ট পাণ্ডুর মুখশ্রী তাহার হৃদয়ে একটা মর্ম্মদাহী বেদনার সৃষ্টি করিয়া তুলিতেছিল। সে যদি তাহার দিদির স্থান পরিপূরণ করিতে নাই পারিবে, তাহা হইলে সে কেন সমস্ত অপরাধের বোঝাটা মাথায় তুলিয়া লইতে এই সংসারের মধ্যে আসিল! হায়, সে যদি নিজের প্রাণ দিয়াও সুরেশকে বাঁচাইয়া তুলিতে পারিত!

সুরেশ শয্যায় পড়িয়া ছটফট্ করিতেছিল। সতীশ রাত্রি দশটার সময় একবার উত্তাপ লইয়া সভয়ে দেখিল, প্রায় এক ডিগ্রী জ্বর কমিয়া গিয়াছে,—সে চকিতকণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—"আঁা, জ্বরটা পড়ে আস্‌ছে যে!—"

"—জ্বর প'ড়ে আসা কি ভাল নয়?"—কম্পিত-কণ্ঠে সরযূ জিজ্ঞাসা করিল!

"না, সরযূ, ভাল ত নয়ই, বড্ড খারাপ—" সতীশের কথা শুনিয়া সরযূর সমস্ত শরীর স্রোতকম্পিত বেতসলতার ন্যায় কাঁপিতে লাগিল!

"কি হবে তা' হ'লে! ঠাকুর পো' সেরে উঠুক, আমি মার বাড়ী পূজো দেব।" সরযূর কণ্ঠ রুদ্ধপ্রায় হইয়া আসিল।

"এখন এই ওষুধটা খাওয়াও ত সরযূ।" সরযূ সুরেশকে ঔষধ খাওয়াইল।

জ্বর বড় তাড়াতাড়ি কমিতেছিল! সুরেশ অবসন্ন ভাবে শয্যার উপর পড়িয়া আছে; সরযূর মুখে তাহার আন্তরিক আশঙ্কা ও বিষাদের ছায়া ফুটিয়া উঠিয়াছে! সতীশ শিয়রে একখানি চেয়ারের উপর বসিয়া সুরেশের ম্লান মুখের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। অমূল্য ডাক্তার দূরে একটা টেবিলের কাছে দাঁড়াইয়া কি একটা ঔষধ মিশাইতেছিলেন!

সরযূ দেখিল, সুরেশের ম্লান মুখখানি মধ্যে মধ্যে উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে,—প্রদীপ নিবিবার পূর্ব্বে ত এমনই উজ্জ্বল হইয়া উঠে! সত্যই কি সুরেশ বাঁচিবে না?—না, তা কি হয়!

সুরেশের কপালটা ঘামিতেছিল, সরযূ অঞ্চল দিয়া মুছাইয়া দিল!

সতীশ ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিল, ১টা ৫ মিঃ—গত বৎসরের এই দিনের আর একখানি করুণ চিত্র সতীশের স্মৃতিপথে জাগিয়া উঠিল;—সেও এমনই সময়ে—না, আর কয়েক মিনিট পরে,—১টা ১৫ মিনিটের সময়, চারু চলিয়া গিয়াছিল!

আর আজ এখন ১টা ৫মিঃ—পনর মিনিটের সময় কি হইবে কে জানে?—

"দিদি -দিদি তুমি কি দিদি ?"

টাক—কি ও ?'—সুরেশের চিন্তাসূত্র ছিন্ন হইল --

"দিদি —দিদি—তুমি কি দিদি ?"

সুরেশ চীৎকার করিয়া শয্যার উপর উঠিয়া সরযূর মুখের দিকে চাহিল,—তাহার চক্ষে এক অস্বাভাবিক উৎসাহ ও আনন্দের জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিয়াছে,—তারপর সুরেশ প্রাণপণে সরযূকে তাহার শীর্ণ তুষার শীতল বাহুযুগল দ্বারা জড়াইয়া ধরিয়া তাহার কোলের উপর অবসন্নভাবে এলাইয়া পড়িল।

অমূল্য ডাক্তার দৌড়াইয়া আসিয়া বলিলেন, "দেখুন ত ফিট হ'ল নাকি ? জলের ঝাপ্টা দিন্ চোখে মুখে,—নাঃ, আপনারা এমন হ'লে চলবে কেন!"

তখন সতীশ ও অমলা ডাক্তার সুরেশের স্পন্দনবিহীন দেহ সরযূর অঙ্ক হইতে ধীরে ধীরে তুলিয়া লইয়া নীচের শয্যার উপর শায়িত করিয়া দিল!

দেয়ালের গায়ের ঘড়িটায় কোয়াটার বাজিল—১টা ১৫মিঃ

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত।

ছিন্নহস্ত।

(শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

নবেম্বর মাসের শীতজর্জ্জর রজনী। আকাশ ঘন মেঘে আচ্ছন্ন। প্রবল পবন-তাড়নে বৃন্তচ্যুত শুষ্ক পত্ররাশি রাজপথের ধূলির সহিত উড়িয়া চলিয়াছে। নিবিড় কুহেলিকার ধূম অবগুণ্ঠনে দিগন্ত আবৃত হইয়া গিয়াছে। রাজপথের উজ্জ্বল গ্যাসালোকশিখা কুজ্ঝটিকার যবনিকান্তরালে স্তিমিত ও নিষ্প্রভ দেখাইতেছে। আর্ত্ত চীৎকারে মত্ত ঝটিকা গাছে গাছে বল পরীক্ষা করিয়া ফিরিতেছে। বৃষ্টি আসন্ন। রমণীয় বুলভাদ্দ দে-ম্যাদেলিন এখন শ্রীহীন ও জন-বিরল। প্রেমিক-প্রেমিকার অস্ফুট কলহাস্য এই রম্য রাজপথ মুখরিত করিতেছে না। কচিৎ দুই একখানি শকট রাজপথে দেখা যাইতেছিল মাত্র। ঝড় বৃষ্টি আসন্ন দেখিয়া সকলে সন্নিহিত পানালয়ে অথবা ক্লব-গৃহে আশ্রয় লইয়াছিল।

এই ঘোর দুর্য্যোগে দুইটি যুবক সেই জনবিরল রাজপথে রজনীর গাঢ় অন্ধকারে পথ অতিবাহন করিতেছিলেন। উভয়েই দীর্ঘাকার, সুগঠিতদেহ ও সুবেশ। গল্পগুজব ও উচ্চহাস্যে রাজপথ মুখরিত করিতে করিতে উভয়ে চলিতেছিলেন। সহসা দেখিবামাত্র উভয়কে যেন সহোদর বলিয়া ভ্রম হয়; কিন্তু আকৃতিগত সাদৃশ্য উভয়ের মধ্যে তেমন ছিল না। একটি গৌরবর্ণ; অপরটি অপেক্ষাকৃত মলিন। প্রথমটির নয়নযুগল সুনীল, মুখশ্রী প্রশান্ত-সুন্দর ও নম্র। দ্বিতীয়টির নয়ন কৃষ্ণতার, আননে দৃঢ়তা। উভয়েই তরুণবয়স্ক।

দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিলেন, "তুমি পাগল হয়েছ? এই ঝড়-বৃষ্টিতে হাঁটিয়া কখন রু দেস্থরেস্নিতে যাওয়া যায়? এখনই মুষলধারে বৃষ্টি নামিবে।"

"তোমার জোঠা মহাশয়ের বাড়ী ত বেশী দূর নয়। রীতিমত ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হইবার অনেক আগে আমরা ঠিকানায় পঁহুছিতে পারিব।"

"হাঁ, তা হ'লে গাড়ীভাড়ার দুটি টাকা বাঁচাতে পারব! এরূপ মিতব্যয়িতা প্রশংসনীয়! জুল্, তুমি শীঘ্রই ক্রোরপতি হইতে পারিবে।"

"প্রিয় ম্যাক্সিম্, সে আশা দুরাশা নয়। কিন্তু তুমি যে ভাবে টাকা উড়াইতে আরম্ভ করিয়াছ, তাহাতে শীঘ্রই সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়িবে। মসিয়ে ভেরজারসের পরামর্শ মত কাজ না করায় পরিণাম ভাল হইবে না ভাই! তিনি তোমাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন। যদি তুমি এখনও তাঁহার ব্যাঙ্কের কাজকর্ম্ম দেখিতে আরম্ভ কর, তাহা হইলে বোধ হয়, তাঁহার কন্যার পাণিগ্রহণ তোমার পক্ষে অসম্ভব হইবে না।"

"বিবাহে আমার আদৌ স্পৃহা নাই। এলিস সুন্দরী বটে; কিন্তু তাহার মত স্ত্রী লইয়া আমার সুখ হইবে না!"

"তোমার যেন কিছুতেই মন উঠে না।"

"তা ঠিক নয়। প্রথমতঃ, আমার ভগিনী নিতান্ত বালিকা তার পর, বোধ হয়, জোঠামহাশয়ের ইচ্ছা, কোনও ধনী-ঘাদী বড় ঘরের ছেলের সঙ্গে তার বিয়ে দেন।"

"তুমি ভুল বুঝেছ। তাঁহার ইচ্ছা, জামাতা তাঁহারই কারবারের অংশী হইবেন। ভবিষ্যতে যেন কারবারটা তিনিই চালাইতে পারেন।"

"তাহা হইলে, আমার প্রিয়বন্ধু, প্রধান খাতাঞ্জী জুল্স্ ভিগ্নরীর ন্যায় সুযোগ্য জামাতা তিনি আর কোথায় পাইবেন? সে সর্ব্বতোভাবে তাঁহার কারবার চালাইবার উপযুক্ত।"

"তুমি পাগল হয়েছ। এত বড় দুরাকাঙ্ক্ষা আমার নাই।"

"কেন? জোঠামহাশয় তোমায় আন্তরিক স্নেহ করেন। আর আমার বিশ্বাস, এলিস্‌ও তোমায় পছন্দ করে। তুমি না হইয়া যদি আমি হইতাম, তাহা হইলে এত দিনে আমি তাহার সহিত কোর্টশিপ্ আরম্ভ করিয়া দিতাম।"

"সে আমার দ্বারা হইবে না। রবার্টের যাহাতে কোনও ক্ষতি হয়, এমন কাজ আমি করিব না।"

"জোঠামহাশয়ের সেক্রেটারী রবার্ট কারমোয়েল! তিনি কি এলিসের অনুরাগী?"

"নিশ্চয়।"

"তা বেশ। তুমি না হয়ে যদি তিনি এলিস্‌কে বিবাহ করেন, আমার তাহাতে আপত্তি নাই। তাঁহার আর্থিক অবস্থা তত ভাল নয় বটে, কিন্তু অন্তঃকরণটি উদার, বুদ্ধিমান্‌ও বেশ। তা ছাড়া বংশমর্য্যাদাও আছে। রবার্ট

লেখা পড়াও ভালরূপ শিখিয়াছেন। তোমার সহিত তাঁহার বিশেষ বন্ধুত্ব আছে না ?"

"হাঁ, সে আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু।"

"তাহা হইলে তাঁহার প্রণয়ব্যাপারও তোমার কাছে অবিদিত নয় ?

"না ; সে বিষয়ে রবার্ট বড়ই চাপা। তবে অনুমানে আমি সমস্ত জানিতে পারিয়াছি। কুমারী এলিস্‌কে সে প্রাণের সহিত ভালবাসে। সম্ভবতঃ শীঘ্রই সে মসিয়ে ভর্‌ভাবসের নিকট বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করিবে। এ বিবাহ হইলে আমি অত্যন্ত সুখী হইব ; কিন্তু আমার আশঙ্কা হইতেছে, বোধ হয়, রবার্টের মনস্কাম সিদ্ধ হইবে না।"

"আমারও সেইরূপ অনুমান। তবে এলিস তাঁহার অনুরক্ত। জ্যেঠামহাশয় কি তাঁহার সুখদুঃখের দিকে চাহিবেন না ? এইবার বৃষ্টি নামিয়াছে।"

"আমরাও বাড়ী আসিয়া পঁহুছিয়াছি। এখন যত ইচ্ছা বৃষ্টি হউক।"

মসিয়ে ভর্‌ভাবসের তোরণদ্বারে তাহারা পঁহুছিলেন। ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষ বিপত্নীক। তাঁহার একটিমাত্র কন্যাসন্তান। ব্যাঙ্কার তাঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসেন। কন্যার প্রীত্যর্থে প্রতি বুধবারে তিনি বাড়ীতে প্রীতিভোজ দিতেন। কয়েকটি ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ও অন্তরঙ্গ বন্ধু ব্যতীত বেশী লোকের নিমন্ত্রণ হইত না। দাতৃপ্পল ম্যাক্সিমও নিমন্ত্রিত হইতেন। খাতাঞ্চী ভিগ্‌নরী ও সেক্রেটারী রবার্টও বাদ যাইতেন না। রবার্ট সেই বাড়ীতেই থাকিতেন। সেদিন তখন তিনি নিমন্ত্রণ-সভায় যোগদান করিয়াছিলেন।

ভিতরে দুই ব্যক্তি দাঁড়াইয়াছিলেন

ভিগ্‌নরী ও ম্যাক্সিম সদর দ্বার দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে যাইতেছেন, এমন সময় ম্যাক্সিম্ বলিলেন, "আফিস ঘরে আলো জ্বলিতেছে কেন ? কেরাণীরা কি রাত্রি এগারটা পর্য্যন্ত কাজ করে ?"

তখন প্রবলবেগে বৃষ্টি পড়িতেছিল। ভিগ্‌নরী বাতায়নপথে চাহিয়া দেখিয়া বলিলেন, "এত রাত্রি পর্য্যন্ত ত কেহ কাজ করে না !"

প্রাঙ্গণের অপর পার্শ্বে ব্যাঙ্কারের বাস ভবন। রাজপথের সন্নিহিত দ্বিতলে কার্য্যালয়। প্রত্যেক কক্ষের বাতায়ন লৌহ গরাদের দ্বারা দৃঢ়ীকৃত। জানালাগুলি তখন বন্ধ ছিল। কিন্তু কোনও ছিদ্রপথে আলোকরশ্মি নির্গত হইতেছিল। ম্যাক্সিম্ সেই আলোকশিখাই লক্ষ্য করিয়াছিলেন।

জুলস্ বলিলেন, "ও কিছু নয়। বোধ হয় চৌকীদার শয়ন করিবার পূর্ব্বে একবার চারিদিক্ ঘুরিয়া দেখিতেছে। কোনও ভয় নাই। লোহার সিন্দুক সুরক্ষিত। যদি কেহ বলপূর্ব্বক উহা খুলিতে যায়, তখনই সে জব্দ হইবে।"

"জ্যেঠামহাশয় সেদিন বলিতেছিলেন বটে,

কোনও চোর যদি অন্য চাবি দিয়া সিন্দুক খুলিতে যায়, অমনই তাহার মৃত্যু হইবে।"

"ওটা তাহার বাড়াবাড়ি। তবে চোর ফাঁদে পড়িবে বটে। সিন্দুকটির নির্ম্মাণকৌশল এমনই বিচিত্র যে, চাবি খুলিবার চেষ্টা করিলেই দুই পার্শ্ব হইতে দুইটি লৌহ হস্ত চোরের মণিবন্ধ দৃঢ়ভাবে ধারণ করিবে। তখন তাহার নিষ্কৃতিলাভ অসম্ভব।"

"বড় চমৎকার কৌশল ত! চল, এখানে দাঁড়াইয়া ভিজিলে লাভ নাই।"

খাজাঞ্চী ঘণ্টার দড়ি ধরিয়া টানিলেন, দ্বার অমনই মুক্ত হইল। প্রথমেই ম্যাক্সিম ভিতরে প্রবেশ করিলেন। ভিতরে দুই ব্যক্তি দাঁড়াইয়াছিলেন। তাঁহারা দ্বার মুক্ত হইবার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তোরণদ্বার উদ্ঘাটিত হইবামাত্র তাঁহারা অভিবাদন করিয়াই দ্রুতবেগে বাহিরে চলিয়া গেলেন। একজন অপেক্ষাকৃত দীর্ঘাকার; অপর মধ্যমাকৃতি। দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রথমোক্তের অঙ্গে ভর দিয়া হাঁটিতেছিলেন। উভয়েরই মাথার টুপী নয়ন আবৃত করিয়া রাখিয়াছিল। উভয়েই সুবেশ। ব্যাঙ্কারের নিমন্ত্রণসভা হইতে বোধ হয় তাঁহারা উঠিয়া আসিয়াছিলেন।

ম্যাক্সিম বলিলেন, "নিমন্ত্রিতেরা চলিয়া যাইতেছেন, আর আমরা এখন আসিলাম! আজ জ্যেঠামহাশয় নিশ্চয় তিরস্কার করিবেন। সময়ে না আসিলে তিনি বড়ই চটিয়া যান।"

দ্বারবানের ঘরের দিকে চাহিয়া ম্যাক্সিম পুনরায় বলিলেন, "দেখ, বৃদ্ধ ভেনলিভাস্ত আরাম কেদারায় শুইয়া কেমন মজা করিয়া ঘুমাইতেছে!"

ভিগ্নেরী বলিলেন, "ওর স্বভাবই ঐ রকম। যদি সিন্দুক-রক্ষার ভিন্ন বন্দোবস্ত না থাকিত—"

"তাহা হইলে বিশেষ ভয়ের কারণ বটে। আচ্ছা, ম্যালিকম্ আফিসঘরের মধ্যে রাত্রে থাকে, না? যাক, টাকাকড়ি চুরি না গেলেই মঙ্গল।"

"ম্যালিকম্ রাত্রি বারটার আগে ফিরিয়া আসে না। তা ছাড়া লোকটার উপর আমার নিজের ততটা বিশ্বাস নাই। বড্ড মাতাল। আমি ভাই ঘরটা একবার দেখিয়া আসি; তুমি বরং উপরে চলিয়া যাও। আমি শীঘ্রই যাইতেছি।"

"চল না, আমিও তোমার সঙ্গে যাই। আমারও তত তাড়াতাড়ি নাই। দু'জনে একসঙ্গে শেষে জ্যেঠা-মহাশয়ের কাছে যাওয়া যাইবে। তুমি সঙ্গে থাকিলে তিরস্কারের ভয় বেশী নাই।"

"সেই ভাল। চল, শীঘ্র কাজ সারিয়া আসা যাক্।"

উভয়ে কার্য্যালয়ের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। জুল্‌স বলিলেন, "এ কি! ঘরের দরজা খোলা কেন?"

তাঁহারা প্রথমতঃ একটি কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তাহারই পার্শ্বস্থ কক্ষে লৌহসিন্দুক অবস্থিত। উভয়ে সবিস্ময়ে দেখিলেন, সে ঘরেরও দরজা মুক্ত। উভয়ে শঙ্কিত মনে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, তথায় কেহ নাই। শুধু টেবিলের উপর একটা আলো জ্বলিতেছে।

ভিগ্নেরী বলিলেন, "এত রাত্রে কে এখানে কাজ করিতেছিল! কর্ত্তা ব্যতীত এ ঘরের চাবি আর কাহারও কাছে ত থাকে না!"

"তবে তিনিই বোধ হয় এখানে এসেছিলেন।"

"অসম্ভব! আজ তাঁহার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ, তিনি কি অতিথিদের ছাড়িতে পারেন? আর কর্ত্তা যদি আসিতেন, তাহা হইলে তিনি আলো নিবাইয়া, দরজা বন্ধ করিয়া যাইতেন। বড়ই বিস্ময়ের কথা! দেখা যাক, লোহার সিন্দুকটা কি রকম অবস্থায় আছে। বোধ হয়, উহাতে কেহ হাত দেয় নাই।"

ম্যাক্সিম সিন্দুকের নিকটে গিয়া বলিলেন, "তোমার অনুমান ঠিক নয়, বন্ধু! চোর সিন্দুক খুলিবার চেষ্টা করিয়াছিল; এই দেখ।"

"সে কি চোর পলাইল কি করিয়া?"

"আলোটা এ দিকে নিয়ে এস ত ভাই! চোর পলাইয়াছে বটে; কিন্তু হাতখানি রাখিয়া গিয়াছে।"

ভিগ্নেরী আলো তুলিয়া ধরিলেন। সবিস্ময়ে বলিলেন, "এ যে স্ত্রীলোকের হাত!"

সিন্দুকের বিচিত্র নির্ম্মাণকৌশল ব্যর্থ হয় নাই। লৌহ-বাহু চোরের ছিন্নহস্ত ধরিয়া রাখিয়াছে!

"ম্যাক্সিম বলিলেন, "চোরই যদি পলাইল, তবে আর সিন্দুকের কৌশল কি রহিল! এরূপ পৈশাচিক শাস্তি দিবার জন্য এমন যন্ত্র নির্ম্মাণ না করাই ভাল।"

"চোর ধরিবার জন্যই এরূপ কৌশল। তাহার হস্ত ছিন্ন করিবার উদ্দেশ্যে উহা নির্ম্মিত হয় নাই। দেখ না, হাতটি ধরিয়া রাখিয়াছে।"

"তোমার কথাই ঠিক। যদি কলে হাত কাটিয়া যাইত, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ উহা মাটিতে পড়িয়া যাইত। যে চুরি করিতে আসিয়াছিল, ধরা পড়িবার আশঙ্কায়, হাতের মায়া ত্যাগ করিয়া উহা তীক্ষ্ণধার অস্ত্রের সাহায্যে কাটিয়া ফেলিয়াছে।"

"কিন্তু অস্ত্রপ্রয়োগ করিল কে?"

"চোর স্বয়ং।"

"তাহা কখনই সম্ভব নয়।"

"সাধারণ চোর হইলে অবশ্য কখনই পারিত না। কিন্তু দেখিতেছ না, হাতখানি কোনও সম্ভ্রান্ত বিলাসিনীর। রমণীর অসাধ্য কোনও কাজ নাই! দেখ অঙ্গুলির গঠন কি সুন্দর! নিশ্চয়ই কোনও বড় ঘরাণার মেয়ে। আঙ্গুলে অঙ্গুরীয়ও ছিল, দেখিতেছি। অস্ত্রোপচারের পর খুলিয়া লইয়াছে। মনের কি দৃঢ়তা! কিন্তু অঙ্গুরীয় ব্যবহারের চিহ্ন অঙ্গুলিতে এখনও বিদ্যমান। ধরা পড়িবার আশঙ্কায় সমস্ত চিহ্ন লুপ্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছে!"

"কিন্তু এত বড় ভয়ানক কাজের পর চোর কি করিরা ঘরের বাহিরে গেল? রক্তস্রাবে ও যন্ত্রণায় সে যে অচেতন হয় নাই, ইহাই আশ্চর্য্য! ঐ দেখ রক্তের ধারা!"

ম্যাক্সিম বলিলেন, "আলোটা সরাইয়া আন। দেখা যাক, কত দূর পর্য্যন্ত রক্ত গড়াইয়া গিয়াছে।"

ভিগ্‌নরী যন্ত্রচালিতবৎ বন্ধুর কথামত কাজ করিলেন। ম্যাক্সিম্ অবিচলিত ও প্রশান্ত ভাবে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

"রমণীর এক জন সহযোগী ছিল।"

বিস্মিত ভিগ্‌নরী বলিলেন, "কেমন করিয়া জানিলে?"

"আমার প্রথমেই সন্দেহ হইয়াছিল। সহকারীই রমণীর হস্তে অস্ত্রপ্রয়োগ করিয়াছে। কোনও স্ত্রীলোক স্বহস্তে নিজের হাতের উপর অস্ত্র চালাইতে পারে না। বিশেষতঃ, অপরের সাহায্য ব্যতীত রক্তস্রাব বন্ধ করাও সম্ভব নয়। তোমার টেবিলের উপর হইতে স্পঞ্জ লইয়া রক্তস্রাব বন্ধ

"এ যে স্ত্রীলোকের হাত।"

করা হইয়াছে। আহত স্থানে তোমারই হাত-মোছা রোমালের দ্বারা ব্যাণ্ডেজ করিয়া দিয়াছে। এই দেখ এখনও রক্তের চিহ্ন। সহকারী তার পর চোরকে লইয়া চলিয়া গিয়াছে।"

"কিন্তু বাড়ী হইতে বাহির হইল কি করিয়া?

"যেমন করিয়া আসিয়াছিল, সেই উপায়েই বাহির হইয়া গিয়াছে। আফিসঘরের চাবি নিশ্চয়ই তাহাদের কাছে ছিল। খুব তাড়াতাড়ি পলাইয়াছে বলিয়া দরজা বন্ধ করিতে বা আলো নিবাইতে তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে।"

"আমরা যখন বাড়ীর মধ্যে আসিতেছিলাম, তখন যে দুট লোক বাহির হইয়া গেল, তাহারা নয় ত?"

"অসম্ভব! তাহারা উভয়েই যে পুরুষ। আমরা বাড়ী আসিবার অনেক আগেই তাহারা পলাইয়াছে! এখন তাহাদের অনুসরণ করা বৃথা।"

"কিন্তু স্ত্রীলোকটি এ অবস্থায় কি ছুটিয়া যাইতে পারিয়াছে?"

"গাড়ী করিয়া গিয়াছে। ইহারা সাধারণ চোর নয়। এবাড়ীর সকলের গতিবিধি, রীতিনীতি নিশ্চয়ই তাহারা ভালরূপ জানে। দিন, ক্ষণ তাহারা ঠিক করিয়া আসিয়াছিল, ইহাই তাহার পক্ষে পর্য্যাপ্ত প্রমাণ। আজ জেঠামহাশয় ভোজ দিতেছেন, চাকরেরা শশব্যস্ত থাকিবে, দ্বারবান্‌ও তাহাদিগকে লক্ষ্য করিবার অবকাশ পাইবে না। আফিসঘরে যে শুইয়া থাকে, সেও রাত্রি দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বে ফিরিয়া আসে না, তাহাও তাহারা জানে।"

"আমার মনে হয়, বাড়ীর কোনও লোক হয় ত ইহাদের সাহায্য করিয়াছে। হয় ত চোর এখনও বাড়ীর কোথাও লুকাইয়া আছে। মসিয়ে ভর্‌জারস্‌কে এখনই খবর দেওয়া উচিত।"

"সেটা কি তুমি উচিত মনে কর?"

"নিশ্চয়ই।"

"আমার কিন্তু মত নয়। তোমার যেমন ইচ্ছা, অবশ্য করিতে পার। আমি কিন্তু জেঠামহাশয়কে এ ঘটনার কথা মোটেই জানাইতাম না।"

"কি বল্‌ছ তুমি? তুমি কি আমায় এ কথা গোপন করিতে পরামর্শ দাও? হয় ত আবার কালই এরূপ ঘটনা ঘটিতে পারে। এই সিন্দুকের দায়িত্ব সম্পূর্ণ আমার, সে কথা হয় ত তুমি ভুলিয়া গিয়াছ।"

"তোমার দায়িত্ব আছে বলিয়াই আমি তোমায় নিষেধ করিতেছি। সব সময়ে জেঠামহাশয় ন্যায় পথে চলেন না। হয় ত এই অসাবধানতার জন্য তোমাকেই দায়ী করিবেন। অবশ্য, দিবারাত্রি যে তুমি যক্ষের মত তাঁহার ধনাগার রক্ষা করিবে, এরূপ আশা করা তাঁর পক্ষে অন্যায়, কিন্তু তবু তোমারই ঘাড়ে দোষ পড়িবে।"

"তা পড়ুক কিন্তু তাই বলিয়া আমি এত বড় ঘটনা গোপন করিয়া রাখিতে পারিব না। চোরের সাহস তাহাতে বাড়িয়া যাইবে।"

"তুমি কি মনে করিতেছ, ফরাসীপুলিস তাহাদিগকে ধরিতে পারিবে? কখনই নয়। সংবাদপত্রে এ বিষয়ের আন্দোলন হইবে। লোকের মুখে মুখে ছিন্নহস্তের কথা প্রকাশিত হইবে। তখন অপরাধীরা আত্মগোপন করিবার সুবিধা পাইবে। আমার কথা বিশ্বাস কর, পুলিস তাহাদিগকে কোনও মতেই ধরিতে পারিবে না।"

"তোমার কি মনে হয়, তুমি বিনা সাহায্যে তাহাদিগকে ধরিতে পারিবে?"

"নিশ্চয়। কিন্তু আমরা উভয় ব্যতীত এই ঘটনার কথা তৃতীয় ব্যক্তির কর্ণগোচর করা হইবে না।"

"কিন্তু এই হাতখানা—"

"ওখানা অবশ্য এখানে রাখিয়া যাইব না। তুমি দরজাটা বন্ধ করিয়া দাও।"

ভিগ্‌নরী প্রথমতঃ একটু ইতস্ততঃ করিলেন, কিন্তু ম্যাক্সিমের আদেশ অবহেলা করিতে পারিলেন না। ম্যাক্সিমের আশঙ্কার কোন কারণও ছিল না। তিনি বুদ্ধিমান্‌, সাহসী ও ভর্‌জারসের ভ্রাতুষ্পুত্র। ভিগ্‌নরী সামান্য কেরাণীমাত্র। সুতরাং তিনি ম্যাক্সিমের আদেশানুসারে দ্বার বন্ধ করিয়াদিলেন।

"এখন সিন্দুকের চাবি খুলিবার কৌশলটা আমায় দেখাইয়া দাও।"

"সে খুব সহজ। সিন্দুকের তালার উপরে যে বোতামটা দেখিতেছ, ইহাতে অনেকগুলি অক্ষর আছে। ঐ অক্ষরগুলি লইয়া একটি নাম বাছিয়া লইতে হয়। আমাদের একটি নির্দ্দিষ্ট সাঙ্কেতিক নাম আছে। অক্ষরগুলি সাজাইয়া সেই নামটা সন্নিবেশিত হইলে, চাবি দ্বারা ডালা খুলিতে হয়। যদি নামটি ঠিক না হয়, তাহা হইলে ডালা কিছুতেই খোলা যাইবে না। সিন্দুকটির দুটি চাবি আছে। একটি তোমার জেঠামহাশয়ের কাছে থাকে, আর একটি আমার কাছে আছে। সিন্দুকটিকে আরও সুদৃঢ় করিবার জন্য আমরা আর একটি নূতন উপায় উদ্ভাবন করিয়াছি। চাবি বন্ধ করিবার সময় প্রত্যহ আমি একটা কল টিপিয়া রাখিয়া যাই। যদি কেহ চাবি সংগ্রহ করিয়াও সিন্দুকটি খুলিতে আসে, তৎক্ষণাৎ সে ধরা পড়িবে। আজ তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখিলে। আবার সকালে আসিয়া আগে কলটি ঘুরাইয়া দিই, তার পর ডালা খুলি।"

"আচ্ছা, এখন আলোটা ধর। আমি একবার সিন্দুকটা ভাল করিয়া পরীক্ষা করি। অক্ষরগুলা কি বলে, দেখা যাক। প্রথম অক্ষর 'এম্‌'; দ্বিতীয় 'আই'; তৃতীয় অক্ষর

'ডি'; চতুর্থ 'এ'; পঞ্চম অক্ষর 'এস্'। মোট কথাটা হইতেছে 'মিডাস'। ইহাই কি তোমাদের সাঙ্কেতিক শব্দ?"

"হাঁ।"

তাহা হইলে আজই নামটা বদলাইয়া ফেল। চোর উহা বুঝিতে পারিয়াছে। এখন হাতখানা পরীক্ষা করা যাক্। এ হাত রাণীর যোগ্য। এখানি দেখিতেছি বাম করপদ্ম। এখন হইতে রমণী বামহস্তহীনা। চাবিটা খুলিয়া ফেল ত ভাই!"

ভিগ্‌নরী বন্ধুর কথামত স্প্রিং টিপিয়া ডালা খুলিয়া ফেলিলেন। অমনই ছিন্নহস্ত ভূমিতলে পড়িয়া গেল।

ম্যাক্সিম সবিস্ময়ে বলিলেন,—"এ কি! একখানা ব্রেস্‌লেটও হাতে ছিল, দেখিতেছি। আমি ঠিক ভাবিয়াছিলাম, নিশ্চয়ই নূতন কিছু আবিষ্কার করা যাইবে।"

সত্যই একখানি সুন্দর মণিমাণিক্যখচিত স্বর্ণ-ব্রেস্‌লেট। দুইখানি চমৎকার বৃহদাকার রক্তরঞ্জিত হীরক উজ্জ্বলালোকে ঝলসিয়া উঠিল। ম্যাক্সিম প্রশান্তভাবে হাতখানি তুলিয়া লইলেন।

ভিগ্‌নরী বলিলেন, "এ সব ঘটনা যেন আমার স্বপ্ন বলিয়া মনে হইতেছে।"

"কিছু স্বপ্ন নয়। সব সত্য। আমি যাহা ভাবিয়াছি তাহাই ঠিক। বিচরালয়ে নীত হইবার আশঙ্কায় যে রমণী নিজ হস্ত বিসর্জ্জন করিতে পারে, সে নিশ্চয়ই বড়ঘরণী। সাধারণ চোর হলে সে ধরা দিত, তথাপি একটি অঙ্গুলির অগ্রভাগের মায়াও ত্যাগ করিতে পারিত না। আমাদের আজিকার এই ঘটনার নায়িকা সাধারণ রমণী নহেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই বাড়ীর কোনও লোক তাঁহার সহকারী। কারণ চোর সিন্দুক খুলিবার সাঙ্কেতিক শব্দটিও অবগত আছে।"

"কিন্তু তোমার জ্যেঠামহাশয় ও আমি ব্যতীত ঐ নামটি আর কেহ যে জানে না! বিশেষতঃ এক নাম আমি অধিক দিন ব্যবহার করি না। প্রায়ই নাম পরিবর্ত্তন করিয়া থাকি। আজই বিকালে নামটি আমি বদলাইয়াছি! আমি তখন একা আফিসে ছিলাম। তোমার জ্যেঠামহাশয় আসিলে আমি তাঁহাকে পঞ্চাক্ষরবিশিষ্ট একটি নাম জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, "মিডাস"। আমাদের কথোপকথন কেহ শুনিতে পাইয়াছে বলিয়াও মনে হয় না। তবে প্রাচীরের যদি কর্ণ থাকে, তা হ'লে বলিতে পারি না! তোমার জ্যেঠামহাশয়ও এই নাম পরিবর্ত্তনের কথা নিশ্চয়ই কাহাকেও বলেন নাই। আর আমি ত বলিই নাই।"

"কিন্তু চোর ত তোমাদের সাঙ্কেতিক শব্দ জানে, দেখিতেছি। নিশ্চয়ই কেহ না কেহ এ কথা তাহার নিকট প্রকাশ করিয়াছে। রমণী আর সব সন্ধানই রাখে, তাহাও বুঝিতে পারিতেছি, কেবল তোমার লৌহসিন্দুকে যে ফাঁদ পাতা আছে, তাহা জানিত না। তাহা হইলে অমন করিয়া তাহার হাতখানি যাইত না।"

আফিসের কোন কেরাণীও উহার অস্তিত্বের বিষয় অবগত নয়। উহা এমনই সুকৌশলে নির্ম্মিত যে, বাহির হইতে কোনও ক্রমেই কিছু বোঝা যায় না।

"এ ঘরে বোধ হয় সকলে আসিতে পারে না? কেমন?"

"নিশ্চয়ই নয়। আমার দুইজন সহকারী, তিন জন সরকার, আর চৌকীদার মালিক্‌স্ ছাড়া এ ঘরে কেহই আসিতে পারে না, আর মালিক্‌স্ রাত্রে আফিসঘরে শুইয়া থাকে।"

"কিন্তু এক জনের কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি। সে দিন জ্যেঠামহাশয় যে বালকটিকে আশ্রয় দিয়াছেন, সে এ ঘরে আসে কি?"

"সে এ দিক্ মাড়ায়ও না। আমি তাহাকে আপিস-ঘরের বাহিরে থাকিতে আদেশ দিয়াছি; কিন্তু সে বেশীর ভাগ রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়ায়। আফিস বন্ধ হইবামাত্রই সে বাড়ী চলিয়া যায়।"

"এ বাড়ীতে সে থাকে না?"

"না সে তাহার মার কাছে থাকে। ছেলেটির বয়স বার কি তের হইবে, কিন্তু ছোঁড়া ভারী চালাক।

"আমি তাহাকে একবার জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিব।'

"তুমি নিজেই এ ব্যাপারের অনুসন্ধানের ভার লইতেছ? কাহারও সাহায্য না লইয়া তুমি এ রহস্যের উদ্ভেদ করিবে নাকি? এ তোমার নির্ব্বুদ্ধিতা! বিশেষতঃ তোমার জ্যেঠামহাশয় যদি ঘুণাক্ষরেও এ বিষয় জানিতে পারেন, তাহা হইলে আমার উপর ঘোরতর অসন্তুষ্ট হইবেন।"

"তিনি কখনই জানিতে পারিবেন না। আর যদিই বা পারেন, তখন সমস্ত দায়িত্ব আমি লইব। তোমার কোনও ভয় নাই।"

"তিনি ঠিক ধরিয়া ফেলিবেন; এই রক্ত, ছিন্নহস্ত, ব্রেসলেট, সব দেখিয়া কি তাঁহার সন্দেহ হইবে না?"

"রক্ত আমি এখনই ধুইয়া ফেলিতেছি। ছিন্নহস্তটি এখনই 'সন নেদে' ফেলিয়া দিয়া আসিব। আরকে ভিজাইয়া হাতটি রাখিবার সাহস আমার নাই। আর ব্রেস্লেট উহা আমার কাছেই রাখিব। যতদিন উহার সুন্দরী অধিকারিণীর সাক্ষাৎ না পাই, ততদিন আমার সঙ্গে সঙ্গেই থাকিবে। তুমি ভাবিতেছ, আমি কখনও তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিব না? না ভাই, নিশ্চিন্ত থাক, আমি তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবই। এই ব্রেসলেট ফরাসী দেশে নির্ম্মিত নহে। নির্ম্মাণকৌশলেই তাহার পরিচয় সুস্পষ্ট। ব্রেসলেট-ধারিণী নিশ্চয়ই বিদেশিনী,—আমরা যে সম্প্রদায়ে মিশিয়া থাকি, চোর রমণী সেই সমাজের অন্তর্ভুক্ত। আমার হাতে কোনও কাজ নাই। চোর ধরিবার কাজে লাগিব। আমি নিষ্কর্ম্মা বলিয়া জ্যেঠামহাশয় আমায় কত তিরস্কার করেন। চোর ধরিতে পারিলে সব কথা তাঁহাকে খুলিয়া বলিব।"

"চোর ধরিয়া তোমার কি আনন্দ, কি লাভ?"

"আনন্দ? এমন আনন্দ আর কিছুতেই নাই। কঠোর সমস্যার সমাধানেই আমার আনন্দ। বাল্যকাল হইতেই ডিটেক্টিভের কার্য্য আমার প্রীতিপদ। কিন্তু পিতা মাতার জন্যই আমি এ ব্যবসায় অবলম্বন করিতে পারি নাই। এখন যখন সুযোগ পাইয়াছি, তখন আর ছাড়িব না।"

"আমি কিন্তু তোমার কোনও সাহায্য করিতে পারিব না।"

"তোমার সাহায্য আমি চাই না। শুধু তুমি ঘটনাটা গুপ্ত রাখিও; প্রকাশ করিও না।

"কিন্তু আবার যদি চোর চুরি করিতে আসে!"

"প্রতিবারই একটা করিয়া অঙ্গ রাখিয়া যাইবার প্রবৃত্তি তাহার হইবে না। তুমিও সতর্ক হও। সাঙ্কেতিক নাম পরিবর্ত্তন করিয়া ফেল।"

ভিগ্‌নরী বলিলেন, "এখনই করিতেছি।" সিন্দুকের ডালা খুলিয়া ভিগ্‌নরী পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, স্বর্ণমুদ্রা, নোটের তাড়া প্রভৃতি স্তরে স্তরে সজ্জিত রহিয়াছে। একটা সুন্দর ষ্টীলের গহনার বাক্স দেখিয়া কৌতূহলী হইয়া ম্যাক্সিম বলিলেন, "ওটা কি হে?"

ভিগ্‌নরী বলিলেন, "উহার মধ্যে আমাদের এক জন মহাধনী খাতকের মূল্যবান্ দলীল ও পারিবারিক কাগজ-পত্রাদি আছে। এইবার নামটি বদলাইয়া ফেলা যাক। একটা নাম ঠিক করিয়া বল ত?"

"পাঁচ অক্ষরে নাম ত? আচ্ছা, ভগিনী আমার এলিসের নামটাই নাও। কিন্তু জ্যেঠামহাশয়কে বলিও না। তিনি হয় ত মনে করিতে পারেন, তুমি তাঁহার কন্যার প্রেমে পড়িয়াছ।"

জুল্‌স বলিলেন, "তুমি কি যে বল! তোমার জ্যেঠামহাশয় জানেন যে, আমি কখনই তাঁহার কন্যার পাণিগ্রহণের দুরাকাঙ্ক্ষা রাখি না।"

"ও কথা ছাড়িয়া দাও। আমি সে জন্য বলিতেছি না। যদি দৈবাৎ এই সাঙ্কেতিক শব্দের পরিবর্ত্তনের বিষয় জ্যেঠামহাশয় জানিতে পারিয়া তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করেন, এবং তুমি এই ঘটনার কথা পাছে প্রকাশ করিয়া ফেল, তাই তোমায় সতর্ক করিয়া দিলাম।"

ভিগ্‌নরী ভাবিলেন, ম্যাক্সিমের কথাই ঠিক। তৎপরে রক্ত ধৌত করিয়া ছিন্নহস্তটি একখানি পুরাতন সংবাদপত্রে মুড়িয়া লইয়া ম্যাক্সিম উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ব্রেস্‌লেট ও ছিন্নহস্ত পকেটে রাখিয়া তিনি বলিলেন, "এখন চল, আমরা যে এখানে আসিয়াছিলাম, কাহাকেও তাহা জানিতে দেওয়া হইবে না। আলোটা নিবাইয়া দাও।"

উভয়ে সন্তর্পণে গৃহ ত্যাগ করিলেন। রাজপথে আসিয়া ম্যাক্সিম বলিলেন, "যদি জ্যেঠামহাশয় জিজ্ঞাসা করেন, 'কা'ল কোথায় ছিলে?" বলিও আমি ভয়ানক মাতাল হইয়া পড়িয়াছিলাম, তাই তুমি হোটেল হইতে আমাকে বাসায় রাখিয়া আসিতে গিয়াছিলে।"

(ক্রমশঃ)

দর্পচূর্ণ।

(১)

অনেকদিন পরে রমেশ আজ বর্ম্মা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে। দশ বৎসর পূর্ব্বে অপক্ক আম্র ও তিন্তিড়ির প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া যে বালিকা তাহাকে স্বামী বলিয়া গ্রহণ করিতে সম্মত হইয়াছিল আজ তাহারই হৃদয় অধিকার করিবার জন্য সে দার্জ্জিলিং গমন করিতেছিল।

তখন শীতকাল। ক্রেগ-হিলের বাতায়ন-পথ হইতে অস্ফুট-আলোক-রশ্মি তুষারাচ্ছন্ন পর্ব্বতগাত্রে প্রতিফলিত হইতেছিল। সেই গৃহের দ্বিতলস্থ একটি সুবৃহৎ সুসজ্জিত কক্ষে নবীন বাবু চিন্তিতভাবে পাদচারণ করিতেছিলেন। তাঁহার বাল্য-বন্ধু, ডাক্তার ঘোষ, সেই উজ্জ্বল কক্ষের এক প্রান্তে বসিয়াছিলেন। নবীনবাবু গম্ভীরভাবে বলিলেন, "দেখুন, ডাক্তারবাবু, পূর্ণবাবু আর আমি ছেলেবেলা থেকেই একসঙ্গে মানুষ হয়েছিলাম—স্কুলে এক ক্লাসে পড়িতাম, মেসে একসঙ্গেই থাকিতাম। কলিকাতায় আমাদের দুজনেরই বাসা নিকটে ছিল। লিলির সঙ্গে রমেশের বিবাহ দিতে তাঁহার একান্ত ইচ্ছা ছিল। আহা অকালে তাঁর মৃত্যু হইল।"

"বাবা, আজ আবার কি গোলমাল? রোজই কি পার্টি হবে?"

ডাক্তার ঘোষ কহিলেন, "বেশ্ ত—আপনিই ত সেদিন বল্‌ছিলেন যে লিলি রমেশের প্রতি অনুরক্তা।"

"হাঁ, কিন্তু সে আজ দশ বৎসরের কথা। রমেশ এখন বর্ম্মাতে থাকে। ব্যবসা-বাণিজ্যে সে অনেক অর্থ উপার্জ্জন করেছে। লিলিরও অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে।"

সত্যই লিলির অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। সে এখন আর বালিকা নহে—আজ সে বিংশবর্ষীয়া যুবতী। পূর্ণ প্রস্ফুটিতা যূথিকার ন্যায় তাহার কমনীয় সৌন্দর্য্য-রাশি ফুটিয়া উঠিয়াছিল। শৈশবের ক্ষীণ দেহলতা অধুনা যৌবন-মুঞ্জরিত হইয়া উঠিয়াছে; কিশোরীর সরল ভীতি-বিহ্বল কটাক্ষ এখন দীপ্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, বিম্বাধর এখন সরস রঞ্জিত-ভাব ধারণ করিয়াছে।

ডাক্তার ঘোষ বলিলেন, "যা' হ'ক—লিলির—"

তাঁহার কথা সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল। লিলি দ্রুতগতিতে কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিল, "বাবা, আজ আবার কি গোলমাল? রোজই কি পার্টি হবে? আমার আর ভাল লাগে না।"

নবীন বাবু। সে কি, লিলি! তুমি কি জান না রমেশ আজ বর্ম্মা থেকে আস্‌চে? বেচারা দশ বৎসর পর আস্‌চে, তা'রই অভ্যর্থনার জন্য আজ পার্টি দিচ্ছি। দে'খ যেন কোন প্রকার ত্রুটি না হয়।

লিলি যে কিছু জানিত না এমন নহে, কিন্তু তবু বিরক্তি-পূর্ণ স্বরে বলিল, "কেন বাবা! আমি কি করব? রমেশবাবু ত স্ত্রীলোক নন, যে তাঁর অভ্যর্থনার ভার আমাকে নি'তে হ'বে। সতীশ দেখ্‌বে এখন?" সতীশ নবীন বাবুর দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়।

নবীনবাবু গম্ভীরভাবে বলিলেন, "ছিঃ, লিলি! ছেলে-মানুষি করিও না। দেখ না তোমার মা কত খাট্‌ছেন। রমেশ যে আমাদের 'জামাই' হবে?—" লিলি বেগতিক দেখিয়া প্রস্থান করিল।

(২)

তখন ডিনার চলিতেছিল। কাঁটা চামচের ঠুন্‌-ঠুন্‌ শব্দে, অতিথি-দলের হাস্য-পরিহাসে, কক্ষটি মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। চাপকান-পরিহিত খানসামাদল নিঃশব্দে খাদ্য-দ্রব্যাদি বহন করিয়া আনিতেছিল। অতিথিগণ পরম আনন্দে ভোজন করিতেছিলেন।

অবশ্য লিলির স্থান রমেশের পার্শ্বেই হইয়াছিল। কিন্তু আজ লিলির মুখ কেমন গম্ভীর, কেমন বিমর্ষ। অন্যদিন তাহারই হাস্যে তাহারই গল্পে ডিনার রুম শব্দিত হইয়া উঠিত। কিন্তু আজ সে যেন কেমন নীরব, অন্যমনস্ক। রমেশ কত গল্প করিতেছিল। বর্ম্মা প্রদেশের নর-নারীর অদ্ভুত আচার-ব্যবহার ও কৌতুকাবহ বিবাহ-রীতি সম্বন্ধে বাদানুবাদ চলিতে-ছিল। অতিথি দলের উচ্চ হাস্য-রোলে রুদ্ধ কক্ষটি ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছিল, কিন্তু লিলির মুখে আজ আর তেমন হাসি ফুটিল না।

ডিনার প্রায় শেষ হইয়াছে এমন সময় ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল যে জনৈক পুলিশ কর্ম্মচারী নবীনবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে চায়। নবীনবাবু অর্দ্ধ-ভুক্ত পুডিং-প্লেট্‌ ফেলিয়া উঠিয়া গেলেন। হাস্য পরিহাস বন্ধ হইল।

প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া নবীন বাবু বলিলেন যে, একজন পলাতক বন্দী তাঁহারই গৃহের নিকট কোথায় লুকাইয়া আছে। কালীমপং হইতে তাহারা আসিতেছিল, পথে সে তাহার রক্ষক পুলিশ-জমাদারকে খুন করিয়া পলায়ন করিয়াছে; পুলিশ তাহারই সন্ধানে আসিয়াছিল।

নবীনবাবু জানালা খুলিয়া একবার বাহিরে চাহিয়া দেখিলেন। তখনও তুষারপাত ক্ষান্ত হয় নাই, উদ্দাম বায়ু তখনও প্রবলবেগে বহিতেছিল। বাতায়ন বন্ধ করিয়া তিনি কহিলেন, "এখনও বরফ পড়্‌চে। বেচারা যদি আশ্রয় না পেয়ে থাকে তবে শীতেই মারা পড়্‌বে?"

রমেশ বলিল, "লোকটা উন্মাদ! না হ'লে এত রাত্রে সে পালায়।"

লিলি রমেশের প্রতি বিদ্রূপ-কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "কেন?"

রমেশের উত্তর করিবার আর সময় হইল না। অতিথিগণ উঠিয়া পড়িলেন। ডিনার শেষ হইল।

কিন্তু লিলির মুখে আজ আর হাসি ফুটিল না।

(৩)

লিলি বিবাহ করিবে না বলিয়া পণ করিয়াছে। পিতার অনুরোধ-উপরোধ, বন্ধুগণের সাধ্য-সাধনা যখন নিষ্ফল হইল, তখন নবীনবাবু একপ্রকার হাল ছাড়িয়া দিলেন।

লিলির মাতা কিন্তু কিছুতেই সান্ত্বনা মানিলেন না। তাঁহার একমাত্র দুহিতা যে অবিবাহিতা থাকিবে এ চিন্তাও তাঁহার পক্ষে অসহ্য হইল। উচ্চশিক্ষিতা অনেক য়ুরোপীয় মহিলা যে আজীবন অবিবাহিতা থাকেন, তাহা জানিয়াও তিনি তাহার আজন্মের সংস্কারকে কোনমতেই ঠেলিয়া ফেলিতে পারিলেন না। কন্যাকে কত বুঝাইলেন, কত তিরস্কার করিলেন, কিন্তু তাহাকে কোন ক্রমেই বশে আনিতে পারিলেন না।

তিনি জানিতেন যে শৈশবে রমেশের প্রতি লিলি অনুরক্তা ছিল—রমেশ না আসিলে তাহার খেলা হইত না, রমেশের অনুপস্থিতিতে সে কাতর হইয়া পড়িত। বাল্যে ক্রীড়াচ্ছলে যে রমেশকে সে পতিত্বে বরণ করিয়াছিল, এ ঘটনাও তাঁহার অবিদিত ছিল না; সুতরাং তিনি ভাবিলেন যে রমেশকে দেখিলে বোধ হয় কন্যার প্রতিজ্ঞা টলিতে পারে। সেই কারণেই চিঠির পর চিঠি লিখিয়া তিনি রমেশকে বর্ম্মা হইতে আনাইয়াছিলেন।

মাতার মনোগতভাব বুঝিয়াই বোধ হয় লিলি রমেশের প্রতি বিমুখ হইল। সে এখন আর পরমুখাপেক্ষী বালিকা নহে, সে এখন স্বাধীনা শিক্ষিতা রমণী। শৈশবের সে ঘটনা একটা বৃথা আমোদ বা খেলা ব্যতীত যে আর কিছুই নয়, ইহা লিলি বেশ্ বুঝিয়াছিল। পুরুষের দাসত্ব স্বীকার করা যে তাহার পক্ষে কোন মতেই সম্ভবপর নয় এ ধারণা এক্ষণে তাহার বদ্ধমূল হইয়াছিল। রমেশ যে তাহার প্রতিজ্ঞা টলাইতে আসিয়াছে তাহার মুক্ত-জীবন শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে আসিয়াছে, এ চিন্তা তাহাকে একেবারে বিমুখ করিয়া তুলিয়াছিল।

তদুপরি রমেশের শিষ্ট-স্বভাব, ধীর-প্রকৃতি তাহার মোটেই ভাল লাগিত না। শিশুকাল হইতে সে চঞ্চল। এখনও সে বালিকার ন্যায় ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতে ভাল বাসিত; সুতরাং রমেশের শান্ত ভাব তাহার নিকট অমার্জ্জনীয়। এবারে কিন্তু রমেশ লিলির অনুপম রূপে একেবারে মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। লিলি কোনমতেই তাহাকে বিরক্ত করিতে পারিত না। লিলি যতই তাহার প্রতি বিদ্রূপ-বাণ নিক্ষেপ করিত, যতই তাহাকে অপদস্থ করিতে চেষ্টা করিত, রমেশ ততই সে সব হাসিয়া উড়াইয়া দিত, বিদ্রূপ-বাণ তাহাকে কোন দিন আহত করিয়াছে বলিয়া মনে হইত না।

একদিন লিলি রমেশকে লক্ষ্য করিয়া প্রস্তাব করিল, বরফে স্কেট করিতে হইবে। রমেশ উত্তরে বলিল, তাহার পায়ে ব্যথা হইয়াছে, সে আজ স্কেটে যোগ দিতে পারিবে না। বিদ্রূপ-মাখা হাসি হাসিয়া লিলি বলিল, "ঠিক ত! পায়ে ব্যথা হয়েচে! আপনি চিমনীর পাশে ব'সে ঠাকুরমার কাছে গল্প শুনুন। তাই ত! পায়ে যদি লেগে যায়।" বাক্যশেল বিদ্ধ হইয়াও রমেশ নীরব রহিল।

লিলি চলিয়া গেল। পরম উৎসাহে সে বরফে ছুটাছুটি করিতে লাগিল। জানালা হইতে যে রমেশ তাহার ক্রীড়া দেখিতেছে, ইহা জানিয়া সে দ্বিগুণ উৎসাহে স্কেট্ করিতে লাগিল।

এত পরিশ্রমেও সে ক্লান্ত হইল না। অপরাহ্নে সে পুনরায় রমেশকে বলিল, "মোটরে ক'রে বেড়াইতে গেলে হয় না?"

রমেশ নির্ভীক ভাবে বলিল, "আমি ত মোটর চালাইতে জানিনে। শুনলুম, আজ সাফোর (চালক) ছুটী নিয়ে গেছে।"

"সাফোরকে দরকার কি? আমিই মোটর চালাইব। আপনি না হয় গাড়ীর দরজা তুলিয়া দিয়া কম্বল গায়ে দিয়া ভিতরে বসিয়া থাকিবেন।"

রমেশ এবার দ্বিরুক্তি করিল না, বলিল, "বেশ্ ত, চলুন না?"

রমেশ কিন্তু গাড়ীর ভিতরে বসিল না। লিলির পার্শ্বেই স্থান লইল। তাহার চোখ যেন জ্বলিতেছিল, ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছিল, প্রতিশোধ-স্পৃহা অন্তর দগ্ধ করিতেছিল। সে নীরবে গম্ভীরভাবে বসিয়া রহিল।

লিলি সুইচ টানিয়া দিল। দ্রুতবেগে অসমতলপথে
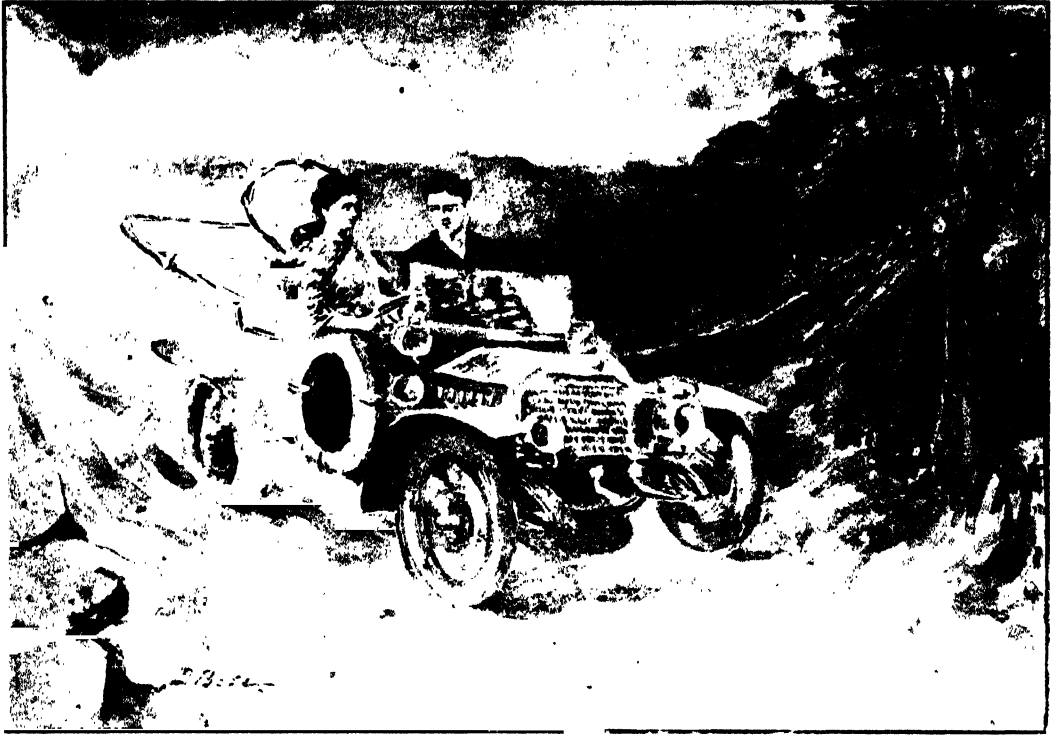
"কেন বলুন দেখি আপনি আমাকে উপেক্ষা করেন ?"

মোটরকার নাচিতে নাচিতে ছুটিতে লাগিল। উপহাস করিয়া লিলি বলিল "দেখ্‌বেন! ভয় পাবেন না ?"

রমেশকে নিরুত্তর দেখিয়া সে একবার রমেশের দিকে চাহিল; দেখিল নির্নিমেষ নয়নে রমেশ তাহাকে দেখিতেছে। রমেশের সেই ধীর, শান্ত দৃষ্টি, সেই নীরব স্থির কটাক্ষ সে সহ্য করিতে পারিল না। লজ্জিত হইয়া সে চক্ষু নত করিল। অতি ধীরে ধীরে রমেশ জিজ্ঞাসা করিল, "কেন বলুন দেখি আপনি আমাকে উপেক্ষা করেন ?"

"আমি দুঃখিত—।" তাহার কথায় বাধা দিয়া রমেশ বলিয়া উঠিল, "মিথ্যা কথা! আপনি ইহার জন্য কিছুমাত্র দুঃখিত নন্।" লিলি তাহার কথার উত্তর না দিয়া বলিল, "আমরা কি এখন ফিরে যাব ? সন্ধ্যা হ'য়ে এল।" রমেশ এবার তাহার প্রতিশোধ লইল; বলিল, "কেন ? আপনি ভয় পেয়েছেন না কি ?" লিলি প্রত্যুত্তর করিতে পারিল না, নীরবে গাড়ী চালাইতে লাগিল।

রমেশ পুনরায় ধীর ধীরে আরম্ভ করিল, "আপনি কি জানেন না আমি আপনাকে কত—।" রমেশ বক্তব্য সমাপ্ত করিতে পারিল না। ইতিপূর্ব্বেই লিলি সুইচ্ টানিয়া ধরিয়াছিল। গাড়ী সশব্দে থামিয়া গেল। ক্রোধে, ঘৃণায়, লজ্জায় উন্মত্তপ্রায় হইয়া লিলি কম্পিতকণ্ঠে বলিল, "আপনি কি আমাকে অপমান করবার জন্য আমার সঙ্গে আসিয়াছেন ?" কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া রমেশ বলিল, "আমি বরং ভাবিতেছিলাম যে, বিবাহের প্রস্তাব করিবার অবসর দিবার জন্যই আপনি আমাকে সঙ্গে আনিয়াছেন।" লিলি পুনরায় নিরুত্তর হইল। অপমানে, লজ্জায় বেচারার মুখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল।

সুইচ্ পুনরায় টানিয়া ধরিয়া লিলি ঘৃণা-বিজড়িত কণ্ঠে বলিল, "আপনার অন্তরে কিছুমাত্র মনুষ্যত্ব আছে কি না জানবার জন্যই আপনাকে আমি সঙ্গে লইয়াছিলাম।" সেইরূপ অসঙ্কোচে রমেশ উত্তর করিল, "ঠিক সেই জন্যই আমি আপনার নিকট আজ বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছিলাম।" রমেশ লিলিকে পুনরায় নিরুত্তর করিল। রমেশের প্রতিশোধ-স্পৃহা কতকটা মিটিল।

গাড়ী ছুটিতেছিল। সহসা রমেশ জিজ্ঞাসা করিল,

"আপনার নিকট আর বাষ্প-যন্ত্র আছে কি? গাড়ীতে বাষ্প নাই দেখিতেছি। গাড়ী ত এখনই থামিয়া যাইবে।" তখনই হুংকার করিতে করিতে গাড়ী স্থির হইয়া দাঁড়াইল। রমেশ গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িয়া বলিল, "যদি আর বাষ্প-যন্ত্র (একিউমিলেটর) থাকে ত দিন, আমি গাড়ীতে ঠিক করিয়া বসাইয়া দিতেছি।"

এবার লিলির ওষ্ঠ কাঁপিয়া উঠিল। উদ্বেগভরে সে বলিল, "আমি তাড়াতাড়িতে বাষ্প-যন্ত্রটি ফেলে এসেছি। কোন উপায়!"

রমেশ পূর্ব্ববৎ গম্ভীরভাবে বলিল, "আমাদের পদব্রজে বাড়ী ফিরতে হবে।"

কিন্তু এ বড় সুখের কল্পনা নয়। কুয়াসায় চারিধার ঢাকিয়া গিয়াছে, পর্ব্বত-গাত্র তুষারে আচ্ছন্ন হইয়াছে, হিমানী-শীতল বায়ু দেহ কণ্টকিত করিতেছে।

পনর মিনিটকাল তাহারা কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া নীরবে বসিয়া রহিল। দেখিতে দেখিতে কুজ্ঝটিকায় চতুর্দ্দিক এমনই আচ্ছন্ন হইয়া গেল যে, নিকটস্থ তরুরাজিও অদৃশ্য হইল। রমেশ জিজ্ঞাসা করিল, "ক্রেগ-হিল হইতে আমরা কতদূরে আসিয়াছি?" ভীতিবিহ্বল কণ্ঠে লিলি উত্তর করিল, "সাত মাইল।" অন্ধকারে সে আর রমেশকে দেখিতে পাইল না।

রমেশ। এখানে কাছে কি কোন গ্রাম আছে?

লিলি। পশ্চিমে দুই মাইল দূরে একটা গ্রাম আছে।

রমেশ। আচ্ছা! আপনি বসুন। আমি গ্রাম থেকে লোক ডেকে আনি।

লিলি কাঁপিয়া উঠিল। সেই জন-হীন স্থানে একাকী নিরুপায় অবস্থায় বসিয়া থাকিতে নির্ভীক লিলির হৃদয়েও ভয়ের সঞ্চার হইল। তাহার মনে হইল, রমেশ যদি তাহাকে সঙ্গে নেয়, যদি সে তাহাকে একবার ডাকে, তবে সে বাঁচিয়া যায়। একবার ভাবিল, বিনা আহ্বানেই সে রমেশের পশ্চাদ্ধাবন করিবে। কিন্তু তাহার অন্তর্নিহিত গর্ব্ব তাহাকে বাধা দিল।

একঘণ্টা কাটিয়া গেল। তথাপি রমেশের দর্শন নাই। কুহেলিকা এমনই ঘনীভূত হইয়া উঠিল যে মোটরকারের চাকা-গুলাও আর দৃষ্টিগোচর হয় না। পথ নিস্তব্ধ, জনহীন। এ দারুণ শীতে গৃহ ছাড়িয়া কে বাহির হইবে?

সেই স্তব্ধ, জন-হীন পথে, সেই কুহেলিকাচ্ছন্ন অন্ধকার নিশীথে, একেলা বসিয়া লিলি ভাবিতে লাগিল। আজ তাহার গর্ব্বিত হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল, তাহার উন্নত উদ্ধত প্রকৃতি নত হইয়া আসিয়াছিল, তাহার নির্ভীক অন্তর ভয়ে কাঁপিতেছিল।

সময় আর কাটে না। রমেশের জন্য সে ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তাহার পদশব্দ শুনিবার জন্য সে ব্যগ্র হইল।

অবশেষে সে আর অপেক্ষা করিতে পারিল না। দারুণ স্তব্ধতা তাহাকে যেন বিঁধিতে লাগিল। সে মোটরকার হইতে অবতরণ করিল। ভাবিল, রমেশবাবু নিশ্চয়ই পথ হারাইয়াছেন। তাহার ভগ্ন-হৃদয়ে সহসা বলসঞ্চার হইল। সে রমেশের অন্বেষণে ছুটিল।

অন্ধকারে বায়ু ও বরফের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে অসমতল পথে সে অগ্রসর হইল। আশঙ্কায়, উদ্বেগে ও পরিশ্রমে এত শীতেও সে ঘামিয়া উঠিল।

অবশেষে কএক ঘণ্টা কঠোর পথশ্রমের পর লিলি একটি ক্ষুদ্র পর্ণকুটীর-প্রান্তে আসিয়া পঁহুছিল। আনন্দে সে দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হইল। রুদ্ধ কবাটে ধাক্কা দিল—কিন্তু কোন সাড়া পাওয়া গেল না। চীৎকার করিয়া সে ডাকিতে লাগিল। তাহার চীৎকারের প্রতিধ্বনি ফিরিয়া আসিল—কেহই উত্তর দিল না। শেষে উপায়ান্তর না দেখিয়া সে দরজায় ধাক্কা দিতে লাগিল। সহসা দ্বার সশব্দে খুলিয়া গেল।

কক্ষে প্রবেশ করিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইল—নিবিড় অন্ধকার চারিদিক্ ঘিরিয়া আছে। বাহিরের অপেক্ষা ভিতরে আরও বেশী অন্ধকার বোধ হইল। সে কিছুই দেখিতে পাইল না।

সহসা যেন কাহার নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা গেল; কাহার নিঃশব্দ পদসঞ্চার তাহার শ্রুতগোচর হইল, কে যেন ধীরে ধীরে দরজার অর্গল রুদ্ধ করিয়া দিল।

ভয়ে লিলির বুকের ভিতরটা হিম হইয়া উঠিল, তাহার বক্ষের স্পন্দন বন্ধ হইবার উপক্রম হইল। আজ তাহার সাহসী মন ভয়কে কোন প্রকারেই দূরে রাখিতে পারিল না।

সহসা সেই পলাতক বন্দীর কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল। পলাতক বন্দী যদি এই গৃহে আশ্রয় লইয়া থাকে। প্রহরীকে সে হত্যা করিয়াছে—আজ যদি তাহাকে হত্যা করে। লিলি শিহরিয়া উঠিল।

নিঃশ্বাসের শব্দ যেন স্পষ্ট হইয়া উঠিল। অলক্ষিত জীব ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইল। অকস্মাৎ কে তাহার বাম হস্ত চাপিয়া ধরিল। সাহসী লিলিও ছাড়িবার পাত্র নয়। দক্ষিণ হস্তে চকিতে সে কাপড় হইতে তাহার বাঘের নখের ব্রোচ্ খুলিয়া আক্রমণকারীর হস্তে সবলে বিদ্ধ করিয়া দিল, অস্ফুট অনুচ্চারিত যন্ত্রণা-ধ্বনি শ্রুত হইল মাত্র—তাহার হস্ত মুক্ত হইল না।

অসহায় নিরুপায় লিলি তখন কাতর-কণ্ঠে বলিল, "ছেড়ে দাও! ছেড়ে দাও! আমার স্বামী এখনই আসিতেছেন। তাঁহার গাড়ী ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; এখনই তিনি আসিবেন।"

তৎক্ষণাৎ বালিকার হস্ত মুক্ত হইল। আক্রমণকারী পশ্চাতে হটিয়া গিয়া বলিল, "কি সর্ব্বনাশ—লিলি, তুমি?" তখনই পকেট হইতে দিয়াসলাই বাহির করিয়া রমেশ একটি শলাকা জ্বালিল।

লজ্জায় লিলির কপোল নীল হইয়া গেল, তাহার শিরাগুলা ফুলিয়া উঠিল। দুই হাতে সে তাহার মুখ ঢাকিয়া ধরিল।

কিন্তু তাহার অঙ্গুলির অন্তরাল হইতে রমেশের পরিচ্ছদ দেখিয়া সে চীৎকার করিয়া উঠিল। রমেশের বহুমূল্য পরিচ্ছদ অন্তর্হিত হইয়াছে। তৎপরিবর্ত্তে জীর্ণ, ছিন্ন কয়েদী-চিহ্নিত বেশ সে পরিধান করিয়া রহিয়াছে।

রমেশ আস্তে আস্তে বলিল, "চুপ কর, চেঁচিও না। এখানে আর একজন লোক আছে।" তৎপরে তৃতীয় ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া সে বলিল, "আর দেরী করিও না। শীঘ্র প্রস্তুত হইয়া এস।"

তখনই পদশব্দ শ্রুত হইল। রমেশের মহামূল্য বেশভূষা পরিধান করিয়া জনৈক শীর্ণ পুরুষ কক্ষে প্রবেশ করিল। তাহার হস্তে একটি লণ্ঠন ছিল। লিলিকে দেখিয়া সে ভয়ে পলায়ন-তৎপর হইল।

রমেশ বলিল, "ভয় পাইও না। ইনি আমার আত্মীয়া, তোমার বিশেষ সৌভাগ্য যে আর কেহ আসে নাই।"

অভ্যাগত পুরুষ তখন লিলিকে প্রণাম করিয়া কহিল, "ঈশ্বর আপনাদিগকে দীর্ঘজীবী করুন। ইঁহার মত মহৎ পরোপকারী পুরুষ আমি আর দেখি নাই।"

লিলি রমেশের দিকে চাহিয়া দেখিল—তাহার হাতের ক্ষতস্থান হইতে তখনও রক্ত নির্গত হইতেছিল—সার্টের হাতাটা প্রায় ভিজিয়া গিয়াছিল। রমেশ বলিতে লাগিল, "এই শূন্য কুটীরে আমরা সকলেই আশ্রয়ের জন্য আসিয়াছি। কিন্তু এই ব্যক্তি প্রথমে আসে এবং আমাকে প্রবেশ করিতে বাধা দেয়।" আগন্তুক বলিল, "সে কথা আর বল্‌বেন না; ধন্য! আপনার সাহস ও বল। আপনি যে এত শীঘ্র আমাকে 'কাবু' করিতে পারিবেন, তাহা আমার ধারণা ছিল না।"

রমেশ। কি করি! আত্মরক্ষা ত করিতে হইবে।

"কিন্তু, এ কি!" এই বলিয়া লিলি রমেশের পরিহিত সেই কয়েদী-চিহ্নিত বেশ দেখাইয়া দিল।

রমেশ। এ কয়েদীরই পোষাক বটে। এ লোকটা আমাকে তাহার সমস্ত ইতিহাস খুলিয়া বলিয়াছে। আমি তাহার পলায়নের সুবিধা করিয়া দিতেছি।

বিস্মিত হইয়া লিলি বলিল, "তুমিই পলাতক বন্দী।"

অবনত-মস্তকে বন্দী বলিল, "যা'র কথা আপনারা শুনেচেন, আমিই সেই। কিন্তু আমি নিরপরাধ। পুলীশে বিনা অপরাধে আমাকে গ্রেপ্তার করে। আমি মুক্ত না হইলে আমার বুড়া মা বাঁচিবে না।"

রমেশ। আর বিলম্ব করিবার আবশ্যক নাই। তুমি যাও। যদি আবার তুমি ধরা পড়, তবে বলিও যে জোর করিয়া তুমি আমার পোষাক কাড়িয়া লইয়াছ। আমাদের সঙ্গেই এস। আমাদের মোটরকার ক'রে তুমি কিছু দূর যাইতে পারিবে।"

বিস্মিত লিলি সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, "মোটরকার?" তাহার আর কথা বাহির হইল না।

রমেশ। হাঁ! এখানে আসিবার পূর্ব্বে জনৈক মোটর-চালকের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। আমি তাহার নিকট হইতে একটা 'একিউমিলেটর' চাহিয়া লইয়াছি।

রমেশ এবার নিজেই মোটর চালাইতে লাগিল। সে যে একজন নিপুণ মোটর-চালক এ বিষয়ে কাহারও আর সন্দেহ রহিল না। ক্রেগ্-হিলের নিকটবর্ত্তী হইলে তাহারা বন্দীকে নামাইয়া দিল।

গৃহে পঁহুছিবামাত্র রমেশ লিলিকে বলিল, "আস্তে আস্তে আমার ওভার-কোটটা নিয়ে এস। চাকরেরা যেন টের না পায়।" ওভার-কোটে কোন মতে তাহার বেশ আবৃত করিয়া রমেশ উপরে চলিয়া গেল।

রমেশ বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া ডিনার-রূমে আসিয়া দেখিল দুই হস্তে মুখ আচ্ছাদন করিয়া লিলি একাকী কাঁদিতেছে।

রমেশ সস্নেহে লিলির হাত সরাইয়া দিল।

রমেশ সস্নেহে লিলির হাত সরাইয়া দিল, সযত্নে তাহার মুখ তুলিয়া ধরিয়া তাহার অশ্রু মুছাইয়া দিল, সাগ্রহে তাহার সেই অশ্রুসিক্ত স্ফুরিত বিম্বাধরে চুম্বন করিল। অহঙ্কারী, উদ্ধত-প্রকৃতি লিলি আজ আর কোন আপত্তি করিল না। আজ তাহার দর্পচূর্ণ হইয়াছে।

শ্রীযতীশচন্দ্র বসু, এম, এ

মন্ত্রশক্তি।

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাজনগরের জমিদার বাবুদের কুলদেবতা গোপী-কিশোরের মন্দিরটি শুধু জন-সাধারণের চক্ষেই সুন্দর বলিয়া আদৃত হইত না, তাহার শিল্পনৈপুণ্য ও নির্ম্মাণ চাতুর্য্য কবি ও চিত্রকরের নেত্রেও প্রশংসার জ্যোতিঃ ফুটাইয়া তুলিত।

সম্মুখে কলনাদিনী চিত্ররেখা। পরপারে গোলাদ্ধাকারে সুনিবিড় বৃক্ষরাজি। ইহাদের শেষপ্রান্ত অনন্ত দিগ্বলয়ে মিশিয়া গিয়াছে এবং পদতলে দিগন্ত-বিস্তারি অতি শুভ্র তীর, বালুকার নিম্নে স্বচ্ছ সলিল-বক্ষে প্রশান্ত নীলিমার প্রশান্ত ছায়া। মধ্যে মধ্যে কেবল জলতলে শ্বেত তরঙ্গের অস্ফুট মৃদু শব্দে অবাধ লীলানর্ত্তন আর গগনাঙ্গনে তেমনই শুভ্র মেঘপুঞ্জের নিঃশব্দ সশঙ্ক গতি। নদীর উপরে বাঁধাঘাট। প্রশস্ত চত্বরের দুই দিকে বসিবার আসন। লোহার ফটকের কবাট ছিল না; তাহার মাথার উপরে একটা বড় লণ্ঠনে রাত্রিতে রঙ্গিণ তেলের বাতি জ্বলিত। এই চত্বরের পরেই একটি সুরচিত সুরক্ষিত পুষ্পোদ্যানের কিয়দংশ দৃষ্টিপথে পতিত হয়। এই উদ্যানটি অত্যন্ত বৃহৎ এবং ইহার পশ্চাতের অংশ বিবিধ ফলবৃক্ষে পরিপূর্ণ। উদ্যানের সম্মুখভাগেই মন্দির। উদ্যানে লতাকুঞ্জ, গুল্ম-ভবন, প্রস্তরাসন, নায়ক বা নায়িকামূর্ত্তি; পথিপার্শ্বে আলোকাধার, ইহার কিছুরই অভাব ছিল না। মার্ব্বেল-মণ্ডিত সুপ্রশস্ত সমচতুষ্কোণ চত্বরের মধ্যস্থলে মন্মর মন্দির নীল আকাশের দিকে মাথা তুলিয়া আছে। জোৎস্নাময়ী যামিনীর কনক-কিরণ মন্দির গাত্রে প্রতিফলিত হইয়া সুন্দর দেখায়। ঘন মেঘাড়ম্বরশালী আসন্ন ঝটিকার স্তব্ধতায় তাহা অধিকতর চিত্তহারী। স্বর্ণচূড়া প্রতপ্ত সূর্য্যকিরণে ঝলসিত হইয়া ছটা বিকীর্ণ করে, উদ্ধপক্ষ পরিশ্রান্ত পক্ষিগণ মধ্যাহ্ন-ব্যাপী ভ্রমণের পর একবার ইহার উপরে বসিয়া বিশ্রাম করিয়া লয়। বর্ষার জলধারা মধ্যে মধ্যে সেই শুভ্র অঙ্গ ধৌত করিয়া দিয়া ছিন্নমাল্যভ্রষ্ট মুক্তাবলীর মত নিম্নের চত্বরে ছড়াইয়া পড়িতে থাকে। তখন তাহার ঔজ্জ্বল্য আরও বৃদ্ধি পায়।

মন্দিরের প্রবেশদ্বার রূপার পাতে মোড়া, বড় বড় অক্ষরে মন্দির-প্রতিষ্ঠাতার নাম ও প্রতিষ্ঠার তারিখ লিখিত ছিল। সে দিন সুদূর অতীতের গর্ভে বিলীন হইয়া যায় নাই।

মন্দিরের অভ্যন্তরে সুচারু রৌপ্য-সিংহাসনে মন্দিরের দেবতাযুগল পাশাপাশি স্থাপিত। পীতাম্বর শ্যামমূর্ত্তি বামদিকে ঈষৎ হেলিয়া বংশীবাদন করিতেছেন, আর সেই বাঁশীর স্বরে গৃহকর্ম্মে আনমনা রাধা সব ভুলিয়া উন্মাদিনীর মত বিস্রস্তকুন্তলে ছুটিয়া আসিয়া শ্যামসঙ্গিনী হইয়াছেন। শিল্পী এই অপূর্ব্ব আদর্শ চিত্তপটে অঙ্কিত রাখিয়া প্রতিমা গঠন করিয়াছিল, তাই তাহা পবিত্র ভাব-সম্পদ্‌-ভূষিত। জীবাত্মা সংসারের ভ্রাম্যমান চক্রে আবর্ত্তিত হইতে হইতে আত্মস্বরূপ বিস্মৃত হইয়া সংসারকেই গৃহবোধে তাহাতেই রত থাকে, কিন্তু যেদিন জীবন যমুনার পরিপূর্ণ কূল হইতে বাঁশীর আহ্বান তাহার কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশে, তখন তাহার সকল ভ্রান্তির অবসান হইয়া যায়। তখন লজ্জা মান ভয় সমুদয় বিসর্জ্জন দিয়া গৃহরূপ পরবাস ছাড়িয়া বদ্ধ আত্মা মুক্ত আত্মার সহিত মিলিত হইবার জন্য ছুটিয়া যায়, এবং সেই আকাঙ্ক্ষিত মিলন লাভ করিয়া সর্ব্ব ব্যাকুলতার হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করে।

এই যুগ্ম প্রতিমার সম্মুখে ক্ষুদ্র একটি অষ্টদল স্বর্ণপদ্মের মধ্যদেশে তুলসীদাম-বেষ্টিত চন্দন-চর্চ্চিত শালগ্রাম শিলা প্রতিষ্ঠিত ছিল। শ্বেত ও কৃষ্ণপ্রস্তরে পদ্মাকৃতিতে রচিত চন্দ্রাতলে নিত্যপূজার রৌপ্য উপকরণ যথাযোগ্য স্থানে সুসজ্জিত। জলে ভরা শুভ্র পানী-শঙ্খ, ঘণ্টা কাঁশর পঞ্চপ্রদীপ দীপও ধূপাধার সমস্তই সুমার্জ্জিত সুবিন্যস্ত; কখনও ইহার একটিও এদিক্ ওদিক্ হইতে দেখা যায় নাই।

এই মন্দির স্বর্গীয় জমিদারের অক্ষয় কীর্ত্তি। শুধু মন্দির নহে, তাঁহার সমুদয় স্থাবর-সম্পত্তিও তিনি দেবোদ্দেশে দান করিয়াছেন। উৎসবাদির ব্যয় ও মন্দির সংস্কারাদি ভাল-রূপেই চালাইবার ব্যবস্থা আছে। জমিদার-গোষ্ঠী এখন হইতে দেবসেবকরূপে সেবাবশিষ্ট উপস্বত্ব উপভোগ করিতে পারিবেন; কিন্তু দান বিক্রয়ের অধিকার পাইবেন না, সমুদায় সম্পত্তি দেবত্র।

মন্দির ব্যতীত একটি ছোট রকম অতিথিশালা ও একটি

টোলবাড়ীও এই স্বধর্ম্মপরায়ণ জমিদারের যশোঘোষণা করিতেছিল। টোলের অধ্যাপক জগন্নাথ তর্কচূড়ামণি প্রতিষ্ঠাতার ইচ্ছানুসারে এতকাল মন্দিরের পৌরোহিত্য কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। জমিদার মহাশয় তাঁহার উইলে স্পষ্ট বিধান করিয়াছেন যে,যতদিন তর্কচূড়ামণি জীবিত থাকিবেন, ততদিন পূজার ভার তাঁহার উপরেই থাকিবে; তাঁহার অভাবে তাঁহার নিয়োজিত শিষ্যই পুরোহিতের পদ পাইবেন; পুরোহিতগণের উপরই ভবিষ্যৎ-পুরোহিত মনোনয়নের ভার ন্যস্ত থাকিবে।

পুরোহিতের অনুপযুক্ততা দেখিলে এবং তাহা স্থানীয় ভদ্রব্যক্তিগণের দ্বারা সমর্থিত হইলে, জমিদার-গোষ্ঠীর যিনি তৎকালে প্রবীণ থাকিবেন, তিনি পুরোহিত পরিবর্ত্তনে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন বটে, কিন্তু সেই মনোনয়ন উপরিউক্ত চতুষ্পাঠীর ছাত্রগণের মধ্য হইতেই করিতে হইবে। এই পদ্ধতিতে অনেক সময় অসুবিধা হইতে পারে, কিন্তু ইহাতে সুবিধারও সম্ভাবনা যথেষ্ট আছে। নিজের উপযুক্ততা প্রমাণ করিবার ইচ্ছায় ছেলেরা প্রথম হইতেই সচেষ্ট থাকায় তাহারা উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হইবে। তবে কখনও কখনও অধ্যাপকের মনোনয়নের ত্রুটি ধরিয়া ছাত্রেরা বিদ্বেষবুদ্ধিপরায়ণ হইয়া উঠিতে প্যারে এবং ঈর্ষাকলুষিত সঙ্কীর্ণহৃদয় ব্যক্তিগণ এই উপলক্ষে বিবিধ অশান্তির সৃষ্টি করিয়া তুলিতে পারে।

অম্বরনাথ ছেলেটি অত্যন্ত নিরীহ ও নম্র প্রকৃতির। সবে সাত আটমাস সে এই টোলে অধ্যয়ন করিতে আসিয়াছে, কিন্তু ইহারই মধ্যে অধ্যাপক হইতে আরম্ভ করিয়া, অল্প কএকজন ছাত্র ব্যতীত, সকলেই তাহার গুণে মুগ্ধ হইয়াছিল। বৃদ্ধ পণ্ডিতের শয্যারচনা, হরিতকি কর্ত্তন হইতে তাঁহার পদসেবার নিত্য ভার এই শান্ত সুশীল ছাত্রটির উপরে নিক্ষেপ করিয়া অন্যান্য ছেলেরা নির্ঝঞ্ঝাট হইয়াছিল, অধিকন্তু তাহাদের ঘাড়ের সমস্ত বোঝা একমাত্র স্থল এই অম্বরনাথেরই উপর তাহারা চাপাইয়া দিয়াছিল। অধ্যাপক মহাশয় সুদূর অতীতে পত্নীহীন হইয়াছিলেন; জমিদার মহাশয়ের টোলবাড়ী চৈতন্যদেবের অনুমোদিত সর্ব্বাপেক্ষা নির্জ্জন স্থান হইয়াছিল; কিন্তু এই নারীবর্জ্জিত গৃহস্থালীর যে একটা মস্ত বড় উপদ্রব বর্ত্তমান ছিল, সেই পাকশাকের ব্যাপার ইদানীং অম্বরনাথের উপরে আসিয়া পড়ায় ছাত্রদলের গুরুভার অনেকটা কমিয়া আসিয়াছিল। অম্বরনাথও ইহাতে দুঃখিত নহে। সূর্য্যোদয়ের অনেক পূর্ব্বে শয্যাত্যাগ করিয়া সে প্রাতকৃত্য ও সন্ধ্যাহ্নিক শেষ করিয়া পাঠ্যপুস্তক লইয়া জনহীন নদীতটে, কখনও একটি গাছের তলায়, কখনও বা শ্যামল প্রান্তরে আসিয়া বসিত। প্রভাতের সদ্যোজাগ্রত কাক তখন প্রাভাতিক মঙ্গলাচরণ করিত, পদতলে চিত্ররেখা মৃদু কল্লোলে গান গায়িয়া বহিয়া যাইত। স্বর্ণকুম্ভকক্ষা রক্তবসনা ঊষা নববধূর সরমশঙ্কিত পদক্ষেপে সখী দিগ্‌বালার হস্তধারণ করিয়া ক্রমে জগমন্দিরের পূর্ব্বদ্বারে আসিয়া দেখা দিতেন; চঞ্চলা বালিকার কণ্ঠ হইতে ছিঁড়িয়া পড়া মুক্তাগুলির মত শিশিরের বিন্দু গাছের তলায় ও অম্বরনাথের মাথার উপরে ঝরিয়া পড়িত। সে কিন্তু এ সকল কিছুই জানিতে পারিত না, সে একাগ্রচিত্ত হইয়া অধীত বিষয়ে তন্ময় হইয়া যাইত,—বাহ্যজগতের সঙ্গে সে সময় তাহার কিছুমাত্র সম্বন্ধ থাকিত না।

এই অবসরটুকু যথার্থ উপভোগের পর সে [illegible] মনোযোগী হইত। গুরু বৃদ্ধ এবং ব্যাধি-নিপীড়িত, কাজেই তাঁহার প্রকৃতি একটু রুক্ষ হইয়াছিল। মন্দিরের পূজা শেষ করিয়া টোলে ফিরিয়াই তিনি ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হইয়া পড়িতেন এবং সেই সময় আহার্য্যদ্রব্য না পাইলে তাঁহার বিরক্তি অনেক সময়েই প্রবল ক্রোধে পরিণত হইয়া উঠিত। পূর্ব্বে এইরূপ রোষাভিনয় নৈমিত্তিক ব্যাপারের মধ্যেই ছিল; কিন্তু অম্বরনাথের আগমনাবধি তাহার সাবধানতায় তাঁহাকে এই সামান্য বিষয়ের জন্য আর কোন দিন বিরক্ত হইতে হয় নাই। মধ্যে মধ্যে কারণবিশেষে তাঁহাকে ক্রুদ্ধ হইতে দেখিলেই ছাত্রগণ তাঁহার সম্মুখ হইতে সরিয়া পলাইত; একা অম্বরনাথই সকলের প্রাপ্য তিরস্কার নীরবে সহ্য করিত। এমনই করিয়া দিন কাটিতেছিল। মানুষের ইচ্ছা দিনগুলা চিরদাসখতে তাহাদের নিকটে নাম সই করিয়া দেয়,কিন্তু তাহা অপেক্ষা প্রবলতর একটা অদৃশ্য শক্তি এই সুখ-দুঃখের চাকাটাকে ঘুরাইয়া লইয়া বেড়ায়; সে কেবল তাহাদের এই আব্‌দার শুনিয়া মুখ মুচকিয়া হাসে এবং চাকাটা ক্রমাগত ঘুরাইতেই থাকে। জগন্নাথ তর্কচূড়ামণি পীড়িত হইয়া প্রায় মাসাবধি শয্যা আশ্রয় করিয়া

রহিলেন। তারপর একদিন ইহলোকের সহিত দেনা পাওনার হিসাব মিটাইয়া লোকান্তরের উদ্দেশে মহাযাত্রার পথে বাহির হইয়া পড়িলেন। এই দূরপথের উপযুক্ত পাথেয় তাঁহার ছিল কি না, তাহা তাঁহার বোচকা খুঁজিয়া দেখা হয় নাই; কিন্তু লোকে কএকদিন বলাবলি করিল যে, লোকটা স্বর্গে গিয়াছে, লোকটা খাঁটি মানুষ ছিল, পূজা পার্ব্বণে বা শ্রাদ্ধশান্তিতে এতটুকু চুব্বোরও খুঁৎ সইতে পারত না, আর তেমনই রাশভারি; লোকে তাহার কাছে ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে থাকত, কাছে ঘেঁসে কার সাধ্য!" অধ্যাপকের রোগবৃদ্ধি ও মৃত্যু পর্যন্ত তাঁহার ছাত্রগণ ও রাজনগরের অধিবাসী জনগণের ভিতরে একটা বিষম কৌতূহল ও উৎকণ্ঠার কাল গিয়াছে। তিনি কাহাকে তাঁহার স্থানে মন্দিরের পুরোহিত ও টোলের অধ্যাপক নিযুক্ত করিয়া যান, ইহা জানিবার জন্য সকলেই বিশেষ ব্যগ্র হইয়াছিল; সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন ছাত্র আশুনাথের নিয়োগ সম্বন্ধে সকলেই এক প্রকার স্থির করিয়া বসিয়াছিল। তবুও একটা ক্ষীণ আশা সকলকে উদ্বিগ্ন করিতে ছাড়ে নাই।

অধ্যাপকের মৃত্যুর একদিন পূর্ব্বে জমিদার-বাড়ীর ছুই-জন কর্ম্মচারীকে সঙ্গে লইয়া বর্ত্তমান জমিদার প্রায় আধঘণ্টা ধরিয়া তাঁহার সহিত কি কথাবার্ত্তা কহিলেন ও কয়েকটি কথা লিখিয়া তাহার নিম্নে তাঁহার নাম কোন মতে স্বাক্ষর করাইয়া লইয়া তাহাতে নিজ নাম সেইখানে বসিয়াই স্বাক্ষর করিলেন। সঙ্গী দুইজনের মধ্যে একজন পারি-বারিক উকিল ছিলেন; অপর জন তাঁহার মুহুরী। গৃহে তখন আর কেহ উপস্থিত ছিল না, কাহাকেও থাকিতে দেওয়া হয় নাই। জানালার বাহিরে দু-একটি ছেলে পা-টিপিয়া আড়ি পাতিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু রোগীর শয্যা জানালা হইতে দূরে থাকায় ভিতরের পরামর্শ কেহই কিছু জানিতে পারিল না। যথাকালে সংবাদ পাওয়া গেল মৃত পুরোহিত তাঁহার অল্পদিনের ছাত্র অম্বরনাথকে তাঁহার উত্তরাধিকার দিয়া গিয়াছেন, সেই এখন মন্দিরের পুরোহিত এবং ছাত্রদিগের অধ্যাপক। গভীর বিরক্তিতে একসঙ্গে সব কয়টি ললাট কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। যে এতদিন ভাত রাঁধিয়া খাওয়াইয়াছে, প্রয়োজন হইলে দুদশটা গালি দিয়া মনের ঝাল মিটাইয়া লইলেও যে কখনও 'টুঁ' শব্দটি করিতে সাহস পায় নাই, সেই অম্বরনাথই আজ হইতে তাহাদের অধ্যাপক হইল, গুরু হইল! এখন হইতে তাহারা সবাই তাহার হুকুম তামিল করিবে? তাহার পায়ে ফুল দিয়া পূজা করিবে? ছাত্রগণ জোট বাঁধিয়া জমিদারকে অনুযোগ করিল; বলিল, "ও দুদিনের ছেলে; তায় পড়াশুনা বেশি-দূর হয় নাই, এই ত ও দুই দিন মাত্র আসিল, উহার দ্বারা কি কাজ চলিতে পারে? আমাদের মধ্য হইতে অপর কোন যোগ্যতর ছাত্রকে মনোনীত করুন।"

জমিদারের এ প্রস্তাব অনুমোদন করিবার সাধ্য ছিল না; ইচ্ছাসত্ত্বেও তিনি সেই জন্য ছাত্রদিগের ইচ্ছা পূর্ণ করিতে সমর্থ হইলেন না। ক্রুদ্ধ, ক্ষুব্ধ ছাত্রের দল মনের মধ্যে গুমরাইতে গুমরাইতে নিজস্থানে ফিরিয়া গেল! গুরু কর্ত্তৃক অম্বরনাথের পদোন্নতিতে অপর সকলে যতটুকু বিরক্ত হইয়াছিল, সে নিজে এই ঘটনায় তাহা অপেক্ষা কিছুমাত্র অল্প ক্ষুব্ধ হয় নাই। সংবাদটা শুনিয়াই সে কিছু-ক্ষণ চুপ করিয়া চালের বাতা ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার-পর দড়ির আল্‌না হইতে ময়লা চাদরখানা টানিয়া কাঁধের উপরে ফেলিয়া লঘুপদক্ষেপে নদীতীরে গিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। নিজেকে বাড়াইবার ইচ্ছা ত তাহার মনে এক নিমেষের জন্যও স্থান পায় নাই, তবে কেন এমন হইল। যাহারা এতদিন মনে মনে কত আশা করিয়া বসিয়াছিল, সে ত তবে তাহাদের মহাশত্রু! সে দুষ্টগ্রহের মত কোথা হইতে সহসা তাহাদের জীবনের মাঝখানে আসিয়া পড়িয়া তাহাদের আশা আকাঙ্ক্ষা ব্যর্থ করিয়া দিল।

জমিদারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে তাহার কেমন সঙ্কোচ বোধ হইতে লাগিল। দুচারিদিন চেষ্টার পর শেষকালে একদিন সে পূজাশেষে দেবনির্ম্মাল্য লইয়া জমি-দার-দর্শনে গমন করিল। জমিদার তখন একাই ছিলেন। ভৃত্যকে আসন আনিবার আদেশ প্রদান করিয়া তিনি বিস্মিতনেত্রে নূতন পুরোহিতকে নিরীক্ষণ করিতে লাগি-লেন। গৌরবর্ণ নম্র সুন্দর মূর্ত্তিখানি ব্রাহ্মণোচিত প্রতি-ভায় মণ্ডিত। সে মূর্ত্তি দেখিলে মনে বেশ একটু শ্রদ্ধার ভাব উদিত হয়, কিন্তু অধ্যাপকপদে আসীন হইবার পক্ষে

বয়সটা নিতান্তই কম। বৃদ্ধ অধ্যাপক কেন যে এই নবীন যুবককে পুরোহিত পদে বৃত করিয়া গেলেন ইহার কারণ কিছুই বুঝিয়া উঠা গেল না। আসন গ্রহণ করিয়া অম্বর সসঙ্কোচে বলিল, "আমার দ্বারা এই সমস্ত কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া উঠে বলিয়া আমার ভরসা হয় না। আমায় না দিয়া এই কার্য্য ভার যোগ্য হস্তে দান করুন।"

জমিদার বলিলেন, "কিন্তু তোমার গুরু তোমাকেই সর্ব্বাপেক্ষা যোগ্য মনে করিয়া এই গুরুভার দিয়া গিয়াছেন। তিনি কি ভুল করিয়াছেন?"

অম্বর অনেকক্ষণ চুপ করিয়া কি ভাবিল। তাহার পর সে উত্তর করিল, "তাঁর ভুল হওয়া সম্ভব নয়; হয় ত আমি নিজের শক্তি বুঝি নাই। কিন্তু এ ভার লইতে আমি নিজেই ভয় পাইতেছি; আপনি ইহা আর কাহাকেও দিন।"

এই বলিয়া সে উঠিতে উদ্যত হইলে জমিদার মহাশয় বিস্মিত হইয়া তাহাকে বসিতে বলিয়া প্রকৃত ব্যাপার বুঝাইয়া দিলেন। পরিশেষে বলিলেন, "এখন তোমায় নিষ্কৃতি দেওয়ার ক্ষমতা আমার নাই। যদি সকলেই তোমাকে পৌরোহিত্য কার্য্যে অসমর্থ বলিয়া মত প্রকাশ করে, তবেই আমি তোমায় পদচ্যুত করিতে পারি, এ ভিন্ন নয়।" পরে ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন "যদি কাজ লইতে একান্ত অনিচ্ছুক থাক, তবে কাজে ত্রুটি দেখাও; তোমার দোষ ধরিবার লোকের অভাব হইবে না।"

অম্বরনাথ এই কথা শুনিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, প্রভুকে নমস্কার করিয়া বলিল, "মহাশয় স্বেচ্ছায় আমি কর্ত্তব্যকর্ম্মে ত্রুটি করিতে পারিব না। সে উপায়ে মুক্তি আমি চাহি না, গুরুর আদেশই তবে শিরোধার্য্য।"

"আমার দ্বারা এই সমস্ত কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া উঠে বলিয়া আমার ভরসা হয় না।"

পরদিন প্রভাতে সে নিজের সমুদয় কর্ত্তব্যভার নীরবে নিজের মস্তকে তুলিয়া লইল, কিন্তু তাহা তাহার মাথার উপরে ঠিক ভাবে বসিল না, ইহার কতক অংশ গড়াইয়া তাহারই চরণে পড়িল। ছাত্রেরা মুখ অন্ধকার করিয়া পুস্তক খুলিয়া বসিল বটে, কিন্তু তাহাদের কণ্ঠ, তালু, জিহ্বা যেন আড়ষ্ট হইয়া রহিল,—স্বর বাহির হইল না। আত্মনাথ পূর্ব্ব রাত্রেই টোল ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিল।

তাহাদের মনোভাব বুঝিতে অম্বরের বিলম্ব হইল না; সে নিজেই মনে মনে লজ্জাবোধ করিতেছিল। কিছু না বলিয়া সে পূর্ব্ববৎ ভাণ্ডারের দ্বার খুলিয়া কাঠায় করিয়া চা'ল মাপিতে লাগিল, তারপর রন্ধনগৃহে গিয়া নীরবে জ্বলন্ত চুলার উপরে দশসেরি ভাতের হাঁড়িটা চাপাইয়া দিল। অন্যান্য ছাত্র পরস্পর দৃষ্টি-বিনিময় করিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅনুরূপা দেবী।

কুলগাছ।

(গল্প)

(১)

হরমোহিনীর তিনকুলে বাতি দিবার কেহ ছিল না। গ্রামের মধ্যে তাঁহার মত প্রাচীনা দ্বিতীয় আর একটিও দেখিতে পাওয়া যাইত না। মৃত্যুদূত একে একে তাঁহার প্রিয়জনদিগকে হরণ করিয়াছে, শোকতাপে তাহার হৃদয় জর্জ্জরিত; কিন্তু তথাপি বিধবার দেহে কাহারও প্রভাব তেমন বিস্তৃত হয় নাই। কাল, সমৃদ্ধ দত্ত-পরিবারের সমস্তই হরণ করিয়াছিল; ধন-জন-মান-সম্ভ্রম কিছুই ছিল না; কিন্তু হরমোহিনীর আত্মসম্ভ্রম জ্ঞান, মর্য্যাদাবুদ্ধি বৃদ্ধ বয়সেও তাঁহাকে পরিত্যাগ করে নাই। বিরাশী বৎসর বয়সে নানারূপ অসুবিধা ভোগ করা সত্ত্বেও, পরের অনুগ্রহ-ভিখারিণী হইবার সঙ্কল্প মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার হৃদয়ে উদিত হয় নাই। বৃহৎ পুরীর অধিকাংশই কালের প্রভাবে মস্তক নত করিয়াছিল। শুধু একাংশে দুইটি মাত্র কক্ষ অতীত-গৌরবের সাক্ষিস্বরূপ তখনও মাথা খাড়া করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। হরমোহিনী একাকিনী সেই নির্জ্জন, নির্ব্বান্ধব পুরীতে বাস করিতেন। কোন রূপ বিভীষিকাই তাঁহাকে শ্বশুরের ভিটা পরিত্যাগ করাইতে পারে নাই।

খামার জমীতে যে ধান হইত, একটা বিধবার গ্রাসাচ্ছাদনের পক্ষে তাহাই যথেষ্ট। 'চাকরান্-ভোগী গদাধর কামার নির্দ্দিষ্ট সময়ে ধান কাটিয়া আনিয়া দিত। হাট-বাজারের কাজ কখনও তাহার পুত্র, কখনও বা স্বয়ং গদাধর করিত। গৃহপ্রাঙ্গণে বৃদ্ধা স্বহস্তে লাউ, কুমড়া প্রভৃতি শাক শবজীর চারা রোপণ করিতেন; সুতরাং পূর্ব্বের তুলনায় অবস্থা অত্যন্ত হীন হইলেও একটা বিধবার স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইত।

শোক-তাপ এবং অবস্থা-বিপর্য্যয়ে হরমোহিনীর রুক্ষ প্রকৃতি আরও উগ্র হইয়া উঠিয়াছিল। পল্লী-রমণীরা তাঁহার মেজাজ এবং রসনাকে অত্যন্ত ভয় করিত। বনেদী দত্তবংশের গৃহিণী বলিয়া সকলে বাহিরে তাঁহাকে সম্ভ্রম করিত বটে; কিন্তু অনেকেই অন্তরে তাঁহাকে যে শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি দান করিতেন, এ কথা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে না। মধ্যাহ্নের পল্লী-মজ্‌লিসে মাঝে মাঝে হরমোহিনী অনাহূত অতিথির ন্যায় অবির্ভূতা হইতেন, তখন অসংকোচ তর্কের স্রোত অথবা অবাধ-মন্তব্যের প্রবাহ মন্দীভূত হইয়া আসিত; বৃদ্ধার সম্মুখে কেহই মন খুলিয়া কোন বিচারের আলোচনা করিতে সাহসী হইত না।

হরমোহিনীর বাড়ীর উঠানে একটি কুলগাছ ছিল। সেই গাছটির উপর বৃদ্ধার পুত্রাধিক স্নেহ ও যত্ন প্রকাশ পাইত। তেমন সুমিষ্ট,রসাল বড় বড় কুল সে অঞ্চলের আর কাহারও গাছে ফলিত না। হরমোহিনীর সঞ্চিত পুত্রস্নেহ যেন প্রাচীরের মত কুলগাছের চারিপার্শ্বে ঘিরিয়া থাকিত। তাহার একটি পাতা অথবা ফলে কেহ হাত দিলে তিনি কোনক্রমেই তাহাকে মার্জ্জনা করিতে পারিতেন না। লোকে দেখিত, সর্ব্বদাই বৃদ্ধা কুলতলায় ঘুরিতেছেন; কখনও শুষ্কপত্র অথবা পল্লব দূরে ফেলিয়া দিতেছেন; কখনও তলদেশ সম্মার্জ্জনীর দ্বারা পরিষ্কার করিতেছেন; কখনও বা গাছের ছায়ায় চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। গাছে যখন ফল ধরিত, তখন হইতে হরমোহিনীর আর অবসর থাকিত না। বিধবা যষ্টিহস্তে অনুক্ষণ গাছের চারিপার্শ্বে ঘুরিয়া বেড়াইতেন; নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইলে, ঘরের রোয়াকের উপর বসিতেন।

নিষিদ্ধ পদার্থেই লোকের লোভ অধিক। কুল পাকিতে আরম্ভ করিলেই পল্লীর বালকগণের চিত্ত হরমোহিনীর কুল-গাছের পানে সর্ব্বাপেক্ষা আকৃষ্ট হইত। সুবিধা ও সুযোগ পাইলেই তাহারা গাছের কুল পাড়িয়া খাইত। বৃদ্ধা কোন কার্য্যোপলক্ষে গৃহান্তরে অথবা এদিক ওদিক গেলেই দুর্দ্দান্ত, অশিষ্ট বালকের দল গাছের উপর যেন দস্যুর ন্যায় ঝাঁপাইয়া পড়িত। দেখিতে দেখিতে অসংখ্য লোষ্ট্র গাছের উপর নিক্ষিপ্ত হইত। বৃদ্ধা অমনই লাঠি লইয়া তাড়া করিতেন। পল্লীর বালখিল্ল-সম্প্রদায় লুণ্ঠিত দ্রব্যের কতক লইয়া, কিছু বা ফেলিয়া পলায়ন করিত। তাঁহার লাঠির বহরের পরিচয় গ্রহণ করিবার প্রবৃত্তি কাহারও ছিল না। এই অত্যাচারী বালকদিগের পিতৃপুরুষের উদ্দেশে বৃদ্ধা যে সকল বাক্যপ্রয়োগ করিতেন তাহা ঠিক আশীর্ব্বাদের মত শুনাইত না বটে; কিন্তু তাহারা এইরূপ সাদর সম্ভাষণে বিশেষ অভ্যস্ত ছিল

...বং হরমোহিনীকে উত্যক্ত করিতে পারিলেই তাহারা বিশেষ প্রীতি লাভ করিত। শীতের অধিকাংশ ভাগই দত্ত ...হে এইরূপ অব্যবস্থিত যুদ্ধের অভিনয় চলিত; কিন্তু বৃদ্ধার সতর্ক পাহারায় বালকদিগের লোভ এবং কৌতুক প্রবৃত্তি চরিতার্থ হইবার অবকাশ অতি অল্পই ঘটিত।

পল্লীর বালকদিগের উপর হরমোহিনী হাড়ে চটা ...লেন; তিনি দুই চক্ষে কাহাকেও দেখিতে পারিতেন না। ...ধু বসুদের বাড়ীর বিনয় বৃদ্ধার স্নেহ-দৃষ্টি লাভ করিয়াছিল। ...লকটির বয়স দশবৎসর। সে যেমন বিনয়ী, ধীরপ্রকৃতি, তেমনই প্রিয়দর্শন। তাহাকে দেখিলেই হরমোহিনীর শোকসন্তপ্ত, জীর্ণপ্রাণে যেন স্নেহের ফল্গুধারা প্রবাহিত হইত। জীবনের শেষ অবলম্বন, স্বর্গগত স্নেহাধার পৌত্রটির মুখের সহিত বিনয়ের মুখের অনেকটা সাদৃশ্য ছিল। তাহার প্রতি চাহিলেই বৃদ্ধার স্মৃতিপথে পৌত্রটির কথা জাগিয়া উঠিত। সেও যে প্রায় এত বড় হইয়া শেষে বিধবাকে ফাঁকি দিয়া পলাইয়াছে!

হরমোহিনীর ফলভারনত কুলগাছের প্রতি বিনয়ের ...নটা যে মাঝে মাঝে ছুটিয়া যাইত না, এ কথা হলপ্ করিয়া ...লিলেও কেহ বিশ্বাস করিবে না। কিন্তু এ কথা সত্য যে, ...স বৃদ্ধার অজ্ঞাতসারে কোন দিন গাছের একটি কুলও ...য় নাই। হরমোহিনী প্রায়ই বড় বড় পাকা কুল পাড়িয়া ...পে চুপে বিনয়কে ডাকিয়া খাওয়াইতেন, কোন দিন তাহাদের বাড়ী পাঠাইয়া দিতেন। বিনয়ের প্রতি এরূপ ...ন্যায় পক্ষপাতিতা অন্যান্য বালক আদৌ বরদাস্ত করিতে ...রিত না। কিন্তু কোন উপায় ত নাই! এজন্য বিনয়ের ...তি বালকদিগের বিলক্ষণ ঈর্ষা জন্মিয়াছিল; বৃদ্ধার প্রতিও ...ফল আক্রোশ এবং ক্রোধ দিন দিন তাহাদিগের হৃদয়ে ...ভীভূত হইয়া উঠিতেছিল।

[২]

রবিবারে মধ্যাহ্নের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া চৌধুরীদের প'ড়ো ...নের পুষ্করিণীর তীরে বসিয়া পল্লী-বালকেরা জটলা ...রিতেছিল। কেহ গাছে উঠিয়া পাখীর ছানার সন্ধানে ব্যস্ত, ...কেহ কচু অথবা কদলীদণ্ড মৃত্তিকাস্তূপের উপর রাখিয়া ...দানের অভিনয় করিতেছে। অপেক্ষাকৃত বয়োজ্যেষ্ঠগণ দামপূর্ণ পুষ্করিণীতে ছিপ ফেলিয়া মৎস্য ধরিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছে। বালকদিগের কলহাস্য এবং কোলাহলে নির্জ্জন বনভূমি মুখরিত হইয়া উঠিতেছিল।

গ্রামের পাঠশালা এবং বিদ্যালয় ইনস্পেক্টর বাবুর শুভাগমন বশতঃ সোমবার পর্য্যন্ত বন্ধ। দুইদিনের দীর্ঘ অবকাশের আনন্দে বালকেরা মা সরস্বতীর দৈনিক আরাধনা স্থগিত রাখিয়াছে। অভিভাবকগণের কেহ কেহ মধ্যাহ্ন-ভোজন শেষ করিয়া গভীর নিদ্রাসুখ অনুভব করিতে-ছিলেন, কেহ বা সম্পন্ন প্রতিবেশীর বৈঠকখানা-ঘরে অথবা আটচালায় বসিয়া তাস, দাবা, পাশা ক্রীড়ায় রত, কিংবা পরের খরচে তাম্রকূট ধূমপানের আনন্দ উপভোগ করিতে-ছিলেন। পল্লী-রমণীরাও পাড়ায় পাড়ায় গল্প করিতে বাহির হইয়াছেন, সুতরাং বালকদিগের চারিদিক বাধাশূন্য; তাহারা নিরুদ্বেগে ছুটির মধ্যাহ্নে গ্রাম মাতাইয়া ফিরিতেছিল।

যখন নকল বলিদান আর ভাল লাগিল না, মাছ ধরিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া উৎসাহ এবং কৌতূহল চরিতার্থ হইয়া গেল, তখন বালকগণ নূতন খেলা, নূতন আনন্দলাভের আশায় চৌধুরীদের বাগান ত্যাগ করিল। ঘোষেদের খিড়কীর পুকুরধার দিয়া, সরকারদের আম্রকানন পেছনে ফেলিয়া এবং মিত্রদিগের পূজার দালানে পায়রার সন্ধান না পাইয়া বালকবাহিনী অবশেষে দত্তদিগের বাড়ীর কাছে পঁহুছিল।

তাহারা বেড়ার ফাঁক দিয়া দেখিল ফলভারনত কুল গাছের তলদেশে বৃদ্ধা হরমোহিনী বসিয়া আছেন। বুড়ীর কি একটুও ক্লান্তিবোধ নাই? 'যক্ষী বুড়ী'ও বোধ হয় তাহার ধনভাণ্ডার এমন করিয়া পাহারা দেয় না!

পাকা ও রসেভরা বড় বড় কুলগুলি ডালে ডালে গুচ্ছে গুচ্ছে দুলিতেছিল, মৃদুবাতাসে তাহাদের অঙ্গে অঙ্গে কি লাবণ্যের ঢেউ খেলিতেছিল! একটু জোর নাড়া পাইলেই তলদেশ ফলে ফলে ছাইয়া যাইবে! বালকদিগের রসনায় জল ঝরিতে লাগিল। বুড়ী কি একবার ঘরের ভিতর অথবা অন্তরালে যাইবে না? বালকদিগের ধৈর্য্যের বন্ধন ক্রমশঃ শিথিল হইয়া আসিতে লাগিল। কিন্তু উপায় নাই। বৃদ্ধা যে অন্যত্র উঠিয়া যাইবেন, এমন কোন সম্ভাবনা দেখা গেল না। কি অন্যায়! এত কুল ডাইনি বুড়ী একা ভোগ করিবে? হ'লইবা তাহার নিজের গাছ? পল্লীর

সাফল্য-লাভের আনন্দ ও উৎসাহে তাহাদিগের হৃদয় নৃত্য করিয়া উঠিল!

(৩)

দুর্জ্জয় শীত পড়িয়াছে। এমন শীত বহুকাল কেহ অনুভব করে নাই। বৃক্ষপত্র হইতে হিমকণা ঝরিয়া পড়িতেছিল। চন্দ্রালোকদীপ্ত শ্বেতমেঘমালা সমুদ্র-তরঙ্গের ন্যায় নীলিমামণ্ডল ছাইয়া ফেলিয়াছিল। নিস্তব্ধ বনতল ঝিল্লিরাগ-মুখরিত। সন্ধ্যার পরই হরমোহিনী চারিদিকের জানালা দরজা বন্ধ করিয়া লেপের অন্তরালে আশ্রয় লইয়াছিলেন। বুড়া হাড়ে শীতের প্রকোপ অধিক। চারিদিক গাঢ় নীরবতায় আচ্ছন্ন। অতীত জীবনের নানা সুখ-দুঃখের কথা ভাবিতে ভাবিতে বৃদ্ধার তন্দ্রাকর্ষণ হইল।

সহসা ঠুন্ করিয়া একটা শব্দ হইল। হরমোহিনীর তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। "বোধ হয় ইঁদুর নড়িতেছে।" বৃদ্ধা পাশ ফিরিয়া শুইলেন। আবার শব্দ হইল ঠক ঠক! "জ্বালাতন করিল দেখিতেছি! আজ নিদ্রার

বেড়ার ফাঁক দিয়া তাহারা দেখিল ফলভারনত কুলগাছের তলদেশে বৃদ্ধা হরমোহিনী বসিয়া আছেন।

সকলকার গাছের ফলমূলেই ত তাহাদের কিছু না কিছু অধিকার আছেই। তাহাদিগকে বঞ্চিত করিয়া একা কেহ কোন গাছের ফল এ পর্য্যন্ত ভোগ করিতে পায় নাই। তবে দত্ত-বাড়ীর কুল তাহারা পাইবে না কেন? এমন অবিচার সহ্য করা যায় না। প্রতিবিধান চাই।

তখন ভুতো, কেলো, নন্দ, ভুলু ও গোপাল প্রভৃতি বয়োজ্যেষ্ঠ বালক অদূরবর্ত্তী আমগাছের ছায়ায় বসিয়া পরামর্শ করিতে লাগিল। বুড়ীকে জব্দ করিতেই হইবে। সে যে এতগুলি প্রাণীকে ফাঁকি দিয়া একা এমন চমৎকার ফলগুলি ভোগ করিবে, অথবা শুধু বিনয়কে দিবে ইহা অসহ্য। নানারূপ যুক্তি ও তর্কের পর শেষে স্থির হইল আজ রাত্রিতেই এই অবিচারের প্রতিশোধ লইতে হইবে। বিনয়কেও সঙ্গে রাখা প্রয়োজন। সে যে সাধু সাজিয়া থাকিবে তাহা হইতেই পারে না। পারামর্শ শেষ হইলে বালকেরা সভাভঙ্গ করিল। ভাবী অভিযানের

এত ব্যাঘাত হইতেছে কেন?" হরমোহিনী ভাল করিয়া লেপ মুড়ি দিলেন। কি শীতই পড়িয়াছে!

একটু পরে তাঁহার মনে হইল বাহিরে যেন ঝুপ্ ঝাপ্ শব্দ হইতেছে। বৃদ্ধা উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিলেন। শব্দ প্রথমে মৃদু, অস্পষ্ট, ক্রমশঃ যেন উহার বেগ বাড়িতে লাগিল! হরমোহিনী শব্দের কোন কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারিলেন না! "ঝড় হইতেছে না ত? কই তাহা হইলে জানালা ও দরজায় কি বাতাসের বেগ অনুভূত হইত না? না—বাতাসের শব্দ কখনই নয়।" শব্দ ক্রমশই বাড়িতে লাগিল। বৃদ্ধা শয্যার উপর উঠিয়া বসিলেন, কোন্ দিক হইতে শব্দ আসিতেছে মনোযোগ পূর্ব্বক তাহা শ্রবণ করিলেন। প্রাঙ্গণ হইতে যেন শব্দটা উত্থিত হইতেছে। কেহ তাঁহার গাছ হইতে কুল পাড়িতেছে না ত?"

কথাটা মনে হইবামাত্র বৃদ্ধা শশব্যস্তে শয্যা হইতে উঠিলেন। অন্ধকারে হাতড়াইয়া তিনি দরজার কাছে

উপস্থিত হইলেন। অর্গল মুক্ত করিয়া তীব্রবেগে তিনি দরজার কপাট ধরিয়া টানিলেন। দ্বার মুক্ত হইল না। প্রাণপণ শক্তিতে বৃদ্ধা পুনঃ পুনঃ কপাট ধরিয়া টানিতে লাগিলেন; দরজা কোন মতেই খুলিল না! নিশ্চয়ই কেহ যেন বাহির হইতে শিকল টানিয়া দিয়াছে।

ঝুপ্ ঝাপ্ শব্দ ক্রমেই প্রবলতর হইতে লাগিল। হায় হায়! এতক্ষণে সর্ব্বনাশ হইয়া গেল! দস্যুতস্করে তাহার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিতেছে, তিনি স্থির থাকিবেন কিরূপে? বৃদ্ধার সর্ব্বশরীরে কে যেন জলন্ত শলাকা বিদ্ধ করিতে লাগিল। হরমোহিনী যথাসম্ভব বেগে আর একটি দরজার কাছে ছুটিয়া গেলেন। কিন্তু বাহির হইতে সে দ্বারও শৃঙ্খলিত। তখন লুণ্ঠনরত বালকবাহিনীর উল্লাসধ্বনি স্পষ্টতর হইয়া উঠিল। ক্রোধে, ক্ষোভে, যন্ত্রণায় বৃদ্ধার নিঃশ্বাস যেন রুদ্ধ হইয়া আসিল। দুর্দ্দান্ত সর্ব্বনেশে বালকদিকের অক্রমণে আজ আর গাছে একটিও ফল থাকিবে না। বিধ্বস্ত, পত্রপল্লবহীন, ফলশূন্য বৃক্ষটিও বোধ হয় আর বাঁচিবে না! হরমোহিনীর মাথায় আগুন জ্বলিয়া উঠিল। দরজা রুদ্ধ দেখিয়া তিনি একটা জানালা খুলিয়া ফেলিলেন। মৃদু, ম্লান জ্যোৎস্নালোকে আততায়ী বালকদিগের ছায়ামূর্ত্তি দেখা যাইতেছিল। দ্বিগুণ উৎসাহে তাহারা বৃক্ষটিকে নির্ম্মমভাবে আক্রমণ করিল। প্রতি মুহূর্ত্তে গাছের উপর অসংখ্য লোষ্ট্র নিক্ষিপ্ত হইতেছিল। পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় বৃদ্ধা জানালা হইতে দরজা এবং দ্বার হইতে বাতায়নের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া প্রাণপণ শক্তিতে কবাট উন্মুক্ত করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতে লাগিল, এবং তাঁহার নিষ্ফল চেষ্টা দর্শনে বালকেরা অধিকতর উৎসাহ সহকারে কুল পাড়িতে লাগিল।

শুভ্র মেঘাবৃত চন্দ্রের ম্লান আলোকে বালকেরা দেখিল বৃদ্ধা বাহিরে আসিয়াছেন।

টানাটানিতে সহসা জানালার একটা পুরাতন গরাদে স্থানচ্যুত হইল। বৃদ্ধা সেই মুক্তপথে বাহির হইয়া পড়িলেন; কিন্তু তাল সামলাইতে না পারিয়া সশব্দে নীচে পড়িয়া গেলেন। শরীরের স্থানে স্থানে আঘাত লাগিল বটে; কিন্তু তিনি তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। হাতে পায়ে ভর দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সম্মুখে একখণ্ড ইষ্টক পড়িয়াছিল, তিনি উহা তুলিয়া লইলেন।

শুভ্রমেঘাবৃত চন্দ্রের ম্লান আলোকে বালকেরা দেখিল বৃদ্ধা বাহিরে আসিয়াছেন। তখন আর অপেক্ষা করা যুক্তিসঙ্গত নহে ভাবিয়া তাহারা অবিলম্বে চাণক্য-নীতি অবলম্বন করিল। নিকটেই একটি বালক শুধু স্থাণুর ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। বৃদ্ধার পতন দর্শনে কি সে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া-

ছিল? সহসা বৃদ্ধার নিক্ষিপ্ত ইষ্টকখণ্ড প্রবলবেগে তাহার মস্তকে আঘাত করিল।

"বাবা গো!" বলিয়া একটা করুণ আর্ত্তনাদ নিশীথ রজনীর নীরবতা ভাঙ্গিয়া শূন্যে উত্থিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে আহত বালকের সংজ্ঞাশূন্য দেহ ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িল। সে আর্ত্ত চীৎকার শতবজ্রের ন্যায় যেন বৃদ্ধার অন্তরে আঘাত করিল; তাঁহার বুকের মধ্যে অকস্মাৎ বেদনা পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিল। কোন এক অদৃশ্য আকর্ষণে মুগ্ধ হইয়া তিনি ভূতলশায়ী বালকের কাছে ছুটিয়া গেলেন।

চন্দ্রমণ্ডলের উপর হইতে মেঘ-যবনিকা সরিয়া গেল। উজ্জ্বল জ্যোৎস্নালোকে পৃথিবী হাসিয়া উঠিল। বৃদ্ধা দেহ অবনত করিয়া আহত বালকের পানে চাহিলেন।

কি সর্ব্বনাশ! এ কে?—বিনয় নয়? ক্ষতস্থল হইতে প্রবলবেগে রক্তধারা ছুটিতেছিল। বালকের দেহ নিস্পন্দ-প্রায়।

শূন্য আলোড়িত করিয়া আর একটা তীব্র আর্ত্তনাদ শোনা গেল। বৃদ্ধার সংজ্ঞাশূন্য দেহ বিনয়ের পার্শ্বে ঢলিয়া পড়িল।

(৪)

বসুজ মহাশয় বলিলেন, "ভাল ক'রে দেখুন,ডাক্তারবাবু! যেমন ক'রেই হোক বুড়ীকে আরাম করা চাই। টাকার জন্য কোন চিন্তা নাই, যত লাগে আমি দিব।"

ডাক্তার নাড়ী টিপিয়া, হৃদ্‌যন্ত্র পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "অবস্থা বড় ভাল নয়। পীড়া কঠিন। হৃদ্‌যন্ত্রের দুর্ব্বলতা অত্যন্ত অধিক। তবে বুড়া হাড়, এই যা ভরসা।"

বিনয়ের পিতা বলিলেন, "বুড়ী না বাঁচিলে তাঁহার মৃত্যুর পাপ প্রকারান্তরে আমাকেই স্পর্শ করিবে। আমার ছেলে যদি দলবল সহ সে রাত্রিতে উঁহার বাড়ীতে উৎপাত না করিত তাহা হইলে এ দুর্ঘটনা ঘটিত না। আমার ছেলেও এখন শয্যাশায়ী, নহিলে—"

রোগশয্যা হইতে হরমোহিনী প্রলাপঘোরে বলিয়া উঠিলেন, "সর্ব্বনাশ হয়ে গেল! ও গো তোমরা দেখ, দেখ, আমার সব গেল! বাঁচাও, বাঁচাও!"

আজ দত্তগৃহে বৃদ্ধার পরিচর্য্যার লোকের অভাব ছিল না। বসু মহাশয় হরমোহিনীকে বাঁচাইবার জন্য যথা-সাধ্য চেষ্টা করিতেছিলেন। তাঁহার যথেষ্ট পরিশ্রম এবং অর্থব্যয় হইতেছিল। পুত্রের ব্যবহারে তিনি আন্তরিক দুঃখিত হইয়াছিলেন। মস্তকের গভীর ক্ষত বশতঃ সে শয্যাশায়ী না থাকিলে তিনি তাহাকে রীতিমত শাস্তি দিতেন।

আসল ঘটনা পল্লীবালকেরা ব্যতীত অন্যে কিছুই জানিত না। তাহারাও তিরস্কার এবং প্রহারের আশঙ্কায় কথা প্রকাশ করে নাই। হরমোহিনীর চীৎকার শুনিয়া পল্লীর ইতর ভদ্র অনেকেই ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। কেহই প্রকৃত ব্যাপার জানিতেন না। বিপর্য্যস্ত কুলগাছের সম্মুখে শুধু হতচৈতন্য, আহত বিনয় এবং মূর্চ্ছিতা হরমোহিনীকে দেখিয়া সকলেই ব্যাপারটা খানিক অনুমান করিয়া লইলেন। বৃদ্ধার চীৎকারে ভয় পাইয়া পলাইবার সময় বিনয় পড়িয়া গিয়া আহত হইয়াছে; তাহার সঙ্গীরা তাহাকে সেই অবস্থায় ফেলিয়া পলাইয়াছে। কুলগাছটি হরমোহিনীর প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয় ছিল, তাহার দুর্দ্দশা দেখিয়া শোকে ও দুঃখে বৃদ্ধা মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়াছেন। সকলেই এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া লইলেন। অনুসন্ধানের ফলে এবং পীড়াপীড়ি করায় দুষ্কৃতকারী বালকদিগের মধ্যে কেহ কেহ সত্য কথা বলিয়া ফেলিল; কিন্তু বিনয় কিরূপে আহত হইয়াছিল, পলায়নকালে কোন বালকই তাহা লক্ষ্য করে নাই।

চিকিৎসা ও শুশ্রূষার কোন ত্রুটী ছিল না, কিন্তু বৃদ্ধার পীড়ার কোন উপশম হইল না। ডাক্তার বলিয়াছিলেন, গুরুতর মানসিক আঘাতবশতঃ স্নায়বিক বিকার হইয়াছে; এ বয়সে এরূপ অবস্থায় খুব কম রোগীই রক্ষা পায়।

বসুজ মহাশয় তাই দিবারাত্রি ভগবানের কাছে বৃদ্ধার আরোগ্য প্রার্থনা করিতেছিলেন। বুড়ীকে না বাঁচাইতে পারিলে চিরকালের জন্য বংশে একটা কলঙ্কের ছাপ লাগিয়া থাকিবে। বিনয়ের পিতা কিছু 'সেন্টিমেণ্টাল'!

হরমোহিনীর প্রলাপ দিন দিন বাড়িতে লাগিল। শুশ্রূষা-কারীরা সর্ব্বদাই শুনিত বৃদ্ধা প্রলাপঘোরে বলিতেছেন, "গেল, গেল, সব গেল! আমার সর্ব্বনাশ হ'ল!" আবার কখনও বলিয়া উঠিতেছেন, "দাদা আমার এসেছিস্? আহা! সোণামুখ কালি হ'য়ে গেছে! কে রে?—উঃ রক্ত!

রক্ত!—সর্ব্বনাশ করেছি সবাই ছুটে আয় রে!—দেখ্ দেখ্ সব গেল!"

সকলেই ভাবিল, এবার কুলগাছের শোকে বৃদ্ধার রক্ষা পাওয়া ভার।

*　　*　　*　　*

মৃত্যুদূত বহুবার গৃহদ্বারে উঁকি মারিয়া গেল। দুই একবার তাহার করাল-বাহু শিকারের অভিমুখে উদ্যত হইল বটে; কিন্তু অবশেষে এ যাত্রার মত তাহাকে ফিরিতে হইল। মানুষের কর্ম্মফল দেবতার আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া মৃত্যুদূতকে বিমুখ করিয়া দিল।

একুশ দিন উত্তীর্ণ হইলে, ডাক্তার বলিলেন যে, আর জীবনের কোন আশঙ্কা নাই। তবে বৃদ্ধার পূর্ব্বের ন্যায় সবল অবস্থা আর যে হইবে সে সম্ভাবনা অল্প।

তখন প্রভাত-রৌদ্র গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া যেন আশার সংবাদ দিতেছিল। বাহিরে—পত্র-পুষ্পে, লতাবিতানে নব বসন্তের বর্ণরাগ ফুটিয়া উঠিয়াছিল। বৃদ্ধা নয়ন উন্মীলিত করিলেন। তাঁহার ঘরে এত লোক কেন? বসু মহাশয় স্বয়ং তাঁহার শয্যাপ্রান্তে দণ্ডায়মান! এমন দৃশ্য বহু দিন বৃদ্ধা দেখেন নাই। সে ত অতীত যুগের কাহিনী! তখন বৃদ্ধা নয়ন নিমীলিত করিলেন; পীড়াকাতর দুর্ব্বল মস্তিষ্ক আর কিছুই ধারণা করিতে পারিল না।

কিয়ৎকাল পরে তিনি আবার চাহিয়া দেখিলেন। কি যেন একবার ভাবিয়া লইলেন। বোধ হয় তখন সব কথা স্মৃতিপথে উদিত হইল। বৃদ্ধা সহসা ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন; যেন কোন প্রিয়জনের শোক তাঁহাকে অধীর করিয়া তুলিয়াছে। সকলে তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। বুঝি কুলগাছের শোক আবার তাঁহার হৃদয়ে জাগিয়া উঠিয়াছে! পল্লীর জনৈক বৃদ্ধ আশ্বাস দিবার জন্য বলিলেন, "দত্তগিন্নি, তুমি কিছু ভেব না, সব বজায় আছে; কিছুই নষ্ট হয় নাই!"

সে আশ্বাসবাণী বৃদ্ধার কর্ণে যেন অমৃতধারা বর্ষণ করিল। ক্ষীণকণ্ঠে সাগ্রহে তিনি বলিয়া উঠিলেন, "আছে? বেঁচে আছে সে? কই, কই, দেখাও।"

এ অবস্থায় উত্তেজনা আদৌ বাঞ্ছনীয় নয়। বসু মহাশয় বলিলেন, "আপনি স্থির হ'ন্। এখন বেশী কথা বলিবেন না।"

"আয়, আয়, আমার সোনার দাদা বুকে আয়।"

কিন্তু বৃদ্ধা কোন কথা কাণে তুলিলেন না। অধীর আগ্রহে পুনঃ পুনঃ বলিলেন, "কই, আমায় দেখাও!"

বুড়ী এ যাত্রা রক্ষা পাইয়াছেন শুনিয়া পল্লীর কয়েকটি বালক দৌড়িয়া দত্তগৃহে আসিল। দ্বার-প্রান্ত হইতে তাহারা উঁকি মারিতেছিল। বিনয়ও ধীরে ধীরে ঘরে প্রবেশ করিয়া এক পার্শ্বে দাঁড়াইল। আজ কয় দিন সে রোগশয্যা হইতে উঠিয়াছে। এখনও পাণ্ডুর-ছায়া তাহার রোগশীর্ণ

মুখমণ্ডল হইতে সম্পূর্ণ তিরোহিত হয় নাই। মস্তকের ক্ষতস্থলে একটা শ্বেত রেখা পড়িয়াছিল, তখনও তথায় কেশোদ্গম হয় নাই।

শ্রান্ত বৃদ্ধা পুনরায় চক্ষু চাহিলেন। চারিদিকে যেন কাহাকে খুঁজিতে লাগিলেন। সহসা তাঁহার দৃষ্টি বিনয়ের উপর পড়িল। বৃদ্ধা অতি কষ্টে শয্যার উপর উঠিয়া বসিলেন, রোগশীর্ণ দুই বাহু বাড়াইয়া দিয়া আবেগভরে বিনয়কে নিকটে ডাকিলেন। বিনয় তাঁহার নিকট আসিলে তিনি তাহাকে কোলের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিলেন, "দাদা আমার! সত্যি তুই বেঁচে আছিস্? রাক্ষসী তোকে মেরে ফেলতে পারে নাই! আয়, আমার সোনার দাদা, বুকে আয়।"

অপরাধীর ন্যায় মৃদুচরণে বিনয় হরমোহিনীর কাছে সরিয়া গেল। বৃদ্ধা শীর্ণ-হস্তে বিনয়কে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। তাঁহার ঘন ঘন শ্বাস পড়িতে লাগিল। তারপর বৃদ্ধা সহসা বিনয়ের পিতার দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন, "যদি আমায় বাঁচাতে চাও, এখনই কুল-গাছটাকে কেটে ফেল। যাও শীঘ্র যাও। ওর জন্যই ত আমার স্নেহের নিধিকে নিজের হাতে মেরে ফেলতে গিয়েছিলাম। দাদা, তুই আমায় আর ছেড়ে যাস্‌নি!"

বৃদ্ধার নয়নাসারে মাথার বালিস সিক্ত হইল। বিনয় ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতেছিল। তাহার চোখের জলে হরমোহিনীর বক্ষস্থল ভাসিয়া গেল।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ

কৌতূহল।

কৌতূহলের সীমা নাই। মানবের মস্তিষ্ক এই কৌতূহলের এক বিশ্রামহীন কারখানা। সমস্ত বিশ্ব হইতে ছুটি লইয়া যখন কুটীরছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করি, নিদ্রার মৃদুস্পর্শে যখন অলস চক্ষু নিমীলিত হইয়া আসে, তখনও আমার অতৃপ্তি-সার সর্ব্বস্ব কৌতূহল, হয় একটি টিকটিকির পশ্চাতে, না হয় কোনও দূরাগত শব্দের অনুসরণে ছুটিয়া যাইতে চাহে। টিক্‌টিকিটি কেমন করিয়া মাধ্যাকর্ষণের সর্ব্বজড়জগজ্জয়ী নিয়মকে হেলায় উল্লঙ্ঘন করিয়া প্রাচীরে ও কড়িকাঠ বহিয়া ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায়? ঐ শব্দটি কোথা হইতে হঠাৎ ভাসিয়া আসিতেছে? বায়ুর তরঙ্গ কর্ণপটহে আঘাত করিলে তবে ত আমরা শব্দ পাই; কিন্তু জলের একটি তরঙ্গ যেমন অপর তরঙ্গের সঙ্গে মিশিয়া যায়, সেটি আবার অন্যটির সঙ্গে, এইরূপে তরঙ্গে তরঙ্গে মেশামিশি হইয়া জলাশয়ের বক্ষ কম্পিত, তরঙ্গিত, উদ্বেলিত হইয়া উঠে; মূল তরঙ্গ বা কোন তরঙ্গ-বিশেষের পৃথক সত্ত্বা তখন আর বুঝা যায় না। বায়ুর তরঙ্গে কি তেমন হয় না? যদি তাহাই হয়, তবে আমরা কেমন করিয়া শব্দ শুনি? কাণের ভিতর তরঙ্গ-বিশ্লেষণকারী স্নায়ু আছে? কিন্তু সে স্নায়ু ত সুরকে পৃথক করিয়া দেয়, শব্দকেও কি পৃথক্ করে? দূরে চক্রবালের নিম্ন হইতে মেঘের গুরুগুরু গর্জ্জন আসিতেছে, অদূরে ঝোপের ভিতর ঝিঁঝিঁর মহোৎসব পড়িয়া গিয়াছে, পথের শেষ সীমায় কুকুর থাকিয়া থাকিয়া ডাকিতেছে, নদীবক্ষে সুপ্ত আরোহী লইয়া যে নৌকাখানি স্রোতের সঙ্গে ভাসিয়া চলিয়াছে, তাহার মাঝি গলা কাঁপাইয়া ক্ষেপণীর তালে তালে গান ধরিয়াছে—সবই ত আমার কাণে সুস্পষ্ট ভাবে আসিতেছে। প্রত্যেক শব্দটি যে বায়ুতরঙ্গ-পরম্পরা সৃষ্টি করিতেছে, তাহা কি অপরটির সহিত মিশে না? যদি মিশে, তবে কর্ণ তাহাকে কি করিয়া পৃথগ্‌ভাবে প্রাপ্ত হয়? এমনই আরও কত সঙ্গত অসঙ্গত প্রশ্ন মস্তিষ্ক আলোড়িত করিয়া নিশীথের বিশ্রামচেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দেয়।

কৌতূহল দুরপনেয়। শিশু তাহার প্রথম বাকাস্ফূর্ত্তির সঙ্গেই এই কৌতূহলের পরিচয় দিয়া থাকে। যে শিশু যত চতুর বা বুদ্ধিমান, সে তত জিনিষের "কেন" জানিতে চাহিয়া তাহার বয়োজ্যেষ্ঠকে বিপন্ন করিয়া তুলে। সাপ জঙ্গলে থাকে কেন? জল ঠাণ্ডা কেন? দীপ জ্বালিলে ঘর আলো হয় কেন? নদীর জল কখনও এক দিকে, কখনও আর এক দিকে বহিয়া যায় কেন? খুকী কাঁদিলে তাহার চোখে জল আসে কেন? এইরূপ শত প্রশ্নে সে তাহার প্রস্ফুরিত জ্ঞানাঙ্কুরের পরিচয় দিয়া থাকে। তাহার পিতা বা শিক্ষক এই সকল "কেন"র উত্তর দিয়া উঠিতে পারেন না। কারণ তাঁহারা নিজেই এমন অনেক "কেন"র মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। তাঁহাদেরও কৌতূহল আছে, প্রশ্ন আছে, "কেন" আছে, কিন্তু সে কৌতূহল এমন সর্ব্বগ্রাসী নহে। সে কৌতূহল কালাকাল, পাত্রাপাত্র বিবেচনা করিয়া থাকে। শিশুর কৌতূহল কালাকাল পাত্রাপাত্র বিবেচনা করে না; তাহার পক্ষে কোন্ কথা জিজ্ঞাসা করিতে নাই, কোন্ কথা জিজ্ঞাসা করিতে আছে, সে তাহার বড় খোঁজ রাখে না। কোন্ প্রশ্নের উত্তর নাই, কোন্ প্রশ্নেরই বা আছে, সে বিষয়ে সে সম্পূর্ণ উদাসীন। কোন্ বিষয় তাহার পক্ষে সুগম, কোন বিষয় দুর্গম বা একেবারেই অগম্য, তাহা সে জানে না। সে জানে তাহার আপনার অতি ক্ষুদ্র জগৎটিকে, আর আছে তাহার দুরন্ত কৌতূহল। সে যখন যাহাকে খুসী, যে কোনও প্রশ্ন, যেমন ইচ্ছা, তেমনই ভাবে করিয়া ফেলে। এইখানেই তাহার কল্পনা ও কৌতূহলের মৌলিকতা, সরলতা ও পবিত্রতা। শিশু যখন বড় হয়, তখন তাহার সঙ্কীর্ণ জগৎ পরিসর প্রাপ্ত হইতে থাকে; ক্রমে সে বহির্জ্জগতের সঙ্গে আপনাকে মানাইয়া লইয়া চলিতে চেষ্টা করে। জগতের সহিত তাহার পরিচয় কর্ম্মে। বস্তুতঃ কর্ম্মই জগতের সহিত মানবের ঘনিষ্ঠতা স্থাপনের মুখ্য উপায়। একটি সুস্থ, সবল বালকের কার্য্যকলাপ দেখিলে বেশ স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়, সে কেমন করিয়া আপনার সহিত জগতের অসংখ্য বন্ধন বাঁধিয়া তুলিতেছে! শিশুর ক্রীড়া—কর্ম্মেরই অভিনয় মাত্র। শিশুরা যে পরিণতবয়স্ক মানবের অনেক কর্ম্মই তাহাদের খেলার ছাঁচে ঢালিয়া আনন্দের সামগ্রী করিয়া তুলে, তাহাই

নহে; তাহাদের খেলায় যে অঙ্গচালনার দরকার হয়, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে তাহাই কর্ম্মের উপাদানরূপে অভীষ্টফলের সাধক হয়! অঙ্গচালনার দ্বারা শিশু আপনার সুখ-দুঃখের মাত্রা বাড়াইয়া লয়। কাজেই কর্ম্ম হইতে নূতন নূতন অভীষ্ট ও নূতন নূতন সুখদুঃখের আস্বাদন পাইয়া শিশু জগতের প্রতি আকৃষ্ট হয়। পুতুল খেলা হইতে পাখীর ছানা আহরণ পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্যই বাহ্য-জগতের সহিত তাহার সখ্য স্থাপনে সহায়তা করিতেছে। তখন তাহার কৌতূহল অনেক পরিমাণে শান্ত হইয়াছে। কৌতূহলের নিবৃত্তি নাই, কিন্তু শান্তি আছে। কৌতূহলের নিবৃত্তি পরিতৃপ্তিতে। শান্তি কর্ম্মে, বিস্মৃতিতে। শিশুর জীবনে যখন কর্ম্মের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়, তখন তাহার সর্ব্বব্যাপী দুর্দ্দমনীয় কৌতূহল হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে। তখন আর তাহার 'কেন'র জন্য অপরের কাণ ঝালাপালা হয় না। তাহার কৌতূহল তখন প্রধানতঃ কর্ম্মকেই আশ্রয় করে। বালক তাহার পুতুলকে সজোরে আঘাত করিয়া শতখণ্ডে পরিণত করিল, আবার তাহাই সযত্নে আহরণ করিয়া ধীরভাবে জোড়া দিতে বসিল। তাহার কৌতূহল পুতুলের ভিতরটা দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিল, সে কৌতূহল চরিতার্থ হইল—ধ্বংসে। আবার পূর্ণাবয়ব পুতুলটিকে দেখিবার সাধ হইল। তাহার গঠনপ্রণালী জানিবার কৌতূহল হইল, সে কৌতূহল চরিতার্থ হইল—সৃষ্টির চেষ্টায়। কর্ম্মের এই দুই প্রধান শাখায়—সৃষ্টি ও ধ্বংসে, সংযোগ ও বিভাগে (বৈশেষিক দর্শন:—সংযোগবিভাগাশ্চ কর্ম্মণাম্), ঘাত ও প্রতিঘাতে কৌতূহলের নানা মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হয়। সেই জন্যই শিশুর কৌতূহল বয়োজ্যেষ্ঠের হৃদয়ে প্রতিবিম্বিত হয় না। বয়োজ্যেষ্ঠ কর্ম্মে অভ্যস্ত, শিশু কর্ম্মের ধার বড় ধারে না। শিশুর কৌতূহল পার্থিব বস্তুতে শক্তি এবং কার্য্য-পরম্পরার সঙ্গে বড় একটা সম্পর্ক রাখে না। বয়োজ্যেষ্ঠের কৌতূহল পারিপার্শ্বিক বস্তু এবং ঘটনার দ্বারা সংযত। সেই জন্যই শিশুর প্রশ্নে বয়স্কের মুখে অনেক সময়ে হাসির আবির্ভাব হয়। কর্ম্মই কৌতূহলের নিয়ামক। যতদিন শিশু কর্ম্মে আসক্ত না হয়, ততদিন তাহার অসংযত কল্পনা সর্ব্বত্র ঘুরিয়া বেড়ায়। যেমন সে কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করে, জগতের উপর আপনার শক্তি প্রয়োগ করে, এবং জগতের শক্তি নানা স্পর্শ সংঘর্ষ বেদনার সহিত অনুভব করে, অমনই তাহার কৌতূহল নিয়মিত, সংযত ও সঙ্কুচিত হয়। কর্ম্ম যেমন শিশুর কৌতূহলকে অন্য দিকে পরিচালিত করে, তেমনই আবার সঙ্কুচিতও করে। কৌতূহল জ্ঞানের জনক-স্বরূপ! জ্ঞান আর কৌতূহল এক বস্তু নহে। ঘড়িতে চাবি দিলে যেমন সমস্ত কলগুলি চলিতে থাকে, তেমনই কৌতূহল উন্মেষিত হইলেই জ্ঞানের অসংখ্য চক্র-বিশিষ্ট কল চলিতে আরম্ভ করে। কৌতূহল, মনোযোগকে উদ্বোধিত করে। মনোযোগ জ্ঞানের সাধন। সুতরাং কৌতূহল জ্ঞানের প্রয়োজক, প্রবর্ত্তক এবং উত্তেজক। জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে অনেক সময়ে কৌতূহলের হ্রাস দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ যে প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি প্রতিদিন সায়াহ্নে গোলদীঘির চতুর্দ্দিকে আবর্ত্তন করিয়া ক্ষুধার সঞ্চয় করিতে আসেন, এবং পরিশ্রান্ত হইলে কিছুকাল একখানি বেঞ্চের উপর বসিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, উঁহার কি কোনও কৌতূহল আছে বলিয়া বোধ হয়? উনি জীবনের অনেক দেখিয়াছেন, শুনিয়াছেন, অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন, উঁহার কৌতূহল আর আছে কি? ঐ যে সাধু গায়ে ভস্ম মাখিয়া মণিকর্ণিকার ঘাটে নিবাতদীপের ন্যায় বসিয়া আছেন, কোনও দিকেই ত উঁহার দৃষ্টি নাই; এত লোক আসিতেছে, যাইতেছে, কেহ বা সন্ন্যাসীর পদধূলি লইতেছে, কিন্তু সন্ন্যাসীর ত সে দিকে দৃষ্টি নাই, কোনও দিকেই ত দৃষ্টি নাই। তবে কি সন্ন্যাসীরও সমস্ত কৌতূহল চরিতার্থতা লাভ করিয়াছে? তাহা নহে। ইঁহাদেরও কৌতূহল আছে। তবে সে কৌতূহল ঐ ধাত্রী-ক্রোড়-বিলগ্ন শিশুর কৌতূহলের মত নহে। শিশু চতুর্দ্দিকে গ্রীবা সঞ্চালন করিয়া জল দেখিতেছে, আকাশের নীলিমা দেখিতেছে, পাখীর স্বর শুনিয়া পাখীকে দেখিবার জন্য অধীর হইতেছে, রাস্তার গাড়ী ঘোড়া দেখিতেছে, সকল লোকের মুখের দিকে বিস্মিতভাবে চাহিতেছে। সে সকলকে জানিতে চাহে, চিনিতে চাহে; আকাশ, জল, তরু, লতা সকলই তাহার নিকট নূতন। তাহার নবোন্মেষিত বুদ্ধি এ সকলগুলিকে একেবারে ধারণ করিতে অক্ষম; তাই সে চতুর্দ্দিকে মস্তক হেলাইয়া, চক্ষু ফিরাইয়া, ঘুরিয়া ফিরিয়া এক এক করিয়া সমস্ত জিনিষ দেখিয়া লইতে

চাহে, জানিয়া লইতে চাহে। প্রৌঢ়ের নিকট এ সকলের নূতনত্ব নাই, অভ্যাসের বলে তিনি এ সকলই একেবারে আয়ত্ত করিয়া লইতে পারেন, সুতরাং তাঁহার কৌতূহল আর বিক্ষিপ্ত নহে। তাঁহার কৌতূহল হয় ত সংসারযাত্রার সহজ উপায় নির্দ্ধারণের জন্য ব্যাপৃত, অথবা আগামীকল্য Share marketএর অবস্থা সম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনা করিতে ব্যস্ত। সন্ন্যাসী শান্ত, স্থির, নিস্পন্দ। জীবনের সমস্ত বৈচিত্র্য হয় ত তাঁহার অগোচর; কিন্তু তিনি বুঝিয়াছেন, সংসারে সুখ নাই, কর্ম্মে ফল নাই, বাসনার তৃপ্তি নাই; তিনি বুঝিয়াছেন পার্থিব বিষয়ের মূল্য নাই। পৃথিবী যে নিমেষে শত সুখদুঃখের বোঝা লইয়া আবর্ত্তিত হইতেছে, ইহাতে আর তাঁহার কৌতূহল নাই। এই তিনি ইন্দ্রিয়সকলকে বিষয় হইতে বিমুক্ত করিবার জন্য রীতিমত সাধনা করিয়াছেন। কিন্তু তাহা বলিয়া তাঁহার কৌতূহল ফুরাইয়াছে কি? তিনি হয় ত পরকালের রহস্য জানিবার জন্য কুতূহলী; সাধনার কঠোরতায় ভগবানের সান্নিধ্য কত নিকটবর্ত্তী হইতে পারে, তাহারই একটু পূর্ব্বাভাস পাইবার জন্য ব্যগ্র। সুতরাং জ্ঞানের সঙ্গে, সাধনার সঙ্গে, কর্ম্মের সঙ্গে অভ্যাসের সঙ্গে কৌতূহলের অতি নিকট সম্বন্ধ আছে। এগুলি যত বাড়িয়া যায়, তত কৌতূহল কমিয়া আসে বটে। কিন্তু অন্য দিকে কৌতূহল আবার নূতন পন্থা প্রস্তুত করিয়া লয়। সেই জন্য দেখিতে পাওয়া যায়, যে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কৌতূহল যেমন কমিয়া আসে, অপর দিকে তেমন নূতন নূতন ব্যাপারে কৌতূহল আবার নূতন আকারে দেখা দেয়। এই জন্যই বলিয়াছি যে কৌতূহল দুরপনেয়।

জ্ঞান ও কর্ম্মের সহিত কৌতূহলের যে সম্বন্ধের কথা বলিয়াছি, তাহা কেবল বয়োবৃদ্ধির সঙ্গেই লক্ষ্য করা যায়। বালকের অসংযত চাপল্য যতদিন কর্ম্মের বা কর্ম্মের পূর্ব্বাভাস-স্বরূপ ক্রীড়াবৈচিত্র্যে আত্ম-প্রকাশ না করে, ততদিন তাহার অবাধ কৌতূহল সকল দিকে, সকল বিষয়ে ক্রীড়া করিতে থাকে। শিশুর জীবনের এই যে সময়, ইহা তাহার জ্ঞানার্জ্জনের অতি প্রকৃষ্ট সময়। একজন ইংরেজ মনস্তত্ত্ববিদ্ বলিয়াছেন যে, শিশু তাহার জীবনের প্রথম তিন বৎসরে যতটা শিখে, কৈশোরে তিন বৎসর কালেজে পড়িয়া ততটা শিখিতে পারে না। প্রথম তিন বৎসরে শিশু যে সকল বিষয় অধিগত করিয়া ফেলে, তাহা ধীরভাবে পর্য্যালোচনা করিলে বাস্তবিকই বিস্মিত হইতে হয়। সে হাসিতে শিখে, বসিতে শিখে, দাঁড়াইতে শিখে, হাঁটিতে শিখে, দৌড়াইতেও শিখে; প্রয়োজনীয় প্রায় সকল রকম অঙ্গ-চালনাই সে এই অত্যল্প কালে শিখিয়া ফেলে। যাঁহারা বেহালা কিংবা হারমোনিয়ম শিখিবার স্বল্পায়াসে পরিশ্রান্ত হইয়া পড়েন এবং চক্ষু, অঙ্গুলি বাহু এবং মস্তকের পৃথক্ পৃথক্ সঞ্চালনগুলিকে একত্র, সমঞ্জসীভূত করিয়া একখানি গৎ অভ্যাস করিতে গিয়া "উঃ, কি ভয়ঙ্কর কঠিন" বলিয়া চক্ষু মুদ্রিত করেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন শৈশবে ইহা অপেক্ষা আরও কত "ভয়ঙ্কর কঠিন" অঙ্গভঙ্গী আয়ত্ত করিতে হইয়াছিল। এই ত গেল অঙ্গ সঞ্চালনের সম্বন্ধ। শিশু তাহার প্রথম জীবনে যেমন করিয়া একটি ভাষা শিক্ষা করে, অতি অল্প লোকের ভাগ্যেই পরজীবনে সেরূপ ভাবে একটি ভাষাকে আয়ত্ত করা সম্ভব হয়। তারপর বস্তু-জ্ঞান। সে সম্বন্ধেও শিশু সাধারণতঃ অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া থাকে। অনেক পিতামাতা ইহার উপর আবার বর্ণপরিচয়ের গুরুতর ভার তিন বর্ষ বয়স্ক শিশুর স্কন্ধে চাপাইতে ছাড়েন না। ইহা যে বড়ই গর্হিত, সে কথা বোধ হয় কাহাকেও বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। শিশু আপনি যাহা শিখে,—চলিতে বলিতে এমন কি অনুকরণ করিতে যে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেয়, তাহাই অদ্ভুত। এই অদ্ভুত ব্যাপারের মূলে অবশ্য শিশুর সহজাত সংস্কার বিদ্যমান আছে। সংস্কার পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত অথবা পিতৃপিতামহসঞ্চিত জ্ঞান। সংস্কারের প্রভাবে শিশুর ব্যক্তিগত চেষ্টা অনেক কমিয়া যায়; যাহা বস্তুতঃ কঠিন এবং বহু আয়াসসাধ্য, তাহা সহজ ও সংক্ষিপ্ত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কিন্তু শিশুর মৌলিক কৌতূহল বা জানিবার ইচ্ছা তাহার ব্যক্তিগত চেষ্টাকে উদ্বুদ্ধ না করিলে, তাহার অন্তর্নিহিত শক্তিকে জাগরিত না করিলে, সংস্কারও ক্রিয়া করিবার অবকাশ পায় না। সুতরাং আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, শিশুর কৌতূহল-বৃত্তি তাহার জ্ঞান ও কর্ম্মের উৎস-স্বরূপ।

গতিশীল। আমরা নড়িতে চড়িতে কর্ম্ম করিতেই জীবনের ধর্ম্ম জানিতে পাই। কল বা যন্ত্রও সময়ে সময়ে গতিশীল হয়, কিন্তু তাহাতে বৈচিত্র্যের অভাব। বৈচিত্র্যপূর্ণ গতিশীলতার নামই জীবন। জীবন কর্ম্মময়। কর্ম্মের পশ্চাতে চৈতন্য দেখা দিয়া মানবকে সমস্ত প্রাণিজগতের মধ্যে একটা বৈশিষ্ট্য প্রদান করিয়াছে। এই যে চৈতন্য, ইহা কর্ম্মের সঙ্গে মিশ্রিত, জড়িত, ওতপ্রোত। কর্ম্মকে ছাড়িয়া চৈতন্য, বা চৈতন্যকে ছাড়িয়া কর্ম্ম গ্রহণ করা সেই জন্যই অসম্ভব হইয়া পড়ে। আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি এই কর্ম্মের সেবায় নিযুক্ত। জ্ঞানযোগ কর্ম্মযোগের পথপ্রদর্শক মাত্র। প্রকৃতিদেবী আমাদিগকে যে শরীর দিয়াছেন, যে সকল ইন্দ্রিয়ের অধিকারী করিয়াছেন, সে সকল কর্ম্মের অনুবর্ত্তী মাত্র। কর্ম্মের জন্য যতটুকু দরকার, তাহাই আমরা পাইয়াছি। তদপেক্ষা বেশী কিছুই পাই নাই। এই জন্যই আমাদের ইন্দ্রিয় খুব বেশী তীক্ষ্ণ বা সূক্ষ্ম নহে। নানা কারণে আমাদের জ্ঞানে বাধা জন্মে।

অতি দূরাৎ সামীপ্যাৎ ইন্দ্রিয়ঘাতান্মনোঽনবস্থানাৎ
সৌক্ষ্ম্যাদ্‌ব্যবধানাদভিভবাৎ সমানাভিহারাচ্চ।

সাংখ্যকারিকা

এই সকল নানা কারণে আমাদের বস্তুর উপলব্ধি হয় না। কিন্তু তাহা হইলেও আমাদের কর্ম্মোপযোগী জ্ঞান আছে, শক্তি আছে, এবং ইন্দ্রিয়াদির সম্পূর্ণতা আছে। সুতরাং কৌতূহল যখন কর্ম্মকে লঙ্ঘন করিয়া অন্যক্ষেত্রে বিচরণ করিতে চাহে, তখন আমরা আশানুরূপ ফললাভ করিতে পারি না। এই স্থানে একটি গল্প বলিয়া উপসংহার করিব।

এক ব্যক্তির পিতা মৃত্যুকালে তাহাকে একটি প্রদীপ দিয়া গিয়াছিলেন। বংশপরম্পরানুক্রমে সে প্রদীপ তাহাদের গৃহে বিরাজ করিতেছিল। প্রদীপের এই আশ্চর্য্য গুণ ছিল যে, সে প্রদীপ জ্বালিলেই তাহাদের সমস্ত অভাব মোচন হইত। প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছুই সে প্রদীপের নিকট চাহিলে পাওয়া যাইত না। প্রদীপের বারটি ডাল ছিল, সে গুলি জ্বালিলে বার জন দরবেশ তাহার ভিতর হইতে বাহির হইয়া নানা প্রকার নৃত্য করিত। পরে অভাব মোচনোপযোগী সমস্ত দ্রব্য প্রদান করিয়া দরবেশগণ অন্তর্হিত হইত। কিছু দিন এইরূপ ভাবে অতিবাহিত হইলে, যুবকের মনে অসন্তোষ এবং কৌতূহলের আবির্ভাব হইল। সে ভাবিল, এই প্রদীপে যখন আশ্চর্য্য উপায়ে আমাদের দৈনন্দিন অভাব দূর হয়, তখন ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব অবগত হইতে পারিলে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইতে পারিব। এই ভাব কিছুকাল হৃদয়ে পোষণ করিয়া সে বড়ই অধীর হইয়া পড়িল, এবং এক জন বৃদ্ধ ফকীরের নিকট প্রদীপটি লইয়া পরামর্শ জানিতে গেল। ফকীর যাদুবিদ্যা জানিতেন; তিনি তাহাকে বলিলেন, "বৎস, যাহা পাইয়াছ, তাহাতেই সন্তুষ্ট হও, তাহার অধিক আকাঙ্ক্ষা করিও না। কিন্তু যুবক বুঝিল না, তখন তিনি তাহাকে প্রদীপের অলৌকিক শক্তি দেখাইয়া দিলেন। ফকীরের যাদুস্পর্শে বারটি দরবেশ প্রদীপের বারটি শাখা হইতে বাহির হইয়া আসিল, এবং অদ্ভুত নৃত্যাদির পরে অতুল ঐশ্বর্য্যের মণিরত্নাদি প্রদান করিয়া অদৃশ্য হইল। যুবক বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গেল, সে প্রদীপ গৃহে লইয়া গিয়া ঐশ্বর্য্যলাভের জন্য ব্যগ্র হইল। কিন্তু ফকীর যেমন বামহস্ত দ্বারা আঘাত করিয়াছিলেন, সে তাহা ভুলিয়া গিয়া দক্ষিণহস্ত দ্বারা দৈত্যগণকে আঘাত করিল। কাজেই ফল এক হইল না। ধনরত্নের পরিবর্ত্তে রাক্ষসগণ দেখা দিল এবং তাহাকে অশেষ রূপে নির্য্যাতন করিয়া অদৃশ্য হইল।*

এই প্রদীপেরই মত আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি। কর্ম্ম ও চিন্তার সামঞ্জস্যই আমাদের জীবন। কৌতূহল যখন এই সামঞ্জস্যের সমভূমি পরিত্যাগ করিয়া যায়, তখনই আমাদের চিন্তা ও সাধনা সুফলপ্রসূ হয় না।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

* ফেরিয়ারের গল্প হইতে গৃহীত।

ভারতবর্ষের অদ্বৈতবাদ।

[১]

শ্রীমৎ-শঙ্করাচার্য্য যে অদ্বৈততত্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, আমরা তাহারই কথা বলিব। প্রামাণ্য ও সুপ্রাচীন কএকখানি উপনিষদের ভাষ্যসমূহে, ভগবদ্গীতার ভাষ্যে এবং সর্ব্বোপরি বেদান্ত-সূত্রের জগদ্বিখ্যাত ভাষ্যে, শঙ্করাচার্য্য তাঁহার অদ্বৈতবাদের অতি বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত বহু প্রকরণগ্রন্থে, নিজের রচিত গদ্যে ও পদ্যে নানাভাবে, আচার্য্য শঙ্কর, অদ্বৈতমতের পরিপুষ্টি সাধন করিয়াছেন। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে সেই অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধেই গুটিকতক কথা পাঠকবর্গকে উপহার দিতে ইচ্ছা করি। নূতনভাবে, নবীন উদ্যমে সম্পাদিত "ভারতবর্ষ" পত্রিকায়, ভারতের সুপ্রসিদ্ধ ও সুপ্রাচীন অদ্বৈতমতের ও অদ্বৈতধর্ম্মের আলোচনা না থাকিলে, পত্রিকা অঙ্গহীন থাকিবে বলিয়া আমরা বিবেচনা করি।

আচার্য্য শঙ্কর খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। "শঙ্কর-দিগ্বিজয়" গ্রন্থ ইহার সাক্ষী। সকলেই জানেন যে, সুরেশ্বরাচার্য্য, শঙ্কর-ভাষ্য সমূহের সুপ্রসিদ্ধ বার্ত্তিককার। সর্ব্বজ্ঞাত্মা নামক একজন সুপণ্ডিত যতি এই সুরেশ্বরের ছাত্র ছিলেন। ইনি "সংক্ষেপশারীরক" নামক একখানি গ্রন্থের রচয়িতা। এই সর্ব্বজ্ঞাত্মা, দক্ষিণাপথের রাজা দ্বিতীয় কীর্ত্তিবর্ম্মা ও রাজা তৈলপের আশ্রয়ে, উঁহাদেরই সভাপণ্ডিত ছিলেন। সুরেশ্বরাচার্য্য, শঙ্করের সমসাময়িক ও শিষ্য। সুতরাং এই প্রমাণ অনুসারেও আমরা নিঃসন্দেহরূপে আচার্য্য শঙ্করকে অষ্টম শতাব্দীর লোক বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারি।

অষ্টমশতাব্দীতে, ভারতের উত্তরাপথে বৌদ্ধনৃপতি "পাল"-বংশের অভ্যুদয় হইয়াছিল। দক্ষিণাপথ এবং কনোজ, মালব, কামরূপ প্রভৃতি প্রদেশে,—সর্ব্বত্রই সকল বৌদ্ধ ও হিন্দু নৃপতিবর্গ কর্ত্তৃক শাসিত হইতেছিল। তখন ভারতের সর্ব্বত্র বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্ম্ম,—উভয়ই পাশাপাশি ভাবে প্রভাব বিকীর্ণ করিতেছিল। তখন বৈদিক যজ্ঞ ও বৌদ্ধধর্ম্মের আলোচনা সর্ব্বত্রই হইতেছিল। তৎকালে অসংখ্য বৌদ্ধ-বিহারগুলিতে অসংখ্য পণ্ডিত বৌদ্ধমতের আন্দোলন, এবং বৌদ্ধগ্রন্থের অধ্যয়ন-অধ্যাপনায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। আবার, অসংখ্য বৈদিক পণ্ডিতও বেদাদি গ্রন্থের আলোচনা ও যজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপে নিয়ত ব্যাপৃত থাকিতেন। কিন্তু এ প্রকার আলোচনা সত্ত্বেও, তৎকালে উভয়ধর্ম্মের মধ্যেই, নানাবিধ দোষ ও হীনমতবাদ প্রবেশ করিয়াছিল। ব্রহ্মের কথা ভুলিয়া, কুমারিলভট্টের মত তীক্ষ্ণধী পণ্ডিতও কেবল বৈদিক যজ্ঞের ক্রিয়াপদ্ধতির আলোচনা লইয়াই ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্মের মধ্যেও, শূন্যবাদ ও বিজ্ঞানবাদ প্রবেশ করিয়াছিল এবং দেবদেবীর বাহ্য পূজা লইয়া, লোকে ব্রহ্মতত্ত্ব ভুলিয়া যাইতেছিল। আড়ম্বরপূর্ণ সকাম যজ্ঞ, হিন্দুধর্ম্মের, এবং শূন্যবাদ ও বিজ্ঞানবাদ বৌদ্ধধর্ম্মের অন্তস্তল বিদীর্ণ করিয়া দিয়া উভয় ধর্ম্মকেই কেবল মৌখিক অসারতার পথে টানিয়া লইয়া যাইতেছিল। দেশের যখন এই প্রকার অবস্থা, শঙ্করাচার্য্য তখনই প্রাদুর্ভূত হন।

ইনি সমগ্র ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়া, নানাস্থানে সুপ্রখ্যাত হিন্দু ও বৌদ্ধ পণ্ডিতগণের সহিত তর্কযুদ্ধ করিয়া সকাম বৈদিক-যজ্ঞের অসারতা এবং শূন্যবাদ ও বিজ্ঞানবাদের অসারতা খণ্ডবিখণ্ড করিয়া, সকাম কর্ম্মকে নিষ্কাম কর্ম্মে পরিণত করিয়া, শূন্যবাদের স্থানে ব্রহ্মতত্ত্ব সুসংস্থাপিত করিয়াছিলেন।

বৌদ্ধদিগের বিজ্ঞানবাদ ও শূন্যবাদ, বাহ্যপদার্থসকলের উচ্ছেদ করিয়া, জগৎকে উড়াইয়া দিয়াছিল। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থের মূলে কোন সত্তাই নাই, উহারা চিত্তের সংস্কার মাত্র, এই কথাই বৌদ্ধগণ প্রমাণিত করিতেছিল। শঙ্করাচার্য্য এই মতের অসারতা প্রতিপাদন করিয়া, বাহ্যজগতের মূলে ব্রহ্মসত্তা স্থাপন করিলেন এবং ব্রহ্মসত্তা তুলিয়া লইলে কোন বস্তুরই স্বতন্ত্র, স্বাধীন সত্তা নাই,—এই তত্ত্বটি স্থাপন করিলেন। এদিকে, হিন্দুপণ্ডিতেরা আড়ম্বরপূর্ণ যজ্ঞে বৈদিক সূর্য্য, ইন্দ্র, বরুণ, সোম প্রভৃতি দেবতার উদ্দেশে ঘৃত ঢালিয়া, উহাদিগকে স্বতন্ত্র, স্বাধীন সত্তাবিশিষ্ট ভিন্ন ভিন্ন দেবতাবোধে, সাংসারিক সুখৈশ্বর্য্য ও স্বর্গাদির প্রার্থনা করিতেন। শঙ্করাচার্য্য বুঝাইলেন যে, —না, কোন দেবতারই স্বাধীন স্বতন্ত্র সত্তা নাই। দেব-

তারা সকলেই 'কার্য্য'মাত্র ; উহারা সকলেই এক 'কারণ-সত্তা' বা ব্রহ্মসত্তারই ভিন্ন ভিন্ন বিকাশ মাত্র। সুতরাং ব্রহ্মচিন্তা ব্যতীত, কোন দেবতারই স্বতন্ত্র চিন্তা অসম্ভব, নিষ্ফল। তিনি আরও বুঝাইয়া দিলেন যে,—ব্রহ্মপ্রাপ্তির কামনা ব্যতীত, সুখৈশ্বর্য্য স্বর্গাদির কামনা নিষ্ফল।

তবেই দেখা যাইতেছে যে, প্রত্যেক পদার্থের মূলে ব্রহ্মসত্তার অনুভব এবং প্রত্যেক ক্রিয়ার মূলে ব্রহ্মশক্তির অনুভব,—ব্রহ্মসত্তা ব্যতীত কোন বস্তু ও ক্রিয়ারই স্বতন্ত্র স্বাধীন সত্তা না থাকা,—ইহাই শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতবাদের মৌলিক ভিত্তি। তিনি এই দৃঢ় ব্রহ্মভিত্তির উপরেই তাঁহার অদ্বৈতবাদের সুবৃহৎ অট্টালিকা স্থাপিত করিয়াছেন।

কিন্তু এখন দেখিতে হইবে যে, তিনি এই অদ্বৈত-বাদের ভিত্তি কোথায় পাইলেন ?

আমরা দেখাইব যে, তিনি ঋগ্বেদ হইতেই এই অদ্বৈতবাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ঋগ্বেদ-কথিত তত্ত্বই তিনি তাঁহার বিবিধ ভাষ্যে বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

কিন্তু বর্ত্তমান যুগে এই কথার অবতারণা নূতন বলিয়া বিবেচিত হইবার বিলক্ষণ আশঙ্কা রহিয়াছে। য়ুরোপের সঙ্গে ভারতবর্ষের সম্পর্ক হওয়ার পর হইতে, আমরা ঋগ্বেদ সম্বন্ধে একটি নূতন কথা শুনিয়া আসিতেছি। য়ুরোপের পণ্ডিতবর্গ আমাদের ঋগ্বেদ লইয়া অক্লান্ত অধ্যবসায় ও অদম্য শ্রম স্বীকার করিয়া, যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের। তাঁহারা যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহাদের সার মর্ম্ম এই যে, ঋগ্বেদে ব্রহ্মতত্ত্ব বা অদ্বৈততত্ত্ব পরিস্ফুট হয় নাই। ঋগ্বেদ,জড়ীয় প্রাকৃতিক পদার্থরাশির স্তুতি-প্রকাশক গ্রন্থমাত্র। সূর্য্য, ঊষা, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতা আর কিছুই নহে ; উহারা প্রাকৃতিক পদার্থ (Phenomena) মাত্র। এই সকল বিচিত্র, অদ্ভুত, প্রাকৃতিক পদার্থ ও দৃশ্য দর্শনে আদিম মানববর্গের চিত্তে যে বিস্ময়বিমিশ্র ভয়ের ভাব উদিত হইয়াছিল, তদ্দ্বারা প্রণোদিত হইয়া যে সকল স্তুতিগাথা উহা-দিগের মুখ হইতে উচ্চারিত হইয়াছিল, ঋগ্বেদ সেই সকল স্তুতিগাথা-প্রকাশক আদিম গ্রন্থমাত্র। ব্রহ্মের একত্বের ধারণা কার্য্য-কারণের জটিল ও সূক্ষ্ম দার্শনিক তত্ত্ব ঋগ্বেদের সময়ে মানবশিশুর চিত্তে ফুটিয়া উঠে নাই। উপনিষ[দে] যে ব্রহ্মবাদ ও অদ্বৈতবাদ দেখিতে পাওয়া যায়, উ[হা] ঋগ্বেদে নাই ; উহা ঋগ্বেদের পরবর্ত্তী যুগে বহুকা[ল]-ব্যাপক চিন্তার ফল। পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গের ম[ধ্যে] প্রায় সকলেই ঋগ্বেদ সম্বন্ধে এই প্রকার নিম্ন ধার[ণা] পোষণ করিয়া আসিতেছেন। বর্ত্তমান কালে, আমাদে[র] দেশেও আর বৈদিক চর্চ্চা নাই। সুতরাং আমরাও পাশ্চাত[্য] পণ্ডিতবর্গের কথিত এই প্রকার ধারণাই গ্রহণ করিতেছি।

কিন্তু আমরা এই প্রবন্ধে, পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গের সিদ্ধা[ন্ত] যে ভারতবর্ষের প্রাচীন সিদ্ধান্তের বিরোধী,—তাহা[ই] প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিব। বেদের প্রাচীন ব্যাখ্যাকারগণ বেদের শব্দার্থ-প্রকাশক নিরুক্ত ও নিঘণ্ট নামক অভিধা[ন] এবং উপনিষদ ও বেদান্তদর্শন—ইহারা সকলেই, পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গের সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ বিরোধী ও বিপরীত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, আমরা এই প্রবন্ধে তাহা[ই] দেখাইব।

মানবচিত্তের প্রকৃতি এই যে, সকলের ধারণা ঠিক্ সমান হয় না। চিত্তের বিকাশের তারতম্য-বশতঃ, একটি তত্ত্ব ভিন্ন ভিন্ন লোকের চিত্তে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পরিস্ফুট ও মুদ্রিত হইয়া পড়ে। যে সকল ব্যক্তি নিতান্ত অজ্ঞ, যাহারা কেবল সংসার লইয়া আসক্ত চিত্ত, যাহারা বৈষয়িক চিন্তা ও শব্দস্পর্শরূপ রসাদির মোহ কাটাইয়া উঠিতে পারে না,—এ প্রকার অজ্ঞ লোকের চিত্তে সর্ব্বব্যাপী, নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ ব্রহ্মতত্ত্বের ধারণা সহসা জন্মিতে পারে না। ঈদৃশ সংসারসুখনিমগ্ন লোকে[র] চিত্তটিকে বিষয়মগ্নতার হস্ত হইতে উদ্ধৃত করিবার উদ্দেশে, ঋগ্বেদে সকাম যজ্ঞের কথা আছে। যজ্ঞ করিবার উপদেশ দিয়া এবং যজ্ঞীয় দেবতাবর্গের ভাবনা করিবার উপদেশ দিয়া, বিষয়বর্গ হইতেও যে কিছু উন্নতবস্তু ও বিষয় সংসারে আছে তাহারই তত্ত্ব অজ্ঞদিগের চিত্তে প্রস্ফুটিত করিয়া দেওয়াই বেদের লক্ষ্য। কিন্তু কেবল ইহাই নহে। যে সক[ল] ব্যক্তির চিত্ত সমধিক উন্নত, ঋগ্বেদ তাদৃশ লোককে নিষ্কা[ম] যজ্ঞের উপদেশও দিয়াছেন। ঋগ্বেদ বলিয়াছেন যে, সুখৈশ্বর্য[্য] লাভই যজ্ঞের একমাত্র উদ্দেশ্য নহে। যজ্ঞীয় যে সক[ল] দেবতাকে স্বতন্ত্র স্বাধীন বস্তু বলিয়া উপাসনা করা হইতেছে, উহাদের একজনেরও স্বাধীন সত্তা নাই। উহারা ব্রহ্মস[ত্তা]

হইতে স্বতন্ত্র হইতে পারে না। সুতরাং ব্রহ্মপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে যজ্ঞ নির্ব্বাহ করাই কর্ত্তব্য। অপেক্ষাকৃত সমুন্নত-চিত্ত লোককে ঋগ্বেদ ঈদৃশ উপদেশ দিয়াছেন। আবার, যাহাদিগের চিত্ত তদপেক্ষাও উন্নত, ঋগ্বেদ তাহাদিগকে পূর্ণ অদ্বৈত-তত্ত্বের উপদেশ দিয়াছেন। ঈদৃশ লোকের পক্ষে, যজ্ঞ-সম্পাদনের কোন আবশ্যকতা নাই। ইহারা সর্ব্বপদার্থে, সর্ব্বক্রিয়ায়, কেবল এক কারণ-সত্তা বা ব্রহ্ম-সত্তার অনুধ্যানে সতত নিমগ্ন থাকিবেন। ঋগ্বেদে, পাশাপাশি একত্র এই ত্রিবিধ উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। মনুষ্যের চিত্তবিকাশের তারতম্য লক্ষ্য করিয়াই, ত্রিবিধ উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং যাঁহারা মনে করেন যে, ঋগ্বেদ কেবল জড়বস্তুর স্তুতিবাদাত্মক গ্রন্থ এবং ঋগ্বেদ কেবল সকাম যজ্ঞের আড়ম্বরে পূর্ণ, আমরা তাঁহাদিগকে ভ্রান্ত বলিয়াই মনে করি।

কিন্তু আমরা কোন্ কোন প্রমাণের বলে, এ প্রকার নূতন সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, এখন আমরা তাহাই পাঠকবর্গকে শুনাইব। এই প্রমাণগুলি দ্বিবিধ। এক,—বাহ্যপ্রমাণ; দ্বিতীয়,—আন্তর প্রমাণ। ঋগ্বেদের ব্যাখ্যাকারগণ, ঋগ্বেদের অভিধানগুলি, ঋগ্বেদের সমযুগের গ্রন্থ উপনিষদ্‌গুলি ও বেদান্তদর্শন—এই সকলই বাহ্যপ্রমাণ। এই সকল গ্রন্থে ঋগ্বেদের দেবতাবর্গ সম্বন্ধে কি প্রকার সিদ্ধান্ত আছে, সর্ব্বপ্রথমে তাহাই আমরা দেখিব। তৎপরে, স্বয়ং ঋগ্বেদের মধ্যে এ সম্বন্ধে কিরূপ সিদ্ধান্ত ও প্রমাণ আছে, তাহাও বিবেচনা করিতে হইবে। ঋগ্বেদের মধ্যেও অদ্বৈতবাদ-সম্বন্ধে বহু প্রকারের বিস্ময়কর প্রমাণ আছে। সে প্রমাণগুলি হিমালয়ের মত অকাট্য ও সুদৃঢ়। তাহাও আমরা দেখাইব।

কিন্তু এই সকল প্রমাণ আমরা ক্রমে ক্রমে পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থিত করিব।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য, বিদ্যারত্ন, এম, এ।

শঙ্কর-দর্শন।

"ব্রহ্মবিদ্যা"নামক মাসিক-পত্রিকায় শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের আত্মানাত্মতত্ত্ব কিঞ্চিৎ আলোচিত হইয়াছিল। এক্ষণে শঙ্করের মতে 'ব্রহ্মতত্ত্ব' প্রভৃতি বিষয়ের কিঞ্চিৎ আলোচনা ভারতবর্ষেও লিখিত হইতেছে।

ব্রহ্মতত্ত্ব।

প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মের গুণও নাই, আকৃতিও নাই, কোন বিশেষও নাই, উপাধিও নাই; আমরা কেবল অবিদ্যা বশতঃ উপাসনা করিবার জন্য তাঁহার উপর উপাধি সকল আরোপ করিয়া থাকি। বর্ণহীন স্বচ্ছ কাচখণ্ডে যেমন লোহিতাভা নিপতিত হইয়া উক্ত কাচখণ্ডকে লোহিতবর্ণে রঞ্জিত করে অথচ তন্নিমিত্ত উহাকে লোহিতবর্ণ বিশিষ্ট মনে করা যেমন ভ্রান্তিমূলক, সেইরূপ নির্গুণ পরব্রহ্মকে অবিদ্যাজনিত উপাধিবিশিষ্ট মনে করা আমাদের ভ্রান্তি বই আর কি বলা যাইতে পারে? পরব্রহ্ম বস্তুতঃ নির্গুণ, নিরাকার, নির্ব্বিশেষ ও নিরুপাধিক। ব্রহ্ম স্থূলও ন'ন, সূক্ষ্মও ন'ন, ক্ষুদ্রও ন'ন, বৃহৎও ন'ন। তিনি অস্পৃশ্য, অশ্রাব্য, অদৃশ্য ও অবিনাশী। তৎসম্বন্ধে যাহা কিছু কল্পনা করা যায় তাহাই 'নেতি নেতি'-প্রমুখ (তিনি অচিন্তনীয়)। ফলতঃ, যাহা আমরা জানি তিনি তাহা ন'ন, যাহা আমরা জানি না—তিনি তাহাও ন'ন। বাক্য ও মন তাঁহাকে না পাইয়া ফিরিয়া আসে।

একান্তই যদি তাঁহার সম্বন্ধে কিছু বলিতে হয়, তবে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে তিনি সৎ-স্বরূপ। তাঁহার অস্তিত্ব নাই একথা বলা যাইতে পারে না; কিন্তু যুক্তি সাহায্যে তাঁহার বিদ্যমানতাও প্রতিপন্ন হয় না। লবণের আস্বাদ যেমন সম্পূর্ণ লবণাক্ত, উহার মধ্যে অন্য কোন

রসের আস্বাদ সংমিশ্রিত নাই, তদ্রূপ পরব্রহ্ম বিশুদ্ধ জ্ঞান-স্বরূপ অর্থাৎ জ্ঞান ব্যতিরিক্ত তিনি আর কিছুই ন'ন। জ্ঞান-বিরহিত অস্তিত্ব যেমন কল্পিত হইতে পারে না, তদ্রূপ অস্তিত্ববিরহিত জ্ঞানও কল্পনার অযোগ্য। তিনি আছেন স্বীকার করিলে তিনি জ্ঞানস্বরূপ হইয়া আছেন একথা স্বীকার করিতে হইবে। কখন কখন তাঁহাকে আনন্দ-স্বরূপ বলা গিয়া থাকে। দুঃখের অভাবই আনন্দ। কথিত আছে যাহা ব্রহ্ম হইতে বিভিন্ন তাহাই দুঃখময়; সুতরাং ব্রহ্মকে সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ বলা যাইতে পারে।

যাবতীয় পদার্থনিচয়ের অন্তঃসত্ত্বরূপে পরব্রহ্ম বিরাজ করিতেছেন। তিনি ধারণার সম্পূর্ণ অতীত। চিন্তা দ্বারা তাঁহাকে অবগত হওয়া অসম্ভব। তবে তিনি সকল পদার্থের মূলে বিদ্যমান আছেন বলিয়া তাঁহা অপেক্ষা সত্য আর কিছুই নাই। তিনি স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ তিনি কদাপি জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইতে পারেন না। তিনি সমস্ত জানিতে পারেন, কিন্তু তাঁহাকে জানিতে পারা যায় না। বহির্জগৎ হইতে ইন্দ্রিয়সকলকে আকর্ষণপূর্ব্বক অন্তরাত্মায় সংযমিত করিয়া 'সংরাধনাবস্থা' (সম্যক্ শান্তি) প্রাপ্ত হইলে, যোগী ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া থাকে। যখন 'আমি' ও ব্রহ্ম এক হইয়া যাই, নাম ও রূপ যখন অস্তিত্ব-বিবর্জ্জিত হয়, তখন 'আমি' মুক্ত হইয়া যাই।

নিরতিশয় সঙ্কল্প-আরোপ দ্বারা পরব্রহ্ম অপরব্রহ্মে পরিণত হয়। যেখানে যেখানে সঙ্কল্প, গুণ, আকৃতি অথবা বিশেষত্বসম্পন্ন ব্রহ্ম উক্ত হইয়া থাকে, সেই সেই স্থানে উক্ত ব্রহ্মকে অপর-ব্রহ্ম বুঝিতে হইবে। এইরূপ-ব্রহ্ম কেবল উপাসনার জন্য কল্পিত হইয়া থাকে। এই উপাসনা বা এতৎসংস্পৃষ্ট কর্ম্মের ফলে স্বর্গলাভ হয়; কিন্তু, ইহা হইতে সংসারগণ্ডির বাহিরে যাওয়া যায় না। যাহা হউক, অপরব্রহ্মের উপাসনায় মৃত্যুর পর দেবযান পথ অতিক্রম করিয়া স্বর্গৈশ্বর্য্য লাভ পূর্ব্বক সম্যগ্ দর্শন লাভ করিতে পারা যায়, এবং সম্যগ্ দর্শন লাভ করিয়া পরিশেষে পূর্ণ-বিমুক্তি সংঘটিত হয়। ইহাকে ক্রমবিমুক্তি বলে। পূর্ণ-বিমুক্তি ক্রম-বিমুক্তির অব্যবহিত ফল নয়; যেহেতু, ক্রমবিমুক্তিতে সাধকের অজ্ঞান সম্পূর্ণরূপ অন্তর্হিত হয় না। অজ্ঞানই পরব্রহ্মকে নির্দ্দেশ করিতে গিয়া তাঁহাকে অপরব্রহ্মে পরিণত করে। বর্ণবিশিষ্ট অন্য কোন পদার্থ সহযোগে অনুরঞ্জিত হইয়া স্ফটিকের স্বচ্ছতা যেমন বিনষ্ট হয় না, আকাশস্থিত একই সূর্য্য জলস্রোতে প্রতিবিম্বিত হইয়া বহু সূর্য্যরূপে প্রতিভাত হইলেও প্রকৃত সূর্য্যের যেমন তাহাতে কোন পরিবর্ত্তন ঘটে না, তদ্রূপ অবিদ্যা কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইলেও পরব্রহ্ম কিছুমাত্রও পরিবর্ত্তিত হয় না। অপরব্রহ্ম তিন শ্রেণী দ্বারা তিনরূপে কল্পিত হইয়া থাকে। এক শ্রেণী তাঁহাকে 'বিশ্বাত্মা' বা জগদাত্মা, অন্য শ্রেণী জীবাত্মা এবং অপর শ্রেণী তাঁহাকে ঈশ্বররূপে কল্পনা করিয়া থাকে।

কখন কখন তাঁহাকে সর্ব্বনিষ্পন্নকারী, ইচ্ছাময়, ঘ্রাণময়, আস্বাদময় অর্থাৎ সমস্ত কার্য্য ও সমস্ত ইন্দ্রিয়জ্ঞানের মূল কারণরূপে বিবৃত করা হয়। তিনি শান্ত ও অচঞ্চলভাবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে পরিব্যাপ্ত হইয়া আছেন। চন্দ্র-সূর্য্য তাঁহার চক্ষুর্দ্বয়, আকাশ তাঁহার শ্রুতি এবং বায়ু তাঁহার নিঃশ্বাস। তিনি সমস্ত জ্যোতির আকর; স্বর্গের বাহিরে, অন্তরের অভ্যন্তরে তিনি জ্যোতিঃস্বরূপ। তিনি ব্যোম-রূপী জীবনরূপী—তাঁহা হইতে জীবন সকল সমুদ্ভূত হইয়া নাম ও রূপের বিশেষত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। বিশ্বসংসার তাঁহাতেই চলিতেছে, ফিরিতেছে। কোন কোন স্থলে এই অত্যাশ্চর্য্য আত্মার ক্ষুদ্রায়তন কল্পিত হইয়াছে। তিনি এই দেহাবাসে অবস্থান করিতেছেন, তিনি হৃৎপদ্মে বিরাজ করিতেছেন ইত্যাদি। এই সকল কল্পনা অবশেষে চূড়ান্ত আকার ধারণ করিয়া ব্রহ্মকে ঈশ্বরত্বে দাঁড় করাইয়াছে। এরূপ ঈশ্বর কল্পনা বড় একটা দেখা যায় না। আমাদের পুনর্জ্জন্ম পরিগ্রহ ঈশ্বরের ইচ্ছাধীন; তাঁহারই অনুগ্রহে আমরা মুক্তির কারণস্বরূপ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া থাকি। বৃষ্টিবিন্দু যেমন প্রত্যেক বীজ হইতে বীজানুরূপ বৃক্ষ বর্দ্ধিত করে, সেইরূপ ঈশ্বরও পূর্ব্বজন্মানুরূপ কর্ম্মান্তিক ফল প্রদান করিয়া থাকে। আমাদের পরীক্ষালব্ধ জ্ঞান দ্বারাই ব্রহ্মের ঈশ্বরত্ব নিষ্পন্ন করা হয়। এই জ্ঞান অবিদ্যা-জনিত; সুতরাং ঈশ্বরত্ব অপ্রতিপাদনীয়।

(ক্রমশঃ)

স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

[ভারতবর্ষ—১ম সংখ্যা]

merald P.g. Works, 6. Simla St., Calcutta.

কবিবর ৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

আজকে হঠাৎ ছিঁড়ে গেছে
বাণীর বীণার একটা তার!
বিশ্ব জুড়ে উঠেছে আজ
একটা মহা হাহাকার!

একটা চন্দ্র খ'সে গেছে,
একটা সূর্য্য গেছে ডুবে;
একটা অতি দীপ্ত জ্যোতিঃ
আজকে হঠাৎ গেছে নিবে;

একটা উচ্চ গিরিচূড়া
চূর্ণ হ'য়ে গেছে আজ;
সুখ-সুপ্ত গৃহকক্ষে
হঠাৎ একটা পড়েছে বাজ;

একটা প্রাসাদ ভস্মীভূত,
একটা নগর গেছে পুড়ে;
বিরাট ঘন আঁধার আজ
আকাশ পাতাল গেছে জুড়ে!

আজকে হঠাৎ থেমে গেছে
একটা মহামহোৎসব;
জগৎ ছেয়ে উঠেছে আজ
একটা কাতর রোদন-রব,

মায়ের চরণকমল হ'তে
খসেছে আজ একটা দ্বিদল;
শক্তিপূজার হোমের অনল
হ'য়েছে আজ শান্ত শীতল!

"একটা হর্ষ, একটা প্রীতি,
একটা গীতি, আজি হায়!
একটা মহামহিমা—যে
মুছে গেছে বসুধায়!"

রুদ্ধ ব্যথার লৌহ-কারায়—
আজকে সবাই করে বাস;
"আজকে শুধু বুকের ভিতর
ঘনিয়ে ওঠে দীর্ঘশ্বাস!"

সবার আঁধার মলিন মুখে
ফুটেছে এক গভীর ব্যথা;
সবার প্রাণে বেজেছে আজ
একটা দারুণ কঠিন কথা।

জাগিয়েছে যে, নাচিয়েছে যে
মাতিয়েছে যে বাঙ্গলা দেশ
চ'লে গেছে হঠাৎ সে আজ—
ফেলে তাহার জীর্ণ বেশ!

জন্মভূমি মায়ের অধিক
যাহার কাছে পেয়েছে মান;
বাঙ্গলা ভাষা হৃদয় যাহার,
বাঙ্গালী যার ছিল গো প্রাণ;

কুনীতি যে বিষের মত
ক'রত দূরে পরিহার;
সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়
যাহার মত ছিল না আর।

শিশুর মত সরল যে জন,
গল্পকথায় কাটাত দিন;
ধনী নির্ধন সমান যাহার,
অভিন্ন যার মহৎ হীন;

নবীন প্রবীণ সবার সনে
তুল্য যাহার ব্যবহার;
স্নেহে, প্রেমে, দানে, ক্ষমায়,
সমতুল্য নাহিক যার;

উদার, রসিক, ভাবুক, গিনি,
গায়ক, কবি, নাট্যকার;
তর্কশাস্ত্রে ছিল যাহার
অসাধারণ অধিকার;

পঞ্চাশৎবর্ষে যাহার
শক্তি ছিল যুবার মত;
সদানন্দ, মহাপুরুষ;
হাস্য আমোদ খেলায় রত;

চলে গেছে হঠাৎ সে আজ—

শূন্য ক'রে বাঙ্গলা দেশ !

জীর্ণ বস্ত্র ফেলে সে আজ

পরতে গেল নূতন বেশ !

যে জন এমন মাতৃভাষায়

ঢালিয়া গেছে নূতন প্রাণ,

"ভক্তি অশ্রু-সলিল সিক্ত

শতেক ভক্ত দীনের গান !"

"মেবার" দুঃখে যাহার হৃদয়

"গলিয়া পড়েছে হইয়া ক্ষীর,"

যে দেখেছে হায় ! "কত যে মধুর

তাহার শস্য, তাহার নীর" ;

যাহার গভীর নির্ভয় বাণী

ডাকিয়া বলেছে "মানুষ হ' !

"গিয়াছে দেশ দুঃখ নাই

আবার তোরা মানুষ হ' !"

"এমন দেশটি" যে গেছে বলিয়া

"খুঁজিয়া কোথাও পাবে না তুমি ;"

"সকল দেশের সেরা সে দেশ

রাণী আমার জন্মভূমি !"

"ভায়ের মায়ের এমন স্নেহ"

সে বলেছে "কোথায় আছে" ;

"কোথায় এমন চাঁদের কিরণ,

পাখীরা গায় গাছে গাছে ;

যে বলেছে "বক্ষে নিতে

মায়ের দুটি চরণ ধরি,"

যে বলেছে "জন্ম হেথায়,

এই দেশেতে যেন মরি !"

একদা যাহার অমর কণ্ঠ

গাহিয়াছিল "আমার দেশ !"

"আমরা ঘুচাব মা তোর কালিমা

মানুষ আমরা নহি ত' মেষ !"

যে সুধিয়াছিল জলদ মন্দ্রে

"কেন গো মা তোর রুক্ষকেশ ?"

"দেবী আমার ! সাধনা আমার !

স্বর্গ আমার ! আমার দেশ !"

ব্যঙ্গ রূপক হাসির গানে

শাসিয়াছে যে স্বেচ্ছাচার ;

জাতির মধ্যে আনিয়াছে যে

একটা নূতন উপচার ;

জাগিয়েছে যে, নাচিয়েছে যে,

মাতিয়েছে যে বাঙ্গলা দেশ !

হঠাৎ সে আজ গিয়াছে চলি—

ফেলিয়া তাহার জীর্ণ বেশ !

"প্রতাপসিংহের দারিদ্র্য, আর

দুর্গাদাসের ইতিহাস ;"

ঔরঙ্গজেবের ষড়যন্ত্রে

সাজাহানের কারাবাস,

দিল্লীশ্বরী নূরজাহানের

কটাক্ষে এক রাজ্য শাসন ;

মহাবতের প্রতিহিংসায়

মেবার রাজ্যের অধঃপতন ;

মৌর্য্যপতি চন্দ্রগুপ্তের

আর্য্যাবর্ত্তে সুপ্রতিষ্ঠা ;

মহাতেজা চাণক্যের সে

ব্রাহ্মণত্বের পরাকাষ্ঠা ;

বিশ্বেশ্বরের বিস্ময়কর

পরহিতে সকল দান,

স্বামীর জন্য "সরযূর" সে

বলি দেওয়া নিজের প্রাণ ;

"সীতার সে স্বর্গীয় ক্ষমার

আলোকিত উপাখ্যান"

শ্রীরামচন্দ্রের উপদেশে

অহল্যার সে দিব্যজ্ঞান ;

বীরাঙ্গনা তারাবাঈ
এঁকেছে যে চমৎকার ;
রাজপুতানার মহিমাতে
হৃদয় পূর্ণ ছিল যার ;
জাগিয়েছে যে, নাচিয়েছে যে
মাতিয়েছে যে বাঙ্গলা দেশ !
চলে গেছে হঠাৎ সে আজ
ফেলে তাহার জীর্ণ বেশ !

ছিল না যার কোন ব্যথা,
নাহি ছিল দুঃখ শোক ;
হঠাৎ সবল সতেজ দেহে
ছেড়েছে যে মর্ত্ত্যলোক ;
লেখার মাঝে কলম ফেলে
কাহার কঠিন আদেশ পেয়ে,
মুহূর্ত্তে যে চলে গেছে,
দেখেনি আর পাছে চেয়ে ;
স্নেহের পুতুল পুত্রকন্যা
দেখে যায়নি তাদের মুখ ;
বিদায় চায়নি কারো কাছে,
ভাসিয়ে গেছে সবার বুক ;
মৃত্যুজ্বালা যাহার অঙ্গ
স্পর্শ কর্ত্তে পায়নি ক্ষণেক ;
অকলঙ্ক শুভ্রদেহে
পুণ্য যাহার ছিল অনেক ;
জাগিয়েছে যে, নাচিয়েছে যে,
মাতিয়েছে যে বাঙ্গলা দেশ !
চলে গেছে হঠাৎ সে আজ
ফেলে তাহার জীর্ণ বেশ !

শ্রীনরেন্দ্র দেব।

বাণী।

সপ্ত-স্বর্গের মানস হ'তে, প্রথম সৃজন প্রাতে,
উঠ্‌লে সুরের পরাগ অঙ্গে, প্রথম আলোর সাথে !
সেই সঙ্গীতের পাছে পাছে, গ্রহ-উপগ্রহ নাচে,
কুহু রবে ফলের মত, ফুটছে তারা রাজি,
তুমি বিশ্বনাথের বীণা, বিশ্বে উঠ্‌ছ বাজি।

ঊষার সাথে নাম্‌লে কবে, করতে সাগর-স্নান,
সিন্ধু উঠ্‌ল কল্লোলিয়া, শুনে' তোমার গান,
নদী শিখ্‌ল কলস্বর, পাষাণ হ'ল সুমধুর,
প্রকৃতিরে বিকাশিলে কোটী কোটী চিতে,
রূপের কাজল মাখাইলে আঁখিতে আঁখিতে।

চলে এলে মৃদু পায়ে মাটীর জগত পানে,
গুঞ্জরিয়া ভাষার মধু ধরার কানে কানে ;
কনক-আঁচল পড়ে লুটে, কিরণ-কমল পায়ে ফুটে,
মেঘের বরণ কেশের রাশি আছে পিঠে শুয়ে !
শ্যামল হ'য়ে গেল ধরা রাতুল চরণ ছুঁয়ে।

গাছে গাছে হরিৎ শোভার জোয়ার এল ডেকে
শিশুর কণ্ঠে আধ-ভাষার ধারা সে দিন থেকে।
পাখীর গলায় বাজ্‌ছে বাঁশী, ফুলের অঙ্গে অঙ্গে হাসি,
কামের ভস্মে প্রেমের মণি, করে ঝকমক্‌,
নারীর বক্ষ হতে গড়ায় দেবের পাদোদক।

জন্ম মরণ দুটি পায়ের যেন নূপুর দুটি,
বেঁধে আন্‌লে সপ্ত-স্বর্গ হতে সপ্ত সুর লুঠি' !
বক্ষ হ'ল সাধন-স্বর্গ, জীবন হ'ল সেবার অর্ঘ্য,
মায়ের মতন জন্মভূমি, গেল সেটা বুঝা,
তুমিই আন্‌লে প্রথম বিশ্বে, বিশ্বনাথের পূজা।

শ্রীপ্রমথনাথ রায় চৌধুরী।

সুখী দম্পতি।

(১)

প্রিয়াতে আমাতে দুজনে মিলিয়া
বড় সুখে আছি মোরা,
ত্রিভুবন খুঁজে কখনও তুমি
পাবেনা এমন জোড়া।

(২)

আমি ভালবাসি বনের ছায়ায়
কুটীরে করিতে বাস,
তেতলা বাড়ীতে সহরে থাকিতে
প্রেয়সীর অভিলাষ।

(৩)

আমি ভালবাসি নিরামিষ দিয়ে
খাইতে ভাত কি লুচি ;
প্রিয়ার আমার পোলাও, কালিয়া,
আমিষে বেজায় রুচি।

আমি চাই খোলা জানালা দুয়ার
মলয়ে জুড়াতে প্রাণ ;
রুধি' ঘর দ্বার তড়িৎ পাখার—
বাতাস—প্রেয়সী চান্।

(৫)

দীপ না নিবায়ে শুইলে আমার
রাতে ঘুম নাহি হয় ;
ঘরে আলো জেলে না শুইলে প্রিয়ে
দেখেন ভূতের ভয় !

(৬)

আমি ভালবাসি ধূতি ও চাদর
সাদাসিদে পরিষ্কার,
প্রিয়া ভালবাসে শুধু আভরণ
আপাদ মস্তকে তার।

(৭)

আমি ভালবাসি দীনতার সনে
কাটাতে জীবন যত ;
প্রিয়া ভালবাসে গৌরবে বিলাসে
থাকিতে রাণীর মত।

(৮)

প্রিয়া মোর তপ্ত উজ্জ্বল দিবস
আমি হিম অমানিশি ;
আলোকে আঁধারে প্রজাপতি বরে
পরস্পরে আছি মিশি।

প্রিয়াতে আমাতে মিলিয়া মিশিয়া
বড় সুখে আছি মোরা ;
ত্রিভুবন জুড়ে দেখগে খুঁজিয়া
পাবেনা এমন জোড়া।

শ্রীরসময় লাহা

গৃহ

স্মৃতিময় শূন্যগৃহ তোমার লাগিয়া,
প্রবাসে ব্যথিত চিত্ত উঠিছে কাঁদিয়া!
কিছু নাই, সব আছে আমিত্ব মাঝারে,
সুখ দুঃখ মর্ম্ম ব্যথা নয়ন আসারে।
কত নিশি জাগরণ, কত দীর্ঘশ্বাস,
কত নৈরাশ্যের অশ্রু, প্রাণে হা হুতাশ,
ছিন্ন বস্ত্র, রুক্ষকেশ, অস্নাত শরীর,
শোকক্লিষ্ট শীর্ণ দেহ, নেত্রে ভরা নীর,
সকলই গৃহখানি বক্ষ পাতি দিয়া
নীরবে সহিছ সব কিছু না কহিয়া!
নিভৃত প্রাণের মাঝে করিছ রক্ষণ,
শীতল তোমার অঙ্গে রচিয়া শয়ন
নিশীথে সান্ত্বনা লভি; দিবসে জুড়াই,
জনকোলাহল হ'তে চির শান্তি পাই!
প্রভাতে তোমারি ক্ষুদ্র গবাক্ষ চাহিয়া
নিশা-ভোরে রবি রশ্মি যায় জাগাইয়া,
মধ্যাহ্নে প্রদীপ্ত ভানু, মুক্ত বাতায়নে
তুমিই আনিয়া দাও শীতল পরাণে,
প্রশমিত কর দাহ, স্নেহের পরশে
ধীরে ধীরে ব্যজনিয়া, সমীর সরসে,
প্রদোষের ছায়ামগ্ন প্রাঙ্গণের তলে
স্তব্ধ প্রকৃতির শোভা দেখাও কৌশলে!
রজনীর আগমনে নীলাম্বর গায়
অযুত হীরকখণ্ড-দীপ্তি তারকায়,
ক্ষুদ্র গৃহ, এ সকল তোমার শিখরে
বসিয়া নিরখি নিত্য নিশীথ অম্বরে,
অতীতের সুখস্বপ্ন প্রত্যক্ষ আকার
সদা বিদ্যমান দেখি হৃদয়ে আমার।
সুখ নাই, দুঃখ আছে, সেই মোর ভালো
সে দিনের সুখস্মৃতি সবখানি আলো!
করিয়াছে হৃদি-গৃহ, স্মৃতিমাখা ঘর,
তোমা তরে পরবাসে কাঁদিছে অন্তর!

অরূপ স্বরূপ চিত্রে আত্ম-সমর্পিয়া
সেই ঘরে বাস করি শোক দুঃখ নিয়া।
জীবনের সেই মম আশ্রয় নির্ভর
"তার বাসে" চিত্ত মোর বাঁধা নিরন্তর!

শ্রীপ্রসন্নময়ী দেবী

জন্ম-মঙ্গল।

১

ছেলে হ'ল ছেলে হ'ল, বাজা শাঁখ বাজা,
ওরে তোরা কর্ জয় জয়!
কুঁড়ে ঘরে এল যে গো নিখিলের রাজা
কত তৃপ্তি চরাচর জয়!
দৈবকীর ভরে' কোল, কারাবাধা টুটে,
আলো হয়ে ওঠে রুদ্ধ ঘর,
যশোদার মুগ্ধ মুখে স্নেহদীপ্তি ফুটে,
পরিপূর্ণ, শুভ্র পয়োধর!
ছেলে হ'ল ছেলে হ'ল, বাজা শাঁখ বাজা
উলুধ্বনি কর্ তোরা ওরে,
জীর্ণদ্বার দেবদারু, আম্রপর্ণে সাজা
তাম্রঘট গঙ্গাজলে ভ'রে!

১

ছেলে হ'ল ছেলে হ'ল বাজুক শানাই
আঙনে বসুক নহবৎ,
পাড়া-পড়োশীরে সবে ডেকে আন ভাই
হোক্ আজ, সোর সরাবৎ!
ছেলে হ'ল ছেলে হ'ল শাঁখ দেয় সাড়া,
পাড়ায় জাগিল কলরব,
কাঙালি দুয়ার ঘেরে, বেজে ওঠে কাড়া,
আহ্লাদেতে নাচে ঢুলি সব!
খুলেদে খুলেদে দোর, আসুক সবাই,
যায় নাক' কেহ যেন ফিরে'—
দেরে হাতে, চাল কড়ি, মুড়কি মিঠাই,
নববস্ত্রে শীর্ণ দেহ ঘিরে!

৩

যারে তোরা ডেকে আন্ ঠাকুর মশায়ে,
মণ্ডপেতে হবে স্বস্ত্যয়ন !
চণ্ডীপাঠ ভাল ক'রে, সুগন্ধে ভাসায়ে
ধূপ দীপে পূজা আয়োজন !
পঞ্চগব্য আন্ তোরা মধুপর্ক সাজা,
নৈবেদ্যে ভরিয়া দেরে ঘর,
কমল, অপরাজিতা, বিল্বপত্রে তাজা,
গন্ধরাজে পুষ্পপাত্র ভর !
পঞ্চদীপ পুণ্যঘৃত অমল কর্পূরে
দুগ্ধশুভ্র উঠুক আরতি ;
ভক্তি-প্রেমে বরাভয়ে মহানন্দে পূরে
শুভ্র হোক বাছার নিয়তি !

শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী।

বিন্দুসরোবর।

(ভুবনেশ্বর)

বিমল সাত্ত্বিক রসে অঙ্গ পুলকিত,
সাধকের স্বেদবিন্দু হইয়া সঞ্চিত,
কত যুগ, যুগ হতে, ওগো সরোবর,
গড়িয়া তুলেছে তোমা বিরাট্ সুন্দর।
কোটি কোটি তীর্থযাত্রী করি প্রণিপাত,
খনিয়া তুলেছে তোমা ওগো পুণ্যখাত,
লক্ষকোটি সাধকের ভক্তি-অশ্রুধারা,
করেছে তোমারে দীর্ঘ মিলিয়া তাহারা।
ভক্তের অমলরক্ত হৃদয় কোমল
প্রতিভাত হয়ে জাগে রক্ত শতদল।
সতীর চিকুর স্পর্শে জেগেছে শৈবাল,
তার শুভ্র শঙ্খশ্রীতে ফুটেছে মরাল।
কোটি কোটি পুষ্পাঞ্জলি অর্ঘ্যনিবেদন,
তব বক্ষে মন্দিরের করেছে সৃজন।

শ্রীকালিদাস রায়।

মন্দির।

(ভুবনেশ্বর)

শান্ত তুঙ্গ অবিচল হে দেবমন্দির,
জেগে আছ কতকাল তুলি উচ্চশির ?
তুমি বুঝি ছিলে আগে অনুচ্চ চঞ্চল
দেবতার ছত্রসম কোমল ধবল ?
কোটি কোটি সন্ধ্যারতি মঙ্গল বাজনা
পূজামন্ত্র, পুষ্পাঞ্জলি, পুণ্য আরাধনা,
তোমা ঘেরি ঘেরি ; লভি' শিলার আকার
গড়িয়া তুলেছে চূড়া, তোরণ, প্রাকার।
ধ্যানমগ্ন শান্ত শত যোগীর মহিমা
দেছে তোমা স্তব্ধস্থির প্রশান্ত গরিমা।
ঘনীভূত ভক্তিপুঞ্জ অটল সুন্দর
করিয়াছে অবিচল সৌম্য মনোহর,
প্রাঙ্গণের তল তব যত হ'ল ক্ষয়
লভিল ও পুণ্যদেহ তত উপচয়।

শ্রীকালিদাস রায়।

সাগর-সঙ্গীত।

শব্দহীন মহাকাশ, শান্তিভরা সমুদায়
আজি বরষিছে সন্ধ্যা তোমার সকল গায়
মহাশান্তি নীরবতা ! হে সাগর ! হে অপার !
বাক্যহীন আজ তুমি, শুদ্ধ শান্তি পারাবার।
নীরব সঙ্গীত তব শান্তিভরা অন্ধকারে,
আনন্দে উজলি রাখে মর্ম্ম মাঝে আপনারে !
সে আনন্দে বিরাজিছে তোমার সকল দেহ,
মগ্ন হয়ে গেছে তার সকল বিষাদ-গেহ।
সকল প্রকৃতি আজ পদ্ম হ'য়ে ভাসে জলে,
মহাকাল থেমে গেছে তোমার চরণতলে,
নিবিড় নিঃশ্বাসহীন ধীর স্থির আঁখি কর
আমার বক্ষের প'রে যোগাসনে যোগিবর।
পেয়েছি আভাস আমি পাইনি সন্ধান তার
যুক্ত করে ব'সে আছি কর মোরে একাকার।

শ্রীচিত্তরঞ্জন।

দুগ্ধের উপকরণ ও উপকারিতা এবং দধির বিশেষ গুণ।

সদ্যোজাত শিশুর আহার্য্যের মধ্যে মাতৃ-দুগ্ধই প্রশস্ত। মার শরীর অসুস্থ হইলেও অনেক স্থলে দুগ্ধ তত বিকৃত হয় না, প্রকৃতির এই রূপই নিয়ম। অভিব্যক্তি-বাদের এই নিয়মটির কার্য্যকারিতা অতি বিস্ময়কর। নূতনকে নিরাপদে রাখিতে প্রকৃতি-দেবীর এমনই স্বাভাবিক চেষ্টা—নইলে অভিব্যক্তিবাদ বাধা পায়।

মাতৃ-দুগ্ধ কোনও কারণে বিকৃত হইলে অনেক স্থলে অন্য নারী-দুগ্ধ বা গরুর দুগ্ধ, মহিষের দুগ্ধ বা ছাগল-দুগ্ধ আমাদের এ দেশে সচরাচর ব্যবহৃত হয়। সে গুলি মাতৃস্তন্য নহে বলিয়া শিশুর তত সুপাচ্য নয়। তবে নানরূপ প্রকরণে—উহাদিগকে বিশুদ্ধ করিয়া প্রয়োজনের সময় ব্যবহার করা হয়। জল বালি, চূণের জল, মৌরীর জল, সোডার গুঁড়া, চিনি ইত্যাদি মিশাইয়া, ঐ দুগ্ধ বিশুদ্ধ করা যাইতে পারে। গো-দুগ্ধ বা মহিষ-দুগ্ধ উক্তরূপে বিশুদ্ধ হইয়া সুন্দর শিশু-সেবা দুগ্ধ প্রস্তুত হয় এবং তাহা অতি সহজে পরিপাক হয়। অনেক সভ্যদেশে—রমণীরা সন্তানকে স্তন্য দান করেন না। তাঁহারা হয়—অন্য স্ত্রীলোককে ওই কাজে নিযুক্ত করেন, অথবা এই সকল নিম্নলিখিত সুপাচ্য কৃত্রিম দুগ্ধ ব্যবহার করেন। যথা—হর্লিক, মেলিন্স, নেসলী, ও এলেনবেরী, ইত্যাদি। বস্তুতঃ দেখা যাইতেছে যে এই কৃত্রিম দুধগুলির ব্যবহার ক্রমশঃ সকল দেশেই বৃদ্ধি পাইতেছে। তাহার কারণ—রসায়ন শাস্ত্রের উন্নতিতে রাসায়নিক প্রথায় ঐরূপ কৃত্রিম দুগ্ধ প্রস্তুত অতি সহজ হইয়াছে এবং ঐ সব বোতলে ভরা গুঁড়া ও জমাট দুধগুলি অনেক দিন স্থায়ী হয়—ও দূর দেশে সঙ্গে লইয়া যাওয়া যায়; দামও সস্তা। সভ্য দেশের অনেক স্থানে—এই সকল কৃত্রিম দুধে শিশুগুলি প্রতিপালিত হইয়া বেশ সুস্থ ও সবল ভাবে বাড়িতে দেখা যায়—ইহাতে মনে হয় মানবের বিজ্ঞান-প্রসূত চেষ্টায় তাদের সকল চেষ্টাই এক দিন সফল হইবে। প্রকৃতির নিয়মগুলিকে অধ্যয়ন করিয়া—মানব দিন দিন প্রকৃতি-বিজয়ী হইয়া পড়িতেছে; ইহাকেই বলে মানবের অভিব্যক্তি।

প্রকৃতপক্ষে বলিতে গেলে মনে হয় দুগ্ধ শিশুরই খাদ্য। দুগ্ধে আহার ও পানীয় উভয়ই একত্র মিশান থাকায় শিশু-পথ্যের ইহা বিশেষ উপযোগী। কিন্তু বয়ঃক্রম বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দুগ্ধের উপকারিতা ও যথেষ্টতা ক্রমে ক্রমে অপ্রচুর হইয়া পড়ে। ১০০ ভাগ দুগ্ধে ৮৮ ভাগ জল এবং ১২ ভাগ মাত্র দুগ্ধ-সার আছে। তাহাতে আবার নানা প্রকার উপকরণ আছে যথা—মাখন, ছানা, চিনি, লবণ ইত্যাদি। এগুলিরও পরিমাণ দ্বারা দেখা যায় যে, দুগ্ধ বর্দ্ধনশীল শিশুর পক্ষেই উপযুক্ত—তদূর্দ্ধ বয়সে ইহা সম্পূর্ণ উপযোগী নহে। তখন দুগ্ধের জলীয় ভাগ ত্যাগ করিয়া—তাহার ঘনতর অংশগুলি—যথা মাখন, ছানা, চিনি ইত্যাদি পৃথক্ করিয়া লইতে হয়, এই গুলি অন্য খাবারের সঙ্গে পাক করিয়া—অনেক প্রকার উপাদেয় ও সারবান খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত হয়। যথা—সন্দেশ, চীজ্ ইত্যাদি; এ গুলি অতিশয় উপাদেয় ও বলকারক খাদ্য—দুধ অপেক্ষা অনেক সস্তা ও স্থায়ী এবং সকল দেশেই বহুল প্রচলিত। পূর্ব্বোক্ত উপকরণগুলি দুধেই যথাযথ আছে—দুধকে পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন সৃষ্টি করিতে হয় না।

কিন্তু দুধ হইতে আর এক শ্রেণীর দ্রব্য প্রস্তুত করিতে পারা যায়, যাহার উপকারিতা ও পাচক গুণ অনেক বেশী। দই এই শ্রেণীর সামগ্রী। প্রক্রিয়া-বিশেষের দ্বারা দুধের চিনি হইতে দম্বলযোগে এই জাতীয় দ্রব্য প্রস্তুত হয়। দম্বল এক প্রকার জীবাণু, উহা উদ্ভিদ-শ্রেণীর অন্তর্গত। দেখিতে গোলাকার বা ন্যূনাধিক লম্বা রকমের। কোনটি বা ইস্ক্রুপের প্যাঁচের মত। দধি প্রস্তুত করিতে যে বীজাণু আবশ্যক, সেগুলিত প্রধান দুই শ্রেণীতে বিভক্ত,—ছোট লম্বা, ও ছোট গোলাকৃতি। প্রথমটির নাম ল্যাক্‌টিক-আসিড্-ব্যাসিলী, দ্বিতীয়টিকে একরূপ ছোট ট্রেপ-টোকফাস্ বলা যায়। প্রত্যেকটিই আলাহিদা আলাহিদা করিয়া ল্যাক্‌টিক-এসিড প্রস্তুত করিতে ও দুধ জমাইতে পারে। সাধারণ দধিতে উহাদের সহিত আরও অনেকগুলি জীবাণু থাকে, তাহারা দধিতে নানারূপ সুগন্ধ উৎপাদন করে।

তদ্ব্যতীত এমন আরও শ্রেণী আছে যাহারা দুর্গন্ধ আনয়ন করে, এবং ভিন্ন ভিন্ন রং, ও পিচ্ছিল দ্রব্যও উৎপন্ন করে। ভাল গোয়ালাদের দধিতে শেষোক্তগুলি প্রায়ই থাকে না।

দধির অনেক সুবিধা ও উপকারিতা আছে, ইহা অনেক দিন রাখিতে পারা যায়—কিন্তু গ্রীষ্মপ্রধানদেশে দুধ একদিনও রাখা যায় না, পচিয়া উঠে। দধিতে যে ল্যাকটিক এসিড্ প্রস্তুত হয়, তাহাই অম্লগুণবিশিষ্ট বলিয়া পচন নিবারণ করে। এই অম্লরসটুকু অল্প হইলে বড়ই মুখরোচক ও বড়ই উপকারী হয়। ল্যাকটিক এসিড-বেসিলীর এমন শক্তি আছে যে আর এক রকম বেসিলী—"বেসিলী কোলাই"—কে আয়ত্তাধীনে রাখে। এই "কোলাই" জাতীয় বেসিলী পরিমিতরূপে আমাদের খাদ্যে থাকিলে হজমের পক্ষে অনেক উপকার করে, তবে কখনও কখনও অতিরিক্ত ও বিকৃত হইয়া—বা অন্য কোনও নূতন জীবাণু দ্বারা দূষিত হইয়া মানবদেহে বড়ই ক্ষতি করে।

সুপ্রসিদ্ধ একজন রাশিয়ান পণ্ডিত প্রত্যক্ষ প্রমাণ করিয়াছেন যে এই "কোলাই" বেসিলীর প্রাদুর্ভাব বা বিষাক্ততা হইতে অনেক রোগ হয়। তাহারা যে ক্লেদগুলি খাদ্যনলে উৎপন্ন করে সে গুলি বড়ই বিষাক্ত। সেই গুলি রক্তে নীত হইয়া অনেক ব্যাধি ঘটায়। ইহাদের দ্বারাই বৃদ্ধবয়সের আবির্ভাব সঙ্ঘটিত হয়। তাই পরিমিত পরিমাণে দই খাওয়াই স্বাস্থ্যকর।

এখন এই দই কিরূপ প্রণালীতে প্রস্তুত করা যায় সেই কথা বলিতেছি। ভেজালহীন দুধটি ঘন করিয়া—অৰ্দ্ধেক বা সিকি অংশ কর। তারপর ভাল গোয়ালার নিকট হইতে দম্বল আন। এই দম্বলের সামান্য অংশ ঘনীভূত দুধে বেশ করিয়া মিশাইয়া দাও। পরে কোনও অল্প গরম স্থানে, যথা উনানের পার্শ্বে—ওই দুধ বসাইয়া দাও। ছয় সাত ঘণ্টায় উহা ঘন দই হইয়া বসিবে।

তবে এইরূপ প্রকরণ অপেক্ষা আজকালকার বৈজ্ঞানিক প্রকরণ মতে—কিছু বিশেষত্ব আসিয়াছে। এক পেয়ালা পূর্ব্বোক্তমত ঘন দুধে এক চামচ চিনি দিলে আরও ভাল দই হয়। খড়ি কেলসিয়ম্ জাতীয় একটি পদার্থবিশেষ—ইহাকে বেশ গুঁড়া করিয়া, দধির সঙ্গে এক চামচ মিশাইলে দই খুব শক্ত হইয়া বসে ও বিশেষ উপকারী হয়। কেলসিয়ম আমাদের দেহের পক্ষে বড়ই উপকারী।—উহাতেই আমাদের দেহের অস্থি পুষ্ট হয়। স্নায়ুমণ্ডলী ও মস্তিষ্কের উহা একটি বড়ই প্রয়োজনীয় উপকরণ। সকল জীব-কোষেই ইহা দরকার। ইহার সাহায্যেই কোষটি দ্বিভাগ হইয়া শরীরবৃদ্ধির কার্য্য করে। শিশুবয়সে এই দ্রব্যের অভাব হইলে অনেক রোগ হয় ও দেহ ভালরূপে গঠিত হয় না। স্কার্ভী এক রকম রক্তপড়া রোগ। আবার যুবাবয়সে—এই বস্তুর অপচয় হইলে—স্নায়ুদৌর্ব্বল্য আসে। আমাদের দেশের অনেক শিক্ষিত লোকের প্রস্রাবের সঙ্গেই এইরূপ শারীরিক বিকার ঘটে। ইহার লক্ষণ মন্দাগ্নি, স্নায়ুদৌর্ব্বল্য—শীর্ণ হওয়া, ও মনের একরূপ ক্লান্তিমাখা বিষণ্ণ ভাব।

অতএব ক্যালসিয়ম বা খড়ি-গুঁড়া দিয়া দই পাতিলে দই খুব ভাল হইয়া বসে ও উপকারী হয়। দইয়ে ল্যাকটিক এসিডের অতিরিক্ত টক-ভাবও হইতে পারে। উক্ত প্রকার দধি বড়ই ক্ষতিকর—বেশী টক হইলে সেই জীবন্ত ল্যাকটিক্ এসিড্ বেসিলীগুলি—বড়ই জখম্ ও নিস্তেজ হয়। এই জন্যই অতিরিক্ত টক্ দধিতে বাতরোগ আনিয়া থাকে। এইরূপ যত প্রকার কেলসিয়ম হইতে উৎপন্ন দ্রব্য আছে তন্মধ্যে—কোরাইড সাবকেট্ ও ল্যাকটেট্ প্রধান—শেষোক্ত ল্যাকটেট্ই রক্তে শীঘ্র মিশিতে পারে ও শীঘ্র ফল দান করে। অন্য গুলির ক্রিয়ায় অনেক দেরী লাগে।

দুধ হইতে—এইরূপ প্রণালীতে—ঘন চিনি ও খড়িগুঁড়া দিয়া—কুসম গরমে (৪০°C) রাখিয়া, (যথা উনানের পার্শ্বে)—দই পাতিলে দই বড়ই ঘন, উপকারী, সুস্বাদু ও সুগন্ধি হয়। মন্দাগ্নি রোগে, যক্ষ্মাকাশে, স্নায়ু দৌর্ব্বল্যে, ও উদরাময়ে এবং অনেকানেক অন্য রোগে এইরূপে প্রস্তুতকরা দধি বড়ই উপকারী।

ইহাতে খাঁটি দুধের সকল সারই থাকে—সুগন্ধি, সু-স্বাদু, মুখরোচক ও অগ্নিদ্দীপক; খাদ্য সম্বন্ধে ইহা অনেক উপদ্রব নিবারণ করে। কি শিশুবয়সে কি যৌবনে কিংবা বার্দ্ধক্যে দুগ্ধের এইরূপ ব্যবহার বড়ই উপকারী। কেবল বৃদ্ধ বয়সে শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অংশে আপনিই চূণ জমে বলিয়া তৎকালীন আহারের জন্য খড়ি না দিয়া প্রস্তুত করাই শ্রেয়ঃ। দই খাইবার আগে এই কয়টি কথা মনে

রাখিতে হইবে—দইয়ের জমাট-বাঁধা অংশটি যত উপকারী, তাহার বর্ণহীন তরল অংশটি তত নয়। সেইটিতেই অতিরিক্ত পরিমাণে ল্যাকটিক এসিড থাকে এবং সেটি ফেলিয়া দিলেই ভাল হয়। কাপড়ে করিয়া ঝুলাইয়া রাখিলে ছানার মত দইয়ের জলও সব কাটিয়া যায়। ইহাতে আকৃতিও অনেক কম হয়। তার পর আরও ঐ জমা দইয়ের উপর উপর ধুইয়া লওয়াও যাইতে পারে। এই দই নুন মরীচ দিয়া বা কিছু চিনির সহিত মিশাইয়া সেব্য। ইহাতে একটু একটু সুন্দর অম্লমধুর রসের তার হয়। এই জল-ঝরা শুক্না শুক্না দই ব্যবহার বড়ই প্রশস্ত।

তবে যে প্রথমে ল্যাকটিক এসিড্‌বিশিষ্ট তরলাংশ কাটাইয়া ফেলিয়া তৎপরে ন্যূনাধিক টাটকা জল মিশাইয়া পাতলা করিয়া—ছাঁকিয়া বা না ছাঁকিয়া—অর্থাৎ দইকে ঘোল করিয়া খাওয়া—প্রশস্ত বলিয়া অনেকের বিশ্বাস আছে—সে কথাও অলীক নহে। কারণ দইয়ের স্নেহযুক্ত সামগ্রীর (যথা মাখন) সূক্ষ্ম-স্নেহকণাগুলি আলোড়ন করিয়া ব্যবহার করিলে আরও গুণ বাড়ে। স্নেহকণাগুলি আলোড়নে সূক্ষ্মতম কণিকায় পরিণত হইয়া আরও শক্তিশালী হয় (Ironised); কারণ তাহারা রক্তমধ্যে অতি শীঘ্র শোষিত হইয়া থাকে। ও এই ছোট সারাল কণাগুলি শরীরে প্রবেশ করিয়া অনেক স্বাস্থ্য ও শক্তি দেয়; দধির সাধারণ গুণ ছাড়া ইহা আর এক রকমের উপকারিতা—সেই মন্থন করা সূক্ষ্মতম অণুগুলি পরিমাণে কম হইলেও কি এক অজানা-রকমে (Ironisation) আশু শক্তিশালী হয় দুধের বাটি ধুইয়া খাইলে আরও শক্তি হয়, তাহাও এই প্রণালীতে, সার হিসাবে নহে।

দুধের রোগবীজকোষকীটাণুগণ নিজেই প্রসার পায় ও সংক্রামক হয়। এই জন্যই দুগ্ধ হইতে দধি নিরাপদ। টাইফইড, যক্ষ্মা, বিসূচিকা প্রভৃতি অনেক ব্যাধি প্রায় দুধ হইতেই ঘটে।

শুদ্ধ শুক্না টেবলেটগুলি ও যাহাকে বাজারে "Pure culture of Lactic Acid Bacille বলে, সেগুলি তত ভাল ক্রিয়া করে না। কেবলমাত্র ল্যাকটিক এসিডের ক্রিয়া একাধারে সকল ক্ষমতা নাই—আরও পাচটি ছটি জীবাণু মিলিয়াই দধির উপকারিতা মধুরতা, সুগন্ধ ও সু-তার জন্মাইয়া দেয়।

শ্রীইন্দুমাধব মল্লিক।

বায়স্কোপ

অতিপ্রাচীন কাল হইতেই সকলদেশে চিত্রশিল্প যথোচিত আদৃত হইয়া আসিতেছে। অতি প্রাচীন যুগের পর্ব্বত গাত্র-খোদিত চিত্রগুলি এই বিজ্ঞান-আলোকিত বিংশ শতাব্দীর অভিনব চিত্রাবলীর মত সমানই চিত্তাকর্ষক ও আনন্দদায়ক ছিল। চিত্র সকল ভাষায় কথা কহে জাতি বিশেষের অপেক্ষা রাখেনা—তাই চিত্রের জগদ্ব্যাপী আদর। চিত্র-জগতে বর্ত্তমান যুগের অদ্ভুত আবিষ্কার—বায়স্কোপ। ইহার দিন দিন যে রূপ উন্নতিসাধন হইতেছে এবং আদর ও উপকারিতা বাড়িতেছে, তাহাতে অনেক সময়ে মনে হয় - ভবিষ্যতে "বায়স্কোপ" বুঝিবা সংবাদপত্রের স্থান অধিকার করে। অনেক সময় দ্বিপ্রহরের ঘটনা—সন্ধ্যাবেলায়—বায়স্কোপ-সাহায্যে জীবন্তবৎ করিয়া তাহার চিত্র দেখাইয়া যে আনন্দ দেওয়া হইতেছে—সংবাদপত্রের শত বর্ণনাতেও সে আনন্দ পাওয়া অসম্ভব।

মূলতত্ত্ব—অনেকেই বোধ হয় লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, একটি কাঠিতে আগুন ধরাইয়া যদি অন্ধকারে অনবরত নাড়ান যায়, তাহা হইলে একটি শিখা না দেখাইয়া, একটি অগ্নিরেখা বলিয়া মনে হয়। ইহার কারণ এই যে, ঘন সঞ্চালনের জন্য চক্ষু মধ্যে একটি ছায়া চলিয়া যাইবার পূর্ব্বে আর একটি ছায়া আসিয়া পতিত হয়, এইরূপ সমস্ত

ছায়াগুলি শ্রেণীবদ্ধ হইয়া পরস্পরের সহিত এমন একটি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ঘটাইয়া দেয় যে, অগ্নি-বিন্দুর পরিবর্ত্তে একটি অগ্নি-রেখা মাত্র দেখা যায়।
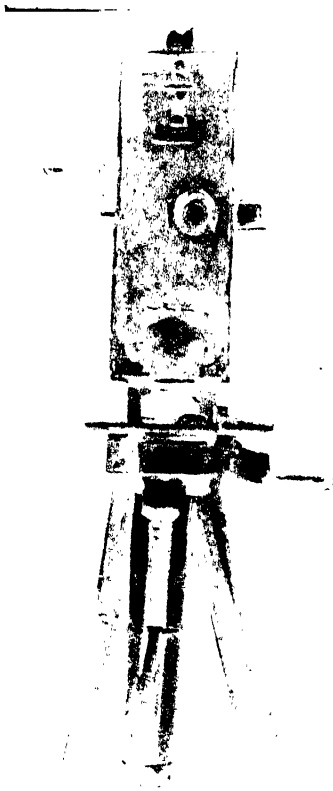
ছবি তুলিবার ক্যামেরা

বৈজ্ঞানিকগণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, এক সেকেণ্ডের লক্ষাংশ অপেক্ষাও অল্পক্ষণস্থায়ী বৈদ্যুতিক আলোও চক্ষের দ্বারা অনুভূত হয়। কিন্তু চক্ষু যত শীঘ্র অনুভব করিতে পারে ততশীঘ্র তাহার—সংস্কারের লোপ হয় না। পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে এই সংস্কার ১/২০ হইতে ১/১০ সেকেণ্ড পর্য্যন্ত স্থায়ী। এই কারণেই বৈদ্যুতিক স্ফুলিঙ্গ বাস্তব সময় অপেক্ষা অধিকক্ষণ স্থায়ী বলিয়া মনে হয়।

অতএব, ইহা হইতেই প্রতিপন্ন হইতেছে যে যদি কতকগুলি চিত্র একটির পর আর একটি অতি শীঘ্র শীঘ্র (চক্ষু হইতে একটির সংস্কার লোপের পূর্ব্বেই) চক্ষের সমক্ষে উপস্থিত করা হয়, তাহা হইলে চিত্র-সমষ্টিটি নিম্নলিখিত অবস্থা গুলির মধ্যে কোন একটি অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

(১) যদি একই চিত্র হয়, তাহা হইলে তাহারা অবিচ্ছিন্ন ভাবে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া যাইবে।

(২) যদি বিভিন্ন চিত্র হয় তাহা হইলে তাহাদের সবগুলি তালপাকাইয়া একটি নূতন জিনিষ বলিয়া প্রতীয়মান হইবে।

(৩) যদি দুইটি মাত্র চিত্র একসঙ্গে এইরূপ ভাবে শীঘ্র শীঘ্র চক্ষের উপর পড়ে তাহা হইলে তাহাদের সংমিশ্রণ হইবে।

(৪) আর যদি চিত্রগুলি সামান্য অবস্থা-ভেদ-পরম্পরায় চক্ষের উপর পড়ে তাহা হইলে চিত্রগুলিতে গতি লক্ষ্য হইবে।

চিত্রের বিভিন্ন গতি বুঝাইবার ফিল্ম

তৃতীয় অবস্থার একটি বেশ সুন্দর উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে, একখানি কার্ড গোল করিয়া কাটিয়া তাহার কল্পিত ব্যাসের দুই মুড়ায় দুইটি সূতা বাঁধ। এই সূতা দুইটি ধরিয়া দুই হস্তে ঐ কার্ডটিকে ঘুরাইতে থাক। এখন যদি এই কার্ডটির এক দিকে একটি পাখী ও অপর দিকে একটি খাঁচা বা একদিকে একটি ইঁদুর ও অপর দিকে একটি ইঁদুরের খাঁচা আঁকা থাকে তাহা হইলে ঐ কার্ডটি কিছুক্ষণ ঘুরাইবার পর দেখা যাইবে যে, পাখীটি বা ইঁদুরটি খাঁচার ভিতর চলিয়া গিয়াছে।

আমরা যখন একজনকে দৌড়াইতে দেখি, তখন সেই একই ব্যক্তির পদদ্বয়ের অবস্থা-ভেদের ছায়া আমাদের চক্ষে পড়িয়া ঐ দৌড়ানর ভাব জ্ঞাপন করে। কোন একটি চিত্রের দ্বারা, এই গতিটি বুঝান যায় না।

চক্ষের উপর স্থায়িত্ব হইতেই

ক্রমে এই গতিশীল চিত্র দেখাইবার প্রয়াস আরব্ধ হয়। ১৮৩৩ খৃঃ অব্দে প্লেটো (Plateau) তাঁহার (Phenakistoscope) ফেনাকিষ্টস্কোপ যন্ত্র আবিষ্কার করেন। ইহা একটি কার্ড বা টীনের চাকৃতি—তাহার ধারে ধারে একটি মানুষ বা জন্তুর গতির অবস্থাভেদ অঙ্কিত। প্রতি দুইটি চিত্রের পর একটি করিয়া খাঁজকাটা। এই চাকৃতির কেন্দ্রস্থল একটি মেরুদণ্ডের উপর অবস্থিত। চাকৃতির পার্শ্বেই একটি দর্পণে এই চাকৃতির ছবির ছায়া পড়ে। চাকৃতিটি ঘুরাইয়া এই খাঁজের ভিতর দিয়া দেখিলে ছবিগুলি দর্পণের গায়ে গতিশীল বলিয়া মনে হয়।

এইরূপে ক্রমে ক্রমে ফটোগ্রাফির সাহায্যে গতিশীল চিত্র দেখাইবার উন্নতির সূত্রপাত হইয়াছে। ক্রমে ১৮৭০—১৮৮০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ম্যারে (Marey) ও মায়ব্রিজ (Muybridge) নামক দুইব্যক্তি এই গতিশীল চিত্র দেখাইবার মানসে কতকগুলি ঘোটকের চিত্র গ্রহণ করেন। তখনও ফিল্মের আবিষ্কার হয় নাই। ম্যারে তখন একটি প্লেটের ধারে ধারে বার বার Exposure দিয়া এই চিত্র লইবার চেষ্টা করেন। মায়ব্রিজ কিন্তু অনেকগুলি ক্যামেরার সাহায্যে চিত্র গ্রহণ করিলেন। তিনি বহুদূর বিস্তৃত শাদা Back Ground দিয়া তাহার সম্মুখে সমান দূরে অনেকগুলি ক্যামেরা খাটাইলেন। ক্যামেরার Shutter গুলির সঙ্গে এমনভাবে সূতা বাঁধিয়া রাখিলেন যে, একটি ঘোড়া দৌড়িয়া যাইলে তাহার গায়ে লাগিয়া সূতাগুলি ছিঁড়িয়া যায় এবং সেই সঙ্গে তাহার ক্রমিক চিত্র উঠিয়া যায়। তাহার পর ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে আনশুট্জ্ (Anschutz) নামক জনৈক জার্ম্মাণ তাঁহার বৈদ্যুতিক টকিস্কোপ (Tachyscope) আবিষ্কার করেন। তিনি Negative হইতে কাচের Positive প্রস্তুত লইয়া, একটি প্রকাণ্ড চক্রের ধারে ধারে সাজাইলেন। এটি একটি পর্দ্দার সম্মুখে ঘুরান হইত এবং চিত্রের অনুপাত অনুযায়ী ইহার মধ্যস্থ একটি ক্ষুদ্র ছিদ্র দিয়া তাহা দেখিতে হইত।

১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে ফিতার আকারে ফিল্মের প্রবর্ত্তনে গতিশীল চিত্রের উৎকর্ষ-সাধনে যথেষ্ট সাহায্য হইল। তাহার পর Edisonএর Kinetoscope—ইহা ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথম প্রদর্শিত হয়। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দ হইতে এডিসন জীবন্ত চিত্র দেখাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। ইঁহারই প্রদর্শিত পথে ক্রমে ক্রমে ফ্যাণ্টস্কোপ, বায়স্কোপ, ফটোস্কোপ প্রভৃতি নির্ম্মিত হইতে আরম্ভ হয়। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে লুমিয়ের কোম্পানী (Messrs Lumiere Co.) ফ্রান্সে সিনামেটোগ্রাফ দেখাইয়া যথেষ্ট সুখ্যাতি অর্জ্জন করেন এবং এই সময় হইতেই গতিশীল চিত্রের যথার্থ আদর হইতে আরম্ভ হয়।

উপস্থিত য়ুরোপে ও আমেরিকায় এই সকল চিত্র তুলিবার অনেকগুলি কোম্পানী হইয়াছে। নাট্যশালা অপেক্ষা এই সকল চিত্রপ্রদর্শনীর এত আদর বৃদ্ধি হইয়াছে যে, এক লণ্ডনেই এই চিত্র দেখাইবার প্রায় ৪০০ চারি শতের অধিক স্থান আছে, সিকাগোতে ৩ শতের এবং নিউইয়র্কেও ৫ শতেরও অধিক স্থান হইয়াছে। আমেরিকার ইউনাইটেড্ ষ্টেট্সে এইরূপ প্রায় দশ সহস্র প্রদর্শনী আছে। আমাদের কলিকাতাতে গত ২।৩ বৎসরের মধ্যেই এই সকল চিত্র দেখাইবার অনেকগুলি দল হইয়াছে। ইহাদের ছয়টি সম্প্রদায় পাকা বন্দোবস্ত করিয়া প্রত্যহ ছবি দেখাইতেছেন। এই সকল চিত্র দেখাইবার ছোট বড় অনেকগুলি সম্প্রদায় হইয়াছে বটে, কিন্তু এই ছবি এখানে প্রস্তুত করিবার ব্যবসা এখনও কেহ আরম্ভ করেন নাই। আমাদের দেশে অনেক অর্থশালী ব্যক্তি আছেন; তাঁহাদের কএকজন মিলিয়া যদি এই ছবি প্রস্তুত করিয়া বিলাতে রপ্তানির ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে বিশেষ লাভ হইবার সম্ভাবনা। ভারতীয় চিত্রের বিলাতে আদর হওয়া খুব সম্ভব।

চিত্র তুলিবার প্রণালী।

এই সকল চিত্র কি করিয়া তোলা হয় জানিবার জন্য অনেকের কৌতূহল হইতে পারে। চিত্র-প্রস্তুতকারক বড় বড় কোম্পানী মাত্রেরই কারখানা-সংলগ্ন ছবি তুলিবার উপযুক্ত মঞ্চ (studio—theatres) আছে। প্রথমে নাটকের মত ছবির গল্পাংশ লিখিত হয় এবং রীতিমত বেতনভুক্ সম্প্রদায় কর্তৃক মহলা দিয়া অভিনীত হয়। এই সকল ষ্টুডিও কোল কাচ দিয়া নির্ম্মিত। অসংখ্য দৃশ্যপট ও উপযুক্ত পরিচ্ছদাদিও ইঁহাদের সংগ্রহ করিতে হয়। চিত্রগুলিকে সঠিক দেখাইবার জন্য যত প্রকার পরিচ্ছদ

আবশ্যক, সমস্ত সংগ্রহ করিতে হয়। অনেক ষ্টুডিও বাগানের মধ্যে অবস্থিত। এই সকল স্থানের প্রাকৃতিক দৃশ্য যতদূর সম্ভব মনোরম দেখিয়া ষ্টুডিওর স্থান নির্বাচন করা হয়। ঘরের বাহিরের ছবি প্রাকৃতিক দৃশ্যের উপর অনেকটা নির্ভর করে। জলের দৃশ্য বড়ই মনোরম—সেইজন্য অনেকেই জলের দৃশ্য তুলিবার জন্য নদীর ধারে বা সমুদ্রতীরে ষ্টুডিও নির্ম্মাণ করিয়াছেন। কোন একটি বিখ্যাত আমেরিকান কোম্পানী আমেরিকার আদিম অধিবাসীদিগের অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর চিত্র প্রস্তত করেন। এই সকল চিত্রের জন্য তাঁহাদের একটি প্রকাণ্ড বনের মধ্যে, পাহাড়ের ধারে অসভ্য জাতির বসতি রাখিতে হইয়াছে। ইহাদের কতকগুলি লোককে রীতিমত শিখাইয়া, মহলা দিয়া, ছবি তুলিতে হয়।

এত বড় এই কাচের ষ্টুডিওগুলির এক একটি সময় সময় মঞ্চের উপর যাহাতে ৪।৫ শত লোকের এক সঙ্গে স্থান হয় এরূপ বন্দোবস্ত থাকে। একটি যুদ্ধের দৃশ্য তুলিতে, যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম সমেত বহু লোককে একসঙ্গে মঞ্চে উঠিতে হয়।

আমেরিকার ভিটাগ্রাফ কোম্পানীর ফিল্ম তুলিবার জন্য নিজেদের অনেকগুলি জাহাজ রাখিতে হইয়াছে—এই জাহাজে করিয়া শিল্পিগণকে প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে ছবি তুলিবার জন্য এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যাওয়া হয়।

ছবির জন্য অভিনয় ও নাট্য অভিনয়ে অনেক প্রভেদ। ছবির অভিনেতা খুব সুচতুর না হইলে চলে না—কারণ, হাব-ভাবেই তাহাকে মনের কথা বুঝাইতে হয়। প্রত্যেক মনের ভাবের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে মুখের ও শারীরিক ভাবের পরিবর্ত্তন না হইলে চিত্রের জন্য অভিনয় হয় না। নাট্য অভিনয়ে যাহা কথায় বুঝাইতে হয়, ছবিতে তাহা ভাবে বুঝাইতে হয়। কথায় মনের ভাব প্রকাশ অপেক্ষা আকার ইঙ্গিতে বুঝান অনেক কঠিন। এই কারণে ভাল ছবি অভিনেতাদের পারিশ্রমিক খুব বেশী। অনেক সময় নাট্য-সম্প্রদায় এরূপ পারিশ্রমিক দিতে অসমর্থ হ'ন।

এই অল্পদিনের মধ্যেই অনেক ভাল অভিনেতার নাম আমাদের অনেকের কাছে সুপরিচিত। Max Linder, Nick Winter প্রভৃতির নাম অনেকেই জানেন। ইঁহাদের অভিনয় দেখিয়া অনেক সময়ে লোকে আত্মহারা হইয়া করতালি প্রদান করেন। কিছুদিন পূর্ব্বে ইংলণ্ডের বিখ্যাত নাটক অভিনেতা Sir H. B. Treer--Henry viii অভিনয়ের ছবি হইয়াছে। Sarah Bernhardt-এর অভিনয়েরও ছবি লওয়া হইয়াছে।

ছবি তুলিবার পূর্ব্বে অনেক দিন ধরিয়া সেই বিষয়টির মহলা দিতে হয়। যতদিন না মহলা নিখুঁত হয়, ততদিন ছবি লওয়া হয় না। ছবি তুলিবার পূর্ব্বে ইঙ্গিত মাত্র অভিনেতৃগণ অভিনয় আরম্ভ করেন, অনেক সময় অভিনয়ের সাহায্যের জন্য কথা কহিয়াও অভিনয় চলে।

অনেকগুলি চিত্রের জন্য অনেক সময়ে অনেক অনুসন্ধান করিয়া সাময়িক পরিচ্ছদ ও দৃশ্যাদি নির্ম্মাণ করিতে হয়। ইহাতে অজস্র অর্থব্যয় হয়। সুপরিচিত "Uncle Tom's cabin" অভিনয়ে কাফ্রিদের দিয়াই তুলাক্ষেত্রের দৃশ্যটি অভিনীত হইয়াছিল। বাস্তবিকতাই চিত্র অভিনয়ের প্রাণ এবং এই বাস্তবিকতার জন্য ভাল ভাল সম্প্রদায়েরা যে কি পরিমাণে অর্থব্যয় ও ক্লেশ স্বীকার করেন তাহা বুঝান কঠিন। একটি জাহাজ ভাঙ্গার দৃশ্য দেখাইবার জন্য এক সম্প্রদায় একটি পুরাতন জাহাজ কিনিয়া সত্য সত্যই তাহাকে বারুদ সংযোগে চূর্ণ করিয়া তাহার চিত্র গ্রহণ করেন। এইরূপ অনেক সময়ে রেল-সংঘর্ষণ (Train collission) প্রভৃতি দেখাইবার জন্য এঞ্জিন ভাঙ্গিয়া ছবি লইতে হয়।

এমন অনেক ছবি আছে, যাহা একেবারে বাস্তব হইতে গ্রহণ করিতে হইলে মানুষ খুন করিতে হয়। তাহা অবশ্য করা হয় না। এ সকল স্থলে কৌশলের সাহায্য লওয়া হয়। যেমন একটি লোক বহু উচ্চ ছাদ হইতে পড়িয়া গেল—বা কিছুদিন পূর্ব্বে এখানে যে চিত্রটি দেখান হইয়াছিল যে একটি লোক সার্কাসের তাঁবুর মাথা হইতে ঘোড়াশুদ্ধ পড়িয়া গিয়া ঘোড়া ও মানুষ উভয়ে মরিয়া গেল—এই চিত্র কি বাস্তব হইতে গৃহীত হইতে পারে? ইহার পতনের কতকটা সত্য—বাকিটা ঐরূপ একটি নকল ঘোড়া ও পুতুল। খানিকটা দূর বাস্তবের ছবি লইয়া ক্যামেরার

মুখ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল, তাহার পর কৃত্রিম মূর্ত্তিটা ফেলিয়া দিয়া ক্যামেরার মুখ খুলিয়া দেওয়া হইল—মাটির নিকট পর্য্যন্ত কৃত্রিম মূর্ত্তির ছবি লওয়া হইল, তাহার পর পুনরায় ক্যামেরার মুখ বন্ধ করিয়া যথার্থ মূর্ত্তিকে সাজাইয়া আবার ক্যামেরার মুখ খুলিয়া দেওয়া হইল।

অনেক সময় দেখান হয় যে, একটা রোলারের নীচে একটা মানুষ চাপা পড়িয়া আবার পূর্ব্ববৎ উঠিয়া দাঁড়াইল। ইহা কি সম্ভব? ইহাতে প্রথমে মানুষটিকে চাপাইয়া দিয়া যতদূর সম্ভব তাহার নিকটে রোলার আনিয়া ছবি লওয়া হইলে, ক্যামেরার মুখ বন্ধ করিয়া দিয়া প্রকৃত মানুষের পরিবর্ত্তে ঠিক ঐ লোকটির অনুরূপ একটা পুতুলকে চাপা দেওয়ার ছবি লওয়া হইল—এই পর্য্যন্ত ছবি লইয়াই ক্যামেরার মুখ বন্ধ করিয়া পুতুলের পরিবর্ত্তে পুনরায় জীবন্ত মানুষটিকে দেখান হইল।
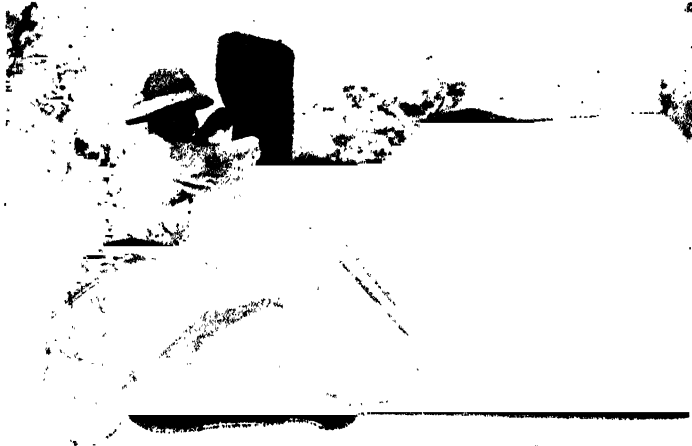
বন্যজন্তু শিকার

অনেক সময়ে দেখান হয় যে, একজন বাড়ীর দেওয়ালের উপর সোজা উঠিয়া গেল। ইহা কি করিয়া দেখান হয়? বাটীর একটি দেওয়ালের প্রতিকৃতির সিনটি মাটীতে রাখিয়া লোকটি তাহার উপর দিয়া বুকে হাঁটিয়া যায়—এখন এমন স্থান হইতে ইহার ছবি লওয়া হয় যে, যখন আমরা এই চিত্র দেখি, তখন ঠিক মনে হয় যে, লোকটি বাড়ীর দেওয়াল বহিয়া উঠিতেছে।

অনেক সময়ে চেয়ার টেবিল নাচিতেছে দেখান হয়। ইহার কারণ আর অন্য কিছু নহে,—সূক্ষ্ম তার দিয়া এগুলিকে নাচান হয়। তাহার পর ফিল্মের গা হইতে এই তারের ছবি মুছিয়া দেওয়া হয়। যত রহস্যময় ছবি দেখা যায়, তাহার অধিকাংশই এইরূপ মুছিয়া দেখান।

অনেক সময় এয়ারোপ্লেন হইতে চিত্রসকল গৃহীত হয়, কাজে-কাজেই এই সকল চিত্রের দরও অধিক। সিনামেটোগ্রাফির উন্নতিকল্পে এক একজন শিল্পী জীবনের মায়া পরিত্যাগ করিয়াও প্রাকৃতিক দুর্য্যোগের মধ্যেও চিত্র সংগ্রহ করিতে ছাড়েন নাই। Cherry Kearton সাহেব আফ্রিকায় কতকগুলি বন্য জন্তু শিকারের এমন ভয়াবহ দৃশ্যের ছবি লইয়াছেন যে, দেখিলে রোমাঞ্চ হয়। ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া একা কতকগুলি কাফ্রিকে সঙ্গে লইয়া একটি সিংহ শিকারের—শিকার দেখা হইতে সংহার পর্য্যন্ত আগাগোড়া ছবি তুলিয়াছেন। ছবি তুলিতে তুলিতে এক সময় সিংহটা তাঁহাকেই আক্রমণের উদ্যোগ করে—সিংহ যখন তাঁহার ১০ ফিট নিকটে আসিয়া পড়ে, তখনও তিনি নিজের কাজ হইতে বিরত হন নাই। সেই দিন সেই কাফ্রিটা সিংহের দৃষ্টি অন্য দিকে আকর্ষণ না করিলে আর তাঁহার রক্ষা থাকিত না। Kernton সাহেব এইরূপ যে কত গণ্ডার, জলহস্তী, জেব্রা, জিরাফ প্রভৃতি আফ্রিকার ভয়াবহ পশুর চিত্র তুলিয়াছেন, তাহার সংখ্যা নাই।

এই সকল জন্তুর ছবি তুলিতে পাথে কোম্পানীর M. Machin সাহেব আর একজন নির্ভীক পুরুষ। তাঁহার একখানি চিত্রে ৫০টি জলহস্তীর পাল পলাইতেছে, দেখা যায়। হস্তি-শিকারের অতি সন্নিকটে থাকিয়া তাহার ছবি লইয়াছেন, ইঁহাদের ন্যায় সাহসী শিল্পী অতি বিরল।

অনেক সময় সাধারণ অবস্থাতেও বাস্তবিকতার আগ্রহে চিত্র-সংগ্রহে বিপদ ঘটে। আমেরিকার কিনেমা কলার কোম্পানীর মেকেঞ্জি সাহেব একটি ১২ ইঞ্চি Shell ইস্পাতের

পাতে লাগিয়া ফাটিবার ছবি সংগ্রহের জন্য তাহার মাত্র ৪৫ ফিট দূর হইতে ছবি লইতে যান। গোলাটি ফাটিয়া তাহার একখণ্ড আসিয়া ক্যামেরার ষ্ট্যাণ্ডে লাগিয়া একটি পায়া ভাঙ্গিয়া দেয়, আর একখণ্ড ক্যামেরার সম্মুখের কাঠের উপর দৃঢ়ভাবে প্রোথিত হয়। এইরূপ পাশ্চাত্য শিল্পিগণ শত শত বিপদের সম্মুখীন হইয়াও জীবন্ত ছবির উৎকর্ষ সাধনে পরাঙ্মুখ হন না।

প্রয়োজনীয়তা।—১৯০৯ সালে আমেরিকায় যখন এইরূপ প্রদর্শনীর সংখ্যা অল্প ছিল, তখনই ইউনাইটেড্ ষ্টেট্সে ২ লক্ষ ২৫ হাজার লোক প্রত্যহ এই সকল চিত্র দেখিয়াছে। কাহারও কাহারও মতে আমেরিকার এই চিত্র-প্রদর্শনীগুলি জাতীয় চরিত্র-গঠনের প্রধান সহায় হইয়াছে।

সিনামেটোগ্রাফের সাহায্যে অনেক বৈজ্ঞানিক বিষয়ের চিত্র তোলা হইয়াছে। বন্দুকের নল হইতে বাহির হইয়া চাঁদমারিতে লাগা পর্য্যন্ত গুলির গতির চিত্র লওয়া হইয়াছে। সিনামেটোগ্রাফে X-rayর সংযোগে অনেকগুলি অদ্ভুত চিত্র সংগৃহীত হইয়াছে। পাকস্থলীতে কি করিয়া খাদ্য জীর্ণ হয়, তাহার ক্রমিক চিত্র লওয়া হইয়াছে। ধমনীর ভিতর রক্ত চলাচলের চিত্র লওয়া হইয়াছে। সিনামেটোগ্রাফের দ্বারা চিকিৎসা-বিজ্ঞানের আরও কত সাহায্য হইতে পারে, কে বলিতে পারে!

আজকাল সিনামেটোগ্রাফের দ্বারা অনেক সাময়িক ঘটনা দেখান হয়। ঘটনা-সময়ের পর ৪।৫ ঘণ্টার মধ্যে film প্রস্তুত করিয়া দেখান হইতেছে। প্রকারান্তরে এগুলি সংবাদ-পত্রের কাজ করিতেছে, অথচ সংবাদ-পত্র অপেক্ষা বহু পরিমাণে চিত্তাকর্ষক।

সিনামেটোগ্রাফে আনন্দ দান অপেক্ষা আরও বিশেষ উপকারিতা আছে। যে সকল ঐতিহাসিক ঘটনা এখন সজীবভাবে চিত্রিত হইতেছে, দুইশত বৎসর পরে, তাহাদের স্মৃতিলোপ পাইবে না।

সিনামেটোগ্রাফের চিত্র দেখিয়া ২০০ বৎসর পরেও এখনকার পোষাক-পরিচ্ছদ, আচার-ব্যবহার প্রভৃতি আমাদের বংশধরগণ প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে, ইহা কি কম সুবিধার কথা? এই চিত্র-প্রদর্শনীর যত আদর বৃদ্ধি হয়, ততই মঙ্গল। ৫।৬ বৎসর পূর্ব্বে ছোট ছোট গল্প রচনা করিয়া, তাহারই চিত্র দেখান হইত; কিন্তু এক্ষণে নানা দেশের বিখ্যাত নাটকীয় চিত্র প্রদর্শিত হইতেছে—ঐতিহাসিক চিত্রের ত কথাই নাই। Shakespeareএর Hamlet, Romeo Juliet, ইটালিয়ান নাটক Padre (father) এর অভিনয় বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। ঐতিহাসিক চিত্রের মধ্যে Fall of Troyএর তুলনা নাই। প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিকদের উপন্যাসের গল্পাংশও এইরূপ সজীবভাবে প্রদর্শিত হইতেছে। এক লে মিজারেব্‌লের ফিল্‌মটিই ১২০০ ফিট লম্বা। শীঘ্রই Quo Vadisএর চিত্র Elphinstone বায়স্কোপে দেখাইবার বন্দোবস্ত হইতেছে। এই সম্প্রদায়-প্রদর্শিত Captain Scottএর মেরুপ্রদেশ যাত্রার চিত্রও অতিশয় হৃদয়াকর্ষক ও শিক্ষাপ্রদ। যাঁহাদের বড় বড় উপন্যাস, ইতিহাস প্রভৃতি পড়িবার ধৈর্য্য থাকে না, তাঁহাদের আনন্দের ছলে Cinematograph যে কত উপকার করিতেছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না।

শ্রীপ্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য।

সংক্ষিপ্ত উদ্যান।

নানা কারণে অনেকে ইচ্ছাসত্ত্বেও উদ্যান-সুখ উপভোগ করিবার সুযোগ বা সুবিধা পান না। বাগান-বাগিচা করিবার পক্ষে অনেকগুলি অন্তরায় আছে, কিন্তু তাহা বলিয়া যে, সে সকল অন্তরায় অতিক্রম করা যায় না, কিংবা অন্য উপায়ে উদ্যান-সুখ লাভ করিতে পারা যায় না, এমন মনে হয় না।

উদ্যান করিতে হইলে, প্রথমেই অল্পাধিক কতকটা জায়গার প্রয়োজন, তারপর জনমজুরের প্রয়োজন। এতদ্ব্যতীত অর্থব্যয়ও আছে, পরিদর্শন করিতেও হয়। যাঁহারা গৃহপালিত পশুপক্ষ্যাদি পালনে আনন্দ অনুভব করেন, তাঁহাদিগকে চিড়িয়াখানা নির্ম্মাণ না করিয়াও নিজ নিজ প্রিয় জীবজন্তু প্রতিপালন করিতে দেখা যায়, অল্প পরিসর মধ্যেই নির্ব্বাচিত পশু বা পক্ষীদিগকে তাঁহারা কত-না যত্ন সহকারে লালনপালন করেন, তন্নিবন্ধন কত না সুখ উপলব্ধি করেন! কাহারও বাটীতে ছাগ বা গাভী

আছে, কাহারও বাটীতে টিয়া, চন্দনা, ময়না, শ্যামা, দয়েল, চড়ুই প্রভৃতি থাকিয়া প্রভুকে ও তদীয় পরিবারবর্গকে আনন্দিত করে, কোকিলের ঝঙ্কারে প্রতিবেশিগণ পর্য্যন্ত আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে। যে নিয়মে আমরা এই সকল পশুপক্ষীদিগকে প্রতিপালন করিয়া সুখলাভ করি, ঠিক সেই নিয়ম অবলম্বনে উদ্ভিদ পালন করিয়া আমরা তদপেক্ষা অধিক সুখ, অধিক আনন্দ ও সেই সঙ্গে কিছু-কিছু জ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতা লাভ করিতে পারি।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা বিস্তৃত বিষয়ের অবতারণা না করিয়া, যেরূপে গৃহপালিত পশু-পালনের ন্যায় সংক্ষিপ্তভাবে নানাবিধ ফলফুল বা নয়নরঞ্জক উদ্ভিদ পালন করিতে পারি, তাহারই আলোচনা করিব। পশুপক্ষী ও উদ্ভিদ পালন মধ্যে একটা লাভালাভের কথা আছে, অগ্রে তাহার বিচার করিয়া দেখিব যে, কোন্ কোন্ পশুপক্ষী বা বৃক্ষ-লতা আমাদিগের শ্রম ও অর্থব্যয়ের প্রতিদান করিয়া থাকে। টিয়া, চন্দনা, ময়না প্রভৃতি পক্ষিগণ আপনাপন সৌন্দর্য্য প্রদর্শন করাইয়া, কিংবা স্বরঝঙ্কার দ্বারা প্রভুর মনস্তুষ্টি করে। গাভী বা ছাগী দুগ্ধপ্রদান করিয়া শিশুর প্রাণরক্ষা করে, বয়স্থদিগের সৌন্দর্য্য-সম্পদ প্রদান করে, জীর্ণদিগকে শক্তি দেয়, শীর্ণদিগকে পরিপুষ্ট করে, ইহা ব্যতীত ইহারা গৃহস্থালীর যে কত কাজে আসে, তাহা কত বর্ণনা করিব? গাভীর শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিবার প্রয়াস পাওয়া নিতান্ত ধৃষ্টতা মাত্র। গর্ভধারিণী জননীর পরেই গাভীর নিকট পৃথিবীর যাবৎ নরনারী ঋণী, ইহা কে অস্বীকার করিতে পারে? বর্ত্তমান কলিকাতার কথা ধরি, বিশপঁচিশ বৎসর পূর্ব্বেও এই সহরে অনেক প্রাচীন অধিবাসিন্দাদিগের বাটী-সংলগ্ন অল্পাধিক জমি ছিল, তাহাতে অনেক গাছপালা ও পুষ্করিণী ছিল। আজকাল কলিকাতায় মানুষেরই স্থানাভাব, গাছের স্থান কোথা হইতে হইবে? খাস কলিকাতা অতিক্রম করিবার পূর্ব্বেই, দক্ষিণে কালীঘাট, ভবানীপুর, উত্তরে কাশীপুর, দমদমা, পূর্ব্বে বেলেঘাটা, ট্যাংরা, চিৎপুর...

স্থানে এখনও অনেক গৃহস্থালী-গাছপালা—নারিকেল, সুপারি, সজিনা, কদলী, আম, কাঁঠাল প্রভৃতি স্থায়ী আওলাতের সঙ্গে লাউ, কুমড়া, শশা, ঝিঙ্গা, উচ্ছে, বেগুণ প্রভৃতি নানাবিধ তরকারি উৎপন্ন হইয়া থাকে। সহরের জমির মূল্য এত অধিক যে, আর বাগান-বাগিচার জন্য জমি খরচ করা, অনেক দিন হইতে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। কলিকাতায় জমি-জিরাত মহার্ঘ হইয়াছে বটে, কিন্তু উপকণ্ঠ বা পল্লীগ্রামের জমির মূল্য সে হারে বৃদ্ধি পায় নাই বলিয়া শেষোক্ত স্থানে এখনও লোকের ভিটাভূমিসংলগ্ন জমি আছে, গাছপালা আছে, তবে লোকের অর্থাভাব ও সময়াভাব বলিয়া বন-জঙ্গলে পরিণত হইয়াছে। পূর্ব্বে লোকের বাগ-বাগিচার দিকে নজর ছিল, নিজ নিজ জমিতে ফলপাকুড়, তরিতরকারি উৎপন্ন না হইলে চলিত না। অধিকাংশ ভদ্রলোকের বাড়ীতে বিগ্রহ ছিলেন; কাজেই প্রতিদিন তাঁহাদিগের অর্চ্চনার জন্য পুষ্প, বিল্বপত্র ও তুলসীর প্রয়োজন ছিল, অগত্যা সকল বাড়ীতেই তরিতরকারি, ফলমূল ও পুষ্পাদির গাছপালা থাকিত। এক্ষণে নূতন নূতন বাড়ী, বড় বড় অট্টালিকা নির্ম্মিত হইতেছে সত্য, কিন্তু পূজা-মণ্ডপ, বা ঠাকুর-ঘর কয়টি বাড়ীতে আছে? ঠাকুর নাই, ফুলের কি প্রয়োজন? বাজারে সকল জিনিষ পাওয়া যায়, বাড়ীতে ফলমূল উৎপাদনেরই বা কি প্রয়োজন? প্রয়োজনীয়তার কথা ছাড়িয়া দিই, আমোদ-আহ্লাদের কথাই বলি। শুনিয়াছি, চীনদেশে এতই লোকসংখ্যা অধিক যে, বহুলোককে সপরিবারে বারমাস বিলখাল ও নদী-সাগরে তরণীতে বাস করিতে হয়; অপিচ সহরবাসীদিগের ঘরবাড়ীর ছাদ বিক্রয় হয়, কত লোক ছাদ কিনিয়া তাহার উপর স্থায়িভাবে নিজ নিজ ঘরবাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া বসবাস করে। সমগ্র ভারতে এখনও কোটী কোটী বিঘা জমি পতিত আছে, সহরবাসীরও এখনও এত অর্থাভাব হয় নাই যে, ছাদ বিক্রয় করে। সুতরাং ছাদ ও আকাশ আমাদিগের নিজস্ব সম্পত্তি। সেই ছাদে আমরা কিরূপে গাছপালা জন্মাইতে পারি, ফলফুল ফলাইতে পারি, এক্ষণে তাহাই দেখিব।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, চিড়িয়াখানা নির্ম্মাণ না করিয়া আমরা যখন পশুপালনসুখ লাভ করিতে পারি, তখন কর্জ্জন-পার্ক

বা ইডন্‌গার্ডেন কিংবা লালদীঘি, গোলদীঘি তৈয়ারি না করাইয়া গাছপালার চর্চ্চা করিতে পারি, ছাদ হইতে এক কাঁদী কদলী, কিংবা ২।১০ স্তবক আঙ্গুর, ২।৫টি আনারস কিংবা শশা, কাঁকুড়, উচ্ছে, বেগুণ উৎপন্ন করিতে পারি ; অন্ততঃ বেল, মল্লিকা, যুঁই, গোলাপ ত পাইতে পারি।

ছাদে বাগান করিতে হইলে কি কি প্রয়োজন? এতদর্থে প্রথমেই দেখিতে হইবে যে, উদ্ভিদকে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে, সে কি কি চাহে, জীবোদ্ভিদ নির্ব্বিশেষে আলোক, উত্তাপ, বায়ু ও রস এই চারিটি জিনিস সকলেরই একান্ত প্রয়োজন, উক্ত কয়টি জিনিসের মধ্যে কোনটিকে বাদ দিলে জীব কি উদ্ভিদ কোনরূপে জীবিত থাকিতে পারে না। 'জীবিত থাকিতে পারে না' এতদর্থে এমন কথা বলি না যে, উল্লিখিত কয়টি হইতে কোন একটি বা দুইটি কিংবা চারিটিকেই উদ্ভিদ বা জীব হইতে বিচ্ছিন্ন করিবামাত্রই তাহা মরিয়া যাইবে। জীবন অর্থে মাত্র প্রাণটি নহে। জীবিত থাকিতে হইলে সুস্থ ও সবল থাকিয়া জীবনের বিধি-নির্দ্দিষ্ট ব্রত সমাপ্ত করিয়া যাওয়া চাই। আজীবন হাঁসপাতালে থাকিয়া ঔষধপথ্য সেবন করিয়া মানবলীলা সাঙ্গ করা মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য নহে। নীরোগশরীরে প্রফুল্লচিত্তে বাঁচিয়া থাকিয়া গৃহস্থালী করিবার সঙ্গে সঙ্গে সমাজ ও ধর্ম্মের সেবা করিতে হইবে, ইহাই হইল মানবজীবন। মানবজীবনে যেরূপ এক একটি কাজ আছে, পশুপক্ষী বা উদ্ভিদেরও সেইরূপ বিশিষ্ট কাজ আছে; সুতরাং উদ্ভিদকে তদীয় স্বধর্ম্মানুসারে সাধ্যমত প্রচুর ফলফুলাদি প্রদান করিয়া যাইতে হইবে, নতুবা উদ্ভিজ্জীবনের সম্পূর্ণতা বাকি থাকিয়া যায়।

মাতৃজঠরে জীব সঞ্জাত হইবার ক্ষণপর হইতেই ভাবী জীবের একটি অবয়ব সংগঠিত হয়—জীবনী-ক্রিয়ার কার্য্যারম্ভ হয়, কিন্তু সে অবস্থায় উহা এতই পরমুখাপেক্ষী যে, গর্ভধারিণী হইতে স্বতন্ত্রীকৃত হইলে এক মুহূর্ত্তকালও বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। মাতা অজ্ঞাতসারে গর্ভস্থ বৎসকে লালনপালন করিয়া থাকেন। কালপূর্ণ হইলে বৎস পৃথিবীতে আসিতে চাহে এবং আসে। সেই মুহূর্ত্ত হইতে তাহার উক্ত চারিটি পার্থিব জিনিস,—আলোক, উত্তাপ, বায়ু ও রস—চাই-ই-চাই। উদ্ভিদ সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথা, কিন্তু সে বিষয় বর্ত্তমান প্রবন্ধে আলোচ্য নহে। সংক্ষেপতঃ উক্ত কয়টি জিনিস বা অবস্থা উদ্ভিদের একান্ত প্রয়োজন।

ছাদটির চারিদিক যত উন্মুক্ত থাকে, ততই ভাল। অন্ততঃ পূর্ব্বদিক ও দক্ষিণদিক প্রশস্ত ও উন্মুক্ত থাকা উচিত। দিগ্বিশেষের আলোক ও উত্তাপের বিশেষত্ব আছে, কিন্তু সে বিষয়ে সমধিক আলোচনা করিতে হইলে স্বতন্ত্র প্রবন্ধের অবতারণা করিতে হয়, প্রয়োজন বোধ করিলে তাহা করিব। যাহা হউক, রজনীর দীর্ঘ কালের আঁধার ও শৈত্যের পর প্রভাতের বালারুণ সমভিব্যাহারী ক্রমোচ্ছ্বাসী উত্তাপ ও আলোক নিতান্তই প্রীতিপ্রদ, নিতান্তই উদ্দীপক—তাহা কে না উপলব্ধি করিয়াছেন? বাড়ীর মধ্যে সর্ব্বোচ্চ ছাদই এপক্ষে বিশেষ স্পৃহণীয়।

আলোক, উত্তাপ ও বায়ুর ব্যবস্থা ইতিপূর্ব্বেই হইয়াছে, এক্ষণে যথেষ্ট জলের আয়োজন রাখিতে হইবে। কলিকাতা সহরে জলের অভাব নাই। বিশেষতঃ বিগত ১।১ বৎসর হইতে বড় বড় অট্টালিকার তিন চারি তলের উপরেও সরবরাহ আছে, ইচ্ছা করিলেই যেখানে ইচ্ছা জল আনিতে পারা যায়, এবং তাহা করিতে হইবে। তবে পরিস্কৃত পানীয় জল গাছপালায় ব্যবহার করিতে দিবে কি না, সে বিষয় বিশেষ সংশয় আছে, কিছু বেশী দাম দিলে পাওয়া যাইতে পারে। স্থূল কথা, ছাদের গাছ মাত্রেই বড়ই পিপাসু হইয়া থাকে, তাহার কয়েকটি কারণ আছে, দুই একটি বলিব।

ভূমির গাছ ভূমি হইতে জল আহরণ করে, কারণ ভূগর্ভ রসময়। বর্ষার তাবৎ বারি ধরিত্রী মাতা আহরণ করিয়া জগতের ভাবী ব্যবহারের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া দেন, সুতরাং ভূমির গাছ জলাভাবে সহজে বিমর্ষ হয় না কিংবা মরে না। দ্বিতীয় কথা এই যে, ভূপৃষ্ঠ হইতে যত উৰ্দ্ধদিকে যাওয়া যায়, বায়ু তত নীরস ও শুষ্ক হয়। এজন্য ছাদের গাছসমূহ শ্বাস-প্রশ্বাস কার্য্য সম্পন্ন করিতে কষ্ট পায়। মাঠময়দানের মহীরুহগণ ত্রিতলাপেক্ষা উচ্চ হয় বটে, কিন্তু তাহারা ভূমিতে থাকে, ভূমি হইতে যে রস বাষ্পাকারে উৰ্দ্ধগামী হইতে থাকে, তাহা স্বভাবতঃ সরস, উপরন্তু উদ্ভিদগণও নিজ নিজ শক্তিবলে যত রস আহরণ করে,

Engraved & Printed by A. V. Seyne & Bros

তাহা পত্র দ্বারা বর্জ্জন হিসাবে ফুৎকার করিয়া বায়ুমণ্ডলকে স্নিগ্ধ করিয়া দেয়। উদ্ভিদের আত্মরক্ষার ইহা একটি বিশেষ অঙ্গ। ঘন ঘন রাস্তা, ঘাট, অট্টালিকা পরিবৃত সহরে ধরিত্রীর স্বকীয় রসোদ্গার নাই, উদ্ভিদের সংখ্যা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। এই দুই কারণে বায়ুমণ্ডল এত শুষ্ক ও নীরস। এতদবস্থায় ছাদের উদ্ভিদগণ পারিপার্শ্বিক বায়ুমণ্ডল হইতে রসের সাহায্য পায় না। অতঃপর ইহাও দেখিতে হইবে যে, সূর্য্যোদয়কাল হইতে সূর্য্যাস্তকালের প্রায় দুই প্রহর পর্য্যন্ত ছাদ উত্তপ্ত থাকে, চারিদিকের ঘরবাড়ী হইতে উত্তাপের ঝাজ উঠিতে থাকে, তন্নিবন্ধন গাছগুলি বিমর্ষভাবে দিনাতিপাত করিতে বাধ্য হয়। অনন্তর ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, ছাদের গাছ, টব বা গামলার নির্দ্দিষ্ট সীমা ও সংক্ষিপ্ত মাটির উপর দণ্ডায়মান থাকে, তন্নিবন্ধন তাহাদিগের অধিক শিকড় থাকে না, শিকড়গণ দীর্ঘ হইতে পায় না, ফলতঃ যে কিছু রস আহরণ করে, তাহাপেক্ষা অধিক রস দিবাকর-রশ্মির প্রখর কিরণ সম্পাতে ও উদ্ভিদের নিজস্ব রস-নিক্ষেপতা নিবন্ধন অমিতপ্রবাহে বায়ুমণ্ডলে চলিয়া যায়। এই সকল কারণে ছাদের গাছের জন্য প্রচুর জলের ব্যবস্থা রাখা একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু, ময়লা জলে ও পরিষ্কার জলে স্বভাবতঃই বিশেষ প্রভেদ আছে, উদ্ভিদগণ বুঝে কি না জানি না, তবে ইহা বুঝা যায় যে, জলের তারতম্যবশতঃ উদ্ভিদ-স্বাস্থ্যের ইতর বিশেষ হইয়া থাকে। মলিন জল গাছের গোড়ায় দিলে, তাহার কোন অনিষ্ট না হইতে পারে, কিন্তু কোমল শাখা প্রশাখায় বা পত্রে সংস্পর্শিত হইলে পত্রের কূপ (Pores) সমূহ বন্ধ হইয়া যাইবার সম্ভাবনা, তন্নিবন্ধন শ্বাস-প্রশ্বাস-ক্রিয়ারও ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে। উদ্ভিদের তাবৎ অঙ্গ যত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিবে, ততই তাহার পক্ষে মঙ্গলের বিষয়। ময়লা বা ঘোলাটে জল গাছের কোমল শাখা-প্রশাখায় বা পত্রাদিতে পতিত হইলে, এই সকল আপদ প্রতিনিয়ত ঘটিবার সম্ভাবনা বলিয়া পূর্ব্বাহ্ন হইতে সতর্ক হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

সহরের এবং ধূলা প্রাদুর্ভূত জনপদের উদ্ভিদ্‌দিগের আর একটি ভয়ঙ্কর আপদ আছে। তাহা ধূলা, জনসঙ্ঘের ঘনতা-জনিত উষ্ণতা, কল-কারখানা ও রন্ধনশালা হইতে উদ্গীর্ণ ধূম। আবার আজকালের পাথুরে কয়লার, এবং কেরোসিন আলোকোদ্ভূত ধূমরাশি। এই সকল পারিপার্শ্বিক কারণে সহরের গাছ বড়ই বিব্রত। ধূলা ও ধূম শরীরের ব্যাধিকর, এবং স্বাস্থ্যকে দুর্নিবার ক্লেশ দিবার নিমিত্ত ইহাদিগেরও যেন বিরাম নাই। ছাদে জলের সুব্যবস্থা থাকিলে, উদ্ভিদ্‌দিগকে প্রতিদিন দুইবার না হউক, একবারও উত্তমরূপে স্নান করাইয়া দিলে স্বভাবতঃই উহাদিগের স্বাচ্ছন্দ্য হয়—সর্ব্বাঙ্গের ধূম ও ধূলা বিধৌত হইয়া যায়। গাছপালার পত্রাদি যত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে, ততই তাহারা সুখে থাকে, তত তাহারা বৃদ্ধিশীল হয়, ফলতঃ যথাশক্তি ফলপুষ্প প্রদান করিয়া প্রভুর নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে। উদ্ভিদ মাত্রই বড় প্রভুভক্ত, ইহা আমরা প্রতিপদে দেখিয়া আসিয়াছি, তবে যেমন সেবা, তেমনই প্রতিদান। উদ্ভিদকে যাহা দিবে, সে তাহাই ফলফুল বা অন্য কোনরূপে প্রত্যর্পণ করে, বরং আসলের উপর সুদ সমেত প্রদান করে।

মাত্র মাটি ও রস পাইলেই যে উদ্ভিদের সব পাওয়া হইল, তাহা নহে। মাটি,—উদ্ভিদের আধার বা ধারক এবং খাদ্য-ভাণ্ডার। অতঃপর শ্বাস-প্রশ্বাস-ক্রিয়ার সুশৃঙ্খলতার জন্য অবাধ বাতাসের প্রয়োজন। বায়ুমণ্ডল হইতে উদ্ভিদগণ বায়ু সহযোগে বাষ্পীয় পদার্থ আহরণ করে। যাহা আহরণ করে, তাহার কতক বায়ুমণ্ডলকে প্রত্যর্পণ করে, আর কতক শরীর মধ্যে ধারণ করিয়া রাখে। বায়বী যে পদার্থটি উদ্ভিদ মধ্যে থাকিয়া যায়, তাহা উদ্ভিদন্তর্গত রসের সহিত সম্মিলিত হইয়া উদ্ভিদের পোষণোপযোগী শর্করা, লালা (albumen), শ্বেতসার (Starch) প্রভৃতি উৎপন্ন করে। এই সকল উপকরণাদি প্রাপ্ত হইলেও পরিপাক করিবার শক্তি তখনও সঞ্চারিত হয় না। সূর্য্যকিরণের সমাবেশ না হইলে উদ্ভিদ মধ্যে শক্তি (Energy) প্রচ্ছন্ন থাকে। জলের সহিত উত্তাপ সম্মিলিত না হইলে বাষ্প (steam) জন্মে না, সেইরূপ উদ্ভিদে রৌদ্রের সমাবেশ না হইলে শক্তির উদ্ভব হয় না। সুচারুরূপে উদ্ভিদ পালন করিতে হইলে এতগুলি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হয়। ইহা উদ্ভিদ-পালকের জ্ঞাত থাকা বিশেষ প্রয়োজন বলিয়া এত কথার অবতারণা করিতে হইল; এ সকল কথাকে কেহ অবান্তর বা অপ্রাসঙ্গিক মনে করিবেন না। তবে তদানুসঙ্গিক সকল কথা বিশদভাবে আলোচনা করিতে পারিলাম না;

কারণ, প্রকৃত বিষয় হইতে তাহা অনেক দূরে; কিন্তু, সে সকল বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানিবার চেষ্টা করা উচিত, সে জন্য বিবিধ পুস্তকাদি আছে।

ছাদের উপরে বাগান করিতে হইলে, কৃত্রিম ভূমি সৃষ্টি করা আবশ্যক; কিন্তু, ছাদে মাটি প্রসারিত করিলে ছাদ ভারি হয়, ছাদ জখম হয়, এই জন্য আমাদিগকে টবের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় এবং তাহাতেই মাটি ভরিয়া গাছ রোপণ করিতে হয়। গাছের প্রকৃতি, স্বাভাবিক বাড় (Growth) ইত্যাদি বুঝিয়া যথোপযোগী গামলা সরবরাহ করিতে হয়।

টব বা গামলা নানা ছাঁদের ও নানা আকারের হইয়া থাকে, তাহা ব্যতীত উহার গড়নও নানা জিনিসের হয়। কেহ মাটির, কেহবা কাঠের, আবার কেহ চীনা মাটির টব ব্যবহার করেন। শেষোক্ত প্রকারের টব সুশ্রী ও নয়নরঞ্জক হইলেও ব্যবহারিক উদ্দেশ্যে স্পৃহণীয় নহে, মাটির টবই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম; কিন্তু, বড় বড় গাছের পক্ষে কাঠের টব ব্যবহার করিতে হয়। বড় গাছ মাটির সুবৃহৎ টবে থাকিলে, তাহাকে সময়ান্তরে অপর টবে দিবার সময় উহা ভাঙ্গিয়া যায়, তন্নিবন্ধন গাছের শিকড় ছিঁড়িয়া যায়, গাছ জখম হয়। সচরাচর ব্যবহারের জন্য মাটির টব ব্যবহার করাই উচিত। মাটির টবে গাছ ভাল থাকে। অভাবে পড়িয়া লোকে লোহা বা টিনের টব বা কানস্তা ব্যবহার করিয়া থাকে। মাটির টবের একটি বিশেষ দোষ এই যে, মাটির রস টবের চারি পার্শ্ব দিয়া শুকাইয়া যায়, এজন্য প্রতিনিয়তই গাছে জল সেচন করিতে হয়।

সর্ব্বত্রই উদ্যান রচনা করিবার একটা নিয়ম আছে। কোন চিত্র অঙ্কিত করিবার পূর্ব্বে সকল চিত্রকরই মনে মনে একটি আদর্শ গড়িয়া লয়। কবি কাব্য রচনাকালেও তাহা করেন। উদ্যানককে একটি আদর্শ করিয়া তদনুযায়ী ছাদে টবের শ্রেণীদ্বারা ছাঁচ বা model করিতে হয়। প্রথমে একখণ্ড কাগজে অঙ্কিত করিয়া, পরে তাহা ছাদে রচনা করিলে সুবিধা হয়। সেই সঙ্কীর্ণ স্থান মধ্যে আঁকাবাঁকা পথ ও স্থানে স্থানে উদ্ভিদ সমষ্টির স্থান নির্দ্দেশিত হইলে একটা শৃঙ্খলা হয় এবং দেখিতেও মনোহর হয়।

কোমলপ্রকৃতি বহু উদ্ভিদ—বিশেষতঃ পরদেশী অনত্যুষ্ণ দেশের উদ্ভিদ ভারতের সমতল প্রদেশে রৌদ্র অর্থাৎ তজ্জনিত উত্তাপ ও আলোক এবং প্রবল বাত্যাবেগ ও প্রচণ্ড বৃষ্টি সহ্য করিতে পারে না। ঈদৃশ গাছপালার জন্য পানের বরোজ সদৃশ ঘর নির্ম্মাণ করিতে হয়। সেই সকল ঘর সাধারণতঃ গাছ-ঘর, গ্রীন-হাউস, সমার-হাউস, কন্জারভেটারি প্রভৃতি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। কোমলপ্রকৃতি গুল্মলতাদির জন্য এবম্প্রকারের গৃহ বা উদ্ভিদশালার একান্ত প্রয়োজন। শীতপ্রধান দেশে যে উদ্ভিদশালা নির্ম্মাণ করিতে হয় তাহাতে সার্শী নিয়োজিত হইয়া থাকে। শীতপ্রধানদেশে কেবল সার্শীদ্বারা গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা চলে না। এসকল দেশে শীত এত অধিক যে, সার্শী মধ্যে থাকিয়াও উদ্ভিদগণ যথোচিত আরাম পায় না, সুতরাং তাহার মধ্যে নিরন্তর কৃত্রিম উপায়ে উত্তাপ সংরক্ষণ করিবার নিমিত্ত বাষ্পীয় উত্তাপ (steam) প্রবর্ত্তন করিতে হয়। সমতল প্রদেশের ভাল ভাল বাগিচায় কোমল উদ্ভিদ্দিগকে বর্ষা বা শীতকালে আরামে রাখিবার জন্যও সার্শীগৃহ নির্ম্মিত হইয়া থাকে। স্বতন্ত্র প্রস্তাবে এবিষয়ের আলোচনা করা যাইবে। তবে এই মাত্র বলিয়া রাখি যে, উল্লিখিত গৃহমধ্যে উদ্ভিদ সংরক্ষিত হইলে, তাহাতে অধিক রৌদ্র বা আলোক কিংবা ঝড়-বৃষ্টিতে কোমলাঙ্গ ও সুকুমার-প্রকৃতি উদ্ভিদগণের তাদৃশ ক্ষতি করিতে পারে না। তাহা ব্যতীত বায়ুমণ্ডলস্থ ধূলা বা ধূমরাশি তত সহজে উদ্ভিদ্দিগের শ্বাস রোধ করিতে পারে না। কীটপতঙ্গাদিও সহজে তন্মধ্যে প্রবেশাধিকার পায় না, ইহাও বিশেষ লাভের কথা। গাছ-ঘর নির্ম্মাণ করিবার প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, উদ্ভিদগণ প্রকৃতির প্রাবল্য হইতে কতক পরিমাণে রক্ষা পায়, ঘরের ভিতরের গাছ, বাহিরের গাছপালা অপেক্ষা অধিক লাবণ্যযুক্ত ও সুশ্রী হইয়া থাকে। মোট কথা, বড়-মানুষে আর গরিব-গৃহস্থে যেরূপ প্রভেদ দৃষ্ট হয়, বাহিরের-গাছে ও ঘরের-গাছে সেইরূপ ভেদ পরিলক্ষিত হয়।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দে।

সেকেলে কথা

যিনি এই "সেকেলে কথা" লিখিয়াছেন, তাঁর একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। ইনি পরলোকগত রেভারেণ্ড কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা ভগিনী, পরলোকগত ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় (ভবানীচরণ বন্দোপাধ্যায়) মহাশয়ের পিতৃস্বসা। ইনি এখনও জীবিতা আছেন। ইনি লেখাপড়া জানেন না। সেকেলে কথা ইনি যে ভাবে, যে ভাষায় বলিয়াছেন, ইঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত মন্মথধন বন্দোপাধ্যায় মহাশয় অবিকল তদ্রূপ লিখিয়া লইয়াছেন, আমরাও তাহাতে কোন স্থানে একটুও পরিবর্ত্তন করি নাই। এই বিস্তৃত "সেকেলে কথা" ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে। ইহাতে যে সমস্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে যে শুধু সেকালের একটি দরিদ্র কুলীনব্রাহ্মণ পরিবারের সুখ দুঃখের ইতিহাস জানিতে পারা যাইবে তাহা নহে, সেকালের সমাজের আচার-ব্যবহার, চাকরী-বাকরীর বৃত্তান্ত, ইংরেজ গভর্মেণ্টের বিবরণ, ঠগীকাহিনী, পরলোকগত রেভারেণ্ড কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের বাল্য, কৈশোর ও যৌবনের আশ্চর্য্য ঘটনাবলী প্রভৃতির বিষয়েরও অনেক কথা অবগত হওয়া যাইবে। পূজনীয়া বৃদ্ধা শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবী যে সকল সুন্দর হেডিং দিয়া ভিন্ন ভিন্ন কথার অবতারণা করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে বিস্মিত হইতে হয়; তখন মনে হয়, পরলোকগত ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় মহাশয় এই পিসিমার নিকট হইতেই তাঁহার সেই সরল সুন্দর ভাষার ভঙ্গী ও কথার বাঁধুনী শিক্ষা করিয়াছিলেন। এই সুদীর্ঘ "সেকেলে কথা" সম্পূর্ণ প্রকাশ করিতে অনেক দিন লাগিবে। — ভারতবর্ষ সম্পাদক।)

শ্রীযুক্তা নিস্তারিণী দেবী।

খন্নেনের পঞ্চানন ঠাকুর জাগ্রত।

হুগলীর নিকট এখন যেখানে খন্নেন ইষ্টিসন হয়েছে, তার খুব কাছে চাটুয্যে মহাশয়ের কুঁড়ে ঘর ছিল। খন্নেনের চাটুয্যে মহাশয়ের নাম জানেন না এমন লোক তখন কেউ ছিল না। গাঁয়ের দেবতা পঞ্চানন ঠাকুরকে তিনিই প্রতিষ্ঠা করেন। পঞ্চানন জাগ্রত দেবতা। গাঁয়ের লোকে যেমন ঠাকুর মানে, তেমনই আমার ঠাকুরমার বাপকে (চাটুয্যে মহাশয়কে) মান্‌ত। চাটুয্যে মশাই পঞ্চানন ঠাকুর পূজা ক'রে যা কিছু পেতেন, তাতে তাঁদের দুঃখ ঘুচ্‌ত না। এখনকার নিষ্ঠাবান্ ভট্টাচার্য্যদের যেমন জীবন, আমার বুড়োদাদারও সেইরূপ ছিল। দেবতার মত সুন্দর শরীর, গম্ভীর ভাব, অমায়িক পরোপকারী চাটুয্যে মহাশয়ের নাম মনে হ'লে আজও আমার মনে আনন্দ হয়। আর যেমন তিনি পরোপকারী, গ্রামের লোকের কুলপুরোহিত, তেমনই তাঁর ঠাকুরটি। যে কেউ কিছু মানস করে, পঞ্চানন ঠাকুরের নামে চা'ল আর পয়সা বেঁধে তুলে রাখ্‌বে, তার সে মানস সফল না হ'য়ে যায় না। বন্ধ্যা স্ত্রীলোকেরা পঞ্চানন ঠাকুরের দোয়ার ধরে যে ছেলে পান, তাদের সকলের নামই পঞ্চানন বা পাঁচু রাখা হয়। এখন এদিকে যত পাঁচু নামের লোক আছে, সব এই পঞ্চাননের দোয়ার-ধরা ছেলে। কত পাঁচু নামের ছেলে আছে,

পাসের খাতা দেখে, শুণে দেখ্‌লেই দাদামশায়ের খাতির কত বুঝা যাইবে।

বাজি রেখে সন্দেশ খাওয়া।

যারা সব বাজি রেখে বাবুদের বাড়ী সন্দেশ খেত, তারাও খাতির ক'রে দাদামশাইকে সালিশ মানত। দিন-ভোরের মধ্যে দশসের পনরসের পর্য্যন্ত সন্দেশ খেতে পারত, এমন লোকও তখন ছিল। ঠাকুরমার মুখে শুনেছি, তাঁর বাড়ীতে এক বাড়ুয্যে মশাই এসে ছাতে বসে বমি ক'রে এত সন্দেশ তুলেছিল, সে গুলো কত দিন ধরে ছাতে শুকিয়ে ছিল। যারা সব বাজি রেখে কাজ কত্তে ভরসা করে, তাদের মধ্যেই একাগ্রতা দেখ্‌তে পাওয়া যায়। এখনকার কালে যারা একরোকা, গায়ে বারোয়ারী পূজা, কাঙালী খাওয়ান, যাত্রা দেওয়াতে যাদের আনন্দ, তারা এই বাজিরাখা দলের ছেলে।

ছোট কুঁদুলী।

চাটুয্যে মহাশয়ের স্ত্রীবিয়োগের পর হইতে চাটুয্যে মশাইয়ের সংসারে দুঃখ কষ্টের আরম্ভ। মানুষ মাত্রেই যে ভাল ক'রে দুবেলা খেতে না পায়, সে হাজার ভাল মেজাজের হ'লেও কুঁদুলে লোক ব'লে পাড়ায় ঢি ঢি হয়ে যায়। আমার মনে হয়, ছোট ছেলেদের মধ্যে যারা দুর্ব্বল, তারাই বড় দুষ্ট হয়। তাদের ভাল ক'রে খেতে দিলেই তাদের অনেক নষ্টামি কমে যায়। আমার ঠাকুরমার নামটি ছিল জগদম্বা। জীবনে আমার যে কোন বউদের সঙ্গে বনেনি, তা আমার ঠাকুরমার দোষে, আমার কি দোষ? পাড়ার লোকে সকলে তাকে ছোট কুঁদুলী বলে জানত। যখন চাটুয্যে মশাইয়ের স্ত্রীবিয়োগ হইল, তখন তিনি অন্য উপায় না দেখিয়া দারান্তর গ্রহণ করলেন।

মামার ঘরে মানুষ।

কুলীনের ঘরের সবাই মামার ঘরেই মানুষ। বাপের মুখ তখন প্রায় দেখা যাইত না। মামার বাড়ীই আমাদের বাড়ী। এইজন্য বাড়ী কোথায় বলিলে, আমাদের গুষ্টির সকলেই মামার বাড়ীর নাম উল্লেখ করে। মামাদের পয়সা থাক্‌লে তারা ঘরজামাই করিয়া রাখে। তখন বাবার মুখ দেখা যায়। কাকের বাসায় কোকিলেরা ডিম ফোটায় বলিয়া, কোকিলের সুস্বর যেমন কাকের রবের মত কর্কশ হইয়া যায় না, সেইরূপ যারা মামার ঘরে মানুষ, তারাও মানুষ হইলে তেজি লোক হয়।

ঘরজামাই।

আমার ঠাকুরমার বাপ চাটুয্যে মহাশয়েরও সেই দশা হ'ল। দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি যাদের ব্রহ্মোত্তর কয় বিঘা জমী আছে, মরাই আছে, গরু আছে, এমন ঘরে বিবাহ করিলেন, আর তিনি তাহাদের ঘরজামাই হইবার সত্য করিয়া বিবাহ করিলেন।

সত্যই ধর্ম্ম।

তখনকার কালে সত্যই ছিল ধর্ম্ম। তিনি ভাবিলেন মৃতা গৃহিণীর ছেলে রামধনকে পঞ্চানন ঠাকুরের পূজা কত্তে দিলে, সেইই সব চালিয়ে নেবে। মেয়ে রাঁধ্‌বে, পইতে কাট্‌বে। আমার খরচও বেচে যাবে। মাঝে মাঝে হেঁটে এসে এদের দেখে যাব। সত্য ত রাখ্‌তে হবে। সত্যই ত ধর্ম্ম। আর আমার গৃহিণী নেই, তার আর গৃহ কি? আমি ত ফকির বল্লেই হয়।

ছুঁতোয় নাতায় কেঁদে নিত।

বোন জগদম্বা কোঁদল্ ক'রে বেড়ান, ভাই রামধন দুঃখের ধান্ধায় ফেরেন। দুঃখের জ্বালায় কাঁদ্‌লে, পাছে লোকে কিছু মনে করে, অথচ কাঁদ্‌লে শান্তি পাওয়া যায়। এই ভেবে বোনের কোঁদলের জন্য কেউ বল্‌তে এলে, যেন সেই জন্যই কাঁদ্‌চেন, এই ভাব দেখিয়ে দুঃখের কান্না কেঁদে নিতেন। ভাই বোনে পাতার জ্বালে রেঁধে খেতেন। ভাই বোনে শুকনো পাতা কুড়ুতে যেতেন। পঞ্চানন ঠাকুরের চাউল না পেলে খুদ রেঁধে খেতেন। পইতে কেটে যে পয়সা পেতেন, তাতেই খুদ কিনে আন্‌তেন।

গরিবের কন্যাদায় উদ্ধার।

যখন উপায়ান্তর না থাক্‌ত, তখন গরিবের কন্যাদায় উদ্ধার ক'রে আস্‌তেন, কুলীন বামনের ছেলের ১০।১২ টাকা বিবাহের যৌতুকে আর কতদিন চল্‌বে। আবার যাদের জমী, ধান, গরু আছে, তাদের দেখাদেখি গরিবেরাও জামাইয়ের

আকৃতি বুঝে ঘরজামায়ের কোট ক'রে বিয়ে দেবার চেষ্টা ক'ত্তো। এরূপ সত্যের দায় হইতে শেষ রামধনও নিষ্কৃতি পান নাই, তবে বোনের বয়স ১৩।১৪ হয়েছে, তারও বিয়ে দেবার ব্যবস্থা ক'রে শ্বশুরের কুলের একটি ছেলের সহিত ভগিনীর বিবাহের কড়ারে নিজ গ্রামের নিকটেই বিবাহ করিলেন।

বউ আনা।

অনেক আপত্তির পর শেষে বউ ঘরে আসিল। বউয়ের হাতে কাসার পইচে ও নোয়া; বোনের হাতেও তাই। বোনের হাতে মুড়কীমাদুলী ছিল, বউয়ের তাও ছিল। ভাটাট অবস্থাপন্ন লোকের মেয়েকে কোন কড়ার না করে বিয়ে ক'ত্তে না পেয়ে বড় দুঃখ কত্তো। বড় মেয়ে বিয়ে দিয়েও যারা বলে বউ আনতে নাই, তারা সেই কুলীনের ঘরের দলের পরপুরুষ।

ডান হাতে উপরি পণ, বাম হাতে মলত্যাগ।

রামধন মাঝে মাঝে প্রায়ই বলতেন, "আমরা কুলীন; শ্বশুর যদি পণের উপরি ডান হাতে দেন ও বাম হাতে বধূ মলত্যাগ করেন, তবুও আমরা কৃতার্থ মনে করি! আমার একি হইল!" পরের মেয়েকে গলায় বাধার চেয়ে অদম্য নাই। মানুষ খেতে পায় না, তার খাবার লোক বেড়ে গেলে যেমন কষ্ট পায়, এমন কষ্ট তার আর কিছুই নাই। গরিবের ঘরে যাদের জন্ম, তারা চাকুরী ক'রে পয়সার মুখ দেখলে, কেউ এলে গেলে এই জন্যই বড় বিরক্ত হয়। কলিকাতায় এই ভাবটা এখন বড় বেশী। কোন অতিথি এলে পয়সা দিয়ে হোটেলের ব্যবস্থা ক'রে দেয়, তবুও হাঁড়ির ভাত দিতে কাতর হয়; কারণ, বাড়্তি লোক সাম্নে থাক্লে তাদের সেই পুরাণ দুঃখের কথা মনে হ'য়ে কষ্ট হয়। বিবাহ-পণের এই ভাবটাও একটা বাতিকে দাড়াইয়াছে। এখন-কার লোকে দান অলঙ্কার বস্ত্রাদিকে আসল ও পণের নগদ টাকে উপরি মনে করে ও বধূমাতার ভাল-মন্দ সোহাগ-[illegible] দ্রব্যাদির ভাল-মন্দের উপর এখন নিভর করে!

ছেলে কাঁদলে মুড়ি দিলে থামে।

রামধনের দুঃখ দেখে ষষ্ঠীদেবীর বড় অনুগ্রহ হইল। [illegible] ক্রমে বিষ্ণু, রাম, ঈশান, মহেশ, নীলমণি পাচ ছেলে হইল। ভগবান যাকে দয়া করেন, তাকে এইরূপ ক'রেই করেন। এক বছরে আঙ্গ ছোট ছোট ছেলেগুলিকে এক যায়গায় বসিয়ে যখন পিতা রামধন এক পাত হইতে খুদের গরম গিলাইয়া দিতেন, ও না গিলিলে পিঠে কিল দিতেন, তখন সে দৃশ্যটি পাঠশালের গুরুমহাশয় ও পড়োদের মত দেখাইত। ভগিনী জগদম্বাই পরিবেশন করিতেন। তিনি বউয়ের নামে নানা ছুতায় লাগাইতেন। ছেলেরা কাঁদিলে মুড়ি দিয়া থামাইতেন। তবে তিনি অন্য মেয়েদের মত তরকারিতে নুন মিশাইয়া বউকে জ্বালাইতেন না।

ছেলেপোষাণি ভিক্ষেপুত্র।

যাদের জমি জমা আছে, অথচ খাবার লোক নাই, বাড়ীতে ছেলে নাই, তারা যখন দুই তিন সংসার করিয়াও পুত্রের মুখ না দেখিতে পাইয়া আসন্ন কালে পিণ্ডের প্রত্যাশায় হতাশ হয়, তখন যাদের বেশী ছেলে-পিলে থাক্ত, তাদের ঘর থেকে ছেলেপোষাণি নিত। ছেলে তার পরিবারকে মা বলিত, তাকে বাবা বলিত। পইতে দিয়া এই ভিক্ষাপুত্র পাকা ক'রে নেওয়ার প্রথা তখন ছিল। পইতের সময় নেড়ামাথায় বিবাহ দিয়া কন্যা থাকিলে ঘরজামাই করিয়াও অনেকে পুত্রের সাধ মিটাইত। এখনও বড় ঘরে এই ভিক্ষাপুত্র দেওয়াতে অনেকে কিছুমাত্র অপমান বোধ করে না। ছেলে কেনা, ছেলে-বেচা যেমন তখন ছিল, বাছুরের পোষাণির মত ছেলে-পোষাণি "ভিক্ষাপুত্র" প্রভৃতি তখন বেশ চলিত। তা বলিয়া রামধনের মত মানুষটি এরূপ করিতে স্বীকার পাইত না; বিশেষ ছেলেদের পিসি জগদম্বার কোঁদলের ভয়ে সেরূপ প্রস্তাব করিতেও কেহই অগ্রসর হয় নাই। জগদম্বা ছেলে-গুলিকে প্রাণের সহিত ভালবাসিত। বউ ত ভাল মানুষ, সে ছেলে বিইয়েই খালাস। পিসিমা জগদম্বাকেও মেও ধরিতে হইত। যত ঝক্কি ঝড়ের মত জগদম্বার মাথার উপর দিয়া চলিয়া যাইত, জগদম্বা তাহা গ্রাহ্যই করিত না।

জামাই নিজের চাড়ে আসে।

জগদম্বা আমার ঠাকুরমা। তার যেমন রূপ, তার উল্টা স্বভাব। আমার কিন্তু ঠাকুরমাকে বড় ভাল লাগত। তিনি যাকে যা ব'লে গাল দিতেন, তাই ফল্ত; আবার যাকে যা ব'লে আশীর্ব্বাদ ক'ত্তেন, তার তাই ফল্ত।

যাদের সঙ্গে ঝগড়া ক'ত্তেন, তাদের ধুড়ধুড়ী নেড়ে দিতেন; যাদের গতর দিয়ে উপকার ক'ত্তেন, তারা কখনও ভুলত না। লক্ষ্মী ঠাকরুণের মত তাঁর চুলের গোছা পিঠ জুড়িয়া পড়িয়া থাকিত। রূপের গরবে তিনি কখন গরবিণী হন নাই; তবুও তাঁর দুধে আলতার মত রূপের তুলনায় পাড়ার লোকেরা সুন্দরীর উপমা দিত। বিবাহ হবার দিনের কথা অনেক মেয়ে ভুলে যায়, কিন্তু গ্রামে কারও ঘরে জামাই এলেই সেটি মনে পড়ে। তখন জামাই আনিতে বিশেষ কোন নিমন্ত্রণ করিতে হইত না। জামাই নিজের গরজে আসিত। জামাইয়ের খরচ কম হইয়া আসিলেই সে এক শ্বশুরবাড়ী হইতে অন্য শ্বশুরবাড়ী আসিত। তখনকার জামাইয়েরা মাথায় পুঁটুলি, হাতে লাঠি, কাঁধে গামছা, পায়ে এক পা ধুলা লইয়া মড় মড় করিয়া বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া পড়িত। প্রথম তাড়না, পরে যত্ন, ইহাই জামাই-আদর।

বিবাহের হাতচিঠা খাতা।

কুলীনেরা যেখানে যেখানে বিবাহ করিত, সেখানকার খাতা রাখিত। আমার বৃদ্ধ পিতামহ মদনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের এইরূপ একখানি খাতা ছিল। তাহাতে তাঁহার ৫৬টি বিবাহের ঠিকানা লেখা ছিল এবং যে একটু স্থান খাতার পার্শ্বে ফাঁক থাকিত, সে স্থলে তিনি টাকার কথা, পুত্রাদির কথা এবং যে গুলি তাঁহার লোক-লৌকিকতা আদায়ের পক্ষে সুবিধাজনক, তাহাই লিখিয়া রাখিতেন। এ খাতাটি আমাদের দেশের যারা উটনো খায় তাদের হাত-চিটা খাতার মত। কলেক্‌টারীর তৌজী-বহির মত তাহাতে কন্যার কত টাকা পণে কবে বিবাহ হইয়াছে, তাহা লেখা থাকিত। যেখানে পাওনা দক্ষিণা বেশী, সেখানে যাতায়াতও তত বেশী হইত।

১০৮টি বিবাহ।

শুনিয়াছি, আমার অতিবৃদ্ধপিতামহের ১০৮টি বিবাহ এবং পিতামহের ৫৪টি মাত্র। তখন যে যত বিবাহ করিতে পারিত সে তত ভাল কুলীন বলিয়া জনসমাজে বিদিত থাকিত। এখনকার ছেলেরা একটি পরিবারকে খাইতে দিতে পারে না, গলার বোঝা মনে করে; তখনকার পুরুষেরা শত পরিবারের পিতা মাতার নিকট হইতে নিজের খরচ চালাইয়া লইত। তখন স্ব-ঘরে পাত্র পাওয়া কঠিন ছিল; আর এক এক ঘরে পুত্রের অপেক্ষা কন্যাসংখ্যা অনেক বেশী ছিল। পত্নীর ভরণপোষণ একটা কর্ত্তব্যের মধ্যে, তাহা তখনকার বিবাহিতদের কল্পনায়ও আসিত না।

মেয়ে-বেচা—শয্যা তোলানি।

আবার যারা বংশজ, তাদের মধ্যে মেয়ে বেচা চ'লত। পণ নিয়ে যারা মেয়ের বিয়ে দেয়, তাদেরই মেয়ে বেচা বামুন বলে। তাদের কেবল বিবাহের সময় নয়, যখনি তাহারা শ্বশুরবাড়ী আসিত, তখনই তাদের শয্যাতোলানি দিতে হইত। এখনকার গ্রামভাটী, বাসর-জাগানি এ সব তখন বংশজদের নিকট আদায় হইত। এখন এটা গৌরবের দান!

ছেলে-বেচা—পা-ধোয়ানি।

জগদম্বার যে দিন স্বামী আসিল, সে গৃহপ্রবেশ করিবামাত্র পা-ধোয়ানির জন্য তাগিদ করিল—সে যে কুলীন! তার পা ধোয়ানি, নমস্কারি, ভোজন দক্ষিণা, এ সকল না দিলে, সে এরূপ শ্বশুরগৃহে পা ধুইবে না, নমস্কারি কাপড় না হইলে একরাত্রও বাস করিবে না, ভোজন-দক্ষিণা না পাইলে সে বাটীতে আর আহার করিবে না। সে ত বংশজ নহে—সে যে কুলীন!

স্বকৃত-ভঙ্গ।

আবার যে-সে কুলীন নহে—স্বকৃত-ভঙ্গ। নিজের কুল ভাঙ্গিয়া পরের মেয়ের বাপের কুলের উদ্ধার করিবার জন্য দৃঢ়ব্রত। আমাদের দেশের মধ্যে যাহারা নিজের ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া পরধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে এবং চৌমাথায় দাঁড়াইয়া অন্য সকলকে সেরূপ করিতে ডাকে, তাদের দেখিলেই আমার মনে হয়, তারা বুঝি স্বকৃত-ভঙ্গ! নইলে এত পরোপকারী লোক মনুষ্যসমাজে দেখা যায় না। এখন যে লোকে স্ব ঘরে কন্যার বিবাহ দিবার জন্য এতটা বাড়াবাড়ি করে, তাহার দুইটি কারণ; একটি লোকের কাছে জাঁক দেখান যে আমার পয়সা আছে; আর একটি তারা ছোট বামুন, তাদের কুলের আর কিছুই নাই, তারা কুলের দোষ ছাপিয়ে আছে; এটি আমার বিশ্বাস। তখনকার ভাল কুলীন আপনার কুল ভঙ্গ করিয়া বিবাহ ক'রে নিজেদের তেজস্বী

স্বরূত-ভঙ্গ বলিয়া গৌরব করিতে পারিত; এখনকার ঢোঁড়া সাপেরা এই মেলের চক্রে প'ড়ে ভাতে হাত দিতে চাইয়ে হাত দেয়।

ঘটি বাটি বাঁধা দিয়ে মানরক্ষা।

কোন রকমে ঘটি বাটি বাঁধা দিয়ে রামধন নিজের মান রক্ষা করিল। জগদম্বা স্বামীকে দেখিয়া যেন নূতন মানুষ হইয়া গেল; তাহার স্বভাব সে দিন লক্ষ্মী-ঠাক্‌রুণটির মত কোমল হইয়াছিল। তার স্বামী যতক্ষণ ছিল, সে ঘোমটা দিয়া তাহারই আসে পাশে ঘুরিতেছিল। দিবাভাগে স্বামিদর্শন শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া সে যেন সেই সুন্দর সুপুরুষকে অভীষ্ট দেবতার মানসিক ছবির মত মনে দেখিয়া লইয়াছিল। কেবল তার বড় রাগ হইয়াছিল যে, ছেলেদের সকলের একখানি থালা আজ বাঁধা পড়িল, তাহাদের খাইবার পাথর দুইখানি আজ বন্ধক পড়িল। তাহাদের হাঁড়ির ভিতরের ছয় আনার পয়সা খরচ হইয়া গেল। কড়ির আলনা হইতে লাল পেড়ে শাড়ী কাপড়খানিও জামাই লইয়া যাইতে ভুলে নাই।

[ই]চে ও মুড়কী-মাদুলী দিয়া স্বামীর মানরক্ষা।

রাত্রে যখন স্বামীর মান রক্ষার জন্য তাহার হাতের [ন]োয়া গাছটি রাখিয়া পইচে ও মুড়কি-মাদুলী খুলিয়া দিয়া [সে] স্বামীর মান রক্ষা করিল, তখন কিন্তু জগদম্বার মনে বড় আহ্লাদ হইয়াছিল। সে যে স্বামীর কাজে লাগিয়াছে, [স্বা]মীর উপকার করিয়াছে, এই ভাবিয়া সে নিজেকে কৃতার্থ [জ্ঞা]ন করিয়াছিল। আজ-কালকার মেয়েদের মধ্যে—নাটক-[না]ভেল পড়া মেয়েদের মধ্যেও এ ভাবটা কোথাও কোথাও [দেখা] যায়। কিন্তু এই আহ্লাদটির বদলে একটা যেন [জ]োরের ভাব, যেন বলবার মত মত কথা, এইটি দেখাবার [জন্য]ই তারা এ কাজটা করে। আর যখন মনে বেশ বুঝে স্বামী মাইনে পেলেই এটিকে উদ্ধার কর্ব্বেন, তখন সেটি [ব]ড় সহজে হয়। পরে এই বিষয় খোঁটা দিয়ে আরও [গহনা] গড়াইবার ফিকিরটাও বেশ পাকা হইয়া পড়ে। কিন্তু [সেদি]নে জামাইয়ের মন জগদম্বার রূপে ও গুণে গলিয়াছিল।

রাত্রবাসের দক্ষিণা।

[রাত্র]বাসের দক্ষিণা লইয়া একটা বচসা হওয়ায়, দাদামহাশয় অতি প্রত্যূষেই প্রাতঃসন্ধ্যা না করিয়াই রওয়ানা হইবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন। কিন্তু রামধন পূর্ব্বদিন পঞ্চানন ঠাকুরের কৃপায় মানতের পয়সা ও চাল পাইয়াছিল। কোন অপুত্রকের পুত্র হওয়ায় সে যে চাউল ও পয়সা মিশাইয়া পঞ্চাননকে দিয়াছিল, তার ফল ফলিল; কিন্তু দাদামহাশয় এখনও আরও কিছু বাহির হইতে পারে কি না দেখিবার জন্য একটি উপায় করিলেন।

দাদামশাইয়ের চাল চালা।

দাদামশাই না যাইয়া বলিয়া গেলেন, তিনি মনে ভাবিয়াছিলেন, আরও কিছু আছে। প্রথম চোটেই ঘটি বাটি বাঁধা দেওয়ায় তাঁর অবিশ্বাস জন্মিয়াছিল। যে চিরদুঃখী, তার যে সকল গুণই দোষের হয়। দাদামহাশয়ের মন ঠাকুরমার দিকে ঝুঁকিয়াছিল, তাই তিনি আধেক রাস্তা হইতে ফিরিয়া ভাঙ্গা চালের ফাঁক দিয়া দেখিতে লাগিলেন যে, ঘটিবাটি বাঁধা দিয়া তাহারা এখন কিসে করিয়া ভাত খায়। তাহলেই সকল ঢং ধরা পড়িবে।

ছেঁড়া আঁচল পাতিয়া ভাত খাওয়া।

দাদামহাশয়ের দেখিয়া শুনিয়া সুবুদ্ধি আসিল। তিনি দেখিলেন, জগদম্বা ছেঁড়া আঁচল পাতিয়া ভাত খাইতেছে ও চক্ষের জলে তাহার বুক ভাসিয়া যাইতেছে। ননদ্ ভাজের একই অবস্থা দেখিয়া মদনমোহনের মন টলিল; আজ সেই শিবের মত চেহারাটি সত্যি সত্যিই শিব হইয়া গেল। সে ভাবিল, ওইখানেই থাকিব। এমন গুণের স্ত্রী আর কোথায় পাইব? অন্য সকল স্থান হইতে যাহা কিছু সংগ্রহ করিব, এইখানেই দিব।

যে কথা, সেই কাজ।

আমাদের গুষ্টিটাই একরোকা—যে কথা, সেই কাজ। দাদামশাই সেই যে চাটুয্যে মশাইয়ের বাড়ী ঢুকিলেন, আর কোথাও যাইলেন না। দাদামশাই এলেন আর সংসারের যেন দুঃখ গেল। খাবার-পরবার দুঃখ কেউ কখনও আর পেয়েছে বলে মনে হয় না। দাদামশাইয়ের মনে শান্তি ছিল! তেঁতুল সিদ্ধ করিয়া ভাত খাইয়াও কখনও কষ্ট পান নাই।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনিস্তারিণী দেবী।

পাণ্ডুয়া-কাহিনী।

হুগলী জেলার পাণ্ডুয়া একটি বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম। মালদহের হজরৎ-পাণ্ডুয়াই পাণ্ডুয়া নামে খ্যাত; মুসলমানগণ হুগলী জেলার পাণ্ডুয়াকে ছোট পাণ্ডুয়া বলিয়া অভিহিত করেন। ইহা হুগলী সহর হইতে ১৪ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। নবদ্বীপের অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক-চূড়ামণি রঘুনন্দন স্মার্ত্ত তাঁহার প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বে পাণ্ডুয়াকে প্রদ্যুম্নগর নামে অভিহিত করিয়াছেন, তিনি মহাভারতের

"প্রদ্যুম্নগরাদ্ যাম্যে
সরস্বত্যাস্তথোত্তরে।
তদ্দক্ষিণপ্রয়াগস্তু
গঙ্গাতোযমুনাগতা॥
স্নাত্বা তত্রাক্ষয়ং পুণ্যং
প্রয়াগ ইব লভ্যতে;
দক্ষিণপ্রয়াগস্তু উন্মুক্তবেণী
সপ্তগ্রামাখ্যদক্ষিণদেশে ত্রিবেণীতি খ্যাতে"

শ্লোক উদ্ধার করিয়া পাণ্ডুয়াই যে প্রদ্যুম্নগর তাহা সপ্রমাণ করিয়াছেন, অধুনা-প্রচারিত মহাভারতে আমরা এই শ্লোক দেখিতে পাই না। কিন্তু পালি মহাবংশ গ্রন্থ হইতে আমরা জানিতে পারি বুদ্ধদেবের ভ্রাতা অমিতোদনের পুত্র পাণ্ডুশাক্য কোশলরাজ বিড়ূডবের ভয়ে পলায়ন করিয়া গঙ্গার পশ্চিমে উপনিবেশ স্থাপন করেন। ক্রমে তিনি ঐস্থানের রাজা হইয়া ঐস্থানের নাম মোরপুর রাখেন। মোরপুর যে মারপুরের অপভ্রংশ তাহাতে সন্দেহ নাই; এবং মারপুর ও প্রদ্যুম্নগর যে একার্থবোধক তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। যাহা হউক, প্রদ্যুম্ন-নগর বা মারনগর আধুনিক পাণ্ডুয়ানগর কি না তাহা প্রত্নতাত্ত্বিকদিগের আলোচ্য। অতীত গৌরবের সাক্ষিস্বরূপ এখনও এখানে একটি মিনার, দুইটি মসজিদ, একটি আস্তানা ও দুইটি পুষ্করিণী বর্ত্তমান থাকিয়া প্রাচীন কাহিনী স্মরণ করাইয়া দেয়। মিনারটি গ্র্যাণ্ড-ট্রাঙ্ক রোডের উপর হাওড়া হইতে ৪২ মাইল দূরে অবস্থিত। ইহা দেখিতে গোলাকার। ৫ তলা উচ্চ, নিম্ন-তলের ব্যাস ৬০ ফিট ও সর্ব্বোচ্চ তলের ব্যাস ১৫ ফিট। বাহিরের দিকে কারুকার্য্যযুক্ত কার্ণিস

পাণ্ডুয়ার মসজিদ।

ও ভিতরের প্রাচীরে মিনাকরা ইষ্টক দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা ১২৫ ফিট উচ্চ ছিল, কিন্তু ১৮৮৫ সালের ভূ-কম্পনে ৫ম তলা ও উচ্চ চূড়াটি ভগ্ন হইয়া যাওয়ায় ১৯০৭ সালে সদাশয় গভর্ণমেণ্ট পুনরায় ইহার সংস্কার করিয়া দিয়াছেন। এক্ষণে ইহার উচ্চতা ১২৭ ফিট। যাঁহারা দিল্লীর কুতুব-মিনার ও গৌড়ের ফিরোজমিনার দেখিয়াছেন, অবশ্য তাঁহাদের নিকট ইহার বিশেষত্ব কিছুই নাই। তবে আদিনা মসজিদ্ দেখিতে যাইবার পথে পুরাতন মালদহে মিনাসরাই মিনার যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্য লক্ষ্য করিতে পারেন যে, মিনাসরাই ও পাণ্ডুয়ার মিনারের উচ্চতা প্রায়ই একরূপ, মুসলমানদিগের মতে ইহা খুয়াজিনের জন্য অর্থাৎ বিশ্বাসী মুসলমানদিগের প্রার্থনার যোগদান করিবার জন্য ব্যবহৃত হইত। হিন্দুদিগের মতে ইহা বিজয়ী পাণ্ডুরাজদিগের জয়স্তম্ভ।

ইহার ১৭৫ ফিট-পশ্চিমে বাইশদারী মসজিদের ভগ্নাবশেষ বর্ত্তমান রহিয়াছে। ইহার নির্ম্মাণ-কৌশল দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, পূর্ব্বে ইহা হিন্দুর মন্দিররূপে ব্যবহৃত হইত। এই পূর্ব্বদ্বারী মসজিদের গঠন

ত্রিবেণীর মসজিদ্

প্রণালী দেখিলে বেশ অনুমান করা যায়, পূর্ব্বে ইহা কাছারী রূপে ব্যবহৃত হইত, ইহার মধ্যস্থলে পশ্চিম দিকের দেওয়ালের অতি সন্নিকটে একটি উচ্চ বেদী আছে। এখানে পূর্ব্বমুখ হইয়া বসিতে হয়। যদি এই মসজিদ মুসলমান দ্বারা নির্ম্মিত হইত, তাহা হইলে পশ্চিমমুখ হইয়া বসিবার ব্যবস্থা থাকিত। চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বিজয়ী মুসলমানদিগের মধ্যে রণোন্মত্ত অশিক্ষিত তুর্কীর সংখ্যাই অধিক ছিল, প্রার্থনার জন্য মসজিদের আবশ্যক হওয়ায় তাহারা হিন্দুদিগের মন্দির লুণ্ঠন করিয়া দেবদেবীর মূর্ত্তিগুলিকে স্থানান্তরিত করিয়া তাহাদের পশ্চাদ্ভাগে কোরাণ হইতে শ্লোকাবলী সংযোগ করিয়া মন্দিরকে মসজিদে পরিণত করিয়াছিল। বোধ হয় রাজমহল হইতে প্রস্তর আনয়ন করা দুরূহ বলিয়া ইষ্টক দ্বারাই মসজিদ নিৰ্ম্মিত হইয়াছিল।
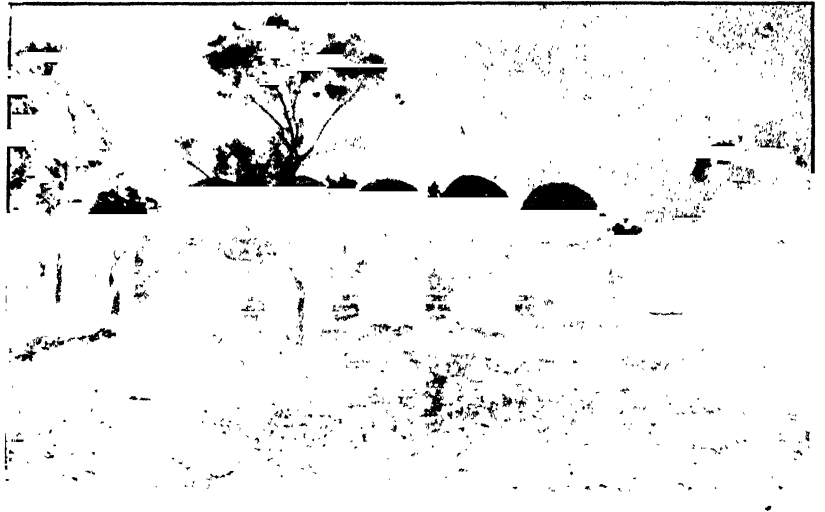
মিনারের দক্ষিণে শাহ সুফিউদ্দিনের কবর আছে। এই আস্তানার সম্মুখে সময়ে সময়ে মেলা বসিয়া থাকে, তন্মধ্যে মাঘ মাসের "বারাণ" মেলাই প্রধান। ইহা প্রায় এক মাস পর্য্যন্ত থাকে। নানাদিক হইতে হিন্দু ও মুসলমান আসিয়া আপনাদিগের আশা পূর্ণ হইবার মানসে পীরের নানাবিধ পূজোপচার দিয়া থাকে।

এই আস্তানার পশ্চিমে আর একটি মসজিদের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার নির্ম্মাণ-সময়-নির্দ্দেশক কোন প্রস্তরফলক পাওয়া যায় না, তবে ইহা যে ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে লালকুমার নাথ নামক একজন হিন্দু দ্বারা সংস্কৃত হইয়াছিল, তাহা তাঁহার ফলকলিপির সাহায্যে জানিতে পারা যায়। এই স্থানায় হিন্দুদিগেরও বিশেষ শ্রদ্ধা আছে দেখিতে পাওয়া যায়। কবরের দক্ষিণে 'রৌজাপোখর' নামে একটি সুন্দর পুষ্করিণী আছে। এই পুষ্করিণীতে অনেক বৌদ্ধ-যুগের প্রস্তর-মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। নিদর্শনার্থক কতকগুলি মূর্ত্তি উপরে উত্থিত হইয়াছে। শুনিতে পাওয়া যায়, এই পুষ্করিণী হইতে অনেকগুলি দেবদেবীর মূর্ত্তিও বাহির হইয়াছিল। এই সকল দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, বিজয়ী মুসলমানগণ মন্দির অধিকার-কালে মূর্ত্তিগুলি পুষ্করিণী মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছিল। গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের দক্ষিণে, অনতিদূরে আর একটি বৃহৎ পুষ্করিণী আছে। তাহা পীর শাহ সুফিউদ্দিনের নামে উৎসর্গীকৃত এবং পীরপোখর নামে খ্যাত। এখানে একটা বৃহৎ কুম্ভীর বাস করিয়া থাকে। যাত্রীরা আহার্য্য সামগ্রী লইয়া 'কাফের খাঁ মিঞা' বা 'মিঞা সাহেব' বলিয়া উচ্চৈস্বরে ডাকিবামাত্র কুম্ভীর কিনারায় আসিয়া সুখে আহার করিয়া থাকে। মুসাফিরের কাছে তাহার ভয়ের কোন কারণ নাই এবং যাত্রীরাও তাহাকে ভয় করে না।

পুরাতন দুর্গ বা পরিখার চিহ্ন এখন লোপ পাইয়াছে। কেবলমাত্র উত্তর দিকে উচ্চ বাঁধ দুর্গ-প্রাকারের স্মৃতি আজিও ধারণ করিয়া রহিয়াছে, এক মাইল উত্তরে উভয় পাড়ের মধ্য দিয়া অল্প পরিসর শুষ্ক নদীর মত একটি পরিখার চিহ্ন এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। নিম্নভূমি বলিয়া এই পরিখাস্থানে আজকাল ঐ দেশের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ধান জন্মিয়া থাকে। এই পরিখার ঠিক উত্তরেই জয়ধ্বনি নামে একটি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। ইহার মধ্যস্থলে একটি বহু পুরাতন ও বহু বিস্তৃত শাখা-প্রশাখা-বিশিষ্ট বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার পত্র বটপত্রসদৃশ, খেজুরের মত ফল

ধরিয়া থাকে, চাপ দিলে দুগ্ধ সদৃশ রস নির্গত হয়; উহা খুব সুমিষ্ট, গ্রামবাসী সকলেই খাইয়া থাকে, এই বৃক্ষজাতীয় আর একটি বৃক্ষও বাঙ্গলায় পাওয়া যায় না। প্রবাদ আছে যে, কামরূপের কোনও মায়াবিনী রাত্রে এই গাছ চালিয়া লইয়া আসিতেছিল, জয়ধ্বনিতে প্রভাত হয় এবং ঐ গাছ ঐখানেই থাকিয়া যায়। প্রভাতে এই বিস্ময়কর ব্যাপার নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহে প্রচারিত হয়। পাণ্ডুয়ার মুসলমান-অধিকারের কাহিনী আমরা নিম্নে বিবৃত করিতেছি। প্রায় ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে পাণ্ডুয়ায় প্রবল প্রতাপশালী হিন্দুরাজা মহানাদ গ্রামে বাস করিতেন। তখন শাহ সুফিউদ্দিন নামে অর্থশালী জনৈক সম্ভ্রান্তবংশীয় মসলমান পাণ্ডুয়ায় বাস করিতেন। তাঁহার পিতা বরখুরদার দিল্লীর সম্রাট্ ফিরোজ শাহের দরবারের জনৈক সম্ভ্রান্ত ওমরাহ ছিলেন। কালে তিনি সম্রাট্-ভগ্নীর পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার পাণ্ডুয়ার বাটীতে কোন বালকের কাট্না (Circumcision) উপলক্ষে গো-বধ হইয়াছিল, পাণ্ডুরাজা এই সংবাদ শ্রবণে অত্যন্ত কুপিত হইয়া বালককে হত্যা করান। মর্ম্মাহত মুস্তফি দিল্লী গিয়া মাতুলকে সকল ঘটনা বিবৃত করেন এবং তাঁহাব সহায়তা প্রার্থনা করেন। সম্রাট্ও সৈন্য প্রেরণ করিয়া সাহায্য করিতে স্বীকার পাইলেন। কাফেরের বিরুদ্ধে অভিযান করিতে হইতেছে দেখিয়া সুফী পানিপথ-করণালের প্রসিদ্ধ সিদ্ধপুরুষ বু-আলি কলন্দরের আশীর্ব্বাদ লইবার আশায় দিল্লী হইতে প্রস্থান করেন। ভবিষ্যদ্‌দ্রষ্টা সাধু, ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁহার অঙ্কশায়িনী হইবেন বলিয়া আশীর্ব্বাদ করেন।

এই অভিযানে দুইজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি যোগদান করিয়াছিলেন। জাফর খাঁ-ই-গাজী ও বায়রাম শক্কা। জাফর খাঁর মসজিদ ত্রিবেণীতে এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। মুসলমানদিগের বর্ত্তমান মসজিদগুলির মধ্যে এইটিও বহু প্রাচীন। কাফেরের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রায় বায়রাম ভিস্তির কার্য্য করিতে স্বীকৃত হন। আহত সৈনিকদিগকে জলদান করিয়া অক্ষয় পুণ্যলাভের আশায় বোধ হয় তিনি এই কার্য্য করিতে চাহেন। ভিস্তির প্রতিশব্দ শক্কা এবং ইহা হইতেই তাহার নামে শক্কা শব্দ যোজিত হইয়াছিল। বর্দ্ধমানে তাহার ক্ষুদ্র মুসলমান আস্তানা এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দুরাজার সহিত সম্মুখ সমরে জয়লাভের আশা সুদূরপরাহত হইল। দু-একটি খণ্ড যুদ্ধে তাহাদের বলক্ষয় হইতে লাগিল দেখিয়া সুফী চিন্তিত হইলেন। আর দেখিলেন, যে হিন্দু তাহাদের ভল্লাঘাতে বা তরবারি সাহায্যে দ্বিখণ্ডিত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, সেই আবার পরদিন অক্ষত শরীরে যুদ্ধ করিতেছে। কারণ অনুসন্ধান করিয়া তিনি জানিতে পারিলেন, পাণ্ডুরাজ মৃত ব্যক্তিদিগকে মহানাদের মন্দিরের নিকটস্থ 'জীবনকুণ্ড' নামক পুষ্করিণীতে নিক্ষেপ করিবামাত্র তাহারা সুস্থ ও সবল দেহ হইয়া পুনর্জীবন লাভ করিতেছে। সুফি ফকিরদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহারা একবাক্যে বলিলেন, গোপনে ঐ পুষ্করিণীতে গোমাংস নিক্ষেপ করিলেই পুষ্করিণীর জীবনীশক্তি-দান লোপ পাইবে। কার্য্যেও তাহাই হইল। রাজা পরাজিত হইলেন। মন্দির ভগ্ন করিয়া তাহার স্থলে মসজিদ নির্ম্মিত হইল, হিন্দুগণ বিতাড়িত হইলেন। পাণ্ডুয়া মুসলমান নগরে পরিবর্ত্তিত হইল। কিয়দ্দিবস পরে সুফি হিন্দুদিগের সহিত যুদ্ধে আহত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার পুত্রেরা কারুকার্য্যখচিত যে কবর নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন, তাহা এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে।

ইহার ভিতর কতটুকু সত্য নিহিত আছে, তাহা নিঃসংশয়ে বলিতে পারা যায় না। তবে সাধু বু-আলি কলন্দর যে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ভারতীয় মুসলমান সাধু আজমীরের মুইন-উদ্দিনই-চিস্তির শিষ্য ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। বু-আলি কলন্দর ১৩২৪ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে বৃদ্ধ বয়সে করণালে মারা যান। আর দিল্লীর সিংহাসনে তিনজন ফিরোজ শাহ অধিষ্ঠিত ছিলেন। প্রথম ফিরোজ শাহ ১২৩৬ খৃষ্টাব্দে মারা যান। ২য় ফিরোজ শাহ ১২৯৬ খৃষ্টাব্দে পরলোকগত হন এবং ৩য় ১৩১৯ হইতে ১৩৩৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তাহা হইলে কাহিনী-উক্ত ফিরোজ শাহ, দ্বিতীয় ফিরোজ শাহই ছিলেন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। আবার ত্রিবেণীর জাফর খাঁর কবর হইতে যে খোদিত লিপি পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে দেখিতে পাওয়া যায় ১৩১৩ খৃষ্টাব্দে উহা উৎকীর্ণ হইয়াছিল। ভোলানাথ চন্দ্র মহাশয় তাঁহার "The Travels of a Hindu" নামক পুস্তকে পাণ্ডুয়ার
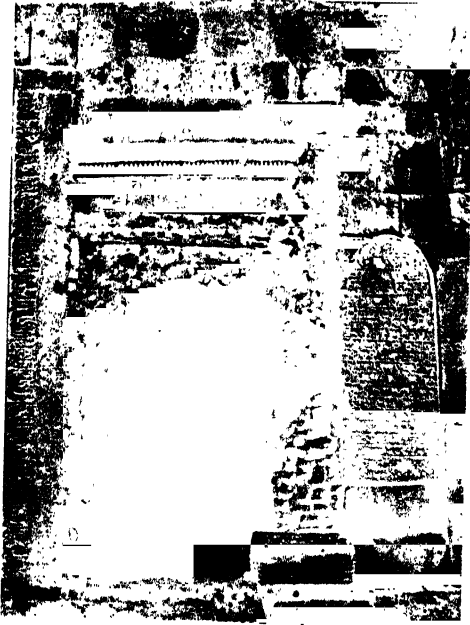
মিহ্‌রাব।

মুসলমানবিজয় সম্বন্ধে নিম্নলিখিত প্রবাদ উদ্ধৃত করিয়াছেন :—যখন পাণ্ডুয়ারাজ ভাবী উত্তরাধিকারীর জন্ম উপলক্ষে প্রীতিভোজ ও আনন্দ-উৎসবে মত্ত, তখন তাঁহার পার্শিদলিলাদির অনুবাদক একজন মুসলমান কর্ম্মচারী গোপনে গো-বধ করিয়া হিন্দুদিগের বিরাগভাজন হইবার ভয়ে হাড়গুলি মৃত্তিকার মধ্যে পুঁতিয়া রাখিয়াছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ রাত্রিকালে শৃগালদ্বারা ঐগুলি উত্তোলিত হয়; ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু প্রজারা রাজার নিকট গোঘাতকের যথোচিত শাস্তি প্রার্থনা করে এবং গোরক্ত মস্তকে ধারণ করিয়া রাজপুরুষ বাঁচিয়া থাকিবার উপযুক্ত পাত্র নয় বলিয়া তাহাকে দণ্ডিত করে। তৎপরে তাহারা মুসলমান প্রজাদিগের উপর অত্যাচার করিতে থাকে, মুসলমানেরা রাজার সহায়তা চাহিয়া সফলকাম না হওয়ায় দিল্লীশ্বরের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিল। দিল্লীশ্বরের সহায়তায় বহুদিন যুদ্ধের পর পাণ্ডুরাজ পরাজিত ও বিতাড়িত হন।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে যখন কাগজের কল নির্ম্মিত হয় নাই, যখন হাতের তৈয়ারী কাগজ ব্যবহৃত হইত, তখন পাণ্ডুয়ার কাগজের খুব আদর ছিল। এখান- কার কাগজ বেশ পাতলা ও স্থায়ী ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে অন্যান্য ম্যাজিষ্ট্রেটেরা হুগলীর ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট হইতে পাণ্ডুয়ার কাগজ লইতেন। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব সরকারী রিপোর্টে পাণ্ডুয়ার কাগজ যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও মূল্যেও সুলভ তাহাও উল্লেখ করিয়াছিলেন। পাণ্ডুয়ার কাগজীপাড়া এখনও লুপ্তশিল্পের স্মৃতি ধারণ করিয়া রহিয়াছে।

আজিও "জঙ্গ ময়দান"কে স্থানীয় মুসলমানেরা সমরক্ষেত্র বলিয়া দেখাইয়া থাকে। ইহারই সন্নিধানে বিজয়ী মুসলমানেরা কাফের জয়ের নিদর্শন-স্বরূপ ও সুভন আল্লার জয় ঘোষণার জন্য এক পুষ্করিণী খনন করিয়া তাহার নাম "ফতে আল্লা" রাখিয়াছে।

১লা মাঘ এখানে একটি বৃহৎ মেলা ও ১লা বৈশাখ একটি ছোটখাট রকমের মেলা বসিয়া থাকে। হিন্দু মুসলমান উভয়ে নির্ব্বিবাদে ইহাতে যোগদান করিয়া থাকে।

১৮২৪ খৃষ্টাব্দে মিনারে ৭০ জন লোক মারা যায়। এক ব্যক্তি উপর হইতে পদস্খলিত হইয়া পড়িয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে যে সমস্ত নীচের লোকেরা উপরে উঠিতেছিল তাহারাও পড়িয়া যায়। সর্ব্বনিম্নের লোকেরা দরজা দিয়া পলায়ন করিতে গিয়া পড়িয়া মারা যায়।

ত্রিবেণী হইতে মহানাদ পর্য্যন্ত ৮ মাইল বিস্তৃত যে উচ্চ বাঁধের উপর রাস্তার ভগ্নাবশেষ এখনও দেখা যায় উহাই পুরাপ্রথিত 'জামাই জাঙ্গাল'।

ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে উড়িষ্যাধিপতি হরিচন্দন দেব সপ্তগ্রাম ও ত্রিবেণী অধিকার করেন। ত্রিবেণীর ঘাট ও জামাই জাঙ্গাল ওড়িয়াদিগের কীর্ত্তির নিদর্শন।

মোল্লা সিমলা মসজিদ—তারকেশ্বর লাইনের নসীবপুর ষ্টেসন হইতে প্রায় অর্দ্ধ মাইল দক্ষিণে ফুরফুরা গ্রামে সরস্বতী নদীর বামতীরে এই অতি পুরাতন মসজিদটি অবস্থিত। জনপ্রবাদ, এই স্থানে পূর্ব্বে বাগ্দীরাজারা রাজত্ব করিতেন। হজরৎ শাহ কবির হালিবি ও হজরৎ করমউদ্দিন বাগ্দীরাজাকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করেন। পরে ইঁহারাও যুদ্ধে হত হইয়াছিলেন। কবির সাহেবের কবরও এখানে আছে। কবির সাহেব আলেপ্পোবাসী আনার কুলি শাহ নামে সাধারণের নিকট পরিচিত।

আনার-কুলির সম্বন্ধে নিম্নলিখিতরূপ প্রবাদ এখনও প্রচারিত হইয়া থাকে। তিনি বড় দর্পণ-প্রিয় ছিলেন।

যাত্রীরা তাঁহার কবরের উপরে আপনাদিগের মনস্কামনা সিদ্ধির মানসে দর্পণ রাখিয়া থাকেন। দোকান হইতে দর্পণ খরিদ করিবার পর তাহাতে মুখ দেখিলে যাত্রীর বিপদ অবশ্যম্ভাবী। কথিত আছে সাধুর জন্য খরিদা আর্শিতে মুখ দেখিয়া একজনকে অকালে প্রাণত্যাগ করিতে হইয়াছিল। এই স্থানে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের যাত্রীরা উপস্থিত থাকেন। প্রবাদের মূলে কতদূর সত্য নিহিত আছে জানি না, তবে আলেপ্পোনগর বহুদিন হইতে কাচ ব্যবসায়ের জন্য বিখ্যাত; ইহা হইতে বোধ হয় আলেপ্পোবাসী ফকিরের দর্পণ প্রিয়তার এই কারণ।

এই মসজিদটি কবে কাহার দ্বারা প্রথম নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহার সঠিক বিবরণ জানিবার কোনরূপ উপায় নাই। উপরোক্ত কবরের ধারে একটি প্রস্তরফলক প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহাতে লিখিত আছে, ৭৭৭ হিজিরা (১৩৭৫ খৃঃ অব্দে, খাঁ উলাগ মুখলিস্ খাঁ একটি মসজিদ নির্ম্মাণ করান; ব্লকম্যান সাহেব মোল্লা-মসজিদের নির্ম্মাণ কাল এইরূপ স্থির করিয়াছেন। অন্যান্য ঐতিহাসিকেরা ইহার গঠন-প্রণালী দেখিয়া ১৪৬০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫১৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করেন। জনপ্রবাদ এই যে, মসজিদ এক হিন্দু সওদাগর দ্বারা ১০০১হিজিরায় নির্ম্মিত হইয়াছিল, সওদাগর যখন পণ্যসম্ভার লইয়া বাণিজ্য ব্যপদেশে সরস্বতী নদীতে উজান বহিয়া চলিতেছিলেন, তখন হঠাৎ তাহার নৌকা সরস্বতীগর্ভে নিমজ্জিত হইতে দেখিয়া মাঝিরা তাহাকে ফকিরের প্রীত্যর্থে প্রার্থনা করিতে বলে। তিনিও পীরের কৃপা পাইয়া সে যাত্রা রক্ষা পাইয়াছিলেন এবং আনোয়ার সাহেবের আস্তানার নিকট এই মসজিদ নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। স্থানীয় লোকেরা দুই মাইল পশ্চিমে বুড়িগাঁ ও হুগলী নদীর পরপারস্থ টিটাগড়ে ফকিরের বিশ্রাম স্থান ছিল বলিয়া এখনও নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ফকির সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক কাহিনী শুনা যায়। নারিকেল গাছ

মোল্লা সিম্‌লার মস্‌জিদ্।

তাঁহার পদানত হইয়া তাঁহাকে ফলদান করিত। একজন হিন্দু নাপিত তাঁহার ক্ষৌর-কার্য্য করিত। একদিন ফকিরের দক্ষিণ হস্ত হঠাৎ ভিজিয়া উঠিতে দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করায় ফকির উত্তর করিয়াছিল, "এইমাত্র এক সওদাগরের কাতর প্রার্থনায় তাহার নিমজ্জমান নৌকা হস্তে করিয়া তুলিয়া রক্ষা করিয়াছি।" অন্য একদিন এই নাপিত আপনার দরিদ্রতার কথা ফকিরকে জানাইলে ফকির স্বহস্তে কিছু মৃত্তিকা লইয়া তাহার হস্তে দিয়া বলিলেন, যতক্ষণ না বাড়ী পঁহুছিবে ততক্ষণ ইহা খুলিবে না। নাপিত কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া অর্দ্ধ পথে মুষ্টি খুলিলে, দেখিল মৃত্তিকার অর্দ্ধেক স্বর্ণে পরিণত হইয়াছে।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

ভারতের শিল্প-বিজ্ঞান-সমিতি।

এখনকার কালে ব্যবসায়-বাণিজ্যে উন্নতি করিতে হইলে, ভারতবর্ষের আবহমান কালের জাতিগত বৃত্তির পিতৃ-পরম্পরাগত অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে চলে না। এই কলকব্জার দিনে, ষ্টীম-এঞ্জিন ও বৈদ্যুতিক

লর্ড কারমাইকেল

শক্তির সাহায্যে পৃথিবীর অপরাপর সভ্যজাতি বিদ্যা, অধ্যবসায় ও পরিশ্রমবলে যাহা করিবে, তাহার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কেবল জাতিগত অভিজ্ঞতাজাত বৃত্তিজ্ঞানের [illegible] সেই ক্ষেত্রে কাজ করিয়া দাঁড়াইতে পারা যাইবে [illegible] এই ব্যাপার, এই তত্ত্ব, এই সত্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া [illegible] দেশের কতকগুলি কৃতবিদ্য, স্বদেশ ও স্বজাতি-[illegible] মনীষী ১৩১০ সালের চৈত্রমাসে (ইং১৯০৪ মার্চ্চ মাসে) একটি সঙ্ঘ স্থাপন করেন। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ রায় [illegible] এম্, এ, বি এল্ মহোদয়ের চেষ্টা, যত্ন ও আগ্রহে এই সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা হয়। যাহাতে আমাদের দেশের উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকেরা য়ুরোপ, আমেরিকা, জাপান, প্রভৃতি দেশে গিয়া বিজ্ঞান-সম্মত কৃষি, ব্যবসা ও বাণিজ্য শিখিয়া আসিতে পারে, তদ্বিষয়ে এই সঙ্ঘ ব্যবস্থা করিবে বলিয়া স্থির হয়। কেবল শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াই সঙ্ঘের কার্য্য শেষ হইবে না। ঐ সকল বিষয়ে বিদেশে বিজ্ঞান-সম্মত শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া যে সকল যুবক দেশে ফিরিয়া আসিবে, সে সকল যুবক যাহাতে দেশে শিক্ষিত বিষয়ে কারখানা খুলিতে পারেন, বা দেশের অন্যান্য লোককে শিক্ষা দিয়া দেশে অভিজ্ঞ লোকের সংখ্যা বাড়াইতে পারেন, তাহার জন্য তাহাদিগকে অর্থ বা অনুরূপ সাহায্য করিতেও এই সঙ্ঘ প্রস্তুত হন। ভারতবর্ষের বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে যে সকল যুবক বিজ্ঞান বিষয়ে গ্রাজুয়েট হইবেন, তাঁহারা যদি য়ুরোপ, আমেরিকা বা জাপানে বিজ্ঞান বিষয়ে আরও অধিকতর শিক্ষা লাভ করিতে উৎসুক হন, এই সমিতি, তাঁহাদিগের সেই ইচ্ছা পূর্ণ করিবারও ব্যবস্থা করিতে প্রস্তুত হন। ভারতবর্ষের কোথাও একটি সম্পূর্ণ সাজসজ্জায় সজ্জীভূত সকল প্রকার রসশালা স্থাপন করিতে, একটি সকল প্রকার শিল্পসম্বন্ধীয় গ্রন্থাগার স্থাপন করিতে এবং সকল প্রকার শিল্পের শিক্ষাশালা বা কারখানা স্থাপন করিতেও এই সঙ্ঘ সংকল্প করেন।

আজ ৯ বৎসর কাল উক্ত সঙ্ঘ এই সকল উদ্দেশ্য লইয়া কাজ করিয়া আসিতেছেন। দেশের সমাজ-হিতৈষী শ্রেয়ঃকাম ধনিগণ ইঁহাদিগকে যে পরিমাণে ধন দিতেছেন, তদনুসারে ইঁহারা ভারতবর্ষের নানাস্থান হইতে জাতি, বর্ণ ও ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে লোক বাছিয়া বিদেশে নানা বিদ্যা শিখিবার জন্য পাঠাইয়া দিতেছেন,তাহাদের মধ্যে প্রয়োজন বুঝিয়া কাহারও কেবল পাথেয়, কাহারও বা পাথেয় এবং বিদেশের বাসা খরচের ও শিক্ষাব্যয়ের অংশ, কাহারও বা সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ করিবার ভার লইতেছেন, এ পর্য্যন্ত বাঙ্গলার প্রায় সকল জেলায়, বিহারে, উড়িষ্যায়, আসামে এই সঙ্ঘের উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দিবার জন্য সুবৃহৎ সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে, এবং নানাস্থানে সঙ্ঘের শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। দেশের মান্যগণ্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ ব্যতীত দেশের বিচার ও শাসন-বিভাগের উচ্চতর ইংরেজ রাজপুরুষও এই সঙ্ঘের

বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর

প্রতি বিশেষ অনুকূল। এ পর্য্যন্ত ৪৮টি শাখা-সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। উৎকল সমিতি উড়িষ্যায় এই সঙ্ঘের কার্য্য করিতে প্রতি বৎসর সঙ্ঘকে প্রচুর অর্থ সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইয়াছে। ব্রহ্ম ও পাঞ্জাবের শাখা-সমিতি প্রতি বৎসর এক একটি ছাত্রের ব্যয় নির্ব্বাহের ভার লইয়াছে। দেশের সহৃদয় ব্যক্তিবর্গের বার্ষিক দানে সঙ্ঘের হাতে এখন বৎসরে ১৫০০৲ টাকা আসিয়া থাকে। অনেক স্কুল কলেজ হইতে নিয়মিত সাময়িক অর্থ-সাহায্য আসিয়া থাকে। কলিকাতার সমস্ত ছাত্রাবাস হইতে সাহায্য পাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। প্রতি ছাত্রকে এজন্য চারি আনা দান করিতে হইবে। এইরূপ ব্যবস্থা করায় অতি সহজে এবং সুশৃঙ্খলে অর্থাগমের উপায় নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এখনও দেশের সর্ব্বত্র সকল সহৃদয় লোকের নিকট সঙ্ঘের সদুদ্দেশ্যের কথা বা কার্য্যের ফলাফল পঁহুছায় নাই, বা অনেকে অন্যান্য বহুতর কার্য্যে নিযুক্ত থাকায় দেশের এই প্রকৃত এবং মুখ্য কার্য্য সুসম্পাদনার্থ এই সঙ্ঘের উদ্দেশ্য সাধনে অর্থ সাহায্য করিতে পারিতেছেন না। দেশের হিতসাধন সম্বন্ধে সকলেই যদি এই সঙ্ঘের জন্য না খাটেন এবং প্রত্যেকে দেশের হিতসাধনে স্ব স্ব কল্পনাগত উপায় অবলম্বনের জন্য ব্যস্ত না হইয়া সামান্য সামান্য মতভেদ মিটাইয়া লইয়া এই সঙ্ঘের অবলম্বিত প্রকৃত উপায়কে সাফল্য দিতে একমত না হন, তাহা হইলে দেশের উন্নতি সাধনের জন্য ব্যবস্থাটা কেবল বড় বড় সভা-সমিতির আড়ম্বর বাগজালপূর্ণ তর্কে মাত্র আবদ্ধ রহিয়া যাইবে।

পূর্ব্বোক্ত উপায় ব্যতীত এই সঙ্ঘের সাহায্যার্থ বঙ্গের রাজ সরকার হইতে বৎসরে ৫০০০৲ টাকা দেওয়া হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন জব্বলপুর নিবাসী ৺হরিদাস খাণ্ডেলবাল নামক এক গ্রন্থকার ও সহৃদয় ব্যক্তি মৃত্যুকালে আপনার সর্ব্বস্ব (প্রায় ২৫০০০৲ টাকা মূল্যের সম্পত্তি) এই সঙ্ঘকে দান করিয়া গিয়াছেন।

এই সঙ্ঘের এইরূপে এখন বৎসরে প্রায় ২৫০০০৲ টাকা আয় ও ২০০০০৲ ব্যয় দাঁড়াইয়াছে।

অতঃপর গত ৯ বৎসরে এই সমিতি কি করিয়াছেন, তাহার একটু পরিচয় দেওয়া যাইতেছে। এ পর্য্যন্ত কৃষিতত্ত্ব, রেশমতত্ত্ব, চর্ম্মপ্রস্তুত, খনিকর্ম্ম, ধাতুলেপ, ঔষধপ্রস্তুত, বৈদ্যুতিক ও যান্ত্রিক ইঞ্জিনিয়ারিং, প্রযোজ্য রসায়ন, ব্যবহারিক রসায়ন, সূত্রবয়ন, বস্ত্রবয়ন, এবং দিয়াশলাই, সাবান, সুগন্ধিদ্রব্য, বোতাম, পেন্সিল, রঙ্, কাচ প্রভৃতির প্রস্তুতবিধি শিক্ষার্থ ১০২ জন ছাত্র এই সঙ্ঘের সাহায্যে বিদেশে গিয়াছিলেন এবং নানাস্থানে উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া তাঁহারা ফিরিয়া আসিয়া দেশে নানাবিধ ব্যবসায়ে ও কার্য্যে লিপ্ত হইয়াছেন।

ইঁহাদের দ্বারা দেশে ২০টি নূতন কারখানা স্থাপিত হইয়াছে এবং যে সকল অপর কারখানায় ইঁহারা নিযুক্ত হইয়াছেন, সে সকল কারখানার ইঁহাদের তত্ত্বাবধানে দেশের ৪০ লক্ষ টাকা ব্যবসায়ে খাটিতেছে। এতদ্ভিন্ন অনেকে অনেক রাজদরবারে এবং অনেকে ইংরেজ-রাজ-সরকারে চাকুরী গ্রহণ করিয়াছেন।

বৰ্দ্ধমানের মাননীয় মহারাজাধিরাজ বাহাদুর এই সঙ্ঘের সভাপতি। তাঁহার এবং সম্পাদক রায় শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ এম, এ, বি, এল, বাহাদুরের যত্নে ও চেষ্টায় এই সঙ্ঘ দিন দিন উন্নতিলাভ করিতেছে। আমরা এই সঙ্ঘের কার্য্যে ইঁহাদিগের প্রতি কৃতজ্ঞ।

এই সঙ্ঘের তত্ত্বাবধানে, এ বৎসর একত্রিশটি ছাত্র বিদেশে যাইতেছেন। ইঁহাদের একজন মাসিক ১০০, একজন ৫০, ও ৮জন ২৫ টিঃ বৃত্তি পাইবেন। আরও একটি বালককে পাথেয় দেওয়া হইয়াছে।

আমাদের সৰ্ব্বজনপ্রিয় গভর্ণর লর্ড কারমাইকেল মহোদয় সমিতির নির্ব্বাচিত ছাত্রগণের এ বৎসরের বিদায়-দানের দিন টাউনহলের সভায় উপস্থিত ছিলেন এবং ছাত্রগণকে জ্ঞানগর্ভ উপদেশ দিয়া, তাহাদের উৎসাহ বৰ্দ্ধন করেন।

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ

বিদেশ প্রত্যাগত কএকটি ছাত্র
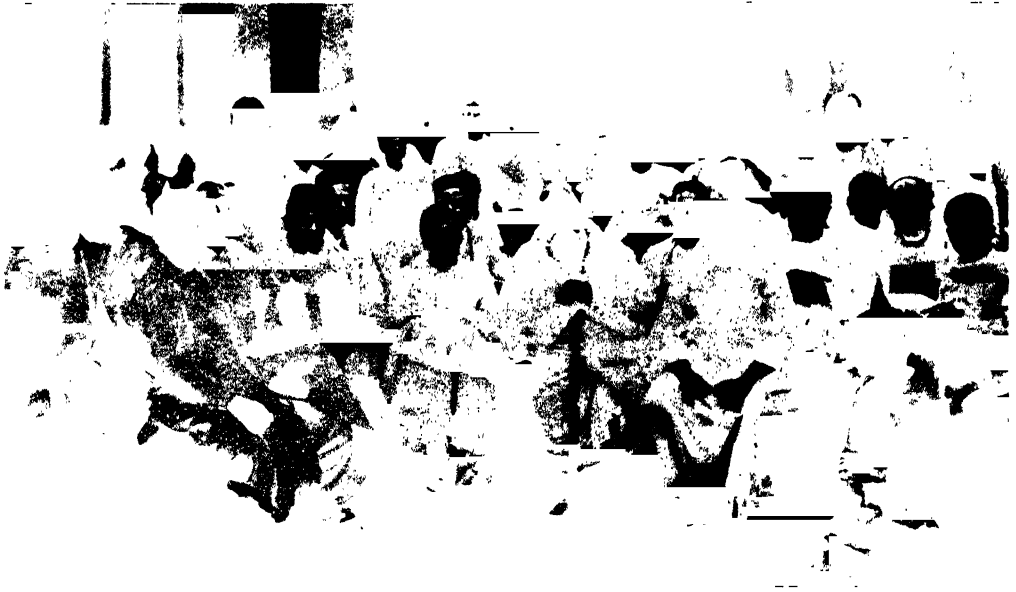
অক্ষয়চন্দ্রের সংবর্দ্ধনা-সভা।

আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্রের সংবর্দ্ধনা।

আচার্য্য শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় বাঙ্গলার সাহিত্য-ক্ষেত্রে সর্ব্বজন-পরিচিত। সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্রের চারিপার্শ্বে যে কএকটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক ছিলেন, আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র তাঁহাদের অন্যতম। বাঙ্গলা দেশে একমাত্র অক্ষয়চন্দ্রই সাহিত্য-সাধনকেই তাঁহার জীবনের ব্রত করিয়াছিলেন, এবং এই বৃদ্ধ বয়সেও তিনি সে সাধনা ত্যাগ করেন নাই। তাঁহার 'সাধারণী', তাঁহার 'নবজীবন', তাঁহার বিবিধ প্রবন্ধাবলি তাঁহাকে বাঙ্গলার সাহিত্য-ক্ষেত্রে যশস্বী করিয়া রাখিয়াছে। এখনও তিনি নানা মাসিক-পত্রিকায় তাঁহার প্রতিভার, তাঁহার অনন্য-সাধারণ একাগ্রতার পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন। বাঙ্গলা দেশের স্বাস্থ্যরক্ষার সম্বন্ধে দুই যুগ পূর্ব্বে তিনি যে প্রকার আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, প্রতি সপ্তাহের 'সাধারণীতে' ম্যালেরিয়া ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধে যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত, এখনও তিনি যখন-তখন সেই কথারই আলোচনা করিয়া থাকেন; এখনও কোন বিষয়ে কথা বলিতে হইলে বা প্রবন্ধ লিখিতে হইলে, সেই ম্যালেরিয়া, সেই বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যের কথাই তিনি বলিয়া থাকেন। তাই তাঁহার চুঁচুড়া সাহিত্য-সম্মিলনের ও চট্টগ্রাম সাহিত্য-সম্মিলনের অভিভাষণে বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যের কথারই বিশেষ ভাবে উল্লেখ দেখিতে পাই।

চট্টগ্রামে সে দিন যে সাহিত্য-সম্মিলন হইয়া গিয়াছে, আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সেই সম্মিলনের সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। চট্টগ্রাম হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইবার পর তাঁহার সংবর্দ্ধনার জন্য বিগত ২৮শে বৈশাখ, রবিবার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনারায়ণ রায় মহাশয় তাঁহার দমদমার আবাস ভবনে একটি আনন্দ-সম্মিলনের আয়োজন করেন। সে দিন অপরাহ্নকালে ভয়ানক ঝড়বৃষ্টি হইয়াছিল; তবুও প্রায় তিন শত গণ্যমান্য ব্যক্তি ও সাহিত্যসেবী এই সংবর্দ্ধনায় যোগদান করিয়াছিলেন। ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে, বাঙ্গলা দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্রকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন।

মহাকালী পাঠশালা।

স্বর্গীয়া মাতাজী মহারাণী তপস্বিনী কলিকাতায় এই মহাকালী পাঠশালার প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। তিনি যখন জীবিতা ছিলেন, সেই সময়েই কলিকাতার নানা স্থানে ও মফস্বলের কএকটি সহরে ইহার শাখা সংস্থাপিত হয়। মহাকালী পাঠশালা হিন্দু বালিকাগণের শিক্ষাদানের জন্য যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা যে হিন্দু মাত্রেরই অনুমোদিত, একথা এই পাঠশালা ও ইহার শাখাগুলির ক্রমোন্নতি দর্শনেই বুঝিতে পারা যায়।

বিগত জ্যৈষ্ঠ মাসে এই পাঠশালার বার্ষিক পারিতোষিক-বিতরণ-কার্য্য মহা সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। সহরের অনেক ভদ্রলোক এই পারিতোষিক-বিতরণ কার্য্যে যোগদান করিয়াছিলেন এবং পাঠশালার উন্নতি দর্শনে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

সেই দিনে যে সকল বালিকা উপস্থিত ছিল, তাহাদের কএকজনের ছায়াচিত্র নিম্নে প্রকাশিত হইল।
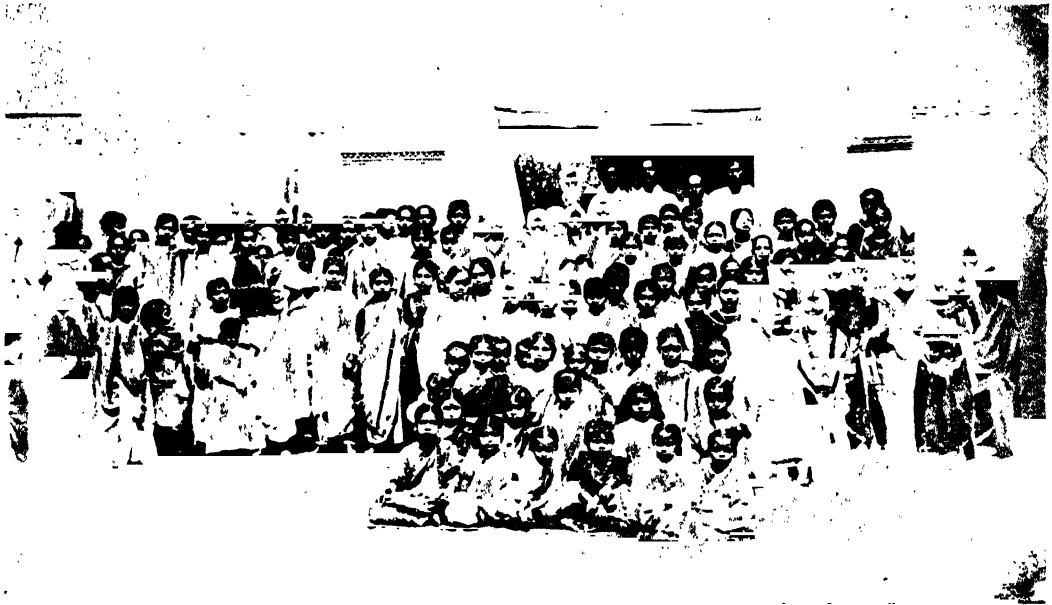
মহাকালী পাঠশালার পুরস্কার-বিতরণ সভা।

প্রাচীন কলিকাতায় ইংরেজ পল্লী।

কলিকাতা সংস্থাপন কালে ইহা বন-জঙ্গলে পরিপূর্ণ। এই সময় জনকয়েক ইংরেজ কলিকাতায় আসিয়া বাস ...। আমরা সেই সমস্ত ইংরেজের বাসস্থানের পরিচয় ...দের প্রাসাদের বর্ত্তমান অবস্থার বিষয় কিঞ্চিৎ ...চনা করিব।

...৮৬ খৃষ্টাব্দে জব চার্ণক নামক জনৈক ইংরেজ ...র নানাস্থানে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যাগার (কুঠী) স্থাপনে অকৃতকার্য্য হইয়া ১৬৯০ খৃষ্টাব্দে "সুতানুটী" গ্রামে (বর্ত্তমান কলিকাতার উত্তর বিভাগে) ইংরেজ উপনিবেশ ও কুঠী স্থাপন করেন। ১৬৯২ খৃষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারি চার্ণকের মৃত্যু হয়। তাঁহাকে St. John গির্জ্জার প্রাঙ্গণে সমাহিত করা হয়। তাঁহার জামাতা Eyre কবরের উপর চার্ণকের যে স্মৃতিচিহ্নের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন পরপৃষ্ঠায় তাহার একটি চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে।

কথিত আছে, কলিকাতায় ডালহাউসীস্কোয়ারই (লাল-দীঘি) ইংরেজের প্রথম আড্ডা; ঐ স্কোয়ার পূর্ব্বে "the

১৭৯৪ খৃষ্টাব্দের কলিকাতার একটি দৃশ্য

green before the fort" এই নামে অভিহিত হইত। বোধ হয় ইহার পশ্চিমাংশ প্রথমে ফোর্ট-উইলিয়ম নামক কেল্লা ও হলওয়েল সাহেব-প্রচারিত "অন্ধকূপ" রাস্তার মধ্যস্থানে সদরদ্বারের সম্মুখে অবস্থিত ছিল, এইজন্য ঐ নামে অভি
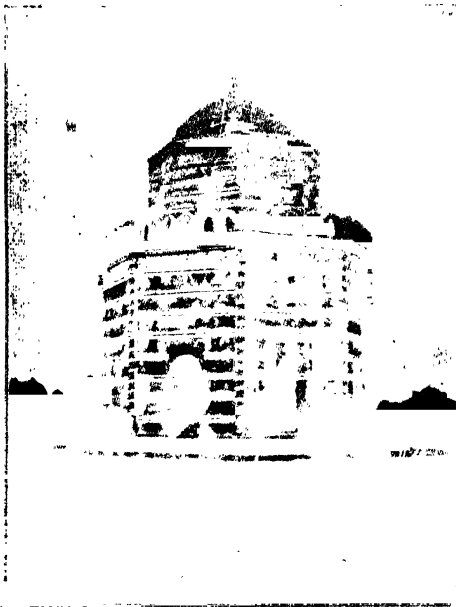
চার্ণকের কবর

হিত হইত; ইহার পূর্ব্বদিকে পুরাতন বিচারালয় (old court house) থাকাতে ঐ রাস্তার নাম "ওল্ড কোর্ট হাউস" ষ্ট্রীট্ হইয়াছে। নিলামওয়ালা ম্যাকেঞ্জি লায়ালের বাড়ী তখন (old theatre) "ওল্ড থিয়েটার" ছিল। ১৭১৬ খৃষ্টাব্দে Parish church নামক গির্জ্জা বর্ত্তমান "কেরাণী-বারিকের" (Writers buildings) পশ্চিমে নির্ম্মিত হইয়াছিল; ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দের ভূমিকম্পে উহার চূড়া ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং বিশ বৎসর পরে "অন্ধকূপ হত্যাকাণ্ডের" সময় ঐ গির্জ্জা একেবারে সমভূমি হয়। এই গির্জ্জায় তৎকালীন লাট বাহাদুর উপাসনার্থ স্বয়ং আসিতেন এবং সাধারণ জনগণের সঙ্গে বসিতেন ও নানাবিধ কথাবার্ত্তায় আপ্যায়িত করিতেন। "এসপ্লানেড রো" নামক গড়ের মাঠের উত্তর দিকের রাস্তায় যে বাড়ীতে এক্ষণে টী, ই, টমসন কোম্পানীর দোকান আছে, তখন ঐ বাড়ীতে লাট ওয়ারেণ হেষ্টিংসের গুপ্ত মন্ত্রণাগৃহ ছিল। এখন যে বাড়ীতে স্মিট্-টমসন নামক ঔষধ বিক্রেতা আছেন, ঐ বাড়ীর সহিত উক্ত গুপ্তমন্ত্রণাগৃহে যাইবার একটি পথ সংলগ্ন ছিল।

হেষ্টিংস ষ্ট্রীটে যে বাড়ীতে বার্ণ এণ্ড কোম্পানীর অফিস আছে, ঐ বাড়ীতে ওয়ারেন হেষ্টিংসের পরমসুন্দরী স্ত্রী Imhoff বাস করিতেন। সম্প্রতি এই বাড়ীর সম্মুখভাগ নূতনভাবে নির্ম্মিত হইয়াছে।

নন্দকুমারের বিচারবিভ্রাট লেখক জজ "হাইড" সাহেব বর্ত্তমান টাউন হলের পাশের বাড়ীতে বাস করিতেন। বর্ত্তমান "মিড্‌লটন্ রো" নামক রাস্তায় যে বাড়ীতে এক্ষণে "Lorett's convent" আছে, তখন সেই বাড়ীতে মহা-

রাজা নন্দকুমারের জীবনহন্তা ইম্পে সাহেবের বাসভবন ছিল। হেষ্টিংসের বসত বাড়ী আলিপুরে এখন হেষ্টিংস সাহেবের বাড়ী বলিয়া আখ্যাত। বর্ত্তমান থিয়েটার রোড ও উডষ্ট্রীটের মিলনস্থান-কোণের বাড়ীতে একজন হিন্দু ব্রহ্মচারী বাস করিতেন। মৃত্যুর পর তাঁহার দেহ পার্ক-ষ্ট্রীটের গোরস্থানে সমাহিত হয়। ঐ স্থানে হিন্দুমন্দিরের ন্যায় তাঁহার সমাধি এখনও বর্ত্তমান। বেগম জনসন নাম্নী এক চতুর্ব্বার বিবাহিতা রমণী St. John গির্জ্জায় সমাহিত হন। তিনি ইংলণ্ডীয় জনৈক প্রধান মন্ত্রীর জননী।

এখন যে বাড়ীতে Llewell কোম্পানীর অফিস আছে, তখন ঐ বাড়ীতে লাটসাহেবের কাছারি বাড়ী (Official Residence) ছিল। পূর্ব্বে ঐ রাস্তার নাম ছিল "কসাই-টোলা।" ঐ বাড়ী লাট মিণ্টোর প্রাসাদ। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে উহা যেমন ছিল, এখনও তেমনই ভাবে আছে।

যেখানে এখন রয়েল এক্সচেঞ্জ (Royal ex change) তথায় ক্লাইভ সাহেবের আবাস ছিল। এখন যে বাড়ীতে মদ্যব্যবসায়ী আমটা কোম্পানীর দোকান, ঐ বাড়ীতে তখন টাকশাল (old mint) ছিল। যে বাড়ীতে এখন Bengal club, ঐ বাড়ীতে সুলেখক মেকলে সাহেব বাস করিতেন। ফ্রী স্কুল ষ্ট্রীটস্থ যে বাড়ীতে Armenian College আছে, ঐ বাড়ীতে প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক Thackeray সাহেব জন্মগ্রহণ করেন। অন্ধকূপ হত্যার বিবরণ প্রচার-কর্ত্তা হলওয়েল সাহেবের সময়ে গভর্ণর ক্রেটেণ্ডেম সাহেবের বাড়ী পুলিশঘাটের নিকটেই অবস্থিত ছিল এবং উহার জমি নদীতীর হইতে Park Square পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। অন্ধকূপহত্যাবশিষ্ট মিস কেরী নাম্নী রমণী ইহারই নিকট বাস করিতেন। কথিত আছে, ইনি হত্যা-কাণ্ডের পর প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী জীবিতা ছিলেন।

কলিকাতা-শব্দের জন্মতত্ত্ব।

কলিকাতা শব্দের বংশপরিচয় সম্বন্ধে অনেকে অনেক প্রকার মতের অবতারণা করিয়া থাকেন; তন্মধ্যে যে মতটি আমাদের যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হইয়াছে, তাহা এখানে সংগ্রহ করিয়া দিলাম। 'কলিকাতা' শব্দ 'কোলকোট্ট' শব্দের অপভ্রংশ বলিয়া বোধ হয়।

কেহ কেহ অনুমান করেন যে, ইহা "কোলকোট্ট," "কোলকোট," বা "কোলকুট" রূপেও ব্যবহৃত ছিল। "কোট্ট," "কোট, ও "কুট," এই তিনটি সংস্কৃত শব্দের অর্থ একই; ইহাদের প্রত্যেকটিরই অর্থ দুর্গ বা আশ্রয়-স্থান। "কুট" শব্দটি বোধ হয় অপর দুইটির বিকৃতি-মাত্র। কলিকাতা শব্দ যে কোট্ট শব্দে সংগঠিত, তাহা ভারতের নানা গ্রাম বা নগরের নাম হইতেও প্রতিপন্ন করা যায়। ভারতের অনেক গ্রাম বা নগরের নামের অন্তভাগে কোট্ট শব্দের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। এমন কি, অনেক স্থান কোল কোট্টাদি নামেই আখ্যাত। শুধু ভারতবর্ষের কেন, আরবের দক্ষিণবর্ত্তী সোকোট্রা বা স্কোট্রা আখ্যাত দ্বীপের নাম ঐ শব্দযোগে সংগঠিত বলিয়া অনুমিত হয়। উক্ত দ্বীপের আদিম নাম "দ্বীপ-সুখাধার," কিন্তু উহার অধস্তন নাম "সুকোট্ট"। নীলতন্ত্রের সপ্তম পটলে ঐ রূপ নামের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

"কোল" শব্দের অর্থ "বন্দর"। মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত চণ্ডীতে একটি কোলা, নামে নগরের উল্লেখ আছে।

প্রাচীনকালে বেতাকীর খাল দিয়া বণিকেরা সপ্তগ্রামে গমনাগমন করিতেন; কিন্তু ১৫৭০ খৃষ্টাব্দে ঐ খালে ভয়ানক চড়া পড়িয়া যাওয়ায় ১৫৯২ অব্দ হইতে বণিকেরা ঐ পথ ত্যাগ করিয়া কলিকাতার সম্মুখবাহিনী ভাগীরথী দিয়া সপ্তগ্রামে যাতায়াত করিতেন। তখন কলিকাতা একটি কোল অর্থাৎ বন্দর হইয়া উঠিল। ইহা বণিকদিগকে ঝড়ের সময়ে আশ্রয় দান করিত বলিয়া কোট্ট অর্থাৎ দুর্গ হইল। শ্রীচৈতন্যদেব যখন তীর্থ পর্য্যটন করেন, তখন অর্থাৎ ১৫০৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫১৫ অব্দ পর্য্যন্ত এখানে যে কোনও লোকের বাস ছিল, এরূপ কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না।

এখন প্রতিপন্ন হইতে পারে যে, লোকের বসতির পূর্ব্বে বণিকগণের পক্ষে প্রাচীন কলিকাতা একটি বন্দর ও আশ্রয়স্থান, অর্থাৎ কোলকোট্ট ছিল। বিশেষ কোনও নামে তখন উহা অভিহিত ছিল না। সাধারণে "কোল-কোট্ট" নামেই পরিচয় দিত। পরে "কোলকোট্ট" কলি-কাতা নামে বিকৃত হইয়াছে। ভ্যানডেন্ ব্রুক সাহেব ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মানচিত্রে ইহাকে "কোল্লিকট্টি" (Collecatte) রূপে সন্নিবেশিত করেন। যদি তখন উহার নাম কোলকোট্ট না থাকিত, তাহা হইলে তিনি

কিরূপে ঐ শব্দটি পাইতেন? এখন স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, "কোল্লিকট্টি" "কোলকোট্ট" শব্দের অপভ্রংশ মাত্র। এইরূপ নানা স্থানের নামের অপভ্রংশ দেখিতে পাওয়া যায়।

যখন বেতাকীর খালে চড়া পড়িয়া বেতড়ার হাটের অবনতি ঘটে, তখন সপ্তগ্রামের তন্তুবায়গণ গোবিন্দপুরে আসিয়া বসতি করেন, এবং কোলকোট্টে একটি হাট সংস্থাপন করেন। তখন বণিকেরা ঐ নূতন হাটেই যাতায়াত করিতেন। এই বণিকদিগের কুলদেবতা গোবিন্দজী ঠাকুরের নামানুসারে ঐ স্থানের নাম গোবিন্দপুর হয়। বাণিজ্য-প্রভাবে ঐ নাম শীঘ্রই সর্ব্বত্র রাষ্ট্র হইয়া যায় এবং এমন কি পুরাণাদিতেও সন্নিবেশিত হইতে থাকে। তন্তুবায়দিগের গোবিন্দপুরে আগমনকালে কোলকোট্টে লোকের বসতি ছিল না।

পাঠানেরা সপ্তগ্রাম লুঠপাঠ করিলে এবং সরস্বতীর স্রোত রুদ্ধ হইলে ১৬৩২ খৃষ্টাব্দে সপ্তগ্রামের তন্তুবায়েরা স্থানান্তরে বসতি করে। তন্মধ্যে কেহ কেহ কোলকট্টে বা প্রাচীন কলিকাতায় আসিয়াও বাস করে। কোলকোট্টে এই প্রথম বসতি। তন্তুবায়দিগের বাসহেতু তথাকার হাটের ক্রমোন্নতি হইতে লাগিল। হাট নিত্য নিত্য বসিতে লাগিল এবং বণিকেরা সতত‌ই গমনাগমন করিতে লাগিল। তন্তুবায়দিগের ব্যবসায়ের গুণে ক্রমে ঐ স্থান সূতানুটি নামে আখ্যাত হয়। প্রাচীন কলিকাতার "ডিহি কলিকাতা" নামক স্থানে তাহারা প্রথম আসিয়া বাস করে। "ডিহি" শব্দের অর্থ প্রথম বসতি।

চিত্রশিল্পী—শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ লাহা।

চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ লাহা

বাঙ্গলার প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ লাহা মহাশয় অতি অল্প দিনের মধ্যেই যে যশ অর্জ্জন করিয়াছেন, তাহা সকলের ভাগ্যে ঘটে না। তাঁহার প্রতিষ্ঠাদর্শনে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, বাঙ্গালী প্রকৃত গুণের আদর করিতে শিখিয়াছে,—প্রকৃত প্রতিভার সম্মান করিতে জানে। শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ লাহা মহাশয় কলিকাতার প্রসিদ্ধ ধন-কুবের বাবু চণ্ডীচরণ লাহা মহাশয়ের পুত্র। ধনের সহিত প্রতিভার সমাবেশ হইলে যে কেমন মণি-কাঞ্চন সংযোগ হয়, শিল্পী শ্রীযুক্ত ভবানীচরণই তাহার দৃষ্টান্তস্থল। আমরা নিম্নে শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ লাহা মহাশয়ের একখানি প্রতিকৃতি প্রকাশিত করিলাম।

আমরা ভারতবর্ষের পাঠকগণকে আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে ভবানী-বাবুর সুন্দর সুন্দর চিত্র ভবিষ্যতে তাঁহাদিগের সমক্ষে উপস্থিত করিতে সমর্থ হইব।

সঙ্কলন।

ঐতিহাসিক সংবাদ।

দিল্লীর লৌহস্তম্ভ—দিল্লীর লৌহস্তম্ভটি কি বিদেশী, কি ভারতবাসী দর্শক মাত্রেরই নানারূপ কৌতূহল জাগাইয়া তুলে। বহুকাল হইতে ইহার ঐতিহাসিক তত্ত্ব লইয়া বিদ্বৎ সমাজে অনেক গবেষণা চলিতেছে। দিল্লীতে যে সকল প্রাচীন কীর্ত্তি বর্ত্তমান আছে, এই স্তম্ভটি তাহার মধ্যে প্রাচীনতম কীর্ত্তিমালার অন্যতম। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে যে সকল য়ুরোপীয় পর্য্যটক এদেশে আসিয়াছিলেন, তন্মধ্যে টমাস কোরিএট এই স্তম্ভটিকে গ্রীকবীর আলেকজ্যাণ্ডারের পুরুরাজজয়ের জয়স্তম্ভ বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। নিকোলা মানুসি বলিয়াছেন যে এটি ভারতে প্রাচীন চীনাধিকারের নিদর্শন; কিন্তু তাহার পর, যখন জেমস প্রিন্সেপ এই স্তম্ভগাত্রে উৎকীর্ণ লিপির পাঠোদ্ধার করিলেন, তখন ইহার স্বরূপ বিদ্বৎ সমাজে প্রকাশিত হইল। ইহা জয়স্তম্ভ বটে, কিন্তু আলেকজাণ্ডারের নহে। মগধরাজ চন্দ্রগুপ্ত (গুপ্তবংশীয়) বঙ্গদেশ ও বাহ্লীকদেশ জয় করিয়া এই স্তম্ভগাত্রে সেই বিজয়বার্ত্তা উৎকীর্ণ করাইয়াছিলেন। ইহাতে বাহ্লীক জয়ের বিবরণ যাহা পাওয়া যায়, তাহাতে জানা যায় যে, তিনি সিন্ধুনদের সপ্তমুখ (সপ্ত উপনদী) উত্তীর্ণ হইয়া বাহ্লীক-জয়ে গমন করেন। অনেকে অনুমান করেন, এই স্তম্ভ প্রথমে মথুরায় ছিল, সেখান হইতে কেহ ইহাকে দিল্লীতে আনিয়া স্থাপন করিয়াছেন। ডাক্তার জে, পি, ভোগেল ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সহকারাধ্যক্ষ। সম্প্রতি তিনি লণ্ডনে লিনিয়ান সোসাইটি নামক এক সভায় এই স্তম্ভটি সম্বন্ধে কতকগুলি গবেষণার কথা উপস্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি পূর্ব্বোক্ত প্রাচীন মতামতের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, ইহার গাত্রে উৎকীর্ণ লিপির বচনবিন্যাস লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায় যে, এই স্তম্ভটি এখন যেখানে আছে, প্রথম হইতেই সেখানে ছিল না। এই লিপির বর্ণমালাও সেই অনুমানের আর এক সাক্ষী। এই বর্ণমালা প্রাচীন ভারতবর্ষের পূর্ব্বাংশের বর্ণমালা এবং সেই সূত্রে বলা যাইতে পারে যে, এই স্তম্ভটি একদিন গুপ্তরাজগণের মগধের কোথাও কোন প্রাচীন রাজধানীতে প্রতিষ্ঠিত ছিল। ডাক্তার ভোগেলের এ অনুমানের যুক্তি ক্ষীণ হইলেও ভাবিয়া দেখিবার ও গবেষণার বিষয়ীভূত তথ্য বটে।

দিল্লীর লৌহস্তম্ভ
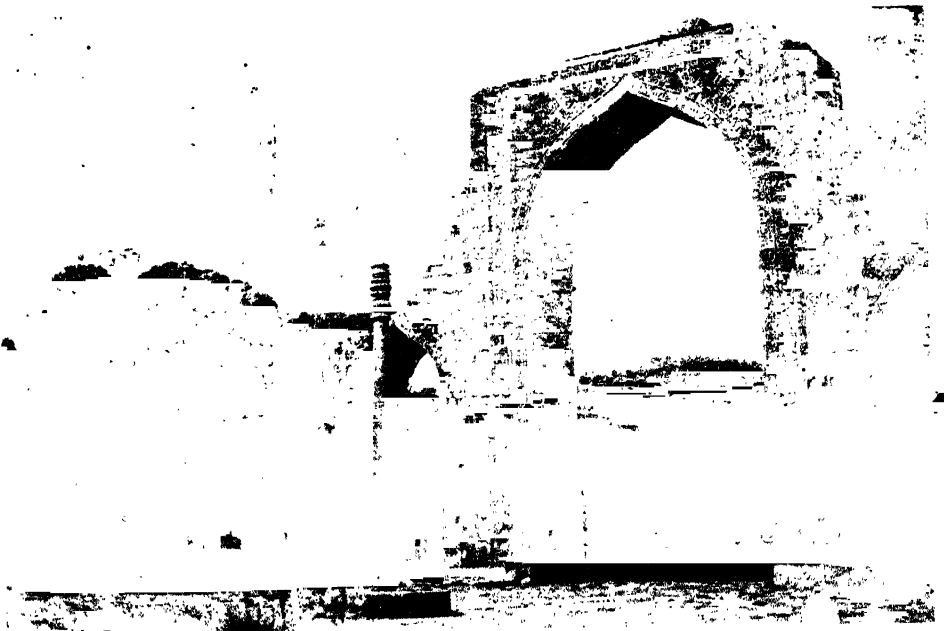
শ্যামদেশে বৈষ্ণবীসেনা ও বৈষ্ণব উপনিবেশ--

মহাভারতে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং পাণ্ডবপক্ষে যোগ দিয়া কৌরবগণকে "নারায়ণীসেনা" নামক অদম্য একদল বৈষ্ণবী সেনা দিয়া সাহায্য করিয়াছিলেন দেখা যায়। তাহার পর আর কোন ইতিহাসে "বৈষ্ণবী সেনার" কোনরূপ উল্লেখ পাওয়া যায় নাই। আমরা নাই খোঁজ রাখি, কিন্তু "বৈষ্ণবী সেনাদলের" অস্তিত্ব তৎপরেও বহুকাল পৃথিবীতে ছিল। এতদিন পরে তাহার একটা নিদর্শন বাহির হইয়াছে, আর সে নিদর্শন ভারতে কিংবা ভারতের পশ্চিমাংশে নহে,—ভারতের বাহিরে পূর্ব্বাঞ্চলে পাওয়া গিয়াছে। ব্যাপারটা এই,-

কএক বৎসর পূর্ব্বে কর্ণেল জেরিণী তামিল ভাষায় উৎকীর্ণ শিলালিপি শ্যাম দেশে প্রাপ্ত হন। তিনি সেখানি ইংলণ্ডে রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটিকে উপহার দেন। সম্প্রতি (এপ্রেল ১৯১৩) ডাক্তার হুল্ চ্ রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় উহার সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। উহা পাঠে জানা যায় যে, উহা প্রাচীন তামিল অক্ষরে, তামিল ভাষায় উৎকীর্ণ। ডাক্তার হুল্‌জ্ উহার কতকগুলি অক্ষর এবং বিরাম চিহ্নাদির আকার বিচার করিয়া বলেন যে, উহারা নন্দীবর্ম্মা পল্লব মল্লের কাসাকুড়ি শাসনের ন্যায় এবং বিজয়-নন্দী বিক্রম বর্ম্মার তিরু বল্লম-শাসনের সহিত ইহার সুসাদৃশ্য আছে; এজন্য তিনি অনুমান করিয়াছেন যে, শ্যামদেশের এই তামিল প্রস্তর লিপিখানিও খৃষ্টীয় অষ্টম বা নবম শতাব্দীর বস্তু। লিপিখানি অংশতঃ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। যে অংশটুকু পড়া যায় তাহা হইতে হুল্‌জ্ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, খৃষ্টীয় অষ্টম বা নবম শতাব্দীতে দক্ষিণ ভারত হইতে একদল মণিগ্রামম্ (বণিক সঙ্ঘ) শ্যামের ন্যায় দূরদেশে একটি বিষ্ণুমূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিল এবং নৌযুদ্ধে জয়ী হইয়া সেখানে উপনিবেশও স্থাপন করিয়াছিল। এই উপনিবেশ তামিল সেনা দ্বারা সুরক্ষিত থাকিত। বিষ্ণু স্থাপনকারী বিজয়ী সেনাদল বৈষ্ণবী সেনার সেনামুখদল (অগ্রবর্ত্তী সেনাদল) বিষ্ণু মন্দির আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিত।

হুল্‌জ্ বলেন তামিল বৈষ্ণবী সেনা যে ব্রহ্মদেশে ও সুমাত্রায় উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল, তাহার প্রমাণ যথাক্রমে সপ্তম ভাগ এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকায় (পৃ ১৯৭) এবং বটেভিয়ার প্রত্নতত্ত্ব সংক্রান্ত দ্রব্যের তালিকায় (১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের ৪৯ সংখ্যার ১৮৮ পৃষ্ঠায়) পাওয়া যায়।

চরক, অশ্বঘোষ ও কণিষ্ক।

কুষণ বংশীয় শকসম্রাট্ কণিষ্ক পণ্ডিতগণের মতে খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীর মধ্যকালে বর্ত্তমান ছিলেন বলিয়া একরূপ সিদ্ধান্ত চলিয়া আসিতেছে এবং অনেকেই অনুমান করেন যে শকাব্দ-গণনা ইঁহারই রাজত্বকাল হইতে প্রতিষ্ঠিত। ডাক্তার ফ্লিট ও কেনেডি কুষণবংশের এবং উত্তরদেশীয় ক্ষত্রপগণের যে সকল তালিকা নির্ণীত করিয়াছেন, তদনুসারে অশ্বঘোষকে কনিষ্কের সমকালিক বলিতে পারা যায়। ডাক্তার হর্ণলে তাঁহার স্বমুদ্রিত বাওয়ার পুঁথির প্রস্তাবনায় বলিয়াছেন যে, নাবনীতক গ্রন্থে চরক সংহিতার উল্লেখ আছে। এই নাবনীতক গ্রন্থকে তিনি খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর গ্রন্থ বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন। এরূপ স্থলে অশ্বঘোষের ন্যায় চরককেও সম্রাট্ কণিষ্কের সমকালবর্ত্তী বলা যায়। শকাব্দের প্রতিষ্ঠাতা হইলে বা খৃষ্ট জন্মের ৫০ বৎসর পূর্ব্বকার লোক হইলে সম্রাট্ কণিষ্ক, অশ্বঘোষ ও চরক সকলেই এখন হইতে প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে কণিষ্ক ও কণিষ্কবংশীয় হুবিষ্ক, দশরথ প্রভৃতি শকরাজগণের স্বর্ণ মুদ্রা সংগৃহীত হইয়াছে। এই মুদ্রাগুলির নাম দীনার।

হনুমানের পরিচয় রহস্য।

এফ্. ই. পাৰ্জ্জিটার আমাদের হাইকোর্টের জজ ছিলেন। তিনি ভারতীয় পুরাতত্ত্বের বিখ্যাত সেবক। তিনি ১৯১১ খৃষ্টাব্দে হনুমানের পরিচয় খুঁজিতে ব্যস্ত ছিলেন। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে তিনি এই পরিচয় রহস্য প্রকাশ করিতে গিয়া দেখাইয়াছেন যে ঋগ্বেদের বৃষাকপি ও রামায়ণের হনুমন্ত (হনুমান)- উভয়েই গোদাবরী নদীর সহিত সংশ্লিষ্ট। হনুমান যে দাক্ষিণাত্যের লোক তাহা সুস্বীকৃত এবং বৃষাকপিও যে সেই দেশের ব্যক্তি তাহা সুসঙ্গতরূপে অনুমিত, এবং এই দুইজনের মধ্যে কোন একটা সংস্রব আছে। গোদাবরী তীরে বৃষাকপি তীর্থ আছে আর হনুমানের কৃপাতেই তাহা তীর্থরূপে গণ্য হইয়াছে,-- গোদাবরী প্রদেশে এইরূপ কিংবদন্তী একটা আছে, তাহা দ্বারাও উভয়ের সমত্ব অনুমিত হয়। এই সমত্ব কোথায়? পার্জ্জিটার বলেন, এই সমত্ব যদি কিছু থাকে তবে তাহা উভয় নামের মূলেই থাকিবে, শব্দ দুইটির মূল অনুসন্ধান আবশ্যক। বৃষাকপি একটি নামবাচক হইলেও 'বৃষ' ও 'কপি' এই শব্দযোগে উৎপন্ন। কেবল শব্দার্থ ধরিলে উহার অর্থ পুংবানর। এখন যদি বৃষাকপিকে দাক্ষিণাত্যবাসী বলা যায়, তবে এই যৌগিক শব্দটি কোন দুইটি দ্রাবিড়ীয় শব্দের সংস্কৃতানুবাদ হইবে। হনুমান বা হনূমান যখন নিশ্চয়ই দাক্ষিণাত্যবাসী তখন এই সংস্কৃত নামটিও কোন দ্রাবিড়ীয় নামের সংস্কৃতানুবাদ হইবে। সংস্কৃত 'হনুমান' শব্দের অর্থ হনু-বিশিষ্ট। এরূপ অর্থ দ্বারা শব্দটিকে আসলে সংস্কৃত শব্দ বলিয়া বুঝা যায় না, কিন্তু গল্পানুসারে মূলতঃ কোন দ্রাবিড়ীয় শব্দের সংস্কৃতরূপ হইতেও পারে এরূপ অনুমান করা যায়।

রামায়ণে হনুমান ও বানরগণের দেশ কিষ্কিন্ধ্যা বলা হইয়াছে। উহা গোদাবরীর দক্ষিণ পশ্চিমে কিয়দ্দূর বিস্তৃত। এই স্থান কর্ণাটী ভাষার দেশের দক্ষিণে এবং তামিল ভাষার দেশের উত্তরে অবস্থিত, অতএব ঐ দুই ভাষা হইতে এই নামের উৎপত্তির মূল যদি কিছু থাকে ত পাওয়া যাইবে।

'বৃষা'-পুরুষ,-দ্রাবিড়ীয় ভাষায় সাধরণতঃ 'আণ' শব্দের সহিত মিলিতে পারে। কর্ণাটী, তামিল ও মালয় ভাষায় ঐ শব্দটি আছে। তেলগু ভাষায় এই শব্দটির পরিবর্ত্তে মগ শব্দ চলিয়াছে। 'আণ' শব্দ অন্য

পক্ষে বসিয়া তাহার পুংস্ত্ব নির্দ্দেশ করে। উক্ত চারি ভাষায় কপি-বাচক দুইটি শব্দ দেখা যায়;—'কুরঙ্গু' ও 'মণ্ডি'। কেবল তামিল ভাষায় 'কুরঙ্গু' শব্দে কপি বুঝায়, অন্য তিন ভাষায় উহার অর্থ সংস্কৃত কুরঙ্গ বা হরিণ। মালয় ভাষার 'কুরঙ্গ' শব্দে হরিণ ও 'কুরন্নু' শব্দে বানর বুঝায়। 'মণ্ডি' শব্দে তামিলে বানর বিশেষতঃ 'বানরী' বুঝায়, মালয় ভাষায় কৃষ্ণমুখ বানর বুঝাইতে 'মণ্ডি' শব্দ ব্যবহৃত হয়। কর্ণাটীতে মানুষ, ব্যক্তি বুঝাইতে 'মণ্ডি' শব্দ ব্যবহৃত হয়। তেলগুতে অন্য শব্দ যোগে 'মণ্ডি' শব্দে ব্যক্তি বুঝায়। কর্ণাটী ও তেলগুতে 'কোটি' ও 'তিম্মা' শব্দে বানর বুঝায়, কিন্তু তামিল ও মালয় ভাষায় উহার সমশব্দ নাই, অতএব দ্রাবীড়ীয় ভাষায় বানরার্থ 'মণ্ডি' শব্দ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন শব্দ।

এই সকল সাদৃশ্য উপস্থাপিত করিয়া পার্জ্জিটার বলিতেছেন যে, যদি এই সকল কথা গ্রহণীয় হয় তবে 'আণ মণ্ডি' শব্দ বৃষাকপি শব্দবোধক হইতে পারে। আণমণ্ডির শব্দার্থ ধরিয়া সংস্কৃতানুবাদ বৃষাকপি হইতে পারে।

তারপর 'আণ মণ্ডি' কে সংস্কৃত করিয়া লইতে হইলে সহজে 'হনুমান' হইয়া পড়ে, কারণ আর্য্যগণ যেখানে দ্রাবীড়ীয় শব্দকে সংস্কৃত করিয়া লইয়াছেন, সেইখানে অনেক স্থলে শব্দের আদিস্থিত কোমল স্বরকে রাখিয়া দিয়াছেন বা তাহার সহিত 'হ' মিশাইয়া লইয়াছেন। এইরূপে আণমণ্ডি—অনমণ্ড, হনুমণ্ড হইয়া দাঁড়াইয়াছে। 'ইড়ুম্বর' আর একটি দ্রাবীড়ীয় নাম সংস্কৃতে মহাভারতে হিড়িম্ব হইয়াছে, হরিবংশে 'ডিম্ব' হইয়াছে।

অতঃপর পার্জ্জিটার বলিয়াছেন যে,—বৃষাকপি—আণমণ্ডি—হনুমন্ত যদি ঠিক হয়, তবে বলিতে হয় ঋগ্বেদের পূর্ব্বেই দাক্ষিণাত্যে আর্য্যপ্রভাবের বিস্তৃতি হইয়াছিল। বানর পূজা দাক্ষিণাত্যের সম্পত্তি, এবং ঋগ্বেদ সংগ্রহের পূর্ব্বেই বানর-স্তুতিমন্ত্র সকল সে দেশে রচিত হইয়াছিল। আর্য্যেরা প্রথমে ভারতের দেশীয় পূজাপদ্ধতি লোপ করিতে যাইতেন; শেষে, যখন তাহা লুপ্ত না হইয়া আবার ঠেলিয়া উঠিত, তখন তাহা নিজস্বভুক্ত করিয়া লইতেন। বৃষাকপি স্তুতিমন্ত্রগুলি দ্বারা এই কথা অনুমিত হয়।

প্রাচীন-পঞ্জী।

কলিকাতায় সুঁদরীবন---কলিকাতা বড় অধিক প্রাচীন নগর নয়। এক সময় ইহা সুন্দরবনের অন্তর্নিবিষ্ট ছিল। ইতঃপূর্ব্বে এখানে সুঁদরী গাছ জন্মিত এবং জোয়ারে জোয়ারে ২ ফুট হইতে ১০ ফুট জল উঠিয়া এই স্থানটি প্লাবিত হইয়া থাকিত। যে ভূমিতে ঐ জাতীয় বৃক্ষ জন্মিত, তাহা এক্ষণে অন্যূন বিশ ফুট বসিয়া গিয়াছে ও জোয়ারে জোয়ারে মৃত্তিকা পড়িয়া ক্রমে উচ্চ হইয়াছে। সম্প্রতি এতদ্বিষয়ে কয়েকটি প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে।

[illegible] খৃষ্টাব্দে সারকুলার রোডের পূর্ব্বধারে ৩০ ফুট গভীর একটি পুষ্করিণী খনন করা হয়। ঐ পুষ্করিণীর তলায় কয়েকটি সুঁদরী গাছের গুঁড়ি পাওয়া যায়। সুঁদরী গাছ যেস্থানে স্বভাবতঃ জন্মে, সেস্থান জোয়ারের জলস্তর হইতে ২ ফুট হইতে ১০ ফুট পর্য্যন্ত নীচু থাকে, আর ভাঁটার জলস্তর অপেক্ষা ৬ বা ৮ ফুট উচ্চ থাকে। জোয়ারে জোয়ারে জল আসিলে ঐ সকল গাছের গোড়া ডুবিয়া থাকে। ভাঁটার সময় আবার জল চলিয়া গেলে, তাহাদের গোড়ায় কএক ঘণ্টা বাতাস লাগিয়া থাকে। উল্লিখিত পুষ্করিণীর মধ্যে যেরূপ নিম্নে ঐ সকল গুঁড়ি পাওয়া গিয়াছে, সেখানে কখনই সুঁদরী গাছ জন্মিতে পারে না;—উহা সর্ব্বদাই জলে ডুবিয়া থাকিত, বাতাস লাগিবার যো ছিল না। উক্ত পুষ্করিণীর তল শিয়াল্দার বর্ত্তমান ক্ষেত্র তল হইতে ৩০ ফুট ও হুগলির ভাটার স্তর হইতে ১৩ ফুট নীচু। এখন যেখানে সুঁদরী গাছ জন্মিতেছে, সেইখানকার, অর্থাৎ সুন্দর বনের নদীর ভাঁটার জলস্তর অপেক্ষা হুগলীর ভাঁটার জলস্তর যদি ১৮ বা ২০ ফুট উচ্চ বলিয়া ধরা না হয়, তাহা হইলে শিয়ালদার যেস্থানে এখন ঐ সকল গুঁড়ি পাওয়া গিয়াছে, সেস্থানে ঐ জাতীয় গাছ জন্মিবার পর তাহা ঐ পরিমাণে বসিয়া গিয়াছে বলিতে হইবে। অনুগাঙ্গ প্রদেশমাত্রই ঐ পরিমাণে বসিয়া গিয়া থাকিবে। পরে জোয়ারে জোয়ারে ভরাট হইয়া গিয়া ঐ সমস্ত জমি ক্রমে উন্নত ও বাসোপযোগী হইয়াছে।

১৮৩৬-৪০ খৃষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়মের ভূগর্ভে যে তিনটি ছিদ্র করা হয়, তাহাতেও এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়। ৩০ ফুট নিম্নে শিয়ালদার উল্লিখিত পুষ্করিণীর মধ্যে যে প্রকার মৃত্তিকা দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল, কেল্লার গর্ত্তের ভিতর ৫১ ফুট নিম্নেও সেই প্রকার মৃত্তিকা বাহির হয়। যদি শিয়ালদার ও কেল্লার উপরিস্থ ভূমির অসমানতাবশতঃ ৩ ফুট বাদ দেওয়া যায়, তাহা হইলে, বোধ হয়, কেল্লার গর্ত্তের উল্লিখিত মৃত্তিকার অধিষ্ঠান ভূমি শিয়ালদার অপেক্ষা ১৮ ফুট বসিয়া গিয়াছে। ঐ প্রকার মৃত্তিকা, বোধ হয়, অবিচ্ছন্ন ভাবেই বিস্তারিত আছে। [Note on a tank section at Sealdah, Calcutta. By H. F. Blanford, Esq. A. R. Sm. F. G. S. (J. A. S. B. Vol xxxiii, p 154-158)]

১৮২২ খৃষ্টাব্দে খিদিরপুরের ভূগর্ভেও ঐ প্রকার ছিদ্র করা হয়, তাহাতে বৃক্ষের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় নাই। উহা কেবল জলময় ছিল। [Calcutta in the olden time—its localities] প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, যখন স্থলভূমি সুন্দরবনের সমতল না হইলে সুঁদরীগাছ জন্মায় না, আর যখন বর্ত্তমান কলিকাতার ক্ষেত্রতলোপরি ঐ জাতীয় বৃক্ষ জন্মিত, তখন বর্ত্তমান কলিকাতার প্রাচীন ক্ষেত্রতল এক সময়ে সুন্দর বনের সমতল ছিল; পরে অন্যূন বিশ ফুট বসিয়া গিয়াছিল। স্থানে স্থানে আবার বিশ ফুট অপেক্ষা অধিক বসিয়া গিয়াছিল; ফোর্ট উইলিয়ম নামক বর্ত্তমান দুর্গের অধিষ্ঠান-ভূমি, অর্থাৎ গোবিন্দপুর অন্যূন ৩৮ ফুট বসিয়া যায়; সুতরাং বর্ত্তমান কলিকাতার প্রাচীন ক্ষেত্রতল এখনকার ক্ষেত্রতল অপেক্ষা এক সময়ে কোথাও বা ৩০ ফুট,

কোথাও বা ৮৮ ফুট নীচু ছিল; কালক্রমে ভাগীরথীর মৃত্তিকা পড়িয়া ক্রমে উন্নত ও বাসোপযোগী হইয়াছে। এরূপ নীচু জমী ভরাট হইতে যে কত শত বৎসর লাগিয়াছিল, তাহা স্থির করিয়া বলা যায় না। কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে, বর্তমান কলিকাতা বাসের যোগ্য হইলেও মনুষ্যের বাসের অভাবে বহুকাল জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল ও হিংস্র জন্তুর আবাসভূমি ছিল। এমন কি, শ্রীচৈতন্যদেবের সময় পর্য্যন্ত এখানে লোকের বসতির কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। যদি এ সময়ে মনুষ্য থাকিত তাহা হইলে শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবতে অবশ্য উল্লেখ থাকিত। শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের কিছুকাল পরেই প্রাচীন কলিকাতায় বা গোবিন্দপুরে লোকের বসতি হয়। তন্তুবায়েরাই গোবিন্দপুরের আদিম নিবাসী। জঙ্গল কাটিয়া ইহারা এখানে "জঙ্গলকাটা" নামে অভিহিত হইয়াছিল। পরে, ১৭১৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা প্রাচীন কলিকাতার ছড়াইয়া পড়েন। খৃঃ সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে তাহারা তথায় প্রথম আসিয়া বাস করে। তাহারা সূতার নুটী প্রস্তুত করিত বলিয়া এস্থানের নাম সূতানুটী হয়।

কচুরী :—গুজ্জর প্রদেশে প্রবাদ আছে যে খৃষ্টীয় ষষ্ঠশতাব্দীতে এখানকার লোকেরা চট্টগ্রামে বাণিজ্যাপদেশে গমন করিত। সেখানে তাহারা চট্টগ্রামবাসীদিগের নিকট পণ্যাদি ক্রয়-বিক্রয় করিত। অন্যান্য স্থানের বণিকেরাও চট্টগ্রামের বন্দরে আসিয়া ব্যবসায় করিত। গুজরাটী বণিকেরা নিজেদের সুবিধার জন্য চট্টগ্রামের কোন কোন ব্যবসায়ীকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতেন। এই ভোজের প্রধান অঙ্গ ছিল—তাহাদের তৈয়ারী "কচোরি"। চট্টগ্রামবাসী বণিকেরাও স্বীয় ব্যবসার সুবিধার জন্য গুজরাটী ব্যবসায়ীদিগকে তাহাদেরই প্রস্তুত প্রণালীমতে 'কচোরি' তৈয়ারী করিয়া ভোজ দিত। তৎকালে এটি একটি ঘুষ দেওয়া ব্যাপারের মধ্যেই পরিগণিত হইয়াছিল। গুজরাটী কচোরি শব্দ ক্রমশঃ চাটিগায়ের উচ্চারণে কচুরি আকার ধারণ করিল। তখন হইতেই বোধ হয় 'কচুরী খাওয়ার আর একটি অর্থ ঘুষ খাওয়া প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। (গুজরাটী জাতীয় কোষ)

নূতন ইতালীয় গ্রন্থ :—ইতালীয় বিখ্যাত পণ্ডিত বালিনি, সিদ্ধর্ষির রচিত 'উপমিত-ভাবপ্রপঞ্চ-কথা' নামক প্রসিদ্ধ জৈন গ্রন্থের আলোচনা বিষয়ক একটি প্রস্তাব প্রকাশ করিয়াছেন। গ্রন্থখানির নাম Contributo allo studio della Upamitabhavaprapanca katha di Siddharsi। এখানি রোমে মুদ্রিত হইয়াছে। বালিনির গ্রন্থে নিম্নলিখিত কয়টি বিষয়ের আলোচনা আছে :—

(ক) সিদ্ধর্ষির জীবন-বৃত্তান্ত ও গ্রন্থাবলী। সিদ্ধর্ষি খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি ৯৬২ সংবতে (৯০৬ খ্রীঃ) 'উপমিত ভাবপ্রপঞ্চকথা' রচনা করেন। খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীর হরিভদ্র তাহার গুরু ছিলেন। সিদ্ধর্ষি আরও দুইখানি টীকা-পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন—একখানি "ন্যায়াবতার বৃত্তি", অপরখানি ধর্ম্মদাসগণি রচিত "উপদেশমালা'র টীকা"।

(খ) উপমিতভাবপ্রপঞ্চা কথা। ইহার সমালোচনা।

(গ) হরিভদ্রের 'সবরাদিত্য কথা'ই এই গ্রন্থের প্রধান অবলম্বন। ইহাতে বর্দ্ধমান সূরি, হংসরত্ন, দেবসূরি এবং বৈরাগ্যকল্পলতাকার যশোবিজয় সূরির বচন উদ্ধৃত হইয়াছে।

(ঘ) এই গ্রন্থের রচনা-প্রণালী ও ভাষা সম্বন্ধীয় আলোচনা।

(ঙ) পিটাসন কৃত মূলের সংশোধন।

এ ছাড়া বালিনি সম্প্রতি আরও তিনখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক লিখিয়াছেন একখানি 'উপমিতভাবপ্রপঞ্চ কথার তৃতীয় অধ্যায়ের ইতালীয় অনুবাদের পরিশিষ্ট। এখানি ইতালীর প্রাচ্যসভার পত্রিকায় (Giornale della Societa Asiatica italiana, Vol. XIX, p. 1—50; Vol XXI, p. 1—48) প্রকাশিত হইয়াছিল। অপর দুইখানির নাম ও বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১। Il Vasupujyacaritadi Vardhamana suri অর্থাৎ বর্দ্ধমানসূরির রচিত বাসুপূজ্য চরিত্র। এখানি পূর্ব্বে Rivista degli Studi Orientalico (Vol I. p. 41—66; 169—195; 439—452, Vol II. p. 39—84) প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার ভূমিকা পাঠে জানিতে পারা যায় যে, ইনি নগেন্দ্র-গচ্ছাবলী ছিলেন। ইঁহার গুরু পরম্পরা এইরূপ—

১। বীরসূরি। ২। চচ্চিগ।
৩। বর্দ্ধমান। ৪। রামসূরি।
৫। চন্দ্রসূরি। ৬। দেবসূরি।
৭। অভয়দেবসূরি ৮। ধনেশ্বর।
৯। বিজয়সিংহ

দেবেন্দ্রাচার্য্য বর্দ্ধমানসূরি

বর্দ্ধমান সূরি তাঁহার গ্রন্থ ১২৯৯ সংবৎ (= ১২৮৩ খ্রীঃ) রচনা করেন। দ্বাদশ তীর্থঙ্করের কাহিনী বর্ণনা করা এই গ্রন্থের মুখ্য উদ্দেশ্য। ইহাতে আরও ২০টি কাহিনী আছে।

অতঃপর বালিনি গ্রন্থের ভাষা ও ছন্দ সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থে বাসুপূজ্য চরিত্রের বিবৃতি ও বিশ্লেষণ আছে। বালিনি এই গ্রন্থের পরিশিষ্টে ব্যক্তি ও স্থানের নামের সূচী এবং উহাতে পারিভাষিক ও দার্শনিক শব্দের সূচী দিয়া গ্রন্থখানির গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন।

২। হেমচন্দ্রের বাসুপূজ্য-চরিত্র ও ত্রিষষ্টি-শলাকা-পুরুষ চরিত্র (Il Vasupujyacartita del Trisastisalakapurushacarita di Hema Candra)।

বর্দ্ধমানসূরির বাসুপূজ্যচরিত্র নামক পুস্তকের পরিশিষ্টে, হেমচন্দ্রের ত্রিষষ্টি-শলাকা-পুরুষচরিত্রে (৪র্থ পর্ব্ব, ২য় সর্গ) এবং বর্দ্ধমান সূরির গ্রন্থে—বাসুপূজ্যের যে কাহিনী আছে, বালানির গ্রন্থে তাহাই তুলনায় আলোচিত হইয়াছে।

প্রমাণ-পঞ্জী

বৌদ্ধ—বৌদ্ধধর্ম্ম।

(ক) সিংহলে বৌদ্ধধর্ম্ম।

The Mahâvamsa.—Translated by G. Turnour (first part.) and L. C. Wijesinha (Second Part.) Colombo, 1899.

The Mahâvansa.—Text and translation by W. Geiger.

The Dipavamsa.—Edited with an English translation, by H. Oldenburg. London, 1879.

W. Geiger.—Dipavamsa and Mahâvamsa. Leipzig, 1905.

R. Spence Hardy.—Eastern Monachism, London, 1860,

R. Spence Hardy, A Manual of Buddhism in its Modern Development. Translated from Singhalese manuscripts. London, 1880.

R. S. Copleston.—Buddhism, primitive and present, in Magadh and Ceylon. London, 1908. Second Edition.

Sir James E. Tennent.—Ceylon. 2 Vols. London 1860. Fourth Edition.

H. W. Cave.—The Ruined cities of Ceylon, London, 1900.

J. de Grey-Downing—Ceylon, Past and present. Buddhism, Vol II, pp. 89-252.

The Dathâvansa;—or, The History of the Tooth Relic of Gotama Buddha. Translated by M. C. Swamy.

(খ) ব্রহ্মদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম।

P. Bigandet.—The life or legend of Gaudama, the Buddha of the Burmese. 2 Vols. London 1880. Third Edition.

Shway yoe—The Burman: his life and notions, London, 1896,

H. F. Hall.—The Soul of People. London, 1903.

Sangermano—The Burmese Empire a Hundred Years ago with Introduction and Notes by J. Jardine. Westminster, 1893.

M Symes.—An account of an Embassy to the Kingdom of Ava in the year 1795. Edinburgh, 1827.

The Gazetteer of Upper and the Shan states.—Rangoon 1900.

Taw Sein Ko:—The Introduction of Buddhism into Burma. রেঙ্গুন হইতে প্রকাশিত (Vol. I, p. 585) &c. "Buddhism" নামক মাসিক পত্রের প্রবন্ধ।

Reorganization of the Sangha in upper Burma. Buddhism, Vol. II p. 107 &c.

Sir R. C. Temple. The Thirty-seven Nats: a phase of Spirit-worship prevailing in Burma. London, 1906.

Sir R. C. Temple. A Native Account of the Thirty-seven Nats; being a Translation of a rare Burmese Manuscript. Indian Antiquary Vol. XXXV, p. 217. &c.

ব্রেসি হালহেডের প্রথম বাঙ্গলা ব্যাকরণ।

বাঙ্গলাদেশে বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত পুস্তকের মধ্যে ইহাই সর্ব্বপ্রাচীন। এই পুস্তকের মলাটের শীর্ষস্থানে বোপদেবের মুগ্ধবোধের প্রারম্ভের অনুকরণে লিখিত আছে—"বোধপ্রকাশং শব্দশাস্ত্রং ফিরিঙ্গিনামুপকারার্থং ক্রিয়তে হালেদঙ্গ্রেজী", মলাটের মধ্যস্থলে সারস্বত ব্যাকরণের দ্বিতীয় শ্লোক "ইন্দ্রাদয়োপি যস্যান্তং ন যযুঃ শব্দবারিধেঃ। প্রক্রিয়ান্তস্য কৃৎস্নস্য ক্ষমো বক্তুং নরঃ কথং" উদ্ধৃত হইয়াছে। কোন্ মুদ্রাযন্ত্রে প্রকাশিত হইয়াছে তাহার নাম নাই। তবে ইংরেজিতে Printed at Hugly in Bengal 1778 লিখিত আছে। বইখানি ইংরেজি ভাষায় লিখিত, বৈয়াকরণিক নিয়মগুলি বুঝাইবার জন্য রামায়ণ, মহাভারত, অন্নদামঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দর হইতে উদাহরণ সংগৃহীত হইয়াছে। এগুলি বাঙ্গলা অক্ষরে। এই পুস্তকের একটি উদাহরণও গ্রন্থকার নিজে দেন নাই।

প্রথম গির্জ্জা।

বাঙ্গলাদেশে হুগলী জেলার বাণ্ডেল সহরে প্রথম গির্জ্জা নির্ম্মিত হয়। ১৫৯৭ সালে ভিল্লালোবস নামক জনৈক পর্ত্তুগিজ হুগলীর ১ মাইল উত্তরে বাণ্ডেল সহরে প্রার্থনার জন্য প্রথম গির্জ্জা নির্ম্মাণ করেন।

প্রথম টানা পাখা।

আজকাল 'ইলেট্রিক্ ফ্যান' না হইলে আমাদের আর চলে না; কিন্তু য়ুরোপীয়েরা যখন প্রথম বাঙ্গলা দেশে আসেন, তখন হাতপাখা দ্বারাই গ্রীষ্ম অপনোদন করিতেন। চুঁচুড়া সহরে টানা পাখার প্রথম প্রচলন হয়। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ডচ্ গভর্ণর সাহেব একদিন ব্যারাকের গৃহে বসিয়া আছেন হঠাৎ বাতাসের একটা ঝাপ্টা আসিয়া খবরের কাগজখানাকে কড়িকাঠে তুলিয়া দুলাইতে থাকে। এই ঘটনা হইতে তিনি টানা পাখার সৃষ্টি করেন।

প্রথম মুদ্রাযন্ত্র।

১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গলার হুগলী সহরে প্রথম মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। Sir Charles Wilkins সাহেবই এ বিষয়ের অগ্রণী। সংস্কৃত ও বাঙ্গলা ভাষায় তিনি অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। তিনি হ্যাল্‌হেড সাহেবের বাঙ্গলা ব্যাকরণ প্রকাশ করিবার জন্য স্বহস্তে বহুদিন পরিশ্রমের পর কাঠের খোদাই বাঙ্গলা অক্ষর প্রস্তুত করেন। এই কার্য্যে তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য তিনি পঞ্চানন কর্ম্মকারকে অক্ষর খোদাই কার্য্য শিখাইয়া লইয়াছিলেন। তাঁহাকে বাঙ্গলার Caxton বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইনিই ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে গবর্ণর জেনারল ওয়ারেন হেষ্টিংস সাহেবের আনুকূল্যে গীতার প্রথম ইংরেজি অনুবাদ করেন।
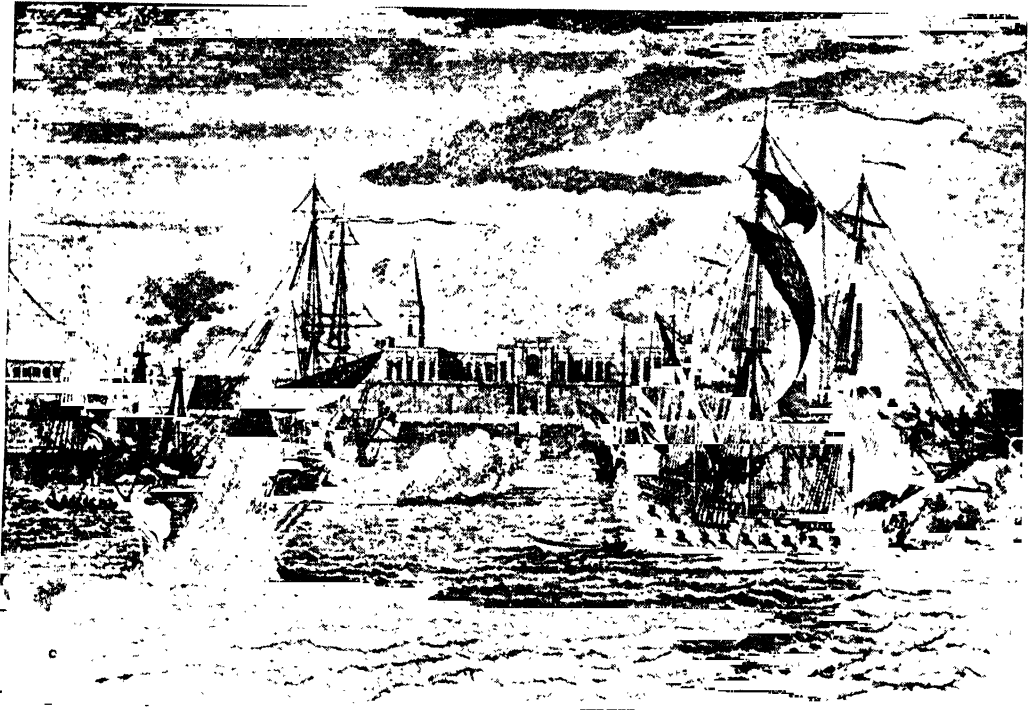
ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ।

ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ।

১৬৯৮ খৃঃ অব্দে শুভাসিংহের বিদ্রোহের পর বাঙ্গলার নবাব ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া-কোম্পানী বাহাদুরকে একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করিবার অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন। এই সময় খোজা ইস্‌রেল সারহাদের সহায়তায় কুমার আজিম-উস্-সাহানের নিকট হইতে কোম্পানী বাহাদুর এক ফারমান প্রাপ্ত হন, তদ্দ্বারা তাঁহারা—বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যার রাজস্ব আদায়ের ভার প্রাপ্ত হন। সুযোগ পাইয়া কোম্পানী বাহাদুর এই ফারমান সহায়তায় ১৬৯৮ সালে একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করেন এবং ইংলণ্ডেশ্বর তৃতীয় উইলিয়মের সম্মানার্থ ইহার নাম ফোর্ট উইলিয়ম রাখিলেন। কিন্তু ১৮১৯ সালে এই পুরাতন দুর্গটি ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়। সেই স্থানে কলিকাতার কাষ্টম-হাউস, কলেক্টরী আফিস প্রভৃতি কোম্পানীর কতকগুলি আফিস বাড়ী নির্ম্মিত হইয়াছে।

বর্ত্তমান ফোর্ট্ উইলিয়ম দুর্গ এই স্থান হইতে প্রায় একমাইল দক্ষিণে গঙ্গাতীরে অবস্থিত। পলাশী যুদ্ধের অব্যবহিত পরে ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে লর্ড ক্লাইভ কর্ত্তৃক এই নূতন দুর্গের নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল। এই সময় ইংরেজদিগের মনে ফরাসী কর্ত্তৃক কলিকাতা আক্রমণের আশঙ্কা প্রবল হওয়ায় দুর্গ-নির্ম্মাণ কার্য্য শীঘ্র সম্পন্ন করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা হইয়াছিল। কাপ্তেন জন ব্রোহিয়ারকে মান্দ্রাজ হইতে আনান হয়, কিন্তু তিনি আরম্ভ করিয়া কার্য্যে বিশেষ অগ্রসর হইতে পারিলেন না দেখিয়া, এমফ্লেট্ সাহেব ঐ কার্য্যের ভার গ্রহণ করেন। এমফ্লেট সাহেব ইঞ্জিনিয়ারিং-এর কিছুই জানিতেন না, কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া কাপ্তেন পোনিয়রকে ঐ পদে নিযুক্ত করেন। দুঃখের বিষয় কাপ্তেন পোনিয়রও বিশেষ কিছু করিতে না পারায়, তাঁহার পর ক্রমান্বয়ে হেমিং মার্টিন, লেফ্‌টনাণ্ট কর্ণেল ক্যাম্বেল, মেজর জেমস্ লিলিয়ান ও মেজর ফরদেমের

উপর একে একে কার্য্যভার প্রদান করা হয়। অবশেষে ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে কর্ণেল ওয়াটসন সাহেব এই দুর্গ-নির্ম্মাণ-কার্য্য সম্পন্ন করেন। এই দুর্গ নির্ম্মাণে বিলম্ব হওয়ার কারণ শুধু যে ইঞ্জিনিয়রের দোষ তাহা নহে কোম্পানী এই সময়ে কুলিদিগকে মজুরির দরুণ "সোণাৎ" টাকা প্রদান করিতেন, ঐ সকল টাকা ভাঙ্গাইতে বেশী বাটা দিতে হইত; ইহাতে কুলিদিগের বিশেষ ক্ষতি হইত; এই জন্য প্রায় ৫০০০ কুলি একযোগে কর্ম্মত্যাগ করিয়াছিল। যাহা হউক ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে এই দুর্গ প্রথম ব্যবহারোপযোগী হয় এবং নাগাপটমের পতনের জন্য ঐ সালে ২৪শে ডিসেম্বর তারিখে এই দুর্গ হইতে প্রথম তোপ ছোঁড়া হইয়াছিল।

দুর্গটি অষ্টভুজাকৃতি; তন্মধ্যে স্থলাভিমুখী পাঁচটি দিক সুন্দর ইঞ্জিনিয়ারিং প্রণালীতে নির্ম্মিত, কিন্তু নদীর অভিমুখের তিনটি দিক সেরূপ সুন্দর ভাবে গঠিত নহে।

এই দুর্গটি একটি গভীর বিস্তৃত পরিখা দ্বারা বেষ্টিত, পরিখাটি প্রায় শুষ্ক হইয়া থাকে, আবশ্যকমত গঙ্গা হইতে ইহাতে যদৃচ্ছা মত জল আনয়ন করা যাইতে পারে—দুর্গে ছয়টি প্রবেশ-দ্বার আছে ইহাদের নাম:—পলাসী, চৌরঙ্গী, কলিকাতা, ওয়াটার, (অর্থাৎ জল), সেণ্টজর্জ্জ এবং ট্রেজরি। প্রত্যেক দ্বারের উপর একটি করিয়া উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর আবাস গৃহ আছে এবং ট্রেজরি গেটের উপর জঙ্গীলাটের কলিকাতাস্থ বাসভবন নির্ম্মাণ করা হইয়াছে।

দুর্গমধ্যে সেনাদিগের ও সেনানায়কদিগের বাস ভবন ভিন্ন আরও কএকটি দর্শনযোগ্য স্থান আছে—

গ্রাণ্ড মেগেজিনটি ১৭৬৩ সালে নির্ম্মিত হইয়াছিল, কিন্তু ১৯০৫ সালে ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়াছে। বর্ত্তমান সেনা নিবাসগুলির মধ্যে রয়েল ব্যারাক একটি; ইহার নির্ম্মাণ কার্য্য ১৭৬৪ সালে শেষ হয়। উহার অল্পদিন পরেই উত্তর ও দক্ষিণ সেনানিবাস দুইটি নির্ম্মিত হয়।

এই সকল সেনানিবাসে প্রথমে কর্ম্মচারীদিগের বাসস্থান ছিল, পরে ১৭৬৭ সালে একটি নূতন বাটী নির্ম্মিত হয়। সেই বাটীই প্রথমে গভর্ণমেণ্ট হাউস ছিল। এখানে ডেপুটী গভর্ণর বাস করিতেন—গভর্ণর জেনারলও কিছুদিন এই বাটীতে ছিলেন। ১৮২৩ খৃঃ অব্দে অক্টোবর মাসে যখন বিসপ হিবর এদেশে প্রথম পদার্পণ করেন লর্ড আমহার্ষ্ট তাঁহাকে কিছুদিনের জন্য এই স্থানেই বাসা নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছিলেন।

১৭৬৯ সালে একটি জঙ্গীলাট-ভবন ও একটি হাসপাতাল প্রস্তুত হয়—কিন্তু এ দুই স্থান এখন আর নাই—ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়াছে।

দুর্গমধ্যে প্রথমে কোনও গির্জ্জা বা অন্য কোনওরূপ ভজনালয় ছিল না,—সৈনিকেরা প্যারেড ভূমিতে ভজনা করিত,—১৭৭১ সালে এখানে সেণ্টপিটার্স গির্জ্জাটি নির্ম্মিত হয়, এবং রেভারেণ্ড টমাস ইয়েট এই গীর্জ্জার প্রথম ধর্ম্মযাজক পদে নিযুক্ত হন।

ফোর্ট উইলিয়মের অস্ত্রাগার একটি দেখিবার জিনিস, ইহা ওয়াটার গেটের সন্নিকটে অবস্থিত; এই গৃহটি ৩০০ ফিট লম্বা; ইহার মধ্যে অনেক পুরাতন অস্ত্র শস্ত্র সজ্জিত আছে।

সৈনিক কারাগারের সম্মুখের প্রাচীরগাত্র সংলগ্ন প্রস্তরফলকে ইংরেজিতে নিম্নলিখিত কথাগুলি লিখিত আছে:—গভর্ণর জেনারল ও কাউন্সিলের আজ্ঞানুসারে ১৭৮২ সালের মার্চ্চ, এপ্রিল ও মে মাসে দুর্গের খাদ্যদ্রব্য সরবরাহকারী জন চেলি সাহেব কর্ত্তৃক এই গৃহে ৫১২৫৮ মণ চাউল ও ২০০২৩২ মণ ধান্য রক্ষিত হইয়াছিল।

প্যাটারণ রুমে একটি ওজন করিবার যন্ত্র ও একখানি অটোগ্রাফ বহি আছে—গণ্যমান্য দর্শকবৃন্দকে তথায় ওজন করা হইত এবং ঐ পুস্তকে তাঁহাদের নিজ নিজ ওজন স্বহস্তে লিখিতে হইত। এই পুস্তকে অনেক রাজা মহারাজের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। ১৭৮৬ সালে মুর্শিদাবাদের নবাব গভর্ণর জেনারেলের সহিত দুর্গ দেখিতে আসেন। তাঁহার সংবর্দ্ধনার জন্য অনেক তোপও ছোঁড়া হইয়াছিল; কিন্তু দুর্গের বিষয় তাঁহাকে ওজন করিতে ভুল হওয়ায় এ পুস্তকে তাঁহার নাম পাওয়া যায় না।

১৭৮৭ সালে দুর্গমধ্যে একটি বাজার নির্ম্মি[illegible]। এই দুর্গ মধ্যে দুইবার অগ্নি লাগিয়া যায়। একবার কার অগ্নিতে প্রায় সাড়ে তিন শত টাকার দ্রব্যাদি পুড়িয়া যায়।

১৮২৮ সালে একটি নূতন গীর্জ্জা নির্ম্মিত হয় এবং ২৭শে মার্চ্চ বিশপ জেম্‌স কর্ত্তৃক এই দুর্গ উৎসর্গীকৃত হয়। পরে আরও দুইটি গীর্জ্জা এই দুর্গমধ্যে নির্ম্মিত হইয়াছিল—একটি ১৮৩৫ সালে, অপরটি ১৮৫৭ সালে; শেষোক্তটি রোমান ক্যাথলিক এবং উহা সে[illegible]ট্রিকের নামে উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল।*

সাহিত্য-সংবাদ।

সুকবি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বাগ্‌চী মহাশয়ের একখানি নূতন কবিতা-পুস্তক "অপরাজিতা" যন্ত্রস্থ।

সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় মিনার্ভার জন্য একখানি গীতিনাট্য রচনা করিতেছেন।

শ্রীযুক্ত রামপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের "ভবরামের উইল" নামক উপন্যাস শীঘ্রই বাহির হইবে।

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় "মিশর-মণি" নামক একখানি নাটক লিখিয়াছেন। তাঁহার নাটকখানি মিনার্ভায় অভিনয়ের জন্য নির্ব্বাচিত হইয়াছে। গ্রন্থখানি শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

সুপণ্ডিত ও বৈষ্ণবশাস্ত্রদর্শী শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ রচিত 'শ্রীশ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়া' নামক মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের ও তৎপ্রিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর লীলাকাহিনী ছাপা হইতেছে।

স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ের নূতন নাটক 'ভীষ্ম', অভিনয়ের পরই প্রকাশিত হইবে। পরলোকগমনের পূর্ব্বে "সিংহল বিজয়" নামক আর একখানি নাটকও তিনি সম্পূর্ণ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। এ নাটকখানি সিংহবাহু পুত্র বিজয় সিংহের বিজয় কাহিনী।

প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্যের তিনখানি উপন্যাস ছাপা হইতেছে। স্বর্গীয় দীনেন্দ্রনাথ পাল ব্যতীত আর কেহ সুরেন্দ্র বাবুর মত অধিক সংখ্যক উপন্যাস লেখেন নাই। আমরা তাঁহার--'বিনিময়' 'অভিসার' ও 'জনরবের' প্রতীক্ষায় রহিলাম।

স্বর্গীয় নফরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ছোট ছোট গল্প লিখিয়া মাসিক সাহিত্যে তাঁহার কৃতিত্বের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। শুনিয়া সুখী হইলাম যে তাঁহার ছোট গল্পগুলি "যাত্রী" নাম দিয়া শীঘ্রই বাহির হইবে।

সুকবি শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় চৌধুরীর তিন খানি পুস্তক একত্র বাহির হইতেছে। এবার তিনি কবিতার আসর ব্যতীত নাটক ও প্রহসনের আসরেও নামিয়াছেন। 'ভাগ্যচক্র' নামে একখানি ঐতিহাসিক নাটক, 'আক্কেল সেলামী' নামে একখানি প্রহসন এবং 'গৈরিক' নামে একখানি কাব্য তিনি রচনা করিয়াছেন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সুযোগ্য সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় আবৃত্তি বিষয়ে অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, সেইগুলি একত্র করিয়া ছাপাইবার আয়োজন হইতেছে। বাঙ্গলা সাহিত্যে এ বিষয়ে কোন পুস্তক নাই— পুস্তকখানি বাহির হইলে বঙ্গ-সাহিত্যের একটি নূতন বিভাগের অবতারণা হইবে।

প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ও ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত হরিসাধন মুখোপাধ্যায়ের একখানি ইতিহাস ও একখানি উপন্যাস শীঘ্রই বাহির হইতেছে। তাঁহার "কলিকাতার ইতিহাস" প্রকাণ্ড বহি নানা চিত্রে সুশোভিত হইয়া বাহির হইবে। তাঁহার ঐতিহাসিক উপন্যাস রঙ্গমহাল ও শীশমহাল পাঠে বাঙ্গলা পাঠক পরিতৃপ্ত, আমরা তাঁহার নব-রচিত 'নূরমহালের' প্রতীক্ষা করিতেছি।

লালদীঘির সম্মুখভাগ

লালদীঘি।

যে সময় ডালহাউসী স্কোয়ার the green before the fort নামে অভিহিত ছিল তাহার বহুপূর্ব্বে ইহা শেঠেদের দীঘি ছিল। ঐ দীঘিতে শেঠেদের সময় দোলপূর্ণিমায় খুব ধুম হইত। এখন যেখানে লালবাজার সেইস্থানে প্রায় দ্বিতল সমান করিয়া আবীর রাশীকৃত হইত। পুঞ্জীকৃত ঐ আবীর লইয়া সাধারণকে হোলী খেলিতে দেওয়া হইত। সকলে শেঠেদের দীঘির জলে আবীর গুলিয়া পিচকারি দিয়া হোলী খেলিত। শেষে দেখা যাইত যে দীঘির জল লালে লাল হইয়া গিয়াছে। এই কারণে এই দীঘির নাম 'লালদীঘি' এবং আবীর রাখিবার স্থানের নাম 'লালবাজার' হয়।

৺দ্বিজেন্দ্রলাল।

বঙ্গমাতার সুসন্তান দ্বিজেন্দ্রলাল আজ আর ইহজগতে নাই—সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া সাধনোচিত অমরধামে হাসিমুখে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মত মরণকে উপহাস করিতে পারে কয় জন? 'সিংহল-বিজয়' নাটকের যবনিকা-পতনের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার জীবন নাট্যের যবনিকা পতিত হইল। বঙ্গ ভারতীর কাব্যকুঞ্জে তাঁহার সুললিত প্রাণমাতান সুধা বর্ষী সঙ্গীত সুরলহর আকাশে বাতাসে আর ভাসিয়া

৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

বেড়াইয়া 'কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিবে' না—হৃদয়-বীণার তন্ত্রীগুলিতে আর ঝঙ্কার দিবে না—কূজন-আকুল কলকণ্ঠের সুমধুর কাকলী আর শুনিতে পাইব না। বঙ্গ-বাণীর মন্দিরে অগ্নিহোত্রী ঋত্বিকের উদাত্ত অনুদাত্ত প্লুতস্বরে আর সামগীতি উঠিয়া হৃদয়ে অনমুভূতপূর্ব্ব ভাবের সমাবেশ করিয়া দিবে না—জ্ঞানের উজ্জ্বল বর্ত্তিকা লইয়া নাট্যে, কাব্যে, গানে, ব্যঙ্গকবিতায় দ্বিজেন্দ্রলাল আর আমাদিগকে শিবসুন্দর ধ্রুবের পথ দেখাইয়া দিবেন না। বাঙ্গলার অবসাদের দিনে সত্যকে শ্রেয়ঃ করিতে কে আমাদিগকে দীক্ষিত করিয়াছিল?—জননী জন্মভূমির প্রকৃত গৌরবগাথা শুনাইয়া কে আমাদিগকে বঙ্গমাতার সহিত পরিচয় সাধন করিয়া দিয়াছিল? যখন আমরা 'বন্দে মাতরমের' ঋষির সেই 'সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা' বঙ্গমাতার কথা বিস্মৃত হইতেছিলাম—যখন সত্যেন্দ্রনাথের 'গাও ভারতের জয়' গানের সুরলহর আকাশে মিশিয়া গিয়াছিল—যখন প্রবাসী কবি গোবিন্দরায়ের 'নির্ম্মল সলিলে বহিছ সদা তটশালিনী সুন্দর যমুনে ও' ক্ষীণস্রোতা যমুনার মত আগ্রার কুঞ্জকানন হইতে বঙ্গদেশের বাতাসে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া সমীরিত হইতেছিল—যখন বঙ্গীয় যুবকমণ্ডলীর কণ্ঠে কণ্ঠে 'অয়ি ভুবন-মন-মোহিনী সূর্য্য-করোজ্জ্বল ধরণি' গীত হইয়া বাঙ্গালীর মানসপটে তুষার কিরীটিনী ভারতলক্ষ্মীর শোভা-সম্পদের চিত্র জাগাইয়া তুলিতেছিল, তখন কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল আমাদের সুপ্ত দেশাত্মবোধকে জাগরিত করিবার জন্য 'আমার জন্মভূমি' ও 'আমার দেশ' গাহিয়া আমাদের হৃদয়-বীণায় আঘাত করিয়াছেন—ভাবের হিল্লোল তুলিয়াছেন—নয়ন-সম্মুখে 'ধনধান্য পুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা' দেশমাতৃকার যে মনোরম চিত্র নিপুণ তুলিকায় অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহার তুলনা ফরাসীদিগের "মার্সেলস্" ব্যতীত জগতের সাহিত্যে বিরল। আমাদের দেশ 'স্বপ্ন দিয়ে তৈরি, স্মৃতি দিয়ে ঘেরা'। বাস্তবিকই কি আমাদের সাধের জন্মভূমি কল্পনার মধুর আলোকে উদ্ভাসিত নয়? নদনদীর অব্যক্ত-মধুর গীতি, পক্ষীদিগের কাকলিকূজন কি আমাদিগকে তাপদগ্ধ এই সংসার হইতে দূরে শান্তির আলয়ে, স্বপ্নময় কুহকরাজ্যে লইয়া যায় না?—আর আমরা যাঁহাদের বংশধর, তাঁহাদের নিকট জগতের সকল দ্রব্যই মায়া—

স্বপ্ন। তাঁহারা লোকোত্তর অতীন্দ্রিয় মোক্ষের জন্য লালায়িত ছিলেন। আর আমাদের এই জন্মভূমি যে পূত ঋষি যতি সাধকদিগের পুণ্যস্মৃতি বিজড়িত, তাহা কি আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে? প্রকৃতির উপাসক কবি বঙ্গজননীর সৌন্দর্য্য বিশ্লেষণ করিয়া জগতের সমক্ষে নিজ জন্মভূমির বিশেষত্ব দেখাইয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলেন না—প্রাণের নিভৃত কন্দরে যে আশা তিনি পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন, অন্তঃসলিলা স্বদেশহিতৈষণার ফল্গুনদী উৎসারিত হইয়া জানি না কাহার প্রেরণায় বাহির হইল—'আমার এই দেশেতে জন্ম—যেন এই দেশেতে মরি'—ভাই বাঙ্গালী, দ্বিজেন্দ্রলালের নিকট কি আমরা এই মহাশিক্ষা গ্রহণ করিতে পরাঙ্মুখ হইব? 'আমার দেশে' কবি দেখাইয়াছেন, আমাদের অভাব কিসের?—অতীত যাহাদের উজ্জ্বল, ভবিষ্যৎ তাহাদের অন্ধকারময় হইতে পারে না। 'যদিও মা তোর দিব্য আলোকে ঘেরিয়াছে আজি আঁধার ঘোর, কেটে যাবে মেঘ, নবীন গরিমা ভাতিবে আবার ললাটে তোর'—তিনি জীবনে আশাহত হন নাই। আমাদের জড়ত্ব, আমাদের অবসাদ, আমাদের কর্ম্মে শিথিলতা দূর করিতে হইবে—জগতের সমক্ষে আমরা যে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের বংশধর, তাহা দেখাইতে হইবে—দেখাইতে হইবে 'মানুষ আমরা নহি ত মেষ' তাই তিনি মর্ম্মভেদী দুঃখে বলিয়াছেন, "আবার তোরা' মানুষ হ"—ইংরেজি চরিত্রে (Ethics) যাহাকে বলে "Be a Person" আপনাকে চিনিতে হইবে—আপনার সুপ্ত শক্তির পরিচয় লইতে হইবে। একদিন জ্ঞানগরিমায় বাঙ্গলাদেশ ভারতের মুকুটমণি ছিল—যে দিন ভারতের অন্যান্য দেশের ছাত্রেরা জ্ঞানার্জ্জনের জন্য বাঙ্গলার নবদ্বীপে আসিয়া বাঙ্গালী গুরুর পদতলে বসিয়া ন্যায়, দর্শন, ব্যাকরণ, স্মৃতি শিক্ষালাভ করিত—যে দিন শৌর্য্যবীর্য্যে বাঙ্গালী ভারতবাসীকে স্তম্ভিত করিত; যেদিন বাঙ্গালীর দয়াদাক্ষিণ্য ও সর্ব্বস্ব-দানের নিদর্শন দেখিয়া ভারতবাসী মুগ্ধ হইত—যে দিন বাঙ্গলাভাষা ভারতের প্রাদেশিক ভাষা সকলের আদর্শ ছিল—সেইদিন পুনর্বার ফিরাইয়া আনিতে হইলে আমাদিগকে মানুষ হইতে হইবে; এবং কর্ম্ম করিতে করিতে যখন আমরা শক্তিধর হইয়া মানুষ হইব, তখনই জননী জন্মভূমির জড়তা ঘুচাইতে পারিব। উষার স্নিগ্ধ-মঙ্গল আলোকের সহিত আমরা সেই শুভদিনের প্রতীক্ষায় রহিলাম। আর সেই শুভদিনে আমরা কবির সহিত যেন বলিতে পারি,—'দেবী আমার, সাধনা আমার, স্বর্গ আমার, আমার দেশ'। এরূপ অকৃত্রিম মাতৃপূজকের সংখ্যা যতই বর্দ্ধিত হইবে, দেশও শিল্পবাণিজ্যের উন্নতির পথে ততই অগ্রসর হইতে থাকিবে।

বঙ্গসাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রলালের স্থান কোথায়, তাহা বলিবার সময় এখনও আসে নাই। বিয়োগবিধুর বাঙ্গালীর নিকট তাহা এখন আশা করা যায় না। তবে তাঁহার সাহিত্য সাধনার সামান্য পরিচয় দিয়া পরিশেষে ব্যক্তিগত ভাবে দুই একটা কথা বলিব।

প্রসিদ্ধ সমালোচক Buffon বলিয়াছেন—মনীষীর চরিত্র তাঁহার রচনাভঙ্গীতে (style) প্রতিভাত হইয়া থাকে। দ্বিজেন্দ্রলালের রচনাভঙ্গী তাঁহার নিজস্ব—তাঁহার ভাব ও ভাষার বেশ সামঞ্জস্য আছে। সোজা কথায়, সরল ভাবে হৃদয়ের ভাব বুঝাইতে তিনি অদ্বিতীয়। দ্বিজেন্দ্রলালের বিশেষত্ব তাঁহার হাসির গানে। তাঁহার গানে শ্লীলতার অভাব নাই, শ্লেষ বিদ্রূপ নাই, মর্ম্মভেদী ব্যঙ্গ নাই—আছে সরল হাসি ও কৌতুক। সময়ে সময়ে হাসির আবরণ ভেদ করিয়া অরুন্তুদ জ্বালা প্রকাশ হইয়া পড়ে, কিন্তু কখন তিনি কাহাকেও ঘৃণা করেন নাই। ব্যথীর জন্য সমবেদনার উৎস তাঁহার ভাবপ্রবণ হৃদয় হইতে সর্ব্বদাই ছুটিতে থাকে। হাস্য-রসিকেরা সামাজিক ব্যাধিগুলি দূর করিবার জন্য হাস্যরসের অবতারণা করেন, দোষীর দোষগুলি লোক-লোচনের সমক্ষে অতিরঞ্জিত করিয়া দেখাইয়া থাকেন—হৃদয়ের পরতে পরতে যাহাতে তাহারা যন্ত্রণা অনুভব করিতে থাকে, তাহাই করিয়া থাকেন। আর আমাদের দ্বিজেন্দ্রলাল যাহাদের লইয়া কৌতুক করেন, আপনাকে তাহাদের একজন করিয়া লন,—"আমরা সেজেছি বিলাতি বাঁদর" "We are reformed Hindus" "আমরা বিলাত-ফের্ত্তা ক ভাই" প্রভৃতি গানে তিনি আপনাকে বাদ দেন নাই। তিনি বলিতেছেন, ভাই আমি তোমাদেরই একজন, কিন্তু আমরা কোথায় চলিয়াছি, একবার নয়ন মেলিয়া দেখ। তাঁহার এই শ্রেণীর হাসির গানে আমরা হাস্যরসি[illegible] Edgar Allen Poeর করুণরসের প্রাচুর্য্য দেখি[illegible]

পাই। নন্দলালের দেশহিতৈষণায় আমরা তথা-কথিত স্বদেশপ্রেমিকদিগকে বিপথগামী হইতে দেখিয়া হাসিয়া থাকি, কিন্তু তাহাদিগকে ঘৃণা করি না। ব্যালজাক বা থ্যাকারের সহিত দ্বিজেন্দ্রলালের এইখানেই পার্থক্য। তাঁহারা মানব-দ্বেষী (Cynic); ভ্রান্ত মানবকে তাঁহারা ঘৃণা করেন; দ্বিজেন্দ্রলাল তাহাদের দোষ সংশোধন করিবার জন্য আপনিও তাহাদের দলে মিশিয়া তাহাদেরই একজন হইয়া তাহাদের সহিত সমবেদনা দেখাইয়া থাকেন—এই সমবেদনা ও করুণাই তাঁহার হাসির গানের বিশেষত্ব।

তাঁহার ঐতিহাসিক নাটকগুলিতে তিনি ইতিহাসের মর্য্যাদা অনেক স্থলেই অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। কোন কোন চরিত্রের ভূমিকা তিনি ইংরেজি হইতে গ্রহণ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু সেগুলিকে আমাদের দেশকালপাত্রোপযোগী করিয়া অঙ্কিত করিয়া প্রতিভার প্রকৃষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। চরিত্র-অঙ্কনে তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল।

'কালিদাস ও ভবভূতি' প্রবন্ধে পাঠকগণ তাঁহার সৌন্দর্য্য-বিশ্লেষণশক্তি, তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি, তাঁহার প্রকৃতি-সমালোচনার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাইয়াছেন সন্দেহ নাই। মৎ-সম্পাদিত 'বাণী' পত্রিকার পাঠকেরাও তাঁহার গোরার সমালোচনায় সে শক্তির পরিচয় পাইয়াছেন। তিনি জীবিত থাকিলে 'ভারতবর্ষে' সেই শক্তির পরিচয় দিবার অধিকতর সুযোগ পাইতেন।

সেদিন প্রথম তিনি বাঙ্গলাভাষায় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর একখানি মাসিক-পত্র প্রকাশ করিতে অভিলাষী হইয়া আমার নিকট আসেন, সেদিন আমার জীবনের এক স্মরণীয় দিন। যখন তিনি আমার ন্যায় নগণ্য ব্যক্তিকে তাঁহার সহযোগী করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে চাহিলেন, তখন তাঁহার উদার-হৃদয়ের ও বন্ধুপ্রীতির পরিচয় পাইয়াছিলাম সত্য; কিন্তু যখন আমি আমার অক্ষমতার কথা বলিয়া তাঁহার নিকট কৃপাভিক্ষা চাহিয়াছিলাম, তখন তাঁহার কাছে

পরিহরি ভব সুখ দুঃখ যখন মা, শায়িত অন্তিম শয়নে,
বরিষ শ্রবণে তব জল কলরব, বরিষ সুপ্তি মম নয়নে;
বরিষ শান্তি মম শঙ্কিত প্রাণে, বরিষ অমৃত মম অঙ্গে;
মা ভাগীরথি, জাহ্নবি, সুরধুনি কল কল্লোলিনী গঙ্গে!

যে সকল উপদেশ পাইয়াছিলাম, তাহা জীবনে কখনও ভুলিব না। তখন তাঁহার সহৃদয়তা ও সহজ-সরল সহাস্য আননের শক্তি অনুভব করিয়া তাঁহার কথায় 'না' বলিবার শক্তি আমার ছিল না। হৃদয়-বশীকরণের অমোঘ শক্তি যে তাঁহার এত ছিল, তাহা পূর্ব্বে জানিতাম না—মানবের ইচ্ছাশক্তির বিরুদ্ধে মানব যে কার্য্য করিতে পারে, তাহা বিশ্বাস করিতাম না, জানিতাম না সাধু-সন্ন্যাসী ভিন্ন এত অল্প সময়ের মধ্যে লোককে আপন করিয়া লইতে পারে, এমন শক্তিধর গৃহী বাঙ্গলায় আছেন। কিন্তু হায়, তখন কে জানিত বঙ্গ-ভারতীর পূজার মন্দিরের হৈম প্রদীপ এত শীঘ্র নিবিয়া যাইবে, কে জানিত জীবন-মধ্যাহ্নে দ্বিজেন্দ্র-তপন চিরতরে অস্ত যাইবে,—কে জানিত নির্ম্মম কাল আসিয়া আমাদের মধ্যে এরূপ ব্যবধান করিয়া দিবে,—কে জানিত তাঁহার সাহায্য হইতে আমি এরূপে বঞ্চিত হইব, কে জানিত আমারই মস্তকে এই গুরুভার ন্যস্ত হইবে। যাহা যায় তাহা ত আর ফিরিবার নয়—দ্বিজেন্দ্রলালের অন্তর্দ্ধানে 'ভারতবর্ষের' যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না, তবে ভগবানের কৃপায় 'ভারতবর্ষ'-সম্পাদনে আমরা আমাদের অগ্রজ-প্রতিম অকৃত্রিম সুহৃদ্ লব্ধ-প্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয়ের সহায়তা লাভ করিয়া কথঞ্চিৎ শান্তিলাভ করিয়াছি। দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিষ্ঠিত 'ভারতবর্ষ' তাঁহারই নিয়ন্ত্রিত পথে চলিবে কবির ভাষায় বলি—

"তোমারি চরণ করিয়া স্মরণ
চলেছি তোমারি পথে ;"—

দ্বিজেন্দ্রলাল ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়াও অল্পদিনের মধ্যেই 'ভারতবর্ষের' জন্য যাহা রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা আমাদের গ্রাহক অনুগ্রাহকবর্গ অনেকদিন ধরিয়া উপভোগ করিতে পারিবেন।

মঙ্গলময়ের মঙ্গলাশীষে দ্বিজেন্দ্রলালের প্রাণপ্রিয় 'ভারতবর্ষ' যেন বাঙ্গালীর ও বঙ্গভাষা-ভাষীর মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হয়।

শ্রী অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ।

জীবন-কথা।

দ্বিজেন্দ্রলাল, নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররায়ের বংশধরগণের দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়ের সপ্তপুত্রের মধ্যে সকলের ছোট। তাঁহার একমাত্র কনিষ্ঠা ভগিনী ছিলেন। নাম মালতী। মালতীকে দ্বিজেন্দ্র বড়ই স্নেহ করিতেন।

১২৭০ বঙ্গাব্দের ৪ঠা শ্রাবণ কৃষ্ণনগরে বাৎস্য গোত্রীয় বারেন্দ্রশ্রেণী ব্রাহ্মণ বংশে দ্বিজেন্দ্রলাল জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহারা সিদ্ধ শ্রোত্রীয়। দ্বিজেন্দ্রের পিতা একজন শিক্ষিত, মার্জ্জিতরুচি, সচ্চরিত্র, সত্যপ্রিয়, উদারচিত্ত, সুহৃদ্‌রঞ্জন, এবং সুকণ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার প্রণীত একখানি ক্ষুদ্র সঙ্গীত-পুস্তক, তাঁহার আত্মজীবন কাহিনী ও ক্ষিতীশ-বংশাবলী প্রকাশিত হইয়াছিল। ৺দীনবন্ধু মিত্রের গ্রন্থে তাঁহার উল্লেখ আছে। উক্ত মিত্রজ মহাশয়, মহাত্মা ৺রামতনু লাহিড়ী, বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রভৃতি মহোদয়গণ তাঁহার পরম সুহৃৎ ছিলেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল পিতৃগুণ সমূহের সম্পূর্ণ অধিকারী হইয়াছিলেন। তিনি যে কেবল পিতার গুণগ্রাম পাইয়াই ক্ষান্ত ছিলেন, তাহা নহে। পিতৃগুণ সমূহের চরমোৎকর্ষ ত তাঁহাতে পরিস্ফুট ছিলই, অধিকন্তু তাঁহার বিশ্ববিমোহিনী প্রতিভা ও আশ্চর্য্য মেধা আজি তাঁহাকে এই উচ্চপদবীতে উন্নীত করিয়াছে। আমরা আপাততঃ তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবন-বৃত্তান্ত লিখিয়া, ক্রমশঃ তাঁহার গুণ সমূহের ও শক্তির পরিচয় দিব। বাল্যকালে দ্বিজেন্দ্র অতিশয় রুগ্ন ছিলেন। কৃষ্ণনগরের Anglo Vernacular School হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ক্রমশঃ গৌরবের সহিত এফ-এ, বি-এ, এবং ১৮৮৪ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে ইংরাজীতে

অনারে প্রথম বিভাগে এম্‌-এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ছাপরা জেলায় রেভেলগঞ্জে প্রথম শিক্ষকের পদ প্রাপ্ত হন। তখন তাঁহার শরীর অসুস্থ ছিল, এবং তাঁহার এক ভ্রাতা তথায় কর্ম্ম করিতেন। বায়ু-পরিবর্ত্তনের উদ্দেশ্যে তথায় গিয়া এই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন। দুই এক মাসের মধ্যেই সরকার বাহাদুর হইতে এই মর্ম্মে পত্র পান যে, যিনি এম-এ, পরীক্ষায় প্রথম হইয়াছিলেন, তিনি ইংলণ্ডে যাইতে অনিচ্ছুক, অতএব দ্বিজেন্দ্রলাল সেই বৃত্তি লইয়া যাইতে প্রস্তুত আছেন কিনা? দ্বিজেন্দ্র পিতার অনুমতি প্রার্থনা করিলে, তিনি অনুমতি দেন। তখন সরকারি বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া, ইংলণ্ডে গিয়া সিসেষ্টার কালেজ হইতে কৃষিবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করেন এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া F. R. A. S. উপাধি লাভ পূর্ব্বক দেশে ফিরিয়া আসেন। ১৮৮৭ এপ্রেল (বৈশাখ) মাসে কলিকাতার স্বনামখ্যাত চিকিৎসক ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের পরম রূপবতী জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী সুরবালা দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। ইঁহাদের দাম্পত্য-জীবন বড়ই সুখের হইয়াছিল। কিন্তু ভগবানের চক্ষে "এত সুখ সইল না"।

৺কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়

বিবাহের অব্যবহিত পূর্ব্বেই ইং ১৮৮৬ সালের ২৫এ ডিসেম্বর তারিখে সরকারি চাকরি পাইয়া তাঁহাকে সেণ্ট্রাল প্রভিন্সে সর্ভে ও সেট্‌লমেণ্টের কার্য্য শিক্ষা করিবার জন্য যাইতে হয়। তৎপরে ১৮৮৭ সালের ২১এ সেপ্টেম্বরে মজঃফরপুরে বদলি হন। তৎকালে তিনি ম্যালেরিয়াগ্রস্ত থাকায়, ১৮৮৭ সালের ২২এ সেপ্টেম্বর তারিখে বিনা-বেতনে ছুটী লইতে বাধ্য হন। এই সময় দ্বিজেন্দ্র মুঙ্গেরে তাঁহার দাদাশ্বশুর (সুরবালার মাতামহ) স্বনামখ্যাত ডাক্তার বিহারীলাল ভাদুড়ীর নিকট চিকিৎসার্থ বাস করেন। রোগমুক্ত হইয়া ১৮৮৮ সালের ১লা জানুয়ারি পুনর্ব্বার কার্য্যে ফিরিয়া যান, এবং বনেলী ও শ্রীনগর ষ্টেটের সহকারী সেট্‌লমেণ্ট অফিসার হইয়া মুঙ্গের ফোর্টের ৫নং বাঙ্গলায় বাস করেন। তৎপরে সুজামুটার সেট্‌লমেণ্ট কার্য্যে মেদিনীপুরে বদলি হন। ১৮৯৩ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে দিনাজপুর যাইতে হয়। ১৮৯৪ সালের ১৮ই অগষ্ট তিনি আবকারী বিভাগের প্রথম ইনস্পেক্টরের পদ প্রাপ্ত হন। ১৮৯৮ সালের ১৭ই মার্চ্চ ল্যাণ্ডরেকর্ডস্ এবং কৃষি বিভাগের সহকারী ডিরেক্টরের পদে নিযুক্ত হন। ১৯০০ সালের ১৩ই অক্টোবর আবকারি বিভাগের কমিশনরের সহকারী পদ প্রাপ্ত হন এবং ঐ বৎসর ১৩ই নবেম্বর পুনর্ব্বার আবকারি ইনস্পেক্টরের পদে ফিরিয়া আসেন। এই সময় অর্থাৎ ১৩১০ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে (২৯এ নবেম্বর ১৯০৩) তাঁহার স্ত্রী-বিয়োগ হয়। তখন দ্বিজেন্দ্রলাল সরকারি

কার্য্যে বিদেশে ছিলেন। ফিরিয়া আসিয়া এই দারুণ শোকে অধীর হইয়া কিছু দিনের জন্য অবসর গ্রহণ করিতে সংকল্প করেন, কিন্তু তাঁহার উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী তাঁহাকে সে সংকল্প পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করেন। তখন তাঁহার একমাত্র পুত্র দিলীপকুমার (মণ্টু) ও একমাত্র কন্যা মায়াদেবী নিতান্ত শিশু; সুতরাং তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করিতে অসম্মত হওয়ায় ১৯০৫ খ্রীঃ অব্দের ৭ই নবেম্বর পুনর্ব্বার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেকটরের পদ গ্রহণ করিয়া খুলনায় বদলি হন, এবং পরে অল্পদিনের মধ্যেই বহরমপুরে এবং গয়ায় বদলি হইয়া কিছুদিন তথায় কার্য্য করিবার পর ১৯০৮ সালের ২৮এ জানুয়ারি ১৫ মাসের জন্য অবসর গ্রহণ করেন এবং কলিকাতায় "সুরধাম" নামক বাটী নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাতে বাস করেন। পরে ১৯০৯ সালের ২৮এ এপ্রেল ২৪ পরগণার ডেপুটী কালেকটর হন। তথা হইতে ১৯১২ সালের জানুয়ারি মাসে বাঁকুড়ায় বদলি হইয়া ৩ মাসকাল সেখানে থাকার পর মুঙ্গেরে বদলি হইবার সময় কলিকাতায় আসিয়া অসুস্থ হন এবং মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ডাঃ কালভার্টের চিকিৎসাধীন থাকেন। এক বৎসর অবসর গ্রহণ করিয়াও স্বকার্য্যে পুনঃ প্রবৃত্ত হইবার সামর্থ্য না হওয়ায়, ১৯১৩ সালের ২২এ মার্চ্চ কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তাহার পর দুই মাসও অতিবাহিত হয় নাই। গত ৩রা জ্যৈষ্ঠ (১৭ই মে) শনিবার অপরাহ্ন বেলা ৫টার কিছু পূর্ব্বেই সাংঘাতিক

দ্বিজেন্দ্রলাল ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী

সংন্যাস রোগে আক্রান্ত হইয়া সুরধামে জ্ঞানশূন্য হন। রাত্রি ৯।১৫ মিনিটের সময় আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবর্গকে কাঁদাইয়া দ্বিজেন্দ্রলাল চলিয়া গেলেন। আর ফিরিবেন না!

শৈশবে, অর্থাৎ যখন দ্বিজেন্দ্রের বয়ঃক্রম ১৪ বৎসর মাত্র, কৃষ্ণনগর স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র, সেই সময় তিনি আর্য্যগাথা প্রথম ভাগ লেখেন। ইহা কএকটি গানের সমষ্টিমাত্র। তাহার পর, সম্ভবতঃ অধ্যয়নে নিবিষ্ট থাকায়, আর কিছু লিখিতে পারেন নাই। ইংলণ্ডে বাসকালে ইংরেজিতে Lyrics of Ind নামক একখানি কবিতা-পুস্তক রচনা করেন। Edwin Arnold সাহেব

দ্বিজেন্দ্রলালের বাসভবন "সুরধাম"

এখানির বিস্তর প্রশংসা করেন, এমন কি, তিনি বলেন যে, যদি ইহাতে গ্রন্থকারের নাম না থাকিত, তাহা হইলে, ইহা যে ইংরেজের লেখা নয়, তাহা বুঝা যাইত না। ইংলণ্ডে ইনি ইংরেজি সঙ্গীত-বিদ্যা শিক্ষা করেন। দেশে ফিরিয়া আসিয়া আত্মীয়-স্বজন কর্ত্তৃক প্রকাশ্যভাবে সমাজে গৃহীত না হইতে পারায়, অভিমানভরে তীব্রভাষায় 'একঘরে' নামক পুস্তক লেখেন। ইহার সমস্ত উক্তি সত্য হইলেও ভাষার তীব্রতা দোষে স্বজনবর্গ কিছু বিরক্ত হন। তৎপরে ক্রমে কবির হাস্যরসের পরিচয় পাওয়া যায়। "আর্য্যগাথা" (২য় ভাগ) প্রকাশিত হওয়ার পর, হাস্য-রসাত্মক নাটক "বিরহ" প্রকাশিত এবং ষ্টার-থিয়েটারে অভিনীত হয়। পরে "কল্কি অবতার", "প্রায়শ্চিত্ত" ("বহুৎ আচ্ছা" নামে ক্লাসিকে অভিনীত), "ত্র্যহস্পর্শ", "পাষাণী", "তারা-বাই" ও "সীতা" নাটক, এবং "আষাঢ়ে," নামক হাস্যরসের কবিতা প্রকাশিত হয়। ১৯০৬ অব্দে "Crops of Bengal" নামক কৃষিবিদ্যা বিষয়ক ইংরেজি পুস্তক প্রকাশিত হয়। কবিপ্রণীত 'প্রতাপসিংহ' নামক নাটকই নাট্য-জগতে তাঁহার যশোরাশি বিস্তার করে। ষ্টার ও মিনার্ভা, উভয় রঙ্গমঞ্চেই উহা বহুদিন ধরিয়া অভিনীত হইয়াছে, পরে ক্রমান্বয়ে 'দুর্গাদাস' 'নুরজাহান' 'মেবার-পতন' 'সোরাব-রোস্তাম,' 'সাজাহান' 'চন্দ্রগুপ্ত,' 'পুনর্জন্ম,' 'পরপারে,' ও 'আনন্দবিদায়' নাটক; 'মন্দ্র', 'আলেখ্য' ও 'ত্রিবেণী' খণ্ডকাব্য এবং 'Lessons in English' শিশুপাঠ্য পুস্তক প্রকাশিত হয়। অপ্রকাশিত পুস্তকের মধ্যে "ভীষ্ম" মুদ্রিত হইয়াছে, কিন্তু অদ্যাপি প্রকাশিত হয় নাই, আরও কএকখানি লিখিত আছে। এতদ্ভিন্ন, বিস্তর প্রবন্ধ মাসিক-পত্রাদিতে প্রকাশিত হইয়াছে। তন্মধ্যে কতকগুলি স্বতন্ত্রভাবে "চিন্তা ও কল্পনা" নামে মুদ্রিত হইতেছিল। কবিরচিত "আমার দেশ," "আমার ভাষা," সম্রাট্ ৭ম এডওয়ার্ডের মৃত্যুতে "শোক-গীতি", প্রভৃতি কএকটি গান **অমূল্য**। উল্লিখিত গ্রন্থ ও গীতাবলী, কবিকীর্ত্তি ভারতে **চিরকাল অক্ষয়** করিয়া রাখিবে।

দ্বিজেন্দ্রলালের পাচটি সন্তানের মধ্যে তিনটি অতি

দ্বিজেন্দ্রলাল ও তাঁহার পুত্র-কন্যা

শৈশবেই প্রাণত্যাগ করে। এক্ষণে দুইটি-মাত্র রাখিয়া তিনি ইহধাম ত্যাগ করিয়াছেন। জ্যেষ্ঠ দিলীপকুমার রায় (মণ্টু) ১৮৯৭ সালের ২২এ জানুয়ারি অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় জন্মগ্রহণ করে। এবৎসর মণ্টু ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়াছে এবং প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি পাইয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যুকালের শেষ কথা—"মণ্টু"; তাহার পর আর তিনি কোন কথা কহেন নাই। কনিষ্ঠা কন্যা মায়া ১৮৯৮ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার প্রাতে জন্মগ্রহণ করে। মায়া তাহার মাতার ন্যায় সুন্দরী, এবং অত্যন্ত শান্তপ্রকৃতি। জগদীশ্বর কবির হৃদয়ের ধন এই দুইটি রত্নকে দীর্ঘজীবী করুন। বাছারা অতি শৈশবে মাতৃহারা হইয়াছিল, কিন্তু স্নেহশীল পিতা তাহাদের পিতামাতা উভয়ের স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। ভগবান সেই পিতাকে হরণ করিয়া তাহাদিগকে অকূল সাগরে ভাসাইয়াছেন। বাছাদের মুখ দেখিলে বুক ফাটিয়া যায়।

শ্রীপ্রসাদদাস গোস্বামী।

উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনী।

সভাপতির অভিভাষণ।

প্রাচীন ঋষিরা ও সভা সমিতিকে প্রজাপতি-দুহিতা বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন। এই সভা তাঁহাদিগের স্তুতি ছন্দের সম্পূর্ণ উপযুক্ত, যদিচ আমি তাহা উচ্চারণ করিবার যোগ্য নহি। তবে আজ পরিষদের অনুগ্রহে সভাপতি-পদে বৃত হইয়াছি বলিয়া, সেই স্তুতিময়ী ভাষায় আপনাদিগের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিবার অধিকার আছে।

মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী।

সভা চ সমিতিশ্চ অবতাম্ প্রজাপতে দুহিতরৌ সম্বিদানে।
যেনা সংগচ্ছে উপমা স শিক্ষাৎ চারুবদানি পিতর সঙ্গতেষু॥
বিদ্মাতে সভানাম্ নরিষ্টা নামবৈ অসি।
যে তে কে চ সভাসদস্তে তে মে সন্তু সবাচসঃ॥
এষামহং সমাসিনাং বর্চ্চো বিজ্ঞানমাদদে।
অস্যাঃ সর্ব্বস্যাঃ সংসদো মামইন্দ্র ভগিনং কৃণু॥
যদ্বো মনাঃ পরাগতং যদবদ্ধং ইহ বেহবা।
তদাবর্ত্তায়ামাস ময়ি বো রমতাং মনঃ॥

এই সভা আমার উপর সুপ্রসন্ন হউন। আমি যেন উপস্থিত পিতৃদিগের আশীর্ব্বাদে উপস্থিত সভাস্থলে চারুবাদী হইতে পারি।

এই সভার অপর, আমি জ্ঞাত আছি, ইহার অন্যতর নাম অক্ষুণ্ণা।

সভাসদেরা যেন আমার সহবাচী হয়েন।

আমি যেন তাঁহাদিগের তেজ ও জ্ঞানের গৌরব প্রাপ্ত হই।

এই সংসর্গের সৌভাগ্য আমি যেন লাভ করিতে পারি।

যদি এই সভায় কাহারও মন পরাগত হইয়া থাকে, কিংবা ইতস্ততঃ আবদ্ধ থাকে, যেন এই স্থানে আবর্ত্তিত হইয়া আমার মনেতে অনুরক্ত হয়।

যে দেবভাষায় আপনাদিগকে অভিভাষণ করিলাম, তাহাতে আমার অধিকার নাই স্বীকার করি। সেই জ্যোতির্ময়ী ভাষা, আদি-কবিদিগের হৃদয়ের ভাষা, সকলের তাহাতে অধিকার নাই। অধিকার সত্ত্বেও আমরা অধিকারভ্রষ্ট। পূর্ব্বের অধিকার কিসে যে রক্ষা করিয়াছি তাহা জানি না। নিজের ভিটা ছাড়িয়া, আবর্জ্জনাস্তূপের উপর স্থান গ্রহণ করিয়াছি। উচ্ছৃঙ্খল জীবন অবলম্বন করিয়াছি। ধর্ম্মের বন্ধন ছিন্ন করিয়াছি, সমাজের বন্ধন অবজ্ঞা করি, প্রাণের বন্ধন শিথিল হইয়া গিয়াছে; হৃদয়ে অনার্য্যভাব, জিহ্বাগ্রে অনার্য্যভাষা। গ্রামে গৃহস্থ নাই, দেবমন্দিরে জাগ্রত দেবতা নাই; নিজের ঘর ছাড়িয়া, পরের দ্বারে উপযাচক আমরা। আমাদের কিসে অধিকার আছে? নির্ম্মল হৃদয় নিষ্পাপ, অথচ আমরা বহুবাচী, অথচ সত্যের প্রতি লক্ষ্যশূন্য। নির্ভীক আত্মা হিরণ্যবর্দ্ধিনী,

পঙ্কিল পদে সে পথে চলা যায় না। গৃহে আলোক নাই, অথচ "মুস্কিল আশান" সাজিয়া, পরের কল্যাণ কামনা করিয়া বেড়াইতেছি। যদি তাহাতেই কিছু পাথেয় সংগ্রহ করিয়া লইতে পারি। শূন্য হস্তে আশীর্ব্বাদ করিতে শিখিয়াছি। ভিক্ষার ধন লইয়া দান করিতে বসিয়াছি। সূর্য্যোদয় হইবার পূর্ব্বে, আমরা পরাঙ্মুখ হইয়া আছি।

হে ইন্দ্র, আমাদিগকে জ্ঞান দাও, পিতা যেমন পুত্রকে জ্ঞান দান করে। এমন পথে শিক্ষা দাও, জীবনে যেন সূর্য্যকে দেখিতে পাই। হে পুরুহূত, আমরা যজ্ঞের জীব, আমরা যেন প্রত্যহ সূর্য্যকে প্রাপ্ত হই।

ইদং ধাতুঃ ন আভর পিতা পুত্রেভ্যো যথা।

শিক্ষা নো অস্মিন্ পুরুহূতয়ামনি, জীবা জ্যোতিরসীমহি॥

যদি আমরা এই প্রার্থনা করিতে পারিতাম, ঈশ্বরও আমাদিগকে সুপথ দেখাইয়া দিতেন।

সচন্দ্র জ্যোতিঃ প্রকাশিতনেত্রা উষা আকাশের দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া, দাঁড়াইয়া আছেন। দীপ্তিমতী আলোক বিকাশিতাঙ্গী দেবী উষা প্রত্যহ সেই দ্বারে দণ্ডায়মানা; আমরা নিদ্রাতুর, কখনও তাঁহাকে দেখি না। এই বিচিত্রা বিস্তীর্ণা দেবীকে যাহারা দেখিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের স্তুতি দেবলোকে গ্রাহ্য হইত। আমরাও বিনীতভাবে আজ স্তুতি করিতেছি। আমাদের আঁধার হৃদয়ে আলোক আনিয়া দাও, প্রাণে বল আনিয়া দাও। অনাবৃত আকাশের নীচে, স্বাধীনচেতা কবি গুরু ছিলেন। নিতান্ত ক্ষুদ্রচেতা আমরা, তাঁহাদিগের মত মনের সাহস আমাদিগের হইবে কিসে?

তাঁহাদিগের এক একটি শব্দ, এক একখানি আলেখ্য।

উষা জলন্ত বলিয়া, "ভাস্বতী"।

আলোকের উৎস বলিয়া "ওদতী"।

অন্যকে আলোকিত করেন বলিয়া "দ্যোতনা"।

রক্তিম বলিয়া "অরুণী"।

শ্রেষ্ঠ বলিয়া "মঘোনী"।

শুদ্ধ বলিয়া "রিতাবরী"।

জাজ্বল্যমান বলিয়া "বিভাবরী" যাহা আমাদের ভাষায় আজকাল রাত্রি।

সঞ্চারিণী বলিয়া সুনৃতা।

দেবতা কি, না বুঝিলে, তাঁহার উপযুক্ত নাম ধরিয়া ডাকিতে পারি না। বৈদিক কবি উষাকে অনাবৃতা-বক্ষা নর্ত্তকীর সহিত তুলনা করিতে সঙ্কোচ করেন নাই। যে কণ্ঠে তাঁহাকে মঘোনী ও রিতাবরী সম্বোধন করিয়াছেন, সেই কণ্ঠে, দেবী তুমি কন্যার ন্যায় শরীর বিকাশ করিয়া, দীপ্তিমান্ সূর্য্যের নিকট গমন কর; যুবতীর ন্যায় উজ্জ্বল দীপ্তি বিশিষ্টা হইয়া, হাস্যমুখে তাঁহার সম্মুখে বক্ষোদেশ অনাবৃত কর বলিয়া স্তুতি করিয়াছেন।

মনে যেরূপ দেখিয়াছেন, সেরূপ অবতারণা করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হ'ন নাই। তাঁহাকে কখনও বালিকা, কখনও জরামৃতা, কখনও সূর্য্য-পত্নী, কখনও বা সূর্য্য-জনয়িত্রী বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। নির্ভীক কবি সহস্র ভিন্ন ভাবে তাঁহাকে দেখিয়াছেন—দ্বিধাশূন্য, সংশয়শূন্য, অপরের অবলম্বন রহিত। বীর্য্যশালী মহাপুরুষের পক্ষে যাহা সম্ভব হইয়াছিল, তোমার আমার সে চেষ্টায় পাপ স্পর্শে। সৃষ্টি বিষয়ে তাঁহারা কি বলিতেছেন শুন:—

নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীং নাসীদ্রজো নো ব্যোমা পরো যৎ।

কিমাবরীবঃ কুহ কস্য শর্ম্মন্নম্ভঃ কিমাসীদ গহনং গভীরং॥

ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ।

আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধান্যন্ন পরঃ কিং চনাস॥

R. V. 10, 129.

Nor aught no naught existed; You bright sky was not, no heaven broad roof out streched above, what covered all? What sheltered? what concealed?

Was it the waters' fathomless abyss?

There was not death—There was naught immortal.

Maxmuller, p. 290

দাম্ভিক কবি গর্ব্বের সহিত বলিয়াছেন—

আমরা সত্যবাদী—মিথ্যা কহি না।

নূনমৃতা বদংতো অনৃতং রপেম।

R. V. 10, 10, 4.

এই সত্যের তেজোবলেই তঁহাদিগের কাব্য তেজোময়। আমাদিগের হৃদয়ে যে দিন এইরূপ বল আসিবে, আমাদিগের কবিতাও ওজস্বিনী হইবে। সাহিত্যের মূলে সত্য ও সাহস চাই। এ বল আসিবে কিসে? ধর্ম্মের পথ অবলম্বন না

করিলে, সামাজিক গ্রন্থি দৃঢ় না করিলে, অসত্য-উপেক্ষী না হইলে, এ শক্তির কখনও সঞ্চার হইবে না। আপনার পারিচর্য্যে আপনাহারা হইয়া চিরদিন রহিতে হইবে। একদিন ঘরের দিকে চোখ পড়িয়াছিল, অবসন্ন আত্মা গৃহ-দেবতাকে জাগ্রত দেখিতে পাইয়াছিল, নূতন ভাব মনে অঙ্কুরিত হইয়াছিল, নূতন আলোকে আপনার হৃদয় দেখিতে পাইয়াছিলাম, বহু দিনের কথা নহে, কিন্তু আলোক স্তিমিতপ্রায়, সে অঙ্কুর বিকাশের পূর্ব্বেই তাহা যেন শুকাইয়া গেল, দেবতা শিলাখণ্ডে পরিণত হইল, দৃষ্টি আবার বাহিরের জঞ্জালের উপর নিক্ষিপ্ত হইল—ভাগ্যের দোষ দেই না, বালকত্ব না ঘুচিতেই আমরা পিতা, শিক্ষা অসম্পূর্ণ না থাকিতেই আমরা শিক্ষক, মাত্রা শুদ্ধ না হইতেই আমরা লেখক। সাধ্যাতীতের সাধনা অপচয় মাত্র, তাহাতে অকল্যাণ ভিন্ন কল্যাণ হইতে পারে না। যাহা আয়ত্বাধীন তাহাতেই বলের পরিচয় পাওয়া যায়। অধিকার যতই আমরা অতিক্রম করিতে চেষ্টা করিব, আমরা ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর হইয়া পড়িব। জাতীয়তার অবতারণা রাজসূয় যজ্ঞ, সহজে সে যজ্ঞের অধিকারী হওয়া যায় না। শুদ্ধ, সংযমী, প্রশান্তচেতা হওয়া চাই। আমার হৃদয় আমারই রাজ্য, অনুভব করা চাই, আমি আছি না বুঝিলে, আপনার কি অপরের চিনিয়া লইবে কি প্রকারে? আদর্শভ্রষ্ট আমরা পণ্যাঙ্গী বারবনিতার অঞ্চল ধরিয়া মার অনুসন্ধানে চলিয়াছিলাম। প্রথমে আপনার ঘরের ভিতর আপনার স্থান কর, পরে পৃথিবীর কোন্ খণ্ডে বাসা বাঁধিয়াছ তাহা বুঝিতে পারিবে, বিশ্বের সহিত কি সম্বন্ধ তখন উপলব্ধি হইবে। ঋত্বিকেরাই আহুতি দিতে অক্ষম; আহুতি ভেদে দেব কি দানব, যজ্ঞক্ষেত্র অধিকার করে।

আদিকবিই আর্য্যাবর্ত্তে আদি পুরোহিত, গুরু, শিক্ষক ছিলেন, সে স্থান আজ কে অধিকার করিতে পারে? আমরা নিজের খেয়ালে, আপন আপন ধর্ম্ম গড়িয়া লইতে শিখিয়াছি। কখনও বা ধর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছি, কিংবা করিতে প্রস্তুত হইয়াছি। আমরা বিজ্ঞানের দোহাই দিতে শিখিয়াছি, ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম্ মাপ জোক করিতে পারি, জগৎকারণ অপরিমেয় বলিয়া তাঁহার ধ্যান করা নিষ্ফল মনে করি। আমরা দেবতার ধার ধারি না, দেবালয়ের পাশ দিয়া চলি না—আমরা কি বলের উপর নির্ভর করিয়া অপরকে বল দান করিতে পারি। তুমি আপনি অবলম্বন রহিত? কি ভরসায় তোমার অবলম্বন করিব? তাই বলি চিত্ত শুদ্ধ করিতে শিক্ষা কর, নিজের গৃহ পরিষ্কার করিয়া লও। ঘরের আঁধার কোণে বসিয়া জগতের আঁধার অনুভব করা সহজ, কিন্তু অবারিত দ্বারে না দাঁড়াইলে জগতের বিস্তীর্ণ আলোক দেখা যায় না। তাই বলি হৃদয়ের দ্বার উদ্ঘাটিত কর। বিশ্বের প্রাণের ভিতর স্থান না পাইলে বায়ুবিতাড়িত বাষ্পের ন্যায় শূন্যে মিলাইয়া যাইবে। সমাজে প্রাণ নাই, বিশ্বের প্রাণ অনুসন্ধান নিষ্ফল।

স্বাধীনচেতারই হস্তে লেখনী জ্বালামুখী হয়। দেবীতমা সরস্বতী সূর্য্যালোকাবৃত। অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি ভিন্ন স্থূল দৃষ্টিগোচর নহেন। এই দৃষ্টি সাধনায় মেলে। যখন বলিতে পারিবে, My mind to me a Kingdom is, তখন সে রাজ্যে দেবীতমার পূর্ণোপচারে পূজা সম্ভব। মিথ্যার বোঝা ঘাড়ে লইয়া সমাজ গড়া যায় না। দেবীর পূজা সোলার ফুল দিয়া হয় না। সত্যই জীবনের ভিত্তি, মানব হৃদয়ের সাহস। ধর্ম্ম বল, কাব্য বল, সবই সত্যের উপর নির্ভর করে। সমাজে লুকাচুরি করিতে করিতে মন জরাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। মুখে যাহা, কাজে তাহা যে জাতি করিতে অশক্ত, কোন্ আশা তাহার ফলবতী হইবে? বক্তা বাঙ্গালী বাহিরে বীর, গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেই মার্জ্জার হইয়া পড়েন। ধর্ম্মাচার্য্য বাঙ্গালী আপনার গৃহমধ্যে অত্যাচার করিতে কুণ্ঠিত হ'ন না, পরের কোষ্ঠী কাটিতে অনুমাত্র সঙ্কোচ করেন না। কাণাকাণি করিয়া গালাগালি দিতে ছাড়ি না, সকলেই প্রায় অনাচারী, কিন্তু সকলেই আচারের গণ্ডীর ভিতর আছি বলিয়া বুঝাইতে চাই। মিথ্যার হাটে মূর্ত্তি কেনা-বেচা চলিতে পারে, দেবী পাওয়া যায় না।

প্রসিদ্ধ ফরাসী কবি, Beranger, Napoleonএর সমসাময়িক ছিলেন। Napoleonএর পতনের পর ফ্রান্সের সামাজিক অবস্থা পঙ্কিল হইয়া পড়িয়াছিল। Beranger সাহিত্য-সমাজের কাছে এই বলিয়া বিদায় লইয়াছিলেন, "আর লিখিব না বলিতে পারি না, কিন্তু লেখা প্রকাশ করিব না, ইহা প্রতিজ্ঞা করিতেছি। দেখিবার শক্তি আছে, কিন্তু আর দেখিতে চাহি না। জীবনের শেষ

সন্ধ্যাতে চক্ষু মুদিয়া থাকিতে থাকিতে ঘুমাইয়া পড়িতে ইচ্ছা নাই। সময় আসিয়াছে মনে হইলে অকাতরে ধরাশায়ী হইয়া চিরনিদ্রা লাভ করিব। প্রাণের কথা লইয়া হাটের মধ্যে দাঁড়াইতে পারি না, সে কথা যদি বেচা-কেনা চলে চলুক—ঘরে যে ক্ষুদ কুঁড়া আছে তাহাতেই আমার চলিবে। আতুরের পায়ের ধূলি চক্ষুতে নিক্ষেপ করিতে ইচ্ছা নাই—আমি বিদায় লইলাম, সহজেই সে স্থান আপনারা পূরাইয়া লইতে পারিবেন।" অনেকেই এ কথার সত্যতা বোধ হয় অনুভব করেন, আমিও করিলাম বলিয়া আমাকে মাপ করা প্রয়োজন মনে করিলে মাপ করিবেন। কারণ আপনাদিগকে বিশ্বাস করিতে বলি, আমি সত্য যাহা ভাবি, তাহাই বলিতেছি। হাটের মধ্যে বাস করিবার অনিচ্ছা সত্বেও বাস করিতে বাধ্য মনে করি। হাটে বারওয়ারি হইতে পারে, উহা পূজার স্থান নহে।

কথা সত্য, তাহার অন্যতর প্রমাণ আছে। বাঙ্গালা নাটক সাধারণতঃ বলিতে গেলে নাট্য-জগতে উচ্চ স্থান পায় নাই। আমাদিগের সামাজিক অবস্থায় পাইতে পারে না। পৃথিবীর কোন স্থানে পারে নাই। নাটক সাহিত্যের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করে। জাতীয় ধীশক্তির প্রধান পরিচয় নাটকেই পাওয়া যায়। অন্য কবিতা কবির মানসজাত, গাথা নিজের প্রাণের গান, মহাকাব্য পৌরাণিক ইতিহাসের অবতারণা—যাহারা আর জগতে নাই, কল্পনার সাহায্যে তাহা সাজাইয়া ল'ন, কঙ্কালে পুনর্জীবন দেন। তাঁহারা রচনার মধ্যে দেবদেবী মানব যেখানে উপযুক্ত মনে করেন, সেইখানে বসাইয়া ল'ন। কিন্তু যথার্থ নাটকে সামাজিক চিত্র যাহা আছে, কবি তাহাই পরিস্ফুট করিয়া তোলেন। যাহা প্রত্যহ দেখি, তাহার ভিতরে প্রাণ কোথায় প্রচ্ছন্ন আছে, তাহাই খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়। একের মনোভাব নহে, সামাজিক প্রাণী সকল কি সূত্রে গ্রথিত আছে, যদি বিচ্ছিন্ন থাকে কোথায় তাহার ছেদ হইয়াছে তাহাই আবিষ্কার করা—তাহাই সেই সমাজের লোকের যাহাতে উপলব্ধি হয়, সে শিক্ষা নাটক হইতে হয়।

যোগ বিয়োগ শুদ্ধমাত্র গণিতের ভাষা নহে, মানবহৃদয়ের ভাষা। এক এক জনের আশা মনোভাব লইয়া সমাজ সৃষ্ট নহে—অথচ মানুষের নিজত্ব যতদিন আছে, আমার হৃদয়ের আশা আমারই, আমার স্নেহ মমতা আমারই, কিন্তু সমাজের শৃঙ্খলা কোথায় তাহা অবরোধ করিয়াছে—কোথায় তাহার বিস্তৃতি সাধনা করিতেছে কোথায় তাহা বিশ্বজগতের প্রাণের ভিতর আমাকে হাত ধরিয়া লইয়া যাইতেছে, তাহাই যথার্থ নাটকে প্রতিভাত। সুন্দর, কুৎসিৎ, সত্য মিথ্যা, অনুরাগ, বিরাগ সকলেরই স্থান আছে। নাটক মানব সমাজের প্রতিরূপ, মনুষ্য-হৃদয়ের জ্বলন্ত, জীবন্ত আখ্যান—পয়ারে তাহাকে আবদ্ধ করা কঠিন, গদ্যে তাহা সম্পূর্ণ উদ্ঘাটিত হয় না; তাহার ভাষা তাহার ছন্দ কবিকে আবিষ্কার করিয়া লইতে হয়, তাহা নিয়মবদ্ধ করা যায় না। বহির্জগৎ কিম্বা অন্তর্জগৎ বিশ্লেষণ করা কাব্যের উদ্দেশ্য নয়। সম্ভাবিতের বিস্তৃতি আর সুদূর আশাকে পরিস্ফুট করিয়া তোলা, অর্থাৎ অসম্ভাবিতকে সম্ভবপর করার সাধনা, বিরাগ হইতে নূতন রাগের মূর্ত্তি অবতারণা করা, অকল্পিতকে কল্পনার আয়ত্ত মধ্যে আনা, সকল প্রকার কাব্যের কর্ত্তব্য। কিন্তু সেই আশা, সেই রাগ, সে আদর্শ সমাজের হৃদয়ে জাগ্রত করা নাটকের শিক্ষা। নাটকেই কবি শিক্ষক।

ইংলণ্ডের সাহিত্যের ইতিহাস দেখ, এই কথার সত্যতা প্রমাণ হইবে। এলিজাবেথের সময় ইংলণ্ড চরম উৎকর্ষ লাভ করে, সর্ব্বোচ্চ সোপানে আরোহণ করে। সে সময় ইংলণ্ডে নূতন প্রাণ আসিয়াছিল, নূতন আশা, নূতন শক্তির সঞ্চার হইয়াছিল। ক্ষুদ্রদ্বীপবাসী জগতের রাজ্য অধিকার প্রয়াসী হইয়াছিল। সেই সময়ে ইংরাজী ভাষাতেও নূতন তেজের আবির্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন এক সময় আমাদের দেশে বাঙ্গালা লেখা পড়ার অনাদর ছিল, ইংলণ্ডেও এই সময়ের পূর্ব্বে ঠিক তাহাই হয়। লাটিন এবং গ্রীকের চর্চ্চা ভিন্ন শিক্ষিত সম্প্রদায় ইংরাজী ভাষার চর্চ্চা লজ্জাকর মনে করিতেন। আমাদিগের পণ্ডিতেরাও সংস্কৃত ভাষা ছাড়া, বাঙ্গালা ভাষার অনাদর বহুকাল পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন; আর আমাদের ইংরাজী-ভাষামুগ্ধ শিক্ষিত সম্প্রদায় বাঙ্গলা ভাষা ব্যবহার করা, অনেক দিন ধরিয়া হেয় জ্ঞান করিতেন। Rogen Ascham ইংরাজী ভাষায় বই লিখিবার সময় এইরূপ ভূমিকা করিয়াছিলেন "Al-though to have writ'en this book either in

Latin or Greek had been more easier and fit for my trade in study, yet I have written this English matter in English tongue for Englishmen তাহার পর কিছুকাল ধরিয়া লেখকেরা লাটিন আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া এক অদ্ভুত রচনা-রীতি সৃজন করেন যথন I trust the learned poets will give me leave and vouchsafe my book passage as being for the rudeness thereof no prejudice to their noble studies but even (as my intent is) an instax cotes to stir up some other of mutability to listen travail in this matter. আমাদের দেশেও তাহা ঘটিয়াছিল, 'নবজলধরপটলসংযোগে' প্রভৃতি সমাসের ও অনুপ্রাসের বেড়ায় বাঙ্গলা ভাষা সোণার হাতকড়ি ও বেড়ী পরিয়াছিল। পুস্তকের নাম 'Hecatompathia' ও 'প্রভুকমলতনুনন্দিনী' প্রায় এক জাতীয়। তখন ইংরাজী ব্যাকরণ শুদ্ধ করিয়া লিখিবার প্রয়োজন জ্ঞান জন্মায় নাই, more easier প্রভৃতির ছড়াছড়ি দেখিতে পাওয়া যাইত! আমরাও তাই করিয়াছি, বাঙ্গলায় ব্যাকরণ নাই বলিয়া যাহা ইচ্ছা তাহা বলা হইয়াছে। 'রাজা' সতী অসতী, 'শনি' ভানুতনুজা প্রভৃতি অনেক কথা পাওয়া যায়। কিন্তু এরূপ করিতে করিতে সহজ সরল ভাষায় লিখিবার চেষ্টা জন্মিতে থাকে। ল্যাটিন দেবদেবী ছাড়িয়া, সাদাসিধা মানুষের জীবনের উপর ক্রমে দৃষ্টি পড়ে। Morality plays, Interludes, Senecan Tragedies, Chronicle Plays একে একে পরিত্যক্ত হইয়াছিল। শূন্যপুরাণ, মাণিকচাঁদের গান, রাম, যাত্রা, পাঁচালি প্রভৃতি রচনা আমাদের মধ্যে আজকাল নাই। নিজের ঘরের ছেলে মেয়ের উপর যখন চোখ পড়ে, তখন নিজের শক্তির তেজও অনুভূত হয়। সেই সময় ইংলণ্ডে জাতীয় জীবন উদ্ভাসিত হয়। এই সময়ের কাব্য নাটক অদ্ভুত বীর্য্যশালী, তাহার প্রত্যেক ছত্রে নবজাত ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। ভাষার প্রতিভা নূতন ছন্দে আবিষ্কৃত হয়। Sackville ও Shirleyর মধ্যবিৎ সময়ে এই বলের উদ্ভাষ প্রত্যক্ষ হয়। দেখিতে দেখিতে সেক্সপীয়র সাহিত্য-জগতে সূর্য্যের মত উদিত হইলেন। এই নাটক-গুলি পড়িয়া দেখিলে অনেক কুৎসিত কথা, কুশ্রীভাব দেখিতে পাইবেন। কিন্তু কুৎসিত কথা মানুষের মুখে আছে কুৎসিত ভাব মানবের মনে আছে। পাপ অপ্রচ্ছন্ন ভাবে সমাজে আছে, পুণ্যই অনেক সময় প্রচ্ছন্ন থাকে। পাপ-পুণ্যে মানুষের হৃদয়, পাপপুণ্যে আমাদের জগৎ, অপাপবিদ্ধ জগৎ মানুষের নহে, দেবতার। এ জগতে ঈশ্বরের স্বরূপ রাহুগ্রস্ত, আমরাই; তাহার সম্যক উপলব্ধি এ জগতে সম্ভবপর নহে।

সত্য যদিচ বলের কারণ, তাহাতে অহং এর অধিকার নাই, তাহা সার্ব্বজনীন। সত্য যেমন মানব-আত্মার ভাষা, মিথ্যা তেমনি মানব হৃদয়ের দরদ-দিয়া-মাথা—এই সত্য মিথ্যা জড়িত মানব সমাজের চিত্র নাটকে প্রতিফলিত। সব সময়ে জীবনে মিথ্যা পরাজিত হয় না। Renan এক স্থানে বলিয়াছেন জগদীশ্বর তোমার রহস্য বুঝিতে পারি না, তুমি যে আমাদের দৃষ্টি হইতে প্রচ্ছন্ন রাগ, সেটা আমাদের উপর তোমার আশীর্ব্বাদ! সত্য যদি সর্ব্বত্র বিকাশিত হইত তাহা হইলে মানব-হৃদয়ের স্বাধীনতা থাকিত না।

যথা ইচ্ছা মন যায়, পৃথিবীতে মানব যথা ইচ্ছা বিচরণ করে। নাটক এই যথেচ্ছাচারী মানব সমাজের অন্তর্নিহিত, রহস্য উদ্ভাসিত করিয়া তোলে। সেক্ষপীয়রের পূর্ব্বে যেমন জনকতক ইংরাজ কবি তাঁহার জন্য স্থান প্রস্তুত করিয়াছিল, তাঁহার পরেও জনকতক কবি, সে স্থান অধিকার করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। যত দিন ইংলণ্ডে সেই নব জীবনের স্রোত বহিয়াছিল ততদিন ধরিয়া ইংরাজী নাটকের প্রতিপত্তি ছিল। যে সময় হইতে সে আবেগ মন্দীভূত হইল সেই সময় হইতে ইংরাজী নাটকের গৌরবহ্রাস হইয়াছে। বড় গাছে যেমন পরগাছা আশ্রয় করে সেইরূপ তাঁহাদিগের আধুনিক নাটক পরগাছা স্বরূপ। নাট্যশালায় তাঁহারা ফরাসী নাটক অনুবাদ করিয়া চালাইতেছেন। বিলাতের জীবনের বৈচিত্র্য গিয়াছে, উৎসাহ সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে, আজকাল বহুদেশের সংসর্গে তাহাদের সহিত মিলিয়া চলিতে হইতেছে। যাহা আছে তাহা বজায় রাখিতে যত্নবান হইতে হইয়াছে। সমাজের প্রাণী আর এক ছাঁচে ঢালা। মানসিক তেজ বহু ব্যাপারে বিক্ষিপ্ত হইয়া কেন্দ্রীভূত হইতে পারিতেছে না। তাহা ছাড়া ঘরে কোঁদল বাঁধিয়াছে।

গৃহের ভিতর কচ্‌কচিতে প্রাণ ওষ্ঠাগত—নাটক লিখিবার অবসর কোথায়? যেমন ইংরাজী সাহিত্যে নাটকের উদ্ভবের কথা বলিলাম, ফরাসী দেশেও ঠিক ঐরূপ হইয়াছিল। ফ্রান্সের চারিদিকে অন্য অন্য দেশ, কাজেই তাহাকে নিজের বিশিষ্টতা বজায় রাখিয়া চলিতে হইয়াছে। যখন রোমান্ সভ্যতা চূর্ণ হইয়া যায়, ফরাসী-ভাষার তখন জন্ম—ল্যাটিন ভাষা হইতেই তাহার উৎপত্তি। রোমানদিগের পূর্ব্বের কেণ্টদিগের প্রভাবের ছায়া তাহাতে পড়ে নাই। Conquering Frankরাও সেই ভাষার মধ্যে নূতন ভাষা চালাইতে পারে নাই। ক্রমে এই ভাষার তেজ বৃদ্ধি হইতে লাগিল, কিন্তু চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে Civil War গৃহবিচ্ছেদের দরুণ ফ্রান্সের সাহিত্য চাপা পড়িয়া গিয়াছিল। সেই সময়ের শেষভাগে বিশৃঙ্খল ফরাসী সমাজে নূতন ভাবের আভাষ পাওয়া যায়। সেই বিশৃঙ্খল সমাজে এক মহাকবি জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু এই কবি দস্যু ছিলেন, বহু দিন ধরিয়া কারাবদ্ধ ছিলেন, একবার তাঁহার উপর প্রাণ দণ্ডের আদেশ হইয়া কোন রূপে পরিত্রাণ পান, কিন্তু এই অসাধারণ পুরুষ, অসাধারণ কাব্য শক্তির পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার নাম Villon, সেই সময় হইতে Ronsard পর্য্যন্ত দিন দিন ফরাসী সাহিত্যের উন্নতি দেখিতে পাওয়া যায়। এই সময় Byzantine রাজত্ব ধ্বংস হয় এবং নূতনতেজ ফ্রান্স, ইতালি, স্পেন, ইংলণ্ডে উদ্ভূত হয়। ফ্রান্সে এই সময় Ronsard বলিয়া একজন মহাকবির অভ্যুত্থান হয় এবং নাট্যজগতে Corneille, Racine পরে Moliere এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে Voltaire এক এক যুগের অবতারণা করিয়া গিয়াছেন। ফ্রান্সের ইতিহাস এক মহাকাব্য—ফ্রান্সের সাহিত্য তাহারই পথবর্ত্তী, ফ্রান্সে কবি, শিক্ষক চিরদিনই সমাদৃত। Plicads দিগের সময় হইতেই ফরাসী দেশে সাহিত্যের একটি বিশেষ সমাজ সৃষ্ট হয়। সে সমাজে রাজা প্রজা ছিল না, গুরু শিষ্য ছিল না, ধনী নির্ধন ছিল না। সকলেরই সেই সমাজে সমান অধিকার। ফ্রান্স যেমন দিন দিন প্রতাপান্বিত হইয়া উঠে তাহার সাহিত্য সমাজ দিন দিন নূতন বলে বলীয়ান হইয়া উঠিয়াছে। French Revolution এর সময় দেখ, জাতীয় তেজের কি আশ্চর্য্য বিকাশ দেখিতে পাইবে। এই সময়ের একটী চিত্র আপাদিগের সম্মুখে উপস্থিত করিতে চাই।

ফরাসী সমাজে যেমন এক সময়ে অভিজাতবর্গ এবং জনসাধারণের মধ্যে একটী ঘোর বিচ্ছেদ হইয়া পড়িয়াছিল, ফরাসী সাহিত্য, বিশেষ কাব্যের ভাষাতেও সেইরূপ Noble এবং Base মহৎ ও নীচ জাতীয় কথার ভাগ হইয়াছিল। যাহা সাধারণের ভাষা তাহা নীচ বলিয়া অভিহিত ও কাব্যে অব্যবহার্য্য ছিল। নীচের ভাষা নীচ ভাবে কলুষিত মনে করা হইত। গাছ বলা অসঙ্গত বিটপি কিংবা পাদপ না বলিলে ভাগবত অশুদ্ধ হইত। Racine তাঁহার একখানি নাটকে Chien কুক্কুর কথাটি ব্যবহার করেন, তাহা লইয়া কতই না আন্দোলন চলিয়াছিল। Moucheir রুমাল কথা এক স্থানে ব্যবহার হইয়াছিল বলিয়া, নাট্যশালায় খুনখুনি হইয়া গিয়াছিল। আমাদের দেশে এখন পর্য্যন্ত কেহ কেহ চলিত কথা ব্যবহার করিতে কাতর হ'ন। কথার মধ্যেও আমরা ব্রাহ্মণ চণ্ডালের ন্যায় জাতিভেদ দাঁড় করাইবার চেষ্ট করিয়াছি। কিন্তু যে জাতিতে বড় ছোটর মধ্যে ভেদ অবহেলে উঠাইয়া দিতে সক্ষম হইয়াছিল, সেই জাতির কবিই বা কতদিন ধরিয়া কথার জাতিভেদ সহ্য করিতে পারে? এই বিষয় লইয়া সাহিত্য জগৎ Victor Hugoর কিছু পূর্ব্ব হইতে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। একদল লেখক Romantic School নামে পরিজ্ঞাত সাধারণ কথাগুলি ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলেন, তাঁহাদের Classic school এর সহিত ঘোর দ্বন্দ্ব বাধিয়াগেল। যাঁহারা আধুনিক তাঁহাদের বয়স কম, সাহস অধিক, তাঁহারা উন্মাদের মত এই বিবাদে যোগ দিলেন। এমন কি অনেকে নিজের পারিবারিক নাম পর্য্যন্ত তুলিয়া দিলেন। তাহার স্থানে Dick, Tom, Harry যাহা মনে আসিল তাহাই ডাকনাম করিয়া লইলেন। পোষাক পরিচ্ছদ সম্বন্ধেও তাহাই হইল। তাঁহারা শুদ্ধমাত্র পূর্ব্ববর্ত্তী ভদ্রসমাজের কালো Hat, Coat ছাড়িয়া—বিবিধ বর্ণের বিবিধ রকমের কাপড় পরিতে আরম্ভ করিলেন। কেহ লম্বা চুল রাখিলেন, কেহ মাথা মুড়াইয়া লইলেন, পারিসের রাস্তায় যেখানে সেখানে এই অদ্ভুত বেশধারী

অভিনবের দল দেখা যাইতে লাগিল। ইহার প্রায় সকলেই সাহিত্য-সেবক, অপর দলের মধ্যে কতিপয় যুবক, Jupiter, Neptune, Mars প্রভৃতি দেবতাদিগের সাজে সজ্জিত হইয়া পথে চলিতে লাগিলেন। দুই দলে কথা বার্ত্তা আরম্ভ হইলে লাঠালাঠিতে পরিণত হইত। এই সময় Victor Hugo র কাব্যের অভ্যুদয় হয়। সময় থাকিলে তাহার প্রথম নাটক Cromwell এর উপক্রমণিকা পড়িয়া শুনাইতাম। Theophile Gautier এই উপক্রমণিকাকে সাহিত্যে Mount sinai এর Ten Commandments বলিয়া গিয়াছেন।

Cromwell লইয়া অনেক বাদ বিসংবাদ চলিল। তাহার পরেই তিনি hernani বলিয়া নাটকখানি লেখেন। ফরাসী সাহিত্য-সমাজে, 25th Feb. 1830, যে দিন Hernani অভিনীত হয়, 14th July এর মত তাহা পূজার দিন বলিয়া গণ্য। Hernani পৌরাণিক শৃঙ্খল ছিঁড়িয়া ফ্রান্সের কাব্য-জগৎকে নূতন অলোকে আলোকিত করিলেন। পুরাতন ছন্দের নিয়ম অনায়াসে ওলট-পালট করিয়া নূতন ছন্দের সৃষ্টি করিলেন। প্রথম অভিনয়ের দিন বেলা দ্বিপ্রহর হইতে সহস্রাধিক সেবকের দল রঙ্গালয় দখল করিয়া লইলেন। পৌরাণিকদলও স্থান বলপূর্ব্বক অধিকার করিতে ছাড়িলেন না। অদ্ভুত বেশধারী শত শত যবকবৃন্দ সারাদিনের খাদ্যদ্রব্য লইয়া রঙ্গালয়ে সারাদিন যাপন করিবার যোগাড় করিয়া লইয়া গিয়াছিল। দাঙ্গা হইবার আরম্ভ জানিয়া, ভিতরে পুলিশ বাহিরে সৈনিকের দল রঙ্গালয় রক্ষার্থে নিয়োজিত হইয়াছিল। অভিনয়ের সময় উপস্থিত হইল। পটোত্তোলন মাত্র অভিনবের দল হুঙ্কারে আকাশ যেন ভাঙ্গিয়া পাড়িল। পৌরাণিকেরাও গর্জ্জন করিতে ছাড়িল না। একটু অবসর পাইবামাত্র অভিনয় আরম্ভ হইল। সূত্রপাতেই Escalier derobe (বিবস্ত্র সোপানাবলি) উচ্চারিত হইবামাত্র, বিষম হুলস্থুল পড়িয়া গেল। Derobe নূতন রকমের বিশেষণ আবার তাহার উপর এক ছত্রের শেষ ভাগে বিশেষ্য Escalier, তার পর ছত্রে তাহার বিশেষণ derobe, ভাষার উপর একি ভয়ঙ্কর অত্যাচার বলিয়া পৌরাণিক গালাগালি আরম্ভ করিলেন। অভিনবেরা তাহাদিগকে বাপান্ত করিতে ছাড়িলেন না, তুমুল সংগ্রাম বাধিয়া গেল। গোলমাল কিছু কমিয়া গেলে আবার অভিনয় আরম্ভ হইল। সাপেও বংশীধ্বনিতে মুগ্ধ হয়, এই অসাধারণ কবির ভাষা ও ছন্দে মন্ত্রমুগ্ধবৎ ক্রমে সকলে ধীরভাবে কতকটা শুনিলেন, মধ্যে মধ্যে তর্জ্জন-গর্জ্জনও চলিতে লাগিল। একজন প্রকাশক চতুর্থ অঙ্ক অভিনয়ের পূর্ব্বেই Victor Hugo র নিকট গিয়া নাটকখানি প্রকাশের সত্ত্বের জন্য ৬ হাজার Franc দিবেন বলিয়া হাতে পায়ে ধরিতে লাগিলেন; বলিলেন, ১ম অঙ্ক শেষ হইতেই দুই হাজার ফ্রাঙ্ক দিব ঠিক করেন, ২য় অঙ্কের শেষে ৪০০০, তৃতীয় অঙ্কের পর ৬০০০ দিতে প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছেন, অভিনয় স্থগিত থাকুক, কথাবার্ত্তা শেষ কর, না হইলে পঞ্চম পর্য্যন্ত শুনিলে ১০,০০০ ফ্রাঙ্ক দিতে ইচ্ছা হইবে, কিন্তু দিবার সাধ্য নাই। Hugo র তখন দুই পাউণ্ড পর্য্যন্ত ঘরে সম্বল ছিল না, তিনি ৬ হাজার ফ্রাঙ্ক আনন্দ সহকারে গ্রহণ করিলেন ও অভিনবেরা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া, সজোরে গান ধরিয়া দিলেন। অন্য পক্ষও ছড়া কাটিতে ছাড়িলেন না। এইরূপে অভিনয় শেষ হইল। কোনরূপে পুলিশ ও সৈনিক শান্তি রক্ষা করিল। কিছুদিন ধরিয়া এইরূপ ঝগড়াঝাটি চলিয়াছিল—পরে সকলেই নতমস্তকে কবির শিক্ষা সত্য বলিয়া মানিয়া লইলেন। ভাষায় ব্রাহ্মণ চণ্ডাল নাই স্বীকার করিয়া লইলেন। Hernani নাটক কল্পনায় উচ্চ স্থান অধিকারের উপযুক্ত নহে, কিন্তু ফরাসী সাহিত্যে ইহা নূতন ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া এখনও পূজিত। আমি তাই বলি, মাতৃভাষার আদর না জানিলে, নিজ সমাজের সমাদর করিতে না শিখিলে, মিথ্যার মধ্যে সত্যের রূপ না দেখিতে পাইলে, সাহিত্য-সেবা বৃথা। আমাদের ভাষার আদর করা কি এতই কঠিন? যে ভাষায় মাকে আহ্বান করিতে শিখিয়াছি, তাহার যদি সম্মান করিতে না জানি, নরকেও আমাদের স্থান হইবে না। আজকাল মনে হয়, এ কথাটি আমরা বুঝিয়াছি। তবে দুটি কথা বলিতে পারি কি? নিজের মা থাকিতে পরের গৃহিণীকে মা বলিও না। আর নিজের মাকে বিদেশী জামা জোড়া পরাইও না। প্রথমটি স্বতঃসিদ্ধ, দ্বিতীয়টির অর্থ বুঝাইয়া দেওয়ার প্রয়োজন আছে কি?

এক স্থানে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বাঙ্গলার পায়ে এক সময় সোণার শৃঙ্খলে ভূষিত করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু আজকাল আমরা দেব দেবীর প্রতিমা জর্ম্মান ডাকের সাজে সাজাই, দেবীর পূজায় হোটেলের খানা দিয়া দেবের ভোগ দিই। আর্য্যসঙ্গীত হার্ম্মোনিয়ামের সাহায্য ভিন্ন চলে না। তেমনই ঘরের কথাগুলিকে বিদেশী-রূপ না দিলে আমাদের বিশ্বাস বাঙ্গালা ভাষায় তেজ হয় না। তাই আজকাল দেখি বর্ণসঙ্কর ও জারজ কথার ছড়াছড়ি। জিজ্ঞাসা, বাঙ্গালা লিখিয়া যদি তাহার পার্শ্বে ইংরেজি phraseএ, কি sentenceএ তাহার অর্থ বুঝাইয়া দিতে হয়, সেটা কি উচিত? বাঙ্গালীর ছেলেকে বাঙ্গালা লিখিয়া বুঝাইতে পারিলাম না, ইহা লজ্জার কথা। যে ইংরেজি ভাবটি (চৌর্য্যবৃত্তিলব্ধ) বাঙ্গালায় অনুবাদ করিতে হয়, করুন, কিন্তু এমন কথা প্রয়োগ করিয়া অনুবাদ করিবেন না, যাহার পাশাপাশি ইংরেজি কথাগুলি না বসাইয়া দিলে বোধগম্য হয় না। আজ কাল দেখিতে পাই, ইংরেজি এক আধটি কথা মাত্র নহে, সমগ্র পদ এবং sentence পর্য্যন্ত না বসাইয়া দিলে অর্থ-বোধ সঙ্কট। সংস্কৃত যে ভাষার মাতা তাহার অভাব কি? তবে সংস্কৃত সাহিত্য পড়ি না, জোর করিয়া শব্দ গড়াইতে বসি। ইংরেজি ভাব, সংস্কৃত ধাতু অবলম্বন করিয়া অনুবাদ করা সহজ নহে, কিন্তু, আমরা এ কথাটি যেন ভুলিয়া না যাই যে, শব্দ মাত্রেরই জীবনের ইতিহাস আছে। পৃথিবীতে যেমন Geological periods আছে, শব্দেরও সেইরূপ। মানুষের যেমন উন্নতি অবনতি আছে, শব্দেরও সেইরূপ। সুব্যবহারেই শব্দ গৌরবান্বিত, অসাধু প্রয়োগে তাহার অগৌরব। শব্দের প্রাণ পিঞ্জরাবদ্ধ করা কঠিন। সে একের নহে, কোটী প্রাণের ধন, অগণ্য কণ্ঠে উচ্চারিত। তবে যিনি মৃত কথার জীবন দান করিতে পারেন, কিম্বা নূতন কথা সৃজন করিতে পারেন, তিনি সঞ্জীবনী-মন্ত্রজ্ঞ ঋষিপুরুষ, তিনি দেবতুল্য। তবে আমরা নাকি সকলেই গঙ্গা-মৃত্তিকা লইয়া শিব গড়িতে বসিয়াছি, তাহাতেই মনে দ্বিধা উপস্থিত হয়। কি গড়িয়া তুলিতে গিয়া কি গড়িয়া বসি। ভাস্কর-হস্তে দেবমূর্ত্তি বিকশিত হয়। হাতুড়িপেটা কথা সহজে চলে না।

বাঙ্গালা সাহিত্য জটিল হইয়া পড়িতেছে। ইংরেজি না জানিলে অনেক সময় লেখকের মনের ভাব খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ইংরেজি ভাষা জারজ, Froude বলেন Mongrel, তাহার শব্দার্থে অনেক বৈচিত্র্য আছে। পরের ঘর হইতে মেয়ে আনিয়া নিজের ঘরের করিয়া লইতে সময় লাগে। অনেক সময় একেবারেই নিজের ঘরের হয় না। হৃদয়ে অনুরাগ না জন্মাইলে একপ্রাণ হইতে পারে না। ক্ষেত্রতত্ত্ব না বলিয়া জ্যামিতি বলা, রসায়ন-শাস্ত্রকে কিমিতিনিমিতি বলাতে পাগলামী আছে। জোর করিয়া Geometry ও Chemistryর জ্ঞাতিত্ব স্থাপন করা বিধেয় মনে করি না। কুল ভাণ্ডারীতে গৌরব নাই। এক সময় শিক্ষিত বাঙ্গালী-সম্প্রদায় নিজের নামেও বিদেশীয় রূপ দিয়াছিলেন, তাহা মনে করিলে হাসি পায়। হিন্দু দেবীর "কালী" নামের পরিবর্ত্তে collie স্কচ্ কুকুরের নামে আনন্দ বহন করিতে দেখা গিয়াছে। সেইরূপ নিজের দেশের কথাকেও বিলাতি চেহারা দেওয়া হেয় জ্ঞান করি। যাহারা নিজের হাট-বাজারে পরের জিনিষ লইয়া বেচা-কেনা করে তাহাদের পক্ষে ভাঁড়ানই প্রয়োজন। তবে সাহিত্য পণ্য-জগতের নহে, সাহিত্যের গৌরব যদি রক্ষা করিতে চাহ, বিলাতি সজ্জা দূর করিবার চেষ্টা কর; বুঝি কথার অভাব প'ড়ে ভাষাতে নূতন ভাব বিকাশের সহিত নূতন কথার প্রয়োজন। Franceএর Academy যেমন নূতন কথার উপর, কথার নূতন ব্যবহারের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে, আমাদিগের পরিষদের সেইরূপ কর্ত্তব্য। একবার বসিয়া বাঙ্গলার অভিধান ঝাড়িয়া বাছিয়া লওয়া প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। আর সহ্য করিতে পারি না, আধ আধ-ভাষা, সে ভাষা অপোগণ্ড শিশুর মুখে ভাল লাগিতে পারে, মানুষের মুখে নহে। আজকাল কবিতাতে এইরূপ কথার ছড়াছড়ি দেখিতে পাই—মুখানি, আলো, জোছনা, দিঠি, ইত্যাদি। নায়মাত্মা বল হীনেন লভ্য। চিরদিন কি আমরা সৌখীন কবিতা লিখিয়া সময় কাটাইব? তরু, লতা জাতিযূথি, সোনার আলা, সাঁজের বেলা, জোছনা রাতি, সবই অতি সুন্দর, কিন্তু এই সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে ক্লান্তি কি কখনও হয় না? স্বীকার করি, বাঙ্গালী কবি এই সৌখীন কাব্য-জগতে অদ্বিতীয়। বাঙ্গলা ভাষার মত মধুর ভাষা কাব্য-জগতে নাই, বাঙ্গালীর মুক্তার হার গাথা সহজ। তবে "জোছনা" দেখিতে দেখিতে মনে হয়, বলি, "আবার গগনে কেন সুধাংশু উদয় রে?" রাত

পায়ে ধরিয়া বলিতে ইচ্ছা করে, যদি চন্দ্র গ্রাস করিলেন, তবে অত সহজে তাহাকে ছাড়িবেন না। আমরা এই অবসরে গঙ্গা-স্নান করিয়া লই—আঁধারের মাহাত্ম্য একটু বুঝিয়া লই। মনে হয় না কি—মনে হয় না কি, কি কারণে "মহাকাব্য" লিখিতে বসিয়া বাঙ্গালী কবি লিখিতে পারিলেন না। তোড়-জোড়ের অভাব হয় নাই, তবে, বাঙ্গালী ঢাল-তলওয়ার লইয়া বেহাত হইয়া পড়েন। মাতৃদুগ্ধ-পিপাসু বালিকার হৃদয়ের দুলাল, দুধে আলতা দেওয়া সরস ভাষার পক্ষপাতী। আমাদের দেশেই রাইরাজা। আমাদের কবি শৈশব যৌবনের মিলনের সৌন্দর্য্য-বিমুগ্ধ, সন্ধিস্থলে মোহে মুগ্ধ হইয়া কত দিন যাপন করিবে? তোমার মদন-মনোহর বেশ ত্যাগ করিতে বলি না; বেশে তুমি অতি সুন্দর কবি, আমার বিশ্বাসে ত তুমি অন্য বেশেও সুন্দর। তোমার মত ধীশক্তি জগতে বিরল, তোমাতে অসাধারণ কল্পনার প্রতিভা আছে, তুমি সরস্বতীর বরপুত্র, তবে রতি মন্দিরে দিন যাপন করিও না। সহস্র নির্ঝর-প্রসূত মন্দাকিনী-বারিবিধৌত সাহিত্যের প্রাণ মহাসাগরে লীন হইয়া আছে। এই সাগর মন্থন করিবার শক্তি সাধনায় মেলে। আমি একস্থানে বলিয়াছি সত্য জগতে "অহং"-এর স্থান নাই। ইহাতে প্রকৃত আমার যাহা বলিবার ইচ্ছা তাহা পরিস্ফুট হয় নাই। সত্যে কাহারও বিশেষ অসম্মতি নাই। একজনের মনে সত্য আবিষ্কার হইতে পারে, কিন্তু সত্য আবিষ্কার হইবা-মাত্র সমগ্র জগতের ধন হইয়া যায়। সত্যে কোন ব্যক্তি কিংবা কোন সম্প্রদায়ের স্বতন্ত্র অধিকার নাই। সাহিত্য ও ধর্ম্ম, বহির্জগতের সহিত অন্তর্জগতের যে সম্বন্ধ আছে ভিন্নপথে তাহারই আবিষ্কারের চেষ্টা করিয়া থাকে, সেইজন্য কবি ও ঋষি সময়ে একই ছিলেন। Prophet, Poet, Vates and Seer অনেক ভাষাতেই একই নাম। সাহিত্য সেই জন্য "সাধনা"। সত্যের অবতারণাতেই সাহিত্যের সৌন্দর্য্য ও সাহিত্যের শক্তি।

জাতীয় জীবনের ইতিহাস ও সাহিত্যের ইতিহাস একই। এ জীবন পরিস্ফুট না হইলে সাহিত্যেও তেজ ও বল দেখা যায় না। মধ্যে মধ্যে বড় বড় লেখক জন্মাইতে পারে, কিন্তু যথার্থ যাহাকে সাহিত্য বলে তাহার জন্মগ্রহণ হয় না। ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের ইতিহাসে এই কথার সত্যতা সপ্রমাণ হয়, এবং এই দুই দেশের সাহিত্য দেখিলে দেখিতে পাইবেন যে জাতীয় ইতিহাস কতটা সাহিত্যের সহায়।

সুকুমার সাহিত্যে বাঙ্গালীর বিশেষ প্রতিপত্তি আছে। তবে সুকুমার সাহিত্যে যে "সাধনার" কথা আমি বলিলাম তাহার উপযোগী নয়। যেমন চন্দ্রালোক সুন্দর, প্রচণ্ড সূর্য্যালোকও সুন্দর। চন্দ্রালোকে পুষ্প প্রস্ফুটিত হইতে পারে, কিন্তু জীবনের উল্লাসের জন্য রৌদ্রতেজের প্রয়োজন।

আমি পূর্ব্বে একস্থানে বলিয়াছি যে জাতীয় ভাষার সাহায্য ভিন্ন জাতি কখন গঠিত হয় না। নিজের হৃদয়ে নিজের দেশের ভাষা ভিন্ন অন্য ভাষারই স্থান সঙ্কীর্ণ। সাহিত্যকে বিদেশী সাজে সাজাইলে কখনই সুন্দর হইতে পারে না। যেমন ভাষা জারজ হয়, সেই রকম বিভিন্ন ভাব মিশ্রণে ভাবের বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি হয়। Burns আপনারা সকলেই জানেন Scotlandএর মহাকবি, তিনি ইংরাজীতেও অল্পসল্প কিছু কবিতা লিখিয়াছিলেন, তাহার সবগুলিই প্রায় অপাঠ্য। French কবি Musset, Italianএ কবিতা লিখিয়াছিলেন, Heine Frenchএ, সেইগুলিও প্রায়ই অপাঠ্য। এ কথাটি বিশেষ করিয়া বলায় আমার উদ্দেশ্য আছে। বাঙ্গলায় বিদেশী ভাষার ছাঁদ আমার কাছে অত্যন্ত ঘৃণিত মনে হয়। আমি ইংরেজ-নবীশ সম্প্রদায়ের মধ্যে 'অমুকে আমার উপর ডাকিয়া-ছিলেন' অর্থাৎ আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন ইংরাজীতে (called on me)র অনুবাদে এ ভাষা কি নিতান্ত ঘৃণাজনক নয়? তাঁহারা আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন না বলিয়া আমাদের ডাকিয়াছেন বলিতে শুনিয়াছি অর্থাৎ (They have asked me) এইরূপ ভাষা সর্ব্বতোভাবে পরিহার্য্য, কিন্তু যাঁহারা এইরূপ ভাষা ব্যবহার করেন, তাঁহাদেরই এই দোষ দিই বা কি করিয়া? মাতৃদুগ্ধ পালিত শিশু ও Mellin's food প্রভৃতিপায়ী শিশুতে প্রভেদ আছে। শিক্ষার প্রথম অবস্থায় যদি বাঙ্গলা না শিখিয়া অন্য ভাষা শিখিবার জন্য আমরা সকলেই প্রাণপণ প্রয়াসী হই, তাহা হইলে শিখিবার শক্তি কত অপচয় হয়; আমাদের শিক্ষার এইটি মৌলিক দোষ। এই দোষ যত দিন পর্য্যন্ত রহিবে ততদিন বাঙ্গালীর জাতীয়তা লাভ করিবার আশা স্বল্পমাত্র। নিজের দেশের ভাষার অর্থ যতখানি

বুঝাইব পরের ভাষাতে তাহা বুঝাইতে পারা যায় না। বিমাতা মাতা হইয়াও মাতা নহে। সৌভাগ্যের বলে আমরা এখনও পর্য্যন্ত বিপিতা প্রাপ্ত হই নাই, তবে কপালে কি আছে বলিতে পারি না। কথার রূপ আছে। সেই রূপ সম্যক্ উপলব্ধি না হইলে তাহার উপযুক্ত ব্যবহার করা কঠিন ও তাহার প্রকৃত পরিচয় দেওয়া কঠিন। ইংরাজী শিক্ষার গুণে আমাদের মানসিক অনেক উপকার হইয়াছে তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। আমাদের সাহিত্যও বলীয়ান হইয়াছে তাহার কোন সন্দেহ নাই। তবে ইউরোপীয় সাহিত্য ইহুদীয় আদর্শ ও গ্রীক্ মনোবিজ্ঞানের আদর্শের উপর সংগঠিত। এই ইহুদীয় প্রভাবটুকু আমরা পাশ্চাত্য বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি। সেইখানেই যাহা কিছু সামঞ্জস্য আছে। বাইবেলের ভাষা ও ভাবে অনেক স্থলে আমাদের আর্য্য ঋষিদের ভাষা ও ভাবের আভাস দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ইউরোপীয় সাহিত্যের বৈচিত্র্যের কারণ বহুতর। তাহাদিগের সমাজ একেবারে স্বতন্ত্র। তবে মানুষের হৃদয়মাত্রই এক এবং সেই নিমিত্ত গীতিকাব্য প্রায় সব দেশেরই সমান। একজন ফ্রেঞ্চ মহাকবি বলিয়াছেন মানুষ ভিন্ন ভিন্ন ভাষা বলিয়া থাকে, কিন্তু অমর জগতের ভাষা একই। এ বিষয় উল্লেখ করিবার এই উদ্দেশ্য যে একভাষা হইতে অন্য ভাষায় অনুবাদ একপক্ষে উন্নতির কারণ হইতে পারে; তেমনই অপরপক্ষে সাহিত্যের প্রাণ যাহা তাহা ক্রমশঃ লোপ পায়; অর্থাৎ জাতীয় বিশেষত্ব ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া পড়ে। সেইজন্য সাহিত্যে আমি অনুবাদের বিশেষ পক্ষপাতী নহি। যতদিন হইতে ইংলাণ্ডে, Russian, কিম্বা Danish উপন্যাস অনুবাদ আরম্ভ হইয়াছে ততদিন হইতে ইংলণ্ডে কোন বিশেষ বড় নভেল প্রকাশিত হয় নাই। তাঁহাদিগের জীবনের বৈচিত্র্য এবং সকলে নিয়ত বিবিধ ব্যাপারে ব্যাপৃত থাকার দরুন আজকাল ইংলণ্ডে চিন্তার সময় কম হইয়া পড়িয়াছে। দেশ বিদেশের কথা এবং দেশ বিদেশের বিভিন্ন সমাজের প্রয়োজনোদ্ভূত নূতন উত্তেজনার প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। সাধারণ সাদাসিধা কথায় ও দৈনিক সামাজিক চিত্রে মনের উত্তেজনা পায় না বলিয়া বাহিরের উত্তেজনার জন্য মন ব্যাকুল হইয়া থাকে। তাহার জন্য আজকালকার ইংরাজী সাহিত্যে ইংরাজ-জাতীয় বিশেষত্ব দেখিতে পাওয়া যায় না। ফরাসী দেশের সাহিত্যের প্রথম উচ্ছ্বাসের সময় Les Chansons de geste এবং পরে Chante Fables এর দরুণ অর্থাৎ জাতীয়-গীতিকবিতার বলে সাধারণের মধ্যে সাহিত্য প্রচারিত হইয়া পড়ে। আমাদের দেশেরও সাহিত্যের প্রথম অবস্থায় মাণিকচাঁদের গীত প্রভৃতি, গম্ভীরা, চণ্ডী ইত্যাদির প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু আজকাল কিসের বলে সাহিত্য গড়িয়া তুলিবেন? বাঙ্গলার ইতিহাসের আলোচনা নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। এই ইতিহাস যদি উদ্ধার করিতে পারেন তাহা হইলে আমাদিগের সাহিত্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইবে, আমার বিশ্বাস। সেই জন্য আনন্দ ও উৎসাহের সহিত বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির কার্য্য এখানে উল্লেখ করিতেছি। যাঁহাদের যত্নে এবং চেষ্টায় এই সমিতি সংগঠিত হইয়াছে ও সংরক্ষিত হইতেছে তাঁহাদিগের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া উপসংহারে বাল্যবন্ধু দ্বিজেন্দ্রলালের কথা দুএকটী বলিতে চাই। তাঁহার বিয়োগে আমার মনে অত্যন্তই আঘাত লাগিয়াছে। অনেক বৎসর ধরিয়া আমরা একত্রে ছিলাম, চিরকাল তাঁহাকে আমার নিজের ভাইয়ের মত দেখিয়া অসিয়াছি এবং সেও আমাকে বড় ভাইয়ের মত শ্রদ্ধা করিত ও ভালবাসিত। অতি বাল্যকালে তাহার সুমধুর সংগীত শুনিয়াছি; তাহাও অদ্য মনে পড়িতেছে। সে যদি "আমার দেশে" ও "আমার জন্মভূমি" এই দুইটী গানমাত্র রচনা করিয়া রাখিয়া যাইত, তাহার কীর্ত্তি চিরদিন অক্ষয় রহিত। সে যেখানে গিয়াছে সেখানে অনেকের স্থান নাই, অনেকের স্থান কখন হবেও না। তাহার পার্শ্বে বসিবার আমাদের মধ্যে অনেকের স্থান হবে না। কিন্তু তাহার স্মৃতি চির দিন আদরের সহিত রক্ষা করিব। এই প্রার্থনা করি আমাদের ছেলে মেয়েরা,—সে যে চক্ষে নিজের দেশকে সুন্দর দেখিয়াছিল—তাহারাও যেন সেইরূপ সুন্দর দেখে এবং তাহারাও সেই দেশের ছেলে মেয়ে বলিয়া গৌরবান্বিত মনে করে। স্বর্গ হইতে হে দ্বিজেন্দ্র! তুমি তাহাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ করিও।

শ্রীআশুতোষ চৌধুরী।

স্বরলিপি।

কীর্ত্তন—একতালা।

বঁধু তুমি সে পরশমণি হে,
বঁধু তুমি সে পরশমণি।
ও অঙ্গ পরশে, এ অঙ্গ আমার,
সোণার বরণখানি।
তুমি রস-শিরোমণি হে,
বঁধু তুমি রস-শিরোমণি॥
তুঁহার লাগিয়া, ধাই বনে বনে,
সুবল বেশ ধরি হে।
এক তিলে শত যুগ, দরশনে মানি,
ছেড়ে কি রইতে পারি হে॥
অঙ্গের বরণ, কস্তুরী চন্দন,
হৃদয়ে মাখিয়ে রাখি।
ও দুটি চরণ, পরাণে ধরিয়া,
নয়ন মুদিয়া থাকি॥
চণ্ডীদাস কহে, শুন রসবতী,
তুহুঁ সে পিরীতি জান হে।
বঁধু সে তোমার, এক কলেবর,
দুহুঁ সে এক পরাণ হে॥

চণ্ডীদাস।

০ + ০ ৩ ০ ১
(নঃ নসঃ) । ধঃনঃ নসঃ । ধঃপঃ পধঃ । মঃ পঃ পঃ । মপধপঃ মগঃ গমঃ ॥
ব ধু০ তুমি সে০ প র শ০ ম ণি ০ হে০০০ ০ ০ বঁধু

+ ০ ৩ ০ ১ + ০ ০ ০ ৩ ০ ০০
নঃ নসঃ ধনঃ । ধঃ পঃ পধঃ । মঃ পঃ—ঃ । —ঃ—ঃ—ঃ ॥ ধসঃ সঃ সঃ । সঃ সঃ সর ঃ ।
তু মি০ সে০ প র শ০ ম ণি০ ০ ০ ০ ও০ অ ঙ্গ প র শে০

০ ০ ১ + ৩ ০ ১ ০ ধ
নঃ সঃ নঃ । নঃ নঃ নধপঃ ॥ পঃ পধনঃ নধপঃ । পঃ পঃ পমীঃ । পঃ ধঃ—ঃ । ধনঃ ধনসঃ নঃ । ।
এ অ ঙ্গ আ মা ০০ র্ সোণা০০ র০০ ব র ণ০ থা ০ ০ নি০ ০০০ ০

+ ৩ ০ ১ + ০
নঃ নঃ ধনঃ । ধঃ পঃ পঃ । মঃ পঃ পঃ । মপধপঃ মগঃ মঃ ॥ নঃ নসঃ ধনঃ ।
তু মি র০ স শিরো ম ণি ০ হে০০০ বঁ০ ধু তু মি০ র০

৩ ০ ১ ০
ধঃ পঃ পধঃ । মঃ প ঃ—ঃ ।—ঃ ন ঃ নস ঃ ॥ ॥
স শি রো০ ম ণি ০ ০ বঁ ধু০

+ ৩ ০ ১ + ৩
সঃ সঃ রঃ । রঃ রঃ গঃ । মঃ পঃ পঃ । পঃ পঃ মধপমগঃ ॥ মঃ পঃ পঃ । পঃ পঃ পমীঃ ।
তুঁ হা র লা গি য়া ধা ই ব নে ব নে০০০০ সু ব ল বে ০ শ০
অ ঙ্গে র ব র ণ ক স্তু রী চ ন্দ ন০০০০ হৃ দ য়ে মা খি য়ে০
চ ণ্ডী দা স ক হে শু ন র স ব তী০০০০ তু হুঁ সে পি রী তি০

০ ১ ০ + ০ ০ ০ ৩ ০ ০ ০ ০ ০ ১
পঃ ধঃ ধঃ । ধনঃ ধনসঃ ধনঃ ॥ সঃ সঃ সঃ । সঃ সঃ সরঃ । নঃ সঃ নঃ । নঃ নঃ নধপঃ ॥
ধ রি ০ হে০ ০০০ ০০ এক্ তি লে শ ত যুগ্ দ র শ নে মা নি০০
রা ০ ০ খি০ ০০০ ০০ ও দু টী চ র ণ০ প রা ণে ধ রি য়া০০
জা ০ ন হে০ ০০০ ০০ বঁ ধু সে তো মা ০ র্ এ ক ক লে ব র০০

+ ৩ ০ ১ ০ ধ
পঃ পধনঃ নধপঃ । পঃ পঃ পমীঃ । পঃ ধঃ ধঃ । ধনঃ ধনসঃ নঃ ॥॥
ছেড়ে০০ কি০০ র ই তে০ পা ০ রি হে০ ০০০ ০
ন য়০০ ন০০ মু দি য়া০ থা ০ ০ কি০ ০০০ ০
দু হুঁ০০ সে০০ এ ক প ০ ·রা ০ ণ হে০ ০০০ ০

শ্রীরজনীকান্ত রায় দস্তিদার, এম্, এ,

এম্, আর্, এস্, এ (লণ্ডন)

শ্রীমান্ প্রমথনাথ

শ্রীমান্ প্রমথনাথ সরকার।

পার্শ্বে যে বালকের প্রতিকৃতি প্রদত্ত হইল, তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিয়াছেন। ইনি নদীয়া জেলার অন্তর্গত কুমার-খালি গ্রামের পরলোকগত ডাক্তার শ্রীশচন্দ্র সরকার এম, বি মহাশয়ের পুত্র। ইহার জ্যেষ্ঠতাত শ্রীযুক্ত আশু-তোষ সরকার এম, এ, বি, এল মহাশয় সবজজ এবং ইঁহার জ্যেষ্ঠতাত ভ্রাতা শ্রীযুক্ত নলিনবিহারী সরকার বি, এ মহাশয় কলিকাতা হাইকোর্টের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ এটর্ণী। শ্রীমান্ প্রমথনাথ শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয়েরও ভ্রাতুষ্পুত্র। ইঁহার বয়স ১৬ বৎসর মাত্র; ইনি কলিকাতা মিত্র ইনষ্টিটিউশন হইতে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ভগবান্ এই প্রতিভাসম্পন্ন বালককে দীর্ঘজীবন ও সুখসৌভাগ্য দান করুন।
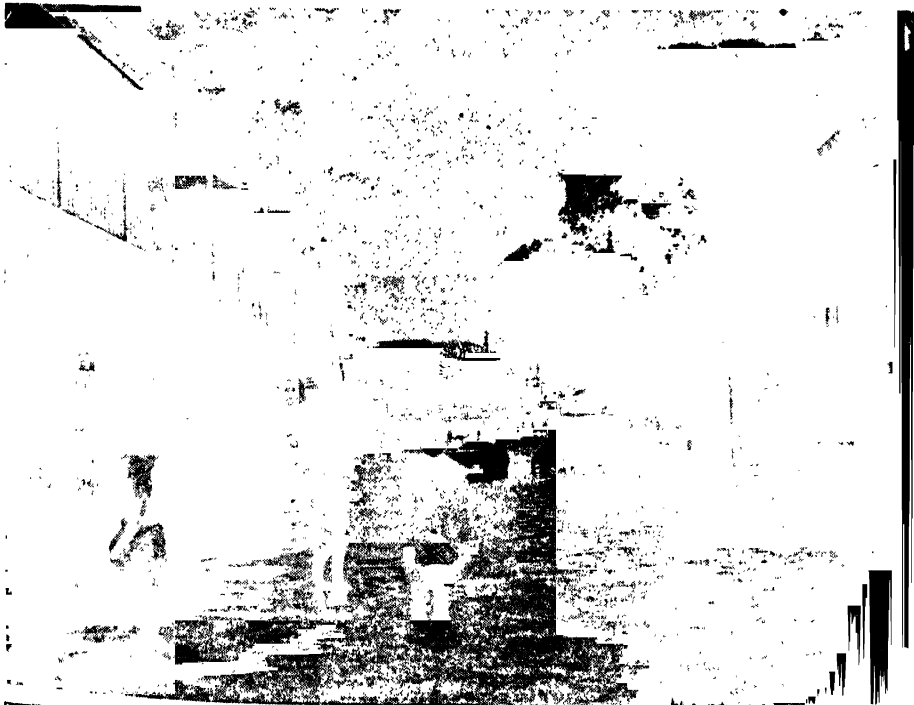
বর্ষায় কলিকাতার রাজপথ।

বর্ষাকালে কলিকাতার রাজপথের যে কি অবস্থা হয়, তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই অবগত আছেন। সামান্য একটু বৃষ্টি হইলেই এই মহানগরী জলে ডুবিয়া যায়। গত জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ ভাগে কএকদিন কলিকাতায় যে অবিশ্রান্ত বারি-বর্ষণ হইয়াছিল, তাহাতে কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের কালীতলার নিকট রাজ-পথের যে অবস্থা হইয়াছিল, আমরা পার্শ্বে তাহার এক-

পুন্নাগ শ্রেণী।

শ্রীযুক্ত অবনীনাথ মুখোপাধ্যায়ের আলোক-চিত্র হইতে

কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

'ভারতবর্ষের' সূচনায় স্বর্গীয় কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয় দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন "আমাদের শাসন কর্ত্তারা যদি বঙ্গসাহিত্যের আদর জানিতেন, তাহা হইলে বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র ও মাইকেল Peerage পাইতেন ও রবীন্দ্রনাথ Knight উপাধিতে ভূষিত হইতেন।" আজ যদি দ্বিজেন্দ্রলাল বাচিয়া থাকিতেন, তাহা হইলে সে দিন সিমলায় রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে রেভারেণ্ড মিঃ এনড্রুজ যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন এবং উক্ত সভার সভাপতি সর্ব্বজনমান্য ভারতের গভর্ণর জেনারেল লর্ড হার্ডিঞ্জ বাহাদুর যে "The Poet Laureate of Asia" বলিয়া রবীন্দ্রনাথের নামকরণ করিয়াছিলেন, তাহা শুনিয়া তিনি কত আনন্দ অনুভব করিতেন। আমাদের শাসন-কর্ত্তারা যে আমাদের দেশের সর্ব্বপ্রধান কবির গুণকীর্ত্তন করিয়াছেন, ইহা বাস্তবিকই আশার কথা।
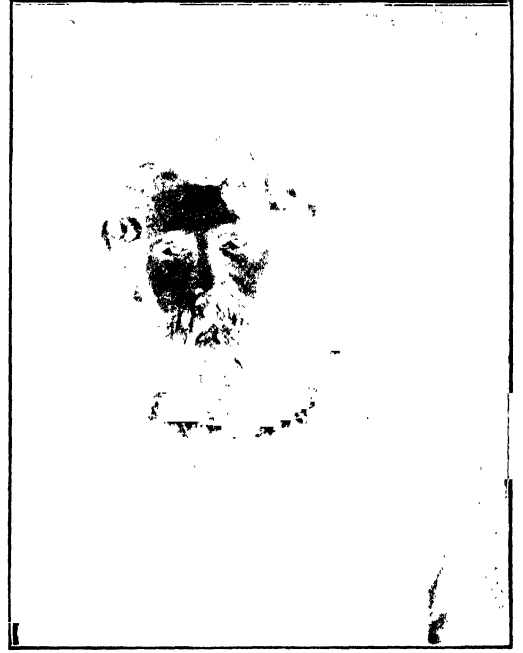
কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

আমরা অনেক চেষ্টা করিয়া ভারতগৌরব নটশেখর স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের একখানি মধ্যবয়সের ছবি সংগ্রহ করিয়াছি। তাহাই আমরা এই সংখ্যার 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত করিলাম।

নিবেদন ।

বড় আশা করিয়া 'ভারতবর্ষ' প্রচারে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলাম। যিনি আমাদিগকে এই কার্য্যে ব্রতী করিয়াছিলেন, যিনি রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া 'ভারতবর্ষের' সম্পাদন-ব্রতে নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, যাঁহার বলে বলীয়ান্ হইয়া, যাঁহার উৎসাহে উৎসাহিত হইয়াছিলাম, তিনি অকালে, এমন কি 'ভারতবর্ষের' প্রথম সংখ্যা মুদ্রিত হইবার পূর্ব্বেই, সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া শান্তিদায়িনী সর্ব্বমঙ্গলার ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। আমরা সত্য সত্যই অকূল সাগরে পড়িলাম। 'ভারতবর্ষ'কে যে-ভাবে সম্পাদন করিবার তাঁহার ইচ্ছা ছিল, তাঁহার অভাবে আমরা তাহার কতদূর কি করিতে পারিয়াছি, সহৃদয় পাঠকগণ ও বাঙ্গালী-সমাজ তাহার বিচার করিবেন। আমরা কেবল এইটুকু বলিতে পারি যে, হঠাৎ কর্ণধারের অভাব হইলেও আমরা যথাশক্তি যত্ন, চেষ্টা ও অর্থব্যয় করিয়া তরী ঘাটে লাগাইয়াছি। এ অবস্থায় যে আমাদের অনেক ক্রটী হইয়াছে, তাহা আমরাও বুঝিতে পারিতেছি। কিন্তু কি করিব, উপায় নাই। তবে, আমাদের আশা আছে, আমরা অতি সত্বরই পরলোকগত সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ের ইচ্ছানুরূপ ব্যবস্থা করিতে সমর্থ হইব। পাঠক পাঠিকাগণের অনুগ্রহ লাভ করিতে পারিলে আমরা 'ভারতবর্ষকে' সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিতে পারিব।

বর্ত্তমান সংখ্যায় আমরা স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ের "ভারতবর্ষ" শীর্ষক গীতি-কবিতার স্বরলিপি প্রকাশ করিতে চাহিয়াছিলাম, কিন্তু অপ্রতিবিধেয় কারণে এবারে তাহা দিতে পারিলাম না।

তাহার পর প্রতি সংখ্যায় ১৫ ফর্ম্মা—১২০ পৃষ্ঠা দিতে প্রতিশ্রুত ছিলাম; কিন্তু সহৃদয় ও শুভানুধ্যায়ী লেখকগণের অনুকম্পায় আমরা এত প্রবন্ধ পাইয়াছি যে, এবার ১৯ ফর্ম্মা অর্থাৎ চারি ফর্ম্মা অতিরিক্ত দিয়াও অনেক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের স্থান করিতে পারিলাম না; লেখক মহোদয়গণ আমাদিগের এই ক্রটী মার্জ্জনা করিবেন।

মাননীয় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সুচিন্তিত ও সুলিখিত প্রবন্ধ বিলম্বে হস্তগত হওয়ায় আমরা বর্ত্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত করিতে পারিলাম না। আমরা আগামী সংখ্যায় তাঁহার প্রবন্ধ এবং তাঁহার চিত্র প্রকাশিত করিব।

'বুদ্ধগয়া' শীর্ষক প্রবন্ধে যে সমস্ত চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে, কলিকাতার প্রসিদ্ধ ফটোগ্রাফার মেসার্স জনষ্টন হফম্যান কোম্পানী সেই চিত্রের কএকখানি প্রকাশিত করিবার অনুমতি প্রদান করিয়া আমাদিগের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। অন্যান্য লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিত্রশিল্পীও আমাদিগকে নানাপ্রকারে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

পরিশেষে সহৃদয় গ্রাহক ও পাঠকগণের নিকট আমাদের পুনরায় নিবেদন এই যে, তাঁহারা আমাদের অতর্কিত বিপদের কথা চিন্তা করিয়া বর্ত্তমান সংখ্যায় যে সমস্ত ক্রটী আছে, তাহা মার্জ্জনা করিবেন।

প্রকাশক।

২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে শ্রীসুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও
২০৩।১।১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট "প্যারাগন প্রেস" হইতে
শ্রীগোপালচন্দ্র রায় দ্বারা মুদ্রিত।

ঘাটে

"সজনি ও ধনী কে কহ বাটে।
গোরোচনা গোরী নবীন কিশোরী
নাহিতে দেখিনু ঘাটে ॥"———চণ্ডীদাস।

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ সরকার অঙ্কিত।

K. v. Seyne : Bros
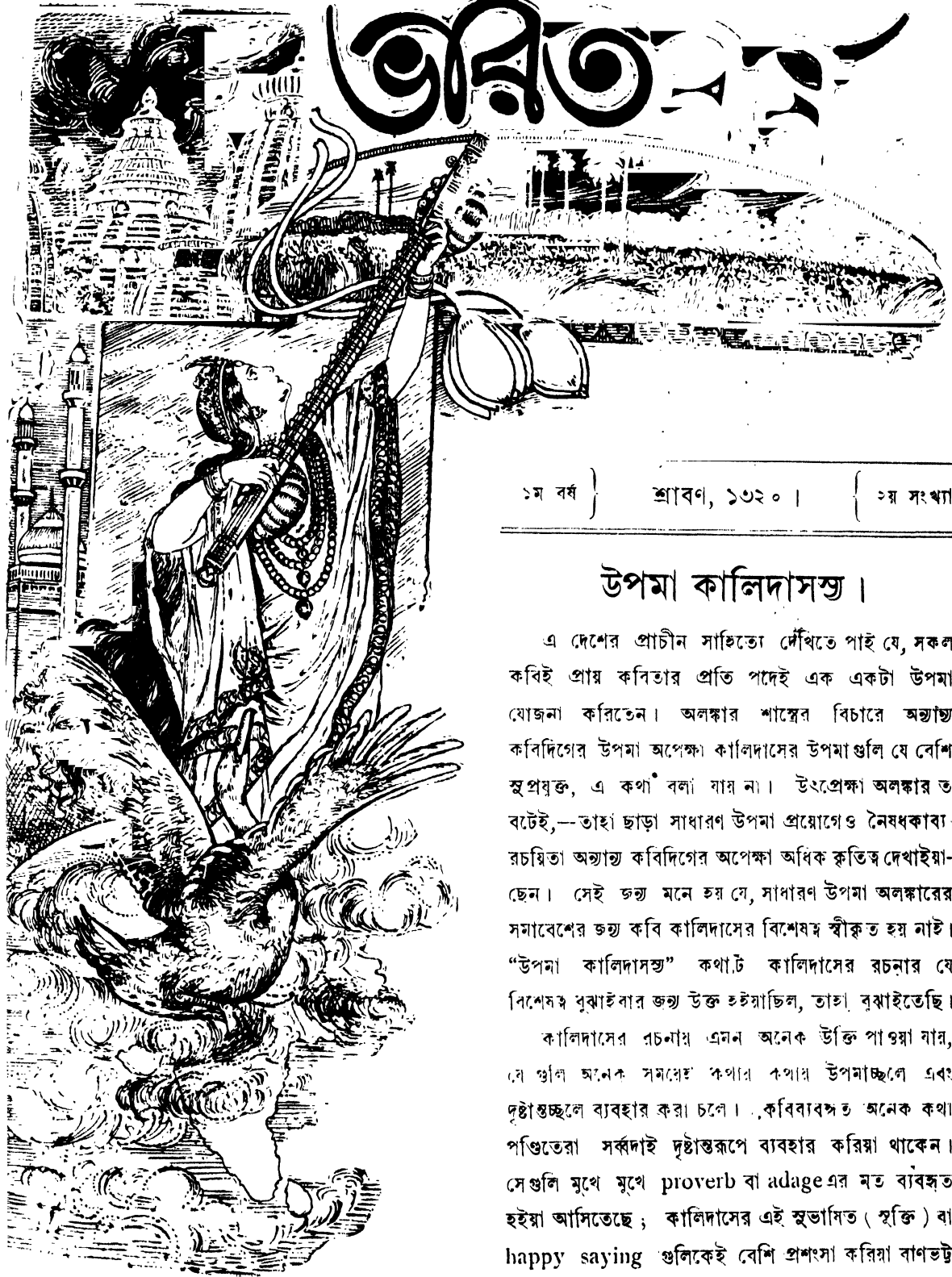
১ম বর্ষ | শ্রাবণ, ১৩২০ । | ২য় সংখ্যা

উপমা কালিদাসস্য ।

এ দেশের প্রাচীন সাহিত্যে দেখিতে পাই যে, সকল কবিই প্রায় কবিতার প্রতি পদেই এক একটা উপমা যোজনা করিতেন। অলঙ্কার শাস্ত্রের বিচারে অন্যান্য কবিদিগের উপমা অপেক্ষা কালিদাসের উপমাগুলি যে বেশি সুপ্রযুক্ত, এ কথা বলা যায় না। উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার ত বটেই,—তাহা ছাড়া সাধারণ উপমা প্রয়োগেও নৈষধকাব্য রচয়িতা অন্যান্য কবিদিগের অপেক্ষা অধিক কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। সেই জন্য মনে হয় যে, সাধারণ উপমা অলঙ্কারের সমাবেশের জন্য কবি কালিদাসের বিশেষত্ব স্বীকৃত হয় নাই। "উপমা কালিদাসস্য" কথাটি কালিদাসের রচনার যে বিশেষত্ব বুঝাইবার জন্য উক্ত হইয়াছিল, তাহা বুঝাইতেছি।

কালিদাসের রচনায় এমন অনেক উক্তি পাওয়া যায়, যে গুলি অনেক সময়েই কথায় কথায় উপমাচ্ছলে এবং দৃষ্টান্তচ্ছলে ব্যবহার করা চলে। কবিব্যবহৃত অনেক কথা পণ্ডিতেরা সর্ব্বদাই দৃষ্টান্তরূপে ব্যবহার করিয়া থাকেন। সেগুলি মুখে মুখে proverb বা adage এর মত ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে; কালিদাসের এই সুভাষিত (সূক্তি) বা happy saying গুলিকেই বেশি প্রশংসা করিয়া বাণভট্ট "হর্ষচরিতে"র প্রারম্ভে কবির নাম করিয়াছেন।

নির্গতাসু ন বা কস্য কালিদাসস্য সূক্তিষু।
প্রীতির্মধুরসান্দ্রাসু মঞ্জরীষ্বিব জায়তে॥

কবিরচিত নাটকগুলি অপেক্ষা অন্যান্য কাব্যে এই সূক্তি অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। এই সূক্তি বা দৃষ্টান্ত-সম্বলিত কবিতাগুলি অপেক্ষা যে কবিতাগুলি কাব্যাংশে অধিক উৎকৃষ্ট এবং মনোজ্ঞ, সেগুলি familiar quotation রূপে প্রচলিত হইলেও ঠিক দৃষ্টান্তরূপে ব্যবহৃত হয় না। "শকুন্তলা"র পঞ্চম অঙ্কের "রম্যাণি বীক্ষ্য" প্রভৃতি অতি মনোহর কবিতাটি কিংবা চতুর্থ অঙ্কের "যাস্যত্যদ্য শকুন্তলেতি" প্রভৃতি প্রাণস্পর্শী রচনাটি পণ্ডিতদিগের কণ্ঠস্থ থাকিলেও কথায় কথায় দৃষ্টান্ত দিবার সময় "আ পরিতোষাদ্বিদুষাং" প্রভৃতি, অথবা "সতাং হি সন্দেহপদেষু বস্তুষু" প্রভৃতি উল্লিখিত হইয়া থাকে। একটা সত্যবাণীর মত গৃহীত না হইলেও, "স্ত্রীণামশিক্ষিতপটুত্বমমানুষীষু" প্রভৃতি উদাহৃত হইয়া থাকে। আমি কোন্ শ্রেণীর দৃষ্টান্ত বা উপমাগুলির প্রতি লক্ষ্য করিতেছি, তাহা এই উদাহরণ হইতেই পাঠকেরা অনেকাংশে বুঝিতে পারিতেছেন।

কালিদাসের সূক্তিমালা সংগ্রহ স্বরূপে কবিবিরচিত ভিন্ন ভিন্ন কাব্য হইতে পাঠকদিগকে "উপমা কালিদাসস্য" উপহার দিতেছি, এই দৃষ্টান্তের সংখ্যা "মেঘদূতে" ১৬টি, "শকুন্তলা"য় ৮টি, "মালবিকাগ্নিমিত্রে" ৩টি, "বিক্রমোর্ব্বশী"তে ৩টি "কুমার-সম্ভবে" ২৭টি এবং "রঘুবংশে" ৩৬টি। এই সকল দৃষ্টান্ত পাঠকদিগের নিকট তৃপ্তিপ্রদ হইবে, আশা করা যায়।

মেঘদূত (পূর্ব্বমেঘ)

(১) কামার্ত্তা হি প্রকৃতিকৃপণাশ্চেতনা চেতনেষু। ৫

অনুবাদ—বোঝেনা প্রেমে আতুর নর, কেবা চেতন, অচেতন।

(২) যাচ্ঞা মোঘা বরমধিগুণে নাধমে লব্ধকামা। ৬

অনুবাদ—অধম জনে তুষিয়া নাহি পূরাতে চাই কামনা;
লজ্জা নাহি মহৎপদে ব্যর্থ হলে যাচ্না।

(৩) আশাবন্ধঃ কুসুমসদৃশং প্রায়শো হ্যঙ্গনানাং
সদ্যঃ পাতি প্রণয়িহৃদয়ং বিপ্রয়োগে রুণদ্ধি॥ ১০

অনুবাদ—বোঁটার গায়ে ফুলের মত, আশায় বাঁধে অবলা বুক, নহিলে গুরু-বিরহে ঝরি পড়িত তার পরাণটুক্।

(৪) রিক্তসর্বো ভবতি হি লঘুঃ পূর্ণতা গৌরবায়। ২০

অনুবাদ—রহিলে পূর্ণ, গৌরব বাড়ে; সারহীন জন লঘু।

(৫) স্ত্রীণামাদ্যং প্রণয়বচনং বিভ্রমো হি প্রিয়েষু। ২৯

অনুবাদ—প্রেমসম্ভাষণ হয় কামিনীর হাবভাবে ঠারেঠোরে।

(৬) আপন্নার্ত্তিপ্রশমনফলাঃ সম্পদো হ্যুত্তমানাং। ৫৭।

অনুবাদ—বিপন্নের দুঃখ নাশি, লভে ধনী সম্পদে সফলতা।

(৭) কে বা ন স্যুঃ পরিভবপদং নিষ্ফলারম্ভযত্নাঃ। ৫৮।

অনুবাদ—দুরাশায় যদি করে আস্ফালন, অপমান হাতে হাতে।

মেঘদূত (উত্তর মেঘ)

(৮) বিত্তেশানাং ন চ খলু বয়ো যৌবনাদন্যদস্তি। ৪

অনুবাদ—ধনেশের কুলে, বয়সে সবাই তরুণ-তরুণী সদা।

(৯) প্রাচীমূলে তনুমিব কলামাত্র শেষাং হিমাংশোঃ। ২৮

অনুবাদ—ইন্দুর শেষ কলাটুকু যেন প্রাচীপানে চেয়ে আছে।

(১০) প্রায়ঃ সর্বো ভবতি করুণাবৃত্তিরার্দ্রান্তরাত্মা। ৩২

অনুবাদ—আর্দ্র যাদের অন্তর, করুণায় তারা যায় গ'লে।

(১১) নীচৈর্গচ্ছত্যুপরি চ দশা চক্রনেমিক্রমেণ। ৪৮

অনুবাদ—চক্রনেমিতে ঘোরে দুঃখ সুখ, চির তরে দুঃখ রহে না।

(১২) স্নেহা নাহুঃ কিমপি বিরহে ধ্বংসিনস্তে ত্বভোগা
দিষ্টে বস্তুন্যুপচিতরসাঃ প্রেমরাশো ভবন্তি। ৫১

অনুবাদ—বিরহে স্নেহের নাহি হয় নাশ, বাড়ে সে বিরহ নাশি;
প্রিয়ের চিন্তায় অভুক্ত বাসনা হয় নব প্রেমরাশি।

(১৩) প্রত্যুক্তং হি প্রণয়িষু সতামীপ্সিতার্থক্রিয়ৈব। ৫৩

অনুবাদ—না করি প্রতিজ্ঞা অভীষ্ট সাধন, এই ত সুজন প্রথা।

এগুলি ছাড়াও পদ্যাংশে দৃষ্টান্ত-যোগ্য সূক্তি আছে; তাহা আর উদ্ধৃত করিলাম না।

শকুন্তলা।

(১) আ পরিতোষাদ্বিদুষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগবিজ্ঞানং।
বলবদপি শিক্ষিতানা মাত্মন্যপ্রত্যয়ং চেতঃ॥

অনুবাদ—অভিনয়ে তৃপ্ত যদি হন সুধীগণ,
নিপুণতা তবে মোর বুঝিব তখন।

যদিও বা হয় কেহ অতি সুশিক্ষিত,
তবু নহে চিত্ত তার সংশয় রহিত।

(২) দূরীকৃতাঃ খলু গুণৈরুদ্যানলতা বনলতাভিঃ।

অনুবাদ—বনলতার কাছে উদ্যানলতা হার মানিল।

(৩) কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্।

অনুবাদ—যাহার আকৃতি মধুর, সে যাহা পরে, তাহাই তাহার ভূষণ হয়।

(৪) সতাং হি সন্দেহপদেষু বস্তুষু
প্রমাণমন্তঃ করণপ্রবৃত্তয়ঃ।

অনুবাদ—সাধুদিগের সন্দেহভঞ্জনের নিমিত্ত নিজের চিত্তবৃত্তির নির্দ্দেশই যথেষ্ট।

(৫) ভবন্তি নম্রাস্তরবঃ ফলাগমৈর্
নবাম্বুভির্দূরবিলম্বিনো ঘনাঃ।
অনুদ্ধতাঃ সৎপুরুষাঃ সমৃদ্ধিভিঃ
স্বভাব এবৈষ পরোপকারিণাম্॥

অনুবাদ—ফলভরে তরুশাখা অবনত,
সজল জলদ নহে উর্দ্ধগত ;
সাধুজন সদা সম্পদে বিনীত,
হিতৈষী জনের এ হিত চরিত।

(৬) ন চ খলু পরিভোক্তুং নৈব শক্নোমি হাতুম্।

অনুবাদ—না পারি ভুঞ্জিতে কিংবা না পারি ত্যজিতে।

(৭) স্ত্রীণামশিক্ষিতপটুত্বমমানুষীষু
সংদৃশ্যতে কিমুত যাঃ প্রতিবোধবত্যঃ।
প্রাগন্তরিক্ষগমনাৎ স্বমপত্যজাতং
অন্যৈর্দ্বিজৈঃ পরভৃতাঃ খলু পোষয়ন্তি॥

অনুবাদ—স্বতঃ জাত প্রবঞ্চনা জানি রমণীর,
না শিখিয়া জানে তারা অশেষ সন্ধান ;
সাক্ষী পিকবধূ,—কিবা কথা মানুষীর,
অন্যের কুলায়ে পালে আপন সন্তান।

(৮) ছায়া ন মূর্চ্ছতি মলোপহত প্রসাদে
শুদ্ধে তু দর্পণতলে সুলভাবকাশা।

অনুবাদ—ছায়ারোধী মলিনতা অপগত হলে।
পড়ে যথা প্রতিবিম্ব দর্পণের তলে ;

মালবিকাগ্নিমিত্র।

(১) পুরাণমিত্যেব ন সাধু সর্ব্বং
ন চাপি কাব্যং নবমিত্যবদ্যং।
সন্তঃ পরীক্ষ্যান্যতরদ্ভজন্তে
মূঢ়ঃ পরপ্রত্যয়নেয় বুদ্ধিঃ॥

অনুবাদ—যাহা কিছু পুরাতন, নহে ভাল কদাচন ;
নব্য বলি কাব্য কিছু দোষযুত হয় না।
হলে কাব্য পরীক্ষিত, হয় সুধী সমাদৃত ;
মূঢ় জন পরবুদ্ধি করে অনুধাবনা।

[এই শ্লোকের শেষ ছত্রটিই স্বতন্ত্রভাবে দৃষ্টান্তে অধিক ব্যবহৃত।]

(২) ইষ্টাধিগমনিমিত্তং প্রয়োগম্ একান্ত সাধুমপি মত্বা।
সন্দিগ্ধমেব সিদ্ধৌ কাতরম্ আশঙ্কতে চেতঃ॥

অনুবাদ—অভীষ্ট বিষয় পাইবার জন্য প্রযুক্ত উপায় একান্ত সাধ্য হইলেও, তাহা দ্বারা কার্য্যসিদ্ধি হইবে কি না সন্দেহ করিয়া মন ব্যাকুল হইয়া আশঙ্কা করে।

(৩) ন হি বুদ্ধিগুণেনৈব সুহৃদাম্ অর্থদর্শনম্।
কার্য্যসিদ্ধিপথঃ সূক্ষ্মঃ স্নেহেনাপ্যুপলভ্যতে॥

অনুবাদ—সুহৃদ্‌গণের বুদ্ধিগুণেই কেবল অর্থ দর্শন হয় না ; স্নেহ দ্বারাও কার্য্যসিদ্ধির অভাবনীয় পন্থা উপলব্ধ হইয়া থাকে।

বিক্রমোর্ব্বশী।

(১) তপ্তেন তপ্তময়সা ঘটনায় যোগ্যম্।

অনুবাদ—তপ্ত লোহের সহিত তপ্ত লোহ যোজনা করা সহজ।

(২) বিঘ্নিতসমাগমসুখো মনসিশয়ঃ শতগুণী ভবতি।

অনুবাদ—মিলন পথের বিঘ্ন মনের আবেগকে শতগুণে বর্দ্ধিত করে।

(৩) স্বার্থাৎ সতাং গুরুতরা প্রণয়িক্রিয়ৈব।

অনুবাদ—সাধুদিগের কাছে স্বার্থ সাধন অপেক্ষা প্রণয়িজনের উপকার করা গুরুতর কার্য্য।

কুমারসম্ভব।

(১) একো হি দোষো গুণসন্নিপাতে
নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেষ্বিবাঙ্কঃ। ১.৩

অনুবাদ—নিমজ্জিত ক্ষুদ্র দোষ গুণের ভিতর,
চন্দ্রের কলঙ্ক যথা কিরণে বিলীন।

(২) ক্ষুদ্রেঽপি নূনং শরণং প্রপন্নে
মমত্বমুচ্চৈঃ শিরসাং সতীব। ১-১২

অনুবাদ—হইলেও ক্ষুদ্র অতি, আশ্রিতের তরে
উন্নত সজ্জন চিত্ত মমত্ব অপার।

(৩) সম্যক্ প্রয়োগাদ্ পরিরক্ষিতায়াং
নীতাবিবোৎসাহগুণেন সম্পৎ॥ ১-২২

অনুবাদ—নীতি সম্যক্ উপায়ে প্রযুক্ত হইলে, উৎসাহবলে
সম্পৎ উৎপন্ন করে।

(৪) বিকারহেতৌ সতি বিক্রিয়ন্তে
যেষাং ন চেতাংসি ত এব ধীরাঃ॥ ১-৫৯

অনুবাদ—বিকারের কারণ থাকিলেও যাহাদের চিত্তবিকার
হয় না, তাহারাই ধীর।

(৫) মন্ত্রেণ হতবীর্য্যস্য ফণিনো দৈন্যমাশ্রিতঃ। ২-২১

অনুবাদ—মন্ত্রবলে হতবীর্য্য হইয়া সর্পেরা দীনতা প্রাপ্ত হয়।

(৬) উপপ্লবায় লোকানাং ধূমকেতুরিবোত্থিত। ২-৩২

অনুবাদ—লোক বিনাশের জন্য ধূমকেতুর ন্যায় উত্থিত।

(৭) শাম্যেৎ প্রত্যপকারেণ নোপকারেণ দুর্জ্জনঃ। ২-৪০

অনুবাদ—দুর্জ্জনকে নিবৃত্ত করিতে হইলে তাহার উপকার
করিলে ফল নাই; অপকার করিলে কার্য্যসিদ্ধি
হয়।

(৮) বীর্য্যবন্ত্যৌষধানীব বিকারে সান্নিপাতিকে। ২-৪৮

অনুবাদ—সান্নিপাতিক বিকারে বীর্য্যবান্ ঔষধও ব্যর্থ হয়।

(৯) বিষবৃক্ষোঽপি সংবর্দ্ধ্য স্বয়ং ছেত্তুমসাম্প্রতম্। ২-৫৫

অনুবাদ—বিষবৃক্ষটি সংবর্দ্ধন করিলেও নিজে তাহা ছেদন
করিতে নাই।

(১০) প্রয়োজনাপেক্ষিতয়া প্রভূণাং
প্রায়শ্চলং গৌরবমাশ্রিতেষু। ৩-১

অনুবাদ—প্রভুদিগের প্রয়োজন সিদ্ধির জন্যই আশ্রিতেরা
আদর প্রাপ্ত হয়েন।

(১১) প্রায়েণ সামগ্র্যবিধৌ গুণানাং
পরাঙ্মুখী বিশ্বসৃজঃ প্রবৃত্তিঃ॥ ৩-২৮

অনুবাদ—সৃষ্ট পদার্থগুলিকে প্রায়শঃ বিধাতা নিখুঁত করেন
না।

(১২) চিত্রার্পিতারম্ভমিবাবতস্থে। ৩-৪২

অনুবাদ—সমস্তই চিত্রার্পিত আরম্ভের মত অবস্থিত হইল।

(১৩) নিবাতনিষ্কম্পমিব প্রদীপঃ। ৩-৪৮

অনুবাদের প্রয়োজন নাই।

(১৪) পতঙ্গবদ্বহ্নিমুখং বিবিক্ষুঃ। ৩-৬৪

অনুবাদের প্রয়োজন নাই।

(১৫) তদধীনং খলু দেহিনাং সুখম্। ৪-১০

অনুবাদের প্রয়োজন নাই।

(১৬) প্রিয়েষু সৌভাগ্যফলা হি চারুতা। ৫-১

অনুবাদ—ভালবাসার পাত্র যদি ভালবাসেন, তবেই
স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য্য সফলতা লাভ করে।

(১৭) ভবন্তি সাম্যেঽপি নিবিষ্টচেতসাং
বপুর্বিশেষেষ্বতিগৌরবাঃ ক্রিয়াঃ॥ ৫-৩১

অনুবাদ—গভীর চিন্তাশীলেরা, সাধারণ সমতার নিয়ম সত্ত্বেও
ব্যক্তি বিশেষের প্রতি বিশেষ আদর প্রদর্শন
করিয়া থাকেন।

(১৮) শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনং। ৫-৩৩

(১৯) ন রত্নমন্বিষ্যতি মৃগ্যতে হি তৎ। ৫-৪৫

অনুবাদ—রত্ন কাহাকেও খোঁজে না; সকলেই রত্নকে
খোঁজে।

(২০) মনোরথা নাম গতি র্ন বিদ্যতে। ৫-৬৪

অনুবাদ—মনোরথের সর্ব্বত্রই গতি।

(২১) অলোকসামান্যমচিন্ত্যহেতুকং
দ্বিষন্তি মন্দাশ্চরিতং মহাত্মনাম্। ৫-৭৫

অনুবাদ—মূঢ়েরা না বুঝিয়া মহাত্মাদের অসাধারণ চরিত্রে
দোষ দিয়া থাকে।

(২২) ন কামবৃত্তির্বচনীয়মীক্ষতে। ৫-৮২

অনুবাদ—স্বেচ্ছাচারীরা অপবাদের দিকে তাকায় না।

(২৩) শৈলাধিরাজতনয়া ন যযৌ ন তস্থৌ। ৫-৮৫

(২৪) ক্লেশঃ ফলেন হি পুনর্নবতাং বিধত্তে। ৫-৮৬

অনুবাদ—ফল লাভের পর অর্জ্জনের ক্লেশ আর থাকে না।

(২৫) স্ত্রী পুমানিত্যনাস্থৈষা বৃত্তং হি মহিতং সতাং। ৬-১২

অনুবাদ—স্ত্রী পুরুষ অভেদে সকল সাধুই পূজিত হয়েন।

(২৬) প্রায়েণৈবং বিধে কার্য্যে পুরন্ধ্রীণাং প্রগল্‌ভতা। ৬ ৩২

অনুবাদ—এইরূপ কার্য্যে (পারিবারিক অনুষ্ঠানে) স্ত্রীদিগেরই প্রভাব দৃষ্ট হয়।

(২৭) স্ত্রীণাং প্রিয়ালোকফলো হি বেষঃ। ৭ ২২

অনুবাদ—স্ত্রীদিগের বেশ-রচনা প্রিয়দর্শনেই সফল হয়।

রঘুবংশ।

(১) তিতীর্ষুর্দুস্তরং মোহাদুড়ুপেনাস্মি সাগরম্। ১-২

অনুবাদ—মোহবশে ভেলায় দুস্তর সাগর পার হইতে চাহিতেছি।

(২) হেম্নঃ সংলক্ষ্যতে হ্যগ্নৌ বিশুদ্ধিঃ শ্যামিকাপি বা। ১-১০

অনুবাদ—স্বর্ণের বিশুদ্ধি বা মলিনতা অগ্নিতেই পরীক্ষিত হয়।

(৩) অধৃষ্যশ্চাভিগম্যশ্চ যাদোরত্নৈরিবার্ণবঃ। ১-১৬

অনুবাদ—সাগর জলজন্তুর জন্য অগম্য; অথচ রত্নের জন্য গম্য হয়।

(৪) সহস্রগুণমুৎস্রষ্টুমাদত্তে হি রসং রবিঃ। ১-১৮

অনুবাদ—সহস্রগুণ জল দিবার জন্য সূর্য্য পৃথিবীর রস আকর্ষণ করেন।

(৫) বৃদ্ধত্বং জরসা বিনা। ১-২৩

(৬) ত্যাজ্যো দুষ্টঃ প্রিয়োঽপ্যাসীদঙ্গুলীবোরগক্ষতা। ১-২৮

অনুবাদ—দুষ্ট ব্যক্তি প্রিয় হইলেও সর্পদষ্ট অঙ্গুলির মত পরিত্যক্ত হইত।

(৭) হিমনির্মুক্তয়োর্যোগে চিত্রাচন্দ্রমসোরিব। ১-৪৬

অনুবাদ—হিম ঋতুর পরে চিত্রা এবং চন্দ্রের যোগের মত।

(৮) সন্ততিঃ শুদ্ধবংশ্যা হি পরত্রেহ চ শর্ম্মণে। ১-৬৯

অনুবাদ—সদ্বংশজাত সন্তান উভয় লোকের কল্যাণকর।

(৯) সুপ্তমীন ইব হ্রদঃ। ১-৭৩

(১০) প্রতিবধ্নাতি হি শ্রেয়ঃ পূজ্যপূজাব্যতিক্রমঃ। ১-৭৯

অনুবাদ—পূজ্য জনের পূজার ব্যতিক্রমে শ্রেয়োলাভে বিঘ্ন হয়।

(১১) প্রাসাদচিহ্নানি পুরঃ ফলানি। ২.২২

অনুবাদ—অনুগ্রহের চিহ্নই ফলপ্রাপ্তির পূর্ব্বনিদর্শন।

(১২) শস্ত্রেণ রক্ষ্যং যদশক্যরক্ষং
ন তদ্ যশঃ শস্ত্রভৃতাং ক্ষিণোতি॥ ২-৪০

অনুবাদ—আশ্রিতকে শস্ত্রদ্বারা রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া উঠিলে, শস্ত্রধারীর যশের হানি হয় না।

(১৩) অল্পস্য হেতোর্বহু হাতুমিচ্ছন্
বিচারমূঢ়ঃ প্রতিভাসি মে ত্বং। ২-৪৭

অনুবাদ—অল্পের জন্য বহু পরিত্যাগ আমার মতে বিচার-মূঢ়তা।

(১৪) ক্ষতাৎ কিল ত্রায়ত ইত্যুদগ্রঃ
ক্ষত্রস্য শব্দো ভুবনেষু রূঢ়ঃ। ২-৫৩

(১৫) একান্তবিধ্বংসিষু মদ্বিধানাং
পিণ্ডেষ্বনাস্থা খলু ভৌতিকেষু। ২-৫৭

অনুবাদ—এইরূপ ধ্বংসশীল শরীরপিণ্ডে আমাদের আস্থা নাই।

(১৬) সম্বন্ধমাভাষণপূর্ব্বমাহুঃ। ২-৫৮

অনুবাদ—সম্ভাষণ হইলেই সম্বন্ধ জন্মিল।

(১৭) ক্রিয়া হি বস্তূপহিতা প্রসীদতি। ৩-২৯

অনুবাদ—উপযুক্ত পাত্রে প্রযুক্ত হইলেই কার্য্যে সুফল হয়।

(১৮) পদং হি সর্ব্বত্র গুণৈর্নিধীয়তে। ৩-৬২

অনুবাদ—সর্ব্বত্রই গুণের ফলে সম্মান হইয়া থাকে।

(১৯) রাজা প্রকৃতিরঞ্জনাৎ। ৪-১২

(২০) আদানং হি বিসর্গায় সতাং বারিমুচামিব। ৪ ৮৬

অনুবাদ—সাধুরা, মেঘের মত, দান করিবার জন্যই গ্রহণ করিয়া থাকেন।

(২১) শরদ্‌ঘনং নার্দতি চাতকোঽপি। ৫-১৭

অনুবাদ—চাতকও শরতের মেঘের কাছে জল চায় না।

(২২) দেহৈঃ স্থিতাঃ কেবলমাসনেষু। ৬ ১১

অনুবাদ—আসনে কেবল শরীরটা ছিল।

(২৩) নক্ষত্রতারাগ্রহসঙ্কুলাপি
জ্যোতিষ্মতী চন্দ্রমসৈব রাত্রিঃ। ৬-২২

অনুবাদ—নক্ষত্রাদি থাকিলেও চন্দ্রের আলোকেই রাত্রি জ্যোতিষ্মতী।

(২৪) ভিন্নরুচির্হি লোকঃ। ৬-৩০

সম্ভব হইতে পারে না। পণ্ডিত দুর্গাপ্রসাদ হরবিজয় গ্রন্থের প্রণেতা কাশ্মীর-কবি, মহাকবি বাণ ও স্বর্গ পাতালবর্ণনকারী কবিদের কথার অবতারণা করিয়া বিশেষ চিন্তাশীলতার পরিচয় দিতে পারেন নাই। কাশ্মীর-কবির দক্ষিণ ভারতে আগমন সর্বজন-প্রসিদ্ধ, বাণ হর্ষচরিতকাব্যে মহারাজ শ্রীহর্ষের জীবনচরিত লিখিতে গিয়া কৌশলে নিজের জীবনবৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। স্বর্গ বা পাতালবাসীরা যে লৌকিক কাব্যরচনা করিতে আসেন না, ইহাই বা কোন্ বিবেকশালী ব্যক্তি না বুঝেন? অতএব তর্কচ্ছলে তিনি যে যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, আমরা তাহার কোন সারবত্তা অনুভব করিতে পারিলাম না।

বারাণসীধামে অধ্যয়নকালে আমরা ব্রহ্মচারিবেশ একটি বিদ্যার্থীর নিকট এতৎসম্বন্ধে যে কিংবদন্তী শুনিয়াছিলাম, (১) তাহা নিম্নে বিবৃত করিতেছি।

বিদর্ভদেশে কোন নিঃস্ব ব্রাহ্মণবংশে ভারবি জন্মগ্রহণ করেন (২)। তাঁহার পিতা নির্ধন হইলেও বিলক্ষণ সুপণ্ডিত ও তেজস্বী ছিলেন। ভূমিষ্ঠ হওয়ার অল্পদিন পরেই পিতা পুত্রের প্রতিভার পরিচয় পাইয়া তাঁহার "ভারবি" এই নামকরণ করেন (৩)। ভারবি বিদ্যারম্ভের পর কএক বৎসরকাল নানাশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তাহার পর, যৌবনে পদার্পণ করিয়াই কুসঙ্গীদের সংসর্গে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠেন। তেজস্বী পিতা কঠোর শাসনদ্বারাও তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ করিতে পারেন না। এইরূপে অনেকদিন অতিবাহিত হইল, অত্যন্ত মর্মাহত হইয়া তাঁহাকে ভারবি নামের পরিবর্তে "দুর্বিনীত" এই অখ্যাতিব্যঞ্জক নামে আহ্বান করিতেন। একদিন পিতার অনুপস্থিতিকালে ভারবি গৃহে আগমন করিলে তাহার জননী সজলনয়নে বলিলেন, বৎস, তোমার নিকট আমাদের অন্য কিছুই প্রার্থনীয় নাই, তোমাকে বিনীত দেখিয়া যাইতে পারিলেই আমাদের মৃত্যু সুখের হইত। হায়, বিধাতা আমাদের সে আশাও পূর্ণ হইতে দিলেন না! মাতার কাতরবাক্যে ভারবির চৈতন্য হইল, সেই দিন হইতে তিনি সমস্ত কুসঙ্গীকে পরিত্যাগ করিলেন এবং গাঢ় অভিনিবেশের সহিত পুনরায় অধ্যয়ন আরম্ভ করিলেন। এইরূপে কএক বৎসরের মধ্যে তাঁহার পাণ্ডিত্য ও কবিত্বের সৌরভে চতুর্দ্দিক আমোদিত হইয়া উঠিল; কিন্তু পিতা তাঁহার সহিত পূর্ব্বের ন্যায়ই ব্যবহার করিতেন, স্নেহপূর্ণ বাক্যের দ্বারা আপ্যায়িত করা দূরে থাকুক, কোন স্থানে ভারবির প্রশংসা শুনিলে তিনি বলিতেন, "আপনারা উহাকে প্রশংসা করিবেন না; উহার কিছুমাত্র চরিত্র সংশোধন হয় নাই, এখনও উহাকে ভীষণ জন্তুর ন্যায় দুর্বৃত্ত মনে করিবেন।" এইরূপ নিয়ত পিতার তীক্ষ্ণবাক্য শুনিয়া শুনিয়া ভারবি অস্থির হইয়া উঠিলেন। তিনি মনে মনে ভাবিলেন, "সম্পূর্ণ বিশুদ্ধভাবে অবস্থান করিয়া এবং নিয়ত শাস্ত্রানুশীলন করিয়াও পিতার ব্যবহারে জনসমাজে মুখ দেখাইতে পারি না, অতএব অগ্রে পিতার প্রাণবিনাশ করিয়া পরে নিজেও জীবন বিসর্জন করিব।"

তাহার পর তিনি রাত্রিতে আহারান্তে পিতাকে গুপ্তভাবে বধ করিবার অভিপ্রায়ে একখণ্ড শিলা লইয়া তৃণাচ্ছাদিত গৃহের উপরিভাগে আরোহণ করিলেন, এবং পিতার নিদ্রা প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া রহিলেন। অভিপ্রায়, যেই পিতা নিদ্রিত হইবেন, অমনই তৃণভেদ করিয়া তাঁহার মস্তকোপরি পাষাণখণ্ড নিক্ষেপ করিবেন। এদিকে তাঁহার বৃদ্ধ পিতা গৃহমধ্যে পালঙ্কোপরি অৰ্দ্ধ-শয়ান আছেন, নিম্ন শয্যায় প্রৌঢ়া জননী বসিয়া স্বামীর সহিত কথোপকথন করিতেছেন - মাতা অনুযোগ করিয়া স্বামীকে বলিলেন "দেখ, ভারবির চরিত্র সম্পূর্ণরূপ সংশোধিত হইয়াছে, সে বহুশাস্ত্রে জ্ঞানলাভ করিয়াছে, লোকে পণ্ডিত বলিয়া তাহাকে বিশেষ সম্মান করে; কিন্তু তোমার মনের কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন ঘটিল না, তুমি তাহার প্রতি যে কঠোর সেই কঠোরই রহিয়াছ, ইহার কারণ কি?" উত্তরে তাহার স্বামী বলিলেন, "গৃহিণি! তুমি আমার মানসিক ভাব বুঝিতে পার নাই, তজ্জন্যই ঐরূপ বলিতেছ। আমি ভারবির হিতকামনায় বাহিরে ঐরূপ কঠোর ব্যবহার করিয়া

---

(১) এই বিদ্যার্থী সম্ভবতঃ মধ্যভারতের অধিবাসী।

(২) পূর্ব্বকালে মহারাষ্ট্রদেশ বিদর্ভদেশের অন্তর্গত ছিল। বিদর্ভের পশ্চিমাংশ মহারাষ্ট্র নামে খ্যাত ছিল না, মারহাট্টি জাতির বসতির পর তাহাদের নামানুসারে বিদর্ভের পশ্চিমাংশ মহারাষ্ট্র নামে খ্যাত হইয়াছে।

(৩) ভা (প্রতিভায়) রবি (রবির ন্যায় দীপ্তিশালী)।

থাকি বটে, কিন্তু সে আমার একমাত্র পুত্র, আমি তাহাকে প্রাণতুল্য ভালবাসি। এখন যদি আমি তাহাকে আদর করি, তাহা হইলে সে আর এতদূর সাবধান থাকিবে না, শাস্ত্রেও আর অধিক পরিশ্রম করিবে না, সে মনে করিবে আমার কর্ত্তব্য শেষ হইয়াছে। তাহার যেরূপ অসাধারণ প্রতিভা, আমি বাসনা করি সে তদনুরূপ পাণ্ডিত্য লাভ করুক।"

এই কথাগুলি যখন ভারবির কর্ণে প্রবেশ করিল, তখন অনুতাপে তাঁহার হৃদয় দগ্ধ হইয়া যাইতে লাগিল। তিনি প্রস্তরখণ্ড দূরে নিক্ষেপ করিয়া গৃহের উপরিভাগ হইতে অবতরণ করিলেন, এবং কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া মাতাকে দ্বার উন্মোচন করিতে বলিলেন। জননী দ্বার উন্মোচন করিলে উন্মত্তের ন্যায় তিনি পিতার চরণতলে গিয়া পতিত হইলেন। জনকজননী পুত্রের অবস্থা দেখিয়া বিস্মিত! কিছুক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া ভারবি বলিলেন, "পিতৃদেব! আমি ঘোর পাপিষ্ঠ, আমায় ক্ষমা করুন, বলুন আমার এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি? এখনই আমি আততায়ীর ন্যায় দেবচরিত্র পিতার বধ-সাধনে উদ্যত হইয়াছিলাম।" তাহার পর, মাতাপিতা উভয়েই পুত্রের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিয়া নানাবিধ আশ্বাসপূর্ণ বাক্যদ্বারা তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদান করিলেন। কিছুদিন পরে ভারবি তাঁহার কীর্ত্তিমন্দির-স্বরূপ কিরাতার্জ্জুনীয় মহাকাব্য রচনা আরম্ভ করেন। কথিত আছে, ঐ কাব্য পরিসমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই কবির জনকজননী পরলোক গমন করেন। কাব্য সমাপ্ত হইবার পর কবি অধিকদিন ইহলোকে বাস করিতে পারেন নাই, জীবনের মধ্যাহ্নেই এই কবি সূর্য্য চরমাচল আশ্রয় করেন।

কথিত আছে, অন্তিমসময়ে পত্নীকে রোরুদ্যমানা দেখিয়া কবি তাঁহার কাব্য হইতে একটি কবিতা উদ্ধৃত করিয়া সহধর্ম্মিণীর হস্তে অর্পণপূর্ব্বক বলেন, "বিশেষ অভাবের সময়ে এই কবিতাটি বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিও।" কবির দেহত্যাগের পর, কবিপত্নী দারুণ দুরবস্থায় পতিত হইলেন, জীবিকার অন্য কোন উপায় স্থির করিতে পারিলেন না। এই সময়ে সন্নিহিত গ্রামবাসী এক ধনী বণিক্‌পুত্র এক নূতন হাট বসাইলেন। তিনি ঘোষণা করিয়া দিলেন, "এই হাটে যে সকল দ্রব্য বিক্রীত হইবে না, হাটের অধিকারী বণিক্ স্বব্যয়ে সে সমস্ত ক্রয় করিয়া লইবেন!" কবিপত্নী শুনিলেন, হাটে অবিক্রীত সমস্ত দ্রব্যই বণিক্‌পুত্র প্রত্যহ বিক্রেতার প্রার্থিত মূল্য প্রদানপূর্ব্বক ক্রয় করিয়া লন; সুতরাং তাঁহার মনে আশার সঞ্চার হইল। কবিপত্নী স্বামীর স্বহস্ত লিখিত কবিতাটি লইয়া হাটে গমন করিলেন এবং অবগুণ্ঠিত বদনে হাটের একপ্রান্তে বটবৃক্ষমূলে বসিয়া রহিলেন। সমস্ত দিন বহুদ্রব্যের ক্রয়বিক্রয় হইল, ক্রমে ক্রমে সমস্ত লোক আপন আপন গৃহে চলিয়া গেল, কবিপত্নী বিষণ্ণচিত্তে বসিয়া রহিলেন। বণিকের কর্ম্মচারিগণ সমস্ত অবিক্রীত দ্রব্য ক্রয় করিয়া অবশেষে কবিপত্নীর নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"মা! তোমার কোন্ দ্রব্য বিক্রীত হয় নাই?" কবিপত্নী কোন কথা না বলিয়া কবিতাটি তাহাদের সম্মুখে ধরিলেন। কর্ম্মচারিগণ জিজ্ঞাসা করিল—"ইহার মূল্য কত?" কবিপত্নী বলিলেন,—"বিংশতি সহস্র রজতমুদ্রা।" এত অধিক মূল্যের বস্তু ক্রয় করিবার অধিকার কর্ম্মচারীদের নাই, সুতরাং তাহারা কবিতাটি লইয়া তাহাদের প্রভুর নিকট উপস্থিত হইল। বণিক্‌পুত্র পৈতৃক সম্পদ্ লাভ করিয়া কোটীশ্বর হইলেও প্রথমে এত অধিক মূল্যে কবিতা বিক্রয়কে এক প্রকার প্রতারণা মনে করিলেন, অবশেষে অনেক বিচার বিতর্কের পর, অন্ততঃ আপন প্রতিজ্ঞা রক্ষার অনুরোধেও বিংশতিসহস্র মুদ্রা প্রদান করিয়া কবিতাটি গ্রহণ করিলেন। বহুমূল্যে ক্রীত কবিতাটি যাহাতে বিনষ্ট না হয়, তজ্জন্য নিজ অট্টালিকার শয়নগৃহের রৌপ্যনির্ম্মিত দ্বারদেশের উপরিভাগে বৃহৎ সুবর্ণাক্ষরে ঐ কবিতাটি উৎকীর্ণ করিয়া রাখিলেন।

কিছুদিন পরে বণিক্‌পুত্রকে বাণিজ্যার্থ সিংহল যাত্রা করিতে হইল। তখন তাঁহার নববধূ প্রথম অন্তর্ব্বত্নী হইয়াছেন। ঐ সময়ে যে সকল সাংযাত্রিক (১) সিংহলে বাণিজ্য করিতেন, তাঁহাদিগকে ভারতীয় দ্রব্য বিক্রয় করিয়া সিংহলের দ্রব্য ক্রয় করিয়া গৃহে ফিরিতে এক বৎসরের অধিক সময়ের প্রয়োজন হইত না। এই বণিক্‌পুত্র তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর, প্রথমে সিংহলে গমন করিয়াছেন; সুতরাং

(১) সাংযাত্রিক—পোত-বণিক্।

সাবধানতার অভাবে তদানীন্তন রাজকর্ম্মচারীদের চক্রান্তে পড়িয়া তিনি বন্দীকৃত হইলেন। তাঁহার অপরাধের বিচার-মীমাংসা হইতে সম্পূর্ণ চতুর্দ্দশ বৎসর অতিবাহিত হইল। তাহার পর, বণিক্‌পুত্র সম্পূর্ণ নিরপরাধ স্থির হওয়ায় তাঁহার ধনসম্পদ্‌ও প্রত্যর্পিত হইল। বণিক্‌পুত্র আনন্দিত হৃদয়ে স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন। তিনি ইচ্ছা করিয়াই বাটীতে কোন সংবাদ প্রেরণ করিলেন না, গভীর রজনীতে গৃহে প্রবেশ করিলেন। দ্বারবান্‌দিগকে কোনরূপ গোলমাল করিতে নিষেধ করিয়া একেবারে অন্তঃপুরে উপস্থিত হইলেন। গ্রীষ্মকাল, বাতায়ন সকল উন্মুক্ত। গৃহমধ্যে আলোক জ্বলিতেছে, পালঙ্কের উপরিভাগে দুগ্ধফেননিভ শয্যায় তাঁহার অনিন্দ্যসুন্দরী যৌবনমধ্যস্থা পত্নী নিদ্রায় বিভোর হইয়া আছেন। একটি পুরুষ তাঁহার বক্ষোমধ্যে মুখ লুকাইয়া ঘুমাইতেছে। পুরুষটির মুখ দেখা যাইতেছে না; কিন্তু পশ্চাদ্‌ভাগ হইতে একটি নবীন যুবা বলিয়া মনে হইতেছে। ঘরের মেঝেয় একটি পরিচারিকা নিদ্রা যাইতেছে। উহা দেখিয়া বণিক্‌পুত্রের আপাদমস্তক ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল, তিনি বাতায়নপথে একটি যষ্টি প্রবেশ করাইয়া পরিচারিকাকে জাগাইলেন। পরিচারিকা দ্বার উন্মুক্ত করিলে কোষ হইতে তরবারি উন্মুক্ত করিয়া যেই ঐ পুরুষটির দেহে আঘাত করিবেন, এমন সময় গৃহের রৌপ্যময় চৌকাটের গাত্রে বড় বড় সুবর্ণাক্ষরে উৎকীর্ণ কবিতাটির দিকে দৃষ্টি পড়িল। কবিতাটি এই

"সহসা বিদধীত ন ক্রিয়াম্,
অবিবেকঃ পরমাপদাং পদম্।
বৃণতে হি বিমৃশ্যকারিণং
গুণলুব্ধাঃ স্বয়মেব সম্পদঃ॥"

(অনুবাদ)

সহসা ক'রোনা কার্য্য সুবুদ্ধি মানব,
অবিবেক সর্ব্ববিধ বিপত্তি কারণ।
গুণের লোভেতে লক্ষ্মী আপনি আসিয়া
বিবেকী জনেরে ল'ন করিয়া বরণ॥

বণিক্‌পুত্র বিদ্যারসজ্ঞ—সংস্কৃতভাষায় তাঁহার অধিকার ছিল, কবিতাটি পাঠ করিয়া ক্ষণকালের জন্য নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইলেন। তখন তাঁহার মনে হইল, "অপরাধী এখন আমার হস্তগত, অতএব সহসা কাপুরুষের ন্যায় নিদ্রিত ব্যক্তির শরীরে অস্ত্রাঘাত না করিয়া পরে ইহার দণ্ডবিধান করিব।" এদিকে বণিক্‌বধূ হঠাৎ নিদ্রা হইতে জাগরিত হইলেন এবং বহুকাল পরে পতিকে গৃহাগত দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন, তখনই পুত্রকে জাগাইয়া স্বামীর ক্রোড়ে স্থাপন করিলেন। বণিক্ দেখিলেন, যাহাকে তিনি পরপুরুষ ভাবিয়া বধ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, সে তাঁহারই অজাতশ্মশ্রু কিশোরবয়স্ক সন্তান; তাঁহার সিংহলযাত্রাকালে বধূ যে অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন, তাহা তাঁহার স্মৃতিপথে উপস্থিত হইল। বণিকের হৃদয়ে আনন্দ ধরে না, তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "আমি যে বিংশতিসহস্র মুদ্রায় কবিতা ক্রয় করিয়াছিলাম, তাহা সার্থক হইয়াছে! বিংশতিসহস্র কেন—উহার মূল্য অনেক লক্ষ মুদ্রা!"

মহাকবি ভারবির আবির্ভাবকাল ও জীবনবৃত্তান্ত সম্বন্ধে যাহা অনুসন্ধান দ্বারা জানিতে পারিয়াছি, তাহা লিপিবদ্ধ করিলাম। যদি সুযোগ হয়, পরে তাঁহার কাব্যের সৌন্দর্য্য প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিব।

শ্রীশরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী।

মন্ত্রশক্তি।

[পূর্ব্ব-প্রকাশিত অংশের সার মর্ম্ম—রাজনগরের জমিদার বাবুদের কুলদেবতা গোপীকিশোরের মন্দির কারুকার্য্যে মনোরম। অভ্যন্তরে রৌপ্যসিংহাসনে অধিষ্ঠিত শ্যামসুন্দর বামদিকে ঈষৎ হেলিয়া বংশীবাদন করিতেছেন, আর সেই বাঁশীর সুরে উন্মাদিনী রাধা ছুটিয়া আসিয়া শ্যামসঙ্গিনী হইয়াছেন। মন্দির-প্রতিষ্ঠাতা তাহার বিশাল জমিদারী তাহার শেষ উইল দ্বারা দেবত্র করিয়া অধ্যাপক জগন্নাথ তর্কচূড়ামণিকে মন্দিরের পৌরোহিত্যে নিযুক্ত করিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহার অবর্ত্তমানে তৎকর্ত্তৃক মনোনীত ছাত্রই এ পদের অধিকারী হইবেন। তর্কচূড়ামণির মৃত্যুর দুই দিবস পূর্ব্বে তিনি তাঁহার প্রিয়ছাত্র অম্বরনাথকে পুরোহিত নিযুক্ত করিয়াছিলেন। নবাগত অম্বরনাথকে এ পদে প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া অন্যান্য ছাত্রেরা বিষণ্ণ হইল। আদ্যনাথ টোল ছাড়িয়া চলিয়া গেল। অম্বরনাথ অভ্যস্ত রন্ধনকার্য্যে যোগ দিল।]

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

রাজনগরের জমিদার-গৃহ ঠিক গ্রামের ভিতরে ছিল না। গ্রামখানি নদীতীর হইতে ন্যূনাধিক আধক্রোশ দূরে অবস্থিত। জমিদার-বাটী হইতে গ্রাম পর্য্যন্ত একটি অনতিপ্রশস্ত পথ দুই পার্শ্বের ঘনসন্নিবিষ্ট আম ও অশ্বত্থ বৃক্ষের শীতল ছায়াতলে দীর্ঘকায় অজগরের ন্যায় নিশ্চিন্ত-মনে বিশ্রাম করিতেছে। হাটের দিনে পশারী-পশারিণী-গণ বোঝা মাথায় লইয়া হাত দোলাইয়া এই রাস্তা দিয়াই পশারশালায় গিয়া পঁহুছিত। শস্যের বোঝার উপর বসিয়া গোশকটের আরোহী অতিমন্থর-গতি বাহনদ্বয়ের প্রতি অতি কটূভাষা প্রয়োগ করিতে করিতে সাতক্রোশ দূরে রেলওয়ে ষ্টেশনের অভিমুখে প্রস্থান করিত। আবার কখনও কখনও দ্বিতীয় একখানা তদবস্থযানের সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত হওয়ায় টক্ টক্, হেই হেই শব্দে ও চালকদ্বয়ের পরস্পরের প্রতি কটূবাক্য প্রয়োগে সে পথ মুখরিত হইয়া উঠিত।

এই পথের দুইধারে রাজনগর গ্রাম সংস্থাপিত। গ্রামের মধ্যে দু' দশ ঘর বর্দ্ধিষ্ণুলোক ভিন্ন অধিকাংশই সাধারণ লোকের বাস; সুতরাং গ্রামে চালাঘরের সংখ্যাই বেশী।

গ্রামখানির মধ্যে লক্ষ্মীর কৃপা-দৃষ্টির বেশ একটু চিহ্ন ছিল। অধিবাসীদের সকলেরই প্রায় গৃহসংলগ্ন দু'চার বিঘা জমি ফলটা ফুলটা উৎপাদন করিয়া গৃহস্থের গৃহ সৌষ্ঠবসাধন ও অভাব দূর করিত। গোময়লিপ্ত পরিচ্ছন্ন গৃহাঙ্গনের একটি ধারে মরাই বাঁধা নাই এমন লক্ষ্মীছাড়ার বাড়ী এ গ্রামে প্রায়ই দৃষ্টিগোচর হইত না। এতদ্ব্যতীত দুগ্ধবতী গাভী বা কমলার বরপুত্র গৃহপালিত কপোতের ঝাঁকও প্রায় সকল গৃহেই দৃষ্ট হইত। গ্রামের ঠিক মধ্য স্থলেই রাজনগরের বাজার। এইখানেই প্রকাণ্ড আট চালার ভিতর বৃহস্পতিবার ও রবিবারে হাট বসে। হাটের দিন নিকটবর্ত্তী গ্রামগুলি হইতে বহুলোকের সমাগম হইয়া থাকে। এই বাজারের পাশেই একটি আটচালায় গ্রামের পাঠশালায় একটি মিঠেকড়া গোছের গুরুমহাশয় প্রাণপণ শক্তিতে গ্রামের অধিকাংশ ভালমন্দ ছেলে লইয়া বিদ্যাদান রূপ মহৎকার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন। বারোয়ারীতলা, চড়কতলা, রথতলা, নূতন মাইনর স্কুল, ইত্যাদি ক্রমশঃ রাস্তার উভয়দিকেই অবস্থিত করিয়া পশ্চিমদিকে বিস্তৃত হইয়া গিয়াছে।

এই বাজারের ভিতরে পাঠশালার ঠিক সম্মুখে একখানি একতল পাকাবাড়ীতে আদ্যনাথের বহুদূর সম্পর্কিত এক জ্ঞাতি খুল্লতাত-পুত্র বাস করিতেন। আদ্যনাথ টোল ত্যাগ করিয়া এখন তাঁহার অতিথিরূপে তাঁহার গৃহে বাস করিতেছিল। তাঁহার এই খুল্লতাত-পুত্রের নাম বৃন্দাবনচন্দ্র। বৃন্দাবন দেশের মধ্যে নিরীহ স্বভাবের জন্য বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। তাহার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী তুলসীমঞ্জরী এমন কিছু মন্দ মানুষ নহে, তথাপি বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা বলিয়াই হউক অথবা নিন্দকের স্বভাবের গুণেই হউক, বার্দ্ধক্যের সীমায় পদার্পণোদ্যত স্বামীর উপর তাহার যে একটা অতিরিক্ত আধিপত্য আছে, এই কথাটা ক্রমে ক্রমে গ্রামে রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছিল। এমন কি লোকের মনে ইহা এতদূর দৃঢ় হইয়া গিয়াছিল যে, স্বভাব-সঙ্কুচিত বৃন্দাবনের দ্বারা জগতের বড় কাজ কিছু হওয়া সম্ভবই নহে,—সামান্য কোন একটা কার্য্যেও তাহাকে প্রবৃত্ত করাইতে হইলে তাহারা তাহার নিকট না গিয়া তাহার পত্নীর নিকট বাড়ীর মেয়েদের পাঠাইয়া অনুরোধ করিলে ফললাভের সম্ভাবনা বলিয়া সকলের বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। তুলসী প্রথম প্রথম এই প্রকার কোন অনুরোধে বড়ই অপমানিত বোধ করিয়া

নিজেকে এ কার্য্যে অক্ষম প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিত; কিন্তু ক্ষমতাগর্ব্বে গৌরবান্বিত বোধ করা মানুষের স্বভাবধর্ম্ম, মঞ্জরী ত সামান্যা নারী!

আঙ্গিনাটি লেপা পোঁছা; তাহার ঠিক মধ্যস্থলে একটি ইষ্টকে গাঁথা অনতি-উচ্চ তুলসীমঞ্চ। মঞ্চের চারিধারে চেরা-বাঁশের ফ্রেমের মত করিয়া তাহাতে একটি ফুটা করা হাঁড়ি দড়ি দিয়া ঝুলাইয়া ঝারা দেওয়া হইয়াছিল। সন্ধ্যা হয় হয়, রাঙ্গা-পেড়ে তসর-সাড়ি পরিয়া মঞ্জরী একখানি পিত্তল থালিতে একঠোঙ্গা বাতাসা ও একটি সজ্জিত তৈলপ্রদীপ স্থাপনান্তে কলসী হইতে তামার ঘটি করিয়া জল গড়াইতেছিল। এমন সময় আত্মনাথ ডাকিল, "বৌদিদি।"

"কি বল্‌চো ঠাকুরপো?" বলিতে বলিতে মঞ্জরী মস্তকচ্যুত সাড়ির একটা অংশ তুলিয়া যথাস্থানে স্থাপন করিয়া মুখ ফিরাইল, "এস,—এস না; আহ্নিকের জায়গা করে দেব?"

এমন সময় আত্মনাথ ডাকিল 'বৌদিদি'।

আত্মনাথ বলিল, "জায়গা—না,—হাঁ, তা দাও। তা সেজন্যে নয়, অন্য একটা কথা ছিল। অন্য সময় বল্‌ব না হয়।" হস্তস্থিত পূজাদ্রব্য মাটিতে স্থাপন করিয়া দুইটি কৌতূহলী চক্ষু দেবরের মুখের উপরে সোৎসুকে স্থাপন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "অন্য সময় কেন?—এখনই বলনা কি বল্‌বে।—না, না; সে হবে না—ওকি ভাই, আধখানা ব'লে এখন কথা চাপা দিলে চল্‌বে না; হাঁ—আধকপালে ধ'রে মরি আর কি!"

তুলসীমঞ্জরী পূর্ণবয়স্কা যুবতী; হাস্যে, রহস্যে, কৌতুকে কৌতূহলে তাহার সারাপ্রাণ বর্ষার পরিপূর্ণ নদীটির মত ছল ছল করিতেছিল, ভিতরে বাহিরে একটা সঘন হিল্লোল মৃদু বাতাসেই বহিয়া যাইত। সে জানালার উপর হইতে একখানা আসন পাতিয়া আত্মনাথকে বসিতে আমন্ত্রণ করিল এবং নিজে অদূরে মাটি চাপিয়া বসিয়া জেদ করিয়া আবার কহিল, —"কি বল্‌বে, বল না।" আত্মনাথ কহিল, "কথা এমন কিছুই না। দাদা ত' এক রকম হয়ে গ্যাছেন, একটা কথার জবাবও তাঁর কাছে পাওয়ার আশা দেখিনে। বুদ্ধি শুদ্ধি পুরুষদের চেয়েও তোমার ঢের বেশী দেখ্‌চি। তাই তোমার কাছেই একটা পরামর্শ চাইব মনে করি। তোমাকে আমার জন্য একটু কষ্ট কর্‌তে হবে।" মঞ্জরী মুখ নত করিল, তাহার বুদ্ধির প্রশংসাগানে সে একটু প্রীত হইয়াছিল বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে তাহার স্বামীর প্রতি দোষারোপটাও সে মনে মনে ঈষৎ অপছন্দ করিয়াছিল, কিন্তু সেভাব প্রকাশ না করিয়া মৃদুহাস্য করিয়া কহিল, "মেয়ে মানুষের আবার বুদ্ধি! হায়রে পোড়ার দশা, মুখ্যু সুখ্যু লোকেদের বুদ্ধি থাক্‌লেই বা কি, আর না থাক্‌লেই বা কি। তা তোমার কি-রকম কাজটা বল, শুনেই না হয় রাখি—কিছু কর্‌তে পারি আর না পারি।" তখন আত্মনাথ নিজের মনের

কথা প্রকাশ করিয়া বলিল, সম্পূর্ণ অবিচার করিয়া গুরু তাহার ন্যায্য পাওনা অম্বরকে দান করিয়া গিয়াছেন। তখন তাঁহার মাথার ঠিক ছিল না, সেই জন্যই এইরূপ অঘটন ঘটিয়া গেল। কিন্তু ইহাত সে প্রমাণ করিতে পারিবে না, করিলেই বা মানিবে কে? কিন্তু তাই বলিয়া যে তাহার চকের ধন অন্যে লুটিয়া খাইবে, ইহাও ত অসহ্য! কোথাকার একটা ছোঁড়া, যার গলা টিপিলে আজও দুধ বাহির হয়, সে না জানে শাস্ত্রার্থ, না সে পূজাপদ্ধতিতে অভ্যস্ত। এত বড় একটা গুরুভার যে তাহাকে দেওয়া হইল, ইহাতে দেশের কাহারও মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই! ফলে, দেশে ঘোর কলি ও অরাজকতার কাল উপস্থিত। জমিদারের মতিচ্ছন্ন হইয়াছে। এ ভুলের সংশোধন হইল না; এ অত্যাচার আর যাহার খুসী সে স্বীকার করুক, কিন্তু আদ্যানাথ খাট মানুষ, সে ইহা বরদাস্ত করিতে পারিবে না। সে বরং না খাইয়া মরিবে, তবু অম্বুরে ছোঁড়াটার তাবেদারি করিবে না—ইহার জন্য সে সব করিতে প্রস্তুত!

সকল কথা শোনা হইয়া গেলে মঞ্জরী ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, "আমায় এতে কি করতে বল?"

আদ্যানাথ তাহার দিকে উৎসুক নেত্রে চাহিয়াছিল, তাহার এই ধীর প্রশ্নে সে কিছু বিরক্তি বোধ করিল;—অল্প ঝাঁঝিয়া উত্তর করিল,"কি করতে হবে,তাই যদি স্থির ক'রতে পারব, তবে নিজেই ত সেই কাজ করে নিতে পারতাম; তা' হ'লে তোমার কাছে পরামর্শ চাইব কেন?"

তাহার ক্রোধ বুঝিয়া মঞ্জরী ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "আমার পরামর্শ! তুমিই একদিন বলেছিলে, ঠাকুরপো,—স্ত্রী-বুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী!"

"আহা,তাই মনে ক'রে বুঝি অভিমান ক'রে ব'সে আছ! রাম বল! সে একটা কথার কথা! সত্যি কি আর বলেছিলাম?—এত কথাও ধর্ত্তে পার!—তোমার সঙ্গে জমিদার বাড়ীর মেয়েদের জানা শুনা আছে না?" তুলসী তার হাস্যময় চোখের সচঞ্চল তারকা পূর্ণভাবে তাহার মুখের উপর স্থাপন করিয়া বলিল,—"তা আর নেই, খু-ব আছে! কেন?"

আদ্যানাথ একটুখানি ইতস্ততঃ করিতে লাগিল, পরে বলিল, "শুনেচি জমিদার বাবুর মেয়ে খুব ধর্ম্মপরায়ণা; তাঁকে যদি এ বিষয়——"

মঞ্জরী সহসা দুইনেত্র বিস্তৃত করিয়া ঘৃণাপূর্ণ অনুযোগের সহিত বলিল, "কি?—আমি অম্বরনাথের নামে তাঁর কাছে লাগাতে যাব?"

আদ্যানাথের মুখ এতটুকু হইয়া আসিল। কোন পুরুষ মানুষ এমন সুরে এই কয়টি কথা তাহার প্রতি এইরূপ উদ্ধতভাবে উচ্চারণ করিলে সে তৎক্ষণাৎ আসন হইতে উঠিয়া তাহার দুই গণ্ডে প্রবলবেগে দুইটা চপেটাঘাত না করিয়া কখন ছাড়িত না! কিন্তু মঞ্জরী একে স্ত্রীলোক, তাহাতে সে মঞ্জরী, তাহার উপরে রাগ করিবার কারণ বর্ত্তমান থাকিলেও সহসা তাহা প্রকাশ করা যে অসঙ্গত, তাহা সে বুঝিল। সে আত্মসংবরণ করিয়া নত-নেত্রে বলিল, "ঠিক তা নয়, তার নামে লাগাবার দরকার হবে না; সে সত্যই পুরুত হবার উপযুক্ত নয়, তা বলায় মিথ্যা বলা হবে না,—এতে দোষ কি?"

মৃদু হাসিয়া মঞ্জরী কহিল, "দোষ বিলক্ষণ! কে না বুঝবে, তুমি আমার আপনার জন—তোমার জন্যে আমরা নতুন পুরুতের নামে কুৎসার রচনা করচি!" আদ্যানাথের ললাটের শিরাগুলি স্ফীত হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া, হঠাৎ মঞ্জরী কথার সুর বদলাইয়া বলিয়া উঠিল—

"তবে এ কথাও তোমায় বল্‌চি, যদি তোমাদের অম্বরনাথ সত্যসত্যই মূর্খলোক হয়, তাহলে তাকে বেশীদিন পুরুতগিরি করতে হবে না। তোমার চোখের চেয়ে আরও দুটো তীক্ষ্ণ চোখ্ সেখানে তার কাজের উপরে চৌকি দিচ্চে।—সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থেক।"

আদ্যানাথের হতাশা-মিশ্রিত ক্রোধের দৃষ্টি শীতল হইয়া আসিল, সে বলিল, "কে? কে? কা'র চোখ?"

"জমিদারবাবুর মেয়ে রাধারাণী,—তার কাছে ফাঁকি চলবে না।" শ্রোতার দুই উৎসুক নেত্রে আশার আলোক জ্বলিয়া উঠিল। সে বলিল, "তবে তুমি একবার খবরটা নিও।" "আচ্ছা,—দেখা যাবে।"

"আমি এখন এইখানেই দু চারটে ছেলে যোগাড় ক'রে একটা টোল খুলে বসি, কি বল? নেহাৎ ওকে না তাড়াতে পারি, ওর চতুষ্পাঠি ভাঙ্গব। দেখি, ও কেমন ক'রে পণ্ডিতি ক'রে খায়। অম্‌নি আমি ছাড়্‌চিনে। বলে, যার ধন তার ধন নয় নেপো মারে দই! কোথায় ছিলি ব্যাটা এতদিন?"

মঞ্জরী আগুনাথের অনুপস্থিত প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতি ক্রোধোত্তেজনা দেখিয়া, মুখ টিপিয়া অলক্ষ্যে ঈষৎ হাসিয়া সন্ধ্যাপ্রদীপ ও হরির শীতল দ্রব্য লইয়া উঠিয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

অম্বরনাথ যে মন্দিরে পূজা করিতে যাইত, সেখানে রজত সিংহাসনে দুইটি ধাতুমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা ব্যতীত আরও একখানি প্রতিমা সে নিত্যপ্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাইত। দেব-বিগ্রহ অচল, কিন্তু মন্দিরবাসিনী এই তৃতীয় দেবীমূর্ত্তি সচলা; এই মাত্র ইহাদের সহিত তাহার প্রভেদ।

প্রথম দিন সে যখন স্নানাহ্নিক ক্রিয়া সমাপনান্তে গুরুর পরিত্যক্ত জীর্ণ গরদের জোড় পরিধান করিয়া পূজার আসনের উপর আসিয়া বসিল, তখন একটা অননুভূতপূর্ব্ব গভীর বিস্ময়ে তাহার সমস্ত চিত্ত এককালে ভরিয়া উঠিয়া তাহাকে প্রায় অভিভূত করিয়া ফেলিল। একি মন্দির! এই মন্দিরের দেবতার এ কি ঐশ্বর্য্য! কি সৌন্দর্য্য! সুপ্রশস্ত মর্ম্মর-নির্ম্মিত হর্ম্ম্য, প্রাচীর-বিলম্বিত সুন্দর সুন্দর চিত্র জন্ম হইতে লয় পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ-লীলার বিচিত্র ঘটনায় পূর্ণ। উপর হইতে বহু বর্ত্তিকাযুক্ত স্ফটিক ঝাড় আলোক বিকীরণ করিতেছে। রামধনুর আলোকরেখা রঙ্গিণ কাচের মধ্য দিয়া সেই অমর লোকের মত গৃহমধ্যে বিস্তৃত হইয়া বহুবর্ণের সমাবেশ করিয়াছিল। কিংখাবের বিছানায় জরির ঝালরযুক্ত মশারীতে ঢাকা মেহগনি পালঙ্কে সেই রৌদ্র ছায়া প্রতিহত হইয়া চক্ষু ঝলসিয়া দিতেছিল, পূজার দ্রব্য-সম্ভারে তাহা ঝিকমিক করিতেছিল। সমস্তই মনোরম।

পাত্রে পাত্রে নৈবেদ্য, স্বর্ণপাত্রে যত্ন-সজ্জিত স্বল্প তাম্বুল, থালিপূর্ণ পুষ্পরাশি। ধূপ, দীপ, অগুরুর গন্ধে বাতাস আমোদিত হইয়া উঠিয়াছে। অম্বর স্তম্ভিত হইয়া কিছুক্ষণ এই সকল দেখিতে লাগিল। দূর্ব্বাদল তুলসী চন্দন কুঙ্কুম, উপচারের কোনখানে একটুকু মাত্র খুঁৎ ধরিবার উপায় নাই। রাজসিক পূজার আড়ম্বর ও সুন্দর আয়োজনে সে ঈষৎ ব্যথা অনুভব করিল। এ কি দেব মন্দির? এত সাজ, এত জাঁক, এ যেন বিলাসকুঞ্জেই শোভা পায়! সোণা-রূপার এত ছড়াছড়ি, সাটিন-কিংখাবের এমন প্রচুরতা, সে তাহার জীবনে এই প্রথম প্রত্যক্ষ করিল; কিন্তু এই দেবৈশ্বর্য্যের বিস্ময়জনক আবির্ভাব তাহাকে স্তম্ভিত ভিন্ন আদৌ বিমুগ্ধ করিতে পারিল না। দেখিতে দেখিতে তাহার বিস্ফারিত দৃষ্টিতলে যে ছায়া সঘন কাল মেঘের বাপীতলস্থ ছায়ার মত নিঃশব্দে ফুটিয়া উঠিল, তাহাতে বিদ্যুতের চকিত স্ফুরণমাত্র ছিল না, ভারাক্রান্ত চিত্তের বিপুল বেদনাভার নিহিত ছিল। পূজাশেষে বাহিরে আসিয়া সে মৃদুশ্বাসে ভিতরের পানে বারেক চাহিয়া দেখিয়া চিন্তিত মুখে চলিয়া আসিল।

হায় দেবতা! তোমার দ্বারের বাহিরে কত দৈন্য, কত হাহাকার; আর তোমার অঙ্গে সহস্র মণিরত্ন জ্বলিতেছে! দেবনামে মানবের একি মর্ম্মভেদী পরিহাস, একি—লজ্জাজনক পুতুল খেলা! এ যে দেবতার অপমান!

একটুখানি বাহিরে বাহিরে ঘুরিয়া টোল বাড়ীর সম্মুখীন হইবামাত্র সে দেখিল, আগুনাথ ছেলেদের সহিত চণ্ডীমণ্ডপের দাওয়ায় দাঁড়াইয়া কি কথাবার্ত্তা কহিতেছে। সে আর অগ্রসর হইল না, কারণ সে জানিত দুর্ভাগ্যক্রমে এই যুবকটির সহিত তাহার একটা বিষম প্রতিদ্বন্দ্বী সম্বন্ধ দাঁড়াইয়াছে;—আগুনাথ তাহাকে তাহার ভীষণ শত্রু বলিয়া মনে করিয়া লইয়াছে ও তাহার প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া আছে। হয় ত তাহাকে হঠাৎ সম্মুখে দেখিলে সে বিরক্তির বৃদ্ধিই হইবে! সসঙ্কোচে তাই সে সরিয়া আসিল। রৌদ্রোজ্জ্বলা ধরণীর অঙ্গে বিচিত্র শ্যামাঞ্চল প্রভাত-পবনে মৃদু মৃদু বিকম্পিত হইতেছে। সুন্দরী নারীর বসনাঞ্চল-বিকীর্ণ পুষ্পসারের সৌগন্ধের মত বিবিধ ফুলের মিশ্র সুবাস বহন করিয়া বাতাস চারিদিকে ছড়াইয়া দিতেছিল। তীব্র উজ্জ্বলতায় আকাশের নীলিমায় অ্যাসিটিলিনের শাদা আলোর মত রং ফুটিয়া উঠিয়াছে। নদীর জলে সূর্য্যের ছায়া চূর্ণ-হীরকের মত আগাগোড়া ঝিক্ মিক্ করিয়া জ্বলিয়া তরঙ্গের সঙ্গে নাচিয়া বেড়াইতেছে। পরাণে কৈবর্ত্ত জাল গুটাইয়া নদীর কিনারায় ডিঙ্গির খোল হইতে আহৃত মৎস্য-সম্ভার মৎস্য গন্ধযুক্ত পুরাতন ডালাখানিতে সজ্জিত করিতেছিল; অম্বরকে দেখিয়া সে হস্তস্থিত মৎস্য নামাইয়া ভূমিতে পড়িয়া প্রণাম করিল। "দণ্ডবৎ হইগো দাদাঠাকুর, তুমি এখন পুৎমশাই হয়েচেন শুনলুম, বেশ্ হয়েচে।"

মধ্যে মধ্যে নদীতীরে দুজনে দেখাসাক্ষাৎ হইত।

অম্বর তাহার পরিচিত—শুধু পরিচিত নয়, উভয়ের মধ্যে বেশ একটু ঘনিষ্ঠতাও ছিল। মধ্যে মধ্যে নদীতীরে দুজনে দেখাসাক্ষাৎ হইত। একদিন সে পরাণের ছোট মেয়ে আতরীকে তাহাদের দগ্ধপ্রায় গৃহের অগ্নিরাশির মধ্য হইতে রক্ষা করিয়াছিল, সেই অবধি পরাণ ও তাহার পরিবারবর্গ পথেঘাটে এই পরোপকারী যুবকটিকে দেখিলেই সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিত। প্রথম প্রথম কিছুদিন সে তাহার গভীর কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ দাদাঠাকুরের জন্য সামান্য ফলটা [illegible]কোড়টা, যেখানে যে'টি পাইত, লইয়া আসিয়া—তাহার মৃদু [illegible]সনার উত্তরে শুধু একটু খানি হাস্য করিয়া—রাখিয়া [illegible];—বাহিরে আসিয়া বলিত, "দাদাঠাকুর ত একটা [illegible]!" কিন্তু বেশিদিন সে এই ক্ষুদ্র উচ্ছ্বাসের দ্বারা [illegible] হৃদয় মধ্যস্থ গভীর কৃতজ্ঞতার যৎসামান্যমাত্র প্রকাশে [illegible] আনন্দ ও তৃপ্তিলাভে নিজেকে কৃতার্থবোধ করিতে-

ছিল, তাহা স্থায়ী করিতে পারিল না। অম্বরনাথের সহিত পরাণে কৈবর্ত্তের এই ভাব শীঘ্রই টোলের ছেলেদের দৃষ্টি ও চিত্ত আকর্ষণ করিল। আদ্যনাথ বলিল, "তুমি জেলের দান নিচ্ছ?" অম্বর এই প্রশ্নটার জন্য একটুও প্রস্তুত ছিল না; এই রকম একটা জবাবদিহি তাহার জন্য অপেক্ষা করিতে পারে, ইহা সে কোন দিন সন্দেহও করে নাই। ঈষৎ চকিত হইয়া উত্তর করিল, "দান! না,—হ্যা সে বারণ কর্‌লেও শোনে না—দিয়ে বড়ই সুখী হয়।"

আদ্যনাথ ঠোঁট টিপিয়া একটুখানি বিদ্রূপের হাসি হাসিল, দলের ছেলেদের চোখেও একটা অবিশ্বাসের হাস্য দেখা গেল। আদ্যনাথ বলিল, "গরীব লোক নিজেই খেতে পায় না, সে আবার দিয়ে সুখী হয়! হাঃ!—তা সে ত কথা নয়, তুমি কেমন করে শূদ্রের প্রতিগ্রহ কর?"

অম্বর কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল, মৃদুস্বরে সে বলিল—"দান ঠিক নয়, ওটা উপহার।" আদ্যনাথ হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিল;—"ঠিক্ ঠিক্—বামুনের ছেলে কৈবর্ত্ত জেলের কাছে উপহার পায়! হা হা হা! কালে আরও কতই দেখ্‌তে হবে! হাঃ হাঃ হাঃ!" সঙ্গিগণও সে হাসিতে যোগ দিল; যাহাদের হাসি আদৌ আসিতেছিল না, তাহারাও দলপতির খাতিরে 'হো-হো' "হু হুঃ" প্রভৃতি বিকট শব্দ করিয়া উঠিল। অম্বর অপ্রতিভের একশেষ হইয়া ঘাড় হেঁট করিয়া রহিল। সংসারে সর্ব্বত্রই মিলিত-শক্তির জয় হইয়া থাকে। আমরা মানুষের উদ্দেশ্য না দেখিয়া দলে মিশিয়া পড়ি।

এ ব্যাপারটা এইখানেই শেষ হইল না। এই ঘটনার পরদিনে যখন পরাণে একটি নবজাত কচি কাঁঠাল লইয়া কুণ্ঠিত চরণে আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া বলিল, "নতুন দ্রিবি, ও পারথে' নিয়ে এনুগো দা-ঠাকুর!—তরকারি বেনিয়ে খেও"।

তখন অম্বরের বক্ষ উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। সে একটু খানি চুপ করিয়া থাকিয়া প্রথম একবার সলজ্জভাবে বলিল, "এটা না নিলে কি হয় না পরাণ! তুমি কিছু মনে করিও না; তুমি গরীব মানুষ, রোজ রোজ তোমার জিনিষ আমি আর নিতে পারব না, ফিরিয়ে নিয়ে যাও।"

পরাণ ক্ষুব্ধ-দৃষ্টিতে দাদাঠাকুরের মুখের দিকে চাহিল,—"সে ও কি কথা হ'ল, ঠাকুর! তোমার নামের দ্রিব্যি তোমায় না দিয়ে ফিরিয়ে নে যাব? তোমাদের কেরপায় পরাণে এত গরীব নয়। তার গতর সুখে থাক্, ডিঙ্গি, জাল যদি না টোটে ফাটে, ভাতের দুঃখু তার ছেলে ছাওয়ালে কক্ষনো পাবে না। ন্যাও মেনে, আর তোমার শাত্তর মাত্তর বের করোনা, কচি কাঁঠালে একটু গরম মসলা দিও, ঠিক পাটার মতন খেতে নাগবে। কি বল্‌ব মাচত খাবে না, নৈলে গল্‌দাচিংড়িটে একবার পেট ভরে খাওয়াতুম।"

পরাণে পুনশ্চ 'গড়' করিয়া চলিয়া গেল। অম্বর আর কিছুই বলিতে পারিল না, মানুষটার এত বড় দানের সুখে বাধা দিয়া নিজেকে 'শুদ্ধ সত্ত্ব' রাখা তাহার পক্ষে অসম্ভব। সে মনে মনে বলিল, "এতে যদি কিছু পাপ হয়, যেন আমারই হয়।" এঁচোড়টি কুটিয়া রন্ধন করিল, এবং অধ্যাপক ও ছাত্রদল খাইতে বসিলে সকলের পাতে পরিবেষণ করিয়া-দিল। অধ্যাপক ডান্‌লার ঝোলটুকু টানিয়া ভাতের সঙ্গে মাখিতে মাখিতে হৃষ্টচিত্তে বলিলেন, "আজ যে নূতন ব্যঞ্জন দেখিতেছি"—

আন্তনাথ সহসা উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "খাবেন না, উহা স্পর্শ করবেন না, উহা ভস্ম—অখাদ্য!"

সকলেই এক সঙ্গে বিস্মিত হইয়া বক্তার দিকে ফিরিল; গুরু বলিলেন, "তোমার সকলই বাড়াবাড়ি; আন্তনাথ, এমন সুন্দর বস্তু, তুমি বল ভস্ম, অখাদ্য। এ কিরূপ?"

আন্তনাথ উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল, "অম্বরনাথের জেলে বন্ধুর উপহার তিনি আনন্দের সঙ্গে খেতে পারেন, কিন্তু আপনার ও আমাদের পক্ষে তাহা শূদ্রের দান, ভস্ম ভিন্ন আর বেশি কিছু নয়। তার উপর পাষণ্ড জেলের ছেলে ইহাকে বৈষ্ণবের মুখে পর্য্যন্ত উচ্চারিত হ'তে পারে না, এমন একটা ভয়ানক বস্তুর সঙ্গে উপমিত করেছে! আপনার ছাত্রটি বোধ হয় ব্রাহ্মণের অনুচিত কোন কর্ম্ম করতেই কুণ্ঠিত না হ'তে পারেন, কিন্তু সকলে তাঁর জন্য পাপের ভাগী হ'বে কেন? শূদ্রের দান গ্রহণ ও তাহা ভোগ এ উভয়ই এক কথা।"

অধ্যাপকের মুখে বিরক্তির চিহ্ন লক্ষিত হইল। তিনি অম্বরকে বলিলেন, "অম্বর! আন্তনাথের কথা কি সত্য?" অম্বর নতমুখে উত্তর করিল, "আজ্ঞা হাঁ"। "ভাল কর নাই, আর এরূপ না হয়।" "যে আজ্ঞা," বলিয়া সে ডালের পাত্র হইতে হাতা ভর্ত্তি ডাল তুলিয়া একজন ভোক্তার পাত্রে প্রদান করিতে গেলে, আন্তনাথ অমনই হাত নাড়িয়া কহিয়া উঠিল, "উহুঁ উহুঁ এসব ভাত নষ্ট হয়েছে, অস্পৃশ্য দ্রব্য সংস্পর্শ জাত খাদ্য গুরুকে দিতে তোমার আপত্তি না থাক্‌তে পারে, আমরা জানিয়া শুনিয়া পাপের ভাগী হইতে পারি না। আবার ভাত চড়াইতে হইবে। এসব ফেলিয়া দাও।" অম্বর নিরুত্তরে রান্নাঘরে ফিরিয়া গেল। অধ্যাপক মহাশয়ের এতটা ভাল লাগিতেছিল না, কিন্তু আন্তনাথকে তিনিও মনে মনে একটু ভয় করিয়া চলিতেন। পাছে সে বাহিরে তাঁহার অনাচারের কথা রাষ্ট্র করে, সেই ভয়ে ক্ষুধার অন্ন ত্যাগ করিয়া বিরক্ত চিত্তে উঠিয়া পড়িলেন। রাগ করিয়া 'যা আজ আর পিণ্ড খাবার দরকার নাই' বলিয়া নিজের শয়নগৃহের দ্বার ভেজাইয়া শয়ন করিলেন।

অম্বর লজ্জায়, ক্ষোভে মরিয়া নূতন করিয়া ঘর পরিষ্কার করিয়া রান্না চাপাইয়া দিল। আন্তনাথ সঙ্গীদের কাছে দম্ভ করিয়া বলিল, "আমার সঙ্গে টেক্কা দেবেন উনি হাঃ, এক ফুঁয়ে উড়িয়ে দেব না!"

বলা বাহুল্য, পরাণের নিকট হইতে অতঃপর সওগাদ গ্রহণ করা অম্বরনাথের পক্ষে সম্ভব হয় নাই এবং এই উপলক্ষে সত্য কথাটাও তাহাকে প্রকাশ করিতে হইয়াছিল। পরাণে মূর্খ গোঁয়ার মানুষ, সে আগুন হইয়া উঠিয়া বলিল, "যাই দিকিন্ বিটেল বামুনের বাম্‌নাই ঝেড়ে দে আসি, দাদাঠাকুর তুমি যেমন ম্যাদানারা ভালমানুষ।" অম্বর অনেক বুঝাইয়া তাহাকে শান্ত করিয়াছিল।

আজ পরাণ তাহার আকর্ণ-বিস্তৃত শুভ্র দন্তপাঁতি বাহির করিয়া তাহাকে যখন অভিনন্দন করিল, তখন সহসা অম্বরের নেত্রপ্রান্ত ঈষৎ সলিলার্দ্র হইয়া আসিল, মূর্খ জেলে সে, জানে না যে অম্বর আজ যে পদে উন্নীত

হইয়াছে, সে পদের সে কত অনুপযুক্ত। যে ঘটনায় সমস্ত রাজপুর বাত্যান্দোলিত, সেই অঘটনীয় কাণ্ডটাকে এমন শান্তভাবে গ্রহণ করিতে পারে, এমন নহিলে আর সে অজ্ঞ চাষার ঘরে জন্মিয়াছে কেন? একটুখানি শুষ্ক হাস্য তাহার অধর-প্রান্তে দেখা দিল। কথাটা উল্টাইয়া সে পরাণকে জিজ্ঞাসা করিল, "কিরে, তোর ছেলে-পিলে সব ভাল ত?" পরাণে একগাল হাসিয়া বলিল, "আর দাদঠাকুর, আপনার কেরপায় পরাণ গতিক সব এক পেরকার ভাল্‌ই যাচ্চেন, গোটাকত বিলিতি আমড়া রেকেচি দাদ্‌ঠাকুর, ও বেলা ওখন দে আসব'খন। এখন তুমিই তো ভসচায হয়েচ, আর ত কেউ রা করবে না?"

অম্বরনাথের চিত্তে ঈষৎ বেদনা লাগিল। অতিরিক্ত ক্ষমতার প্রয়োগ মানুষকে মানুষের বিরুদ্ধে এই রকমে উত্তেজিত করিয়া রাখে যে, সেই ক্ষমতা নিজ হস্তে প্রাপ্ত হইলেই সে বিদ্রোহ-ঘোষণা করিতে এতটুকুও বিলম্ব করে না। সে বিষণ্ণ-মুখে কহিল "না পরাণ, গুরুর কাছে যা' একদিন স্বীকার করেছি, তা আর এ জন্মে ভাঙ্‌তে পারব না। তুই কিছু মনে করিস্‌নে বাপু।" পরাণ কিছু দুঃখিত হইয়া বলিল, "আমি আবার কি মনে করব, দাদাঠাকুর! আমরা হলুম বোকা সোকা মানুষ। তোমাদের যাতে ধম্মে দাগ পড়ে, তা কি তোমরা খাতিরে প'ড়ে করতে পার!"

সে ডিঙ্গির খোল হইতে মৎস্যোত্তোলন-কার্য্যে মনোযোগ প্রদান করিয়া নিজের বেদনার রেখা অম্বরনাথের নিকট হইতে গোপন করিবার চেষ্টায় বলিয়া উঠিল, "আজ দুটো ইলসে জালে পড়েচে। আর এই দেখনা পাতচিংড়ি, কলাপাতায় ভাগা দিয়ে পয়সা পাচেকে বিক্কিরি করলেও আক্কারা দেওয়া হবে না।" অম্বর ধীরে ধীরে চলিয়া আসিল।

নদীতীরে কাহারও বাড়ী নাই। যতদূর দৃষ্টি চলে শ্যামল-সবুজ তীর-ভূমে দূর-বিস্তৃত শস্যক্ষেত্র-সীমায় বিবিধ [illegible]তরু ও লতাগুল্মের প্রকৃতি-রচিত চারু কুঞ্জবন। শস্যক্ষেত্রে ধান্য ফলিয়া উঠিতেছে; নবীন শীর্ষগুলি মন্দ বাতাসে ক্রীড়াশীল সুকুমার শিশুগুলির মত নৃত্য করিতেছে। বাধাহীন বিস্তৃত মাঠের সুদূর সীমানায় কৃষকপল্লীর ছোট কুটীরগুলি অমল রৌদ্রস্নাত হইয়া অতি সুন্দর দেখাইতেছিল। এক স্থানে একটা পৌরাণিক বটবৃক্ষ বৃহৎ জটাভার চারিদিকে বিস্তৃত করিয়া দিয়া তপস্যা-পরায়ণ সন্ন্যাসীর মত দূর অনন্তে নিস্তব্ধ দৃষ্টি সংযত করিয়া অনন্ত শক্তির ধারণায় নিবিষ্ট হইয়া আছে। তাহার পদতলে কত লতা, কত গুল্ম, কত তরু জন্মিল, কত সুখ-দুঃখের অভিনয়-স্মৃতি তাহার সবল বক্ষে মুদ্রিত করিয়া দিয়া কাল-সমুদ্রের তরঙ্গ সঙ্গে মিশিয়া লয় হইয়া গেল। গতিশীল জগৎ নিজের গতিপথে বিচরণ করিতেছে; প্রতিপদে সে জীবনের অনিত্যতার গান গাহিয়া চলিয়াছে। ইহার মাঝখানে নিত্য বস্তুর শরণাগত অভয়-মন্ত্রে দীক্ষিত জীবন্মুক্ত সাধকের মত সে অটল, অচল দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

অম্বরনাথ চিন্তিতহৃদয়ে এই বটমূলে আসিয়া দাঁড়াইল। গাছের উপরে শালিক, দোয়েল, বুলবুলি আনন্দ কলরব করিতেছিল। কেহ রাঙ্গা ফলে ঠোকর দিতেছে, কেহ সন্তানের চঞ্চুর মধ্যে চঞ্চু প্রবেশ করাইয়া আহার্য্য প্রদান করিতেছে, কেহ কেবল গান গাহিয়া ডালে ডালে নাচিয়া বেড়াইতেছে, কোন পক্ষিদম্পতি অস্ফুট কূজনে সুখ-বিহ্বল—যেন এক বৃহৎ সমাজভুক্ত আত্মীয়-ভাবাপন্ন সুখী পরিবার।

অম্বর চারিদিকে চাহিয়া চাহিয়া একটা নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিল। সে আজ পূজা করিতে গিয়া যাহা দেখিয়া আসিয়াছে, কিছুতেই সে দৃশ্য মন হইতে সরাইয়া ফেলিতে পারিতেছে না। কেবলই তাহার ব্যাকুল চিত্তে এই অমীমাংসিত প্রশ্ন উঠিতেছিল, "দেবতার নামে এ ঐশ্বর্য্যের খেলা কেন? ইহাতে কি দেবতা প্রসন্ন হইতেছেন?"

সেই ইন্দ্রপুরী-তুল্য দেবমন্দিরের ছবি ও সহরের ভিতরকার বুভুক্ষা-পীড়িত দীন দরিদ্রের ভগ্নকুটীর তাহার মনোদর্পণে ফুটিয়া উঠিয়া পরস্পরের সহিত উপমিত করিতেছিল; আর তাহার হৃদয় বিষাদে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল। দেব-মন্দিরে ঐ নৃপৈশ্বর্য্য, আর ও-দিকে দারিদ্র্য কত মানব-সন্তানের বক্ষঃশোণিত শুষিয়া পান করিতেছে। সেখানে কি তবে দেবতা নাই? হা নাথ! তুমি কি মন্দিরেশ্বর! বিশ্বেশ্বর কি তুমি নও?

বেলা বাড়িতেছিল। বৃক্ষপত্রের ব্যবধান-পথে প্রথম শরতের পীতাভ রৌদ্র, খণ্ড খণ্ড চন্দ্রকান্ত মণির মত জ্বলিতে আরম্ভ করিল। কৃষাণেরা মুড়ি মুড়কি খাওয়া শেষ করিয়া নদীর ঘাটে জলপান করিতে আসিয়া তাহাকে

'প্রেরণাম হইগো ভস্‌চায মশাই' বলিয়া কেহ সাষ্টাঙ্গে, কেহ কেবলমাত্র উত্তমাঙ্গ দ্বারা ভূমে প্রণাম রাখিয়া গেল। একজন কেবল একটু কাছে আসিয়া বলিল, "তুমি ভসচাগ্যির জায়গা পেয়েচ বলে আদ্দি-ঠাকুর বড্ড রেগেচে, বলেচে, দেখি কত বড় সাগ্যি যে আমার হক্কের ধন কেড়ে খায়, ওকে খান-ছাড়া, মানছাড়া করব, তবে আমার নাম আগ্নিনাথ। আমাদের এসব কথায় কাজ কি ঠাকুর! তবে কথাটা শুনমু, তোমায় জানিয়ে গেমু; হুঁস চাক্‌ রেখো। ও সব্বনেশে নোক, সব কর্‌তে পারে।" (ক্রমশঃ)

শ্রীঅনুরূপা দেবী।

ছিন্নহস্ত।

(শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত।)

[পূর্ব্বপ্রকাশের সার-সঙ্কলন :—মসিয়ে ভর্‌জারস একটি ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষ—বিপত্নীক। তাঁহার একমাত্র কন্যাসন্তান এলিস্‌কে তিনি প্রাণের সহিত ভালবাসেন। কন্যার প্রীত্যর্থে প্রতি বুধবারে তিনি বাড়ীতে প্রীতি-ভোজ দিতেন। কয়েকটি ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ও অন্তরঙ্গ বন্ধু ব্যতীত বেশী লোকের নিমন্ত্রণ হইত না। ভ্রাতুষ্পুত্র ম্যাক্সিমও নিমন্ত্রিত হইতেন। খাজাঞ্চী ভিগ্‌নরী ও সেক্রেটারী রবার্টও বাদ যাইতেন না। যে বাটীতে ব্যাঙ্কারের বাস, তাহারই প্রাঙ্গণের অপরপার্শ্বে, রাজপথের সন্নিহিত দ্বিতলে, কার্য্যালয়। সেক্রেটারী রবার্টও সেই বাড়ীতেই থাকিতেন। নবেম্বর মাস, বুধবার, শীত-জর্জ্জর রজনী—তখন প্রবলবেগে বৃষ্টি পড়িতেছিল। ভিগ্‌নরী ও মাক্সিম ব্যাঙ্কারের নিমন্ত্রণসভায় যোগদান করিবার উদ্দেশ্যে সদরদ্বার দিয়া প্রবেশ করিতে যাইতেছেন, এমন সময় আফিস ঘরে আলো জ্বলিতে দেখিয়া উভয়ে কুতূহলী হইলেন। ঘণ্টার দড়ি ধরিয়া টানিবা-মাত্র দ্বার মুক্ত হইল। ভিতরে দুই ব্যক্তি যেন দ্বার মুক্ত হইবার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন—তোরণদ্বার উদ্‌ঘাটিত হইবামাত্র তাঁহারা দ্রুতবেগে বাহিরে চলিয়া গেলেন। উভয়েই সুবেশ- বোধ হয় নিমন্ত্রণ-সভা হইতে উঠিয়া আসিয়াছিলেন। ভিতরে প্রবেশ করিয়া বৃদ্ধ দ্বারবান ভেন্‌লিভান্তকে নিদ্রিত এবং ম্যালিকম্‌কে অনুপস্থিত দেখিয়া ভিগ্‌নরী বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া আফিস্‌ ঘরটি দেখিতে গেলেন—বন্ধু ম্যাক্সিম্‌ও সঙ্গে চলিলেন। গিয়া দেখেন ঘরগুলির দরজা মুক্ত! এখন খাজাঞ্চিখানার সিন্দুকটির নির্ম্মাণকৌশল এমনই বিচিত্র যে, চাবি খুলিবার চেষ্টা করিলেই দুই পার্শ্ব হইতে দুইটি লৌহ হস্ত চোরের মণিবন্ধ দৃঢ়ভাবে ধারণ করে—তাহার নিষ্কৃতিলাভ অসম্ভব। উপস্থিত ক্ষেত্রে বন্ধুদ্বয় সিন্দুকের নিকট গিয়া দেখেন, যে মণিমাণিক্যখচিত স্বর্ণ ব্রেসলেট্‌ পরিহিত সদ্য-ছিন্ন একখানি স্ত্রীলোকের বামহস্ত উক্ত যন্ত্রে সংবদ্ধ!

ম্যাক্সিম্‌ বাল্যকাল হইতেই ডিটেক্‌টিভের কার্য্যে অনুরক্ত। সে এই ছিন্ন-হস্ত দেখিয়া বুঝিল যে ব্রেস্‌লেট্‌ধারিণী বিদেশিনী এবং যে সমাজে তাহারা মিশিয়া থাকে, তাহারই অন্তর্ভুক্ত। উপস্থিত কঠোর সমস্যা সমাধানে তাহার ডিটেক্‌টিভ্‌ বুদ্ধির পরিচয় দিবার সুযোগ পাইয়া, সে ভিগ্‌নরীকে এই ঘটনার কথা তৃতীয় ব্যক্তির কর্ণগোচর করিতে নিষেধ করিয়া এবং সিন্দুক খুলিবার যে সাঙ্কেতিক শব্দটি ছিল তাহা পরিবর্ত্তন করাইয়া দিল। তৎপরে রক্ত ধৌত করিয়া ছিন্নহস্তটি একখানি কাগজে মুড়িয়া ব্রেস্‌লেট্‌সহ নিজের পকেটে রাখিয়া উভয়ে সন্তর্পণে গৃহত্যাগ করিল।]

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

মসিয়ে ভরজারস দরিদ্রের সন্তান; কিন্তু অধ্যবসায়বলে তিনি মেষপালক হইতে ক্রমশঃ অবস্থার উন্নত শিখরে আরোহণ করিয়াছেন। সংসারে কন্যা এলিস্‌ ব্যতীত তাঁহার আর কেহ ছিল না। ভ্রাতুষ্পুত্র ম্যাক্সিম্‌ পিতৃব্যভবনে থাকিতেন না। তিনি স্বেচ্ছামত আমোদ-প্রমোদে কালযাপন করিতেন। বৃদ্ধ ভরজারস বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু ম্যাক্সিম্‌ কাহারও উপদেশ গ্রাহ্য করিতেন না। তিনি পিতৃপরিত্যক্ত অগাধ সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। ঘোড়দৌড়, ক্লব ও থিয়েটারে তিনি জলের মত অর্থব্যয় করিতেন। পিতা ও জ্যেষ্ঠতাতের ন্যায় হিসাবী ও মিতাচারী না হইলেও, ম্যাক্সিম্‌ সাহসী, সরল ও সত্যবাদী। প্রতারণা, ছলনা প্রভৃতি নীচতা তাঁহার চরিত্রে আদৌ লক্ষিত হইত না।

পূর্ব্বপরিচ্ছেদে বর্ণিত ঘটনার পরদিবস প্রভাতে পিতা ও পুত্রী বসিয়া গল্প করিতেছিলেন। তাঁহাদের কাহারও মুখে বিষাদের লেশমাত্র চিহ্ন ছিল না। উভয়েরই আননে প্রসন্ন পবিত্রতা। এলিসের মনে হইতেছিল, তাঁহার চারি পার্শ্বে পৃথিবী আজ কি আলোক, কি সুধা বর্ষণ করিতেছে! তাঁহার জীবনাকাশে কোনদিন এতটুকু মেঘের সঞ্চার হয় নাই। স্বচ্ছ ও নির্ম্মল উৎসের ন্যায় তাঁহার জীবনপ্রবাহ অপ্রতিহত গতিতে উৎসারিত হইতেছিল। যুবতীর সুনীল আকর্ণবিশ্রান্ত নয়নযুগলে প্রীতি ও স্নেহ উছলিয়া উঠিতেছিল।

মৃণালধবল বাহুলতায় পিতার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া যুবতী তাঁহার গণ্ডে সস্নেহে চুম্বন করিলেন।

পিতা বলিলেন, "মা, তুই কি দাঁড়াইয়াই থাকবি? চেয়ারে ব'স্‌। এখন ত আর তুই ছেলেমানুষটি ন'স্‌; উনিশ বৎসর পার হয়ে গেছে!"

"হাঁ বাবা, সত্যই আমি সে কথা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। আমি তোমার কোলে বসিতে যাইতেছিলাম।"

"কি বোকা মেয়ে!"

"বাবা, আমি মনে করিলে খুব গম্ভীর ও শিষ্ট শান্ত হইতে পারি।"

"এত বুদ্ধি হয়েছে? তোর যে এখন বিয়ের বয়স হয়েছে, তা ভুলে গেছিস?"

এলিস্ এবার পিতার কথায় উত্তর করিলেন না। পিতার সম্মুখের আসনে বসিয়া তিনি অর্দ্ধসিদ্ধ ডিমগুলি সাজাইয়া রাখিতে লাগিলেন। বৃদ্ধ অপাঙ্গে কন্যার মুখপানে চাহিলেন। সুন্দরীর আননে লজ্জার আরক্তিম আভা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। পিতা সহাস্যে বলিলেন, "এখন বিবেচনা করিবার সময় আসিয়াছে, চিরকুমারী হইয়া থাকিলে ত চলিবে না।"

নত নয়ন না তুলিয়াই এলিস্ বলিলেন, "তোমাকে ছাড়িয়া আমি কোথাও যাইতে পারিব না।"

"আমাকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে, কে তোকে বলিতেছে? জামাতাকে কি প্যারীস নগরী ছাড়িয়া তোমায় অন্যত্র লইয়া যাইতে দিব? এমন জামাই আমি নির্ব্বাচিত করিব না।"

"আমারও তাই বিশ্বাস, বাবা!"

কৌতুক দেখিবার জন্য মসিয়ে ভরজারস বলিলেন, "অনেকের ইচ্ছা, তোমাকে পত্নীরূপে লাভ করেন। এক জন রুস ধনী সেদিন আমার কাছে এ প্রস্তাব করিয়াছিলেন।"

"কেন আমায় বিদ্রূপ ক'র্‌ছ, বাবা!"

"ঠাট্টা নয় মা, আমি ঠিক কথাই ব'লেছি। কর্ণেল বোরিসফ্ খুব ধনী। সেদিন তিনি পনর লক্ষ টাকা আমার ব্যাঙ্কে জমা দিয়েছেন। খুব সম্ভ্রান্ত বংশ, যুবা বয়স। চেহারাও সুন্দর। তোর প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়িয়াছে। তোর মত হইলে তিনি এখনই তোকে বিবাহ করিতে সম্মত।

"যদি তুমি ইহাতে মত দাও, তা হ'লে বাবা আমি এখনই বাঁচিব না।"

হাসিতে হাসিতে পিতা বলিলেন, "সত্য বল্‌ছিস্ মা? আচ্ছা, তা হ'লে আমারও এ বিবাহে মত নাই। তোর ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি কোনও কাজ করিব না। আমার ইচ্ছা নয়, তুই আমায় ছেড়ে বিদেশে যা'স। তা আমি হতে দেব না।"

গ্রীবা উন্নত করিয়া এলিস্ বলিলেন, "ধন্যবাদ, বাবা!"

বৃদ্ধ বলিলেন, "বিবাহের কোনও প্রস্তাব আসিলে আমি আমার সর্ত্তের কথা বলিব। এই বৃহৎ অট্টালিকায় আমার কন্যা জামাতার যথেষ্ট স্থান সংকুলান হইবে।"

"আঃ! সে কত সুখের হবে, বাবা!"

"তা হ'লে তোর বিবাহে আর কোনও আপত্তি নাই?"

"সে কথা—"

"হাঁ, বুঝিয়াছি, যদি পাত্র মনোমত হয়। আচ্ছা, তোর কি রকম পছন্দ বল্‌ত! আমি এক রকম মনে মনে ঠিক ক'রে রাখিয়াছি। দেখি, তোর সঙ্গে মেলে কি না। পাত্রটি যুবক হইবে—কেমন?

"বেশী অল্পবয়স্ক নয়।"

"হাঁ, এই পচিশ হইতে ত্রিশের মধ্যে বয়স। কেমন ঠিক? আচ্ছা, বেশ। আমারও ঐরূপ অভিপ্রায়। পাত্রটি দেখিতে সুপুরুষ হইবে।"

"ভদ্রলোকের মত চেহারা হইলেই চলিবে, বাবা; তাহাতেই আমি তৃপ্ত হইব। বুদ্ধিমান ও দয়ার্দ্রচেতা হওয়া চাই।"

"এ পর্য্যন্ত তোর সঙ্গে আমার মতের খুব মিল আছে। এখন আর্থিক অবস্থা।"

"খুব ধনবান্ হউক্, এমন আমি চাহি না।"

"আমারও তাই মত। তবে ধনোপার্জ্জনের শক্তি তাহার থাকা দরকার।"

"তোমার কথা আমি ঠিক বুঝ্‌তে পারিতেছি না, বাবা!"

"শোন্ মা, আমি বল্‌ছি। তোর জননীকে যখন আমি বিবাহ করিয়াছিলাম, তখন আমার এক পয়সাও ছিল না। তিনি বিবাহে অনেক অর্থ যৌতুক পাইয়াছিলেন। তিনি জানিতেন, তাঁহার স্বামী শ্রমসহিষ্ণু ও পরিণামে স্বাধীনভাবে জীবিকার্জ্জনে সমর্থ হইবে। এ বিষয়ে তিনি ভুল করেন নাই।"

"তুমি কি মনে কর, বাবা, আমি কোনও অলস অকর্ম্মণ্য ব্যক্তিকে স্বামিত্বে বরণ করিব?"

"না আমার রক্ত যখন তোর শিরায় শিরায় বহিতেছে, তখন এমন বোকা তোকে আমি মনে করি না। আচ্ছা, আমার অধীন কোনও কর্ম্মচারী যদি তোর পাণিগ্রহণ

করে, তাতে তোর কোনও আপত্তি নাই ? ভবিষ্যতে সে আমার ব্যবসায়ের অংশী হইতে পারিবে।"

এলিস্ অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "তার চেয়ে সুখী আমি আর কিছুতেই হইব না।"

বৃদ্ধ ব্যাঙ্কার ঈষৎহাস্যে বলিলেন, "একটি পাত্র আমার সন্ধানে আছে, দেখিতেছি; তাহাতে তোর ও আমার কাহারও অমত নাই। তাহাকে অত্যন্ত বিশ্বাস করি এবং ভালবাসি। সে ভবিষ্যতে উন্নতি করিবে। তাহার নাম বলিব কি ?"

আনন্দ সংবরণ করিতে না পারিয়া যুবতী সোৎসাহে বলিলেন "রবার্ট ! তোমার সেক্রেটারী মসিয়ে রবার্ট কার্নোয়েল !"

ভ্রূকুটি করিয়া বৃদ্ধ বলিলেন, "কি ! তুই কি মনে ভাবিয়াছিস, আমি কারনোয়েলের কথা বলিতেছি ?"

এলিসের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। নতদৃষ্টিতে নীরবে সে মাটীর দিকে চাহিয়া রহিল। মসিয়ে ভরজারসের পরিবর্তনের চিহ্ন প্রকটিত হইল। কঠোরস্বরে তিনি বলিলেন, "তুমি কিসে বুঝিলে, আমি রবার্টের কথা বলিতেছিলাম ?"

"তিনি কি তোমার কর্ম্মচারী নন ? তুমি পূর্ব্বে আমাকে বল নাই যে, তিনি তোমার বিশেষ বিশ্বাসভাজন ? বিবাহের পূর্ব্বে তুমি যেমন দরিদ্র, পরিশ্রমী ও অভিমানী ছিলে, তাঁহার অবস্থাও কি সেইরূপ নহে ?"

উপেক্ষাভরে পিতা বলিলেন, "হাঁ মসিয়ে কারনোয়েলের এ সকল গুণ আছে, স্বীকার করি; কিন্তু তুমি কিসে বুঝিলে, আমি তাহাকে আমার ব্যবসায়ের অংশী ও জামাতৃপদে বরণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি ?"

এলিস্ বলিলেন, "কন্যার সুখের বিষয় লইয়া যে তুমি বিদ্রূপ করিবে, আমিই বা জানিব কি প্রকারে ?"

"আমি উপহাস করি নাই।"

"তুমি তা হ'লে অন্তরের সহিত বলিতেছিলে; কিন্তু তোমার লক্ষ্য কাহার উপর ?"

"সে আর একটি লোক। এখন আমার কথা শোন। কারনোয়েলকে আমি কি অবস্থায় আমার আশ্রয়ে আনিয়াছিলাম, তাহা তোমার অবিদিত নাই। তাহার পিতা জুয়াখেলায় সর্ব্বস্ব হারাইয়া মারা যান। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি আমার ব্যাঙ্কে অনেক টাকা জমা রাখিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর রবার্টের নিরাশ্রয় অবস্থা দেখিয়া আমার দয়া হয়। তাহাকে সামান্য বেতনে একটা চাকরী দিলাম। সে সানন্দে তাহাই গ্রহণ করিল। সে সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান। অভিজাত সম্প্রদায়ে কায়িক পরিশ্রমে বিমুখ; কিন্তু রবার্ট যেরূপ পরিশ্রম করিয়া জীবিকার্জ্জন করিতেছে, তাহাতে আমি তাহার যথেষ্ট প্রশংসা করি। আমি নানাপ্রকারে তাহাকে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। সে পরম বিশ্বাসভাজন ও পরিশ্রমী; কিন্তু আমি তাহার উন্নতিকল্পে যত সাহায্যই করি না কেন, সে কোনও কালে ভাল ব্যবসায়ী হইতে পারিবে না।"

যুবতী মৃদুস্বরে বলিলেন, "কেন, বাবা ?"

"অভিজাত-বংশে তাহার জন্ম। চিরকাল আভিজাত্য গর্ব্ব তাহার মধ্যে বিদ্যমান থাকিবে। বাণিজ্য বা ব্যবসায়বুদ্ধি বংশগত। আমার মধ্যে তাহা আছে, কারণ আমি সাধারণ মানুষ। দুঃখ, কষ্ট ও দারিদ্র্যেই আমি লালিত ও বর্দ্ধিত হইয়াছি। অনাহারে শীতে কত কষ্টই না আমি পাইয়াছি। কিন্তু রবার্ট বিলাসেই লালিত পালিত হইয়াছে। সম্প্রতি সে অর্থের মহিমা বুঝিতে শিখিয়াছে মাত্র।"

"সংসারে উন্নতিলাভ করিবার জন্য তিনি যেরূপ পরিশ্রম করিতেছেন, তাহাতে কি তাঁহার গুণের প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় না ?"

"সেকথা আমি স্বীকার করি। কিন্তু শুধু গুণ থাকিলেই ধনবান্ হওয়া যায় না। তাহার অন্তঃকরণ মহৎ, ব্যবহার দোষশূন্য। আমি তাহাকে আমার অন্তঃপুরে অনায়াসে যাতায়াত করিতে দিতে পারি। অন্যান্য বিষয়েও সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারি; কিন্তু আমার ব্যবসায়ের পরিচালনে আমি তাহাকে বিশ্বাস করিতে পারি না! অবশ্য তাহার সাধুতায় আমার বিন্দুমাত্র অবিশ্বাস নাই; কিন্তু সে যে বংশের সন্তান, সে বংশে ব্যবসায়বুদ্ধি থাকিতে পারে না।"

এলিস্ আর উত্তর করিলেন না। প্রবাহিতপ্রায় অশ্রুস্রোত রুদ্ধ করিবার জন্য তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছিলেন। মসিয়ে ভরজারসও কন্যার ভাবান্তর দর্শনে

বিচলিত হইয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, "তোমার ক্ষুধা আজ কোথায় গেল? আজ কিছুই খাইতেছ না কেন, অসুখ ক'রেছে?"

"না; আজ আমার ক্ষুধা নাই!"

"সে আমারই দোষ, মা, বিবাহের কথা না তুলিলেই হইত। এখন তাড়াতাড়ি ত নাই। যাক্, ও কথা আর তুলিব না। একটা কথা তোমায় বলিয়া রাখি, মা। কোনও বনেদী বংশে তোমার বিবাহ হইলে আমি বড়ই দুঃখিত হইব। আমরা যে অবস্থার লোক, তাহার উর্দ্ধে আমাদের দৃষ্টিপাত করা উচিত নয়। এটি আমার কুসংস্কার হইতে পারে; কিন্তু কি করিব, মা, এখন বড়া হইয়াছি; এ বয়সে সে দোষ আর সংশোধিত হইবার নহে। ব্যবসায়-বুদ্ধিবিশিষ্ট, ব্যবসায়িশ্রেণীর কোনও যুবক আমার জামাতা হন, ইহাই আমার মনের ইচ্ছা। আমি কৃষকপুত্র। রবার্ট মার্কুইসের সন্তান। তাহাতে ও আমাতে সামাজিক ব্যবধান অনেক বেশী। এ বিষয়ে আমি আর কখনও আলোচনা করিব না। এখন মা আমার, তুমি প্রসন্নচিত্তে, হাসিমুখে এই আঙ্গুরগুলি খাও। শুধু তোমার জন্যই অনেক দূর হইতে আনাইয়াছি।"

এলিস্ আর সহ্য করিতে পারিল না। বুক ভাঙ্গিয়া ক্রন্দন যেন বাহিরে ছুটিয়া আসিতে চাহিল। এমন সময় দরজা খুলিয়া গেল। রবার্ট কারনোয়েল কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। কোনও গুরুতর কারণ না থাকিলে তিনি পিতাপুত্রীর কথোপকথনে বাধা জন্মাইতে আসিতেন না। এলিস্কে অভিনন্দন করিয়া তিনি ভরজারসের দিকে অগ্রসর হইলেন। এলিস্ প্রেমাস্পদের দিকে একবার চাহিলেন মাত্র। দৃষ্টি যেন বলিতেছিল, "সব শেষ; আর আশা নাই!"

এলিসের দৃষ্টি যেন বলিতেছিল "সব শেষ, আর আশা নাই।"

যুবকের মুখমণ্ডল সহসা বিবর্ণ হইয়া গেল। তিনি মুহূর্ত্তমাত্র স্তম্ভিত ভাবে দাঁড়াইলেন।

বৃদ্ধ স্নেহশূন্যস্বরে বলিলেন, "কি সংবাদ, মসিয়ে?"

অন্য সময় তিনি যুবককে রবার্ট বলিয়াই সম্বোধন করিতেন। 'মসিয়ে' সম্ভাষণে যুবক চমকিয়া উঠিলেন! তিনি বুঝিলেন, কিছু ঘটিয়াছে।

আবেগ দমন করিয়া বরার্ট বলিলেন, "কর্ণেল বোরিসফ্ এসেছেন।"

"আমি এখন কাজে ব্যস্ত আছি, তিনি কিছুকাল অপেক্ষা করুন।"

"আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম; কিন্তু তিনি এখনই আপনার সহিত দেখা করিবার জন্য এরূপ ব্যস্ততা প্রকাশ করিতে লাগিলেন যে, আমি অগত্যা আপনাকে জানাইতে বাধ্য হইয়াছি।"

ভরজারস বুঝিলেন, রবার্টকে অতটা উগ্রভাবে কথা বলা সঙ্গত হয় নাই।

তখন সস্নেহে কোমলকণ্ঠে তিনি বলিলেন, আমায় ক্ষমা কর, কর্ণেল বোরিসফ্ এ সময়ে আমায় বিরক্ত করায় তোমার কোনও দোষ নাই। আচ্ছা বল গে, আমি এখনই যাইতেছি।

যুবক অভিবাদনানন্তর প্রস্থান করিলেন।

মসিয়ে ভর্জারস কন্যার ললাটতলে স্নেহভরে চুম্বন করিয়া বলিলেন, "মা, মলিনমুখে থাকিও না। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবে, তোমার বাবা শুধু তোমার মঙ্গলের,—তোমার সুখেরই কামনা করেন, তাঁহার অন্য কোনও অভিসন্ধি নাই!"

আবেগে এলিসের কণ্ঠ শুষ্ক হইল, তিনি বিনা বাক্যব্যয়ে কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

বৃদ্ধ তখন আপনা-আপনি বলিলেন, "আজ বিবাহের প্রসঙ্গ উঠাতেই এলিসের গুপ্ত প্রেমের কথা জানিতে পারিলাম। ভালই হইয়াছে, গোড়াতেই তাহার এই স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে। বিলম্বে জানিতে পারিলে পরিণাম শোচনীয় হইত। যাক্, ভালই হইয়াছে।"

মসিয়ে ভর্জারস তখন স্বীয় আফিস-ঘরে প্রবেশ করিলেন। উহারই পার্শ্বস্থ কক্ষে রবার্ট কাজ করেন। মধ্যে একটা কাপড়ের পর্দ্দামাত্র ব্যবধান। ভর্জারস রবার্টকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতেন। ব্যবসায়ের কোনও গুপ্ত কথা তাঁহার দ্বারা প্রকাশিত হইবে না, এ বিশ্বাস বৃদ্ধের বিলক্ষণ ছিল।

যুবক স্বীয় আসনে বসিয়া কাজ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, এমন সময় মসিয়ে ভর্জারস কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। কর্ণেল বোরিসফ্ সেই ঘরেই তাঁহার অপেক্ষা করিতেছিলেন। বৃদ্ধকে দেখিবামাত্র তিনি বলিলেন, 'নমস্কার মহাশয়! আপনার আহারে বাধা দিয়া বড়ই অন্যায় কাজ করিয়াছি। আপনার কন্যা কেমন আছেন? তাঁকে কোনও রকমে অসন্তুষ্ট করা আমার ইচ্ছা নয়।"

"ধন্যবাদ! আমার কন্যা আজ একটু অসুস্থ। এখন কি প্রয়োজনে মহাশয়ের শুভাগমন হইয়াছে?

"এইমাত্র একখানি জরুরী সরকারী টেলিগ্রাম পাইলাম। আগামী কল্য আমাকে প্যারীস ত্যাগ করিতেই হইবে। আপনার কাছে আমার কিছু টাকা গচ্ছিত—"

"টাকা তুলিয়া লইতে চান? বিনা সংবাদে অনেক টাকা এক সঙ্গে দিবার নিয়ম নাই, কিন্তু আপনার কথা স্বতন্ত্র। আমি এখনই সব ঠিক করিয়া দিতেছি।"

"না না; টাকার জন্য আমি আসি নাই। টাকা আপনার কাছে থা'ক্। আপনার সিন্দুকে আমার যে অলঙ্কারের বাক্সটি আছে, উহার মধ্যে আমার অনেক মূল্যবান্ দলীলাদি আছে, প্যারীস ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে আমি সেই কাগজগুলি লইয়া যাইতে চাই।"

"এখনই আমি বাক্সটি আনাইয়া দিতেছি।"

"না না; আজই দরকার নাই। এখন আমি বড় ব্যস্ত। কাল ব্যাঙ্ক খুলিলে আমি উহা লইয়া যাইব। তখন কএক সহস্র টাকাও আমার দরকার হইবে।"

"আমার কাছে এখন অপনার ১৪ লক্ষ টাকা জমা আছে। প্রয়োজন হইলে সব টাকা লইয়া যাইতে পারেন। অন্যদিন আমাদের তহবিলে খরচপত্রের মত টাকা থাকে; কিন্তু আজ সকালে কোনও কার্য্যবশতঃ আমি 'ফ্রান্স' ব্যাঙ্ক হইতে চৌত্রিশ লক্ষ টাকা আনাইয়া রাখিয়াছি। টাকাটা আমার সিন্দুকেই আছে।"

বৃদ্ধের কথা শেষ হইতে না হইতেই রবার্ট একতাড়া চিঠি লইয়া মসিয়ে ভর্জারসের টেবিলের উপর সাজাইয়া রাখিবার জন্য ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রত্যহ এই সময়ে তিনি এই কাজ করেন। তাঁহার মুখমণ্ডল বিবর্ণ। কর্ণেল তাহা লক্ষ্য করিলেন। মৃদুস্বরে তিনি ভর্জারসকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই যুবকটি কে? উহাকে ভয়ানক বিচলিত দেখিতেছি।"

মসিয়ে ভর্জারস সে কথার উত্তর করিলেন না। বোরিসফের আর কোনও কাজ ছিল না। তিনি বিদায় লইলেন। ভর্জারস রবার্টকে ডাকিয়া বলিলেন, 'তোমার সহিত কথা আছে।

বৃদ্ধ চূড়ান্ত মীমাংসা করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন. বলিলেন, "বোধ হয়, দুই বৎসর তুমি আমার কাজ করিতেছ?"

যুবক এইরূপ প্রশ্নে বিস্মিত হইয়া বলিলেন, হাঁ মহাশয়!

"এই সময়ের মধ্যে আমি তোমার প্রতি কোনরূপ মন্দ ব্যবহার করিয়াছি কি?"

"কখনও না। আপনার দয়ার জন্য আমি ৃতজ্ঞ।"

"সেই সদয় ব্যবহারের পুরস্কারস্বরূপ কি আমার কন্যার ্হিত প্রেমচর্চ্চা আরম্ভ করিয়াছ ?"

রবার্ট চমকিয়া উঠিলেন। তিনি সহসা এরূপভাবে াক্রান্ত হইবেন, ভাবেন নাই।

"অস্বীকার করিও না। এলিস্ আমার নিকট সমস্ত াকাশ করিয়াছে।"

বিস্মিত যুবক কোনও উত্তর করিলেন না। পাছে িনি আত্মসংবরণ করিতে না পারেন, এ জন্য তিনি হসা কোনও কথা কহিতে পারিলেন না। অবশেষে ষ্টে তিনি বলিলেন, "লুকাইবার আমার কিছুই নাই হাশয়! আমি এমন কোনও অন্যায় কাজ করি নাই , তাহা গোপন করিব; কিন্তু আপনি যে ভাষা প্রয়োগ রিয়াছেন, তাহাতে আমার যথেষ্ট আপত্তি আছে। ামি আপনার কন্যার মনোরঞ্জনের চেষ্টা করি নাই। নবানের কন্যা সম্বন্ধে এরূপ ভাষা প্রয়োগ করিলে, যে কানও ভদ্রসন্তানের অপমান করা হয়।"

"কথার অর্থ লইয়া অত মারামারি করিবার কোনও ায়োজন নাই। সরলভাবে সমস্ত খুলিয়া বল। তুমি লিস্কে ভালবাস ?"

অসঙ্কোচে যুবক বলিলেন, "বাসি।"

"তুমি স্বীকার করিতেছ ?"

"কেন স্বীকার করিব না মহাশয়।"

"হয় ত তুমি ভাবিয়াছ, এলিস্ও তোমাকে ভালবাসে ?" আপনি কি তাঁহাকে এ কথা জিজ্ঞাসা করেন নাই ? ...ই ত আপনি বলিলেন যে, তিনি অপনাকে সব কথা ...য়াছেন।"

মসিয়ে ভরজারস সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়া বলিলেন, ...দিন তুমি এ কথা আমায় জানাও নাই কেন ? ... ত জানিবার অধিকার আছে। যাক্, যাহা হইবার ... গিয়াছে, এখন বর্ত্তমান অবস্থায় কি করা কর্ত্তব্য, ... তাই বলিতেছি। ব্যাপার এইখানেই যাহাতে শেষ য়, আর বেশী দূর না গড়ায়, এখন তাই করিতে হইবে।"

...র্টের পাণ্ডুর মুখচ্ছবি এই কথায় আরও মলিন হইয়া গেল; কিন্তু তিনি অবিচলিতভাবে বৃদ্ধের রায় শুনিবার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

মসিয়ে ভরজারস বলিলেন, "আমার পূর্ব্ব হইতে সাবধান হওয়া উচিত ছিল। আমার কন্যা সুন্দরী ও যুবতী। তাহার ঐশ্বর্য্যের প্রলোভনে পড়িয়াই তুমি যে তাহাকে ভালবাসিয়াছ, অবশ্য তাহা আমার বিশ্বাস নহে। তুমি তাহাকে যথার্থই হয় ত ভালবাস। কিন্তু আমার অভিমত আমি স্পষ্ট করিয়া তোমাকে বলিব; রাখিয়া ঢাকিয়া বলিবার কোনও প্রয়োজন নাই। আমার কন্যার সহিত তোমার বিবাহ হওয়া অসম্ভব। অবশ্য, তোমার চরিত্রে কোনও দোষ আছে বলিয়া আমি যে অসম্মতি প্রকাশ করিতেছি, তাহা নয়। কি কারণে অসম্ভব, তাহা আমার কন্যাকে বুঝাইয়া দিয়াছি, সে বুঝিয়াছে। অযোগ্য পরিণয়ে পরিণামে কি বিষম ফল ফলিতে পারে, আজ আমি তাহাকে বলিয়াছি। সে পরিশেষে বুঝিয়াছে, সমান অবস্থার নারী ও পুরুষের পরিণয়েই দম্পতি সুখী হয়। আমি একজন ব্যবসায়িমাত্র। আমার কন্যা কোনও মার্কুইসকে বিবাহ করিলে নিতান্ত নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় দিবে।"

"যদি আমি অভিজাত বংশে জন্মগ্রহণ না করিতাম, তাহা হইলে এ বিবাহে কি আপনি আপত্তি করিতেন ? শূন্য খেতাবটা ত আমি স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করিয়াছি।"

"সে কথা আমি বলিতেছি না। তোমার একটি বিশেষ গুণের অভাব আছে। ব্যবসায়বুদ্ধি তোমার নাই। অবশ্য অন্য সদ্গুণ তোমার যথেষ্ট আছে; কিন্তু এ গুণটি নাই। চেষ্টা দ্বারা উহা আয়ত্ত করা যায় না। ব্যবসায়বুদ্ধি না থাকিলে আমার এত বড় কারবার পরিচালন করা অসম্ভব। আমি বুড়া হইতেছি; মৃত্যুর পূর্ব্বে এলিসের স্বামী আমার কারবার চালাইতে পারে, আমি দেখিয়া যাইতে চাই। আমার ভাবী জামাতা ধনবান্ হন, সে ইচ্ছাও আমার আছে; কিন্তু তাহাতেও বড় আসে যায় না। তাঁহার ধনোপার্জ্জনের শক্তি থাকিলেই আমি যথেষ্ট মনে করিব। আমি কথাটা স্পষ্ট করিয়া বলিলাম—আমায় ক্ষমা করিও, রাগ করিও না। আমার কন্যাকে এই কথাই আমি বলিয়াছি। আমি এখন তোমার কি উপকার করিতে পারি,

বল ; আমি সাধ্যমত তাহাই করিব। এ ঘটনার পর এখানে থাকা তোমার পক্ষে বড়ই কষ্টকর হইবে। আমারও ইচ্ছা, আপাততঃ দুই এক বৎসর তোমরা উভয়ে দূরে দূরেই থাক। আমার যথেষ্ট অর্থ আছে। মিশর দেশেও আমার কারবার চলিতেছে। আমার প্রতিনিধিস্বরূপ তুমি সেখানে যাও। তোমার বুদ্ধি ও অধ্যবসায় আছে, অবস্থার উন্নতি করিতে পারিবে। কেমন, তুমি স্বীকৃত আছ ?”

রবার্ট উঠিয়া দাঁড়াইলেন ; বলিলেন, “আমার ভবিষ্যতের জন্য আপনি চিন্তিত, এ জন্য আমি কৃতজ্ঞ। আপনার প্রস্তাব খুব লোভনীয় ; কিন্তু এ প্রস্তাবে সম্মত হইবার পূর্ব্বে আমি একবার কথাটা ভাবিয়া দেখিতে চাই।”

“প্রিয় রবার্ট, আচ্ছা, তুমি ভাল করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখ। আমি তোমার উন্নতির জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত। যাহাতে তোমার ভাল হয়, তুমি দেশের মধ্যে একজন হইতে পার, এ চেষ্টা আমার আছে। চিরকাল আমি তোমার বন্ধুই থাকিব। আজিকার এ মেঘ চিরদিন থাকিবে না।”

“কাল আমি আপনাকে উত্তর দিব। আজ আর এখন আমাকে কোনও প্রয়োজন আছে ?”

“না, আজ তুমি যেখানে ইচ্ছা যাইতে পার।”

যুবক অভিবাদন করিয়া কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

মসিয়ে ভরজারস স্বগত বলিলেন, “আহা, বেচারীর কষ্ট দেখিয়া দুঃখ হইতেছে! কিন্তু সত্য কথা প্রকাশ করিয়া বলাই ভাল। দু’দিন একটু কষ্ট পাইবে। তার পর সব ভুলিয়া যাইবে। এলিসের জন্যই ভাবনা বেশী। রবার্টকে চক্ষুর অন্তরাল করাই এখন দরকার। এ ঘটনার কথা এলিস্‌কে বলা হইবে না। বিবাহের প্রসঙ্গ এখন অনিষ্টকর হইবে। ভিগ্‌নরীর সঙ্গে তাহার বিবাহ দিতে হইবে। যে যে গুণ থাকিলে মানুষ উন্নতি করিতে পারে, ভিগ্‌নরীর সমস্তই আছে। এখন প্রত্যহ তাহাকে নিমন্ত্রণ করিব।”

এদিকে নৈরাশ্যপীড়িতহৃদয়ে রবার্ট স্বীয় কক্ষ হইতে নির্গত হইলেন। তাঁহার সাধের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। যে রমণীকে তিনি হৃদয়-মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া পূজা করিতে-ছিলেন, এ জীবনে তাহার সহিত মিলন অসম্ভব। পিতার অনভিমতে সে কখনও তাঁহাকে বিবাহ করিবে না। পিতার কথারও হয় ত সে প্রতিবাদ করে নাই। ভরজারসের কথার ভাবে রবার্ট বুঝিয়াছিলেন যে, পিতা পুত্রী এক-মত হইয়া কাজ করিতেছেন। জীবনে আর কোনও আশা নাই! কিন্তু রবার্ট সগর্ব্বে উন্নতশিরে বাহির হইলেন।

জুল্‌স্ ভিগ্‌নরী ব্যতীত তাঁহার ব্যথার ব্যথী আর কেহ ছিল না। তাহাকে তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করিতেন, ভালবাসিতেন। আজিকার এ দুঃসংবাদ তিনি তাহাকে না জানাইয়া থাকিতে পারেন না। রবার্ট বন্ধুর সন্ধানে তাঁহার আফিস-ঘরে প্রবেশ করিলেন।

“তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে ; শীঘ্র বাহিরে আইস।”

ভিগ্‌নরী লৌহ সিন্দুকে চাবী দিয়া দ্রুতপদে বন্ধুর অনু-বর্ত্তী হইলেন। “কি হয়েছে, ভাই ?”

“আমি এখান হইতে চলিয়া যাইতেছি, তাই বিদায় লইতে আসিলাম।”

“চলিয়া যাইতেছ ? মসিয়ে ভরজারস বুঝি তোমায় মিশর দেশে পাঠাইতেছেন ? তিনি সেদিন বলিতেছিলেন, মিশরে এক জন প্রতিনিধি পাঠাইবেন।”

“আমি মিশরে যাইব না।”

“তবে কোথায় যাইবে ?”

“তা আমি জানি না।”

“সে কি ? তুমি কোথায় যাবে, তা জান না ?”

“এখানকার সকল সংস্রব ত্যাগ করিয়াছি।”

“কি ? তুমি পদচ্যুত হইয়াছ ?”

“তা নয়, আমি স্বেচ্ছায় কর্ম্মত্যাগ করিতেছি।”

“কেন বল দেখি? ব্যাপার কি ?”

“যদি সব শুন্‌তে চাও, বাহিরে এস। এখানে কোনও কথা বলিব না ; ঐ ছোঁড়াটা আমাদের কথা শুনিতেছে।”

“কে, জর্জ্জেট ? ও এখন ঘুড়ী দেখিতেই ব্যস্ত, আমাদের কথায় ওর কাণ নাই। চল, বাহিরেই যাই ; গোপনীয় কথা বাহিরে হওয়াই ভাল। পাঁচ মিনিটের বেশী কিন্তু আমার সময় নাই।”

উভয়ে প্রাঙ্গণের এক নির্জ্জন প্রান্তে গেলেন। রবার্ট

"ইদং তৎস্নেহসর্ব্বস্বং সমমাঢ্যদরিদ্রয়োঃ।
অচন্দনমনৌশীরং হৃদয়স্যানুলেপনম॥"—মৃচ্ছকটিক।

K. v. Seyne : Bros

বলিলেন, "হল্‌, এলিস্‌কে যে আমি ভালবাসি, এ কথা তুমি ছাড়া আর কেহও সন্দেহ করে নাই।"

প্রফুল্লচিত্তে ভিগ্‌নরী বলিলেন, "তিনিও তোমায় ভালবাসেন। তোমাদের মিলন হউক, ইহাই আমার আন্তরিক কামনা।"

"আমি ভাবিয়াছিলাম, সে আমায় ভালবাসে, কিন্তু সে ভ্রম আমার ঘুচিয়াছে।"

"সে কি? তোমরা কি পরস্পর বাগ্‌দত্ত হইয়াছিলে?"

"হাঁ, সে আমার পত্নী হইবে বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিল। আমি নির্ব্বোধ, তাই কিশোরীর শপথবাক্যে নির্ভর করিয়াছিলাম। তাহার পিতার অনুরোধে তাহার শপথ, প্রতিজ্ঞা কোথায় ভাসিয়া গেল!"

"তাঁহার সঙ্গে তুমি দেখা করিয়াছিলে?"

"না, করি নাই। কিন্তু সে তাহার পিতার নিকট সকল কথা বলিয়াছে। বৃদ্ধ আমাকে বলিলেন যে, তিনি এ বিবাহের বিরোধী। তিনি আমাকে বলিয়াছেন যে, তাঁহার কন্যাও তাঁহার আপত্তি গ্রাহ্য করিয়াছে।"

"আমি বিশ্বাস করি না! কারণটা কি শুনিলে?"

"প্রথমতঃ, আমি কোনও শ্রমজীবীর অথবা বণিকের পুত্র নই। তার পর, কারবার চালাইবার ক্ষমতা অথবা গুণ আমাতে নাই। মসিয়ে ভরজারস্‌ তাঁহারই কোনও কর্ম্মচারীকে জামাতৃপদে বরণ করিতে চাহেন। অথচ তাহার ব্যবসায়-বুদ্ধি থাকা চাই।"

"কুমারী এলিস্‌ কি এ সর্ত্তে সম্মত হইবেন?"

"নিশ্চয়ই। না হইলে তাঁহার পিতা আমাকে এ সব কথা বলিবেন কেন? তার পর, বিনয় ও সৌজন্য প্রকাশ করিয়া বৃদ্ধ আমাকে মিশরের কার্য্যভার দিতে চাহিলেন।"

"হয় ত বুড়া ঠিক বুঝিয়াছেন। তাঁহার ইচ্ছা যে, তুমি মিশরে গিয়া কাজকর্ম্ম শিখিয়া এস! হয় ত তিনি তোমায় পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছেন। মিশরের কার্য্যভার তোমার লওয়া উচিত। আমি হইলে লইতাম।"

"আমার মত অবস্থায় পড়িলে, জুল, প্রিয়বন্ধু, তুমি আমার ন্যায় কাজই করিতে; মসিয়ে ভর্‌জারস্‌ অথবা তাঁহার কন্যার মুখাবলোকন করিতে না;—চিরকালের জন্য ফ্রান্স্‌ ত্যাগ করিতে। আমি আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, জাপান, যেখানেই হউক, চলিয়া যাইব। এ জীবনে আর ফিরিব না। যে রমণী আমার সঙ্গে প্রতারণা করিয়াছে, আমি তাহার কথা আর—শুনিতে—চাহি না।"

"মসিয়ে ভরজারস্‌ তোমাকে কন্যা সম্প্রদান করিবেন না, এই কথা শুনিয়াই তুমি ধন, মান, যশ সব পরিত্যাগ করিয়া আত্মগোপন করিতে চাও? এ বড় বোকামি ভাই! হয় ত পরিণামে তিনি মত পরিবর্ত্তন করিতে পারেন। এরূপ আপত্তি ঘটিতে পারে—ইহা তোমার পূর্ব্বেই বোঝা উচিত ছিল।"

"এলিস্‌ যে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিবে, আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই। আমার বিশ্বাস ছিল যে, তাহার চরিত্রের দৃঢ়তা আছে; কিন্তু এখন দেখিতেছি, আমি কি ভুলই করিয়াছি! অদৃষ্টকে ধিক্কার দিব না। কিন্তু আমি যথেষ্ট সহ্য করিয়াছি—আর সহ্য করিব না।"

ভিগ্‌নরী বিচলিতভাবে সব শুনিতেছিলেন। কিছুকাল পরে তিনি বলিলেন, "প্রিয়বন্ধু, এখন তোমার মন অত্যন্ত বিচলিত, এখন তোমায় কোন কিছু না বলাই ভাল। আমার এখন সময় নাই। লোহার সিন্দুকে আজ অনেক টাকা জমা রহিয়াছে, সেগুলি মিলাইতে হইবে। কাল আবার এ বিষয়ের আলোচনা করা যাইবে।"

"কাল আমি এখানে থাকিব না।"

"অসম্ভব! বিনা আয়োজনে তুমি যাইবে কি প্রকারে?"

"আমি প্রস্তুত হইয়া আছি।"

"কিন্তু টাকা কোথায়?—অনেক টাকার দরকার, এত টাকা কি তোমার আছে?"

"যোগাড় করিয়া লইব।"

"বেশী টাকা ত তুমি জমাও নাই। আমার যা কিছু আছে, তোমায় দিতে পারি, কিন্তু তাও ত এখন আমার কাছে নাই।"

"ধন্যবাদ, তোমার টাকা আমি অনায়াসে লইতে পারিতাম; কিন্তু দরকার নাই। শেষ বিদায়ের দিনে তোমার সহিত দু'দণ্ড বসিয়া গল্প করিবার ইচ্ছা হইতেছে, আজ সন্ধ্যার পর কোথায় তোমার দেখা পাইব বল ত?"

"ম্যাক্সিম্‌কে আজ নিমন্ত্রণ করিয়াছি। সে ৬টার সময়

আসিবে ; কিন্তু তাহার সম্মুখে কোনও বিষয়ের আলোচনা অসম্ভব।"

"নিশ্চয়ই। আহারশেষে তুমি কি তোমার আফিসে ফিরিয়া আসিবে ?"

বন্ধুর প্রশ্নে বিস্মিত হইয়া ভিগ্‌নরী বলিলেন, "না। সমস্ত দিন কাজের পর আরও কাজ করিবার প্রয়োজন হইবে না। তা ছাড়া হয় ত থিয়েটারে যাইতে পারি। কাল সকালে তোমার ঘরে আসিব।"

"কিন্তু হয় ত তখন আমার দেখা পাইবে না। মসিয়ে ভরজার্‌সের গৃহে আমি আর এক রাত্রিও বাস করিতে চাহি না।"

"আমি খুব ভোরে উঠিয়াই আসিব। তত ভোরে কি তুমি কোথাও যাইবে ?"

"দেখা যাবে। আমার সময় বড় অল্প। ধর, যদি আর তোমার সঙ্গে দেখা না হয় ; তুমি জানিও, আমি চিরকাল তোমায় মনে রাখিব। আমাদের বন্ধুত্ব অবিচ্ছিন্ন থাকিবে। হাত নিয়ে এস।"

"কোথায় যাবে ?"

"আমি আত্মহত্যা করিব না, সে ভয় নাই। আত্মহত্যা কাপুরুষের কার্য্য। এমন নির্ব্বোধের কাজ আমি করিব না। আমি কোথায় যাই, কি করি,—আমি শেষে তোমায় সব জানাইব। এখন আমি যাই। এ বাড়ী ত্যাগ করিবার জন্য আমি অধীর হইয়া পড়িয়াছি !"

"এলিসের সঙ্গে দেখা না করিয়াই তুমি চলিয়া যাইতেছ। ধর, যদি তুমি প্রতারিত হইয়া থাক। তোমার প্রতি তাঁহার প্রেম যদি অবিচলিতই থাকে !"

"তা' হলে সে আমায় অবশ্য জানাইবে। কিন্তু সে আশা নাই। কুমারী এলিস্ পিতার অভিপ্রায়ানুসারেই কাজ করিবে। তাহার পিতা মনোমত জামাই খুঁজিয়া আনিবেন। ভাবী জামাতার ব্যবসায়বুদ্ধি থাকিলেই হইল। সাধারণ গৃহস্থসন্তান হইলেই চলিবে, অর্থ না থাকিলেও ক্ষতি নাই।"

ভিগ্‌নরী বলিলেন, "তিনি নিজে এ কথা ব'লেছেন ?"

"হাঁ। মুখে যাহা বলিয়াছিলেন, কাজেও তাহা করিবেন। এখন তবে আসি ভাই !"

ভিগ্‌নরী বন্ধুকে আর বাধা দিলেন না। রবার্ট চলিয়া গেলেন। খাতাঞ্জীর তখন আর কাজ করিবার স্পৃহা ছিল না। রবার্টের নিকটে তিনি আজ অনেক নূতন কথা জানিতে পারিয়াছেন। ম্যাক্সিম্ ৬টার সময় আসিবেন, লিখিয়াছিলেন। ভিগ্‌নরী টাকাকড়ি সিন্দুকের মধ্যে গুছাইয়া রাখিলেন। মসিয়ে ভরজারস্ আসিয়া বলিয়া গেলেন, "পরদিন আফিস খুলিলে কর্ণেল বোরিসফ্‌কে তাঁহার অলঙ্কারের বাক্স ও কিছু টাকা দিতে হইবে।" অন্যান্য কেরাণী ক্রমে চলিয়া গেল। ভিগ্‌নরী সিন্দুকের চাবী বন্ধ করিতেছেন, এমন সময় ম্যাক্সিম্ কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

ভিগ্‌নরী সাবধানতার সহিত চাবী বন্ধ করিয়া কোট গায়ে দিতেছেন, এমন সময় ম্যাক্সিম্ বলিলেন, "সেই ছোঁড়াটা এখনও এখানে রহিয়াছে, দেখিতেছি। যা—এখান থেকে চ'লে যা, কি ক'চ্ছিস্ এখানে ?"

বালক জর্জ্জেট্ শশকের ন্যায় দ্রুতবেগে পলায়ন করিল। ছয়টার পরও বালক আফিসে রহিয়াছে দেখিয়া ভিগনরী বিস্মিত হইলেন।

ম্যাক্সিম্ বলিলেন, "তোমার সঙ্গে কথা আছে।"

"নূতন কিছু জানিতে পারিয়াছ নাকি ?"

"রাস্তায় চল, সেখানে সব বলিব। ঘরের মধ্যে কোনও কথা বলিতে আমার সাহস হয় না। আমার বোধ হইতেছে, কেহ যেন আমাদের কথা শুনিতেছে।"

উভয়ে রাজপথে উপনীত হইলেন।

"তোমার নিকট হইতে বিদায় লইয়া আমি কাল সীন নদীর দিকে গিয়াছিলাম। পোলের ধার পর্য্যন্ত কেহ আমার অনুসরণ করে নাই, কিন্তু ফিরিবার সময় আমি অনুভব করিলাম, গুপ্তভাবে কে যেন আমার অনুসরণ করিতেছে। তাহাকে ফাঁকি দিবার অভিপ্রায়ে শেষে আমি একখানি গাড়ীতে চড়িলাম।

"একজন পুরুষ। তাহার মুখ আমি দেখিতে পাই নাই, কিন্তু তাহার গতিবিধির প্রতি আমি লক্ষ্য রাখিয়াছিলাম। পোলের রেলিংএর উপর ঝুঁকিয়া সে যেন কি দেখিতেছিল। আমি অলক্ষ্যে তাহার পার্শ্ব দিয়া চলিয়া গেলাম। নদীতে হাতখানি ফেলিয়া দিয়াই আমি ফিরিয়া আসিলাম, তখন

স তথায় দাঁড়াইয়া ছিল। তার পর দেখিলাম সে আমার পিছু লইয়াছে।"

"তাহার উদ্দেশ্য কি?"

"সে আমায় নদীগর্ভে হাতখানি ফেলিয়া দিতে দেখিয়াছিল। আমি কে, জানিবার জন্যই সে আমার পিছু লইয়াছিল। আজিকার কাগজে একটি সংবাদ বাহির হইয়াছে,—এই আলোটার কাছে দাঁড়াও, আমি সংবাদটা পড়িতেছি। 'আজ সীন্ নদীতে এক জন ধীবর মাছ ধরিবার সময় একটি ছিন্নহস্ত পাইয়াছে, হাতখানি কোনও রমণীর। পুলিস-অনুসন্ধান আরম্ভ হইয়াছে। যদি কেহ কোনরূপ সন্ধান বলিতে পারে, এই আশায় প্রকাশ্য স্থানে হাতখানি আরকে ডুবাইয়া রাখা হইয়াছে।'

"পুলিস যাহাতে এই ঘটনার বিন্দুমাত্র জানিতে না পারে, এ জন্য এত সতর্কতা অবলম্বন করা গেল; কিন্তু অবশেষে তাহাই ঘটিল!"

"আমি তখনই তোমাকে বলিয়াছিলাম। তা আমার কথা ত শুনিলে না!"

"তাহাতে কি হইয়াছে? আশঙ্কা কিসের? লোকে না হয় কএক দিবস ধরিয়া এই অদ্ভুত বিষয়টা লইয়া আলোচনা করিবে। শেষে সব থামিয়া যাইবে। কোনও চিন্তা নাই।"

"আচ্ছা মনে কর, যদি কোনও লোক ছিন্নহস্তটি দেখিয়া উহা সনাক্ত করে?"

"তুমি পাগল হইয়াছ? চোর ধরা দিবার জন্য নিজের হাতখানি দাবী করিতে যাইবে? যাক্, এখন বল দেখি, জ্যেঠামহাশয়ের মনে কোনও সন্দেহের উদয় হয় নাই ত?"

"না। কাল রাত্রিকালে আমি কেন নিমন্ত্রণ রক্ষা করি নাই, তাহার কারণ তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তোমার শিক্ষামত আমি বলিলাম—তিনি আমার কৈফিয়তে বিশ্বাস করিলেন। এখন তিনি নিজের বিষয় লইয়া এত ব্যস্ত যে, অন্য দিকে মন দিবার তাঁহার আদৌ অবসর নাই।"

ম্যাক্সিম্ সবিস্ময়ে বলিলেন, "কেন, কি হইয়াছে?"

"রবার্ট তাঁহার কন্যার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী, কুমারী এলিস্ও তাহার একান্ত অনুরক্ত, এ সংবাদ তিনি জানিতে পারিয়াছেন। বৃদ্ধ ভয়ানক চটিয়া গিয়াছেন। কন্যার সহিত তাঁহার কি কথাবার্ত্তা হইয়াছে, তাহা অবশ্য আমি জানি না; কিন্তু রবার্ট তাঁহার কর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছে।"

"বল কি! আমার কিন্তু এ কথা বিশ্বাস হইতেছে না।"

"রবার্ট নিজমুখে আমায় সমস্ত কথা বলিয়াছে। তোমার জ্যেঠামহাশয় তাহাকে স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, তাহার সহিত কুমারী এলিসের বিবাহ হইবে না। তবে ক্ষতিপূরণস্বরূপ তিনি তাহাকে মিশর-স্থিত কার্য্যালয়ের তত্ত্বাবধানের ভার দিতে চাহিয়াছেন।"

"কারনোয়েল্ কি সে প্রস্তাবে সম্মত?"

"সম্মত! তুমি তাহাকে জান না! আত্মসম্ভ্রমজ্ঞান তাহার অত্যন্ত প্রখর। সে অত্যন্ত অভিমানী। অনাহারে সে শুকাইয়া মরিবে, তথাপি কাহারও নিকট দীনতা স্বীকার করিবে না। সে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া যাইতেছে।"

"কোথায় যাইবে?"

"এখনও তাহার স্থিরতা নাই। তবে সে যে এ দেশে থাকিবে না, তাহা নিশ্চিত। রবার্ট বলিয়াছে, তাহার কাছে টাকা আছে; কিন্তু আমার সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।"

"রবার্টের সৎসাহস প্রশংসনীয়। স্বাধীনচেতা লোককে আমি আন্তরিক শ্রদ্ধা করি, ভালবাসি। কারনোয়েল্ জ্যেঠামহাশয়ের প্রস্তাবে উপেক্ষা করিয়া ভালই করিয়াছে। তাহার শক্তি, সামর্থ্য ও প্রতিভা আছে; কালে সে উন্নতি করিতে পারিবে। তাহার বিবাহেরও ভাবনা নাই। যে কোনও ধনবতী, সুন্দরী মহিলা তাহার সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইতে পারিলে আপনাকে ধন্য মনে করিবে। কর্ম্মক্ষেত্র হইতে রবার্টের অন্তর্দ্ধানে দেখিতেছি তোমারই সুবিধা।"

"বন্ধুকে বঞ্চিত করিয়া তাহার আকাঙ্ক্ষিত দ্রব্যে আমার লোভ নাই। বিশেষতঃ তাহা সম্ভবপর নহে।"

ম্যাক্সিম্ বলিলেন, "হতাশ হইও না। আপনা হইতেই সুযোগ ঘটিবে। রবার্ট চলিয়া গেল, কিন্তু তুমি ত রহিলে! সর্ব্বদা দেখা সাক্ষাৎ হইলে অবশেষে এলিস্ তোমার নির্দ্দোষ ব্যবহারে নিশ্চয়ই মুগ্ধ হইবে। সে এখনও বালিকা বলিলেই হয়। তরুণ যৌবনের প্রথম প্রণয়ে মাদকতা আছে বটে; কিন্তু বড় তরল। দেখিও, কালে সে তোমার প্রতি আসক্ত হইবে।"

ম্যাক্সিমের কথায় ভিগ্‌নরীর হৃদয়ে একটা গভীর রেখা পড়িয়া গেল। তিনি অন্যমনে কি ভাবিতে লাগিলেন। ম্যাক্সিমের কথায় তিনি মনঃসংযোগ করিতে পারিতেছিলেন না। ম্যাক্সিমের সহিত তিনি রঙ্গালয়ে গেলেন বটে, কিন্তু অভিনেতা অথবা অভিনেত্রীদিগের একটি কথাও তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিতেছিল না। রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর তিনি গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। ভৃত্য তাঁহার হস্তে একখানি পত্র অর্পণ করিল। শিরোনামা দেখিবামাত্র হস্তাক্ষরে তিনি বুঝিলেন, রবার্ট লিখিয়াছেন। ভিগ্‌নরী পড়িলেন, "আমার সহিত তোমার আর দেখা হইবে না। আজ রাত্রিতেই আমি এখান হইতে চলিলাম। কাল সকালে আমি বহুদূরে চলিয়া যাইব। যেখানেই যাই না কেন, তোমাকে সংবাদ দিব। আমার মানসিক অবস্থা বুঝিয়া আমায় ক্ষমা করিও।"

ভিগ্‌নরী পুনঃ পত্রখানি পাঠ করিলেন। এক অবর্ণনীয় ভাবাবেগে তাঁহার হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

(ক্রমশঃ)

হরিদ্বার।

শেষ রাত্রিতে হরিদ্বারে আমাদের নামাইয়া দিয়া, ট্রেণ খানি চলিয়া গেল।

এখানে কি শীত! লক্ষ্ণৌ থেকে যখন ট্রেণে চাপিয়াছিলাম, তখন দিব্য মিঠে হাওয়া, কাজেই গায়ে পাত্‌লা ফিন্‌ফিনে জামা ছিল। এখন গরম কাপড় চোপড়ের একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিল; কিন্তু কাপড় চোপড় ছিল লগেজে,—সুতরাং শীতে জড়-ভরতের মত হইয়া সেখানে ঠায় দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কাঁপিতে লাগিলাম। মাঝে মাঝে আবার ফুর্‌ফুর্‌ করিয়া তোফা হাওয়া বহিতেছিল। সে তুষার-স্নিগ্ধ শীতল বাতাস—

"কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো;
আকুল করিল মোর প্রাণ।"

সকাল বেলায়, কাকচিল ডাকিবার আগেই পাণ্ডারা, গণ্ডায় গণ্ডায় আসিয়া হাজির। আমাদের প্রতিজ্ঞা পাণ্ডার ছায়া মাড়াইব না; অতএব, তখন বাক্যের 'ওয়াটার-লু' সুরু হইল। ফলে, আমরা হার মানিলাম। পাণ্ডাবেশী বিজেতা ওয়েলিংটনের হাতে বন্দী হইয়া আমরা জাহাজ অভাবে এক্কায় গিয়া উঠিলাম।

আমাদের জন্য একটি তেতলা বাড়ী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। "হড়কিপাড়ি" নামে একটি পাহাড়ের উপরে উহা নির্ম্মিত।

বারান্দায় গিয়া দেখি, সম্মুখে অপূর্ব্ব দৃশ্য! এ রকম কিছু একটা দেখিব বলিয়া আমি ঠিক প্রস্তুত ছিলাম না; সুতরাং, প্রথমদর্শনেই একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িলাম। যেন ছবি, যেন স্বপ্ন, যেন মায়া,—কি যে দেখিলাম! বর্ষামেঘমুক্ত সুনীল আকাশতলে ঊষার প্রথম হাসি কি এতই সুন্দর! ছোট ছোট পাহাড় সোহাগে ঢলাঢলি করিয়া, পরস্পরের সঙ্গে গভীর প্রেমালিঙ্গনে বাঁধাবাঁধি হইয়া, সারে সারে থরে থরে ক্রমে ক্রমে উপরে—আরও উপরে উঠিয়া গিয়াছে! ঠিক যেন চঞ্চল সমুদ্র-তরঙ্গেরা কার যাদুমন্ত্রে অসাড় পাথর হইয়া গিয়াছে।

আর নীচে শৈলবলয়িতা ক্ষীণাঙ্গী গঙ্গা, আপন ধবল আঁচল দোলাইয়া, উল্লাস-কল্লোলে চারিদিক মুখরিত করিয়া, বহিয়া চলিয়াছে।

তীরে তীরে ভক্তি-বিহ্বল নরনারী। কতজন গঙ্গার সুশীতল সলিলে অবগাহন করিয়া আনন্দরোল তুলিল, "গঙ্গা মায়ী কী জয়!"—সে গম্ভীর একতান গিরিমালার শিখরে শিখরে প্রতিধ্বনিত হইল। হায় রে, এযে অসাড় প্রাণ,—তেমন ভক্তি কোথায় পাইব? তবু কাণ পাতিয়া সে ধ্বনি শুনিলাম এবং দুহাত যোড় করিয়া মকরবাহিনী গঙ্গাদেবীকে প্রণাম করিলাম,—প্রণাম না করিয়া কে সেখানে থাকিতে পারে?

আমাদের বাসার সম্মুখেই বিখ্যাত 'হরিকাচরণ ঘাট'। এই ঘাটের উপর পাথরে একখানি চরণচিহ্ন আছে। প্রবাদ, তাহা শ্রীহরির শ্রীচরণ। শোনা গেল, আসল পাথরখানি আর নাই। যেখানি আছে, সেখানি নকল।

তা যাই বল,—আসল আর নকল ও সব আমি কিছু

বুঝি না—বুঝিতে চাহি না। অবুঝ আমি, এইটুকু সার বুঝিতেছি যে,—এই দৃশ্য, এই বিশ্ব,—ইহা ত তাঁরই রূপ। তাঁকে ছাড়িয়া যখন এক পা বাড়াইবার যো নাই, সর্ব্বভূতে তিনি যখন সর্ব্বরূপ—অরূপে স্বরূপ এবং স্বরূপে অরূপ, তখন, হে মাণবক, সেই বিশ্বভূপকে ক্ষুদ্র এক প্রস্তরখণ্ডে কেমন করিয়া বাঁধিয়া রাখিবে?

'হরিকাচরণ' ঘাট—হরিদ্বারের প্রধান ঘাট, ইহাকেই ব্রহ্মকুণ্ডঘাটও বলে। আগে এইখানে একটি ছোট ঘাট ছিল। তখন, কুম্ভমেলার সময়ে এখানে যে ব্যাপার হইত, তাহা আর বলিবার নয়। ভক্তিবিহ্বল নরনারী পরস্পরের সঙ্গে মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইত, কে আগে জলে নামিয়া আগে মুক্তিলাভ করিবে! মুক্তিলাভ হইত, সন্দেহ নাই—তবে, অনেক সময় জলে নামিবার আগেই!

ব্রহ্মকুণ্ড-ঘাট।

'হরিকাচরণ' ঘাটের উন্নতির জন্য অনেক দিন হইতেই চেষ্টা হইতেছে। মোগল রাজত্বকালে, মানসিংহ কর্ত্তৃক এখানে একটি ঘাট তৈয়ারি হয়—(Cunningham's Archæological Survey of India)। তারপর, ইংরেজেরা এখানে একটি চমৎকার চওড়া ঘাট বাঁধাইয়া দিয়াছেন (Hamilton's East India); অতএব, আজকাল হরিদ্বারে পাপমুক্তির জন্য আসিলে দেহমুক্তির আর ভয় নাই।

হরিদ্বার হইতে গঙ্গার মুখ ১৩০০ মাইল দূরে। (Balfour's Encyclopædia of India—Vol II.)

এই ধর্ম্মক্ষেত্রে অনেক কুরুক্ষেত্রের অনুষ্ঠান হইয়াছে। গোস্বামী ও বৈরাগী নামক দুই ধর্ম্মসম্প্রদায় কএকবার এখানে রীতিমত যুদ্ধ বাঁধাইয়াছিল। একবার তাহাদের রণোন্মত্ততা চরমে উঠিয়াছিল। একবার (১৭৬০ খৃঃ) শিখেদের তলোয়ারের মুখে পাঁচশত গোস্বামী ধর্ম্মের জন্য দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। মুসলমানের ধর্ম্মদ্বেষিতা এখানেও আপনার চিহ্ন রাখিতে ভুলে নাই। তৈমুর কর্ত্তৃক প্রবাহিত ভারত-বিসারি শোণিত-স্রোতে, হরিদ্বারের অনেক ভক্ত-যাত্রী আপনাদের হৃদয়-রক্ত মিশাইয়া ছিল। (Imp. Gazetteer of India, Vol IV.)—যাঁহারা হরিদ্বারের পাপনাশন অপার মহিমার কথা জানিতে চান, তাঁহারা মহাভারত এবং নারদ, মৎস্য, কূর্ম্ম ও ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণ পড়ুন। ইন্দ্রের ঐরাবতের দর্পচূর্ণ করিয়া এই কূলপ্লাবিনী গঙ্গা ধরণীর তপ্তশুষ্ক বক্ষে এইখানেই প্রথমে অবতীর্ণা হন।

পুরাণ যতই পুরাণ হউক—হরিদ্বার নামটি কিন্তু তত পুরাতন নয়। * কানিংহাম পুরাকাহিনীর দোহাই দিয়া বলেন এখানে কপিলমুনির বাস ছিল বলিয়া, তাঁর নামেই ইহার নামকরণ হইয়াছিল। ব্যালফোরও ইহাকে প্রাচীন "কপিলস্থান" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন বটে,—কিন্তু

* লেখকের যুক্তি বুঝা গেল না। ভাঃ সঃ।

কপিলকে বলিয়াছেন গুপিল। কপিল জীবিত থাকিলে, নিশ্চয়ই তাঁর এই নূতন নামকরণে প্রবল আপত্তি করিতেন!

Tom Coryeat, জাহাঙ্গীরের রাজত্ব-কালে এখানে বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। তাঁর মুখে হরিদ্বারের নাম পাই। আকবরের সময়েও হরিদ্বার নাম অজ্ঞাত ছিল না—(Gladwin's Ain-i-Akbari)।

চীন পরিব্রাজক য়ু-য়ন-চুয়ঙ, আপনার প্রসিদ্ধ ভ্রমণ-কাহিনীতে "ময়লো" নামে একটি স্থানের বর্ণনা করিয়াছেন। "ময়লো"র কিছু তফাতে গঙ্গাদ্বার নামে একটি মন্দিরও তিনি দেখিয়াছিলেন—(Julien's Hiouen Thsang—Vol II)। এখনও হরিদ্বারের কিছুদূরে এক সুরম্য কাননে অসংখ্য কলাপীর গম্ভীর কেকারব শুনিতে পাওয়া যায়। অনুমান হয়, এইখানেই চীন পরিব্রাজকের 'ময়লো' অবস্থিত ছিল এবং ময়ূর হইতেই 'ময়লো' নাম হইয়াছিল। 'ময়লোর' বর্ত্তমান নাম মায়াপুর। মায়াপুরের কাছে গঙ্গাদ্বারের মন্দির এখনও বর্ত্তমান। মায়াদেবীর মন্দির হইতে মায়াপুর নাম; মায়াপুরে প্রাচীন "ময়লো"র ধ্বংসাবশেষ অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়।

বিল্বকেশ্বর।

কানিংহাম বলেন, হরিদ্বার নূতন সহর; মায়াপুরই প্রাচীন নগর। মায়াপুর হইতে কিঞ্চিৎ দূরে বেন নামে এক প্রাচীন রাজার কেল্লার ধ্বংসাবশেষ আছে। দুর্গটির পরিধি (circuit) সাড়ে তিন মাইলেরও অধিক—(The Ancient Geography of India)।

বুঝা যাইতেছে, এত বড় দুর্গের অধিকারী যে রাজা ছিলেন, তাঁর পরাক্রমও বড় সামান্য ছিল না।

কানিংহামের মতে, আগে এখানে বৌদ্ধধর্ম্মেরও খুব প্রাধান্য ছিল। বাস্তবিক, হরিদ্বারের অনেক প্রসিদ্ধ হিন্দু-দেব-মূর্ত্তিতে বৌদ্ধ-শিল্পীর হাত বেশ স্পষ্ট দেখা যায়।

নাম ও স্থান লইয়া বেশী গবেষণা করা ভ্রমণকাহিনীতে মানায় না; বিশেষ, এই পুণ্যক্ষেত্রের নাম যখন একটি নয়—কপিলস্থান, গঙ্গাদ্বার, হরিদ্বার, হরদ্বার, মায়াপুর ও ময়লো—যে নামে খুসি, সেই নামেই ডাক! কারণ, হরিদ্বার নাম-মাহাত্ম্যে বড় নয়,—বড়, স্থান-মাহাত্ম্যে।

অপরাহ্ণকালে সহর দেখিতে বাহির হইলাম,—ভারি সহর! যেমন ছোট—তেমনই ধূলাভরা। রাস্তাও দুচারি[illegible], বাজারে দুচারখানা কাপড়ের দোকান আছে। আর অন[illegible] যে সব দোকান দেখিলাম, তাতে বুঝিলাম এখানকার লোক লাঠী, ও ক্ষীরের খাবারের ভারি ভক্ত। কারণ, [illegible]ঠী ও ক্ষীরের খাবারের দোকান গণিয়া উঠা ভা[illegible]। বাড়ীগুলি বড়সড় ও পাথরের তৈয়ারি। নির্ম্মাতৃ[illegible]র শিল্পজ্ঞানহীনতার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবার জন্যই যেন [illegible]রা

১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে একবার কলেরা রোগে, এখানে আটদিনের ভিতরে ২০,০০০ হাজার লোকের মৃত্যু হয়!—(Yule's Cathay : p. 411).

সহর দেখিতে দেখিতে, পাহাড়ের ভিতরে একটি জায়গায় গিয়া উপস্থিত হইলাম। তার নাম, ভীমঘোড়া। অশ্ব-ক্ষুরাকৃতি একটি জলাধার—তারমধ্যে শিব-লিঙ্গ। পাণ্ডা প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝাইয়া দিল, ভীমচন্দ্রজী অশ্বারোহণে কোথায় যাইতেছিলেন—তাঁহার অশ্বের পদাঘাতে এখানটা একেবারে পুকুর হইয়া গেল। ভীমের ঘোড়া কিনা! অতএব, দাও কিছু দর্শনী—তোমার বহুৎ পুণ্য হইবে।

আমি বলিলাম, "বাপু, আমার অদৃষ্টে পুণ্য লেখা নাই—তোমার অদৃষ্টেও সুতরাং শূন্য!"

বাসায় ফিরিয়া আসিতে দেখিলাম, হরিরচরণ ঘাটের পাশে একটা ছোট মন্দির। তার তলায় সারি সারি তিনটি সজীব মূর্ত্তি চূড়া-ধড়া পরিয়া বসিয়া আছে। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, তাদের একটি রামচন্দ্রজী, একটি লক্ষ্মণজী এবং আর একটি—সেটি বালিকা, তিনি সীতামায়ী।

ভীমগোদা।

...ও দাঁড়াইয়া আছে। বিল্বকেশ্বর মহাদেবের মন্দির দর্শন ... বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

...তাব্দীপূর্ব্বে হরিদ্বার সহরের অবস্থা আরও শোচনীয় ছিল। তখনকার বাড়ীগুলির নিম্নতল পাথর দিয়া ও উপ...ল ইষ্টক দিয়া প্রস্তুত হইত। রাস্তা ছিল একটি মা... উনবিংশ শতাব্দীর আরম্ভ হইতে সহরেরও উন্নতি হই... থাকে। (Imp. Gaz.—Vol XIX).

...লার সময়ে এখানে অসংখ্য লোক-সমাগম হয়। কো... কোন বারে ২০।২৫ লক্ষ লোকও এখানে আসিয়া স্নান করিয়া গিয়াছে। সহর ছোট-জনতা, সাগরবৎ; সুতরাং ...ৎকালে ব্যাধির প্রাদুর্ভাবও বড় সামান্য হয় না।

কিন্তু সীতামায়ী তখন আপনার স্ত্রীজাতিসুলভ লজ্জা পরিহার করিয়া, আনন্দে দুলিতে দুলিতে অতি সন্তর্পণে একটি সন্দেশ ভক্ষণ করিতেছিলেন। সকলের সম্মুখেই একখানি করিয়া পিতলের থালা ও একপাত্র জল। কোন যাত্রী দেখিবামাত্র রামচন্দ্রজী দেবতাসুলভ মৌনব্রত অবলম্বন করিয়া বসেন। কিন্তু অনেক যাত্রীই রামচন্দ্রজীর উপরে কিছুমাত্র মনোযোগ না দিয়া চলিয়া যায়। রামচন্দ্র তখন মৌনব্রত নিষ্প্রয়োজন বুঝিয়া চীৎকার সুরু করেন, "মায়ী! মায়ী! ইধার—ইধার!" তাতেও যারা বুদ্ধিমানের মত চলিয়া যায়, তা'রা গালি খায়, আর যারা পয়সা দিয়া প্রণাম করে, তা'রা রামচন্দ্রজীর চরণামৃত পায়। দেখিলাম প্রণামকারীর দলই বেশী।
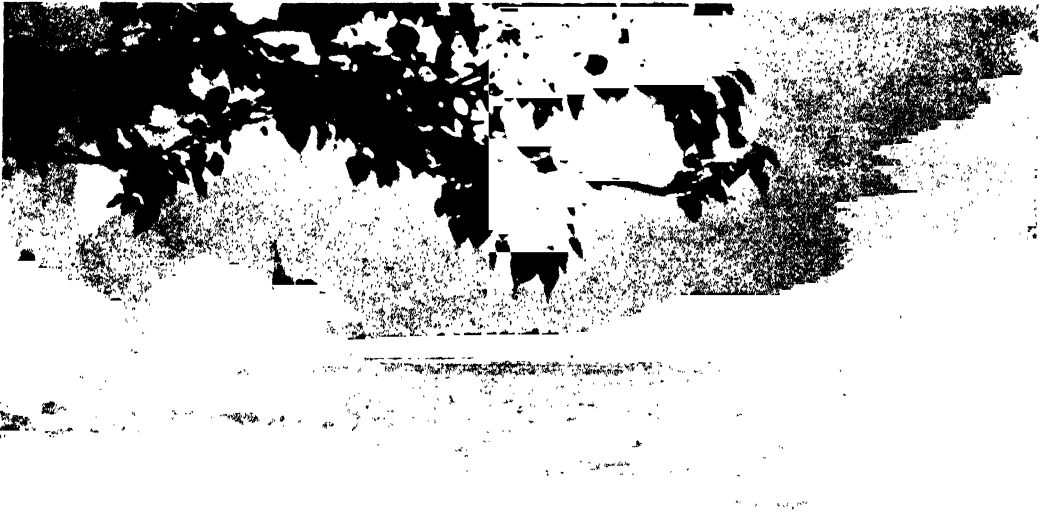
নীলধারা।

অতএব সম্মুখের থালায় ঝমাঝম্ পয়সা পড়ে। মাঝে মাঝে আড়াল থেকে একটি বয়স্ক লোক আসিয়া থালার পয়সাগুলি গণিয়া যাইতেছে। তিনি নিশ্চয়ই রামচন্দ্রজীর অভিভাবক —অর্থাৎ বাবা দশরথ। পাছে লোভী ছোক্‌রা রামচন্দ্র, দু'এক পয়সার বিড়ি খাইবার লোভে থালার পয়সা সরায়—তাই দশরথজী হিসাব ঠিক রাখিতেছেন!

পরদিন কনখলে যাত্রা করিলাম। কনখল, হরিদ্বার হইতে দুইমাইল দূরে। কালিদাস হরিদ্বারের নাম করেন নাই,—কিন্তু কনখলের নাম করিয়াছেন। পুরা-প্রসিদ্ধি এই যে,—এখানেই দক্ষযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

একার মধুর ধাক্কা কোনরূপে সামলাইয়া কনখলে প্রবেশ করিলাম। খাসা সহর। বাড়ীগুলি সুগঠিত, পথঘাট সুনির্ম্মিত, বাজার হাট দিব্য—হরিদ্বার হইতে সকল রকমেই এই সহর উন্নত। এক একখানি বাড়ীতে সুপরিকল্পিত সূক্ষ্ম খোদন-কার্য্য দেখিলাম।

প্রথমেই 'দক্ষেশ্বর' শিবালয়ের দিকে গেলাম। প্রাঙ্গণের ভিতরে পা দিতে না দিতেই একপাল বানর আসিয়া আমাদের এক সঙ্গীর হাত হইতে খপ্ করিয়া দুটি পান কাড়িয়া লইয়া মুখে পুরিয়া দিল। পানে ছিল দোক্তা,—সুতরাং বানর বাবাজীর বড় শোচনীয় রকম সুখোদয় হইয়াছিল।

শিবালয়ের চারিদিক খুব উচ্চ প্রাচীর দিয়া ঘেরা। প্রাচীরের কোথাও চূণ-বালি নাই—ইটগুলি কতদিনের পুরাণ, তা বলা কঠিন। এদিকে ওদিকে কতকগুলি বহুপুরাতন বাড়ী-ঘর। চারিদিক স্তব্ধ। কেবল অনতিদূর হইতে গঙ্গার কলনাদ সে স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া দিতেছে এবং অঙ্গনমধ্যে রোপিত দল তরুর শাখায় শাখায় যেন একটা অনাদিযুগের প্রাচীন রহস্য, অব্যাহত পবনোচ্ছ্বাসের সহিত গভীর শ্বাস ত্যাগ করিতেছে।

একদিকে দক্ষেশ্বরের মন্দির। তার পাশেই যজ্ঞকুণ্ড। কুণ্ডের উপরিভাগের ছাদতল ধূম্রম্লান—প্রবাদ, এইখানেই পতিনিন্দা-কাতরা সতী দেহত্যাগ করিয়াছিলেন।

মন্দিরের কোন বিশেষত্ব নাই। আছে সুধু, স্মৃতি। সেই স্মৃতির যবনিকাখানি তুলিলে, কবেকার কোন্‌দিনে অভিনীত একখানি বিয়োগান্ত নাটকের শেষ-দৃশ্য, মনশ্চক্ষের সম্মুখে বারংবার ভাসিয়া উঠে!

প্রাঙ্গণ পার হইয়া দেখি, সম্মুখে উচ্ছ্বসিত-অঙ্গে, বিচিত্র রঙ্গে, তরঙ্গভঙ্গে, পুলকিতা গঙ্গা তরল নীলাঙ্গ এলাইয়া বহিয়া যাইতেছেন। গঙ্গার নাম এখানে নীলধারা। তিন দিকে পাহাড়, মাঝে জল; সুতরাং এখানটি প্রকৃতির একটি সাজান চিত্রশালা।

পাহাড়ের উপর হইতে নীলধারা নামিয়া আসিতেছে—কি প্রবল উচ্ছ্বাস! কি অদম্য উৎসাহ! কি অনিবার গতি! সহসা মধ্যস্থ শিলা-প্রাচীরে আহত হইয়া ক্রুদ্ধ অজগরের মত রুদ্ধাক্রোশে নীলধারা গর্জ্জিয়া উঠিতেছে এবং সূর্য্যকর-প্রোজ্জ্বল সেই উদ্ধোৎক্ষিপ্ত বারিধারা ফেনপুঞ্জে তুষার-শুভ্র হইয়া আবার নিম্নমুখে গড়াইয়া পড়িতেছে—কি তীব্র সে পতন-বেগ!

> "থর থর করি কাঁপিছে ভূধর
> শিলা রাশি রাশি পড়িছে খ'সে;
> ফুলিয়া ফুলিয়া ফেনিল সলিল
> গরজি উঠিছে দারুণ রোষে!"

প্রকৃতির এই রঙ্গভঙ্গী দেখিয়া আমার অসাড় প্রাণও জাগিয়া উঠিয়া অমনই করিয়া বিশ্বের প্রান্তরে ছুটিয়া যাইতে চাহিল।

* * * * *

অপরাহ্নে হরিদ্বারে ফিরিলাম; এখানে গঙ্গা ভিন্ন দ্বিতীয় দেবতা নাই,—তাই এক কথাই বারংবার বলিতে হইতেছে, এবং আবার বলিতে হইবে।

এখানকার গঙ্গা বড় ক্ষীণাঙ্গী; কিন্তু ধারা একটি নয়, অনেকগুলি। মাঝে মাঝে কাননছায়াসুপ্ত ছোট ছোট দ্বীপের মত বালুভূমি আছে। বাঙ্গলার গঙ্গাজল দেখিয়া এখানকার জলের কল্পনা করিতে পারা যায় না,—এ জল কাচের মত পরিষ্কার।

ঘাটের কাছে মাছেরা সব দলে দলে নির্ভয়ে মানুষের গা ঘেঁসিয়া আসে,—কোন কোনটি আবার নোলক-পরা! এখানে মাছ মারা নিষিদ্ধ। তাই তাদেরও কোন সঙ্কোচ নাই,—স্বল্প জলে পুচ্ছ দোলাইয়া তারা মনের সুখে খেলা করিতে থাকে, এ দৃশ্য দেখিলে কাহার না মনে আনন্দ হয়? প্রেমের মহিমা এরাও বুঝে। হিংসার দ্বারা আমরা নিখিলকে দূরে রাখি বৈ ত' নয়!

দিবান্তের দীপ্ত ললাটিকা শৈলশিখরের উপরে মুছিয়া গেল। আমি কুশাবর্ত্ত ঘাটে বসিয়া হরিদ্বারের জনতা দেখিতে লাগিলাম।

ভিড়ের ভিতরে এক শ্রেণীর লোকই খুব বেশী দেখিলাম। তাহাদের সম্বলের ভিতরে, কাঁধের উপরে মোটা লাঠীর ডগায় ঝুলান একটা পুঁটুলি এবং পাশে একটি করিয়া মুখরা রমণী;—এই লইয়া তারা ভারতবর্ষের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত হাঁটুভোর ধূলা লইয়া প্রসন্ন মুখে ঘুরিয়া আসিবে, স্থানে অস্থানে কষ্টাৰ্জ্জিত মলিন গেজিয়া-ভরা রূপেয়ার সঙ্গে ভক্তির পশরা খালি করিবে, এবং যখন-তখন পথের ধারে কলেরায় মরিবে।

এই শ্রেণীর একটা লোক যাইতে যাইতে

সপ্তধারা।

হঠাৎ আমাকে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। তারপর বলিল, "বাবুজী, আপনি কোথা থেকে আস্‌ছেন?"

"কল্‌কাত্তা।"

"খাস্‌ কল্‌কাত্তা?"

"হাঁ।"

উত্তর শুনিয়া তার প্রকাণ্ড পাগ্‌ড়ীর নীচে সরল মুখমণ্ডল প্রসন্ন হইয়া উঠিল। সে গদগদ-কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "ধন্য, ধন্য, ধন্য।" অর্থাৎ আমি যে খাস কলকাত্তায়" থাকি, সেটা আমার পূর্ব্ব জন্মার্জিত বহু পুণ্যের ফল! মনে মনে ভাবিলাম—হায় দিল্লী! তুমি কলিকাতার সব গৌরব হরণ করিলে!

কুশাবর্ত্ত ঘাট।

এখন সন্ধ্যা! নক্ষত্ররাজি ধীরে ধীরে আকাশে উঠিতেছে। মাঝে মাঝে দীর্ঘাঙ্গী, বিকশিতযৌবনা, ফুল্ল পুষ্পাননা পঞ্জাব সুন্দরীরা ওড়্‌না উড়াইয়া আসিতেছে। তাহাদের প্রতি চরণক্ষেপে সর্ব্বাঙ্গে যেন উন্মুখ-রূপের ঢেউ উছলিয়া উঠিতেছে। তাদের মুখে হাসি—হাতে দীপাধার। দীপের একটুখানি ম্লান আলো ওড়্‌নার ভাঁজে ভাঁজে এবং রাঙা কপোল ও নত নেত্রের উপরে গিয়া পড়িয়াছে। পঞ্জাব রমণীদের সঞ্চারিণী লতার মত মৃণালপেলব তনুভঙ্গীর ভিতরে কেমন একটা অব্যাহত ছন্দ আছে, ইহাদের এই মৌন হাস্যোজ্জ্বল সাঞ্জন নেত্র-বিভায় গতঘনা যামিনীর সান্দ্রস্নিগ্ধ জ্যোৎস্নার মত কেমন একটা অনাবিল মধুরিমা আছে, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। সুন্দরীরা ঘাটের ধারে গিয়া দীপাধার নামাইলেন—চারু-হস্ত-তাড়িত হইয়া দীপগুলি গভীর জলে ভাসিয়া গেল।

* * * *

সহসা চারিদিকে সুরের কম্পন তুলিয়া, মন্দিরে মন্দিরে সন্ধ্যারতি বাজিয়া উঠিল! সে সময়ে মনে মনে যে কি রকম ভাবোদয় হয়, কাহাকেও তা বুঝাইতে পারিব না। কি গম্ভীর সে মুহুর্মুহু শঙ্খের নাদ—কি গগনভেদী সেই ভক্তগণের একতানে স্তোত্রপাঠ!

তারপর, আবার সব নিস্তব্ধ। দেখিতে দেখিতে দেবালয়ের আলোর সার একে একে নিবিয়া গেল, ঠাকুরের পায়ে 'গড়' করিয়া জনগণ যে যার ঘরে ফিরিয়া গেল,—মন্দির সব রুদ্ধ দ্বার, সব নীরব। তারকারাজি সুশোভিত নীলাকাশ তখন একাকী মাথার উপরে রাত্রিজাগরণ করিতে লাগিল। শূন্যে জ্যোৎস্না, পাহাড়ে জ্যোৎস্না, গঙ্গায় জ্যোৎস্না—সেকি জলধারা, না, জ্যোৎস্নাধারা? পাহাড়ের এ দিকে আলো—অপর দিকে অন্ধকার,—আর সেই বিজন সৈকতে বসিয়া শুধু একলা আমি!

পৃথিবীর গোলমাল যত থামিয়া আসে, গঙ্গার কল্লোলোৎসব তত উচ্চ হইয়া ওঠে—সে যেন অকাল মেঘের গর্জ্জন! কাণ পাতিয়া শুনিতে লাগিলাম—যেন, পরপারের চিরগুপ্ত-রহস্যের অজানা কাহিনী আজও শ্রবণ-কুহরে ধ্বনিত হইতে লাগিল! দেখিলাম, দূরে তখনও দীপালিগুলি ভাসিয়া যাইতেছে—কোনটি অতলে ডুবিতেছে, কোনটি পরপারে ঠেকিয়া কাঁপিতেছে! হায়!—এই দুস্তর সংসার-পাথারে, আমার এই ক্ষুদ্র জীবন-তরী মাঝপথেই জলতলে তলাইয়া যাইবে, না,—অমনই—ওপারে গিয়া ভিড়িবে? কে জানে!

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

দারার অধঃপতন।

(ঐতিহাসিক চিত্র)

দারার নাম বঙ্গীয় পাঠকের নিকট অজ্ঞাত নহে। দারা সম্রাট্ শাহ্‌জাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র, সিংহাসনের ভাবী অধিকারী, আদরের সন্তান, সৌভাগ্যের বরপুত্র। তাঁহার প্রথম জীবনের সৌভাগ্য-সূচনার প্রারম্ভ দেখিয়া, লোকে অনুমান করিত, দারাই ভারত-সম্রাট্ হইবেন; কিন্তু তাহা হয় নাই। দারার শেষ জীবন বড়ই দুর্ভাগ্যময়, জীবনের শেষার্দ্ধভাগের কাহিনী বড়ই শোচনীয়। তাহা পড়িলে চোখে জল আসে। তাহা উপন্যাসের ঘটনার মত অতীব বৈচিত্র্যময়। এই

দারা।

প্রবন্ধের সহিত পাঠক যতই অগ্রসর হইতে থাকিবেন, ততই সেই বৈচিত্র্য তাঁহার দৃষ্টি-গোচর হইবে।

যদি ঔরঙ্গজেবের পরিবর্ত্তে দারা দিল্লীর সম্রাট্ হইতেন, তাহা হইলে বোধ হয় আকবর শাহের বহু যত্ন-প্রতিষ্ঠিত সাধের মোগল-সাম্রাজ্য অত শীঘ্র ধ্বংসমুখে অগ্রসর হইত না; তদ্ভিন্ন ঔরঙ্গজেবের নাম মোগল-রাজত্বের ইতিহাসে অতটা উজ্জ্বল হইয়া থাকিত কি না, তৎপক্ষে বিশেষ সন্দেহ হইত।

বিধাতার কৃপায় দারা বহুবিধ সদ্‌গুণমণ্ডিত ছিলেন। মোগল সম্রাটের জ্যেষ্ঠপুত্র,—বিশাল হিন্দুস্থানের সিংহাসনের অধিকারী হইতে হইলে যে সকল গুণ থাকা প্রয়োজন তাহা তাঁহার ছিল। জীবে মমতা, স্বজন প্রীতি, পত্নীতে অনুরক্তি, পুত্রে স্নেহ, স্বার্থগন্ধশূন্য অনাবিল পিতৃভক্তি সবই তাঁহাতে বর্ত্তমান ছিল। হিন্দুদিগকে, হিন্দুর ধর্ম্মকে তিনি বড়ই ভক্তি ও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। ঔরঙ্গজেব বিদ্বেষ-বুদ্ধি এক-দেশ-দর্শিতা বশে, তাঁহাকে বিধর্ম্মী ইত্যাদি নানাবিধ বিরুদ্ধ বিশেষণে অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। এরূপ করায় তাঁহার যথেষ্ট স্বার্থ ছিল। আর এই মহা স্বার্থের জন্যই তিনি দারার রুধিরাক্ত ছিন্নমুণ্ড স্বহস্তে ধারণ করিয়া তাহা বার বার পরীক্ষা করিয়াছিলেন।

দারা যে সর্ব্বগুণান্বিত ছিলেন, একথা আমরা বলিতেছি না। মানুষ মাত্রেরই দোষ গুণ দুইই থাকে। দারারও

তাহা ছিল; কিন্তু সাধারণ লোকের যে সকল দোষ থাকিলে কোন অনিষ্ট হয় না, সে সকল দোষ সিংহাসনাভিলাষী সম্রাট্ পুত্রে বর্ত্তিলে তাঁহার যথেষ্ট স্বার্থহানি হইয়া থাকে। কাজেই এই সমস্ত দোষের জন্য দারার যুদ্ধে পরাজয়, রাজ্য-চ্যুতি ও অতি শোচনীয় মৃত্যু সংঘটিত হইয়াছিল।

ঔরঙ্গজেব।

সম্রাট্ শাহ্‌জাহানের চারি পুত্রই এক মাতৃগর্ভজাত। সম্রাট্ তাঁহার পুত্রগণকে খুব ভাল করিয়াই চিনিতেন—তাঁহাদের প্রত্যেকেরই চরিত্র তিনি গভীরভাবে বিশ্লেষিত করিয়া বুঝিয়াছিলেন, যদি ভবিষ্যতে কাহারও দ্বারা মহাবিপ্লব উপস্থিত হওয়া সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে ঔরঙ্গজেবের দ্বারাই হইবে। ঔরঙ্গজেবের কপট ধর্ম্ম-ভাবের সুদৃঢ় আবরণ ভেদ করিয়া তিনি মনশ্চক্ষে দেখিয়াছিলেন, সেই সংসার-বিরাগপ্রবৃত্তির অন্তরালে স্বার্থসিদ্ধির একটা দারুণ বাসনা অতি প্রচ্ছন্নভাবে শক্তিসঞ্চার করিতেছে। উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া, সেই অন্তর্নিহিত শক্তি মহাপ্রলয় উপস্থিত করিবে। তজ্জন্যই তিনি কূটবুদ্ধি ঔরঙ্গজেবকে চিরদিন আগরা হইতে সুদূর স্থানের শাসনভার দিয়া নেত্রান্তরালে রাখিয়াছিলেন। সুজা ও মোরাদকে বিচ্ছিন্ন করিয়া যথাক্রমে বাঙ্গলা ও গুজরাটের শাসনভার দিয়া পাঠাইয়াছিলেন। আর তাঁহার প্রাণোপম প্রিয়-পুত্র দারাকে পার্শ্বচররূপে রাজধানীতে তাঁহার নিকটে রাখিয়াছিলেন।

শাহ্‌জাহান স্পষ্টাক্ষরে বলিতেন,—"দারা আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র। সিংহাসনের উপর জ্যেষ্ঠের ন্যায্য স্বত্ব। দারাই আমার অবর্ত্তমানে দিল্লীর সিংহাসনে বসিবে।" তাঁহার অপর পুত্রেরা যে একথা জানিতেন না, তাহা নহে। দারাকে সম্রাট্ কখনও নিজের সামীপ্য-চ্যুত করেন নাই। ভবিষ্যতে রাজ্যেশ্বর হইয়া দারা যাহাতে সুচারুরূপে রাজকর্ম্ম পরিচালনা করিতে পারেন, তৎপক্ষে ব্যবহারিক শিক্ষাদানের জন্যই তিনি দারাকে নিজের কাছে রাখিতেন—হাতে-কলমে, তাঁহাকে রাষ্ট্রবিভাগের সকল কাজেই শিক্ষিত করিতেন। বহুদিন ধরিয়াই এই ব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছিল। এলাহাবাদ, পঞ্জাব, মুলতান প্রভৃতি শান্তিময়, বিদ্রোহশূন্য প্রদেশের শাসনভার তিনি কএক বার দারাকে দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু দারা অনেক সময় প্রতিনিধিদ্বারা এই সমস্ত প্রদেশ শাসন করিতেন,—নিজে বড় একটা শাসন-কেন্দ্রস্থলে উপস্থিত থাকিতেন না।

সম্রাট্ তাঁহার প্রিয়পুত্র দারাকে "শাহী-বুলন্দ ইকবাল" উপাধি দান করেন। ইহা সাম্রাজ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাধি; ইহার অর্থ "অতুল ধনেশ্বর।" এ উপাধি ইতঃপূর্ব্বে বা পরে কেহই পান নাই।

দারা চল্লিশ হাজার অশ্বারোহীর সেনানায়ক ছিলেন; পরে ষাট হাজারের অধিনায়কত্বে উন্নীত হন। এ সৌভাগ্য আর কোন

সুজা।

রাজকুমারের হয় নাই। পদোচিত গৌরব রক্ষার উপযুক্ত প্রচুর অর্থ, জায়গীর ইত্যাদিও তিনি প্রাপ্ত হন। দেওয়া-

আমে, বা দেওয়ান-খাসে যখন প্রকাশ্য দরবার হইত, দারা সম্রাটের তক্তে-তাউসের অতি সান্নিধ্যে স্বর্ণময় একটি ক্ষুদ্র সিংহাসনে বসিতেন। সম্রাটের আদেশ ও ইচ্ছানুসারেই এইরূপ আসন ব্যবস্থা হইয়াছিল। আর কোন সম্রাট্‌পুত্রের ভাগ্যে এরূপ সম্মান ঘটে নাই। দারার পুত্রগণ সম্রাটের অন্যান্য পুত্রগণের ন্যায় সমান পদবীর সেনানায়ক ছিলেন। দারা,

মুরাদ।

সম্রাটের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেনাপতি। তাঁহার বেতনও তদীয় পদোচিত—দুইকোটী মুদ্রা—ছিল।

রাজসভার মধ্যে দারাকে অতিক্রম করিয়া কোন কাজ করিবার ক্ষমতা কাহারও ছিল না। সম্ভ্রান্ত আমীর ওমরাহই হউন,—উচ্চপদস্থ সেনাপতিই হউন,—সামন্ত-রাজই হউন—বা অর্থী-প্রত্যর্থীই হউন, সকলকে আগে যুবরাজ দারার নিকট 'আরজ' করিতে হইত। যাহারা রাজদরবারে উচ্চপদপ্রার্থী, কিংবা অপরাধজনিত ভীষণ দণ্ডভয়ে কাতর, তাঁহাদের সকলকেই দারার সহায়তা লইতে হইত—তাহা না করিলে সে সম্রাটের নিকট পঁহুছিতেই পারিত না। যাহারা দারার সাহায্যতায় সম্রাটের নিকট পঁহুছিত, সম্রাট্ তাহাদিগকে পুনরায় দারার নিকটে শেষ হুকুমের জন্য পাঠাইতেন। এই ঘটনা দেখিয়া অনেকেরই ধারণা জন্মিয়াছিল যে মনে মনে দারাকে সন্তুষ্ট রাখিতে পারিলেই তাহাদের কাজ হইবে। এজন্য দারা, উচ্চপদস্থ অর্থী-প্রত্যর্থী রাজা-মহারাজাদিগের নিকট প্রচুর বিত্ত, হস্তী, অশ্ব, বহুমূল্য মণিমাণিক্যাদি নজরাণারূপে লাভ করিতেন।

দারা সম্রাট্ শাহ্‌জাহানের উপর কতটা শক্তি বিস্তার করিয়াছিলেন তাহা জীবন খাঁর ঘটনা হইতেই প্রমাণিত হয়। জীবন খাঁ অবাধ্যতা ও বিদ্রোহাপরাধে সম্রাট্‌-কর্ত্তৃক চরম দণ্ডে দণ্ডিত হন। সম্রাট্ আদেশ করেন,—"হস্তী পদতলে বিমর্দ্দিত করিয়া এই হতভাগ্যের প্রাণনাশ কর।" জীবন খাঁ সম্রাটের আদেশে আবদ্ধ অবস্থায় ভূপাতিত, মাহুত হস্তীকে অঙ্কুশাঘাত করিতে উদ্যত, এমন সময়ে দারা সম্রাটের নিকট করজোড়ে জীবন খাঁর জীবন ভিক্ষা করিলেন—সে প্রার্থনা তখনই মঞ্জুর হইল। জীবন খাঁ সে যাত্রা বাঁচিয়া গেল।*

অনেক সময়ে সভামধ্যে প্রকাশ্যভাবে সম্রাট্ দারার পরামর্শ লইয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন, আবার কখনও কখনও বা, দারা স্বাধীনভাবে স্বমতানুসারে কাজ কর্ম্ম করিয়া তাঁহার স্বহস্তলিখিত আদেশের উপর সম্রাটের "শীলমোহর" বসাইয়া দিতেন। দারার প্রদত্ত এরূপ আদেশ-পত্রাদি সম্রাটের আদেশপত্র বলিয়াই বিবেচিত হইত। শাহ্‌জাহানের এরূপ করার প্রধান কারণই এই ছিল যে, সাধারণে জানুক দারাই ভবিষ্যৎ সম্রাট্। সুবিশাল সাম্রাজ্যভার পরিচালনার উপযোগী করিবার জন্যই তিনি তাহাকে হাতেকলমে শিক্ষাদান করিতেছিলেন।

ধর্ম্মমত সম্বন্ধে দারা আকবর শাহের পথাবলম্বী ছিলেন। স্বাধীনচিন্তার সহিত হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান প্রভৃতি সর্ব্ব জাতির শাস্ত্রগ্রন্থই তিনি আলোচনা করিতেন। অবশ্য আকবরের প্রণোদিত "দীন ইলাহি"র মত নূতন ধর্ম্মমত প্রচার করিবার উদ্দেশ্য তাঁহার ছিল না বটে, কিন্তু সকল শাস্ত্রের সত্যানুসন্ধান করিয়া ধর্ম্ম ও নীতি সম্বন্ধে নূতন তথ্যাবিষ্কার করাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য। হিন্দুর বেদান্ত, মুসলমান সুফীদের শাস্ত্রগ্রন্থ, বাইবেল প্রভৃতি সকল জাতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রই তিনি বহুল আলোচনা করিয়াছিলেন। তিনি যখন এলাহাবাদের শাসনকর্ত্তা ছিলেন, সেই সময়ে প্রচুর অবসর কালের মধ্যে, কএকজন বিশিষ্ট হিন্দু পণ্ডিতকে

* ভবিষ্যতে ভাগ্যচক্রের অদ্ভুত বিধানে এই নরাধম অকৃতজ্ঞ জীবন খাঁর দ্বারা যুবরাজ দারা বন্দীরূপে ঔরঙ্গজেবের নিকট আনীত হন। পাঠক পরে ইহার পূর্ণ পরিচয় পাইবেন।

কাশীধাম হইতে আনাইয়া তাঁহাদের সহায়তায় "উপনিষদের" পারস্যানুবাদ করেন এবং নিজে তাহার একটি ভূমিকাও লেখেন। দারার এই উপনিষদের অনুবাদ গ্রন্থ "সির্‌-উল্‌ অসরার" বলিয়া পরিচিত। ১৬৫৭ খৃঃ অব্দের জুলাই মাসে এই অনুবাদ পরিসমাপ্ত হয়। তাঁহার "মাজম্‌ অউল্‌-বহারেন্‌"ও একখানি হিন্দুশাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ। ইহার অর্থ—

দিল্লী দুর্গ।

দুইটি সমুদ্রের মিলন। হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মের সারসত্যগুলির সমন্বয়-সাধনই এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য। "সুফীনাত্‌-উল-অউলিয়া" গ্রন্থও তাঁহার প্রণীত। এই গ্রন্থে মুসলমান সিদ্ধ ফকিরগণের জীবন-বৃত্তান্ত সঙ্কলিত হইয়াছিল। এতদ্‌ব্যতীত "সাকিনাৎ-উল্‌-অউলিয়া" নামক তাঁহার লেখনী প্রসূত আর একখানি ধর্ম্মজীবনী—এই গ্রন্থে "মিয়াঁমীর" নামধেয় এক তপঃসিদ্ধ ফকিরের জীবনবৃত্ত লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। লাহোরের "মিয়ানমির" নগর এখনও—এই বিখ্যাত ফকির মিয়াঁমীরের নামের স্মৃতি জাগাইয়া রাখিয়াছে।

দারা-প্রণীত উল্লিখিত ধর্ম্মগ্রন্থচয় হইতে সহজ বিচার দ্বারা বুঝিতে পারা যায়, যে দারা হিন্দু ও মুসলমান, এই উভয় ধর্ম্মেরই সমানভাবে আলোচনা করিয়া যাহা কিছু সার-সত্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহাই তিনি স্বরচিত গ্রন্থাবলীতে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। একপক্ষে তিনি যেমন লাল দাস বলিয়া একজন হিন্দু যোগীর পক্ষপাতী ছিলেন, অন্যপক্ষে মুসলমান ফকির সারমাদও তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন।

আবার দারা যেমন হিন্দুদিগের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন, য়ুরোপীয় খৃষ্টানদের প্রতিও তাঁহার বিরাগ ছিল না। তাঁহার নিজের একটি ক্ষুদ্র দরবার ছিল। এ দরবারে তাঁহার আত্মীয় অন্তরঙ্গ ও পণ্ডিতবর্গই থাকিতেন। আকবর শাহের প্রণোদিত পথাবলম্বনে দারা এই দরবার করিতেন। ম্যালপিকা (Malpica), জুক্সারটী (Juxarte), হেনরি বিউজ (Buze) প্রভৃতি পর্ত্তুগীজ ও ফ্লেমিশ্‌ পাদরীগণ তাঁহার পার্শ্বচররূপে গণ্য হইয়াছিলেন। বার্ণিয়ার বলেন—ইহাদের মধ্যে বিউজের শক্তিই দারার উপর বিশেষভাবে প্রকটিত হইয়াছিল। দারার খাস্‌ সেনাদলের মধ্যে অনেক রাজপুত অধিনায়ক ছিলেন। আকবরের ন্যায় মুসলমান অপেক্ষা হিন্দুদেরই তিনি অধিক বিশ্বাস করিতেন। কএকজন য়ুরোপীয় ইঞ্জিনিয়ার ও গোলন্দাজও দারার সেনাদলে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। দারা অনেক সময়ে ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবগণ বেষ্টিত হইয়া থাকিতেন। এই সমস্ত সভাসদ্‌ ব্রাহ্মণগণকে তিনি নিয়মিত বৃত্তিও প্রদান করিতেন। *

* As a religious person Dara belonged to the School of Akbar. He was accomplished, liberal and a friend to Hindus and a generous patron of Europeans. He held a minor *Durbar* in which both these elements were represented. H

দারার প্রধান শত্রু, ঔরঙ্গজেব। ঔরঙ্গজেব দারাকে বিধর্ম্মী বলিয়া ঘৃণা করিতেন। এই বিধর্ম্মী অভিযোগেই তিনি তাঁহাকে হত্যা করেন। ঔরঙ্গজেব গোঁড়া মুসলমান ছিলেন। ধর্ম্ম ও সিংহাসন উভয় ব্যাপারেই দারা তাঁহার ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বী। এরূপ স্থলে ধর্ম্মান্ধ ঔরঙ্গজেব যে উদার ধর্ম্মমতাবলম্বী দারাকে নাস্তিক, অবিশ্বাসী বলিয়া অভিযুক্ত করিবেন, তাহা কিছু বেশী আশ্চর্য্যজনক নহে।

দারা যে দেবোপাসক ছিলেন, অথবা তিনি মহম্মদের প্রচারিত ধর্ম্মমত বিশ্বাস করিতেন না—ঔরঙ্গজেব এ কথা কোন স্থলেই বলেন নাই। তিনি বলিতেন,—"দারা সর্ব্বদা যোগী, সন্ন্যাসী ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের সহিত সংলিপ্ত থাকেন; এই সমস্ত যোগী, সন্ন্যাসীকে ঈশ্বরের স্বরূপজ্ঞ বলিয়া বিশ্বাস করেন, হিন্দুর বেদকে ঈশ্বরপ্রেরিত শাস্ত্র বলিয়া সম্মান করেন, এবং এই সমস্ত হিন্দুশাস্ত্র অনুবাদে অযথা সময়ক্ষেপ করেন। হিন্দুধর্ম্মের প্রতি সম্মান দেখাইবার জন্য অঙ্গুলিতে হিন্দী ভাষায় লিখিত 'প্রভু' শব্দাঙ্কিত অঙ্গুরীয় ধারণ করেন। রমজানের পবিত্র মাসে যে প্রকার নমাজ ও উপাসনা বিধি মুসলমান ধর্ম্মশাস্ত্রানুমোদিত, তাহা তিনি করেন না এবং আত্মম্ভরিতা বশে, নিজেকে—ঈশ্বর সম্বন্ধে সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ বলিয়া বিবেচনা করেন।"

ঔরঙ্গজেবের আনীত এই সমস্ত অভিযোগের প্রত্যাখ্যান দারা নিজেই করিয়া গিয়াছিলেন। তিনি স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছেন,—"মুসলমান ধর্ম্মানুমোদিত কোন বিধানই আমি অগ্রাহ্য করি নাই। স্বাধীনভাবে সর্ব্বধর্ম্মের মূল তথ্যাবিষ্কার ও সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম সম্বন্ধে জ্ঞান বৃদ্ধির জন্যই আমি বিবিধ ধর্ম্মের সারসত্য সঙ্কলন করিয়াছি। সুফী সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তিত পথাবলম্বনে জীবন পরিচালিত করিয়াছি। ধর্ম্ম সম্বন্ধে গোড়ামি করা আমার উদ্দেশ্য নহে। ধর্ম্মের অছিলায় বিধর্ম্মীদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা আমার অভীষ্ট নহে। ধর্ম্মের ভাণ করিয়া লোকজনকে আমার পতাকাপার্শ্বে সমবেত করা আমার ইচ্ছা নহে।"

উল্লিখিত ঘটনাবলী হইতে নিঃসংশয়িত ভাবে প্রমাণ হয়—দারা ধর্ম্মবিষয়ে তাঁহার প্রপিতামহ আকবরের প্রদর্শিত পথই অবলম্বন করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাতে ভবিষ্যতে তাঁহার যথেষ্ট স্বার্থহানি হইয়াছিল। ভাগ্যচক্রের এমনই অদ্ভুত বিধান—যে উদারনীতি অবলম্বনে আকবর শাহ তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্যের ভিত্তিমূল সুদৃঢ় করিয়া যান, সেই নীতি অবলম্বনেই দারা তাঁহার রাজ্য এমন কি জীবন হারাইয়াছিলেন! ইহার কারণ আর কিছুই নহে—আকবর শাহ সাম্রাজ্যের ভিত্তিমূল সুদৃঢ় করিয়া তাঁহার উদারনীতি প্রকটিত করিয়াছিলেন; আর দারা সাম্রাজ্য লাভের পূর্ব্বেই সে চেষ্টা করায় জীবন ও সাম্রাজ্য দুইই হারাইলেন।*

ঔরঙ্গজেব সর্ব্ববিষয়েই তাঁহার প্রবল শত্রু! তিনি সকল বিষয়েই শনির ন্যায় জ্যেষ্ঠের ছল খুঁজিতেন। পিতা শাহজাহান্‌কেও তিনি স্পষ্টভাবে এক সময়ে লিখিয়াছিলেন,—"দারার রাজপুত্রোচিত কোন গুণই নাই। কেবল আপনার অসীম অনুগ্রহ, স্নেহ, ও সিংহাসনের পার্শ্বে অলসভাবে বসিয়া থাকিয়া প্রভুত্ব দেখাইবার শক্তিই তাহার আছে।" এই দারুণ বিদ্বেষ-বুদ্ধিবশেই ঔরঙ্গজেব ধর্ম্মসম্বন্ধে দারার বিপরীত পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। সুজা ও মুরাদকে প্রতারিত

...had in his suite a number of Rajput chiefs and many Engineers and Artillery officers from Europe. There were ...three Jesuit priests Fr. a Neapolitan named Malpica, a Portuguese called Juxarte and Henry Buze, a Flemish Father who is mentioned by the well known French traveller Bernier as exercising a powerful influence over the Prince. According to the same authority he had constantly about his person some of the Brahmans and Vaidyas on whom he bestowed large pensions. He also brought learned *Brahmins* from *Benares* with whose help he had the *Upanishads* translated into Persian.—(Last days of Dara Sheko H. R. P, 47.)

* All these points clearly show that he (Dara) had placed Akbar before himself as his ideal, whom he was trying to equal and not to surpass. But such is the irony of fate that the very traits of character which strengthened the empire of the one, not only cost the other the throne, but his life as well. And the reason of this is not far to seek. Akbar promulgated his eclectic and hetrodoxical views after he had secured the Crown; but Dara was foolish and rash to tread in the footsteps of his ancestor before he even occupied the throne and when he knew perfectly well that he had a formidable rival in the person of his brother Aurangzeb. 'It was the height of imprudence", says Keene, "to attempt the part of Akbar before he had secured the succession and he paid for the imprudence with his life."

করিবার জন্যই তিনি ধর্ম্মের আবরণে রাজনীতির উপাসনা করিয়া সিদ্ধমনোরথ হইয়াছিলেন। এই জন্যই সমরক্ষেত্রে জয় পরাজয়ের সন্ধিস্থলে ভীষণ সঙ্কটময় সময়ে, বিশৃঙ্খল সেনাগণকে সমবেত করিবার জন্য,—প্রোৎসাহী করিবার জন্য—তাহাদের প্রাণে প্রবল ধর্ম্মভাব উদ্দীপ্ত করিবার জন্য তিনি —"খোদা হায়! খোদা হায়! দিল্ ভরণা—দিল্ ভরণা" বলিয়া উৎসাহিত করিয়াছিলেন! দারাও যদি ঔরঙ্গজেবের অপেক্ষা মুসলমান ধর্ম্মের প্রতি অধিকতর আস্থা দেখাইতে পারিতেন—নিজের স্বাধীন শক্তির উপর বিশ্বাস না করিয়া ঈশ্বরের শক্তির উপর অধিকতর বিশ্বাস স্থাপন করিতেন—তাহা হইলে বোধ হয় তাঁহার শোচনীয় অধঃপতন হইত না। বারান্তরে দারার সম্বন্ধে আরও অনেক কথা বলিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।

পাশ্বনাথের মন্দির।
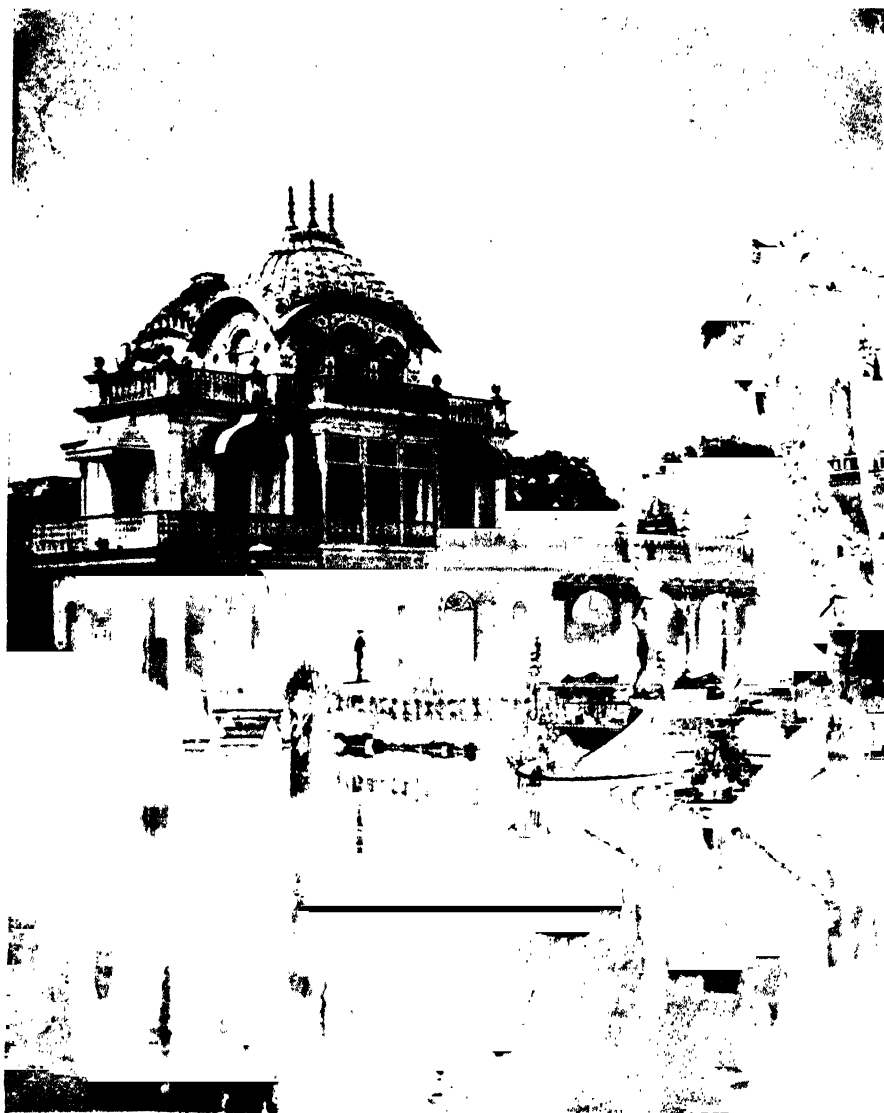
[শ্রীআবাকুমার চৌধুরীর আলোক চিত্র হইতে]

গোবিন্দজীর পরিত্যক্ত মন্দির

অন্ধকার বৃন্দাবন।

নন্দপুর-চন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার।
বহে না চল-মন্দানিল লুটিয়া ফুল-গন্ধভার।
জ্বলে না গৃহে সন্ধ্যাদীপ,
ফুটে না বনে কুন্দ-নীপ,
ছুটে না কলকণ্ঠসুধা পাপিয়া-পিক-চন্দনার।
ছোঁয় না তৃণ গোধনগুলি,
ছুটিছে মাঠে পুচ্ছ তুলি,
করে না রাধা কৃষ্ণ লয়ে শারিকা শুক দ্বন্দ্ব আর;
নন্দপুর-চন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার।

সজল চল আয়ত-আঁখি,
পিয়াল ফুল-পরাগ মাখি,
খুঁজিছে কারে,লেহন করে' মৃগ পদারবিন্দ কার?
ময়ূর আর মেলিয়া পাখা,
করে না আলো তমালশাখা,
কুসুমকলি ফুটে না,অলি পিয়ে না মকরন্দ তার।
নন্দপুর-চন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার।

ছলনা করি বধূরা আজ,
আনিতে জল করে না সাজ;
যমুনা জল শিহরে, শুনি বাঁশীটি শ্যাম-চন্দ্রমার।
বাতাস শ্বাসে বেতস-বন
গুমরি মরে, হতাশ মন,
কুঞ্জে নাহি ঝুলন দোল, মধু-মিলনানন্দ আর।
নন্দপুর-ইন্দু বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার।

যায় না চুরি নবনী ক্ষীর,
বলিয়া, ফেলে অশ্রুনীর,
করে না দধিমন্থ গোপী নাচায়ে কটি, চন্দ্রহার।
সলিলকেলি ফেনিল জলে,
যমুনা আর নাহিক চলে,
পাটনী কাঁদি,তরণী বাঁধি করেছে খেয়া বন্ধ তার।
নন্দপুর-চন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার।

গোঠের ধূলি গায়েতে মাখি,
রাখাল ফেরে উদাস-আঁখি,
ঘুরিছে ভুলে কুসুম তুলে, নাহি সে দেব-বন্দনার,
যশোদা আজি মলিনা দীনা,
লুটায় ভূমে সংজ্ঞাহীনা,
কাঁদিয়া আঁখি অন্ধ হ'ল, তুলে না মুখ নন্দ আর।
কীচকবনে বাজে না বাঁশী,
নাহিক গান, নাহিক হাসি,
নবনারীর কণ্ঠে আজি দুলে না প্রেমানন্দ হার।
নন্দপুর-চন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার।

শ্রীকালিদাস রায়।

সেকেলে কথা।

(২)

পুরাণ কাপড় প'রে সাধ খেতে হয়।

আমাদের জীবনের সকল কাজেই ধর্ম্ম বজায় রেখে চ'ল্‌তে হয়। যখন ঠাকুরমার সাধের সময় নূতন কাপড় পরিয়া সাধভক্ষণ হইয়া উঠিল না, তখন দাদামশাই নিয়ম করিলেন, এখন থেকে আমাদের গোষ্ঠীর সকলেই পুরাণ কাপড় প'রে সাধ খাবে। আজ পর্য্যন্ত এই নিয়ম চ'লে আস্‌ছে। শুনিতে পাই, কুসংস্কার সমাজে প্রবেশ ক'রে অনেক কষ্ট দিয়াছে; কিন্তু এই সকল কুসংস্কারের মূলই হচ্চে অনাটন। যারা চিরকাল দরিদ্র অথচ গর্ব্বিত, তারাই বলে আমাদের সাধ পুরাণ কাপড় প'রে খেতে হয়; আমাদের ছেলের আটকৌড়ে নাই; আমাদের হরির লুটের ছেলে, আমাদের আঁতুড় মান্‌তে নাই; আমাদের ছেলের ভাত দিতে নাই। আমাদের দেশের লোকে যারা গরিব হয়েছে, তাদের এইরূপ আত্মগোরব থাক্‌লে, তারা এত হীন হ'য়ে যেত না।

মামা ভাত খাওয়াইয়া ভাতদেয়।

যখন আমার পিতা হরচরণ জন্মগ্রহণ করেন, তখন এই জন্যই কোন ধূমধাম হয় নাই। যাদের নিজের খেতে কুলায় না, তারা পাচজনকে খাওয়াইবে কি করিয়া? লোকে জিজ্ঞাসা করিলে বলে, "ভাত দেওয়ার পরদিন আমাদের গোষ্ঠির কার একটি ছেলে নষ্ট হওয়ায় ভাত দেওয়ার প্রথা উঠিয়া গিয়াছে"। এ সকলই দুঃখের কান্না ঢাক্‌বার চেষ্টা। ভাতের সময় কুলীনের ঘরে ত বাপের মুখ দেখবার যো নাই; এজন্য ছেলেকে ভাত খাওয়াইয়ে দিবার একমাত্র অধিকারী পিতার পরিবর্ত্তে মাতুলের ব্যবস্থা। যে সব ছেলের ভাতের সময় মামা ভাত খাওয়াইয়া দেয়, তারা না জেনে সেই পুরাতনপ্রথা অনুকরণ করে। কিন্তু বাপ থাক্‌তে মামার ভাত খাওয়ার প্রথা তখন শুনি নি; এখন দেখে-শুনে হাসি পায়!

কলাপাত না পেয়ে অশ্বত্থপাতে লেখান।

ছেলে হরচরণ যখন তালপাতের লেখা সায় ক'রে কলাপাত ধ'রল, তখন কলাপাত বাড়ীতে না থাকায় এবং পাছে কাহারও কাছে পাতা চাহিলে সে দুঃখী মনে করে, এই ভাবিয়া দাদামশাই অশ্বত্থপাতে বাবার লেখা শিখাইয়াছিলেন। এত কষ্টে আর কতদিন চলিবে। দাদামশাই সংসার অচল দেখিয়া আবার রোজগারের জন্য বাহির হইলেন।

আবার শ্বশুরবাড়ী।

দাদামশাইয়ের সকল শ্বশুরবাড়ী ঘুরিয়া আসিতে ৮।৯ বৎসর কাটিয়া গেল। বাড়ীতে যে দুঃখ, সেই দুঃখ। সংসার অচল। রামধন ও জগদম্বা—ভাই আর বোনে পরামর্শ করিয়া হরচরণের পৈতা দিল। পৈতার ভিক্ষা তখনকার দিনে অতি অল্প চাউল, সুপারী, পৈতা ও পয়সা মাত্র। তখন যাহা বড় গরিবের ঘরে দুঃখের ভিক্ষা ছিল, এখনও সেই প্রথাটিতে অনেকের মনে গর্ব্বের ভাব হয় যে, আমার ছেলের পৈতায় এত টাকা উঠিয়াছে। এ কথা বলিতে কোথায় লজ্জা হইবে, না সেটি যেন গর্ব্বের কথা হইয়াছে। যারা ভিক্ষা দেন, তাঁরাও টাকা দিয়া নিজের দানের গর্ব্ব প্রকাশ করেন। এই লোক-দেখান ভাবটা তখন ছিল না। ছেলেকে দিয়ে 'ভিক্ষাং দেহি' বলিয়ে আত্মীয়-বন্ধু, স্ত্রী-পুরুষ, সবার কাছে নত হ'তে শিখানতে যে বিনয়-নম্র ভাব শিখান হইত, ব্রহ্মচারীর কঠোর নিয়মে বাধ্য করিয়া যে আপনার উপর নির্ভরের ভাব শিখান হইত, সেটি ভুলিয়া এখন দেনাপাওনা, দোকানদারীর ভাব শিখান হইতেছে।

নেড়া-মাথায় বিবাহ।

ভাই বোনে পরামর্শ করিয়া সংসার চালাইবার সুবিধা করিবার জন্য পৈতার সময়েই নেড়ামাথায় বাবার বিবাহ দেওয়া হইল। হরচরণের প্রথম বিবাহ হইল ফরেশডাঙ্গায়; বধূমাতা ক্ষেত্রমণি কালীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা। বংশজের ছেলে বিয়ে দিয়ে এবার এই জন্য ভাই বোনে কিছু

টাকা ও সোণার গহনা পেয়েছিলেন। বংশজ কি না, টাকা না দিলে তার ঘরে কুলীনের ছেলে বিবাহ ক'রে তাদের কুল উজ্জ্বল কর্‌বে কেন? গরিব ভাই বোনে বাপকে না জানিয়েই হরচরণকে খন্নেন থেকে ফরেশডাঙ্গায় নিয়ে গিয়ে বিয়ে দিয়ে যে টাকা পেয়েছিলেন, তাতে তাঁদের অচল সংসার কিছু দিন সচল হইয়াছিল।

স্ত্রী পরিত্যাগের ভয়।

হরচরণের কিন্তু নিজ শ্বশুরালয় হইতে এ খবর জানিতে বাকি রহিল না; তিনি স্বীয় স্ত্রী পরিত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। ভাই বোনে প্রমাদ গণিলেন। লোকে বলে হিন্দু স্ত্রীর সাত পাকের বন্ধন, মুসলমান খৃষ্টানের মত সহজে ছিন্ন হয় না। এ কথা সত্য নহে। হিন্দুর নিয়মে স্ত্রী স্বামীকে পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না, স্বামী যখন ইচ্ছা স্ত্রী পরিত্যাগ করিতে পারিবেন।

হার বাজু পাওনার তাগাদা।

বিবাহের যৌতুকের কড়ারে হার বাজু পাওনা ছিল। ভাই বোনে পরামর্শ করিয়া হরচরণকে পিতার সঙ্গে দিয়া হার বাজু পাওনার কড়া তাগাদা করিবার জন্য শ্বশুরবাড়ী ফরেশডাঙ্গায় পাঠাইলেন।

সিতি ফুলঝুম্‌কো জামিন রেখে প্রণাম।

ক্ষেত্রমণির বাপও ছাপোষা মানুষ। বেহাই বেয়ানে পরমর্শ করিয়া ক্ষেত্রমণির গায়ের অলঙ্কার, সিঁতি ফুলঝুম্‌কো জামিন রেখে প্রণাম করিল। বলিল টাকা এখন নাই, মোকদ্দামায় খরচ হয়ে গেছে। তাহারা ভাবিয়াছিল, নিজের বউয়ের গায়ের গহনা কোন্ মুখে শ্বশুর মহাশয় লইয়া যাইবেন, এই ভাবিয়া বধূমাতাকে দিয়া গহনা হাতে প্রণাম করাইল।

কাপড়ে গহনা বাঁধিয়া রওনা।

মদনমোহন তখনই এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া গহনা গুলি নিজের কাপড়ে বাঁধিয়া রওনা হইলেন। পথে ছেলেকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন, 'আমার জন্য এত কম। এতে কি হবে? আমার আরও চাই।' হরচরণ পিতৃভক্ত ছেলে। গুরুজনের উপর তার অগাধ ভক্তি; নিজের ভাইদের নিকট হইতে ভক্তি আদায় করিতে তাহার বেগ পাইতে হইয়াছিল, কারণ এ ভক্তি বিনিময়ের ভক্তি। ভাবের বদলে ভাব চাই। ভক্তির প্রতিদান স্নেহ, ভালবাসার প্রতিদান প্রাণের টান। অর্থের সহিত কর্ম্মের সম্বন্ধ হইলে সে ভাব নিচু দরের। এই নিচু দরের ভক্তিই এখন সর্ব্বত্র বাপ মায়ে ছেলের অর্থের জন্য দাবী করেন ও মুখে বলেন এটি ভক্তি; ছেলেও ভক্তির মূল্য অর্থের দ্বারা তৌল করেন। ফলে ভক্তিহীনতাই দেখা যায়।

আর একটা বিয়ে কর্ব্ব, তোমাকে কিছু এনে দেব।

হরচরণ বাবার মনের দুঃখ সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন, "এতে হ'ল না বাবা! মনে তুমি কিছু কর না। মাকে কিছু ব'ল না; চল আমি আর একটা বিয়ে ক'রে তোমাকে কিছু এনে দিই।"

শ্যামনগরে ঘরজামাই।

বাপ বেটায় পথে আসিতে আসিতে যে পরামর্শ হইল, তাহার পাকা বন্দোবস্ত সেই সময়েই স্থির হইয়া গেল। ফরাসডাঙ্গার কিছু দূরে অপরপারে শ্যামনগর। শ্যামনগরের নপাড়ার জমিদারদের বড় ইচ্ছা যে, মেয়ে চন্দ্রমণিকে কুলীনে দিয়া নিজ কুল উজ্জ্বল করেন। তবে জমিদার বলিয়া জামাইকে ঘরজামাই করিয়া রাখিবার কড়ার করিয়া লইবেন বলিয়া বিবাহ সহজ হয় নাই; কারণ কুলীনের ছেলের গরজ না হইলে সে ভবিষ্যৎ আমদানী বিবাহের পথ বন্ধ করিয়া ঘরজামাই হইতে রাজি হইবে কেন?

গরজ বড় বালাই।

হরচরণ বাবাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য এই নিঃস্বার্থ কাজটা স্বীকার করিলেন। হরচরণের বয়স তখন ১২।১৩ বৎসর মাত্র। তাঁর ছোট ছোট দুটি উজ্জ্বল চোকে মুখখানি বড় সুন্দর দেখাইত। কপালে পুরুষের কপাল যেমন হয়, তেমনই

তাঁর কপাল ছিল। তাঁর এমন সুন্দর রূপ ছিল ও কোঁকড়া কোঁকড়া চুল ছিল যে, তখনকার সাহেবেরাও তাঁকে দেখে তারিফ ক'রত। রং গোরাদের মত কিছু লাল্‌চে। এরূপ ছেলে যদি আবার কুলীন হয় ও ঘরজামাই থাকিতে চায়, তবে সেকালের বাজারে পড়্‌তে পায় না।

ছোলাভাজা মুড়ির স্থানে বাদাম পেস্তা চিবান।

হরচরণের বাপ ভাবিলেন যে, ছেলে যখন বড়লোক শ্বশুরের ঘরে ছোলাভাজা মুড়ির বদলে বাদাম পেস্তা চিবাইবে, তখন ভালই হইবে। এই ভাবিয়া মনকে প্রবোধ দিলেন। ঘরজামাই হইতে মদনমোহনকে কেহ ছেলেবেলায় বলিলে সে কখনও স্বীকৃত হইত না, কারণ ঘরজামাইয়ের স্ত্রী কখনও বাধ্য হয় না। সে বিবাহে কখন সুখও হয় না।

ছেলের একটা হিল্লে হবে।

বড়মানুষ শ্বশুর হ'লে ছেলের একটা হিল্লে হবে, তার সহজেই চাকরি বাকরী হবে, সে চাই কি একদিন থানার দারোগা হবে। বুঝি থানার দারোগার চেয়ে আর বড় পদের কথা তখন কেউ ভাব্‌তে পারতেন না। এই রকম সাত পাঁচ ভেবে মদনমোহন তাঁর ছেলেটিকে রামমোহন জমিদারের মেয়ের হাতে সঁপে দিয়ে পাওনাগণ্ডা বুঝে নিয়ে এলেন। বাড়ী গিয়ে পরিবার ও সম্বন্ধীকে সেই হিল্লে হওয়ার কথাটি বুঝাইলেন। তাঁরাও বকুনির দায় হইতে অব্যাহতি পাইলেন ভাবিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

নিমফল পাটীর বদলে কবচ ও হার।

কবচ ও হার প'রে যখন হরচরণ শ্যামনগরের মেটে রাস্তায় বেড়াইত, তখন ঘুঙ্গুর, নিমফল ও পাটীপরা ছেলেরা তাঁর সৌভাগ্য দেখিয়া আপনাদের ধিক্কার দিত। হরচরণের সৌভাগের আর সীমা নাই, তবু হরচরণ জমিদার ভাইদের মধ্যে ছোট ভাই রামমোহনের মেয়েকে বিবাহ করিয়াছিল।

একটা আস্ত কাঁটাল একলা খেলে সাপের বিষ যায়।

ছেলে রামমোহন একটা কাঁটাল আস্ত খেতে আব্দার ধরিল। ফলও হইল। মায়ের ইচ্ছা ভাল কাঁটালটি ছোট ছেলে রামমোহনকে খাওয়ায়, কিন্তু অন্য ছেলের ভয়ে দিতে পারেন না। ছেলে ফন্দি ক'রে বল্লে "মা কিসে কামড়াল" মা, সাপে কামড়েছে মনে ক'রে একটা টাকা ছেলের মুখে দিয়ে নীল হয় কি না দেখতে লাগ্‌লেন। চিনি মুখে দিলে নুনের মত লাগ্‌তে লাগল। শেষ অন্য উপায় না পেয়ে ভাল কাঁটালটি আস্ত খেতে দেওয়া হইল। কাঁটালে অমৃত থাকে। সেই অমৃতে সাপের বিষ কাটিয়া গেল। রাম-মোহনের সেই দিন থেকে পেটের পিলে পাঁজরায় চ'লে গিয়ে চিরকালের মত পিলে ভাল হ'য়ে গেল।

ডাকাতপড়া।

মা যখন হন নি, তখন শ্যামনগরে একবার ডাকাত পড়ে। ডাকাতেরা আস্‌বার আগে চিঠি এল 'আজ তোমাদের বাড়ী যাব।' সকলে ভয়ে অস্থির। কেটো সিঁড়ি দিয়ে ডাকাতেরা যখন ঘুজ্ ঘুজ্ করে ঢুক্‌ল, তার আগেই সকলে অড়হর ক্ষেতে লুকিয়েছেন। তারা অড়হর বনে মশালের আগুন জ্বেলে দিল। মশাল জ্বেলে রেখে গেলে বড় মঙ্গল। ডাকাতেরা অনেক টাকা ও গহনা পেয়ে বড় খুসি হয়ে মশাল জ্বেলে রেখে গেল, আর ব'লে গেল "বেনিয়াকা ঘর হ্যায়"। ডাকাতেরা চলে গেল, ধন আবার উথ্‌লে পড়ল।

মশাল নিবিয়ে গেলে লক্ষ্মীও চলে গেল।

শ্যামনগরের বাবুদের একে একে সব গেলেও পয়সা যা ছিল তা গৃহস্থের পক্ষে অনেক হ'লেও ডাকাতদের পক্ষে অতি অল্পই হইয়াছিল। তাই তারা যখন আবার চিঠি পাঠিয়ে আসিল, তখন কেবল সিন্দুক দেখিল। দশ গণ্ডা খালি সিন্দুক দেখে তারা বড়ই বিরক্ত হ'ল। খুঁজে খুঁজে কিছু পায় না। তারা গোদা মাসীর হাতে যখন সোণার পৈচে দেখেছে, তখন যে আরও কিছু আছে, তা বেশ বুঝিয়াছিল। তারা তখন দূর সম্পর্কীয় ভৈরব মামাকে বলিদানের খাঁড়া দিয়া সর্ব্বাঙ্গে আঘাত করিল। গোদা মাসীকে ঘিয়ে ভাজিবার চেষ্টা করিলে গোদা মাসী সোণার পৈঁচে বের ক'রে দিলেন। শেষে কিছু না পেয়ে তারা যখন চালে ডালে সব একাকার ক'রে দিতে লাগ্‌ল, তখন দিদিমা প্রায় উলঙ্গ হয়ে এলোচুল ক'রে বলিদানের খাঁড়া

নিয়ে তাদের সম্মুখে দাঁড়ালেন। তখন তাদের দল স্বয়ং মা দুর্গা ভেবে দিদিমাকে নমস্কার ক'রে চ'লে গেল। এবার কিন্তু মশাল নিবিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে শ্যামনগরের লক্ষ্মী চ'লে গেল। যক্ষীর বাড়ী থেকে যক্ষ চলে গেল।

মেজর স্লীমেন—ঠগীধরা সাহেব।

ইহার কিছু দিন পরে মেজর স্লীমেন বারাকপুর হইতে গোরার দল লইয়া যখন শ্যামনগরের মাঠে তাঁবু গাড়িয়াছিল, তখন আমার পিতা হরচরণও অন্য ছেলেদের সহিত সকালবেলা গাড়ু হাতে বাগানে গিয়াছিলেন। সাহেবের তাঁবুতে তখন সাপ ঢুকিয়াছিল, সাহেব প্রাণের ভয়ে তাঁবু হইতে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। সাপ যখন তাঁবুর বাহিরে আসিতেছিল, সে সময় হরচরণ দেখিতে পাইয়া গাছের ডাল ভাঙ্গিয়া তখনই সাপ মারিয়া ফেলিল। হরচরণের গোরাদের মত সুন্দর চেহারা, সৌম্যমূর্ত্তি ও সৎসাহস দেখিয়া স্লীমেন সাহেব তখন তাহাকে নিকটে ডাকিলেন। তখন হরচরণের বয়স সতর সৎসর, অল্প অল্প গোঁফের রেখা মাত্র দেখা দিয়াছিল। সাহেব জমিদার রামমোহনকে চিনিতেন। রামমোহন মিরাটে কমিসারিয়েটে কাজ করিয়াছিলেন। রামমোহনের মৃত্যুর পর তাঁহার দুর্দ্দশার কথা শুনিয়া সাহেব হরচরণকে স্বীয় সহকারার লেখকের কার্য্য দিয়া তাহাকে আহত সৈনিকের ডুলিতে চড়াইয়া লইয়া গেলেন।

গাড়ু হাতে হরচরণ নিরুদ্দেশ।

হরচরণ বাড়ীতে কোন সংবাদ না দিয়া এরূপ ভাবে নিরুদ্দেশ হইলে, জগদম্বা ও রামধন পরামর্শ করিয়া ফরেশডাঙ্গার ক্ষেত্রমণি ও শ্যামনগরের চন্দ্রমণি দুই গর্ভবতী বধূমাতাকে লইয়া আসিল। এবার কাটনা কাটিয়া দুই খানি নতুন কাপড় পরাইয়া সাধ ভক্ষণ করান হইল। দুই বউয়ের দুই কন্যা হইল।

বউদের গহনা লইয়া সংসার চালান।

পুরাতন আমগাছ বেচিয়া আর সংসার চলে না দেখিয়া বউদের গহনা ছোট হইয়া গিয়াছে, পাঁইজোর আর পরা ভাল দেখায় না ইত্যাদি বলিয়া ছুতায় নাতায় সে গুলি বন্ধক দিয়া সংসার-খরচ চলিল। এদিকে মদনমোহনের শ্বশুরালয় হইতে তাঁহার অকাল-মৃত্যুর সংবাদ পাওয়া গেল। জগদম্বা লোকেদের উপর বড় রাগিয়া গেলেন। মানুষের অদৃষ্ট যখন বড় খারাপ হয়, তখন আর মানুষ ভগবানের অবিচার ভাবিয়া ভগবানকে গাল দিতে পারে না, তখন লোকেদের গালাগালি দেয়। ছেলেরা যেমন দেওয়ালে মাথা ঠুকিয়া গেলে দেওয়ালকে মারে, সেইরূপ সরল প্রকৃতির মানুষ লোকমাত্রেরই উপর নারাজ হয়।

হরচরণের পত্র।

একবার সুখ একবার দুঃখ, এই ভাব সংসারে দেখা যায়। মেজর সাহেবের প্রিয়পাত্র হরচরণের ক্রমে ক্রমে ত্রিশ টাকা মাহিয়ানা হইলে তিনি বাড়ীতে পত্র লিখিলেন। গরিব সংসার টাকার মুখ দেখিয়া আনন্দে অধীর হইল।

এক চড়ে এক ঠগী মারা।

হরচরণ স্লীমেন সাহেবের সঙ্গে যখন সারণ ছাপরায় বদলী হইলেন, তখন সেখানে দরিয়ার কুম্ভীরের উপদ্রব দূর করিতে ও ঠগীদের অত্যাচার দমন করিতে তাঁহার উপর ভার পড়িল। নদীতে যদি কোন স্ত্রীলোক গহনা পরিয়া নামিত, তাহাকে কুম্ভীরে কোথায় লইয়া যাইত; শেষে তাহার মৃতদেহ ভাসিয়া উঠিত। পুরুষদের কিছুই হইত না। হরচরণ বুঝিলেন ইহা কুম্ভীর নহে, ইহা ঠগীদেরই কীর্ত্তি। তিনি একদিন স্ত্রীলোকের পোষাক ও গায়ে গহনা পরিয়া কোমরে দড়ি বাঁধিয়া দুই জনকে দড়ির অগ্রভাগ ধরিতে বলিয়া জলে নামিলেন। জলে নামিবার পরেই তাঁহাকে কে যেন জড়াইয়া ধড়িল ও গভীর জলে টানিয়া লইতে লাগিল। হরচরণ দড়ি টানিয়া ইঙ্গিত করিলেন ও সেই লোকটাকে জড়াইয়া ধরিলেন ডাঙ্গায় উঠিলে সকলে দেখিল হরচরণ একজন ঠগীকে টানিয়া আনিয়াছেন। লোকটাকে ছাড়িয়া দেওয়ামাত্র চতুর্দ্দিকে লোক ঘিরিয়া দাঁড়াইল। ঠগী উপায়ান্তর না দেখিয়া অধোবদন হইলে, হরচরণ রাগের মাথায় তাহাকে এক বিরাশী সিক্কার ওজনে চড় মারিলেন। সেই এক চড়েই সে ধরাশায়ী হইল! ইহাতেই পিতার উন্নতির সূত্রপাত হইল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনিস্তারিণী দেবী।

৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

একি মর্ম্মভেদি বাণী! একি হ'ল—এত অকস্মাৎ
নির্মেঘ গগন হ'তে আচম্বিতে রুদ্র বজ্রপাত?
স্বপনেও নাহি জানি মধ্যদিনে সূর্য্যাস্তের শোক
আঁধারিবে বাণী-কুঞ্জ—ভারতীর আরতি-আলোক
বাষ্পাকুল আঁখিকূলে নেহারিব অস্ফুট মলিন,
আকার-হারাণ' শিখা হ'বে হায় ছায়ায় বিলীন!

প্রতিভা-বীণায় যা'র উথলিত ঝঙ্কার-সাগর,
রাগিণীরা মূর্ত্তি ধরি' বিহরিত দূর-দূরান্তর—
ধ্যান-নেত্রে হেরিল যে সদ্যঃস্নাতা ভারত-লক্ষ্মীর
সিন্ধু হ'তে অভ্যুত্থান; অম্বিকা সে জগন্মোহিনীর
চরণ-মঞ্জীর ঘিরি' নৃত্য করে সূর্য্য-তারা-সোম,
বিশ্ব-জলধির বক্ষে, নত শীর্ষে প্রণমিছে ব্যোম।

হে কবীন্দ্র, বাণী-ভক্ত, মহাপ্রাণ, স্বদেশ-প্রেমিক,
পরিহরি' বসুধার এই মায়া-কন্দুক অলীক,
মহিমার উপাধানে রাখি' শির ঘুমাইছ সুখে—
স্বপ্নহারা কি প্রশান্তি! কি নির্ম্মাল্য ভাসে তব মুখে!

যৌবনের কুঞ্জবনে, উৎসবের অশোক-মঞ্জরী-
হিন্দোলাতে যা'র সাথে মদালসা কবিতা-অপ্সরী
সম্ভাষিয়া হাসিমুখে, দিত দোল ভাব-চন্দ্রিকায়—
সে আজি তাহারে লয়ে' উত্তরিল নবীন বেলায়।

সন্ধ্যার সীমন্ত-মেঘে ঢাকি' নীল-কজ্জল-অলকে,
সে আজি বাসর জাগে সাথে তার কোন্ কল্পলোকে?
পূর্ণ দধি-সমুদ্রের উর্ম্মি-শঙ্খ বাজে সুগম্ভীর,
অমরী ভাসায় তরী - এলোচুলে লুকায় তিমির।

প্রেমচন্দ্রকান্ত-প্রভা বক্ষে তব নির্ম্মিল দেউল,
শক্তিমান্ পুরোহিত, মন্ত্র-চিন্তা-গৌরবে অতুল,
রঙ্গ-হাস্য-অশ্রু-উৎস, করুণায় সুমধুর প্রাণ—
আজি শুনিতেছ, দেব, অমরায় চিরন্তন গান।

আরাধনা করে' গেছ মানবের জীবন-মরণ—
কল্পনার ফুল্ল পক্ষে সঞ্চরিছ পেলবগুণ্ঠন
রহস্য-রাজ্যের মাঝে,—মৃত্যু দেছে দ্বার উদ্‌ঘাটিয়া—
নব জাগরণ লভি' বেলাহীন নীলাম্বু চুম্বিয়া
কোথা যাও? পিছে তব গঙ্গোত্তরী, সমবেদনার
হিমশিলা গলি' গলি' ঢলি' পড়ে রচি' পারাবার।

তা'র মাঝে হে বিজয়ী, জাগে ওই বলয়-রেখায়
হাসির প্রবাল দ্বীপ, কান্ত বসন্তের সুষমায়;
বহে' যায় অশ্রু-ফল্গু, ফেনহাস্য আননে তাহার
উচ্ছ্বসিত হেমবিম্বে। অভিরাম সে চিত্রশালার
অন্তঃপুরে প্রবেশিয়া, হাসিয়াছে স্বজাতি তোমার—
বুঝেনি দর্পণতলে বিরাজিত মূর্ত্তি আপনার।

জাতীয় কলঙ্কলজ্জা, জড়তার ধিক্কৃত গঞ্জনা,
সহিয়াছ মর্ম্মে মর্ম্মে, আশীবিষ দংশন-যন্ত্রণা—
দেখিয়া যে এসেছিলে সমুদ্রের পরপার হ'তে
মানবত্ব-'পিরামিড্' গড়ে কা'রা আত্মদান-ব্রতে
জাতিরে করিতে ধন্য। হে মহান্, হে উচ্চ-উদার,
জাগাতে এ মরা-গাঙ্গে জীবনের সে নব জোয়ার,
প্রাণপণ আকিঞ্চনে তরী তব বাহিলে উজান—
কিন্তু জীবন্মৃত মোরা তন্দ্রাঘোরে মেলি নি নয়ান।

পাসরি' প্রাণের হাসি আছে যা'রা মরমে মরিয়া,
জীবনের উপবন গেছে খর কণ্টকে ভরিয়া,
জ্বালায়ে পঞ্জরতলে হিংসার প্রলয়-হুতাশন—
ঊষর মরুভূ-মাঝে ঘোরে সদা প্রেতের মতন—
ডেকেছ এদের তুমি, এরা যে তোমার সহোদর,
হরষের সোম-রসে জুড়ায়েছ বিশুষ্ক অধর।

দেখ নি ঘৃণার চোখে স্বজাতির শত অবিচার,
দাঁড়ায়ে বিদ্রোহী সম বিদ্রূপের তীক্ষ্ণ অসিধার
হান নি তাদের বক্ষে—ফুটাও নি তীব্র শ্লেষ-সূচি—
প্রদীপ্ত তোমার শ্লোকে রহস্যের পূর্ণ-শশি-রুচি।

অলঙ্কৃত ছিলে, দেব, অপার্থিব প্রসাদে সম্পদে,
ফুটিল যে তামরস তোমার সে মানসের হ্রদে
অফুরন্ত পরিমলে চিরদিন মাতোয়ারা করি'
রাখিবে বঙ্গের কুঞ্জ। অকপট অশ্রুর লহরী

অতরল করি' মোরা রচি' তব বিজয়-তোরণ,
তোমার স্মৃতিরে সেথা পুণ্যলগ্নে করিব বরণ।
শতাব্দীর ইতিকথা কীর্ত্তি তব রাখিবে গাথিয়া
জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলী মাঝে রত্ন-বেদী দিবে উদ্ভাসিয়া।

যাও আজি, হে কবীন্দ্র, মরণের মহার্ণব পারে,
যেথানে অক্ষয় উষা আলিঙ্গিয়া লইবে তোমারে।

অবনীর রণাঙ্গনে লভিয়া গৌরব-উপায়ন
আলোকের পানে আজি খুলে দাও প্রাণ-বাতায়ন,
আনন্দের মধুবণ চন্দ্রমল্লী করিয়া চয়ন,
পিঙ্গল চিতার ধূমে কর, দেব, শান্তিতে শয়ন।

শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রীআদ্যাকুমার চৌধুরীর আলোকচিত্র হইতে। পুষ্প-চয়ন।

পাষাণী
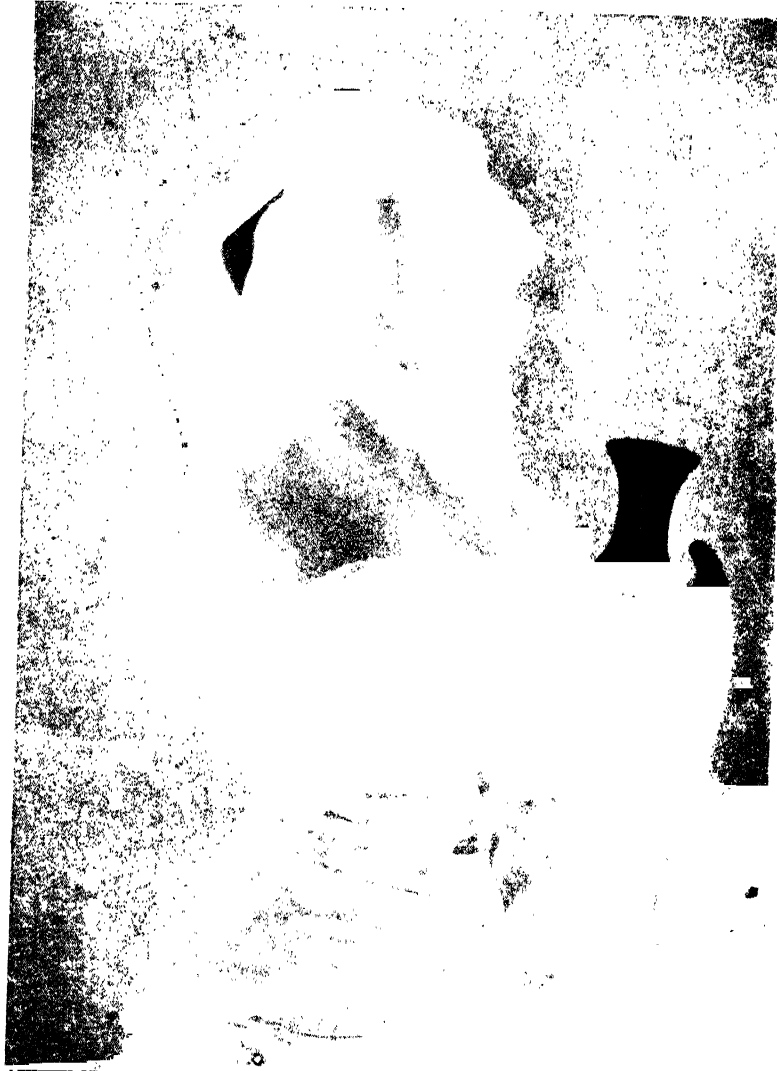
"ইন্দীবরেণ নয়নং মুখমম্বুজেন
কুন্দেন দন্তমধরং নবপল্লবেন।
অঙ্গানি চম্পকদলৈঃ স বিধায় ধাতা
কান্তে কথং ঘটিতবানুপলেন চেতঃ॥"—ভবভূতি

K. V. Seyne : Bros.

রাজমহলের সহিত পৌণ্ড্রক্ষেত্রের সম্বন্ধ।

প্রাচীন গঙ্গানদীর অবস্থান।

(ভূতত্ত্ব)

ভূতত্ত্ববিৎগণ সূক্ষ্মদর্শন দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন যে, পৃথিবীর কোন্ অংশ কোন্ সময়ে কীদৃশ অবস্থায় ছিল এবং কোন্ কোন্ দেশ কোন্ কোন্ দেশের সহিত প্রাচীনকালে সংযুক্ত ছিল। তাঁহাদের ভূয়োদর্শনফলে যে বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহার দ্বারা আমরা বুঝিতে পারি, কোন্ যুগে, কোন্ প্রদেশে, কোন্ কোন উদ্ভিদ বা জীবাদির বাস ছিল। কালক্রমে কোন কোন প্রদেশে প্রাচীন জীব ও উদ্ভিদ-জগতের পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু ভূগর্ভস্থ বহুকাল নিহিত জীব ও উদ্ভিদ কঙ্কাল (Fossil) গুলি পরিদর্শন করিয়া, প্রত্যেক ভূস্তরের অবস্থা এবং সেই সেই বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন যুগ-নিহিত Fossil গুলি দেখিয়া, সেই দেশের প্রত্যেক যুগ (age) গুলির ধারাবাহিক বিবরণ সংগ্রহের সহিত সেই প্রদেশের একটা প্রাচীন ভূতত্ত্ব অবগত হওয়া যায়।

মৃত্তিকাস্তরগুলির একটা নির্দ্দিষ্ট 'স্বজাতীয়ত্ব' ভাব বর্ত্তমান আছে; ইহা তাঁহারাই প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। কোন স্তরে কোন্ ধাতব ও যৌগিক পদার্থের অবস্থান, তাহাও এই নিয়মে আমরা অবগত হই।

ভারতের ভূবিদ্যা আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই, কোন্ কোন ভারতীয় দেশ প্রাচীন ও কোন্গুলি আধুনিক বাসোপযোগী হইয়াছে। আমরা সমুদায় ভারতের এইরূপ বর্ণনায় অগ্রসর হইতেছি না; আমাদের পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ও গৌড়ের সহিত যেটুকু সম্বন্ধ রহিয়াছে, তাহারই বিবরণ সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করাই আমাদের উদ্দেশ্য। তবে সংক্ষেপে সমগ্র ভারতের কথা কিঞ্চিৎ বলিয়া রাখিলে, বাঙ্গলার মাটীর পরিচয়ের সুবিধা হইবে।

মাননীয় H. B. Mealicott M.A. F.R.S. &c. মহাশয়ের "Geology of India" নামক পুস্তক পাঠে আমরা আমাদের দেশের প্রাচীন ভূবিদ্যা সুন্দররূপে অবগত হই। তাঁহার পুস্তকে ভূতত্ত্বপরিজ্ঞাপক যে, "Geology of India" নামক মানচিত্র প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইয়াছে।

এই "Geology of India"র সহিত Imperial Gazetteer Vol. I নামক পুস্তকখানি পাঠ করিলে, পুরাকালে ভারত কত বড় ছিল, তাহার একটা ধারণা করিয়া লইতে পারি। সেই ধারণায় আমাদের প্রাচীন হিন্দুগণের কাল্পনিক ভূবিভাগ যে কত দূর সত্য, তাহা উপলব্ধি করিতে পারি।

ভারত তখন আজকালকার মত ছিল না। সিংহল, অষ্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা প্রভৃতির সহিত সংযুক্ত ছিল। তাহা Fossil এবং Coal mine দ্বারা প্রমাণিত হইয়া পড়িয়াছে। ভূস্তরের ক্রমিক অবস্থানে তাহার সুস্পষ্ট নিদর্শন অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। পুরাকালে ভারতবর্ষের সকল স্থানে মানব বাসোপযোগী উন্নত ভূভাগ ছিল না। ছোটনাগপুর হইতে মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সি পর্য্যন্ত ভারতের আদিম উন্নত প্রদেশ ছিল। জিওলজি এই প্রদেশের crystalline, granite প্রভৃতি সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন।

হিমালয় পর্ব্বতের পাদদেশে Upper Territory soil রেখার নিম্নে পঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ, বিহার এবং বাঙ্গলা এই স্থানগুলি অতীব প্রাচীনকালে মহাসমুদ্র ছিল বলিয়া উক্ত হইয়াছে এবং এই সকল স্থানের মাটী recent ও sub recent soilএর অন্তর্গত, কেবল পলিমাটি পড়িয়া এই স্থানগুলি উন্নত হইয়াছে। তথাপি ভারতের সকল প্রদেশ হইতে এই recent ও sub-recent soil গুলি নিম্নতর।

বঙ্গদেশ ও গৌড় সহ পৌণ্ড্রবর্দ্ধন recent এবং sub recent soilএর অন্তর্গত। সেই কারণে এদেশে নিম্নজলা ভূমির আতিশয্য এবং ইহা বিল, খাল ও নদী সমাকীর্ণ। আজও পৌণ্ড্রদেশ পরিভ্রমণ করিলে প্রাচীনকালের অত্যধিক নদীপ্রবাহের সুস্পষ্ট চিহ্ন পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। প্রাচীনকালে পৌণ্ড্রদেশ বহুসংখ্যক বৃহৎ নদনদী দ্বারা সমাকীর্ণ ছিল, বহু কেদারবাহিনী নদীও ছিল; তদ্ব্যতীত অনেক বড় বড় বিল খালও ছিল।

আজকাল তাহারা লুপ্ত ও শুষ্ক অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে; এবং কতকগুলি ক্রমশঃ ভরাট হইয়া কৃষিকার্য্যের উপযোগী হইয়া পড়িতেছে।

পৌণ্ড্রদেশে অত্যধিক শুষ্ক বিল, নদীগর্ভ ও মৃত্তিকার অবস্থা দেখিয়া মনে হয়, কোন নৈসর্গিক কারণে পৌণ্ড্রদেশ উন্নত হইয়া পড়িয়াছে, অথবা ধীরে ধীরে ক্রমশঃ উন্নত হইতেছে।

এই প্রকারে পৌণ্ড্র ভূপৃষ্ঠ উন্নত হওয়াতে, বহু প্রাচীন নদীর গতি ফিরিয়া গিয়াছে ও যাইতেছে। স্কন্দপুরাণে করতোয়া-মাহাত্ম্য বর্ণনা প্রসঙ্গে পৌণ্ড্রক্ষেত্র কূর্ম্মপৃষ্ঠাকার বলিয়া গিয়াছেন; বাস্তবিক তাহার ব্যতিক্রম হউক আর নাই হউক, পৌণ্ড্র ভূপৃষ্ঠের যে পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে, তাহা সুনিশ্চিত।

পৌণ্ড্র পৃষ্ঠের কঙ্করময় রক্তমৃত্তিকা (Alumen soil) দৃষ্টে আমাদের অনুমান হয়, খুব সম্ভব ভূগর্ভস্থ কোন পরিবর্ত্তনের ফলে গৌড় ভূপৃষ্ঠ উন্নত ও পরিবর্ত্তিত হইয়া পড়িয়াছে। কেবল যে পৌণ্ড্রক্ষেত্রই ভূগর্ভে কোন কারণবশতঃ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে তাহা নহে, রাঢ় দেশের কিয়দংশ সেই নৈসর্গিক পরিবর্ত্তনের দ্বারা পরিবর্ত্তিত হইয়া পড়িয়াছে।

কতদিন হইল এই পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে, তাহা বলা অসম্ভব হইলেও সম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। আমরা রাজমহল-পাহাড়শ্রেণী ও দামোদর-পাহাড়শ্রেণীর দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিলেই এই পরিবর্ত্তনের একটি আদিম ইতিহাস পাইতে পারি।

রাজমহল-পাহাড় আমাদের আলোচ্য বিষয়। রাজমহল পাহাড়প্রদেশটি Jurassic extra peninsular এবং Upper Gondwana peninsular soil বলিয়া ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ নির্ব্বাচন করিয়াছেন।

একদিকে crystalline, অপরদিকে recent ও sub-recent soil, মধ্যে খানিকটা Jurassic extra peninsular soil কেন বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহা কি আমাদের দেখিবার বা আলোচনা করিবার বিষয়ীভূত নহে?

রাজমহল ভূভাগ ছোট ছোট ও উঁচুনীচু পাহাড়ের সমান্তর (parallel) শ্রেণী। আমরা যে রাজমহলের পাথর দেখি, বাস্তবিক তাহা প্রস্তর মধ্যে গণ্য হইবার উপযুক্ত নহে। উহা lava শ্রেণীর অন্তর্গত basaltic traps; basaltic প্রস্তরগুলি একপ্রকার lava অর্থাৎ ভূগর্ভস্থ অগ্ন্যুৎপাতের ফলে হঠাৎ উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে। এইস্থানে যথেষ্ট মূল্যবান্ প্রস্তর আছে। নৈসর্গিক বলে ভূপৃষ্ঠ বিদীর্ণ হইয়া ভূগর্ভস্থ পদার্থসমূহ আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতে তরলীকৃত হইয়া প্রবলবেগে বিদারণপথে বাহির হইয়া ক্রমে জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে।

এই জন্য রাজমহল পাহাড়গুলি কতকটা ভূপৃষ্ঠে সমান্তর-ভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে, যেন তরল পদার্থের ঢেউ জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে।

রাজমহল পাহাড়ভূমির সহিত পার্শ্বস্থ ভূখণ্ডের ও ভূস্তরের সাদৃশ্য বর্ত্তমান নাই। এই বৈসাদৃশ্য দর্শনে রাজমহল soilটি Jurassic শ্রেণীর মধ্যে পড়িয়াছে এবং সাদৃশ্যে Upper Gondwanaর সহিত কতকটা মিলিয়া গিয়াছে। যে নিয়মে যে প্রকারে রাজমহল ভূপৃষ্ঠের উন্নতির কারণ নির্দ্দেশ করা যায়, সেই নিয়ম কটক, রাজমহেন্দ্রী, পাচমারি সম্বন্ধেও খাটে।

এক নিয়মের অধীন হইলেও রাজমহলে জান্তব Fossil-এর বড়ই অভাব; অর্থাৎ উহার স্তর মধ্যে কেবল উদ্ভিদ Fossil দৃষ্ট হইয়া থাকে; কিন্তু পূর্ব্বোল্লিখিত অন্যান্য স্থানে Fossil দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা আমাদের মনে হয়, রাজমহল উল্লিখিত স্থানের সহিত সমতা রক্ষা না করিয়া, কোন এক যুগ অতিক্রম করিয়া মাথা ঠেলিয়া উঠিয়াছে।

রাজমহলে Kaolin load stone প্রভৃতির অস্তিত্ব দৃষ্ট হয় এবং Coal mine বা carbon iforous স্তর আদৌ নাই, যাহা আছে, তাহা নগণ্য; কিন্তু Kaniganj, Assansole অঞ্চলের ভূস্তরে যথেষ্ট Coal স্তর দৃষ্ট হইয়া থাকে। যাক্, আমাদের উহা বর্ণনা উদ্দেশ্য নহে; আমরা বলিতে চাই, পৌণ্ড্র (গৌড়) দেশটি রাজমহলের অন্তর্গত ভূভাগ; কিন্তু জিওলজিষ্টগণ উক্ত পৌণ্ড্রভূমি recent ও sub-recent soilএর অন্তর্গত করিয়া রাখিয়াছেন। বাস্তবিক তাহা স্বীকার করিতে হয়। তবে

আমরা Rajmahal soilএর সহিত পৌণ্ড্রভূমির সাদৃশ্য বর্ণনা করিতে চাই কেন, তাহা বলিতেছি---এস্থলে সাদৃশ্য বলিবার উদ্দেশ্য—যে সময়ে রাজমহল পাহাড়গুলি মাথা তুলিয়াছিল এবং যে কারণে ঐ বিপ্লব ঘটিয়াছিল, তাহার সহিত পৌণ্ড্রভূমির সম্বন্ধ বর্ত্তমান রহিয়াছে দেখি। পৌণ্ড্রভূমি recent বা sub-recent soilএর অন্তর্গত হইলেও, Lead mine এর সন্ধান পৌণ্ড্রভূমিতে বর্ত্তমান থাকিবার কথা অবগত হওয়া যায়। আর পৌণ্ড্রভূমি রক্তমৃত্তিকা ও অগ্ন্যুৎপাতোদ্ভূত কঙ্করময়। এই রক্তমৃত্তিকা দেখিতে সাঁওতাল পরগণা বা রাজমহলের মাটির মত। আবার পৌণ্ড্রবর্দ্ধন কোন কোন ধাতুর আকর ভূমি বলিয়াও পরিচয় পাইয়া থাকি।

ইহাতে কি মনে হয় না যে, পৌণ্ড্রক্ষেত্র কোন কালে ভূগর্ভস্থ আগ্নেয় উৎপাতে উন্নত হইয়াছে? রাজমহল উন্নত হইবার নিয়ম ইহাতে ঠিক বর্ত্তমান না থাকিতে পারে, কিন্তু নিকটে কোন আগ্নেয় বিপ্লব হইলে তন্নিকটবর্ত্তী ভূস্তরে তাহার একটা চিহ্ন বর্ত্তমান থাকিতে সাধারণতঃ দেখা যায়। উদাহরণ স্বরূপ আমরা বলিতে পারি—অনেকেই শ্লেট প্রস্তরে এক প্রকার গোলাকার বা ডিম্বাকার চিহ্ন (mark) দেখিতে পাইয়া থাকেন। কি কারণে ঐ চিহ্নগুলি শ্লেট প্রস্তরে সূচিত হইয়াছে, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিলেই বুঝিবেন---যে, ভূস্তরে পলিময় শ্লেট-প্রস্তর বিদ্যমান ছিল। তাহার অনতিদূরে কোন কালে একটা আগ্নেয় উৎপাত ঘটিয়া থাকিবে এবং সেই আগ্নেয়-উৎপাতের ফলেও শ্লেট পলি ভেদ করিয়া ভূগর্ভের আগ্নেয় বিপ্লবের ফলে কোন কিছু উপ্গত হইয়াছে, অথবা উত্তাপ বা একটা তেজ ও বল উক্ত অংশে কার্য্যকর হইয়াছে, তাহারই সমস্ত চিহ্ন শ্লেট-প্রস্তরে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে। আবার দেখিতে পাওয়া যায়, দূরবর্ত্তী ভূগর্ভস্থ আগ্নেয় উৎপাতের ফলে অদূরস্থিত কতিপয় ভূস্তর ভূপৃষ্ঠের দিকে উল্টাইয়া পড়ে, তাহাকে সচরাচর Vault হওয়া বলে। তাহাতে হয় কি?

না—ভূপৃষ্ঠের উপর স্তর মাথা গুঁজিয়া ভূপৃষ্ঠের নিম্নস্তরে প্রবেশ করে এবং নিম্ন ভূস্তরগুলি যাহা অতিশয় নিম্নে ছিল, তাহা surfaceএ উঠিয়া পড়ে। জিওলজিবেত্তারা তাহা দেখিয়া ধরিয়া ফেলেন। আমাদের চক্ষে তাহা পড়িবার উপায় নাই। ধরুন, একস্থানে ভূগর্ভে কএক ফিট coal স্তর বিদ্যমান রহিয়াছে; কয়লা তুলিতে তুলিতে দেখা গেল, সেই স্তর হঠাৎ লুপ্ত হইয়াছে এবং সেই স্থানে অন্য স্তর দৃষ্ট হইতেছে। জিওলজিষ্টগণ, অমনই ধরিয়া ফেলেন, এই স্তরটি কোথাও Vault করিয়াছে; সুতরাং এই স্তর আবার কতদূরে গিয়া উঠিয়াছে, তাহা তাঁহারা অঙ্কশাস্ত্র দ্বারা ধরিতে পারেন। হয় ত গভীর ভূগর্ভস্থিত স্তরটি অন্যত্র গিয়া অপেক্ষাকৃত ভূপৃষ্ঠাভিমুখীন হয় বলিয়া তাঁহাদের কয়লা উত্তোলনের সুবিধা হইয়া থাকে।

আমরা মনে করি, এই নিয়মে পৌণ্ড্রভূপৃষ্ঠ রাজমহল পাহাড়ে উঠিবার সময় ঐ প্রকারে উৎক্ষিপ্ত হইয়া দেখিতে পাই, উক্ত অংশের Recent ও subrecent soilটি নিম্নে এবং ইহার কতকটা নিম্নস্থ ভূস্তর উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। তাই পৌণ্ড্রক্ষেত্রের Recent soil কতকটা স্থানে আংশিক অদৃশ্য হইয়া ভূগর্ভস্থ আগ্নেয় কঙ্কর-সংযুক্ত আলিউমিনেটময় রক্তমৃত্তিকার স্তর উপরে উঠিয়া পড়িয়াছে।

আদিম ও প্রকৃত পলি মাটির স্তরে ধান্য ভাল জন্মে না; উক্ত রক্ত-মৃত্তিকার সহিত সার মিশ্রণ একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়ে। তবে বহুকাল ধরিয়া উদ্ভিদাদি পচিয়া বনভূমি মধ্যস্থ যে একটা মাটির সারময় স্তর পড়িয়াছে, তাহারই ফলে রক্ত-মাটিতে ফসল জন্মিবার সুবিধা হইয়াছে। অনেক সময় দেখা যায়, উপরের নূতন পলিমাটি তুলিয়া এবং রক্ত-মাটির কতকটা তুলিয়া যে জমি প্রস্তুত হইয়াছে, তাহাতে ভাল ধান্য উৎপন্ন হয় না। ইহার কারণ কি? একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায়, পৌণ্ড্রদেশে Recent ও sub-recent soilএর উপর একটা নৈসর্গিক কাণ্ড ঘটিয়াছিল। আমরা ইহাদ্বারাই বলিতে পারি, পৌণ্ড্রভূমি রাজমহলে অগ্ন্যুৎপাতকালে Vaulted হইয়াছে। আমরা Sulphate of Lead এবং উক্ত প্রকারের কোন রাসায়নিক ধাতব পদার্থের স্তর বর্ত্তমান আছে দেখিতে পাই; খুব সম্ভব রাজমহলের Kaolin মাটিও পৌণ্ড্রক্ষেত্রে দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাহার নমুনাপ্রদান ও স্থাননির্দ্দেশ অসম্ভব নহে। পৌণ্ড্রক্ষেত্রের নদী, বিল, প্রাচীন শুষ্ক নদীগর্ভ দেখিয়া এবং পুষ্করিণী খনন, কূপ খনন দৃষ্টে একটা উপরের ক্ষুদ্র উপস্তরের

সন্ধান পাই। ভূস্তরগুলি পাতলা নহে, কারণ আমরা দেখিতে পাই—

"The laded basaltic traps of the Rajmahal hills, with their associated sedimentary beds, attain a thickness of at least 2,000 feet, of which the non-volcanic portion never exceeds 100 feet in the aggregate."

(Geology of India)
Ch. vii.

সুতরাং সহজে, বিনা Boring এ,স্তর সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের সম্ভাবনা নাই। তবে ধীরে ধীরে পাতলা পাতলা পলি পড়িয়া পৌণ্ড্রক্ষেত্রের নিম্নভূমিগুলি উন্নত হইয়াছে; তাহাই এক্ষণে মানবের বাসভূমি; গৌড়ে, বর্ত্তমান ইংলিশবাজারে ধ্বংসাবশেষ এবং রোহনপুর, পাণ্ডুয়া,রাঙ্গামাটিতে সাবেক মাটি, দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা রক্তমৃত্তিকার বেথাবৎ ভূখণ্ডগুলি প্রাচীন উন্নত ভূমি এবং পলিময় অল্প স্থল পলিময় স্তরভূমি প্রাচীনকালের নিম্নভূমি বিল, খাল ও নদীগর্ভ বলিয়া ধরিয়া লই। কূপাদি নিখাতকালে ভরাট নিম্নভূমিগুলির স্তর মধ্যে তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বিদ্যমান রহিয়াছে; সুতরাং আমরা পৌণ্ড্র ও গৌড়ভূমি বর্ণনকালে রক্তময় ভূভাগ, প্রাচীন মানববাসভূমি, পলিময় নিম্নভূমি, প্রাচীন নদীপ্রবাহ স্থান বলিয়া ধরিয়া প্রাচীন পৌণ্ড্র দেশের একটা আনুমানিক মানচিত্র অঙ্কিত করিয়াছি। এই নিয়মে গৌড় ও পৌণ্ড্রক্ষেত্রস্থ কোন্ কোন্ গ্রাম, নগর, পল্লী প্রাচীন ও আধুনিক এবং কোন্‌গুলি বৌদ্ধযুগেরও পূর্ব্ববর্ত্তী এবং কোন্‌গুলি হিন্দু রাজত্বকালের এবং কোন্‌গুলি নিতান্ত আধুনিক ও মুসলমান যুগের, তাহার তালিকা করিতে পারিয়াছি। সুতরাং স্থাননির্ণয় সম্বন্ধে আমরা এই প্রকারের নিয়ম অবলম্বন করিয়াছি।

গাস্‌টলডিসের মানচিত্র হইতে গৃহীত।

(খৃষ্টাব্দ ১৫৬১)

গঙ্গার অবস্থা পরিবর্ত্তন।

গৌড়রাজমহল পাহাড়ের পূর্ব্বভাগে গঙ্গা উত্তর পশ্চিম হইতে আসিয়া গৌড়ের অনতি উত্তরে দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে এবং বাম শাখা গৌড়ের পূর্ব্ব পার্শ্ব দিয়া সপ্তগ্রামের নিকট বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে (Golfo-de-Bengala); দক্ষিণ শাখা আবার দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে এবং Cernamer নামক দেশের দক্ষিণ পশ্চিমে দুইভাগে বিভক্ত হইয়া দক্ষিণ শাখা পূর্ব্বাভিমুখে এবং বাম শাখা বাঙ্গালা (Bengala) দেশের পশ্চিম দিয়া Ianarl নামক দেশের পূর্ব্ব দক্ষিণে গলফো দে বাঙ্গলায় পড়িয়াছে। Ianarl দেশ ত্রিভুজাকার, ইহার দুই পার্শ্বে গঙ্গার দুই শাখা পশ্চিমে গৌড় ও সাতগা (Satigan) এবং পূর্ব্বে বাঙ্গলা (Bangala), দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর।

গৌড় তখন রাজমহলের সহিত এক ছিল। সামান্য একটি গিরিনদী রাজমহল পাহাড়ের পূর্ব্বপার্শ্বে প্রবাহিত হইত। তাহা গৌড় নগর হইতে বহুদূর। পুণ্ড্রদেশ তখন Gastaldis এর মতে গঙ্গার মূল শাখার পূর্ব্ব পারে, গৌড় তাহার পশ্চিম পারে ছিল। যে প্রদেশ পুণ্ড্রদেশ, Gastaldis সেই প্রদেশের নাম "Regno de Benga" বলিয়াছেন। ইহার উত্তরে অন্য এক নদীতীরে (যাহা গৌড়ের উত্তরে গঙ্গায় পড়িয়াছে) Scierno নামক দেশ অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছেন।

রাজমহলের গিরিনদী ও গঙ্গার লীলাক্ষেত্রে নূতন পলি মাটির উপর বর্ত্তমান গৌড় নির্ম্মিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান গৌড়ের অধিকাংশ স্থল পলিমাটিময়; কোন কোন অংশ রক্তমৃত্তিকাময় দৃষ্ট হয়। যেমন কাঞ্চন সোণা (কর্ণসুবর্ণ) রমতী নগরের সন্নিকটে ছিল। বৌদ্ধযুগে এই স্থান বর্ত্তমান ছিল।

গঙ্গা ও পদ্মা, কোশী ও মহানন্দা প্রভৃতি নদী সমূহের লীলাক্ষেত্র গৌড়ভূমি জলমগ্ন হইয়া আবার জাগিয়াছিল; তাহার ফলে, বিল খাল, শুষ্ক নদীগর্ভ পৌণ্ড্রক্ষেত্রে দৃষ্ট হয়।

শ্রীহরিদাস পালিত।

সাগর-তরঙ্গ—পুরী।

মে কুইন।

(১)

ম্যান্‌চেস্‌টারের একটি আলোক-উদ্ভাসিত অনতিবৃহৎ কক্ষে সন্ধ্যার পর মিষ্টার চৌধুরী বসিয়া একখানি বড় পুরাতন ছিন্নপ্রায় 'টুকটুকে বই' হাতে করিয়া এক দৃষ্টিতে দেখিতেছিলেন, আর কি ভাবিতেছিলেন। বইখানির পাতার উপর কাঁচা হাতের আঁকাবাঁকা অক্ষরে তাহার অধিকারিণীর নাম লেখা ছিল—শ্রীমতী বীণাপাণি দেবী।

কিঞ্চিৎ দূরে একটি দেরাজের উপর কএকখানি ছোট ছোট ছেঁড়া বই ছিল।

মিঃ চৌধুরীর বয়স বাহাত্তর বৎসরের উপর হইয়া গিয়াছে। তাঁহার মস্তকের রজত শুভ্র কেশদাম মুক্ত বাতাসে এদিক্ ওদিক্ উড়িতেছিল মিঃ চৌধুরীর শান্ত, সৌম্য মুখখানির উপর যেন নিষ্ঠুর নিয়তি কি একটি দারুণ দুঃখের দগ্ধরেখা টানিয়া দিয়াছিল; তাঁহার চক্ষু দু'টি কোটরাগত, কালিমা-বেষ্টিত, গোপ যোড়াটিও প্রায় সাদা হইয়া তাঁহার প্রাচীনত্বের পরিচয় দিতেছে।

মিঃ চৌধুরী একজন বঙ্গদেশীয় সঙ্গতিপন্ন লোক;—আজ কয়মাস হইতে ম্যান্‌চেস্‌টারে আসিয়া পার্ক সাহেবের বাটীতে একটি কক্ষে বাসা লইয়াছেন।

মিঃ চৌধুরী বসিয়াছিলেন, এমন সময় মিস্ পার্ক আসিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিল। তিনি এতক্ষণ কি ভাবিতেছিলেন, মিস্‌পার্কের সহাস্য, সুন্দর স্নেহমাখা মুখখানি দেখিবামাত্র তাহা ভুলিয়া গেলেন। সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মিস্ পার্ক, আজ কেমন আছ?" "আজ আর কোন' ক্লান্তি নেই—আজ বেশ ভাল আছি মিঃ চৌধুরী।"

"মিস্ পার্ক, আজ কেমন আছ?"

সহসা মিঃ চৌধুরীর হৃদয়ে কাহার স্মৃতি জাগিয়া উঠিল; তাঁহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল।

মিস্ পার্ক ইহা দেখিয়া বিষণ্ণভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"মিঃ চৌধুরী, তুমি সব সময় এত বিষণ্ণ থাক কেন? তোমার বিষণ্ণ মুখ দেখে আমার বড় কষ্ট হয়। দিনরাত তুমি কি ভাব' শুনতে পারি কি? আমি তোমাকে পিতার মত ভালবাসি—তুমি আমার পিতৃতুল্য। যদি কোন' আপত্তি না থাকে তবে আমায় একবার বল, তুমি কার জন্য এত দুঃখিত থাক?"

মিস্ পার্ক বাস্তবিকই মিঃ চৌধুরীকে পিতার মত ভক্তি শ্রদ্ধা করিত।

মিঃ চৌধুরীও তাহাকে কন্যার মত ভালবাসিতেন। মিস্ পার্কের মুখখানি দেখিলে তাঁহার আর একখানি মুখ মনে পড়িত; মিস্ পার্ক যখন অনুচ্চ স্বরে কবিতা পড়িত, তখন আর একটি বালিকাকণ্ঠের সুর করিয়া 'শিশুরঞ্জন রামায়ণ' পড়া তাঁহার মনে পড়িত।

তাই বুঝি মিঃ চৌধুরী ইহাকে না ভালবাসিয়া থাকিতে পারেন নাই। তাঁহার দুঃখদীর্ণহৃদয় কি এক অজানা মোহে এই বিদেশিনী ইংরেজবালা মিস্ পার্ককে আকৃষ্ট করিয়া লইতেছিল, মিঃ চৌধুরী তাহা বুঝিতে পারিতেন না।

সোণালী রেশমের মত ফুরফুরে চুলগুলির উপর টুপি দিয়া, সুন্দর 'লাইট ব্লু' রঙের বিলাতী পোষাক পরিয়া মিস্ পার্ক যখন আসিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিত, তখন 'চিকণের ডুরে' পরা, কপালে কাঁচ পোকার টিপ দেওয়া, নেপোলিয়েন-কাটা কাল কাল এলোচুলের উপর লালটুকটুকে রেশমি ফিতা বাঁধা, মতিয়ার আতর-মাখা একটি বালিকার 'বিজয়ার' প্রণাম করা মনে পড়িয়া তাঁহাকে আকুল করিয়া তুলিত।

মিস্ পার্ক যখন তাঁহাকে মিঃ চৌধুরী বলিয়া সম্বোধন করিত, তখন কাহার আদরের স্বরে—'বাবা' বলিয়া ডাকা তাঁহার কাণে বাজিয়া উঠিত।

মিস্ পার্কের বয়স আঠার বৎসর; তাহার কণ্ঠস্বরের অসাধারণ কোমলতা ও লালিত্য, তাহার অপরূপ স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্য ইংরেজসমাজে যেন কেমন খাপছাড়া গোছের ঠেকিত; সে যদি ইংরেজ না হইয়া বাঙ্গালী হইত, তাহা হইলেই বেশ মানাইত।

মিঃ পার্ক ম্যানচেস্টারের একজন বড় লোক, মিস্ পার্কই তাঁহার একমাত্র কন্যা। মিঃ পার্ক আদর করিয়া তাহার নাম রাখিয়াছিলেন—'থিওডোরা' অর্থাৎ ঈশ্বরের দান।

কবি গায়িয়াছেন—

"এ সংসারে হয় যাহা
কাল সব গ্রাসে তাহা
তুমি রাখ ছবি তুলে তার,
দেখাও সে হারানিধি নিকষ-ভাণ্ডার।"

জগতে চিরস্থায়ী কেবল অতীতের স্মৃতিটুকু। অতীত স্মৃতিতে যে একটি তীব্র-বিষাদ-ময় সুখ আছে; মিঃ চৌধুরী নিশিদিন তাহাই উপভোগ করিতেন। মিঃ চৌধুরী মিস্ পার্কের প্রশ্নের উত্তর দিতে পরিলেন না; নীরবে থিওডোরার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন; তাঁহার চক্ষু দু'টি অশ্রুতে ভরিয়া উঠিল।

মিস্ পার্ক ব্যথিতান্তঃকরণে আবার বলিল—"বল মিঃ চৌধুরী, তোমার কি দুঃখ?"

মিঃ চৌধুরী কথা কহিতে বিস্তর চেষ্টা করিলেন; কিন্তু পারিলেন না; সেই ছেঁড়া 'টুকটুকে বই'খানি দুই হাতে আপনার বুকের ভিতর চাপিয়া ধরিলেন।

মিস পার্ক বুঝিয়াছিল—এই ছেঁড়া পুরাণ বইগুলির মধ্যে একটি ইতিহাস আছে; এই বইগুলি দেখিলেই কাহার স্নেহের স্মৃতিতে বৃদ্ধের বক্ষ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। তাই সে আকুল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—"মিঃ চৌধুরী, এই বইগুলি কা'র, আমায় বল?"

অশ্রু-উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বৃদ্ধ বলিলেন—"কি বলব' কার? আমার সর্ব্বস্বধন বীণার।"

"সে তোমার কে?"

"আমার মেয়ে।"

"কোথায় আছে?"

মিঃ চৌধুরী আকাশের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলেন; তাঁহার দুই চক্ষু আবার জলে ভরিয়া গেল।

* * *

(২)

সংবাদ-পত্রখানি টেবিলের উপর রাখিয়া মিস্ পার্ক বলিল—"তারপর কি হ'ল বল না মিঃ চৌধুরী, আমার শুনতে বড় আগ্রহ হচ্চে।"

চিমনীতে আগুন জ্বলিতেছিল। মিঃ চৌধুরী তাহার সম্মুখে বসিয়া আগুন পোহাইতে ছিলেন; মিস্ পার্কের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"তারপর আমরা আহারাদি করিয়া ক্যালে হইতে যখন জাহাজে ডোভর প্রণালীতে আসিলাম—তখন বেলা পাঁচটা। ক্যাবিনের ভিতর আমি আমার স্ত্রীর সহিত কথা কহিতেছিলাম, সহসা জাহাজে কি একটা গোলমাল উঠিল। ক্যাবিনের বাহিরে আসিয়াই জানিতে পারিলাম—আটলান্টিক মহাসাগর ও বিস্কে উপসাগর হইতে তুফান আসিয়াছে। আমি ও আরও দুইটি ভদ্রলোক ডেকের উপর উঠিয়া দেখিলাম—আকাশ ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন, প্রচণ্ড পবন যেন যুদ্ধোন্মত্ত দৈত্যের মত বীরদাপে হুঙ্কার ছাড়িতেছে; অন্যায়-নিপীড়নে ক্রোধোন্মত্তা তেজস্বিনী রাজপুত

মিস পার্ক বলিল,—"তার পর কি হ'ল বল না মিঃ চৌধুরী।

মেয়ে!" আর সেই কচি বালিকা বীণা? সে আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "বাবা—বাবা কেন বিলেত এলে?—ঠাকু'মা যে বারণ ক'রেছিল; আমরা সবাই ম'রে যাব বাবা, উঃ বড় আগুন।"

"আমার স্ত্রী আমার পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিল? হাঁ, দাঁড়াইয়াই ছিল বটে, কিন্তু সে যেন পাষাণ প্রতিমূর্ত্তির মত রমণীর মত শত্রু-শোণিত-শোভিত তরবারি হস্তে প্রকৃতি বীরাঙ্গনা যেন কি এক ভয়ঙ্কর বেশে যুদ্ধক্রীড়া করিতেছে। বিষম আবর্ত্তে প্রণালীর বারিরাশি বিঘূর্ণিত হইতেছে। বুঝি আজই জগতের শেষ দিন। কি সে ভয়ঙ্কর দৃশ্য! আমার চক্ষুর সম্মুখে আজও যেন তাহার জ্বলন্ত চিত্র ফুটিয়া রহিয়াছে।

আমরা ডেকের উপর আর দাঁড়াইতে পারিলাম না; থর থর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে নীচে নামিয়া আসিলাম।

এমন সময় আবার মহা গোল হইয়া উঠিল - "সর্ব্বনাশ! সর্ব্বনাশ! জাহাজে আগুন লাগিয়াছে।"

জাহাজের কর্ম্মচারিগণ প্রাণপণ করিয়া আগুন নিবাইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না;—ক্রমেই আগুন বাড়িতে লাগিল। ধূ ধূ করিয়া জাহাজ জ্বলিতে লাগিল,—ফট ফট শব্দে সব কাট ফাটিতে আরম্ভ করিল। যাহারা পারিল আপন আপন প্রাণ বাঁচাইল, আর যাহারা পারিল না, তাহারা পরস্পরের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া প্রতি মুহূর্ত্তেই মৃত্যুর আলিঙ্গনের অপেক্ষা করিতে লাগিল।

সে জাহাজে ভারতবর্ষীয় ছিলাম কেবল আমরা। আমার স্ত্রী আমার হাতে বীণাকে দিয়া বলিল, "এই নাও, তোমার নিস্পন্দ। সে অনিমিষ নয়নে আমার মুখের দিকে চাহিয়াছিল, আর তাহার দুই চক্ষু দিয়া অজস্র অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছিল।"

মিস্ পার্ক আগ্রহাকুলকণ্ঠে বলিল, "আর তোমার 'বেবি' বীণা কি করছিল?"

"সে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গিয়াছিল! এই সময় কাহার স্নেহের স্মৃতির স্পর্শে আমার প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল। এই লেলিহান অগ্নিময় ভীষণ দৃশ্যের সম্মুখে কাহার শস্য-শ্যামল-স্নিগ্ধ শোভা, কাহার কোকিল-কূজিত-কুঞ্জ আমার মনে পড়িয়া গেল। আমার সোণার ছবি আমার নয়নপথে ভাসিয়া উঠিল। ভারত! আমার সোণার ভারত! আমার জন্মভূমি শান্তিময়ী সুধাময়ী ভারতভূমি! কোথা হইতে আমার প্রাণের তারে রবীন্দ্রবাবুর সুর বাজিয়া উঠিল—"আমার সোণার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি।"

আমি অতি হতভাগ্য, তাই সে প্রিয়তম জন্মভূমিতে আমার মৃত্যু হইল না। বিহগ-গীত-মুখরিত, শেফালি-সুরভিত কলনাদিনী ধীর-গামিনী তটিনী-তীরে চিরবিশ্রাম-শয়ন করা আমার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিল না; বিদেশে বিপাকে

এই ভীষণ জল-স্রোতের ভিতর আমার সমাধি হইল। আমার চক্ষু ফাটিয়া সহসা এক বিন্দু অশ্রু ঝরিল।

"এমন সময়ে আমাদের ক্যাবিনটিতেও আগুন ধরিয়া উঠিল। আমি তখন বীণাকে বক্ষে চাপিয়া এবং আমার স্ত্রীর হাত ধরিয়া জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িলাম। আমি ভাল সাঁতার জানিতাম; তবুও প্রাণপণে জলের উপর থাকিতে চেষ্টা করিলাম; কারণ তখন আমার বুকের মধ্যে বীণা, হস্তে দৃঢ়বদ্ধা আমার স্ত্রী। তাহারা সাঁতার জানে না। ক্রমে আমি অবসন্ন হইয়া পড়িতে লাগিলাম। তাহার পর কখন্ জ্ঞানশূন্য হইয়াছিলাম, বলিতে পারি না।

"যখন আমি সংজ্ঞালাভ করিলাম, তখন দেখিলাম আমি একখানি জাহাজের একটা ক্যাবিনে শয়ন করিয়া আছি। তখনও আমার শরীর দুর্ব্বল ছিল। জাহাজের লোকেরা বলিল তাহারা আমাকে সমুদ্রমধ্য হইতে উদ্ধার করিয়াছিল, আর কাহাকেও তাহারা দেখিতে পায় নাই।

"তারপর নানাস্থানে বীণার ও তাহার জননীর অনুসন্ধান করিয়াছি। আজ এই বার বৎসরের মধ্যে তাহাদের কোনও সন্ধান পাই নাই। নিশ্চয়ই তাহারা জলে ডুবিয়া মারা গিয়াছে। বুঝি সেই পতিরতা স্নেহময়ী স্ত্রী নিয়তির নিকট আপনার জীবনাহুতি প্রদান করিয়া আমার জীবন ভিক্ষা করিয়া লইয়াছিল, নতুবা আমি বাঁচিলাম কেন?

"আমার সবই গিয়াছে;—সে স্নেহের-কুসুম সাধের লতিকা প্রাণাধিক প্রিয় কন্যাটিকে বহুদিন হারাইয়াছি;—আর কিছুই নাই কেবল সেই শোণিত-রাঙা বেদনা বুকে লইয়া, জগজ্জনকে সেই শোক-গীতি শুনাইবার জন্য আমিই আছি। বীণার সেই শুষ্ককণ্ঠের করুণ কথাগুলি আজিও আমার প্রাণে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। তাহার পায়ের মলের রুণু ঝুণু শব্দ আজও যেন আমার কাণে বাজিতেছে।

"মিস্ পার্ক; সে এত দিন বাঁচিয়া থাকিলে তোমারই মত হইত।"

মিঃ চৌধুরী এইখানে থামিলেন; তাঁহার বার্দ্ধক্য-কুঞ্চিত শোণিত-শূন্য কপোল নয়নজলে ভাসিয়া যাইতেছিল!

আর মিস্ পার্ক? সে নীরবে সব শুনিতেছিল, তাহার গোলাপীগণ্ডের উপর দুই বিন্দু অশ্রু মুক্তার মত ঝলমল করিতেছিল।

মিঃ চৌধুরী আবেগ-উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"মিস্ পার্ক এই ছেঁড়া বইগুলি দেখিতেছ, এই বইগুলি আমার বীণার। সেই দুর্ঘটনার পর আমি আবার ভারতবর্ষে ফিরিয়া গিয়াছিলাম, কিন্তু সেখানে থাকিতে পারিলাম না, মন টিঁকিল না! তাই দেশ ছাড়িয়া আবার বিলাতে আসিলাম। আমার স্ত্রী, আমার বীণা এই বিদেশে প্রাণ হারাইয়াছে; তাই স্বদেশে মরিতে আর আমার ভাল লাগিল না,—এই প্রাচীন বয়সে বিদেশে আসিয়া মৃত্যুর অপেক্ষা করিতেছি। বাটী ফিরিয়া গিয়া আমি বীণার এই ছেঁড়া বইগুলি আনিয়াছি—আমার বীণা নাই—কিন্তু তাহার এই বইগুলি লইয়া আমি শোকে শান্তিলাভ করি—এই বইগুলিই আমার সম্বল।

"মিস্ পার্ক, যখন তুমি ঈশ্বরের কথা বল, তখন আমি তোমার দিকে অমন আত্মহারা হইয়া চাহিয়া থাকি কেন জান? আমি তখন বীণার কথা ভাবি, সেও অমনই করিয়া কথা বলিত। তাহার সেই মুখখানি যেন আমার চক্ষুর সম্মুখে ভাসিয়া বেড়াইতেছে! মিস পার্ক, এই শেষ;—আমার অতীত জীবনের কথা আর বলিবার মত কিছু নাই।"

(৩)

প্রভাত কাল। একা মিঃ চৌধুরী তাঁহার কক্ষে বসিয়া উন্মুক্ত বাতায়নের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া ছিলেন, তাঁহার নেত্রপ্রান্তে শুভ্র অশ্রু-রেখা শুকাইয়া আসিল!

এমন সময় পুষ্পমুকুট-শোভিতা, ফুলসাজে সজ্জিতা 'মে কুইন' বেশে মিস্ পার্ক আসিয়া শিশুর মত মিঃ চৌধুরীর বুকের উপর লুটাইয়া পড়িল, আকুলকণ্ঠে বলিল,—"বাবা, বাবা, আমিই তোমার সেই 'বেবি'—তোমার আদরের বীণাপাণি।"

মিঃ চৌধুরী বিস্মিত—স্তম্ভিত! কি বলিবেন ভাবিয়া পাইলেন না। এই মিস্ পার্ক তাহার সেই বীণাপাণি! ভগবান্ এও কি সম্ভব।

মিস্ পার্ক মিঃ চৌধুরীর হস্তে মিঃ পার্কের স্বহস্তাঙ্কিত একখানি কাগজ দিল।

আজ একমাস মিঃ পার্ক স্বর্গগত হইয়াছেন। সেই কাগজখানিতে লেখা ছিল,—

"থিওডোরা, আজ আমি তোমাকে তোমার জীবনের একটি চিরগোপন কথা জানাইতেছি। আমি নিঃসন্তান—তুমি আমার কন্যা নও। তোমার পিতার নাম জানি না, জানি কেবল তুমি কোনও ভারতবাসী বাঙ্গালী বিলাতযাত্রীর কন্যা। আমি তোমার পালক-পিতা।

"আজ বার বৎসর পূর্ব্বে ডোভর প্রণালীতে আগুন লাগিয়া যে জাহাজখানি নষ্ট হইয়া যায়, আমিও সেই জাহাজের একজন আরোহী ছিলাম, তোমার পিতা যখন তোমাকে ও তোমার মাতাকে লইয়া জলে ঝাঁপ দেন, তখন আমি দূরে দাঁড়াইয়া ছিলাম, আগুন তখনও আমার দিকে আসে নাই। একটু পরেই দেখিলাম, তোমার পিতার বক্ষচ্যুত হইয়া তুমি জলে ডুবিয়া যাইতেছ। তখন আমি লম্ফ দিয়া জলে পড়ি এবং তোমাকে চাপিয়া ধরি; তোমার পিতা বা মাতাকে দেখিতে পাই নাই। তার পর সৌভাগ্যক্রমে আমি একটি ফ্লোটিং বোট পাই। তাহারই সাহায্যে তোমাকে লইয়া তীরে উঠি।

"বাবা, বাবা, আমিই তোমার সেই, 'বিবি'—তোমার আদরের বীণাপাণি।"

"আমি সন্তানহীন ছিলাম, জগদীশ্বর সেই দুর্য্যোগে আমাকে তোমায় দান করিয়াছিলেন বলিয়া আমি তোমার নাম রাখিয়াছি 'থিওডোরা'; তুমি তখন নিতান্ত ছোট ছিলে, বড় জোর তখন তোমার বয়স চারি পাঁচ বৎসর হইবে। তুমি তোমার পিতার নাম বলিতে পারিলে না; আমি তোমাকে কন্যারূপে গ্রহণ করিলাম।

"তুমি ইংরেজ নও ডোরা, আজ বলিতেছি—তুমি বাঙ্গালী। এখন তুমি বাঙ্গলা ভুলিয়া গিয়াছ, ছেলেবেলায় সন্ধ্যার সময় কতদিন আমার কাছে বসিয়া আকাশের নক্ষত্র-পুঞ্জ দেখাইয়া বলিতে—ঐ দেখ সাত ভাই চম্পা! আমি 'সাত ভাই চম্পা' মানে বুঝি না, কিন্তু তোমার মুখে বার বার শুনিয়া মুখস্থ হইয়া গিয়াছে। এতদিন এ কথা গোপন রাখিয়াছিলাম বলিয়া ক্ষমা করিও।

"ডোরা! আমি তোমাকে কন্যার অধিক স্নেহ করি, ভালবাসি। পাছে তোমার সুকোমল শান্তিভরা বালিকা-বক্ষে বেদনার কীট প্রবেশ করে, এই ভয়ে এতদিন ইহা প্রকাশ করি নাই।

"থিওডোরা, তুমি ভিন্ন আমার আর কেহই নাই;—আমার সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি আমি তোমাকে দিলাম, গ্রহণ করিও।

আর একটি কথা; তোমার বামহস্তের উপরিভাগে নীল রংএর যে কতকগুলি দাগ আছে, তাহা কি আমি জানি না। তবে যেন বোধ হয়, উহা তোমার মাতৃভাষায় লিখিত কোনও কথা। যাহা হউক যদি কখনও বাঙ্গলা শেখ, তাহা হইলে পড়িতে চেষ্টা করিও।

"জগদীশ্বর, তোমাকে সুখী করুন; ইহাই আমার অন্তিম শয্যার শেষ প্রার্থনা।

ইতি—

তোমার একান্ত স্নেহের
পালক-পিতা
পার্ক।"

(৪)

বিলাতের কোনও কোনও পল্লবাসিগণ মে মাসের প্রথম প্রভাতে একটি পরমাসুন্দরী বালিকাকে ফুলসাজে সাজাইয়া তাহার মস্তকে ফুলমুকুট পরাইয়া আমোদ করে। সেই সুসজ্জিতা বালিকাকে 'মে কুইন' বলে।

মিস্‌পার্কের প্রতিবেশিনীগণ প্রতি বৎসর মিস্ পার্ককেই 'মে কুইন' সাজাইত। মিস্ পার্ককে 'মে কুইন' বেশে যেন কোন ফুলরাণী বলিয়া বোধ হইত, বড় চমৎকার দেখাইত।

আজ ১লা মে, প্রত্যূষে মিস্‌পার্কের সঙ্গিগণ আসিয়া তাহাকে 'মে কুইন' সাজাইয়াছিল। 'মে কুইন' সাজিয়া ময়দানে যাইবার সময় কি এক প্রয়োজনে মিস্ পার্ক তাহার স্বর্গীয় পিতার হাতবাক্স খুলিয়াছিল। হাতবাক্সটি খুলিবামাত্র দেখিল একখানি চতুষ্কোণ খামের উপর মিঃ পার্কের হস্তাক্ষরে তাহার নামে একখানি পত্র লেখা রহিয়াছে।

মিঃ চৌধুরীর জীবন-কাহিনী শুনিয়া অবধি মাঝে মাঝে মিস্-পার্কের মনে কোথা হইতে একটি অশান্তির কাঁটা আসিয়া ফুটিত। কোন সুদূর স্বপনের ক্ষীণ স্মৃতির মত রাত্রে শুইয়া তাহার মনে হইত, সেও বুঝি কোন জাহাজে আগুন লাগা দেখিয়াছে। সে বুঝি মিঃ পার্কের কন্যা নহে। তবে সে কাহার কন্যা? কই তা ত মনে পড়ে না। ভারতের সহিত তাহার কোনও সম্বন্ধ আছে কি?—না কিছু না, সে ইংরেজ তবে কেন সে ভারতবর্ষের প্রতি একটি অজানা আকর্ষণ মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করে!! মিঃ পার্কের পত্রখানি পড়িবামাত্র সে যেন কোন্ স্বপনের রাজ্যে গিয়া পড়িল।

মিঃ চৌধুরী পত্রখানি পড়িলেন। মিস্‌পার্ক তাহার বাম হস্তের আস্তিন গুটাইয়া অশ্রুপূর্ণ নেত্রে বলিল, "এটা কি লেখা, পড়ুন ত?"

মিঃ চৌধুরী পড়িয়া বলিলেন, "শ্রীমতী বীণাপাণি দেবী; একে বাঙ্গলায় 'উল্কি' বলে।"

মিঃ চৌধুরীর মনে পড়িয়া গেল, তাঁহার সেই বীণার বামহস্তে বাস্তবিকই তাহার জননী সখ করিয়া তাহার নাম লিখাইয়া লইয়া ছিলেন। আর কোনও সন্দেহ রহিল না। বহুদিন পরে মিঃ চৌধুরী প্রাণ ভরিয়া ডাকিলেন, "বীণা বীণা—আমার বীণা!"

কুমারী প্রফুল্লনলিনী ঘোষ।

৺কালীপ্রসন্ন সিংহ।

আমি পরলোকগত কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের জীবনবৃত্তান্ত লিখিতে বসি নাই। সে শক্তি, সামর্থ্য বা স্পর্দ্ধা আমার নাই। এ জীবনে আমি অনেক অনধিকারচর্চ্চা করিয়াছি, নিজের বিদ্যাবুদ্ধি ও ক্ষমতার ওজন না বুঝিয়া অনেক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি এবং তাহার জন্য অপরের কাছে ত লাঞ্ছিত হইয়াছিই, নিজের কাছেও লাঞ্ছিত হইয়াছি। বহু কষ্টে উপার্জ্জিত এই অভিজ্ঞতার কথা বিস্মৃত হওয়া আমার পক্ষে আর সম্ভবপর নহে। সেই জন্যই বলিতেছি, আমি পরলোকগত কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের জীবন-বৃত্তান্ত লিখিতে বসি নাই।

তবে আমার উদ্দেশ্য কি? সেই কথাই বলিতেছি। এক্ষণে বাঙ্গালা সাহিত্যের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছে, এবং কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ বাঙ্গালা ভাষার সাহায্যে অনেক বিষয় লিখিতেছেন। ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ই বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত হইতেছে, কয়েকখানি জীবনচরিতও লিখিত হইয়াছে। আমরা মহাত্মা রামমোহন রায়ের

জীবন-চরিত পড়িয়াছি, অক্ষয়কুমার দত্তের জীবন-চরিত পড়িয়াছি। বিদ্যাসাগর মহাশয়, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, কেশবচন্দ্র সেন, রামতনু লাহিড়ী, পরমহংস শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেব, স্বামী বিবেকানন্দ, কৃষ্ণদাস পাল, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি অনেক মহাত্মার জীবন-চরিত বাঙ্গলা ভাষায় লিখিত হইয়াছে। কিন্তু মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় এমন কি গুরুতর অপরাধ করিয়াছিলেন যে, এতকালের মধ্যে তাঁহার জীবন-চরিত লিখিবার জন্য কেহই লেখনী ধারণ করিলেন না, এই কথাটি জিজ্ঞাসা করিবার জন্যই আমি এই ক্ষুদ্র প্রস্তাবের অবতারণা করিয়াছি।

পরলোকগত কালীপ্রসন্ন সিংহ কি দশ-জনের মত একজন ছিলেন? তাঁহার জীবনে কি তিনি বাঙ্গালীর জন্য, বাঙ্গালা সাহিত্যের জন্য কিছুই করেন নাই? শত শত বাঙ্গালী ভদ্রলোক যেমন ভাবে জীবন কাটাইয়া গিয়াছেন, কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ও কি তাহাই করিয়াছেন? ইহাই আমার জিজ্ঞাসা।

৺কালীপ্রসন্ন সিংহ

আমার এ কথা জিজ্ঞাসা করিবার কারণ আছে। এক দিন আমার এক সাহিত্যিক বন্ধু আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় কোন্ [illegible] জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা বলিতে পার?" আমি বলিলাম, "আমি জানি না।" তিনি বলিলেন, "আমি এই কথাটা জানিবার জন্য দুই চারিখানি বইয়ের পাতা উল্টাইয়াছি, কিন্তু কোথাও কিছু পাই নাই। তুমি আরও দুইচারি খানি বই খুঁজিয়া দেখিও, যদি কোথাও সংবাদটা পাও।" তাঁহার সহিত এই কথোপকথনের পর আমি কয়েকখানি ছাপা বই সংগ্রহ করিয়াছিলাম; কিন্তু কোন বইতেই বন্ধু-বরের প্রশ্নের উত্তর পাই নাই। কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের বাড়ীতে জিজ্ঞাসা করিলে এ সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারিতাম; কিন্তু বন্ধুবর সে ভাবে এ সংবাদ সংগ্রহ করিতে বলেন নাই। যে সমস্ত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা হইতে এ সংবাদ পাওয়া যায় কি না, তাহাই জানা তাঁহার উদ্দেশ্য। আমি কোন ছাপা পুস্তকে এখন পর্য্যন্তও তাহা দেখিতে পাই নাই। শুধু তাহাই নহে, কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের জীবনের বিশেষ কোন কথাই আমি কোন পুস্তকে দেখিতে পাই নাই। আমি যাহা পাইয়াছি, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

'বঙ্গভাষার লেখক' নামক পুস্তকে দেখিলাম,—"ইনি (কালীপ্রসন্ন সিংহ) কলিকাতা যোড়াসাঁকোর বিখ্যাত জমিদার বংশসম্ভূত। ইঁহার প্রপিতামহের নাম শান্তিরাম সিংহ। ইনি সার্ টমাস্ রামবোল্ড ও মিঃ মিডল্টনের নিকট মুর্শিদাবাদ ও পাটনায় দেওয়ানী কর্ম্ম করিতেন। ইঁহার দুই পুত্র—প্রাণকৃষ্ণ ও জয়কৃষ্ণ। জয়কৃষ্ণের এক পুত্র নন্দলাল। এই নন্দলালই কালীপ্রসন্নের পিতা।"

৺শান্তিরাম সিংহ

কিছুই পাইলাম না—জন্ম মৃত্যুর কোন সংবাদ নাই।

'বিশ্বকোষের' পরই আমি সুলেখক শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার মহাশয়ের তৃতীয় সংস্করণ 'বিদ্যাসাগর' গ্রন্থে কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের জীবন-কথা দেখিতে পাই। তাহাতে তিনি উপরি উক্ত কয়েকটি কথাই বলিয়াছেন। বেশীর মধ্যে ঐ জীবন-কথায় দেখিতে পাই যে, ইঁহার (কালীপ্রসন্ন সিংহের) যত্নে ইঁহার বাটীতে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে বেণীসংহার নাটকের অভিনয় হয়। ইহার আট মাস পরে ইনি বিক্রমোর্ব্বশী নাটকখানি বাঙ্গালায় স্বয়ং অনুবাদ করিয়া আপনার বাড়ীতে অভিনয় করেন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত কর্ত্তৃক মেঘনাদবধ কাব্য রচিত হইলে কালীপ্রসন্ন স্বীয় বাটীতে একটি সভা আহ্বান করিয়া কবিবরকে বাঙ্গলাভাষায় একখানি অভিনন্দন পত্র ও রৌপ্যনির্ম্মিত ক্ল্যারেট-পানোপযোগী একটি মদ্যপাত্র প্রদান করেন।"

কালীপ্রসন্ন সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও ইংরেজী তিন ভাষাতেই বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। বিপুল ব্যয়ে, বহু পণ্ডিত-সাহায্যে ইনি মূল সংস্কৃত মহাভারতের বঙ্গানুবাদ প্রচার করেন। এই অনুবাদ-মহাভারত বিনামূল্যে বিতরিত হয়।"

ইহার পরই ঐ পুস্তকে, কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় তাঁহার মহাভারতের বঙ্গানুবাদ শেষ করিয়া উপসংহারে যে কএকটি কথা বলিয়াছিলেন, তাহাই উদ্ধৃত করা হইয়াছে। সর্ব্বশেষে "হুতোম পেঁচার নক্সার" উৎসর্গপত্র প্রদত্ত হইয়াছে। আর কোন কথাই এ পুস্তকে নাই।

ইহার পরই আমি সুপ্রসিদ্ধ 'বিশ্বকোষ' পড়িয়া দেখি, তাহাতেও উপরি উদ্ধৃত কএকটি কথা ব্যতীত অতিরিক্ত

'আর্য্যাবর্ত্ত' নামক মাসিক পত্রের দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম সংখ্যায় শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্ত, এম, এ, মহাশয় "পুরাতন-প্রসঙ্গ" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লেখেন। মনস্বী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয় কথাপ্রসঙ্গে সেকালের যে সমস্ত কাহিনী বিপিনবাবুর নিকট মধ্যে মধ্যে বলিতেন, তাহাই বিপিনবাবু "পুরাতন প্রসঙ্গ" নাম দিয়া প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত করিয়াছিলেন। সেই প্রবন্ধের একস্থানে মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কএকটি কথা আছে।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিতেছেন, "পুরাতন সাহিত্যের আলোচনা করিতে বসিলে আমরা দেখিতে পাই যে,

৺কালীপ্রসন্ন সিংহের আসন খুব উচ্চে। আমার যখন ১৫।১৬ বৎসর বয়স তখন আমার সহিত কালীপ্রসন্ন সিংহের প্রথম আলাপ হয়। প্রথম পরিচয় ঠিক কেমন করিয়া কোন্ সময়ে হয়, তাহা এখন আমার স্মরণ নাই। তাঁহার বাড়ীর দোতলায় একটি

বাল্যবয়সে কালীপ্রসন্ন সিংহ

Debating Club ছিল, আমি সেই সভার সভ্য হইয়াছিলাম। × × ×

"বিদ্যাসাগর মহাশয়কে তিনি অত্যন্ত ভক্তি করিতেন। মহাভারতের অনুবাদ বিদ্যাসাগরের

৺নন্দলাল সিংহ

মহাভারত অনুবাদের-সভা

প্ররোচনায় হইয়াছিল; হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে বিদ্যাসাগর মহাশয় এই কার্য্যে ব্রতী করিয়াছিলেন; যে পণ্ডিতমণ্ডলীর দ্বারা মহাভারত অনূদিত হইয়াছিল, তাঁহারাও বিদ্যাসাগরের লোক!

"যৌবনেই কালীপ্রসন্নের মৃত্যু হয় বোধ হয় আমি তাঁহার সমবয়স্ক ছিলাম। তাঁহার খেয়ালের অন্ত ছিল না। বোধ হয়

কালীপ্রসন্ন সিংহের গৃহ।

কালীপ্রসন্ন সিংহের ভবনের ঠাকুরদালান

তিনি Purse-proud ভাব কতকটা প্রকাশ করিতেন, কিন্তু তিনি যেমন তাঁহার Purse এর সদ্ব্যবহার করিতে জানিতেন, তেমন আর কেহ জানিত না। যেদিন Rev. Mr. Long এর মোকদ্দামার রায় প্রকাশ করিবার কথা ছিল, সেদিন কালীপ্রসন্ন আদালতে উপস্থিত ছিলেন। হাজার টাকা জরিমানা হইবামাত্রই তিনি তৎক্ষণাৎ সেই জরিমানার টাকা আদালতে দাখিল করিয়া দিলেন। কেহ তাঁহাকে টাকা লইয়া যাইবার পরামর্শ দেন নাই। আমরা কেহই জানিতাম না যে, তিনি মনে মনে এই প্রকার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন।

"মহাভারত তাঁহার কীর্ত্তিস্তম্ভ। রাধাকান্তের শব্দকল্পদ্রুমের পার্শ্বে কালীপ্রসন্নের মহাভারতের স্থান নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। বলিয়াছি তিনি বিদ্যাসাগরের কথায় এই বিরাট কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার নিজেরও Higher, nobler sympathies যথেষ্ট ছিল, লেখাপড়ার দিকে ঝোঁক, লেখাপড়া প্রচারের একটা প্রবল বাসনা ছিল।

"তাঁহার হুতুম পেঁচার নক্সা'য় অবশ্যই প্রতিভার কোনও বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু

গ্রন্থখানির মূল্য আছে। রচনা সম্বন্ধে একটি কথা তোমাদের মনে রাখিতে হইবে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সংস্কৃত-বহুল রচনার বিরুদ্ধে একটা revolt হইয়াছিল। বোধ হয় ১৮৫৪।৫৫ খৃষ্টাব্দে রাধানাথ সিকদার 'মাসিক পত্রিকা' নামে একখানি কাগজ বাহির করেন, তাহাতে চলিত কথা ব্যবহৃত হইত। 'মাসিক পত্রিকা'র সহযোগী-সম্পাদক ছিলেন প্যারীচাঁদ মিত্র। তিনি তাঁহার 'আলালের ঘরের দুলালে' সেই Tendencyর চূড়ান্ত করিয়া যান। তাহার পর যখন এই দুই বিরুদ্ধ ভাবের সামঞ্জস্য সজ্ঘটিত হইল, বাঙ্গলা সাহিত্য নূতন আকার ধারণ করিল—নূতন বল সঞ্চয় করিল। সাহিত্যরথ বঙ্কিমচন্দ্র হইতে সাহিত্যরথ রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত সকলেই আমাদের সাহিত্যের ভাষায় সেই সামঞ্জস্য বজায় করিয়া চলিলেন।

"হুতোম প্যাচার মধ্যে যথেষ্ট লোকজ্ঞতা ও পরিহাস-রসিকতা প্রকাশিত হইয়াছে। অনেক স্থলেই তখনকার ব্যক্তিবিশেষের প্রতি কটাক্ষপাত আছে। পাথুরিয়াঘাটার কোন ধনী প্রবীণ বয়সে নিজের জন্মতিথি উৎসব উপলক্ষে স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত হইয়াছিলেন। কালীপ্রসন্নের বিদ্রূপবাণ তাঁহার উপর বর্ষিত হইল, নক্সায় পাথুরিয়াঘাটা 'নুড়িঘাটা'য় রূপান্তরিত হইল। মাহেশে রথের সময় বাচখেলা, মেয়েমানুষ সঙ্গে লইয়া দ্বাদশগোপাল দেখিতে যাওয়া ইত্যাদি তিনি নিপুণহস্তে চিত্রিত করিয়াছেন। যে সকল সামান্য লোক ইয়ার্কির উপলক্ষে বেইক্তার হইয়া নানাপ্রকার বাঁদরামি করিয়া থাকে, সস্তায় আমোদ করিবার চেষ্টা করে, নক্সায় সেই প্রকৃতির লোকদিগের প্রতি তীব্র কটাক্ষপাত দেখিতে পাওয়া যায়। Satire হিসাবে হুতোম প্যাচা যে খুব effective হইয়াছিল, তাহা বোধ হয় না। But as an early specimen of that type of writing it deserves not to be forgotten, এবং রুচি হিসাবে হুতোম ঈশ্বর গুপ্তের ও গুড়গুড়ে ভট্টাচার্য্যের লেখার চেয়ে অনেক অংশে শ্রেষ্ঠতর।"

মানসী পত্রিকার তৃতীয় ভাগের অষ্টম সংখ্যায় শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্ত, এম, এ, মহাশয় 'পুরাতন' শীর্ষক প্রবন্ধে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কয়েকটি উক্তি লিপিবদ্ধ করেন। ইহাতে কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় সম্বন্ধে যে কএকটি কথা আছে, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল :—

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিতেছেন, "পুরাতন কথা বলিতে গেলে কালীপ্রসন্ন সিংহের কথা মনে পড়ে। তোমাদের সাহিত্য-পরিষদের মন্দিরে তাহার যে সুন্দর প্রতিকৃতিখানি বঙ্কিম বাবুর প্রতিকৃতির পার্শ্বে বসাইয়াছ, তাহা দেখিয়া আমার মনে বড় আহ্লাদ হয়। বিচিত্র বিলাস-ব্যসনের মধ্যে লালিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াও তিনি যেরূপে আপনার মনুষ্যত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া মহীয়ান্ হইয়াছিলেন, তাহা যে তোমরা বুঝিতে পারিয়াছ, ইহা অপেক্ষা আনন্দের বিষয় আর কি হইতে পারে ? যে ঘরটিতে কালীপ্রসন্ন, কৃষ্ণদাস পাল প্রমুখ কএকজন বন্ধু লইয়া 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা' গঠিত করিয়াছিলেন, সেই ঘরটি মনে পড়ে। যে ঘরটিতে হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য-প্রমুখ পণ্ডিতমণ্ডলী অষ্টাদশ পর্ব্ব মহাভারত সংস্কৃত হইতে বাঙ্গলা ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন, সেই ঘরটিও মনে পড়ে। যে প্রাঙ্গণে রামনারায়ণ পণ্ডিতের 'বেণী-সংহার' নাটক অভিনীত হইয়াছিল, সেই প্রাঙ্গণে সেই রাত্রের কথা একটিও ভুলি নাই। যে দিন রেভারেণ্ড লং সাহেবের হাজার টাকা অর্থদণ্ড হইল, সেদিন কালীপ্রসন্ন তৎক্ষণাৎ সেই টাকা আদালতে জমা করিয়া দিলেন, সে কথা তোমরা জান কি ? আজ পুরাতনের মোহ আমাকে উতলা করিয়া তুলিয়াছে। হৃদয়ের যে গোপন কক্ষ, গত অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে উদ্ঘাটিত হয় নাই, কি জানি আজ কেমন করিয়া সেই দূর অতীতের দিগন্ত হইতে একটা দমকা বাতাস আসিয়া তোমার সমক্ষে সেই অর্গলবদ্ধ কক্ষদ্বার মুক্ত করিয়া দিল। আমার সমস্ত সঞ্চিত বেদনা আজ এই শারদ নিশীথের বায়ুস্তরে মিশাইয়া গেল।"

মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহের সম্বন্ধে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয় যে কয়েকটি মর্ম্মস্পর্শী কথা বলিয়াছেন, তাহা উপরে উদ্ধৃত হইল। আমার মনে হয় আর কেহই, কোন লেখকই ইহার অধিক কিছু বলেন নাই। সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গলা সাহিত্যের কথা উপলক্ষে 'হুতোমের' কথা বলিয়াছেন, 'হুতোমের' ভাষার সমালোচনা করিয়াছেন, কিন্তু কালীপ্রসন্নের জীবন-কথা কেহই বলেন নাই।

এত বড় একখানি মহাভারতের বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইল; কিন্তু সে সম্বন্ধে কোন পুস্তকেই বিশেষ কিছু পাওয়া গেল না; সুতরাং মহাভারতের বঙ্গানুবাদ সম্বন্ধে কালী প্রসন্ন সিংহ মহাশয় তাঁহার মহাভারতের ভূমিকায় ও উপসংহারে যাহা বলিয়াছেন, তাহাই নিম্নে প্রকাশিত হইল।

মহাভারতের ভূমিকায় এক স্থলে আছে, "এক্ষণে আমাদিগের দেশের মধ্যে নানাস্থানে নানা বিদ্যোৎসাহী ও স্বদেশ হিতানুরাগী মহানুভবগণ ইংরাজী ভাষার বিবিধ জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করিয়া দেশের হিতসাধনে তৎপর হইয়াছেন। কেহ বিজ্ঞান শাস্ত্রের অনুবাদ করিতেছেন, কেহ সাহিত্যের অনুবাদ করিয়া প্রচার করিতেছেন, কেহ পুরাবৃত্তাদি গ্রন্থের অনুবাদ প্রসঙ্গেও আমোদিত হইতেছেন। ইহা দেখিয়াও আমার মনে হইল যে, যেমন অনুবাদ দ্বারা ভিন্ন দেশের গ্রন্থান্তর্গত অমূল্য জ্ঞানরত্ন সকল সঞ্চয় করিয়া স্বদেশের গৌরব বৃদ্ধি করা উচিত, সেইরূপ স্বদেশীয় মহানুভব পুরুষদিগের মানসোদিত আশ্চর্য্য তত্ত্ব সকল স্থায়ী হইবার উপায়বিধান করাও একান্ত কর্ত্তব্য। স্বদেশের জ্ঞানোন্নতি সংসাধন ও জ্ঞান-গৌরব রক্ষা করাই তাহার প্রকৃত হিতসাধন করা। সুদূর প্রান্তস্থিত প্রশস্ত পন্থাও কালেতে বিলুপ্ত হয়, সুদীর্ঘ দীর্ঘিকাও সময়ে শুষ্ক হইয়া যায়, অত্যুচ্চ প্রাসাদও কালে ভগ্ন ও চূর্ণ হইয়া গিয়া থাকে এবং পরিখা-পরিবেষ্টিত দুর্গম দুর্গেরও ক্রমেই নাশ হইয়া থাকে; কিন্তু প্রগাঢ় জ্ঞানচিহ্ন দেশ হইতে অপনীত হইবার নহে। এই বিবেচনায় আমি স্বীয় যৎসামান্য পরিমিত শক্তি দ্বারা বাঙ্গালা ভাষায় প্রবিস্তীর্ণ মহাভারতের অনুবাদ করত স্বদেশের হিতসাধন করিতে সাহসী হইয়াছি।

"মহাভারত যেরূপ দুরূহ গ্রন্থ, মাদৃশ অল্পবুদ্ধিজন কর্ত্তৃক ইহা সম্যক্‌রূপ অনুবাদিত হওয়া নিতান্ত দুষ্কর। এই নিমিত্ত ইহার অনুবাদ সময়ে অনেক কৃতবিদ্য মহোদয়গণের ভূয়িষ্ঠ সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছে, এমন কি তাঁহাদের পরামর্শ ও সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়াই আমি এই গুরুতর ব্যাপারের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছি; তন্নিমিত্ত ঐ সকল মহানুভবদিগের নিকট চিরজীবন কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রহিলাম।

আমি যে দুঃসাধ্য ও চিরজীবনসেব্য কঠিন ব্রতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি, তাহা যে নির্বিঘ্নে শেষ করিতে পারিব, আমার এ প্রকার ভরসা নাই। মহাভারত অনুবাদ করিয়া যে লোকের নিকট যশস্বী হইব, এমত প্রত্যাশা করিয়াও এ বিষয়ে হস্তার্পণ করি নাই। যদি জগদীশ্বর প্রসাদে পৃথিবী মধ্যে কুত্রাপি বাঙ্গালা ভাষা প্রচলিত থাকে, আর কোন কালে এই অনুবাদিত পুস্তক কোন ব্যক্তির হস্তে পতিত হওয়ায় সে ইহার মর্ম্মানুধাবন করত হিন্দুকুলের কীর্ত্তিস্তম্ভ স্বরূপ ভারতের মহিমা অবগত হইতে সক্ষম হয়, তাহা হইলেই আমার সমস্ত পরিশ্রম সফল হইবে।"

১৭৮০শকে সিংহ মহাশয় মহাভারত অনুবাদ আরম্ভ করেন। এই "মহাভারতের উপসংহারে"(১৮৮৮শকে) সিংহ মহাশয় লিখিয়াছেন,—"আমি বহু যত্নে আসিয়াটিক সোসাইটির মুদ্রিত, এবং সভাবাজারের রাজবাটীর মৃত আশুতোষ দেবের, ও শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের পুস্তকালয়স্থিত, তথা আমার প্রপিতামহ ৺শান্তিরাম সিংহ বাহাদুরের কাশী হইতে সংগৃহীত হস্তলিখিত পুস্তক সমুদায় একত্রিত করিয়া বহুস্থলের বিরুদ্ধ ভাবের ও ব্যাসকূটের সন্দেহ নিরাকরণ পূর্ব্বক অনুবাদ করিয়াছি। এই বিষয়ে কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যামন্দিরের সুবিখ্যাত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত তারানাথ তর্কবাচস্পতি আমার যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন।

"মহাভারতানুবাদ সময়ে অনেক স্থলে অনেক কৃতবিদ্য মহাত্মার নিকট আমাকে ভূয়িষ্ঠ সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছে, তন্নিমিত্ত তাঁহাদিগের নিকট চিরজীবন কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রহিলাম। আমার অদ্বিতীয় সহায় পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বয়ং মহাভারতের অনুবাদ করিতে আরম্ভ করেন এবং অনুবাদিত প্রস্তাবের কিয়দংশ কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের অধীনস্থ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ক্রমান্বয়ে প্রচারিত ও কিয়দ্ভাগ পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিয়াছিলেন; কিন্তু আমি মহাভারতের অনুবাদ করিতে উদ্যত হইয়াছি শুনিয়া, তিনি কৃপা পরবশ হইয়া মহাভারতানুবাদে ক্ষান্ত হন। বাস্তবিক বিদ্যাসাগর মহাশয় অনুবাদে ক্ষান্ত না হইলে, আমার অনুবাদ হইয়া উঠিত না। তিনি কেবল অনুবাদেচ্ছা পরিত্যাগ করিয়াই নিশ্চিন্ত হন নাই। অবকাশানুসারে আমার অনুবাদ দেখিয়া দিয়াছেন ও

সময়ে সময়ে কার্য্যোপলক্ষে যখন আমি কলিকাতায় অনুপস্থিত থাকিতাম, তখন স্বয়ং আসিয়া আমার মুদ্রাযন্ত্রের ও ভারতানুবাদের তত্ত্বাবধান করিয়াছেন। ফলতঃ বিবিধ বিষয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট পাঠ্যাবস্থাবধি আমি যে কত প্রকারে উপকৃত হইয়াছি তাহা বাক্য বা লেখনী দ্বারা নির্দ্দেশ করা যায় না। এতদ্ভিন্ন প্রিয়চিকীর্ষু বান্ধবেরা ও কলিকাতার অদ্বিতীয় পৌরাণিক শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর তর্কবাগীশ, শ্রীযুক্ত রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর, শ্রীযুক্ত বাবু যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর, শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র, সোমপ্রকাশ সম্পাদক শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের সংস্কৃত-সাহিত্যাধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দোপাধ্যায় ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুক্ত নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলদর্পণ নাটক প্রভৃতির লেখক শ্রীযুক্ত বাবু দীনবন্ধু মিত্র ও ভাস্কর সম্পাদক শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন বিদ্যারত্ন প্রভৃতি মহাত্মারা অনুবাদ সময়ে সংপরামর্শ ও সদভিপ্রায় দ্বারা আমারে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন এবং সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত মাইকেল মধুসূদন দত্ত অনুবাদিত ভাগ হইতে উৎকৃষ্ট প্রস্তাব সকল সংগ্রহ করিয়া অমিত্রাক্ষর পদ্যে ও নাটকাকারে পরিণত করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া আমাকে বিলক্ষণ উৎসাহিত করিয়াছেন।

"যে সকল মহাত্মারা সময়ে সময়ে আমার সদস্য পদে ব্রতী হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে সংস্কৃত বিদ্যামন্দিরের ব্যাকরণ অধ্যাপক ও সংস্কৃত রঘুবংশের বাঙ্গালা অনুবাদক ৺চন্দ্রকান্ত তর্কভূষণ, ৺কালীপ্রসন্ন তর্করত্ন, ৺ভুবনেশ্বর ভট্টাচার্য্য, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরমাত্মীয় ৺শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়, ৺ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন ও ৺অযোধ্যানাথ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি দশ জন অনুবাদ শেষের পূর্ব্বেই অসময়ে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন।

"এক্ষণকার বর্ত্তমান শ্রীযুক্ত অভয়াচরণ তর্কালঙ্কার, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন বিদ্যারত্ন, শ্রীযুক্ত রামসেবক বিদ্যালঙ্কার ও শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রভৃতি সদস্যদিগকে মনের সহিত সকৃতজ্ঞ চিত্তে বার বার নমস্কার করিতেছি। * * হিন্দু কলেজের দ্বিতীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালিদাস চট্টোপাধ্যায়, সংস্কৃত যন্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অন্যতর যন্ত্রাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কালীকিঙ্কর ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত কেদারনাথ ভট্টাচার্য্য ও দরজিপাড়া-নিবাসী শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাভারত মুদ্রাঙ্কণ সময়ে কেহ পুরাণ-সংগ্রহ যন্ত্রের তত্ত্বাবধায়ক, কেহ প্রুফ-দর্শক ও কেহ কাপি-পাঠক ছিলেন। হুগলী গভর্মেণ্ট নর্ম্ম্যাল বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শিক্ষক শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন বহুদিন ভারতানুবাদের পরিদর্শকতা ও শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর তর্কবাগীশ পুরাণান্তরের উপদেশ প্রদান করিয়া আমারে যথেষ্ট উপকৃত করিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত অযোধ্যানাথ পাকড়াশী এবং ঐ সমাজের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক ও উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, তথা বর্ত্তমান সহকারী সম্পাদক ও উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ প্রভৃতি মহাত্মারাও পুরাণ-সংগ্রহ যন্ত্র স্থাপন বিষয়ে আমারে সম্যক্ সাহায্য প্রদান করিয়াছেন।

"হিন্দু-সমাজের শিরোভূষণ স্বরূপ সুবিখ্যাত শব্দকল্পদ্রুম-গ্রন্থকার পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর * * প্রতিদিন সায়ংকালে আমার অনুবাদিত গ্রন্থের আনুপূর্ব্বিক পাঠ শ্রবণ করিয়াছেন এবং সময়ে সময়ে অনুবাদ বিষয়ক বিবিধ সৎপরামর্শ দ্বারা আমারে কৃতার্থ করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন শ্রীযুক্ত রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর, শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ মিত্র প্রভৃতি বিখ্যাত হিন্দুদলপতিরা আমার নির্দ্দিষ্ট পাঠক ছিলেন।"

শ্রীযুক্ত শ্রীকান্ত রায় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও প্রকাশিত 'বঙ্গগৌরব' নামক গ্রন্থে কালীপ্রসন্ন সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কএকটি কথা আছে। "মাইকেল যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রচলন করেন, কালীপ্রসন্ন সিংহই প্রথমে তাহা 'হুতোম পেঁচায়' ব্যবহার করিয়াছিলেন। পাঠক, দেখুন কালীপ্রসন্ন বিরচিত 'হুতোম পেঁচার' অমিত্রাক্ষর উৎসর্গটি কেমন সুন্দর!—

"হে সজ্জন! স্বভাবের সুনির্ম্মল পটে
রহস্য রসে রঙ্গে, চিত্রিনু চরিত্র,
দেবী সরস্বতী-বরে! কৃপাচক্ষে হের
একবার; শেষে বিবেচনা মতে যার
যা অধিক আছে, তিরস্কার কিম্বা
পুরস্কার, দিও তাহা মোরে,
বহুমানে লব শির পাতি।"

"কালীপ্রসন্ন ব্যয়ে অকুণ্ঠিত ছিলেন। অনেক সময়ে

তিনি কেবল সহানুভূতি-প্রণোদিত হইয়া পাত্রাপাত্র না বুঝিয়া, অতিরিক্ত দানশীলতার পরিচয় দিতেন। অর্থের প্রতি তাঁহার কিছুমাত্র অনুরাগ ছিল না; এই জন্যই শেষ দশায় তাঁহাকে কষ্টে পতিত হইতে হইয়াছিল। মহাভারত প্রকাশকল্পে অজস্রব্যয়ে এবং অন্যান্য ব্যয়ে ও অকুণ্ঠিত দানে তাঁহাকে ঋণগ্রস্ত হইতে হয়। সেই জন্যই উড়িষ্যার বিস্তৃত জমিদারী এবং কলিকাতার বেঙ্গল ক্লাবের ন্যায় কতকগুলি বাড়ী তাঁহার হস্তচ্যুত হয়। তিনি যে বালকের ন্যায় সরলচিত্ত ছিলেন, তাহা তাঁহার ঋণশোধ-প্রণালীতে প্রতিপন্ন হয়। কপটতাকে তিনি একান্ত ঘৃণা করিতেন। কপট ব্যবহারকে বড় ভয় করিতেন বলিয়াই, তিনি অনেক সময়ে সরলতাকে পরাকাষ্ঠায় আনয়ন করিয়া, নিজে অপরিণামদর্শী বলিয়া পরিচিত হইতেন। কিন্তু সহস্র ত্রুটি সত্ত্বেও তাঁহার স্বভাবে ও চরিত্রে যে সকল সরল ও অমায়িক ভাব ছিল, তাহা অল্প লোকেই দেখিতে পাওয়া যায়। এই গুণেই তিনি অনেক মহদাশয় লোকেরই স্নেহভাজন ছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে পুত্রাধিক স্নেহ করিতেন। কালীপ্রসন্ন কবে চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু এখনও তাঁহার গুণ সকলে ভুলিতে পারেন নাই। তিনি মরিয়াছেন, কিন্তু মহাভারতই তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে।"

পরলোকগত কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় সম্বন্ধে যেখানে যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, অন্ততঃ আমি চেষ্টা করিয়া যাহা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। আমি পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি, কালীপ্রসন্ন সিংহের জীবন-চরিত লিখিতে বসি নাই। আমি পূর্ব্বে যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছি, এখনও সেই প্রশ্নই পুনরায় জিজ্ঞাসা করিতেছি, মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের সম্বন্ধে কি আর কিছুই জানিতে পারিব না? তাঁহার একখানি জীবন-চরিত লিখিত হওয়া কি উচিত নহে? ভিন্ন ভিন্ন স্থানে লিখিত সামান্য কএক ছত্র লিখিয়াই কি আমরা আমাদের কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিয়াছি বলিয়া নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া থাকিব?

শ্রীজলধর সেন।

সূরজ কওর।

পঞ্জাব-কেশরী মহারাজা রণজিৎ সিংহের মৃত্যুর পরেই শিখ-রাজ্যের পতনের সূচনা হইল। কে কবে কাহাকে হত্যা করে স্থির নাই, চারিদিকে চক্রান্ত ও ষড়্‌যন্ত্র, স্ত্রীলোকেরাও তাহাতে যোগ দিত। মহারাজা শের সিংহ সৈন্য পরিবেক্ষণ করিতেছিলেন; তাঁহাকে সেইখানে গুলি করিয়া মারিল। রাজা ধ্যান সিংহ রণজিৎ সিংহের প্রধান মন্ত্রী, তিনি একটা দল বাঁধিতেছিলেন, এমন সময় তিনিও নিহত হইলেন।

ধ্যান সিংহের প্রকাণ্ড হবেলী (বাড়ী) এখনও লাহোরে দেখিতে পাওয়া যায়। ধ্যান সিংহের ভাই মহারাজা গোলাব সিংহ কাশ্মীরের বর্ত্তমান মহারাজার পিতামহ। সেই হবেলীর পাশে একটা গলিতে এক ঘর শিখ বাস করিত। তাহাদের কথা শিখ ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় না, অথচ অনেক বড় বড় ঘটনায় তাহারা জড়িত ছিল।

বাড়ীতে বাস করিত হরি সিংহ। হরি সিংহের বয়স সাতাইশ হইবে; খাল্‌সা শিখ, মাথার লম্বা চুল কাঠের চিরুণী দিয়া জড়াইয়া রাখা, দাড়ী পাকাইয়া কাণে জড়াইয়া বাঁধা। চক্ষুর দৃষ্টি খুব তীক্ষ্ণ, দীর্ঘ বলিষ্ঠ শরীর। পাগড়ী ফিকা নীল রংএর, কোমরে তরবারি, পিস্তল। তখন বিনা হাতিয়ারে কেহ বাড়ীর বাহির হইত না।

হরি সিংহ বাড়ী আসে যায়; কখনও একা আসে, কখনও সঙ্গে কেহ থাকে। তখন চারিদিকে রক্তারক্তি; বড় বড়

মাথা কখন্ কোন্‌টা আছে কখন্ নাই, তাহার কোন স্থিরতা ছিল না; সকলে আপন আপন শত্রু মিত্র লইয়া ব্যস্ত, সকলে আপন আপন প্রাণ রক্ষায় যত্নবান্।

২

রাজা ধ্যান সিংহের হবেলীর সম্মুখে রাজপথ। অল্প দূর গিয়া উত্তরমুখে একটা গলি। সেই গলিতে কিছুদূর গিয়া হরি সিংহের বাড়ী। বাড়ী ছোট কিন্তু খুব উচ্চ, ছাদে উঠিলে সহরের অনেক দূর পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়; বিশেষ রাজা ধ্যান সিংহের প্রাসাদের অন্দর মহলের একটি ঘর দেখিতে পাওয়া যাইত। ঘরের দরজা প্রায় বন্ধ থাকিত; কিন্তু খোলা থাকিলে হরি সিংহের বাড়ীর ছাদের এক প্রান্ত হইতে দেখিতে পাওয়া যাইত। হরি সিংহের বাড়ীর সদর দরজা প্রায়ই বন্ধ থাকিত। এমন অনেকের থাকিত, কিন্তু হরি সিংহের দরজা খোলা প্রায় কেহই দেখিতে পাইত না। তখন কে কোথায় কি করিতেছে, কেহ জানিতে পাইত না; সহসা এক দিন কোন হত্যাকাণ্ডে সহর শুদ্ধ লোক সশঙ্কিত হইয়া উঠিত।

হরি সিংহের বাড়ীর দরজা ঠেলিলে কেহ সহজে সাড়া পাইত না। অনেক ঠেলাঠেলি করিলে হয় ত উপরের একটা জানালা খুলিয়া স্ত্রীকণ্ঠে কেহ বলিত যে, বাড়ীতে পুরুষ মানুষ কেহ নাই; আবার জানলা বন্ধ হইয়া যাইত। রাজা ধ্যান সিংহের হবেলীর নিকটেই টকসালী দরজা। সহরে প্রবেশ করিবার কএকটি দ্বার—তাহার মধ্যে একটি এই। এখন টকসালী দরজা সমভূমি হইয়া গিয়াছে। এক দিন রাত্রি এগারটার সময় এক ব্যক্তি এই দরজা দিয়া প্রবেশ করিয়া, রাজা ধ্যান সিংহের হবেলী উত্তীর্ণ হইয়া, হরি সিংহের বাড়ীর অভিমুখে গমন করিতেছিল। আকৃতি কিছু খর্ব্ব, মাথায় মস্ত পাগড়ী, শীতকাল বলিয়া একটা মোটা লুই জড়াইয়াছিল, তাহাতে মুখ ভাল দেখিতে পাওয়া যাইতেছিল না। হরি সিংহের বাড়ীর সম্মুখে গিয়া কএকবার এদিক ওদিক দেখিয়া দাঁড়াইল। তাহার পর ধীরে ধীরে দ্বারে করাঘাত করিল। করাঘাতের কিছু কৌশল ছিল! কএকবার সেইরূপ আঘাত করাতে দরজার ভিতরেও কে সঙ্কেতসূচক আঘাত করিল। আগন্তুক আবার পূর্ব্বের ন্যায় করাঘাত করাতে দরজা সাবধানে মুক্ত হইল। আগন্তুক মুখের ঢাকা খুলিয়া ফেলিল। প্রদীপ হস্তে একটি স্ত্রীলোক দরজার ভিতরে দাঁড়াইয়া ছিল। সে আগন্তুককে ভাল করিয়া দেখিয়া প্রবেশ করিতে সঙ্কেত করিল। সে ব্যক্তি প্রবেশ করিবা-মাত্র রমণী আবার দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।

প্রদীপ হস্তে একটি স্ত্রীলোক দরজার ভিতরে দাঁড়াইয়াছিল।

রমণীর বয়স হইয়াছে, আকার দীর্ঘ,

মুখের ভাব কঠোর। জিজ্ঞাসা করিল, "আজ কি আছে ?"

"তাহা জানি না ! হুকুম পাইয়া আসিয়াছি।" এই ব্যক্তি খর্ব্বাকার হইলেও অত্যন্ত বলবান্, বিশাল মুখশ্রী, চক্ষু ক্ষুদ্র কিন্তু বড় তীক্ষ্ণ, মুখের ভাব উগ্র ; কটিতে অসি, ছোরা, পিস্তল।

রমণী তাহাকে ডাকিয়া লইয়া গিয়া একটি ঘরে বসিতে বলিল। তাহার পর সে চলিয়া গেল, আগন্তুক একা বসিয়া রহিল।

কিয়ৎকাল পরে হরি সিংহ আসিল। কহিল, "মঙ্গল সিংহ, আর একটা কাজ পড়িয়াছে।"

মঙ্গল সিংহ অল্প হাসিয়া কহিল, "তাহা ত বুঝিতে পারিয়াছি, নহিলে আবার তলব হইবে কেন ?"

"কাজটা কিছু শক্ত, তোমাকে দিয়া হইবে কি না ভাবিতেছি।"

মঙ্গল সিংহ মাথা তুলিয়া কিছু রুক্ষভাবে কহিল, "কি এমন কাজ যাহা আমাকে দিয়া হইবে না ?"

হরি সিংহ স্মিতমুখে কহিল, "তোমাকে আমি জানি, তোমার প্রতি আমার কোন সংশয় নাই। এ কাজে একজন স্ত্রীলোক আমাদের প্রধান শত্রু, তাহার সহিত কৌশলে তুমি পারিবে কি না ভাবিতেছি।"

মঙ্গল সিংহ মাথা নীচু করিয়া, দাড়িতে হাত বুলাইয়া কহিল, "সে কথা মানি। কৌশলে স্ত্রীলোককে কে কবে আঁটিয়া উঠিয়াছে !"

"এ স্ত্রীলোক অত্যন্ত চতুর, তাহাতে তাহার ভয়ের লেশ মাত্র নাই। কাজ অত্যন্ত সাবধানে করিতে হইবে। গোল হইলে আমাদের সকলেরই বিপদ, কেহ রক্ষা পাইবে না।"

মঙ্গল সিংহ মৃদু মৃদু বলিল, "বিপদকে কি আমরা ভয় করি ? আর এখন কাহার বিপদ নাই ? ঘরে বসিয়া একেবারে নির্লিপ্তভাবেও যে থাকে তাহারও সমূহ বিপদ।"

হরি সিংহের বড় বড় চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল। কহিল, "মঙ্গল সিংহ,—তুমি আমাকে বেশ জান। বিপদের কথা নয়, কার্য্য সিদ্ধ হইবে কি না তাহাই ভাবিতেছি।"

মঙ্গল সিংহ কহিল, "সেই ত কথা !"

মঙ্গল সিংহ নিজে কোন কথা পাড়িল না, বা জিজ্ঞাসা করিল না,—কোনরূপ কৌতূহল প্রকাশ করিল না। সে হরি সিংহকে চিনিত।

আর কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর দুইজনে উঠিল। মঙ্গল সিংহ চলিয়া গেল, হরি সিংহ দরজা বন্ধ করিয়া উপরে গেল।

৩

উপরে গিয়া হরি সিংহ একটা উজ্জ্বল আলোকশালী লণ্ঠন জ্বালিয়া সেইটা হাতে করিয়া ছাদে উঠিল। ছাদের যে স্থান হইতে রাজা ধ্যান সিংহের অন্দর মহলের একটি ঘর দেখা যাইত, সেই স্থানে দাঁড়াইয়া লণ্ঠন তুলিয়া কএকবার আন্দোলন করিল। সেই সঙ্কেতের উত্তরে রাজা ধ্যান সিংহের হবেলীর সেই দরজা হইতে একটা আলোক দেখা গেল, কিন্তু উহা তৎক্ষণাৎ অপসৃত হইল। হরি সিংহ লণ্ঠন নিবাইয়া নীচে আসিয়া শয়ন করিল।

পরদিবস গভীর রাত্রে হরি সিংহ সশস্ত্র হইয়া সাবধানে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। অনেক গলি ঘুঁজি ঘুরিয়া একটা ছোট বাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হইল। সে বাড়ী রাজা ধ্যান সিংহের প্রাসাদের ঠিক পশ্চাতে, কিন্তু হরি সিংহ অনেকটা পথ ঘুরিয়া আসিয়াছিল। হরি সিংহ রুদ্ধ দ্বারে তিন বার মৃদু মৃদু করাঘাত করিল। আবার কিছুপরে দুইবার আঘাত করিল। তখন দ্বার ধীরে ধীরে মুক্ত হইল, কিন্তু যে দ্বার খুলিল সে চকিতের মত সরিয়া গেল। হরি সিংহ দেখিল দ্বার মুক্ত, কিন্তু দ্বারপথে কেহ দাঁড়াইয়া নাই।

মুক্তপথে সহসা প্রবেশ না করিয়া হরি সিংহ একটু দাঁড়াইল। তখন কেহ কাহাকেও বিশ্বাস করিত না, সকলের প্রাণে ভয় ; কারণে হউক অকারণে হউক, যেথানে সেথানে হত্যাকাণ্ড হইত। হরি সিংহ নির্ভীক হইলেও তাহাকেও একটু বিবেচনা করিতে হইল।

সহসা সেই স্তব্ধ গৃহে রমণীকণ্ঠে হাস্যধ্বনি হইল। অতি মধুর স্বরে কে কহিল, "কোন আশঙ্কা নাই, ভিতরে আইস।"

হরি সিংহ বলিল, "আশঙ্কা নয়, না ডাকিলে অপরিচিত গৃহে প্রবেশ করিব কি না ভাবিতেছিলাম।"

"গৃহ অপরিচিত হউক, তুমি ত অনাহূত নও। ভিতরে আইস।"

হরি সিংহ প্রবেশ করিয়া দুয়ার ভেজাইয়া দিল! সে আর একটু অগ্রসর হইতে না হইতেই পশ্চাতে দরজা রুদ্ধ হইল। হরি সিংহ অসিমুষ্টি ধারণ করিয়া আর কিছু দূর গিয়া দেখিল একটি কক্ষে আলোক জ্বলিতেছে। গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিল গালিচার উপর চাদর পাতা রহিয়াছে। হরি সিংহ সেইখানে উপবেশন করিল।

যেখানে হরি সিংহ বসিল তাহার পশ্চাতে একটি দরজা ছিল। অল্পক্ষণ পরেই সেই দরজা অল্প মুক্ত হইল। পূর্ব্ব-শ্রুত রমণীকণ্ঠে কে কহিল, "তোমাকে কেন ডাকাইয়াছি, জান?"

হরি সিংহ ফিরিয়া সেই দিকে চাহিল। রমণী দরজার অন্তরালে দাঁড়াইয়া ছিল, শুধু তাহার ঘাগরা ও মাথার চাদরের কিয়দংশ দেখা যাইতেছিল।

হরি সিংহ বলিল, "তাহা কেমন করিয়া জানিব? আপনি কে, তাহাও আমি জানি না। তবে কোন কঠিন কার্য্য না হইলে আমাকে ডাকিতেন না, এ পর্য্যন্ত বুঝিতে পারিতেছি।"

অৰ্দ্ধমুক্ত দরজায় রমণী আর একটু সরিয়া আসিল, তাহার অলঙ্কার-শিঞ্জিতের মৃদুধ্বনি হইল। কহিল, "আমার পরিচয়ে তোমার প্রয়োজন? যে কৰ্ম্মে তোমায় নিযুক্ত করিব তাহার উপযুক্ত পুরস্কার দিব, আর তোমার কি চাই?"

হরি সিংহ কিছু গর্ব্বিতভাবে কহিল, "যদি আপনি শুনিয়া থাকেন যে, আমি কেবল গুণ্ডাগিরি করি, টাকার লোভে সব করিয়া থাকি, তাহা হইলে সে মিথ্যা কথা। সকল কথা না জানিয়া কোন কৰ্ম্মে আমি হস্তক্ষেপ করি না। অর্থলাভের জন্য সকল কৰ্ম্ম স্বীকারও করি না।

রমণী একটু বিরক্তভাবে কহিল, "তবে তোমাকে দিয়া আমার কৰ্ম্ম হইবে না।"

"আপনার যেমন অভিরুচি"—বলিয়া হরি সিংহ উঠিয়া দাঁড়াইল।

রমণী ব্যস্তভাবে আর একটু অগ্রসর হইল, হাত বাড়াইয়া হরি সিংহকে উঠিতে নিষেধ করিল। হস্তের গঠন, অঙ্গুলি বড় সুন্দর। হরি সিংহ দেখিল একটি অঙ্গুলিতে হীরার আংটী জ্বলিতেছে।

রমণী কহিল, "তোমার মত পুরুষের এত সহজে ধৈর্য্যচ্যুতি হওয়া উচিত নয়। তোমার কথা সবিশেষ অবগত না হইলে তোমার সহিত আমি সাক্ষাৎ করিতাম না। এ বাড়ীতে আমরা ছাড়া তৃতীয় ব্যক্তি নাই, ইহাতে বুঝিতে পারিতেছ যে, তোমার প্রতি আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস। যাহা তুমি জানিতে চাও তাহা আমাকে বলিতেই হইবে; কিন্তু তুমি বুঝিতে পারিবে যে, এই কৰ্ম্মে আমার যে শুধু প্রাণের শঙ্কা আছে তা নয়, দুইটি প্রধান প্রধান বংশের অসম্মানের আশঙ্কা আছে। আমার প্রাণ ত তুচ্ছ, কিন্তু যাহাতে বংশ-মর্য্যাদা রক্ষা হয় তাহা তোমায় করিতে হইবে।"

রমণী কিছু বেগের সহিত এই কয়টি কথা বলিল। হরিসিংহ আবার উপবেশন করিল; জিজ্ঞাসা করিল, "আমাকে কি করিতে হইবে?"

"সুন্দর সিংহকে সরাইতে হইবে।"

হরি সিংহ সহজে বিস্মিত হইবার লোক নয়, কিন্তু সে এই কথা শুনিয়া বিস্ময়ে চমকিয়া উঠিল! যেখানে রমণী দাঁড়াইয়া ছিল, সেই দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল; রমণীর অঙ্গুরীমণ্ডিত, চম্পকনিন্দিত অঙ্গুলি দ্বারে লগ্ন রহিয়াছে, হস্তের কাছে মাথার ওড়না একটু চঞ্চল হইয়াছে। হরি সিংহ বিস্ময় গোপন করিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

"তোমরা জান সুন্দর সিংহ নিৰ্ম্মল-চরিত্র, মহৎ স্বভাব, কিন্তু সে যে কি সর্ব্বনাশের আয়োজন করিতেছে তাহা বাহিরের কেহ জানে না। তাহার মৃত্যু না হইলে কাহারও মঙ্গল নাই।" কণ্ঠস্বর অতি মৃদু, কিন্তু তাহাতে একটা এমন নির্ম্মমতা যে, হরি সিংহ বুঝিতে পারিল এ সামান্যা রমণী নয়।

হরি সিংহ কহিল, "সুন্দর সিংহকে লোকে শুধু ভাল বলে না, তাহার যথেষ্ট লোকবল আছে। তাহাকে সরাইবার চেষ্টা বিফল হইবার সম্ভাবনা।"

রমণী তীব্র ব্যঙ্গের স্বরে কহিল, "রাজা ধ্যান সিংহকে কি লোকে ভাল বলিত না,—তাঁহার লোকবল ছিল না? তাঁহার মত বলশালী লোক কে ছিল?"

"তবে দেখ" বলিয়া রমণী গৃহে প্রবেশ করিল।

হরি সিংহ অনেকক্ষণ মৌনী রহিল। তাহার পর কহিল, "যে কর্ম্মে তুমি আমাকে নিয়োগ করিতেছ, উহা অতি কঠিন, তথাপি তুমি আমার একটা কথা রাখিলে আমি স্বীকৃত আছি।"

অতি মৃদু, অতি মধুর, অতি লঘু হাস্যধ্বনি হইল। রমণী কহিল, "কি কথা ?"

"আমি তোমার পরিচয় জানি না, তুমি কেন সুন্দর সিংহের বিরোধী তাহা জানি না। কিছু না জানিয়া আমি এ কর্ম্ম স্বীকার করিব না।"

"তোমার কি জানিবার আবশ্যক ? পুরস্কার তুমি যাহা চাও পাইবে। চাহ ত তোমায় আগাম টাকা দিব।"

হরি সিংহ কিছু বেগের সহিত কহিল, "আবার তোমার ভুল হইতেছে, আমি পেশাদার গুণ্ডা কিংবা খুনী নই। তুমি আর কোন লোক দেখ।"

আবার সেইরূপ মৃদু হাস্যধ্বনি হইল। রমণী কহিল, "তুমি বিরক্ত হইও না। কি চাও ?"

"তোমাকে একবার দেখিতে চাই।"

"আমাকে দেখিয়া কি হইবে ? তাহাতে ত আমার পরিচয় পাইবে না ?"

"না পাই,—তোমাকে ত দেখিতে পাইব। তুমি কেমন সুন্দরী দেখিতে চাই।"

"আমি কি সুন্দরী ?"

"দেখিলে বুঝিতে পারিব।"

"তবে দেখ",—বলিয়া রমণী গৃহে প্রবেশ করিল। মাথার ওড়না সরাইয়া ফেলিয়াছিল। অনাবৃত সস্মিত মুখে হরি সিংহের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল।

হরি সিংহও চাহিয়া দেখিল। দেখিতে দেখিতে সে নিস্পন্দ হইল। অনেকক্ষণ পরে রমণী হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "দেখা হইয়াছে ?"

তখন নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া হরি সিংহের মোহ ভগ্ন হইল; কহিল, "না,—এমন রূপ দেখিয়া ফুরায় না। আমাকে যাহা করিতে বলিবে, আমি স্বীকৃত আছি।"

রমণী কহিল,"তবে আজ যাও, কা'ল এই সময়ে আবার আসিও।"

রমণী মুখে হরি সিংহকে বিদায় দিল বটে, কিন্তু হাসিয়া তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল। মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় হরি সিংহ তাহাকে দেখিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে তাহার দিকে অগ্রসর হইল। অমনি রমণী পিছাইয়া দ্বারদেশে দাঁড়াইল; কহিল, "শুধু দেখিবার কথা, আমার নিকটে আসিও না। কা'ল আবার দেখা হইবে।"

হরি সিংহ কহিল,—"তোমার নাম কি ?"

"নাম বলিলেই ত পরিচয় দেওয়া হইল। তা তোমায় বলিলে ক্ষতি কি ! আমার নাম সুরজ কওর !"

হরি সিংহ নির্নিমেষ নয়নে দেখিতে লাগিল। সুরজ

কওর তাহার প্রতি লোল কটাক্ষপাত করিয়া ধীরে ধীরে দ্বার রুদ্ধ করিল।

হরি সিংহ গৃহে ফিরিয়া গেল। শয়নকক্ষে গিয়া মৃদু মৃদু গায়িল,

অজব সিঙ্গার ময় ডিঠা তেরা জটি,
জটি দি সোহনি সুরত লাগ্‌দি মিঠি।

(হে জাট কন্যে, তোমার অপূর্ব্ব বেশ দেখিলাম! জাটকন্যার শোভনরূপ বড় মধুর লাগিল)।

সে রাত্রে হরি সিংহের নিদ্রা হইল না।

৪

লাহোরের পশ্চিমে রাবীর তীরে বিশাল অন্ধকার অরণ্য। সেই অরণ্যের ভিতর দিয়া একটি পথ; সেই পথ দিয়া সকলে স্নান করিতে যাইত। দস্যু ও শ্বাপদের ভয় বলিয়া সে পথে বড় একটা লোক স্নানের সময় ব্যতীত চলিত না। একা প্রায় কেহই যাইত না।

সূর্য্য অস্ত গিয়াছে। নদীর পারে আর গাছের মাথায় অন্ধকার হইয়া আসিতেছে। সেই সময় দুই ব্যক্তি আব্-ছায়ায় একটা গাছের তলায় দাঁড়াইয়া। একজন মঙ্গল সিংহ, দ্বিতীয় হরি সিংহের গৃহে যে তাহাকে দ্বার খুলিয়া দিয়াছিল সেই রমণী।

মঙ্গল সিংহ বলিতেছিল, "প্রেম দেঈ,এমন কি গোপনীয় কথা যে তুমি এমন সময়ে আমাকে এখানে ডাকিয়াছ? তোমার কি ভয় নাই?"

প্রেম দেঈর ভ্রূ কুঞ্চিত, চক্ষু ক্রোধে জ্বলিতেছিল; কহিল, "আমার কন্যা চন্দার সহিত হরি সিংহের বিবাহ স্থির করিয়াছি, এমন সময় হরি সিংহ সুরজ কওরের পাল্লায় পড়িল। তাহার কাছে কাহারও নিস্তার নাই! সুরজ কওর আপনার কার্য্য সিদ্ধি করে, তাহার পর যাহাকে সেজন্য নিযুক্ত করে তাহাকেও বিনাশ করে।"

মঙ্গল সিংহ হাত উল্টাইয়া কহিল, "আমি কি করিব? এখন ত রোজ এমন ঘটিতেছে।"

"আমার একটা যদি উপকার হয়?"

"রাজি আছি। কিন্তু যদি আমার বিপদ হয়?"

"যাহাতে না হয়, আমি তাহার উপায় করিব।"

"আমায় কি করিতে হইবে?"

"সুরজ কওরকে সরাইতে হইবে।"

"স্ত্রীহত্যা! আমাকে দিয়া হইবে না।"

"পিশাচী কি স্ত্রী?"

"পিশাচী দেখিতে পাই?"

"তাহা হইলে তোমারও হরি সিংহের দশা হইবে।"

"ক্ষতি কি!"

"তাহাকে দেখিবার আবশ্যক কি? সে পাপীয়সীকে মারিলে আমি তোমাকে দুশো আশরফি দিব।"

"আগাম?"

"আগাম একশো, পরে একশো।"

"দাও", বলিয়া মঙ্গল সিংহ হাত পাতিল, প্রেম দেঈ তাহার হাতে তোড়ায় বাধা এক শো আশরফি দিল।

মঙ্গল সিংহ বলিল, "তাহার সন্ধান পাইব কেমন করিয়া?"

দুইজনে অনেক কথাবার্ত্তা হইল। রাত্রি হইয়া আসিল। তখন দুইজনে সহরে ফিরিয়া গেল।

ইহারা সকলেই অন্ধকারে চক্রে ঘুরিতেছিল। হরি সিংহ যে স্ত্রীলোকের কথা মঙ্গল সিংহকে বলিয়াছিল, সে কি সুরজ কওর না প্রেম দেঈ?—তাহা সে নিজেই জানিত না। কিছু শোনা কথা, কিছু কল্পিত; এই রকম করিয়া তখন নানা ভীষণ ঘটনা ঘটিত। যে অপরকে ধরিবার কল পাতিত, অনেক সময় তাহার নিজের মাথা সেই কলে পড়িত।

৫

রাজা ধ্যান সিংহের মৃত্যুর কারণ সিন্ধিয়ান সর্দ্দারগণ! তাহারা কয় ভাই অত্যন্ত দুর্দ্দান্ত,—মনে করিয়াছিল সকল শত্রুকে নাশ করিয়া পঞ্জাব হস্তগত করিবে। নামে না হউক কাজে রাজা হইবে। অবশেষে তাহাদেরও ধ্বংসপ্রাপ্তি হইল! সে ইতিহাসের কথা।

সুন্দর সিংহ এই সিন্ধিয়ানদিগের দলের লোক। বয়স অল্প, বড় সুপুরুষ, মধ্যাকৃতি, গড়ন কিছু কৃশ। মুখের মধ্যে চক্ষু বড় সুন্দর। কিন্তু চক্ষু সর্ব্বদা নত করিয়া থাকিত, সকল সময় তাহার চক্ষের সৌন্দর্য্য দেখিতে পাওয়া যাইত না। সুন্দর সিংহ বুদ্ধিমান্ ও ক্ষমতাশালী বলিয়া তাহার লোক জুটিয়াছিল অনেক, আর নির্দ্দোষ চরিত্র বলিয়া

[মিলন

"জগতি জয়িনস্তে তে ভাবা নবেন্দুকলাদয়ঃ
প্রকৃতিমধুরাঃ সন্ত্যেবান্যে মনো মদয়ন্তি যে।
মম তু যদিয়ং যাতা লোকে বিলোচনচন্দ্রিকা।
নয়নবিষয়ং জন্মন্যেকঃ স এব মহোৎসবঃ॥"—মালতীমাধব।

By the courtesy of The Bengal Art Studio, Calcutta.

Engraved & Printed by K. V. Seyne & Bros.

লোকে তাহার প্রশংসা করিত। সুন্দর সিংহ বড় একটা কোথাও যাওয়া আসা করিত না, কিন্তু সকলেই জানিত যে, সিন্ধিয়ানদিগের দলে সেই প্রধান ব্যক্তি।

সন্ধ্যার পর সুন্দর সিংহ আপনার ঘরে বসিয়া ছিল। নিকটে আর কেহই ছিল না। একটা ভৃত্য আসিয়া কহিল, "সর্দার সাহেব, একটা স্ত্রীলোক আপনার সঙ্গে দেখা করিতে চায়।"

"স্ত্রীলোক? এমন সময়?"

"হাঁ হুজুর।"

"কে সে? আর কখন আসিয়াছিল?"

"না। বলিতেছে, বিশেষ কথা আছে, আপনাকে ছাড়া কাহাকেও বলিবে না।"

সুন্দর সিংহ একটু ভাবিল। ভাবিয়া কহিল, "ডাক তাহাকে।"

প্রেম দেঈ আসিয়া সুন্দর সিংহের সম্মুখে দাড়াইল। সুন্দর সিংহের চক্ষু নিবিড় কৃষ্ণতার, চক্ষের পাতা ভারি, দৃষ্টির ভাব অলস, চাহনির ভঙ্গী বড় সুন্দর। একবার চাহিয়া চক্ষু নত করিল। জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে? আমার সঙ্গে দেখা করিতে চাহিয়াছ কেন?"

"আমি কে, বলিয়া কোন ফল নাই, কারণ আমাকে তুমি চিনিতে পারিবে না। তোমার বড় বিপদ, সেই কথা তোমাকে বলিতে আসিয়াছি।"

সুন্দর সিংহের কোমরে ছোরা ছিল, তাহার মুষ্টি বহুমূল্য পাথর দিয়া বাধান। সুন্দর সিংহ তাহাতে হাত রাখিয়া, হাই তুলিয়া কহিল, "বিপদ ত এখন সকলের। আমার নূতন বিপদ কি?"

"সূরজ কওর তোমাকে হত্যা করিবার জন্য লোক নিযুক্ত করিয়াছে।"

"সূরজ কওর কে?"

প্রেম দেঈ অত্যন্ত বিস্মিত হইল।

"সূরজ কওরকে কে না জানে? রাজা ধ্যান সিংহের বংশের সহিত তাহার দূর সম্পর্ক আছে। অত বড় ভয়ানক স্ত্রীলোক পঞ্জাবে নাই। তুমি তাহাকে জান না, এ কেমন কথা?"

"স্ত্রীলোককে কেমন করিয়া জানিব? আর আমি ত সূরজ কওরের কোন অনিষ্ট করি নাই।" অঙ্গুলি দিয়া সুন্দর সিংহ ছোরার মুষ্টি নাড়াচাড়া করিতেছিল।

"তুমি সিন্ধিয়ানদের দলে, সূরজ কওর রাজা ধ্যান সিংহের পক্ষে। তোমার প্রতি শত্রুতার আর কি কোন কারণ নাই?"

সুন্দর সিংহ কহিল, "তুমি যে আমাকে সাবধান করিয়া দিয়াছ, সেজন্য ধন্যবাদ করিতেছি। আমার দ্বারা যদি কখনও তোমার কোন উপকার হয় ত আমাকে স্মরণ করিও।"

প্রেম দেঈ বিদায় হইল। সে ঘরের বাহিরে গেলে সুন্দর সিংহ একজন লোককে ডাকিয়া চুপি চুপি কএকটা কথা বলিল; সে শুনিয়া বাহিরে গেল।

ঘণ্টাখানেক পরে সে লোকটা ফিরিয়া আসিল। সুন্দর সিংহের সম্মুখে মাথা নোয়াইয়া মৃদু স্বরে কহিল, "হরি সিংহের বাড়ী।"

"অচ্ছি বাত হয়", বলিয়া সুন্দর সিংহ তাহাকে বিদায় করিল। তাহার পর অল্প হাসিল। সুন্দর সিংহের চাহনি সুন্দর, কিন্তু হাসির ভাব বড় নির্মম।

৬

যে বাড়ীতে সূরজ কওরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, রাত্রে নির্দ্দিষ্ট সময়ে হরি সিংহ সেখানে উপস্থিত হইল। দ্বারে সেইরূপ আঘাত করাতে দ্বার মুক্ত হইল। হরিসিংহ প্রবেশ করিয়া দ্বার বন্ধ করিল। সূরজ কওর আলো হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। হরি সিংহকে পূর্ব্বদিনের ঘরে বসাইয়া, আলো রাখিয়া সেই দরজায় গিয়া দাঁড়াইল। এবার আর দরজার আড়ালে গেল না।

হরি সিংহ সূরজ কওরকে দেখিতে লাগিল। সূরজ কওর মাথায় ওড়না দিয়া দাড়াইয়া ছিল, কিন্তু মুখে অবগুণ্ঠন ছিল না।

সূরজ কওর কহিল, "সুন্দর সিংহকে কেমন করিয়া সরাইবে স্থির করিয়াছ?"

হরি সিংহ কহিল, "এখনও ঠিক করি নাই। কিন্তু এ কাজে একা কৃতকর্ম্ম হওয়া কঠিন। আর একজন লোকের আবশ্যক।"

"তোমার কোনও লোক নাই?"

"আছে, বেশ বিশ্বাসী লোক। তাহাকেই নিযুক্ত করিব।"

"কত টাকা চাই ?"

হরি সিংহ স্থির দৃষ্টিতে স্বরজ কওরের দিকে চাহিয়া কহিল, "আমার কিছু চাই না। সেই লোকটাকে যাহা ইচ্ছা হয় দিও।"

"তোমার কিছু চাই না ?"

"চাই। আমি তোমাকে চাই।"

স্বরজ কওর হাসিয়া মুখে কাপড় দিল। মধুমাখা স্বরে কহিল, "তাই স্বীকার; কিন্তু পুরস্কারের দাবি কর্ম্মসিদ্ধির পর।"

"কিছু বায়না পাই না ?"

"এ সওদায় বায়না নাই।"

হরি সিংহ অগ্রসর হইল, স্বরজ কওর পিছাইল। হরি সিংহ তাহার ওড়না ধরিল, স্বরজ কওর ওড়না ছাড়াইয়া লইয়া কহিল, "তোমাকে বিশ্বাস করিয়া আমি একা গৃহে তোমার সঙ্গে দেখা করিয়াছি। এই কি সে বিশ্বাসের ফল ?"

হরি সিংহ আর এগাইল না, আর হাত বাড়াইল না। সতৃষ্ণ নয়নে স্বরজ কওরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

স্বরজ কওর ওড়নার অঞ্চল ধরিয়া হরি সিংহের প্রতি কটাক্ষপাত করিতেছিল। সে কটাক্ষে তরল বিদ্যুতের আনাগোনা, সে কটাক্ষে প্রেমের আহ্বান। চক্ষের খেলায় স্বরজ কওরের তুল্য আর কেহ ছিল না।

হরি সিংহ রুক্ষ স্বরে কহিল, "শুধু দেখিয়া ফিরিয়া যাইব ?"

স্বরজ কওর আসিয়া হরি সিংহের হস্তধারণ করিল, কহিল, "এই ত দরশ পরশ হইল! আমি যে কাজ বলিয়াছি করিয়া আইস, তখন আমার অদেয় আর কিছুই থাকিবে না—

"হীরা ভি দিউঙ্গি মোতি ভি দিউঙ্গি,
দিউঙ্গি গলে কা হার!
যো মাঙ্গো সো দিউঙ্গি!"—

পদ্মকোরকে উপবেশনোন্মুখ ভ্রমর-গুঞ্জনের ন্যায় স্বরজ কওর এই গীতখণ্ড আবৃত্তি করিল। আবার তখনই সরিয়া গিয়া হরি সিংহকে যাইতে ইঙ্গিত করিল। হরি সিংহ কহিল, "আবার কবে দেখা হইবে ?"

"যখন ইচ্ছা। কার্য্য সিদ্ধি করিয়া আইস।"

হরি সিংহ চলিয়া গেল। স্বরজ কওর যখন দ্বার বন্ধ করিয়া ফিরিতেছে, তখন দেখিল একটা দরজায় একজন বৃদ্ধা দাঁড়াইয়া আছে। বৃদ্ধার বয়স অনেক, চর্ম্ম লোল, কেবল চক্ষু বড় উজ্জ্বল। স্বরজ কওরকে দেখিয়া কহিল, "এখনও তোর আশা মিটিল না ? আরও কত চাই ?"

স্বরজ কওর হাসিল। এবার হাসি মধুর নয়, তীব্র; কহিল, "পতঙ্গ যত পোড়ে তাহাতে কি শিখা নিবে ? পোড়াইয়াই শিখার সুখ !"

৭

রাত্রে স্বরজ কওর শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া দরজা ভেজাইয়া দিল। কাপড় চোপড় ছাড়িয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া শয়ন করিবে। মাথার ওড়না খুলিয়া, পালঙ্কে রাখিয়া শয্যায় বসিবার উপক্রম করিতেছে এমন সময় যেন ঘরের মধ্যে কিসের শব্দ হইল। স্বরজ কওর স্থির হইয়া শুনিতে লাগিল। শব্দ তখনই বন্ধ হইয়া গেল বটে, কিন্তু স্বরজ কওরের মনে সংশয় হইল যে ঘরে কোন মনুষ্য লুক্কায়িত আছে। তখন স্বরজ কওর একবার কাশিয়া, হাতের অলঙ্কারের শব্দ করিয়া, মাথার অলঙ্কার খুলিল। তাহার পর মস্তকের বেণী খুলিয়া ফেলিয়া কেশ এলাইয়া দিল। পায়ের নূপুর খুলিয়া রাখিয়া, জামা খুলিয়া, সূক্ষ্ম মলমলের চাদর দিয়া অঙ্গ আবৃত করিল। তাহাতে অঙ্গের রূপ লাবণ্য ঢাকা পড়িল না, বরং আরও যেন ফুটিয়া উঠিল। পালঙ্কের এক পাশে একটা বড় আরসী ছিল, স্বরজ কওর চিরুণী হাতে করিয়া আরসীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া চুল আঁচড়াইতে লাগিল।

আরসীতে ঘরের অনেকটা প্রতিবিম্বিত হইতেছিল। স্বরজ কওর চুল আঁচড়াইবার সময় অলক্ষ্যে ঘরের কোণায় কি আছে দেখিতেছিল।

ঘরের এক কোণে একটা আলমারির মত ছিল। সেটা কাপড় চোপড়ে ঢাকা। স্বরজ কওর অপাঙ্গে দেখিল, সেইখানে বস্ত্রাদি ঈষৎ আন্দোলিত হইতেছে। তাহার পর বস্ত্রের মধ্য দিয়া একটা হাত বাহির হইল; হাতে তীক্ষ্ণধার

ছুরী। তাহার পর কাপড়ের ভিতর দিয়া একটা মুখের কিয়দংশ দেখা গেল। গুম্ফশ্মশ্রুমণ্ডিত বৃহৎ মুখ, ক্ষুদ্র চক্ষু জ্বলিতেছে।

সুরজ কওর সমস্ত দেখিল, অথচ তাহার দৃষ্টি আরসীতে নিজের মুখের প্রতিবিম্বের দিকে। চুল আঁচড়াইতে আঁচড়াইতে চাদর যেন অনবধানতা-বশতঃ বক্ষ হইতে অল্প স্রস্ত হইল। আলমারির পার্শ্ব হইতে মুখখানা আরও বাহিরে আসিল। যে লুকাইয়াছিল সে একদৃষ্টে সুরজ কওরের অনাবৃত রূপ দেখিতে লাগিল।

চকিতের মত সুরজ কওর দরজার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। দরজা ভেজান ছিল; একটা দরজা খুলিয়া ধীরভাবে কহিল, "ঘরে কে লুকাইয়া আছ বাহির হইয়া আইস, নহিলে লোক ডাকিব।"

সুরজ কওর চীৎকার করিল না, পলায়নের চেষ্টা করিল না, ভয়বিচলিত হইল না। সে তেমন রমণীই নয়,—পুরুষ দেখিয়া সে পলায়ন করিতে জানিত না।

মঙ্গল সিংহ ঘরের মাঝখানে আসিয়া জানু পাতিয়া হাত যোড় করিল। হাতের ছোরা ঝন্ ঝন্ করিয়া পড়িয়া গেল। তাহার মুখ শুষ্ক, সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছিল। কহিল, "আমি অপরাধী, তোমার যেমন ইচ্ছা হয় কর।"

যে লুকাইয়াছিল সে একদৃষ্টে সুরজ কওরের অনাবৃত রূপ দেখিতে লাগিল।

সুরজ কওর দরজা ছাড়িয়া নিশ্চিন্তভাবে মঙ্গল সিংহের নিকটে গিয়া ছুরী উঠাইয়া লইল। দৃষ্টি ছিল মঙ্গল সিংহের মুখের দিকে। সে দৃষ্টিতে রাগের বা ভয়ের লেশ মাত্র ছিল না; ছিল অভয়, ছিল আশা, ছিল আকর্ষণ। মঙ্গল সিংহ মূঢ়ের মত তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

সুরজ কওর জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে?"

"মঙ্গল সিং।"

"চুরী করিতে আসিয়াছিলে?"

মঙ্গল সিংহ মাথা নাড়িল।

সুরজ কওর অঙ্গুলি দিয়া ছুরীর ধার পরীক্ষা করিতেছিল, কহিল, "আমাকে হত্যা করিতে আসিয়াছিলে?"

মঙ্গল সিংহ মস্তক নত করিয়া কহিল, "হাঁ। এখন তোমার লোকজনকে ডাকিয়া আমাকে বধ করিবার আদেশ দাও।"

সুরজ কওর কহিল, "আমার দিকে চাহিয়া দেখ।" মঙ্গল সিংহ অনুতপ্ত-পিপাসু নয়নে তাহাকে দেখিতে লাগিল।

সুরজ কওর বক্ষের কাপড় সরাইয়া ছুরীর অগ্রভাগ বক্ষে বসাইল। কহিল, "এইখানে ছুরী বিদ্ধ করিতে? আমার কি মরিবার বয়স হইয়াছে? তোমার কাছে আমি কি অপরাধ করিয়াছি? আমি অসহায়া স্ত্রীলোক, তুমি বলবান্ পুরুষ, আমাকে মারিলে তোমার কি পৌরুষ বাড়িবে? তাহাতেই যদি তুমি সন্তুষ্ট হও ত এই নাও ছুরী, আমাকে মারিয়া নির্ভয়ে পলায়ন কর, কেহ তোমায় ধরিবে না।"

সুরজ কওর মঙ্গল সিংহের হাতে ছুরী দিল। মঙ্গল সিংহ ছুরী দূরে ফেলিয়া দিয়া সুরজ কওরের চরণ জড়াইয়া ধরিল; রুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, "বল আমাকে মার্জ্জনা করিবে, নচেৎ পা ছাড়িব না।"

সুরজ কওর আপনার পা ছাড়াইয়া লইল। ছাড়াইবার সময় মঙ্গল সিংহের হাতে তাহার হাত ঠেকিল—একটু ঠেকিয়া রহিল, কোমল অঙ্গুলি দ্বারা যেন মঙ্গল সিংহের কঠিন অঙ্গুলি একবার অল্প ঈষৎ চাপিল, ধীরে ধীরে হাত সরাইয়া লইল। মঙ্গল সিংহের দেহ ও মন আনন্দে অবশ হইল!

এবার সুরজ কওর সরিয়া বেশী দূরে গেল না। দাঁড়াইয়া মঙ্গল সিংহকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, মঙ্গল সিংহ কলের মত উত্তর দিতে লাগিল।

"তোমাকে কে আমাকে হত্যা করিবার জন্য নিযুক্ত করিয়াছিল?"

"প্রেম দেঈ।"

"কেন?"

"তাহা জানি না।"

"কত টাকা পাইবার কথা?"

"একশো আশরফি আগাম, একশো আশরফি পরে।"

এখন কি করিবে?"

"টাকা ফিরাইয়া দিব।"

"ফিরাইয়া দিও না, তাহা হইলে প্রেম দেঈ অন্য লোক দেখিবে, অথবা তোমার অনিষ্ট চেষ্টা করিবে। তাহাকে বল এবার সুযোগ হইল না, তুমি অপর সুযোগ পাইলেই আমাকে মারিয়া ফেলিবে।"

মঙ্গল সিংহ চুপ করিয়া রহিল। সুরজ কওর বলিতে লাগিল, "এখন হইতে তুমি আমার কর্ম্মে নিযুক্ত হইলে। প্রেম দেঈ হইতে আমার কোন আশঙ্কা নাই, সে আমার কি করিবে? তুমি হরি সিংহকে জান?"

"জানি।"

"সে কোন কাজ তোমায় দিয়াছে?"

"একটা কি কাজের জন্য আমাকে ডাকাইয়াছিল, কিন্তু কি কাজ তাহা জানি না।"

সুরজ কওর একটু হাসিল। কি কাজ সে জানিত। কহিল, "যখন জানিতে পারিবে আমাকে আসিয়া বলিয়া যাইও।"

"কেমন করিয়া আসিব?"

"আজ কেমন করিয়া আসিয়াছিলে?"

"আর একজন প্রবেশপথ ও তোমার ঘর দেখাইয়া দিয়াছিল।"

"এবার আমি নিজে দেখাইয়া দিব, তোমার কোন চিন্তা নাই।"

আলমারি খুলিয়া সুরজ কওর এক মুঠা আশরফি মঙ্গল সিংহের হাতে দিতে গেল। সে কোন মতে লইল না। তখন সুরজ কওর কহিল, "এইবার যখন আমার কোন কাজ করিবে, তখন তোমায় পুরস্কার দিব।"

মঙ্গল সিংহ কহিল, "তুমি যাহা আদেশ করিবে করিব, কিন্তু পুরস্কার লইব না। আজিকার কথা কখন ভুলিব না। আজীবন তোমার নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ থাকিব।"

সুরজ কওর দ্বার খুলিল; মঙ্গল সিংহকে সঙ্গে লইয়া গিয়া বাড়ীর বাহির করিয়া দিল। মঙ্গল সিংহ আবার দেখা করিতে চাহিলে কি করিতে হইবে বলিয়া দিল।

লোলায়মান শিখার ন্যায় সুরজ কওরের রূপ পুরুষকে পতঙ্গের মত আকর্ষণ করিত। মঙ্গল সিংহও বহ্নিবিবিক্ষু হইল।

৮

মোরী দরজার বাহিরে সুন্দর সিংহের একটা বাগান বাড়ী ছিল। কোন কোন দিন রাত্রে সুন্দর সিংহ সেইখানে থাকিত। বাগান-বাড়ীতে সে বিলাসিতা কিংবা প্রমোদের জন্য যাইত না, বিশ্রামের জন্য যাইত। সহরে তাহাকে লোকে নানা প্রকার কাজের ও অকাজের জন্য—অনুগ্রহের জন্য—বিরক্ত করিত।

রাত্রি অধিক হয় নাই। সুন্দর সিংহ আহার করিয়া শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া ঘরে ঢালা বিছানায় বসিয়াছিল। স্থির মুখের ভাব ও নত চক্ষুতে বড় সুন্দর দেখাইতেছিল।

দরজা খুলিয়া একজন স্ত্রীলোক ঘরে প্রবেশ করিয়া আবার দরজা ভেজাইয়া দিল। মাথার কাপড় খুলিয়া সুন্দর সিংহের সম্মুখে দাঁড়াইল। সুন্দর সিংহ দেখিল সুরজ কওর।

সুন্দর সিংহ উঠিয়া দাঁড়াইল। সুরজ কওরের দিকে যখন চাহিয়া দেখিল, তখন তাহার দৃষ্টি বড় কঠোর। আবার চক্ষু নত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি এখানে কেমন করিয়া আসিলে?"

সুন্দর সিংহের মুখের ও চক্ষের রুষ্ট ভাব দেখিয়া সুরজ কওর অধর দংশন করিল। কথা কহিবার সময় স্মিত-মুখে কহিল, "আমাকে সকলেই পথ ছাড়িয়া দেয়, আমার পথ সর্ব্বত্রই মুক্ত।"

"জানি। কিন্তু এমন সময় আমার কাছে কেন? আমার লোকেরা কি মনে করিবে?"

"যাহা করিবার তাহাই করিবে। তাহাতে আমাদের কি আসিয়া যায়?"

"আমার বিশেষ আসিয়া যায়। সর্দ্দারেরা শুনিলে কি মনে করিবে?"

"তুমি কি তাহাদের ভয় কর?"

"আমি তাহাদের নিমক খাই।"

"তুমি ইচ্ছা করিলে দেশের মালিক হইতে পার।"

"তুমি আমার সহায়তা করিবে?"

"সে কথা ত তোমাকে বলিয়াছি।"

"তোমার রূপে মুগ্ধ হইয়া তোমার জন্য প্রাণপাত করিতে প্রস্তুত নয় এমন লোক বোধ হয় নাই। কিন্তু আমি তোমার প্রণয়ের আকাঙ্ক্ষা করি না, দেশের সর্ব্বনাশ করিতে চাহি না।"

সুরজ কওরের চক্ষে বিষাগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। কম্পিত রুদ্ধ স্বরে কহিল, "আমাকে ঘৃণা করিয়া তোমার কি লাভ হইবে?"

"না হইতে পারে। তোমার শত্রুতা ভয়ানক, জানি। আমাকে হত্যা করিবার জন্য লোক নিযুক্ত করিয়াছ, জানি। কিন্তু প্রাণের ভয় থাকিলে আমি এখানে আসিতাম না, প্রাণভয়ে তোমার শরণাপন্ন বা প্রণয়প্রার্থী হইব না।"

সুরজ কওর আবেগের সহিত সুন্দর সিংহের হস্ত ধারণ করিল। কহিল, "এত লোকে আমাকে সুন্দর দেখে, তুমি কি আমাকে সুন্দর দেখ না? তুমি আমাকে অপমান কর তাহাতে আমার রাগ হয় না, তুমি আমাকে ভালবাস না তাহাতে আমার লজ্জা হয় না। তোমার হৃদয় যে পাষাণ তাহা আমার বিশ্বাস হয় না। তোমার জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে স্বীকৃত আছি। নিষ্ঠুর, চিরকাল কি আমাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিবে?"

সুন্দর সিংহ বল প্রকাশ না করিয়া আপনার হস্ত মুক্ত করিল। কহিল, "শুধু লালসার চক্ষে দেখিলে, যেমন অপর লোকে তোমাকে কামনা করে আমিও সেইরূপ করিতাম। কিন্তু আমি শুধু তোমার অতুল রূপ দেখি নাই, তোমার স্বভাব জানি। তোমার দ্বারা অমঙ্গল ছাড়া কাহারও মঙ্গল হইবে না! তোমার রূপের আগুনে পুড়িয়া মরিবার আমার সাধ নাই, এই জন্য আমি দূরে থাকি।

দরজায় মৃদু আঘাত হইল। সুন্দর সিংহ সুরজ কওরের নিকট হইতে সরিয়া দাঁড়াইল। একজন ভৃত্য ঘরে প্রবেশ করিয়া কহিল, "সর্দ্দার সাহেব আপনাকে ডাকিয়াছেন।"

"যাইতেছি," বলিয়া সুন্দর সিংহ সুরজ কওরকে নির্দ্দেশ করিয়া কহিল, "ইহাকে বাহিরে যাইবার পথ দেখাইয়া দাও।"

ভৃত্য দরজা খুলিয়া দরজার পাশে দাঁড়াইল। সুরজ কওর বাহিরে যাইবার সময় অতি মৃদুস্বরে সুন্দর সিংহকে কহিল, "এই শেষ কথা?"

সুন্দর সিংহ সেইরূপ স্বরে কহিল, "কেমন করিয়া বলিব?"

সুরজ কওর বাহিরে গেল। সুন্দর সিংহ সিন্ধিয়ান সর্দ্দারের হাবেলীতে গমন করিল।

৯

সুন্দর সিংহ যখন ফিরিল তখন রাত্রি এগারটা বাজিয়া গিয়াছে। সঙ্গে কোন লোক ছিল না। সহরের ফটক হইতে বাহির হইলেই চারিদিকে গাছপালায় অন্ধকার! কিছুদূর গিয়া দেখিল একজন লোক পথ আগলাইয়া দাঁড়াইয়া আছে। সে ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, "কে তুমি?"

"যাহাকে তুমি চাও আমি সেই। আমি সুন্দর সিংহ। তুমি হরি সিংহ।"

"কেমন করিয়া জানিলে?"

"সে কথা বলিতে রাত বাড়িয়া যাইবে। আমি জানি তুমি সুরজ কওরের গুণ্ডা। আমাকে মারিলে কত টাকা পাইবে?"
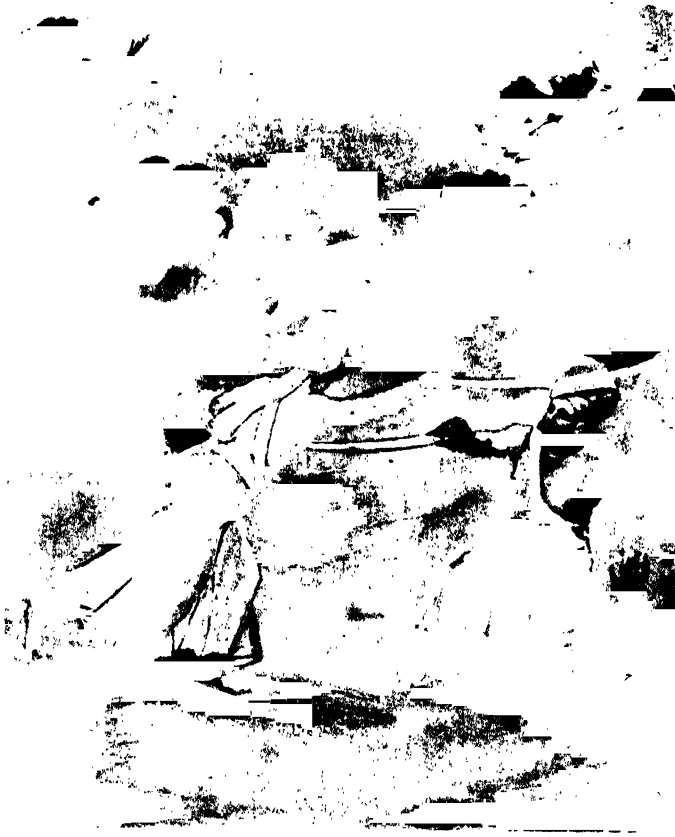
হরি সিংহ আঘাত করিয়া সম্মুখের দিকে একটু ঝুঁকিয়া পড়িল।

"আমি তোমাকে সম্মুখযুদ্ধে মারিব স্থির করিয়া অন্যায় করিয়াছি। তোমাকে পশুর মত মারিলেই হইত। তোমার বড় স্পর্দ্ধা।"

"কিসে?"

"তুমি সূরজ কওরের নাম মুখে আন!"

"কথা ঠিক। তাহার নাম মুখে আনিলে পাপ হয়।"

"তোমাকে মারিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া কুকুরকে দিব।"

সুন্দর সিং তরবারির উল্টা দিক দিয়া হরি সিংহের মুখে আঘাত করিল, কহিল, "মুখে আস্ফালন গুণ্ডার কাজ, মরদের নয়। আগে আমাকে মারিবার চেষ্টা কর, তাহার পর অন্য কথা।"

হরি সিংহের তুলনায় সুন্দর সিংহ কিছুই নয়। হরি সিংহ দীর্ঘ বলিষ্ঠ জোয়ান, সুন্দর সিংহ খর্ব্বকায় শীর্ণ পুরুষ। কিন্তু তলোয়ার খেলে হাতের কব্জির কৌশলে ও দেহের স্ফূর্ত্তিতে,—অঙ্গের আয়তনে নয়। অল্পক্ষণ অস্ত্রচালনা করিয়া হরি সিংহ বুঝিল যে, সে অস্ত্রবিদ্যায় অসাধারণ কুশলী হইলেও সুন্দর সিংহ তাহার অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। হরি সিংহ হটিতে লাগিল।

সুন্দর সিংহ কহিল, "সূরজ কওরের জন্য অনেকে মরিয়াছে, আজ তুমিও মরিবে। কিছু বলিবার আছে?"

"মুখে নয়", বলিয়া হরি সিংহ প্রচণ্ড বেগে সুন্দর সিংহকে আক্রমণ করিল। সুন্দর সিংহ লম্ফ দিয়া সরিয়া গেল। হরি সিংহ আঘাত করিয়া সম্মুখের দিকে একটু ঝুঁকিয়া পড়িল। উঠিয়া, অসি তুলিবার পূর্ব্বেই সুন্দর সিংহ বিচিত্র বেগের সহিত হরি সিংহের প্রসারিত হস্তের নীচে দিয়া আপনার অসি চালনা করিল। অসি হরি সিংহের হৃদয়ে বিদ্ধ হইল।

"ওয়াহ গুরু কি ফতে!" বলিয়া হরি সিংহ পড়িল। দু একবার কাঁপিয়া স্থির হইল, আর কোন কথা কহিল না।

১০

সূরজ কওরের বাড়ী ফিরিবার সময় পথে হরি সিংহের সহিত দেখা হইয়াছিল; তখন যে কথা হয়, তাহার ফলে হরি সিংহ মরিল।

বাড়ীর কাছে আসিয়া সূরজ কওর দেখিল, মঙ্গল সিংহ দাঁড়াইয়া আছে। মঙ্গল সিংহ কহিল, "তোমার সঙ্গে কথা আছে।"

"আমার সঙ্গে আইস", বলিয়া সূরজ কওর মঙ্গল সিংহকে বাড়ীর ভিতর লইয়া গেল। সূরজ কওর আপনার কক্ষে প্রবেশ করিল। মঙ্গল সিংহ তাহার পশ্চাৎ প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল।

সূরজ কওর জিজ্ঞাসা করিল, "দরজা বন্ধ করিলে কেন?"

"কি জানি যদি আর কেহ আইসে।" এই বলিয়া মঙ্গল সিংহ সূরজ কওরের হস্ত বলপূর্ব্বক ধারণ করিল।

সুরজ কওর দুই একবার চেষ্টা করিয়া হস্ত মুক্ত করিতে পারিল না। কহিল, "এ কি এ?"

"এই আমার পুরস্কার", বলিয়া মঙ্গল সিংহ সুরজ কওরকে আলিঙ্গন করিল।

ক্রুদ্ধা ব্যাঘ্রীর মত সুরজ কওরের চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল; বলিল, "মূর্খ, মরিবার ইচ্ছা হইয়াছে?"

"কে আমাকে মারিবে? তুমি আমাকে নিজে ডাকিয়া আনিয়াছ, এখন গোল করিলে কি হইবে?"

সুরজ কওর কহিল, "কাহাকেও ডাকিতে হইবে না, তোমার মৃত্যু তোমাকে ডাকিয়া আনিয়াছে।" সুরজ কওর আপনার বাম হস্ত মঙ্গল সিংহের হস্তের উপর রাখিয়া দক্ষিণ হস্ত দিয়া নিজের বাম হস্ত চাপিল। মুহূর্ত্ত পরে মঙ্গল সিংহ বিকট চীৎকার রবে সুরজ কওরকে পরিত্যাগ করিয়া বজ্রাহতের মত পতিত হইল! ছট্‌ফট্‌ করিয়া কএক মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহার মৃত্যু হইল! সুরজ কওর বাম হস্তের আংটি ঘুরাইয়া দেখিল। আংটিতে তীব্র বিষ ও তাহার ভিতর সূক্ষ্ম সূচী ছিল। কল টিপিয়া সুরজ কওর তাহা বন্ধ করিল। তখন আংটির উপর এক খণ্ড হীরক জ্বলিতে লাগিল।

এমন সময় বেগে ছুটিয়া আসিয়া এক ব্যক্তি সুরজ কওরের পৃষ্ঠে তীক্ষ্ণধার ছুরিকা বিদ্ধ করিল।

সুরজ কওর দরজা খুলিল। বাহিরে আসিয়া দেখিল, সেই বৃদ্ধা দাঁড়াইয়া আছে। তাহাকে বলিল, "ঘরে একটা মৃতদেহ আছে। লোক ডাকিয়া ফেলিয়া দিতে বল।"

বৃদ্ধা বলিল, "আবার?"

সুরজ কওর তাচ্ছিল্য ভাবে হাত নাড়িল, কোন কথা কহিল না।

এমন সময় বেগে ছুটিয়া আসিয়া এক ব্যক্তি সুরজ কওরের পৃষ্ঠে তীক্ষ্ণধার ছুরিকা বিদ্ধ করিল। সুরজ কওর কাতরোক্তি করিয়া ফিরিয়া দেখিল, প্রেম দেঈ! কহিল, "তুমি? তোমাকে আমি হিসাবের মধ্যেই আনি নাই! আমার ভুল হইয়াছিল।"

প্রেম দেঈ বেগে পলায়ন করিল। রক্তে সুরজ কওরের অঙ্গ ভাসিয়া যাইতে লাগিল, শরীর অবসন্ন হইল, চক্ষে অন্ধকার দেখিল। প্রথমে সুরজ কওর দরজা ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহার পর ভূতলে বসিয়া পড়িল।

সহসা বাহিরের দরজা মুক্ত হইল, সুন্দর সিংহ প্রবেশ করিল। সুরজ কওরের রক্তাক্ত কলেবর ও ভূতলে শোণিত-স্রোত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "একি? কে এমন করিল?"

সুরজ কওর ক্ষীণ হাসি হাসিল,—কহিল, "প্রেম দেঈ।"

"আমি দেখিলাম সে ছুটিয়া যাইতেছে।"

"যাইতে দাও। তাহাকে ধরিবার আবশ্যক নাই।"

সুন্দর সিংহ সুরজ কওরের পাশে বসিয়া তাহার হস্ত গ্রহণ করিল। প্রেমে ও করুণায় তাহার চক্ষু ভরিয়া আসিয়াছিল। জিজ্ঞাসা করিল, "আঘাত কি অধিক লাগিয়াছে?"

সুরজ কওর চক্ষু মুদ্রিত করিল, তাঁহার হাতে সুন্দর সিংহের হাত রহিল।

সুরজ কওরের কণ্ঠ ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল, কহিল, "আমার অধিক বিলম্ব নাই। তুমি একটু বস, তোমায় দেখি।"

সুন্দর সিংহ বসিয়া রহিল, সুরজ কওর তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। ক্রমে তাহার চক্ষের জ্যোতিঃ ম্লান হইতে লাগিল। সুন্দর সিংহ মুখ নত করিয়া সুরজ কওরকে চুম্বন করিল। সুরজ কওর চক্ষু মুদ্রিত করিল, তাহার হাত সুন্দর সিংহের হাতে রহিল। ক্ষীণ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া সুরজ কওর স্থির হইল।

পতঙ্গ দহনকারী দীপ্ত শিখা নির্ব্বাপিত হইল।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

পাশ্চাত্য প্রেত-তত্ত্ব।

১

পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে য়ুরোপ ও আমেরিকার সভ্য লোকদিগের নিকট ভূত প্রেতের কথা অবজ্ঞা ও পরিহাসের বিষয় ছিল। কিন্তু বিগত অর্দ্ধ শতাব্দীর আলোচনা ও অনুসন্ধানে প্রেততত্ত্ব শুধু যে অবজ্ঞা ও পরিহাসের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছে তাহা নহে, উক্ত বিষয়টি সমগ্র শ্বেতকায় জাতির বিশেষ আলোচ্য এবং সর্ব্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক ও অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। এই বিষয়ের আলোচনার জন্য ইংলণ্ড, রুষিয়া, ফ্রান্স, জার্ম্মেনী ও আমেরিকায় অনেকগুলি "প্রেততত্ত্বানুসন্ধান-সমিতি" (Society for Psychical Research) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সেই সকল দেশের ধনী মানী ও জ্ঞানিগণ এই সকল সমিতির সভ্য-শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন। ইংলণ্ডের লর্ড সল্সবেরী, মিঃ গ্লাড্ষ্টোন, ডিস্‌রেলী, বেলফুর, ডাফরিন, ল্যান্সডাউন, কর্জ্জন, মর্লি প্রভৃতির ন্যায় রাজনীতিকগণ, ডাক্তার ওয়ালেস, ক্রুক, লজ, মায়ার্স প্রভৃতির মতন দর্শন ও বিজ্ঞানাচার্য্যগণ, মহাত্মা ষ্টেড্ প্রভৃতির ন্যায় জন-হিতৈষী সাহিত্যিকগণ, এই সমিতির সভ্য। আমরা কএকটি মাত্র নাম করিলাম; সভ্যের তালিকা দেখিলে জানা যায় যে, যে কোন বিভাগে যাঁহারা বড় লোক তাঁহাদের অধিকাংশই এই সমিতির সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন। ইংলণ্ড ভিন্ন য়ুরোপের

অন্যান্য দেশেও সেই দেশের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ নিজ নিজ দেশীয় প্রেত-তত্ত্ব সভার সভ্য। বলিতে গেলে য়ুরোপ ও আমেরিকার অধিকাংশ শিক্ষিত লোকই প্রেত-তত্ত্বানুসন্ধানের জন্য অল্পাধিক পরিমাণে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন।

কুসংস্কারী লোকের সংখ্যা কোন দেশেই অপ্রচুর নহে। এক দল অন্ধবিশ্বাসী অনায়াসে ভূত প্রেত বিশ্বাস করিল, আর একদল অন্ধবিশ্বাসী সমস্তই অবিশ্বাস করিল; প্রথম দল অজ্ঞানান্ধ, শেষোক্ত দল জ্ঞানান্ধ। এই দুই দলের মাঝখানে আর একদল আছেন, যাহারা উপযুক্ত প্রমাণ না পাইয়া কোন বিষয়কে গ্রাহ্য করেন না, অগ্রাহ্যও করেন না; পরন্তু প্রকৃষ্ট অনুসন্ধান ও অনুশীলন করিয়া প্রকৃত তত্ত্ব নির্ণয়ের জন্য ব্যাকুল হইয়া থাকেন। এই শ্রেণীর সুধীবর্গই পাশ্চাত্য জগতে প্রেত-তত্ত্বানুসন্ধানের জন্য যথোপযুক্ত পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন।

"প্লাণ্‌চেট্‌" বস্তুটার নাম আজকাল অনেকেই জানেন। শুনিয়াছি একবৎসরে নাকি ত্রিশ হাজার প্লাণ্‌চেট্‌ বিকাইয়াছিল। যাহার দুইপয়সা আছে তাহারই ঘরে একটা প্লাণ্‌চেট্‌ দেখা যাইত; কিন্তু এখন আর এদেশে উহার আদর নাই বলিলেই হয়। ইহার কারণ এই যে, প্লাণ্‌চেট্‌ যত কথা লিখিয়া দেয়, তাহাব শতকরা একটিও সত্য হয় না,। লোকেরা স্থির করিল যে, প্লাণ্‌চেট্‌ জিনিষটা Plain cheat অর্থাৎ সোজাসুজী ঠকাবার যন্ত্রমাত্র। বুদ্ধিমান্ লোকেরা বুঝাইয়া দিলেন যে, একখানা কাষ্ঠের উপর হাত রাখিলে তাহা অবলম্বন করিয়া ভূত আসিয়া কথা বলিবে, ইহা বিশ্বাস করা একান্তই নির্ব্বোধের কার্য্য; ভূতের সহিত এই পাত্‌লা কাষ্ঠখণ্ডের সম্পর্ক কি? কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ, দর্শন ও বিজ্ঞানাচার্য্যগণ আজিও প্লাণ্‌চেট্‌কে পরিত্যাগ করেন নাই। তাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন যে প্লাণ্‌চেট্‌ এক হাজার মিথ্যা কথার মধ্যে এমন একটি সত্য কথা বলিয়াছে যে, উহাকে হঠাৎ মিলিয়া যাওয়া (Chance coincidence) বলা যাইতে পারে না! মনে করুন, ঘটনাস্থল হইতে শত শত মাইল দূরে থাকিয়া প্লাণ্‌চেট্‌ বলিল যে, আমেরিকার অমুক প্রেসিডেণ্ট্‌কে একজন লোক হত্যা করিল; অথবা বলিল যে, আগুন লাগিয়া নগর ভস্মসাৎ হইতেছে। ঘটনা ঠিক্ ঠিক্ মিলিয়া গেল, এবং প্লাণ্‌চেট্‌ যে সময় ঐ সকল কথা বলিয়াছে ঠিক সেই সেই সময়ই ঘটনাগুলি ঘটিয়াছে। ধীমান্ পণ্ডিতগণ এইরূপ কতকগুলি ঘটনা দেখিয়া স্থির করিলেন যে, ইহার মধ্যে এমন কোন শক্তির আবির্ভাব হয় যাহা দূরস্থ ঘটনা প্রত্যক্ষ দেখিতে পায়। তবে যে সহস্র সহস্র উক্তি মিথ্যা হইতেছে, সে সকলের হয়ত এমন কিছু কারণ আছে যাহা তাঁহারা বুঝিতে পারিতেছেন না। যে দুইটি ঘটনা সত্য হইল তাহাকেই তাঁহারা শক্ত করিয়া ধরিলেন, এবং অত্যন্ত ধৈর্য্যের সহিত অধিকতর অনুশীলনদ্বারা সত্য আবিষ্কারের জন্য বৎসরের পর বৎসর অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত তাঁহারা টেবিল, পেন্সিল ও প্লাণ্‌চেটের সাহায্যে এমন সকল তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়াছেন যে,চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই প্রভূত প্রত্যাশা ও ঔৎসুক্যের সহিত তত্ত্বানুসন্ধান সমিতির দিকে তাকাইয়া আছেন।

প্রেততত্ত্বের অনুশীলন করিতে গিয়া মাঝখানে মানুষের কতকগুলি অদ্ভুত নিগূঢ় শক্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। আমাদের ভাষায় এক কথায় সেই সমস্ত শক্তিকে "যোগশক্তি" আখ্যা প্রদান করিতে পারা যায়; কিন্তু বুঝিবার সুবিধার জন্য ডাক্তার মায়ার্স প্রভৃতি পণ্ডিতগণ সে সকলকে ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত করিয়াছেন। প্রেততত্ত্ব বুঝিতে হইলে ঐ সকল শক্তির অন্ততঃ কএকটি সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা আবশ্যক, নতুবা টেবিল নড়িলেই কেহ ভূত আসিয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারে, অথবা মিডিয়মের একটি কথা মিথ্যা হইলে সমস্ত ব্যাপারগুলি উড়াইয়া দিতে পারে। বিশেষতঃ এই সকল শক্তি সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকিলে প্রেত-তত্ত্ব সম্বন্ধে কোন বিচারই চলিতে পারে না। এই জন্য সে সকলের মধ্যে কএকটির নাম ও পরিচয় নিম্নে লিখিত হইল।

(১) মনুষ্য-তড়িৎ (Human Magnetism)। ট্রামগাড়ীখানা যেমন বৈদ্যুতিক তারস্পর্শে চলিয়া থাকে, সেইরূপ মানুষের অঙ্গুলিস্পর্শে জড় বস্তু (টেবিল ও প্লাণ্‌চেট্‌ প্রভৃতি) চলিতে পারে। ট্রামগাড়ীগুলি লৌহবর্ত্মের উপর দিয়া অনায়াসে ও দ্রুতগতিতে চলিয়া থাকে, প্লাণ্‌চেটে তিনটি চাকা থাকায় উহা টেবিল প্রভৃতি অপেক্ষা সহজে চলে। অন্য বস্তুর সহিত প্লাণ্‌চেটের এইটুকু মাত্র পার্থক্য। প্লাণ্‌চেটের মধ্যে কোন ভূত বাস করে না।

(২) মোহকরণ শক্তি (Hypnotism)। ইহার অন্য নাম মেস্‌মেরিজম্ (Mesmerism) মেসমার্ নামক এক জন শ্বেতাঙ্গ এই শক্তির সাধনায় বিশেষ কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম মেস্‌মেরিজম্ হইয়াছে। কিন্তু মেস্‌মার্ সাহেবের বহুপূর্ব্বেও য়ুরোপে অনেকে এই শক্তির অনুশীলন করিয়াছিলেন। মেস্‌মার্ সাহেব ইহার আদি প্রকাশক নহেন। এই মোহকরণশক্তি দ্বারা এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ অভিভূত ও একান্ত আজ্ঞাকারী করিতে পারে! মুগ্ধ ব্যক্তি (Hypnotised Subject) মোহকারীর এতই বশীভূত হয় যে, তিনি শীত বলিলে সে শীতে কাঁপিতে থাকে, গ্রীষ্ম বলিলে হাঁপাইতে থাকে। মুগ্ধ ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে আত্মবিস্মৃত হয়। এমন কি, নিজের নাম, পিতার নাম কিছুতেই তাহার মনে থাকে না। মোহকারী যদি মুগ্ধব্যক্তির পিতার নাম বদলাইয়া বলেন, সে তাহাতেই সায় দেয়। মুগ্ধ ব্যক্তিকে মোহকারী যাহা করিতে বলিবে, সে তাহাই করিবে। এই উপলক্ষে একটা কথা মনে পড়িল। য়ুরোপের কোন আদালতে এক খুনী আসামী বলিয়াছেন যে, অমুক ব্যক্তি তাহাকে মুগ্ধ করিয়া তাহার দ্বারা খুন করাইয়াছে। অবশ্য এ কথা বলিয়া অপরাধী খালাস পায় নাই। বস্তুতঃ কোন ব্যক্তিকে মুগ্ধ করিয়া নিকট হইতে দূরে ছাড়িয়া দিলে দুই চারি ঘণ্টা পরে তাহার দ্বারা যে এরূপ কার্য্য করা যাইতে পারে, অদ্যাপি সে বিষয়ের কিছুমাত্র প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। যতক্ষণ মোহকারীর নিকটে ততক্ষণ মুগ্ধব্যক্তি তাহার আয়ত্তে থাকে।

(৩) চিন্তাপাঠ (Thought-reading)। একজনের মনের কথা আর একজন জানিতে পারে।

(৪) চিন্তাচালনা (Thought-transference)। এক ব্যক্তির নিজের চিন্তা অথবা মনের ভাব অন্য ব্যক্তির মনে সঞ্চারিত করিতে পারে।

(৫) ইচ্ছাশক্তি (Will force)। ইহার মধ্যে উপরিউক্ত দুই শক্তি নিহিত আছে; তদ্ব্যতীত এই শক্তি দ্বারা নানা প্রকারের রোগ আরাম করা যায় এবং কাহারও চক্ষু, কর্ণ, মুখ ও হস্তপদের ক্রিয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। পাঠক, প্রাচীনকালের আশীর্ব্বাদ ও অভিসম্পাতের কথা মনে করিবেন।

(৬,৭) দূরদর্শন ও দূরশ্রবণ (Clairvoyance)। এই শক্তিদ্বারা সহস্র সহস্র মাইল দূরবর্ত্তী বস্তুর সাক্ষাৎ দর্শন হয় এবং বহুদূরস্থিত ব্যক্তির বাক্য শ্রুত হয়।

(৮) দেহ ছাড়িয়া গমন। ব্যাখ্যা অনাবশ্যক। ইংলণ্ডের একটী সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে যখন নিদ্রাভিভূত থাকিত, তখন অন্যত্র তাহাকে খেলা করিতে দেখা গিয়াছে। অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি ও পণ্ডিতগণ এই দৃশ্য দেখিয়াছেন।

(৯) দেহে থাকিয়া অন্যত্র গমন। কোন উচ্চ শ্রেণীর সৈনিক পুরুষ কএকজন সঙ্গী লইয়া মৎস্য ধরিতে গিয়াছিলেন। সেই সময়ের মধ্যে তাঁহার অধীনস্থ কোন কর্ম্মচারী শিবিরে তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা বলিল, এবং কিছুদূর তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গেল। কিছুক্ষণ পরে মৎস্য ধরার সরঞ্জাম সঙ্গে লইয়া ক্যাপটেন্ শিবিরে ফিরিলেন। যখন অধীনস্থ ব্যক্তি তাঁহার সহিত শিবিরে কথা বলিয়াছিল, তখন প্রকৃতপক্ষে তিনি শিবিরে ছিলেন না।

(১০) চিন্তা-মূর্ত্তি। একজন যে বিষয় চিন্তা করে, অন্য ব্যক্তির নিকট তাহা মূর্ত্তি ধরিয়া প্রকাশিত হয়, অর্থাৎ হরি তাহার পিতাকে ভাবিতেছিল; তাহার ভ্রাতা শ্যামের নিকট পিতার মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ হইল। কিন্তু এরূপ ঘটনার সন্তোষজনক প্রমাণ বিলাতের সমিতিকর্ত্তৃক সংগৃহীত হয় নাই; এখনও এই ব্যাপারটা প্রতিপাদ্য অবস্থায় রহিয়াছে।

(১১) ত্রাটক বা দৃষ্টি সাধন। জলে, আয়নায়, কিংবা কোন চকচকে জিনিষে দৃষ্টি স্থাপন করিলে নানা রূপ দর্শন হয়। সেই সকল দৃশ্য অনেক সময় অদূর ভবিষ্যতে ঠিক ঠিক মিলিয়া যায়।

(১২) টেবিল, পেন্সিল ও প্লাণ্‌চেট্ চালা (Automatic power)। এগুলি আমাদের দেশের হাতচালা, বাটীচালা ও নলচালার প্রকারান্তর মাত্র।

(১৩) ভূতে ধরা (Possession)। এক ব্যক্তিতে অন্য ব্যক্তির আবির্ভাব। উপরে যে কএকটি বিষয় লিখিত হইল তাহার প্রত্যেকটি লইয়া একাধিক প্রবন্ধ লিখিলে কিঞ্চিৎ পরিষ্কাররূপে বুঝান যাইতে পারে। তবে এই তত্ত্বগুলির যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞান না থাকিলে প্রেততত্ত্ব বুঝিবা-

সুবিধা হয় না ; এইজন্য এই প্রবন্ধে কিছু কিছু ইঙ্গিত করা হইল মাত্র।

পাঠক যদি কথাগুলি মনে রাখেন, তবে তাঁহার পরবর্ত্তী ঘটনা বিচার করিবার বিশেষ সুবিধা হইবে।

টেবিল কিংবা প্লাণ্‌চেট্ লইয়া প্রেত-তত্ত্বের অনুশীলন করাকে ইংরেজিতে বুরো (Bureau) করা বলে ; আমরা উহাকে চক্র করা বলিয়া থাকি। একটি ত্রিপায়া টেবিল লইয়া আপনারা পাঁচজনে চক্র করিয়া বসিলেন। কিছুক্ষণ পরে টেবিলের একটি পায়া আস্তে আস্তে উঠিল, তাহার পর খট্ খট্ করিয়া নড়িতে লাগিল, ইহার পরে টেবিলটি দৌড়াইয়া রাস্তায় বাহির হইল! আপনাদের মধ্যে এক ব্যক্তি টেবিলের মাঝখানটায় শুধু একটি আঙ্গুল দিয়া স্পর্শ করিয়া আছেন। জীবন্ত জীবের মতন পায়ের পর পা ফেলিয়া টেবিলটা ছুটিয়া যাইতে লাগিল! একবার রংপুর কাকিনিয়া রাজবাড়ীতে আমাদের টেবিল এমন ছুটিয়াছিল যে, রাধিকা বাবু বলিষ্ঠ পুরুষ হইয়াও টেবিল স্পর্শ করিয়া টেবিলের সঙ্গে দৌড়াইয়া দৌড়াইয়া গলদঘর্ম্ম হইয়াছিলেন। সকলেই ভাবিল এটা নিশ্চয়ই ভূতের কার্য্য, বস্তুতঃ উহাতে ভূত ছিল না। ট্রামগাড়ী যে জন্য চলে,উহাও সেইজন্য চলিয়াছিল। যাহারা মনুষ্য-তাড়িতের খবর ও ক্ষমতা জানে না, তাহারা জড়পদার্থের এমন গতিশীলতা দেখিয়া ভূতের আবির্ভাব ভাবিবে, আশ্চর্য্য কি!

বরিশালে একবার বেথুন্ কলেজের একজন অধ্যাপক এবং আর দুই জন অতিথিকে টেবিলে বসাইয়াছিলাম। টেবিল চলিতে লাগিল এবং ভূতকে যেরূপ প্রশ্ন করা হয়, সেইরূপ প্রশ্ন করা হইতেছিল ; একটা সাঙ্কেতিক নিয়মে টেবিলটা পায়ার শব্দ করিয়া প্রশ্নের উত্তর দিতেছিল। এক ডাক্তারের স্ত্রীর আত্মা আসিয়াছে বলিয়া পরিচয় দিল এবং বলিল যে, ডাক্তারের কোন বিশেষ ব্যবহারে দুঃখিত হইয়া সে আত্মহত্যা করিয়াছে! ডাক্তার চটিয়া গিয়া বলিলেন, "এই সমস্তই ভণ্ডামি ; আচ্ছা, আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিলে বুঝিব যে সত্যই আমার স্ত্রী আসিয়াছে"। ডাক্তার প্রশ্ন করিলেন এবং তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইল যে, উত্তর একবারে ঠিক ঠিক হইয়াছে। উপস্থিত অনেকেই ভাবিলেন, ইহা নিশ্চয়ই ভূতের কার্য্য। প্রকৃতপক্ষে ইহা যে ভূতের কার্য্য তাহার কোন প্রমাণ নাই।

ব্যাপারটা পরিষ্কার করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিব। পাঠক, অনুগ্রহপূর্ব্বক একটু মনোযোগ করিবেন।

টেবিলটা কেন নড়িল, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ; কিন্তু সাঙ্কেতিক অক্ষরে কিছু লিখিয়া দেওয়া বৈদ্যুতিক শক্তির সাধ্যায়ত্ত নহে, উহা বুদ্ধির কার্য্য। যে তিনজন টেবিলে বসিয়াছেন, তাঁহারা ইচ্ছা করিয়া টেবিলে ধাক্কা দিয়া সাঙ্কেতিক লেখা লেখেন নাই। তাঁহারা সকলেই সম্ভ্রান্ত এবং ধার্ম্মিক ব্যক্তি। বিশেষতঃ ডাক্তারের স্ত্রীর অপমৃত্যুর কথা তাঁহারা কেহই জানিতেন না। সচরাচর দেখা যায়, যে ঘরে চক্র করা হয় সেই ঘরে যাহারা উপস্থিত থাকেন, তাঁহাদের কাহারও কাহারও ইচ্ছাশক্তি চক্রস্থ ব্যক্তিদিগের উপরে কার্য্য করে। ডাক্তারের স্ত্রীর অপমৃত্যুর ঘটনা জানেন, এমন অনেক লোক সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ডাক্তারকে দেখিয়া তাঁহাদের সেই কথা মনে আসা একান্তই সম্ভব। তাঁহাদের মনের অবস্থা চক্রস্থ ব্যক্তিদিগের উপর কার্য্য করিয়াছে। ডাক্তারের শেষ প্রশ্নের উত্তর ডাক্তার ভিন্ন কেহই জানিত না, সুতরাং ডাক্তারের মনই চক্রস্থ ব্যক্তিদিগের উপর কার্য্য করিয়াছিল। ডাক্তার নিশ্চয়ই প্রশ্নের উত্তরটা নিজের মনে বিশেষভাবে ভাবিতেছিলেন, সুতরাং উহা সহজেই মিডিয়মের উপরে কার্য্য করিয়াছে। হাত-চালান, বাটীচালান প্রভৃতির দ্বারা চোর কিংবা চোরাই মালের অনুসন্ধান এই প্রণালীতেই হইয়া থাকে। চোর, কিংবা চোরাইমালের সন্ধান জানে এমন কোন ব্যক্তি, নিকটে উপস্থিত থাকিলে তাহার মনের ভাব যাহার হাতচালান দেওয়া হইতেছে, অথবা যে বাটী ধরিয়াছে, তাহার উপর কার্য্য করে। এমন কি এই সূত্র ধরিয়া যেখানে চোরাই মাল লুক্কায়িত আছে, বাটী একেবারে সেইখানে গিয়া উপস্থিত হইতে পারে। এ বিষয়ের আরও সুগভীর তত্ত্ব আছে। এ প্রবন্ধে সে সকল আলোচনার স্থানাভাব। এক দিকে ভণ্ডামি, অন্য একদিকে অবজ্ঞা—এই উভয়ের মধ্যে পড়িয়া এই সকল গুপ্তবিদ্যা এদেশ হইতে লুপ্ত হইয়া যাইতেছে।

শ্রীমনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা।
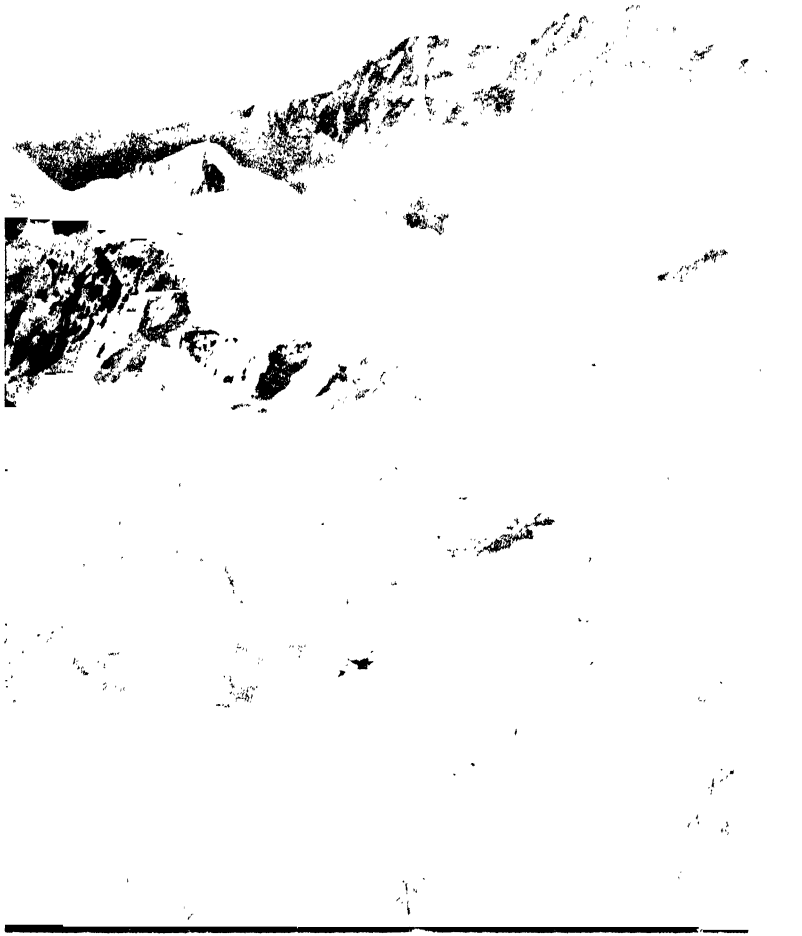
কাঞ্চন-জঙ্ঘা।

নীল আকাশে বুলিয়ে তুলি
তুষার-শাদা শেখর গুলি
কে আঁকিল মেঘ-সাগরের পারে ?

বালক-ভানুর আলোর কণা
রং-ফলান' কি আলপনা !
দিগ্‌বধূরে সাজায় জ্যোতির হারে।

শ্বেত বিজুলি নিথর হ'য়ে
ঘুমিয়েছে ওই মূর্ত্তি লয়ে'—
শিথানে তা'র উজল ঢেউএর সারি ;

ছাড়িয়া ওই ঊষার তারা
সামনে নেমে আস্‌ছে কা'রা ?
কটাক্ষেতে স্ফটিক হ'ল বারি।

অভ্রভেদী দুর্গ-প্রাকার,
অলঙ্ঘ্য ওই দূর পরিখার
এমন মহান্ মোহন ছবির পানে

নির্নিমেষে রইনু চেয়ে—
মৌন পরাণ যায় গো ছেয়ে
সংজ্ঞা হারাই কোন্ অনাদির ধ্যানে।

মহাকালের পারাবারে
কে তাহারে খুঁজ্‌তে পারে?
ডুব্‌তে পারে ধ্রুবের সমাধিতে?

অচিন্ বেলার ঊর্ম্মি-তালে
কোন্ স্বপনের অংশু জালে
ধর্‌তে পারে—রেখায় শ্লোকে গীতে?

তন্দ্রাপথে উঠ্‌তে পারে
অস্ত-উদয়-শেষ কিনারে,
শেষ ধ্বনিটির প্রতিধ্বনির সনে?

টুট্‌বে আশার নীহারিকা,
ফুট্‌বে অশোক-মেরুর শিখা,
নিত্য-নবীন মিল্‌বে চিরন্তনে।

হারাণ' সেই আনন্দ-ধন
কোন্ তোরণে কর্‌ব বরণ
তন্ময়তায় লুটিয়ে হৃদয়-তনু?

অনন্ত সে সান্ত হ'য়ে
স্বরূপ-রসে উচ্ছ্বসিয়ে
ফুটিয়ে দেবে ত্রিদিব-ইন্দ্রধনু।

কোন্ অমৃত-চন্দ্রিকাতে
তুহিন-ঝরা যূথীর সাথে
কইব কথা সুপ্ত-ফুলের শেজে,

প্রহর সনে প্রহর গাথি
প্রেম-আরতির অগাধ রাতি!
উদ্বোধনের সপ্তক উঠে বেজে।

মর্ত্ত্য-মানস-সমুদ্র-নীর
উন্মথিবে অ-তল অ-তীর
জাগ্‌বে মন্দ্র জীবন-শঙ্খ ভরি'।

সুখের সুধা, বিষাদ-গরল—
পূর্ণ তরল কল্প অনল
উদ্ভাসিবে অন্ধকারের দরী।

ভৈরব রূপের নীলাম্বরে
বিরাট্ শিখী কলাপ ধরে,
তারাস্তোমে বরণ-শোভা জাগে।

প্রেম গোমুখীর মন্দাকিনী,
চন্দন-উদক্-কল্লোলিনী,
অমৃত ধারায় ঝর্‌বে রসে রাগে।

দিব্য-দেউল দীপালিতে
জপারতির মন্ত্র-গীতে
মগ্ন হ'ব কারণ-মধু নীরে;

সুদূর মণি কর্ণিকাতে,
পরসাদের পূর্ণিমাতে,
উত্তরিব অরুণিমার তীরে।

লোকান্তরের অবন্তীতে,
অশ্রু-উজল অঞ্জলিতে,
করব কবে সর্ব্ব সমর্পণ?

মৃত্যু সেথায় পায় গো বিনাশ
অন্ত আদির পরম বিকাশ—
পূজ্‌ব শান্ত সত্য-নিরঞ্জন।

শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়।

—দার্জ্জিলিং।

পরিহার।

প্রাক্তন।

আমার পরিচয় এখন কেহ জিজ্ঞাসা করিও না; কারণ পরিচয় পাইলে, হয়ত আমার সব কথা বিশ্বাস করিবার প্রবৃত্তি তোমাদের হইবে না; মনে করিবে ওর আবার জ্ঞান আছে? ও বোঝে কি? কিন্তু সত্য বলিতেছি, আমি সব বুঝি, এবং যে কথা বলিতে চাহিতেছি, সে কথা আমার অন্তরে গাথা রহিয়াছে। এখন যদিও আমার অবস্থান্তর ঘটিয়াছে, কালের করাল গতিতে দেখিতে দেখিতে কত বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, আমি এখন শত খণ্ডে শত স্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছি, তবুও আমি আছি; এবং যে ভাবে যে স্থানেই থাকি না কেন, আমার প্রত্যেক অণু পরমাণুতে সে কাহিনী জড়িত আছে। এতকাল নীরব থাকিয়া আর পারিতেছি না, আজ বহুকাল পরে, কি জানি কেন, সেই কথা মনে পড়িয়া গেল।

আমি সর্ব্বপ্রথমে কোথায়, কি ভাবে, ছিলাম স্মরণ নাই। কে আমাকে নানাস্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া কেমন করিয়া গড়িয়া তুলিল, তাহাও মনে পড়ে না। একদিন যেন আশে পাশে গুন্ গুন্ শব্দ শুনিলাম, বুকের কাছে ঠক্ ঠক্ ঠকাশ্ করিয়া উঠিল। সহসা চেতনার সঞ্চার হইল, সেই আমার প্রথম স্মৃতি। কে যেন গম্ভীরস্বরে কহিল, "যাও যাও, তোমাদের কাজ শেষ হইয়াছে।" জাগিয়া কত কি যে দেখিলাম, তখন কিছুই বুঝিতে পারিলাম না; তার পর ক্রমে বুঝিলাম। যাহারা আশে পাশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, তাহারা মানুষ; আমার মাথার উপর যে নীল চাঁদোয়া ঝুলিতেছিল, সেটা আকাশ! আহা, কি সুন্দর দৃশ্য! ক্রমে দিনের শেষে তার মাঝখানে সোণার থালার মত চাঁদ ভাসিয়া উঠিল; তাহার চারিদিকে ছোট ছোট বনযূঁইয়ের মত তারাগুলি ফুটিয়া উঠিল; দেখিয়া মন আনন্দে ভরিয়া গেল। শুনিলাম—সবই বিধাতার সৃষ্টি!

মৃদু মন্দ বাতাসে আমার সর্ব্বাঙ্গ জুড়াইয়া গেল; সেই বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে গাছগুলি হেলিয়া দুলিয়া শন্ শন্ শন্ রবে কাহার মহিমা কীর্ত্তন করিতে লাগিল! বুঝি বিধাতার! নীচে চাহিয়া দেখিলাম,—বিস্তৃত সবুজ ঘাসের উপর শ্বেত, লোহিত, পীত ইত্যাদি বিবিধ বর্ণের কত শত শত ফুল ফুটিয়া কি বিচিত্র শোভা হইয়াছে! তাহারা হাসিতে হাসিতে উর্দ্ধমুখে চাহিয়া কেন? বুঝিলাম,—যাঁহার সৌরভ অঙ্গে মাখিয়া তাহারা ধন্য হইয়াছে, দিনান্তে সেই বিশ্ব-

বিধাতার বন্দনা করিতেছে। কি আনন্দ! কি আনন্দ! সমস্ত বিশ্ব যেন শুধুই আনন্দময়!

ক্রমে রাত্রির সঙ্গে সঙ্গে আমার চতুর্দ্দিকে শত দীপ জলিয়া উঠিল; ফুলের মালায়, লতা পাতায় আমি সজ্জিত হইয়া উঠিলাম, শুনিলাম সেদিন আমারই অভিষেক উৎসব। ক্রমে লোকসমাগম বাড়িয়া উঠিল। আমার প্রভু গর্ব্বভরে বন্ধুবান্ধবগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি হে, কি রকম দেখ্‌ছো?" সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিল যে, এমন বড় একটা দেখা যায় না। প্রভুর মুখে হাসি ধরে না; আমার মনেও যে যথেষ্ট অহঙ্কার হইল, তাহা স্বীকার করাই ভাল।

প্রীতিভোজনে অনেক সময় কাটিল; সে দৃশ্য খুব যে সুখের, তাহা বলিতে পারিলাম না! ডাকাডাকি হাঁকা হাঁকিতে কাণে তালা ধরিয়া গেল। বড়লোকের ভোজ দেখিয়া বুঝিলাম, যিনি ভোজ দিলেন তাঁহার যতখানি আগ্রহ, যাঁহারা গ্রহণ করিলেন তাঁহাদিগের তৃপ্তিও তদ্রূপ। যাক্, আমার দর্শনেই তৃপ্তি। আহারান্তে নৃত্যগীতাদি আরম্ভ হইল। নর্ত্তকীগণের রূপরাশিতে চক্ষু ঝলসিয়া উঠিল; অলঙ্কারের রুণ্ ঝুণ্ শব্দের সহিত সুন্দর দেহের তরঙ্গায়িত আন্দোলনে ভাবিলাম—ইহাই বুঝি সৌন্দর্য্যের চরম! তাহাদিগের অঙ্গের বিবিধ ভঙ্গীর সঙ্গে সঙ্গে মাধুর্য্য যেন গলিয়া পড়িতে লাগিল। তাহার পর যখন তাহাদের কণ্ঠ-নিঃসৃত মধুর রাগরাগিণী আমার দেহ মন প্লাবিত করিয়া গগন পবন ভরিয়া ফেলিল, আমি তখন আত্মহারা হইলাম। গীতের ছন্দে ছন্দে, প্রতি কম্পনের হিল্লোলে, মনোহর মূর্চ্ছনার সঙ্গে সঙ্গে, আমার শরীর মন শিহরিয়া উঠিল,—সারা রজনী আমি আনন্দ সাগরে মগ্ন রহিলাম। কখন যে আলোকমালা নিবিয়া গেল, কখন সঙ্গীত-স্রোত থামিয়া গেল, সকলে সুখশ্রান্ত অবসন্ন চিত্তে ঘুমাইয়া পড়িল, জানি না; বোধ হয় মদোন্মত্ত মানবের পাশব চীৎকারে যখন সকল শোভা, সকল আনন্দ, সুপ্ত করিবার আয়োজন হইতেছিল, আমি লজ্জায় ঘৃণায় যখন নয়ন মুদিয়াছিলাম, সেই সময় সব নীরব হইয়াছিল!

প্রভাতের প্রথম আলোকরেখা যখন আমার অঙ্গে আসিয়া লাগিল, তখন চাহিয়া দেখিলাম সকলে নিদ্রামগ্ন; দেখিলাম বিপুলা ধরণী যামিনী যাপন করিয়া তরুণ অরুণালোকে যেমন প্রতিদিন হাসিয়া থাকে, তেমনি হাসিতেছে,—শুধু আমোদে উন্মত্ত মানবদল, যাহারা রজনীর অন্ধকারে সুখহিল্লোলে কায়মন ঢালিয়া দিয়াছিল তাহারা, বিরস—বিবর্ণ! শত প্রদীপের উজ্জ্বল আলোকে নর্ত্তকীগণের যে সৌন্দর্য্যে চক্ষু ঝলসিত করিয়াছিল, প্রভাতের পবিত্র আলোকে তাহাদিগকে শ্রীহীন ও কুৎসিৎ করিয়া দিয়াছে! আমার প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা এই পর্য্যন্ত।

তার পর দীর্ঘকাল ধরিয়া পৃথিবীর একপ্রান্তে অটল ভাবে থাকিয়া কত যে দেখিতেছি! মানবের কত সুখ সাচ্ছন্দ্য, কত দুঃখ ক্লেশ, কত মিলন, কত বিচ্ছেদ, কত হাহাকার। কিন্তু আমাকে আশ্রয় করিয়া সেই যে অসহায় অবলা, নির্ম্মম পুরুষের প্রতারণায় অকূল সাগরে ভাসিয়াছিল, যাহার নয়নজল এবং গভীর বেদনা আমার শিরায় শিরায় বসিয়া গিয়াছিল, তাহার কাহিনী আজও ভুলিতে পারিলাম না। তোমাদিগকে সেই কাহিনী আজ বলিব।

আমি যাঁহার,তিনি একজন প্রভুত ধনশালী ভদ্রসন্তান;—নামটা নাই করিলাম। আমার প্রভুর উপর আমার বড় মায়া ছিল, তার কারণ তিনিও আমাকে খুবই ভাল বাসিতেন! ভালবাসা জিনিষটা উভয় পক্ষের সমান না হইলে বজায় থাকে না। তাঁর ভালবাসার জোরেই অনেক অত্যাচার, উৎপীড়ন সহ্য করিয়াছিলাম; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত বজায় থাকিল না। কেন, সব কথা শুনিলে তোমরা বুঝিতে পারিবে।

একদিন শুনিলাম আমার প্রভুপত্নী আসিতেছেন! তিনি আমার প্রভুর দ্বিতীয় পক্ষ। শুনিয়া বড় রাগ হইল। আবার দ্বিতীয় পক্ষ কেন? প্রথম পক্ষটির অপরাধ কি? এ দ্বিতীয় পক্ষটিকে কিছুতেই ভালবাসিতে পারিব না, কারণ আমার মনে হইল ইনি যেন আমার উপর অন্যায় অধিকার স্থাপন করিতে আসিতেছেন। প্রথম পক্ষটির সহিত যদিও আমার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা কিছু ছিল না, দু এক দিন শুধু চোখের দেখা দেখিয়াছিলাম, তথাপি আমার সর্ব্বান্তঃকরণের সহানুভূতি তাঁহার দিকেই ছুটিল। মনে মনে খুব রাগিয়া রহিলাম; ভাবিলাম, দ্বিতীয় পক্ষটি একবার পঁহুছিলে বিমুখ হইয়া থাকিব। কিন্তু যতই বেলা যাইতে লাগিল, ততই ছট্‌ফট করিতে লাগিলাম। সন্ধ্যার কিছু

পূর্ব্বে অদূরে গাড়ীর শব্দ শুনিয়া সকলে যার যার কাজে ছুটিল, আমি নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলাম। গাড়ী আসিয়া দ্বারে লাগিল। অলঙ্কারশূন্যা একখানি সামান্য বস্ত্র-পরিহিতা একটি দীর্ঘাঙ্গী রমণী প্রভুর সঙ্গে গাড়ী হইতে নামিলেন। কি জানি কি মনে করিয়া, আমাকে দেখিয়া তাঁহার মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। তাঁর সেই হাসিতে কি ছিল জানি না, আমার রাগ দ্বেষ সব সেই মুহূর্ত্তে ভাসিয়া গেল। আমি অজ্ঞাতে দুই বাহু প্রসারিত করিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলাম! সেই প্রথম মুহূর্ত্তে যে বন্ধন পড়িল, শেষ দিন পর্য্যন্ত তাহা অটুট ছিল। তথাপি তিনি কেন আমাকে ত্যাগ করিলেন, সেই দুঃখের কথাই বলিতেছি।

একটি রমণী প্রভুর সঙ্গে গাড়ী হইতে নামিলেন।

শুনিলাম আমার প্রভুপত্নীর নাম সুনীতি। তিনি এক দুঃখিনী বিধবার কন্যা। জন্মাবধি পশ্চিমে ছিলেন। আমার প্রভু বহুবার পশ্চিমে যাতায়াত করিয়াছেন; সেই সূত্রে তাঁহাদিগের সহিত পরিচয় হয় এবং সুনীতির গুণে মুগ্ধ হইয়া তিনি বিবাহের প্রস্তাব করেন। সুনীতির ভ্রাতা আমার প্রভুকে কলিকাতার একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক জানিয়া ভগিনীকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিলেন এবং বিবাহান্তে পঞ্চদশ বর্ষীয়া ভগিনীকে, স্বামী সহ এই এত দূরদেশে পাঠাইয়া দিলেন। আমি নানা লোকের মুখে নানা কথা শুনিয়া বুঝিলাম এ বিবাহে কি একটু গলদ আছে; কিন্তু সুনীতি তাহা জানেন না। আমি দেখিলাম, আমার প্রভু সত্যই সুনীতির গুণে মুগ্ধ। তাঁহার তেমন রূপ ছিল না; শুধু সরল, নম্র স্বভাব, সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধির প্রভাবেই তিনি স্বামীকে সম্পূর্ণ জয় করিয়াছিলেন। অতি অল্প সময়েই আশে পাশে সকলেই সুনীতির স্তাবক হইয়া পড়িল, এমন কি বাড়ির কুকুর বিড়ালগুলি পর্য্যন্ত তাঁহার বশবর্ত্তী হইল।

ক্রমে ছয় মাস কাটিয়া গেল। মানুষ যেমন নেশায় ভোর থাকে, প্রভু সেইরূপ সুনীতিতে মগ্ন ছিলেন; আহার-বিহার শয়ন—স্বপন সবই সুনীতিময়। স্বামীর সে ভালবাসায় সুনীতির মনে স্বর্গরাজ্য যেন আপনি নামিয়া আসিল—শুধু একটি দুঃখ তাঁহাকে চিরদিন পীড়ন করিত, সেটি তাঁহার রূপের অভাব। সমস্ত দেহ মন দিয়া স্বামীকে ভালবাসিয়াও যেন তাঁহার তৃপ্তি হইত না। স্বামী যখন আবেগপূর্ণ হৃদয়ে তাঁহাকে টানিয়া লইতেন, তাঁহার দেহ লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া

পড়িত; পূর্ণ সুখের ভিতর, অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে একটি বেদনা জাগিয়া উঠিত। স্বামী কিন্তু সুনীতির রূপের অভাব কখন অনুভব করেন নাই। তিনি বলিতেন, সুনীতির শ্যাম শোভা তাঁহার নয়ন স্নিগ্ধ করে, কেশরাজি বর্ষাকালের ঘন মেঘমালা স্মরণ করাইয়া দেয়; সুগোল বাহু দুটি লতিকার মত তাঁহাকে ঘিরিয়া বেড়িয়া আছে, ছোট ছোট পা দুখানি মাটীতে পড়িলে তাঁহার বুক পাতিয়া দিতে ইচ্ছা করে। সুনীতি বিরক্তিভরে ওষ্ঠ কুঞ্চিত করিলে স্বামী ঘন ঘন চুম্বনে সে কম্পন নিবারণ করেন, তখন সেই বিরক্তির মধ্যেও দুষ্ট হাসি ফুটিয়া উঠে। আর চক্ষু দুটি ত সর্ব্বদাই সুযোগ খুঁজিয়া ফিরে, কিসে স্বামীকে জব্দ করিবে। সত্যকথা শুনিতে চাও ত আমি বলিতে পারি, এ সকল আমার প্রভুর কল্পনা। আমার বিশ্বাস, পুরুষজাতি প্রেমে উন্মত্ত হইলে তাহাদিগের কল্পনা-শক্তির আধিক্য জন্মে। যাক্—সুখী স্বামীর এত কথাতেও সুনীতির মন কিন্তু মানিত না। একদিন চিত্রাঙ্গদা কাব্য পড়িতে পড়িতে স্বামী পত্নীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন;—

"সকল দৈন্যের তুমি মহা অবসান;
সকল কর্ম্মের তুমি বিশ্রামরূপিণী।"

সুনীতি একটি সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিলেন। স্বামী বলিলেন, "এত বড় একটা নিঃশ্বাস ফেল্‌লে কি মনে ক'রে বল দেখি?" সুনীতি মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "যদি না বলি?" স্বামী তখন আদরে সোহাগে তাঁহাকে পাগল করিয়া তুলিলেন। তবুও সুনীতি নীরব। তখন স্বামীর অভিমান হইল, তিনি বিমুখ হইয়া শয়ন করিলেন। সুনীতির আর সহ্য হইল না, তিনি বারবার বলিলেন "ওগো, শোন, আমি বল্‌ছি; আমি ভাব্‌ছিলাম, চিত্রাঙ্গদার মত বসন্তের বরে শুধু একটি দিনের জন্যেও যদি আমার দেহে সৌন্দর্য্যের বিকাশ হ'ত, তা'হলে একদিনে জীবনের সাধ মিটিয়ে নিতাম।" মনের ভাব প্রকাশ করিয়া সুনীতি লজ্জায় অবনতমুখী হইলেন। স্বামী আবেগকম্পিত কণ্ঠে বলিলেন, "সুনীতি! আমার তৃপ্তিতে তোমার তৃপ্তি নাই? আমার কথায় বিশ্বাস নাই?" সেবার অভিমান কিছু বেশী রকমের হইল। ক্রমে রাত্রি অধিক হইতে চলিল, আহারান্তে অনেক কথা-কাটাকাটির পর উভয় পক্ষের নয়নজলে অভিমানের পালা শেষ হইল। পূর্ব্বের ন্যায় সেদিনও সুনীতির হার হইল। বেচারা চিরদিনই হার মানিয়া কাটাইল! আমি তখন ভাবিতাম আমার প্রভু দেবতা, এত প্রেম মানবে সম্ভব নয়, কিন্তু শেষে বুঝিলাম, সেটা তাঁহার পাশব প্রবৃত্তির বিকাশ মাত্র—প্রেম নয়। এখনও সে সকল কথা স্মরণ করিলে দন্তে দন্ত পীড়ন করিতে ইচ্ছা হয়। পাষণ্ড! প্রতারক! থাক্, আগে সব কথা শুনিয়া লও।

একদিন সহসা আমার প্রভুর কার্য্যোপলক্ষে কলিকাতা যাওয়া নিতান্ত আবশ্যক হইল। ভাল কথা, আমি বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, আমরা যেখানে থাকি সে স্থানের নাম বরাহনগর,—কলিকাতার খুব কাছে, তোমরা অবশ্য জান। সুনীতি সঙ্গে যাইতে চাহিলেন, কিন্তু প্রভু কিছুতেই রাজী হইলেন না। তৎপূর্ব্বে কলিকাতার বসতবাটী সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইয়া গিয়াছে। এবারও সুনীতিকে প্রভু বুঝাইলেন যে, সেখানে শুধু পুরুষ কর্ম্মচারিগণ থাকে, অন্য কোন স্ত্রীলোক নাই, সুতরাং সেখানে যাওয়া অসম্ভব। আমি যদিও জানিতাম কথাগুলি সম্পূর্ণ মিথ্যা, কিন্তু সুনীতির নিকট স্বামীর বাক্য বেদতুল্য। তিনি বিনা তর্কে স্বামীকে ছাড়িয়া দিলেন; কিন্তু স্বামীকে ছাড়িয়া থাকা কিরূপ সম্ভবপর সুনীতি তাহা বুঝিতে পারিলেন না; তাঁহার বুক ফাটিয়া কান্না আসিল; বিবাহের পরবর্ত্তী একটি বৎসর, একটি সুদীর্ঘ সুখস্বপ্ন মাত্র বলিয়া মনে হইতে লাগিল। স্বামী যে পথে গাড়ী চড়িয়া চলিয়া গেলেন, যতক্ষণ দেখা গেল, সুনীতি ততক্ষণ আকুল নয়নে সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন—তাঁহার দুই গণ্ড অশ্রুধারায় ভাসিয়া যাইতেছিল। তারপর—তারপর যখন গাড়ীর চক্রোৎক্ষিপ্ত ধূলিজালও আর দৃষ্ট হইল না, তখন ঘরে ফিরিয়া শয্যায় পড়িয়া শিশুর ন্যায় কাঁদিয়া সারারাত্রি কাটাইলেন। আমার বড় দুঃখ হইল, কিন্তু তখনও জানিতাম না সরলা সুনীতিকে জীবন-ভরিয়া কত কাঁদিতে হইবে।

আমি শুনিয়াছিলাম প্রভুর প্রথম পক্ষটি এ বিবাহের কথা জানিতেন না এবং কলিকাতায় প্রভুর আত্মীয় বন্ধু, বান্ধবগণ সকলেই জানিত, তিনি তখনও পশ্চিমে হাওয়া খাইতেছেন। বুঝিলাম, সুনীতির সহিত বিবাহ গোপনে সম্পন্ন হইয়াছে। আরও বুঝিলাম, সুনীতি কি এক ছলনা-

অঙ্গে জড়াইয়া পড়িয়াছেন। প্রশ্ন করিবার কোনও ক্ষমতা না থাকায় নীরব রহিলাম।

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া সংসারের প্রাত্যহিক কাজকর্ম্ম সারিয়া স্নানান্তে নামমাত্র আহার করিয়া সুনীতি শয়ন-কক্ষে গেলেন। তাঁহার কিছুই ভাল লাগিতেছিল না। শয্যায় আশ্রয় লইতে প্রবৃত্তি হইল না—বালিশ-গুলিতে যেন স্বামীর মস্তকের চিহ্ন রহিয়াছে—নির্ব্বোধ বালিকার ন্যায় বালিশগুলিকে বক্ষে ধরিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। একখানি একখানি করিয়া কত পুস্তক পড়িলেন, কিন্তু পড়িবার চেষ্টা বৃথা হইল, সকল পুস্তকে স্বামীর স্পর্শ রহিয়াছে। পুস্তকগুলি সযত্নে তুলিয়া রাখিলেন। একটি ছোট হারমোনিয়াম ছিল—স্বামীর নিকট সবেমাত্র বাজনা শিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন—সেটি লইয়া বাজাইতে বসিয়া পার্শ্বের আসনের প্রতি দৃষ্টি পড়িল—সে আসন শূন্য। দুই চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল—হারমোনিয়াম ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন; সম্মুখে স্বামীর একখানি বৃহৎ তৈলচিত্র। কিছুক্ষণ অতৃপ্তনয়নে সেই চিত্রের প্রতি চাহিয়া রহিলেন—তারপর বারবার স্বামীর সেই চিত্রের মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন। চিত্র বাহিয়া অশ্রুধারা গড়াইতে লাগিল। তোমরা আমার কথা শুনিয়া হাসিতেছ? কিন্তু আমার বিশ্বাস, ভাল বাসিলে মানুষের এমনই হয়। সেই জন্যই বৈজ্ঞানিকেরা উহাকে মস্তিষ্কের রোগবিশেষ বলিয়া থাকেন। তা যা'ক্,—এইরূপে একদিন কাটিয়া গেলে দ্বিতীয় দিবস সন্ধ্যাকালে প্রভু ফিরিয়া আসিলেন। গাড়ীর শব্দ পাইয়া সুনীতি পাগলের ন্যায় ছুটিলেন। অর্দ্ধপথে দুজনের মিলন হইল। সুনীতি স্বামীর বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন—যেন কতকালের পর সেই প্রথম মিলন—স্বামীও লজ্জা সরম ত্যাগ করিয়া আদরে চুম্বনে সুনীতির সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। হরি! হরি! এ কি প্রেম?

সময়ে যতই মোহ কাটিতে লাগিল, বহির্জগৎ প্রভুকে ততই আকর্ষণ করিতে লাগিল; কিন্তু সুনীতির স্বামী ভিন্ন অন্য জগৎ ছিল না—তাঁহার অন্য কোন আকাঙ্ক্ষাও ছিল না—ধর্ম্ম, কর্ম্ম, ধ্যান, জ্ঞান সবই স্বামী। আমি বুঝিলাম, সুনীতির মনে কিঞ্চিৎ অভিমানের সঞ্চার হইতেছে। তখন প্রভু প্রায় প্রত্যহ কলিকাতা যাতায়াত করিতে লাগিলেন, নিত্য নূতন কাজের সৃষ্টি হইতে লাগিল; কিন্তু তখন পর্য্যন্তও অন্যত্র রাত্রিযাপনে অভ্যস্ত হন নাই। আমি গোপনে শুনিয়াছিলাম সে সময় প্রথম পক্ষটি তাঁহার পিত্রালয়ে ছিলেন।

একদিন নির্দ্দিষ্ট সময় অতীত হইয়া গেল,প্রভু কলিকাতা হইতে ফিরিলেন না; সুনীতি স্বামীর আগমন প্রতীক্ষায় সারারাত্রি বাতায়নে বসিয়া কাটাইলেন। তার পরদিন অনাহারে কাটিল, স্বামীর কোন সংবাদ নাই। সন্ধ্যার পূর্ব্বে যখন লোক পাঠাইয়া সংবাদ লইবার উদ্যোগ হইতেছে, সেই সময় প্রভু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মুখশ্রী মলিন, অন্য-মনস্ক ভাব। সুনীতি মনে মনে কত অভিমান করিয়াছিলেন, ভাবিয়াছিলেন, এবার স্বামীকে কাঁদাইয়া তবে ছাড়িবেন; কিন্তু স্বামীর শুষ্ক মলিন মুখ দেখিয়া সকল অভিমান ভাসিয়া গেল; সব ভুলিয়া নিজেই অগ্রসর হইয়া তাঁহার হাত ধরিয়া বসাইলেন, নানা প্রকার প্রসঙ্গ তুলিয়া সত্বর স্বামীর মন প্রফুল্ল করিয়া লইলেন। স্বামী যখন বলিলেন, তাঁহার একটি বন্ধু পীড়িত হওয়ায় তিনি আসিতে পারেন নাই, তার উপর আর কোন প্রশ্ন করা আবশ্যক মনে না করিয়া সুনীতি সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হইলেন। সেবারকার মত মেঘ কাটিয়া গেল। আমার নিকট কিন্তু বন্ধুর বিপদের কথা গোপন রহিল না; প্রভুর বিশ্বস্ত ভৃত্য নিবারণের নিকট শুনিলাম, প্রথম পক্ষটি সেই সময় বিনা আহ্বানে পিত্রালয় হইতে ফিরিয়া আসিয়া প্রভুকে বিশেষরূপে বিপদগ্রস্ত করিয়াছেন। দুই বিবাহ কি হয় না? তোমরা বলিতে পার, তবে বিপদ কিসের? একটু কারণ ছিল, ক্রমে শুনিতে পাইবে, অধীর হইও না।

সেই সময় সুনীতি বুঝিলেন, তাঁহার শারীরিক অবস্থার কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। তাঁহার দাসী কামিনী মুখ টিপিয়া হাসিল এবং সকলকে জানাইল যে, শীঘ্রই মার কোলে খোকা আসিবে। প্রভুর কর্ণেও সে সংবাদ পহুছিল। সে সংবাদে প্রভু সন্তুষ্ট না হইয়া বিমর্ষ হইলেন, দেখিয়া আমি বিস্মিত হইলাম; কিন্তু সুনীতি যখন বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার সত্বর জননী হওয়ার সম্ভাবনা আছে, তখন তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি মনে মনে ভাবিতেন, দুই জনের সম্পত্তি যে শিশু, তাহার স্থান কোথায়? দিব্যচক্ষে দেখিতেন, স্বামী তাঁহার বক্ষ হইতে

শিশুকে লইয়া আদর করিয়া আবার তাঁহারই পীযূষপূর্ণ বক্ষে স্থাপন করিতেছেন, আনন্দ-উল্লাসে সুনীতির মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিত। মাঝে মাঝে স্বামীর প্রতি অভিমান করিয়া বলিতেন, "থোকা এলে তুমি আর কোথাও যেতে পারবে না, সে তোমাকে ধ'রে রাথ্‌বে।" প্রভুর কিন্তু সে কথায় কোন ভাবান্তর দেখিতাম না—সুনীতিও যেন অনুভব করিতেন বাঞ্ছিত সন্তানের জন্য যতটা আগ্রহ থাকা স্বাভাবিক, স্বামীর তাহা নাই। সুনীতি ইহাতে বড় ব্যথিতা হইতেন। আমি দেখিতাম, মাঝে মাঝে তিনি গোপনে বালিকার ন্যায় কাঁদিতেন। এইরূপ সুখে দুঃখে দিনগুলি কাটিতেছিল, এমন সময় সুনীতি কঠিন রোগগ্রস্তা হইয়া পড়িলেন, তখনও প্রসবের ছইমাস বাকী। কলিকাতা হইতে ঘন ঘন ডাক্তার যাতায়াত করিতে লাগিল। সেই সূত্রে কলিকাতার সংবাদ একটা কুৎসিত কথার রটনা হইল। সে কথা শুনিয়া আমি ছুই হাতে কাণ ঢাকিলাম; ভাবিলাম ছি! ছি! এমন সতী লক্ষ্মীর নামে এ পরিবাদ কেন? তারপর বুঝিলাম,ইহার জন্য দায়ী—স্বয়ং প্রভু। ইহাতে তাঁহার কি অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল, বুঝিলাম না। যে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিয়াছিল, পরিপূর্ণ বিশ্বাসের সহিত আত্ম-নিবেদন করিয়াছিল, পতি হইয়া সেই ভক্তিমতী, শ্রদ্ধাবতী পত্নীর সর্ব্বনাশ সাধন করিলেন,—স্বেচ্ছায়—অনায়াসে!

শুনিলাম স্বামীর অবহেলায় প্রথম পঙ্কটির মন যখন ঈর্ষা ও সন্দেহে পূর্ণ হইল, তখন তিনি গোপনে অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন, স্বামী পশ্চিম হইতে একটি স্ত্রীলোক আনিয়া বরাহনগরের বাগানে রাখিয়াছেন। তাহাকে লইয়া স্বামী উন্মত্ত। তিনি তখন স্বামীকে যৎপরোনাস্তি ভর্ৎসনা করিয়া পৃথিবীময় সে কথার রটনা করিলেন; কিন্তু প্রভু নাকি সে কথার প্রতিবাদ করেন নাই। কি লজ্জা, কি পরিতাপের বিষয়! পরিণীতা ধর্ম্মপত্নীর প্রতি এই কলঙ্কারোপ নীরবে সহ্য করিলেন? এ কি কোনও মানুষে পারে? ক্রোধে আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিতে লাগিল; কিন্তু নিবারণের মুখে এ কি শুনিলাম? থা'ক, এখন নাই বলিলাম। আমি কি করিয়া শুনিলাম বলি, শোন।

সে দিন সুনীতির অবস্থা অতি সঙ্কটাপন্ন। ডাক্তার সাহেব বলিয়া গেলেন, রোগিণীর জীবনের কোনও আশা নাই। বাড়িময় হুলস্থূল বাধিয়াছে, নীচের ঘরে ঝি-চাকরেরা একত্র হইয়াছে। আমার কাণ সর্ব্বত্র, আমি শুনিলাম কেহ বলিতেছে, "আহা এমন মনিব আর হবে না,—স্বয়ং লক্ষ্মী ঠাকরুণ।" কেহ বলিল, "এ বউ না বাঁচিলে বাবু পাগল হবেন।" কিন্তু নিবারণ কহিল, "মরাই ভাল।" আমি শিহরিয়া উঠিলাম। কি নিমকহারাম! স্বামীর প্রিয় ভৃত্য বলিয়া সুনীতি নিবারণকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্নেহ করেন; কিন্তু সকল কথা শুনিয়া নিবারণের উপর শ্রদ্ধা জন্মিল, বুঝিলাম সে সত্যই সুনীতির কল্যাণাকাঙ্ক্ষী। সেই রোগে সুনীতির মৃত্যু ঘটিলে যে কঠিন আঘাতে তাহার হৃদয় শত খণ্ড হইয়াছিল,সে আঘাত পাইতে হইত না; কিন্তু প্রাক্তন ফল কে খণ্ডন করিবে বল?

সেবার সুনীতি বাঁচিয়া উঠিলেন সত্য, কিন্তু আরোগ্য লাভ করিবার পর হইতে স্বামীর অপ্রত্যাশিত পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া মনে আর শান্তি পাইলেন না। তখন স্বামী অধিকাংশ সময় কলিকাতাতেই বাস করেন। কচিৎ কখন সুনীতির সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন। সুনীতি কোন প্রশ্ন করিলে মহা বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বলিতেন, "তোমার জন্য বিষয়কর্ম্ম সব ভাসিয়ে দিতে হবে কি?" এ রকম কথা সুনীতির পক্ষে একেবারেই নূতন। এতদিন কোথায় ছিল বিষয়কর্ম্ম, কোথায় ছিল বন্ধু-বান্ধব! ভালবাসায় যে অবসাদ আসিতে পারে, তাহা সুনীতির স্বপ্নেরও অগোচর; সুতরাং তাঁহার প্রাণের ভিতর মহা দৈন্যের সৃষ্টি হইল; তিনি আকুল চিত্তে আশা করিয়া রহিলেন, খোকা আসিলে সব গোল মিটিয়া যাইবে। তাঁহার মায়া কাটাইলেও সন্তানের মায়া কাটান স্বামীর পক্ষে কখনই সম্ভব হইবে না। এইরূপে কল্পনারাজ্যে নিত্য নূতন আশার মন্দির গড়িয়া নিঃসঙ্গ অবস্থায় নীরবে তিনি দিন কাটাইতে লাগিলেন; কিন্তু অভাগীর সকল আশার আবাস ধূলিসাৎ হইতে অধিক বিলম্ব হইল না; একদিন অকস্মাৎ বজ্রপাত হইল।

সে দিন সারাদিন কাঁদিয়া কাঁদিয়া যখন চোখের জল শুকাইয়া আসিয়াছে, তখন অবসন্ন দেহ মন লইয়া সুনীতি একটু শান্তি পাইবার আশায় ছাদে একাকিনী ঘুরিয়া বেড়াইতে চলিলেন। আকাশে ঘন মেঘের সঞ্চার হইয়াছে। সেই

মেঘের দিকে চাহিয়া সুনীতির মন হু হু করিয়া উঠিল। তাহার প্রাণের মধ্যেও এমনই নিবিড় ঘন মেঘ দেখা দিয়াছে। তিনি নিবিষ্টমনে ভাবিতেছেন, আকাশের এ মেঘ ত কাটিয়া যাইবে? সংসারে আর কোথায় কি ঘটিতেছে, কিছুই মনে করিতে ইচ্ছা হইতেছে না; আপনার চিন্তায় আপনি মগ্ন হইয়া আছেন। কখন যে গাড়ী আসিয়া দ্বারে দাঁড়াইল, কখন দুইটি রমণী উপরে উঠিয়া আসিল, সুনীতি কিছুই জানেন না। সহসা কাহার অলঙ্কারের মৃদু শব্দ এবং অস্ফুট কণ্ঠস্বর কর্ণে প্রবিষ্ট হইল। তিনি ফিরিয়া দেখিলেন সম্মুখে অপূর্ব্ব রমণীমূর্ত্তি! তাহার রূপরাশিতে ছাদ যেন আলোকিত হইয়াছে। সুনীতি মুগ্ধ নয়নে দেখিতে লাগিলেন। পশ্চাতে দণ্ডায়মানা পরিচারিকা হাসিয়া বলিল, "মাগো! এই রূপের ছিরি?" সে কথা সুনীতির কর্ণে পহুছিল না; কিন্তু দ্বিতীয়া রমণী যখন মধুর কলকণ্ঠে কহিলেন, "তোমারই নাম কি সুনীতি? তুমিই বাবুর রক্ষিতা?" তখন সুনীতির চৈতন্য হইল। অসাবধান অবস্থায় তাঁহার অজ্ঞাতসারে তাহাকে যেন কেহ প্রচণ্ড বেগে আঘাত করিল। সুনীতি শিহরিয়া পিছু হটিলেন, লজ্জায় মুখ রক্তবর্ণ ধারণ করিল, কর্ণমূল হইতে উত্তাপ নির্গত হইতে লাগিল। তিনি জিহ্বা দংশন করিয়া বলিলেন, "ছিঃ ছিঃ!" পর মুহূর্ত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন" আপনি কে? কা'র অনুমতি নিয়ে আমার বাড়িতে আমাকেই অপমান করতে ঢুকেছেন, ?" রমণী গর্ব্বভরে বলিলেন, "তুমি আমায় চেন না? আমি বাবুর পত্নী।" সুনীতি বলিলেন—"পত্নী তাঁর অন্য বিয়ে আছে, আমি জান্‌তাম না ত?"

নবাগতা সুন্দরী হাসিয়া বলিলেন, "অন্য বিয়ে কি রকম?" সে হাসি সুনীতির অতীব অপমানজনক মনে হইল; তিনি মস্তক উন্নত করিয়া স্বাভাবিক আত্মসম্ভ্রম বজায় রাখিয়া গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "আমিও তাঁহার ধর্ম্ম-পত্নী।"

"তোমার কথা মিথ্যা।"

"কিছুতেই নয়। আপনি যদি আর কিছু শুনে থাকেন ত আপনারই ভুল, আমাদের শাস্ত্রসঙ্গত ধর্ম্মবিবাহ হয়েছে।"

নবাগতা ব্যঙ্গভরে বলিলেন, "শাস্ত্রসঙ্গত বিবাহ! ব্রাহ্মণে শূদ্রে কখন বিয়ে হয় শুনেছ?"

সুনীতি চমকিত হইয়া বলিলেন, "শূদ্র! কে শূদ্র? আমি ব্রাহ্মণকন্যা।"

"আমার স্বামী শূদ্র। তুমি তাঁর রক্ষিতা মাত্র।"

শেষ কথা সুনীতির শুনিতে হয় নাই। স্বামীর নিদারুণ ছলনার কথা শুনিয়া তাঁহার সব শূন্য হইয়া গেল—মুহূর্ত্তের মধ্যে স্বামীর সন্দেহজনক আচরণসমূহ মনে পড়িতে লাগিল। তিনি সংজ্ঞা হারাইয়া পড়িয়া গেলেন। আমি সেই বিলুপ্ত-চেতনা, অবলুণ্ঠিত দেহ বক্ষে লইয়া ক্ষোভে ও ঘৃণায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিলাম। সেই জিঘাংসা পরায়ণা নবাগতা রমণী সুনীতিকে সেই অবস্থায় ফেলিয়া জুড়ি হাঁকাইয়া বায়ুবেগে চলিয়া গেল। কি অহঙ্কার! কি নির্ম্মম ব্যবহার! আর এই করুণারূপিণী, নিষ্পাপ, সাধ্বী—ইহার এ কি লাঞ্ছনা! ইহার উত্তর কে দিবে? এ সমস্যা মীমাংসা করিবার প্রবৃত্তি তখন আমার ছিল না।

ক্রমে রজনীর ঘোর অন্ধকার আমাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিল; ইচ্ছা সত্ত্বেও সান্ত্বনার কথা কহিতে পারিলাম না, শুধু অন্তরের অন্তস্তলে সুনীতির অসীম বেদনা অনুভব করিয়া ধন্য হইলাম।

কিছুক্ষণ পরে কামিনী আসিয়া সুনীতিকে লইয়া গেল। সারারাত্রি সুশ্রূষার পর তাঁহার চেতনা আসিল। প্রভাতালোকের সঙ্গে সঙ্গে লজ্জা ও বিষাদভরা চক্ষু দুটি তুলিয়া চারিদিকে চাহিয়া তিনি হৃদয়বিদারক স্বরে বলিলেন, "মা গো"! উঃ! সে স্বর মনে করিতে এখনও আমার দেহ কণ্টকিত হয়। সুনীতির প্রকৃত অবস্থা বর্ণনা করিবার ক্ষমতা আমার নাই। তাঁহার চক্ষে কি অসহায় ভাব, এবং কি অপরিসীম বেদনার চিহ্ন দেখিয়াছিলাম, তোমরা অনুমান করিয়া লইতে পার না কি? একবার কল্পনা কর দেখি—যাহাকে অবলম্বন করিয়া অকূল সাগর পার হইবার জন্য যাত্রা করিলে—সে তোমাকে অকূল সাগরে ভাসাইয়া পলায়ন করিল। অসহায়া রমণী তখন কূল পায় কোথায়? কিন্তু অনাথের নাথ যিনি, তিনি যেন স্নেহপূর্ণ হস্ত প্রসারণ করিয়া সুনীতিকে বক্ষে টানিয়া লইলেন। তাঁহার সান্ত্বনা-বাক্য অন্তরে অনুভব করিয়া সুনীতি উঠিয়া বসিলেন। করযোড়ে বলিলেন, "হে আমার অন্তর্যামী দেবতা! তুমি জান, আমি স্বামী ব'লেই তাঁকে দেহ মন সমর্পণ করেছি—

তিনি যে ছলনা করলেন, সে কি তোমারই ইচ্ছা ইচ্ছাময় ? তবে তোমার ইচ্ছাতেই আত্ম-সমর্পণ করিলাম। তুমি বল দাও। অবশিষ্ট জীবন যেন নষ্ট না হয়।" এমন নির্ভর কি আর আছে ? ব্যথাহারী হরি ; সকলের বেদনা তিনি স্বয়ং গ্রহণ করিলে ব্যথিতের মনে শান্তি না দিলে সান্ত্বনা আর কোথায় ? সুনীতি সেই বিশ্বাসে বল পাইলেন। অশ্রু মুছিয়া স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে প্রস্তুত হইলেন।

যথা সময়ে প্রভুর গাড়ী আসিয়া দ্বারে লাগিল, দেখিলাম তাঁহার মুখে অপ্রসন্ন ভাব, সে ভাব দুঃখের কি বিরক্তির, ভাল বুঝিলাম না ; ধীরপদবিক্ষেপে উপরে উঠিয়া তিনি সুনীতির রুদ্ধ দ্বারে আঘাত করিলেন, পরিচিত হস্তের আঘাত শুনিয়া সুনীতি উঠিলেন ; অনশনক্লিষ্ট বেদনা-ব্যথিত, অবসন্ন দেহ মন লইয়া দ্বারাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। মুহূর্ত্তের জন্য চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিলেন, তারপর আপনাকে সংযত করিয়া দৃঢ় হৃদয়ে দ্বার খুলিলেন।

সুনীতিকে দেখিয়া কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া প্রভু বলিলেন, "তোমার শরীর ভাল আছে ত ?" সুনীতি নতমুখে গম্ভীর স্বরে বলিলেন "হাঁ।" প্রভুর ভাব দেখিয়া বুঝিলাম, তিনি গৃহিণীটির নিকট সকল ঘটনা শুনিয়াই আসিয়াছেন। আমি ভাবিয়াছিলাম, তিনি সুনীতির পদ-তলে পড়িয়া ক্ষমা চাহিবেন ; কাঁদিয়া বলিবেন, "আমার অন্তরাত্মা তোমাকে চাহিয়াছিল, তাই ছলনা করিতে হইয়াছিল। আর কেহ স্বীকার করুক্ কি নাই করুক, ধর্ম্ম সাক্ষী, আমি তোমাকে ধর্ম্মপত্নী বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছি।" তাহা হইলে বুঝি সব গোল মিটিয়া যাইত ; কিন্তু পাষণ্ডের, ক্ষমা চাওয়া ত দূরের কথা, একবিন্দু জলও তার চোখের কোণে দেখা দিল না ; অসহায়া রমণীর জীবনে স্বেচ্ছায় যে বিপ্লব ঘটাইয়াছে, তাহার জন্য একটুমাত্র অনুতাপ আসিল না ? মানব-রূপী পশু তোমায় শত ধিক্ !

অনেকক্ষণ সুনীতির মুখে বাক্য সরিল না। কথা কহিতে যেন কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। তিনি মনের ভাব প্রকাশ করিবার ভাষা খুঁজিয়া পাইলেন না। প্রভুই প্রথম নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বলিলেন, "চুপ ক'রে রইলে যে ? কিছুই কি বল্‌বার নেই ?" তখন সুনীতির বল আসিল। তিনি বলিলেন, "বলবার অনেক আছে, শোন। তোমার কি উদ্দেশ্য ছিল, তুমিই জান ; আমি যতদূর শুন্‌লাম,আর য বুঝ্‌তে পারছি, তাতে মনকে আর প্রতারণা করা চলে না , তোমার সঙ্গে বাস কর্‌বার অধিকার আমার নেই। বল সত্য কি না ?

প্রভু অত্যন্ত সহজভাবে কহিলেন, "যদি সত্য কথা জান্‌তে চাও, ত স্ত্রী হিসেবে নেই। তবে ওসব কথা মনে স্থান দাও কেন ? আমি তোমাকে চেয়েছিলাম পেয়েছি ; তুমি তাতে অসুখী হওনি ত ? তোমার অভাব কিছু নেই, সুখেই আছ। লোকে বল্লেই বা তুমি আমার—" সুনীতি তাহার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন, "থাম,থাম, আর বল্‌বার দরকার নেই। তুমি আমাকে যে ভাবেই চেয়ে থাক, ভগবান জানেন আমি তোমাকে স্বামী ব'লেই আত্মসমর্পণ করেছি , কিন্তু আমার ভালবাসায় লোকের অপবিত্র দৃষ্টি পড়্‌তে পাবে না।" প্রভু তখন বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া বলিলেন, "তুমি কি করতে চাও ? যা হ'য়ে গেছে তার জন্য অনুতাপ ক'রে কি কম্‌বে ?"

সুনীতি। আজ আমাকে চিরদিনের মত বিদায় দিতে হবে ; তোমায় আমায় এই শেষ দেখা। আমি যত শীগ্‌গির পারি এখান থেকে চ'লে যাব ; কিন্তু তোমায় যে আত্মসমর্পণ করেছি সেটা মিথ্যা নয়। আমার মনে—চিরদিন তুমি একই স্থান অধিকার ক'রে থাকবে।

স্বামী। কোথায় যাবে ?

সুনীতি। ভগবান্ যেখানে স্থান দেন।

স্বামী। তুমি এখন একা নও, সে কথা ভেবেছ ?

সুনীতি। তার জন্য আমার চেয়ে কার ভাবনা বেশী ? তার জন্য কিছুমাত্র আমার অনুতাপ অথবা ক্লেশ নেই। আমার জীবনের এ অবলম্বন আমি ভগবানের অসীম করুণায় লাভ করেছি ; সুখে দুঃখে সকল অবস্থায় প্রাণপণে তা'কে রক্ষা করব।

স্বামী। শোন সুনীতি ! কাজটা যত সহজ মনে ক'র্‌ছ, তত সহজ হবে না। কেন যে বিপদ টেনে আন্‌ছ, তুমিই জান। তোমার ভাইয়ের অবস্থা এমন নয় যে, তোমাকে সুখে-স্বচ্ছন্দে রাখতে পারে। আমার সঙ্গে বাস করতে না চাও এখানে থাক, তোমার খরচপত্র যা লাগে আমি দেব, কারণ তোমার নিজের জন্য না ক'লে

...মার সন্তানের জন্য তোমার দাবী করবার অধিকার আছে।"

একথা শুনিয়া গভীর দুঃখের মধ্যেও সুনীতি না হাসিয়া থাকিতে পারিলেন না; বলিলেন,"ঈশ্বর না করুন, সে প্রবৃত্তি যেন আমার কখনও না হয়। সাগরে যার শয্যা, তার শিশিরে ভয় কি? যা'ক্, এখন বুঝ্‌তে পার্‌ছি আমার মনের অবস্থা তোমাকে বোঝাবার চেষ্টা করা বৃথা।" সুনীতি গলবস্ত্র হইয়া স্বামীর পদধূলি গ্রহণ করিয়া বলিলেন, "আশীর্ব্বাদ কর, যখন যে ভাবে থাকি স্বামী বলে' তোমার চরণে ভক্তি যেন অটল থাকে। জন্মান্তরের পাপে তোমাকে পেয়ে হারালেম; এ জন্মে যেন আর পাপের সঞ্চয় না হয়। যদি সত্যস্বামী বলে' তোমাকে আত্মদান করে থাকি ত পরজন্মে নিশ্চয় তোমাকে পাব।" সে কথায়ও পাষণ্ডের মন টলিল না,গলিল না। বিরক্তির সহিত তিনি বলিলেন, "না, আমার ধর্ম্মজ্ঞান নেই ও সব বড় কথা বুঝি বলিলে? মনে রেখো নিজের ইচ্ছায় বিপদ সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়্‌ছ, শেষটা আমায় দোষ দিও না। এখনও বল্‌ছি; বিবেচনা ক'রে দেখ।"

সুনীতি অটল পর্ব্বতের ন্যায় সকল প্রলোভন উপেক্ষা করিলেন। স্বামীকে চিরদিনের মত বিদায় দিয়া অবসন্ন-দেহে পুনরায় শয্যা গ্রহণ করিলেন। সে দিনও আহার হইল না; বোধ হয় সেদিনই যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল সব বিসর্জ্জন দিয়া অন্তর্যামীর সহিত নিগূঢ় সম্বন্ধ খুঁজিয়া পাইলেন; কিন্তু তিনি কি যে অশেষ যাতনা ভোগ করিয়াছিলেন তাহা আমি জানি। আমার চোখে এখনও সে দৃশ্য যেন লাগিয়া রহিয়াছে।

ক্রমে এক সপ্তাহ কাটিয়া গেল। সুনীতি উঠিলেন, স্নান আহার করিলেন। মন এ কয় দিনে অনেক স্থির হইয়া আসিল—ভগবানের এমনই লীলা!

আমার সেই পিশাচ প্রভু আর আসিলেন না। তিনি হয় ত স্থির করিয়াছিলেন, সুনীতি আবার ডাকিয়া পাঠাইবেন; হয় ত ভাবিয়াছিলেন, প্রথম আঘাতের তীব্রতা চলিয়া গেলে সুনীতি আবার পূর্ব্ববৎ জীবন-যাপন করিতে স্বীকৃত হইবেন; ভালবাসার মোহে এ অপমান ভুলিয়া যাইবেন; কিন্তু সুনীতি বুঝিলেন, তাহার মনে যাহাই থাক জগৎ সংসার তাহা বুঝিবে না, পবিত্র প্রেমে কলঙ্ক লেপন করিয়া তাঁহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিবে। তাহা অপেক্ষা আপন চিত্ত দমন করিয়া সুখের আশা বিসর্জ্জন দেওয়াই শ্রেয়।

ইতিমধ্যে সুনীতির দাদা আসিয়া পড়িছিলেন। সুনীতিই তাঁহাকে আসিতে লিখিয়াছিলেন; যে দিন ভ্রাতার সহিত প্রথম সাক্ষাৎ হইল, সেদিনকার কথা আমি কখনও ভুলিতে পারিব না। যাহাকে বিশ্বাস করিয়া নিঃসন্দেহ-চিত্তে ভগিনীকে সমর্পণ করিয়াছিলেন, তাহার প্রতারণার কথা শুনিয়া ভ্রাতার চক্ষুর্দ্বয় ক্রোধে রক্তবর্ণ ধারণ করিল এবং হস্তদ্বয় মুষ্টিবদ্ধ হইয়া আসিল। তিনি বলিলেন, "পাষণ্ডকে খুন ক'রে তবে বাড়ী ফিরব।" তখন সুনীতি ভ্রাতার পদতলে পড়িয়া কাঁদিয়া বলিলেন, "ক্ষমা কর, ক্ষমা কর দাদা! তিনি আমার স্বামী। ধর্ম্ম জানেন, তুমিও জান, তাঁর সন্তান আমার গর্ভে। ক্রোধে আত্ম-বিস্মৃত হ'য়ে আমার পবিত্র প্রেমে আপন হাতে কলঙ্ক লেপন করিও না।" সুনীতির সকরুণ ক্রন্দনে তাঁহার দয়া হইল, ভগিনীকে ক্রোড়ে টানিয়া লইয়া বলিলেন, "তুমি নিষ্পাপ জানি। তবে চল, তোমাকে নিয়ে যাই; এখানে আর এক দণ্ডও থাকা নয়। এক বস্ত্রে এসেছিলে, এক বস্ত্রে যাবে, চল।"

সকলকে অশ্রুজলে ভাসাইয়া, দুই বৎসরের সুখের স্মৃতি বিসর্জ্জন দিয়া, চিরজীবনের মত সুনীতি বিদায় লইয়া চলিলেন। আমার নিকট বিদায় লইতে তাঁহার কি ক্লেশ হইয়াছিল, ভাষায় তাহা ব্যক্ত করিতে পারি না? দুই পদ অগ্রসর হ'ন, আর আমার দিকে ফিরিয়া চা'ন। তিনি আকুল নয়নে কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেলেন। তাঁহার ক্রন্দনের সেই মর্ম্মভেদী স্বর এখনও আমার সর্ব্বাঙ্গে বিদ্ধ হইয়া আছে। দাস দাসী যে যাহার ঘরে চলিয়া গেল, কুকুরগুলি কাঁদিয়া কাঁদিয়া মরিল; আমার লক্ষ্মী চির-দিনের মত আমাকে লক্ষ্মীছাড়া করিয়া রাখিয়া গেল।

তারপর বহুদিন প্রভুর সাক্ষাৎ পাই নাই। ভালই, কারণ সুনীতিকে বিদায় দিবার পরই তাঁহার সাক্ষাৎ বোধ হয় অসহ্য হইত; কিন্তু তাঁহাকে যেদিন প্রথম দেখিলাম, সে দিন আমার মনে সত্যই করুণার সঞ্চার হইল। শূন্য গৃহে একাকী বসিয়া বসিয়া যখন শ্রান্তি বোধ হইল,তখন তিনি শূন্য

বরাহ নগরের বাগান বাড়ীর ভগ্নাবশেষ।

মনে কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইলেন; সুনীতির আসবাব পত্র, তাঁহার পরিত্যক্ত বস্ত্র পরিচ্ছদ সবই তেমনই রহিয়াছে। দেখিতে দেখিতে ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে তিনি বাহির হইয়া পড়িলেন। বাগানে কিছুক্ষণ লক্ষ্যহীন ভাবে ঘুরিয়া ফিরিয়া আমার পানে চাহিয়া একটি সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া চলিয়া গেলেন।

এইরূপে কিছুদিন কাটিল। প্রথম পক্ষটির কোন সংবাদ রাখিতাম না; তবে অচিরে বুঝিলাম, সুনীতির প্রেমডোর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াও স্বামীকে তিনি ধরিয়া রাখিতে পারিলেন না। সাধ্বী স্ত্রীকে রক্ষিতা বলিয়া তিনি যে অপমান করিয়াছিলেন, তাহাতে সমগ্র সতী রমণীর অভিশাপ যেন তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া ধরিল। স্বামী তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়া নিজ প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত দিন দিন পাপপঙ্কে ডুবিলেন, আমারই বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া নিত্য নূতন বিলাস-বাসনা লইয়া নব নব আনন্দ-কৌতুকে মত্ত হইয়া বিষয়-সম্পত্তি উড়াইয়া দিলেন। বোধ হয়, অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া তিনি তখন বিস্মৃতি খুঁজিতেছিলেন। তারপর আমিও অপরের হস্তগত হইলাম।

তারপর কতজনের হস্তে পড়িয়া আমার কি যে অবস্থা হইল তার সংখ্যা নাই। কিন্তু যখনই সূর্য্যের আলোক দেখিতে পাই, যখনই বায়ুর স্পর্শ অনুভব করিতে পাই, যখনই মানবের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাই—তখনই সেই সতী রমণীর কথা মনে পড়ে—ভাবি তারপর তার কি হইল? তোমরা কেহ বলিতে পার কি? না—তোমাদের জিজ্ঞাসা করা বৃথা; সে যে অনেক কালের কথা। আমার বিশ্বাস, সুনীতি গভীর দুঃখের মধ্যে মানব মাত্রেরই চরম ও পরম আশ্রয় সেই নিখিলপতির চরণাশ্রয় লাভ করিয়া সম্পদ ঐশ্বর্য্য স্বামী সহবাসের সুখকেও তুচ্ছ করিতে ও ভুলিতে পারিয়াছিলেন এবং তাঁহারই বলে অবশিষ্ট জীবনটা নির্ব্বিবাদে কাটাইয়া দিয়াছিলেন। যা'ক, সে বিশ্বাসে তোমাদের কোন সান্ত্বনা নাই, কিন্তু আমার আছে, তাই বলিলাম।

এখন আমার পরিচয়টা অসঙ্কোচে দিতে পারি। আমি বরাহনগরের সেই বাগানবাড়ির ভগ্নজীর্ণ অবশেষ। তোমরা হাসিতেছ? ভাবিতেছ আমার প্রাণ নাই? বিজ্ঞানাচার্য্য বসু মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তোমাদিগকে বুঝাইয়া দিতে পারিবেন যে, শতখণ্ড করিয়া ফেলিলেও

"যাচ্ছিল সে ঘোষেদের ঐ পুকুর-পাড় দিয়ে,
কাঁখে কলসী নিয়ে রে ভাই, কাঁখে কলসী নিয়ে।"
—৺দ্বিজেন্দ্রলাল।

শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ লাহা অঙ্কিত।

K. V. Seyne & Bros.

আমাদের প্রাণ থাকে, শুধু বাক্‌শক্তি নাই। আমরা নীরবে পৃথিবীর নানা স্থানে ছড়াইয়া থাকি ; কত শত শত দুর্ব্বল মানবের গোপন-বেদনা বহন করিয়া বিশ্বময় ছড়াইয়া দিই, তোমরা দশজনে কোন শুভক্ষণে তাহা অন্তরে অনুভব করিয়া, ভাষায় প্রকাশ কর ; এবং প্রতিষ্ঠার বরমালা তোমরাই লাভ কর। আমাদের নিকট তোমরা যে কতটা ঋণী তা দশেও জানে না, তোমরাও বুঝ না।

শ্রীঅমলা দেবী।

আত্মোৎসর্গ
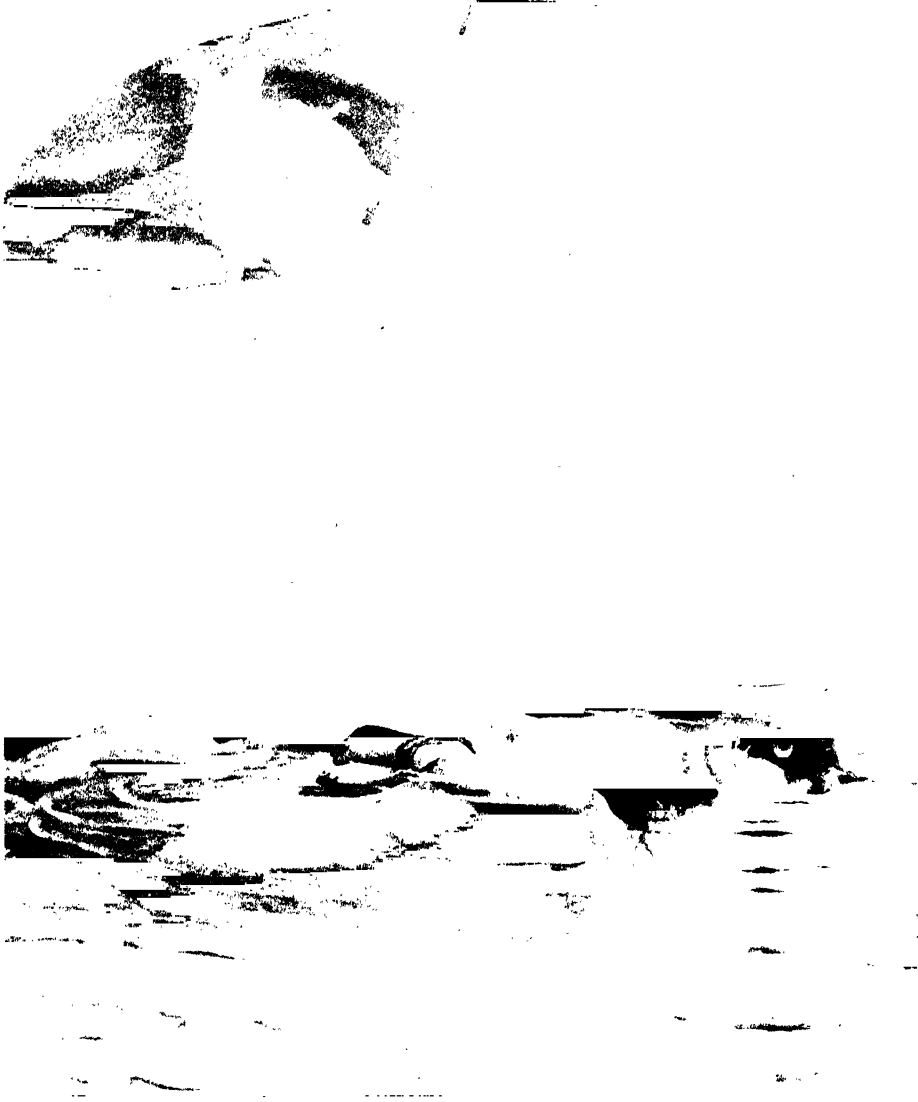
কবি দ্বিজেন্দ্রলাল

না জানি সে কোন্ মহা আনন্দে রসিয়া
কলকণ্ঠে তুলি' তান পাপিয়া ধরিল গান
বঙ্গরঙ্গতরুশাখে হরষে বসিয়া ;
মোহিত হইয়া গানে চাহিনু যে তরুপানে
কৈ গান, কৈ পাখী—গেছে ফাঁকি দিয়া !

কিন্তু হায়, এরি মাঝে ভাঙ্গিবে বাসর !
বাসন্তী কুসুমরাজি এখনো ভরেনি সাজি—
পাপিয়া কোথায় যাবে ছাড়িয়া আসর !
সাধের সেতারে যবে মোহিনী—সে সুরু হবে—
এরি মাঝে কানাড়ায় কে বাঁধিল স্বর ?

আনন্দ-অমৃত-উৎস, সত্যই কি রোধ ?
আজন্ম হাসির গানে মাতাইয়া লক্ষ প্রাণে
আজি এ বেদনা-বাণে লবে তারি শোধ !
যে দিয়াছে এত সুখ সেও দেয় এত দুখ—
হায়রে রহস্যবিধি, হায়রে অবোধ !

অশ্রু যার নিত্যসাথী, আজন্ম কাঙ্গালী'
শতাব্দীর দুঃখ ভুলি' সে গায়িবে কণ্ঠ খুলি'
এমন অদৃষ্ট সে কি করেছে বাঙ্গালী !

একদিন দুইদিন ধনী ডাকে অন্নহীন ;
চিরদিন কে যোগাবে পরমান্ন থালী ?

অমর কদিন থাকে তুচ্ছ নরদলে ?
বায়সের কারাবাসে কোকিল কদিন ভাসে,
কমল কদিন হাসে বদ্ধ কূপজলে ?
যাবার সে যাবে চলে,' যত বাধ দৃঢ় বলে
হেথা শুধু ব্যথা থাকে অন্তরের তলে ?

যাও কবি, পুষ্পরথ অপেক্ষিছে দ্বারে ;
কিন্নরের হাস্যগানে মহেন্দ্র কি শান্তি মানে ?
তাই বুঝি ডাকি' নিল অমরার পারে !
হা অভাগ্য বঙ্গভাষা হায়রে সঞ্চিত আশা,
ভিখারী ঐশ্বর্য্য পাবে—কে দেখেছে কারে ?

বিধির বিধান যদি,—কেন এ ক্রন্দন ?
তবে তাই—তাই হো'ক্ নরতের মহাশোক
হোথায় অশোক হয়ে হাসাক নন্দন,—
ইন্দ্রাণী লউন তুলে,' বীণাপাণি কণ্ঠলে,
ইন্দিরা পরুন চুলে অলকবন্ধন !

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী।

ছত্র-মহিমা।

শোন্ ভাই, আজ তোদের আমি ছত্রের মাহাত্ম্য ব্যাখ্যা কর্ব্ব। বেশ মন দিয়ে শুনিস্।

আমি সে দিন বসে' ভাব্ ছিলাম যে, কি আশ্চর্য্য ব্যাপার যে বাষ্পীয় যান, তাড়িত বার্ত্তাবহ, ফনোগ্রাফ ইত্যাদির আবিষ্কর্ত্তার নাম মানব-ইতিহাসের পৃষ্ঠায় "জ্বলন্ত অক্ষরে" লিখিত রয়েছে, অথচ ছত্র এমন একটা আশ্চর্য্য আবিষ্কার, তাহা প্রথম কাহার মস্তিষ্ক আশ্রয় করেছিল, সে সম্বন্ধে কোন বিবরণী নাই। সে কোন্ মৌলিক ভাগ্যবান মহাপুরুষ, যাঁহার মস্তক থেকে এই ধারণার জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হ'য়ে শেষে ছত্রাকারে ছড়িয়ে পড়েছিল, তাহা কেহ জানে না !—হে অজ্ঞাত, অপরিখ্যাত মহর্ষি, তোমায় কোটি কোটি নমস্কার।

আমার মনে হয়, এই ভারতবর্ষই এই আবিষ্কারের জন্মভূমি। যে জন্মভূমি শব্দ নাটকে থাক্লে পুলিশ সে নাটক অভিনয় করিতে দিতে অনিচ্ছুক, এ সে জন্মভূমি নয়। ইহার মধ্যে রাজবিদ্বেষ নাই। এ অতি নিরীহ জন্মভূমি। আমার বলার উদ্দেশ্য যে, ভারতবর্ষেই ছাতির

প্রথম আবিষ্কার হয়। কি? তার প্রমাণ চাও? কথা আরম্ভ না হ'তেই প্রমাণ?—কি প্রমাণ—নৈলে আজ কোন কথা বিশ্বাস কর্ব্বে না? আচ্ছা, প্রমাণ দিচ্ছি।

প্রথমতঃ, আমাদের দেশের চাষারা এই ছাতির আবিষ্কারের বহু পূর্ব্ব হতে এক প্রকার টুপী ব্যবহার কর্ত্ত, তার নাম টোকা। তারপরে আমরা দেখি যে, শ্রীরামচন্দ্রের মস্তকে রাজছত্র ছিল। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ এবং সংস্কৃত ইতিহাস তার সাক্ষ্য দিবে।

এ আবিষ্কার এত পুরাতন, কিন্তু আশ্চর্য্য! সুবিখ্যাত উদ্ভাবনগুলির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সন্দেহ করি না। বাষ্পীয়যান বিপুল ভার বহন ক'রে, ক্ষণকালের মধ্যে যোজন অতিক্রম করে; কিন্তু সেটা তৈয়ার করবার সরঞ্জামটা ভেবে দেখ দেখি! কত মুদ্রা ব্যয়, কত কৌশল, কত পরিশ্রম দরকার হয় একখানি বাষ্পীয়-যান তৈয়ার কর্ব্বার জন্য; কিন্তু ছত্র একগাছি বেত, তাহার উপরে সংলগ্ন কয়টি লোহার শিক, তাহার উপরে গজখানেক কাপড়! কি সহজ, সুসাধ্য, সুলভ।

অথচ তার উপকারিতা!—উঃ! যদি আমার বাসুকীর সহস্র মুখ—অন্ততঃ স্বয়স্তুর চতুর্ম্মুখ থাকিত, ত একবার বর্ণনা করিবার চেষ্টা করিতাম,—একমুখে কি করিব।

বাষ্পীয় যান বিরাট্ ব্যাপার; কিন্তু সে একটি মাত্র কাজ করে। সে অল্প সময়ের মধ্যে কাছের জিনিস দূরে নিয়ে যায়। ছত্র এরূপ কোন ব্যাপার সংসাধন করে না। কিন্তু সে যা করে' তাহা—একাদিক্রমে চতুর্দ্দশ পুরুষ সংসাধন কর্ত্তে পারে না।

প্রথমতঃ দেখ বালকবৃন্দ! ছত্র মানুষের মাথা রক্ষা করে। ডারউইনাদি বৈজ্ঞানিকগণ মনুষ্যজাতি যে বানর জাতির চেয়ে উচ্চ জন্তু, তা সরলভাবে স্বীকার করেছেন। তাঁহাদিগের জয় হৌক্! যা'ক্, সে কথা যা'ক্। কি বলিতেছিলাম;—হাঁ হাঁ মানুষ শ্রেষ্ঠ জন্তু আর—মনোযোগ দিয়ে শোন। কি প্রমাণ? প্রমাণ চাও?—কি, তুমি "জন্তু" কথায় আপত্তি করিতেছ?—উক্ত বৈজ্ঞানিকগণ স্পষ্টভাবে ছাপার অক্ষরে লিখিয়াছেন যে মানব—এক জন্তু!—কি? এই বৈজ্ঞানিকগণ এক এক জন্তু!—আমি জন্তু? অবশ্য মানুষ যাহা যদি জন্তু হয়, তবে উত্তম পুরুষ, মধ্যম পুরুষ ও অধম পুরুষ—সকলেই জন্তু। কি হেসে উঠিলে যে!—ও! অধম পুরুষ নয়—প্রথম পুরুষ! বটে বটে!—ভুলিয়া গিয়াছিলাম। দেখ আমার বিশ্বাস, এই স্থানে বৈয়াকরণেরা একটু ভুল করেছেন। উত্তম, মধ্যম ও অধম পুরুষ—ইহাই বলা তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল, কেবল ভদ্রতার খাতিরে সেরূপ বলিতে পারেন নাই। উত্তম মানে ভাল (আমি চিরকালই ভাল,—হ'তেই হবে) তাহার পরে তুমি মধ্যম, (নিশ্চয়ই, নইলে শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা) আর বাকি সব (জনান্তিকে) অধম;—শুদ্ধ ভদ্রতার খাতিরে প্রথম।

এর আবার প্রমাণ কি? ওঃ, তুমি বলছ, প্রমাণ নহিলে বিশ্বাস কর্ব্বে না।—উত্তম! এ উক্তির প্রধান প্রমাণ উক্ত বৈজ্ঞানিকগণ দিয়াছেন। প্রথমতঃ, মানুষ ছাড়া অন্য কোন জন্তু রেঁধে খায় না। কুকুর রাঁধা জিনিষ খায়; কিন্তু নিজে রেঁধে খায় কি? দ্বিতীয়তঃ, মানুষ ছাড়া অন্য কোন জন্তু হাস্‌তে জানে না।—কি? কুকুরে হাসে। না, তাকে হাসি বলে না। তাকে জিভ্ বের ক'রে থাকা বলে। মর্কটে-মর্কটে দাঁত খিচোয়—হাসে না। হাসি কাকে বলে?—হাসি বলে হাস্যকে।—অর্থাৎ?—অর্থাৎ কোন মনোভাবে দুটি ওষ্ঠপ্রান্ত সমভাবে কর্ণদ্বয়ের দিকে প্রসারণের নাম হাস্য। দাঁত বেরোনো হাসির অঙ্গ নয়। তবে হাসতে গেলে দাঁত বেরোয় (অর্থাৎ যদি দাঁত থাকে)। তবে দেখ্‌লে, মানুষ হাসে, আর কোন জন্তু হাসে না। তৃতীয়তঃ, মানুষ অস্ত্র ব্যবহার করে, আর কোন জন্তু অস্ত্র ব্যবহার কর্ত্তে পারে না। চতুর্থতঃ, মানুষ কথা কইতে পারে, আর কোন জন্তু—কি? টিয়া? টিয়া কথা কয় না। শেখা বুলি উচ্চারণ করে মাত্র। টিয়া যদি কথা কয়, তা হ'লে গ্রামোফোনও কথা কয়।

মানুষ দুপায়ে হাঁটে;—পাখী? তা যে বল্‌বে, তা আগেই বুঝেছি। পাখী দুপায়ে হাঁটে বটে, কিন্তু পক্ষহীন অন্য কোন জানোয়ার হাঁটে না। চতুর্থতঃ, মানুষ গান গায়, আর কোন জন্তু গান গায় না। কি? গাধা গান গায়? তোমারই মত গায় বটে! তার উপর প্রমাণের সেরা প্রমাণ হচ্ছে,—এটা কোন বৈজ্ঞানিক বলেন নি, আমি নিজে ভেবে বের করেছি!—প্রমাণের সেরা প্রমাণ শোন, কাণ উচ্চ ক'রে

শোন।—প্রমাণের সেরা প্রমাণ হচ্ছে—মানুষ কবিতা লেখে, আর কোন জানোয়ার কবিতা লেখে না।

মুষড়ে গেল!—তবে স্বীকার কচ্ছ যে, মানুষ শ্রেষ্ঠ জানোয়ার! তার অব্যবহিত পরেই—মানুষের শ্রেষ্ঠ অঙ্গ হচ্ছে মাথা। তার আবার প্রমাণ কি?—তার প্রমাণ মাথায় মস্তিষ্ক আছে, সে সমস্ত শরীরকে জ্বালায়। মাথা হচ্ছে শরীরটার রাজধানী, যেমন ভারতবর্ষের কলিকাতা। হাঁ—সেটা এখন দিল্লীতে উঠে গিয়েছে বটে। কি? হাঁ ঠিক বলেছ ভাই। মানুষের মাথা শ্রেষ্ঠ অঙ্গ না হ'লে উপর দিকে থাক্‌বে কেন? তারও একটা প্রমাণ যে, এই মুণ্ডটার মধ্যে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ই আছে। আর কোন অঙ্গে নেই। তার আরও একটা প্রমাণ হচ্ছে এই যে, অন্য কোন অঙ্গ কেটে দিলে মানুষ বাঁচে, কিন্তু মাথা কেটে নিলে মানুষ বাচে না। কি?- কে বাচে না?—মানুষ—মানুষ। বল্লাম না?—ও! মাথা কেটে নিলে মানুষ কোন্‌টা- মাথাটা? না অঙ্গটা?—কূট! কূট! তুমি বড় গোলমাল কর। না হয় ও প্রমাণটা ছেড়ে দিলাম।

তা হ'লে এতদূর পর্য্যন্ত প্রমাণ করেছি যে, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জন্তুর শ্রেষ্ঠ অঙ্গ হচ্ছে—মাথা! এখন দেখ, ছাতি মানুষের মাথা রক্ষা করে, রেল গাড়িতে করে না, গ্রামোফোনও করে না!—পাগড়ি? হাঁ, পাগড়ি কি মুকুট, মাথা ঠেকায় বটে, কিন্তু তারা সে রকমে মাথা রক্ষা কর্ত্তে পারে না—যেমন ছাতিতে ঠেকায়। কি রকমে?—নানা রকমে?—নানা রকমে। শোন।

প্রথমতঃ ছাতি রৌদ্র নিবারণ করে, তজ্জনাই ছত্রকে আতপত্র বলে। পাগড়িতে, কি সোলার টুপীতে রৌদ্র নিবারণ করে, বাতাস বন্ধ করে বটে, কিন্তু তারা মাথার সঙ্গে এমন একটা নিকট ঘনিষ্ঠতা করে যে,মাথা নিজেই চটে, গরম হ'য়ে ওঠে—বাহিরের রৌদ্রে সে প্রায় অত গরম হয় না। ছত্র মস্তক হ'তে সাহেবের আর্দ্দালির মত—দূরে থাকিয়া এরূপ সসম্ভ্রমে মস্তককে রক্ষা করে যে, তাহাতে মস্তক অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়।

তারপরে এই ছত্র—যা রৌদ্র নিবারণ করে, তাই আবার - বৃষ্টি নিবারণ করে।—ঠিক বিপরীত। রৌদ্র দাহ করে, কিন্তু স্নিগ্ধ করে না। বৃষ্টি স্নিগ্ধ করে, কিন্তু দাহ করে না। কিন্তু ছত্র—কি? দাহও করে না, স্নিগ্ধও করে না? তা করে না বটে, কিন্তু উভয়েই সমভাবে নিবারণ করে। তদুপরি যদি শিল পড়ে, ত সে দুর্য্যোগেও ছাতি মাথাকে সযত্নে ঘিরে রক্ষা করে। এমন—এই এক ছাতি। তৃতীয়তঃ, ছাতি আরও এক কাজ করে। অভাবপক্ষে এই ছাতিকেই লাঠির আকারে পরিণত করা যায়। কুকুর, শেয়াল, এমন কি বাঘ পর্য্যন্ত এই ছত্র দিয়ে তাড়ান যায়।—কি? বাঘ তাড়ান যায় না? তবে তোরা পশ্বাবলি পড়িস্‌নি। তাতে কি আছে?—তাতে আছে যে, কয়জন সাহেব মেম বনভোজন কর্ত্তে যান, এমন সময়ে এক বাঘ এসে তাঁদের আক্রমণ করেন। সকলে এই বিপরীত বনভোজনের আয়োজন দেখে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হলেন। তখন এক প্রত্যুৎপন্নমতি সাহেব—একটা ছাতি নিয়ে বাঘের মুখের কাছে এরূপ ক্ষিপ্রভাবে খুলেছিলেন যে, ব্যাঘ্র মহোদয় এ নূতন যন্ত্রের অভ্যুদয়ে তৎক্ষণাৎ বিপরীত দিকে প্রস্থান কর্ল। ছাতি না থাক্‌লে সে দিন আর বনভোজন হ'ত না। হ'ত? কি রকম করে?—ও! সাহেবের বনভোজন না হয়ে বাঘের বনভোজন হ'ত।—বেশ বলিছিস্‌। নাতিনীরা চিরকাল দেখিছি নাতিশ্রেণীর চেয়ে রসিক হয়। আমি তার জন্য চিরকাল নাতির চেয়ে নাতিনীর পক্ষপাতী!—কিহে ভায়া, তুমি বিশ্বাস কর না? কি বিশ্বাস কর না? নাতিনী, না বাঘ?—এই গল্পটা?—কেন? বিশ্বাস কর্ত্তে পারই না ভায়া। ও! তুমি বল্‌ছ—যে দিনে দুপুরে বাঘ এসে ও রকম আক্রমণ করে না। তবে কি রকম এসে আক্রমণ করে?- দিনে বাঘ আসে না! তবে শোন। আমি এক দিন ঘড়ি ধরে' এগারটা বেজে সাড়ে চব্বিশ মিনিটে প্রাণ নগরের জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ঠাকুরগা থেকে আস্‌ছি, এমন সময়ে ঈশান-কোণে চেয়ে দেখ্‌লাম একটা ঝোপের ভিতরে একপাল বাঘ চরে' বেড়াচ্ছে। কতগুলো? শ দুই তিন হবে।—কি? হ'তেই পারে না। আচ্ছা শ দুতিন না হোক, ত্রিশ বত্রিশটা ত হবেই।—অসম্ভব? বাঘ পাল বেঁধে বেড়ায় না?—তবে কটা বাঘ ছিল তুমি বল্‌তে চাও?—পাঁচটা? দুটো? একটা? তাও নয়? তবে ঝোপের মধ্যে কি যেন একটা নড়েছিল।—কি হাস্‌ছ যে! নড়েও নি?—তুমি ভায়া বেজায় নাস্তিক! কিন্তু বনভোজনের গল্পটা সত্য? –

মাথা নাড়ছ যে? প্রমাণ চাও? তবে শোন। এতক্ষণ সেটা দেই নি। শুন্‌লে মুষড়ে যাবে। তবে শোন। সেদিন আমিও সে বনভোজনে গিয়েছিলাম।—কেন গিয়েছিলাম? দেখ ভায়া জেরা ক'র না। ধরে' নাও গিয়েছিলাম। Let it be granted। হাঁ, এটা Postulate।—কি? মাথা নাড়'ছ যে?—আচ্ছা ভায়া, বিশ্বাস কল্লেই বা! আচ্ছা, না হয় ছাতিতে বাঘ তাড়ান যায় না। কুকুর শেয়াল ত তাড়ান যায়?—তা হ'লেই হল!

অতএব ছত্র সবল আকারে যষ্টিরূপেই পরিণত হয়; এবং সে যষ্টি দ্বারা আক্রমণ ও আত্মরক্ষা উভয় কার্য্যই সম্পন্ন হয়। কি? ছাতি দিয়ে আক্রমণ করা যায় না? খুব যায়। আচ্ছা, ছাতি নিয়ে আয়, আমি তোদের একবার 'ছাতি পেটা' করে দেই! শীঘ্রই মীমাংসা হয়ে যাবে। সব কথারই ঐক।—হাঁ, বলে, যেতে দে।

ছত্র আর কি করে? ছাতা মুড়ে' গাছতলায় মাথার নীচে বালিশ করে' শোয়া যায়!—বালিশের কাজ ঠিক হয় না বটে। তা না হৌক, কিছু হয় ত।

আর একটি ছত্রের প্রয়োজনীয়তা আছে—সে শ্রেণী বিশেষের কাছে। সে শ্রেণীটি অধমর্ণ সম্প্রদায়। তারা যখন অঙ্গীকৃত ঋণ পরিশোধ করা সম্বন্ধে হতাশ ভাব অবলম্বন করে—তখন মহাজনের বাটীর সম্মুখে দিয়ে যেতে এই ছত্রই তাদের লজ্জা নিবারণ করে। যে দিকে মহাজন, সেই দিকে ছত্রটি কৌশল সহকারে ফিরালে সেই ঋণীর মনে অনেক শান্তির আবির্ভাব হয়—যা হরিনামে হয় না।

একেবারে এত গুণ কার?—অথচ দাম একটি মুদ্রা মাত্র। এত সহজ, এত সুন্দর! মানুষও কৃতজ্ঞভাবে ছত্রের যথোচিত আদর করে। তাই সে তাকে মাথায় ক'রে রেখেছে। ছত্র সম্মানের চিহ্ন। তাই পুরাকালে ভারতবর্ষে রৌদ্র বৃষ্টি না লাগ্‌লেও স্বাধীন রাজার মাথার উপর রাজছত্র বিরাজ কর্ত্ত, এবং এখনও করে। তাই "একছত্র ভূপতি"—সম্মানের বিশেষণ। হে ছত্র! তোমায় কোটি কোটি নমস্কার।

ছত্রধারী।

আমার মনে হয় যে পৃথিবীর ছত্র ঐ আকাশ। শুদ্ধ তার দামটা দেখা যায় না। কিন্তু দণ্ড আছে। সে দণ্ডটি কি?—সে দণ্ডটি মাধ্যাকর্ষণ। ঐ বিরাট্, দিগন্তব্যাপী, নক্ষত্রখচিত মহাছত্র এই বিপুল মেদিনীকে বিরাট্ ধ্বংসের গ্রাস থেকে রক্ষা কচ্ছে। সে ছত্রধারী স্বয়ং ভগবান।

৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলন ।

এবার দিনাজপুরে উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলন হইয়া গিয়াছে। আমরা এই সম্মিলন দেখিতে গিয়াছিলাম। দেখিতে যাওয়া কথাটায় হয় ত কেহ আপত্তি করিতে পারেন। কথাটা তাহা হইলে খুলিয়াই বলি। দিনাজপুরের বিদ্যোৎসাহী মহারাজ শ্রীযুক্ত গিরিজানাথ রায় বাহাদুর আমাদিগকে সভায় উপস্থিত হইবার জন্য সাদর নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন; আমরা সেই নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইব, ইহাই স্থির করিয়াছিলাম। ইহার মধ্যে দেখি বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ এই অধমকে পরিষদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করিয়া এক আদেশপত্র প্রচারিত করিলেন। এই ডবল নিমন্ত্রণ পাইয়া যাওয়ার ইচ্ছাটা আরও বলবতী হইল।

দিনাজপুরের এই সম্মিলনে উপস্থিত হইবার আরও একটা কারণ ঘটিয়াছিল; সে কথাটা গোপন করিয়া কোন লাভ নাই, বরঞ্চ খুলিয়া বলাই ভাল। বিগত গুড্ ফ্রাইডের পূর্ব্বে সংবাদপত্রাদিতে প্রচারিত হইল যে, ঐ ছুটীর সময় ঢাকা নগরীতে রাজনৈতিক প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশন হইবে; সেই সময়েই চট্টগ্রামে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের বৈঠক বসিবে; আবার সেই সময়েই উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনেরও ব্যবস্থা দিনাজপুরে হইবে। আমরা মহা প্রমাদ গণিলাম! রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক বীরকেশরী-বৃন্দ কি ভাবিয়াছিলেন, তাহা তাঁহারাই বলিতে পারেন। আমরা বাজে লোক, সাহিত্যের বাজারেও ফড়িয়াগিরি করি, রাজনীতির হাটেও হট্টগোল করিয়া থাকি; আমরাই দেখিলাম বেজায় বিপদ। একদিনে তিন স্থানে নিমন্ত্রণ; তিন স্থানেই চর্ব্বচুষ্য লেহ্যপেয়ের বিপুল আয়োজন; তিন স্থানেই জামাই-আদর, অথচ তিনটাই একদিনে। এ পাড়া ও পাড়া হইলেও না হয় জয় জগন্নাথ বলিয়া কোমরে চাদর জড়াইয়া তিন বাড়ীর নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে বাহির হইতাম। তাহার পর যা থাকে অদৃষ্টে! কিন্তু স্থান নির্ব্বাচনের বাহাদুরী আছে;—এক বৈঠক সেই পূর্ব্ববঙ্গের বুড়ীগঙ্গার তীরে ঢাকা নগরীতে; আর এক বৈঠক একেবারে সমুদ্র-তীরে পাহাড়ের উপরে চট্টগ্রামে, আবার তৃতীয় বৈঠক সেই বাণরাজার দেশে—সেই বিরাট্ রাজার উত্তর গোগৃহ দিনাজপুরে। তখন হতাশ কাতর হইয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলাম,—বুঝিলাম এই ঘোর দুর্ভিক্ষের সময়ে একদিনে যখন তিন বাড়ীতে নিমন্ত্রণ—প্রত্যক্ষ ত্র্যহস্পর্শ, তখন সকল নিমন্ত্রণই বাদ পড়িবে। যাহা হউক, আমাদের মত উদর সর্ব্বস্বের দল এ ব্যবস্থা নীরবে সহ্য করিতে পারিলেন না, সংবাদপত্রে ঢাক বাজিয়া উঠিল, কলিকাতার ঔদরিকদলের কএকজন নিজ নিজ নাম স্বাক্ষর করিয়া প্রতিবাদ করিলেন। সাবালকের দল হুকুম ঠিক রাখিলেন, নাবালক উত্তরবঙ্গ সম্মিলন পেটুকদলের আবেদন গ্রাহ্য করিলেন। তাঁহারা সুশীল ও সুবোধ বালকের মত বলিলেন, "থাক্ বাপু, আমরা দশহরার ঘন বৃষ্টির মধ্যেই সম্মিলন করিব।" আমরা হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। এ অবস্থায় যাঁহারা সে সময় আন্দোলন আলোচনা করিয়া, সাহিত্যের দোহাই দিয়া দিনাজপুরের অধিবেশন বন্ধ করিয়াছিলেন, তাঁহারা লোকতঃ ধর্ম্মতঃ দিনাজপুরে যাইতে বাধ্য। আমরা যদিও আন্দোলন আলোচনার মধ্যে ছিলাম না, কিন্তু যাঁহারা এই সকল ব্যাপার করিয়াছিলেন, তাঁহারা আমাদেরই ভাই বন্ধু; সুতরাং তাঁহাদের মুখ রক্ষার জন্যই এবার এত বড় একটা রেজিমেণ্ট কলিকাতা হইতে দিনাজপুরে গিয়াছিল। তাহার পর মহারাজা বাহাদুরের নিমন্ত্রণ, সোনায় সোহাগা এবং মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের বাঙ্গালা সাহিত্যক্ষেত্রে নব প্রবেশ দর্শনও একটা কম প্রলোভন নহে। অতএব আমরা দিনাজপুরে গিয়াছিলাম।

এইবার যাওয়ার কথাটা বলি। উদ্যোগপর্ব্ব আমার কোষ্টীতে লেখে না। দিনাজপুরের অভ্যর্থনা-সমিতি যে নিমন্ত্রণ পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহাতে বিছানা ও মশারী লইয়া যাইবার জন্য অনুরোধ ছিল। আমি সে অনুরোধ রক্ষা করা প্রয়োজন মনে করি নাই; বিছানা না জোটে ভূমিশয্যা আছে; আর মশা মহাশয়েরা অতিশয় দুর্দ্দান্ত শত্রু হইলে আমাকে অতি সহজে পরাজয় করিতে পারিবেন না, এ বিশ্বাস আমার ছিল। তাহার পর দিনাজপুরে যাইয়া আমার কোন প্রিয় বন্ধুর গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিব, এ সঙ্কল্পও ছিল; সুতরাং কোন প্রকার উদ্যোগ আয়োজনের প্রয়োজনই ছিল না। দ্বিতীয় একখানি গামছা লইয়া বৃহস্পতিবারের প্রথম বেলাতেই কলিকাতার কার্য্যস্থান

ছিলাম। বিদ্যাভূষণ ভায়া যখন দর্শন দিলেন, তখন অপরাহ্ণ চারিটা—একেবারে খাটি বার-বেলা। তাঁহার সঙ্গে একটি ব্যাগ ও পাটুরী; তিনিও আমার ন্যায় মহাজনের পন্থাই অবলম্বন করিয়াছিলেন—বিছানা বা মশারি সঙ্গে লইয়া যান নাই।

তখন একখানি গাড়ী আনিবার জন্য লোক পাঠাইয়া দেওয়া হইল। সাড়ে চারিটা বাজিয়া যায়, লোক আর ফিরিয়া আসে না। শ্রীমান হরিদাস চট্টোপাধ্যায় ভায়া বলিতে লাগিলেন, "আজ আপনাদের ট্রেণ ফেল।" আমরা তখন ট্রামে যাওয়াই স্থির করিলাম; কিন্তু এই বৃহস্পতিবারের বারবেলা পাইয়া শ্যামবাজারের ট্রাম আসিতে বিলম্ব করিতে লাগিল। তাই ত—বারবেলাটা হাতে হাতে ফলিবার মতই হইল। এমন সময়ে দেখি হেদোর দিক হইতে একখানি ভাড়াটিয়া গাড়ী আসিতেছে এবং সেই গাড়ীর মস্তকোপরি একটি ছোট ট্রাঙ্ক ও একটা বিছানা রহিয়াছে। আমি এই গাড়ী দেখিয়াই বলিলাম, "ভায়া, আর ভয় নাই, ঐ গাড়ীতে নিশ্চয়ই একজন দিনাজপুর-যাত্রী আছেন; আর তিনি নিশ্চয়ই একাকী, কারণ গাড়ীর ছাতে একটি ট্রাঙ্ক ও একটি বিছানা দেখিতেছি।" আমার কথা শেষ হইতে না হইতেই গাড়ী-খানি আমাদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। যাহা বলিয়াছিলাম, তাহাই ঠিক—গাড়ীর মধ্যে একাকী উপবিষ্ট যিনি তিনি যে সে নহেন—স্বয়ং প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব বন্ধুবর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়। তখন তাঁহার গাড়ী থামাইয়া আমরা দুইজন সেই গাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম। মহার্ণব গাড়োয়ানকে বলিলেন "জল্‌দি হাঁকাও, বহুবাজার!" যাইতে হইবে শিয়ালদহ ষ্টেসনে, ঘড়িতে বাজিয়াছে পৌনে পাচটা, দারজিলিং মেল ছাড়িবে সাড়ে পাচটায়, এদিকে মহার্ণব বলিতেছেন, "হাঁকাও বহুবাজার!" আমার ভয় হইল হয়ত সাক্ষাৎ 'বারবেলা' আমাদিগকে বিড়ম্বিত করিবার জন্য মহার্ণব-বেশ ধারণ করিয়া আসিয়াছেন। বিদ্যাভূষণ

দিনাজপুরের মহারাজাবাহাদুরের প্রাসাদের প্রবেশ-দ্বার।

উপস্থিত হইলাম। আমার এই প্রকার সাজ সজ্জা দেখিয়া আমার এক শুভানুধ্যায়ী ভ্রাতা ঘোর আপত্তি করিলেন এবং তাঁহার গৃহ হইতে একটি ক্ষুদ্র, ভদ্রোচিত ব্যাগ আনিয়া দিলেন। আমার সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার সেই ব্যাগটির চাবি ছিল না, নতুবা সেই চাবির হেপাজাত করিবার জন্য আমাকে বিশেষ বিব্রত হইতে হইত।

ব্যাগই যদি হইল, তাহা হইলে পথের সম্বল কিছু লইয়া যাওয়ারই বা আপত্তি কি? তখন বাজার হইতে কিছু পথের সম্বল কিনিয়া লইলাম। এ দ্রব্যটি আর কিছুই নহে—পঞ্চাশটি চুরুট!

মনে করিয়াছিলাম বৃহস্পতিবারের বারবেলার পূর্ব্বেই যাত্রা করিব; কিন্তু আমার সঙ্গী শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ভায়ার কাজ আর শেষ হয় না। আমি কিন্তু তাড়াতাড়ি 'ভারতবর্ষের' শেষ ফর্ম্মার অর্ডার দিয়া যাত্রামুখী হইয়া বসিয়া

বলিলেন "বড়বাজারে কেন?" মহার্ণব উত্তর করিলেন, "সেখান থেকে পাচকড়িকে তুলে নিতে হবে।" তবু ভাল!

'ডাইনে', 'বাঁয়ে', 'বাঁয়ে', 'ডাইনে' বলিতে বলিতে হয়রাণ হইয়া শ্রীযুক্ত পাচকড়ি বাবুর দ্বারে পুষ্পরথ পৌছিল। 'বাবাজি' বলিয়া চীৎকার করিতে না করিতেই বাবাজির পুত্র শ্রীমান মানিক ভায়াজি বলিলেন, "বাবা পুলিশ কোর্টে সাক্ষী দিতে গিয়াছেন। তিনি ঐ পথেই যাইবেন। তাঁহার বাক্স ও বিছানা আপনাদের লইয়া যাইতে হইবে।" এই বলিয়াই মানিক ভায়া তাড়াতাড়ি বাক্স ও বিছানা গাড়ীর উপর তুলিয়া দিলেন। আমরা বাবার পরিবর্ত্তে ছেলেকে লইয়াই ষ্টেসন অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

আপনারা দশজন পাঠকপাঠিকা হয় ত বলিতেছেন, "বাবা, এমন করিয়া বর্ণনা আরম্ভ করিলে ত তিন দিনেও কথা শেষ হইবে না।" কি করিব বলুন, বুড়া মানুষে কথাটা একটু বেশীই বলে। তাহার পর এই ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিখিবার যুগে যদি এক নিশ্বাসে সব কথা বলিয়া ফেলি, তাহা হইলে যে ভ্রমণবৃত্তান্তই লেখা হয় না—পোষ্টকার্ডে কি এ সকল কাজ চলে। অতএব, আপনাদের ধৈর্য্যের উপর মাশুল না বসাইয়া (tax your patience ইতিভাষা) পারিতেছি না।

গাড়ী ষ্টেসনে পৌছিল; তখন ত গাড়ী ছাড়িবার আধ ঘণ্টা বিলম্ব ছিল। রেল কোম্পানী বহুত মেহেরবাণী করিয়া দিনাজপুর সাহিত্য সম্মিলনের যাত্রীদিগকে একভাড়ায় যাতায়াতের আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন; আমরা সকলেই এক একখানি ছাড়পত্র পাইয়াছিলাম। রেলে যাতায়াতের সময় যাহাই করি না কেন, ট্রামে কখন দ্বিতীয় শ্রেণীর নীচের গাড়ীতে চড়ি না; আজ সে সনাতন নিয়মের অন্যথা করিব কেন? বিশেষতঃ কম ভাড়ার প্রলোভন; কাজেই একেবারে নগদ কোম্পানী সিক্কা বার টাকা পাচ আনা দিয়া দিনাজপুরের একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর রিটার্ণ টিকিট কিনিয়া ফেলিলাম। তারপর ব্যাগটি হাতে করিয়া প্লাটফরমে যাইয়া দেখি সবই আমরা। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ভায়া বারবেলার পূর্ব্বেই বাড়ী হইতে যাত্রা করিয়া ষ্টেসনে আসিয়াছিলেন, শ্রীযুক্ত পাচকড়ি বাবুও পুলিশের হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া ষ্টেসনে আসিয়াছিলেন। আরও দেখিলাম শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায় ভ্রাতৃযুগল দিনাজপুরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিলেন; অর্থনীতিবিৎ শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার, রসায়নবিৎ শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার, শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী, শ্রীমান নলিন পণ্ডিত ষ্টেসনে উপস্থিত। আর দেখিলাম সাহিত্য পরিষদের উপযুক্ত কর্ণধার শ্রীমান ব্যোমকেশ মুস্তফী চারিদিকে ছুটাছুটি করিতেছেন; তাঁহার উপযুক্ত সহকারী রামকমল ভায়া কে কোথায় উঠিল, কাহার কি দরকার, তাহার ব্যবস্থা করিতেছেন।

যাঁহারা দ্বিতীয় শ্রেণীর আরোহী, তাঁহারা সকলেরই এক দিন দুই দিন পূর্ব্বে আসন রিজার্ভ করিয়াছিলেন; তাঁহারা সেই সকল নির্দ্দিষ্ট গাড়ীতে দ্রব্যাদি তুলিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত মনে ভ্রমণ করিতেছিলেন। আমার রিজার্ভ ছিল না। আগে থাকিতেই যদি কোন কাজ কর্ম্মের ব্যবস্থা বন্দোবস্ত করিতে জানিতাম, শিখিতাম তাহা হইলে জীবনের গতি হয় ত অন্য প্রকার হইত। কোন দিনই কিছু রিজার্ভ করিতে পারি নাই; কত যত্ন, কত চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু এ জগতে কিছুই রিজার্ভ করিতে পারিলাম না; সুতরাং সে দিন শিয়ালদহ ষ্টেসনেও আসন রিজার্ভ করিতে পারি নাই। আমার রিজার্ভ নাই শুনিয়া শ্রীযুক্ত সমাজপতি মহাশয় একজন টিকিট-সংগ্রাহককে সেই কথা বলিলেন; তিনি বলিলেন, চেষ্টা করিয়া দেখিবেন।

যথাসময়ে আরোহীবৃন্দ নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট আসন গ্রহণ করিলেন। শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার আমাকে বলিলেন "দাদা, আপনি আমার নির্দ্দিষ্ট আসনে উঠিয়া বসুন; আমি আপনার ব্যবস্থা করিতেছি।" এই বলিয়া তিনি ষ্টেসন মাষ্টারের আফিসের দিকে দৌড়িয়া গেলেন, আমি তাঁহার নির্দ্দিষ্ট আসন দখল করিয়া বসিলাম। একটু পরেই যোগীন্দ্রভায়া আসিয়া বলিলেন, "দাদা, ষ্টেসন মাষ্টার তার পাঠাইয়া দিলেন, ও পারে আপনার রিজার্ভ হইবে।" যাহা হউক, ভায়ার মুখে এই অভয়বাণী শুনিয়া আশ্বস্ত হইলাম। বলিলাম, "যা হোক, ও পারে ত একটু স্থান মিলিবে। এ পারে যে আমার স্থান নাই তাহা কি আর জানি না; এই

দিনাজপুরের মহারাজ বাহাদুরের প্রাসাদমধ্যস্থ শ্রীশ্রীকান্তজীর মন্দির।

ড় বয়স পর্য্যন্ত কোথাও স্থান মিলিল না। বড়ই ভরসার যে, ওপারে স্থান মিলিবে। এমন আশাও ভাই, এত- কেহ দিতে পারেন নাই।" তখন গাড়ীর বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম, এ পারে যাহা তাহা ত হইল, কোন রকমে আরোহীদিগের কৃপায় লাম, এখন পার হইলে যেন একটু স্থান পাই। এ ত অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে, ওপারে যেন আলো পাই। শ্রীমান্ যোগীন্দ্রনাথের আশ্বাসবাণীই মনে হইতে লাগিল, "দাদা, ওপারে মিলিবে।" ন হয়, ওগো, তাই যেন হয়! ওপারে যেন এ জন্য একটু স্থান থাকে! শেষে যেন তোমরা না,—

"স্থান নাই, স্থান নাই, ছোট এ তরী,
আমারই সোণার ধানে গিয়াছে ভরি।"

—গাড়ী ছাড়িয়া দিল। দারজিলিং মেল কাহারও ধার ধারে না, শিয়ালদহ ছাড়িয়া একেবারে এক দৌড়ে রাণাঘাট যাইয়া হাঁফ ছাড়ে। গাড়ীর মধ্যে নানা জনে নানা আলাপ করিতে লাগিলেন; আমি এক কোণে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। সত্য সত্যই আমার সঙ্গে কথা বলিবার লোক মিলিল না। যাঁহারা আমার সহিত এক কামরায় ছিলেন, তাঁহারা সকলেই যুবক, সকলেই উচ্চশিক্ষিত, সকলেরই অদম্য উৎসাহ, অকৃত্রিম সাহিত্য-অনুরাগ, অবিচলিত জ্ঞানপিপাসা; আর আমি,—যা'ক্ সে কথা না বলিলাম; সুতরাং এই যুবকদলের সহিত আমি কি বলিব?

গাড়ী যখন রাণাঘাটে পৌছিল, তখন চা-পানের জন্য সকলেই গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িলেন। যে কামরায় সমাজপতি মহাশয়, পাঁচকড়ি বাবু, হীরেন্দ্রবাবু ও মহার্ণব মহাশয় ছিলেন, সেই কামরায় আর একটি বন্ধুকেও দেখিলাম; তিনি শ্রীযুক্ত কবিরাজ দুর্গা নারায়ণ শাস্ত্রী। আমাদের সহযাত্রী মহাশয়েরা যিনি যাহাই সঙ্গে লইয়া গিয়াছেন তাহা পরিণাম চিন্তা করিয়া; কিন্তু শাস্ত্রী মহাশয় বর্ত্তমান অভাবের কথাই বিশেষভাবে চিন্তা করিয়াছিলেন; তাই তিনি প্রকাণ্ড একটা ঝুড়ি সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। পাঠকপাঠিকাগণ মনে করিবেন না যে, কবিরাজ মহাশয়ের নিদান, চরক, এবং চন্দ্রামৃতরস, বৃহৎ কস্তুরীভৈরব প্রভৃতিতে ঝুড়িটি পূর্ণ ছিল। তাহা নহে,—সেই বৃহৎ ঝুড়িতে কতকগুলি সুপক্ক আম্র, বড় বড় কদলী, নিচু, জামরুল, প্রভৃতি ফল এবং সিঙ্গারা, পান্তুয়া, ছানার জিলাপী ইত্যাদি ইত্যাদি থরে থরে সজ্জিত ছিল। সমাজপতি ভায়া এ সন্ধান না দিলে আমি সে কক্ষে হয় ত প্রবেশ করিতাম না। যখন কবিরাজ মহাশয়ের এই মহার্ঘ ভাণ্ডারের সন্ধান পাওয়া গেল, তখন সকলেই তাহার সদ্ব্যবহার

আরম্ভ করিলেন,—রঙ্গবিদ্যাপরায়ণ শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র বাবু পর্য্যন্তও বাদ গেলেন না। আমাদের ব্যোমকেশ মুস্তফী ভায়ার 'বসুধৈবকুটুম্বকম' তিনি দেখিলেন কবিরাজের ভাণ্ডার এই দ্বিতীয়-শ্রেণীর আরোহী কএকটই লুণ্ঠন করিতেছেন. তখন তিনি সকলের অজ্ঞাতসারে গাড়ী হইতে নামিয়া মধ্যম শ্রেণীর আরোহী মহাশয়গণকে এই শুভ সংবাদ প্রদান করিলেন। তখন প্রকাণ্ড বর্গীর দল আসিয়া কবিরাজের ঝুড়ি আক্রমণ করিলেন, দেখিতে দেখিতে এক ঝুড়ি দ্রব্য উড়িয়া গেল, কবিরাজ মহাশয় ঝুড়িটার মধ্যে তাঁহার ব্যাগটি রক্ষা করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন!

রাত্রি আটটার সময় দামুকদিয়া ঘাটে গাড়ী পৌঁছিল; আমরা সকলে ষ্টীমার অভিমুখে দৌড়িলাম, কারণ তখন আকাশে মেঘ উঠিয়াছে, দুই এক বিন্দু বৃষ্টিও পড়িতেছে। ষ্টীমারে উঠিয়া এক আধ জন ব্যতীত কেহই ডিনার করিলেন না। দিনাজপুর সাহিত্য সম্মিলনের সভাপতি মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ও এই দিনেই যাইতেছিলেন। তাঁহার সঙ্গে ছিলেন তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র। তাঁহারা তিন জনই প্রথম শ্রেণীর আরোহী। তাঁহারা ষ্টীমারের যে দিকে ছিলেন সে দিকে আমাদের প্রবেশ নিষেধ; সুতরাং তাঁহাদের কথা কিছুই বলিতে পারিলাম না।

ষ্টীমার যখন সারাঘাট পৌঁছিল, তখন অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতেছিল, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। আমরা সকলে তাড়াতাড়ি ষ্টীমার হইতে নামিয়া ষ্টেসনে উপস্থিত হইলাম। ষ্টেসনে তখন তিনখানি গাড়ী দাঁড়াইয়া ছিল; একখানি দারজিলিং মেল, দ্বিতীয় খানি শিলং মেল, এবং তৃতীয়খানি কাটিহার প্যাসেঞ্জার। আমরা পূর্ব্বেই শুনিয়া রাখিয়াছিলাম যে, আমাদিগকে কাটিহার প্যাসেঞ্জারে চড়িতে হইবে, দারজিলিং মেলে চড়িলে পার্ব্বতীপুর ষ্টেসনে নামিয়া এই প্যাসেঞ্জার গাড়ীর জন্য হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে। তিন গাড়ীর আরোহিবৃন্দ ষ্টেসনে উপস্থিত হইয়াছু টাছুট আরম্ভ করিলেন। আমরা জানিতাম আমাদের গাড়ী সর্ব্বশেষে ছাড়িবে, সুতরাং আমাদের তাড়াতাড়ির তেমন প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু আমার একটু তাড়াতাড়ি ছিল; কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমার রিজার্ভ ছিল না। যদি পদ্মানদী পার হইয়াও রিজার্ভ না থাকে, তাহা হইলে ত আমাকে দশজনের সঙ্গে একটু স্থান করিয়া লইতে হইবে। এই জন্য গাড়ীর দিকে একটু দ্রুতপদে গেলাম, কিন্তু কোথাও আমার নামাঙ্কিত ছাড়পত্র দেখিলাম না; বুঝিলাম বৈতরণী পার হইলে কি হয়, অদৃষ্ট পূর্ব্বের খেয়াতেই পার হইয়া আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। তখন আর কি করিব, দারজিলিং মেলে যে সমস্ত দেবদেবী উঠিতেছিলেন, তাঁহাদের গতিবিধি দেখিতে লাগিলাম। এমন সময় শ্রীমান্ যোগীন্দ্র ভায়া আমার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "এই যে দাদা! আপনি এখানে দাঁড়িয়ে কি করছেন; আপনার জন্য স্থান যে রিজার্ভ হইয়াছে। শীঘ্র চলুন।" আমি বলিলাম, "কৈ, আমি ত দেখ্‌তে পাই নাই।" ভায়া বলিলেন, "ওসব খুঁজে বা'র করা আপনার কর্ম্ম নয়, আসুন।" তখন ভায়ার সঙ্গে চলিলাম। একখানি হরগৌরী গাড়ী ছিল, তাহার অর্দ্ধেকখানি প্রথম শ্রেণী, অপরার্দ্ধ দ্বিতীয় শ্রেণী। আমি দূর হইতে প্রথম শ্রেণীর রূপ দেখিয়া সে দিকে আর অগ্রসর হই নাই। সেই প্রথমার্দ্ধ মাননীয় চৌধুরী মহাশয়দিগের, দ্বিতীয়ার্দ্ধে লেখা আছে আমার নাম, আর একটি নাম এম, সি, রায় চৌধুরী। আমি বলিলাম "ভায়া, ইনি হন কে?" ভায়া বলিলেন, "আপনার ভয় নাই, সে ব্যবস্থা করিয়াছি। রায় চৌধুরীকে আমরা হীরেন্দ্র বাবুর স্থানে বসাইয়াছি; আপনার সঙ্গে হীরেন্দ্র বাবু যাইবেন। কি বলেন?" আমি বলিলাম, "তোমাকে দুইহাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছি। একে রিজার্ভ, তাহার উপর সঙ্গী কি না হীরেন্দ্র বাবু! একেবারে স্বর্গসুখের ব্যবস্থা!" যোগীন্দ্র ভায়া একটা বড় রকমের কম্প্লিমেণ্ট্ দিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেলেন। একটু পরেই হীরেন্দ্র বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং গাড়ীর মধ্যে উঠিয়া বলিলেন, "বাঃ। বেশ হয়েছে।" কি বেশ হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। তখন হীরেন্দ্র বাবুর ভৃত্য আসিয়া বিছানা করিয়া দিল। হীরেন্দ্র বাবু আমাকে বলিলেন, "কৈ জলধর বাবু, আপনার বিছানা কৈ?" আমি বলিলাম, "বিছানার প্রয়োজন নাই বলিয়া আনি নাই; আমি
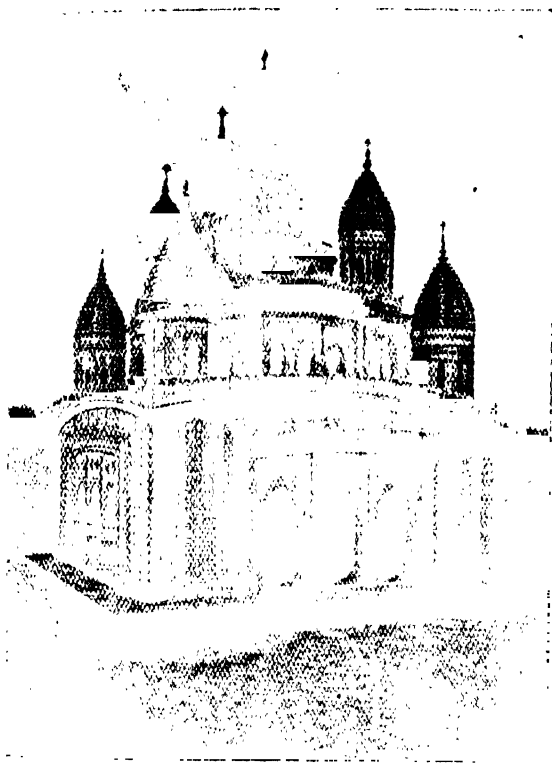
(দিনাজপুরের) কান্তনগরের মন্দির।

গাড়ীতে চড়িয়া কখনও ঘুমাই না।” “সারারাত বসিয়া থাকিবেন!” বলিয়া হীরেন্দ্র বাবু বিস্ময় প্রকাশ করিলেন। হীরেন্দ্র বাবুর সঙ্গে খাদ্যদ্রব্য ছিল, তিনি আমাকে তাহার অংশ দিতে আসিলেন; আমি বলিলাম, “রাত্রিতে আহার করিবার প্রয়োজন হইবে না।” তিনি বলিলেন, “আহার নিদ্রা দুইই ত্যাগ।” আমি বলিলাম, “আজ্ঞে, তা হ’লে ত এত দিন মুক্ত হইয়া যাইতাম।” হীরেন্দ্র বাবু হাসিতে লাগিলেন। আহার শেষ করিয়া হীরেন্দ্র বাবু শয়নের আয়োজন করিলেন; এমন সময় একটি উনিশ কুড়ি বৎসর বয়সের মগ যুবক আমাদের গাড়ীতে উঠিয়া ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাঙ্গালায় জিজ্ঞাসা করিলেন, “বেঞ্চে কি লোক আছে?” হীরেন্দ্র বাবু বলিলেন, “না, আপনি অনায়াসে ওটা দখল করিতে পারেন।” যুবকটি ইংরাজি জানেন, দেখিতেও অতি সুপুরুষ। তিনি রঙ্গপুরে যাবেন; তাঁহাকে পার্ব্বতীপুরে নামিয়া অন্য গাড়ীতে যাইতে হইবে। হীরেন্দ্র বাবু যুবকের সহিত আরাকাণী ভাষা সম্বন্ধে আলাপ আরম্ভ করিলেন। তখন পার্শ্বের প্রথম শ্রেণী হইতে ব্যারিষ্টার-প্রবর শ্রীযুক্ত প্রমথ নাথ চৌধুরী মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হীরেন্দ্র বাবু ভাষা সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন, সাহিত্য রসিক চৌধুরী মহাশয় একেবারে উল্‌টা কথা আরম্ভ করিলেন। তিনি যুবককে বলিলেন, “আপনি রঙ্গপুরে তামাক কিন্‌তে যাচ্ছেন, কেমন?” যুবক মাথা নাড়িয়া স্বীকার করিল। তখন কোথায় কেমন তামাক হয়, কোন্ তামাকে চুরুট ভাল হয়, কোথায় কোথায় তামাক রপ্তানি হয়, ইত্যাদি ইত্যাদি কথা চলিতে লাগিল। আমি দেখিলাম, ‘বীরবল’ মহাশয় সুধু সাহিত্য ক্ষেত্রেই বীরবল নহেন, ‘সনেট্ পঞ্চাশতেই’ তাহার অধিকার বিস্তৃত নহে, পান তামাক প্রভৃতি গৃহস্থালীর দ্রব্যেরও তিনি বিশেষ খোঁজ রাখেন, সে সকল সম্বন্ধেও বেশ দশ কথা জানেন।

দারজিলিং মেল ছাড়িয়া গেল; তাহার প্রায় অর্দ্ধ-ঘণ্টা পরে আসাম মেলও চলিয়া গেল; লোকজনের গতিবিধিও কম হইল, ষ্টেসনে যে সমস্ত আলো জ্বলিতেছিল, তাহারও দুই দশটা নিবাইয়া দেওয়া হইল। বৃষ্টি দেখিয়া রেল কোম্পানীর বাবুরাও অনেকে গা ঢাকা দিলেন। তখন ষ্টেসনে ‘আমরাই সুধু রইলাম পড়ে!’

প্রায় দেড় ঘণ্টা পরে আমাদের গাড়ী ছাড়িল। তখন মুষল ধারায় বৃষ্টি পড়িতেছে, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, চারিদিক অন্ধকার; আর সেই জমাট অন্ধকার ভেদ করিয়া বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে গাড়ী দৌড়িল। আমাদের গাড়ীতে একজন দার্শনিক, আর একজন তাম্রকূট ব্যবসায়ী, আর আমি খাঁটি গদ্যময় জন্তু; সুতরাং সে সময়ের অবস্থার একটা কবিত্বপূর্ণ বর্ণনা দেওয়া আমাদের কাহারও সাধ্যায়ত্ত ছিল না। অতএব আমার দিনাজপুর ভ্রমণ-বৃত্তান্ত এইখানেই একেবারে মাটি! কি করিব,—নাচার!

আমি তখন গাড়ীর বৈদ্যুতিক আলো কয়টি নিবাইয়া দিলাম; বাহিরের অন্ধকার-রাশি আসিয়া আমাদের কামরা দখল করিয়া বসিল, আমি চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম, “তিমিরে অনন্যকায় শূন্য ধরাতল!”

আমাদের গাড়ীখানি প্যাসেঞ্জার কি না, তাই তাহাকে

ছোট বড় সকল ষ্টেসনেই দাঁড়াইতে হইল। যে মুষল ধারে বৃষ্টি, তাহাতে আর লোকজন উঠিবে নামিবে কি; যাহারা উঠিল নামিল তাহারা হয় ওয়ারেণ্টের আসামী, আর না হয় পরের চাকর,—নতুবা এমন বৃষ্টিতে কি কেহ ঘরের বাহির হয়।

গাড়ী যখন নাটোর ষ্টেশনে পৌঁছিবে, তাহার একটু পূর্ব্বেই, আমি গাড়ীর বাতি জ্বালাইয়া দিয়া অন্ধকার হইতে আলোকে আসিলাম; তাহার কারণ এই যে, আমার প্রিয়-সখা শ্রীমান্ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় পূর্ব্বেই আমাকে চিঠি লিখিয়াছিলেন যে, তিনি সেই গাড়ীতে আমাদের জন্য খাদ্য-দ্রব্য লইয়া উঠিবেন। গাড়ী অন্ধকার থাকিলে আমার মত ঘোর অন্ধকারদেহ ব্যক্তিকে তিনি দেখিতেই পাইবেন না, এই ভয়ে আলো জ্বালাইয়া দিয়াছিলাম। গাড়ী নাটোর ষ্টেসনে পৌঁছিল, তখনও খুব বৃষ্টি পড়িতেছে। বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখি সেই বৃষ্টির মধ্যেই অক্ষয় ভায়া মাথায় চাদর বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। আমাকেই তিনি প্রথম দেখিতে পান; দেখিতে পাইয়া সভাপতি মহাশয় কোথায় আছেন, তাহাই জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি আমাদের পার্শ্বের কামরা দেখাইয়া দিলাম। অক্ষয় সেই দিকে দৌড়িলেন এবং চৌধুরী মহাশয়কে দুই এক কথা বলিয়া আমাদের গাড়ীর সম্মুখে আসিলেন এবং খাদ্যদ্রব্য লইতে বলিলেন। আমি বলিলাম, "পিছনের সব গাড়ীতেই আমাদের লোক সকল আছেন, তাঁহাদের আগে দিয়া এস, তাহার পর আমার যাহা হয় হইবে।" অক্ষয় তখন লোকজন সঙ্গে লইয়া সেইদিকে দৌড়িলেন। একটু পরেই গাড়ী ছাড়িয়া দিল, তিনি আর আমাদের দিকে আসিতে পারিলেন না! তখন আরও বেগে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। প্রাতঃকালে যখন পার্ব্বতীপুর ষ্টেসনে গাড়ী পৌঁছিল—বৃষ্টি কিঞ্চিৎ কমিয়াছিল; তখন সকলের সঙ্গে দেখা হইল।

গাড়ী এই দুর্যোগে প্রায় দুই ঘণ্টা সময় পিছাইয়া পড়িয়াছিল। ওদিকে পূর্ব্বাহ্ণ আটটার সময় সভার অধিবেশন, কিন্তু পার্ব্বতীপুরেই সাড়ে সাতটা বাজিয়া গেল। আমরা নিশ্চিন্ত ছিলাম, কারণ বিলম্বই হউক আর যাহাই হউক স্বয়ং আশুতোষ আমাদের সঙ্গে রহিয়াছেন,—দিনাজপুর শিবহীন যজ্ঞ করিতেই পারিবেন না।

সাড়ে আটটার সময় গাড়ী দিনাজপুরে পৌঁছিল। তখনও আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, ফিন্‌কি ফিন্‌কি বৃষ্টিও পড়িতেছিল। ষ্টেসনের প্লাটফরমে তিলধারণেরও স্থান ছিল না; সহরের সমস্ত ভদ্রলোকই বোধ হয় ষ্টেসনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। আমরা দেখিলাম, ভলণ্টিয়ারগণ সারি দিয়া দাঁড়াইয়া আছেন; তাহার পশ্চাতে শত শত ভদ্রলোক দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। আমাদের 'ভারতবর্ষের' ফটোগ্রাফার-বাবু প্লাটফরমের এক প্রান্তে ক্যামেরা বসাইয়া এই জনসঙ্ঘের ছবি লইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছেন। গাড়ী থামিবামাত্র জয়ধ্বনি উত্থিত হইল। সভাপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় সহাস্য বদনে গাড়ী হইতে নামিলেন, আবার জয়ধ্বনি হইল। অভ্যর্থনা-সমিতি সদস্যগণ দিনাজপুরের মহারাজা শ্রীযুক্ত গিরিজানাথ রায় বাহাদুরকে অগ্রণী করিয়া সভাপতি মহাশয়ের সংবর্দ্ধনা করিলেন; ভলণ্টিয়ারগণ ও অন্যান্য ভদ্রলোকেরা প্রতিনিধিগণের অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন। অভ্যর্থনা-সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় চারিদিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। তাঁহার উৎসাহ দেখে কে! মহারাজার প্রাসাদ, যোগীন্দ্রবাবুর বাড়ী, গভর্ণমেণ্ট স্কুল, মিউনিসিপাল আফিস প্রভৃতি স্থানে প্রতিনিধিগণের অবস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছিল; ভলণ্টিয়ারগণ প্রতিনিধিগণের দ্রব্যাদি লইয়া গাড়ীতে তুলিয়া দিতে লাগিলেন এবং প্রতিনিধি-বোঝাই গাড়ীসকল নির্দ্দিষ্ট স্থান অভিমুখে ছুটিতে লাগিল। আমার তখন মনে হইল,—

'নানা পক্ষী এক বৃক্ষে,
রজনী বঞ্চিয়া সুখে,
প্রভাত হইলে দশ দিকেতে গমন।'

আমার দিনাজপুরের বন্ধুগণ ষ্টেসনে ছিলেন; আমি তাঁহাদের স্নেহশীতল গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিবার জন্য চলিলাম। ষ্টেসনেই সংবাদ পাইলাম যে, মধ্যাহ্ণ বারটার সময় সভার অধিবেশন হইবে। গাড়ীর বিলম্ব হওয়াই ইহার একমাত্র কারণ নহে; আমরা পথে যাইতে যাইতে দেখিলাম যে, সভার জন্য যে মণ্ডপ প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বরাত্রির বৃষ্টিতে একেবারে নষ্ট ও শ্রীভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে; এখন তাহার জীর্ণসংস্কার আরম্ভ হইয়াছে। বহুদিনের চেষ্টা, যত্ন ও অর্থব্যয়ে যে সুন্দর ও মনোরম মণ্ডপ প্রস্তুত হইয়া-

ছিল, তাহার এই অবস্থা দেখিয়া বড়ই কষ্ট বোধ হইতে লাগিল।

বন্ধুবর শ্রীযুক্ত কৃষ্ণনাথ ও কেদারনাথ সেন মহাশয়-গণের গৃহে রাজোচিত সেবাগ্রহণ করিয়া তাড়াতাড়ি সভাস্থলে উপস্থিত হইলাম। স্থানীয় ভদ্রলোকদিগের অক্লান্ত পরিশ্রমে শমে মণ্ডপের কিঞ্চিৎ সংস্কার সাধিত হইয়াছিল। যথা-সময়ে সভার কার্য্য আরম্ভ হইল। প্রথমে অভ্যর্থনা-সঙ্গীত গীত হইল; তাহার পর পূর্ব্ববৎসরের সম্মিলনের সভাপতি শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণপূর্ব্বক একটি অনতিদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া সভার উদ্বোধন করিলেন। তৎপরে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি মহারাজ শ্রীযুক্ত গিরিজা-নাথ রায় বাহাদুর তাঁহার নিবেদন পাঠ করিলেন। মহারাজ বাহাদুর যে প্রকার বিনয়ী ও ধর্ম্মপ্রাণ, তাঁহার নিবেদনও তেমনই সুন্দর হইয়াছিল; তাঁহার নিবেদন শুনিয়া উপস্থিত সকলেই মুক্তকণ্ঠে সাধুবাদ করিলেন! তাহার পরেই প্রস্তাবিত, সমর্থিত ও সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে অনুমোদিত হইয়া মাননীয় শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। দিনাজপুরে যাইবার কএক দিন পূর্ব্বে তিনি এতদূর অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, শরীর সুস্থ করিবার জন্য তাঁহাকে রাজকার্য্য হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া পুরীতে যাইতে হইয়াছিল। তাঁহার চিকিৎসকগণ তাঁহাকে সভায় উপস্থিত হইতে নিষেধ করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি কাহারও নিষেধ শুনেন নাই; অসুস্থ শরীরেই তিনি দিনাজপুর আসি-বার জন্য পুরী-ত্যাগ করেন। তাঁহার এই নির্ব্বন্ধাতিশয় দর্শনে চিকিৎসক ও আত্মীয়-বন্ধুগণ তাঁহাকে নিষেধ করিয়া দেন যে, তিনি যেন তাঁহার অভিভাষণ নিজে পাঠ না করেন এবং একটি কথাও না বলেন; কিন্তু এই জনসমাগম দেখিয়া, এই আনন্দ-সম্মিলন দেখিয়া, তিনি সে নিষেধবাক্য ভুলিয়া গেলেন; তাঁহার সে সময়ের ভাব দেখিয়া আমরা বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, তিনি কথা না বলিয়া থাকিতে পারিবেন না। তিনি তখন অতি ধীরস্বরে তাঁহার শরীরের অবস্থা জ্ঞাপন করিয়া অভিভাষণ পাঠ আরম্ভ করিলেন। কোথায় রহিল চিকিৎসকের উপদেশ, কোথায় রহিল বন্ধু-গণের অনুরোধ,—আশুতোষ তখন আশুতোষের মত ভাব-বিহ্বল হইয়া, প্রাণ মন তন্ময় করিয়া তাঁহার সেই সুন্দর অভিভাষণ পাঠ করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহার দেহ এ অত্যাচার নীরবে সহ্য করিতে পারিল না। যে সুবক্তা আশুতোষ কত কত বক্তৃতামঞ্চে দণ্ডায়মান হইয়া সহস্র সহস্র লোককে শুনাইয়া ওজস্বিনী বক্তৃতা করিয়াছেন, যে বারিষ্টার-প্রবর আশুতোষ ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া হাইকোর্টে বড় বড় মামলার সওয়াল জবাব করিয়াছেন, আজ সেই আশুতোষ দশ মিনিট কাল এই অভিভাষণ পাঠ করিয়াই ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন; তাঁহার সেই শান্ত, গম্ভীর অথচ ভাবোদ্দীপক স্বর ক্রমেই নামিয়া আসিতে লাগিল। অবশেষে তিনি সকলের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া বসিয়া পড়িলেন; বাগ্মীপ্রবর শ্রীযুক্ত পাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তখন চৌধুরী মহাশয়ের অভিভাষণ পাঠ করিতে লাগিলেন। দেবতা তখন বাদ সাধিলেন, আকাশ মেঘে ছাইয়া গেল, প্রবলবেগে বাতাস বহিতে লাগিল, মণ্ডপের সুন্দর চন্দ্রাতপ প্রভৃতি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল, মণ্ডপ মাথার উপর ভাঙ্গিয়া পড়ে পড়ে হইল, বৃষ্টি আরম্ভ হইল! কিন্তু কি আশ্চর্য্যের বিষয় যে, একজন লোকও স্থানত্যাগ করিলেন না, বা উঠিয়া দাঁড়াইলেন না। জজ সাহেব, মাজিষ্ট্রেট সাহেব, পুলিশ সাহেব, মিশনরিগণ, রঙ্গপুরের মাজিষ্ট্রেট্ শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দে মহাশয়, প্রসিদ্ধ সিভি-লিয়ান্ শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়, মহারাজা বাহাদুর, কএকজন সম্ভ্রান্ত মহিলা এবং কলিকাতার ও ভিন্ন ভিন্ন স্থানের ভদ্রমণ্ডলী—একজনও উঠিলেন না! সকলেই সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণ শুনিতে লাগিলেন; পাঠ শেষ হইলে বিষয়-নির্ব্বাচন সমিতি অতি তাড়াতাড়ি গঠিত হইল। তাহার পর আর গান হইবার সময় পাওয়া গেল না, আকাশ ভাঙ্গিয়া জল আসিল, মণ্ডপ উড়িয়া গেল! তখন আড়াইটা বাজিয়াছিল। চারিটার সময় মণ্ডপের সম্মুখস্থ নবনির্ম্মিত রঙ্গমঞ্চে দ্বিতীয় অধিবেশন হইবে, এই কথার ঘোষণা শ্রবণ করিয়া সমাগত জনসঙ্ঘ আশ্রয় অন্বেষণে চারিদিকে ধাবিত হইলেন। এতদিনের আয়োজন, দিনাজপুরবাসী সহৃদয় মহোদয়গণের এত চেষ্টা, এত অর্থব্যয়, সমস্ত একেবারে ব্যর্থ হইয়া গেল! সেই যে জল নামিল, তাহা যে তিন দিন আমরা দিনাজপুরে ছিলাম, তাহার মধ্যে আর থামিল না!
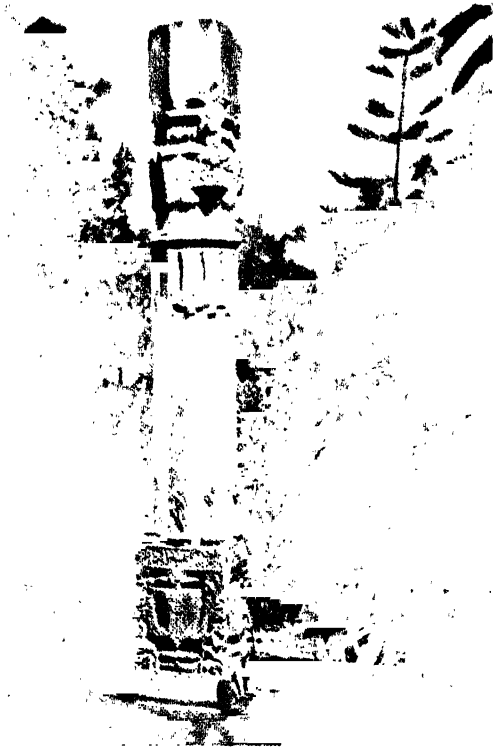
দিনাজপুরের বুদল স্তম্ভ।

অপরাহ্ণ চারিটার সময় রঙ্গমঞ্চগৃহে পুনরায় সভার অধিবেশন হইল। ছোট একটা ঘর, তাহাতে চারি পাঁচ শত লোকের স্থান হইতে পারে; কিন্তু সেখানে সহস্রাধিক ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন,—কেহ প্রবেশ করিতে পারিলেন, কেহ পারিলেন না। মধ্যাহ্নের অধিবেশনেই সভাপতি মহাশয় এত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তিনি এই অপরাহ্নের সভায় উপস্থিত হইতে পারিলেন না; পাটনা কলেজের অধ্যাপক সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় সভাপতির কার্য্যনির্ব্বাহ করিলেন। কএকটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের নানা স্থান বাদ দিয়া অতি সংক্ষেপে পঠিত হইল; ইহাতে যে প্রবন্ধগুলির সৌন্দর্য্য নষ্ট হইতে লাগিল, তাহা সকলেই বুঝিলেন; কিন্তু উপায়ান্তর নাই; অতি অল্প সময়ের মধ্যে একরাশি প্রবন্ধের ত গতি করিতে হইবে; সুতরাং তাহাদের দুর্গতি অনিবার্য্য!

সভাস্থলে যখন এই ভাবে প্রবন্ধ পাঠ চলিতেছিল, তখন সভার বাহিরে মহা গণ্ডগোল। ইনি বলিতেছেন, 'বিষয়-নির্ব্বাচন সমিতিতে আমাদের জেলার প্রতিনিধি নির্ব্বাচন ঠিক হয় নাই', উনি বলিতেছেন, 'সম্মিলনের কোন কার্য্যে যদি আমাদের একটুও কথা বলিবার অধিকার না থাকে, তাহা হইলে আমরা কি লুচি খাইতে আসিয়াছি'? আবার তিনি বলিতেছেন, 'এই সম্মিলন যখন কলিকাতা সাহিত্য-পরিষদের শাখা, তখন মূল পরিষদের প্রতিনিধিগণ বিষয়-নির্ব্বাচন সমিতিতে থাকিবেন না কেন?'—ইত্যাদি ইত্যাদি। বাহিরে এমন তুমুল কোলাহল উত্থিত হইল যে, আমার ত ভয়ই হইল যে, মুখোমুখি ছাড়িয়া শেষে হাতাহাতি না হয়। প্রীতি-সম্মিলনে এমন অপ্রীতিকর দৃশ্য বড়ই ক্ষোভের কারণ! আমি এই গোলযোগ, তর্কবিতর্ক, আন্দোলন আলোচনা হইতে দূরে থাকিবার জন্য একটি বৃক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। কলিকাতা হইতে আগত বন্ধুগণের পাঁচ সাতটিকে এই অপরাহ্নের সভায় দেখিলাম, আর কেহ আসেন নাই! যখন সন্ধ্যা আসিল, তখন শ্রীমান্ অক্ষয় ও আমি এক পেয়ালা চায়ের উদ্দেশে বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে গবর্ণমেণ্ট্ স্কুলে গেলাম। আরে রাম! সেখানেও সেই মূল আর শাখা, শাখা আর মূল! প্রতিনিধিগণের মুখে স্তধু একই কথা এবং তাহার মধ্যে অনুসন্ধান করিয়া প্রীতির একটু অণুও দেখিতে পাইলাম না। সন্ধ্যার পর বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে বন্ধুগৃহে ফিরিয়া আসিলাম। সাহিত্য-সম্মিলনের প্রতিনিধিগণের মনোরঞ্জনের জন্য সেই রাত্রিতে নাটকাভিনয়ের ব্যবস্থা হইয়াছিল, কিন্তু সেই বৃষ্টির মধ্যে অনেকেই অভিনয় দেখিতে যাইতে পারেন নাই।

পরদিন প্রাতঃকালেই সভার অধিবেশন হইল;—এই শেষ অধিবেশন। সভাপতি চৌধুরী মহাশয় আজ উপস্থিত ছিলেন। এদিনেও অনেকগুলি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের চুম্বক পঠিত হইল; তাহাতে এত যত্নে লিখিত ও এমন তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধগুলি একেবারে শ্রীহীন হইয়া গেল। যাহা হউক, আমাদের সান্ত্বনার কথা এই যে, সম্মিলনে প্রবন্ধগুলির সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে না পারিলেও পরে মাসিক পত্রাদিতে সেগুলির দর্শনলাভ ঘটিবে।

প্রবন্ধ পড়িবার পর বক্তৃতার পালা। কলিকাতার

প্রসিদ্ধ বাগ্মী সাহিত্য-সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় বক্তৃতা করিলেন, মনস্বী শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় বক্তৃতা করিলেন, অদ্বিতীয় বক্তা শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দোপধ্যায় মহাশয় সুললিত, প্রাণস্পর্শী ভাষায় একটি সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিলেন। তাহার পর মামুলী ধন্যবাদ আরম্ভ হইল। ধন্যবাদের পালা শেষ হইলে ঢাকার প্রসিদ্ধ গায়ক বৃদ্ধ শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ রায় মহাশয়, কাঙ্গাল হরিনাথের রচিত "এই কি সেই আর্য্যস্থান—আর্য্যসন্তান" গান করিয়া সভাস্থ সকলকে মোহিত করিয়াছিলেন। তাহার পরই উত্তর বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের কার্য্য শেষ হইল।

দিনাজপুরের মাননীয় মহারাজা বাহাদুর সেই দিন অপরাহ্নকালে তাঁহার প্রাসাদে একটী সান্ধ্য-সমিতির বিপুল আয়োজন করিয়াছিলেন এবং সকলকেই সেই সম্মিলনে যোগদান করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। কিন্তু সেদিন বৃষ্টি আরও বেশী করিয়া নামিল, রাস্তা ঘাট জলে ভাসিয়া গেল! তবুও অধিকাংশ ভদ্রলোক এই সান্ধ্য-সমিতিতে যোগদান করিয়াছিলেন। রাজবাড়ীর প্রাঙ্গণে সম্মিলন-মণ্ডপ নির্ম্মিত হইয়াছিল, নানাপ্রকার আমোদ প্রমোদের আয়োজন হইয়াছিল; কিন্তু অবিশ্রান্ত বৃষ্টিতে সবই মাটি করিয়া দিল! তবুও সেই দিন সন্ধ্যার পর আমরা সকলেই মহারাজার প্রাসাদে সমবেত হইয়া অতুল প্রীতি লাভ করিয়াছিলাম; মহারাজা বাহাদুরের ব্যবহারে সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তাহার পর বিরাট ভোজ—তাহার বর্ণনা করিতে পারিব না—তাহা ভোগ্য, শ্রাব্য নহে। একটি কথা বলিলেই আয়োজনের গুরুত্ব সকলে বুঝিতে পারিবেন:—দিনাজপুরে একটি ডাবের মূল্য পাঁচ ছয় আনা, কারণ সেখানে ডাব মিলে না; এই রাজবাড়ীর ভোজে পাঁচ ছয় শত লোক যিনি যতগুলি ইচ্ছা তাহার সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন। রাত্রি দশটার পর এই আনন্দ-সম্মিলন শেষ হয়, আমরা মহারাজা বাহাদুরকে অভিবাদন করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম। পরদিন দিনাজপুর হইতে ১২ মাইল দূরবর্ত্তী কান্তনগরে কান্তজির মন্দির দেখিতে যাইবার ব্যবস্থা ছিল; কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য বশতঃ পরদিন এক-ঘণ্টার জন্যও বৃষ্টি থামিল না,—কান্তজির মন্দিরে যাওয়া হইল না। সেই রাত্রিতেই আমরা দিনাজপুর ত্যাগ করিলাম।—বৃষ্টি মাথায় করিয়া দিনাজপুর সহরটি দেখিবারও অবকাশ পাইলাম না। আমাদের 'ভারতবর্ষে'র পক্ষ হইতে একজন ফটোগ্রাফারকে কএক দিন পূর্ব্বে দিনাজপুরে প্রেরণ করা হইয়াছিল; তিনি এই মেঘবৃষ্টির মধ্যেও অনেক চেষ্টা করিয়া যে কএকখানি ফটো তুলিতে পারিয়াছিলেন, তাহাই আমার এই প্রবন্ধে দিলাম। যাহা দর্শন করিবার সুবিধা হইল না, তাহার বর্ণনা আর কি দিব?

দিনাজপুরের সাহিত্য-সম্মিলন।

অবশেষে দিনাজপুরের মহারাজা বাহাদুর, অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক, সদস্যবর্গ ও স্বেচ্ছাসেবকগণকে সর্ব্বান্তকরণে অভিবাদন করিয়া আমি আমার ঢাকের বাদ্য শেষ করিলাম:—আপনারা সমস্বরে বলুন, "রাম, বাঁচা গেল!"

দ্বিজেন্দ্র-বন্দনা।

(সুর—'আমার দেশ')

বঙ্গ তোমার, জননী তোমার, ধাত্রী তোমার, তোমার দেশ,—
হেরিয়া তোমার মুদিত নয়ন, হেরিয়া তোমার স্থিরকেশ,
হেরিয়া তোমার ধূলায় শয়ন, হেরিয়া তোমার শিথিল বেশ,
সপ্তকোটী মিলিত কণ্ঠে কাঁদে উচ্চে,—নাহিক শেষ।
কিসের দুঃখ, কিসের চিন্তা, কিসের অশ্রু, কিসের ক্লেশ,
"ধন্য কীর্ত্তি দ্বিজ-ইন্দ্র! গায়ে যখন কালের শেষ॥"

একদা যাহার সরস কণ্ঠ হাসায়ে বাঙলা করিল জয়,
একদা যাহার দীপক-গীত ছায়িল ভারত-অম্বরময়,
ছন্দ যাহার ভাষার অঙ্গে পরাল কত না নবীন বেশ,
তার কিনা আজি ধূলায় শয়ন, তার কিনা আজি হইল শেষ!
কিসের দুঃখ, ইত্যাদি।

গায়িল যে জন মুরজ-মন্দ্রে নাটক পুঞ্জে মধুর তান,
ব্যক্ত করিল প্রতাপ-মহিমা দুর্গাদাস রাঠোর মান,
দেখাল যতেক মোগলসিংহ, গায়িল দিব্য মেবার-শেষ,
ধন্য আমরা পাইয়া তাহায়, ধন্য তাহার পুণ্য দেশ!
কিসের দুঃখ, ইত্যাদি।

লইল যাহারে শ্বেতবসনা মুক্ত করিয়া স্বর্গদ্বার,
আজি গো কতই ক্ষুদ্র মহৎ ভক্তি-প্রণত চরণে যার,
সাহিত্য অপার কীর্ত্তি ঘোষিল পরায়ে যাঁহাকে অমর বেশ,
অকাল-মৃত্যু গ্রাসিল তাহারে! নাহিক হৃদয়ে দয়ার লেশ
কিসের দুঃখ, ইত্যাদি।

যদিও তোমার নিত্যবিরহে নেহারি কেবল আঁধার ঘোর,
কেটে যাবে শোক, তোমারি গরিমা মোহের রজনী করিবে ভোর,
আমরা পূজিব প্রতিমা তোমার, মানুষ আমরা নহিত মেষ,
জ্যোতি তোমার, ধর্ম্ম তোমার, সাধনা তোমার ব্যাপিবে দেশ!
কিসের দুঃখ, ইত্যাদি।

শ্রীললিতচন্দ্র মিত্র।

আমার য়ুরোপ-ভ্রমণ।

আয়োজন।

আমাদের বৰ্দ্ধমানের জনসাধারণ যখন জানিতে পারিলেন যে, আমি য়ুরোপ-ভ্রমণের কল্পনা করিয়াছি, তখন এই সংবাদে সহরের চারিদিকে ভারি একটা আন্দোলন উপস্থিত হইল। অবশ্য রাজবাড়ীর লোকদিগের মধ্যে এ সম্বন্ধে আন্দোলন-আলোচনা হওয়া স্বাভাবিক; কিন্তু যাহারা কোন দিন আমার কোন ব্যাপার সম্বন্ধে কোন তত্ত্ব লওয়া প্রয়োজন মনে করে নাই, তাহারাও আমার য়ুরোপ-ভ্রমণের কল্পনার কথা শুনিয়া বিশেষ আগ্রহভরে এই কথার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইল, আমার জন্য তাহাদের মাথাব্যথা অত্যধিক মাত্রায় বৃদ্ধি হইল।

দেখিতে দেখিতে এই সংবাদ সহরের ছোট বড় সকলেই অবগত হইলেন-- সংবাদটি তাঁহাদের মধ্যে একটা বিশেষ আন্দোলন তুলিয়া দিল। অধিকাংশ লোকেই আমার এই সঙ্কল্পের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিলেন---চারিদিকে আমার নিন্দাবাদ প্রচারিত হইতে লাগিল---প্রায় সকলেই বলিতে লাগিলেন, আমি অতি গর্হিত সঙ্কল্প করিয়াছি। তাহার পর আমার নিকট যে কত পত্র আসিয়াছিল, তাহা বলিয়া উঠিতে পারি না; সকল পত্রেই এই ভ্রমণ-সঙ্কল্প ত্যাগ করিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করা হইয়াছিল; অনেক অনুরোধ উপরোধ, অনেক আবেদন নিবেদনও আমাকে শুনিতে হইয়াছিল; সকল গুলিরই সার মর্ম্ম এই যে, আমি অতি অন্যায় কার্য্য করিতে যাইতেছি-- স্বধু অন্যায় নহে, আমার এই কার্য্যকে অনেকে গুরুতর পাপকার্য্য বলিয়া অভিহিত করিতেও দ্বিধা বোধ করিলেন না। য়ুরোপ-যাত্রার পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত এই প্রকার প্রতিকূল মতের সহিত আমাকে সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। যাক্, এ সকল আমার ব্যক্তিগত কথা;---ইহার বিশেষ বিবরণ প্রদান করার প্রয়োজন নাই। তবে এই স্থানে দুইটি কৌতুককর কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। আমার বৰ্দ্ধমান ত্যাগের পূর্ব্বে উত্তর-ভারতের একজন প্রধান হিন্দু মহারাজার নিকট হইতে আমি একখানি স্নেহ ও বাৎসল্যপূর্ণ পত্র পাইয়াছিলাম। তিনি সেই পত্রে আমাকে য়ুরোপে গমন করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে য়ুরোপ-গমন অত্যন্ত অহিন্দু কার্য্য; কিন্তু রহস্যের বিষয় এই যে, সেই পত্রেরই শেষাংশে তিনি বলিয়াছেন যে, হাঁ, যদি সম্রাটের অভিষেক বা জুবিলি উপলক্ষে এই বিলাত-গমনের আয়োজন হইত, তাহা হইলে কালাপানি পার হইবার যথেষ্ট উপযুক্ত কারণ বিদ্যমান ছিল, অর্থাৎ তাহা হইলে আমার এই ভ্রমণের সঙ্কল্প কোন অপরাধের বা পাপের কারণ হইত না। একই পত্রে এই দুই প্রকার অভিমত দেখিয়া আমি বিশেষ আমোদ অনুভব করিয়াছিলাম এবং একজন হিন্দু মহারাজার মতের গুরুত্ব বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলাম।

তাহার পর আর একটি ঘটনার কথা বলি। আমি যে দিন যাত্রা করিব, সেই দিন প্রাতঃকালে শুনিলাম আমার য়ুরোপ যাত্রার একজন সঙ্গী-- আমার পার্শ্বচর---ইংরেজিতে যাহাকে A. D. C. বলে, এই রকম একজনের উদ্দেশ পাওয়া যাইতেছে না। ইনি আমার একজন আত্মীয়। শুনিলাম, পূর্ব্ব রাত্রিতে তিনি কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছেন, অথবা সোজা কথায় বলিতে হইলে, তাঁহাকে সরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহার পর আমি জানিতে পারিলাম যে, মনের দৌর্ব্বল্য ও প্রিয়তমা পত্নী ও আত্মীয়-স্বজনের বিরাগের ভয়ই তাহাকে এই পলায়ন কার্য্যে প্রণোদিত করিয়াছিল। যাত্রার দিন এই অতর্কিত অন্তর্দ্ধান আমাকে একটু বিব্রত করিয়া ফেলিয়াছিল এবং সে জন্য কিঞ্চিৎ অধিক অর্থব্যয়ও করিতে হইয়াছিল। আরও একটা কৌতুকের কথা আছে। সেই দিনই স্থানীয় একখানি বাঙ্গলা সংবাদ-পত্রে একটি মনোহর মন্তব্য প্রকাশিত হইল। সম্পাদকপ্রবর আমার পলায়িত পার্শ্বচর মহাশয়ের এই ভীরুতার অশেষ প্রশংসাবাদ করিয়া অবশেষে বলিয়াছিলেন যে, এই মহাত্মা হিন্দুধর্ম্মের উচ্চতম আদর্শ সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াই ম্লেচ্ছদেশে গমনে নিবৃত্ত হইয়াছিলেন।

সংবাদপত্রখানি ত এই পর্য্যন্ত বলিয়াই লেখনীকে বিশ্রাম-দান করিলেন, কিন্তু স্থানীয় লোকেরা আরও একটু অগ্রসর হইলেন; তাঁহারা চারিদিকে ঘোষণা প্রচার করিলেন যে, যেহেতু আমার পার্শ্বচর মহাশয় পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়াছেন, সেই জন্য আমি য়ুরোপ-ভ্রমণের সঙ্কল্প সেই দিন ত্যাগ করিয়াছি।

তাঁহারা নিশ্চয়ই জানিতেন যে, সেই দিন সন্ধ্যার মেল গাড়ীতে আমি যাত্রা করিব, তবুও তাঁহারা বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন যে, আমি গমনের সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়াছি। তাহার পর যখন সন্ধ্যা সমাগত হইল, আমার দ্রব্যজাত রেল-ষ্টেশনে প্রেরিত হইতে লাগিল, আমি যথাসময়ে সদলবলে ষ্টেসনে উপস্থিত হইয়া আমার জন্য নির্দ্দিষ্ট সেলুন গাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম, তখন সকলেই বুঝিতে পারিলেন যে, আমি আমার সঙ্কল্প ত্যাগ করি নাই, পর-কুৎসাপ্রিয় ব্যক্তিগণও তখন জানিতে পারিলেন যে, তাঁহাদের ঘোষণা অমূলক প্রতিপন্ন হইল। তখন এই মহারথবৃন্দ আর এক সুরে গান ধরিলেন। গাড়ী ছাড়িবার কিছুক্ষণ পূর্ব্বে দেখিলাম যে, রেলষ্টেসনে আমার আত্মীয়গণ, রাজকর্ম্মচারিবৃন্দ, এবং আমার দেশীয় ইংরেজ বন্ধুগণ আমার বিদায় সংবর্দ্ধনার জন্য সমবেত হইয়াছেন। ইতঃপূর্ব্বে এই প্রকার ব্যাপারে যাঁহারা কখনও যোগদান করেন না, এমন অনেক ব্যক্তিকে ষ্টেসনে দেখিয়া আমি আশ্চর্য্য বোধ করিলাম, কৌতুকও অনুভব করিলাম।

১৯০৬ খৃষ্টাব্দের ১৭ই এপ্রিল তারিখটি আমার বহুদিন মনে থাকিবে। কারণ, বহুকাল হইতে আমাদের রাজ-পরিবার হিন্দুসমাজের একটি শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া আছে। সেই পারিবারিক রীতি-পদ্ধতি উল্লঙ্ঘন করিয়া, এবং শত সহস্র বাধা ও আপত্তিতে বিচলিত না হইয়া, এই দিনে আমি আমার সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিয়াছিলাম। ভগবান্‌কে ধন্যবাদ যে, আমি এত বাধা বিঘ্নের মধ্যেও আমার সঙ্কল্পচ্যুত হই নাই। তাহার পর আমি য়ুরোপ ভ্রমণ শেষ করিয়া দেশে প্রত্যাগত হইয়াছি এবং আমার ভ্রমণ-কাহিনী—নানা স্থান পরিভ্রমণ করিয়া যে আনন্দলাভ করিয়াছি, অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছি, যে উপকার লাভ করিয়াছি, তাহারই পরিচয় দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি; অবশ্য এ বিবরণ যে অতি সুন্দর হইবে না, তাহা আমি বেশ বুঝিতেছি।

বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর।

শ্রীবিজয় চন্দ্‌ মহ্‌তাব্‌।

সঙ্কলন।

বৌদ্ধ অন্ত্যেষ্টি।

বস্তুতঃ "পৃথিবীর এক দৃশ্য সূতিকাগৃহ, আর এক দৃশ্য শ্মশান।" কিন্তু আমরা মুখে "সামগমা সাপগমা সর্ব্বমুৎপাদি ভঙ্গুরম্‌" ইত্যাদি সর্ব্বকিছুই বলিনা কেন, কদাপি এই উভয় দৃশ্যে তুল্যরূপ আনন্দ লাভ করিতে পারি না। সূতিকাগৃহের নিরাবিল বায়ুতে হৃদয় যেমন সুশীতল হইয়া যায়, ধূমপটলাচ্ছন্ন শ্মশানভূমির পাশ দিয়া যাইতেও ততোধিক কাতর হইয়া পড়ে! পক্ষান্তরে সূতিকাগৃহের উলুধ্বনির স্বরতরঙ্গে প্রাণের অন্তস্তল পর্য্যন্ত যেরূপ মাতিয়া উঠে, শ্মশানের বিকট আর্ত্তনাদে তাহার সম্ভাবনা কোথায়? তবে যাহারা উৎসবে বা ব্যসনে সমান আসক্ত, অধিকন্তু জন্মোৎসব অপেক্ষা মৃত্যুৎসবে অধিকতর অনুরাগী, তাহাদের ক্রিয়ানুষ্ঠানই সর্ব্বাপেক্ষা দেখিবার ও ভাবিবার বিষয়!

কর্ম্মযোগী ভগবান্‌ বুদ্ধদেব জীবনের সত্তা ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বাক্য এবং কার্য্যে আজীবন যে সমুদয় লোকশিক্ষা প্রদান করিয়াছেন, তদীয় ভক্তসম্প্রদায়ের মধ্যে তাহা কোন কোন অংশে বিশেষভাবে কার্য্যকরী হইয়াছে। বক্ষ্যমান অন্ত্যেষ্টিপ্রথা তাহারই অন্যতম। ইঁহাদের মৃত্যুও যেন এক একটি মহোৎসব! আজ তাহারই এক সংক্ষিপ্ত বিবরণী "ভারতবর্ষের" প্রিয় পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি।

পার্ব্বত্য চট্টগ্রামে চাক্‌মা নামে এক বৌদ্ধসম্প্রদায়ের বাস, এস্থলে প্রথমেই তাহাদেরই অন্ত্যেষ্টি পদ্ধতি বিবৃত করি। তাহারা মৃত্যুর পর স্নানাদি করাইয়া শবকে নববস্ত্র পরিধান করায় এবং শয়নগৃহেরই এক কক্ষে তিনটি বংশ-বোঝা সংস্থাপন করিয়া তদুপরি শয্যা রচনা পূর্ব্বক উহাকে তাহাতে চিৎ করিয়া শোয়াইয়া রাখে। অনন্তর শবের শিরোদেশে ও পদপ্রান্তে দুইটি অন্নপিণ্ড এবং বক্ষোপরি কতকগুলি খই ও একটি টাকা রাখার পর ফুঙ্গী "মালেম তারা" * পাঠ আরম্ভ করেন; রাজা বা গণ্যমান্য লোকের মৃত্যুতে "আরেন্ডামা তারা"ও পঠিত হইয়া থাকে। এই সময়ে সঙ্গে সঙ্গে ঢোলাদি বাদ্যোৎসবও চলিতে থাকে, এবং শবরক্ষক যুবকগণ ঢোল বাজাইতে বাজাইতেই রাত্রি যাপন করে। অন্ত্যেষ্টির আয়োজন এবং আত্মীয় স্বজনের আগমন পর্য্যন্ত শব এইরূপ ভাবেই থাকে, পরে সুবিধানুরূপ দিনে চরম সংস্কারের নিমিত্ত সকলে প্রস্তুত হয়। বুধবার "ফাঁবার", সুতরাং সেইবারে মৃতসংস্কার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ; তদ্ভিন্ন অনেক পরিবারে শুক্রবারেও অন্ত্যেষ্টি স্থগিত থাকে; কিন্তু শব যতদিন গৃহে থাকে, বাড়ীতে ততদিন উনুন জ্বলে না; পরিবারস্থ সকলে নিকটবর্ত্তী আত্মীয় বা প্রতিবেশীর গৃহে একে একে আহার করিয়া আসে।

একশৃঙ্গক রথ।

নির্দ্ধারিত দিনে সংস্কারের যথাবিধি আয়োজন হইলে পূর্ব্বস্থাপিত অন্নপিণ্ডদ্বয় হইতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সাতবার শবের মুখে স্পর্শ করাইয়া ফেলিয়া দেয়; তৎস্থলে পুনরায় দুইটি সদ্যপক্ক অন্নপিণ্ড স্থাপন করে। অনন্তর শবের পাদকনিষ্ঠাঙ্গুলিতে সপ্তলহর সূত্রের এক প্রান্ত বদ্ধ করিয়া অপর প্রান্ত একটি মোরগ-শাবকের অঙ্গুলিতে বাঁধিয়া দেয়, এবং মৃতব্যক্তির পরিবারস্থ সকলে সেই মোরগ-শাবক ধরিয়া থাকে। তখন পাড়ার জনৈক বয়োবৃদ্ধ সূত্রের নিম্নে একখণ্ড কাষ্ঠস্থাপন করেন এবং দা হস্তে সমাগত হইয়া সকলকে জিজ্ঞাসা করেন, 'মরা হইতে জীবিতদের সম্বন্ধ ছিন্ন করিতে হুকুম আছে কি না?' তখন সকলে 'আছে'—'আছে' বলিয়া উঠিলে, মধ্যস্থলে একই ঘায়ে মৃত জীবিতদের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। তৎপরে "আনিজ্যা তারা" পাঠ আরম্ভ হয়, এবং তাহা সম্পূর্ণ হইলেই সকলে শবকে শ্মশান ভূমিতে লইয়া চলে। সচরাচর স্রোতস্বতী-তীরেই শ্মশান নির্ব্বাচিত হয়; তথায় আনয়নের পর শেষোক্ত অন্নপিণ্ডদ্বয় হইতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সাতবার শবের মুখস্পর্শ করাইয়া ফেলিয়া দেয়।

পূর্ণবয়স্কের মৃত্যুতে সমর্থপক্ষে শ্মশানে রথ টানিবার আয়োজন হয়। এই রথ-নির্ম্মাণেও আবার ইতরবিশেষ ব্যবস্থা আছে। রাজ-পরিবারে বা তদঘনিষ্ঠ কেহ মরিলে "পঞ্চরত্ন" রথ প্রস্তুত হয়, অপর সাধারণের মৃত্যুতে একটি মাত্র শৃঙ্গ থাকে। চিত্রে

* "তারা" শব্দের অর্থ শাস্ত্র। চাকমাদিগের মধ্যে এইরূপ একখানি "আগর তারা" অর্থাৎ পৌরাণিক শাস্ত্র আছে।

একটি একশৃঙ্গক রথের নমুনা প্রদর্শিত হইল। কাষ্ঠমঞ্জুষায় নানা সুগন্ধ-দ্রব্যাদির সহিত শব রাখিয়া, সেই শবাধার যেরূপে রথোপরি স্থাপন করা হয়, চিত্রে তাহা মধ্যভাগে পরিদৃষ্ট হইতেছে। অতঃপর উপস্থিত সকলে সমান দুই দলে বিভক্ত হইয়া পরস্পর বিপরীতাভিমুখে টানিতে থাকে। এই টানাটানির চিত্রও এইখানে প্রদর্শিত হইল। দুইদলের একপক্ষকে "স্বর্গের দূত", এবং অপরপক্ষকে "নরকের দূত" কল্পনা করা হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, তাহাদের হারজিতের দ্বারাই মৃতব্যক্তির পরলোকের আশ্রয়স্থান বলিতে পারা যায়। পরন্তু বিশেষ বিবেচনা সহকারেই দল দুইটি নির্ব্বাচিত হয়,—ইহাতে "স্বর্গীয় দূতদেরই" জয়লাভ ঘটে। পূর্ব্বে এই রথ টানিবার নিমিত্ত বিবাহিত এবং অবিবাহিতদিগের মধ্যে প্রতিযোগিতা হইত। বর্ত্তমানে বিবাহিতের সংখ্যা অধিক হইয়া যাওয়াতে, গোষ্ঠীভেদে অথবা নদীর বিপরীত তীরবাসীদের মধ্যে এই প্রতিযোগিতা হইয়া থাকে। বলিয়া রাখা ভাল, এই সময়ে নানাবিধ বাদ্য, বাজীপোড়ান প্রভৃতি হইয়া থাকে।

শবাধার।

বাজি পোড়াইবার উৎসব।

সচরাচর শব দাহ করিয়া বিনষ্ট করা হইয়া থাকে, কিন্তু অনুদ্গত দন্তক শিশুর শব ভূপ্রোথিত করাই সাধারণ বিধি। যদি কেহ তেমন শবকেও পোড়াইতে ইচ্ছা করে, তবে মুখে কড়িস্পর্শ করাইয়া জ্বালাইতে পারে। এতদ্ভিন্ন বসন্ত বা বিসূচিকাদি সংক্রামক রোগে মৃতের দেহ প্রথমে ভূগর্ভে পুতিয়া রাখে, এবং দুই তিন মাস পরে, সেই শব তুলিয়া যথানিয়মে জ্বালাইয়া দেয়। তাহাদের বিশ্বাস এসকল ছোঁয়াচে রোগের শব সদ্য জ্বালাইলে, তৎক্ষণাৎ উক্ত রোগে গ্রাম প্রায় উৎসন্ন করিবে। ইহাদের শব দগ্ধ করিবার নিমিত্ত চুলার প্রয়োজন হয় না। দুই পার্শ্বে দুইটি মোটা গুঁড়ি স্থাপন করিয়া তদুপরি পুরুষের নিমিত্ত পাঁচ তবক এবং স্ত্রীলোকের সাত তবক—সরুকাষ্ঠ সাজাইয়া লয়। * মধ্যে মধ্যে আমপল্লব দেওয়ার নিয়ম আছে, ধনাঢ্যেরা তৎপরিবর্ত্তে চন্দনকাষ্ঠ দিয়া থাকেন। চিতার চতুষ্কোণে চারিটী বাঁশ পুতিয়া শীর্ষদেশে একখানি চন্দ্রাতপও টাঙ্গাইয়া দেওয়া হইয়া থাকে। অনন্তর পুরুষের শব পূর্ব্বশিয়র এবং স্ত্রীলোকের শব পশ্চিম-শিয়র করিয়া চিতার উপর স্থাপন পূর্ব্বক জ্যেষ্ঠপুত্র, তদভাবে অপর কোন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়, সপ্তবার প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক মুখাগ্নি প্রদান করে; সঙ্গে সঙ্গে আরও কয়েক ব্যক্তি চতুর্দ্দিক হইতে অগ্নিসংযোগ করিয়া দেয়। এই সঙ্গে মৃতব্যক্তির গৃহের একটি খুঁটি, কি একটি বাঁশ—যে কোন একটি অংশ—পরজন্মে আশ্রয়ার্থ দগ্ধ করা হয়। প্রাপ্তবয়স্কের শবদেহ প্রজ্বালনকালে বাদ্যোৎসবের প্রচলন আছে, অবস্থাপন্ন হইলে বাজী পোড়াইবার ব্যবস্থাও করা হয়। পরিশেষে দাহকার্য্য সমাধা হইয়া আসিলে, কাষ্ঠ

* মগদিগের মধ্যেও স্ত্রীলোকের নিমিত্ত অধিকতর কাষ্ঠ ব্যবহৃত হয়। হয়ত চাক্‌মাগণ তাহাদিগের নিকট হইতেই ইহা অনুকরণ করিয়াছে; কিন্তু জানি না, ঈদৃশ অনুষ্ঠানের মধ্যে কোন্ বিশেষ রহস্য নিহিত আছে। কাপ্তেন্ লেইন্ তদীয় "The Hill Tracts of Chittagong and the Dwellers therein" নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন, স্ত্রীলোকদিগের দৈহিক আয়তন এবং তৈলাক্ত পদার্থ অধিক বলিয়া অল্প দা[illegible] করণের প্রয়োজন হইবার কথা; কিন্তু ইহারা তৎস্থলে আরও অধিকই ব্যবহার করিয়া থাকে।

...গিরি তারা" পাঠ করেন। গর্ভাবস্থায় মরিলে আগে পেট ... ভ্রূণ বাহির করিয়া পরে জ্বালায়, এবং সেই ভ্রূণকে ... করে। * আর যদি কেহ ভূতগ্রস্ত হইয়া প্রাণ হারায়, তাহা ... সেই শব অর্দ্ধদগ্ধ হইবার পর বক্ষের নিম্ন ভাগ দ্বিখণ্ডিত করিয়া ...ওয়া হয়। অন্যথায় নাকি সেই ব্যক্তি পুনরুজ্জীবিত হইয়া ... অহিত সংঘটন করে। পুরাকালে আত্মহত্যাকারীদিগের ...বের প্রতিও ঈদৃশী ব্যবস্থা করা হইত।

"রাওলী" † অর্থাৎ ফুঙ্গীদিগকে পোড়াইবার নিমিত্ত মগদিগের মধ্যে বিশেষতঃ যেরূপ উদ্যোগ আয়োজন ও অর্থব্যয় করিবার প্রথা আছে, তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। জ্ঞানপ্রবীণ রাওলীর অন্ত্যেষ্টিকে ইহারা প্রধানতম মহাপুণ্য বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকে। এমন কি স্থানান্তরে কোন রাওলীর মৃত্যু হইলেও অন্ত্যেষ্টির দিনে দুইতিন দিনের পথ ... সকলে আসিয়া উক্ত পুণ্যব্রতে যোগদান করে; এবং স্বদেশের কোন রাওলী কোনরূপে বিদেশে গিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, দেশবাসীরা কিছুতেই বিদেশীকে সেই পুণ্য প্রতিষ্ঠা সম্পাদন করিতে দেয় না, অধিকন্তু নানা আড়ম্বরে তদীয় শব দেশে আনয়ন করে। ... কাষ্ঠমঞ্জুষায় এই শব রক্ষা করা হয়, তাহা কেবল নানাবিধ কারুকার্য্য খচিত নহে, উপরন্তু স্বর্ণ ও মণিমুক্তাদিতে বিমণ্ডিত করা হইয়া থাকে। তাদৃশ অন্ত্যেষ্টির উদ্যোগ আয়োজনে অন্ততঃপক্ষে তিনমাস হইতে ছয়মাস সময়ের প্রয়োজন হয়। এই সুদীর্ঘ কাল ধরিয়া শবাধারের তলায় চূর্ণ ও কয়লার গুঁড়া পুরিয়া তদুপরি শব স্থাপনানন্তর উপরিভাগে এবং পার্শ্বেও তদ্রূপ গুঁড়া ইত্যাদি দিয়া পরে চতুষ্পার্শ্বে ভাজে ভাজে তামাকপাতা জড়াইয়া রাখে। কোন কোন স্থলে এইরূপে প্রথমতঃ চন্দনকাষ্ঠের বাক্সে শব স্থাপনান্তর, সেই বাক্স পুনরায় ...বৃহদাকার বাক্সমধ্যে রক্ষা করা হয়। ইহাতে শবদেহ শীঘ্র পচিয়া গলিয়া যাওয়ার আশঙ্কা অনেকাংশে দূর হয়; দুর্গন্ধও প্রায় অনুভূত হয় না। বলাবাহুল্য রাওলীর শব তদীয় 'ক্যয়ং' অর্থাৎ মঠেই রক্ষিত হয়; গ্রামবাসী যুবকেরা স্বেচ্ছাক্রমেই পালা করিয়া ...ই শবের পাহারায় থাকে। ক্যয়ঙের যে প্রকোষ্ঠে শবরক্ষিত হয়, তাহাও বিবিধ সজ্জায় সজ্জিত করা হয় এবং প্রতিদিন তাহা ...ৰ্চ্চিত হইয়া থাকে।

যে রথে করিয়া রাওলীর শব বহন করা হয়, তাহার নাম "আলাং"; ইহা অনেকটা মহরমের তাজিয়ার, কিংবা কতক পরিমাণে জগন্নাথের রথের মত। দূর হইতে ইহাকে "ক্যয়ং" বলিয়া মনে হইয়া থাকে। এই "আলাং" নির্ম্মাণে ইহারা কারুকার্য্যের একশেষ প্রদর্শন করিতে ত্রুটী করে না। এক একটি "আলাং" প্রস্তুত করিতে তিন চারি সহস্র টাকা পর্য্যন্ত ব্যয় করিয়া থাকে। এক একটি "আলাং" ৭০।৮০ হাত পর্য্যন্ত উচ্চ করা হয়, ১০।১২ জন অভিজ্ঞ কারিকর অহর্নিশ পরিশ্রমে দীর্ঘকাল ধরিয়া ইহা প্রস্তুত করিয়া থাকে। এই আলাং প্রস্তুতের ভার ও ব্যয় স্থানীয় প্রতিবেশীদের উপরই পড়ে; অন্যান্য স্থানের মহল্লাদারেরা ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে চাঁদা প্রদানপূর্ব্বক "ধূম" প্রস্তুত করাইয়া আনে। "ধূম" কতকটা কামানেরই মত,—ইহাকে কামানের অন্যতম অসভ্য সংস্করণও বলা যায়। এক হাত হইতে তিনচারি হাত পরিধির এবং ছয় হাত হইতে আটদশ হাত দীর্ঘ গোলাকার বৃক্ষকাণ্ডের অভ্যন্তরভাগ আগাগোড়া ক্ষোদিত করিয়া, আটনয় ইঞ্চি ব্যাস পরিমাণের একটি "চোঙ্" প্রস্তুত করা হয়; তন্মধ্যে খুব ঠাসিয়া বারুদ পুরিলেই ধূম হইল। একমণ হইতে চারি পাঁচমণ বারুদ এক একটি ধূমের মধ্যে পূর্ণকরা হয় এবং যাহাতে তাহা সহজে ফাটিতে না পারে, তাহারও বিশেষ ব্যবস্থা থাকে। *

অন্ত্যেষ্টির মাসাবধি পূর্ব্ব হইতে মহল্লায় মহল্লায় দলে দলে লোক নির্ব্বাচিত হইয়া "ধূম"পোড়ায় প্রদর্শনের নিমিত্ত নাচগানের মহলা দেয়, কোন দল বৈষ্ণব, কোন দল সন্ন্যাসীর বেশও ধারণ করে; আবার বালকেরা স্ত্রীবেশ পরিধান করিয়া জাতীয় "ওয়াছা" নৃত্য করিয়া থাকে। নির্দ্দিষ্ট দিনে দূর দূরান্তর হইতে যথাসয়ে মহল্লাদারগণ সবান্ধবে "ধূমাদি" সহ আসিয়া উপস্থিত হয়। সুবিস্তৃত ও সুসজ্জিত ময়দানে দাহস্থান নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে। তথায় আবাল বৃদ্ধ-বনিতা সকলে দলে দলে আসিয়া যথাসময়ে উপস্থিত হইতে থাকে। ক্রমে যতই অন্ত্যেষ্টি কাল নিকটবর্ত্তী হয়, জনতা ততই বৃদ্ধি পাইতে থাকে; সমস্ত আয়োজন যথানিয়মে হইলে, তুমুল আড়ম্বরের সহিত শবসহ "আলাং" আনিয়া জনসঙ্ঘ মধ্যে সংস্থাপিত করা হয়। "ধূম"গুলিও তৎস্থলে আনিবার সময় নৃত্য গীতাদি আড়ম্বরের ত্রুটী হয় না। প্রত্যেক "ধূমের"

---

* এই প্রথা পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশের মগ ও ত্রিপুরাবাসীদের মধ্যেও ...ছে, সম্ভবতঃ ইহা হিন্দুদের আচার হইতে গৃহীত; পরন্তু এই পেট ...রিবার ভার স্বামী, অভাবে দেবরের স্কন্ধেই পড়ে।

† বার্ম্মিজ ভাষায় "রাগ" অর্থে বিষয়ানুরাগ, এবং "হাই" অর্থে ...য়, অর্থাৎ যিনি বিষয়ানুরাগ হনন করিয়াছেন। বস্তুতই ফুঙ্গীরা ...জীবন বিষয়ানুরাগ বর্জ্জিত হইয়া কৌমার্য্য-ব্রত অবলম্বন করিয়া ...কেন।

* "ধূমে" বারুদপূরণ ব্যাপারটিও বড়ই কৌতূহলোদ্দীপক। এই উদ্দেশ্যে প্রতি মহল্লায় মুষলের মত যন্ত্রবিশেষ প্রস্তুত করা হয়। সর্ব্বাগ্রে "ধূমের" এক প্রান্তে উক্ত যন্ত্রের সাহায্যে আটাল মাটি আঁটিয়া দেওয়া হয়, পরে এক সের বারুদ দিয়া প্রথমে একহাজার আশীবার মুষলাঘাতে তাহাকে ঠাসা হয়। তৎপরে প্রতিসের বারুদ ঠাসিবার সময় মুষলাঘাত সংখ্যা ক্রমেই বাড়াইতে থাকে। মহল্লার লোকমাত্রেই এই বারুদপূরণ কার্য্যে পালাক্রমে যোগদান করে, এবং মুষলাঘাতের সংখ্যা ঠিক রাখিবার নিমিত্ত জপমালায় হিসাব রাখিয়া থাকে।

সঙ্গে একটি করিয়া আম্রপল্লব সংযুক্ত জলপূর্ণ কলসী থাকে এবং "ধুমের" উপরিভাগে নানাবর্ণের পতাকা উড্ডীন হয়।

অনন্তর প্রায় দ্বিপ্রহর বেলায় অনুষ্ঠান আরব্ধ হয়। যে সকল সুবৃহৎ স্থূল রজ্জুতে "আলাং" আবদ্ধ থাকে, তাহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র "ধুম"গুলি ঝুলান থাকে। প্রথমে এই সকল ক্ষুদ্র "ধুমে" অগ্নি সংযোগ করা হয়। পরে বৃহৎ "ধুম" গুলিতে অগ্নি দেওয়া হয়। "ধুমে" অগ্নি সংযোগের পূর্ব্বে "ধুমের" অধিকারীরা প্রথমে উহাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক উহার চারিদিকে ঘিরিয়া নৃত্যগীত করিতে থাকে; আগুন দেওয়ার সময় "ধুমের" গতি যাহাতে সরল রেখায় থাকে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা হয়। বলাবাহুল্য বারুদে আগুন লাগিলে "ধুম" ভৈরব গর্জ্জনে "আলাং" অভিমুখে ছুটিতে থাকে, সকলেও সেই সঙ্গে তাহার পশ্চাদ্ধাবন করে। যাহাদের "ধুম" যত অধিক অগ্রসর হয়, তাহাদের তত অধিক সম্মান! আর তাহারা আপনাদিগকে দেবানুগৃহীত ও পুণ্যবান্ জ্ঞান করিয়া আনন্দে ও গৌরবে আস্ফালন করিতে থাকে। পক্ষান্তরে যাহাদের "ধুম" আশানুরূপ অগ্রসর নাহয়, তাহারা ক্ষোভে দুঃখে অধীর হইয়া "ধুমকে" পদাঘাত করিতে করিতে অশ্রাব্য গালি দিতে থাকে। এইরূপে "ধুম" পোড়ান শেষ হইলে, সেই প্রভূত যত্ন ও অর্থব্যয়ে নির্ম্মিত সহস্র সহস্র লোচনানন্দকর বিবিধ কারুকার্য্য-খচিত "আলাঙে" অগ্নিপ্রযুক্ত হয়;—দেখিতে দেখিতে অনলদেব লেলিহান জিহ্বা বিস্তার করিয়া বহুমূল্য নেত্রাভিরাম আধারসহ সেই শবদেহ ভস্মসাৎ করে।

অন্ত্যেষ্টির পরদিন প্রত্যূষে চিতা হইতে কতকগুলি অস্থিমাত্র সংগ্রহ করিয়া অবশিষ্ট ভস্মরাশি স্রোতের জলে নিক্ষেপ করে। অনন্তর মৃতব্যক্তির জনৈক স্বগোত্র সংগৃহীত অস্থিগুলি একটি হাঁড়িতে বন্ধ করিয়া লইয়া স্রোতস্বতীজলে নামে। হাঁড়িটি একটি সূতার একপ্রান্ত তাহার কনিষ্ঠাঙ্গুলিতে বাঁধা থাকে এবং অপর প্রান্ত তীর ভূমিস্থিত সগোত্রীয় সম্মানিত কোন ব্যক্তি টানিয়া ধরেন। জলস্থিত ব্যক্তি হাঁড়িটা চাপ দিয়া ডুবাইয়া ঠেলিয়া দিবামাত্রই, তীর

ধুমা পোড়াইবার উৎসব।

বর্ত্তী ব্যক্তি তন্মুহূর্ত্ত সূত্রাকর্ষণে উক্ত ব্যক্তিকে টানিয়া আনে। সপ্তাহান্তে শ্রাদ্ধ বিধান। এই আদ্য শ্রাদ্ধও শ্মশানভূমিতে অনুষ্ঠিত হয়। ক্রিয়াস্থলে প্রেতাত্মার প্রীত্যর্থে ধ্বজা, খট্টা, শয্যা, নানাবিধ তৈজস, মদ্য ও অন্ন ব্যঞ্জন প্রভৃতি বিবিধ ভোজ্যোপকরণ দক্ষিণা সহ উৎসর্গ করে। অতঃপর পরিবারস্থ সকলে কলসী ধরিয়া জল ঢালে—পরিবারের কাহারও অন্তঃপুর হইতে বাহির হইবার আপত্তি থাকিলে, সে বাড়ীতে বসিয়াই একটি সুদীর্ঘ সূত্রের এক প্রান্ত ধরিয়া থাকে, অপরপ্রান্ত দানভূমিস্থিত উক্ত কলসীর গলদেশে জড়ান হয়। সময়ে সমাগত আত্মীয় বন্ধুবান্ধবেরা প্রেতাত্মার উদ্দেশে ধ্বজ (বৃষ?) প্রতিষ্ঠা এবং দান "খয়রাত" ইত্যাদি পুণ্যানুষ্ঠান করিয়া থাকে। কথিত আছে, 'ধ্বজা দিবার এতই ফল যে, তৎসকালনে শ্মশানের রেণু যত সঞ্চালিত হয়, মৃতব্যক্তি তত বৎসর পর্য্যন্ত নির্ব্বিঘ্নে স্বর্গবাসের অধিকার লাভ করে।' সুতরাং ধ্বজা সংখ্যায় যত অধিক হইয়া থাকে স্বর্গবাসের সুবিধাও তত ঘটে। উপরে এইরূপ ধ্বজা মণ্ডিত এক শ্মশান-ভূমির চিত্রও প্রদর্শিত হইল; মৃতের চিতাস্থল উহাতে ঘেরা রহিয়াছে।

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ।

বিবিধ-প্রসঙ্গ।

প্রাচীন কলিকাতা।
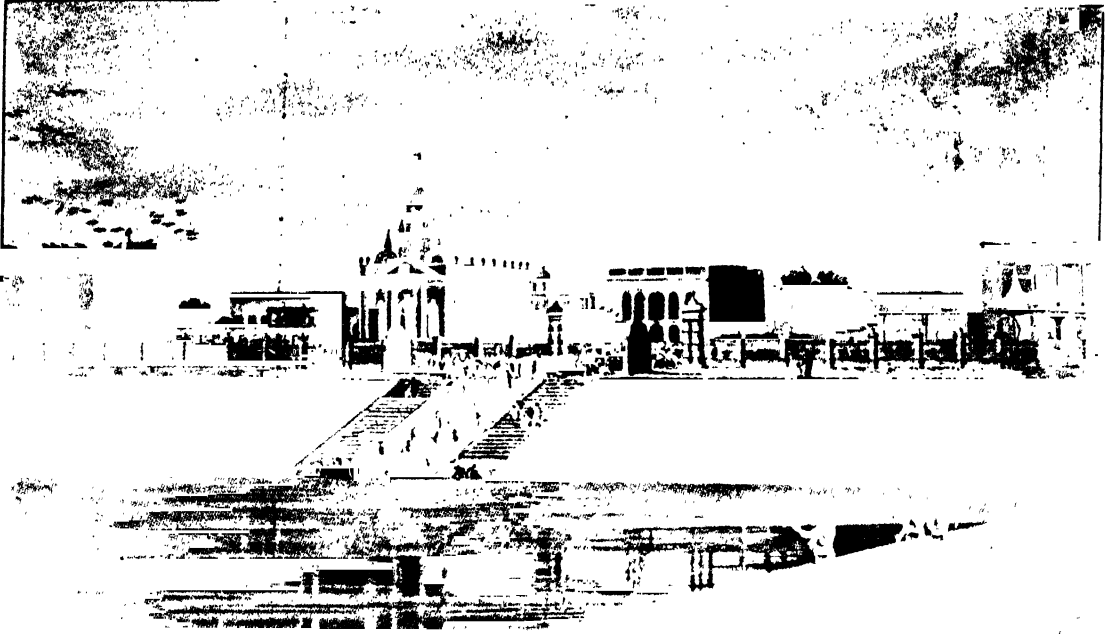
বৃহৎ পুষ্করিণী।

প্রাচীন-কলিকাতার দৃশ্যাবলীর মধ্যে ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে প্রাচীন [illegible]রেডভূমির সম্মুখস্থ বৃহৎ পুষ্করিণী ও তৎপার্শ্বস্থ রাস্তার দৃশ্য অতি মনোরম ছিল। আমরা ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দের ঐ পুষ্করিণীর একটি দৃশ্য উপরে প্রদান করিলাম।
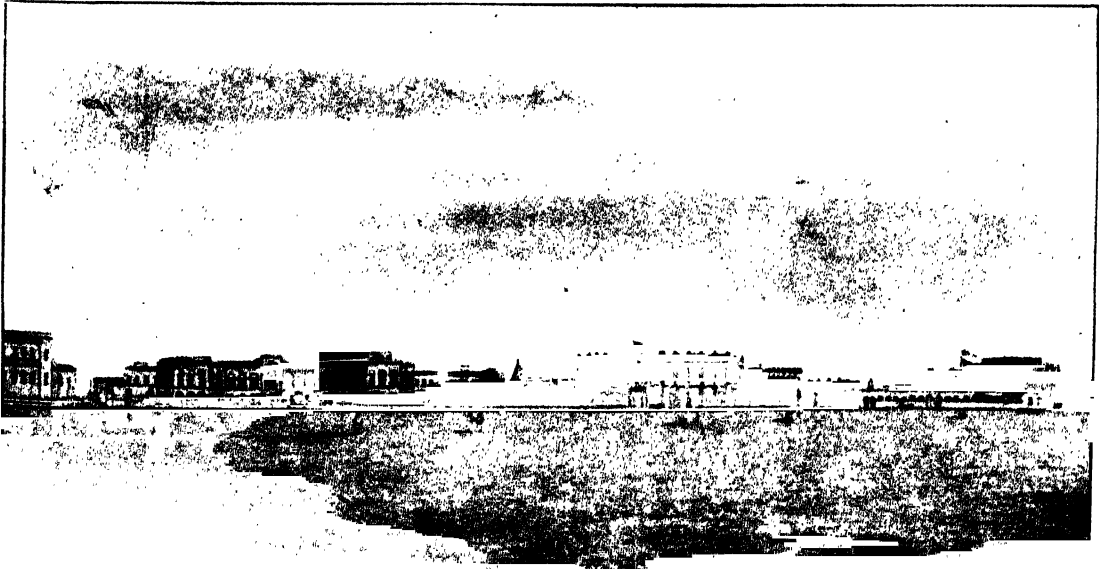
লংসাহেব লিখিয়াছেন যে, ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে কেল্লার ভিতর গভর্ণরের প্রাসাদ একেবারে জীর্ণ হইয়া পড়ে এবং সংস্কার ব্যতীত সেখানে বাস করা অসম্ভব হইয়া উঠে। সেই সময় গভর্ণরের বাসের জন্য ড্রেক সাহেবের বাড়ীখানি ১২,০০০ টাকা দিয়া ক্রয় করা হয়। এই বাড়ীর জমিতে পরে টঙ্কশালা হয়। ১৮১২ সালে তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়। পুরাতন টঙ্কশালার জমিতেই বর্ত্তমান ছোট আদালত অবস্থিত আছে। ১৭৮৯ সাল পর্য্যন্ত 'Govt. House' কোথায় ছিল, তাহা বলিতে পারা যায় না। ১৭৯৮ সালে Bailli কর্ত্তৃক প্রকাশিত চিত্রে দেখা যায়, Govt place-এর পূর্ব্ব এবং Esplanade যেখানে মিলিয়াছে, সেইখানে Govt. House ছিল। রাস্তা হইতে পশ্চাৎ পর্য্যন্ত বাড়ীটি প্রসারিত ছিল। এই বাড়ীতেই তখন রাজ-প্রতিনিধি থাকিতেন। তবে তাঁহার কর্ম্মচারীদিগের তথায় সঙ্কুলান হইত না বলিয়া Old Court House Street-এ ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে লাট কর্ণওয়ালিস ৬০০ টাকা ভাড়ায় একখানি বাড়ী লইয়াছিলেন।

ওল্ড কোর্ট হাউস্।

রিচার্ড বুরশিয়র (Richard Bourchior) সাহেব প্রথমে কলিকাতা কাউন্সিলের সভ্য ছিলেন এবং পরে বোম্বাইর গভর্ণরের পদে উন্নীত হন। ইনি ১৭২৭ খৃষ্টাব্দে "চ্যারিটী স্কুল" স্থাপনকল্পে নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। কএক বৎসর পরে, যখন কলিকাতায় "মেয়রের কোর্ট" সংস্থাপিত হয়, বুরশিয়র সাহেব ইহার স্থান সঙ্কুলানের জন্য 'কোর্ট হাউস্' নির্ম্মাণ করিয়া তাহা সরকারী সম্পত্তি করিয়া দিলেন। তবে সরকারকে 'চ্যারিটী স্কুলে, বার্ষিক ৪০০ পাউণ্ড করিয়া দিতে হইবে, এইরূপ এক কড়ার করিয়া লওয়া হয়। এক্ষণে যেস্থানে St. Andrew's Church" আছে, সেই স্থানে ৬০ বৎসর এই 'কোর্ট হাউস্' ছিল। এই কোর্ট হাউসের কিয়দংশ মেয়রের কোর্টের জন্য ব্যবহৃত হইত, অবশিষ্টাংশে অনেকের অনেক কার্য্যে আবশ্যক হইত। ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে ইহাতে আরও ঘর ও বারাণ্ডা বাড়াইয়া দেওয়া হয়। এই সময় হইতে ইহা নানা কার্য্যের জন্য ব্যবহৃত হইত এখানে যেমন ডাকঘর, কোয়ার্টার-সেসন্স অফিস ও নিলামের ঘর আছে, সেইরূপ নৃত্য, গীত ও সাধারণের আমোদ-প্রমোদেরও বন্দোবস্ত ছিল। ১৭৯২ সালে যখন দেখা গেলে যে, কোর্ট হাউসটি জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে, এবং ইহা নৃত্যাদি ব্যাপারে বড় নিরাপদ নয়, তখন এই বাড়ীখানিকে ফেলিয়া দেওয়া হয়। কুড়ি বৎসর এই জমি পড়িয়াছিল— অতঃপর ১৮১৫ খৃঃ এই স্থানটি স্কট্ গির্জ্জা নির্ম্মাণের জন্য গভর্মেণ্ট কর্ত্তৃক প্রদত্ত হয়।
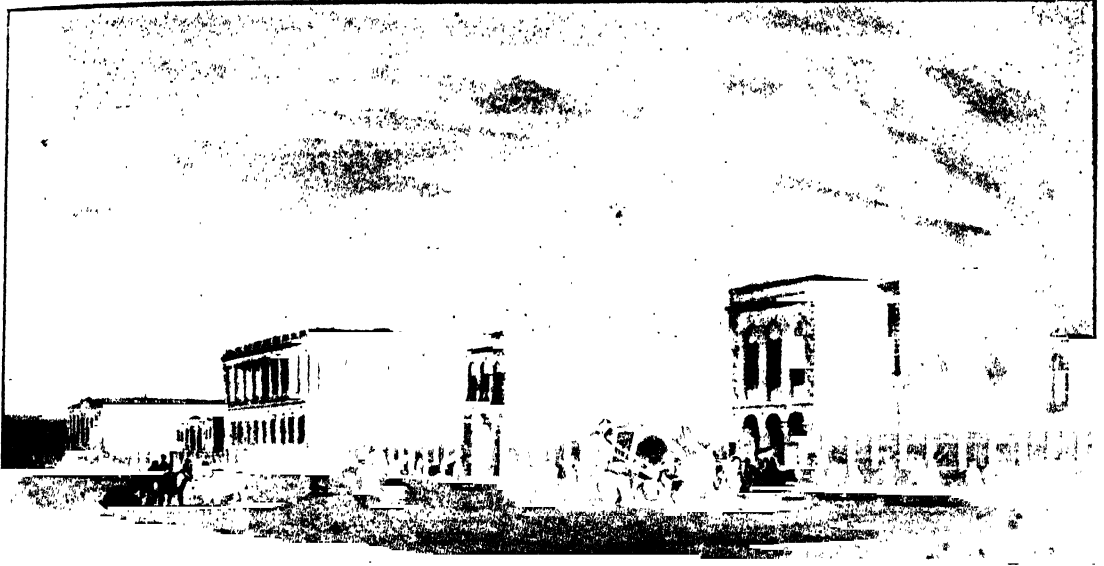
মন্ত্রণাগার (১৭৯২ খ্রীঃ)।

সরকার বাহাদুর ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ২২এ জুন স্থির করেন যে, তাহাদের একটি পরামর্শ-গৃহের প্রয়োজন; সুতরাং রিচার্ড কোর্ট সাহেবের বাড়ীটি খরিদ করিয়া সেই স্থানে পরামর্শ-গৃহ নির্ম্মাণ করা হউক। তদনুসারে ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে এস্প্লানেডের উপর গভর্মেণ্ট হাউসের পশ্চিম পার্শ্বে কাউন্সিল হাউস (মন্ত্রণাগার) নির্ম্মিত হয়। তাহা হইতেই বর্ত্তমান কাউন্সিল হাউস্ ষ্ট্রীটের নামকরণ হইয়াছে।
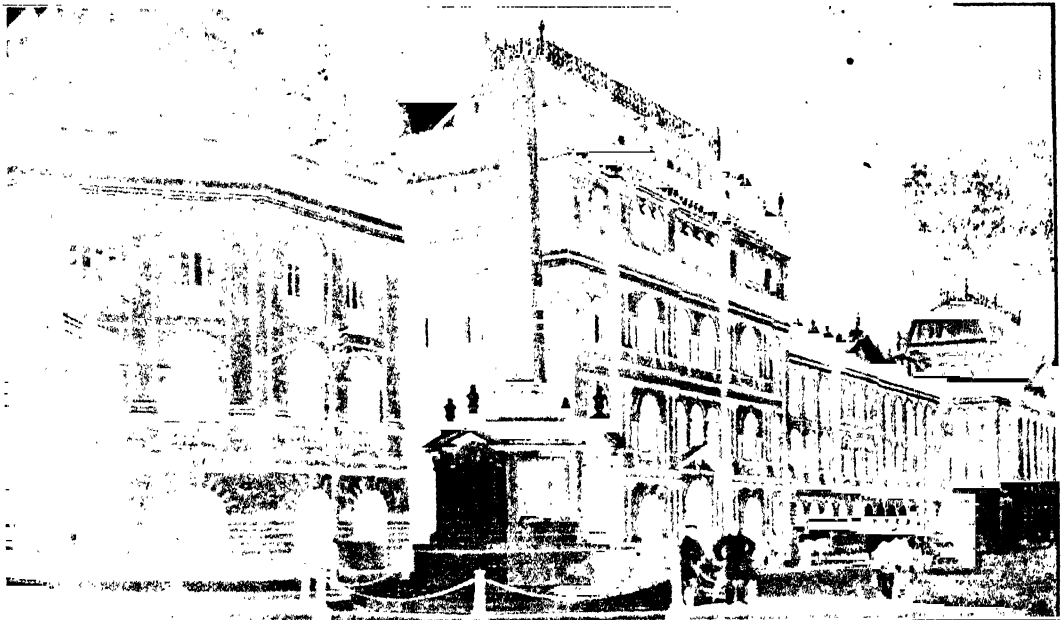
বেঙ্গল সেক্রেটেরিয়েট (১৭৮৮ খ্রীঃ)।

লালদীঘির উত্তরস্থিত প্রকাণ্ড বাড়ীটি প্রায় শতবর্ষ ধরিয়া 'Writers' buildings' নামে পরিচিত আছে। R. C. Sterndale সাহেব একখানি পুরাতন পাট্টা পাইয়াছেন, তাহাতে লিখিত আছে, ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে কোম্পানির কেরাণীদের ব্যবহারোপযোগী একখানি বড় বাড়ী নির্ম্মাণ করিবার জন্য Thomas Legonকে অনুমতিপত্র প্রদান করা হয়। ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে ১৯টি মহলযুক্ত এই প্রকাণ্ড অট্টালিকার নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হয়। কোম্পানি বাহাদুর পাঁচ বৎসরের কড়ারে প্রতি মহল ২০০ আর্কট মুদ্রা মাসিক ভাড়ায় তাহা গ্রহণ করেন। ইহারই অন্যতম নাম "বেঙ্গল সেক্রেটেরিয়েট বিল্ডিংস্‌"। পূর্ব্ব-পৃষ্ঠায় ইহার চিত্র দেখুন।

শ্রীবিমলাচরণ লাহা।

ফেয়ারি হিল।

চট্টগ্রাম সহরের বাহিরে ১৫০-২০০ ফুট উচ্চ ছোট ছোট পাহাড়ের উপর য়ুরোপীয়গণ গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিয়া থাকে। পাহাড়ের এই বাড়ীগুলি দূর হইতে দেখিতে বড়ই চমৎকার। এই পাহাড়গুলির মধ্যে 'ফেয়ারি হিলের' দৃশ্য সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর। এই পাহাড়ের উপর কাছারি ও সরকারী আফিস নির্ম্মিত হইয়াছে। 'ফেয়ারি হিল' হইতে চতুর্দ্দিকের নয়নানন্দকর যে দৃশ্য দেখা যায়, তাহা স্যর জোসেফ হুকার তাঁহার গ্রন্থে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন :—
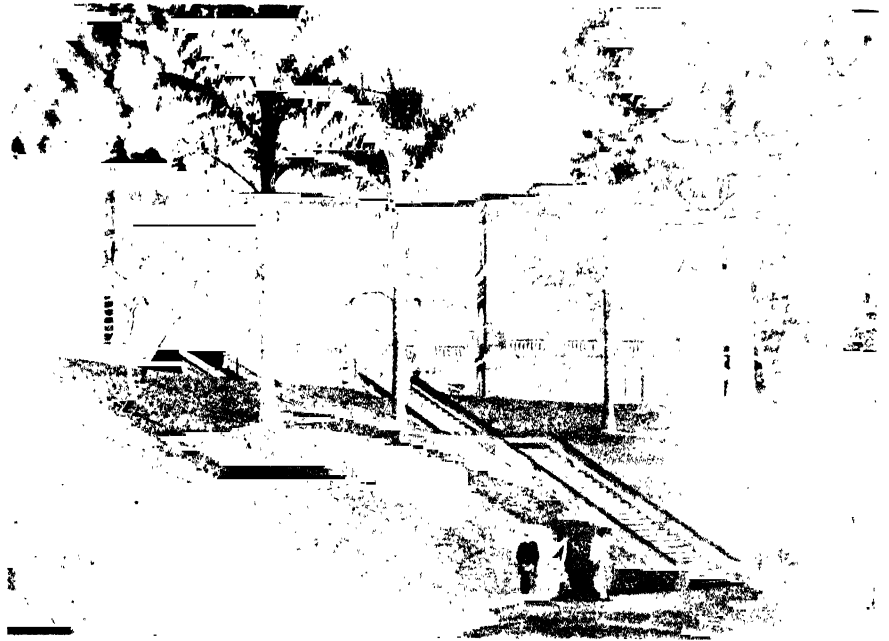
ফেয়ারি হিল।

"Below ৺ all round is Chittagong, the Chittagong of yesterday ৺ the Chittagong of to-day while seemingly at the very feet of the observer lies the port and beyond the ocean, breaking in long-crested rollers upon a shining white beach. The course of Karnaphuli, adown which country boats move lazily with the tide and wind, can be descried for miles, winding its way between waving paddy, maize fields, palm ৺ mangrove plantations, past mud-walled villages ahum with life, ৺ through stretch after stretch of tropical foliage of the brightest green hue, a view worth many miles of travel to obtain, ৺ from which the traveller, remembering the dusty, scorching plains of Northern & Central India ৺ the bare-fields of the interior of Eastern Bengal, is loth to tear himself away and descend again to the steaming flats and the nauseous odours of the bazars."

(Himalayan Journals)

রাজপ্রতিনিধি শ্রীযুক্ত লর্ড হার্ডিঞ্জ।

মাননীয়া শ্রীযুক্তা লেডি হার্ডিঞ্জ।

বড় লাট বাহাদুরের জন্মদিন উপলক্ষে প্রীতি-ভোজ।

আনন্দ জিনিসটা বাঙ্গলাদেশ হইতে যেন চির-বিদায় লইয়াছে। দারিদ্র্যের পেষণে, আধিব্যাধির যন্ত্রণায় বেদনাক্লিষ্ট বাঙ্গালীর পাণ্ডুর মুখে আনন্দের চিহ্ন বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না; কিন্তু গত ২০এ জুন, প্রতিনিধি বড়লাট হার্ডিঞ্জ সাহেবের জন্মদিন উপলক্ষে বালক-বালিকাদের যে আনন্দোৎসব হইয়াছিল, তাহাতে প্রীতি-ভোজে তাহারা আনন্দলাভ করিয়াছিল, প্রতি বৎসর এই শুভদিনে ভারতের বালকবালিকারা আনন্দলাভ করুক ইহাই আমাদিগের একান্ত প্রার্থনা। উৎফুল্লানন ক্রীড়ারত কলিকাতাস্থ বালকদিগের চিত্রখানি পার্শ্বে প্রদত্ত হইল।

শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু ।

বাঙ্গালীর নিকট বঙ্গবিশ্রুত অভিনেতা শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসুর নূতন করিয়া পরিচয় দিতে হইবে না, তিনি বাঙ্গালার নিকট সুপরিচিত। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে, যখন 'বিবাহ বিভ্রাট' রচিত হয়, সেই সময়কার একখানি অমৃতবাবুর ছবি আমরা বহুকষ্টে সংগ্রহ করিয়াছি। পার্শ্বের ছবিখানি অমৃতবাবুর যুবা-বয়সের। ছবিখানির সম্বন্ধে একটা কথা বলিবার আছে। এখন যেমন অমৃতবাবু কোন একটি আদর্শের কতকটা অনুকরণে পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া থাকেন, ঐ সময়েও তিনি বঙ্গের শ্রেষ্ঠ নাটককার দীনবন্ধু বাবুর পরিচ্ছদের অনুকরণ করিতেন। যিনি উপরের ছবি দেখিবেন, তাঁহার দীনবন্ধু বাবুর পোষাকের কথা স্বতঃই মনে পড়িবে। এখন বঙ্গের শ্রেষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথের বেশভূষার যেমন কেহ কেহ অনুকরণ করিয়া থাকেন, তখনকার দিনে, আমাদের শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের বেশভূষার অনুকরণও অনেকে গৌরবের বলিয়া মনে করিতেন।

নলহাটির
ললাটেশ্বরীর মন্দির।

নলহাটি বীরভূম জেলার অন্তর্গত রামপুরহাট সবডিভিশনের উত্তর-পূর্ব্বে অবস্থিত একখানি গ্রাম। শুনা যায়, ইহা পূর্ব্বে নলরাজার রাজধানী ছিল। নলহাটির সন্নিকটবর্ত্তী ছোট ছোট পাহাড়ে অনেক প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ আছে। এই স্থানটি সম্বন্ধে একটি প্রবাদ আছে যে, বিষ্ণু যখন শিবের স্কন্ধ হইতে সতীর দেহ চক্রদ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলেন, তখন নাকি এইস্থানে তাঁহার 'নল' বা কণ্ঠদেশ পতিত হয়; তজ্জন্য ইহার নাম 'নলহাটি' হইয়াছে। এই প্রবাদটিই অধিকাংশ স্থানীয় লোকেরা বিশ্বাস করিয়া থাকে। এই নলহাটিতে একটি মন্দির আছে। মন্দিরাভ্যন্তরে 'ললাটেশ্বরী'র বৃহৎ মূর্ত্তি সংস্থিত। মন্দিরটি দেখিলে অতি প্রাচীন বলিয়া মনে হয়। 'ললাটেশ্বরী'র নাম সম্বন্ধে আর একটি জনশ্রুতি এই যে, সতীর 'ললাট' এই স্থানে পতিত হওয়ায় ইহার নাম এইরূপ হইয়াছে। যাহা হউক, এই স্থানটি পীঠস্থানের অন্তর্গত বলিয়া সকলে বিশ্বাস করিয়া থাকে।

শ্রীশ্রীললাটেশ্বরীর মন্দির।

দিলখুশবাগ।

বৰ্দ্ধমান সহরের দুইটি শোভা মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের রাজপ্রাসাদাবলী ও রাজোদ্যানসমূহ। এগুলি সহরের মধ্যস্থলে অবস্থিত। দিলখুশবাগ একটি সুন্দর সুদৃশ্য উদ্যান— রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে প্রায় ২ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। এই উদ্যানের মধ্যে ছোটখাট রকমের একটি পশুশালা আছে। পশুশালাটি দেখিবার মত জিনিস। বলা বাহুলা, মহারাজবাহাদুর পশুশালার ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন।

কাঃ স্কটের তুষার সমাধি।

দক্ষিণ মেরু অভিযানের অধিনায়ক কাপ্তেন রবর্ট ফ্যাল্‌কন্ স্কট, R. N. মহোদয়ের নাম কাহারও অবিদিত নাই। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে ডেভন্‌পোর্ট নগরে তাঁহার জন্ম হয়। ১৮৮২ খৃঃ অব্দে ১৪ বৎসর বয়সে তিনি ইংলণ্ডের নৌ-সেনাবিভাগে প্রবেশ করেন। ১৮৮৭-১৮৮৮ সালে "রোভর্" নামক রণ-তরির এবং ১৮৮৯ সালে "য়্যাম্পিয়ন্" নামক রণতরির "লেফ্‌টেনেণ্ট্" পদে নিযুক্ত হন; ১৮৯৮-৯৯ সালে "ম্যাজেষ্টিক্" নামক রণতরির "টর্পিডো লেফ্‌টেনেণ্ট্" পদে বৃত থাকেন; ১৮৯৯-১৯০০ সালে "প্রথম লেফ্‌টেনেণ্ট্" পদে উন্নীত, এবং ১৯০০ সালে যে বৈজ্ঞানিক অভিযান প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহার নেতৃত্বপদে অধিষ্ঠিত হন।

পরে ১৯১০ সালে দক্ষিণ মেরু-অভিযানকল্পে একটি সম্প্রদায় গঠিত হওয়ায়, তাহার নেতৃত্ব তাঁহারই উপরে ন্যস্ত হয়। হায়! এই যাত্রাই তাঁহার মহাযাত্রা হইল!

পৃথিবীর দক্ষিণপ্রান্তে যেস্থানে কাপ্তেন স্কট্ ও ব্রাউনিং এবং ডিকেন্‌সন্ নামক তাঁহার সহচরদ্বয় তুষার-সমাধি প্রাপ্ত হন, সেই সেই স্থানে জারা-কাষ্ঠের এক একটি সুবৃহৎ ক্রুশ সংস্থাপিত হইয়াছে। প্রদত্ত চিত্রখানি কাপ্তেন স্কটের চরম কার্য্যক্ষেত্র এবং শুভ্র-তুষার অন্তিম শয্যাস্থল নির্দ্দেশ করিতেছে।

কাপ্তেন স্কটের স্মৃতি-চিহ্ন।

কাপ্তেন স্কটের কীর্ত্তিকাহিনী তাঁহার স্বদেশবাসীদিগের স্মৃতিপথে চির জাগরূক রাখিবার জন্য কোথায় কি ভাবে তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত, তাহা লইয়া ইতোমধ্যেই আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। ভুবনবিখ্যাত "স্ফীয়র" পত্রিকার পরিচালক-মণ্ডলী এই প্রশ্ন সুসমাধা করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহাদের গত ২০এ মে তারিখের পত্রিকায় প্রস্তাব করিয়াছেন যে, লণ্ডন— ওয়াটারলু প্লেসে—রিজেণ্ট্ ষ্ট্রীটের পাদদেশে, অর্থাৎ ফ্রাঙ্ক্লিন্ প্রভৃতি মনস্বী বর্গের প্রতিমূর্ত্তিচয় যে অঞ্চলে রক্ষিত আছে, সেই অঞ্চলে, তাহা প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। স্মৃতি চিহ্নটি কি ভাবের হওয়া উচিত,সে সম্বন্ধেও তাঁহারা একটা আভাস দিয়াছেন। তাঁহাদের নির্দ্দেশানুসারে মিঃ এফ্, ম্যাটেনিয়া কর্ত্তৃক পরিকল্পিত সেই স্মৃতিস্তম্ভের প্রতিকৃতি আমরা দক্ষিণে মুদ্রিত করিলাম। তাঁহারা বলেন যে, ইহা মর্ম্মর ও ব্রোঞ্জ নামক মিশ্র ধাতু যোগে, অর্থাৎ চিত্রস্থিত তুষার-স্তূপটি মর্ম্মরে, এবং স্কট, তাঁহার সহচরদ্বয়ের প্রতিমূর্ত্তি ব্রোঞ্জে, গঠিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

পরলোকগত রায় নরেন্দ্রনাথ সেন বাহাদুর

নরেন্দ্রনাথ সেন রায় বাহাদুরের নাম শুধু বাঙ্গলা দেশে কেন ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই পরিচিত। দুই বৎসর পূর্ব্বে, ২রা জুলাই তারিখে তিনি নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করিয়াছেন। তাঁহার পরলোকগমনের অব্যবহিত পরেই তাঁহার স্মৃতিরক্ষার জন্য একটা সভা হয় এবং যাহাতে অতি সত্বর তাঁহার কোন প্রকার স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন করিতে পারা যায়, তাহার জন্য দেশের রাজা মহারাজা গণ্যমান্য ভদ্রলোক—সকলে মিলিয়া একটি কমিটি গঠিত করেন। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে, এই দুই বৎসরের মধ্যে রায় বাহাদুর নরেন্দ্রনাথ সেনের স্মৃতিরক্ষার কোন ব্যবস্থাই হয় নাই। বাঙ্গলা দেশে যে সমস্ত সৎকার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে, রায় নরেন্দ্রনাথ প্রায়ই তাহার অগ্রণী ছিলেন। তিনি কায়মনোবাক্যে দেশের ও দশের সেবা করিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালা দেশের গত চল্লিশ বৎসরের ইতিহাসে রায় বাহাদুরের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। তাঁহার 'ইণ্ডিয়ান মিরর' নামক প্রাত্যহিক পত্রিকা এখনও তাঁহার পুত্রগণদ্বারা বিশেষ যোগ্যতার সহিত সম্পাদিত হইতেছে। তাঁহার ন্যায় সত্যনিষ্ঠ, পরোপকারী, কর্ত্তব্যপরায়ণ, ও চরিত্রবান লোক এখনকার দিনে অতি অল্প সংখ্যকই দেখিতে পাওয়া যায়।

কলিকাতার ঠাকুর-বংশ আমাদের দেশে সর্ব্বজনপরিচিত। ধনে, মানে, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, শিল্পকলায় কলিকাতার ঠাকুর-পরিবার আমাদের দেশে অদ্বিতীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের কবি-যশঃ এখন পৃথিবীময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে, এদিকে শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের চিত্রশিল্পের খ্যাতিও ভারতবর্ষে আবদ্ধ নহে, য়ুরোপ আমেরিকায়ও তাঁহার চিত্রশিল্পের যথেষ্ট প্রশংসা হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশে যে সমস্ত চিত্রশিল্পী আছেন, শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় যে তাঁহাদের অগ্রণী, একথা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। সদাশয় গবর্ণমেণ্টও অবনীন্দ্রবাবুর গুণের আদর করিয়াছেন; মহামহিম ভারতসম্রাটের বিগত জন্মদিন উপলক্ষে শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সি, আই, ই (C. I. E.) উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন। প্রকৃত গুণের আদর দেখিয়া কে না আনন্দ লাভ করে? ভগবান্ শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথকে দীর্ঘজীবন দান করুন!

শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সি, আই, ই।

মহাকবির শ্রাদ্ধবাসরে।

গত ৩০এ জুন বাঙ্গলার মহাকবি মধুসূদনের শ্রাদ্ধ-বাসর গিয়াছে। তাঁহার জীবনচরিত রচয়িতা শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় সভাপতির আসন পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁহার এই সমাধিস্থান বাঙ্গালীর বড় আদরের, বড় শ্লাঘার ক্ষেত্র। এই স্থানে তিনি চির-নিদ্রায় নিদ্রিত থাকিয়া তাঁহার স্বদেশবাসীকে বলিয়াছেন,—

"দাঁড়াও পথিকবর জন্ম যদি তব বঙ্গে,
তিষ্ঠ ক্ষণকাল এ সমাধিস্থলে,
জননীর কোলে শিশু লভয়ে বিরাম,
যেমতি, মহীর কোলে তেমতি লভিছে
বিরাম দত্তকুলোদ্ভব কবি শ্রীমধুসূদন।

বাঙ্গালী, এই সমাধিস্থলে ক্ষণকাল দাঁড়াও—মানস-নয়নে দারিদ্র্যপেষণে নিষ্পেষিত মহাকবির জীবন একবার স্মরণ কর; ভাবিয়া দেখ তিনি তোমাদের জন্য কি করিয়া গিয়াছেন—উত্তাল বারিধির ন্যায় ভাবরত্ন হৃদয়ে ধারণ করিয়া ভীষণ-গর্জ্জি ভাষা-স্রোতে বাঙ্গলাদেশ ভাসাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার সেই ভীমনাদি-গর্ব্বোক্তি—'রচিব মধুচক্র গৌড় জন যাহে, আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি' অক্ষরে অক্ষরে

জলন্ত সত্যরূপে প্রতিভাত হইয়াছে। যিনি একদিন ভাষা লক্ষ্মীর সম্পদ সংবর্দ্ধনকল্পে ইটালী ও ইংলণ্ড হইতে সনেটের আমদানি করিয়া তাঁহাকে 'বিলাতী বনেট' পরাইয়াছিলেন—বৈষ্ণব কবিগণের পদানুসরণ করিয়া মধুর গীতি-কবিতার ঝঙ্কারে যিনি বাঙ্গলাদেশকে একদিন মুখরিত করিয়া গিয়াছেন—সেই মহাকবির জীবদ্দশায় আমরা ত তাঁহাকে চিনিতে পারি নাই, সম্যক্ রূপে তাঁহার প্রতি কর্ত্তব্য পালন করিতে পারি নাই! সে ত্রুটী সংশোধনের আর উপায় নাই। তবে তাঁহার শ্রাদ্ধ-বাসরে সেই মহাপুরুষের, সেই মহাকবির, সেই মহামনীষার স্মৃতি জাগরূক রাখিবার জন্য, প্রতি বৎসর এইদিনে এই পুণ্যক্ষেত্রে সকলে মিলিয়া আমরা শোকাশ্রুপাত করিয়া থাকি। মহাকবির পুণ্য নাম স্মরণ করিয়া বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ স্যর বিজয়চন্দ মহতাপ বাহাদুর যে কবিতা রচনা করিয়াছেন, তাহা নিম্নে মুদ্রিত হইল। সভারম্ভের পূর্ব্বে সমাধিক্ষেত্রের দ্বারদেশ হইতে বঙ্গসাহিত্যিক ও বঙ্গসাহিত্যের শুভানুধ্যায়ী কাব্যামোদগণের শোভাযাত্রা হইয়াছিল। মহাকবির সমাধিক্ষেত্রে সমবেত ভদ্রমণ্ডলীর চিত্র এই স্থানে প্রদত্ত হইল।
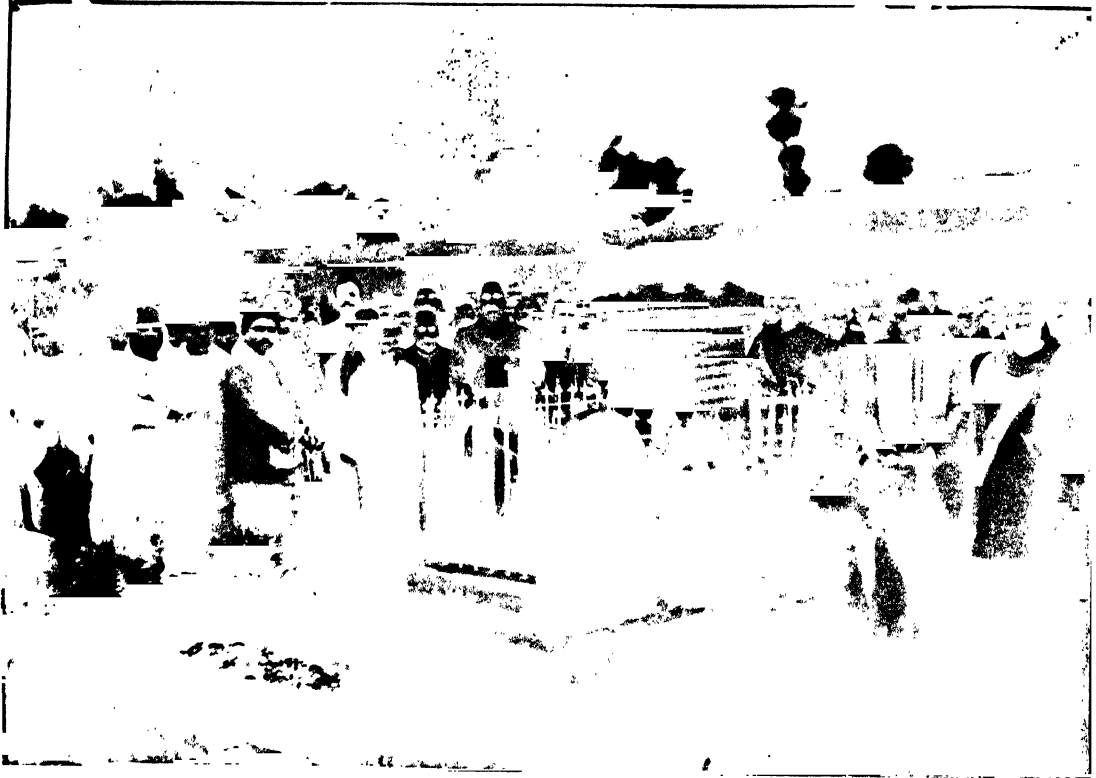
মাইকেলের সমাধি।

৺মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

বসন্ত—চৌতাল।

কাককোলাহলে হ'লেও পালিত,
মধুরকাকলী ভোলে কি কোকিলে?
পঙ্কে সদা বাস, বলে' কি সুবাস,
থাকে না বিকচ-কোকনদ-দলে?
বিদেশী আকারে, সকল প্রকারে,
ইংরাজী বাহিরে, বাঙ্গলা অন্তরে,
দেহ পরবাসে স্নেহ নিজঘরে,

দৃপ্তসহবাসে যদিও লালিত,
সরলতাময় মধুর ললিত,
প্রণয়-পীযূষ-সিঞ্চিত যে চিত,
হয়নি দূষিত তা'ত কোন কালে!
বিজাতীয় ভাবে বিজাতি সদনে,
শিক্ষিত দীক্ষিত হইয়া কেমনে,
স্বজাতীয় প্রেমে ডুবালে পরাণে,

মা প্রতি ভকতি কতই তোমার,
ভাল ভাষা শত করি পরিহার,
সুদীনা-মলিনা স্বদেশ-ভাষার,
সেবনে জীবন হরষে যাপিলে।
একনিষ্ঠ প্রীতি তব মা'র প্রতি,
তাই ত সদয়া তোমারে ভারতী,
তাঁহারি কৃপায় হে মধু সুমতি,
এত উচ্চ পদ বঙ্গ-কবিদলে।
কথা ছন্দ ভাব সব মধুময়,
বাণী বীণাধ্বনি শুনি মনে হয়,
যে প্রভা পূরিত কোমল হৃদয়,
সম্ভবে তা ভবে বহু পুণ্য ফলে।
বিধর্ম্মী হইয়া স্বধর্ম্ম নিরত,
বিদেশে সাধিলে দেশ-হিতব্রত,
তোমার জীবনে সব বিপরীত,
জগত-বান্ধব, নিজে দুঃখ পেলে।
কাতর অন্তরে ভাবিছে বিজয়,
বঙ্গবাসিগণে বিধাতা নিদয়,
তাই ত মধ্যাহ্নে তপন বিলয়,
মধুর মুরলী নীরব অকালে॥

শ্রীবিজয় চন্দ্র মজুমদার।

সাহিত্য-সংবাদ।

স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত প্রসাদদাস গোস্বামী মহাশয়ের "গীতা"র দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রিত হইতেছে।

সুকবি শ্রীযুক্ত রসময় লাহা মহাশয়ের 'আমোদ' নামক হাসির কবিতা-সংগ্রহ পূজার পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইবে।

প্রসিদ্ধ নাট্যকার শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের নূতন নাটক 'ভীষ্ম' প্রকাশিত হইয়াছে।

সুলেখক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের স্ত্রীপাঠ্য গ্রন্থ 'নারীলিপি' যন্ত্রস্থ, অতি সত্বর প্রকাশিত হইবে।

খ্যাতনামা ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নূতন সচিত্র উপন্যাস 'বিনিময়' প্রকাশিত হইয়াছে।

কবিবর শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচী মহাশয়ের 'অপরাজিতা' যন্ত্রস্থ; পূজার সময়ে অপরাজিতা ফুটিয়া উঠিবে।

নটচূড়ামণি শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয়, মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের জন্য সুপ্রসিদ্ধ 'রত্নাবলী' নাটকখানি গীতিনাট্যে গ্রথিত করিয়াছেন। পুস্তকখানি যন্ত্রস্থ।

প্রসিদ্ধ কবিতা-লেখক শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কএকটি কবিতা পুস্তকাকারে বাহির হইতেছে। এই সংগ্রহের নাম হইয়াছে 'মন্দিরা'।

সুকবি শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় চৌধুরী মহাশয়ের 'গৈরিক' নামক কবিতাপুস্তক অতি সত্বর প্রকাশিত হইবে। তাঁহার সম্পূর্ণ গ্রন্থাবলীও পূজার পূর্ব্বে প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা হইতেছে।

শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয়ের নূতন সচিত্র গল্পপুস্তক 'করিম সেখ' যন্ত্রস্থ; শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। তাঁহার 'কাঙ্গাল হরিনাথের'ও প্রথম খণ্ড পূজার সময় বাহির হইবে।

সুপ্রসিদ্ধ গল্পলেখক শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কএকটি উৎকৃষ্ট গল্প 'বাল্যবন্ধু' নামে পুস্তকাকারে সংগৃহীত হইতেছে। ভাদ্র মাসের মধ্যেই প্রকাশিত হইবে।

"রাজপুত ও উগ্রক্ষত্রিয়" নাম দিয়া শ্রীযুক্ত হরিচরণ বক্সু জাতিতত্ত্ব বিষয়ক একখানি পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন—অচিরেই প্রকাশিত হইবে।

প্রসিদ্ধ নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ের উপযুক্ত পুত্র শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র এম, এ. বি এল মহাশয়ের প্রণীত কবিতাপুস্তক 'আকিঞ্চন' প্রকাশিত হইয়াছে।

'আরতি' পত্রিকার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মজুমদার, বি, এল্, মহাশয়ের "আকাশের গল্প" নামক একটি নূতন গ্রন্থ যন্ত্রস্থ। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় উক্ত গ্রন্থের একটি সুন্দর ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন।

ভূতপূর্ব্ব "বঙ্গনিবাসী", "ভারত-সংবাদ", "শিল্প সখা" প্রভৃতি পত্রের সম্পাদক, এবং "কর্ণেল সুরেশ বিশ্বাস," "বকাউল্লার দপ্তর" প্রভৃতি পুস্তক প্রণেতা শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকৃষ্ণ বন্দোপাধ্যায় রচিত "বুকের বোঝা" (পত্রোপন্যাস) নামধেয় একখানি অভিনব প্রণালীর উপন্যাস যন্ত্রস্থ—অতি শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

সুলেখক ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্ত মহাশয় আর্য্যাবর্ত্ত পত্রে যে সমস্ত 'পুরাতন প্রসঙ্গ' বা 'আচার্য্য কৃষ্ণকমলের পঙ্কস্মৃতি' লিখিয়াছিলেন, তাহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইতেছে, শ্রাবণ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহেই এই পুস্তক বিক্রয় আরম্ভ হইবে। এই পুস্তকে অনেকগুলি চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের 'কর্ম্মকথা' সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারী হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে মনুষ্যজীবনের কর্ত্তব্য কর্ম্ম এবং ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও শাস্ত্রীয় বিচার অতি বিশদভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তাঁহার সর্ব্বজনপ্রশংসিত 'জিজ্ঞাসা' নামক পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ যন্ত্রস্থ।

বামড়ার রাজা শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ ত্রিভুবন দেব বাহাদুর একজন সুপ্রসিদ্ধ ওড়িয়া কবি ও সুলেখক। শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় রাজা বাহাদুরের কএকটি সুন্দর কবিতা ভাষান্তরিত করিয়া 'সচ্চিদানন্দ' গ্রন্থাবলী, নাম দিয়া প্রকাশিত করিয়াছেন। রাজা বাহাদুরের 'যৌন নির্ব্বাচন' নামক ওড়িয়া ভাষায় লিখিত পুস্তকখানিও শ্রীযুক্ত বিজয়বাবু ভাষান্তরিত করিয়া প্রকাশ করিতেছেন।

লব্ধপ্রতিষ্ঠ সুলেখক ও প্রসিদ্ধ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন মহাশয়ের 'ব্যাকরণ বিভীষিকা' যথেষ্ট সমাদর লাভ করিয়াছে। তাঁহার 'সাধুভাষা বনাম চলিত ভাষা' নামক পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে এবং তাঁহার যে অনুপ্রাসের প্রবন্ধাবলী পাঠক সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল, তাহা যন্ত্রস্থ, শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

আর্য্যাবর্ত্ত সম্পাদক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের সর্ব্বজন সমাদৃত উপন্যাস 'নাগপাশের' দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। আর্য্যাবর্ত্তে তাঁহার 'অদৃষ্টচক্র' নামক যে উপন্যাস প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাও পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইতেছে। এতদ্ব্যতীত তিনি তাঁহার ছোট গল্পগুলিও সংগ্রহ করিয়া একখানি গল্পপুস্তক প্রকাশিত করিতেছেন। পূজার পূর্ব্বেই পুস্তকগুলি বাহির হইবে।

পাটনা কলেজের ইতিহাসের অন্যতম অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার বি, এ, এফ্, আর্, ই, এস, এফ্, আর, হিষ্ট্, এস, এম্, আর্, এস, এ মহাশয় "অর্থনীতি" ও "অর্থশাস্ত্র" নামক দুইখানি পুস্তক প্রণয়ন করিয়া সাহিত্য-সংসারে পরিচিত হইয়াছেন। মাসিক সাহিত্যের পাঠকগণের নিকট তিনি অধিকতর পরিচিত। সম্প্রতি অধ্যাপক মহাশয় পঞ্চবিংশ খণ্ডে "সমসাময়িক ভারত" নামক এক গ্রন্থাবলী প্রকাশ করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন। অধুনা দুই খণ্ড যন্ত্রস্থ গ্রন্থাবলী, "প্রাচীন ভারত", "চৈনিক-পরিব্রাজক", "মুসলমান ঐতিহাসিক" ও "ইউরোপীয়ান পর্য্যটক" এই চারি কল্পে বিভক্ত হইবে এবং অতি প্রাচীন কাল হইতে বৈদেশিকগণ ভারতবর্ষকে যে যেরূপ চক্ষে দেখিতেন তাহাই এই গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত হইবে। দ্বিতীয় কল্পটি বহু চিত্রে সুশোভিত হইবে। বহু ভাষাবিদ্ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় প্রথম খণ্ডের ও শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকা লিখিয়াছেন। শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী, শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর শরচ্চন্দ্র দাস, মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার, শ্রীযুক্ত মাননীয় সৈয়দ নবাবালী চৌধুরী নবাব বাহাদুর প্রভৃতি ইঁহার অন্যান্য খণ্ডের ভূমিকা লিখিবেন। প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড কএক দিবস মধ্যেই প্রকাশিত হইবে। তৃতীয় খণ্ড যন্ত্রস্থ হইয়াছে।

ভারতবর্ষের অদ্বৈতবাদ।

[১]

আমরা বলিয়াছি যে, চিত্তের ধারণা করিবার শক্তি সকল ব্যক্তির সমান নহে। সমান নহে বলিয়াই উপাসকের শ্রেণীও ত্রিবিধ। কেবল-কর্ম্মী, কর্ম্ম ও জ্ঞানের একত্র অনুষ্ঠানকারী, এবং কেবল-জ্ঞানী,—এই তিনপ্রকার উপাসকের কথা শঙ্করাচার্য্য তাঁহার উপনিষদের ব্যাখ্যায় নানা স্থানে বলিয়া দিয়াছেন। বাহুল্য-ভয়ে আমরা এস্থলে তাঁহার উক্তি উদ্ধৃত করিলাম না। উপাস্য দেবতা সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নাই; দেবতাদিগের স্বরূপ কি প্রকার; ইঁহাদের সঙ্গে ব্রহ্মের সম্বন্ধ কিরূপ—ইত্যাদি বিষয়ে কিছুমাত্র বোধ নাই, অথচ দেবতাবর্গের উদ্দেশ্যে অগ্নিতে ঘৃত ঢালিয়া, বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া, যজ্ঞ করা হইতেছে;—ঈদৃশ সাধক "কেবল-কর্ম্মী।" দ্বিতীয় শ্রেণীর সাধক অন্যরূপ। ইঁহারা জানিতে পারিয়াছেন যে, অগ্নি, সূর্য্য, ইন্দ্রাদি দেবতা-বর্গ 'কার্য্য' মাত্র। ব্রহ্মসত্তাই ইঁহাদের 'কারণ'। কারণ-সত্তা ছাড়িয়া দিলে, কার্য্যের অস্তিত্ব বা ক্রিয়া থাকিতে পারে না; সুতরাং দেবতাবর্গের স্বতন্ত্র, স্বাধীন সত্তা নাই। ব্রহ্মসত্তাতেই ইঁহাদের সত্তা ও স্ফুরণ। সুতরাং বৈদিক যজ্ঞে উপাস্য দেবতাবর্গের যে উপাসনা ও স্তুতি করা হইতেছে, উহা ব্রহ্মেরই উপাসনা ও স্তুতিমাত্র। যে সকল সাধক এই প্রকারে দেবতাদিগের স্তুতি করিয়া থাকেন, তাঁহারা দ্বিতীয় শ্রেণীর সাধক। ইঁহাদের পরমার্থ-দৃষ্টি জন্মিয়াছে।

তৃতীয় শ্রেণীর সাধক সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত। ইঁহাদের পক্ষে যজ্ঞ সম্পাদনের কোন আবশ্যকতা নাই। ইঁহারা সর্ব্বদা অধ্যাত্মদৃষ্টি সম্পন্ন। ইঁহারা ব্রহ্মসত্তার দর্শন ও অনুভব ভিন্ন কোন বস্তুরই স্বতন্ত্র দর্শন ও অনুভব করেন না।

ঋগ্বেদেও এই তিন প্রকার সাধকের উল্লেখ আছে এবং ইঁহাদেরও উপযুক্ত বৈদিক সূক্ত আছে। শঙ্করাচার্য্য ঋগ্বেদ হইতেই সাধকের এই ত্রিবিধ শ্রেণী লইয়া, উপনিষদেও তাঁহাদের কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। যাঁহারা মনে করেন যে, পরমার্থ-দৃষ্টিসম্পন্ন জ্ঞানী ব্রহ্মদর্শী সাধকের কথা ঋগ্বেদে নাই; ঋগ্বেদে কেবল কর্ম্মপরায়ণ সকাম-যাজ্ঞিকগণের কথাই নিবদ্ধ আছে;—আমরা তাঁহাদিগকে ভ্রান্ত বলিয়া মনে করি। ঋগ্বেদে একত্র পাশাপাশি ত্রিবিধ সাধকেরই কথা আছে। ঋগ্বেদ যেমন কর্ম্মীর গ্রন্থ; তেমনই উহা জ্ঞানীরও গ্রন্থ। এই নিমিত্তই ঋগ্বেদের এত সম্মান ও এত শ্রেষ্ঠতা; সুতরাং ঋগ্বেদের কেবল কর্ম্ম-পর ব্যাখ্যাটি মাত্র গ্রহণ করিয়া জ্ঞান-পর ব্যাখ্যাটি ছাড়িয়া দিব কেন? ঋগ্বেদ যেমন যাজ্ঞিকের গ্রন্থ; ঋগ্বেদ তেমনই ঘোরতর অদ্বৈতবাদীরও গ্রন্থ।

আমরা উপনিষদে ও বেদান্তদর্শনে যে অদ্বৈতবাদ দেখিতে পাই, তাহাতে "পারমার্থিক দৃষ্টি" ও "ব্যবহারিক দৃষ্টি" বলিয়া দুইটি কথা উল্লিখিত দেখিতে পাই। বিষয়-লিপ্ত, ইন্দ্রিয়-সুখ-পরায়ণ, অজ্ঞ সাংসারিক লোক, ব্যবহারিক-দৃষ্টিসম্পন্ন। ইঁহারা জগতের পদার্থগুলিকে স্বতন্ত্র স্বাধীন পদার্থ বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকে। মার্জ্জিতচিত্ত, জ্ঞানী লোকেরাই পরমার্থ দৃষ্টি সম্পন্ন। ইঁহারা পদার্থবর্গের মধ্যে কারণ-সত্তার অনুভব করিয়া থাকেন। মৃত্তিকার সত্তা ব্যতীত যেমন ঘটের কোন স্বাধীন সত্তা নাই; হার-বলয়-কুণ্ডলাদি দ্রব্যের সত্তা যেমন সুবর্ণ-সত্তার উপরেই একান্ত নির্ভর করে; সুবর্ণের সত্তা তুলিয়া লইলে যেমন হার বলয়াদির কোন সত্তা থাকিতে পারে না; তদ্রূপ ব্রহ্মসত্তা ব্যতীত জগতের কোন বস্তুরই স্বতন্ত্র সত্তা নাই। কার্য্য-কারণের নিয়মই এইরূপ যে, কার্য্যবর্গের মধ্যেই প্রকৃত পক্ষে কারণ-সত্তাই অনুপ্রবিষ্ট ও অনুস্যূত থাকে। এই প্রকার পরমার্থদৃষ্টিসম্পন্ন জ্ঞানী লোকেরা, জগতের বস্তুগুলি লইয়া ব্যবহার করিবার সময়েও, সেই কারণ সত্তা বা ব্রহ্মসত্তার কথা ভুলিয়া যান না। দুগ্ধ, দধির আকার পরিণত হইলেও, দুগ্ধের যাহা প্রকৃত উপাদান তাহার একান্ত নাশ হইয়া যায় না;—উহা দধির মধ্যেই লুক্কায়িত আছে এবং সেই উপাদানের উপরেই দধি আপনার আকারের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। যদিও আমাদের ইন্দ্রিয়ের সম্মুখে জগতের পদার্থরাশির অনন্ত রূপ ও আকার প্রকটিত রহিয়াছে; তথাপি যাঁহারা পরমার্থদৃষ্টি-সম্পন্ন পুরুষ তাঁহারা বেশ বুঝিতে পারেন যে, ব্রহ্মসত্তার উপরেই পদার্থগুলি নিজেদের আকারের ও রূপের প্রতিষ্ঠা করিয়া বসিয়া আছে। সুতরাং প্রকৃত জ্ঞানিগণ, ব্যবহারিক দৃষ্টির সময়েও, পারমার্থিক দৃষ্টি ভুলেন না।

এই জন্যই শঙ্করাচার্য্য "পরিণাম-বাদকে" রাখিয়াই "বিবর্ত্তবাদের" প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই জন্যই শঙ্করাচার্য্য বলিয়া দিয়াছেন যে—

"ন ক্ষীরস্য সর্ব্বোপমর্দ্দেন দধিভাবাপত্তিঃ"

এবং

"তন্তুবস্থাং-মনুপমর্দ্দেন পটো জায়তে।"

ইহাই অদ্বৈতবাদের ভিত্তি।

বিকারেঽনুগতং জগৎ-কারণং ব্রহ্মনির্দ্দিষ্টং—
তদিদং সর্ব্বমিত্যুচ্যতে, যথা 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্মেতি।'
কার্য্যঞ্চ কারণাদব্যতিরিক্তমিতি বক্ষ্যামঃ"

(বেঃ দঃ, ১।১।২৫।)

অদ্বৈতবাদের মূল সূত্র এই যে—"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।' এই জগৎ ব্রহ্মই। ইহার অর্থ কি? ইহার অর্থ এই যে, কারণ ছাড়া কার্য্যের স্বতন্ত্র সত্তা নাই; অগ্নি, সূর্য্য, বায়ু, আকাশ প্রভৃতিতে কারণ সত্তা বা ব্রহ্মসত্তা অনুস্যূত রহিয়াছেন। ইহাদের কাহারই নিজের কোন স্বাধীন সত্তা নাই! ব্রহ্ম-সত্তাতেই ইহাদের সত্তা। এই অদ্বৈতবাদই বেদান্তদর্শনে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। উপনিষদ্‌গুলিতেই অদ্বৈতবাদ এই ভাবেই প্রদর্শিত হইয়াছে।

সুতরাং ঋগ্বেদে উল্লিখিত সূর্য্য, ইন্দ্র, বায়ু, প্রাণ, আকাশ প্রভৃতি 'দেবতারাও' এই প্রকারই তাৎপর্য্য। ইঁহারা স্বয়ং-সিদ্ধ স্বতন্ত্র কোন পদার্থ নহে; ইঁহারা কারণ-সত্তারই অবস্থা ভেদ বা রূপান্তরমাত্র। যাহা অবস্থাভেদমাত্র, যাহা রূপান্তর মাত্র, তাহা স্বতঃসিদ্ধ ও স্বতন্ত্র কোন বস্তু হইতে পারে না।

"ন হি বিশেষদর্শনমাত্রেণ বস্ত্বন্যত্বং ভবতি।" "ন হি দেবদত্তঃ সংকোচিতহস্তপাদঃ প্রসারিতহস্তপাদশ্চ
বস্ত্বন্যত্বং গচ্ছতি, স এবেতি প্রত্যভিজ্ঞানাৎ।"

যাহারা অজ্ঞ, যাহারা ব্যবহারিক দৃষ্টি লইয়াই ব্যস্ত, তাহারাই ইহাদিগকে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন পদার্থ বলিয়া মনে করে। যাঁহারা পরমার্থদৃষ্টিসম্পন্ন, তাঁহারা ইহাদিগকে স্বতন্ত্র বস্তু বলিয়া অনুভব করেন না। তাঁহারা সূর্য্য, ইন্দ্র, বায়ু প্রভৃতি বস্তুকে এক সদবস্তুরই বিকাশ বা পরিচায়ক চিহ্ন বলিয়া মনে করেন।

বেদান্তদর্শনের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদে, ২২ সূত্র হইতে এই পাদের শেষ পর্য্যন্ত, উপনিষদে ব্যবহৃত আকাশ, প্রাণ, আদিত্য, জ্যোতিঃ (সূর্য্য ও অগ্নি) প্রভৃতি শব্দের এই প্রকার অর্থই গ্রহণ করা হইয়াছে;—এই প্রকার ব্যাখ্যাই প্রদত্ত হইয়াছে। বেদান্তদর্শন স্পষ্টই বলিয়া দিয়াছেন যে, আকাশ সূর্য্যাদি শব্দ দ্বারা ভৌতিক জড় পদার্থগুলিকে বুঝিতে হইবে না। কেন না, ঐ সকল শব্দের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত বহু শব্দে "ব্রহ্মলিঙ্গ" বা ব্রহ্মের পরিচায়ক চিহ্ন আছে; সুতরাং এই সকল আকাশ সূর্য্যাদি শব্দদ্বারা, ঐ পদার্থগুলিকে না বুঝাইয়া, ঐ সকল পদার্থে অনুস্যূত কারণ-সত্তা বা ব্রহ্মসত্তাকেই বুঝিতে হইবে; অনুস্যূত, কারণ-সত্তাকে লক্ষ্য করিয়াই, উপনিষদ্‌গুলিতে সূর্য্য, আকাশাদি শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। দেবতা সম্বন্ধে বেদান্তদর্শনের ইহাই সিদ্ধান্ত।

উপনিষদের সিদ্ধান্তও অবিকল এইরূপ। ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যকের নানা স্থানে, যজ্ঞের উপাস্য অগ্ন্যাদিতে, যজ্ঞীয় মন্ত্রে সামগানে সর্ব্বত্রই প্রাণশক্তির অনুভব উপদিষ্ট হইয়াছে। সামগানের মন্ত্রগুলিতে পৃথিবী সূর্য্যাদির দৃষ্টির যে উপদেশ ছান্দোগ্যে দৃষ্ট হয়, তাহারও তাৎপর্য্য এই প্রকার। সামমন্ত্র উচ্চারিত হইবামাত্র যেন ভিতরে ও বাহিরে মূল 'প্রাণশক্তির' কথা চিত্তে জাগিয়া উঠে। যে প্রাণশক্তি হইতে সূর্য্য, বায়ু, অগ্নি প্রভৃতি অভিব্যক্ত হইয়াছে, সেই প্রাণশক্তির ক্রিয়াই যজ্ঞে উচ্চারিত সামমন্ত্রে ব্যক্ত হইয়া থাকে। ছান্দোগ্যের 'সংবর্গ বিদ্যায়' প্রদর্শিত হইয়াছে যে, প্রাণশক্তি হইতেই—চক্ষুঃ, শ্রোত্র, বাক মন প্রভৃতি ইন্দ্রিয় ব্যক্ত হয় ও উহাতেই লীন হয়। আবার, বাহিরেও চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু, অগ্নি, জলাদি বস্তু প্রাণশক্তি হইতেই ব্যক্ত হয় ও উহাতে লীন হয়; অর্থাৎ বাহিরে ও ভিতরে একই প্রাণ-স্পন্দন—নানা আকারে ক্রিয়া করে। 'ইন্দ্রিয়বর্গের কলহে' ও 'দেবতাবর্গের কলহে' প্রদর্শিত হইয়াছে যে, প্রাণশক্তিই ইন্দ্রিয়বর্গের মূলে এবং সূর্য্যাদি দেবতাবর্গের মূলে অবস্থিত। 'দেবাসুর-সংগ্রামের'

---

* আদিত্যাদিমতয় এব উদগীথাদয়ঃ উপাস্যাঃ। ঋগাদিষু পৃথিব্যাদিদৃষ্টি কর্ত্তব্যা। এবং প্রাণাত্মনা সাম উপাস্য
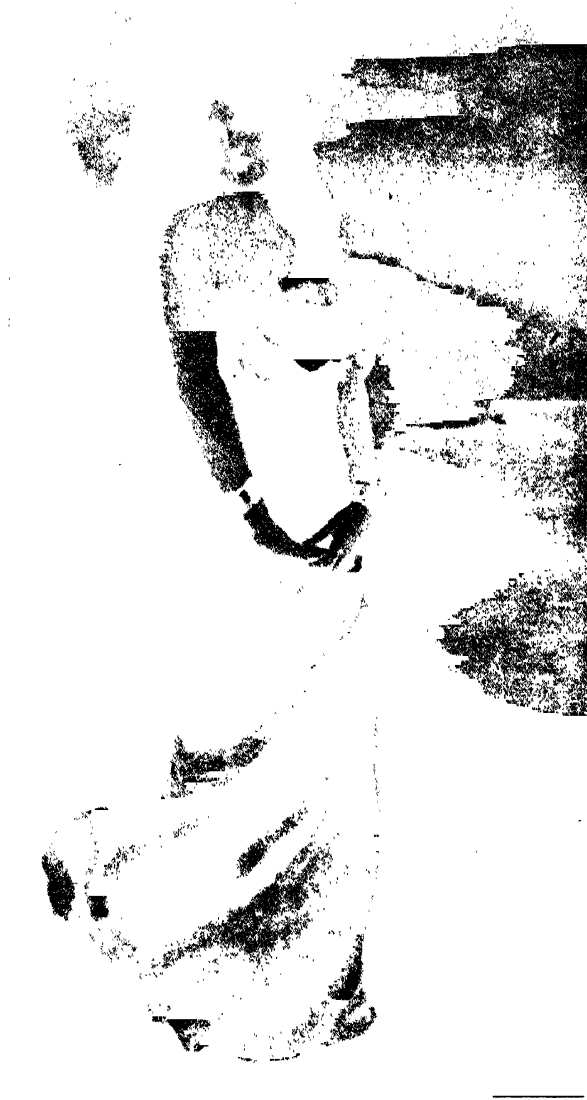
শৃঙ্খলিতা।

K. V. Seyne & Bros.

আরণ্যয়িকায়, এই প্রাণ-সত্তা বা কারণ সত্তারই অনুভূতি দৃঢ় করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

আমরা আর অধিক দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া, প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিব না।

উপনিষদ্ এবং বেদান্তদর্শন উভয়ই বৈদিক যুগের নিকট বর্ত্তী গ্রন্থ। এই সকল গ্রন্থে এই ভাবেই অগ্নি-সূর্য্যাদি দেবতাবোধক শব্দের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে; সুতরাং বৈদিক যুগে লোকে অগ্নি-সূর্য্যাদি শব্দ দ্বারা, ব্রহ্মসত্তা বা কারণ-সত্তাকেই বুঝিত। আমরা এই সকল ব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করিয়া, কাহার কথায় কেন আজ অগ্নি সূর্য্যাদি শব্দ দ্বারা ভৌতিক জড় পদার্থকেই বুঝিতে যাইব? নিরুক্ত, বৈদিক অভিধান গ্রন্থ। ইহাতেও ঐ সকল শব্দের কারণ-সত্তা বা ব্রহ্মসত্তা-দ্যোতক 'অধ্যাত্ম' ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। টীকাকার দুর্গদাস ও অনেক ঋগ্বেদ-মন্ত্রের, যজ্ঞপক্ষে, দেব-পক্ষে এবং ব্রহ্ম-পক্ষে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তবে কেন আজ আমরা, ব্রহ্মপক্ষের ব্যাখ্যাটি গ্রহণ করিয়া, ঋগ্বেদে-কথিত সূর্য্য-চন্দ্রাদি শব্দগুলিকে ভৌতিক জড়ীয় বস্তু-বোধক শব্দ বলিয়া গ্রহণ করিব?

শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্ন।

শৃঙ্খলিতা।

লো তরুণি, দুখের রাণি, সুন্দরি বন্দিনি,
রাজার ঘরের আলোর ঝারি, সোহাগ-সীমন্তিনি,
কি খুঁজিছ সাঁঝের আলোয় গিরি-শেখর-ফাঁকে?
হেরিছ কোন্ তারার রথে প্রাণের দেবতাকে?

কে বাঁধিল বাহুর লতা লোহার বেড়ী দিয়া?
কে বিঁধিল বজ্র-শরে কুরঙ্গিণীর হিয়া?
কালো লোহার কস্ লেগেছে সোণার শ্রীঅঙ্গে—
কে ছিঁড়িল ঝঙ্কৃত তার আশার সারঙ্গে?

দুঃখ দিল তোমার ভালে পরম পরসাদী—
চরণ-তলে করুণ-রোলে সাগর ওঠে কাঁদি'।
শিরীষ-কপোল কুরে কুরে ঝরে আঁখির নীর,
রোদনভরা নীরব অধর ভুবন-মোহিনীর।

উড়ন্ত ওই এলোচুলের কালীর ফোয়ারায়
তিমির-ঘন-অন্তরীপে পাষাণ গলে যায়।—
এড়িয়ে গেছ লো অচেনা, লো অপরাজিতা,
চিরদিনের অনির্ব্বাণ এই মরণ-শোকের চিতা।

শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বরলিপি।

গান ও সুর—স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।] [স্বরলিপি—শ্রীআশুতোষ ঘোষ।

একি মধুর ছন্দ, মধুর গন্ধ, পবন মন্দ মন্থর—
একি মধুর মুঞ্জরিত নিকুঞ্জ পত্রপুঞ্জ মর্ম্মর।
একি নিখিল বিশ্বহাসি,—
একি সুরভি, স্নিগ্ধ শিশিরসিক্ত কুসুম রাশি রাশি—
একি শ্যাম হসিত নব বিকশিত ঘন কিশলয় পল্লব—
একি সরিৎ-রঙ্গ, শত তরঙ্গ নৃত্য ভঙ্গ নির্ঝর।
কভু কোকিল মৃদুগীতে—
উঠে জাগি' শব্দ বিনিস্তব্ধ স্বপ্নময় নিশীথে—
উঠে বেণু গান মধুর তান করি' বিলাপ কম্পিত—
ঘন অবিশ্রান্ত—বিমল কান্ত নীল শান্ত অম্বর।
একি কোটি মুগ্ধ তারা!—
একি মধুর দৃশ্য—প্লাবি' বিশ্ব চন্দ্রকিরণ ধারা—
একি স্তিমিত নয়ন, শিথিল শয়ন অলস বিভল শর্ব্বরী—
শশী-বাহু লগ্ন মুগ্ধ মগ্ন সুপ্ত স্বপ্নসুন্দর।

০ ১ + ৩ ০ ১ + ৩
ন ন র্সর্সগ র্রর্সনধপ প - - - - র্সণধপম ম - — — ধপমগর রগনপ ন গ
একি মধুর ছ- - -ন্দ ম ধু র গ- - -ন্ধ প ব ন ম- - -ন্দ ম- - - ন্থ র

০ ১ + ৩ ০ ১ + ৩
মগ
সস ম— — ম—ম মগমপপ প— প নপ প ধ ধ — - পধ ণ ণ ধ
একি ম ধু র মু - ঞ্জ রিত নি কু -ঞ্জ প - - ত্র পু - ম্প ম - - র্ম্ম র।

০ ১ + ৩
ন ন ন — — ন ন র্স ধন র্স র্র র্স
একি নি খি ল বি - শ্ব হা - - সি—
একি কো — টি মু - গ্ধ তা - - রা—

০ ১ + ৩ ০ ১ + ৩
স
র্সর্স র্রর্রর্র র্রর্রর্র র্র — — র্গর্রর্গর্র সর্স র্সর্রর্গ র্গ র্গর্গ র্রর্গ র্ম—র্ম—
একি সুরভি স্নি-গ্ধ শি শি র সি— —ক্ত কু-সু ম রাশি রা - - - শি—
একি মধুর দৃ -শ্য প্লা - বি বি— —শ্ব চ-ন্দ্র কি র ণ ধা - - - রা—

০ ১ + ৩ ০ ১ + ৩

গাঁ গাঁ গাঁ গাঁ গাঁ গাঁ মাঁ গাঁ র্রর্রর্র র্গর্র র্সর্সর্সণধপ পধ ণ ধ প

একি শ্যা-ম হসিত নববিকশিত ঘন কিশলয় প - - ল্লব

একি স্তিমিত নয়ন শিথিল শয়ন অলস বিহ্বল শ - - র্বরী

০ ১ + ৩ ০ ১ + ৩

ম ম ণ — — ণ — ধ প ধ ন র্স র্স র্স ন র্স র্স নর্সর্স নর্সর্রর্সণ ধপ

একি সরিৎ র-ঙ্গ শত তর-ঙ্গ নৃ-ত্য ভঙ্গ নি- - র্ঝ র

শশী বা-হু ল-গ্ন মু-গ্ধ ম-গ্ন সু-প্ত স্ব-প্ন সু- - ন্দ র।

০ ১ + ৩

স — স র গ গ গ গ রগ ম — মম

ক ভূ কো কিল মু হু র্গা - - -তে

০ ১ + ৩ ০ ১ + ৩

ম ম গম পপ প—প প প প প ধপধপ ম মপধ ধধধ পধ ণ — —

উঠে জা- -গি শ- -ব্দ বি নি - - স্ত - ব্ধ স্ব-প্ন ময় নি শা- -থে —

০ ১ + ৩ ০ ১ + ৩

ন ন নর্সর্স নর্সর্স নর্সর্স র্রর্স ণধ ধ ধধ ধ র্সণধ— প র্গ র্গর্গ — —

উঠে বে-ণু গা-ন মধুর তা- - -ন করি বি লা - - প ক-ম্পি ত

০ ১ + ৩ ০ ১ + ৩

র্গর্গ র্গ র্গ র্গ র্মর্গ র্গর্র র্র — — গর রস র্স — — র্রর্স ণধ পধণর্স ণধ

ঘন অবিশ্রা- - ন্ত বি ম ল কা- -ন্ত নী - ল শা -ন্ত অ- -ম্বর। আ

স, র, গ, ম, প, ধ, ন,—দ্বারা সপ্তকের সাতটি সুর দর্শিত হইয়াছে।

ণি,—নি কোমল বুঝিতে হইবে। একটি অক্ষর একমাত্রাকালস্থায়ী, কিন্তু যেখানে দুই বা ততোধিক একত্রে লিখিত এবং নিম্নে ‿ চিহ্নিত হইয়াছে, সে স্থলে ঐ চিহ্ন-মধ্যস্থিত সুরগুলি সকলে মিলিয়া একমাত্রাকাল স্থায়ী। এই লিপিতে যেখানে দুই সুর একত্র করা হইয়াছে,—প্রত্যেকটি অর্দ্ধমাত্রা, ও ৪টি হইলে প্রত্যেকটি সিকিমাত্রা, উচ্চ সপ্তকের সুর রেফ দ্বারা দর্শিত হইল, যথা, র্স।

যেখানে, মপ, এইরূপ আছে, সেখানে বামপার্শ্বের উপরের সুরটি কেবল ছুঁইয়া যাইতে হইবে,—এবং উভয়ে মিলিয়া একমাত্রাই হইবে।

একতালা দ্বাদশমাত্রিক তাল। ইহাকে চারিভাগ করিয়া প্রত্যেক তালে তিন মাত্রা রহিল। যেখানে উপরে ০ চিহ্ন আছে,—সেস্থানে ফাঁক বুঝিতে হইবে এবং + চিহ্ন দ্বারা 'সম' দর্শিত হইল। ১ এবং ৩, প্রথম ও তৃতীয় তাল।

জাক্কো-শীর্ষ হইতে সিমলা—দূরে শালি-পাহাড়।

শঙ্কর-দর্শন।

(২)

শ্রীমৎ-শঙ্করাচার্য্য যে কয়টি মতবাদের বিষয় তাঁহার ভাষ্যাদিতে উত্থাপিত করিয়াছেন আমরা প্রথমে সেইগুলির যথাযথ উল্লেখ করিয়া, পরে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দার্শনিক মতবাদের সহিত তুলনা করিয়া সেইগুলির সারবত্তা নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিব। জীবাত্মা ও পরমাত্মা সম্বন্ধে শঙ্করাচার্য্যের মত এইরূপ,—আমরা জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে এক দেখিয়া থাকি; জগতের সৃষ্টি,স্থিতি ও লয় কিছুই কল্পিত হয় না। ব্যবহারাবস্থার জ্ঞানে আমরা জগতের সৃষ্টি দেখিতে পাই; জীবাত্মাকে ব্রহ্মের সহিত এক অনুভব করিতে পারি না। উপাধি বিশিষ্ট জীবাত্মাসকল অনাদি কাল হইতে অবস্থিতি করিতেছে এবং যে পর্য্যন্ত না একেবারে পূর্ণবিমুক্তি হয়, ততদিন শরীর হইতে শরীরান্তর পরিগ্রহ নিবারিত হয় না। এখানে পূর্ব্বকথিত জগৎসৃষ্টিতত্ত্ব রূপান্তরিত হইতেছে। জগৎ একবার মাত্র সৃষ্টি না হইয়া ক্রমান্বয়ে পুনঃ পুনঃ ব্রহ্ম হইতেই প্রকাশ হইতেছে এবং ব্রহ্মেই ইহা বারংবার মুদিত হইতেছে। এইরূপ অনাদিকাল হইতে চলিতেছে এবং অনন্তকাল চলিবে।

বাহ্য জগৎ ও জীবাত্মা সকল প্রত্যেক প্রলয়ে বীজভূত হইয়া ব্রহ্মে অবস্থিতি করে এবং প্রত্যেক সৃষ্টিকালে তন্মধ্য হইতে অপরিবর্ত্তিতভাবে বিনিঃসৃত হয়। এরূপ কল্পনায় সৃষ্টিতত্ত্বের মৌলিক অর্থ সংরক্ষিত হয় না, অথচ ইহা বেদপ্রতিপাদ্য বলিয়া পরিত্যক্ত হইতে পারে না। বেদান্তে বিশ্বসৃষ্টির অভিপ্রায় প্রকাশ পায় না, বরং বিশ্ব যে অনাদিকালাবধিই আছে, ইহাই দ্যোতিত হয়।

যুক্তিপ্রতিপাদ্য বিশ্বতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্ব আলোচনা করিলে সৃষ্টিতত্ত্বের প্রধান অভিপ্রায় বুঝিতে পারা যায়; সংসারচক্র অনাদিকালাবধি বিঘূর্ণিত হইতেছে। ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্রভাবে অনাদিকালাবধি জীবাত্মা সকল বিরাজ করিতেছে। এই সকল জীবাত্মা যথার্থতঃ ব্রহ্ম হইতে বিভিন্ন না হইলেও,উপাধি-পরিবেষ্টিত হইয়া বিভিন্নরূপে প্রতীয়মান হয়। যে সকল উপাধি সমাবলীর সহিত আত্মায় সংলগ্ন হয়, তাহার কি হয়? সূক্ষ্ম শরীরস্থ ইন্দ্রিয়, মন,মুখ্যপ্রাণ, এবং কখন কখন স্থূল শরীর ও বাহ্যজগৎ—সেই উপাধি সকলের মধ্যে পরিগণিত হয়। মৃত্যুকালে কেবল স্থূল দেহ নষ্ট হয়; সূক্ষ্মদেহ ও মানসযন্ত্র (Psychical organs) অনাদিকাল হইতে বিদ্যমান রহিয়াছে এবং আত্মার সমভিব্যাহারে থাকিয়া প্রতি জন্মে পরিস্ফুট হইয়া থাকে। আনুষ্ঠানিক ও নৈতিক ক্রিয়া সকলও নিত্য আবর্ত্তনশীল আত্মার সমভিব্যাহারী হয়; যেহেতু, সৎই হউক, অসৎই হউক, কর্ম্মমাত্রই, পুরস্কার অথবা দণ্ডস্বরূপ অনুরূপ জন্মান্তর ব্যবস্থা করিয়া থাকে। এই পুরস্কার বা দণ্ড প্রথমতঃ অন্যলোকে এবং তদনন্তর এই পৃথিবীতে ভোগ হইয়া থাকে। আবার দেহিমাত্রকে কর্ম্ম করিতেই হইবে। কর্ম্মব্যতীত জীবনযাত্রা অসম্ভব। সুতরাং এক জীবনে কর্ম্ম, তৎপর-জীবনে ভোগ, পক্ষান্তরে, উক্ত জীবনও যে কর্ম্মদ্বারা সমাপ্ত হইবে, সে কর্ম্মের ফল ভোগার্থ পুনর্জ্জন্ম অবশ্যম্ভাবী। এইরূপে অনন্ত জন্ম-মরণ শৃঙ্খলের হাত হইতে কেহই এড়াইতে পারে না। উৎকৃষ্ট কর্ম্মপ্রভাবে দেবযোনি প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং অপকৃষ্ট কর্ম্মদ্বারা পশু, পক্ষী অথবা উদ্ভিদ জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয়। যদি বর্ত্তমান জীবনে কেহ কোনও কর্ম্ম না করে, তথাপি কেহ পুনর্জ্জন্মের হাত হইতে একেবারে নিষ্কৃতি পায় না, যেহেতু, (অতীত সৎ ও অসৎ) কর্ম্মের একজন্মে পর্য্যবসান হয় না; কর্ম্মজন্য ক্রমান্বয়ে কতিপয় জীবন অতিবাহিত করিতে হয়। এই কারণে উদ্ভিদজাতি হইতে দেবগণ পর্য্যন্ত অনাদি কালাবধি ক্রমান্বয়ে জীবনের পর জীবন যাপন করিয়া আসিতেছে এবং জ্ঞানপ্রভাবে কর্ম্মের প্রচ্ছন্নশক্তি নষ্ট না হইলে অনন্তকাল এইরূপ করিবে।

এই নাম-রূপপ্রপঞ্চ জগতের অভিব্যক্তি বস্তুতঃ আত্মার উপর অধ্যারোপিত কর্ম্মফল ব্যতীত আর কিছুই নয়। এখন সিদ্ধান্ত হইল যে এই দৃশ্যজগৎ আত্মার কর্ম্মসূচিত এক অনুভবনীয় ব্যাপার। আত্মা কর্ম্মফলস্বরূপ ইহা সম্ভোগ করিয়া থাকে। কর্ম্ম ও কর্ম্মফলের মধ্যবর্ত্তী থাকিয়া যাহা এতদুভয়ের সম্বন্ধ যোজনা করে, তাহা অস্তিত্ব বিরহিত অদৃষ্টশক্তিমাত্র নয়, তাহা অবিদ্যাভূত ব্রহ্মের ব্যক্তিত্বব্যঞ্জক ঈশ্বর। তিনি পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মানুরূপ জীবের সুখ, দুঃখ ও কর্ম্মবিধান করিয়া থাকেন।

জীবের পুনরাবর্ত্তনচক্র যে নিয়মের বশবর্ত্তী, জগতের

পুনরাবর্ত্তন চক্রও সেই নিয়মের বশবর্ত্তী। জীবগণ যখন প্রলয়কালে ব্রহ্মে সংলগ্ন হইয়া যায়, তখন তাহাদের বীজভূত কর্ম্ম সকল প্রচ্ছন্ন অবস্থায় থাকিয়া ফলপ্রসবের উদ্যোগ করে; তাহার ফলে ব্রহ্মাণ্ডের পুনঃসৃষ্টি সম্পাদিত হয়।

সৃষ্টিকালে ব্রহ্ম হইতে সর্ব্বপ্রথম আকাশ উৎসৃষ্ট হয়; আকাশ হইতে বায়ু; বায়ু হইতে অগ্নি; অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হয়। আবার প্রলয়কালে বিপরীত প্রণালীতে সৃষ্ট পদার্থনিচয় ব্রহ্মের ভিতর আকৃষ্ট হইয়া পুনর্মিলিত হইয়া থাকে।

আকাশ, শ্রুতিদ্বারা—বায়ু, শ্রুতি ও স্পর্শদ্বারা—অগ্নি, শ্রুতি, স্পর্শ, ও চক্ষুদ্বারা—জল, শ্রুতি, স্পর্শ, চক্ষু ও জিহ্বাদ্বারা—পৃথিবী, শ্রুতি, স্পর্শ, চক্ষু, জিহ্বা এবং ঘ্রাণেন্দ্রিয়দ্বারা অনুভূত হইয়া থাকে। (এই সকল উপাদান মিশ্র অবস্থায় উৎপন্ন হইয়া থাকে।)

উপনিষদের মতে, ব্রহ্ম ভূতসকলকে সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে জীবাত্মারূপে অনুপ্রবিষ্ট হ'ন অর্থাৎ আবর্ত্তনকারী আত্মা সকল সৃষ্টিপ্রলয়ের পর ব্রহ্মে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিতি করে, পরে সৃষ্টিকালে মায়াময়ী মহাসুষুপ্তি হইতে জাগ্রৎ হইয়া পূর্ব্ববর্ত্তী জীবনের কর্ম্মানুযায়ী দেব, কি মানুষ, তির্য্যক্ কি উদ্ভিদ্-দেহ ধারণ করে। যে প্রণালীতে ইহা সম্পাদিত হয়, তাহা এই : পুনরাবর্ত্তনকালে আত্মা সূক্ষ্ম শরীরে যে বীজ-উপাদান সংগ্রহ করে, তৎসমুদায় স্থূল উপাদান হইতে স্থূলদেহে বর্ত্তমান পরমাণুপুঞ্জদ্বারা সংবর্দ্ধিত হয়। অমনই সেই সময় সংপিণ্ডিতাবস্থাপন্ন মনোময় বৃত্তিগুলি ক্রমশঃ উদ্ভিন্ন হইতে থাকে।

নাম ও রূপবিশিষ্ট এই দৃশ্যজগৎ স্বপ্নবৎ। জগতের সমস্তই অবিদ্যাজনিত ভ্রান্তি হইলেও আমাদের আত্মা মিথ্যা বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। এই আত্মাকে সপ্রমাণ করা যায় না, যেহেতু কোন কিছু প্রমাণ করিবার আবশ্যক হইলে পূর্ব্বে তাহার অস্তিত্ব কল্পনা করিতে হয়। ইহাকে খণ্ডন করাও যায় না, যেহেতু, ইহাকে খণ্ডন করিতে হইলে পূর্ব্বে ইহার অস্তিত্ব স্বীকার না করিয়া ইহাকে খণ্ডন করা যায় না।

আমাদের আভ্যন্তরিক সত্ত্বা সকল সত্যাবধারণের কারণস্বরূপ। এই জীবাত্মার প্রকৃতি কি? যিনি আমাদের ভিতর সকল সত্ত্বা অবধারণ করিতেছেন, সেই ব্রহ্মের সহিত আত্মার সম্বন্ধ কি?

আত্মা ব্রহ্ম হইতে বিভিন্ন নয়। যেহেতু, ব্রহ্ম ব্যতিরেকে আর কিছুই নাই। ইহা ব্রহ্মের পরিণামাবস্থাও নয়, যেহেতু, ব্রহ্ম সম্পূর্ণরূপে অপরিবর্ত্তনীয়। ইহা ব্রহ্মের অংশস্বরূপও নয়, যেহেতু ব্রহ্ম অবিভাজ্য; সুতরাং আত্মা ও ব্রহ্ম এক, আমরা প্রত্যেকেই অবিভাজ্য, অপরিবর্ত্তনীয় এবং সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম।

ইহাতে বুঝাইতেছে যে, পরব্রহ্মের প্রকৃতি সম্বন্ধে যাহা প্রযুক্ত হয়, আত্মার প্রকৃতি সম্বন্ধেও তাহাই প্রযোজ্য। ব্রহ্ম যেমন প্রকৃতিগত বিশুদ্ধ চৈতন্য, আত্মাও তদ্রূপ। ব্রহ্মের বিশেষত্ব অপসারিত করিবার জন্য যেমন তাহার উপর কল্পিত উপাধি সকল খণ্ডন করিতে হয়, সেইরূপ আত্মা সম্বন্ধেও তাহা প্রযোজ্য হইয়া থাকে। সুতরাং আত্মা ব্রহ্মের ন্যায় সর্ব্বময়, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান, অকর্ত্তা ও অভোক্তা।

যদি আত্মা প্রকৃতিগত এইরূপ, তাহা হইলে এতদ্বিপরীত যাহা কিছু আত্মা সম্বন্ধে কল্পনা করা যায়, তাহা অজ্ঞানসম্ভূত বলিতে হইবে। এই সকল উপাধি আত্মার সঙ্কীর্ণত্ব সম্পাদন করে। আত্মা সেই সঙ্কীর্ণ অবস্থায় অন্তঃকরণের ভিতর মনের সীমাবদ্ধস্থানে অবস্থিতি করে। এই অবস্থায় আত্মার জ্ঞান ও শক্তি সঙ্কীর্ণতাপ্রাপ্ত হয়। দৃষ্টান্ত—যেমন অগ্নির আলোক ও উত্তাপ কাষ্ঠের ভিতর প্রচ্ছন্ন অবস্থায় থাকে, সেইরূপ আত্মার সর্ব্বজ্ঞতা ও সর্ব্বশক্তিমত্তা উপাধির ভিতর প্রচ্ছন্ন থাকে। সকলের সহিত সম্মিলিত হইয়া আত্মার কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব সম্পাদিত হয়। শেষোক্ত এই দুই প্রকার বিশেষণ প্রভাবে আত্মার সংসারবন্ধন সংঘটিত হয়; যেহেতু এক জন্মের কর্ম্ম জন্মান্তরের ভোগ্যরূপে পরিণত হয় এবং পক্ষান্তরে পরজন্মে পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মভোগ কালে দেহী যে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় সেই কর্ম্মফল ভোগ করিবার জন্য জন্মান্তর পরিগ্রহ অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। এই প্রকারে একদেহ হইতে দেহান্তর পরিগ্রহের অনন্ত পারম্পর্য্য সম্পন্ন হয়।

অবিদ্যাজনিত উপাধিসকল আত্মার প্রকৃত স্বভাব লুক্কায়িত রাখে। সেই অবস্থায় আত্মা, জন্ম ও মৃত্যুর অনন্ত

চক্র পরিবেষ্টন করে। আমাদের জড়দেহ ও বাহ্যজগতের সহিত, উক্ত দেহের সম্বন্ধবিশিষ্ট পদার্থনিচয়ের সহিত উক্ত উপাধিসকলের সম্বন্ধ নাই। জড়দেহ মৃত্যুকালে পঞ্চভূতে সংমিশ্রিত হইয়া যায়। জীবাত্মার সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া উপাধি সকল জড়দেহ হইতে বহির্ভূত হয়। আত্মা—(১) মন ও ইন্দ্রিয়, (২) মুখ্যপ্রাণ ও (৩) সূক্ষ্মশরীর—এই ত্রিবিধ উপাধিভূষণে অনাদিকাল হইতে মোক্ষ পর্য্যন্ত ভূষিত থাকে। ঐ আবরণ ব্যতীত আত্মার আর একটি নৈতিক পরিচ্ছদ আছে। এখন একটু বিশেষ করিয়া এই সকল উপাধির বিষয় আলোচিত হইতেছে।

চক্ষু, কর্ণ, হস্ত, পদ প্রভৃতির সহিত জড়দেহ নষ্ট হইয়া গেলেও ঐ সকল দৈহিক-যন্ত্রের বৃত্তিগুলি নষ্ট না হইয়া আত্মার সহিত সম্বদ্ধ থাকে। এই বৃত্তিসকল ইন্দ্রিয়নামে অভিহিত; জীবিতাবস্থায় আত্মা ইহাদিগকে আপনা হইতে বহির্ভূত করে এবং মৃত্যুকালে আপনার ভিতরেই আকর্ষণ করিয়া লয়। এই সকল ইন্দ্রিয়দ্বারা আমাদের যাবতীয় অনুভূতি ও কার্য্য সম্পাদিত হয় এবং তাহাতে আমাদিগের দর্শন, শ্রবণ, আঘ্রাণ, আস্বাদন ও স্পর্শ; গ্রহণ, গতি, কথন, উৎপাদন ও ত্যাগ এই কয়টি কার্য্য নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। দশ ইন্দ্রিয়ের কেন্দ্রস্থানে মনের অবস্থিতি; দশ ইন্দ্রিয় মনের দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়সকল সমস্ত শরীর ব্যাপিয়া রহিয়াছে; কিন্তু, মন সূচ্যগ্রসদৃশ আকৃতিতে হৃদয়াভ্যন্তরে বিরাজ করিতেছে। আবার এই মনের ভিতর ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ হইয়া আত্মা বিরাজ করিতেছে। আত্মা, মন ও ইন্দ্রিয় অপেক্ষা অল্প সংস্রবে মুখ্যপ্রাণের সহিত আসক্ত। মুখ্যপ্রাণকে উপনিষদে মুখের শ্বাসবায়ু বলিয়া থাকে। বেদান্তে ইহাকে জীবনের শ্বাস রূপে অভিহিত করা হয়। মন এবং ইন্দ্রিয়, অনুভূতি ও কার্য্যের এক একটি আকৃতি স্বরূপ। মুখ্যপ্রাণের উপর এই সকলের অস্তিত্ব নির্ভর করিতেছে। ইহা ভৌতিক শরীরের একটি স্বতন্ত্র সত্তা মাত্র। মুখ্যপ্রাণ, প্রাণ, অপান, ব্যান, সমান, ও উদান এই পঞ্চ অংশে এই শরীরকে পরিচালিত করে। প্রাণ—প্রশ্বাস ও অপান নিঃশ্বাসরূপে শরীরকে পরিচালিত করিতেছে। যখন শ্বাস প্রশ্বাস মুহূর্ত্তজন্য স্থগিত থাকে, ব্যান তখন জীবন রক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত থাকে। সমান ভোক্তা দ্রব্য জীর্ণ করে। উদান আত্মার দেহত্যাগ কালে প্রধান একশতএক শিরার অন্যতমের মধ্যদিয়া আত্মাকে পথ দেখাইয়া লইয়া যায়। মৃত্যুকালে মন, ইন্দ্রিয় ও মুখ্যপ্রাণ আত্মার সহগামী হয়। জীবিতকালে ইহারা শক্তিরূপে শারীরিক যন্ত্র সকলকে শাসন করিয়া থাকে; শরীর নাশের পর অন্য নূতন দেহের নূতন বৃত্তির পুনর্জন্মসাধক বীজরূপে অবস্থিতি করে। আত্মা একদিকে যেমন ইন্দ্রিয়ের সহিত দৈহিক বৃত্তি সকলের বীজ সমভিব্যাহারে লইয়া থাকে, অন্যদিকে তেমনই সূক্ষ্ম শরীরের সহিত জড়দেহের বীজ বহন করে। শঙ্করাচার্য্য এই বীজকে দৈহিক বীজ-উপকরণের সূক্ষ্মাংশ রূপে অভিহিত করিয়াছেন। এই সমস্ত উপাদানের সূক্ষ্মাংশ গুলি জড়দেহের সহিত কিরূপ সম্বন্ধযুক্ত, তাহা সুস্পষ্ট নির্ণীত হয় নাই। এই সকল সূক্ষ্মাংশ রচিত জড়দেহ ভৌতিক হইলেও স্বচ্ছতাসম্পন্ন; সুতরাং আত্মার দেহান্তরাবস্থায় ইহা দৃষ্টিগোচর হয় না। এই সূক্ষ্ম শরীরই দৈহিক উত্তাপের কারণ। আত্মার দেহান্তর-কালে জড়দেহ হইতে সূক্ষ্মশরীরের অন্তর্দ্ধান মৃতদেহের শৈত্যের কারণ।

আত্মার সহিত চির-সংসক্ত ও অপরিবর্ত্তনীয় মনোযন্ত্র দেহাবসানে আত্মার সমভিব্যাহারী অন্য এক পরিবর্ত্তনশীল উপাধির সহিত সংসক্ত থাকে। এটি জীবের স্বভাব, জীবিতাবস্থায় কর্ম্ম সমষ্টিতে ইহা রচিত হয়। ভূতাশ্রয় অর্থাৎ সূক্ষ্মশরীর ব্যতীত এই জীবস্বভাব আমাদের কর্ম্মাশ্রয়রূপে জড়দেহ হইতে বহির্গত হয় এবং জীবের ভবিষ্যৎ সুখদুঃখের অবস্থা ও কর্ম্মসকলকে নিয়মিত করে।

প্রমাণ পঞ্জী—

বৌদ্ধ—বৌদ্ধধর্ম্ম ।

(চীনে বৌদ্ধধর্ম্ম)

1. Bunyiu Nanjio—A catalogue of the Chinese Translation of the Budhist Tripitaka. Oxford, 1883

2. S. Beal—A catena of Budhist Scriptures from the Chinese. London, 1871.

3. S. Beal. Abstract of four lectures on Budhist Literature in China. London, 1882

4. S. Beal—Budhism in China, S. P. C. K. London, 1884.

5. J. Edkins:—Religion in China. London, 1893. 2nd ed.

6 E. H. Parker: China & Religion. London, 1905.

7. J. J. M. de Groot:—Le code du Mahayana en Chine. Amsterdam, 1893

8. J. J. M. de Groot: The Religious system of China. Vols I to V. Leyden, 1892 1907.

9. C. Puini:—Encyclopaepedia Sinico Giapponese. (A translation into Italian of parts of the Wa kan san sai tu ye).

10. E. I. Eitel:—Handbook of Chinese Budhism; being a Sanskrit-Chinese Dictionary. Hongkong, 1888. 2nd ed.

11. C. de Harlez: Vocabulaire Buddhique Sanskrit-Chinois. Leide, 1897.

12 A Wylie: Notes on Chinese Literature. (Pages 204-215 on Budhist books) Shanghai, 1901 New ed

13. C. de Harlez: Les Quarante-deux Lecons de Bouddha, on le king des XLII. Sections. Paris, 1890.

14. W. Schott:—ii beiden Buddhaismus in Hochasien and in China. (Partly a translation of the book Ching tu wen.) Berlin, 1846.

15. T. Richard: Guide to Buddahood; being a standard Manual of Chinse Budhism. Translated Shanghai, 1907.

16. T. Watters. The Eighteen L han of Chinese Budhist Temples. Shanghai, 1800

17 D. T. Macgowan: Self Immolation by fire in China. Chinese Recorder, vol. XIX, No 11, p 508 et seq.

18. G. Miles: Vegetarian sects Chinese Recorder, vol xxxiii, No I. p. 1. et seq.

19. S W. Bushell:—Chinese Art. 2 vols London, 1904, 1906 (on the Chinese Pilgrims in India)

কোরিয়ায় বৌদ্ধধর্ম্ম—

20. The Korea Review, a monthly magazine. Seoul, 1901-1906.

21. W. E Griffis: The Religions Buddhism in Japan. of Japan New York, 1806. 3rd ed.

22. Banyiu Nanjio:—A short History of Twelve Japanese Budnist sects. Tokyo, 1886.

23. Ryauon Fujishima;—Le Bouddhisme Japonais. Paris, 1889

24. G. W. Knox:—The development of religion in Japan, New York, 1907.

25 E. M. Satow and A. G. S. Hawes:—A hand book for travellers in Central and Northern Japan. London. 1884.

26. G. Migeon:—Au Japon:—Promenades aux sanctuires de l' Art. Paris, 1908.

27. C Netto and G. Wagener:—Japanischer Humor Leipzig, 1901.

28. W. Anderson:—A History of Japanese Art Translations of the Asiatic Sciety of Japan, vol. VII, part IV, Tokyo, 1889.

29. L. Hearn:—Gleanings in Buddha Fields Boston and New York, 1898.

30. L. Hearn:—In Ghostly Japan. Boston, 1903.

31. L. Hearn:—Kwaidan. Boston & New York, 1908.

32. Anesaki—Masahar:—Religious History of Japan An outline with 2 appendices on the Textual History of the Buddhist Scriptures. Tokyo, 1907.

33 S. Kuroda:—Outlines of the Mahayana. Tokyo, 1893.

34 A. Lloyd:—Developments of Japanese Buddhism. Transactions of the Asiatic Society of Japan. Vol. xxii, part iii, p. 337, et seq.

35. A Lloyd:—The praises of Amida, seven Buddhist Sermons, translated 1907.

36. J. Troup: On the Tenets of the Shinshiu, or True Sect of Buddhists, transactions of the Asiatic Society of Japan, vol xiv, part i, p. 1. et. seq. Yokohama, 1886.

37. J Troup:—The Gobunsho, or Ofumi, of Reunyo shonin. Transations of the Asiatic Society of Japan, vol. vii part iv. p. 267 et seq, Yokohama, 1890,

38. I. M. James:—A Discourse on Infinite Vision Transactions from the Asiatic Society of Japan. vol vii part iv, p 267, et seq. Yokohama, 1880.

39. I. Suzuki:—The zen sect of Buddhism. Journal of the Pali Text Society, 1906-07.

40. H Haas:—Die Secten des Japanischen Buddhismus. Heidelberg, 1905

41. H Haas:—Die kontemplativen Schulen des Buddhismus. Tokyo, 1905,

42 Kobayashi:—The Doctrines of Nichiren, with a Sketch of his Life. Shanghai, 1903.
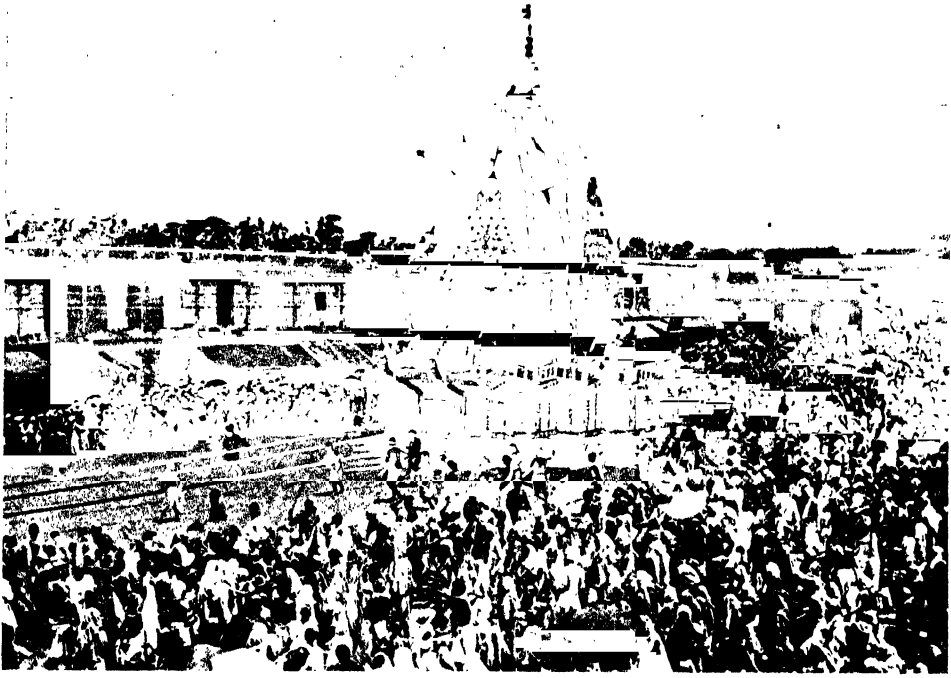
শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা।

রথযাত্রা।

"রথেস্তু বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে" এই আজন্ম-সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া ধর্ম্মগতপ্রাণ হিন্দু আজন্ম দুঃখের নিদান জন্ম হইতে রক্ষা পাইবার জন্য সাগ্রহে পুরী যাত্রা করিয়া থাকেন। অদ্য আমরা সেই রথযাত্রা সম্বন্ধে দুএকটি কথা বলিব।

আষাঢ় মাসে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রার সময় দয়িতা-পাণ্ডাগণ রমণীর ন্যায় গামছা দ্বারা বক্ষঃস্থল আবৃত করিয়া গোপিকাভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া আনন্দাতিশয়ে হাসিতে হাসিতে 'পট্টডোরী' দিয়া শ্রীভগবানের কটিদেশ বাধিয়া ফেলেন। তৎপরে হর্ষ কোলাহল করিতে করিতে অগ্রে বলরাম, তারপর সুভদ্রা, সুদর্শন ও পরিশেষে শ্রীজগন্নাথদেবকে লইয়া যাত্রা করেন। এই 'পাণ্ডুবিজয়' যাত্রাকে উৎকলে 'ধাড়িপহণ্ডী' বলে। সর্ব্বাগ্রে শ্রীবলরামকে তাঁহার শ্রীরথ'তালধ্বজ' প্রদক্ষিণ করাইয়া তাহার উপর অবরোপিত করা হয়। এইরূপে শ্রীসুভদ্রা দেবী ও শ্রীসুদর্শনকে 'বিজয়া' রথে ও সর্ব্বশেষে শ্রীভগবানকে 'নন্দি ঘোষ' রথে চাপান হয়।

শ্রীমন্দির হইতে গুণ্ডিচা বাড়ী পর্য্যন্ত রথযাত্রা হইয়া থাকে। বৈষ্ণবদিগের মতে এই যাত্রা ভগবানের ঐশ্বর্য্যময়ী রাজধানী দ্বারকা হইতে লীলাস্থলী প্রকৃতির রম্য উপবন-শ্রী-বিভূষিত শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা। কবিকেশরী কর্ণপূর-রচিত শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটকের দশম অঙ্কে এই কথাই লিখিত আছে। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থেও (মধ্যলীলা, ১৪শ পরিচ্ছেদে) এই কথাই দেখিতে পাওয়া যায়:—

"যদ্যপি জগন্নাথ করে দ্বারকা-বিহার।
সহজ প্রকট করে পরম উদার॥
তথাপি বৎসর মধ্যে হয় একবার।
বৃন্দাবন দেখিবারে উৎকণ্ঠা অপার॥
বৃন্দাবন-সম এই উপবনগণ।
তাহা দেখিবারে উৎকণ্ঠিত হয় মন॥
বাহির হইতে করে রথযাত্রা ছল।
সুন্দরাচল যায় প্রভু ছাড়ি নীলাচল॥"

গুণ্ডিচা বাড়ীর সুন্দরাচলের উপর অবস্থিত নীলাচলেই প্রভুর মন্দির।

আর প্রভুর অসংখ্য সেবক পাণ্ডা থাকিতে দয়িতাগণ

দ্বারা আনীত হওয়ার অর্থ বোধ হয় তাহাদের মধ্যে অনেকে গোপী-ভাবাপন্ন বলিয়া। অন্যদেশের রথযাত্রা ও পুরীধামের রথযাত্রার পার্থক্য প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের অমৃতময়ী ভাষায় বলি, "অন্য দেশের রথযাত্রার ভাব—ক্রূরমতি কংস কর্ত্তৃক প্রেরিত অক্রূর যেন ব্রজের জীবন কৃষ্ণধনকে লইয়া রথে করিয়া মথুরায় গমন করিতেছেন; আর ব্রজের নরনারী, পশুপক্ষী, তরুলতা, তৃণগুল্ম, নদীভূমি কাঁদিয়া কাঁদিয়া গগন বিদীর্ণ করিয়া ফেলিতেছেন; কিন্তু এখনকার রথযাত্রার ভাব ঠিক ইহার বিপরীত। অন্য স্থানের রথযাত্রা—বিষাদের বিষতরঙ্গিণী, আর পুরীধামের রথযাত্রা—আনন্দের মঞ্জু-মন্দাকিনী। অন্য স্থানের রথযাত্রা—করুণা ঔদাস্যের আলেয়া বেহাগ বাগেশ্রী, আর পুরীধামের রথযাত্রা—উজ্জ্বল-মধুর রসের সাহানা-বাহার। অন্য স্থানের রথযাত্রা-বিরহের হা হুতাশমাখা নিদাঘ-মধ্যাহ্ন, আর পুরীধামের রথযাত্রা মিলনের মঙ্গলগীতি-মুখরিত মৃগাঙ্ক-কর-বিধৌত মধুযামিনী।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা আমাদের এই সনাতন রথযাত্রাকে বৌদ্ধদিগের রথযাত্রার অনুকরণ বলিয়া প্রমাণ করিতে চাহেন। প্রমাণগুলির সারবত্তা ত আমরা দেখিতে পাই না। বৌদ্ধদিগের রথ ছিল, হিন্দুদিগের রথ আছে; অতএব হিন্দুর রথ বৌদ্ধদের অনুকরণ। এস্থলে আমাদের জিজ্ঞাস্য, যখন হিন্দুদিগের সমগ্র শাস্ত্রেই রথের বর্ণনা রহিয়াছে, তখন কি করিয়া এ বিষয়ে হিন্দুগণ বৌদ্ধদিগের নিকট ঋণী?

হিন্দুর নানা দেশে নানা দেব-বিগ্রহের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ঘোষপাড়ার রথযাত্রা বৈশাখ মাসে হইয়া থাকে। অনেক বৈষ্ণব-প্রধান দেশে কার্ত্তিক মাসে উত্থান-একাদশীর দিন রথযাত্রা হইয়া থাকে। শ্রীহরিভক্তি-বিলাস গ্রন্থের ১৬শ বিলাসে ইহার বিষয় সম্যক্‌-রূপে জানিতে পারা যায়। মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোণার সুপ্রসিদ্ধ রথযাত্রা কার্ত্তিক মাসেই হয়। শ্রীরঙ্গক্ষেত্রের ও শ্রীবৃন্দাবনধামের শেঠেদের শ্রীরঙ্গনাথজীউর রথ কৃষ্ণানবমী তিথিতে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

মাসিক সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ—বৈশাখ।

ধর্ম্ম—দর্শন

আপ্ত ঋষি এবং আপ্ত বাক্য—কবিরাজ শ্রীকেদারনাথ কাব্যতীর্থ—সাহিত্য-সংহিতা।
মায়া ও মুক্তি—শ্রীঅন্নদাচরণ চৌধুরী— ঐ
ভাগবত ধর্ম্ম—শ্রীকুলদাপ্রসাদ মল্লিক—বীরভূমি।
বুদ্ধের অষ্ট বিমোক্ষ—শ্রীমহেশচন্দ্র ঘোষ—ব্রহ্মবাদী।
প্রয়োজন সিদ্ধি—শ্রীরামদয়াল মজুমদার—উৎসব।
শ্রাদ্ধ-রহস্য—শ্রীচন্দ্রভূষণ শর্ম্মা মণ্ডল—সাহিত্য-সংবাদ।
চৈতন্যকথা—শ্রীপূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ—ব্রহ্মবিদ্যা।
বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতি—শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী—প্রবাসী।
অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে রামানুজাচার্য্যের আপত্তি খণ্ডন (৭) শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ—উদ্বোধন।
সরল সাংখ্যদর্শন—শ্রীগৌরীনাথ শাস্ত্রী—মানসী।

ভ্রমণ

তীর্থযাত্রা—শ্রীরাধাগোবিন্দ চন্দ্র—হিন্দুপত্রিকা।
দেরাহুন—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত—উপাসনা।
আমার বোম্বাই প্রবাস—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর—ভারতী।

কবিতা

দুঃখের প্রতি শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী—আর্য্যাবর্ত্ত।
কর্ম্মদেবী—শ্রীরসময় লাহা—ব্রহ্মবিদ্যা।
বর্ষবরণ—শ্রীকালিদাস রায়—উপাসনা।
বিনামূল্যে—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—প্রবাসী।
নববর্ষের নূতন-পঞ্জিকা—শ্রীরাধানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—ব্যবসায়ী।
নববর্ষ—শ্রীরমণীমোহন ঘোষ—ভারত-মহিলা।
বাল্মীকির মৃত্যু—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত—ভারতী।
দল ও পরিমল—শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী- মানসী
ভূস্বর্গে কএকটি দিন—শ্রীপ্রমথনাথ রায় চৌধুরী—আর্য্যাবর্ত্ত।
সোরাব ও রোস্তাম—শ্রীনরেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য—বঙ্গদর্শন।

সাহিত্য-আলোচনা

নববর্ষ—শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়—সাহিত্য।
দাশরথি রায়—শ্রীচন্দ্রশেখর কর—সাহিত্য।
বঙ্গভাষায় সংস্কৃত ছন্দ—শ্রীআশুতোষ চট্টোপাধ্যায়—প্রবাসী।
অক্ষয়চন্দ্র ও সাহিত্য-সম্মিলন—শ্রীবিপিন চন্দ্র পাল—বঙ্গদর্শন।
জীবনটা কি?—শ্রীজগদানন্দ রায়—বঙ্গদর্শন।
পুরাতন-প্রসঙ্গ—শ্রীবিপিনবিহারী গুপ্ত—আর্য্যাবর্ত্ত।
সংক্ষিপ্ত মহারাজবংশ—শ্রীগজেন্দ্রলাল চৌধুরী—জগজ্জ্যোতিঃ।
চণ্ডীদাস—শ্রীনীলরতন মুখোপাধ্যায়—আলোচনা।
তীর্থ—শ্রীমন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—উদ্বোধন।
ময়নামতীর পুঁথি—শ্রীআবদুল করিম—মানসী।
কাব্য-কথা—শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত—মানসী।
বাঙ্গালার বাঙ্গালী—শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়—সুধী।

ইতিহাস—প্রত্নতত্ত্ব

মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষের তাম্রশাসন—শ্রীঅক্ষয় কুমার মৈত্রেয়—সাহিত্য।
প্রাচীন ভারত ও মিশর—শ্রীগৌরসুন্দর রায়—দেবালয়।
আমাদের আদি বাসভূমি—শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দত্ত—ভারত-মহিলা।
পুনর্জন্মে আকবর—শ্রীনিখিলনাথ রায়—শাশ্বতী।
একখানি কুলগ্রন্থ ও নূতন ঐতিহাসিক তথ্য—ঐ—ঐ।
৺শ্যামসুন্দর দেবের আখড়ার ইতিহাস—শ্রীশ্রীশচন্দ্র দে—আর্য্য-গৌরব।
বাঙ্গালার মুদ্রা—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—বন্দনা।
ইতিহাসের যৎকিঞ্চিৎ—শ্রীপরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—হিন্দু-সখা।
কুরু-ভারত—শ্রীকালীপ্রসন্ন ভাদুড়ী—সাহিত্য-সংবাদ।
বৈদিক নদী—শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার—নব্যভারত।
প্রাচ্য আকাশ-রথ ও জল-রথ এবং পাশ্চাত্য বায়ুযান ও জলযান—শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী—ঢাকা রিভিউ।
ভুবনেশ্বর—শ্রীশশিশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়—উপাসনা।
পূর্ব্ব ময়মনসিংহে একটী দ্বিজ বংশ—আর্য্যগৌরব।
বঙ্গালরাজ গোবিন্দচন্দ্র—শ্রীবিনোদবিহারী রায়—উপাসনা।
বেদাদি গ্রন্থে সূর্য্য—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—আর্য্যাবর্ত্ত।

জীবন-বৃত্তান্ত

সুশ্রুত—পঞ্চানন নিয়োগী—ভারতী।
কাঙ্গাল হরিনাথ—শ্রীজলধর সেন—মানসী।
কবি বিহারীলাল—শ্রীনবকৃষ্ণ ঘোষ—আর্য্যাবর্ত্ত।
কাঙ্গাল হরিনাথ-প্রসঙ্গ—শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ সরস্বতী—সাহিত্য-সংহিতা।
দ্বিজ রামপ্রসাদ—শ্রীচন্দ্রকিশোর চক্রবর্ত্তী—আর্য্য-দর্পণ।
জয়দেব—শ্রীনীলরতন মুখোপাধ্যায়—নব্যভারত।
ভক্ত গিরীশচন্দ্র—শ্রীশ্রীশচন্দ্র মতিলাল—উদ্বোধন।

সমাজ-তত্ত্ব

ধর্ম্ম ও সমাজ—শ্রীনিখিলনাথ রায়—শাশ্বতী।
বঙ্গবধূর কর্ত্তব্য—শ্রীভৈরবচন্দ্র চৌধুরী—আর্য্য-গৌরব।

শিল্প—বিজ্ঞান

শরীর স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান—চুনীলাল বসু—ভারতী।
আলোক রহস্য—শ্রীজগদানন্দ রায়—তত্ত্ববোধিনী।
চন্দ্রলোকে প্রাণী আছে কি না?—শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সরকার—সাহিত্য সংহিতা।
আকস্মিক বিপদের চিকিৎসা—ডাঃ শ্রীসত্যচরণ চক্রবর্ত্তী—স্বাস্থ্য-সমাচার।
স্তন্য দুগ্ধ ও শিশুর আহার—ডাঃ শ্রীকার্ত্তিক চন্দ্র বসু—ঐ।
বাঁশ—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র বসু—তোষিণী।
চন্দ্রগ্রহণ—অবিনাশ চন্দ্র সান্ন্যাল—উপাসনা।
বৃক্ষের স্বেদ—শ্রীবিশ্বেশ্বর ঘোষ—কৃষক।

গল্প—উপন্যাস

রামের সুমতি—শ্রীশরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—যমুনা।
বাস্তুভিটা—শ্রীসৌরীন্দ্র মোহন মুখোপাধ্যায়—ভারতী।
প্রায়শ্চিত্ত—শ্রীসরোজনাথ ঘোষ—উপাসনা।
দিদি—শ্রীনিরুপমা দেবী—প্রবাসী।
অজ্ঞাতবাস—শ্রীফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—মানসী।
রত্নদীপ—শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়—মানসী।

বিবিধ

হেমকণা—শ্রীরাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায়—প্রবাসী।
জাতীয় সাধনা—পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এম্, এ,—প্রভাত।
পুরাতন ও নূতন—শ্রীমনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়—সেবক।
স্ত্রী-শিক্ষা—শ্রীহেমন্তকুমারী ঘোষ—কায়স্থ-পত্রিকা।
সুখ—শ্রীসরোজরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়—সাহিত্য সংহিতা।
সুখ-তত্ত্ব—শ্রীচন্দ্রকান্ত বিদ্যাভূষণ—আর্য্যদর্পণ।
পল্লী-সেবক—শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়—গৃহস্থ।
বইয়ের ব্যবসা—শ্রীবীরবল—মানসী।

চিত্র-প্রসঙ্গ।

কবি ও চিত্রকর উভয়েই মানব-মনে ভাবের লহর তুলিয়া দিয়া এক অতীন্দ্রিয় রাজ্যে লইয়া যায়; কিন্তু উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এই, একজন রেখা ও বর্ণসম্পাতে সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া তুলেন; অপর বাণী ও সুর তরঙ্গের মোহিনী-লীলায় সেইরূপ করিয়া থাকেন। একের সৌন্দর্য্য-পরিকল্পনা ও অপরের ভাব-ব্যঞ্জনা দর্শক ও পাঠকের হৃদয়ে যে অননুভূতপূর্ব্ব ভাবের সমাবেশ করাইয়া দেয়। তাহার গভীরতা বুঝাইবার জন্য ভাষার প্রয়োজন নাই, সত্য। চিত্র ও কবিতা, কলাকুশলা চিত্রকর ও মহাকবির প্রকৃষ্ট পরিচায়ক, তথাপি সেই ভাব সকলের ব্যাখ্যা করিবার সাহায্যকল্পে যতটুকু ভাষার প্রয়োজন, আমরা ততটুকুই করিব। আশা করি, ভাষার পীড়নে আপনাদের সৌন্দর্য্য-উপভোগের ক্ষতি হইবে না। নিম্নে কয়েকটি মাত্রের পরিচয় দিলাম।

স্নেহময়ী।

চিত্রে জননীর স্নেহ-সুষমা স্বর্গঙ্গা অলকনন্দার ধারার ন্যায় বালকবালিকাদের উপর পতিত হইতেছে। স্নেহময়ীর স্নেহ-রাজ্যে গৃহপালিত পারাবতগুলি অকুতোভয়ে জলপান করিতেছে।

পরিহার।

অনুতাপানল-বিদগ্ধ সুন্দরী সর্ব্বস্বত্যাগের সঙ্কল্প করিয়া হৃদয়ের দুর্দ্দমনীয় বাসনাকে পরিত্যাগ করিবার জন্য রূপের মোহ কাটাইবার জন্য বহিঃসৌন্দর্য্যের আকর সমুদয় পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়াছেন, ও অন্তরের কুভাব সকলকে দূর করিয়া পুণ্যবেদিকার মূলে পুরোহিতগণের সমক্ষে ভগবানের রাতুল চরণে আত্ম-সমর্পণের জন্য ব্যাকুল হৃদয়ে তন্ময় হইয়া প্রার্থনা করিতেছেন।

এই ভাবটি চিত্রকর চিত্রে সুন্দররূপে প্রকাশ করিয়াছেন। বৈষ্ণব কবিরা সত্যই বলিয়াছেন, ভগবানের কৃপালাভ করিতে হইলে—'লজ্জা, মান, ভয়; তিন থাক্‌তে নয়'।

কল্প্য-বেশ।

কল্প-বেশ বা ছদ্মবেশ-সম্মিলন ইংরেজদিগের একটি উপাদেয় প্রমোদ। এইরূপ সম্মিলনে আহূত অতিথিগণ জগতের ভিন্ন ভিন্ন জাতির বেশ পরিধান করিয়া মহাকবি ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিত্রকরগণের পরিকল্পনা-প্রসূত বিভিন্ন—বিচিত্র সজ্জায় সজ্জিত হইয়া মিলন-গৃহে সমাগত হ'ন। কেহ দিবা, কেহ রাত্রি, কেহ ঐতিহাসিক কোন ব্যক্তি, কেহ ভিন্ন দেশ-বাসী, কেহ গ্রীষ্ম ঋতু, কেহ বসন্ত, কেহ শরৎ, কেহ কোন দেবতা, আবার কেহ বা অন্য কোনও জাতি বা ব্যবসায়ী—এইরূপ প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন রূপ সাজিয়া, বেশভূষার নিদর্শনে তাহা ফুটাইয়া তুলিয়া থাকেন। এই কল্প-বেশধারণ কলায় যিনি যেমন পারদর্শিতা দেখাইতে পারেন, তিনি তত প্রশংসা লাভ করেন। এই চিত্রখানি হইতে পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন, ইহাতে একজন "বুড়ো খুকী", একজন Mary, Queen of Scotts, একজন রাত্রি, একজন উষা, একজন ভারতীয় বিধবা, একজন তুর্কী ক্রীতদাসী, একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারিণী, একজন মঠবাসিনী সন্ন্যাসিনী, একজন নাবিক-পুত্র, একজন গ্রীষ্ম, একজন বসন্ত, একজন শরৎ, একজন Joan of Arc ইত্যাদি ভূমিকায় সজ্জিত হইয়াছেন।

আত্মোৎসর্গ—বা আহুত জীবন।

এখানি সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী চিত্রকর পল্ দেলারোশ্ কর্ত্তৃক অঙ্কিত সর্ব্বজনপ্রশংসিত "মার্টার" নামক মূল চিত্রের প্রতিলিপি। রমণী শত অত্যাচার উৎপীড়নেও স্বীয় ধর্ম্মবিশ্বাসে অটল;—বরং জীবন আহুতি দিলেন,—তথাপি ধর্ম্মবিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন না। জীবনান্তেও ধার্ম্মিকার মুখে যে অপূর্ব্ব শান্তি—মোহন দিব্য-শ্রীবিরাজিত, তাহা দেখিলে স্বতঃই মন ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়া উঠে।

ভ্রম-সংশোধন।

১৫৬পৃঃ ১ম স্তম্ভ ১০ পঙ্‌ক্তি—সম্যক্‌প্রয়োগাদ্ পরিক্ষ-তায়াং" স্থলে "সম্যক্ প্রয়োগাদপরিক্ষিতায়াং" হইবে। ১৫৬ পৃঃ ২য় স্তম্ভ ৩৪ পঙ্‌ক্তি—"ক্লেশঃ ফলেন হি পুনর্নবত্যং বিধত্তে" স্থানে "ক্লেশঃ ফলেন হি পুনর্নবতাং বিধত্তে" হইবে। ১৫৭ পৃঃ ২য় স্তম্ভ ১পঙ্‌ক্তি—"প্রাসাদাচহ্নানি পুরঃ ফলানি" স্থানে "প্রসাদচিহ্নানি পুরঃ ফলানি" হইবে।

১৯৯পৃঃ ১ম স্তম্ভ ৩১ পঙ্‌ক্তি—"পেলবগুণ্ঠন" স্থানে "নিরবগুণ্ঠন হইবে। ২১০পৃঃ ২য় স্তম্ভ ১পঙ্‌ক্তি "বিবি" স্থানে "বেবি" হইবে। ২১৭পৃঃ ২য় ১২পঙ্‌ক্তি—"১৮৮৮শকে" স্থানে "১৭৮৮শকে" হইবে। ২৫৩ পৃঃ ২য় স্তম্ভ ৫ পঙ্‌ক্তি "দামটা" স্থানে "দামাট্টা" হইবে।

---

২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে শ্রীসুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও
২০৩।১।১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট "প্যারাগন প্রেস" হইতে

জন্মাষ্টমী।

[চিত্র-শিল্পী শ্রীযুক্ত ভবানী চরণ লাহা-কর্ত্তৃক অঙ্কিত]

K. V. Seyne & Bros.
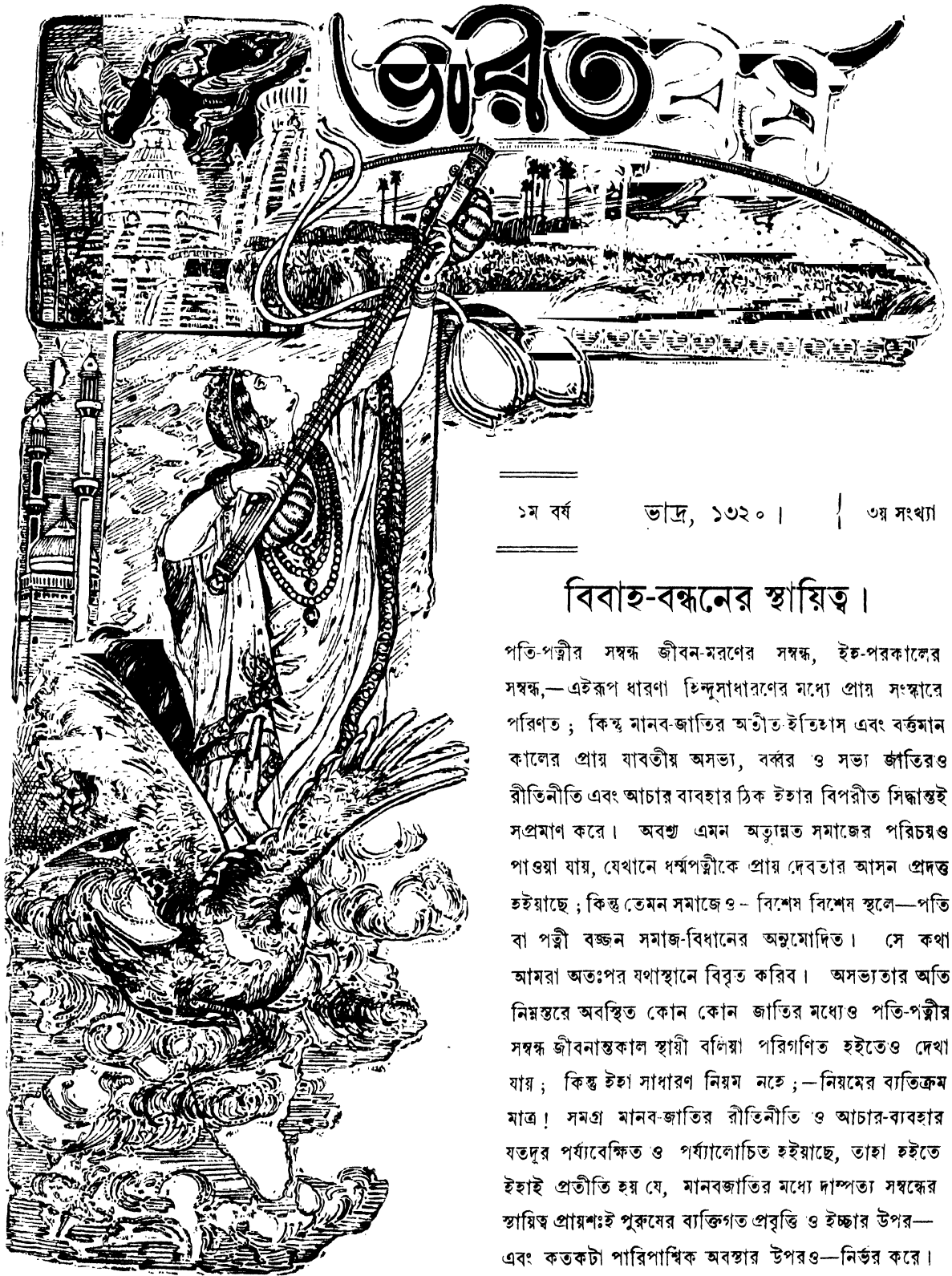
১ম বর্ষ ভাদ্র, ১৩২০। ৩য় সংখ্যা

বিবাহ-বন্ধনের স্থায়িত্ব।

পতি-পত্নীর সম্বন্ধ জীবন-মরণের সম্বন্ধ, ইহ-পরকালের সম্বন্ধ,—এইরূপ ধারণা হিন্দুসাধারণের মধ্যে প্রায় সংস্কারে পরিণত ; কিন্তু মানব-জাতির অতীত ইতিহাস এবং বর্ত্তমান কালের প্রায় যাবতীয় অসভ্য, বর্ব্বর ও সভ্য জাতিরও রীতিনীতি এবং আচার ব্যবহার ঠিক ইহার বিপরীত সিদ্ধান্তই সপ্রমাণ করে। অবশ্য এমন অত্যুন্নত সমাজের পরিচয়ও পাওয়া যায়, যেখানে ধর্ম্মপত্নীকে প্রায় দেবতার আসন প্রদত্ত হইয়াছে ; কিন্তু তেমন সমাজেও - বিশেষ বিশেষ স্থলে—পতি বা পত্নী বর্জ্জন সমাজ-বিধানের অনুমোদিত। সে কথা আমরা অতঃপর যথাস্থানে বিবৃত করিব। অসভ্যতার অতি নিম্নস্তরে অবস্থিত কোন কোন জাতির মধ্যেও পতি-পত্নীর সম্বন্ধ জীবনান্তকাল স্থায়ী বলিয়া পরিগণিত হইতেও দেখা যায় ; কিন্তু ইহা সাধারণ নিয়ম নহে ;—নিয়মের ব্যতিক্রম মাত্র ! সমগ্র মানব-জাতির রীতিনীতি ও আচার-ব্যবহার যতদূর পর্য্যবেক্ষিত ও পর্য্যালোচিত হইয়াছে, তাহা হইতে ইহাই প্রতীতি হয় যে, মানবজাতির মধ্যে দাম্পত্য সম্বন্ধের স্থায়িত্ব প্রায়শঃই পুরুষের ব্যক্তিগত প্রবৃত্তি ও ইচ্ছার উপর—এবং কতকটা পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপরও—নির্ভর করে। এইরূপ হওয়াই স্বাভাবিক।

অসভ্যতার নিম্নতম স্তরে,—যেখানে শারীরিক সামর্থ্যই সর্ব্ববিধ বৈষম্যের নিদান,—দুর্ব্বল স্ত্রীজাতির উপর যে প্রবল পুংজাতির প্রভুত্ব সীমাহীন ও সর্ব্বতোমুখ হইবে, এবং অসভ্যের অসংযত উদ্দাম চিত্তবৃত্তির বশে সেই প্রভুত্বের ব্যবহার যে অতি নিষ্ঠুর ও পৈশাচিক হইবে, ইহা ত সহজেই অনুমেয়। নিতান্ত অসভ্য সমাজে—যেমন অষ্ট্রেলিয়া, ট্যাসমেনিয়া প্রভৃতি স্থানে—স্ত্রীজাতির অবস্থা গৃহপালিত পশুর অপেক্ষা অনুমাত্রও উন্নত নহে! ইচ্ছা হইলেই পুরুষ, অতি সামান্য কারণে বা অকারণেও, স্ত্রীকে প্রহার করিতে—আহত করিতে—হত্যা করিতে—এমন কি খাইয়া ফেলিতেও পারে! ফলে, অতি সামান্য উত্তেজনাতেই তাহারা এ সকলই করিয়া থাকে।—আর, যাহাকে ইচ্ছা করিলেই অবাধে মারিয়া ফেলিতে পারা যায়, তাহাকে যে ইচ্ছা করিলেই ত্যাগ করিতে পারা যাইবে, একথা না বলিলেও চলে। হইয়াও থাকে তাহাই,—নিতান্ত অসভ্য সমাজে স্ত্রী-বর্জ্জন অতি সহজেই ও প্রতিনিয়তই সংঘটিত হয়।

উত্তর-আমেরিকার ইণ্ডিয়ানেরা, কোন কিছু বিবেচনা না করিয়া, সাময়িক প্রবৃত্তির বশে যেমন বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হয়, তেমনই কারণে বা অকারণে,—কেবলমাত্র সাময়িক বিরক্তির বশবর্ত্তী হইয়া,—সে সূত্র ছিন্ন করে। গ্রীনলণ্ডদেশে পতি ও পত্নী অনেকস্থলে ছয় মাস মাত্র বিবাহিত জীবন যাপন করিয়া পরস্পরকে পরিত্যাগ করিয়া পৃথক্ হইয়া যায়! ক্রীক্‌জাতির মধ্যে দাম্পত্য সম্বন্ধটা সাময়িক সুবিধামাত্র বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। তাহারা দাম্পত্য সম্বন্ধের পরিবর্ত্তন এত ঘন ঘন ও প্রতিনিয়ত করিয়া থাকে যে, কালে তাহাদের সন্তানেরা দূর দূরান্তরে ছড়াইয়া পড়ে এবং প্রৌঢ়াবস্থায় উপনীত হইলে পিতামাতা আপনাপন ঔরসজাত ও গর্ভজাত সন্তানদিগের সহিত সম্পূর্ণ অপরিচিত হইয়া থাকে! ওয়েট্‌জ্ সাহেবের গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, উইয়ানডট্ নামক জাতির মধ্যে পরীক্ষাধীন বিবাহ-প্রথা প্রচলিত আছে,—বলিয়া দিতে হইবে না যে এই পরীক্ষাধীন দাম্পত্য সম্বন্ধ অতি অল্পকালমাত্র স্থায়ী হয়। কীন্ সাহেব বলেন যে, বটসুদো নামক জাতির মধ্যে দাম্পত্য সম্বন্ধ অতি অল্পকালমাত্র স্থায়ী। এ সম্বন্ধ স্থাপন করিতে কোন প্রকার সামাজিক অনুষ্ঠান আচরিত হয় না, এবং সম্পূর্ণ অকারণে—বা সামান্য কারণে—কেবলমাত্র নূতন-প্রিয়তার বা সাময়িক খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া, ইহারা এই সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করে। ডায়াক্‌জাতির মধ্যে পরিণত বয়স্ক এমন অল্প পুরুষই দেখা যায়, যাহারা বহুস্ত্রীর স্বামিত্ব গ্রহণ করে নাই। সেণ্টজন্ সাহেব বলেন যে, ইহাদের মধ্যে সপ্তদশ বা অষ্টাদশ বর্ষ বয়স্কা যুবতী তিনচারিবার স্বামি-পরিবর্ত্তন করিয়াছে, এরূপ দৃশ্য বিরল নহে! রোসেট্ সাহেব বলেন যে, মালদ্বীপবাসীরা এমনই পরিবর্ত্তন ও নূতন-প্রিয় যে, ইহাদের মধ্যে এমন অনেক পুরুষ দেখা যায় যাহারা বার্দ্ধক্যে উপনীত হইবার পূর্ব্বেই একই স্ত্রীলোককে তিনচারিবার বিবাহ করিয়াছে ও তিনচারিবার পরিত্যাগ করিয়াছে। সিংহলীদের সম্বন্ধে নক্স্ সাহেব লিখিয়াছেন যে, কি পুরুষ, কি নারী, চারিপাঁচ বার বিবাহের পর স্থায়ী দাম্পত্য সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া গৃহস্থালী পাতে। মালয় উপদ্বীপের মন্ত্রা জাতির সম্বন্ধে ফাদার বুরিয়েন্ বলেন যে, চল্লিশ বা পঞ্চাশ বার বিবাহ করিয়াছে এমন পুরুষ ইহাদের মধ্যে বিরল নহে। বার্ক্‌হার্ট্ সাহেব আরবদেশের বেতুইন জাতির মধ্যে এমন একাধিক লোক দেখিয়াছেন, যাহারা পয়তাল্লিশ বৎসর বয়স অতিক্রম না করিতেই পঞ্চাশেরও অধিকবার বিবাহরূপ প্রহসনের নায়ক হইয়াছে। এ সম্বন্ধে আর অধিক দৃষ্টান্ত প্রদর্শন নিষ্প্রয়োজন।

কিন্তু তাই বলিয়া এমন কথা বলা যায় না যে, যেজাতি যত অসভ্য তাহাদের পতি-পত্নী সম্বন্ধ তত অল্পকালস্থায়ী। বরং একথা বলা যায় যে, অসভ্যতার নিম্নতম স্তরে অবস্থিত জাতির পুরুষ বা স্ত্রী, খেয়াল বা সাময়িক উত্তেজনার বশে যেমনই করুক না কেন, মানুষ কতকটা সভ্যতা-প্রাপ্ত না হইলে তাহার পত্নী-পরিবর্ত্তনের আকাঙ্ক্ষা ও নূতনের স্পৃহা তেমন বলবতী হয় না। এমন অসভ্য জাতিও দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাদের মধ্যে পত্নী-বর্জ্জন সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। আণ্ডামানদ্বীপবাসীদিগের মধ্যে দাম্পত্য সম্বন্ধ কোন কারণেই বিভিন্ন হইতে পারে না। কেবল আণ্ডামান দ্বীপপুঞ্জ বলিয়া নহে,—ভারত-মহাসাগরের অনেক দ্বীপের অনেক জাতির মধ্যে এবং নবগিনির পাপয়ান্‌দিগের মধ্যেও এই নিয়ম প্রচলিত। ইহারা সভ্যতা-বিষয়ে এখনও প্রাথমিক অবস্থায় অবস্থিত এবং ইহাদের প্রাচীন রীতিরই

অনুবর্ত্তন করিয়া থাকে। সিংহলদ্বীপের বেদ্দাদিগের মধ্যে একটি প্রবাদবাক্য প্রচলিত আছে যে, মৃত্যুই কেবল পতি-পত্নী সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিতে পারে এবং বেলি সাহেব বলেন যে, এই নীতিপালনে তাহারা কদাচ কোন ব্যতিক্রম করে না।

কিন্তু অসভ্য সমাজে যৌন সম্বন্ধ বিষয়ে এইরূপ এক-নিষ্ঠার উদাহরণ নিতান্ত বিরল;—প্রায় সর্ব্বত্রই ইচ্ছাধীন পত্নীবর্জ্জনের অধিকার থাকাই নিয়ম। যে সকল সমাজ প্রাথমিক অসভ্য অবস্থা অতিক্রম করিয়া কতকটা সভ্যতা প্রাপ্ত হইয়াছে, অথচ বর্ব্বর ভাবাপন্ন, সে সকল সমাজে এইরূপ উচ্ছৃঙ্খল নিয়মের সমধিক প্রচলন পরিলক্ষিত হয়। লেন্ সাহেব বলেন যে, কায়রো নগরে এমন লোক অতি অল্প দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা দীর্ঘকাল বিবাহিত জীবন যাপন করিয়াছে অথচ একটিও পত্নী-বর্জ্জন করে নাই! তিনি লিখিয়াছেন যে, মিশর দেশে এমন অনেক লোক দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা দুইবৎসরের মধ্যে বিশ ত্রিশ বা ততোধিক বার পত্নী-গ্রহণ করিয়াছে; এবং এরূপ স্ত্রীলোকও বিরল নহে, যাহারা বিগত-যৌবনা হইবার পূর্ব্বেই ক্রমান্বয়ে দ্বাদশ কি ততোধিক সংখ্যক পুরুষের পত্নীত্ব স্বীকার করিয়াছে! লেন্ সাহেব এমন কথাও শুনিয়াছিলেন যে, তথায় কোন কোন পুরুষ প্রতি মাসে একটি করিয়া নূতন পত্নী গ্রহণ করিয়া থাকে। ডাক্তার চার্চ্চার্ বলেন যে, মরক্কো প্রদেশে পত্নী-বর্জ্জনের অতিমাত্র শোচনীয় প্রবলতা ও বাহুল্য দৃষ্ট হয়; প্রকৃত বা কল্পিত অতিসামান্য কারণেই পুরুষেরা পত্নী-বর্জ্জন করিয়া দারান্তর পরিগ্রহণ করিয়া থাকে। রিড্ সাহেব বলেন যে, সাহারা প্রদেশের মুরদিগের সমাজে কোন দম্পতি দীর্ঘকাল এক-নিষ্ঠ থাকিলে তাহা নীচতার পরিচায়ক বলিয়া পরিগণিত হয়। সে প্রদেশে আদর্শ-নারী তাহারাই যাহারা বহুবার পতিকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছে। লোবো সাহেব বলেন যে, এবিসিনিয়া দেশে কোন নির্দ্দিষ্টকালের জন্য বিবাহিত হইবার প্রথাও প্রচলিত আছে। জর্জ্জি সাহেব লিখিয়াছেন যে, আলুৎ জাতির পুরুষেরা এক সময়ে আহার্য্য ও পরিধেয়ের বিনিময়ে পত্নী হস্তান্তর করিত। টোঙ্গা দেশে "তুমি চলিয়া যাও" বলিলেই পত্নী-বর্জ্জন সিদ্ধ হয়। বলিতে কি, প্রাচীন হিব্রু, গ্রীক্, রোমক এবং জার্ম্মানদিগের মধ্যেও বিরক্তিমাত্র বিবাহ-বন্ধন ছেদনের যথেষ্ট কারণ বলিয়া বিবেচিত হইত।

সাধারণতঃ পত্নী-বর্জ্জনের অধিকার পুরুষের থাকিলেও এমনও অনেক বর্ব্বরজাতি দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা বিশেষ বিশেষ কারণ ব্যতীত সে অধিকার কার্য্যে পরিণত করে না। গ্রীণলণ্ডবাসীরা সন্তানাদি হইলে প্রায় কখনও পত্নী-ত্যাগ করে না। পাওয়ার্স সাহেব বলেন যে, কালিফর্নিয়ার উইন্টুন্ জাতির মধ্যে পত্নী-বর্জ্জনের দৃষ্টান্ত অতিমাত্র বিরল। অতিমাত্র ক্রোধপরবশ হইয়া তাহারা হয়ত পত্নী-হত্যা করিতেও পারে, কিন্তু পত্নী-পরিত্যাগের কথা তাহাদের মনে কখনও উদিত হয় না। প্রাচীনকালে ইরকয় জাতির মধ্যে দাম্পত্য বন্ধন ছেদন, পতি-পত্নী উভয়ের সম্বন্ধেই অতি নিন্দনীয় ও ঘৃণার্হ ব্যাপার বলিয়া বিবেচিত হইত; সুতরাং তাহাদের মধ্যে পত্নী-পরিত্যাগ নিতান্তই বিরল ছিল। ইউপে জাতির কোন ব্যক্তি নূতন স্ত্রী গ্রহণ করিলেও পুরাতন পত্নীকে কখনও গৃহ-বহিষ্কৃত করিয়া দেয় না। পরিত্যক্তা স্ত্রী স্বামি-গৃহে গৃহিণীরূপেই অবস্থান থাকে। চারুয়ার্, পেটাগণিয়ান্, ইয়াগণ্, প্রভৃতি কয়েকটি জাতির মধ্যে দাম্পত্য সম্বন্ধ প্রায়শঃই জীবনান্তস্থায়ী—কেবল মৃত্যুতেই এই সম্বন্ধের অবসান হয়। প্রাচীন গ্রীকেরা, পরবর্ত্তীকালে পত্নী-বর্জ্জন-পরায়ণ হইলেও, হোমরের সময়ে এমন কুনীতির বশবর্ত্তী ছিল না; তখন তাহাদের মধ্যে পত্নীবর্জ্জন প্রায় অজ্ঞাতই ছিল।

এমনও অনেক বর্ব্বর জাতি দেখা যায়, যাহাদের মধ্যে পত্নীর উপর স্বামীর এবংবিধ নিরঙ্কুশ সর্ব্বতোমুখ অধিকার সমাজ-বিধি বা সামাজিক রীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। কুকী জাতির মধ্যে এইরূপ নিয়ম প্রচলিত আছে যে, স্বামীর ঔরসে যে স্ত্রীর গর্ভে পুত্র সন্তান জন্মিয়াছে, সে স্ত্রীর সহিত বিবাহ-বন্ধন বিচ্ছিন্ন হইতে পারে না। কিন্তু যদি পরস্পরের মনের মিল না হয় এবং পুত্র-সন্তানও না থাকে, তাহা হইলে পুরুষ নিজের ইচ্ছানুসারে স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারে। ইন্দো-চীনের কারেণ্ নামক জাতির মধ্যে নিঃসন্তানস্থলে পত্নী-বর্জ্জন সমাজকর্ত্তৃক অনুমোদিত; কিন্তু একটিমাত্র সন্তানও যদি থাকে, তাহা হইলে সমাজ-বিধি অনুসারে পত্নী-ত্যাগ নিষিদ্ধ। সাঁওতালদিগের মধ্যে,

ও ত্রিপুরার কোন কোন জাতির মধ্যে, পত্নী-বর্জ্জন করিতে হইলে বিশিষ্ট কারণ দেখাইয়া নিজের জ্ঞাতিবর্গের বা গ্রামের প্রধানদিগের সম্মতি লইতে হয়। ভারত-মহাসাগরের দ্বীপ-পুঞ্জের অনেক জাতি একমাত্র ব্যভিচারস্থল ব্যতীত পত্নী পরিত্যাগ করিতে পারে না। নিগ্রোদিগের মধ্যেও, কোন কোন সম্প্রদায়ে, এইরূপ নিয়ম প্রচলিত আছে, কিন্তু তাহা কেবল প্রথমা বা প্রধানা পত্নীর সম্বন্ধেই বলবান্ হয়। কেসালিস্ সাহেব বলেন যে, বাসুতো জাতির মধ্যে একমাত্র বন্ধ্যাত্বই পত্নী পরিত্যাগের সমাজানুমোদিত বিশিষ্ট কারণ বলিয়া বিবেচিত হয়। পক্ষান্তরে, সভ্যতাবিষয়ে অপেক্ষাকৃত হীনতর কোন কোন জাতির মধ্যে, স্ত্রী বর্জ্জন করিতে হইলে অগ্রে তাহাকে সম্মত করিতে হয়।

সুসভ্য অধিকাংশ জাতির মধ্যেই বিবাহ বন্ধন প্রায় জীবনান্তকালপর্য্যন্ত স্থায়ী, তবে তেমন সকল সমাজেও বিশেষ বিশেষ কারণে পত্নী-পরিত্যাগ হইতে পারে, কিন্তু সেই সকল কারণ সমাজ-বিধিদ্বারা স্থিরীকৃত হইয়া থাকে। আজ্‌তেক্ জাতির মধ্যে বিবাহসম্বন্ধে বিশিষ্ট মত এই যে, একজনের মৃত্যু ব্যতীত এই সম্বন্ধের অবসান হয় না,—রাজবিধি ও জনমত দাম্পত্যবন্ধন ছিন্ন করিবার একান্ত বিরোধী। তাহাদের মধ্যে স্ত্রীপুরুষের মিলন সম্বন্ধে এতটাই বাঁধাবাঁধি যে, উপপত্নী পরিত্যাগ করিতে হইলেও সঙ্গত কারণ দর্শাইতে হয় ও ধর্ম্মাধিকরণের অনুমতি লইতে হয়। নিকারাগুয়া দেশে ব্যভিচার ব্যতীত আর কোন কারণেই পত্নী-পরিত্যাগ হইতে পারে না। ইউরোপের সভ্য সমাজে দুই কারণে এই সম্বন্ধ ছিন্ন হইতে পারে—এক, ব্যভিচার; দ্বিতীয়, নিষ্ঠুর ব্যবহার। তবে প্রসঙ্গতঃ ইহাও উল্লেখ করিতে হয় যে, রোম্যান্ ক্যাথলিক্ সম্প্রদায়ের প্রাচীন বিধানকর্ত্তারা "ঈশ্বর যাহাদিগকে মিলিত করিয়াছেন, কোন মানুষ যেন তাহাদিগকে পৃথক্ না করে"—এই সূত্র ও আদেশ অনুসারে বিবাহ বন্ধন ছেদন সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। রোম্যান্ ক্যাথলিক্ ধর্ম্মাবলম্বী জাতিদিগের মধ্যে এই নিষেধের প্রভাব এখনও বিদ্যমান্ দেখিতে পাওয়া যায়। স্পেন্, ইটালী ও পর্টুগালের আইনানুসারে বিচারালয়ের সাহায্যে পতি ও পত্নী, উপযুক্ত কারণ দেখাইয়া, পৃথক্ হইতে পারে বটে; কিন্তু বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন হয় না। পূর্ব্বে ফ্রান্সেও বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন হইতে পারিত না, কিন্তু ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের কিছু পূর্ব্বে বিবাহ-বন্ধন ছেদনের নিয়ম আইনদ্বারা পুনঃপ্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ইউরোপের যে সকল দেশ প্রটেষ্ট্যান্ট্ ধর্ম্মাবলম্বী, সে সকল দেশে বিশেষ বিশেষ স্থলে বিবাহবন্ধন ছেদন রাজবিধি-কর্ত্তৃক অনুমোদিত। চীনদেশের রাজবিধি অনুসারে সাতটি কারণে পত্নী-বর্জ্জন করা যাইতে পারে; যথা,—বন্ধ্যাত্ব, ব্যভিচার, শ্বশুর-শাশুড়ীর প্রতি অবহেলা, বাচালতা, চৌর্য্য প্রবৃত্তি, রুক্ষপ্রকৃতি এবং অসাধ্যব্যাধিগ্রস্ততা। এই রাজ-বিধি প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে চীনদেশে আরও দুই একটি নিতান্ত হাস্যজনক কারণেও পত্নী-বর্জ্জনের অধিকার প্রচলিত ছিল। চীনের প্রাচীন বিধি অনুসারে, বাড়ীতে অধিক ধোঁয়া করিলে, অথবা শ্রুতিকঠোর শব্দদ্বারা বাড়ীর পোষা কুকুরটিকে ভীত করিলে, স্ত্রী পরিবর্জ্জনীয়া হইত। চীনদেশে যে সকল কারণে পত্নী পরিত্যাজ্যা হয়, পূর্ব্বে জাপানেও প্রায় সেই সকল কারণেই পত্নী-বর্জ্জন হইতে পারিত।

হিন্দুজাতির মধ্যে শাস্ত্রানুসারে সাধারণ বিধি এই যে, বিবাহ-বন্ধন কোন কারণেই বিচ্ছিন্ন হইতে পারে না। মনুসংহিতার বিধান এই যে,—

'ন নিষ্ক্রয়বিসর্গাভ্যাং ভর্ত্তুর্ভার্য্যা বিমুচ্যতে।
এবং ধর্ম্মং বিজানীমঃ প্রাক্ প্রজাপতিনির্ম্মিতম্॥'

—মনু, ৯।৪৬।

অর্থাৎ,—'পতির সহিত পত্নীর যে সম্বন্ধ, তাহা কদাপি দান, বিক্রয়, বা ত্যাগের দ্বারা বিনষ্ট হইতে পারে না। এ নিয়ম পুরাকাল হইতে বিধাতাকর্ত্তৃক নির্ণীত হইয়াছে, ইহা আমরা অবগত আছি।'—ইহাই হইল সাধারণ বিধি। তথাপি এই সংহিতাতেই বিশেষবিধিদ্বারা স্থলবিশেষে পত্নী-বর্জ্জনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে;—

'মদ্যপাঽসাধুবৃত্তাচ প্রতিকূলাচ যা ভবেৎ।
ব্যাধিতা ব্যাধিবেত্তব্যা হিংস্রাঽর্থঘ্নী চ সর্ব্বদা॥
বন্ধ্যাষ্টমেঽধিবেদ্যাব্দে দশমে তু মৃতপ্রজা।
একাদশে স্ত্রীজননী সদ্যস্ত্বপ্রিয়বাদিনী॥' ৯।৮০।৮১।

অর্থাৎ,—'মদ্যপানাসক্তা, দুশ্চরিত্রা, পতিবিদ্বেষিণী, অসাধ্য ব্যাধিগ্রস্তা, অপকার সাধনক্ষমা ও ধনক্ষয়কারিণী অপব্যয়িনী স্ত্রীসত্ত্বে অধিবেদন, অর্থাৎ পুনরায় বিবাহ, করিবে। স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে অষ্টম বর্ষে, মৃতবৎসা হইলে দশম বর্ষে, কেবল

কন্যা-প্রসবিনী হইলে একাদশ বর্ষে, কিন্তু অপ্রিয়-বাদিনী হইলে তৎক্ষণাৎ দারান্তর গ্রহণ করিবে।'

কি ভয়ঙ্কর ব্যবস্থা! আজকালকার স্ত্রী-শিক্ষা, বালিকা-বিদ্যালয় ও বেথুন-কলেজের দিনে এবং পাশ্চাত্য-ভাবের প্রভাব-কালে অপ্রিয়বাদিনী স্ত্রী ত ঘরে ঘরে বিরাজমানা;—শাস্ত্র মানিয়া চলিলে ত নিত্যই স্ত্রী-পরিত্যাগ করা চলিতে পারে! —অথচ তাহা হয় না; কখনও যে হইত, এরূপ মনে করিবারও কারণ দেখা যায় না! চীন ও জাপান সম্বন্ধেও এই কথা বলা যায়। ইহার অর্থ এই যে, শাস্ত্র-বিধান অপেক্ষা মানব প্রকৃতি মহত্তর;—আজ বলিয়া নহে, চিরকালই।—মানুষ যত দিন মানুষ, ততদিনই শাস্ত্রবিধান অপেক্ষা মানুষ বড়!

হিন্দু-শাস্ত্রকারেরা স্বার্থপর, নিষ্ঠুর বা অনুদার ছিলেন না। তাঁহারা যেমন পুরুষের জন্য দারান্তর পরিগ্রহের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তেমনই স্ত্রীলোকের জন্যও স্থলবিশেষে অন্য-পতি গ্রহণের ব্যবস্থাও করিয়াছিলেন। নানা প্রসঙ্গে পরাশর সংহিতার বচনটি বহুসহস্রবার উদ্ধৃত ও আলোচিত হইয়াছে, তথাপি আর একবার উদ্ধৃত করিলে বোধ করি অপ্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হইবে না। বচনটি এই,—

'নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চ স্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যোঃ বিধীয়তে॥'

ইহার অর্থ,—'স্বামী যদি নিরুদ্দেশ হয়, মরিয়া যায়, প্রব্রজ্যা অবলম্বন করে, ক্লীব হয়, পতিত হয়, তাহা হইলে স্ত্রীলোক অন্য পতি গ্রহণ করিতে পারে।'

ইস্‌লাম্ ধর্ম্মাবলম্বী অধিকাংশ জাতি বিশিষ্টরূপ সভ্যতা-প্রাপ্ত বলিয়া আপনাদিগকে পরিচিত করিবার সম্পূর্ণ অধিকারী; তথাপি তাহাদিগের প্রায় সকল শাখাতেই বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করা নিতান্তই সাধারণ! ইহার জন্য তাহাদিগকে কোন কারণ দর্শাইতে হয় না, কোন বিচারালয়ের আশ্রয় লইতে হয় না, সমাজের প্রাচীন বা প্রধানদিগের অনুমতি গ্রহণ করিতে হয় না;—কেবলমাত্র নিজের উদ্দাম ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া তাহারা অনায়াসেই পত্নী-বর্জ্জন করিতে পারে ও করিয়া থাকে। স্বয়ং মহম্মদ যদিও বলিয়াছেন যে, "সঙ্গত কারণ ব্যতীত পত্নী-বর্জ্জন করিলে ঈশ্বরের অভিশাপ তাহার উপর ন্যস্ত হয়",—তথাপি মুসলমানমাত্রই ইচ্ছাধীন স্ত্রী-পরিত্যাগ করিবার অধিকারী। কেবল তিনবার বলিলেই হইল, "তোমাকে আমি পরিত্যাগ করিলাম",—তাহা হইলেই পত্নীকে বাধ্য হইয়া আপন পিতামাতা বা স্বজনের আশ্রয়ে ফিরিয়া যাইতে হয়। কোরাণের ব্যবস্থা অনুসারে পরিত্যক্তা পত্নীর যথোপযুক্ত ভরণপোষণের ব্যবস্থা করা স্বামীর পক্ষে প্রয়োজনীয় বটে; কিন্তু এই অনুশাসন প্রায়শঃই কার্য্যতঃ প্রতিপালিত হয় না। পরাস্যদেশে একরূপ বিবাহপ্রণালী প্রচলিত আছে, তাহার নাম 'সিঘে' বিবাহ;—এই বিবাহ চুক্তিমূলক। এই চুক্তির স্থায়িত্বকাল এক ঘণ্টা হইতে নিরানব্বই বৎসর পর্য্যন্তও হইতে পারে!

সভ্যতার ও অসভ্যতার সর্ব্ববিধ স্তরে অবস্থিত মানব-জাতির রীতিনীতি ও আচারব্যবহার পর্য্যালোচনা করিলে ইহাই প্রতীতি হয় যে, প্রাথমিক অবস্থায় স্ত্রী-পুরুষের বৈবাহিক মিলন স্ত্রীলোকের পক্ষে সম্পূর্ণ ও নিরবচ্ছিন্ন দাসত্ব। তখন তাহাদের সামাজিক অবস্থা গৃহপালিত পশুর অপেক্ষা কিছুমাত্র উন্নত নহে। তখন স্ত্রীর উপর পুরুষের সর্ব্ববিধ অধিকারই থাকে, সুতরাং ইহা বলা বাহুল্য যে তাড়াইয়া দিবার অধিকারও থাকে। কালক্রমে মানব সমাজের উন্নতির সঙ্গে স্ত্রী-জাতির সামাজিক অবস্থারও উন্নতি হয়। প্রথমে বিরক্তিমাত্র উৎপাদন করিলেই পুরুষ স্ত্রীকে হত্যা করিতে পারিত; তাহার পর মানব কতকটা সভ্যতা-প্রাপ্ত হইলে বিরাগভাগিনী স্ত্রীকে হত্যা না করিয়াই ক্ষান্ত হইত! এই অবস্থাতে ব্যভিচারস্থলে হত্যা করিবার অধিকারও থাকে। তাহার পর, মানব-সমাজ আরও কতকটা উন্নত হইলে, পত্নী-পরিত্যাগের অবাধ অধিকার কতকটা সঙ্কুচিত হয়;—বিশেষ বিশেষ স্থলে সামাজিক বিধানদ্বারা পরিত্যাগের কারণগুলি নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। কোন কোন স্থলে পরিত্যক্তা পত্নীকেও কিছু কিছু অধিকার প্রদান করিতে দেখা যায়। ইহার পর, মানব-সমাজ বিশিষ্ট সভ্যতার উচ্চস্তরে উপনীত হইলে, অসহ্য উৎপীড়নস্থলে এবং আরও কোন কোন স্থলে স্ত্রীকেও পতি-পরিত্যাগের অধিকার প্রদত্ত হইয়া থাকে। সর্ব্বশেষে মানুষ, পতি-পত্নী উভয়ের সম্মতিক্রমে, বিবাহ-বন্ধন ছেদনের রীতির পুনঃ-প্রবর্ত্তন করিয়া থাকে—পুনঃ-প্রবর্ত্তন বলিতেছি, কেননা অনেক নিতান্ত বর্ব্বর সমাজেও এই রীতির অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। বিবাহ-বন্ধন ছেদন ব্যাপারের ক্রম-পরিণতির ইহাই সংক্ষিপ্ত-ইতিহাস। —শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়।

[চিত্রকর—এল্‌, ক্রোসিও]

——কন্দর্পের শাসন

রজনীকান্ত-স্মৃতি।

"মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই," এই উন্মাদক ধ্বনি প্রথমে যে দিন আমার কাণে প্রবেশ করিল, সেই দিন হইতেই গীত রচয়িতার সঙ্গে পরিচিত হইবার ইচ্ছা মনোমধ্যে প্রবল হইয়া উঠিল। পরে, রাজসাহী সাহিত্য সম্মিলন উপলক্ষে, রজনীকান্তের সহিত প্রথম চাক্ষুষ পরিচয়ের সুবিধা হইয়াছিল। তখন হইতেই তাঁহার চিত্র আমার মানসপটে অঙ্কিত হইয়া গেল। তাঁহার অমায়িকতা ও প্রফুল্লতা আমাকে মুগ্ধ করিল। প্রথম হইতেই বুঝিলাম, রজনীকান্ত অদ্ভুত উপাদানে নির্ম্মিত মানুষ। আমাদের রাজসাহী-প্রবাসের কয়দিন রজনীকান্তের কল্যাণে মধুময় হইয়া উঠিয়াছিল। প্রতিদিন সভারম্ভের সময় তাঁহার সঙ্গীত যেন আমাদের হৃদয়ে নূতন উৎসাহ আনিয়া দিত, সভাভঙ্গের পরেও তাঁহার কণ্ঠস্বর কাণে বাজিত। শেষ দিন, সভাবসানের সময়, প্রসাদীসুরে তিনি যে গান রচনা করিয়া আমাদিগকে বিদায় দেন, তাহা কখনও ভুলিতে পারিব না। গানের শেষ ছত্রটি যেন এখনও আমার কাণে মাঝে মাঝে বাজিতে থাকে—

"(মোদের) প্রাণের ব্যাকুলতা বুঝে,
ক্ষমা ক'রো সবাই মিলে।
কি দিয়ে আর রাখ্‌ব বেঁধে,
রইবেনা হাজার কাঁদিলে।
(শুধু) এই প্রবোধ যে, হর্ষ-বিষাদ
চির-প্রথা এই নিখিলে।"

সান্ধ্য-সমিতি ও অন্যান্য নিমন্ত্রণ-সভায় তাঁহার কণ্ঠস্বর কখনও তীব্রব্যঙ্গ ও রহস্যের গানে সভামণ্ডল হাসির হিল্লোলে পূর্ণ করিয়া দিত, কখনও বা ব্যাকুল ভগবৎভক্তিপূর্ণ আশাময়ী গীতিকার আহ্বানে শ্রোতৃমণ্ডলীর হৃদয় করুণায় পূর্ণ করিয়া দিত। নিজের ক্লেশের দিকে দৃষ্টি নাই—পরকে তুষ্ট করাই যেন তাঁহার ব্রত! এপ্রকার লোকের যে আনন্দের দুয়ারে পশার হইবে না, তাহার আর বিচিত্রতা কি? Lomboroso যথার্থই দেখাইয়াছেন যে, প্রতিভাসম্পন্ন মনস্বী ও উন্মাদের মধ্যে ক্রম-বিভেদভিন্ন আর কিছুই নাই। কবিও বলিয়াছেন—

'The lunatic, the lover and the poet,
Are of imagination all compact :
* * * *
The poet's eye in a fine frenzy rolling,
Doth glance from heaven to earth, from earth to heaven ;
And as imagination bodies forth
The forms of things unknown, the poet's pen
Turns them to shapes, and gives to airy nothing
A local habitation and a name.'

রজনীকান্ত যখন দুরারোগ্য পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া হাঁসপাতালে দিন কাটাইতে ছিলেন, তখন আমি মাঝে মাঝে তাঁহাকে দেখিতে যাইতাম। বাক্‌শক্তি রহিত হইয়াছে, শ্বাসপ্রশ্বাসের জন্য কণ্ঠনালী ছিদ্র করিয়া রবারের নল পরাইয়া দেওয়া হইয়াছে, খাতায় লিখিয়া কথাবার্ত্তা বলিতে হইতেছে,—এমন অবস্থাতেও যদি কেহ তাঁহার সহিত দেখা করিতে যাইত, অমনই নিজের দুঃসহ কষ্ট ভুলিয়া সাক্ষাৎকারীকে তৃপ্ত করিবার জন্য ব্যস্ত হইতেন! কবি প্রথমে আমায় যে মনের ভাব জানাইলেন, তাহাতে তাঁহার বড়ই দুঃখ হইতেছে বোধ হইল ;—"সকলই অন্ধকার, আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব ফেলিয়া কোথায় যাইতেছি বুঝি না!" Hamletএর উক্তি স্বতঃই আমার স্মৃতি-পথে আসিল—

'That undiscovered country,
From whose bourne no travller returns,
Puzzles the will, and makes us rather bear
Those ills we have, than fly to others that we know not of!'

কিন্তু এ প্রথম দিনের কথা বলিতেছি ;—তারপর বুঝিলাম কবি মৃত্যুকে পরাজয় করিয়া অমৃতে পৌঁছিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন! আমি যতবারই সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছি, ততবারই তাঁহার আত্মসংযম ও বিনয় দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি! রোগের নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন, কিন্তু দ্বিরুক্তি মাত্র নাই—কিসে আমাকে অপ্যায়িত করিবেন, ইহাই তাঁহার ঐকান্তিক চেষ্টা। মহারাজ মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, কুমার শরৎকুমার রায় ও শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্র প্রমুখ রাজসাহীর বন্ধুবর্গ যে তাঁহার সর্ব্বদা তত্ত্বতল্লাস লইতেছেন, ইহাতে তিনি ভাবে বিগলিত হইয়া পড়িতেন—যেন তিনি তাঁহাদের স্নেহ ও সহানুভূতির উপযুক্ত পাত্রই নহেন! যেমন অবসন্ন রোগীও উত্তেজক ঔষধ প্রভাবে ক্ষণেক সবল হয়, আমার উপস্থিতিতেও দেখিতাম

তিনি সেইরূপ সবল হইয়া উঠিতেন। তিনি উঠিয়া উপাধানে ঠেস্ দিয়া খাতায় লিখিয়া—অনেক প্রকার ভাব ও সংবাদ আমাকে জ্ঞাপন করিতেন—এমন কি নিজে হার্ম্মোনিয়ম্ ধরিতেন এবং পুত্রকন্যাদিগকে ডাকাইয়া স্বরচিত গান শুনাইয়া আমার চিত্তবিনোদন করিতেন। এরূপ নিদারুণ যাতনার মধ্যে পড়িয়াও কবির কবিত্ব-উৎস শুকাইয়া যায় নাই,—যেন আবার নূতন উৎস প্রবাহিত হইয়াছিল!—ইহা যে অসাধারণ, তাহাতে তিলার্দ্ধ সন্দেহ নাই! "অমৃত", "আনন্দময়ী", "বিশ্রাম", "অভয়া" প্রভৃতি ভাবস্রোতস্বিনীগুলি এই উৎস হইতেই উদ্ভূত! তাই যেন বলিতে ইচ্ছা হয়—"Sweet are the uses of adversity"! কবি যেদিন তাঁহার "দয়ার বিচার" গান করাইয়া শুনাইলেন, সেদিনের কথা এ জীবনে ভুলিব না!
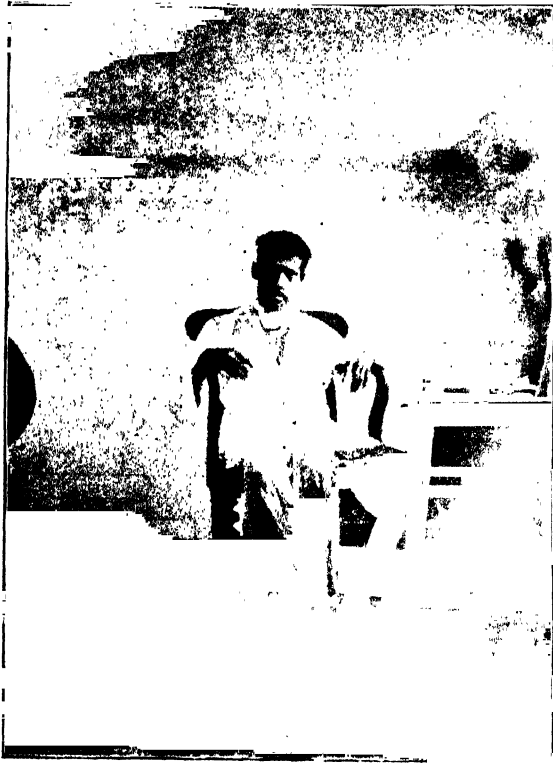
৺রজনীকান্ত—শেষ চিত্র।

তাঁহার কবিতার সমালোচনা আমার সাধ্যাতীত—যোগ্যতর ব্যক্তি সে ভার গ্রহণ করিয়াছেন। তবে তাঁহার ধর্ম্মভাব-প্রবণতা বিষয়ে কিছু না বলিয়া এই প্রসঙ্গের উপসংহার করিতে পারি না।

বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বর গুপ্তের জীবন-চরিতের একস্থলে বলিয়াছেন ঃ—

"তাঁহার কবিত্বের অপেক্ষা আর একটা বড় জিনিষ পাঠককে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছি;—ঈশ্বর গুপ্ত নিজে কি ছিলেন, তাহাই বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি। কবির কবিত্ব বুঝিয়া লাভ আছে, সন্দেহ নাই;—কিন্তু কবিত্ব অপেক্ষা কবিকে বুঝিতে পারিলে আরও গুরুতর লাভ। কবিতা দর্পণ মাত্র—তাহার ভিতর কবির অবিকল ছায়া আছে। দর্পণ বুঝিয়া কি হইবে? ভিতরে যাহার ছায়া, ছায়া দেখিয়া তাহাকে বুঝিব। কবিতা, কবির কীর্ত্তি তাহা ত আমাদের হাতেই আছে—পড়িলেই বুঝিব। কিন্তু যিনি এই কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তিনি কি গুণে—কি প্রকারে,—এই কীর্ত্তি রাখিয়া গেলেন, তাহাই বুঝিতে হইবে। তাহাই জীবনী ও সমালোচনাদত্ত প্রধান শিক্ষা ও জীবনী ও সমালোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য।"

বঙ্কিমচন্দ্রের এই উক্তির বলে বলীয়ান্ হইয়াই কবি রজনীকান্ত সম্বন্ধে দুই চারিটা কথা বলিতে সাহসী হইতেছি।

এক কথায় বলিতে হইলে,—রজনীকান্ত সাধক ছিলেন বলিলেই যথেষ্ট হইল! কবিতা-পুষ্প চয়ন করিয়া রজনীকান্ত আবেগের ধূপ-ধূনাতে আমোদিত করিয়া, আজ কয়েক বৎসর হইল মাতৃভাষাকে সমৃদ্ধিশালিনী করিবার প্রয়াস পাইতেছিলেন। হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ হইতে যে সাধনা-উৎস প্রবাহিত হইয়াছে, তাহা শুধু কবির স্বীয় হৃদয়ের পবিত্র নিলয়টি অধিকতর পবিত্র করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই,—উহা বঙ্গবাসীর অন্তঃস্থলে প্রবেশ করিয়া সরল-সাধনার একটি যুগ আনয়ন করিয়াছে, বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। বিষয়টি একটু তলাইয়া দেখিতে হইবে, কেননা পাঠক হয়ত এতাদৃশ প্রশংসাবাদকে কোনরূপ অপকৃষ্ট আখ্যায় আখ্যায়িত করিতে পারেন। রজনীকান্ত ধর্ম্মপ্রচারক নহেন, অথচ নব্য-বঙ্গে সরল সাধনার যুগ আনয়ন করিয়াছেন,—শুনিলে স্বতঃই মনে সংশয় সন্দেহের উদয় হইতে পারে। কিন্তু কথটার মীমাংসা করিতে হইলে, রজনীকান্ত কোন শ্রেণীর সাধক তাহা সম্যক্ বুঝিতে হইবে। বঙ্গের এমন কোন সন্তান নাই, যিনি সঙ্গীতজ্ঞ সাধু রামপ্রসাদকে সাধক বলিতে কুণ্ঠিত হইবেন—বরং সাধক রামপ্রসাদ, ইহাই বাঙ্গালার প্রতি গৃহে রামপ্রসাদের আখ্যা। তাঁহার সাধনার উপকরণ সম্বন্ধে

আমরা যতদূর অবগত আছি, তাহা আর কিছুই নহে গভীর আবেগপূর্ণ সঙ্গীতই তাঁহার ফুল-বিল্বপত্র, প্রেমাশ্রু তাঁহার গঙ্গোদক, তন্ময়তাই তাঁহার "আনন্দম্"। কবি রজনীকান্তও এই শ্রেণীর সাধক! যাঁহারা এই সাধু ও সজ্জন কবিবরকে দেখিয়াছেন, যাঁহারা তাঁহার জীবনের সুখদুঃখ সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আসিয়াছেন, যাঁহারা তাঁহার আর্থিক, নৈতিক প্রভৃতি সর্ব্ববিধ অবস্থা জ্ঞাত, যাঁহারা এই বিনীত-উদার ধর্ম্মপ্রাণ কবি-প্রবরের দয়া-দাক্ষিণ্য-সরলতার বিষয় সম্পূর্ণ অবগত—তাঁহারা একবাক্যে সকলেই সাক্ষ্য দিবেন যে, রজনীকান্ত প্রকৃত সাধক ছিলেন। সংসারে থাকিয়া ধনরত্ন স্পৃহা পরিত্যাগ করিয়া, কি প্রকারে শিক্ষা-জ্ঞান সমাজসংস্কারে জীবন ঢালিয়া দেওয়া যায়—রজনীকান্ত তাহারই উদাহরণ। যিনি পরের মুখে সুখ্যাতি-বাহবা শুনিবার জন্য কর্ম্ম করিয়া থাকেন, তিনি কর্ম্মী হইতে পারেন, কিন্তু কর্ম্ম-যোগী নহেন।

সঙ্গীত সাধনার উপায় সঙ্গীত ভাবের পরিচায়ক—সঙ্গীত প্রাণের সরল প্রস্রবণ—সঙ্গীত প্রাণের ক্লান্তি-ক্লেদ অপনয়নকারী- এই সঙ্গীতই রজনীকান্তের সাধনার পথ! তিনি বনবিহঙ্গের ন্যায় যখন-তখন আপন মনে ভাবের বন্যায় নাচিতেন, গায়িতেন। প্রাণের ব্যাকুলতা,—সর্ব্ববিধ অবসাদ—হৃদয়ের দুর্ব্বলতা—অবিরাম তাঁহারই চরণে উৎসর্গ করিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিতেন। শিশু যেমন আবদার করিয়া—মায়ের অবাধ্য হইয়া—পীড়িত হইয়া পুনরায় মায়ের কাছে কাঁদিতেকাঁদিতে উপস্থিত হয়, রজনীকান্তের পারমার্থিক কবিতা-গুলিতে এই একই ভাব প্রবাহিত দেখিতে পাই!—কবির সরল প্রাণের নিভৃততম প্রদেশে কি যেন এক অতৃপ্ত বাসনার ঢেউ হৃদয়টাকে বিপর্য্যস্ত করিবার প্রয়াস পাইতেছে, কি যেন পৃথিবীর পাপ ও তজ্জনিত অনুশোচনা হৃদয়ের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে গরল অয়ঃ-স্রোত ঢালিতেছে,—তাই কবি রহিয়া রহিয়া ব্যাকুল প্রাণে সেই একই তান ধরিয়াছেন। মানুষের—পৃথিবীর- সমাজের গভীর পঙ্কিলতা, কপটতা,— পার্থিব নৈরাশ্যের বিষম প্রবাহ—দূরে ঠেলিয়া ফেলিয়া, তাই যেন কবি সরল প্রাণে ব্যাকুল হইয়া তাঁহারই চরণপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া বলিতেছেন,—

"আমি শুনেছি হে তৃষাহারি!
তুমি এনে দাও তারে প্রেম-অমৃত
তৃষিত যে চাহে বারি।"

এই ভাবলহরী যখন কবি তাঁহার স্বীয় সুমিষ্ট কণ্ঠে গায়িতেন,—মনে হইত যেন কোথায় আসিয়াছি—মুহূর্তের জন্য যেন পার্থিব ক্ষুৎপিপাসা ভুলিতে সমর্থ হইয়াছি!—কি যেন এক গভীর বিশ্বাস, কি যেন এক গভীর আনন্দ, আবার কি যেন এক সুখবিজড়িত প্রীতিপ্রদ অবসাদ যাহা ভাষায় প্রকাশ অসাধ্য তাহাই— আসিয়া হৃদয় অধিকার করিয়াছে! কি গভীর ভাব! কি গভীর ব্যাকুল বিশ্বাস!! কি সরল অথচ মর্ম্মস্পর্শী কল্পনা!!! পাঠক, কল্পনার দ্বার উদ্ঘাটিত কর, যদি কখনও "পথের ধূলায় অন্ধ হইয়া", প্রশান্ত দিগন্ত বিস্তারিত জলধির কূলে আসিয়া দেখ যে, আকাশে মেঘ উঠিয়াছে, উৎকট বাত্যাতাড়িত হইয়া উর্ম্মিরাশি প্রণয়ালিঙ্গনের ভাব পরিহার করিয়া ক্রোধে ভীমরবে গর্জ্জন করিতেছে, নীলজল গভীর কৃষ্ণাভ হইয়া ভীতি সঞ্চার করি-তেছে,—জড়-প্রকৃতির সেই উলঙ্গ—উন্মত্ত নর্ত্তনের সময় যদি তুমি কূলে "খেয়ার" প্রত্যাশায় আসিয়া দেখ "খেয়া বন্ধ"—খেয়া নাই, হায়, জানি না সে অবস্থায় কাহার না হৃদয় ভাঙ্গিয়া যায়! আবার ততোধিক শোক-তাপ-বিরহ-বিচ্ছেদ-ধূলিতে আচ্ছন্ন সংসারের দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া যদি ক্লিষ্ট পান্থ ভব-জলধিতটে আসিয়া দেখে যে, কাণ্ডারিহীন খেয়া কালের ফেনিল নর্ত্তনে মগ্নপ্রায়—যদি সেই ঘোর আবর্ত্তে আশার ক্ষীণ রেখামাত্র দেখিতে না পায়—জানি না এ বিষম সংঘাতে বিশ্বাসের দৃঢ় যষ্টি ভিন্ন কে তাহাকে তুলিয়া ধরিবে! তাই যেন কবি গায়িয়াছেন—

হয়ে পথের ধূলায় অন্ধ
এসে দেখিছ কি—খেয়া বন্ধ?
তবে পারে ব'সে পার কর বলে'
(পাপী) ডাকে কেন দীন-শরণে!

এই প্রশান্ত ভাব কবির প্রত্যেক ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় কবিতাতে ওতপ্রোতভাবে বিরাজমান—এই ভাব প্রত্যেকের হৃদয়স্পর্শী, প্রত্যেকের অনুকরণীয়। *

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়।

* শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়ের "কান্তকবি রজনীকান্ত" গ্রন্থের জন্য লিখিত ভূমিকা। ভারতবর্ষ সম্পাদক।

আমার য়ুরোপ-ভ্রমণ।

যাত্রা

নানা বাধাবিপত্তি অতিক্রম করিয়া ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের ১৭ই এপ্রেল মঙ্গলবার রাত্রির মেল গাড়ীতে আমি বর্দ্ধমান ত্যাগ করি। পূর্ব্বেই ব্যবস্থা করিয়াছিলাম আমরা বোম্বাইয়ে গিয়া জাহাজে উঠিব। আমার সঙ্গে চলিলেন আমার প্রাইভেট্ সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত পশুপতিনাথ চট্টোপাধ্যায় ও আমার চিকিৎসক শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়। সঙ্গে লইয়াছিলাম ছয়জন ভৃত্য—তিনজন হিন্দু, আর তিনজন মুসলমান। এত লোকজন লইয়া য়ুরোপে যাওয়ার যে কোনই প্রয়োজন হয় না, তাহা আমি পরে বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলাম। এই অনাবশ্যক ও অতিরিক্ত লোকজন লইয়া সত্য সত্যই আমাকে একটু বিব্রত হইয়া পড়িতে হইয়াছিল; আমার এই ভ্রমণপথে কতএকদিন তাহাদের জন্য আমাকে অনেকটা অসুবিধাও ভোগ করিতে হইয়াছিল। ভৃত্যগণের সুখস্বাচ্ছন্দের দিকে আমাদের বিশেষ দৃষ্টি থাকিলেও তাহারা কিন্তু এ ভ্রমণের আনন্দ মোটেই অনুভব করিতে পারে নাই। তাহারা অশিক্ষিত লোক,—ইংরেজিভাষা না জানা থাকায় তাহাদের এই ভ্রমণের আনন্দ-উপভোগপক্ষে প্রধান ব্যাঘাত ঘটিয়াছিল।

বর্দ্ধমান হইতে বোম্বাই পর্য্যন্ত রেল পথে ভ্রমণ, আর এ ভ্রমণও আমার পক্ষে এই নূতন নহে, সুতরাং তাহার আর কি বর্ণনা করিব?—আর পথে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনাও ঘটে নাই। আমরা ১৯এ এপ্রিল বৃহস্পতিবার অপরাহ্নকালে বোম্বাই সহরে পৌছিলাম এবং ষ্টেশন হইতে বরাবর তাজমহল হোটেলে গিয়া উপস্থিত হইলাম। এ হোটেলটি আমার অপরিচিত নহে, পূর্ব্বে এখানে আসিয়া আমি এই হোটেলেই ছিলাম। তাজমহল হোটেলে আমাদের কোন
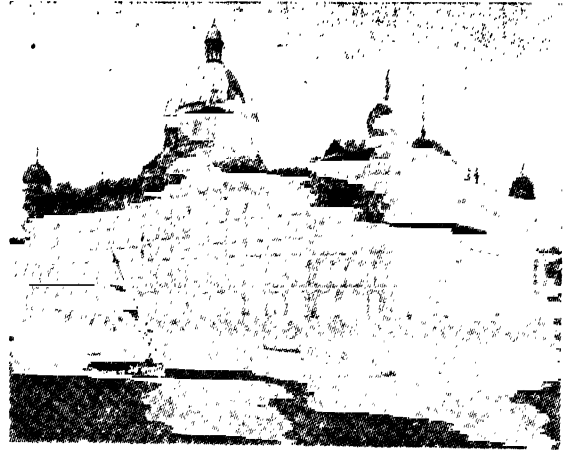
তাজমহল হোটেল।

অসুবিধাই হইল না; হোটেলের ভাল একটি ঘর দখল করিয়া আমরা অতি অল্পসময়ের মধ্যেই সমস্ত গোছগাছ করিয়া লইলাম। আমি কিন্তু এখানে হাত পা ছড়াইয়া বিশ্রাম করিবার অবকাশ পাইলাম না। হোটেলে পৌছিয়া সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া, আমি কুক্ কোম্পানীর জাহাজের আফিসে আমাদের জাহাজের ক্যাবিন্ প্রভৃতি ঠিক করিবার জন্য গমন করিলাম। আমাদের সঙ্গে যে সমস্ত মালপত্র ছিল, তাহা পূর্ব্বাহ্নেই জাহাজে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলাম। তাহার পর আর এক ব্যাপার ছিল,—ডাক্তারের

আমাদের পার্টি

পরীক্ষা। স্বাস্থ্য পরীক্ষক মহাশয় যাহাতে হোটেলেই আসিয়া তাঁহার মামুলী কার্য্য শেষ করেন, তাহার ব্যবস্থাও সেই দিনই আমি করিয়া আসিলাম। সেই রাত্রিতে আমরা হোটেলে ছোট-খাট একটা ভোজেরও আয়োজন করিয়াছিলাম; আমার বোম্বাইবাসী কএকটি বন্ধুকে সেই রাত্রিতে আহারের নিমন্ত্রণ করিলাম; কালাপানি পার হইবার পূর্ব্বে বন্ধু কএকটির সহিত প্রীতি-ভোজনে মিলিত হইয়া বিশেষ প্রীতি অনুভব করিলাম। বোম্বাইয়ের প্রথম দিন এই সকল ব্যাপারেই কাটিয়া গেল।

দ্বিতীয় দিনটায় যাওয়ার ব্যবস্থা ও বোম্বাইয়ের বাজার হইতে কিছু জিনিসপত্র ক্রয় করিতে অতিবাহিত হইল। এই দিন অপরাহ্নকালে শ্রীযুক্ত টাটা এণ্ড সন্স কোম্পানীর মিঃ পাদশা নামক জনৈক ভদ্রলোক আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন যে, তাঁহারা ময়ূরভঞ্জ রাজ্যে একটি লৌহের কারখানা খুলিবার আয়োজন করিতেছেন। তিনি এই সম্বন্ধে লিখিত কাগজপত্র ও অনুষ্ঠানপত্রাদি আমাকে দেখাইবার জন্য আগমন করিয়াছিলেন; কিন্তু সে সময়ে আমি যাত্রার আয়োজনে ব্যস্ত ছিলাম; তাই তাঁহাকে সবিনয়ে নিবেদন করিলাম যে, এখন এই বিষয়ের পর্য্যালোচনা করিবার আমার সময় নাই। তবে, ইহা আমি সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি তাঁহাদের এই সঙ্কল্প সিদ্ধ হউক। পাঠকগণ অবগত আছেন যে, টাটা কোম্পানীর সেই কারখানা স্থাপিত হইয়া তাহার কার্য্য চলিতেছে। আমার মনে বড়ই ক্ষোভের উদয় হয় যে, ভারতবর্ষে এই প্রকার কার্য্য করিবার চেষ্টা ও উদ্যম যথেষ্টপরিমাণে পরিলক্ষিত হয় না। আমাদের দেশের যাঁহারা 'স্বদেশী' 'স্বদেশী' করিয়া অনবরত চীৎকার পূর্ব্বক গগন বিদীর্ণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা যদি বাক্যের অপব্যয় না করিয়া এই প্রকার প্রকৃত স্বদেশী কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে প্রকৃতপক্ষেই মাতৃভূমির অশেষ কল্যাণ সাধন করিতে পারেন।

২১এ এপ্রিল শনিবার আমাদের পক্ষে বিশেষ স্মরণীয় দিন;—এই দিনে কালাপানি পার হইবার জন্য আমরা পি. এণ্ড ও কোম্পানির 'পেনিনসুলার' নামক জাহাজে আরোহণ করি;—এই দিনে আমরা সর্ব্বপ্রথম সুদীর্ঘ সমুদ্রযাত্রা আরম্ভ করিলাম। আমাদের ভারি ভারি মালপত্রগুলি আমরা অনেক পূর্ব্বেই—কলিকাতা হইতে লণ্ডনে চালান দিয়াছিলাম। আমাদের সঙ্গে সেই জন্য বড় বেশী জিনিষপত্র ছিল না;- এই সুদীর্ঘ পথের জন্য যাহা প্রয়োজন বলিয়া মনে হইয়াছিল, তাহাই আমরা সঙ্গে লইয়াছিলাম। কিন্তু পরে বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, এত জিনিসপত্র, এত লটবহর সঙ্গে লইবার কোনই প্রয়োজন ছিল না। আমরা যাহা সঙ্গে লইয়াছিলাম, তাহার অর্দ্ধেক দ্রব্য থাকিলেই আমরা সুখে স্বচ্ছন্দে যাইতে পারিতাম। স্বাস্থ্য পরিদর্শক মহাশয় এই দিন প্রাতঃকালে হোটেলে দর্শন দিলেন। ভদ্রলোক বৃদ্ধ এবং খুব আমুদে। তিনি হোটেলে আসিয়া আমাদিগের স্বাস্থ্য-পরীক্ষার মত যাহা-হয়-কিছু করিলেন এবং যথারীতি ছাড়পত্র লিখিয়া দিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

কুক কোম্পানীর লোকেরা আমাদিগকে জাহাজে তুলিয়া দিবার জন্য একখানি ছোট লঞ্চ্ ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন। আমরা জাহাজ ছাড়িবার অনেক পূর্ব্বেই গিয়াছিলাম; আমরা জাহাজে উঠিবার প্রায় এক ঘণ্টা পরে অন্যান্য যাত্রীরা উঠিতে আরম্ভ করিল। আমাদের ভৃত্যগণ আমাদের সঙ্গে আসিতে পায় নাই; তাহাদিগকে ব্যালার্ড পিয়ারে যাইতে হইয়াছিল এবং সেখানে স্বাস্থ্য-সম্বন্ধে পরীক্ষা প্রদান করিয়া তাহারা অন্যান্য যাত্রীর সহিত জাহাজে আসিয়াছিল। কুক কোম্পানীর লোকেরা আমাদের জন্য ভাল দুইটি ক্যাবিন ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল। আমরা সেই দুই ক্যাবিনে অল্প কএকদিনের জন্য গৃহস্থালি গোছাইয়া লইলাম;—অল্প কএক দিন বলিবার কারণ আছে; এই 'পেনিনসুলার' ষ্টীমারখানি তেমন বড় নহে। ইনি আমাদিগকে এডেন্ বন্দর পর্য্যন্ত পৌছাইয়া দিবার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। এডেনে আমরা অপেক্ষাকৃত বৃহৎকায় 'মম্বরা' জাহাজে আরোহণ করিব, এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছিল। আমাদের জাহাজের অধ্যক্ষ—কাপ্তেন্ পামার—অতি ভদ্রলোক; জাহাজের অন্যান্য কর্ম্মচারীদের অধিকাংশই বেশ ভদ্র ও বিনয়ী। তবে সকল লোকেই যে সমান হয় না, তাহার প্রমাণ সেই দিনই পাইয়াছিলাম। জাহাজ ছাড়িবার একটু পূর্ব্বে পি, এণ্ড ও কোম্পানীর একজন যুবক ইংরেজ কর্ম্মচারী জাহাজে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সামান্য একটু ক্ষমতা পাইলেই যাঁহারা আপনাদিগকে সর্ব্বশক্তিমান্ বলিয়া মনে করেন এবং সেই ক্ষমতা জাহির করিতে দ্বিধা

বোধ করেন না, এই যুবকটি সেই শ্রেণীভুক্ত। তিনি আসিয়াই আমার প্রাইভেট্ সেক্রেটারী ও ডাক্তার বাবু যে ক্যাবিন্ দখল করিয়াছিলেন,সেই ক্যাবিন হইতে তাঁহাদিগকে বাহির হইবার জন্য আদেশ প্রচার করিলেন। তাঁহার অভিপ্রায় এই যে,আমার সঙ্গীদিগকে সেই ক্যাবিন্ হইতে স্থানান্তরিত করিয়া সেই স্থানে তাঁহার একটি বন্ধুর স্থান করিবেন। এই ক্যাবিনটি আমার ক্যাবিনের পার্শ্বেই ছিল। আমি এই হুকুম শুনিয়া সাহেবের নিকট উপস্থিত হইলাম এবং তাঁহাকে আমাদের টিকিট ও ক্যাবিনের নম্বর দেখাইলাম। তাহার পর দুই চারিটি মিষ্ট বচন প্রয়োগ করিতেই সমস্ত গোল মিটিয়া গেল, যুবকটি স্থানান্তর অন্বেষণে চলিয়া গেলেন। আমার মনে হইল যে, পি, এণ্ড ও র ন্যায় এত বড় একটা কোম্পানী যাত্রীদিগের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যবিধানের ভার এমন বে-আদব যুবক কর্ম্মচারীদিগের উপর নির্ভর করিয়া ভাল কাজ করেন নাই।

আহারাদির ব্যবস্থা করিবার জন্য আমাকে একটু বিব্রত হইতে হইয়াছিল, ইহাতে তাহাদেরও কিঞ্চিৎ বোকামি ছিল। সে যাহাই হউক, তাহারা 'মম্বরা' ও 'ওসিরিস্' জাহাজে আমার সম্বন্ধে কোনপ্রকার অসুবিধা ভোগ করে নাই।

জাহাজে কএকজন লালকুর্ত্তি অর্থাৎ সৈনিক পুরুষের সহিত সাক্ষাৎ হইল; ইহারা সকলেই যুবক। ইহাদের সহিত ইতঃপূর্ব্বে জব্বলপুরে আমার দেখা হইয়াছিল। জাহাজে কলিকাতা হইতে আগত আরও কএকটি ভদ্রলোকের সহিত পরিচয় হইল। এই জাহাজে একজন ইংরেজ মহিলাও যাইতেছিলেন। তিনি মন খুলিয়া আমোদ-আহ্লাদ করিয়া বিবিমতে যুবক সৈনিক পুরুষদিগের আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছিলেন।

ইহার পর কএকদিন উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনাই ঘটে নাই। যাত্রীদিগের মধ্যে কেহবা ডেকের উপর অবিশ্রান্ত ভ্রমণ করিয়া সময় কাটাইতে লাগিলেন, কেহ বা উপন্যাস পাঠে মনোনিবেশ করিলেন, কেহ বা ব্রিজ্খেলা বা চাকা নিক্ষেপ প্রভৃতি ক্রীড়ায় মত্ত হইলেন, কখন কখন বা পাঁচ সাত জন জাহাজের ডেকের এক পার্শ্বে একত্র হইয়া সমুদ্রের মধ্যে উড্ডীয়মান মৎস্যের গতিবিধি দেখিয়া আমোদ উপভোগ করিতে লাগিলেন। জাহাজের উপর এইভাবে মিলিয়া মিশিয়া বেশ আনন্দে সময় কাটিয়া যায়। তিমি মাছগুলি সমুদ্রের মধ্যে ছুটিয়া বেড়াইতেছে এবং উর্দ্ধে জলধারা উৎক্ষিপ্ত করিতেছে, নূতন সমুদ্র-যাত্রীর নিকট এ দৃশ্য
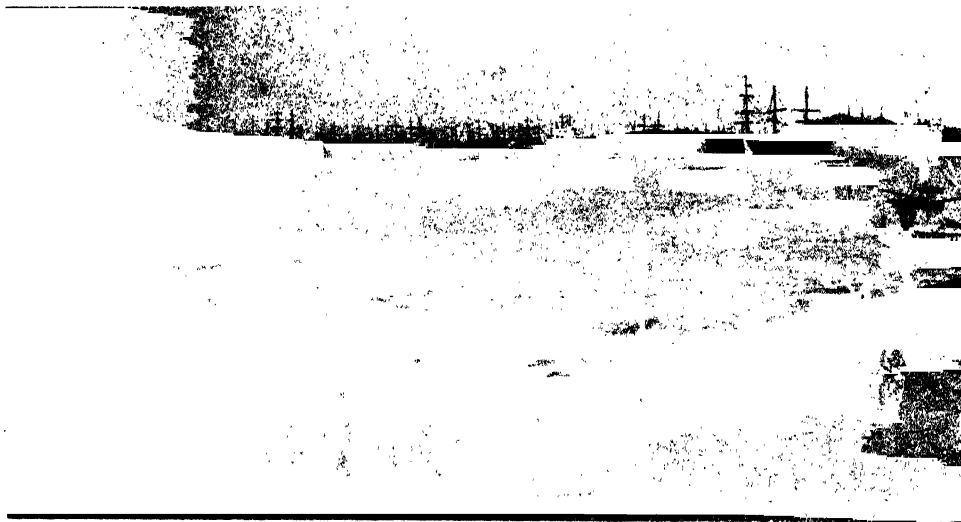
বোম্বাই—এপলো বন্দর।

অপরাহ্ন চারিটার সময় আমাদের জাহাজ বোম্বাই বন্দর ত্যাগ করিল—আমাদের সমুদ্রযাত্রা আরম্ভ হইল। সাতটা যখন বাজিল তখন তীরভূমি আমাদের দৃষ্টিবহির্ভূত হইল—আমরা অকূল সাগরে পড়িলাম। আমার ভৃত্যগণ ডেকযাত্রী, কিন্তু কাপ্তেন্ সাহেবকে ধন্যবাদ, তিনি তাহাদের জন্য একটা ঘেরা স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন; সুতরাং তাহাদের কোন প্রকার অসুবিধা হয় নাই; কিন্তু তাহাদের

বড়ই সুন্দর। আরব সাগরে আমরা অনেক তিমি মৎস্য দেখিয়াছিলাম।

জাহাজে যে ঘড়ি ছিল, প্রথম দিনের পর তাহার কাঁটা চল্লিশ মিনিট সরাইয়া দেওয়া হইল, তাহার পর প্রতিদিন দশ মিনিট করিয়া সরাইয়া
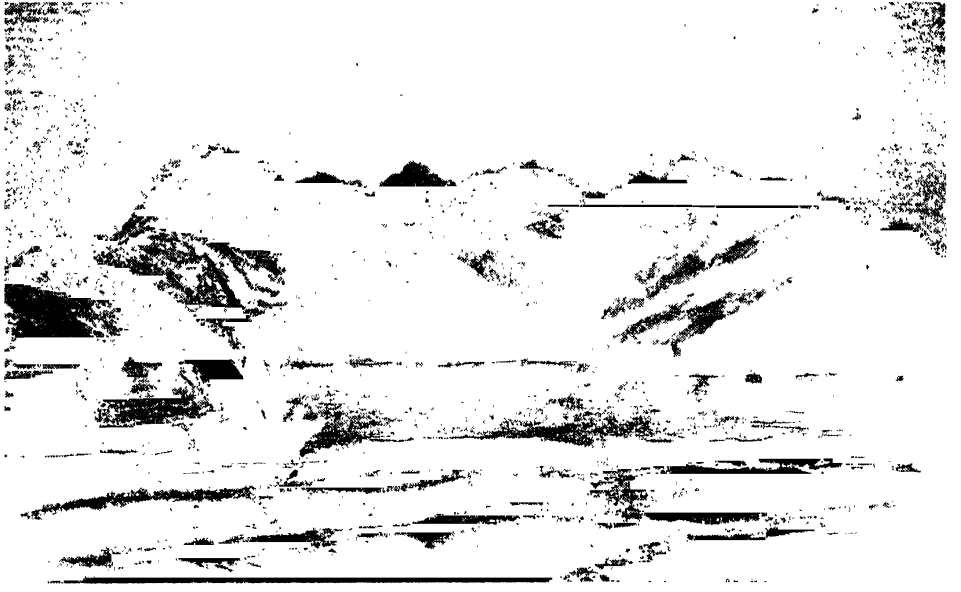
এডেন্ বন্দর।

দেওয়া হইতে লাগিল। আমি প্রথমে ইহার কারণ বুঝিতে পারি নাই, কিছু পরেই ঠিক বুঝিলাম যে, এমন করিয়া ঘড়ির কাঁটা সরাইয়া না দিলে প্রকৃত সময় নিরূপণ করা যাইতে পারে না;—কারণ, গ্রীনিচ্ ও কলিকাতার মধ্যে সময়ের তারতম্য পাঁচঘণ্টারও অধিক।

২৫এ এপ্রিল রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় আমাদের জাহাজ এডেন্ বন্দরে পৌছিল; দূর হইতে বন্দরের আলোকরাজি অতি সুন্দর দেখাইতেছিল। আমরা সেই রাত্রিতেই 'পেনিন্‌সুলার্' জাহাজ ত্যাগ করিয়া 'মর্ম্মরা' জাহাজে উঠিলাম।—এখানি পি, এণ্ড ও কোম্পানীর একখানি বড় জাহাজ। এই জাহাজখানি অষ্ট্রেলিয়া হইতে আসিয়া আমাদিগকে তুলিয়া লইবার জন্য এই বন্দরে অপেক্ষা করিতেছিল; সুতরাং এই জাহাজে অনেকগুলি অষ্ট্রেলিয়া-বাসী ভদ্রলোক ও মহিলা ছিলেন। আমরা যখন বোটে চড়িয়া এ জাহাজের নিকটবর্ত্তী হইলাম, তখন দেখিলাম জাহাজের আরোহীদিগের অনেকেই সেই গভীর রজনীতে ডেকের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। তাঁহারা আমাদের জাহাজের যাত্রীদলকে অভ্যর্থনা করিবার জন্যই সমবেত হইয়াছিলেন; মহিলাগণও ডেকের উপর উপস্থিত হইয়াছিলেন; দেখিলাম অনেকে বেশপরিবর্ত্তনও করেন নাই; তাঁহারা কেহ বা পায়জামা পরিয়া, কেহ বা রাত্রিবাসের গাউন্ পরিয়াই ডেকের উপর আসিয়া দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। আমাদের বোট জাহাজের নিকটবর্ত্তী হইতেই আমাদের ঔপনিবেশিক বন্ধুগণ আনন্দধ্বনি করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন আমাকে দেখিয়া চীৎকার করিয়া, স্বাগত—Here is a cheer for the Indian Gentleman !'—বলিয়া আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিলেন! আমাদের এই ঔপনিবেশিক বন্ধুগণ এমন আনন্দপূর্ণ স্বরে অভ্যর্থনা-ধ্বনি করিলেন এবং তাঁহাদের এমন সহৃদয়তা দেখা গেল যে, পেনিন্‌সুলার্ জাহাজ হইতে আগত আমরা সকলেই এই বন্ধুগণের সদ্ভাব-পূর্ণ অভ্যর্থনায় অতিশয় প্রীত হইলাম। আমরা পরে তাঁহাদের সহিত আলাপ পরিচয় ও ব্যবহারে বুঝিতে পারিলাম যে, এই ঔপনিবেশিক ভদ্রলোকদিগের আদবকায়দা বিলাতী এংলো-সাক্‌সন্ জাতির আদবকায়দা হইতে নানা বিষয়ে বিভিন্ন। বিশেষতঃ আমি বেশ দেখিতে পাইলাম যে, অষ্ট্রেলিয়ার পুরুষগণ একটু মোটামুটি ও সোজা রকমের মানুষ; তাহারা এমন দিল্-দরিয়া ও আমুদে যে, তাহাদের সেই ঔপনিবেশিক কেমনতর ভাবগুলি যদি একটু সহিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে মোটের উপর তাহাদের বেশ লোক বলিয়া মনে হইবে। আমার ত ইহাদিগকে বেশ ভাল লাগিয়াছিল।
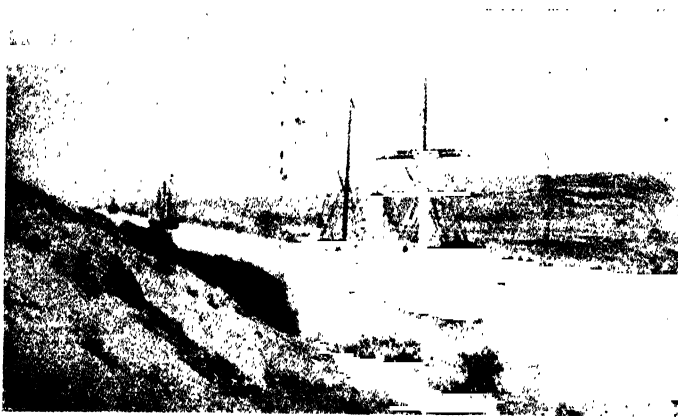
সুয়েজ।

'পেনিনসুলার' জাহাজ হইতে 'মর্ম্মরা' জাহাজে দ্রব্যাদি লইয়া যাইতে আমাদের অধিক সময় লাগে নাই। রাত্রি বারটার সময় আমরা এডেনে পৌঁছিয়াছিলাম; রাত্রি দুইটার সময়ই 'মর্ম্মরা' জাহাজ আমাদিগকে লইয়া বন্দর ত্যাগ করিল—প্রাতঃকাল পর্য্যন্তও অপেক্ষা করিল না। 'মর্ম্মরা' জাহাজেও আমরা বেশ ভাল ক্যাবিন্ পাইয়াছিলাম। তাহার পর তিন দিন ক্রমাগত লোহিত-সাগরের মধ্য দিয়া চলিলাম এই পথটুকু অতিক্রম করিতে প্রথমে আমার কেমন ভয় হইয়াছিল; কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে শেষ কালে বাতাস মৃদু হইয়া আসিল, সাগর স্থিরভাব ধারণ করিল, উপরে নীল আকাশ শোভা বিস্তার করিতে লাগিল, অনুকূল বাতাস বহিল; তখন আর আমার মনটা তেমন খারাপ বোধ হইল না। মধ্যে মধ্যে দূরে তীরভূমি অস্পষ্ট দেখা যাইতে লাগিল।

এডেন্ আমাদের ভারত-সাম্রাজেরা অন্তর্গত। এডেন্ ত্যাগ করিবার পরই আমরা ভারত-সাম্রাজ্যের সীমানার বাহিরে গেলাম; তখন আমরা আরব ও মিসর দেশের তীর-ভূমির মধ্য দিয়া চলিতেছিলাম। ২৯এ এপ্রিল রবিবার আমরা সুয়েজে পৌঁছিলাম। এই স্থানে 'মাল্‌টা' নামক জাহাজের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইল। এই জাহাজ-খানি আমাদের জাহাজ ছাড়িবার পূর্ব্বে ১১ই এপ্রিল তারিখে বোম্বাই হইতে যাত্রা করিয়াছিল। এই জাহাজে আমার কএকজন ইংরেজ বন্ধু ছিলেন। তখনও আমাদের জাহাজ একটু দূরে ছিল; আমি দূরবীক্ষণ আঁটিয়া সেই জাহাজের আরোহীদিগকে দেখিতে লাগিলাম এবং আমার ইংরেজ-বন্ধুগণকে বেশ চিনিতে পারিলাম। তাহার পর রুমাল নাড়িবার ধুম পড়িয়া গেল;—আমরা রুমাল উড়াইয়া মাল্‌টা জাহাজস্থিত বন্ধুগণের অভ্যর্থনা করিলাম; তাঁহারাও তাহাই করিলেন।

আমরা সুয়েজে কএক ঘণ্টা অপেক্ষা করিয়াছিলাম, কারণ এখান হইতে সকলেই কিছু খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া লইলেন। দেশী জেলে নৌকা করিয়া ব্যবসায়িগণ নানাদ্রব্যপূর্ণ বাক্স, ঝুড়ি প্রভৃতি লইয়া আমাদের জাহাজে আসিয়া উপস্থিত হইল। এই সকল বিক্রেতা যে কত রকম জিনিস আনিয়াছিল, তাহা আর বলা যায় না। তাহারা খরিদদার ঠকাইয়া বেশ দুই পয়সা উপার্জ্জন করিতে জানে! একজন বিক্রেতা এক বাক্স জঘন্য সিগারেট্ দিয়া আমার এক বন্ধুর নিকট হইতে চারি শিলিং আত্মসাৎ করিয়াছিল।

সুয়েজের চারিদিকের বালুকা স্তূপ দেখিয়া, এবং দূরবর্ত্তী

ফার্ডিন্যাণ্ড্ ডি লেসেপ্স্।

জনপদ সকলের পুরাতন বাইবেল-প্রসিদ্ধ বিবরণ স্মরণ করিয়া, এই স্থানটির কথা অনেকক্ষণ চিন্তা করিলাম। তাহার পর সুয়েজ খাল ; - ইহা উনবিংশ শতাব্দীর একটা সর্ব্বপ্রধান পূর্ত্তকীর্ত্তি ; ইহার তুলনা হয় না! তখন মনে হইল সেই প্রসিদ্ধ ফরাসী ইঞ্জিনিয়ার ডি, লেসেপ্সের কথা। কি অক্ষয়, আশ্চর্য্য কীর্ত্তি এই ইঞ্জিনিয়ার রাখিয়া গিয়াছেন! এই সুয়েজ খালের জন্য য়ুরোপের রাজ্যগুলির রাজনীতি ও বাণিজ্যনীতির কি উন্নতি ও পরিণতি হইয়াছে! এই খালের প্রসাদে ইংরেজরাজের কত উপকার হইয়াছে, তাহা আর আমায় বলিতে হইবে না ; সে কথা সকলেই জানেন। সভ্যজগতের বর্ত্তমান বংশীয়গণ ত লেসেপ্সের নিকট কৃতজ্ঞ আছেনই, ভবিষ্যৎ-বংশীয়গণও এই মহাত্মার বরণীয় ও স্মরণীয় কার্য্য কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করিবে। আর সেই সঙ্গে
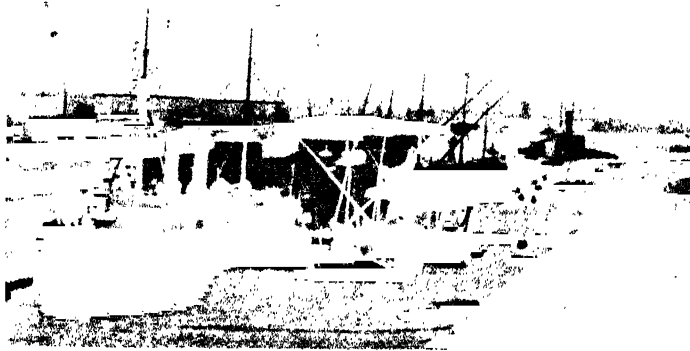
পোর্ট সৈয়দ্।

সঙ্গে আরও এক মহাত্মার নাম ইংরেজমাত্রেই স্মরণ করিবেন—সে নাম ইংলণ্ডের তদানীন্তন মহানুভব প্রধান মন্ত্রী ও প্রসিদ্ধ রাজনীতিক বেন্‌জামিন্ ডিস্‌রেলি। ইনিই পরে আর্‌ল অব্ বিকন্‌সফীল্ড হন। একদিন সমস্ত য়ুরোপ শুনিয়া অবাক্ ও বিচলিত হইল যে, কাহারও সহিত পরামর্শ না করিয়াই, এমন কি মন্ত্রিবর্গকেও না জানাইয়া, সুয়েজখাল নির্ম্মাণের জন্য যে যৌথ ফণ্ড স্থাপিত হইয়াছিল, ডিস্‌রেলি ইংলণ্ডের রাজার পক্ষ হইতেই তাহার অনেক গুলি অংশ ক্রয় করিয়াছিলেন। এই কথা প্রচারিত হইবামাত্র ইংলণ্ড ও য়ুরোপে মহা সোরগোল পড়িয়া গেল, তাঁহার এই কার্য্যের বিরুদ্ধ সমালোচনা আরম্ভ হইল ; কিন্তু কিছুদিন পরেই রাজা-প্রজা, পণ্ডিত-মূর্খ, ছোট-বড় সকলেই একবাক্যে 'ডিজির' ভবিষ্যৎদৃষ্টির ও রাজনীতিজ্ঞানের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন!

সন্ধ্যার প্রাক্কালে আমরা সুয়েজ ত্যাগ করিয়া খালের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। আমাদের দুই পার্শ্বে সুধু বালুকা-স্তূপ ; তাহারই মধ্য দিয়া প্রবাহিত এই ক্ষুদ্র জল-ধারা বাহিয়া আমাদের জাহাজ চলিতে লাগিল। আমরা দুই দিকে চাহিয়া দেখিলাম, অনেক-গুলি মাটীকাটা ষ্টীমার অবিশ্রান্ত এই খাল হইতে মাটী কাটিয়া তুলিতেছে। পরে শুনিলাম যে, যদি দুইদিনের জন্য এই মাটীকাটা ষ্টীমারগুলির কার্য্য বন্ধ থাকে, তাহা হইলে এই খালের অধিকাংশ বালুকা-পূর্ণ হইয়া যাতায়াতের পথ একেবারে বন্ধ হইয়া যায়।

৩০এ এপ্রিল তারিখে পূর্ব্বাহ্ণ নয়টার সময় আমরা পোর্ট সৈয়দে পৌঁছিলাম।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিজয় চন্দ্ মহ্‌তাব।

নৌকাপথে

১
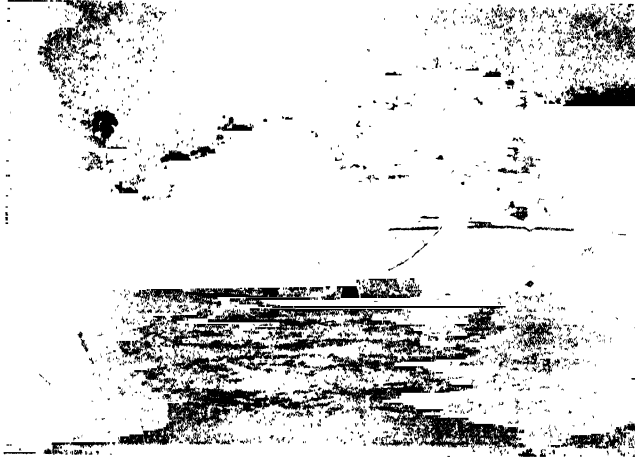
মাঝি ভিড়ায়োনাকো চলক্ তরী
নদীর মাঝে,
তরী এ ঘাটেতে বাঁধ্‌বনাকো
আজ্‌কে সাঁজে।
এই ঘাটে ওই বকুল গাছে
জল্‌টি যেথা ছুঁয়েই আছে,
এখনো ওই যে ঘাটেতে
পল্লীবালার কাঁকণ বাজে।
তরী সেথা বাঁধ্‌বনাকো আজ্‌কে সাঁজে।

২

মৌন সাঁজের ম্লান মাধুরী
কতই ব্যথা আন্‌ছে ডেকে,
গ্রামের ছোট দীপটি প্রাণে
বিষাদ ছবি দিচ্ছে এঁকে।
একটি গৃহ হোথায় কিনা
ছিল আমার বড়ই চেনা,
ছবিটি যার আজও আমার
হৃদয় কোণে সদাই রাজে।
তরী হেথা বাঁধবনাকো আজ্‌কে সাঁজে।

৩

এই নদীরই এই ঘাটেতে
এম্‌নি সাঁজে আমার প্রিয়া,
সে'ত ছোট কল্‌সীটিকে
কোমল তাহার কক্ষে নিয়া।
সোহাগে জল উথ্‌লে উঠি'
বক্ষে তাহার পড়্‌ত লুটি',
পথে প্রিয়া আমায় দেখে',
ঘোম্‌টা দিত হর্ষে—লাজে।
তরী হেথা বাঁধ্‌বনাকো আজকে সাঁজে।

৪

এই ঘাটে ওই গাছের পাশে—
তটিনীর ওই শ্যামল কূলে,
দিয়েছি সেই স্বর্ণলতায়
আপন হাতে চিতায় তুলে।
আজ্‌কেও সেই চিতার পরে
শিথিল বকুল পড়্‌ছে ঝরে',
আজও মধুর মুখখানি তার
দেয় যে বাধা সকল কাজে
তরী হেথা বাঁধ্‌বনাকো আজ্‌কে সাঁজে।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

দ্বিচক্রযান।

(সঙ্কলন)

স্বাধারণতঃ Bicycleকে দ্বিচক্রযান, বা চলিত কথায় 'দু'চাকার গাড়ী, বলে। অধুনা সমগ্র পৃথিবীতে উক্ত গাড়ীর প্রচলন এত অধিকরূপে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে যে, এইরূপ ব্যাখ্যা নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন;—কারণ দ্বিচক্রযান অর্থে যে কেহ গোযান বুঝিবেন না, এরূপ আশা করা অন্যায় নহে। স্বপরিশ্রমে, অল্পায়াসে এবং অল্পসময়ের মধ্যে বহুদূরস্থানে গমনাগমন করিবার উপযোগী এ যাবৎ ইহাপেক্ষা আর কোনও কিছু আবিষ্কৃত হয় নাই,—এ কথা সর্ব্ববাদি সম্মত। অধিকন্তু ইহার গুণের তুলনায় মূল্য এত অল্প যে, ধনী-দরিদ্র—সকলেই ইহা ব্যবহার করিয়া থাকে।

এহেন প্রয়োজনীয় ও মানবহিতকর যন্ত্রের উদ্ভাবক কে, সে বিষয় স্থির কিছু জানা যায় না।—তবে ইহা যে সর্ব্বপ্রথম ফরাসীরাজ্যে আবিষ্কৃত সেকথা সকলেই স্বীকার করেন। ইহার উদ্ভাবক সম্বন্ধে কএক বৎসরপূর্ব্বে একখানি বিলাতী পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়—তাহার মর্ম্মার্থ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। ফরাসীসাম্রাজ্যের জনৈক তস্কর স্বীয় চৌর্য্যবৃত্তির সুবিধার জন্য সর্ব্বপ্রথমে এই অত্যদ্ভুত যানের উদ্ভাবনা করে;—পুলিসের কবল হইতে দ্রুত পলায়নকল্পে সে ইহা ব্যবহার করিত। তাহার বাসস্থান ছিল, এক জন-মানবশূন্য পর্ব্বতগহ্বরে এবং অদূরবর্ত্তী পল্লীবাসীর গৃহলুণ্ঠন দ্বারা সে নিজ জীবিকা-নির্ব্বাহ করিত। পল্লীবাসী ও শান্তিরক্ষক-সম্প্রদায় বহুচেষ্টা ও বহুপরিশ্রম সত্ত্বেও তাহাকে ধৃত করিয়া উক্ত পল্লীসমূহে শান্তিস্থাপন করিতে পারেন নাই। অবশেষে, একদিন ধূলিকর্দ্দমপূর্ণ রাজপথে উক্তযানের চক্র রেখা দেখিতে পাইয়া, তদনুসরণে তাহার বাসস্থান ও একখানি গাড়ী আবিষ্কার করেন। গাড়ীখানি আর কিছুই নহে—কদাকার এবং গুরুভার দু'খানি সমব্যাস কাষ্ঠের চাকা লম্বাভাবে একটি সরল (Horizontal) কাষ্ঠ-দণ্ড দ্বারা আবদ্ধ এবং এই কাষ্ঠদণ্ডের উপর আরোহীর বসিবার একখানি পীঠিকা। এই ক্ষুদ্র আসনে বসিয়া পদদ্বারা মাটী ঠেলিয়া উহা চালান হইত।

১৮১৫ খৃঃ অব্দে য়ুরোপে যে মহাসমর সংঘটিত হয়,

আদিম দ্বিচক্র-যান।

তাহার অব্যবহিত পরেই ঐরূপ একখানি গাড়ী ফ্রান্স হইতে ইংলণ্ডে আনীত হয়। যদিচ প্রদত্ত চিত্রটি ৭।৮ বৎসর পরে যে গাড়ী প্রচলিত ছিল তাহারাই, তত্রাচ পূর্ব্বোক্তের সহিত ইহার অনেক সৌসাদৃশ্য আছে। এই সময় হইতে প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী যাবৎ উভয় রাজ্যে উক্ত যানের উন্নতির চেষ্টা করা হয়; কিন্তু নানাবিধ নূতন পন্থা অবলম্বন করা সত্ত্বেও উহা ক্রমেই জটিল হইয়া পড়ে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিম্নে একখানি চিত্র দেওয়া হইল। পদদ্বয় ভারবোধ হইলে
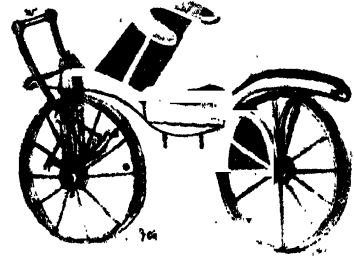
মধ্যকালের দ্বিচক্রযান।

"ক" এর উপর বক্ষ রক্ষা করিয়া "খ" হাতলটি দাঁড়ের ন্যায় সম্মুখভাগে ও পশ্চাৎভাগে টানিলে "গগ" বৃত্তখণ্ড (Arc) এবং "চ" চক্রখানির পরস্পর কার্য্যদ্বারা গাড়ী ক্রমশঃ সম্মুখ-দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। "চ" চক্রখানি অক্ষদণ্ডের (Axle) সহিত এরূপভাবে আবদ্ধ যে "খ"টি আরোহীর দিকে টানিলেই গাড়ীখানি অগ্রসর হয়, বিপরীতদিকে ঠেলিলে গাড়ীর গতি অব্যাহত থাকে।

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে মিশো (Michaux) নামক একজন পারী-নিবাসী সম্মুখের চাকাখানি পশ্চাতের চাকার তুলনায় বৃহদাকার করিয়া তাহাই চালক-চক্ররূপে (Driving wheel) নিয়োজিত করেন। বলা বাহুল্য যে, এ পর্য্যন্ত

চক্রযানগুলি কাষ্ঠই দ্বারা নির্ম্মিত হইতেছিল; কিন্তু ইহার অল্পদিন পরেই মাজী (Magee) নামক অন্য একজন প্যারী নিবাসী আগাগোড়া লৌহ ও ইস্পাত দ্বারা একখানি গাড়ী নির্ম্মাণ করেন। পশ্চাতের তুলনায় ইহার সম্মুখের চাকাখানি এত বৃহৎ যে লোকে ইহাকে একচাকার গাড়ী বলিত। এই সময় হইতে ফ্রান্স, ইংলণ্ড ও আমেরিকার যুক্তরাজ্যে এই শ্রেণীর চক্রযানের বহুল প্রচলন হয় এবং অনেকে ইহার উন্নতিকল্পে মনোনিবেশ করেন। অল্পকাল মধ্যেই অনেকে অনেক প্রকার গাড়ী প্রস্তুত করিয়া পেটেণ্ট করিয়া লন এবং ইহার চালনাকার্য্য শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় পর্য্যন্ত খোলা হয়। এই সময়ে চালকচক্রের ঘূর্ণ্যমান অক্ষদণ্ডের (Rovolving axle) সহিত আবর্ত্তক-বাহু (Crank) সংযুক্ত করিয়া তদ্দ্বারা চালনকার্য্য নির্ব্বাহ অর্থাৎ গাড়ীর গতি ভিন্নমুখ করিতে হইলে সম্মুখের চাকাদ্বারাই সে কার্য্য সম্পন্ন করিবার কৌশল উদ্ভাবিত হয়। কেহ কেহ সম্মুখের ও পশ্চাতের চাকাখানি ক্রমে শৃঙ্খল দ্বারা সংযুক্ত করিয়া হাতল সাহায্যে গতিশীল গাড়ীকে ভিন্নমুখী করিবার কৌশল উদ্ভাবন করিলেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ইহার দ্রুত উন্নতি আরম্ভ হয়। পূর্ব্বে স্বপরিশ্রমে চালিত সমস্ত গাড়ীকেই ভেলসিপীড্ (Velocipede) বলা হইত। এমন কি এইরূপ প্রণালীতে চালিত নৌকাকেও ভেলসিপীড্ বলা হইত। উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ইহার নামেরও পরিবর্ত্তন হয়। এই সময় হইতে ঘর্ষণজনিত বাধা এবং ঝাঁকুনি কমাইবার জন্য চাকার হালে নিরেট ইণ্ডিয়া রবার ব্যবহৃত হইতে থাকে। কিন্তু অল্পদিন পরেই নিরেট রবার অপেক্ষা রবারের, বায়ুপূর্ণ অর্থাৎ ফাঁপা নল অধিকতর উপযোগী বিবেচিত হওয়ায় শেষোক্তেরই প্রচলন আরম্ভ হয়। অল্পদিন পরেই পশ্চাদ্ভাগের চাকাখানি চালকচক্ররূপে এবং সম্মুখের চাকাখানি নায়কচক্ররূপে (Directing wheel) ব্যবহার করিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। অতঃপর চালকচক্রের ঘূর্ণ্যমান অক্ষদণ্ডের সহিত আবর্ত্তক বাহুর পরিবর্ত্তে একখানি ক্ষুদ্র সদন্তক চক্র Toothed wheel সংযুক্ত করিয়া লওয়া হয় এবং চালক ও-নায়ক-চক্রের মধ্যস্থানে আর একখানি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ সদন্তক চক্র ফ্রেমের সহিত আবদ্ধ করিয়া একটি শৃঙ্খল দ্বারা উক্ত দুইখানি সদন্তক চক্রকে পরস্পর সংলগ্ন (Gearing) করা হয়। অনন্তর, যথাক্রমে শেষোক্ত সদন্তক চক্রের সহিত পাদান (Pedals) বিশিষ্ট আবর্ত্তক বাহু সংলগ্ন করিয়া তদ্দ্বারা চালনা কার্য্য নির্ব্বাহ করা এবং নায়ক-চক্রের সহিত আড়াআড়ি-ভাবে-সংবদ্ধ-হাতল (Transverse handle) লাগাইয়া তদ্দ্বারা গাড়ীকে ইচ্ছামত ঘুরাইবার ফিরাইবার কৌশলগুলি প্রবর্ত্তিত হয়। প্রথমাবস্থায় Fixed wheel গাড়ীর প্রচলন ছিল; ইহাতে চালকচক্রের অক্ষদণ্ডের সহিত তৎসংলগ্ন সদন্তক চক্রখানি পরস্পর দৃঢ় ভাবে সংযুক্ত থাকাতে পাদান ঘুরান বন্ধ করিলেই চালকচক্র সঙ্গে সঙ্গে থামিয়া যাইত। এক্ষণে অন্যান্য উন্নতির সঙ্গে এই সংবদ্ধ চক্র গাড়ীকে Free wheel এ পরিবর্ত্তিত করা হইয়াছে; অর্থাৎ অক্ষদণ্ড ও সদন্তক চক্রকে এখন এরূপভাবে আবদ্ধ করা হইয়াছে যে, পাদান ঘুরান বন্ধ করিলেও স্থিতিপ্রবণতা (Inertia) দ্বারা চালকচক্র কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত আপনা আপনি গতিমান্ থাকে। ইচ্ছা করিলে আবশ্যকমত হঠাৎ গাড়ী থামাইবার জন্য গতিরোধক-কল (Brake) আবিষ্কৃত হইয়াছে। চালকচক্রের ঠিক উপরে ফ্রেমের সহিত আরোহীর আসন সংযুক্ত আছে। ক্রমশঃ এই গাড়ীতে প্রয়োজনীয় অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রত্যঙ্গ সংযুক্ত হইয়াছে ও হইতেছে। তবে এখনও ইহাতে কোনরূপ পার্শ্বাবলম্বন (Lateral Support) না থাকাতে হাতলদ্বারা নিজের ভারকেন্দ্র ঠিক রাখিয়া চালাইতে হয়।

আজকাল সমগ্র সভ্যজগতেই দ্বিচক্রযানের বহুল প্রচলন হওয়ায় ক্রমান্বয়ে ইহাকে দৃঢ় ও লঘুভার করাই কারিগরগণের প্রধান লক্ষ্য দাঁড়াইয়াছে। যে সকল গাড়ী প্রতিদ্বন্দ্বিতা উপলক্ষে (Racing cycle) ব্যবহার হয় তাহার ওজন [illegible] পাউণ্ডের অধিক নহে, অর্থাৎ পূর্ব্বেকার কাষ্ঠনির্ম্মিত গাড়ীর ওজনের অর্দ্ধেক। ইদানীং আরোহীর পদের দৈর্ঘ্যানুসারে দ্বিচক্রযানের চাকার ব্যাস (Diameter) ২॥০ হইতে [illegible] পর্য্যন্ত, এবং উভয় চাকাই সমান করা হয়। যেগুলি প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, সেগুলির পৃথক্ পৃথক্ অংশচয় যথাসম্ভব লঘু এবং মধ্যের সদন্তক চক্রখানি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ করা হয়।

দিনকতক ত্রিচক্রযান (Tricycle) প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল

কিন্তু ইহার বেগ (Speed) দ্বিচক্রযানের তুলনায় কম, অথচ ইহার ভার এবং নির্ম্মাণ-ব্যয়ও অধিক বলিয়া ইহা আর বেশী ব্যবহৃত হয় না। বেগবৃদ্ধিমানসে কেবলমাত্র একখানি চাকার (High Wheel) গাড়ী দিনকতক প্রচলিত হইয়াছিল; কিন্তু সুদক্ষ চালক ভিন্ন ইহা বড় একটা কেহ পরিচালনা করিতে পারিত না বলিয়া, তাহাও এক্ষণে তিরোহিত হইয়াছে।

দ্বিচক্রে চড়িতে শিখিবার প্রারম্ভে নিজের ভারকেন্দ্র ঠিক রাখিতে (Balancing) অভ্যাস করিতে হয়। ক্রমাবনত ভূমিতে (Slope) মাধ্যাকর্ষণের (Attraction of gravity) অনুকূলে গাড়ীখানি রাখিয়া আসন অভ্যাস করিতে হয়। তাহার পর ভালরূপ balance অভ্যাস হইলে পাদান ঘুরাইবার চেষ্টা করা উচিত। উভয়কার্য্য একসঙ্গে শিক্ষা করিতে কষ্ট ও বিলম্ব হয়। কেহ কেহ balance অভ্যাস করিবার সঙ্গে সঙ্গেই পাদান ঘুরান অভ্যাস করেন; কিন্তু পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে একে একে অভ্যাস করাই সহজসাধ্য। শিক্ষাকালে দুই চারিবার পতন অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু যেদিকে গাড়ী কাৎ হয়, ঠিক সেই দিকে (বিপরীত দিকে নহে) হাতল সাহায্যে সম্মুখের চাকাখানি বাঁকাইয়া দিলে পতন আশু-নিবারণ করা যায়।

যাহাতে বেগ হ্রাস না হয় এবং ঘর্ষণ জনিত বাধা বৃদ্ধি না হয়, তজ্জন্য মধ্যে মধ্যে চাকার বাহক (Bearing) গুলিতে তৈল প্রদান করা আবশ্যক এবং প্রত্যহ ব্যবহারের পর গাড়ীখানিকে যথাস্থানে রাখিয়া উত্তমরূপে ধূলামাটী পরিষ্কার করা উচিত। এবিষয়ে না লক্ষ্য রাখিলে তেলের সহিত ধূলামাটী মিশ্রিত হইয়া গাড়ীর বেগের পক্ষে ক্ষতি ঘটায়।

একস্থান হইতে অন্যস্থানে স্বপরিশ্রমে ও দ্রুতবেগে গমনাগমন পক্ষে (Skating অর্থাৎ মসৃণস্থানে এবং বরফের উপর ব্যবহৃত চাকাবিশিষ্ট কাষ্ঠপাদুকাবিশেষ ব্যতীত) দ্বিচক্রযান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট উপায় আর কিছু নাই। একজন সাধারণ দ্বিচক্রযানারোহী একদিনে, এবং একজন সুদক্ষ আরোহী এক ঘণ্টায় একটি দ্রুতগামী অশ্বকে পরাজিত করিতে পারে। ১৯১০।১৫ বৎসরে দ্বিচক্রযানের প্রচলন অত্যন্ত অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং আজকাল অনেকে খুব দীর্ঘপথও স্বচ্ছন্দে এবং অল্পসময়ে অতিক্রম করিয়া থাকেন। যেখানে মোটামুটি রকম বাঁধাপথ আছে সেখানে দ্বিচক্রযানে অক্লেশে যাওয়া চলে; কিন্তু বাঁধা রাস্তা না হইলে—অর্থাৎ চষামাঠে, অথবা পার্ব্বত্য প্রদেশে, ইহা একেবারে অব্যবহার্য্য।

সুগমপথ দ্বিচক্রযানে কতদূর কত সময়ে উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভবপর, নিম্নে তাহার একটা মোটামুট হিসাব দেওয়া গেল;—

মাইল	ঘণ্টা	মিঃ	সেঃ
১/২	০	১	৩২ ৪/৫
৩/৪	০	২	১৯ ২/৫
১	০	৩	০
২	০	৬	৩১
৩	০	৯	৫৮
৪	০	১৩	১৯
৫	০	১৬	৪১
৬	০	২০	৫৫
৭	০	২৪	২৩
৮	০	২৮	৫
৯	০	৩১	২
১০	০	৩৪	৪১
২০	১	১২	৩৮
৩০	১	৫২	৪৮
৪০	২	৩১	৪৫
৫০	৩	৯	২১
৬০	৪	১১	২৪
৭০	৪	৫৬	৩৫
৮০	৫	৪৬	৪৮
৯০	৬	৪২	২ ২/৫
১০০	৭	৩৩	৪৩
১০৬	৭	৫৮	৫৪

বলা বাহুল্য যে, প্রতিদ্বন্দিতা হিসাবে সুদক্ষ আরোহিবর্গের কৃতিত্বের বিবরণ হইতেই উপরোক্ত তালিকাটি সংগৃহীত।

এতৎপ্রসঙ্গে লণ্ডনের কোন এক দৈনিক পত্রিকা সম্পাদক লিখিয়াছেন—"কিঞ্চিদূন আট ঘণ্টায় ১০৬ মাইল—প্রায় ৫৩ ক্রোশ—পথ অতিক্রমণ করা কোন

জীবজন্তু বা কল-কৌশলের পক্ষেই সহজসাধ্য নহে।” টানব্রিজ হইতে লিভারপুল ২৩৪ মাইল পথ ১৮ ঘণ্টা ১৬ মিনিটে অতিক্রম করা যায়। একশত মাইল পথ দ্বিচক্রযান সাহায্যে অনেকেই অতিক্রম করিয়া থাকেন। এমন কি ১৮৭৩ খৃঃ অব্দের জুন মাসে (যখন ইহার ততটা উন্নতি হয় নাই) লণ্ডন হইতে জন-ও গ্রোটস্ পর্য্যন্ত ৮০০ মাইল পথ অতিক্রম করিতে ১৪ দিন মাত্র লাগিয়াছিল।

দ্বিচক্রযানের যথাসম্ভব উন্নতি হইয়া গিয়াছে ইহাই সাধারণ ধারণা, কিন্তু সম্প্রতি অষ্ট্রীয়াতে একপ্রকার নূতন গাড়ী উদ্ভাবিত হইয়াছে; পার্শ্বে তাহার চিত্র দেওয়া গেল। ইহাতে পাদান ঘুরাইয়া গাড়ী চালাইতে হয় না, পাদান দু'টি পর্য্যায়ক্রমে চাপিয়া 'উচু নীচু' করিলেই গাড়ী চলে। এই চাপের পরিমাণ হ্রাসবৃদ্ধি করিলেই গাড়ীর বেগ ইচ্ছামত হ্রাস ও বৃদ্ধি করা চলে। ইহার চেন ও সদন্তক চক্রগুলির পরস্পর সম্বন্ধ পার্শ্বস্থিত চিত্রে দেখান হইয়াছে। 'ক' হইতে আরম্ভ করিয়া 'গ' ও 'ঘ' সদন্তক চক্রের উপর দিয়া, 'চ' সদন্তক চক্রখানি আবর্ত্তন করিয়া পুনরায় 'ঘ' (ইহা ঠিক 'ঘ' এর পশ্চাতে, সম্মুখ হইতে দেখা যাইতেছে না) এবং 'গ' সদন্তক চক্রের উপর দিয়া 'খ'এ আসিয়া সংযুক্ত হইয়াছে। 'ঘ' এবং
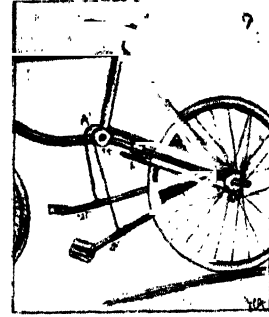
অষ্ট্রিয়ার নবোদ্ভূত দ্বিচক্রযান

'খ' অক্ষদণ্ডের সহিত এরূপভাবে আবদ্ধ যে একের কার্য্যের সময় অন্যের কার্য্য বন্ধ হইয়া যায়। পর্য্যায়ক্রমে 'ক' ও 'খ' এর উপর চাপ দিলে 'ঘ' ও 'খ' একে একে কার্য্য করিতে থাকে এবং এইরূপে গাড়ী চালিত হয়। সাধারণ গাড়ী চালাইতে যে পরিশ্রম হয়, এই গাড়ীতে তাহার অর্দ্ধেক পরিশ্রম করিলেই সমান ফল পাওয়া যায়; অথবা, অন্য কথায় সমান পরিশ্রমে দ্বিগুণ বেগে গাড়ী চালিত হয়।

আজকাল Motor cycle এর বহুল প্রচলন হইয়াছে; কিন্তু তাহা বাষ্পে চালিত হয়, স্বপরিশ্রমে নহে; তজ্জন্য তাহার বিষয় উল্লেখ করিলাম না।

শ্রীযোগেশ চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

লর্ড লেটনের অঙ্কিত চিত্র হইতে] দ্বন্দ্ব—শূর ও শমন

বাঙ্গালা সাহিত্যে ইতিহাস।

সাহিত্য জাতির জীবনের আদর্শ, ভাব ও চিন্তার মধ্য দিয়া আপনাকে প্রকাশ করে। সাহিত্য ও ইতিহাস ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্পর্কিত, কারণ ইতিহাস জাতীয় জীবনের সম্যক্ বিবৃতি। ভাষার সৌন্দর্য্য ও বর্ণনার রমণীয়তা উভয়কেই উপভোগ্য করিয়া তুলে। ঐতিহাসিক ঘটনার কঙ্কালগুলিকে সাহিত্য নবরসের মৃত-সঞ্জীবনীসুধা দ্বারা জীবন্ত করিয়া তুলে। ইংরেজ ঐতিহাসিক মেকলে, ফ্রুড্ ও ফ্রীম্যান্ যেসকল ইতিহাস রচনা করিয়া গিয়াছেন, সেগুলি ইংরেজি সাহিত্যেরও সম্পদ। আমাদের দেশেও ৺রজনীকান্তের 'সিপাহি যুদ্ধ' ও অক্ষয়কুমার, নিখিলনাথ প্রভৃতির ঐতিহাসিক রচনাবলী একাধারে ইতিহাস ও সাহিত্য।

আবার ইতিহাস ও সাহিত্যের মধ্যে প্রভেদ যে নাই, তাহা নহে। সাহিত্যের কোন কোন বিভাগে কল্পনার প্রসার অবাধ; কিন্তু ইতিহাসে তাহা সত্যের শাসনে সংযত। অতীতকে বর্ত্তমানের ন্যায় উজ্জ্বল ও জীবন্ত করিতে, বিভিন্ন বিক্ষিপ্ত ঘটনাবলীকে ঐক্য ও সামঞ্জস্যের সূত্রে সম্বদ্ধ করিতে, এবং বর্ত্তমানের সহিত অতীতের, কার্য্যের সহিত কারণের সম্বন্ধকে ফুটাইয়া তুলিতে, যতটুকু কল্পনার প্রয়োজন, ঐতিহাসিক কেবল ততটুকুর উপরই দাবী করিতে পারেন। তদতিরিক্ত কল্পনার আশ্রয়গ্রহণ করিলে তিনি সত্যের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারেন না। ইতিহাসে তাহা অমার্জ্জনীয়, কারণ বর্ণনার সত্যতাই ইতিহাসের প্রাণ।

সাহিত্যকে যদিও সাধারণতঃ এরূপ শাসন মানিতে হয় না, তথাপি যখনই ইহা ইতিহাসের গণ্ডীর মধ্যে আসিয়া পড়ে, তখনই ইহার অবাধ স্বাধীনতা সঙ্কুচিত করা আবশ্যক। ঐতিহাসিক প্রবন্ধের ত কথাই নাই; কাব্যে ও উপন্যাসে যখন কোন প্রকৃত ঐতিহাসিক ঘটনাকে আখ্যানবস্তু করিয়া লওয়া হয়, তখন তাহাকে একটুও বিকৃত করিতে, কবি কি ঔপন্যাসিক, কাহারও অধিকার নাই।

আমাদের দেশে সাহিত্যিকগণ যে এই সাদা কথাটি সব সময়ে বুঝিয়াছেন, অথবা বুঝিয়াও তদনুসারে কার্য্য করিয়াছেন, তাহাত বোধ হয় না। বাঙ্গালীর জাতীয় ইতিহাস নাই! আমাদের এই শোচনীয় অভাব সর্ব্বপ্রথম অনুভব করেন, সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র; আর তিনিই প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙ্গালীকে এই অভাবপূরণের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে উপদেশ দেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি স্বয়ং ঐতিহাসিক সত্য ও কল্পনার অপূর্ব্ব সংমিশ্রণে উপন্যাসের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত করিয়া সত্যের অমর্য্যাদা করিয়াছেন। তিনি যে "বাঙ্গালা ইতিহাসের ভগ্নাংশ" * আমাদিগকে দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার স্বাধীনচিন্তা ও অনুসন্ধানের কোন চিহ্নই দেখিতে পাওয়া যায় না! প্রবন্ধটি সমগ্রই যেন (Glazier) গ্লেজিয়ার্ সাহেবের 'Report on the District of Rungpore' হইতে সঙ্কলিত বলিয়া বোধ হয়। গ্লেজিয়ার্ সাহেব চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে রঙ্গপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট্ ছিলেন। তিনি ঐ জেলা সম্বন্ধে যাহা কিছু লিখিয়া গিয়াছেন, সে সমস্তই বঙ্কিমচন্দ্র অবিসংবাদী সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে,—আট নয় শত বৎসর পূর্ব্বে যে মহীয়সী বঙ্গরমণী রাজা ধর্ম্মপালের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন এবং নিরক্ষর গ্রামবাসীর 'ময়নামতীর গান' উত্তরবঙ্গে আজিও যাঁহার ক্ষমতা ও প্রভাবের পরিচয় প্রদান করে, গ্লেজিয়ার্ সাহেব ইংরেজিতে তাঁহার নাম Minavati লিখিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র ময়নামতীমূলক প্রবন্ধ ও গানের বিষয় অবগত না থাকাই সম্ভব। সম্ভবতঃ তাঁহার মৃত্যুর পরে শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র শীলকর্ত্তৃক এই সকল গান প্রথম সঙ্কলিত হয়। এরূপ ক্ষেত্রে তাঁহার এ সম্বন্ধে কিছু না লেখাই উচিত ছিল। কিন্তু তিনি যে সাহেবের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া 'ময়নামতীকে' 'মীনাবতি'তে রূপান্তরিত করিবেন, তাহা কি বিচিত্র নহে? যে বিষয় সম্বন্ধে তাঁহার নিজের অভিজ্ঞতা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, তাহাই 'বাঙ্গলা ইতিহাসের ভগ্নাংশ' বলিয়া সাধারণের সম্মুখে উপস্থাপিত করা, তাঁহার মত মনীষীর সমীচীন হয় নাই বলিয়া মনে হয়!

যিনি অন্যান্য অনেক প্রবন্ধে এবং কৃষ্ণচরিত্রে অসাধারণ গবেষণা, যুক্তি ও বিচারশক্তি দেখাইয়াছেন, তিনি যে ইতিহাসের আলোচনায় এরূপ গতানুগতিকতার পরিচয় দিবেন, তদপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে?

ঐতিহাসিক প্রবন্ধ ছাড়িয়া তাঁহার উপন্যাসের দিকে

* বিবিধ প্রবন্ধ, দ্বিতীয় ভাগ।

দৃষ্টিপাত করিলেও আমাদিগকে মাঝে মাঝে ঐরূপ হতাশ হইতে হয়! কবি ও ঔপন্যাসিক যতই কেন নিরঙ্কুশ হউন না, ইতিহাসের মর্য্যাদা তাঁহারা কখনও ক্ষুণ্ণ করিতে পারেন না। কেবল যেখানে ইতিহাস লেখকগণ একমত নহেন, ঐতিহাসিক সত্য সন্দেহের ছায়ায় ম্লান, অথবা প্রবাদমাত্র ইতিহাসের ভিত্তি, সেখানে সাহিত্যিকগণ আপনাদের উদ্ভাবনী কল্পনাবলে ঘটনার সমাবেশ করিতে পারেন। সেক্স্পীয়রের কোন কোন ঐতিহাসিক নাটক এবং সার ওয়াণ্টার স্কটের Ivanhoe, Kenilworth প্রভৃতি কএকখানি উপন্যাস ইহার উদাহরণ স্থল। উল্লিখিত ময়ণামতী ঘটিত উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া যদি কেহ কাব্য, নাটক, কি উপন্যাস রচনা করেন, তাহা হইলে তাঁহার কল্পনাকে সংযত করিবার বিশেষ কোন প্রয়োজন নাই। কারণ এই প্রবাদ সংক্রান্ত ঐতিহাসিক তথ্য এখনও নিঃসন্দিগ্ধরূপে নির্দ্ধারিত হয় নাই; কিন্তু যেখানে সত্য অবিসংবাদিত, অথবা যেখানে সামান্য চেষ্টা করিলে প্রমাণ সহজসাধ্য, সেখানে সত্যের অপলাপ করা, অথবা প্রমাণ-সংগ্রহ না করা, যে কতদূর অসঙ্গত, তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না।

বঙ্কিমচন্দ্র এ সম্বন্ধে যে উদাসীন ছিলেন, তাহা তাঁহার তোকি খাঁর চরিত্র-চিত্রণ হইতেই বুঝিতে পারা যায়। ঐতিহাসিকগণ একবাক্যে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে, মীরকাশিমের এই সেনাপতি সাহস, বীরত্ব ও প্রভুভক্তি প্রভৃতি সদ্‌গুণে ভূষিত ছিলেন, এবং যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁহার রণ-কুশলতায় ঈর্ষান্বিত সহকারিগণকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া অনন্যসাধারণ বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে মৃত্যু-শয্যায় শয়ন করেন! কিন্তু 'চন্দ্রশেখরে' তোকি খাঁর যে চরিত্র চিত্রিত হইয়াছে, তাহা অতীব ঘৃণিত! এখানে তিনি প্রভু-পত্নীর প্রেমাকাঙ্ক্ষী, বিশ্বাসঘাতক নারকী! উদার, উন্নত বীরচরিত্রে এরূপ ঘোর কলঙ্ককালিমা লেপনের আবশ্যকতা আমরা উপলব্ধি করিতে পারি না!

অনেক সময়ে বঙ্কিমচন্দ্রের এই ঔদাসীন্য যে স্বেচ্ছাকৃত ছিল, তাহা তাঁহার 'আনন্দমঠের' ভূমিকা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়! তিনি বলেন, 'উপন্যাস উপন্যাস,—ইতিহাস নহে।' কিন্তু এই ধারণা যে ভ্রমাত্মক, তাহা যেন তিনি পরে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাই তাঁহার আনন্দমঠে ও ইতিহাসে যে দুইটি প্রধান অনৈক্য ছিল, তাহা তিনি পরবর্ত্তী সংস্করণে দূরীভূত করেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের এই ত্রুটির জন্য যে এত কথা বলিলাম, আশা করি তাহা সাধারণের অপ্রীতিকর হইবে না। বঙ্গ-সাহিত্যে তাঁহার প্রভাব অসামান্য বলিয়া নব্য লেখকগণ যাহাতে তাঁহার ত্রুটিগুলির অনুসরণ করিয়া ইতিহাসের মর্য্যাদাহানি না করেন, সেইজন্যই দুইচারি কথা বলা।

নবীনচন্দ্রের 'পলাশীর যুদ্ধে' সিরাজদ্দৌলা নরপিশাচরূপে চিত্রিত হইয়াছেন।—এজন্য তাঁহাকে বড় বেশী দোষ দেওয়া যায় না। কারণ, হতভাগ্য সিরাজের চরিত্র তখনও বাঙ্গালী ঐতিহাসিকের চেষ্টায় কালিমামুক্ত হয় নাই। তাই গিরিশ চন্দ্রের নাটক 'সিরাজদ্দৌলা' প্রকাশিত হইলে নবীনচন্দ্র তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন, 'আমি যখন 'পলাশীর যুদ্ধ' লিখি, তখন সিরাজের বিকৃত আলেখ্যই আমাদের একমাত্র অবলম্বন ছিল।'

আমাদের সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে যে, বর্ত্তমান যুগে ঔপন্যাসিক ও নাটককারদিগের দৃষ্টি ইতিহাসের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের পর রমেশচন্দ্র ঐতিহাসিক উপন্যাসে সত্যের মর্য্যাদারক্ষণে সমধিক কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। তিনি নিজে একজন বিচক্ষণ ঐতিহাসিক ছিলেন, তাঁহার ঐতিহাসিক উপন্যাস চতুষ্টয়ে মোগল রাজত্বের যে শতবর্ষের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা ইতিহাসকে অতিক্রম করে নাই, অথচ তাহা বেশ সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বল। আজকাল, নাটকের উপাদানও ইতিহাস হইতে সংগৃহীত হইতেছে। গিরিশচন্দ্র বৃদ্ধবয়সে কয়েকখানি ঐতিহাসিক নাটক লিখিয়া ইতিহাসের কএকটি ঘটনা রামায়ণ-মহাভারতের ন্যায় বাঙ্গালীর আপামরসাধারণের গোচর করিয়া গিয়াছেন। অধুনা-দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটক কয়খানি ঐতিহাসিক সত্য-প্রচারে কতকটা সহায়তাকরে আসর জমাইয়া রাখিয়াছে।

যেখানে ঐতিহাসিক চরিত্র লইয়া আলোচনা করিতে হইবে, সেখানে কবি, নাটককার কি ঔপন্যাসিকের বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। ইতিহাসে তাঁহাদিগকে যেরূপ পাওয়া যায়, ঠিক সেইরূপ ভাবেই তাঁহাদিগকে চিত্রিত করাই প্রকৃষ্ট পন্থা। সাহিত্যিক প্রয়োজন যেন

ইতিহাসকে বিকৃত করিয়া না ফেলে! আমাদের দেশ চিরকালই ইতিহাসের প্রতি অনাদর দেখাইয়া আসিয়াছে,—এখন আমরা তাহার ফলভোগ করিতেছি! এতদিন পরে যদি আমাদের মনে সত্যসত্যই এই ইচ্ছা জাগিয়া থাকে যে,—ভারতের একখানি সুসম্পূর্ণ প্রকৃত ইতিহাস আমাদিগকেই প্রণয়ন করিতে হইবে, তাহা হইলে যাহা কিছু তথ্য ইতিহাসের পৃষ্ঠায় বিবৃত আছে, অথবা যাহা কিছু সুধীগণের চেষ্টায় আবিষ্কৃত হইতেছে, তাহা যেন সাহিত্যিকের হাতে পড়িয়া ভিন্নরূপ ধারণ না করে!

—শ্রীকৃষ্ণবিহারী গুপ্ত।

আমি ও তুমি।

১

তুমি চন্দ্র,—আমি নাথ! কলঙ্ক তোমার,
তুমি আলো,—আমি অন্ধ তমঃ;
পবিত্র পঙ্কজ তুমি,—আমি পঙ্কতার,
তুমি মণি,—আমি ভুজঙ্গম।

২

আমি জড় দেহ,—তুমি চেতনা তাহার,
আমি মন,—তুমি বোধ-ভূমি;
আমি স্থূল ভাষা,—তুমি সূক্ষ্ম ভাব তার,
আমি বাহ্য,—অভ্যন্তর তুমি।

৩

তুমি কর্ত্তা, তুমি ভোক্তা, তুমি যজ্ঞানল,—
কর্ম্ম, ভোগ, আমি যে ইন্ধন;
তুমি অনাসক্তি হৃদে, মুক্তি নিরমল,—
আমি মায়া, মোহের বন্ধন।

৪

আরাধ্য দেবতা তুমি হৃদয়-মন্দিরে,—
কামরূপে আমি বলিদান;
তুমি প্রভু,—আমি দাসী, ভাসি নেত্রনীরে
স্মরি' সদা করুণা তোমার।

৫

লবণাক্ত কর্ম্মসিন্ধু আমি কামনার,—
প্রেমরূপী সুধাকুম্ভ তুমি;
বিন্দু বিন্দু বিগলিত তুমি মধু-ধার,—
মধু-চক্র মম চিত্ত-ভূমি।

শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী।

ছিন্নহস্ত।

[পূর্ব্বাবৃত্তি।—ব্যাঙ্কার মঃ ভরজারস্ বিপত্নীক। এলিস তাঁহার একমাত্র কন্যা, মাক্সিম্ ভ্রাতুষ্পুত্র, খাজাঞ্চী ভিগ্‌নরী, সেক্রেটারী রবার্ট, দ্বারবান ভেন্‌লিভান্ত্, মালখানা রক্ষক ম্যালিকম্ এবং বালক-ভৃত্য জর্জ্জেট্। তাঁহার যে বাটীতে বাস, তাহাতেই ব্যাঙ্কও স্থাপিত। একদিন তাঁহার বাটীতে নিশা-ভোজ; ভিগ্‌নরী ও ম্যাক্সিম্ একসঙ্গে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিয়া দেখে খাজাঞ্চিখানার বিচিত্র কলকৌশলসমন্বিত লৌহ সিন্দুকে কোন রমণীর মূল্যবান্ ব্রেসলেট্ পরিহিত ছিন্ন-বামহস্ত সংবদ্ধ রহিয়াছে! এ ঘটনা তৃতীয় ব্যক্তির কর্ণগোচর না করিয়া মাক্সিম্ ঐ সদ্য-ছিন্ন হস্তের অধিকারিণী নিরাকরণে প্রবৃত্ত হইলেন।

রবার্ট এলিসের পাণি-প্রার্থী, বৃদ্ধ ব্যাঙ্কার কিন্তু তাহার বিরোধী। রবার্টের অভিজাত বংশে জন্ম বলিয়া তাঁহার ব্যবসায়-বুদ্ধি সম্বন্ধে ভরজারস্ সন্দিহান ছিলেন। তিনি ভিগ্‌নরীকে জামাতৃপদে বরণে ইচ্ছুক।

কন্যার সহিত কথোপকথনে বুঝিয়াছিলেন, এলিস রবার্টের প্রতি অনুরক্ত। তাই তিনি এলিসের চক্ষুর অন্তরাল করিবার উদ্দেশে রবার্টকে স্বীয় মিশরস্থিত কার্য্যালয়ের ভার দিয়া পাঠাইবার প্রস্তাব করিলেন। সে দিন রবার্ট সে কথার উত্তর দিল না।

কর্ণেল বোরিসফের ১৪ লক্ষ টাকা এবং মূল্যবান্ দলীলাদিসমেত একটি বাক্স ভরজারসের ব্যাঙ্কে গচ্ছিত ছিল। তিনি ঐ দিবস আসিয়া বলেন যে, পরদিবস তাঁহার কিছু টাকার প্রয়োজন।

রবার্ট আফিস ঘরে গিয়া বন্ধু ভিগ্‌নরীকে আভাসে সকল কথা জানাইয়া বলিল যে, সে মিশরে যাইবেন না—দেশত্যাগী হইবে।

মাক্সিম্ সায়াহ্নে ভিগ্‌নরীকে জানাইল, ছিন্নহস্ত সম্বন্ধে পুলিস অনুসন্ধান আরম্ভ হইয়াছে! পরে দুই বন্ধু মিলিয়া রঙ্গালয়ে অভিনয়-দর্শনে গেল। রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় ভিগ্‌নরী গৃহে আসিয়া রবার্টের এক পত্র পাইলেন; লেখা ছিল, সে সেই রাত্রেই দেশত্যাগ করিয়া চলিল।]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ভরজারসের ব্যাঙ্ক্ প্রত্যহ দশটার সময় খোলা হয়। এক মিনিট এদিক্ ওদিক্ হইবার যো নাই। জুলস্ ভিগ্‌নরী প্রত্যই নিরূপিত সময়ের বহুপূর্ব্বে আফিসে আসিয়া থাকেন। আজ আরও পূর্ব্বে তিনি আফিসে আসিয়াছিলেন। সমস্ত রাত্রি ভাল নিদ্রা হয় নাই। মনটা নানাকারণেই বিচলিত হওয়ায় বেলা না হইতেই আফিসে আসিয়াছিলেন। দশটার সময় কর্ণেল বোরিসফ্ ব্যাঙ্কে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাহিরের দরজার কাছে তিনি শুধু জর্জ্জেট্‌কে দেখিতে পাইয়া বিস্মিতভাবে বলিলেন, "কি আশ্চর্য্য, এখনও কেহ আসে নাই? কেরাণীরা কখন আসে?"

"এখনই সকলে আসিয়া পড়িবে। একজন বোধ হয় আফিস ঘরে আছেন। দরজায় ঘা দিন্ না।"

কর্ণেল্ বোরিসফ্ দরজার কাছে দাঁড়াইয়া করাঘাত করিতে লাগিলেন।—দরজার পার্শ্বে এক ব্যক্তি আসিয়া দাঁড়াইল। তাঁহার মুখমণ্ডল কি বিবর্ণ।

"আমি কর্ণেল্ বোরিসফ্। বোধ হয় মসিয়ে ভরজারস্ আপনাকে বলিয়া থাকিবেন যে, আজ দশটার সময় আমি—"

"টাকা লইতে আসিবেন।—আজ্ঞা হাঁ মহাশয়! সে কথা আমি জানি। কিন্তু আপনাকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইবে।" ভিগ্‌নরীর কণ্ঠস্বর কম্পিত হইল।

বিরক্তিপূর্ণস্বরে বোরিসফ্ বলিলেন, "ব্যাপার কি, মহাশয়?"

"লোহার সিন্দুকটা খোলা পড়িয়া রহিয়াছে! গতকল্য বৈকালে আমি নিজে চাবী দিয়া গিয়াছি।—রাত্রিতে কেহই আসে নাই।—টাকাগুলি আমি এখনও গণিয়া দেখি নাই। আমার আশঙ্কা হইতেছে;—হয় ত টাকা চুরী গিয়াছে।"

"আপনি টাকা গণিয়া দেখুন আমি কিন্তু বেশীক্ষণ অপেক্ষা করিতে পারিব না।"

"মঁসিয়ে ভরজারস্‌কে সংবাদ দিতে হইবে। কারণ, ঘটনা যেরূপ গুরুতর, তাহাতে তাঁহার অসাক্ষাতে কিছু করিতে পারিব না!"

"তাঁহাকে খবর দিন।—আমার সময় বড় অল্প।—শীঘ্র কাজ শেষ করুন্।"

ভিগ্‌নরী ডাকিল, "জর্জ্জেট্!"

বালক নিকটেই ছিল। সে বলিল,—"হুজুর, হাজির!"

"বাহিরের দরজা বন্ধ করিয়া দাও। কর্ত্তার কাছে দৌড়িয়া গিয়া বল, আফিস ঘরে তাঁহাকে এখনই আসিতে হইবে। বড়ই গুরুতর প্রয়োজন।"

"যে আজ্ঞা।"

"তারপর বাহিরে গিয়া দাঁড়াইয়া থাক।—সকলকে বলিবে, বেলা এগারটার আগে আজ আফিস্ খুলিবে না।"

"যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে,—কেন?"

"তোমার যা খুসী তাই ব'লো।"

বালক দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া মনিবকে সংবাদ দিতে দৌড়িল।

বোরিসফ্ বলিলেন,—"এত সতর্কতা কেন, মহাশয় ?"

"যদি চুরীই হইয়া থাকে, সমগ্র প্যারী নগরীতে তাহা ঘোষণা করিবার কোনও প্রয়োজন নাই।"

"আপনি ভাব্‌ছেন—মসিয়ে ভর্‌জার্‌সের দুর্নাম হইবে? দুই চারি হাজার টাকা চুরী গেলে তাঁহার কোন ক্ষতিই হইবে না।"

"তা' নয় মহাশয়; সিন্দুকে কাল ত্রিশ লক্ষ টাকা মজুত ছিল, বুঝেছেন ?"

"ত্রিশ লক্ষ! হাঁ, কাল মসিয়ে ভর্‌জারস্ ব'লেছিলেন বটে! উঃ! এত টাকা যদি চুরী গিয়ে থাকে, তা হ'লে বিলক্ষণ আশঙ্কার কথা বটে!—সব টাকাই কি চুরী গিয়াছে ?"

"তা এখন ঠিক বলিতে পারিনা। বোধ হয় সব যায় নাই। কর্ত্তা এলেই টাকা গণিয়া দেখিব।'

মসিয়ে ভর্‌জারস্ সেই মুহূর্ত্তেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

"নমস্কার, কর্ণেল! আমার খাতাঞ্জি আমায় ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন,—ব্যাপার কি ?"

ভিগ্‌নরী বলিলেন, "বড়ই দুঃসংবাদ!"

"সিন্দুক সম্বন্ধে না কি? চল, দেখি! কর্ণেল্, আপনিও আসুন।"

সকলে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ভিগ্‌নরী বলিলেন, "আমি আফিসে আসিয়াই ঠিক এই ভাবে দেখিতে পাইয়াছিলাম। কোনও দ্রব্য আমি স্পর্শ করি নাই।"

"অসম্ভব! আর একটা চাবী আমার কাছে আছে। তা ছাড়া অন্য কাহারও নিকট চাবী নাই। তবে সিন্দুক কিরূপে খোলা হইল ?"

"আমার চাবী আমার কাছেই আছে, এই দেখুন।"

"আর আমার চাবীও, এই দেখ, রহিয়াছে!"

বোরিসফ্ বলিলেন, "কিন্তু সিন্দুকের গায়ে আর একটা চাবী রহিয়াছে!"

"সত্যই ত! কি অসম্ভব ব্যাপার! কিন্তু মোহরের তোড়া তো রহিয়াছে, দেখিতেছি। তবে চোরে কি চুরী করিল? ভিগ্‌নরী, নোটের তাড়া কোথায় রাখিয়াছ ?"

"এই যে, এইখানেই আছে।"

"সর্ব্বসমেত কত টাকা কাল সিন্দুকে ছিল ?"

"ত্রিশ লক্ষ ছষট্টি হাজার উননব্বই টাকা।"

"গণিয়া দেখ।"

গণনাশেষে ভিগ্‌নরী বলিলেন, "নোটগুলা সমস্তই আছে, দেখিতেছি।"

"ভগবান্ রক্ষা করিয়াছেন! এত টাকা চুরী গেলে আমার সর্ব্বনাশ হইত! এখন বাকী টাকা সব গণিয়া দেখ।"

ভিগ্‌নরী গণিয়া দেখিয়া বলিলেন, "সবই ঠিক আছে, কেবল –"

মসিয়ে ভর্‌জারস্ সেই মুহূর্ত্তেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

"কেবল কি ?—"

"একটা বিল্ আজ সকালে শোধ করিয়া দিব বলিয়া পঞ্চাশ হাজার টাকার নোট আমি পৃথক করিয়া রাখিয়াছিলাম, সেই নোটের তাড়া পাওয়া যাইতেছে না !"

বোরিসফ্ বলিলেন, "বিচিত্র চোর বটে ! এত টাকা থাকিতে সে সামান্য অর্থ লইয়াই সন্তুষ্ট হইল !"

ভর্জারস্ বলিলেন, "বিস্ময়কর ব্যাপার বটে ! যা'ক্,—আমার এ ক্ষতি সামান্য,—এখন আপনার টাকা আপনি লইতে পারেন, কর্ণেল্। আপনার সময় বড় অল্প। যত টাকা আপনার দরকার, খাতাঞ্চীকে বলুন,—দিবে; আর গহনার বাক্সটাও—"

ভিগ্‌নরী সবিস্ময়ে বলিলেন, "গহনার বাক্স ?"

"হাঁ,—সিন্দুক হইতে বাহির করিয়া দাও।"

যুবক রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "কই, বাক্সটা ত দেখিতেছি না !"

"সে কি ? গহনার বাক্স কে লইবে ? ভাল করিয়া খুঁজিয়া দেখ, রাশি রাশি টাকা ছাড়িয়া সামান্য একটা গহনার বাক্স কাহার প্রয়োজনে লাগিবে ?"

"তা জানি না, মহাশয়,কিন্তু বাক্স ত দেখিতে পাইতেছি না !"

কর্ণেল্ বলিলেন, "এতক্ষণে ব্যাপারটা বোঝা গেল !"

ভর্জারস্ বলিলেন, "কি মহাশয় ?—খুলিয়া বলুন্ !"

কর্ণেলের মুখমণ্ডল বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল, তিনি কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া বলিলেন, "আপনি কেন সতর্ক হন নাই !—কিন্তু এখন সে তর্ক বৃথা। এখন আমার অনুরোধ—"

"বাক্সের মধ্যে কত টাকা মূল্যের অলঙ্কারাদি ছিল, আমায় বলুন,—আমি ক্ষতিপূরণ করিব। আপনি যাহা বলিবেন, সেই মূল্যই দিব।"

"ধন্যবাদ ! কিন্তু আমার যে অমূল্য দ্রব্য হারাইয়াছে, তাহার মূল্য আপনি দিতে পারিবেন না! উহার মধ্যে বহুমূল্য দলীলাদি ছিল।"

"আমি এখনই পুলিসে সংবাদ দিতেছি! চোর নিশ্চয়ই ধরা পড়িবে। সম্ভবতঃ বদ্‌মাস্ চোর অপর কাহারও নিকট দলীল্ বেচিবার চেষ্টা করিবে, তখন পুলিস তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে পারিবে !"

"ধন্যবাদ, মসিয়ে ভর্জারস্, আপনার উদারতা প্রশংসনীয়; কিন্তু তাহাতে আমার কাগজ ফিরিয়া পাইবার সম্ভাবনা নাই! আমরা যথেষ্ট অর্থ আছে, আর্থিক ক্ষতি আমি অনায়াসে সহ্য করিতে পারিব; আপনার নিকট আমার কিছুই দাবী নাই;—করিবও না। শুধু আমার এইটুকু অনুরোধ, পুলিসকে এর ভিতরে জড়াইবেন না।"

"সে কি মহাশয়!—চোর নির্ব্বিবাদে চুরী করিয়া পলাইয়া যাইবে, তাহাকে ধরিবার চেষ্টা করিব না ?"

"চোর ধরিতেই হইবে,—কিন্তু সমগ্র য়ুরোপ ও প্যারী নগরীর লোককে এই চুরীর বিষয় জানাইবার কোনও প্রয়োজন নাই! পুলিসে সংবাদ দিলে, আমায় জবানবন্দী দিতে হইবে,—তাহা হইলে আমাদের রাজদূতও এ কথা শুনিবেন;—তাহাতে আমি রাজী নই! আমি নিজেই চোর ধরিবার চেষ্টা করিব। আর মহাশয় যদি আমায় সাহায্য করেন, তাহা হইলে ভালই হয়।—দু'জনে গোপনে চোর ধরিবার ব্যবস্থা করা যাইবে।"

"সে কি রকম ?'

"প্রথমতঃ—এই চুরীর উদ্দেশ্যটা কি, জানা দরকার। আমাদের পরিচিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে কাহার স্বার্থ এই চুরী ব্যাপারে বিজড়িত! সাধারণ চোর হইলে, সে আমার বাক্সটি না লইয়া আপনার অর্থরাশিই অপহরণ করিত—বুঝিয়াছেন ?"

"চোর ত আমারও পঞ্চাশ হাজার টাকা লইয়া গিয়াছে !"

"সে কিছুই নয়! সম্ভবতঃ চোরের দূরদেশে পঁহুছিবার অর্থাভাব হইয়াছিল,—তাই সে টাকাটা লইয়াছে। সেইখানে গিয়াই সে কাগজগুলা সম্বন্ধে বিলিব্যবস্থা করিবে !"

"ওঃ বুঝিয়াছি !"

কর্ণেল্ বলিলেন, "আমার অনেক শত্রু।—দায়িত্বপূর্ণ কাজ যাঁহারা করেন, তাঁহাদের শত্রুর সংখ্যা অধিকই হয়। আমাদের গবর্ণমেণ্টের কোনও গোপনীয় দৌত্যভার লইয়া আমি এখানে আসিয়াছি।—আমার বিশ্বাস, আমারই ক্ষতি করিবার জন্য এই চুরী সংঘটিত হইয়াছে। ভাল কথা,—আমার কাগজপত্র আপনার কাছে গচ্ছিত আছে, এ কথা আপনি ছাড়া আর কেহ জানিত ?"

ভরজারস্ বলিলেন, "আমার খাতাঞ্জী এই ইনি, আর সেক্রেটারী—কাল যে যুবকটিকে দেখিয়াছিলেন,—ইঁহারা দু'জনেই কেবল জানিতেন।—আর কেহই জানে না।"

"ঠিক্, মনে প'ড়েছে। কাল যখন বাক্সের কথা হইতেছিল, সেই সময় যুবকটি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল বটে। তাহার মুখও তখন ভয়ানক বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল।"

"আমি সম্প্রতি তাহাকে বলিয়া দিয়াছি যে, এখানে তাহাকে আমি আর রাখিব না।"

"তাহা হইলে সে এখন আপনার এখানে কাজ করে না?"

"আমার বাড়ী ছাড়িয়া সে এখনও কোথাও যায় নাই বটে, কিন্তু দুই চারি দিনের মধ্যে সে চলিয়া যাইবে।"

"তার নামটি কি?"

"রবার্ট কার্নোয়েল্!"

"কার্নোয়েল্! কএক বৎসর পূর্ব্বে সেণ্টপিটার্সবর্গে দণ্ডবিভাগে ঐ নামে এক জন রাজকর্ম্মচারী ছিলেন যে!"

"তিনি এই যুবকের পিতা।—বেচারা সর্ব্বস্বান্ত হইয়া মারা পড়িয়াছেন। কিন্তু আমার বিশ্বাস, রুসিয়ায় তাঁহার অনেক বন্ধুবান্ধব আছে।

"যুবকটির সহিত আমার পরিচয় করাইয়া দিবেন কি?"

"নিশ্চয়ই। আজ সকাল হইতে তাহাকে দেখি নাই।—বোধ হয়, সে বাড়ীতেই আছে। ভিগ্নরী, তুমি তাহাকে একবার ডাকিয়া আন ত।"

"সে বোধ হয় বাড়ীতে নাই।—কাল সে আমায় লিখিয়া জানাইয়াছিল যে, সে প্যারী হইতে চলিয়া যাইতেছে।"

"না,—না,—সে এত শীঘ্র চলিয়া যাইবে কেন? দেখ, সে হয় ত তার ঘরে আছে।"

ভিগ্নরী ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। তারপর বলিলেন,—"সাড়ে দশটা বাজিয়া গিয়াছে। আর বেশীক্ষণ আফিস বন্ধ করিয়া রাখিলে লোকের মনে হয় ত—"

"তা' বটে, কিন্তু এগারটা পর্য্যন্ত আফিস বন্ধ থাকিলে বিশেষ কোনও ক্ষতি হইবে না।—তুমি এখন কার্নোয়েলের খোঁজে যাও।"

ভিগ্নরী চলিয়া গেলেন।

কর্ণেল্ বলিলেন, "আপনার খাতাঞ্জী খুব বিশ্বাসী কি?"

"আমি তাহাকে সর্ব্বস্ব দিয়া বিশ্বাস করিতে পারি। একদিন হয় ত তাহাকে আমার কারবারের অংশী করিয়া লইব।"

"কি রকম লোকের সহিত উনি মেশামিশি করেন?"

"ভিগ্নরী বড় একটা কাহারও সহিত মিশে না; নিজের কাজ লইয়াই সে আছে। তাহার নৈতিক চরিত্রও অতি সৎ ও পবিত্র।"

ভিগ্নরী ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, 'রবার্টকে দেখিতে পাইলাম না!"

"সে বোধ হয় কোথাও বাহির হইয়াছে, এখনই ফিরিয়া আসিবে।"

"না মহাশয়,—সে আর আসিবে না! সে প্যারী ত্যাগ করিয়া গিয়াছে! গতকল্য রাত্রি সাড়ে এগারটার সময় চলিয়া গিয়াছে! দ্বারবান তাহাকে চলিয়া যাইতে দেখিয়াছে। তাহার কাপড় চোপড় সবই প্রায় পড়িয়া রহিয়াছে!"

বোরিসফ্ বলিলেন, "সে পলায়ন করিয়াছে, দেখিতেছি!"

"পাজী, বদমাস!—আমার সর্ব্বনাশ করিয়া পলাইয়াছে! কিন্তু সে এখনও সীমান্ত অতিক্রম করিতে পারে নাই। আমি এখনই তাহার নামে তারযোগে হুলিয়া জারি করিয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করাইব।"

কর্ণেল্ প্রশান্তভাবে বলিলেন, "একটু থামুন, ঠাণ্ডা হউন; পুলিসকে এ ব্যাপারের সংশ্রবে আনিবেন না। বিশেষতঃ আপনার সেক্রেটারীই যে দোষী, তাহার নিশ্চয়তা কি? অনেক সময় আমরা বড় ভুল করিয়া বসি!"

"চুরী হইবার পরই সে পলাইয়াছে শুনিতেছেন, তবু আপনার তাহার প্রতি সন্দেহ হইতেছে না?"

"সেইটা স্থির করাই এখন আবশ্যক। আপনার খাতাঞ্জী এ বিষয়ে কি জানেন?"

"কালরাত্রে আমি যখন সিন্দুক বন্ধ করি তখন টাকাকড়ি সব ঠিক ছিল। খাজনাখানার বাহিরে যে চৌকিদার রাত্রে শুইয়া থাকে, সেও বোধ হয় রাত্রি বারটার সময় ফিরিয়া আসিয়াছিল।"

ভরজারস্ বলিলেন, "রাত্রি বারটার আগে ম্যালিকম্

পাহারায় আসে না? বড়ই অন্যায় কথা! আমি তাহাকে দূর করিয়া দিব। সে আজ বিশ বৎসর আমার কাজ করিতেছে। অবশ্য তাহাকে আমি আদৌ সন্দেহ করি না বটে, কিন্তু কর্ত্তব্যে অবহেলা অমার্জ্জনীয়। ভিগ্নরী তুমিও একথা এতদিন আমায় না জানাইয়া ভাল কর নাই!"

কর্ণেল্ বলিলেন,"এ লোকটা যখন আপনার খুব বিশ্বাসী, তখন সে কাজে আসিবার পূর্ব্বে এবং কেরাণীরা চলিয়া যাইবার পরে এই ঘটনা হইয়াছে।"

"হাঁ, সন্ধ্যা ছয়টা হইতে রাত্রি বারটার মধ্যে! —পাপিষ্ঠ রবার্ট রাত্রি সাড়ে এগারটার সময় চলিয়া গিয়াছে!"

"সেটা অনুমান মাত্র, প্রমাণ নহে। এই ঘরে আসিবার অন্য পথ আছে?"

"আছে বই কি,—চৌকিদারের চাবী যদি চুরী না করিয়া থাকে, তাহা হইলে সে আর একটা চাবী সংগ্রহ করিয়া ঘরের দরজা খুলিয়া থাকিবে।"

"কিন্তু সিন্দুকের চাবী সে কোথায় পাইল?"

মসিয়ে ভরজারস্ চাবীটি লইয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিলেন, উহা নূতন তৈয়ার হইয়াছে। কোথাও আদর্শ না পাইলে ঠিক এমনটি গড়াও যায় না!

বোরিসফ্ বলিলেন, "হয় আপনার, নয় আপনার খাতাঞ্জীর, চাবী দেখিয়া এই চাবীটি প্রস্তুত হইয়া থাকিবে।"

ভিগ্নরী বন্ধুর দোষ ক্ষালণের অবসর খুঁজিতেছিলেন। তিনি তাড়াতাড়ি বলিলেন, "আমি ত কোনও দিন রবার্টকে আমার চাবী দিই নাই।"

"আমিও কখনও দিই নাই; কিন্তু হয় ত আমি কোন সময়ে টেবিলের উপর চাবী ফেলিয়া থাকিব, সেই সুযোগে সে তাহা দেখিয়া লইয়া থাকিবে!

"কিন্তু চাবী না লইয়া গেলে ত আর সেইরূপ একটা তৈয়ার করান যায় না!—আর লইয়া গেলে নিশ্চয় চাবীর খোঁজ পড়িত।—ভাল কথা, সিন্দুক খুলিবার সাঙ্কেতিক শব্দ ছিল না কি?"

"হাঁ,—নিশ্চয়ই আছে।—ভিগ্নরী, তুমি রবার্টকে সাঙ্কেতিক কথাটি কোনও দিন বল নাই ত।"

"না মহাশয়,—তাহা ছাড়া, সম্প্রতি আমি সাঙ্কেতিক কথাটি বদলাইয়াছি; সে কথা কেহই জানে না।"

"আমিও না?—আমায় না জানাইয়া তুমি বদলাইলে কেন?"

"তখন অতটা ভাবিয়া দেখি নাই!"

সিন্দুকের নিকটে আসিয়া ব্যাঙ্কার্ বলিলেন, "কই দেখি?"—অক্ষর পাঁচটি পাশাপাশি তখনও ছিল। এলিসের নাম পড়িয়াই তিনি বলিলেন, এত শব্দ থাকিতে "এ নামটা তুমি মনোনীত করিলে কেন?"

"তা বলিতে পারি না, মহাশয়, তাড়াতাড়ি যা মনে আসিল, তাহাই করিয়া দিলাম।"

"নাম পরিবর্ত্তনের পর—রবার্ট ঘরে আসিয়াছিল?

"না। গতপূর্ব্ব রাত্রিতে আমি বদলাইয়াছি, কাল সকালে সে একবার আমার ঘরে একখানি পত্র লইয়া আসিয়াছিল; কিন্তু বোধ হয় সিন্দুকের কাছে যায় নাই।"

"তুমি নিশ্চিত করিয়া বলিতে পার না?—সিন্দুকের গুপ্ত লৌহহস্ত চোর-গ্রেপ্তার করিতে পারে নাই দেখিতেছি! —রবার্ট এ কৌশল জানিত। আর আমার সন্দেহ নাই!— সে যদি না চুরী করিয়া থাকে, তবে হয় আমি, নয় তুমি চোর!"

ইহার পর আর প্রতিবাদ করিতে ভিগ্নরীর সাহসে কুলাইল না। রবার্টের উপর যদি সন্দেহ না হয়, তাহা হইলে তাঁহার উপরেই পড়িবে।

অবশ্য এতদুভয় হইতে উদ্ধারের একটা পথ ছিল।— ছিন্নহস্তের কথা প্রকাশ করিয়া বলিলে, নাতিপূর্ব্বে যে চুরীর চেষ্টা হইয়াছিল, তাহাও জানান হইত, এবং রবার্টের নির্দ্দোষিতাও সপ্রমাণ হইত। রবার্ট পূর্ব্ব দিন নিয়ত ড্রয়িং রুমে ছিল; কিন্তু রবার্টের উপর সন্দেহ তাহাতেই বা সম্পূর্ণ অপনোদিত হইবে কিরূপে? কারণ নিজে না করিয়া, যদি তাহার সহকারীর দ্বারা চুরীর চেষ্টা করিয়া থাকে এরূপ সন্দেহও ত হইতে পারে! সুতরাং এখন সে কথা বলিয়া লাভ নাই! বিশেষতঃ ম্যাক্সিম্‌কে না জানাইয়া তিনি কোনও কিছু করিতে পারিতেছেন না।

কর্ণেল্ বলিলেন, "এখনই আমার বিশ্বাস হইতেছে যে, রবার্টই অপরাধী। তাহাকে এখন খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে।—পুলিসকে আমি এ বিষয় জানাইতে চাহি না। আমার লোকবল ও অর্থ যথেষ্ট আছে; পুলিস অপেক্ষা
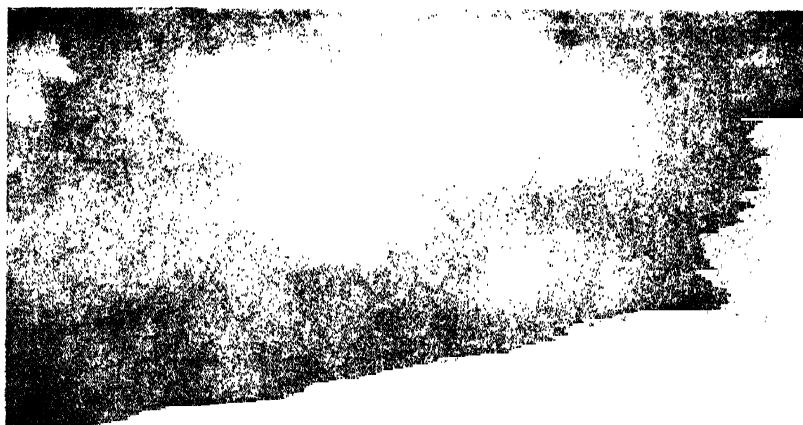
তরঙ্গ-ভঙ্গে।

K. V. Seyne : Bros.

আমি সহজে এ কাজ সম্পন্ন করিতে পারিব। রবার্ট কার্নোয়েল্ কোথায় কোথায় যাইত বলিতে পারেন ?”

“যতদিন আমার বাড়ীতে ছিল ততদিন তাহাকে কোথাও যাইতে দেখি নাই। সর্ব্বদাই সে বাড়ীতে থাকিত। ‘আপনার’ বলিবার তাহার কেহই নাই। বিষয় সম্পত্তিও বিশেষ কিছু নাই। থাকিবার মধ্যে এক পিতৃ-পরিত্যক্ত অট্টালিকাটি মাত্র !”

“সেটা কোথায় বলুন ত ?

“ব্রিটানীতে।—কিন্তু সে বোধ হয় সেখানে যায় নাই। সম্ভবতঃ রাত্রির গাড়ীতে সে লি হ্যাবারে গিয়া জাহাজে চড়িয়া আমেরিকা-যাত্রা করিয়াছে !”

“রুষিয়া ব্যতীত সে যে রাজ্যেই যা’ক্ না কেন, আমি তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবই।”

“আপনার আত্মনির্ভরতা প্রশংসনীয় ; কিন্তু আমার বিশ্বাস, তাহাকে ধরিতে পারিবেন না ! তাহার বিরুদ্ধে আমি কিছু বলিতে চাহি না।—সে অনেক দিন আমার বাড়ীতে ছিল।—তাহার শাস্তি হয়, সেটা আমার ইচ্ছা নয়। এখন আপনার যাহা অভিরুচি তাহাই করুন। সকল ভার আপনার উপরেই দিলাম।”

“বেশ ! যাহাতে লোক-জানাজানি না হয়, এমন ভাবেই আমি কাজ করিব।—কাজ শেষ না হইলে আপনার সহিত আমি দেখা করিব না। এখন আমায় ত্রিশ হাজার টাকা দিন্।”

‘ভিগ্নরী !—এ কথা ঘুণাক্ষরেও যেন প্রকাশ না পায়।—এখন কর্ণেল্কে টাকা দাও।”

মসিয়ে ভর্জারস্ তাড়াতাড়ি কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া কন্যার সন্ধানে গেলেন।—এলিস্ তখন কি লিখিতেছিলেন ; তাঁহার আননে পাণ্ডুর ছায়া, নয়ন আরক্ত।

পিতা স্নেহকোমল কণ্ঠে বলিলেন, “মা তুমি কাঁদিতে-ছিলে ? কি হ’য়েছে ?”

“কাল থেকে কোনও কাজেই আমার মন লাগিতেছে না! তোমার জন্যই আমার এই দুঃখ !”

পিতা চমকিয়া উঠিলেন ! এলিস্ যে তাঁহার নিকট স্বীয় মনেরভাব গোপন করিল না, ইহাতে তিনি বিস্মিতহইলেন। তিনি এখন যে কথা বলিতে আসিয়ায়াছিলেন, তাহা শুনিয়া কন্যার মনে কতদূর কষ্ট হইবে, তাহা কতকটা তিনি অনু-মানও করিলেন।

“আমি তোমায় সদুপদেশ দিয়াছিলাম বলিয়াই তুমি আমার উপর রাগ করিয়াছ ! এ বিবাহ যদি হইত, তাহা হইলে জীবনে কেবল অশান্তি ভোগ করিতে ! আমার কথা শুনিলে বুঝিতে পারিবে, মসিয়ে কার্নোয়েলের সঙ্গে তোমার বিবাহ অসম্ভব !—আর তাহাও শুধু তাহারই দোষে।”

এলিস্ কোন উত্তর করিল না।—পিতার দৃষ্টি টেবিলের উপর অৰ্দ্ধসমাপ্ত পত্রখানির উপর পড়িল। তিনি বলিলেন “কাহাকে পত্র লিখিতেছ ?”

“রবার্টকে।” তাহার কথায় কোন সঙ্কোচ অথবা কুণ্ঠার লক্ষণ প্রকাশ পাইল না।

“কি ! তাকে তুমি চিঠি লিখ্ছ ?”

“তোমার নিকট লুকাইবই বা কেন ? আমি তাঁহাকে বিবাহ করিব বলিয়া শপথ করিয়াছি।—সে শপথ আমি ভাঙ্গিব না। বাগ্দত্ত স্বামীকে আমি অনায়াসে পত্র লিখিতে পারি।”

“আমার বিনা অনুমতিতে তুমি তাহাকে বাগ্দান করিয়াছ ? আমার অসম্মতিসত্তেও কি তুমি তাহাকে বিবাহ করিতে পার ?—তুমি পাগল ! তুমি জান না, দেশের আইন অনুসারে নাবালিকা কন্যা পিতার সম্মতিব্যতীত কাহাকেও বিবাহ করিতে পারে না ! আমি—তোমায় সম্মতি দিব না ,—শুনিতেছ ?”

“আচ্ছা, তাহা হইলে অগত্যা আমি অপেক্ষা করিব।”

ক্রোধে বৃদ্ধের আনন আরক্ত হইয়া উঠিল। চীৎকার করিয়া তিনি বলিলেন, “বটে,—এতদূর ! সাবালিকা হইয়া তুমি তাহাকে বিবাহ করিবে, ঠিক করিয়াছ ? আমাকেও তুমি গ্রাহ্য কর না ? তবে শাস্তি গ্রহণ কর। তোমার প্রণয়াস্পদ কি করিয়াছে জান ?—চুরী করিয়াছ।”

“মিথ্যা কথা !”

“না, সত্যই চুরী করিয়াছে। কাল আমি তাহাকে এ বাড়ী হইতে অন্যত্র যাইতে বলিয়াছিলাম। বিদেশে চাকরী দিতে চাহিয়াছিলাম, কিন্তু সে তাহা লয় নাই।”

“তিনি ঠিক কাজই করিয়াছেন।”

"আগে আমায় বলিতে দাও, তার পর তাহার জন্য ওকালতি করিও।—সে আমার সাহায্য গ্রহণে অসম্মত হইয়া সগর্ব্বে চলিয়া গিয়াছিল। তার পর আর আমি তাহাকে দেখি নাই। কিন্তু রাত্রিকালে সে ফিরিয়া আসিয়া অন্য চাবী দিয়া সিন্দুক খুলিয়াছিল। আমার পঞ্চাশ হাজার টাকা ও কর্ণেল বোরিসফের বাক্স লইয়া সে চলিয়া গিয়াছে?

"তোমার মনে বিশ্বাস হয় নাই যে, তিনি চুরী করিয়াছেন? তবে এই ভয়ঙ্কর অপরাধ তাঁহার স্কন্ধে পড়িয়াছে তাই বলিতেছ? তাঁহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা কর না, তিনি অনায়াসেই নিজের নির্দ্দোষতা সপ্রমাণ করিবেন।"

"সে পলাইয়াছে—চোরের ন্যায় পলায়ন করিয়াছে। এতক্ষণ সে সীমান্ত পার হইয়া গিয়াছে! ভালই হইয়াছে। পাষণ্ড বদমায়েস গিয়াছে, আমিও বাঁচিয়াছি। সে যেন আর কখনও এ দেশে না ফিরিয়া আসে। যদি আসে, তখন তুমি তাহাকে বিবাহ করিও। আমি বাধা দিব না, তাহাকে গ্রেপ্তারও করিব না।"

নৈরাশ্যপীড়িত হৃদয়ে এলিস্ বলিলেন, "এঁ্যা! চ'লে গেছেন!—কেন গেলেন? না জানাইয়াই চ'লে গেলেন! একবার আমার কাছে বিদায়ও লইলেন না।"

"যুবতী পিতার ক্রোড়ে মুখ লুকাইয়া আবেগে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িলেন।"

যুবতী পিতার ক্রোড়ে মুখ লুকাইয়া আবেগে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িলেন।

মহামিলন।

এই যে বিশ্ব বাঁধিয়াছে রূপ,
আলোক আঁধারে বাঁধা,—
দু'য়ে মিলি এক! বিচ্ছেদ হীন
রূপ ও বিশ্বে গাঁথা।
মধু সুমিষ্ট মধুরতা রসে,
মধু মধুরতা এক
শব্দ উঠিয়া প্রতিধ্বনিরে
কাতরে দেয় সে ডাক।

কুসুম আপনি ধরেছে গন্ধ,
গন্ধ কুসুমে ল'য়ে
স্পর্শ শরীরে জাগায় চেতনা,
দু'য়ে মিলি এক হ'য়ে।
জীবন টানিছে মৃত্যুরে সদা,
মৃত্যুর সহ প্রাণ,
তুমি আমি তবে কেননা মিলিব,
কেন মাঝে ব্যবধান?

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

দেশী-বিদেশী শব্দের উচ্চারণ।

আজ আমি বিদ্বজ্জন সমক্ষে কতকগুলি সচরাচর প্রচলিত সাধারণ শব্দের উচ্চারণ লইয়া কএকটি কথা বলিব।

আপনাদের মধ্যে অনেকে হয়ত মনে করিতেছেন, আমি 'জ্যোছনা,' 'মুখানি' 'প্লাবন' সম্বন্ধে—অথবা হাল 'ফেসিয়ানের' দীর্ঘ ঈকার গ্রস্ত 'ক' অর্থাৎ 'কী,' কিংবা 'কতো' 'মতো'র 'তো' সম্বন্ধে—কোন কূট বৈয়াকরণিক তত্ত্ব উপস্থাপিত করিব;—সমাশ্বসিত হউন আমি সে দিক্ দিয়া যাইব না।

বঙ্গভাষায় তালব্য 'শ,' মূর্দ্ধণ্য 'ষ,' দন্ত্য 'স', ও মূর্দ্ধণ্য 'ণ,' দন্ত্য 'ন,' ও বর্গীয় 'জ,' অন্তঃস্থ 'য,' ও দুই দুইটা 'ব,' এবং হ্রস্ব 'ই'কার, দীর্ঘ 'ঈকার, হ্রস্ব 'উ'কার, দীর্ঘ 'ঊ'কার যুক্ত শব্দমধ্যে (ঙ ঞ, ডবল ঋ ৯ না হয় ছাড়িয়া দেওয়া যা'ক্) উচ্চারণ তারতম্য দেখিতে পাওয়া যায় না;—লিখিবার সময়ে প্রচলিত বানানে ভুল না হইলেই হইল! কিন্তু ইদানীং যেরূপ হাওয়া বহিতেছে তাহাতে মনে হয়, প্রথিতযশা বাঙ্গালী লেখক কাহারও কাহারও মতে ঐ সকল বর্ণ এবং 'ই'কার 'উ'কার লইয়া বানানের দিকে তত সূক্ষ্ম দৃষ্টি না রাখিলেও চলে। বাক্যের ধ্বনি-নিনাদের দিকে নজর রাখাই উদ্দেশ্য দাঁড়াইতেছে। *

ইতঃপূর্ব্বে আমাদের সাহিত্যগুরুগণের সময়ে রীতি পদ্ধতি ছিল ভিন্নরূপ, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দিতে চেষ্টা করিব।

রায় সাহেব যোগেশ চন্দ্র রায় বিদ্যানিধি যে কারণে বানান সংস্কার, প্রচলিত অক্ষরের রূপান্তর ও নূতন পদ্ধতিতে যুক্তাক্ষর বিন্যাস করিতে চাহেন, সে একটা বিষম ব্যাপার! * ইহাতে হয়ত "একলিপি-বিস্তার-সমিতি"র কাজ অনেকটা অগ্রসর হইবে। ইউনাইটেড্ ষ্টেটের ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেণ্ট্ রুসভেল্ট সাহেব তাঁহাদের ভাষায় (ভাথায় ?) বুঝি কতকটা সেইরূপ হিসাবে বানান-বিপর্য্যয়ে উদ্যোগী হইয়াছিলেন; উদাম মাঠে মারা গেল। ইংলণ্ডেও যে এরূপ মধ্যে মধ্যে না হইয়াছে এমন নহে, তবে অঙ্কুরেই শুখাইয়া গিয়াছে। য়ুরোপের 'এস্পেরাণ্টো' ভাষার কথা অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন;—সে যাউক্। আমাদের দেশ আমেরিকাও নহে, ইংলণ্ডও নহে, এখানে নেতা ধরণের একজন কেহ নূতন কিছু একটার সূত্র ধরাইয়া দিলেই অমনই তাঁহার শিষ্য-প্রশিষ্য-অনুশিষ্যের দল, বিনা বিচারে অবাধে গড্ডলিকাপ্রবাহবৎ স্রোতে গা ঢালিয়া দেন। বুঝিতেছি নব্যসম্প্রদায়ের কেহ কেহ রুষ্ট হইতেছেন—তাঁহাদের জানাইয়া রাখি, আমিও তাঁহাদেরই 'মতো' একজন। কৈফিয়ৎ হিসাবে আমার মনে হয়,—অমুক যখন বলিতেছেন, তখন সেটা করাই ভাল; কেন না প্রবাদ আছে 'মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ'। আবার তাহার উপর বেশী মনে হয় ৺দ্বিজেন্দ্রলালের সেই উদ্দীপনা—

"একটা নতুন কিছু কর, ভাই, একটা নতুন কিছু কর।"

—তা ছাই হোক্ আর ভস্মই হোক্। থাক্, এখন আসল কথায় আসা যা'ক্। আমার প্রবন্ধটার নাম,—'দেশী বিদেশী শব্দের বাঙ্গালা উচ্চারণ।' এইবার সে সম্বন্ধে সংক্ষেপে দু'চার কথা বলিব।

নম্বর ১।—আমাদের পূর্ব্ববঙ্গীয় ভ্রাতৃগণের নিকট পশ্চিমবঙ্গবাসী আমার কিছু অভিযোগ আছে। বঙ্গভূমি আমাদের উভয়ের জননী,—বাঙ্গালা ভাষা আমাদের উভয়েরই মাতৃভাষা, কিন্তু আমাদের এই এক ভাষায় বহু শব্দের উচ্চারণে

---

* এই হিসাবেই বোধ করি পূর্ব্বের 'একা' 'একলা' 'কোনও' স্থলে, উপস্থিত দেখা যায় 'অ্যাকা' 'অ্যাকলা' 'কোনো' প্রভৃতি। 'মরাঠি' 'ওড়িয়া' 'ওড়িশা' নূতন মূর্ত্তিতে দেখা দিতেছে! 'কী', 'বেস' 'বেসী' আবির্ভূত হইতেছে।' আমরা—কালো, ভালো, জড়ো, নড়ো, আরো, বলো, দাঁড়ানো, ওড়ানো পাইতেছি; আবার দ্যান, দ্যায়, অ্যালান, হ্যাকে, ফ্যালে, বাংলা, এগ্নি, ডাঙা, ভাঙা, আঙুল, ডিঙানো, য়ুরোপ, যুহুদি প্রভৃতি দেখিতেছি। কথোপকথনের ভাষায় এরূপ থাকিলে 'আলালী ভাষা'র অন্তর্ভূত করা চলিত কিন্তু বিচক্ষণ লোকের গম্ভীর প্রবন্ধ হইতে এগুলি সংগৃহীত;- হুলালী ভাষা বলা চলিবে কি?

* ধম কায আশ্চয চচ। বতমান দ্রব্য নিমাণ বধিত ক্রিয়া কিন্তু রূপ ক্রমশ গুলা বাহুল্য শুনি—স্থাপনা বাংগলা গঙ্‌গা উদ্‌ধার গ্রন্‌থ ব্রাহ্‌মণ আশঙ্‌কা বিভক্‌তি সম্বন্‌ধ রক্ত—ইত্যাদি।

(প্রেসে নব্যমূর্ত্তির যুক্তাক্ষর টাইপ মেলা দুর্ঘট সুতরাং সকল স্থলে প্রস্তাবিত রূপ দেখান চলিল না। ক্ত, ক্ষ ক্ক প্রভৃতির আকার একদম বদলাইয়াছেন। পণ্ডিতবর স্থলে স্থলে মামুলী রূপও চালাইতে রাজি, যথা—পক্ক, ভক্ত, জ্ঞান, রক্ষি বস্তুতঃ চট্টগ্রাম।

'কতো' পার্থক্য—'কী' বৈসাদৃশ্য! আমরা উভয়েই বাঙ্গালী, কিন্তু শব্দ উচ্চারণের ফেরে 'বাঙ্গাল' কথাটা গালির সামিল হইয়া পড়িয়াছে।

স্বীকার করি, দেশভেদে উচ্চারণের তারতম্য হইয়া থাকে, এবং নগর ও পল্লীগ্রামের উচ্চারণে তফাৎ অনিবার্য্য; অপিচ, লিখিবার ভাষায় ও কথোপকথনের ভাষায় প্রভেদ অবশ্যম্ভাবী। এ সমস্ত মানিলেও সচরাচর ব্যবহৃত কথায় পূর্ব্বপশ্চিমে উচ্চারণ বৈষম্যের দৌড় দেখিয়া বিস্মিত না হইয়া থাকা যায় না! অনেক সময় ইহা লইয়া হাস্যরসের এবং সঙ্গে সঙ্গে রৌদ্ররসেরও আবির্ভাব লক্ষিত হয়।

'সধবার একাদশী'তে রামমাণিক্যের 'ভালা হয়ার বল্লক বৃত্ত'ত কাল্পনিক কথা নহে। আপনাদের 'কান্ত কবি' তাঁহার

'বাজার হুধ্‌ধা কিনে আইনে ঢাইলে দিছি পায়'

গানটিতে আমার কথাই সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। 'মনসার ভাসানে' কবি কেতকাদাস 'হুড়ুর বাপৈ বাপৈ'র লোভ-সংবরণ করিতে পারেন নাই। চারিশত বর্ষ পূর্ব্বের কবিশ্রেষ্ঠ কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম—

'অল্‌দিগুরা হুক্ত পাত হিদোল হিক্কই।
মজাইল হর্ব দন কামনে কুলোই॥'

গায়িয়া পূর্ব্ববঙ্গীয় উচ্চারণের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিয়াছেন। তৎপূর্ব্ববর্ত্তী স্বয়ং শ্রীগৌরাঙ্গদেব বাঙ্গালিয়া 'হয় হয়' বুলীতে 'ঢোল' করিতে ভাল বাসিতেন। আমরা 'চৈতন্য-ভাগবতে' দেখিতে দেখিতে পাই—

'বিশেষ চালেন প্রভু দেখি শ্রীহট্টিয়া।
কদর্থেন সেই মত বচন বলিয়া॥'*

অন্য পরে কা কথা?

গ্রাম্য ভাষা, স্ত্রীসাধারণ বা নিরক্ষর লোকের উচ্চারণ আমরা ছাড়িয়া দিতে পারি, কিন্তু শিক্ষিত - উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত লোকের ভিতরও উচ্চারণের দারুণ বিকৃতি কেন? মনে আছে, আমরা যখন কলেজে পড়িতাম, আমাদের মহা-পণ্ডিত অধ্যাপক দুইজন ছিলেন পূর্ব্ববঙ্গের লোক; ভুলিয়াও তাঁহারা আমাদের সহিত বাঙ্গালা ভাষায় আলাপ করিতেন না; যদি কদাচ কখনও অনবধানবশতঃ মা বঙ্গ-সরস্বতী তাঁহাদের বদন-কমল হইতে এক-আধবার উঁকি মারিতেন, তখন অবস্থা শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইত!

যাহা হউক, জানিতে ইচ্ছা হয়, আমাদের পূর্ব্ববঙ্গবাসী ভ্রাতৃগণ! আপনারা আপন ভাষায় 'শ' 'স' স্থলে 'হ' (হোদন, হাবুন), 'ক' 'খ' স্থলে 'হ' (থাহেন, ঠাহে, কহন থ্যাহো), 'হ' স্থলে 'অ' (অইবে, অইল, অল্‌দিগুরা), এবং 'ভ' স্থলে 'ব' (বালো, বক্কোন, বদ্র), প্রায়শঃ বর্গের চতুর্থ বর্ণস্থলে তৃতীয় বর্ণ (বাই, ডাহা, দেনো, গুরাই, বোজ্‌লাম), দ্বিতীয় বর্ণস্থলে প্রথম বর্ণ (অকাণ্ঠ, তুপান), 'ট' স্থলে 'ড' (এডা, মনডা), আদেশ করেন কি হিসাবে? অকার, একার, ওকার উচ্চারণে 'উদোর বোঝা বুধোর ঘাড়ে' চাপানইবা কেন? (ওলোক্কার, মাষ্টের, ব্যাতন, বতোল, ক্যাবোল, ব্যাশকোম, ক্যান) প্রভৃতি তাহার প্রমাণ। একার আপনাদের কাছে সব স্থলেই বোধ হয় 'অ্যা'।*—তবু 'আষ্ট' 'লগে' 'মদ্দাগোর' 'নি' 'হুক্‌না' প্রভৃতি উহ্য রাখিলাম। ক্রিয়াপদ (কি সমাপিকা কি অসমাপিকা) উচ্চারণ অনেক স্থলে আকাশ-পাতাল প্রভেদ;—আমরা বলি, 'যাবে' 'খাবে'; আপনারা বলেন, 'যাবা' 'খাবা'; 'পারমু' 'খাইমু' 'করা' 'বসা,' 'আইনে' 'ঢাইলে'র ত অন্ত নাই।

বর্ণ বিপর্য্যয়ের রকম দেখিয়া এক এক বার একটা কথা মনে হয়। আমাদের দেশের স্ত্রীলোকে স্বামী-সম্পর্কিত গুরু জনের নাম গ্রহণ করে না; আমার জনৈক অাত্মীয়া—তাঁহার কোন গুরুজনের নাম বরদা বাবু, তিনি নাম ধরিতে পারেন না, তাঁহার নাম বলিতে হইলে বলেন 'ফরদা বাবু'! পূর্ব্ববঙ্গ-বাসী ভ্রাতৃগণ, আপনাদের শব্দ-উচ্চারণের মূলে এমন কোন গুপ্ত রহস্য নিহিত নাই ত? অথবা প্রাচীন ইরাণীগণ 'স' স্থানেই 'হ' উচ্চারণ করিতেন (সপ্তসিন্ধু—হপ্তহিন্দু দাঁড়াইত), সংস্কৃত 'স' জেন্দ ভাষায় 'হ' (যথা অসুর—অহুর), আপনার কতক উচ্চারণে তাঁহাদেরই বা অনুকারী। পালি ভাষায় ফের কতক কতক আপনাদের উচ্চারণে রহিয়া গিয়াছে বা

* শ্রীহট্ট অধুনা বঙ্গচ্যুত।—অবশ্য বাহিরে, অন্তরে নহে।

* অগত্যা 'অ্যা' ব্যবহার করিতে হইতেছে, তবে নজীর আছে; কিন্তু 'অ' স্বরবর্ণ—ইহার উপর য-ফলা আকার চলে ত? চালাইলেই চলে। উচ্চারণ-সমস্যার উপর আর ব্যাকরণ-বিভীষিকা আনিয়া ফেলিব না।

(প্রাকৃতে 'মুকুল' স্থলে 'মুউল', 'মুখ' স্থলে 'মুহ' দৃষ্ট হয়)। এমন অনেক কথা—অনেক বিকৃতি—উচ্চারণ-বৈষম্য দেখাইতে পারা যায়, কিন্তু তৎসমুদয় প্রায় সকলেই অবগত আছেন, সুতরাং বৃথা সময় নষ্ট করিব না।

তবে, এই সঙ্গে আর একটা কথা বলিয়া লই :— পূর্ব্ববঙ্গবাসী ভ্রাতৃগণ একটা উচ্চারণে আমাদের অপেক্ষা ব্যঞ্জনবর্ণে ধনী। পশ্চিমবঙ্গে ইংরেজি Z উচ্চারণ করিবার কিছু নাই।* স্বর্গীয় যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় কোথাও কোথাও Z উচ্চারণস্থলে 'ছ' ব্যবহার করিয়া বোধ হয়, সেই খেদ মিটাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন (যথা—'ফিনোফন) কিন্তু তাহা স্থায়ী হইল না! পূর্ব্ববঙ্গে 'জ' ও 'য'র উচ্চারণ Zর ন্যায়, সুতরাং আমাদের প্রতিবাসিগণের সে অভাব নাই ; † কিন্তু তেমনই তাঁহারা আমাদের চন্দ্রবিন্দুকে ধলেশ্বরীতে বিসর্জ্জন দিয়াছেন (পাচ, কাচা, চাদ) এবং আমাদের 'ড়' 'ঢ়' তাঁহাদের 'র' এর ভিতর নিমজ্জিত (বারী, রারী, বোরো)। শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের লেখায় 'গুর' 'খিচুরী' 'ধরান্ ধরাস্' 'ঝারি' 'বশি' দেখিয়াছি।

এই 'ভাই ভাই এক ঠাঁই, ভেদ নাই ভেদ নাই,' মহামন্ত্রের দিনে আমাদের ভিতর কথিত ভাষায় আর 'এতো' পার্থক্য 'এতো' ভেদ থাকে কেন?

ভরসা করি কেহ মনে করিবেন না, আমাদের মতে পশ্চিম বঙ্গবাসিগণের উচ্চারণ সর্ব্বাঙ্গীন সুষ্ঠু। কথিত ভাষায় ক্রিয়াপদ প্রয়োগে রাঢ়দেশে অত্যাচার কম নহে। মধ্য রাঢ়ের 'ককনি' উচ্চারণেও সময়ে সময়ে নিয়মের ধারা খুঁজিয়া মেলা ভার! আমাদের 'হর' ও 'হরি' শব্দের আদ্য অক্ষর, 'টা' 'ও টি' যুক্ত 'এক' শব্দের 'এ' বর্ণও 'দেখাদেখি' শব্দে দুটা 'দে' র উচ্চারণের প্রতি দৃষ্টি রাখিলেই বৈলক্ষণ্য বুঝা যাইবে। গণ্যমান্য কাহাকেও কাহাকেও 'আসিল' 'আসিলেন' স্থলে 'আইল' 'আইলেন' লিখিতে দেখা যায়। এগুলো বোধ হয় প্রাদেশিকতা বলিয়া ধরিতে হয়। আমরা ভদ্রলোকের মুখেও কখন কখন 'লালিশ্' 'লুটিস্' শুনিতে পাই ;—এ সকলকে গ্রাম্য ভাষার ভিতরই ফেলিতে হয়। এ সব কথা আজ এই পর্য্যন্ত।

আমাদের দ্বিতীয় নালিস গুরুস্থানীয় সম্মানার্হ—অধুনা পুণ্যলোকপ্রাপ্ত—সাহিত্যরথবৃন্দের উদ্দেশে :—আমাদের এই বঙ্গভাষায় বিদেশী শব্দের উচ্চারণে—উচ্চারণে না হউক লিখনে, অর্থাৎ কথিত ভাষায় না হউক, লিখিত ভাষায়, যথেষ্ট যথেচ্ছাচার পরিলক্ষিত হয়। সাহিত্য-সংসারে সুপরিচিত বিশিষ্ট ব্যক্তির লেখা হইতে উদাহরণ দেখাইতেছি, সর্ব্বনাম শব্দে—বিদেশী নাম উচ্চারণে—অন্ততঃ বানানে—বড়ই গোলযোগ দৃষ্ট হয়। অনেক সময়ে বিদেশী নাম তদ্দেশীয় লোকের মুখে কিংবা তদ্দেশের ভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট না শুনিলে প্রকৃত উচ্চারণ জানিতে পারা যায় না। সুতরাং বৈলক্ষণ্য ঘটে ; কিন্তু আমাদের দেশে আমাদের প্রাচীন সাহিত্য-গুরু সুশিক্ষিত অনেকে অকারণ উচ্চারণ বিকৃতি বিষয়ে সাহায্য করেন বলিয়া মনে হয়।

C-o-l-q-u-h-o-u-n নামটার উচ্চারণ শুনিতে পাই শুধু 'কহন'; M-c-L-e-o-d নামটা উচ্চারিত হয় নাকি 'ম্যাকলাউড'; B-e-t-h-u-n-e নামের উচ্চারণ 'বীটন্' ; এই সাহেবের নামে প্রতিষ্ঠিত কলিকাতার মেয়েস্কুলের নাম 'বীট্‌ন্ কলেজ',—'বেথুন কলেজ' নহে। ইংরেজিতে S-o-u-t-h-e-y কবির নামের উচ্চারণ 'সদি' ; S-a-l-i-s-b-u-ry উচ্চারিত হয় 'সল্‌স্‌বেরি' ; অনেকে ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রীকে 'মার্ক্‌ইস্ অফ্ সালিসবরী' বলিতেন, সেটা ভুল। W-o-r-c-e-s-t-e-r Shireর উচ্চারণ 'উষ্টার সায়র' ; C-a-n-t-o-n-m-e-n-tকে বলিতে হয় 'ক্যাণ্টুনমেণ্ট্'—(উকার যুক্ত) ; এ সকল উচ্চারণ ঠিক কয় জন বাঙ্গালী করিয়া থাকেন? এ গুলা উচ্চারণ বৈচিত্র্যের নিদর্শন সন্দেহ নাই। Q-u-i-n-i-n-e ঔষধটার উচ্চারণ 'কুইনাইন্' আমাদের চলন হইয়া গিয়াছে, কিন্তু আসল জিনিষটা 'কুইনীন্'। ছেলেবেলায় আমরা C-o-w-p-e-r কবিকে 'কুপার', Macaulay সাহেবের নাম 'মেকলি' বলিতে শুনিয়াছি; এখন সে

---

* এ অঞ্চলে 'লুচি ভাজতে হবে' কথাটার 'জ' এ কেহ কেহ Z)র আভ্রাণ পান ; তাহা হইলে মধ্যে মধ্যে 'আমেজ' পাওয়া যায় স্বীকার করিতে হয়। নামটার আদ্য অক্ষর X কিন্তু উচ্চারণ Z।

† বিস্ময়ের কথা—পূর্ব্ববঙ্গে 'জ' ও 'য'র উচ্চারণ 'Z'র ন্যায়, কিন্তু 'Z' যুক্ত শব্দের উচ্চারণ আমাদের 'জ' 'য' র মত! Zero, Zebra প্রভৃতির ঢাকাই উচ্চারণ শুনিলেই হইবে।

প্রচলন নাই। এ দুটা কি সেকেলে ভুল ? ভুলই বা বলি কি করিয়া ? Webster অভিধানে নাম-উচ্চারণ তালিকায় এই সেকেলে উচ্চারণই আছে। শ্রদ্ধেয় রমেশ দত্ত মহাশয়ের কোন গ্রন্থে 'মেকালি' নাম দেখিয়াছি।

বিদেশী অনেক সুবিখ্যাত ব্যক্তি কিংবা জনপদাদির নামের প্রকৃত উচ্চারণ আমাদের শুনা নাই বলিয়া শব্দের বানান ধরিয়া অনেক স্থলে যতটা কাছাকাছি সম্ভব আমরা উচ্চারণ করিয়া থাকি। কথনও কথনও ঠকিতে হয় সন্দেহ নাই। যশস্বী কবি Shellyর একখানি কাব্যের নামের বানান C-e-n-c-i অভিজ্ঞ লোকে বলিয়া না দিলে কে বা উচ্চারণ করে 'চেঞ্চি' ? প্রসিদ্ধ ফরাসী দার্শনিকের নামের বানান C-o-m-t-e ; পূজ্যপাদ ভূদেববাবুর গ্রন্থে উচ্চারণ লিখিত 'কমট' ; স্বনামধন্য বঙ্কিমবাবুর লেখায় দেখা যায় 'কোম্‌ৎ' ; শ্রদ্ধাস্পদ, যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণের গ্রন্থে 'কোমট ;' প্রফুল্ল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রবন্ধে'কোম্‌তে', মনীষী ৮ কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাবুর উচ্চারণ 'কোণ্ট' ; ফরাসী-ভাষাবিৎ জনৈক প্রবীণ লেখকের রচনায় দেখিয়াছি 'কোঁৎ'। পুরা নাম Auguste Comte, আদ্য নামটার উচ্চারণ দেখিয়াছি—আগষ্ট, অগা, অগোস্ত, ওগুস্ত ; ইহা ছাড়া 'অগস্ত' ত আছেই। সুপ্রসিদ্ধ জর্ম্মাণ কবির নামের বানান G-o-e-t-h-e,—উচ্চারণ খ্যাতনামা বাঙ্গালীর হাতে 'গেটে' 'গেটি' 'গৈটে' দেখিয়াছি , সেদিন একস্থলে দেখিলাম 'গত্তে', এক অধ্যাপকের মুখে শুনিলাম 'গেয়েটা'। তাঁহার অমর কাব্য F-a-u-s-t, কেহ উচ্চারণ করেন 'ফষ্ট্‌', কেহ বলেন 'ফাউষ্ট্‌'। ইহার কোন কোনটা হয়ত ফরাসী বা জর্ম্মাণ্ উচ্চারণ ; ফরাসী জর্ম্মাণ্ দেশের অনুসারেই ফরাসী জর্ম্মাণ্ নাম আমাদের উচ্চারণ করিতে হইবে, এমন ত লেখাপড়া নাই, —সর্ব্বত্র তা চলেও না।—করিতে পারিলে হয় ভাল বটে. কিন্তু উপরি উক্ত নমুনা হইতেই বুঝা যায় অনেকেরই অন্ধকারে লোষ্ট্র প্রক্ষেপ। সব দেশের সব লোকের জনপদাদির নামের বেলায় এরূপ নিয়ম খাটাইতে গেলে অনেকস্থলে সাধারণ লোকে ঠিক জিনিসটা চিনিতে পারিবে কিনা সন্দেহ। বঙ্কিমবাবুর 'বলটের' 'দাঁতো' (১) চন্দ্রনাথ বাবুর 'তালের্যাঁ' 'মাদাম রোলাঁ' (২), খুব ঠিক না হউক, বরং বুঝা যায় ; কিন্তু কালীপ্রসন্ন বাবুর 'যজিফিন' 'রসিও' (৩), প্রফুল্ল বাবুর 'তিতান' 'দিয়ানা' (৪) চেনা কঠিন। আমরা যখন ইংরেজির মধ্য দিয়া ফরাসী জর্ম্মাণ্ প্রভৃতি নাম গুলার সন্ধান পাইতেছি, তখন ইংরেজেরা ঐ সকল নাম যেমন উচ্চারণ করেন, আমাদের সেইরূপ করাই ত যুক্তি সঙ্গত। অনেক শব্দের বিদেশী উচ্চারণও সাব্যস্ত হইয়াই গিয়াছে ; - যথা গ্যানোঁ (Ganot), ড্যুপ্লে (Duplex) শ্যাম্পেন্ (Champagne) প্রভৃতি। বিশ্ববিজয়ী Napoleon এর নাম আমরা যাহা বলিয়া ডাকি, প্রথিতনামা রাজ্ঞী Marie Antoinette, বীরাঙ্গনা Joan of Arcএর ফরাসী আকার Jean d' Arc নাম আমরা যাহা বলিয়া উচ্চারণ করি, তাহা ত ফরাসী নহে ; ফরাসী উচ্চারণ অনুসারে সে সব নাম ডাকিলে অনেকের হয় ত হাস্য সংবরণ করা দায় হইয়া উঠে (৫)! বাঙ্গালা থিয়টরে ফরাসী E-n-c-o-r-e শব্দটার প্রকৃত উচ্চারণে অনেককে হাসিতে দেখিয়াছি। (৬)

ফরাসী রাজধানী Paris নগরীকে কেহ কেহ লিখিয়া থাকেন 'প্যারি' বা 'পারী' ; (যদিও বিলাত-প্রত্যাগত বাঙ্গালীর মুখেও শুনা যায় 'প্যারিস') ; কিন্তু ফ্রান্সের অন্যান্য নগরাদির নামের বেলায় ফরাসী উচ্চারণের বশবর্ত্তী হইবার লক্ষণ ত বড় একটা দৃষ্টিগোচর হয় না। আমরা 'বোর্ডো' (Bordeaux) বলি বটে, আবার 'মার্সেলীস্' (Marseilles) 'লীয়নস্' (Lyons 'রুয়েন্' (Rouen) বলিয়া থাকি।* প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় Viennaকে 'বিয়েনা' লেখায়, 'বিয়ে না হইতে সস্ত্রীক' রহস্য-প্রবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। সেদিন দেখিলাম কোন শ্রদ্ধেয় প্রবীণ সাহিত্যিক

(১) Voltaire, Danton.

(২) Tallyrand, Madame Roland (৩) Josephine. Rousseau. (৪) Titan, Diana.

(৫) শুনিতে পাই উচ্চারণ—নাপোলেয়োঁ, মারি আঁটোয়ানেৎ, জাঁ দাক। (৬) উচ্চারণটা না কি — আঁকোর। নবীন সেন বাবু লিখিয়াছেন 'আংকোর।'

* শুনিয়াছি প্রকৃত উচ্চারণ— মারস্তেঁ, লিয়ঁ, রুয়ঁ। প্রথম নামটা বিদ্যাসাগর মহাশয় লিখেন 'মারসীলস্ ;' বঙ্কিমবাবু 'মারসে' যোগেন্দ্রবাবু 'মাসে লিস' ; অপর একজন 'মাসেল্স' লিখিয়াছেন দেখিয়াছি। উচ্চারণ 'মারসেল্স' ও শুনিয়াছি।

Venice নগরীকে 'বিনিস্' বলিয়াছেন (ভূদেব বাবুর গ্রন্থে 'বেনিস্' আছে)। বঙ্কিমবাবুতে 'সরবন্টিস্' (Cervantes), লোপ্ ডি বেগা (Lope-de-Vega) দেখা যায়; কেহ কেহ ইংরেজি Oliverকে 'অলিবর' লেখেন; প্রফুল্ল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ইংরেজ Vincent সাহেবকে 'বিন্‌সেন্ট' লিখিয়াছেন। চিন্তাশীল চন্দ্রনাথ বাবু গ্রন্থের খণ্ডবাচক ইংরেজি volume শব্দের বাঙ্গালা লিখিয়াছেন 'বালম্'; ইহা কোন্ আইন অনুসারে হয়? ইহার ভিতর ত জর্ম্মাণ্ ফ্রেঞ্চ্ উচ্চারণ আসিতেছে না। জীবন্ত ইংরেজি শব্দ, যাহা সকলে সহজে বুঝিতে পারে, তাহার এমন বিকৃতি-সাধনের প্রয়োজন কি? কথাটা ইহার দ্বারা যে (টেবিল্ গেলাসের মত) বেশী মোলায়েম হইয়া আসিল তাহাও ত নহে। এগুলা এক এক সময় যথেচ্ছাচার মনে হয় না কি? আমরা আমাদের লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকগণের লেখায় বর্জ্জিল্ (Virgil), লিবি (Livi) বলটের (Voltaire), বিক্‌টোরিয়া (Victoria) দেখি; সর্ব্বিস্ (Service), নবেল (Novel), সিভিল্ (Civil) ইউনিবর্সিটি (University), বর্নাকিউলার (Vernacular, ও দেখিতে পাই। 'ভ' কে বনবাস দিবার কারণ কি? এদিকে আবার ইংরেজেরাও—শুধু ইংরেজ কেন, য়ুরোপীয়েরা, আমাদের ব্যাস, বাল্মীকি, বেদ, ব্যাকরণকে, 'ভ্যাস' 'ভাল্মাকি' 'ভেদ্' 'ভ্যাকরণ, (Vyas, Valmiki, Veda, Vyakarana) লিখিয়া ও বলিয়া থাকেন। এ মন্দনয়; আমরা তাঁহাদের 'ভ'-যুক্ত শব্দগুলাকে 'ব' দিয়া উচ্চারণ করিব, তাঁহারা আমাদের 'ব' যুক্ত শব্দ গুলাকে 'ভ' দিয়া উচ্চারণ করিতে থাকুন। অন্তঃস্থ 'ব' বর্গীয় 'ব' এর প্রভেদ যে সর্ব্ব স্থলে রক্ষিত হয়, এমন ত' মনে হয় না।

প্রসিদ্ধ জর্ম্মাণ্ পণ্ডিত W-e-b-e-rকে অনেকে 'বেবর' (অক্ষয় দত্ত মহাশয় 'বেবের') নামে অভিহিত করিয়াছেন। হইতে পারে ইহাই জার্ম্মাণ্ উচ্চারণ; পূর্ব্বেই বলিয়াছি এরূপ করিবার সার্থকতা বুঝা যায় না। বঙ্কিম বাবু আর একজন জার্ম্মাণ্ পণ্ডিত S-w-a-n-b-e-e-kকে 'শ্বানেক্' লিখিয়া গিয়াছেন; wতে 'ব'ফলা, bও 'ব'ফলা? রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের 'শ্বানবেক' বরং পদে আছে;—কিন্তু নামটার এ উচ্চারণ কি ঠিক? বঙ্কিম বাবু ইংরেজি নাম Darwinকে 'ডার্বিন', Cromwellকে 'ক্রম্বেল' Kenilworthকে 'কেনিল্বর্থ' লিখিয়াছেন। তাহা হইলে এইবার হইতে আমরা William, Walter, Watson, নামগুলি বিলিয়ম, বাল্‌টর, বাটসন্ বলিব কি? Edwin, Edward, Ewingকে এড্‌বিন্,এড্‌বার্ড, এবিঙ্,লিখিব? Warwickকে 'বারবিক্', কবি Wordsworthকে 'বার্ডস্‌বার্থ' বলিব ত? বীর Wellingtonকে বেলিংটন, মহাত্মা Washingtonকে বাসিংটন্ বলিব? Browning, Longfellow, Lansdowne নামগুলি কিরূপ উচ্চারণ করিব? আশ্চর্য্যের বিষয়—বঙ্কিম বাবুতেই (মনিয়র) উইলিয়াম্‌স্, (হরেস্ হেমান্) উইলসন্, (কর্ণেল্) উইল্‌ফোর্ড দেখিতে পাওয়া যায়। তবেই ত, নিয়ম বজায় থাকে কই? দু নৌকায় পা কেন? বিদ্যাসাগর মহাশয় আখ্যানমঞ্জরীতে Whitechapelকে 'হ্বাইট্‌চেপল্' করিয়াছেন;—সুকুমারমতি শিশুগণ হাঁপাইয়া না উঠিলে হয়! এ হিসাবে আমাদের Whitney, Whitmore, Wheeler, নামগুলা হ্বিট্‌নি, হ্বিট্‌মোর হ্বীলার্ বলা ত উচিত? Whiteaway Laidlaw কোম্পানীকে হ্বইটাবে লেড্‌ল্ব, বলিব ত? যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় 'মিল চরিতে' W-h-e-w-e-l- নামটা হিউয়েল্ লিখিয়া ফেলিয়াছেন,'হ্বেবেল্ লেখাত কর্ত্তব্য ছিল? সাবেক বঙ্গদর্শনে Bhushby সাহেবের নাম 'বুস্বী' লিখিত দেখিয়াছি; w স্থানে 'ব' বা ব-ফলা ছিল রক্ষা, স্পষ্ট b আস্ত 'ব', তাহাও 'শ্বানেকের' মত ব-ফলা হইয়া পড়িল! 'v' র উচ্চারণ 'ব', w-রও 'ব'; B ত 'ব' আছেনই; 'ব' এর উপর এত মায়ার কারণ কি?

বাঙ্গালার একজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক বিখ্যাত ইটালিয়ান বাগ্মী C-i c-e-r-oকে লিখিয়াছেন 'কিকিরো'; * বঙ্কিম বাবু ও ভূদেব বাবুর গ্রন্থে দেখিতে পাই 'মেকিদন' 'মেকিদোনীয়' অবশ্য Maedon, Maedonia, † স্থলে; এগুলা ল্যাটিন্ ও গ্রীক্ উচ্চারণ না জবরদস্তি? বিদেশী কয়টা c-e কে আমরা 'কি' উচ্চারণ করি? অতঃপর আমরা Saint Ceciliaকে 'সেণ্ট্ কিকিলিয়া' বলিব কি? কুহকিনী Circe দেবীকে 'কার্কি' লিখিব? সকল ল্যাটিন্ গ্রীক্ শব্দ ও নাম ঠিক

*ইহাদের প্রকৃত উচ্চারণ "কিকেরো" ও "মাকেডোন"।

† শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার-সম্পাদিত ভূতপূর্ব্ব 'নবজীবন' পত্রিকায় ইনি প্রকৃতই 'বার্দস্বার্থ' নামে অভিহিত হইয়াছেন।—ভাঃ সং।

উচ্চারণের সুবিধা করিতে পারিলে, তবে ত প্রচলিত উচ্চারণে পরিবর্ত্তন সংস্কার শোভা হয়।

বিদ্যাসাগর মহাশয় Shakespeareকে 'সেক্‌সপীয়র' Max Mullerকে 'মোক্ষমূলর' লিখিয়াছেন;—বিলাতী নামের দেশী আকার? বোধ হয়, সেই দেখাদেখি অনেকে 'সেক্ষপীর'—'মোক্ষমূলার' লিখিয়া থাকেন। ইহাই বা কোন্ উচ্চারণ-শাস্ত্রের দোহাই? 'সেক্‌সপীর,' 'রোবস্‌পীর' করিয়া অকারণে পীরের সংখ্যা বৃদ্ধি করাই বা কেন? 'মোক্ষের' 'ম'এ 'ও'কার-আগম হয় কোথা হইতে? 'ক'এ 'ষ'এ মিলিয়া 'ক্ষ' হইয়া থাকে বটে, কিন্তু সর্ব্বস্থলে ষত্ববিধান কি খাটে? 'সেক্ষপীর' 'মোক্ষমূলর'—যথেচ্ছা উচ্চারণ তাহার প্রমাণ! কৃতবিদ্য সম্প্রদায়ের ভিতর লিখনের বহুরূপিতা—শেক্ষপীর, শেক্ষপীয়ার, সেক্সপীর, সেক্সপিয়র, সেক্‌সপীয়র দেখা যায়; আবার মক্ষমূলর, মাক্ষমূলর, মোক্ষমূলর, ম্যাক্ষমূলর, মক্সমূলর, মাক্সমূলর, ম্যাক্সমূলার, মেক্‌সমূলর, ম্যাক্‌সমূলর—দৃষ্ট হয়; বাধাবাঁধি নিয়ম নাই। কৌতুকের কথা—একই জন একই নামে দুই তিন প্রকার বানান ব্যবহার করেন। বিদেশী নামের উচ্চারণে 'ক' ও 'স' পাশাপাশি থাকিলে 'ক্ষ' নির্ম্মাণ-স্পৃহাতেই সম্ভবতঃ যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণ ও বঙ্কিমবাবু মহাশয়গণ Saxonকে স্থলে স্থলে 'সাক্ষণ' জাতি লিখিয়া গিয়াছেন; প্রফুল্ল বাবু Exodus স্থলে 'এক্ষোদাস', Anaxagoras নামে 'আনক্ষগোরা' বসাইয়াছেন; আরও আছে।* তাহা হইলে, এইবার হইতে আমরা Mr. Jacksonকে কি 'জ্যাক্ষণ' সাহেব বলিয়া ডাকিব? Dictionary চাহিতে 'ডিক্ষনারি' বলিব? X বর্ণস্থলে আপনারা যদি 'ক্ষ' বসাইতে চান, মিউনিসিপাল্ Tax, ইন্‌কম্ Tax দিতে হইবে! অতঃপর রোকায় টেক্ষ বাবদ চাপানই ত উচিত। গতানুগতিকধর্ম্মী স্বল্পবিদ্য আমরা Alexanderকে 'আলেক্ষন্দার' বলিব না, Xerxesকে 'ক্ষরক্ষিস' লিখিব? Exhibition বলিতে 'এক্ষ্‌হিবিসন' এবং Examine বুঝাইতে 'এক্ষামিন' কহিব ত? মনস্বী অক্ষয় দত্ত মহাশয় Artaxerxesর মূল উচ্চারণ 'অর্ত্তক্ষত্র' লিখিয়াছেন। আমরা 'দরায়ুস'কে Darius, 'অলিকসন্দর'কে Alexander আঁচে আঁচে বুঝিতে পারি, কিন্তু কেহ বলিয়া না দিলে দশ বৎসর মাথা কুটাকুটি করিয়াও Xerxes স্থলে 'ক্ষত্র' বুঝিতে পারিতাম না! এখন আমাদের কায়স্থভ্রাতৃগণ সকলেই তাহা হইলে, এক এক Xerxes. বাঙ্গালায় X উচ্চারণের বড় সহজ উপায় শ্রদ্ধাস্পদ রাজনারায়ণ বাবু নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। 'বক্‌সু' খান্‌সামার নাম 'বক্‌ষু' কিংবা 'ক্ষু' লেখায় বিদ্যা প্রকাশ হইয়া পড়িবার ভয়ে কোন স্থলে 'বXু' লেখা সাব্যস্ত হয়!

উচ্চারণের বিভ্রাটে পড়িয়াই এক সময়ে 'হিন্দু' Gentooতে পরিণত হইয়াছিল; হয়ত সেই বিপাকেই 'চন্দ্রগুপ্ত' Sandracottasএ দাঁড়াইয়াছেন; অহিফেনখোর De Quinceyর মতে বুদ্ধদেব চীনা ভাষায় Fo Fo হইয়া গিয়াছেন! দিন কতক বাদে 'শ্রীমতী অন্নবসন্ত'কে কিংবা 'মাদম্ বলবৎ সখী'কে কেহ কি আর চিনিতে পারিবে?*

আমাদের সাহিত্যগুরু কৃতবিদ্য-সম্প্রদায়ের 'ট'বর্গের সহিত কি কোন বিবাদ আছে? বঙ্কিমবাবু প্রমুখ অনেকের লেখায় দেখি—তাসিতস্, প্লতস্, ত্রৈলস্, ত্রোজান্,ওরিয়স্তো, জস্তিন, প্লুতার্ক, ওবিদ্, ক্রেসিদা, ইউরিপিদিস্, দ্যোনিসস্, ক্লদিয়স্, থুকিদিদিস্, কালদেরন; লামার্তিন, দাঁতো, দান্তে, কান্ত† ত আছেই! চন্দ্রনাথ বাবু লেখেন—তেলিমেকস্, জুপিতর, ফিদিয়াস্, মেদনা। প্রফুল্ল বাবু—তিতান, বিত্তভিয়া, লিয়োনিদা, হেক্‌তার, দীয়ানা। অনেকস্থলেই দেখা যায়—ইলিয়দ, ইনিয়াদ, ইতালী। বিদ্যাভূষণ মহাশয় Scandinavia স্থলে লিখিয়াছেন 'স্কন্দনভ'। মহাশয়গণ দৃষ্টি রাখিবেন, ইহার ভিতর গ্রীক, ইটালীয়ান, জর্ম্মাণ, ফ্রেঞ্চ, স্পেনীয় নাম আছে, সব এক গাদায়! 'ট'বর্গের স্থলে 'ত'বর্গ কি হেতু? হইতে পারে গ্রীক বা ইটালীয়ান বা

---

* ইঁহার মতে Xটা 'ক্ষ' চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে! 'গ্রীক ও হিন্দু-প্রণেতা গ্রীক নামগুলার X স্থলে 'ক্ষ' ত বসাইয়াছেনই, অধিকন্তু স্যাক্ষণ (?) Maxo Roll নাম 'ম্যাক্ষ ও রেল' লিখিয়াছেন; ইনি 'মোক্ষ'লাভের পক্ষপাতী নহেন।

* মিষ্টার রাণী 'লেডিগেনি' কোন মহীয়সী মহিলার স্মৃতিরক্ষা কল্পে এই অপূর্ব্ব নাম বহন করিতেছে, উচ্চারণ-বিকারের বিপাকে অনেকে হয়ত অবগত নহেন! কে জানিত Canning 'গেনি' হইয়া যাইবে? অবশ্য এ উপদ্রবগুলার জন্য আমাদের সাহিত্য-রথেরা দায়ী নহেন।

† এখানে বলিয়া রাখি, 'কান্তের' জর্ম্মাণ্ নাম Kant, যে ভাষায় 'ট' বর্গের—কটুকটে মূর্দ্ধণ্যবর্ণেরই ওড়ন পাড়ন!

রুক্ষ উচ্চারণ ঐ ঐ নামের ঐরূপ ; কিন্তু সকল স্থলে ঐ ঐ ভাষায় উচ্চারণ যখন আমাদের ঘটিয়া উঠিবে না, তখন ইংরেজি ডিঙ্গাইয়া মূল ভাষায় উচ্চারণের প্রয়াসের বিশেষ আবশ্যকতা কি ?

মাইকেল কবি যখন 'ফ্রাঞ্চিস্কো পেতরার্কা (Francisco Petrarch) লিখিয়াছিলেন, তিনি নানাভাষাবিৎ—আমরা বুঝিতে পারি তিনি যথাযথ উচ্চারণই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ; কিন্তু কবিবর হেমবাবুতে যখন 'তৈতস ওট' (Titus Oates) দেখি, তখন মনে হয় না কি—এটা কবি-প্রয়োগ ? তাঁহার 'অতলন্ত সিন্ধু'ও বিদেশী শব্দের বাঙ্গালিকরণ ? উপরকারগুলা তবু যেন ইংরেজি ছাড়া অন্য দেশীয় নাম সম্বন্ধে ; কিন্তু ইংরেজ কবি-লিখিত ইংরেজি গ্রন্থোক্ত, লক্ষ লক্ষ ইংরেজ-উচ্চারিত বিদেশী নামেরও বিকৃতিসাধনে আমাদের সাহিত্য-গুরুগণ পশ্চাৎপদ নহেন। বঙ্কিমবাবুরা লিখিলেন—মিরন্দা, ফর্দিনন্দ, জুলিয়েত, দসদিমোনা, চন্দ্রনাথ বাবুর আবার দসদেমোনা)। ব্যক্তি গুলি ইটালীয়, সুতরাং নাম তদ্দেশীয় বটে, কিন্তু হইয়া গিয়াছে ত ইংরেজি—Naturalised বলা চলে; উচ্চারণে 'ত' বর্গ আনা কি প্রয়োজনীয় ? স্পষ্ট ইংরেজি নামেও দেখিয়াছি 'আদম্ স্মিথ'! এখানে কি 'আদম ও হবা'র আদিম পুরুষ আসিল না কি ? এ সব কেন ? সর্ব্বত্র ত তাঁহারা নিয়ম অব্যাহত রাখেন না,—অনেক নামে ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। একই কলমে আমরা 'মাদাম ক্লোতিলদ্' 'মাদাম দুবারী' দেখি এবং 'মাদাম ডেষ্টাল'ও দেখিতে পাই। যাঁহাদের লেখায় 'কান্ত' 'গারিবল্দি' দেখা যায়, তাঁহারাই 'গোল্ডষ্টুকর', 'ব্রূটস্, লিখিয়াছেন। (লক্ষ্য রাখিবেন—একটা নাম জর্ম্মাণ্, একটা ইটালীয়ান্)। তাঁহাদেরই লেখায় প্লেটো, আরিষ্টটল, ষ্ট্রাবো, সক্রেটিস, হিরোডোটস জাজ্বল্যমান রহিয়াছে ;—ব্যাক্‌ট্রিয়া, স্পার্টাও দেখা যায়,—ত্রিণ্ডিসি, লম্বার্ডিও আছে। এগুলা কি 'ভ্রমাৎ', না বিকল্পে ? অবশ্য কোন কোন স্থলে এই সকল নামেও 'ট'বর্গ—'ত'বর্গ হইয়া গিয়াছে।—দুইই আছে, বেশীর ভাগ 'ত' বর্গ। * তাঁহারা 'আদম স্মিথ' বলেন, 'আন্দ্রুস' লেখেন ; কিন্তু 'দ্রাইদেন,' 'মিল্‌তন' 'স্কত' ত বলেন না ; 'উদ্রো' 'উদরোফ্' ত শুনি নাই ; তবে ঐতিহাসিক Froudeকে 'ফ্রুদ' দেখিয়াছি। আছে বটে ; চন্দ্রনাথ বাবু 'গারিবল্দি, গারফিল্দ, গর্দন, গ্লাদিষ্টোন' (স্তোন নয় কেন ?) নাম এক সূত্রে গাঁথিয়াছেন ; —এসকল অনুপ্রাসের বাহার নিঃসন্দেহ, কিন্তু উচ্চারণের মুণ্ডাহার নহে কি ?

মনে হয়, একবার সাবেক বঙ্গদর্শনে দেখিয়াছিলাম—বঙ্গদেশীয় কোন কলেজের প্রিন্সিপাল সাহেব একদিন কলেজের পণ্ডিতকে স্বীয় কামরায় ডাকাইয়া বলিলেন, "ওয়েল্ পণ্ডিট্, টোমাদের বর্ণমালার টৃটীয় এবং চটুর্ঠ বর্গের কিছু ভিন্নটা ডেকাইটে পার ? আমি ট অনেক পরিশ্রম করিয়া ডেকিয়াছি, ডুইরই উচ্চারণ একরূপ।" আমরা একথা এক রকমে মানিয়াই লইতেছি, কেবল বর্গ-বিনিময় করিতেছি মাত্র। অতঃপর সাহেবদের মুখে টুমি নিটান্ট ঠগ্ আড্‌মি' শুনিয়া আমাদের আর 'হাস দেওয়া' উচিত হইবে না। আমরাও তাঁহাদের 'ট'বর্গকে 'তবর্গ' করিয়া থাকি।

য়ুরোপীয়গণ দায়ে পড়িয়া Troilakya, Tarini, Debendra, Dino Nath বলিতে লিখিতে টবর্গ ব্যবহার করেন। শুনিয়াছি স্কটলণ্ডবাসীরা বিশেষ চেষ্টা করিয়াও 'ট' উচ্চারণ করিতে পারেন না; ইংলণ্ডবাসীরা 'ত' উচ্চারণে অপারগ; আমরা কেন অকারণ সে অভাব—সে ন্যূনতা স্কন্ধে করিয়া লই ? আমাদের ভাষার বর্ণমালায় ত আর উচ্চারণের দুর্ভিক্ষ পড়ে নাই! নেপথ্যে বলিয়া রাখা চলে, সাহেবদের ভাষায় 'ছ' কিংবা 'ঠ' উচ্চারণ করিবার কিছু নাই। 'ছুচ্ছুন্দরী' লিখিতে chh করিয়া অবৈয়াকরণিক ডবল hর সাহায্য লইতে হয়, এবং 'ঠন্‌ঠনে' লিখিতে Thunthunia বানানে থন্‌থনিয়া কি দন্‌দনিয়া—কোন্ উচ্চারণটা ঠিক, অনভিজ্ঞের পক্ষে সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়!

শব্দ এক ভাষা হইতে অন্য ভাষায় কিরূপ হইবে, তাহার নিয়ম ভাষাতত্ত্ববিৎ জর্ম্মাণ্ পণ্ডিত গ্রিম্ সাহেব ধারাবদ্ধ করিয়াছেন। বঙ্গসুধীগণের হস্তে পূর্ব্বোক্তরূপ বর্ণবিন্যাস Grimm's Lawর অভিব্যক্তি কি লাটিন্ গ্রীক্ ভাষার সহিত আমাদের সগোত্রত্ব বিশেষ করিয়া বুঝাইবার প্রয়াস ? যাহাই হউক উচ্চারণ-বৈষম্য স্বীকার করিতেই হয়। Pater,

* সুপণ্ডিত ডাক্তার রামদাস সেন তাঁহার পুরাতত্ত্বে 'স্ত্রাবো' 'অরিস্তত্ল' 'আন্তোকস' 'অন্তিগোনস' 'দেন' (Dane) লিখিয়াছেন, আবার 'টলেমী' 'পিণ্ডার' 'স্পার্টান'ও ব্যবহার করিয়াছেন। ইহার ভিতর ব্যাকরণ-বিভীষিকা থাকে ত আমি নাচার।

Mater, Daughterএর সহিত পিতৃ-মাতৃ-দুহিতৃ শব্দের সৌসাদৃশ্য সম্পর্ক বুঝাইতে গিয়া সকল শব্দ ধরিয়া টান দেওয়া চলে কি? সবস্থলে ব্যাপার ত বড় সহজ নহে। Helena ও Paris নাম সংস্কৃতে 'সরমা' ও 'পনিস্' হইয়া যায়। শব্দশাস্ত্রকে মাথায় তুলিয়া রাখিয়া যথার্থ উচ্চারণের দিকে মনোযোগ সমধিক প্রয়োজনীয় ও বাঞ্ছনীয় নহে কি?

শুধু 'ট'বর্গ 'ত'বর্গ নহে, বিদেশী নাম ও শব্দ উচ্চারণে আরও অন্য গোল আছে। অনেকের লেখায় দেখিতে পাওয়া যায়—'ম্যাকবেথ্' 'হ্যামলেট্' ইত্যাদি; সুকবি নবীন সেন মহাশয় লিখিয়াছেন, 'মেকবেথ' 'হেমলেট' 'ডনকেন'; ইহাই বা কেন? শেষোক্ত বানান সম্বন্ধে তবু না হয় বলা যাইতে পারে—পূর্ব্ববঙ্গবাসিগণ আমাদের একার গুলা প্রায়শঃ 'য'ফলা 'আ'কার অর্থাৎ 'অ্যা'র মত উচ্চারণ করিয়া থাকেন, সুতরাং শব্দগুলা উচ্চারণের বেলায় ঠিক থাকে। * কিন্তু আমাদের এখানে 'অ্যা'স্থলে শুধু 'আ'কার লিখিলেও ত গোল! কেবল 'আ'কার নহে; ভক্তিভাজন রাজনারায়ণ বাবুর 'এমেরিকা', 'ষ্ট্রেবো', 'হেট-কোট' দেখিয়াছি; কোবিদ রমেশ দত্ত বাবুর গ্রন্থে 'কেথলিক,' 'মেডেম ডুশো', 'কেটরিন্ হুদ', 'হেম্পটন কোর্ট' আছে। অনেকেই Mackenzie নাম 'মেকেঞ্জি' উচ্চারণ করেন, অতএব দেখা যাইতেছে পশ্চিম-বঙ্গীয়, বিশেষতঃ মধ্যরাঢ়ের, 'ককৃনি' উচ্চারণেও উচ্চারণে না হউক লিখনে 'অ্যা' স্থলে 'এ' বা 'আ' র অসদ্ভাব নাই। Alice, Annie, Abott নাম বাঙ্গলায় 'এলিস', 'এনি', 'এবট' দেখা যায়; Address, Abolish, Association, Apprentice শব্দ 'এড্রেস,' 'এবালিস,' 'এসোসিয়েশ্যন,' 'এপ্রেন্টিস' দৃষ্ট হয়। আবার Addison, Alfred, Alexandra নাম 'আডিসন,' 'আলফ্রেড', 'আলেকজান্দ্রা' লিখিত হয়। 'আফ্রিকা,' 'আমেরিকা'ত জন্মকাল শুনা যাইতেছে। 'আসিয়া,' 'আসিয়াটিক'ও দুর্লভ নহে।—'এ' স্থলে 'আ'।

ইংরেজিশব্দের অকার আকার উচ্চারণেও স্থলে স্থলে বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হয়। Copy, Club, College 'কাপি,' 'ক্লাব,' 'কালেজ' লিখিত হইয়াছে; আবার তদ্বিপরীত—Dinner, Member, Letter-paper, 'ডিনর,' 'মেম্বর,' 'লেটর-পেপর' লিখিত দেখা যায়! নাম লেখায়—Augustsকে 'আগষ্টস',Lord Curzonক 'লাট কার্জন',Hunterকে 'হাণ্টার' দেখিবেন, আবার উল্টা—Herbert Spencerকে 'হর্ব্বট' স্পেন্সর, Fergussonকে 'ফর্গুসন', Homerকে 'হোমর' যত্রতত্র দেখিতে পাইবেন। বিচক্ষণ সাহিত্যিকগণ এমন 'আ'কার উচ্চারণ স্থানে অকার এবং 'অ'কার স্থানে 'আ'কার করেন কেন?

বঙ্কিমবাবুতে 'হ্যুম' (Hume), 'ঐবানহো' (Ivanhoe), 'নৈকটর (Nikator), 'সৈবিরিয়া (Siberia), 'টৈলর' (Taylor) প্রভৃতি দেখা যায়। ভূদেব বাবুতে 'পউডর' (powder), 'ব্রৌন'(Brown), 'ফৌণ্ডলিং' (foundling);† কালীপ্রসন্ন বাবুতে 'ইষ্টাট' (estate) 'প্যালাস্তিন' (Palestine), 'ব্রূম' (Brougham) দৃষ্ট হয়! † এই ঈষৎ ট্যারা উচ্চারণের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে কি হেতু?

তবে 'মিশালা' (Michlet), 'রিশলু' (Richilien), 'গিজো' (Guizot), 'সোপেনহৌর' [সোপেনহয়ার?] (Schopenhauer),'কাবুর' (Cavour), 'টিয়র' (Thiers), 'কৌণ্ট টলষ্টোয়া' (Count Tolstoi), বোধ হয় ঠিক; কিন্তু 'মস্যুর তাইন' ‡ (Mons. Taine), 'রেবেলাস'

---

* কবিবরের 'জীবনে' একারের অনর্গল ব্যবহার দেখিয়া একারে অরুচি জন্মিয়া যায়—কেপ্টেন, গ্রেজুয়েট, রেঙ্গলার, বেরিষ্টার, মেনেজার চেলেঞ্জ, বেঙ্ক, ব্রেকেট, এটলেণ্টিক; আবার—এডেম, গ্লেডষ্টোন, মেনফ্রেড, জেকসন, হেরিসন, মেনিং হেমিণ্টন, প্রভৃতির ছড়াছড়ি।

* রাজনারায়ণ বাবু বলিয়াছেন, Cow শব্দের ভাগ্য তিন বার পরিবর্ত্তিত হইয়াছে! প্রথমে উচ্চারণ ছিল 'কো'—তারপর হয় 'কৌ'—এক্ষণে দাঁড়াইয়াছে 'কাউ'। তাই বুঝি তিনি Townsend সাহেবের নাম 'টৌনসেণ্ড' লিখিয়াছেন? কিন্তু এ উচ্চারণও প্রথম দশার; ভূদেব বাবুর তদ্ দ্বিতীয় দশায় পঁহুছিয়াছে! Cowper নামের উচ্চারণ 'কুপার' ধরিলে Cow শব্দের ভাগ্য-পরিবর্ত্তন বাড়িয়া যায়!

† রায় বাহাদুর ঘোষ বিদ্যাসাগর মহোদয় 'ছায়াদর্শনে' Dniester নদীকে 'দিনিষ্টার' লিখিয়াছেন;—তাজ্জব ব্যাপার! ভ্রম না যদৃচ্ছাচার? 'রুসিয়ান' উচ্চারণ বা! সম্ভবতঃ তাহাই;—কিন্তু কোন্ স্কুলে এই উচ্চারণ শিখান হয়?

‡ ফরাসী Monsieur শব্দটার উচ্চারণ 'মস্যুর' না 'মসিও'? রাজনারায়ণ বাবু লেখেন 'মুঁসে'। অন্যত্র দেখিয়াছি 'মঁসিয়ে'।

(Rabelais), 'কান্ত' (Kant), 'রসিও' (Rousseau), 'ডায়োনিসস্' (Dionysius), 'দীয়ানা' (Diana), উচ্চারণ কি ঠিক?

কবিবর হেমচন্দ্রের 'পারশ', 'কপলত', 'মন্তাগো', 'মরকেশ' 'বেনুবল', 'তৈবল', 'বরণা' আমরা কাব্যানুবাদের ভিতর নামানুবাদ বলিয়া ছাড়িয়া দিতে পারি!

এই সাবেক 'লিখীয়ে'গণের একজন আফ্রিকার Zambesi নদীকে 'জাম্বসী' লিখিয়াছেন,—এটা বেশ সংস্কৃতাকার দেশী নাম দাঁড়াইয়াছে! Tornado বাত্যাকে 'তূর্ণড' লিখিয়া ব্যাকরণসম্মত করা হইয়াছে,—ইহাও বেশ! সেদিন Byzancianকে 'বৈজয়ন্তী' দেখিলাম,—মন্দ নয়! কিন্তু ইংরেজি Sir Thomas (Strange) নামকে 'সার তামস (ষ্ট্রেঞ্জ)' কিংবা Hercules নামকে 'হর-কুলিশ' বা 'হরিকুলেশ' দেখিয়া ব্যঙ্গোক্তি মনে হয়!

আজ আর নয়,—আপনাদের মূল্যবান সময় আর বৃথা নষ্ট করিব না; অবসর হয় অন্যান্য কথা পরে বলিব। আমার উদ্দেশ্য—দেশী বিদেশী শব্দগুলা সুধীবৃন্দকর্তৃক স্বেচ্ছামত লিখিত পঠিত—তথা কথিত বা উচ্চারিত—না হইয়া, প্রকৃত উচ্চারণ প্রাপ্ত হয়।

পরিশেষে নিবেদন—গুরুঘাতিবিশ্চার জন্য গুরুকুল সমীপে মার্জ্জনা-ভিক্ষাপূর্ব্বক নিতান্ত সঙ্কোচের সহিত একটা কথা বলিতে ইচ্ছা করে—বিদেশী শব্দ লিখনে কোন কোন স্থলে ঠিক উচ্চারণ জানা না থাকিতে পারে, মূলভাষায় যথাযথ উচ্চারণ যদি জানা থাকে তাহা হইলে 'বঙ্কিমচূর্ণ'ভাবেই হউক, বা শ্রুতিকঠোরই হউক, তাহাই লেখা ভাল। নচেৎ মনোগঠিত—ইচ্ছামত লেখা উচিত নহে; তাহাতে নিজের বিদ্যাগৌরবে যেন আঘাত পড়ে! অধিকন্তু—অপরের ভ্রান্ত ধারণা ঘটাইবার সহায়তা করা হয়। সন্দেহস্থলে ইংরেজি বর্ণমালায় শব্দ বিন্যস্ত করিয়া ছাড়িয়া দিলেই ত ল্যাঠা চুকিয়া যায়—ইদানীং তাহাই করিতেছেন অনেকে। কি বকিতেছি? যে সকল মহাজনের নামোল্লেখ করিয়াছি, তাঁহাদের সম্বন্ধে 'জানা নাই' বা 'আন্দাজে প্রয়োগ' বলা আমার পক্ষে অতীব ধৃষ্টতা—ইংরেজিতে ঠিক কথাটা বলা যায় Blasphemy। অতএব 'ইচ্ছাপূর্ব্বক বিকৃতি-সাধান বলিতে হয়। কিন্তু রহস্যস্থলে ভিন্ন—জানিয়া শুনিয়া—উচ্চারণের সপিণ্ডীকরণ বুধমণ্ডলীর পক্ষে ন্যায্য কি না সুধীপাঠকগণ বিচার করিবেন।

মূর্খ স্থূলবুদ্ধি লোক আমরা, যাঁহাদের পদাঙ্ক-অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হইব, তাঁহাদিগকে এইপ্রকার বহুমার্গগামী হইতে দেখিয়া অগত্যা আমাদের মনে হয়—

'বল্ মা তারা দাঁড়াই কোথা?

আমরা—'বিলাতি ধরণে হাসিতে ও ফরাসি ধরণে কাসিতে' গিয়া এ-কুল ও-কুল—দুকুল হারাইতেছি।

ইংরেজিতে প্রাচ্য নামের Hunterian Prondunciation না এই রকম কি একটা উচ্চারণ-বিধি আছে শুনিয়াছি; বাঙ্গালায় সর্ব্ববাদিসম্মত তেমন একটা পদ্ধতি হয় না? কিন্তু হায়! বাঙ্গালীর সর্ব্ববাদিসম্মত কিছু?—সে যে আকাশকুসুম।

শ্রীঅনাথকৃষ্ণ দেব।

মিসর-দেবী ইসিস্‌।
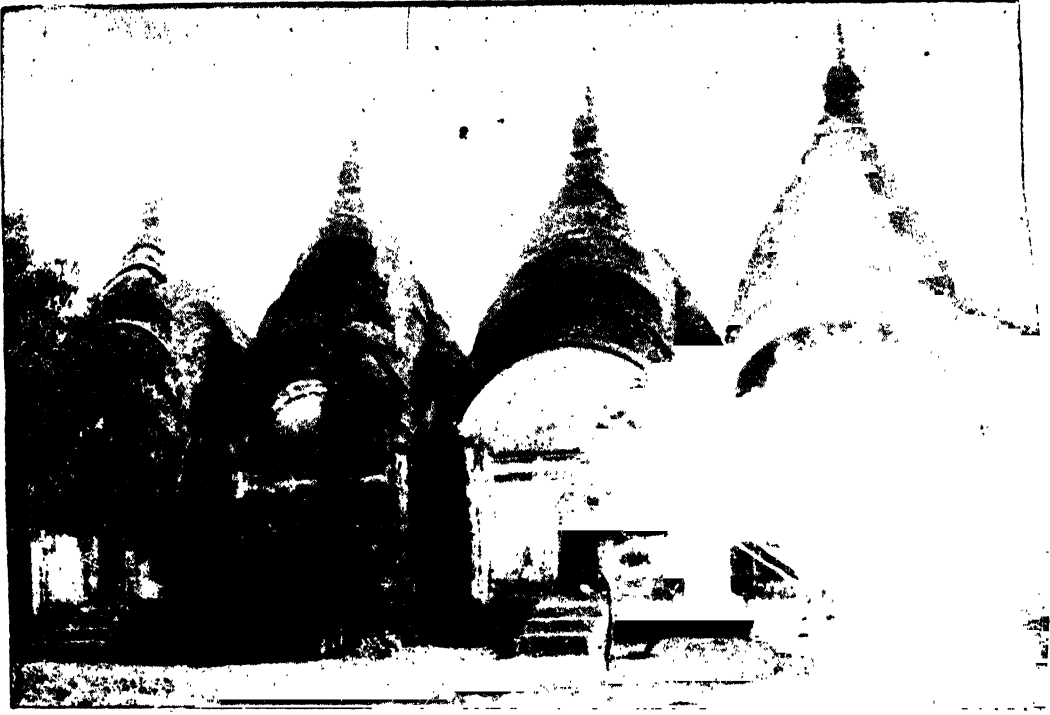
ঢাকেশ্বরী বাড়ীর শিব-মন্দির।

ঢাকেশ্বরী। *

'বৃদ্ধগঙ্গাতটে বেদবর্ষসাহস্রবাত্যয়ে
স্থাপিতব্যঞ্চ যবনৈর্জাঙ্গিরং পত্তনং মহৎ।
তত্র দেবী মহাকালী ঢক্কাবাদাপ্রিয়া সদা
গাস্যান্তি পত্তনং ঢক্কা-সংজ্ঞকং দেশবাসিনঃ॥' †

ঢাকেশ্বরী মন্দিরের দশভূজার মাহাত্ম্য ও স্থাপত্য-কৌশল একদিন সমগ্র বঙ্গদেশে খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। এক্ষণে এই মন্দিরের কোন প্রামাণিক ইতিহাস নাই। শুধু কিংবদন্তীর উপর নির্ভর করিয়া ঐতিহাসিকগণ এই মন্দিরের বিলুপ্তপ্রায় কীর্ত্তিকাহিনী সযত্নে রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন।

পুরাতন সহরের পশ্চিম-প্রান্তে এই মন্দির অবস্থিত। দক্ষিণ-দিক্ দিয়া মন্দির-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিতেই সর্ব্বপ্রথমে নহবৎ-খানা দৃষ্টিগোচর হয়। এই উচ্চ মঞ্চের উপরি-ভাগে বাদ্যকরেরা প্রভাতে ও সায়াহ্নে—পূজা ও আরতির সময় - দামামা, ঢাক ও ঢোল বাজাইয়া চতুর্দ্দিক্ মুখরিত করিয়া তোলে।

নহবৎ-খানার সংলগ্ন প্রাঙ্গণের উত্তরাংশে চারিটি মঠ বা শিবমন্দির আছে। এই মঠগুলি বেশীদিনের প্রাচীন নয়, গঠনপ্রণালী দেখিলে খুব আধুনিক বলিয়াই মনে হয়। কথিত আছে যে, কলিকাতার বিখ্যাত মল্লিকবংশের

* ভবিষ্যপুরাণ।

† "The temple of Dhakeshwari is situated a little to the north-east of the Lâl-Bagh, and wss in olden times a most famous place of resort. Every stranger coming to Dacca was expected to lose no time in presenting himself before the Goddess with an appropriate offering of a goat, buffalo, or other animal, according to his means. The number of daily sacrifices is said to have been from 25 to 50 goats and from 5 to 10 buffaloes. There still exists a pucka drain built for the purpose of carrying off the blood of the Victories. Dr. Taylor says, that the Brahmins attached to the temple were 18 in number. The Temple is still an object of reverence to devout Hindoos, and religious ceremonies are still performed within its precincts.

A. L. Day.

কোনও কৃতী পুরুষ এই মঠ * ও শিব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

মঠের পশ্চিমাংশে একটি অতি বৃহৎ পুষ্করিণী দৃষ্ট হয়। যাত্রীদের স্নানের সুবিধার জন্য একটি বাধান ঘাটও আছে;—এক্ষণে উহার স্থানে স্থানে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। মন্দির-প্রবেশের পূর্ব্বে যাত্রিগণ এই পুকুরে স্নান-আহ্নিক করিয়া থাকেন। কোন্ সময়ে এবং কাহার আমলে যে এই পুকুর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা ঠিক করিয়া বলা যায় না। কাহারও মতে সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের সময় এই জঙ্গলাকীর্ণ দেবালয়ের সংস্কার হয়। প্রবাদ, পশ্চিমাঞ্চলবাসী লালা কায়স্থ-বংশীয় তাঁহার কোন তাৎকালিক কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক এই পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সুদূর অতীত যুগে এই মন্দিরের পাদদেশ দিয়া বুড়ী-গঙ্গা প্রবাহিত হইত; দেবীর পূজার জন্য গঙ্গাজল ব্যবহৃত হইত বলিয়া পুষ্করিণী-প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন ছিল না। উত্তরকালে, গঙ্গার গতি দূরে সরিয়া যাওয়াতে, এই পুষ্করিণী-প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন হইয়াছিল।

শিবমন্দির ও নাট-মন্দিরের মাঝখানে একটি প্রাচীর আছে; এই প্রাচীর-গাত্রেই ফটক। এই প্রবেশ-পথ দিয়া মূল-মন্দিরের প্রাঙ্গণে যাইতে পারা যায়। ফটক অতিক্রম করিলেই নাট-মন্দির,—এখানে উৎসবোপলক্ষে যাত্রা ও কবি-গানের বৈঠক বসিয়া থাকে। বড় বড় শাল গাছের খুঁটির উপর টিনের ছাদ দিয়া নাট মন্দির নির্ম্মিত।

ঢাকেশ্বরী মন্দিরের পশ্চাদ্ভাগের দৃশ্য

পূর্ব্বে এই মন্দিরের আয়তন অতি ক্ষুদ্র ছিল। বর্ত্তমান সময়ে ধনীদের অর্থে মূল-মন্দিরের আয়তন অনেক বৃদ্ধি এবং এবং ইহার পুনঃ পুনঃ সংস্কার হইয়াছে। সম্মুখে শ্বেতপ্রস্তর দিয়া বাঁধান একটি সুন্দর বারান্দা, পশ্চিমাংশে একটি কুঠরী আছে, সাধারণতঃ পুরমহিলারা এখানে বসিয়া দেবী দর্শন করেন, পূর্ব্বদিকে আর একটি কুঠরী, ইহাতে ভোগ ও নৈবেদ্য প্রস্তুত ও সজ্জিত করা হয়।

* মঠ-নির্ম্মাণপ্রথা যে কখন্ আমাদের দেশে প্রথম প্রচলিত হয় তাহা ঠিক করিয়া বলা সুকঠিন। তবে মনে হয় বৌদ্ধদের অনুকরণেই তান্ত্রিক-যুগে হিন্দুসম্প্রদায়ভুক্ত তান্ত্রিকদের প্রধান উপাস্য দেবতা লিঙ্গ মূর্ত্তি স্থাপনের জন্যই মঠ নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে। তাহা হইলে দেখা যায় যে, মঠ নির্ম্মাণ-প্রথা সপ্তম কি অষ্টম শতাব্দীতে প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়।

ঢাকেশ্বরী

মন্দিরাভ্যন্তরে ইষ্টক-নির্ম্মিত বেদীর উপর অষ্টধাতু-নির্ম্মিত দশভূজা মূর্ত্তি,—মূর্ত্তিখানি বড়ই সুন্দর ও ভক্তিব্যঞ্জক।

বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মাণের কাল সম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয়। কেহ বা শ্যামল বর্ম্মার সময়, কেহ বা রাজা মানসিংহের সময় এবং কেহ কেহ রাজা রাজবল্লভের সময় এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করেন। ঢাকার 'হোসেনী' দালানের ইট ও ঢাকেশ্বরী মন্দিরের ইট অবিকল এক রকমের। ইহা হইতে অনেকে মনে করেন, সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সুজার আমলে ঢাকেশ্বরী মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। ময়মনসিংহে সুসঙ্গের রাজা রাজসিংহ অনুমান ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকার ঢাকেশ্বরী দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার স্বরচিত বিবরণ গ্রন্থে ঢাকেশ্বরীর উল্লেখ দৃষ্ট হয়।
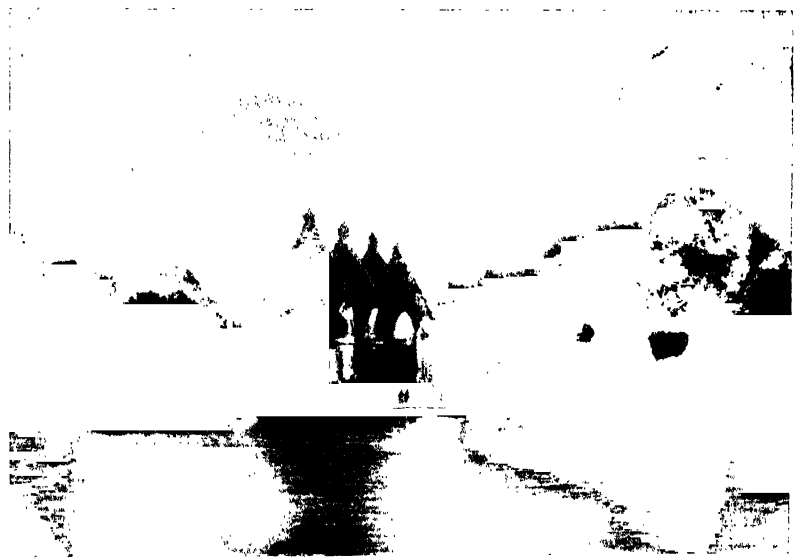
ঢাকা নামটি অতি প্রাচীন। প্রয়াগের অশোকস্তম্ভগাত্রে উৎকীর্ণ কবি হরিষেণ-বিরচিত প্রশস্তিতে এইরূপ লিখিত আছে, 'সমতট-ডবাক-কামরূপ-নেপাল-কর্ত্তৃপুরাদি-প্রত্যন্তনৃপতিভিঃ'। বাঙ্গালার কোন্ অংশ যে 'ডবাক' তাহা কোন কোন প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতের মতে একটু সমস্যাপূর্ণ। সমতট ও কামরূপের মধ্যবর্ত্তী ভূভাগকে (বর্ত্তমান ঢাকা জিলা) ডবাক বলিয়া গ্রহণ করিলে বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। ডবাক নাম কালক্রমে ঢাকায় পরিণত হওয়া খুবই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থে ও ঢাকার নাম দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত গ্রন্থে 'ঢাকা বাবু' নামে যে পরগণার কথা উল্লেখ আছে, সম্ভবতঃ তাহা হইতেই ঢাকা শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। ১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দে টোডরমল্ল ঢাকা বাবু পরগণার বন্দোবস্ত করেন। ১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা ইসলাম খাঁ রাজধানী রাজমহল হইতে স্থানান্তরিত করিয়া বুড়ীগঙ্গাতীরে ঢাকা বাবুতে স্থাপন করেন এবং বাবুর (পরগণা) নামানুসারে নূতন রাজধানীর নাম ঢাকা রাখেন। উত্তর কালে ইসলাম খাঁ নিজ প্রভু বাদশাহ জাহাঙ্গীরের নামে ঢাকার নাম 'জাহাঙ্গীর নগর' রাখিয়াছিলেন।

ঢাকা জিলার অনেক স্থানেই হিন্দু-মন্দির-বিধ্বংসী কালাপাহাড়ের অত্যাচার-চিহ্ন এখনও বিদ্যমান! বাসুদেবপ্রভৃতি বহু বিগ্রহের ভগ্নমূর্ত্তি আজিও ঢাকার নানাস্থানে বিক্ষিপ্ত দেখিতে পাওয়া যায়। ষোড়শ কি সপ্তদশ শতাব্দির পূর্ব্বে ঢাকেশ্বরীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিলে, কালাপাহাড়ের অত্যাচার হইতে ইহা কিরূপে রক্ষা পাইল তাহা বিচিত্র বলিয়া মনে হয়। ফলে, এই সকল বিষয় বিশেষভাবে অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, ঢাকেশ্বরীর বর্ত্তমান মন্দির মুসলমান-রাজত্বের অবসান সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল। *

সেই সময়ে রাজা রাজবল্লভ প্রভৃতি বিখ্যাত হিন্দু রাজপুরুষদিগের রাজনৈতিক অধিকার ও আর্থিক সমৃদ্ধি এত অধিক ছিল যে, মুসলমান নবাবেরা পর্য্যন্ত ইঁহাদিগকে উপেক্ষা করিতে পারিতেন না। বরং অনেক সময় রাজনৈতিক

* কিন্তু মাণিকগাঙ্গুলীর শ্রীধর্ম্মমঙ্গলে যখন ঢাকেশ্বরীর উল্লেখ আছে, তখন মন্দিরটি যে এ সময়ে নির্ম্মিত হয় নাই তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। বিশেষতঃ ঢাকেশ্বরী মন্দিরটি যেরূপ ইষ্টক দিয়া নির্ম্মিত সেরূপ ছোট ছোট ইষ্টক কখনও মুসলমানরাজত্বের অবসানকালে ব্যবহৃত হইত না।—প্র° সং°।

ব্যাপারে ইঁহাদের পরামর্শ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতেন। ইঁহাদের প্রতিপত্তির ফলেই বোধ হয় ঢাকেশ্বরী, রমণা প্রভৃতি হিন্দুদেবালয়গুলি মসজিদ সমাকীর্ণ মুসলমান নগরীর মধ্যস্থলে অভগ্ন অবস্থায় থাকিয়া আজিও সনাতন হিন্দুধর্ম্মের বিজয়-গৌরব ঘোষণা করিতেছে।

(১) ঢাকেশ্বরীর প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে একটি 'দুর্গামঙ্গল' গ্রন্থে দেখা যায়। রাজা আদিশূর কোনও অজ্ঞাত কারণে প্রিয়তমা মহিষীকে বনবাস দিয়াছিলেন। রাণী এই অপমানে ব্রহ্মপুত্রনদে প্রাণবিসর্জ্জন করিতে গিয়া কোনও অলৌকিক শক্তি-প্রভাবে রক্ষা পান। রাণী তখন ঢাকেশ্বরীর নিকট নিবিড় জঙ্গলে বাস করিতেছিলেন। কালক্রমে রাণীর গর্ভে বল্লালসেনের জন্ম হয়। বনের ভিতর জাত ও পালিত বলিয়া রাণী পুত্রের নাম 'বনলাল' বা 'বল্লাল' রাখিয়াছিলেন। একদা রাজকুমার বনের চতুর্দ্দিকে ঘুরিতে ঘুরিতে লতাপাতায় ঢাকা একটি দশভুজা-মূর্ত্তি দেখিতে পান। এই দেবীর যথোচিত ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শন-জন্য ইনি এই মন্দির-প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

(২) দ্বিতীয় প্রবাদ এই যে, ১৬০৪ খ্রীষ্টাব্দে রাজা মানসিংহ বিক্রমপুরাধিপতি বিখ্যাত কেদার রায়কে পরাজিত করিয়া তাঁহার শিলাময়ী গৃহ দেবতা ঢাকায় লইয়া আসেন। ঢাকার কর্ম্মকার দ্বারা তিনি এই মর্ত্তির অনুরূপ আর একটি মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করান। এই নব-নির্ম্মিত বিগ্রহটি ইনি ঢাকেশ্বরী নাম দিয়া ঢাকায় প্রতিষ্ঠা করেন এবং কেদার রায়ের গৃহ-দেবতাকে জয়পুরে লইয়া যান।

(৩) তৃতীয় প্রবাদ এই যে, বিষ্ণুচক্রে সতীদেহ ছিন্ন হইলে তাঁহার কিরীটের উজ্জ্বল 'ডাক' (গহণার অংশ বিশেষ) এই স্থানে পতিত হইয়াছিল। 'ডাক' হইতে এই স্থানের নাম ঢাকা এবং অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম 'ঢাকেশ্বরী' হইয়াছে।

প্রথমোক্ত প্রবাদ সম্বন্ধে প্রথম আপত্তি এই যে, আদিশূর বল্লাল সেনের পিতা কিনা; সম্প্রতি প্রমাণীকৃত হইয়াছে যে, আদিশূর, বল্লাল সেনের পিতা নন।* তিনি আদিশূরের মাতামহ কুলোদ্ভব ছিলেন। বল্লাল সেনের প্রকৃত নাম ছিল শ্যামল বর্ম্মা। তাঁহার পিতার নাম বিজয় সেন। বর্ম্ম-বংশের অভ্যুদয়ে গৌড়ে বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী পাল নৃপতিগণের রাজত্বের অবসান হয়। বিজয় সেনের † পুত্র শ্যামল-বর্ম্মা দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিক্রমপুরে রাজত্ব করিতেন। প্রবাদের অলৌকিক অংশ বাদ দিলে মনে হয় শ্যামল বর্ম্মা ঢাকার নিকট জঙ্গলাবৃত দশভুজা-মূর্ত্তি প্রথম আবিষ্কার করেন এবং সম্ভবতঃ তিনিই দেবীর নাম ঢাকেশ্বরী রাখিয়াছিলেন। গৌড়দেশকে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করিতে এবং গৌড় রাষ্ট্র পুনরায় সুগঠিত ও এককেন্দ্রীভূত করিবার জন্য গৌড়েশ্বর শ্যামল বর্ম্মা অশেষ যত্ন ও চেষ্টা করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় প্রবাদ হইতে জানা যায়, সেনাপতি মানসিংহ ঢাকেশ্বরী মন্দিরের পুনঃ-সংস্কার করিয়া নব-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তিনি যে মূল-মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, এরূপ কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই।

তৃতীয় প্রবাদ পুরাণ হইতে গৃহীত। ইহা হইতে কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ সংগ্রহ করা যায় কিনা, বলা সুকঠিন।

ঢাকেশ্বরী মন্দিরের বর্ত্তমান সেবায়েত শ্রীযুত প্রতাপ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় ১৩১৭ সালে এ সম্বন্ধে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, সেই পত্র মতে ঢাকেশ্বরী সম্বন্ধে কএকটি কথা এখানে উদ্ধৃত করা গেল,—

১। "প্রাচীনকালে আদিশূর নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার দুই স্ত্রী ছিল। কোনও কারণবশতঃ রাজা বেদবতী নাম্নী প্রথমা মহিষীকে এখানে বনবাস দেন। বনবাসকালে রাণী এখানে মায়ের মূর্ত্তি প্রাপ্ত হন এবং ইনি অতি ভক্তি-ভরে নিয়ত এই অষ্টধাতু-নির্ম্মিত দশভুজা-মূর্ত্তির পূজা

* ঘটক কারিকা' গ্রন্থে আছে—'আদিশূরের বংশ ধ্বংস সেনবংশ তাজা। ভীষক সেনের দত্তক-পুত্র বল্লালসেন রাজা॥

[আমরা পুঁথিখানি দেখিয়াছি। ইহাতে "ভীষক সেনের দত্তক-পুত্র" নাই—"বিশ্বক সেনের ক্ষেত্রজ পুত্র", এইরূপ পাঠই আছে। লেখক মহাশয় সম্ভবতঃ পাঠোদ্ধারে গোলযোগ করিয়া ফেলিয়াছেন।—ভাঃ সং]

আদিশূর শূরবংশীয় ও শ্যামলবর্ম্মা বর্ম্মা বংশীয় ছিলেন। শূর ও বর্ম্ম দুইটি বিভিন্ন রাজবংশ ছিল। আদিশূর খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে পূর্ব্ববঙ্গে ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

† [আদিশূরের সপ্তম পুরুষ রণশূরের কন্যার সহিত হেমন্ত সেনের বিবাহ হয়। হেমন্ত সেনের পুত্র বিজয় সেন।—ভাঃ সং।]

করিতেন। কালক্রমে রাজা কান্যকুব্জ হইতে পাঁচজন সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনাইয়া এক যজ্ঞ করেন; সেই যজ্ঞে প্রথমা মহিষী বেদবতীর উপস্থিতি আবশ্যক হওয়ায় রাজা আদিশূর ইঁহাকে রাজধানীতে ফিরাইয়া লইয়া যান। রাণী চলিয়া গেলে ঢাকেশ্বরীমূর্ত্তি বনের ভিতরই থাকিয়া যায়।

২। "বাদশাহ জাহাঙ্গীরের সময় এই জঙ্গলাকীর্ণস্থান আবাদ করিতে করিতে এই ঢাকেশ্বরী মূর্ত্তির পুনরুদ্ধার হয়। বাদশাহ এই সংবাদ পাইয়া তাঁহার কর্ম্মচারী দ্বারা দেবীর দৈনিক পূজার বন্দোবস্ত করেন। তদনুসারে পশ্চিমাঞ্চল বাসী লালা কায়স্থবংশীয় কএকজন ব্যক্তি পূজার ভার প্রাপ্ত হন। সরকার-পক্ষ হইতে মন্দির-নির্ম্মাণ ও পুষ্করিণী-খননের বন্দোবস্ত করা হয়। এই সময় হইতে লালা কায়স্থেরা মন্দিরের সেবাইত রূপে নিযুক্ত আছেন।

৩। কলিকাতার বিখ্যাত মল্লিক পরিবারের জনৈক বংশধর মঠ চারিটি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

৪। "মন্দির ও তৎসংলগ্ন স্থান ৫।৬ বিঘা হইবে। ইহা কোনও জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত নহে। ইহা বাদশাহের আমল হইতেই লাখেরাজ।

৫। "পূর্ব্বকালে সেবাইতদের বাড়ী ঢাকা উর্দ্দুবাজারে ছিল।

৬। "বর্ত্তমান সেবাইত:—শ্রীযুক্ত ব্রজলাল তেওয়ারী, উর্দ্দুবাজার; শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ শর্ম্মা, রমণা; শ্রীযুক্ত প্রতাপ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ঢাকেশ্বরী-বাড়ী; শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার দোবে, মাহুতটুলি; শ্রীযুক্ত নরসিংহ বন গোস্বামী, মালীবাগ।

শ্রীঅতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

চির-বাঞ্ছিত।

ভৈরবী—একতালা।

তোমারি বারতা পশেছে পরাণে
গলেছে পাষাণ মন,
তৃপ্ত করিয়া তৃষিত চিত্ত
প্রকাশিলে প্রিয়তম!

করুণা তোমার শতধারে আজ
ঝরিয়া পড়িছে অন্তর মাঝ,—
কোথায় দুঃখ, কোথায় দৈন্য,
কোথা ব্যথা অতুলন!

শান্তি পুলকে ডুবেছে আজিকে
বিরহি-হৃদয় মম,
অশ্রু সলিলে লভিয়া তোমার
মিলন নিবিড়তম!

রাখ নাই আর কিছু চাহিবার
পূর্ণ সকল আশা-কামনার,—
জীবনে এমনি তুমি থেকো শুধু
চির বাঞ্ছিত-ধন!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

মহাবীর আলেক্‌জাণ্ডারের সনাতন আর্য্যধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা।

প্রাচীনকালে মহাবীর যবনরাজ আলেক্‌জাণ্ডার দিগ্বিজয় উপলক্ষে দেশ-দেশান্তর অতিক্রম করিয়া যখন ভারতবর্ষে উপস্থিত হন, তখন এই পুণ্যক্ষেত্র ভারতে দণ্ডী নামে একজন জ্ঞানী ও বয়োবৃদ্ধ তপস্বী ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। আলেকজাণ্ডারের দূত ওনেসিক্রিটাস্‌কে কহ্লন্ রূঢ়ভাবে উত্তর প্রদান করিবার জন্য ইনি কহ্লন্‌কে তিরস্কার করিয়াছিলেন। গ্রীক্ (যবন) দার্শনিক ওনেসিক্রিটাসের সহিত কিছুক্ষণ সক্রেটিস্, পাইথাগোরাস, ও ডায়োজেনিসের মত অলোচনা করিয়া অকপটে তাঁহাদিগের জ্ঞানবত্তা স্বীকার করিয়া বলিয়াছিলেন যে, "আমি তাঁহাদিগের মধ্যে মাত্র একটি দোষ দেখিতে পাইতেছি যে, তাঁহারা স্বভাব অপেক্ষা বিধি ও পদ্ধতির অধিক সমাদর করেন। নচেৎ আমাদের ন্যায় নগ্ন থাকিতে তাঁহারা লজ্জা বোধ করিতেন না।"

মহাত্মা দণ্ডী একান্ত দৃঢ়তার সহিত দূতকে প্রত্যাখ্যান করেন; কোন সর্ত্তেই আলেক্‌জাণ্ডারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে স্বীকার করেন নাই। তাহাতে দূত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে বলেন যে, 'তাঁহাদের রাজা স্বর্গাধিপতি জুপিটারের পুত্র ও সসাগরা ধরিত্রীর অধীশ্বর; আপনি তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলে তিনি আপনাকে প্রভূত ধন দিবেন, কিন্তু অস্বীকৃত হইলে তাঁহাকে একটা ক্রুসে শলাবিদ্ধ করিয়া বধ করিবেন!' দণ্ডী দূতের এই কথা শ্রবণ করিয়া বলেন যে, 'আলেক্‌জাণ্ডার যে জুপিটারের পুত্র তাহা তিনি বিশ্বাস করেন না, এবং তাঁহার যে প্রকৃতই তেমন সম্পদ্ আছে, সে সম্বন্ধেও বিশেষ সন্দেহ আছে! কারণ, সম্পদ্ থাকিলে তিনি তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতেন এবং কদাচ এ প্রকারে আপনার ও সমগ্র পৃথিবীর পীড়া জন্মাইতেন না!' দণ্ডী আরও বলিলেন যে, "ধনে তাঁহার কোন প্রয়োজন নাই, তিনি ধন অভিলাষ করেন না। তিনি যে তাঁহাকে ভয়-প্রদর্শন করিতেছেন দণ্ডী তাহাতে ভীত নহেন। কারণ তিনি ইঁহাকে বধ করিলে তিনি তাঁহার জরাগ্রস্ত ভগ্নপ্রায় দেহ-পিঞ্জর হইতে মুক্ত হইয়া অধিকতর শান্তিময় স্থানে গমন করিবেন। তাহাতে তিনি কিছুমাত্র ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন না!"

ব্রাহ্মণদিগের অগাধ জ্ঞান সম্বন্ধে আলেক্‌জাণ্ডারের উচ্চ ধারণা থাকায় তিনি দণ্ডীর এবংবিধ উত্তরে রুষ্ট না হইয়া তাঁহার সাহস ও দৃঢ়-সংকল্পের প্রভূত প্রশংসা করিয়াছিলেন। অনন্তর তিনি দণ্ডীর নিকট এই মর্ম্মে এক পত্র প্রেরণ করিলেন যে, তিনি ব্রাহ্মণদিগের মতের সারবত্তা ও অসাধারণ জীবনোপায়—রীতি-নীতি সম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য্যজনক কথা শুনিয়াছেন, সেই বিষয় তাঁহার নিকট পরিজ্ঞাত হইবার জন্য ও সেগুলির শ্রেষ্ঠতা উপলব্ধি করিবার জন্য তাঁহার শিষ্য হইতে সমুৎসুক।

আলেক্‌জাণ্ডারসদৃশ দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ, সূর্য্য-সদৃশ তেজস্বী, দিগ্বিজয়ী রাজার এইরূপ বিনয়পূর্ণ লিপিপ্রাপ্ত হইয়া দণ্ডী প্রত্যুত্তরে তাঁহাকে উপদেশগর্ভ একখানি পত্র প্রেরণ করেন, তাহার ভাবার্থ এই,—

'আলেকজাণ্ডার! তুমি আমাদের জ্ঞান-গরিমার সহিত পরিচিত হইবার জন্য সমুৎসুক, কিন্তু আমি বিবেচনা করি যে, তুমি ইতোমধ্যেই জ্ঞানি-মণ্ডলীর শ্রেণীভুক্ত হইয়াছ। তবে, তোমাকে জ্ঞানী মনে করিবার পক্ষে একটি প্রধান অন্তরায় এই যে, তুমি মানবজাতিকে পরাভব করিবার জন্য ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ড স্বীয় শাসনাধীন করিবার জন্য অধিকতর উৎসুক। জ্ঞানী আপনাকে জয় করিতে, এবং বিনা আপত্তিতে সম্পূর্ণরূপে বিবেকের শাসনাধীন হইতে চেষ্টা করেন। তোমার প্রকৃতি এবং স্বাভাবিক উচ্চ আকাঙ্ক্ষা এপক্ষে অলঙ্ঘনীয় অন্তরায় স্বরূপ। তুমি আমাদিগের রীতি, নীতি ও পদ্ধতির বিষয় শিক্ষা করিতে ইচ্ছা করিয়াছ, কিন্তু আমি এ বিষয় তোমাকে শিক্ষা দিতে সাহস করি না; কারণ আমার সেরূপ বাক্‌পটুতা নাই এবং তুমিও যেরূপ নিরন্তর অস্ত্রশাস্ত্র চর্চ্চা লইয়া জীবনাতিপাত কর, তাহাতে আমার শাস্ত্রোপদেশ শুনিবার তোমার অবকাশ হইবে না। তথাপি এবিষয়ে যখন তোমার ইচ্ছা বলবতী হইয়াছে, তখন আমি একান্ত বিরত হইব না। তুমি কিন্তু এরূপ আশা করিও না যে, আমি তোমার মনোমত বাক্য দ্বারা চিত্তরঞ্জন করিতে প্রয়াস পাই। আমরা সরল প্রকৃতির লোক। আমরা কদাচ কোনও বিষয় অতিরঞ্জন বা গোপন

করিতে শিক্ষা করি নাই। ব্রাহ্মণদিগের জীবন পবিত্র ও সরল। সাংসারিক সুখেচ্ছা সাধারণ লোককে বিচলিত করে, কিন্তু ব্রাহ্মণগণ তদ্দ্বারা অনুমাত্রও বিচলিত হন না। বিবেকই আমাদের একমাত্র পরিচালক। আমরা যখন যে অবস্থায় থাকি, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকি। কোনরূপ দুর্ঘটনা ঘটিলেও আমরা তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্র অধীর হই না। আহারের পক্ষে আমাদের কোন আসক্তি না থাকায় রসনা-তৃপ্তিকর স্বাদু আহার কাহাকে বলে আমরা আদৌ জানি না। বিনা ক্লেশে ও বিনা পরিশ্রমে এই ধরণী-পৃষ্ঠে স্বতঃউৎপন্ন কন্দ ফলমূলাদি দ্বারাই আমরা ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া থাকি; একারণ আমাদের শরীরে কোন ব্যাধি নাই। আমাদের হৃদয়ে যে বিমল আনন্দ বিরাজ করে, তাহা অপরের দুঃখ-দর্শন ভিন্ন, অন্য কিছুতেই ব্যতায় হয় না। একমাত্র নির্ব্যূঢ় একতা—'সোঽহং' ভাব আমাদিগের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করিয়া আমাদের হৃদয় হইতে হিংসা, দ্বেষ, আকাঙ্ক্ষা ও পরশ্রীকাতরতা দূরীভূত করে। আমাদের জন্য কোনরূপ ধর্ম্মাধিকরণ আবশ্যক হয় না, কারণ আমরা কোনরূপ দুষ্কর্ম্ম করি না। যেসকল কঠোর বিধানদ্বারা দুষ্ক্রিয়ার শাসন করা হয়, আমরা ন্যায়পথে থাকিয়া সে সকল বিধির বহির্ভূত হইয়াছি। এমন কি,—আমরা পাপ-চিন্তা-পর্য্যন্ত মনে স্থান দিতেও কুণ্ঠিত হই; একমাত্র বিধি আমরা বিশেষ মান্য করি—আমরা স্বভাবের কোনরূপ নিয়ম—বিধির কোনও বিধান কদাচ ভঙ্গ করি না। আমরা কাহারও গ্লানি করি না—একারণ কাহারও নিকট আমাদিগকে ক্ষমাপ্রার্থনা করিতে হয় না। অর্থদ্বারা আমাদিগকে দণ্ডমুক্তি বা ক্ষমা-ক্রয় করিতে হয় না। অর্থলোভে বিচারকের হৃদয়ে যে দয়া উদ্ভূত হয়, তাহা দুষ্ক্রিয়াকারী অপেক্ষা বিচারককে অধিক দোষী করে। আমাদের নিকট আলস্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নিন্দনীয়। সুখ, দুর্ব্বলতা সৃষ্টি করে, এজন্য আমরা উহাকে ভয় করি। যে পরিশ্রমদ্বারা শরীরের পরিচালনা হয়, সেই পরিশ্রমই আমরা ভালবাসি; কিন্তু লাভের লোভে যে পরিশ্রম করিতে হয়, তাহা আমরা ঘৃণা করি। কেবল মাত্র জীবন-ধারণের জন্য যাহা প্রয়োজন হয়, তাহাই সংগ্রহ করিবার জন্য আমরা আয়াস স্বীকার করি। অন্য সকল প্রকার আয়াসই আমরা ঘৃণা করি, এবং সেগুলি পাপের দ্বার বলিয়া বিবেচনা করি। আমাদের ক্ষেত্রে কোনরূপ সীমা-নির্দ্দেশ নাই, বা তাহার কোন বিধানও নাই। আমাদের বিশ্বাস যে, এরূপ বিধান স্বাভাবিক নিয়মের সম্পূর্ণ বিরোধী। পৃথিবী সকলের জন্যই প্রচুর পরিমাণে শস্যাদি উৎপন্ন করে। সকলেই নিজ নিজ প্রয়োজনানুসারে তাহা গ্রহণ করিতে পারে। বিহঙ্গমগণ সুখে আকাশে উড়িয়া বেড়ায়, গবাদি পশু নির্ব্বিঘ্নে মাঠে চরিয়া বেড়ায় এবং মৎস্যগণ জলে ক্রীড়া করে, আমরা কখনও উহাদিগকে উৎপীড়িত করি না। আমরা যাহা চাই, তৎসমুদায়ই আমাদের আছে। আমাদের প্রয়োজনাতিরিক্ত কোন বিষয়ই আমরা আকাঙ্ক্ষা করি না। সম্পত্তি-অর্জ্জন করিবার বাসনা আমরা ভয়ে পরিবর্জ্জন করি। বাসনার বশবর্ত্তী হইলে হৃদয়ে সহস্র অভাবের সৃষ্টি হয়। মানব যতই অধিক ধনী হয়, ততই তাহার দারিদ্র্য বৃদ্ধি পায়। সূর্য্য-কিরণ আমাদের শীত-নাশ করে। শিশির আমাদিগকে শীতল করে। নদী আমাদিগকে ধৌত করে। ক্ষেত্রোৎপন্ন শাক ও সব্‌জি ফলমূলাদি আমাদের আহার্য্য। ভূমিই আমাদের শয্যা। দুশ্চিন্তা কখনও আমাদের নিদ্রার ব্যাঘাত করে না। মানসিক শান্তি আমাদের হৃদয়ে আদৌ চিন্তার উদ্রেক হইতে দেয় না। চিত্তের স্বাধীনতা আমাদিগকে সকল প্রকার ভয় ও বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়াছে। আমরা সকলকেই ভ্রাতৃভাবে দেখি, কারণ প্রকৃতি-দেবীর নিকট কাহারও পার্থক্য নাই, এবং সকলেই এক পরমপিতা পরমেশ্বরের সন্তান। তিনি যাহা দিয়াছেন তাহাতে সকলেরই সমান অধিকার। আমরা গৃহ-নির্ম্মাণের জন্য বৃক্ষচ্ছেদন করিতে ও পর্ব্বতকে খণ্ড খণ্ড করিতে জানি না। গৃহরূপে ব্যবহার করিবার জন্যই প্রকৃতি গুহা সৃষ্টি করিয়াছেন; তন্মধ্যে থাকিয়া আমরা ঝঞ্ঝাবাত, বৃষ্টি, শীত বা গ্রীষ্ম—কিছুরই ভয় করি না। আমরা জীবিতকালে এই সকল স্বভাবজাত গৃহে বাস করি এবং জীবনাবসানে সমাধিপ্রাপ্ত হই। *

* "সংত্যজ্য গ্রাম্যমাহারং সর্ব্বঞ্চৈব পরিচ্ছদং।
পুত্রেষু ভার্য্যাং নিক্ষিপ্য বনং গচ্ছেৎ সহৈব বা॥"

—মনু, ৬।৩।

যাহাতে কোমলতার লেশমাত্র নাই, এরূপ বৃক্ষত্বক্ বা পত্র পরিধান করিয়া আমরা লজ্জা নিবারণ করি। আমাদের মহিলাগণকে অলঙ্কারাদি দ্বারা ভূষিত করি না, এবং তাঁহারাও তাহাইচ্ছা করেন না। তাঁহারা জানেন যে,আড়ম্বর-যুক্ত পরিচ্ছদে সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধি না করিয়া কষ্টেরই বৃদ্ধি করে; যাবতীয় কলা একত্রিত হইলেও রূপের উৎকর্ষ সাধন বা অভাব পূরণ করিতে পারে না, এজন্য সে উপায় অবলম্বন বৃথা ও পাপজনক। আমাদের রমণীগণের যেরূপ স্বভাব তাহাতে তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে আমাদের স্নেহ-ভাজন হন। পরদার, ব্যভিচার প্রভৃতি স্বভাব ও ধর্ম্মবিরুদ্ধ পাপ কদাচ আমাদের মধ্যে আচরিত হয় না। আমাদের সমাজে সর্ব্বদা শান্তি বিরাজমান। নরহত্যার কথা ভাবিলেও আমাদের মনে বিভীষিকার উদয় হয়। আমরা কখনও অপরিচিতের সহিত বিবাদ করি না; এমন কি, আমরা অস্ত্র ধারণ করিতেই জানি না। আমরা শিষ্টাচার দ্বারা প্রতিবেশিগণের সহিত সদ্ভাব রক্ষা করি। লক্ষ্মীই আমাদের এক মাত্র শত্রু,—কেবল তাঁহারই সহিত আমাদের বিবাদ; কিন্তু সাধারণতঃ তিনি যে সকল বাণ আমাদের প্রতি নিক্ষেপ করেন,সেগুলি আমাদের আঘাত করিতে পারে না। যাহাতে অনিষ্ট হইতে পারে, সেরূপ কার্য্য আমরা করি না; সুতরাং ক্বচিৎ আমাদের অভিযোগ করিবার কারণ জন্মে। অকালমৃত্যু হইলেই আমরা তজ্জনিত পীড়া অনুভব করি, নতুবা পিতাকে পুত্রের অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ায় উপস্থিত থাকিবার সুযোগ বা আবশ্যক হয় না। যাহা কিছু সংঘটিত হয়, তৎসমস্তই ভবিতব্য বলিয়া জ্ঞান করি। আড়ম্বর বা সমারোহ করিয়া আমরা কখনও স্মৃতিমন্দির স্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হই না,—তাহাতে তন্মধ্যস্থিত ভস্মাবশেষের অবমাননা করা হয় বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। বস্তুতঃ পৃথিবী দুষ্ট হইবার ভয়ে যে বিকৃত শবকে অগ্নি-সংযোগে দগ্ধ করা হয়, তাহার অবশিষ্ট-অংশ অপেক্ষা নিকৃষ্ট, জঘন্য বস্তু আর কি হইতে পারে!”

আলেকজাণ্ডার যখন আনেসিক্রিটাসের মুখে শুনিলেন যে, লোভ বা ভয়-প্রদর্শনে দণ্ডী তাঁহার নিকট আসিতে কিছুতেই সম্মত নহেন, তখন ভুবনবিজয়ীর এই কৌপীনধারী বৃদ্ধব্রাহ্মণকে দেখিবার জন্য অতিশয় কৌতূহল জন্মিল। তিনি কতিপয় সহচর সহ দণ্ডী যে অরণ্যে বাস করিতেন তথায় গমন করিলেন আশ্রম সান্নিধ্যে উপনীত হইয়া অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন এবং রাজমুকুট প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া একাকী সেই ব্রাহ্মণসদনে গমন করিলেন। বৃদ্ধকে দেখিয়া সোৎসুকে তাঁহার চরণতলে উপবিষ্ট হইয়া বলিলেন,—‘দণ্ডিন্! পরমেশ্বর আপনার মঙ্গল করুন! আপনি আমার নিকট যাইতে অস্বীকৃত, তাই আমি স্বয়ং আপনার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলাম।’

দণ্ডী বলিলেন,—‘কি জন্য আসিয়াছ? এই নির্জ্জন স্থানে নিঃস্ব বনবাসীর নিকট এমন কি বস্তু আছে যাহা অপহরণ-মানসে তুমি সমুপস্থিত! তোমার কাম্য-বস্তু আমার নাই এবং আমার যাহা আছে তাহা তোমার পক্ষে লোভনীয় নহে! আমরা ভগবান্‌কে সম্মান করি, মনুষ্যকে ভালবাসি, সুবর্ণকে হেয় জ্ঞান করি ও মৃত্যুকে অবজ্ঞা করি। পক্ষান্তরে, তোমরা মৃত্যুকে ভয় কর, সুবর্ণকে সম্মান কর, মানবকে ঘৃণা কর এবং ভগবান্‌কে তাচ্ছিল্য কর।’

আলেক্‌জাণ্ডার বলিলেন, ‘আপনার জ্ঞানের কিয়দংশ আমাকে দান করুন। আমি লোকমুখে শুনিয়াছি যে, আপনি দেবভাবপূর্ণ এবং সতত ভগবদ্ধ্যান-ব্যাপৃত। এক্ষণে আমি জানিতে উৎসুক কি গুণে আপনি গ্রীক্‌দিগের অপেক্ষা মহৎ ও উচ্চ এবং কি কারণে আপনি অন্যান্য মানব অপেক্ষা সমধিক জ্ঞানী?’

দণ্ডী বলিলেন, ‘যদি তোমার হৃদয়ে ভগবদ্দত্ত বস্তু রাখিবার স্থান থাকিত, তাহা হইলে আমি যাহা ভগবানের নিকট পাইয়াছি তাহা স্বেচ্ছাক্রমে তোমাকে দিতাম। তোমার চিত্ত অসংযত, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, অদম্য অর্থলিপ্সা এবং বিকট সাম্রাজ্যতৃষ্ণায় আকুল। এ সমস্তই আমি পরমার্থের শত্রু বলিয়া জ্ঞান করি। তোমার অন্তঃকরণ হইতে ইহাদিগকে বিদূরীত করিবার জন্য আমার স্বতঃই ইচ্ছা হইতেছে। এখন তোমার বাসনা যেরূপ প্রবল তাহাতে তুমি সমুদ্রের পরপারে যদি পৃথিবীর অন্য কোন অংশ থাকে তাহাও জয় করিতে প্রস্তুত; কিন্তু যখন জয় করিবার আর কিছু থাকিবে না—তখন এই অতৃপ্ত বাসনাই তোমাকে পীড়া দিবে! সমস্ত পৃথিবীর অধিপতি হইয়াও যখন তুমি সন্তুষ্ট নহ,

তখন আমি কিরূপে তোমাকে সন্তোষ দান করিব! তুমি এই জগতের তুলনায় কতক্ষুদ্র, তথাপি এই জগৎ জয় করিতে ও সমগ্র মানবজাতির সর্ব্বস্ব অধিকার করিতে তোমার বাসনা! কিন্তু আমাকে তুমি যেটুকু ভূমিতে উপবিষ্ট দেখিতেছ, বা যেটুকু ভূমিতে তুমি উপবিষ্ট আছ, ইহা অপেক্ষা অধিক পরিসর ভূমি তুমি অধিকার করিতে পার না! আমি সকল মনুয্যের সহিত সমভাবে ভূমি, জল, বায়ু প্রভৃতি পৃথিবীর যাহা কিছু ভোগ করি; সুতরাং আমার যাহা আছে তাহাতে আমি ন্যায়ানুসারে অধিকারী। যদিও তুমি পৃথিবীর সমগ্র জলরাশির অধিপতি হও, তথাপি তুমি তোমার প্রয়োজনাতিরিক্ত অধিক জল পান করিতে পার না। প্রয়োজনের অধিক আকাজ্ক্ষা না করিলে সকল অভাবই পূর্ণ হয়;—বাসনাই দারিদ্র্যের জননী-স্বরূপ। বাসনারূপ ব্যাধির যথার্থ ঔষধ না জানিয়া তুমি ব্যাধি-মুক্ত হইবার কামনা করিতেছ। যে ব্যক্তি নিখিল-পদার্থের অধিকারী হইতে বাসনা করে, তাহার বাসনা কোন কালেও পূর্ণ হয় না! অধিকন্তু সে যাহা পাইয়াছে, তাহাতে শান্তিলাভ না করিয়া আরও অধিকতর লাভের আশায় অসীম যন্ত্রণা ভোগ করে। তুমি যদি আমার মত হইয়া আমার সহিত বাস কর, তাহা হইলে অসামান্য ধনের অধিকারী হইয়া পরমানন্দে সেই ধন ভোগ করিতে পার—তাহা হইলেই আমি তোমাকে জ্ঞানের প্রকৃত আস্বাদ গ্রহণ করাইতে সমর্থ হইব এবং আমার যে ঐশ্বর্য্য আছে, তুমি তাহারও অধিকারী হইতে পারিবে। আকাশ আমার চন্দ্রাতপ, ধারাতল আমার শয্যা, নদীর জল পেয় এবং সম্মুখবর্ত্তী ক্ষেত্রই আমার আহার্য্য-ভাণ্ডার। আমি শ্বাপদাদির ন্যায় অন্যপ্রাণী হিংসা করিয়া আহার করি না। অন্য জীবের রক্তমাংস আমার জঠরে প্রবিষ্ট হইয়া আমার দেহকে তাহাদের সমাধি-ক্ষেত্রে পরিণত করে না। শৈশবে যেমন আমি নির্দ্দোষ মাতৃদুগ্ধ পান করিয়া জীবন ধারণ করিতাম, এখনও তেমনই ফলমূল খাইয়া জীবন ধারণ করি। ইহাই স্বভাবানুগত কার্য্য। তুমি জানিতে চাহ, অপর ব্যক্তি অপেক্ষা আমার অধিক কি আছে এবং তাহাদের অপেক্ষা আমি কত অধিকজ্ঞান-সম্পৎশালী। তুমি ত দেখিতেই পাইতেছ যে, আমি যেভাবে সৃষ্ট হইয়াছিলাম, ঠিক তদনুরূপ প্রণালীতেই জীবন যাপন করিতেছি! মাতৃগর্ভ হইতে যেমন সম্পত্তিহীন ও চিন্তাশূন্য হইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলাম, এখনও ঠিক্ সেইরূপই আছি! ভগবান্ কি করিয়াছেন, করিতেছেন, ও পরে কি করিবেন—আমি সকলই জানি! তোমরা ভবিষ্যদ্বাণী শুনিয়া বিস্মিত হও; কারণ তোমরা দুর্ভিক্ষ, মহামারী, যুদ্ধ, অনাবৃষ্টি ও শস্যসমৃদ্ধি প্রভৃতি ভগবানের কার্য্যের কারণ কিছুই নিরাকরণ, উপলব্ধি করিতে পার না। এ সকল কেন সংঘটিত হয়, কিরূপে হয়, এবং কি জন্য হয়,—সে সকল কার্য্য-কারণসম্বন্ধ আমার অবিদিত নাই!'

আলেক্জাণ্ডার ধীরভাবে এই কথা শুনিয়া কিঞ্চিন্মাত্রও অসন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি প্রত্যুত্তরে প্রাজ্ঞ মনীষী দণ্ডীকে বলিলেন, 'আমি আপনার সমস্ত কথার সত্যতা সম্যক্রূপে উপলব্ধি করিতেছি। আপনার পবিত্রবংশে জন্ম, যেখানে আপনার বাস তথায় আহার্য্য প্রভৃতি উপকরণের অপর্য্যাপ্ত ভাণ্ডার প্রকৃতিরাণী স্বতঃই উন্মুক্ত রাখিয়াছেন, সুতরাং কোনও বিষয়ে আপনার আদৌ কোনরূপ ক্লেশ হয় না এবং জীবনাবধি পরম আনন্দ-উপভোগে যাপিত হয়। আপনি পূর্ণশান্তির মধ্যে প্রকৃতির সমস্ত ঐশ্বর্য্যে ঐশ্বর্য্যবান্ হইয়া আছেন। আমি অবিরাম কোলাহল ও অনন্ত ক্লেশের মধ্যে বাস করি। আমার বেতনভোগী যে সকল ব্যক্তি আমার রক্ষার জন্য নিযুক্ত, তাহাদিগকেও আমি ভয় করি। মিত্রবর্গ হইতে আমার যত অধিক আশঙ্কা, শত্রুবর্গ হইতে তত নহে। প্রতিনিয়ত, শত্রুসেনা অপেক্ষা মিত্রের বিশ্বাসঘাতকতার ভয় আমার অধিক। নিরাপদ হইবার জন্য প্রহরী নিযুক্ত করিয়া তাহাদিগের ভয়েই অস্থির হইতে হয়। আমি অবিরাম দুশ্চিন্তা লইয়াই জীবন যাপন করি—আমার জীবনের দিবাভাগ কেবল অপরের দুঃখ-বিধান ও বিনাশ-সাধন করিতে অতিবাহিত হয়। পাছে কোন শত্রু অকস্মাৎ প্রচ্ছন্নভাবে আমাকে নিহত করে, এই ভয়েই আমি সতত শঙ্কিত। আমি যাহাদিগকে ভয় করি তাহাদিগকে শত্রু জানিয়াও বধ করিতে পারি না—পাছে তাহাতে লোকের ঘৃণাভাজন হই। ধীর ও মৃদুস্বভাব হইলেও জনসমাজে নিন্দনীয় হইবার ভয় আছে। কিরূপে যে এইরূপ বহুতর বিপদ হইতে উদ্ধার হইতে পারিব, আমি ত তাহা ভাবিয়া পাই না। যদি আমি সংসারত্যাগ করিয়া আপনার সহিত এই বিজন প্রদেশে বাস

করিতে চেষ্টা করি তাহাও আমার পক্ষে অসাধ্য ! আমি যে পদে আছি, সে পদত্যাগ করা আমার পক্ষে অসম্ভব; সুতরাং আমার এইমাত্র আশা যে, ভগবান্ যখন আমাকে এই পদে অধিষ্ঠিত করিয়াছেন, তখন তিনি অবশ্যই আমার এই সকল ক্রটি মার্জ্জনা করিবেন।'

'হে মহানুভব প্রাজ্ঞবর ! আপনি ধীরভাবে আমার সমস্ত দুঃখের কাহিনী শ্রবণ করিয়াছেন। আপনার জ্ঞানগর্ভ বাক্যদ্বারা আমার শোকমগ্ন হৃদয় আশ্বস্ত হইয়াছে ! এক্ষণে আপনার অমূল্য জ্ঞানগর্ভ উপদেশাবলীর গুরু-দক্ষিণা-স্বরূপ আপনার জন্য যে আনীত উপঢৌকন গুলি অনুগ্রহপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া আমাকে কৃতার্থ করুন; প্রত্যাখ্যান করিয়া আমার প্রতি ঘৃণাপ্রকাশ করিবেন না।'

আলেকজাণ্ডার এই কথা বলিলে পর, তদীয় দাসগণ উপহার-সম্ভার উপস্থিত করিয়া বহুমূল্য আশ্চর্য্য কারু-কার্য্য সম্বলিত স্বর্ণ ও রৌপ্য পাত্রে যাবতীয় উপঢৌকন-দ্রব্য সাজাইয়া দিল এবং তৎসঙ্গে বহুল পরিমাণ ঘৃত ও পিষ্টক স্থাপিত করিল। দণ্ডী ইহা দেখিয়া হাস্য সংবরণ করিতে পারিলেন না। অবশেষে বলিলেন, 'এই অরণ্যস্থিত বিহঙ্গকুলকে স্বর্ণ ও রৌপ্যের প্রলোভন দেখাইয়া কে মধুর সঙ্গীত-বর্ষণে প্রবৃত্ত করিতে পারে ? যদি তাহা অসম্ভব হয়, তবে আমাকে ঐ বিহঙ্গগণ অপেক্ষা হীন বিবেচনা করিবার কি কারণ আছে ! আমি যাহা আহার বা পান করি না, সেরূপ দ্রব্য কেন গ্রহণ করিব ? এযাবৎকাল মুক্ত থাকিয়া এই বৃদ্ধ বয়সে কেন প্রয়োজনাতিরিক্ত দ্রব্য গ্রহণ করিয়া শেষদশায় নিজেকে বদ্ধ ও জড়িত করিব ? এই জনসমাগমশূন্য প্রদেশে যাহা আমি বিনিময় দিতে পারিব না, তাহা কদাচ গ্রহণ করিতে পারি না। ভগবান্ এখানে আমার চতুষ্পার্শেই যথেষ্ট ফলমূল সাজাইয়া রাখিয়াছেন। আমি স্বেচ্ছামত ঐ সকল আহরণ করিয়া ভোজন করি। ভগবান্ অর্থ লইয়া মনুষ্যকে কোন ফলই বিক্রয় করেন না; যাঁহারা তাঁহার শিক্ষা গ্রহণ করিতে সমর্থ, তাহাদিগকে তিনি উহা বিনামূল্যে বিতরণ করেন। যে পরিচ্ছদে আমাকে জগতে আনয়ন করিয়াছেন, সেই পরিচ্ছদই আমার আছে। অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বস্ত্রাচ্ছাদিত না থাকায় আমি স্বচ্ছন্দে মুক্ত বায়ু উপভোগ করি ! ক্ষুধা ও তৃষ্ণা নিবারণকল্পে আমি যাহা আহার ও পান করি, তদপেক্ষা সুমিষ্ট আর কিছু হইতে পারে না। এই পিষ্টকগুলি যদি স্বতঃই সুস্বাদু হইত, তাহাহইলে এগুলিকে অগ্নিপক্ক করা হইয়াছিল কেন ? আমি আমার আহার্য্যদ্রব্য অগ্নি-স্পৃষ্ট হইতে দিই না। পশু-মাংস ভক্ষণ করিলে যেরূপ প্রকারান্তরে পশুর অবস্থান্তরিত আহার্য্য বস্তুই আহার করা হয়, তদ্রূপ অগ্নি-সংযোগে কোন পদার্থ অবস্থান্তর করিয়া খাওয়াও সমান; সুতরাং এই সকল পক্ক পিষ্টক তুমি লইয়া যাও। তবে পাছে তুমি মনে কর যে, আমি তোমার উপহারের প্রতি অবজ্ঞা করিতেছি, তজ্জন্য আমি এই ঘৃত গ্রহণ করিলাম।'

দণ্ডী এই কথা বলিয়া অরণ্য হইতে অনেকগুলি শুষ্ক কাষ্ঠ আহরণপূর্ব্বক উহাতে অগ্নি-সংযোগ করিয়া আলেক্জাণ্ডারকে বলিলেন যে, 'ব্রাহ্মণের সমস্ত বস্তুই আছে—ব্রাহ্মণ যাহা অভিলাষ করেন, তাহাই ভোগ করিতে পারেন!' এই বলিয়া প্রজ্বলিত হুতাশনে ঘৃতাহুতি দিয়া, তৎসমক্ষে অতি সুস্বরে সর্ব্ব-অভাব-মোচনকর্ত্তা সর্ব্ব-দাতা পরমেশ্বরের স্তব গান করিতে লাগিলেন।

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আলেক্জাণ্ডার ভক্তি প্রীতি বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। ঘৃত ব্যতীত সমস্ত দ্রব্যই প্রতিপ্রেরণ করিয়া ক্ষণপরে নিজেও স্বস্থানে প্রস্থান করেন।

তিনি চলিয়া যাইবার সময়ে দণ্ডী তাঁহাকে আরও অনেক উপদেশ দিয়া, অবশেষে বলিলেন, 'মনে রাখিও বৎস, ব্রাহ্মণদিগের স্বভাবই এইরূপ—যাহা দেখিলে ও শুনিলে তাহাই ব্রাহ্মণের ধর্ম। কহ্লনের স্বভাব দেখিয়া ব্রাহ্মণের বিচার করিও না। কহ্লন সমাজ-ত্যাগী—যাবনিক আচার ও ব্যবহার অনুকরণকারী—একারণ তাঁহাকে মনুষ্যাধম বলিয়া জানিও।'

শ্রীশরচ্চন্দ্র দাশ।

ষ্টীমার পার্টি।

(১)

গর্ব্বোৎফুল্ল আননে একটু হাসিয়া হেমেন্দ্র বাবু বলিলেন, "এইবার চোরেদের ব্যবসা উঠিল!"

হেমেন্দ্র বাবু কলিকাতার কোনও কলেজের বিজ্ঞান-অধ্যাপক। শ্যামবাজারের নিকট একটি ক্ষুদ্র পল্লীতে তাঁহার বাস। পাড়ায় কিছুদিন হইতে চোরের উপদ্রবে লোকে ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিল। আজ এ-বাড়ীতে কাল ও বাড়ীতে চুরি হইতেছে, অথচ পুলিশের বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও তাহার কোন প্রতিকার হইতেছে না! বৈজ্ঞানিক হেমেন্দ্র বাবু ভাবিয়া চিন্তিয়া এক প্রকার ঘণ্টা আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা দরজায় লাগাইয়া রাখিলে, কেহ দরজা খুলিবার চেষ্টা করিবামাত্র উহা আপনিই বাজিয়া উঠিবে!

হেমেন্দ্র বাবু বলিতে লাগিলেন,—"হিসাব করিয়া দেখিলাম, সাড়ে এগার আনা করিয়া এক একটি ঘণ্টার খরচ পড়িবে। যে গৃহস্থের বাড়ীতে ২০টা দরজা, সে ১৪৶০ খরচ করিলেই একেবারে নিশ্চিন্ত! বাড়ীতে চুরি হইবার আর কোন ভয় থাকিবে না।"

আমি একটু হাসিয়া বলিলাম, "চোরেরা কি দরজা না খুলিয়া বাড়ী ঢুকিতে পারে না?"

হেমেন্দ্র বাবু অত্যন্ত নিরীহ-প্রকৃতির লোক হইলেও তাঁহার আবিষ্কারগুলিসম্বন্ধে কেহ কোন প্রতিবাদ করিলে, আদৌ সহ্য করিতে পারিতেন না। তিনি রাগান্বিত হইয়া বলিলেন, "দরজা দিয়ে আস্‌বে না ত দেওয়াল ফুঁড়ে আস্‌বে? তোমাদের মত যাহারা বিজ্ঞান অবহেলা ক'রে আর্ট-কোর্স পড়ে, তাহাদের practical বুদ্ধিটা বড় অল্প হয়!" হেমেন্দ্রবাবুর "practical বুদ্ধি" সম্বন্ধে এস্থলে বলা উচিত যে, তিনি প্রায় প্রতি মাসেই জনসমাজের হিতার্থে একটা না একটা নূতন কিছু আবিষ্কার করিতেন। তিনি ধনি-সন্তান, কলেজেও মোটা বেতন পাইতেন। উপরন্তু তিনি পত্নীহীন, তাঁহার সংসারের ব্যয়ও সামান্য। উপার্জ্জনের টাকাটা প্রায় সমস্তই বৈজ্ঞানিক আলোচনা ও আবিষ্কারের হিসাবেই খরচ হইত; কিন্তু দুঃখের বিষয় এ পর্য্যন্ত তাঁহার সব আবিষ্কার, তাহার একটাও জগতের কোন কাজে লাগিল না। তাঁহার ধান ছাঁটা কল, কলার বাসনা হইতে সূতা বাহির করিবার কল, শিরঃপীড়া-নিবারক বৈদ্যুতিক যন্ত্র, জল-গামী দ্বিচক্র-যান, ইত্যাদি কেবল তাঁহার বিশৃঙ্খল গৃহের আবর্জ্জনাই বৃদ্ধি করিত।

আমি আস্তে আস্তে বলিলাম,—যা'ক্, "চুরি ব্যবসায়টা ত এ পৃথিবী হইতে উঠিয়া গেল। এখন হেমেন্দ্র বাবু যদি একটা মশা আর ছারপোকা মারিবার কল বাহির করেন, তবে পৃথিবীর বাকী দুঃখের অনেকটা লাঘব হয়। কাল সমস্ত রাত্রি ছারপোকার অত্যাচারে ঘুমাইতে পারি নাই।"

ক্রুদ্ধস্বরে হেমেন্দ্র বাবু বলিলেন, "জগতের সমস্ত উন্নতির চিরন্তন শত্রু হচ্চে চিন্তাহীনের বিদ্রূপ।"

আমি বলিলাম, "আপনার বাড়ীতে একদিন সত্য সত্যই চোর আসে, ত আপনার একটু শিক্ষা হয়"।

হেমেন্দ্র বাবু বলিলেন, "আমার বাড়ীতে—যদি আমার অজ্ঞাতে কেহ আসিয়া চুরি করিয়া যাইতে পারে, তবে তাহাকে আমি পুলিশে না দিয়া বরং ৫০০৲ টাকা বখ্‌শিশ্‌ দিব।"

আমি চায়ের বাটি ও চেয়ার ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া বলিলাম, "কেমন Honor bright?—কথা ঠিক ত? ৫০০৲ টাকা বখ্‌শিশ্‌?"

হেমেন্দ্র বাবু বলিলেন, "আমার কথার নড়চড় হয় না"।

এ কথাটা সত্য। সকলেই জানিত, হেমেন্দ্র বাবুর কথার কখনও ব্যতিক্রম হয় না।

(২)

বাড়ী ফিরিয়া আসিবার পর নানাবিধ মতলব মাথায় গজাইতে লাগিল। হেমেন্দ্র বাবুর ঘণ্টা-রক্ষিত বাড়ী হইতে কোন জিনিষ চুরি করিয়া তাঁহার নিকট ৫০০৲ টাকা আদায় করিতেই হইবে, এবিষয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলাম।

অবশ্য অর্থলাভ উদ্দেশ্য নহে। আমি সম্পত্তিশালী পিতার একমাত্র সন্তান; বি, এ, পাশ করিয়া বাড়ীতে বসিয়া আছি; অভাব কিছুরই নাই; কিন্তু দর্পীর দর্পচূর্ণ করা কর্ত্তব্য; সুতরাং স্থির করিলাম যে, টাকাটা আদায় করিয়া বন্ধুবান্ধবদের একটা বড় ষ্টীমার পার্টি দিব;—হেমেন্দ্র বাবুরও দর্পের মূলেও কুঠারাঘাত করা হইবে।

ষ্টীমার পার্টিতে কোন্ বাবদে কি খরচ হইবে, তাহারও একটা খস্‌ড়া হিসাব মনে মনে ঠিক করিলাম।

আমি কুস্তি, বারের খেলা, জুজুৎসু ইত্যাদি নানা ব্যায়ামে অভ্যস্ত;—সামান্য একটা বাঁশের সাহায্যে অনায়াসে দ্বিতলের ছাদে উঠিতে পারি,—শরীরে বলও যথেষ্ট ছিল; সুতরাং সংকল্প সাধন করা আমার পক্ষে কিছুমাত্র আয়াস-সাধ্য বলিয়া মনে হইল না।

তখন ৺পূজা নিকটবর্ত্তী। বাবা ৪।৫ দিনের মধ্যেই পশ্চিম বেড়াইতে যাইবেন।—সুতরাং বেশ সুযোগ উপস্থিত! পাছে কৌতুকের-হ্রাস হয়, তজ্জন্য বন্ধুবান্ধবদের কাহারও নিকট অভিসন্ধিটা আগে প্রকাশ করিলাম না।

(৩)

সন্ধ্যার ট্রেনে পিতাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া বাড়ী ফিরিলাম। সেদিন মহালয়া,—অমাবস্যার ঘোর অন্ধকার। চৌর্য্য বিদ্যাবিশারদগণের মাহেন্দ্রক্ষণ!

রাত্রি ১২টার সময় আঁটা কোট পরিয়া, মাল.কাঁচা দিয়া কাপড় পরিয়া, হেমেন্দ্র বাবুর বাটীর নিকট উপস্থিত হইলাম। দেখি, বাটীর সদর দরজা বন্ধ। উপরের জানালাও খোলা নাই। বাটীর পার্শ্বে নর্দ্দমা-ভরাটি একটি সরু গলি। সেই পথ দিয়া গিয়া বাটীর পশ্চাদ্‌ভাগে দেখিলাম দ্বিতলের একটি মাত্র জানালা দিয়া আলোক আসিতেছে। অবশিষ্ট দরজা জানালাগুলি রুদ্ধ।

বাটীর পশ্চাতে একটা লোহার নল; নীচের ড্রেণ হইতে দূষিত বাষ্প বাহিরের জন্য দ্বিতলের ছাদ পর্য্যন্ত গিয়াছে।

প্রাচীর ডিঙ্গাইয়া লোহার নলের সাহায্যে অবলীলাক্রমে উপরে উঠিলাম। তারপর, পায়খানার নীচু ছাদ হইতে দ্বিতলের বারান্দায় লাফাইয়া পড়া খুব সোজা হইল; কিন্তু লাফাইতে গিয়া একটা জলপূর্ণ বাল্‌তির উপর পড়ায়, সেটি পড়িয়া গেল এবং গড়াইতে গড়াইতে একটা খালি ঘটির সহিত তাহার ঘাত-প্রতিঘাত হওয়াতে শব্দ বিজ্ঞানের নির্দ্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে একটা "ঠনন্‌ঠন্" ধ্বনিযুক্ত বায়বীয় তরঙ্গ বাড়িময় ছড়াইয়া পড়িল!

মনে ভয় হইল যে, হেমেন্দ্র বাবু যদি জাগিয়া উঠেন ও জানিতে পারেন—তা' হ'লেই ত সমূহ বিপদ! হেমেন্দ্র বাবুর দর্পচূর্ণ বা তাঁহার টাকায় ষ্টীমার পার্টি হওয়া দূরে থাক্,—নিজেই অপদস্থ ও বন্ধু-সমাজে হাস্যাস্পদ হইব। রুদ্ধনিঃশ্বাসে চারিদিক্ দেখিতে লাগিলাম।

সহসা একটা মোটা গলায় শব্দ হইল, "কেও"?—একি হইল?—এ ত হেমেন্দ্র বাবুর গলা নহে!—তাঁহার বাটীর অন্য কাহারও গলা বলিয়াও ত মনে হইল না!

মোটা গলা আবার হুঙ্কার করিল—"কে ঘটি নাড়ে?" অবস্থা সুবিধাজনক নয় ভাবিয়া পলাইবার অভিপ্রায়ে লোহার নলের দিকে অগ্রসর হইতেছি, এমন সময় সম্মুখের একটা দরজা উন্মুক্ত হইয়া একজোড়া সবল হস্ত আমায় জড়াইয়া ধরিল! সঙ্গে সঙ্গে "চোর,—চোর" "পাকড়াও—ধরো" ইত্যাদি শব্দে সুষুপ্ত—পল্লী প্রকম্পিত হইয়া উঠিল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমার ব্যায়ামপুষ্ট অঙ্গপ্রত্যঙ্গে বল ও ক্ষিপ্রকারিতার অভাব ছিল না। আমি তড়িদ্বেগে আপনাকে মুক্ত করিয়া লোহার নল সাহায্যে তাড়াতাড়ি নামিয়া পড়িলাম। নলটি ভূমি হইতে কএক হাত উচ্চে,—আমি নল ছাড়িয়া লম্ফ দিলাম; কিন্তু আমার পদদ্বয় মাটী স্পর্শ না করিতে করিতেই শরীরটা কতকগুলা মানুষের হাতে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ হইল। দেখি—একজন পুলিশের জমাদার ও একজন কনেষ্টবল আমায় লুফিয়া লইয়াছে!

এস্থলে পাঠকের বিস্ময় হইতে পারে যে, কলিকাতা সহরে দুইচারি বার ডাকাডাকি করিবামাত্র কি করিয়া সত্য সত্যই পুলিশ আসিয়া উপস্থিত হইল!—ইহার হেতু, বোধ হয় গত কএক দিন চোরের দৌরাত্ম্য অত্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রভুদের সুনিদ্রার কিছু ব্যাঘাত ঘটিয়াছিল।

যাহা হউক, তাহারা আমাকে ধরিয়া বাটীর ভিতর—উপরে লইয়া চলিল। যাইতে যাইতে আমি আসল ব্যাপারটা জমাদারকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু বিশেষ কৃতকার্য্য হইলাম বলিয়া মনে হইল না। উপরে গিয়া দেখি বাড়ীশুদ্ধ লোক জাগিয়া একত্র সম্মিলিত হইয়াছে;—কিন্তু কৈ,—তাহার মধ্যে ত হেমেন্দ্রবাবু বা তাঁহার বাড়ীর অপর কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না!

একটি প্রবীণ ভদ্রলোক আমার মুখের দিকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, 'তাই ত, চোর্‌টার চেহারাটা চোয়াড়ে চোয়াড়ে হ'লেও কতকটা যেন ভদ্রলোকের মত!" জমাদার ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "উয়োর সে বহুৎ ভালা চেহারার চোর হামলোগ্ কেতো দেখিয়েছে।" ভদ্রলোকটি জিজ্ঞাসা করিলেন, "লোক্‌টা বলে কি?" জমাদার উত্তর করিল, "বল্‌বে কি উয়োর মাথা আর মুণ্ডো। কবুল দিচ্ছে—কবুল দিচ্ছে—বলে কোন্ হিমিন্দার বাবুর বাড়ি চোরি কর্‌তে আসেছিলো।" বাবুটি বলিলেন "ওহো, হেমেন্দ্রবাবু! এই পাশের বাড়ী থাকেন্ বটে। পরশু রাত্রে তাঁরা সবাই দেশে গেছেন।"

একটি প্রবীণ ভদ্রলোক বলিলেন,—'চেহারাটা চোয়াড়ে চোয়াড়ে হ'লেও ভদ্রলোকের মত!

অবস্থাটা তখন কতক হৃদয়ঙ্গম হইল। যে বাড়ীতে ঢুকিয়াছিলাম, তাহা হেমেন্দ্রবাবুর বাড়ীর পশ্চাদ্ভাগ নহে,—একটা ভিন্ন বাড়ীর। দুইটী বাড়ীরই গোলাপী রং, তাই একইবাড়ী বলিয়া আমার ভ্রম হইয়াছিল!

হেমেন্দ্রবাবুর সহসা দেশে যাওয়ার সংবাদটাও ভাল বোধ হইল না; বুঝিলাম ব্যাপারটা ক্রমেই ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছে।

আমি বাবুটিকে প্রকৃত অবস্থা বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম; কিন্তু জমাদার সাহেব মহা তর্জ্জনগর্জ্জন করিয়া আমায় "জাস্তি বক্ বক্" করিতে নিষেধ করিলেন।

তারপর আমার তল্লাসী লওয়া হইল।—বস্ত্রাদি অনুসন্ধান করিয়া, পকেটে একখানি কলমকাটা ছুরি ও যৎকিঞ্চিৎ অর্থ সম্বলিত একটি 'মনিব্যাগ' পাওয়া গেল। ছুরিখানি হাতে লইয়া জমাদার প্রভু গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "বাপ্! ইয়ে তো ঘাব্বি বদ্‌মাস্ আছে। ছুরি লিয়ে চোরি কর্‌তে আসেছিলো, খুন্ ভি কর্‌তে সখ্‌তো!"—কথাটা শুনিয়া সকলের মুখেই একটি আতঙ্কের রেখা অঙ্কিত হইল! ভয়াবহ অপমৃত্যুর সম্ভাবনা হইতে রক্ষা পাইয়া, কেহ কেহ ভগবানের নাম উচ্চারণ করিলেন। 'মনিব্যাগ্'টি কোথা হইতে চুরি করিয়াছি, সে সম্বন্ধেও অনুসন্ধান করিবার কথা হইল।

তাহার পর, এদিক্ ওদিক্ খুঁজিতে খুঁজিতে বারাণ্ডার এক কোণে আবর্জ্জনারাশির মধ্যে একটি ভগ্ন লোহদণ্ড পাওয়া গেল; বোধ হয় পুরাতন হাতার বাঁট! প্রহরীপ্রবর সেটি তুলিয়া লইয়া সোল্লাসে বলিলেন, "আরে ইয়ে সিঁধ্ কাটি ভী আছে, পালাবার বখৎ ফেলিয়ে গিছ্‌লো।

আমি জমাদারের ধমক্ খাইয়া অবধি নিস্তব্ধ ছিলাম;

কিন্তু নিতান্ত অযৌক্তিক কথটা আমার 'লজিক্'-পড়া মস্তিষ্কে দারুণ আঘাত করিল। আমি তর্ক ধরিলাম যে, "যখন আমি পাচীল ডিঙিয়ে বাড়ীতে প্রবেশ করিলাম, তখন সঙ্গে সিঁধ্‌কাটী আনিবার আমার কি আবশ্যক হইতে পারে?" আমার কথা শেষ হইতে না হইতেই পাহারাওয়ালা সাহেব আমার মুখের উপর একটি প্রবল চপেটাঘাত করিয়া বলিলেন, "চোপ্!" আমি রাগিয়া বলিলাম, "আরে মারতা হ্যায় কাহে? আগর হাম্—"! পুনর্ব্বার চপেটাঘাত ও "চোপ্‌রাও।" এরূপ অকাট্য যুক্তির উপর আমার আর তর্ক চলিল না; —কাজেই আমি নীরব হইলাম।

আরও খানিকক্ষণ তদারকের পর পুলিশ কর্ম্মচারীরা চোর (অর্থাৎ অহং শ্রীসমরেন্দ্র কৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায়, বি,-এ,) এবং চোরের নিকট প্রাপ্ত সম্পত্তি (অর্থাৎ ছুরি, মণিব্যাগ্ ও সিঁধ্‌কাটী) লইয়া থানায় চলিলেন।

৪

বদ্ধহস্তে পুলিশ-প্রহরী সমভিব্যাহারে সদর রাস্তা দিয়া চলিলাম। সৌভাগ্যক্রমে তখন গভীর রাত্রি, পল্লীবাসী প্রায় সকলেই নিদ্রিত! নতুবা অপমানটি আরও একটু অধিক মাত্রায় হইত।

এমন সময়ে একটা গুরুতর দুর্ব্বুদ্ধি ঘটিল। বাস্তবিক মূর্ত্তিমতী কুবুদ্ধি ঠাকুরাণী সে রাত্রে আমার স্কন্ধে পূর্ণভাবে ভর করিয়া ছিলেন। আমার মনে হইল, "পলাইলে হয় না? তাহা হইলেই ত সমস্ত ঝঞ্ঝাট মিটিয়া যায়।"

যেমন চিন্তা, তেমনই কার্য্য। জুজুৎসুর কৌশল অবলম্বনে আপনাকে পাহারাওয়ালার কবল হইতে নিমেষমধ্যে মুক্ত করিয়া ও জমাদারকে সবল পদাঘাতে ভূপৃষ্ঠে শায়িত করিয়া, পার্শ্বস্থ এক ক্ষুদ্র গলির ভিতর দৌড়াইলাম। শান্তিরক্ষকদ্বয়ও "চোর,—চোর,—আসামী ভাগা" শব্দে আমার পশ্চাদ্ধাবিত হইল। আমি দ্রুতবেগে এ-গলি সে-গলি করিয়া শীঘ্রই অনুসরণকারীদিগের চক্ষের অন্তরাল হইলাম।

কিন্তু সে রাত্রির দুর্ভোগ যে, এত শীঘ্র অবসান হইবে, বিধাতা পুরুষ ঘেঁঠেরা-পূজার রাত্রে এরূপ বিধান আমার ললাটে লেখেন নাই। আমি আমায় নিরাপদ ভাবিয়া যেমন একটি গলির মুখ হইতে বাহির হইতেছি, তেমনই একদল পাহারাওয়ালার "ফাইলে"র সম্মুখে পড়িয়া গেলাম! "মরিয়া" হইয়া পলায়নের চেষ্টা সত্ত্বেও শীঘ্রই আবার বন্দী এবং নাতিবিলম্বে পূর্ব্ব-জমাদারের হস্তে সমর্পিত হইলাম!

তাহার পর যাহা হইল, তাহা বর্ণনা করিয়া আর কোমল-হৃদয় পাঠক-পাঠিকার চিত্তে এ অভাজনের প্রতি করুণার উদ্রেক করিতে চাহি না। তবে, এই পর্য্যন্ত বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, সে দিন ১৮ই আশ্বিন—আর ১৮ই কার্ত্তিক তারিখেও তৈল মাখিবার সময় দেখিয়াছি যে, আমার শরীর হইতে সে রাত্রির স্মৃতিচিহ্ন সকল এককালে বিলুপ্ত হয় নাই!

রাত্রি প্রায় ২টার সময় থানায় নীত হইলাম।

৫

শ্যামবাজারের চুরির কিনারা হইয়াছে, আসামী গ্রেপ্তার, —এই সংবাদ প্রচারিত হইবামাত্র থানার প্রায় সমস্ত লোক আফিস ঘরে সমবেত হইল। ইন্‌স্পেক্টারবাবু চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে উপর হইতে নামিয়া আসিলেন এবং জমাদার ও পাহারাওয়ালার বিস্তর "তারিফ্" করিতে লাগিলেন। তাহার পর চুরির কাহিনী শুনিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিলেন, "পুরাণ চোর নিশ্চয় বটে, একবার মুখটি আলোতে ভাল করিয়া দেখা যাক্।"—এই বলিয়া আমার কাণ্‌টা ধরিয়া টানিলেন।

"কাণ টানিলে মাথা আসে" সর্ব্ববাদিসম্মত চিরন্তন সত্য; সুতরাং আমার বাম কাণটি হস্তদ্বারা আকৃষ্ট হইবামাত্র, সঙ্গে সঙ্গে আমার মাথাটাও ইন্‌স্পেক্টার বাবুর সম্মুখে উপস্থিত হইল।

ভাল করিয়া দেখিয়া ইন্‌স্পেক্টর বাবু বলিলেন, "হুঁ, মুখ্‌টা খুব চেনা চেনা বটে। তবে কোন্ কেসের দাগী, ঠিক মনে হ'চ্চে না। বড় আফিসে আঙ্গুলের টিপ্ পাঠাও, আর তোমরা সবাই একবার দেখ, চিন্‌তে পার কি না।"

তাঁহার পক্ষে আমার মুখটি "চেনা চেনা" বোধ হইবার কারণ বুঝিতে আমার বাকী রহিল না। আমি, ইন্‌স্পেক্টার বাবুকে দেখিয়াই চিনিয়াছিলাম যে, তিনি আমার শ্বশুরের অতি ঘনিষ্ঠ কুটুম্ব। গত বৎসর বিবাহের সময় শ্বশুর বাড়ীতে ইঁহাকে দেখিয়াছিলাম; কিন্তু নূতন শ্বশুরবাড়ীর

...কের নিকট এরূপ অবস্থায় আত্ম-পরিচয় দিতে কুবুদ্ধি ঠাকুরাণী নিষেধ করিলেন ; বরং তিনি যে আমাকে চিনিতে পারেন নাই, ইহাই সৌভাগ্য মনে হইল।

ইন্‌স্পেক্টার বাবুর কথামত সকলেই আমার মুখের দিকে চাহিতে লাগিল। একজন বৃদ্ধ জমাদার একটু সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি করিয়া বলিয়া উঠিল, "আরে ইয়ে তো যোড়াবাগান্ কা অজ্জুন্ সাও। উয়ো বরস্ গোরু চুরি কেসে ইয়ের ছ'মাহিনা মেয়াদ্ হইয়েছিলো।"

এস্থলে বলা উচিত যে পুলিশ প্রভুরা আমার সহিত যে অপরূপ বঙ্গভাষায় কথা কহিতেছিলেন,তাহার অধিকাংশ শব্দ বিশ্বকোষ, শব্দকল্পদ্রুম এমন কি সাহিত্য-পরিষদ্-কর্ত্তৃক সংগৃহীত পরিভাষার তালিকাতেও পাওয়া যায় না। ভদ্র-পাঠক-পাঠিকাগণের বোধ-সৌকার্য্যার্থে আমি বাধ্য হইয়া মূল-সৌন্দর্য্য বিনষ্ট করিয়া সাধারণ বঙ্গ-ভাষায় তাহার অনুবাদ করিয়া দিলাম।

ইন্‌স্পেক্টার বাবু আমার মোকদ্দমার কাহিনী লিখিয়া উপরে গেলেন। আমি হাজৎঘরে প্রেরিত হইলাম! হাজৎঘরে শুইবার জন্য একখানি দুর্গন্ধময় কম্বল পাইলাম। আমার সঙ্গী এক পুরান দাগী চোর, আর একজন কলরবকারী মাতাল,—তিনি কি কারণে জানি না, আমাকে বোধ হয় "গ্রাম্‌ফেড্ মটন্" মনে করিয়া, রাত্রে কএকবার কামড়াইতে আসিয়াছিলেন—তা ছাড়া, ছুরীমারা কেসের আসামী একজন পেশোয়ারী গুণ্ডা। "দুর্ভাগ্য অদ্ভুত শয্যাসহচর আনয়ন করে," এই ইংরেজি প্রবাদ বাক্যের সার্থকতা বুঝিয়াছিলাম।

শুইয়া শুইয়া নিজ কর্ত্তব্য-চিন্তা করিতে লাগিলাম। পিতা নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন—নির্দ্দিষ্ট ঠিকানা নাই, বন্ধুগণ প্রায় সকলেই অল্প-বয়স্ক, সংবাদ পাঠাইলেও সাহায্যের প্রত্যাশা নাই। হেমেন্দ্র বাবুর দেশের ঠিকানা জানি না! শ্বশুরবাড়ীতে কিছুতেই সংবাদ দেওয়া যাইতে পারে না!—সুতরাং, ইতিকর্ত্তব্য স্থির করিতে পারিলাম না! ভাবিতে ভাবিতে অচিরে নিদ্রাদেবীর শরণাপন্ন হইলাম!—অনেকে বিস্মিত হইবেন যে, এরূপ অবস্থাতেও নিদ্রা আসিল কিরূপে! কিন্তু যথার্থ কথা বলিতে কি, আমার দিব্য নিদ্রা হইয়াছিল।

(৬)

প্রত্যহ যেরূপ রাত্রের পর দিন আসে, পরদিনও সেইরূপ আসিল ; তবে আমার দুঃখনিশি পোহাইবার অনুমাত্রও চিহ্ন দেখা গেল না। কলিকাতা পুলিশের কর্য্যবিধির আইন অনুসারে আমি প্রথমতঃ পুলিশ কমিশনরের কাছে পেশ হইয়া তথা হইতে "হাউস্ ব্রেকিং" অজুহতে মাজিষ্ট্রেটের আদালতে সোপরদ্দ হইলাম। আমি কবুল-জবাব আসামী, সুতরাং আমায় চালান দিতে বিশেষ বিলম্ব হইল না। ভাবিলাম, আমার যাহা কিছু বলিবার আছে মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে বুঝাইয়া বলিব ; এখন বাক্যব্যয় বৃথা।

থানায় একমুঠা মুড়ি ও একটি লঙ্কা মাত্র আহার ব্যতীত, সমস্তদিন প্রায় অনাহারে লালবাজারের হাজতে রহিলাম। বৈকাল বেলা আমাকে একবার মুহূর্ত্তেকের জন্য হাকিমের সম্মুখে হাজির করা হইল ; মাজিষ্ট্রেট্ হুকুম দিলেন, "মোকদ্দমা এক হপ্তা মুলতুবী—আসামী হাজতে থাকিবে।"

সন্ধ্যার প্রাক্কালে একটি প্রকাণ্ড বদ্ধ জুড়ীতে চড়িয়া অন্যান্য আসামিগণের সমভিব্যাহারে হরিণবাড়ীর ফটকে নীত হইলাম।

হরিণবাড়ীর জেলে জনৈক বাঙ্গালী ডেপুটী-জেলর আসামিগণের নাম ধাম আদি লিখিয়া লইতেছিলেন। আমার নাম শুনিয়াই সবিস্ময়ে আমার দিকে চাহিলেন-বলিলেন, "একি! তুমি অম্বিকা বাবুর ছেলে না? তুমি এখানে কি ক'রে এলে?" আমি অবনতমস্তকে গদ্‌গদ কণ্ঠে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝাইয়া বলিলাম। জেলর্ বাবু আদ্যোপান্ত শুনিয়া ক্ষণিক অবাক্ হইয়া রহিলেন,—পরে "হো—হো" করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। এমন সময়ে হঠাৎ বড় সাহেব ডাকাতে তিনি উঠিয়া কক্ষান্তরে গেলেন, আমিও হাজৎঘরে প্রেরিত হইলাম।

সপ্তাহান্তে পুনর্ব্বার বড়গাড়ী করিয়া লালবাজারের কোর্টে উপনীত হইলাম।

ঘটনা-পরম্পরা যেভাবে ঘটিয়া আসিতেছিল, তাহাতে একরূপ স্থিরবিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, ছয়মাস কি একবৎসর মেয়াদের হুকুম হইয়া ব্যাপারটি চূড়ান্ত হইবে! কিন্তু শেষে বুঝিয়াছিলাম, করুণাময় বিধাতার নিতান্ত ততটা দুরভিসন্ধি ছিল না।

ডেপুটী জেলর্ * * আমার নাম শুনিয়াই সবিস্ময়ে আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন—

মোকদ্দমার দিন এক বাঙ্গালী হাকিমের নিকট বিচারার্থে প্রেরিত হইলাম। কোর্টে নীত হইয়াই দেখি,আমার পিতা,শ্বশুর, হেমেন্দ্র বাবু ও অন্যান্য বহু আত্মীয় বান্ধবে আদালত গৃহ-পরিপূর্ণ। হাইকোর্টের একজন বড় ব্যারিষ্টার্ ও পুলিশকোর্টের প্রসিদ্ধ উকীল নগেন্দ্রবাবু আমার পক্ষে নিযুক্ত। বুঝিলাম, এসব ডেপুটী জেলর্ বাবুর কীর্ত্তি।

প্রায় তিন-ঘণ্টা-ব্যাপী বিচার চলিল। উভয় পক্ষের সাক্ষীর এজেহার ও জেরা হইয়া বিস্তারিত বক্তৃতা ও বাদানুবাদের পর হাকিম নিম্নলিখিত মর্ম্মে সুদীর্ঘ রায় দিলেন ;—

"বাদীপক্ষের প্রমাণে জানা যায় যে, সম্প্রতি শ্যামবাজারের এক পল্লীতে চৌর্য্যের প্রাদুর্ভাব হওয়ায় অতিরিক্ত পুলিশ-প্রহরী মোতায়েন্ হয়। ২রা অক্টোবর গভীর রাত্রে জমাদার সল্‌তা সিং ও কনেষ্টবল ঝট্‌পট্ পাঁড়ে উক্ত পল্লীতে রোঁদে ফিরিবার সময় দেখে যে, আসামী এক ভদ্র লোকের বাড়ীর দ্বিতল হইতে নর্দ্দামার নল বাহিয়া নীচে নামিতেছে। বাটীর লোকের সাক্ষ্যে জানা যায় যে, আসামী বাটীর ভিতর গিয়া তৈজসপত্র নাড়িতেছিল। তল্লাসীতে আসামীর নিকট চোরাই মাল বলিয়া প্রমাণিত কোনও দ্রব্য পাওয়া না গেলেও, একখানি ছুরি ও একটি সিঁধকাটী পাওয়া গিয়াছিল। ইহা বিশেষ সন্দেহজনক কথা। থানায় লইয়া আসিবার সময় আসামী পুলিসের হাত ছিনাইয়া পালাইবার চেষ্টা করিয়াছিল। ইহাতেও তাহার মন্দ-অভিসন্ধি প্রমাণিত হয়। পক্ষান্তরে আসামীর পক্ষে প্রমাণ এই যে, আসামী সম্ভ্রান্ত-বংশজাত যুবক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বি,-এ, উপাধিধারী। আসামীর গল্প এই যে, 'অধ্যাপক হেমেন্দ্র বাবুর সহিত তাহার একটি তর্ক হওয়ায়, সে রহস্যচ্ছলে এই কার্য্য করে এবং ভ্রমক্রমে অপর বাটীতে প্রবেশ করে!' গল্পটি কতকটা অবিশ্বাসযোগ্য বোধ হইলে, হেমেন্দ্র বাবু আপন সাক্ষ্যে সে কথাটার সমর্থন করিয়াছেন। অধ্যাপক হেমেন্দ্র বাবুর ন্যায় ব্যক্তির সাক্ষ্য অবিশ্বাস করা যায় না ; এতএব সন্দেহের ফলে (Benefit of the doubt) আসামীকে খালাস দেওয়া গেল। ছুরি ও সিঁধকাটী সরকারে বাজেয়াপ্ত হইবে। মণিব্যাগটি আসামী ফেরৎ পাইবে।"

৭

মুক্ত হইয়া কোর্টের বাহিরে আসিলে পিতৃদেব সজল নেত্রে তাঁহার একমাত্র বংশধরকে আলিঙ্গন করিলেন ; হেমেন্দ্র বাবু ও বন্ধুবান্ধবগণ আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। শ্বশুর মহাশয় কিন্তু একটু কাষ্ঠ সম্ভাষণ করিয়াই নীরব হইলেন। তিনি অবসর-প্রাপ্ত "ঝুনা" ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট্। পেন্‌সনের অব্যবহিত পূর্ব্বে কএকটি স্বদেশী মোকদ্দমায় অপূর্ব্ব বিচার-কৌশল প্রদর্শন করিয়া সরকার হইতে "রায় বাহাদুর" খেতাব্ লাভ করিয়াছেন। আমি খালাস হইয়াছি দেখিয়া বোধ হয়

স্ত্রী কন্যার খাতিরে কতকটা খুসী হইলেন; বিচারফল যে তাঁহার মতে ন্যায়-সঙ্গত হয় নাই, তাহা তাঁহার গম্ভীর মুখ দেখিয়াই বুঝা যাইতেছিল। বৃদ্ধ, বোধ হয়, আগামী জামাই-ষষ্ঠী উপলক্ষে আমি নিমন্ত্রণে গেলে তিনি তাঁহার কোম্পানীর কাগজের তাড়া ও অন্যান্য অস্থাবর সম্পত্তি কোথায় - কিরূপে রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন তাহাই ভাবিতেছিলেন।

পরদিন প্রাতে কলিকাতার একখানি প্রসিদ্ধ সাহেবী কাগজের সম্পাদকীয় মন্তব্যে প্রকাশিত হইল ;—

"কলিকাতার উত্তর-অংশে কোনও দেশীয় পল্লীতে সম্প্রতি চৌর্য্যের অত্যন্ত বৃদ্ধি হওয়ায় যে, বিশেষ পুলিশ-প্রহরীর বন্দোবস্ত হয়, সে সংবাদ আমাদের পাঠকগণ জানেন। সম্প্রতি পুলিশ এক ব্যক্তিকে অদ্ধরাত্রে এক গৃহস্থের বাটী হইতে নর্দ্দামার নলের সাহায্যে পলায়নপর দেখিয়া দক্ষতার সহিত তাহাকে গ্রেপ্তার করে। অনুসন্ধানে তাহার নিকট চোরা, সিঁধকাটী ও অন্যান্য সন্দেহজনক দ্রব্য পাওয়া যায়। গ্রেপ্তারের পরও আসামী শান্তিরক্ষকগণকে প্রহার করিয়া পলায়নের চেষ্টা করে। এই সকল প্রমাণসত্ত্বেও বিচারক দেশীয় হাকিম আসামীকে মুক্তি দিয়াছেন। মুক্তি দিবার প্রধান কারণ, আসামী ভদ্রবংশজাত ও উচ্চশিক্ষিত। আমরা আশা করি যে, বিচারক তাঁহার বিবেক-শক্তি ও ন্যায়-নিষ্ঠার বশবর্ত্তী হইয়াই এই আদেশ দিয়াছেন; কিন্তু যদি এই হাকিম একটু কষ্ট করিয়া বিগত কএক বৎসরের পুলিশ-শাসন বিবরণীর কএক পাতা উল্টাইয়া দেখিতেন, তাহা হইলে বুঝিতেন যে, আজকাল বঙ্গদেশের অধিকাংশ চুরি ডাকাতি উচ্চশিক্ষিত ও তথাকথিত ভদ্রযুবকবর্গ-কর্ত্তৃক সংঘটিত হইতেছে। এই জন্যই আমরা বারবার বলিয়াছি যে, এরূপ মোকদ্দমাগুলি য়ুরোপীয় বিচারক-দ্বারা মীমাংসিত হওয়া বাঞ্ছনীয়! যদি এই বিচার-

"পিতৃদেব সজলনেত্রে তাহার একমাত্র বংশধরকে আলিঙ্গন করিলেন।"

ফলের পর উক্ত পল্লীতে চুরি হ্রাস না হইয়া বরং বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে আমরা তাহাতে আদৌ বিস্মিত হইব না।"

বলা বাহুল্য, সম্পাদক-প্রবরকে "বিস্মিত" হইতে হয় নাই। চুরি পূর্ব্বমত তেজেই চলিতে থাকে। অবশেষে ইহার তিনমাস পরে ডিটেক্টিভ পুলিশ থাঁটির এক কনেষ্টবল ও দুইজন পুরাণ চোরকে সন্দেহক্রমে গ্রেপ্তার করে। অনুসন্ধানে ইহাদের নিকট অনেক চোরাই মাল পাওয়া যায়, এবং বিচারে প্রত্যেকেই দুই বৎসর করিয়া কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়। ইহার পর হইতেই উক্ত পল্লীতে চুরি একেবারে থামিয়া যায়

যাহা হউক, আমি খালাস পাইবার কএক দিন পরেই হেমেন্দ্রবাবু প্রায় পাঁচশত টাকা ব্যয় করিয়া মহাসমারোহে এক ষ্টীমার পার্টি দিলেন। আমি, বন্ধুদিগের সমীপে,

আমার শরীর অসুস্থ, মাথাধরা, কাজ আছে—প্রভৃতি যতবিধ অছিলা আছে, প্রত্যেকটি পৃথক্‌ভাবে এবং একযোগে পেশ করা সত্ত্বেও বন্ধুবর্গ জোর করিয়া আমায় ধরিয়া তাঁহাদের সঙ্গে লইয়া গেলেন।

শ্রীমনোজমোহন বসু।

বুদ্ধিমান্ ছেলে।

পান্তুয়া সন্দেশ, পাইলে ত বেশ
উদরস্থ হ'য়ে যায়;
লেখাপড়া ঠিক্ তেমনটি নয়,
মুখস্থ করাই দায়।

আবার ইংরেজি লেখা হিজিবিজি,
বানান—তথৈবচ;
D-o হবে 'ড়' S-o নহে 'সু'
এতেই সে খচমচ।

বোড়ে দিলে আঁক, লেগে যায় তাক্,
মিলিয়ান্, বিলিয়ান্,—
লম্বা লম্বা যোগ, একি কর্ম্মভোগ!
বিয়োগে—হারায় জ্ঞান।

তদুপরি গুণ—করিলে যে খুন!
ভাগ দেখে—হয় রাগ;
সুকুমারমতি আমি যে গো অতি,
মাষ্টার?—যেন সে বাঘ!

বাবা বলে—"নরু, তুই বড় গরু,
রোজ খাবি কাণ-মলা?"
বাবার কি ভুল! আমি এত ছোট,
উচিত 'বাছুর' বলা।

শ্রীরসময় লাহা।

বুদ্ধ পোখর

আকবরের ধর্ম্মমত।

'দিল্লীশ্বরোবা জগদীশ্বরোবা' আকবার শাহ ভারতের সার্ব্বভৌম নরপতির পদে আসীন হইয়া, সকল জাতিকে যে মিলনের মহামন্ত্রে দীক্ষিত করার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা ইতিহাস আলোচনা করিলে সুস্পষ্টরূপেই বুঝিতে পারা যায়। আকবর যে কেবল রাজনীতির কঠিন শৃঙ্খলে সকলকে আবদ্ধ করিতে যত্নবান্ হইয়াছিলেন, এমন নহে;—তিনি ধর্ম্মনীতির সূক্ষ্ম সূত্রে সকলের হৃদয়-পুণ্ডরীককে গ্রথিত করারও চেষ্টা করিয়াছিলেন। রাজনীতির চর্চ্চার সহিত তিনি সর্ব্বদা ধর্ম্মনীতিরও আলোচনা করিতেন। মোগলের গৌরব-সূর্য্যকে চিরোজ্জ্বল রাখিবার জন্য যেমন তিনি সর্ব্বদাই ব্যাপৃত ছিলেন, লোকদিগকে নবধর্ম্মের

সম্রাট্ আকবরের রাজসভা।

মহিমায় আলোকিত করিতেও সেইরূপ সচেষ্ট হইতেন। তিনি আশৈশব সংযম ও ধর্ম্মালোচনাদ্বারা আপনার চরিত্রকে সুগঠিত করার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার চরিত্রসম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও, তিনি যে একজন আদর্শ-চরিত্র মহাপুরুষ ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। মুসলমান ঐতিহাসিকগণ তাঁহাকে সেইরূপ ভাবেই চিত্রিত করিয়াছেন। রাজনীতির ও ধর্ম্মনীতির এরূপ অপূর্ব্ব-সংমিশ্রণ ভারতের আর কোন মুসলমান সম্রাটের জীবনে দেখিতে পাওয়া যায় না! একদিকে সম্রাটের মুকুট,অপর দিকে ফকীরের বেশ,—ইহা আকবরকেই শোভা পাইয়াছিল। সর্ব্বধর্ম্ম আলোচনা করিয়া তিনি যে সার-সংগ্রহ করিয়াছিলেন, নিজে সর্ব্বদা তাহারই অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত থাকিতেন, এবং অনেকে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া তাঁহার পদতলে বিলুণ্ঠিত হইয়া পড়িত; যদিও আকবর সর্ব্বধর্ম্মের সার সংগ্রহ করিয়া নব-ধর্ম্মের গঠন করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার সেই ধর্ম্মমতে হিন্দুধর্ম্মেরই প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা নিম্নে তাহার যথাযথ আলোচনা করিতেছি ঃ—

হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, ইহুদী ও পারসিক ধর্ম্মের সহিত সংশয়বাদ আলোচনা করিয়া আকবর নিজ নব-ধর্ম্মমতের ভিত্তি স্থাপন করেন। তাঁহার ধর্ম্মমত আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, তিনি যুক্তিবাদকেই আপনার ধর্ম্মের মূলসূত্র করিয়াছিলেন। প্রত্যাদেশের প্রতি তাঁহার সেরূপ আস্থা ছিল না। (১) তিনি সত্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া স্থির করিয়াছিলেন যে, সত্য কখনও কোন ধর্ম্মবিশেষে আবদ্ধ থাকিতে পারে না। সত্যজ্ঞান সকল স্থান হইতেই সংগৃহীত হইতে পারে। (২) সত্য ও যুক্তিবাদের উপর নির্ভর করিয়া তিনি বিশ্বমধ্যে ঈশ্বরের সত্তা অনুভব করিতে আরম্ভ করেন; বিশেষতঃ সূর্য্য ও অগ্নিতে তাঁহার সত্তা সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয় বলিয়া তাঁহার ধারণা ছিল। তাঁহার ধর্ম্মমত একেশ্বর-বাদেই পরিণত হয় এবং তাহা 'তৌহিদি ইলাহি' বা স্বর্গীয় একেশ্বরবাদ নামে অভিহিত হইত। তিনি ব্যক্তিগত ঈশ্বরের পক্ষপাতী ছিলেন বলিয়া বোধ হয় না, কারণ প্রত্যাদেশে তাঁহার বিশ্বাস ছিল না—একথা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ

(1) "Reason, not revelation, was declared to be the basis of religion."—*Tarikhi Badauni,—History of India, Elliot —Vol. V.—P. 52?.*

(2) If some true knowledge was thus everywhere to to be found, why should truth be confined to one religion, or to a creed like Islam, which was comparatively new, and scarcely a thousand years old? Why should one sect assert what another denies, and why should one claim a preference without having superiority conferred on itself?"—*Tarikhi Badauni,—Elliot,—Vol. V.,—P. 528.*

করিয়াছি। আমরা তাঁহার ধর্ম্মমতের মূলসূত্র নির্দ্দেশ করিয়া এক্ষণে দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, তিনি কিরূপ ভাবে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন।

আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, আকবর সকল ধর্ম্মের আলোচনা করিয়া নিজ ধর্ম্মমতের গঠন করিয়াছিলেন। বাস্তবিক তিনি কোন ধর্ম্ম বা জাতিকে উপহাস বা নিন্দা করিতেন না। (৩) সকল ধর্ম্মবাদীর তর্ক বিতর্ক শ্রবণ ও তাঁহাদের সহিত কথোপকথন করিয়া তিনি জ্ঞান-সঞ্চারের চেষ্টা করিতেন। যদিও তাঁহার জীবনীলেখক আবুলফজেল লিখিয়াছেন যে, বহুকাল ধরিয়া জ্ঞান-তৃষ্ণা নিবারণের চেষ্টা করিলেও কোন ব্যক্তিতে তিনি আপনার অপেক্ষা বিচার-শক্তির শ্রেষ্ঠত্ব দেখিতে পান নাই। (৪) আবুলফজেলের কথা কতদূর সত্য তাহা আমরা বলিতে পারি না। তবে আমরা একথা বলিতে পারি যে, আকবর ধর্ম্মমতে বা রাজ্যশাসনে কোন ধর্ম্মবিশেষের বা ব্যক্তিবিশেষের মুখাপেক্ষা করিতেন না। তিনি আলোচনাদ্বারা যাহা ভাল বুঝিতেন, তাহারই অনুষ্ঠানে রত হইতেন। কিরূপভাবে তিনি ধর্ম্মালোচনা করিতেন, আমরা নিম্নে তাহার উল্লেখ করিতেছি।

আকবর শাহ রাজ্যমধ্যে শান্তিস্থাপন করিয়া 'ইবাদৎ-খানা' নামে এক প্রকাণ্ড অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তথায় তিনি সন্ন্যাসী, ফকীর ও ধর্ম্মশাস্ত্র বেত্তাদিগকে লইয়া ধর্ম্মালোচনা করিতেন এবং ঈশ্বরচিন্তায় মগ্ন থাকিতেন। তাহাতেই সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত হইত। শুক্রবারে নমাজাদির পর তিনি সেখ, উল্‌মা ও অন্যান্য ধার্ম্মিকলোক-দিগকে লইয়া সভা করিতেন ও মুসল্‌মানধর্ম্মবিষয়ের তর্ক-বিতর্ক শুনিতেন। সেই সময়ে সুফীবাদসম্বন্ধেও আলোচনা করা হইত। এইরূপে মুসল্‌মান ধর্ম্ম হইতে তিনি সত্য-সংগ্রহের চেষ্টা করিতেন, কিন্তু মুসল্‌মানধর্ম্মের সকল বিষয়ে তাঁহার আস্থা ছিল না। আমরা পরে তাহার উল্লেখ করিব। খৃষ্টান পাদরীরা তাঁহার সহিত আলাপনে আপনাদের পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মারূপ ঈশ্বরের ত্রিত্বভাব ও যীশুখৃষ্টের ধর্ম্মমতের আলোচনা করিয়া অনেক কথা জানাইতেন। বলা বাহুল্য, সে সময়ে রোমান্ ক্যাথলিক্ জেস্যুইট্ পাদ্‌রীরাই ভারতে আগমন করিয়াছিলেন। আকবর স্বীয় পুত্র মোরাদকে তাঁহাদের ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে ধর্ম্মোপদেশ গ্রহণ করিতে আদেশ দেন, এবং আবুলফজেল ঐ সমস্ত উপদেশের অনুবাদ করিতে আদিষ্ট হন। বাদশাহ ইহুদীদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রও আলোচনা করিতেন। পারসিকেরা গুজরাট প্রদেশ হইতে আহূত হইয়া তাঁহাদেরও ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করাইতেন, এবং তাঁহারা অগ্ন্যুপাসনাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রকাশ করিতেন। আকবর পারস্যরাজের ন্যায় স্বীয় ভবনে দিনরাত্রি অগ্নি-প্রজ্জ্বালিত করিয়া রাখিতেন, ও তাহাকে ঈশ্বরের অন্যতম নিদর্শন বলিয়া মনে করিতেন। আবুলফজেলের প্রতি সেই পবিত্রাগ্নি রক্ষার ভার অর্পিত হয়। (৫) এতদ্ব্যতীত প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সংশয়-বাদীরাও তাঁহার সহিত নানা বিষয়ের তর্কবিতর্ক করিয়া যুক্তিবাদ স্থাপনের চেষ্টা করিতেন; তাহাতে তাঁহার মুসল্‌মান-ধর্ম্মের দৈনিক নমাজ, রোজা, ভবিষ্যদ্বাণী প্রভৃতি যুক্তিবিরুদ্ধ বিষয়ের প্রতি অনাস্থা হয়, এবং প্রত্যাদেশ অপেক্ষা যুক্তিই ধর্ম্মের মূলভিত্তি বলিয়া তাঁহার ধারণা হয়। (৬) এই যুক্তি-বাদের উপরই তাঁহার নবধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা। তিনি এই

(3) He never laughs at, nor ridicules, any religion or sect." —(*Gladwin's Ayeen Akbari*).

(4) From his thirst after wisdom, he is continually labouring to benefit by the knowledge of others, while he makes no account of his own sagacious administration. He listens to what every one hath to say, because it may happen that his heart may be enlightened by the communication of a just sentiment, or by the relation of a laudable action But although a long period has elasped in their practice, he has never met with a person whose judgment he could prefer to his own."—*Ayeen Akbari.*

(5) "And at last he directed that the sacred fire should be made over to the charge of Abulfazal and that after the manner of the kings of Persia, in whose temples blazed perpetual fires, he should take care it was never extinguished, either by night or day, for that it is one of the signs of God, and one light from among the many lights of his creation." —*Badauni —Elliot,—Vol. V.,—P. 530.*

(6) "His Majesty's faith in the companions of the prophet began to be shaken, and the breach grew broader. The daily prayers, the fasts, and prophecies were all pronounced delusions as being opposed to sense. Reason, not revelation was declared to be the basis of religion. Europeans also paid visits to him and he adopted some of their rationalistic tenets."—*Badauni—Elliot,—Vol. V.,—P. 524.*

"নমুদ্ ও নাখ্ , অয় গুল, ও রিন্দী কুন্, ও খ্ শ বাশ্ ;
বস্ তৌরে অজব্ লজিমে ঐয়্যম্ ই শবাবস্ত্।"—হাফিজ্

K. v. Seyne : Bros.
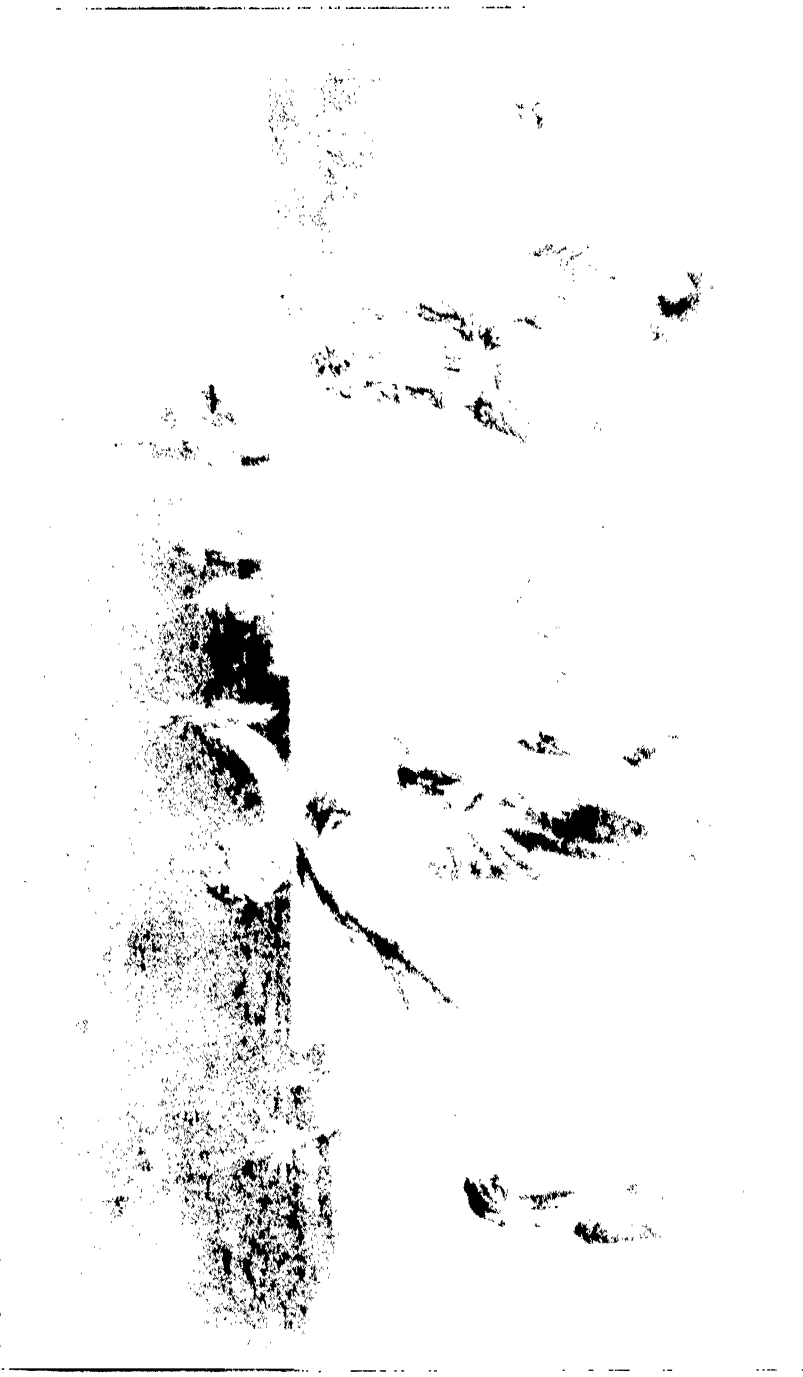
যুক্তিবাদের নিকষ-পাষাণে সকল ধর্ম্মমতকে কষিয়া আপনার ধর্ম্মের মূলসূত্র বাহির করিয়াছিলেন। সকল ধর্ম্মের কোন কোন অংশ তাঁহার ধর্ম্মমতে দৃষ্ট হইলেও হিন্দুধর্ম্মের যে অনেকাংশ তাঁহার যুক্তিবাদরূপ নিকষ-পাষাণে অঙ্কিত হইয়াছিল, এক্ষণে আমরা তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিব।

অন্যান্য ধর্ম্মের আলোচনার সহিত আকবর হিন্দুধর্ম্ম বিশেষরূপেই আলোচনা করিতেন। হিন্দুর অনেক শাস্ত্র তিনি অনুবাদ করাইয়াছিলেন। তাঁহার আদেশানুসারে আবুল-ফজেল 'আইন আকবরী'তে, হিন্দুদর্শন ও অন্যান্য শাস্ত্রের মত লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। সন্ন্যাসী ও ব্রাহ্মণেরা সর্ব্বদাই গোপনে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। তাঁহারা অন্যান্য ধর্ম্মবাদী অপেক্ষা জ্ঞান, বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতায় শ্রেষ্ঠ ছিলেন বলিয়া ও তাঁহারা যুক্তিসহকারে আপনাদের মতস্থাপনের ও অন্য ধর্ম্মের দোষ দর্শনের চেষ্টা করিতেন বলিয়া আকবর তাঁহাদিগকে যারপরনাই শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহাদের সহিত আলাপ করিয়া তাঁহার মুসলমান ধর্ম্মের প্রত্যাদেশ, পুনরুত্থান, বিচার-দিবস প্রভৃতির প্রতি অনাস্থা হয়। (৭) এতদ্ভিন্ন বীরবল তাঁহার প্রধান মন্ত্রী থাকায়, তিনি তাঁহার সহিত সর্ব্বদা হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন। এইরূপ কথিত আছে যে, তিনি তাঁহারই উপদেশানুসারে সূর্য্যোপাসনায় প্রবৃত্ত হ'ন। সূর্য্য জগতের প্রকাশ স্বরূপ, তিনি সকলকে আলোক প্রদান করিয়া থাকেন, তাঁহার দ্বারা জগতের ফলশস্য পরিপক্ক এবং মনুষ্যের জীবন ধারণ হয়,—সূর্য্য জগতের জ্যোতিষ্ক ও বিশ্ববাসীর একমাত্র উপকারক, এবং রাজগণের বন্ধু স্বরূপ। তজ্জন্য তাহারই গতি অনুসারে অব্দাদি নির্ণয় হওয়া কর্ত্তব্য। (৮) সূর্য্যের উদয়াস্তপ্রভৃতি ঈশ্বরেরই মহিমা-সূচক; সুতরাং যাঁহাতে ঈশ্বরের মহিমা ও উপকারিতা প্রকাশ পায়, তাঁহাকে সর্ব্বতোভাবে আরাধনা করা কর্ত্তব্য। সেই জন্য আকবর প্রাতে, মধ্যাহ্নে, সায়াহ্নে ও মধ্য-রাত্রিতে সূর্য্যের উপাসনা করিতেন। (৯) তিনি গ্রহগণের বর্ণানুযায়ী পরিচ্ছদ পরিধান করিতেন। এতদ্ভিন্ন অগ্নি, জল, প্রস্তর, বৃক্ষ প্রভৃতি প্রাকৃতিক পদার্থের পূজা, গো-পূজা ও মনুষ্যের কর্ত্তব্য

(7) "Moreover, sannyasis and Brahmins managed to get frequent private interviews with His Majesty. As they surpass other learned men in their treatises on morals, and on physical and religious sciences and reach a high degree in their knowledge of the future, in spiritual power and human perfection, they brought proofs, based on reason and testimony for the truth of their own and the fallacies of other religions, and inculcated their doctrine so firmly and so skilfully represented things as quite self-evident which require consideration, that no man by expressing his doubts, could now raise a doubt in His Majesty, even if mountains were to crumble to dust or the heavens were to tear asunder. Hence His Majesty cast aside the Islamitic revelations regarding resurrection, the Day of Judgment, and the details connected with it, as also all ordinances based on the tradition of our Prophet. He listened to every abuse which the courtiers heaped on our glorious and pure faith, which can so easily be followed, and eagerly seizing such opportunities, he showed, in words and gestures, his satisfaction at the treatment which his original religion received at their hands."—*Badauni—Elliot,—Vol.,—P. 528.*

(8) "The accursed Birbal tried to persuade the king that since the Sun gives light to all, ripens all grain, fruits and products of the earth and supports the life of mankind, that luminary should be the object of worship and veneration, that the face should be turned towards the rising, not towards the setting Sun * * * * Several wise men at court confirmed what he said, by representing that the Sun was the chief light of the world and the benefactor of its inhabitants; that it was a friend to king and that kings established periods and eras in conformity with its motions. This was the cause of the worship paid to the Sun of the Nauroz Jabali, and of his being inducted to adopt that festival for the celebration of his accession to the throne."—*Badauni Elliot—Vol.—V.—P. 529-30.*

(9) "He is continually returning thanks unto Providence and scrutinizing his own conduct. But he most especially so employs himself at the following stated times: At day-break, when the sun begins to diffuse his rays; at noon, when that grand illuminator of the Universe shines in full resplendence; in the evening, when he disappears from the inhabitants of the earth; and again at midnight, when he recommences his ascent. All these grand mysteries are in honor of God; and if dark-minded, ignorat people cannot comprehend their signification, who is to be blamed? Every one is sensible that it is indispensibly our duty to praise our Benefactor ond consequently it is incumbent on us to praise this Diffuser of bounty, the fountain of light! And more especially behoveth it princes so to do, seeing that this Sovereign of the heavens sheddeth His benign influence upon the monarchs of the earth. His Majesty has also great veneration for fire in general and for lamps, since they are to be accounted rays of the greater light."

—*Gladwin's Ayeen Akbari.*

বলিয়া আলোচিত হইত। (১০) তিনি কখনও গোহত্যা বা গোমাংস গ্রহণ করিতেন না এবং রাজ্যমধ্যে গোহত্যা নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। (১১) তিনি হিন্দুদিগের ন্যায় হোম করিতেন এবং তাঁহার হিন্দু-মহিষীগণের অনুরোধে তাহা সম্পন্ন হইত বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন তিনি কতকগুলি হিন্দু আচার-ব্যবহারও পালন করিতেন। (১২) হিন্দুদিগের ন্যায় তাঁহার জন্মান্তরেও বিশ্বাস ছিল। (১৩) হিন্দু সন্ন্যাসী ও যোগীদিগকে মুসলমান ফকীরদের ন্যায় ভোজন করাইতেন। তদ্ভিন্ন মাংস-ভক্ষণে তাঁহার স্পৃহা ছিল না, এবং তিনি ইন্দ্রিয়-নিগ্রহেরও চেষ্টা করিতেন। (১৪) এইরূপ অনেক দৃষ্টান্ত তাঁহার ধর্ম্মমতে ও আচারব্যবহারে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

এইরূপে সমস্ত ধর্ম্মমত আলোচনা করিয়া তাঁহার নব ধর্ম্মমত গঠিত হয়। যুক্তির নিকষ-পাষাণে যে ধর্ম্মমতের যে দাগটি অঙ্কিত হইত, তিনি তাহাই গ্রহণ করিতেন এবং আলোচনাদ্বারা বুঝিতে পারা যায়, হিন্দুধর্ম্মের অধিকাংশ দাগই সেই নিকষ-পাষাণে অঙ্কিত হইয়াছিল। আকবরের ধর্ম্মমতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তিনি বিশ্বমধ্যে ঈশ্বরের সত্তা অনুভব করিতে আরম্ভ করেন; এবং সূর্য্য ও অগ্নিতে তাহা সুস্পষ্টরূপে অনুভূত হয় বলিয়া তিনি সূর্য্য ও অগ্নির উপাসনা করিতেন। তদ্ভিন্ন অন্যান্য প্রাকৃতিক পদার্থেও তিনি ঈশ্বরের সত্তা অনুভব করিতে চেষ্টা করেন। বিশ্বমধ্যে ঈশ্বরের সত্তা অনুভব করা যে হিন্দু-দার্শনিকমত তাহা বোধ হয় নূতন করিয়া বলিতে হইবে না, এবং তাহাই যে প্রকৃত বৈদিকধর্ম্ম তাহাও বোধ হয় বলিবার প্রয়োজন নাই। জগতের যত ধর্ম্ম আলোচিত হউক না কেন, হিন্দুধর্ম্মের মূলসূত্র যে সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইবে, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। মুসলমান ঐতিহাসিকগণ দেখাইয়াছেন যে, হিন্দু সন্ন্যাসী ও ব্রাহ্মণেরা জ্ঞান, বিজ্ঞানে ও আধ্যাত্মিকতায় শ্রেষ্ঠ হওয়ায় আকবরের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন। সে যাহা হউক, আকবরের ধর্ম্মমত আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, তাহার অধিকাংশই হিন্দুধর্ম্ম হইতে গৃহীত হইয়াছিল; এবং হিন্দু আচার-ব্যবহারের অনুষ্ঠান করিয়া তিনি সেই ধর্ম্মভাবকে সর্ব্বদা আপনার অন্তঃকরণে জাগরূক রাখিতে চেষ্টা করিতেন। সেই জন্য দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি সংযম অভ্যাস করিয়া আপনার চরিত্র-গঠনের চেষ্টা করিয়াছিলেন।

বিশ্বমধ্যে ঈশ্বরের সত্তা অনুভব করিয়া—বিশেষতঃ সূর্য্য ও অগ্নিতে তাঁহার বিশেষ বিকাশ দেখিয়া—আকবর একেশ্বরবাদী হইয়াছিলেন। সেই জন্য তাঁহার ধর্ম্মমত 'তৌহিদি

"He began also, at midnight and at early dawn to mutter the spells, which the Hindus taught him for the purpose of subduing the Sun to his wishes."—*Badauni—Elliot—Vol. V.,—P. 530.*

(10) That man should venerate fire, water, stones and trees, and all natural objects, even down to Cows and their dung, that he should adopt the frontal mark and the Brahminical cord.—*Badauni—Elliot, —Vol. V.,—P. 529.*

(11) "He prohibited the slaughter of cows, and the eating of their flesh, because the Hindus devoutly worship them, and esteem their dung as pure."

(12) "From his earliest youth, in compliments to his wives, the daughters of the Rajas of Hindu, he had withen the female apartments, continued to burn the *hom*, which is a ceremony derived from fire worship, but on the New-year festival of the 25th year after his accession, he prostrated himself both before the Sun and before the Fire in public and in the evening the whole Court had to rise up respectfully when the lamps and candles where lighted On the festival of the eighth day after the Sun's entering Virgo in this year, he came forth to the public Audience-chamber with his forehead marked like a Hindu and he had jewelled strings tied on his wrist by Brahmans, by way of a blessing. The chiefs and nobles adopted the same practice in imitation of him, and presented on that day pearls and precious stones, suitable to their respective wealth and station. It became the current custom also to wear the rakhi on the wrist, which means and amulet formed out of twisted linen rags. In defiance and contempt of the true faith every precept which was enjoined by the doctors of other religions, he treated as manifest and decisive. Those of Islam on the contrary were esteemed follies, innovations, inventions of indigent beggars, of rebels, and of highway robbers, and those who professed that religion were set down as contemptible idiots. These sentiments had been long growing up in his mind, and ripened gradually into a firm conviction of their truth.—*Baduni—Elliot,—V. pp. 530-31.*)

(13) Badauni.

(14) "He abstains much from flesh, so that whole month pass away without his touching any animal food. He takes no delight in sensual gratifications, and in the course of twenty-four hours, never takes more than one meal."—*Ayeen Akbari.*

ইলাহি' বা স্বর্গীয় একেশ্বরবাদ নামে অভিহিত হইত। এই গভীর তত্ত্ব স্থির করিয়া তিনি ঐশ মহিমার গুণগান করিতেন ও সর্ব্বদাই ঈশ্বরচিন্তায় মগ্ন থাকিতেন। সপ্তরাত্রি সেই চিন্তায় অতিবাহিত হইয়া যাইত। এইরূপে ঈশ্বরতত্ত্ব অনুভব করিয়া আকবর স্বীয় ধর্ম্মমত প্রচারে সচেষ্ট হন। যাহারা জ্ঞানপিপাসা-শান্তির জন্য অন্যান্য ধর্ম্মের আশ্রয় লইয়া তৃপ্ত হইতে পারিত না, তাহারা তাঁহার পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িত, তাঁহার জীবনীলেখক এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন; তিনি ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে যে জগতের লোকদিগকে নবধর্ম্মের আলোকে আলোকিত করিয়াছিলেন, তাহারও উল্লেখ করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন বাল্যকাল হইতে তাঁহার অলৌকিক ক্ষমতাপ্রকাশের কথাও শুনাইয়াছেন। (১৫) সে যাহা হউক, আকবর শাহ যে নবধর্ম্ম প্রচারের জন্য লোকদিগকে আহ্বান করিতেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; এবং অনেকে যে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া আপনাদিগকে ধন্য মনে করিত, তাহারও অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। তাহারা "আল্লা-হ-আকবর" (ঈশ্বরই শ্রেষ্ঠ) "জিনেল্লা-হ" (শক্তিমানই ঈশ্বর) প্রভৃতি উচ্চারণ করিয়া, এবং নিবৃত্তি ও সংযমের অনুসরণ করিয়া 'তৌহিদি ইলাহি'র গৌরব রক্ষায় সচেষ্ট হইত। (১৬) এই স্বর্গীয় ধর্ম্মমত গ্রহণের সময় তাহারা ধন, জীবন, সম্মান ও ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইত। মুসলমানেরা ইসলামধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতেন। (১৭) আকবরের ধর্ম্মমতে অন্য যাহা কিছু থাকুক্ না কেন, ঐশী সত্তার অনুভব ও ঈশ্বরানুরূপ যে তাহার মূলসূত্র ছিল তাহা অবশ্যই বলিতে হইবে। আর একথাও অবশ্য স্বীকার্য্য যে, যুক্তিবাদ যখন তাঁহার ধর্ম্মের মূলভিত্তি, তখন তিনি কখনও নাস্তিক্যের প্রশ্রয় প্রদান করেন নাই!

এইরূপে আকবর শাহ স্বীয় নবধর্ম্মের প্রচার করিয়া ভারতের ভিন্ন ভিন্ন জাতিকে একতাসূত্রে বদ্ধ করিবার চেষ্টা করেন। তিনি যদিও রাজনীতির শৃঙ্খলে সকলকে বদ্ধ করিয়াছিলেন, তথাপি ধর্ম্মনীতিসূত্রে তাহাদিগকে গ্রথিত

(15) In his infancy, he involuntarily performed such actions as astonished the beholders; and when at length, contrary to his inclination, those wonderful actions exceeded all bounds, and became discernible to every one, he considered it to be the will of the Almighty, that he should lead men into the paths of righteousness, and began to teach, thus satisfying the thirsty who were wandering in the wilderness of enquiry. Some he taught agreeably to their wishes; whilst he disappointed others in their desires. Many of his disciples, through the blessing of his holy breath, obtained a greater degree of knowledge in the course of a single day than they could gain from the instruction of other holy doctors after a fast of forty days. Numbers of those, who have bidden adieu to the world, such as *Sannyasis*, *Fakirs*, Philosophers, and *Sophis*, together with a multitude of men of the world, namely, soldiers, merchants, husbandmen, and mechanics, have daily their eyes opened unto knowledge. And men of all nations and ranks, in order to obtain their desires, invocate His Majesty considering those vows as the means of extricating themselves from difficulties, and when they have attained their wishes, they bring to the royal presence the offerings which they had vowed. But many from the remoteness of their situation, or to avoid the bustle of a court, bestow their vows in charity and pass their lives in grateful praises." —*Ayeen Akbari.*

(16) "When two disciples meet, one says, "*Allah Akbar*" (God is greatest); and the other answers, "*Ji lejilalahoo*" (mighty is his glory) And this form of salutation is appointed merely to the end that they may keep the Diety in continual remembrance, by exercising their tongues in praise. It is also ordered by His Majesty that the food which is usually given away after the death of a person, shall be prepared by the donor during his lifetime. Every disciple, on the anniversary of his birth-day, is obliged to make a feast and to bestow alms. He is also enjoined to endeavour to abstain from eating flesh entirely; and if he is not able to quit it altogether, he must at least refrain at the times appointed in the regulations for the *sufyaneh* (o) as also during the whole of the month in which he was born. He is prohibited from eating voluntarily of any animal that he hath himself slain. Neither is he to eat out of the same dish with butchers, hunters, or bird catchers. Nor is he allowed to have dealings with pregnant, or old women, or with one who is barren, or with a girl under the age of puberty."—*Ayeen Akbari.* (o) বিশেষ দিবসে মাংস ভক্ষণ নিষেধ নিয়ম *sufyaneh* নামে অভিহিত হইত।

(17) "I so and so, son of so and so have willingly and cheerfully renounced the false and pretended religion of Islam, which I have received from my ancestors, and have joined the Divine Faith (Din-i-Ilahi) of Shah Akbar, and have assented to its fourfold rule of sincerity—(the readiness to) sacrifice wealth and life, honour and religion."—*Badauni—Elliot,—Vol. V.,—P. 536*

করিতে না পারিলে যে তাহা স্থায়ী হইবে না, ইহা তিনি সুস্পষ্টরূপেই বুঝিতে পারেন। সেই জন্য তাঁহার 'তৌহিদি ইলাহি'র প্রচার। সকল ধর্ম্মমত আলোচনা করিয়া তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, একেশ্বরবাদই সর্ব্বধর্ম্মের মূলসূত্র, এবং তিনি তজ্জন্য সেই মূলসূত্রটিকেই অবলম্বন করিয়াছিলেন। সেই মূলসূত্রটি অবলম্বন করিতে হইলে, অনেক সময়ে প্রাচীন ধর্ম্মমতগুলির কোন কোন অংশের সহিত গোলযোগ ঘটিবার সম্ভব; সেই জন্য আকবর অনেক প্রাচীন অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। মুসলমান ধর্ম্মের অনেক বিষয়ে তাঁহার আস্থা ছিল না, সেকথা আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। তদ্ব্যতীত তিনি খৃষ্ট পারসিক হিন্দু ধর্ম্মমতের সারাংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। মুসলমান ধর্ম্মমতের সকলাংশে তাঁহার আস্থা না থাকিলেও, তিনি ইহাকে কখনও অবজ্ঞা করেন নাই; কারণ, তিনি কোনও ধর্ম্মকেই অবজ্ঞা করিতেন না। তবে আনুষ্ঠানিক মুসলমানেরা তাঁহার প্রতি তাদৃশ সন্তুষ্ট ছিলেন না। এমন কি অনেকে তাঁহার শত্রুও হইয়া উঠেন। আকবরের সমসাময়িক গ্রন্থকার বদৌনি প্রভৃতি তাঁহার মৃত্যুর পর আকবরের প্রতি শ্লেষোক্তি করিতেও ক্ষান্ত হন নাই; কিন্তু হিন্দুরা তাঁহাকে শ্রদ্ধার চক্ষেই দেখিতেন। হিন্দুদের ধর্ম্মমতের সর্ব্বাংশের সহিত তাঁহার ধর্ম্মমতের ঐক্য না থাকিলেও, তাহা যে অনেক পরিমাণে হিন্দুধর্ম্মের মূল ভিত্তিতে গঠিত, ইহা হিন্দুসাধারণে বুঝিতে পারিয়াছিল। সেই জন্যই তাহাদের বিশ্বাস হইয়াছিল যে, তাহাদের প্রয়াগের তপস্বী মহাপুরুষ মুকুন্দ ব্রহ্মচারী (১৮) আকবররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

শ্রীনিখিলনাথ রায়।

(১৮) মুকুন্দ ব্রহ্মচারীর আকবররূপে জন্মগ্রহণের কথা আমরা বৈশাখ মাসের "ভারতী" পত্রিকায় "পূর্ব্বজন্মে আকবর" নামক প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছি। —লেখক।
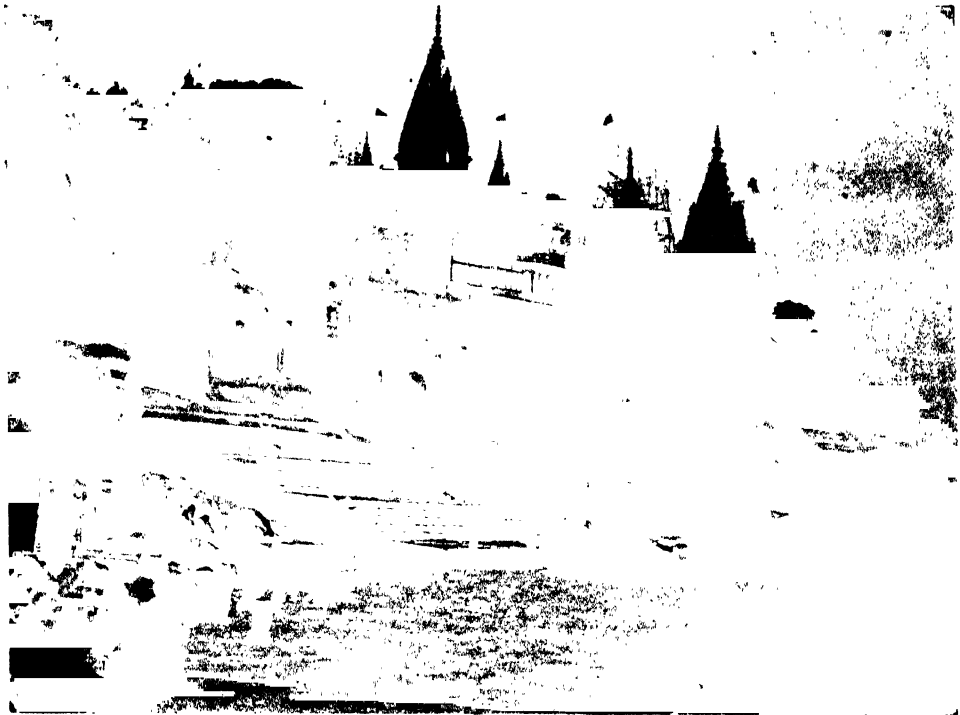
কাশী—মণিকর্ণিকা ঘাট।

গুরুদাস-জননী।

বহুদিনপূর্ব্বে প্রসঙ্গক্রমে পূজাপাদ শ্রীযুক্ত স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মাতৃদেবীসম্বন্ধে কিছু কিছু বিবরণ আমার হস্তগত হয়। তখন হইতেই এই স্বর্গীয়া পুণ্যশীলা মহিলার বিষয় আলোচনা করিবার ইচ্ছা আমার হৃদয়ে স্থান লাভ করে; কিন্তু নানাকারণে সে সময়ে তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারি নাই। এক্ষণে সেই পুণ্যকাহিনীর আলোচনায় আমার লেখনী সার্থক ও হৃদয় পবিত্র করিতে অগ্রসর হইতেছি।

["গৃহস্থ"—হইতে] স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

স্যর গুরুদাসের পিতামহ কলিকাতার দক্ষিণাঞ্চল হইতে নারিকেলডাঙ্গায় আসিয়া বাস করেন। স্যর গুরুদাসের পিতৃদেব ৺রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় খুব রাশভারি লোক ছিলেন। যাঁহারা তাঁহাকে দেখিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন। ৺দ্বারকানাথ ঠাকর প্রতিষ্ঠিত 'কারঠাকুর কোম্পানী'র আফিসে রামচন্দ্র পঞ্চাশ টাকা বেতনে কর্ম্ম করিতেন। সেখানে তাঁহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। তাঁহার সন্ধ্যাবন্দনা পূজাআহ্নিকে একটু বেলা হইত, সুতরাং আফিসে উপস্থিত হইতে একটু বিলম্ব হইত। অন্য কর্ম্মচারীদের বিলম্ব হইলে তিরস্কৃত হইতে হইত, তাঁহাকে কেহ কিছু বলিত না। এই বিষয় লইয়া অন্যান্য লোক যখন কর্ত্তৃপক্ষকে বিব্রত করিতে আরম্ভ করিল, তখন কর্ত্তৃপক্ষ নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রতিকার-পরায়ণ হইলেন; কিন্তু এই নিষ্ঠাবান্ ও কর্ত্তব্যপরায়ণ কর্ম্মচারীটিকে তাঁহারা কোন কথা না বলিয়া 'হাজিরা বহি'খানির (Attendance Register) ভার তাঁহার উপর দিলেন। সকলের যথাসময়ে উপস্থিত হওয়ার উপর দৃষ্টি রাখিতে গিয়া তিনি আপনা হইতেই ঠিক্ সময়ে উপস্থিত হইতে আরম্ভ করিলেন। অল্প বয়সে তাঁহার লোকান্তরগমন জন্য স্যর গুরুদাসের পিতৃগৃহে দৈন্যদশার সংঘটন হয়। স্বর্গীয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাঁহাদের আফিস হইতে পেনসন হিসাবে মাস মাস কিছু টাকা মঞ্জুর করিবেন, এমন সময় নানাবিপৎপাতে আফিস উঠিয়া গেল! সে সাহায্য দানের আর সুবিধা ঘটে নাই। এই অকাল-মৃত্যুনিবন্ধন গুরুদাসের পিতৃপরিবার তাঁহার বাল্যাবস্থায় দারিদ্র্যক্লেশ ভোগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

স্যর গুরুদাসের মাতৃদেবী অধ্যাপক-বংশসম্ভূতা। শোভাবাজার নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীটে রামকানাই গঙ্গোপাধ্যায় ন্যায়বাচস্পতি বাস করিতেন। তিনি প্রতিষ্ঠাবান্ অধ্যাপক ছিলেন। তাঁহারই চতুর্থকন্যা সোণামণি দেবীর সহিত রামচন্দ্রের পরিণয়কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল। এই অধ্যাপক-কন্যা সোণামণি দেবীই স্যর গুরুদাসের জননী। কলিকাতায় বাস হইলেও বাচস্পতি মহাশয়ের কলিকাতার বাসায় বারমাসে তের পার্ব্বণ পূর্ণমাত্রায় বিরাজ করিত। এখনকার মত শিথিল ভাব তখনও দেখা দেয় নাই; সুতরাং বাচস্পতি মহাশয়ের প্রতিষ্ঠা ও সম্মান প্রচুর ছিল। তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা রামমণি স্বামীর অনুমৃতা হইয়াছিলেন। নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের কন্যা হইয়া এবং এই হিন্দু-গার্হস্থ্য জীবনের আদর্শ দেখিয়া গুরুদাসের মাতৃদেবী নিজচরিত্র গঠন করিয়াছিলেন; তাই তিনি ব্রহ্মচর্য্যব্রত-ধারিণী হইয়া জীবনযাপন

করিয়া গিয়াছেন। বাচস্পতি ও তদীয় পরিবারে লালিত পালিত কন্যা সোনামণি অশূদ্র-পরিগ্রাহী ছিলেন ; এইজন্য লোভ-সংবরণ-শিক্ষা প্রথমাবধিই লাভ করিয়া ছিলেন। লোভ-শূন্যতাই গুরুদাস-জননীর সকল শিক্ষার মেরুদণ্ডরূপ জীবনের শেষদিনপর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিল।

আমরা স্ত্রী-শিক্ষার সম্পূর্ণ পক্ষপাতী—সে বিষয়ে সন্দেহ নাই ; কিন্তু এখনকার শিক্ষাসূত্রে সেকালের হিন্দু মহিলা সমাজের ধাতটুকু যে লোপ পাইতে বসিয়াছে তাহার কিনারা কে করিবে? তখনকার শাঁখা-সাড়ীতে তুষ্ট বঙ্গীয় রমণীকুল ত্যাগের আদর্শ ছিলেন। তখন, এখনকার মত, স্বল্পে কাতরা পরিশ্রম বিমুখ মহিলাদের প্রতিষ্ঠা ছিল না। সর্ব্বকর্ম্মে নিপুণা গৃহিণী ঘরে ঘরে পাওয়া যাইত। এখন সেকালের মত সামাজিক ভোজের অনুষ্ঠানই ক্বচিৎ দৃষ্ট হয়! এখনকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভোজের অনুষ্ঠানে রন্ধনকার্য্য নির্ব্বাহের জন্য অর্থ ব্যয় করিয়া "বামুন ঠাকুর" সংগ্রহ করিতে হয় ; কিন্তু সে কালের গৃহিণীরাই হাজার হাজার লোকের আহার্য্য প্রস্তুত করিয়া যথাসময়ে অসংখ্যলোককে আহার করাইয়া কৃতার্থ জ্ঞান করিয়াছেন। আত্মীয় স্বজন ও ভদ্রমণ্ডলীর আহারীয় দ্রব্যের আয়োজন ও প্রস্তুত-করণে যে নিষ্ঠার প্রয়োজন, বলিতে আক্ষেপ হয় যে, এখনকার গৃহে ও সমাজে সে নিষ্ঠার অভাব দাঁড়াইয়াছে। এখন কত্তাদ আহারই অনেকস্থলে অন্যের হস্তে ন্যস্ত। স্যর গুরুদাসের জননী সেই প্রাচীনকালের নিষ্ঠাপূর্ণ পদ্ধতির চিরপক্ষপাতী ছিলেন। পুত্রকে এবং পরিবারের অপর সকলকেও সেইভাবে গঠন করিয়া গিয়াছেন।

শৈশবকাল অতিক্রান্ত হইবার পূর্ব্বেই স্যর গুরুদাসের পিতৃবিয়োগ হয়। তখন তাঁহার বয়স দুই বৎসর দশমাস। সুতরাং পুত্রের লালনপালন, রক্ষণাবেক্ষণ ও শিক্ষাদান-বিষয়ে স্যর গুরুদাসের জননী একাকিনীই পিতৃ-মাতৃকর্ত্তব্য-ভার গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। আর সে সময়ে—সেই সচ্ছলতার দিনেও ঐ ক্ষুদ্র সংসারের অভাব-অনটন যথেষ্ট ছিল। নিঃসম্বল ক্ষুদ্র হিন্দু সংসারে দুঃখ দারিদ্র্যের রুক্ষদৃষ্টি যেরূপ স্বাভাবিক, স্যর গুরুদাসের মাতৃ-গৃহে তাহার অভাব ছিল না।

এইরূপ অবস্থা-বিপর্য্যয়ে বিপন্না হইয়াও, এই এক পুত্র লইয়া অল্পবয়সে বৈধব্য ও তজ্জাত শত ক্লেশ ও অসুবিধা মস্তকে ধারণ করিয়া, তিনি পুত্রটির প্রতিপালনে মনোনিবেশ করিলেন। কিরূপ ভাবে ছেলেটিকে মানুষ করিয়া তুলিবেন, এই একমাত্র চিন্তা তখন তাঁহার হৃদয়-মন পূর্ণরূপে অধিকার করিয়াছিল। সেই সময়ের একটি ঘটনা সংক্ষেপে বিবৃত করি, তাহা হইলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন,—এই বাঙ্গালী মায়ের হৃদয়ের স্নেহ-পারাবার কিরূপ দৃঢ় বেষ্টনীদ্বারা সুরক্ষিত ছিল।

স্যর গুরুদাসের পিতৃবিয়োগের পর, বৎসর অতিক্রান্ত হইবার পূর্ব্বেই যে আঁবের সময়, অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাস, আসিল—তখন তিনি সমগ্র জ্যৈষ্ঠ মাস ব্যাপিয়া দুই বেলা দুটা, কোন দিন বেশীও, আঁব খাইতে পাইয়াছেন। ১লা আষাঢ় তারিখে আহারের সময় আঁব চাহিবামাত্র তাঁহার মাতৃদেবী বলিলেন, "আজ আর আঁব খায় না, আঁব জ্যৈষ্ঠ মাসেই খায়, আষাঢ় মাসে আঁব খায় না, তুমিও খেয়ো না।" গুরুদাস আমের জন্য আব্‌দার ধরিলেন। আঁব না হইলে, ভাত খাইবেন না। শেষ কান্নাকাটি মারধোর ব্যাপার-জননী কিছুতেই আঁব দিবেন না। গুরুদাসের সম্পর্কে এক ভাগিনেয় সেইখানে বসিয়াই আঁব খাইতেছে, তিনি তাহা দেখিয়া নিজের আঁব পাইবার অধিকার প্রতিপন্ন করিতে যথেষ্ট চেষ্টা করিলেন ; গুরুদাসের পিতামহী নিতান্ত কাতরা হইয়া বালকের আব্‌দার পূরণের জন্য বধূমাতাকে বলিলেন, "দাও না, ঘরে আছে দাও,—যখন না থাকিবে তখন না দিও।" বধূমাতা শাশুড়ী ঠাকুরাণীকে অতি মিষ্টভাবে সসম্মানে বলিলেন, "এই বায়নার উপর আঁবটি দিলেই দিন দিন ভয়ানক আব্‌দারে হয়ে উঠবে—এখন কোথায় পাব? আজ দিব না, কাল দিব, না হয় বিকালে দিব, কিন্তু এখন দিব না।" তাঁহাকে তখন বিনা আঁবেই ভাত খাইতে হইল। তৎপরে অপরাহ্নে আঁব পাইয়া আনন্দ আর ধরে না!

স্যর গুরুদাসের জননী অনেক সময় পুত্রের সঙ্গে [illegible] করিতেন। বাল্যকালে বাটীর বাহিরে যাইবার হুকুম ছিল না। একাধিক প্রতিবেশী বালক বাড়ীতে আসিয়া গুরুদাসের সঙ্গে খেলা করিলে তিনি আপত্তি করিতেন না, কারণ, নিজের, এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য বালকের, পু[illegible]

... দৃষ্টি রাখিতেন। কোন প্রকারে নিজের অভিপ্রেত ... বাহিরে যাইতে দিতেন না। কোন প্রকার অপ্রিয় ..., কলহ ইত্যাদির সুযোগ ঘটিত না। মায়ের ...মতিতে বাড়ীর বাহিরে যাইবার অধিকার ছিল না ... মায়ের অজ্ঞাতসারে গুরুদাস সে অধিকার প্রায় কখনও ... করিতেন না। এ বিষয়ে মাতাপুত্র উভয়েরই গুণপনার ... পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। মাতা কেমন সুন্দর উপায়ে পুত্রটিকে বাল্যকালে, যৌবনে ও পরিণত বয়সে আপন বশে রাখিয়াছিলেন, আবার পুত্রও, এই বর্ত্তমান ...ক্তিত্বাভিমানের দিনে, কেমন সহজে মাতৃ-আজ্ঞার অনুবর্ত্তী হইয়া জীবন সার্থক করিয়াছেন!—এইটি বর্ত্তমান সমাজের পক্ষে উচ্চ আদর্শ বলিয়া মনে হয়।

অনেক স্থলে পিতামহী, মাতামহী বিধবা পিতৃস্বসৃগণের ...প্রাবল্যে মাতৃশক্তি কার্য্যকারী হয় না। এ ক্ষেত্রে গুরুদাসের পিতামহী তাঁহার বধূমাতার পুত্রপালন-পদ্ধতি অবলোকন করিয়া এরূপ বুঝিয়াছিলেন যে, তিনি কখনও "খোদার উপর খোদকারি" করিতে যাইতেন না। অবশ্য এটা হয়ত স্যর গুরুদাসের শুভগ্রহের ফল বলিতে হইবে, কারণ অনেক স্থলেই প্রবীণা গুরুজনের অসাবধানতায় মাতৃশক্তি উত্তমরূপে কার্য্য করিতে পায় না; এ বিষয়ে গুরুদাসের পিতামহী দেবী ভিন্নধাতুর লোক ছিলেন।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গুরুদাসের অতি কোমল ও নম্র স্বভাবের পরিচয় পাইয়া নারিকেলডাঙ্গা পল্লীসমাজ তাঁহার মাতৃদেবীকেই প্রশংসাবাদ করিতে লাগিল। তাঁহার পুত্রপালন-পদ্ধতি প্রতিবেশিনী মহিলা-মহলে বিশেষ একটা প্রতিষ্ঠালাভ করিল। পাড়ায় কেহ পুত্রকন্যা লইয়া বিব্রত ও বিপন্ন হইলে, ... তাঁহারই দ্বারস্থ হইত। তিনিও সর্ব্বদাই অতি সহজে তাঁহার কোমল-কঠোর-নীতি প্রয়োগ করিয়া তৎক্ষণাৎ ... বালক-বালিকাকে শান্ত করিয়া দিতেন। তিনি ... ঐরূপ অশিষ্ট বালক-বালিকাকে নিকটে ডাকিয়া ... কিছু আহার দিতেন, সঙ্গে সঙ্গে তাহার সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন করিয়া তাহার আবদার বা ... কারণ জানিয়া লইতেন; পরে, স্থলবিশেষে তাহার আত্মীয়স্বজনকে দুএকটা মিষ্ট ভৎর্সনা করিয়া, শেষে তাহাকে ... সময়ের মধ্যে তাহার দৌরাত্ম্য ও বেয়াদবি বুঝাইয়া দিতেন,—তখন সে ত্বরায় নিজের দোষ স্বীকার করিয়া শান্তভাব ধারণ করিত।

প্রতিবেশিগণের মধ্যে এই দেবী-স্বভাবা রমণী নানা কারণে প্রচুর সম্মান ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। সে গুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা বহুজ্ঞাতব্য বিষয়ে পূর্ণ হইলেও, সহসা সে গুলির সংগ্রহ সম্ভবপর নহে। তবে এ কথা ঠিক যে, স্যর গুরুদাসের অকপট, নির্ম্মল ও সৌজন্যপূর্ণ মিষ্টব্যবহার দীর্ঘকাল ধরিয়া তাঁহার মাতৃদেবীকে নিকটবর্ত্তী জনমণ্ডলীমধ্যে পূজার পাত্রী করিয়া রাখিয়াছিল। তাঁহার সাধু ব্যবহারের অন্তরালে লোকে তাঁহার সাধ্বী ও পূতকর্ম্মানুরাগিণী জননীর নিষ্ঠা ও ধর্ম্মভাবের আভাস অনুভব করিয়া থাকে।

হিন্দুরমণী শ্বশুরকুলের নাম রক্ষার জন্য যেমন লালায়িত, শ্বশুরের ভিটায় প্রদীপ দেওয়াও তেমনই গৌরবের বিষয় বলিয়া অনুভব করিয়া থাকেন। গুরুদাস জ্ঞান ও গুণের অধিকারী হইয়া যখন বহরমপুরে ওকালতি করিতে যান, তখন তাঁহার মাতা অনিচ্ছাপূর্ব্বক সকলকে লইয়া পুত্রের সঙ্গে বিদেশবাসিনী হইলেন, কিন্তু সর্ব্বদাই নারিকেলডাঙ্গার ডাঙ্গাটি তাঁহার হৃদয়ে জাগিয়া থাকিত; সর্ব্বদাই বলিতেন, "সামান্য কিছু করিয়া লও, পরে চল বাড়ী যাই; বাড়ীতে থেকে ক্লেশ পাই সেও ভাল! এখানে কেন থাকিবে?" নিয়ত মায়ের এই ইচ্ছা শুনিতে শুনিতে স্যর গুরুদাস কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি করিতে আসিলেন। মাতৃ-আদেশে পুনরায় নারিকেলডাঙ্গার বাটীতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইলেন।

হাইকোর্টের জজ্ হইবার পর বন্ধুবান্ধবদের অনেকে চৌরঙ্গী অঞ্চলে বাড়ী করিয়া, বা ভাড়া লইয়া, বাস করিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন। সে পরামর্শ মাতাপুত্র উভয়ের—কাহারই মনঃপূত হয় নাই। দুর্দ্দিনের সংগ্রামক্ষেত্র নারিকেলডাঙ্গার বাসভবন গুরুদাসের জননীর বড়ই প্রিয়স্থান ছিল। তিনি এই স্থানটিকে জীবন-সংগ্রামের তীর্থ-স্থান বলিয়া মনে করিতেন।

স্যর গুরুদাসের বাল্যাবস্থায় রন্ধনের জন্য একখানি গোলপাতার ঘর ছিল। ঐ পাকশালার অতি নিকটে এক পার্শ্বে একটি কাগ্‌জি লেবুর গাছ ছিল,—গাছটিতে এত লেবু

হইত যে, পাড়ার লোক, দাসদাসী, মুটেমজুর, যাহার যখন প্রয়োজন হইত, চাহিবামাত্র লেবু পাইত। গাছটিতে এত ফল ধরিত যে, লেবু পুষ্ট হইবার সময় গাছটিকে আসন্নপ্রসবা গর্ভিণীর ন্যায় অবসন্ন ও ফলভার-বিপন্ন বলিয়া বোধ হইত। সেই সময় প্রতিবেশিগণের বাৎসরিক প্রাপ্য বিতরিত হইত,—সে বিতরণে পাড়ার এক প্রাণীও বাদ পড়িত না। এইরূপ সময়ে একদা এক মুটিয়া, কাঠের মোট নামাইয়া পারিশ্রমিক লইবার সময় লেবুগাছের দিকে দৃষ্টি পড়ায়, মা ঠাকুরাণীর নিকট অতি ব্যাকুলভাবে একটি লেবু চাহিয়াছে! তাঁহার কোন সময়েই সহজে ধৈর্য্যচ্যুতি হইত না। সর্ব্বদাই প্রসন্নচিত্তে সংসারের নিত্য-নৈমিত্তিক কাজগুলি সম্পন্ন করিতেন, কেবল কখন কখন গুরুদাসের বাল্যব্যবহারে বিরক্তির কারণ ঘটিলেই তিনি কাতর ও বিরক্ত হইয়া পড়িতেন। মা ঠাকুরাণী তখন ঐরূপ একটি ঘটনায় চিত্ত-চাঞ্চল্য ভোগ করিতেছিলেন, ঠিক সেই সময়ে মুটিয়া লেবু চাহিয়াছে; তাই রুক্ষভাবে বিরক্তির স্বরে তাহাকে বলিয়া ফেলিলেন "কেন?—যে আসবে, যার দরকার, সেই লেবু চাহিবে কেন? না,- লেবু পাবে না।" লোকটা নিতান্ত অপ্রস্তুত হইয়া নীরবে প্রাপ্য পয়সা লইয়া চলিয়া গেল। অল্পকাল পরেই ঠাকুরাণীর বিরক্তির অবসানের সঙ্গে সঙ্গে সেই মুটিয়ার অনুসন্ধান আরম্ভ হইল,—তাহাকে অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া গেল না!— গুরুদাসের মাতৃদেবীর মানসিক গ্লানি ও অশান্তির মাত্রাও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ক্রমশঃ সে দিন গেল, পর দিন গেল, কিন্তু উঠিতে বসিতে "লোকটাকে লেবু দেওয়া হইল না" এই কয়টি বাক্য সর্ব্বদাই তাঁহার মুখে প্রকাশ পাইতে লাগিল!—সে কি অশান্তি! এইরূপে কএকদিন কাটিয়া গেলে, একদিন পুত্রকে বলিলেন—"খালধারে যেখান হইতে আমাদের কাঠ আসে, স্কুল থেকে আসিবার সময় সেইখানে লোকটির সন্ধান লইও, পাইলে তাহাকে ডাকিয়া আনিবে, তাহাকে লেবু না দিয়া আমি স্থির হইতে পারিতেছি না।" মাতৃদেবীর এইরূপ আত্মগ্লানি, ন্যায়নিষ্ঠা ও কর্ত্তব্যজ্ঞানের সুবিমল প্রভাব যে গুরুদাসের বাল্যজীবন গঠনের পরিপোষক—ঐ মায়ের সুবুদ্ধিপ্রসূত বিবিধ উপকরণ যে জীবনগঠনের উপাদানরূপে নিয়োজিত হইয়াছিল—সে জীবনের পরবর্ত্তী অভিনয় যে সমগ্র জনসমাজকে মুগ্ধ করিবে, সে বিষয়ে কি আর সন্দেহ আছে? স্যর গুরুদাসকে ঠেকিয়া শিখিতে হয় নাই। মাতৃস্নেহের বেষ্টনীর মধ্যে থাকিয়া মাতৃজীবনের ক্রিয়াকলাপ, আচারব্যবহার, সৌজন্য ও শীলতাই তাঁহার বেদ-বাইবেল-কোরাণে পরিণত হইয়াছিল;—তিনি মাতাকে দেখিতে দেখিতে নিজে গড়িয়া উঠিয়াছিলেন!

স্যর গুরুদাসের শৈশব, বাল্য, ও প্রথম-যৌবনকাল এইরূপে মায়ের উপদেশ ও পরামর্শের অধীন হইয়া অতি পবিত্রভাবে অতিক্রান্ত হইয়াছিল, গৃহের বাহিরে কখনও জলস্পর্শের প্রয়োজন হয় নাই। বাল্যকাল হইতে এই প্রাচীন বয়স পর্য্যন্ত সমগ্রজীবনে—বোধ হয় পাঠদ্দশায়—মোটের উপর দুই তিন দিন বিদ্যালয়ে মিষ্টান্নভক্ষণ ও পিপাসার জল পান করিয়াছিলেন।—তাহাও জননী জানিতে পারিয়া আপত্তি করিয়া নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। সেই প্রবীণ গৃহিণীর সংসারধর্ম্ম পালনের ফলে, আজপর্য্যন্ত স্যর গুরুদাসের পুত্রপৌত্রগণ এই নিয়ম রক্ষা করিয়া চলিতেছেন। পারিবারিক জীবনে এরূপ বিচিত্র নিষ্ঠা এদেশে আরও অনেক আছে কিনা বলিতে পারি না। আজকালকার দিনে পারিবারিক 'দাঁড়া-দস্তুরের' এরূপ দৃঢ়তা যে নিতান্ত বিরল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। পরে আর গুরুদাসের মাতৃপ্রতিষ্ঠিত এই নিয়মরক্ষা করিয়া তিন পুরুষ চলিতেছেন, ইহা স্মরণ করিয়া তিনি আনন্দিত হইতে পারেন। এ বিমল আনন্দে স্যর গুরুদাস প্রবেশিকা হইতে আরম্ভ করিয়া সকল পরীক্ষাতেই সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। প্রবেশিকার সময়ে জ্বরে খুব কষ্ট পাইতেছিলেন। বেচু-চাটুয্যের ষ্ট্রীটের ডাক্তার ক্ষেত্র নাথ ঘোষ বহুযত্নে পরীক্ষার পূর্ব্বে জ্বরমুক্ত করেন। ইংরেজি পরীক্ষার দিনেও গুরুদাস পথ্য পান নাই। এইরূপ অবস্থায় পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করা কিছু অসম্ভব ব্যাপার সন্দেহ নাই! কিন্তু যাহার দীর্ঘজীবনে বারমাসের নিত্য-আহার প্রায় একাদশীর কাছাকাছি, তাঁহার পক্ষে জ্বরের পর উপবাসে ইংরেজি সাহিত্যের পরীক্ষা দিতে যাওয়া ও পরীক্ষায় প্রথম হওয়া বেশী বিচিত্র ব্যাপার নাও হইতে পারে। ঐ পরীক্ষায় উৎকৃষ্ট ফললাভের জন্য গুরুদাস ও তদীয় মাতৃদেবী ডাক্তার ক্ষেত্রনাথ ঘোষের নিকট চিরদিনই কৃতজ্ঞ ছিলেন। ইহার পরে একবার ৬সরস্বতী পূজার সময়ে মাতার

আদেশমত ডাক্তার বন্ধুর বাটীতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিয়া সন্ধ্যা অতিক্রান্ত হইয়া যায়;—পুত্রের অত্যধিক বিলম্ব দেখিয়া জননী অস্থির হইয়া পড়িয়াছেন। প্রত্যেক পদশব্দে গুরুদাসের বাটী প্রত্যাবর্ত্তন-কল্পনা করিয়া, পরে নিরাশ হইয়া উৎকণ্ঠার মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া, যৎপরোনাস্তি ক্লেশ অনুভব করিতেছেন!—রাত্রি আট্‌টার পর গুরুদাস গৃহে আসিবামাত্র মাতা পুত্রকে বিলম্বের জন্য তিরস্কার করিতে লাগিলেন। গুরুদাস ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া বলিলেন,"ডাক্তার বাবু আমাকে পূজার আরতি হওয়া পর্য্যন্ত আটক করিয়া রাখিলেন,—আমি কি করিব?" মাতা বলিলেন,"তুমি তাঁকে কেন বলিলে না যে মা বিরক্ত হইবেন।" পুত্র বলিলেন, "আমি কি অন্যের নিকট 'মা বিরক্ত হইবেন'—এ কথা বলিতে পারি? "পুত্রের এই সুবিবেচনা সঙ্গত বাক্যে মায়ের বিরক্তির বিরতি হইল;—আর কিছুই বলিলেন না। গুরুদাসের বাল্যজীবনে এরূপ ঘটনা অধিক ঘটে নাই!

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, লোভ-শূন্যতা এই পরিবারের প্রধান অলঙ্কার - লোভ না থাকিলে মানুষ স্পৃহার বশবর্ত্তী হইয়া জীবন-সংগ্রামে অগ্রসর হইতে পারে না; কিন্তু স্যর গুরুদাসের জননী সর্ব্বদাই পুত্রকে স্পৃহার অধীন হইয়া বিদ্যা-অর্জ্জনে অত্যধিক বাধা দিয়া বলিতেন, 'বেশী খাটাখুটি, বেশী বাড়াবাড়ী, কিছুই ভাল নহে। নিজের শক্তি সামর্থ্যের অনুরূপ শ্রমসহকারে পড়াশুনা কর,—ফললাভ তোমার হাতে নাই;—বেশী খাট্‌লেই যে উত্তম ফল ফলিবে, তা' মনেও ক'রো না, ফলদাতা বিধাতা উপযুক্ত সময়ে যোগ্যপাত্রে উপযুক্ত ফল বিধান করিয়া থাকেন।' এই বলিয়া মাতা সর্ব্বদাই পুত্রের অধিক পরিশ্রমে বাধা দিতেন। স্যর গুরুদাসও হৃষ্টচিত্তে মাতৃ-আজ্ঞা পালন করিয়া বিধাতার কৃপার উপর নির্ভর করিতে শিখিতে লাগিলেন। কিন্তু তবুও প্রথম যৌবনের উৎসাহ, উদ্যম এবং কর্ম্মপটুতা কোথায় যাইবে? আবার ইহার উপর তাঁহার পরীক্ষার ফল সর্ব্বদাই তাঁহাকে বঙ্গদেশীয় ছাত্র-মণ্ডলীর শীর্ষস্থানে স্থাপন করিতেছে!—সেরূপ স্থলে আত্মসংযম বড়ই কঠিন ব্যাপার। বি, এল পরীক্ষার সময় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিবারজন্য ও মেডেল্‌টি পাইবার জন্য বেশ একটু পরিশ্রম সহকারে পড়াশুনা করিতেছেন;—পাইকপাড়ার শরচ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় স্যর গুরুদাসের দূর সম্পর্কে ভাই হন, তিনি ঐ সময় তাঁহাদের বাটীতে থাকিয়া লেখাপড়া করিতেন। তিনিই একদিন বলিতে ছিলেন, 'সব কটা পরীক্ষায় দাদা সকলের উপর হইয়াছে, এইটা হইলেই হয়!—এতে আবার একখানা সোণার চাক্‌তি দেয় কিনা!' গুরু দাসের জননী জানিতে পারিয়া ত্বরায় নিকটে আসিয়া সমস্ত শুনিয়া বড়ই ক্ষুব্ধ ও বিরক্ত হইয়া বলিলেন,—"এরূপ জয়লাভের বাসনা মনে পোষণ করা অন্যায়! তুমি সব বিষয়ে ভাল হ'য়েছ—ভালই, কিন্তু অন্যকে পরাজয় করিবার বাসনা কখনও মনে স্থান দিও না। তা'তে ধর্ম্মহানি হইবে!—ওটা প্রশস্ত পথ নহে। তুমি পাশ্ হইলেই আমি সুখী হইব।" প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্র শ্রীযুক্ত নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ও গুণবান্ ও কর্ম্মপটু হইয়াও গুরুদাসকে আঁটিয়া উঠিতে পারেন নাই শুনিয়া, এবং এবার তাঁহারই সঙ্গে পাল্লা চলিবে, ত্রৈলোক্যবাবুর মুখে গুরুদাস জননী এই সংবাদ অবগত হইয়া, হর্ষবিমিশ্রিত কাতরস্বরে বলিলেন,—"আহা! এবার সেই যেন সোণার চাক্‌তি পায়,—তুমি পাশ হইলেই আমি খুসি হইব।" কিন্তু কার্য্যতঃ স্যর গুরুদাস মাতৃআজ্ঞা রক্ষা করিতে—মাতৃইচ্ছা পালন করিতে পারেন নাই!—নীলাম্বরকে পশ্চাতে রাখিয়া, সোণার চাক্‌তিখানি লইয়া, বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ফিরিয়াছিলেন। জানি না, এইরূপ মাতৃইচ্ছার অনুবর্ত্তী হইতে না পারায় গুরুদাসের কোন অপরাধ হইয়াছিল কি না! তাঁহার মা কিন্তু সে দিন ফল-কামনার বিরুদ্ধে গীতাসঙ্গত সদুপদেশ দ্বারা পুত্রের হৃদয় হইতে লালসার বশবর্ত্তী হইয়া আশার পথে ছুটাছুটি করা যে অত্যন্ত অন্যায়, আর তাহাতে যে চরিত্রের স্বাভাবিকতা নষ্ট হয়, ইহা তাঁহাকে উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। স্যর গুরুদাস দীর্ঘজীবনে মাতৃ-আদর্শে এরূপ নিরীহ প্রকৃতিতে গড়িয়া উঠিয়াছিলেন যে, ছাত্র-জীবনে অমিত গৌরব, পরবর্ত্তী জীবনে বহু অর্থ ও প্রচুর মান-সম্ভ্রম অর্জ্জন করিয়াও কোথাও—কখনও—কোনও কারণে আত্মশ্লাঘার পরিচয় দেন নাই এবং পদমর্য্যাদার প্রতাপে কখন কোন কার্য্যোদ্ধারের প্রয়াস পান নাই। সুযোগ এবং সুবিধা হইলে পরে সে বিষয় আলোচনা করা যাইবে।

স্যর গুরুদাসের গৃহস্থজীবন যখন বিধাতার কৃপায় বিস্তৃতি লাভ করিতে লাগিল,—ক্রমশঃ পুত্রকন্যা ও পরিজন-

বর্গে যখন গৃহ পূর্ণ হইতে লাগিল,—তখন সেই প্রাচীনা বৃদ্ধা জননী ষষ্ঠীবুড়ীর ন্যায় বহু নাতি নাতিনী লইয়া সুখে কালযাপন করিতেন !—তখনও সকলকে আপনবশে রাখিয়া আপনার শাসননীতি জারি করিয়া সকলকে সংযত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সময় সময় গৃহের শিশুরা জননীদের নিকট দৌরাত্মনিবন্ধন প্রহার, পুরস্কার পাইলে, বৃদ্ধা বলিতেন—

"ছেলে মারে, কাপড় ছেঁড়ে,
নিজের ক্ষতি নিজে করে।"

তিনি বালক বালিকাদিগকে প্রহার করার সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল—স্নেহমমতা ও মিষ্ট কথায় যত কাজ হয়, কঠোর ব্যবহারে তাহা হয় না। তাই তিনি শিশুদিগের উপর কখন কঠোর ব্যবহার করিতেন না!—কাহাকেও সেরূপ করিতে দেখিলে ক্ষুণ্ণ হইতেন। স্যর গুরুদাসের মাতৃদেবী পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের শিশুপালন-নীতি-বিবরণ কখন অবগত ছিলেন না; কিন্তু স্বভাবগুণে আপনাআপনি সেগুলি তাঁহার উচ্চচরিত্রে স্থানপ্রাপ্ত হইয়াছিল। বধমাতাদের কেহ কখন পুত্রকন্যাকে শাসন কালে "মেরে হাড় গুঁড়ো করে দেব" বলিলেই তিনি বলিতেন, "কখনও অমন অন্যায় ও অসভ্য কথা বলিও না। তুমি ত ওর একখানি হাড়ও ভাঙ্গিবে না, তবে বল' কেন? ছেলের কাছে তোমার কথার মর্য্যাদা থাকিবে না! এতেই মিথ্যাবলার অভ্যাস প্রবল হইয়া পড়িবে!—নানা রকমে অনিষ্ট হইবে! যাহা করিবে না, তাহা বলিও না।"

স্যর গুরুদাসের জননী শেষবয়সে সর্ব্বদাই অপরাহ্ণে জ্যেষ্ঠ পৌত্র হারাণচন্দ্রের নিকট বসিয়া গীতার পাঠ ও ব্যাখ্যা শ্রবণ করিতেন এবং মধ্যে মধ্যে প্রশ্ন করিয়া হারাণ বাবুর নিকট কোন কোন বিষয় বুঝিয়া লইতেন। হারাণ বাবুও আনন্দে ঠাকুরমায়ের ধর্ম্মচিন্তা ও ধর্ম্মচর্চ্চার সহায়তা করিতেন। একদা প্রসঙ্গক্রমে হারাণ বাবু বলিয়াছিলেন, "ঠাকুরমা! তোমার গীতা-শ্রবণের প্রয়োজন কি? তুমি যেভাবে জীবন-যাপন করিলে, এই ত গীতা! গীতায় যাহা আছে তোমাতেও আমরা তাহাই দেখিতে পাই!—আমরা বাড়ীতেই জীবন্ত গীতা দেখিতে পাইতেছি।" ঠাকুরাণী পৌত্রের এতাদৃশ সমাদর প্রদর্শনে নিতান্ত লজ্জিত ও কুণ্ঠিত হইয়া বলিয়াছিলেন "ছি, ছি, অমন কথা কি মুখে আনিতে আছে? ওসব দেবতার কথা,—দেবতার লীলা—মানুষে কখন সম্ভব হয় না। অমন কথা বলিতে নাই!"

স্যর গুরুদাসের মাতৃবিয়োগের পর আদ্যশ্রাদ্ধ নিকটতর হইয়া আসিয়াছে,—এই সময়ে 'নববিধান' ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক শ্রীযুক্ত উমানাথ গুপ্ত মহাশয় স্যর গুরুদাসের সহিত সাক্ষাৎ হইলে বলিয়াছিলেন, "তিনি (জননী) যেরূপ উদার হৃদয়া ধর্ম্মপরায়ণা রমণী ছিলেন, তাহাতে আমাদের বড়ই ইচ্ছা যে তাঁহার স্বর্গারোহণ উপলক্ষে, হিন্দুর অনুষ্ঠেয় সকল ক্রিয়াকলাপের মধ্যে আমরা একদিন আপনার গৃহে (স্যর গুরুদাসের গৃহে) কীর্ত্তনাদি করিতে যাই।" উপযুক্ত মাতার উপযুক্ত পুত্র তৎক্ষণাৎ প্রস্তাবে সম্মতিদান করিয়া বলিয়াছিলেন, "তিনি যেরূপ জীবনযাপন করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে এ প্রস্তাব তাঁহার সম্পূর্ণ উপযুক্ত হইয়াছে।" তদনুসারে শ্রাদ্ধ-ক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর একদিন অনেকগুলি শ্রদ্ধাবান্ ব্রাহ্ম মিলিত হইয়া নারিকেলডাঙ্গার বাটীতে মিলিত হইয়া কীর্ত্তনাদি করিয়াছিলেন।

মাতাপুত্রের চরিত্রচিত্র আলোচনা করিয়া আরও অনেকগুলি কথা বলিবার রহিল। সেগুলি বারান্তরে বিবৃত হইবে।

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

হরিপদর ধ্রুপদ-শিক্ষা।

হরিপদ সময় অপব্যয় করিবার সমস্ত উপায় নিঃশেষ করিয়া, শেষে— ধ্রুপদ-শিক্ষা করিলেন।

হরিপদ তাঁহার পিতা—শ্যামাপদর একমাত্র পুত্র। যে হেতু শাস্ত্রমতে 'পুত্রপিণ্ডপ্রয়োজনম্'—পিণ্ড প্রাপ্তির আশায় শ্যামাপদ তাঁহার পুত্রের অনেক আব্দার শুনিতেন, অগত্যা এ আব্দারও শুনিলেন। হরিপদর 'গলা' ছিল না। যাহাদেরই স্বর-মাধুর্য্যের অভাব এবং 'গলা খেলে না,' তাহারা গীতি রাজ্যে যে উপনিবেশ স্থাপন করেন তাহার নাম —'ধ্রুপদ'। সেই উপনিবেশের প্রচলিত কঠোর-শাসন-প্রথা অনুসারে তাহার অধিবাসীদের সমস্ত ব্যক্তিগত সত্ব বিসর্জ্জন দিয়া তালের আনুগত্য করিতে হয়; কিন্তু স্বরের গতি-সম্বন্ধে যেমন তাঁহাদিগের স্বাধীনতার অভাব ঘটে, তেমনই অপর দিকে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গতি-সম্বন্ধে তাঁহাদিগের কতকগুলি সত্ব জন্মে।—হরিপদ এই সত্বের পূর্ণব্যবহার করিতেন। তিনি গায়িবার সময় "দন্তরুচি-কৌমুদী"-বিকাশ করিয়া যেরূপ ঘন ঘন শিরঃ সঞ্চালন করিতেন, তাহাতে মৃগীরোগের প্রায় সমস্ত লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিত। দক্ষিণহস্তে তান্পুরা ধরিয়া বামহস্ত এরূপ প্রক্ষেপণ, বিক্ষেপণ, ও উৎক্ষেপণ করিতেন যে, শ্রোতৃগণ তাঁহার ব্যায়াম-দক্ষতার শক্তিতে বিস্মিত হইয়া ক্রমে ক্রমে সসম্মানে দূরে সরিয়া বসিত। গায়িবার সময় উত্তরমুখী হইয়া গায়িতে গায়িতে অনেক সময়ই দেখা যাইত যে, শেষে যখন পাখোয়াজে সমে ঘা পড়িল, তখন তিনি পূর্ব্ব ও দক্ষিণ মুখ ঘুরিয়া পশ্চিমমুখী হইয়া বসিয়া আছেন।—এরূপ ঘটনা প্রায়ই ঘটিত।

হরিপদর পিতা—শ্যামাপদ—পুত্রের এরূপ অবস্থা দেখিয়া ভীত হইলেন এবং তাহার সমুচিত চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিলেন। হরিপদ নির্ভয়ে তান্পুরা ও পাখোয়াজ্ বিছানার সহিত একত্রে সজোরে বাঁধিলেন।— এমন সময় তাঁহার মাতা (তাঁহার নাম নিস্তারিণী) শ্যামাপদর কাছে আসিয়া প্রভূত অশ্রুবিসর্জ্জন করিলেন। শ্যামাপদ পত্নীর অকাট্য যৌক্তিকতা উপলব্ধি করিয়া হরিপদর চিকিৎসার সম্বন্ধে মত-পরিবর্ত্তন করিলেন। পাঁচদিন পরে তিনি স্ত্রীর হস্তে লোহার সিন্দুকের চাবি ও সংসারের ভার অর্পণ করিয়া এবং তাঁহার পুত্রকে গায়িবার অবারিত অধিকার দিয়া কাশীযাত্রা করিলেন।—হরিপদর চিকিৎসা হইল না।

শ্যামাপদর গৃহে সমস্যাটির এইরূপ সুচারু-মীমাংসা হইল বটে, কিন্তু প্রতিবেশীরা কাশীবাস করিতে সম্মত হইল না। তাঁহারা সজোরে হরিপদের ধ্রুপদে আপত্তি করিল।

হরিপদর সহধর্ম্মিণী হরিপদর ধ্রুপদের নিষ্ফল প্রতিবাদ করিয়া, শেষে মাথাকুটিতে আরম্ভ করিলেন!—কোন ফলোদয় হইল না। তিনি শেষে নিরুপায় হইয়া নৌকাযোগে সন্তান লইয়া পিত্রালয়ে গমন করিলেন। ফলোদয় হইল না। হরিপদ ধ্রুপদ গায়িতেন ও তাঁহার মাসতুতো-ভাই নীলাম্বর—পাখোয়াজ্ বাজাইতেন।

ক্রমে হরিপদর শ্রোতার অভাব ঘটিতে লাগিল! প্রথম তাহার শ্রোতৃবর্গ ধ্রুপদের সঙ্গে পোলাও বন্দোবস্ত করিলে আসিত; কিন্তু পরিশেষে আহারের নিমন্ত্রণ করিলেও তাহারা আর ধ্রুপদ শুনিতে আসিত না।

শ্রোতার অভাব হরিপদ কখন বিশেষভাবে অনুভব করেন নাই। তিনি তাঁহার বৃদ্ধামাতাকে ধরিয়া সম্মুখে বসাইতেন এবং ধ্রুপদ শুনাইতেন। নিস্তারিণী নিরুপায় হইয়া শুনিতেন—পুত্র পরিত্যাগ করিতে পারেন না! বিশেষতঃ হরিপদ যখন 'দুধের ছেলে'!—তিনি পূর্ব্বে পুত্রের অনেক অত্যাচার নীরবে সহিয়া আসিয়াছেন, ইহাও সহিতেন।

হরিপদর ধ্রুপদের খ্যাতি ক্রমে দেশদেশান্তরে ছড়াইয়া পড়িল। মাতারা ছেলে কাঁদিলে, বলিত, "ঐ আসছে হরিপদ"! অমনই সে আসিয়া মাতৃবক্ষে মুখ লুকাইত! এক প্রৌঢ়া স্ত্রীলোককে 'ভূতে পাইয়াছিল'। হরিপদর গান শুনিয়া সে আশ্রয় পরিত্যাগ করিল, দূরে—আমকাননে এক বেলবৃক্ষে নিজের বাসস্থান স্থির করিল! বস্তুতঃ হরিপদর ধ্রুপদ নগরে অনেক অসাধ্য-সাধন করিল; এবং আরও করিত যদি প্রতিবেশিগণ প্রতিবাদী না হইত!

তৎপরে, প্রতিবেশিগণও হরিপদর সহিত 'রফা' করিলেন! স্থির হইল যে, প্রতিবেশীরা যখন রাত্রিকালে নিদ্রা যাইবেন, তখন শ্যামাপদপুত্র হরিপদ ধ্রুপদ গায়িবেন। শ্যামাপদ কাশীবাস করিবার পূর্ব্বে, বহু প্রতিবেশীর

বহু উপকারসাধন করিয়াছিলেন। প্রতেবেশিগণ স্বীকৃত হইল।

কিন্তু শীতকালের অবসানের সহিত এরূপ সন্ধির অসুবিধা প্রতিবেশীদের অনুভূত হইতে লাগিল। শীতকালে, ধ্রুপদ সহ্য হয়; কারণ রাত্রিকালে দরজা বন্ধ থাকে, তাহার উপর লেপ দিয়া শ্রবণদ্বয় রুদ্ধ করা যায়। কিন্তু গ্রীষ্মকালে ছাদের উপর শুইয়া—একদিকে গ্রীষ্ম আর এক দিকে ধ্রুপদ—ইহার মধ্যে পড়িয়া, প্রতিবেশীরা আত্মহত্যার সঙ্কল্প করিত! কিন্তু আত্মহত্যায় নানারূপ অসুবিধা বিবেচনা করিয়া, শেষে একদিন প্রভাতে দলবদ্ধ হইয়া, হরিপদর মাতার নিকট গিয়া—হরিপদর ধ্রুপদে তাহাদের বিশেষ-আপত্তি জ্ঞাপন করিল।

বৃদ্ধপিতা কাশীবাস করিলে সাংসারিক অসুবিধা নাও হইতে পারে; কিন্তু বিদ্রোহী প্রতিবেশিগণ কাশীবাস করিতে অস্বীকৃত হইলে নানারূপ স্থূল অসুবিধা ঘটে! হরিপদর পৈতৃক গৃহের মধ্যে ইষ্টক-খণ্ড বর্ষিত হইতে লাগিল!—অবিরাম যুদ্ধ চলিতে লাগিল।—একদিকে ধ্রুপদ আর একদিকে ইষ্টক খণ্ড। শেষে স্থির হইল যে,—অতঃপর হরিপদ নগরের প্রান্তভাগে অবস্থিত আম্রকাননে ধ্রুপদের চর্চ্চা করিলে নির্ব্বিরোধ একটা মীমাংসা হয়! হরিপদ জিজ্ঞাসা করিলেন,—তাঁহার তান্‌পুরা ও পাখোয়াজ্ বহন করে কে? প্রতিবেশীদিগের মধ্যে তিনচারিজন সাহসী বীরপুরুষ তৎক্ষণাৎ অগ্রসর হইয়া, সে বিষয়ে—তাঁহার যন্ত্রদ্বয় বহনের—ব্যয়ভার বহন করিতে প্রস্তুত হইলেন।

তাহাই হইল।—হরিপদ আম্রকাননে গিয়া নির্ভয়ে ধ্রুপদ গায়িতেন ও নীলাম্বর পাখোয়াজ্ বাজাইতেন—কেহ কোন বাধা প্রদান করিত না। কথিত আছে যে, একদা এক ব্যাঘ্র সন্নিহিত পুষ্করিণীতে জলপান করিতে আসিয়াছিল; হরিপদ ধ্রুপদ আরম্ভ করিতেই সে জলপান না করিয়াই লাফ্ দিয়া পলায়ন করে!—সে বিষয়ে কিন্তু কখন উচিত সংখ্যক সাক্ষীদ্বারা চূড়ান্ত-মীমাংসা হয় নাই। কএকটি স্ত্রীলোক সেই পুষ্করিণীতে প্রভাতে জল আনিতে যাইত। —হরিপদ কাননে আসিয়াই 'শঙ্করা' ধরিলেন।—যেই সেই শঙ্করার অন্তরা ধরা, অমনই তাহারা কলস ফেলিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে গৃহাভিমুখে ছুটিল ও তাহাদের মধ্যে একজন পা মচ্‌কাইয়া—বাতাহত-কদলীবৎ উপুড় হইয়া পড়িয়া গেল।

হরিপদ ধ্রুপদ গায়িলেও করুণার্দ্রচিত্ত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি তখনই গীত পরিত্যাগ করিয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, রমণীটি মূর্চ্ছিত হইয়াছেন! শুশ্রূষা দ্বারা সেই নারীটির মূর্চ্ছা অপনোদন করিয়া, তাঁহাকে সযত্নে ধরিয়া, তাঁহার গৃহে লইয়া গেলেন। সেই সময় যুবতীটি ঘন-কৃষ্ণ-বারিদদলে স্থির-সৌদামিনীর ন্যায় প্রতীয়মানা হইয়াছিলেন। সেখানে একটু ডাকাডাকির পর একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক আবির্ভূত হইলেন, এবং রমণীটিকে তদবস্থ দেখিয়া শয্যায় শয়ন করাইতে গেলেন। তাঁহার চীৎকারে প্রতিবেশিনীগণ রেল্‌ওয়ে এক্‌স্‌প্রেসের ন্যায় ছুটিয়া আসিলেন! হরিপদ বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। কিয়ৎপরে বৃদ্ধা আসিয়া হরিপদকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন—তিনি একটু কথোপকথন-প্রিয় ছিলেন।

বৃদ্ধা। মূর্চ্ছা গেল কেন বাছা?

হরি। আমার গান শুনে।

বৃদ্ধা। গান শুনেই?

হরি। তাইত' এখন বোধ হচ্ছে!

বৃদ্ধা। কিরকম গান? যাত্রারদলের?

হরি। না মা, ধ্রুপদ।

বৃদ্ধা। সে আবার কি?

হরি। ধ্রুপদ—ধ্রুপদ গান!—আসল গান ত' ধ্রুপদ! ব্রহ্মা ধ্রুপদ গায়িতেন কিনা তা পুরাণে নাই,—কিন্তু মহাদেব যে ধ্রুপদ গায়িতেন, তাঁতে আর কোন সন্দেহ নাই! কারণ, তিনি তান্‌পুরার সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

বৃদ্ধা। সে আবার কি?

হরি। তান্‌পুরা কি আশ্চর্য্য যন্ত্র! চারিটা তার, কিন্তু কি স্বর-মাধুর্য্য! যেন সহস্র মত্ত-দাদুরী বর্ষোদ্গমে এক সঙ্গে তান্ ধ'রে দিয়েছে—আর কি আকার!—যেন "দারুভূত-পিণাকী!"—তান্‌পুরা যে নিশ্চয়ই শিবের সৃষ্টি, তা' আকারেই প্রমাণ! প্রত্নতত্ত্ববিদেরা বলেন যে, ১৩১৭ সালে—

বৃদ্ধা আধুনিক প্রত্নতত্ত্ব পাঠ করেন নাই, ও তম্বুরার পুরাতত্ত্ব জানিবার জন্য কোন ঔৎসুক্য প্রদর্শন করিলেন

না। তিনি শুদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বল্লে বাছা? কি পদ?"

হরি। ধ্রুপদ—শুনবে? পাখোয়াজ্‌টা আন্‌লে হ'ত! তা হ'ক—বিনা যন্ত্রেই হোক্‌!

এই বলিয়া, হরিপদ দরবারি কানাড়া আলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন! বৃদ্ধা কোনরূপ উদ্বেগ বা আগ্রহ-প্রকাশ করিলেন না। শুধু তিনি গালে হাত দিয়া হরিপদর ধ্রুপদ শুনিতে লাগিলেন। হরিপদর ধ্রুপদ এত নিবিষ্টচিত্তে বোধ হয় ইতঃপূর্ব্বে কেহ কখন শুনে নাই! হরিপদ নামে দরবারি কানাড়া আলাপ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহা কার্য্যে "সন্ধ"! ক্রমে হরিপদ বেগে হস্তপদ-বিক্ষেপ আরম্ভ করিলেন। বৃদ্ধাও সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘ-দন্তপংক্তি প্রকাশ ও সীমন্ত বিভক্ত শুভ্র শিরঃ সঞ্চালন করিতে আরম্ভ করিলেন। হরিপদ তখন দ্বিগুণ উৎসাহে গায়িতে গায়িতে প্রবলবেগে হস্ত ও নাসিকা শূন্যে প্রক্ষেপ করিয়া দাড়াইয়া উঠিলেন! বৃদ্ধাও সঙ্গে সঙ্গে এক ঘটি জল আনিয়া হরিপদর মস্তকে ঢালিয়া দিলেন!

হরিপদ বিরক্ত হইয়া গান থামাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও কি কচ্ছিস্‌ বুড়ি"?

বৃদ্ধা। বোস বাছা বোস!—আহা-হা! বোস—

হরি। কেন বস্‌ব? (বলিয়া বসিলেন)

বৃদ্ধা। আহা-হা!—কতদিন এরকম হ'য়েছে বাছা?

হরি। কি রকম?

বৃদ্ধা। এই জিজ্ঞেসা কচ্ছিলাম কি—এই ক'দ্দিন থেকে তুমি—কি বল্লে—এই ধ্রুপদ গাও?

হরি। চার বছর থেকে।

বৃদ্ধা। আহা হা! চিকিৎসা করাও। সারবে।

হরি। কি সারবে?

বৃদ্ধা। আহা হা! ছেলে বয়েস!—তোমার মা আছে?

হরি! আছে। তার সঙ্গে ধ্রুপদের কি সম্পর্ক?

বৃদ্ধা। মা দেখে না?

হরি। দেখ্‌বে আবার কি?

বৃদ্ধা। বৌ আছে?

হরি। না আমি বিয়ে করিনি?

বৃদ্ধা। আহা হা! বিয়ে কর সারবে। আহা হা! আমার জামাই এই রকম হাত পা নাড়্‌তে নাড়্‌তে চোখ উল্টাত গো! কিন্তু ডাক্তার বল্লে সে ধনুষ্টঙ্কার। কিন্তু তাতে বাছা এত গাধার মত চেঁচাতনা ত! শুধুই হাত পা নাড়্‌তো, হ্যাঁ বাছা তাহ'লে ধনুষ্টঙ্কার ঠিক্‌ ধ্রুপদ নয়?

উক্ত প্রশ্ন শুনিয়া, বৃদ্ধার ভবিষ্যৎসম্বন্ধে হরিপদর মনে গাঢ় ভীতিসঞ্চার হইল! তিনি তাহা প্রকাশ করিবার পূর্ব্বেই অভ্যন্তর হইতে নারীকণ্ঠে কোলাহল উত্থিত হইল,—'উঠে বসেছে,' 'মাথাটা ধর' 'জলের ছিটা দাও,' 'ওমা কি হোলো!"—ইত্যাদি। বৃদ্ধা ক্ষিপ্রপদে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া সেই মথিত সমুদ্রকল্লোলবৎ কলরবে যোগ দিলেন। হরিপদ বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন।

কালিদাস, ধ্রুপদের তুলনা 'মেঘ-গম্ভীর-ঘোষের' সহিত করিয়াছেন; কিন্তু ধ্রুপদের সহিত ধনুষ্টঙ্কারের তুলনা ইতঃপূর্ব্বে কেহ করিয়াছেন কিনা, তাহার স্মরণ হইল না। ধ্রুপদে তাহার উত্তপ্ত অনুরাগ 'বরফ' হইয়া গেল! তিনি সর্ব্বাঙ্গে একটা শৈত্য অনুভব করিলেন! জীবনে ঘৃণা জন্মিল!

অদূরে আম্রকাননের দিকে চাহিতে চাহিতে তাহার সুদূর বাল্যকাল স্মৃতিপথে উদিত হইল—যখন তিনি ধ্রুপদ শিখেন নাই, এবং যে দিন, গদ্দভের চীৎকার ও ধ্রুপদ ভিন্নবর্গীয় বলিয়া গণিত ছিল। আহা কি সুখের সেই বাল্যকাল!—এরূপ তুলনায় হরিপদ একবারে 'দমিয়া' গেলেন!

কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া হরিপদ বসিয়া আছেন, এমন সময়ে বৃদ্ধাটি ক্রমে ক্রমে চক্রবালরেখায় পূর্ণচন্দ্রের মত সেই কক্ষে উদিত হইলেন। তিনি আসিয়া বলিলেন,—'জ্ঞান হয়েছে! উঠে ব'সেছে'!

হরিপদ জিজ্ঞাসা করিলেন,—'কিসে জ্ঞান হোল?'

বৃদ্ধা উত্তর করিলেন, 'বোধ হয় তোমার ধ্রুপদে।'

সেই সময়ে বৃদ্ধা যদি হরিপদর মুখ নিরীক্ষণ করিতেন, ত হরিপদর মুখ অত্যন্ত ক্ষুদ্র বোধ হইত! হরিপদ আর বিনা বাক্যব্যয়ে, ধীরপদবিক্ষেপে গৃহে ফিরিয়া আসিলেন; তাহার পরে যাহা হইল, তাহা অত্যন্ত গদ্যময়। গল্পটি এরূপ কবিত্বময় অবস্থায় আনিয়া তাহার পরে তাহার এরূপ গদ্যময় পরিণতি লিপিবদ্ধ করিতে আমার লজ্জাবোধ করিতেছে!

অথচ এ অবস্থায় (যোগ্যহস্তে পড়িলে) পরে কি না হইতে পারিত! হাতে, এক পঞ্চবিংশতি-বয়স্ক যুবক, ইঁহাকে গড়িয়া পিটিয়া প্রেমিক করিয়া তোলা অসম্ভব নহে! পরে তাহার যুবতী পত্নী (তাঁহার ত্রিপুত্রকন্যা সত্বেও) সুন্দরী অন্ততঃ সুন্দরী যে নহেন তাহার কোন নিদর্শন এই গল্পে কুত্রাপি নাই। তাঁহাকে প্রেমমূলক উপন্যাসে নায়িকাতে পরিণত করা যাইত। পুত্রকন্যাগুলি ধরুন বসন্ত রোগে মারা গেল। আর কোন আপত্তি রহিল না। তাহার পরে এই সুন্দরী বিধবা—কোন পরিচয় দিই নাই। ইঁহার পুত্রত্বদোষ নাই। ইঁহাকে পার্শ্বনায়িকারূপে খাড়া করা যাইতে পারিত। পিতা কাশীবাসী হৃদ্‌রোগে মারা গেলেই সমস্ত বিষয় হরিপদর; কিংবা তিনি অন্যরূপ উইল করিলে উপন্যাসটি আরও জটিল ও ঘটনাপূর্ণ করা যায়। মাতা হঠাৎ জ্বরে মারা যাইতে পারেন। হৃদ্‌রোগে মারা যাওয়া তাঁহার অসম্ভব, যেহেতু তাঁহার হৃৎপিণ্ড এতদিন সবলে হরিপদর ক্রুপদ সহ্য করিয়া আসিয়াছে। রহিল এক বৃদ্ধা (যুবতীর মাতা) তা একজন বৃদ্ধা থাকিতেও পারে। তাহারা কর্ম্মক্ষেত্রে কোন কাজে না লাগিলেও উপন্যাসে অনেক কাজে লাগে। হরিপদ নামটি গন্ধময় বটে; কিন্তু তাহার এটি ডাক-নাম ও আসল নাম রমণীমোহন, এরূপ ধরিয়া লইলে কোন আপত্তিই থাকেনা! এ গল্পে উত্তম উপকরণের অভাব নাই! এ ঘটনাপরম্পরা হইতে পরে কি না হইতে পারিত!

কিন্তু কি করিব আমি সে চেষ্টাও করিবার সুবিধা পাইলাম না। কারণ, তাহার পর কি ঘটিল তাহাই আমায় লিপিবদ্ধ করিতে হইবে, কি ঘটিতে পারিত তাহা আমার বর্ণনীয় বিষয় নহে।

যাহা ঘটিল তাহা এই :—

হরিপদ চিন্তা করিতে করিতে ধীরপদবিক্ষেপে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কি আশ্চর্য্য! যে ক্রুপদে মূর্চ্ছা, আবার সেই ক্রুপদেই মূর্চ্ছাভঙ্গ! Similia similiabus curantur সূত্রের প্রমাণ পাইয়া, তিনি গৃহে ফিরিয়া ক্রুপদ পরিত্যাগ করিলেন এবং—

এক হোমিওপ্যাথিক বাক্স কিনিলেন।

৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

অজন্তা-গুহার একটি দৃশ্য।

টিং পাইয়ের হংসোপনিবেশ।

বন্য হংস।

(শিকারীর খাতা হইতে সংগৃহীত)

"মৃগয়া"— ব্যাপারটা এদেশে অনেককাল হইতেই প্রচলিত আছে। তবে পুরাকালে রাজারাজড়ারাই প্রায় মৃগয়ায় প্রবৃত্ত হইতেন। আর "শিকার" প্রচলিত ছিল বন্য পাহাড়ী জাতিদিগের মধ্যে। নিষাদ কিরাত, শবর প্রভৃতি নীচ জাতির ইহাই ছিল জীবিকা। সেকালে তীর ধনুক, গুল্‌তী বাঁটুল, বর্ষা, বল্লম কুঠার, টাঙ্গী, প্রভৃতি অস্ত্র লইয়াই সর্ব্ববিধ পশুপক্ষী শিকার চলিত। এখনও বন্যজাতিদের মধ্যে সেই সব অস্ত্রশস্ত্রই প্রচলিত আছে। ইদানীং সভ্যতালোক, প্রাপ্ত যেসকল ভারতবাসীদিগের মধ্যে শিকার-ব্যসন প্রবেশ করিয়াছে, তাঁহারা এখন গুলি বারুদ-বন্দুক লইয়াই শিকারে প্রবৃত্ত হন।

শিকারের জন্য ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর আবার পৃথক্ পৃথক্ শ্রেণীর বন্দুক-গুলি ও (বারুদ) ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

আজকাল এতদ্দেশীয় রাজা-মহারাজা এবং বড়-ঘরের ছেলেরা অনেকেই বিশেষ শিকার-প্রিয় হইয়াছেন; এবং খুব সুদক্ষ—অভ্রষ্ট-লক্ষ্য—শিকারী বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। এতদ্দেশের অনেকগুলি প্রথিতযশাঃ শিকারীর বিবিধ বিচিত্র শিকার-কাহিনীর বিবরণ সম্প্রতি আমাদের হস্তগত হইয়াছে। আমরা তাহা হইতে সময়ে সময়ে এক একটি প্রবন্ধ সঙ্কলন করিয়া পাঠকবর্গকে উপহার দিব। অদ্য আমরা বন্য হংস সম্বন্ধে একটি বিবরণী পত্রস্থ করিলাম।

হংসের 'শারীরতত্ত্ব' সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার নাই। হংস পক্ষিজাতির 'সন্তরকবর্গের' অন্তর্ভুক্ত—তাহাদের পা দুখানি দেহের পশ্চাতে সংলগ্ন সেই জন্য তাহারা সাঁতার দিতে পটু, আবার তজ্জনই মাটীতে দ্রুত চলাফেরা করিতে অক্ষম—পায়ে চারিটি আঙ্গুল; সমুখে তিনটী, পিছনে অতি ছোট একটি; সমুখের তিনটি পাতলা চামড়া দ্বারা যোড়া—ঠোঁট চেপ্টা এবং তাহার উভয় পাশ করাতের ন্যায় খাজকাটা, যখন জল-কাদা-পাঁকের ভিতর হইতে খাদ্যসংগ্রহ করে, নীর-মিশ্রিত দুধ হইতে ক্ষীর ছাঁকিয়া লয়, তখন কাদা ও জল সেই খাজের ফাঁক দিয়া বাহির হইয়া যায়—চর্ম্ম লোমের ন্যায় কোমল পরবিশিষ্ট এবং তাহার উপর আবার ঘন পালকদ্বারা আবৃত—এই-গুলিই হংসের বিশেষত্ব।

বন্য হাঁস।

এদেশে খাল বিল নদী তড়াগ প্রভৃতি জলাশয়ে বন্য হংস দলে দলে বিচরণ করে। সমগ্র শীতকাল ইহারা ভারতবর্ষের নানাস্থানে বাস করে,—শীতের অবসানে অন্যত্র চলিয়া যায়। বন্য হংস নানা আকার ও বর্ণবিশিষ্ট এবং নানা জাতিতে বিভক্ত;—আমাদের দেশে সাধারণতঃ বালি হাঁস, সরাল, চকাচকি, পানমোরগ প্রভৃতি কএক শ্রেণীর বন্য হংস দেখিতে পাওয়া যায়! সকল দেশেই প্রায় চিনা হাঁস

ও পাতিহাঁসই গৃহে পালিত হইয়া থাকে। গৃহপালিত হংস মাত্রই বন্য হংসের বংশধর। চিনাহাঁস গুলি পাতিহাঁস অপেক্ষা আকারে একটু বড় হয় এবং তাহাদের ঠোঁটের মূলে ডালিম ফুলের মত মাংসের একটা লাল ফুল থাকে। সাধারণতঃ বন্যহাঁসের মধ্যে ৬।৭ ইঞ্চি হইতে একহাত পর্য্যন্ত লম্বা জাতির হাঁস দেখিতে পাওয়া যায়। বন্যহাঁসেদের মধ্যে দাম্পত্য-আকর্ষণটা অতি প্রবল—চকাচকির স্ত্রী-পুরুষের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ সকলেই জানেন।

বিলাতে শিকার-প্রিয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বন্যহাঁসের বড়ই আদর। বসন্তের প্রাক্কালে যখন সর্ব্বপ্রথম ক্বচিৎ দুই একটা বন্য হাঁস দেখা দেয় তখন, শিকারীদিগের মধ্যে একটা আনন্দ রোল—উৎসবধ্বনি উঠে!—যেন একটা কি বিশিষ্ট ঘটনা সূচিত হইল! তাহার কারণ এই যে ওই অগ্রদূতদিগকে দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, তাহাদের বাসা নির্ম্মাণ, ও ডিম-পাড়িবার সময় সমাগতপ্রায়। অতঃপর তাহারা দলে দলে—ঝাঁকে ঝাঁকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিবে! আর হাঁসদিগকে বাসা বাঁধিতে দেখিলেই ইহাও বুঝা যায় যে, এইবার শিকারোপযোগী অন্যান্য বৃহৎ জাতীয় পাখীদিগেরও আসিবার সময় হইয়াছে। ইহারা প্রায় জলাশয়ের নিকটবর্ত্তী শরবনের ভিতর—পুরাতন বৃক্ষাবলীর কোটরে তড়াগতটবর্ত্তী লতাগুল্মের মধ্যে বাসা-স্থাপনা

হাঁসের বাসা।

করে! ঋতুর প্রাক্কালেই যাহারা আসিয়া বাসা বাঁধে তাহাদের একটা বিপদ্ আছে। মার্চ্চমাসেও বিলাতে মাঝে মাঝে তুষার-পাত হয় কুয়াসা ত আছেই; কাজেই যাহারা সর্ব্বাগ্রে আসিয়া ডিম পাড়ে, অতিরিক্ত ঠাণ্ডা লাগিয়া তাহাদের ডিমগুলি ফাটিয়া যাইবার বিশেষ ভয় থাকে। তবে জীবজন্তুরও একটা জন্মগত—সহজাত জ্ঞান আছে, ইহা লইয়া জীবমাত্রেই জন্মগ্রহণ করে। ইহা আছে বলিয়া পশুপক্ষকীটপতঙ্গ প্রভৃতির জ্ঞান বা চেতনকণা বৃদ্ধি বা স্ফূর্ত্তি পায় না; অপিচ মানুষ সেই সাধনের ফলে উপার্জ্জিত জ্ঞান—প্রজ্ঞা বা প্রবুদ্ধ-জ্ঞান-লাভ করে। এই সহজাত জ্ঞান বা বুদ্ধিবশে হাঁসেরা, তাহাদের ডিমগুলিকে ঠাণ্ডা হইতে রক্ষা করিবার জন্য, নিজেদের বুকের নরম পালক ঠোঁট দিয়া ছিঁড়িয়া তদ্দ্বারা ডিমগুলিকে আবৃত করে। বাসাটি তেমন নিম্ন বা আর্দ্রভূমিতে স্থাপিত হইলে এইরূপ সতর্কতা সত্ত্বেও ডিমগুলিকে রক্ষা করা সুকঠিন হইয়া উঠে; অনেক সময় শৈত্যবশতঃ দুই একটা চিড় খাইয়া যায়! আর একবার একটু চিড় খাইলেই সে ডিম ফুটিবার কোনও আশাই থাকে না!

যাহা হউক, পরম করুণাময়ের মঙ্গলবিধানে অনুমাত্রও ত্রুটি দেখা যায় না!—অভ্যাসবশেই হউক, অথবা ঠেকিয়া শিখিয়াই হউক, বন্য হাঁসেরা নিতান্ত অভাবস্থলেই জলাশয়তটবর্ত্তী হোগ্‌লাবন বা অপর লতাগুল্মমধ্যে বাসা স্থাপন করে, নচেৎ সাধারণতঃ তাহারা বাসার স্থান-নির্ব্বাচনে বেশ বুদ্ধিমত্তা—পরিণামদর্শিতার পরিচয় দেয়। সচরাচর তাহারা ভূমি হইতে দশ পনর হাত উচ্চে, গাছের কোটরে বা মোটা ডালের গোড়ায় বাসা নির্ম্মাণ করে! নিম্নভূমিতে বাসা বাঁধিলে তাহাদের ডিমের অনেক প্রকার শত্রু জুটে—ইন্দুর, শৃগাল প্রভৃতি জন্তু, তাহাদের ডিম নষ্ট করিবার চেষ্টায় ফেরে! তুষারপাতেও তাহাদের ডিম নষ্ট হইয়া যায়। উচ্চস্থানে বাসা স্থাপন করিলে, তুষার ও শৃগালের হাত হইতে রক্ষা হয়, কিন্তু ইন্দুরের হাত হইতে পরিত্রাণ লাভ ঘটে না! কারণ, ইন্দুরেরা গাছ বাহিয়া অনায়াসেই উপরে উঠে; সুতরাং এইদিকে লক্ষ্য রাখিয়া তাহারা বাসার জন্য প্রায় এমন সকল গাছ মনোনীত করে, যেগুলির গুঁড়ি ঘনলতাজড়িত। এখানেও ইন্দুরেরা উৎপাত করিতে দেখিলেই সকলে মিলিয়া ঠোক্‌রাইয়া তাহাদিগকে বিতাড়িত এমন কি নিহত পর্য্যন্ত করে।

এই প্রসঙ্গে একটা গল্প মনে পড়িল—শুনিলে, ইতর জীবদিগের মধ্যেও একতা-বন্ধন যে কত প্রবল পাঠকগণ অনায়াসেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন:—

ইংরেজজাতি প্রায়ই পরের মুখে ঝাল খায় না, তাহাদের গ্রন্থকর্ত্তারা মৌলিক গবেষণা দ্বারা যে সকল স...

মরা গাছে হাঁসের বাসা।
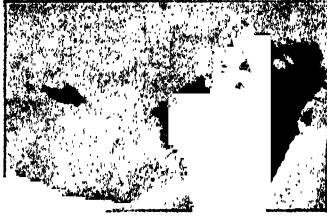
নিরাকরণ করে - অনুসন্ধান ও পর্য্যবেক্ষণ করিয়া যে সকল সত্যে উপনীত হয় তাহাই লিপিবদ্ধ করেন। (Col. L. Le Mesurier) লেমেস্থুরিএ সাহেবের প্রণীত The Game Shore and Water Birds of India নামক একখানি পুস্তক আছে। ইহারই উপকরণ-সংগ্রহের জন্য তিনি ভারতবর্ষের নানাদেশ পর্য্যটন করিয়া অবশেষে হিমালয়ের দুরারোহ প্রদেশে এক অভিযান করেন। আমাদের জনৈক বন্ধুও কেরাণীরূপে—বাঙ্গালীর কেরাণীগিরি করা ভিন্ন আর গতি কি ?—তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলেন! তাঁহারই মুখে নিম্নলিখিত ঘটনাটি শুনিয়াছি ; তিনি বলেন—

"একদিন সারাদিন কুচ্ করিয়া আমরা সদলবলে হিমাচলের এক অত্যুচ্চ প্রদেশে উপনীত হইলাম। স্থানটি বড়ই মনোহর—একদিকে বিবিধপক্ষিরব মুখরিত সুদূরবিস্তৃত নিবিড় অরণ্যানী, অপরদিকে শত-পার্ব্বত্য স্রোতস্বতীসিক্তা, ক্ষুদ্র-বৃহৎ-হ্রদবিমণ্ডিতা, শার্দ্দূল-তাড়িত কুরঙ্গকুলাকুলিতা শষ্প সমাচ্ছন্না অধিত্যকা ভূমি। সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া রাত্রের মত সেই অধিত্যকা-তেই আমাদের বস্ত্রাবাস স্থাপিত হইল। যে পাহাড়ীরা পথপ্রদর্শকরূপে আমাদের সঙ্গে ছিল, তাহারা এখানে বন্দুকের আওয়াজ করিতে পূর্ব্বাহ্নেই আমাদিগকে নিষেধ করিয়া দিয়াছিল। তাহারা বলিল, এখানে বন্দুকধ্বনি করিলে আমাদের এক প্রাণীরও আর রক্ষা থাকিবেনা! এই সতর্কতার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তাহারা অদূরবর্ত্তী অরণ্যানীর প্রান্তভাগ নির্দ্দেশ করিয়া কহিল এই বনের প্রান্তবর্ত্তী ঐ যে বৃক্ষাবলী, উহার তলদেশ এবং উপরিভাগ অসংখ্য বন্য হংসে পরিপূর্ণ—লক্ষ লক্ষ হাঁস ওখানে দলবদ্ধ হইয়া বাস করে। উহারা এত ভীষণ প্রকৃতির এবং উহাদের মধ্যে এতই একতা যে,কেহ কোনরূপে তাহাদের একটিরও অনুমাত্র হানি করিলে, সকলে দলবদ্ধ হইয়া আততায়ীকে আক্রমণ করে এবং তাহাদের চেপ্টা চঞ্চুর আঘাতে মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহাকে নিহত করে। বন্দুকের শব্দ শুনিলেই আমাদিগকে শত্রু মনে করিয়া আমাদিগকে আক্রমণ করিবে! ইহা শুনিয়া অতঃপর আমরা সাবধান হইলাম। আমাদের নিয়ম ছিল যে, এই সকল অজ্ঞাত বিপৎসঙ্কুল বিজনস্থানে অবস্থানকালীন দৈবাৎবিপৎপাতের হস্ত হইতে রক্ষার জন্য—পালাক্রমে চারিজন করিয়া সশস্ত্র সান্ত্রী সজ্জিত বন্দুক লইয়া আমাদের বস্ত্রাবাসের চরিদিকে পাহারা দিত। জ্যোৎস্নালোকিত শুক্লপক্ষের রাত্রি—গভীর নিশীথে জনৈক সান্ত্রী সশব্যস্তে আমাদিগকে জাগরিত করিয়া জানাইল একটা প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র বন হইতে নির্গত হইয়া অদূরস্থিত জলাশয়াভিমুখে চলিয়াছে! আমরা সকলেই ঝটিতি উঠিয়া সশস্ত্র হইলাম—দলপতি সাহেব দূরবীক্ষণসাহায্যে অদূরবর্ত্তী ব্যাঘ্র-রাজের গতিবিধি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ক্ষণপরে দেখা গেল, ব্যাঘ্রপ্রবর জলাশয় হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বনপ্রবেশোদ্দেশ্যে চলিয়াছে। কিছুক্ষণ যাইতে না যাইতেই কোটীহংসধ্বনি-সূচিত একটা ভীষণ বিকট কলরবে সেই নীরব প্রদেশ মুখরিত হইয়া

বন্য হাঁসের পাল।

উঠিল—সঙ্গে সঙ্গে কর্ণবধিরকারী ঘোরতর আর্ত্তনাদ গর্জ্জন! দেখা গেল লক্ষ লক্ষ বন্য হাঁস ব্যাঘ্র-রাজকে আক্রমণ করিয়াছে! পলায়নের চেষ্টা করিয়া, ভীষণ লম্ফ ঝম্প করিয়া—অমিত তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়াও সে কিছুতেই নিষ্কৃতি পাইতেছে না! প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা-ব্যাপী এইরূপ ঘোরতর আহবের পর ক্রমে ক্রমে সে আর্ত্তনাদ কোলাহল কলরব প্রশমিত হইল; কিন্তু ব্যাঘ্রের কি পরিণাম হইল, সে রাত্রে জানিতে পারিলাম না। কৌতূহল বশবর্ত্তী হইয়া প্রত্যূষেই আমরা সদলবলে সশস্ত্র বনভূমির দিকে অগ্রসর হইয়া দেখি, বনপ্রান্তেই এক মহাকায় শার্দ্দূলের মৃতদেহ ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় পতিত রহিয়াছে। নিরীহ হাঁস ও হিংস্র ব্যাঘ্রের দ্বন্দ্ব—সে দ্বন্দ্বে হাঁস বিজয়ী—এমন অসম্ভব ব্যাপার উপকথাতেই শুনা যায়, বাস্তব-জগতে বড় একটা দেখা যায় না!"

বন্য ও পোষা হাঁস—উপনিবেশ স্থাপনের উপায়।

যা'ক্—যাহা বলিতেছিলাম পূর্ব্বে, শীতকালে বিলাতে যত্র তত্র—জলাশয় মাত্রেই দলে দলে বন্য হাঁস বিচরণ করিতে দেখা যাইত; কিন্তু সকল দেশের বন্য হাঁসই •অতি-ভীরু—সন্দিগ্ধ-স্বভাব—সর্ব্বত্রই ইহারা অতি সাবধানে চলাফেরা করে। বিলাতী শিকারীদের উপদ্রবে ইহারা প্রায় দেশান্তরিত হইতে বসিয়াছিল। তজ্জন্য, বিলাতে শিকারের সুবিধার জন্য যে উপায়ে ময়ূরদিগকে পালন করা হয়, সেই প্রথায় ইহাদিগকেও ভুলাইয়া—স্থানবিশেষে বাসা-নির্ম্মাণের সুবিধা করিয়া দিয়া স্থায়িভাবে রাখিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এইরূপে এক একটি নির্দ্দিষ্টজলাশয়ে অসংখ্য বন্য হাঁসের উপনিবেশ স্থাপিত হওয়ায়, শিকারীদের পক্ষে বড়ই সুবিধা হইয়াছে! ফলে, উপায়টা যে এত সহজ, একথা পূর্ব্বে কাহারই মনে স্থান পায় নাই! এই উপায় আর কিছুই নহে,—শীত ঋতুতে, যে সময় জলাশয় মাত্রেই দলে দলে বন্য হাঁস আসিয়া বিচরণ করে, সেই সময় কতকগুলি পালিত পাতি হাঁস সেই জলাশয় মধ্যে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। পাতি হাঁসের সহিত কালক্রমে ইহাদের দাম্পত্য-সম্বন্ধ সংঘটিত হইলেই, অতঃপর আর ইহারা উড়িয়া দূরান্তরে পলায়ন করে না।—পাতি হাঁসেরা স্বভাবতঃই বড় একটা দূরে বা উচ্চে উড়িতে পারে না।—আর, তাহাদের প্রেমের খাতিরেই তাহাদের 'অর্দ্ধাঙ্গ' গণ তাহাদিগকে ছাড়িয়া যায় না! চিত্রে পাতি হাঁসগুলি শ্বেতবর্ণে পরিদর্শিত হইয়াছে!

বিলাতে শিকার-প্রিয় ধনি-পুত্রদিগের শিকারবাসন পরিতৃপ্তির জন্য সুবিস্তৃত বনভূমিতে মৃগ ময়ূরাদি নানা শিকারোপযোগী পশুপক্ষী সুরক্ষিত হইয়া থাকে। এগুলি সংরক্ষণের জন্য প্রভূত ব্যয় করিতে তাহারা আদৌ কাতর নন। আমাদের দেশে যেমন মৎস্যশিকারার্থীরা ক্ষুদ্রবৃহৎ পুষ্করিণীতে মাছ 'জিয়াইয়া' রাখেন, তেমনই পশুপক্ষীদের 'জিয়াইয়া' রাখিবার জন্য বহুসংখ্যক সুরক্ষিত অরণ্যানী বিলাতের নানা স্থানে প্রতিষ্ঠিত আছে। সুপ্রসিদ্ধ ধনী রথস্‌চাইল্ড সম্প্রতি উল্লিখিত প্রথায় বন্য হাঁসদিগের একটি উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত টিং পাই নামক জলাশয়ে এই উপনিবেশ স্থাপিত। এখানে লক্ষ লক্ষ বন্য হাঁস দলবদ্ধ হইয়া বাস করে। সামান্য চেষ্টা ও যত্নে বন্য হাঁসের সংখ্যাও যেমন পরিবর্দ্ধিত হয়, আকৃতিও তেমনই হৃষ্টপুষ্ট হয়—একথা, এই উপনিবেশ স্থাপিত হওয়া অবধি, সপ্রমাণিত হইয়াছে।

এই প্রবন্ধের শিরোদেশে আমরা রথস্‌চাইল্ডের টিং পাই হংসোপনিবেশের একটি চিত্র পাঠকবর্গকে উপহার দিলাম! এই জলাশয়-চিত্রে বাম ও দক্ষিণ পার্শ্বে জলমধ্যে যে দুইটি বিন্দুবৎ চিহ্ন দৃষ্ট হইতেছে, ঐ দুইটি ক্ষুদ্র গৃহ—Gun station—উহারই মধ্যে শিকারীরা লুকাইয়া বসিয়া শিকার করে। বনহাঁস শিকার করা বড় কঠিন ব্যাপার। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইহারা স্বভাবতঃ অত্যন্ত ভীরু—সেই জন্যই

শিকারী।

আর সেই সময় সুযোগ পাইলেই শিকারীরা গুপ্ত-স্থান হইতে গুলি চালাইতে থাকেন।

এদেশের সাধারণ শিকারী-ব্যবসায়ীরা মূল্যবান্ Duck Gun কোথায় পাইবে তাহারা হাঁস-শিকার করিবার জন্য আর একটি নলের শেষ ভাগ কাটিয়া ফেলিয়া দিয়া, বাকিটি একটি মুঙ্গেরী বন্দুকের নলের মাথায় ঝাল দিয়া লয়। ইহাই তাহাদিগের Duck Gun এর কার্য্য করে; অর্থাৎ, মোট কথাটা এই যে, হাঁস-শিকারের জন্য দূর-পাল্লা-ওয়ালা বন্দুকই উপযোগী; আর বন্দুকের নল

অতি সাবধানে চলাফেরা করে—কোনমতে সামান্য একটু কারণে ভয় পাইলেই, ইহারা সব এক জোটে ঝাঁক বাঁধিয়া উড়িয়া পলায়ন করে। উড়িবার সময় ক্রমাগত ঘুরিয়া ঘুরিয়া উচ্চে উঠা ইহাদের অভ্যাস হয়। এইজন্য হাঁসশিকারে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয়। অদূরে লোক দেখিতে পাইলেই ইহারা পলায়ন করে বলিয়া হাঁস-শিকারের বন্দুকই একটু অসাধারণ রকম—পৃথক্ শ্রেণীর; তাহা Duck Gun নামেই বিখ্যাত। হাঁস-শিকারের ছট্‌রাও (Duck Shots) নামেই প্রখ্যাত। সাহেব ও সৌখীন শিকারীরাই এই সকল সাজ-সরঞ্জাম লইয়া শিকার করেন। সচরাচর হাঁসেরা যেখানে চরিতে আসে তাহারই অদূরবর্ত্তী কোনও ঝোপ বা বনের অন্তরালে, অভাবে, কোন গোপনীয় স্থানে একটি ক্ষুদ্র কুটীর বাঁধিয়া, তাহারই মধ্যে পূর্ব্ব হইতে আত্মগোপন করিয়া, ওৎ পাতিয়া, বসিয়া থাকেন। হাঁসেরা প্রাতে একটু বেলায় চারণস্থলে নামে।

যত দীর্ঘ হয়, তাহার ততই দূর পাল্লা হয়। এই বন্দুক ও সাধারণ ছট্‌রা বারুদাদি লইয়া দেশী-শিকারীরা নিকটবর্ত্তী কোনও এক লুকান স্থানে—বাঁশ বনে ঝোপের পিছনে বসিয়া থাকে। শিকারান্বেষণে তাহাদের প্রায় আজ এখানে—কাল ওখানে—পরশ্ব দিন অমুক নদীর তীরে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়; সুতরাং ঘর বাঁধিয়া শিকার করিবার সুবিধা তাহাদের হয় না!

পলায়নপর হাঁস।

এজন্য তাহারা হয় লতাগুল্ম-ডালপালা দিয়া দাঁড় করাইয়া রাখিবার উপযোগী একখানি "আগোড়" প্রস্তুত করে এবং তাহা লইয়া তাহারই আড়ালে আড়ালে তীরে তীরে চলিতে থাকে; যখন বন্দুক চালাইবার উপযুক্ত স্থলে উপনীত হয়, তখন আগোড়টিকে দাঁড় করাইয়া তাহারই পশ্চাৎ হইতে গুলি করে। এতদ্ভিন্ন হাঁস-শিকারের জন্য তাহারা আর এক অদ্ভুত উপায় অবলম্বন করে—দুই একটি গরুকে তাহারা এমনই শিখাইয়া লয় যে, তাহাদের গায়ে হাত দিয়া ইসারা করিলেই দাঁড়াইয়া যায়। পরে একখানি কণ্ডার উপর কতকগুলি ডালপালা—লতাপাতা—জড়াইয়া, গরুর পৃষ্ঠে ঝুলাইয়া দেয়। গরুটিকে জলাশয় তীরে চরিতে ছাড়িয়া দিয়া, শিকারী বসিয়া বসিয়া গুটি গুটি তাহারই আড়ালে চলিতে থাকে; যখন লক্ষ্য করিবার সুবিধা মত স্থানে গিয়া উপস্থিত হয়, তখন গরুটির গায়ে হাত দিয়া ইসারা করিবার মাত্র সে দাঁড়াইয়া পড়ে—শিকারী তাহার পেটের তলদেশ দিয়া লক্ষ্যস্থির করিয়া গুলি করে। ইহাদের লক্ষ্য প্রায় অভ্রান্ত হয়!

শ্রীসুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়।

'বৈতানিক'-পাঠে। *

নিভৃতে তারার দেশে আত্ম-নিমগন,
কোন্ পুণ্য-সপ্তকের গম্ভীর মূর্চ্ছন
ঝঙ্কৃত তোমার কর্ণে? কোন্ মন্ত্রপূত
অনির্ব্বাণ আনন্দের বৈশ্বানর-চ্যুত
তোমার এ হিরণ্ময়ী বৈতানিক-শিখা?
কোন্ মেরু-ভূধরের শেখর-বেদিকা
ধূপ-ধূমে সুরভিয়া অর্পিলে অঞ্জলি?
চন্দ্রোদয়ে জলদেরা উঠিল চঞ্চলি'
আরাধনা-ধ্যানময়ী সেবিকা 'দাসী'র
বিরহ-ব্যাকুল-কণ্ঠে অখিল-স্বামীর
রূপ-নীলাম্বরে ডুবি' অশ্রুজলে ভাসি'
নিবেদিলে শ্রীচরণে বন-কুন্দরাশি।

অনন্ত-গভীর নীল সমুদ্রের কূলে,
লোকনাথ সুন্দরের উদার দেউলে
সোণার ত্রিশূল জ্বলে!—'মনোরথ-রাণী'
তোমার মেঘের ভেলা নিয়ে যায় টানি'
ঈপ্সিত-বেলায়—হের চরণে তাহার
দয়া ধর্ম্ম-স্নেহ-প্রেম-কুমুদ-কহ্লার।

পূজিতেছ, হে পূজারি, পরম নির্ভরে,
বরণ করিয়া ধ্রুব রসের নির্ঝরে,
বিশ্বের মিলন-পীঠে। যখন যে সুর
বাজিছে, সে সুর তাঁরি অমৃত-মধুর।
ফুলের মতন তাঁরি চরণ-তলায়।
ঝরিয়া পড়েছ, কবি, লুটায়ে ধূলায়।

শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

* (বৈতানিক) গীতিকাব্য—শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর-প্রণীত।

মন্ত্র-শক্তি।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

[পূর্ব্বাবৃত্তি—রাজনগরের জমিদার—কুলদেবতা গোপীকিশোরের প্রতিষ্ঠাতা—উইলসূত্রে তাঁহার বিশাল জমিদারী দেবত্র এবং অধ্যাপক জগন্নাথ তর্কচূড়ামণি ও তৎকর্ত্তৃক মনোনীত ব্যক্তিকে সেবায়েৎ নিযুক্ত করেন। তর্কচূড়ামণি মৃত্যুকালে তাঁহার নবাগত ছাত্র অম্বরনাথকে স্বীয় পদে মনোনীত করিয়া গিয়াছেন। এই ব্যবস্থায় অসন্তুষ্ট হইয়া পুরাতন ছাত্র আদ্যনাথ টোল ছাড়িয়া সেই গ্রামস্থ সুদূর সম্পর্কিত জ্ঞাতি বৃন্দাবনচন্দ্রের বাটীতে বাস করিতে লাগিল। বৃন্দাবন নিরীহ, বারাণসীমায় পদার্পণোদ্যত; তুলসী তাহার দ্বিতীয় পক্ষের তরুণী ভার্য্যা। আদ্যনাথ তুলসীকে দিয়া জমিদার কন্যা রাধারাণীর কাছে অম্বরকে মূর্খ প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করে;—তুলসী সে অনুরোধ অবজ্ঞাভরে অগ্রাহ্য করে।—আদ্যনাথ অধ্যাপকের জীবদ্দশায় অম্বরের আগমন হইতেই তাহার প্রতি বিরক্ত। অম্বর কিন্তু হৃদয়বান পরোপকারী, তাহার গুণে কৈবর্ত্ত, কৃষাণ সকলেই তাহাকে ভক্তি করিত—ভালবাসিত। আদ্যনাথ যে তাহার বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত, একথা সে শুনিয়াছিল; কিন্তু দেশের অন্যান্য সকলে তাহার পৌরোহিত্যে নিযুক্ত হওয়ায় সন্তুষ্ট। পৌরোহিত্যে ব্রত হইয়া প্রথম যে দিন সে মন্দিরে পূজা করিতে গেল, মন্দিরাভ্যন্তরে দেবৈশ্বর্য্য দেখিয়া সে স্তম্ভিত—ক্ষুব্ধ হইল!—"দেবতার নামে এ ঐশ্বর্য্যের খেলা কেন?" ভাবিয়া সে আকুল হইল!]

রাজনগরের জমিদারগোষ্ঠী কৌলীন্য-গৌরবে যেরূপ সমাজের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন, দান, ধ্যান, ক্রিয়াকলাপের জন্যও সেইরূপ দেশের ও দশের মুখপাত্র ছিলেন। এতদ্ব্যতীত আর একটা বিশেষ কারণে তাঁহাদের নাম জনসাধারণের মধ্যে একটু বিশেষভাবেই আলোচিত হইয়া আসিতেছিল—সেটা, তাঁহাদের বংশপরম্পরাগত হিন্দুত্বের গোঁড়ামী। জমিদারবংশ পুরাতন। বংশমর্য্যাদাগর্ব্বে পুরাকালের সূর্য্য বা শাক্যবংশীয়ের তুল্য অভিমানী। বল্লালী আমলের কিছু পরেই পঞ্চ-ব্রাহ্মণের এক শাখা তত্রত্য কোন রাজার নিকট হইতে রাজনগর জায়গীর পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং স্বয়ং প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবে বঙ্গদেশে যখন প্রেমের বন্যা আসিয়াছিল—বাঙ্গালীর সুপ্ত-প্রেমের কলনদী উৎসারিত হইয়াছিল, সহস্র পাষাণ জলে গলিয়া অমৃতের নদী বহিয়াছিল, সেই সময়ে এই বংশের জমিদার সেই মৃত-সঞ্জীবনী সুধায় তাঁহার বিষয়-বাসনা-বিষ-জর্জ্জর চিত্তকে অভিষিক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। সেই হইতে আজ পর্য্যন্ত বৈষ্ণবধর্ম্ম এ বংশের কুলধর্ম্ম ও এই মন্দির অধিষ্ঠিত যুগল-দেবতা কুলদেবতারূপে পূজিত হইয়া আসিতেছেন।

এ বংশের সন্তানসন্ততিগণের মধ্যে অনেকগুলি কঠোর নিয়ম পালনের বিধি নির্দ্দেশ করা আছে এবং এ পর্য্যন্ত এ বংশের বংশধর কেহ এই নিয়মের ব্যতিক্রম করিতে সাহসী হইয়াছেন, এমন কথা তাহাদের কোন বিপক্ষ পক্ষও বলিতে পারে নাই।

জমিদার হরিবল্লভ বাবু—বর্ত্তমান জমিদারের পিতা এই বংশের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ভক্ত ছিলেন। মন্দির স্থাপন ও বিষয়াদির দেবত্র বন্দোবস্ত, তাঁহার অতুল কীর্ত্তি। হরিবল্লভ বাবু তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনের মধ্যে পৌত্র-মুখ দর্শনের আশায় হতাশপ্রায় হইয়া তাঁহার বিপুল ধনৈশ্বর্য্য পরমার্থে উৎসর্গের কল্পনা করিয়া এই মন্দির নির্ম্মাণে মনোযোগী হইয়াছেন, এমন সময় পুত্রবধূ কৃষ্ণপ্রিয়া একটি পুষ্পকোরকতুল্য সন্তান প্রসব করিলেন। শিশুটি পুত্র সন্তান নহে, কন্যা সন্তান! তথাপি এই 'হাপুতে'র ঘরে তাহার আদরের সীমা রহিল না। কন্যার পিতামহ সূতিকাগারে আসিয়া বস্ত্রবিজড়িত নাতিনীকে ধাত্রীক্রোড় হইতে গ্রহণ করিয়া আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে করিতে গদ্গদ-স্বরে বলিলেন, "রাধারাণি! এতদিনে তোর এই অধম সাধককে কি প্রত্যক্ষ হয়ে দেখা দিতে আস্‌লি!"

অন্তরালে শিশু-জননীও নয়নজলে অভিষিক্ত হইতেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাহার কাতর আহ্বান এতদিনে কাণে তুলিয়াছেন। এই সন্তানটুকুর জন্য প্রাণ এতদিন কত যে হাহা করিয়াছে, তাহা অপরে কি বুঝিবে! এইটুকুর জন্যই শ্বশুর একেবারে তাহার প্রতি বিমুখ হইয়া উঠিয়াছিলেন! স্বামী অবশ্য মুখে কিছু বলিতেন না, বরং কুলীন ও ধনী সন্তান হইয়াও আত্মীয়-স্বজনের অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া ও পিতার সক্রোধ আদেশ অমান্য করিয়া কেবল এই হতভাগিনীর মুখ চাহিয়াই গৃহে পুনর্ব্বার সৌভাগ্যবতী নব বধূ আনয়ন করেন নাই। ফলে, ইহাতে তাঁহার নিজের প্রেমপূর্ণ হৃদয়েরই পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন; কিন্তু কৃষ্ণপ্রিয়াত

তাহাতে সুখী হইতে পারেন নাই। হিন্দুনারী তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনকে বড় করিয়া দেখিতে জানে না, তিনি যাঁহার মধ্যে নিজের সমুদয় নিমজ্জিত করিয়া তন্ময় হইয়াছেন, তাঁহার ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত দুঃখ সুখের মাপকাঠি ধরিয়া নিজের লাভলোকসানকে ওজন করিতে সতীচিত্ত ব্যথিত হয়! তিনি তাঁহার শ্বশুরবংশের কথাই ভাবিয়া নীরবে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিতেন। এত বড় নামটা এই অভাগীকে ঘরে আনিয়াই লোপ হইল! অথচ স্বামীকেও পুনর্বিবাহে সম্মত করিতে পারেন নাই! বুঝি সম্মতি পাইলেও সহিত না। আজ তাই বড় সুখে অতীতের সকল দুঃখ এক সঙ্গে বক্ষ আলোড়িত করিয়া জাগিয়া উঠিল। গভীর স্নেহে জননী ক্ষুদ্র সন্তানটিকে বুকের ভিতর চাপিয়া তাহার ঘুমন্ত মুখ চুম্বন করিলেন, শিশু ঘুমের ঘোরে মধুর হাসি হাসিল।

মেয়েটির নাম অন্নপ্রাশনের দিন 'রাণী' রাখা হইয়াছিল; কিন্তু মেয়েদের কতকগুলা অলঙ্কার—বস্ত্র কেবল বাক্স আলমারিতে কোন একটা বিশিষ্ট দিনের অবসর চাহিয়া আবদ্ধ থাকিবার জন্যই যেমন জন্মলাভ করে, রাণী মেয়েটির এই পদবীটুকুও তাহাকে সেইরূপ আটপৌরে ব্যবহারের জন্য না দিয়া পোষাকীরূপে ব্যবহার করিতে দেওয়া হইয়াছিল। মা সাধ করিয়া কখনও কখনও সেই তোলানামটি ধরিয়া ডাকিলে কি হইবে, ইতিমধ্যেই তাহার পিতামহ দত্ত 'রাধারাণী' নাম সর্ব্বসাধারণে প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার আধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্ত পিতা এই সেকেলে নামটার বিরুদ্ধে নিজের ঘোর আপত্তি জ্ঞাপন করিবার জন্যই কিছুদিন খুব জোর করিয়া পিতার সাক্ষাতেও তাহাকে রাণী বলিয়া ডাকিয়াছিলেন; কিন্তু ক্রমশঃ কালে শুনিয়া শুনিয়া তাঁহারও রাধারাণী নামটার উপর বিতৃষ্ণার মাত্রা কমিয়া আসিতে লাগিল এবং কিছুদিন পরে তিনিও বালিকাকে তাহার পিতামহ-দত্ত নামে ডাকিতে লাগিলেন।

হরিবল্লভ বাবু অত্যন্ত গোড়া বৈষ্ণব। সর্ব্বদা হরিনাম ও তিলক সেবায় তাঁহার বৃদ্ধকালেও বিন্দুমাত্র আলস্য ছিল না, প্রতি সন্ধ্যায় তাঁহার বেতনভোগী ও গ্রামস্থ বৃদ্ধ, প্রৌঢ় সঙ্গীতজ্ঞগণ মিলিয়া নাট-মন্দিরে যখন হরিসঙ্কীর্ত্তন হইত এবং ঝুলন, রাস, দোলাদি উৎসব উপলক্ষে প্রায় মাসাবধি যখন ঠাকুরবাড়ীর সুবৃহৎ দালানে হরিকথা বসিত, সেই সময়ে প্রায় সর্ব্বক্ষণ ধরিয়াই তাঁহার মুদিত নেত্রদ্বয় হইতে দরবিগলিত প্রেমাশ্রুধারা তাঁহার অনাবৃত বিশাল বক্ষে ঝরিয়া পড়িতে থাকিত। অতি প্রত্যূষে শয্যা ত্যাগ করিয়া নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ না করিয়া এবং সহস্র বার তুলসীকাষ্ঠ নির্ম্মিত জপমালায় রাধাকৃষ্ণ নাম জপ সমাধা না করিয়া জলগ্রহণ করিতে তাঁহাকে কেহ কোনদিন দেখে নাই। মধ্যাহ্নে মধ্যে মধ্যে পণ্ডিত সমাগম হইলে তাঁহার শুভ্র জাজিম-মোড়া প্রশস্ত গৃহতলে কম্বলাসন আস্তীর্ণ করিয়া শাস্ত্রানুশীলন হইত। বলা বাহুল্য ইহার ফলে বৈষ্ণব তন্ত্রের বাহিরে তাঁহার মনকে কেহ তিল পরিমাণও নড়াইতে সমর্থ হইত না। পৌত্রী রাধারাণী কর্ম্মী দাদা মহাশয়ের হৃদয়ের সমস্ত স্থানটুকু অধিকার করিয়া তাঁহার অভ্যস্ত শৃঙ্খলের বাঁধ ভাঙ্গিয়া চুরিয়া সবটা উল্টাপাল্টা করিয়া দিয়াছিল।

আজকাল বৃদ্ধের সাধন-ভজনের কাল অল্পে অল্পে হ্রাস হইয়া নাতিনী রাধারাণীর খেলার সঙ্গ যেন একটু বৰ্দ্ধিত হইতেছিল। জপের মালায় টান পড়িয়া মধ্যে মধ্যে একটা বায়নাভরা আদুরে কণ্ঠ ডাকিয়া ওঠে "দাদা!" হরিবল্লভ বাবু মনেমনে উদ্বেগ অনুভব করিলেও বাহিরে খুব স্নেহভরেই তাহাকে কোলের উপর টানিয়া লন।

পুত্র রমাবল্লভ বাবু কিছু নব্যতন্ত্রের লোক; ইহার আভাস। পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। হরিবল্লভ বাবু যখন নবমবর্ষে পৌত্রী রাণীকে পাত্রস্থা করিয়া অক্ষয় স্বর্গ-ফল-কামনা-লোলুপ-চিত্তে চারিদিকে ঘটক পাঠাইয়া বরানুসন্ধানে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, সেই সময়ে হঠাৎ একদিন এই উপলক্ষে পিতাপুত্রে ঈষৎ মনোমালিন্য ঘটিবার মত হইয়া উঠিল। একজন প্রজাপতির অনুচর একদা এক সর্ব্বোৎকৃষ্ট কুলীন সন্তানের শুভসংবাদ বহন করিয়া রাজনগরের বাটীতে উপস্থিত হইল। পাত্র কুলসম্বন্ধে একবার নিখুঁত বংশপরম্পরাক্রমেই ইঁহারা বৈষ্ণবাচার পরায়ণ। হরিবল্লভ বাবু পুত্রকে ডাকাইয়া প্রফুল্লভাবে সবিশেষ সংবাদ বিবৃত করিয়া পরিশেষে নিজের মন্তব্য প্রকাশ করিলেন যে, ছেলেটি অতি সুপাত্র! আগামী

ফাল্গুনে দোল পূর্ণিমার পর বিবাহের দিন স্থির করা হৌ'ক, বৃদ্ধ বয়স, কবে আছি কবে নাই, শুভকার্য্যে বিলম্ব করা ভাল নয়। পুত্র কিন্তু এ সংবাদে আনন্দিত হইতে পারিলেন না, বিমর্ষভাবে বলিলেন, "এখনই এত তাড়াতাড়ি? এখনও মেয়ে ত ছোট আছে।"

হরিবল্লভ বাবুর চক্ষু বিস্ফারিত হইয়া আসিল, বলিলেন, "ছোট আছে! বল কি? ন'বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া যায় সে খবর কিছু রাখা হয় কি?" রমাবল্লভের মুখ শুখাইয়া আসিল; তথাপি একটু সাহসে ভর করিয়া বলিয়া ফেলিলেন, "এখন সকল লোকেই মেয়েদের একটু ডাগর করিয়া বিবাহ দিতেছেন এমন কি কুলীনের ঘরে বিশ পঁচিশ বৎসর বয়সেরও মেয়ে আইবুড় থাকে দেখিয়াছি, শুধু শুধু তাড়া হুড়া করিয়া সতীনের হাতে মেয়ে দিবার দরকার কি?"

রাধারাণী জপের মালা টানিয়া আদরে কণ্ঠে ডাকিয়া উঠিল,—"দাদা"!

শুনিয়া হরিবল্লভ বাবুর চক্ষু আরক্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু আপনাকে একটু সংবরণ করিয়া ঈষৎ শ্লেষের ভাবে বলিলেন, "বটে সতীনের হাতে! হুঁ কুলীনের ছেলে তোমার মত স্ত্রৈণ কোথায় খুঁজিয়া জোড়া মিলাইতে পারিবে? এখন একটা দুইটা সতীন-ওয়ালা বর জুটিতেছে, ইহার পর যে গণ্ডা ভরিয়া যাইবে?" রমাবল্লভের চোকের সামনে ঝাপটা-কাটা কোঁকড়া চুলের থরের মধ্যস্থ একখানা অতি মধুর মুখ মুহূর্ত্তে চাঁদের মত ফুটিয়া উঠিল। তিনিও হঠাৎ ঈষৎ উত্তেজনার সঙ্গে রাগিয়া উঠিলেন, "রাণীকে আমি বিবাহিত ছেলের হাতে দেব না, না পারি সে আইবুড় থাকবে; শুনেছি আপনার ছোটপিসি চিরকাল কুমারী থেকে দেবসেবা ক'রে কাটিয়ে গেছেন।"

হরিবল্লভ বাবু যৎপরোনাস্তি বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইলেও ছেলের জেদী স্বভাব জানিতেন বলিয়া আর কিছুই বলিলেন না, কেবল "হ্যাঁ কুলীনের ঘরের আইবুড় ছেলে বিধাতা-পুরুষকে ফরমাস দিয়া গড়াইয়া লইয়া এসোগে যাও" বলিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। রাধারাণী কাছে আসিলে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, "যা যা তুই তোর মা বাপের কাছে যা, আমি তোর কে'রে বাপু যে চব্বিশঘণ্টা আমার কাছেই লেগে থাকবি? রাণী বালিকা হইলেও অত্যন্ত প্রখরবুদ্ধিশালিনী; সে আশৈশব পিতামহের সঙ্গে থাকিয়া তাঁহার স্বভাব ভালরূপেই চিনিয়াছিল। ভর্ৎসনার কোন উত্তর না করিয়া সে ধীরপদে সেল্‌ফের নিকট গিয়া হরিকথামৃত গ্রন্থ পাড়িয়া আনিয়া তাঁহার পায়ের কাছে বসিয়া সুর করিয়া পড়া আরম্ভ করিয়া দিল। প্রথমেই পড়িল;—

অপূর্ব্ব শ্রীহরি-লীলা কহনে না যায়।
অন্ধ নেত্র লভে ইথে বোবা গীত গায়॥

"হ্যাঁ দাদামশাই আমাদের কৈলাসীর ভাইটি ত কালা তাহ'লে তাকে ত হরিকথা শোনাইলে হয়? আমি তাকে ডাকিয়া লইয়া আসিব?"

হরিবল্লভ বাবু চকিত হইয়া মুখ ফিরাইলেন; কি

তাঁহার পায়ের কাছে বসিয়া সুর করিয়া পড়া আরম্ভ করিয়া দিল।

দেখছিস্ না!" রাণী এ কথার উত্তরে মুখ নত করিয়া একটুখানি হাসিত মাত্র। কাজেই এ প্রসঙ্গ আর বেশী-দূর পর্য্যন্ত চালান সম্ভব ছিল না। নিগূঢ় অভিমানভরে পিতৃসম্মানে আহত পিতা, পুত্র বা পুত্রবধূকে এ সম্বন্ধে তাঁহার চিন্তার আভাষ মাত্র দিতে ইচ্ছুক ছিলেন না।

রাণী ত্রয়োদশ বৎসরে পদার্পণ করিবার পর হঠাৎ একদিন পত্নীর অনুযোগে রমাবল্লভের চমক হইল যে, এইবার তাহার বিবাহ না দিলেই নয়, লোকেও নিন্দা করিতেছে, এদিকে মেয়েও বেশ ডাগর হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার মনে মনে যথেষ্ট বিশ্বাস ছিল যে, এই বিস্তৃত বঙ্গদেশে তাঁহার মনের মত পাত্রের কোনই অভাব ঘটিবে না; একটু মনোযোগী হইয়া অনুসন্ধান করারই যা অপেক্ষা; কিন্তু মানুষের মনের মত জিনিষ জগতে ক'য়টাই

বিশ্বাসভরা সরল প্রাণ! ইহার উপর রাগ করিয়া থাকে এমন মানুষ জগতে আছে! আহা থাক্‌না, দুটোদিন হাসিয়া খুসিয়া বেড়া'ক, বাপ যদি ইহার মধ্যে ভালপাত্র খুঁজিয়া আনে ক্ষতি কি?"

এমন করিয়া নবম বৎসর বয়সে যে বিবাহ বন্ধ হইয়াছিল, মেয়েটি দ্বাদশ পার হইলেও, সে বিবাহ আর ঘটিয়া উঠিল না। হরিবল্লভ বাবু একরোখা মানুষ, যে অধিকার তাঁহার পুত্রের দ্বারা একবার খর্ব্ব করা হইয়াছে, নিজে যাচিয়া আর কোন মতেই তাহা তিনি গ্রহণ করিতে পারিলেন না। কাজেই অনেক মনোমত পাত্রের সন্ধান পাইয়াও তিনি আর নাতিনীর বিবাহ সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্য করিলেন না। কেবল মধ্যে মধ্যে অন্তরের ক্ষোভ তাঁহার একমাত্র অন্তরঙ্গ সঙ্গিনীটির নিকট ব্যক্ত করিয়া ফেলিয়া বলিতেন, "ওরা তোর বিয়ে দেবেনা'রে দিদি! সেই মতলব করে সব চুপচাপ বসে' আছে,

বা মেলে? মন যাহাই পাউক না কেন কিছুই সে তাহার নিজের মত করিয়া লইতে পারে না, খুঁৎগুলাই মাইক্রস্‌কোপের সম্মুখে কীটাণুর প্রত্যেক প্রত্যঙ্গটির মত বৃহৎ ও স্পষ্ট করিয়া তুলিতে থাকে। রাধারাণীর জন্য অনেক বরের সন্ধান মিলিল; কিন্তু একটিকেও ঠিক সুপাত্র বলিয়া কৃষ্ণপ্রিয়া বা রমাবল্লভের মনে ধরিল না। অন্য কোন খুঁৎ যাহার নাই, সে হয়ত সুদূর পল্লীবাসী, অথবা নিতান্ত মূর্খ বা মাথায় এত খর্ব্ব যে বাড়ন্ত রাণীর মেয়ের সহিত মোটেই সাজিবে না। কুল একটু খাটো করিতে স্বীকার পাইলে অনেক ভাল পাত্র পাওয়া যাইত, কিন্তু তাহা একেবারে অসম্ভব। রমাবল্লভ পিতার নিকট কঠিন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যে কুলগৌরবের একচুল লাঘব করিয়া তিনি কন্যার বিবাহ দিবেন না, কিন্তু ঠিক সমান ঘরে যোগ্য বর খুঁজিয়া মিলিল না। তিনি গভীর চিন্তাভারাক্রান্ত হইয়া পড়িলেন।

হরিবল্লভ বাবু এই সকল দেখিতেন, শুনিতেন, আর মনে মনে একটু আমোদ বোধ করিতে থাকিতেন। ছেলে যে তাঁহাকে খাট করিয়া নিজের মত প্রচার করিতে দ্বিধা করে নাই, ইহাতে তিনি অত্যন্ত অপমানিত বোধ করিয়াছিলেন। এখন 'ঘোড়া ডিঙ্গাইয়া ঘাস খাওয়ার' সুখ বুঝুন বাছাধন! কিন্তু মেয়েটি যে এই উপলক্ষ্য করিয়া তাঁহার কোল ঘেঁসিয়া রহিল, পরের হাতে পরের ঘরে গেল না, ইহার মধ্যেও একটা যে প্রচ্ছন্ন সুখ না ছিল এমনও ঠিক বলা যায় না।

ইহার অল্পদিন পরেই রাধারাণীর পিতামহ অল্পদিনের রোগশয্যা ছাড়িয়া একদিন সম্পূর্ণ অজানা দেশের উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন। মৃত্যুশয্যায় যে উইল প্রস্তুত হইল, তাহাতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে রাধারাণীর সম্বন্ধে এইরূপ আদেশ ছিল যে, যে সমুদয় স্থাবর সম্পত্তি তাঁহার পূর্ব্ব-নির্দ্দেশানুসারে দেবত্র করা হইয়াছে, যদি যোড়শবৎসর বয়সের মধ্যে তাঁহার পৌত্রী রাধারাণী কোন সমশ্রেণীর সমান ঘরের কুলীনসন্তানের সহিত বিবাহিতা হয়, তবেই সে অথবা তাহার সন্তান-সন্ততিগণ দেবসেবা ব্যতিরেকে আয়ের সমুদয় উপসত্ব পুরুষানুক্রমে ভোগদখল করিতে পাইবে। অবিবাহিত অবস্থায় থাকিলে রাধারাণীর ষোড়শ বৎসর পূর্ণ হওয়ার পরদিবস প্রাতঃকালেই তাঁহার সুদূর সম্পর্কীয় ভাগিনেয়ীপুত্র মৃগাঙ্কমোহন সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হইবেন। রমাবল্লভ যাবজ্জীবন সহস্র মুদ্রা মাসহারা পাইবেন এবং এই পৈতৃক গৃহে তাঁহার কোনই অধিকারের দাবী থাকিবে না।'

নিষ্ঠুর প্রতিশোধ! রমাবল্লভব্যথিত বক্ষে কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। এই ননীর পুতুল সোণার প্রতিমাকে কি শেষে শুধু কুল দেখিয়া অযোগ্য হস্তে দিতে হইবে? কোন উপায় নাই, কোন উপায় নাই! তাহাকে প্রাণের সহিত ভালবাসিয়াও কেমন করিয়া তাহার পিতামহ এমন একটা কঠিন সর্ত্তের দৃঢ় বেষ্টনের মধ্যে তাহার সমস্ত ভবিষ্যৎটাকে অত্যন্ত কঠোররূপেই বদ্ধ করিয়া দিতে সমর্থ হইলেন? স্নেহ কি স্নেহাধারের দুঃখ সুখকেই সব চেয়ে প্রধান করিয়া ভুলিতে পারে না? কৃষ্ণপ্রিয়া সকল কথা শুনিয়া বিশেষ দুঃখিতা হইলেন না; বলিলেন, "তা ঠাকুর ত কিছুই অন্যায় কথা বলেন নাই; ষোল-বছরে ভদ্র ঘরের মেয়ের বিবাহ না দিতে পারিলে লোকে যে ছিছিকার করিবে, সে কি হইতে পারে, ইহার মধ্যে বিবাহ দিতে হইবে বৈ"কি! রমাবল্লভ ঈষৎ চটিয়া বলিলেন, "বেশ্ তুমি ত বলিলে, 'চাই বই কি!' কিন্তু ধর, যে সময়-টির মধ্যে দিতেই হইবে যদিই সেই সময়ের মধ্যে তেমন ভাল ছেলে না পাওয়া যায়?"

গৃহিণী আশ্বাসের মৃদু হাসির সহিত সকল সন্দেহ ঝাড়িয়া ফেলিয়া বলিলেন, "কি যে বল! তিন বছরের মধ্যে আমাদের রাধারাণীর বর জুটিবে না, এও কি কথা! ঢের সময় আছে।"

তিন বৎসর কাটিয়া আসিল; কিন্তু এই তিন বছরের ১০৯৫টি দিনেও পিতামাতার যথেষ্ট যত্ন ও চেষ্টা সত্ত্বেও শ্রীমতী রাণীদেবীর বর জুটিল না। আজ কালিকার দিনে শিক্ষিত ঘরে বড় একটা কেহ কুলমর্য্যাদা নিখুঁত রাখে নাই; কাজেই রমাবল্লভ স্বঘরে নিজের মনোমত পাত্র কোনক্রমেই খুঁজিয়া পাইলেন না। তখন অগত্যা একটি দরিদ্রঘরের নিতান্ত অশিক্ষিত বালকের উপরেই মন ফেলি-বার চেষ্টা করিতেছিলেন, কিন্তু মন কেবলই কাঁদিতেছিল; কল্পনায় বাস্তবে এতটা প্রভেদ কি সহ্য করিতে পারা যায়?

রাণী কিন্তু তাহার নিজের অবস্থায় বেশ ভালই আছে। কুমারীজীবনের যে সুখাস্বাদে হিন্দু বালিকারা চিরবঞ্চিতা, সেই অনুপমেয় শান্তির আস্বাদগ্রহণে সে নিজেকে চরিতার্থ মনে করিতেছিল। যে দাদা মহাশয়ের স্নেহের আশ্রয়ে তাহার জীবনটি মুকুলিত হইয়া দেবদোশে উৎসর্গীকৃত হইয়াছে, সেই হৃদয়-পারিজাতের সৌরভে চতুর্দ্দিক্ আমোদিত। সেই কুসুম-পল্লব শান্তির আধার হৃদয়ে চিন্তা, ভয়, বেদনা, আঘাত কিছুই অশান্তি আনয়ন করিতে পারে না। একি কম সুখ! সে বেশ আছে। হরিবল্লভ চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তিনি যে পলে পলে, তিলে তিলে নিজের অন্তর্বাহ্যের সমুদয় বৃত্তি ও কর্ম্মসংস্কারের দ্বারা এই মেয়েটিকে গঠিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার কোন কার্য্য অসম্পাদিত বা কোন মত পরিবর্ত্তিত হইবার সম্ভাবনা ছিল না; বরং 'বংশ অপেক্ষা কঞ্চি দড়' বলিয়া যে একটা প্রবাদ আছে,

এ মেয়েটি উহাই বিশেষরূপে সপ্রমাণ করিয়া তুলিতেছিল। ছোটবেলা হইতে মন্দিরের সেবা তাহার যেন প্রধান খেলা, প্রধান আনন্দের কার্য্য ছিল। এ দেবপ্রীতি তাহার হাড়ের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিল। খেলাঘরেও সেই 'ঠাকুর ঠাকুর' খেলা। বস্তুতঃ ইহাই তাহার একমাত্র সাধের কাজ। শিশুকাল হইতে অতিক্রান্তপ্রায় কৈশোর ব্যাপিয়া যে একটি সংযমপূর্ণা, নিয়মচারিণী, শুদ্ধ-সত্ত্ব-কুমারী-জীবন এই সংসারটিতে পুণ্য দেবাশীর্ব্বাদের মত আবির্ভূতা হইয়া রহিয়াছে, ইহাই তাহার সর্ব্বপ্রধান ঐশ্বর্য্য ও শোভা। রমাবল্লভ এখনও কতবার ভাবিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতেন এবং ভাবিতেন, কি করিলে ইহাকে চিরদিন এমনই ভাবে রাখিতে পারা যায়।

"রাধারাণী কিছুক্ষণ উদ্যানের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইল।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

নূতন পুরোহিত প্রথম যেদিন পূজার আসন গ্রহণ করিল, সেদিন পূজাগৃহের মধ্যে যেন একটা নবযুগের সূচনা হইয়াছিল। রাধারাণী তাহার দুই অচঞ্চল, দীপ্ত নেত্রের স্থির পর্য্যবেক্ষণের ফলে সর্ব্বপ্রথমে এই নূতন পুরোহিতের সম্বন্ধে এইটুকু অভিজ্ঞতা লাভ করিল যে, সে নিতান্ত ছেলেমানুষ, কাজেই পুরোহিতের যোগ্য নয়। পূজাশেষে পুরোহিত বিদায় লইলে তাহার দুই সূক্ষ্ম ভ্রূরেখা কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। কিছুক্ষণ নীরবে দ্বারের দিকে চাহিয়া থাকিয়া অবশেষে সে পূজার নৈবেদ্যগুলা পূজাস্থান হইতে সরাইয়া রাখিয়া উঠিয়া গেল। দেবসেবক ব্রাহ্মণ সে সকলের যথাযথ ব্যবস্থা করিয়া দিবে, সে সকল বিষয়ে আর তাহাকে পিছন ফিরিয়া দেখিতেও হয় না,এবাটীতে কাহারও এমন বুকের শক্ত পাটা নাই যে,জমিদার-দুহিতার নিয়ম লঙ্ঘন করে। সামরিক আইনের মত সে সমুদায় অনতিক্রমণীয়।

মন্দিরের বাহিরে পুষ্পভূষিত প্রশস্ত উদ্যানে বসন্তের প্রমোদ উৎসব তখনও সাঙ্গ হয় নাই। কৃষ্ণচূড়ার কতকগুলা রাঙ্গা রাঙ্গা ভাঙ্গা পাপ্ড়ি বাতাসে উড়িয়া রাস্তাময় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। সেই রক্তরাঙ্গা পাপ্ড়িগুলি পদদলিত করিয়া রাধারাণী কিছুক্ষণ উদ্যানের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইল, তাহার মনের ভিতরে ভারি একটা অশান্তি জাগিতেছিল। একি হইল! এ কি রকম ব্যবস্থা হইল? দেবতার সহিত মানবের এ পরিহাস নাকি? এই মন্দিরের এই পুরোহিত! গোধূলির আকাশের প্রান্তে অস্তগত সূর্য্যের দীপ্তিবিহীন রশ্মিচ্ছটায় যেমন

সুবর্ণমণ্ডিত রক্তিমা ধীরে ধীরে ফুটাইয়া তুলে, তেমনই করিয়া তাহার দুই কপোলে পূর্ণরক্তিমা সুলোহিত রাগে ফুটিয়া উঠিল। দাদাবাবুর বুকের ধন মাথার মণি কি এই অল্প সময়ের মধ্যে এ সংসারে এমন মূল্যহীন হইয়া গেল যে, ইহার জন্য সৃষ্টি খুঁজিয়া এই কচি বাচ্চাটিকে পূজারী করা হইল! বাবা, কেন এমনটা ঘটিতে দিলেন! এতে কি আমাদেরই অপরাধ হইবে না?

বিরক্ত ও ক্ষুব্ধচিত্তে সম্মুখস্থ বৃক্ষ হইতে গোটাকএক ফুল ছিঁড়িয়া মাটিতে নিক্ষেপ করিয়া সে গৃহে ফিরিয়া গেল। অম্বরনাথের উপরে তাহার মন বিরূপ হইয়া উঠিবার এমন কিছু কারণ যে পাইল তাহা নয়; কিন্তু তথাপি মানুষের মন কখন্ কাহার প্রতি প্রসন্ন বা অপ্রসন্ন হয় তাহার কোন বাধা নিয়ম নাই। রাণীও এই যুবকের তরুণ বয়স দেখিয়া তাহার প্রতি বিরক্ত; এমন কি ঈষৎ ক্রুদ্ধ হইয়াই ঘরে ফিরিল।

কৃষ্ণপ্রিয়া পাটের শাড়ীর প্রান্ত গলায় বেষ্টন করিয়া নাসিকাগ্রে তিলক ধারণপূর্ব্বক হরিনামের মালা হাতে ফিরাইতে ফিরাইতে একজন দাসীকে ডাকিয়া ভাণ্ডারিণীকে তরকারি প্রস্তুত করিবার জন্য উপদেশ দিতে ছিলেন; এমন সময় কন্যা আসিয়া নিকটস্থ চৌকিতে বসিল।

উপদেশপ্রাপ্তা দাসী কর্ত্রীর আদেশে "আচ্ছা বল্‌'চি গিয়ে" বলিয়াই রাণীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,"হাঁগা দিদিমণি! কি হয়েচে গা, মুখটা অমন ক'রে রয়েছ কেন?"

দাসীর কথায় কৃষ্ণপ্রিয়া চকিতে কন্যার দিকে চাহিয়া শশব্যস্তে বামপার্শ্বস্থিত পাত্রে মালাছড়াটি রাখিলেন, এবং সস্নেহে বামহস্তে কন্যার গলা জড়াইয়া ধরিয়া গণ্ডে গণ্ড স্থাপন করিয়া স্নেহপূর্ণ স্বরে বলিলেন, 'তোর যেমন কথা। রাণীর আমার মুখ ভার আবার কোথায় দেখ্‌লি? নূতন পুরুত কেমন পূজো করলেন্ রে?"

রাধারাণী ঠোঁট ফুলাইয়া সবেগে উত্তর করিল, "ছাই, ও আবার পুরুত"; এই বলিয়াই সে মার পাশ দিয়া ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল,—"অত ছেলেমানুষ ও আবার পুরুত।"

কৃষ্ণপ্রিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ওমা তাই নাকি? খুব ছেলে মানুষ? তাত শুনিনি! কত বয়েস হ'বে?"

রাণী অবজ্ঞার সহিত বলিল, "বছর কুড়ির বেশি ত হ'বেই না, বরং কমই হ'তে পারে।"

সন্ধ্যাকালে যথাযথ আরত্রিকের ব্যাপার সম্পন্ন হইয়া গেল। বিংশাধিক বর্ত্তিকার হেম-পিঙ্গল জ্যোতিতে মর্ম্মর মন্দিরের চিক্কণ ভূমিতল শুক্তিখণ্ডের মত জ্বলিতেছিল। বসন ভূষণ পরিহিত দেবতার রত্নরাজী ঝলমল করিয়া নক্ষত্রখণ্ডের মত উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছিল। ঘণ্টা কাঁসরের সহিত খোল করতাল ও মৃদঙ্গধ্বনি 'হরি হরিবোল' শব্দকে অতিক্রম করিয়া উদ্ধাকাশে ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছিল। দেবতার গলায় পুষ্পমাল্য দুলিয়া দুলিয়া তাঁহাকে চামর ব্যজন করিতেছিল। আর বিগ্রহের পার্শ্বে একখানি পুষ্পকোমল শুভ্রহস্ত রৌপ্যমণ্ডিত ব্যজনী সঞ্চালিত করিয়া দেবঅঙ্গে তেমনই সুরভিবায়ু প্রদান করিতেছিল। অম্বরনাথ বামে দক্ষিণে সঞ্চালিত সেই হাতখানার প্রতি এক মুহূর্ত্ত দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া পরক্ষণে পঞ্চপ্রদীপ তুলিয়া লইয়া আরত্রিক ক্রিয়া সম্পাদনে মনোযোগী হইল। সুপ্রচুর আলোকে সেই হাতখানাকে প্রথম মুহূর্ত্তে যেন মর্ম্মরগঠিত একখানা নকল হাত বলিয়া মনে হইয়াছিল।

এবেলার কাজেও অম্বরনাথের উপরে রাণীর চিত্ত তেমন প্রসন্ন হইতে পারিল না। সে স্থিরচক্ষে তাহার অনভিজ্ঞ হস্ত সঞ্চালন ও কোন কোন ক্রিয়ার বিশেষ ত্রুটি দেখিতে পাইতেছিল। আজন্ম যে এই মন্দির ও মন্দির-দেবতাকে লইয়া কাটাইয়া আসিল, তাহার চোখের দৃষ্টি হইতে ভ্রম গোপন রাখা বড় কঠিন কার্য্য। রাণী মনে মনে কঠিন হইয়া উঠিয়া অম্বরের উদ্দেশ্যে বলিল, "মূর্খ, অতি মূর্খ ওটা!"

তাহার পর গৃহে ফিরিয়া পিতার নিকটে গিয়া রাধারাণী বলিল, "নতুন পুরুতটাকে কবে বিদায় কর্ব্বেন্ বাবা?" রমাবল্লভ পূর্ব্বেই কৃষ্ণপ্রিয়ার নিকট তাহার পুরোহিত বিদ্বেষের সংবাদ অবগত হইয়াছিলেন। ঈষৎ হাসিয়া খবরের কাগজ পড়া বন্ধ রাখিয়া বলিলেন, "কেন রে?"

রাণী তাহার সূক্ষ্ম ভ্রূরেখা ঊর্দ্ধে টানিয়া বলিল, "বাবা, তুমি বল্‌লে কেন? ও কি রকম পুরুত—ছেলেমানুষ—"

রমাবল্লভের মনেও যে এই খুঁৎটাই জাগিয়া ছিল, সেকথা তিনি এখন আর প্রকাশ করিলেন না; বরং কন্যার কথায়

হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন, "ছেলেমানুষ নাত সব্বাই একেবারে বুড়ো হবে কেমন করে রে। আরও এমনই কি ছেলেমানুষ!" "ছেলেমানুষ বইকি, বছর কুড়ি বয়েস।" "অত কম না পঁচিশ ছাব্বিশ হবে"। পিতার এইকথা শুনিয়া রাণী বেশি চটিল, বলিল, "দাদাবাবু থাক্‌লে কখন ওকে রাখ্‌তেন না; কিন্তু ওর দ্বারা বিধিপূর্ব্বক পূজা হ'বে না। ওটা মর্গ।" এই বলিয়াই সে অভিমানভরে মুখ ফিরাইয়া লইল। তাহার রাঙ্গা রাঙ্গা পাত্‌লা ঠোঁট দুখানা কাঁপিতেছিল। রমাবল্লভ তাহাকে ব্যথিত দেখিয়া একান্ত দুঃখিত হইলেন; অম্বরের প্রতি তাঁহার এমন কিছুই সহানুভূতি ছিল না, যাহা দ্বারা তিনি তাঁহার রাণীর মনে বেদনা দিতে পারেন। তিনি তখন উঠিয়া বসিয়া সস্নেহে কন্যার গায়ে হাত দিয়া ডাকিলেন, "রাধারাণি!" রাণী ঈষৎ মুখ ফিরাইল।

"দুঃখিত হ'য়োনা মা; ওকেই শিখিয়ে নাও, এখন আর ওকে ত্যাগ কর্ব্বার উপায় নেই।" রাণী উইলের কথা জানিত না, সে সবিস্ময়ে মাথা তুলিয়া পিতার দিকে চাহিয়া বলিল, "কেন বাবা?"

রমাবল্লভ পিতার উইলের কথা সবিশেষ জানাইয়া শেষকালে বলিলেন, "দেখ্‌চ ত পুরুত নির্ব্বাচনে আমার কোন হাতই নাই; এখন সাধারণ লোকের বিচারের উপরেই ওর থাকা না থাকা নির্ভর করচে; কিন্তু মা, আমার মনে হয় ছেলে মানুষ হ'লেই যে সব সময় ভারি নির্ব্বোধ হয়, তা নয়। আজই নূতন কাজ আরম্ভ করেচে, তাই হয় ত ঠিক পারেনি। তোমার হাতে পড়লেই দুদিনে ঠিক ক'রে নিতে পার্‌বে। আমি জানি আমার রাধারাণী মা ছেলে মানুষ হ'লেও অনেক বুড়োর মায়েদের চেয়েও ঢের বেশি বুদ্ধিমতী।" রাণী পিতার এই স্নেহপূর্ণ স্তোক বাক্যে আলক্তরঞ্জিত হইয়া সলজ্জমুখে "বাবা যে কি বলেন; আমি ত সবই জানি, তাই ওকে শেখাব" বলিয়াই উঠিয়া গেল; কিন্তু মনে মনে যে সে এই শিক্ষকের পদটির

অম্বরনাথ পঞ্চপ্রদীপ লইয়া আরত্রিক ক্রিয়ায় মনোযোগী হইল।

পুরাগৌরব অনুভব করিয়া গেল, তাহা তাহার ক্ষুদ্র অধরের প্রান্তে এক ফোঁটা সূক্ষ্ম হাসিই তাহার পিতার নিকটে প্রকাশ করিতেছিল—উহা শিশিরে ধোয়া গোলাপ কুঁড়িটির মত সুরভি যুক্ত। রমাবল্লভ অতৃপ্তনেত্রে তাহার গমনশীল মূর্ত্তিখানি চাহিয়া দেখিয়া অবশেষে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া দৃষ্টি ফিরাইয়া লইলেন। অন্তর ব্যাকুল হইয়া পড়িল, হায়! এই সাধের দেবী প্রতিমাকে যে কোন অযোগ্য হস্তে সঁপিয়া দিতে হইবে তাহা কে জানে! হায় মানবের ভাগ্য! লক্ষপতিরও সমুদয় শক্তি ও চেষ্টা বুঝি তোমার নিয়ম রোধ করিতে পারে না! নহিলে এই নিষ্পাপ ক্ষুদ্র বালিকার উপর তাঁহার প্রতি পূর্ণস্নেহপরায়ণ পিতামহের এ কঠোর বিধান কেন?

মন্দিরের নিত্যপূজা যথাকালে সাড়ম্বরে সম্পন্ন হইতে থাকিল, কিন্তু পূজারী কিংবা মন্দিরসেবিকা দুজনের এ

পূজায় তৃপ্ত হইতে পারিল না। প্রচুর আয়োজনের বৃথা ভারে অম্বরের চিত্ত অযথা ব্যথিত হইয়া উঠিতে লাগিল। সে চারিদিকের বাদ্যোদ্যমের কোলাহলের ভিতরে কোনও ক্রমে পূজা সমাপ্ত করিয়া ফেলে, পুষ্পথালিতে অপর্য্যাপ্ত পুষ্প চন্দন পড়িয়া থাকিয়া ম্লান হইয়া যায়। বাহিরে আসিয়া সে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে একবার ভিতরের পানে চাহিয়া চিন্তাক্লিষ্টমুখে চলিয়া যায়। তাহার মনের ভিতর হইতে কে যেন বলিয়া উঠে "এতক্ষণ ধরিয়া কেবল খেলা করিয়া আসিলি, পূজা করিলি কই?"

তাহার পর বিষণ্ণচিত্তে সে উদ্যানে একটু ঘুরিয়া বেড়ায়; পথের ধারে কালু পোদের কুঁড়ে ঘরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কখনও তাহার রুগ্ন ছেলেটাকে একটু আদর করে, বাগ বুড়ীর ঘাড়ের বোঝাটা কিছু দূর পর্য্যন্ত বহিয়া দিয়া ঈষৎ স্বচ্ছন্দমনে ঘরে ফিরিয়া ছাত্র কয়টিকে পাঠ বলিয়া দেয় ও রান্নাঘরে গিয়া রন্ধন করিতে বসিয়া যায়। তখন তাঁহার মনের বোঝা অনেকটা কমিয়া যায়।

রাণী প্রতিদিন বসিয়া তাহার পূজা দেখে, মনে মনে সাতবার করিয়া তাহার কাজের সমালোচনা করে, কিন্তু বাহিরে সে মুখ ফুটিতে পারে না। খুঁৎ বাহির হয় অনেক, কিন্তু তাহা লইয়া অনুযোগ করিতে গেলে সে গুলা যুক্তির দিক্ দিয়া এমনই ছোট দেখায় যে, তাহাতে এ সম্বন্ধে কিছু বলিতে গেলে যেন নিজেকেই ছোট করিয়া ফেলা হয়! এ একটা দোষ পাওয়া বরং ভাল, তাহাতে উভয়ের মধ্যেই একটা মীমাংসার উপায় হয়; কিন্তু যে দোষটা সুধুই মনের খুঁতের উপর নির্ভর করে সেইটে লইয়া আলোচনা করা সব চেয়ে মুস্কিল। না সেটাকে ছাড়া যায়, না তাহার কোনও প্রতীকার করা যায়। রাণী মনে করে নূতন পূজারীর অজ্ঞতা সে নিজে বুঝাইয়া শিখাইয়া দূর করিবে; কিন্তু কাজের বেলা এমন কিছু বড় রকম দোষ চোখে পড়েনা যা লইয়া চোখ রাঙ্গাইয়া বলা চলে, "একি পূজো কর্‌চো ঠাকুর! এমন করে কর'না!" কাজেই সে অসন্তুষ্টচিত্তে চুপ করিয়া চাহিয়া দেখে তাহার দেবতাকে লইয়া শিশু হস্তের অনভ্যস্ত খেলা চলিতেছে। শিখাইয়া পড়াইয়া গড়া আর হয়না, কেবল বিরক্তিই বৃদ্ধি হয়।

(ক্রমশঃ।)

শ্রীঅনুরূপা দেবী।

সেকেলে কথা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

দুই সতীনের ছেলে বদলাবদলি।

গোরক্ষপুরে যখন হরচরণের ৩০৲ টাকা মাহিনা হইল তখন তিনি দুই স্ত্রীকেই সেখানে লইয়া গেলেন। দুইজনের দুই মেয়ে বদলাবদলি করিয়া দিলেন। নিয়ম করিলেন যে, দুই সতীনের দুই মেয়ে যেমন বদল্ হইল সেইরূপ তাহাদের মা গুলাও বদল্ হইবে। ফলে এই নিয়মে ছেলেরা আসল মাকে মা না বলিয়া সৎমাকে মা বলিতে শিখিল। আসল মা তাহাদের 'বড় মা' বা 'ছোট মা' হইল! এই গোরক্ষপুরে আমার জন্ম হয়। আমার দুই মাই আমাকে আদর করিতেন। বড় মাকেই আমি মা বলিয়া জানিতাম। আমার মায়ের গর্ভে এক ছেলে দেবীচরণ জন্মায় ও তৎপরে আমার জন্ম হয়।

রামজে সাহেবের ডান হাত বাঁ হাত।

জব্বলপুরে যখন ঠগী অফিস উঠিয়া যায়, তখন আমার বয়স ৮৷১০ মাস মাত্র। আমার নামকরণ হইল। আমার

জন্মের পর বাবার মাহিনা বাড়িল বলিয়া বাবা আমার নাম রাখিলেন নিস্তারিণী। হরচরণ মেজর শ্রীমেন সাহেবের প্রিয় ছিলেন। পরে রামজে সাহেবের ডান হাত বাম হাত হইয়া উঠিলেন। সুন্দর রূপ, চরিত্রবান্, সদা প্রফুল্ল, শান্তশিষ্ট নিষ্ঠাবান্, ব্রাহ্মণ-কুমার চাকুরী স্বীকার করিয়া নিজেকে মনিবের সকল কাজেই অসঙ্কোচে লাগাইয়া দিল। এতদিনে তাহার পরোপকার প্রবৃত্তির চরিতার্থ হইল। সাহেবের সেবায় কালে তিনি সাহেবের ডান হাত বাঁ হাত হইলেন।

কুল কছনিয়া বা বদ্ হাওয়া।

আমার জ্ঞানের উদয় হইতেই জীবনের কষ্ট আরম্ভ। আমার পরে মায়ের তিনটি মেয়ে পরপর মরিয়া যায়; বাবা আমার নাম রাখিয়াছিল নিস্তারিণী—কিন্তু হিন্দুস্থানি চাকরাণীরা আমায়—"কুলকছনিয়া" বা বদ্ হাওয়া ব'লে ডেকে গাল দিত; কারণ আমার কোলে তিনটি মেয়ে মারা গেছিল। আমি বড় হওয়ার পর যে আমাকে আশ্রয় দিয়েছে, তাকেই আমি খেয়েছি। যদি খারাপ হাওয়া ব'লে কোন জিনিস থাকে, তবে তা আমার ভিতরে জন্মিবার আগেই ভগবান ভরে রেখেছিলেন। বাপ ছাপোষা মানুষ। দুই মা কার্য্যে ব্যস্ত, আমায় কে আদর করে? ক্রমে ক্রমে আমরা থাবার পরবারও অনেকজন হলুম। আমার দাদা দেবীচরণ, দিদি রাজকুমারী, আমি, দুই মা, আর বাবা—আমরা এতজন খেতে।

লব-কুশ।

বিমাতার আবার এ সময়ে লবকুশ দুই যমজ ছেলে হইল। এদের চেহারা বাবার মতই সুন্দর হয়েছিল। আমার বিমাতার বৈষ্ণব মন্ত্র; তিনি গোপাল নাম ভালবাসিতেন বলিয়া দুই ছেলের লব গোপাল ও কুশ গোপাল নাম রাখেন। আমার মা ঘোর শাক্তের মেয়ে; সেদিনও আমার মামার বাড়ী মহিষ বলি হয়েছে। তিনি দুর্গার নাম ভালবাসিতেন বলিয়া তাঁহার পুত্রদের নাম দুর্গার নাম হইতে লওয়া হইত এজন্য আমার বড়দাদার নাম দেবীচরণ, মেজ ভায়ের কালীচরণ, ছোট তারিণীচরণ। সে সময়ে দেবেন্দ্র, সুরেন্দ্র প্রভৃতি নামের আমদানী হয় নাই। তখন দেবদেবীদের নামেই নামকরণ করা হইত।

গা আদুড়।

ক্রমে যখন আমার বার বছর বয়স হল; তখন দেশে থাকলে সে হিন্দুস্থানীর দেশে ত পাত্র পাওয়া যায় না। (জন্য এবং কুলীনের মেয়ের যেমন নিয়ম, কাজেই বিয়ে হ'(দেরী হয়েছে। আমার ঠাকুরমাকে আনা হইয়াছে; তি দিনরাত আমায় বক্‌তেন। আমি যেন সকলের চ(শূল। বাবা সর্ব্বদাই শুনিয়ে শুনিয়ে বল্‌তেন, "নিস্তা(বিয়ে দিতে এতগুলি টাকা খরচ হবে।" ঠাকুমা বল্‌তে "গা আদুড় ক'রে রাখিস্ না, শীঘ্রই বেড়ে যাবি।" দা বল্‌তেন, "অনেক টাকা দেনা ক'রে দেশে পাঠাতে হবে। এর মধ্যে যারা পাড়ার ভাল লোক, তাঁরা বল্‌তেন, "আ(দুর্গা ঠাকরুণের মত এই মেয়েটির বিবাহে বাঁড়ুয্যে মহাশয়ে দুর্গা পূজার পুণ্য-সঞ্চয় হবে।" আমি বাবার পূজার (সংগ্রহ করিয়া পূজার যায়গা করিয়া দিতাম বলিয়া কেব(আমার মা আমাকে স্নেহের চক্ষে কুমারী পূজায় কুমারী মত দেখিতেন।

পায়ের গঠন মা সরস্বতীর মত।

সকলেই আমার দেহের রূপলাবণ্যের প্রশংসা করিত। আমার চক্ষু বাবার চক্ষুর মত কটা ছিল; কিন্তু আমার পায়ের গঠন, সকলেই বলিত, দেবী সরস্বতীর মত ছিল। মারহাট্টা জ্যোতিষী ব্রাহ্মণ আমার পা দেখিয়া বলিয়াছিলেন, এরূপ রূপবতী সুগঠিতা কন্যা ও যাহার এরূপ সুন্দর পদদ্বয়, তারা প্রায়ই বিধবা হয়। সে কথা আমার বেশ মনে আছে। আমি তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছি যে, কোন মেয়ের পা দেখিলেই সে বিধবা মরিবে কি সধবা মরিবে, তাহা জানা যায়। একথা সত্য।

মা শীতলা দেবীর স্বপ্নাদেশ।

আমার জন্মের ১৪ বৎসর পরে একদিন মা স্বপ্নে মা শীতলা দেবীর দ্বারা আদিষ্ট হইলেন যে, "আমার বকুল তলায় (পাইবি, তাহা খাইলে তোর অভীষ্ট পূর্ণ হইবে।" মা সেই তিনটা রাত্রিতে উঠিয়া একটি চাকরাণীর সহিত বকুলতলায় যাইয়া দুইটি পাকা বকুল ফল পাইলেন এবং ভক্তিপূর্ব্বক খাইলেন। তখন পৌষমাস, বকুলের সময় নহে; ইহাই

আশ্চর্য্যের কথা! মা গর্ভবতী হইলেন। লোকে দেবদেবী মানে না। ভাবের কথা মানে না। তারা ভাবে শুধু শরীরটা। মন ও আত্মা বলে ভিতরে কি আছে, তা তারা বুঝে না, এজন্য মানস ঠাকুর মানে না।

মহেশ কাকার বরপুত্র কালীচরণ।

আমার পিতার বৈমাত্র ভাই মহেশ কাকা অনেক দিন হইল সংসার ছাড়িয়া জব্বলপুরের নর্ম্মদার ধারে পর্ব্বত-গুহায় বাস করিতেন। যে দিন কালীচরণের জন্ম হইল, সে ৪৬ সালের কথা বলিতেছি, সে দিন উলঙ্গ সন্ন্যাসীর মত মহেশ কাকা কোথা হইতে একটি কালো পাঁটা ও একখানি খাঁড়া লইয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি আসিয়া বলিলেন, "হর দাদা, ছোট গিন্নীর গর্ভে আমার বরপুত্র আসিয়াছে; আজ সে ভূমিষ্ঠ হইবে।" আমি এই পাঁটা মানিয়াছি। ছেলের জন্ম হইবামাত্র এই পাঁটা বলি দিব।

রক্তমাখা খাঁড়া দিয়া নাড়ীকাটা।

তাহাই হইল। কালীচরণ ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র মহেশ কাকা সেই কালো পাঁটা বলি দিয়া সেই রক্তমাখা খাঁড়া মায়ের নাড়ী কাটিতে পাঠাইয়া দিলেন। কালীচরণ নামটি এই মহেশ কাকারই প্রদত্ত। রাশনাম কামাখ্যাচরণ হইল। সকলকে তিনি বলিয়া গেলেন যে, আমার বরপুত্র বড় ধার্ম্মিক হইবে, কিন্তু ইহাকে যদি কেহ প্রহার করে, তবে বড় অমঙ্গল হইবে।

খড়ম পেটা।

দেবীচরণ আফিসের কাগজ কখনও কখনও বাড়ী লইয়া আসিতেন ও বাড়ীতে কার্য্য করিতেন। কালীচরণ একদিন দোয়াত কলম লইয়া সেই সকল কাগজের উপর লিখিয়াছিল, এই জন্য রাগ করিয়া দেবী কালীকে খড়মপেটা করেন। সকলে "কি কর, কি কর" বলিতে লাগিল। মার খাইয়া কালীচরণের ভয়ানক জ্বর আসিল। ২।৩ দিনের জ্বরে কালীচরণ মরণাপন্ন হইল। তাহার জীবনের আশা রহিল না। সকলে নিরাশ হইয়া ভাবিতেছেন, এমন সময় মহেশ কাকা আসিয়া সকল কথা শুনিয়া কালীচরণের গায়ে হাত বুলাইয়া যেন খড়মের মারের বেদনা পুঁছিয়া দিয়া গেলেন। তিনি বলিয়া গেলেন "ছেলে এ যাত্রা রক্ষা পাইবে। সে খুব ধার্ম্মিক হইবে, কিন্তু ঘরে থাকিবে না।"

এক বেলার পথ এক মাসে।

আমার বিবাহের জন্য আমার দুই মা তিন বোন সবাই দেশে এলুম। কালীর বয়স তখন দুবছর। লব কুশ দু ভাই সঙ্গে এল। তখন রেলগাড়ী হয় নাই। এখনকার একবেলার পথ এক মাসে এলুম। ৩।৪ খানা গরুর গাড়ী ক'রে বিন্ধ্যাচলে এলুম। নৌকা ক'রে কাশীর গঙ্গা দিয়ে ত্রিবেণী এসে ডুলি করে খন্নেনে এলুম।

বিশু কাকা।

আমার বাবার মামাত ভাই বিশুকাকার কাছে বাবা পত্র লিখে আমাদের পাঠিয়ে দিলেন। পত্রে লিখে দিলেন, "তুমি বর খুঁজে নিস্তারের বিবাহ দিও; কারণ মেয়ে ডাগর হয়েছে।" বিশু কাকা অনেক খুঁজেও স্বঘরে পাত্র পান না। শেষে থানাকুল কৃষ্ণনগরের এক স্বকৃত ভঙ্গ কুলীনের সঙ্গে বিবাহের ঠিক হইল। তাঁহার কিন্তু ৩০।৪০টি বিবাহের খবর পাওয়া গেল।

খৃষ্টানরা যা ব'লে ভগবান্‌কে ডাকে।

শালগ্রামকে লোকে যা'বলে পূজা করে, সেই (নারায়ণ) ঠাকুরের সন্তানটির নাম--খৃষ্টানরা যা বলে ভগবান্‌কে ডাকে সেই—(ঈশ্বর) চাটুর্য্যের সঙ্গে বিবাহের দিন ঠিক ক'রে শিবরাত্রের আগের দিন বরকে লইয়া আসা হইল। তার পরের দিন বিয়ে হ'বে।

বিয়ের বায়নার নাম এখন বলে আশীর্ব্বাদ।

আমার যার সঙ্গে বিবাহ হইবে, তাঁহার বাপ-বড় গরীব। পৈতের সময় ন্যাড়া মাথায় কুল ভেঙ্গে বিয়ে ক'রে ক'রে যাঁরা বেড়ান, ইঁনি তাঁদেরই একজন। বয়স তখন ২৫ বৎসর। এই বয়সেই এতগুলি বিবাহ করেছেন। কনের বাপ মা অনেক সময়ে নিজেদের তিন চারটি করিয়া কন্যার দায় হইতে ইঁহার কৃপায় উদ্ধার হয়েছেন। ইঁহাকে বায়না বা এখনকার কথায় আশীর্ব্বাদের টাকা দিয়া রাজি করিয়া আনা হইয়াছিল। জাত রাখা মান রাখা আগে চাইত।

মা স্বধু কলার ভিতর সূতো গিলে উপোস কল্লেন।

অনেক দর কসাকসির পর বিবাহ হইল। বিবাহে খুব সামান্ত খরচ। ১০৷১২ টাকায় বিবাহ হইল। জামাইকে সাদা পাড়ওয়ালা ধুতি চাদর দেওয়া হইল। আমাকে রঙিন কাপড় ছোপাইয়া দিয়াছিল। একগাছি রূপার নোয়া গড়িয়ে, একটি নথ দিয়ে বিশু কাকা আমায় উৎসর্গ করে দিলেন। তখন স্ত্রী-আচারের সকল নিয়মগুলি ছিল। বড় মাই বরণ করেছিলেন। আমার মা সতীনকেই খাতির ক'রে বরণ কত্তে দিলেন, তিনি স্বধু কলার ভিতর সূতো গিলে উপোস ক'রেছিলেন; তাঁকে আর বেশী কিছু করতে হয় নাই।

আমার আইবুড়ো নাম খণ্ডে গেল।

পাড়ার মেয়েদের খুব হাসি খুসি। নিয়ম কম্ম সবই হ'ল। গায়ে স্বধু হলুদ ঠেকানো হ'ল; কিন্তু এখনকার মত খাওয়ান তখন হ'ত না। বিয়ের দিন যারা বাসর জাগবে, তাদের ভাত, ব্যঞ্জন, শুক্তা, ডান্‌লা, মাছের ঝোল ক'রে খাওয়ান হ'ল অন্য লোকজন বরযাত্র কন্যেযাত্রদের খাওয়ান হইত না। তবে বরের সঙ্গে যদি কেহ অভিভাবক আসিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাকেও খাওয়ান নিয়ম ছিল। সর্ব্বশুদ্ধ ১০৷১২ জন মেয়ে ছেলে খেলে। আমাদের বোনদেরও ঐ রকম বিবাহ হইয়াছে। বিবাহ হ'ল, বর চলে গেলেন, স্বপ্নের মত আমার আইবুড়ো নাম খণ্ডে গেল।

দাদার বিয়ে চিঁড়ে মুড়কী দিয়ে।

বড় ভাই দেবীচরণ ছুটী লইয়া দেশে আসিল; কি[illegible] কাকা দাসপুরে তা'র বিবাহের কনে ঠিক করিলেন। গায়ে হলুদ ঠেকিয়ে নিয়ে গেল। কটকের এখনকার উকিল হরি বাঁড়ুয্যের পিসতুতো বোন রাজকুমারীর সহিত দাদার বিবাহ হইল। দুটি চিঁড়ে মুড়কী দিয়ে বর ও পাড়ার ছেলে মেয়েরা খেলে। বউ ঘরে এল, কারণ আমরা ত বিয়ে করা কুলীন নই যে আমাদের বৌ বাপের বাড়ী থাক্‌বে। (ক্রমশঃ)

শ্রীনিস্তারিণী দেবী।
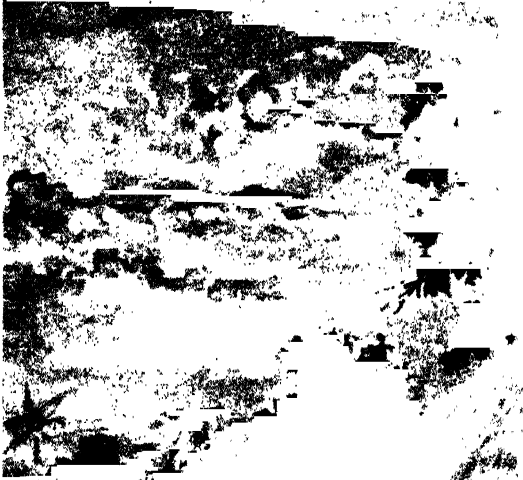
"উজল করিয়া আছে দূরে সেই আমার কুটীরখানি।"—দ্বিজেন্দ্রলাল

ওয়াল্‌টেয়ারে

বিনি সুতায় কে গেঁথেছে
উজল মণিমালা ?
সাজিয়েছে কোন্ উপাসিকা
পূজারতির ডালা ?
সীমাচলের চরণ-মূলে,
অপরূপ এই পাষাণ-কূলে
কে তাপসী আননে তা'র
ধ্যানের জ্যোতি ঢালা ?

সাম্‌নে হেরি সুনীল বারি
তালী-বনের ফাঁকে,
গেরুয়া রঙ্ ভাঙ্গা মাটী
ঢালু পথের বাঁকে ;
ঝর্ণা-ঝালর পড়্‌ছে ঝরি'
শ্যামল তরু-পর্ণ 'পরি,
আলোক-লতা অলক-জালে
কালো পাথর ঢাকে।

দেখেছি তো কতই শোভা
কতই দেশে ঘুরি',
রেবার শাদা মোতির সঁাথি
তুষার হিমের পুরী ;
নারিকেলের সোণার ফুলে
এমন মলয় কোথায় দুলে ?
সাগর-ধোয়া রবির করে
হাসির লুকোচুরি।

নীল লহরীর মাথায় অথির
ফেনার যূথীরাশি
দেয় গো চুমা লাল বালিতে
দেখ্‌রে হেথায় আসি' ;
বুলিয়ে তুলি গিরির গায়ে
ঘোর বেগুণী রঙ্ ফলায়ে
সায়াহ্ন রোদ পড়্‌ছে ঢলে'
নীলাম্বু উদ্ভাসি'।

সময়ে সময়ে সেইরূপ অভিমত প্রকাশ করিতে দেখা যাইত; কিন্তু প্রকৃত সংবাদ অন্তর্যামীর অগোচর ছিল না।

গোপালের দৌরাত্ম্যে কালীচরণের একদণ্ড স্থির থাকিবার যো ছিল না। প্রভাতে উঠিয়া কালীচরণ হিসাবের বহি লইয়া বসিয়াছেন। দোয়াত হইতে কালী লইতে গিয়া দেখেন যথাস্থান হইতে দোয়াত কখন্ অন্তর্হিত হইয়াছে এবং গোপাল নিবিষ্টচিত্তে শুভ্র চাদরের উপর দিব্যরূপে মসীলেপন করিতেছে। স্নানের সময় ভৃত্য জল ও তৈল দিয়া গিয়াছে—স্নান করিতে বসিয়া কালীচরণ দেখেন, গোপাল তেলের বাটী বালতির ভিতর অবলীলাক্রমে ডুবাইয়া দিয়াছে। সমস্ত তৈল জলের উপর ভাসিতেছে! কালীচরণ নস্য লইতেন—নস্যের কৌটা পার্শ্বে রাখিয়া একটু ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন, হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া দেখেন কৌটা খুলিয়া গোপাল সমস্ত নস্য তাঁহার নাসিকার উপর নিক্ষেপ করিয়াছে। কালীচরণ তখন হাঁচিতে হাঁচিতে হাসিতে থাকিতেন। প্রতিদিন গোপাল এইরূপ নানাপ্রকার উপদ্রবের সৃষ্টি করিত। তদ্ভিন্ন কাক ডাকা, বক ডাকা, ঘোড়া হওয়া, কলের গাড়ি হইয়া মুখে বাঁশী বাজাইয়া দুই হস্ত সঞ্চালিত করা—এ সকল ত ঘণ্টায় ঘণ্টায় করিতে হইত; কিন্তু কালীচরণের এ সকলে কিছুমাত্র বিরক্তি ছিল না, বরং যে দিন উপদ্রবের সংখ্যা কম হইত, সেদিন তাঁহার একটু ফাঁকা ফাঁকা মনে হইত।

গোপাল নিবিষ্টচিত্তে শুভ্র-চাদরের উপর দিব্যরূপে মসীলেপন করিতেছে।

২

অন্তঃপুরে দুইদিন হইতে যোগমায়ার সহিত সুকুমারীর সংঘর্ষণজনিত অগ্ন্যুৎপাদন হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। ভোলা চাকরকে সংসার হইতে তাড়াইবার জন্য যোগমায়া বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিয়াছিলেন—সে শুধু অকর্ম্মণ্য এবং অলস নহে—যোগমায়ার সহিত তাহার আচরণ নিতান্ত আপত্তিজনক হইয়া উঠিয়াছিল। ভোলার ব্যবহার এবং আচরণের দ্বারা স্পষ্ট প্রকাশ পাইত যে, তাহার মতে সংসারের যথার্থ গৃহিণী যোগমায়া নহেন সুকুমারী! সর্ব্বাপেক্ষা ক্রোধের কারণ হইয়াছিল কএকদিন হইতে ভোলা সুকুমারীকে 'মা' এবং 'ঠাক্‌মা' বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছিল। 'ঠাক্‌মা' এবং 'মা'র মধ্যে যে নিগূঢ় অর্থ নিহিত ছিল যোগমায়া তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়া প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। উঠিতে বসিতে তিনি ভোলাকে নিগ্রহ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

সুকুমারী কিন্তু ঠিক বিপরীত পথ অবলম্বন করিয়াছিল। সে ভোলার প্রতি অযথা স্নেহশীলা হইয়া উঠিয়াছিল। ভোলার মাতৃসম্বোধনের প্রতি একমুহূর্ত্তও তাহাকে অসম্মান করিতে দেখা যায় নাই। যোগমায়া যখন রুদ্র মূর্ত্তি হইয়া ভোলাকে তিরস্কার করিতেছেন, ঠিক সেই সময়েই হয় ত সুকুমারীর মাতৃহৃদয়ে স্নেহের উৎস

উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল; একটা পাত্রে জল-খাবার আনিয়া ভোলাকে বলিল, "সমস্ত দিন ত' খেটে মরছিস, যা আগে একটু খাবার খেয়ে মুখে জল দে!" ভোলা খাবারের পাত্র লইয়া যোগমায়ার প্রতি বক্র কটাক্ষ করিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল। যোগমায়া হয় ত ভোলাকে একটা কঠিন এবং কষ্টকর কার্য্যে নিযুক্ত করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতেছেন; সুকুমারী আসিয়া বলিল, "ভোলা যা, খুকি ঘুমুচ্ছে তার কাছে একটু বসে থাক্।" ভোলা যোগমায়ার অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া বসিয়া থাকিবার জন্য চলিয়া গেল।

অবশেষে একদিন ভীষণভাবে দীর্ঘকালব্যাপী ঝগড়া করিয়া যোগমায়া ভোলাকে ছাড়াইয়া দিলেন। ভোলা তাহার মাহিনা কড়াক্রান্তি বুঝিয়া লইয়া সুকুমারীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল।

পরদিন প্রভাতে যোগমায়া ঘুম হইতে উঠিয়া দেখিলেন, সুকুমারীর কন্যাকে ক্রোড়ে লইয়া ভোলা দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

"তুই যে আবার এসেছিস?"

একটু বিদ্রূপের সহিত ভোলা বলিল, "আমি কি আপনি এসেছি—মা ডাকিয়েছেন তবে এসেছি।"

যোগমায়া ক্রোধে তপ্ত হইয়া উঠিলেন,—"এখনই দূর হ' হারামজাদা!"

চক্ষু গোল করিয়া ভোলা বলিল—"গাল কেন দাও গা? আমি কি তোমার চাকর যে তোমার কথায় দূর হ'ব? মা আমাকে বলেছেন তাঁর বাপের বাড়ীর পয়সায় তিনি আমার মাইনে দেবেন। আমাকে গাল মন্দ দিও না বলছি!"

অপমানে ও ক্রোধে যোগমায়া চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার দেখিলেন। তুমি! চাকর হইয়া তাঁহাকে তুমি বলিয়া সম্বোধন করিবে—আর সুকুমারী হইলেন তিনি!

"বউমা!"—গৃহ যোগমায়ার কণ্ঠশব্দে প্রকম্পিত হইয়া উঠিল।

"রুদ্ধস্বরে সুকুমারী বলিল, ফেলে দিগে যা।" ৩৯৮ পৃষ্ঠা।

সহজ ভঙ্গিভরে সুকুমারী আসিয়া দাঁড়াইল।

"তুমি ভোলাকে কার হুকুমে বাড়ীতে ঢুকিয়েছ?"

সুকুমারী ধীরভাবে বলিল, "ভোলাকে ছাড়ালে আমার চলবে না মা। ও মাইনে আপনাদের দিতে হবে না। আমার বাবা দেবেন।"

অপমানে যোগমায়ার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল, "এতদূর তোমার আস্পর্দ্ধা হয়েছে! আচ্ছা, আজ ওঁকে ব'লে যা হয় একটা করব। হয় তুমি এ বাড়ী থেকে বেরবে নয় আমি বার হব।" কাঁদিতে কাঁদিতে যোগমায়া ঘরে প্রবেশ করিয়া শয্যাগ্রহণ করিলেন। বাহিরে ভোলা খুকিকে ভুলাইবার জন্য উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল, "খুকুন যাবে শ্বশুরবাড়ী সঙ্গে যাবে কে—বাড়ীতে আছে কেলো কুকুর কোমর বেঁধেছে।"

দ্বিপ্রহরে কালীচরণ আহার সমাপন করিয়া আচমন করিতে যাইবেন, এমন সময় কাঁদিতে কাঁদিতে যোগমায়া আসিয়া পথরুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইলেন। কাঁদিয়া কাঁদিয়া যোগমায়ার মুখ ফুলিয়া গিয়াছিল—এবং ক্রোধে ও অপমানে সর্ব্বশরীর কাঁপিতেছিল।

যোগমায়া বলিলেন,—"তুমি কোন দিন আমার কোন কথা শোন নি। আজ যদি আমার কথায় কাণ না দাও ত' আজ আমি বিষ খেয়ে মরব। কাল ভোলাকে ছাড়িয়ে দিয়েছিলাম—তোমার গুণবতী বউ তাকে ডাকিয়ে আমাকে অপমান করবার জন্য বাহাল করেছেন। আমাকে বল্লেন, তাঁর বাপের পয়সায় ভোলার মাইনে দেবেন। ভোলা আমাকে চোখ ঘুরিয়ে বল্‌লে যে,আমি যেন তার সঙ্গে কথা না কই—সে আমার চাকর নয়। তোমার গুণের বউ নিয়ে তুমি ঘর কর, আমাকে ছুটী দাও। আমি আজ বিষ খেয়ে মরব!" উচ্চৈঃস্বরে যোগমায়া কাঁদিতে লাগিলেন।

এতদিন যে উপদ্রব দূর হইতে নীরবে সহ্য করিয়া আসিয়াছেন যোগমায়ার কথা শুনিয়া ও অবস্থা দেখিয়া আজ সহসা কালীচরণের নিকট তাহা অসহ্য হইয়া উঠিল! যোগমায়ার সমগ্র অপমান তাঁহারই মস্তকে যেন কুঠারাঘাত করিতে লাগিল।

চীৎকার করিয়া কালীচরণ ডাকিলেন, "ভোলা!"

ভোলা নিকটে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,—"আজ্ঞে?"

অধৌত হস্তে পা হইতে চটীজুতা খুলিয়া কালীচরণ সজোরে ভোলাকে ছুড়িয়া মারিলেন।

"পাজি! শয়তান! বের আমার বাড়ি থেকে—এখনই বের!" ক্রোধে কালীচরণ কাঁপিতে লাগিলেন।

নেপথ্যে দাঁড়াইয়া সুকুমারী সব শুনিতেছেন। তীব্র অপমানের আঘাতে কঠিন এবং রক্তিম হইয়া সে স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

ভোলা আসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "মা ঠাকরুণ আমাকে ছেড়ে দিন, জুতা খেয়ে আমি এ বাড়ীতে থাক্‌তে পার্‌ব না!"

সুকুমারীর চক্ষুর্দ্বয় অগ্নিকগোলকের মত প্রদীপ্ত এবং নাসিকা স্ফীত হইয়া উঠিল।

"ও জুতা তুই খাস্ নি ভোলা—ও জুতা আমা[illegible] মারা হয়েছে! তোকে এখানে থাক্‌তে হ'বে না—যা [illegible] খানা গাড়ী ডেকে নিয়ে আয়, জলস্পর্শ না ক'রে এখনই অ[illegible] বাপের বাড়ী চলে যাব!"

৩

অপরাহ্ণে বহির্ব্বাটীতে গোপালের সহিত কালীচর[illegible] শরীরতত্ত্বের আলোচনা চলিতেছিল।

গোপাল জিজ্ঞাসা করিতেছিল, "দাদাবাবু, মেয়ে মানু[illegible] গোঁফ্ ওঠে না কেন?"

এই গুরুতর প্রশ্নের কি উত্তর দিবেন ভাবিয়া কালীচ[illegible] বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন, এমন সময় পরিচারিকা বি[illegible] আসিয়া বলিল, "গোপাল, তোমার মা ডাক্‌চেন, এস গা[illegible] এসেছে, মামার বাড়ী যাবে।"

গোপাল সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিল, "দাদাবা[illegible] বিন্দির গোঁপ ওঠে নি কেন?"

প্রশ্ন শুনিয়া বিন্দুবাসিনী, ওরফে বিন্দি, ত্রস্ত হই[illegible] উঠিল। কালীচরণ কোন কথা কহিলেন না—ব্যাপার তিনি কতকটা অনুমান করিয়া লইয়া মনে মনে অধীর হই[illegible] উঠিয়াছিলেন।

"কেন রে বিন্দি, বৌমা হঠাৎ বাপের বা[illegible] যাচ্ছেন?"

বিন্দু মৃদুস্বরে বলিল, "কি জানি বাবু, বউদিদি আ[illegible] ভাত খান্‌নি—সমস্ত জিনিষপত্র গুছান হয়ে গিয়েছে, গা[illegible] এসেছে। এখনই বাপের বাড়ী যাবেন।"

গোপালকে লইয়া চিন্তিতমনে কালীচরণ গৃহাভ্যন্ত[illegible] প্রবেশ করিলেন। সম্মুখেই সুকুমারী দাঁড়াইয়া গোপালে[illegible] জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। কালীচরণ নিকটে গি[illegible] বলিলেন, "বউমা, তুমি এখনও ভাত খাও নি?"

সুকুমারী কালীচরণের সহিত কথা কহিত, কি[illegible] আজ অর্দ্ধাবগুণ্ঠিত হইয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। উত্ত[illegible] দিল না।

কালীচরণ স্নিগ্ধস্বরে বলিলেন, "না খেয়ে বাপের বাড়ী যাচ্ছ, তুমি কি আমার উপর রাগ করেছ মা! আমি ত[illegible] তোমাকে কিছু বলি নি!"

"তুমি কি আমার উপর রাগ করেছ মা ?"

যাইবে বলিয়া গোপাল প্রথমে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু গাড়ীতে উঠিয়া যখন বুঝিতে পারিল কালীচরণ যাইবেন না, তখন সে বাঁকিয়া বসিল।

"দাদাবাবু, তুমিও এস, দাদাবাবু, তুমিও এস !" অবশেষে গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িবার জন্য গোপাল অধীরভাবে কাঁদিতে লাগিল। "দাদাবাবু, আমি মামার বাড়ী যাব না, তোমার কাছে থাক্‌ব !" সুকুমারী নির্দ্দয়ভাবে গোপালকে চাপিয়া ধরিয়া বসিয়া রহিল।

কালীচরণের চক্ষে অশ্রু গাঢ় হইয়া নামিয়া আসিল ! গোপালের মাথায় হাত দিয়া বলিলেন, "ছি দাদা, কাঁদ্‌তে নেই, হাস্‌তে হাস্‌তে মামার বাড়ী যাও !"

গাড়ীর ঘর্ঘর শব্দ ছাপাইয়া গোপালের কাতরোক্তি শুনা যাইতে লাগিল। কালীচরণ উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিলেন গোপাল বলিতেছে, "আমি যাব না, আমি দাদাবাবুর কাছে থাক্‌ব, আমাকে ছেড়ে দাও !" কালীচরণের হৃৎপিণ্ডের মধ্যে যেন কে নির্ম্মমভাবে শূল বিদ্ধ করিতে লাগিল।

গলির বাঁক ফিরিয়া গাড়ী যখন দৃষ্টির অন্তরালে চলিয়া গেল, তখনও যেন গোপালের ক্রন্দন ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া কালীচরণের কর্ণে আসিয়া পৌছিতে লাগিল। কালীচরণের মনে হইতে লাগিল কলিকাতা সহরের সহস্র প্রকার কোলাহলের একত্র মিলিত উদারা সুরের গভীরতার মধ্যে যেন পাঁচ বৎসরের একটি শিশুকণ্ঠের ক্ষীণ তীক্ষ্ণ সুর, অত্যন্ত ক্ষীণ হইলেও, পরিষ্কার স্বতন্ত্রভাবে শুনা যাইতেছে। গাড়ীর শব্দ আর শুনা যায় না। সে গাড়ীর পর আরও পাঁচ সাত খানা গাড়ী সশব্দে চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু কালীচরণের কর্ণে যেন লাগিয়া রহিয়াছে, "আমি দাদাবাবুর কাছে থাক্‌ব,

সুকুমারী গোপালকে টানিয়া লইয়া কক্ষে প্রবেশ করিল। কালীচরণও কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "বউ মা গুরুজনের মনে কষ্ট দিতে নেই। ভাত খাওগে যাও, আর তোমার যদি নিতান্ত যাবার ইচ্ছা হয়ে থাকে, দুদিন না হয় বাপের বাড়ী বেড়িয়ে এস। গোপালকে নিয়ে যেও না। তুমি ত জান গোপালকে ছেড়ে আমি থাকতে পারি না !"

গোপালকে রাখিয়া যাইবার মত সুকুমারীর কিন্তু কোন লক্ষণ প্রকাশ পাইল না। সে গোপালকে পরিচ্ছদ পরাইতে আরম্ভ করিল। কালীচরণ বুঝিলেন তাঁহার আরজি সহজে মঞ্জুর হইবার সম্ভাবনা নাই। বলিলেন, "বউমা, আমাকে ক্ষমা কর ! তুমি ভোলাকে না হয় রে'খ, আমি কিছু বল্‌ব না—" কালীচরণের কণ্ঠ কাঁপিয়া রুদ্ধ হইয়া গেল।

সুকুমারীর কঠিন হৃদয় বিচলিত হইবার নহে। গোপালকে লইয়া সে গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। মামার বাড়ী

আমাকে ছেড়ে দাও !" একটি তপ্ত দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া কালীচরণ তাঁহার শূন্য বৈঠকখানায় আসিয়া বসিলেন। ভৃত্য তামাক দিয়া গেল। আলবোলার নল মুখে দিয়া কালীচরণের চক্ষু হইতে টপ্ টপ্ করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল ! তখনও কর্ণে বাজিতেছিল, "আমাকে ছেড়ে দাও, আমাকে ছেড়ে দাও !"

৪

কোন উপদ্রব নাই, কোন উৎপীড়ন নাই ! দোয়াতের কালী দোয়াতেই থাকে, নস্যের কৌটা হইতে কেহই নস্য নাসিকার উপর ঢালিয়া দেয় না, মাখিবার তৈল পাত্রের মধ্যে নিশ্চিন্তভাবে অপেক্ষা করে,—নিদ্রার ব্যাঘাত নাই, অবসরের অভাব নাই ; কিন্তু তথাপি কালীচরণ অশান্তির তাড়নায় অধীর হইয়া উঠিয়াছেন। স্নান করিতে গিয়া চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়া আসে ! আহার করিতে বসিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া আহার অসমাপ্ত রাখিয়া অন্যমনস্কভাবে উঠিয়া পড়েন ! দিনের মধ্যে সর্ব্বদা তাঁহার মনে হয় কে যেন তাঁহাকে ডাকিল, "দাদাবাবু !" চকিত হইয়া কালীচরণ চাহিয়া দেখেন। কিন্তু বৃথা ! কেহ কোথাও নাই ! শুধু উদাস বায়ু জানালার ছিদ্রের মধ্য দিয়া করুণ আর্ত্তনাদ করিয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করে।

পাঁচ দিন গোপাল গিয়াছে। প্রথম দিনটা কালীচরণের কতকটা নেশার মত কাটিয়াছিল,—একটা তীব্র মর্ম্মস্পর্শী অভিমানের নেশা তাঁহার সমস্ত অনুভূতি ও ক্লেশকে কতকটা বিবশ করিয়া রাখিয়াছিল। দুঃখে যে হৃদয় মথিত হইতেছিল না, তাহা নহে ; কিন্তু দুঃখের ঠিক বিপরীত দিকে একটা প্রবল অভিমান টান দিতেছিল। এই পাঁচ দিনে সেই অভিমানের টান ক্রমান্বয়ে শ্লথ হইয়া প্রায় শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছে—এখন দুঃখটাই সমগ্র হৃদয় অধিকার করিয়াছে।

সমস্ত দিন ইতস্ততঃ করিয়া বৈকালে কালীচরণ কোন প্রকারে আপনাকে সামলাইয়া রাখিতে পারিলেন না। দৃষ্টির অগোচর, কিন্তু অন্তরিন্দ্রিয়ের গোচর, একটা অজেয় শক্তি অপরাহতভাবে তাঁহার দেহ ও মনকে আকর্ষণ করিতেছিল। যষ্টি লইয়া কালীচরণ পথে বাহির হইয়া পড়িলেন। অন্তরের পরস্পর বিরুদ্ধ প্রবৃত্তিগুলির সহিত তখনও স্পষ্টরূপে বুঝা পড়া হইয়া উঠে নাই ; তথাপি যেন মন্ত্রশক্তি বলে কালীচরণ গোপালের মামার বাড়ীর দ্বারে আসিয়া উপনীত হইলেন। প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে একটু ইতস্ততঃ করিতেছিলেন, এমন সময় ব্যাকুল উচ্ছ্বসিত ধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করিল, "দাদা বাবু !"

কোথা হইতে দৌড়িয়া আসিয়া গোপাল কালীচরণকে জড়াইয়া ধরিল। কালীচরণ গোপালকে বক্ষের উপর তুলিয়া লইয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন। তাহার পর অদর্শনক্লিষ্ট দুইটি বন্ধুর মধ্যে আগ্রহভরে কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইল।

গোপাল বলিল, "দাদাবাবু, আমার সঙ্গে তুমি এলেনা কেন ? তুমি বড় দুষ্টু !"

কালীচরণ গোপালকে বক্ষের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ ভাই, আমি দুষ্টু, তুমি খুব লক্ষ্মী !"

গোপাল কালীচরণকে সান্ত্বনা দিবার অভিপ্রায়ে বলিল, "আচ্ছা তুমিও লক্ষ্মি, বল আর চলে যাবে না!"

এমন স্নেহের যুক্তির বিরুদ্ধে আপত্তি বা ছলনা করিতে কালীচরণের কষ্ট হইতেছিল। তিনি বলিলেন, "তুমি চলনা ভাই আমার সঙ্গে ?"

ব্যস্ত হইয়া গোপাল কালীচরণের ক্রোড় হইতে নামিয়া পড়িল। উৎফুল্ল হইয়া বলিল, "আচ্ছা, কাপড় পরে আসি।" পরক্ষণেই সহসা তাহার মুখ ম্লান হইয়া গেল। মা মারবে। দাদাবাবু, তোমার কাছে যাব বলে মা আমাকে মারে।"

কালীচরণের চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল। "তবে সে কথা আর ব'লোনা ভাই !"

"দাদাবাবু, ভোলা বড় দুষ্টু ; না ?"

"বড্ড !"

"আমি বড় হলে ভোলাকে খুব মারব !"

কালীচরণের বৈবাহিক সান্ধ্য ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছিলেন। দাসদাসী, কর্ম্মচারী, আত্মীয় স্বজন যাহারা ছিল তাহাদের দ্বারা কলিকাতার ধনী বৈবাহিকের গৃহে দরিদ্র বৈবাহিকের সাধারণতঃ যেরূপ সমাদর হইয়া থাকে, তাহাই হইতেছিল—অর্থাৎ কেবলমাত্র শুষ্ক মৌখিক 'কেমন আছেন ?' 'ভাল আছেন ?' 'নমস্কার !' ছাড়া আর

পান তামাক পর্য্যন্তও আসিতেছিল না। কালীচরণের সে সকল দিকে দৃষ্টি ছিল না, তিনি গোপালকে লইয়া তন্ময় হইয়াছিলেন। বিস্তৃত সাগরের মধ্যে অবস্থান করিয়া, নদী হইতে জল অধিক আসিতেছে কি অল্প আসিতেছে, তাহা লক্ষ্য করিবার তাঁহার অবসর ছিল না।

গোপাল বলিতেছিল, "দাদাবাবু, এখানকার দাদাবাবু ভাল না, কই ঘোড়া হয় নাত ?"

কালীচরণ বলিলেন, "এখানকার দাদাবাবু গাধা কিনা, তাই ঘোড়া হয় না!"

"দাদাবাবু, একবার ইঞ্জিন হও না ?"

বৈবাহিকের গৃহে বসিয়া, অপরিচিত লোকের সম্মুখে, কি করিয়া হস্ত সঞ্চালিত করিয়া মুখে বাঁশী বাজাইবেন তাহাই কালীচরণ ভাবিতেছিলেন, এমন সময় একজন পরিচারিকা উপস্থিত হইয়া বলিল, "খোকা এস, দুধ খাবে এস।"

গোপাল তর্জ্জন করিয়া উঠিল, "যাও, আমি দুধ খাব না।"

পরিচারিকা বিরক্ত হইয়া বলিল, "কি দস্যি ছেলে গো! চল্ শিগ্‌গির, নইলে তোমার মা মার্‌বেন। ওই দোরের কাছে দাঁড়িয়ে আছেন।"

কালীচরণ স্নেহভরে বলিলেন, "যাও দাদা, দুধ খেয়ে এস, ছিঃ দুষ্টুমী কর্‌তে নেই!"

গোপাল যখন দেখিল দুধ খাওয়া ভিন্ন আর উপায়ান্তর নাই, তখন বলিল, "দুধ খেয়েই আমি আস্‌ব, তুমি যেয়োনা, দাদাবাবু" বলিয়া কালীচরণকে ফিরিয়া ফিরিয়া দেখিতে দেখিতে গোপাল পরিচারিকার সহিত চলিয়া গেল।

প্রায় অর্দ্ধঘণ্টাকাল নীরবে বসিয়া থাকার পর কালীচরণ শুনিতে পাইলেন, দ্বিতলের কক্ষে গোপাল উচ্চস্বরে কাঁদিয়া বলিতেছে, "না দাদাবাবু চলে যায় নি, আমি দাদাবাবুর কাছে যাব!"

কালীচরণ অধীর হইয়া উঠিলেন! কে বলিল তিনি চলিয়া গিয়াছেন! তিনিত গোপালের অপেক্ষায় জড়ের মত একস্থানে বসিয়া রহিয়াছেন।

পূর্ব্বোক্ত পরিচারিকা একটি রেকাবে দুইটি সন্দেশ এবং দুইটি রসগোল্লা লইয়া উপস্থিত হইল। দুই খিলি পানও রেকাবের উপর রক্ষিত ছিল। বিদায়-সম্ভাষণের মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া তাহারা যেন বলিতেছিল, "নমস্কার! তা হ'লে চর্ব্বণ কর্‌তে কর্‌তে বেরিয়ে পড়ুন।"

জলের পাত্র রেকাবের নিকট রাখিয়া দাসী বলিল, "বাবু, একটু জল খান।"

কালীচরণ ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "ঝি, গোপাল এল না?"

সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে কতকটা প্রবেশ লাভ করিয়া, ঝি মনে মনে সুকুমারীর উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। বলিল, "কি জানি বাবু, বল্‌তে পারিনে! সে নাকি এরি মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছে; দিদিমণি বললেন, সে আর আসতে পার্‌বে না। আপনি জল খান।" ঝি চলিয়া গেল।

তখনও গোপালের ক্রন্দন শুনা যাইতেছিল। কালীচরণ বজ্রাহতের মত নিশ্চলভাবে বসিয়া রহিলেন। দুঃখে ও অপমানে তাঁহার দৃষ্টিশক্তি লোপ পাইয়াছিল। কিছুক্ষণ পরে যখন চাহিয়া দেখিলেন, দেখিলেন সদ্যধৌত পাঞ্জাবী গায়ে দিয়া উচ্চ টেরি কাটিয়া স্কন্ধে শুভ্র তোয়ালে ঝুলাইয়া, হস্তে কারুকার্য্যখোদিত রৌপ্যনির্ম্মিত আলবোলার নল জড়াইয়া ভোলা গণ্ড স্ফীত করিয়া কলিকার আগুনে ফুঁ দিতেছে।

আর মুহূর্ত্ত মাত্র বিলম্ব না করিয়া যষ্টি হস্তে লইয়া কালীচরণ উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

ভোলা বলিল, "খাবার খেলে না বাবু?"

কালীচরণের হস্ত নিমেষের জন্য উত্তেজিত হইয়া উঠিল, কিন্তু তখনই নিজেকে সংযত করিয়া লইয়া কালীচরণ রাজপথে আসিয়া পড়িলেন।

ভোলা মিষ্টান্নের পাত্র লইয়া অন্তঃপুরে সুকুমারীর নিকট উপস্থিত বলিল। অস্পৃষ্ট মিষ্টান্ন দেখিয়া সুকুমারী বলিল, "খাবার নিয়ে এলি যে?"

ভোলা বলিল, "কি কর্‌ব বল মা—আমি কত সাধলুম, কিন্তু বাবু বললে তোমার বাড়ীতে জলস্পর্শ করবে না, তোমার মুখদর্শনও কর্‌বে না।"

ভোলার কথা শুনিয়া সুকুমারীর মুখ কঠিন হইয়া উঠিল। বটে! তবে আমার হাতে যতটুকু আছে আমিও করে দেখি! এত স্পর্দ্ধা! আমার গৃহে আসিয়া আমাকে অপমান!

পাত্রস্থ সন্দেশ রসগোল্লার প্রতি সকরুণ দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া ভোলা বলিল! "মা খাবার কোথ'য় রাখ্‌ব?"

ক্রুদ্ধস্বরে সুকুমারী বলিল, "ফেলে দিগে'যা?"

দ্বিতীয়বাক্য না বলিয়া ভোলা প্রস্থান করিল। মিষ্টান্ন সে কোথায় নিক্ষেপ করিয়াছিল, তাহা নির্ণয়ের জন্য অনুসন্ধানের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, অনুমানই যথেষ্ট!

৫

এবারকার অপমানের মাত্রাটা আরও গুরুতর হইয়াছিল। ফিরিবার পথে আত্মগ্লানি ও অনুশোচনায় কালীচরণের হৃদয় উদ্বেলিত হইতেছিল। কেন তাঁহার এমন মূঢ়তা হইয়াছিল যে গৃহ বাহিয়া অপমান সঞ্চয়ের জন্য গিয়াছিলেন! যেখানে ভালবাসার উপর কোনও দাবী নাই সেখানে ভালবাসিতে যাওয়া ত' দুর্ব্বলতার কথা! সে রকম ভালবাসা আপনার হৃদয়ের প্রতি গুরুতর অবিচার করা ভিন্ন ত' আর কিছুই নহে! পার্শ্ব দিয়া বৈদ্যুতিক ট্রাম ঢং ঢং শব্দ করিয়া ছুটিয়া চলিতেছিল—ঘোড়ার গাড়ির ঘর্ঘর শব্দ, পথচারী জনসাধারণের কল কোলাহল—ক্রয় বিক্রয়, হাস্য কৌতুক, উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছিল, তাহার মধ্য দিয়া কালীচরণ কলিকাতার পথের তরঙ্গহিল্লোল ঠেলিয়া গৃহাভিমুখে চলিতেছিলেন। পর্ব্বতপ্রমাণ অপমানের অন্তরালে গোপালের চিন্তা একেবারে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছিল। শুধু মনে হইতেছিল অপমানিত হইয়াছেন—উৎপীড়িত হইয়াছেন - বহিষ্কৃত হইয়াছেন। বৃষ্টিধারায় স্নিগ্ধ হইবার বাসনায় মেঘের তলায় গিয়া দাঁড়াইয়াছিলেম—কিন্তু বর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে বজ্রপাতও যে হইতে পারে, সে কথা পূর্ব্বে মনে হয় নাই!

পাঁচ ছয় দিন ধরিয়া কালীচরণের অন্তরে অগ্নি জ্বলিয়া জ্বলিয়া অবশেষে নিভিয়া গেল বটে, কিন্তু হৃদয়ে সরস জলীয় অংশটুকু প্রায় নিঃশেষিত করিয়া দিয়া গেল। যে কোমল উর্ব্বরা ভূমিতে আপনা আপনি প্রতিনিয়ত পুষ্পলতিকা অঙ্কুরিত হইয়া উঠিত, আঘাতের পর আঘাতে সে ভূমি ক্রমশঃ কঠিন হইয়া আসিয়াছে—কেবলমাত্র এখনও তাহাতে কণ্টকগুল্ম দেখা দেয় নাই—কিন্তু পুষ্পলতার সম্ভাবনা প্রায় লুপ্ত হইয়াছে।

সে দিন সমস্ত দিন ধরিয়া ঘরে বসিয়া বসিয়া কালীচরণ উত্যক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। দিনের জমাখরচের হিসাব পাচ মিনিটে শেষ হইয়া যায়। আহারের পর মধ্যাহ্নে নিদ্রার আরাধনা তপস্যার মত কঠিন হইয়া উঠিয়াছে—ভুবন ঘোষের তাসের আড্ডায় যাইতে একেবারেই ইচ্ছা হয় না—সতরঞ্চ খেলিতে বসিলে পদে পদে চাল ভুল হয়—পাঁচ আনা সেরের তাম্রকূট পুড়াইয়াও সুগন্ধ পাওয়া যাইতেছে না—এবং সর্ব্বাপেক্ষা শঙ্কটের হইয়া দাঁড়াইয়াছে আর একটা ব্যাপার! পার্শ্বের বাটির হরনাথ মিত্র তাঁহার সদ্য-সমাগত পৌত্রকে লইয়া কালীচরণের গৃহে যখন তখন বেড়াইতে আসেন এবং সেই অস্থির পৌত্রটি সর্ব্বদাই "দাদাবাবু, দাদাবাবু" করিয়া এককালে হরনাথ ও কালীচরণকে অস্থির করিয়া তুলে। কালীচরণ ক্ষণে ক্ষণে চমকিত হইয়া উঠেন—এবং যতই ভাবিতে চেষ্টা করেন যে কিছুই কষ্ট হইতেছে না, ততই হৃদয়টা ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম করে। এ যেন জব্দ করিবার জন্য ভাগ্যদেবতার কৌশল! নিজের পৌত্রকে ভুলিতে চাহেন বলিয়া পরের পৌত্র ঘাড়ে চাপিয়া বসিয়াছে। কালীচরণ নানাপ্রকারে নিজের মনকে ভুলাইয়া রাখিবার চেষ্টা করেন; কিন্তু সে যেন তৃণ দিয়া অগ্নিকণাকে চাপা দেওয়ার মত সর্ব্বদাই একটা আশঙ্কা থাকে; হঠাৎ কোন মুহূর্ত্তে দপ করিয়া জ্বলিয়া না উঠে।

হরনাথ মিত্র পৌত্রকে লইয়া বেড়াইতে আসিতেছেন দেখিয়া কালীচরণ তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িলেন—হরনাথকে বলিলেন, শরীরটা আজ ভাল বোধ হচ্ছে না, একটু বেড়িয়ে আসব মনে কচ্ছি।

পথে বাহির হইয়া কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্ ধরিয়া কালীচরণ বরাবর উত্তরমুখে চলিলেন। গৃহিণীকে সম্মত করিয়া কাশী যাইবার প্রস্তাব করিয়া অজয়-নাথকে পত্র লিখিয়াছেন কালীচরণ সেই কথা ভাবিতেছিলেন। সে কি সুখের জীবন হইবে! একটি ক্ষুদ্র গৃহ লইয়া স্বামী স্ত্রীতে বসবাস করিবেন; প্রভাতে উঠিয়া পুণ্যমন্ত্রমুখরিত গঙ্গার তীরে অবগাহন কোন দিন দশাশ্বমেধে, কোন দিন কেদারে, কোন দিন বা অসিতে। তাহার পর মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত পূজাপাঠ—দেবার্চ্চনা; অপরাহ্নে গঙ্গার তীরে বসিয়া লীলাদর্শন, সন্ধ্যার পর বিশ্বনাথের আরতি দর্শন করিয়া গৃহে ফেরা। এমনই করিয়া দিনের পর দিন অতিবাহিত করিতে করিতে সহসা একদিন মণিকর্ণিকার

অভিনয়ের দিন উপস্থিত হইবে। সে হয় ত কোন এক শরতের ঝলমলে প্রভাতে, কিংবা বরষার উদাস মধ্যাহ্নে, কিংবা শীতেরই স্তব্ধ নিশীথে কালীর গঙ্গা পলকহীন চক্ষের সম্মুখে দেখিতে দেখিতে চিত্রের মত শব্দহীন গতিহীন হইয়া আসিবে। মুহূর্ত্তের জন্য হৃদয়ের মধ্যে কি একটা অব্যক্ত পরিবর্ত্তন ঘটিয়া যাইবে, তাহার পর প্রস্থান, মহাশূন্যের স্বচ্ছতা ভেদ করিয়া অসীমের পানে অকাতর ধাবন! সে মহাযাত্রার অন্ত কোথায় কিরূপে হইবে তাহার কোন স্থিরতা নাই; শুধু অখণ্ড আনন্দের মত সহজ গতিভরে উৰ্দ্ধ হইতে উর্দ্ধের দিকে ছুটিয়া চলা।

"দাদাবাবু!"

পরিচিত প্রিয়কণ্ঠস্বর শ্রবণ করিয়া কালীচরণ চমকিয়া উঠিলেন। চাহিয়া দেখিলেন রেলিংয়ের ভিতরে রেলিং ধরিয়া গোপাল দাঁড়াইয়া। তাহার মুখে চক্ষে আনন্দ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে।

"দাদাবাবু ভেতরে এস!"

সংসার ত্যাগেচ্ছুর কণ্ঠদেশ প্রিয়জন বেষ্টিত করিয়া ধরিলে সে যেমন বিব্রত হইয়া উঠে, কালীচরণের অবস্থা কতকটা সেইরূপ হইল। মণিকর্ণিকা-কল্পনার প্রভাব তখনও মনকে যথেষ্ট উদাস করিয়া রাখিয়াছিল এবং অশরীরী আত্মা মহানীলিমার রাজ্য হইতে তখনও প্রত্যাবর্ত্তন করে নাই। কিয়ৎকাল স্তব্ধ রহিয়া কালীচরণ বলিলেন, "না, দাদা, আমি বাড়ী যাই।"

গোপাল অধীর হইয়া বলিয়া উঠিল "না দাদাবাবু, তুমি এস, শিগ্‌গির এস।" যেওনা দাদাবাবু।"

পূর্ব্বদিনকার পরিচারিকা গোপালের নিকটেই ছিল। সে বলিল, "বাবু, একবার আসুন। গোপাল আপনার জন্য বড় কেঁদিয়েছে।"

কালীচরণের অন্তরের মধ্যে ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু প্রবল, যে যুদ্ধ চলিতেছিল তাহাতে স্নেহই জয়লাভ করিল। কালীচরণ উদ্যান মধ্যে প্রবেশ করিলেন।
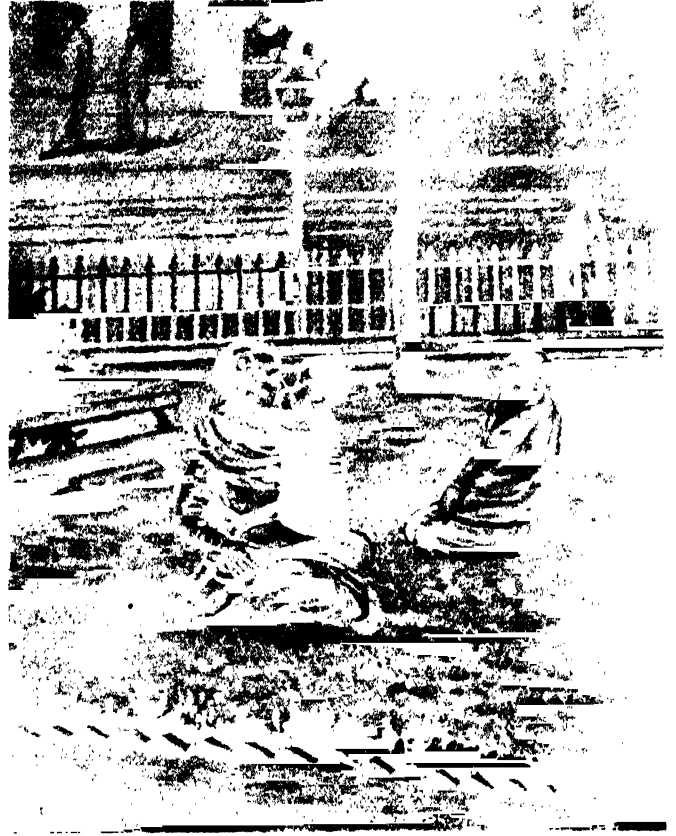
"দাদাবাবু তুমি আমাদের বাড়ী থাকনা কেন?"

(৬)

শ্যামতৃণরাজির উপর উপবেশন বলিলে গোপাল কালীচরণের গলা জড়াইয়া ধরিল। "দাদাবাবু, তুমি আমাদের বাড়ী থাক না কেন?"

কালীচরণ কহিলেন, "তুমি আমদের বাড়ী থাক না কেন ভাই?"

গোপাল ক্ষুণ্ণস্বরে বলিল, "কই, তুমি ত' আমাকে নিয়ে যাও না।"

তাহার পর নানা প্রকার তর্কবিতর্ক, প্রশ্ন, উত্তর, আলোচনা প্রভৃতির পর এই দুইটি বৃদ্ধ ও শিশুর মধ্যে এমন একটা বোঝাপড়ার মত স্থির হইল যে, উপস্থিত অবস্থায় কাহারও বাটীতে কাহারও থাকার তেমন সুবিধা যখন ঘটিয়া উঠিতেছে না, তখন অন্ততঃ এই বাগানে প্রত্যহ বৈকালে কিছুক্ষণের জন্য একত্র অতিবাহিত করিতে পারিলে মন্দ হয় না।

পরিচারিকা পার্ব্বতীর পক্ষ হইতে এ বিষয়ে যথেষ্ট সহানুভূতির পরিচয় পাওয়া গেল, এবং স্থির হইল যে, পরামর্শের কথা তাহারা তিনটি প্রাণী ভিন্ন আর কাহাকেও জানিতে দেওয়া হইবে না; সুকুমারী ও ভোলাকে ত' কিছুতেই নহে। যতই সামান্য হউক না কেন, শিশুবুদ্ধিকে একেবারে অস্বীকার করা চলে না। ভোলা ও সুকুমারী তাহার দাদাবাবুর ঠিক স্বপক্ষের লোক যে নহে, এ কথা গোপাল এই কএক দিনের মধ্যে একটা হৃদয়ঙ্গম করিয়া লইয়াছিল, এবং বাগানে কালীচরণের সহিত দেখা সাক্ষাতের কথা সুকুমারী ও ভোলার নিকট সর্ব্বতোভাবে গোপন রাখা আবশ্যক, তাহা বুঝিতেও তাহার বিলম্ব হইল না।

সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছিল। আকাশে দুই একটি করিয়া তারা ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিতেছিল—এবং তাহাদের ক্ষীণ প্রতিবিম্ব হেদুয়ার স্বচ্ছ জলের উপর পড়িয়া মৃত তরঙ্গাঘাতে কম্পিত হইতেছিল।

গোপাল বলিল, "দাদাবাবু, সব মানুষ মরে' তারা হয়?"

কালীচরণ কহিলেন, "না ভাই, মন্দলোক মরে' তারা হয় না, যারা ভাল লোক তারাই তারা হয়।"

"ভোলা মরে' তারা হবে না, না দাদা বাবু?"

মৃত্যুর পর ভোলা যে তারা হইয়া আকাশে প্রস্ফুটিত হইবে না, সে বিষয়ে কালীচরণের মতদ্বৈধ ছিল না। বলিলেন, "না।"

"তবে কি হবে?"

"ভোলা মরে' চামচিকে হবে!"

পরজীবনে ভোলার দুর্গতির কথা মনে করিয়া গোপাল অত্যন্ত পুলকিত হইল। এমন কি পার্ব্বতীরও কথাটা মন্দ লাগিল না।"

"দাদাবাবু, মা মরে' তারা হবে?"

কালীচরণ বিব্রত হইয়া উঠিলেন; বলিলেন, "ও কথা বলতে নেই দাদা। তোমার মা বেঁচে থাকবেন।"

কথাটা গোপাল অন্য আকারে জানিবার চেষ্টা করিল। "দাদাবাবু, মা মন্দলোক না ভাল লোক?"

পার্ব্বতী বস্ত্রের অন্তরালে নীরবে হাস্য করিল। কালীচরণ বলিলেন, "ভাল লোক।"

গোপাল কহিল, "তবে ত মা তারা হবে। বড় তারা হবে না, ছোট তারা হবে, না দাদাবাবু?

মৃত্যুর পর সুকুমারীর অদৃষ্টে তারা হওয়া যে সুনিশ্চিত সে বিষয়ে গোপাল একেবারে নিঃসন্দেহ ছিল না। তাহার যথেচ্ছাচারিতার উপর সর্ব্বদা যে প্রতিবন্ধকতা করে এবং তাহার দাদামহাশয়ের সহিত তাহাকে যে অবাধে মিশিতে দিতেছে না, সে আর যাহাই হউক বড় তারা হইয়া আকাশে জ্বল জ্বল করিবে না তাহা নিশ্চিত।

পার্ব্বতী কহিল, "বাবু রাত হল, আজ তা হলে গোপালকে নিয়ে বাড়ী যাই।"

কালীচরণ ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া পড়িলেন। তারপর উচ্ছ্বলতা বৃদ্ধির সহিত শুধু তারকার গল্প জমিয়া উঠে না, রাতও গভীর হইয়া আসে, সে কথা কালীচরণ এতক্ষণ ভুলিয়া ছিলেন। পরদিন পুনরায় গোপালকে হেদুয়ায় বেড়াইতে লইয়া আসিতে প্রতিশ্রুত হইয়া পার্ব্বতী গোপালকে লইয়া চলিয়া গেল। কালীচরণ গৃহে ফিরিলেন। কাশী যাইবার সঙ্কল্পে একটা মস্ত বাধা পড়িয়া গেল।

অপরাহ্ণে তিনটা বাজিবার পর হইতেই কালীচরণ ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। তখন হইতে সময় আর কাটিতে চাহিত না। পনের মিনিট হইয়া গিয়াছে ভাবিয়া পাচ মিনিট অন্তর ঘড়ী দেখিতেন, এবং প্রত্যহই ভাবিতেন সে দিন নিশ্চয় ঘড়ী স্লো চলিতেছিল; কিন্তু ঘড়ী যে ঘণ্টায় চল্লিশ মিনিট স্লো চলিতে পারে না, এবং মন যে ঘণ্টায় ষাট মিনিট ফাষ্ট চলিতে পারে, এ কথা একবারও মনে হইত না। চারিটা বাজিতেই কালীচরণ বাহির হইয়া পড়িতেন। পথে তখন যথেষ্ট রৌদ্র, কিন্তু সেদিকে তাঁহার লক্ষ্য থাকিত না, ঘাম মুছিতে মুছিতে হেদুয়ার অভিমুখে ছুটিতেন, মনে হইত তাঁহারই বিলম্ব হইয়া গিয়াছে, গোপাল আসিয়া বসিয়া আছে; কিন্তু হেদুয়ায় পৌছিয়া প্রত্যহই দেখিতেন, গোপাল তখনও আসে নাই, তিনিই পূর্ব্বে আসিয়াছেন। তাহার পর হইতে গোপালের আসা পর্য্যন্ত সময়টার—ঘড়ীর আচরণ বাস্তবিকই যন্ত্রণাদায়ক হইয়া উঠিত। শব্দ হয় অথচ কাঁটা সরে না, এরূপ ঘড়ী লইয়া কোন্ ভদ্রলোক ধৈর্য্য রক্ষা করিতে পারে! কালীচরণ

ঘন ঘন ঘড়ী দেখিতেন। পাঁচটার সময় গোপালের আসিবার কথা থাকিত। কালীচরণ অন্যমনস্ক হইবার জন্য পথের লোক গুণিতেন; তাহার মধ্যে কয় জন স্ত্রীলোক, কয়জন পুরুষ, কয়জন বৃদ্ধ, কয়জন বালক, কয়জন উত্তর দিক হইতে আসিতেছে, কয় জন উত্তর দিকে যাইতেছে, সমস্ত মনে মনে নির্ণয় করিতেন। অবশেষে বাস্তবিকই দেখা যাইত দূরে ফুটপাথের উপর পরিচারিকার হাত ধরিয়া একটি বালক-মূর্ত্তি অগ্রসর হইতেছে! কালীচরণের নয়ন উৎফুল্ল হইয়া উঠিত!

প্রায় একমাসের মধ্যে কেবল একদিন মাত্র গোপালের সহিত কালীচরণের সাক্ষাৎ হয় নাই। সেদিন অপরাহ্ন হইতে আকাশ ভাঙ্গিয়া বৃষ্টি নামিয়াছিল। দুর্য্যোগে পথে বাহির হইবার কোনও উপায় ছিল না, বাহির হইলেও গোপালের সহিত সাক্ষাৎ হইবার কোনও আশা ছিল না। কালীচরণের নিরুপায় দেহ ঘরের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া ছিল বটে, কিন্তু তাহার উদ্‌ভ্রান্ত মন বৃষ্টিধারা ভেদ করিয়া সহস্রবার হেদুয়ার পথে যাতায়াত করিতেছিল! মানুষের মন আর যাহাতেই ভিজুক না কেন, বৃষ্টির জলে ভিজে না তাহা নিঃসন্দেহ; নহিলে কালীচরণের মন সেদিন নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হইত তাহাতে সন্দেহ নাই।

৮

সবেমাত্র গোপাল বেড়াইয়া গৃহে ফিরিয়াছে। সুকুমারী তাহাকে লইয়া নিপীড়ন করিতেছিল। তর্জ্জন করিয়া সুকুমারী বলিল, "শীঘ্র বল তোকে এত লজেঞ্জুস্ কে দিয়াছে নইলে মেরে হাড় ভাঙ্গব।"

গোপাল কাঁদ কাঁদ হইয়া নীরবে দাঁড়াইয়াছিল। বিপদ্ যে কিরূপ ঘনীভূত হইয়া আসিয়াছিল তাহা বুঝিতে কিছুমাত্র বাকি ছিল না। পার্ব্বতী বিপদের সূচনা হইতেই সরিয়া পড়িয়াছিল।

"শীঘ্র বল, বল্‌ছি!"

গোপাল কথা না কহিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। তাহার শিথিল মুষ্টি হইতে একটির পর একটি লজেঞ্জেস্ খসিয়া পড়িতেছিল।

ভোলা আসিয়া উপস্থিত হইল। বলিল, "আমি জানি, মাঠাকরুণ, কে ল্যাব্যানচুস্ দিয়াছেন। তোমার শ্বশুর রোজ গোপালের সঙ্গে হেদোয় দেখা করেন। তিনিই দিয়েচেন।"

অগত্যা পার্ব্বতীকেও স্বীকার করিতে হইল। সুকুমারী ছাড়িবার পাত্রী নহে।

সুকুমারীর অন্তরে যে প্রতিহিংসাবহ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছিল—রাবণের চিতার মত তাহার অন্ত ছিল না। এই ক্ষীণকায়া সুদর্শনা রমণীটি ঠিক একটি সুনির্ম্মিত পরিচ্ছন্ন বৈদ্যুতিক যন্ত্রের মত—যতক্ষণ শান্ত ততক্ষণ মন্দ নহে, কিন্তু যখন তড়িৎ সঞ্চালন করিবার প্রয়োজন হয় তখন ভীষণ হইয়া উঠে।

হুকুম হইয়া গেল পরদিন হইতে পার্ব্বতীর স্থলে ভোলা গোপালকে বেড়াইতে লইয়া যাইবে। ভোলার উপর যে নির্দ্দেশ করা হইল তাহার কোনও প্রয়োজন ছিল না, ভোলার নিজের বিবেচনাই সে পক্ষে যথেষ্ট ছিল।

পরদিন বৈকালে কালীচরণ হেদুয়ায় বসিয়া অন্যমনস্ক হইয়া চিন্তামগ্ন ছিলেন। অলক্ষ্যে গোপাল তথায় উপস্থিত হইয়া ডাকিল, "দাদাবাবু!"

কালীচরণ চমকিয়া চাহিয়া দেখিলেন, এবং চাহিয়া দেখিয়া বোধ হয় অধিকতর চমকিয়া উঠিলেন। রজ্জু ধরিতে গিয়া রজ্জু সর্পে পরিণত হইলে যেমন হয় কতকটা সেই প্রকার।

ভোলা ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল, "ফের গোপাল কথা কচ্চ? তোমার মা না কারুর সঙ্গে কথা কইতে মানা করেছেন?"

সক্রোধে গোপাল বলিল, "চুপ কর্ চাম্‌চিকে! বেশ করব কথা কব!"

ভোলা সজোরে গোপালের হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিল। "চল তোমার মার কাছে—মেরে আজ হাড় গুঁড়ো করবেন!"

গোপালের আর্ত্তনাদে হেদুয়া সচকিত হইয়া উঠিল, এবং ভোলার হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য গোপাল প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু কোন ফল হইল না। ভোলা গোপালকে উদ্যানের বাহিরে টানিয়া লইয়া গেল।

মুহূর্ত্তের জন্য কালীচরণ স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। ক্রোধে ও অপমানে সমগ্র বিশ্ব তাঁহার পক্ষে অস্পষ্ট হইয়া

গিয়াছিল। তাহার পর সহসা উঠিয়া দাঁড়াইয়া ঝড়ের মত উদ্যান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। দিবালোকে পথের গ্যাস তখন পাণ্ডু হইয়া জ্বলিতেছিল।

৯

ভোলা যখন বিদ্রূপের ভঙ্গীতে কালীচরণের অপমানের কাহিনী বর্ণনা করিতেছিল এবং দ্বারের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া গোপাল রুদ্ধ ক্রন্দনে উচ্ছ্বসিত হইতেছিল - তখন সুকুমারীর অন্তরের নিগূঢ় প্রদেশে যে অনুভূতি প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহাকে ঠিক অমিশ্র তৃপ্তি বলা চলে না। একটি নিরীহ বৃদ্ধ এবং একটি নিরপরাধ শিশুর বিরুদ্ধে অকারণে সে যে নির্যাতন আরম্ভ করিয়াছে—তাহার নির্মমতার বেগ সহজে সহ্য করিবার পক্ষে তাহার যথোপযুক্ত শক্তি ছিল না; কিন্তু যে পাপকে সে নিজে প্রশ্রয় দিয়াছে—যাহাকে সে স্বয়ং সৃষ্ট করিয়াছে, প্রকাশ্যভাবে তাহাকে প্রতিবাদ করিতেও তাহার সঙ্কোচ বোধ হইতেছিল; শুধু মনে হইতেছিল ভোলাটা বড়ই বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিয়াছে, ধরিতে বলিলে বাঁধিয়া আনে।

তাহার পর প্রায় একমাস অতীত হইয়া গিয়াছে—ইহার মধ্যে একদিনও কালীচরণকে হেদুয়ার নিকটে দেখা যায় নাই। ভোলা বলে, কালীচরণ খুব জব্দ হইয়া গিয়াছেন! কিন্তু জব্দ বাস্তবিক কে হইতেছিল সে সংবাদ একমাত্র বিধাতাপুরুষই অবগত ছিলেন! কোথাকার জল কোথায় দাঁড়ায়, কোথাকার টান কোথায় পড়ে, কোথাকার আঘাত কোথায় ফিরিয়া আসে এ সকল তথ্য ভোলার ত ভুল হইবারই কথা, যাহারা বাস্তবিক ভোলা নহে, তাহারাও সব সময়ে বুঝিতে পারে না।

একদিন সুকুমারীর পিত্রালয়ে সংবাদ উপস্থিত হইল, অজয়নাথ শঙ্কটাপন্নরূপে পীড়িত হইয়া কলিকাতার গৃহে আসিয়াছেন। সুকুমারী গোপনে সংবাদ লইয়া জানিল কথাটা সত্যই বটে—তবে শুধু শঙ্কটাপন্ন নহে—তদপেক্ষাও গুরুতর। জীবন ও মৃত্যু পরস্পরে প্রবলভাবে টানাটানি করিতেছে! আকুল প্রতীক্ষায় সুকুমারী তিন দিন অতিবাহিত করিল, কিন্তু কেহ ডাকিল না, কেহ সংবাদ দিল না, কেহ আসিল না! শুধু মনে হয়, কে যেন কোথায় কাঁদিতেছে—শুধু মনে হয়, বিপদ যেন চতুর্দ্দিক্ হইতে ঘিরিয়া আসিতেছে। এ যেন পূর্ব্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্তের মত! অভিমান অটুট রাখিবার শক্তি লুপ্ত হইয়াছে, অথচ চক্ষুর্লজ্জাও প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। ইচ্ছা ও সঙ্কোচের মধ্যে দিবারাত্র অবিরাম দ্বন্দ্ব চলিয়াছে—ইচ্ছা যতটা টানিয়া লইয়া যায়, সঙ্কোচ ততটা পিছাইয়া আনে।

তিনদিনের দীর্ঘ অবসরে সুকুমারীর লুপ্ত নারীত্ব ধীরে ধীরে কতকটা সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল। পুত্রের প্রতি সে গুরুতর উৎপীড়ন করিয়াছে—নিরীহ শ্বশুরকে সে অকাতরে অপমানিত করিয়াছে—অবশেষে স্বামী এখন কঠিন রোগে শয্যা গ্রহণ করিয়াছে, কে জানে শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিতে পারিবে কি না! দিনের মধ্যে শতবার সুকুমারী শিহরিয়া উঠে, আর মনে হয় বিধাতার দণ্ড যেন তাহার মস্তকে পড়িতেছে,—কর্ম্মফল যেন আসন্ন হইয়া আসিয়াছে!

সমস্ত রাত্রি শয্যায় নিদ্রাহীন অবস্থায় কাটাইয়া—অতি প্রত্যুষে সুকুমারী শয্যাত্যাগ করিল। পূর্ব্বগগনের অন্ধকার তখন সবেমাত্র ধূসর হইয়া আসিয়াছে। সমস্ত গৃহ নিদ্রামগ্ন। সুকুমারী ভোলাকে জাগাইয়া শীঘ্র একখানা গাড়ি আনিবার আদেশ দিল। গাড়ি যখন আসিল, তখন সুকুমারী গোপাল ও তাহার শিশুকন্যাকে লইয়া প্রস্তুত হইয়াছে।

সুকুমারী ভোলাকে বলিল, "মাকে গিয়ে বল আমি শ্বশুরবাড়ী যাচ্ছি।"

ভোলা বলিল, "আমিও যাব ত' না?"

সুকুমারী বলিল, "না, তুই যাবিনে। মহেশ যাবে।"

১০

কালীচরণের গৃহে তখন একটি কষ্টকাতর জীবন তাহার শেষ নিঃশ্বাসগুলি ধীরে ধীরে নিঃশেষিত করিয়া লইতেছিল। বিনিদ্র গৃহে একটা নিষ্ঠুর সম্ভাবনার আশঙ্কায় ঊষার স্তিমিতালোকে উদাস, স্তব্ধ হইয়াছিল। একখানা গাড়ি আসিয়া দ্বারে লাগিল।

কালীচরণ উন্মত্তের মত দৌড়িয়া আসিয়া দ্বার খুলিলেন। "ডাক্তারবাবু, শীঘ্র আসুন!"

কিন্তু ডাক্তারবাবু ত' নহে, একটি রমণী একটি বালকের হাত ধরিয়া দীনভাবে অপেক্ষা করিতেছিল।

কালীচরণ কঠিন হইয়া পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইলেন।

"বাবা!"

"কে, বৌমা ?"

"হ্যাঁ বাবা।"

কালীচরণের চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল !

"সে হ'বে না বৌমা ! তোমাকে এই গাড়িতেই বাপের বাড়ী ফিরে যেতে হ'বে। যখন তোমার ছেলের সঙ্গে আমাকে দেখা করতে দাও নি—তখন ভুলে গিয়েছিলে যে আমারও ছেলে আছে। আমার ছেলের সঙ্গে তোমার দেখা হ'বে না, যাও গাড়ীতে গিয়ে ওঠ !"

গৃহমধ্যে সহসা ক্রন্দনের রোল উঠিল—এবং তাহার মধ্য দিয়া যে কএকটি বাক্য শ্রবণে আসিয়া পৌছিল তাহা শুনিয়া সুকুমারীর হতচেতন দেহ কালীচরণের পদতলে লুটাইয়া পড়িল !

প্রভাত-সূর্য্যের কিরণ সুকুমারীর সুবর্ণবলয়ের উপর প্রতিফলিত হইয়া ঝিক্ ঝিক্ করিয়া হাসিতে লাগিল।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

প্রাচীন বঙ্গে দাস দাসী বিক্রয়

(সঙ্কলন)

শ্রীহট্ট অঞ্চলের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন ভট্টাচার্য্য মহাশয় অনেকগুলি পুরাতন দলিল সংগ্রহ করিয়াছেন। এই সমুদয় দলিলের মধ্যে কএকখানি দলিল পাঠে জানিতে পারা যায় যে, পূর্ব্বে আমাদের দেশে নিম্ন শ্রেণীর লোকদের মধ্যে দাস-দাসী বিক্রয় প্রথা প্রচলিত ছিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের দলিলগুলির মধ্যে দুইখানি দলিলের প্রতিলিপি নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

১

(১১২৫ বঙ্গাব্দের ৬ই চৈত্র তারিখে লিখিত দলিলের প্রতিলিপি)

"৺ ইয়াদিকীর্দ্দ শ্রীশঙ্করদাস উলদে রুদ্র দাস সাকীম পরগণে বেজোড়া সদাসয়েষু—লিখিতং শ্রীবোদাইর স্ত্রী সাং বেঙ্গাডুবা পরগণে মজকুর কস্য মুনিস্য আজীরি-পাট্টা পত্রমিদং কার্য্যঞ্চ আগে :—আমি আপনা খুসরজ ও রয়বাত পুরাকত আকাম বিনা ওজর ইতবারে তুমার পাশ হনে রে আজি তিন রূপাইয়া লৈয়া আমার বেটী যার উমর এগার বরিস তুমার স্থানে আকির পাস করিয়া দিলাম। ল আজীমা খুরাক পুষাগ খাইয়া পীন্দিয়া মুর্দ্দত সতের বয়স যেদমত আবকসী ওমাহর করিব। যদি এই মুর্দ্দতের মৈদ্ধে ফারগ হইবার চাহে, তবে দশ মণ তামা আরবি দিয়া আখাগস হইব। দান বিক্রয় অধিকার দাসী তুমার, আমার কিছু এলেকা নাই ! এতদর্থে আজীরি পাট্টা লিখিয়া দিলাম। ইতি সন ১১২৫সাল তারিখ ২০ রাম্না মাহে ৬ই চৈত্র। সহি শ্রীবোদাইর স্ত্রী ও শ্রীমতী কনাই।"

মর্ম্মার্থ

বোদাই অর্থাৎ বুদ্ধিমন্ত নামক কোনও ব্যক্তির স্ত্রী আপনার একাদশ বর্ষীয়া কন্যা কনাইকে শঙ্করদাস নামক এক ব্যক্তির নিকট বিক্রয় করিয়া, এই মর্ম্মে প্রতিজ্ঞা করিতেছেন, কন্যা পত্রের লিখিত সময় হইতে সত্তর বৎসর পর্য্যন্ত শঙ্করদাসের দাসত্ব করিবে। শঙ্করকে তাহার আহার ও পরিধানের সুব্যবস্থা করিতে হইবে। যদি ইতোমধ্যে কনাই স্বাধীনতা লাভে অভিলাষিণী হয়, তাহা হইলে, তাহার নিষ্কৃতি লাভের জন্য দশ মণ আরবি তামা শঙ্করদাসকে দিতে হইবে। অতঃপর মাতার সহিত কন্যার আর কোনও সম্পর্ক থাকিবে না। ইহার দান বিক্রয় প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার স্বত্ব স্বামিত্ব শঙ্করদাসের হইবে।

২

"শ্রীশ্রীদুর্গা

"ইয়াদিকীর্দ্দ শ্রীরামনাথ দেব ওলদে শ্রীউদয় রামদেব ইরিসে মহেশদাস দের সাকীম পরগণে বেজোড়া সরকার শ্রীহট্ট সদাসয়েষু—"লিখিতং শ্রীপার্ব্বতী দাসী জনে শ্রীআসারাম সাকীম মঙ্গলপুর আমলে পরগণে কাছিমনগর সরকার মজকুর কস্য মুনস্য আজিরী পাট্টা পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে আমী অন্নকষ্টে মহাপীড়া পাই পররিস করিতে না পারি এতরব আপনা খুস বজায় তুমার পাশ হতে রেওয়াজি মবলগ ত তিন রূপাইআ পুর ওজনসহ দাসী নগদ লইয়া আমার কন্যা শ্রীমণিদাসী উমর ছয় বৎসর আপনার স্থানে আজীর পাস করিয়া দিলাম লয়াজীমা খুরাক খাইয়া ও পুষাক পৈরিয়া আবকসী ওসানেকুটী গয়রহ খেদমত করিব। ইহা ও ইহার গর্ভে সন্তানাদি

যাহা হয় দান বিক্রয় অধিকার মুনস্য তুমি ও তুমার পুত্র পৌত্রাদি ক্রেমে হইল। আমার কিছু এলেকা নাহি। এতদর্থে মুনস্য আজীরি পাট্টা লিখিয়া দিলাম। ইতি সন ১১*৭ সাল মাহে * * শ্রাবণ।"

অলঙ্কারে অনুমতি

ভট্টাচার্য্য মহাশয় কর্ত্তৃক সংগৃহীত একখানি দলিলে লিখিত আছে যে, পূর্ব্বকালে বঙ্গদেশে নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকের অর্থ সংস্থান থাকিলেও ইচ্ছামত অলঙ্কার পরিতে পারিত না। বিশেষ বিশেষ অলঙ্কার পরিবার জন্য রাজার অনুমতি লইতে হইত। আমরা নিম্নে দলিল খানির অবিকল প্রতিলিপি দিলাম :

"শ্রীগৌররাম * রৈ সাকীম নিজেবজোড়া পরগণে মজকুর সরকার শ্রীহট্ট হুকুম জানিবে তুমি এবং তোমার পরবেশীগণ জনানা নত পেরাইবার কারণ আরজ করিয়াছ। এতয়ব হুকুম হইল যে তোমরা পুত্র পৌত্রাদি ক্রোমে নত পেরাং সেলামী শ্রীযুত রামবল্লভ ভট্টাচার্যাকে রেয়াত করা গেল। ইতি মোতাবেক সন ১১৫৬ সাল তারিখ ২২শে আশার,"

মর্ম্মার্থ

সরকার শ্রীহট্টের অধীনে নিজাবজুড়া নিবাসী রৈ (অর্থাৎ পান ব্যবসায়ী, বারৈ) গণ আপনাপন স্ত্রীকন্যাকে নত পরাইবার জন্য রাজসরকারে আবেদন করিয়াছিল। তাহাকে তাহাদিগকে উল্লিখিত অনুমতি পত্রখানি প্রদত্ত হইয়াছিল। ১১৫৬ সাল ১৭৪৮।৪৯ খৃষ্টাব্দ। পলাশীর যুদ্ধ ইহার আট নয় বৎসর পরে সঙ্ঘটিত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ, এই সময়ে আলিবর্দ্দি খাঁ বাঙ্গালার মসনদে আসীন ছিলেন।

[লর্ড লেটন্ কর্ত্তৃক অঙ্কিত চিত্র হইতে]

নিদাঘ-শশী

রাঢ়ে বৌদ্ধ মঠ।

ভোটবাগান।

(সঙ্কলন)

উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গে বৌদ্ধকীর্ত্তির শত শত নিদর্শন আছে সত্য, কিন্তু রাঢ় প্রদেশেও যে বৌদ্ধদিগের কোনরূপ কীর্ত্তি-চিহ্ন বর্ত্তমান নাই, তাহা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারা যায় না। অদ্য আমরা এই কলিকাতা মহানগরীর উপকণ্ঠে পতিত-পাবনী ভাগীরথীর পশ্চিমকূলে হাওড়া জেলার শালিখা গ্রামের উত্তরে ঘুষুড়িতে যে বৌদ্ধকীর্ত্তি বিরাজিত থাকিয়া বঙ্গ-তিব্বতের মিলনক্ষেত্ররূপে দণ্ডায়মান রহিয়াছে তাহারই সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

এই স্থানের নাম "ভোট-বাগান।" "ভোট-বাগান" অর্থে তিব্বতীয় বাগান বুঝায়। কাহারও কাহারও মতে ভুটিয়াদিগের বাগান হইতে ইহার নামকরণ হইয়াছে। তিব্বতের অন্যতম ধর্ম্মযাজক তাসি লামার অনুরোধে ওয়ারেণ হেষ্টিংশ সাহেব বঙ্গ ও তিব্বতের মধ্যে বাণিজ্য-বন্ধন সুদৃঢ় করিবার, ব্যবসায়ী-দিগের থাকিবার ও তাহাদের উপাসনাদি করিবার জন্য কোম্পানি বাহাদুরের খরচায় এই মঠ নির্ম্মাণ করাইয়া দেন।

১৭৭২ খৃষ্টাব্দে ভুটানবাসীরা কুচবিহার রাজ্য আক্রমণ করিয়া কুচবিহাররাজ দ্বিজেন্দ্র-নারায়ণ ও তাঁহার ভ্রাতা দেবন দেওকে ধৃত করিয়া বন্দী করিয়া লইয়া যান। মিত্ররাজের অবমাননার প্রতিশোধ লইবার জন্য কোম্পানি বাহাদুর ভোটান অভিযান প্রেরণ করেন। স্বল্পসংখ্যক ইংরেজবাহিনী ভুটানদিগকে সমরে পরাস্ত করেন। তখন তাহারা অনন্যোপায় হইয়া তিব্বতের প্রধান ধর্ম্মযাজক নাবালক দালাই লামার অভিভাবক তাসি লামার শরণাপন্ন হ'ন। তিনিও ইংরেজ ও ভুটানবাসি-দিগের মধ্যস্থ হইতে স্বীকার করিয়া তৎকালীন বড়লাট হেষ্টিংশ সাহেবের নিকট তাঁহার প্রীতি-ভাজন ও প্রিয় শিষ্য বিশ্বস্ত পূর্ণগিরি গোস্বামী নামক জনৈক হিন্দু সন্ন্যাসীকে প্রতিনিধিরূপে কলিকাতা দরবারে পাঠান। তাসি লামা আসিবার সময় পূর্ণগিরিকে বহুমূল্যের স্বর্ণ, রৌপ্য, স্বর্ণধূলি ও মৃগনাভি প্রদান করেন। দূরদর্শী বড়লাট সাহেব দেখিলেন, এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। তিব্বতে সাধু সন্ন্যাসী ও তিব্বতীয়গণের অনুগৃহীত ব্যক্তি ব্যতীত আর কাহারও প্রবেশাধিকার নাই। এই উপলক্ষে তিব্বত ও ভারতের মধ্যে বাণিজ্যবন্ধন স্থাপিত হইলে ইংরেজদিগের লাভের সম্ভাবনা দেখিয়া তিনি জর্জ্জ বগ্‌ল্ ও ডাঃ হ্যামিল্টন নামক দুই জন ইংরেজকে পূর্ণগিরির সহিত তিব্বতে তাসি লামার দরবারে প্রেরণ করেন। ১৭৭৪ খৃঃ অব্দে তাঁহারা তিব্বতে

ভোটবাগান—দ্বিতল
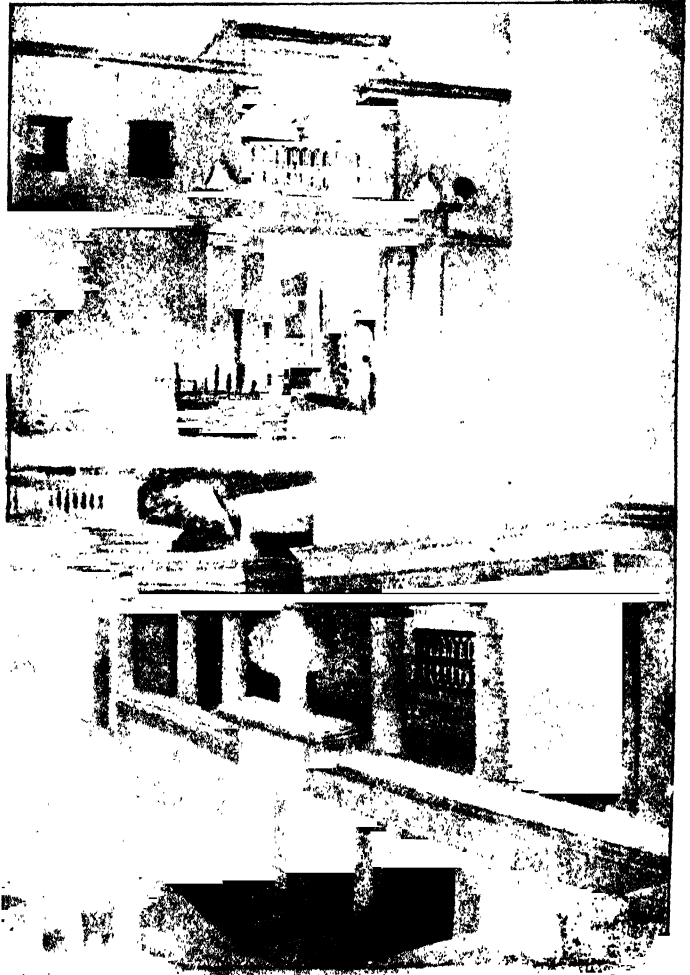
ভোটবাগান—নিম্নতল

উপস্থিত হন এবং তাসিলাম্পো সহরে উভয় পক্ষের প্রথম সাক্ষাৎ হয়। তাসি লামার সাদর আপ্যায়নে বগ্‌ল্ সাহেব বড়ই প্রীত হইয়াছিলেন। তিনি সাহেবকে বলেন,—"বঙ্গদেশে এখন আর বৌদ্ধদিগের পূজারাধনার কোনরূপ ধর্ম্মমন্দির নাই, বঙ্গদেশ হইতে সুধীবর্গ ও শ্রমণেরা আসিয়া এককালে আমাদিগকে বৌদ্ধধর্ম্মের অমৃতময়ী বাণী শুনাইয়া আমাদের প্রাণে ধর্ম্মোন্মেষ করাইয়া দিয়াছেন ; আর এক্ষণে আমরা বঙ্গসন্তানদের সেই উপকারের প্রত্যুপকার করিতে চাই—শুনাইতে চাই তাঁহাদের অমিতাভের সুনির্ম্মল উপদেশ। বিশেষতঃ যখন বৌদ্ধেরা ভারতের রাজধানী কলিকাতায় গমন করেন, তখন তাঁহাদের ধর্ম্মোপাসনার বড়ই ব্যাঘাত হয়। অতএব আমার প্রার্থনা ভাগীরথী হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম্মসম্প্রদায়ের পূজিতা—তাহার তীরে কলিকাতার সন্নিকটে বৌদ্ধ মঠ স্থাপন করিবার প্রস্তাব বড়লাট যদ্যপি গ্রাহ্য করেন, তাহা হইলে আমি স্বয়ং সমুদায় ব্যয়ভার বহন করিতে সম্মত আছি।"

বগ্‌ল্ সাহেব তাসি লামার অভিপ্রায় গবর্ণর জেনারেল ওয়ারেণ হেষ্টিংশকে জ্ঞাপন করেন। হেষ্টিংশ সাহেব তাহাতে স্বীকৃত হইয়া কোম্পানীবাহাদুরের ব্যয়ে ভোট-বাগনের জমি খরিদ করেন। মাননীয় গৌরদাস বসাক মহাশয় সংগৃহীত ১৮৯০ সালের এসিয়াটিক সোসাইটীর জর্ণালে প্রকাশিত প্রবন্ধ হইতে জমি ক্রয় সম্বন্ধে যে ৪ খানি সনন্দের প্রতিলিপি পাওয়া যায়, তাহার ১ খানিতে লিখিত আছে, ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দের ১২ই জুন, বঙ্গাব্দ ১১৮৫ সালের ১লা আষাঢ় ও সম্রাটের রাজত্বের বিংশ বর্ষের ১৬ জুমাদা-লা অওয়ালে ১০০ শত বিঘা ৮ বিশ্বা (কাঠা) নিষ্কর জমি যাহার একাংশ বোরো পরগণার বারবাক্‌পুর মৌজায় (আধুনিক বালি বারাকপুর) অবস্থিত ও অপরাংশ পাইকান পরগণার ঘুষুড়ি মৌজায় অবস্থিত পণ্ডিতাগ্রগণ্য সকল সত্যান্বেষীর বরেণ্য মহাত্মা পূরণগির মহারাজকে তাঁহার ধর্ম্ম ও নিষ্ঠার জন্য প্রদত্ত হইল। তিনি এই সস্থানে মঠ নির্ম্মাণ ও বাগান করিতে পারিবেন। দ্বিতীয় সনন্দ হইতে আরও ৫০ বিঘা নিষ্কর জমিদানের কথা জানিতে পারা যায়। এই জমি উপরোক্ত বারবাক্‌পুরস্থ জমিসংলগ্ন মহারাজা বাহাদুর নবকৃষ্ণ ও রাজা বাহাদুর চাঁদরায় ও রামলোচন রায়ের সত্ত্বাধিকৃত জমি। চাঁদ রায় ও রামলোচন রায়ের পিতা রামচরণ রায় গভর্ণর জেনারেল ভ্যানসিটার্ট সাহেবের দেওয়ান ছিলেন। ইঁহাদের বংশধরেরা পাথুরিয়াঘাটা হইতে হুগলী জেলার আঁচল গ্রামে যাইয়া আঁচুলরাজ নামে পরিচিত হন। এই দ্বিতীয় সনন্দের তারিখ ১১ই ফেব্রুয়ারী ১৭৮১ বঙ্গাব্দ ১১৮৯, ২রা ফাল্গুন। গবর্ণর জেনারেল ইঁহাদের নিকট হইতে জমী ক্রয় করিয়া পূর্ণগিরিকে দান করেন। আর যে দুইখানি সনন্দ পাওয়া যায় তাহা প্রথম ও দ্বিতীয় সনন্দের প্রতিলিপি। তবে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এই, এই দুইখানি সনন্দে পূর্ণগিরির নামের স্থানে তাসি লামা পন্‌চান অরদানি বগ্‌দেও পন্‌চান্ লিখিত আছে ; অর্থাৎ পণ্ডিত তাসি লামা পণ্ডিতদের মধ্যে রত্নস্বরূপ ও তিনি বাগ্‌দেবতা। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে পূর্ণগিরি গোস্বামী এবং বগ্‌ল্ সাহেব দ্বিতীয়বার তিব্বত যাত্রা করেন। এই সময়ে তাসি লামা তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া চীন-সম্রাটের দরবারে উপস্থিত হন। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে দুরারোগ্য বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইয়া তাসি লামা দেহত্যাগ করেন। তৎপরে ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে স্যামুয়েল টার্ণারের সহিত পূরণ গিরি তৃতীয়বার নূতন তাসিলামার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বাণিজ্যবন্ধন দৃঢ়তর করিবার জন্য তিব্বতে গমন করেন এবং ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে চতুর্থবার তিনি একাকী তিব্বতে গমন করেন। ইতোমধ্যে হেষ্টিংশ সাহেব মঠ নির্ম্মাণ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া জমিদানের সনন্দসহ একখানি পত্র তাসি লামাকে পাঠান। তিনি তাঁহার প্রেমাস্পদ পূরণ গিরি গোস্বামীকে ধনরত্ন, বহুতর দেবমূর্ত্তি ও শাস্ত্রীয় গ্রন্থাদি সহ ভোটবাগানে প্রেরণ করেন। তিনি ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া প্রধান মহান্তরূপে এইস্থানে বাস করিতে থাকেন। তাঁহার বিমল নৈতিক চরিত্রপ্রভাবে তিনি সকলকেই আপনার করিতে পারিতেন, সকলের নিকট হইতে ভক্তি শ্রদ্ধা প্রাপ্ত হইতেন ; তদনীন্তন উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীরা তাঁহার গুণগ্রাহী ছিলেন ও তাঁহাকে বিশেষ সম্মান ও শ্রদ্ধা করিতেন। গভর্ণর জেনারেল হেষ্টিংশ সাহেবের ন্যায় ম্যাক্‌ফারসন ও কর্ণওয়ালিশ অবকাশকালে ভোটবাগানে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। প্রায় দশ বৎসরকাল পূরণগিরি এই মঠে ধর্ম্মালোচনা করিয়া শান্তিতে বসবাস করেন। এই মঠে

প্রচুর ধনরত্ন রক্ষিত আছে জানিতে পারিয়া ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে ৩রা মে রাত্রিযোগে একদল ডাকাইত ভোটবাগানের মঠ আক্রমণ করে। পূরণগিরি তাহাদিগকে যথাসাধ্য বাধা দিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাদিগের সহিত সংঘর্ষে দুর্বৃত্তদিগের বর্ষাঘাতে সাংঘাতিকরূপে আহত হন। এই দুঃসংবাদ গভর্ণর জেনারেলের নিকট প্রেরিত হইবামাত্র তিনি একজন বিচক্ষণ সার্জ্জনকে চিকিৎসার জন্য পাঠাইয়া দেন; কিন্তু ডাক্তার সাহেব পৌছিবার পূর্ব্বেই তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হয়। ডাকাইতদিগের মধ্যে ৪জন ধৃত হইয়াছিল। তাহাদিগকে মন্দিরের ভিতর ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলান হইয়াছিল। পূরণ গিরির দেহাবসানে, দলজিৎ গিরি গোস্বামী মহান্তপদে প্রতিষ্ঠিত হন। দলজিৎ গিরি তাঁহার গুরুর দেহ মঠের পশ্চাতে ভূমধ্যে প্রোথিত করিয়া তাঁহার সমাধিস্তম্ভের উপর বঙ্গাক্ষরে সংবৎ ১৮৫২,শকাব্দা ১৭১৭ ও বঙ্গাব্দ ১২০২, ২৩শে বৈশাখ রবিবার পূর্ণিমার দ্বাদশ দণ্ডের মধ্যে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন এবং হিন্দু মুসলমান সকলকেই ইঁহার পূজা করিতে আদেশ করেন এবং যে হিন্দু ইঁহার পূজা না করিবেন, তিনি ব্রাহ্মণহত্যার পাতক হইবেন এবং যে মুসলমান ঐ পূজারাধনা না করিবেন, তিনি দোজকে (নরকে) পতিত হইবেন।

যখন পূরণগিরি তিব্বতে গমন করেন, তখন তিনি তাঁহার শিষ্য দলজিৎ গিরিকে আপনার প্রতিভূ রাখিয়া যান। জমিদার রাজা চাঁদরায় তাঁহার অনুপস্থিতিতে গোঁসাইএর মৃত্যু হইয়াছে ভাবিয়া তাহাদের বিক্রীত ৫০ বিঘা জমি বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লন। পূরণগিরি প্রত্যাগমন করিয়া কাপ্তেন টার্ণারের মধ্যস্থতায় ঐ ৫০ বিঘা জমী পুনরায় প্রাপ্ত হন।

দলজিৎগিরি ৪৩ বৎসর মহান্তপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া ১২৪৩ সালে ৬ই মাঘ মৃত্যুমুখে পতিত হন। তৎপরে তাঁহার শিষ্য কালীগির মহান্তপদ প্রাপ্ত হন। মঠের নিকটে তিনি ১২৫৯ বঙ্গাব্দে একটি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। ২রা বৈশাখ ১২৬০ সালে তিনি মারা যান। তৎপরে তাঁহার শিষ্য বিলাসগির ১২৬৫ সালে এক শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া মহান্তপদ প্রাপ্ত হন; কিন্তু ওমরাহগিরও ঐ পদপ্রার্থী হইয়া আদালতের সাহায্যে উভয়েই মহান্তপদ প্রাপ্ত হন। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে বৃদ্ধ ওমরাহগিরির লোকান্তর হইলে বাঙ্গলার দশনামী শৈব সম্প্রদায়ের শীর্ষস্থানীয় তারকেশ্বরের মহান্ত সতীশচন্দ্র গির মহারাজ, অন্যান্য মহান্তদিগের সহায়তায় ত্রৈলোক্যচন্দ্র গিরকে ভোট বাগানের মহান্তপদে প্রতিষ্ঠিত করেন।

পূরণগিরি বা পূর্ণগিরি বা গোঁসাই পূর্ণানন্দ কোন্ জাতীয় ছিলেন তাহা ঠিক্ করিয়া নিরূপণ করা যায় না। কএক বৎসর পূর্ব্বে সুবিখ্যাত 'বঙ্গবাসী' পত্রিকায় জনৈক লেখক লিখিয়াছিলেন,—"ভারতের প্রথম গবর্ণর জেনারেল ওয়ারেণ হেষ্টিংশ তিব্বতের সহিত ভারতের বাণিজ্য-সম্বন্ধ স্থাপনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সে অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্য পূর্ণগিরি গোস্বামী নামক জনৈক বাঙ্গালীর সহিত জর্জ্জ বগ্‌ল্ এবং ডাক্তার হ্যামিল্টন নামক দুইজন ইংরেজ তিব্বতে তাসি লামার দরবারে প্রেরিত হন।" অবশ্য তিনি কোথা হইতে পূর্ণগিরি যে বাঙ্গালী ছিলেন বলিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন তাহা উল্লেখ করেন নাই; আমরা কিন্তু টার্ণার বা মারকাম সাহেবের বিবরণী হইতে অথবা গৌরদাসবাবুর প্রবন্ধ হইতে তাঁহার বাঙ্গালীত্বের পরিচয় পাই নাই। সুপণ্ডিত গৌরদাস বাবু বহু অনুসন্ধান করিয়াও পূরণগিরির জীবন-বৃত্তান্তের প্রথম অবস্থার কথা কিছুই লিপিবদ্ধ করিতে পারেন নাই। তিনি ভারতীয় ব্রাহ্মণকুলে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জন্মগ্রহণ করেন। বগ্‌ল্ সাহেব প্রথম যখন তাঁহাকে দেখেন,তখন তিনি যুবাপুরুষ ছিলেন। দণ্ডী হইবার পূর্ব্বে তিনি উপবীত ত্যাগ করেন। অতি অল্পবয়সেই ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের দশনামী সম্প্রদায়ের অন্তর্গত গিরি শাখাভুক্ত হইয়া বদরিকাশ্রমস্থ যোশী মঠে দীক্ষিত হন। অল্পদিনের মধ্যে কুশাগ্রবুদ্ধি পূরণগির বেদান্তাদি শাস্ত্রবিৎ হইয়া পরিব্রজ্যা গ্রহণ করেন। ভারতের বহু তীর্থ ভ্রমণ করিয়া দুরারোহ চিরতুষার সমন্বিত হিমালয়ের গিরিসঙ্কট অতিক্রম করিয়া তিব্বতে উপনীত হন ও তথা হইতে মধ্য এসিয়ার প্রধান প্রধান নগর ও জনপদ সকল পরিদর্শন করিয়া তৎ-তৎ প্রদেশের ভাষা, আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি, ধর্ম্মমত ও বাণিজ্য বিষয়ক জ্ঞানলাভ করেন। তিনি তিব্বতের তাসি লামার এতদূর বিশ্বাসভাজন হইয়াছিলেন যে, সকল কর্ম্মেই তিনি তাঁহাকে পরামর্শ দিতেন।

একসময়ে পূরণগির তাসি লামার রাজধানী তাসিলাম্পো

হইতে ৮০০ মাইল দূরবর্ত্তী শতলজ নদীর উদ্ভবস্থান পুণ্যতোয় মানস সরোবর নামক হ্রদে অবগাহন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, তাসিলামা তাঁহাকে যে নিরাপদ ভ্রমণের অনুমতি পত্রিকা (passport) দেন, তাহার প্রতিলিপি গৌরদাস বাবু এসিয়াটিক সোসাইটীর জর্ণলে প্রকাশিত করেন। আমরা তাহার অবিকল আলোকচিত্র প্রকাশিত করিলাম ও নিয়ে রায় বাহাদুর শরৎচন্দ্র দাস মহাশয়ের প্রদত্ত ইংরেজি অনুবাদের বঙ্গানুবাদ করিয়া দিলাম :—

"নরথন, গয়াস্থান, নোদসন, ফুংজংলিন, লোরটসী ও নাসীরণ প্রদেশ সমূহ এবং নিরিণ প্রদেশের লামার প্রতি আদেশ।

"জ্ঞাত হও যে, আমাদের রাজ্যের জনৈক কর্ম্মচারী পূরণগির তিনজন অনুচর সহ মাকান (মানস সরোবর) হ্রদে স্নান, পূজা ও প্রদক্ষিণ করিবার জন্য যাইতেছেন। যাত্রিগণ যাহাতে উপরি উক্ত স্থান সকলে আবশ্যকমত ইন্ধন, মৃৎপাত্র প্রভৃতি রন্ধনোপযোগী সামগ্রী, ঘোটক, পাচক ও প্রয়োজনীয় অপরাপর দ্রব্য যাহাতে প্রাতে ও রাত্রিকালে প্রাপ্ত হন, তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিবে।

"চারিটি ঘোটক ও ৭টি ভারবাহী পশুর আবশ্যক। এই স্থান হইতে ফুংজংলিন, তথা হইতে লারটসি, তথা হইতে নার্মরিণ, তথা হইতে সাজোওয়ায় ঘোটক পরিবর্ত্তনের বন্দোবস্ত করিতে হইবে। এই অনুমতি-পত্রের, পূর্ব্ব পত্রের নির্দ্দেশমত ঐ সকল প্রদেশে ও বিভাগের পশুচারণ ভূমির অধিকারী প্রধান অশ্বরক্ষকগণ পূর্ব্বোক্ত সংখ্যক বলিষ্ঠ ঘোটকের ডাক প্রস্তুত রাখে ও ব্যবহৃত ঘোটকগুলি যাহাতে শীঘ্র শীঘ্র ফেরৎ পাঠান হয় তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখে ও যথাসম্ভব যাত্রিগণের সাহায্য করে। অবিলম্বে ভারবাহী পশু ও পূর্ব্বোক্তমত ডাকের বন্দোবস্ত করিতে হইবে; এবং এই সকল পশু ফেরত পাঠাইবার জন্য যাত্রীরা যেন সর্ব্বদাই লোক পান। তাঁহাদের প্রত্যাবর্ত্তন সময়েও যেন পূর্ব্বোক্তরূপ বন্দোবস্ত করা হয়। ইহা বড় প্রয়োজনীয় পত্র।" এই পত্র ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে লিখিত হইয়াছিল।

পূরণগিরির মৃত্যুতে গৌরদাসবাবু যে উচ্ছ্বাসময়ী ভাষায় হৃদয়ের ভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন তাহা উদ্ধৃত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না :—"Thus ended the life of the great Purangir Gosain, the Bhotbagan mohant, the linguist, the traveller, the religionist, and merchant, the first and the only ambassador of the Tashi Lama sent to Bengal, the guide and material helper of the British mission to Tibet, the companion of Lama in his journey to China, where in the court of Peking he stood before the Emperor * * * and lastly to man who exhibited such strong and repeated instances of his ability,
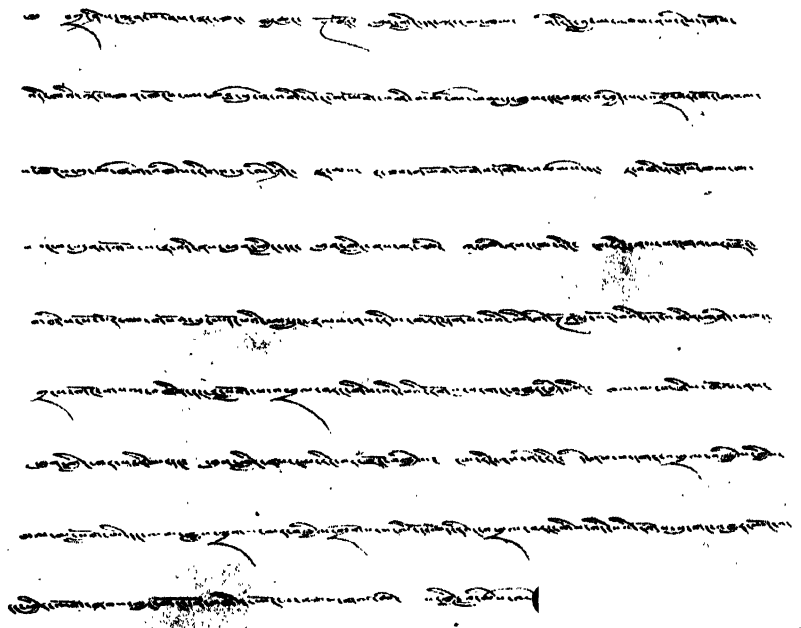
তাসিলামার অনুমতিপত্রিকা

intelligence, intrepidity and faithfulness as to be appointed, by that keen-sighted statesman Warren Hastings the sole envoy accredited to the Court of Tashi Lampo in 1785.” অর্থাৎ ভাষাবিৎ, পরিব্রাজক, ধর্ম্মপ্রচারক ও ব্যবসাদার বাঙ্গালায় তাসিলামার প্রথম ও একমাত্র প্রেরিত দূত, তিব্বতে ইংরেজ অভিযানের পথপ্রদর্শক ও প্রকৃষ্ট সহায়ক, চীন ভ্রমণে লামার সহযাত্রী ও যিনি লামার সহিত চীনসম্রাটের সম্মুখীন হইয়াছিলেন এবং পরিশেষে কর্ম্মকুশলতার, বুদ্ধিমত্তার, সৎসাহসের ও বিশ্বস্ততার ভূরি ভূরি নিদর্শন দেখাইয়া দূরদর্শী রাজনীতিবিৎ হেষ্টিংসের নিকট ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে তাসিলাম্পো সহরে তাহার একমাত্র বিশ্বাসী রাজপ্রতিনিধিরূপে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, সেই ভোটবাগানের মহান্ত পূরণগিরি গোস্বামীর শোচনীয় পরিণামে ব্যথিত হইবে না কে?

ভোটবাগানের মঠের আকৃতিতে একটু বিশেষত্ব ও অভিনবত্ব আছে। ইহার গঠন-প্রণালী তিব্বতীয় রীত্যনুসারী। তবে সংস্কারের সময় সে রীতির ব্যতিক্রম হইয়া তিব্বতীয় ও বঙ্গীয় রীতির মিলন হইয়া গিয়াছে। মঠটি দ্বিতল অট্টালিকা, কিন্তু অট্টালিকার অবস্থা ভাল নয়। পূর্ব্বে এখানে বসিয়া বৌদ্ধেরা উপাসনা করিতেন। ইহার চারিদিকে প্রাচীরবেষ্টিত ছিল। প্রাচীরের মধ্যভাগে পশ্চিমমুখে উহার একটি সিংহদ্বার ছিল। মন্দিরসংলগ্ন একটি পুষ্পলতাকুঞ্জ-শোভিত রমণীয় উদ্যান ইহার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিত। উদ্যানের কিয়দংশ এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। অবশিষ্ট অংশে মৌরশী মোকরারি প্রজাবিলি আছে। কিয়দংশের উপর ঘুসুড়ি কটনমিল স্থাপিত হইয়াছে।

মঠের ভিতর হিন্দু ও তিব্বতীয় বৌদ্ধদিগের দেবদেবীর অনেকগুলি মূর্ত্তি আছে। হিন্দুদেবতার মধ্যে বিষ্ণু, দুর্গা, বিন্ধ্যবাসিনী, গণেশ, গোপাল, শালগ্রাম ও শিবলিঙ্গ আছেন, মহাদেবের বাহন বৃষও এখানে আছে। বৌদ্ধমূর্ত্তিগুলির মধ্যে তারা, মহাকালভৈরব সম্ভারচক্র, সমাজগুহ্য, বজ্র-ভ্রূকুটি ও পদ্মপাণি প্রধান। এখানে কপিল মুনির পদচিহ্ন ও পূরণগিরির কাষ্ঠপাদুকা বিদ্যমান আছে, নেপালী বৌদ্ধেরা তারাদেবীকে প্রজ্ঞাপারমিতা নামে অভিহিতা করিয়া থাকেন, এবং ইনিই পূর্ব্ব পূর্ব্ব তথাগতদিগের মাতা। উত্তর বৌদ্ধতান্ত্রিকদিগের মতে ইনি শক্তির অবতার। চীন দেশ হইতে আনীত এই মূর্ত্তিটি তাম্রনির্ম্মিত ও চীনদেশের সুবর্ণদ্বারা রঞ্জিত। মহাকাল ভৈরব শক্তিকে আলিঙ্গন করিয়া আছেন, ইঁহার ৯টি মস্তকের মধ্যে একটি অপর আটটির উপরে আছে। ইঁহার ৩৬ হাত ও ১৮টি পা।—গলায় নর-মুণ্ডমালা। ইনিই তিব্বতীয় লামাদিগের, বিশেষতঃ তাসি লামাদিগের রক্ষক। সম্ভারচক্র তিব্বতীয় তান্ত্রিকদিগের প্রধান দেবতা। ইনি শক্তি-সহ বিমর্দ্দিত মানবশত্রু মারের উপর প্রতিষ্ঠিত। ৯ ইঞ্চি উচ্চ এই মূর্ত্তি তাম্র-নির্ম্মিত ও হরিদ্বর্ণে রঞ্জিত। সমাজ-গুহ্য অন্যতম তান্ত্রিক দেবতা। ইনি ও ইঁহার শক্তি উভয়ের তিনটি করিয়া মাথা ও ৬ খানি করিয়া হাত। বজ্র-ভ্রূকুটি তারাদেবীর নেপালি মূর্ত্তি। মূর্ত্তিটি দেখিতে সুন্দর।

কালবশে বৌদ্ধদিগের এই সকল দেবদেবী হিন্দুর দেবদেবী-রূপে পূজিত হইয়া হিন্দুধর্ম্মের উদারতার সাক্ষ্য দিতেছে। কবে যে ইহার প্রথম সূত্রপাত হয়, তাহা নিঃসন্দেহে বলিবার উপায় নাই। গয়ার মহাবোধি বিহারের ন্যায়, ভোট বাগান এক্ষণে হিন্দুর দেবত্র সম্পত্তি।

যে বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া, যে মহদুদ্দেশ্য হৃদয়ে পোষণ করিয়া, বঙ্গ-তিব্বতের বাণিজ্যভিত্তি সুদৃঢ় করিবার জন্য দূরদর্শী ওয়ারেণ হেষ্টিংস্ তাঁহার সাধের ভোট বাগান নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন—তিব্বতীয়দিগের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি শিক্ষা করিবার জন্য অবকাশ-কালে ভোট বাগানের রমণীয় উদ্যানে বসিয়া তিব্বতীয় বণিকগণের সহিত কত-বিশ্রম্ভালাপ করিয়াছেন, কুসুমসুরভিত উদ্যানে বসিয়া গঙ্গার শীতল সমীর সেবন করিতে করিতে গোসাইজীর মুখ-নিঃসৃত তিব্বতীয় কাহিনী তিনি শুনিতেন, আর ভবিষ্যতে তিব্বতে বাণিজ্য-বিস্তারের সহায়তা করিবার উপায় উদ্ভাবন করিতেন—সেই স্থানের স্মৃতিরক্ষা করা সকলেরই কর্ত্তব্য। যে পুণ্যক্ষেত্রে, শাস্ত্রদর্শী হিন্দুবৌদ্ধ উভয় সম্প্রদায়ের সম্মানার্হ ইংরেজদিগের তিব্বত বাণিজ্য-সংস্থাপন-সহায়ক, পূরণগিরি গোস্বামী শায়িত রহিয়াছেন, সেই স্থানের প্রতি সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষিত হউক ও এতৎ সম্বন্ধে পুরাতত্ত্বের আলোচনা হউক, ইহাই আমাদের বাসনা।

শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র।

কলিকাতা নামের উৎপত্তি।

কলিকাতা মহানগরীর ইতিহাস আলোচনা করিতে হইলে "কলিকাতা" এই নামটি কিরূপে এবং কোথা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সে বিষয়ে আমাদিগের অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। খ্রীষ্টের ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে লিখিত কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীর চণ্ডীগ্রন্থে কালীঘাট ও তাহার নিকটবর্ত্তী চতুঃপার্শ্বস্থ তদানীন্তন গ্রাম সমূহের ধারাবাহিক নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়ঃ—"

"ত্বরায় বাহিছে তরী তিলেক না রয়।
চিৎপুর সালিখা সে এড়াইয়া যায়॥
কলিকাতা এড়াইল বেণিয়ার বালা।
বেতড়েতে উত্তরিল অবসান বেলা॥
ডাহিনে এড়াইয়া যায় হিজলীর পথ।
রাজহংস কিনিয়া লইল পারাবত॥
বালুঘাটা এড়াইল বেণিয়ার বালা।
কালীঘাটে গেল ডিঙ্গা অবসান বেলা॥
মহাকালীর চরণ পূজেন সদাগর।
তাহা মেলান বেয়ে যায় মাইনগর॥"*

মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্য ১৪৯৯ শকে অর্থাৎ ১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রণীত হইয়াছে। এইখানেই কলিকাতার প্রথম উল্লেখ দেখিতে পাই।

তাহার পর ১৫৯৬ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট্ আকবরের সুবিখ্যাত সচিব আবুল-ফজল প্রণীত "আইন-ই-আকবরী" নামক গ্রন্থে "কলিকাতা" নামের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। "আইন-ই-আকবরী" গ্রন্থে রাজা টোডর-মল্লের রাজস্বের "ওয়াশীল তুমার জমা'র তালিকায় বঙ্গদেশকে যে কএকটি বিভাগে বিভক্ত করা হয়, তাহার মধ্যে কলিকাতা, সাতগাঁও সরকার ভুক্ত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। † "আইন-ই-আকবরী" রচিত হইবার পরে ও বঙ্গদেশের সহিত য়ুরোপীয়দিগের সংস্রব হইবার পূর্ব্বে কোন ইতিহাস লেখক কোন পুস্তকে কলিকাতা নামের কোনও উল্লেখ করেন নাই। ১৪৯৯ হইতে ১৫৯৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যবর্ত্তী সময়ে কলিকাতার ইতিহাস ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন।

তৎপরে ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে ভাগীরথী তীরে সুতানুটী গ্রামে ইংরেজ বণিকের বাণিজ্য-কুটী সংস্থাপনের কিছুদিন পরে ইংরেজী ইতিহাসে পুনর্ব্বার "কলিকাতা"র উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

কলিকাতা নামের উৎপত্তি-বিষয় আলোচনা করিবার পূর্ব্বে, "কলিকাতা" এই নাম যে মূল হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন মত প্রচলিত আছে, তাহার কতকগুলি এইস্থলে আমরা সন্নিবেশিত করিলামঃ—

১। কলিকাতা নামের উৎপত্তি বিষয়ে এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, সর্ব্বপ্রথম একজন ইংরেজ কলিকাতায় আসিয়া অন্য কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া একজন তৃণচ্ছেদককে উক্ত স্থানের নাম জিজ্ঞাসা করেন। তাহাতে উক্ত তৃণছেদনকারী ইংরেজি ভাষা বুঝিতে না পারিয়া বিবেচনা করিল যে, বোধ হয় সাহেব তাহাকে ঘাস কবে কাটা হইয়াছে তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছেন, ইহাতে সে উত্তর করিল "কাল কাটা" (অর্থাৎ কাল কাটা হইয়াছে)। সাহেব মনে করিলেন যে, এই স্থানের নাম "ক্যালক্যাটা।" এই কৌতুকাবহ গল্পটি যে রহস্যচ্ছলে কোন উর্ব্বর মস্তিষ্ক হইতে প্রসূত হইয়াছে, সে বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

২। কলিকাতা নামের উৎপত্তি-বিষয়ে আর একটি কৌতুকাবহ প্রবাদ প্রচলিত আছে। কলিকাতা সীমার মধ্যে অথবা উহার পার্শ্বে কোন স্থানে পূর্ব্বে অপর্য্যাপ্ত কলিচূর্ণ প্রস্তুত হইত বলিয়া তাহা হইতেই কলিকাতা নাম হইয়াছে। ইহাও কেহ রহস্য করিয়া প্রচলন করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়।

৩। লং সাহেব বলেন যে, কলিকাতার নাম সম্ভবতঃ মহারাষ্ট্রীয় খাত (Maratha Ditch) অর্থাৎ মহারাষ্ট্র কাটা খাল হইতে উদ্ভূত হইয়া থাকিবে।* মহারাষ্ট্রীয় খাত ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দে খনন করা হয়। লং সাহেব বলেন, উক্ত

* চণ্ডীকাব্য—ধনপতির নৌকারোহণ।

† Sirkar Satgaon containing 53 Mahals, revenue 1,67,24,720 Dams. Calcutta, Bakoowa and Barbakpur 3 mahals revenue 9,36,215 Dams—Gladwin's Ayeen Akbery *Vol II P. 101.*

* Selection from the Calcutta Review—Calcutta in the olden times—its localities. *Vol. V. P. 169.*

সময়ের পূর্ব্বে কলিকাতা নামের উল্লেখ কোন স্থানে নাই। তাঁহার এই মতটি সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক; কারণ আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, চণ্ডীকাব্যে ও আইন-ই-আকবরীতে কলিকাতার উল্লেখ আছে, এবং ইংরেজি ঐতিহাসিকের পুস্তক হইতে দেখাইব যে, মহারাষ্ট্রীয় খাত খনিত হইবার পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৭১৭ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট্ ফরোকসায়ার ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে যে ফারমান্ প্রদান করেন, তাহার মধ্যে পরগণা আমিনাবাদের অন্তর্গত কলিকাতা, সুতানুটী ও গোবিন্দপুরের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।* এখন পাঠকগণ দেখিবেন যে, মহারাষ্ট্রীয়-খাত হইতে যে কলিকাতা নামকরণ হয় নাই তাহা সম্পূর্ণরূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে।

৪। স্বর্গীয় রাজা স্যর রাধাকান্ত দেব বাহাদুর মহোদয় পদাবলী † নামক পুস্তকে কলিকাতাকে 'কিলকিলা' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। 'কিলকিলা' শব্দে হর্ষধ্বনি বা কোলাহল বুঝায়। কোন পুস্তকে কলিকাতাকে কিলকিলা নামে অভিহিত হইতে দেখিতে পাওয়া যায় না এবং এই নাম কোথা হইতে, কিরূপে আসিল, তাহারও কোন প্রমাণ আমরা পাই নাই।

৫। জনৈক ওলন্দাজ ভ্রমণকারী কলিকাতা নগরকে "গলগোথা" (Golgotha) অর্থাৎ "নর-কপালসমাকীর্ণ স্থান" নামে অভিহিত করিয়াছেন। কথিত আছে যে, কলিকাতার সঙ্গে য়ুরোপীয়দিগের সংস্রব হইবার প্রারম্ভে বর্ষাকালে এক প্রকার রোগ উৎপন্ন হইয়া য়ুরোপীয় অধিবাসীদিগের একচতুর্থাংশ বিনষ্ট করে। সেই সময়ে য়ুরোপীয় নাবিকগণ (বিশেষতঃ ওলন্দাজগণ) ভাগীরথী নরকপালে সমাকীর্ণ দেখিয়া কলিকাতাকে "গল্‌গোথা" নামে অভিহিত করে। ‡

কলিকাতা নামের উৎপত্তি বিষয়ে যে কএকটি মত উপরে সন্নিবেশিত হইল, তাহার মধ্যে কোনটিও যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হয় না। এখন আমাদিগকে দেখিতে হইবে যে কলিকাতা নাম কোথা হইতে উৎপন্ন হইল। ইতিহাস-পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন যে, কোন নূতন নগর প্রতিষ্ঠা করিয়া নামকরণ করিতে হইলে নিকটবর্ত্তী কোন কীর্ত্তিস্তম্ভ বা কোন সুবিখ্যাত ব্যক্তি বা কোন দেবতাদির স্থানের নাম গ্রহণ করা হয়। এখন দেখিতে হইবে উপরিউক্ত কএক প্রকারের মধ্যে কোনটি কলিকাতার সন্নিকটে আছে কি না, এবং যদি থাকে তাহা হইলে কলিকাতা নামোৎপত্তির পূর্ব্বে উহার অস্তিত্ব ছিল কি না? প্রত্যুত্তরে বলা যাইতে পারে যে, কলিকাতার সন্নিকটে সুবিখ্যাত প্রাচীন কালীঘাট বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং উহা দেবতা-স্থান। তাহা হইলে নির্ব্বিঘ্নে বলা যাইতে পারে যে, 'কলিকাতা' নাম কালীঘাট হইতেই উৎপন্ন হওয়া সম্পূর্ণ সম্ভব। এই মত সমর্থন করিবার বিবিধ কারণ আমরা পরে দেখাইব।

পূর্ব্বোক্ত মতের পোষকতা করিবার পূর্ব্বে কালীঘাটের প্রাচীনত্ব বিষয়ে আমাদিগের ঐতিহাসিক আলোচনা করা প্রয়োজন। কোন্ সময় হইতে কালীপীঠ প্রকাশিত ও কালীঘাট নামে জনসমাজে পরিজ্ঞাত হইয়াছে, তাহা নিরাকরণ করা বড়ই দুরূহ। রামায়ণ বা মহাভারতে অথবা অন্য কোন সুপ্রাচীন গ্রন্থে কালীপীঠ বা কালীঘাটের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। মহাভারতে দক্ষিণ বাঙ্গালার অন্তর্গত তাম্রলিপ্তি প্রভৃতি কএকটি স্থানের উল্লেখ পাওয়া যায়। কালীমূর্ত্তির প্রকাশ বা কালীঘাট নাম হইবার পূর্ব্বে ঐ স্থান নিবিড় অরণ্যময় ও মনুষ্যের বাসের অযোগ্য ছিল বলিয়া মহাভারতীয় যুগে উহার অন্য কোন বিশেষ অভিধেয় ছিল না। পুরাণোক্ত দেশ-বিবরণে দক্ষিণ বাঙ্গালার সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত অরণ্যময় তাবৎ ভূভাগকে "সমতট" বলিয়াই উল্লেখ করা হইয়াছে। যে স্থানকে এখন কালীঘাট বলে, তাহা যে পুরাণোক্ত "সমতট" প্রদেশের অন্তর্গত ছিল, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। বিজয়সিংহের সিংহলযাত্রা বর্ণনায় দক্ষিণ বাঙ্গালার কোন নগরীর নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহাতে বোধ হয় বিজয়সিংহের সিংহল যাত্রাকালেও কালীঘাট ও তৎসংলগ্ন স্থান সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত নিবিড় অরণ্যময় ছিল। মগধরাজ্যের

---

* Translation of the *Firman* obtained from Emperor Ferokshere 1717 A D —History of the Rise and Progress of the Bengal Army—Broome.

† ১২৭৩ বঙ্গাব্দে মুদ্রিত।

‡ (1) Imperial Gazetteer of India *Vol II P. 317.*— W. W. Hunter and Selections from the Calcutta Review—Calcutta in the olden times—its localities *Vol. V. P. 168.*

উচ্ছেদের পর পালবংশীয় বৌদ্ধ নৃপতিরা খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। এই সময়ে বৌদ্ধ ধর্ম্ম একপ্রকার হীনপ্রভ হইয়াছিল। স্বধর্ম্মানুরাগী হিন্দু-ধর্ম্ম-প্রচারকগণ পৌরাণিক ও তান্ত্রিক ধর্ম্মের প্রচারে যত্নবান্ হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণগণ বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতির সময় বুঝিয়া নির্ভীক হৃদয়ে তান্ত্রিক উপাসনাদি প্রচার দ্বারা সাধারণ লোকদিগকে বৌদ্ধধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন; সুতরাং তান্ত্রিক কাপালিকেরা নির্ব্বিবাদে অরণ্যমধ্যে আপনাদের তন্ত্রোক্ত শক্তির উপাসনায় রত হইয়াছিলেন। এই সময়ের পূর্ব্বে উপপুরাণ ও তন্ত্র সংকলিত হয়। উপপুরাণ ও তন্ত্রে যে কালীক্ষেত্রের বা কালীপীঠের উল্লেখ পাওয়া যায়, তাহাই এই দক্ষিণ বাঙ্গালার কালীঘাটেরই নামান্তর মাত্র। চূড়ামণি তন্ত্রে দেখা যায়।

"নকুলেশঃ কালীপীঠে দক্ষপাদাঙ্গুলিষু চ।
সর্ব্বসিদ্ধিকরী দেবী কালিকা তব দেবতা॥"

অর্থাৎ কালীঘাটে সতীর দক্ষিণ পাদাঙ্গুলি পতিত হয় এবং এখানে দেবতা কালী ও ভৈরব নকুলেশ্বর পীঠরক্ষক। এইরূপ কিংবদন্তী আছে যে, সতীর যে পাদাঙ্গুলি কালীক্ষেত্রে পতিত হইয়াছিল, তাহা অদ্যাপি কালীর মন্দির মধ্যে সংরক্ষিত আছে ও প্রতিবৎসর স্নানযাত্রার সময় ও অম্বুবাচীর শেষ দিনে উহার বিধিপূর্ব্বক অভিষেক হইয়া থাকে। সুদর্শন-ছিন্ন সতী-অঙ্গ নিপতিত হইয়া কতটুকু স্থান কালীক্ষেত্র হইল, তাহা নিগমকল্পের পীঠমালায় সবিস্তার বর্ণিত আছে—

"দক্ষিণেশ্বরমারভ্য যাবচ্চ বহুলা পুরী।
ধনুরাকারক্ষেত্রঞ্চ যোজনদ্বয়সংখ্যকং॥
তন্মধ্যে ত্রিকোণাকারঃ ক্রোশমাত্রং ব্যবস্থিতঃ।
ত্রিকোণে ত্রিগুণাকার ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবাত্মকং।
মধ্যে চ কালিকা দেবী মহাকালী প্রকীর্ত্তিতা॥
নকুলেশঃ ভৈরবো যত্র যত্র গঙ্গা বিরাজিতা।
তত্র ক্ষেত্রং মহাপুণ্যং দেবানামপি দুর্লভং॥
কাশীক্ষেত্রং কালীক্ষেত্র মভেদোপি মহেশ্বরঃ।
কীটোঽপি মরণে মুক্তি কিংপুনর্ম্মানবাদয়ঃ॥
ভৈরবী বগলা বিদ্যা (কালী) মাতঙ্গী কমলা তথা।
ব্রাহ্মী মাহেশ্বরী চণ্ডী চাষ্টশক্তি বসেৎ সদা॥"

অর্থাৎ দক্ষিণেশ্বর হইতে বহুলা * পর্য্যন্ত দুই যোজন ব্যাপী ধনুকাকার স্থান কালীক্ষেত্র, তন্মধ্যে এক ক্রোশ ব্যাপ্ত ত্রিকোণাকার স্থানের ত্রিকোণে ত্রিগুণাত্মক ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এবং মধ্যস্থলে মহাকালী নামে কালিকা দেবী বিরাজ করেন। যেখানে নকুলেশ্বর ভৈরব এবং গঙ্গা বিরাজ করেন, সেই স্থান মহাপুণ্যক্ষেত্র—তাহা দেবতারও দুর্লভ। কাশীক্ষেত্র ও কালীক্ষেত্র উভয়ের মধ্যে কিছুই ভেদ নাই। এখানে মরণমাত্রেই কীট পর্য্যন্ত মুক্তিলাভ করে, মনুষ্যের ত কথাই নাই। ঐ স্থানে ভৈরবী, বগলা, কালী, মাতঙ্গী, কমলা, ব্রাহ্মী, মাহেশ্বরী ও চণ্ডী এই সনাতনী অষ্টশক্তি সর্ব্বদা অবস্থান করেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, এই অরণ্যময় স্থান মনুষ্যের পরিজ্ঞাত হইবার পরে, তন্ত্রাদির পীঠ বিবরণ লিখিত হইবার পূর্ব্বে ও বুদ্ধের তিরোভাবের পরে কালীমূর্ত্তি ও নকুলেশ প্রকাশিত হইলে, ঐ স্থান কালীক্ষেত্র নামে অভিহিত হইয়াছে সন্দেহ নাই।

মগধের ও বাঙ্গালার বৌদ্ধ নৃপতিগণের রাজত্ব সময়ে ভারতের গাঙ্গ্য প্রদেশের বাণিজ্য সুদূর পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। হিন্দু বণিক্‌গণ তখন নির্ভীক হৃদয়ে বড় বড় অর্ণবযানে ভাগীরথী দিয়া বঙ্গসাগর অতিক্রম করিয়া সিংহল, যাবা, সুমাত্রা, বালি প্রভৃতি দ্বীপে বাণিজ্যার্থ গমন করিতেন।† হিন্দু বণিকগণ সাগরাভিমুখে গমনকালে তীরস্থ দেবদেবীর পূজা না করিয়া যাইতেন না।

কালীক্ষেত্র গঙ্গার তীরবর্ত্তী থাকায় সমুদ্রগামী বণিক্‌গণ যাইবার সময় তীরে উঠিয়া কালীদেবীর পূজা দিয়া যাইতেন। তাঁহারা তীরে উঠিবার জন্য যে স্থানে অর্ণবযান লাগাইতেন, তাহার নিদর্শনের জন্য তাঁহারা সেই তীরস্থ ভূমিকে "কালী দেবীর ঘাট" বা "কালীর ঘাট" বলিতেন। ক্রমে "কালীঘাট" আখ্যা হইল এবং হিন্দু বণিক্‌গণ কর্ত্তৃকই যে এই নামকরণ হইয়াছিল

* কালীঘাটের দক্ষিণে বর্ত্তমান বেহালা।

† Vincent's "Commerce and Navigation of Ancients" *Vol II. P. 283.*

তাহা বেশ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বল্লাল সেন গৌড়ের সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। তাঁহার সময়ে কালীঘাটের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।* তখন অসংখ্য নরনারী পাপমোচন করিবার জন্য কালীক্ষেত্রে গঙ্গাস্নান করিতে আসিত। গঙ্গাতীরে কালীক্ষেত্র, সুতরাং এই কালীঘাট যে সেই কালীক্ষেত্র, তাহার আর সন্দেহ নাই। বল্লাল সেন, রাজকার্য্যের সুবিধার জন্য সমস্ত বাঙ্গালা দেশকে যে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে বগড়ি বিভাগ পদ্মার দক্ষিণ ও ভাগীরথীর পূর্ব্ব এবং এই কালীক্ষেত্র বগড়ি বিভাগের অন্তর্গত ছিল। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, বল্লাল সেনের সময় কালীক্ষেত্র ও তৎসন্নিকটস্থ স্থান, নিবিড় অরণ্যময় ছিল না। ঠিক কোন্ সময়ে এই কালীক্ষেত্র কালীঘাট আখ্যা পাইয়াছে, তাহা বলা যাইতে পারে না, তবে বাঙ্গালার বৌদ্ধ নৃপতিদিগের সময়ে হিন্দু বণিক্‌গণ কর্ত্তৃক এই কালীক্ষেত্রের যে প্রকারে কালীঘাট আখ্যা হইয়াছে, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব নবদ্বীপে প্রাদুর্ভূত হন। শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত গ্রন্থে চৈতন্যদেবের উৎকল হইতে প্রত্যাগমনের বর্ণনায় কলিকাতার উত্তরে বরাহনগর, পানিহাটী এবং খড়দহ ও কালীঘাটের দক্ষিণে ছত্রভোগ প্রভৃতি কএকটি গ্রামের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু তাহাতে কালীঘাটের কোন উল্লেখ না থাকিলেও, স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, পঞ্চদশ শতাব্দীতে কালীঘাটের চতুঃপার্শে গ্রাম সন্নিবেশিত হইয়াছিল। বোধ হয়, কালীঘাট শাক্তদিগের তীর্থ বলিয়া বৈষ্ণব গ্রন্থকার উহার উল্লেখ করেন নাই।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, চণ্ডীকাব্য ১৪৯৯ শকে অর্থাৎ ১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল। চণ্ডীকাব্যে কালীঘাটের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। ধনপতির নৌকারোহণে বর্ণিত আছে—

> "বালুঘাটা এড়াইল বেণের নন্দন।
> কালীঘাটে গিয়া ডিঙ্গা দিল দরশন॥"

মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্য রচনার অব্যবহিত পরেই ক্ষেমানন্দের "মনসার ভাসান" নামক গ্রন্থে সর্ব্বদেব-বন্দনায় কালীঘাটের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়—

> "কালীঘাটে কালী বন্দ বড়াতে বেতাই"

অতএব দেখা যাইতেছে যে, খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে কালীঘাট মহাতীর্থ স্থান বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিল এবং তাহার চতুঃপার্শ্বে গ্রাম সন্নিবেশিত হইয়াছিল।

খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে আবুল ফজল আইন-ই আকবরী গ্রন্থে সরকার সাতগাঁর মধ্যে "কালীকোটা" নামক স্থানের উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে, আইন-ই-আকবরী লিখিত হইবার পূর্ব্বেই কালীঘাট মহাতীর্থস্থান বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিল, এবং সেই সময়ে উহার সন্নিকটে সূতানুটী, গোবিন্দপুর প্রভৃতি গ্রামসকল উদ্ভূত হইয়াছিল। আবুল ফজল যে কালীঘাট ও তন্নিকটবর্ত্তী গ্রামসকলকে এক "কালীকোটা" বলিয়াই আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। কারণ ইহাতে তিনি সূতানুটী বা গোবিন্দপুরের কোন উল্লেখ করেন নাই। বঙ্গভাষানভিজ্ঞ আবুল ফজল কালীঘাট শব্দকে পার্সী অক্ষরে* লিখিতে গিয়া "ঘ" স্থলে পার্সীর "গায়েন" না লিখিয়া "কাফ্" লিখিয়া "কালীকোটা" এইরূপ অপভ্রংশ পদ লিখিয়াছেন, সন্দেহ নাই। রাঢ় অঞ্চলে এখনও সাধারণ লোকে কালীঘাটকে কালীঘাটা বলিয়া থাকে।†

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে দক্ষিণ বাঙ্গলায় সূতানুটী গোবিন্দপুর প্রভৃতি ভাগীরথী তীরস্থ কএকটি গ্রাম বাণিজ্য-প্রধান স্থান হইয়া উঠে। খ্রীষ্টীয় ১৬৯০ অব্দে ইংরেজ বণিকেরা সূতানুটী বা কালীকোটা গ্রামে কুটী সংস্থাপন করেন। আইন-ই-আকবরী মতে, সূতানুটী কালীকোটার অন্তর্গত ছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে "গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী" নামক গ্রন্থ রচনা হয়। এই পুস্তকেও কালীঘাট যে তখন জনসমাজে সুপরিজ্ঞাত ছিল, তাহার বর্ণনা পাওয়া যায়ঃ—

* গৌড়ীয়ভাষাতত্ত্ব—১ম খণ্ড, ৫০ পৃষ্ঠা।

* বাঙ্গলা "ঘ" পার্সী অক্ষরে গায়েন ও হে সংযুক্ত, "ক" পার্সীর "কাফ্"।

† কালীক্ষেত্র দীপিকা ৪৯ পৃষ্ঠা।

"চলিল দক্ষিণ দেশে, বালি ছাড়া অবশেষে,
উপনীত যথা কালীঘাট।
দেখেন অপূর্ব্ব স্থান, পূজা হোম বলিদান,
দ্বিজগণে চণ্ডী করে পাঠ॥"

আমরা কালীঘাটের প্রাচীনত্ব বিষয়ে যথাসাধ্য আলোচনা করিলাম। এখন আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, যখন কালীঘাটই বহু পূর্ব্ব হইতে সমৃদ্ধিশালী স্থান এবং এই স্থান ব্যতীত কলিকাতার সন্নিকটে অন্য কোন সুপ্রসিদ্ধ স্থান পরিলক্ষিত হয় না, তখন আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে, কালীঘাট ব্যতীত অন্য কোন কারণ হইতে কলিকাতা নামোৎপত্তি সম্ভবপর নহে। অনেক সময়ে স্থানের নাম প্রথমে যাহা থাকে তাহা হইতে ক্রমশঃ অপভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। ইহা ইতিহাসপাঠকের অবিদিত নাই। সেইরূপ কলিকাতা শব্দ কালীঘাট হইতে বর্ণবিপর্য্যয় ঘটিয়া কিরূপে যে অপভ্রষ্ট হইয়াছে, তাহা স্থির করা অতীব দুরূহ। আবুল ফজল কালীঘাটকে যে ভাবে "কালীকোটা" করিয়াছেন, তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। পরে ইংরেজ বণিক্‌গণ সুতানুটীতে কুটী স্থাপন করিয়া, "কালীকোটা" শব্দের ঈকারের লোপ করিয়া "কালকোটা" ও ক্রমে "কালকট্টা" করিয়াছেন এবং দেশীয় বণিক্‌গণ ইংরেজ বণিকের সংস্পর্শে আসিয়া "কালীকোটা" স্থলে "কালীকাতা" বা 'কলিকাতা' করিয়াছেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কলিকাতা নামের উৎপত্তি বিষয়ে আমরা কএকজন ঐতিহাসিকের মত উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব ঃ—

১। কোন প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধায়ী পণ্ডিত বলেন যে, বহু প্রাচীন কাল হইতে লোকে এই স্থানটি কলিকাতা বলিয়া অবগত আছেন। উক্ত স্থানকে তৎকালে হিন্দুগণ কালীক্ষেত্র বলিতেন। ইহা বেহুলা হইতে দক্ষিণেশ্বর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বেহুলা (বর্ত্তমান বেহালা) ও দক্ষিণেশ্বর এখনও বর্ত্তমান আছে। পুরাণাদিতে এইরূপ কথিত আছে যে, এই সীমার মধ্যে কোন স্থানে সতীর মৃতদেহের অংশ বিশেষ পতিত হইয়া কালীক্ষেত্র নামে অভিহিত হয়। কলিকাতা কালীক্ষেত্রেরই অপভ্রংশ।*

২। Beeton's Dictionary of Geography নামক পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায় যে, কালীকুট্ট (কালী = কালীর এবং কুট্ট = দুর্গ) হইতে কলিকাতা নামের উৎপত্তি হইয়াছে।

৩। Balfour's Cyclopaedia of India নামক পুস্তকে লিখিত আছে যে, কলিকাতা নাম কালীঘাটের অপভ্রংশ মাত্র।

৪। Stewart সাহেব তাঁহার বাঙ্গালার ইতিহাসে কলিকাতাকে কালীকোটা নামে অভিহিত করিয়াছেন।

কালীঘাট বা কালীক্ষেত্র হইতেই যে কলিকাতা নামের উৎপত্তি হইয়াছে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।†

শ্রীইন্দ্রভূষণ দে।

---

* Indian Antiquary. Pandit Padmanav Ghosal's letter, dated Calcutta, July, 1873.

† এই বিষয় আলোচনা করিতে, আমরা বসুক, কালীক্ষেত্র দীপিকা, কলিকাতার ইতিহাস ও বিভা প্রভৃতি নানা পুস্তক ও মাসিক পত্রিকার সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি।

মা ও ছেলে।

"কুলুঙ্গিতে তিন জোড়া রেখেছি সন্দেশ,
এরি মধ্যে এক জোড়া কি হ'ল রমেশ।"
"এত অন্ধকার, মাগো, ওই কুলুঙ্গিতে—
আরো যে দু'জোড়া আছে পাইনি দেখিতে।"

শ্রীরসময় লাহা।

সভা-সমিতি।

শোকসভা।

৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

মহাকবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ের অকাল মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ ও ৺কবিবরের স্মৃতি-রক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্য বিগত ৩১ শ্রাবণ রবিবার কলিকাতা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ একটী সভা আহ্বান করেন। অপার সার্কুলাররোডস্থিত সাহিত্যপরিষৎ মন্দিরেই এই সভার অধিবেশন স্থির হয়; কিন্তু পরিষদের কর্তৃপক্ষ বুঝিতে পারেন নাই যে, পরলোকগত কবিবরের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশের জন্য এত লোকের সমাগম হইবে যে, পরিষৎ মন্দিরের নিম্নতল ও দ্বিতল এই উভয় স্থানে দুইটি সভার অধিবেশনের আয়োজন করিলেও স্থান সঙ্কুলান হইবে না। অপরাহ্ণ সাড়ে পাঁচটার সময় সভার অধিবেশনের কথা ছিল, কিন্তু তিনটা হইতেই এত লোকসমাগম আরম্ভ হইল যে, দেখিতে দেখিতে দ্বিতলের প্রশস্ত কক্ষ পরিপূর্ণ হইয়া গেল। তখন পরিষদের কর্তৃপক্ষ স্থির করিলেন যে, নিম্নতলে আর একটি সভার ব্যবস্থা করা হউক। তাহাই হইল; কিন্তু চারিটা বাজিবার পর দেখা গেল যে, নিম্নতলের কক্ষে আর স্থান নাই; তখনও শত শত লোক স্থানাভাবে বাহিরে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, তখনও দলে দলে লোক আসিতেছেন। তখন অনন্যোপায় হইয়া পরিষদের কর্তৃপক্ষ নিকটবর্ত্তী পরেশনাথের মন্দিরে সভার স্থান করিবার জন্য মন্দিরাধ্যক্ষ মহাশয়ের অনুমতি গ্রহণ করিবার অভিপ্রায়ে লোক প্রেরণ করিলেন। মন্দিরের অধ্যক্ষ মহাশয় তৎক্ষণাৎ সম্মতি প্রদান করিলেন। কিন্তু তখন আর আসনের ব্যবস্থা হইল না। পরেশনাথের মন্দিরের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে সভার অধিবেশন হইল; সকলে মৃত্তিকা-আসনে উপবিষ্ট হইয়া মৃত কবির প্রতি সম্মান প্রদর্শনে কুণ্ঠিত হইলেন না। সহস্র সহস্র লোক সেই প্রবল গ্রীষ্মের মধ্যে মৃত্তিকা-আসনে বসিয়া সভার কার্য্যে যোগদান করিলেন।

সাহিত্য পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। তাহার পর কবিবর দ্বিজেন্দ্রলালের রচিত একটি গীত হইল। তৎপরে শ্রীযুক্ত শরৎকুমার লাহিড়ী ও শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন এম এ এবং শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কবির পরলোকগমনে শোক-প্রকাশসূচক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। প্রবন্ধ কয়টিই অতি সুন্দর হইয়াছিল। সভাস্থলে একটি কবিতাও পঠিত হইয়াছিল।

এই সভায় তিনটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রথম, শোকপ্রকাশের প্রস্তাব; দ্বিতীয় কবির পুত্রের শোকে সহানুভূতি প্রকাশের প্রস্তাব; এবং তৃতীয় কবির স্মৃতিরক্ষার প্রস্তাব। শ্রীযুক্ত সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল, শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার, শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত জলধর সেন প্রভৃতি এই সভায় বক্তৃতা করেন। কবিবরের স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করিবার ভার বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির উপর অর্পিত হয়।

টাউনহলে শোকসভা।

গত ২৫শে জুলাই, ৯ই শ্রাবণ শুক্রবার কলিকাতা টাউনহলে মহাকবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ের পরলোক গমনে শোক প্রকাশের জন্য একটি মহতী সভা আহুত হয়। সুকবি শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায়চৌধুরী, সুকবি শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায়চৌধুরী এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় এই সভা আহ্বান করেন। টাউনহলের এই সভাতেও বহুলোকের সমাগম হইয়াছিল। পার্সীপ্রবর শ্রীযুক্ত আর, ডি, মেটা মহাশয় বাঙ্গালা ভাষায় বক্তৃতা করিয়া শ্রীযুক্ত রাসবিহারী ঘোষ মহাশয়কে সভাপতি পদে বরণ করেন। সভার কার্য্য আরম্ভেই কলিকাতার ইভ্নিং ক্লব কবিবর দ্বিজেন্দ্রলালের রচিত 'ভারতবর্ষ' শীর্ষক গীতটি গান করেন। এই গীতটি 'ভারতবর্ষের' প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।

তাহার পর সভাপতি শ্রীযুক্ত রাসবিহারী ঘোষ মহাশয় বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত অভিভাষণ পাঠ করেন। ঘোষ মহাশয় অতি সুন্দরভাবে কবিবরের জীবনকথা ও তাঁহার কবি-প্রতিভার বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন। তাহার পর সুকবি শ্রীযুক্ত রসময় লাহা মহাশয় একটি শোকসূচক কবিতা পাঠ করেন। তৎপরে অমর-নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ের উপযুক্ত পুত্র শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের রচিত "বঙ্গ তোমার, জননী তোমার" নামক সুন্দর গীতটি ইভ্‌নিং ক্লব কর্ত্তৃক গীত হয়। এই গীতটিও "ভারতবর্ষের" দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।

টাউন হলের এই সভাতেও শোকপ্রস্তাব, সহানুভূতিসূচক পত্র প্রেরণের প্রস্তাব ও স্মৃতিরক্ষার প্রস্তাব গৃহীত হয়। শ্রীযুক্ত সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, বারিষ্টার শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর সেন, বারিষ্টার শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী প্রভৃতি এই সভায় বক্তৃতা করেন। সভাস্থলেই প্রায় পাঁচ হাজার টাকা চাঁদা প্রতিশ্রুত হয়। শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায়চৌধুরী ও কবি শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায়চৌধুরী মহাশয়দ্বয় যথাক্রমে এক হাজার ও পাঁচশত টাকা কবিবরের স্মৃতি-রক্ষা ভাণ্ডারে দান করেন। সভাপতি মহাশয়ও ২৫০্ টাকা দান করেন। ষ্টার থিয়েটারের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ দত্ত পাঁচশত টাকা দান করেন; ভারতবর্ষের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সনস্ একশত টাকা দান করেন; দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয়ের মাতাঠাকুরাণী একশত টাকা এই স্মৃতি-ভাণ্ডারে দান করিতে প্রতিশ্রুত হন। এই প্রকারে প্রায় পাঁচ হাজার টাকা দান সভাস্থলেই প্রতিশ্রুত হইয়াছিল। অবশেষে সন্তোষের রাজা শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ রায়চৌধুরী মহাশয় সভাপতি মহাশয়ের ধন্যবাদের প্রস্তাব করিবার পর সভার কার্য্য শেষ হয়।

৺কৃষ্ণদাস পাল

স্মৃতি-সভা।

গত ২৪শে জুলাই, ৮ই শ্রাবণ বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণে কলিকাতার ওভারটুনহলে পরলোকগত কৃষ্ণদাস পাল মহাশয়ের স্বর্গারোহণ দিবস স্মরণার্থ একটি সভা আহূত হয়। প্রসিদ্ধ ব্যবহারাজীব, বঙ্গের সুসন্তান শ্রীযুক্ত রাসবিহারী ঘোষ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাস্থলে বহু ভদ্রলোকের সমাগম হইয়াছিল। সভাপতি শ্রীযুক্ত ঘোষ মহাশয় একটি সুদীর্ঘ ও সুললিত বক্তৃতা করিয়া পরলোকগত কৃষ্ণদাস পাল মহাশয়ের গুণের ব্যাখ্যা করেন। তৎপরে ফরিদপুরের খ্যাতনামা উকিল শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ মজুমদার মহাশয় একটি সুন্দর প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই প্রবন্ধে তিনি অতি বিশদভাবে পরলোকগত মহাত্মার নানা সদ্‌গুণের বর্ণনা করেন। সভাস্থ সকলেই মজুমদার মহাশয়ের সুন্দর ও সুচিন্তিত প্রবন্ধ শ্রবণে প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন। মজুমদার মহাশয়ের প্রবন্ধ পাঠ শেষ হইলে মিঃ ডবলিউ গ্রেহাম ও মাননীয় শ্রীযুক্ত রায় সীতানাথ রায় বাহাদুর কৃষ্ণদাস পাল মহাশয়ের সম্বন্ধে কএকটি কথা বলেন। তাহার পরেই সভাভঙ্গ হয়।

বিদ্যাসাগর-স্মৃতি-সভা।

গত ২৯শে জুলাই, ১৩ই শ্রাবণ মঙ্গলবার কলেজের প্রাঙ্গণে সর্ব্বজন পূজনীয় দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্বর্গারোহণের দ্বাবিংশ বার্ষিক স্মারক সভার অধিবেশন হয়। সুসঙ্গের মহারাজা শ্রীযুক্ত কুমুদচন্দ্র সিংহ বাহাদুরের সভাপতির আসন গ্রহণ করিবার কথা ছিল; কিন্তু তিনি কোন বিশেষ কারণে সভায় উপস্থিত হইতে না পারায় রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সে দিন সমস্ত দিনই বৃষ্টি হইয়াছিল, বিশেষতঃ অপরাহ্নকালে সভা আরম্ভ হইবার কিছু পূর্ব্ব হইতে মুষলধারে বৃষ্টি পতিত হইতে থাকে। কিন্তু যে মহাপুরুষের গুণকীর্ত্তন করিবার জন্য এই সভার আয়োজন, সেই ক্ষণজন্মা পুরুষের নাম স্মরণ করিয়া অনেকেই সেই বৃষ্টি মাথায় করিয়া সভাস্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কলেজের প্রাঙ্গণে স্থানাভাব হইয়াছিল; সভার আরম্ভে ও শেষে সুকবি শ্রীযুক্ত বিহারিলাল সরকার মহাশয়ের রচিত দুইটি গান গীত হয়; আমরা তাহার একটি গান নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।—

ভূপালী—একতালা।

কেন জাগে না জাগে না প্রাণ,
হে সাগর গরীয়ান্!
জাগাইতে নিত্য সত্য
তোমার জীবন গান;
কি করুণ প্রাণে দিতে কত জ্ঞান,
জাগায়ে তুলিতে জননীর ধ্যান,
শিখাতে আদর্শে দম দয়া-দান,
কে পারে শিখাতে তোমার সমান।
যে বঙ্গ-সাহিত্যে, যে বঙ্গভাষায়,
আজি মধ্যমণি উজলে বিভায়
তুমি না সৃজিলে কে সৃজিত তায়
কে রাখিত বঙ্গজননীর মান।
হে দয়ালদাতা বিধাতা তোমার,
স্মরণের দিন যাচি বার বার,
ভেঙ্গে যাক্ ভুল মোহের বিকার,
বরিষ আশীষ, জগত-কল্যাণ॥

সভাস্থলে সহরের অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত-প্রণেতা শ্রীযুক্ত বিহারিলাল সরকার ও শ্রীযুক্ত ... বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

বিপিনচন্দ্র পাল, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র রায় চৌধুরী, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি সুধীগণ পরলোকগত মহাত্মার গুণকীর্ত্তন করেন। তৎপরে সভাপতি মহাশয় একটি সুললিত বক্তৃতা করিয়া সভার কার্য্য শেষ করেন। কলিকাতার, বিশেষতঃ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত মেট্রোপলিটান কলেজের ছাত্রগণের বিশেষ চেষ্টায় এই সভা আহূত হয়। অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও উক্ত কলেজের অধ্যাপক ও ছাত্রগণ ঐ দিনে কলেজ-প্রাঙ্গণে কাঙ্গালী বিদায় করিয়াছিলেন।

৺ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর।

কাফি সিন্ধু—কাওয়ালী।

কমনীয় বরণীয়, মিলেছে ভাল তোমাতে।
স্নেহ ভক্তি হে ঈশ্বর, তাই মন চাহে দিতে॥

সদা অবহেলি সুখে, ধর্ম্মেরে রাখি সম্মুখে,
চলেছে কর্ত্তব্য পথে, নাহি চাহি কোন ভিতে।
পদে ঠেলে ধনে মানে, যাপিল সুখে জীবনে,
জগত চকিত দেখি, হেন দীন-দ্বিজ-সুতে।
কিছুতে নাহিক ভয়, অলৌকিক চিত-জয়,
এমন বীর-মূরতি, অতুল এ অবনীতে।
কিন্তু পর-দুঃখ-তাপে, সে বীর-হৃদয় কাঁপে,
গলে প্রাণ যেন ননি, তপনকিরণপাতে।

মা দেখে' সুতযাতনা, পান কি এত বেদনা,
পর-দুঃখে দয়াময়, যে ব্যথা তোমার চিতে।
ভূধর সম অচল, কুসুম সম কোমল,
খর ধীর দুই ধারা, মিশেছে এ বারিধিতে।
বিজয়ের সাধ মনে, তোমার মহিমাগুণে,
আমরা উন্নত হই, বিশোধিয়া স্বরচিতে ॥১১॥

———

৺রমেশচন্দ্র মিত্র।

বিগত ১৩ই জুলাই ভবানীপুর সবার্ব্বন স্কুলগৃহে স্যর্ রমেশচন্দ্র মিত্র, কে, টি, মহোদয়ের স্মৃতিসভার অধিবেশন হয়; সভাপতি হইয়াছিলেন স্যর্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। রায় দেবেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর ৺রমেশচন্দ্রের গুণরাশির উল্লেখ করিয়া বলেন, হাইকোর্টের জজীয়তী হইতে অবসর লইয়া তিনি জমিদারী পঞ্চায়েতে অনেক মোকদ্দমার সালিসি করিতেন, এবং তাঁহার সুব্যবস্থায় উভয় পক্ষই সন্তুষ্ট হইত। স্যর্ রমেশচন্দ্র লাট পরিষদের সদস্যরূপে দেশের লোকের হইয়া সহবাস সম্মতি-আইনের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। রমেশ বাবুর এই কার্য্যের জন্য দেবেন্দ্রবাবু দুঃখ প্রকাশ করেন; কিন্তু সভাপতি স্যর্ আশুতোষ সে কথার উত্তরে বলেন যে, রমেশচন্দ্র সে আইনের প্রতিবাদ করিয়া ভালই করিয়াছিলেন, কারণ আমাদের সামাজিক ব্যাপারে সরকারের হস্তক্ষেপ কোন মতেই বাঞ্ছনীয় নহে।

স্যর রমেশচন্দ্র মিত্র।

আসল ও নকল।

বনের পাখীরে খাঁচায় পুরিয়া শুনিয়া তাহার গান
জুড়ায় কাহার কাণ?
ধাতুর পাত্রে কনকের ফুলে দেবতারে অর্চ্চিয়া
তৃপ্ত ভকতহিয়া?
কৃত্রিম শিলা উৎস সমীপে নিদাঘে করিয়া স্নান
জুড়ায় কি কভু প্রাণ?
স্বর্ণ সীতায় মাখালে যতনে মণির অঙ্গরাগ
পুরে কি কখনো যাগ?

শ্রীকালিদাস রায়।

দিল্লী ।

১

কবিবর নবীনচন্দ্র সেন লিখিয়াছেন, 'দিল্লী হিন্দু সাম্রাজ্যের মহাশ্মশান, মুসলমান রাজ্যের মহা সমাধি, মহাকালের মহারঙ্গভূমি'। দিল্লীদর্শন না করিলে এ সত্যের সম্যক্ উপলব্ধি করা অসম্ভব। আধুনিক দিল্লীর প্রান্তভাগেই যুধিষ্ঠিরের ইন্দ্রপ্রস্থের ধ্বংসাবশেষ। হিন্দুমাত্রেরই ইন্দ্রপ্রস্থ দর্শনে মহাভারতীয় যুগের কথা মনে পড়ে—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কথা মনে পড়ে—এই ধ্বংসাবশেষ যে সেই ভগবানের পাদস্পর্শপূত ধূলিরাশি বক্ষে চাপিয়া রাখিয়াছে তাহা মনে করিতেই ভাবাবেশে মস্তক আপনিই অবনত হয়।

এখান হইতে কিছু দূরেই আর একটি হিন্দু-কীর্ত্তির শ্মশানভূমি পিথোরাগড়—চৌহানকুলতিলক পৃথিরাজের দিল্লীর ধ্বংসাবশেষ। তাই বলি দিল্লী হিন্দুর মহাশ্মশান—ভারতবাসীর চরম তীর্থ!

বর্ত্তমান দিল্লী হইতে পুরাতন দিল্লীর পথপার্শ্বে চারিদিকেই মুসলমানের সমাধি! সমাধির পর সমাধি! জনহীন প্রান্তরের মধ্যে সুন্দর সমাধিসমূহ দণ্ডায়মান থাকিয়া অতীতের সুখসমৃদ্ধির কাহিনী স্মরণ করাইয়া দেয়। এত বড় সমাধিক্ষেত্র জগতে আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ।

দিল্লীকে ভন অরলিক 'ভারতবর্ষের রোম' আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। এই দিল্লী ক্ষেত্রে যত যুদ্ধ, যত হত্যাকাণ্ড হইয়াছে, যত নররক্ত বহিয়াছে, পৃথিবীর আর কোথাও তাহা হয় নাই। দিল্লী (উপকণ্ঠ লইয়া) আয়তনে প্রায় ৪৫ বর্গ মাইল। ফিঞ্চ নামক জনৈক বণিক ১৬১১ খৃষ্টাব্দে লিখিয়াছেন যে, এই সপ্ত দুর্গ ও ৫২ দ্বারবিশিষ্ট স্থলে অন্যূন ১৩টি রাজধানীর উৎপত্তি ও লয় হইয়াছে। কালবশে এখন সাজাহানের রাজধানী ব্যতীত অন্য রাজধানীগুলির স্মৃতিচিহ্ন প্রায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

নাম ।

আমরা ইংরেজীতে Delhi লিখিয়া থাকি, মুসলমানেরা "দেহলি" এই নাম দিয়াছে—কিন্তু মূলতঃ প্রাচীন কাল হইতে ইহা "দিল্লী" নামে আখ্যাত হইয়া আসিতেছে। চাঁদকবির সময় এই 'দিল্লী' শব্দের বানানে সর্ব্বত্রই প্রথম 'ই'টি হ্রস্ব এবং দ্বিতীয়টি দীর্ঘ দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রীক ঐতিহাসিক টলেমীর গ্রন্থে দিল্লীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। টলেমী বলেন, 'দৈদল' (Daidala)—ইন্দবর (ইন্দ্রপ্রস্থ) নামক স্থানের নিকটবর্ত্তী এবং মত্তবা (মথুরা) ও বটন কৈসর (Batan Kaisora) অর্থাৎ স্থানেশ্বরের মধ্যবর্ত্তী।
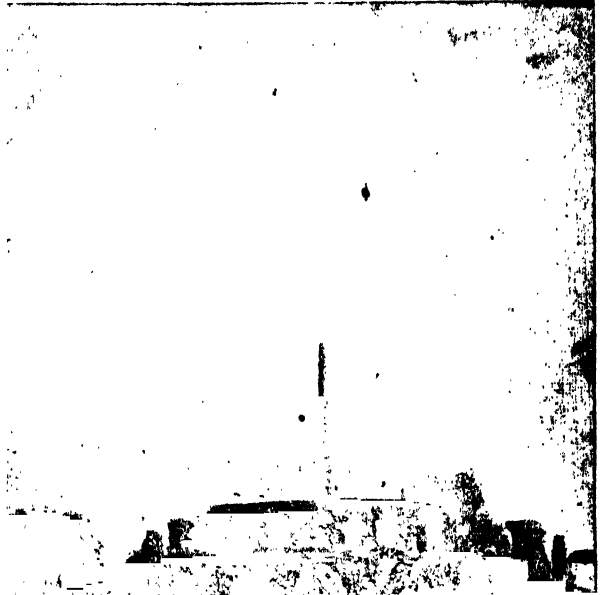
ইন্দ্রপ্রস্থ।

টলেমীর দৈদল যে 'দিল্লী' তৎসম্বন্ধে কোনই সন্দেহ থাকিতে পারে না। কিন্তু এই দিল্লীনামের কারণ সম্বন্ধে দুই একটি

প্রবাদ ভিন্ন আর কিছুই জানিতে পারা যায় নাই। প্রবাদ আছে, যে দিলু বা ঢিলু নামে এক রাজা ছিলেন—ইনিই 'দিল্লি' বা 'ঢিল্লি' নগর নিম্মাণ করিয়াছিলেন। এই রাজার গোত্র বা বংশের পরিচয় পাওয়া যায় নাই। তবে ক্যানিংহাম সাহেবের অনুগ্রহে জানিতে পারা গিয়াছে যে, ইনি বিক্রমাদিত্যের সমকালবর্ত্তী; সুতরাং এই প্রবাদ অনুসারে খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীতে এই নগর নির্ম্মিত হয়।

আর একটি প্রবাদ আছে যে, পৃথ্বিরাজের দেবালয়ের প্রাঙ্গণে যে লৌহস্তম্ভ প্রোথিত আছে, তোমর-বংশের প্রতিষ্ঠাতা বিলন দেও বা অনঙ্গপাল তাহার মূলদেশ দেখিতে চেষ্টা করেন, তাহাতে স্তম্ভের তলদেশ হইতে রক্ত উঠে ও স্তম্ভ 'ঢিলা' হইয়া যায়। "ঢিল্লী" হইতে দিল্লী নাম হইয়াছে। তাই প্রবাদ—

"কীল্লী তো টাল্লী ভয়ি
তোমর ভয় মত হি।"

কাহারও কাহারও মতে রাজা দিলীপের নাম হইতে 'দিলীপুর' হইয়াছে—এই দিলীপুর ক্রমশঃ দিল্লী হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

দিল্লীর ইতিহাস।

ইন্দ্রপ্রস্থে রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহার রাজধানী নিম্মাণ করেন। ৭৩৬ খৃষ্টাব্দে "তোমর"-বংশীয় রাজা অনঙ্গপাল ইহার কিছু দূরে তাঁহার রাজধানী নিম্মাণ করেন। কুতুব মিনারের সন্নিকটে এই রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ আছে। ১১৫১ খৃষ্টাব্দে "চোহান" রাজপুত কর্ত্তৃক তোমর-বংশীয়গণের উচ্ছেদ সাধিত হয়।

এই 'চোহান'শ্রেষ্ঠ পৃথ্বিরাজ সাহাবুদ্দিন ঘোরীকে থানেশ্বর যুদ্ধক্ষেত্রে ১১৯১ খৃষ্টাব্দে পরাস্ত করেন। ইহার দুই বৎসর পরে ঘোরী পুনরায় পৃথ্বিরাজকে আক্রমণ করেন; কিন্তু এইবার কুলাঙ্গার কান্যকুব্জাধিপতি জয়চন্দ্রের বিশ্বাসঘাতকতায় পৃথ্বিরাজ পরাস্ত হন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুর সুখসূর্য্য চিরতরে অস্তমিত হয়।

ঘোরী গজনিতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে তাঁহার বিশ্বাসী অনুচর কুতুবুদ্দিনের উপর দিল্লীশাসনের ভার অর্পণ করেন। সেখানে তাঁহার ভ্রাতাকে সিংহাসনে বসাইয়া আবার ভারতে ফিরিয়া আসেন। ১২০৬ খৃষ্টাব্দে ঘোরীর হত্যার পর কুতুবুদ্দিন দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহারই রাজত্বকালে কুতুবমিনারের নিম্মাণ আরম্ভ হয় এবং মিনারের গাত্রে আরবী অক্ষরে তাঁহার পূর্ব্বপ্রতিপালক ঘোরীর গুণকীর্ত্তন খোদিত হয়। ইঁহারই সময়ে আলতমাসের রাজত্বকালে কুতুবমিনারের নিম্মাণ শেষ হয়। পৃথ্বিরাজের বিষ্ণুমন্দিরের ভিত্তির উপর প্রকাণ্ড কুতুব মস্‌জিদের নিম্মাণকার্য্য আরম্ভ হয় ও পরে ইহারই প্রাঙ্গণে তাঁহার সমাধি স্থাপিত হয়।

১২৪৬ খৃঃ অঃ নাসিরুদ্দিন মহম্মদ সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ১২৬৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার মন্ত্রী বলবন সিংহাসন অধিকার করেন। মোগলযুদ্ধে তাঁহার পুত্রের মৃত্যুতে হৃদয় ভগ্ন হয় এবং তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পৌত্র কৈকোবাদ সিংহাসনারোহণ করেন। ইঁহার সঙ্গে সঙ্গেই দিল্লীর "দাস-বংশের" লোপ হয়।

দাসবংশের পর পাঠান জাতীয় 'খিলিজি'বংশ দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন। এই বংশের দ্বিতীয় সম্রাট আলাউদ্দিন খিলিজি ১২৯৬ খৃঃ অঃ সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইঁহারই রাজত্বকালে আউলিয়া ফকির নিজামুদ্দিন ভারতবর্ষে আগমন করেন। ইনি অত্যন্ত হিন্দুদ্বেষী ছিলেন এবং বহু দেবালয় চূর্ণ করিয়া সেই স্থানে মস্‌জিদ নিম্মাণ করান। ইহার রাজত্বকালে কুতুব মসজিদের অনেকাংশ পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল, এবং এখনও ধ্বংসাবশেষ-প্রাচীরগাত্রে তখনকার খোদিত কারুকার্য্য দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। মোগল আক্রমণ হইতে রক্ষার জন্য ইনি সিরি দুর্গ নিম্মাণ করান।

১৩২১ খৃঃ গিয়াসুদ্দীন টোগলক সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং সুরক্ষিত টোগলকাবাদে তাঁহার রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করেন। ইঁহার পুত্র মহম্মদ টোগলকের সময়ে দিল্লীতে অত্যন্ত দুর্ভিক্ষ হওয়ায় তিনি দিল্লী পরিত্যাগ করিয়া ইলোরার সন্নিকটে দৌলতাবাদে প্রস্থান করেন।

ইঁহার মৃত্যুর পর ফিরোজ সাহ টোগলক সিংহাসনারোহণ করেন এবং ৩৭ বৎসরকাল সুশৃঙ্খলে রাজ্যশাসন করেন। ইনি পূর্ব্বপুরুষগণের কীর্ত্তি বজায় রাখিবার জন্য বিশেষ যত্নবান্ ছিলেন। ১৩৬৮ খৃঃ অঃ বজ্রাঘাতে কুতুব

"যতো যতঃ ষট্‌চরণোভিবর্ত্ততে
ততস্ততঃ প্রেরিতলোললোচনা।
বিবর্ত্তিতভ্রূরিয়মদ্য শিক্ষতে
ভয়াদকামাপি হি দৃষ্টিবিভ্রমম্।—অভিজ্ঞানশকুন্তলম্

K. V. Seyne & Bros.

মিনারের সর্ব্বোচ্চ দুইটি তল নষ্ট হইয়া গেলে ফিরোজসাহ অনেক যত্নে তাহার সংস্কার করাইয়াছিলেন এবং সর্ব্বোপরি একটি মিনার প্রস্তুত করাইয়াছিলেন।

ফিরোজশার মৃত্যুর পর তৈমুরলঙ্গ ভারত আক্রমণ করেন। এই সময় হইতে বাবরের রাজ্যকাল পর্য্যন্ত দিল্লীতে উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য-কীর্ত্তি ছিল বলিয়া বোধ হয় না। সিকন্দর সাহ লোদি ও বেহলোল লোদির সমাধি, এই দুইটি লোদি-বংশীয়গণের রাজত্বকালীন স্থাপত্যকীর্ত্তি।

১৫৫৩ খৃঃ অঃ, হুমায়ুন বাদশা ইন্দ্রপ্রস্থের পুরাতন দুর্গের সংস্কার ও নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ করেন। মুসলমান ঐতিহাসিক খোন্দ আমির বলেন যে, হুমায়ুন ইন্দ্রপ্রস্থে বা 'পুরাণ' কিলা'র ধ্বংসাবশেষের যথোচিত সংস্কার করিয়া ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিগণের বাসের জন্য নগরী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। 'পুরাণাকিলা' এই নাম পরিবর্ত্তন করিয়া তিনি ইহার এক অভিনব নাম দিয়াছিলেন—নামটি "দিন পনান্"—কিন্তু বিদ্বান্ ব্যক্তি ভিন্ন কেহ এই নবীন নামে ইহাকে অভিহিত করিত না—তাহারা সকলেই ইহাকে 'পুরাণা কিলা'ই বলিত। ১৫৫৫ খৃঃ অঃ হুমায়ুন দিল্লী পুনরধিকার করিলে ইহারই সন্নিকটের সেরমঞ্জিলে পাঠাগার স্থাপনা করেন। এই স্থান হইতে একদিন সন্ধ্যার সময় হুমায়ুন বাদসাহ তাড়াতাড়ি নমাজ করিবার জন্য নামিতে গিয়া পড়িয়া গিয়া দারুণ আঘাত প্রাপ্ত হন এবং এই আঘাতই ক্রমে তাঁহার মৃত্যুর কারণ হয়।

হুমায়ুনের মৃত্যুর পর দিল্লী আদিলসাহীদিগের হস্তগত হয়। আকবর কর্ত্তৃক আদিলসাহীগণ পরাস্ত হইলেও দিল্লী তাঁহার পিতার অপমৃত্যুর স্থান বলিয়া রাজ-অনুগ্রহে বঞ্চিত হইয়াছিল, এবং সেই জন্য আকবর আগ্রাকেই রাজধানী করিয়াছিলেন।

সাহজেহান বাদসাহ দিল্লীতে পুনরায় রাজধানী উঠাইয়া লইয়া আসেন। ১৬৩৮-১৬৫৮ খৃঃ অব্দের মধ্যে আধুনিক দিল্লীর প্রতিষ্ঠা হয়। সাহজেহানের এই নূতন রাজধানী সাহজেহানবাদ বা জেহানাবাদ নামে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বোধ হয় আগ্রা সাহাজানের জীবনসর্ব্বস্ব মোমতাজ বিবির সমাধিস্থল বলিয়া তাঁহার নিকট ক্রমে অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল —তাই তিনি দিল্লীতে হুমায়ুন বাদসাহের বাসস্থানের উত্তরে যমুনাতীরে এই নূতন নগরীর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বর্ণয়ার বলেন, সাহজেহান তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্য এই নগর সাহজেহানাবাদ নামে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এই নগরী সম্ভবতঃ বিখ্যাত পারস্যশিল্পী আলিমর্দ্দনের তত্ত্বাবধানে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইঁহারই সময়ের "আলি-মর্দ্দনের খাল" এখনও বিদ্যমান আছে।

ইংরেজ রাজত্বকালীন দিল্লী-ইতিহাসের কলঙ্কিত পৃষ্ঠা সিপাহীবিদ্রোহ। যে সমস্ত ইংরেজ বীরপুরুষ এই বিদ্রোহ দমন করিতে প্রাণ-বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের স্মৃতি, ঘটনাস্থলে, ইংরেজরাজ সযত্নে রক্ষা করিয়াছিল।

সাধারণ পর্য্যটকের সুবিধা-অসুবিধা।

দিল্লীর ষ্টেশনের সন্নিকটে অনেক ভাল ভাল সরাই আছে, কুলি বা গাড়োয়ানদের বলিলেই লইয়া যায়। হিন্দু ও মুসলমানের পৃথক্ পৃথক্ সরাই আছে। ঘরের ভাড়া অল্প। এই সমস্ত সরাইতে নিজের আহারের বন্দোবস্ত করিতে পারেন বা সরাইওয়ালার খাদ্য আহার করিতে পারেন; তাহাতে সরাইওয়ালার কোন আপত্তি নাই। সরাইএর সন্নিকটেই ভাল খাবারের দোকান আছে এবং কলিকাতা অপেক্ষা সুলভ। দিল্লী সহরের ভিতর যাতায়াতের জন্য এক্কা পাওয়া যায়, ভাল গাড়ী পাওয়া যায়। গাড়ীর তুলনায় এক্কার ভাড়া অল্প। এখন দিল্লীতে ইলেক্‌ট্রিক ট্রাম হইয়াছে —ইহাতে কোর্ট জুমা মসজিদ প্রভৃতি অনেক স্থানে যাইবার সুবিধা হইয়াছে। পর্য্যটকের পক্ষে দিন হিসাবে গাড়ী লওয়াই সুবিধা। ভাল গাড়ীর ভাড়া কলিকাতার গাড়ির ভাড়ার সমান। সরাইওয়ালা ও গাড়োয়ানেরা বিশ্বাসী, তবে সর্ব্বত্র সাবধান হওয়াই ভাল। দিল্লীতে ডাক্‌বাংলা নাই, তবে অনেক ইংরেজের হোটেল আছে।

দিল্লী এতকালের পুরাতন সহর ও ভিন্ন রাজবংশীয়-গণের রাজধানী যে, এখানকার সমস্ত দ্রষ্টব্যস্থান বেশ ভাল করিয়া দেখিতে হইলে ২।৪ দিনের অবকাশে বঙ্গবাসীর কৌতূহল চরিতার্থ হওয়া অসম্ভব। আমরা যথাসম্ভব সমস্ত স্থানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিব; কিন্তু পর্য্যাটক, তাঁহার অবকাশানুযায়ী, কোন্ কোন্ স্থান তাঁহার বিশেষ দ্রষ্টব্য তাহা পূর্ব্ব হইতে স্থির করিয়া লইবেন।

দিল্লীর রেলষ্টেশন।
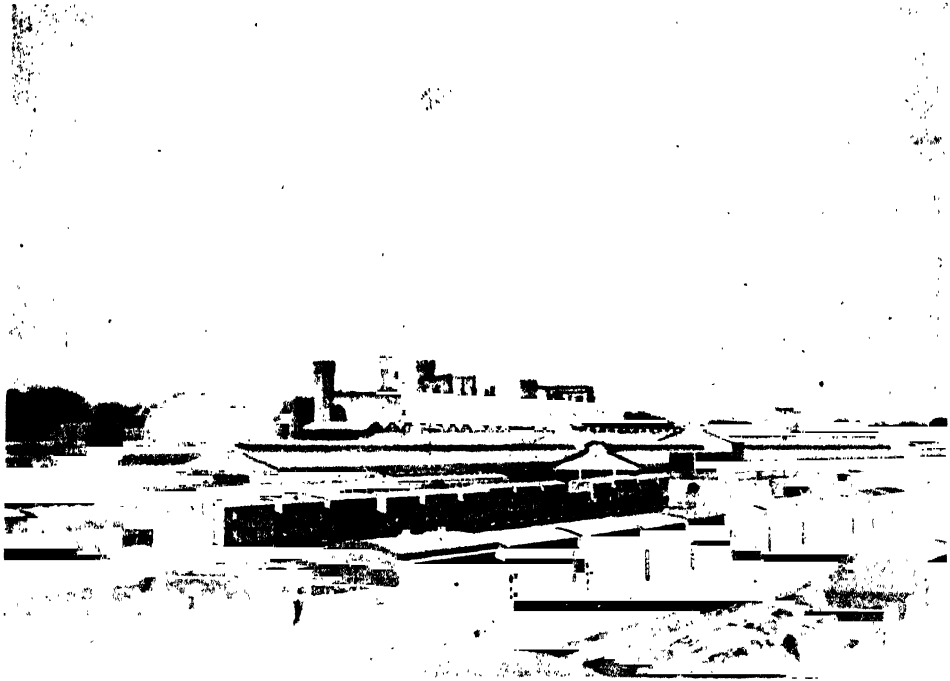
আমাদের নির্দ্দিষ্ট পর্য্যায় অনুসারে দেখিতে আরম্ভ করিলে আশা করি অনেকের বিশেষ সুবিধা হইবে।

কাশ্মীর গেট হইতে আরম্ভ করিয়া বরাবর পশ্চিম মুখে সার্কুলার রোড দিয়া অগ্রসর হইয়া যেখানে পূর্ব্বে মোরী গেট ছিল সেই স্থান দিয়া দক্ষিণ মুখে সহরে প্রবেশ করিতে হয়। এই কাশ্মীর গেট ১৪ই সেপ্টেম্বর ১৮৫৭ খৃঃ অঃ সিপাহী বিদ্রোহের সময় লেফ্‌টানেণ্ট হোম ও সালকেল্ড ভঙ্গ করিয়া সহরে প্রবেশ করিতে সমর্থ হন। এই থানে যে সমস্ত বীরগণ কর্ত্তৃক এই অসমসাহসিক কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল তাঁহাদের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ লর্ড নেপিয়ার কর্ত্তৃক একখানি প্রস্তরফলক বসান আছে। ক্রমে বাম দিকে অগ্রসর হইয়া রেলওয়ে ও কর্ণাল রোড পার হইয়া যেখানে পূর্ব্বে কাবুল গেট ছিল, সেইখান দিয়া সহরে পড়া যায়। ক্রমে অগ্রসর হইলে দক্ষিণভাগে কৃষ্ণগঞ্জ ছাড়াইয়া আলি মর্দ্দনের খাল পার হইয়া যাইতে হয়।

আলিমর্দ্দনের খাল। এই খালে সাহজাহান বাদসাহের সময় আলিমর্দ্দনের তত্বাবধানে প্রস্তুত হইয়াছিল। আলিমর্দ্দন পারস্য রাজের অধীনে কান্দাহারের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। পারস্যের সাহের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া ১৬৩৭ খৃঃ অঃ সাহজাহান বাদসাহের হস্তে কান্দাহার সমর্পণ করায় বাদসাহ বহুসম্মানে তাঁহাকে দিল্লীতে আনাইয়া নূতন সহর নির্ম্মাণের ভার তাঁহার হস্তে সমর্পণ করেন—সাহজাহান বাদসাহের সময়ের স্থাপত্য-কীর্ত্তি সমূহ ইঁহারই তত্বাবধানে নির্ম্মিত হয়।

এই আলিমর্দ্দনের খাল পশ্চিমাভিমুখ হইতে আসিয়া কাশ্মীর গেট দিয়া পূর্ব্বমুখে সহরের ভিতর চাঁদনীচক, বেগমবাগ, ফেজ বাজার, লাল কেল্লা ইত্যাদি হইয়া যমুনার সঙ্গে মিশিয়াছে।

কিছুদূর অগ্রসর হইলে দক্ষিণে সদর বাজার থাকে, খালের উপরের পুল পার হইয়া পূর্ব্বে যেখানে লাহোর গেট ছিল সেই স্থান দিয়া সহরে প্রবেশের পথ। ১৮৯৩ খৃঃ অঃ এই গেট ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়। এই স্থান হইতে একটী অপ্রশস্ত গলির ভিতর দিয়া নিকল্‌সনের স্মৃতিচিহ্ন দেখিতে যাইতে হয়। এই থানেই জেনারেল নিকল্‌সন ১৮৫৭

সেপ্টেম্বর ১৮৫৭ খৃঃ অঃ সাংঘাতিকরূপে আহত হন। ফিরিয়া আসিয়া বড়বাজার দিয়া অগ্রসর হইলে সম্মুখে চাঁদনী চক্ এবং ইহারই পশ্চিমপ্রান্তে ফতেপুরী বেগমের মস্‌জিদ।

প্রতিমূর্ত্তি আছে। 'কুইন্স গার্ডেনের' ভিতর দ্রষ্টব্য—ভূতপূর্ব্ব মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রতিমূর্ত্তি ও দিল্লী দুর্গ হইতে আনীত একখণ্ড শ্বেতপ্রস্তর-নির্ম্মিত স্নানপাত্র। ইহা আয়তনে ১০ফুট × ৯½ফুট × ৩ ফুট।

চাঁদনী চক্।

চাঁদনী চক্। সাহজেহানের প্রিয়তমা কন্যা জাহানারা বেগম এই প্রশস্ত পথ নির্ম্মাণ করান এবং তাহার উত্তরে একটি বাগান ও সরাই নির্ম্মাণ করান। এই বাগান এক্ষণে "কুইন্স গার্ডেন" নামে অভিহিত। সরাইটি সিপাহী বিদ্রোহের পর ভাঙ্গিয়া সেই স্থানে এক্ষণে দিল্লী ইনস্‌টিটিউট প্রতিষ্ঠিত। এই পথ দৈর্ঘ্যে কিছু কম এক মাইল ও প্রস্থে ৭৭ হাত, এবং ইহার মধ্যভাগ দিয়া আলিমর্দ্দনের খালের গতি ছিল ও তাহার দুই পাড়ে বৃক্ষরাজি সুশোভিত। এক্ষণে এই খালের উপর খিলান গাথা ও তাহার উপর বিপণির সার।

দিল্লী ইন্সটিটিউট। এই দিল্লী ইন্স্‌টিটিউটের ভিতর দিল্লী মিউজিয়ম একটি দ্রষ্টব্য স্থান। ছোট হইলেও ইহাতে এমন অনেক জিনিষ আছে এখন যাহা কলিকাতা মিউজিয়মে নাই। এই মিউজিয়মে রাজপুত বীর জয়মল্ল ও পুত্তের ভগ্ন প্রস্তর-

মাঝামাঝি স্থানে একটি পুষ্করিণী ছিল। সেখানে এখন ক্লক টাওয়ার প্রতিষ্ঠিত আছে। এই স্থানে পূর্ব্বে বহু বিপণি ছিল এবং ইহারই পার্শ্ববর্ত্তী স্থান চাঁদনী চক্ নামে বিখ্যাত। চাঁদনী চকের চতুঃপার্শ্বের গৃহাদি পূর্ব্বে এক সমান উচ্চ এবং খিলান ও চিত্রাদি-সুশোভিত ছিল। এখন তাহা অন্য আকার ধারণ করিয়াছে।

ফতেপুরী-মস্‌জিদ।

সাহাজাহান বাদসাহের ফতেপুরী বেগম কর্ত্তৃক এই মস্‌জিদ ১৬৫০ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়। ইহা আগাগোড়া বালীপাথরের প্রস্তুত এবং ইহাতে একটিমাত্র গম্বুজ আছে তাহার উপর 'পঙ্কের কাজ' করা। সম্মুখে দুই দিকে দুইটি অষ্টকোণ মিনারেট আছে। উচ্চে প্রায় ৮০ফুট। পশ্চাদ্দিকে চারিটি চূড়া আছে। মধ্যবর্ত্তী প্রবেশদ্বারের

সম্মুখের প্রাঙ্গণে একটি প্রস্তর নির্ম্মিত বেদী। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে এই মস্‌জিদ হাজি মহম্মদ তকি কর্তৃক সংস্কৃত হয়। এই কথাটি একটি প্রস্তর ফলকে লিখিত আছে।

সোনেহরী মস্‌জিদ্

এই চাঁদনী চকের সন্নিকটে 'সোনেহরী মস্‌জিদ' বা রোসন উদ্‌দৌলার স্বর্ণ মস্‌জিদ। নাদির সাহ এইখানে বসিয়া দিল্লী অবলুণ্ঠন করান। এই মসজিদে বসিয়া নাদির দিল্লী অধিবাসীর আবালবৃদ্ধবনিতাকে হত্যা করিবার আজ্ঞা দেন। এই হত্যাকাণ্ড বেলা ৭টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত চলে। পরে মহম্মদ সাহের অনুনয়ে হত্যার আজ্ঞা বন্ধ করেন। খুনিদরওয়াজার নিকট রক্তস্রোত প্রবাহিত হওয়ায় সেই স্থান এখনও ঐ নামেই পরিচিত।

ইহা ছাড়িয়া বামদিকে অগ্রসর হইলে দিল্লী কোতোয়ালী বা পুলিশে পৌছান যায়। সিপাহী বিদ্রোহের সময় কর্ণেল হড্‌সন দিল্লী অধিকারের পর তথনকার দিল্লীশ্বর (২য়) বাহাদুর সাহ যিনি প্রাণ ভয়ে হুমায়ুনের কবরে আশ্রয় লইয়াছিলেন—তাঁহাকে ধৃত করিয়া আনে। তাহার পরদিবস আবার তাঁহার দুই পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রকে সৈন্য লইয়া গিয়া যখন বন্দী করিয়া একায় করিয়া আনিতেছিলেন—এই দলে দিল্লীঅধিবাসিগণ উত্তেজিত হইয়া উঠে—ইহার বিদ্রোহের অন্যতম নেতা বলিয়া পুনরাক্রমণের ভয়ে হড্‌সন সাহেব স্বহস্তে সেই হতভাগ্য রাজপুত্রদিগকে গুলি করিয়া মারেন এবং তাহাদের মৃতদেহ লোক নয়নের সমক্ষে দণ্ড ও প্রতিহিংসার চিহ্নস্বরূপ এই কোতোয়ালীতে, যেখানে বহু খৃষ্টান নরনারী বিদ্রোহিগণ কর্তৃক হত হইয়াছিল সেই স্থানে ফেলিয়া রাখেন।

এই স্থান হইতে কিছুদূর অগ্রসর হইলেই জুমা মসজিদ।

জুমামস্‌জিদ। ১৬৪৪ খৃঃ সাজাহান বাদসাহ ১০ লক্ষ মুদ্রাব্যয় করিয়া এই সুবৃহৎ মসজিদের নির্ম্মাণ আরম্ভ করান—ইহা নির্ম্মাণ করিতে ৫ সহস্রলোক ৬ বৎসর যাবৎ প্রত্যহ কার্য্য করে। এই মসজিদ প্রধানতঃ রক্তপ্রস্তর নির্ম্মিত। ইহার তিনটি প্রবেশদ্বার। পূর্ব্ব, উত্তর ও দক্ষিণদিকের দ্বারে প্রবেশ করিতে হইলে ৩৫, ৩৯ ও ৩৩টি ধাপ অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়। এই পূর্ব্বদিকের দ্বার
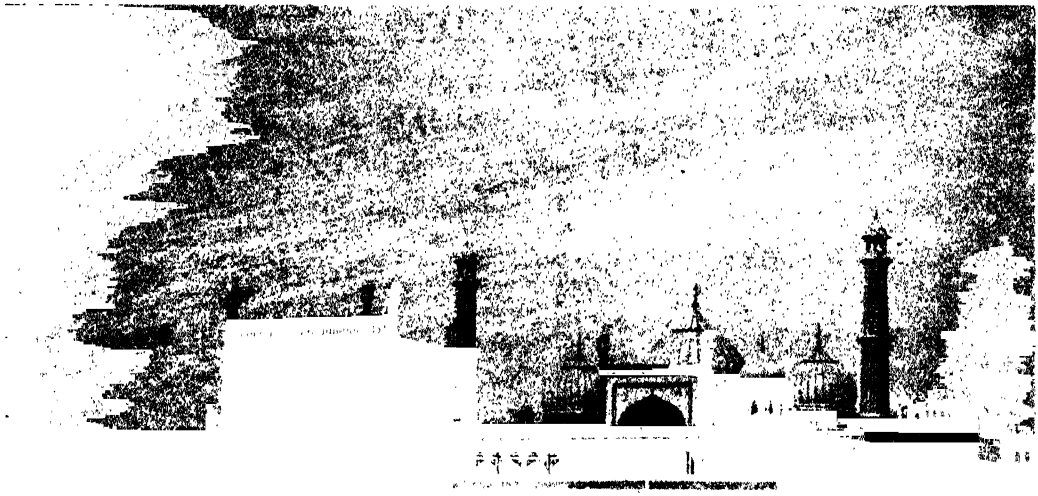
জুমা মসজিদ।

দিয়াই মুসলমান নরপতিগণ মস্‌জিদে প্রবেশ করিতেন এবং এখনও পর্য্যন্ত ভারতরাজ-প্রতিনিধি এবং রাজ-পরিবারবর্গ ব্যতীত আর কাহারও এই দ্বার দিয়া প্রবেশের অধিকার নাই। এই মস্‌জিদ-মধ্যস্থিত প্রাঙ্গণ দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ২৭২ হাত, এবং ইহার মধ্যস্থলে একটি শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত ৩০ হাত লম্বা ও ২৪ হাত চওড়া চৌবাচ্চা আছে।

এই প্রাঙ্গণের তিনদিকে রক্ত-প্রস্তর-নির্ম্মিত দালান। এই দালানের পূর্ব্বোত্তর কোণে মহম্মদের জামাতৃলিখিত কোরাণের ২৮শ সূত্র এবং মহম্মদের দৌহিত্রলিখিত কোরাণের ১৫শ সূত্র, মহম্মদের পাদুকা, মহম্মদের একগাছি রক্তবর্ণ শ্মশ্রু, এবং একটি পাথরের উপর মহম্মদের পদচিহ্ন প্রভৃতি সযত্নে সংরক্ষিত আছে। এই সমস্ত স্মৃতিচিহ্ন মেদিনা হইতে তৈমুর কর্ত্তৃক আনীত বলিয়া প্রবাদ। উপাসনার স্থান মসজিদ প্রাঙ্গণের পশ্চিমে অবস্থিত। ইহা দৈর্ঘ্যে ১৭৪ হাত এবং প্রস্থে ৬০ হাত। মসজিদের মেজেতে ৮৯৯ জনের উপযুক্ত নমাজের জন্য চিহ্নিত স্থান আছে, এবং মধ্যস্থলে উপাসনার বেদী। মসজিদের ভিতরের দেওয়ালের গাত্রে শ্বেত প্রস্তরে খোদিত মসজিদের ইতিহাস ও মাহাত্ম্য পারসী অক্ষরে লিখিত আছে। মসজিদের সম্মুখের প্রত্যেক কোণে ১৩০ ফুট উচ্চ রক্ত ও শ্বেতপ্রস্তর-নির্ম্মিত ত্রিতল মিনারেট। প্রত্যেক মিনারেটের ১৩০টি ধাপ আছে; এবং অষ্টকোণ বিশিষ্ট উপরকার ছাদ শ্বেতপ্রস্তর-নির্ম্মিত। মসজিদের উপর শ্বেত ও কৃষ্ণ প্রস্তরের ডোরাকাটা বিরাট গম্বুজ।

এইস্থানের নিকটে দিল্লীর রাজপ্রাসাদ।

জুমা মস্‌জিদের সন্নিকটেই জৈন-মন্দির। এই মন্দিরের প্রবেশপথ অতিশয় দক্ষতার সহিত নির্ম্মিত। মন্দিরের উপরিস্থিত গম্বুজের নিম্নদিক সুবর্ণ রঞ্জিত। এখানে একটি উৎকৃষ্ট কারুকার্য্যের হস্তিদন্তের চন্দ্রাতপের নিম্নে একটি বুদ্ধমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে।

এই স্থানের অনতিদূরেই আওরঙ্গজীব কন্যা জিন্নৎউন্নিসা বেগমের মস্‌জিদ্। ইনি 'কুমারী' বেগম নামেই পরিচিত। এই মসজিদ, জুমামসজিদ অপেক্ষা ক্ষুদ্র হইলেও, দ্রষ্টব্য। জিন্নৎউন্নিসার মৃত্যুর পর এই মসজিদের সন্নিকটেই তাঁহাকে কবর দেওয়া হয়। সিপাহী-বিদ্রোহের সময় ইংরেজ সেনানীর দ্বারায় ইহার অনেকাংশ নষ্ট হইয়াছে—পূর্ব্বের, জিন্নত-উন্নিসার প্রস্তর নির্ম্মিত কবরটি পর্য্যন্ত নষ্ট হয়—এক্ষণে কোন সহৃদয় ব্যক্তিকর্ত্তৃক সেইস্থানে একটি ক্ষুদ্র কবর নির্ম্মিত হইয়াছে।

এখান হইতে সাজাহান-নির্ম্মিত দিল্লী রাজপ্রাসাদ বা দুর্গের মধ্যে যাইতে হইলে, দুর্গের "দিল্লী দ্বার" দিয়া প্রবেশ করিতে হয়। ভাল করিয়া এই প্রাসাদ দেখিতে হইলে এক দিন কেবল প্রাসাদ দেখাই উচিত। দুর্গদ্বারের দুই পার্শ্বে চিতোরবীর জয়মল্ল ও পত্তের প্রস্তরনির্ম্মিত মূর্ত্তিদ্বয় রক্ষিত আছে। আকবর বাদসাহ চিতোর জয়ের পর ইহাদের মূর্ত্তি নিজের কীর্ত্তি ঘোষণার জন্য দুর্গদ্বারে স্থাপিত করিয়াছিলেন। তাহার পর সাহজাহান বাদসাহ কর্ত্তৃক এই মূর্ত্তিদ্বয় দিল্লী দুর্গদ্বারে প্রতিষ্ঠিত হয়; কিন্তু অবশেষে আওরঙ্গজেব বাদসাহের আজ্ঞায় শত খণ্ড করিয়া এই মূর্ত্তিদ্বয় ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়—তাহার পর অনেকদিন যাবৎ ইহার আর কোন খোঁজখবর ছিল না। তাহার পর বিখ্যাত শিল্পী ম্যাকেঞ্জি সাহেবের তত্ত্বাবধানে পুরাতন মূর্ত্তির অনুকরণে এই মূর্ত্তি প্রস্তুত হয়। হস্তী দুইটি কৃষ্ণ প্রস্তরের ও তাহার দাঁত শ্বেত প্রস্তর-নির্ম্মিত—মনুষ্যমূর্ত্তি রক্ত প্রস্তরের এবং হাওদা শ্বেত ও পীতপ্রস্তর-নির্ম্মিত। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে এই মূর্ত্তির ভগ্নাংশগুলি দেওয়ানী আমের সন্নিকটে মৃত্তিকা মধ্যে প্রোথিত অবস্থায় পাওয়া যায়।

সাহজাহানের দিল্লী প্রাসাদ ও দুর্গ

এই প্রাসাদের নাম 'লাল কেল্লা' ১৬০৮ হইতে ১৬৪৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ইহা নির্ম্মিত হয়। ইহার পর দিল্লীর চতুঃপার্শ্বের বৃহৎ প্রাকার নির্ম্মিত হয়। এই প্রাকার নির্ম্মাণ করিতে প্রায় দেড়লক্ষ মুদ্রা ব্যয় হয়, কিন্তু তাড়াতাড়ি চারিমাসের মধ্যে নির্ম্মাণের জন্য শীঘ্রই ইহা ভগ্নিয়া যায়। তৎপরে পুনরায় নূতন প্রাকার প্রস্তুত করিতে ৪ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় হয়; নির্ম্মাণ করিতে সাত বৎসর সময় লাগে। ইহা উচ্চে ১৮ হাত এবং প্রস্থে ৮ হাত। ইংরেজ অধিকারের সময় এই প্রাচীরের অনেকাংশের সংস্কার, পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিয়া ইহাকে আধুনিক সময়ের যুদ্ধোপযোগী করা হইয়াছে।

এই দুর্গ ও প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিতে প্রায় এক কোটি মুদ্রা

ব্যয় হয়। দুর্গ নির্ম্মাণের পর সাহজাহান বাদসাহ যমুনামুখী 'সম্মন্ বুরুজ' দ্বার দিয়া প্রথম প্রবেশ করেন এবং "দেওয়ানী আমে" তাঁহার প্রথম দরবারের অধিবেশন হয়।

দুর্গপ্রাচীরের পরিধি প্রায় দেড় মাইল। নদীর দিকে ইহা ৬০ ফুট এবং অন্যান্য দিকে ৭৫ ফুট উচ্চ। ভিতের নিকট ইহা প্রস্থে ৪৫ ফুট। নদীর দিক্ ভিন্ন অপর সকলদিকে ৭৫ ফুট প্রস্থ ও ৩০ ফুট গভীর পরিখা আছে। ইহার প্রধান দ্বার দুইটি—'লাহোর গেট' ও 'দিল্লী গেট'—সুদৃঢ়রূপে গঠিত। পূর্ব্বদিকে ইহা ছাড়া আরও ৫টি দ্বার ছিল। তাহার তিনটি এখন বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এখন যে দুইটি দ্বারা আছে; তাহার উত্তরটি দিয়া সালিমগড়ের পুলের দিকে এবং অপরটি দিয়া খাস মহলে যাওয়া যায়। এই সালিমগড় হইয়াই ইংরেজ সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ দিল্লী প্রবেশ করেন। এই দুর্গের অনেকাংশ ভাঙ্গিয়া এক্ষণে সেনানিবাস, প্রভৃতি নির্ম্মাণ করায় ইহার সৌন্দর্য্য অনেকটা নষ্ট হইয়াছে।

দিল্লীদুর্গ।

পূর্ব্বে দিল্লী প্রবেশের ১৪টি তোরণদ্বার ছিল। তাহার মধ্যে মোরী, কাবুল, লাহোর, কলিকাতা ও পাথরঘাটি দ্বারগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়াছে। উপস্থিত যেগুলি আছে, তাহা কাশ্মীর, আজমীর, তুর্কী, দিল্লী, খরিস্তী, রাজঘাট, নিগমবোধ কেল্লাঘাট ও বদর রাও নামে অভিহিত।

দুর্গের মধ্যে 'দিল্লী' ও "লাহোর" তোরণ প্রধান দ্রষ্টব্য। লাহোর তোরণটি ত্রিতল ও উচ্চে ১১০ ফুট। এই তোরণ দ্বার যেমন সুদৃঢ় তেমনি সুন্দর। ইহার উপরের খিলান ও কারুকার্য্য অতি মনোরম। উপরে ৭টি শ্বেত প্রস্তরের গম্বুজ আছে। লাহোর-তোরণ-সংশ্লিষ্ট প্রবেশপথ ২৩০ ফুট লম্বা ও ১৩ ফুট প্রস্থ এবং ইহার দুই পার্শ্বে ৩২টি করিয়া কামরা আছে—এগুলি বিপণী রূপে ব্যবহৃত! উত্তর দিকের পথ দিয়া উপরে উঠিবার সিঁড়ি আছে। নবাবী আমলে এই তোরণের সম্মুখস্থ পথের উভয় পার্শ্বে শত শত স্বর্ণকার, সূত্রধার, চর্ম্মকারগণ বাদসাহী ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিত।

দুর্গের সন্নিকটে বাদসাহী 'নহবৎখানা।' বাদসাহী রাজত্বের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে সে অপূর্ব্ব সানাইয়ের আলাপ আর শুনা যায় না—এক্ষণে এই রক্ত-প্রস্তর নির্ম্মিত দ্বিতল গৃহটিই তাহার স্মৃতি বহন করিতেছে।

দেউড়ীর সম্মুখের খিলান-আচ্ছাদিত পথ দিয়া অগ্রসর হইলে 'নকার খানার' বৃহৎ প্রাঙ্গণে যাওয়া যায়। এই প্রাঙ্গণের চতুঃপার্শ্বস্থ গৃহকক্ষে ওমরাহগণ প্রহরী রূপে থাকিতেন। এই 'নকারখানার' ভিতর দিয়া রাজপরিবারবর্গের অশ্বপৃষ্ঠে দেওয়ানী "অম্‌খসে" যাইবার পথ। দেওয়ানী আমে প্রবেশকালে ওমরাহগণকেও পদব্রজে যাইতে হইত। মোগলসাম্রাজ্যের দুর্দ্দশার সময়েও এই নিয়ম বিশেষভাবে পালিত হইত।

এই পথের পূর্ব্বদিকে দেওয়ানী আমের প্রাঙ্গণ

বিখ্যাত 'দেওয়ানী আম।' প্রাঙ্গণের চতুঃপার্শ্বস্থ গৃহ সকলে রাজকর্ম্মচারী ও ওমরাহগণ পাহারা স্বরূপ অবস্থান করিতেন।

প্রাঙ্গণের উত্তরে বাদসাহী রন্ধনশালা ছিল; এবং ইহারই সন্নিকটে 'মাহতর' ও 'হায়াৎবক্স' উদ্যান দ্বয় ছিল। তাহার উত্তরেই পরিখা। পরিখার উত্তরেই বাদসাহী অশ্বশালা। প্রাঙ্গণের দক্ষিণে বেগম মহল ও ওমরাহগণের বাসস্থান। দেওয়ানী আমের পশ্চাতে 'ইমতিয়াজ মহল' তাহার পূর্ব্বদিকে 'রঙ্গ মহাল' বা বেগমগণের বাসস্থান।

দেওয়ানী আম বা প্রকাশ্য রাজসভা রক্তপ্রস্তর নিৰ্ম্মিত। পূর্ব্বে এই সভাগৃহের স্তম্ভ শ্রেণী ও দেওয়াল বিচিত্ররূপে চিত্রিত ও স্বর্ণ রঞ্জিত ছিল। এখন তাহার কিছুই নাই! ইহারই পূর্ব্বভাগে অত্যুচ্চ বেদীর উপর বাদসাহগণের বিচার আসন ছিল। সিংহাসনের উপরিভাগে বিচিত্র কারুকার্য্যময় শ্বেতপ্রস্তর নিৰ্ম্মিত, স্বর্ণ মণ্ডিত আচ্ছাদন ছিল। দেওয়ালে বহুমূল্য মণিমাণিকা খচিত ফল, ফুল ও জীবজন্তুর প্রতিকৃতি ছিল। মণি মণিক্যাদি এখন আর কিছুই নাই। তৎপরিবর্ত্তে এক্ষণে সেখানে গালা দিয়া ভরাট করা হইয়াছে। এই সকল কারুকার্য্য ফরাশী শিল্পী অষ্টিন কৃত। সিংহাসনের সম্মুখে বিচিত্র কারু-কার্য্য খচিত অত্যুচ্চ আসন—এইস্থান হইতে উজীর, বাদসাহকে কাগজাদি দেখাইতেন। এই দেওয়ালের উত্তরাংশে প্রস্তরের উপর মণিমাণিকা খচিত অষ্টিন কৃত একটি বহুমূল্য আলেখ্য ছিল। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে জনৈক ইংরাজ সেনানী কর্ত্তৃক ইহা লুণ্ঠিত হয়। পরে ইহা গবর্মেণ্টের নিকট ৭৫০০৲ বিক্রীত হয়। ইহার কতকাংশ এখন বিলাতের সাউথ কেন্সিংটন মিউজিয়মে আছে।

দেওয়ানী আম।

এই সভাগৃহে সকল শ্রেণীর লোকের প্রবেশ অধিকার থাকায়—ইহার নাম "আম"। এই স্থান হইতে বাদসাহগণ সৈনিক পরিদর্শন করিতেন, এবং সেনানীদের সমর-কৌশল পরীক্ষা করিতেন। তৎপরে সকলের আবেদন শুনিতেন এবং বিচার করিতেন। ইহা ব্যতীত 'আদালত খানায়' বা প্রধান বিচারালয়ে বসিয়া সম্রাট্ সপ্তাহে একদিন, দুইজন প্রধান কাজীর সাহায্যে বিচার করিতেন।

দেওয়ানী আমের উত্তর-পূর্ব্বদিকের দেওয়ালের মধ্যস্থলে একটি প্রবেশ পথ সর্ব্বদা লাল পরদা আবৃত থাকায় 'লাল পরদা' নামে অভিহিত ছিল। এই পথ দিয়া দেওয়ানী খাসে যাইবার আর একটি দ্বার ছিল। দেওয়ানী খাসের প্রাঙ্গণের উত্তরে 'মোতিমস্‌জিদ্।' ইহা আওরঙ্গজেব বাদসাহ এক লক্ষ ৬০ হাজার মুদ্রা ব্যয়ে নির্ম্মাণ করান। মসজিদটি ক্ষুদ্র হইলে উৎকৃষ্ট মর্ম্মর প্রস্তর নির্ম্মিত। মসজিদটি ছাদ পর্য্যন্ত মাত্র ১৬ হাত উচ্চ। ইহার উপর তিনটি গোল পল তোলা গম্বুজ আছে এবং তাহার উপর সোণার কলাই করা তাম্র 'কলস' আছে। প্রাঙ্গণটি শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত এবং ইহার মধ্যস্থলে হস্ত পদ প্রক্ষালনার্থ একটি চৌবাচ্চা আছে। মোগল বাদসাহগণ এই মসজিদের পূর্ব্বদ্বার দিয়া এবং বেগমগণ উত্তরের গুপ্তদ্বার দিয়া উপাসনা করিতে আসিতেন।

মোতিমসজিদের ঠিক পূর্ব্বে বাদসাহী স্নানাগার বা হমাম। এখানে তিনটি মর্ম্মর কামরা আছে। গৃহগাত্র, জলাধার ও ভূমিতল পুষ্পে পুষ্পলতাদি চিত্রিত বিবিধ বর্ণের বহুমূল্য মণিমাণিক্য খচিত ছিল। যমুনার দিকের গৃহমধ্যে তিনটী জলাধার আছে। পূর্ব্বদিকের দেওয়ালে একটি মর্ম্মর নির্ম্মিত জাফরি আচ্ছাদিত ছোট জানালা আছে। দ্বিতীয় গৃহে একটী মাত্র জলাধার আছে; এবং তৃতীয় গৃহের মধ্যস্থলে

হামাম।
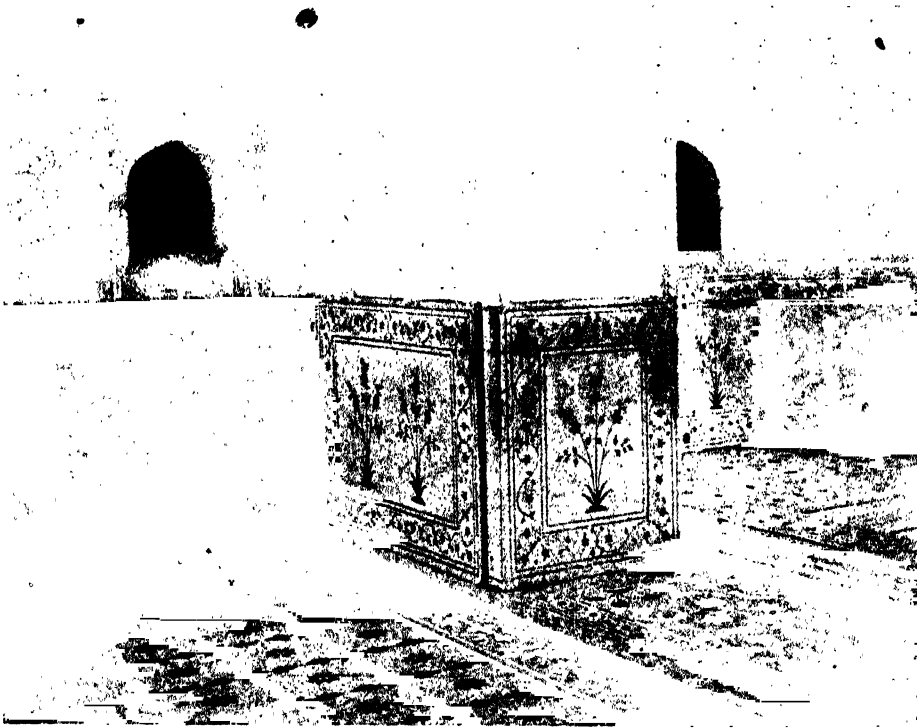
সুন্দর কারু কার্য্যময় আচ্ছাদনের ভিতর দিয়া উষ্ণবাষ্প আসিবার একটি পথ আছে। ইহার পশ্চাতে জল গরম হইত। হমামের মধ্যস্থলে উৎস ছিল। গরম জলের আধারটি বহুমূল্য মণিমাণিক্য খচিত ছিল এবং তন্নিকটবর্ত্তী শীতল জলাধারের চারি কোণে সুবর্ণ নির্ম্মিত, চারিটি নল ছিল। এখন আর সুবর্ণ, মণিমাণিক্যের কিছুই নাই।

মহারাষ্ট্রীরা ইহা গলাইয়া ২৮ লক্ষ টাকা পান। এক্ষণে এই ছাদের চিত্রিত তলদেশ কাষ্ঠাচ্ছাদিত। মধ্যের গৃহটিতে জগদ্বিখ্যাত তখ্‌ৎ-ই-তাউস (বা ময়ূর সিংহাসন) স্থাপিত ছিল। এই গৃহ সুন্দর দ্বাদশটি স্তম্ভবেষ্টিত। ইহা দৈর্ঘ্যে ৩২ হাত ও প্রস্থে ১৮ হাত; এবং ইহার উত্তর দক্ষিণের খিলানের উপর পারসী অক্ষরে লিখিত আছে,—
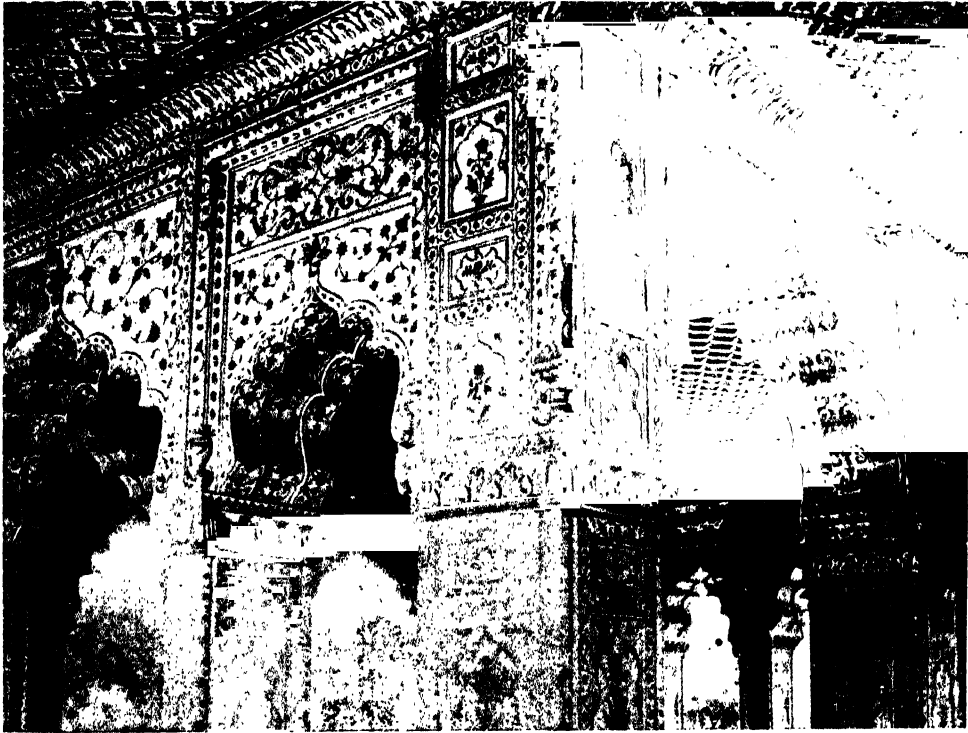
দেওয়ানী খাস—ভিতরের দৃশ্য।

দেওয়ানী খাস, বা বাদসাহের বিশেষ সভা; হমামের দক্ষিণে অবস্থিত। ইহা উৎকৃষ্ট শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত,—আয়তনে ৬০ হাত দীর্ঘ এবং ৪৪ হাত প্রস্থ। গৃহের চতুষ্পার্শ্বে মর্ম্মর নির্ম্মিত বর্ণনাতীত সুন্দর কারুকার্য্যখচিত ৩২টি স্তম্ভ পরিশোভিত। এখানকার কারুকার্য্য ভাস্করবিদ্যার আদর্শ। ইহার শোভা চক্ষে না দেখিলে বর্ণনা করিয়া বোঝান অসম্ভব। ইহার ছাদ পূর্ব্বে সুবর্ণ ও রৌপ্যমণ্ডিত ছিল। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে সদাসিব রাও ভাও ইহার দস্তা, রৌপ্য ও স্বর্ণের ফলকগুলি লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যান। ইহা ৩৯ লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে প্রস্তুত হইয়াছিল।

"অগর ফির্‌দৌস বরুয়ে জমীনস্ত।
হমীনস্ত, হমীনস্ত, হমীনস্ত॥"
যদ্যপি সম্ভবে স্বর্গ কখনও ধরায়।
হেথায়, হেথায় তাহা, হেথায় হেথায়॥

এই দরবার গৃহে বসিয়া বাদসাহগণ প্রতি সন্ধ্যায় রাজ্য সম্বন্ধীয় বিশেষ কার্য্যাবলীর পরিদর্শন ও আলোচনা করিতেন। তখন সেখানে সমস্ত ওমরাহগণকে উপস্থিত থাকিতে হইত। এই দরবার গৃহে বহু স্মরণীয় ঘটনা ঘটিয়াছে। এই দরবার গৃহে বসিয়া মোগল বাদসাহ ফিরোক সিয়র ১৭১৬ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার গেব্রিল হেমিল্টনকে

দেওয়ানী খাস—বাহিরের দৃশ্য।

টিয়াপাখী ছিল। এই আসনও ফরাসী শিল্পী অষ্টিনের তত্ত্বাবধানে নির্ম্মিত হয়। এই সিংহাসনের এক প্রতিকৃতি লক্ষ্ণৌ ইমাম বাড়ায় ছিল। সিপাহী বিদ্রোহের সময় বোধ হয় তাহাও নষ্ট হইয়া যায়—যে প্রস্তর বেদীর উপর আসনটি অধিষ্ঠিত ছিল, সেটি এড্‌ওয়ার্ড প্রিন্স অব ওয়েল্‌সের আগমন সময়ে, উপস্থিত যেখানে আছে সেই স্থানে স্থানান্তরিত করা হয়।

ইমামের সম্মুখেই বাদসাহদিগের খাস মহল। এই খাস মহলের ভিতর 'তস্‌বিখানা' বা ভজনাগার, 'খোয়াবগাহ' বা শয়নমন্দির এবং বৈঠকখানা অবস্থিত। প্রাসাদের অন্যান্য কক্ষের ন্যায় এই কক্ষেরও মণিমাণিক্য অপহৃত হইয়াছে। সে সকল স্থানে এক্ষণে কাচ বসাইয়া রাখা হইয়াছে।
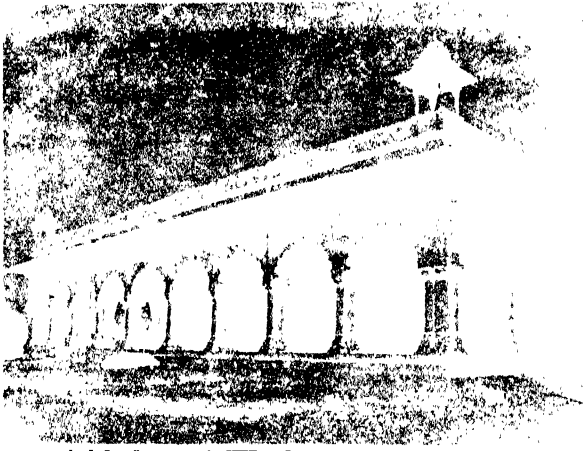
তাঁহার রোগমুক্তির পুরস্কার স্বরূপ হুগলীতে কুঠি স্থাপনের অনুমতি প্রদান করেন এবং ৩৮ খানি গ্রাম ইংরেজ দিগকে যথেচ্ছ-ব্যবহার করিতে দিয়াছিলেন—ইহাই ক্রমে বর্ত্তমান ফোর্ট-উইলিয়মের ভিত্তিস্বরূপ হইয়া উঠে।

এই দরবার গৃহে বসিয়া নাদীরসাহ, মহম্মদ্ সার সহিত বন্ধুত্বের নিদর্শন স্বরূপ পাগড়ী বদল করিয়াই, পরদিন দিল্লী নগরী নরশোণিতে প্লাবিত করেন।

এই দরবার গৃহে হতভাগ্য দ্বিতীয় সাহ আলম বাদসাহ, রোহিলা-নায়ক গোলাম কাদিরের হস্তে অন্ধ হন।

এই দরবার গৃহে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় বাহাদুর সার বিদ্রোহের বিচার হয় এবং বিচারে যাবজ্জীবন দীপান্তরের আজ্ঞা প্রচার হয়।

তখৎ-ই-তাউস্ ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে নাদীরসাহ পারস্যে লইয়া যান। এই রাজাসন ৯ কোটি মুদ্রাব্যয়ে প্রস্তুত হইয়াছিল। ইহা এক্ষণে তিহারাণ রাজপ্রাসাদে অবস্থিত। আসনের উপরিভাগে মণিমাণিক্য খচিত দুইটি ময়ূরের প্রতিমূর্ত্তি হইতেই ইহার নাম ময়রাসন। ময়ূরের বর্ণের অনুকরণে নানা মণিমাণিক্য খচিত এই আসন জগতে অতুলনীয়।

সুবর্ণ নির্ম্মিত আসনটি, হীরা, পান্না, ও মাণিকমণ্ডিত এবং দৈর্ঘ্যে ৪ হাত ও প্রস্থে ৩ হাত ছিল। আসনোপরি প্রকাণ্ড মণিমাণিক্যখচিত ছত্র পরিশোভিত থাকিত। ময়ূর দুটির মধ্যভাগে পান্নার একটি পূর্ণায়তনের

এই শয়নমন্দিরের মধ্যের গৃহের উত্তরের দ্বারের বহির্দ্দিকে "ধর্ম্ম তুলাদণ্ড" খচিত আছে। খোদিত গৃহগাত্র শ্বেত-মর্ম্মর নির্ম্মিত জাফরি দ্বারা আচ্ছাদিত। এই গৃহের কারুকার্য্য দেখিলে তন্ময় হইতে হয়। গৃহটি ৩০ হাত দীর্ঘ ও ১২ হাত প্রস্থ। ইহার উত্তরের ও দক্ষিণের বাতায়নের উপর সাহাজানের উক্তিরক্ত কবিতা লিখিত আছে।

বাদসাহদিগের এত সাধের রঙ্গমহল এক্ষণে সৈনিকগণের ভোজনাগাররূপে ব্যবহৃত। বলা বাহুল্য, এই রঙ্গমহলের গৃহগাত্রও পূর্ব্বে দেওয়ানী খাসের ন্যায় বহু কারুকার্য্য-বিশিষ্ট ছিল।

রঙ্গমহলের পশ্চিমে ও দেওয়ানী আমের মধ্যে বিখ্যাত 'ইমতিয়াজ' মহল। এক সময়ে এই ইমতিয়াজ মহল ও বিশেষ কারুকার্য্য সম্পন্ন ও সুবর্ণরঞ্জিত ছিল। পূর্ব্বে রঙ্গমহল সংলগ্ন, বহু উৎসপরিশোভিত এক মনোরম উদ্যান ছিল।

'আসাদ বুরুজ' ও 'সমন বুরুজ' এক্ষণে ইংরেজ সেনা-নিবাস বলিয়া সাধারণের দেখিবার উপায় নাই।

শ্রীপ্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য।

পাশ্চাত্য প্রেত-তত্ত্ব।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

টেবিলের কার্য্য সম্বন্ধে আর একটি কথা এই যে,মানুষের মনের মধ্যে অনেকগুলি স্তর আছে। উপরের স্তরটি পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের লীলাভূমি। গভীর, গভীরতর, গভীরতম প্রভৃতি স্তরে যে সমস্ত শক্তি নিহিত আছে, ইন্দ্রিয়গণ সে সকলের খবর রাখে না। বিলাতের সমিতির লেখকগণ ঐ সকলের স্তরের নাম রাখিয়াছেন "Subconsciousness". এ সম্বন্ধে ডাক্তার মায়ার্স তাঁহার সুবিখ্যাত Human personality নামক গ্রন্থের একস্থানে লিখিয়াছেন,—

My view that a stream of Consciousness flows on within us, at a level beneath the threshhold of ordinary working life, and that this Consciousness embraces unknown powers.

ইহার অর্থ এই যে, যে আটপৌরে জ্ঞানটুকু লইয়া আমরা সর্ব্বদা নাড়াচাড়া করি, সংসারে কার্য্য নির্ব্বাহ করি, তাহার অন্তরতলে অন্য একটি গভীরতর জ্ঞানের স্রোত প্রবাহিত হইতেছে, সে জ্ঞান যে কত শক্তি-সমন্বিত, তাহা আমাদের অজ্ঞাত। এই গভীর স্তরের জ্ঞান আমাদের ব্যবহারিক জ্ঞানের অতিরিক্ত কত নিগূঢ়-তত্ত্ব ও অলৌকিক শক্তির আধার তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। সমুদ্রের নিস্তরঙ্গ গভীরতম প্রদেশে লোকচক্ষুর অগোচর যেমন অসংখ্য মণিমুক্তা অবস্থিতি করে, ডুবুরী ভিন্ন অন্যে তাহার সন্ধান পায় না, সেইরূপ মনুষ্য-মনের গভীরতম প্রদেশে যে অসংখ্য জ্ঞানরত্ন রহিয়াছে, যোগী ভিন্ন অন্য কেহই তাহা দেখিতে পায় না। পাশ্চাত্য তত্ত্বানুসন্ধান-সমিতিগুলি যে প্রণালীতে সেই সকল রত্নের কথঞ্চিৎ সন্ধান পাইয়াছেন, উহা আমাদের দেশের যোগপ্রণালীর একটা বহিরঙ্গ ক্রিয়া মাত্র। তবে সুখের বিষয় এই যে, যে যোগ-তত্ত্ব ইংরেজী শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকদিগের নিকট একেবারে কুসংস্কার বলিয়া উপেক্ষিত হইয়াছিল, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অনুসন্ধানে ও অধ্যবসায় ফলে উহা পুনরায় জগতে আদৃত হইতে চলিয়াছে।

শরীর ও মনের কতকগুলি অবস্থা (Conditions) এক সঙ্গে সংযুক্ত হইলে গভীর স্তরের জ্ঞান উপরে ভাসিয়া উঠে এবং আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর হয়। চক্র করিয়া টেবিলে বসিলে চক্রস্থ ব্যক্তিবিশেষের শরীর ও মন উপরিউক্ত অবস্থা (Conditions) প্রাপ্ত হয়; তখন তাহার মধ্য দিয়া এমন সকল নিগূঢ় তত্ত্ব প্রকাশিত হয় যাহা সাধারণ লোকেরা অলৌকিক শক্তি অথবা প্রেতাত্মার কার্য্য বলিয়া মনে করে। পূর্ব্বোক্ত মুগ্ধ ব্যক্তিগণ যখন এইরূপ জ্ঞানের অধিকারী হয়, তখন তাহাদিগকে 'মিডিয়াম' বলে।

মিডিয়ামের নিগূঢ় স্তরের জ্ঞান তাহার ব্যবহারিক জ্ঞানের অগোচরে তাহার দ্বারা যে সকল কথা বলায় কিংবা লেখায়, সে ব্যক্তি তাহার কিছুই জানিতে পারে না। বিষয়টি অত্যন্ত জটিল অথচ এই প্রবন্ধে অতি সংক্ষেপে উহা বুঝাইতে হইবে। মোট কথা এই যে (১) মিডিয়ামের নিজের নিগূঢ়স্তরের জ্ঞান তাহার অগোচরে তাহার শরীর ও মনের উপর কার্য্য করে, (২) মিডিয়ামের নিকটবর্ত্তী লোকদিগের চিন্তাস্রোত তাহার মন ও শরীরের উপর কার্য্য করে (৩) মুগ্ধকারী (Hypnotiser) ব্যক্তির ইচ্ছাশক্তি মিডিয়ামের উপর কার্য্য করে। (৪) মিডিয়াম কতক পরিমাণে যোগশক্তি প্রাপ্ত হয় (৫) মিডিয়াম কখনও কথা বলিয়া, কখনও লিখিয়া দিয়া, কখনও টেবিল, পেন্সিল ও প্লানচেটের সাহায্যে মনের ভাব ব্যক্ত করে। এই কথাগুলি পাঠক মহাশয়কে সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে এবং কোনটা বৈদ্যুতিক কার্য্য কোনটা ইচ্ছাশক্তির কার্য্য, কোনটা যোগ-দৃষ্টির কার্য্য, কোনটা বা চিন্তাপাঠ (Thought Reading) তাহা ধরিতে না পারিলে প্রকৃতপক্ষে পরলোকগত আত্মার কার্য্য যে কোন্‌টি তাহা নির্ণয় করা যাইবে না। পূর্ব্বোক্ত শক্তিসমূহের সাহায্যে যে সকল কার্য্যের ব্যাখ্যা করা চলে না, তেমন কার্য্যকে ভূতের কার্য্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। এই প্রবন্ধে যে সমস্ত সংজ্ঞার উল্লেখ করা হইয়াছে, তদ্ব্যতীত আর একটি বিষয় আছে,তাহার নাম ভ্রান্তিদর্শন।

মস্তিষ্কের অবস্থান্তর উপস্থিত হওয়ায় যে বস্তু বা ব্যক্তি প্রকৃত পক্ষে উপস্থিত নাই তাহাকে প্রত্যক্ষ করার নাম ভ্রান্তি-দর্শন। অনেক লোকের কখন কখন এইরূপ ভ্রান্তি-দর্শন ঘটিয়া থাকে। পাশ্চাত্য প্রেততত্ত্বানুসন্ধান-

সমিতির সভ্যদিগের মধ্যে দুইটি দল আছে। উভয় দলের মধ্যেই প্রধান প্রধান পণ্ডিত আছেন। একদল কিছু সহজবিশ্বাসী, দ্বিতীয় দল কিছু বেশী সতর্ক; প্রথম দলের লোকেরা যাহাকে প্রেতের আবির্ভাব বলিয়া বিশ্বাস করেন, দ্বিতীয় দলের সভ্যগণ অন্য কোনরূপে তাহার ব্যাখ্যা দিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া থাকেন। বিশেষ পরীক্ষা দ্বারা যে সমস্ত ঘটনা (Fact) নির্ভুল বলিয়া সমিতি কর্তৃক গৃহীত হয়, তাহা লইয়া দুই পক্ষেই বিচার চলিতে থাকে। প্রথম পক্ষ যাহাকে ভৌতিক কার্য্য বলেন, দ্বিতীয় পক্ষ ইচ্ছাশক্তি প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত কোন না কোন যোগশক্তি দ্বারা তাহার ব্যাখা প্রদান করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করেন যে, প্রেতাত্মার আবির্ভাব ব্যতীতও সেই সকল কার্য্য হইতে পারে; সুতরাং টেবিল নাড়া, মনের কথা বলা, দূরস্থ সংবাদ অবগত হওয়া, ভবিষ্যৎ কথা বলা প্রভৃতি কোন কার্য্যের দ্বারাই মিডিয়ামের উপর পরলোকগত আত্মার আবির্ভাব প্রমাণিত হইতে পারিতেছে না। এমন কি প্রত্যক্ষ প্রমাণ ও দ্বিতীয় পক্ষ গ্রাহ্য করিতেছে না। প্রথম পক্ষ (এ পক্ষে বড় বড় বিজ্ঞানাচার্য্য আছেন) বিশ্বাস করেন যে, পরলোকগত আত্মারা তাহাদের ইচ্ছামত দেহ ধারণ করিয়া মানুষকে দেখা দিতে পারে। উক্ত দেহকে ইংরাজীতে 'এপারিশন' (Aparition) বলে। রায় বাহাদুর ৺কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর মহাশয় এই প্রেত-দেহকে ছায়ামূর্ত্তি বলিয়াছেন। যিনি বাঙ্গালা ভাষাকে "স্বায়ত্ত শাসন" প্রভৃতি অপূর্ব্ব শব্দ সম্পদে ভূষিতা করিয়াছেন তাঁহার প্রদত্ত শব্দের উপর কিছু বলিতে বিশেষ সঙ্কোচ উপস্থিত হয়, কিন্তু তিনি আমাকে যেরূপ স্নেহ করিতেন তাহাতে এ সময় তিনি জীবিত থাকিলে "ছায়ামূর্ত্তির" পরিবর্ত্তে "মায়ামূর্ত্তি" লিখিবার জন্য আমি তাঁহার নিকট আব্দার করিতাম। পরলোকগত আত্মা যখন মায়া দ্বারা দেহের সৃষ্টি করে, তখন সে দেহকে আমি মায়া-দেহই বলিব। সে দেহ কোন দেহের ছায়া নহে। একই আত্মা কাহারও নিকট ৫ বৎসরের শিশু কাহারও নিকট বৃদ্ধ হইয়া দেখা দেয়। এই পৃথিবীতে যে তাহাকে যেরূপ অবস্থায় দেখিয়াছে ঠিক সেইরূপ অবস্থা ধরিয়া তাহার নিকট প্রকাশিত হয়; সুতরাং সে, যে মূর্ত্তি ধারণ করে সেটি মায়ামূর্ত্তি।

মানুষটি কবে মরিয়া গিয়াছে তাহার দেহ শ্মশানে ভস্ম অথবা কবরে গলিত হইয়া গিয়াছে, সেই দেহ সেই রক্ত মাংসের শরীর সেই পুরাতন পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া প্রেতাত্মা দেখা দেয়, কথা বলে, আলিঙ্গন করে, হস্তমর্দ্দন করে এবং দ্রষ্টা তাহাকে স্পর্শ করে, তাহার সহিত কথাবার্ত্তা বলে, এই সকল কথা বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানাচার্য্য ডাক্তার ওয়ালেস, সার ওলিভার লজ্, অধ্যাপক ক্রুক প্রভৃতির ন্যায় জগন্মান্য পণ্ডিতগণ বিশ্বাস করিতেছেন, ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি আছে? কিন্তু ইহারা যে সমস্ত ঘটনা সংগ্রহ করিয়াছেন, জ্ঞানাভিমানী একান্ত অন্ধ ও কু-সংস্কারী না হইলে সে ঘটনা অগ্রাহ্য করা কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তির পক্ষে স্বাভাবিক নহে।

বিলাতের সমিতির রেকর্ড হইতে দুইটি ঘটনার উল্লেখ করিয়া এবং পূর্ব্বোক্ত প্রথম পক্ষ ও দ্বিতীয় পক্ষের সভাগণের বিচারের প্রণালী দেখাইয়া আমি আমার এই প্রবন্ধ এই বারের মতন সমাপ্ত করিব। বিলাতের কোন একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারে একটি আদরিণী কন্যা ছিল। কালের উত্তপ্ত নিঃশ্বাসে সেই অর্দ্ধপ্রস্ফুটিত কুসুমটি অকালে ঢলিয়া পড়িল। এই শোকে সমস্ত পরিবার শোকসাগরে নিমগ্ন হইল। পরিবারের যিনি কর্ত্তা, তিনি একজন সুশিক্ষিত দার্শনিক পণ্ডিত, বিশেষ প্রমাণ প্রাপ্ত না হইয়া কোন বিষয় মানিয়া লওয়া তাঁহার স্বভাববিরুদ্ধ কার্য্য। যিনি গৃহিণী, তিনিও অত্যন্ত সুশিক্ষিতা এবং একটি উচ্চ বিদ্যালয়ের অবৈতনিক পরিদর্শিকা তাঁহাদের দুইটি সুযোগ্য ও সুশিক্ষিত পুত্র ও একটি কন্যা ছিল, এই কন্যাটির মৃত্যু হওয়ায় সুখের সংসার দুঃখের নিলয় হইয়াছে। কিছুদিন পরে শোকের হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য বাণিজ্যব্যপদেশে কনিষ্ঠ পুত্রটি দূরদেশে চলিয়া গেলেন। সেখানে একদিন কতকগুলি লাভজনক বস্তুর সরবরাহ করার অর্ডার পাইয়া তাহার মন কথঞ্চিৎ প্রফুল্ল হইল। অপরাহ্নকালে একটি টেবিলের নিকট কেদারায় বসিয়া সেই অর্ডারগুলি সম্বন্ধে চিঠি পত্র লিখিতেছিলেন, হঠাৎ চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহার একান্ত নিকটে তাঁহার মৃতা ভগিনী দাঁড়াইয়া আছেন। এরূপ স্পষ্টভাবে দেখিলেন যে, কিছুমাত্র সংশয় রহিল না। দেখিতে দেখিতে সেই মায়ামূর্ত্তি মিলাইয়া গেল। যুবক স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিলেন। একটি

বিষয়ে তাঁহার মনকে আলোড়িত করিতে লাগিল। সেই মায়ামূর্ত্তির চিবুকে একটি দাগ দেখিলেন, সেটি ছড়িয়া যাওয়ার দাগ, এ দাগ ত তাহার ছিল না, তথাপি তিনি যে ভগিনীকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন এ বিশ্বাস তাঁহার কিছুতেই নষ্ট হইল না; আশা ও উদ্বেগে তাঁহার চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। সেই দিনই তিনি বাড়ী যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। বাড়ীতে আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার জননী অত্যন্ত পীড়িতা। যুবক তাহার পিতার নিকট তাঁহার ভগিনীর মায়ামূর্ত্তি-দর্শনের কথা বলিতেছিলেন। সে কথা জননীর ঘর হইতে শুনা যাইতেছিল। যখন যুবক বলিলেন যে, ভগিনীর চিবুকে একটা দাগ দেখা গিয়াছিল, জননী অমনই দুর্ব্বল চরণে ভর করিয়া ছুটিয়া আসিয়া পুত্রকে বলিলেন যে, "তুই নিশ্চয়ই খুকীকে দেখেছিস্, নিশ্চয়ই দেখেছিস্"। আরও বলিলেন যে, সত্য সত্যই কন্যার চিবুকে আঁচড় লাগিয়া কতকটা স্থান ছড়িয়া গিয়াছিল। মাতা পাউডার প্রভৃতির দ্বারা তাহা এমনই করিয়া ঢাকিয়া সামলাইয়া রাখিয়াছিলেন যে, কন্যা এবং মাতা ভিন্ন সে বিষয় আর কেহই জানিতে পারে নাই। এই কথা শুনিয়া ভ্রাতার বিশ্বাস অধিকতর দৃঢ় হইল এবং যুক্তিপ্রিয় কর্ত্তাটির মনও আন্দোলিত হইল। সে পরিবারে কেহ মিথ্যাকথা বলিবে এরূপ বিশ্বাস কেহ করিত না।

এই ঘটনা জানিতে পারিয়া বিলাতের সমিতি প্রকৃত-তত্ত্ব সংগ্রহের জন্য তাহাদের মধ্য হইতে উপযুক্ত কএকজন পণ্ডিতকে উক্ত পরিবারস্থ ব্যক্তিদিগের সাক্ষ্য-গ্রহণের জন্য পাঠাইলেন এবং অনুসন্ধানের পরে ঘটনাটি সত্য বলিয়া সমিতি কর্ত্তৃক গৃহীত হইল।

সমিতির প্রথম দলের সভ্যগণ এই ঘটনায় মায়ামূর্ত্তির আবির্ভাব বিশ্বাস করিলেন। দ্বিতীয় (Cautious) দলের অন্যতম নেতা অধ্যাপক ফ্রাঙ্ক পোডমোর (Professor Frank Podmore) এইরূপ ব্যাখ্যা করিলেন যে, উহাকে চিন্তামূর্ত্তির প্রকাশ বলা যাইতে পারে। রুগ্ন মাতা কন্যা-শোকে অধীর ছিলেন এবং নিজের আসন্ন মৃত্যু কল্পনা করিয়া বিদেশবাসী পুত্রের আগমনের আকাঙ্ক্ষা করিতেছিলেন। ঐরূপ অবস্থায় তাঁহার মানসিক চিন্তা কন্যারূপে প্রকাশিত হইয়া পুত্রকে বাড়ীতে আসার জন্য উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল।

পণ্ডিত ফ্রাঙ্ক পোডমোরের এই ব্যাখ্যা যে অত্যন্ত কষ্ট-কল্পনাপ্রসূত, তাহা আর বলিতে হইবে না। বিষয়টি বড় জটিল। এখানে ভ্রান্তি-দর্শনের দোহাই দিলে চলিবে না, কেন না, ভ্রান্তি-দর্শন (Hallucination) হইলে যুবকের পক্ষে তাঁহার ভগিনীর চিবুকে দাগ দেখার সম্ভাবনা ছিল না; সুতরাং বাধ্য হইয়া পোডমোর সাহেবকে চিন্তামূর্ত্তির আশ্রয় লইতে হইয়াছিল। এইরূপ ব্যাখ্যাকারীদিগের যন্ত্রণায় অনেক গণ্যমান্য সুশিক্ষিত সভ্য বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছেন।

দ্বিতীয় ঘটনাটি সম্বন্ধে এই উৎকট সংশয়িদলের বলিবার কিছুই নাই। সে ঘটনাটি নিম্নে লিখিতেছি।

ইংলণ্ডের কোন সম্ভ্রান্ত পরিবারে চক্র করিয়া বসিবার প্রথা ছিল। অনেক পরলোকগত আত্মা আসিয়া অনেক কথা বলিত; কিন্তু তাহাতে সকলের সংশয় মিটিত না। সেই পরিবারের একটি যুবক (বোধ হয় পীড়িত ছিল) একদিন একখানা ইট হাতে লইয়া কালি দিয়া তাহাতে লম্বা লম্বা কতকগুলি রেখা টানিল। ইহার পরে ইটখানা ভাঙ্গিয়া দুইভাগ করিয়া একভাগ তাহার ভগিনীর হাতে দিল। অন্য ভাগ সে কোথায় লুকাইয়া রাখিল, তাহা কেহই জানিতে পারিল না। যুবক পরিবারস্থ সকলকে বলিল, "আমার মৃত্যু হইলে তোমরা চক্র করিয়া আমাকে ডাকিও, আমি আসিয়া বলিব যে ইটের অর্দ্ধাংশ কোথায় রাখিয়াছি, তবেই তোমরা বুঝিতে পারিবে যে, আমি আসিয়াছি।" কিছুদিন পরে যুবকের মৃত্যু হইলে পরিবারস্থ লোকেরা শোকে অভিভূত হইয়া চক্র করিয়া বসিল। একজন মিডিয়ামের হাতে আবির্ভূত হইয়া যুবকের আত্মা লিখিয়াছিল, অমুক স্থানের একটা অব্যবহার্য্য কুঠরীতে একটা কাঠের বাক্সের মধ্যে অনেক কাগজে জড়াইয়া ইটের অর্দ্ধাংশ রাখা হইয়াছে। তৎক্ষণাৎ সকলে ছুটিয়া অনুসন্ধানে গেল এবং ঠিক কথিত স্থানে বর্ণিত অবস্থায় উহা পাইল। ভগিনী আপনার অর্দ্ধাংশ বাহির করিয়া মিলাইয়া দেখিল, দুইখণ্ড ঠিক ঠিক মিলিয়া গিয়া একখানা সম্পূর্ণ ইট হইল এবং উভয় খণ্ডের রেখাগুলি সমসূত্রে মিলিয়া গেল।

বলা বাহুল্য যে, ইহাকে যদি চিন্তা-চালন (Thought-transferance) বলিতে হয়, তবে মৃত ব্যক্তির চিন্তাই মিডিয়ামের মধ্য দিয়া কার্য্য করিয়াছে। অধ্যাপক ফ্রাঙ্ক

পোডমোর প্রমুখ দ্বিতীয়দলের পণ্ডিতগণ ইহার অন্য কোনরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করেন নাই।

এই প্রবন্ধে আমি ঘটীর মধ্যে হাতীভরিতে চেষ্টা করিয়াছি; সুতরাং কৃতকার্য্যতা লাভের সম্ভাবনা দেখিতেছিনা; তবে যাঁহারা পাশ্চাত্য প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানেন না, অথচ টেবিল নাড়া হইতে ভূত আসা পর্য্যন্ত সমস্ত ব্যাপার গুলিকে মিলাইয়া মিশাইয়া গোলযোগ করিয়া ফেলেন, তাঁহারা যদি এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া স্বতন্ত্রভাবে বিষয়গুলির অধিকার ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে প্রযত্ন করেন, তবেই আমি কৃতার্থ হইব। গত মাঘ মাসে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হীরালাল হালদার মহাশয় প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে শৃঙ্খলাক্রমে আমাকে কতকগুলি বক্তৃতা করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। শারীরিক অসুস্থতা বশতঃ তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিতে আমার সাহস হয় নাই। এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া পাঠকগণের যদি কিঞ্চিন্মাত্র কৌতূহল জন্মে এবং যদি স্বাস্থ্য আমার একান্ত বিরোধী না হয়, তবে প্রত্যেক বিষয়ে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লিখিয়া যথাসাধ্য পরিষ্কারভাবে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।

শ্রীমনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা।

রথযাত্রা।

আমরা বাঙ্গালা দেশের লোক—রথযাত্রা বলিলে সাধারণতঃ জগন্নাথদেবের রথযাত্রাই বুঝিয়া থাকি; কিন্তু জগন্নাথের রথযাত্রা ব্যতীত ভিন্ন ভিন্ন পুরাণে ভিন্ন ভিন্ন দেবদেবীর রথযাত্রার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ভবিষ্যপুরাণে সূর্য্যদেবের রথযাত্রা; একাম্রপুরাণে শিবের রথযাত্রা; পদ্মপুরাণ, স্কন্দপুরাণ ও ভবিষ্যোত্তর পুরাণে বিষ্ণুর রথযাত্রা; দেবীপুরাণে মহাদেবীর রথযাত্রা;—এইরূপ নানা পুরাণে নানা দেবদেবীর রথযাত্রার উল্লেখ আছে। আর এই রথযাত্রা পর্ব্বটা যে কেবল ভারতেরই পর্ব্ব, তাহাও নহে; নেপালরাজ্যে ভৈরবের রথযাত্রা, লিঙ্গযাত্রা, সেতা-দেবীর রথযাত্রা, কুমারী-যাত্রা, মৎস্যেন্দ্রনাথের যাত্রা ইত্যাদি দেবদেবীর রথযাত্রা প্রচলিত আছে। ভারতের প্রতিবেশী নেপাল ত দুরের কথা, য়ুরোপের সিসিলি দ্বীপেও রথযাত্রা আছে; গ্রন্থ-বিশেষে তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। ইহাতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, রথযাত্রা পর্ব্বটা সার্ব্বভৌমিক এবং বহু প্রাচীন।

যে পুরাণে বা যে দেশে, যে দেবদেবীর রথযাত্রার উল্লেখ বা প্রচলন থাকুক না কেন, বর্ত্তমান কালে আমরা কিন্তু রথযাত্রা বলিলে জগন্নাথদেবের রথযাত্রাই বুঝিয়া থাকি। আমরা সকলেই উৎসবে আমোদ-আহ্লাদ করিয়া থাকি, উৎসব দেখিবার জন্য কত নরনারী, কত দেশবিদেশ হইতে দেশ-দেশান্তরে গমন করিয়া থাকেন, তজ্জন্য যত কিছু অর্থ ব্যয় হউক, যত কিছু কায়িক ক্লেশ-স্বীকার করিতে হউক, তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্রও কুণ্ঠাবোধ করেন না, এমন কি কখন কখন প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করিতেও হৃষ্টান্তঃকরণে প্রস্তুত হইয়া থাকেন, অথচ ইহার গুপ্ত রহস্য অনেকেরই পরিজ্ঞাত নহে। নিতান্ত অজ্ঞেয় না হইলেও আপাততঃ অজ্ঞাত সেই গুপ্ত রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা; কিন্তু প্রয়াস কতদুর সফল হইয়াছে বলিতে পারি না।

জগতে সভ্য অসভ্য, শিক্ষিত অশিক্ষিত, প্রাচ্য প্রতীচ্য, সকল জাতিই অল্পাধিক দেবদেবীর অস্তিত্ব স্বীকার ও কোন না কোন প্রকারে আরাধনা করিয়া থাকে। দেব দেবীগণও প্রায়শঃ সকলেই যে অল্পাধিক সংখ্যক লীলা করিয়াছেন, সেই লীলাকারী দেবতার উপাসক জাতিগণের গ্রন্থবিশেষও তাহার সাক্ষ্য-প্রদান করিতেছে। নির্দ্দিষ্ট মাসে, নির্দ্দিষ্ট দিনে বা নির্দ্দিষ্ট তিথিতে সেই লীলা

বাৎসরিক উৎসব সম্পাদনকে পর্ব্ব বলে। ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রাচীন য়ুরোপীয় জাতিদিগের মধ্যে গ্রীক জাতির উপাস্য দেবতার সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। আর সেটা যদি গর্ব্ব বা গৌরবের বিষয় হয় এবং দেবতা যদি শ্রেষ্ঠতার পরিমাপক ও প্রতিপাদক হয়, তবে এ কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করা যাইতে পারে যে, জাতিদিগের মধ্যে য়ুরোপে গ্রীক শ্রেষ্ঠ হইলেও, ভারতীয় হিন্দু জগতের

সেরিঙ্গপত্তনের রথ।

মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। হিন্দুর দেবতাও যত, পর্ব্বও তত। দোল, রাস, জন্মাষ্টমী, রামনবমী রাসলীলা, ইত্যাদি পর্ব্ব শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরামচন্দ্রের লীলা-বিশেষের সাংবাৎসরিক স্মারক উৎসব। এ সকল পর্ব্ব তাঁহাদের স্বকৃতলীলার স্মারক উৎসব, সুতরাং এগুলিকে দৈব পর্ব্ব বলা যাইতে পারে।

লীলা যে কেবল দেবতারাই করিয়াছেন, তাহা নহে। অনেক প্রখ্যাতনামা মুনি-ঋষিও অনেক সময় অনেক লীলা করিয়াছেন। তাঁহাদের লীলা কোন স্মারক উৎসব বা পর্ব্ব না হইয়া সামাজিক বিধি ও নিষেধ-প্রথায় দাঁড়াইয়াছে। অগস্ত্য ঋষি আদিত্য-দেবের অনুরোধে তাঁহার প্রিয় শিষ্য বিন্ধ্যাচলের উন্নত শির চিরদিনের মত অবনত করাইয়া হিন্দুসমাজে চিরপ্রচলিত অগস্ত্য যাত্রার নিষেধ প্রথা সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত হিন্দুসমাজে সাধারণ গৃহস্থের মধ্যেও অনেক সময় অনেক মহাপুরুষ ও মহীয়সী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যাঁহাদের লোকপ্রসিদ্ধ কার্য্যকলাপ কেবল নরলোককে নহে, সমগ্র দেবলোককেও মুগ্ধ ও চমৎকৃত করিয়াছে; তাঁহাদের কার্য্যাবলী নরনারীর অনুষ্ঠিতব্য পুণ্য ব্রতাদিতে পরিণত হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ সাবিত্রী চতুর্দ্দশীর উল্লেখ করা যাইতে পারে।

এখন দেখা যাউক, জগন্নাথের রাসযাত্রা কোন দেবতার, কোন ঋষির বা কোন মহাপুরুষের কোন লীলার সাংবাৎসরিক উৎসব কি না। এ সম্বন্ধে নানা মুনি নানা মত প্রকাশ করিয়াছেন। উৎসবটা যে হিন্দু জাতির অনুষ্ঠিত একটা প্রাচীন ধর্ম্মোৎসব সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই; কিন্তু কোন্ সময়ে, কাহার কোন্ লীলা অবলম্বনে ইহা প্রচলিত হইয়াছে, তাহা এ পর্য্যন্ত স্থিরীকৃত হয় নাই, এবং কোন পুরাণাদিতেও তাহার নিঃসন্দেহ প্রমাণ কিছু পাওয়া যায় না। তবে এক সম্প্রদায়ের প্রত্নতত্ত্ববিদগণ বলেন যে, বুদ্ধদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে বৌদ্ধ সাধারণ যে রথযাত্রা উৎসব করিত, তাহা হইতেই জগন্নাথের রথযাত্রার উৎপত্তি। আমরা কিন্তু এ সিদ্ধান্ত অবিবাদে শিরোধার্য্য করিয়া লইতে প্রস্তুত নহি; কারণ ফাহিয়ানের বিবরণ অনুসারে দেখা যায় যে, ঐ উৎসব ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন দিবসে হইত। যদি বুদ্ধদেবের জন্মতিথিই ঐ উৎসবের উপলক্ষ হয়, তবে উৎসব-তারিখের সমতা নাই কেন? একমাত্র বুদ্ধ এক-দিন মাত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তবে এ বৈষম্যের কারণ কি? দ্বিতীয়তঃ ফাহিয়ান্ বৌদ্ধোৎসবের রথের যে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহাতে দেখিতে পাই, "মধ্যস্থলে মূল বিগ্রহ, তাঁহার সহচর রূপে দুই পার্শ্বে দুই বোধিসত্ত্ব এবং তাঁহাদের অনুচররূপে নানা দেবমূর্ত্তি।" এদিকে দেখিতে পাই যে, পুরাতত্ত্ববিদগণ ফাহিয়ানের বর্ণনা অবলম্বন করিয়া বৌদ্ধোৎসব বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন, তাঁহারাই আবার বলেন যে, পূর্ব্বকালে বৌদ্ধগণের মধ্যে বোধিসত্ত্ব ও দেবদেবীর মূর্ত্তিপূজা

প্রচলিত ছিল না। তাহা হইলে আর বৌদ্ধোৎসবের অনুকরণে হিন্দুৎসবের সৃষ্টি একথার সামঞ্জস্য থাকে কৈ? সুতরাং এ বক্যের যাথার্থ্য আমরা স্বীকার করিয়া লইতে পারিলাম না। আর এক সম্প্রদায় বলেন, ভারতে মূর্ত্তিপূজা প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে রথযাত্রার উৎসব প্রচলিত হইয়াছে এবং জগন্নাথদেবের রথযাত্রা, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলাচিত্রের একাংশ মাত্র। কথাটা একেবারে ভিত্তিহীন বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলেনা; কারণ যাত্রা শব্দের অর্থ একস্থান হইতে স্থানান্তরে গমন এবং রথযাত্রা শব্দে বুঝিতে হইবে যে, রথে আরোহণ করিয়া গমন। ভগবান্ জগন্নাথদেবের রথযাত্রা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত শাস্ত্রবচন দেখিতে পাওয়া যায়ঃ—

"আষাঢ়স্য সিতেপক্ষে দ্বিতীয়া পুষ্যাসংযুতা।
তস্যাং রথে সমারোপ্য রামং মাং ভদ্রয়া সহ।
যাত্রোৎসবং প্রবৃত্ত্যাস্য প্রীণয়েচ্চ দ্বিজান্ বহূন্॥"

আষাঢ় মাসের পুষ্যা নক্ষত্রযুক্তা শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে সুভদ্রা ও বলরামের সহিত জগন্নাথদেবেকে রথে আরোহণ করাইয়া এই উৎসব করিতে হয় এবং তাহাই করা হইয়া থাকে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কবে কি উপলক্ষে রথে আরোহণ করিয়া বৃন্দাবন হইতে যাত্রা করিয়া ছিলেন, শাস্ত্রে তাহার অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে পাই যে, কৌশলপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে মথুরায় আনাইয়া তাহার প্রাণবধ করিবার নিমিত্ত দুষ্ট কংসাসুর যখন অক্রূরকে বৃন্দাবনে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কংসপ্রেরিত রথারোহণে অক্রূর-সমভিব্যাহারে সবান্ধবে বৃন্দাবন হইতে মথুরা-যাত্রা করিয়াছিলেন। এ যাত্রায় অবশ্য বৃন্দাবন-লীলার একাংশের সাদৃশ্য লক্ষিত হয় বটে, কিন্তু অন্যদিকে অনেক অসাদৃশ্য থাকিয়া যায়।

আমাদের বাঙ্গালা দেশে রথযাত্রা উপলক্ষে যে সকল গান রচিত ও গীত হইয়া থাকে, তাহার অধিকাংশই বৃন্দাবনের গোপিকা ও গোপবালকদিগের কৃষ্ণ-বিরহ-বেদনা-জনিত কাতরোক্তি-ব্যঞ্জক; সুতরাং সেই সকল গীতের মর্ম্মানুসারে রথযাত্রাকে শ্রীকৃষ্ণের মথুরা-যাত্রা বলিয়া কল্পনা করা নিতান্ত অসঙ্গত নহে; কিন্তু জগন্নাথের সঙ্গে বলরাম ও

কম্বকোনমের রথ।

সুভদ্রা-দেবীকে রথে বসাইবার ব্যবস্থা থাকায় বিষম গোল যোগ বাধিয়াছে। বলরামকে না হয় সঙ্গে দেওয়া যাইতে পারে, তাহাতে বিশেষ কোন আপত্তি নাই; কিন্তু বৃন্দাবনে সুভদ্রা-দেবীকে কিরূপে পাওয়া যায়? ভক্ত-বিশেষের খাতিরে একটা অপ্রাকৃত ভাবের কল্পনা স্বীকার করিয়া লইতে পারা যায়, কিন্তু ঐতিহাসিক সত্যের অপলাপ করিলে তাহা অমার্জ্জনীয় হইয়া পড়ে। প্রথমতঃ এ বৈষম্যের মীমাংসা করা চাই। দ্বিতীয়তঃ, যাত্রার সপ্তাহান্তে যে পুনর্যাত্রার ব্যবস্থা আছে, তাহারই বা সামঞ্জস্য রক্ষা হয় কিরূপে? মথুরা হইতে ত শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে প্রত্যাগমন করেন নাই, অন্ততঃ ভাগবতে ত তাহার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না! শ্রীজীব গোস্বামী প্রভৃতি দুই একজন ভক্ত-বৈষ্ণব-পণ্ডিত কষ্ট-কল্পিতভাবে শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনে

প্রত্যাগমন প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা আপত্তিজনক। যাহা সর্ব্ববাদি সম্মত নহে, তাহা একটা সার্ব্ব ভৌমিক উৎসবের ভিত্তি বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।

শোনা গিয়াছে পূর্ব্ববঙ্গের ফরিদ পুর জেলায় দুই একটি গ্রামে রথ যাত্রার পুনর্যাত্রা নাই। হইতে পারে, সেখানে যাঁহারা রথযাত্রায় পুনর্যাত্রার প্রবর্ত্তন করেন নাই, তাঁহারা রথযাত্রাকে মথুরা-যাত্রা বলিয়াই মানিয়া লন, অথচ মথুরা হইতে অপ্রত্যাগমনের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে চান; সেই জন্য পুন-র্যাত্রার ফাঁদে পা না দিয়া ফাঁকে দাড়াইয়াছেন; অথবা একটা স্থানীয় দেশাচার বা লোকাচারকেই বা সর্ব্বত্র প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে সার্ব্ব-জনীন ধর্ম্মমূলক দৈবোৎসবের ভিত্তিরূপে গ্রহণ করা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে?

মন্দ্রাজের রথ।
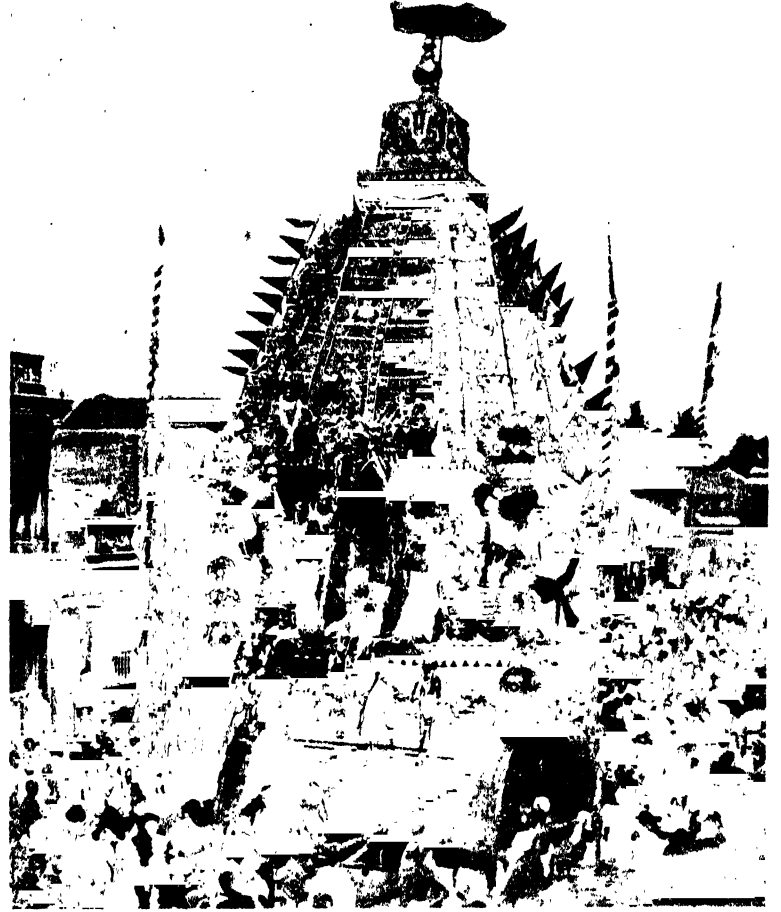
কেহ কেহ এরূপ অভিমতও প্রকাশ করেন যে, জগন্নাথ-দেবের রথযাত্রা শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা হইতে বৃন্দাবনযাত্রা অবলম্বনে কল্পিত হইয়াছে এবং ৺পুরীধামের রথযাত্রা-প্রণালী উহারই প্রতিপোষক। অবশ্য দ্বারকাপুরী হইতে মথুরা-যাত্রায় সুভদ্রা-দেবীর সংশ্রব ঘটাইতে অথবা পুনর্যাত্রা করিতে এক পক্ষে কোনও আপত্তি ঘটিতে পারে না বটে, কিন্তু অপর পক্ষে ঘোর দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইবার কথা। এ স্থলে প্রথমে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, শ্রীকৃষ্ণ, বলভদ্র ও সুভদ্রাকে সঙ্গে লইয়া দ্বারকা হইতে বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন কি না? যদি তাহা স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য এই যে, তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত কি না? দ্বিতীয় কথা এই যে, মানুষ স্বীয় প্রকৃতির আদর্শে দেবপ্রকৃতির কল্পনা করিয়া থাকে। নিজেরা যেমন গুরুজনে ভক্তি, সন্তানে স্নেহ, বৈরিজনের প্রতি বিরাগ প্রদর্শন করে, দেবতাদিগের সম্বন্ধেও নিজেদের রুচি ও প্রকৃতি অনুসারে সেই সেই ভাবের কল্পনা করিয়া থাকে। নিজেদের আহার-বিহারের প্রথানুসারে দেবতা পূজোপচারাদির আয়োজন করিয়া থাকে, তবে পারিবারিক ব্যবহার সম্বন্ধেই বা তাহা না করিবে কেন? বৃন্দাবনে অবস্থান-কালে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজ-গোপীদের সহিত যেরূপ মাখামাখি করিয়াছিলেন, দীর্ঘকাল বিরহের পর পুনরায় বৃন্দাবনে গমন করিলে তাঁহার সহিত তাহারা যে ব্যবহার করিবে, সে ব্যবহার তাঁহার মহিষীবর্গ বা পরিবারস্থ অন্য কাহারও নিকট গোপন রাখিবার চেষ্টাই

জাপানের রথ।

সহিত আত্মীয়তা সংস্থাপন-অপরাধে স্বয়ং ভগবতীর নিকট মহেশ্বরকে নির্যতিত হইতে দেখি, মানব-সমাজে নিন্দিত রঙ্গালাপ দর্শন-অপরাধে যখন জগজ্জননী পার্ব্বতীও আশুতোষকে শাপ প্রদান করিতেছেন দেখিতে পাই, তখন দ্বারকানাথের সম্বন্ধেই বা সে আশঙ্কা না হইবে কেন? অতএব রথযাত্রাকে আমরা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা হইতে বৃন্দাবন-যাত্রার উৎসব বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না।

আমাদের মনে হয় জগন্নাথের রথযাত্রা ভগবানের কোন লীলার উৎসব নহে, ভক্তের আধ্যাত্মিক ভাবের উৎসব। যত কিছু মহাপ্রভুরই রঙ্গ। ভগবান্ যে ব্রজ বাসীর নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, "কর্ম্ম শেষ" করিয়া পুনরায় ব্রজধামে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন, মহাপ্রভু তাঁহার সেই প্রতিশ্রুত "কর্ম্ম শেষ" এই বাক্যের সার্থকতা সম্পাদনের জন্য ও ভগবানের সত্যভঙ্গ-কলঙ্ক অপনোদনের নিমিত্ত একটা কাল্পনিক পুনর্যাত্রার প্রচলন করিয়া গিয়াছেন। আর সকলেই ত

স্বভাবসিদ্ধ; কিন্তু তাহা না করিয়া তিনি যে সুভদ্রাকে সঙ্গে লইয়া গিয়া তাঁহার গুপ্ত কথা প্রকাশ হইবার পথ স্বেচ্ছায় উন্মুক্ত করিয়া দিবেন, একথা সাধারণ সংসারী গৃহস্থ কেমন করিয়া কল্পনা করিবে? সুতরাং দ্বারকা হইতে বৃন্দাবন-যাত্রার কল্পনা করিতেও সম্ভবতঃ অনেকেরই আপত্তি হইতে পারে। হয় ত কোন কোন মহাত্মা বলিতে পারেন যে, মানব-প্রকৃতির আদর্শে দেব-প্রকৃতির কল্পনা করা কোন ক্রমেই সঙ্গত নহে। প্রেমময় ভগবান্ সম্বন্ধে আবার সঙ্কীর্ণ লোকলজ্জা বা দ্বেষ-হিংসার কলুষিত কল্পনা কেন? স্বীকার করিলাম, কিন্তু বৈকুণ্ঠ-ভবনেও যখন স্বয়ং লক্ষ্মী-দেবীর অন্তরে সপত্নী-বিদ্বেষের দারুণ অনল প্রজ্বলিত দেখিতে পাই, পল্লী-বিশেষের

আধ্যাত্মিক জগতের জীব নহে, সাধারণ অজ্ঞ লোকদিগের সহজ উপলব্ধির জন্য গুণ্ডিচা মন্দির ও মাসীর বাড়ীর একটা ভাবাঙ্ক জনসাধারণের চিত্তপটে অঙ্কিত করিয়া দিয়া গিয়াছেন, নতুবা জগন্নাথধামে ভগবানের কোন্ পক্ষের কোন্ মাসী আছেন, তাহা ত বলিতে পারিনা। তখন অন্ধ বিশ্বাসের কাল ছিল, মহাপুরুষ স্বীয় ভাবের বশে যে চিত্রের যে ব্যাখ্যা করিয়া দিয়াছেন, কোন যুক্তি-তর্কের অবতারণা না করিয়া লোকে সেই বাক্যই ধ্রুবসত্য জ্ঞান করিয়া আসিতেছে; কিন্তু এখন যুক্তির কাল আসিয়াছে, বিনা যুক্তিতে আর কেহ কোন কথা সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে প্রস্তুত নয়, তাই আজ রথযাত্রার উপলক্ষ-সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিতেছে!

রথযাত্রা সম্বন্ধে আমাদের এই সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত হইতে পারে। সত্যে উপনীত হইবার নিমিত্তই এই প্রবন্ধের অবতারণা। মধুচক্রে মধু আছে, কিন্তু কেবল হাত পাতিলেই মধু পাওয়া যায় না। চক্রের নিম্নভাগে ধারণোপযোগী পাত্ররক্ষা করিয়া খোচা মারিলেই তবে মধু পাওয়া যায়। এই বিশ্বাসে নির্ভর করিয়া "রথযাত্রা"-সমস্যার মধুচক্রে "রথযাত্রা" প্রবন্ধের খোচা মারিলাম।

রথযাত্রা সম্বন্ধে আলোচনা করিবার অনেক কথা আছে। সকল কথার অবতারণা করিতে গেলে একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহার স্থান সঙ্কুলান হওয়া কঠিন। উপরে প্রধানতঃ আমরা বাঙ্গালা ও উড়িষ্যায় প্রচলিত রথযাত্রার সম্ভাবিত ভিত্তি-সম্বন্ধীয় দুই একটি কথার আলোচনা করিয়াই বাহুল্য-ভয়ে ও পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতির আশঙ্কায় ক্ষান্ত হইলাম। উৎসবের প্রণালী-সম্বন্ধে হিন্দুমাত্রেরই কিছু না কিছু অভিজ্ঞতা আছে। সেই জন্য সে সম্বন্ধে আর কিছু বলা হইল না। এক্ষণে বাঙ্গালা, উড়িষ্যা ব্যতীত ভারতের অন্যান্য প্রদেশে যে রথযাত্রার উৎসব হইয়া থাকে এবং ইতঃপূর্ব্বে সূর্য্য, বিষ্ণু, শিব, মহাদেবী প্রভৃতি পুরাণোক্ত দেবদেবীর ও অন্যান্য পাশ্চাত্যভূমি-প্রচলিত রথের কথা উল্লেখ করিয়াছি; সেই সকল রথের যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

সূর্য্যের রথযাত্রা।

এ রথযাত্রা ভবিষ্যপুরাণোক্ত। মাঘমাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে এই রথযাত্রা করিতে হয়। চতুর্থী তিথিতে অযাচিত ভক্ষণ, পঞ্চমীতে সংযম, ষষ্ঠীতে নিশীথে মাত্র ভোজন করিয়া সপ্তমীর দিন পূর্ণ উপবাসী থাকিয়া সূর্য্য-দেবকে রথে আরোহণ করাইতে হয়। দোলযাত্রার পূর্ব্ব রাত্রে সূর্য্যদেবের রথের সম্মুখে অগ্নিকার্য্য বিধেয়। রাত্রিকালে ভগবান্‌কে রথে আরোহণ করাইয়া সমস্ত রাত্রি জাগরণে ও উৎসবাদিতে অতিবাহিত হয়; অষ্টমীর দিন প্রাতে বাদ্যভাণ্ডাদি সহকারে রথভ্রমণ করাইতে হয়। সংবৎসরের কল্পনায় রথের চক্র, নেমী প্রভৃতি গঠিত হয় এবং স্বর্ণ, রৌপ্য বা দৃঢ় কাষ্ঠ দ্বারা রথ নির্ম্মিত হয়। জগন্নাথের রথে যেমন বলরাম ও সুভদ্রাকে আরোহণ করাইতে হয়, সূর্য্যদেবের রথে তদ্রূপ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবাদি দেবতাকে যথাবিধানে স্থাপন করিয়া রথচালনা করিতে হয়। রথ টানিবার জন্য অশ্বই প্রশস্ত; অভাবে বলীবর্দ্দও নিয়োজিত করা হয়। যাহারা সূর্য্যেতর দেবতার উপাসক, কোনরূপ কুক্রিয়াসক্ত বা অনুপবাসী, তাহাদের পক্ষে রথ-বহন নিষিদ্ধ। পূর্ব্বদ্বার দিয়া রথ বাহির করিয়া যে স্থানে লইয়া যাইবে, তথায় একরাত্রি অবস্থান করিয়া নানাবিধ সংকল্প, বেদ-পাঠ, ব্রাহ্মণ ভোজন ও সূর্য্য, গ্রহ নক্ষত্রাদি দেবগণের পূজা করিতে হয়।

বিষ্ণুর রথযাত্রা।

পদ্ম, স্কন্দ ও ভবিষ্যোত্তর পুরাণে উল্লিখিত হইয়াছে যে, চাতুর্ম্মাস্যের শেষ হইলে ভগবানের উত্থানের পর কার্ত্তিকী শুক্লা দ্বাদশীর রাত্রিতে বিষ্ণুকে রথে স্থাপন করিয়া উৎসব করিতে হয়। পুরাকালে প্রহ্লাদ প্রথমে মহাবিষ্ণুর রথ টানিয়াছিলেন, পরে দেব সিদ্ধ গন্ধর্ব্বগণও এই রথযাত্রার অনুষ্ঠান করিতেন। বিষ্ণুর রথকে পুরভ্রমণ করাইতে হয়।

শিবের রথযাত্রা।

একাম্রপুরাণের মতে শিবের রথযাত্রার নাম আশোকা-মহাযাত্রা। চৈত্রমাসের শুক্লাষ্টমীতে এই উৎসব করিতে হয়। রথনির্ম্মাণের প্রণালী এইরূপ; রথের বর্ণ শুভ্র, চারিখানি চক্র, উচ্চতার পরিমাণ একুশ হাত এবং মণ্ডল ষোল হাত পরিমিত হইবে। রথের তোরণ-চতুষ্টয়ে চারিটি সুবর্ণ কলস থাকিবে। ব্রহ্মা রথের সারথি হইবেন। মহাদেবের রথের দক্ষিণভাগে নন্দী, উত্তরে মহাকাল, পৃষ্ঠভাগে বিনায়ক, পুরোভাগে সবাহন কার্ত্তিক ও অনন্তদেবের পূজা করিয়া তাহার পর মহাদেবের পূজা বিধেয়। এইরূপে যথাবিধানে পূজাদি করিয়া রথপ্রদক্ষিণ পূর্ব্বক মহাদেবকে রথে আরোহণ করাইয়া রথযাত্রার ব্যবস্থা আছে।

দেবীর রথযাত্রা।

দেবীপুরাণে মহাদেবীর রথোৎসবের বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। কার্ত্তিকী শুক্লা তৃতীয়া, পঞ্চমী, সপ্তমী

একাদশী বা পূর্ণিমার সাপ্তভৌম রথে দেবীকে স্থাপন করিয়া যাত্রা করিতে হয়। দেবীর পূজায় সকল প্রকার অন্নপানাদির নৈবেদ্য ও সকল প্রকার বলি দিতে হয়। রথস্থ বেতালদিগের উদ্দেশেও বলিদিবার ব্যবস্থা আছে। পুরভ্রমণ অন্যান্য রথেরই মত।

মেরীর রথযাত্রা।

ইতঃপূর্ব্বে আমরা যে য়ুরোপে সিসিলি দ্বীপের রথযাত্রার কথা উল্লেখ করিয়াছি, সেই রথযাত্রা যীশু-জননী মেরীর উদ্দেশে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। উহা কতকটা সূর্য্য রথেরই মত। এই রথে চন্দ্র-সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলের প্রতিকৃতি রথের নিম্নদেশ হইতে চূড়াপর্য্যন্ত ক্রমশঃ ক্ষুদ্রাকারে গঠিত ও সন্নিবেশিত করা হয়। রথ টানিবার জন্য বহুসংখ্যক মহিষও সংযোজিত করিয়া দেওয়া হয়। শুনিতে পাওয়া যায় সিসিলি দ্বীপের এই রথযাত্রার সময় অতি বীভৎস কদাচারের অভিনয় হইয়া থাকে। বাঙ্গালা দেশের লোকের যেমন বিশ্বাস যে, রথে জগন্নাথকে দর্শন করিলে আর জন্মমৃত্যুর যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না, সিসিলির রমণী-মণ্ডলিতেও সেইরূপ একটা সংস্কার আছে যে, মেরীর রথের ঘূর্ণায়মান চক্রে পিষ্ট হইয়া মৃত্যু হইলে, সেই মৃত ব্যক্তির আত্মা মেরীর সহিত স্বর্গে গমন করে, আর তাহাকে মর্ত্ত্য-ভূমিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। যাহার সন্তানের এইরূপে রথচক্রে মৃত্যু হয়, পরকালে তাহারও অক্ষয় স্বর্গবাস অবশ্যম্ভাবী। এই ভ্রান্ত-বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া অনেক স্ত্রী মূল্য দিয়া দরিদ্র জননীদিগের নিকট হইতে মূল্যদানে সন্তান ক্রয় করিয়া সেই সন্তানকে সঞ্চরমান রথের চক্রে বাঁধিয়া দেয়। সারাদিন চক্রের সহিত বদ্ধাবস্থায় ঘুরিয়া সেই শিশুকে কি যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, তাহাকে কি অবস্থায় ফিরিয়া পাওয়া যায় আর সেই দৃশ্য কি হৃদয়বিদারক, পাঠক তাহা মানসচক্ষে কল্পনা করিয়া দেখুন। অনেক বালককে এইরূপে রথের চাকায় বাঁধিয়া দেওয়া হয়। সমস্ত দিনের পর রথ থামিলে তাহাদের যদি কেহ জীবিত থাকে, তাহাকে লইবার জন্য জননীদের মধ্যে পরস্পর মারামারি কাটাকাটি বাধিয়া যায়। আজ কাল এই নৃশংস পদ্ধতি অনেক পরিমাণে উঠিয়া গিয়াছে।

নেপালের রথযাত্রা।

আজকাল নেপালের অনেক দেবদেবীর রথযাত্রা উঠিয়া গিয়াছে, কিন্তু তথাপি যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহা ভারতের আর কুত্রাপি নাই। এখনও সেখানে জৈনদিগের পার্শ্বনাথ ও মহাবীর স্বামীর রথযাত্রা ব্যতীত সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকার রথযাত্রা প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়টিই প্রধান।

১ম। ভৈরব যাত্রা ও লিঙ্গ-যাত্রা। বৎসরের প্রারম্ভেই ১লা, ২রা বৈশাখ দুইখানি রথে ভৈরব ও ভৈরবীকে স্থাপন করিয়া ঐ রথদ্বয়কে নগর পরিক্রমণ করাইয়া আনা হয়।

২য়। দেবীযাত্রা। এই যাত্রার নাম নেতাদেবীর যাত্রা। ভৈরব যাত্রার পর শুক্লা চতুর্দ্দশীতে এই রথযাত্রা সম্পন্ন হইয়া থাকে।

৩য়। কুমারী-রথযাত্রা। নেপালে কেবল রথযাত্রা বলিলে এই কুমারী রথযাত্রাকেই বুঝায়। কোন দেব-দেবীর প্রতিমা লইয়া এই রথোৎসব অনুষ্ঠিত হয় না। ইহাতে অষ্টমাতৃকার অন্যতম কুমারী এবং গণেশ, একটি বালিকা আর কুমার স্বরূপ একটি বালকের রথে পূজা হইয়া থাকে। নেপালে এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে, রাজা জয়প্রকাশ মল্ল প্রথমে কুমারীবিশেষকে অবমাননা করিয়া তাঁহার ভূসম্পত্তি কাড়িয়া লইয়াছিল। সেইদিন রাত্রিতে তাঁহার রাণী মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়েন এবং কুমারী আসিয়া তাঁহাতে অধিষ্ঠিত হইয়া রাণীর মুখে এই কথা প্রকাশ করেন। রাজা ভীত হইয়া কুমারী-পূজার আয়োজন করিলেন। পূজার প্রণালী এইরূপ :—একটি সপ্তবর্ষীয় কুমারী ও দুইটি বালক মনোনীত করিয়া লওয়া হয়। যাহাকে কুমারী করা হইবে সেই কন্যা ও বালক দুইটিকে শোণিত-সংলিপ্ত বহুতর সুবৃহৎ মহিষশৃঙ্গ সজ্জিত একটি ভীতিপ্রদ গৃহে আনিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়। যদি সেই ভীষণ দৃশ্যে তাহারা কিছুমাত্র বিচলিত না হয়, তাহা হইলে কন্যাকে স্বয়ং দেবীর অবতার কুমারী ও পুত্র দুটি কার্ত্তিক গণেশ বলিয়া সকলের ভক্তি আকর্ষণ করে। স্বয়ং নেপালপতি আসিয়া কন্যার পূজা করেন এবং তাঁহার ব্যয়ের জন্য তিন হাজার টাকার এবং বালক দুইটির জন্য দেড়হাজার টাকা আয়ের জায়গীর দেওয়া হয়। ঐ তিনজন

গৃহে থাকে, তাহা "দেওতার মুকান্" বলিয়া গণ্য। ঐ কুমারীকে দেবী ভাবিয়া কেহ আর বিবাহ করিতে পারে না, কিন্তু বালক দুইটির গলে মালা দিবার জন্য নেওয়ার কুমারীগণ সকলেই উৎসুক। তিন চারি বর্ষ পর্য্যন্ত ঐ তিনজনের পূজা চলিয়া থাকে; তৎপরে আবার নূতন নূতন বালক বালিকা নির্ব্বাচিত হয়। এই তিন জনকে সুসজ্জিত মন্দিরাকার রথে স্থাপন করিয়া যখন রথযাত্রা হয়, তখন সর্দারগণ পরিবৃত হইয়া স্বয়ং নেপালাধিপতি পূজা ও সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

সেরিঙ্গপত্তনের রথ।

মদ্রাজের ন্যায় সেরিঙ্গপত্তনেও রথযাত্রা সমারোহে সম্পন্ন হয়। এই স্থানের রথোপরি বিশালকায় সিংহমূর্ত্তি সংস্থিত থাকে। উৎসবের সময় বিষ্ণু-বিগ্রহ মন্দির হইতে আনয়ন পূর্ব্বক রথমঞ্চে স্থাপিত করা হয়। খ্রীষ্টীয় ১৮শ শতাব্দীর পূর্ব্বে এ প্রদেশে রথযাত্রার কথা শোনা যায় না।

জাপানে রথযাত্রা।

বুদ্ধদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে জাপানে বৌদ্ধগণ রথে বুদ্ধমূর্ত্তি সংস্থাপনপূর্ব্বক রাজপথ দিয়া বুদ্ধের রথযাত্রার অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। তদ্ভিন্ন তোকিওতে ছোট ছোট বালক লইয়া প্রতি বৎসর এক পবিত্র আনন্দের রথযাত্রা হইয়া থাকে। এই রথযাত্রায় বালক, যুবা, বৃদ্ধ, স্ত্রী, পুরুষ সকলেই যোগ দিয়া আনন্দ অনুভব করিয়া থাকে।

কুম্ভকোনমের রথযাত্রা।

কুম্ভকোনমের রথযাত্রাও হিন্দুর উৎসব। এখানে প্রতি বৎসর রথযাত্রা হইয়া থাকে; কিন্তু এ রথে কোন দেবতা অধিষ্ঠিত থাকেন না--প্রধান মন্দিরের পুরোহিতকে স্রক্‌চন্দন দ্বারা সুশোভিত করিয়া রথে বসাইয়া দেওয়া হয়। অতঃপর রথখানিকে রাজপথ দিয়া বহুলোক-সাহায্যে টানিয়া লইয়া যাওয়া হয়। পরিশেষে বহু সমারোহে একটি প্রসিদ্ধ পুষ্করিণীর সম্মুখে রথখানি সমানীত হয়। এই স্থানে নানা পূজোপচারে রথ-সমাসীন পুরোহিতকে পরিতুষ্ট করা হয়। কুম্ভকোনমের এই রথযাত্রা ব্যাপার প্রায় ৭০০ বৎসরের প্রাচীন।

মদ্রাজের রথযাত্রা।

মদ্রাজের এই রথযাত্রা বহুদিন ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। জেসুইটগণ যখন খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে মলবরে আগমন করিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা এই স্থানের রথযাত্রার কথা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এই স্থানের রথ অতি বৃহৎ ও নানা দেবদেবীর মূর্ত্তিদ্বারা চিহ্নিত। এই রথে সাধারণতঃ বিষ্ণুমূর্ত্তিই অধিষ্ঠিত থাকেন। মদ্রাজের রথযাত্রা উপলক্ষে বিপুল সমারোহ হইয়া থাকে।

সাহিত্য-সংবাদ।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত এম, এ মহাশয়ের 'অনিন্দ্যা' নামক পুস্তকখানি যন্ত্রস্থ; পূজার অব্যবহিত পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইবে।

পুষ্পহার:—ছোট গল্প লিখিতে সিদ্ধহস্তা শ্রীযুক্তা উর্ম্মিলা দেবী প্রণীত এই নূতন গল্পের বইখানি পূজার পূর্ব্বেই বাহির হইবে।

প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় এইবার পূজার সময় বঙ্গীয় পাঠকগণকে 'নানান্-নিধি' উপহার দিবেন। পুস্তক যন্ত্রস্থ, শীঘ্রই বাহির হইবে।

বৈষ্ণব-ধর্ম্মানুরাগী শ্রীযুক্ত বামাচরণ বসু মহাশয় 'গৌরাঙ্গ সুন্দর' নামক একখানি সুবৃহৎ গ্রন্থ লিখিয়াছেন। গ্রন্থখানি ছাপা হইতেছে। প্রকাশিত হইতে বিলম্ব হইবে না।

প্রসিদ্ধ গল্পলেখক শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের গল্প-পুস্তক 'বড়দিদি' পূজার সময় প্রকাশিত হইবে; পুস্তকখানি এক্ষণে যন্ত্রস্থ।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসের কায়স্থখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। অনেকেই এই পুস্তকখানি দেখিবার জন্য এতদিন অপেক্ষা করিয়াছিলেন।

সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় 'বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়' নামক সুবৃহৎ গ্রন্থ লিখিতেছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই গ্রন্থের প্রকাশক। সত্বরই এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইবে।

কবিবর শ্রীযুক্ত করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের দুইখানি উৎকৃষ্ট কবিতা পুস্তক পূজার পূর্ব্বে বাহির হইবে। একখানির নাম 'শান্তিজল', অপরখানির নাম 'চন্দ্রাতপ'।

প্রসিদ্ধ গল্পলেখক শ্রীযুক্ত ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের 'পথের কথা' নামক পুস্তকখানি শিক্ষা-বিভাগ কর্ত্তৃক বিদ্যালয় সমূহের পুরস্কার ও পুস্তকালয়ে রক্ষা-কল্পে মনোনীত হইয়াছে।

সুলেখক শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় বহুদিন হইতে কান্তকবি রজনীকান্তের জীবনচরিত সংগ্রহ করিতেছিলেন। তাঁহার এই সুন্দর পুস্তকখানি যন্ত্রস্থ, সত্বরই প্রকাশিত হইবে।

প্রসিদ্ধা লেখিকা শ্রীমতী নিরুপমা দেবীর উপন্যাস 'অন্নপূর্ণার মন্দির' প্রকাশিত হইয়াছে। উপন্যাসখানি পূর্ব্বে ১৩১৮ সালের ভারতী পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল।

প্রসিদ্ধ লেখক শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ গুপ্ত মহাশয় এই পূজার পূর্ব্বে 'হুগলীর ইতিহাস' প্রকাশিত করিবেন। তিনি অনেক দিন হইতে এই ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ করিতেছিলেন।

এই ভাদ্র মাস হইতে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় 'মন্দার-মালা' নামক একখানি মাসিক পত্র প্রকাশিত করিলেন। এই পত্রে কি কি বিষয় আলোচিত হইবে তাহা আমরা জানিতে পারি নাই।

সুলেখক শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের দুইখানি পুস্তক ছাপা হইতেছে। একখানি 'পুষ্পক'—কতকগুলি ছোট গল্পের সমষ্টি; অপরখানি 'মাতৃঋণ' উপন্যাস; এখানি প্রসিদ্ধ ফরাসী ঔপন্যাসিক আলফন্স দোদে রচিত 'জ্যাক' এর অনুবাদ। 'পুষ্পক' পূজার পূর্ব্বে এবং 'মাতৃঋণ' পূজার পরে বাজারে বাহির হইবে।

এবার কলিকাতার টাউনহলে ইষ্টারের বন্ধের সময় বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের অধিবেশন হইবে। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এবং সম্পাদক রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়। সম্মিলনের সভাপতি কে হইবেন তাহা এখনও স্থির হয় নাই। এখন হইতেই আয়োজন আরম্ভ হইয়াছে।

মালদহ জেলার প্রথম বার্ষিক-সাহিত্য-সম্মিলন আগামী পূজার সময় মালদহ জেলার অন্তর্গত কলিগ্রামে অনুষ্ঠিত হইবে। এই উপলক্ষে ইতিহাস প্রসিদ্ধ মালদহ জেলার অনেক পুরাকীর্ত্তি দেখাইবারও ব্যবস্থা হইবে। শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ঘোষ, শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচরণ সরকার প্রভৃতি একনিষ্ঠ সাহিত্য সেবকগণ বিশেষ উৎসাহের সহিত এই সম্মিলন সুসম্পন্ন করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছেন।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন এম, এ মহাশয়ের 'বানান সমস্যা' ও 'অনুপ্রাস' প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথমখানি ব্যাকরণ-বিভীষিকার পরিশিষ্ট; দ্বিতীয়খানিতে অধ্যাপক মহাশয়ের নানা মাসিক পত্রে প্রকাশিত অনুপ্রাস সম্বন্ধীয় প্রবন্ধগুলি একত্র সংগৃহীত হইয়াছে। এই পুস্তকে শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ লাহা মহাশয় কর্ত্তৃক অঙ্কিত হরগৌরীর একখানি সুন্দর চিত্র চারি রঙে মুদ্রিত হইয়াছে।

পুস্তক-পরিচয়।

জীবনী-শক্তি—স্বাস্থ্যরক্ষা ও দীর্ঘজীবন লাভ-বিষয়ক পুস্তিকা। শ্রীযুক্ত ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদার এম, ডি, প্রণীত। মূল্য আট আনা। শ্রীযুক্ত ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের নাম সর্ব্বজনবিদিত; তিনি একজন বহুদর্শী ও বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক। এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি তাঁহার বহুদর্শিতার ফল। পুস্তকখানি আকারে ক্ষুদ্র বটে, ৭২ পৃষ্ঠা মাত্র; কিন্তু ইহার মধ্যে মজুমদার মহাশয় যে সমস্ত কথা বলিয়াছেন, তাহা অপর কেহ তিনশত পৃষ্ঠাব্যাপী সুবৃহৎ পুস্তক লিখিয়াও বলিতে পারিতেন কি না সন্দেহ। আমাদের দেশে এখন অনধিকার-চর্চ্চার আমল পড়িয়াছে; এ সময়ে প্রকৃত অধিকারী ব্যক্তি কোন বিষয় লিখিলে আমরা বড়ই আনন্দ অনুভব করি। সেইজন্যই ডাক্তার মহাশয়ের এই পুস্তকখানি আমরা পরম সমাদরে গ্রহণ করিয়াছি। ইহাতে স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে সমস্ত কথা অতি সুন্দর ভাবে বিবৃত হইয়াছে। স্নান, আহার, শরীরচালনা, ব্যায়াম, চিকিৎসা ও ঔষধসেবন, নানাবিধ চিন্তা ও ভাবনা, দীর্ঘজীবনলাভ প্রভৃতি সমস্ত বিষয় আলোচিত হইয়াছে। ডাক্তার মজুমদার মহাশয়ের নিকট জীবনী-শক্তিসম্বন্ধে যত কথা, যত মূল্যবান উপদেশ পাইব বলিয়া আমরা আশা করি, তাহা সমস্তই এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এমন সুন্দর, এমন প্রয়োজনীয় পুস্তক বঙ্গের প্রতি গৃহে পঠিত হওয়া কর্ত্তব্য।

আকিঞ্চন—কবিতা পুস্তক। শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র প্রণীত। মূল্য এক টাকা। শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র মহাশয় স্বর্গীয় নাট্যকার দীনবন্ধু মহাশয়ের পুত্র, এক্ষণে কলিকাতা ছোট আদালতের জজ। মুন্সেফ জজ প্রভৃতি বিচারকগণ সারা দিনরাত পরিশ্রম করিয়া রাজকার্য্যই শেষ করিয়া উঠিতে পারেন না; এ অবস্থায় বঙ্কিমবাবু যে সাহিত্যচর্চ্চা করেন, সুন্দর কবিতা লেখেন, ইহা তিনি উত্তরাধিকার-সূত্রে লাভ করিয়াছেন, কবি দীনবন্ধুর পুত্র যে কবিতা লিখিবার অধিকারী! আর কবিতাগুলিও প্রেমের কবিতা নহে; ইহাতে মধুর হাসি, চাঁদের জ্যোৎস্না, মলয় বাতাস, অশোককুঞ্জ নাই, আছে শ্রীকৃষ্ণ-ব্যাস-নারদ-সংবাদ, ভগীরথের গঙ্গানয়ন, শিবস্তোত্র, সাধকের নিবেদন, মুমুক্ষুর প্রার্থনা, লছমনঝোলায় গঙ্গা, দেবস্বপ্ন, বঙ্গভাষা প্রভৃতি কবিতা। আমরা এই কবিতাগুলি পাঠ করিয়া প্রীত হইয়াছি এবং বঙ্কিমবাবুকে চিনিতে পারিয়াছি। এই কবিতা-সংগ্রহের আদর হইবে।

পুরাতন প্রসঙ্গ—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্ত এম, এ, প্রণীত। মূল্য পাঁচ সিকা। অধ্যাপক গুপ্ত মহাশয় বাঙ্গালা সাহিত্যে এক নূতন জিনিষ আনিয়াছেন। আমাদের দেশে এমন অনেক বিজ্ঞ বহুদর্শী, পণ্ডিত ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা সহজে আত্মপ্রকাশ করিতে সম্মত হন না, অথচ তাঁহাদের সুদীর্ঘ জীবনকালে এমন সকল ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে, তাহারা এমন সকল বিবরণ জানেন, যাহা সাধারণের গোচর হইলে সত্যসত্যই ইতিহাসের অনেক উপকরণ সংগৃহীত হইতে পারে। অধ্যাপক আচার্য্য শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই শ্রেণীর পণ্ডিত। তিনি যে সময়ে বিদ্যালয় ও কলেজে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, যে সময়ে তিনি কার্য্যক্ষেত্রে প্রথম প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন, সে সময়ে বঙ্গদেশে অনেক রত্নের, অনেক প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তির আবির্ভাব হইয়াছিল। সেই সময়ের ঘটনাবলি, নানা কাহিনী জানিবার জন্য সকলেরই আগ্রহ হওয়া স্বাভাবিক। অধ্যাপক বিপিনবিহারী গুপ্ত মহাশয় পাঠকগণের এই আগ্রহ, এই কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য 'পুরাতন প্রসঙ্গ' নাম দিয়া এই পুস্তকখানি প্রকাশিত করিয়াছেন। আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সহিত কথোপকথন উপলক্ষে বিপিন বাবু যে সমস্ত কথা জানিতে পারিয়াছিলেন, তাহাই যথোপযুক্তরূপে সাজাইয়া তিনি এই প্রসঙ্গ প্রকাশিত করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে এমন সকল কথা প্রকাশিত হইয়াছে, যাহা অনেকেই জানেন না; আর বিপিন বাবু যে প্রকার সুন্দরভাবে, মনোহর ভাষায় কথাগুলি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহাতে উপন্যাস ফেলিয়া পাঠকের এই পুস্তক পড়িতে ইচ্ছা হইবে। এই পুস্তকের ছাপা, কাগজ, বাঁধাই সমস্তই উৎকৃষ্ট; তাহার পর আবার ইহাতে চারিখানি ছবি দেওয়া হইয়াছে। বাঙ্গালী পাঠকদিগকে আমরা এই পুস্তক পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

বিনিময়—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য প্রণীত। মূল্য দেড় টাকা মাত্র। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য মহাশয় বাঙ্গালা সাহিত্য ক্ষেত্রে অপরিচিত নহেন। তিনি অনেকগুলি উপন্যাস এবং অন্যান্য পুস্তক লিখিয়াছেন, জনসাধারণও সেই সকল পুস্তক বিশেষ আগ্রহসহকারে পাঠ করিয়া থাকে। সুরেন্দ্রমোহন বাবু বাঙ্গালী গৃহস্থের চিত্র অতি সুন্দররূপে অঙ্কন করিয়া থাকেন, তাহার কারণ এই যে,তিনি সহরবাসী নন, পল্লীতেই তাঁহার জীবন অতিবাহিত হইতেছে;—তাই পল্লীবাসীর সুখ-দুঃখের, আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা তিনি বেশ জানেন, এবং বিশেষভাবে অনুভব করিয়া থাকেন। তিনি সেই সকল কথাই তাঁহার উপন্যাসাদিতে চিত্রিত করিয়া থাকেন; এবং সেই জন্যই তাঁহার পুস্তকগুলি জনসাধারণ এমন আদরের সহিত পাঠ করিয়া থাকে। এই 'বিনিময়' সুরেন্দ্রবাবুর একখানি গার্হস্থ্য উপন্যাস; ইহাতে দুই ভাইয়ের জীবন-কথা অতি সুন্দর ও মনোজ্ঞভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ভ্রাতৃবিরোধে আমাদের দেশে যে কি অনর্থপাত হয়, তাহা সুরেন্দ্রবাবু যথাযথ চিত্রিত করিয়াছেন। পাপের অধঃপতন ও পুণ্যের জয় এই পুস্তকের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় বর্ণিত হইয়াছে। সুপথে থাকিলে, ন্যায়ানুমোদিত কার্য্য করিলে, ভগবানের উপর একান্ত নির্ভর করিলে দুই দিন আগেই হউক বা দুই দিন পরেই হউক, মানুষের যে মঙ্গল হইবেই হইবে, তাহা ধর্ম্মদাসের জীবন-কথায় সুন্দরভাবে

দেখান হইয়াছে। এ সংসারে যেমন পাষণ্ড সুদখোর মহাজন আছে, বিষকুম্ভ পয়োমুখ আত্মীয় আছে, তেমনই আবার পরোপকারী সাধু সজ্জনও আছে; মতি ঘোষই তাহার দৃষ্টান্ত। আমাদের দেশের যে প্রকার অবস্থা হইয়াছে, তাহাতে অনেক ঘরেই তারিণীচরণের মত গুণধর ভ্রাতা ও তারাসুন্দরীর মত বধূ দেখিতে পাওয়া যায়। এই পুস্তক পাঠে কি তাঁহাদিগের চৈতন্যোদয় হইবে না? 'বিনিময়' পুস্তকখানির ছাপা, কাগজ, বাঁধাই অতি উৎকৃষ্ট এবং ইহাতে কএকখানি সুন্দর ছবি প্রদত্ত হইয়াছে।

ধরা দ্রোণ ও কুশধ্বজ—শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন প্রণীত। মূল্য বার আনা মাত্র। ইহাতে দুইটি কথা আছে তাহার মধ্যে ধরা-দ্রোণ গল্প ও কুশধ্বজ পৌরাণিক উপাখ্যান। দীনেশবাবু এই ক্ষুদ্র পুস্তকের ভূমিকায় ঠিক কথাই বলিয়াছেন যে, "একটি স্বভাবের প্রতিলিপি, অপরটি স্বভাবের হস্তে আদৌ ধরা দেয় না। একটি মনুষ্যের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চলে, অপরটি অজ্ঞাতরাজ্যের সন্ধানে ব্যস্ত!" কথা দুইটিতে দীনেশবাবু এই ভাব সম্পূর্ণ পরিস্ফুট করিয়াছেন। তাঁহার এই ছোট পুস্তকখানি সকলেরই আদরণীয় হইবে। যেমন ছোট বই, তেমনই সুন্দর বহিরাবরণ, তেমনই মনোহর বর্ণনা-কৌশল!

উত্তর-ভারত ভ্রমণ ও সমুদ্র-দর্শন—শ্রীযুক্ত শ্যামাকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য দেড় টাকা মাত্র। ভ্রমণ সম্বন্ধে কোন পুস্তক পাইলেই আমরা বিশেষ আগ্রহ সহকারে পাঠ করিয়া থাকি; বিশেষতঃ উত্তর-ভারতে এমন দর্শনীয় স্থান ও পবিত্র তীর্থ আছে যে, তাহাদের কথা জানিলে বা পড়িলে, সত্যসত্যই কিছুক্ষণের জন্য মনে ভাল ভাবের উদয় হয়। তাই আমরা এ পুস্তকখানি পরম সমাদরে পাঠ করিয়াছি। ইহাতে উত্তর-ভারতের অল্প কএকটি স্থানের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। আমাদের মনে হয়, জম্বুর বিশেষ বিবরণ লিপিবদ্ধ করাই লেখক মহাশয়ের প্রধান উদ্দেশ্য; তাই তিনি হরিদ্বার, লক্ষ্ণৌ, অমৃতসর প্রভৃতি স্থানের কথা অতি সংক্ষেপে সারিয়াছেন। সে যাহাই হউক, এই পুস্তকখানি উত্তর-ভারত ভ্রমণকারীদিগের পথের কথা অনেকটা বলিয়া দিবে।

বাঙ্গলার বেগম—(ঐতিহাসিক চিত্র)। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য ॥০ আনা। অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ ইহার ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। বাঙ্গলার বেগমে সিরাজের পত্নী লুৎফুন্নিসা, মাতা আমিনা, মাতৃস্বসা ঘসিটী প্রভৃতি বঙ্গেতিহাস-প্রখ্যাত ছয়টি বেগম-কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। এই বেগমদের মধ্যে কেহ কেহ বাঙ্গলার শেষ নবাবী আমলের রাজনৈতিক চক্রে লিপ্ত ছিলেন। এই পুস্তকপাঠে মুর্শিদকুলি খাঁর রাজত্বকাল হইতে মীরজাফরের সময় পর্য্যন্ত অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙ্গলার একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পাওয়া যায়, বঙ্গসাহিত্যে আর কেহ ইতঃপূর্ব্বে এরূপ বিস্তৃতভাবে বেগম কাহিনী আলোচনা করেন নাই। ব্রজেন্দ্রনাথ পুরাকালের ইতিহাসের জীর্ণ পত্রগুলি ঘাঁটিয়া এই সুন্দর পুস্তকখানি রচনা করিয়াছেন। লেখকের ভাষা সুললিত—লেখার গুণে পুস্তকখানি উপন্যাসের ন্যায় চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। পুস্তকে বর্ণিতব্য বিষয়গুলি পরিস্ফুট করিবার জন্য গ্রন্থকার অর্থব্যয় ও শ্রম স্বীকার করিয়া গ্রন্থে ৭খানি হাফটোন চিত্র প্রদান করিয়াছেন। এই চিত্রগুলির মধ্যে ঘসিটী বেগমের ত্রিবর্ণে মুদ্রিত চিত্রখানি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বঙ্গীয় পাঠক সমাজে বাঙ্গলার বেগমের যথাযোগ্য সমাদর দেখিলে, আমরা আন্তরিক সুখী হইব। পুস্তকখানির কাগজ ছাপা সুন্দর।

মাস-পঞ্জী

(আষাঢ়)

১লা—বর্ম্মা রেলওয়ের য়ুরোপীয় Linemanরা ধর্ম্মঘট করে।

২রা—কানাডাবাসী হিন্দুগণ ভ্যাঙ্কোভারে তাহাদের প্রতি যেরূপ নির্ম্মম ব্যবহার হইতেছে, তাহার বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদ-সভা করে।

৩রা—বরিশালের রাজনৈতিক মামলা আরম্ভ হয়। বিচারকর্ত্তা মিঃ নেল্‌সন।

ঐ—হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের মৃত্যু হয়।

৩রা—স্যর গায় উইল্‌সনকে সিমলার গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ এক ভোজ দেন।

ঐ—বোম্বায়ের "রেলওয়ে টাইম্‌স্" নামক পত্রের সম্পাদক মিঃ মার্টিন নামক এক সৈনিকের মানহানি করায় অদ্য দোষ সাব্যস্ত হয় ও তাঁহার ২০০৲ টাকা জরিমানা হয়।

৪ঠা—তুর্কী গবর্ণমেণ্ট প্রকাশ করেন যে, তাহাদের বিরুদ্ধে এক ষড়যন্ত্র

সেণ্ট্ হিউবার্ট্।

K. V. Seyne : Bros.

হইয়াছে। তাঁহারা অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে বন্দী করেন।

২।—"অমৃতবাজার পত্রিকার" সম্পাদক ও প্রিণ্টারের বিরুদ্ধে আদালতের অবমাননার অভিযোগের বিচার হাইকোর্টে আরম্ভ; শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ মহাশয় খালাস পান।

৫— আনন্দমোহন্ কলেজে বি, এ, ক্লাস খুলিতে দেওয়া হইবে না, এইরূপ হুকুম ভারতগবর্ণমেণ্ট প্রদান করেন।

৬ই— ভারতবর্ষের সকল স্থানেই শ্রীযুক্ত লর্ড হার্ডিঞ্জ মহাশয়ের জন্মোৎসব সমারোহের সহিত সম্পন্ন হয়। বালকবালিকাদিগকে মিষ্টান্ন ভোজন করান ও বিবিধ প্রকারের আমোদ প্রমোদ হয়।

৭ই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এসসি, পরীক্ষার ফল বাহির হয়।

৮ই আমাদের সম্রাট্ মহোদয়ের রাজদণ্ড গ্রহণের দ্বিতীয় বাৎসরিক উৎসব নানাস্থানে সম্পন্ন হয়।

„ কানপুরের বিখ্যাত ডাক্তার শ্রীহেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মৃত্যু হয়।

৯ই কলিকাতার পুলিশ কমিশনার বাহাদুর মৌলবী লিয়াকৎ হোসেনকে ছয় মাসের জন্য প্রকাশ্যে বক্তৃতা করিতে দেওয়া হইবে না, এইরূপ হুকুম জারী করেন।

„ রঙ্গপুরে ক্ষত্রিয়-সমিতির ৪র্থ বাৎসরিক অধিবেশন সমারোহের সহিত সম্পন্ন হয়।

১০ই— পার্লেমেণ্টে মরিসন কমিটির রিপোর্ট পাস হয়।

„ প্রেসিডেণ্ট পাইনকারে ইংলণ্ডে পদার্পন করেন। তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করা হয়।

১১ই —কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ, পরীক্ষার ফল বাহির হয়।

„ —স্যর গায়-উইলসন পদত্যাগ করিয়া স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করেন।

„ -অযোধ্যার জমিদারদ্বয়ের ব্যাপার পার্লেমেণ্টে আলোচিত হয়।

১২ই— দাক্ষিণাত্যের সর্দ্দারগণের বাৎসরিক দরবার পুনায় বসে; মিঃ ফসেট্ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

„ মদ্রাজের সাধারণ হাঁসপাতালের "ওয়ার্ড বয়রা" ধর্ম্মঘট করে।

„ -স্যর হারবার্ট মহিল্স্ জিবরালটারের গভর্ণার নিযুক্ত হইয়াছেন এই সংবাদ জানা যায়।

„ -কাটিওয়াড়ে পুনরায় ভীষণ বন্যা হইয়াছে এই রিপোর্ট পাওয়া যায়।

১৩ই—বম্বে গবর্ণমেণ্ট মুসলমানগণের শিক্ষা সম্বন্ধে এক মন্তব্য প্রকাশ করেন।

„ এলাহাবাদ হাইকোর্টের প্রথিতনামা ব্যারিষ্টার মিঃ বলের মৃত্যু-সংবাদ পাওয়া যায়।

„—প্রেসিডেণ্ট পাইনকারে ইংলণ্ড ত্যাগ করিয়া স্বদেশে যান।

১৩ই—মার্কিন সেনেটে এক "কারেন্সি" বিল পাস হয়।

„ মদ্রাজের আলুমিনিয়ম ফ্যাক্টরীর কারীকরগণ ধর্ম্মঘট করে।

„ - জাতীয়-শিক্ষা-সমিতির পরীক্ষার ফল বাহির হয়।

১৫ই -মাইকেল মধুসূদন দত্তের মৃত্যুর ৪০ বাৎসরিক উৎসব হয়।

১৬ই—"অমৃতবাজার পত্রিকার" প্রিণ্টারের বিরুদ্ধে আদালতের অবমাননার মামলার বিচারফল বাহির হয়। তাহার নির্দ্দোষিতা সাব্যস্ত হয়।

ঐ -হাজী মহম্মদ লতিফের মৃত্যু হয়।

১৭ই—বোম্বাই মিউনিসিপ্যালিটীর ঝাড়ুদারগণ ধর্ম্মঘট করে।

„ নবাব বদরুদ্দীন হাইদার সাহেবের মৃত্যু হয়।

„—এম, হেনরী রোসেফোর মৃত্যু হয়।

১৯এ ভারত গভমেণ্ট নূতন দিল্লী নির্ম্মাণ বিষয়ক কাগজপত্র সকল প্রকাশ করেন।

২০এ—মিঃ এ লেট্‌লটনের মৃত্যু হয়।

„—বিখ্যাত বৈদান্তিক পণ্ডিত শ্রীজয়রাম বেদান্তবাগীশের মৃত্যু হয়।

২১এ— 'সুহৃদ' মানহানি মামলায় অভিযুক্ত সম্পাদক অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। আপীলে জামিনে খালাস পান।

„—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সভায় ভারতগভর্ণমেণ্টের "লেক্‌চারার" নিয়োগ-সম্বন্ধীয় পত্রের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ হয়।

২৩এ—কমন্স মহাসভা হোমরুল বিল পাস করেন।

২৪এ—জাপানী প্রিন্স্ আরিসুগাওয়ার মৃত্যু হয়।

২৫এ—কমন্স মহাসভায় ওয়েলস্ ডিসএস্ট্যাবলিস্‌মেণ্ট বিল পাস হয়।

„—আহমদসাহ আবদালির বংশধর খাঁ বাহাদুর সাহজাদা সুলতান ইব্রাহিমের মৃত্যু হয়।

„—মেদিনীপুর ভঙ্গকরা সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্ট এক প্রস্তাব "কলিকাতা গেজেটে" প্রকাশ করেন।

২৬এ—স্কচ্ টেম্প্যারেন্স্ বিল কমন্স মহাসভায় পাস্ হয়।

২৭এ—রুমেনিয়া বুলগেরিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।

„—কাউণ্ট্ হায়াসীর মৃত্যু সংবাদ পাওয়া যায়।

৩০এ—কমন্স মহাসভায় প্লুর্যাল ভোটীং বিল পাস হয়।

৩১এ—ভিক্সার রাজার মৃত্যু হয়।

„—ভাইস-এডমিরেল হিউজেস্ হ্যালেটের মৃত্যু হয়।

„—বোম্বায়ের কামা হাঁসপাতালের ধাত্রীগণ ধর্ম্মঘট করে।

„—লর্ডস্ মহাসভা হোমরুল বিল নামঞ্জুর করেন।

৩২এ—ডাক্তার ব্রিজেস্ ইংলণ্ডের রাজকবি ("পোয়েট্ লরিয়েট") নিযুক্ত হইয়াছেন।

গীতলিপি।

"ভারতবর্ষ"।

মিশ্র ইমন ভূপালী—একতালা।

কথা ও সুর—স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।] [স্বরলিপি—শ্রীআশুতোষ ঘোষ।

\+ ৩ ০ ১ + ৩ ০ ১
স ধ্ - সরগ গ গ গ - গ - রগরর রগহ্ম - - - হ্মগ ররগ মপপ প — —
যে দি - - - ন সু নী ল জলধি হইতে - - - উ ঠিলে জননি ভার - - - - ত ব — র্ষ
স - - স্ত্বঃ - - স্না - ন সি-ক্ত বসনা - - - চি কু র সি-ন্ধ্ শীক - - - - র লি — প্ত
শী - - - র্ষে - শু - ভ্র তুষার কিরী- - - ট সা গ র উ-র্ম্মি ঘেরি - - - - য়া জ — ঙ্ঘা
উ প - - - রে প ব ন প্রবল স্বননে - শূ -ন্যে গরজে অবি - - - - - শ্রা — ন্ত
জ ন - - - নি তো মা র ব-ক্ষে শা-ন্তি - - - ক - ণ্ঠে তোমার অভ - - - - য় উ — ক্তি

\+ ৩ ০ ১ + ৩ ০ ১
হ্ম প ধ ধ - - ধ ধ ন ধ প - প ধ ন ন - - ধ নর্স র্স - - -
উ ঠি ল বি - শ্বে সেকি ক ল র ব সেকি মা ভ - ক্তি সেকি - মা হ - র্ষ
ল লা টে গ রি মা বি ম ল হা - স্যে অ ম ল ক ম ল আ ন - ন দী - প্ত
ব - ক্ষে দু লি ছে মুক্তার হা - র প - ঞ্চ সি - ন্ধু য মু - না গ - ঙ্গা
লু টা য়ে প ড়ি ছে পিক ক ল র বে চু - ম্বি তোমার চ র - ণ প্রা - ন্ত
হ - স্তে তোমার বি ত র অ - ন্ন চ র ণে তোমার বিত - র মু - ক্তি

\+ ৩ ০ ১ + ৩ ০ ১
প— হ্মপ ধন ন - ন — ন র্স - - - - র্সন র্সর্রর্র — র্র —র্গ র্সর্র র্গ র্রর্সর্রর্সর্র র্গ —
সেদি - - - ন তোমা - র প্রভায় ধরার প্রভা- - - ত হ ই ল গভী - র রা- - - - ত্রি
উ প - - - রে গ গ - ন ঘেরিয়া নৃ - ত্য করি- - -ছে ত প ন তার - কা চ- - - - ন্দ্র
ক থ - - - ন মা তু - মি ভীষণ দী - প্ত ত - - - - প্ত ম রু র উ ষ - র দৃ- - - - শ্যে
উ প - - - রে জ ল - দ হানিয়া ব - জ্র করি- - - য়া প্র ল য় স লি - ল বৃ- - - - ষ্টি
জ ন - - - নি তোমা - র স - ন্তা ন তরে কত - - - না বে দ না ক ত - না হ- - - - র্ষ

\+ ৩ ০ ১ + ৩ ০ ১
র্গ - র্প - র্গ - র্রর্র র্স - - ধ - - প ধন ন ন - - ধ ন র্র র্স — —
ব - - ন্ দি ল সবে জ য় মা জ ন নি জগ - - ত্তা রি ণি জ গ - দ্ধা — ত্রি
ম - - ন্ ত্র মু - গ্ধ চ র ণে ফে নি ল জল - ধি গ র জে জ ল দ ম — ন্দ্র
হা - সি - য়া ক থ ন শ্যা ম ল শ - স্যে ছড়া- য়ে প ড়ি ছ নি খি ল বি — শ্বে
চ - র - ণে তোমার কু - ঞ্জ কা ন ন কুসু- ম গ - ন্ধ ক রি ছে সৃ — ষ্টি

\+ ৩ ০ ১ + ৩ ০ ১
র্গ - র্গ - র্পর - - র্র - র্গর্স - - প ধ - ন - - নর্স ধ ন র্র - র্স - - -
জ - গ - দ্ পালিনি জ গ - ত্তারিণি জ গ - - জ্জ ন নি ভার - ত ব - র্ষ

কোরাস্

```
+      ৩      ০      ১      +      ৩      ০      ১
র্স - - র্স - - ন - - ধ - - প হ্ম প  ন ধ ধ  হ্ম ধ প হ্মগ  — —
ধ - ন্য হ ই ল ধ র ণী তোমার চ র ণ ক ম ল ক রিয়া স্প — শ

+      ৩      ০      ১      +      ৩      ০      ১
প র্গ - র্র - - র্স র্স র্সধ - র্রর্স - গ - র গ ম গ র · স— ন্ র স
গা ই ল জ য় মা জ গ    ন্ মোহিনি জ গ - জ্জন নি ভার - ত ব - র্ষ।
```

স, র, গ, ম, প, ধ, ন, চিহ্ন দ্বারা মুদারার সাতটি সুর প্রদর্শিত হইল। উচ্চ সপ্তক বা তারার সুরের চিহ্ন রেফ; যথা, র্স; নিম্ন সপ্তক বা উদারার চিহ্ন হসন্ত; যথা, ধ্। হ্ম = কাড়ি মধ্যম। এক একটি অক্ষর বা টান (—) একমাত্রা কাল স্থায়ী; সুরের পর — চিহ্ন সেই সুরের টান বুঝাইবে। উপরে লাইন যুক্ত একাধিক অক্ষর বা টান একমাত্রা বুঝায়। সর, উভয় সুর মিলিয়া একমাত্রা, অর্থাৎ প্রত্যেকটি, আধ মাত্রা; রগরর, ৪টি মিলিয়া একমাত্রা, প্রত্যেকটি সিকি মাত্রা কাল স্থায়ী, ৩টি এক সঙ্গে থাকিলে, প্রত্যেকটি ⅓ মাত্রা কাল, ইত্যাদি। নধ, এইরূপ থাকিলে, উপরের সুরটি কেবল ছুঁইয়া যাইবে। মপপ, প আধমাত্রা ও মপ আধমাত্রা (ম, ¼ ও প, ¼)।

একতালা দ্বাদশ মাত্রিক তাল; ৪ ভাগে বিভক্ত হইয়া প্রত্যেক তাল বিভাগে ৩ মাত্রা আছে। + চিহ্ন দ্বারা সম ও ০ চিহ্ন দ্বারা, অনাঘাত প্রদর্শিত হইল।

জন্মাষ্টমী।

১

মেঘ-অজগর মেলিয়াছে ফণা, গর্জ্জে অশনি ক্রুদ্ধ;
মত্ত মরুৎ অন্ধকারের একি উন্মাদ যুদ্ধ!
কালো কালিন্দী প্রলয়োল্লাসে
প্লাবে প্রান্তর রুদ্র-উছাসে—
খোলে ঝনঝনি' কংস-কারার দ্বার অর্গল-রুদ্ধ।

২

পিতা বসুদেব স্নেহের দুলালে লুকায় বিকল বক্ষে;
ফুকারিতে নারে মায়ের হৃদয়, জমাট্ অশ্রু চক্ষে;
কাঁদিয়া উঠিল পরাণ-পুতলি,
স্তন্য-অমৃত উঠিল উথলি'
অভয়া যামিনী দিগ্-দিগন্তে ঢাকিল অসিত পক্ষে।

৩

মর্ত্ত্য-মমতা পার করে আজি পারের কর্ণ-ধারে।
দ্বিধা-বিভক্ত যমুনা-লহরী ঝর্ঝর বারি-ধারে।
কাতর-শরণে ডাকিছে দেবকী,
গভীরা রাত্রি রয়েছে থমকি',
রুধিছে তপনে প্রভাত-আত্মা উদয়-দেউল-দ্বারে।

৪

দেখা যায় দূরে গোকুল-গোষ্ঠ, বিজুলি-উজল পন্থ,
বসুধা-গগনে ঝরে দেবতার ফুলহার অফুরন্ত।
ধন্য হইল গোপের আলয়,
ঘুচিল শঙ্কা, কংসের ভয়,
অতিথি আজিকে আনন্দময়—ঝঞ্ঝা-রজনী অন্ত!

৫

হে ভাগ্যবান্ নন্দ রাজন্, গৃহ-অলিন্দ তলে
ধূলায় ধূসর কিশোর শ্রীহরি খেলিবেন কুতূহলে—
যুগ যুগান্ত কল্প ধরিয়া
বসি' যোগাসনে তপশ্চরিয়া
পায় নি যাঁহার পরসাদ, তাঁরে লভিলে সুকৃতিফলে।

শ্রীসুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়।

চিত্রপ্রসঙ্গ।

সেণ্ট্ হিউবার্ট

৬৫৬ খৃষ্টাব্দে সেণ্ট হিউবার্ট জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা-মাতা ধনী ও সম্ভ্রান্তবংশীয় ছিলেন; যৌবনকালে ইনি শিকার করিতে এত ভালবাসিতেন যে, "গুড্‌ফ্রাইডের" দিনেও শিকারে বাহির হইলেন। সে দিন কোনও ক্রিশ্চানের এরূপ আমোদ করা উচিত নয়, কারণ ঐ দিন যীশুখ্রীষ্ট ক্রুশে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। শিকার করিতে করিতে তিনি ও তাঁহার সঙ্গীরা পরস্পর ছাড়াছাড়ি হইলেন এবং তিনি দ্রুত অশ্বসঞ্চালন পূর্ব্বক তাহাদিগকে খুঁজিতে গেলে হঠাৎ অশ্বটি থামিয়া পড়িল। হিউবার্ট চাহিয়া দেখিলেন সম্মুখে একটি হরিণ, আর তাহার শৃঙ্গ দুটির মধ্যে ক্রুশঃবিদ্ধ যীশু—তিনি যেন বলিতেছেন, "হিউবার্ট,আর কত কাল পার্থিব আমোদে মত্ত থাকিয়া ধর্ম্মকে তুচ্ছ করিবে;" হিউবার্ট বলিলেন; "প্রভু আপনার ইচ্ছা কি! আমি কি করিব?" প্রভু বলিলেন, "আমার শিষ্য লাম্বার্টের কাছে যাইলে সব শুনিতে পাইবে।" সেই অবধি হিউবার্ট সংসার পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভগবানের প্রেমে মত্ত হইয়া তাঁহার কার্য্যে ও মানবের হিতসাধনে জীবন উৎসর্গ করিলেন।

রেভারণ্ড্ এফ্ ডব্লিউ, ডগ্‌লাস্ এম এ,

আমাদের কবিকঙ্কণ "চণ্ডী"তেও ঠিক এইরূপ একটি ঘটনার উল্লেখ আছে;—

তথা ধর্ম্মকেতু তাড়া দিয়াছে হরিণে॥
রূপসী হরিণ হইয়া আপনি অভয়া।
ব্যাধের সম্মুখে আসি পাতিলেন মায়া॥
রৈয়া রৈয়া যান মাতা দীঘল তরঙ্গে॥
তার পাছে ব্যাধ যেন উড়য়ে তরঙ্গে।
আকর্ণ পুরিয়া মহাবীর এড়ে শর।
শর ছাড়ি দিতে দেবী হইলা অন্তর॥

ইসিস্।

ইনি মিসরবাসীদিগের শক্তিরূপা দেবী। গাভী ইঁহার বাহন। ভৈরবের নাম অসীরিস, পুত্রের নাম হোরাস। ইঁহার স্থিরযৌবন-মূর্ত্তি অমিতলাবণ্যময়ী। আমাদের প্রদত্ত চিত্রের মূল খানি সুপ্রসিদ্ধ চিত্রকর এল্ ক্রোসিও কর্ত্তৃক অঙ্কিত।

কন্দর্পের শাসন।

এখানিও এল্ ক্রোসিও কর্ত্তৃক অঙ্কিত; সুরারাণীর সহিত কন্দর্পের "চোখ্ ফোটাফুটি" খেলাই চিত্রখানির বিষয়। চিত্রখানি দেখিলেই ভবভূতির সেই শ্লোকটি মনে পড়ে,—

"ভ্রমতি ভুবনে কন্দর্পাজ্ঞা বিকারি চ যৌবনং।
ললিতমধুরাস্তেতে ভাবাঃ ক্ষিপন্তিচ ধীরতাং॥"

অর্থাৎ 'কন্দর্পের শাসন ভুবনে বিচরণ করিতেছে, যৌবন-সুলভ বিকার, এবং নারীদের ললিতমধুর সেই সেই ভাবে ধীরতাও সহজেই পরাজিত হয়।'

শূর ও শমন।

লর্ড লেটন কর্ত্তৃক অঙ্কিত এই বিখ্যাত চিত্রখানির বিষয় য়্যাড্‌মেটসের পত্নী য়্যালসেস্‌টিসকে শমনের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য সেই ভুবনবিখ্যাত শূর হার্কিউলিসের সহিত যমরাজের দ্বন্দ্ব। লেটনের এই চিত্রখানিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত।

রাগ-রঙ্গ।

"নাচ, বাজাও, গোলাপ-সুন্দরি;
হৃদয় আনন্দে মশগুল হউক!—
জীবন-বসন্তে ভরপুর আমোদ-প্রমোদ ত চাই।"

নিদাঘ-শশী।

এখানিও লর্ডলেটন্-কর্ত্তৃক ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে অঙ্কিত একখানি চিত্রের প্রতিলিপি। এ পর্য্যন্ত এই শ্রেণীর ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট চিত্র প্রকাশিত হয় নাই।

২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে শ্রীসুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও
২০৩।১।১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট "প্যারাগন প্রেস" হইতে
শ্রীগোপালচন্দ্র রায় দ্বারা মুদ্রিত।

—কৈলাসে—

চিত্রশিল্পী···শ্রীযুক্ত ভবানী চরণ লাহা কর্তৃক অঙ্কিত।

K. V. SEYNE & BROS.
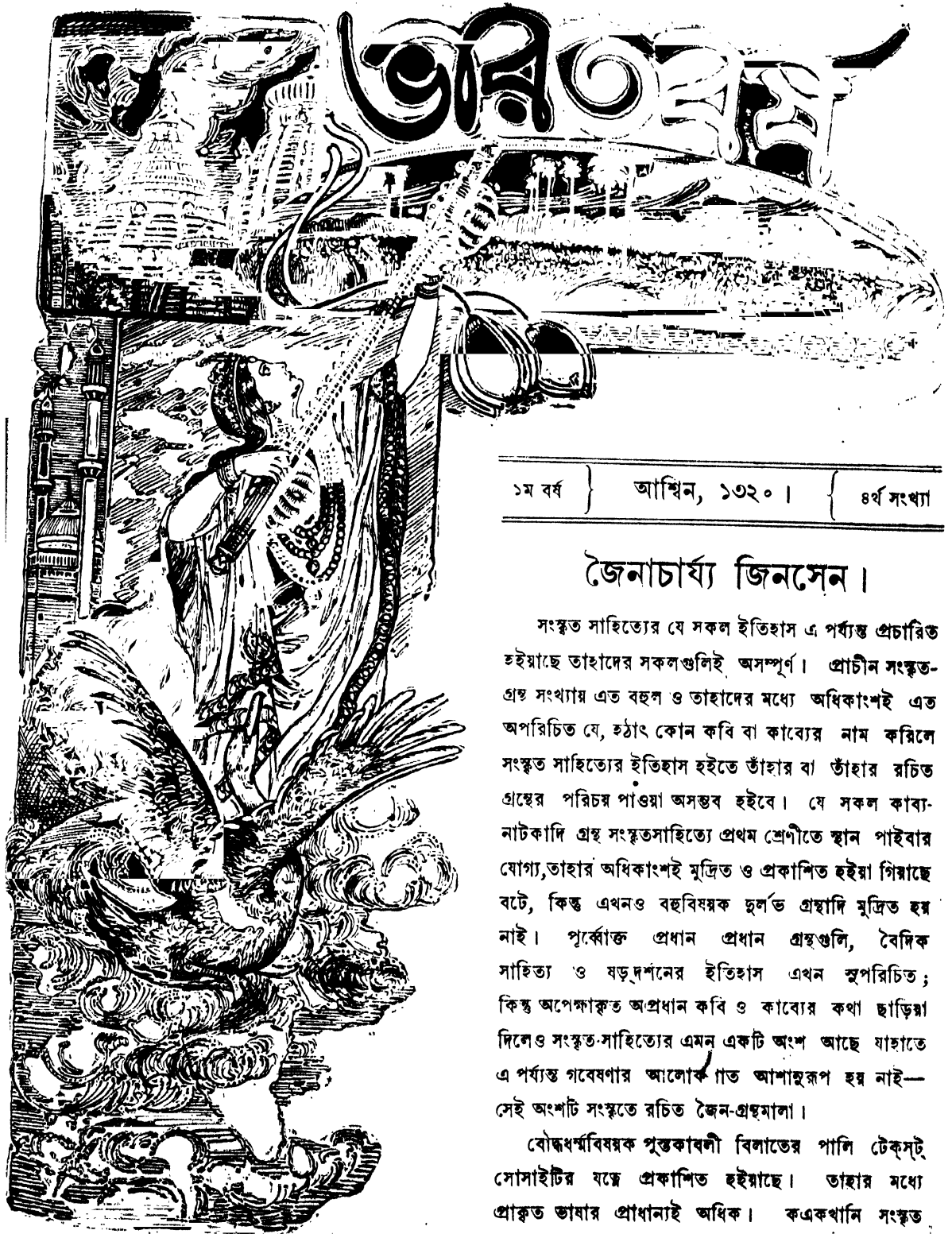
১ম বর্ষ } আশ্বিন, ১৩২০। { ৪র্থ সংখ্যা

জৈনাচার্য্য জিনসেন।

সংস্কৃত সাহিত্যের যে সকল ইতিহাস এ পর্য্যন্ত প্রচারিত হইয়াছে তাহাদের সকলগুলিই অসম্পূর্ণ। প্রাচীন সংস্কৃত-গ্রন্থ সংখ্যায় এত বহুল ও তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই এত অপরিচিত যে, হঠাৎ কোন কবি বা কাব্যের নাম করিলে সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস হইতে তাঁহার বা তাঁহার রচিত গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া অসম্ভব হইবে। যে সকল কাব্য-নাটকাদি গ্রন্থ সংস্কৃতসাহিত্যে প্রথম শ্রেণীতে স্থান পাইবার যোগ্য,তাহার অধিকাংশই মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু এখনও বহুবিষয়ক দুর্লভ গ্রন্থাদি মুদ্রিত হয় নাই। পূর্ব্বোক্ত প্রধান প্রধান গ্রন্থগুলি, বৈদিক সাহিত্য ও ষড়্‌দর্শনের ইতিহাস এখন সুপরিচিত; কিন্তু অপেক্ষাকৃত অপ্রধান কবি ও কাব্যের কথা ছাড়িয়া দিলেও সংস্কৃত-সাহিত্যের এমন একটি অংশ আছে যাহাতে এ পর্য্যন্ত গবেষণার আলোকপাত আশানুরূপ হয় নাই—সেই অংশটি সংস্কৃতে রচিত জৈন-গ্রন্থমালা।

বৌদ্ধধর্ম্মবিষয়ক পুস্তকাবলী বিলাতের পালি টেক্‌সট্‌ সোসাইটির যত্নে প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে প্রাকৃত ভাষার প্রাধান্যই অধিক। কএকখানি সংস্কৃত গ্রন্থও আছে। সংস্কৃত সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিহাসে এ

গুলিরও স্থান হওয়া উচিত। অশ্বঘোষের বুদ্ধ-চরিত, বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা প্রভৃতি গ্রন্থ সংস্কৃত সাহিত্যেও বিশেষ স্থান লাভ করিতে সমর্থ।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, জৈনধর্ম্ম সম্বন্ধীয় গ্রন্থাবলী এ পর্য্যন্ত অতি অল্পই মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। জৈন-সাহিত্যের অধিকাংশই প্রাকৃত ভাষায় রচিত। আবার এমন অনেক জৈন গ্রন্থকার জন্মিয়াছেন, যাঁহাদের সংস্কৃত-ভাষায় রচিত গ্রন্থাবলী প্রথম শ্রেণীর কবিদের রচনার সহিত তুলিত হইতে পারে। সেইরূপ একটি কবি ও তাঁহার রচনার কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

মহাকবি কালিদাসের "মেঘদূত" আজ জগদ্বিদিত। সংস্কৃত ভাষায় আর একখানি কাব্য আছে, উহার নাম "পার্শ্বাভ্যুদয়ম্।" এই গ্রন্থখানিতে চারিটি সর্গ আছে। প্রথম সর্গের শ্লোক-সংখ্যা ১১৮, দ্বিতীয়ের ১১৮, তৃতীয়ের ৫৭ ও চতুর্থের ৭১। এই কাব্যখানির বৈচিত্র্য এই যে, ইহার প্রত্যেক শ্লোকের একটি বা দুইটি চরণ অবিকল মেঘদূত হইতে গৃহীত। সমস্যাপূরণে যেরূপ একটি চরণ দিয়া বলা হয়, বাকি তিন চরণ রচনা করিয়া শ্লোকটি সম্পূর্ণ কর, এই কাব্যখানির মেঘদূতের পংক্তিগুলি, যেন সেই সমস্যা পংক্তিসমূহ, কবি নিজরচিত অন্যান্য পংক্তি দিয়া তাহা পূর্ণ করিয়াছেন। উদাহরণে ইহা পরিস্ফুট হইবে। মেঘদূতের প্রথম শ্লোকটি সর্ব্ববিদিত হইলেও উদ্ধৃত হইল—

কশ্চিৎ কান্তাবিরহগুরুণা স্বাধিকারপ্রমত্তঃ
শাপেনাস্তংগমিতমহিমা বর্ষভোগ্যেন ভর্ত্তুঃ।
যক্ষশ্চক্রে জনকতনয়াস্নানপুণ্যোদকেষু
স্নিগ্ধচ্ছায়াতরুষু বসতিং রামগির্য্যাশ্রমেষু॥

এখন এই মেঘদূতের প্রথম শ্লোকের চারিটি চরণ "পার্শ্বাভ্যুদয়" কাব্যের প্রথম চারিটি শ্লোকের যথাক্রমে শেষ চরণরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে। যথা—

শ্রীমন্মূর্ত্ত্যা মরকতময়স্তম্ভলক্ষ্মীং বহন্ত্যা
যোগৈকাগ্র্যস্তিমিততরয়া তস্থিবাংসং নিদধ্যৌ।
পার্শ্বং দৈত্যো নভসি বিহরন্ বদ্ধবৈরেণ দগ্ধঃ
কশ্চিৎ কান্তাবিরহগুরুণা স্বাধিকার-প্রমত্তঃ॥ ১

তন্মাহাত্ম্যাৎ স্থিতবতি সতি স্বে বিমানে সমানঃ
প্রেক্ষাঞ্চক্রে ভ্রুকুটিবিষমং লব্ধসংজ্ঞো বিভাগাৎ।
জ্যায়ান্ ভ্রাতুর্বিধৃতপতিনা প্রাক্ কলত্রেণ যোঽভূ-
চ্ছাপেনাস্তং গমিতমহিমা বর্ষভোগ্যেন ভর্ত্তুঃ॥ ২
যো নির্ভর্ৎসৈঃ পরমবিষমৈর্ব্বধাটিতো ভ্রাতরি স্বে
বদ্ধা বৈরং কপটমনসা হা তপস্বী তপস্যাম্।
সিন্ধোস্তীরে কলুষহরণেপুণ্যপণ্যেষু লুব্ধো
যক্ষশ্চক্রে জনকতনয়াস্নানপুণ্যোদকেষু॥ ৩
তস্যাস্তীরে মুহুরুপলবান্নৃদ্ধশোষং প্রশুষ্যন্
-নুদ্বাহুস্ সন্ পরুষমননঃ পঞ্চতাপং তপো যঃ।
কুর্ব্বন্ন স্ম স্মরতি জড়ধীস্তাপসানাং মনোজ্ঞাং
স্নিগ্ধচ্ছায়াতরুষু বসতিং রামগির্য্যাশ্রমেষু॥ ৪

এইরূপভাবে মেঘদূতের প্রতিপংক্তি লইয়া নিজরচিত কাব্যের এক একটি শ্লোকের চরণে পরিণত করা যে কত দূর কঠিন, তাহা সহজেই উপলব্ধি হইবে। আরও বিস্ময়ের বিষয় এই যে, "পার্শ্বাভ্যুদয়" কাব্যের বিষয়ের সহিত মেঘদূতের কোন সাদৃশ্য নাই। পার্শ্বাভ্যুদয়-রচয়িতা জৈনধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। এই কাব্যে তিনি জৈন তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের তপস্যা, প্রলোভন ও প্রলোভনজয়ের কথা বিবৃত করিয়াছেন। মেঘদূতের বিরহী যক্ষের মুখোচ্চারিত বাক্যগুলি এরূপ বিষয়ে ভিন্ন অর্থে ব্যবহার কতদূর দুরূহ, তাহা স্পষ্টই প্রতীত হইবে। কেবল একটি চরণ লইয়া নহে, সময়ে সময়ে দুইটি চরণও এক শ্লোকে স্থান পাইয়াছে। যথা—

তত্র ব্যক্তং দৃষদি চরণন্যাসমদ্ধেন্দুমৌলে-
র্চাং ভর্ত্তুস্ত্রিভুবনগুরোরর্হতঃ সংসপর্য্যৈঃ।
শশ্বৎসিদ্ধৈরুপহৃতবলিং ভক্তিনম্রঃ পরীয়াঃ
পাপাপায়ে প্রথমমুদিতং কারণং ভক্তিরেব॥
যস্মিন্ দৃষ্টে করণবিগমাদূর্দ্ধমুদ্ধূতপাপাঃ
সিদ্ধক্ষেত্রং বিদধতি পদং ভক্তিভাজস্তমেনম্।
দৃষ্ট্বা পূতস্ত্বমপি ভবতাদ্বৈ পুনর্দূরতোঽমুং
কল্পিষ্যন্তে স্থিরগণপদপ্রাপ্তয়েঽশ্রদ্দধানাঃ॥

উদ্ধৃত অংশের প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম ও অষ্টম চরণগুলি মেঘদূতের। কোন কোন স্থলে মেঘদূত হইতে দুইটি চরণই একত্রে উদ্ধৃত হইয়াছে। যথা—

নাহং দৈত্যো ন খলু দিবিজঃ কিন্নরঃ পন্নগো বা
বাস্তব্যোঽহং ধনদনগরে গুহ্যকোঽয়ং মদীয়া।
বাপী চাস্মিন্ মরকতশিলাবদ্ধসোপানমার্গা
হৈমৈশ্ছন্না বিকচকমলৈর্দীর্ঘবৈদূর্য্যনালৈঃ॥

এইরূপ বহুভাবে মেঘদূতের পংক্তিগুলি গৃহীত হইয়াছে। স্থানাভাবে অধিক উদাহরণ দেওয়া হইল না।

পার্শ্বাভ্যুদয় কাব্যের সংক্ষিপ্ত বিষয় এই—পোদনপুরে অরবিন্দ নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার দুই মন্ত্রী। মন্ত্রিদ্বয়ের নাম কমঠ ও মরুভূতি। উভয়ে সহোদর ভ্রাতা, বিশ্বভূতি নামক ব্রাহ্মণের পুত্র। কমঠের পত্নীর নাম বরুণা ও মরুভূতির স্ত্রীর নাম বসুন্ধরা। অরবিন্দ রাজার সহিত বজ্রবীর্য্য নামক কোন রাজার যুদ্ধ উপস্থিত হইলে অরবিন্দ সসৈন্যে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। তাঁহার সঙ্গে মন্ত্রী মরুভূতিও চলিলেন। মরুভূতির অবর্ত্তমানে জ্যেষ্ঠ কমঠ, কনিষ্ঠ মরুভূতির পত্নী বসুন্ধরার প্রতি অনুচিত আচরণ করিয়াছিল। রাজা যখন যুদ্ধজয়ের পর প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, তখন এই বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া মরুভূতির সহিত মন্ত্রণা করিয়া কঠোর আজ্ঞা প্রচার করিলেন ও তদনুসারে কমঠ পুরী হইতে বহিষ্কৃত হইল। পরে কমঠ বনে গিয়া তাপসবৃত্তি অবলম্বন করিল; কিন্তু মরুভূতির মনে তাহার পর অনুতাপ হইতে লাগিল। সে বনে গিয়া জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে প্রসন্ন করিবার জন্য তাহার চরণে নত হইলে দুরাচার কমঠ প্রস্তরাঘাতে সেই অবস্থাতেই মরুভূতিকে বধ করিয়া নিজ নিষ্ঠুরতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিল।

জন্মান্তরে মরুভূতি বারাণসীর রাজা বিশ্বসেনের ঔরসে রাজ্ঞী ব্রাহ্মীদেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন। উত্তরকালে জৈন তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ নামে ইনি প্রসিদ্ধিলাভ করেন। কমঠও জন্মান্তরে শম্বর নামক জ্যোতিরিন্দ্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল।

এইটকু পূর্ব্বকথা। তাহার পরের ঘটনা হইতে পার্শ্বাভ্যুদয় কাব্য আরম্ভ হইয়াছে। পার্শ্বনাথ ধ্যানমগ্ন। শম্বর আসিয়া জন্মান্তরের শত্রুতা-স্মরণে পার্শ্বনাথের সহিত যুদ্ধ প্রার্থনা করিল। পরে বহু প্রলোভন দেখাইল। এই কথোপকথনকালে মেঘদূতের ন্যায় বহু জনপদ-বর্ণনাও করিয়া লইল। এই বর্ণনার সময় যে শ্লোকগুলি রচিত হইয়াছে, তাহাতে কবির তত আয়াস স্বীকার করিতে হয় নাই; কেননা মেঘদূতেও এইরূপ জনপদ-বর্ণনা আছে। পার্শ্বনাথ কিন্তু অটল। কাব্যশেষে নাগরাজ, পত্নী পদ্মাবতীর সহিত, পার্শ্বনাথের প্রীত্যর্থে সমাগত হইলেন। শম্বরও নিজ কৃত কার্য্যের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিল। পার্শ্বনাথ প্রসন্ন হইলেন।

এই কাব্যের শেষে গ্রন্থকারের এইরূপ পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছেঃ—"এই কাব্য কালিদাসরচিত মেঘদূত আশ্রয় করিয়া রচিত হইয়াছে। পর-রচিত কাব্যকে তিরস্কৃত করিয়া যাবৎ চন্দ্রমা বিদ্যমান থাকেন, তাবৎ এই কাব্য প্রচারিত থাকুক্। দেব অমোঘবর্ষ সর্ব্বদা ভুবন পালন করুন।

শ্রীবীরসেন মুনির পাদপদ্মের ভৃঙ্গ স্বরূপ শ্রেষ্ঠ বিনয়সেন নামক মুনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহা দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া মুনিশ্রেষ্ঠ জিনসেন মেঘদূত আশ্রয় করিয়া এই কাব্য রচনা করিয়াছিলেন।" *

প্রতি সর্গের শেষেও "অমোঘবর্ষের গুরু জিনসেনাচার্য্য রচিত পার্শ্বাভ্যুদয় কাব্য" ইত্যাদি লিখিত আছে। † ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় জিনসেনাচার্য্য কোন্ সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন; কারণ, অমোঘবর্ষ ইতিহাসে সুপ্রসিদ্ধ।

অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে দাক্ষিণাত্যে রাষ্ট্রকূটবংশীয় নরপতিগণ চালুক্যবংশীয় নৃপগণকে পরাস্ত করিয়া প্রাধান্য লাভ করেন। দন্তিদুর্গ রাজার নিকট চালুক্যনৃপতি দ্বিতীয় কীর্ত্তিবর্ম্মা পরাস্ত হইবার পর হইতে দুই শতাব্দীরও অধিক-কাল রাষ্ট্রকূট নরপতিগণ দাক্ষিণাত্যে নিজেদের প্রভাব

---

* ইতি বিরচিতমেতৎ কাব্যমাবেষ্ট্য মেঘং
বহুগুণমপদোষং কালিদাসস্য কাব্যম্।
মলিনিতপরকাব্যং তিষ্ঠতাদাশশাঙ্কং
ভুবনমবতু দেবঃ সর্ব্বদামোঘবর্ষঃ॥
শ্রীবীরসেনমুনিপাদপয়োজভৃঙ্গঃ
শ্রীমানভূদ্বিনয়সেনমুনির্গরীয়ান্।
তচ্চোদিতেন জিনসেনমুনীশ্বরেণ
কাব্যং ব্যধায়ি পরিবেষ্টিত মেঘদূতম্॥

† "ইত্যমোঘবর্ষপরমেশ্বর পরমগুরু শ্রীজিনসেনাচার্য্য বিরচিত মেঘদূতবেষ্টিত বেষ্টিতে পার্শ্বাভ্যুদয়ে ভগবৎ কৈবল্যবর্ণনো নাম চতুর্থঃ সর্গঃ।"

বিস্তার * করেন। এই রাষ্ট্রকূটবংশীয় তৃতীয় গোবিন্দের রাজ্যাবসানে প্রথম অমোঘবর্ষ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তাঁহার রাজ্যকাল ভিন্সেণ্ট স্মিথ ৮১৫ হইতে ৮৭৭ খৃষ্টাব্দ নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। †

প্রথম অমোঘবর্ষ দিগম্বর-সম্প্রদায়ভুক্ত জৈনগণের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি নিজেও একজন সুকবি ছিলেন। 'কবিরাজমার্গ' নামক অলঙ্কার গ্রন্থ ও 'প্রশ্নোত্তর-রত্নমালা' নামক গ্রন্থদ্বয় তিনি রচনা করিয়াছিলেন। ‡

উদ্ধৃত জিনসেন এই অমোঘবর্ষের গুরু ছিলেন। জিনসেন রচিত পার্শ্বাভ্যুদয় কাব্যের শেষ শ্লোকদ্বয় হইতে ইহা স্পষ্টই জানা যায়। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য গ্রন্থেও ইহার উল্লেখ আছে। "উত্তরপুরাণ" নামক জৈনগ্রন্থের প্রশস্তিতে আছে, "বীরসেন জিনসেনের গুরু ছিলেন। অমোঘবর্ষ জিনসেনের পদে প্রণত হইতেন"। §

জিনসেনের অপর গ্রন্থাবলীর বিষয় বলিবার পূর্ব্বে 'পার্শ্বাভ্যুদয়' সম্বন্ধীয় এক কাহিনীর বর্ণনা প্রয়োজনীয়। পার্শ্বাভ্যুদয় কাব্যের কথাবতরে আছে—কালিদাস নামক কোনও কবি মেঘদূত নামক কাব্য রচনা করিয়া বিভিন্ন নৃপতিগণকে তাহা শ্রবণ করাইবার জন্য দেশে দেশে ভ্রমণ করিতেছিলেন। শেষে তিনি অমোঘবর্ষের সভায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সভাতে জিনসেন ও তাঁহার সতীর্থ বিনয়সেন উপস্থিত ছিলেন। কালিদাস সগর্ব্বে নিজ কাব্য পাঠ করিয়া সকলকে অবজ্ঞা সহকারে গণনা করাতে বিনয়সেন জিনসেনকে কালিদাসের দর্পচূর্ণ করিতে বলিলেন। জিনসেন তাহাতে উপহাসের হাসি হাসিয়া কালিদাসকে বলিলেন, "তোমার এ কাব্যখানি সুন্দর বটে, কিন্তু ইহা ত আমন্ত প্রাচীন গ্রন্থ হইতে চুরি দেখিতেছি।" ক্রুদ্ধ কালিদাস বলিলেন, "কি রকম! কই কোন্ গ্রন্থ হইতে চুরি দেখাও ত।" জিনসেন বলিলেন, "আটদিনের রাস্তা তফাতে অন্য গৃহে সেই গ্রন্থ আছে। আটদিনের মধ্যে আনিয়া দেখাইব।" এই বলিয়া জিনসেন চলিয়া গেলেন ও আটদিনের মধ্যে "পার্শ্বাভ্যুদয়" কাব্য রচনা করিয়া সভায় আসিয়া শুনাইলেন। বলা বাহুল্য শ্রবণমাত্র কালিদাসের মেঘদূত জিনসেন আয়ত্ত করিয়া লইয়াছিলেন। মেঘদূতের প্রত্যেকপংক্তি পার্শ্বাভ্যুদয় হইতে গৃহীত ইহা বলিয়া কালিদাসের দর্পচূর্ণ করিলেন। তৎপরে সভাস্থলেই যথার্থ বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া কালিদাসের যথোচিত সংবর্দ্ধনা করিয়াছিলেন।

"কালিদাসাহ্বয়ঃ কশ্চিৎ কবিঃ কৃত্বা মহৌজসা।
মেঘদূতাভিধং কাব্যং শ্রাবয়ন্ গণশো নৃপান্॥
অমোঘবর্ষরাজস্য সভামেত্য মদোদ্ধুরঃ।
বিদুষোঽবগণয্যৈষ প্রভুমশ্রাবয়ৎ কৃতিম্॥
তদা বিনয়সেনস্য সতীর্থস্যোপরোধতঃ।
তদ্বিষ্যাহং-কৃতিচ্যুত্যৈ সন্মার্গোদ্দীপ্তয়ে পরম্॥
জিনসেনমুনীশানস্ত্রৈবিদ্যাধীশ্বরাগ্রণীঃ।
বিংশত্যগ্রশতগ্রন্থপ্রবন্ধশ্রুতিমাত্রতঃ॥
একসন্ধিস্থিতসর্গবং গৃহীত্বা পদ্যমর্থতঃ।
ভূভৃদ্বিদ্বৎসভামধ্যে প্রোচে পরিহসন্নিতি॥

---

* রাষ্ট্রকূটবংশে অমোঘবর্ষ নামধারী ৩ জন রাজা ছিলেন। প্রথম অমোঘবর্ষ তৃতীয় গোবিন্দের পুত্র, তাহার অপর অনেকগুলি নাম ছিল—"নৃপতুঙ্গ, মহারাজ সর্ব্ব বা মহারাজ ষণ্ড, অতিশয়ধবল দুল্লভ বীরনারায়ণ। তিনি মান্যখেত (মুসলমান ঐতিহাসিকগণের মানকির) নগরের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার নিলগুণ্ড ও সিরুর খোদিত লিপি অনুসারে তিনি বঙ্গদেশ জয় করিয়াছিলেন। অনুমান হয়, পালবংশীয় নরপতি দেবপালের রাজ্যকালে তিনি বঙ্গ আক্রমণ করিয়া পরাজিত হইয়াছিলেন।

Epigraphia Indica. Vol. VIII App 2. p. 3.

† Early History of India, P. 328

‡ বিবেকাত্ত্যক্তরাজ্যেন রাজ্ঞেয়ং রত্নমালিকা।
রচিতামোঘবর্ষেণ সুধিয়া সদলংকৃতিঃ॥
[প্রশ্নোত্তররত্নমালার শেষ শ্লোক]

§ অভবদিহ হিমাদ্রেদেবসিন্ধু-প্রবাহো ধ্বনিরিব সকলজ্ঞাৎসর্ব্বশাস্ত্রৈকমূর্ত্তিঃ।
উদয়গিরিতটাদ্বা ভাস্করো ভাসমানো মুনিরনু জিনসেনো বীরসেনাদমুষ্মাৎ॥
যস্য প্রাংশুনখাংশুজালবিসরদ্ধারান্তরাবির্ভবৎ-
পাদাম্ভোজরজঃ পিশঙ্গমুকুটপ্রত্যগ্ররত্নদ্যুতিঃ।
সংস্মর্ত্তা স্বমমোঘবর্ষনৃপতিঃ পূতোঽহমদ্যেত্যলং
স শ্রীমান্ জিনসেনপূজ্যভগবৎপাদো জগন্মঙ্গলম্॥
[উত্তরপুরাণ-প্রশস্তি]

পুরাতনকৃতি স্তেয়াৎ কাব্যং রম্যমভূদিদম্।
তচ্ছ্রুত্বা সোঽব্রবীদ্রুষ্টঃ পঠতাৎকৃতিরস্তি চেৎ॥
পুরান্তরে সুদূরেঽস্তি বাসরাষ্টকমাত্রতঃ।
আনায্য বাচয়িষ্যামীত্যবোচদ্ যমিকুঞ্জরঃ॥
ইত্যেতদবলোক্যাথ সভাপতি পুরোগমাঃ।
তথৈবাস্থিতি মাধ্যস্থ্যাৎ সময়ং চক্রিরে মিথঃ॥
শ্রীমৎপার্শ্বার্হদীশস্য কথামাশ্রিত্য সোঽতনোৎ।
শ্রীপার্শ্বাভ্যুদয়ং কাব্যং তৎপাদার্দ্ধাদিবেষ্টিতম্॥
সঙ্কেতদিবসে কাব্যং বাচয়িত্বা স সংসদি।
তদুদস্তমুদীর্য্যাথ কালিদাসমমানয়ৎ॥
[পার্শ্বাভ্যুদয়কাব্যম্—কথাবতরঃ।]

কিন্তু এই উপাখ্যান সম্পূর্ণ অলীক। কালিদাস যে জিনসেনের সমসাময়িক নহেন,তাহা সহজেই প্রতিপন্ন হইতে পারে। জিনসেন নবম শতাব্দীতে প্রাচুর্ভূত হইয়াছিলেন। অমোঘবর্ষের রাজত্বকাল ৮১৫ হইতে ৮৭৭ খৃষ্টাব্দ, জিনসেনও ঐ সময়ে বিদ্যমান ছিলেন। নবম শতাব্দীর শেষভাগে ও দশম শতাব্দীর প্রারম্ভে জিনসেন, গুণভদ্র প্রভৃতি দিগম্বর জৈনাচার্য্যগণের প্রভাবে বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতি হইতেছিল। * কিন্তু কালিদাস যে সপ্তম শতাব্দীর পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশির রাজত্বকালে উৎকীর্ণ একখানি শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। উহাতে জৈনকবি রবিকীর্ত্তি, কালিদাস ও ভারবির নামোল্লেখ আছে। † কাজেই কালিদাস যে ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী তাহার সন্দেহ নাই। দ্বিতীয় পুলকেশি ৬০৮ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। শিলালেখটির কাল ৫৫৬ শকাব্দ। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, কালিদাস দ্বিতীয় পুলকেশির রাজ্যকালে ৫৫৬ শকাব্দের পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন, কিন্তু জিনসেন তাহার অন্ততঃ দুইশত বৎসর পরে প্রাচুর্ভূত হইয়াছিলেন।

এখন আমরা জিনসেনের অপর গ্রন্থাবলীর কিছু পরিচয় প্রদান করিব।

জিনসেন "জয়ধবলপুরাণ" নামক জৈনধর্ম্মগ্রন্থের টীকা রচনা করিয়াছিলেন। এই টীকা রচনার এক ইতিহাস আছে। জিনসেনের গুরু বীরসেন "জয়ধবলপুরাণ" গ্রন্থের টীকা রচনা করিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু উহা সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার মৃত্যু হয়। গুরু রচিত টীকা অসম্পূর্ণ থাকে দেখিয়া জিনসেন উহা সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন। বীরসেন বিংশ সহস্র শ্লোক লিখিয়া কালগ্রাসে পতিত হন। জিনসেন আরও চল্লিশ সহস্র শ্লোক রচনা করিয়া উহা শেষ করেন। এই টীকারচনার কাল জয়ধবলটীকার প্রশস্তি হইতে জানা যায়। ৭৫৯ শকাব্দে ইহা সমাপ্ত হয়।

"একোণষষ্টিসমধিক সপ্তশতাব্দেষু শকনরেন্দ্রস্য।
সমতীতেষু সমাপ্তা জয়ধবলা প্রাভৃতব্যাখ্যা॥"

জিনসেন-রচিত তৃতীয় গ্রন্থের নাম "আদিপুরাণ।" ইহার বিষয় তীর্থঙ্কর ও শলাকা-পুরুষগণের পরিচয়-প্রদান। জিনসেন কিন্তু ইহার ৪২ অধ্যায়মাত্র সমাপ্ত করিয়াই কালগ্রাসে পতিত হন। এই গ্রন্থ এইরূপ অসম্পূর্ণ অবস্থায় থাকে দেখিয়া জিনসেনের শিষ্য গুণভদ্রাচার্য্য পাঁচ অধ্যায় লিখিয়া আদিপুরাণ সম্পূর্ণ করেন; কিন্তু ইহার সমস্ত বর্ণনীয় বিষয় পুস্তকের মধ্যে স্থান না পাওয়াতে গুণভদ্রাচার্য্য "উত্তরপুরাণ" নামক নিজে একখানি গ্রন্থ লিখিয়া বিষয়টি সম্পূর্ণ করেন। জিনসেন রচিত আদিপুরাণ ও গুণভদ্র-রচিত উত্তরপুরাণ এই দুইখানি গ্রন্থ একত্র 'মহাপুরাণ' নামে জৈনসাহিত্যে সুপ্রসিদ্ধ।

জৈনহরিবংশপুরাণ নামক একখানি গ্রন্থ আছে। পিটর্সন, ভাণ্ডারকর প্রভৃতি মনীষিগণ ইহা জিনসেন রচিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু পদ্মরাজ রাণীবালা * ইঁহাদের মত ভ্রান্ত এই যুক্তির পোষকতায় নিম্নলিখিত কারণগুলির উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথমতঃ তিনি বলেন হরিবংশপুরাণ জিনসেন নামক এক ব্যক্তির রচিত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই;

* "The rapid progress made by Digambara Jainism late in the ninth and early in the tenth century under the guidance of various notable leaders, including Jinasena and Gunabhadra who enjoyed the favour of more than one monarch had much to do with the marked decay of Buddhism." Vincent Smith.—Early History of India p, 328.

† যেনাযোজি নবেঽশ্মস্থিরমর্থবিধৌ বিবেকিনা জিনবেশ্ম।
স বিজয়তাং রবিকীর্ত্তিঃ কবিতাশ্রিতকালিদাসভারবিকীর্ত্তিঃ॥

* ভাস্কর। ভাগ ১, কিরণ ১, পৃষ্ঠা ৫০।

কিন্তু এই জিনসেন ও পার্শ্বাভ্যুদয়-প্রণেতা জিনসেন এক নহেন। কেননা আদিপুরাণ ও হরিবংশপুরাণের মঙ্গলাচরণে যে পট্টাবলী প্রদত্ত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে কোন সাদৃশ্য নাই। দ্বিতীয়তঃ হরিবংশপুরাণকার জিনসেন, জিনসেন স্বামীকে হরিবংশপুরাণের মঙ্গলাচরণে নমস্কার করিয়াছেন। * ইহাতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, এই জিনসেন পৃথক্ ব্যক্তি। তৃতীয়তঃ, হরিবংশকার জিনসেন নিজ গুরুর পরিচয় এইরূপে প্রদান করিয়াছেন—"জয়সেনের শিষ্য অমিতসেন। অমিত সেনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কীর্ত্তিসেন। এই কীর্ত্তিসেনের প্রধান শিষ্য নেমিনাথ স্বামী। নেমিনাথ স্বামীর ভক্ত জিনসেন হরিবংশপুরাণ রচনা করিয়াছেন।" ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে পার্শ্বাভ্যুদয় প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা জিনসেন (যিনি বীরসেনের শিষ্য ছিলেন) হরিবংশকার হইতে ভিন্ন।

জিনসেন "বর্দ্ধমানপুরাণ" নামক আর একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাহা হরিবংশপুরাণের মঙ্গলাচরণের একটি শ্লোক হইতে জানিতে পারা যায়। † তাহা হইলে দেখা গেল জিনসেন-রচিত গ্রন্থ চারিখানি—(১) পার্শ্বাভ্যুদয় কাব্য (২) জয়ধবলপুরাণের টীকার শেষাংশ (৩) আদি-পুরাণ ও (৪) বর্দ্ধমানপুরাণ।

এবার জিনসেনের পরিচয় কিছু দিয়াই এই প্রবন্ধ শেষ করিব।

তীর্থঙ্কর মহাবীরের তিরোভাবের পর দিগম্বর-সম্প্রদায়ে চারিটি সঙ্ঘ স্থাপিত হয়। এই চার বিভাগ যথাক্রমে নন্দি, দেব, সেন ও সিংহ নামে প্রথিত হয়। জিনসেন সেনসঙ্ঘে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁহার গুরুপরম্পরা এইরূপ—

সমন্তভদ্র (গুরু)
|
শিবকোটি (সেনভদ্রের শিষ্য)
|
বীরসেন (শিবকোটির শিষ্য)
|
জিনসেন (বীরসেনের শিষ্য)

* জিতাত্মপরলোকস্য কবীনাং চক্রবর্ত্তিনঃ।
বীরসেনগুরোঃ কীর্ত্তিরকলঙ্কাবভাসতে॥
যামিতেহভ্যুদয়ে যস্য জিনেন্দ্র গুণসংস্তুতা।
স্বামিনো জিনসেনস্য কীর্ত্তিঃ সংকীর্ত্তয়ত্যসৌ॥

† "বর্দ্ধমান পুরাণোদ্যদাদিত্যোক্তিগভস্তয়ঃ।
প্রস্ফুরন্তি গিরীশান্তা স্ফুটস্ফটিকভিত্তিষু॥
[হরিবংশপুরাণের মঙ্গলাচরণ।]

হস্তিমল্ল কবি প্রণীত "বিক্রান্ত কৌরবীয়" নাটকে এ গুরুপরম্পরার উল্লেখ আছে। *

জিনসেনের বংশপরিচয় আর কিছু পাওয়া যায় না। দাক্ষিণাত্যেই তাঁহার জীবন অতিবাহিত হইয়াছিল। নৃপতি অমোঘবর্ষের রাজধানী মান্যখেটেই † তিনি জীবনের দীর্ঘ কাল কাটাইয়াছিলেন।

জিনসেন ধর্ম্মসম্বন্ধীয় গ্রন্থই রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে "ধর্ম্মবিষয়ক কবিতাই শ্রেষ্ঠ। বাকি কেবল পাপের সহায়তা করে।……শাস্ত্র অভ্যাস করিয়া, মহাকবিগণের উপাসনা করিয়া ধীমান্ যেন ধর্ম্মসম্বন্ধীয় যশোযুক্ত শ্রেষ্ঠ কাব্য রচনা করেন।" ‡ জিনসেন নিজেও এ বাক্যের যথার্থতা রক্ষা করিয়াছিলেন। পার্শ্বাভ্যুদয় কাব্যের স্থলে স্থলে আদিরসাত্মক শ্লোক আছে বটে, কিন্তু ঐ কাব্যখানির প্রতিপাদ্য বিষয় জৈন তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের প্রলোভন-জয়। জিনসেন নিজে জৈনধর্ম্মের একজন প্রধান আচার্য্য; কাজেই তাঁহার প্রভাব অপরিসীম ছিল। নিজরচিত গ্রন্থাবলীতেও তিনি জৈন ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়াছিলেন; এবং তাঁহার ও তাঁহার শিষ্য গুণভদ্রের অদম্য চেষ্টায় যে বৌদ্ধধর্ম্মের মূলক্ষয় হইয়াছিল ইতিহাস সে কথার সাক্ষ্য দেয়।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল।

* স্বামী সমন্তভদ্রোঽভূদ্দেবাগম-নিদশকঃ।

* * * * *

শিষ্যো তদীয়ো শিবকোটিনামা শিবায়নঃ শাস্ত্রবিদাং বরিষ্ঠো
কৃৎস্নশ্রুত শ্রীগুরুপাদমূলে হ্যধীতিমন্তো ভবতঃ কৃতার্থো।
তদন্বয়ে বিদুষাং বরিষ্ঠঃ স্যাদ্বাদনিষ্ঠঃ সকলাগমজ্ঞঃ
শ্রীবীরসেনোঽ জনিতার্কিকশ্রীঃ প্রধ্বস্তরাগাদিসমস্ত দোষঃ॥
তচ্ছিষ্য প্রবরো জাতো জিনসেন-মুনীশ্বরঃ॥
যদ্বাঙ্ময়ং পুরোরাসীৎ পুরাণং প্রথমং ভুবি॥
[বিক্রান্তকৌরবীয় নাটকের প্রশস্তি]

† বর্ত্তমান মলখেড়্। নিজামরাজ্যভুক্ত। N. lat. 17, 10 E. long. 77·13 (ভিনসেণ্ট স্মিথ।)

‡ "ধর্ম্মানুবন্ধিনী যা স্যাৎ কবিতা সৈব শস্যতে।
শেষা পাপাস্রবায়ৈব সুপ্রযুক্তাপি জায়তে॥
তস্মাদভ্যস্য শাস্ত্রার্থামুপাস্য চ মহাকবীন্।
ধর্ম্ম্যং শস্যং যশস্যঞ্চ কাব্যং কুর্ব্বন্তু ধীধনাঃ॥"

প্রতীচ্য-চিত্র-পরিচয়।

লিওনার্দো দা ভিঞ্চি।

যখন মধ্যযুগের অন্ধকার-যবনিকা ভেদ করিয়া নূতন জীবনের তীব্র আলোক য়ুরোপ উদ্ভাসিত করিতেছিল,

লিওনার্দো দা ভিঞ্চি।

সেই সময়ে লিওনার্দো দা ভিঞ্চি যেন সেই পুনর্জন্মের সার-সংগ্রহ স্বরূপ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মবৎসর ঠিক জানা নাই—অনুমান ১৪৫২ খ্রীষ্টাব্দ। তাঁহার দীপ্ত-ললাটে লজ্জার টীকা—তিনি পিয়েরো আন্তোনিয়োর জারজ পুত্র; কিন্তু আন্তোনিয়ো আর এগারটি পুত্র-কন্যার সঙ্গে সমান আদরে এই লিওনার্দোকে প্রতিপালিত করেন।

যে আর্ণো আর্ণো—সাভোনারোলার জলন্ত চিতাবশেষ বক্ষে লইয়া আজিও যেন জ্বলিতেছে—সেই আর্ণো নদী-সন্নিহিত ভিঞ্চিতে পিয়েরোর ফ্লরেন্সীয় বাসস্থান। তাই পিয়েরো পুত্র লিওনার্দো দা ভিঞ্চি, অর্থাৎ ভিঞ্চির লিওনার্দো নামে পরিচিত।

মধ্যয়ুরোপে পঞ্চদশ শতাব্দী দুইটি বিশেষ ভাবে অনুপ্রাণিত। একটি ভাব পৌরাণিকত্ব—পৌরাণিকত্বে পুরাতন, নূতনের বেশে সমাগত; দ্বিতীয়টি আধুনিকত্ব—আধুনিকত্বে বিজ্ঞানের অধিকার আরম্ভ। পুনর্জন্মে পৌরাণিকত্বের প্রভাব লক্ষিত হইলেও আধুনিকত্বের প্রভাবকে একেবারে পরাভূত করিতে পারে নাই। লিওনার্দো তাঁহার কৌতূহল ও সৌন্দর্য্যলিপ্সায় পুনর্জন্মের এই দুইটি উপাদান মিশাইয়া এক সম্পূর্ণ নূতন প্রতিভা দেখাইয়াছিলেন।

ইটালীয় চিত্রকরদিগের জীবনচরিত গ্রন্থে ভাসারি, লিওনার্দো সম্বন্ধে অনেক গল্প লিখিয়াছেন। তাহাতে লিওনার্দোর চরিত্রের এক দিক্ বেশ ভাল করিয়া দেখা যায়। যে বয়সে সাধারণ ছেলেরা সামান্য খেলা ধূলায় কাটায়, সেই বয়সে লিওনার্দো কোথায় কি নূতন পাওয়া যায়, তাহারই অন্বেষণে ব্যস্ত। অনেক যুবা বৃদ্ধ এক জায়গায় জমিয়াছে, লিওনার্দো তাহাদিগকে নূতন নূতন গান গাহিয়া, নূতন নূতন ছড়া শুনাইয়া মশগুল করিতেন। বাজারে গিয়া একখাঁচা পাখী কিনিয়া আনিয়া সেগুলি উড়াইয়া দিতেন;—দেখিতেন কেমন পক্ষভঙ্গীতে তাহারা উড়িয়া যায়। ফ্লরেন্সের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া ঝক্ঝকে রঙের পোষাকে আলোর লীলা দেখিতেন—কত নর-নারীর বিচিত্র মুখশ্রী, কত দুষ্ট ঘোড়ার গ্রীবাভঙ্গী মানসপটে মুদ্রিত করিয়া রাখিতেন।

লিওনার্দোর পিতা দেখিলেন, অল্প বয়সেই ছেলে 'মডেলিং'এ সিদ্ধহস্ত। তিনি সেই সময়ের বিখ্যাত চিত্রকর ও ভাস্কর আন্দ্রিয়া দেল ভেরোকচিওর চিত্রশালায় তাহাকে লইয়া গেলেন। ভেরোকচিও লিওনার্দোকে শিক্ষা দিবার ভার নিজে লইলেন। ফ্লরেন্সের সিন্দূর-আভা-মণ্ডিত সূর্য্যাস্ত, ইটালীর নীল আকাশের অপরূপ মায়া-মরীচিকা (aerial illusions) বালকের মনে কোন্ দূর দেশের অসাধারণ দীপ্তি জাগাইয়া দিত। তাঁহার তখন হইতেই চেষ্টা সেই অপার্থিব আলোক সাধারণ বস্তুর ভিতর দিয়া ফুটাইয়া তোলা।

কথিত আছে, এই সময়ে লিওনার্দোর শিক্ষক ভেরোকচিও যীশুর অভিষেক চিত্রিত করিতেছিলেন। ছবিখানির এক কোণে একটি দেবদূত অসম্পূর্ণ ছিল। লিওনার্দোকে সেই ছবিখানি সম্পূর্ণ করিতে বলা হয়। লিওনার্দোর চিত্রণ শেষ হইলে ভেরোকচিও বলেন, 'আজ থেকে আর আমি ছবি আঁকিব না। একজন সামান্য বালক কি না আজ আমাকে হারাইয়া দিল।' ভেরোকচিও তখন জানিতেন না যে, বালক সামান্য নয়। আজও সেই বালক-চিত্রিত দেবদূত

ফ্লরেন্সের মধ্যে একটি দেখিবার জিনিষ। সেই অনিন্দ্য-সুন্দর মুখে কোন্ সুর-পুরের আলোক আসিয়া পড়িয়াছে—সেই মুখে মানুষের চিরকালের আশা যেন ঘনীভূত। লিওনার্দো চিত্র-জীবনের আরম্ভেই যেন বলিতেছেন, "তোমরা দেবদূত আঁকিয়াছিলে তুলি দিয়ে, রঙ্ দিয়ে,—কিন্তু তোমরা বুঝ নাই চিত্রের মর্ম্মগত বাণী—সে স্বর তোমাদের কাণে যায় নাই। আমি কিন্তু পূর্ব্বজন্মের 'অচলস্মৃতি' নিয়ে এসেছি। আমি তোমাদের দেখাব,—'যেখানে চরণ রেখেছে, সে মোর মর্ম্ম গভীরতম।' আমার কল্পনার এত বেগ কোথা থেকে এল? তোমরা জান না—আমার কল্পনা শত রঙ্গীন মেঘের মত; এ দেবদূতের মুখে তাহারই ছটা আসিয়া পড়িয়াছে মাত্র।"

ভেরোকচিওর চিত্রাগারে লিওনার্দোর মনে অসন্তোষের বীজ অঙ্কুরিত হইতে আরম্ভ হইল। তিনি দেখিলেন, তাঁহার চিত্র-কলা (art) যদি কিছুমাত্র শিল্পনামের উপযুক্ত হয়, তবে তাহাতে প্রকৃতির অন্তরের কথা, মানবহৃদয়ের চিরন্তন আকাঙ্ক্ষা, জীবনের শেষ উদ্দেশ্য পরিস্ফুট হওয়া চাই। যে প্রহেলিকার জাল প্রকৃতি মুখে টানিয়া বসিয়া আছে, তাহা খুলিতে হইবে। ইটালীর চিত্রকরেরা তাঁহার কাছে নগণ্য কাচপাত্র বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তাহাদের মনের ভিতর দিয়া ফ্লরেন্সের লাল আলো একটু ম্লান হইয়া তাহাদের ছবির রঙ্গে দাঁড়াইয়াছে। এই রকম প্রাণহীন কাচের পাত্র চিত্রকর নয়।

তাই তখন হইতেই প্রকৃতির শক্তিমূলে কি বীজ নিহিত রহিয়াছে তাহাই জানিবার জন্য তিনি পদার্থ-বিদ্যা, রসায়ন, উদ্ভিজ্জবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা, গণিত বিজ্ঞানের অনুশীলন আরম্ভ করিলেন। লিওনার্দোর প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী। তিনি বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন সকল বিষয়েই অসাধারণ ব্যুৎপন্ন ছিলেন; কিন্তু এই সমস্ত অধ্যয়নকালে তিনি তাঁহার জীবনের চরম উদ্দেশ্য ভুলেন নাই। চিত্রকে পরিপূর্ণ করিবার জন্যই এত অনুষ্ঠান। শৈশবের প্রিয়তম গভীর জ্ঞানালোচনা-স্পৃহা—অনন্ত জলবিস্তারের মোহিনী গতি ও রমণী মুখের হাস্যভঙ্গী—তাঁহার কাছে চিরদিনই প্রীতিপ্রদ ছিল এবং কি এক অপূর্ব্ব প্রহেলিকাপূর্ণ বলিয়া বোধ হইত।

ত্রিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত লিওনার্দো ফ্লরেন্সে অতিবাহিত করেন। একত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি মিলানের ডিউক লুদোভিকো স্ফর্জার নিকট গমন করেন। কেহ কেহ বলেন, স্ফর্জার নিকট লিওনার্দো গায়করূপে যান, চিত্রকররূপে নয়; কিন্তু লিওনার্দো যে চিঠি স্ফর্জাকে লেখেন, তাহাতে নিজেকে স্থপতিবিদ্যা পারদর্শী, বৈজ্ঞানিক, চিত্রকর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন—গায়ক বলিয়া আত্ম-পরিচয় দেন নাই। তিনি স্ফর্জার পূর্ব্বপুরুষ ফ্রান্সেস্কোর একটি ব্রঞ্জ্ প্রতিমূর্ত্তি তৈয়ারী করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা শেষ করিতে পারেন নাই। তাঁহার অধিকাংশ কাজই অসমাপ্ত থাকিয়া যাইত।

১৪৮২ খৃষ্টাব্দে তিনি মিলানে যান ও ১৪৯৯ খৃষ্টাব্দে তথা হইতে প্রত্যাগমন করেন। তিনি লুদোভিকোর রাজ-সভায় অবস্থান কালে তাঁহার বিখ্যাত চিত্রসম্বন্ধীয় পুস্তক লেখেন। এই সময়েই ডাচেশ্ বিয়াত্রিচের প্রতিকৃতি অঙ্কিত করেন। কথিত আছে, এই ছবি আঁকিবার কিছুদিন পরেই বিয়াত্রিচে একটি মৃত সন্তান প্রসবান্তে মারা যান। বিয়াত্রিচের মুখে যেন পূর্ব্ব হইতেই মৃত্যুচ্ছায়া আসিয়া পড়িয়াছিল। লিও নার্দো-অঙ্কিত ছবির মুখে ম্লান জ্যোতিঃ ছিল; যেন পরপারের আহ্বান কাণে আসিয়াছে, আলো ছায়ার মিলনে, আলোর চেয়ে ছায়ার গভীরতাই বেশী ফুটিয়া উঠিয়াছে। দুঃখের বিষয় বিয়াত্রিচের সে চিত্রখানি পাওয়া যায় না। প্যারিসের বিখ্যাত লুভ্‌র্ চিত্রশালার একটি প্রতিকৃতিকে বিয়াত্রিচের প্রতিকৃতি বলা হয়; কিন্তু চিত্রসমালোচকেরা সেখানি প্রকৃত বিয়াত্রিচের চিত্র বলিয়া ধরেন না। এ চিত্রখানিরও মুখ বিষাদক্লিষ্ট, দৃষ্টি স্থির, যেন কোন দূর জগতের দিকে নিক্ষিপ্ত।

ফরাশীর রাজা ফ্রান্সিসের আহ্বানে ১৫০৬ খ্রীষ্টাব্দে আবার তিনি একবার মিলানে যান; ১৫১৩ হইতে ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দে পর্য্যন্ত রোমে বিজ্ঞান আলোচনায় অতিবাহিত করেন। মৃত্যুর তিন বৎসর পূর্ব্বে ১৫১৬ খ্রীষ্টাব্দে ফরাশীর রাজা প্রথম ফ্রান্সিসের আহ্বানে তিনি পুনরায় ফ্রান্সে গমন করেন। রাজা ফ্রান্সিস, লিওনার্দোকে রাজার অপেক্ষাও সম্মান করিতেন। কিন্তু লিওনার্দোর তখন সূর্য্যাস্তের সময়। তাঁহার মন সম্পূর্ণ সবল ছিল; কিন্তু হাত মনের বশে ছিল না; এই সময় লালখড়ি দিয়া তিনি নিজের প্রতিকৃতি ব্যতীত আর উল্লেখযোগ্য অন্য কোন কিছু করেন নাই। ১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দে

২৩শে এপ্রিল মৃত্যু-শয্যায় শায়িত হইয়া ২রা মে এই চিত্রকর সেক্‌স্‌পিয়র মৃত্যুর পর-পারে চলিয়া যান।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে লিওনার্দো অনেক জিনিষ আরম্ভ করিয়া শেষ করিতে পারেন নাই। ইহা তাঁহার অব্যবস্থিত চরিত্রের পরিচায়ক নহে। লিওনার্দো অসাধারণ মানুষ, তাঁহার আশাও অসাধারণ, তাঁহার চেষ্টাও অসাধারণ। সাধারণ চিত্রকর একটি মানুষ, একটি রমণী, একটি ফুল আঁকিয়াই সন্তুষ্ট, কিন্তু লিওনার্দোর মানুষ, রমণী, ফুল প্রকৃতির সৃষ্টির মত হওয়া চাই। যতক্ষণ অঙ্গসৌষ্ঠবের মধ্য দিয়া মনের ভাব না ফুটিল, যতক্ষণ মানুষের ক্ষণ রমণীর রূপলাবণ্যের ভিতর দিয়া অশরীরিণী আদর্শমানস-মূর্ত্তি, (ideal) শরীরিণী না হইল, যতক্ষণ না ফুলের ছবি ফুলের গন্ধ আনিতে পারিল, ততক্ষণ লিওনার্দো অসন্তুষ্ট। যেমন করিয়াই হউক প্রকৃতির সৃষ্টিকৌশল করতলগত করা চাই। সেজন্য পরিশ্রমের বিরাম নাই। কত রাত্রিতে বসিয়া কোন নক্ষত্র হাজার বৎসরের মধ্যে একবার পৃথিবীর কাছে আসিয়াছিল কি না, তাহাই গণনা করিতেন। যদি কোন রাসায়নিক প্রক্রিয়ার এমন রঙ্ বাহির হয়, যাহা চিরকাল সমানভাবে উজ্জ্বল থাকিবে, তাহার চেষ্টায় দিনের পর দিন কিমিয়-বিদ্যাবিদের (alchemist) মতন হাপর জ্বালাইতেন। গতি-বিজ্ঞানের এমন কোন নিয়ম আছে কি না, যাহাতে মিলানের প্রাসাদ একটু হঠাইয়া দেওয়া যায়, তাহা বাহির করিবার জন্য, অদম্য উৎসাহে গণিতশাস্ত্রের অনুশীলন করিতেন। আলোকবিজ্ঞানের এমন কোন নিয়ম পাওয়া যায় কি না, যাহাতে ছবির উপর আলোক-সম্পাত জীবন্ত প্রকৃতির অনুরূপ হইতে পারে, সেই চেষ্টায় কতদিন আহারনিদ্রা ভুলিয়া গিয়া আলোক-বিজ্ঞানের মর্ম্মানুসন্ধানে নিযুক্ত ছিলেন। এই অসাধারণ মানুষ দেখিতেন, সাধারণে যে ছবিকে, যে প্রতি-মূর্ত্তিকে অনন্যসাধারণ বলিতেছে, সেটি তাঁহার কল্পনার কত নিম্নে। পিরামিড-সৃষ্টির চেষ্টার ফলে একটি গীর্জ্জার চূড়া। লোকে সেই গীর্জ্জাই অবাক্ হইয়া দেখিতে লাগিল; কিন্তু ব্যর্থ মনোরথ লিওনার্দো আর সেদিকে চাহিলেন না।

লণ্ডনের ভিক্টোরিয়া এবং য়্যালবার্ট মিউজিয়মের দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকের সিঁড়িতে নিশান-যুদ্ধ বলিয়া একখানি ছবি আছে। জনরব এই ছবিখানি লিওনার্দো-পরিকল্পিত আংগিয়ারির যুদ্ধের অংশ-বিশেষ। সেই ছবির পরিকল্পনা পর্য্যন্ত করিয়াই লিওনার্দো ক্ষান্ত হইয়াছিলেন। যেদিন উহা শেষ হয়, সেদিন ফ্লরেন্সের রাজপথ প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত লোকে ভরিয়া গিয়াছিল। দলে দলে লোক লিও-নার্দোর চিত্র দেখিতে আসিতেছে। বোধ হয়, তখনই তাঁহার আবার ব্যর্থচেষ্টার কথা মনে হইল। তরুণ বয়সের সেই দেবদূত-চিত্রণের কথা, নবীন সফলতা, প্রবীণ বিফলতাকে ব্যঙ্গ করিতে লাগিল। লোকের জনতা দেখিয়া লিওনার্দো একটু হাসিয়াছিলেন; সে হাসি স্ফিংক্‌সের হাসি। সামান্য বুদ্ধি, সামান্য দৃষ্টি লইয়া ফ্লরেন্সের নরনারী বুঝে নাই যে, কার্টুন আর বৃহৎ চিত্রে পরিণত হইবে না। জন-তার প্রশংসা-কোলাহল লিওনার্দো শুনিতে চাহিলেন না। তাঁহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, 'যত সাধ ছিল সাধ্য ছিল না।' বস্তুতঃ তাহা নহে, তাঁহার আদর্শ ইটালীয় আল্পসের চেয়েও উচ্চ, তাই তিনি কিছুতেই সন্তুষ্ট হইতেন না। তাঁহার চিত্রসমুদয় তাঁহার নিজেরই বাণীর সার্থকতা প্রমাণ করিতেছে—Quanto piu un arte porta seco fatica di corpo, tanto piu é vile—যে শিল্পে দেহের ক্লান্তি দেহের গ্লানি আছে, সে শিল্প নিকৃষ্ট—সুন্দর দেহ নশ্বর—শিল্প-কলা (art) অমর।

এইবার আমরা তাঁহার কএকটি চিত্রের পরিচয় দিব:—

(১) 'ব্যাকস্' (সুরা-দেবতা)।

এই চিত্রখানি প্যারিসের লুভ্‌র্ চিত্রশালায় আছে। ইহারই নিকটবর্ত্তী সেণ্ট জন দি ব্যাপটিষ্টের সহিত এই চিত্রের আশ্চর্য্য মিল দেখিয়া বোধ হয়, সেণ্টজনের প্রতি-কৃতিই চিত্রকর, পরে সুরাদেবতা ব্যাকসে পরিণত করিয়া-ছিলেন।

লিওনার্দোর শিল্পের বিশেষত্ব এখানে পরিলক্ষিত হয়। ধর্ম্মবীর সেণ্টজনের সহিত উচ্ছৃঙ্খল ব্যাকসের যে কোন তুলনা হয়, তাহা ক্ষীণদৃষ্টি সমালোচক অস্বীকার করিবেন; কিন্তু লিওনার্দোর কল্পনা-চক্ষু ঈগল্ চক্ষুর মত অনেক দূর দেখিতে পাইত। তিনি জন দি ব্যাপ্‌টিষ্টকে প্রচলিত প্রথামত বল্কল পরাইয়া দিয়া মাথায় উস্ক খুস্ক চুলের জটা বিভূতি-ভূষণ আকারে সম্মুখে আনিলেন না। তাঁহার চিত্রপরিকল্পনার উদ্দেশ্য

তাহা হইলে বিফল হইত। যে মূর্ত্তি শুধু মনুষ্য প্রতিমূর্ত্তি, তাহাতে শিল্পীর কোন গুণপনা দেখা যায় না। ছাইমাখা সাধারণ সন্ন্যাসী ও জনের মধ্যে প্রভেদ কি, তাহা জনের বাহ্য আকৃতি হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় না। জনের জীবন-চরিত লেখক দেখিলেন, জন বল্কল পরেন, বনে ফলমূল খাইয়া থাকেন এবং 'তোমরা সকলে ধর্ম্মজীবন লাভের চেষ্টা কর' এই বলিয়া লোক-সাধারণকে মঙ্গলের পথে লইয়া যাওয়ার চেষ্টা করিয়া বেড়ান। জনের মাথায় জটা, শরীর নিতান্তই নিরাভরণ—ত্যাগী সন্ন্যাসী। কবি চিত্রকর দেখিলেন, এ সব ত্যাগের সাধারণ নিদর্শন বটে, কিন্তু জনের শিরায় শিরায় যে অমৃত-মদিরা প্রবাহিত হইতেছে, সে মদিরা কতকাল পূর্ব্বে এক-বার গ্রীকদের ধমনীতে প্রবাহিত করিতে ব্যাকস্ ধরাতলে আসিয়াছিলেন। তাঁহার জঙ্ঘাদেশে বাঘছাল। তিনি অঙ্গুলি-ভঙ্গে বামবাহূপরি ন্যস্ত দ্রাক্ষাযষ্টি দেখাইতেছেন। রমণী-সুলভ মসৃণ কেশ, বিলোল দৃষ্টি, মুখে প্রহেলিকাপূর্ণ হাসির আভাষ—এই হাসিই ঘোরাল 'ওরিয়েল' কাচের ভিতর দিয়া কত শতাব্দী পর্য্যন্ত সূর্য্যাস্তের শ্যাম্পেন-আভা ঢালিয়া দিবে।

ব্যাকস্ যেন বলিতেছেন, তোমরা পায়ের দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া দূরদৃষ্টি হারাইয়াছিলে, আজ আমি এমন কিছু তোমাদের পান করাইব যে, আবার তোমরা সম্মুখে তাকাইয়া দেখিবে, দিগন্ত সীমায় নীল পাহাড় বিরাট্ মাথা তুলিয়া আছে। জীবনের অন্তস্তম তত্ত্ব এখনও পাও নাই, যাহা বড় সত্য, ধ্রুব বলিয়া ধরিয়া আছ, তাহা নিতান্তই মিথ্যা। সাধারণ খৃষ্টান যে ব্যাকস্ দেবকে, গ্রাম্য-দেবতা অসভ্যের (Pagan) দেবতা বলিয়া এক কথায় উড়াইয়া দেয়, তিনি যে খৃষ্টের কত নিকটে, লিওনার্দো সেই ভাবটি চিত্রিত করিয়া গিয়াছেন। এই ব্যাকসের চিত্র একটি রূপকের আভাস বা সঙ্কেত (Symbol)। লিওনার্দোর মত আর কেহ এ রকম সাধারণের ভিতর দিয়া অসাধারণত্বে পৌছাইতে পারেন নাই।

(২) গিরিগুহা-সন্নিহিত কুমারী।

অনুমান ১৪৮২ খ্রীষ্টাব্দ এই ছবিখানির জন্মবৎসর। এক রকমের দুইখানি চিত্র আজকাল দেখা যায়। একখানি প্যারিসের লুভ্‌র্ নামক চিত্রশালায়, আর একখানি লণ্ডনের জাতীয় চিত্রাগারে রক্ষিত আছে। এই দুইখানি ছবির কোন কোন অংশ লিওনার্দো অঙ্কিত করেন নাই; কিন্তু সমগ্র চিত্র যে লিওনার্দোর শিল্পসৃষ্টির উৎকৃষ্টতম উদাহরণ, তাহা চিত্রসমালোচকগণ একবাক্যে স্বীকার করেন। আলোছায়ার এমন বিন্যাস আর কাহারও সাধ্যাতীত। আলো-ছায়ার সম্পাত (tone) বোধ হয় এই চিত্রে পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে।

লিওনার্দোর পূর্ব্বেও অনেক চিত্রকর যীশুর জীবন-কথা বুঝিতে ও বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। অনেক গাথা রচিত হইয়াছিল; কিন্তু জগতের ইতিহাসের এই একটি অসাধারণ ঘটনা, অসাধারণ লিওনার্দোই সম্যক্ অনুভব করিয়াছিলেন। অন্যান্য চিত্রকরগণ কেবল কুমারী-গর্ভ-জাত যীশুর আলৌকিক জীবনের প্রভাব দেখাইবার চেষ্টা পর্য্যন্ত করিয়াই ক্ষান্ত। লিওনার্দোই শুধু অলৌকিক জীবনের গূঢ় ভাবটি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

কুমারী-জননী কালবর্ণের ব্যাসাল্ট পাহাড়ের নীচে ফুলের মধ্যে বসিয়া আছেন; তাঁহার ডান হাত জন দি ব্যাপটিষ্টের কাঁধের উপর এবং তাঁহার বাম হাত একটি দেবদূত-সন্নিহিত শিশু-যীশুর মাথার কিছু উপরে আশীর্ব্বাদ সঙ্কেতে উত্তোলিত। পার্শ্বে পাহাড়ের গুহায় অন্ধকার যেন এক অস্ফুট বেদনা-ধ্বনি চাপিয়া আছে। যে শিশু জীবনের প্রারম্ভে জগতের দুষ্কৃতিভার বহন করিতে অগ্রসর হইবে, তাহারই মাথার উপর জননীর আশীষ-সঙ্কেত। মেরীর মুখে কিন্তু সেই স্ফিংক্সের হাসি। বুঝি মনে হইতেছে, একদিন একটি কণ্টক মুকুটের কাছে কত হিরণ্ময় মুকুট হার মানিবে। ফ্লরেন্সের পুনর্জ্জন্মের সঙ্গে সঙ্গে যে অসীম আশা, অসীম বেদনা লিওনার্দোর মনে জাগিয়া উঠিয়াছিল সেই আশা, সেই বেদনা এই অলোকসামান্য মেরীর হাসিতে ঘনীভূত। কত যুগ-যুগান্তর ধরিয়া যে সন্দেহের পাহাড় আলোর পথ ঢাকিয়া দাঁড়াইয়াছিল, সে বুঝি এইবার ফাটিয়া পড়িবে। আলোক-সম্ভূত শিশু, জনের দিকে মুখ ফিরাইয়া আছে। দেবদূত আশার বাণীর মত উজ্জ্বল। মেরীর মুখশ্রী শান্ত গম্ভীর। এ কি বিরাট্ অভিনয়!

(৩) যীশুর মুখমণ্ডল।

ইহা লিওনার্দোর চিত্র-শিল্পের উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত।

বিখ্যাত 'শেষ-ভোজন' চিত্রে যীশুর চিত্র-অঙ্কনের ভূমিকাস্বরূপ এই মুখমণ্ডল অঙ্কিত। এই চিত্রখানিতে লিওনার্দোর অবা-

যীশুর মুখমণ্ডল।

স্তব অতীন্দ্রিয়তা (mysticism) শেষ সীমায় পৌঁছিয়াছে। যেন নীহারিকাবর্ত্তের আরম্ভ হইতে সৃষ্টির শেষ দিন পর্য্যন্ত সকল নরনারীর চিন্তার ভার যীশুর মাথার উপরে আসিয়াছে। ঈষদুন্মেষিত চক্ষু দুটিতে ইহলোকের আলোক প্রবেশের আর উপায় নাই। চক্ষু অন্তর্দৃষ্টি-নিবদ্ধ। জীবনের কাজ প্রায় শেষ হইয়াছে। এখন বাকি শুধু কাঁটার মুকুট। বড় আশা করিয়া তাহারা রাজার কাছে আসিয়াছিল; কিন্তু রাজা তাহাদের উজ্জ্বল পোসাক পরিলেন না, হেরড্ বড় ভয় করিয়াছিল যে, তাহার রাজত্ব কাড়িয়া লইতে একজন আসিতেছেন। সে বুঝিল না তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী রজতপাত্রে স্বর্ণমদিরা পান করিতে আসেন নাই। যে রাত্রিতে হেরডের প্রমোদভবন আলোর ছটায় ভরিয়া গিয়াছিল, সেই রাত্রেই জগতের রাজা একটি তারার আলোয় ভগ্নকুটীরে অসহায় অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হ'ন।

তারপর কত নরনারী আসিয়া সেই একই প্রশ্ন করিতে লাগিল, 'তুমি কি আমাদের রাজা ? কই তোমার রাজাভরণ কই ?' উত্তরও সেই এক—'আমার পিতা আমাকে তোমাদের কাছে পাঠাইয়াছেন।' ইহাতে কেহই পরিতৃপ্ত হয় নাই। সাধারণের ভাষায় সাধারণকে বুঝাইবার চেষ্টা ব্যর্থ হইল। কত শিষ্য জুটিল, কত শত্রু জুটিল, কিন্তু কেহই রাজাকে চিনিল না। বড় আশা লইয়া আসিয়াছিলেন; কিন্তু তেমনই নিরাশ হইয়া ফিরিতে হইল। তা হউক কাঁটার মুকুট এখনও আছে, এখনও যদি লোকে সামান্য কথাটা বুঝিতে পারে! আর মানুষের ভাষায় যখন হইল না, তখন শেষ উপায় পাষাণ-মৌনাবলম্বন।

(৪) শেষ-ভোজন।

এই চিত্র য়ুরোপীয় সাহিত্যের অনেকখানি স্থান জুড়িয়া রহিয়াছে। জার্ম্মান কবি, দার্শনিক গেটে-রচিত এই চিত্রের ইতিহাস বড় করুণ বলিয়া পেটারের ধারণা। ডাচেস্ বিয়াত্রিচে যখন মৃত্যু-শয্যায়, সেই সময় লুদোভিকোর মনে ধর্ম্মভাবের উদয় হইল। বিয়াত্রিচের মৃত্যুর পর তিনি জীবদ্দশায় গীর্জ্জার যে অংশে প্রার্থনা করিতেন, সেইখানে গিয়া মৃতের আত্মার মঙ্গল কামনায় লুদোভিকো হাঁটু গাড়িয়া কিয়ৎক্ষণ প্রত্যহ ক্ষেপণ করিতেন। গীর্জ্জার নাম সান্তা মেরিয়া দে গ্রাৎজিয়া। সেই গীর্জ্জার দেওয়ালে এই শেষ-ভোজনের চিত্র নব-উদ্ভাবিত তৈল-উপকরণে চিত্রিত; কিন্তু দেওয়ালের উপর ফ্রেস্কো-চিত্রণই চিত্র-পদ্ধতি অনুমোদিত। ফ্রেস্কোর একটি অসুবিধা এই যে, একবার রঙ্ দেওয়া হইলে আর বদলান বড় কঠিন। কাজে কাজেই ফ্রেস্কোতে ধীরে ধীরে ভাব-উন্মেষণের সঙ্গে সঙ্গে চিত্রিত-মূর্ত্তির ক্রমবিকাশ সম্ভব নয়। লিওনার্দোর কোন কাজই অচিন্তিত-পূর্ব্ব (impromptu) নহে। চিত্রের উপর একটি রেখা সম্পাতের জন্য, কতদিন মিলানের সমস্ত পথ হাঁটিয়া গিয়াছেন; কেবল পরিশ্রম ও নিয়মের বশ হইলেই চিত্রকর হয় না, সে কথা তিনি তাঁহার কাজে দেখাইতেন। দিনের পর দিন গিয়াছে একবারও তুলিকা হাতে করেন নাই, কারণ নূতন সৃষ্টি করার মুহূর্ত্ত আসে নাই, প্রকৃতির সৃষ্টির মত ধীরে ধীরে এই ছবিখানি সকল সুষমাসম্পন্ন হইয়া উঠিল। কথিত আছে ১৪৯৭ খ্রীষ্টাব্দে এই চিত্র সম্পূর্ণ হয়। তাহার পর তিন শত বৎসর ইহার উপর দিয়া অনেক উপদ্রবের ঝড় বহিয়া গিয়াছে। ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে নেপোলিয়নের সৈন্যদল তাঁহার নিষেধ সত্ত্বেও চিত্রখানির অনেক স্থলে ঢিল

শেষ-ভোজন।

ছুড়িয়া, কাদা মাথাইয়া নষ্ট করিয়াছিল। শেষে দেওয়ালে তৈল-চিত্রের আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। লণ্ডনের ডিপ্লোমা চিত্রাগারে যে ছবিখানি আছে, সেখানি লিওনার্দো-অঙ্কিত চিত্রের প্রতিকৃতি।

'শেষ-ভোজন' লিওনার্দোর চিত্র-গৌরবের এক অনির্ব্বচনীয় নিদর্শন। মধ্যযুগে যীশুর শেষ-বিদায় গীর্জ্জার মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। লিওনার্দো সেই ঘটনাটিকে গীর্জ্জার দেওয়াল ভাঙ্গিয়া সমস্ত পৃথিবীর আলোয় উজ্জ্বল করিয়া দেখাইলেন। পাঁচ বৎসর পরে রাফেলও ইউকারিষ্টের চিত্র আঁকিয়াছিলেন। রাফেলের কল্পনায় ভাব সমাবেশ অত্যধিক, এমন কি বাস্তব অবাস্তবে পার্থক্য নাই। পেরুজিনো-প্রবর্ত্তিত অবাস্তব অতীন্দ্রিয়তায় পরিপূর্ণ। লিও-নার্দোর পরিকল্পনায় বাস্তব (Realism) ও অবাস্তব অতীন্দ্রিয়তা ওতপ্রোতভাবে মিশিয়া গিয়াছে। যীশুর মুখে সমবেত শিষ্যমণ্ডলীর মনোবেগ অতি পরিস্ফুট। অসাধারণ শিল্প-নৈপুণ্য-ফলে সেই আনম্র গ্রীবাভঙ্গিতে এক অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তনের সঙ্কেত প্রচ্ছন্ন। শিষ্যগণের দেহের ভিতর দিয়া দেওয়ালের রঙ্‌ ঈষৎ ফুটিয়া উঠিয়াছে। শরীরের জড়ত্ব যেন ধীরে ধীরে মিলাইয়া যাইতেছে। যীশুর এই ভাবটি সকলের চেয়ে বেশী ও জুডাসের সকলের চেয়ে কম। 'তোমাদের মধ্যেই একজন বিশ্বাসঘাতকার কাজ করিবে' যীশুর মুখে ইহা শুনিবামাত্রই সকলে চঞ্চল হইয়া উঠিল। জুডাস চাঞ্চল্যহীনতার ভাণ সত্ত্বেও তাড়াতাড়ি টাকার থলি ধরিতে গিয়া নিকটস্থ লবণ-দানী ফেলিয়া দিল। লিওনার্দো-অঙ্কিত চিত্রপুঞ্জের কোনটিতেই যেমন কৃত্রিমতা নাই এখানেও তাই। চিত্রকলা (art) তাঁহার মতে ভাবের (emotion) প্রকাশ। এই যীশু-চিত্র লিওনার্দোর সাধনার চরম ফল। ইনি জগতের আদর-অনাদরে দৃক্‌পাত না করিয়া চিররহস্যময় অনন্ত জীবনের ধ্যানে মগ্ন।

ইটালীর আকাশে সূর্য্যাস্তের স্বর্ণকিরণ ছড়াইয়া পড়িয়াছে, যীশুর পশ্চাতের জানালা দিয়া আকাশের কিছু কিছু দেখা যাইতেছে, কিন্তু সেই সন্ধ্যা-ছায়াপূর্ণ ভোজন-গৃহে যে আলোকসম্ভূত নরদেবতার বাণী শিষ্যদের কাণে পেঁাছিল, সে বাণী জগতের সীমা হইতে সীমান্তর পর্য্যন্ত কত প্রকারে, কত বিষাদকরুণসুরে, কত আশা-আনন্দের কোলাহলে চিরকাল ধ্বনিত হইবে!

(৫) মনালিসা—লাজোকোন্দা—লাজোকোঁদ্‌

মনালিসা ফ্রান্সেস্কো দেল্‌ জোকোন্দের তরুণী পত্নী। যদিও চিত্রের নামকরণে ইহা একটি প্রতিকৃতি বলিয়া বুঝান হইয়াছে, কিন্তু এটি লিওনার্দোর কল্পনা-গরিমার

লুক্রেজিয়া ক্রিভেলি। মনালিসা

গারিগুহা-সন্নিহিত-কুমারী। ব্যাকস্।

K. V. Seyne & Bros
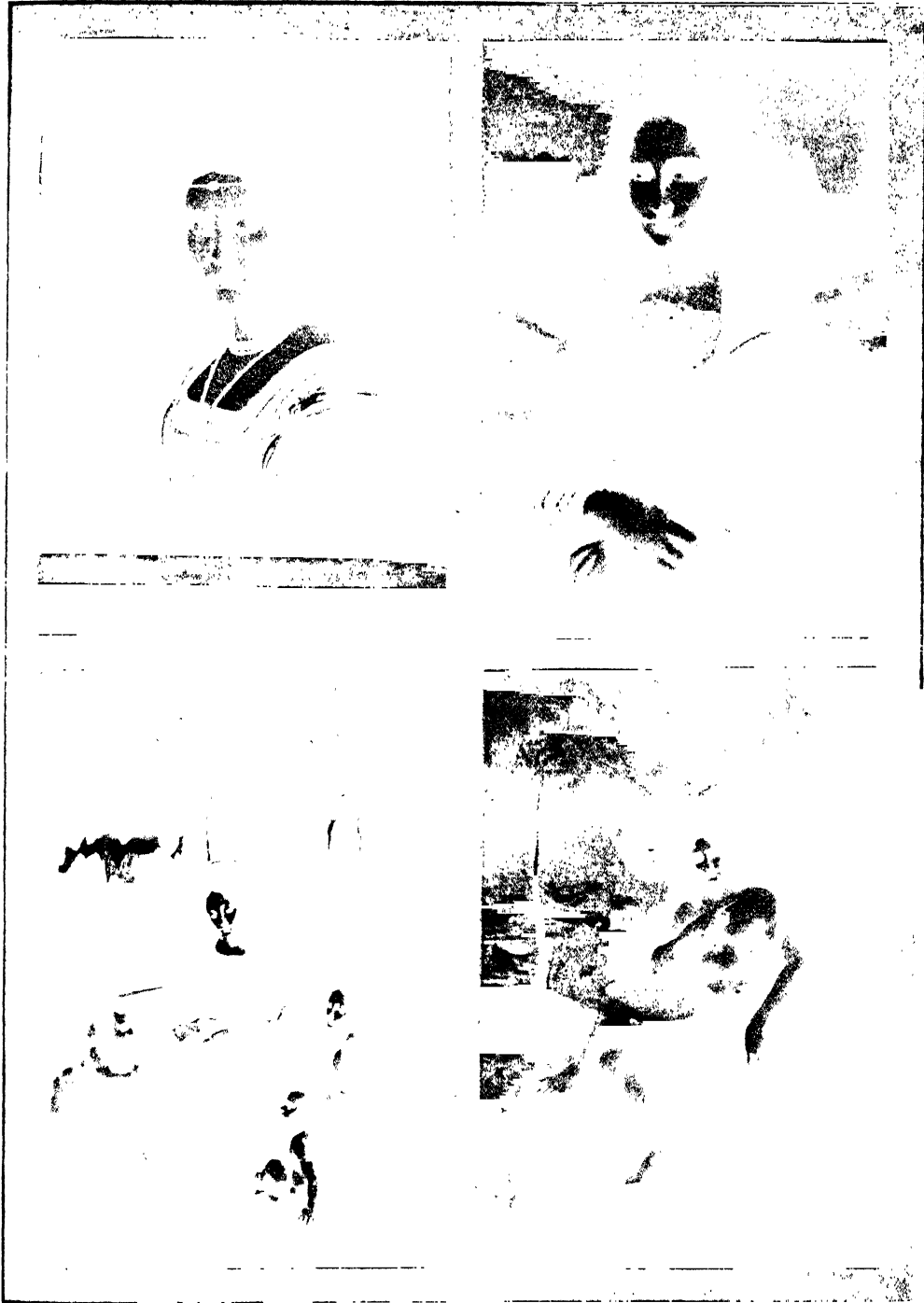
চরম বিকাশ। ভাসারি বলিয়াছেন, 'যদি কেহ চিত্রে প্রকৃতির অনুকরণের শেষ সীমা দেখিতে চান, তবে তাঁহাকে আমি জোকোন্দার প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে বলি। চক্ষে জ্যোতিঃ-মিশ্রিত ছলছলে ভাব, নাসিকারন্ধ্রে গোলাপের ঈষৎ আভা, ওষ্ঠের সিন্দূররাগ লোহিতাভ কপোলের দীপ্তি ঘনাইয়া তুলিয়াছে। একটু মনঃসংযোগ করিয়া দেখিলে বোধ হইবে, জীবন্ত নারীমূর্ত্তি লিওনার্দোর চিরাভ্যস্ত রহস্য হাসি হাসিতেছে। কথিত আছে, ১৫০১ খ্রীষ্টাব্দে এই চিত্র আরব্ধ হইয়া ১৫০৫ খ্রীষ্টাব্দে সমাপ্ত হয়। এই কয়বৎসর মাঝে মাঝে লিসাকে প্রস্তরখণ্ডের পার্শ্বে বসাইয়া তাহার মুখে প্রহেলিকাপূর্ণ হাসি ফোটাইবার জন্য লিওনার্দো জনকতক লোককে বাঁশী বাজাইতে বলিতেন। সে যাহাই হউক এই চিত্র যে প্রতিকৃতি, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু প্রতিকৃতির অনুরূপ কোন জীবন্ত নারীমূর্ত্তি ফ্লরেন্সে কি মিলানে ছিল কি না, তাহা জানা যায় না। এই রমণীমুখ বাল্যকাল হইতে লিওনার্দো মানসচক্ষে দেখিতেছিলেন। ফ্লরেন্সের রাজপথে কোন অচেনা চাহনির ভিতর দিয়া, কোন অপরিচিতের কেশ-বিন্যাসের ভিতর দিয়া ধীরে ধীরে যে মানস-সুন্দরী জাগিয়া উঠিতেছিল, তাহাকেই মর্ম্মর প্রস্তরের উপর অস্পষ্ট আলোকে বসান হইয়াছে। আশৈশব যে মূর্ত্তি, স্বপ্ন-তন্তুতে সোনার জালে বোনা হইতেছিল উহাই কোন অলব্ধপূর্ব্ব মন্ত্রবলে চিত্রপটে উদ্বোধিত। একি ইন্দ্রজাল! হাজার হাজার বৎসর মানুষ যে আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পোষণ করিয়াছিল এই লিসাতে তাহারই বিকাশ।

সেইজন্য এত কাল পরেও জোকোন্দা অমলিন। চোখ দুটি ঈষৎ অলস। বিশ্বের আত্মার সকল ভাব, সকল ভাষা, সকল বোধ, সকল রোগ, শোক, ভয় যেন এইখানে আসিয়া জমাট বাঁধিয়াছে। গ্রীসের আসঙ্গ-লিপ্সা, রোমের বীর্য্য-লিপ্সা, মধ্যযুগের অবাস্তব অতীন্দ্রিয়তা (mysticism,) বর্জ্জিয়ার (Borgia) পাপপ্রবণতা ও পেগান পৃথিবীর ভাব-তরঙ্গ যেন লিসার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ভিতর দিয়া প্রবাহিত। সে যে পাহাড়ের উপর বসিয়া আছে, তাহার চেয়েও সে ঢের পুরাতন। সে এই পৃথিবীর আদিম কালে ভ্যাম্পায়ারের মতন অনেকবার মরিয়া জীবনের শেষ রহস্য জানিয়াছিল। সে ঈজিপ্টের ফেরোয়াদের সঙ্গে সঙ্গে সৌন্দর্য্য-ঝারি বহন করিয়া বেড়াইত। সে হেলেনের জননী, যীশু-জননী মেরী তাহার সন্তান; কিন্তু তাহার সকল বেশ, সকল অভিজ্ঞতা, বাঁশীর সুরের মতন মিলাইয়া গিয়াছে। কেবল সেই সুরের স্মৃতি, রহস্য হাসি উদ্ভাসিত ঠোঁট দুটিতে জড়িত। অনন্ত জীবন-প্রবাহে শত সহস্র আকারে এক শক্তির বিকাশই বিজ্ঞানের চরম সিদ্ধান্ত, আবার যুগযুগান্তর হইতে চিন্তাপুঞ্জ মানবত্বের আকার ধারণ করিতেছে এটি দর্শনের শিক্ষা। মনালিসা বিজ্ঞান ও দর্শনের এই গূঢ় তত্ত্বসূচক সঙ্কেতের মিলন-ক্ষেত্র।

লিওনার্দো টস্কান-চিত্র-প্রতিভার সর্ব্বোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনি মাইকেল আঞ্জেলো এবং রাফেলের সমসাময়িক। বেনভেনুতো চেলিনি বলেন, এই তিনজনকে লইয়া ফ্লরেন্সের পুনর্জ্জন্মের পুঁথি লিখিত। ইঁহাদের মধ্যে লিওনার্দোই বিজ্ঞানানুমোদিত, আলোছায়ার নিয়ম অনুসারে চিত্র-অঙ্কন প্রণালীর পথ-প্রদর্শক। তাঁহার চিত্রসমূহে বর্ণসমাবেশ অপেক্ষা আলো-ছায়ার সমাবেশ অধিক পরিস্ফুট। তাঁহাকে চিত্রের ভাষায় বর্ণনিপুণ না বলিয়া স্বরনিপুণ বলা যাইতে পারে।* রঙের সঙ্গে আলো-ছায়া-সম্পাতে কি করিয়া ছবি বাস্তব আকার ধারণ করে, তাহাই লিওনার্দোর চিত্রনৈপুণ্যের বিশেষত্ব। এই আলো ছায়াসম্পাতকে কিয়ারোস্কিউরো (Chiaroscuro) বলে।

লিওনার্দো যে বর্ণসমাবেশে মধ্যযুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী, তাহা নয়; কিন্তু চিত্রের ভাষাবোধে তিনি অদ্বিতীয়। তিনি তাঁহার পূর্ব্বের, তাঁহার সমসাময়িক শিল্পীদিগের সকল শিল্প-নৈপুণ্য আত্মসাৎ করিয়া বাস্তব (Reality) ও পরমার্থে (Spirituality)র একত্ব সম্পাদন করিয়াছেন। রঙের ব্যবহারে তাঁহার একটু বিশেষত্ব দেখা যায়। দৃশ্য বস্তুর অন্তরে যে ভাব লুকান আছে, সেইটিকে যেন ফুটাইয়া তুলাই রঙের কাজ। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তিগণের রেখা-ভঙ্গী তিনি একেবারে ত্যাগ করেন

* বারান্তরে বর্ণ-নৈপুণ্য ও স্বর-নৈপুণ্য উদাহরণ দিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

নাই; কিন্তু আলো-ছায়ার গভীর-বিরল সমাবেশে চিত্রের উপর জীবন্ত ভাব আনয়নের কৌশল তাঁহারই উদ্ভাবিত। তাঁহার পূর্ব্বে আর কোন চিত্রকর এত জীবন্ত চাঞ্চল্য-ভাব চিত্রের ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারেন নাই।

লিওনার্দো তাঁহার চিত্রসমূহে মধ্যযুগের একটি ব্যাকুল চেষ্টার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। জীবনের উদ্দেশ্য কি? এই চিরন্তন প্রশ্নের উত্তরে জিজ্ঞাসাচিহ্ন-স্বরূপ প্রহেলিকা-পূর্ণ স্ফিংক্সের হাসি লিওনার্দোর শিল্পের উপর রক্ষিত, পুনর্জ্জন্মের অন্তরতম কথা চিত্রের ভাষায় অভিব্যক্ত।

শ্রীসতীশচন্দ্র বাগচি।

যোগমায়ার জন্ম।

[বাসনাযুক্ত শঙ্কর]

আজু হম্ চিন্তব কাহে।
কোন সুধা গুলব,
কোন চাঁদ তুলব,
ডুবিয়া অন্তর-প্রবাহে।

আজু মঝু হৃদ মাঝে,
এ কোন আলোক রাজে,
দিশি দিশি আনন্দ উজোরা।
কি নব পুলকরাশি,
চিত্তে উঠিছে ভাসি,
হৃদি নব ভাব বিভোরা।

দুরু দুরু, দুরু, দুরু, কম্পিত হিয়া গুরু,
জটা জূট উঠিছে শিহরি।
চিত্ত উলসি বিলসি নাচে,
অন্তর কিবা যাচে,
দেহ নব শিহরণ ভরি।

মুদিত লোচন-পুটে,
কি পীত আলোক ফুটে,
দশদিশি কনক-মণ্ডিতা।
গৌর-চম্পক টুটে,
এ কোন গৌরী ফুটে!
সহসা স্ফুরিলা ধাতা

যেমন স্ফুরিল বাণী, ঈশের বাসনা খানি,
সৃজনিল অপূর্ব্ব মূরতি।
রাগরক্ত নভঃস্থল, সুলোহিত পদতল!
জগন্মাতা কোরক-প্রকৃতি।

তুহিন শিখর-শিরে,
হিম-শিলা স্তরে স্তরে,
কুহেলি-গুণ্ঠনে ঢাকা।
শুভ্র শিখরে বসি,
শুক্ল জলদরাশি,
গুটাইয়া ধূমল-পাখা!
বরসিয়া-দেশ-দেশ,
—বিরামে বরিষা-শেষ,
—আশীষি শরতে সুব্রতী।

সহসা নবরাগে, কি ফুটে পুরোভাগে,
নেহারে যত পার্ব্বতী।
তীব্র সে জ্যোতিচ্ছটা,
উজ্জ্বল বরণ ঘটা,
সহিতে নারি শিখরী—
ঢাকিলা করপুটে,
যুগল আঁখি পুটে,—
জন্মিলা মানসী গৌরী

প্রসন্ন দশদিক্ ঝঙ্কারে গিরিপিক্
সমীর সুরভি চোরা
পুলকে টলি টলি
ছুটিল ঢলি ঢলি
জন্মিলা যোগেশ-দারা !

মোহিনী-মোহমাখা
কিশোরী সে বালিকা,
যোগ-আনন্দ যোগমায়া,
কেশরী পিঠে দুলি,　তাই তাই করতালি ;
মাতৃরূপিণী মহামায়া !—

দেখি, শিখর-রাণী ছুটি,
সে কনক-পদ্ম-গুটী !
চুমিয়া লইলা কোলে।
জয় জয় গিরি-বালা
সরব-মঙ্গলা
গিরীন্দ্রমোহিনী কোলে।

শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী।

ভারতবর্ষের অদ্বৈতবাদ

[৩]

আমরা পূর্ব্ব সংখ্যায় দেখাইয়াছি যে, বৈদিক যুগের নিকটবর্ত্তী গ্রন্থ উপনিষদে ও বেদান্তদর্শনে এবং বেদের শব্দার্থ-প্রকাশক নিরুক্ত প্রভৃতি অভিধান-গ্রন্থে, ঋগ্বেদে ব্যবহৃত সূর্য্য, ইন্দ্র, মরুৎ, অগ্নি, প্রাণ প্রভৃতি শব্দ দ্বারা ভৌতিক পদার্থগুলিকে বুঝাইত না। ঐ সকল শব্দ দ্বারা কার্য্যবর্গে অনুপ্রবিষ্ট কারণ-সত্তা বা ব্রহ্ম-সত্তাই বুঝাইত ; সুতরাং ঋগ্বেদে যে সূর্য্য, ইন্দ্রাদি দেববর্গের স্তুতি রহিয়াছে, উহা কারণ-সত্তারই স্তুতি। উপনিষদ্ ও বেদান্ত দর্শনের ইহাই সিদ্ধান্ত।

বেদান্তদর্শনে যে কার্য্য-কারণবাদ নির্ণীত হইয়াছে, উহাও ঋগ্বেদেরই সম্পত্তি। কার্য্যবর্গের মধ্যে কারণ-সত্তার অনুসন্ধানই ঋগ্বেদে আগাগোড়া উপদিষ্ট হইয়াছে। এক সদ্বস্তুই বিশ্বের মূলে অবস্থিত ; উহাই বিশ্বের উপাদান ; উহাই বিশ্বের তাবৎ পদার্থে অনুস্যূত হইয়া রহিয়াছে। এই উপাদান-সত্তাই, বিবিধ নামে ও বিবিধরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে এবং বিবিধ নাম ও বিবিধ রূপের মধ্যে এই উপাদান-সত্তাই অনুস্যূত হইয়া আসিতেছে। বিবিধ নাম ও রূপ লইয়াই জগৎ। এই নাম-রূপগুলি, কারণ-সত্তাকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। ইহাদের নিজের কোন স্বতন্ত্র সত্তা নাই। ব্রহ্মসত্তাতেই উহাদের সত্তা। নাম-রূপগুলিতে অনুপ্রবিষ্ট সত্তা দ্বারাই আমরা ব্রহ্মের সত্তা বুঝিতে পারি।

স্বর্ণ হইতে হার, বলয়, কুণ্ডল, মুকুট নির্ম্মিত হইল। এস্থলে স্বর্ণকে 'কারণ' বা উপাদান ; এবং হার, বলয়, কুণ্ডল, মুকুটকে উহার 'কার্য্য' বলা যায়। কার্য্যগুলি—কারণেরই একটা বিশেষ অবস্থা, একটা রূপান্তর, একটা আকার বিশেষ।

অজ্ঞ, সাধারণ লোক,—হার-বলয়-কুণ্ডলাদি পদার্থগুলির প্রত্যেককে এক একটা স্বতন্ত্র স্বাধীন পদার্থ বলিয়া মনে করে। স্বর্ণ-সত্তাই যে হারাদির মধ্যে অনুস্যূত, সে দিকে আর এ সকল লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় না। ইহা-

দের চিত্তে ভেদ-বুদ্ধি বড় প্রবল। হারাদি আকার ধারণ করাতেও, স্বর্ণ-সত্তার যে কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি হয় নাই,—এ কথাটা অজ্ঞলোকে বুঝিতে পারে না। ইহারা কারণ-সত্তার কোন সংবাদ রাখে না ; ইহারা কার্য্যবর্গ লইয়াই যাবজ্জীবন মহাব্যস্ত থাকে।

তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি কিন্তু, এই নাম-রূপাত্মক জগতে কেবলমাত্র ব্রহ্মসত্তাই অনুস্যূত দেখিতে পান। ইঁহারা হার, বলয়, কুণ্ডলাদিকে স্বতন্ত্র স্বাধীন বস্তু বলিয়া অনুভব করিতে পারেন না। ইহাদিগকে তাঁহারা স্বর্ণ-সত্তারই একটা 'আকার'-মাত্র বলিয়াই মনে করেন। স্বর্ণ-সত্তাকে তুলিয়া লইলে, হার-বলয়-কুণ্ডলাদি থাকে না। হারাদি আকারগুলি একটা 'আগন্তুক' অবস্থা মাত্র। এই অবস্থার ভেদে, প্রকৃতপক্ষে, স্বর্ণ-সত্তার কোন ভেদ হয় না। উহা পূর্ব্বেও যে স্বর্ণসত্তা, এখনও সেই স্বর্ণ-সত্তাই রহিয়াছে। হারাদিকে প্রকৃত পক্ষে স্বর্ণ বলিয়াই অনুভব করা কর্ত্তব্য ; কিন্তু অজ্ঞলোক তাহা না করিয়া, হারাদিকে স্বর্ণ হইতে স্বতন্ত্র এক একটা বস্তু বলিয়াই মনে করে। ভ্রমের প্রকৃত বীজ এই স্থানে।

ঋগ্বেদের মধ্যে এই কারণ-সত্তার অনুসন্ধান—এই অদ্বৈতবাদ—অতীব পরিস্ফুট। ঋগ্বেদে যে যজ্ঞানুষ্ঠানের পদ্ধতি আছে, সেই পদ্ধতির মধ্যেই অতি সুস্পষ্টরূপে এই অদ্বৈতবাদ নিহিত রহিয়াছে।

যজ্ঞীয় অন্নাদিতে, যজ্ঞীয় মন্ত্রাদিতে, এক কারণ-সত্তার অনুসন্ধান করার উপদেশে ঋগ্বেদ পূর্ণ। বাহিরে ও ভিতরে সকল পদার্থে সর্ব্বত্র, সাধক কারণ-সত্তার অনুভব করিবেন। এই অনুভবের ফলে, ক্রমে দেবতাবর্গের 'স্বতন্ত্র' সত্তার প্রতীতি অন্তর্হিত হইতে থাকিবে। চিত্ত সুমার্জ্জিত হইয়া উঠিলে, সকল পদার্থে এক কারণ-সত্তাকেই অনুস্যূত দেখিতে পাইবেন। এইরূপে সর্ব্বপদার্থে ব্রহ্ম-সত্তার অনুভব অত্যন্ত দৃঢ় হইলে, অবশেষে কিঞ্চিন্মাত্রও ভেদবুদ্ধি থাকে না। তখন পূর্ণব্রহ্মাত্ম-বোধ হইতে থাকে। ঋগ্বেদে এই 'ভাবনাত্মক' যজ্ঞের প্রচুর উপদেশ আছে।

আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে যে তিন প্রকার সাধকের শ্রেণীভেদ দেখাইয়াছি, সাধনের তারতম্যানুসারে, ঋগ্বেদে এই প্রকার সাধকের পরলোকগতিরও তারতম্য প্রদর্শিত হইয়াছে। ঋগ্বেদ যদি কেবল অজ্ঞ কর্ম্মীদিগেরই গ্রন্থ হইত, তবে গতির এরূপ ভেদও আমরা দেখিতে পাইতাম না। পিতৃযান পথ ও দেবযান পথ বলিয়া, দুইটি পথের কথা ঋগ্বেদে রহিয়াছে। যাঁহারা এখনও দেবতাদের প্রকৃত স্বরূপটিকে ধারণা করিয়া উঠিতে পারেন নাই ; যাঁহারা স্বর্গ-সুখাদির আশায়, দেবতাবর্গকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বস্তু বোধে যজ্ঞানুষ্ঠান করেন, যাঁহাদের চিত্তে এখনও কারণ-সত্তার বোধ ফুটিয়া উঠে নাই, তাঁহারা 'পিতৃযান' পথে নিকৃষ্টলোকে দেহান্তে গমন করেন। আর, যাঁহাদের চিত্তে, দেবতাবর্গের স্বাতন্ত্র্যবোধ তিরোহিত হইয়া, দেবতাবর্গের মধ্যে অনুস্যূত কারণ-সত্তার অনুসন্ধান জাগিয়া উঠিয়াছে, তাঁহারা 'দেবযান' পথ দিয়া, উন্নত স্বর্গগুলিতে দেহান্তে প্রস্থান করেন। ইঁহাদিগকে আর এই মর্ত্ত্যলোকে ফিরিয়া আসিতে হয় না। সর্ব্বোচ্চ ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি এই সাধনের উৎকৃষ্ট ফল।

কার্য্যবর্গের মধ্যে কারণ-সত্তার জ্বলন্ত অনুভবই, ভাবনাত্মক যজ্ঞের লক্ষ্য এবং দেবযান মার্গ অবলম্বন করিয়া উন্নত লোকে গতিই উহার ফল। ঋগ্বেদের সর্ব্বত্র, এই লক্ষ্য ও ফলের কথা আছে। উপনিষদে ও বেদান্তে, ইহাই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। উপনিষদে ও বেদান্তে এমন কোন তত্ত্ব উপদিষ্ট হয় নাই, যাহার মূল ঋগ্বেদে না আছে। ঋগ্বেদের বিরুদ্ধ কোন কথা বা বেদ হইতে সম্পূর্ণ নূতন কোন তত্ত্বও —এই সকল গ্রন্থে স্থান প্রাপ্ত হয় নাই। বেদ-বিরুদ্ধ গ্রন্থ কোন কালেই হিন্দুজাতির নিকটে সমাদৃত হয় নাই। সুতরাং, ঋগ্বেদে কার্য্য-কারণবাদ ছিল না, উন্নত অদ্বৈততত্ত্ব ঋগ্বেদে ছিল না ; উহারা বহু পরে বেদান্তদর্শনে, বহু চিন্তার ফলে, নূতন প্রবিষ্ট হইয়াছে,—আমরা একথা মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহি।

এস্থলে, আমরা আর একটি কথা বলিব। একই শক্তি বা সদ্বস্তু যে বিবিধ রূপে ও বিবিধ নামে—বিবিধ 'দেবতার' মূর্ত্তি ধারণ করিয়া নানা স্থানে ক্রিয়া করিতেছে, ঋগ্বেদ অতি সুস্পষ্ট-ভাবে তাহা বলিয়া দিয়াছেন। বেদান্তদর্শনের পাঠক শঙ্কর-ভাষ্যের নানা স্থানে "মায়া" শব্দটির ব্যবহার অবশ্যই দেখিয়াছেন। এই নিমিত্তই অদ্বৈতবাদটি, "মায়াবাদ" নামেও পরিচিত হইয়া পড়িয়াছে। আমরা ঋগ্বেদেও নানাস্থানে এই "মায়া" শব্দের ব্যবহার দেখিতে পাই। ঋগ্বেদের যে যে স্থলে এই "মায়া' শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে, আমরা সে স্থলগুলি

পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। একই বস্তু যে ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করে,—এই অর্থেই মূলতঃ মায়া শব্দটি ঋগ্বেদে ব্যবহৃত হইয়াছে, পরীক্ষা দ্বারা আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি। বিবিধ রূপান্তর ধারণ করিয়া যে বিবিধ ক্রিয়া করিবার সামর্থ্য—তাহারই নাম "মায়া"। ঋগ্বেদ এই "মায়া" শব্দের প্রয়োগ করিয়া,—দেবতাবর্গ যে একই সত্তার বিবিধ বিকাশ, বিবিধ রূপ, বিবিধ আকার,—তাহা অতি সুস্পষ্ট ভাষায় বলিয়া দিয়াছেন; সুতরাং দেবতাবর্গ যে একই সত্তার বিকাশ, দেবতাবর্গ যে মূলে একই সত্তামাত্র,—এই মহাতত্ত্বই আমরা পাইতেছি। একই সদ্বস্তু, স্বীয় সামর্থ্য প্রভাবে, সূর্য্য-চন্দ্রাদি বহু আকার ধারণ করিয়া, আত্ম-প্রকাশের নিমিত্ত, বহু ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিতেছেন; সুতরাং দেবতাবর্গ—একই সত্তার বা সামর্থ্যের বিকাশ বা ভিন্ন ভিন্ন রূপ। এই তত্ত্বটি ঋগ্বেদে পূর্ণভাবে রহিয়াছে। আমরা বারান্তরে এই মায়া সম্বন্ধে ঋগ্বেদ হইতে কএকটি স্থল উদ্ধৃত করিয়া, আমাদের সিদ্ধান্তের যাথার্থ্য সপ্রমাণ করিব।

শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

আকবর শাহের ধর্ম্মমত।

মহামতি আকবর শাহ ইসলাম্ ধর্ম্মে আস্থাহীন হইয়া অভিনব ধর্ম্মমতের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। এই ধর্ম্মমত তৌহিদ-ই-ইলাহি নামে পরিচিত হইয়াছিল।

আকবরের নবরত্ন-সভা।

আমরা আকবরপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্মমতের মূল সূত্রসকল লিপি-করিতেছি। হিন্দু ও খৃষ্টীয় ধর্ম্মের বহুমত তৌহিদ-ই-ইলাহির গঠনে গৃহীত হইয়াছিল। বীরবল সিংহ, সূর্য্যের অপার মহিমা বর্ণনা করিয়া আকবর শাহকে সূর্য্যোপাসক করিয়া তুলিয়াছিলেন। অগ্নি-উপাসক এবং খৃষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারকগণও আকবর শাহের নিকট স্ব স্ব ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিতে যত্ন করেন। বস্তুতঃ আকবর-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম যাবতীয় ধর্ম্মের সমবায়ে গঠিত হইয়াছিল। ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়; আকবর তাঁহার প্রতিনিধি; এই মত নবধর্ম্মের প্রথম সূত্র। উপাসকের বিবেকোজ্জ্বল হৃদয়ে ঈশ্বরের যাদৃশ স্বরূপ প্রকটিত হইয়া থাকে, তাদৃশ স্বরূপই ধ্যেয়। যাহার হৃদয় মন সকল বিষয় হইতে মুক্ত, তিনি অনুপম ঈশ্বর-প্রেম লাভের অধিকারী হইয়াছেন। দুষ্প্রবৃত্তির দমন এবং

লোকহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠানই পারত্রিক মঙ্গল লাভের প্রকৃষ্ট উপায়। আকবর আপন ধর্ম্মবিধান হইতে পৌরহিত্যের প্রথা তুলিয়া দিয়াছিলেন। তিনি মনুষ্যকে শাস্ত্রের অনুশাসন হইতে মুক্ত করিয়া একমাত্র জ্ঞান ও বিবেকের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য যত্নশীল হইয়াছিলেন। দুর্ব্বলচিত্ত উপাসকের চিত্তবৃত্তির স্থিরতা সম্পাদনার্থ কোন অবলম্বন আবশ্যক হইলে অগ্নি অথবা সূর্য্যকে গ্রহণ করিবার বিধান ছিল। আকবর ঈশ্বরকে জ্যোতিঃস্বরূপ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, তজ্জন্যই এই প্রকার ব্যবস্থা করা হয়।

পরলোক ও মুক্তি সম্বন্ধে আকবর শাহের বিশ্বাস অনেকাংশে বৌদ্ধশাস্ত্রানুযায়ী ছিল। তিনি বিশ্বাস করিতেন, জীবাত্মা মৃত্যুর পর নানারূপ যোনি ভ্রমণ করে এবং ইহকালের শুভাশুভ কর্ম্মের অনুরূপ যোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এইরূপ যোনি পরিভ্রমণ করিতে করিতে অবশেষে পূর্ণ শুদ্ধিলাভ করিয়া ঈশ্বরে বিলীন হয়, ইহাই স্বর্গসুখভোগ, এতদ্ব্যতীত পরলোকে পুণ্যের অন্য কোনরূপ পুরস্কার নাই। তৌহিদ-ই-ইলাহির উপাসনা-প্রণালীতে প্রার্থনাংশ পারসিক ধর্ম্মের অনুকরণে এবং অনুষ্ঠানাংশ হিন্দুপদ্ধতি অনুসারে রচিত হইয়াছিল; কিন্তু সামাজিক উপাসনার কোনরূপ বিধান ছিল না। আকবর নিশাকালে বিচিত্র আলোকমালা প্রজ্বলিত করিয়া একাকী ঈশ্বরোপাসনা করিতেন।

তৌহিদ-ই-ইলাহির মতে অতিরিক্ত উপাসনা, উপবাস ও দান অনেক সময়ে কপটতাচরণের প্রশ্রয় দিয়া থাকে। মাংসাহার পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য, কিন্তু নিষিদ্ধ নহে। সহমরণ, ঘনিষ্ঠ স্বগণ মধ্যে বিবাহ, বাল্য-বিবাহ, বহুবিবাহ এবং চিরবৈধব্য সমাজের অহিতকর বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছিল।

তৌহিদ-ই-ইলাহি অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি কর্ত্তৃক গৃহীত হইলেও জনসাধারণ মধ্যে উহা প্রচারিত হইতে পারে নাই। মোসলমান সমাজের বিশ্বাস ছিল যে, মোসলমান আবুল ফজল এবং হিন্দু বীরবলের প্ররোচনায় আকবর স্বীয় ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তিত করিয়া তৌহিদ-ই-ইলাহির প্রবর্ত্তন করেন। বদায়ুনি লিখিয়াছেন যে, আবুল ফজল সমস্ত পৃথিবী অগ্নিতে দগ্ধ করেন; কিন্তু আকবর শাহ জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে নানা শ্রেণীর শাস্ত্রবেত্তা লইয়া গভীরভাবে ধর্ম্মালোচনা করিতেন; তৎকালে তিনি ইস্‌লাম ধর্ম্মে আস্থাহীন হ'ন। তখন তাঁহার প্রতিভাদীপ্ত নয়নে ধর্ম্মের অভিনব উজ্জ্বল মূর্ত্তি পতিত হয়। আমাদের মতের সমর্থন জন্য বদায়ুনির গ্রন্থ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি। "৯৮৩ হিজিরার পূর্ব্বে বহুযুদ্ধে আকবর শাহ বিজয়শ্রী লাভ করিয়াছিলেন; মোগল সাম্রাজ্য ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল, সমস্ত কার্য্য সুশৃঙ্খলভাবে নির্ব্বাহিত হইতেছিল এবং বাদশাহ নিঃশত্রু হইয়াছিলেন। এই কারণে তিনি এই সময় হইতে সাধু, ফকির এবং মুইনিয়া সম্প্রদায়ের শিষ্যবর্গের সাহচর্য্য লাভ করিবার অবসর প্রাপ্ত হ'ন এবং কোরান ও হদিসের আলোচনায় বহু সময় অতিবাহিত করিতে আরম্ভ করেন। সুফিমত, বিজ্ঞান, দর্শন এবং আইন সম্বন্ধে আলোচনা হইতে থাকে। বাদশাহ সমস্ত রাত্রি ঈশ্বরচিন্তায় মগ্ন থাকিতেন। * * * যিনি প্রকৃত দাতা, তাঁহার নামে বাদশাহের হৃদয় ভক্তিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। অতীতকালে যে সাফল্য লাভ হইয়াছে, তজ্জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যে তিনি একাকী অবনত-মস্তকে উপবিষ্ট হইয়া প্রার্থনা ও বিষাদে বহু প্রাতঃকাল যাপন করিতেন।"

বৃহস্পতিবার রাত্রিতে ধর্ম্ম ও শাস্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা হইত। নানা সম্প্রদায়ভুক্ত ইস্‌লাম শাস্ত্রবেত্তৃগণ সবিশেষ প্রতিবাদ সহকারে আপন আপন মতের প্রাধান্য সংস্থাপনার্থ যত্নবান্ হইতেন। তাঁহাদের তর্ক-কোলাহল বহুদূর পর্য্যন্ত ধ্বনিত হইত। তাঁহারা বাদশাহের সম্মুখেই ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িতেন, এবং পরস্পরকে কাফের বলিয়া সম্বোধন করিতেন। ইহার ফলে বাদশাহ সাতিশয় বিরক্ত হইয়া উঠিতেন। অহঙ্কার ও আত্মম্ভরিতা তাঁহার নিকট সাতিশয় ঘৃণ্য ছিল। বিশেষতঃ জ্ঞানী ব্যক্তির অহঙ্কার তাঁহার পক্ষে একপ্রকার অসহ্য ছিল। যে সময় তিনি ইস্‌লাম শাস্ত্র ও ইস্‌লাম শাস্ত্রবেত্তৃগণের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইতেছিলেন, তৎকালে খৃষ্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ প্রভৃতি ধর্ম্মাবলম্বী শাস্ত্রজ্ঞগণ আপনাদের গুণগ্রাম প্রদর্শন করিয়া তাঁহার শ্রদ্ধাভাজন হইতে সচেষ্ট হন।

এইভাবে যে সময়ে ধীরে ধীরে বাদশাহের ধর্ম্ম-বিশ্বাস হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছিল, তৎকালে তিনি মোগল-সাম্রাজ্যের শাসন-সংরক্ষণ-বিধানসকল সংস্কার করিবার জন্য নিরত হন এই কার্য্যে ইস্‌লাম ধর্ম্মের গোঁড়া রাজপুরুষগণ বিরোধ

হইয়াছিলেন। এই কারণ বাদশাহ সে ধর্ম্মের বন্ধন ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। অতঃপর তিনি অভিনব ধর্ম্মমত ঘোষণা করেন এবং সর্ব্বসাধারণের মধ্যে সে ধর্ম্ম প্রচার করিতে উদ্যোগী হ'ন।

৯৮৮ হিজিরার জমাল আবল মাসের প্রথম তারিখে ফতেপুরের জুমা মস্‌জিদে আকবর প্রকাশ্যভাবে আপনার অভিনব ধর্ম্মবিধানের প্রচার করেন। বাদশাহ মঙ্গলাচরণের জন্য ফৈজীর রচিত নিম্নলিখিত কবিতা আবৃত্তি করিয়া তাহার পর তৌহিদ-ই-ইলাহির মূল সূত্রসকল ব্যাখ্যা করেন।

আমাকে রাজত্ব প্রভু করিলা অর্পণ,
বল বীর্য্য জ্ঞান দিয়া করিলা সৃজন।
সত্য প্রতি অনুরাগে পূর্ণ করি মন,
ন্যায় সত্য পরিচ্ছদে করিলা শোভন।
কে পারে বর্ণিতে তাঁর গুণ করি গান,
আল্লা হো আকবর সেই ঈশ মহীয়ান্।

আকবর-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের মূল সূত্রসকল আমরা পূর্ব্বেই বিবৃত করিয়াছি। আকবর শাহের বিদ্বেষী বদায়ুনি লিখিয়াছেন যে, এই ধর্ম্মের অনুসঙ্গক্রমে আকবর শাহ আরও অনেক নিয়ম প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। তিনি এই সকল নিয়মের প্রসঙ্গে অনেক কৌতুককর বিষয়ের অবতারণা করিয়া গিয়াছেন। আমরা তৎসমুদয়ের সারমর্ম্ম নিম্নে প্রদান করিতেছি :—

(১) ঔষধার্থ সুরাপান বৈধ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল; কিন্তু সুরাপানজনিত মত্ততার দণ্ড বিধানের জন্য বিবিধ উপায় অবলম্বিত হয়। আকবর শাহের আদেশে রাজপ্রাসাদের অদূরে সুরালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; শৌণ্ডিক জাতীয় দ্বাররক্ষকের পত্নীকে তাহার ভার প্রদত্ত হয়; কিন্তু তাদৃশ ব্যবস্থা সত্ত্বেও সুরাপায়ীদের সুসময় উপস্থিত হইয়াছিল।

(২) নগরের একপ্রান্তে বেশ্যাপল্লী স্থাপিত হইয়াছিল; এই পল্লী সয়তানপুরা নামে পরিচিত ছিল।

(৩) গোমাংস আহার নিষিদ্ধ হইয়াছিল। আকবর শাহ পেঁয়াজ রসুন পরিত্যাগ করেন। তদীয় মহিষীদের প্রভাবে তিনি এই সমস্ত পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হ'ন। আকবর শ্মশ্রুমুণ্ডন করিতেন।

(৪) খৃষ্টীয় আচারের অনুকরণে ঘণ্টাধ্বনি হইত।

(৫) শূকর ও কুকুর অপবিত্র বলিয়া পরিগণিত করিবার নিয়ম তুলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। রাজান্তঃপুরে অনেক কুকুর স্থান প্রাপ্ত হয়। এই বিষয়ের মূলে আকবর শাহের মহিষীদের প্রভাব বিদ্যমান ছিল। হিন্দুর ঈশ্বর এক সময়ে শূকররূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

(৬) মৃত ব্যক্তির প্রীত্যর্থে ভোজদান অনাবশ্যক বলিয়া প্রচারিত হইয়াছিল।

(৭) ব্যাঘ্র ও শূকর মাংস আহারের বিধি প্রদত্ত হইয়াছিল। মনুষ্যকে ব্যাঘ ও শূকরের ন্যায় শক্তিশালী করিবার উদ্দেশ্যে এই বিধি প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল।

(৮) হিজিরা অব্দের পরিবর্ত্তে এক নূতন অব্দ প্রচলিত হইয়াছিল। আকবর শাহের সিংহাসনারোহণের তারিখ হইতে এই অব্দ আরম্ভ হয়।

(৯) নওরোজের প্রথম দিবস আকবর শাহ সাধু ফকির, উল্মা, কাজি, মুফ্‌তিদিগকে সুরাপান করিতে বাধ্য করিতেন।

(১০) রবিবার এবং করওয়ার দিন এবং আবল্ মাসে পশুহত্যা নিষিদ্ধ হইয়াছিল। এই আদেশের অন্যায়াচরণ করিলে মৃত্যুদণ্ড প্রদত্ত হইত। বাদশাহ হিন্দুদিগকে সন্তুষ্ট করিবার জন্যই এই সব কাজ করিতেন।

হিন্দুবেশে আকবর।

(১১) প্রাতঃকালে, দ্বিপ্রহরে, সন্ধ্যাকালে এবং দ্বিপ্রহর রাত্রিতে সূর্য্যের উপাসনা করিবার জন্য বাদশাহ আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি সূর্য্যের এক সহস্র একটি সংস্কৃত নাম সংগ্রহ করেন, এবং সূর্য্যের অভিমুখিন হইয়া তৎসমুদয় ভক্তিভরে পাঠ করিতেন। তাঁহার কপালে ত্রিপুণ্ড্রক পরিদৃষ্ট হইত। বাদশাহের আদেশে মসজিদসকল শস্য-ভাণ্ডার অথবা চৌকীদারী গৃহে পরিণত হয়।

(১২) বাদশাহ নগরের বহির্ভাগে দুইটি অতিথিশালা নির্ম্মিত করিয়াছিলেন, ইহার একটিতে দরিদ্র হিন্দুরা, অপরটিতে দরিদ্র মুসলমানেরা আহার পাইত।

(১৩) বাদশাহের সময়ে তিব্বত দেশে দুইশত বয়স্ক লামা পরিদৃষ্ট হইত। আকবর তদ্রূপ দীর্ঘজীবী হইবার অভিপ্রায়ে তাহাদের অনুকরণে অন্তঃপুরে অল্প সময় অতিবাহিত করিতেন এবং পানাহারের পরিমাণ হ্রাস করিয়াছিলেন; বিশেষতঃ মাংসাহার হইতে নিবৃত্ত ছিলেন।

(১৪) বাদশাহের নিজের বহু সংখ্যক শিষ্য ছিল; তাহারা 'চেলা' নামে অভিহিত হইত। তাহারা নীচাশয় এবং প্রতারক ছিল; রাজপ্রাসাদের বহির্ভাগে দাঁড়াইয়া থাকিত। বাদশাহ সূর্য্যের এক সহস্র এক নাম পাঠ করিয়া ঝারোকায় উপনীত হইলেই তাহারা ভূমিতলে গড়াগড়ি দিত। তস্করতুল্য প্রতারক ব্রাহ্মণেরা বাদশাহের এক সহস্র এক নাম সংগ্রহ করিয়াছিল, এবং তাঁহাকে রাম ও কৃষ্ণের ন্যায় ঈশ্বরের অবতাররূপে বর্ণনা করিত। অনেক ব্রাহ্মণ তাঁহার প্রিয়পাত্র হইবার কল্পনায় তদ্বোধক সংস্কৃত শ্লোক "আমদানী" করিত।

(১৫) খুসরোজের বাজারে নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য কেবল রমণীবৃন্দের প্রবেশাধিকার থাকিত। এই সময় তাঁহারাই ক্রয় বিক্রয় করিতেন; তদর্থে অজস্রধারে বাদশাহের অর্থ অপচিত হইত। তাদৃশ সম্মিলনীতে বিবাহের কথাবার্ত্তা ও বাগ্দান নিষ্পন্ন হইত।

(১৬) আরব্য ভাষা শিক্ষার পথ রুদ্ধ হইয়াছিল।

(১৭) হিন্দুদের বিবাদ মীমাংসার ভার ব্রাহ্মণবর্ণের হস্তে অর্পিত হইয়াছিল। শপথ গ্রহণ করা আবশ্যক হইলে তাঁহারা অভিযোক্তার হস্তে উত্তপ্ত লৌহ স্থাপন করিতেন, সময় সময় উত্তপ্ত ঘৃতে তাহাদের হস্ত নিমজ্জিত করিবার আদেশ প্রদত্ত হইত। এই পরীক্ষায় হস্ত অক্ষত থাকিলে বিচারক তাহাকে নির্দ্দোষ প্রতিপন্ন করিতেন।

(১৮) দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে পিতামাতার সন্তান বিক্রয় করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিবার অনুমতি ছিল।

(১৯) কোন হিন্দু ঘটনাচক্রে পতিত হইয়া বাল্যকালে ইস্লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে সে পুনর্ব্বার হিন্দুধর্ম্মে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারিত। কোন ব্যক্তির ধর্ম্ম-বিশ্বাসে হস্তক্ষেপ করা নিষিদ্ধ ছিল। যাহার যে ধর্ম্মে অনুরাগ হইত, সে তাহাই গ্রহণ করিতে পারিত। যদি কোন হিন্দু রমণী মোসলমানের প্রেমে পতিত হইয়া ইস্লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিত, তবে তাহাকে তদীয় পরিবারে প্রত্যর্পণ করিবার আদেশ ছিল।

আকবর শাহ তৌহিদ-ই-ইলাহি প্রচার করিয়া মোসলমান সমাজের সাতিশয় বিদ্বেষভাজন হইয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক বদায়ুনি একজন গোড়া মোসলমান ছিলেন। তিনি আকবর শাহের প্রতি অনেক কটুবাক্য বর্ষণ করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু তাদৃশ কটুবাক্য আকবরের মহিমা আচ্ছন্ন করিতে পারে নাই; বদায়ুনির গ্রন্থ পাঠ করিলে পাঠকগণের মানসনয়নে আকবর শাহের ভাস্বর মূর্ত্তি প্রকটিত হইয়া থাকে।

জাহাঙ্গীর স্বরচিত জীবনবৃত্তে লিখিয়া গিয়াছেন যে, আকবর শাহ মৃত্যুর পূর্ব্বে ইস্লাম ধর্ম্মে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন এবং তৌহিদ-ই-ইলাহির প্রচারার্থ অনুতপ্ত হইয়াছিলেন। ব্লকম্যান সাহেব একথার যাথার্থ্য স্বীকার করেন না। যে মোল্লার সাহায্যে আকবর মৃত্যুর পূর্ব্বে কল্মা পাঠ করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত হইয়াছে, তাঁহার নাম কাদির জাহান, এবং তিনি নিজেও একজন নবধর্ম্ম বিশ্বাসী ছিলেন। খাকি খাঁ আকবরের পুনর্ব্বার ইস্লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার বিষয়ে নীরব রহিয়াছেন। আকবর শাহের মত পরিবর্ত্তিত হইলে খাঁকি খাঁ অবশ্যই তাহার উল্লেখ করিতেন। অন্যান্য ইতিহাসেও এই বিষয়ের উল্লেখ নাই। মোল্লা তাতারমলের সহচর আকবরের যে কুৎসা প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতেও অনুমিত হয় যে, তিনি কখনও ইস্লাম ধর্ম্ম পরিত্যাগ করার জন্য অনুতাপ প্রকাশ করেন নাই।

আকবর শাহের মৃত্যুর পর তৌহিদ-ই-ইলাহি আপনা আপনি বিলুপ্ত হইয়াছিল।

আকবর শাহের দরবারভুক্ত কতিপয় অমাত্য তৌহিদ ই-ইলাহি ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন; আমরা তাঁহাদের নাম এবং সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিপিবদ্ধ করিতেছি:—

আবুল ফজল—আবুল ফজল আকবর শাহের অন্যতম প্রধান অমাত্য এবং অন্তরঙ্গ বান্ধব ছিলেন। তিনি 'আকবরনামা' ও 'আইন-ই-আকবরী' নামক গ্রন্থের প্রণেতা। কি বিদ্বজ্জন-সম্মিলনীতে, কি মন্ত্রণাকক্ষে, কি রণক্ষেত্রে সর্ব্বত্রই তাঁহার অতুল প্রতিভা সমভাবে স্ফূর্ত্তি লাভ করিত। আবুল ফজলের অসাধারণ আহারশক্তি ছিল। তিনি প্রত্যহ বাইশ সের পরিমিত খাদ্য উদরসাৎ করিতেন। রাজকুমার সেলিম (পরে জাহাঙ্গীর) আবুল ফজলকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন। অবশেষে সেলিমের ষড়্যন্ত্রে তিনি নিহত হন।

ফৈজী—ফৈজী আবুল ফজলের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। তিনি বিবিধ শাস্ত্রে গভীর পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার পাঠাগারে প্রায় সার্দ্ধ চারি সহস্র হস্তলিখিত পুঁথি সংগৃহীত ছিল। তিনি কাব্যরচনায় সুদক্ষ ছিলেন। আকবর শাহ তাঁহার কবিতার ভাবে ও ভাষার মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইতেন।

সেখ মবারক—ইনি আবুলফজল ও ফৈজীর পিতা। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ আরবের অধিবাসী ছিলেন। মবারকের পিতা অর্থোপার্জ্জন উদ্দেশ্যে জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া আগ্রায় বাসস্থান নির্দ্দেশ করেন। তিনি ইস্‌লাম শাস্ত্র-বিশারদ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ছিলেন; ইস্‌লাম শাস্ত্রের কোন অংশই তাঁহার নিকট অপরিজ্ঞাত ছিল না।

জাফরবেগ আসফ খাঁ—জাফরবেগ পারস্যের অধিবাসী ছিলেন। তিনি আকবরের দরবারে উপনীত হইয়া প্রথমতঃ তাঁহার প্রসন্ন দৃষ্টি লাভ করিতে সমর্থ হন নাই। এই কারণে তিনি নিরাশ হৃদয়ে রাজদরবার পরিত্যাগ পূর্ব্বক বঙ্গদেশে গমন করেন। এই স্থানে তাঁহার গুণরাজি প্রকটিত হয় এবং তিনি বাদশাহের অনুগ্রহভাজন হন। জাফরবেগ কিয়ৎকালের জন্য কাশ্মীরের সুবাদার এবং রাজকুমার প্রবেজের গৃহশিক্ষক ছিলেন। জাফর বেগ সাতিশয় প্রতিভাশালী ছিলেন। রাজস্ব ও হিসাব-নিকাশ সম্বন্ধীয় কার্য্যে তাঁহার অসাধারণ দক্ষতা পরিদৃষ্ট হইত। কোন হিসাব পত্রে একবার দৃষ্টিপাত করিলেই তিনি তাহার সমস্ত মর্ম্ম বুঝিতে পারিতেন। কাব্যমালার গ্রন্থনেও তাঁহার প্রতিভা স্ফূর্ত্তিলাভ করিত। তাঁহার কবিতাবলী মধুর বাক্যবিন্যাস ও মনোহর ভাবের সমাবেশে পাঠকবৃন্দের মনোরঞ্জন করিত। উদ্যানরচনা তাঁহার সাতিশয় প্রিয়কার্য্য ছিল, কখন কখন এক হস্তে কোদাল ধারণ করিয়া অপর হস্ত দ্বারা রাজকীয় কাগজপত্র লিখিতেন।

কাসিম-ই-কাহি—কাসিম-ই-কাহি আকবর শাহের একজন বিশিষ্ট পারিষদ এবং কবি ছিলেন।

আজম খাঁ কোকা—আজম খাঁ কোকা আকবর শাহের প্রধান সেনাপতি এবং আকবরের ধাত্রীপুত্র। আকবর এবং আজিম খাঁ এক সঙ্গে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। এই বাল্য-সুহৃদের প্রতি তাঁহার অপরিসীম অনুরাগ ছিল। আজম খাঁ আপন দুঃসাহসিকতা বশতঃ অনেক সময় আকবর শাহের মতবিরুদ্ধ কার্য্য করিতেন, কিন্তু বাদশাহ তৎসমুদয় অকুণ্ঠিতচিত্তে ক্ষমা করিতেন। তিনি বলিতেন, এক পার্শ্বে আমি অপর পার্শ্বে আজম খাঁ, মধ্যে দুগ্ধ-নদী—এই নদী উত্তীর্ণ হওয়া আমার পক্ষে সম্ভবপর নহে। আজম খাঁ বীরপুরুষ ছিলেন। তিনি বহু যুদ্ধে মোগলের জয়পতাকা উড্ডীন করিয়াছিলেন। তৌহিদ-ই-ইলাহি প্রবর্ত্তিত হইলে তিনি স্বধর্ম্মরক্ষার উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষ পরিত্যাগপূর্ব্বক মক্কা গমন করেন। এই পবিত্র তীর্থের মোল্লা মৌলবীবর্গ তাঁহার সমস্ত অর্থ শোষণ করিয়া লইয়াছিলেন। এই অবস্থায় তিনি অনন্যোপায় হইয়া পুনর্ব্বার ভারতবর্ষে প্রত্যাবৃত্ত এবং তৌহিদ-ই ইলাহি গ্রহণ করেন। আকবর শাহের দ্বিতীয় কুমার মুরাদ তাঁহার কন্যারত্নের পাণিপীড়ন করিয়াছিলেন। আজম শাহ কবিতা রচনা করিতেন; তাঁহার একটি কবিতার মর্ম্ম এইরূপ—'মনুষ্যের চারি বিবাহ করা কর্ত্তব্য; আলাপের জন্য পারসিক রমণী, গৃহকার্য্যের জন্য খোরসানী রমণী, সন্তানপালন জন্য হিন্দু রমণী, এবং এই তিন পত্নীকে সতর্ক রাখিবার অভিপ্রায়ে বেত্রাঘাত জন্য মারওয়ারাহারী রমণী আবশ্যক।'

মোল্লা শাহ মোহাম্মদ—মোল্লাশাহ মোহাম্মদ একজন ইতিহাস লেখক ছিলেন।

সুফি আহম্মদ—সুফি আহম্মদ মিসর দেশ হইতে আগমন করিয়াছিলেন।

কাদের জাহান—কাদের জাহান বাদশাহের আইন-বিষয়ক পরামর্শদাতা ছিলেন। তিনি দুই পুত্র সহ তৌহিদ-ই-ইলাহি ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

মীর শরিফ—মীর শরিফ আমুনের অধিবাসী ছিলেন। তিনি বঙ্গদেশে নবধর্ম্ম সম্বন্ধে আকবরশাহের প্রতিনিধিত্ব করিতেন।

সুলতান খাজে আব্দুল আজিম—আব্দুল আজিমের শাস্ত্রজ্ঞান সামান্য ছিল, কিন্তু তিনি দার্শনিক-ভা ম্ম ও ধাম্মিক ছিলেন। আকবর শাহ তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন। বাদশাহ তাঁহাকে এক হাজারী মনসব প্রদান করেন। রাজকুমার দানিয়ালের সহিত তদীয় কন্যার বিবাহ হইয়াছিল।

মিরজা জানি বেগ—জানি বেগ চিরখ্যাত চেঙ্গিস খাঁর বংশধর এবং ঠাটের অধিপতি ছিলেন। আকবর শাহ তাঁহাকে তিন হাজারী মনসব প্রদান করেন। জানি বেগ সুরাপান করিতেন। তিনি কাব্যপ্রিয় ছিলেন, নিজেও কবিতা রচনা করিতে পারিতেন।

তকি মোহাম্মদ—তকি মোহাম্মদ আকবরের আদেশে শাহনামা,গদ্যে পরিবর্ত্তিত করেন। বদায়ুনি লিখিয়াছেন যে, তিনি বিদ্বান্ ও কাব্যরসজ্ঞ ছিলেন।

সেখ জাদা গোসাল খাঁ—গোসাল খাঁ বারাণসী নগরীর অধিবাসী ছিলেন।

বীরবল।

বীরবল—বীরবল পরিহাসপটু এবং আকবরের সাতিশয় প্রিয়পাত্র ছিলেন। আকবর অনেক সময় তাঁহাকে দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত করিতেন।

শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত।

অনুনয়।

১

জগদীশ !

গড়িতে বাসনা যদি সে সব গড়িও—
আবার ভারতবর্ষ তেমনি করিও ;
পুনঃ নব সুপ্রভাতে,
কনক-কিরীট মাথে,
সমুজ্জ্বল দিবাকরে সে আলোক দিও ;
সেই শশী, গ্রহ, তারা,
সে যুগে জ্বলিত যারা
উদ্ভাসিয়া দশ দিক্—পুনঃ পাঠাইও,
তোমারি মঙ্গল-আলো ভারতে জ্বালিও।

২

গড়িতে বাসনা যদি তেমনি গড়িও—
সেই সব দেব-লীলা দেখিবারে দিও,
সেই রম্য হিমাচলে,
মৃত্যুঞ্জয়-নেত্রানলে,
ভস্মীভূত মনসিজ বিশ্বে দেখাইও।
* * * *

৩

গড়িতে বাসনা যদি সে সব গড়িও,
আবার ভারতবর্ষ তেমনি করিও,
আবার সে তপোবনে
বেদমন্ত্র উচ্চারণে,

কালজয়ী ত্রিকালেতে ঋষিগণ দিও ;
জ্বলিবে হোমাগ্নি-শিখা,
মরমে গায়ত্রী লিখা,
ধর্ম্ম, কর্ম্ম, পবিত্রতা, পুণ্য বিলাইও,
আবার ভারত তব নিষ্পাপ করিও।

৪

গড়িতে বাসনা যদি তেমনি গড়িও—
সেই অনুরক্ত ভক্ত প্রহ্লাদে সৃজিও ;
সেই বিশ্বজয়ী ভক্তি,
দেখাবে অজেয়া শক্তি—
মরণ চরণে লুটে, সে বীরত্ব দিও,
যার চিন্তা স্বতঃ শুভ,
পিতৃত্যক্ত শিশু ধ্রুব,
মহতী-তপস্যা রত—সে চিত্র আঁকিও,
আবার ভারতে তব সে সুদিন দিও।

৫

গড়িতে বাসনা যদি তেমনি গড়িও,
পাপে ক্ষয়, পুণ্যে জয়, পুনঃ শিখাইও ;
দুরাশা-লালসা তরে,
দিগ্বিজয়ী রক্ষ মরে,
চিত্তজয়ী রামচন্দ্রে চির জয় দিও,
লক্ষ্মণ ভরত কবে,
ভারতে উদিত হবে,
সে মহত্ত্ব, সে দেবত্ব নরে দেখাইও—
আবার ভারত তব সুবর্ণে গড়িও,

৬

দেখিতে বাসনা যাহা তাই দেখাইও—
জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম্ম-যোগে ভারত ভরিও ;
আবার দেখুক বিশ্ব,
সেই দেবব্রত ভীষ্ম,
ধার্ম্মিক বিদুর বীরে আবার আনিও;
ভীমার্জ্জুন যুধিষ্ঠির,
দ্রোণ কর্ণ আদি বীর,
তেজস্বিনী পাঞ্চালীরে আবার আনিও;
ভারতের হৃত-রত্ন পুনঃ আনি দিও।

৭

গড়িতে বাসনা যদি তেমনি গড়িও,
সতীর সতীত্বে দেশ মঙ্গলে মাখিও,
পুনঃ দেবী অরুন্ধতী
লভিবে বশিষ্ঠ পতি,
রাম-প্রাণা জানকীরে অনলে রক্ষিও ;
লভিয়া জন্মান্ধ পতি,
অন্ধত্ব করিবে সতী,
গান্ধারীর নেত্রপদ্ম বস্ত্রে আবরিও ;
ত্যজিয়া নশ্বর বিত্ত
চাহিবে মৈত্রেয়ী-চিত্ত,
অমর অমৃত নিধি—তুমি প্রদানিও ;
রাজ-সুখ ত্যজি ধনী,
হবে চির-সন্ন্যাসিনী,
বুদ্ধ-জায়া গোপারে সে মন্ত্রশক্তি দিও,
সাবিত্রী সতীত্বে তার পতি বাঁচাইও।

৮

গড়িতে বাসনা যদি তেমনি গড়িও—
ভারতের যত দৈন্য সব ঘুচাইও,
উজলিয়া রাজস্থান,
সেই সব মহাপ্রাণ,
সুকৃতী, সুকীর্ত্তি ভরা পুনঃ পাঠাইও।

* * *

আর দেব ! পুনরায়,
দীন হীন বাঙ্গালায়,
অপহৃত রত্নরাজি, খুঁজি আনি দিও।
অপার করুণা তব তুমি প্রকাশিও

৯

গড়িতে বাসনা যদি আবার গড়িও—
সঞ্জীবনী-মন্ত্রে দেশ পুনঃ বাঁচাইও ;
আবার ভারতবর্ষ,
লভি ও মঙ্গল স্পর্শ,
জাগুক নবীন প্রাণে, (তুমি জাগাইও)।
জ্ঞান, ধর্ম্ম, শক্তিদাত্রী,
জগদম্বা জগদ্ধাত্রী,
জগতের নিত্য পূজ্যা আবার করিও ;
আবার ভারতে আর্য্য,
করুক তোমারি কার্য্য,
তোমারি গঠিত রাজ্য তুমিই পালিও,
এই অনুনয় নাথ ! বারেক শুনিও।

বীরকুমার-বধ-রচয়িত্রী।

সেকেলে কথা।

লব কুশের একদিনেই বিয়ে।

বড় মার দুটি ছেলে যমজ, নাম লব কুশ। এদের এক দিনেই বিয়ে হ'লে ভাল হয়। নবগোপালের ইল্‌ছোবা মোল্লাইয়ে যেদিন বিবাহ হইল সে দিন কিন্তু কুশগোপালের শ্যামনগরে বিবাহ ঠিকঠাক হইলেও বিবাহে বাধা পড়িল। আমাদের মামার বাড়ী শ্যামনগর। মা কুশগোপালকে শ্যামনগরে গায়ে হলুদ দিতে নিয়ে গেছেন। গায়ে হলুদের দিন তার নাসাজ্বর হইল। এদিকে বাবা লিখ্‌লেন, ছেলেদের বিয়ে দিয়ে শীঘ্র নিয়ে এস ; কিন্তু জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, এ তিনে কি কার হাত আছে ?

ছেলের বিয়ে শীঘ্র দিলে ছেলে খারাপ হ'তে পারে না।

তখনকার লোকের ধারণা ছিল, ছেলেদের শীঘ্র শীঘ্র বিবাহ দিলে ছেলেরা কখনও খারাপ হইতে পারে না। সেজন্য তখন ছেলে খারাপ হওয়ার কথা খুব বেশী শোনা যেত না। এখন সাহেবদের সঙ্গে নাকি ছেলেরা মিশে তাদের চাল চলন ধরণ ধারণ এমন কি তাদের খানা তাদের খেলা সকলই অনুকরণ ক'রে বাপ মাকে অমান্য কর্ত্তে শেখে। এ সকল রোগ আইবুড়া ছেলেদের বেশী ধরে।

লাউ মাচা ভেঙ্গে বরের আশীর্ব্বাদ।

যে দিন কুশগোপালের আশীর্ব্বাদ কত্তে আস্‌বার কথা সেদিন আমাদের উঠানের লাউ মাচা ভেঙ্গে ফেলে, বরের আশীর্ব্বাদের জন্য পাড়ার পাঁচজন বস্‌বার জায়গা কল্লেন। তখন সকলে সত্য সত্যই বরকে প্রাণ খুলে আশীর্ব্বাদ কত্তেন এখন আশীর্ব্বাদের সময় বরযাত্র—খাওয়ানের ধূম হ'তে দেখা যায়।

কনের আশীর্ব্বাদ তখন ছিল না।

তখন কনেকে আশীর্ব্বাদ করার নিয়ম ছিল না। মা একদিন গিয়ে একখানা বাজু মেয়েকে পরিয়ে দিয়ে এসে মেয়ের পাকা দেখা ঠিক করে রেখে এলেন। কনের বাপের নাম পার্ব্বতী মুখুয্যে। তিনিই এসে আশীর্ব্বাদ ক'রে বিয়ে পাকা পাকি ঠিক ক'রে গেলেন। বিবাহের আর ভাল দিন ছিল না ব'লে তিনি আমাদের সঙ্গে মেয়ে নিয়ে গিয়ে পশ্চিমে বিয়ে দিতে সম্মত হলেন।

কনে নিয়ে গিয়ে বিয়ে দেওয়া।

কনে নিয়ে গিয়ে বিয়ে দেওয়া তখনকার কালে অনেক দেখা যেত। এখন সেকাল গিয়েছে। মেয়ের খাতির সত্যি সত্যি যে জাত করে, সে জাতের মেয়ের ঘরে বিয়ে কর্ত্তে বর

আসে। যাদের গির্জ্জায় বিয়ে হয় তারা মেয়ে ছেলে সমান দেখে। আমাদের নৌকাতেই মেয়ে নিয়ে মেয়ের বাপ মা চল্লো।

আমার বর আনা।

দাদা এদিকে থানাকুল কৃষ্ণনগর থেকে আমার বর আনতে গেলেন। বর আস্‌তে চাইবে কেন? তাঁর সংসার অচল। মাসে ৫৲ টাকা দিবার পাকা বন্দোবস্ত করে তবে তাঁকে রাজি করা হ'ল। কথা হল তাঁর বাপ তাঁর সঙ্গে একজন লোক পাঠাবেন, তাঁর হাতে নগদ ৫৲ টাকা আগাম দিতে হবে, তবে আমার দাদা আমার বরকে নৌকায় চড়াতে পার্‌বে।

ভুজং ভাজাং দিয়ে রাজি করা।

আমাদের হাতেও বেশী পয়সা ছিল না। দাদার জিদ্‌ আমার বরকে নিয়ে আসতেই হবে। যে লোক সঙ্গে এসেছিল দাদা তার হাতে আমার বরের সম্মুখে ৫৲ টাকা গুণে দিয়ে আমার বরকে নৌকায় চড়ালেন। বর খুসি হয়ে নৌকায় চড়্‌লেন; ও দিকে বিশু কাকা সে লোকের কাছ থেকে ৫৲ টাকা ভুজং ভাজাং দিয়ে ফিরিয়ে নিলেন। বর এদিকে খুসী হয়ে যাচ্চেন। টাকা পেলে কে না খুসী হয়?

কালীর ব্যারাম—কাল বৈশাখীতে রওনা।

কাল বৈশাখীতে নৌকায় চড়ে আমরা যাত্রা কল্লুম। কালীর ব্যারাম হয়ে ছিল, ব্যারাম নিয়েই রওনা হলুম। পরামর্শ হ'ল কবিরাজকে মুর্শিদাবাদ পর্য্যন্ত সঙ্গে নিয়ে যাব। কত দুঃখের কালী। মা আমার কত দেবতার কাছে মাথা খুঁড়ে তবে কালীকে পেয়েছেন। মুর্শিদাবাদে কবিরাজের কে আত্মীয় আছে। কবিরাজও সেখানে যেতে চাইলেন। রথ দেখা কলা বেচা দুইই হলে সকলেই খুসী হয়।

কবিরাজ থলে করে ঔষধ নিয়ে গেলেন।

কবিরাজ মশাই তাঁর সব ঔষধের বড়ি ও অনুপানের গাছ-গাছড়া থলে করে নিয়ে চল্লেন। তিনি ভরসা দিয়ে বল্লেন ভয় নাই। দিন দেখে নৌকা ছাড়া হল। মগ্‌রায় নৌকা লাগল, কৈমাছ কেনা হল। কৈমাছ জিইয়ে রাখা হ'ল। রোজ মাছের ঝোল ভাত নদীর চড়ায় রাঁধা হবে। মগ্‌রার সেখানে শ্বশুরবাড়ী।

দাদা বেঁকে দাঁড়াল।

দাদা তখন বউ নিয়ে যেতে চাইলেন। বায়না ধরে বেঁকে দাঁড়ালেন। বৌয়ের বয়স তখন ১১।১২ বৎসর, বেচারী জ্বরে ধুঁক্‌ছে। দম রাখতে পারে না। বৌয়ের তিন মামা। এক মামা বল্লে জামাই চাইনে। বড় মামা বল্লে, যখন জামাই অত জিদ্‌ কচ্চে, তখন মেয়ে না বাঁচে জলে ভাসিয়ে দিয়ে চলে যাবে; আমরা ত দান করেছি, আট্‌কে রাখতে পারি না। খন্নেন থেকে পিসি এসে মেয়েকে ভুলাতে লাগ্‌লেন। ডুলি করে যেন তাকে দেখিয়ে নিয়ে যাবে, এই বলে তাকে নিয়ে এসে নৌকায় চড়িয়ে জোর করে নিয়ে যাওয়া হল। রুক্মিণীহরণের মত হল না কি?

বৌ কাঁদে আমরা ভুলাই।

বৌ কেঁদে খুন। আমরা ভুলাতে লাগলুম। ঐ দেখ কেমন চাঁদ উঠেছে। কেমন হাওয়া দিচ্চে। ঐ একটা মাছ ঘাই দিচ্চে। কুমীর চলে গেল। শুশুক ভাস্‌ছে। এই সব কত কথা বলে তাকে ভুলাই। কৈমাছের ঝোল ভাত রোজ হয়। দরমা দিয়ে ঘেরা তিনচারখানি ঘরের মত, নৌকার তলায় মাঝিরা তক্তা খুলে জল সেঁচছে। বউ দিন দিন খুসী হতে লাগল। তার চেহারা ফিরে গেল।

গলায় কাপড় বেঁধে বাবার ঠাকুর নিয়ে যাত্রা।

দাদা আমাদের ঘরের ঠাকুর বাবার শালগ্রাম শিলা গলায় বাঁধিয়া নৌকায় উঠিলেন। খন্নেন হইতে যেন বাস উঠিল। আমাদের ঘরের ঠাকুর জাগ্রত, সকল অভীষ্ট পূর্ণ করেন। রাত্রে ঠাকুরের মশারি ফেলিতে ভুলে গেলে আমার মা পরদিন কেঁদে অনর্থ করতেন।

বাবাকে স্বপ্ন হয়েছিল।

বাবাকে স্বপ্ন হয়েছিল। ঠাকুর স্বপ্নে বলেছিলেন 'আমাকে নিয়ে যা। নইলে আমার এখানে কষ্ট হ'বে।' বাবা তাই সেখান থেকে ঠাকুর নিয়ে যেতে চিঠি লিখেছিলেন। এখনকার লোকে জেগে ঘুমায় তখনকার লোক ঘুমিয়ে জাগত। তাই সে সময়ে স্বপ্নে অনেকে আশ্চর্য্য খবর, দুরারোগ্য রোগের স্বপ্নাদ্য ঔষধ বাহির করিয়া লোকের সত্য সত্যই উপকার করতেন।

রথ দেখা কলা বেচা।

নৌকা মুর্শিদাবাদে পৌছিলে আমার "তিনি" আমার দাদার নিকট এক দিনের কড়ার করাইয়া সেখানে আর এক স্ত্রীর বাপের বাড়ী কিছু আদায়ের চেষ্টায় গমন করিলেন, এবং একদিন পরেই ফিরে নৌকায় এলেন। তাঁহার বিশ্বাস যে আমরা মাস মাস তাঁহার সংসারের খরচ যোগাইব। ধন্য আশা। আমরা 'তিনি' বলি কেন জান? তিনি ভগবানকে বলা হয়। আমাদের স্বামী ভগবান, সর্ব্বস্ব।

মা কালী, ঝড় থাম্‌লে পাঁটাবলি।

কাল্‌নার কাছে এসে নৌকার মাঝি নঙ্গর করিল। বড় ঝড়। যারা আমায় নিতে এসেছিল তাদের বড় ভয় হ'ল। সে সময় নৌকাডুবির কথা প্রায় শুনা যেত। তখন জলে ডুবে মরাই বিপদের মধ্যে ছিল। বড় দুঃখ হলে তখনকার মেয়েরা গলায় কল্‌সি বেঁধে ডুবে মর্‌ত। এখন ক্রমে ক্রমে নেশার প্রাদুর্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে মেয়েরাও মনের দুঃখে নেশার জিনিষ আফিং খেয়ে মরে। আর একটা নৌকা ঝড়ে বান্‌চাল্ হয়ে এসে যখন আমাদের নৌকাতে ধাক্কা লাগ্‌তে লাগ্‌তে বেঁচে গেল, তখন সকলে মিলে মা কালী ঝড় থাম্‌লে পাঁটাবলি দেব বল্লে। পরদিন ঝড় থেমে গেলে কাল্‌নার মা কালীর কাছে ঘাটেই পাঁটা বলি দেওয়া হইল।

বামুন পণ্ডিতের ঘোড়ায় চড়া।

আমার "তিনি" ও দাদা বিন্ধ্যাচলে এসে দুটি ঘোড়ায় দুজনে চড়লেন, এ ঘোড়া আমার পিতা ঠাকুর পাঠিয়েছিলেন। দাদা এক ঘোড়ায়, তিনি এক ঘোড়ায়। বামুন পণ্ডিত মানুষ কাপড় চাদর প'রে ঘোড়ায় চড়ে যখন যেতে লাগলেন, লোকে পথে বল্‌তে লাগল, কোন পুরুষে এরা ঘোড়ায় চড়েনি। তখনকার সময়ে বামুন পণ্ডিতের ঘোড়ায় চড়া চলিত ছিল না।

আমার তিনি তন্ত্রধার।

আমাদের বাড়ী দুর্গোৎসব। তখন সস্তাগণ্ডা ছিল। অল্প টাকায় দুর্গোৎসব হ'ত। তবে এখনকার মত নয়। কেউ অভুক্ত অবস্থায় মহামায়ার বাড়ী এসে থাক্‌তে পেত না। তখন এই মহামায়ার বাড়ীতে হাড়ি ডোম চণ্ডাল সকল দলের লোকের বৈঠক বসিত। এই কয় দিন সমাজের অন্ত্যজ জাতিও সম্মান পাইতে বঞ্চিত থাকিত না। আমাদের বাড়ী দুর্গোৎসব হবে। আমার "তিনি" ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত। সেইজন্য তাঁকেই তন্ত্রধার হতে হল। তাঁর বড় আনন্দ হ'ল।

ভুষার দরে আটা।

তখন সব সস্তা গণ্ডা ছিল। চাষার ঘরে এক আঁজলা চাল চাইলে সহজে পাওয়া যেত, কিন্তু একটি পয়সা মাথা কুটলেও পাওয়া যেত না। তখন খাবারওয়ালারা সন্দেশ রসগোল্লা লইয়া বাঙ্গলার চাষাদের বাড়ী সহর থেকে ফেরি করিয়া বস্তা বস্তা চাল ডাল লইয়া বাড়ী ফিরিত। তখন ভুষার দরে গম বিকাইত; সুতরাং ২০।২৫ টাকায় দুর্গোৎসব হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

ছেলেদের পরচুল প'রে যাত্রা।

তখনকার পুজার সময় ছেলেরা পরচুল পরিয়া যাত্রা করিত। এখনকার মত থিয়েটারের প্রকাণ্ড খরচ তখন ছিল না। তখনকার ছেলেরা বুড়া সং সাজিয়া, গাঁয়ের লোককে হাসাইত। কাহার কোন গলদ থাকিলে সেটি সকলের সম্মুখে সংএর কথায় রসান দিয়া বলিয়া আক্কেল দিত। সমাজের একটা শক্তি পুলিসের পাহারার চেয়ে লোকদের প্রত্যেক বদচালে বাধা দিত। তখনকার যাত্রায় এখনকার যাত্রায় অনেক তফাৎ।

বাবা ভিক্ষের ধন, আমার বড় কষ্ট।

আমার বর জানেন, মাস মাস ৫৲ তাঁহার বাড়ী পাঠান হয়; তাই ভেবে তিনি নিশ্চিন্ত আছেন। এদিকে শ্বশুর মশাই পত্র লিখ্‌লেন, "বাবা ভিক্ষের ধন, তুমি সেখানে সুখে আছ, এখানে আমার বড় দুঃখ, হাঁড়ী চড়ে না।" স[illegible] ফাঁকি জান্‌তে পেরে বড় দুঃখে তাঁর চোখে জল এ[illegible] এবার সত্যি সত্যি আমার শ্বশুরবাড়ী ৫৲ টাকা পাঠা[illegible] হ'ল। তখন ৫৲ টাকায় একটা সংসার এক রকম চ[illegible] যেত।

পায়ে হেঁটে দেশে যাওয়া।

আমার বরের একটি ১২ টাকা মাহিনায় ছুমাসের ঠিকা চাকরী হ'ল, তাঁকে বলা হ'ল কাজ ক'রে তিনি তাঁর বাপকে টাকা পাঠালে দুঃখ ঘুচ্‌বে। ছমাস পরে দুর্গাপূজার সময় পুরোহিত এসেছিলেন। আমার বর তাঁর সঙ্গে কাশী পর্য্যন্ত গেলেন। তার পরে পায়ে হেঁটে দেশে চলে গেলেন। তখন রেলগাড়ী ছিল না বলেই লোকের পায়ের জোর ছিল। পায়ের জোর নাই বলিয়া পা-গাড়ী চড়ে।

ফন্দি করে জামাই আনা।

বাবা ফন্দি করে আমার বরের মত অন্য জামাইদেরও দেখে নিয়েছিলেন। পয়সার জোরে কি না হয়! বাবার ২৫৲ থেকে ৪০৲ মাহিনা হ'ল। দাদার ২০৲ টাকা মাহিনা হ'ল। এই সময়ে আমার ছোট ভাই তারিণীর জন্ম হ'ল। ছোট ছেলেই বাপ মার আদরের হয়।

এদের দোরে হাতি বাঁধা থাক্‌বে।

বাবা দুঃখ কত্তেন, মেয়েদের পেটে যদি ছেলে পিলে হয়, তবে এদের দোরে হাতি বাঁধা থাক্‌বে। বাবার ১০০৲ টাকা মাহিনা হ'ল। বাবাকে বড়সাহেব ভালবাসতেন। দেশে একটা ২০৲ মাহিনার পুলিসের চাকুরী খালি হল, দাদা দেবীচরণ একলা দেশে চলে এলেন, কুশ গোপাল দাদার কাজে লেগে গেল, শেষে তারও সেই কাজে ক্রমে ক্রমে ১০০৲ মাহিনা হয়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনিস্তারিণী দেবী।

জঁহানারা ও রোশনারা

সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমবাবু তাঁহার 'রাজসিংহে' লিখিয়াছেন:—

"ভারতবর্ষীয় মহিলারা রাজ্যশাসনে সুদক্ষ বলিয়া বিখ্যাত। পশ্চিমে কদাচিৎ একটা জেনোবিয়া, ইসাবেলা, এলিজ্যাবেথ বা কাথারাইন পাওয়া যায়; কিন্তু ভারতবর্ষের অনেক কুলজারাই রাজ্যশাসনে সুদক্ষ। মোগলসম্রাট্‌দিগের কন্যাগণ এ বিষয়ে বড় বিখ্যাত।"

বর্ত্তমান প্রবন্ধে মোগল-সম্রাট্-শাহ্‌জহান-দুহিতা জঁহানারা ও রোশনারার আলোচনায় সম্রাটের শাসনকালে তাঁহারা কিরূপভাবে সাম্রাজ্য-পরিচালন ব্যাপারে এবং রাজনৈতিক আন্দোলনে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, আমরা তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিব।

শাহ্‌জহানের চারি পুত্র—দারা, সুজা, ঔরঙ্গজেব ও মুরাদ এবং তিন কন্যা—জঁহানারা, রোশনারা ও গহ্‌রারা।

জ্যেষ্ঠা কন্যা জঁহানারা ১০২৩ হিজরা বা ১৬১৪ খৃঃ-অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 'বেগম সাহেব' বা 'পাদশা বেগম' নামে অভিহিতা হইতেন। জঁহানারা অশেষ-গুণসম্পন্না, রূপবতী ও সুগায়িকা ছিলেন। মাতা মমতাজের মৃত্যুর পর হইতেই তিনি পিতার সংসারের সমস্ত ভার গ্রহণ করেন। পিতার সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল, এমন কি তাঁহার আহার্য্য পর্য্যন্ত তিনি স্বহস্তে প্রস্তুত করিতেন। তিনি স্বেচ্ছায় সকল সুখে জলাঞ্জলি দিয়া পিতার জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত একান্তভাবে

জঁহানারা।

তাঁহার সেবাশুশ্রূষায় নিরত ছিলেন। তাঁহার অতুলনীয় পিতৃভক্তি জগদ্বিখ্যাত; কিন্তু দুঃখের বিষয়, তৎকালীন কেহ কেহ তাঁহার এই পিতৃ-অনুরাগকে পবিত্রভাবে গ্রহণ করেন নাই। † সম্রাট্-কন্যাগণ আপনাদের বংশ-মর্য্যাদানুরূপ পাত্রের অভাবে সাধারণতঃ বিবাহ হইতে বিরত থাকিতেন; এ ক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিয়াছিল। কথিত আছে, ঔরঙ্গজেবের মাতুল সায়েস্তা খাঁ, নজর খাঁ নামক একজন সুন্দর পারস্য যুবকের সহিত জঁহানারার বিবাহ দিবার জন্য সম্রাটের নিকট প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কিন্তু শাহ্‌জহান তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই। জঁহানারা কিন্তু যৌবনের উদ্দামগতি রোধ করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না; তথাপি তাঁহার চরিত্র যে বহুসদ্‌গুণের আধার ছিল, একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

জঁহানারা সর্ব্ববিষয়ে ছায়ার ন্যায় পিতার অনুবর্ত্তিনী ছিলেন। সুখে দুঃখে সকল সময়েই তিনি মূর্ত্তিমতী করুণা ও সান্ত্বনারূপে পিতৃপরিচর্য্যা করিতেন। পিতাও তাঁহাকে বড় ভালবাসিতেন। পিতার উপর তাঁহার যথেষ্ট প্রভাব পরিলক্ষিত হইত। এই কারণে সর্ব্বপ্রথমে তাঁহাকে উপঢৌকন ও নজরাদি দ্বারা পরিতুষ্ট না করিলে সম্রাটের নিকট কাহারও প্রার্থনা পূর্ণ হইত না; (১) কাজেই জঁহানারা বহু ধনরত্নের অধিকারিণী হইয়াছিলেন। তিনি দারা অপেক্ষা বয়সে বড় ছিলেন। দারা তাঁহার বিশেষ স্নেহের পাত্র ছিলেন বলিয়া, তিনি তাঁহাকে অনেক বিষয়ে সাহায্য করিয়াছিলেন। জঁহানারা দারা কর্ত্তৃক সফিনৎ-উল-অউলিয়া মতানুসারে 'কিষ্‌তি' ধর্ম্মমতে দীক্ষিত হ'ন। ১৬৪৮ খৃঃ অব্দে জঁহানারা ৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে আগ্রাদুর্গের সন্নিকটে একটি সুবৃহৎ মসজিদ নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। (২) দিল্লীতে বেগমসরাই (কারাভানসরাই) নামে যে সরাই ছিল, তাহাও জঁহানারা কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

১৬৪৪ খৃঃ অব্দের মার্চ্চ মাসে জঁহানারা অগ্নিদাহে মৃতপ্রায় হইয়াছিলেন। একদিন রাত্রে তিনি পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া দ্রুতপদে তাঁহার কক্ষে ফিরিতেছিলেন, এমন সময় অন্তঃপুর-ভিত্তিগাত্রসংলগ্ন একটি দীপশিখা-সংস্পর্শে তাঁহার পরিধেয় বস্ত্র জ্বলিয়া উঠে। জঁহানারা সাহায্যের জন্য কাহাকেও না ডাকিয়া, তাড়াতাড়ি অর্দ্ধদগ্ধ অবস্থায় আপনার মহলে প্রবেশ করেন। এই ঘটনায় তাঁহার জীবনের কোনই আশা ছিল না। পরে আগ্রার ডাক্তার বাউটন্ (Boughton) সাহেবের যত্ন ও সুচিকিৎসায় জঁহানারা সে যাত্রা রক্ষা পাইয়াছিলেন। (৩)

† Bernior—Constable. P. 11; কিন্তু মেনুষী এ কথায় বিশ্বাস স্থাপন করেন নাই। (History of the Mogul Dynasty —Manouchi thro: Catrou—P. 198.)

(১) একজন আমীর সিন্ধুদেশস্থ তাত্তা প্রদেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়া প্রজাদের প্রতি অত্যন্ত অত্যাচার করেন। সম্রাট্ তাঁহার এইরূপ আচরণে ও প্রজার আর্ত্তনাদে প্রথমে কর্ণপাত করেন নাই। চারি বৎসর পরে তিনি আমীরকে ডাকিয়া পাঠান। আমীর আগ্রায় পৌঁছিবার পূর্ব্বে গোপনে সম্রাট্ শাহ্‌জহানকে ৫০ হাজার ও জঁহানারাকে ২০ হাজার স্বর্ণমুদ্রা উপহার দিয়াছিলেন। আমীর আগরায় পৌঁছিলে বাদশাহ তাঁহাকে এলাহাবাদের শাসনকর্ত্তার পদে উন্নীত করেন। Tavernier's Travels—Ball. Vol. I; P 17.

(২) Beale's Oriental Biography P. 127.

(৩) Hedges' Diary—Vol. III—p. 182 & 185; See also Dow's History of Hindustan—Vol. III—p. 179.

মধ্যমা কন্যা রোশনারা ১৬১৮ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অত্যন্ত বিলাসপরায়ণা ছিলেন। সৌন্দর্য্য-সম্পদে জঁহানারার সমতুল্য না হইলেও বুদ্ধি-প্রাখর্য্য ও চতুরতায় তিনি তাঁহাকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। পিতার সংসারের সহিত তাঁহার বিশেষ কোন সম্বন্ধ ছিল না। বৃদ্ধ পিতার সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া, তিনি অধিকাংশ সময়ই ভ্রাতা ঔরঙ্গজেবের কল্যাণ-কামনায় অবহিত থাকিতেন। (৪) দারার সহিত জঁহানারার স্বভাব ও মনের যেরূপ সর্ব্ববিষয়ে মিল ছিল, রোশনারার সহিতও ঔরঙ্গজেবের সেইরূপ মতের ঐক্য ছিল। রোশনারা তাঁহার নিয়োজিত চরের সাহায্যে রাজ্যের যাবতীয় প্রয়োজনীয় ও গোপনীয় সংবাদ রাখিতেন এবং ঔরঙ্গজেবকে সহায়তা করিবার জন্য সেই সমস্ত তাঁহাকে জানাইতেন। উত্তরকালে ঔরঙ্গজেবের সিংহাসনলাভে তাঁহার যথেষ্ট চেষ্টা, সাহায্য ও সহানুভূতি পরিলক্ষিত হয়। যে সময়ে ঔরঙ্গজেব ভ্রাতৃগণের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন, সেই সময়ে রোশনারা যুদ্ধ চালাইবার জন্য বহু স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা তাঁহাকে পাঠাইয়াছিলেন। যৌবনে তিনিও যে পদস্খলিতা হ'ন নাই, একথা মুক্তকণ্ঠে বলা যায় না।

রোশনারা।

পুত্রগণ বিদ্রোহী হইবার কিছুদিন পূর্ব্ব হইতেই সম্রাট্ শাহ্জহান তাহাদের মানসিক অবস্থা উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন, পুত্রগণের মধ্যে সদ্ভাব নাই—ময়ূরসিংহাসনের প্রতি সকলেরই লোলুপদৃষ্টি। এ অবস্থায় তাহাদের মধ্যে বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হইবার উপক্রম হইতেছে দেখিয়া, তিনি দারাকে কাবুল ও মুলতানের, সুজাকে বাঙ্গলার, ঔরঙ্গজেবকে দাক্ষিণাত্যের এবং মুরাদকে গুজরাটের শাসনকর্ত্তা রূপে পাঠাইয়া দিলেন। কিছুদিন পরে ১৬৫৮ খৃঃ অব্দে তিনি অসুস্থ হইয়া পড়ায় প্রিয়পুত্র দারাকে আপনার নিকট আনিয়া রাজকার্য্য চালাইতে লাগিলেন। সম্রাটের এই পীড়ার সংবাদ চারিদিকে প্রচারিত হইবামাত্র শাহ্জাদারা সিংহাসন লাভের আশায় আগরার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

সম্রাট্ শাহ্জহান পুত্রগণের যুদ্ধাভিযানের কথা শুনিয়া মর্ম্মাহত হইয়া প্রিয়পুত্র দারাকে সুজা ও ঔরঙ্গজেবের গতিরোধ করিতে আদেশ করিলেন। সুজা এলাহাবাদের নিকট দারার সৈন্যগণ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া বাঙ্গলা অভিমুখে পলায়ন করিলেন। এদিকে ঔরঙ্গজেব মুরাদকে হস্তগত করিয়া মীরজুম্লার সহিত দাক্ষিণাত্য হইতে সসৈন্যে আগরার দিকে অগ্রসর হইলে, দারা যশোবন্ত সিংহকে তাঁহাদের গতিরোধের নিমিত্ত পাঠাইলেন। নর্ম্মদাতীরে ভীষণ যুদ্ধে ঔরঙ্গজেব জয়লাভ করিলেন। তখন দারা তাঁহাদের সম্মিলিত-সৈন্যের সম্মুখীন হইলেন; কিন্তু ভাগ্য-বিপর্য্যয়ে আগরার নিকট শ্যামনগর বা ফতেয়াবাদের যুদ্ধে তাঁহার পরাজয় হইল। যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তিনি লজ্জায় পিতার সহিত আর সাক্ষাৎ করিতে পারিলেন না। জঁহানারার সহিত সাক্ষাতে, দারা সম্রাট্-প্রেরিত বহু অর্থ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দারা দিল্লীতে উপস্থিত হইয়া সৈন্য-সংগ্রহে ব্যাপৃত রহিলেন।

---

(৪) গোলকুণ্ডা দুর্গ অবরোধের পর, দারা ও জঁহানারাকে প্রতারিত করিবার জন্য রোশনারা, মীরজুম্লাকে সম্রাট্ শাহজহানের নিকট প্রেরণ করিতে, ঔরঙ্গজেবকে পরামর্শ দেন। (Sleeman—p. 267) এই কারণে মীরজুম্লা কোহিনুর মণি ও নানা রত্ন উপঢৌকন লইয়া শাহজহানের নিকট সপরিবারে উপস্থিত হইলেন। সম্রাট্ এই কোহিনুর মণি পাইয়া বিশেষ সন্তোষ লাভ করিয়াছিলেন। জুম্লাও সুযোগ দেখিয়া তাঁহাকে বুঝাইলেন, যদি সম্রাট্ তাঁহাকে একদল সৈন্য সাহায্য করেন, তাহা হইলে তিনি গোলকুণ্ডা হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত জয় করিয়া বহু মণিমাণিক্য আনয়ন করিতে পারেন। শাহজহান তাঁহার প্রার্থনামত সৈন্য দিতে স্বীকৃত হইলেন; কিন্তু জঁহানারা ও দারা ইহাতে অসন্তুষ্ট হইলেন। তাঁহারা দেখিলেন, এই সমস্ত সৈন্য ভবিষ্যতে ঔরঙ্গজেবের বলবৃদ্ধি করিবে; এই কারণে তাঁহারা উভয়ে সম্রাট্কে সৈন্য-সাহায্য করিতে বাধা দিলেন। অবশেষে সম্রাট্, জঁহানারা ও দারার সন্তোষ বিধানের জন্য স্থির করিয়া দিলেন যে, জুম্লা বিশ্বাসের জন্য তাঁহার পরিবারবর্গকে সম্রাট্-সকাশে রাখিয়া যাইলে তিনি তাঁহাকে সৈন্য প্রদান করিতে পারেন। শেষে জুম্লা ইহাতেই স্বীকৃত হইয়াছিলেন।

বিজয়ী ঔরঙ্গজেব ও মুরাদ আগরা প্রাসাদের ১ ক্রোশ দূরে শিবির সন্নিবেশ করিলেন। বৃদ্ধ শাহ্‌জহান পুত্রদ্বয়কে কৌশলে বন্দী করিবার অভিপ্রায়ে মহলে কতকগুলি বলশালিনী তাতার-রমণী রাখিয়া দেন এবং জঁহানারাকে শাহ্‌জাদাদিগের শিবিরে পাঠাইয়া দিয়া, সম্রাট্‌ তাহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিয়াছেন,বলিয়া পাঠান; কিন্তু ঔরঙ্গজেব, ভগিনী রোশনারার সহায়তায় সম্রাটের দুরভিসন্ধির কথা পূর্ব্বেই অবগত হইয়া পিতার সহিত আর সাক্ষাৎ করেন নাই।

দারার পরাজয়ে সম্রাট্‌ শাহ্‌জহান স্বয়ং সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া বিদ্রোহী পুত্রদ্বয়কে সমুচিত শাস্তি দিবেন, অথবা তাহাদিগকে কৌশলে বন্দী করিবেন, স্থির করিয়াছিলেন। ঔরঙ্গজেব এই সংবাদ শুনিয়া বড়ই বিচলিত হইলেন। এদিকে জঁহানারা কার্য্যসিদ্ধির জন্য ঔরঙ্গজেবকে পত্র দ্বারা জানাইলেন যে, তিনি যেন পিতার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। অতঃপর জঁহানারা স্বয়ং মুরাদের শিবিরে উপস্থিত হইলেন। মুরাদ দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া তাঁহার প্রতি অসম্মানসূচক বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন। অপমানিতা হইয়া জঁহানারা যখন আগরায় ফিরিতেছিলেন, সেই সময়ে ঔরঙ্গজেব নগ্নপদে ছুটিয়া আসিয়া দক্ষিণহস্তে পাল্‌কী ধরিয়া তাঁহাকে আপনার শিবিরে ক্ষণকালের জন্য যাইতে অনুরোধ করেন। জঁহানারা সৈন্যগণের সমক্ষে ঔরঙ্গজেবকে তাঁহার প্রতি এরূপ সম্মান প্রদর্শন করিতে দেখিয়া অত্যন্ত প্রীত হইয়াছিলেন। তিনি শিবিরে উপনীত হইলে, ঔরঙ্গজেব তাঁহাকে বুঝাইলেন,—তিনি আপনার কৃতকর্ম্মের জন্য অনুতপ্ত হইয়াছেন এবং শীঘ্রই পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিবেন। জঁহানারা ঔরঙ্গজেবকে তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইতে দেখিয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছিলেন। তিনি সম্রাটের সহিত সাক্ষাতের দিন নির্দ্ধারিত করিয়া পিতার নিকট ফিরিয়া গেলেন।

দিনের পর দিন গেল—ঔরঙ্গজেব আর পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না। এদিকে সম্রাট্‌, পুত্রের অপেক্ষায় পূর্ব্বের সঙ্কল্পমত যুদ্ধক্ষেত্রেও অবতীর্ণ হইতে পারিলেন না। অবশেষে হঠাৎ একদিন চতুর ঔরঙ্গজেব পুত্র মহম্মদকে পাঠাইয়া পিতাকে কৌশলে বন্দী করিলেন। জঁহানারা বৃদ্ধ পিতার সহিত দুর্গে অবস্থান করিতে লাগিলেন। দারার দিল্লী পলায়নের সময় সম্রাট্‌ তাঁহাকে যে অর্থসাহায্য করিয়াছিলেন, তাহা ঔরঙ্গজেব, ভগিনী রোশনারার সহায়তায় অবগত হইয়া পিতাকে ভর্ৎসনাসূচক একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন।

দারাকে পরাভূত করিবার জন্য ঔরঙ্গজেব ও মুরাদ তাঁহার বিরুদ্ধে দিল্লী অভিমুখে ধাবিত হইলেন। পথিমধ্যে ঔরঙ্গজেব পানাসক্ত মুরাদকে বন্দী করিয়া, স্বয়ং দিল্লীর সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। এই ঘটনার কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি পিতার নিকট মূল্যবান্‌ মণিমাণিক্য চাহিয়া পাঠান। বৃদ্ধ শাহ্‌জহান পুত্রের এই মর্ম্মদাহী আচরণে বুঝিতে পারিলেন, বিদ্রোহী ঔরঙ্গজেব দিল্লীর তক্তে উপবেশন করিবে, তখন কএকদিন যাবৎ তিনি উন্মত্তের ন্যায় সমস্ত মণিমাণিক্য ধূলিচূর্ণ করিবার জন্য কন্যার নিকট লৌহমুদ্গর চাহিয়াছিলেন। এই সময়ে জঁহানারা পিতাকে বহুকষ্টে সান্ত্বনা করিয়া রত্নগুলি আপনার নিকট রাখিবার অধিকার প্রার্থনা করেন।

ইহার কএক দিবস পরেই ঔরঙ্গজেব দারার পশ্চাদ্ধাবনার্থ মুলতান পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন; কিন্তু তথায় সুজার দ্বিতীয় অভিযানের কথা শুনিয়া তিনি আগ্রায় ফিরিলেন।

সুজা বাঙ্গলার নানা স্থানে যুদ্ধে পরাজিত হইয়া অবশেষে আরাকানে পলায়ন করেন; তথায় আরাকান-রাজের কোপানলে পতিত হইয়া তাঁহার অমানুষিক অত্যাচারে সুজাকে প্রাণ হারাইতে হয়।

দারা দিল্লী হইতে নানাস্থানে উপস্থিত হইয়া সৈন্যসংগ্রহ করিতে থাকেন। অবশেষে আজমীরের নিকট ঔরঙ্গজেবের সহিত তাঁহার যে যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে পরাজিত হইয়া তিনি বন্দী হ'ন। দারাকে গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দিভাবে রাখিতে ওমরাহগণ পরামর্শ দিয়াছিলেন; কিন্তু রোশনারা এই প্রস্তাবে সম্মত না হইয়া, ঔরঙ্গজেবকে বুঝাইলেন,—দারা লোকপ্রিয়, তাহাকে বন্দী করিয়া রাখিলে, পরে বিদ্রোহের সূচনা হইতে পারে, অতএব তাহাকে ধরাধাম হইতে অপসৃত করা কর্ত্তব্য। ঔরঙ্গজেব রোশনারার পরামর্শ অনুযায়ী ১৬৫৯ খৃ

অব্দে দারার শিরশ্ছেদ করাইলেন এবং তাঁহারই পরামর্শে দারার ছিন্ন মুণ্ড আগরার কারাগারে শাহ্‌জহানের নিকট প্রেরণ করেন। (৫) এই লোমহর্ষক দৃশ্যে—ভারতের ভাবী সম্রাটের এই শোচনীয় পরিণামে, নিদারুণ ভাগ্য-বিপর্য্যয়ে আপনার প্রাসাদে আপনি বন্দী হইয়া, সম্রাটের মানসিক অবস্থা যে কিরূপ হইয়াছিল, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না।

যেদিন দারার শিরশ্ছেদ হয়, ঔরঙ্গজেব সেইদিন রাত্রে দারার কন্যা জুহন্‌জেবকে স্বীয় মহলে আনিয়াছিলেন; কিন্তু সম্রাট্ ও জঁহানারা দারার কন্যাকে পাঠাইতে অনুরোধ করায়, ঔরঙ্গজেব পুনরায় তাহাকে পাঠাইয়া দেন। জঁহানারা জুহন্‌জেবকে পোষ্যকন্যারূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ঔরঙ্গজেবের রাজ্যলাভের পর রোশনারা রঙ্গমহালের সর্ব্বময় কর্ত্রী হইলেন। জঁহানারা পূর্ব্বের মত পিতার সেবা-শুশ্রূষা লইয়াই রহিলেন। তিনি অবসর পাইলেই কাশ্মীরের বিখ্যাত ফকিরদিগের জীবন-চরিত লিখিতেন। ঔরঙ্গজেব রোশনারার বাধ্য ছিলেন ও তাঁহার নিকট রাজ্যশাসন বিষয়ে অনেক পরামর্শ লইতেন। তবে রোশনারা তাঁহার প্রণয়পাত্রদিগকে অন্তঃপুরে আনিতেন বলিয়া, তিনি তাঁহাকে মনে মনে ঘৃণা করিতেন। ঔরঙ্গজেব রোশনারার প্রণয়িগণকে ইহজগৎ হইতে অপসারিত করিবার ব্যবস্থা করেন। (৬) বলা বাহুল্য বৃদ্ধ শাহ্‌জহানকেও জঁহানারার প্রণয়ীদিগের জন্য ঐরূপ পন্থা অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। (৭) কেহ কেহ এ কথাও বলেন, ঔরঙ্গজেব রোশনারার চরিত্রদোষের জন্য তাঁহাকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করিয়াছিলেন।

১৬৬৫ খৃঃ অব্দে ঔরঙ্গজেব অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়েন। চারিদিকে ষড়্‌যন্ত্র চলিতে লাগিল। রোশনারা এই সময় ঔরঙ্গজেবের জ্যেষ্ঠ পুত্রের পরিবর্ত্তে তাঁহার নাবালক পুত্র আজামসাহ্‌কে সিংহাসনে বসাইতে সচেষ্ট হইলেন। রোশনারা স্থির করিলেন, ঔরঙ্গজেবের নাবালক পুত্র সিংহাসন পাইলে, তিনি অধিক দিন তাহার অভিভাবকরূপে থাকিয়া আপনার প্রভুত্বটুকু বজায় রাখিতে পারিবেন। তিনি ঔরঙ্গজেবের সংজ্ঞাশূন্য অবস্থায় তাঁহার হস্ত হইতে বাদশাহী মোহরাঙ্কিত অঙ্গুরী খুলিয়া লইয়াছিলেন এবং মহম্মদ আজামকে রাজপদে অভিষিক্ত করিবার জন্য ১০০ খানি বাদশাহ্‌র মোহরযুক্ত পত্র রাজ্যের প্রধান প্রধান রাজা ও অমাত্যবর্গকে পাঠাইয়াছিলেন। (৮) ঔরঙ্গজেবের পীড়ার সময়ে রোশনারা রোগীর গৃহে আর কাহাকেও প্রবেশ করিতে দিতেন না—এমন কি সম্রাট্ জীবিত কি মৃত, এ কথাও কেহ জানিতে পারিত না। রোশনারার অনুপস্থিতকালে একদিন ঔরঙ্গজেবের প্রধানা বেগম, সাহআলমের মাতা, খোজাদিগকে ঘুষ দিয়া সম্রাট্‌কে দেখিতে গিয়াছিলেন। তাঁহাকে রোগীর গৃহে যাইতে দেখিয়া, রোশনারা আসিয়া তাঁহার বদনমণ্ডল ক্ষতবিক্ষত করিয়া গৃহ হইতে বিতাড়িত করিয়া দেন।

ক্রমে ঔরঙ্গজেব সুস্থ হইয়া উঠিতে লাগিলেন। হঠাৎ একদিন তিনি হস্তস্থিত মোহরাঙ্কিত অঙ্গুরী দেখিতে না পাইয়া রোশনারাকে অঙ্গুরীর কথা জিজ্ঞাসা করেন। রোশনারা বলেন, উহা তাঁহার অঙ্গুলী হইতে পড়িয়া যায় এবং তিনি সেই পতিত অঙ্গুরীয়টি রাখিয়া দিয়াছেন; ইহাতে ঔরঙ্গজেবের মনের সন্দেহ বদ্ধমূল হইল। কিছুদিন পরেই পুত্রকে রাজ্য-প্রদানের জন্য ভগিনীর ষড়্‌যন্ত্র ও সুলতানার অপমানের কথা তাঁহার কর্ণগোচর হইল। তিনি ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া প্রধানা সুলতানাকে নূতন উপাধিতে ভূষিত করিলেন। রোশনারা আপনাকে অপমানিত বোধ করিয়া, অন্তঃপুর হইতে দূরে থাকিবার অভিপ্রায় জানাইলেন; কিন্তু ঔরঙ্গজেব ইহাতে অনুমতি দিলেন না; অধিকন্তু তিনি ভগিনীর উপর আপনার কন্যাদিগের শিক্ষার ভার দিয়া তাঁহাকে প্রাসাদেই অবস্থান করিতে বলিলেন।

ঔরঙ্গজেব সুস্থ হইয়া দারার কন্যা জুহন্‌জেবের সহিত স্বীয় পুত্র আজামসাহ্‌র বিবাহ দিবার জন্য জঁহানারার নিকট

(৫) History of the Mogul Dynasty—Manouchi th... : Catrou.

(৬) Tavernier's Travels—Ball. Vol. I. P. 377.

(৭) Bernier's Travels—Constable. P. 12—13.

(৮) হ্যাভেল (Havell) সাহেব তাঁহার Agra and the Taj পুস্তকের ৩৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, রোশনারার এই ষড়্‌যন্ত্রের জন্য ঔরঙ্গজেব তাঁহাকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করেন।

প্রস্তাব করিয়া পাঠান; কিন্তু জঁহানারা এই প্রস্তাবে সম্মত হ'ন নাই।

প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্লিম্যান সাহেব লিখিয়াছেন :—"দারার মৃত্যুর ১০ বৎসর পরে ঔরঙ্গজেব তাঁহার ৩য় পুত্র মহম্মদ আজুমের সহিত, জঁহানারার তত্ত্বাবধানে রক্ষিত দারার কন্যার মহাসমারোহে বিবাহ প্রদান করেন।"

বার্ণিয়ারের মতে রোশনারার পরামর্শে ঔরঙ্গজেব তাঁহার সহিত কাশ্মীর গিয়াছিলেন। ইহার কিছুদিন পরে ১৬৬৬ খৃঃ অব্দে বৃদ্ধ শাহ্‌জহান জঁহানারার ক্রোড়ে আগরাতুর্গে দেহত্যাগ করেন।

সুদীর্ঘ সাত বৎসর কারাবাসের পর ভারতের একছত্র সম্রাট্ অসীম যন্ত্রণা হইতে রক্ষা পাইলেন—আপনার ঔরসজাত পুত্রের নির্ম্মম ব্যবহারে ব্যথিতহৃদয়-সম্রাট্ এতদিন পরে শান্তি পাইলেন। চিরনিদ্রায় সমাহিত হইবার পূর্ব্বে জঁহানারাকে তিনি কুলুনাদিনী মন্থরগামিনী নীল-সলিলা যমুনার দিকের বাতায়ন উন্মুক্ত করিয়া দিতে বলিলেন। বাতায়ন উন্মুক্ত হইলে, তিনি অতৃপ্তনয়নে মমতাময়ী প্রাণের মমতাজের স্মৃতিমন্দিরের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া চাহিয়া দুই বিন্দু অশ্রু ফেলিলেন—জঁহানারা তাহা মুছাইয়া দিলেন। মৃত্যুর করাল ছায়া তাঁহার পাণ্ডুর মুখের আনন্দ-আভাকে ম্লান করিয়া দিতে পারে নাই—অনন্ত পথের যাত্রী, প্রাণ-প্রিয়ার সহিত বহুদিন পরে মিলিত হইবার আশায় হাসিমুখে চলিয়াছেন; তাই আজ তাঁহার ফুল্লানন আনন্দে উদ্ভাসিত।

পিতার মৃত্যুর পর ঔরঙ্গজেব জঁহানারার প্রতি কোনরূপ কুব্যবহার করেন নাই।(৯) তিনি যখন সর্ব্বপ্রথম আগরায় জঁহানারার সহিত সাক্ষাৎ করেন, তখন জঁহানারা তাঁহাকে একটী স্বর্ণপাত্রে কতকগুলি বহুমূল্য মণি-মাণিক্য উপহার দেন। এই সময় জঁহানারা ঔরঙ্গজেবকে বলিয়াছিলেন :—

"এই সমস্ত মণিমাণিক্য তোমারই; কারণ তৈমুরলঙ্গের বংশের মধ্যে তুমিই একমাত্র জীবিত বংশধর; কিন্তু কিরূপে যে তুমি রাজসিংহাসন পাইলে, ভবিষ্যতে সে কথা ভুলিয়া যাইতে চেষ্টা করিব।" (১০)

ঔরঙ্গজেব জঁহানারাকে সমাদরের সহিত প্রাসাদে আনয়ন পূর্ব্বক ভগিনীদ্বয়ের হস্তে সংসারের কর্ত্তৃত্বভার ন্যস্ত করেন। বার্ষিক ১৫০০০,০০০ টাকা আয়ের জঁহানারার যে সকল সম্পত্তি পূর্ব্বে ঔরঙ্গজেব রাজকোষভুক্ত করিয়াছিলেন, এক্ষণে তিনি তাঁহাকে তৎসমুদয় প্রত্যর্পণ করিয়া সম্মানার্হ 'সা বেগম' উপাধিতে ভূষিত করেন।

টেভার্ণিয়ার লিখিয়াছেন :—"জঁহানারা একজন বুদ্ধিমতী রমণী ছিলেন এবং কিরূপে রাজ্য পরিচালনা করিতে হয়, সে বিষয়ে তাঁহার বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল। শাহ্‌জহান ও দারা যদি যুদ্ধের পূর্ব্বে তাঁহার পরামর্শ লইতেন, তাহা হইলে বোধ হয়, ঔরঙ্গজেবকে আর সিংহাসনে বসিতে হইত না। (১১)

ঔরঙ্গজেব তাঁহাকে বুদ্ধিমতী জানিয়াই উত্তরকালে তাঁহার পরামর্শ লইয়া রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেন। (১২) জঁহানারা ও রোশনারা উভয়েই সাম্রাজ্যের বহু কল্যাণ সাধিত করিয়াছিলেন।

---

(৯) পিতার মৃত্যুর পর ভগিনী জঁহানারার বহুমূল্য রত্নরাজির উপর ঔরঙ্গজেবের দৃষ্টি পড়ে। তিনি ভগিনীর সহিত প্রথমে বেশ সদ্ব্যবহার করিয়া তাঁহাকে আগ্রা হইতে জহানাবাদে আনয়ন করেন। ইহার কয়েক দিবস পরেই জঁহানারার মৃত্যুসংবাদ চারিদিকে প্রচারিত হইয়া পড়ে। ইহাতে সকলেই স্থির করিয়াছিল যে, ঔরঙ্গজেব বিষ-প্রয়োগে জঁহানারাকে হত্যা করিয়া রত্নরাজির অধিকারী হ'ন। টেভার্ণিয়ার এই সময় বাঙ্গলা হইতে আগ্রায় ফিরিতেছিলেন। তিনি স্বচক্ষে জঁহানারাকে হস্তিপৃষ্ঠে আগ্রা ত্যাগ করিতে দেখিয়াছিলেন। Tavernier's Travels—Ball. Vol. I—P. 344-45

(১০) Rambles & Recollections—Sleeman. (A. C. Mukerjee's edition) Vol. I. P. 331

(১১) Tavernier's Travels—Vol. I. P. 376-377.

(১২) যে সময়ে পারস্যরাজ ২য় সাআব্বাসের সহিত ঔরঙ্গজেবের বিবাদ ঘটিয়াছিল, সেই সময়ে ঔরঙ্গজেব রাজ্যের সম্ভ্রান্ত পারস্যগণকে নির্যাতিত করিয়া তাহাদিগকে হত্যাকাণ্ডের ভয় দেখান। এই সময় জঁহানারা আগ্রা হইতে প্রায় দুই দিন হস্তিপৃষ্ঠে আসিয়া দিল্লীতে উপস্থিত হন। ঔরঙ্গজেব তখন উজীর ও দুইজন প্রসিদ্ধ মোগলের সহিত পরামর্শ করিতেছিলেন। তিনি ভগিনীকে দেখিয়া তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা করিলেন। জঁহানারা এই সময় পারস্যগণের অনুকূলে অনেক কথা বলিয়াছিলেন। Dow—History of Hindustan Vol. III. p. 3'

জহানারার সমাধি।

লোলুপ সরল কবি হৃদয়ের পরিচায়ক—উদারতা ও প্রকৃতি পূজার পুণ্য প্রয়াগ; এই স্থানে ক্ষণকাল দাঁড়াইলে আপনাকে বিস্মৃত হইতে হয়—আপনার অহঙ্কার গর্ব্ব চূর্ণ হইয়া যায়। বেগম-সাহেবার চরিত্র দোষ ভুলিয়া অশ্রুপ্রবাহ আপনি উৎসারিত হইতে থাকে।

পুরাতন দিল্লী যাইবার পথে নিজামুদ্দীন আউলিয়ার যে বিশাল সমাধিভবন আছে, তাহার মধ্যে প্রাচীরবেষ্টিত এক স্বল্পায়তন স্থানে জহানারা সমাহিতা আছেন। ১৬৮১ খৃঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। সমাধি শ্বেত মর্ম্মর প্রস্তরাচ্ছাদিত। জহানারা মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে একটী কবিতা লিখিয়াছিলেন—ইহাতে তিনি তাঁহার সমাধিস্থানকে তৃণমণ্ডিত করিয়া রাখিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন; তাই আজিও তাঁহার কবর তৃণাস্তরণে আবৃত। সমাধিপার্শ্বে শ্বেত মর্ম্মরফলকে ১০৯১ হিজরা বা ১৬৮২ খৃঃ অব্দে ক্ষোদিত এই কবিতাটী দৃষ্ট হইয়া থাকে। কবিবর নবীনচন্দ্র সেন তাহার এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন:—

"বহুমূল্য আবরণে করিও না সুসজ্জিত
কবর আমার
তৃণশ্রেষ্ঠ আবরণ দীন-আত্মা জেহানারা
সম্রাট্-কন্যার।"

আড়ম্বরপ্রিয় মোগল-সম্রাট্-দুহিতার এই নিরাভরণতা—সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা—মুক্ত আকাশের তলে, মুক্ত বাতাসে তৃণাবরণে ভূমিতলে শয়ন করিবার বাসনা—তাঁহার সৌন্দর্য্য-

শাহজহানাবাদের (নূতন দিল্লীর) পশ্চিমে "রোশনারাবাগ" নামে সুন্দর উদ্যান আছে। ১৬৫০ খৃঃ অব্দে রোশনারা উহার নির্ম্মাণ-কার্য্য আরম্ভ করেন। ১৬৭১ খৃঃ অব্দে তাঁহার সমাধির পর, ইহা "রোশনারাবাগ" নামে অভিহিত হয়। এক সমচতুষ্কোণ চাতালের উপর রোশনারা চিরনিদ্রায় অভিভূতা। সমাধি মর্ম্মর-প্রস্তরাবৃত—উপরিভাগ অনাবৃত। ইহার চারি কোণে বারান্দা সংযুক্ত দ্বিতল গৃহ। সমাধিভবনে একটী উৎস হইতে জলধারা নিঃসৃত হইয়া স্থানটীর রমণীয়তা আরও বৃদ্ধি করিয়া দেয়। গভীর পরিতাপের বিষয়, এখন পুরাতনের স্মৃতিচিহ্ন লুপ্ত হইয়াছে, আছে কেবল—রোশনারার সমাধি, একটী পুষ্করিণী ও তোরণদ্বার।

রোশনারার মৃত্যুর কালনির্ণয় সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণ একমত হ'ন নাই। মেনুচী ও হ্যাভেল সাহেবের মতে ঔরঙ্গজেবের কাশ্মীরযাত্রার পূর্ব্বেই রোশনারার মৃত্যু হইয়াছিল; কিন্তু বার্ণিয়ার বলেন, এক সুবৃহৎ পেগু হস্তিপৃষ্ঠে আরূঢ়া হইয়া, রোশনারা ঔরঙ্গজেবের সহিত কাশ্মীরযাত্রা করিয়াছিলেন। কাশ্মীর হইতে ফিরিয়া আসিবার পর তাঁহার মৃত্যু হয়; কিন্তু আমাদের বোধ হয়, বার্ণিয়ার ভ্রমক্রমে রোশনারার পরিবর্ত্তে ঔরঙ্গজেবের কন্যা জেবুন্নিসাকে হস্তিপৃষ্ঠে দেখিয়াছিলেন।

মোগল-সম্রাট্ শাহ্‌জহানের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ তাঁহার বলবুদ্ধিভরসা, রাজনীতিকুশলা, একনিষ্ঠা কন্যা জঁহানারা বেগম ও ঔরঙ্গজেবের পরামর্শদাত্রী রোশনারা বেগম, তৎকালীন প্রজাগণের ভাগ্যনিয়ন্ত্রীরূপে যবনিকার অন্তরালে থাকিয়া, সম্রাট্‌দিগকে ইঙ্গিতে পরিচালিত করিয়া রাজকার্য্য সমাধা করিতেন। ১৩) বস্তুতঃ উভয়েই, কন্যা ও ভগিনীর হস্তের ক্রীড়নক মাত্র ছিলেন। তাঁহাদের শেষ স্মৃতিচিহ্ন,

(১৩) সিরমুরের রাজা বুধপ্রকাশকে জঁহানারা কতকগুলি পত্র লিখিয়াছিলেন। অতীতের সেই পুরাতন পত্রগুলি এই তিন শত বৎসর পরে প্রত্নতত্ত্ববিদ্ রোজ্ সাহেব বহু কষ্টে সংগ্রহ করিয়াছেন। আমরা এই বহুমূল্য পত্রগুলির মর্ম্মানুবাদ বঙ্গভাষায় প্রকাশ করিতেছি। এই পত্রগুলি হইতে প্রমাণিত হইবে—জঁহানারা প্রত্যক্ষভাবে অনেক সময়ে রাজকার্য্য পরিচালনায় সহায়তা করিতেন। পত্রগুলি অনুবাদ কালে, আমরা সাধ্যমত মূলাংশের অনুসরণ করিয়াছি।

(১)

করুণাময় খোদাতালার নাম স্মরণে এই পত্র লিখিত হইল।

সমসাময়িক সমপদস্থগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, দয়া ও অনুগ্রহ লাভের উপযুক্ত পাত্র, রাজা বুধপ্রকাশ যে সুপক্ব আনার ও কএকটি জন্তু পাঠাইয়াছেন, তাহা আমাদের হস্তগত হইয়াছে। পৃথিবীর অধীশ্বর, জগৎবাসীর একমাত্র সান্ত্বনাদাতা শাহান্‌সাহ্‌কে রাজা বুধপ্রকাশ তাঁহার অনুকূলে সুপারিশ করিবার জন্য যে অনুরোধ করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে তাঁহাকে জানান যাইতেছে যে, রাজাদিগের রক্ষক, সম্রাট্ এখন কালিফ-নিবাস আকবরাবাদে অবস্থান করিতেছেন; কাজেই বর্ত্তমান সময়ে আমরা তাঁহার ইচ্ছামত কার্য্য করিতে পারিলাম না। তিনি যেন মনে রাখেন, আমরা সর্ব্বদাই তাঁহার কার্য্যে যথাসাধ্য সহায়তা করিব। ১৬ জমাদি-উস্ শনি; জুলাস ১৩ বর্ষ।

(২)

(সমসাময়িক ······ পাত্র) রাজা বুধপ্রকাশ তাঁহার আরজ-দস্তের সহিত যে সুপক্ব হরিতকী, আনার, সুগন্ধি মশলার গাছ, বিচিত্র-বর্ণের মোরগ ও মৃগনাভি পাঠাইয়াছেন, তাহা আমাদের হস্তগত হইয়াছে। আমরা ইচ্ছা করি, তিনি যেন এই বর্ণের আর একটি মোরগ সংগ্রহ করিয়া আমাদের পাঠান। তাঁহাকে সম্রাট্-দরবার হইতে একটি সম্মান-সূচক খেলাৎ প্রদত্ত হইয়াছে—শীঘ্রই উহা তাঁহার নিকট প্রেরিত হইবে। ১১ সওয়াল; জুলাস ১৪ বর্ষ।

(৩)

(সমসাময়িক·········পাত্র) রাজা বুধপ্রকাশ তাঁহার আরজদস্তের সহিত যে মৃগনাভি ও চানোয়ার পাঠাইয়াছেন, তাহা আমরা পাইয়াছি ও আমাদের মনোমত হইয়াছে। তিনি তাঁহার সোঙ্কা ও অপরাপর তবিল-দারের অশিষ্টাচার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, সাধোরা পরগণার জমিদারগণ প্রথমে উক্ত তবিলদারগণের জামিন হ'ন, পরে যখন তাহারা টাকাকড়ি লইয়া পলাইয়া যায়, সেই সময়ে আবার এই জমিদারগণ তাহাদের এই কার্য্যে সহায়তা করিয়াছেন। রাজা বুধপ্রকাশ এই প্রসঙ্গে মিয়ানিদোবের ফৌজদার রুহুল্লা খাঁ, সারান্দের ফৌজদার দাওয়ার খাঁ এবং সাধোরা পরগণার আমিনি ফৌজদার আলি আকবরকে এই তবিলদার ও জমিদার-গণকে বন্দী করিবার জন্য আদেশ পত্র পাঠাইতে অনুরোধ করিয়াছেন; কিন্তু আমাদের মতে তিনি প্রথমেই এই জমিদারগণকে বিশ্বাস করিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন। আমরা এরূপ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে ইচ্ছা করি না। তিনি বরং রাজাদিগের রক্ষক, মহাশক্তিমান্ সম্রাট্‌কে এ সম্বন্ধে একখানি আরজী প্রেরণ করুন। এ সম্বন্ধে সম্রাট্‌কে প্রথমে না জানাইলে, রুহুল্লা প্রভৃতি কেহই কিছু করিবে না। ২১ রবি-উস-শনি; জুলাস ১৮ বর্ষ।

(৪)

ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্।

(সমসাময়িক·········পাত্র) রাজা বুধপ্রকাশ আমাদের অনুগ্রহ-লাভার্থ যে আরজদস্তগুলি ও ২ বাক্স বরফ পাঠাইয়াছেন, তাহা আমাদের হস্তগত হইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন, সৈয়দ সাফি ও ভোরি এই বরফ প্রেরণ করিয়াছে এবং ইহা রাজসরকারের জিনিস; কিন্তু আমরা এ বিষয়ে প্রেরকদিগের নিকট হইতে কোনরূপ সংবাদই পাই নাই। বরফগুলি বড় অপরিষ্কার এবং ইহার অধিকাংশই গলিয়া গিয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, এগুলি আমাদের ভাণ্ডারের নহে। গারোয়ালের জমিদার লিখিয়াছেন যে, তিনিই ইহা পাঠাইয়াছেন। খোদা জানেন, কে ইহার প্রেরক। রাজা বুধপ্রকাশ তাঁহার সহিত গারোয়ালের রাজার বিবাদ-প্রসঙ্গে ন্যায় বিচারের জন্য সম্রাটের নিকট যে বিষয় উপস্থাপিত করিতে লিখিয়াছিলেন, আমরা তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী সে অনুরোধ রক্ষা করিয়াছি। এই কারণে কে দোষী, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য সম্রাট্ বারবার বক্সীদিগকে এই মর্ম্মে একখানি "হস্‌বুলহুকুম" লিখিতে বলিয়াছেন যে, প্রথমে যিনি অপরাধ করিয়াছেন, তিনিই দণ্ডনীয় হইবেন। গারোয়ালের জমিদার বলেন, তিনি সর্ব্বপ্রথমে দোষ করেন নাই; যে জমি লইয়া বিবাদ, তাহা বহুদিন হইতেই তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের দখলে ছিল—মাত্র জোর করিয়া ইহা তাঁহার নিকট হইতে কাড়িয়া লওয়া হইয়াছিল। এক্ষণে সুযোগ বুঝিয়া, তিনি স্বয়ং উহার পুনরুদ্ধার করিয়াছেন। এই বিবরণের সহিত রাজা বুধপ্রকাশের অভিযোগের অনেক পার্থক্য পরিলক্ষিত হইতেছে। যতক্ষণ না সম্রাট্ একজন আমিন পাঠাইয়া এ বিষয়ে সবিশেষ অবগত হ'ন, ততক্ষণ তিনি সৈন্য পাঠাইয়া ইহার কোন কিছু মীমাংসা করিতে সম্মত নহেন। অধিকন্তু কাবুল ও দাক্ষিণাত্যে সম্প্রতি অভিযান প্রেরণ

সমাধিমন্দিরদ্বয় অদ্যাপি বিদ্যমান থাকিয়া, কৌতূহলী দর্শকের মনে পুরাতন স্মৃতির উদ্রেক করিয়া দেয়।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

করিতে হইবে—এজন্য এখন আর অন্যত্র সৈন্য পাঠাইবার কোন সম্ভাবনা নাই। ৭ জুমাদ ২ ; জুলাস ২১ বর্ষ।

(৫)

ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্।

(সমসাময়িক·········পাত্র) রাজা বুধপ্রকাশ যে আরজদস্ত, মৃগনাভি ও সুপক্ক আনার পাঠাইয়াছেন, তাহা আমাদের হস্তগত হইয়াছে। তিনি প্রথমে যে মৃগনাভি পাঠাইয়াছিলেন, তাহা আমাদের নিকট ভাল বলিয়া বোধ হইয়াছিল। তিনি যেন আরও কিঞ্চিৎ উৎকৃষ্ট মৃগনাভি আমাদের ব্যবহারার্থ পাঠাইয়া দেন। যাহাতে খাঁটি জিনিষটি আমরা পাই —সে বিষয় তিনি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন। আমরা নিশ্চয়রূপে বলিতে পারি, তাঁহার কার্য্যে আমরা সর্ব্বদা সহায়তা করিতে চেষ্টা করিব। ২১ রমজান ; জুলাস ২১ বর্ষ।

(৬)

ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্।

(সমসাময়িক·······পাত্র) রাজা বুধপ্রকাশ তাঁহার পেসকাসের সহিত যে শিকারী বাজপক্ষীটি ও পার্ব্বত্য মধু পাঠাইয়াছেন, তাহা আমরা পাইয়াছি। আমরা সেই ছোট বাজপক্ষীটির বিনিময় করিয়া একটি বড় বাজপক্ষী এখানে পাইয়াছি। মধু আমাদের বেশ পছন্দ হইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন, শ্রীনগরের অবাধ্য জমিদারের সহিত তাঁহার নিয়তই যুদ্ধ লাগিয়া আছে ; এ সম্বন্ধে তিনি শাহান্‌সাহ্‌কে পূর্ব্ব হইতে জানাইয়া ভালই করিয়াছেন। তিনি তথাকার, তুষারপাতের পরিমাণ ও দারোগা আবদর রহমানের বরফ সংগ্রহকার্য্যে শৈথিল্য সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা আমরা অবগত হইয়াছি। এই দারোগাকে সতিক্‌তার সহিত অধিক পরিমাণ বরফ সংগ্রহ করিবার জন্য ও তথাকার শ্রমজীবিদিগকে অঙ্গীকার-পত্র অনুযায়ী বেতন দিবার জন্য একখানি ফারমান্ পাঠান হইল। তিনি যদি গত বর্ষের ন্যায় তুষার সংগ্রহ-কার্য্যে অমনোযোগিতা প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে কর্ত্তব্যহীনতার জন্য ফলভোগ করিতে হইবে। ২৫ মহরম ; জুলাস ২৩শ বর্ষ।

ফুট্‌বল্ ফাইনাল্

১

কলিকাতার গড়ের মাঠে লোকে লোকারণ্য। ফুট্‌বল্ শীল্ড্ টূর্ণামেণ্টের আজ শেষ দিন। যে দুই দলে খেলা, তাহার একটী বাঙ্গালী। ফাইনালে আজ পর্য্যন্ত কোন বাঙ্গালী দল যাইতে পারে নাই। আজ প্রথম বাঙ্গালী দল অনেক বিখ্যাত দলকে পরাজিত করিয়া ফাইনালে আসিয়াছে। সেই জন্য এত ভিড়। শীল্ডের শেষ দিন বিস্তর লোক হয়, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত এত লোক মাঠে কখন দেখা যায় নাই। ক্যাল্‌কাটা গ্রাউণ্ডে খেলা। ক্যাল্‌কাটা ক্লাবের লাল সাদা নিশান উড়িতেছে। গ্রাউণ্ডের চারি পাশে সারি দিয়া প্রায় পঞ্চাশ হাজার লোক দাঁড়াইয়াছে। ভিতরে চেয়ারে ও গ্যালারিতে লোক ঠাসা। পথের ধারে অসংখ্য গাড়ী ও মটর ; গাড়ীর ছাদে লোক দাঁড়াইয়াছে। গাছের ডালে লোক উঠিয়াছে। কেল্লার উঁচু জমী দিয়া খেলিবার স্থান দেখিতে পাওয়া যায় ; সেখানে কাতারে কাতারে লোক দাঁড়াইয়াছে। এত লোকের সমাগম মাঠে ইতঃপূর্ব্বে কেহ কখন দেখে নাই।

শ্রাবণ মাস কএক দিন বৃষ্টি হয় নাই, মাঠে জল দাঁড়াইয়া নাই, গাঢ় সবুজ ঘাসে মাঠ ঢাকা, দেখিলে চক্ষু জুড়ায়। আকাশে মেঘ করিয়া আছে, কিন্তু ফাঁকা ফাঁকা মেঘে বৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা নাই। বেলা পাঁচটা বাজিয়া গিয়াছে, সাড়ে পাঁচটায় খেলা আরম্ভ। পশ্চিমে মেঘের আড়ালে সূর্য্য অল্প অল্প দেখা যাইতেছে, কিন্তু রৌদ্রের তেমন প্রখর উত্তাপ নাই। দক্ষিণ হইতে বাতাস বহিতেছে।

গঙ্গায় সারি সারি জাহাজ, বাতাসে নিশান উড়িতেছে। পথে মটরের ও গাড়ীর ঘণ্টার অবিশ্রাম শব্দ। চারিদিকে ফেরিওয়ালারা পান সিগারেট্ বেচিতেছে, চীনের বাদাম ভাজা, অবাক্ জলপান্ হাঁকিতেছে।

সেই সমবেত লক্ষ লোকের কোনদিকে দৃষ্টি নাই। তাঁবুর ভিতর হইতে যে দিক দিয়া খেলোয়াড়েরা রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিবে, লক্ষ জোড়া চক্ষু এক দৃষ্টে সেই দিকে চাহিয়া আছে। এমন জাতিই নাই যাহাকে সে ভিড়ে দেখা যায় না। পশ্চিমে সারি সারি সাহেব মেম বসিয়াছে, দক্ষিণে গোরারা ঘাসের উপর বসিয়াছে, উত্তরে ও পূর্ব্বে বাঙ্গালী ও অপরাপর জাতি। দড়ীর বাহিরে সংখ্যাতীত নানা জাতীয় লোক। বাঙ্গালীর সংখ্যাই অধিক; কিন্তু হিন্দুস্থানী, মাড়ওয়ারী, মোগল, পাঠান, পঞ্জাবী, চীনাম্যান্ সকল জাতিই দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকে খেলার কিছুই বুঝে না, তথাপি আগ্রহের সহিত দেখিতে আসিয়াছে। ঘোড়দৌড়ের মাঠে ভিড় হয় জুয়া খেলিবার জন্য; ফুট্‌বল্ খেলাতেও জুয়া হয়, কিন্তু অনেকে শুধু দেখিতে যায়, জুয়া খেলিতে যায় না। আজ তাহাতে শুধু খেলা দেখিবার আমোদ নয়; কৌতূহলের পশ্চাতে জাতীয়তার একটা উত্তেজনা আছে। ফুট্‌বল খেলায় বাঙ্গালী, কি এ দেশীয় অন্য কোন জাতি এ পর্য্যন্ত বিশেষ পারদর্শিতা দেখাইতে পারে নাই। অল্প দিনই এ দেশে এ খেলা আরম্ভ হইয়াছে। ভাল ইংরেজ সিভিলিয়ান্ কিংবা মিলিটারি টীমের সহিত বাঙ্গালী দল কখনও আঁটিয়া উঠে না। ক্রিকেটে রণজিৎসিংহের যেমন অক্ষয় যশ ও কীর্ত্তি, ফুটবলে এ দেশীয় কোন লোকের এখনও তেমন হয় নাই, তথাপি একদল বাঙ্গালী যুবক বড় বড় 'টীম্'কে হারাইয়া শীল্ড্ ফাইনালে ঠেলিয়া উঠিয়াছে। আজ হারিলেও তাহারা 'রণর্স অপ্' হইবে; জিতিলে—জিতিলে যে কি হইবে, তাহা কল্পনা করিতে সেই বহু সহস্র বাঙ্গালীর অঙ্গ রোমাঞ্চিত হইতেছে! শীল্ড্ পাওয়া, দিগ্বিজয়ের তুল্য!
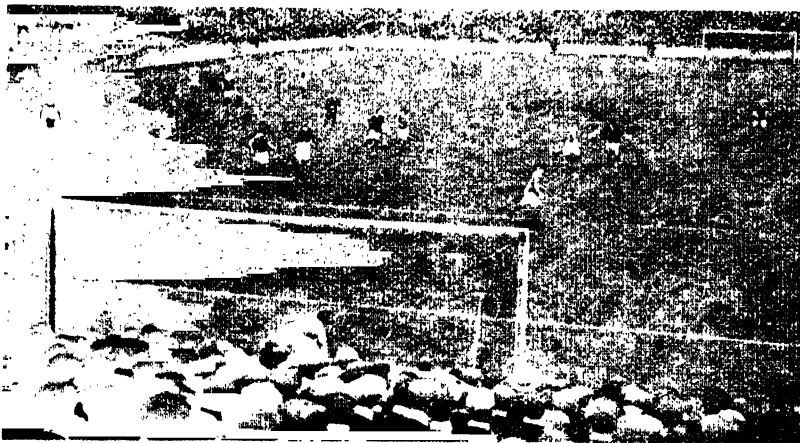
২

হাফ্ প্যান্ট্ পরা, সাদা জামা গায়ে, ডান হাতে রিষ্টলেট্ ঘড়ী বাঁধা রেফরী গ্রাউণ্ডে অবতীর্ণ হইলেন। দুই জন লাইন্স্‌ম্যান্ নিশান হাতে দৌড়িয়া আসিয়া দুইধারে গেল। দর্শকেরা এতক্ষণ মৌমাছির চাকের মত গুন্ গুন্ করিতেছিল, এখন কোলাহল করিতে লাগিল। রেফ্‌রী তর্ক একবার ঘড়ীর দিকে দেখিয়া বাঁশী বাজাইল। তাঁবুর দক্ষিণ দিকে ফাইফ্ ও ড্রামের ব্যাণ্ড্ বাজিয়া উঠিল। বাজনার তালে তালে বাদকগণ রঙ্গভূমে প্রবেশ করিল। হাইল্যাণ্ড পোশাকে ব্যাণ্ডমাষ্টার্ ছড়ি হাতে আগে আগে, পিছনে বাদকগণ, সম তালে, সমপদক্ষেপে চলিয়া আসিতেছে। অমনি চারিদিকে করতালি ধ্বনি পড়িয়া গেল। তাহাদের পশ্চাতে গোরার টীম্—'আর্গাইল্' আসিল। গোরারা, সাহেবেরা চারিদিক হইতে ঘন ঘন করতালি শব্দে তাহাদিগকে অভিনন্দন করিল। তাহার পর তাঁবুর উত্তর পার্শ্ব দিয়া বাঙ্গালী টীম্—'ইউনাইটেড বেঙ্গল'—নামিল। গ্রাউণ্ডের উত্তর পূর্ব্ব দিক হইতে, কেল্লার জমী হইতে, গাড়ীর ছাদ হইতে, গাছের ডাল হইতে একটা গর্জ্জন উঠিল, চারিদিকে ছাতা ছড়ি ঘুরিতে লাগিল, দর্শকেরা আবেগে উন্মত্ত হইয়া উঠিল। ইংরাজে ও বাঙ্গালীতে বলের ও কৌশলের পরীক্ষা—কাহার জয় হইবে?

ফুট্‌বল্।

খেলা আরম্ভ হইবার কএক ঘণ্টা পূর্ব্ব হইতে মাঠে লোক জড় হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। লোক নানা রকমের, নানারকমের কথাবার্ত্তাও হইতেছিল, কিন্তু ময়দানের ছোক্‌রারা সকলের চেয়ে বেশী কথা কহিতেছিল। এই ছোক্‌রার দল মাঠের একটা অঙ্গ। দশ বৎসর হইতে ত্রিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সব ছোক্‌রা। তাহাদের মধ্যে সব জাতি আছে—হিন্দু মুসলমান, মেথর চামার, ধাঙ্গড় কুলি সব আছে। খেলা ও খেলোয়াড়দিগের সম্বন্ধে তাহাদের যে বিদ্যা তাহাতে তাহারা সে বিষয়ে রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ বৃত্তি পাইবার উপযুক্ত। সব খেলোয়াড়ের নাড়ী নক্ষত্র তাহারা জানে। যে ভাষায় তাহারা কথা কয় তাহাও চমৎকার। কদর্য্য হিন্দী, অদ্ভুত বাঙ্গলা আর ইংরেজির বুক্‌নি মিশাইয়া একটা খিচুড়ী। তাহাদের কথার ও টীকা-টিপ্পনীর স্রোত এক মুহূর্ত্ত বন্ধ হয় না। খেলা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে তাহারা নানারূপ জল্পনা করিতেছিল।

ছোক্‌রা নম্বর ১ বলিতেছিল, "নাটা (ইউনাটেড্) বেঙ্গল জরুর জিৎ যাবে।"

নম্বর ২। "সে ত জিত্‌বে কিন্তু আরগাইলের গোল্‌কী (গোল্‌কীপর্) বড়া মজবুত আছে।"

নম্বর ৩। "হাঁ, সে বড় গোল্ বাঁচাতা।"

নম্বর ৪। "সেমি-ফাইনালে ওর টেংরিমে খুব চোট্ লেগেছে। এখনও ল্যাংড়াচ্চে।"

নম্বর ৫। "ও কিছু নয় গোরার জান্ বড়া কঠিন, আজ আবার ঠিক হো গেয়া।"

নম্বর ১। "এণ্ডুর্‌সন্ সন্তর্ (সেণ্টর) ফার্‌ওয়ার্ড্ বড়া ভারি খেলোয়াড়্।"

নম্বর ৪। "আরে, তুমি কি বল্‌চে! নাটার বাঁয়া উইং হাওয়া মাফিক্ খেল্‌তা। নাটা শীল্ড্ জরুর লে যায়গা। কেৎনে থায়গা (কত বাজি রাখিবে)?"

নম্বর ১। "আরে, হম্ ভি তো ওহি বোল্‌তা। নাটা শীল্ড্ লেগা তো, হম্ কালী মায়ীকো পাটা চড়ায়গা।"

এমন সময় তাঁবু হইতে ফুট্‌বলটা আসিয়া ঝুপ্ করিয়া গ্রাউণ্ডে পড়িল। তাহার পর রেফরী ও খেলোয়াড়েরা আসিল। টস্ করিয়া গোরারা জিতিয়াছিল। তাহারা কেল্লার দিকে দক্ষিণ গোল্ লইল। বল্ গ্রাউণ্ডের মাঝখানে রাখা হইল, 'ইউনাইটেড্ বেঙ্গলের' ফর্‌ওয়ার্ডের বলের কাছে দাঁড়াইল। রেফরীর হুইস্‌ল্ বাজিল, খেলা আরম্ভ হইল।

তখন পশ্চিম আকাশে পাত্‌লা মেঘের আড়ালে সূর্য্য ঝিকিমিকি করিতেছে। বাতাস ঝর ঝর করিয়া বহিতেছে, বাতাসে ক্যাল্‌কাটা ক্লাবের নিশান দুলিয়া দুলিয়া উড়িতেছে। খেলা আরম্ভ হইবা মাত্র সেই বিপুল লোকসঙ্ঘ একেবারে নিস্তব্ধ হইয়া গিয়াছে!

৩

যে কখন মাঠে বাঙ্গালী ও ইংরেজের ফুট্‌বল্ খেলা দেখে নাই, সে সেই খেলা প্রথম দেখিলে কি মনে করিত! ইংরেজেরা বলিষ্ঠ দৃঢ়কায়, বিশালবক্ষ; তাহাদের হস্ত পদের মাংসপেশী স্থূল ও কঠিন। বাঙ্গালীরা অল্প বয়স্ক যুবক, ছিপ্‌ছিপে গড়ন, কএকজন স্কুল কলেজে ছাত্র। গোরাদের সকলের পায়ে ফুট্‌বল্ খেলিবার বুট, বাঙ্গালীরা নগ্নপদ। কোন্ সাহসে তাহারা খেলিতে আসিয়াছে! যদি পায়ে বুটের ঠোক্কর লাগে, যদি বুট্‌সুদ্ধ পা দিয়া শুধু পা মাড়াইয়া দেয়, তাহা হইলে পা ভাঙ্গিয়া যাইবার সম্ভাবনা; কিন্তু বাঙ্গালীদের সে বিষয়ে ভ্রূক্ষেপ নাই। তাহাদের বুট পরিয়া খেলা অভ্যাস নাই, বুট পরিয়া তাহারা ভাল দৌড়িতে পারে না। অথচ ইংরেজদের পায়ে বুট দেখিয়াও তাহারা কিছু মাত্র ভয় পায় না।

খেলা আরম্ভ হইল। বাঙ্গালীদের ফর্‌ওয়ার্ড লাইনে রাইট্-উইঙ্গে লাহিড়ী আর সেণ্টর ফর্‌ওয়ার্ড্ বোস ভারি খেলওয়াড়্। তাহারা বল দুই তিনবার পাস্ করিয়া হাফ-ব্যাক্‌দের ছাড়াইয়া লইয়া গেল। তাহার পর লাহিড়ী বল লইয়া নক্ষত্রবেগে ছুটিল। এক জন ব্যাক্‌কেও ছাড়াইয়া গেল। বাকি রহিল একজন ব্যাক্ আর গোল্‌কীপর্। মাঠ কাঁপাইয়া উৎসাহের গর্জ্জনধ্বনি উঠিল। ইংরেজ ও গোরারা নীরব। বাঙ্গালী যুবকেরা চীৎকার করিতে লাগিল, "Go on, go on! Put it in!" মাঠের ছোক্‌রারা চেঁচাইল, "Shoot, shoot!"

দুই জন হাফ্ ব্যাক্ বেগে আসিয়া লাহিড়ীকে ঘিরিল। তখন লাহিড়ী বল্ সেণ্টর্ করিল। বল্ বোসের পায়ের কাছে আসিয়াছে এমন সময়ে আর্গাইল দিগের দ্বিতীয় ব্যাক্

তাহাকে 'চার্জ' করিল। ধাক্কা খাইয়া বোস ছিট্‌কিয়া গিয়া পড়িল। তখন ব্যাক্ 'কিক্' করিয়া বল্ গ্রাউণ্ডের মাঝখানে পাঠাইয়া দিল। "Foul, foul!" করিয়া দেশী দর্শকেরা চেঁচাইল। ময়দানের কতকগুলা ছোক্‌রা বলিতে লাগিল, "রেফ্‌রী ডাকু হ্যায়!" তাহাদের মনের মত কিছু না হইলেই তাহারা রেফরীকে গালি দেয়।

আর্গাইলের সেণ্টর্ হাফ্-ব্যাক্ বল পাইয়া রাইট্-উইঙ্গে পাস করিয়া দিল। উইঙ্গে ডোনাল্ড্ ভারি তেজী খেলোয়াড়; বল পাইয়া উদ্ধশ্বাসে ছুটিয়া গিয়া বল সেণ্টর্ করিল। সেণ্টর্ ফরওয়ার্ড্ এণ্ডরসন্ ভীমকায় পাহালওয়ান; দুই পায়ের মাঝে বল লইয়া ঝড়ের মত গোলের দিকে ছুটিল। লেফ্‌ট্-উইঙ্গ দৌড়িয়া আগে চলিয়া গেল। ময়দানের ছোক্‌রারা চেঁচাইল, "হাফ্‌সাইড্, হাফ্‌সাইড্ (অফ্-সাইড্)!" এ সকল চীৎকারে কোন রেফরী কখন কর্ণপাত করে না;—করিলে খেলা হওয়া অসম্ভব।

এণ্ডরসন্ বল ড্রিবল্ করিয়া লইয়া যাইতেছে, তাহাকে কেহ চার্জ্ করিতে সাহস করিতেছে না, এমন সময় ইউনাইটেডের সেণ্টর্-হাফ্ মিত্র, এণ্ডর্‌সনের পিছন হইতে দৌড়িয়া আসিল। মিত্র কৃশ ও লম্বা। সে পিছন হইতে এণ্ডর্‌সন্‌কে চার্জ না করিয়া এণ্ডর্‌সনের পায়ের মধ্য দিয়া বলে পা ঠেকাইয়া দিল। বল বাহির হইবামাত্র ইউনাইটেডের আর এক জন খেলোয়াড় বল বাহির করিয়া দিল। খুব হাততালি পড়িয়া গেল।

৪

যাহারা খেলা দেখে তাহারা মনে করে যে, তাহারা খেলোয়াড়দের চেয়ে ঢের বেশী খেলা বুঝে। তবে যেমন দাবা খেলা যাহারা দেখে তাহারা খেলোয়াড়দের উপর চাল বলিয়া দেয়, তাস্ খেলায় কোন্ তাস খেলিতে হইবে দেখাইয়া কিংবা বলিয়া দেয়, ফুট্‌বলে তাহা হয় না; কারণ খেলোয়াড়েরা যদি দর্শকের কথা শোনে, তাহা হইলে খেলাই বন্ধ হইয়া যায়। ফুট্‌বল্ ভাবিয়া চিন্তিয়া খেলিবার খেলা নয়। খেলার প্রধান অঙ্গ ক্ষিপ্রতা; যে বিলম্ব করে কিংবা ইতস্ততঃ করে সেই ঠকে। কিন্তু তাহা জানিয়াও দর্শকদের মুখ বন্ধ হয় না। যাহার পায়ে কখনও ফুট্‌বল্ ঠেকে নাই—যে নিজে খেলিতে গেলে হাস্যাস্পদ হয়—সেও এমনভাবে কথা কয় যেন সে স্বয়ং অদ্বিতীয় খেলোয়াড়। যাহারা ফুট্‌বল্ খেলা দেখিতে যায় তাহারা কেহই প্রায় চুপ করিয়া খেলা দেখে না, অনবরত বিচিত্র অভিমত প্রকাশ করিতে থাকে। আজও সকলে সেইরূপ করিতেছিল। একজন দর্শক বলিতেছিল, "আর্গাইলেরা যেরূপ করিতেছে তাহাতে অবশেষে মারামারি না করে!"

২য়। "হাঁ, মারামারি ফাইনালে করা তামাসার কথা কি না! রেফরী কিসের জন্য আছে?"

৩য়। "আরে, রেখে দাও তোমার রেফরী! বাঙ্গালীতে আর ইংরাজে খেলায় রেফরী কবে আবার ইম্পার্শ্যাল্ হয়।

একজন ভদ্র লোক পাশে দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, "রেফরীর বিরুদ্ধে এ রকম কথা বলা বড় অন্যায়। সে নিজের বিবেচনা মত ঠিক কাজ করে। এখন রেফরীর কি দোষ হইল?"

৩য়। "মশায়, আপনারা ত সব জানেন। রেফ্‌রী ত আর হাইকোর্টের জজ্ নয়।"

ভদ্র লোকটি কোন উত্তর দিলেন না। খেলা চলিতে লাগিল। দুই পক্ষ প্রায় সমান সমান, কিন্তু কৌশলে বাঙ্গালীরা শ্রেষ্ঠ, আর তাহাদের দৌড়িবার বেগ বেশী। ফরওয়ার্ডের দুই তিন জন একবার বল পাইলেই নিমেষের মধ্যে হাফ্-ব্যাক্ ও ব্যাক্‌দিগকে ছাড়াইয়া যায়। অর্গাইলের হাফ্-ব্যাকেরা তাহাদিগকে খুব সাবধানে আগলাইতে লাগিল।

আর্গাইলেরা একবার বল বাহির করিয়া দিলে 'থ্রো ইনে'র পর ইউনাইটেডের দুইজন ফর্‌ওয়ার্ড্ বল পাস করিয়া লইয়া চলিল। বাঙ্গালীর একজনকে অর্গাইলের একজন হাফ্-ব্যাক্ চার্জ্জ করাতে সে একটু পিছাইয়া পড়িল। অপর ব্যক্তি বল ড্রিব্‌ল্ করিয়া লইয়া চলিল। অর্গাইলের একজন ব্যাক্ বেগে আসিয়া তাহার পথ রোধ করিল। তাহার পর কি হইল ভাল করিয়া দেখা গেল না! ব্যাক্ দুই একবার চার্জ্জ করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু ইউনাইটেডের ফর্‌ওয়ার্ড্ তাহাকে পাশ কাটাইয়া ছুটিল। তাহার পর ব্যাক্ বল কাড়িয়া লইবার জন্য পা বাড়াইয়া দিল। ইউনাইটেডের ফর্‌ওয়ার্ড্ বল পাশের দিকে দিয়া লাফ দিয়া

ব্যাকের পা ডিঙ্গাইয়া গেল। সেই সময়—হয় তাহার পা ব্যাকের উরুতে লাগিল, কিংবা ব্যাকের পা পিছ্‌লাইয়া গেল—ব্যাক্ সজোরে পড়িয়া গেল, উঠিতে তাহার বিলম্ব হইল। গোরারা "Foul, foul!" করিয়া তারস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। রেফরী হুইস্‌ল্ দিতেই খেলা বন্ধ হইল। রেফরী বাঙ্গালীদের বিরুদ্ধে ফাউল্ দিল! গোরারা "Foul foul!" বলিয়া করতালি ধ্বনি করিতে লাগিল, ময়দানের ছোক্‌রারা আর বাঙ্গালীরা অসন্তোষসূচক কলরব করিতে লাগিল।

ছোক্‌রা নম্বর ১ বলিল, "দেখা বেটাকা বেইমানি! গোরারা চিল্লায়া তো এক দম ফাউল্ দিয়া। হাল্‌দার্ (ইউনাইটেডের ফরওয়ার্ড) কুছ্ ফাউল নহি কিয়া।"

নম্বর ২। "ওরা সব বেইমান্। বাঙ্গালী শীল্ড লেবে তাই ওদের বড়া গোসা হ'য়েচে।"

নম্বর ৩। "কেৎনা বেইমানি করেগা! বাঙ্গালী শীল্ড্ জরুর্ লে যায়গা!"

নম্বর ৪। "আলবৎ! ওদের মাফিক্ খেল্ কভি দেখা?"

নম্বর ৫। "কেয়া বাৎ হায়! দেখো দেখো হাল্‌দার কা খেল্!"

হালদার আবার বল পাইয়াছিল। গ্রাউণ্ডের মাঝখান হইতে বল লইয়া তীরের মত ছুটিল। দুইজন আর্গাইলদের হাফ্‌ব্যাক্ দৌড়িয়া তাহার দিকে আসিল। প্রথমকে এমন করিয়া ফাঁকি দিল, যে সে বল কাড়িতে গিয়া চিৎপাৎ হইয়া পড়িয়া গেল! হো হো করিয়া দর্শকেরা হাসিয়া উঠিল। আর একজন অর্গাইলদের হাফ্-ব্যাক্ দৌড়িয়া আসিল। হালদার তখন বল ঠেলিয়া পিছন দিকে করিয়া দিল। খেলা খুব ফাষ্ট্ হইতে লাগিল। বল কখন আর্গাইলদের গোলের দিকে, কখন ইউনাইটেডের গোলের দিকে। ফর্‌ওয়ার্ডের যেমন বেগ, ব্যাকেদের সেইরূপ সতর্কতা! খেলার অবিশ্রাম গতি, দর্শকেরা অপরিতৃপ্ত কৌতূহলের সহিত দেখিতে লাগিল।

অর্দ্ধেক গ্রাউণ্ড্ পার হইয়া একবার ফাউল্ হওয়াতে, রেফরী ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে "ফ্রী কিক্" দিল। ফ্রী কিকের পর বল পাইয়া আর্গাইলের সেণ্টর্ ফরওয়ার্ড ইউনাইটেডের গোলের দিকে দৌড়িল। একজন ব্যাক্ সম্মুখে পড়িল, তাহাকে ঠেলিয়া এণ্ডরসন্ বায়ুবেগে চলিল। সম্মুখে গোল্ দেখিয়া সে শূট্ করিল। যাহাকে 'গ্রাসকটর্' বলে সেই রকম শূট্—বল ঘাসে ঠেকিয়া খুব জোরে গোলের অভিমুখে চলিল। গোলকীপর্ লাইনের মাঝখানে দাঁড়াইয়াছিল, বল এক ধার দিয়া আসিতেছিল। দৌড়িয়া গিয়া গোল্‌কীপর্ বল্ আট্‌কাইবার সময় পাইল না। শুইয়া পড়িয়া বল ধরিল। সে উঠিবার আগেই এণ্ডর্‌সন্ আসিয়া পড়িল। ইউনাইটেডের গোল্‌কীপর দেখিল, বল তাহার হাতে থাকিলে এণ্ডরসন্ পা দিয়া বল গোলে প্রবেশ করাইয়া দিবে—সে শুইয়া শুইয়াই বল এণ্ডরসনের মাথা ডিঙ্গাইয়া ফেলিয়া দিল। ইউনাইটেডের একজন ব্যাক্ আসিয়া পড়িয়াছিল, সে বল হেড্ করিয়া পাশের দিকে ফেলিল, তখন একজন হাফ্‌ব্যাক্ কিক্ করিয়া বল দূরে পাঠাইয়া দিল!

চারিদিকে খুব হাততালি পড়িতে লাগিল। সাহেবেরাও তাহাতে যোগ দিল। দুই চারি জন চেঁচাইল, "well played goal-keeper!" ইউনাইটেডের ফর্‌ওয়ার্ডেরা বল লইয়া আর্গাইল্‌দের গোলের দিকে ছুটিল। খেলার বেগ কৌশলের সহিত চলিতে লাগিল!

৫

খেলার যেমন বিরাম নাই, দর্শকদের মুখেরও সেইরূপ বিরাম নাই। আট দশ বৎসরের বালক হইতে ষাট বৎসরের বৃদ্ধ পর্য্যন্ত খেলা দেখিতেছিল; বাক্সের উপর এক জায়গায় পাঁচ ছয় জন ছোট ছোট বালক বসিয়াছিল। এক জন বলিতেছিল, "গোবে যদি একবার বল পায় ত দেখিয়ে দেবে।"

গোবের নাম গোবিন্দ দত্ত, বয়স প্রায় পঁচিশ বৎসর। যে বালক তাহার কথা বলিতেছিল, তাহার এখনও বার বৎসর পূর্ণ হয় নাই; কিন্তু সে ইতিমধ্যেই ময়দানের ও ফুটবলের ভাষা বেশ শিখিয়াছে! গোবিন্দকে সকলে গোবে বলে, সেও বলে; তাহার চেয়ে গোবিন্দ যে বয়সে কত বড়, তাহা স্মরণ করে না। ছেলেদের খেলা দেখিবার যেরূপ নেশা হয়, ভদ্রতা শিক্ষার জন্য সেরূপ হয় কি না বিশেষ সংশয়স্থল।

২য় বালক। "তা গোবেকে বল দিচ্চে না কেন?"

৩য়। "সুবিধা পেলেই দেবে, ব্যস্ত হচ্চিস্ কেন?"

১ম। "এতক্ষণ খেলা হচ্চে কিছু ত হইল না।"

ময়দানের ছোক্‌রারা অনবরত কথা কহিতেছিল কে কেমন খেলোয়াড়, কাহার পায়ে কবে চোট লাগিয়াছিল। কোন্ রেফরী কি রকম, এইরূপ নানা প্রকার বিচার হইতেছিল।

ছোক্‌রা নম্বর ১। "আরে ভইয়া খেল্ তো জম্‌তাই নহি। আর্গাইল্ তো জোর্ নহি খেল্‌তা হায়।"

নম্বর ২। "নাটালোগ আগে বচাকে খেল্‌তা হায়, ফের্ বড়া জোর্ খেল্‌তা হয়।"

নম্বর ৩। "অভি হাফ্ টাইম্ হোগা, অব্ তক্ কুচ্ নহি হুয়া।"

বাঙ্গালীরা চাপিয়া খেলিতেছিল। গোরা দর্শকেরা চীৎকার করিতেছিল, "Buck up Argyles!" জনৈক সাহেব বলিতেছিল, This is quite the finest game of the tournament. It is indeed high class football."

তাহার পাশে বসিয়া একজন মেম। সে বলিল, "The Bengalee boys are wonderfully plucky and clever. They are playing a rather clean hard game."

সাহেব বলিল, "They are really fine exponents of football. They have learned the science and are remarkably quick on the ball. They deserve to win."

মেম হাসিয়া চোক ঘুরাইয়া বলিল, "But I hope they won't."

সাহেব হাসিতে লাগিল, "Ah, that's patriotic, but not sportsmanlike."

মেম ঈষৎ স্কন্ধ তুলিবার ভঙ্গী করিল। "I don't care. I hope the Argyles will win."

তখন বল আর্গাইলদের গোলের কাছে। একজন গোরা খেলোয়াড় হাত তুলিয়া "off side" বলিল। দর্শক গোরারা তারস্বরে চেঁচাইল, "off side, off side" রেফরী সে চীৎকারে কর্ণপাত করিল না। বল গোলের নিতান্ত কাছে আসিয়াছে দেখিয়া গোলকীপর্ দৌড়িয়া গিয়া মুষ্ট্যাঘাত বল দূরে নিক্ষেপ করিল। গোরা দর্শকেরা অসন্তুষ্ট হইয়া ক্রুদ্ধস্বরে বলিতে লাগিল, "Play the game, referee, play the game!"

যে সাহেব ও মেম পূর্ব্বে কথা কহিতেছিল, তাহারা এ কথা শুনিতে পাইল। মেম বলিল, "Why, what's wrong with the refereeing?"

সাহেব। "That's an absurd cry; the refereeing is all right! Party feeling makes people very unfair! Besides, don't you know, the spectators fancy they see most of the game and they have better judgment than the referee."

মেম। "But still it must be very annoying to the referee."

সাহেব। "Very likely, but it all comes in, in the day's work."

৬

কুড়ি মিনিট খেলা হইয়াছে, হাফ্‌টাইমের আর পাঁচ মিনিট বাকি আছে। কোন পক্ষে এ পর্য্যন্ত কিছু হয় নাই। খেলার নিমেষ মাত্র বিরাম নাই, খেলোয়াড়দের ক্লান্তি নাই, কিন্তু দুই পক্ষেই গোল্ করিবার চেষ্টায় ব্যর্থ হইতেছিল। হাফ্ টাইমের একটু পূর্ব্বে লাহিড়ী একটা পাস হইতে বল পাইয়া এক কোণ হইতে খুব জোরে শূট্ করিল। গোল্‌কীপরের হাতে লাগিয়া গোল পোষ্টে ঠেকিয়া জালের পিছনে গেল। ময়দানের ছোক্‌রারা কোনর কোনর্ (corner) বলিয়া চেঁচাইল!

রেফরী 'কর্ণর'দিল। ইউনাইটেডের ফর্‌ওয়ার্ড ও হাফ্ ব্যাকেরা গোলের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। ব্যাক দুই জনও কতকটা আগাইয়া আসিল। শূট্ করিবার পর, বল ঠিক গোলের মুখে আসিল। সেখানে দুই দলে ভারি হুড়াহুড়ি পড়িয়া গেল। বল গোলের ভিতর যায় যায় এমন সময় আর্গাইলদের গোল্‌কীপর্ লাফাইয়া উঠিয়া দুই হস্তের মুষ্টি দিয়া বলে আঘাত করিল, বল দূরে

গিয়া পড়িল। আর্গাইলের ফরওয়ার্ডেরা অম্নি বল লইয়া ছুটিল। ইউনাইটেডের ব্যাক্ ও হাফ্ ব্যাকেরা দৌড়িয়া আসিল; কিন্তু আর্গাইলের ফর্ওয়ার্ডেরা বল হেড্ করিয়া লইয়া চলিল। খেলার কৌশল চমৎকার! বল একেবারে মাটীতে পড়ে না, মাথায় মাথায় চলিতে লাগিল! দেখিতে দেখিতে কি হইতেছে কেহ জানিবার পূর্ব্বে সেণ্টর্ ফর্ওয়ার্ড হেড্ করিয়া বল গোলের মধ্যে নিক্ষেপ করিল! রেফরীর হুইস্‌ল্ বাজিল, বাহির করিয়া গ্রাউণ্ডের মাঝখানে রাখা হইল, খেলোয়াড়েরা আপন আপন স্থানে গেল। হাফ টাইমের বাঁশী বাজিল, খেলা বন্ধ হইল।

হাফ্টাইমের বাঁশী বাজিল— [illegible]

৭

আর্গাইলেরা গোল্ দিবামাত্র গ্রাউণ্ডের চারিধারে তুমুল কোলাহল হইতে লাগিল। সাহেব দর্শকেরা ঘন ঘন করতালি ধ্বনি করিতে লাগিল, গোরারা টুপি ছুঁড়িতে লাগিল, হাততালির শব্দ, মুখের নানাবিধ শব্দ, চারিদিকে হই-হই পড়িয়া গেল। মিলিটারি ব্যাণ্ড্ বাজিয়া উঠিল, ময়দানের ছোক্‌রারা কলরব করিতে লাগিল। বাঙ্গালী দর্শকদের মুখ ম্লান হইয়া গেল। ভিড়ের মধ্যে পাড়াগাঁয়ের কতকগুলি লোক ছিল, তাহারাও চর্চ্চা করিতে লাগিল। একজন বলিল, "ওরে ভাই নিতাই, ই ত ভাল হ'ল না। তবে তা বাঙ্গালীরা হার্‌বে।"

"ওরে তা লয়, তা লয়। আবার খেলায় তারা নিশ্চয় জিত্‌বে।"

পূর্ব্ববঙ্গীয়, মাড়োয়ারী, চীনা, ব্রহ্মদেশীয় লোকেরা সকলে নিজের নিজের ভাষায় নানা রকম আলোচনা করিতে লাগিল। ইতঃপূর্ব্বে যে সাহেব মেমের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহারাও কথাবার্ত্তা কহিতেছিল। মেমের মুখ আনন্দে উৎফুল্ল, সে বলিতেছিল, "I am delighted the soldiers have won. They are now sure to get the shield!"

সাহেব সস্মিতমুখে কহিল, "I don't know. It is true, they are leading by a goal but the Bengali lads are a tough lot and bad to beat. I wouldn't bet any thing on the result, as it seems to be quite open yet."

মেম একটু ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল, "You want the Bengalis to win. Is that right?"

সাহেব—"I still think they deserve to win! It'll be hard times, if they don't."

চারিদিকে সিগারেটের কটু ধোঁয়া ও গন্ধ। দর্শকেরা পান চিবাইতেছে ও সিগারেট্ খাইতেছে। দর্শকদের মধ্যে নানা রকম লোক আছে, সকলে শুধু খেলা দেখিতে ব্যস্ত নয়। একটি মোটাসোটা বাবু দাঁড়াইয়াছিলেন। সিগারেটওয়ালা আসিলে সিগারেট্ কিনিয়া তাহাকে পয়সা দিবার জন্য বাবু পকেটে হাত দিলেন। অমনি তাঁহার মুখ শুকাইয়া গেল। সমস্ত

পকেট্‌ দেখিলেন, টাকার ছোট ব্যাগটী কোথাও পাইলেন না! তাঁহার মুখ ও পকেটের বিফল অন্বেষণ দেখিয়া সিগারেট্‌ওয়ালা ছোক্‌রা ব্যাপার বুঝিল! দাঁত বাহির করিয়া কহিল, "বাবু পাকিট্‌ মার্‌ লিয়া ?"

গাঁট্‌কাটায় পকেট হইতে চুরী করিলে লোকসান যাহা হউক, লজ্জা ততোধিক হয়, কারণ যাহার যায়, তাহার নিজেকে বড় বোকা মনে হয়! বাবু আম্‌তা আম্‌তা করিয়া কহিলেন, "তাই ত, কখন নিয়েচে কিছুই টের পাই নি।"

সিগারেট্‌ওয়ালা বালকের আরও কএকটা দাঁত বাহির হইল, বলিল, "যদি টের পাবে ত নেবে কেমন কোরে ? তোমরা বাবু লোগ্‌ খেল্‌ দেখে, আর সে বেটারা তোমাদের পাকিট্‌ দেখে।"

বাবু একজন পরিচিত লোকের কাছে পয়সা ধার করিয়া সিগারেটের দাম দিলেন।

খান্‌সামারা খেলোয়াড়দের জন্য কাটা পাতি লেবু ও বরফের টুক্‌রা লইয়া আসিল। আর্গাইলেরা গ্রাউণ্ডের বাহিরে গেল; কিন্তু ইউনাইটেডেরা গ্রাউণ্ডের মাঝখানে দাঁড়াইয়া রহিল। হাফ্‌টাইম্‌ অথবা বিশ্রামকাল এই রকম করিয়া গেল। রেফ্‌রী আসিয়া আবার হুইস্‌ল্‌ দিল, আবার খেলা আরম্ভ হইল।

৮

লোকে মনে করিয়াছিল, এক গোল হারিয়া বাঙ্গালীরা দমিয়া যাইবে, কিন্তু তাহার কোন লক্ষণ দেখা গেল না! হাফ্‌টাইমের পর তাহারা আরও জোরে খেলিতে লাগিল, বিশেষ লাহিড়ী ও আর এক জন ফর্‌ওয়ার্ড বার বার বল আর্গাইল্‌দের গোলের দিকে লইয়া যাইতে লাগিল। আর্গাইল্‌দের কাপ্তেন, লাহিড়ীকে আগ্‌লাইবার জন্য এক জন হাফ্‌-ব্যাক্‌কে ইসারা করিয়াছিল ও মাঝে মাঝে বলিতে লাগিল, "Play him, play him !" কএক মিনিট খেলা হইতে লোকে বুঝিতে পারিল যে, আর্গাইলেরা ক্রমাগত আত্মরক্ষা করিতেছে; বড় একটা আক্রমণ করিতেছে না! বাঙ্গালীরা একবার বল পাইলে গোরারা আর সহজে বল কাড়িয়া লইতে পারে না। অবশেষে, তিন জন বাঙ্গালী বল পাস্‌ করিয়া লইয়া চলিল। আর্গাইলের এক জন হাফ্‌-ব্যাক্‌ বাঙ্গালীদের এক জন ফর্‌ওয়ার্ডকে চার্জ্‌ করিতে আসিল। বাঙ্গালী ফর্‌ওয়ার্ড্‌ পা দিয়া বল একটু উঁচু করিয়া দিয়া পাশ কাটাইয়া গেল। আর একজন ফর্‌ওয়ার্ড্‌ সেই বল বুক দিয়া আট্‌কাইল। তাহার হাতে বল ঠেকিল কি না সকলে দেখিতে পাইল না; কিন্তু দুই এক জন গোরা খেলওয়াড় হাত তুলিয়া বলিল, "Hand ball !" অমনি গোরা দর্শকেরা চেঁচাইতে লাগিল, "Hand ball, hand ball !" রেফ্‌রী সে চীৎকারে কাণ দিল না। ওদিকে বল একজন ব্যাক্‌কে ছাড়াইয়া গিয়াছে। লাহিড়ী বল লইয়া বায়ুবেগে ছুটিল। অবশিষ্ট একজন ব্যাক্‌ তাহার নিকট হইতে বল কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু লাহিড়ী তাহাকে ফাঁকি দিয়া বল আগে লইয়া গিয়া শূট্‌ করিল! বল তীরের মত বেগে গিয়া গোলে প্রবেশ করিল। সে বল রক্ষা করিবার সাধ্য গোলকীপরের ছিল না!

বাঙ্গালী ও দেশীয় অপর দর্শকেরা আনন্দে উন্মত্তের মত হইয়া উঠিল। ময়দানের ছোকরারা লাফাইয়া নাচিতে আরম্ভ করিল, ছাতা ছড়ি কন্দুকের মত শূন্যে ঘুরিতে লাগিল, বার বার আনন্দধ্বনিতে মাঠ কাঁপিয়া উঠিল। গোরারা চুপ, সাহেবেরা নিস্তব্ধ। কোলাহল একটু কমিলে সেই মেম সাহেবকে বলিল, "So the Bengalis have drawn level; I wonder whether there will be a draw and extra time will have to be played !"

সাহেব ঘড়ীর দিকে কটাক্ষ করিল, "There are fifteen minutes yet left and a great many things may happen during that. I don't think there will be a draw !"

মেমের মুখ মলিন হইয়া গেল "You think the Bengalis will win ?"

সাহেব হাসিল; "Don't prophesy ere you know ! You See everything will be clear in a few minutes.'

বল গ্রাউণ্ডের মাঝে রাখিয়া আবার খেলা আরম্ভ হইল। আবার বল আর্গাইলদের গোলের কাছে গিয়া উপস্থিত। গোল্‌কীপর্‌ দৌড়িয়া গিয়া বল হাতে তুলিয়া লইয়া দূরে নিক্ষেপ করিল। আর্গাইলের ফর্‌ওয়ার্ডের

বল পাইয়া ইউনাইটেডের গোলের অভিমুখে ছুটিল। গোলের কাছে হয় একজন ব্যাকের হাত বলে ঠেকিয়া থাকিবে, অথবা আর কোন রকম ফাউল হইয়া থাকিবে,— আর্গাইলের খেলোয়াড়েরা হাত তুলিয়া ফাউলের দাবী করিল! রেফ্‌রী হুইস্‌ল দিল। গোরা দর্শকেরা চেঁচাইতে লাগিল, "Penalty, penalty!"

রেফ্‌রী পেনাল্টীর আদেশ করিল। ময়দানের ছোক্‌রারা চীৎকার করিয়া উঠিল, "পলেন্টি দিয়া, পলেন্টি! বাঙ্গালী লোগ্‌কো রেফ্‌রী হরা দেগা!"

বাঙ্গালী দর্শকেরাও বলিতে লাগিল, "পেনাল্টি হইল কেমন করিয়া? এত জোর করিয়া হারাইয়া দেওয়া!"

বাঙ্গালীদের গোলকীপর একা গোলের মুখে রহিল, আর সকলে সরিয়া গেল। পেনাল্‌টি লাইনের মাঝখানে বল রাখিয়া আর্গাইলের একজন ফরওয়ার্ড শূট্‌ করিল। বল বারের উপর দিয়া চলিয়া গেল, গোল হইল না! ময়দানের ছোকরারা আর বাঙ্গালীরা আনন্দসূচক কোলাহল করিতে লাগিল। গোলকিক্‌ হইতে বাঙ্গালীরা আবার চাপিয়া খেলিতে লাগিল। তাহাদের খেলার বিচিত্র কৌশল সমবেত লক্ষ লোক মুগ্ধ হইয়া দেখিতে লাগিল। একজন বাঙ্গালী খেলোয়াড় দুই তিন জন গোরাকে ফাঁকি দিয়া বল লইয়া যায়। একবার একজন বাঙ্গালী ফরওয়ার্ড বল লইয়া যাইতেছে, এমন সময় আর্গাইলের একজন হ্যাফ-ব্যাক্‌ তাহার পথরোধ করিল। বাঙ্গালী খেলোয়াড় বল লইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। দুই তিন বার হাফ-ব্যাক্‌ তাহার নিকট হইতে বল কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিল, প্রত্যেক বার বাঙ্গালী খেলোয়াড় বল একটু সরাইয়া দিয়া তাহাকে ঠকাইল। মাঠ শুদ্ধ লোক হো হো করিয়া হাসিতে লাগিল! অবশেষে বাঙ্গালী খেলোয়াড় বল লইয়া পলায়ন করিল!

খেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। পশ্চিম দিকে মেঘ উঠিতেছে, মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চিক্‌মিক্‌ করিতেছে। বাতাস একটু খর বহিতেছে। বৃষ্টি আসিবার উদ্যোগ দেখিয়া সাহেবেরা ও বাঙ্গালীরা ম্যাকিণ্টস গায় দিতে লাগিল।

বাতাসের সঙ্গে যেন খেলারও বেগ বাড়িল। মুহূর্ত্ত মাত্র বিরাম নাই, বাঙ্গালীরা আর্গাইলদের গোল আক্রমণ করিতে লাগিল। অবশেষে উহাদের একজন ফরওয়ার্ড বল লইয়া ব্যাক্‌ দুইজনকে ছাড়াইয়া গেল। কোণ হইতে শূট্‌ করিল। সে রকম স্থান হইতে গোল শূট্‌ করা বড় কঠিন, কিন্তু ভোঁ করিয়া বল গোলে প্রবেশ করিল, গোল্‌কীপর দৌড়িয়া আটকাইতে পারিল না।

সংক্ষুব্ধ সমুদ্রের ন্যায় সেই বিশাল জনতা গর্জ্জিয়া উঠিল! করতালি ধ্বনির পর করতালি ধ্বনি, জয়োল্লাস কোলাহলের পর কোলাহল! চেয়ারে বেঞ্চে দর্শকেরা লাফাইয়া উঠিল, মাথার উপর অসংখ্য ছড়ি ও ছাতা ঘুরিতে লাগিল। সমুদ্রতটে যেমন দোলায়মান মহা তরঙ্গ আঘাত করে, সেইরূপ সেই মানবসমুদ্রতটে আনন্দতরঙ্গ বারংবার আঘাত করিতে লাগিল। সে দৃশ্য দেখিলে ভুলিতে পারা যায় না।

সেই মেম ম্লানমুখে ঈষৎ হাসিয়া সাহেবকে বলিল, "So the unexpected sometimes happens."

সাহেব গম্ভীরভাবে বলিল, "On the contrary it is the expected that has happened. I all along expected the Bengalis to win."

"Is it all over?"

সাহেব ঘড়ির দিকে চাহিয়া বলিল, "Time's up and I think it is all over, including the shouting. Though we may hear some more when the shield is given away."

হাটখোলা হইতে কএকজন পূর্ব্ব বঙ্গের লোক আসিয়াছিল। একজন কহিল, "আমি ত কইছিলাম ইউনাইটেড জিতিবে।"

পাশে সেই দেশীয় এক জন মুসলমান দাঁড়াইয়াছিল। সে বলিল, "মুইওত সেই কইছিলাম।"

ময়দানের ছোক্‌রারা খুব আস্ফালন করিতেছিল। নম্বর ১ বলিতেছিল, "আজ তো বাঙ্গালী সীল্ড্‌ লে যায়গা। গোরা লোগ্‌ কিসিকো কুছ্‌ নহি সমঝ্‌তা হ্যায়।"

নম্বর ২। "আজ, উন্‌ লোগ্‌কা মুহ্‌ কালা হুয়া।"

বল গ্রাউণ্ডের মাঝখানে লইয়া গিয়া অল্পক্ষণ খেলা হইতেই রেফরী হুইস্‌ল্‌ দিল! তখন জয়ধ্বনি ও আনন্দ-কোলাহল করিয়া দর্শকেরা গ্রাউণ্ডে প্রবেশ করিতে লাগিল!

খেলা শেষ হইলে, আর্গাইলদের কাপ্তেন আসিয়া ইউনাইটেডের কাপ্তেনের সহিত শেক্‌হ্যাণ্ড করিল। বাঙ্গালী দর্শকেরা ইউনাইটেডের খেলোয়াড়ের সহিত কোলাকুলি করিতে লাগিলেন। যখন ইউনাইটেডের কাপ্তেন ও খেলোয়াড়েরা শীল্ড্‌ আনিতে গেল, তখন ইংরেজেরা ও গোরারা মিলিয়া টুপি ঘুরাইয়া তাহাদিগকে খুব 'চিয়র' করিতে লাগিল। চারিদিকে খুব করতালি পড়িতে লাগিল। ইণ্ডিয়ান ফুটবল্‌ এসোশিয়েশনের সভাপতি বাঙ্গালীদের খেলার বিশেষ প্রশংসা করিয়া, বক্তৃতার অবসান হইলে, জেতাদিগকে শীল্ড্‌ ও মেডেল প্রদান করিলেন। দর্শকদিগের আনন্দধ্বনিতে মাঠ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল।

সন্ধ্যা ঘোর হইয়া আসিয়াছে, অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতেছে। পথে আলোক জ্বলিতেছে, গঙ্গাবক্ষে জাহাজে বিদ্যুতের আলোক জ্বালিয়া দিয়াছে। খেলা শেষ হইলে ব্যাণ্ড্‌ বাজিয়া উঠিল। গোধূলির অন্ধকারে সেদিনকার খেলা আলোচনা করিতে করিতে দর্শকমণ্ডলী গৃহে ফিরিল।

ফুটবল খেলায় সেই বৎসর বাঙ্গালীরা প্রথম বার শীল্ড পাইয়াছিল।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

ধোয়ীকবির কবিত্ব-শক্তি লাভ।

('সেখ শুভোদয়া' অবলম্বনে)

মহারাজ বল্লাল সেনের রাজত্বকালে গৌড়রাজসভায় চারিজন ব্রাহ্মণপণ্ডিত মহারাজের প্রিয়পাত্র ছিলেন। তাঁহারা কবিযশঃপ্রার্থী হইয়া বাগ্‌বাদিনীর আরাধনার্থ ভাগীরথীতীরে মণ্ডপ নির্ম্মাণপূর্ব্বক তন্মধ্যে একটি সুন্দর বেদিকা প্রস্তুত করিয়া তদুপরি বারিপূর্ণ ঘটস্থাপনা করিয়াছিলেন। এক বৎসর দেবীআরাধনার পর চৈত্র-বলি-মহোৎসবের দিবস উপস্থিত হইল। সেই দিবস অসংখ্য নরনারী গঙ্গাস্নানোদ্দেশে গঙ্গাতীরে সমবেত হয়। ধোয়ী নামক একজন তন্তুবায় রাজাদেশে ব্রাহ্মণ-চতুষ্টয়ের সেবকরূপে অবস্থানপূর্ব্বক তাঁহাদের নিয়ত পরিচর্য্যা করিতেন। ব্রাহ্মণ-সেবকরূপে অবস্থানপূর্ব্বক পণ্ডিত ব্রাহ্মণগণের মুখনিঃসৃত পবিত্র বেদধ্বনি শ্রবণ এবং একনিষ্ঠভাবে তদ্বিষয় চিন্তা করিতে করিতে ধোয়ীর হৃদয় কলুষবিধৌত হইয়া গেল। প্রতিদিন প্রাতঃস্নান, পুষ্পচয়ন ও দেবীপূজার মধ্য দিয়া ধোয়ী প্রকৃতিদেবীর অসীম সৌন্দর্য্যময় বিবিধ শিক্ষাপরিপূর্ণ বিদ্যামন্দিরের স্বভাবসুলভ শিক্ষা দ্বারা বিপুল জ্ঞানলাভ করিলেন।

ধোয়ী তন্তুবায়ের সাধনা

সেই উন্মুক্ত প্রান্তর, সেই মেঘবর্ণ শৈলমালার পার্শ্ব দিয়া তরঙ্গায়িত গঙ্গাপ্রবাহ, সেই পুষ্পকানন, সেই পশুগণ সহ রাখালগণের আনন্দনিকেতন, সেই পুষ্পে পুষ্পে মধুপগুঞ্জন, সেই পল্লীবাসী নরনারীগণের আড়ম্বরহীন সরল সম্ভাষণ, সেই স্বচ্ছসলিলোপরি শতদলের শোভা, সেই ঊষার অরুণালোক ধোয়ীকবির হৃদয়ে এক নূতন জগৎ সৃষ্টি করিয়া দিল।

যে দেহ, যে প্রাণ লইয়া ধোয়ী নগর হইতে অদূর-পল্লীপার্শ্বস্থ যোগাশ্রমে প্রথমে আগমন করিয়াছিলেন, অদ্য আর সেই দেহ, সেই প্রাণ নাই। তাঁহার অন্ধকারাচ্ছন্ন হৃদয়মন্দির সহস্র অরুণালোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। প্রকৃতিরাণীর বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানজনক একটি উপাধি-পরীক্ষায় ধোয়ী তন্তুবায় অদ্য উত্তীর্ণ হইয়াছেন—দুদিন পরেই তাঁহার যশঃসৌরভে চতুর্দ্দিক্ আমোদিত হইবে। যে চারিজন বিদ্যার্থী বাগ্‌দেবীর ধ্যান ও পূজা দ্বারা কবিত্ব-শক্তি-লাভের জন্য তপস্যা করিতেছিলেন,

প্রকৃতির বিশ্ববিদ্যালয়ে ধোয়ীর শিক্ষালাভ

"ক্ষ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফিরে পরশ-পাথর।
মাথায় বৃহৎ জটা   ধুলায় কাদায় কটা,
মলিন ছায়ার মত ক্ষীণ কলেবর।"—সোনার তরী

চিত্র শিল্পী···শ্রীচারুচন্দ্র রায়।

K. V. Seyne : Bros.

তাঁহাদের সেবা করিয়া, তাঁহাদের কার্য্যাবলী সন্দর্শন করিয়া এবং তাঁহাদের পূজার মন্ত্র, স্তব, স্তুতি শ্রবণ করিয়া যে ভাবগঙ্গা তাঁহার হৃদয়ে প্রবাহিত হইল, প্রকৃতির বিপুল সৌন্দর্য্যের সংমিশ্রণে তাহাই তাঁহার ভাবী অপূর্ব্ব কবিত্ব-শক্তির সূচনা করিয়া দিল।

এক বৎসরে সিদ্ধি-লাভের পাত্র

শত বৎসরের চেষ্টায় মানব যাহা আয়ত্ত করিতে সমর্থ হয় না, ধোয়ী এক বৎসরের নীরব সাধনায় সেই সিদ্ধি লাভ করিলেন। প্রথম সাধুসঙ্গ, দ্বিতীয় স্বভাবসুন্দর পল্লীবাস, তৃতীয় নব নব ভাবতরঙ্গের অপূর্ব্ব প্রতিঘাত। তাঁহার এই সাধনাই সিদ্ধিলাভের সোপান হইল। সেবা ও ত্যাগ তিনি গৌণভাবে আয়ত্ত করিয়াছিলেন।

মহারাজ লক্ষ্মণসেন ধোয়ীকে ভাল বাসিতেন। ধোয়ীর প্রধান গুণ প্রভুভক্তি। সেই ভক্তিবলেই তিনি সকলকে বাধ্য করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অদ্য বাগ্‌দেবী-আরাধনার শেষ দিবস—পূজাদি সমাধা হইয়া গিয়াছে। ধোয়ী প্রতিদিন রাত্রে সাধনার স্থানে অবস্থান করিতেন, দ্বিজ-চতুষ্টয় আপনাপন আবাসে গমন করিতেন। দিবসে ব্রাহ্মণগণ রাজসভায় গমন করিতেন। কেবল পূজার সময় মণ্ডপে আগমনপূর্ব্বক পূজাদি করিতেন, কিন্তু ধোয়ী দিবা রাত্র কখন ব্রাহ্মণগণের সহিত, কখন রাখালবালক-গণের সহিত আলাপ করিতেন; কখন বা পল্লীবাসিগণের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিতেন; এবং অবশিষ্ট সময় নির্জ্জনে চিন্তা করিতেন।

ধোয়ীর শেষ পরীক্ষাদান

ব্রাহ্মণগণ অদ্য পূজাদি সমাপনান্তে গৃহগমনে প্রস্তুত হইলেন। এমন সময় ধোয়ী বলিলেন—প্রভু আমি বৎসরাবধি গৃহে গমন করি নাই, বাটীর কোন সমাচার রাখি নাই, স্ত্রীপুত্রাদি জীবিত কি মৃত, তাহা চিন্তা করি নাই। অদ্য গৃহগমনের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইয়াছে। অতএব আমিও আপনাদের পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করিব। ব্রাহ্মণগণের মধ্যে এক-জন বলিলেন, অদ্য এই স্থানেই অবস্থান কর, কল্য ব্রত শেষ হইবে, গঙ্গাস্নানান্তে গৃহে গমন করিবে। ধোয়ী তাহাতে সম্মত হইলেন না। ব্রাহ্মণগণ ধোয়ীকে হস্তপদ বন্ধনপূর্ব্বক সেই স্থানে রাখিয়া প্রস্থান করিলেন।

ধোয়ীর নীরব সাধনার সিদ্ধি

রাত্রি অধিক হইয়াছে। সেই গঙ্গাতীরবর্ত্তী অরণ্য মধ্যস্থ সাধনামণ্ডপ নিস্তব্ধ। ধোয়ী বন্ধন-যন্ত্রণা অনুভব করিতে করিতে সবেমাত্র নিদ্রিত হইয়াছেন, এমন সময় দেবী বাগ্‌বাদিনী সরস্বতী সেই মণ্ডপ মধ্যে প্রবেশ করিয়া হস্তপদাবদ্ধ ধোয়ীকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন—অরে! ব্রাহ্মণচতুষ্টয় কোথায়?' তন্তুবায় বলিলেন, 'কে মা তুমি! এই নির্জ্জন স্থানে কে মা?' এই বলিয়া মস্তক অবনত-পূর্ব্বক প্রণাম করিলেন। দেবী পুনরপি বলিলেন, 'ব্রাহ্মণ-গণ কোথায়?' ধোয়ী বারংবার প্রণামপূর্ব্বক বলিলেন, 'মা! তাঁহারা আমাকে বন্ধনপূর্ব্বক এই স্থানে রাখিয়া নিজাবাসে গমন করিয়াছেন। দেবী এই বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রস্থানোদ্যত হইলে ধোয়ী কাতরকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মা! কি জন্য এ স্থানে আগমন করিয়াছিলেন, এবং কি কারণেই বা এস্থান ত্যাগ করিয়া চলিলেন?' বাগ্‌দেবী ধোয়ীর বন্ধন মোচন করিলেন এবং বলিলেন, 'দেখ ধোয়ী! যে চারিজন ব্রাহ্মণ তোমাকে বন্ধন করিয়া-ছিল, তাহারা একবৎসর কাল আমারই আরাধনা করিতে-ছিল, তাহাদের জন্যই আমি এই স্থানে উপস্থিত হইয়া-ছিলাম।' এই বলিয়া দেবী মণ্ডপ ত্যাগ করিতে অগ্রসর হইলে ধোয়ী বলিলেন, 'মা! আপনি যখন আমাকে বন্ধনমুক্ত করিয়াছেন, তখন আপনার সহিত আমি নিজালয়ে গমন করিব। কেবলমাত্র রাজভয়ে আমি এত দিবস গৃহে গমন করি নাই।' দেবী বলিলেন, 'মণ্ডপে বেদিকার উপরে যে জলপূর্ণ ঘট রহিয়াছে, ব্রাহ্মণগণকে উহার জলপান করিতে বলিবে এবং আমার আজ্ঞা জ্ঞাপন করিয়া তুমিও পান করিবে।' এই বলিয়া দেবীমূর্ত্তি অদৃশ্য হইল। ধোয়ী সরস্বতীর দর্শন পাইয়া উৎফুল্ল হইলেন এবং মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, যাহারা আমাকে বন্ধন করিয়াছে, তাহারা কি আমাকে জলপান করিতে দিবে? নিশ্চয় আমাকে এই পবিত্র বারি হইতে বঞ্চিত করিবে। এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে ধোয়ী স্থির করিলেন, ঘটস্থ জল তখনই পান করিবে। ধোয়ী তদনুযায়ী যথাশক্তি সেই জল পান করিলেন এবং অবশিষ্ট জল গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করিলেন। রাত্রি প্রভাত

হইল। ধোয়ী গঙ্গাস্নানান্তে সর্ব্বপ্রথমে রাজসভায় গমন করিলেন।

সেই সময় রাজসভায় কোন পণ্ডিত মহাকবি কালিদাসের এক কবিতা লইয়া বাখ্যা আরম্ভ করিয়াছিলেন। ধোয়ী সেই ব্যাখ্যার ভ্রমপ্রমাদ প্রদর্শন করিলে উক্ত পণ্ডিত বলিলেন, "আরে পাপ তন্তুবায়! কালিদাসের কাব্যের প্রত্যুত্তর করিতে সাহসী হইতেছ? তোমার সাহস দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম; তুমি এই শ্লোকের প্রকৃত মর্ম্ম কি বল দেখি?" তখন ধোয়ী অলৌকিক উপায়লব্ধ বিদ্যাপ্রভাবে তাহার যথাযথ মর্ম্ম বুঝাইয়া দিলেন।

রাজসভায় কবির সম্মান

ইহা শুনিয়া সভাস্থ অপরাপর পণ্ডিতগণ তন্তুবায় ধোয়ীকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন। সভা মধ্যে সেখ জালাল-উদ্দিন উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি বলিলেন, "তন্তুবায় নিশ্চয় একজন মহাপণ্ডিত"। এই বলিয়া তিনি তন্তুবায়কে সুন্দর কুণ্ডলদ্বয় উপহার দিলেন। মহারাজ লক্ষ্মণসেনের সভায় সেখ-প্রসাদে তন্তুবায় ধোয়ী, পণ্ডিত বলিয়া সম্মান প্রাপ্ত হইলেন। এই প্রকারে ধোয়ীর মহিমা রাজ্যস্থ সকল জনপদে প্রকাশিত হইল।

সেখ কর্ত্তৃক ধোয়ীর কুণ্ডললাভ

উপসংহার।

ধোয়ী নামক একজন বিখ্যাত কবি মহারাজ লক্ষ্মণসেনের সভায় পণ্ডিত ছিলেন। কবি জয়দেব তাহা বলিয়াছেন। কালীদাসের মেঘদূত অনুকরণে তিনি "পবনদূত" রচনা করিয়া মহারাজের নিকট সম্মানিত হইয়াছিলেন। সেই ধোয়ী কবির সহিত 'সেখ শুভোদয়া'-বর্ণিত তন্তুবায় ধোয়ী কবির কোন সম্বন্ধ আছে কি না, বলিতে পারি না; পরলোকগত রাধেশচন্দ্র শেঠ মহাশয় ধোয়ী কবিকে তন্তুবায় বলিয়াছিলেন। তাহা তাঁহার স্বকপোলকল্পিত উক্তি নহে বলিয়া বিবেচনা হয়। তিনি এই 'সেখ শুভোদয়া' গ্রন্থাবলম্বনেই ঐ প্রকার মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। কালিদাসের ন্যায় ধোয়ী, সরস্বতীর অনুগ্রহলাভ করিয়াছিলেন। মালদহ জেলার সীমান্তপ্রদেশে মহানন্দাতীরে 'সরস্বতী বেলুয়া' বলিয়া একটি স্থান আছে। প্রবাদ আছে, মহাকবি কালিদাস সেই স্থানে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। সেই স্থানে সরস্বতী মূর্ত্তি ও অন্যান্য দেবমূর্ত্তি আছে। অদ্যাপি বহুদূরদেশাগত বিদ্যার্থী সেইস্থানে আগমনপূর্ব্বক উপবাস ও "হত্যা" দিয়া থাকেন এবং সেই সরস্বতী কুণ্ডে স্নান ও সরস্বতী পূজা করিয়া সেই স্থানের মৃত্তিকা ভক্ষণপূর্ব্বক নিজ বিদ্যাস্থানে গমন করেন। সেনবংশীয়গণের রাজত্বকালে সেই স্থান পীঠস্থান বলিয়া খ্যাত ছিল। 'সেখ শুভোদয়া'-বর্ণিত গঙ্গাতীরসন্নিকটস্থ সরস্বতী আরাধনার স্থান সেই 'সরস্বতী বেলুড়' কি না তদ্বিষয়ে যথাযথ প্রমাণলাভ সুকঠিন। সময়ান্তরে সরস্বতী-বেলুড়ের দেবীচিত্র সহ উহার বিবরণ পত্রস্থ করিব।

সরস্বতী পীঠ-বেলুড় বা সরস্বতী-বেলুয়া

শ্রীকৃষ্ণচরণ সরকার।

আমার য়ূরোপ ভ্রমণ।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

পোর্ট সৈয়দ হইতে ব্রিন্দিসি।

ইজিপ্টের সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ এই পোর্ট সৈয়দে, আর এই পোর্ট সৈয়দই আমার ইজিপ্টের শেষ নগর দর্শন—ইহাই প্রথম এবং ইহাই শেষ। এই স্থান হইতে একটি রেলপথ কায়েরো পর্য্যন্ত গিয়াছে। তীরভূমিতে কএকটি সুন্দর অট্টালিকা দেখিতে পাইলাম। খালের প্রবেশপথের পার্শ্বেই প্রসিদ্ধ স্থপতি ডি লেসেপ্সের একটি মর্ম্মর-প্রস্তর-নির্ম্মিত মূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম। আমাদের জাহাজ তীর সংলগ্ন হইবামাত্র আরবদেশীয় দ্রব্যবিক্রেতৃগণ নানা রকম
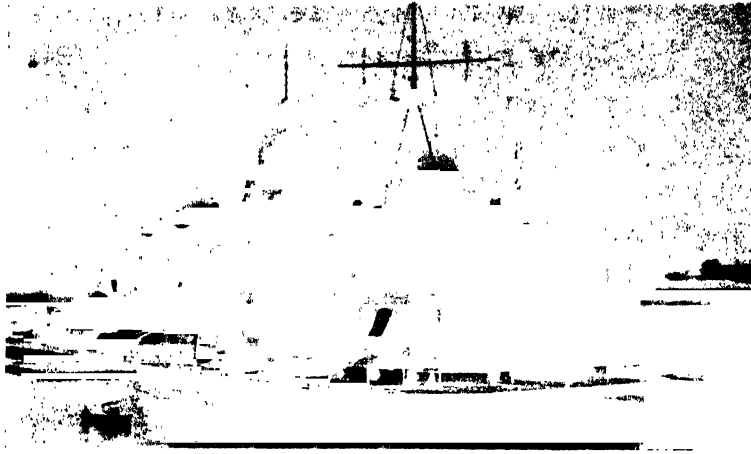
পোর্ট সৈয়দ।

দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য তাড়াতাড়ি জাহাজের উপর আসিতে লাগিল। আর একস্থানে ভিন্ন ভিন্ন কোম্পানীর এজেণ্টগণ সেই সেই কোম্পানীর নাম ধরিয়া চীৎকার আরম্ভ করিয়া দিল; তাহাদের অভিপ্রায় এই যে, যাত্রীদিগের মধ্যে যাহারা যে কোম্পানীর মারফৎ যাইতেছে, তাহারা সেই কোম্পানীর লোককে চিনিয়া লউক এবং তাহাদের ব্যবস্থা বন্দোবস্ত করিয়া লউক। তখন চারিদিকে একটা গোলমাল, একটা চলাফেরার ধুম পড়িয়া গেল। আমাদিগকেও এই স্থানে মারমোরা জাহাজ ত্যাগ করিয়া পি এণ্ড ও কোম্পানীর আর একখানি জাহাজে উঠিতে হইবে। এই জাহাজের নাম "ওসিরিস।" আমরা তখন উক্ত জাহাজে যাইবার আয়োজন করিতে লাগিলাম; এ কয় দিন যাঁহাদের সহিত সুখে কাটাইয়াছিলাম, তাঁহাদের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া নূতন জাহাজে চড়িয়া বসিলাম।

এই স্থানে একটি কথা বলিতে হইতেছে। বোম্বাই হইতে এই পোর্ট সৈয়দ পর্য্যন্ত একটি ভদ্রলোক আমাদের সহযাত্রী ছিলেন; তাঁহার সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলা আমি অবশ্য-কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেছি। ইনি নাগপুরের বিশপ বা খৃষ্টধর্ম্মযাজক রেভারেণ্ড আয়ার চ্যাটারটন্ মহোদয়। জাহাজের উপরই ইঁহার সহিত আমার প্রথম পরিচয় হয়। ইনি একটি মানুষের মত মানুষ; ইঁহার সহিত বাক্যালাপ করিলে ইঁহার মহত্ব বেশ বুঝিতে পারা যায়। খৃষ্টধর্ম্মযাজকেরা ভারতবর্ষের ধর্ম্মকর্ম্ম সম্বন্ধে সাধারণতঃ যে সকল সুন্দর মত সযত্নে পোষণ করিয়া থাকেন, ইনি তাহা করেন নাই দেখিয়া আমার বড়ই আশ্চর্য্য বোধ হইল। ইঁহার ধর্ম্মমত অতি উদার ও সার্ব্বজনীন; আমাদের হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধেও ইঁহার মত বিরুদ্ধভাবাপন্ন নহে। পোর্ট সৈয়দে ইঁহার সহিত ছাড়াছাড়ি হইবার পর এমারেল্ড আইলে ইহার বাসভবনে পুনরায় ইঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। জাহাজে অল্প কএকদিনের আলাপ পরিচয়েই আমরা বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলাম। জাহাজের উপর যে কএকদিন আমরা একসঙ্গে ছিলাম, সেই সময়ে প্রতিদিন অনেকক্ষণ করিয়া আমরা ভারতের ধর্ম্ম-সমস্যা সম্বন্ধে বন্ধুভাবে বাদানুবাদ ও আলোচনা করিয়াছি। বোম্বাই হইতে পোর্ট সৈয়দ পর্য্যন্ত ভ্রমণের কথা মনে হইলেই এই মহদাশয় বিশপ মহাশয়ের কথা আমার স্মৃতিপথে উদিত হইয়া থাকে।

বেলা এগারটার সময় আমাদের জলযান যাত্রা আরম্ভ করিলেন, আমরা ভূমধ্যসাগরে ভাসিলাম। জাহাজ ছাড়িবামাত্রই তাঁহার ঝাঁকুনি ও হেলনদোলন দেখিয়া বুঝিলাম যে, ইনি মন্থরগামী নহেন। একটু পরেই তাহার বিশেষ পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। এ জাহাজ বা বোটখানি তেমন বড় নহে; তাহা হইলেও যে পঞ্চাশজন যাত্রী ইহাতে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের কোন কষ্ট বা অসুবিধা হয় নাই। এই দিন সন্ধ্যার পরেই আমরা সর্ব্বপ্রথম উত্তাল তরঙ্গে পড়িয়াছিলাম, ভূমধ্যস্থ সাগর এই রাত্রিতে তরঙ্গভঙ্গে যাত্রীদিগকে বিশেষ ক্লিষ্ট করিয়াছিলেন, আমরা সকলেই বেশ নাড়াচাড়া খাইয়াছিলাম। সৌভাগ্যক্রমে, ইহাতে আমি তেমন কাতর হইয়া পড়ি নাই, কারণ এই নাগরদোলার নর্ত্তনে আমার সুনিদ্রা আসিয়াছিল, তবে প্রথমটা এই রকম দোলানি ও তজ্জনিত নাড়াচাড়ায় আমার নিদ্রার যে কিঞ্চিৎ ব্যাঘাত জন্মিয়াছিল, তাহা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি

না। পার্শ্বের ক্যাবিনগুলি হইতেও কলরব ও ঝন্‌ঝন্‌ শব্দ আসিয়া আমাকে বিশেষ উত্যক্ত করিয়াছিল।

পরদিন প্রাতঃকালে ১লা মে তারিখে আর কোন গোল ছিল না। শয্যা ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিয়াই আমি সুন্দর প্রাতঃকালকে সানন্দে অভিনন্দন করিয়াছিলাম। পার্শ্বে চাহিয়া দেখিলাম, অদূরে ক্রীট দ্বীপ আমাদিগের জন্য সুসজ্জিতভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। ক্রমাগত ছয় ঘণ্টা আমরা এই দ্বীপ দেখিতে পাইয়াছিলাম। ক্রীট দ্বীপের দৈর্ঘ্য প্রায় দেড়শত মাইল। এই দ্বীপ লইয়াই বিগত গ্রীস-তুরস্ক যুদ্ধ আরম্ভ হয়। এই দ্বীপের মধ্যে অবস্থিত কএকটি তুষারশীর্ষ পর্ব্বত অতি সুন্দর দেখাইতেছিল; আর তাহার মধ্যে সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গ 'আইডা' (৮ হাজার ফিট উচ্চ) অদূরে আকাশভেদ করিয়া দণ্ডায়মান ছিলেন। সমুদ্র কিন্তু সমস্ত দিনই অস্থির ছিল, মধ্যে মধ্যে খুব তুফানও উঠিয়াছিল। ২রা মে বুধবার অপরাহ্ণ দুইটার সময় আমরা এড্রিয়াটিক সাগরে প্রবেশ করিলাম এবং সেই দিনই পাচটার সময় আমাদের জাহাজ ব্রিন্দিসিতে পৌছিল।

দূর হইতে এই ব্রিন্দিসি বন্দরের দৃশ্য অতি মনোরম। রোমকেরা পূর্ব্বে এই বন্দরকে ব্রুন্দুসিয়ম বলিয়া ডাকিত। বন্দরের নিকটেই কএকটি দুর্গ আমাদের নয়নপথে পতিত হইল। আমরা কএকখানি ইটালিয়ান টর্পেডো বোটের নিকট দিয়া গেলাম। এইগুলিকে দেখিয়া আমাদের একজন সহযাত্রী বলিয়া উঠিলেন, "এগুলি আমাদের সঙ্গে যাইবে বলিয়া এখানে অপেক্ষা করিতেছে।" বন্দরে অনেকগুলি শ্বেতকায় কুলী দেখিলাম। তাহাদের মলিন ও ছিন্ন বেশভূষা এবং চেহারা দেখিয়া আমার ভাল লাগিল না।

আমরা টমাস কুক এণ্ড সন্‌সের খাস যাত্রী। তাই সেই কোম্পানীর অধ্যক্ষগণ আমাদের সঙ্গী ও পথপ্রদর্শক হইবার জন্য একজন ইটালিয়ান ভদ্র লোককে এই স্থানে প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই ভদ্র লোকটির নাম মিঃ ফ্রান্সিস ম্যান্‌টেলি। আমাদের জাহাজ তীরসংলগ্ন হইবামাত্র এই ভদ্রলোকটি জাহাজে আসিয়া আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং তাঁহার পরিচয় প্রদান করিলেন। তাঁহার সহিত অতি অল্পক্ষণ কথোপকথনেই বুঝিতে পারিলাম যে, যদিও তিনি জাতিতে ইটালিয়ান এবং তাঁহার বাড়ী টিউরিণে, তবুও তিনি ইংরেজি ভাষা বেশ জানেন; অবশ্য একজন বিদেশীয় ভদ্রলোকের পক্ষে অপর দেশের ভাষায় যতদূর অভিজ্ঞ হওয়া সম্ভবপর, ইঁহার ইংরেজি ভাষায় ততখানি অভিজ্ঞতা ছিল। এতদ্ব্যতীত তিনি য়ুরোপের আরও পাঁচ ছয়টি দেশের ভাষা জানেন। এই ভদ্রলোকটি আমাদের বিশেষ উপকারে লাগিয়াছিলেন; আমি বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, এই প্রকার কোন ভদ্রলোকের সাহায্য না পাইলে আমাদের য়ুরোপ-ভ্রমণ বিশেষ অসুবিধাজনক হইত, আমরা অনেক কষ্টে পড়িতাম, হয়ত আমাদের অনেক স্থান দেখাই হইত না এবং অকারণে অনেক স্থানে অযথা বিলম্ব করিতে হইত। ইনি বেশ ক্ষিপ্রকারিতার সহিত আমাদের মালপত্র ও দ্রব্যজাত শুল্ক আফিসের হস্ত হইতে বাহির করিয়া আনিয়া দিলেন। আমাদের সহযাত্রীদিগের মধ্যে যাঁহারা সোজা

ব্রিন্দিসি।

লণ্ডনে চলিয়া যাইবেন, তাঁহারা তখনই ব্রিন্দিসি-পেরিস-ক্যালে-ডোভার রেলে চড়িলেন। ইঁহারা চুয়ান্ন ঘণ্টার মধ্যেই লণ্ডনে পৌছিবেন।

আমাদের সে দিন ব্রিন্দিসিতে অপেক্ষা করিবার ব্যবস্থা ছিল, তাই আমরা জাহাজ হইতে নামিয়া একখানি ফিটন ভাড়া করিলাম। গাড়োয়ান অল্প সময়ের মধ্যেই আমাদিগকে "ইণ্টারন্যাসনেল গ্রাণ্ড হোটেলে" পৌছাইয়া দিল। এইটিই এখানকার সর্ব্বপ্রধান হোটেল। আমরা অল্প সময়ের মধ্যেই এই হোটেলের একটি ভাল ঘর দখল করিয়া বসিলাম।
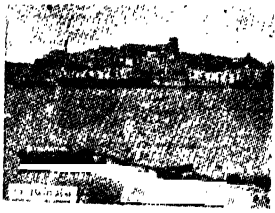
ব্রিন্দিসি

এই স্থানে এ দেশের 'শুল্ক আফিস' (Custom House) সম্বন্ধে দুই একটা কথা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। এই সকল শুল্ক আফিসে যাত্রীদিগের বাক্স-পেটারা বোচ্‌কা-বুচ্‌কি সমস্ত খুলিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা হয়। কোন যাত্রী কোন প্রকার নিষিদ্ধ দ্রব্য বা বিক্রেয় দ্রব্য গোপনে লইয়া যাইতেছে কি না, তাহাই অনুসন্ধান করা এবং তাহার সন্ধানে আইনানুসারে ব্যবস্থা করাই এই আফিসের উদ্দেশ্য। আমার পথ-প্রদর্শক মহাশয়ের কার্য্যতৎপরতা ও ব্যবস্থার গুণে এই আফিসের কর্ম্মচারীরা আমাদের বাক্স-পেটারা প্রভৃতি কিছুই খুলিয়া দেখিল না; কিন্তু আমি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলাম যে, আমাদের সহযাত্রী অনেকেরই বাক্স ব্যাগ প্রভৃতি খুলিয়া উলট-পালট করিয়া পরীক্ষা করা হইতে লাগিল। শুনিলাম কেহ নিজের ব্যবহারের জন্য ৫০টির অধিক চুরুট বা সিগারেট লইয়া যাইতে পারিবে না; কাহারও ব্যাগে বা বাক্সে যদি ঐ সকল দ্রব্য অধিক পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাহাদিগকে শুল্ক প্রদান করিতে হয়; আর নিষিদ্ধ দ্রব্য আবিষ্কৃত হইলে, তাহা তৎক্ষণাৎ সরকারে বাজেয়াপ্ত হইয়া যায় এবং অপরাধীরও দণ্ড হয়। এ প্রকার অনুসন্ধান যে বিশেষ প্রয়োজন, তাহা আমি অস্বীকার করি না; কিন্তু অনেক স্থলেই দেখিয়াছি, আসল কাজ কিছুই হয় না, মধ্য হইতে যাত্রীদিগের হয়রাণ মাত্রই সার হয়। এই আমাদের কথাই বলি না কেন। এই স্থানে ও য়ুরোপের নানা স্থানেই ত আমরা গিয়াছি; আমাদের সঙ্গে বাক্স ব্যাগ বোচ্‌কাও অনেক ছিল; কিন্তু আমার পথ-প্রদর্শক মহাশয়ের কুশলতায় কোন স্থানের কোন শুল্ক আফিসে কোন কর্ম্মচারী একদিনও আমার একটি বাক্স বা একটি বোচ্‌কা খুলিয়া দেখেন নাই। ইহা হইতেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন যে, এই সকল আফিসের কাজকর্ম্ম কি ভাবে সম্পাদিত হইয়া থাকে।

হোটেলে পৌছিয়া আমরা হাত পা ছড়াইয়া বিশ্রাম করি নাই। আমাদের দ্রব্যজাত যথাস্থানে রক্ষিত হইলে আমরা সহর দেখিতে বাহির হইলাম—অবশ্য পদব্রজে নহে, গাড়ী করিয়া। সহরটা আমার মোটেই ভাল লাগিল না; পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এ সহরে মোটেই দেখিলাম না। স্থানীয় লোকেরাও তেমন পরিচ্ছন্ন নহে; বন্দরে যে সমস্ত মলিন-বেশধারী ও অপরিচ্ছন্ন কুলী দেখিয়াছিলাম, রাস্তার লোকেরাও তাহাদের অপেক্ষা ভাল নহে। আমরা একটা রাস্তা দিয়া কিছু-দূর অগ্রসর হইবার পর কোচম্যান পথের পার্শ্বে আমাদের গাড়ী থামাইল। আমরা দেখিলাম যে,সুসজ্জিত একদল সৈন্য শোভাযাত্রা করিয়া আসিতেছে; তাহাদের পশ্চাতেই একদল সামরিক বাদ্যকর এবং সর্ব্বশেষে একদল উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী পদোচিত বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া আসিতেছেন। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে, এই সহরে সে দিন একটা কৃষি-প্রদর্শনী খোলা হইবে, উচ্চ রাজকর্ম্মচারিগণ শুভকার্য্যে যোগদান করিবার জন্য এই শোভাযাত্রা করিয়াছেন।

এখানকার পথগুলি পাথর দিয়া বাঁধান। মেটে রাস্তা আমরা মোটেই দেখিতে পাইলাম না। এখানকার পুরাতন রোমান বুরুজ (Tower) একটি প্রধান দ্রষ্টব্য। পূর্ব্বতন রোমানদিগের আমলে রোম হইতে ব্রিন্দিসি পর্য্যন্ত যে প্রকাণ্ড রাজপথ বিস্তৃত ছিল, যাহাকে লোকে 'এপিয়ান পথ' (Appian way) বলিত, সেই পথ এই স্থানে শেষ হওয়ায় রোমানগণ এই স্থানে বুরুজটি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

বিদেশে অপরিচিত, ভিন্ন ভাষাভাষী লোকের মধ্যে প্রথম আসিয়া পড়িলে কেমন যেন একটা বাধ বাধ ঠেকে,

একটু অস্বাচ্ছন্দ্য বোধও হয়। তাহার পর আমাদের মত লোক দেখিয়া সেখানকার লোকেরা কেমন হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকে ; দুষ্ট বালকেরা আমাদিগকে দেখিয়া বিকট মুখভঙ্গী করে, এ সকল অবশ্যই ভাল লাগে না। আমাদের সঙ্গে যদি ঐ পথপ্রদর্শক ভদ্রলোকটি না থাকিতেন, তাহা হইলে অতি সামান্য বিষয়েও যে আমাদিগকে কত অসুবিধা ও বিরক্তি সহ্য করিতে হইত, তাহা এই দিনেই আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম। আমি এ দেশের ভাষা জানি না, সুতরাং হাত পা নাড়িয়া ইঙ্গিত ইসারা কিছুতেই হোটেলের ভৃত্যকে বুঝাইতে পারিলাম না যে, আমার খানিকটা গরম জলের প্রয়োজন হইয়াছে। তাহার পর আর কি করিব ; নিজেই খুঁজিয়া পাতিয়া একটা স্নানাগারে প্রবেশপূর্ব্বক গরম জলের পরিবর্ত্তে এক পাত্র ঠাণ্ডা জল লইয়া আসিয়া ক্ষৌর-কার্য্য সম্পন্ন করিলাম।

এই দিন সন্ধ্যার পর ভারি একটা কৌতুককর ব্যাপার হইয়াছিল ; তখন ত সেই ব্যাপারে আমরা হাসিয়া অস্থির হইয়াছিলাম, এখনও এতদিন পরে সেই ঘটনা স্মরণ হইলে আমি হাস্য সংবরণ করিতে পারি না। হোটেলের যে কক্ষটি আমাদের বসিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, তাহার পার্শ্বের বিস্তৃত কক্ষ, হোটেলের বড় বড় ভোজে ব্যবহৃত হইত। আমরা যে দিনের কথা বলিতেছি, সেই দিন সহরের প্রধান কর্ম্মচারিবৃন্দ ও সম্ভ্রান্ত নাগরিকগণ ইটালির পূর্ত্তবিভাগের প্রধান মন্ত্রীকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য হোটেলের ঐ প্রশস্ত কক্ষে একটি ভোজ-সভার আয়োজন করিয়াছিলেন। যথা-সময়ে ভোজ আরম্ভ হইল ; আমরা আমাদের কক্ষ হইতে এই ভোজব্যাপার দেখিতেছিলাম। আমার ডাক্তার বাবুও আমাদের ঘরে বসিয়াই এই দৃশ্য দেখিতেছিলেন। একটু পরেই তিনি আমাদের ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন ; আমি মনে করিলাম তিনি হয়ত কোন প্রয়োজনে কোথাও গেলেন। একটু পরেই দেখি ডাক্তার বাবু হাঁপাইতে হাঁপাইতে আমাদের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন ; তাঁহার মুখ শুধু শুকাইয়া যায় নাই, মুখের ভাবই বদল হইয়া গিয়াছে। অত্যন্ত ভয় পাইলে মানুষের যে প্রকার মুখের চেহারা হয়, ডাক্তার বাবুরও মুখ তেমনই হইয়াছিল। তাঁহাকে এই প্রকার শোচনীয় অবস্থায় ঘরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া আমরা তাঁহার এই ভাবান্তরের কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি ত প্রথমে কথাই বলিতে পারেন না ; তাহার পর কিঞ্চিৎ শান্ত হইয়া,তিনি যে ব্যাপারের বর্ণনা করিলেন, তাহা শুনিয়া সত্য সত্যই আমাদের হাস্য সংবরণ করা অসাধ্য হইয়া পড়িল। তিনি মুখ চোখ ঘুরাইয়া যথারীতি অভিনয় করিয়া ব্যাপারটি বলিলেন। ঘটনাটি এই—আমাদের কক্ষ দ্বারের সাসির মধ্য দিয়া ভোজের ব্যাপার দেখিয়া ডাক্তার বাবুর আগ্রহ মিটে নাই ; তাই তিনি আমাদের কক্ষ হইতে বাহির হইয়া যে কক্ষে ভোজ হইতেছিল, সেই কক্ষের দ্বারের নিকট গমন করিয়াছিলেন। সেখান হইতে ব্যাপারটি ভাল করিয়া দেখিতে পাইবেন মনে করিয়াই তিনি সেখানে গিয়াছিলেন। সেই দ্বারে একজন সশস্ত্র দ্বাররক্ষী দণ্ডায়মান ছিল। ডাক্তার বাবুকে দ্বারের নিকট যাইতে দেখিয়া সে ইটালীয় ভাষায় বলিল "prohibito, no entrata" অর্থাৎ এখানে প্রবেশ নিসিদ্ধ ; কিন্তু ডাক্তার বাবু ইটালীয় ভাষায় পরম পণ্ডিত ছিলেন। তিনি যদি বুদ্ধিমানের মত তখনই ফিরিয়া আসেন, তাহা হইলে আর কোন গোলই হয় না ; কিন্তু তিনি এক মজার কাজ করিয়া বসিলেন। সান্ত্রী মহাশয় যে প্রকার ভঙ্গী করিয়া, যেমন স্বরে বলিয়াছিলেন "pro hibito, no entrata" ডাক্তার বাবুও ঠিক তেমনই স্বরে তেমনই ভাবে সেই কথার পুনরুক্তি করিলেন ; তিনিও তেমনই ভঙ্গী করিয়া বলিলেন "prohibito, no entrata" ডাক্তার বাবু যে সিপাহীকে অপমানিত করিবার জন্য কথাটার পুনরুক্তি করিয়াছিলেন তাহা নহে ; তিনি বলিলেন যে, কথাটা ও বলিবার ভঙ্গী তাঁহার নিকট এমন আমোদজনক বোধ হইয়াছিল যে, তিনি নির্জ্জলা আমোদ করিবার জন্যই ঐ প্রকার ভঙ্গীতে কথাটা বলিয়াছিলেন; কিন্তু রাম উল্টা বুঝিল। সান্ত্রী মহাশয় বুঝিলেন যে, লোকটা তাঁহাকে পরিহাস করিতেছে। তিনি তখন হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন এবং কি একটা শপথবাক্য উচ্চারণ করিলেন। তাঁহার সেই সময়ের ভাবভঙ্গী দেখিয়া ডাক্তার বাবুর আত্মাপুরুষ উড়িয়া গেল; তিনি তখন সময়োচিত বীর্য্যের পরিচয় প্রদান করিলেন, উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে আমাদের কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ডাক্তার বাবুর এই কীর্ত্তি-কাহিনী শুনিয়া আমরা হাসিয়াই অস্থির হইলাম। আমাদের

এই ডাক্তার বাবুটির এ প্রকার কার্য্য এই স্থানেই শেষ হয় নাই; আমাদের সুদীর্ঘ ভ্রমণকালের মধ্যে আরও অনেকবার তিনি কৌতুককর অভিনয়ের নায়ক হইয়াছিলেন। সে সকল কথা যথাস্থানে বলিব।

যে ভোজের ব্যাপার লইয়া ডাক্তার বাবুর এই অভিনয় হইয়া গেল, সে ভোজের একটা বর্ণনা না দেওয়া ভাল দেখায় না। বিশেষতঃ এ প্রকার ভোজ-ব্যাপার আমি এই প্রথম দেখিলাম, সুতরাং তাহার একটা বর্ণনা না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। ভোজের প্রকাণ্ড টেবিলে খাদ্যদ্রব্য ত মোটেই দেখিলাম না—দেখিলাম সারি সারি গ্লাস ও নানা জাতীয় ইটালীয় মদ্যের বোতল। নিমন্ত্রিত অতিথিগণ যখন ভোজটেবিলের চারিদিকে উপবেশন করিলেন, তখন আমি চাহিয়া দেখিলাম যে, সে স্থানে একটিও রমণী উপস্থিত নাই। পুরুষগণ নানা প্রকার বেশে সজ্জিত হইয়া সভার শোভা বর্দ্ধন করিতে লাগিলেন। সহরের প্রধান বিচারপতি মহাশয় মহামান্য অতিথির বামপার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়াছিলেন। তাহার পর কথাবার্ত্তা—সে এক তুমুল কাণ্ড; একজন একজন করিয়া যদি কথা বলে, তাহা হইলে আর গোল হয় না; কিন্তু সকলেই একযোগে কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন; একটা হট্টগোল উঠিল। তাহার পর যখন সম্মাননীয় অতিথির স্বাস্থ্যপানের সময় উপস্থিত হইল, তখন সকলেই এক একটা গ্লাস হাতে লইলেন এবং তাঁহার সমীপস্থ হইয়া তাঁহার গ্লাসের গায়ে নিজের হস্তস্থিত গ্লাসটি ঠেকাইয়া লইয়া যাইতে লাগিলেন।

এই ত গেল স্বাস্থ্যপানের ব্যাপার। তাহার পর বক্তৃতা—সে এক ভীষণ ব্যাপার—একেবারে লণ্ডভণ্ড কাণ্ড! যদিও বক্তৃতার ভাষা বুঝি না, বক্তৃতার একটি শব্দের অর্থও হৃদয়ঙ্গম হইল না; কিন্তু বক্তা মহাশয়েরা যে প্রকার উচ্চৈঃস্বরে বক্তৃতা করিতে লাগিলেন, যে প্রকার মুখভঙ্গী করিতে লাগিলেন, যে প্রকার উত্তেজিতভাবে কথা বলিতে লাগিলেন এবং প্রতি দুই সেকেণ্ড পরেই যে ভাবে টেবিলের উপর প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাত করিতে লাগিলেন, তাহাতে এটা যে অভ্যর্থনা-সভা, এটা যে ভোজসভা তাহা কাহারও মনে হইতেই পারে না। আমার ত মনে হইল, ইহারা হয় ত কোন রাজনৈতিক বিষয়ে তুমুল বাদানুবাদ করিতে আরম্ভ করিয়াছে; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে; এখানকার বক্তৃতাই না কি এই রকমের। আমার ত ভারি আমোদ বোধ হইল।

পরদিন প্রাতঃকালেই আমরা হোটেল ত্যাগ করিয়া রেল ষ্টেসনে গেলাম। ষ্টেসনটি বাহির হইতে বেশ বড় ও সুদৃশ্য বোধ হইয়াছিল, কিন্তু ভিতরে গিয়া দেখি, সেখানেও সেই অপরিচ্ছন্নতা। আমাদের প্রথম শ্রেণীর টিকিট ছিল। আমরা এই সর্ব্বপ্রথম য়ুরোপের রেল গাড়ীতে চড়িলাম। গাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখি বসিবার আসনগুলি সমস্তই মুখোমুখি সাজান রহিয়াছে। এ বন্দোবস্ত আমার ভাল বোধ হইল না। য়ুরোপের নানাস্থানে ভ্রমণ করিবার সময় নানা কোম্পানীর গাড়ীতে চড়িয়াছি, ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ "ঘুমাইবার গাড়ীতেও" (Sleeping car) অনেকবার চড়িয়াছি; কিন্তু ঐ সকল রেলগাড়ীতে যত সুব্যবস্থাই থাকুক না কেন, আমার ত মনে হয়, আমাদের দেশের গাড়ীর ব্যবস্থাই ভাল। তবে "ভিন্নরুচির্হি লোকঃ" এই যা কথা।

শ্রীবিজয়চন্দ্ মহতাব্।

সাহিত্য।

অভিব্যক্তি।

এ জগতে সাহিত্য বা কাব্য কতদিনের? মানুষ এখানে যত দিনের, মানুষের সাহিত্যও এখানে ততদিনের; কবে এ পৃথিবীতে মানুষ প্রথম দেখা দিয়াছে, তাহা বুঝিবার যেমন কোন উপায় নাই, সেইরূপ মানুষের সাহিত্য মানুষের সমাজে কবে উদিত হইয়াছে, তাহাও জানিবার কোন পথ নাই। সাহিত্য ও মানুষের জীবন, যেন এক সুরে গাথা,—সত্য বলিতে কি, যে হৃদয়ে সাহিত্যের কমনীয় কুসুম বিকশিত হয় না, সে হৃদয় মানুষেরই নহে।

জ্যোতিষের যখন বাল্যাবস্থা, বিজ্ঞান যখন সদ্যঃপ্রসূত শিশু, চিকিৎসা-শাস্ত্রের যখন অন্নপ্রাশনও হয় নাই, ভূগোল বা ইতিহাস, মনোবিজ্ঞান বা দর্শন যখন জন্মগ্রহণও করে নাই, সেই মানবীয় সভ্যতার অঙ্কুর-বিকাশের সময়ে একমাত্র সাহিত্যের স্নিগ্ধ আলোকচ্ছটা মানবের হৃদয়কন্দর আলোকিত করিয়া থাকে। সেই স্বর্গীয় সাহিত্যালোক উদিত হইয়া যদি আদিম মানবের হৃদয়ক্ষেত্র আলোকিত না করিত, তাহা হইলে কে বলিতে পারে যে, তাহাতে কোন দিনও সভ্যতার বীজ উপ্ত হইবার সম্ভাবনাও থাকিত?—জ্যোতিষ বল, বিজ্ঞান বল, চিকিৎসা শাস্ত্র বল, মনোবিজ্ঞান বল, আর দর্শনই বল—এ সকল ত সেই অপরিমেয় অগাধ সাহিত্য-রত্নাকর হইতে সমুদ্ভূত এক একটি উজ্জ্বল রত্নমাত্র!

প্রমাণের জন্য গুরুগম্ভীর গবেষণার আবশ্যকতা নাই, সভ্যতার বিদ্যুচ্ছটা-ঝলসিত, নিয়ত কোলাহলময় তোমার চিরপরিচিত সুশাসিত প্রদেশ কিয়ৎকালের জন্য পরিত্যাগ করিয়া তুমি সভ্যমানব একবার শ্বাপদসঙ্কুল নিবিড় বনরাজি-বেষ্টিত নির্ঝরধ্বনি মুখরিত পার্ব্বত্য ভূমিতে আরোহণ কর—ভীল, গারো, সাঁওতাল, কুকি ও মুঙ্গা প্রভৃতি আদিম অসভ্য বন্যমানবগণের স্বভাব-সহচর অশিক্ষিত প্রকৃতির প্রতি একবার অভিনিবেশপূর্ব্বক চাহিয়া দেখ, দেখিবে—ঐ সকল অসভ্য শ্বাপদ-সহচর বনেচর মানবগণের মধ্যে জ্যোতিষ বা বিজ্ঞান, ইতিহাস বা ভূগোল, আয়ুর্ব্বেদ বা দর্শন দেখা না দিলেও সাহিত্যের অপরিস্ফুট অথচ স্নিগ্ধ আলোকে তাহাদের হৃদয়ক্ষেত্র সময়ে সময়ে আলোকিত হইয়া থাকে। পশুপালন, সামান্য কৃষিকর্ম্ম বা মৃগয়ার শ্রম হইতে যখন তাহারা অব্যাহতি পাইয়া আমোদ করিবার জন্য একত্র সমবেত হয়, কি বালক কি যুবা কি বৃদ্ধ, কি স্ত্রী কি পুরুষ, সকলে যখন তাহাদের সেই অযত্ন-সম্পাদিত আসব-পানের আবেশে উৎফুল্লচিত্ত হয়, সেই সময় তাহাদেরই একজন সুকণ্ঠগায়ক মন্দল ও ঝাঁঝরের সুরে তালে মনের মতন লয় করিয়া যখন গাহিতে আরম্ভ করে, কবে কোন পল্লীর একজন যুবার প্রণয়ে হতাশ এক রমণী উন্মাদিনীবেশে দেশে দেশে গাহিয়া বেড়াইত, কোনকালে কোন একজন পল্লীপতি আর একজন পল্লীপতির কন্যাকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া আনিয়া বিবাহ করে, সেই বিবাহের রাত্রিতে অপহৃত-কন্যার পিতা সদলবলে তাহার কন্যার উদ্ধারার্থ আসিয়া রণক্ষেত্রে প্রাণ-বিসর্জ্জন করে, সেই শোকে নববধূ উন্মত্তপ্রায় হইয়া নবপরিণীত পতির বক্ষে ছুরিকাঘাত করিয়া নিজেও সেই ছুরির আঘাতে প্রাণ বিসর্জ্জন করে, এই প্রকার তাহাদের চিরপরিচিত ঘটনাগুলি গায়কের গানের ওজস্বিনী ভাষায় শুনিতে শুনিতে যখন তাহাদের বন্যহৃদয় ভাবাবিষ্ট হইয়া উঠে, তখন তাহাদের সকলেরই নয়ন অশ্রুভার-পরিপ্লুত হয়। তাহাদের ব্যক্তিগতসত্তা কোথায় মিলাইয়া যায়, তখন সকলের হৃদয়তন্ত্রী যেন এক সুরে আপনাআপনি ঝঙ্কার দিতে আরম্ভ করে, তখন তাহারা বর্ত্তমান ভুলিয়া যায়। ব্যবহারিক জগৎকে প্রাতিভাসিক করিয়া তুলে, আর সেই আনন্দময়, প্রকাশময় ও একতাময় স্বর্গীয় প্রাতিভাসিক জগতের সত্তায় আত্মসত্তা মিশাইয়া দিয়া রসময় হইয়া পড়ে। বল দেখি, তখন তাহাদের হৃদয়সিংহাসনে কোন্ দিব্যপ্রতিমা বিরাজ করে? সাহিত্যের কল্পনাময়ী স্বর্গীয় প্রতিমা ছাড়া আর কোন প্রতিমা সেই কঠোরপ্রকৃতি বন্য পশুর হৃদয়ে রসময় অমৃতসাগরের সৃষ্টি করিতে পারে? এই রসময় সাগরের জলে অভিষিক্ত না হইলে মানবহৃদয়ে সভ্যতার বীজ অঙ্কুরিত হইতে পারে না; সাহিত্যই মানবজীবনের আদিম অবলম্বন। সাহিত্যই মানবজীবনের অপার্থিব ধন, সাহিত্যই অসভ্যতার মূলে কুঠারাঘাত করিয়া

মানবীয় সভ্যতাবিস্তারের পথ প্রশস্ত করিয়া দেয়; মানবের জীবন ও সাহিত্যের সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য ও অনাদি।

তীক্ষ্ণধার নীরস লৌহ এবং সর্ব্বতোমুখী কর্কশ নীতির সাহায্যে যত বড় ঐশ্বর্য্যশালী বিশাল সাম্রাজ্য অর্জ্জিত হউক না কেন, তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য দেশের অগণিত অর্থ এবং অজস্র শোণিত অকাতরে ব্যয়িত হইয়া থাকে—ইহার প্রমাণ সকল দেশের ইতিহাসেই দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু সাহিত্য সমগ্র সভ্য-সমাজের হৃদয়প্রদেশে যে সুখময়, শান্তিময় ও প্রকাশময় সাম্রাজ্য স্থাপন করে, তাহার রক্ষার জন্য এক বিন্দু রক্তপাত করিতে হয় না—একখানি তরবারিকেও শাণিত করিতে হয় না, সে সাম্রাজ্যের ক্ষয় নাই, তাহার ক্রমিক বিস্তার ও উজ্জলতা শুক্লপক্ষের চন্দ্রকলার ন্যায় অবশ্যম্ভাবী ও সকলের নয়নমনোরঞ্জন।

সীরিয়া, বাবিলন, পারস্য, গ্রীস বা রোমে অসির সাহায্যে স্থাপিত যে বিশ্ববিস্ময়কর দিগন্তব্যাপী সাম্রাজ্য এক দিন জগতের অলঙ্কাররূপে পরিগণিত হইয়াছিল, আজ সে সাম্রাজ্য কোথায়? ইতস্ততোবিক্ষিপ্ত কতকগুলি ভগ্নপ্রাসাদস্তূপ বা কএকটি জীর্ণ পিরামিড্ অথবা থান কএক বিধ্বস্তপ্রায় শিলালিপি ছাড়া এ সকল মহনীয় সাম্রাজ্যের কোন দর্শনযোগ্য নিদর্শন আজ খুঁজিয়া পাওয়াও কঠিন; কিন্তু সাহিত্য মানবসভ্যতার অঙ্কুরোদ্গমের সময় হইতে যে সাম্রাজ্য অন্তর্জগতে স্থাপিত করিয়াছে, যত দিন মানুষ বাঁচিবে, ততদিন পর্য্যন্ত তাহা অবিনশ্বর হইয়া থাকিবে। বাল্মীকি কবে অস্তমিত হইয়াছেন, তাহা জানিবার উপায় পর্য্যন্ত আজ জগতে বিলুপ্ত; কিন্তু তাঁহার অমর সাহিত্য রামায়ণ যে দাম্পত্য-প্রেমের অপার্থিব সাম্রাজ্য আর্য্যজাতির হৃদয়ে স্থাপিত করিয়াছে, তাহার শান্তিময়, আনন্দময় এবং পবিত্র আশ্রয় লাভ করিয়া কত কোটি কোটি নরনারী এখনও এ মরভূমিতে অমরবাঞ্ছিত গার্হস্থ্য-সুখের আস্বাদন করিতেছে এবং করিবে, তাহার ইয়ত্তা কে করিতে পারে? ব্যাসদেব চলিয়া গিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাঁহার অমর প্রতিভার অমৃতময় ফল মহাভারত ভারতীয় আর্য্যগণের হৃদয়ে যে দয়া, মৈত্রী, পুত্রস্নেহ, মাতৃভক্তি ও সত্য-নিষ্ঠা প্রভৃতি স্বর্গীয় ভাবের পবিত্র সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছে, তাহার আশ্রয় পাইয়াছিল বলিয়া এখনও হিন্দুসমাজ জীবিত রহিয়াছে, এখনও হিন্দুসভ্যতার ক্ষীণ চন্দ্রিকা বিভিন্ন দেশীয় সভ্য মানব-সমাজের ভারতের প্রতি নিহিত বিস্ময়বিস্ফারিত নয়নযুগলে তৃপ্তিসুধা বর্ষণ করিতে সমর্থ হইতেছে; এই বেদব্যাসের সাহিত্য-স্থাপিত অপার্থিব ভাবময় সাম্রাজ্যের আশ্রয় আমরা পাইয়াছি বলিয়া এখনও আশা হয় যে, আবার আমরা পৃথিবীর সমুন্নত সভ্য জাতিগণের মধ্যে বরণীয় আসন পাইবার যোগ্য হইব।

সাহিত্যের অনুশীলনে হৃদয় উদার হয়। সাহিত্য-সেবকের যশঃ অবশ্যম্ভাবী। সাহিত্য অর্থার্জ্জনের পথকে প্রশস্ত করে। সাহিত্য ব্যবহার শিখিবার প্রধান অবলম্বন, সাহিত্যের সেবায় অমঙ্গল দূর হয়। রসাস্বাদরূপ আনন্দসমুদ্রে অবগাহনার্থীর পক্ষে সাহিত্য অনুপম সোপান।

এ হেন সাহিত্যের সমালোচনা আমাদের মাতৃভাষার এই নবাভ্যুদয়ের দিনে উপেক্ষার বিষয় নহে, বরং এ প্রকার সমালোচনায় বঙ্গসাহিত্যের কিয়ৎপরিমাণে উপকার হইতে পারে। এই কারণে আমি সংস্কৃত ভাষায় আলঙ্কারিক পণ্ডিতগণের প্রদর্শিত পদবীর অনুসরণ করিয়া সাহিত্যের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

সাহিত্যের লক্ষণ।

সাহিত্য কাহাকে বলা যায়? যে বাক্য শ্রবণে বা পাঠে রসাবির্ভাব হয়, সেই বাক্যকে সাহিত্য বা কাব্য বলা যায়; ইহাই হইল কাব্যের সাধারণ লক্ষণ। এই লক্ষণটি ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে অগ্রে রস কাহাকে বলে, তাহা বুঝিতে হইবে। এই কারণে এক্ষণে রসের স্বরূপ নির্ণয় করা যাইতেছে।

রসতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ প্রথমতঃ মানবের মনোবৃত্তি-গুলিকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া থাকেন। প্রথম—প্রধান বা স্থায়ী; দ্বিতীয়—অপ্রধান বা সঞ্চারী। এই প্রধান বা স্থায়ী নয় ভাগে বিভক্ত, যথা—রতি, হাস, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, ঘৃণা, বিস্ময় ও নির্ব্বেদ বা বৈরাগ্য।

আবেগ, দীনতা, উৎকণ্ঠা, অভিলাষ, স্মৃতি, মতি,উগ্রতা, মোহ, আলস্য, লজ্জা, মতি, হর্ষ, অমর্ষ, বিষাদ প্রভৃতি মনোবৃত্তিগুলিকে অপ্রধান বা সঞ্চারী ভাব বলা যায়।

মনুষ্য যে কোন অবস্থাতেই থাকুক না কেন, পূর্ব্বোক্ত নয়টি স্থায়ী ভাবের মধ্যে কোন না কোন একটি ভাব তাহার হৃদয়রাজ্য অধিকার করিয়া থাকিবেই থাকিবে। এই নয়টি স্থায়ী ভাবের মধ্যে কোন একটি ভাব প্রধান-ভাবে আমাদের হৃদয়ে বিদ্যমান থাকিলেই পরবর্ত্তী অপ্রধান-ভাবসঞ্চারী ভাবগুলি উদিত হয় এবং তাহাদের সেইরূপ উদয় দ্বারা ঐ প্রধান বা স্থায়ী ভাবের পরিপুষ্টি হইয়া থাকে; একটি উদাহরণ দেখিলেই বিষয়টি স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হইতে পারিবে।

মনে কর, সুধাংশু তাহার পত্নী চন্দ্রিকাকে অতিশয় ভালবাসে। সে চন্দ্রিকাকে ভালবাসে বলিয়াই চন্দ্রিকার বিরহে তাহার হৃদয়ে বিষাদের উদয় হয়, চন্দ্রিকাকে দেখিবার জন্য তাহার তীব্র উৎকণ্ঠা হয়, সে তখন কেবল চিন্তা করে কি উপায়ে সে চন্দ্রিকার দর্শন পাইবে। এই যে চন্দ্রিকাকে না পাইয়া সুধাংশুর বিষাদ, উৎকণ্ঠা ও চিন্তা প্রভৃতি,—এই-গুলি তাহার অপ্রধান মনোবৃত্তি বা সঞ্চারী ভাব। তাহার হৃদয়ে যদি চন্দ্রিকার প্রতি ভালবাসা না থাকিত, তাহা হইলে কখনই তাহার চন্দ্রিকার বিরহে এই বিষাদ, ঔৎসুক্য বা চিন্তা প্রভৃতির উদয় হইত না। তাহার হৃদয়ে ভালবাসা আছে বলিয়াই ত বিরহে এই বিষাদ, ঔৎসুক্য বা চিন্তা। তবেই দাঁড়াইতেছে যে, সুধাংশুর চন্দ্রিকার প্রতি ভালবাসা বা রতিই তাহার প্রধান মনোবৃত্তি। আর সেই ভালবাসার অধীন যে সকল বিষাদ প্রভৃতি মনোবৃত্তি তাহার অন্তঃকরণে কখন কখন উদিত হয়, ঐগুলি অপ্রধান মনো-বৃত্তি বা তাহার প্রধান মনোবৃত্তি ভালবাসা বা রতির সহচর অপ্রধান মনোবৃত্তি; সুতরাং ঐ বিষাদ প্রভৃতি বৃত্তি-গুলি দ্বারা ভালবাসা আরও গভীরভাবে তাহার হৃদয়ে অঙ্কিত হয়। যত সে বিষণ্ণ হয়, যত সে দেখিবার জন্য উৎসুক হয় বা যত সে না দেখিতে পাইয়া চন্দ্রিকার বিষয়ে চিন্তা করে, ততই সুধাংশুর চন্দ্রিকার প্রতি ভালবাসা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

এরূপ মনুষ্য-হৃদয়ে উৎসাহও একটি স্থায়ী বা প্রধান ভাব। রামচন্দ্র,যুধিষ্ঠির,অর্জ্জুন প্রভৃতি মহাপুরুষগণের কর্ত্তব্য-কার্য্য সিদ্ধ করিবার জন্য যে অপ্রকম্প্য উৎসাহ বা অধ্যবসায় ছিল, তাহাই তাঁহাদের হৃদয়ের সর্ব্বপ্রধান বৃত্তি বা ভাব। সেই ভাবে আবিষ্ট ছিলেন বলিয়াই ত তাঁহাদের কর্ত্তব্য-কার্য্য সিদ্ধ করিবার জন্য চিন্তা, উৎকণ্ঠা বা আবেগ প্রভৃতি অপ্রধান মনোবৃত্তি সকল উদিত হইত এবং ঐ সকল অপ্রধান বৃত্তি বা উৎসাহের সঞ্চারী ভাবগুলি উদিত হইয়া তাঁহাদের সেই আজন্মসিদ্ধ উৎসাহ বা অধ্যবসায়কে আরও বাড়াইয়া দিত; সুতরাং এরূপ স্থলে অনায়াসে বলিতে পারা যায়, রামচন্দ্রের জানকী-উদ্ধারের জন্য যে উৎসাহ বা অধ্যবসায়, তাহা তাঁহার হৃদয়ের স্থায়ী ভাব এবং সেই অধ্যবসায় বা উৎসাহের সহচর যে চিন্তা বা ঔৎসুক্য প্রভৃতি সেই অধ্যবসায়ের সঞ্চারী ভাব অপ্রধান মনোবৃত্তি।

এইপ্রকার একটি একটি করিয়া মিলাইয়া দেখিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ যেভাবে আমাদের মনোবৃত্তিগুলিকে প্রধান বা স্থায়ী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং কতকগুলিকে অপ্রধান বা সঞ্চারী ভাব বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা অস্বাভাবিক বা কাল্পনিক নহে।

মনের মধ্যে এই প্রকার স্থায়ী ভাব এবং সঞ্চারী ভাবের উদয় হইলে কোন কোন সময়ে আমাদের এই বাহ্য শরীরেও কতকগুলি কার্য্য প্রকাশ পাইয়া থাকে; যেমন হৃদয়ে যাহার অনুরাগ বা রতি আছে এবং সেই অনুরাগের পাত্রকে পাইবার জন্য যাহার হৃদয়ে আশা, উৎকণ্ঠা ও চিন্তা প্রভৃতি সঞ্চারী ভাবের আবেশ হয়, সে হয়ত সময়ে সময়ে সেই ভাব সমূহের আবেশে এমন বিহ্বল হইয়া পড়ে যে, তাহার আর নিজের দেহের উপরও যেন পূর্ব্বের ন্যায় কর্ত্তৃত্ব থাকে না। তাহার সেই অনুরাগরঞ্জিত হৃদয়ে নিরন্তর ভাবনার বশে বহিরিন্দ্রিয়গুলিও যেন অপ্রকৃতিস্থ হইয়া পড়ে। এরূপ অবস্থায় তাহার হৃদয়ের সেই কল্পনাময়ী প্রেমপ্রতিমা হঠাৎ যেন নয়নের সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হয়। আর সেই সদসদ্বিবেকরহিত ভাবোন্মত্ত যুবক সেই কল্পনাময়ী মূর্ত্তিকে দেখিতে পাইয়া আবেগে আলিঙ্গন করিবার জন্য দুই হস্ত প্রসারিত করে, হর্ষে তাহার নয়নদ্বয় জলভাবাবসিক্ত হয়, কণ্ঠের স্বর আপনা হইতে গদগদ হইয়া আসে, তাহার

সর্ব্বশরীর বর্ষাসমাগমোৎফুল্ল কদম্বকুসুমের ন্যায় রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। এরূপ অবস্থায় সে হয় ত "এস হৃদয়সর্ব্বস্ব, বহু দিনের পর তোমার দর্শন পাইয়া অদ্য নয়ন চরিতার্থ হইল" এই প্রকার নানা প্রলাপও বকিয়া থাকে। এই যে তাহার বাহু-প্রসারণ, গদ্‌গদস্বর, রোমাঞ্চ ও প্রলাপ প্রভৃতি কার্য্যগুলি তাহার বাহ্য শরীরে উদিত হইয়া থাকে, এই সকল কার্য্যের কারণ কি? তাহার হৃদয়ে যে সকল সঞ্চারী ভাব উদিত হইয়া তাহার অনুরাগ বা রতিকে অত্যন্ত উত্তেজিত করিয়াছে, সেই উত্তেজিত রতি বা স্থায়ী ভাব হইতেই এই সকল কার্য্য বাহ্যশরীরে প্রকাশ পাইয়াছে। এই কার্য্যগুলিকে সংস্কৃত ভাষার আলঙ্কারিকগণ "অনুভাব" বলেন।

এই অনুভাবও দ্বিবিধ,—প্রথম সাত্ত্বিক অনুভাব, দ্বিতীয় সাধারণ অনুভাব।

ভাবের অত্যধিক আবেশে যখন আমরা আমাদের হৃদয়ের উপর কর্ত্তৃত্ব হারাইয়া ফেলি, তখন আমাদের যে সকল কার্য্য দেখা দেয়, সেইগুলির নাম সাত্ত্বিক অনুভাব। স্তম্ভ (জড়ের ন্যায় স্তব্ধ হইয়া থাকা) স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, কম্প, বিবর্ণভাব, অশ্রু, এবং মূর্চ্ছা এই কয়টি স্থায়ী ভাবের কার্য্য যাহা আমাদের বাহ্য শরীরে দেখা যায় তাহাই সাত্ত্বিক অনুভাব।

যাহাকে ভালবাসি, তাহাকে পাইবার জন্য জানিয়া শুনিয়া বুঝিয়া আমরা যে সকল কার্য্য দেহের দ্বারা সম্পাদন করি, সেই সকল কার্য্যই সাধারণ অনুভাব; যেমন ভ্রূভঙ্গি, কটাক্ষ, জ্ঞানপূর্ব্বক হস্তাদি সঞ্চালন প্রভৃতি। হৃদয়ে স্থায়ী ভাব একবার অঙ্কুরিত হইলে যে সকল বাহ্য বস্তুর সন্নিধানবশতঃ তাহা ক্রমে উত্তেজিত বা উপচিত হয়, সেই সকল বহিঃস্থিত বস্তুর নাম উদ্দীপন ভাব বা উদ্দীপন বিভাব; শরতের নীলাকাশে বিমল পূর্ণচন্দ্র, নববসন্তসমাগমে মৃদুমধুর মলয়মারুত হিল্লোল, নব কুসুমরাজিবিরাজিত মাধবীকুঞ্জে কোকিলের কুহুস্বর, পাপিয়ার প্রাণস্পর্শী কাকলী কলকল, সহকার-মঞ্জরী-নিষণ্ণ ভ্রমরকুলের সুমধুর ঝঙ্কার—এই সকল হৃদয়োন্মাদকর সুন্দর বাহ্যবস্তুগুলি আমাদের সঞ্চারী ভাব এবং স্থায়ী ভাবকে উত্তেজিত ও উপচিত করিয়া থাকে। এই কারণে এই বস্তুগুলিকে উদ্দীপন বিভাব বলা যাইতে পারে। সীতাদেবীকে দেখিয়া রামচন্দ্রের হৃদয়ে প্রথমে অনুরাগ আবির্ভূত হয়। এই কারণে সীতাদেবী রামচন্দ্রের স্থায়ীভাবের আলম্বন। এইরূপ, রামচন্দ্রকে দেখিয়া সীতাদেবীর হৃদয়ে অনুরাগ সঞ্চার হয়, এই কারণে সীতাদেবীর স্থায়ীভাব বা অনুরাগের আলম্বন ফলে দাঁড়াইতেছে যে, যাহাকে অবলম্বন করিয়া স্থায়ী ভাব প্রথমে উৎপন্ন হয়, তাহাকেই আলম্বন বিভাব বলা যায়।

স্থায়ী ভাবের উৎপত্তির কারণকে আলম্বন বিভাব বলা যায়। তাহার উত্তেজনার যাহা কারণ, তাহাকে উদ্দীপন বিভাব কহে। স্থায়ী ভাবের কার্য্য দ্বিবিধ; সুতরাং অনুভাবও দ্বিবিধ। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, স্থায়ী ভাবের যাহা কার্য্য, তাহাকেই অনুভাব বলা যায়; আর স্থায়ী ভাবের সহিত আমাদের হৃদয়মধ্যে যে বৃত্তি (feeling) সকল আবির্ভূত হয়, তাহাদিগকে সঞ্চারী ভাব বা ব্যভিচারী ভাব কহে।

রসের তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে এই কয়টি বিভাবের স্বরূপ ভাল করিয়া বুঝা আবশ্যক। এক্ষণে কি প্রকারে রসের অভিব্যক্তি ও আস্বাদন হয়, তাহাই দেখান যাইতেছে।

রসাস্বাদনের অধিকারী কে? তাহাই প্রথমতঃ দেখা যাক।

মনুষ্যমাত্রই রসাস্বাদে অধিকারী হইতে পারে; কিন্তু রসাস্বাদের পূর্ব্বে তাহার হৃদয়ে সত্ত্বগুণের আবির্ভাব হওয়া চাই। সত্ত্বগুণ কি? নিজের অভিলষিত বস্তুর প্রতি অত্যন্ত অনুরাগ বা অপ্রিয় বস্তুর প্রতি তীব্র বিদ্বেষ যে সময় মানবের হৃদয়কে একান্ত কলুষিত করিয়া রাখে, সে সময় তাহার হৃদয়ে সত্ত্বগুণ আবির্ভূত হইতে পারে না। সত্ত্বগুণের আবির্ভাব হইলে চিত্তে প্রসন্নতা ও লাঘব (অর্থাৎ ভারি ভাব বোধ না হওয়া) উদিত হয়; সুতরাং বুঝিতে হইবে, প্রসন্নতা ও লাঘবই সত্ত্বগুণের স্বভাব, যে নিজের লাভালাভের চিন্তায় নিমগ্ন, যাহার হৃদয়ে স্বজনবিয়োগের তীব্র দাবানল দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতে থাকে, আসন্নবিপৎপাতের তীব্র আশঙ্কায় যাহার হৃদয় অত্যন্ত ব্যাকুল, শত্রুবিশেষের সর্ব্বনাশ করিবার অভিপ্রায়ে যে ব্যক্তির হৃদয়

বিভোর হইয়া থাকে, কিংবা যে হৃদয়ে সংসারের যাবৎ বস্তুর প্রতিই কেমন একটা উপেক্ষার ভাব লাগিয়াই থাকে, সে ব্যক্তির রসাস্বাদে অধিকার নাই, আত্মম্ভরিতার তীব্র উত্তাপে যে হৃদয়ে স্নেহ, মায়া, প্রীতি প্রভৃতি কোমল বৃত্তিগুলি শুষ্কপ্রায় হইয়া যায়, সে ব্যক্তিও রসাস্বাদে অধিকারী নহে। আবাল্য নীরস শুষ্কতর্কের অভ্যাসে যাহার হৃদয় শুষ্ককাষ্ঠবৎ হইয়া যায়, সে ব্যক্তিও রসাস্বাদে অনধিকারী।

অপরদিকে পরের দুঃখে যাহার হৃদয় কান্দিয়া উঠে, সুন্দর ও পবিত্র বস্তু দেখিয়া যাহার হৃদয়ে প্রীতির উদ্রেক হয়, প্রতিবেশীর সুখে বা দুঃখে যে স্বয়ং সুখ বা দুঃখের অনুভব করে, তাহা ছাড়া যাহার সাধারণ জ্ঞান (common sense) খুব প্রবল, আকার বা ইঙ্গিত দেখিবা মাত্র অপরের মনোবৃত্তি বুঝিবার সামর্থ্য যাহার বিলক্ষণ, পরকে আপনার করিয়া লইবার যোগ্যতা যাহার হৃদয়ে সূক্ষ্মভাবে সর্ব্বদা নিহিত হইয়া থাকে, সেই ব্যক্তিই রসাস্বাদের অধিকারী। যে রসাস্বাদের অধিকারী, আলঙ্কারিকগণ তাহাকেই সহৃদয় বলিয়া থাকেন। এক কথায় বলিতে গেলে যে সহৃদয়, সেই রসাস্বাদে অধিকারী।

রসাস্বাদ কি প্রকারে হয়, এইবার তাহাই দেখান যাইতেছে।

শ্রব্যকাব্য অপেক্ষা দৃশ্যকাব্যই রসাস্বাদের অধিক উপযোগী। এই কারণে রসাস্বাদের স্বরূপ প্রদর্শনের জন্য দৃশ্যকাব্যেরই উদাহরণ দেখাইতেছি। মনে কর, আমরা কলিকাতার কোন প্রসিদ্ধ রঙ্গশালায় অভিনয় দেখিতে উপস্থিত হইয়াছি। ভারতের সর্ব্বপ্রধান ভাবের কবি ভবভূতির অক্ষয়কীর্ত্তি উত্তরচরিতের অভিনয় হইবে, আমাদের দেশের রঙ্গমঞ্চের উজ্জ্বল রত্নস্বরূপ সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতৃবর্গ উহার অভিনয় করিবেন। অভিনয়-সভায় দেখা গেল যে, যাঁহারা অভিনয় দেখিবার জন্য সমবেত হইয়াছেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই সুশিক্ষিত রসভাববিবেকসম্পন্ন এবং সহৃদয়, অভিনয়শালার অধ্যক্ষগণ যাহাতে অভিনয়ে কোন প্রকার ত্রুটি পরিলক্ষিত না হয়, সে জন্য যথেষ্ট অর্থব্যয় এবং অধ্যবসায় করিয়াছেন। সুন্দর সুন্দর দৃশ্যপট, সমুজ্জ্বল স্নিগ্ধতা, আলোকমালা, আসনবিন্যাসের অপূর্ব্ব কৌশল, শ্রবণবিবরে সুধাবর্ষী মনোহর একতান বাদ্যধ্বনি, সুরুচি-সঙ্গত বসনাভরণ প্রভৃতি উপকরণ সামগ্রী দেখিয়া অভিনয়ের ভবিষ্যৎ সাফল্যের আশায় দর্শকবৃন্দের অন্তঃকরণ উল্লসিত হইয়া উঠিতেছে। সামাজিকগণ শান্তভাবে একাগ্রহৃদয়ে অভিনয়ারম্ভের প্রতীক্ষা করিতেছেন। এমন সময় সহসা যবনিকা উত্তোলিত হইল। কি দেখিলাম?—সমস্ত দিবস সমস্ত পৃথিবীর প্রজার রঞ্জনরূপ অতিদুরূহ কার্য্য শেষ করিয়া পরিশ্রান্ত রঘুকুলধুরন্ধর রামচন্দ্র চিত্তবিনোদনের জন্য প্রাণপ্রতিমা মৈথিলীর শয়নকক্ষে উপবিষ্ট হইয়া, তাঁহারই সঙ্গে মুক্ত বাতায়নপথে বসিয়া সান্ধ্য সমীরণ সেবন করিতেছেন।

রামচন্দ্র এবং জানকীর প্রবেশের পূর্ব্বে সূত্রধার ও পারিপার্শ্বিক যাহা কিছু বলিয়াছে, তাহা শুনিতে শুনিতে সমবেত সভ্যগণের হৃদয় হইতে বর্ত্তমান সময়ের জগৎ যেন এক প্রকার অন্তর্হিত হইয়াছে, চতুর্দ্দশ বৎসরের সেই পিতৃসত্য পালনার্থ কঠোর বনবাস-ক্লেশ, তাহার উপর আবার জানকীর ন্যায় প্রাণাধিক প্রিয়তমা পত্নীর অসহ বিরহ, সেই দুরন্ত বিরহের গুরুভাব হৃদয়ে বহন করিতে করিতে জানকীর উদ্ধারের জন্য সেই অলৌকিক ও অসাধ্য উপায়ের অনুষ্ঠান, তাহার পর সমুদ্রে সেতুবন্ধন, লঙ্কার অবরোধ, রাবণের ন্যায় অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন মহাবীরের সহিত বহুদিন ব্যাপী যুদ্ধ এবং তাহার সবংশে নিপাত, এই সকল লোকোত্তর কার্য্য সম্পাদন দ্বারা জানকীর উদ্ধার সাধন এবং অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন। তাহার পর আত্মীয়স্বজন এবং সামন্ত নরপতিগণের অযোধ্যায় সমাবেশ, বহুদিন ব্যাপী রাজ্যাভিষেকের অভাবনীয় মহোৎসব, পরে মহোৎসবান্তে আত্মীয়স্বজনগণের স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন, সেই সঙ্গে রাজর্ষি জনকেরও অযোধ্যাত্যাগ এরূপ এই কয়টি ঘটনা কৌশলের সহিত সুন্দরভাবে প্রস্তাবনা দ্বারা সূচিত হইয়াছে যে, তাহাতে সকল সামাজিকের মানসপটে যেন সেই অযোধ্যা সেই রাজ্যাভিষেকোৎসবের আনন্দ, কোলাহল, আর সেই অতীত বনবাসাদি ঘটনা একসঙ্গে মিশিয়া যুগপৎ হর্ষবিষাদ ও বিস্ময়ের বিচিত্র বর্ণে আপনা আপনি প্রতিফলিত হইতেছে, তখন আমাদের এই মরজগতের বর্ত্তমান কালের ক্ষুদ্র অস্তিত্ব যেন অন্তর্হিত হইয়া

পড়ে, সকলের মনে যেন এক ভাব, এক অবস্থা এবং একই প্রকার একাগ্রতার উদয় হইয়া পড়ে, বীণা-যন্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন তারগুলি ভাল ওস্তাদের হাতে বাঁধা হইলে যেমন সকল তারে এক সুর বাজিতে থাকে, সেইরূপ এই সময় সকল সামাজিকের ভিন্ন ভিন্ন হৃদয়-তন্ত্রীগুলি একসুরে একতানে মিলিয়া এক হইয়া যায়, সেহৃদয়গুলির বিভিন্ন সত্তা সকল মিলিয়া যেন এক হইয়া উঠে; সুতরাং ঐসকল হৃদয়ে তখন ভাবের সুরে আর ভেদ থাকে না। তোমার হৃদয়ে যে ভাব উদিত হইয়া থাকে, আমার হৃদয়েও সেই ভাবই খেলিতে থাকে। তুমি আমি, রাম শ্যাম প্রভৃতির তুমিত্ব আমিত্ব রামত্ব শ্যামত্ব কোথায় ডুবিয়া যায়। আমরা সকলেই তখন এক হইয়া একই চক্ষে একই হৃদয়ে ঐ সকল কাব্য-বর্ণিত বিষয়গুলিই দেখিতে পাই। সাহিত্য রসাস্বাদের ইহাই পূর্ব্বাবস্থা এই অবস্থা না হইলে প্রকৃত রসাস্বাদন হয় না।

শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ।

ঢাকার জন্মাষ্টমী।

অধুনা অনেকেরই ধারণা যে, আমাদের দেশে মহাপুরুষের স্মৃতি রক্ষা করিবার রীতি আদৌ প্রচলিত ছিল না; প্রতীচ্য-জাতির সংস্পর্শেই উহা আমাদের দেশে প্রবেশলাভ করিয়াছে। জেতৃগণের উর্ব্বর-মস্তিষ্ক-প্রসূত অসার কল্পনা-বিজৃম্ভিত এই উক্তি আমরা বিনা বিচারেই গ্রহণ করিয়াছি। বস্তুতঃ আমাদের অসীম শাস্ত্র-জলধি মন্থন করিলে বহু ঐতিহাসিক রত্নরাজিরই সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যায়। ধর্ম্ম-প্রাণ হিন্দুর দেশে অনেক উৎসবাদি দেবতা-বিশেষের পূজার আকার ধারণ করিয়া ধর্ম্মোৎসবে পরিণত হইয়াছে। প্রত্যেক উৎসবই যে এক একটা বিশিষ্ট কারণের জন্য প্রচলিত হইয়াছিল, একটু নিবিষ্টচিত্তে অনুধাবন করিলে তাহা স্পষ্টই হৃদয়ঙ্গম হয়। কোন্ অতীত যুগের শুভ মুহূর্ত্তে মহাভারতের সূত্রধার ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে নররূপে আবির্ভূত হইয়া এক বিরাট্ ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন, সেই পুণ্যদিনের মধুর স্মৃতি আজও হিন্দু সযত্নে রক্ষা করিয়া আসিতেছে। এজন্যই জন্মাষ্টমী ব্রতের সংকল্পান্তে "ধর্ম্মায় নমঃ ধর্ম্মেশ্বরায় নমঃ ধর্ম্মসম্ভবায় নমঃ" এই মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের প্রণাম করিতে হয়। এইরূপ কল্পান্তস্থায়ী স্মৃতির ব্যবস্থা জগতের অন্য কোনও জাতি করিতে পারিয়াছেন কি না জানি না।

ব্রহ্মপুরাণে লিখিত আছে,—

"অথ ভাদ্রপদে মাসি কৃষ্ণাষ্টম্যাং কলৌ যুগে।
অষ্টাবিংশতিতমে জাতঃ কৃষ্ণোঽসৌ দেবকীসুতঃ॥"

অর্থাৎ অষ্টাবিংশতিতম কলিযুগে ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষীয় অষ্টমী তিথিতে দেবকীর গর্ভে শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হন।

আবার বিষ্ণুপুরাণে মহামায়ার প্রতি ভগবান্ বলিয়াছেন :—

"প্রাবৃট্‌কালে চ নভসি কৃষ্ণাষ্টম্যামহং নিশি।
উৎপৎস্যামি নবম্যাঞ্চ প্রসূতিংত্বমবাপ্স্যসি।"
(বিষ্ণুপুরাণ—পঞ্চমাংশ)

অর্থাৎ বর্ষাকালে শ্রাবণ মাসে কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে নিশীথ সময়ে আমি জন্মপরিগ্রহ করিব। তুমি নবমীতে আবির্ভূত হইবে।

উল্লিখিত বচনদ্বয়ে শ্রাবণ ও ভাদ্র এই উভয় মাসই শ্রীকৃষ্ণের জন্মমাস বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এই দুই শ্লোকে

সমুদ্র-মন্থন। (বড় চৌকী)

রাত্রি-জাগরণ ইত্যাদি নিয়মে জন্মাষ্টমী ব্রত করিতে হয়। স্কন্দপুরাণের মতে এই ব্রত স্ত্রী পুরুষ সাধারণেরই প্রতি বৎসর কর্ত্তব্য।

জন্মাষ্টমী তিথি যদি নিশীথ সময়ের পূর্ব্ব দণ্ডে বা পরদণ্ডে কলামাত্রও রোহিণী নক্ষত্রের সহিত যুক্ত হয়, তবে ঐ যুক্ত তিথি জয়ন্তী বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। এই যোগের নাম জয়ন্তী-যোগ। যথাঃ—

"সিংহার্কে রোহিণীযুক্তাং নভঃ
কৃষ্ণাষ্টমী যদি।
রাত্র্যর্দ্ধপূর্ব্বাপরগা জয়ন্তী
কলয়াপি চ"॥

বরাহ-সংহিতা।

জয়ন্তীযোগ হইলে উপবাস প্রভৃতিতে অধিক ফল হয় বলিয়া শাস্ত্রকারগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। উহাতে আবার সোমবার বা বুধবার পড়িলে আরও প্রশস্ত। কালমাধবীয়ের মতে জন্মাষ্টমী ব্রত ও জয়ন্তী ব্রত দুইটি পৃথক্। উপবাস, জাগরণ, দান ও ব্রাহ্মণভোজনাদি ব্যাপার জয়ন্তী ব্রতের অঙ্গীভূত; আর কেবল মাত্র উপবাসের নামই জন্মাষ্টমী ব্রত। ঢাকার বৈষ্ণব-সম্প্রদায় কালমাধবীয়ের মতেই

অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হইলেও মুখ্যচান্দ্র ও গৌণ চান্দ্র ভেদে ইহার সমাধান হইবে। যখন মুখ্যচান্দ্র শ্রাবণের কৃষ্ণপক্ষীয় অষ্টমীই গৌণচান্দ্র ভাদ্রের কৃষ্ণপক্ষীয় অষ্টমী হইয়া থাকে, তখন উক্ত পুরাণদ্বয়ে লিখিত বচনের আর অসঙ্গতি থাকে না। জন্মাষ্টমী তিথি কোন বৎসর সৌর শ্রাবণ মাসে হয়, আবার কোন বৎসর বা সৌর ভাদ্র মাসেই হয়। ঐদিনে উপবাস, যথানিয়মে শ্রীকৃষ্ণের পূজা, চন্দ্রকে অর্ঘ্যদান এবং

জন্মাষ্টমীর ব্রতানুষ্ঠান করিয়া থাকে।

স্মার্ত্ত ও বৈষ্ণবদিগের মতভেদে জন্মাষ্টমী ব্রতের ব্যবস্থা ভিন্ন ভিন্ন স্মার্ত্তদিগের মধ্যে রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য ও মাধবাচার্য্যের ব্যবস্থা এক প্রকার নহে। রঘুনন্দনের মতে বশিষ্ঠ প্রভৃতির বচনানুসারে যে দিন জয়ন্তী যোগ হয়, সেই দিনই জন্মাষ্টমী ব্রত করিতে হয়, কিন্তু দিনদ্বয়ে ঐ যোগ হইলে পরদিনে ব্রত হইয়া থাকে। জয়ন্তী যোগ না হইলে রোহিণী-

যুক্ত অষ্টমীতে ব্রতের ব্যবস্থা; দুই দিনেই যদি রোহিণীনক্ষত্রযুক্ত অষ্টমী হয়, তবে পরদিনে রোহিণীর যোগ না হইলে যে দিন নিশীথ সময়ে অষ্টমী থাকিবে সেই দিনে জন্মাষ্টমী ব্রত কর্ত্তব্য। বৈষ্ণবদিগের মতে যেদিন পলমাত্রও সপ্তমী থাকে, সে দিন জন্মাষ্টমী ব্রত হয় না। নক্ষত্রের যোগ থাকিলেও নবমীযুক্ত অষ্টমী গ্রাহ্য, কিন্তু সপ্তমীবিদ্ধা অষ্টমী নক্ষত্রযুক্ত হইলেও অগ্রাহ্য। যথাঃ—

"জন্মাষ্টমী পূর্ব্ববিদ্ধা ন কর্ত্তব্যা
কদাচন।
পলবেধে তু বিপ্রেন্দ্র সপ্তম্যাং
চাষ্টমীং ত্যজেৎ।"
(হরিভক্তি-বিলাস)

ভবিষ্যপুরাণে ও ভবিষ্যোত্তরে লিখিত আছে, উপবাসের পূর্ব্বদিনে হবিষ্য করিয়া থাকিবে, উপবাসের দিন প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তে উপবাসের সংকল্প করিবে। সংকল্পের পর "ধর্ম্মায় নমঃ ধর্ম্মেশ্বরায় নমঃ ধর্ম্ম পতয়ে নমঃ গোবিন্দায় নমঃ" ইত্যাদি উচ্চারণপূর্ব্বক প্রণাম করিবে।

এই চৌকীতে ভগবানের নৃসিংহাবতার প্রদর্শিত হইয়াছে। মুহূর্ত্ত মধ্যে দ্বাবিংশতি হস্ত দীর্ঘ বিরাট্ মূর্ত্তিটি পরিবর্ত্তিত হইয়া হিরণ্যকশিপুর সভামণ্ডপে পরিণত হইত।

কৃষ্ণের পূজার পর শ্রীপূজা, তৎপরে দেবকীর পূজা। কৃষ্ণ যশোদা প্রভৃতির হেমময় প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করিতে হয়। পূজান্তে গুড় ও ঘৃত দ্বারা বসুধারা দিতে হয়। অনন্তর নাড়ীচ্ছেদন, ষষ্ঠীপূজা এবং নাম করণাদি সংস্কার কর্ত্তব্য।

এই পর্য্যন্তই গেল শাস্ত্রীয় কথা। ঢাকায় এই জন্মাষ্টমী ব্রত উপলক্ষে যেরূপ মহা সমারোহ হইয়া থাকে, বাঙ্গালার অন্য কোনও স্থানেই সেরূপ হয় না।

কথিত আছে, বঙ্গের শেষবীর, বিক্রমপুরাধিপতি মহাপ্রাণ কেদার রায়ের অধঃপতন সংঘটিত হইলে তদীয় কুলদেবতা শ্রীশ্রী৺লক্ষ্মীনারায়ণ চক্র, নবাব ইসলাম খাঁর মুৎসুদ্দি দেওয়ান কৃষ্ণদাস বসাকের হস্তগত হয়। তৎকালে বঙ্গ-রাজলক্ষ্মী দুর্দ্ধর্ষ পাঠানের সংস্পর্শ ত্যাগ করিয়া নববলদৃপ্ত মোগলের অঙ্কশায়িনী হইবার জন্য ব্যস্ত। ষোড়শ শতাব্দী কালগর্ভে বিলীন হইবার সঙ্গে সঙ্গেই বাঙ্গালায় হিন্দু-পাঠানের সম্মিলিত শক্তির উপচয় আরম্ভ হইয়াছিল। কতিপয় স্বদেশদ্রোহীর প্ররোচনায় এবং কূট মন্ত্রণাজালে পতিত হইয়া বাঙ্গালার দ্বাদশ ভৌমিকগণ এই ঘোর দুর্দ্দিনে নিজ নিজ প্রভুত্ব স্থাপনের জন্য একে অন্যের প্রতি অত্যাচার করিতে লাগিলেন। ফলে, দ্বাদশ বীরের স্বদেশ-উদ্ধার-কামনা কল্পনায় পর্য্যবসিত হইল। ১৫৮৬ খৃঃ অব্দে সুপ্রসিদ্ধ পর্য্যাটক রালফ্ ফিচ্ এবং ১৫৯৫ খৃঃ অব্দে পাদ্রী সুইট যে চাঁদ-কেদারের বাহুবল-রক্ষিত শ্রীপুর নগরীর সমৃদ্ধিগৌরব এবং বীর ভ্রাতৃদ্বয়ের অপূর্ব্ব স্বদেশহিতৈষণা এবং অদ্ভুত সমরকৌশল সন্দর্শনে

বড় চৌকী (নবাবপুর)।

সন্দেহ আছে। কারণ, কীর্ত্তিকুসুম গ্রন্থের অপর একস্থানে লিখিত হইয়াছে "জাজপুরে পাণ্ডাগণের তীর্থ-যজমান-সংগ্রহ-তালিকা বহিতে বাঙ্গালা ১০৯৪ সনের ২৯শে মাঘ তারিখে যাদবানন্দ, বলাইদাস ও কৃষ্ণ মুচ্ছুদ্দির নাম প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।" সুতরাং ৯৮২ বঙ্গাব্দ কৃষ্ণদাসের জন্ম সন ধরিয়া লইলেও জাজপুরে যাওয়ার সময় তাঁহার বয়স ৮৮ বৎসর হয়। কেদার রায়ের অধঃপতন ১৫৭৫ খৃঃ অব্দে (৯৮২ বঙ্গাব্দ) সংঘটিত হয় নাই। ঐ সময়ে রায় ভ্রাতৃযুগলের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ। ১৬০৪ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগেই কেদার রায়, মানসিংহ কর্ত্তৃক পরাজিত হন। রায় রাজগণের অধঃপতনের পূর্ব্বে তাঁহাদিগের সযত্ন রক্ষিত কুলদেবতা অপরের হস্তগত হইয়াছিল ইহা সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না।

যাহা হউক, কৃষ্ণদাসের গৃহে রায় রাজগণের, কুল-দেবতার আবির্ভাবের পর হইতেই যে, তিনি অদৃষ্টলক্ষ্মীর

বিস্মিত হইয়াছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দী কাল চক্রবাল রেখায় পদার্পণ করিতে করিতেই তাহা লোকলোচনের অন্তরাল হইয়া গেল।

"কীর্ত্তিকুসুম" ও "জন্মযাত্রোপাখ্যান" গ্রন্থে লিখিত আছে, "৯৮২ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণদাস শ্রীশ্রী৺লক্ষ্মীনারায়ণ চক্র কেদার রায়ের গৃহ দেবতার পূজকের নিকট প্রাপ্ত হন"; কিন্তু আমাদিগের বিবেচনায় উহা সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। কৃষ্ণদাসের পিতা বলরাম দাস নবাব ইসলাম খাঁর সঙ্গে ঢাকায় প্রথম পদার্পণ করেন বলিয়া লিখিত আছে; সুতরাং প্রথম সুবাদার ইসলাম খাঁর সহিত বলরামের ঢাকায় আগমন ধরিয়া লইলেও ১৬০৮ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বে তাহার ঢাকায় থাকা প্রতিপন্ন হয় না। বলরামের পুত্র কৃষ্ণদাস ৯৮২ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন কি না তদ্বিষয়েই

কৃপাকটাক্ষলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। প্রবাদ এই যে, তিনি নিদ্রাবেশে শ্রীশ্রীবলরামমূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া স্বপ্ন-লব্ধ অপরিস্ফুট প্রত্যাদেশ বাক্য প্রতিপালনের উদ্দেশ্যে ভগবান্ বেরতীরমণের দারুময় সুন্দর সুঠাম মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিতে অধীর হইয়া উঠেন। অচিরে সর্ব্বজনচিত্তহারী দারুময় বলরামমূর্ত্তি নির্ম্মিত হইল। অনন্তর গয়াধাম হইতে পাষাণময় মদনমোহন বিগ্রহ আনয়ন করিয়া এবং অষ্টধাতুময় সমুজ্জ্বল কিশোরীমূর্ত্তি গঠিত করিয়া তিনি ১০২০ বঙ্গাব্দে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র শ্রীপাদ বীরভদ্র গোস্বামীর নামে শ্রীশ্রী৺লক্ষ্মীনারায়ণ চক্র সহ উক্ত বিগ্রহ-দ্বয় প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার কিয়ৎকাল পূর্ব্বেই কৃষ্ণদাস ঢাকা নগরীতে জন্মাষ্টমী উৎসবের সূচনা করিয়াছিলেন এবং উহাই বহু আড়ম্বরপূর্ণ জন্মাষ্টমী শোভাযাত্রার প্রথম সূত্রপাত। ১০২০ বঙ্গাব্দের পর ব্রজলীলার অভিনয় লইয়া

শোভাযাত্রার উৎকর্ষ সাধন আরম্ভ হয়। নন্দোৎসব প্রভৃতি ব্যতীত অন্য কোনও অনুষ্ঠান জন্মাষ্টমীর অঙ্গীভূত করিবার আবশ্যকতা তখনও উপলব্ধি হয় নাই। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রতিষ্ঠিত বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারকার্য্যে ব্রতী হইয়া বীরভদ্র গোস্বামী ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ ভাগে ঢাকায় শুভাগমন করিয়াছিলেন। ভক্তবীর বৃন্দাবন দাস তদীয় "নিত্যানন্দ বংশাবলী" গ্রন্থে ইহা উল্লেখ করিয়াছেন। পঞ্চদশ শতাব্দীতে

বড় চৌকী।

বঙ্গদেশে যে অপূর্ব্ব প্রেম-বন্যা প্রবাহিত হইয়াছিল, প্রভুপাদ বীরভদ্র গোস্বামীর উদ্যমে সেই প্রেম-বন্যার বীচি-বিক্ষেপ ঢাকা পর্য্যন্তও আসিয়া পৌছিয়াছিল। পীতবসন পরিহিত এবং পুষ্পমাল্যে বিভূষিত হইয়া তিনি করতাল মৃদঙ্গ সংযোগে ঢাকা নগরীর প্রতি প্রান্ত হরিনামামৃতে সিঞ্চিত করিয়াছিলেন। অপূর্ব্ব ভক্তিরসের সেই মহান্ আদর্শই তৎকালে দেশে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল, সুতরাং জন্মাষ্টমীর প্রাথমিক শোভাযাত্রার যে উহার কিঞ্চিৎ বাহুল্য ঘটিয়াছিল তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। তৎকালে কৃষ্ণ বলরাম সহ নন্দ যশোদাদি একটি সুসজ্জিত কাষ্ঠমঞ্চ মধ্যে স্থাপিত করিয়া বাহির করা হইত। তৎসঙ্গে দধি-নবনী-ভারবাহী ও অন্যান্য নর্ত্তন-পর গোপবৃন্দ ও ব্রজবাসিগণ কেহ অশ্বোপরি এবং কেহ বা ভূপৃষ্ঠে অবস্থানপূর্ব্বক নৃত্য ও বাদ্যাদি করিয়া শোভাযাত্রার প্রত্যুদ্গমন করিত। উহাই প্রথমাঙ্গ নন্দোৎসব। তৎসঙ্গে ভক্তিমান্ বসাক সম্প্রদায় হরিনাম সংকীর্ত্তন করিতে করিতে উহার অনুসরণ করিত।

কৃষ্ণদাসের মৃত্যু হইলে ১০৪৫ বঙ্গাব্দের পর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চতুষ্পাদ সমন্বিত চৌকিতে ভগবানের অবতারাদির মূর্ত্তি প্রদর্শিত হইতে লাগিল। তৎসঙ্গে ক্রমশঃ পতাকা-নিশানাদি ও বন্দুক বর্ষা প্রভৃতি এবং আশা-সটা-বল্লম-ছড়িধারী পদাতিক ও অন্যান্য আড়ম্বরপূর্ণ সাজ সজ্জা শোভাযাত্রার অঙ্গীভূত হইয়া পড়ে। ইহাই জন্মাষ্টমী মিছিলের পরবর্ত্তী উন্নতাবস্থা। ক্রমে নবাবপুরের তদানীন্তন অন্যান্য বসাক বংশীয় কমলার বরপুত্রগণ স্বীয় দেবালয় হইতে জন্মাষ্টমী উপলক্ষে পৌরাণিক উপখ্যানানুযায়ী বিবিধ "সং" বাহির করিয়া শোভাযাত্রার সৌষ্ঠব ও সমৃদ্ধিগৌরব বর্দ্ধিত করিতে লাগিলেন। এইরূপ প্রায় শতাধিক বৎসর অতীত হইলে আনুমানিক ১০৫০ বঙ্গাব্দে উর্দ্দু বাজার নিবাসী গঙ্গারাম ঠাকুর নামধেয় জনৈক বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ বসাকগণের অনুকরণে অপর একটি শোভাযাত্রার অনুষ্ঠান করেন। এই মিছিল ঢাকার উর্দ্দুপল্লী হইতে অমরাপুর (নবাবপুর) পর্য্যন্ত অগ্রসর হইত; কিন্তু অল্পকাল পরেই উহার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া যায়। তৎকালে মিছিলগুলি নবাবপুর মধ্যেই পর্য্যটন করিত, পরে উহা নবাবপুর অতিক্রম করিয়া বাঙ্গালাবাজার প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণপূর্ব্বক পুনরায় নবাবপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিত।

বঙ্গীয় দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তাঁতিবাজার পানিটোলা নিবাসী গদাধর ও বলাইচাঁদ বসাক কর্ত্তৃক ইসলামপুরের মিছিলের আরম্ভ হয়। অধুনা এই মিছিল উহাদিগের প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রী৺কৃষ্ণচন্দ্র বিগ্রহের প্রীত্যর্থেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। মাননীয় ডাক্তার টেলার সাহেব তদীয় "টপোগ্রাফি অব ঢাকা" গ্রন্থে নবাবপুর পক্ষকে লক্ষ্মী-নারায়ণের দল এবং ইসলামপুর পক্ষকে মুরারিমোহনের দল বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। মুচ্ছুদ্দি বংশের কুল-

দেবতা লক্ষ্মীনারায়ণের প্রীত্যর্থে নবাবপুরের মিছিল অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া তিনি নবাবপুরের পক্ষকে লক্ষ্মীনারায়ণের দল বলিয়াছেন। তৎকালে অপর পক্ষীয়দিগের নিজের প্রতিষ্ঠিত দেবতা না থাকায়, তাঁহারা তাঁহাদিগের কুলগুরু প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ মুরারিমোহনের প্রীত্যর্থেই জন্মোৎসব সম্পন্ন করিতেন। এজন্যই টপোগ্রাফি গ্রন্থে উহা মুরারীমোহনের দল বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। তৎকালে গদাধর ও বলাইচাঁদ সহরের মধ্যে সম্পদ্‌-গৌরবে যথেষ্ট প্রতিপত্তি-শালী হইয়া উঠে। তাহারা মিছিলের উন্নতি সাধন করিয়া মহা সমারোহে নবাবপুর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইত। ইসলামপুরের মিছিল আরম্ভ হওয়ায় উভয় পক্ষ আপন আপন মিছিলের সমৃদ্ধিগৌরব বর্দ্ধিত করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। এই প্রতিযোগিতার ফলে শোভাযাত্রা যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছিল। ক্রমে উভয় পক্ষেই নানা পৌরাণিক আখ্যায়িকার মনোরঞ্জন চিত্র প্রভৃতি "সং" এর অঙ্গীভূত হইয়া পড়িল। এই সময়েই বড় চৌকী, সোনা রূপার চতুর্দ্দোল, হস্ত্যশ্ব-পৃষ্ঠোপরিস্থ কারুকার্য্যময় জরীর সাজ মিছিলের সমৃদ্ধি জ্ঞাপন করিতে লাগিল। উভয় পক্ষ হইতে প্রভূত অর্থব্যয়-সাধিত বিবিধ পাদচারী ও মঞ্চস্থাপিত সং মনোরম সাজ সজ্জায় জন্মাষ্টমীর উৎসবকে জাঁকাল করিয়া তুলিল। তৎসঙ্গে ঢাকার পূর্ব্বতন শাসন-কর্ত্তা নবাবগণ যে প্রকার মিছিল সহকারে অতি সমারোহে নগরে বাহির হইতেন, তাহারও কতক অনুকরণ করিয়া ঐ নবাব সোয়ারী অংশ মিছিলের কোন কোন স্থানে সন্নিবেশিত হইয়া উহার অবয়ব বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

পূর্ব্বে জন্মাষ্টমীর পারণা দিবসেই নন্দোৎসবের সঙ্গে শোভাযাত্রা বাহির হইত। ইংরেজাধিকারের পরে ঢাকায় শ্বেতাঙ্গসম্প্রদায়ের বাহুল্য ঘটিলে তাঁহাদিগের সুবিধা অসুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া রাজপুরুষগণ রবিবার দিন পারণা হইলেও মিছিলের আদেশ দিতে আপত্তি করিতে লাগিলেন। সেই সময় হইতেই শোভাযাত্রার চির নির্দ্দিষ্ট দিনের ব্যত্যয় হইয়া দিনান্তর হইতে লাগিল।

১২৫৪ বঙ্গাব্দে নবাবপুরস্থ গোপবংশীয় ছয়টি পরিবার এবং বসাকবংশীয় নয়টি পরিবারের মধ্যে মনান্তর হয়। এই বিবাদ "৬ঘরী ৯ঘরী দলাদলি" বলিয়া পরিচিত। এই বিসম্বাদের ফলে উভয় পক্ষে ঘোরতর দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। মুচ্ছুদি বাটীস্থ ঠাকুর বাড়ীর-প্রাঙ্গণে উভয় পক্ষের বহু-লোক অস্ত্রশস্ত্রাদি সহ সমবেত হইয়া বল পরীক্ষায় নিযুক্ত হইল। ফলে কতিপয় লোক আহত হইয়া বিচারালয়ের আশ্রয় গ্রহণ করিল। এই ঘটনা কার্ত্তিকের উত্থান দ্বাদশী দিন পূর্ব্বাহ্নে ঘটিয়াছিল। এজন্য উহা "নিয়মপূর্ণার হাত কাটাকাটি" বলিয়া অভিহিত হয়। এই আত্মকলহের ফলে নবাবপুরের পক্ষীয়গণ সেই বৎসর শোভাযাত্রার আয়োজন করিতে পরাঙ্মুখ হইলে স্থানীয় নিত্যানন্দ বংশীয় স্বর্গীয় কৃষ্ণকান্ত গোস্বামী মহাশয় নবাবপুরের উভয় পক্ষ হইতে চাঁদা সংগ্রহপূর্ব্বক কোনও প্রকারে জন্মোৎসবের মিছিল নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন।

নবাবপুর ও ইসলামপুর এই উভয় পক্ষের মিছিলই পূর্ব্বে একদিনে বাহির হইত। রায় সাহেবের বাজারস্থ পুলের নিকটে প্রতিদ্বন্দ্বিপক্ষদ্বয় পরস্পর সম্মুখীন হইলে বিবাদ ঘটিতে পারে এই আশঙ্কা করিয়া উভয় পক্ষের বয়োবৃদ্ধগণ একটি সুনিয়ম নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন যে, যে পক্ষের মিছিলের অগ্রভাগস্থ পতাকা অগ্রে সেতু অতিক্রম করিতে সমর্থ হইবে সেই পক্ষীয়গণই অগ্রে সেতু পার হইয়া চলিয়া যাইবে; কিন্তু এই নিয়মে বিবাদ বন্ধ না হইয়া বরং বর্দ্ধিতই হইয়াছিল। পরে ১২৬২ বঙ্গাব্দে কমিশনর ডেভিড্‌সন সাহেবের যত্নে এই অশান্তি দূর হয়। তিনি দুই পক্ষকে দুই দিনে মিছিল বাহির করিবার জন্য পরামর্শ দেন। তৎপর হইতে এই নিয়মই রক্ষিত হইতেছে।

সূচনা হইতে এপর্য্যন্ত নবাবপুরের মিছিল পাঁচবার স্থগিত হইয়াছে:—(১) বর্গির হাঙ্গামার ভয়ে যখন বঙ্গদেশ সন্ত্রস্ত, সেবার মিছিল বাহির হয় নাই। (২) "বৃন্দাবনী ধুম" —দেওয়ান বৃন্দাবন রাজদ্রোহী হইয়া যে বৎসর ঢাকা নগরী লুণ্ঠন করেন, সে বৎসর মিছিল বন্ধ ছিল। (৩) ব্রহ্মদেশের প্রথম যুদ্ধের সময় মিছিল হইতে পারে নাই। (৪) সামাজিক দলাদলির ফলে একবার মিছিল বন্ধ হয়। (৫) ১২৬০ বঙ্গাব্দে ইসলাপুরের প্রতিযোগিতায় বিবাদ বিসংবাদের আশঙ্কায় মিছিল বন্ধ থাকে। ইসলামপুরের মিছিল এপর্য্যন্ত বন্ধ হয় নাই। নবাবপুরের মিছিলের ব্যয় নবাপুরের

অধিবাসিগণের নিকট হইতে সংগৃহীত অর্থেই নির্ব্বাহ হয়; ইসলামপুরের মিছিলের ব্যয়ভার গদাধর ও বলাইচাঁদের বংশধরগণই বহন করিয়া থাকে।

প্রথমে সুবৃহৎ পতাকা, পরে দুই পংক্তিতে সারি দিয়া বর্শা-আসাসটা-বল্লমধারী পদাতিকবৃন্দ, এবং সুবর্ণ ও রৌপ্য নির্ম্মিত বহুসংখ্যক দীপাধার, তৎপরে হেমময় বিরাট্ কিরীট-শোভিত কুঞ্জরদ্বয়, তৎপশ্চাতে সাচ্চার জরীর কারুকার্য্য শোভিত ঝুল-সমন্বিত হস্তীযূথ, পরে সুবর্ণ ও রৌপ্যময় শিরোভূষণ ও মূল্যবান্ ঝুলপরিহিত শতাধিক বাজীবৃন্দ শোভাযাত্রার পুরোভাগে স্থাপিত হয়। তৎপশ্চাতে বনমালাবিভূষিত পীতধড়া-চূড়া-পরিহিত সুবর্ণ ও রৌপ্য নির্ম্মিত বংশীকরধৃত বালকবৃন্দ শ্রীদাম সুদাম সখাসহ কেহবা ভূপৃষ্ঠে কেহবা অশ্বপৃষ্ঠে সমাসীন হইয়া অগ্রসর হইতে থাকে। পরে দধি-নবনী-ভার-বাহী নর্ত্তনপর গোপবৃন্দ উহার প্রত্যুদ্গমন করিতে থাকে। দামামা, তূরি, ভেরী, রামশিঙ্গা, সানাই, টিকারা, প্রভৃতি প্রাচীন বাদিত্রসহ বাদকগণ এবং সুসজ্জিত মনোরম বেশধারী অসংখ্য পৌরাণিক ও আধুনিক সং ও অভিনয় মিছিলের সহযাত্রী হয়। এতৎ সমুদয়ের পশ্চাতে কাগজ ও রাং নির্ম্মিত বিবিধ মনোরম কারুকার্য্য সমন্বিত প্রায় ত্রিংশৎ সংখ্যক ছোট চৌকী, এবং প্রায় বিংশতি সংখ্যক নয়নলোভন হেমময় ও রজতময় ছোট চৌকী, এবং সর্ব্বশেষে বহু পদাতিক ও বাদিত্রগণ পুরোভাগে রাখিয়া রাজবেশ পরিহিত সুগৌরকান্তি নবকিশোর বয়স্ক বালক সুসজ্জিত কুঞ্জরপৃষ্ঠোপরিস্থ সিংহাসনে সমাসীন হইয়া মন্থরগতিতে উহার অনুসরণ করিয়া থাকে। ইনি মিছিলের রাজা পদবাচ্য। এই বিশালায়তন শোভাযাত্রা প্রায় দুই মাইল দীর্ঘ হইয়া থাকে।

মিছিল এইরূপ আড়ম্বরপূর্ণ হইলেও বড় চৌকিগুলিই ইহার গৌরবস্তম্ভ। বস্তুতঃ, জন্মাষ্টমীর বড় চৌকির শিল্প-চাতুর্য্য ভারত-প্রসিদ্ধ। ইহার এক একখানি উচ্চতায় ত্রিতল অট্টালিকাকেও পরাজয় করিয়া থাকে। এই সুবিশাল চৌকিগুলি বংশদণ্ড এবং কাগজদ্বারা নির্ম্মিত। ইহার বিভিন্ন অংশগুলি খণ্ডিতাকারে সহরের নানাস্থানে বিভিন্ন কারিকরের দ্বারা নির্ম্মিত হইলেও মিছিলের ৪।৫ ঘণ্টা পূর্ব্বে সংযোজিত করা হয়। তখন উহা যে পৃথক্ পৃথক্ ব্যক্তিগণের হস্তপ্রসূত তাহা একেবারেই অনুমিত হয় না। কোনও কোনও শিল্পী চৌকিগুলি শুধু সুনিপুণভাবে নির্ম্মাণ করিয়াই ক্ষান্ত হয় না। উহাতে বিবিধ প্রকারের কল সংযোজনা করিয়া নানা প্রকার অদ্ভুত ক্রীড়া প্রদর্শন করিয়া থাকে এবং প্রতি মুহূর্ত্তে চৌকীগুলির দৃশ্য আশ্চর্য্যরূপে পরিবর্ত্তিত করিয়া দর্শকবৃন্দের চিত্তবিমোহন করিতে সমর্থ হয়। এই অভিনব প্রণালী গত কএক বৎসর যাবৎ সূচিত হইয়াছে। এবং ঢাকার সুপ্রসিদ্ধ শিল্পী আনন্দহরি রায়কেই ইহার প্রকৃত প্রবর্ত্তক বলা যাইতে পারে। এই শ্রেণীর চৌকীগুলির মধ্যে "বেলুন," "নৃসিংহ অবতার," "সমুদ্রমন্থন" "শূন্যে কালী," "রঙ্গভঙ্গ," "মদনভস্ম," "ভগবানের বিশ্বরূপ প্রদর্শন","উর্ব্বশীর শাপ বিমোচন" প্রভৃতি শীর্ষস্থানীয় হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত "যোগমায়া," "ছয় রাগ ও ছত্রিশ রাগিণী" "সগরবংশ উদ্ধার," "ইন্দ্রসভা," "লর্ড কার্জ্জনের দিল্লী-দরবার" প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নভোমণ্ডলস্থ গ্রহগণের ভ্রমণ ও গ্রহাদি এবং পৌরাণিক ও সামরিক যুদ্ধ বিগ্রহাদি, দুর্গ, কেল্লা, সার্কাস, ঘোড়দৌড়, দার্জ্জিলিঙ্গের রেলপথ, প্রভৃতি ক্রীড়া কৌশলও বড় চৌকীতে প্রদর্শিত হইয়া থাকে। আনন্দহরির পিতা স্বর্গীয় লক্ষ্মণ রায়ই কাগজের পুতুল দ্বারা জন্মাষ্টমীর বড় চৌকি সজ্জিত করিবার পথপ্রদর্শক।

শ্রীযতীন্দ্র মোহন রায়।

প্রেমার্চ্চিত ।

কত ভালবাসে, হায়—
ক্ষণে ক্ষণে বোঝা যায় ;
পাষাণ গলিয়া অশ্রু ছুটে !

তাহারি আহ্বান শুনি'
রহি' রহি' দিন গুণি ;
—জীবন-পল্লব পড়ে টুটে' !

গগন-গরিমা ধীরে
ডুবিছে অম্বর-নীরে ;
ত্রস্ত পাখী কোথা ছুটে' যায় ।

শুভ্র দু'টি পক্ষ-তলে
নীল সিন্ধু মন্থি' চলে,
ডাক শুনি' খুঁজিছে কুলায় ।

কত ভালবাসে, তা'ই
ভাবি মনে । সীমা নাই !
—'সীমা নাই' মানি' মরি লাজে !

ব্যাপি' এ বিপুল ধরা
সকল-সুন্দর-করা
এ সোহাগ আমারে কি সা'জে

ফুলপুঞ্জে ফুটি' হাসে,
ভৃঙ্গ হয়ে গুঞ্জি আসে,
আশেপাশে গন্ধ হয়ে বহে

করায়ে কিরণ-স্নান
তুলে' ধরে মুখ খান,—
চাঁদ হয়ে শুধু চাহি' রহে।

প্রভাত-শিশির-হারে
দুলাইয়া বারে বারে ;
ইন্দ্রধনু রচি' তাহে, নাচে !

মেঘ-মন্দ্রে অভিমানী,
আবার বেদনাখানি
বিদ্যুতে চমকি মোরে যাচে ।

ধারায় ধারায় নেমে'
অশ্রু তা'র মহাপ্রেমে
ধায় নদ-তরঙ্গিণী-ধারে ;

বিরহ-প্লাবনে মোরে
এমনি আচ্ছন্ন করে'
নিত্য তাই টানিছে পাথারে ।

নাহি রাত্রি, নাহি দিবা,
বঁধুয়া আমারে কিবা
অনিবার রহিয়াছে ঘিরে' !

কভু সুধা-সম্ভাষণ,
কভু পুণ্য-পরশন,
আভাস-ইঙ্গিত ঘুরে' ফিরে' !

ওগো প্রিয়, কিবা চাও ?
পায়ে পড়ি, টেনে নাও—
লহ টানি' বুকের মাঝারে !

এত প্রেম, সমাদর,
সহেনা, সহেনা মোর ;
কাঁপে হিয়া এ আগ্রহ-ভারে ।

শ্রীদেবকুমার রায় চৌধুরী

প্রাচীন

ভারতবর্ষের ভৌগোলিক তত্ত্ব।

(পৌরাণিক মূল হইতে সংগৃহীত)।

ভূগোলশাস্ত্র সম্বন্ধে যে সকল পুস্তক এখন বাঙ্গালা ভাষায় বর্ত্তমান আছে এবং বঙ্গবিদ্যালয়সমূহে পঠিত হইয়া থাকে, তাহা ইংরেজী ভূগোলশাস্ত্র অথবা Geographyর অনুবাদ এবং অনুকরণ মাত্র। শুধু ভূগোল কেন,—পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, উদ্ভিদবিদ্যা প্রভৃতি বিজ্ঞান-বিষয়ক পাঠ্য পুস্তকগুলি, ইতিহাস নামধেয় গ্রন্থাবলি, এমন কি গদ্যপদ্য রচনা-সংযুক্ত সাধারণ সাহিত্যেরও অধিকাংশ পাঠ্যপুস্তক ইংরজীর অনুবাদ অথবা অনুকরণপ্রসূত। এই অনুবাদ অথবা অনুকরণপ্রথার সপক্ষে কিংবা বিপক্ষে কিছু বলিবার উদ্দেশ্য আমাদের নাই,—এবং সেরূপ সমালোচনায় আমাদের অধিকারও নাই। বঙ্গসাহিত্যের অভিভাবকগণ এবং শিক্ষাপরিষদের সুপণ্ডিত ব্যক্তিবর্গের সুযোগ্য স্কন্ধে সেই ভার অর্পিত করিয়া,—আমরা অর্থাৎ বঙ্গের সাধারণ লোকসঙ্ঘ বেশ নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি এবং আছি।

উপোদঘাত নিবেদন।

আজ ভূগোল লইয়াই আমরা কিছু বলিতে অগ্রসর হইতেছি;—আর সেই ভূগোলকথা আমাদের এই প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তরা এবং জননী হইতেও পূজ্যতরা জন্মভূমি সম্বন্ধেই বলিতে যাইতেছি। আমাদের দেশকে আমরা অতি শিশুকাল হইতেই "ভারতবর্ষ" নামে চিনি। জ্ঞানোদয়ের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পাঠশালায় পাঠাভ্যাসকালে বিদ্যালয়ের সেই জীর্ণ শীর্ণ দেওয়ালে আমরা "ভারতবর্ষের মানচিত্র" দেখি। আজ প্রায় অর্দ্ধশতাব্দীর অধিক কাল হইতে চলিল, বাঙ্গালী বালকবালিকাগণ এই মানচিত্র দেখিয়া আসিতেছে এবং শিক্ষকেরা দেখাইয়া আসিতেছেন। সুলেখক- সুকবি
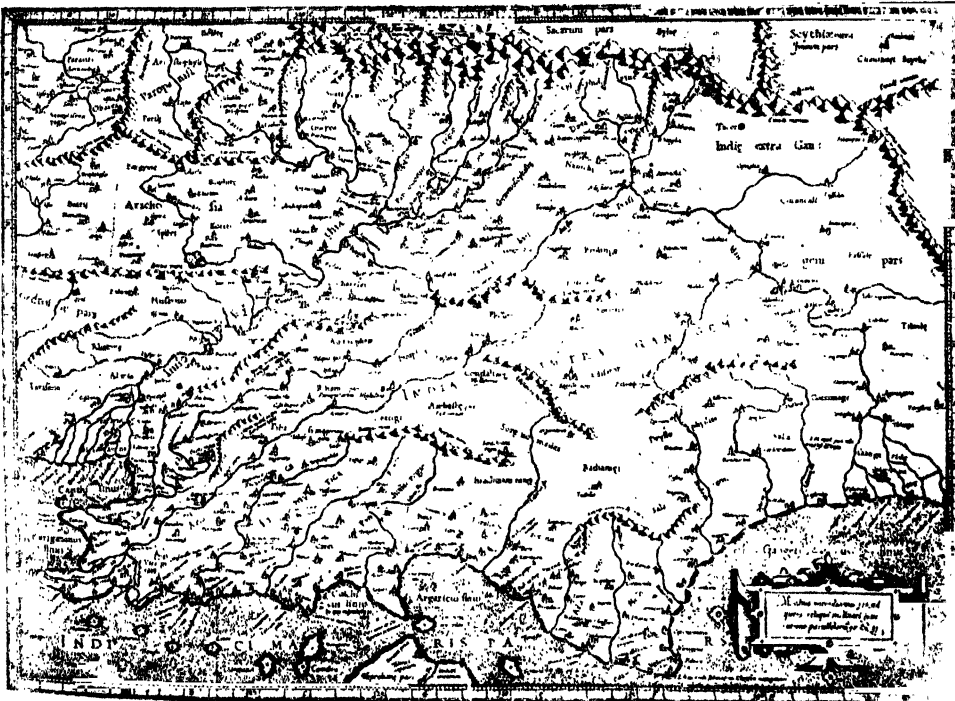
ভারতবর্ষের মানচিত্র—টলেমী

এবং সুশিক্ষক শ্রদ্ধাস্পদ যোগীন্দ্রনাথ বসুজও তাঁহার ছাত্রগণকে এই মানচিত্রই দেখাইয়াছেন। * বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যার্থী যখন উচ্চতর শিক্ষার স্থান অর্থাৎ ইংরেজী বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে, সেখানেও সেই দৃশ্য,—সেই মানচিত্রই দেখিতে পায়; কেবল "ভারতবর্ষ" নামের পরিবর্ত্তে "(India)" ইণ্ডিয়া নামটি শিখিতে হয়, এইমাত্র প্রভেদ।

ইণ্ডিয়ার যে মানচিত্র আমরা অধুনা দেখিতে পাই, তাহার সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কিছু বলিবার নাই,—কারণ যবনাদি প্রাচীন বৈদেশিকগণ আমাদের দেশকে যেমন বুঝিয়াছিলেন,—তেমনই উহার নামকরণ করিয়াছিলেন। তবে বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে, যবনরাজ মহাবীর সেকেন্দর সাহের ইণ্ডিকা বা ইণ্ডিয়া এবং আধুনিক ইণ্ডিয়া এক বস্তু নহে। মুসলমান সময়ের হিন্দুস্থানও আধুনিক ইণ্ডিয়া নহে। আধুনিক মানচিত্রে আমাদের বর্ত্তমান রাজরাজেশ্বর ইংলণ্ডেশ্বরের ইণ্ডিয়া চিত্রিত হইয়াছে। ইহার তুলনায় প্রাচীন যাবনিক ইণ্ডিয়া বা ইণ্ডিকা অতি নগণ্য স্থান ছিল। পাঠক মহাশয়গণ ইচ্ছা করিলে যে কোন একখানি এনসাইক্লোপিডিয়ার ভূচিত্রাবলীতে প্রাচীন ইণ্ডিয়ার চিত্র দেখিতে পাইবেন।

যাহাই হউক,—এসব অবান্তর কথায় আমাদিগের বিশেষ প্রয়োজন নাই। আমরা "ইণ্ডিয়া" লইয়া কি করিব?—আমাদের প্রয়োজন "ভারতবর্ষ" লইয়া। আমাদের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা এই যে, দেবতাদিগেরও বাঞ্ছিত অগণ্য অবতার এবং মহাত্মাদিগের চরণরেণুতে পবিত্র, লক্ষ লক্ষ মহর্ষি ও রাজর্ষিদিগের সাধনার স্থান ও তপস্যার ক্ষেত্র, অগণ্য বীরবৃন্দের স্বার্থত্যাগের সর্ব্ববিধ সদাচারের স্মৃতিকাগারস্বরূপ প্রাচীন ভারতবর্ষকে আমরা একবার দেখিব এবং চিনিব। ভারতবাসী আমরা চিরকাল ত এইরূপ ছোট ছিলাম না, এককালে আমরা যে খুবই বড় ছিলাম,—জগতের ইতিহাস সেকথা স্পষ্টাক্ষরে ঘোষণা করিতেছে, পৃথিবীর আধুনিক সভ্যজাতির প্রায় সকলেই আমাদের পিতৃপিতামহদিগের নিকট হইতে গৃহীত ঋণ স্বীকার করিতেছেন এবং অনেকেই সেই ঋণ শোধ করিতেছেন।

যে সময়ে আমরা এত বড় ছিলাম,—যে সময়ে পৃথিবীর সকল দেশের লোকই অতি আগ্রহের সহিত আমাদের শিষ্যত্ব স্বীকার করিত † তখন আমাদের এই দেশ কিরূপ ছিল, কত বড় ছিল, তাহা জানিতে কাহার না কৌতূহল জন্মে?

কিন্তু এই কৌতূহল নিবৃত্তির উপায় কি? আমরা অতি অভাগ্য; আমাদের দেশের ভূগোল নাই,—আমাদের দেশের বা জাতির ইতিহাস নাই"—এই বলিয়া আমরা সকলেই কাঁদিয়া থাকি। আমাদের বৈদেশিক গুরুগণও, তাঁহারা মুসলমানই হউন অথবা ইংরেজই হউন,—আমাদিগকে অনবরত অতি যত্ন ও ঐকান্তিক নিষ্ঠার সহিত শিখাইতেছেন, "—তোমাদের ইতিহাস নাই,—তোমাদের ভূগোল নাই,—তোমাদের বিজ্ঞান নাই,—ইত্যাদি ইত্যাদি"। আর আমরাও সেই উপদেশে মোহিত এবং উদ্ভ্রান্ত হইয়া কেবল কাঁদিতেছি। কিন্তু প্রকৃত কথা কি তাই?—প্রকৃতই কি আমরা নিতান্ত অভাগ্য? না—অথবা সেরূপ অভাগ্য নহি। ইতিহাস যে আমাদের আছে এবং চেষ্টা করিলে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র রাজবংশেরও অতি বিস্তৃত ইতিহাস লিখিত হইতে পারে,—আজমীরের পণ্ডিতপ্রবর হীরাচাঁদ গৌরীচাঁদ ওঝা মহাশয় তাঁহার "চালুক্য ইতিহাস" লিখিয়া দেখাইয়াছেন। মহারাষ্ট্রের গৌরবস্বরূপ অশেষ ভক্তিভাজন পণ্ডিতকুল-শিরোমণি ডাক্তার সার রামকৃষ্ণগোপাল ভাণ্ডারকর তাঁহার "দাক্ষিণাত্যের ইতিহাস" রচনা করিয়া আমাদের কলঙ্ক অনেক দূর করিয়াছেন। সুখের বিষয় বাঙ্গালায়ও তাহার সূত্রপাত হইয়াছে। বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি ইতিহাসের তথ্যসংগ্রহের পথে যেরূপ অগ্রসর হইয়াছেন—তাহাতে আশা হয়, বাঙ্গালীর সে কলঙ্ক মুছিতে পারে। শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ভারতবর্ষের প্রাচীনকালের ইতিহাস লিখিয়া আমাদের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। দুঃখের বিষয় ভূগোল সম্বন্ধে আশার আলোকের অতি ক্ষীণ রশ্মিও আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই। আশা করি, অদূর ভবিষ্যতে বাঙ্গালায় কোন প্রতিভাবান্ মহারথ সে দিকে,

* মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত্রপ্রণেতা সুকবি যোগীন্দ্রনাথ বসু [illegible] চিত্র করিয়াছিলেন [illegible] লক্ষ্য করা হইয়াছে

† "এতদ্দেশপ্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ।
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্ব্বমানবাঃ॥
মনুসংহিতা

এ পথে অধ্যবসায় সহকারে অগ্রসর হইয়া আমাদের আশা পূর্ণ করিবেন।

যে পর্য্যন্ত সূর্য্যদেব রাত্রির আবরণে আবৃত থাকেন,—লোকে কখনই অন্ধকারে থাকিতে চাহে না, তাহার ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র দীপ জ্বালাইয়া নিজ নিজ অভাব-মোচনে যত্নবান্ হয়। তদ্রূপ, যে পর্য্যন্ত কোন প্রতিভাশালী লেখক ভারতবর্ষের প্রাচীন ভৌগোলিক তত্ত্ব সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসারে গবেষণায় প্রবৃত্ত না হইতেছেন, ততদিন অলসভাবে বসিয়া না থাকিয়া, আমরা আমাদের অতি সামান্য শক্তি লইয়া, এ সম্বন্ধে দুই চারি কথায় আলোচনা করিতে অগ্রসর হইতেছি। ক্ষুদ্র কুলিমজুর বনজঙ্গল কাটিয়া পথ করিয়া দিলে তবে রথী মহারথ নিজ নিজ রথ পরিচালনা করিতে পারেন। আমরা এই পথে, সেই উদ্দেশ্যে সেই কুলিমজুরের কার্য্য করিতেই অগ্রসর হইয়াছি। ভগবানের চরণে আমাদের প্রার্থনা যে, তিনি সত্বরেই রথী-মহারথদিগকে এই পথে প্রেরণ করুন।

আমাদের অবলম্বন পুরাণগ্রন্থাবলী। পুরাণের নাম শুনিলে নাসিকাসঙ্কুচিত করেন, অথচ পুরাণ কখনও চক্ষুতেও দেখেন নাই, এদেশে এরূপ পাঠকের সংখ্যা অল্প নহে। তাদৃশ মহানুভব মহাশয়দিগের প্রতি আমাদের বিনীত প্রার্থনা এই যে, তাঁহারা যেন 'পরের মুখে ঝাল না খাইয়া নিজে যে কোন একখানি মহাপুরাণ লইয়া পড়িতে আরম্ভ করেন। তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবেন যে, আমাদের পূর্ব্ব পিতামহগণ কি অসাধারণ পরিশ্রম দ্বারা এই সকল রত্নের খনি লাভ করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডের কীর্ত্তিস্তম্ভস্বরূপ বিরাট্ বিশ্বকোষ (Encyclopaedia Britannica) ও এই বহু পুরাতন পুরাণ গ্রন্থাবলীর নিকট নগণ্য বলিয়া বোধ হইবে। পুরাণে অনেক কাল্পনিক কথা আছে ;—স্বর্ণরৌপ্যাদি ধাতুর অথবা হীরকাদি রত্নের বহুসহস্র যোজনব্যাপী পর্ব্বতমালা, দধি-ক্ষীরসুরাসর্পিপূর্ণ মহাসাগর, অযুত নিযুত বৎসর পরিমাণের দীর্ঘায়ু নীরোগ নরনারীসমূহের অতিরিক্ত বিবরণ ইত্যাকার অনেক অলীক উপকথা পুরাণে লিপিবদ্ধ আছে, তাহা নিতান্ত গোঁড়া ভিন্ন কেহই অস্বীকার করিবেন না ; আবার ইহপরলোকের পরমাবশ্যক অনেক কথাই যে সেখানে অতি সুন্দররূপে কথিত হইয়াছে, তাহাও কোন বিচক্ষণ ব্যক্তি অপলাপ করিতে সাহসী হইবেন না। একটু ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ের সহিত পুরাণ পাঠ করিলেই পাঠের ফল পাওয়া যায়। আমরা যখন বিষ্ণুশর্ম্মার সঞ্জীবক ও দমনকের উপাখ্যান হইতে নীতিশিক্ষা করি, তখন পুরাণপাঠে ভয় করিব কেন ?

তবে দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, আমাদের প্রকৃত সৌভাগ্য এবং গৌরবের বস্তুস্বরূপ রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণ প্রভৃতির একটিও ভাল সংস্করণ অদ্যাপি প্রকাশিত হইল না। সম্প্রতি য়ুরোপে মহাভারতের এক পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে, কিন্তু মহাভারতের জন্মস্থান এই ভারতবর্ষে উহার একখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ বাহির হইল না। সমীচীন পাঠসংগ্রহ, সুবোধ টীকা অথবা ব্যাখ্যা সংযোজন, পরিপাটী মুদ্রণ এবং সর্ব্বোপরি বিষয়সূচী সঙ্কলন,—এইগুলি গ্রন্থ-সম্পাদনের অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গ। অধ্যবসায়, পরিশ্রম ও সাবধানতার সহিত পুরাণ গ্রন্থগুলি সুচারুরূপে সম্পাদিত হইলে আমাদের দেশের এবং সমাজের প্রাচীন তত্ত্বসমূহ আলোচনার প্রকৃতই রাজপথ আবিষ্কৃত হইবে। অধুনা যে সকল পুঁথি পাওয়া যায়, তাহা হইতে কোন বিষয়বিশেষ বাহির করিতে হইলে যেরূপ প্রাণপাত পরিশ্রম করিতে হয় এবং তদ্ধেতু সময়ের যেরূপ অযথা অপব্যবহার হয়, তাহা ভুক্তভোগিমাত্রেই অবগত আছেন এবং সেই জন্য অত্যল্প লোকেই পুরাণগ্রন্থ পাঠ করিয়া থাকেন। এই বিষয়ে আমাদের দেশের বিদ্যানুরাগী এবং বিদ্যোৎসাহী ধনবান্ মহাশয়দিগের কৃপাদৃষ্টি নিতান্ত আবশ্যক।

যাহা নাই,—তাহার জন্য দুঃখ করা বৃথা। যাহা আছে তাহারই সাহায্য লইয়া আমাদিগকে কার্য্য করিতে হইবে এবং সেইরূপেই আমরা এই বিষয়ে অগ্রসর হইয়াছি। উপযুক্ত উপাদানের অভাবে আমাদিগকে পদে পদে বাধা-প্রাপ্ত হইতে হইয়াছে এবং অনেকস্থলে অনেক ভ্রমপ্রমাদও ঘটিয়াছে। পাঠকগণ কৃপাপূর্ব্বক এই সকল বিষয় মনে রাখিয়া আমাদের ত্রুটিবিচ্যুতি ক্ষমা করিবেন, এই আশাতেই আমরা সর্ব্বাগ্রে এই নিবেদন করিয়া এক্ষণে প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করিতেছি।

বর্ত্তমান ভারতবর্ষের যে মানচিত্র দেখিতে পাওয়া যায়

তাহার উত্তর-সীমা হিমালয়-পর্ব্বতের উত্তরাংশ এবং তিব্বত, পূর্ব্বসীমা চীনদেশ, ব্রহ্মদেশ ও বঙ্গোপসাগর, দক্ষিণসীমা ভারতমহাসাগর, এবং পশ্চিমসীমা আরবসাগর, বেলুচিস্থান ও আফ্‌গানিস্থান দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ মানচিত্রে আরও দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই দেশের উত্তরসীমায় অবস্থিত এবং পশ্চিমে কাশ্মীর হইতে পূর্ব্বে আসাম প্রদেশের উত্তর সীমাস্থ পর্ব্বতমালাকেই "হিমালয় পর্ব্বতমালা" নামে অভিহিত করা হইতেছে। পুরাণে ভারতবর্ষের সীমা-নির্দ্দেশ প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে যে, ইহার উত্তরে হিমবান্ পর্ব্বত এবং দক্ষিণে, পূর্ব্বে ও পশ্চিমে মহাসমুদ্র যথা,

মার্কণ্ডেয় মহাপুরাণে—

> দক্ষিণাপরতো হ্যস্য পূর্ব্বেণ চ মহোদধিঃ।
> হিমবানুত্তরেণাস্য কার্ম্মুকস্য যথা গুণঃ ॥৫৯॥
> তদেতদ্ভারতং বর্ষং সর্ব্ববীজং দ্বিজোত্তম।
>
> মার্কণ্ডেয়, সপ্তপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

তথাচ বায়বীয়ে,—

> ইদন্তু মধ্যমং চিত্রং শুভাশুভফলোদয়ম্।
> উত্তরং যৎ সমুদ্রস্য হিমবদ্দক্ষিণঞ্চ যৎ ॥৭৫॥
> বর্ষং যদ্ভারতং নাম যত্রেয়ং ভারতী প্রজা।
> ভরণাচ্চ প্রজানাং বৈ মনুর্ভরত উচ্যতে
> নিরুক্তবচনাচ্চৈব বর্ষং তদ্ভারতং স্মৃতম্। ॥৭৬॥
>
> বায়ু ৪৫ তম অধ্যায়।

তথাহি ব্রহ্মাণ্ডে,—

> ইদন্তু মধ্যমং বর্ষং শুভাশুভফলোদয়ম্।
> উত্তরং যৎ সমুদ্রস্য হিমবদ্দক্ষিণঞ্চ যৎ ॥৯॥
> বর্ষং তদ্ভারতং নাম যত্রেয়ং ভারতী প্রজা।
> ভরণাচ্চ প্রজানাং বৈ মনুর্ভরত উচ্যতে ॥১০॥
>
> ব্রহ্মাণ্ড, ৪৯ তম অধ্যায়।

তথাহি আগ্নেয়ে,—

> উত্তরং যৎ সমুদ্রস্য হিমাদ্রেশ্চৈব দক্ষিণম্।
> বর্ষং তদ্ভারতং নাম নবসাহস্রবিস্তৃতম্ ॥১॥
>
> অগ্নি, ১১৮ তম অধ্যায়।

তথাচ বৈষ্ণবীয়ে,—

> উত্তরং যৎ সমুদ্রস্য হিমাদ্রেশ্চৈব দক্ষিণম্।
> বর্ষং তদ্ভারতং নাম ভারতী যত্র সন্ততিঃ ॥১॥
>
> বিষ্ণু ৩য় অংশ।

এই সকল পুরাণবাক্যের অর্থ এক। পৌরাণিক সময়ে তিন দিকে সমুদ্র এবং উত্তরদিকে হিমবান্ পর্ব্বত ভারতবর্ষের চতুঃসীমা ছিল। সমুদ্র অর্দ্ধচন্দ্রাকারে ভারতবর্ষের পূর্ব্বদক্ষিণ এবং পশ্চিমদিক ধনুরাকারে বেষ্টন করিয়াছেন এবং হিমবান্ উত্তরদিকে এই সুবিশাল ধনুকের গুণের ন্যায় গুণবৎ প্রতীয়মান হইত। প্রাচীনকালে হিমবান অথবা হিমালয় বলিতে আধুনিক হিমালয় বুঝাইতনা, কারণ, মহাকবি কালিদাস-রচিত কুমারসম্ভব-কাব্যের প্রারম্ভেই দেখিতে পাই, লিখিত আছে—

> অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ।
> "পূর্ব্বাপরৌ বারিনিধী বগাহ্য স্থিতঃ পৃথিব্যা ইব মানদণ্ডঃ।"

অর্থাৎ উত্তরদিকে হিমালয় নামে দেবাত্মা নগাধিপতি পূর্ব্ব এবং পশ্চিম সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত দেহ লইয়া পৃথিবীর মানদণ্ড স্বরূপ অবস্থিতি করিতেছেন। আর কেবল কালিদাস কেন,—পুরাণেও আমরা এই কথাই দেখিতে পাই, যথা মার্কণ্ডেয় পুরাণে,—

> "কৈলাসো হিমবাংশ্চৈব দক্ষিণেন মহাচলৌ।
> পূর্ব্বপশ্চায়তাবেতাবর্ণবান্তর্ব্যবস্থিতৌ ॥২৮॥
>
> অধ্যায় ৫৯

তথাচ বায়ুপুরাণে,

> "তথৈব দক্ষিণে পার্শ্বে হিমবত্যচলোত্তমে।
> নিকুঞ্জনির্ঝরগুহানৈক সানুদরীতটে ॥২৭॥
> অর্ণবাদর্ণবং যাবৎ পূর্ব্বপশ্চায়তেঽচলে ॥
>
> অধ্যায় ৩৮

পুরাণের উক্ত বর্ণনানুসারে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, এসিয়া মহাদেশের মানচিত্রে যে পর্ব্বতশ্রেণীর পশ্চিমে আরব সাগর তীর হইতে তিব্বত দেশের উত্তরসীমা দিয়া পূর্ব্বে প্রশান্তমহাসাগরের বেলাভূমি পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে তাহাই

নামে হিমবান্ বা হিমালয় এবং আমাদের আধুনিক হিমালয় এই বিরাট পর্ব্বতমালার সর্ব্বপ্রধান অংশমাত্র। এই পর্ব্বত-শ্রেণীর দক্ষিণে এবং মহাসাগরের উত্তরে যত দেশ এবং দ্বীপপুঞ্জ দেখিতে পাওয়া যায়—সমস্তই "ভারতবর্ষের" অন্তর্ভুক্ত হইতেছে। প্রকৃতপক্ষে চীন, পূর্ব্বোপদ্বীপ, ব্রহ্মদেশ, আধুনিক ভারতবর্ষ, আফগানিস্থান, বেলুচিস্থান, পারস্য, আরব, ও এসিয়ামাইনর এবং ভারতমহাসাগরবক্ষস্থ দ্বীপপুঞ্জ প্রাচীন ভারতবর্ষের কুক্ষিগত ছিল। * এই বিশাল মহাদেশ প্রধানতঃ নবধা বিভক্ত ছিল এবং প্রত্যেক বিভাগকে এক এক খণ্ড বলিত। পুরাণে সেই সকল খণ্ডের নাম এইরূপ লিখিত আছে

যথা ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে—

ভারতস্যাস্য বর্ষস্য নবভেদাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
সমুদ্রান্তরিতা জ্ঞেয়াস্তেত্বগম্যাঃ পরস্পরম ॥১২॥
ইন্দ্রদ্বীপঃ কসেরুশ্চ তামবর্ণো গভস্তিমান্।
নাগদ্বীপস্তথা সৌম্যো গান্ধর্বস্থথ বারুণঃ ॥১৩॥
অয়ন্তু নবমস্তেষাং দ্বীপঃ সাগরসংবৃতঃ।
যোজনানাং সহস্রন্তু দ্বীপোঽয়ং দক্ষিণোত্তরম্ ॥১৪॥
আয়তো হ্যাকুমারিকাদাগঙ্গা প্রভবাচ্চ বৈ।
তির্য্যগুত্তরবিস্তীর্ণ সহস্রত্রয়মেবচ ॥১৫॥ ৪৯ অ।

তথাচ মাৎস্যে—

ভারতস্যাস্য বর্ষস্য নব ভেদান্ নিবোধত ॥৭॥
ইন্দ্রদ্বীপঃ কশেরুশ্চ তাম্রপর্ণী গভস্তিমান্।
নাগদ্বীপ স্তথা সৌম্যো গন্ধর্ব স্তথ বারুণঃ ॥৮॥
অয়ন্তু নবম স্তেষাং দ্বীপঃ সাগরসংবৃতঃ।
যোজনানাং সহস্রন্তু দ্বীপোঽয়ং দক্ষিণোত্তরঃ ॥৯॥
আয়তস্ত কুমারীতো গঙ্গায়াঃ প্রবহাবধিঃ।
তির্য্যগূর্দ্ধন্তু বিস্তীর্ণঃ সহস্রাণিদশৈব তু ॥১০॥১১৪ অ।

তথাচ বায়বীয়ে—

"ভারতস্যাস্য বর্ষস্য নবভেদাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
সমুদ্রান্তরিতা জ্ঞেয়াস্তে ত্বগম্যাঃ পরস্পরম্ ॥৭৮॥
ইন্দ্রদ্বীপঃ কসেরুশ্চ তামবর্ণো গভস্তিমান্।
নাগদ্বীপ স্তথা সৌম্যো গন্ধর্বস্তথ বারুণঃ ॥৭৯॥
অয়ন্তু নবমস্তেষাং দ্বীপঃ সাগরসংবৃতঃ।
যোজনানাং সহস্রন্তু দ্বীপোঽয়ং দক্ষিণোত্তরম্ ॥৮০॥
আয়তো হ্যাকুমারিকাদাগঙ্গা প্রভবাচ্চ বৈ
তির্য্যগুত্তরবিস্তীর্ণঃ সহস্রাণি নবৈব তু ॥৮১॥৪৫ অধ্যায়।

তথাহি মার্কণ্ডেয়ে—

ভারতস্যাস্য বর্ষস্য নব ভেদান্ বিবোধমে।
সমুদ্রান্তরিতা জ্ঞেয়াস্তে ত্বগম্যাঃ পরস্পরম্ ॥৫॥
ইন্দ্রদ্বীপঃ কশেরুমাং স্তামবর্ণো গভস্তিমান্।
নাগদ্বীপস্তথা সৌম্যো গান্ধর্বো বারুণস্তথা॥৬॥
অয়ন্তু নবমস্তেষাং দ্বীপঃ সাগরসংবৃতঃ।
যোজনানাং সহস্রং বৈ দ্বীপোঽয়ং দক্ষিণোত্তরাৎ
॥৭॥৫৭ অধ্যায়।

তথাচ গারুড়ে—

ইন্দ্রদ্বীপঃকশেরুমাং স্তামবর্ণো গভস্তিমান্ ॥৪॥
নাগদ্বীপঃ কটাহশ্চ সিংহলো বারুণস্তথা।
অয়ন্তু নবমস্তেষাং দ্বীপঃ সাগরসংবৃতঃ ॥৫॥৫৫ অধ্যায়।

তথাহি আগ্নেয়ে—

ইন্দ্রদ্বীপঃ কসেরুশ্চ তামবর্ণো গভস্তিমান্ ॥৩॥
নাগদ্বীপ স্তথা সৌম্য গান্ধর্ব স্তথ বারুণঃ।
অয়ন্তু নবমস্তেষাং দ্বীপঃ সাগরসংবৃতঃ ॥৪॥
যোজনানাং সহস্রাণি দ্বীপোঽয়ং দক্ষিণোত্তরাৎ।
নব ভেদা ভারতস্য মধ্যভেদেঽথ পূর্ব্বতঃ ॥৫॥১১৮ অধ্যায়।

তথাচ বৈষ্ণবীয়ে—

ভারতস্যাস্য বর্ষস্য নব ভেদান্ নিশাময়।
ইন্দ্রদ্বীপঃ কসেরুশ্চ তাম্রপর্ণো গভস্তিমান্॥৬॥
নাগদ্বীপস্তথা সৌম্যো গান্ধর্বস্তথ বারুণঃ।
অয়ন্তু নবমস্তেষাং দ্বীপঃ সাগরসংবৃতঃ॥৭॥
যোজনানাং সহস্রং তু দ্বীপোঽয়ং দক্ষিণোত্তরাৎ ॥
দ্বিঃ অংশ ৩ অধ্যায়।

অন্যান্য কতিপয় পুরাণেও এই ভাবের শ্লোকাবলী দেখিতে পাওয়া যায়। উদ্ধৃত শ্লোকাবলী দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে ভারতবর্ষের নয় খণ্ডের নামকরণ

* ...মিড় ভাষার খুব প্রাচীন গ্রন্থে লিখিত আছে যে, পূর্ব্বে আফ্রিকা হইতে ...ষ্ট্রেলিয়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত এক মহাদেশ ছিল। জলাপ্লাবনে উক্ত ...ধ্বংসপ্রাপ্ত এবং সমুদ্র গর্ভগত হইয়াছে। বর্ত্তমান Oceania নামক দ্বীপপুঞ্জ ঐ মহাদেশেরই অত্যুচ্চ অংশমাত্র।

সম্বন্ধে একমাত্র গরুড় পুরাণের সঙ্গে অপর সকল পুরাণের দুইটী খণ্ডের নাম লইয়া বিরোধ। সৌম্য এবং গন্ধর্ব্ব খণ্ডের স্থলে গুরুড় পুরাণ কটাহ এবং সিংহল নাম করিয়াছেন। আমাদের মনে হয় যে গরুড় পুরাণেরই ভ্রম হইয়াছে। যাহাই হউক, নাম লইয়া বিবাদে আমাদের কোনই আবশ্যক নাই। ভারতবর্ষের মধ্যে এক ভারতখণ্ড ভিন্ন আমরা এক্ষণে আর কোন খণ্ডকেই চিনিতে পারিব না। ইন্দ্রদ্বীপাদির বর্ত্তমান নাম কি, তাহা নির্ণয় করা আমাদের সাধ্যাতীত। যে সকল অসাধারণ প্রতিভাশালী পণ্ডিত মঙ্গোলিয়া দেশে পুরাণবর্ণিত স্বর্গের আবিষ্কার করিতে সাহসী হইয়াছেন, তাঁহাদের উপরই আমরা এ বিষয়ে ভারার্পণ করিতেছি। এক্ষণে এইমাত্র বলিতে চাই যে, প্রাচীন সময়ের ভারতবর্ষ বহুবিস্তৃত মহাদেশ ছিল এবং পুরাণ-গ্রন্থাবলী আমাদের সেই মত সমর্থন করিতেছে।

সম্প্রতি আমরা ভারতবর্ষের নবমাংশ ভারতখণ্ডের ভৌগোলিক তত্ত্ব সম্বন্ধে কএকটী সংবাদ দিতেছি। উপরিবৃত পৌরাণিক প্রমাণনিচয় আলোচনা করিলে স্পষ্ট দেখা যায় যে, পৌরাণিক "ভারতখণ্ডকেই" আমরা "ভারতবর্ষ" নামে অভিহিত করিয়া আসিতেছি। পুরাণে "ভারতখণ্ডের পর্ব্বত, নদনদী এবং জনপদ সমূহের যে বিস্তৃত বিবরণ আছে তাহা পাঠ করিলে আমাদের উক্তির সারবত্তা বুঝিতে পারা যাইবে। তবে সেকালে ব্রহ্মদেশ, পুর্ব্বোপদ্বীপ, চীন দেশের কিয়দংশ, আফগানিস্থান, বেলুচিস্থান, পারস্য এবং তিব্বত এই "ভারতখণ্ডেরই" অন্তর্ভুক্ত ছিল বলিয়া অমরা বিশ্বাস করি। নিম্নলিখিত পৌরাণিক বিবরণই আমাদের বিশ্বাসের মূল। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে ভারতখণ্ডের নদনদী, পর্ব্বতমালা এবং প্রদেশ সমূহের নিম্নলিখিত বর্ণনা পাওয়া যায়। বায়ুপুরাণও ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের মতাবলম্বী। মৎস্য ও মার্কণ্ডেয় পুরাণেও এ সম্বন্ধে দীর্ঘ বর্ণনা আছে; তদ্ভিন্ন ভাগবত, দেবীভাগবত, অগ্নি এবং গরুড় পুরাণেও সংক্ষেপে এই সকল বিষয় আলোচিত হইয়াছে। আমরা প্রধানতঃ ব্রহ্মাণ্ড পুরাণকেই প্রধান অবলম্বনস্বরূপ গ্রহণ করিলাম, তবে যে যে স্থলে যে যে পুরাণে ভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে, পাদটীকায় তাহার উল্লেখ করিতেছি।

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ এইরূপ আরম্ভ করিতেছেন,—

অয়ন্তু নবমস্তেষাং দ্বীপঃ সাগরসংবৃতঃ।
যোজনানাং সহস্রন্তু দ্বীপোঽয়ং দক্ষিণোত্তরম্॥১৪॥
আয়তো হ্যাকুমারিক্যাদাগঙ্গা প্রভবাচ্চ বৈ।
তির্য্যাগুত্তরবিস্তীর্ণ সহস্রত্রয়মেব চ ॥১৫॥
দ্বীপো হ্যপনিবিষ্টোঽয়ং ম্লেচ্ছৈরন্তেষু নিত্যশঃ।
পূর্ব্বে কিরাতা হ্যস্যান্তে পশ্চিমে যবনাস্মৃতাঃ॥১৬॥
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা মধ্যে শূদ্রাশ্চ ভাগশঃ।
ইজ্যাযুদ্ধবাণিজ্যাদ্যৈর্ব্বর্ত্তয়ন্তো ব্যবস্থিতাঃ॥১৭॥
তেষাং সংব্যবহারোঽয়ং বর্ত্ততে তু পরস্পরম্।
ধর্ম্মার্থ কামসংযুক্তেন বর্ণানান্তু স্বকর্ম্মসু॥১৮॥
সংকল্পঃ পঞ্চমানান্তু সধর্ম্মাণাং যথাবিধি।
ইহস্বর্গাপবর্গার্থং প্রবৃত্তির্যেষু মানুষী॥১৯॥
যস্ত্বয়ং নবমো দ্বীপস্তিষ্যগায়ত উচ্যতে।
কৃৎস্নং জয়তি যোহ্যেনং সম্প্রাতি হ কীর্ত্যতে॥২০॥
অয়ং লোকস্তু বৈ সম্রাড়ন্তরীক্ষে বিরাট্ স্মৃতঃ।
স্বরাড়ন্যঃ স্মৃতো লোকঃ পুনর্বক্ষ্যামি বিস্তরম্॥২১॥
সপ্ত চাস্মিন্ সুপর্বাণোঃ বিশ্রুতাঃ কুলপর্বতাঃ।
মহেন্দ্রো মলয়ঃ সহ্যঃ সুক্তিবানৃক্ষ পর্ব্বতঃ॥২২॥
বিন্ধ্যশ্চ পারিপাত্রশ্চ সপ্তৈতে কুলপর্বতাঃ।
তেষাং সহস্রশশ্চান্যে পর্বতাস্তু সমীপগাঃ ॥২৩॥
অভিজাতাঃ সর্বগুণা বিপুলাশ্চিত্র মানবঃ।
মন্দরঃ পর্বতশ্রেষ্ঠা বৈভারো দর্দ্দুরস্তথা॥২৪॥

---

(২৪) হইতে ২৭ "বৈভার" স্থলে "বৈভ্রাজ", "সুরস" স্থলে "... "নামগিরি" স্থলে "নাগগিরি" "গণ্ডপ্রস্থ" স্থলে "তুঙ্গপ্রস্থ" "কারু" ... "কোচ" "গোধন" স্থলে "গোমন্ত" নামভেদ এবং রোচন, ঋষ্যমূক ও ... স্মর এই তিনটী অধিক নাম পাওয়া যায়। মার্কণ্ডেয় পুরাণ ৫৭ অধ্যায় ... মৎস্য, গরুড়, অগ্নি এবং বিষ্ণুপুরাণে এই ক্ষুদ্র পর্বতগুলির নাম ... কেবল ৭টী কুলপর্বতের নাম আছে। মহাভারতীয় ভীষ্মপর্ব্বে ভারত ... বর্ণনা প্রসঙ্গেও এই সকল ক্ষুদ্র পর্বতের নাম নাই। শ্রীমদ্ভাগবত ... এবং শ্রীদেবীভাগবত পুরাণে কুলপর্বতের সহিত মিলাইয়া ... নাম দেওয়া হইয়াছে, যথা মলয়, মাঙ্গলপ্রস্থ, মৈনাক ত্রিকূট, ... কূটক, কোল্ল, সহ্য, দেবগিরি, ঋষ্যমূক, শ্রীশৈল, বেঙ্কট মহেন্দ্র, বা... বিন্ধ্য, শুক্তিমান্ ঋক্ষগিরি, পারিযাত্র, দ্রোণ, চিত্রকূট, গোবর্দ্ধন, ... ককুভ, নীল, গোকামুক অথবা গৌরমুখ, ইন্দ্রকীল এবং কাম... উভয় ভাগবত ঠিক একই রূপ, প্রভেদের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগ...

কোলাহলঃ সসুরসঃ মৈনাকো বৈদ্যুতস্তথা।
বাতন্ধমো নাম গিরিস্তথা পাণ্ডুরপর্ব্বতঃ॥২৫॥
গণ্ডপ্রস্থঃকৃষ্ণগিরির্গোধনো গিরিরেব চ।
পুষ্পগির্য্যুজ্জয়ন্তৌ চ শৈলো রৈবতকস্তথা॥২৬॥
শ্রীপর্বতশ্চ কারুশ্চ কুটশৈলো গিরিস্তথা।
অন্যে তেভ্যঃ পরিজ্ঞেয়াঃ হ্রস্বাঃ স্বল্পোপজীবিনঃ॥২৭॥
তৈর্বিমিশ্রা জনপদা আর্য্যাম্লেচ্ছাশ্চ নিত্যশঃ।
পীয়ন্তে বৈরিমা নদ্যো গঙ্গা সিন্ধুঃ সরস্বতী॥২৮॥
শতদ্রুশ্চচন্দ্রভাগা চ যমুনা সরযূস্তথা।
ইরাবতী বিতস্তা চ বিপাশা দেবিকাকুহূঃ।
গোমতীধূতপাপা চ বাহুদা চ দৃষদ্বতী॥২৯॥
কৌশিকী চ তৃতীয়া তু নিশ্চীরা গণ্ডকী তথা।
ইক্ষুর্লোহিত ইত্যেতা হিমবৎপদনিঃসৃতা॥ ৩০ ॥
বেদস্মৃতির্বেদবতী বৃত্রঘ্নী সিন্ধুরেবচ।
বর্ণাশা চন্দনা চৈব সদানীরা মহী তথা॥ ৩১ ॥
পরা চর্ম্মণ্বতী চৈব বিদিশা বেত্রবত্যপি।
শিপ্রা হ্যবন্তীচ তথা পারিপাত্রাশ্রয়াঃ স্মৃতাঃ॥ ৩২ ॥

শোণো মহানদশ্চৈব নর্ম্মদা সুরসাক্রমা।
মন্দাকিনী দশার্ণা চ চিত্রকূটা তথৈবচ॥ ৩৩ ॥
তমসা পিপ্পলা শ্রোণী করতোয়া পিশাচিকা।
নীলোৎপলা বিপাশা চ জম্বুলা বালুবাহিনী॥ ৩৪ ॥
সিতেরজা শুক্তিমতী মঙ্কণা ত্রিদিবা ক্রমাৎ
ঋক্ষপাদাৎ প্রসূতাস্তা নদ্যো মণি নিভোদকাঃ॥ ৩৫ ॥
তাপী পয়োষ্ণী নির্বিন্ধ্যা মদ্রা চ নিষধানদী।
বেণ্বা বৈতরণী চৈব শিতিবাহুঃ কুমুদ্বতী॥ ৩৬ ॥
তোয়াচৈব মহাগৌরী দুর্গা চান্তঃশিলা তথা।
বিন্ধ্যপাদ-প্রসূতাশ্চ নদ্যঃ পুণ্যজলাঃ শুভাঃ॥ ৩৭ ॥
গোদাবরী ভীমরথী কৃষ্ণবেণ্যথ বঞ্জুলা।
তুঙ্গভদ্রা সুপ্রয়োগা কাবেরী চ তথাপগা॥ ৩৮ ॥
দক্ষিণাপথনদ্যস্তু সহ্যপাদাৎ বিনিঃসৃতা॥ ৩৯ ॥
কৃতমালা তাম্রবর্ণা পুষ্পজাত্যুৎপলাবতী।
মলয়াভিজাতা নদ্যঃ সর্ব্বাঃ শীতজলাঃ শুভাঃ॥ ৪০ ॥

বর্ণনা গদ্যময়ী ও দেবীভাগবতেরও গদ্যময়ী। বায়ুপুরাণ যে ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের অনুরূপ তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

হিমালয়-নিঃসৃত নদীগণের মধ্যে মার্কণ্ডেয় পুরাণে রংক্ষু নাম্নী একটী নদী অধিক আছে। যে গুলির নাম অন্যপুরাণে গৃহীত হয় নাই, তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। মার্কণ্ডেয় ৫৭ অধ্যায়। মৎস্যপুরাণে এই নদীগুলির সংখ্যা ঠিক আছে, কেবল "ইরাবতী" স্থলে "এরাবতী" "ধূতপাপা" স্থলে "ধৌতপাপা" "বিপাশা" স্থলে "বিশালা" এবং "নিশ্চীরা" স্থলে "[illegible]" নামভেদ আছে। মৎস্যপুরাণ, ১১৪ অধ্যায়। বায়ুপুরাণ ও [illegible]র বর্ণনা এক।

হিমালয়-প্রসূতা।

(৩২) পারিপাত্র-নিঃসৃত নদীগুলির মধ্যে "বর্ণাশাচন্দনাচৈব" স্থলে "বেত্রাসানন্দনীচৈব" "পরা" স্থলে "পারা" "অবন্তী" স্থলে 'অবর্ণী' এই নাম ভেদ এবং "তাপী" নাম্নী একটা নদীর নাম অধিক মার্কণ্ডেয় পুরাণে (৫৭ অধ্যায়) আছে। মৎস্য পুরাণে সংখ্যা ১৫ অর্থাৎ একটা অধিক আছে, কিন্তু "[illegible]" স্থলে "পর্ণাশা" "চন্দনা" স্থলে "নর্মদা" "সদানীরা" স্থলে "[illegible]" "মহী" স্থলে "মহতী" "পরা" স্থলে "পারা" "বিদিশা" স্থলে "বিদ[illegible]" "বেত্রবতী" স্থলে "বেণুব্রতী" এই নামভেদ ও কুন্তী একটা [illegible] নদীর বর্ণনা আছে। মৎস্যপুরাণমতে বিশাল নর্মদা [illegible]

পারিপাত্র-প্রসূতা।

কাবেরী নদী পারিপাত্র অথবা পারিযাত্র হইতে নির্গত হইয়াছে, উক্ত ভ্রমাত্মক।

(৩৫) ঋক্ষপাদ প্রসূতা নদীগুলির মধ্যে মার্কণ্ডেয় পুরাণে (৫৭ অধ্যায়) "সুরসাক্রমা" স্থলে "সুরথাদ্রিজা", "করতোয়া" স্থলে "করমোদা" "নীলোৎপলা" স্থলে "চিত্রোৎপলা" "সিতেরজা" স্থানে "সুমেরুজা" এবং "জম্বুলা" স্থলে "বঞ্জুলা" নামভেদ দেখিতে পাওয়া যায়।

ঋক্ষপর্ব্বত-প্রসূতা।

মৎস্যপুরাণে বিমলা, চঞ্চলা, ধুতবাহিনী, গুণী, লজ্জা, মুকুটা এবং হ্রদিকা এই কয়টী নূতন নাম পাওয়া যায়।

(৩৬) (৩৭) মার্কণ্ডেয় পুরাণে "নিষধানদী" স্থলে নিষধাবতী' "শিতিবাহু" স্থলে"সিনীবালী', "তোয়া" স্থলে "করতোয়া" এবং "মদ্রা" স্থলে "শিপ্রা" আছে। মৎস্যপুরাণে "মদ্রা" স্থলে "ক্ষিপ্রা", "বেণ্বা" স্থলে "বেণা" "সিতিবাহু" স্থলে "বিশ্বফলা" "দুর্গা" স্থলে "দুর্গমা" এবং "অন্তঃশিলা" স্থলে "শিলা" দেখিতে পাওয়া যায়।

বিন্ধ্য-পর্ব্বত প্রসূতা।

(৩৮) (৩৯) মার্কণ্ডেয় পুরাণে "ভীমরথী" স্থলে "ভীমরথা", "কৃষ্ণবেণী" স্থলে "কৃষ্ণবেণ্বা" "বঞ্জুলা" স্থলে "অপরা" এবং "বাহ্যা" নাম্নী একটা অধিক নদীর উল্লেখ আছে। মৎস্যপুরাণে "বাহ্যা" আছে, কিন্তু "আপগা" নাই, সুতরাং সংখ্যায় ঠিক আছে।

সহ্যপর্ব্বত প্রসূতা।

ত্রিসামা ঋষিকুল্যাচ ইক্ষুলা ত্রিদিবা চ যা।
লাঙ্গুলিনী বংশধরা মহেন্দ্রতনয়াঃ স্মৃতা॥ ৪১॥
ঋষিকা সুকুমারী চ মন্দগা মন্দবাহিনী।
কৃপা পলাশিনী চৈব শুক্তিমৎ প্রভবাঃ স্মৃতাঃ॥ ৪২॥
সর্বাঃ পুণ্যা সরস্বত্যঃ সর্বা গঙ্গাঃ সমুদ্রগাঃ।
বিশ্বস্য মাতরঃ সর্বা জগৎপাপহরাঃ স্মৃতাঃ॥ ৪২॥
তাসাং নদ্যাপনদ্যোঽপি শতশোঽথ সহস্রশঃ॥ ৪৩॥
তাস্বিমে কুরুপাঞ্চালাঃ শাল্বাশ্চৈব সজাঙ্গলাঃ।
শূরসেনা ভদ্রকারা বোধা শতপথে স্বরৈঃ॥ ৪৪॥
বৎস্যাঃ কুসট্টাঃ কুল্যাশ্চা কুন্তলাঃ কাশিকোশলাঃ।
প্রথমাশ্চ কলিঙ্গাশ্চ মগধাশ্চবৃকৈঃ সহ।
মধ্যদেশা জনপদাঃ প্রায়শোঽমী প্রকীর্ত্তিতাঃ॥ ৪৫॥
সহ্যস্য চোত্তরান্তেতু যত্র গোদাবরী নদী।
পৃথিব্যামিহ কৃৎস্নায়াং স প্রদেশো মনোরমঃ॥ ৪৬॥
তত্র গোবর্দ্ধনো নাম পুরা রামেণ নির্মিতঃ।
রামপ্রিয়ার্থং স্বর্গোঽয়ং বৃক্ষা ওষধয়স্তথা॥ ৪৭॥
ভরদ্বাজেন মুনিনা তৎপ্রিয়ার্থেঽবতারিতাঃ।
অতঃপুর বনোদ্দেশস্তেন জজ্ঞে মনোরমঃ॥ ৪৮॥

বাহ্লীকা বাটধানাশ্চ আভীরাঃ কালতোয়কাঃ।
অপরীতাশ্চ শূদ্রাশ্চ পল্লবাশ্চর্মখণ্ডিকাঃ॥ ৪৯॥
গান্ধারা যবনাশ্চৈব সিন্ধুসৌবীরমদ্রকাঃ।
শকাহ্রণাঃ কুলিন্দাশ্চ পারদা হারহূণকাঃ॥ ৫০॥
রমণা রুদ্ধকটকা কেকয়া দশমালিকাঃ।
ক্ষত্রিয়োপনিবেশাশ্চ বৈশ্যশূদ্রকুলানিচ॥ ৫১॥
কাম্বোজা দরদাশ্চৈব বর্বরা অঙ্গলৌকিকাঃ।
চীনাশ্চৈব তুষারাশ্চ পহ্লবাশ্চ ক্ষতোদরাঃ॥ ৫২॥
আত্রেয়াশ্চ ভরদ্বাজাঃ প্রস্থলাশ্চ কশেরুকাঃ।
লম্পাকা স্তনপাশ্চৈব পীড়িকা জুহুড়ৈঃসহ॥ ৫৩॥
অপগাশ্চালিমদ্রাশ্চ কিরাতানাঞ্চ জাতয়ঃ।
তোমরা হংসমার্গাশ্চ কাশ্মীরাস্তঙ্গনাস্তথা॥ ৫৪॥
চূলিকাশ্চালকাশ্চৈব ঊর্ণাদধস্তথৈবচ।
এতেদেশা হ্যদীচ্যাশ্চ প্রাচ্যান্ দেশান্ নিবোধ চ॥ ৫৫॥

মলয় পর্বত

(৪০) মার্কণ্ডেয়, মৎস্যপুরাণেও এই ব্রহ্মাণ্ড এবং বায়ুপুরাণেও একই নাম প্রদত্ত হইয়াছে। উভয়ভাগবত এবং বিষ্ণুপুরাণে তাম্রপর্ণী নাম আছে, তাম্রবর্ণা অপেক্ষা উহা শুদ্ধতর পাঠ বলিয়া বোধ হয়।

মহেন্দ্র পর্বত নিঃসৃত

(৪১) মার্কণ্ডেয় পুরাণে "ত্রিসামা" নাই, কিন্তু "পিতৃকুল্যা" এবং "সোমকুল্যা" এই দুইটা অধিক নাম এবং মৎস্যপুরাণে "ত্রিসামা" স্থলে "ত্রিভাগা" "ইক্ষুলা" স্থলে "ইক্ষুদা" আছে, "লাঙ্গলিনী" এবং "বংশকরা" নাই এবং "অচলা" "তাম্রপর্ণী" "মূলী" "শবরা" এবং "বিমলা" অধিক আছে।

শুক্তিমৎ পর্বত নিসৃতা।

(৪২) মার্কণ্ডেয় পুরাণে "ঋষিকা" স্থানে "ঋষিকুল্যা" "সুকুমারী" স্থানে "কুমারী" এবং "কৃপা" স্থলে "কৃপা" এবং মাৎস্যে "ঋষিকা" স্থলে "কাশিকা" "কৃপা" স্থলে "কৃপা" এবং "পলাশিনী" স্থলে "পালিনী" আছে।

(৪৪) (৪৫) মার্কণ্ডেয় পুরাণে "মৎস্য", "অশ্বকূট", "অথর্ব", ও "মশক" এই কয়টা নূতন নাম দেখিতে পাওয়া যায়। অথচ উহাতে মাত্র দশটী জনপদের নাম আছে। মাৎস্যে "বোধাশতপথে স্বরৈঃ" স্থলে "বাহ্যাঃ সহ পটচ্চরাঃ" পাঠ, "বৎস্যাঃ কুসট্টা" স্থলে "মৎস্যা কিরাতাঃ, এবং "প্রথমাশ্চ... বৃকৈঃসহ" স্থলে "আবন্ত্যাশ্চ কলিঙ্গাশ্চ মূকাশ্চৈবান্ধকৈঃ সহ" আছে। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে বায়ুপুরাণের

জনপদ মধ্য দেশীয়

পাঠ প্রায়শঃই ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের অনুরূপ, প্রায় সামান্য মাত্রই ভেদ এই জনপদ বর্ণনায় দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক স্থলে এই ভেদ লিপিকরপ্রমাদ জন্য হইয়াছে তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়, যথা—বায়বীয়ে "কুসট্টা" স্থলে "[illegible]" এবং "প্রথমাশ্চ কলিঙ্গাশ্চ" স্থলে "অথপাশ্চ তিলঙ্গাশ্চ" দেখিতে পাওয়া যায়। মৎস্যপুরাণের পাঠ সাধীয়ান্ বলিয়া বিবেচনা হয়।

(৪৮) বায়বীয়ে "অতঃপুর" স্থলে 'অন্তঃপুরঃ' এবং মাৎস্যে "[illegible] পুষ্পকোদ্দেশঃ" পাঠ আছে। ইহাই সাধু বলিয়া বিবেচনা হয়। ৪৭ শ্লোকে "রামেণ নির্মিত" এবং "রামপ্রিয়ার্থং" আছে। এই রাম কে? মার্কণ্ডেয় বলিতেছেন "গোবর্দ্ধন পুর রম্য ভার্গবস্য মহাত্মনঃ"। ভার্গবরাম সস্ত্রীক এখানে বাস করিয়াছিলেন।

(৪৯) (৫০) "মদ্রকা" স্থলে ভদ্রকা" 'পারদাহারহূণকা' স্থলে "[illegible] তাহারপূরিকা, "হূণা" স্থলে "হূদা" "অঙ্গসৌধিকাঃ" স্থলে 'প্রিয়[illegible]

উদীচ্য দেশীয় জনপদ

চীনা স্থলে "পীনা" 'ক্ষতোদর' স্থলে বাহ্যতো[illegible] অপগা স্থলে "অপসা"। বায়বীয়ে॥ "অপর[illegible] খণ্ডিকা" স্থলে "পুরন্ধ্রাশ্চৈব শুভ্রাশ্চ পল্লবাশ্চান্ত[illegible] 'হূণাঃ' স্থলে 'দ্রু হ্যাঃ' "হারহূণকা" স্থলে "হারমূর্ত্তিকাঃ" রমণা[illegible] স্থলে "রামঠাঃ কণ্টকারাশ্চ" "দশমালিকা" স্থলে "দশনামকা", 'আ[illegible] স্থলে 'ক্ষত্রয়ো হথ কশেরুকাঃ' স্থলে 'দশেরকা স্তনপা' স্থলে "[illegible]" "পীড়িকাজুহড়ৈঃ সহ" স্থলে "সৈনিকাঃ সহ জাঙ্গলৈঃ" ও ৫২।৫৪ ৫৫ শ্লোকবর্ণিত জনপদের নাম নাই। মাৎস্যে॥ "অপরীতাঃ [illegible]

অন্ধ্রবাকা স্মুজরাকা অন্তর্গিরিবহির্গিরী ।
তথা প্রবঙ্গ বঙ্গশ্চ মালদা মালবর্ণিকা ॥ ৫৬ ॥
ব্রহ্মোত্তরা প্রবিজয়া ভার্গবাগেয়মর্থকা ।
প্রাগ্‌জ্যোতিষাশ্চ পৌণ্ড্রশ্চ বিদেহাস্তাম্রলিপ্তকাঃ ॥ ৫৭ ॥
মালা-মগধ-গোনন্দা প্রাচ্যাঃ জনপদাঃ স্মৃতাঃ ।
অথাপরে জনপদা দক্ষিণাপথবাসিনঃ ॥ ৫৮ ॥
পাণ্ড্যাশ্চ কেরলাশ্চৈব চৌল্যাঃ কুল্যাস্তথৈবচ ।
সুতুকা মূষিকাশ্চৈব কুনাসা বানবাসকাঃ ॥ ৫৯ ॥
মহারাষ্ট্রা মহিষকাঃ কলিঙ্গাশ্চৈব সর্বশঃ ।
আভীরা সহচৈষীকা আটব্যাশ্চ বরাশ্চ যে ॥ ৬০ ॥
পুলিন্দা বিন্ধ্যমূলীকা বৈদর্ভা দণ্ডকৈঃ সহ ।
পৌলিকা মৌলিকাশ্চৈব অশ্মকা ভোগবৰ্দ্ধনাঃ ॥ ৬১ ॥
মৈন্দিকাঃ কুন্তলা অন্ধ্রা উদ্ভিদা নলকালিকাঃ ।
দাক্ষিণাত্যাশ্চ বৈ দেশা অপরাংস্তান্নিবোধত ॥ ৬২ ॥

সূর্পারকাঃ কোলবনা দুর্গাঃ তালীকটৈঃ সহ ।
পুলেয়াশ্চ সুরালাশ্চ রূপসাস্তাপসৈঃ সহ ॥ ৬৩ ॥
তথা তুরসিতাশ্চৈব সর্বে চৈবপরাক্ষরাঃ ।
নাসিক্যাদ্যাশ্চ যে চান্যে যে চৈবান্তরনর্ম্মদাঃ ॥ ৬৪ ॥
ভারুকচ্ছাঃ সমাহেয়াঃ সহসা শাশ্বতৈরপি ।
কচ্ছীয়াশ্চ সুরাষ্ট্রাশ্চ আনর্ত্তাশ্চার্বুদৈঃ সহ ॥ ৬৫ ॥
ইত্যেতে সম্পরীতাশ্চ শৃণুধ্বং বিন্ধ্যবাসিনঃ ।
মালবাশ্চ করুষাশ্চ মেকলাশ্চোৎকলৈঃ সহ ॥ ৬৬ ॥
উত্তমর্ণা দশার্ণাশ্চ ভোজাঃ কিষ্কিন্ধকৈঃ সহ ।
তোষলাঃ কোশলাশ্চৈব ত্রৈপুরা বৈদিশাস্তথা ॥ ৬৭ ॥
তুমুরাস্তম্বরাশ্চৈব ষট্সুরা নিষধৈঃ সহ ।
অনূপাস্তুণ্ডিকেরাশ্চ বীতিহোত্রা হ্যবন্তয়ঃ ॥ ৬৮ ॥

"অপরান্তা", "শকাহূণাঃ" স্থলে "শতদ্রুজাঃ" "কুলিন্দাশ্চ" স্থলে "কলিঙ্গাশ্চ", হারহূণকাঃ স্থলে "হারভূষিকা", "রমণারুদ্ধকটকাঃ" স্থলে "মাহেয়া বহুভদ্রাশ্চ", "অঙ্গলৌকিকাঃ" স্থলে "হংসবৰ্দ্ধনাঃ", "পহ্লবাশ্চ কাত্তাদরাঃ" স্থলে "বহুলা বাহ্যতো নরাঃ", "প্রস্থলাঃ" স্থলে "পুষ্কলা", "লম্পকা" জুহড়ৈঃ সহ" স্থলে "লম্পাকাঃ শূলকারাশ্চ চুলিকা জাগুড়ৈঃ সহ" এবং "তোমরা" স্থলে "তামসা" মার্কণ্ডেয় পুরাণে পাওয়া যায়। লিপিকরপ্রমাদ হইতে অনেক "তামাসা"র উদ্ভব হইয়াছে, সন্দেহ নাই।

(৫৬)—(৫৮) মার্কণ্ডেয়পুরাণে ৫৬ শ্লোকস্থলে পাঠ আছে "অঙ্গাশ্চ মুদ্গরকা অন্তর্গিরবহির্গিরা। তথা সবঙ্গা বঙ্গেয়া মালসা মালবর্ত্তিকা ॥" "গেয়মর্থকাঃ" স্থলে "জ্ঞেয়মল্লকা", "পৌণ্ড্রাশ্চ" স্থলে "মদ্রাশ্চ" এবং "মালামগধগোনন্দা" স্থলে "মল্লামগধগোমন্তাঃ" আছে। মৎস্য পুরাণের পাঠ এইরূপ "অঙ্গাবঙ্গা মদ্গুরকা অন্তর্গিরি-বহির্গিরী। ব্রহ্মোত্তরাঃ প্রবিজয়া মার্গবা গেয়মানবাঃ ॥৪৫॥ প্রাগ্‌জ্যোতিষ্যাশ্চ পৌণ্ড্রাশ্চ বিদেহাস্তাম্রলিপ্তকাঃ। শাল্বমাগধগোনর্দ্দাঃ প্রাচ্যাজনপদাঃ স্মৃতাঃ। ...১১৩ অধ্যায়। এই পাঠ সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ হয়। বায়ুবীয়ে "মালবর্ণিকা" স্থলে "মালবৰ্ত্তিনঃ", "পৌণ্ড্র" স্থলে "মুণ্ড" এবং "গোনন্দাঃ" স্থলে "গোবিন্দঃ" পাঠভেদ আছে। কোন গোঁয়ারগোবিন্দ পুঁথি নকল করিতে গিয়া তাঁহার "মুণ্ড" লিখিয়াছেন।

(৫৯)—(৬২) বায়বীয়ে "বানবাসকা" স্থলে "বনবাসিকা", "পৌলিকা মৌলিকাশ্চৈব" স্থলে "পৌলিকা মৌলিকাশ্চৈব" এবং "মৈন্দিকা" স্থলে "নৈণিকা আছে। "বনবাসিকা" পাঠ শুদ্ধ বলিয়া বোধ হয়। মার্কণ্ডেয়ে "পাণ্ড্য" স্থলে "পুণ্ড্র" "চৌল্য" ও "কুল্যা" গোলাঙ্গুলা", "সেতুকা" স্থলে "শৈলূষা", "কুনাসা বানবাসকাঃ" স্থলে "কুসুমানামবাসকাঃ", "চৈষীকা" স্থলে "বৈশিক্যা" "আটব্যা" স্থলে "আঢক্যা", "বিন্ধ্যমূলীকা" স্থলে "বিন্ধ্যমৌলেয়া", "কৌলিকা" স্থলে "পৌরিকা" "মৈন্দিকা" স্থলে "নৈষিকা", এবং "নলকালিকা" স্থলে "বনদারকা" পাঠ আছে। মাৎস্যে "চৌল্যাঃ" স্থলে "চোলাঃ", "মূষিকা" স্থলে "সূতিকা", "কুনাসা" স্থলে "কুপথা", "বনবাসকা" স্থলে "বাজিবাসকাঃ", "মহারাষ্ট্রা" স্থলে "নবরাষ্ট্রা", "আভীরা... বরাশ্চ যে" স্থলে "কারুষাশ্চ সচৈষীকা আটব্যাঃ শবরাস্তথা", এবং "বিন্ধ্যমূলীকা" স্থলে বিন্ধ্যপুষিকা" দৃষ্ট হয়।

(৬৩)—(৬৫) বায়বীয়ে কেবলমাত্র "সূর্পারকা" স্থলে "শূর্পাকারা" "তালীকটৈ" স্থলে "কালীতকৈ" পাঠান্তর দৃষ্ট হয়। মার্কণ্ডেয়ে "সূর্পারকা" স্থলে "সূর্য্যারকাঃ", "কোলবনা" স্থলে "কালিবলা", "তালীকটৈ" স্থলে "চালীকটৈঃ", "পুলেয়াশ্চ...তাপসৈঃ সহ" স্থলে পুলিন্দাশ্চ, সুমিনাশ্চ, রূপপাঃ স্বাপদৈঃ সহ।" "তুরসিতা" স্থলে "কুরুমিনঃ," "পরাক্ষরাঃ" স্থলে কঠাক্ষরাঃ," অন্তর নর্ম্মদাঃ" স্থলে "উত্তরনর্ম্মদাঃ" "সহসা শাশ্বতৈরপি" স্থলে "সহ সারস্বতৈরপি", "কচ্ছীয়াশ্চ" স্থলে "কাশ্মীরাশ্চ," এবং "আনর্ত্ত" স্থলে "আবন্ত্য" পাঠান্তর আছে। "কাশ্মীরাঃ" পাঠ নিশ্চয়ই অশুদ্ধ। মাৎস্যে "পুলেয়াশ্চ সুরালাশ্চ" স্থলে "পুলীয়াশ্চ সিরালাশ্চ", "তুরসিতা" স্থলে "তৈত্তিরিক," "পরাক্ষরা" স্থলে "কারস্করা," "নাসিক্যা" স্থলে "বালিক্যা" "(স্পষ্টই অশুদ্ধ), "সহসা শাশ্বতৈঃ" স্থলে "সহ সারস্বতৈঃ," এবং "কচ্ছীয়া" স্থলে "কাচ্ছীকা" পাঠভেদ পাওয়া যায়।

অনুবিন্ধ্য জনপদ

(৬৬)—(৬৮) বায়বীয়ে একমাত্র "মেকলা" স্থলে "রোকলা" পাঠান্তর দৃষ্ট হয়। মার্কণ্ডেয়ে "মালবা" স্থলে "সরজা," "মেকলা"

এতে জনপদাঃ সর্ব্বে বিন্ধ্যপৃষ্ঠনিবাসিনঃ।
অতো দেশান্ প্রবক্ষ্যামি পর্ব্বতাশ্রয়িণশ্চ যে ॥ ৬৯ ॥
নিগর্হারা হংসমার্গাঃ কুপথাস্তঙ্গনা খসাঃ।
কর্ণপ্রাবরণাশ্চৈব হূর্ণদর্বা বহূদকাঃ ॥ ৭০ ॥
ত্রিগর্ত্তাঃ মালয়াশ্চৈব কিরাতাস্তামসৈঃ সহ।
চত্বারি ভারতেবর্ষে যুগানি কবয়ো বিদুঃ ॥ ৭১ ॥

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের সহিত অন্যান্য পুরাণের পাঠভেদ মিলাইয়া পৌরাণিক সময়ের ভারতখণ্ডের পর্ব্বত, নদী এবং প্রদেশসমূহের বর্ণনা উদ্ধৃত করিলাম।—সংস্কৃত শ্লোকাবলীর বঙ্গানুবাদ দিবার আগে আরও তিনখানি পুরাণের উল্লেখ আবশ্যক। স্বদেশী এবং বিদেশী পণ্ডিতদিগের মতে বিষ্ণুপুরাণ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকৃত এবং ভারতের অনেক স্থানে ভাগবতপুরাণের অত্যন্ত আদর। আবার শাক্ত সম্প্রদায়ের মতে শ্রীশ্রী দেবীভাগবতই প্রকৃত মহাপুরাণ বলিয়া স্বীকৃত। এরূপ অবস্থায় বিষ্ণুপুরাণ, দেবীভাগবত ও শ্রীমদ্ভাগবতে এই ভারতবর্ষের নদনদী এবং প্রদেশাদি বর্ণনা কিরূপ পাওয়া যায়, তাহা পাঠকবর্গের নিকট গোপন রাখিলে প্রবন্ধের অঙ্গহানি হয়। পূর্ব্বেই (ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের শ্লোকাবলী ১৪ হইতে ২৭ সংখ্যক শ্লোকের পাদটীকায়) পর্ব্বত সম্বন্ধে বলা হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবত এবং দেবীভাগবত এই উভয় পুরাণের উদ্দেশ্য এবং প্রস্তাব অন্যান্য অংশে নিতান্ত বিভিন্ন হইলেও এই ভারতবর্ণনা-প্রসঙ্গ একেবারে এক। কৃষ্ণলীলাদি-প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবত প্রায়ই বিষ্ণুপুরাণের অনুসরণ করিয়াছেন, কিন্তু এ ক্ষেত্রে তদ্রূপ হয় নাই। এই উভয় ভাগবত-পুরাণে ভারতখণ্ডের প্রদেশগুলির বর্ণনা নাই,—কেবল কতকগুলি নদনদীর বর্ণনামাত্র আছে। উভয় পুরাণে একই বর্ণনা, একই নামাবলী, প্রভেদের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত গদ্যময়ী রচনায় এবং দেবী ভাগবত পদ্যময়ী রচনায় স্ব স্ব বিষয়ের বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত, পঞ্চমস্কন্ধ, ঊনবিংশ অধ্যায়ের ১৮শ সংখ্যক বাক্যাংশ এবং দেবী ভাগবত, অষ্টমস্কন্ধ দশম অধ্যায় ১৩ হইতে ১৮শ শ্লোকে এই বর্ণনা পাওয়া যায়। পদ্যরচনাই আমরা উদ্ধৃত করিতেছি :—

"তাম্রপর্ণী চন্দ্রবশা কৃতমালা বটোদকা ॥ ১৩ ॥
বৈহায়সা চ কাবেরী বেণা চৈব পয়স্বিনী।
তুঙ্গভদ্রা কৃষ্ণবেণা শর্করাবর্ত্তকা তথা ॥ ১৪ ॥
গোদাবরী ভীমরথী নির্বিন্ধ্যা চ পয়োষ্ণিকা।
তাপী রেবা চ সুরসা নর্ম্মদা চ সরস্বতী ॥ ১৫ ॥
চর্ম্মণ্বতী চ সিন্ধুশ্চ অন্ধশোণৌ মহানদৌ।
ঋষিকুল্যা ত্রিসামা চ বেদস্মৃতি মহানদী ॥ ১৬ ॥
কৌশিকী যমুনা চৈব মন্দাকিনী দৃষদ্বতী।
গোমতী সরযূরোঘবতী সপ্তবতী তথা ॥ ১৭ ॥
সুষমা চ শতদ্রুশ্চ চান্দ্রভাগা মরুদ্‌ বৃধা।
বিতস্তা চ অসিক্নী চ বিশ্বাচেতি প্রকীর্ত্তিতা ॥ ১৮

তথাহি বিষ্ণু-পুরাণে দ্বিতীয় অংশে, তৃতীয় অধ্যায়ে—
শতদ্রুচন্দ্রভাগাদ্যা হিমবৎ পাদনির্গতাঃ।
বেদস্মৃতি মুখাদ্যাশ্চ পারিযাত্রোদ্ভবা মুনে ॥ ১০ ॥

স্থলে "কেরল" (মালায়ান্ বলিয়া বোধ হয়)। "স্তম্ভরা" স্থলে "স্তম্ভুলা" 'মট্স্বরা' স্থলে "পটবো" এবং 'অরূপা—"বীতিহোত্রা।' স্থলে "অন্নজাতুষ্টিকারাশ্চ বীরহোত্রা" পাঠান্তর দৃষ্ট হয়। মাৎস্যে "উত্তমর্ণা" স্থলে "ভগুোমাষা" "মট্স্বরা" স্থলে "পদ্গমা" এবং 'অরূপা... স্থলে "অরূপা শৌণ্ডিকেরাশ্চ" পাঠান্তর আছে।

পার্ব্বত্য জনপদ (৭০) ৭১)। বায়বীয়ে 'কুপথা" স্থলে "ক্ষুপণা", "কর্ণপ্রাবরণা" স্থলে "কুণপ্রাবরণ," বহূদকা" স্থলে "সহূদকা" এবং 'মালয়া" স্থলে 'মালবা' পাঠান্তর; মাৎস্যে "নির্গহরা" স্থলে "নাহারা," 'কুপথাস্তঙ্গনা' স্থলে কুপথা [illegible] [illegible] স্থলে 'কুণপাবরণা' এ. [illegible] স্থলে" ঊর্ণা [illegible] সমূদ্গকা" এবং মলয়া" স্থলে মালয়া" এবং মাৎস্যে "নিগাহারা [illegible] [illegible] কুণপ্রাবরণাশ্চৈব ঊর্ণাদর্বা সমূদ্গকা॥" "মালয়" স্থলে "মণ্ডলা" এবং 'তামস" স্থলে "চমর" পাঠান্তর দৃষ্ট হয়।

* তাম্রপর্ণী, চন্দ্রবশা, কৃতমালা, বটোদকা, বৈহায়সী, কাবেরী, বেণা, পয়স্বিনী, তুঙ্গভদ্রা, কৃষ্ণবেণা, শর্করাবর্ত্তকা, গোদাবরী, ভীমরথী, নির্বিন্ধ্যা, পয়োষ্ণিকা, তাপী, রেবা, সুরসা, নর্ম্মদা, সরস্বতী, চর্ম্মণ্বতী, সিন্ধু, অন্ধ, শোণ, ঋষিকুল্যা, ত্রিসামা, বেদস্মৃতি, মহানদী কৌশিকী, যমুনা, মন্দাকিনী, দৃষদ্বতী, গোমতী সরযূ, ওঘবতী, সপ্তবতী, সুষমা, শতদ্রু, চন্দ্রভাগা, মরুদ্‌বৃধা, বিতস্তা, অসিক্নী এবং বিশ্বা এই গুলি ভারতখণ্ডের নদী। এই নাম দেখিলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে, ব্রহ্মাণ্ডাদি [illegible] ন্যায় এই বর্ণনায় কোন শৃঙ্খলার আশ্রয় গ্রহণ করা হয় নাই, কোন্ কোন্ নদী কোন পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাও দেখান হয় নাই।

নর্ম্মদা সুরসাদ্যাশ্চ নদ্যো বিন্ধ্যাদ্রি নির্গতাঃ।
তাপী পয়োষ্ণী নির্ব্বিন্ধ্যা প্রমুখা ঋক্ষসম্ভবাঃ ॥ ১১ ॥
গোদাবরী ভীমরথী কৃষ্ণবেণ্যাদিকাস্তথাঃ।
সহ্যপাদোদ্ভবা নদ্যঃ স্মৃতাঃ পাপভয়াপহাঃ ॥ ১২ ॥
কৃতমালা তাম্রপর্ণী প্রমুখা মলয়োদ্ভবাঃ।
ত্রিসামা চর্ষিকুল্যাদ্যা মহেন্দ্রপ্রভবাঃ স্মৃতাঃ ॥ ১৩ ॥
ঋষিকুল্যা কুমারাদ্যাঃ শুক্তিমৎপাদসম্ভবাঃ।
আসাং নদ্য উপানদ্যঃ সন্ত্যন্যাশ্চ সহস্রশঃ ॥ ১৪ ॥ *
তাস্বিমে কুরুপাঞ্চালা মধ্যদেশাদয়ো জনাঃ।
পূর্ব্বদেশাদিকাশ্চৈব কামরূপনিবাসিনঃ ॥ ১৫ ॥
পুণ্ড্রাঃ কলিঙ্গাঃ মগধা দক্ষিণাত্যাশ্চ সর্বশঃ।
তথা পরান্তা সৌরাষ্ট্রা শূরাভীরাস্তথার্বুদাঃ ॥ ১৬ ॥
কারূষা মালবাশ্চৈব পারিযাত্রনিবাসিনঃ।
সৌবীরা সৈন্ধবা হূণাঃ সাল্বাঃ কোশলবাসিনঃ ॥ ১৭ ॥
মাদ্রারামাস্তথাম্বষ্ঠাঃ পারসীকাদয়স্তথা।
আসাং পিবন্তি সলিলং বসন্তি সহিতাঃ সদা ॥ ১৮ ॥

* শতদ্রু ও চন্দ্রভাগাদি নদী হিমবৎ হইতে, বেদস্মৃতি ইত্যাদি পারিযাত্র হইতে, নর্ম্মদা ও সুরসানদী বিন্ধ্যাদি হইতে, তাপী, পয়োষ্ণী ও নির্ব্বিন্ধ্যা প্রভৃতি ঋক্ষ পর্ব্বত হইতে, গোদাবরী, ভীমরথী, ও কৃষ্ণবেণী ইত্যাদি সহ্য পর্ব্বত হইতে, কৃতমালা এবং তাম্রপর্ণী ইত্যাদি মলয় পর্ব্বত হইতে, ত্রিসামা ও ঋষিকুল্যাদি মহেন্দ্র পর্ব্বত হইতে ঋষিকুল্যা ও কুমারাদি নদী শুক্তিমৎ পর্ব্বত হইতে নির্গত হইয়াছে এবং এই সকল নদী ও উহাদের উপনদীর সংখ্যা অসংখ্য। পাঠক দেখিবেন, এই পুরাণে কেবল দুই একটি প্রধান প্রধান নদীর নাম করা হইয়াছে, তথাচ ইহাতে একটা শৃঙ্খলা আছে দেখিতে পাওয়া যায়।

নিম্নলিখিত দেশনিবাসী জনগণ ঐ সকল নদীর জল পান করে।

মধ্যদেশ—কুরু ও পাঞ্চাল আদি,
পূর্ব্বদেশ—কামরূপাদি
দক্ষিণদেশ—পুণ্ড্র, কলিঙ্গ, মগধাদি,
পশ্চিমদেশ—সৌরাষ্ট্র, শূর, আভীর, অর্বুদ, কারূষ, ও মালব। ইহারা পারিযাত্র পর্বতাশ্রয়ে বাস করে, সিন্ধু, সৌবীর, হূণ সাল্ব, কোশল, মদ্র, আরাম, অম্বষ্ঠ ও পারসীকাদি।

এই সকল দেশের বর্ণনা পাঠ করিলে পাঠক দেখিতে পাইবেন যে, এই পুরাণকার পর্বত ও নদনদী বর্ণনার ন্যায় জনপদসমূহের বর্ণনাও অত্যন্ত সংক্ষেপে শেষ করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে, ব্রহ্মাণ্ড, বায়ু, মার্কণ্ডেয় এবং মৎস্য এই চারিখানি মহাপুরাণই সমস্ত বিষয় যথাযথরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। তবে অর্বাচীন লিপিকর মহাত্মাদিগের ভৌগোলিক জ্ঞানের অভাবে এরূপ নামভেদ এবং পাঠভেদের সৃষ্টি হইয়াছে যে, অনেক নামের অর্থ এবং বর্ত্তমান সংস্থান বাহির করা অসাধ্য না হইলেও দুঃসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। এ সম্বন্ধে কৌতূহলী পণ্ডিতবৃন্দের কৃপাভিক্ষা করিতেছি। তাঁহারা দয়া করিলে এখনও প্রকৃত পাঠ-নির্ণয় ও স্থাননির্দ্দেশ হইতে পারে।

এক্ষণে আবশ্যকবোধে ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ হইতে উদ্ধৃত সংস্কৃত শ্লোকাবলীর বাঙ্গালা অনুবাদ দিতেছি।

পরিমাণ।

এই সাগরবেষ্টিত দ্বীপ অর্থাৎ ভারতখণ্ডই ভারতবর্ষের নবম খণ্ড। এই দ্বীপ (প্রকৃত পক্ষে উপদ্বীপ) উত্তরে এবং দক্ষিণে সহস্র যোজন বিস্তৃত। ইহার উত্তরসীমা গঙ্গানদীর উৎপত্তির স্থান এবং দক্ষিণসীমা কুমারী—অন্তরীপ। ইহার বিস্তার উত্তর দিক্ হইতে তির্য্যক্‌ভাবে তিনসহস্র যোজন। ১৪-১৫। *

এই দ্বীপের অন্তভাগে অনেক জাতীয় ম্লেচ্ছগণের নিবাস আছে। ইহার পূর্ব্বদিকে কিরাতদিগের এবং পশ্চিম দিকে যবন জাতির এবং মধ্যভাগে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যজাতির এবং স্থানে স্থানে শূদ্রজাতির নিবাস। ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণ যজ্ঞ, যুদ্ধ ও বাণিজ্যাদি অবলম্বন করিয়া জীবিকার্জ্জন করেন এবং তাঁহারা যথাযথভাবে নিজ নিজ বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের আশ্রয়ে থাকিয়া ধর্ম্মার্থকাম এই ত্রিবর্গের সেবা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের স্ব স্ব প্রবৃত্তি অনুসারে ইহলৌকিক উন্নতি, স্বর্গলাভ অথবা মোক্ষসাধন উদ্দেশ্যে নানাবিধ ধর্ম্মকার্য্য করিয়া থাকেন। যিনি পশ্চিমোত্তর হইতে তির্য্যগ্‌ভাবে পূর্ব্ব-দক্ষিণে বিস্তৃত এই দ্বীপকে সমগ্রভাবে জয় করিতে পারেন, তাঁহাকে সম্রাট্ নামে অভিহিত করা হয়। এই ভারতখণ্ডকে "সম্রাট্"

চতুর্বর্ণ আর্য্য এবং ম্লেচ্ছ জাতির বাসস্থান

* যোজনের পরিমাণ দ্বারা বর্ত্তমান মাইল হিসাবে পরিমাণ স্থির করা আমাদের বুদ্ধির অতীত। তবে এটুকু দেখা যাইতেছে যে, গঙ্গাদ্বার হইতে কন্যাকুমারী যতদূর, এই দেশ উত্তরপশ্চিম হইতে তির্য্যগ্‌ভাবে পূর্ব্বদক্ষিণে তাহার তিনগুণ দূর বিস্তৃত; সুতরাং পারস্য হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র পূর্বোপদ্বীপ এই পরিমাণের ভিতর পড়ে কি না তাহার বিচার পাঠকগণ করিবেন।

অন্তরীক্ষকে "বিরাট্" এবং অন্য লোককে "স্বরাট্" নামে নির্দ্দিষ্ট করিয়া থাকে। আমি পুনশ্চ এই খণ্ডের কথা বিস্তৃতভাবে বলিতেছি। ১৬-২১॥ *

পর্বতাবলী।

এই ভারতখণ্ডে মহেন্দ্র, মলয়, শুক্তিমান্, ঋক্ষ, বিন্ধ্য ও পারিপাত্র (অথবা পারিযাত্র) নামক সাতটি কুলাচল আছে। ইহাদের নিকটে মনোহর, সর্বগুণসম্পন্ন, বিপুলকায় এবং বিচিত্র সানু-সমন্বিত সহস্র সহস্র পর্বত বিদ্যমান্ আছে। ইহাদের মধ্যে পর্বত-শ্রেষ্ঠ মন্দর, বৈভার, দর্দ্দুর, কোলাহল, সুরস, মৈনাক, বিদ্যুত, বাতন্ধম, নামগিরি, পাণ্ডুর, গণ্ডপ্রস্থ, কৃষ্ণগিরি, গোধন, পুষ্পগিরি, উজ্জয়ন্ত, রৈবতক, শ্রীপর্বত, কারু এবং কূটশৈল প্রধান। এতদ্ভিন্ন আরও অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্বত আছে। এই পর্বতসনাথ দেশগুলিতে আর্য্য এবং ম্লেচ্ছ উভয় জাতির নরনারীই বাস করেন। ২২-২৮॥ †

নদনদী।

এই দেশের আর্য্য এবং ম্লেচ্ছ নরনারী যে সকল নদনদীর জল পান করেন, তাহাদের নাম শ্রবণ করুন।

(১) হিমালয় পর্বত হইতে নির্গত,—গঙ্গা, সিন্ধু, সরস্বতী, শতদ্রু, চন্দ্রভাগা, যমুনা, সরযূ, ইরাবতী, বিতস্তা, বিপাশা, দেবিকা, কুহূ, গোমতী, ধূতপাপা, বাহুদা, দৃষদ্বতী, কৌশিকী, তৃতীয়া, নিশ্চীরা, গণ্ডকী, ইক্ষু, এবং লোহিত। ‡

(২) পারিপাত্র পর্বত হইতে নির্গত,—দেবস্মৃতি, বেদস্মৃতি, বেদবতী, বৃত্রঘ্নী, সিন্ধু, বর্ণাশা, চন্দনী, সদানীরা, মহী, পরা, চর্ম্মণ্বতী, বিদিশা, বেত্রবতী, শিপ্রা, এবং অবন্তী। †

(৩) ঋক্ষপর্বত হইতে নির্গত,—শোণ, মহানদ, নর্মদা, সুরসা, দ্রুমা, মন্দাকিনী, দশার্ণা, চিত্রকূটা, তমসা, পিপ্পলা শ্রোণী, করতোয়া, পিশাচিকা, নীলোৎপলা, বিপাশা, জম্বুলা, বালুবাহিনী, সিতেরজা, শুক্তিমতী, মক্ষণা এবং ত্রিদিবা। ‡

(৪) বিন্ধ্য পর্বত হইতে,—তাপী, পয়োষ্ণী, নির্বিন্ধ্যা, মদ্রা, নিষধা, বেণ্বা, বৈতরণী, শিতিবাহু, কুমুদ্বতী, তোয়া, মহাগৌরী, দুর্গা এবং অন্তঃশিলা।

(৫) সহ্যপর্বত হইতে,—গোদাবরী, ভীমরথী, কৃষ্ণবেণী, বঞ্জুলা, তুঙ্গভদ্রা, সুপ্রয়োগা, কাবেরী এবং অপগা। §

(৬) মলয় পর্বত হইতে,—কৃতমালা, তাম্রবর্ণা, পুষ্পজাতি এবং উৎপলাবতী। **

(৭) মহেন্দ্র পর্বত হইতে,—ত্রিসামা, ঋষিকুল্যা, ইক্ষুলা, ত্রিদিবা, লাঙ্গুলিনী, এবং বংশধরা। ††

(৮) শুক্তিমৎ পর্বত হইতে,—ঋষিকা, সুকুমারী, মন্দগা, মন্দবাহিনী, কৃপা এবং পলাশিনী। ‡‡ এই সমস্ত নদীই গঙ্গা এবং সরস্বতীর ন্যায় পবিত্রা, জগতের পাপহারিণী এবং বিশ্বের মাতৃস্বরূপা। তাহাদিগের শত সহস্র উপনদী এবং শাখানদী বর্ত্তমান আছে। ২৮-৪৩॥

---

* "সম্রাট্" বলিতে সমগ্র ভারতের একচ্ছত্র নরপতি বুঝাইত। যুধিষ্ঠির এইরূপ সম্রাট্ ছিলেন। অশোকবর্দ্ধন এই বহুগৌরববিশিষ্ট উপাধির অধিকারী কি না তাহা সুধীগণের বিবেচ্য।

† নামভেদ, পাঠান্তর এবং অতিরিক্ত নাম সংস্কৃত শ্লোকাবলীর পাদটীকায় দেওয়া হইয়াছে। হিমালয় অথবা হিমবান্ ভারতবর্ষের বর্ষ পর্বত, তাই এই পর্বত সমূহের মধ্যে হিমালয়ের নাম পঠিত হয় নাই।

‡ নামভেদে পাঠান্তর এবং পুরাণান্তরে প্রাপ্ত অতিরিক্ত নাম সংস্কৃত শ্লোকাবলীর পাদটীকায় প্রদত্ত হইয়াছে। এই সকল নদীর অনেকগুলির নামই অধুনা পরিবর্তিত হইয়াছে তাহা নিশ্চয় করিবার চেষ্টা এখানে করিলাম না।

† বিন্ধ্যাচলের পশ্চিম এবং উত্তরাংশের নাম। সেকালে "পারিযাত্র" অথবা পারিমাত্র ছিল দেখা যাইতেছে।

‡ তদ্রূপ উহার পূর্ব্ব এবং উত্তরাংশের নাম "ঋক্ষ" পর্ব্বত ছিল বোধ হইতেছে। মহানদ অধুনা মহানদী নামে বিখ্যাত।

§ পশ্চিমঘাটের উত্তরাংশের প্রাচীন নাম "সহ্যপর্ব্বত" ছিল।

** পশ্চিমঘাটের দক্ষিণাংশের নামই "মলয়" ছিল বোধ হইতেছে।

†† পূর্ব্বঘাট পর্ব্বতের যে অংশ কলিঙ্গদেশে (বর্ত্তমান মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর উত্তরাংশ) অবস্থিত, উহাকে "মহেন্দ্র" বলিত।

‡‡ শুক্তিমৎ পর্ব্বতের আধুনিক নাম কি তাহা আমরা ঠিক করিতে অক্ষম।
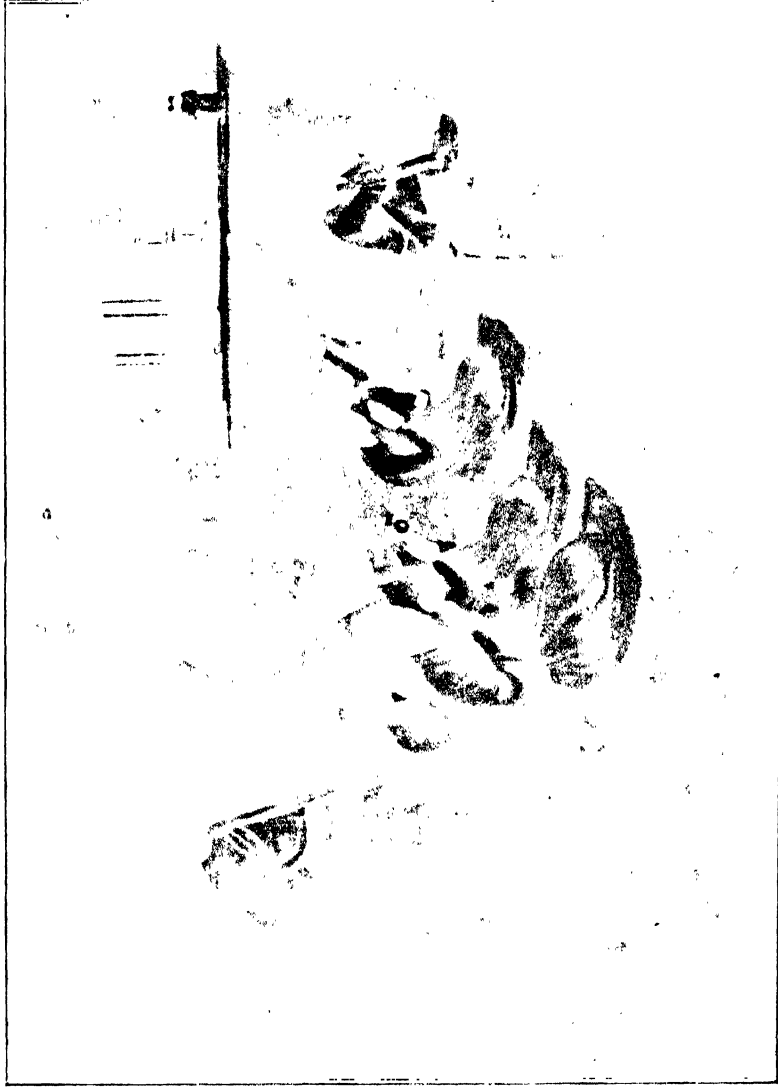
—মন্দিরে—

K. V. Seyne : Bros.

জনপদ সমূহ। যে জনপদগুলির ভিতর দিয়া উল্লিখিত নদী এবং উপনদীগুলি প্রবাহিত হইতেছে তাহাদিগের নাম যথা :—

(১) মধ্যদেশীয় জনপদ,—কুরু, পাঞ্চাল, শাল্ব, জাঙ্গল, শূরসেন, ভদ্রকার, বোধ, শতপথেশ্বর, বৎস্য, কুসট্ট, কুল্য, কুন্তল, কাশী, কোশল, প্রথম, কলিঙ্গ, মগধ এবং বৃক। *

যেস্থান হইতে গোদাবরী নদী প্রবাহিত হইয়াছে, সহ্যশৈলের সেই উত্তরাংশে সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা মনোহর এক প্রদেশ অবস্থিত আছে। পুরাকালে রাম এই প্রদেশে গোবর্দ্ধন নামে একটি পুর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ভরদ্বাজমুনি রাম এবং তদীয় প্রিয়ার প্রীতিসম্পাদন নিমিত্ত এই স্বর্গ এবং তদুপযোগী বৃক্ষ এবং ওষধিসমূহ উৎপাদন করিয়াছিলেন। তজ্জন্যই এই মনোরম পুর ও উপবন সৃষ্ট হইয়াছিল। †

(২) উত্তরদেশীয় জনপদ, বাহ্লীক, বাটধান, আভীর, কালতোয়ক, অপরীত, শূদ্র, পল্লব, চর্ম্মখণ্ডিক, গান্ধার, যবন, সিন্ধু, সৌবীর, মদ্র, শক, হূণ, কুলিন্দ, পারদ, হারহূণ, (White Huns? হার = মুক্তা = শ্বেত) রমণ, রুদ্ধকটক, কেকয়, দশমালিক,—এই দেশে ক্ষত্রিয়ের উপনিবেশ এবং বৈশ্য ও শূদ্রকুলের বাস। (প্রঃ ব্রাহ্মণগণ কি এদেশসমূহে বাস করিবেন না?—এখন যে সকল নাম করা হইতেছে, ঐ সকল দেশে কি চতুর্ব্বর্ণ্যের বসতি ছিল না? কাম্বোজ, দরদ, বর্ব্বর, (আফ্রিকার Barbary প্রদেশ এই জাতির উপনিবেশের জন্য সৃষ্ট হয় নাই ত? দরদ দর্দিস্থানের প্রাচীন অধিবাসী?) অঙ্গলৌকিক, চীন, তুষার, পহ্লব, ক্ষতোদর, আত্রেয়, ভরদ্বাজ, প্রস্থলা, কসেরুক, লম্পাক, স্তনপ, পীড়িক, জুহুড়, অপগ (আফ্‌গানিস্থানের প্রাচীন নাম?) আলিমদ্র, কিরাতজাতি সমূহের উপনিবেশ, তোমর, হংসমার্গ, (মেঘদূত—পূর্ব্বমেঘ) কাশ্মীর, তঙ্গণ, চুলিক, আহুক, উর্ণা এবং দর্ব।

(৩) প্রাচ্যদেশীয় জনপদ—অন্ধ্রবাক, সুজরক, অন্তর্গিরি, বহির্গিরি, প্রবঙ্গ, বঙ্গ, মালদ, মালবর্ণিক, ব্রহ্মোত্তর, প্রবিজয়, ভার্গব, প্রাগ্‌জ্যোতিষ, পৌণ্ড্র, বিদেহ, তাম্রলিপ্ত, মাল, মগধ এবং গোনন্দ।*

৪ দক্ষিণাপথের জনপদ—পাণ্ড্য, কেরল, চোল্য, কুল্য, সেতুক, মূষিক, কুনাসা, বনবাসক, মহারাষ্ট্র, মাহিষক, কলিঙ্গ, আভীর, ঐষীক, আটবা, বর, পুলিন্দ, বিন্ধ্যমূলিক, বৈদর্ভ, দণ্ডক, শৌলিক, মৌলিক, অশ্মক, ভোগবর্দ্ধন, মৈন্দিক, কুন্তল, অন্ধ্র, উদ্ভিদ এবং নলকালিক।

৫ পাশ্চাত্য জনপদ,—সূর্পারক, কোলবনা, দুর্গা, তালীকট, (বায়বীয়ে "কালীতক," এবং মার্কণ্ডেয়ে "চালীকট" নামান্তর দৃষ্ট হয়। আমাদের মনে হয় যে, প্রকৃত নাম "কালীকট" Vasco da Gamaর। এখনও কালীকট মালবার উপকূলে অবস্থিত। Calicut লিপিকরপ্রমাদে নামগুলির যে কি দুরবস্থা হইয়াছে, তাহা পাঠকগণ পাঠান্তরগুলির প্রতি দৃষ্টি করিলেই বুঝিতে পারিবেন। এই সকল প্রমাদ হইতে প্রকৃত নাম বাছিয়া লওয়া অনেকস্থলেই অসাধ্য।) পুলেয়, সুরাল, রূপস, তাপস, এবং

নামান্তর, পাঠান্তর এবং অতিরিক্ত নাম অন্যান্য পুরাণে যাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহা সংস্কৃতাংশের পাদটীকায় দেওয়া হইয়াছে। বিষ্ণুপুরাণ হইতে যাহা উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাও দ্রষ্টব্য। তাহাতে "রসীক" নাম স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়।

† এই বর্ণনা পাঠ করিলে রাঘব রামচন্দ্রের উপাখ্যানই পুরাণকারের অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয়. কিন্তু রামায়ণে এরূপ প্রদেশ বা পুরের উল্লেখ আছে বলিয়া স্মরণ হইতেছে না। সংস্কৃতাংশের পাদটীকায় পাঠক দেখিয়াছেন যে মার্কণ্ডেয়পুরাণকার এই প্রসঙ্গে স্পষ্ট ভার্গব রামের উল্লেখ করিয়াছেন। অথচ পরশুরাম যে বিবাহিত ছিলেন তাহা আমরা অবগত নহি। তবে পুরাণের ত অন্ত নাই! বালব্রহ্মচারী বলিয়া কথিত শুকদেবেরও স্ত্রীপুত্রাদির বর্ণনা ত আছে।

* মৎস্যপুরাণের এই বর্ণনা শুদ্ধতর বলিয়া সংস্কৃতাংশের পাদটীকায় লিখিয়াছি। এখানে ঐ সংস্কৃত বাক্যাংশের বঙ্গানুবাদ দিলাম:— অঙ্গ, বঙ্গ, মদ্‌গুরক, (মুঙ্গের?) অন্তর্গিরি, বহির্গিরি, সুহ্ম এবং উত্তর সুহ্ম (আধুনিক) রাঢ়, প্রবিজয়, মার্গব, (মনুর "নিষাদো মার্গবং সূতে দাশং নৌকর্মজীবিনম্"।১০।৩৪॥ মালব, প্রাগ্‌জ্যোতিষ (বিষ্ণুপুরাণে "কামরূপ" উক্ত হইয়াছে, উহাই আধুনিক নাম। পুণ্ড্র, বিদেহ, তাম্রলিপ্ত, শাল্ব, মগধ এবং গোনর্দ্দ। মৎস্যপুরাণে লিখিত প্রাচ্যজনপদগুলির মধ্যে এক "প্রবিজয়" ভিন্ন আর সকলকেই চিনিতে পারা যায়। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করার স্থানাভাব। তবে সংক্ষেপে এইমাত্র বলা আবশ্যক যে, পুরাণে 'গৌড়' নাম দেখিতে পাওয়া গেল না।

তুরসিত; নর্ম্মদানদীর উপকূলস্থিত নাসিক্যাদি প্রদেশ, ভারুকচ্ছ, মাহেয়, শাশ্বত, কচ্ছীয়, সুরাষ্ট্র, আনর্ত্ত এবং অর্ব্বুদ।

(৬) অনুবিন্ধ্য জনপদ—মালব, করুষ, মেকল, উৎকল, উত্তমর্ণ, দশার্ণ, ভোজ, কিষ্কিন্ধক, তোসল, কোশল, ত্রৈপুর, বৈদিশ, তুমুর, তুম্বুল, ষট্‌কুর, নিষধ, অনুপ, তুণ্ডিকের, বীতিহোত্র এবং অবন্তী।

(৭) পার্ব্বত্য জনপদ—নির্গহর, হংসমার্গ, কুপথ, তঙ্গণ, খস, কর্ণপ্রাবরণ, (অর্থ,—যাহাদের কাণ এত বড় যে, কাণমুড়ি দিয়া শুইতে পারে,—লিপিকর-প্রমাদবশতঃ এই উপকথার সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়; কারণ বায়ুবায়ে "কুশপ্রাবরণ" অর্থাৎ কুশের বস্ত্র আবরণ যাহাদের আছে—তাহাই ঠিক বলিয়া বোধ হয়।) হুণ, দর্ব্ব, বহুদক, ত্রিগর্ত্ত, মালয়, কিরাত এবং তামস। ৪৪—৭১॥

আমাদের প্রতিজ্ঞা অনুসারে ভারতখণ্ডের পৌরাণিক ভৌগোলিক বর্ণনা অতি সংক্ষেপে সমাপ্ত হইল। এই বর্ণনায় সমগ্র পৌরাণিক সাহিত্যের মুকুটমণি "মহাভারত" এবং কাব্যশাস্ত্রনিচয়ের আদিগ্রন্থ রামায়ণের সাহায্য লওয়া হয় নাই। রামায়ণ এবং মহাভারতের সাহায্য লইতে গেলে প্রবন্ধের কলেবর প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে; সুতরাং আপাততঃ এই স্থলেই বক্তব্য শেষ করিতে হইল। রামায়ণ এবং মহাভারতে ভারতখণ্ডের যে সকল ভৌগোলিক তত্ত্ব বর্ণিত আছে, ভবিষ্যতে প্রস্তাবান্তরে তাহা পাঠক মহাশয়দিগের সমীপে উপস্থিত করার চেষ্টা করিব।

শ্রীসত্যবন্ধু দাস।

প্লাবনে।

১

সংহর,—সংহর রুদ্র এ তব সংহারবেশ!
সম্বর তাণ্ডব নৃত্য, হে শম্ভু,—হে প্রথমেশ!
মৃত্যুঞ্জয় জটাজালে রুদ্ধকর মহাকালে,—
ক্ষান্ত দাও ক্ষিপ্ত নৃত্যে,—শ্মশান হয়েছে দেশ!
প্রজ্বলিত নেত্রানলে শ্বাসরুদ্ধ হ'ল "শেষ"!

২

দক্ষযজ্ঞ বিনাশের ঘটেছে কি প্রয়োজন?—
পুনঃ কি ত্রিপুর আসি স্বর্গে বাধায়েছে রণ?—
যোগেন্দ্রের যোগচ্যুতি পুনঃ কি ঘটালে সতী?—
দগ্ধ হ'ল নেত্রানলে ফুলধনু ফুলশর?—
কেন এ সংহারবেশ তবে আজি, হে শঙ্কর?

৩

কোন্ যুদ্ধ প্রয়োজনে সাজিয়াছ, হে ধূর্জ্জটি!
নবীন নীরদ-বাসে আঁটিয়া বেঁধেছ কটি,
মেঘ ডম্বরুর রবে সভয়ে চাহিছে সবে,
ফেনপুঞ্জ মণি-শিরে চন্দ্র-সূর্য্য পড়ে টুটি—
জটামুক্ত জহ্নুসুতা চরণে পড়েছে লুটি।

৪

ক্ষুদ্র বিশ্ব বিনাশিতে এ বিপুল আয়োজন
কেন করিয়াছ নাথ,—কিবা ছিল প্রয়োজন?
তোমারি সৃজিত সৃষ্টি রেখেছে তোমারি দৃষ্টি,—
তুমি যদি নহ তুষ্ট এখনি তা হবে লোপ!—
ক্ষুদ্রজনে মহতের সাজে কি এমন কোপ?

৫

আবার কি একার্ণবে হবে ধরা জলময়?—
তাই কি এ ভীম লীলা দেখাইলে লীলাময়?
জলে জলময়ী ধরা— প্রলয়প্লাবনে ভরা—
মৎস্যরূপে পুনরপি করিবে কি বেদোদ্ধার?—
তাই কি সলিলক্রীড়া বিশ্বে করি একাকার!

শ্রীইন্দিরা দেবী

ব্রহ্মদেশের কথা।

(সঙ্কলন)

ব্রহ্মদেশের আয়তন অতি বৃহৎ। ইহা দৈর্ঘ্যে প্রায় ১০০ মাইল, প্রস্থে ৫৭৫ মাইল। ইহার অধিবাসীদিগের অবয়ব হ্রস্ব, দৃঢ়, মঙ্গোলীয় ছাঁচে গঠিত; কেশ দীর্ঘ, কিন্তু গুম্ফ শ্মশ্রু প্রায় অপুষ্ট ও বিরল। এদেশের পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকই বেশী সুন্দর; তাহাদের সম্মোহনশক্তিও কম নহে। অতি প্রাচীনকাল হইতে সেই যে একটা কথা চলিয়া আসিতেছে যে, কামরূপ ও ব্রহ্মদেশে গেলে লোকে 'ভেড়া' হয়, স্বদেশে ফিরিয়া আসে না, এ সব কথায় তত্তদ্দেশের রমণীগণ কিরূপ মোহিনী তাহারই সাক্ষ্য পাওয়া যায়। ব্রহ্মদেশের পুরুষেরা অলস। সুচতুরা নারীগণই হাটে বাজারে কেনা বেচা করে,—দেশের ব্যবসায় বাণিজ্য নিয়ন্ত্রিত করে। স্ত্রীস্বাধীনতা ব্রহ্মদেশে যেমন অবারিত য়ুরোপেও তেমন নয়। কি পুরুষ, কি স্ত্রীলোক, সকলেই সরল, অতিথিবৎসল, বেশবিন্যাস ও আমোদ প্রিয়। ধনী নির্ধন সকলেরই রেশমের 'লুঙ্গি,' রেশমের উষ্ণীষ!—ইহকালের সুখটুকু, সখটুকু, সাধটুকু মিটাইবার ইচ্ছা কাহারও কম নহে।

রেঙ্গুনের মস্‌জিদ্।

পর্যাটকের পক্ষে ব্রহ্মদেশে নানা আকর্ষণ আছে।—রাজধানী রেঙ্গুন অতি সুন্দর, পরিচ্ছন্ন সহর। ইহার রাস্তাগুলি যেমন প্রশস্ত তেমনই অপূর্ব্ব। সকল পার্কই সুশোভন। কৃত্রিম হ্রদ, মস্‌জিদ সোয়ে ডিগোং ফায়া অতিশয় চমৎকার।
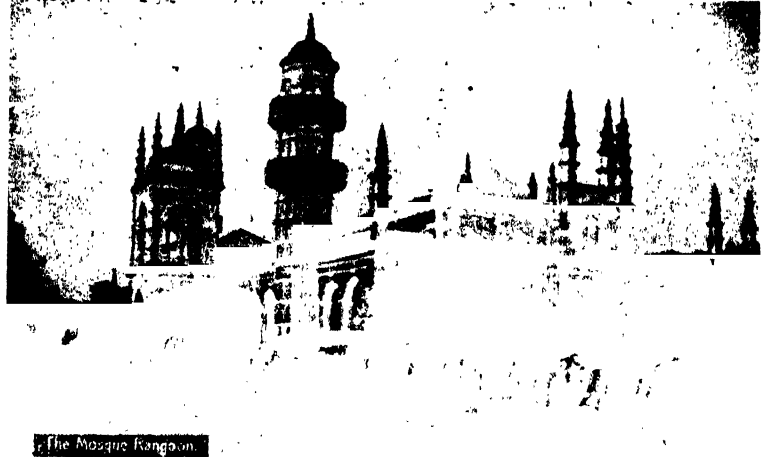
ফায়া বা বৌদ্ধ মন্দিরগুলির সংখ্যা নির্ণয় করা অসম্ভব। রেঙ্গুনের সোয়ে ডিগোং বা সুলে, মান্দালের মুনি বা আরাকান ফায়া, পিগুর ফায়া, প্রোমের সোয়ে স্বদ, পাগান, সাগায়িং প্রভৃতির ফায়া অতি বৃহৎ ও অপরূপ কারুকার্য্য-শোভিত। ইহা ছাড়া গিরি শৃঙ্গে, সমতল ক্ষেত্রে কত ক্ষুদ্র বৃহৎ বৌদ্ধ মন্দির! এক কথায় ব্রহ্মদেশ ফায়া-ময়। ফায়াতে পর্ব্ব, উপাসনা, পোয় নাচ, প্রাণ বিনিময় সব চলে। ফায়া ব্রহ্মবাসী ও ব্রহ্মবাসিনীগণের প্রধান মিলন-ক্ষেত্র। ভারতের সুরধুনী, ব্রহ্মের ইরাবতী। ইরাবতীর তীর-

রেঙ্গুনের সোয়ে ডিগোং ফায়া।
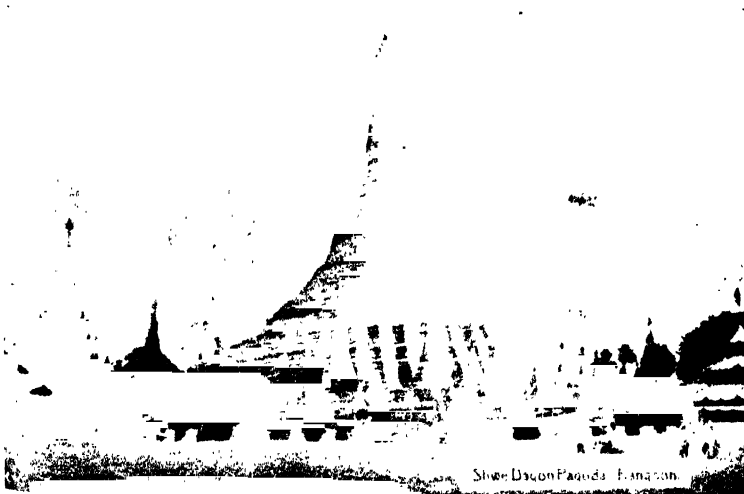
চূন্বী শ্রেণীবদ্ধ পর্ব্বতমালা অশেষ সৌন্দর্য্যমণ্ডিত! এ শোভা রেলে না গিয়া ষ্টীমারপথেই পর্য্যাটকের নয়নগোচর হয়।

মান্দালে ব্রহ্মদেশের শেষ রাজধানী। উহা ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে মিন্দন মিন কর্ত্তৃক স্থাপিত ও ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ইংরেজদিগের অধিকৃত হয়। ইহার আরাকান মন্দির, রাণীর সুবর্ণমঠ, প্রাসাদ, দরবার-গৃহ, মান-মন্দির, দুর্গ, ৪৫০ ফায়া সুবিখ্যাত। প্রাসাদের এক পার্শ্বে প্রমোদ
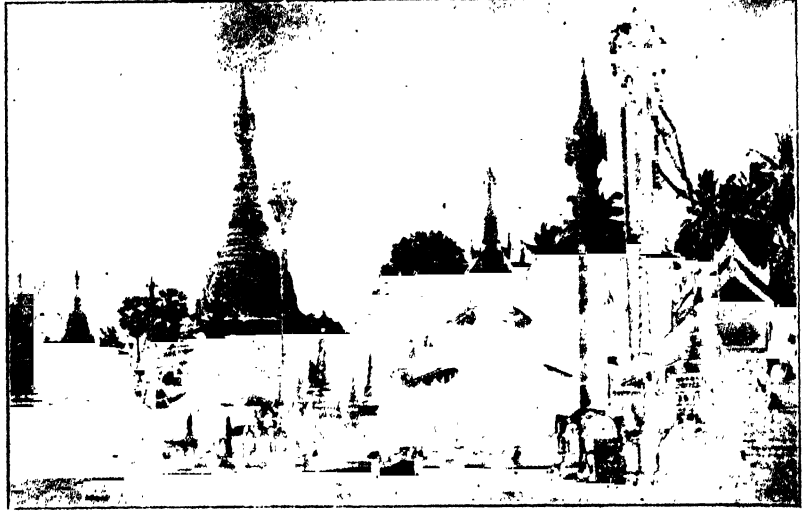
ফায়া বা বৌদ্ধ মন্দিরের আভ্যন্তরীণ দৃশ্য।

গৃহ। ইহার সম্মুখে ইংরেজীতে লেখা আছে, "রাজা থিব এইখানে তাঁহার দুই রাণী ও রাণীমার সহিত ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ২৮এ নভেম্বর জেনেরাল প্রেন্ডারগষ্টের নিকট আত্মসমর্পণ করেন।" মান্দালের সন্নিকটে, ইরাবতীর পশ্চিম তীরে মিঙ্গন গ্রামে একটি সুবৃহৎ ভগ্ন মন্দির আছে। ইহার ভিত্তি ৪০০ ফিট সমচতুষ্কোণ, উচ্চতা ৫০০ ফিট হইবার কথা ছিল, কিন্তু এক তৃতীয়াংশমাত্র নির্ম্মিত হইবার পর কার্য্য স্থগিত হয়। ইহাই পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ ইষ্টকালয়। ফায়াটি যেমন বড়, উহার ঘণ্টাও সেইরূপ:—ইহা ওজনে ৯০ টন, ‑‑ ফিট উচ্চ:— এত বড় ঘণ্টা পৃথিবীর একটি আশ্চর্য্য দর্শনীয় বস্তু।

বৌদ্ধ মূর্ত্তি।

মান্দালে হইতে গোটেকে রেলে যাইতে হয়। এই গোটেকের ব্রিজ্ উচ্চতায় পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার

ব্রহ্মের শেষরাজা 'থিব'।
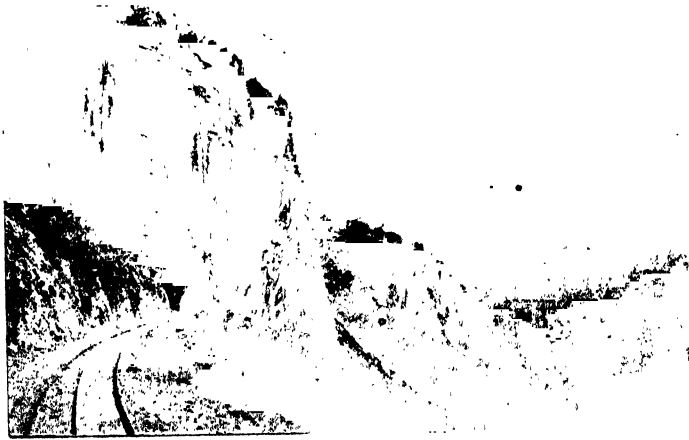
করিয়াছে। পর্ব্বতের অতি নিম্নে দুইটি সুবৃহৎ গহ্বর, তাহার উপর বিশাল স্তম্ভে এই বিপুলকায় সেতু। গোটেকের পথেই মেমিও, ব্রহ্মদেশের দার্জ্জিলিং।

মান্দালে হইতে ভামো পর্য্যন্ত উত্তর ইরাবতীর প্রাকৃতিক দৃশ্য অতুলনীয়। ভামো চীনপথের প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র। মোগকের Ruby Mines বিশ্ববিখ্যাত। পর্য্যটকের পক্ষে এগুলিও বিশেষ দর্শনীয়। অসংখ্য কক্ষপূর্ণ সাগায়িং পর্ব্বত হইতে প্রোম পর্য্যন্ত গিরিশ্রেণীর দৃশ্য অত্যন্ত মনোহর। পাগানের অপূর্ব্ব ধ্বংসাবশেষও অতি বিচিত্র। নদীতীরে লম্বে সাত মাইল ও প্রস্থে তিন মাইল ব্যাপী জীর্ণ ভগ্ন মন্দিরাদির অনন্যসাধারণ সমাবেশ প্রাচীন রাজধানী পাগানের গৌরব-গর্ব্বের চিতা ভস্ম।

শ্রীসত্যরঞ্জন রায়।

গোটেকের সেতু ও 'ভায়াডক্ট'।

বৌদ্ধধর্ম্মের বিশেষত্ব।

উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের বিগত দিনাজপুরের অধিবেশনে "বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা" শীর্ষক একটি সন্দর্ভ পাঠ করিয়া আমি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম যে, বুদ্ধদেব যাহার উপর নিজের ধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাঁহার ধর্ম্মের যাহা ভিত্তি, এবং যাহা যাহা তাঁহার প্রধান তত্ত্ব, তাহাদের অধিকাংশই তিনি তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী বহুভেদভিন্ন ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম হইতে গ্রহণ করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে উভয় ধর্ম্মের বিশেষ কোন ভেদ নাই। অন্য ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম হইতে বৌদ্ধ

ধর্ম্মের প্রধান বিশেষত্ব কি, তাহাই এই বর্ত্তমান প্রবন্ধে আলোচনা করিব।

ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের কয়টি গোড়ার কথা আছে; যথা, আত্মা বা জীব ও লোক বা সংসার। আত্মা কি, তাহা নিত্য কি অনিত্য, তাহার উচ্ছেদ আছে কি নাই, জীবের সহিত শরীরের সম্বন্ধ কি, জীব ও শরীরে কোন ভেদ আছে কি না, এই শরীরই জীব কি না, মরণের পর জীব থাকে কি না; এই লোক বা সংসার নিত্য কি অনিত্য; ইত্যাদি প্রশ্ন ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের মূলে। এই জাতীয় প্রশ্নের অনুকূল মীমাংসা করিয়া নিখিল ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম তাহারই উপরে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়াছে। ব্রাহ্মণ্য দার্শনিক চিন্তাগুলিও ইহারই উপর প্রতিষ্ঠিত। আত্মা নামে যদি কোন এক নিত্য পদার্থ না থাকে, শরীর হইতে জীব যদি ভিন্ন না হয়, এবং মরণের পর যদি তাহার সত্তা না থাকে, তবে আমাদের ব্রাহ্মণ্য দর্শনগুলির দাঁড়াইবারই স্থান থাকে না। বুদ্ধদেব যখন জন্মগ্রহণ করেন, তাহার পূর্ব্ব হইতেই ভারতের ধর্ম্মচিন্তাক্ষেত্র ঐ কএকটি বিষয়ের স্থূল-সূক্ষ্ম বহুবিধ আলোচনায় পরিপূর্ণ ছিল। বহুলোকে বহুপ্রকার মতবাদ প্রচার করিয়াছিলেন ও করিতেছিলেন। সকলের দৃষ্টি তাহাতেই আবদ্ধ ছিল। ঐ কথাগুলি ছাড়িয়া দিয়া কেহ কিছু চিন্তা করিতে পারিতেন না। বুদ্ধদেব এই সকল মতবাদকে "দিট্‌ঠিজাল" অর্থাৎ দৃষ্টিজাল বা মতরূপ জাল বলিতেন। লোকে তাহাতে আবদ্ধ হইয়া থাকিত। ব্রহ্মজালসুত্ত ও পোট্‌ঠপাদসুত্ত প্রভৃতি আলোচনা করিলে ইহা স্পষ্ট জানিতে পারা যায়। এই সকল বিষয় এত জটিল, সাধারণের পক্ষে এত দুর্গম যে, নিঃসংশয়ভাবে কাহাকেও বুঝাইয়া দেওয়া যায় না। অথচ বুদ্ধদেব বুঝিয়াছিলেন যে, এই সব কথা একবারে পরিত্যাগ করিলে কোন ক্ষতি নাই। তিনি নির্ব্বাণ-লাভের যে পথ চিন্তা করিয়াছিলেন, তাহাতে ঐ সকল আলোচনার কোন আবশ্যকতা নাই। তিনি বুঝিয়াছিলেন লোকে নিরর্থক ঐ সকল প্রশ্ন লইয়া যথার্থ কুশল হইতে বঞ্চিত হইয়া পড়ে। আত্মা নিত্যই হউক বা অনিত্যই হউক, শরীরই জীব হউক বা শরীর হইতে তাহা ভিন্নই হউক, ইহার সহিত যথার্থ মঙ্গললাভের কোন সম্বন্ধ নাই। এইজন্য তৎসমুদয়কে প্রত্যাখ্যান করিয়া তিনি এক অভিনব প্রস্থান প্রদর্শন করিয়াছেন।

পোট্‌ঠপাদসুত্তে (দীঘ ৯.২১-৩০) পরিব্রাজক পোট্‌ঠপাদ বুদ্ধদেবকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে, সংজ্ঞাই কি পুরুষের আত্মা, অথবা সংজ্ঞা অন্য এবং আত্মা অন্য। বুদ্ধদেবের প্রতিপ্রশ্নে পোট্‌ঠপাদ নিজের প্রশ্ন সমর্থন করিতে না পারিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলেন যে, 'আমি কি ইহা জানিতে সমর্থ হইতে পারি,—ইহা জানিতে কি আমার শক্তি আছে যে, সংজ্ঞাই পুরুষের আত্মা, অথবা সংজ্ঞা অন্য এবং আত্মা অন্য?'

বুদ্ধদেব উত্তর করিলেন—'পোট্‌ঠপাদ, তোমার দৃষ্টি অন্যত্র, রুচি অন্যত্র, অভিনিবেশ অন্যত্র, এবং তোমার আচার্য্যও অন্যত্র (অভিনিবিষ্ট)। তোমার পক্ষে ইহা দুর্জ্ঞেয়।'

'ইহা যদি আমার দুর্জ্ঞেয় হয়, তাহা হইলে (আপনি আমার আর এক প্রশ্নের উত্তর প্রদান করুন)—এই লোক শাশ্বত, ইহাই কি সত্য, এবং অপর কথা নিরর্থক—নিঃসার (মোঘ)?'

'ইহা আমি বিবৃত করি নাই।' *

'ভাল, এই লোক অশাশ্বত, ইহাই কি সত্য এবং অপর কথা নিরর্থক?'

'ইহাও আমি বিবৃত করি নাই।'

'আচ্ছা, এই লোকের অন্ত শেষ সীমা আছে, ইহাই কি সত্য এবং অপর কথা নিরর্থক?'

'পোট্‌ঠপাদ, আমি ইহাও বিবৃত করি নাই।'

'তবে কি লোক অনন্ত, ইহাই সত্য এবং অপর কথা নিরর্থক?'

'ইহাও আমি বিবৃত করি নাই।'

'আচ্ছা, যে জীব সেই শরীর, ইহাই কি সত্য এবং অপর কথা নিরর্থক?'

'ইহাও আমি বিবৃত করি নাই।'

'তবে কি জীব অন্য, শরীর অন্য, ইহাই সত্য এবং অপর কথা নিরর্থক?'

* অথবা 'প্রকাশ করি নাই,' বা 'বলি নাই,' বা 'উত্তর প্রদান করি নাই।' মূল—'অব্যাকতং।'

'ইহাও আমি বিবৃত করি নাই।'

'ভাল, জীব * মৃত্যুর পরেও থাকে, ইহাই কি সত্য এবং আমার কথা মিথ্যা ?"

'আমি ইহাও বিবৃত করি নাই ?'

'তবে কি জীব মৃত্যুর পরে থাকে না, ইহাই সত্য এবং অপর কথা মিথ্যা ?'

'আমি ইহাও বিবৃত করি নাই।'

'তাহা হইলে কি জীব মৃত্যুর পরে থাকে এবং থাকেও না, ইহাই সত্য এবং অপর কথা মিথ্যা ?'

'আমি ইহাও বিবৃত করি নাই।'

'তবে কি মৃত্যুর পর জীব থাকে ইহাও না' এবং থাকে না ইহাও না, ইহাই সত্য এবং অপর কথা মিথ্যা ?'

'পোট্‌ঠপাদ, আমি ইহাও বিবৃত করি নাই !' †

উদ্ধৃত অংশ পাঠ করিলেই স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে, ব্রাহ্মণ্য দর্শনসমূহ যে সকল প্রশ্নের সমাধান লইয়া ব্যাকুল ও শত শত সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম বিচারে নিমগ্ন, বুদ্ধদেবের দর্শন তৎসমুদয়কে একবারে নির্ভীকভাবে অগ্রাহ্য করিয়াছে। বুদ্ধদেব নিজেই অসঙ্কোচে বলিয়া যাইতেছেন, তিনি সে সকল প্রশ্নের কোন উত্তর প্রদান করেন নাই। এই একস্থলে নহে, ত্রিপিটকের বহু স্থানে তিনি ইহা প্রকাশ করিয়াছেন। কখন কখন কেহ এই সব প্রশ্ন উপস্থিত করিলে তিনি মৌনাবলম্বনে থাকিতেন, ‡ তিনি ইহাতে কোন অভিচার বা লজ্জা অনুভব করিতেন না। যে সকল প্রশ্নের অনুকূল সিদ্ধান্তের উপর ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এবং ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের ন্যায় জগতের আরও বহু ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা যাহার উপর নির্ভর করিতেছে, বুদ্ধদেব একবারে তাহা প্রত্যাখান করিয়াছেন, অথচ নিজের ধর্ম্মকেও সুপ্রতিষ্ঠ করিয়া গিয়াছেন। বৌদ্ধ ধর্ম্মের ইহা সাধারণ প্রভাব নহে যে, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের ঐ সুদৃঢ় মতকে একবারে অগ্রাহ্য করিয়া তাহা ভারতক্ষেত্রে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিয়াছিল।

প্রশ্ন হইতে পারে এবং এখনও অনেকে করিয়া থাকেন ও প্রাচীনেরাও করিয়া গিয়াছেন,—বুদ্ধদেব কেন ঐ সকল প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন নাই ? তিনি তাহাদের যথার্থ উত্তর জানিতেন না, অথবা অপর কোন কারণ আছে ?

তিনি ঐ সমস্ত প্রশ্নের যথার্থ উত্তর জানিতেন না, তাহা বলা যায় না, যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে তিনি পোট্‌ঠপাদকে বলিতেন না যে, ইহা তোমার দুজ্ঞেয়। আবার তিনি দুর্জ্ঞেয় ("দুজ্জানং") বলিয়াছেন, অজ্ঞেয় বলেন নাই। পোট্‌ঠপাদের কেন তাহা দুজ্ঞেয়, তাহাও তিনি সেখানে বলিয়াছেন এবং ইহা পূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে (পোট্‌ঠপাদ সুত্ত, ২৫)।

পোট্‌ঠপাদ যখন দেখিলেন যে, ঐ কয়টি তাঁহার দুর্জ্ঞেয়, তখন তিনি তাহা হইতে নিবৃত্ত হইয়া পূর্ব্বোক্ত আর কয়টি স্থূল কথা জানিতে চাহিয়াছিলেন যে,ঐ সকল মতের কোন্‌টি সত্য। বুদ্ধদেব যখন স্পষ্টই বলিয়া ফেলিলেন যে, তিনি তাহার উত্তর দেন নাই, তখন সেই পরিব্রাজক সহজেই প্রশ্ন তুলিলেন যে, কেন তিনি সেই সমস্ত বিষয় বিবৃত করেন নাই। বুদ্ধদেব বলিলেন (পোট্‌ঠপাদসুত্ত, ২৮)—"যেহেতু তাহাতে কোন প্রয়োজন সিদ্ধি হয় না, ধর্ম্মসিদ্ধি হয় না, মূল ব্রহ্মচর্য্য-সিদ্ধি হয় না—যেহেতু তাহা নির্ব্বেদের জন্য, বিরাগের জন্য, নিরোধের (ধ্যানবিশেষের) জন্য, অভিজ্ঞার জন্য, সম্বোধের জন্য ও নির্ব্বাণের জন্য হয় না—এই নিমিত্ত আমি ইহা প্রকাশ করি নাই।"*

ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে, বুদ্ধদেব দুই কারণে ঐ সকল প্রশ্নের উত্তর দিতেন না। প্রথম, তাহা অতি দুর্জ্ঞেয়, সাধারণের তাহাতে প্রবেশ করা কঠিন ; এবং দ্বিতীয়, তাহার কোন প্রয়োজন নাই, বৃথা ঐ সমস্ত আলোচনা করিয়া লাভ নাই। এই সব কথা যে অতি গম্ভীর অতি দুর্ব্বোধ, এবং

* এখানে মূলের শব্দ "তথাগতো।" এ স্থলে ইহার অর্থ জীব, বুদ্ধ নহে। অনেকে ইহা ভুল করিয়া থাকেন। বুদ্ধঘোষ সুমঙ্গলবিলাসিনীতে (১১৮পৃঃ) লিখিয়াছেন—"হোতি তথাগতোতি :আদিসু সত্তো তথাগতোতি।"

† মজ্‌ঝিমনিকায় ৪২৬ পৃঃ ইত্যাদি দ্রষ্টব্য ; মিলিন্দপঞ্‌হ, ৪-২-৪

‡ পূর্ব্ববর্ত্তী টীকা জালিয়সুত্ত [দীঘ ৭]। মহালিসুত্ত [দীঘ-৬-১৬]।

* "ন হেতং পোট্‌ঠপাদ অত্থসংহিতং ন ধম্মসংহিতং ন আদি ব্রহ্মচরিয়কং, ন নিব্বিদায়, ন বিরাগায়, ন নিরোধায়, ন উপসমায়, ন অভিঞ্ঞায়, ন সম্বোধায়, ন নিব্বানায়, সংবত্ততি। তস্মা তং ময়া অব্যাকতং।"

তিনি যে তৎসমুদয় ও তদতিরিক্ত তত্ত্ব জানিতেন, ব্রহ্ম-জালসুত্তে (১-২৮; ৩৬-৩৭; ইত্যাদি) শাশ্বতবাদ প্রভৃতির আলোচনা প্রসঙ্গে তাহা তিনি বলিয়াছেন।

একদিন কৌশাম্বীর ঘোষিতারামে পরিব্রাজক মণ্ডিস্‌স ও জালিয় (জালিয়সুত্ত, ১-৫) বুদ্ধদেবের নিকট পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নটি করিয়াছিলেন—"যে জীব সেই শরীর, অথবা জীব অন্য এবং শরীর অন্য?" বুদ্ধদেব সামঞ্ঞফলসুত্তে (৪০-৯৭) বর্ণিত শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞার উল্লেখে দেখাইলেন যে, মানব যখন শীল, সম্পত্তি প্রভৃতি দ্বারা ক্রমান্বয়ে প্রথম ধ্যানাদি হইতে চতুর্থ ধ্যানে উপস্থিত হয়; দুঃখ, দুঃখের কারণ, দুঃখের নিরোধ ও দুঃখ নিরোধের পথ এই সমস্ত বিষয়ে তাহার যথাভূত তত্ত্বজ্ঞান জাত হয়; কামতৃষ্ণা, জন্মতৃষ্ণা ও অবিদ্যা এই তিন আসব হইতে তাহার চিত্ত বিরত হয়, সে তখন ইহাতেই জানিতে পারে যে, তাহার জন্মের ক্ষয় হইয়াছে, তাহার ব্রহ্মচর্য্যাবাস সম্পন্ন হইয়াছে, কর্ত্তব্য করা হইয়াছে, এবং তাহার পর আর কিছু করিবার নাই। অতঃপর তিনি বলিলেন যে, যে ভিক্ষু এই তত্ত্ব জানে ও অনুভব করে, তাহার নিকটে এই প্রশ্নের উদয় সম্ভবপর হয় না যে, "যে জীব সেই শরীর, অথবা জীব অন্য এবং শরীর অন্য।"

ইহা দ্বারাও বুঝা যাইবে যে, মানবজীবনের যাহা প্রধান লক্ষ্য, তাহার জন্য এই জাতীয় প্রশ্নের কোন আবশ্যকতা নাই, ইহার মীমাংসার জন্য মস্তিষ্ক পরিচালনার কোন প্রয়োজন নাই।

বুদ্ধদেব মানবজীবনকে পর্য্যালোচনা করিয়া চারিটি প্রধান তত্ত্ব প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি ইহাদের নাম দিয়াছিলেন "অরিয়সচ্চ" অর্থাৎ আর্য্যসত্য। আর্য্য-শব্দের অর্থ বিশুদ্ধ, উত্তম। অতএব আর্য্যসত্য শব্দের অর্থ বিশুদ্ধ, উত্তম, পরম সত্য; যে সত্যে কাহারও কোন আপত্তি থাকিতে পারে না, যাহা সকলেরই নিকট স্বীকৃত। দুঃখ ইহা একটি আর্য্যসত্য। মানবের দুঃখ আছে, নিয়ত কতদিকে কত প্রকারে সে দুঃখভোগ করিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। জন্মও দুঃখ, জরাও দুঃখ, ব্যাধিও দুঃখ, মরণও দুঃখ, প্রিয়ের সহিত বিয়োগও দুঃখ, অপ্রিয়ের সহিত সংযোগও দুঃখ, যাহা ইচ্ছা করিয়া না থাওয়া যায়, তাহাও দুঃখ। এইরূপে দুঃখ-প্রবাহ মানবের চারিদিকে অবিরাম বহিয়া চলিয়াছে। ইহা স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব ইহা একটি আর্য্যসত্য। দুঃখ থাকিলে তাহার কারণও অবশ্যই আছে, অতএব দুঃখ-সমুদয় অর্থাৎ দুঃখের কারণ একটি আর্য্যসত্য। এই দুঃখের নিরোধ বা ধ্বংস হইয়া থাকে, অতএব দুঃখ-নিরোধ একটি আর্য্যসত্য; এবং এই দুঃখনিরোধের পথ বা উপায় আছে, এইজন্য দুঃখনিরোধগামিনী "পটিপদা" অর্থাৎ পথ আর্য্যসত্য। বুদ্ধদেবের গোড়ার কথাই হইতেছে দুঃখ ও দুঃখনিরোধ:—

"পুব্‌বে চহং ভিক্‌খবে এতরহি চ দুক্‌খং চেব
পঞ্ঞাপেমি দুক্‌খস্‌স চ নিরোধং।"

ভিক্ষুগণ, দুঃখ ও দুঃখের নিরোধ, ইহাই আমি পূর্ব্বে জানাইয়াছি, এবং এখনও আমি ইহাই জানাইতেছি।

বুদ্ধদেবের সারকথা এই এক সংক্ষিপ্ত পঙ্‌ক্তির মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। ইহাতেই বুঝা যাইবে যে, তাঁহার আদেশ-উপদেশ-অনুশাসন সমস্তই সেই দিকে। যে সকল চিন্তা বা প্রশ্নের সহিত ইহার সাক্ষাৎ বা পরম্পরায় কোন সম্বন্ধ নাই, তিনি সেগুলিকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। পোট্‌ঠপাদের পূর্ব্বোল্লিখিত প্রশ্নগুলির সম্বন্ধে বুদ্ধদেব যখন বলিলেন যে, তিনি তাহাদের উত্তর দেন নাই,—সে সকলকে তিনি বিবৃত করেন নাই, তখন পোট্‌ঠপাদ আবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—'ভগবন্, তবে আপনি কি বিবৃত করিয়াছেন?' তিনি উত্তর করিলেন (পোট্‌ঠপাদ সুত্ত, ৩০)—'ইহা দুঃখ,—ইহা আমি বিবৃত করিয়াছি। ইহা দুঃখের কারণ,—ইহা আমি বিবৃত করিয়াছি। ইহা দুঃখের নিরোধ, ইহা আমি বিবৃত করিয়াছি; এবং ইহা দুঃখ নিরোধের পথ, ইহা আমি বিবৃত করিয়াছি?'

'কি জন্য আপনি ইহা বিবৃত করিয়াছেন?'

'যেহেতু ইহাতে প্রয়োজন-সিদ্ধি হয়, ধর্ম্ম-সিদ্ধি হয়, মূল ব্রহ্মচর্য্য-সিদ্ধি হয়, এবং ইহা নির্ব্বেদের জন্য, বিরাগের জন্য, নিরোধের জন্য, উপশমের জন্য, সম্বোধনের জন্য এবং নির্ব্বাণের জন্য হইয়া থাকে। এই জন্যই আমি ইহা বিবৃত করিয়াছি।'

এইরূপে দুঃখ-নিরোধের উপায় নির্দ্দেশ করিতে গিয়

বুদ্ধদেব যে আত্মা, জীব ও লোক সম্বন্ধে সমস্ত প্রশ্নকে অগ্রাহ্য করিয়া নিজ ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম হইতে ইহাই তাহার সর্ব্বপ্রধান বিশেষত্ব বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য।

রাখাল-রাজ।

১

অবোধ কানু কার মায়াতে ভুলে
গোকুল ছেড়ে চলে গেলি ভাই?
পেলি তথায় অনেক হাতী ঘোড়া
তোর ত তথা খেলার সাথী নাই।
কোথায় সেথা দুর্ব্বাভরা গোঠ,
রাখালদলে খেলার হেন জোট,
ননীর মত নরম সাদা দেহ
কোথায় সেথা দুগ্ধে ভরা গাই?
রাখালরাজা রাজ্য তোর এ ফেলে
কেমন করে' চলে গেলি ভাই?

২

ময়ূর নাচা, এমন পাখী ডাকা
হরিণচরা কোথায় সেথা বন,
মাটীছোঁয়া কোথায় তরুশাখা
ঝুলবি কোথা দুলবি সারাক্ষণ!
কোথায় সেথা ফুলের ছড়াছড়ি,
কোথায় দিবি সদাই গড়াগড়ি;
গুঁজতে কানে কোথায় পাবি ফুল;
বনমালা পরতে সুশোভন?
ময়ূরনাচা এমন পাখীডাকা
হরিণচরা কোথায় সেথা বন।

৩

ক্লান্তি হলে বসবি কোথা ভাই,
শীতল হেন কোথায় তরুছায়া!
কোথায় সেথা কালিন্দীরি জলে
কলকলিয়ে সাঁতার কেটে যাওয়া।
সেথা গভীর কালীদহের জলে
পাবি কি যেতে আঁধার-কালো তলে!
শুকিয়ে দিতে গায়ের জলকণা
কোথায় সেথা মধুর মৃদু হাওয়া?
ক্লান্তি হলে বসবি কোথা ভাই
কোথায় সেথা এমন তরুছায়া?

৪

তুলবে কেবা বেলের কাঁটা দিয়া
কুশের কাঁটা বিঁধলে রাঙ্গা পায়!
পড়লে খসে নূপুর ধড়াচূড়া
আবার কেবা পরিয়ে দেবে তায়?
তমালতলে বসলে মেলি পা'
বাছুর তব চাটবে না ত গা'
দুপুর রোদে ধেনুর পিছে ঘুরি
কাহার দেহে এলিয়ে দিবি গায়?
কে ক্ষুধা পেলে আনবে বনফল
ঘামলে মুখ মুছিয়ে দিবে হায়?

একটি উদ্যান বাটিকার বহির্ভাগ।

করিতে না পারিয়া জীবন-বিসর্জ্জন দেন। যুবক প্লিনি এই সময়ের ঘটনাবলির উল্লেখ করিয়া সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত টাসিটাস্‌কে কএকখানি পত্র লেখেন। আমরা তাঁহার লিখিত দ্বিতীয় পত্রের অংশবিশেষের মর্ম্মানুবাদ নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম।

প্লিনি বলিয়াছেন—"তখন সবে ভূমিকম্প আরম্ভ হইয়াছে, তখন প্রথম ঘণ্টা। তখন আলোক ছিল, কিন্তু বড়ই অস্পষ্ট ও মলিন;—নির্ব্বাণোন্মুখ। চারিদিকের অট্টালিকা সমূহ ক্রমাগত কম্পিত হইতেছিল; প্রবল ভূমিকম্পে সমুদ্র দূরে সরিয়া যাইতে লাগিল; ভূমিকম্পনে সমুদ্রের জলরাশি এক একবার স্ফীত হইয়া বেলাভূমি অতিক্রম করিয়া আসিতেছিল, আবার দ্রুতগতিতে বহুদূরে চলিয়া যাইতেছিল; সামুদ্রিক জীবগণ তীরভূমিতে পড়িয়া আকুল হইয়া উঠিতেছিল। এই সময়ে আমরা দেখিতে পাইলাম অদূরে পর্ব্বতশৃঙ্গে ঘনকৃষ্ণ মেঘরাশি সঞ্চিত হইতেছে; আমরা তখন ইহাকে মেঘ বলিয়াই মনে করিয়াছিলাম। তাহার পরেই দেখিলাম সেই মেঘরাশির মধ্যে বিদ্যুৎ খেলিতে লাগিল; সেই মেঘরাশি বিদীর্ণ করিয়া অগ্নিময় আলোকরেখা চারিদিকে

মস্তক উত্তোলন করিয়া শোভাসম্পদের স্পর্দ্ধা করিবার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয় নাই, সেই সময়ে ৭৯ খৃষ্টাব্দের ২৩শে নবেম্বর তারিখে বিসুবিয়স সংহারমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। এবার আর কম্পন নহে—এবার সেই পাষাণ হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গলিত ধাতুদ্রব্য, বহুকালের সঞ্চিত প্রস্তর ও ভস্মরাশি উৎক্ষিপ্ত হইয়া সমস্ত নগরকে চিরদিনের জন্য সমাহিত করিল—গোলাপবাগ, মদিরার উৎস, বিলাসের অলকা নির্ম্মাণের চেষ্টা চিরদিনের মত লুপ্ত হইয়া গেল—পাশ্চাত্য জগতের বিলাসিতার একটি কেন্দ্র ভস্মের মধ্যে মস্তক লুক্কায়িত করিয়া শাপাবসানের অপেক্ষা করিতে লাগিল। মহাকাল বড়ই কঠোর শাস্তি-বিধান করিয়া ক্ষুদ্র মানবের স্পর্দ্ধা ও দর্প চূর্ণ করিয়া দিলেন।

প্রসিদ্ধ পণ্ডিত প্লিনি এই শোচনীয় কাণ্ডের একটি অতি বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। এই ঘটনার সময় যুবক প্লিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন; তাঁহার খুল্লতাত প্রসিদ্ধ উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিৎ প্লিনি মহোদয় এই সময়ে পম্পিয়াই নগরে ছিলেন, এবং তিনি এই অগ্ন্যুৎপাতের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা

টাইটাসের গৃহ—নগরের সর্ব্বপ্রধান অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ।

বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। সে এক ভীষণ দৃশ্য! দেখিতে দেখিতে এই মেঘরাশি সমুদ্রের দিকে ধাবিত হইল এবং ক্রমেই নিম্নে নামিয়া আসিতে লাগিল। তাহার পরই নগরের উপর ভস্মরাশি বর্ষিত হইতে লাগিল। এ বর্ষণ গভীর নহে। তখন চারিদিক্ ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। তখন যে যেদিকে পারিল পলায়ন করিতে লাগিল। তাহার পর অবিশ্রান্ত গলিত ধাতুদ্রব্য ও ভস্ম-বর্ষণে নগর ডুবিয়া গেল।"

এই শোচনীয় ঘটনার বহুকাল পরে এই নগরের পুনরুদ্ধারের চেষ্টা আরম্ভ হয়; এখনও সে চেষ্টা চলিতেছে। ভস্মরাশি বহুকাল এই সমৃদ্ধ নগরকে বুকের মধ্যে রাখিয়াছিল; তাহার পরে ক্রমে ক্রমে সেই ভস্মরাশি অপসারিত করিয়া বড় বড় অট্টালিকা, সুন্দর প্রমোদভবন সকল বাহির করা হইয়াছে। এখনও অনেক স্থান ভস্মাচ্ছাদিত আছে। ইহাই পম্পিয়াই নগরের ধ্বংসের ইতিহাস।

আমরা পম্পিয়াই নগরের কএকটি অট্টালিকা ও দৃশ্যের প্রতিকৃতি প্রকাশ করিলাম; ইহা হইতেই পাঠকগণ পম্পিয়াই নগরের শোভা ও সমৃদ্ধির কথঞ্চিৎ পরিচয় প্রাপ্ত হইবেন।

পম্পিয়াই নগরের অধিবাসিগণ বড়ই আমোদ প্রিয় ছিল; আমোদ, আনন্দ, বিলাস, ব্যসনেই তাহারা অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিত। নগরটিও ভিন্ন ভিন্ন স্থানের ধনীদিগের বিশ্রাম ও বিলাসনিকেতন ছিল। স্থানান্তরে যে ক্রীড়াভূমির চিত্র প্রকাশিত হইল সেই স্থানে ক্রীড়া করিবার জন্য বেতনভোগী মল্ল নিযুক্ত ছিল। ইহারা মল্লক্রীড়ায় বিশেষ নিপুণ ছিল; ইহাদিগকে Gladiator বলিত। নাগরিকগণ এই সকল বলবান্ মল্লদিগের ক্রীড়া দর্শন করিয়া আমোদ উপভোগ করিতেন। একবার এই ক্রীড়া-ভূমিতে মল্লযুদ্ধ উপলক্ষে এমন ভীষণ বিবাদ আরম্ভ হয় যে, তাহাতে অনেকের জীবনপাত হয়। এই সংবাদ অবগত হইয়া রোমের সম্রাট্ নিরো এই

সমাধি স্থান।

নগরের মল্লক্রীড়া বন্ধ করিয়া দিবার আদেশ প্রচার করেন।

উপরে যে কএকটি প্রতিকৃতি প্রকাশিত হইল তাহা ভগ্নাবশেষ হইলেও তাহা হইতে পম্পিয়াই নগরের শোভা, সৌন্দর্য্য ও সমৃদ্ধির পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সকল দেখিয়া স্বতঃই কবির সেই বাণী মনে হয়—

"যদুপতে ক গতা মথুরাপুরী।"

শ্রীজলধর সেন।

গোবিন্দচন্দ্র রাজার কথা।

বিজ্ঞবর গ্রিয়ারসন্ সাহেব ও স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহোদয়ের কল্যাণে "মাণিকচাঁদ রাজা" ও তৎপত্নী "রাণী ময়নামতী" এখন বঙ্গীয় সাহিত্যিকবর্গের নিকট সুপরিচিত। প্রবন্ধের শীর্ষোক্ত গোবিন্দচন্দ্র রাজা এই মাণিকচাঁদ ও ময়নামতীরই পুত্র। তাঁহাদের রাজ্য ও রাজপাট কোথায় অবস্থিত ছিল, তৎসম্বন্ধে আমাদের ঐতিহাসিকগণের মধ্যে সম্প্রতি একটু বেশ আলোচনা চলিতেছে। অনৈতিহাসিক হইয়াও আমি এ বিষয়ে কএকটি কথা বলিতে দুঃসাহস করিতেছি।

মান্যবর গ্রিয়ারসন্ সাহেব, শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ বসু মহোদয়গণের মতে আধুনিক রঙ্গপুরের অন্তর্গত পটিকানগরে মাণিকচাঁদ এবং তৎপুত্র গোবিন্দচন্দ্রের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। (মিঃ গ্রিয়ারসন্ প্রকাশিত The Song of Manikchandra J. A. S. B. Vol. XLVII, শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য কৃত 'ময়নামতীর গান' নামক প্রবন্ধ—সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ১৫শ ভাগ ২য় সংখ্যা এবং শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ বসু কৃত "পূর্ব্ববঙ্গে পালরাজগণ"—প্রতিভা, ২য় বর্ষ ৯ম সংখ্যা দ্রষ্টব্য)।

রঙ্গপুর জেলায় ধর্ম্মপাল নামক জনৈক রাজার বহুকীর্ত্তিচিহ্ন পরিদৃষ্ট হয়। তাঁহার সহিত ঢাকার অন্তর্গত সাভারের রাজা হরিশ্চন্দ্র পালের বৈবাহিক সম্বন্ধাদি বিদ্যমান ছিল বলিয়া প্রবাদ আছে। ধর্ম্মপাল নামধেয় দুইজন রাজার অস্তিত্ব বিষয় জানা গিয়াছে। একজন গৌড়ের পাল-রাজবংশের দ্বিতীয় নৃপতি। প্রথম ধর্ম্মপালের প্রায় দুইশত বৎসর পরে দ্বিতীয় ধর্ম্মপালের আবির্ভাব হয়। দাক্ষিণাত্যপতি রাজেন্দ্র চোল ১০১২ খৃষ্টাব্দে দণ্ডভুক্ত (সম্ভবতঃ গৌড়মণ্ডল) পতি ধর্ম্মপালকে যুদ্ধে পরাজিত করেন। সুতরাং ইহা হইতে জানা যায়, দ্বিতীয় ধর্ম্মপাল খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে রাজত্ব করিয়াছিলেন। লামা তারানাথের গ্রন্থ এবং খালিমপুরে প্রাপ্ত প্রথম ধর্ম্মপালের তাম্রশাসন হইতে প্রমাণিত হয় যে, প্রথম ধর্ম্মপাল খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে রাজত্ব করিতেন।

মাণিকচাঁদ রাজা কাহারও মতে প্রাগুক্ত দ্বিতীয় ধর্ম্মপালের ভ্রাতা * এবং কাহারও মতে শ্যালীপতি † ছিলেন। মাণিকচাঁদের পত্নী ময়নামতী এবং ধর্ম্মপালের স্ত্রী বনমালা সহোদরা ছিলেন। মাণিকচাঁদের পুত্র গোবিন্দচন্দ্র রাজা সাভার-রাজ হরিশ্চন্দ্রের অদুনা ও পদুনা নাম্নী দুহিতৃদ্বয়ের পাণিগ্রহণ করেন। দুর্ল্লভমল্লিক-কৃত "গোবিন্দচন্দ্র-গীত" নামক প্রাচীন গ্রন্থের—

"সুবর্ণচন্দ্র মহারাজা ধারিশচন্দ্র পিতা।
তার পুত্র মাণিকচন্দ্র শুন তার কথা॥"

এই দুই ছত্র হইতে মাণিকচাঁদ রাজার পিতৃপিতামহের নাম পরিজ্ঞাত হওয়া যায়।

* Montgomery Martin's Eastern India, Vol. III. Page 407.

† মাণিক গাঙ্গুলির ধর্ম্মমঙ্গল এবং মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

মাণিকচাঁদের মৃত্যুর পর ধর্ম্মপাল তাঁহার রাজ্য অধিকার করিয়া বসেন। এই কারণে রাণী ময়নামতীর সহিত রাজা লইয়া ধর্ম্মপালের গোলযোগ ও মনোমালিন্য উপস্থিত হয়, এবং তাহার ফলে উভয় পক্ষে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সাভারের রাজা হরিশ্চন্দ্র স্বীয় জামাতা গোবিন্দচন্দ্রের সাহায্যার্থ সসৈন্যে যুদ্ধে উপস্থিত হন। ত্রিস্রোতা বা তিস্তা নদীর তীরে যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে সম্ভবতঃ রাজা হরিশ্চন্দ্র নিহত হন। ধর্ম্মপালের মৃত্যু বা পরাভবের পর গোবিন্দচন্দ্র পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন। পরে তিনি মাতার উপদেশে হাড়িপা নামক সিদ্ধার সহিত গৃহত্যাগী হইয়া সন্ন্যাসাবলম্বন করেন। কতকাল পরে তিনি রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পুনরায় রাজ্যভার গ্রহণপূর্ব্বক কর হ্রাস করিয়া প্রজাদিগকে সুখী করেন।

গোবিন্দচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র ভবচন্দ্র বা হবচন্দ্র সিংহাসন লাভ করেন। তাঁহার অপর নাম উদয়চন্দ্র হইতেই তাঁহার রাজধানীর নাম উদয়পুর হইয়াছিল। বাঘদ্বার (কোথায় ?) পরগণায় এই রাজধানীর ভগ্নাবশেষ এখন নিবিড় বনাকীর্ণ।

রঙ্গপুরের অন্তর্গত ডিমলার কিঞ্চিৎ নিম্নে তিস্তা নদীর যে প্রকাণ্ড বাঁক দৃষ্ট হয়, তাহার প্রায় দুই মাইল দক্ষিণে ধর্ম্মপাল রাজার রাজধানীর ভগ্নাবশেষ পড়িয়া রহিয়াছে।

গোবিন্দচন্দ্রের রাজধানী "দেওনাই" নদীর পশ্চিম তটে এবং ধর্ম্মপালের দুর্গের প্রায় দুই মাইল পশ্চিমে অবস্থিত ছিল। ময়নামতী এই স্থানে বাস করিতেন। অদ্যাপি রঙ্গপুর জেলার বহুস্থানে ধর্ম্মপাল ও তাঁহার বংশধরগণের বহু কীর্ত্তিচিহ্নাদি বর্ত্তমান।

মাণিকচাঁদ প্রভৃতির সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত যাহা যাহা জানিতে পারা গিয়াছে, পূর্ব্বোক্ত বিবরণে আমরা সংক্ষেপে তাহার সার-সঙ্কলন করিয়া দিয়াছি।* সম্প্রতি রাণী ময়নামতী ও গোবিন্দচন্দ্র রাজার সম্বন্ধে যে সকল নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, নিম্নে আমরা তাহার উল্লেখ করিতেছি।

ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত মেহারকুল পরগণায় ময়নামতী নামক একটি স্থান আছে। উহা আসাম-বেঙ্গল রেলের একতম ষ্টেসন লালমাইর চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী লালমাই নামক পাহাড়ের সংলগ্ন। মাণিকচাঁদ-পত্নী ময়নামতী বৌদ্ধ তান্ত্রিক প্রক্রিয়াদিতে অত্যন্ত পারদর্শিনী ছিলেন। তিনি প্রাগুক্ত স্থানে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নামানুসারে ঐ স্থানের নাম ময়নামতী হইয়াছে।

প্রাচীন লোকের ধারণা, ময়নামতীর চারি স্থানে চারিটি রাজবাটী ছিল। ১ম বাড়ী—তরফে ওরফে কৌলীন্য নগরে (সম্ভবতঃ রঙ্গপুর অঞ্চলে) ; ২য় বাড়ী চট্টগ্রামে ; ৩য় বাড়ী —বিক্রমপুরে এবং ৪র্থ বা সর্ব্বশেষ বাড়ী ত্রিপুরার অন্তর্গত প্রাগুক্ত ময়নামতী নামক স্থানে। এস্থানে অদ্যাপি তাঁহার বাটীর ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি এই বাড়ীকে কেন্দ্র করিয়া উহার চতুর্দ্দিকে উনশত রাজবাটী তৈয়ার করাইয়াছিলেন। "উনশত রাজার বাড়ী" বলিয়া স্থানীয় লোকেদের যে ধারণা আছে, তাহা বাস্তবিক রাণী ময়নামতীর উনশত রাজবাটী বই আর কিছুই নহে। উহার চতুঃসীমা এইরূপ ঃ—উত্তরে দেবপুর ইত্যাদি গ্রাম, দক্ষিণে চণ্ডীমুড়া প্রকাশ চন্দ্রনাথ ও সীতাকুণ্ড, পূর্ব্বে গোমতী নদী এবং পশ্চিমে পাটীকারা ও গঙ্গামণ্ডল পরগণা। এই সীমান্তর্গত স্থানের বহু জায়গায় এখনও অট্টালিকাদির অনেক ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়।

রাণী ময়নামতী তাঁহার বাটীর যে অংশে সর্ব্বদা অবস্থান করিতেন, তাহাই ময়নামতী নামে প্রসিদ্ধি-লাভ করিয়াছে। উহার চতুঃসীমা এইরূপঃ—পূর্ব্বে "সাগর-দিঘীর" পূর্ব্ববাহিনী গোমতী নদী পর্য্যন্ত, উত্তরে দেবপুর ইত্যাদি গ্রাম, পশ্চিমে জুমুর ও সাহাদৌলৎপুর এবং দক্ষিণে সাহাদৌলৎপুর ও ঘোষনগর। প্রায় দুইশত বৎসর পূর্ব্ব হইতে এই ময়নামতীতে পার্ব্বত্য ত্রিপুরার মহারাজ বাহাদুরের এক বাঙ্গালা আছে। তাহা সাধারণ্যে "ময়নামতীর বাঙ্গালা" নামে পরিচিত। যে ভিটাতে উক্ত বাঙ্গালা অবস্থিত, তাহা অতি পূর্ব্বের,—মহারাজ বাহাদুরের তৈয়ারি নহে। এইখানে রাণী ময়নামতীর কেল্লা ছিল বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। উক্ত ভিটার চতুর্দ্দিকে বর্গক্ষেত্রাকারে একটি বিস্তীর্ণ মাঠ আছে, উহা ইষ্টকরাশি দ্বারা গ্রথিত। সম্ভবতঃ এই সমগ্র মাঠটাই রাণীর কেল্লা ছিল।

প্রবাদ আছে, রাণী ময়নামতী আত্মীয়-পরিজন সহ

* "পূর্ব্ববঙ্গে পালরাজগণ"—প্রতিভা, ২য় বর্ষ ৯ম সংখ্যা।

সুরঙ্গ পথে পাতাল গমন করিয়া তথায় কপিল-মুনির আশ্রমে অবস্থিতি করিতে থাকেন। এই সুরঙ্গ ত্রিপুরাধিপতির বাঙ্গালা হইতে ১২ ফুট পূর্ব্বে অবস্থিত এবং অদ্যাপি তাহার চিহ্ন স্পষ্টরূপে বিদ্যমান আছে। আজও ভক্ত সাকারোপাসকগণ দুগ্ধাদি নৈবেদ্য প্রদান করিয়া উহার উপর পূজা করিয়া থাকে। সুরঙ্গপথে রাণীর পাতালপ্রবেশের মত উদ্ভট কথা অবশ্যই এখন বিশ্বাস করা যায় না; কিন্তু তাহা যে কেল্লায় প্রবেশের গুপ্ত পথ ছিল, তাহাতে সংশয় করিবার কোন কারণ দেখা যায় না।

প্রচলিত জনশ্রুতি হইতে ও স্থানীয় অনুসন্ধান দ্বারা যতটা জানিতে পারা গিয়াছে, উপরে তাহারই সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল। সুযোগ অভাবে নিজে পরিদর্শন করিতে না পারায় প্রবন্ধোক্ত স্থানাদির নক্সা প্রভৃতি অদ্য দিতে না পারিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতেছি।

কেবল জনপ্রবাদ অবলম্বন করিয়াই যে আমরা প্রচলিত ঐতিহাসিক মতের বিপরীতগামী হইতে উদ্যত হইয়াছি, তাহা নহে। সম্প্রতি "ময়নামতীর পুঁথি" নামক একখানি অতি প্রাচীন পুঁথি আমাদের হস্তগত হইয়াছে। তাহা হইতে ময়নামতী ও গোবিন্দচন্দ্র রাজার সম্বন্ধে অনেক নূতন কথা জানা যায়। পরে যথাস্থানে আমরা তাহার উল্লেখ করিব।

ভবানীদাস নামক জনৈক কবি এই পুঁথির রচয়িতা। তাঁহার আর কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই। পুঁথিতে এমন কতকগুলি শব্দের ব্যবহার আছে, যাহা হইতে কবিকে চট্টগ্রামবাসী না হউক অন্ততঃ পূর্ব্ববঙ্গবাসী বলা যাইতে পারে। পুঁথির প্রথম পাত ও শেষাংশ পাওয়া যায় নাই বলিয়া উহার লিপিকালাদি জানা যায় নাই। পুঁথিখানি অত্যন্ত জীর্ণশীর্ণ এবং অবস্থা দৃষ্টে দেড়শত বৎসরের ন্যূন প্রাচীন বোধ হয় না। উহাতে গোবিন্দচন্দ্র রাজার সন্ন্যাস-যাত্রা বর্ণিত হইয়াছে। বিষয়গুণে এবং কবির সরল অনাড়ম্বর রচনা-চাতুর্য্যে পুঁথিখানি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক হইয়াছে।

গোবিন্দচন্দ্রের অপর নাম গোপীচাঁদ। তাহা এই পুঁথির বহু স্থানে উক্ত হইয়াছে। ময়নামতীর পিতার নাম তিলকচাঁদ, তাহাও এই পুঁথি হইতে জানা যায়। গোবিন্দচন্দ্রের অনুরোধে রাণী ময়নামতী মাণিকচাঁদ রাজার আমলের অবস্থা বর্ণনা করিতে গিয়া বলিতেছেন:—

"বড় পুণ্যের লাগি দিল দিঘি আর জাঙ্গাল।
সোণারূপা এ গড়াগড়ি না ছিল কাঙ্গাল॥
হিরামণি মাণিক্য লোকে তলিতে সুখাইত।
কাহার পুষ্কর্ণির পানি কেহ নাহি খাইত॥
কাহার বাটীতে কেহ উধারে না যাইত।
সোণার চেপুয়া লৈয়া বালকে খেলাইত॥
হারাইলে চেপুয়া পুণি না চাহিত আর।
এমতে গোয়াইল লোকে হরিশ অপার॥
মেহারকুল বেরি ছিল মুলি বাঁশের বেড়া।
গ্রিহস্থের পরিধান সোণার পাছড়া॥
গরিবে চড়িয়া ফিরে খাশা তাজি ঘোড়া॥
ফকিরের গায়ে দিত খাসা কাপড় জোড়া॥
তোমার বাপের কালে রসের ছিল ধ্বনি।
সোণার কলসী ভরি লোকে খাইত পানি॥
রূপার কলসী ভরি ধুপিএ জল খাএ।
কিবা রাজা কিবা প্রজা চিনন না জাএ॥
মুজুরি করিতে জাএ আড়ঙ্গি ছত্র মাথে।
বসিতে লইয়া জাএ সোণার পিড়িতে॥

* * *

* * *

দেড় বুড়ি কৌড়ি ছিল কাণি খেতের কর।
চৌদ্দ বুড়ি কৌড়ি ছিল টাকার মোহর॥
দশ টাকার বাড়ি খাইত দেড় বুড়ি দিত।
বার মাস ভরিয়া বচ্ছরের খাজনা নিত॥
তোমার বাপের সৈত্য তুমি লৈলা লাড়ি।
খেত পিছে দাড়ি লৈলা এক পণ কৌড়ি॥
এহার কারণে রাজা বহু দুঃক্ষ পাবে।
এ সুখ সম্পদ তোমার সব হারাইবে॥"

আমরা আগেই বলিয়াছি, ময়নামতী নামক স্থান ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত মেহারকুল পরগণায় অবস্থিত।

গোবিন্দচন্দ্র প্রাগুদ্ধৃত অংশে উল্লেখিত সেই মেহারকুলেরই রাজা ছিলেন। পশ্চাৎ এ বিষয়ে আরও প্রমাণ পাওয়া যাইবে।

রাণী ময়নামতী তৎপুত্র গোবিন্দচন্দ্রকে সন্ন্যাসে যাইবার জন্য উত্তেজিত করিতেছেন। তদুত্তরে রাজা বলিতেছেনঃ—

"আমি রাজা যুগি হোবে তারে অধিক নাই।
এ সুখ সম্পদ আমি এড়িমু কার ঠাঁই ॥
কার কাছে এড়ি জাইব হংসরাজ ঘোড়া।
কার ঠাঞি এড়ি জাইমু গাএর খাসা জোড়া ॥
ধনুবাণ লেঞ্জা কাতে এড়িমু লাখে ২।
তির তাম্বু বাণ কাতে এড়িব ঝাকে ২ ॥
গাঙ্গেত এড়িয়া জাবে বত্তিশ কাহোন নাও।
পুরি মধ্যে এড়ি জাবে তুমি হেন মাও ॥
কিল ঘরে এড়ি জাবে আশী হাজার হাতী।
বিদেশে গমন কৈলে কে ধরিব ছাতি ॥
আস্তবি লাএ এড়ি জাবে নয় লাখ ঘোড়া।
জোড় মন্দিরে এড়ি জাবে সাহেমানি দোলা ॥
পুরি মধ্যে এড়ি জাবে পঞ্চ পাত্রবর।
পাণ জোগানি এড়ি জাবে উনশত নফর ॥
শেঁত বান্দা এড়ি জাবে হারিয়া ছোঁহর।
অদুনা পদুনা এড়ি জাবে কার ঘর॥
বাগানে এড়িয়া জাবে সত্তর কায়ন বেত।
গোঞাইলে এড়িয়া জাবে গাই বার শত ॥
এহি সব এড়ি জাবে আপনে জানিয়া।
নয়া নগর এড়ি জাবে উনশত বানিয়া ॥
বাপের মিরাশ এড়ি জাইমু গৈরব সহর।
দাদার মিরাশ এড়ি জাবে কামলাক নগর ॥
তুমি মাএর জত বাড়ি কলিকা নগর।
আমি বাড়ি বান্ধিয়াছি মেহারকুল সহর ॥
চল্লিশ রাজাএ কর দেএ আমার গোচর।
আমা হোতে কোন জন আছএ ডাঙ্গর ॥
সাজ ২ করি রাজা দিল এক ডাক।
এক ডাকে সাজি আইল বাসৈন্তের লাথ ॥
হস্তী ঘোড়া সাজে আর মোহা মোহা বীর।
সাজিল অপার সৈন্য আঠার উজির ॥
বাশষ্টী উজির সাজে চৌশষ্ট সিকদার।
হস্তে ঢাল সৈন্য সাজে বিরাশি হাজার ॥"

পূর্ব্বোদ্ধৃত অংশে গোবিন্দচন্দ্র রাজার ঐশ্বর্য্যাদি সম্বন্ধে যে সব কথা আছে, তাহা সর্ব্বপ্রথম এই গ্রন্থ হইতেই জানা গেল। তাহা হইতে আমরা জানিতে পারি, গোবিন্দচন্দ্র একজন বড় রাজা ছিলেন। তাঁহার বত্রিশ কাহন নৌকা, আশী হাজার হস্তী, নয় লক্ষ ঘোড়া ও বার শত গাভী ছিল। তাঁহার পঞ্চ পাত্র, আঠার (পক্ষান্তরে বাষট্টি) উজীর ও চৌষট্টি সিকদার ছিল। উনশত নফরে তাঁহার পান যোগাইত।

নয়া নগর নামক স্থানে তাঁহার উনশত বানিয়া ছিল। এই নয়ানগর সম্ভবতঃ ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত বর্ত্তমান নবিনগর। তাঁহার বাপের (মাণিকচাদের) মিরাশ (বাড়ী বা রাজধানী) গৈরব সহর, দাদার (পিতামহের) মিরাশ কামলাক নগর, মাতার মিরাশ কলিকা নগর এবং নিজের মিরাশ মেহারকুল সহর ছিল। গৈরব সহর এবং কলিকা নগর কোথায়, আমরা জানি না। কেহ কেহ কলিকা নগরকে কৌলীন্য নগর বা রঙ্গপুর নির্দ্দেশ করেন। কামলাক নগর সম্ভবতঃ কমলাঙ্ক নগর বা কুমিল্লা সহর। গোবিন্দচন্দ্র যে মেহারকুলের রাজা ছিলেন, তাহা গ্রন্থের অপর স্থানে উক্ত নিম্নোদ্ধৃত পংক্তিদ্বয় হইতেও জানা যায়ঃ—

"থেনেক রহ বসুমতী থেনেক রহ তুমি।
মেহারকুলের রাজারে পরীক্ষা দেখাই আমি ॥"

পূর্ব্বোদ্ধৃত অংশ হইতে জানা যায়, রাজার অদুনা ও পদুনা নাম্নী দুইজন মহিষী ছিলেন। কিন্তু গ্রন্থের অপর এক স্থান হইতে জানা যায়, তিনি চারি বিবাহ করিয়াছিলেন। যথা,—

"এক বিভা করাইলা অদুনা পদুনা।
সে সব সুন্দরী জানে আমার বেদনা ॥
আর বিভা করাইলা থাণ্ডাএ জিনিয়া।
আর বিভা করাইলা উরয়া রাজার মাঁএয়া ॥ *
দশ দিন লাড়াই কৈল উড়য়া রাজার সনে।
চৌদ্দ বোড়ি মনিস্য কাটিলাম এক দিনে ॥
চৌদ্দ পণ মনিস্য কাটি সাত শত লস্কর।
হস্তী ঘোড়া কাটিলাম তেশট্টি হাজার ॥

* মাঁএয়া— মেয়ে

যুদ্ধেতে হারিয়া নৃপ গেল পলাইয়া।
তার বেটি বিভা কৈলাম মহিম † জিনিয়া॥"

গ্রন্থের স্থানান্তরে উক্ত চারিজন মহিষীর নাম পাওয়া গিয়াছে। তাঁহাদের নামগুলি এই, অদুনা, পদুনা, রত্নমালা ও কাঞ্চা সোণা (বা কাঞ্চনমালা বা পদ্মমালা)। অদুনা ও পদুনা যে সাভার-রাজ হরিশ্চন্দ্রের তনয়া ছিলেন, তাহা প্রবন্ধের প্রারম্ভভাগে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। পূর্ব্বোদ্ধৃত অংশ হইতে জানা যাইতেছে, রাজা "খাণ্ডাএ" জিনিয়া এক বিবাহ করিয়াছিলেন এবং "উড়য়া" রাজাকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া আর এক বিবাহ করিয়াছিলেন। এই সব উক্তির ঐতিহাসিক সত্যাসত্য নির্দ্ধারণে আমরা অক্ষম। তাহাতে ঐতিহাসিকগণের গবেষণা আবশ্যক ও বাঞ্ছনীয়।

রাণী ময়নামতী নেপালী বৌদ্ধ যোগী গোরক্ষনাথের শিষ্যা ছিলেন। গ্রন্থের একস্থানে নিম্নোদ্ধৃত কথাগুলি পাওয়া যায়:—

"অব্রেথা (অব্যর্থ) হৈল সিদ্ধা খেতির উপর।
একনাম রাখি জাবে মেহ্রাকুল সহর॥
আদ্য মাটী আছে কিছু মেহারকুল নগরে।
নিজ মাটী আছে কিন্তু বিক্রমপুর সহরে॥
আর আছে আদ্য মাটী তরপের দেশ।
চাটীগ্রাম পুর্ব্ব মাটী জানিবা বিশেষ॥
তবে হস্তে ধরি গোর্থে রথে তুলি লৈল।
রথ খান কুদাইয়া বিক্রমপুরে নিল॥
যুগি ঘাঠ করি নাথে ঘাট বানাইল।
সেই ঘাঠে স্নান করি পাপ বিনাশিল॥"

এই অংশের মর্ম্ম ভাল বুঝিতে পারিলাম না বলিয়া তৎসম্বন্ধে আর বেশী কিছু বলিতে পারিতেছি না। তবে রাণী ময়নামতীর যে চারি স্থানে চারিটি রাজবাটী ছিল বলিয়া প্রবাদ শুনা যায়, উদ্ধৃত অংশে সম্ভবতঃ তাহারই সমর্থন হইতেছে। 'মেহ্রাকুল' মেহারকুলকেই বলা হইয়াছে। "তরফের দেশ" অর্থে কোন্ দেশ? কেহ কেহ উহাকে রঙ্গপুর নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। চাটীগ্রাম চট্টগ্রামের নামান্তর।

আমাদের প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ রঙ্গপুরের অন্তর্গত 'পাটকেপাড়া'কে পটিকানগর অনুমান করিয়া মাণিকচাঁদ রাজাকে তথাকার রাজা সাব্যস্ত করিয়াছেন, একথা আমরা আগেই বলিয়াছি। কিন্তু এই গ্রন্থ হইতে শুধু গোবিন্দচন্দ্রই যে মেহারকুলের রাজা ছিলেন বলিয়া জানা যাইতেছে, তাহা নয়; মাণিকচাঁদও মেহারকুলের রাজা ছিলেন বলিয়া জানা যাইতেছে। যথা:—

"মেহারকুলের রাজা মৈল মাণিকচাঁদ গোসাই।
পৃথিবীতে জলময় পুড়িতে স্থল নাই।"

এই পুঁথি হইতে আরো জানা যায় যে, মাণিকচাঁদ রাজাকে গোমতী নদীর কুলে দাহ করা হইয়াছিল। এবং রাণী ময়নামতীর দামোদর নামক আর এক পুত্র ছিল। যথা,—

(রাণী মাণিকচাঁদের সহিত সহমৃতা হইতে চাহিয়া ছিলেন,—ময়নামতীর এই উক্তিতে রাজা গোবিন্দচন্দ্র সন্দিহান্ হইয়া সাক্ষ্য তলব করিলে রাণী বলিতেছেন।)

"হেন সাক্ষী দিব হেন নাহি মেহারকুল।
হাসিতে ২ মৈলাএ কহিতে লাগিল॥
সেই দিনের তিন সাক্ষী আছে হেন জানি।
তাহারে আনিয়া শুন সে সব কাহিনী।
এক সাক্ষী আছে মোর বেটা দামুদর।
আর সাক্ষী আছে জে ব্রাহ্মণ সন্ধিহর॥
আর সাক্ষী আছে রাজা সাউধ লক্ষিধর।
সাক্ষী আনিবারে শীঘ্র পাঠাও অনুচর॥"

পুঁথির অপর এক স্থল হইতে জানা যায়, মুদাই তাম্বুরি (?) নামক গোবিন্দচন্দ্রের এক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিল। তাহাতে খেতুয়া বা খেত্তা নামক আরও এক ব্যক্তির উল্লেখ দেখা যায়, কিন্তু তাহার সহিত গোবিন্দচন্দ্রের কিরূপ সম্পর্ক ছিল, পুঁথিতে তাহার কোন উল্লেখ নাই। সেই অংশটি এই,—

"আমি রাজা যুগি হোবে তারে অধিক নাই।
এ চারি সুন্দর নারী সমর্পিব কার ঠাঞি॥

* * * *
* * * *

খেত্তা স্থানে সমর্পিব ঘর আর বাড়ি।
কার স্থানে সমর্পিব এ চারি সুন্দরী॥

† মহিম—যুদ্ধ।

বড় ভাই আছে মোর মুদাই তান্তরি (?)।
তার ঠাঞি সমর্পিব এ চারি সুন্দরী ॥"

ময়নামতী রাজাকে সন্ন্যাসে পাঠাইতে চাহেন। তজ্জন্য রাজমহিষীগণ ময়নামতীর উপর ভারি চটিয়া যান এবং বিষপ্রয়োগে তাঁহাকে হত্যা করিতে উদ্যোগ করেন। বিষ খাইয়া ময়নামতী কপট মৃত্যুর ভাণ করিয়া পড়িয়া থাকিলে রাণীগণ তাঁহাকে—

"সারাদিন ছেছাইল সব মেহারকুলদেশ।
গোমইদের (গোমতীর) কূলে নিল দিবা অবশেষ ॥"

তারপর তাঁহারা মৈনা হাড়িকে আদেশ করিলেন,—

"লালমাই পর্ব্বতের সব বাঁশ ছোক্কাইয়া।
কুণ্ডের নিকটে শব রাখিবে গাড়িয়া ॥"

পূর্ব্বে ময়নামতী প্রভৃতি স্থানের যে সীমা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে গোমতী নদী ও সাগর দিঘীর উল্লেখ করা গিয়াছে। জলাশয়টি অতিশয় প্রকাণ্ড। এই পুঁথিতেও একস্থলে উহার নাম উল্লিখিত হইয়াছে। যথাঃ—

"উলুর কচুরা তোমার গলাএ বান্ধিয়া।
সাগরদিঘির মধ্যে স্নান কর গিয়া ॥"

রাণী ময়নামতী সাধু গোরক্ষনাথের শিষ্যা ছিলেন। গোবিন্দচন্দ্র রাজা হাড়িকা নামক জনৈক সিদ্ধপুরুষের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। হাড়িকা সিদ্ধার সম্বন্ধে এই গ্রন্থোক্ত নিম্নোদ্ধৃত অংশ দ্রষ্টব্য ঃ—

"চারি সিদ্ধাএ শাপ পাইল দুর্গা দেবীর পাশে।
মিননাথ চলি গেল কদলীর দেশে ॥
গোক্ষ'নাথ চলি গেল ব্রাহ্মণের ঘরে।
কানুকা পাইল শাপ ড়াড়ার সহরে ॥
হাড়িকাএ পাইল শাপ তোমা সেবিবার।
তেকারণে হীন কর্ম্ম করে তোমার ঘর ॥
মহাদেবীর শাপে তোমার ঘরে থাটে।
মোহা জ্ঞান আছে জান হাড়িকার পেটে ॥"

এই "কদলীর দেশ" কোথায়? সেখ কয়জুল্লাকৃত "গোরক্ষবিজয়" নামক আর একখানি প্রাচীন পুঁথিতেও এই কদলী নগর এবং মেহারকুলের উল্লেখ দেখা যায়। "ময়নামতীর গানে"ও কদলী নগরের উল্লেখ আছে।

রাজা হাড়িকার সহিত সন্ন্যাসী হইয়া প্রথমে কলিকা নগরে গমন করিলে সেখানে তাঁহার রাণীগণ তাঁহাকে ভিক্ষা প্রদান করেন। যথা,—

"শূন্য কাঁথা শূন্য ঝুলি রাজা কান্ধে দিয়া।
দেশান্তরী হইল রাজা ব্রহ্মজ্ঞান পাইয়া ॥
কলিকা নগরে ভিক্ষা মাগেন্ত জোগাই।
দিন অবশেষে গেল রাজা গোবিন্দাই ॥
ধোও ২ করি রাজা শিঙ্গাতে দিল ফুক।
পুরী থাকি চারি বধু শুনিতে লাগে সুখ ॥"

তথা হইতে তাঁহারা সুরিপু নামক নগরে গমন করেন। তথায় গিয়া হাড়িকা সিদ্ধা মদ খাইবার জন্য রাজাকে নয়কড়া কড়ির বদলে হীরা নটীর নিকট বন্ধক দিয়া চলিয়া যান।

কলিকা নগরে ময়নামতীর মিরাশ (বাড়ী বা রাজধানী) ছিল বলিয়া পূর্ব্বেই একবার এই পুঁথির সাহায্যে উল্লেখ করা গিয়াছে। এই কলিকা নগর ও সুরিপু নগর কোথায়, তাহা আমাদের জানা নাই।

রাজা গোবিন্দচন্দ্র সম্বন্ধে এই গ্রন্থ হইতে যত কথা জানিতে পারা যায়, এই প্রবন্ধে আমরা তাহার প্রায় সকলই বিবৃত করিয়াছি। একদিকে ঐতিহাসিকগণের গবেষণা-প্রসূত সিদ্ধান্ত এবং অন্যদিকে আমাদের অনুসন্ধানের ফল-স্বরূপ নূতন তথ্যগুলি,—উভয়ে মিলিয়া এই বিষয়টিকে অত্যন্ত জটিল রহস্যময় করিয়া তুলিয়াছে। গোবিন্দচন্দ্রের রাজ্যের সীমা কতদূর এবং তাঁহার রাজধানী কোথায় ছিল, এখন তাহা নির্ণয় করিবার ভার আমাদের ইতিবেত্তারা গ্রহণ করুন। ঐতিহাসিকগণ মাণিকচাদের রাজধানী পটিকানগরকে রঙ্গপুরের অন্তর্গত বলিয়া স্থির করিয়াছেন। তাঁহাদের এই সিদ্ধান্ত কতকটা অনুমানসিদ্ধ, সন্দেহ নাই। ত্রিপুরা জেলার মেহার-কুল পরগণারও পাটীকারা নামক এক স্থান রহিয়াছে। উহা ময়নামতীর রাজবাটীর নিকটবর্ত্তী। উক্ত জেলায় ময়নামতীর এতগুলি কীর্ত্তিচিহ্ন অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। পক্ষান্তরে আমাদের প্রবন্ধোক্ত "ময়নামতীর পুঁথি" স্থানীয় তদন্তের ফল এবং প্রচলিত কিংবদন্তীর অনুকূলে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এই অবস্থায় মাণিকচাঁদ, গোবিন্দচন্দ্র

প্রভৃতি রাজগণ শুধু উত্তর-বঙ্গেই (রঙ্গপুরেই) রাজত্ব করিতেন, এইরূপ সিদ্ধান্ত কিছুতেই সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। যে পর্য্যন্ত 'ময়নামতীর পুঁথি' ও 'গোক্ষ বিজয়ের' মতে মেহারকুলে গোবিন্দচন্দ্রের রাজধানী হওয়ার বিরুদ্ধে উপযুক্ত প্রমাণ না পাওয়া যাইবে, সে পর্য্যন্ত গোবিন্দচন্দ্রকে মেহারকুলের রাজা বলিয়া সকলকে স্বীকার করিতে হইবে।

একজনের সাহায্যে এ রকম প্রাচীন ও জটিল বিষয়ের সুমীমাংসা সম্ভব নহে। বিশেষতঃ আমরা ঐতিহাসিক নহি। আমরা উপকরণ সংগ্রহ করিয়া দিলাম। গবেষণার আলো ফেলে এই অন্ধকারাবৃত জটিল বিষয়ের ঔজ্জ্বল্য-বিধানের জন্য বাঙ্গালার পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণকে সাদরে আহ্বান করিয়া এস্থলে আমাদের প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম।

আবদুল করিম।

মোহ।

তাহাকে দেখিলাম সদ্য-বিকশিত কমলের ন্যায় পরিপূর্ণ—শোভায় ঢল ঢল; কৈশোর-অবসানে যৌবনারম্ভের মহিমায় উচ্ছ্বসিত; সর্ব্বাঙ্গে অদ্ভুত আনন্দের জ্যোতিঃ বিভাসিত। তাহার সহিত প্রথম সাক্ষাৎ দার্জ্জিলিং ষ্টেসনে। সে প্রাসাদ-বাতায়নে দণ্ডায়মানা রাজকন্যা অপরাজিতা, অথবা বসন্ত-মুঞ্জরিত পুষ্পকাননে অশোকবৃক্ষতলে মালবিকা নয় বলিয়া কেহ নাসিকা কুঞ্চিত করিবেন না। কালিদাস ভবভূতি হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক কবিকুল পর্য্যন্ত সকলের বর্ণিত অনেক সুন্দরী নায়িকার চিত্র, আমার মানসপটে অঙ্কিত দেখিয়াছি; শপথ করিয়া বলিতে পারি, যদিও আমার নায়িকা সামান্য নেপালি কুলী রমণী, তথাপি সে সৌন্দর্য্যে, আত্মগরিমায় মহীয়সী—কাহারও অপেক্ষা কম নয়।

দার্জ্জিলিং ষ্টেশনে।

সে বার শরীর অসুস্থ বোধ করায় সামান্য কয়টি দিনের ছুটি লইয়া দার্জ্জিলিং চলিলাম—সেই প্রথম শৈলযাত্রা। অনেকের নিকট অনেক বর্ণনা শুনিয়া একটি বৃহৎ কল্পনা লইয়া চলিলাম, কিন্তু শিলিগুড়ি হইতে দুচার ষ্টেসন ছাড়াইয়া দেখিলাম, আমার কল্পনা কোথাও থই পায় না। কি দৃশ্য যে দেখিলাম তাহার যথাযথ বর্ণনা করা আমার সাধ্যাতীত; তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি, আমি বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া প্রকৃতির সেই সৌন্দর্য্যে মগ্ন হইয়া রহিলাম। পার্ব্বত্য ক্ষুদ্র রেলযোগে ক্রমশঃ নূতন হইতে নূতনতর রাজ্যে নীত হইতে লাগিলাম। কখনও চন্দ্রপথের ভিতর দিয়া কখনও গোলাকারে কিয়ৎ স্থান সম্পূর্ণ পরিবেষ্টন, কখনও অর্দ্ধবেষ্টন করিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে মেঘরাজ্যের ভিতর দিয়া, আমার নয়নে প্রতি মুহূর্ত্তে স্বপ্নরাজ্য প্রতিভাত করিতে করিতে গাড়ি যখন দার্জ্জিলিং ষ্টেসনে প্রবেশ করিল, আমি তখনও আশে পাশে উচ্চ

পর্ব্বতশ্রেণীর উপরিস্থিত বিক্ষিপ্ত বাড়ীগুলি এবং ক্রমোত্থিত পথসমূহের শোভা একাগ্রমনে দেখিতেছিলাম, সহসা রমণীকণ্ঠনিঃসৃত মধুর স্বরে সচকিত হইয়া উঠিলাম। রমণী কহিল, "বাবুজী মোট নেব?"

আমার অনিমেষ নয়ন তাহার মুখোপরি সংস্থিত দেখিয়া সে অসঙ্কোচে হাসিয়া কহিল, "বাবুজী গাড়ি ছেড়ে মালখানায় যাবে—সবাই নেমেছে তুমি নাম্‌বে না?" আমি তখন অবিলম্বে প্লাটফর্ম্মে নামিয়া পড়িলাম, সে আমার জিনিষপত্র স্তূপাকার করিয়া পৃষ্ঠে লইতে উদ্যত হইল, আমি কহিলাম, "তুমি একা এত জিনিষ নেবে কি ক'রে?" সে হাসিয়া কহিল, "এই দেখ"; এই বলিয়া একখণ্ড বেত্রদ্বারা বেষ্টন করিয়া বেত্র শেষাংশদ্বয় আপনার শিরোভাগে সংলগ্ন করিয়া অবলীলাক্রমে মোট পৃষ্ঠে তুলিয়া লইয়া চলিল। আমি ভাবিলাম, এই কোমল দেহে এত শক্তি। জুবিলিসেনিটেরিয়মে যাইতে আদেশ করিয়া তাহার পশ্চাতে চলিলাম। পথ কখনও উচ্চগামী কখনও নিম্নগামী হইয়া চলিয়াছে, সেই অসমান পথে গুরুভার লইয়া সে অবাধে চলিল, সেনিটেরিয়মে পঁহুছিয়া মোট রাখিয়া দাঁড়াইল, পথশ্রমে ও রৌদ্রতাপে তাহার মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ ধারণ করিয়াছে, নিঃশ্বাস ঘন ঘন বহিতেছে ও বক্ষঃস্থল ঈষৎ কম্পিত হইতেছে। আমি তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিলাম, তাহারই অপূর্ব্ব রূপরাশি অতৃপ্তনয়নে দেখিতেছি বুঝিতে পারিয়া বস্ত্রাঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া হাসিয়া কহিল, "বাবুজী পয়সা?" আমি তাড়াতাড়ি একটি রৌপ্যমুদ্রা তাহার হস্তে দিতে সে ফিরাইয়া দিয়া কহিল, "আমার পাওনা চার আনা।" অনেক অনুরোধ করা সত্ত্বেও প্রাপ্য অর্থের অধিক এককড়াও গ্রহণ করিতে সম্মত হইল না, প্রাপ্য চারিআনা লইয়া ছুটিয়া বাহির হইল, তারপর গান গায়িতে গায়িতে চলিয়া গেল; তাহার কণ্ঠস্বর চতুর্দ্দিক্ হইতে ঘুরিয়া ফিরিয়া আমার কর্ণে আসিতে লাগিল, তেমন মধুর কণ্ঠ খুব কমই শুনিয়াছি।

সে বার তাহার সহিত অধিক সাক্ষাৎ হয় নাই, কচিৎ কখনও পথে দেখিতাম; কখনও পাথর লইয়া খেলা করিতেছে, কখনও মোট লইয়া চলিয়াছে, কখনও সঙ্গিগণ সহ গান গায়িতে গায়িতে চলিয়াছে, সর্ব্বদাই আনন্দময়ী, জ্যোতির্ম্ময়ী। দার্জ্জিলিং ত্যাগ করিবার দিন সেনিটেরিয়াম হইতে অনেকে একত্র রওনা হইলাম; বহু কুলীর সঙ্গে সেও মোট লইতে আসিল, আমাকে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবুজী তোমার মোট কোথায়?" আমি সবিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ভাবিলাম, অযাচিতভাবে এ আমার মোট লইতে এত ব্যস্ত কেন? সে পূর্ব্বের ন্যায় ঈষৎ হাসিল; সেই হাসিতে বুঝিলাম আমি যে তাহার সৌন্দর্য্যের স্তাবক তাহা সে বিলক্ষণ বুঝিয়াছে, তাহারই জন্য এতাদৃশ পক্ষপাতিত্ব জন্মিয়াছে, এবং আমার জিনিষপত্রের উপর বিশেষ দাবী স্থাপন করিতে উদ্যত হইয়াছে। শুনিয়াছি এইরূপে পর্ব্বতীয় কুলী-রমণীগণ চঞ্চলচিত্ত পুরুষকে ক্রমে আয়ত্ত করে। আমি সেই দিনই সে স্থান ত্যাগ করিতেছি, সুতরাং আমার সম্বন্ধে তাহার চেষ্টা বৃথা ভাবিয়া মনে মনে হাসিলাম।

আমার আদেশের অপেক্ষা না করিয়া সে আমার মোট উঠাইয়া লইয়া চলিল, আমিও তাহার পশ্চাতে সর্ব্বাগ্রে রওনা হইলাম। চলিতে চলিতে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, এক বৃদ্ধ পিতা ব্যতীত তাহার আর কেহই নাই। নিজের এবং পিতার জন্য তাহাকে উপার্জ্জন করিতে হয়, সে তাহাতেই সুখী। সারাদিন কঠিন পরিশ্রম করিয়াও কোনও ক্লেশ অনুভব করেনা, তাহার সেই স্বাভাবিক আনন্দের ভাবটুকু দেখিয়া বড় সুখ হইল। ষ্টেসনের কাছাকাছি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবুজী আবার কবে আস্‌বে?" আমি কহিলাম, "জানি না—এ কথা জিজ্ঞাসা কর্‌লে কেন?" সে কহিল "শান্তারাম জায়গা ভাল না, এখানে এসে বাড়ি নিও, আমি তোমার সব কাজ করে দেব।" আমি কৌতুকচ্ছলে জিজ্ঞাসা করিলাম" "কত নিবি, সে হাসিয়া কহিল "তোমার কাছে কিছু নেব না, আমি মোট বয়ে আপনার রোজগার কর্‌ব।" আমার বিশ্বাস তখন দৃঢ়তর হইল, ভাবিলাম সত্যই ইহারা স্বভাবতই চরিত্রহীনা।

দেখিতে দেখিতে ষ্টেসনে আসিয়া পঁহুছিলাম, জিনিষ পত্র গাড়িতে তুলিয়া দিয়া প্রাপ্য অর্থের জন্য হস্তপ্রসারণ করিল, আমি সেবার জিজ্ঞাসা করিয়া লইলাম, "কত দিতে

হইবে ?" সেবারও চারি আনা মাত্র দাবী করিল ; প্রসারিত হস্তে একটি সিকি রাখিতে আমার হস্ত তাহাকে স্পর্শ করিবামাত্র সে হস্ত টানিয়া লইয়া বিস্ফারিত নেত্রে আমার দিকে চাহিল। আমি কহিলাম, "আমার সঙ্গে যাবি ?" সে মস্তক সঞ্চালন করিয়া অসম্মতি জানাইয়া হাসিতে হাসিতে ছুটিয়া পলায়ন করিল।

যথাসময়ে কলিকাতায় পঁহুছিলাম। দেখিলাম সকল কার্য্য ও কার্য্যের অবসানে সহজ সরলতাপূর্ণ ও স্বাভাবিক আনন্দবিভাসিত সেই মুখ এবং কলকণ্ঠনিঃসৃত সুমধুর সেই গীতধ্বনির স্মৃতি আমাকে কিছুতেই ত্যাগ করে নাই। চারিমাস পরে পূজার ছুটি আসিলে, পুনরায় দার্জ্জিলিং যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম। গৃহিণী হাসিয়া কহিলেন, "একবার দর্শনেই যে দার্জ্জিলিংএর প্রেমে পড়ে গেলে দেখছি।" আমি প্রত্যুত্তরে কহিলাম, "একবার দেখলেই যে দেখবার ইচ্ছা বেড়ে যায় তা জান না ?"

আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই, দার্জ্জিলিং যাওয়ার জন্য আমার এত আগ্রহ হইবে। ক্রমে ইচ্ছা প্রবলতর হইতে লাগিল, কিছুতেই দমন করিতে পারিলাম না ; অবশেষে কোনও বন্দোবস্ত না করিয়াই একদিন সহসা রওনা হইলাম। সমস্ত পথ এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলাম। সেবার পথের সৌন্দর্য্য আর তেমন করিয়া চিত্ত আকর্ষণ করিল না ; সমস্ত পথ শুধু তাহারই স্মৃতি বিকল করিয়া রাখিল ; ভাবিলাম যদি ষ্টেসনে সে না আসে, যদি এবার তাহার সন্ধান না পাই !

দার্জ্জিলিং ষ্টেসনে গাড়ি প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই আমি মুখ বাহির করিয়া অসহ্য উৎকণ্ঠায় চতুর্দ্দিকে দেখিতে লাগিলাম। ষ্টেসনের অপর পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ কুলী পুরুষ ও রমণীগণ দাঁড়াইয়া আছে, গাড়ি না থামিলে তাহাদিগের ষ্টেসন প্লাটফর্ম্মে আসিবার নিয়ম নাই, ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিতে করিতে সহসা তাহার চোখে চোখ পড়িয়া গেল, আমাকে দেখিয়া সে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল। শিরোদেশ হইতে বস্ত্রাঞ্চল খসিয়া পড়িল, দীর্ঘ বেণী পৃষ্ঠদেশে বিলম্বিত—আনত মুখখানি আনন্দে উৎসাহে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, তাহাকে দেখিয়া আমার অন্তর পুলকিত হইয়া উঠিল, গাড়ি থামিবামাত্র সে আমার গাড়ির নিকট আসিয়া হাজির হইল। সে যে কুলীরমণী, চিরদিনই এই কাজ করিয়া আসিতেছে, আমি মুহূর্ত্তের জন্য বিস্মৃত হইলাম—অন্তরের অনুভূতি দ্বারা তাহাকে সমকক্ষ দেখিয়া তাহার উদ্দেশে হস্তপ্রসারণ করিয়া কহিলাম, "একটা কুলী ডাক।" সে হাসিয়া কহিল, "বাবুজী, আমিই ত কুলী, আমাকে ভুলে গেছ ?" তাহার রহস্যে আমার মোহ ভাঙ্গিল, আমি অপ্রতিভ হইয়া কহিলাম, "আচ্ছা তবে তুমিই মোট লও।" মোট লইবার পূর্ব্বে সেবারও "শান্তারাম" যাইতে হইবে কি না জিজ্ঞাসা করিয়া লইল। কোনও বন্দোবস্ত হয় নাই শুনিয়া হাসিয়া কহিল, "আমাদের বাড়ী যাবে ?" আমি কহিলাম, "তাই চল।"

ঘুরিয়া ফিরিয়া বহুপথ অতিক্রম করিয়া "ম্যাকিনটস" রোডের উপরে এক দ্বিতল সুন্দর বাড়ীর নিকট আসিয়া "বাবু, বাবু" বলিয়া ডাকিতে এক বৃদ্ধ বাহিরে আসিল। অনুমানে বুঝিলাম, সে তাহার পিতা ; আমাকে দেখিয়া বৃদ্ধ মহা খুসী। তখন বুঝিলাম, যাহার বাড়ী সে বৃদ্ধকে চৌকীদার স্বরূপ রাখিয়াছে ; বৃদ্ধ সেই বাড়ীতে ভৃত্যদিগের আবাসে একখানি ঘর পাইয়াছে, তাহাতেই কন্যাসহ বাস করে। সে বৎসর বাড়ীভাড়া হয় নাই, সুতরাং আমাকে পাইয়া বৃদ্ধ যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইল। দেখিলাম, বাড়ীখানি সুসজ্জিত, আমার পক্ষে সুবৃহৎও বটে, স্থানটি

দার্জ্জিলিং পথে

আরব উপকূলে।
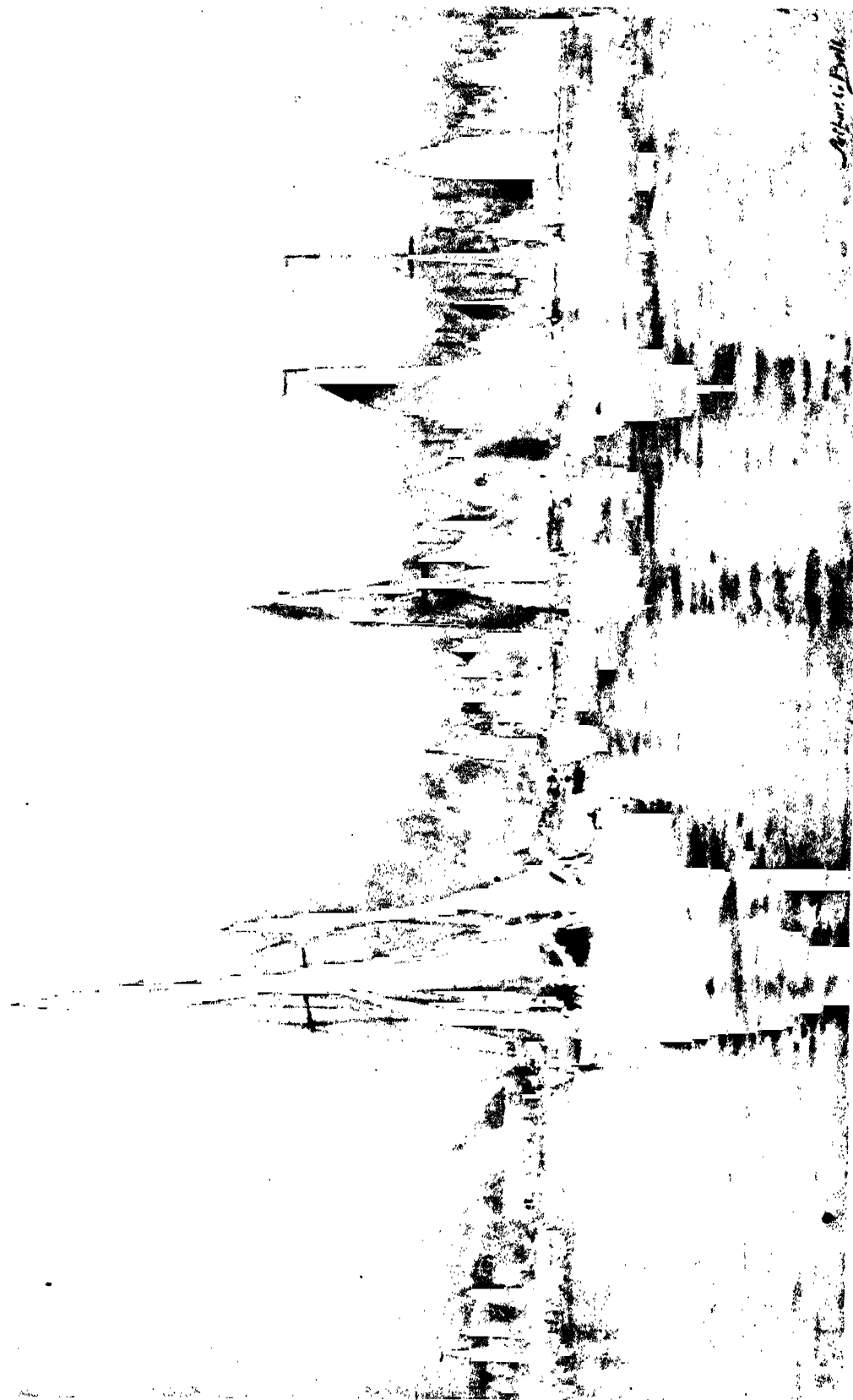
খুবই নির্জ্জন এবং মনোরম। সঙ্গে কোন জিনিষ পত্র নাই দেখিয়া আমার মোটবাহিকা দেখিতে দেখিতে নিজগৃহ হইতে সমস্ত সংগ্রহ করিয়া উৎকৃষ্ট চা পান করাইয়া কহিল, "বাবুজী, গরম জল আছে স্নান কর, আমি ঠাকুর ডেকে আনি, আমাদের ভাত খাবে না ত?" আমার যদিও কিছুমাত্র আপত্তি ছিল না, কিন্তু উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া সে ঝড়ের মত ছুটিল, পথে বাহির হইয়াই গান ধরিল :—

আমা ছাইনা, বাবু ছাইনা
ধোবী লোকে ধুন সুয়ারি
বেরিলাই লাই।"

তাহার কণ্ঠস্বর বাতাসের সঙ্গে মিশিয়া আমার প্রাণে এক অপূর্ব্ব মোহের সৃজন করিল।

দেখিলাম আমার কার্য্য নিঃশব্দে সম্পাদিত হয়; যথা-সময়ে সবই প্রস্তুত, যে ঠাকুরটি সংগ্রহ হইয়াছিল, সে বহু বাঙ্গালীর ঘরে কাজ করিয়া রন্ধনবিষয়ে বেশ পরিপক্ব; কোন অভাবই রহিল না। কেবল কার্য্যকারিণীর সন্ধান পাইতাম না; শুধু সময়ে অসময়ে গীতলহরীতে তাহার গতিবিধি অনুমান করিয়া লইতে হইত। পথে যখন তখন সাক্ষাৎ পাইতাম; কখনও আমাকে অপরিচিতের ন্যায় উপেক্ষা করিত, কখনও ঈষৎ হাসিয়া পলায়ন করিত; অথচ গৃহে সে আমার জননী ভগিনী সকলের স্থান অধিকার করিয়া-ছিল। সে বিনাপ্রয়াসে অজ্ঞাতসারে, আমাকে যতই স্নেহশৃঙ্খলে আবদ্ধ করিতে লাগিল, আমার মন যতই তাহার দিকে আকৃষ্ট হইতে লাগিল, সে ততই দূরে পলায়ন করিতে লাগিল; আমার আশে পাশে চতুর্দ্দিকে দিবানিশি জাগ্রত জীবন্ত থাকিয়াও ধরা দেয় না, একি অপূর্ব্ব চরিত্র! তখন ভাবিলাম, ইহাদিগের কৌশলই এইরূপ।

সপ্তাহান্তে একদিন সান্ধ্য আহারান্তে শয়নকক্ষের বাতায়নে বসিয়া জ্যোৎস্নালোকে সুদূর পর্ব্বতোপরি প্রদীপ-মালার শোভা নিরীক্ষণ করিতে করিতে আপন মনে তাহারই প্রিয় গানটি গায়িতেছি—

"ঘর ছোড়ি, ডেরি ছোড়ি ছোড়লা আপন দেশ
সুরু ধুলসা ছোড়ি আবু পরছা গুরু বেশ।
কাঞ্চি তেরো লিয়া॥"

গান সমাপ্ত হইতে না হইতে সহসা স্বপ্নের ন্যায় আমারই পশ্চাতে দাঁড়াইয়া সে কহিল, "আমারই ত নাম কাঞ্চি। অসময়ে আমার কক্ষে তাহাকে দেখিয়া কিঞ্চিৎ বিস্ময়ের আবির্ভাব হইল, আনন্দও যে হয় নাই তাহা শপথ করিয়া বলিতে পারি না, কিন্তু সত্বরই সে বিস্ময় ও আনন্দের অবসান হইল। সে কহিল, "এই নাও বাবুজী, তোমার তার এসেছে, বুড়ো বাপ রাত বলে আসতে পারল না, তাই আমাকে পাঠিয়ে দিলে।" টেলিগ্রাফখানি রাখিয়া দেখিতে দেখিতে সে অদৃশ্য হইল, তারপর কলকণ্ঠের মধুরঝঙ্কারে আকাশ বাতাস প্লাবিত করিয়া গায়িল—

"কাঞ্চি ছারি আপন মন্‌সা,
না জান্‌ছা সুখ কি হম্‌,
তেরো গোরে পড়ি ভন্‌ছা কাঞ্চি।"

তাহার চরিত্র আজ পর্য্যন্ত বুঝিলাম না।

টেলিগ্রাম খুলিয়া দেখিলাম স্ত্রী বিশেষ পীড়িতা। পর-দিনই দার্জ্জিলিং ত্যাগ করিতে হইবে, একটা অব্যক্ত বেদ-নায় বক্ষঃস্থল পীড়িত হইল, সংস্পর্শজনিত যে সুখটুকু ছিল, তাহাও ত্যাগ করিতে হইবে ভাবিয়া বড়ই ক্লেশ অনুভব করিলাম; রাত্রিপ্রভাতে সে সংবাদ চৌকীদারকে জ্ঞাপন করিলাম; পিতার নিকট সংবাদ পাইয়া যথাসময়ে কাঞ্চি মোট লইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিলে আমি কহিলাম, "কাঞ্চি তুমি এতদিন যে কাজ করলে তার জন্য কত দিব?" ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সে কহিল, "তুমি কি আমাকে চাকরী দিয়েছিলে, আমি আপন ইচ্ছায় যা করেছি তার জন্য তোমায় কিছু দিতে হবে না।" আমি তখনও তাহাকে বুঝিতে পারিলাম না, নীরবে তাহার চরিত্রতত্ত্ব আলোচনা করিতেছিলাম; আমাকে নীরব দেখিয়া কাঞ্চি কহিল, "গাড়ি চলে যাবে যে, এইবার চল —" মোট তুলিয়া লইয়া সে অগ্রে চলিল, আমি তাহার অনুসরণ করিয়া চলিলাম। পথে বাহির হইয়া কহিল, "বাবুজী এবার এত শিগ্যির যাচ্ছ যে?" আমি কহিলাম "আমার স্ত্রীর অসুখ করেছে। কেন? তোর তাতে কষ্ট হচ্ছে?" আমার কথা শুনিয়া—কেন জানিনা—বিস্ময়বিস্ফারিত নয়নে আমার দিকে কিয়ৎকাল চাহিয়া রহিল—পরে হাসিয়া কহিল, "বাবুজী, কুলীর আবার কষ্ট কি?" আমি পুনরায় কথা কহিবার পূর্ব্বে সে

এত দ্রুত চলিতে আরম্ভ করিল যে বহু প্রয়াসেও তাহাকে ধরিতে পারিলাম না; একেবারে ষ্টেশনে প্রবেশ করিয়া দাঁড়াইল। বহু জনতায় আর কথা কহিবার অবসর পাইলাম না। গাড়ির নিকট পঁহুছিয়া মোট গাড়িতে তুলিয়া প্রাপ্য অর্থের জন্য অপেক্ষা করিয়া রহিল; শ্রেণীবদ্ধ কুলী-নরনারীর মধ্যে আমি তাহাকে স্বতন্ত্র দেখিলাম; তাহার সরল উদার মুখ ও অশেষ গৌরবভরা মহীয়সী মূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে তাহার প্রাপ্য অর্থের কথা বিস্মৃত হইলাম; সহসা গাড়ি ছাড়িয়া দিল; চক্ষের পলকে সেও কোথায় অদৃশ্য হইল; আমি হতবুদ্ধির ন্যায় চাহিয়া রহিলাম।

ষ্টেসন হইতে বাহির হইয়া, একটি ক্ষুদ্র পর্ব্বতবেষ্টন করিয়া পুনরায় গাড়ি উন্মুক্ত পথে বাহির হইতেই, পরিচিত কণ্ঠস্বরে গীতধ্বনি শুনিয়া আমি সচকিত হইয়া ইতস্ততঃ চাহিয়া দেখিলাম, পর্ব্বতোপরি আরোহণ করিবার পথমূলে কাঞ্চি দাঁড়াইয়া; গাড়ি তখন খুব ধীরে ধীরে চলিতেছে; সে গাড়ির সঙ্গে ছুটিতে ছুটিতে হস্তপ্রসারণ করিয়া কহিল, "বাবুজী, আমার পয়সা?" আমি তাহার প্রসারিত হস্ত ধারণ করিয়া চুম্বন করিবামাত্র হাত টানিয়া লইয়া সে দাঁড়াইল; গাড়ি তখন সহজ পথ পাইয়া দ্রুত ছুটিল, তাহার মুখে আনন্দ অথবা বিরক্তির কোনও ভাবই লক্ষ্য করিতে না পারিয়া দ্বিধায় চলিলাম।

মনে মনে অনেক তর্কযুক্তির পর স্থির করিলাম, এ মোহকে প্রশ্রয় দেওয়া হইবে না। আমি গভর্ণমেণ্ট-জানিত রাজকীয় শাসনশক্তির মূর্ত্তিমান্ অবতার শ্রীঅমুক ডেপুটী বাবুর একটা সামান্য কুলী-রমণীর কুহকে পড়িয়া আত্ম-সম্মান বিসর্জ্জন দিব; সে হইতেই পারে না। কলিকাতায় ফিরিয়া স্ত্রীর চিকিৎসার যথোচিত বন্দোবস্ত করিলাম, চিকিৎসাও শুশ্রূষার কোনও ত্রুটী না হইলেও সম্পূর্ণ আরোগ্য-লাভ করিতে অনেক সময় লাগিল। সে সময়টা বিলক্ষণ উদ্বেগে কাটিল। ছুটী ফুরাইলে কাছারী খুলিল, আমিও যথাসাধ্য কার্য্যে মনোনিবেশ করিলাম; কিন্তু অচিরে দেখিলাম, আমি এত বড় একটা রাজকর্ম্মচারী হইলেও সামান্য কুলীরমণীর কুহকজাল হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারি নাই। সকল কার্য্যের ভিতর, কার্য্য-অবসানে, শয়নে স্বপনে, প্রতি মুহূর্ত্তে সে যেন আমার জীবন আচ্ছন্ন করিয়া রহিল,আমার মনের উপর তাহারই যেন একাধিপ[ত্য]; অন্য কোনও চিন্তা করিতে বসিলে অজ্ঞাতে কে[মন] করিয়া যে মন টানিয়া লয় তাহা বুঝিতে পারি না। ত[খন] মানসিক যোগাযোগ সম্বন্ধে মহা আলোচনায় প্র[বৃত্ত] হইলাম; সে বিষয়ে যত পাঁজি পুঁথি আছে সব সং[গ্রহ] করিলাম। আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল যে, সে আমা[কে] ইচ্ছাপূর্ব্বক স্মরণ করিয়া বিফল করিতেছে; সাম[য়িক] ক্রোধের উদয় হইল, কিন্তু ক্রমে সে চিন্তায় যে অপরিসীম আনন্দ অনুভব করিলাম তাহা ব্যক্ত করি[বার] নয়। ভাবিলাম সে যে মুক্ত বাতাসের [ন্যায়] পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরিয়া বেড়ায়; আপনার উচ্ছৃ[ঙ্খল] সঙ্গীতলহরীতে আপনি মত্ত হইয়া থাকে, অবাধ আন[ন্দ] যাহার জীবন, তাহার পক্ষে নির্জ্জনে আমার বিষয় চিন্ত[ায়] মনঃসংযোগ করিবার অবসর কোথায়? আর তাহ[ার] এত স্পর্দ্ধা জন্মিলই বা কিসে?

এইরূপ নানা চিন্তায় বৎসরাধিক অতীত হইল। আমা[র] মন কিছুতেই সংযত হইল না। উচ্ছৃঙ্খল চিত্ত লই[য়া] সংসারে সকল কর্ত্তব্যই পালন করি, কিন্তু একটি স্মৃ[তি] আমাকে সারা সংসার হইতে স্বতন্ত্র করিয়া রাখিল; সে সুমধুর চিন্তাটুকুতে আর কাহারও অধিকার রহিল না। অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রতিদিন আপন মনে নিভৃত গৃহকো[ণে] সেই চিন্তাটুকুতে সময় অতিবাহিত করিয়া যে তৃ[প্তি] হইত, আর কিছুতেই তেমন আনন্দ, তেমন তৃ[প্তি] পাইতাম না।

দ্বিতীয় বৎসর আমি জলপাইগুড়ি বদ্লী হইলাম। সেখানে ক্রমাগত ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগিয়া আমার স্ব[াস্থ্য] বিশেষরূপে অসুস্থ হইয়া পড়িলে ডাক্তারেরা বা[য়ু] পরিবর্ত্তনার্থ স্থানান্তরে যাইতে আদেশ করিলেন, আমা[র] দার্জ্জিলিং যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে ডাক্তারেরা আপ[ত্তি] করিলেন না—আমি অনেক আপত্তি উত্থাপন করিয়া[ও] কিছু করিতে পারিলাম না। অগত্যা দুইমাসের ছুটী লইয়া অনিচ্ছাসত্ত্বে সেবারও দার্জ্জিলিং চলিলাম। 'ম্যাকিনটস' রোডের সেই বাড়ীটি আমার বড় পছন্দ হইয়াছিল। বাড়ী[র] মালিকের নিকট লিখিয়া সেই বাড়ীটি ভাড়া লইলাম। যতই অনিচ্ছা প্রকাশ করি না কেন, সকল বন্দোব[স্ত]

দার্জ্জিলিং সান্নিধ্যে।

পাকা হইল; দেখিলাম নিভৃত অন্তরের কোণে ক্রমে আনন্দসঞ্চার হইতেছে। কোন অদৃশ্য ইচ্ছা কিসের জন্য আমাকে টানিয়া লইয়া চলিল, কে জানে?

যথাসময়ে দার্জ্জিলিং পঁহুছিলাম। পথে আমার স্ত্রী অজস্র প্রশ্নে আমাকে পাগল করিয়া তুলিলেন। আমার মন সে দিকে ছিল না, আমি ভাবিতেছিলাম, এই দুই বৎসরে না জানি তাহার কি পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ষ্টেসনে প্রবেশ করিতে করিতে উৎসুকনয়নে যেদিকে কুলীরা থাকে সেইদিকে চাহিলাম; তাহাকে দেখিতে পাইলাম না। নিরাশ, ব্যথিতচিত্তে উঠিলাম; গাড়ি থামিল; সেবার কেহ আর আগ্রহ করিয়া মোট লইতে ছুটিয়া আসিল না; আমি আপনি মোট নামাইতে প্রবৃত্ত হইলাম, ইতিমধ্যে কুলী আসিয়া জুটিল। ষ্টেসনের বাহিরে আসিয়া আমার স্ত্রীকে ডাণ্ডিতে বসাইতে বসাইতে তাহার সন্ধানে ইতস্ততঃ চাহিতেছিলাম, যদি সহসা দেখিতে পাই; দেখিলাম রেল লাইনের পরপারে যে পথে সহরে উঠিতে হয়, সেই পথপ্রান্তে কাঠের রেলিংএ ভর দিয়া দাঁড়াইয়া এক নেপালি রমণী কৌতুহলপূর্ণনয়নে আমার স্ত্রীকে দেখিতেছে। ডাণ্ডির পশ্চাতে আমি হাঁটিয়া চলিলাম; রমণীর সম্মুখীন হইয়া দেখিলাম—সেই কাঞ্ছি; তাহার বেশভূষার অদ্ভুত পরিবর্ত্তনের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, তাহার বিবাহ হইয়াছে, স্বামী পলটনের বড় সাহেবের নিকট কাজ করিয়া যথেষ্ট অর্থউপার্জ্জন করে; সে আর মোট বহন করে না। দেখিলাম তাহার পরিধানে পরিষ্কার অপেক্ষাকৃত মূল্যবান্ শাটী, অঙ্গে মখমলের জামা, গলায় সুবর্ণহার, এবং কর্ণেও স্বর্ণালঙ্কার দুলিতেছে। তাহার স্বাভাবিক আনন্দের ভাবটুকুর অভাব নাই; কিন্তু সহজ সরল হাসিটুকু গাম্ভীর্য্যে পরিণত হইয়াছে। বিবাহ কেন করিল জিজ্ঞাসা করায় সে প্রথমতঃ হাসিয়া কহিল, "তুমি বিয়ে করেছিলে কেন?" তারপর যাহা কহিল, তাহাতে বুঝিলাম তাহার স্বামী যে, সে বহুদিন হইতে কাঞ্ছির পাণিপ্রার্থী ছিল। এতদিন কাঞ্ছি সম্মত হয় নাই। পিতার মৃত্যুতে একেবারে অসহায়া হইয়া পড়াতে বিবাহ করিতে বাধ্য হইয়াছে। আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবুজী ডাণ্ডিতে কাকে বসালে?" আমার স্ত্রী সঙ্গে আসিয়াছেন এবং তাঁহাকেই ডাণ্ডিতে বসাইলাম শুনিয়া পূর্ব্ববৎ হাসিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, সে কাহার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া ছিল। কাঞ্ছি কহিল, "এ সময় আমি রোজ আসি, কে আসে না আসে তাই দেখতে।" আমারই আশায় যে সে দিনের পর দিন ষ্টেসনের সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকে, সে বিষয়ে সন্দেহ রহিল না—কতদিন কত নিরাশায় মুহ্যমান হইয়া ফিরিয়াছে, ভাবিয়া আমার মন তাহার ব্যথায় ব্যথিত হইল। আমি যে পুরাতন স্মৃতিপূর্ণ সেই পরিচিত বাড়ীটি ভাড়া লইয়াছি সে তাহারই জন্য, এ সংবাদ জ্ঞাপন করিলাম, কিন্তু সে মস্তক সঞ্চালন করিয়া দ্রুত চলিল; পথের দ্বিতীয় বাঁকে উঠিয়া ডাকিয়া কহিল, "আমি এখন সেখানে থাকি না;" তার পর ছুটিয়া চোখের পলকে অদৃশ্য হইল; সে কোথায় থাকে জিজ্ঞাসা করিবার অবসর পাইলাম না।

ব্যথিত চিত্ত লইয়া বাড়ী চলিলাম; কাঞ্ছি আর সে কাঞ্ছি নাই; তাহার বিবাহ হইয়াছে তাহাতে আমার আপত্তি কেন? তাহার উপর কোনদিন আমার কি অধিকার ছিল? এ বেদনা তবে কিসের বুঝিলাম না। দার্জ্জিলিংএ আমার তাদৃশ উৎসাহ ও আনন্দ না দেখিয়া আমার স্ত্রী আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া একদিন কহিলেন, "এবার তোমার তেমন উৎসাহ দেখছি না কেন বল দেখি?" সে প্রশ্নের উত্তরে বলিবার কিছুই ছিল না, অন্য প্রসঙ্গে সে প্রশ্নের খণ্ডন করিলাম। সত্যই সেবার কিছুই ভাল লাগিল না;

নিশিদিন চক্ষু ও কর্ণ জাগ্রত থাকিত, কিন্তু তাহাকে দেখিতেও পাইতাম না, সময়ে অসময়ে সুমধুর কণ্ঠে সেই গীতধ্বনিও আর শুনিতে পাইতাম না। আমার দিনগুলি নীরস নিঃসঙ্গভাবে কাটিতে লাগিল। স্থির বিশ্বাস জন্মিল, আমার স্ত্রীকে লইয়া আসায় কাঞ্চি অভিমান করিয়া আমাকে জব্দ করিবার অভিপ্রায়ে দূরে দূরে থাকে। আমি যখন তখন পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াই তাহারই সন্ধানে, কচিৎ কখনও তাহাকে বহুসঙ্গিনী সহ দেখিতে পাই, কথা কহিতে সাহস পাইনা, শুধু চোখে চোখে মিলিত হইলে দেখিতে পাই সেই জ্যোতি—সেই আনন্দ।

অবশেষে বহুচেষ্টার পর একদিন তাহার সাক্ষাৎ পাইলাম—আমাদের বাড়ী হইতে জলা পাহাড়ে উঠিবার পথে সে একটি বৃক্ষতলে একাকী দাঁড়াইয়া পশমের গলাবন্ধ বুনিতে ব্যস্ত। সহসা আমাকে দেখিয়া যেন একটু অপ্রতিভ হইয়া পড়িল। আমি দ্রুত অগ্রসর হইয়া কহিলাম, "এখানে একা দাঁড়িয়ে কেন কাঞ্চি?" একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, "দেখছিলাম"—তাহার কথা সমাপ্ত হইতে না হইতে আমি ধৈর্য্যধারণ করিতে না পারিয়া কহিলাম, "কাঞ্চি! একটা কথা সত্য বল দেখি। আমার স্ত্রী সঙ্গে এসেছে বলে তুমি রাগ করেছ?" কাঞ্চি এতক্ষণ অভিনিবেশ-সহকারে আপনার কার্য্য করিতেছিল, আমার প্রশ্ন শুনিয়া সবিস্ময়ে আমার মুখের পানে চাহিয়া কহিল, "কেন? বেশত হয়েছে বাবুজীর আর একা থাক্‌তে হয় না।" কথা শেষ করিয়া পুনরায় তাহার কার্য্যে মনঃ-সংযোগ করিল। আমি নিবিষ্টচিত্তে তাহাকে লক্ষ্য করিতেছিলাম।

পশম বুনিতে বুনিতে সে কহিল, "বাবুজীর বউ খুব সুন্দর।" আমার মনোভাব জানাইবার উত্তম অবসর বিবেচনা করিয়া আগ্রহ-সহকারে কহিলাম, "তোমার চেয়ে নয়, তোমার মত সুন্দরী আমি কোথাও দেখিনি।" আমার কথা শুনিয়া সে উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল। তাহার মুখে তেমন হাসি ইতঃপূর্ব্বে কখনও দেখি নাই—পরক্ষণে কোনও কথা না কহিয়া আপনার পথে চলিল। আমি হতবুদ্ধির ন্যায় দাঁড়াইয়া তাহাকে দেখিতে লাগিলাম, সে ধীর পদবিক্ষেপে গলাবন্ধ বুনিতে বুনিতে চলিল; প্রতিবাঁকের শেষে আমাকে একইভাবে দণ্ডায়মান দেখিয়া হাসিল; সে হাসি আনন্দের কি বিদ্রুপের বুঝিলাম না—বড় রাস্তায় উঠিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল; তাহার উৎকৃষ্ট অমল গীতলহরী শুনিতে শুনিতে সেবারও ব্যর্থমনোরথ হইয়া গৃহে ফিরিলাম।

স্ত্রীর শরীর অল্পদিনে বেশ সুস্থ হইয়া উঠিল। এদিকে কার্য্যস্থলে ফিরিবারও সময় নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিল; আমি শুধু অবসর খুঁজিতেছি, একবার তাহার মুখে স্পষ্ট কথা না শুনিলে যেন দার্জ্জিলিং ত্যাগ করা অসম্ভব। সে যেন তাহার অন্তরের নিভৃতস্থানে কি কথা চাপিয়া রাখিয়াছে, তাহারই বেদনা আমাকে অস্থির অতৃপ্ত পথিকের ন্যায় ঘুরাইয়া লইয়া ফিরিতেছে। (তাহার নয়নে, আননে, ওষ্ঠে কি লুক্কায়িত রহস্য প্রথম দর্শনাবধি আমাকে আকর্ষণ করিতেছে, আজও তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না) ভাবিলাম ইহার মীমাংসা করিতেই হইবে।

সে দিন জলাপাহাড় হইতে ফিরিতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল, পথটি অতি নির্জ্জন, মাঝে মাঝে বিশ্রামের জন্য ছোট ছোট কাঠের ঘর আছে, আমি অনন্যমনে চলিতে চলিতে অনুভব করিলাম, কে যেন চকিতের ন্যায় সেই কাঠের ঘরে লুক্কায়িত হইল। ওই সকল পথে সন্ধ্যার পর অনেক রকম দুর্ঘটনা

জলাপাহাড়ের পথে।

ঘটে শুনিয়াছি। কৌতূহল-পরবশ হইয়া অনুসন্ধান করিবার ইচ্ছায়, আমিও সেই ঘরে প্রবেশ করিলাম, পকেট হইতে ম্যাচবাক্স বাহির করিয়া জ্বালিয়া দেখি, সম্মুখে কাষ্ঠাসনে উপবিষ্ট কাঞ্চি। তাহাকে কিঞ্চিৎ ভীত সন্ত্রস্ত দেখিলাম। আমাকে বিস্ময়াপন্ন ও সন্দিগ্ধ দেখিয়া সে কহিল, "জল পাহাড়ের উপর পলটনের লাইনে আমরা থাকি।" বুঝিলাম সহর হইতে ফিরিতে বিলম্ব হইয়াছে, কিন্তু সেই ঘরে লুক্কায়িত হইবার কারণ কি জিজ্ঞাসা করায় কিঞ্চিৎ দ্বিধার পর কহিল, "আমি তোমার কাছে থেকে পালাবার জন্য ঘরে ঢুকলাম, তুমি যে আমায় দেখতে পাবে তাকি জানি?" আমি তখন সেই কাষ্ঠাসনে তাহার পার্শ্বে বসিয়া কহিলাম, "আমাকে দেখে পালালে কেন, তা বল্‌তে হবে।" একটু উৎকন্ঠিত হইয়া সে কহিল, "আমার স্বামী এখুনি এই পথে আসবে, দেখতে পেলে তোমাকেও খুন করবে, আমাকেও খুন করবে। তুমি যে আমাকে ভালবাস তা' সে অনেক দিন থেকে জানে।" ভাবিলাম তবে স্বামীর ভয়েই কাঞ্চি প্রথমাবধি আমার নিকট হইতে দূরে পলায়ন করিয়াছে। আমি তখন আরও অগ্রসর হইয়া কহিলাম, "তোমার স্বামী আবার কবে পলটনের সঙ্গে যাবে?" সে অবাক্ হইয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "কেন?" আমি কহিলাম, "সেই সময় তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসব, তাহ'লে আর কোনও ভয় থাকবেনা। এই বলিয়া তাহাকে বাহুপাশে আবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিবামাত্র সে উঠিয়া দাঁড়াইল। সরকারী ল্যাম্পের অতি সামান্য আলোকসত্ত্বেও দেখিলাম তাহার চক্ষুর্দ্বয় হইতে জ্যোতিঃ নির্গত হইতেছে! গর্ব্বভরে গ্রীবা উন্নত করিয়া কহিল, "তুমি কি মনে করেছ কুলীর মেয়ে ব'লে আমার ধর্ম্ম নেই? আমি আমার স্বামীকেই ভালবাসি; বাবুজী, তোমার স্ত্রীর কথা ভুলে গেছ?" তাহার শেষ কথার সঙ্গে সঙ্গে আমার কর্ণে কাহার পদশব্দ পৌঁছিল, কাঞ্চিও সে পদশব্দ শুনিয়া দ্রুত বাহির হইয়া পড়িল। পরক্ষণে পুরুষকণ্ঠে তাহার নাম উচ্চারিত হইতে শুনিয়া অনুমান করিলাম তাহার স্বামী। আমি নিঃশ্বাস রোধ করিয়া বসিয়া রহিলাম; তাহারা উভয়ে অদৃশ্য হইয়া গেলে গৃহাভিমুখে চলিতে চলিতে ভাবিলাম, সামান্য কুলীরমণীর নিকট আজ একি শিক্ষালাভ করিলাম? ইহাকেই চরিত্রহীনা কুহকিনী ভাবিয়াছিলাম!

বিবাহিতা কাঞ্চি।

তারপর তিন চারি দিন তাহার সাক্ষাৎ পাই নাই। নানারূপ সন্দেহ মনকে পীড়ন করিতে লাগিল। যদি তাহার স্বামী আমাকে দেখিয়া থাকে! যদি তাহার কোন বিপদ্ ঘটিয়া থাকে! সারাদিন দুশ্চিন্তায় কাটাইয়া যথাসময়ে শয়ন করিতে চলিলাম; নিদ্রার ঘোরে দেখিলাম জলাপাহাড়ে কাঞ্চির সন্ধানে চলিয়াছি। অনুসন্ধান করিতে করিতে তাহার কুটীর-দ্বারে উপস্থিত হইয়া নাম ধরিয়া ডাকাডাকি করিয়া কোন সাড়া পাইলাম না। দ্বার ঠেলিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখি কাঞ্চির রক্তাক্ত কলেবর ভূতলে পড়িয়া আছে, প্রাণ তখনও আছে। স্বাভাবিক মধুর হাসি হাসিয়া সে কহিল, "তুমি এসেছ? তোমার জন্যই প্রাণটুকু আছে, আমি তোমাকেই ভালবাস্‌তাম, তাই জান্‌তে পেরে স্বামী আমাকে

হত্যা করে গেছে।” আমি সেই রক্তাক্ত দেহের উপর পড়িয়া তাহাকে বক্ষে লইয়া শতচুম্বনে তাহার সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদন করিলাম। সে হাসিতে হাসিতে আমারই বক্ষে প্রাণত্যাগ করিল। আমি “কাঞ্চি কাঞ্চি” বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলাম। সহসা কাহার করস্পর্শে আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। শুনিলাম গৃহিণী বলিতেছেন “মাগো! এত বেলায় ঘুমের ভিতর কি চেঁচামেচি করছ? আমি শশব্যস্তে শয্যায় উঠিয়া বসিয়া ব্যাকুলনয়নে চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম, আমার বস্ত্রে অথবা কোথাও রক্তচিহ্ন নাই—আমার বক্ষঃস্পন্দন তখনও দ্রুত চলিতেছে, শয্যাত্যাগ করিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে কহিলাম, “বড় দুঃস্বপ্ন দেখেছি।”

বাহিরে আসিয়া দেখিলাম বেলা অনেক হইয়াছে। সে দিন দলে দলে নরনারী হাটে চলিয়াছে, বাতায়নে বসিয়া নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে সহসা পরিচিত কণ্ঠ শুনিয়া চাহিয়া দেখি কাঞ্চিও চলিয়াছে—বোধ হয় হাটে, সঙ্গে এ সুবৃহৎ পুরুষ, খুব সবম্ভতঃ তাহার স্বামী। আমাকে দেখি পূর্ব্ববৎ সহজ সরলভাবে হাসিল। বুঝিলাম সে আমা ক্ষমা করিয়াছে, আমার মনে যে অপবিত্র ভাবটুকু ছি তাহার হাসিতে সেটুকু দূর হইল, আমিও প্রত্যুত্তরে হাসি তাহাকে সে বারতা জানাইলাম। পরক্ষণেই তাহার মধু কণ্ঠে পর্ব্বত প্রতিধ্বনিত করিয়া সুরতরঙ্গ ভাসিয়া উঠিল সে গাহিল “কাঞ্চি ছারি আপন মন্‌সা” ইত্যাদি।

পরদিন দার্জ্জিলিং ত্যাগ করিলাম। সংকল্প করিলা স্ত্রীকে সকল কথা খুলিয়া না বলিলে মনের পাপ দূর হই না। আমার স্ত্রী আদ্যোপান্ত সব শুনিয়া কহিলেন, “মুনীনা মতিভ্রমঃ”; তোমার আর দোষ কি? কিন্তু সেখানে থাক্‌ বল্লেনা কেন? তোমার কাঞ্চিকে একটা প্রণাম ক’রে তা পায়ের ধূলা নিয়ে আস্‌তাম।”

শ্রীঅমলা দেবী।

বিনা প্রেমসে না মিলে নন্দলালা।

রাজার বাড়ী সহিস্‌ রোদে
আন্‌ত কাটি’ নিত্য ঘাস,
শ্রম বিহান কার্য্যো দেন
যাপিতে তার নিত্য আশ।

বিধাতারে সে নিন্দা করি
বলে নাহি কি চক্ষু তোর,
সুখ-সাগরে ভাস্‌ছে নৃপ
আমার বহে চক্ষে লোর।

এড়াতে ক্লেশ বেদনা-দুখ
বিরাগ এল চিত্তে তার,
রাগিয়া ফেলি ‘খুরপা’ ‘থলি’
করিল ঝলি কন্থা সার।

কাননে গিয়া হরিরে ভজে
হরির একি পক্ষপাত,
লইয়া কাথা গেল না ব্যথা
আধেক দিন পায়না ভাত।

দিবস-শেষে দেয় কে এসে
আধেক পোড়া রুটী দুখান,
কষায় ফল, নির্ঝর জল,
ভখিয়া সাধু বিরসপ্রাণ।

কালেতে সেই নৃপতি আসি
কানন মাঝে রচিল বাস;
কাঁধেতে তাঁর রাজিছে ঝুলি,
কটিতে শোভে গেরুয়া বাস।

বিভব ত্যজি নৃপতি আজি
আসিয়া বানপ্রস্থে হায়,
কত সাধুর বচনমধু
কত লোকের ভকতি পায়।

কেহ বা জল কেহ বা ফল
কেহ বা আনে দুগ্ধ ক্ষীর—
হেরি সে সুখ সহিস্ কাঁদে
রোষে ও ক্ষোভে চক্ষু থির।

হায়রে বিধি করুণাহীন
হেন বিচারে কি সুখ পাও ?
আমার বেলা দগ্ধ রুটী
রাজারে ক্ষীর নবনী দাও।

বুঝিনু আমি বিশ্বস্বামী
বিচার তব রাজ্যে নাই।
বনেতে এসে ভিন্ন ভেদ এ
ঘৃণা ও লাজে মরিয়া যাই।

কাঁদিছে খেদে শূন্য হ'তে
কে হাসি' ডাকি বলিল তায়—
দুখের লাগি তুমিও রাগি'
খুরপা থলি ত্যজেছ হায় !

"সুখের আশে এ বনবাসে
এসেছ পরি' হিংসা হার,
দগ্ধ রুটি, তাহার বেশী
বল কি হবে লভ্য আর।"

রাজা যে এল তুচ্ছ করি
অতুল ধনরত্ন রাশ,
হরিরে ডাকি দিবসনিশি
করিছে পাদপদ্ম আশ।

সকলি দেছে হরিরে সে যে
এটা কি তুমি বোঝনা ধীর,
তাইতে হরি মাথায় করি
বহিয়া আনে নবনী ক্ষীর।

না ত্যজি কিছু না দিয়ে প্রেম,
সাধক হতে করো না আশ,
হরি যে দেখে হৃদয়খানি
ভোলে না দেখি গেরুয়া বাস।

শ্রীকুমদরঞ্জন মল্লিক।

সংক্ষিপ্ত উদ্যান।

কৃষি—বহুবিভাগ ও উপবিভাগে বিভক্ত। উদ্যান-চর্চা তাহারই একটি ক্ষুদ্র শাখা মাত্র; আবার সেই শাখা বহুদিকে বহুরূপে লোকসমাজে পরিগৃহীত হইয়াছে। ব্যক্তি-দিগের কৃষিকার্য্যে স্বল্প ও নির্দ্দিষ্ট ব্যয়ে প্রভৃত সামগ্রী উৎপন্ন করিবার রীতি আছে; কিন্তু ঔদ্যানিকতায় তাহা হয় না। উদ্যানে ফলপুষ্পাদি নয়নরঞ্জক ও মনোরম করিতে উদ্যান-স্বামীর সমধিক দৃষ্টি থাকে বলিয়া, ব্যয়ের দিকে লক্ষ্য থাকে না। প্রায়ই দেখা যায় যে, ঔদ্যানিক কার্য্যে অর্থ বিবেচ্য বিষয় নহে। ইহা সৌখীন লোকদিগের নয়ন-মনের তৃপ্তিবর্দ্ধক। এই জন্য সখের রম্য উদ্যানটি যত সুরুচি সহকারে রচিত হয়, পথ, ঘাট, তৃণমণ্ডল (Lawn), পুষ্পবীথিকা, ও বৃক্ষ-লতাদি যত পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন থাকে, তত তাহার শ্রীবৃদ্ধি

হয়। রম্য বাগানের প্রত্যেক উপকরণ—কি বৃক্ষলতা, কি সাজ সরঞ্জাম—সবই সুন্দর হওয়া চাই, প্রত্যেক জিনিষটিকে নিরতিশয় যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করা চাই,প্রত্যেক জিনিষের বিশেষত্ব (Individuality) যতদূর পরিস্ফুট করিয়া তুলিতে পারা যায়, তৎপ্রতি বিশেষরূপ লক্ষ্য রাখা একান্ত কর্ত্তব্য। কতকগুলি বহুমূল্য বা বিরল উদ্ভিদ্ কিংবা চাকচিক্যময় সরঞ্জাম থাকিলেই যে বাগানের শোভাবৃদ্ধি হয়, তাহা নহে। প্রত্যেক উদ্ভিদ্‌কে শোভাসম্পদ্ দান করিয়া স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে হইবে। প্রত্যেক উদ্ভিদের নিজস্ব সৌন্দর্য্য আছে, উহাই তাহার সম্পদ্। যত্ন ও চেষ্টা দ্বারা উদ্ভিদের সেই সম্পদ্‌কে অধিকতর শ্রীসমন্বিত ও নেত্রতৃপ্তিকর করাই উদ্যানকর্ত্তার মুখ্য উদ্দেশ্য।

রুচি না থাকিলে কিন্তু কোন জিনিষেরই শ্রীকে বর্দ্ধিত করিতে পারা যায় না। রুচির অভাববশতঃ অনেক সময়ে আমরা উদ্ভিদ্‌দিগের প্রকৃতিগত শোভাকে নষ্ট করিয়া থাকি। রুচি রূপরসগন্ধাদিবিবর্জ্জিত বলিয়া বাহেন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত নহে, তবে তাহার বিকাশ উপভোগের জিনিষ। এই বৃত্তিটির সুচর্চ্চা হইলে বহু বিষয়ে সুখলাভ করিতে পারা যায়। সৌন্দর্য্য-চর্চ্চা (Æsthetic culture) না থাকিলে কোথাও পারিপাট্য বজায় রাখিতে পারা যায় না। বিশেষতঃ উদ্যানকার্য্যে, রম্য ও বিচিত্র ঔদ্যানিকতায়, রুচির বিশেষ আবশ্যক। যে উদ্যানস্বামী গাছপালার সহিত আপনার মার্জ্জিত রুচির যত পরিচয় দিতে পারেন, তিনি তত বড় শিল্পী, তিনি উদ্যানকে তত মনোরম ও চিত্তাকর্ষক করিতে পারেন। উদ্যানকার্য্য আমরা যতটা সহজ মনে করি, প্রকৃতপক্ষে তত সহজ নহে। মনোহর উদ্যান,—উদ্যানস্বামীর মার্জ্জিত রুচির পরিচায়ক। গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া তন্মধ্যস্থিত সাজসজ্জা, আসবাবপত্রগুলির পারিপাট্য ও সুব্যবস্থা দেখিলে গৃহিণীর যে রুচির পরিচয় পাওয়া যায়, উদ্যানে প্রবেশ করিয়া তথাকার সুব্যবস্থা দর্শন করিলেও উদ্যান-স্বামীর সেইরূপ উন্নত রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। অনেকের বাড়ীতে বা ঘরে প্রবেশ করিয়া নানাবিধ বিশৃঙ্খলা ও বেবন্দোবস্ত দেখিলে আগন্তুকের চিত্তে বিষাদের রেখা দেখা দেয়—বিরক্তির ভাব আসে। অনেকের বাগানে প্রবেশ করিতেও সেইরূপ হয়। এইরূপ বিশৃঙ্খলতা যে অর্থাভাবে বা পরিদর্শনাভাবে হয়, তাহা নহে। উহার মূল রুচিহীনতা। রুচি অনেক স্থলে বংশগত ও জাতিগত, অনেক স্থলে ব্যক্তিগত। যাহাদিগের রুচি-জ্ঞান নাই, কিংবা যাহাদিগের রুচি থাকিলেও বিকশিত হইবার সুযোগ বা অবসর পায় নাই, তাহাদিগের পক্ষে আলোচনা দ্বারা সৌন্দর্য্য-চর্চ্চা শিক্ষা করিতে হয়। আমার মনে হয়, এই বিদ্যা আয়ত্ত করা মহিলাকুলের পক্ষে যত সহজসাধ্য পুরুষদিগের পক্ষে তেমন নহে। আমরা সন্তানসন্ততিদিগকে লেখাপড়া বিষয়ে ও সামাজিক ব্যাপারে রুচিশিক্ষা দিয়া থাকি। কিন্তু কি উপায়ে কায়িক শোভা বর্দ্ধিত হইতে পারে, কিংবা চিত্তের প্রফুল্লতা বৃদ্ধি পাইতে পারে, অথবা কিরূপে ঘরবাড়ী বাগান-বাগিচার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে হয়, এসকল বিষয় শিক্ষা দিই না। এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু প্রয়োজনীয় বিষয় শিক্ষা না করিলে শিক্ষার পূর্ণতা লাভ হইতে পারে না। বই পড়িয়া বিদ্যালাভ হয় সত্য, কিন্তু সম্পূর্ণ শিক্ষা হয় না। সৌন্দর্য্য-চর্চ্চার অভাব হেতু আমাদের কার্য্যে শৃঙ্খলা থাকে না। আমাদের সকল কার্য্যেই রুচিহীনতার পরিচয় পাওয়া যায়।

একটি অকিঞ্চিৎকর সামগ্রীকে যথাস্থানে রুচিসহকারে সংরক্ষিত করিতে পারিলে, আগন্তুকের দৃষ্টি সর্ব্বাগ্রে তাহাতেই আকৃষ্ট হয়। আমাদের অনেকের আঙ্গিনায় তৃণ আছে, কিন্তু অযত্নহেতু তাহা অরুচিকর হইয়া থাকে, আর কুটীরবাসী কোন টুপিওয়ালার তৃণমণ্ডল দেখিলে মন মুগ্ধ হয়, নয়ন তৃপ্ত হয়। এস্থলে একটি কথা বলিবার আছে। ছাদে বা বারান্দায়, আঙ্গিনা বা খিড়কী মহলে যদি উদ্যানশোভা উপভোগ করিতেই হয়, তাহা হইলে সে উদ্যানটির পর্য্যবেক্ষণ-ভার কুললক্ষ্মীগণের হস্তে ন্যস্ত হইলে বড়ই সুখকর হয়। কারণ প্রথমতঃ সর্ব্বদা তাঁহারা বাড়ীতে অবস্থান করেন বলিয়া প্রত্যহই গাছপালাগুলির অবস্থা দেখিবার সুবিধা পাইয়া থাকেন। দ্বিতীয়তঃ কলাশিল্পে তাঁহাদিগের আধিপত্য বড় কম নহে। তাই অমর কবি কালিদাস শকুন্তলার মৃণালবিনিন্দিত বাহুতে জলের ঝাঁজরা ও খোন্তা দিয়েছেন দিয়া ছিলেন। বাস্তবিকই যাঁহারা সন্তানসেবা করিতে জানেন, তাঁহারা যে পশুপক্ষী বা উদ্ভিদের সেবা করিতে জানেন না—একথা বিশ্বাস করিতে পারা যায় না।

প্রকৃতির সৌন্দর্য্যপিপাসু কবিগণ প্রথমতঃ প্রকৃতির বাহ্য-রেখা (outlines) দেখিয়া বিমুগ্ধ হন। বাহ্য-রেখা ঊর্দ্ধে পার্শ্বদেশে ও পাদদেশে দেখিতে পাওয়া যায়। বৃক্ষ-শ্রেণী তিন দিক্ দিয়া আপনাদিগের শোভা বিস্তার করে। গাছের একটি শ্রেণী থাকিলে দর্শক দূর হইতে তাহাদিগের শিরোভাগে একটি রেখা দেখিতে পান। উক্ত রেখাকে ঔদ্যানিকের ভাষায় আকাশরেখা (sky outline) বলে। উদ্ভিদ্দিগের পার্শ্বদেশে তাহার শিরোদেশ হইতে ভূ পর্য্যন্ত বিস্তৃত তরঙ্গায়িত একটি রেখা দেখিতে পাওয়া যায়। আবার উদ্ভিদ্গণের বৃদ্ধির সঙ্গে যখন ভূপৃষ্ঠে তাহাদের ছায়া পড়ে, তখন অপর একটি রেখা স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। এই রেখাটির সৌন্দর্য্য কবিরা বিশ্লেষণ করিতে বা ভাষায় ফুটাইতে পারেন না; কিন্তু চিত্রকর ও ঔদ্যানিক এই রেখাটি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়া চিত্রে ও উদ্যান রচনায় ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করেন। এই সৌন্দর্য্যের মূলে আলো ও ছায়ার অপূর্ব্ব মিলন দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাতঃকাল, মধ্যাহ্নকাল ও সায়ংকাল—এই তিনটি সময়ে একই উদ্ভিদের ছবি লইলে বুঝিতে পারিবেন যে, তিন অবস্থার তিনখানি ছবির মধ্যে কত প্রভেদ! সেই উদ্ভিদ্, সেই স্থান, সেই চিত্রকর; কিন্তু চিত্রে কত প্রভেদ! কেবল কি তাহাই? আজ যে স্থান হইতে যে সময়ে যে দৃশ্যের ছবি লওয়া যায়, কাল বা দুদিন পরে ঠিক সেই স্থান হইতে, ঠিক সেই সময়ে সেই দৃশ্যের ছবি লইলে দুই ছবির মধ্যেও বহু প্রভেদ পরিলক্ষিত হইবে। প্রতিদিনের দিনরাত্রি যখন সমান দীর্ঘ নহে, তখন দুই দিনের আলোক ও ছায়ার মধ্যে সমতা থাকিবে কিরূপে? এ সকল কথা ক্রমে ক্রমে ব্যাখ্যা করিতে প্রয়াস পাইব। এক্ষণে দেখা যাউক সৌন্দর্য্যবৃদ্ধির জন্য কিরূপ গাছের প্রয়োজন? পূর্ব্বেই বলিয়াছি প্রত্যেক গাছেরই একটি বিশেষত্ব বা স্বাতন্ত্র্য আছে। একটি ঝাউগাছে যে শোভা-সৌন্দর্য্য আছে, আম্রবৃক্ষে তাহা নাই, আবার আম্রবৃক্ষে যে সৌন্দর্য্য আছে, তাহা সহস্র চেষ্টা দ্বারাও ঝাউগাছে পাওয়া যায় না। ঝাউ ও আম্র—এই দুইটি বৃক্ষের আকৃতি, প্রকৃতি, বৃদ্ধি, বর্ণ প্রভৃতি বহুবিষয়ে এত বিভিন্ন যে, উভয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ আছে বলিলেও হয়; আর এই দুইটি বিভিন্নধর্ম্মী বৃক্ষের যে একীকরণ হইতে পারে তাহা মনে হয় না; কিন্তু ঔদ্যানিকেরা ভূয়োদর্শনফলে ও পরীক্ষা দ্বারা এমন সকল কৌশল বাহির করিয়াছেন যাহা দ্বারা উভয়ের বৈষম্য সত্ত্বেও তাঁহারা মিলন ঘটাইয়া অঘটন-ঘটন-পটীয়সী শক্তির পরিচয় দিয়া থাকেন। এক্ষণে আমরা দেখিব যে, যে দুই বৃক্ষ মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ, তাহাদিগের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিয়া কিরূপে মনোহর নূতন বৃক্ষের উৎপাদন করিতে পারা যায়। ভিন্নপ্রকৃতির উদ্ভিদ্দ্বয়কে কাছে কাছে না রাখিয়া বহুদূর ব্যবধানে রাখা উচিত। ধরিয়া লউন, ঝাউ ও আম্রবৃক্ষ মধ্যে পাঁচ-শত হাত ব্যবধান রাখিলাম। এক্ষণে ঝাউএর প্রকৃতিকে আম্রে এবং আম্রের প্রকৃতিকে ঝাউএ পরিবর্ত্তিত করিতে হইলে কোন্ পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে দেখা যাউক।

প্রথমে দুইটি ভিন্নপ্রকৃতির গাছের প্রত্যেকের প্রকৃতির পর্য্যালোচনা করা উচিত। ঝাউগাছ ঊর্দ্ধে বর্দ্ধমান, দ্রুত বৃদ্ধিশীলতাবিশিষ্ট, কিন্তু আম্রবৃক্ষ নাতিবৃদ্ধিশীল, বহুল শাখা-পত্র-প্রসারী। এক্ষণে এই দুইটিকে এমনভাবে সম্মিলিত করিতে হইবে যেন সে মিলন মধুর হয়, নয়নতৃপ্তিকর চিত্তাকর্ষক ও স্থায়ী হয়। ইতঃপূর্ব্বেই উক্ত বৃক্ষদ্বয় মধ্যে একটি মনগড়া ব্যবধান দিয়াছি, এক্ষণে সেই ব্যবধানের মধ্যস্থলকে চিহ্নিত করিয়া চিহ্নিত স্থান হইতে উক্ত কয়টি বিষয়—আকার, বৃদ্ধি ও পত্রত্ব মনে রাখিয়া আর কএকটি গাছকে সেই ব্যবধান মধ্যে স্থাপিত করিতে হইবে। উদ্ভিদ্ দুইটি নিতান্ত বিরুদ্ধপ্রকৃতির, সুতরাং এতদুভয় ব্যবধান-বিরহিতভাবে থাকিলে উভয়েরই সৌন্দর্য্য নষ্ট হইবে, উভয়েরই বিশেষত্ব তেমন উজ্জ্বলভাবে ফুটিবার অবসর পাইবে না। আমগাছের পার্শ্বে লিচু, তাহার পার্শ্বে সপেটা, তাহার পার্শ্বে কৎবেল থাকিলে আমগাছ হইতে বেশ শৃঙ্খলার উদ্ভব হইবে। এক্ষণে ঝাউ হইতে কৎবেল পর্য্যন্ত ব্যবধান মধ্যে ২।১টি চামুরে ঝাউ (Pinus) বা তৎপ্রকৃতিবিশিষ্ট গাছ রোপণ করা বিধেয়। পূর্ব্বে যে কয়টি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া উদ্ভিদ্দিগকে সাজাইতে হয়, তাহা বলিয়াছি। কিন্তু উদ্ভিদের বর্ণ-বিষয়েও অবহিত হওয়া উচিত। কোন্ বর্ণের পর কোন বর্ণ রক্ষিত হইলে নয়ন তৃপ্ত হয়, তাহা জানিয়া রাখা উচিত। কিন্তু এ সকল বিষয় ব্যবহারিক,—

পুস্তকপাঠে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায় না। ভূয়োদর্শনের ফলে জানিতে পারা যায়।

ছাদে বা বারান্দায় উদ্যানশোভা উপভোগ করিতে হইলে উদ্ভিদ্‌গণকে নিজ আয়ত্তের মধ্যে রাখিতে হইবে। এতদর্থে কাঁচি ব্যবহার করিতে হইবে। কিছুদিন পূর্ব্বে আমি কোন সাপ্তাহিকে 'কাঁচির মুখে ফুল' শীর্ষক প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে, বিচক্ষণ উদ্যানিক অসময়ে গাছে ফুল ফুটাইতে পারেন, ফুলের আকার ছোট বা বড় করিতে পারেন। সূত্র অবলম্বন করিয়া ফলের গতিকে নিয়ন্ত্রিত করা যায়, ফলও সেই নিয়মের বশবর্ত্তী। টবের গাছকে কৃত্রিম উপায়ে ছোট রাখিতে হইবে, নির্দ্দিষ্ট কএকটিমাত্র শাখা প্রশাখা রাখিতে হইবে। টবের আয়তন সাধারণতঃ সঙ্কীর্ণ বলিয়া অধিক মাটির স্থান হয় না, এবং যে মাটি থাকে তাহাও অল্পদিন মধ্যে তাহার স্থাপকতা হারাইয়া ফেলে, এবং গাছও সে মাটি হইতে সমস্ত রস শোষণ করিয়া লয়। এই সকল কারণ বশতঃ টবের মাটি ঘন ঘন বদলাইয়া দিতে হয়। পুরাতন মাটি—সব না হইলেও কতক—ফেলিয়া দিয়া সেই স্থান নূতন ও তেজস্কর সারমিশ্রিত মাটিদ্বারা পূর্ণ করিতে হয়। মাটি তেজস্কর হইলে প্রথমাবস্থায় উদ্ভিদ তেজাল ও বহুপল্লবী হইয়া পড়ে, এবং তৎসমুদায় হইতে বহু পত্র উৎপন্ন হইয়া থাকে।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দে।

নসীবের লেখা।

(১)

"ওরে অলপ্পেয়ে, ভাত ভাত যে করিস্, ভাত আসে কেমন ক'রে, তার কোন খবর রাখিস্?"

মায়ের মুখে এই রূঢ় কথা শুনিয়া পুত্র অলিমদ্দী ছলছল নয়নে মায়ের মুখের দিকে চাহিল; তাহার পর অতি কাতরস্বরে বলিল, "হারু পরামাণিক কা'ল যেতে ব'লেছে; কা'ল থেকে আমি তাদের কাজ ক'রব।"

মাতা বলিলেন, "আবার তাদের একটা গরু হারিয়ে যাক্, তাই নিয়ে শেষে হেঙ্গাম হুজ্জুত হ'ক।"

অলি বলিল, "মা, মণ্ডলদের ছাগল ত আর আমার দোষে হারায়নি। আমি কত ব'ল্লাম যে, আমি তেরটা ছাগল এনে খোঁয়াড় বন্ধ ক'রেছি। রাত্তিরে কে নিয়ে গেল, ওরা বলে আমি মাঠে হারিয়ে এসেছি; মণ্ডলের বৌ আবার বল্লে যে, আমি চুপে চুপে ছাগলটা বেচে ফেলেছি। তাইতেই ত তাদের রাখালী ছেড়ে দিলাম।"

মাতা বলিলেন, "এখেনেও যদি অমনই কিছু হয়, তখন কি হবে?" অলি বলিল, "মা, তা হ'লে বুঝব আল্লা আমার নসিবে এই সব লিখেছেন।"

মাতা তখন একটু কোমলস্বরে বলিলেন, "আমি কি আর ইচ্ছে ক'রে তোরে বকি; কার ভাত খাচ্চিস্ তা ত জানিস্।"

অলি বলিল, "সেই জন্যই ত মা, তোমারে আবার নিকে পুষতে বারণ ক'রেছিলাম; তুমি ত সে কথা শুনলে না, তুমি একই কথা ধরলে 'তোর একটা হিল্লে হবে'। কেমন, আমি তখন বলিনি?"

মাতা কোন উত্তর করিলেন না, একটি মর্ম্মভেদী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "হা আল্লা!"

(২)

অলিমদ্দী সাধু সেখের ছেলে। সাধু জমিদার বাড়ীর সর্দ্দার ছিল। সাধুর মত পাকা খেলওয়াড় তখন কালনা অঞ্চলে ছিল না। একখানি লাঠি লইয়া দাঁড়াইলে সাধু সর্দ্দার পঞ্চাশজন লাঠিয়ালের মহড়া লইতে পারিত। একবার তাহার মনিব জমিদারের সহিত আর এক জমিদারের একটা হাট লইয়া বিবাদ উপস্থিত হয়। সেই বিবাদ উপলক্ষে একটা প্রকাণ্ড দাঙ্গা হয়। সাধু সর্দ্দার সেই দাঙ্গায় একাকী সতেরজন লোককে গুরুতর জখম করিয়া

পলায়ন করে এবং দুই ঘণ্টার মধ্যে সাতক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া সাঁতার দিয়া গঙ্গাপার হইয়া কাল্‌নার থানার দারোগা সাহেবকে সেলাম করিয়া বাড়ী যায়। তারপর যখন সাধু সর্দ্দারকে আসামী করা হইল, তখন স্বয়ং দারোগা সাহেব সাক্ষ্য দিলেন যে, ঘটনার সময় সাধু সর্দ্দার কাল্‌নার থানায় উপস্থিত ছিল। সাধু বেকসুর অব্যাহতি লাভ করিল। এমন দাঙ্গা হাঙ্গামা, খুন জখম সাধু সর্দ্দার অনেক-বার করিয়াছিল, কিন্তু সে কখন বিপদে পড়ে নাই।

সাধু অনেক দিন বিবাহ করে নাই, কেহ বিবাহের কথা তুলিলে সে তাহার লাঠিখানি দেখাইয়া বলিত, "এরই সাথে আমার সাদী হ'য়েছে।" তাহার পর যেবার স্বরূপগঞ্জে একটা দাঙ্গা হয়, সেই দাঙ্গার পর মনিরদ্দী বিশ্বাসের খুবসুরত বেটীকে দেখিয়া সাধুর বিবাহের ইচ্ছা হয়। সাধু সর্দ্দারের মত জামাই পাওয়া খুব জোর কপালের কাজ। মনিরদ্দী সাধুর হাতে কন্যার ভার সমর্পণ করিয়া ইহলোকের কাজ শেষ করিল। মেয়ের বিবাহের জন্যই বোধ হয় তাহারা স্বামীস্ত্রীতে এতদিন বাঁচিয়া ছিল। বিবাহের একমাস পরেই মনিরদ্দী ও তাহার স্ত্রী বোধ হয় পরামর্শ করিয়া একদিনেই দশঘণ্টা আগেপাছে এই দুনিয়ার কাজে ইস্তফা দিয়া চলিয়া গেল।

সাধু সর্দ্দার কাল্‌নার থানার দারোগা সাহেবকে সেলাম করিয়া বাড়ী যায়।

এত বড় যোয়ান, এমন পাকা সর্দ্দার, কিন্তু এই এক সেই নবপরিণীতা যুবতী পত্নীর উপর একটা নেশা জন্মিয়াছিল! সাধুর আপনার বলিতে কেহ ছিল না। যখন এতকাল পরে সে বিবাহ করিল, তখন সে মনে করিয়াছিল, বৌ তার বাপমায়ের কাছে থাকিবে; সে নিশ্চিন্তমনে বাবুর বাড়ী সর্দ্দারী করিবে, আর যখন তখন এই সামান্য দশক্রোশ পথ দেখিতে দেখিতে পার হইয়া স্বরূপগঞ্জে আসিবে।

কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় তার উল্‌টা। সাধুর এ সংসারে লাঠিখানা ছাড়া আর কিছু ছিল না; বেশ দাঙ্গা হাঙ্গামা করিয়া মনের স্ফূর্ত্তিতে তাহার দিন কাটিয়া যাইতেছিল। শেষে চল্লিশ বৎসর বয়সের সময় বিবাহের খেয়াল তাহার মাথায় চাপিল। বিবাহ করিবার একমাস পরেই একটি সুন্দরী যুবতী পত্নীর সম্পূর্ণ ভার তাহার মাথায় পড়িল। সর্দ্দার তখন মহা গোলে পড়িল।

তাহার মনিব বলিলেন, "সাধু, স্বরূপগঞ্জের বাড়ীঘর জমাজমি বেচিয়া এখানে বাড়ী কর, আমরা জমি দিচ্ছি, ঘর তুল্‌বার খরচ দিচ্ছি।"

সাধু তাহার স্ত্রীকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিল; সাধু-পত্নী এ সাধু প্রস্তাবে সম্মত হইল না; সে বলিল, "ও ব্যবসা ছেড়ে দেও; দাঙ্গা ফেসাদ ক'রে কবে গারদে যাবে, তখন আমার কি হবে? তার চাইতে এখানে চ'লে এস। বাবা যে জমিজমা রেখে গেছেন, তাই চাষ আবাদ কর; তাতেই বেশ দিনগুজরান হবে। ও সব লাঠালাঠির আর দরকার নেই।"

অন্য সময় হইলে অন্যের মুখে শুনিলে সাধু এই প্রস্তাবে কর্ণপাত করিত না; কিন্তু এই এক মাসেই সাধু সর্দ্দারের লাঠির বহর একহাত কমিয়া গিয়াছিল; যে সাধুর কোন পরওয়া ছিল না, সেই সাধু এই এক মাসেই আর এক রকম হইয়া গিয়াছিল। স্ত্রীর কথা শুনিয়া সাধু অনেকক্ষণ দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজিয়া ভাবিল; তাহার পর বলিল, "যা'ক্, সেই ভাল। আর ও সব ভালও লাগে না।"

সা তাহার পর জমিদারের কর্ম্ম ত্যাগ করিল। জমিদার মহাশয় কত অনুরোধ করিলেন, কিন্তু সে তাহার পরিবারের পরামর্শ অগ্রাহ্য করিতে পারিল না; জমিদার বাবুকে সেলাম করিয়া বলিল, "কর্ত্তা মশাই, বড় একটা কিছু বাধ্‌লে খবর দেবেন, সাধু লহমার মধ্যে দশ কোশ পথ উড়ে আস্‌বে।"

সাধু সর্দ্দার তখন পাকা বাঁশের লাঠি তিনখানি ঘরের কোণে ফেলিয়া দিল; শ্বশুরের লাঙ্গল গরু লইয়া চাষের কার্য্যে মন দিল। গ্রামের কেহ কখন সাধুকে লাঠি খেলিতে বলিলে সাধু বলিত, "সে সব গঙ্গাপারে রেখে এসেছি; ও কর্ম্ম আর না।"

এক বৎসর পরেই সাধুর একটি পুত্রসন্তান হইল। সাধু তাহার নাম রাখিল অলিমর্দ্দী সেখ—সর্দ্দার উপাধিটাও সে মুছিয়া ফেলিল। দশ বৎসর সুখে কাটিয়া গেল; সাধুর আর সন্তান হইল না।

সাধুর স্ত্রী তাহাকে বলিয়াছিল অলিকে চাষের কাজে নিযুক্ত না করিয়া হয় লাঠিখেলা শিক্ষা দেওয়া হউক, অথবা তাহাকে পাঠশালায় দেওয়া হউক। সাধু এই দুই প্রস্তাবেই অসম্মত হইয়াছিল; সে বলিয়াছিল "দেখ বৌ, লাঠিখেলা আমি আর ওকে শিখাব না। যে দিন কা'ল পড়েছে তাতে ও কসরত আর শিখে কাজ নেই, দাঙ্গা ফেসাদ এখন আর চল্‌বে না। কোম্পানীর কাছে গেলেই যখন সকল গোলের রফা হয়, তখন ও সব আর দরকার হবে না। তবে লেখাপড়া,—তা দেখ, আমাদের চাষার ছেলে লেখাপড়া শিখ্‌লে বাবুভেয়েদের মত হ'য়ে যায়, বাপ, বড়বাপের চাষ আবাদের দিক বড় নজর দেয় না। লেখাপড়া শিখিয়ে ছেলেটার পায়া ভারি ক'রে কাজ নেই। আর এখনও ত ওর উমর এগার বছর। এখন ও খেলা ক'রেই বেড়াক। আমি যে কয়দিন আছি, সে কয়দিন ওকে আর ভাব্‌তে হবে না। তারপর আমাদের এই জমাজমির চাষ আবাদ ক'রেই ও বেশ দিনগুজরান করতে পারবে"; সুতরাং অলিমর্দ্দী কোন কাজই করিত না। সময়মত বাড়ীতে আসিয়া আহার করিত, আর নিজের মনে খেলা করিয়া বেড়াইত।

এই সময়ে একদিন সাধুর শরীর বড়ই অসুস্থ বোধ হইল; রাত্রিতে কম্প দিয়া জ্বর আসিল। তিন দিন আর সে জ্বর ছাড়িল না। চতুর্থ দিনে অলিমর্দ্দী কবিরাজ ডাকিয়া আনিল, কবিরাজ সাধুকে পরীক্ষা করিয়া বলিল, "জ্বর আজই কমে যাবে, কিন্তু গায়ে বোধ হয় ঠাকরুণ বাহির হইবে।"

কবিরাজের কথাই ঠিক হইল, সাধুকে বসন্তরোগে ধরিল। দশদিন চিকিৎসার পর সাধু স্ত্রীপুত্রকে কাঁদাইয়া চলিয়া গেল। সাধুর স্ত্রী নাবালক ছেলেটি লইয়া অকূল সাগরে পড়িল। কেমন করিয়া দিনপাত হইবে তাহা সে ভাবিয়া পাইল না।

(৩)

তখন পার্শ্বের গ্রামের জমির সেখ তাহাদের বাড়ীতে বড়ই আনাগোনা আরম্ভ করিল। সাধুর স্ত্রীর বয়স তখনও ত্রিশ বৎসর হয় নাই; তাহার সৌন্দর্য্যও তখন যায় নাই। জমির সাধুর স্ত্রীকে একদিন বলিল, "দেখ, তোমাদের বড় কষ্ট হচ্ছে। যে জমাজমি আছে, ছেলে মানুষ কি তা রক্ষা করতে পারবে, বার ভূতে সমস্ত লুটে

যাবে। তার থেকে এক কাজ কর। আমি তোমাকে নিকে করি। আমার যে দুচার বিঘে জমি আছে তার সঙ্গে তোমাদের জমিও চাষ আবাদ করব, তা হ'লে যেমন ভাবে তোমাদের চ'লে যাচ্ছিল, তাই হবে, কোন কষ্টই হবে না; ছেলেটাও মানুষ হবে।"

জমিরের এ প্রস্তাব সাধুর স্ত্রীর ভাল বোধ হইল না; সে বলিল, "না, আর আমি নিকে ক'রব না। কষ্টেসৃষ্টে ছেলেটাকে মানুষ করতে পারলে আর আমাদের দুঃখ থাকবে না। তুমি যদি একটু দয়া কর, তা হ'লে আমাদের জমি থেকে যা হবে, তাতে আমাদের বেশ চ'লে যাবে। কি বল?"

জমির বুদ্ধিমান্ ছিল; সে মনে করিল, তাড়াতাড়ি করিয়া কাজ নাই, দুচারি মাস যাকই না; তখন দেখা যাইবে।

জমির যাহা ভাবিয়াছিল তাহাই হইল। তাহার প্রলোভনে সাধুর স্ত্রীর সঙ্কল্প ঠিক রহিল না। একদিন সে জমিরকে নিকা করিতে সম্মত হইল। এগার বৎসরের ছেলে অলিমদ্দী যখন শুনিল যে, তাহার মায়ের সহিত জমিরের নিকা হইবে, তখন সে মাকে নিষেধ করিয়াছিল; কিন্তু তাহার মাতা তাহাকে বলিল, "তোর ভালর জন্যই এ কাজ করছি; এতে তোর একটা হিল্লে হবে, নহলে যা কিছু আছে সব বেহাত হ'য়ে যাবে।" অলিমদ্দী মায়ের বিবাহে আগ্রহ দেখিয়া নীরব হইল।

তাহার পর যথাসময়ে অলিমদ্দীর মাতার সহিত জমিরের বিবাহ হইয়া গেল। অলিমদ্দীর মাতা তাহাদের বাড়ী ঘর দুয়ার বিক্রয় করিয়া ছেলেটিকে লইয়া জমিরের বাড়ীতে উঠিয়া গেল। তখন জমির নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিল। সে ইতঃপূর্ব্বেই জমিদারের নায়েবের সহিত পরামর্শ করিয়া সাধুর জমি কয়খানি গ্রাস করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিল। এখন তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িল।

একদিন জমির বাড়ীতে আসিয়া তাহার স্ত্রীকে বলিল, "এ সব কি ব্যাপার, বুঝিতে পারি না। তোমাদের জমির আজ তিন বৎসরের খাজনা বাকী; তা ছাড়া কর্জ্জের বাকীও অনেক টাকা। নায়েব মশাই বল্লেন যে, এ মাসের মধ্যে যদি বেবাক টাকা চুকাইয়া না দেওয়া হয়, তা হ'লে সমস্ত জমি তাঁরা অন্যের সঙ্গে বন্দোবস্ত ক'রে দেবেন। কৈ, এত বাকীর কথা ত তুমি একদিনও আমাকে বল নাই?"

তাহার স্ত্রী বলিল, "সে কি কথা! আমি ত কিছুই জানিনা। খাজনা যে এত দিনের বাকী আছে, তা কি ক'রে জানব!"

জমির বলিল, "সাধু সদ্দারকে সকলেই ভালবাস্‌ত, নায়েব মশাইয়ের সঙ্গেও তার খুব দহরম মহরম ছিল, তাই আর তাঁরা ও সম্বন্ধে তাগাদা করেন নাই, সাধুও সে কথা ভাবে নাই। এখন মহা বিপদ! আমি এ টাকা কোথায় পাব? এখন কি করা যায় তাই বল?"

তাহার স্ত্রী বলিল, "আমি মেয়ে মানুষ, আমি কি বল্‌ব; যাতে ভাল হয়, তাই কর। জমিটুকু গেলে ছোঁড়াটার কি হবে?"

জমির বলিল, "আমার হাতে ত আর নয়শ পঞ্চাশ নেই যে, তাই দিয়ে তোমাদের জমি বাচাই, আর সাধুও দুপয়সা রেখে যায় নি! এমন জান্‌লে আমি এ সব গোলের মধ্যেই যেতাম না। পরের বালাই ঘাড়ে ক'রে এখন আমি বাড়ী আর কাছারী করি।"

এ কথার আর উত্তর নাই; অলিমদ্দীর মাতা মাথায় হাত দিয়া ভাবিতে লাগিল। তাহার কোন কথাই বুঝিতে বাকী রহিল না। কিন্তু সে স্ত্রীলোক; এ বিপদে যে কি করিতে হইবে, কাহার আশ্রয় লইতে হইবে, তাহা সে ভাবিয়াই পাইল না। এ দিকে জমির জমিদারের নায়েবের সহিত যোগ দিয়া সাধুর সমস্ত জমি নিজের নামে বন্দোবস্ত করিয়া লইল। অলিমদ্দীর মাতা যখন এই কথা শুনিল, তখন সে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া নীরব হইল।

জমিরের ব্যবহার ক্রমেই কঠোর হইতে লাগিল। অলিমদ্দীর উপরই তাহার রাগ বেশী হইল; কিন্তু এ রাগের কারণ কি, তাহা কেহই খুঁজিয়া পাইল না। বেগতিক দেখিয়া অলির মাতা পুত্রকে মণ্ডলদের বাড়ীর রাখালীতে নিযুক্ত করিয়া দিল; কিন্তু সে রাখালীতেও সে অনেক দিন থাকিতে পারিল না; একটা ছাগল হারাইয়া যাওয়ায় মণ্ডলেরা অলিকে বিদায় করিয়া দিল।

এই গল্পের আরম্ভেই মাতা ও পুত্রের যে দিনের কথোপকথন বর্ণিত হইয়াছে, সেই দিন প্রাতঃকালে জমিরের মেজাজ্‌টা, কি জানি কেন, বড়ই খারাপ হইয়াছিল। প্রথমে সে এটা ওটা বলিয়া স্ত্রীর উপর যথেষ্ট বাক্যবাণ বর্ষণ করিল; কিন্তু জমিরের স্ত্রী বড়ই ভালমানুষ; সে একটি কথারও উত্তর দিল না। কথার উত্তর না পাইলে কোন দিনই ঝগড়া বা কথা জমে না; এ ক্ষেত্রেও তাই হইল, জমিরের সকল দুর্ব্বাক্যই ব্যর্থ হইয়া গেল, তাহার স্ত্রী কোন কথারই প্রতিবাদ করিল না।

জমির তখন স্ত্রীকে ছাড়িয়া তাহার পুত্রের উপর গালি বর্ষণ আরম্ভ করিল; বলিল, "দেখ দেখি, এত বড় ছেলেটা, কাজকর্ম্ম কিছুই কর্‌বে না; শুধু ব'সে ব'সে গিল্‌বে। কেন, আমি কি ওর সাতপুরুষের দেন্‌দার। ও আমার কে যে, আমি ওকে এমন ক'রে খেতে দেব? কথা কও না যে?"

রমণী সমস্তই সহ্য করিতে পারে; সকল নির্যাতন, সকল অপমান সে মাথা পাতিয়া লইতে পারে; শুধু পারে না দুইটি কথা; একটি তাহার সতীত্বের উপর সন্দেহ, আর একটি পারে না তাহার পেটের সন্তানের উপর অবিচার। জমিরের স্ত্রীর উপর দিয়া এত কথা হইয়া গেল তাহাতে সে বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিল না; কিন্তু যখন তাহার একমাত্র পুত্রের উপর জমির অবিচার করিল, তখন তাহার মাতৃত্বের গর্ব্ব মাথা নিচু করিয়া থাকিতে পারিল না; সে তবুও ধীরভাবে বলিল, "ও তোমার কেউ নয়, কিন্তু ও আমার পেটের ছেলে।" অভাগী আর কিছু বলিতে পারিল না, তাহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল। জমির আর কিছু না বলিয়া বাড়ীর বাহির হইয়া গেল। তাহার কিছুক্ষণ পরেই অলিমদ্দী বাড়ী আসিয়া মায়ের নিকট ভাত চাহিলে তাহার মাতা অভিমানভরে যে কথা বলিয়াছিল, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

(৪)

হারু পরামাণিকের বাড়ী অলিমদ্দীর রাখালী কর্ম্ম হইল না। তাহারও কারণ জমির। জমির হারু পরামাণিককে বলিয়াছিল, "দেখ পরামাণিকের পো, অলিরে নিতে চাচ্ছ নেও; কিন্তু শেষে কিছু চুরী চামারী হ'লে আমাকে কিছু বল্‌তে পার্‌বে না; সে কথা কিন্তু আগেই ব'লে রাখ্‌ছি।" এমন প্রশংসাবাদের পর কে কাহাকে কর্ম্ম দেয়?

অলিমদ্দী পরদিন যখন পরামাণিক বাড়ী গেল, তখন হারু পরামাণিক জমিরের কথা বলিয়া তাহাকে ফিরাইয়া দিল। অলিমদ্দী বিষন্নমুখে বাড়ী আসিয়া মাতাকে সমস্ত কথা বলিল। মাতা তখন পুত্রকে সাহস দিয়া বলিল, "ভয় কি! এক দুয়োর বন্ধ দশ দুয়োর খোলা। আর দানাপানি ঠিক ক'রেই মানুষ পয়দা করে। তুই ভাবিস নে, যা হয় একটা হবে। মায়ের এই আশ্বাসবাণী শুনিয়া অলিমদ্দী মনে একটু বল পাইল, বালক তখন সহাস্য বদনে চলিয়া গেল।

সেই দিন সন্ধ্যার সময় জমির বাড়ী আসিয়া যথারীতি আহারাদি শেষ করিয়া ঘরের বারান্দায় একখানি চট পাতিয়া বসিল, এবং এক ছিলিম তামাক সাজিয়া দিবার জন্য অলিমদ্দীকে ডাকিল। অলিমদ্দী তখন বাড়ীতে ছিল না। জমিরের স্ত্রী রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া বলিল, "অলি ত বাড়ীতে নাই; তোমার কি চাই?"

জমির বলিল "বাড়ী নেই, কোথায় গেল?"

তাহার স্ত্রী বলিল, "ও পাড়ায় পীরের গান হবে, সে তাই শুন্‌তে গিয়েছে।"

জমির তখন রাগিয়া বলিল, "নবাব জান গান শুন্‌তে গেছে, ঘরের কাজ কর্ম্ম ক'র্‌লেও ত বুঝি যে, হাঁ একটা উপকার হয়।"

তাহার স্ত্রী ধীরভাবে বলিল, "ছেলেমানুষ, গান শুন্‌তে যেতে চাইল, তাই আমিই তাকে যেতে বলেছি। তোমার তামাক সেজে দিতে হবে কি?"

জমির কোন উত্তর করিল না; তাহার স্ত্রী তখন কলিকা লইয়া রান্নাঘরে গেল এবং তামাক সাজিয়া কলিকায় আগুন দিয়া জমিরের নিকট আসিয়া বলিল, "এই তামাক নেও।"

জমির তাহার স্ত্রীর হাত হইতে কলিকাটা টানিয়া লইয়া উঠানে ফেলিয়া দিল; তাহার স্ত্রী অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল; এ রাগের কারণ সে কিছুই বুঝিতে পারিল না।

স্ত্রীকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া জমির বলিল, "অমন ক'রে দাঁড়িয়ে রইলে যে?"

তাহার স্ত্রী বলিল, "তোমার এত রাগ কেন হ'ল, তাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছি।"

জমির বলিল, "সে ভাবনাই যদি তোমাদের থাকবে, তা হ'লে ত হ'তই। এই সারাদিন খেটেখুটে ঘরে এলাম কোথায় একটু সোয়াস্তি করব, তা নয় এই সব।"

তাহার স্ত্রী বলিল, "এই সব কি, তা' ত বুঝলাম না।" জমির তখন আরও রাগিয়া উঠিল; বলিল, "কি মুখের উপর জবাব! এত বড় গোস্তাকি!"

জমিরের স্ত্রী আর কথা বলিল না, চুপ করিয়া সেই স্থানে বসিয়া পড়িল। কথা বলিলেও গোস্তাকি, চুপ করিয়া থাকিলেও গোস্তাকি! এ রকম বদমেজাজি লোকের সঙ্গে কে পারিয়া উঠে?

জমির বলিল, "চুপ ক'রে রইলে যে?" তাহার স্ত্রী কোন উত্তর করিল না। তখন জমির বলিল "হারু পরামাণিক ত তোমার ছেলেকে রাখ্‌বে না। অমন চোরের ব্যাটা চোরকে কে ভাত কাপড় দিয়ে পুষ্‌বে?"

জমির তাহার স্ত্রীর হাত হইতে কলিকাটা টানিয়া লইয়া উঠানে ফেলিয়া দিল।

পুত্রের উপর এ অবিচার মায়ের প্রাণে বড়ই বাজিল; সে মনে করিয়াছিল কোন কথার উত্তর দিবে না; কিন্তু যখন তাহাকে উত্তর দিতেই হইবে, তখন সে অতি ধীরস্বরে বলিল, "অলি কোন দিন চুরী করে নাই।"

জমির গর্জ্জিয়া উঠিল বলিল, "চুরী করে নাই—সাধুর বেটা সাধু! বেজন্মা ছেলে আবার কত ভাল হবে?" ক্রুদ্ধা সিংহী গর্জ্জিয়া উঠিল—জমিরের স্ত্রী বসিয়াছিল, উঠিয়া দাঁড়াইল ঘাড় বাঁকাইয়া তীব্রস্বরে বলিল, "কি, বলিলে? খবরদার, অমন কথা আর মুখে এন না; সাবধান ক'রে দিচ্ছি। কি ব'লব তোমাকে আল্লার নাম নিয়ে নিকে করেছি, নইলে আর কেউ একথা বল্লে এতক্ষণ এই বাঁ-পায়ের লাথি দিয়ে তার মুখ ভেঙ্গে দিতাম।" জমিরের স্ত্রী আর সেখানে দাঁড়াইল না; দ্রুতগতিতে বাড়ীর বাহিরে চলিয়া গেল। জমির হাঁ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার স্ত্রীর সেই মূর্ত্তি দেখিয়া—সেই সতীত্বের গর্ব্ব, নারীত্বের অপূর্ব্ব বিকাশ দেখিয়া—সে একেবারে এতটুকু হইয়া গিয়াছিল; তাহার কথা বলিবার শক্তি অপহৃত হইয়াছিল।

বাহিরে তখন ঘোর অন্ধকার, আকাশে দুই দশটি তারা ফুটিয়া রহিয়াছে; সমস্ত গ্রামটা যেন ঝম্‌ঝম্ করিতেছে, নিকটের জঙ্গলের মধ্য হইতে ঝিঁঝিঁ পোকার স্বর সেই ঘনান্ধকার রজনীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছিল। জমির বসিয়া ভাবিতে লাগিল তাহার স্ত্রী কোথায় চলিয়া গেল? এই অন্ধকার রাত্রিতে বাড়ীর বাহির হইয়া সে ত পুকুরে আত্মহত্যা করিতে গেল না। তাহার মনে তখন ভয়ের

আর কেউ একথা বল্লে এতক্ষণ এই বাঁ পায়ের লাথি দিয়ে তার মুখ ভেঙ্গে দিতাম।

জমির একটু সাহস পাইল; সে বলিল, "তবে এখনও রাগ যায় নাই।"

তাঁহার স্ত্রী ক্রুদ্ধ স্বরে বলিল, "তুমি আজ যে কথা বলেছ তাতে যে রাগ ক'র্বে না, তাকে আমি মেয়েমানুষই বলি না। শোন, তখন রাগ বেশী হ'য়েছিল তাই কি বল্‌তে কি বলব মনে করে তোমার সুমুখ থেকে চ'লে গিয়েছিলাম। এখন আমার কথা শোন, তুমি আমাকে যে কথা বলেছ, তার পর আর তোমার ঘরে থাক্‌ব না। ছেলেটার হাত ধ'রে যে দিকে হয় চলে যাব। যে আল্লা পয়দা করেছেন, তিনি আমাদের দুজনকে দুমুঠো খেতে দিতেও পার্‌বেন। তোমার দেওয়া দানা-পানি আর আমরা খাব না। কিন্তু যাবার আগে তোমাকে একটা কথা মনে করিয়ে দিই; কাঁচা ছেলের যা কিছুই ছিল, তা এমন করে ঠকিয়ে নিয়ে তুমি ভোগ কর্‌তে পার্‌বে না—পার্‌বে না—পার্‌বে না। আমি যদি সতী নারীর মেয়ে হই, আমি যদি সদ্দারের বউ হই, তা হলে তোমায় বলে যাচ্ছি, ছেলে মানুষের ঠকিয়ে নেওয়া বিষয় তোমার থাক্‌বে না—থাক্‌বে না। আরও শোন যে মুখে তুমি আমার ছেলেকে বেজন্মা বলেছ, সেই মুখের যে কি হয় তা দশজনে দেখ্‌বে, আমি আর সে কথা মুখে আন্‌ব না।" এই বলিয়া জমিরের স্ত্রী জন্মের মত সেই বাড়ী হইতে চলিয়া গেল। পরদিন প্রাতঃকালে অলিমদ্দী বা তাহার মাতাকে কেহ আর সে গ্রামে দেখিতে পাইল না।

তাহার পর—তাহার পর—আর কি! সতীবাক্য কি কখন অন্যথা হয়। একবৎসর যাইতে না যাইতেই জমিরের শরীরে কুষ্ঠের লক্ষণ প্রকাশ পাইল। সতী রমণীর কথা ফলিয়া গেল; সর্ব্বাগ্রে জমিরের মুখেই কুষ্ঠের ক্ষত দেখা দিল।

তাহার পর—তাহার পর যাহা হইল তাহা আর শুনিয়া কাজ নাই।

শ্রীজলধর সেন।

সঞ্চার হইল। সে উঠিতে চেষ্টা করিল; কিন্তু কি ভাবিয়া আবার বসিয়া পড়িল।

একটু পরেই জমিরের স্ত্রী বাড়ী ফিরিয়া আসিল। জমির তখন ধীরভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "এই আঁধার রাত্রিরে কোথায় গিয়েছিলে?" তাহার স্ত্রী সে সকল কথার উত্তর দিল না। জমির মনে করিল তাহার স্ত্রী বোধ হয় প্রশ্নটা শুনিতে পায় নাই; তাই সে পুনরায় বলিল, "এমন আঁধার রাত্রিরে কোথায় গিয়েছিলে?"

তাহার স্ত্রী উত্তর করিল, "কোথাও যাই নাই; কোথায় যাব, তাই বাইরে গিয়ে গাছতলায় বসে ভাব্‌ছিলাম।"

শারদীয়া মাতৃভূমি।

অখিল-আনন্দকারী সাজেতে সাজ মা' আজি,
শরৎ-শর্ব্বরী এল লইয়ে রতনরাজি ;
চন্দ্রমা-তিলক পর,
তারকা কুন্তলে ধর,
অলকে শারদ অভ্র স্তবকে স্তবকে রাখ ;
ওই স্বচ্ছ স্বপ্রকাশ
পরিয়ে সুনীল বাস,
অমল কোমল শ্যাম সর্ব্বাঙ্গে চন্দ্রিকা মাখ ;
মরকতে মুক্তা ঢালা—
শশিকর-সমুজ্জ্বলা
আসলিল-শ্যাম-তটা তটিনীর হার পর ;
বনফুলে ফুলবালা—
অঙ্গে দোলা বনমালা,
শেফালি অঞ্চলে ঢালি অনিলে চঞ্চল কর ;
বাজা মা আজ বনে বনে
কোকিল-দোয়েল-স্বনে
অতুল বাঁশরী তোর পুলকিয়া চরাচর ;
স্বর্ণধান্য ভরা মাঠ,
পণ্যভরা হাটবাট,
অন্নপূর্ণা অন্ন নিয়ে সর্ব্ব গৃহ পূর্ণ কর ;
সাজমা, এল শরৎ,
আজি পুত্র মনোমত,
চরণে পূজিব তব সর্ব্ব অর্থ কাম্য যত ;
তোর বনফুলে আজি
ভরিয়া এনেছি সাজি,
তোর রত্ন তোরে দিব—পুরা মা এ মনোরথ।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র মিত্র।

কর্ম্মবীর।

অঙ্গুলি পরশে তব বীণার যে তার
ঝঙ্কারি উঠিয়াছিল সুরে তানে লয়ে,
হে যন্ত্রি ! শোন গো শোন, তাহার ঝঙ্কার
গগনে ভুবনে আজ পড়ে ব্যাপ্ত হ'য়ে।
অসাড় অঙ্গুলি তব ; মহানিদ্রাঘোরে
ধূলিতলে সুখসুপ্ত আছ গো শয়ান ;
হে কর্ম্মি, কর্ম্মের তব বিধাতার বরে
—অনন্ত সুফল প্রসূ—নাহি অবসান।
কল্যাণ এনেছে সে যে তাই কর্ম্মবীর
স্মরিয়া তোমারে সবে ভক্তি-নত-শির।

শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী দেবী

প্রতীচ্যের পুরাতন ভাস্কর্য্য।

যাহা কিছু বিজাতীয় তারই প্রতি অন্তরের একটা বিরাগ ভাব আজ কাল আমাদের দেশে দু চারিজনের ভিতর দেখা দিয়াছে। নানা কারণে সমাজ যখন দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং প্রাকৃতিক নিয়মে ক্রমে যখন আবার সেই পতিত সমাজে জীবনী শক্তি দেখা দেয়, তখন এরূপ একটা পরের প্রতি বিরাগ ও নিজের প্রতি অত্যধিক প্রাণের টান লক্ষিত হইয়া থাকে। হারান ধন ফিরিয়া পাইলে মানুষ যেমন অন্তরের সমস্ত আগ্রহ দিয়া তাহাকে গ্রহণ করে, তেমনই সমাজের প্রাণের স্পন্দনের সহিত মানুষ নিজেদের সব জিনিসগুলিকেই অত্যধিক প্রেমের চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করে এবং তখন বাহিরের সব জিনিষকেই অপেক্ষাকৃত ছোট বলিয়া ধারণা করে। চিত্র এবং ভাস্কর্য্য সম্বন্ধে অত্যধিক স্বদেশানুরাগ আজকাল আমাদের স্বাধীন চিন্তাকে যেন একটু ম্লান করিয়া ফেলিতেছে। নিজের জিনিষকে ভালবাসা এবং উহাকে বড় করিয়া দেখায় বিশেষত্ব থাকিতে পারে, কিন্তু মহত্ত্ব নাই; নিজের বস্তুকে যথার্থভাবে জানিয়া উহার যথার্থ মূল্য বুঝিয়া, মৌমাছির মত বিশ্ব ঘুরিয়া আরও ভাল ভাল বস্তু সংগ্রহ করিতে শিক্ষা করা ও আপনার সম্পদকে বৰ্দ্ধিত করাই মহত্ত্বের পরিচায়ক। কৃপণের মত ধনবৃদ্ধির উপায় না করিয়া কেবল বসিয়া বসিয়া আপনার ধনের প্রশংসা বা চিন্তায় সময় কাটাইলে অনর্থই সংঘটিত হইয়া থাকে, কারণ, বৃদ্ধিতেই স্বাস্থ্য প্রকাশ পায়, স্থৈর্য্যে স্থবিরতা ও ধ্বংস আনয়ন করে। কল্পনার কষ্টিপাথরে ঘসিয়া নিজের পিত্তলকে সোণা এবং পরের সোণাকে পিত্তল ঠাওরাইয়া লওয়াতে বিশেষ কিছুই লাভ নাই। নব-জাগ্রত জাতির প্রাণ সমুদ্রের ন্যায় গভীর, আলোকের মত ব্যাপক ও বায়ুর মত সর্ব্বগ হওয়া চাই। অভাব ও অতৃপ্তির ভাব প্রাণে না জাগিলে ও অপর জাতির নিকট হইতে সত্য গ্রহণের শক্তি না জন্মিলে জাতি গঠিত হইতে পারে না। যতদিন জাতির প্রত্যেক নরনারী মক্ষিকাবৃত্তি অবলম্বন না করিবে, ততদিন জাতিরূপ মধুচক্র কখনই গঠিত হইতে পারিবে না। পুরাতন বা নূতন সকল জাতির ইতিহাসই এই সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। ইংরেজ ত্রিভুবন তন্ন তন্ন করিয়া, আকাশ পাতাল ভ্রমিয়া যেখানে যে ধন পাইতেছে তাহাই সংগ্রহ করিয়া তাহার দেশ জননীকে অপূর্ব্ব গৌরবশালিনী করিতেছে। সে নিজের পরের জিনিসের প্রশংসার উপর প্রশংসা ও ব্যাখ্যার উপর ব্যাখ্যা করিয়া সময় অতিবাহিত করে নাই।

চিত্র ও ভাস্কর্য্য জাতীয় জীবনের দর্পণ। একটা জাতির স্বরূপ ঐ মুকুরে প্রতিফলিত দেখিতে পাওয়া যায়। এই হিসাবে চিত্র ও ভাস্কর্য্যের মূল্য মানবসমাজে অত্যন্ত বেশী। আমি যখন দর্পণে মুখ দেখি, তখন যেমন আমার বদনমণ্ডলের সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করি, তেমনই সঙ্গে সঙ্গে কোথাও একটু কলঙ্ককালিমা থাকিলে তাহাও দেখিতে পাই। স্বীয় বদনমণ্ডলের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ ও অভিভূত হইয়া যদি সেই কালিমাটুকুকে উপেক্ষা করিয়া জনসমাজে বাহির হই, তবে আমার মুখে কালি দেখিয়া লোক হাসিবে। সুকুমার কলায় কলঙ্করেখাপাত দেখিয়া যদি তাহাতে অবহিত না হই, তাহা হইলে উপহাস বিদ্রূপের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিব কি করিয়া? আমাদের চিত্র ও ভাস্কর্য্য অতি সুন্দর, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই কলালক্ষ্মীর সুবর্ণ মূর্ত্তিতে একটু মলামাটি দেখা দিয়াছে। উহার শোধন আবশ্যক। ভাস্কর্য্যে প্রতীচ্য অনেকদূর অগ্রগামী হইয়াছে। আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই পড়িয়া আছি—ভাস্কর্য্যের দোষগুণ শোধন করিতে হইলে প্রতীচ্যের পুরাতন ভাস্কর্য্যের বিশেষত্ব কি তাহা জানিতে হইবে—তাহার যাহা আমাদের আদর্শের যতটুকু অনুকূল, ততটুকু গ্রহণ করিয়া আমাদের আদর্শ গঠিত করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধের অবতারণা করিতেছি।

পুরাতন গ্রীক এবং রোমীয় সভ্যতাই প্রতীচ্যের সকল সভ্যতা ও উন্নতির মূল স্বরূপ। ঐ উৎস হইতেই আজ অসংখ্য শ্বেত-জাতির সভ্যতা ও সাধনা অসংখ্য স্রোতস্বিনীর ন্যায় ত্বরিত-তরঙ্গরঙ্গে ছুটিয়া চলিয়াছে। চিত্র ও ভাস্কর্য্য-সাধনায় প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যে দুইটা বিভিন্ন ধারা দেখিতে পাওয়া যায়। পুরাতন গ্রীক ও রোমীয় ভাস্কর্য্য প্রকৃত্যনুসারী। আর ভারতের ভাস্কর্য্য, ভাব ও কল্পনা

...প্রয়োগ। এই কারণে য়ুরোপের ভাস্কর্য্য আজ প্রকৃতিপ্রধান
...জড়াত্মক। আর ভারতের ভাস্কর্য্য ভাব-কল্পনার প্রতি-
মূর্ত্তি। সেই জন্যই ভাবের অভাবেও প্রতীচ্যের ভাস্কর্য্য-সৃষ্টি
...চলিয়াছে এবং কল্পনার অভাব হওয়াতে ভারতের
ভাস্কর্য্য অধুনা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। প্রকৃতি অনন্তরূপিণী
... বৈচিত্র্যময়ী; তাই প্রতীচ্যের ভাস্কর্য্য নানাভাব ও নানা
... ভরপুর; ভারতের ভাস্কর্য্য ভাব ও কল্পনার অভাবে
প্রাণহীন। এই কারণেই প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যের ভাস্কর্য্যে
তুলনা অসম্ভব। নীলকান্ত ও পদ্মরাগের আদর চিরকালই
থাকিবে; তবে কাহারও নিকট নীলকান্তের আদর, কাহারও
নিকট পদ্মরাগের আদর, অধিক। ভারতের ভাস্কর্য্যের গুণ
গাহিতে গিয়া গ্রীক ও রোমীয় ভাস্করগণের আজীবন সাধ-
নার ধনকে অবহেলা করা অদূরদর্শিতা ও সঙ্কীর্ণতারই
পরিচায়ক। আমরা শূন্য-ভাণ্ডার পূর্ণ করিতে বসিয়াছি,
এই বিশ্ব-ফুলবনে সকল কুসুমের মধু আহরণ করিয়া
অপূর্ব্ব মধুচক্র রচনা করাই আমাদের কাজ। সঙ্কীর্ণতাকে
সর্ব্বে পরিহার করিয়া তবে আমাদিগকে ভাস্কর্য্যের সাধনায়
মনোনিবেশ করিতে হইবে। এক্ষণে প্রতীচ্য ভাস্কর্য্যের
কয়েকটি নমুনা লইয়া সৌন্দর্য্য বিশ্লেষণ করা যাউক ;—১ম চিত্র
ডেমেটার বা কীরিজ—আমাদের লক্ষ্মীদেবী আর গ্রীকদের
কীরিজ প্রায় একই ভাবসম্পন্না। তবে কীরিজে মাতৃত্বের
ভাবটি কিছু বেশী পরিস্ফুট হইয়াছে। কল্পনাবলে আমাদের
অন্নপূর্ণা এবং লক্ষ্মীমূর্ত্তিকে একবারে সম্মিলিত করিলে
কীরিজের মাতৃত্বের পূর্ণানুভূতি হয়। এই অপূর্ব্ব মূর্ত্তি
লণ্ডনের বৃটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত হইয়াছে; এখানে আসিয়া
অবধি কতবার যে এই মূর্ত্তি দেখিয়াছি, তাহার সংখ্যা নাই,
তবু যেন নয়ন তৃপ্ত হইতে চায় না। আশৈশব মাতৃহীন
... এই অনন্ত-স্নেহশালিনী বিশালহৃদয়া প্রসন্নবদনা জননী-
... সম্মুখে উপস্থিত হইলে, আমার হৃদয়ে যে ভাব-লহরী
... হয় তাহা ভাষায় প্রকাশ করিতে পারি না! জননীর
... অভয়-দায়িনী মূর্ত্তি যাঁহার মানসনেত্রে প্রথম প্রতিফলিত
...ল, এবং যাঁহার কলা নৈপুণ্যের উদ্ভাবিনী-শক্তিতে
...ই মূর্ত্তির প্রচার হইয়াছিল, সেই মহাপুরুষ আজ
পরলোকগত হইয়া সকলের ধন্যবাদার্হ। এমন জননীর সন্তোষ ও

১ম চিত্র ডেমেটার বা কীরিজ।

রক্ষা-বিধানকল্পে গ্রীক-সন্তানদল যে হাসিতে হাসিতে হেলায়
প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?
আমরা যদি মাকে এমন করিয়া দেখিতে শিখিতাম—যদি
মায়ের মূর্ত্তি এমন করিয়া গড়িতে জানিতাম—তবে কি আজ
আমাদের মায়ের এ দশা ঘটিত? তবে কি আজ মাকে
সন্তানের নিত্য অকাল-মৃত্যু দর্শন করিয়া অন্তরজ্বালায় জ্বলিয়া
অবিরল অশ্রুজলে ভাসিতে হইত? ভাবে কতটুকু গভীরতা
থাকিলে, শিল্পে কতটুকু নৈপুণ্য থাকিলে, এমন মাতৃমূর্ত্তি
গড়িতে পারা যায়, এবিষয়ে যিনি অনুধাবন করিয়াছেন,
তিনিই বুঝিতে পারিবেন। করাল-বদনা মহিষাসুর-মর্দ্দিনী
ভৈরবী দশভুজার মাতৃরূপ কয়জনে ধারণা করিয়া উঠিতে
পারে? যে সমস্ত প্রবীন সাধক সাধনার ফলে এরূপ
ভাস্কর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাঁহারা চিরদিনের মত চলিয়া
গিয়াছেন! বিজ্ঞানের এই উন্নতির যুগে, মানব-চিন্তার
স্বাধীনতার ও বিকাশের যুগে, এমন স্নেহময়ী দয়াময়ী

২য় চিত্র—ভিনাস্।

ইহার কল্পনায় সেটা নাই। ইহার আদর্শ ফুল-গন্ধের মত প্রীতিপ্রদ, মলয়ের মত নির্ম্মল, আকাশের মত প্রশান্ত, জ্যোৎস্নার মত উজ্জ্বল। ইহাতে প্রেম ও সৌন্দর্য্য গঙ্গা-যমুনার মত সম্মিলিত হইয়াছে;—কামের নাম গন্ধ ইহাতে নাই। ইহা চণ্ডীদাসের কামগন্ধহীন পীরিতি,—ইহাতে মাধুরী উছলিয়া পড়িতেছে, ইহা লালসার লেশমাত্র উদ্রেক করে না। এই মূর্ত্তির দিকে ক্ষণকাল দেখুন—দেহের যে কোনও অংশ পৃথক্ ভাবে নিরীক্ষণ করুন দেখিবেন পূর্ণতা, মাধুর্য্য ও সুষমায় ভরিয়া রহিয়াছে,—দেহের ও মুখমণ্ডলের প্রত্যেক বহির্গঠন রেখা সৌন্দর্য্যে মহিমময়। এই মূর্ত্তির সম্মুখে সকল শিক্ষাভিমান নিমেষে অন্তর্হিত হইয়া যায়—ইহার জনক ভাস্করের উদ্দেশ্যে মস্তক স্বতঃই নত হইয়া পড়ে।

৩য় চিত্র, শোক-গ্রস্তা রমণী;—এই মূর্ত্তি লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়মে স্থাপিত রহিয়াছে। রমণী এ সংসারে যাহাকে সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়াছিল, প্রেম ও মাধুর্য্য দিয়া যাহার জীবনকে স্বর্গীয় সুখে ভরপুর করিয়া দিয়াছিল,—সুখে দুঃখে, বিপদে সম্পদে, স্বাস্থ্যে অসুস্থতায় লতিকার মত যাহাকে নিরন্তর আশ্রয় করিয়া ছিল—দেখিতে দেখিতে অকস্মাৎ যখন কালজলধি-নীরে তাহার সেই চির ঈপ্সিত আগ্রহের ধন—চির আশ্রয়-স্থল ভাসিয়া গেল, যখন তাহার মৃণাল ভুজ-বন্ধন ছিন্ন করিয়া তাহার প্রাণপ্রিয়তম চলিয়া গেল, তখন সেই রমণীর মনের অবস্থা এই মহাপ্রেমিক ভাস্কর এই মূর্ত্তিটিতে পরিস্ফুট করিতে প্রয়াস পাইয়া সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধকাম হইয়াছেন। কাব্যের পর কাব্য রচনা করিয়াও যে ভাব পরিস্ফুট করা দুঃসাধ্য, তাহাই তিনি প্রস্তরে খোদিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন! মানব-চরিত্রে কত দূর অভিজ্ঞতা থাকিলে, মানবের হৃদিসাগর-বেলায় শোক-দুঃখের উর্ম্মিগুলি কেমন করিয়া আকুলঅন্তরে কাঁদিয়া বেড়ায়, সে সকলের সঙ্গে কতটা সাক্ষাৎ-পরিচয় থাকিলে তবে এমন মূর্ত্তি গড়িতে পারা যায়, তাহা যিনি এই মূর্ত্তি দেখিবার সুযোগ পাইয়াছেন তিনিই বলিতে পারেন!

মাতৃমূর্ত্তি আর একটি গঠিতে হইল না কেন? কখনও হইবে কি না তাহা কে বলিতে পারে?

২য় চিত্র, ভিনাস্;—ইহা মাইলোর ভিনাস্ নামে বিখ্যাত। বহু ভাস্কর ও তক্ষণ-শিল্পী ভিনাসের বহুতর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছেন, কিন্তু ইহার সৌন্দর্য্য অপরাজেয় অনবদ্য। নয়নাভিরাম এই মূর্ত্তি প্যারীস সহরের বিখ্যাত লুভর মিউজিয়মে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ভিনাসের কল্পনা অতি মধুর—আমাদের রাধিকা, বা মাধুর্য্য-রসের কল্পনার মত ততটা ব্যাপক ও গভীর না হইলেও ইহা ভালবাসা ও সৌন্দর্য্যের মিলন-কেন্দ্র। এই দেবীর কল্পনার অনুরূপ আদর্শ আমাদের শাস্ত্রে নাই। রতির কল্পনার সঙ্গে ইহার কতকটা সাদৃশ্য আছে বটে, কিন্তু রতির আদর্শে রক্ত মাংস-সম্ভব সম্ভোগের দিক্‌টা বড়ই বেশী!—

ভাস্কর্য্যে, বিজ্ঞানাংশের অভিব্যঞ্জনে ইহা অতুলন, বস্ত্রের প্রত্যেক ভাঁজটি, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গঠন ও সন্নিবেশ নিখুঁত। অথচ ভাবপ্রকাশে বিন্দুমাত্র ত্রুটী লক্ষিত হয় না। যাঁহারা বলেন চিত্র বা ভাস্কর্য্যের বিজ্ঞানাংশ অর্থাৎ এনাটমি বা পারস্পেক্টিভের সম্যক্ প্রয়োগে ভাবের অভাব ঘটিয়া থাকে তাঁহাদের সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি ও সীমাবদ্ধ জ্ঞানের প্রতি করুণ উপহাস করিবার জন্যই যেন এই মূর্ত্তি আজ মানব-সমাজে দণ্ডায়মান। অবৈজ্ঞানিক ও কাল্পনিক ভিত্তির উপরে অপূর্ব্ব চিত্র ও ভাস্কর্য্যের সৌধ নির্ম্মাণ করিয়া মানবকে মুগ্ধ করিতে হইলে কতটা মনীষা ও উদ্ভাবনীশক্তির পরিচয় দিতে হয় তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। মিথ্যাকে সত্যের আবরণ দিয়া ভাবের সাহচর্য্যে নয়নরঞ্জন করিতে হইবে; কারণ চিত্র বা ভাস্কর্য্যের লক্ষণই হইল সৌন্দর্য্যসৃষ্টি। তবে একথা স্বীকার করিতে হইবে, উজ্জ্বল মধুরের সমাবেশে যে কেবল সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি হয় তাহা নহে; ভৈরব গম্ভীরে, সান্দ্র তমিস্রায়, নির্জ্জন ভূধরকন্দরে, উত্তালবারিধির ভীষণ গর্জ্জনে সৌন্দর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। আবেগ ও কল্পনা নিয়ত চঞ্চল ও পরিবর্ত্তনশীল, কাজেই প্রকৃতি ও বিজ্ঞানের পিঞ্জরে ইহাদের আবদ্ধ করিয়া না রাখিতে পারিলে পাখীর মত ইহারা উধাও হইয়া উড়িয়া উড়িয়া বেড়াইবে—আমাদের জীবনের কোনও কাজেই আসিবে না।

৩য় চিত্র—শোক প্রপ্তা রমণী।

চতুর্থ চিত্র—বিশ্ববিশ্রুত মহাকবি হোমর:—জগতে এমন কে আছেন যিনি এই অন্ধ কবির সহিত পরিচিত নন? আমাদের বাল্মীকি ও রামায়ণ এবং গ্রীকদের হোমর ও ইলিয়ড্ জগতে অতুলনীয়। সীতা এবং হেলেন যেন যমজ-ভগিনীর মত চিরকাল মানুষের স্মৃতি-নন্দনবনে অনন্ত সুষমায় বিরাজিত থাকিবে; আমাদের মধুর কল্পনার মধুময় লোকে অফুরন্ত মধুচক্ররূপিণী ইঁহারা চিরদিনই বিরাজ করিবেন।

প্রতীচ্যবাসী নিতান্ত কাজের লোক, তাই ইঁহারা হেলেনের রচয়িতাকে প্রস্তরে খুদিয়া মানবের জন্য অক্ষয় অমর করিয়া রাখিয়াছেন; আমরা একটু সৃষ্টিছাড়া রকমের, তাই আমাদের কুটিরে সীতা-লক্ষ্মীর অপূর্ব্ব জীবনী গায়ক বাল্মীকির মূর্ত্তি নাই। এই মূর্ত্তিটিতে অন্ধ-কবির নয়নের জ্যোতিবিহীনতার ভাবটি কেমন সুন্দরভাবে ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। হৃদয়ে যে জ্যোতির আবির্ভাব হইলে ইলিয়ড্ রচনা করিতে পারা যায়—হেলেনের সৃষ্টি সম্ভবপর হয়—সে জ্যোতিই প্রকৃত জ্যোতিঃ। এই মহান্ প্রেমের জ্যোতিঃ অন্ধ কবির নয়নজ্যোতির ভিতর দিয়া কেমন খেলিতেছে, একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করুন। হৃদয়ের যে অসীম করুণা বদনমণ্ডলে ক্রীড়া করিতেছে, তাহার সমক্ষে নয়নের জ্যোতিঃ কোন্ ছার।

৪র্থ চিত্র—বিশ্ববিশ্রুত মহাকবি হোমর।

৫ম চিত্র—সক্রেটিস:—এই মহাপুরুষের জীবন এক অভূতপূর্ব্ব করুণকাহিনীপূর্ণ। আমরা হতভাগ্য মানুষ; অজ্ঞানতা, অন্ধতা, ও বর্ব্বরতার বশবর্ত্তী হইয়া, যে মহাপুরুষ আমাদের দুঃখে করুণহৃদয়ে সমবেদনার অশ্রু ফেলিয়া আমাদিগকে বক্ষে টানিয়া লইয়াছিলেন, আমাদের অন্ধ নয়নে জ্ঞানাঞ্জন মাখাইয়া আমাদিগকে শ্রেয়ের পথ দেখাইয়া দিতে চাহিয়াছিলেন, সেই মহাপুরুষের প্রেমের পরিবর্ত্তে তাঁহারই বক্ষের রক্ত শুষিয়া লইয়াছি, তাঁহাকে বিষপানে লোকান্তরিত করিয়াছি। জগতে একবার নয়, শতবার শত নির্যাতনে ক্রুশকাষ্ঠে আবদ্ধ করিয়া, ব্যাধের বাণে বিদ্ধ করিয়া বা বিষপ্রয়োগে কত পুণ্য-জীবন গ্রহণ করিয়াছি তাহার কি ইয়ত্তা আছে? সক্রেটিসের জীবন আমাদের এ তথা-কথিত ধর্ম্মমূলক অন্ধ-বিশ্বাস ও বর্ব্বরতার কাহিনী অনন্তকাল ঘোষণা করিবে। ঐ সর্ব্বসন্তোষের আকর প্রেমময় নয়নদ্বয়ের বিশাল দৃষ্টির দিকে তাকাইয়া দেখুন, যেন বলিতেছে, "আমায় বিষ দিবে, দাও, আমি তোমাদের মুখের দিকে চাহিতে চাহিতে তোমাদের দেওয়া বিষ পান করিয়া এখান হইতে চলিয়া যাইব। তোমরা বাঁচিয়া থাক, তোমরা সুখে থাক, আমার জীবনের কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে—তোমরা একদিন আমার মর্ম্মকাহিনী বুঝিবে—জ্ঞানালোকে সত্যের সন্ধান পাইবে—মঙ্গলময়ের মঙ্গলাশিসে তোমাদের মঙ্গল হউক—দাও গরল দাও।" যদি কখনও আমরা মানুষ হই, তবে বুঝিতে পারিব আমরা অতীত যুগে কত অপদার্থ ছিলাম, আমরা কেমন করিয়া পশুর মত যুগে যুগে আমাদের প্রেমাবতার সত্যানুসন্ধিৎসু চিরবন্ধু ও চিরসুহৃদসকলকে অন্যায় করিয়া শত নির্যাতনে নির্যাতিত করিয়াছি; এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত—মহাপুরুষদিগের অনুচারের জন্য অনুসরণ ও তাঁহাদের প্রদর্শিত সত্যপথে বিচরণ বিজ্ঞানালোচনা ও নিত্য-নবাবিষ্কার প্রতীচ্যবাসীকে উন্নতির দিকে অগ্রসর করিতেছে। ধর্ম্ম, কাব্য, সাহিত্য বা শিল্প, বিজ্ঞানের ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত না হইলে মানবজীবন সুফলপ্রদ হয় না। তাই বিজ্ঞানালোচনাফলে জাপান উন্নতির উচ্চশিখরে উঠিয়াছে; চীন উঠিতে চেষ্টা করিতেছে। বিজ্ঞানালোচনা করিলে আমরাও উন্নত হইব। ভাস্কর্য্য কাহারও এক-

৫ম চিত্র—সক্রে

নিজস্ব সম্পত্তি নয়। সকল দেশের ভাস্কর্য্যেই সকলের সমান অধিকার। আমাদের সঙ্কীর্ণবুদ্ধি পরিহার করিয়া দৃষ্টিকে প্রসারিত করিতে হইবে। বিজ্ঞানের ভিত্তিতে ভাস্কর্য্যের চর্চ্চা করিয়া আমাদের জাতীয় সাধনাকে, আমাদের জাতীয় আদর্শকে প্রস্তরে মূর্ত্ত করিয়া তুলিতে হইবে। গ্রীক বা রোমীয় ভাস্কর্য্যের প্রতি অবহেলা করিলে চলিবে না—সেই সকল পূর্ব্বগামী ভাস্করদিগের নিকট হইতে আমাদের শিখিবার অনেক জিনিষ আছে। ভাস্কর্য্য চর্চ্চা করিতে হইলে যে আমাদের বিশেষ কোনও অভাবনীয় নূতন পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে তাহা বুঝিতে পারি না। বঙ্গের এই নবযুগের দিনে—নবসাধনার দিনে ভাস্কর্য্য ও তক্ষণ শিল্পের দিকে আমার স্বদেশবাসীকে অবহিত হইতে দেখিলে আনন্দিত হইব।

শ্রীঅশ্বিনীকুমার বর্ম্মণ।

লণ্ডন।

ছিন্নহস্ত।

(শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত।)

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

(পূর্ব্বাবৃত্তি :— ব্যাঙ্কার মঃ ভরজারস্ বিপত্নীক। এলিস তাঁহার একমাত্র কন্যা, ম্যাক্সিম ভ্রাতুষ্পুত্র, ভিগ্‌নরী খাজাঞ্চি, রবার্ট সেক্রেটারী, ভেনলিভাণ্ড দ্বারবান, ম্যালিকর্ন মালখানা রক্ষক এবং জজেট বালক ভৃত্য। তাঁহার যে বাটীতে বাস, তাহাতেই ব্যাঙ্কও স্থাপিত। একদিন তাঁহার বাটীতে নিশা-ভোজ; ভিগ্‌নরী ও ম্যাক্সিম এক সঙ্গে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিয়া দেখে খাজাঞ্চিখানার বিচিত্র কল-কৌশল-সমন্বিত লৌহ-সিন্দুকে কোন রমণীর মূল্যবান্ ব্রেসলেট্-পরিহিত ছিন্ন বামহস্ত সংবদ্ধ রহিয়াছে। এ ঘটনা তৃতীয় ব্যক্তির কর্ণগোচর না করিয়া ম্যাক্সিম ঐ সদ্য-ছিন্ন হস্তের অধিকারিণী নিরাকরণে প্রবৃত্ত হইলেন।

রবার্ট এলিসের পাণি প্রার্থী, বৃদ্ধ ব্যাঙ্কার কিন্তু তাহার বিরোধী। নীচের অভিজাত বংশে জন্ম বলিয়া তাহার ব্যবসায়বুদ্ধি সম্বন্ধে ভরজারস্ সন্দিহান ছিলেন। তিনি ভিগনরীকে জামাতৃপদে বরণ করিতে ইচ্ছুক। কিন্তু তিনি কন্যার সহিত কথোপকথনে বুঝিয়াছিলেন যে এলিস রবার্টের প্রতি অনুরক্ত। তাই তিনি রবার্টকে স্থানান্তরিত করিবার জন্য তাহাকে স্বীয় মিসরস্থিত কার্য্যালয়ের ভার দিয়া পাঠাইবার প্রস্তাব করিলেন। সে দিন রবার্ট সে কথার উত্তর দিল না; কিন্তু পরে ভিগনরীকে বলিল যে, সে মিসরে যাইবে না—দেশত্যাগী হইবে।"

কর্ণেল বেরিসফের ১৮ লক্ষ টাকা ও মূল্যবান্ দলিলাদি সমেত একটি বাক্স ভরজারসের ব্যাঙ্কে গচ্ছিত ছিল। তিনি ঐ দিবস আসিয়া বলেন যে, পরদিন তাঁহার কিছু টাকার প্রয়োজন।

ম্যাক্সিম্ সায়াহ্নে ভিগনরীকে জানাইল যে, ছিন্নহস্ত সম্বন্ধে পুলিস-অনুসন্ধান আরম্ভ হইয়াছে। পরে দুই বন্ধু রঙ্গালয়ে অভিনয় দর্শন করিতে গেল। সেখান হইতে মধ্যরাত্রিতে ফিরিয়া ভিগনরী রবার্টের এক পত্র পাইলেন, তাহাতে লেখাছিল যে, সে সেই রাত্রিতেই দেশ-ত্যাগ করিয়া চলিল।

পরদিন প্রাতঃকালে কর্ণেল বোরিসফ টাকার জন্য আসিলেন। ভিগনরী তাঁহাকে বলিলেন লৌহ সিন্দুক কে খুলিয়াছে, বোধ হয় টাকা কড়ি অপহৃত হইয়াছে। তখনই ভরজারসকে সংবাদ দেওয়া হইল। তিনি ব্যাপার দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, কারণ সিন্দুকের চাবি তাঁহার নিকট থাকে। শেষে সিন্দুকের টাকাকড়ি গণিয়া দেখা গেল যে, ৫০ হাজার টাকা নাই এবং কর্ণেলের দলীলের বাক্সও নাই। সকলেরই সন্দেহ হইল রবার্ট এই কার্য্য করিয়াছে। পুলিসে সংবাদ দিবার প্রস্তাব হইল, কর্ণেল তাহাতে সম্মত হইলেন না, তিনি গোপনে অনুসন্ধান করিতে বলিলেন। তাহার পর যখন রবার্টের অনুসন্ধান করিবার কথা হইল, তখন ভিগনরী বলিল যে, সে বিগত রাত্রিতে সহর ছাড়িয়া গিয়াছে। সন্দেহ আরও দৃঢ় হইল। ভরজারস্ তাহার পরই গৃহমধ্যে গিয়া এলিসকে এই সংবাদ দিল; তাহার প্রণয়পাত্র যে চুরি করিয়া পলায়ন করিয়াছে এ কথা সে কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিল না; সে পিতার কোলে মুখ লুকাইয়া আবেগে সংজ্ঞাশূন্যা হইয়া পড়িল।)

উক্ত ঘটনার কএক দিবস পরে দুই বন্ধুতে রুদে লা চৌসি দে এনটিন অভিমুখে চলিযাছিলেন।

জুলস্ ভিগ্‌নরী বলিলেন, "কোথায় যাইতেছ বল দেখি ?"

"সে জায়গায় তুমি কখনও যাও নাই। সেখানে বড় মজা!"

"আমার মজা দেখিবার অবকাশ নাই। এ সময় কি আমোদ ভাল লাগে!"

"সে কথা ঠিক। ছিন্নহস্ত, কর্ণেলের বাক্স, পঞ্চাশ হাজার টাকা!—চিন্তার কথা বটে! কিন্তু তাহাতে তোমার কি? তিনি ত তোমায় সন্দেহ করেন নাই। আর ছিন্নহস্তের সঙ্গে লৌহসিন্ধুকের কোন সম্বন্ধ আছে, সে সংবাদও তিনি রাখেন না।"

"তুমি আমায় কোন কথা প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়াছ বলিয়াই আজ আমার মন এত অপ্রসন্ন। সব কথা বলিতে পারিলে হয় ত রবার্টের উপর চুরীর সন্দেহ আর থাকিত না।"

"আমার বিশ্বাস, এ কাজ রবার্টের। তাহা না হইলে সে অমন করিয়া পলাইত না। আরও এক কথা, সাধারণ চোর সব টাকাই চুরী করিত। রবার্টের টাকার দরকার ছিল। সে প্রয়োজনীয় অর্থ লইয়াই চলিয়া গিয়াছে। মনে করিয়াছে, সময়ে টাকাটা ফিরাইয়া দিলেই চলিবে; কিন্তু অলঙ্কারের বাক্সে কি ছিল বল ত? সম্ভবতঃ কোনও রমণীর গুপ্তরহস্য। রমণী রবার্টের সঙ্গে এক যোগে এই কাজ করিয়াছে। প্রথমতঃ নিজেই চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু হাতখানি যাওয়াতে অবশেষে রবার্টের সাহায্য লইয়াছিল। রবার্ট তখন বরখাস্ত হইয়াছে। সে ভাবিল, ক্ষতি কি? সঙ্কেতও তাহার জানা ছিল। এখন যাহার জিনিস, তাহাকে ফিরাইয়া দিয়াছে, টাকাটা আমেরিকা-যাত্রার জন্য রাখিয়াছে। আমার ত এইরূপ অনুমান।"

"এ সব তোমার কল্পনা,—নিতান্ত অমূলক ধারণা। রবার্টের অন্য কোন প্রণয়িনী কখনও ছিল না।"

"তুমি কেমন করিয়া জানিলে?"

"তোমার ভগিনীকে সে ভালবাসে।"

"ওটা ঠিক প্রমাণ নয়। আমার ভগিনীর সহিত ত তাহার সবে দুই বৎসর পরিচয়। তাহার পূর্ব্বে সে যদি কোনও রমণীর প্রেমে পড়িয়া থাকে, সে রমণীর প্রভাব ত থাকিতে পারে!"

"তোমার ধারণা অত্যন্ত অসার। সে এমনই মূর্খ যে, পূর্ব্ব প্রণয়িনীর কথায় নিজের মানসম্ভ্রম, সর্ব্বস্ব জলাঞ্জলি দিবে?"

"তোমার কথা হয় ত ঠিক। কর্ণেল বোরিসফ্ কি কাল জ্যেঠা মহাশয়ের বাড়ী যাবেন? আমি একবার তাঁকে দেখিতে চাই।"

"তিনি চুরীর পরদিবসেই চলিয়া গিয়াছেন।"

"কোথায় গেছেন?"

"তা আমি কি জানি? তবে আমার সন্দেহ হইতেছে, তিনি রবার্টের সন্ধানে গিয়াছেন।"

"তিনি তা' হ'লে গোয়েন্দাগিরী করিতেছেন? আমার বিশ্বাস, উহাই তাঁহার ব্যবসায়। কোন গুপ্ত দৌত্য লইয়া তিনি এখানে এসেছেন, বরাবর এইরূপ আমার ধারণা। আমি যদিও নূতন ডিটেক্‌টিভগিরী আরম্ভ করিয়াছি; কিন্তু আমার বিশ্বাস, তাঁহার আগেই আমি চোরকে গ্রেপ্তার করিব। রবার্টকে খুঁজিয়া বাহির করায় আমার দরকার নাই। একহস্তবিশিষ্টা রমণীর সন্ধান করিব, তাহা হইলেই চোর ধরা পড়িবে।"

"যদি বাস্তবিক তুমি রমণীকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পার, তা' হ'লে সত্যই রবার্টের উপকার করা হবে।"

"কিন্তু তোমার সব আশা যে নিবে যাবে! এলিস তখন তাহার পূর্ব্বপ্রণয়ের দিকেই ঝুঁকিবে। যাই হউক না কেন, আমি কিন্তু হাল ছাড়িতেছি না। কারনোয়েল যদি নির্দ্দোষ সাব্যস্ত হয়, তা' হ'লে সে কথা আমিই প্রথমে চারিদিকে ঘোষণা করিয়া দিব; কিন্তু যদি দেখি সে এই একহস্তহীনা রমণীর সহকারী—বেশ ত, তাহাতে তারই অনিষ্ট, তোমার মঙ্গল।"

"তোমার সে ব্রেস্‌লেট্‌টা কোথায়?"

"তুমি হ'লে হয় ত উহা হস্তখানার সঙ্গেই সীন নদের জলে ফেলিয়া দিতে! আমি কিন্তু তাহা করি নাই। আমার পরিচিত জহুরীকে সেটা দেখাইয়াছিলাম। সে বলিয়াছে, কিছু দিন আগে একটি সুন্দরী যুবতী তাহার দোকানে উহা মেরামতের জন্য

আসিয়াছিল। সপ্তাহ পরে আবার লইয়া গিয়াছিল। নগরের প্রায় সমস্ত সম্ভ্রান্ত রমণীকে সে চিনে, কিন্তু এই রমণী তাহার সম্পূর্ণ অপরিচিতা। সম্ভবতঃ সে সম্প্রতি প্যারী নগরীতে আসিয়াছে। অলঙ্কারখানির গঠনও এদেশীয় নয়—সম্পূর্ণ বৈদেশিক।"

"তা' হ'লে ব্রেস্‌লেট্‌টা তোমার কাছেই আছে?"

"নিশ্চয়ই। বাড়ী রাখিলে পাছে চুরী যায়, তাই নিজের হাতেই পরিয়াছি।"

"লোকে দেখিতে পাইলে তোমায় কিন্তু বিদ্রূপ করিবে।"

"আমি না দেখাইলে লোকে দেখিবে কেমন করিয়া? আর যদিই বা দেখে, লোকে ভাবিবে উহা আমার প্রণয়িনীর প্রণয়োপহার।"

"যাহা হউক, আমায় কোথায় লইয়া যাইতেছ বল দেখি?"

"কেন ব্রেস্‌লেট্‌টি হাতে বাঁধিয়া রাখিয়াছি, বুঝিয়াছ?"

"না ভাই!"

"এই অলঙ্কারের অধিকারিণীর সন্ধানে আমি রঙ্গালয়, নৃত্যসভা, সর্ব্বত্রই যাইব।"

"তুমি নিশ্চয়ই পাগল হইয়াছ। এক সপ্তাহ পূর্ব্বে যার শরীরে এমন অস্ত্রোপচার হইয়াছে, সে কি কখনও রঙ্গালয়ে যাইতে পারে? এখন হয়ত সে শয্যাশায়িনী, নয় ত মরিয়া গিয়াছে।"

"স্কেট্ ক্রীড়াপ্রাঙ্গণে আমি তাহাকে দেখিতে পাইব, সে আশায় যাইতেছি না।"

"ওখানে আমি যাই না, ভাই।"

"অবশ্য জোর করিয়া তোমায় আমি সেখানে লইয়া যাইব না। ইচ্ছা হয় আসিতে পার। না, থাক্, তুমি বাড়ী ফিরে যাও। কি জানি, যদি জ্যেঠা মহাশয় শুনিতে পান তুমি এই সব স্থানে আসিয়াছ, হয় ত এলিসকে বলিয়া দিতেও পারেন। এজন্য এলিস তোমার উপর অসন্তুষ্টও হইতে পারে। কি, তুমি এলিসের কথা ভাবিতেছ না? সেটা ঠিক নয়। আমার একান্ত ইচ্ছা, তোমাদের উভয়ের মিলন হয়—তুমি বাড়ী যাও।"

"তুমি সেখানে কি করিবে বল ত? আমার ভারী কৌতূহল হইয়াছে।"

"আজ যত সুন্দরী রমণীর সহিত দেখা হইবে, সকলকেই ব্রেস্‌লেট্‌টা দেখাইব। সম্ভবতঃ কেহ না কেহ আমার হাতে উহা দেখিয়া বিস্মিত হইবে; তখন কথায় কথায় কাহার হাতে এ অলঙ্কার ছিল, তাহার নিকট হইতে এ সংবাদ জানিয়া লইব।"

"বুঝিলাম বটে, কিন্তু আমার বিশ্বাস হয় না যে, ইহাতে কাজ হইবে। অদৃষ্টের খুব জোর যদি থাকে, তা' হ'লে হয় ত অলঙ্কারাধিকারিণীর পরিচিতা কাহারও সহিত তোমার সাক্ষাৎ হইতে পারে, কিন্তু সেটা কি সম্ভব?"

"অবশ্য প্রথম বারেই যে দেখা পাইব, তা নয়। চেষ্টা করিতে করিতে ক্রমশঃ হইবে। এক এক করিয়া যখন অনেকে ব্রেস্‌লেট্‌টি দেখিবে, তখন হয় ত সমগ্র প্যারীনগরীর মধ্যে একটা আন্দোলন উপস্থিত হইবে। লোকে বলাবলি আরম্ভ করিবে যে, আমি একটা বিচিত্র হীরকখচিত ব্রেস্‌লেট হাতে পরিয়া আছি। হয় ত যাহার অলঙ্কার, তাহার কানেও কথাটা পৌছিতে পারে; তখন কোনও ছলে আমার নিকট হইতে কঙ্কণখানি কৌশলে হস্তগত করিবার অভিপ্রায়ে আমার কাছে আসিবে। যাই হ'ক না কেন, জ্যেঠা মহাশয় ও এলিস্ এ সব কথা যেন শুনিতে না পান। তবে যদি আমি বুঝিতে পারি, কারনোয়েল চুরীব্যাপারে সংশ্লিষ্ট নয়, তা' হ'লে কিন্তু আমি প্রকাশ করিয়া দিব—রবার্ট সম্পূর্ণ নিরপরাধ।"

"আহা ভগবানের অনুগ্রহে তাহাই হউক। আমায় কিন্তু সব কথা জানাইও। তুমি যে কাজের ভার লইয়াছ, উহা বড়ই বিপজ্জনক বলিয়া আমার মনে হইতেছে।"

"আমি শিশু নই। আচ্ছা, তবে এখন বিদায়। আবার শীঘ্র দেখা হইবে।"

ভিগ্‌নরী বন্ধুর করমর্দ্দন করিয়া বিদায় লইলেন। ম্যাক্সিম ও স্কেট ক্রীড়াক্ষেত্রাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। ম্যাক্সিম গাড়ী ও লোকের ভিড় ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। এমন সময় কেহ পশ্চাদ্দিক্ হইতে তাঁহার বাহুমূল স্পর্শ করিল। ম্যাক্সিম পশ্চাতে চাহিবামাত্র দেখিতে পাইলেন,

একটি বালক দ্রুতবেগে পার্শ্বস্থ দ্বারপথে অন্তর্হিত হইল। ঘটনাটি তুচ্ছ, কিন্তু ম্যাক্সিম্ সতর্ক হইলেন। মনে মনে ভাবিলেন, "সাবধানে না চলিলে হয় ত কেহ ব্রেস্‌লেট্‌টি চুরী করিতে পারে।"

ম্যাক্সিম্ ধীরে ধীরে চলিতে লাগিলেন। ক্রীড়াক্ষেত্রে অনেক লোকের সমাগম হইয়াছিল। প্রত্যেকের মুখ নিরীক্ষণ করিতে করিতে যেখানে ঐক্যতান-বাদন হইতেছিল, সেখানে গিয়া দাঁড়াইলেন। সহসা তিনটি পরিচিতা রমণীকে তিনি দেখিতে পাইলেন। তাঁহাদের সহিত কোনও পুরুষ ছিল না। ম্যাক্সিম তাঁহাদের পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইলেন।

একটি যুবতী বলিল, "এখন আর আপনার দেখা পাই না কেন?"

ম্যাক্সিম্ বলিলেন, "আমি এখন অন্যের প্রণয়াসক্ত, সুতরাং অন্য রমণীর সহিত আলাপ পরিচয় এখন নিষিদ্ধ।"

"আপনি প্রণয়ে পড়িয়াছেন!"

"ওঃ! সে কি প্রগাঢ় প্রেম!"

তৃতীয়া রমণী বলিলেন, "কথাটা ঠিক। প্রণয়িনীর প্রেম ঠিক উঁহার হাতে দেখিতেছি।"

ম্যাক্সিম্ যে ভাবে চেয়ারের উপর হাত রাখিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, তাহাতে ব্রেস্‌লেট্‌টি বেশ দেখা যাইতেছিল।

প্রথমা যুবতী বলিলেন, "বাঃ, সুন্দর ব্রেস্‌লেট্‌টি ত! কিন্তু আপনার প্রণয়িনী কত কদর্য্য উপহার দিয়াছেন। হীরকে তেমন উজ্জ্বলতা নাই, বড় মলিন।"

অপরা বলিলেন, "সম্ভ্রান্ত বিলাসিনীদিগের পছন্দ বড় একটা দেখা যায় না।"

তৃতীয়া যুবতী বলিলেন, "আপনার প্রণয়িনীর বোধ হয় বয়স হইয়াছে। আমার পিতামহীর এই রকম এক গাছা ব্রেস্‌লেট্ ছিল।"

ম্যাক্সিম্ তাচ্ছিল্যভাবে বলিলেন, "এ বিষয়ে আপনাদের অভিজ্ঞতা নাই। মহিলাটি বিদেশিনী। তাঁহার সমস্ত অলঙ্কার উত্তরাধিকারীসূত্রে তিনি পাইয়াছেন।"

"এই কঙ্কণগাছা আমি যেন কোথায় দেখিয়াছি।"

"বাস্তবিক? কার হাতে দেখিয়াছিলেন, বলুন ত?"

"নামটা এখন ঠিক মনে পড়িতেছে না। আচ্ছা, দুই চারি দিনের মধ্যেই মনে আসিবে। আপনি ভাবিতেছেন, আমি মনগড়া কথা বলিতেছি? তা নয়; শীঘ্রই আমি আপনার প্রণয়িনীর নাম বলিয়া দিব।"

ম্যাক্সিম্ ভাবিলেন, রমণী যে ভাবে বলিতেছেন, কথাটা হয়ত সত্য। তিনি এ বিষয়ে আরও প্রশ্ন করিয়া যাইতেছেন, এমন সময় বাধা পড়িল। জনৈক হঙ্গেরীবাসী চিকিৎসক তাঁহাদের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। আকৃতিতে ইঁহাকে চিকিৎসক বলিয়া বুঝা অসম্ভব। বিপুল শ্মশ্রুভারে তাঁহার মুখমণ্ডল আচ্ছন্ন, পরিধানে সৈনিকের অনুরূপ পরিচ্ছদ। কিন্তু লোকটি প্রকৃতই চিকিৎসক। জার্ম্মাণ ও পোলাণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি শিক্ষালাভ করিয়া পরে চিকিৎসাব্যবসায় অবলম্বন করেন। এখন বহু অর্থ সঞ্চয় করিয়া তিনি ব্যবসায় একরূপ ছাড়িয়া দিয়াছেন। কিন্তু কেহ ডাকিলে, তিনি ডাক ফিরাইয়া দেন না। তবে চিকিৎসার বিনিময়ে এখন আর অর্থ গ্রহণ করেন না। ম্যাক্সিম চিকিৎসকের আগমনে অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন।

ম্যাক্সিমের সহিত ডাক্তারের পরিচয় হইয়া গেল। এ কথা সে কথার পর ডাক্তার বলিলেন, "এ দিকে আসুন, একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখিতে পাইবেন।"

সহসা চিকিৎসকের এরূপ ঘনিষ্ঠ ব্যবহারে ম্যাক্সিম একটু বিস্মিত হইলেন। ডাক্তারের সঙ্গে যাইবার ইচ্ছা তাঁহার ছিল না; কিন্তু একটু চিন্তা করিয়া ভাবিলেন, "ক্ষতি কি ব্যাপারটা দেখাই যাক্ না কেন? একটু পরে মহিলাদিগের কাছে ফিরিয়া আসিলেই চলিবে।"

"কি মহাশয়! ব্যাপারখানা কি?"

ডাক্তার বলিলেন, "আপনাকে একটি অপূর্ব্ব সুন্দরী দেখাইব। দেখিলে বুঝিতে পারিবেন।"

উভয়ে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেন। ডাক্তার মৃদুস্বরে বলিলেন, "এইখানে দাঁড়ান, সুন্দরী এখনই এখানে আসিবেন। দেখিলে বুঝিতে পারিবেন, কি অপরূপ রূপ!"

ম্যাক্সিম ডাক্তারের নির্দ্দেশ মত ক্রীড়াক্ষেত্রের দিকে চাহিয়া রহিলেন। দূরে একটি রমণী স্কেট পায় আঁটিয়া ঘুরিতেছিলেন। তাঁহার অপূর্ব্ব ক্রীড়ানৈপুণ্য দর্শনে চারিদিকে লোকের জনতা হইতেছিল। সহসা রমণী তীরগতিতে ম্যাক্সিমের পাশ দিয়া চলিয়া গেলেন। ম্যাক্সিম্ দেখিলেন,

ম্যাক্সিম্ দেখিলেন, যুবতী অসামান্যা সুন্দরী।

"নিশ্চয়। মহাশয়, এই রমণী কোন্ দেশীয় জানেন কি ?—প্যারী রমণী কথনই নন।"

"আমি জানি না। সম্ভবতঃ সুন্দরী আমাদের দেশের। কারণ পোস্তনগরে আমি এই শ্রেণীর রমণী দেখিয়াছি।"

"আচ্ছা, আমি খোঁজ লইতেছি। সুন্দরীর সহিত আলাপ করিতেই হইবে।"

ডাক্তার চলিয়া গেলেন। ম্যাক্সিম্ রমণীর সৌন্দর্য্যে এত মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, নিজের উদ্দেশ্য ভুলিয়া গেলেন। ভিগ্নরী যদি এখন থাকিতেন তাহা হইলে বন্ধুর আত্মবিস্মৃতিতে তিনি নিশ্চয়ই বিস্মিত হইতেন। ম্যাক্সিম রমণীর প্রতীক্ষায় দ্বারপার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিলেন। সহসা কেহ পশ্চাৎ হইতে বলিল, "নমস্কার, মসিয়ে ম্যাক্সিম্!"

ম্যাক্সিম্ বালক ভৃত্য জক্কেট্‌কে তথায় দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। "তুই এখানে কি ক'চ্ছিস ?"

বালক বলিল, "আমি রোজ সন্ধ্যার পর এখানে আসি।"

"এই অল্প বয়সে তুই এই সব জায়গায় আসিস্? দাঁড়া, এবার ভিগ্নরীকে বলিয়া দিব। তোকে খুব শাস্তি দিবে।"

"কেন? আমি ত কোনও অন্যায় কাজ করি নাই। আমার ঠাকুরমার জন্যই আমি এখানে আসি। সত্যি মহাশয়, আমার ঠাকুরমা বড় গরীব। আমি ছাড়া তার আর কেউ নাই। এখানে রোজ রাত্রিতে আমি উপরি তিন চার ফ্রাঙ্ক রোজগার করি। আপনার জ্যাঠা মহাশয় মাসে পঁচিশটি ফ্রাঙ্ক আমায় দেন। উপরি রোজগার না হ'লে আমাদের চলে না।"

"আচ্ছা, এবার তোমার মাহিনা বাড়াইয়া দিতে বলিব।"

"ওঃ! তা হলে আমার ঠাকুরমা কত খুসীই হবেন!"

যুবতী অসামান্যা সুন্দরী, তাঁহার নয়নযুগল আয়ত ও কৃষ্ণতার। রমণী ম্যাক্সিমের দিকে একবার চাহিলেন। তাঁহার বিস্ময় অপনোদন হইবার পূর্ব্বে রমণী তখন বহুদূরে চলিয়া গিয়াছেন।

ডাক্তার মসিয়ে ভিলানস্ বলিলেন, "এখন কি বলেন? রমণী সুন্দরী নন কি ?"

"আপনার কথাই ঠিক। এমন সুন্দরী আমি দেখি নাই। কারণ এখানকার অধিবাসিনী হইলে একদিন না একদিন আমার নজরে পড়িতেন। আহা, কি চমৎকার রূপ! কি অপূর্ব্ব অঙ্গসৌষ্ঠব! বোধ হয়, এখনই এখান দিয়া ফিরে যাইবেন।"

ডাক্তার মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "তবে আপনি সুন্দরীর প্রতীক্ষায় থাকুন, আমি চলিলাম। ক্লাবে দেখা হইবে ত?"

"আচ্ছা, এখন চ'লে যা। তুই আমায় যে চিনিস, এ রকম ভাব দেখাস না যেন।"

"যে আজ্ঞে। মসিয়ে ম্যাক্সিম, যদি জলে ডুবিবার কি আগুনে ঝাঁপ দেবার জন্য, লোকের দরকার হয়, আমায় আদেশ ক'রবেন, আপনার জন্য আমি প্রাণ দিতে প্রস্তুত।"

[illegible] সদয়ে [illegible] ম্যাক্সিমকে অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেল। ম্যাক্সিম্ দেখিলেন, অপূর্ব্ব সুন্দরী তখন পদতল হইতে স্কেটের চাকা খুলিয়া ফেলিতেছেন। আলাপের এই শুভ সুযোগ। সুন্দরী যখন বাহিরে যাইবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময়ে ম্যাক্সিম অগ্রসর হইয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "ভদ্রে, একজনের সহিত আমি বাজী রাখিয়াছি। আপনি যদি আমার একটু সাহায্য করেন!"

সুন্দরী বিন্দুমাত্র বিস্মিত অথবা বিচলিত না হইয়া বলিলেন, "কিসের বাজী?"

"আপনাকে স্কেট ক্রীড়ায় রত দেখিয়া আমার বন্ধু বলিয়াছিলেন যে, আপনি হলাণ্ড, রুসিয়া অথবা সুইডেনের অধিবাসিনী। তিনি বলিয়াছেন, উত্তর দেশের রমণীর এমন সুন্দর নয়ন হয় না।"

"আপনার বন্ধুর ভুল হইয়াছে।"

"আমারও তাই বিশ্বাস। দক্ষিণ দেশে এমন সুকৌশলে স্কেট ক্রীড়া করিবার সুবিধা ত হয় না, সুতরাং আপনি উত্তরদেশবাসিনী। আমি দশ টাকা বাজী জিতিয়াছি।"

"না মহাশয়, আপনি হারিয়াছেন। আমি ফরাসিনী।"

"মহাশয়ার নাম তা হ'লে সালোটি অথবা রোসেনি?"

"আমার নাম জষ্টিন্।"

"আপনি ঠাট্টা করিতেছেন!"

"আপনিই আমার সঙ্গে বিদ্রূপ করিতেছেন। আপনার কথার উত্তর দেওয়াই আমার অন্যায় হইয়াছে।"

"তাতে দোষ কি, আমি কি অন্যায় প্রশ্ন করিয়াছি? আপনি সুন্দরী এ কথা বলা কি আমার অপরাধ?"

"না, তা নয়, প্রশংসা আমি ভালবাসি; কিন্তু সীমা অতিক্রম করিবেন না, মহাশয়! আমি এখন বাড়ী চলিলাম।"

"চলুন আমিও আপনার সঙ্গে যাইতেছি।"

"আমি কিন্তু অনুমতি দিব না।"

"না দিন, আমি অনুসরণ করিতে পারিব।"

"ভদ্রলোক ভাবিয়া আপনার সঙ্গে কথা বলিয়াছি।—আমায় একা বাড়ী যাইতে দিন। আশা করি, আপনি অনর্থক আমায় বিরক্ত করিবেন না।"

"আমায় বলা বৃথা। আপনি পছন্দ করুন আর নাই করুন, আমি আপনার সঙ্গে যাইবই। যদি দরজা বন্ধ করিয়া দেন, বাহিরে পড়িয়া থাকিব।"

যুবতী ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "আপনি যেরূপ নাছোড়বান্দা দেখিতেছি, তাহাতে আপনার কথায় সম্মত দেওয়া ছাড়া উপায় নাই। কিন্তু আমি হাঁটিয়া যাইব, আপনার সহিত একত্রে গাড়ীতে যাইব না। আর একটা সর্ত্ত আছে; বাড়ীর কিছু দূর হইতেই আপনি চলিয়া আসিবেন আমার বিনা অনুমতিতে আমার সঙ্গে দেখা করিবার চেষ্টা করিতে পারিবেন না।"

"তথাস্তু"—ম্যাক্সিম্ হাত বাড়াইয়া দিলেন। যুবতী অসঙ্কোচে উহা গ্রহণ করিলেন।

বাহিরে আসিয়া ম্যাক্সিম্ বলিলেন, "যদি একান্ত হাঁটিয়া যাইতে হয়, তবে আপনি আমায় পথ দেখাইয়া লইয়া যাইবেন।"

তখন রাত্রি দ্বিপ্রহর। আকাশ চন্দ্রকে লইয়া হাসিতেছিল। এ পথ সে পথ করিয়া উভয়ে বহুদূর অগ্রসর হইলেন। রাজপথ জন-বিরল, সুতরাং উভয়ের প্রেমালাপ কাহারও কর্ণগোচর হইবার সম্ভাবনা ছিল না। ম্যাক্সিম্ এতক্ষণ তন্ময় হইয়াই আলাপ করিতেছিলেন, প্লেস্ ডি লা য়রোপের কাছে আসিয়া তাঁহার চমক ভাঙ্গিল। তিনি সতর্কভাবে চারিদিকে চাহিয়া বলিলেন, আজিকার এ নৈশ অভিসারের পরিণাম কি, কে জানে? একটা প্রকাণ্ড সেতুর উপর উঠিয়া ম্যাক্সিম্ চাহিয়া দেখিলেন, রেলিংয়ের উপর ভর দিয়া তিনটি লোক দাঁড়াইয়া কি দেখিতেছে।

ম্যাক্সিম্ বলিলেন, "এ সকল লোক দেখিয়া কি আপনার আশঙ্কা হয় নাই? একা এ পথে কি আসিতে পারিতেন?"

"আমি হাঁটিয়া আসিতাম না। গাড়ী করিয়া আসিতাম। রাত্রিতে এ দিক্‌টা খুব নির্জ্জন বটে, কিন্তু আমিও ভীরু নই।"

"আপনার বাড়ী কোন্ খানে ?"

"রু জোক্রয়।—পথটি বড় দূর ; কিন্তু আপনার আগ্রহ বেশী কিনা, তাই শাস্তি দেবার জন্য আমিও সে কথা বলি নাই।"

"এরূপ শাস্তি বড় মধুর। যদি আপনার বাড়ী আরও দূরে হইত !"

"ওঃ, আপনি কোটের নীচে বস্ত্র পরিধান করিয়াছেন না কি ? আমার হাতে কি যেন ফুটিতেছে।"

ম্যাক্সিম্ ব্রেস্‌লেটের কথা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। যুবতী যেরূপভাবে প্রশ্ন করিলেন, তাহাও বিচিত্র। কিন্তু ম্যাক্সিম সত্য গোপনের কোনও কারণ দেখিলেন না। তিনি বলিলেন, "ও একটা ব্রেস্‌লেট্।"

"প্রেমচিহ্ন! আমি ভাবিয়াছিলাম, এ সব বাতিক আপনার নাই।"

ম্যাক্সিম্ সে কথার উত্তর না দিয়া বলিলেন, "আপনার সম্পূর্ণ নামটি ত আমায় বলিলেন না !"

রমণী বলিলেন, "আমি তবু খানিকটা বলিয়াছি। কিন্তু আপনার নাম আমি এখনও জানিতে পারি নাই। প্রথমে আপনারই বলা উচিত।"

এ সকল লোক দেখিয়া কি আপনার আশঙ্কা হয় না।

"আপনার ডাকনাম জষ্টিন্, আমার ডাকনাম ম্যাক্সিম।"

"ওঃ বুঝিয়াছি, আমার পদবীটা না শুনিয়া নিজের পদবীটা বলিতে চাহেন না, কেমন ? আমার পূরা নাম জষ্টিন্ সার্জ্জেণ্ট ; আপনার পূরা নাম এখন বলুন ?"

"ম্যাক্সিম্ ভরজারস্, বয়স পঁচিশ, কিছু পৈতৃক সম্পত্তি আছে, এখনও অকৃতদার। চরিত্র পবিত্র. হইয়াছে ? আপনাকে আমি কিছুই গোপন করিতে চাহি না।"

"কিন্তু সবটি ত জানা গেল না ! আপনার প্রণয়িনী—যাহার নিকট হইতে ব্রেস্‌লেট্‌টি পাইয়াছেন, তাঁহার নামটি কি, তাহা ত বলিলেন না !"

"আমার প্রণয়িনী কেহ নাই, কাহারও কাছে আমি বাঁধা পড়ি নাই।"

"বেশ। এখন ব্রেস্‌লেট্‌টি যদি আমি চাই, আপনি কি আমায় উহা দিবেন ?"

ম্যাক্সিমের শরীরে কেহ যেন তুষারশীতল জল ঢালিয়া দিল। ব্রেস্‌লেট্‌টি হাতছাড়া হইলে, ছিন্নহস্ত-রমণীর সন্ধান আর হইবে না। কিন্তু সে আশা তিনি ছাড়িতে পারেন না। রমণীর উপর তাঁহার একটু সন্দেহও হইল। সুন্দরী তাঁহার ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "আমি আপনাকে পরীক্ষা করিতেছিলাম ; হয় ত অলঙ্কারটি মূল্যবান। সামান্য এক নারীর জন্য সেটা কি আপনি পরিত্যাগ করিতে পারেন, এ কথাটা আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল।"

ব্যস্তভাবে ম্যাক্সিম বলিলেন, "তা নয়, তা নয়, ব্রেস্‌লেট্‌টি যদি আমার পূর্ব্বপুরুষদিগের স্মৃতিচিহ্ন না হইত—"

(এই ছবিখানি ... প্রবাসীর ... ছবিখানি ... হইবে।)

"থাক্, থাক্, আপনাকে কৈফিয়ৎ দিতে হইবে না। আপনি স্বেচ্ছায় আমায় বাড়ী পর্য্যন্ত পৌছিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন, তাই আসুন। একা এত রাত্রিতে এ পথে আসিতে সত্যই আমার ভয় করিত। আমি পদব্রজে কখনও এত রাত্রিতে বাড়ীর বাহির হই নাই। এ পথটাও যে এত নির্জ্জন, আগে তাহা জানিতাম না।"

"ভয় নাই, আমি আপনাকে পথিমধ্যে রাখিয়া যাইব না। আশঙ্কারও কোনও কারণ দেখিতেছি না।"

"আপনি হাসিবেন না। আমার মনে হইতেছে, কেহ যেন আমাদের পিছু লইয়াছে।"

ম্যাক্সিম ফিরিয়া চাহিলেন, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। প্রফুল্লভাবে তিনি বলিলেন, "যদিও কোন বিপদ্ ঘটে, আমি আপনাকে রক্ষা করিব। আমার হাত ধরিবেন কি ?"

"না, ধন্যবাদ! আপনার কঙ্কণটি আমার হাতে ফুটিবে।"

"কঙ্কণের কথাটা আপনি ভুলিতে পারেন নাই দেখিতেছি। আপনি যদি সমস্ত ঘটনাটা শোনেন, তাহা হইলে আমায় দোষ দিতে পারিবেন না।"

"থাক্, আমি শুনিতে চাহি না।"

"আমার সহিত হয় ত আর আপনার দেখা হইবে না। আর পাঁচ মিনিট পরেই সব শেষ হইবে। আমার জীবনের উপন্যাস প্রথম পৃষ্ঠাতেই শেষ হইয়া যাইবে।"

"ছোট গল্পই ভাল। উঃ—পথটা কি অন্ধকার! পশ্চাতে পদশব্দ যেন শোনা যাইতেছে। চলুন তাড়াতাড়ি যাই।"

ম্যাক্সিম্ দেখিলেন, তিনি অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছেন। পথঘাট সম্পূর্ণ অপরিচিত। গতিরও বিরাম নাই। হাঁটিয়া এতটা পথ ফিরিয়া যাওয়াও কষ্টকর। কিন্তু পথে একখানিও ত গাড়ী নাই। মনে মনে ভাবিলেন, স্ত্রীলোকটির সঙ্গে আসিয়া তিনি ভাল করেন নাই। ভবিষ্যতে তিনি আর উহার সহিত দেখা করিবার চেষ্টা করিবেন না; কিন্তু রমণীর কি চমৎকার রূপ!

অপরিচিতা বলিলেন, "এতক্ষণে নিরাপদ স্থানে পৌঁছিলাম। এই পথের উপরেই আমাদের বাড়ী। এতটা পথ কষ্ট করিয়া আপনি আমার সঙ্গে আসিলেন, সেজন্য সহস্র ধন্যবাদ। সত্যই আমি বড় ভয় পাইয়াছিলাম।"

"চলুন, আপনার বাড়ীর দরজা পর্য্যন্ত যাই।"

যুবতী একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "আমার জন্য আপনি যখন এতটা কষ্ট স্বীকার করিলেন, তখন আপনার অনুরোধ উপেক্ষা করা সঙ্গত হইবে না। আচ্ছা, আসুন।"

ম্যাক্সিম তাঁহার অনুবর্ত্তী হইলেন। একটা নূতন অট্টালিকার সম্মুখে দাঁড়াইয়া তিনি গেটের দরজা চাবী দিয়া খুলিলেন।

"ভবিষ্যতে যখন আপনার সহিত দেখা করিতে আসিব, তখন কি এই দরজা দিয়া প্রবেশ করিতে হইবে?"

রমণী বলিলেন, "কই, এমন কথা ত আমি বলি নাই যে, আপনার সহিত আমি দেখা করিব।"

"বলেন নাই বটে; কিন্তু আমি যদি কাল আসি, আপনি কি আমায় তাড়াইয়া দিবেন?"

"কাল সকালেই আমি প্যারী ছাড়িয়া চলিয়া যাইব।"

"চিরকালের জন্য?"

"না, দিন পনের পরে আবার আসিব।"

"আচ্ছা, ততদিন আমি অপেক্ষা করিয়া থাকিব।"

"ততদিনে আপনি আমার কথা ভুলিয়া যাইবেন। না গেলেও আপনি আমার সহিত দেখা করিবেন না।"

"আপনার পরামর্শ আমি শুনিব না।"

"না শোনেন, নিজেই কষ্ট পাইবেন। যদি একান্তই আসিতে চাহেন, পনের দিন পরে আসিবেন। এখন বিদায়।"

রমণী দরজায় চাবী দিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে অন্ধকারে অদৃশ্য হইলেন।

ম্যাক্সিম্ অগত্যা সেইখানে দাড়াইয়া বাড়ীটি লক্ষ্য করিয়া দেখিয়া লইলেন। তিনি বাড়ীটি দেখিতেছেন, সহসা মনুষ্যপদশব্দ তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। ফিরিয়া দেখিলেন, যে তিনটি লোককে তিনি পোলের উপর দেখিয়াছিলেন, তাহারাই আসিতেছে। আর একটি মূর্ত্তি যেন দেওয়ালের পার্শ্ব দিয়া তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতেছে বোধ হইল। তাঁহার মনে একটা অনিশ্চিত আশঙ্কা

সন্দেহ হইল। তিনি নিরস্ত্র, পথেও লোকজন নাই, আক্রান্ত হইলে সাহায্য পাইবার সম্ভাবনাও অল্প। অনুসরণকারীদিগের উদ্দেশ্য নিশ্চয় ভাল নয়।

তিনি ভাবিলেন, "স্ত্রীলোকটি কৌশল করিয়া কি আমাকে এখানে লইয়া আসিল? ব্যাপারটা হাসিয়া উড়াইবার নয়। ব্রেস্‌লেট্‌টি হাতছাড়া করা হইবে না। না—আমারই ভ্রম, উহারা আর ত অগ্রসর হইতেছে না। কিন্তু একটা মূর্ত্তি যেন গুড়ি মারিয়া আসিতেছে।"

ম্যাক্সিমের হৃদয়ে অতুল সাহস। তিনি ব্যাপারটা কি, জানিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। দুই তিন পদ যাইবামাত্র অতি মৃদুস্বরে কে বলিল, "নড়িবেন না, মসিয়ে ম্যাক্সিম। আমি!"

"বিস্মিতভাবে ম্যাক্সিম্ বলিলেন, "কে তুমি? কেহ উত্তর দিল না। পর মুহূর্ত্তেই ছায়ামূর্ত্তি তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তিনি চিনিতে পারিয়া বলিলেন, "কে, জর্জ্জেট? তুই এখানে?"

"চেঁচাইবেন না। উহারা আপনার গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছে। আমি উহাদের কথাবার্ত্তা শুনিয়াছি। উহারা ডাকাত। আমি উহাদের চেহারা দেখিয়াই চিনিয়াছি।"

"আমাকে আক্রমণ করাই যদি উহাদের উদ্দেশ্য, তবে এতক্ষণ চুপ করিয়া আছে কেন?"

"এ পথে অনেক লোকের বাস। গণ্ডগোলে লোকজন আসিয়া পড়িতে পারে। কিন্তু ঐ রাস্তায় লোকজনের বাস বেশী নাই। আপনি ঐখানে পৌঁছিলেই উহারা কাজ সাবাড় করিবার চেষ্টা করিবে। তাই চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।"

"এখন কি করা যাবে? যদি অন্য পথে যাই, উহারাও আমার পেছু লইবে।"

"কিন্তু আমি যতক্ষণ আপনার সঙ্গে আছি, ততক্ষণ আপনার কিছু করিতে পারিবে না।"

"তোর মত একটা ক্ষুদে ছোঁড়ার ভয়ে ওরা চুপ ক'রে থাকবে?"

"আমি দৌড়ে গিয়ে নিকটস্থ কাফিঘর থেকে লোকজন নিয়ে আস্‌তে পারব। রাত্রি দু'টা পর্য্যন্ত কাফিঘর খোলা থাকে। সেখানে আমার ঢের জানা লোক আছে। তা ছাড়া এখানকার সকলকেই আমি চিনি, নিকটেই আমাদের বাড়ী।"

"এ বাড়ীটা কার, তা' হ'লে তুই জানিস্?"

"না। কিন্তু কাল সকালে জানিয়া আপনাকে বলিব। এখন চলুন যাই।"

"চল্, দেখা যাক্ পাজীগুলা কি করে।"

বালক অগ্রে চলিল। ম্যাক্সিম্ সুন্দরীর গৃহের দিকে আর একবার চাহিলেন। বাড়ীটা ঘনান্ধকারে আচ্ছন্ন; কোথাও কোন আলোক রেখা দেখা যাইতেছে না।

জর্জ্জেট বলিল, "লোকগুলাও দ্রুতবেগে আসিতেছে।"

ম্যাক্সিম্ কিছু বিস্মিত হইলেন। তিনি বলিলেন, "আক্রমণের অবসর ও সুযোগ খুঁজিতেছে, বোধ হয়।"

জর্জ্জেট্ বলিল, "আমারও তাই মনে লইতেছে। যাক্, এখন একটা জায়গা পার হইতে পারিলেই আমরা অনেকটা নিরাপদ্ হইব। আর কিছুদূর গেলেই আমার ঠাকুরমার বাড়ী।"

"সেইখানেই তুই থাকিস্?"

"আজ্ঞা হাঁ। আপনি আমাদের বাড়ীতে খানিক ব'সবেন, আমি ততক্ষণ একখানা গাড়ী ডেকে নিয়ে আসব।"

"যে মহিলাটির সঙ্গে আমি আস্‌ছিলাম, তাঁকে তুই চিনিস্?"

"আমি ভাল ক'রে দেখি নি। বোধ হয় চিনি না। আপনারা যখন পোল পার হন, তখন তিনটি লোক আপনাদের সঙ্গে নিলে দেখলুম। আমার ভারী আশ্চর্য্য বোধ হ'ল।—আমিও তাদের পিছু নিলাম। কিছু দূর এসে শুন্‌লেম, একজন ব'ল্‌ছে, যেই একা আস্‌বে, অমনি ঘিরে ফেলা যাবে।"

"তুই পূর্ব্বেই আমায় সাবধান করিয়া দিস্ নাই কেন?"

"আমার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু মহিলাটির জন্য পারি নাই। তা ছাড়া আমি জানতুম, যতক্ষণ মহিলাটি আপনার সঙ্গে আছেন, ততক্ষণ ওরা আপনার গায়ে হাত দিবে না। এখন খুব জোরে চলুন্। ওরা এসে পড়্‌ল!

উভয়ে দৌড়াইতে আরম্ভ করিলেন। সহসা ম্যাক্সিম্ বলিলেন, "শুনছিস্? উহারাও দৌড়াইতেছে।"

উভয়ে দৌড়াইতে আরম্ভ করিলেন।

"আমি ত আগেই ব'লেছিলাম; কিন্তু আর ভয় নাই, হুজুর! ঐ যে দুটো আলো জল্‌ছে দেখ্‌ছেন, ও নিশ্চয়ই কোন গাড়ীর। বোধ হয় ভাড়া গাড়ী। এই গাড়োয়ান্, ভাড়া যাবি? ভাড়া ছাড়া পাঁচ ফ্রাঙ্ক বক্‌সিস্ পাবি।"

গাড়োয়ান্, গাড়ী লইয়া আসিল। জ্যাকো ক্ষিপ্রহস্তে দরজা খুলিয়া ফেলিল। ম্যাক্সিম্ গাড়ীতে উঠিয়া বলিলেন, "তুইও আয়।"

"ভয় নাই হুজুর, ওরা চ'লে যাচ্ছে। আর উপায় নাই দেখে পালাচ্ছে।"

ধন্যবাদ বালক, তোমার উপকার আমি ভুলিব না, আজিকার কথা আমার মনে থাকিবে।"

গাড়োয়ান গাড়ী হাঁকাইয়া দিল।

তুমি কোথায়?

তুমি কোথায়—
তুমি কোথায়?—
রবিকর তপ্ত দূর অম্বরে শুভ্র জলদ গায়?
অথবা শান্ত কিরণশালিনী জোছনা স্নিগ্ধতায়?
তুমি কোথায়?—
শ্যামল কুঞ্জে হরষে বিভোর কুসুম-গরিমায়?
কিংবা শীতল নিঝর-পৃক্ত ধীর সুরভি বায়?
তুমি কোথায়?—
প্রলয় গর্জ্জিত বিশ্ববিনাশী প্রমত্ত ঝটিকায়?

শৈল-উপান্তে আঘাত-গর্জ্জিত সিন্ধু ভীষণতায়?
বাড়ব অনল দাবদহনে ঘোর কানন ছায়?
তপন তাপিত শ্রান্ত দিবসে—সন্ধ্যা ধূসরতায়?
ঝিল্লি-মুখর সুপ্‌তি মগন বিঘোর তমসায়?
কোথায়—
তুমি কোথায়?
ঘনঘটা ঘোর গগন-প্রান্তে দীপ্ত-তড়িতাভায়?
অবিরল ধারে বারি-বর্ষণে পতিত করকায়?
তুমি কোথায়?—

সেণ্ট সিব্যাষ্টিয়ান

K. V. Seyne & Bros.

বসন্ত-হসিত নশ্বর গাত্র—ফুটন্ত লতিকায় ?
হিমানি তুষারে অথবা ফুল্ল শারদ-চন্দ্রিমায় ?
তুমি কোথায় ?—
বিরহ-তাপিত মানসে কিংবা কঠোর সাধনায় ?
সিদ্ধিরূপিণী তুমি কি রয়েছ কোমল কবিতায় ?
মন্ত্র-মুগধ ভাবুক হৃদয়ে, কবির কল্পনায় ?
অন্বেষ-ব্যাকুল নয়নকোণে চাহনি নীরবতায় ?
প্রেম-বিভল প্রথম মিলনে নিশীথ নিরালায় ?

কোথায়—
তুমি কোথায় ?
বিশ্ব-সংসারে তোমারি মূরতি—ব্যাপ্ত বিরাটকায় !
তবুও অভাগা দেখেও দেখেনা ; গভীর নিরাশায়
নয়ন আবরি রেখেছ কি তুমি ? কঠিন ছলনায়,
আত্মগোপন করিবে কিরূপে ?—তোমারি ভাবনায়
দীর্ঘজীবন করিব নিঃশেষ : মঙ্গল কামনায়
নিকটে আসি দাঁড়াবে তখন গলিত করুণায় !

শ্রীপ্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়।

গৌরীসেন। †

"লাগে টাকা দেবে গৌরীসেন" নামক প্রবচনটি খুব প্রাচীন না হইলেও অখণ্ড বঙ্গের অধিবাসীদিগের নিকট যে ইহা বিশেষ পরিচিত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই গৌরীসেন কে ছিলেন, তাঁহার নিবাস কোথায় ছিল, কোন্ সময় তিনি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন এবং কি বিশেষ কারণে তাঁহার নাম প্রবচনের অঙ্গীভূত হইয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছে তাহা বোধ হয় অনেকেই জানেন না। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা সেই কথাই কিছু বলিবার প্রয়াস পাইব।

গ্রাম হুগলী সহর কএকটি পল্লীতে বিভক্ত। বালী তন্মধ্যে অন্যতম। এই বালার সুবর্ণবণিককুলে সেন বংশে মহাত্মা গৌরীসেন জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম হরেকৃষ্ণ মুরারীধর সেন। ঠিক কোন্ সময়ে গৌরীসেন, প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন তাহা বলিবার উপায় নাই। কেহ কেহ তাঁহাকে প্রায় ৩০০ শত বৎসর পূর্ব্বের লোক বলিতে চাহেন। কিন্তু আবার অন্যে বলেন—না তাহা নয়। তিনি বাঙ্গালায় প্রথম ইংরেজ আগমনের সময়ের লোক। ইহার একটি সত্য বলিলে অন্যটি বাধ্য হইয়াই মিথ্যা বলিতে হইবে। কিন্তু তাহা বলিবার পূর্ব্বে এই উভয় মতের মধ্যে কোনও সামঞ্জস্য করা যায় কি না অগ্রে আমরা সেই চেষ্টা করিয়া দেখিব।

গৌরীসেনের বর্ত্তমান বংশধর ঈশ্বরচন্দ্র সেন তাঁহার অধস্তন অষ্টম পুরুষ। সুতরাং যিনি গৌরীসেনকে ৩০০ শত বৎসর পূর্ব্বের লোক বলিতে চাহেন, তিনি নিশ্চয়ই শত বৎসরে তিন পুরুষ এই হিসাবেই তাহার সিদ্ধান্ত নির্ণয় করিয়াছেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু ঐতিহাসিক সময় নির্দ্দেশ করিতে হইলে সর্ব্বত্রই যে এই নিয়ম অনুসৃত হইয়া থাকে তাহা নয়, বরং অনেক স্থলেই শত বৎসরে চারি পুরুষ হিসাবেও সময় নির্দ্দেশ করিতে দেখা যায়। এই স্থলেও যদি সেই চারি পুরুষে শত বৎসর ধরিয়া এবং ইংরেজের প্রথম আমলে গৌরীসেন পুত্র পৌত্র পরিবৃত্ত ষাট বৎসর বয়স্ক জ্ঞানবয়োবৃদ্ধ প্রবীণ পুরুষ ছিলেন বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া যায় তবে বোধ হয় উভয় মতের বৈষম্য ঘুচিয়া যায়—আমরা নিঃসন্দেহে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগকেই তাঁহার অভ্যুদয়কাল বলিয়া মানিয়া লইতে পারি।

গৌরীসেনের পিতা বা তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের সাংসারিক অবস্থা তত ভাল ছিল না ; সুতরাং গৌরীসেন উল্লেখযোগ্য কোনও পৈতৃক সম্পত্তি প্রাপ্ত হন নাই—তাঁহার নিজের পথ নিজেকেই করিয়া লইতে হইয়াছিল। প্রথমে তিনি অতি অল্প মূলধন লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে পদার্পণ করেন। কিন্তু মূলধন সামান্য হইলেও তাঁহার ব্যবসায়বুদ্ধি ও সাধুতা যথেষ্ট ছিল ; সুতরাং তিনি ব্যবসায়ে উন্নতি করিয়া প্রভূত ধনশালী হইয়া উঠেন। এই সময়ে গৌরীসেন কলিকাতার বড় বাজারে বাসস্থাপন করিয়া তথাকার বিখ্যাত ধনী ব্যবসায়ী বৈষ্ণবচরণ শেঠের কারবারে অংশীদার হইয়া চালানী কারবার আরম্ভ করেন। হুগলী

---

† 'Hugly—Past and Present' by Shambhu Chundra Dey B. L.; 'Calcutta in the olden times and its localities', ৺চণ্ডীচরণ সেন প্রণীত 'মহারাজ নন্দকুমার ;' and 'The Early History and Growth of Calcutta,' by Rajah Benoy Krishna Deb Bahadur লেখক।

এবং কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহ হইতে পণ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিয়া মেদিনীপুর অঞ্চলে প্রেরণ করিতেন। মেদিনীপুরবাসী ভৈরবচন্দ্র দত্ত নামক তাঁহার জনৈক কায়স্থ বন্ধু তাঁহার মেদিনীপুরের কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতেন।

প্রথম প্রথম সেন মহাশয় শস্যাদিই চালান দিতেন। ক্রমে ব্যবসায়ের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ধাতু ও ধাতুদ্রব্যাদিও পাঠাইতে লাগিলেন। একবার তিনি সপ্ত নৌকা ভরিয়া শুধু রাংতা মেদিনীপুরে প্রেরণ করেন। রাংতাপূর্ণ নৌকাগুলি পৌছিলে সংবাদ পাইয়া ভৈরবচন্দ্র লোকজন সহ মাল খালাস করিবার জন্য ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; কিন্তু তিনি নৌকায় ঢুকিয়া দেখিলেন যে নৌকার জিনিষগুলি রাংতা নয়—তৎপরিবর্ত্তে বিশুদ্ধ রজতখণ্ড সকল সূর্য্যকিরণে ঝক্‌মক্ করিতেছে। ইহা দেখিয়া তিনি একেবারে অবাক্ হইয়া গেলেন। গৌরীসেন মালের সঙ্গে যে চালান পাঠাইয়াছিলেন তাহাতে স্পষ্টতঃ রাংতার উল্লেখ ছিল, সুতরাং ইচ্ছা করিলে ভৈরবচন্দ্র গৌরী সেনকে রাংতার উপযুক্ত মূল্য দিয়া সপ্তনৌকা রৌপ্যই আত্মসাৎ করিতে পারিতেন; কিন্তু সাধু গৌরীসেনের বন্ধু ভৈরবচন্দ্রও অত্যন্ত সাধু প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি মনে করিলেন—বন্ধুর ভুল হইয়াছে। তাই কাহাকে কিছু না বলিয়া ঐ রৌপ্যপূর্ণ নৌকাগুলি গৌরীসেনকে ফেরত পাঠাইয়া দিলেন। এদিকে নৌকাগুলি হুগলী ফিরিয়া আসিবার পূর্ব্বে একদিন গৌরীসেন স্বপ্নে দেখিলেন যেন দেবাদিদেব মহাদেব তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিতেছেন—'তুমি যে সপ্তনৌকাপূর্ণ রাংতা মেদিনীপুরে প্রেরণ করিয়াছিলে পথিমধ্যে আমার কৃপায় সে রাংতা রজতখণ্ডে পরিণত হইয়াছে। তোমার বন্ধু সেগুলি গ্রহণ না করিয়া সমস্তই তোমাকে ফেরত পাঠাইয়াছে। নৌকাগুলি কল্য প্রাতেই ঘাটে পৌছিলে তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে সমস্ত রৌপ্যই তোমার নিজের বলিয়া গ্রহণ করিবে এবং তোমার বাড়ীতে আমার মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে আমার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া সেবা পূজার বন্দোবস্ত করিয়া দিবে। তাহাতেই তোমার মঙ্গল হইবে।

রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতে নৌকাগুলি হুগলীর ঘাটে পৌছিলে গৌরীসেন দেখিলেন যে, তাঁহার স্বপ্ন অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়া গিয়াছে। সেই রৌপ্য বিক্রয় করিয়া তিনি বহুধন লাভ করিলেন এবং প্রত্যাদেশানুযায়ী নিজের বাড়ীতেই মন্দির নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তাহাতে মহাদেবের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার সেবা ও পূজার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। সেই মন্দির ও বিগ্রহ এখনও গৌরীসেনের বাসভূমির উপকণ্ঠে বিদ্যমান থাকিয়া তাঁহার উপযুক্ত বংশধরগণকর্ত্তৃক নিয়মিতভাবে সেবিত ও পূজিত হইতেছেন।

এই অভাবনীয় ঘটনা উপন্যাসের গল্পের ন্যায় বোধ হয় বটে, কিন্তু ভগবানের বিধি দুর্জ্ঞেয়। তাহা বোধ হয় কোন ঈশ্বরবিশ্বাসী ব্যক্তিই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। লোকের অদৃষ্ট প্রসন্ন হইলে কোন্ দিক্ হইতে কি ভাবে যে তাহার উপর ভগবানের করুণাকণাবর্ষিত হয় তাহা মানুষের বুঝিবার সাধ্য নাই!

এরূপভাবে হঠাৎ ধনশালী হইয়া উঠিলে অনেকেই ধনমদে আত্মহারা হইয়া অসৎ কার্য্য করিয়াই তাহাদের ধনবত্তার পরিচয় দিতে গর্ব্ব অনুভব করে। তাহাদের ধন কাহারও কোনও উপকারে আসা দূরের কথা, বরং অনেক সময় তাহাতে লোকসমাজের অশেষ অনিষ্ট ও নানাবিধ অসুখের কারণ উৎপাদন করে। কিন্তু গৌরীসেনকে আমরা তদ্বিপরীত আচরণ করিতেই দেখিতে পাই। ভগবানের অনুগ্রহে রাতারাতি প্রভূত ধনের অধিকারী হইয়াও তিনি গর্ব্বিত না হইয়া ফলভরে অবনত বৃক্ষের ন্যায় বিনীতভাবে সে ধন অনাথ আতুর, গরীব দুঃখীর দুঃখ বিমোচনকল্পে ব্যয় করিয়া সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধনে মনোনিবেশ করিলেন। গৌরীসেনের নিকট হইতে দান গ্রহণ করিতে হইলে, রাজপুরুষগণের অনুগ্রহ বা বড়লোকের পরিচয় পত্রের আবশ্যক হইত না, কিংবা তাঁহার এ দানকার্য্য ধর্ম্ম, জাতি বা ব্যক্তিবিশেষের গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকিত না—দায়গ্রস্ত ব্যক্তি মাত্রেই তাহার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি প্রয়োজনানুযায়ী অর্থ প্রদানে তাঁহাকে দায়মুক্ত করিয়া দিতেন। ঋণদায়ে কারাগারে আবদ্ধ কন্যাদায়গ্রস্ত, পিতৃমাতৃশ্রাদ্ধে সাহায্যপ্রার্থী বা গৃহদাহে সর্ব্বস্বান্ত কোনও ব্যক্তিই কোনও দিন তাঁহার নিকট হইতে রিক্তহস্তে প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই। সর্ব্বোপরি কেহ কোন সৎকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া অর্থাভাবে তাহা সম্পন্ন করিতে পারিতেছে না, এ সংবাদ শুনিলে গৌরীসেন সর্ব্বাগ্রে অযাচিতভাবে তাহাকে অর্থসাহায্য করিয়া সে আরব্ধ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া দিতেন!

ইহার ফল এই হইল যে নানাস্থানে নানা সাধুলোক নিঃশঙ্কচিত্তে আপনাপন সাধ্যাতীত ও বহুব্যয়সাপেক্ষ সাধারণ হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন—ভরসা এই যে, নিজে কার্য্য সম্পন্ন করিয়া উঠিতে না পারি—'লাগে টাকা দেবে গৌরীসেন!' কৌশলী লোকেরা মনে করিল যে, সৎকার্য্য আরম্ভ করিয়া তাহা শেষ করিতে না পারিলে যখন গৌরীসেনই টাকা দিবেন, তখন আমিই কেন কতকগুলি সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া দিয়া গৌরীসেনের নিকট হইতে সাহায্য লইয়া তাহা সম্পন্ন করিয়া দিয়া ফাঁকতালে নাম কিনিয়া লইতে বিরত থাকি। আবার দুষ্ট লোকেরা দেখিল যে, উপার্জ্জন করিবার এও এক সুবিধা বটে। তাই তাহারাও সৎকার্য্যের আরম্ভ করিয়া অর্থাভাবে তাহা সম্পন্ন হইতেছে না বলিয়া গৌরীসেনের নিকট হইতে টাকা আনিয়া আরব্ধ কার্য্যে ব্যয় না করিয়া নিজেরাই তাহা আত্মসাৎ করিবার অভিলাষ করিত! বলা বাহুল্য গৌরীসেন কাহাকেও নিরাশ করিতে নাই।

গৌরীসেনের এরূপ দানবাহুল্য দেখিয়া তাঁহার বন্ধুবান্ধবেরা শঙ্কিত হইয়া বলিতেন—'আপনি এ কি করিতেছেন?' গৌরীসেন উত্তর

বলিতেন—'আমি অন্যায় কি করিতেছি? পূর্ব্বে আমার অবস্থা এত উন্নত ছিল না। দেবাদিদেব মহাদেবের কৃপায় আমার হস্তে প্রভূত ধন আসিয়াছে; কিন্তু আমি তাহার অধিকারী নই—ভাণ্ডারী মাত্র। ভগবান লোকসমাজের উপকারার্থ দান করিবার জন্যই আমাকে এ ধন দিয়াছেন—আমার নিজের ভোগ করিবার জন্য নহে। সমাজের হিতকামী অনেক সাধুব্যক্তি নিঃস্বার্থভাবে অনেক সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছেন। তাঁহাদের কার্য্যে সাহায্য না করিলে আমি প্রত্যবায়ের ভাগী হইব। অনেক লোক শুধু আমার ভরসাতেই অনেক সৎকার্য্যের আরম্ভ করিতেছেন; সুতরাং সে কার্য্য আমার নিজের কার্য্য নয় কি? অনেক দুষ্টলোক আমার নিকট হইতে চাতুরী করিয়া কিছু লইবার অভিপ্রায়েই সৎকার্য্যের আবরণে আমার নিকট উপস্থিত হইতেছে, তাহা আমি না জানি, না বুঝি এমন নয়—কিন্তু তবুও তাহাদিগকে আমি বিমুখ করি না; কারণ তাহারা যে সৎকার্য্যের ভাণ করিতেছে তাহাও ভাল।' গৌরীসেনের উত্তর শুনিয়া তাঁহার বন্ধুবর্গ একেবারে বিস্ময়বিমূঢ় হইয়া তাঁহাকে অনেক সাধুবাদ দিতেন।

গৌরীসেনের এই অসামান্য বদান্যতার কথা দেশ বিদেশে প্রচার হইয়া গেল—আর নানাস্থানের অগণন নরনারী নানাভাবে উৎসাহের সহিত সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে আরম্ভ করিলেন। কারণ সকলেরই সাহস—"লাগে টাকা দেবে গৌরীসেন।" এইরূপে গৌরীসেনের নাম বাঙ্গালার এক প্রান্ত হইতে অন্যপ্রান্ত পর্য্যন্ত লোকের মুখে মুখে ধ্বনিত হইয়া বর্ত্তমানে প্রবচনের অঙ্গীভূত হইয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছে।

টাকা যাহা রোজ আসে রোজ যায় তাহা অনেকে উপার্জ্জন করিতে পারে বটে, কিন্তু কয়জনে তাহা গৌরীসেনের মত এমন সৎকার্য্যে ব্যয় করিতে পারে? দেশে যুগে যুগে কত রাজা মহারাজা, কত লক্ষপতি ক্রোরপতি জন্মিতেছেন মরিতেছেন, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কয়জন গৌরীসেনের মত এমন দেশব্যাপী সুনাম, এমন অবিনশ্বর কীর্ত্তি রাখিয়া যাইতে পারেন? যিনি পারেন—তিনি মানুষ নন—দেবতা।

গৌরীসেন গিয়াছেন—তাঁহার ভৌতিক দেহ অণুপরমাণুতে লয় পাইয়াছে—কিন্তু তাঁহার অসামান্য বদান্যতার পুণ্যগাথা ভাষার সঙ্গে গ্রথিত হইয়া আজিও তাঁহার কীর্ত্তিকাহিনী ঘোষণা করিতেছে। সে কীর্ত্তি যাইবার নয়। যত দিন বাঙ্গালা ভাষা থাকিবে ততদিন বাঙ্গালী তাঁহার সে কীর্ত্তিগাথা বিস্মৃত হইবে না। *

শ্রীঅশ্বিনীকুমার সেন।

* বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ১৩১৯ সালের ৭ই মাঘের অধিবেশনে পঠিত।

পূজারীতি !

শক্তি পূজার　　পশু বলি, আর
　　রক্তজবা, কুবলয়;
শিবের পূজার　　সলিল গঙ্গার,
　　বিল্ব-পল্লবচয়,
ইষ্ট-পূজার　　জপ মন্ত্র সার
　　ভক্তি চিত্তের জয়!
শক্তি দরশন　　পূজা নিবেদন
　　তিনটি দিনের তরে,
শিবের পূজন　　করে গৃহীজন
　　মন্ত্র পাইলে পরে,
ইষ্ট-আরাধন　　চলে আজীবন
　　ভক্ত-হৃদয়-ঘরে!

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

মন্ত্রশক্তি।

[পূর্ব্বাবৃত্তি—রাজনগরের জমিদার, কুলদেবতা গোপীকিশোরের প্রতিষ্ঠাতা উইল সূত্রে তাঁহার বিশাল জমিদারী দেবত্র এবং অধ্যাপক জগন্নাথ তর্কচূড়ামণি ও তৎকর্ত্তৃক মনোনীত ব্যক্তিকে সেবায়েৎ নিযুক্ত করেন। তর্কচূড়ামণি মৃত্যুকালে তাঁহার নবাগত ছাত্র অম্বরনাথকে স্বীয় পদে মনোনীত করিয়া যান। এই ব্যবস্থায় অসন্তুষ্ট হইয়া পুরাতন ছাত্র আদ্যনাথ টোল ছাড়িয়া সেই গ্রামস্থ দূর সম্পর্কিত জ্ঞাতি বৃন্দাবনচন্দ্রের বাড়ীতে বাস করিতে লাগিল। বৃন্দাবন অতি ভাল মানুষ, তুলসীমঞ্জরী তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের যুবতী ভার্য্যা। আদ্যনাথ তুলসীর দ্বারা জমিদার কন্যা রাধারাণীর নিকট অম্বরনাথের অযোগ্যতা জ্ঞাপন করিবার চেষ্টা করিলে, সে সে প্রস্তাবে কর্ণপাত করে না। আদ্যনাথ গোড়া হইতেই অম্বরনাথের উপর বিরক্ত ছিল, এই নিয়োগে সে তাহার শত্রু হইয়া দাঁড়াইল! অম্বরনাথ কিন্তু হৃদয়বান পরোপকারী; সেই জন্য আর সকলেই তাহাকে শ্রদ্ধা করিত ও ভালবাসিত। পুরোহিত নিযুক্ত হইয়া সে যখন প্রথম দিন পূজা করিতে গেল, তখন দেবতার ঐশ্বর্য্য দেখিয়া সে ক্ষুব্ধ হইল "দেবতার নামে এ ঐশ্বর্য্যের খেলা কেন?" ভাবিয়া সে আকুল হইল। জমিদার হরবল্লভ বাবুর একমাত্র পুত্র রমাবল্লভ; রাধারাণী রমাবল্লভের একমাত্র কন্যা। রাধারাণীর বিবাহ দিবার জন্য ঠাকুরদাদা যে বর স্থির করিলেন, তাহা রাধারাণীর পিতার মনোমত হইল না। হরবল্লভ রাগ করিয়া নাতিনীর বিবাহ প্রসঙ্গ ত্যাগ করিলেন। তাহার কিছু দিন পরেই হরবল্লভ মারা গেলেন, তিনি উইল করিয়া গেলেন যে ১৬ বৎসর বয়সের মধ্যে রাধারাণী যদি উপযুক্ত বরে সমর্পিত হয় তাহা হইলে দেবত্র সম্পত্তি ব্যতীত আর সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী রাধারাণী হইবে; আর তাহা যদি না হয় তবে বিষয় দূর সম্পর্কীয় এক জ্ঞাতি পাইবে, রমাবল্লভ কেবল মাসিক বৃত্তি পাইবে। কিন্তু উপযুক্ত বরও মেলে না, রাধারাণীরও বিবাহ হয় না, তবে ষোল বৎসর বয়স হইবার বিলম্ব আছে। রাধারাণী গোপীকিশোর বিগ্রহের সেবায় আত্মসমর্পণ করিয়াছিল। বালক পুরোহিত অম্বরনাথের পূজা তাহার মনের মত হইত না, সে বিরক্ত হইত, কিন্তু পুরোহিতকে সে কথা মুখ ফুটিয়া বলিতেও পারিত না, কারণ সে বিশেষ কোন ত্রুটী দেখিতে পাইত না।]

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সেদিন সন্ধ্যার বিলম্ব আছে, সূর্য্য সবে পশ্চিম দিগ্বলয় সীমান্তে নামিয়া দাঁড়াইয়াছেন, হোমশিখাবৎ প্রোজ্জ্বল রক্তজ্যোতিঃ অদ্ধাকাশ ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে। রাঙ্গা আলোয় স্নান করিয়া প্রকৃতির মূর্ত্তি যেমন সুন্দর দেখাইতেছিল, গৃহমধ্যে শিল্পকার্য্যে নিমগ্নচিত্তা রাণীকে তাহা অপেক্ষা কম সুন্দর দেখায় নাই। সম্মুখে স্নানযাত্রা; সেদিন মন্দিরে বড় ধুম। বস্ত্র মণ্ডিত শিবিকায় লইয়া বিগ্রহ দ্বয়কে সেদিন নদীতে স্নান করান হয়। দেবতাযুগলকে নববেশ পরাইতে হইবে। তাই, রাণী সযতনে রাধার জন্য নীল রেশমের উপর জরির কাজ করিতেছিল। পীতবস্ত্র ইতি পূর্ব্বে প্রস্তুত হইয়া গিয়াছে। উত্তরীয় খানির চারিধারে কেবল চারিটী কল্কা প্রস্তুত করা বাকি। প্রশস্ত পাড়টি সোণারূপার জরির বড় বড় ফুল পাতা ও লতায় বিচিত্র, তাহার মধ্যে মধ্যে জীবনহীন স্বর্ণভ্রমর মধুলেশশূন্যপুষ্প পরাগ মধ্যে বৃথা মধু অন্বেষণে ব্যতিব্যস্ত। ক্রমে কল্কা কয়টি সমাপ্ত হইয়া আসিয়াছে—একবার সে আলোর দিকে উজ্জ্বল পাড়টি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিল; গোধূলির আলো চুমকি গুলিতে হীরার জ্যোতির মত তাহার ম্লান হাসি ছড়াইয়া দিল। রচয়িত্রী তৃপ্তচিত্রে আবার সূঁচে জরি পরাইতে মনঃসংযোগ করিল। তাহার অধরপ্রান্তে সাফল্যের হাসি বিকাশোন্মুখ হইয়াছিল, তাহার অর্থ, বেশ মানাইবে!

বাহিরে অপরাহ্নের হাওয়া মধুরতর হইয়া উঠিতেছে। দোলের দিনের পথের মত আকাশবক্ষে লাল ধূলির ন্যায় মেঘগুলা ক্ষিপ্রগতিতে ভাসিয়া যাইতেছিল। পিছন হইতে কে আসিয়া তাহার চোক টিপিয়া ধরিল এবং তৎক্ষণাৎ আবার ছাড়িয়া দিয়া খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিয়া তাহার পাশে বসিয়া পড়িল।

রাণী হাসিয়া কহিল "আমি যেন জান্‌তে পারিনি!"

"তা জানবিনি কেন? তোকে সোহাগ জানাবার লোক এই একজন বই আর দুজন ত হলোনা! মরণ, এমন আলোয় ঘরের কোণে কেন লো? আয় ছাতে যাই" এই বলিয়াই সে তাহার হাতের কাজটা টানিয়া লইতে চেষ্টা করিল।

ত্বরিতে হাত ফিরাইয়া লইয়া রাণী ঈষৎ হাসিয়া বলিল "এতে যা'তা হাত দিসনে ভাই!—এ যে ঠাকুরদের। আর ছাতে গিয়ে কি হবে? এই খানেই বোস্‌না, দুটো গল্প সল্প কর্‌তে কর্‌তে বোনাটাও শেষ হয়ে যাক্।"

বেশ মানাইবে।

তুলসীমঞ্জরী—রাণীর সখী অগত্যা ছাদের লোভ সংবরণ করিয়া একটু খানি সরিয়া বসিল, মৃদু হাসিয়া বলিল, "আমিও কাপড় চোপড় না কেচে তোমার কাছে আসিনি ওগো ভট্টাচার্য্য মশাই!—এটা হচ্চে কি?"

রাণী সখীকে সমাপ্তপ্রায় স্বহস্তকৃত শিল্প প্রদর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "দেখ দেগি, কি রকম হ'ল।"

মঞ্জরী মুরুব্বীর মত একটু মাথা নাড়িয়া মন্তব্য প্রকাশ করিল, "সুন্দর হয়েচে, কিন্তু হলে কি হয় এ শুধু বেণাবনে মুক্ত ছড়ান।"

রাণীর বুকে ধড়াস্ করিয়া একটা ধাক্কা লাগিল; সে তাহার মুখ ঈষদুত্তোলন পূর্ব্বক সন্দিগ্ধস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

মঞ্জরী হাসিতে লাগিল, বলিল "যে পুরুত জুটেছে—তাই বল্‌ছি। হ্যাঁ, ভালকথা, লোকটা পূজা আচ্চা করুচে কেমন? মন্তর তন্তর কিছু জানে? না কেবল কোশাকুশি নেড়েই যাবে?" মঞ্জরী এই কথা বলিয়া বিদ্রূপের ছলে হাসিয়া উঠিল।

রাণীর মুখ আকাশের মত লাল হইয়া উঠিল, সে যেন ইহাতে নিজেকেই অপমানিত বোধ করিতেছিল।

মঞ্জরী সখীর মুখের দিকে চাহে নাই, সে আপনার মনেই বলিতে লাগিল, "দেশশুদ্ধ সবাই এই কাজটার জন্য কত কি বল্‌ছে, মরবার সময় পুরুত মশাইএর নাকি বুদ্ধি বিপর্য্যয় হয়েছিল, তাই এমন কাণ্ডটা হঠাৎ ঘটে গেল। পূজা-পাঠের ও কি জানে? আদি ঠাকুরপোর মুখে শুনিছি ছোঁড়াটা বরাবর ওদের ভাত রাঁধ্‌ত। রাঁধুনী বামুন, হঠাৎ হলেন ঠাকুর মশাই, সেই পাট-হস্তীর শুঁড়ে জড়িয়ে চাষার ব্যাটা চাষাকে রাজগদিতে বসানর গল্পটা ঘটে গেল। যাক্, ভাই রাধারাণি! তোর ত মনে ধরেচে, তা হলেই সব লেঠা চুকে গেল।"

রাণী প্রথমে মনে করিয়াছিল পুরোহিতের সম্বন্ধে সে মঞ্জরীর সহিত কোন আলোচনা করিবে না, কেন না অম্বরনাথকে যখন বিদায় করিবার পথ নাই, তখন তাহাকে চালাইয়া লইবার চেষ্টা করাই উচিত, বিশেষতঃ তাহার অক্ষমতা কেবলমাত্র তাহারই ত্রুটির পরিচায়ক নহে—তাহাদের পক্ষেও গ্লানিকর; কিন্তু ইন্ধনযুক্ত অগ্নি যেমন আপনাকে গোপন রাখিতে পারে না, রাণীও তেমনই আপনার মনোভাবকে গোপন রাখিতে না পারিয়া হঠাৎ বলিয়া ফেলিল, "মনে ধরেচে ছাই। ওর চেয়ে তোমার আদি ঠাকুরপো ঢের ভাল।"

মঞ্জরী মনে মনে আত্মনাথকে তেমন পছন্দ করিত না, অথচ অম্বরনাথের উপর তাহার কোনরূপ বিদ্বেষের কারণ বর্ত্তমান নাই; কিন্তু যতই হোক আত্মনাথ তাহার আপনার জন; তাহার উপর জন দশেক ছাত্রের সহিত সে এখন তাহারই জীর্ণ চণ্ডীমণ্ডপে আস্তানা গাড়িয়া বসিয়াছে। তিনটি বেলা তাহাদের স্বামী স্ত্রীকেই তাদের সকল হাঙ্গাম পোহাইতে হইতেছিল। এই প্রাণীগুলির উপর তাহাদের যথেষ্ট পরিশ্রম ও পয়সা খরচ হইলেও, স্বামী স্ত্রী দুই জনের মধ্যে কেহই অতিথিগণকে সে সম্বন্ধে কোনরূপ আভাস দিতেও কুণ্ঠিত হইত। আত্মনাথের যেরূপ গতিক, তাহাতে

তাহাকে এই ঈপ্সিত পদটি দেওয়া ব্যতীত অন্য কোন উপলক্ষ করিয়া তাহাকে বাটী হইতে বাহির করিবার উপায় ছিল না। কাজেই মঞ্জরী এতদিন ধরিয়া নানা অছিলায় আত্মনাথকে ফাঁকি দিয়া কাটাইয়া আজ রাণীকে বলিয়া ফেলিল। আত্মপ্রবোধচ্ছলে সে নিজেকে বুঝাইল যে, আমি ত অম্বরকে মিথ্যা দোষী করিতেছি না,—সত্য যা শুনিয়াছি তাহাই বলিতেছি বই ত নয়!—এতে আমার দোষ কি? না হলে এদিকে আমার স্বামীর প্রাচীন ঘরটি যে ভাঙ্গিয়া যায়। সে দিন মঞ্জরী আর এ কথার উল্লেখ করিল না! সখীর কথায় সে স্পষ্ট বুঝিল যে, অম্বরনাথের আসন টলমল, আর সে আসন টলিলে যে তাহাদের গৃহের শান্তি পুনঃস্থাপিত হইবার সম্ভাবনা ঘটিবে—ইহা জানিয়াই সে আপাততঃ একটু আশ্বস্ত হইল, কিন্তু মনে মনে একটু বিষণ্ণও যে না হইল এমন নয়,—"আহা! বেচারা অম্বরনাথ বড়ই নিরীহ!"

কথাটা চাপা দিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের জরির কটিবন্ধটা তুলিয়া লইয়া উত্তমরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে মঞ্জরী বলিল, "কবে এমনই পোষাক পরে আমার রাধারাণীর শ্রীকৃষ্ণ আস্‌বেন্—আহা সই! সেই ভাব্‌না ভেবে ভেবেই আমি আকুল হ'য়ে প'ড়েছি।"

"কথায় বলে, যার বিয়ে তার মনে নেই—পাড়া পড়্‌সীর ঘুম নেই। তোর অত মাথা ব্যথা কেন বল্ দেখি? আমার কৃষ্ণ ত দিন রাত্তির আমার কাছেই রয়েচেন, আমি কি একদণ্ড কৃষ্ণ ছাড়া? এই দেখ তার জন্যে এই তাজ করেছি, নূতন বাঁশি গড়িয়েছি, চাদর, মালা সব করেছি। আমার তাঁকে আমি কত সেবা করি, কত আদর করি, প্রাণ সঁপে দিয়ে তাঁরই হয়ে পায়ের তলায় পড়ে আছি। তোরা তোদের স্বামীকে কি এমন করে সাজাতে পারিস্, না এমন ভালবাস্‌তে পারিস্? তারা পান থেকে চুণ খস্‌লে ঝগড়া করে, দাসীর মত খাটাইয়া নিয়ে দুটো ভাল কথাও কয়ে উঠ্‌তে ফুরসৎ পায় না, রোগে ভোগে কত রকমে—বিধিমতে জ্বালায় বল দেখি? এই চিরকিশোর, চিরানন্দময় স্বামীকে ফেলে কে তোর মানুষের দাসীত্ব চায়? আমি স্বয়ংবরা হয়েছি।"

রাধারাণী কথাগুলা খুব গম্ভীর মুখেই বলিয়া গেল, কিন্তু তাহার সখী এত বড় বিষয়টাকে তেমনভাবে গ্রহণ করিতে পারিল না। সে হঠাৎ হাসিতে উচ্ছ্বসিত হইয়া তাহার পিঠের উপর গড়াইয়া পড়িল। অকস্মাৎ নড়িয়া গিয়া সীবনকারিণীর আঙ্গুলে সুঁচটা বিঁধিয়া গেল, সে চমকিয়া উঃ করিয়া উঠিল, কিন্তু মঞ্জরীর হাসির স্রোত তাহাতে বাধা পাইল না। সে বেদম হাসি হাসিয়া হাসিয়া গদ্‌গদস্বরে বলিতে লাগিল, "স্বয়ংবরা হবার সাধ হয়েছিল, ত আমায় বলিস্‌নি কেন? তোর সয়া ত ছিল। গোসাঁই ঠাকুরটি ও তিলক-সেবা টেবা করেন, না হয় একটি চূড়া বাঁধিয়াই নিতিস্। স্বয়ংবরা হবি ত, এখনও না হয় বল?"

রাধারাণী রাগ করিয়া তাহাকে ঠেলিয়া দিয়া সরিয়া বসিয়া কাঁচি দ্বারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আকারে জরি কাটিতে কাটিতে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল, "তুই ভাই ভারি ছ্যাব্‌লা, আমি কি তামাসা করিতেছি? সত্যিই আমি আমার দেহ মন সব আমার শ্রীকৃষ্ণকে 'তুভ্যমহং সম্প্রদদে' বলিয়া দিয়া ফেলিয়াছি। এগুলোর উপর আর কারু এক তিলও দাবী দাওয়া নাই, নিজেরও না। দেখিস্ এ আর কেউ পাচ্চে না।"

মঞ্জরী হাসিয়া বলিল, "দেখ্‌ব লো দেখ্‌ব, এক মাঘেই ত আর শীত পালায় না, এখনই ত আর মর্‌ছিনে।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ

প্রথম যেদিন অম্বর পূজা করিতে গিয়াছিল, সে এক মূর্ত্তিমতী দেবীপ্রতিমা সেখানে প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া আসিয়াছিল, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ইহার পর হইতে প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় পূজাআরতির সময়ে সে সেই একই স্থানে সেই মর্ম্মরপ্রতিম অনুপম মূর্ত্তি দেখিতে পাইত। সে কে, কোথা হইতে আসে, তাহা সে জানিত না; জানিবার কৌতূহল এক নিমিষের জন্য তাহার চিত্তে জাগ্রত হয় নাই। সে মন্দিরে প্রবেশ করিয়া প্রতিদিন সেই প্রতিমাকে নির্দ্দিষ্ট স্থানে বর্ত্তমান দেখিত; পূজাশেষে তাহাকে সেইখানেই দেখিয়া চলিয়া আসিত। মন্দিরবাসী অন্য দেবদেবীদের মত সে মূর্ত্তিও এই মন্দিরসংশ্লিষ্ট বলিয়াই তাহার ধারণা জন্মিয়াছিল। সে দেখিত সে মূর্ত্তির কৌষেয় বসনের স্খলিতাঞ্চলে খস খস শব্দ হয় না, হস্তালঙ্কার রুণু ঝুণু বাজিয়া উঠে না, যেন পাষাণ

জীবনহীনা পাষাণপ্রতিমা। কিন্তু অম্বর ইচ্ছা করিয়া না—অতর্কিতভাবে যদি কখনও সহসা সে দিকে দৃষ্টিপাত করিত, ত দেখিতে পাইত সেই জীবনহীনাবৎ নিথর মূর্ত্তি তাহার সুপ্রচুর কৃষ্ণতারকোজ্জ্বল চক্ষু দুটির তীক্ষ্ণভেদী দৃষ্টির দ্বারা শুধু জীবনীযুক্ত বলিয়া প্রতীত হয়। সে দৃষ্টি একটু নূতন, একটু অস্বাভাবিক। তার কোমল কাল চুলের তরঙ্গে কোমল বঙ্কিম ভ্রূরেখার নিম্নে মসৃণ শুভ্র সুগঠিত কোমল চিবুকের প্রবাল রক্ত ক্ষুদ্র কোমল অধরোষ্ঠের সঙ্গে সেই বিদ্যুতুজ্জ্বল স্থির দৃষ্টি অত্যন্ত বিসদৃশ মনে হইত। তা হ'ক, অনন্যচিত্তা সেই ভক্তিমতী পূজারিণীকে সে মনে মনে প্রণাম করিত। এই বয়সে এই রূপরাশি লইয়া সে শৈলজা উমার ন্যায় তপস্যাপরায়ণা ভোগবিলাসহীনা। কিন্তু রহস্যময়ী তাহার সেই অন্তর্ভেদী যুগলনেত্র তাহার উপরেই সমস্তক্ষণ স্থাপিত রাখিয়া তাহাকেই দেখিতে থাকেন। অম্বরনাথ একবার চোক উঠাইতেই দেখিল, সেই তীব্র অনুসন্ধানদৃষ্টি তাহারই উপর পতিত। সে একটু লজ্জিত হইল, সে আর চাহিতে পারিল না, কিন্তু পূজার সময় কেহ তাহার দিকেই সমস্ত দৃষ্টি স্থির করিয়া রাখিয়াছে ইহা মনে করিতে তাহারও মনে একটু অশান্তি বোধ হইতে লাগিল। মনে হইল, এই জন্য পূজাকালে পূজাস্থানে অন্যলোকের অবস্থান নিষিদ্ধ। তারপর ক্রমে তাহার এ দৃশ্য সহিয়া গেল। মন্দিরের মধ্যে ঐশ্বর্য্যাড়ম্বর ও বৃথোপোকরণরাশি প্রথম দিন যেমন তাহার অনাড়ম্বর অভ্যাসকে পীড়িত করিয়াছিল, এখন সেগুলাও তেমন আর দর্শনপীড়া জন্মায় না; তেমনই সেই অসামান্যা সুন্দরী কিশোরীর কুণ্ঠাহীন পরীক্ষাদৃষ্টিও আর তাহাকে তত সঙ্কুচিত করেনা। বরং অম্বর এখন সেই অনন্যচিত্তা শ্রদ্ধাময়ী নারীর অবস্থানকে ভক্তির সহিত দেখিত, তাহার অকৃত্রিম দেবপ্রীতি তাহার মনে যেন কি একটা অননুভূত আনন্দ ও গৌরব জাগাইয়া দিত।

তাহার এ আনন্দের মধ্যে তা বলিয়া কোন পার্থিব ভাব মিশ্রিত ছিল না। সে তাহার সৌন্দর্য্য ও নারীত্বের দিক্ হইতে তাহার প্রতি বিন্দুমাত্রও আকর্ষণ অনুভব করে নাই। সে শুধু দেখিত সেই গভীর মনোনিবেশেরই ছবিখানি—ভক্তির শরীরিণী মূর্ত্তি। সে মূর্ত্তি দেখিয়া তাহার হৃদয়-সমুদ্রে ভক্তির তরঙ্গ উঠিত—উপাসনায় আগ্রহ বর্দ্ধিত হইত। পাছে তাহার নিষ্ঠায় আঘাত লাগে, সে সেই ভয়ে যথাসাধ্য সশঙ্কিত থাকিত, কিন্তু ফলে সে অভ্যাসানুযায়ী পূর্ব্বের মত ধ্যানে ও ভাবে তন্ময় থাকিয়া পূজার সকল কার্য্য কাঠিন্যভাবে সম্পন্ন করিতে পারিত না।

এমনই করিয়া একে একে কতকগুলি পর্ব্বদিন গত হইয়া গিয়া স্নানযাত্রা আসিয়া পড়িল। স্নানযাত্রা হইতে রথের পর্য্যন্ত মন্দিরে দীর্ঘকালব্যাপী সমারোহ চলিতে থাকে। এবারও সাড়ম্বরে আয়োজন চলিতে ছিল।

স্নানযাত্রার যথাকৃত্য সম্পন্ন করিয়া বিগ্রহ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইলে, পুরোহিত যথাবিধি দেবার্চ্চনা করিতে বসিলেন। নূতন বস্ত্রালঙ্কারে নব অঙ্গরাগে দেবমূর্ত্তি সুন্দরতর দেখাইতেছিল; কৃষ্ণচূড়ায় এবার একখানি বহুমূল্য হীরক শোভা বর্দ্ধিত করিয়াছে; এ রত্নখানি জমিদারদুহিতার কণ্ঠভূষণের জন্য জমিদারের উপহার; কিন্তু সে তাহা তাহার ইচ্ছামত ব্যবহার করিয়াছে।

মন্দির বাহিরে বিবিধ বাদ্য বাজিতেছিল। সঙ্কীর্ত্তনের দল করতাল বাজাইয়া নাচিয়া নাচিয়া গাহিতেছে, 'হরি হরিবোল গৌরহরি'

এইদিন হইতে আরম্ভ করিয়া মাসাবধি প্রত্যহ অপরাহ্ণে সভা সাজাইয়া পুরোহিতঠাকুর মঞ্চারূঢ় হইয়া হরিকথামৃত বর্ষণ করিতেন। স্মৃতিতীর্থের সেই অমর-স্মৃতি স্মরণে এবারও সে উদ্যোগ হইয়াছিল। ঠাকুর বাড়ীর মর্ম্মরবেদিকা-সজ্জিত দরদালানের দুইপাশের কুঠারিগুলি আসনে পূর্ণ; দ্বারে চিক খাটান। বাহিরে ঢালা জাজিমের উপর সহস্র শ্রোতার বসিবার স্থান। গিদ্দা তাকিয়া, পুষ্পমালা, আতর পান প্রভৃতি অভ্যর্থনাসূচক কোন উপকরণই এখানে বাদ পড়ে নাই।

যথাকালে গাড়ু গামছা, সম্মুখে লইয়া কথকঠাকুর মঞ্চারোহণ করিলেন। একটি জুঁইএর গোড়ে তাঁহার কণ্ঠে বিলম্বিত হইল, অপরটি তাঁহার মস্তকে চড়িয়া বসিল। শ্রোতা ও শ্রোত্রীবৃন্দ দলে দলে আপন আপন স্থান গ্রহণ করিতে লাগিল। ভূমিকা

ও প্রস্তাবনা হইয়া কথারম্ভ হইয়া গেল। কথক অম্বরনাথ। মুখচোরা অম্বর একটা লোকের সাক্ষাতেই কথা কহিতে কেমন হইয়া যায়, এত লোকের সম্মুখে বিনাইয়া বিনাইয়া ছন্দে তালে কথার স্রোত প্রবাহিত করা কি তাহার সাধ্য? সে ঘামিতে লাগিল। কথা বলিতে বলিতে সে থামিয়া যায়, কণ্ঠ যেখানে তারায় তুলিতে হইবে সেখানে উদারায় নামিয়া আসে, যেখানে হর্ষে উচ্ছ্বসিত হইয়া কহিতে হইবে, সেখানে কণ্ঠ বাধিয়া স্বর থামিয়া যায়। বিষম বিপদ! শ্রোতার দল প্রসন্ন হয় না, বক্তা লজ্জায় মাটি হইয়া যাইতে চাহে। চিরকালের অনভ্যাস, কাজও কঠিন। যে নিজের চিত্তরঞ্জন করিবার জন্য শুধু নীরবেই পাঠ করিয়া গিয়াছে, সে আজ একবারে এত লোকের চিত্তরঞ্জিনী শক্তি কোথায় পাইবে? চিকের অন্তরালে নারীদলের অগ্রবর্ত্তিনী রাণী কথা শুনিতে বসিয়াছে। অপর সকলে পান চিবাইতেছিল, দোক্তা গুল্ চাহিতেছিল, ঘরকন্নার কথা অস্পষ্ট অর্দ্ধস্পষ্ট সুরে বলা কহা করিতেছিল, কথকের কথার দিকে বড় একটা কাহারও কাণ ছিল না! একা রাণীই যেন সবার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছিল; তাহার ফলে সকল ইন্দ্রিয় আসিয়া শ্রবণেন্দ্রিয়ের সহিত একাগ্র হইয়া গিয়াছে; এমনই তন্ময়চিত্তেই সে কাণ পাতিয়া আছে। এমনই সে বরাবর থাকিত। বৎসর বৎসর এই একটি মাস ধরিয়া দিনের পর দিন এইরূপ স্পন্দহীন লোচনে চাহিয়া বক্তার প্রতি বচনটি কর্ণদ্বারা পীযূষধারার ন্যায় সে পান করিয়া আসিতেছে। আজও কি সেই সুধাস্বাদ সে তাহার ক্ষুধিত অন্তরে প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাই তাহার এই নিবিষ্টচিত্ততা? না, তাহা সে পায় নাই। অভিনিবিষ্টচিত্ত পরীক্ষক পরীক্ষার্থীর পঠন যেমন শ্রবণ করিয়া যায়, রাণীর স্থির মনোযোগের মধ্যে সেইরূপ তীক্ষ্ণতা ছিল। বক্তা যত বার কথা থামাইয়া গলা ঝাড়িয়া স্বর শুদ্ধ করিতেছিল, ললাটের ঘর্ম্ম গাত্রমার্জ্জনীদ্বারা মুছিয়া অধরোওষ্ঠ সিক্ত করিয়া

কথক অম্বরনাথ।

ভীত শিশুর ন্যায় সঙ্কুচিতচিত্তে কথিতাংশ পুনরায় আরম্ভ করিতেছিল, তখন থাকিয়া থাকিয়া অন্তরালবর্ত্তিনী রাণীর ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হইয়া উঠিতেছিল—দুই নেত্র হইতে রুক্ষ বিরক্তির তীব্র দাহ ক্ষরিত হইয়া পড়িতেছিল। মুক্তাদন্তে অধর চাপিয়া কোন মতে শুধু নিজেকে সে সংযত রাখিয়াছিল। অনেকবারই উঠিয়া যাইবার ইচ্ছা তাহার মনে জাগিয়াছিল।

পরদিন পূজা করিতে আসিয়া পুরোহিত মন্দিরাধিষ্ঠাত্রীর দিকে ভাল করিয়া চাহিতে পারিলেন না। লজ্জায় সে যেন একেবারে মরিয়া গিয়াছে। রাত্রে জমিদার বাবু তাহাকে ডাকাইয়া বলিয়াছেন, "তাহার 'ধ্রুবচরিত' ব্যাখ্যান তেমন হৃদয়গ্রাহী হয় নাই। রাধারাণী বড় ক্ষুণ্ণ হইয়াছে।" এই কথা লজ্জিত অম্বরকে অধিকতর লজ্জিত করিয়াছিল। একে অক্ষমতার মত লজ্জা আর কিছুই নাই, তাহার উপর অনুযোগ। তাছাড়া—।

অন্তরালবর্ত্তিনী রাণীর ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হইয়া উঠিতেছিল।

হাঁ, তা ছাড়া আরও কিছু ছিল বইকি। রাধারাণীর ক্ষোভ! সে ত বড় অগ্রাহ্যের জিনিষ নয়। সেই যে প্রতিমাখানি অকৃত্রিম নিষ্ঠার প্রতিকৃতিস্বরূপ দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি একভাবে, একস্থানে দেবসেবিকার পদ লইয়া এ মন্দিরে অক্লান্তপরিশ্রমে দেবসেবার আনন্দমাত্র যে ইহজীবনের সার করিয়াছে, তাহার সেই আনন্দ ব্যাঘাতকারীর ন্যায় কে আছে? মহা-পাতক! তাই অম্বর লজ্জায় মরিয়া গেল। ছিঃ, সে কেন এমন অক্ষম হইয়াছিল!

রাণী কিন্তু তাহাকে কোন কথা বলিল না; পুরোহিতের সহিত কথা বলিবার তাহার বড় আবশ্যক হয় না; সেও স্বভাবতঃ স্বল্পভাষিণী, পূজারীও তাই। নীরবেই দেবারাধনা নির্বাহ হইয়া যায়। ভৃত্যগণ কাঁসর ঘণ্টা বাজাইতে থাকে। রাণী দেবঅঙ্গে চামরব্যজন করে. আরতির কর্পূরদীপ জ্বালিয়া চন্দনচূর্ণ ধূনার সহিত অগ্নিগর্ভে নিক্ষেপ করে। তারপর পুরোহিত পূজাশেষে চলিয়া যায়, রাণী অপ্রসন্নমুখে চাহিয়া থাকে। আজও ঠিক সেই মত হইল। বাহিরে আসিয়া অম্বর জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া চলিয়া গেল।

তারপর কথারম্ভ হইল। সেদিনও কথা জমিল না, তাহার প্রাণপণ চেষ্টার ফলে একটুখানি উন্নতি দেখা গেলেও কথকতায় সে লীলাসরস রসিকতা পাওয়া গেল না, অশ্রু-হাস্যময় ভাবতরঙ্গ বক্তা ও শ্রোতাকে উদ্বেগ-পুলক-চঞ্চল করিয়া তুলিতে পারিল না। কেবল ভক্তি-গদ্গদানের ভারে মাথা নুইয়া আসে, গম্ভীর স্বর, গম্ভীর-রহস্যবাণী প্রাণের নিভৃত প্রান্তে একটা অজানা ভীতিবিস্ময় জাগাইয়া তুলে। সভা ভাঙ্গিলে গৃহপথে সকলেই বলাবলি করে, "একি আবার কথা! ছাই, ছাই! এমন কথা ত তুমি আমিও বলিতে পারি!" কিন্তু যতক্ষণ কথকের কথন শেষ না হয়, ততক্ষণ মনটা বিদ্রোহের সুর ধরিতে চাহে না।

কথাটা খুব সত্য। নহিলে রাধারাণী এতদিন কথকের সহিত হয় ত কথা বন্ধ করিয়া দিত। সে বুঝিয়াছিল, একথার মধ্যে সুখতরঙ্গের ঝঙ্কার উঠুক না উঠুক, বুকের মধ্যে প্রাণের হিল্লোল বহুক না বহুক, ইহার মধ্যে কিছু একটা আছে—আছে। এ ধ্রুবের 'কোথায় হরি, কোথায় হরি' শুনিয়া চোখে জল না আসিলেও মনে শান্তি আসে! পরীক্ষিত রাজার তক্ষকদংশন কালে একজনও কান্নায় ফোঁপাইয়া না উঠুক, প্রত্যেকেই কিন্তু সেইক্ষণে জীবনের নশ্বরত্ব অনুভব করিয়াছিল। তাই যখন রমাবল্লভ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ কেমন লাগ্‌লরে রাধা-রাণি?" তখন সে ম্লানভাবে উত্তর দিল, "ভাল না বাবা।"

এমনই করিয়া দিন পনের কাটিল। ধ্রুব, প্রহ্লাদ, পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ, পারিজাত-হরণ প্রভৃতি বাছাবাছা বিষয়-গুলি কথিত হইয়া গেল। পারিজাত-হরণের পরদিন অম্বর পূজা শেষে উঠিয়া গেলে, পুষ্পপাত্রে নেত্রপাত করিয়াই রাণী

চমকিয়া উঠিল। সর্ব্বনাশ! একি রক্তজবা! এ কোথা হইতে আসিল! একি অলক্ষণ-কাণ্ড? আর কে ইহা দিয়াছে? বৈষ্ণবের উপাস্য দেবমন্দিরে জবা—শক্তি সাধনার উপচার! ক্রোধে অন্ধপ্রায় হইয়া সে ছুটিয়া আসিয়া ফুলগুলা তাম্রথালি হইতে তুলিয়া দ্বারের বাহিরে ছুঁড়িয়া ফেলিল! কিন্তু একি! দেবচরণে ঐযে ঐ শোণিতরাগ ফুটিয়া আছে! তখন সে স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিল? কোন্ ফুলে কোন্ দেবতার পূজা করিতে হয় তাহা যে জানে না, সে পুরুতগিরি করিতে আসে! ঠাকুরমশাইএর বুড়া বয়সে চরমকালে বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছিল। তাই এই বালককে স্বপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। ক্রোধে ক্ষোভে আশঙ্কায় সে অস্থির হইয়া উঠিল, সারাদিন অনাহারে মন্দিরে পড়িয়া থাকিবে, দেববিগ্রহ এখান হইতে তুলিয়া কোন নিরাপদ স্থানে চলিয়া যাইবে, অথবা ইঁহাকে গলায় বাঁধিয়া চিত্রায় ডুবিয়া মরিবে। তাহা হইলে যদি পিতা পুরোহিতকে বিদায় দেন! এমন কত কথাই যুগপৎ তাহার মনে উঠিতেছিল। তারপর একটুখানি মনঃস্থির হইলে উঠিয়া ভৃত্যকে আদেশ করিল, "বামুন ঠাকুরকে ডাকিয়া আন।" সে রাগ করিয়াই 'পুরুত ঠাকুর' না বলিয়া তাঁহাকে ছোট করিয়া 'বামুন ঠাকুর' বলিল। কালাচাঁদ বলিল, "রঘুঠাকুরকে দিদিমণি?"

পুষ্পপাত্রে নেত্রপাত করিয়াই রাণী চমকিয়া উঠিল।

"সব সমান" বলিয়া ক্রুদ্ধ রাণী সতর্জ্জনে বলিল, "তাকে আমার কি দরকার? যে পূজা করতে আসে দেখ নাই? রোঘ কোথায় থাকে?" "ওঃ তাই বলুন না কেনে ভসচাযি মশাইকে।" ভৃত্য চলিয়া গেল; রাণী তাহার রোষপ্রদীপ্ত দৃষ্টি আবার দেবচরণের দিকে ফিরাইল। ভক্তহৃদয়ের ভক্তি-রস শোণিতাক্ষরে যেন সেখানে ফুটিয়া আছে—চাহিয়া থাকা যায় না, এমনই উজ্জ্বল লাল। সে শিহরিয়া চক্ষু মুদিল। একি লীলা নাথ! একি তোমার লীলা? না, না, প্রেমাবতার তুমি, তোমার ত এ ভূষা নয়? একি তোমায় সাজে? অট্টহাসিনী নরমুণ্ডমালিনী শোণিতবসালিপ্তাঙ্গী ভীষণা করালী মূর্ত্তি, এ যে সেই নিষ্ঠুর সন্তান-শোণিতচিহ্ন! তোমাতে ত হিংসালেশ নাই—(তুমি সন্তানঘাতিনী ত নহ)—তুমি যে প্রাণময়, প্রেমময়, তবে একি? এ পাপ যে আমারই, কিরূপে সে অজ্ঞাত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব?—আমায় বলিয়া দাও। কালাচাঁদ ফিরিয়া আসিয়া খবর দিল, "ঠাকুরমশাই ঘরে নাই, আদ্ঠাকুর বল্লে, "চল্ আমিই শুনে আসি।"

বিমানমার্গ হইতে প্রেরিত কোন অশরীরি-বাণী যেন সেই মুহূর্ত্তে রাণীর কর্ণকুহরে আশার বাণীরূপে বাজিয়া উঠিল। আদ্যঠাকুর,—আদ্যনাথ—আসিয়াছে? বুঝি ইহা দৈবপ্রেরণা! বুঝি তাই। ক্ষণকাল পরে বলিলেন, "আচ্ছা তাহাকে আসিতে বল।"

আদ্যনাথ অনেক কথা বলিল। রাণীর ক্রুদ্ধচিত্ত আজ একেই জ্বলিয়া আছে, তাহার উপর অনেকগুলা ইন্ধন যোগান পাইল। সে বলিল, "কলিকালে ন্যায় ও সত্যের জয় নাই, গুণের আদর কেহ করে না; তা নহিলে অম্বর, ভাত-

পাধা অবধি যাহার বিদ্যার দৌড়, সে জমিদার বাড়ীর সর্দ্দার রসুইয়া বামুনদের পদ না পাইয়া পাইল পূজা পাঠের অধিকার। এ সকল বিদ্যার কার্য্য ঘণ্টা নাড়িয়া ফুল ফেলিয়া মানুষকে ফাঁকি দেওয়া যায়, কিন্তু উপরে ত একজন সব দেখিতে পাইতেছন! কতদিন আর জুয়াচুরি চলিবে? পূজায় ত এই; কথকতার ছেলেখেলা যে দিন দিন কিরূপ ভাঁড়ামির নিদান হইয়া উঠিতেছে তাহা যাহারা রাস্তা ঘাটে বাহির হয় তাহারা চব্বিশ ঘণ্টাই শুনিতে পায়। লোকে সকলেই বলাবলি করে, মৃত কর্ত্তার এমন কীর্ত্তিটা দুদিনে লোপ পাইবে। এ বড়ই দুঃখের বিষয়।"

শুনিয়া রাণীর যত্নায়ত্ত ধৈর্য্যের বাঁধ প্রায় ভাসিয়া গেল। সে কঠোর দৃষ্টিতে আত্মনাথের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কথকতা জান?"

"নিজমুখে বলিলে লোকে বলিবে অহঙ্কার করিতেছে—আমার মত কথকতা এ তল্লাটে কারু সাধ্য নাই যে করিতে পারে। একদিন শুনিবেন?"

"একদিন কি—আজই।" আত্মনাথ প্রীত হইল, কিন্তু মান বাড়াইবার জন্য একটু জিদ দেখাইয়া কহিল, "আজ কি পারিব? সর্দ্দি হইয়াছে—তা ভিন্ন—"

রাণীর যুগলভ্রূ গুণ দেওয়া ধনুর মত বিস্তৃত হইল, দৃঢ় আদেশের স্বরে সে বলিল, "আজ না পারিলে আর পারিয়া কাজ নাই,—"

সর্ব্বনাশ! সভয়চিত্তে হরিস্মরণ করিয়া আত্মনাথ ব্যাকুলভাবে বলিয়া উঠিল, "তবে আজই।"

"হাঁ আজই।"

"আপনার হুকুম পাইলেই হইল।"

"বেশ, এখন এর কি উপায়? অঙ্গুলিদ্বারা দেবচরণ দেখাইয়া সে স্থিরনেত্রে ভট্টাচার্য্যের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি?"

আত্মনাথ প্রথমটা এ প্রশ্নের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই। তাই একটু যেন ফাঁপরে পড়িয়াছিল, কিন্তু চাহিয়া চাহিয়া হঠাৎ রহস্যটা বুঝিতে পারিল। সাতঙ্কে ঈষৎ পিছাইয়া সে বলিয়া উঠিল, "শ্রীবিষ্ণু! বৈষ্ণবের মন্দিরে বৈষ্ণব প্রতিমায় শক্তি উপাসকের রাঙ্গা ফুল! হায় হায়! আরও কি দেখিতে হইবে! ইহাতে মহাপাতক হইয়াছে।"

"উপায়?" "উপায়?" দেববিগ্রহকে পঞ্চগব্যে স্নান করাইয়া পুনঃপ্রতিষ্ঠা, হোম, জপ ও কাঞ্চনমূল্য বৈষ্ণবকে দান। তা সে মূল্যটা যে কত তাহারও নিয়ম প্রায়শ্চিত্ত-পদ্ধতির দ্বাদশ অধ্যায়ে লিখিত আছে, সেটা এখন আমার ঠিক স্মরণ হইতেছে না, পুঁথি দেখিয়া বলিয়া যাইব। এমন আনাড়ি—অ্যাঁ!—একেবারে কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞানবিবর্জ্জিত!"

অম্বরনাথের নিন্দা আরও কিছুক্ষণ ধরিয়া চালাইতে আত্ম ঠাকুরের উৎসাহ ব্যতীত অনুৎসাহ ছিল না, কিন্তু শ্রোত্রী আর প্রশ্রয় দিল না। সে অসহিষ্ণুভাবে বাধা দিল, "আগে হাত ধুইয়া তুমি ও ফুলগুলা ফেলিয়া দাও, আমার কিছুই ভাল লাগিতেছে না। তারপর পুঁথি দেখিয়া এস, আমি প্রায়শ্চিত্তের উদ্যোগ করিয়া রাখি।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅনুরূপা দেবী।

সংস্কার-সমিতি।

হাতে কোন কাযকর্ম্ম না থাকিলে ঘুরিয়া বেড়ান মন্দ নহে। প্রথমতঃ, অঙ্গচালনা-জনিত-পরিশ্রম-হেতু ক্ষুধা ও নিদ্রা সুন্দররূপ হয়, তদ্ভিন্ন, অনেক স্থানে অনেক রূপ অভিনব ব্যাপার দেখিতে পাওয়া যায়; মনুষ্য চরিত্রের বৈচিত্র্য দেখিয়াও অনেক শিক্ষা লাভ করা যায়। এই সকল কারণে আমার ঘুরিয়া বেড়ান রোগ জন্মিয়াছে।

একদিন অপরাহ্ণে এইরূপ বেড়াইতে বেড়াইতে বহুদূর গিয়া পড়িয়াছি। যখন বাটী হইতে বহির্গত হই, তখন পশ্চিম-দিকে অতি সামান্য মাত্র মেঘ ছিল; ক্রমে আকাশ ঘন-ঘটাচ্ছন্ন হইল দেখিয়া গৃহাভিমুখ হইলাম বটে, কিন্তু অল্পপথ অতিক্রম করিতেই প্রবল বেগে ঝঞ্ঝা ও সঙ্গে সঙ্গে মুসলধারায় শিলা-বৃষ্টি আরম্ভ হইল। তখন শিলাঘাত হইতে ছত্র হীন মস্তককে রক্ষা করা কাপুরুষের কার্য্য মনে করিয়া, পথপার্শ্ববর্ত্তী একটি বাটীতে আশ্রয় গ্রহণ করাই সমীচীন বিবেচনা করিয়া সন্নিহিত একখানি বাটীতে উপস্থিত হইলাম। বাটীখানির উপরে বৃহৎ উজ্জ্বল স্বর্ণাক্ষরে "সংস্কার সমিতি" লেখা আছে। বাটীর সম্মুখস্থ বারান্দায় উঠিলাম। তৎপার্শ্বেই গৃহ, গৃহ-মধ্যে বিস্তর লোক কোলাহল করিতেছে। বাহিরে ঝঞ্ঝা, বৃষ্টি, মেঘগর্জ্জন, ও মধ্যে মধ্যে করকাপাত শব্দ, ভিতরে জনসংঘের অভ্রভেদী কোলাহল কর্ণযুগলের পরিতৃপ্তি সাধন করিতে লাগিল। কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া, সাহসে ভর করিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, সমিতির কার্য্য আরব্ধ হইয়াছে, কিন্তু কোনও শৃঙ্খলা নাই। চারি পাঁচ-জন করিয়া এক এক বিষয়ের মীমাংসায় রত, এবং তন্মধ্যে এক এক জন মীমাংসিত বিষয়গুলি লিপিবদ্ধ করিতেছেন। এইরূপ দুই চারি দল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বুঝিলাম, সকলেই সৃষ্টি ও সংসারের অনিয়মগুলি লিপিবদ্ধ করিতে, অর্থাৎ ভগবানের ভ্রম বা অন্যায় কার্য্যগুলির তালিকা করিতে ব্যস্ত। সম্বর্দ্ধিত-কৌতূহল-পরবশ হইয়া এক এক স্থানের বিতর্ক শুনিতে লাগিলাম। একস্থানে চন্দ্রের হ্রাস-বৃদ্ধি সম্বন্ধে কথা হইতেছে। চন্দ্রের গতি পৃথিবীর আবর্ত্তনের সঙ্গে সমান হইলে, সর্ব্বত্র রাত্রিকালে পূর্ণচন্দ্র দেখা যাইতে পারিত, তাহা না করিয়া অমাবস্যার রাত্রে মনুষ্যকে কষ্ট দেওয়া কেন হয়? অন্ততঃ বৃহস্পতির ন্যায় পৃথিবীকেও চন্দ্র চতুষ্টয় সমন্বিত করিলে কি ক্ষতি হইত? স্থানান্তরে, সর্প, বৃশ্চিক, দংশ মশকাদি সৃজনের অনাবশ্যকতা লইয়া বিতর্ক হইতেছে। কেহ কেহ বলিতেছেন, তাহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব ভক্ষণ করে, না করিলে, ঐ সকল ক্ষুদ্রজীব মনুষ্যের পীড়া দায়ক হইত। একজন উত্তর করিলেন, ঐ সকল ক্ষুদ্র জীবের সৃষ্টিরইবা কি প্রয়োজন ছিল? অন্ততঃ সর্পাদিকে নির্ব্বিষ এবং মনুষ্য দংশনে অক্ষম করিতে পারিতেন। অন্যত্র, আহারীয় দ্রব্যের অপ্রাচুর্য্য ও তাহাদের উৎপাদনে কষ্টের কথার মীমাংসা হইতেছে। ধান্যাদি ক্ষেত্রে স্বতঃ প্রচুর পরিমানে জন্মিয়া থাকেনা কেন? এবং তাহাহইতে কষ্টে শস্য বাহির করিতে হয় কেন? এক গুচ্ছ ধান্য লইয়া ঝাড়িলেই প্রচুর পরিমাণে তণ্ডুল নির্গত হওয়া এবং সেই তণ্ডুল জলে দিবা মাত্রই উৎকৃষ্ট অন্নে পরিণত হওয়া নিতান্ত উচিত। আম্র পনসাদি বৃক্ষসকল সর্ব্বদা রসাল ফলে পূর্ণ থাকিবে। নারিকেল দুরারোহ উচ্চবৃক্ষ-শিরে দুর্ভেদ্য আবরণে আবৃত না থাকিয়া কুষ্মাণ্ডাদির ন্যায় ভূমিতলে থাকে না কেন? একজন আপত্তি করিলেন, "মনুষ্য তাহা হইলে নিতান্ত অলস হইয়া পড়িবে।" তদুত্তরে আর একজন বলিলেন, "মনুষ্য অলস হউক বা না হউক তাহাতে ভগবানের কি আসে যায়? তিনি আপনার কার্য্য সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর না করেন কেন?" কোথাও, রোগ এবং অকালমৃত্যু সম্বন্ধে বিষম বিতর্ক আরম্ভ হইয়াছে। এখানে এত জটিল প্রশ্ন সকল উত্থিত হইতেছে, যে প্রায় তাহার কোনটিরই পরিষ্কার মীমাংসা হইয়া উঠিতেছেনা। আদৌ মৃত্যুর আবশ্যকতা কি? মৃত্যু না থাকিলে, জন্মেরও আবশ্যকতা থাকে না, অন্ততঃ ক্রমাগত মনুষ্য জন্মিয়া পৃথিবীতে স্থান ও খাদ্যাভাব হইবার সম্ভাবনা। অতএব যদি মৃত্যু হয়, কতবয়সে হওয়া উচিত? এবং সকলের একই সময়ে মৃত্যু না হইয়া অকালমৃত্যু হয় কেন? লোক রোগে কষ্টপায় কেন? এ সকলের সুমীমাংসা নাহওয়ায় বড়ই গণ্ডগোল বাধিয়াছে। তথাহইতে স্থানান্তরে যাইব, এমন সময় ঘোর রবে কর্ণজ্বরকর ঘণ্টা-নিচয়-নিনাদে চমকিত হইয়া উঠিলাম। তৎক্ষণাৎ সকলে তর্ক বিতর্ক ছাড়িয়া আসন গ্রহণ করিলেন, সভা নিস্তব্ধ হইল। অগত্যা আমাকেও

আসন গ্রহণ করিতে হইল। তখন বিলম্বিত-কুর্চ্চরাশি-সমন্বিত, চশমা-যুগলাবৃত-নেত্র, সভাপতি মহাশয়, মস্তিষ্ক-সাগরসমুত্থিত-সুধাংশুবৎ সহসা সমুত্থিত হইলেন, এবং করতলধ্বনিতে গৃহ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে সভাপতি মহাশয়ের ওষ্ঠ কম্পিত হইয়া মৃদুগম্ভীর ধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল। তাঁহার নিম্নলিখিত সারগর্ভ অভিভাষণ শ্রবণে কর্ণকুহর চরিতার্থ করিলাম।

"সভ্যমহোদয়গণ! আপনারা সকলেই বিচক্ষণ এবং সুপণ্ডিত, সকলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী অথবা দির্ঘায়ু; আপনারা পৃথক্‌ভাবে যে সকল তালিকা প্রস্তুত করিতেছেন, তাহাদ্বারা সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন যে, সৃষ্টিকার্য্যে বিস্তর দোষ আছে। আমাদের সংস্কার সমিতির কর্ত্তব্য, অগ্রে এই সকল সংশোধন করা। আমাদের ইচ্ছা, এই সমস্ত দোষের কর্ত্তা সৃষ্টিকর্ত্তার দ্বারাই এই সকল দোষ সংশোধিত করিয়া লওয়া হউক। নচেৎ প্রথমতঃ, তাঁহার অবমাননা করা হয়, তাহা বোধ হয় কেহই ইচ্ছা করেন না (নিশ্চয় নয়, নিশ্চয় নয়)। দ্বিতীয়তঃ, আমাদিগকে অনর্থক একটা গুরুভার গ্রহণ করিতে হয়, তাহাই বা কেন করি? (করতলধ্বনি)। তবে এক্ষণে কথা হইতেছে যে, তিনি সৃষ্টিকর্ত্তা—এভার গ্রহণ করিবেন কি না? যদি তিনি স্বেচ্ছায় প্রবৃত্ত হইয়া অথবা কোনও দুরভিসন্ধিবশতঃ এরূপ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে গ্রহণ না করাই সম্ভব, কিন্তু যদি ভ্রমবশতঃ এরূপ করিয়া থাকেন, আর তাঁহাকে তাঁহার ভ্রম সকল তন্ন তন্ন করিয়া দেখাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই স্বীয় ভ্রমগুলি সংশোধন করিয়া দিবেন, যেহেতু তিনি দয়াময়, (করতলধ্বনি)। আর তিনি যে অন্যের অপেক্ষা কিছু সহজে এ সংস্কার-কার্য্যে কৃতকার্য্য হইবেন, এ বিষয়েও আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে, যেহেতু তিনি সর্ব্বশক্তিমান্। (করতলধ্বনি)। তবে এক্ষণে বিবেচ্য এই যে, তিনি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক একার্য্য করিয়াছেন, কি না? আমার মতে তিনি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক লোককে কষ্ট দিতে পারেন না, যেহেতু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, তিনি দয়াময়। আর তিনি দুরভিসন্ধিবশতঃও এরূপ করেন নাই, কারণ, তিনি মঙ্গলময় (সজোরে করতলধ্বনি)। অধিকন্তু আমরা মনুষ্য জাতি তাঁহার কখনই কোন অনিষ্ট করি নাই, বরং তাঁহার পূজা করিয়াই আসিতেছি। তবে, যাহারা তাঁহার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না, এরূপ লোকের প্রতি যদি তিনি নির্ব্বিকার হইয়াও রুষ্ট হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহাদের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করা উচিত, সমগ্র অমঙ্গল তাহাদের প্রতি প্রয়োগ করিতে পারেন, (উৎকৃষ্ট প্রস্তাব, উৎকৃষ্ট প্রস্তাব)। তিনি সর্ব্বজ্ঞ, কে কে তাঁহার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না, তাহা আমাদিগকে কষ্ট করিয়া দেখাইয়া দিতে হইবে না, তিনি সহজেই তাহাদিগকে নির্ব্বাচিত করিয়া, আসামের কি সাহারায় তাহাদের বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া যাবতীয় মশক, মৎকুন, উৎকুণ, সর্প, বৃশ্চিক, সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি বন্যজন্তু," (আমাদিগের আহারীয় পশু কয়টা বাদে) "ভাল, আমাদিগের ব্যবহার-যোগ্য জীব ব্যতীত অন্য বন্যজন্তু এবং রোগ, অকালমৃত্যু সমস্ত তথায় প্রেরণ করুন। (করতলধ্বনি)। এক্ষণে আমরা সমস্ত ভ্রমগুলির তালিকা প্রস্তুত করিয়া আগামীবারে তদ্বিষয়ে বিচারান্তে যেরূপ সিদ্ধান্ত হয়, তাহার একখণ্ড প্রতিলিপি ভগবৎসমীপে প্রেরণের প্রস্তাব করি। তাহার পর সভার অন্য কার্য্য করা যাইবে।"

সভাপতি মহাশয় এইপর্য্যন্ত বক্তৃতা শেষ করিয়া ঘোরতর করতলধ্বনির মধ্যে ললাটস্থিত ঘর্ম্ম মুছিতে মুছিতে উপবেশন করিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ তাহার প্রস্তাব সকলে একবাক্যে সমর্থন করিলেন।

আমার অবিবেচনা হইয়া আসিয়াছিল, ধীরে ধীরে প্রস্থান করিবার চেষ্টা করিতেছিলাম, অথচ একটি কথা কহিয়া যাইবার প্রলোভনও অতিক্রম করিতে পারিলাম না। উঠিয়া দাঁড়াইলাম, ইতঃপূর্ব্বে অনেকে আমাকে লক্ষ্য করেন নাই, উঠিয়া দাঁড়াইবামাত্র সকলের দৃষ্টি আমার উপর নিপতিত হইল, তখন আর একটা কথা না বলিয়া চলিয়া আসা অথবা পুনর্ব্বার আসন গ্রহণ করা, উভয়ই অসভ্যতার পরিচয় হয় দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "মহাশয়! আপনাদের এ প্রস্তাব ভগবৎসমীপে কাহার দ্বারা প্রেরণ করিবেন?"

সভাপতি মহাশয় তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন, "সে বিষয় আমরা এখনও কিছু স্থির করি নাই, তবে এই

সভারই কোন বিচক্ষণ সভ্যের দ্বারা প্রেরিত হইবে; আপাততঃ একটা তালিকা প্রস্তুত করাই প্রথম কার্য্য।"

আমি। "এসম্বন্ধে আমার একটু বক্তব্য আছে।"

সভাপতি। "অবাধে বলিতে পারেন।"

আমি। "আমার বয়ঃক্রম দেখিয়া বুঝিতে পারিতেছেন যে, এ সভাস্থ সকল সভ্য অপেক্ষা আমি অগ্রে তথায় যাইবার আশা করিতে পারি। যদি আমি কোন মতে আপনাদের একখণ্ড তালিকা সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে পারি, এবং ভগবৎসাক্ষাৎকার লাভ করিয়া তালিকা প্রদানের সুবিধা পাই, তবে আমি তাহাতে প্রস্তুত আছি, অনুগ্রহ করিয়া আমাকে একখণ্ড তালিকা পাঠাইয়া দিতে পারেন। যদি ইতোমধ্যে সভাস্থ আর কেহ অগ্রসর হইতে ইচ্ছা করেন, তিনিও একখণ্ড তালিকা লইয়া যাইতে পারেন।"

এ প্রস্তাবে সভাপতি-প্রমুখ সকলে সম্মতি দানকরিলে, আমি ঠিকানা দিয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম।

বাহির হইবার সময় একজন পরিচিত বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হইলে, তিনি এত রাত্রে আমার এখানে আসার কারণ জিজ্ঞাসা করায়, আমি পথে যাইতে যাইতে তাঁহাকে সভার বিবরণ আদ্যোপান্ত বলিলাম। শুনিয়া তিনি এমন দীর্ঘকালব্যাপী উচ্চহাস্য করিলেন যে, আমাদের ঠিক সম্মুখবর্ত্তী দুইটি ভদ্রলোক কএকবার ফিরিয়া তাঁহার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, সম্ভবতঃ তাঁহার মস্তিষ্ক-বিকৃত ভাবিয়া, অন্য ফুটপাথে গমন করিলেন।

শ্রীপ্রমাদদাস গোস্বামী।

সভা-সমিতি।

যোগেন্দ্র স্মৃতি-সভা।

'বঙ্গবাসী'র প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু মহাশয়ের স্মৃতি-সম্মানার্থ গত ৭ই ভাদ্র সোমবার "সাহিত্য-সম্মিলনের" উদ্যোগে কলিকাতার কোহিনুর রঙ্গমঞ্চে নবম বার্ষিক সভার অধিবেশন হইয়াছিল। কলিকাতার গণ্যমান্য অনেক ভদ্রলোক ও সাহিত্যিক সভায় উপস্থিত ছিলেন। হাইকোর্টের বিচারপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সন্তোষের রাজা শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ রায় চৌধুরী, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, বৈদ্যরত্ন কবিরাজ শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ, শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব, শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি মহোদয়গণ বক্তৃতা করেন। বঙ্গবাসীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার মহাশয়ের রচিত দুইটি গান এই সভায় গীত হয়

আনন্দমোহন স্মৃতি-সভা।

বিগত ২০এ আগষ্ট, ৪ঠা ভাদ্র বুধবার কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউট্ হলে পরলোকগত স্বদেশসেবক মনীষী আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের সপ্তম বার্ষিক মৃত্যুদিন উপলক্ষে কলিকাতার জনসাধারণের একটি মহতী সভা আহূত হয়। হাইকোর্টের স্বনামধন্য বিচারপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত সৈয়দ হাসান ইমাম সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সুসঙ্গের মহারাজা শ্রীযুক্ত কুমুদচন্দ্র সিংহ বাহাদুর, ময়মনসিংহের রাজা শ্রীযুক্ত শশিকান্ত আচার্য্য বাহাদুর, সন্তোষের রাজা শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ রায় চৌধুরী, বিজ্ঞানাচার্য্য ডাঃ শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, রায় দেবেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, বৈদ্যরত্ন কবিরাজ শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সেন, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র, শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন

স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসু।

বসু, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত, শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা প্রভৃতি বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। মাইকেলের জীবন চরিত-প্রণেতা শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু, রায় শ্রীযুক্ত রাধাচরণ পাল বাহাদুর ও শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র ইংরেজিতে, এবং শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ বঙ্গভাষায় স্বর্গীয় বসু মহাশয়ের অশেষ গুণাবলীর বর্ণনা করেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং রাজা শ্রীযুক্ত শশিকান্ত আচার্য্য বাহাদুরের সমর্থনে আনন্দমোহনের উপযুক্ত কোন স্থায়ী স্মৃতিরক্ষার্থ একটি কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হয়। তৎপরে সভাপতি মহাশয় একটি সুললিত বক্তৃতা করিয়া সভার কার্য্য শেষ করেন। সভায় সহস্রাধিক লোক উপস্থিত ছিলেন।

আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের স্মৃতির সম্মানার্থ ময়মনসিংহেও এক মহতী সভার অধিবেশন হয়। তাহার বিস্তৃত বিবরণ আমরা পরে প্রকাশিত করিব।

শোক সংবাদ

হিজ হাইনেস্ স্যর কুচবিহারাধিপতি মহারাজ রাজেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুরের গত সোমবার ২রা সেপ্টেম্বর বিলাতে রাত্রি দুইটার সময় (এখানে তখন রাত্রি ৮টা) মৃত্যু হইয়াছে। ১৯১১ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে ইঁহার পিতা স্বর্গীয় মহারাজ স্যর নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুরের বিলাতের এক্সহিল অন সি নামক জনপদে মৃত্যু হয়। ইনি ঐ বৎসর ৮ই নভেম্বর তারিখে সমারোহ সহকারে রাজগদিতে প্রতিষ্ঠিত হন। ইঁহার রাজত্বকাল পূরা দুই বৎসরও হইল না। এক্ষণে ইঁহার দ্বিতীয় ভ্রাতা রাজকুমার শ্রীল শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনারায়ণ কুচবিহারের সিংহাসন লাভ করিবেন। এই রাজকুমারের বিগত ২৫এ আগষ্ট বিলাতে বাকিংহাম প্যালেস হোটেলে গাইকবাড় তনয়া ইন্দিরার সহিত শুভ পরিণয় সম্পন্ন হইয়াছে। কুচবিহার রাজ্যের সীমানার অভ্যন্তরস্থান ১৩০৭ বর্গ মাইল ও জনসংখ্যা ৬০০,০০০; বাৎসরিক রাজস্ব প্রায় ২৩ লক্ষ টাকা।

মাস-পঞ্জী

—শ্রাবণ—

১লা—মান্দ্রাজের "ইণ্ডিয়ান্ পেট্রিয়ট্" নামক দৈনিক পত্রের সম্পাদক মানহানি অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া ৩০০১ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হন।

২রা—মোহন বাগান ফুটবল-ক্লব ই, বি, এস, আর, ক্লবের সহিত ম্যাচ খেলিতে হারিয়া যা'ন।

৩রা—হালের ডকারগণ ধর্ম্মঘট করে।

„—এডিনবারার ট্রামচালকগণ ধর্ম্মঘট করে।

৫ই—ভ্যাটিক্যানের সুইস গার্ডগণ ধর্ম্মঘট করে।

„—ইজিপ্টের নূতন "লেজিস্‌লেটিভ্ এসেমব্লির" নিয়মাবলী প্রকাশিত হয়।

৭ই—স্যর রালফ্ নক্‌সের মৃত্যুসংবাদ পাওয়া যায়।

৬ই—ফুকিয়ান রাজ্য নিজের স্বাধীনতা ঘোষণা করে।

„—লর্ড মহাসভা 'ওয়েলস্ ডিসএসট্যাব্লিসমেণ্ট' বিল নামঞ্জুর করেন।

৭ই—তুর্কী আড্রিয়ানোপল পুনরায় দখল করে। ইহাতে অপরাপর শক্তিপুঞ্জ আপত্তি করে।

„—মেজর জেনারেল আরথর রিড্ আউটের মৃত্যু সংবাদ পাওয়া গেল।

৮ই—দক্ষিণ আফ্রিকার মিনিষ্টার অফ্ এগ্রিকল্‌চার, মি, সয়ারের মৃত্যু সংবাদ পাওয়া যায়।

৯ই—হাউস্ অফ্ লর্ডস্ 'প্লুরাল ভোটিং বিল' নামঞ্জুর করেন।

„—জেনারল্ স্যার হ্যারী প্রেণ্ডারগ্যাষ্টের মৃত্যু সংবাদ পাওয়া যায়।

„—কলিকাতার টাউন হলে মিঃ, ডি, এল, রায়ের স্মৃতি-সম্মিলন হয়।

১২ই—গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা সম্বন্ধীয় প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কলিকাতায়

রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এক মহতী সভা হয়।

১৩ই বোম্বায়ের বিখ্যাত সওদাগর সর্ [illegible] বাহমানজী কামা[illegible]র মৃত্যু হয়।

১৪ই লর্ড [illegible] মহাসভায় [illegible] প্রকাশ করেন [illegible] ভারতের [illegible] পরিচালন সম্বন্ধে এক নূতন বিল পেশ হইবে।

" বিখ্যাত ভূতত্ত্ববিদ্ প্রফেসার মিলনের মৃত্যু হয়।

১৬ই বরওয়ানী রাজ্যের মহারাণী ধন কুমার সাহেবার মৃত্যু হয়।

১৮ই কানপুরের এক মসজিদ ভাঙ্গার জন্য স্থানীয় মুসলমানদিগের সহিত পুলিসের লড়াই হয়। উভয় পক্ষের অনেক লোক হতাহত হয়।

১৯এ ভাগলপুরের বিখ্যাত উকীল রায় তারিণীপ্রসাদ বাহাদুরের মৃত্যু হয়।

২১এ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ. ও আই. এ. পরীক্ষার ফল বাহির হয়।

" রুমেনীয়া, গ্রীস ও সার্ভিয়া, বুলগেরিয়ার সহিত সন্ধি করে।

" লণ্ডনে মেডিকেল কংগ্রেসের অধিবেশন আরম্ভ হয়।

২২এ বিখ্যাত দানবীর মিঃ রবার্ট [illegible]র মৃত্যু হয়।

" রাওলপিণ্ডিতে এক দরবার হয়। পঞ্জাবের ছোট লাট বাহাদুর সভাপতি ছিলেন।

২৩এ কমন্স মহাসভায় [illegible] ভারত বজেট পেস হয়। মিঃ মণ্টেগু এই উপলক্ষে ভারতের বর্ত্তমান অবস্থার আলোচনা করেন।

" ঢাকায় এক মিউজিয়ম খোলা হয়।

২৫এ রুমেনিয়ার সহিত বুলগেরিয়ার সন্ধি স্থাপনা হয়।

" বন্যায় বর্দ্ধমানসহর ও নিকটবর্ত্তী বহু গ্রামের বিস্তর ক্ষতি হয়, অনেকগুলি প্রাণহানিও হয়।

২৬এ বোম্বায়ের বিখ্যাত সওদাগর স্যার আদমজী পীরভায়ের মৃত্যু হয়।

২৭এ দিল্লির "কমরেড" ও "হমদরদ" পত্রিকাদ্বয়ের অধিকারী মিঃ মহম্মদ আলীকে জামিন দিবার জন্য সরকার হইতে হুকুম হয়।

" মাননীয় সর্ জজ্ শ্রীগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু হয়।

২৮এ জর্ম্মানীর বিখ্যাত সোসিয়ালিষ্ট মিঃ বেবেলের মৃত্যু সংবাদ পাওয়া যায়।

৩০এ মানহানির দায়ে অভিযুক্ত "মহাম্মদী" সম্পাদক নির্দোষী সাব্যস্ত হ'ন।

" পানামা খাল দিয়া সর্ব্বপ্রথম ষ্টীমার যায়।

" কমন্স মহাসভা অবকাশ গ্রহণ করেন। উভয় সভায় সম্রাট মহোদয়ের অভিভাষণ পাঠ হয়।

সাহিত্য-সংবাদ।

'আলোচনা' সম্পাদক সুধী যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পুস্তকগুলি গ্রন্থাবলী আকারে পূজার মধ্যে প্রকাশিত হইবে।

সুকবি শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক মহাশয়ের কাব্যপুস্তক 'একতারা' পূজার পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইবে।

এবার পূজার বাজারে অনেক কবিতাপুস্তক প্রকাশিত হইতেছে। কবিবর শ্রীযুক্ত ভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী মহাশয়ের 'ছায়াপথ' নামক একখানি কবিতাসংগ্রহ এই আশ্বিন মাসেই প্রকাশিত হইবে।

প্রবীণ ঐতিহাসিক ও ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত হরিসাধন মুখোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক উপন্যাস 'শিশমহলের' দ্বিতীয় সংস্করণ বহুচিত্রসুশোভিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে।

কবিবর শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বড়াল মহাশয়ের 'এষা'র দ্বিতীয় সংস্করণ শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় লিখিত ভূমিকা সহিত ও 'শঙ্খের' দ্বিতীয় সংস্করণ প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ভূমিকাসংযুক্ত হইয়া পূজার পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইবে।

সুকবি শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র নিয়োগী মহাশয় তাঁহার পূর্ব্বপ্রকাশিত ও অপ্রকাশিত কবিতাগুলি সংগ্রহ করিয়া অতি সত্বরই পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিতেছেন। বলা বাহুল্য, প্রবীণ কবির কবিতাসংগ্রহ দেখিবার জন্য সকলেই উৎসুক হইবেন।

সুকবি শ্রীযুক্ত করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ইতঃপূর্ব্বে 'ঝরাফুল' লিখিয়া বঙ্গীয় পাঠকসমাজে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। সম্প্রতি আবার তাঁহার নূতন কবিতাপুস্তক 'শান্তিজল' প্রকাশিত হইয়াছে। আশা করি 'শান্তিজল' পাঠে বাঙ্গালী অশান্ত হৃদয়ে শান্তিলাভ করিবে।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার মহাশয়ের 'সমসাময়িক ভারতের' প্রথম দুইখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি "ইংরাজের কথা" নামক দশখণ্ডে সমাপ্য আর একখানি বিরাট গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইংরেজিতে যেমন Readings from History আছে, ইহাও সেই ধরণের গ্রন্থ। এই পুস্তকের প্রথম খণ্ড বহু দুষ্প্রাপ্য ও মূল্যবান চিত্রে সুশোভিত হইয়া পূজার পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইবে।

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ইতঃপূর্ব্বে মুর্শিদাবাদের নবাব-বেগমগণের কাহিনীগুলি সংগ্রহ করিয়া 'বাঙ্গালার বেগম' রচনা করিয়াছেন। তাঁহার 'ভারতীয় বেগম' শীঘ্রই বহু মূল্যবান্ চিত্রে সুশোভিত হইয়া প্রকাশিত হইবে। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত যদুনাথ রায় বি, এল, মহাশয় এই পুস্তকের ভূমিকা লিখিবেন।

রাজসাহী কলেজের সুযোগ্য অধ্যাপক ও সাহিত্যক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠ শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী মহাশয়ের নিম্নলিখিত তিনখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। (১) 'বৈজ্ঞানিক জীবনী,' ইহাতে নিউটন প্রভৃতি য়ুরোপীয় ও সুশ্রুত প্রভৃতি প্রাচীন ভারতীয় বৈজ্ঞানিকগণের জীবন চরিত থাকিবে। (২) 'আয়ুর্ব্বেদ ও নব্যরসায়ন'; এই সম্বন্ধে লেখক মহাশয়ের যে সমস্ত প্রবন্ধ ইতঃপূর্ব্বে ভিন্ন ভিন্ন সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল, সে সমস্তই এই সংগ্রহে স্থান প্রাপ্ত হইবে। (৩) 'তুফান', ইহাতে পঞ্চানন বাবুর রসাত্মক (humorous) রচনাগুলি স্থানপ্রাপ্ত হইবে।

শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের তিনখানি পুস্তক প্রকাশিত হইতেছে; তাহার মধ্যে 'গয়া-কাহিনী' ও 'অরুন্ধতী' পূজার পূর্ব্বেই বাহির হইবে এবং 'প্রবাসের কথা' পূজার পরে প্রকাশিত হইবে। 'গয়া-কাহিনীর' ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয়। শ্রীযুক্ত অতুল বাবুর 'প্রবাসের কথায়' পূর্ব্ব বঙ্গ, উত্তর বঙ্গ, আসাম, পশ্চিম বঙ্গ, উড়িষ্যা, ছোট নাগপুর প্রভৃতি অঞ্চলের প্রসিদ্ধ স্থান, পুরাকীর্ত্তি প্রভৃতির বর্ণনা থাকিবে।

'নদীয়া কাহিনী' লেখক শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ মল্লিক মহাশয়ের নিম্নলিখিত তিনখানি পুস্তক পূজার পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইবে। (১) 'সতীদাহ'; বৈদিক যুগ হইতে বর্ত্তমান সময় পর্যান্ত সতীদাহের ইতিহাস এই বিপুল গ্রন্থে স্থান লাভ করিয়াছে, ইহাতে অনেকগুলি চিত্র থাকিবে। (২) 'শ্রীচৈতন্য', ইহাতে শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের জীবনকথা থাকিবে, এখানিও বহু চিত্রে সুশোভিত হইয়াছে। (৩) 'চাঁদমুখ,' এখানি বালকবালিকাদিগের জন্য লিখিত সচিত্র পুস্তক।

পুস্তক-পরিচয়।

চরিতকথা।—শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম, এ, প্রণীত। মূল্য দশ আনা মাত্র। এই চরিতকথায় আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর আটটি মহনীয় চরিত্রের কথা বলিয়াছেন। ইহা জীবনচরিত নহে, ইহাতে বর্ণনীয় মহাত্মাগণের জন্মমৃত্যুর তারিখ, শিক্ষাদীক্ষার কথা লিপিবদ্ধ হয় নাই; অথচ যাহা বলা হইয়াছে তাহাতেই চরিত কথা সম্পূর্ণ হইয়াছে। দয়ারসাগর বিদ্যাসাগর, সাহিত্যসম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, হরমান হেলম্‌-হোলৎজ, আচার্য্য মক্ষমূলর, উমেশচন্দ্র বটব্যাল, রজনীকান্ত গুপ্ত ও বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, এই কএকটি চরিত-কথা রামেন্দ্র বাবু যে ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, আমাদের মনে হয় আর কোন বাঙ্গালী লেখক তেমন ভাবে লিপিবদ্ধ করিতে পারিতেন, বা পারেন, কি না সন্দেহ। এই চরিতকথাগুলি আমরা একাধিকবার মাসিক পত্রে পাঠ করিয়াছি। কিন্তু তবুও যখন এই পুস্তকখানি আমাদিগের হস্তগত হইল, তখন ইহার প্রত্যেক প্রস্তাব আদ্যোপান্ত পাঠ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। এমন বর্ণনা কৌশল, এমন চিন্তাশীলতা, এমন গবেষণা অতি অল্প লোকের লেখাতেই দেখিতে পাওয়া যায়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যদি এই পুস্তকখানি প্রবেশিকা পরীক্ষার পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ব্বাচিত করেন এবং বর্ত্তমান সময়ে বিদ্যালয়সমূহের উচ্চশ্রেণীতে যে ভাবে বাঙ্গালা সাহিত্য অধীত হইয়া থাকে, তাহা না হইয়া যথোপযুক্তভাবে এই পুস্তকখানি অধীত হয়, তাহা হইলে শিক্ষার্থীবৃন্দ সর্ব্ববিষয়ে যথেষ্ট উপকার লাভ করিতে পারিবেন; এ কথা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি।

কর্ম্মকথা।—শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম, এ, প্রণীত। মূল্য পাঁচ সিকা। ছাপা, কাগজ, বাঁধাই অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে যে কএকটি প্রস্তাব সংগৃহীত তাহার অধিকাংশই মাসিক পত্রিকাদিতে প্রকাশিত হইয়াছিল, দুই একটি গ্রন্থবিশেষের ভূমিকারূপেও মুদ্রিত হইয়াছিল। পুরাতন সাধনা, সাহিত্য, ভারতী প্রভৃতির পৃষ্ঠা উদ্ঘাটন করিয়া আমরা কতবার যে রামেন্দ্র বাবুর মুক্তির পথ, বৈরাগ্য, জীবন ও ধর্ম্ম, স্বার্থ ও পরার্থ, ধর্ম্মপ্রবৃত্তি, আচার, ধর্ম্মের প্রমাণ, ধর্ম্মের অনুষ্ঠান, প্রকৃতিপূজা ধর্ম্মের জয় প্রভৃতি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছি এবং প্রত্যেকবার পাঠ করিয়াই ভাবিবার নূতন কথা পাইয়াছি, তাহা আর বলিতে পারি না! বলিতে গেলে এমন সুন্দর, এমন সারগর্ভ, এমন ভাবপূর্ণ, এমন সুললিত সন্দর্ভ আমরা বাঙ্গালা ভাষায় পাঠ করি নাই; ইহার এক একটি প্রবন্ধ বাঙ্গালা ভাষার—বাঙ্গালা সাহিত্যের গৌরব। এমন কর্ম্মকথা যিনি শুনাইতে পারেন, তিনি বাঙ্গালীর নমস্য। আচার্য্য ত্রিবেদী মহাশয় ইদানীং শারীরিক পীড়ায় নিতান্ত অবসন্ন; তাই তাঁহার লিখিত প্রবন্ধ আমরা দেখিতে পাইতেছি না; তিনি যে তাঁহার ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত প্রবন্ধগুলি সংগ্রহ করিয়া এই কর্ম্মকথা প্রকাশিত করিয়াছেন, ইহার জন্য সাহিত্য-সেবীমাত্রেই তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে। এই সুন্দর পুস্তকখানি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ, পরীক্ষার পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হওয়া উচিত।

উচ্ছ্বাস।—শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দাস প্রণীত। মূল্য আট আনা মাত্র। নাম দেখিয়াই বুঝিতে পারা যায় যে, এখানি কবিতা-পুস্তক।

আজকাল কবিতাপুস্তক দেখিলেই অনেক সময় মনে ভয়ের সঞ্চার হয়, মনে হয় সেই পুরাতন সুরে প্রেমের কথা, চাঁদের জোছনা, মলয় সমীর, মাধবীকুঞ্জ, বাঁশীর স্বর হয় ত আবার কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করিবে; কিন্তু শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্রের কবিতায় সে সকল মামুলী উৎপাত দেখিলাম না; গ্রাম্য কবি সহজ সুন্দর ভাষায় পল্লীজীবনের সুখদুঃখের আশা···আকাঙ্ক্ষার কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কবিতাগুলি সবই যে ভাল- সবই যে সুন্দর --তাহা বলিতেছি না, কিন্তু কএকটি কবিতায় যথেষ্ট প্রতিভার পরিচয় আছে। আমরা এই নবীন কবির সংবর্দ্ধনা করিতেছি।

বৈজ্ঞানিকী।— শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় প্রণীত। মূল্য এক টাকা। পুস্তকখানির কাগজ, ছাপা, বাঁধাই সুন্দর; ততোধিক সুন্দর এই পুস্তকখানির অভ্যন্তর-ভাগ। শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় মহাশয় বাঙ্গালা সাহিত্যক্ষেত্রে অপরিচিত নহেন, অনেক মাসিকপত্রিকায় তাঁহার লিখিত বৈজ্ঞানিক সন্দর্ভাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে এবং শিক্ষিত পাঠকগণ সেই সকল প্রবন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য পাঠ করিয়া উপকৃত হইয়া থাকেন। এই বৈজ্ঞানিকীতে যে কএকটি সন্দর্ভ স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে তাহার অনেকগুলি প্রবাসী, বঙ্গদর্শন, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রভৃতি সাময়িক পত্রে ইতঃপূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল, কএকটি নূতন রচনাও এই সংগ্রহে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। জগদানন্দ বাবুর প্রধান গুণ এই যে, তিনি নিতান্ত অবৈজ্ঞানিককেও বিজ্ঞানের কথা অতি সহজ সরল ও সুন্দর ভাবে বুঝাইতে পারেন। বর্ত্তমান সংগ্রহে যে কএকটি প্রস্তাব স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলেই পাঠক জগদানন্দ বাবুর লিপিকুশলতা ও কঠিন বিষয় সহজ করিয়া বুঝাইবার শক্তির পরিচয় প্রাপ্ত হইবেন। এই কবিতা-নাটক গল্প প্লাবিত দেশে বৈজ্ঞানিকীর আদর হওয়া উচিত। যাহাতে আস্তুদের হস্তে এই পুস্তকখানি পৌঁছে তাহার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। এমন সুন্দর, শিক্ষাপূর্ণ পুস্তকের যদি আদর না হয়, তবে বুঝিব যে, আমাদের যে জ্ঞানস্পৃহার উন্মেষ হইতেছে শুনিতে পাই, তাহা সত্য নহে।

খাদ্য-তত্ত্ব।—শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র চৌধুরী প্রণীত। মূল্য এক টাকা মাত্র। শ্রীযুক্ত নিবারণ বাবু কৃষিবিদ্যায় পারদর্শী; তিনি এই খাদ্য-তত্ত্ব পুস্তকখানি লিখিয়াছেন। খাদ্য সম্বন্ধীয় অধিকাংশ বিষয় কৃষিবিজ্ঞানের অন্তর্ভূত, সুতরাং নিবারণ বাবুর ন্যায় ব্যক্তি যে এ বিষয়ে দশকথা বলিবার অধিকারী সে সম্বন্ধে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। ইহাতে নিম্নলিখিত কএকটি বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, যথা—খাদ্যের আবশ্যকতা ও খাদ্য-উপাদান, দৈনিক রসদ, ধান্যজাতীয় খাদ্য, ডাইল, সব্জী, ফল, আমিষ খাদ্য, মৎস্য, মাংস, ডিম্ব, গব্য, মসলা, রোগীর পথ্য, মিষ্টান্ন, মোরব্বা-চাট্নী প্রভৃতি, পানীয়, পাকক্রিয়া, আয়ুর্ব্বেদ মতে খাদ্য-ব্যবস্থা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, খাদ্যপরিপাকের সময় নির্দ্ধারণ। আমরা এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া বিশেষ শিক্ষা লাভ করিয়াছি। আমাদের মনে হয়, এমন পুস্তক বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে থাকা উচিত। এই রোগপ্রপীড়িত বাঙ্গালা দেশের লোকে যদি এই পুস্তকখানি অনুসারে খাদ্যের ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে বিশেষ ফললাভ করিবেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

উদ্ভিদ্-খাদ্য।—শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র দে প্রণীত। মূল্য আট আনা। শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র দে মহাশয়ের পরিচয় নূতন করিয়া দিতে হইবে না; আমাদের দেশে যাঁহারা সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রাদি পাঠ করিয়া থাকেন, তাঁহারা প্রবোধ বাবুর কৃষি সম্বন্ধীয় উৎকৃষ্ট প্রবন্ধাবলী পাঠে উপকৃত হইয়াছেন। তিনি হাতেকলমে কাজ করিয়া তাঁহার অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেন। বর্ত্তমান উদ্ভিদ্-খাদ্য পুস্তকখানি তাঁহার সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফল। ইহাতে উদ্ভিদ্ খাদ্য অর্থাৎ সারের কথা বর্ণিত হইয়াছে। উদ্ভিদের সার সম্বন্ধে এমন সুন্দর, এত তথ্যপূর্ণ পুস্তক বাঙ্গালা ভাষায় ইতঃপূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া আমরা জানি না। যাঁহারা কৃষিবিদ্যার অনুরাগী তাঁহারা এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া অনেক বিষয় অবগত হইতে পারিবেন এবং এই পুস্তকে সার সম্বন্ধে যে সমস্ত উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে তদনুসারে কার্য্য করিয়া বিশেষ লাভবান্ হইবেন। এই অন্ন কষ্টের দিনে সামান্য চাকরীর প্রলোভন ত্যাগ করিয়া বাঙ্গালী যুবকগণ যদি কৃষিকার্য্যে মনোযোগ করেন, তাহা হইলে আমাদের অন্ন কষ্ট দূর হইতে পারে। কৃষিক্ষেত্রে, সব্জিবাগ, ফলকর, মৃত্তিকা-তত্ত্ব ও মালঞ্চ কৃষিকার্য্য-শিক্ষার্থী যুবকগণের বিশেষ উপকারে লাগিবে।

কারবালা।—শ্রীযুক্ত আবদুল বারি প্রণীত। মূল্য কাপড়ে বাঁধাই ১।০, কাগজে বাঁধাই একটাকা মাত্র। গ্রন্থকার কারবালার ইতিহাস সম্বন্ধে বলিয়াছেন "মুসলমানধর্ম্মসংস্থাপক, প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষ মোহাম্মদের প্রিয়তমা কন্যা ফতেমার গর্ভে, এমাম হাসেন ও এমাম হোসেন নামক ভ্রাতৃযুগল জন্মগ্রহণ করেন। মুসলমান জগতের ধর্ম্ম গুরু নেতৃত্ব লইয়া যৌবনে, ইঁহাদের সঙ্গে তৎকালীন ভক্তিমাসক্ত পবল প্রতাপ দামেস্ক-সম্রাট্, এজিদের বিরোধ উপস্থিত হয়। বলা বাহুল্য উক্ত দামেস্কপতিও মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। 'জয়নব' নাম্নী একটি অপরূপ সুন্দরী ললনার রূপে বিমুগ্ধ হইয়া এজিদ তাঁহাকে পরিণয়পাশে আবদ্ধ করিতে চাহিলে উক্ত যুবতী, স্খলিত-চরিত্র সম্রাটের প্রস্তাব ঘৃণার সহিত অগ্রাহ্য করিয়া ধর্ম্মপ্রাণ এমাম হাসেনের সহিত পরিণয়সূত্রে সম্মিলিতা হন। এমামদ্বয়ের সহিত দামেস্কপতির বিরোধের ইহাও অন্যতর কারণ বলিয়া অনেকে উল্লেখ করিয়া থাকেন। দুরাত্মা এজিদ ষড়্যন্ত্র করিয়া বিষপ্রয়োগে এমাম হাসেনকে নিহত ও এমামগণের বন্ধু কুফাধিপতি আবদুল্লা জেয়াদকে প্রচুর অর্থদানে ও বিশাল রাজ্যপ্রদানের আশ্বাসে প্রলুব্ধ করতঃ তাহার ছলনাকৌশলে এমাম হোসেনকে সপরিবারে মদিনা হইতে বহির্গত করাইয়া পথভ্রান্ত বিপন্ন এমামকে এসিয়া মাইনরের ইউফ্রেটিস্ নদীর নিকটবর্ত্তী কারবালা নামক স্থানে ভীষণ নিপীড়নের সহিত বধ করেন।" ইহাই মহরমের শোকাবহ ঘটনা। গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত আবদুল বারি মহাশয় এই শোকাবহ ভীষণ ঘটনা অবলম্বনে এই কারবালা কাব্যখানি লিখিয়াছেন। আমরা এই কাব্যগ্রন্থখানি পাঠ করিয়া বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছি; ইহার রচনা-কৌশল অতি সুন্দর; সুললিত বাঙ্গালা পদ্যে এমন কাব্য লিখিয়া শ্রীযুক্ত আবদুল বারি মহাশয় আমাদের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। শিক্ষিত মুসলমানগণ যদি এই ভাবে বাঙ্গালা সাহিত্য-সেবায় ব্রতী হন, তাহা হইলে আনন্দের সীমা থাকে না। আমরা এই সহৃদয় মুসলমান কবিকে সাদরে বাঙ্গালা-সাহিত্য-ক্ষেত্রে অভ্যর্থনা করিতেছি।

সপ্তক।—শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বি, এল, প্রণীত। মূল্য দশ আনা। ইহা সাতটি গল্পের সংগ্রহ, এই জন্য ইহার নাম সপ্তক। আমরা সাতটি গল্পই পড়িয়াছি। উপেন্দ্রবাবুর লিখিবার ভঙ্গীটি অতি সুন্দর; তিনি বেশ গোছাইয়া কথাগুলি বলিতে পারেন। তাঁহার এই সাতটি গল্পের মধ্যে আমাদের বিভ্রম, কামনাদেবীর

...নর, সন্ধিপত্র ও সমালোচক বেশ লাগিয়াছে। উপেন্দ্রবাবু লেখক, বাঙ্গালা সাহিত্যে তাঁহার নাম আছে। আশা করি, ভবিষ্যতে তিনি আরও উচ্চ শ্রেণীর উপন্যাস লিখিয়া যশস্বী হইবেন।

তপতী। শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্, এ, বি, এল, প্রণীত; মূল্য এক টাকা মাত্র। একখানি নাটক; সূর্য্যকন্যা তপতীর ঘটনা-অবলম্বনে এই নাটকখানি লিখিত হইয়াছে। নাটকে স্বর্গীয় গিরীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় যে ভাঙ্গা ছন্দের প্রবর্ত্তন করেন, জ্যোতিশবাবুও সেই ছন্দে এই নাটকখানি লিখিয়াছেন। সম্বরণ, প্রগণ্ড, দেবব্রত, অরুন্ধতী, গায়ত্রী, এই কএকটি চিত্র অতি সুন্দর হইয়াছে; গানগুলিও বেশ হইয়াছে। 'লীলাবসান' নাটকে জ্যোতিষবাবু যে ক্ষমতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, এই নাটকখানিতে সেই ক্ষমতার উৎকর্ষ দর্শনে আমরা বিশেষ প্রীত হইয়াছি।

স্বরলিপি।

ভৈরবী — কাওয়ালী।

কথা ও সুর—স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।] [স্বরলিপি—শ্রীআশুতোষ ঘোষ

পতিতোদ্ধারিণি গঙ্গে!

শ্যামবিটপি-ঘন তট-বিপ্লাবিনি ধূসর তরঙ্গভঙ্গে।

কত নগনগরী তীর্থ হইল তব চুম্বি' চরণ যুগ মায়ি!

কত নরনারী ধন্য হইল মা, তব সলিলে অবগাহি।

বহিছ জননী এ ভারতবর্ষে কত শত যুগ যুগ বাহি;

করি সুশ্যামল কত মরু প্রান্তর শীতল পুণ্য তরঙ্গে।

নারদ-কীর্ত্তন-পুলকিত-মাধব-বিগলিত-করুণা ক্ষরিয়া,

ব্রহ্ম-কমণ্ডলু উচ্ছলি' ধূর্জ্জটি জটিল-জটাপর ঝরিয়া,

অম্বর হইতে সমশতধারা জ্যোতিঃ প্রপাত তিমিরে,

নামি ধরায় হিমাচল-মূলে মিশিলে সাগর সঙ্গে।

পরিহরি ভব সুখ দুঃখ যখন মা শায়িত অন্তিম শয়নে,

বরিষ শ্রবণে তব জল-কলরব বরিষ সুপ্তি মম নয়নে,

বরিষ শান্তি মম শঙ্কিত প্রাণে, বরিষ অমৃত মম অঙ্গে,

মা ভাগিরথি, জাহ্নবি, সুরধুনি কলকল্লোলিনি গঙ্গে!

০		১		+		৩
(স স ধ ধ	প ধ প -	মপ ধ প -	- - - -)
(প তি তো-	দ্ধা - রি ণি	গ - ঙ্গে -	- - - -)

০ ধ - - - ১ - - - ন + ন র্স র্স - ৩ ধন র্স - - র্স ০ - ন - ১ ধ - - প + প - মপ ধ ৩ পম গর স

শ্যা - ম বি ট পি ঘ ন ত ট বি - প্লা - বি নি ধূ - স র ত র - ঙ্গ ভ - ঙ্গে - - - - - { } আ

আজকাল কবিতাপুস্তক দেখিলেই অনেক সময় মনে ভয়ের সঞ্চার হয়, মনে হয় সেই পুরাতন সুরে প্রেমের কথা, চাঁদের জোছনা, মলয় সমীর, মাধবীকুঞ্জ, বাঁশীর স্বর হয় ত আবার কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করিবে ; কিন্তু শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্রের কবিতায় সে সকল মামুলী উৎপাত দেখিলাম না ; গ্রাম্য কবি সহজ সুন্দর ভাষায় পল্লীজীবনের সুখদুঃখের আশা... আকাঙ্ক্ষার কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কবিতাগুলি সবই যে ভাল- সবই যে সুন্দর—তাহা বলিতেছি না, কিন্তু কএকটি কবিতায় যথেষ্ট প্রতিভার পরিচয় আছে। আমরা এই নবীন কবির সংবর্দ্ধনা করিতেছি।

বৈজ্ঞানিকী।—শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় প্রণীত। মূল্য এক টাকা। পুস্তকখানির কাগজ, ছাপা, বাঁধাই সুন্দর ; ততোধিক সুন্দর এই পুস্তকখানির অভ্যন্তর-ভাগ। শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় মহাশয় বাঙ্গালা সাহিত্যক্ষেত্রে অপরিচিত নহেন, অনেক মাসিকপত্রিকায় তাঁহার লিখিত বৈজ্ঞানিক সন্দর্ভাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে এবং শিক্ষিত পাঠকগণ সেই সকল প্রবন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য পাঠ করিয়া উপকৃত হইয়া থাকেন। এই বৈজ্ঞানিকীতে যে কএকটি সন্দর্ভ স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে তাহার অনেকগুলি প্রবাসী, বঙ্গদর্শন, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রভৃতি সাময়িক পত্রে ইতঃপূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল ; কএকটি নূতন রচনাও এই সংগ্রহে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। জগদানন্দ বাবুর প্রধান গুণ এই যে, তিনি নিতান্ত অবৈজ্ঞানিককেও বিজ্ঞানের কথা অতি সহজ সরল ও সুন্দর ভাবে বুঝাইতে পারেন। বর্ত্তমান সংগ্রহে যে কএকটি প্রস্তাব স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলেই পাঠক জগদানন্দ বাবুর লিপিকুশলতা ও কঠিন বিষয় সহজ করিয়া বুঝাইবার শক্তির পরিচয় প্রাপ্ত হইবেন। এই কবিতা-নাটক গল্প-প্লাবিত দেশে বৈজ্ঞানিকীর আদর হওয়া উচিত। যাহাতে আর্য্যদের হস্তে এই পুস্তকখানি পৌঁছে তাহার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। এমন সুন্দর, শিক্ষাপূর্ণ পুস্তকের যদি আদর না হয়, তবে বুঝিব যে, আমাদের যে জ্ঞানস্পৃহার উন্মেষ হইতেছে শুনিতে পাই, তাহা সত্য নহে।

খাদ্য-তত্ত্ব।—শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র চৌধুরী প্রণীত। মূল্য এক টাকা মাত্র। শ্রীযুক্ত নিবারণ বাবু কৃষিবিদ্যায় পারদর্শী ; তিনি এই খাদ্য-তত্ত্ব পুস্তকখানি লিখিয়াছেন। খাদ্য সম্বন্ধীয় অধিকাংশ বিষয় কৃষিবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত, সুতরাং নিবারণ বাবুর ন্যায় ব্যক্তি যে এ বিষয়ে দশকথা বলিবার অধিকারী সে সম্বন্ধে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। ইহাতে নিম্নলিখিত কএকটি বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, যথা—খাদ্যের আবশ্যকতা ও খাদ্য-উপাদান, দৈনিক রসদ, ধান্যজাতীয় খাদ্য, ডাইল, সব্‌জী, ফল, আমিষ খাদ্য, মৎস্য, মাংস, ডিম্ব, গব্য, মসলা, রোগীর পথ্য, মিষ্টান্ন, মোরব্বা-চাটনী প্রভৃতি, পানীয়, পাকক্রিয়া, আয়ুর্ব্বেদ মতে খাদ্য-ব্যবস্থা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, খাদ্যপরিপাকের সময় নির্দ্ধারণ। আমরা এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া বিশেষ শিক্ষা লাভ করিয়াছি। আমাদের মনে হয়, এমন পুস্তক বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে থাকা উচিত। এই রোগপ্রপীড়িত বাঙ্গালা দেশের লোকে যদি এই পুস্তকখানি অনুসারে খাদ্যের ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে বিশেষ ফললাভ করিবেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

উদ্ভিদ্-খাদ্য।—শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র দে প্রণীত। মূল্য আট আনা। শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র দে মহাশয়ের পরিচয় নূতন করিয়া দিতে হইবে না ; আমাদের দেশে যাঁহারা সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রাদি পাঠ করিয়া থাকেন, তাঁহারা প্রবোধ বাবুর কৃষি সম্বন্ধীয় উৎকৃষ্ট প্রবন্ধাবলী পাঠে উপকৃত হইয়াছেন। তিনি হাতেকলমে কাজ করিয়া তাঁহার অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেন। বর্ত্তমান উদ্ভিদ্-খাদ্য পুস্তকখানি তাঁহার সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফল। ইহাতে উদ্ভিদ্ খাদ্য অর্থাৎ সারের কথা বর্ণিত হইয়াছে। উদ্ভিদের সার সম্বন্ধে এমন সুন্দর, এত তথ্যপূর্ণ পুস্তক বাঙ্গালা ভাষায় ইতঃপূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া আমরা জানি না। যাঁহারা কৃষিবিদ্যার অনুরাগী তাঁহারা এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া অনেক বিষয় অবগত হইতে পারিবেন এবং এই পুস্তকে সার সম্বন্ধে যে সমস্ত উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে তদনুসারে কার্য্য করিয়া বিশেষ লাভবান্ হইবেন। এই অন্ন কষ্টের দিনে সামান্য চাকরীর প্রলোভন ত্যাগ করিয়া বাঙ্গালী যুবকগণ যদি কৃষিকার্য্যে মনোযোগ করেন, তাহা হইলে আমাদের অন্ন কষ্ট দূর হইতে পারে। কৃষিক্ষেত্রে, সব্‌জিবাগ, ফলকর, মৃত্তিকা-তত্ত্ব ও মালঞ্চ কৃষিকার্য্য-শিক্ষার্থী যুবকগণের বিশেষ উপকারে লাগিবে।

কারবালা।—শ্রীযুক্ত আবদুল বারি প্রণীত। মূল্য কাপড়ে বাঁধাই ১।০, কাগজে বাঁধাই একটাকা মাত্র। গ্রন্থকার কারবালার ইতিহাস সম্বন্ধে বলিয়াছেন "মুসলমানধর্ম্মসংস্থাপক, প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষ মোহাম্মদের প্রিয়তমা কন্যা ফতেমার গর্ভে, এমাম হাসেন ও এমাম হোসেন নামক ভ্রাতৃযুগল জন্মগ্রহণ করেন। মুসলমান জগতের ধর্ম্ম গৌরব লইয়া যৌবনে, ইঁহাদের সঙ্গে তৎকালীন ভক্তিবিলাসক্ত প্রবল প্রতাপ দামেস্ক সম্রাট, এজিদের বিরোধ উপস্থিত হয়। বলা বাহুল্য উক্ত দামেস্কপতিও মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। 'জয়নব' নাম্নী একটি অপূর্ব্ব সুন্দরী ললনার রূপে বিমুগ্ধ হইয়া এজিদ তাঁহাকে পরিণয়পাশে আবদ্ধ করিতে চাহিলে উক্ত যুবতী, স্খলিত-চরিত্র সম্রাটের প্রস্তাব ঘৃণার সহিত অগ্রাহ্য করিয়া ধর্ম্মপ্রাণ এমাম হাসেনের সহিত পরিণয়সূত্রে সম্মিলিতা হন। এমামদ্বয়ের সহিত দামেস্কপতির বিরোধের ইহাও অন্যতর কারণ বলিয়া অনেকে উল্লেখ করিয়া থাকেন। দুরাত্মা এজিদ ষড়্‌যন্ত্র করিয়া বিষপ্রয়োগে এমাম হাসেনকে নিহত ও এমামগণের বন্ধু কুফাধিপতি আবদুল্লা জেয়াদকে প্রচুর অর্থদানে ও বিশাল রাজ্যপ্রদানের আশ্বাসে প্রলুব্ধ করতঃ তাহার ছলনাকৌশলে এমাম হোসেনকে সপরিবারে মদিনা হইতে বহির্গত করাইয়া পথভ্রান্ত বিপন্ন এমামকে এসিয়া মাইনরের ইউফ্রেটিস্ নদীর নিকটবর্ত্তী কারবালা নামক স্থানে ভীষণ নিপীড়নের সহিত বধ করেন।" ইহাই মহরমের শোকাবহ ঘটনা। গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত আবদুল বারি মহাশয় এই শোকাবহ ভীষণ ঘটনা অবলম্বনে এই কারবালা কাব্যখানি লিখিয়াছেন। আমরা এই কাব্যগ্রন্থখানি পাঠ করিয়া বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছি ; ইহার রচনা কৌশল অতি সুন্দর ; সুললিত বাঙ্গালা পদ্যে এমন কাব্য লিখিয়া শ্রীযুক্ত আবদুল বারি মহাশয় আমাদের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। শিক্ষিত মুসলমানগণ যদি এই ভাবে বাঙ্গালা সাহিত্য-সেবায় ব্রতী হন, তাহা হইলে আনন্দের সীমা থাকে না। আমরা এই সহৃদয় মুসলমান কবিকে সাদরে বাঙ্গালা সাহিত্য-ক্ষেত্রে অভ্যর্থনা করিতেছি।

সপ্তক।—শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বি, এল, প্রণীত। মূল্য দশ আনা। ইহা সাতটি গল্পের সংগ্রহ, এই জন্য ইহার নাম সপ্তক। আমরা সাতটি গল্পই পড়িয়াছি। উপেন্দ্রবাবুর লিখিবার ভঙ্গীটি অতি সুন্দর ; তিনি বেশ গোছাইয়া কথাগুলি বলিতে পারেন। তাঁহার এই সাতটি গল্পের মধ্যে আমাদের বিভ্রম, কামনাদেবীর

...র, সন্ধিপত্র ও সমালোচক বেশ লাগিয়াছে। উপেন্দ্রবাবু লেখক, বাঙ্গালা সাহিত্যে তাঁহার নাম আছে। আশা করি, ভবিষ্যতে তিনি আরও উচ্চ শ্রেণীর উপন্যাস লিখিয়া যশস্বী হইবেন।

তপতী। শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম, এ, বি, এল, প্রণীত। মূল্য এক টাকা মাত্র। একখানি নাটক; সূর্য্যকন্যা তপতীর ঘটনা অবলম্বনে এই নাটকখানি লিখিত হইয়াছে। নাটকে স্বর্গীয় গিরীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় যে ভাঙ্গা ছন্দের প্রবর্ত্তন করেন, জ্যোতিশবাবুও সেই ছন্দে এই নাটকখানি লিখিয়াছেন। সম্বরণ, প্রগণ্ড, দেবব্রত, অরুন্ধতী, গায়ত্রী, এই কএকটি চিত্র অতি সুন্দর হইয়াছে; গানগুলিও বেশ হইয়াছে। 'লীলাবসান' নাটকে জ্যোতিশবাবু যে ক্ষমতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, এই নাটকখানিতে সেই ক্ষমতার উৎকর্ষ দর্শনে আমরা বিশেষ প্রীত হইয়াছি।

স্বরলিপি।

ভৈরবী—কাওয়ালী।

কথা ও সুর—স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। | | স্বরলিপি—শ্রীআশুতোষ ঘোষ।

পতিতোদ্ধারিণি গঙ্গে!
শ্যামবিটপি-ঘন তট-বিপ্লাবিনি ধূসর তরঙ্গভঙ্গে।
কত নগনগরী তীর্থ হইল তব চুম্বি' চরণ যুগ মায়ি!
কত নরনারী ধন্য হইল মা, তব সলিলে অবগাহি।
বহিছ জননী এ ভারতবর্ষে কত শত যুগ যুগ বাহি;
করি সুশ্যামল কত মরু প্রান্তর শীতল পুণ্য তরঙ্গে।

নারদ-কীর্ত্তন-পুলকিত-মাধব-বিগলিত-করুণা ক্ষরিয়া,
ব্রহ্ম-কমণ্ডলু উচ্ছলি' ধূর্জ্জটি জটিল-জটাপর ঝরিয়া,
অম্বর হইতে সমশতধারা জ্যোতিঃ প্রপাত তিমিরে,
নামি ধরায় হিমাচল-মূলে মিশিলে সাগর সঙ্গে।

পরিহরি ভব সুখ দুঃখ যখন মা শায়িত অন্তিম শয়নে,
বরিষ শ্রবণে তব জল-কলরব বরিষ সুপ্তি মম নয়নে,
বরিষ শান্তি মম শঙ্কিত প্রাণে, বরিষ অমৃত মম অঙ্গে,
মা ভাগিরথি, জাহ্নবি, সুরধুনি কলকল্লোলিনি গঙ্গে!

০	১	+	৩
স স ধ ধ	প ধ প -	মপ ধ প -	- - - -
প তি তো-	দ্ধা - রি ণি	গ - ঙ্গে -	- - - -

০	১	+	৩	০	১	+	৩
ধ - - -	- - - ন	ন র্স র্স -	ধন	র্স - - র্স	- ন -	ধ - - প	প - মপ ধ	পম গ র স
শ্যা - ম বি	ট পি ঘ ন	ত ট বি -	প্লা	- বি নি ধূ	- স র	ত র - ঙ্গ	ভ - ঙ্গে -	- - - - { } আ

কত নগ নগরী তী-র্থ হ ইল ত ব চু-ম্বি চ রণ যুগ মা-য়ি - - - - -

না-রদ কী-র্ত্তন পু ল কিত মা-ধ ব বি গ লিত ক রু ণা- ক্ষ রি য়া - - - - -

পরিহরি ভব সুখ দুঃ খ য খ ন মা-শা য়িত অ প্তি ম শ য়নে - - -

ক ত নর না-রী - ধ ন্য হ ইল মা ত ব স লি লে অব গা-হি - - - - - -

বরিষ শ্রবণে - ত ব জল ক ল রব বরিষ সু-প্তি ম ম ন য় নে - - -

ব-ন্ধ ক ম ণ্ড ল উ চ্ছ লি ন স্ফু টি জ টি ল জ টা প র ঝ রি য়া - - - -

বহি ছ জ ননী এ-ভা র ত ব র্ষে-ক ত শ ত যু গ যু গ বা - হি - - - - -

অ ম্ব র হ ই তে স ম শ ত ধা-রা-জ্যো-তি প্র পা - ত তি মি রে - - - -

বরিষ শা ন্তি-ম ম শ-ঙ্কি ত প্রা-ণে-ব রি ষ অ মৃ ত ম ম অ - ঙ্গে - - - -

করি সু-শ্যা-ম ল ক ত ম রু প্রা ন্ত র শী ত ল প-ণ্যে ত র-ঙ্গে - - - - - - {} আ

না-মি ধ রা য় হি মা-চ ল ম-লে মি লি লে- সা গ র স-ঙ্গে - - - - - ,,

মা-তা গি-র শি জা হ্ন বি সু র ধু নি ক ল ক ল্লো-লি নি গ-ঙ্গে - - - - - - ,,

স, র, গ, ম, প, ধ, ন, মুদারার সাতটি সুর, উপরে ৭ চিহ্ন থাকিলে কোমল সুর, এবং রেফ দ্বারা তারার সুর বুঝাইবে। প্রত্যেক অক্ষর বা টান একমাত্রা, উপরে লাইনযুক্ত একাধিক সুর বা টান একমাত্রা কালস্থায়ী। হসন্ত দ্বারা উদারা বা নিম্নসপ্তক বুঝাইবে। উপরে ছোট অক্ষরের সুর কেবল ছুঁইয়া যাইবে। কাওয়ালী ষোড়শমাত্রিক তাল, প্রত্যেক তাল বিভাগে ৪ মাত্রা আছে। ০ দ্বারা আনাঘাত ও + দ্বারা সম প্রকাশিত হইল। {} আ—চিহ্নদ্বারা, আস্থায়ীর গুম্ফবন্ধনী যতদূর আছে, ততদূর পুনরাবৃত্তি বুঝাইবে।

২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে শ্রীসুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও
২০৩।১।১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট "প্যারাগন প্রেস" হইতে
শ্রীগোপালচন্দ্র রায় দ্বারা মুদ্রিত।

"যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননি! ভারতবর্ষ!"— দ্বিজেন্দ্রলাল

K. V. SEYNE & BROS.
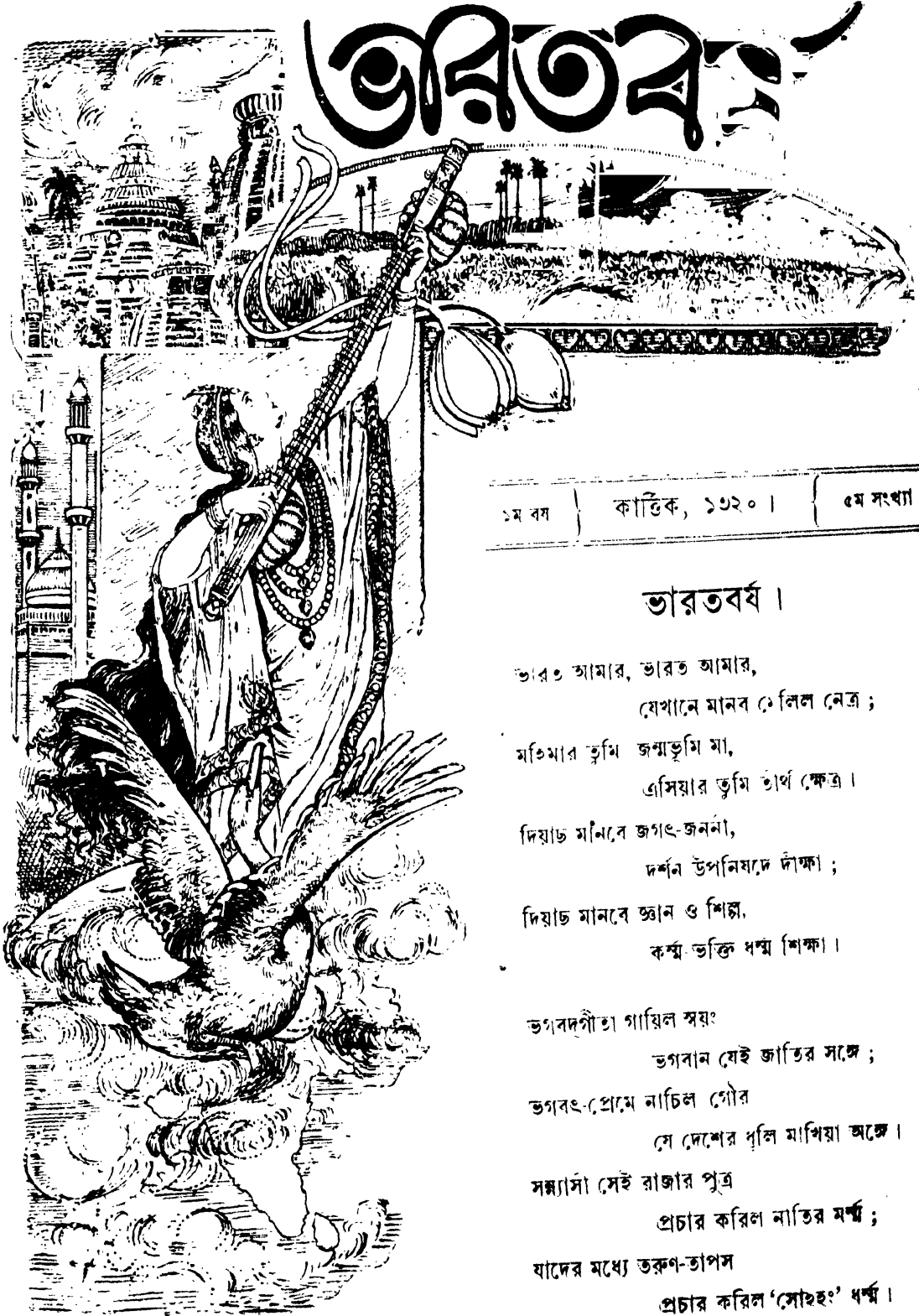
১ম বর্ষ | কার্ত্তিক, ১৩২০। | ৫ম সংখ্যা

ভারতবর্ষ।

ভারত আমার, ভারত আমার,
যেখানে মানব মেলিল নেত্র ;
মহিমার তুমি জন্মভূমি মা,
এসিয়ার তুমি তীর্থ ক্ষেত্র।
দিয়াছ মানবে জগৎ-জননী,
দর্শন উপনিষদে দীক্ষা ;
দিয়াছ মানবে জ্ঞান ও শিল্প,
কর্ম্ম-ভক্তি ধর্ম্ম শিক্ষা।

ভগবদ্গীতা গায়িল স্বয়ং
ভগবান যেই জাতির সঙ্গে ;
ভগবৎ-প্রেমে নাচিল গৌর
যে দেশের ধূলি মাখিয়া অঙ্গে।
সন্ন্যাসী সেই রাজার পুত্র
প্রচার করিল নীতির মর্ম্ম ;
যাদের মধ্যে তরুণ-তাপস
প্রচার করিল 'সোহহং' ধর্ম্ম।

আর্য্য ঋষির অনাদি গভীর, উঠিল যেখানে বেদের স্তোত্র;
নহ কি মা তুমি সে ভারতভূমি, নহি কি আমরা তাঁদের গোত্র!
তাদের গরিমা স্মৃতির বর্ম্মে, চলে যাব শির করিয়া উচ্চ—
যাদের গরিমাময় এ অতীত, তারা কখনই নহে মা তুচ্ছ।

ভারত আমার, ভারত আমার, সকল মহিমা হৌক্ খর্ব্ব;
দুঃখ কি যদি পাই মা তোমার পুত্র বলিয়া করিতে গর্ব্ব;
যদি বা বিলয় পায় এ জগৎ, লুপ্ত হয় এ মানব-বংশ,
যাদের মহিমাময় এ অতীত, তাদের কখন হবে না ধ্বংস!

চোখের সামনে ধরিয়া রাখিয়া অতীতের সেই মহা আদর্শ,
জাগিব নূতন ভাবের রাজ্যে রচিব প্রেমের ভারতবর্ষ!
এ দেবভূমির প্রতি তৃণ'পরে, আছে বিধাতার করুণা দৃষ্টি,
এ মহা জাতির মাথার উপরে করে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি!

কোরাস্

ভারত আমার, ভারত আমার, কে বলে তুমি মা কৃপার পাত্রী?
কর্ম্ম জ্ঞানের তুমি মা জননী, ধর্ম্ম ধ্যানের তুমি মা ধাত্রী।

৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

———

রেলপথে।

রামকমলের সহিত বিদেশ-ভ্রমণে বাহির হইলাম। ...ন ওকালতি করিয়া যথেষ্ট পসার প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন এই মাত্র জানিতাম; কিন্তু তিনি যে একটি আস্ত কবি, এরূপ সন্দেহ আমার কখনও হয় নাই। আমরা সতীর্থ বটে; কিন্তু বহুদিন ছাড়াছাড়ি হওয়ার ... এ খবরটুকু ভাল করিয়া পাই নাই।

বেঙ্গল নাগপুর রেলের দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় যখন আমরা প্রবেশ করি, তখন কেবলমাত্র একজন সাহেব একখানা গদি দখল করিয়া বসিয়া ছিলেন; বাকি দুইখানি আমরা অধিকার করিয়া বসিলাম।

গাড়ি ছাড়িয়া দিল। অপরাহ্ন কাল। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। রামকমল জানালায় করতলে কপোল বিন্যস্ত করিয়া এক-দৃষ্টে বাহিরের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। খানিকক্ষণ পরে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি হে, কি ভাবিতেছ?" আমার দিকে মুখ না ফিরাইয়াই তিনি বলিলেন,—

"হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে,
ময়ূরের মত নাচেরে,
হৃদয় নাচে রে,—"

আমি ত অবাক্! তিনি বলিলেন, "বাঙ্গালার বর্ষার মত এমন নিবিড় আনন্দের জিনিষ আমি ত আর কিছু দেখি না। কত শত বৎসর পূর্ব্বে আজিকার মত আর একদিন "মেঘৈর্মেদুরমম্বরং" দেখিয়া জয়দেব গীতগোবিন্দ-পদাবলি গাহিয়াছিলেন; আর বৈষ্ণব কবি "ভরা বাদর, মাহ ভাদর, শূন্য মন্দির মোর" বলিয়া আক্ষেপ করিয়া-ছিলেন। এই যে আসন্নঝটিকার প্রতীক্ষায় স্তম্ভিতা বিশ্ব-প্রকৃতির উপরে "বর্ষা এলায়েছে তার মেঘময় বেণী", ইহার স্নিগ্ধগম্ভীর শান্তিটুকু তুমি উপলব্ধি করিতে পারিতেছ না, এমন কথা বলিও না। প্রকৃতির এই বিরাট্ শান্তিকে উপেক্ষা করিয়া আমাদের এই ট্রেন খানা ঐ দীর্ঘবিসর্পিত লৌহবর্ত্মের উপর দিয়া উন্মত্তের মত হুঙ্কার করিয়া চলি-য়াছে; কোনও দিকে দৃক্‌পাত নাই; কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নাই; দুই ধারের বন উপবন, দীঘি নদী সরোবর,

"মাঠের পরে মাঠ, মাঠের শেষে
সুদূর গ্রাম খানি আকাশে মেশে,"

দেখিতে না দেখিতে অন্তর্হিত হইয়া যাইতেছে। বুকের মধ্যে রক্তস্রোত একটু দ্রুততর তালে নৃত্য করি-তেছে না কি? এতবড় বিপুল শান্ত-প্রকৃতির বক্ষ মথিত করিয়া এই যে ট্রেন খানা ছুটিতেছে, ভালে অগ্নি ধক্‌ধক্ জ্বলিতেছে, বলিতে পার কি কোন নিরুদ্দেশ্য রহস্যান্ধকারের মধ্যে কিসের অন্বেষণে চলিয়াছে?"

বন্ধুর গতিক দেখিয়া আমি দাঁড়াইয়া উঠিলাম। মাথার উপরকার ইলেকট্রিক পাখা চালাইয়া দিলাম। গাড়ি একটা ষ্টেশনে আসিয়া থামিল। তাঁহার চমক ভাঙ্গিল। আমরা সকলেই একটু নড়িয়া চড়িয়া বসিলাম। ভায়া যেন একটু অপ্রতিভভাবে বলিলেন, "আমি এতক্ষণ আপনমনে কি বকিয়া গেলাম, তুমি বোধ হয় আমাকে পাগল মনে করিতেছ। তুমি ত কই কোনও কথাই কহিলে না; কিন্তু আজ আমি এই ট্রেনের ভিতর হইতে উভয় পার্শ্বের এই দিগন্তবিস্তৃত বর্ষাবারি-সম্পৃক্ত মাঠ, আর মাথার উপরে ঐ ঘনমেঘাচ্ছন্ন আকাশ দেখিয়া যেন কেমন একটু চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছি। সুজলা সুফলা, মলয়জশীতলা, শস্যশ্যামলা বাঙ্গালার ষড়্‌ঋতুর মধ্যে বর্ষার মত এমন সরস করা, হরষ-ভরা, ঋতু আর আছে কি? "ধন ধান্য পুষ্প ভরা, আমাদের এই বসুন্ধরা"র উপরে যেদিন "গগনে গরজে মেঘ, ঘন বরষা," সেই দিনই ত বঙ্গপ্রকৃতির মহোৎসব।"

এইবার আমি একটু কথা কহিলাম। বলিলাম, "আমি তোমাকে পাগল মনে করিতেছি না। তুমি যে কবি, তাহা বেশ বুঝিতে পারিতেছি। সহজেই যে তুমি এই বহিঃপ্রকৃতির সহিত তোমার অন্তঃপ্রকৃতির সামঞ্জস্য স্থাপিত করিতে পারিয়াছ, তাহাও বুঝিতে পারিতেছি। কিন্তু দোহাই তোমার, আর একটু নীচু সুরে কথা কও, নহিলে আমি তোমার সহিত তাল রাখিতে পারিতেছি না। অনেক বৎসর তোমার সহিত ছাড়াছাড়ি হইয়া গিয়াছে; তুমি যে কেমন করিয়া অল্পে অল্পে এমন কবি হইয়া দাঁড়াইয়াছ, একটু হাল্‌কা রকম ভাষায় তোমার জীবনের সেই অধ্যায়ের ইতিহাসটুকু রচনা কর না কেন?

আমার বিশ্বাস, তাহা হইলে নবীন সেনের "আমার জীবনের" মত আর একটি উপাদেয় গ্রন্থ রচিত হইয়া উঠিবে।"

৺নবীনচন্দ্র সেন।

রামকমল বলিলেন "ভাই, ক্ষমা কর; বিদ্রূপ করিও না।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "বিদ্রূপ কিসের?" তিনি বলিলেন, "আত্মজীবনকাহিনী বাঙ্গালা সাহিত্যের ধাতে সহিল না। নবীনচন্দ্রের 'আমার জীবন'ই বোধ হয় বাঙ্গালায় শেষ autobiography।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন?" তিনি বলিলেন,—

"চট্টগ্রামের সাহিত্য সম্মিলনের সভাপতি শ্রীযুক্ত অক্ষয় চন্দ্র সরকার স্বর্গীয় কবি নবীন চন্দ্র সেনের কথা স্মরণ করিয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়াছেন; ভালই করিয়াছেন; কিন্তু তিনি একটু ভাবিয়া দেখিলে অত অসামাল হইতেন না; বেদান্তের "অহং" যেমন নির্ব্বিকল্প, অক্ষয়, অব্যয়, তেমনই "আমার জীবনের" রচয়িতাও অক্ষয়, অব্যয়; তাঁহার সর্ব্বগ্রাসী "আমি" আজ মৃত্যুর যবনিকা ভেদ করিয়া বৈতরণীর পরপার হইতে নিজেকে একমাত্র নির্ব্বিকল্প "সৎ" বলিয়া পরিচিত করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে কাহার কাছে পরিচয়? সেই বিরাট আমিত্বের বাহিরে সমগ্র ব্যবহারিক জগৎটার কাছে আবার পরিচয় কিসের? যেটা মায়া, সেটা ছায়া, আমি আছি বলিয়া যেটা আছে আমি নিমেষে যেটাকে আমার এই বিরাট আমিত্বের ভিতর লয় করিতে পারি, তাহার কাছে আমার আবার নূতন করিয়া পরিচয় দিবার বাসনা জাগিয়া উঠিবে কেন?

"কেন, তাহা কে বলিতে পারে? যিনি জীবদ্দশায় রৈবতক, কুরুক্ষেত্র, প্রভাসে মহা আড়ম্বরে নূতন করিয়া ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়াদিলেন, তাঁহার নিকট হইতে আরও অনেক বিষয় শিখিবার বোধ হয় আমাদের বাকি ছিল। কেমন ভক্তিভরে, প্রণতশিরে, আমরা তাঁহার কাছে নূতন দীক্ষা গ্রহণ করিতে লাগিলাম! যখন তিনি "ব্রাহ্মণের প্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষত্রিয় দাম্ভিক"কে দাঁড় করাইয়া অনার্য্য জরৎকারুকে তাঁহাদের সঙ্গে জড়াইয়া দিলেন, তখন plot টা কি কম sensational হইয়া দাঁড়াইল! Epic grandeur-এর বোধহয় যেটুকু বাকি ছিল, কএকটি ক্ষত্রিয়রমণীকে এক একটি Florence Nightingale'র মত আদর্শ Sister of Mercy-তে পরিণত করিয়া তিনি তাঁহাদের মুখে বড় বড় বক্তৃতা বসাইয়া দিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর মহাকাব্য রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাসের পশ্চাতে বৃদ্ধ কাশীরামদাসের তথা বেদব্যাসের, ছায়া সঙ্কুচিত হইয়া গেল।

ফ্লোরেন্স্ নাইটিঙ্গেল্।

"কৃষ্ণ, খ্রীষ্ট, মহম্মদ, বুদ্ধ, ব্যবহারিক জগতের সামাজিক ধর্ম্মজীবনের লোকবিশ্রুত কএকটি মহাপুরুষের কথা তিনি জীবদ্দশায় আমাদিগকে শুনাইয়া কেমন আমাদের দুর্ব্বল হৃদয়কে সবল করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন! কিন্তু যেটি সব চেয়ে বড় কথা, সেটি বলা হয় নাই। কৃষ্ণ, খ্রীষ্ট, মহম্মদ, চৈতন্য, বুদ্ধ, সবগুলিকে, একত্র তাল পাকাইয়া লইলেও তাহা যে অহংতত্ত্বের আমিত্বের কাছে হ্রস্ব, খর্ব্ব

নান হইয়া যায়, সেই অতিগভীর ও বিপুল রহস্যপূর্ণ তত্ত্বটির ব্যাখ্যা করা বাকি ছিল। আধিব্যাধিমণ্ডিত, ষড়্‌রিপুমর্দ্দিত দেহী বোধ হয় সে রহস্যের যবনিকা সম্যক্ উদ্ঘাটিত করিতে পারে না; তাই মৃত্যুর, এই ব্যবহারিক জগতের দেহীর মৃত্যুর (অহং-এর কি মৃত্যু আছে?) নেপথ্য হইতে, এক, দুই, তিন, চার খানা দিব্য স্থূলকলেবর "আমার জীবন" এই সূক্ষ্ম তত্ত্বটি প্রচারিত করিবার জন্য "অন্নপায়ী বঙ্গবাসী স্তন্যপায়ী জীবের" শিরোদেশে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। মাথা ঘুরিতেছে, শিরায় শিরায় রক্ত বেগে প্রবাহিত হইতেছে, অত বড় তত্ত্বকথা ঠিক্ যেন ভাল করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না; কিন্তু একটু স্থির হইলেই বোধ হয় বুঝিতে পারিব। যদি না পারি, ত সে আমাদের দোষ। যে কবিপ্রতিভা বাঙ্গালার সিরাজ চরিত্রকে চিরকালের জন্য কলঙ্কিত করিতে পারিয়াছে, সে যে "আমার জীবনে"র আমিত্বটাকে চিরকালের জন্য ভাস্বর করিতে পারিবে তাহার আর বিচিত্র কি?

'ওগো, ভাল করে বলে যাও।
আঁখিতে, বাঁশিতে, যে কথা ভাষিতে,
সে কথা বুঝায়ে দাও।'

"তাহা হইলে বুঝিতে না পারিব কেন? অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় কিন্তু ভয় দেখাইতেছেন। যে তত্ত্ব স্বয়ং অর্জ্জুন বুঝিতে পারেন নাই, যীশুর শিষ্যগণ বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই, সেটা কি সহজে হৃদয়ঙ্গম করা যায়? শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ;" পার্থ অমনই কৃষ্ণের পা জড়াইয়া ধরিলেন— "মাম্"এর মধ্যে বেদান্তের যে 'অহং'-তত্ত্বটুকু নিহিত রহিয়াছে, তিনি তাহা বুঝিতে পারিলেন না। যীশু বলিলেন, "Have faith in Me and thou shalt be saved, অমনই তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহাকেই পূজা করিতে আরম্ভ করিয়া দিল; এই 'me'র মধ্যে যে অহং তত্ত্বটুকু নিহিত আছে তাহা কাহারও বোধগম্য হইল না। শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ প্রদর্শনের অর্থ কি এই যে, তিনি বিকট মুখব্যাদান করিয়া দেখাইলেন যে সমস্ত বিশ্বটা তিনি গিলিয়া ফেলিবার উপক্রম করিতেছেন? না ইহার অর্থ, অহংএর মধ্যেই সমগ্র বিশ্বটা লীন?

"এত বড় তত্ত্বকথাটির বিষয় আমরা এতদিন ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখি নাই। আরও অনেকে ত স্ব-স্ব জীবন কাহিনী লিখিয়াছেন ও লিখিতেছেন; কিন্তু এমন করিয়া অহংটিকে বড় করিয়া দেখাইবার স্পর্দ্ধা কাহারও হয় নাই; পূর্ব্বেই ত বলিয়াছি যে, কেবল দেহীর পক্ষে এ তত্ত্বটি এমন করিয়া প্রকট করা সাধ্যাতীত। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যখন

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ব্রহ্মের সাক্ষাৎকারলাভ বর্ণনা করিয়া নিজেকে ব্রহ্মর্ষি নারদের সহিত তুলনা করিয়াছেন, তখন যেন অনেকটা এই বৈদান্তিক কবিবরের কাছাকাছি গিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। আমরা মাথায় হাত দিয়া ভাবিতাম, নারদের কি ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ হইয়াছিল? সে কিরূপ? নির্গুণ, নির্বিকল্প, সৎ, চিৎ, আনন্দম্, অহং এর জ্ঞানসম্বন্ধে চেতনার নামই কি ব্রহ্মসাক্ষাৎকারলাভ? মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথেরও কি এই অহং-জ্ঞান সম্যক্ জাগ্রত হইয়াছিল? ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন যে দিন প্রকাশ্য সভাস্থলে বলিয়াছিলেন, And yet I am a singular man, তখন তাঁহার অন্তরে কিপ্রকার অহং জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা ঠিক্ জানিবার উপায় এখন আর নাই।
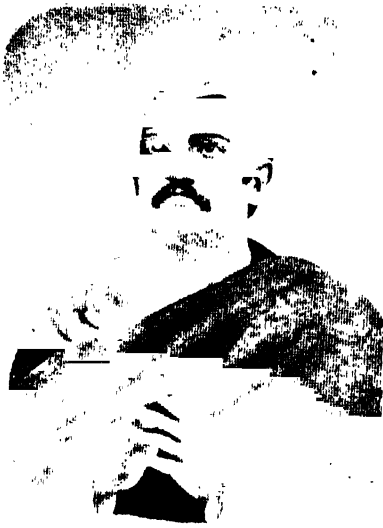
কেশবচন্দ্র সেন।

"অথচ এই অহং তত্ত্বটি মাঝে মাঝে এক এক মহাপুরুষ অতি সরলভাবে অতি অল্প কথায় বুঝাইবার চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে য়ুরোপের চতুর্দ্দশ লুই বলিয়াছেন L'etat? C'est moi, রাষ্ট্র? সে ত

চতুর্দ্দশ লুই।

আমি! অহংতত্ত্বটি বেশ পরিষ্কার হইয়া গেল। আবার ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে বার্লিণ কংগ্রেসের অধিনায়ক বিস্মার্ক্ যখন

বিস্মার্ক্। বেঞ্জামিন ডিসরেলি।

বলিলেন, Le congress? C'est moi, কংগ্রেস? সে ত আমি! তখন কথাটি বেশ সুস্পষ্ট হইল না কি?

"যাক্, বড় বড় বিদেশীর নাম করিবার আবশ্যকতা নাই। আমাদের স্বদেশীর কথা বলিয়া শেষ করা যায় কি? স্বদেশীর কথা? কোন্ স্বদেশীর কথা? (দেখ, শব্দই ব্রহ্ম; সে বিষয়ে কিছুমাত্র ভুল নাই; in the beginning was the word; আচ্ছা, সেই wordটা কি? 'ওঁ,' না 'অহং'?) এই স্বদেশীর কথা তুলিয়া সেদিন কদমতলার সরকার মহাশয় আমাদিগকে বেশ দুকথা শুনাইয়া দিয়াছেন; আমরা ভারতমাতাকে বঙ্গমাতায় পরিণত করিয়া গত কয় বৎসর ধরিয়া যে বাৎসরিক বারোয়ারি করিতেছি, তাহার বিষময় ফল এখন আমাদিগকে ভোগ করিতে হইতেছে,—রাজধানী বাঙ্গালা মুল্লুক হইতে সরিয়া গিয়াছে। "আমার জীবন"-রচয়িতা আর এক স্বদেশী বারোয়ারির কথা বলিয়াছেন তাহার তুলনা বাঙ্গালীর সাহিত্যে, বাঙ্গালীর রাজনীতিক্ষেত্রে নাই এবং কখনও ছিল না, একথা জোর করিয়া বলা যাইতে পারে।—শোন।

"আজ কাল দেশীয় দ্রব্যের সমাদরের একটা ধুয়া উঠিয়াছে। ইহা বাঙ্গালির নব্যতম হুজুগ। কিন্তু আমিই প্রকৃতপ্রস্তাবে বহুপূর্ব্বে দেশীয় দ্রব্যের সমাদরের সূত্রপাত করিয়াছিলাম। আমি ঢাকাই আমদানি বন্ধ করিয়া নোয়াখালির এক নর্ত্তকীকে পেশোয়াজ পরাইয়া বাই খাড়া করিলাম, এবং বেদেদের মেয়েরা হাটবাজারে গায়িয়া

নাচিয়া বেড়ায় তাহাদের মধ্য হইতে দুটিকে কাউন্সিলের ফাঁকা অনারেবল্ মেম্বরদের নির্ব্বাচন প্রথানুসারে নির্ব্বাচন করিয়া, এবং উনবিংশ শতাব্দীর চতুর্ব্বর্গদাতা সাবানের দ্বারা তাহাদের বাহ্যিক বহুবর্ষসঞ্চিত তৈলজাত অশ্লীলতা বিদূরিত করিয়া যাত্রার দলের একটি গায়কের ও বাদকের হস্তে সমর্পণ করিলাম। সে এক পক্ষের মধ্যেই উভয়কে অতিরিক্ত সাবান সেবার ও শিক্ষার দ্বারা উর্ব্বশীমেনকাত্ব প্রদান করিয়া আসরে উপস্থিত করিল। বাইজী তিলোত্তমা, কারণ তিনি একাধারে বাই, খেমটা, যাত্রা ও থিয়েটার। তিনি সকল প্রকার সঙ্গীতে শিক্ষিতা হইয়াছিলেন। তাহার উপর সোনায় সোহাগা তিনটিই সুন্দরী ও তিনটিই ষোড়শী। তিনটাই স্থানীয় কীর্ত্তি (Indigenous production)। ঢাকাই আমদানি সম্পূর্ণরূপে পরাজিত ও কেবল শ্রেণীতে বন্ধ হইল এমন নহে, এ অঞ্চলেই বন্ধ হইল। ইহাদের খুব প্রসার হইল, এবং দেখিতে দেখিতে নোয়াখালি ও কুমিল্লাতে আরো দলসৃষ্টি হইল। অথচ এই মহৎ স্বদেশপ্রেমিকের কার্য্য সম্পাদন করিতে ন্যূনাধিক পঞ্চাশ মুদ্রামাত্র ব্যয় হইয়াছিল।*

"একটা বড় প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেল। কবে কোথায় সর্ব্বপ্রথম স্বদেশীর সূত্রপাত হইয়াছিল? আমাদের মধ্যে কেহ কেহ অত্যন্ত গভীর ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন; তাঁহারা ঠাহরাইয়াছিলেন যে Dawn Society'র সতীশবাবুই বুঝি সর্ব্বপ্রথম এই কাজটি করিয়াছিলেন; এটা যে কত বড় ভুল তাহা বুঝা গেল! নোয়াখালি সকলকে টেক্কা দিয়াছে!

'নোয়াখালির মাটি, নোয়াখালির জল,
নোয়াখালির হাওয়া, নোয়াখালির ফল,
ধন্য হোক, ধন্য হোক, ধন্য হোক, হে ভগবান।'

"বিদেশিনী বারাঙ্গনাকে বয়কট্ করা হইল; নোয়াখালির নর্ত্তকীকে পেশোয়াজ পরান হইল; বাজারের বেদিনীর বাহিরের অশ্লীলতা সাবানের দ্বারা বিদূরিত করা হইল; কাউনসিলের ফাঁকা অনারেবল্ মেম্বরদের নির্ব্বাচন-প্রথানুসারে নির্ব্বাচন করা হইল; আমরা মুখে অনেক কথার আবৃত্তি করি, কাগজেও খুব লেখালেখি করি, কিন্তু কাজে কয়জন কৃতিত্ব দেখাইতে পারি? এই যে জন ষ্টুয়াট মিলের কাছে কত কথা শিখিয়াছি, আজও সেই সকল কথাই আওড়াই মাত্র। সে দিন পুনার ফার্গুসন কলেজে মিঃ র‍্যামজে মাক্‌ডোনাল্ড বলিলেন, "আমি এই পবলিক্ সর্ব্বিস কমিশনে বসিয়া একটা বড় মজা দেখিতেছি,—ভারতবাসীরা আমাদের Mid-Victorian Period এর বুলি এখনও কপ্‌চাইতেছে। কিন্তু ১৮৯২ সালের পূর্ব্বে ও একজন বাঙ্গালী মনীষী কাউন্‌সিলের ফাঁকা অনারেবল মেম্বরদের নির্ব্বাচনপ্রথানুসারে নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন। এখানেও মৌলিকতা।

জন্ ষ্টুয়ার্ট মিল।

"একটা সমস্যার সমাধান হইল; কিন্তু আর একটা সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে। চট্টগ্রামের সাহিত্যসম্মিলনের সভাপতি মহাশয় বলিয়াছেন যে, 'তিনি অনেকবার বঙ্কিম বাবুকে করযোড়ে অনুরোধ করিয়াছিলেন যে, বঙ্কিমবাবু যেন আদর্শ মাতৃচরিত্র অঙ্কিত করেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় বঙ্কিমবাবু তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই। আমরা ভাবিতাম যে, সাহিত্যে মাতৃচরিত্রের প্রস্তাবটা আজকালকার সাহিত্যিক ডেঁপোমি; কিন্তু এখন দেখিতেছি তাহা নহে। এ জিনিষটা অনেক দিনের। "আমার জীবনে"ও এ কথার রীতিমত অবতারণা দেখিতে পাইতেছি। তবে একটু প্রভেদ আছে; এখানে মাতৃমূর্ত্তির উল্লেখ না করিয়া লেখক বাকি যাবতীয় প্রেমের তালিকা দিয়াছেন। তিনি লিখিতেছেন,—

'আমি বলিলাম,—'আমি ত বরাবর আপনাকে বলিয়াছি আপনার বিলাতি পীরিতের পিণ্ড পিণ্ডাস্ত আর আমার ভাল লাগে না। কেবল একঘেয়ে সেই ইংরেজি নভেলের পতিপত্নীর ও উপপত্নীর পীরিত। আপনাকে

* আমার জীবন" চতুর্থ ভাগ, ৮৭ পৃষ্ঠা।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

এত করিয়া বলিলাম যে, যেসকল প্রেম লইয়া আমাদের জাতীয় জীবন ও জাতীয় সাহিত্য, রামায়ণ ও মহাভারত, পিতৃপ্রেম, ভ্রাতৃপ্রেম, বাৎসল্য, প্রজাপ্রেম, সর্ব্বশেষে ঈশ্বরপ্রেম—এই সকল প্রেমের আদর্শ আঁকিয়া আমাদের মনুষ্যত্বের পথে লইয়া যান। আপনি ত তাহা শুনিলেন না! ছাই ভস্ম নরনারী প্রেমের উগ্রছবি আঁকিয়া আজ আপনি বঙ্গদেশের অর্দ্ধেক নারীহত্যার—বিশেষতঃ নারীদিগের আত্মহত্যার জন্য দায়ী হইতেছেন।.........আমি সেজন্য বলিতেছি, আপনি উপন্যাস ছাড়িয়া ইতিহাসটিতে হাত দিউন।'

"এখন সমস্যাটা কিরূপ দাঁড়াইল দেখ। সাহিত্যে মাতৃচরিত্র অঙ্কিত না করিয়া বঙ্কিমবাবু সর্ব্বনাশের সূত্রপাত করিলেন;—না, পিতৃপ্রেম, ভ্রাতৃপ্রেম, বাৎসল্য, প্রজাপ্রেম, সর্ব্বশেষে ঈশ্বরপ্রেম ইত্যাদি প্রেমের আদর্শ না আঁকিয়া নারীদিগের আত্মহত্যার জন্য তিনি দায়ী হইতেছেন? সরকার মহাশয় মাতৃমূর্ত্তির প্রসঙ্গ আগে উত্থাপিত করিয়াছিলেন, কি সেন মহাশয় বাকি যাবতীয় প্রেমের ফর্দ্দ লইয়া আগে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাহা জানিবার উপায় এখন আর নাই। নারীদিগের আত্মহত্যার কারণ ত অবগত হওয়া গেল, কিন্তু একটা statistics প্রস্তুত করিবার ভার কেহ লইলে ভাল হয় না? সাহিত্যপরিষদ যদি এই কার্য্যভার গ্রহণ করেন, তাহা হইলে সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইতে পারে।—বহুপূর্ব্বেই প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইতে পারিত, যদি বঙ্কিমবাবু ইতিহাসটিতে হাত দিতেন!—হায়, কেন তিনি সেই ইতিহাসে হাত দিলেন না? বাঙ্গালার উপন্যাসরাজ্যের একছত্র সম্রাট্ যদি বাঙ্গালার গিবন্ হইতেন!"

গিবন্।

বন্ধু একটু চুপ করিলেন। পরক্ষণেই বলিলেন, আমার "এই সমালোচনা তোমার বোধ হয় ভাল লাগিল না; আমিই কি খুব আনন্দের সহিত এই সমালোচনা করিতেছি? আমাদের নবীনচন্দ্র সাহিত্যে যে আনন্দের, করুণার, উদ্দীপনার উৎস খুলিয়া দিয়াছেন কোন বাঙ্গালী সে কথা ভুলিতে পারে! পলাশীর যুদ্ধে যখন ব্রিটিশের রণবাদ্য বাজিল; রণস্থল কাঁপাইয়া, আম্রবন কাঁপাইয়া, সেই ধ্বনি কিশোর বয়স্ক পাঠক পাঠিকার কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল না কি? আজ ও থাকিয়া থাকিয়া সেই ধ্বনি মস্তিষ্কের মধ্যে রণিয়া রণিয়া বাজিয়া উঠে না কি? আবার বিধবা উত্তরার ব্যথিত হৃদয়ের করুণ আর্ত্তনাদ স্মরণ করিলে আজও আমাদের হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন দ্রুততর হয় না কি?

'দেব, কহ একবার,
ভাঙ্গিয়াছে কপাল কি তব উত্তরার?
তাহার পুতুল খেলা নাহি ফুরাইতে হায়,
ফুরাইল জীবনের খেলা কি তাহার,
ভাঙ্গিয়াছে কপাল কি তব উত্তরার?

তুমি উত্তরার হাসি বড় যে বাসিতে ভাল,
মুছাইলে এইরূপে সে হাসি কি তার,
ভাঙ্গিয়াছে কপাল কি তব উত্তরার?
সমরে যাইতে আজি শূলাগ্রে ছিঁড়িল হার,
উত্তরা কি সেই হার পরিবে না আর,
ভাঙ্গিয়াছে কপাল কি তব উত্তরার?
মামা যার বাসুদেব, জনক গাণ্ডীবধন্বা,
জননী সুভদ্রা দেবী, এই দশা তার?
ভাঙ্গিয়াছে কপাল কি তব উত্তরার?'

"তাই বলিতেছিলাম, নবীনচন্দ্রের সমালোচনায় আমি আনন্দ বোধ করিতেছি না। কেবলই মনে হইতেছে, বাঙ্গালীর নবীনচন্দ্র কেন "আমার জীবন" লিখিলেন? লিখিলেন ত, মুদ্রিত করিবার সময় কেহ চোঁট করিয়া

৺রাজনারায়ণ বসু।

দিলেন না কেন? যাঁহাদের হাতে তাঁহার কাগজ পত্রগুলি পড়িয়াছিল, তাঁহাদের কি এ সম্বন্ধে কোনও স্বাধীনতা ছিল না?"

আমি বলিলাম—"তুমি নবীনচন্দ্রের অহঙ্কারের সমালোচনা করিলে; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, 'আমি একটা যে সে লোক নহি' এ জ্ঞান না থাকিলে কেহ আত্ম-জীবনকাহিনী রচনা করিতে বসেন কি? যে ব্যক্তি আপনাকে তৃণ অপেক্ষা সুনীচ বলিয়া মনে করেন, তিনি কেন নিজের জীবনকাহিনী লিখিতে বসিবেন? রুসোই বল, আর রাজনারায়ণই বল; ষ্টুয়ার্ট মিলই বল, আর দেবেন্দ্রনাথই বল, যিনিই এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তাঁহার মধ্যে নিশ্চয়ই তুমি যেটাকে অহংতত্ত্ব বা আমিত্ব বলিতেছ সেটি সম্যক্ জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে; তিনি নিশ্চয় মনে করেন যে তাঁহার কাহিনী পাঁচজনকে শুনাইবার উপযুক্ত। ভাবিয়া দেখ দেখি, ব্যাপারখানা কি! আমি আমার জীবনবৃত্তান্ত আমাদের জাতীয় সাহিত্যের অঙ্গীভূত করিয়া রাখিবার প্রয়াস পাইতেছি, আমি কি নিজেকে কম বড় মনে করি! দীনতম বৈষ্ণবের মন লইয়া কেহ কখনও নিজের জীবনকাহিনীর বিবৃতি করিতে বসে না।"

রুসো।

রামকমল বলিলেন,—"তা কি আমি বুঝিনা? কিন্তু সামান্য ডেপুটি-জীবনের প্রত্যেক খুটিনাটি লইয়া অত ফেনাইয়া না তুলিলে কি চলিত না? তিনি জীবিত থাকিলে কি নিজের ডায়ারিটি আগাগোড়া মুদ্রিত করিতেন? রবিবাবু তাঁহার জীবনস্মৃতিতে কতটুকুই বা বলিয়াছেন! কিন্তু এত বেশী জিনিধ আভাসে জানাইয়াছেন, পাঠকের মনে কৌতুহল এমন জাগাইয়া দিয়াছেন যে, তাঁহার আগাগোড়া

একটা সুস্পষ্ট ছবি গড়িয়া তোলা বিশেষ শক্ত হয় না। তিনি তাঁহার নিজের কবিতায় যতটা ধরা দিয়াছেন, তাহার শতাংশের একাংশও তাঁহার জীবনস্মৃতিতে প্রকটিত হয় নাই। একটা দৃষ্টান্ত দিয়া আমার কথাটা পরিষ্কার করিতে পারি। রবিবাবু ছেলেবেলায় চাকর বাকরের কড়া পাহারায় এক প্রকার কারারুদ্ধ অবস্থায় ছিলেন, এইটি তাঁহার জীবনস্মৃতিতে অবগত হওয়া যায়। তাঁহার 'অচলায়তনের' একটি গানে এই অবস্থাটির আভাস যেন একটু পাওয়া যায়, শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার এইরূপ অনুমান করেন। গানটি তোমার মনে পড়ে কি ?

"বেজে ওঠে পঞ্চমে স্বর,
কেঁপে ওঠে বদ্ধ এ ঘর,
বাহির হতে দুয়ারে কর
কেউ ত হানে না।"

"আমার কিন্তু ঐ দাসরাজত্বের কথায় আর একটি জিনিষ মনে পড়িয়া গেল। সে আজ প্রায় ত্রিশ বৎসরের কথা। "ভারতী"তে রবীন্দ্রনাথ যে "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ" লিখিয়াছিলেন, সেই কবিতাটি আমার স্মৃতিপথে উদিত হইল।

কি জানি কি হোলো আজি, জাগিয়া উঠিল প্রাণ,
দূর হ'তে শুনি যেন মহাসাগরের গান !
ডাকে যেন—ডাকে যেন—সিন্ধু মোরে ডাকে যেন !
আজি চারিদিকে মোর কেন কারাগার হেন !
ওই যে হৃদয় মোর আহ্বান শুনিতে পায় !
"কে আসিবি, কে আসিবি, কে তোরা আসিবি আয় !
পাষাণ বাঁধন টুটি, ভিজায়ে কঠিন ধরা,
বনেরে শ্যামল করি, ফুলেরে ফুটায়ে ত্বরা,
সারাপ্রাণ ঢালি দিয়া জুড়ায়ে জগৎ হিয়া,
আমার প্রাণের মাঝে কে আসিবি আয় তোরা !"
আমি যাব—আমি যাব—কোথায় সে, কোন দেশ—
জগতে ঢালিব প্রাণ, গাহিব করুণা গান,
উদ্বেগ-অধীর হিয়া
সুদূর সমুদ্রে গিয়া
সে প্রাণ মিশাব, আর সে গান করিব শেষ।
ওরে চারিদিকে মোর,
একি কারাগার ঘোর !
ভাঙ্ ভাঙ্ ভাঙ্ কারা, আঘাতে আঘাত কর !

ত্রিশ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে; ভাবিয়া দেখ দেখি কারাগার ভাঙ্গা হইয়াছে কি না ! উদ্বেগ অধীর হিয়া সুদূর সমুদ্রে গিয়া, প্রাণ মিশাইয়া, সে গান "গীতাঞ্জলি"তে শেষ করিতেছে কি ? কিন্তু এ সকল কথা তাঁহার জীবন স্মৃতিতে বোধ হয় নাই। নবীনচন্দ্র নিজের "স্বপ্ন দিয়ে গড়া, সে যে স্মৃতি দিয়ে ঘেরা" কবিপ্রতিভার উন্মেষের ইতিহাস না দিয়া, কেন ডেপুটির বিন্দুটির উপর বৃহৎ আমিত্ব পিরামিডটা খাড়া করিয়া তুলিবার প্রয়াস পাইলেন ! যদি তিনি একটু চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে আজ আমরা তাঁহার "সুমগ্ন প্রতিভা-বক্ষে ফুটন্ত সৌন্দর্য্যস্বপ্ন" দেখিতে পাইতাম না কি !"

বন্ধু থামিলেন। ডিবা হইতে পাণ বাহির করিয়া তাঁহার হাতে একটি দিলাম, একটি নিজে লইলাম। সাহিত্যিক আলোচনায় আমি যেন হাঁপাইয়া উঠিতেছিলাম ; কথা অন্য দিকে ফিরাইব মনে করিতেছি, এমন সময় তিনি

বলিলেন,—"সে দিন টাউনহলে দ্বিজেন্দ্রলালের স্মৃতিসভায় আমি একটা জিনিষ লক্ষ্য করিয়াছিলাম,—পুষ্পমালা-বিভূষিত দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিকৃতি। তোমার কি রকম বোধ হইয়াছিল বলিতে পারি না, আমার কিন্তু আর এক জন কবির কথা মনে হইয়াছিল। দৃষ্টি স্থির, স্নিগ্ধ, শান্ত; মুখমণ্ডল, গম্ভীর, চিন্তারেখাযুক্ত, বেদনাময়। দান্তের মুখচ্ছবি এইরূপ গম্ভীর, চিন্তা-রেখাযুক্ত, বেদনাময় নহে কি? যখন হীরেন্দ্রবাবু বলিলেন, 'দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির উৎস তাঁহার অশ্রু প্রস্রবণের অতি সন্নিকটে ছিল,' তখন আর

দ্বিজেন্দ্রলাল।

দান্তে।

একবার সেই ছবিটিকে দেখিয়া লইলাম। তাই বটে; তাঁহার হাসির মধ্যেও বেদনা লুক্কাইত ছিল; যিনি যৌবনে হাসির ভাণ করিয়া গায়িয়াছিলেন "এ জীবনটা কিছু নয়", তিনি পরপারে যাত্রা করিবার সময়েও বোধ হয় তাঁহার মত পরিবর্ত্তন করেন নাই। তিনি যদি আরও বেশীদিন বাঁচিতেন, তাহা হইলেও বোধ হয় বহুবিস্তারিত ভাবে 'আমার জীবন' রচনা করিতেন না; তিনি যে তা'র চেয়ে বড় জিনিষ রচনা করিয়া গিয়াছেন,—'আমার দেশ'।"

এমন সময়ে আমাদের ট্রেন উলুবেড়িয়া ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিল। প্ল্যাট্‌ফরমে কএকটি যুবক তখন গাহিতেছে,—'বঙ্গ আমার, জননী আমার, ধাত্রী আমার, আমার দেশ'। আমাদের কামরায় যে সাহেবটি ছিলেন, তিনি হঠাৎ সোজ হইয়া বসিয়া ঈষৎ দুলিতে লাগিলেন; জুতা-পরিহিত পা গানের সহিত তালে তালে শব্দ করিতে লাগিলেন; তাঁহা চক্ষুর্দ্বয় দীপ্ত হইয়া উঠিল। রামকমল বিস্মিত হইয় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমাদের, এই জাতীয়সঙ্গীতটি আপনার ভাল লাগিয়াছে?" তিনি বলিলেন—"আমি আইরিশ্‌ম্যান্; আমারও দেশ আছে। ইংরাজ এতদিন পরে আমার দেশকে আমাদিগের হাতেই প্রত্যর্পণ করিতেছেন।" আমরা দুজনে সরিয়া আসিয়া সাহেবের ঠিক সম্মুখে উপবেশন করিলাম। ট্রেন ছাড়িয়া দিল। সাহিত্যের আলোচনার অগাধ জলে গিয়া পড়িয়াছিলাম; এতক্ষণে তীরে উঠিবার আশা হইল।

সাহেব বলিলেন, "এতদিন পরে আমাদের 'হোম রুল' পাইবার আশা হইয়াছে; ইংরাজ আমাদের দুঃখ বুঝিয়া আমাদিগকে সম্পূর্ণ স্বাধীন পার্লামেণ্ট দিতেছেন। মনে রাখিবেন, যে পার্লামেণ্ট আমরা পাইব সেটি ভিক্ষালব্ধ নহে; বহুজনের বহুদিনের কৃচ্ছ্রসাধনার ফলস্বরূপ আমরা ইহা লাভ করিতেছি।"

রামকমল বলিলেন,—"যাদৃশী সাধনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী। পার্লামেণ্ট পাইলেই আপনারা চতুর্ব্বর্গ ফল লাভ করিলেন, এই রকম কিছু একটা মনে করিতেছেন। সমুদ্রমন্থন করিয়াছেন; বোধ হয় অমৃত উঠিতেছে; কিন্তু উঠিতে না উঠিতেই যে দেবাসুর সংগ্রামের সূচনা দেখা দিতেছে, আলষ্টারের সহিত যে বিরোধ অবশ্যম্ভাবী, সেটা আপনাদের জাতীয় উদ্বোধনের পক্ষে মঙ্গলকর কি?"

সাহেব উত্তর দিলেন,—"আলষ্টার যে ভয় করিতেছে, সেটা সম্পূর্ণ অমূলক। প্রটেষ্টাণ্টের উপর অত্যাচার হইবে কেন? সেও কেন নিজেকে আইরিশ্‌ম্যান্ বলিয়া পরিগণিত করিতেছে না? ইংরাজের ত ভাবনার কোনও কারণই নাই—আমরা কিছু আর বিটিশ্ সাম্রাজ্য হইতে নিজেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিতে চাহিতেছি না। জাতিবিরোধ আছে, সে কথা অস্বীকার করিলে চলিবে না; কিন্তু এখন বিরোধটাকে বড় করিয়া দেখিব না, মিলনকে নিবিড়তর করিতে হইবে। *Revanche* প্রতিহিংসাবৃত্তির বশবর্ত্তী না হইয়া আলষ্টারকে

প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধ করাই আমাদের উদ্দেশ্য, এই কথাটাই সে বুঝিতে চাহে না। হইতে পারে, আমরা বহুশতাব্দী ধরিয়া অত্যাচার প্রপীড়িত হইয়াছি; কিন্তু"—তাঁহাকে বাধা দিয়া রামকমল হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—

"মেরেছ কলসীর কানা,
তা বোলে কি প্রেম দেব না?"

"আপনাদের এই বৈষ্ণব-প্রীতির প্রতি আল্‌ষ্টারের সন্দেহ হইবার যথেষ্ট কারণ আছে। আপনার এই আশা, উৎসাহ, আনন্দ, উদ্দীপনা দেখিয়া আমার বড় কৌতুক বোধ হইতেছে। পলিটিক্সের ভিতর দিয়া যে জাতীয় সাধনা আপনারা করিয়াছেন, তাহার ফলপ্রাপ্তির সময় উপস্থিত; কিন্তু সেই ফলটা যদি Dead Sea apple হয়!"

সাহেব,—"হইবে কি না, জানি না। আমরা কেল্‌ট্‌, আমরা খ্রীষ্টান; আপনারা বাঙ্গালী হিন্দু, বোধ হয় বৈষ্ণব। আপনাদিগের সহিত আমাদিগের ভাবগত একটা সাদৃশ্য আছে,—আমাদিগের উভয়ের জাতিগত কল্পনা-প্রাচুর্য্য। একজন বড় আইরিশ্ লেখক সে দিন বিলাতের এক পত্রিকায় লিখিয়াছেন যে, কল্পনা-প্রাচুর্য্য আয়র্লণ্ডকে রক্ষা করিয়াছে এ কথা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না (It is not too much to say that Ireland was saved by her imagination)।* আপনাদের imagination, আপনাদের কল্পনা-প্রাচুর্য্য একদিন আপনাদিগকেও হয় ত রক্ষা করিবে। যাহারা আপনাদের কল্পনাশক্তির কথা তুলিয়া বিদ্রূপ করে, তাহারা মূঢ়।"

রামকমল,—"আপনি কতকটা আমাদিগকে চিনিতে পারিয়াছেন। একদিন আমরা কল্পনা করিয়াছিলাম যে পলিটিক্সের সাধনাই আমাদিগের চরম সাধনা। ইংরাজের পদতলে বসিয়া পলিটিক্স শিক্ষা করিলাম। তাহার ফল কি দাঁড়াইল? আমাদের জাতিগত লাভ লোক্‌সানের খতিয়ান করিয়া দেখি নাই; কিন্তু বোধ হয় 'অমিয় সাগরে সিনান করিতে সকলি গরল ভেল।' "বড়ই ক্ষোভে রবীন্দ্রনাথ গায়িলেন—

"যৌবরাজ্যে বসিয়ে দে মা
লক্ষ্মীছাড়ার সিংহাসনে।"

ধিক্কার দিয়া বলিলেন,

"এর চেয়ে হ'তাম যদি
আরব বেদুয়িন,
চরণতলে বিশাল মরু
দিগন্তে বিলীন......।"

গম্ভীরমন্দ্রে দ্বিজেন্দ্রলাল বাঙ্গালিকে বলিলেন,—

"আবার তোরা মানুষ হ।"

"বৰ্দ্ধমানে প্রাদেশিক সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী বলিলেন, "পরাধীন জাতির আবার পলিটিক্স কি? A subject nation has no politics," তখন আমরা স্থির হইয়া ভাবিবার চেষ্টা করিলাম; বাস্তবিকই কি আমরা এতদিন—

"কেবলই স্বপন, করেছি বপন,
বাতাসে?"

"আপনারা কি মনে করেন যে আপনাদের নিজের পার্লামেণ্ট হইলেই আপনাদের ধনসম্পদ বৃদ্ধি হইবে? লক্ষ্মী ফিরিয়া আসিবেন?"

সাহেব,—"মনে করি বৈ কি! কেন মনে করিব না? আমাদের দেশের ইতিহাসই যে এ বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। তবে একটু স্থির হইয়া শুনুন।

"অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের কথা বলিতেছি। ১৭৮২ সাল। ইংরাজের সহিত যুদ্ধ করিয়া আমেরিকা স্বাধীন হইল। ইংলণ্ডের সেই ঘোর দুর্দ্দিনে হেন্‌রি গ্রাটান, এক লক্ষ ভলন্টিয়ার সৈন্যের অধিনায়ক হইয়া ইংরাজকে বলিল, 'আমাদিগকে স্বতন্ত্র স্বাধীন পার্লামেণ্ট দাও; নহিলে যুদ্ধ করিব।" ইংরাজ রাজি হইলেন। আয়র্লণ্ড স্বাধীন, স্বতন্ত্র পার্লামেণ্ট পাইল।

"পাইল বটে, কিন্তু ঠিক যতটা স্বাধীন হইতে চাহিয়াছিল, ততটা স্বাধীন হইতে পারে নাই। গভর্ণমেণ্টের উপর পার্লামেণ্টের কর্ত্তৃত্ব স্থাপিত হইল না। ডব্‌লিন কাস্‌ল্ পার্লামেণ্টের অধীন হইল না;—ব্রিটিশ ক্যাবিনেট্‌ও ইচ্ছা করিলে পার্লামেণ্টের নূতন আইন রদ করিয়া দিতে পারিত।

* ব্রিটিশ রিভিউ, জুলাই ১৯১৩।

...বাধা সত্ত্বেও গ্রাটানের পার্লামেণ্ট নিজেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন মনে করিল।

"অল্পকাল পরেই বিরোধের সূত্রপাত হইল। রাজা তৃতীয় জর্জ্জ পাগল হইলেন। প্রশ্ন উঠিল, কে যুবরাজ হইয়া রাজ্যভার গ্রহণ করিবেন? ইংরাজের পার্লামেণ্টে এই কথা লইয়া তুমুল আন্দোলন হয়। পিট ও ফক্সের দ্বন্দ্ব ইংরাজের ইতিহাসে বিশদরূপে বিবৃত হইয়া রহিয়াছে। ফক্স্ বলিলেন,'জ্যেষ্ঠ রাজকুমার প্রিন্স জর্জ্জ,পার্লামেণ্টের অনুজ্ঞার অপেক্ষা না করিয়া যুবরাজ হইয়া রাজ্যভার গ্রহণ করিতে পারেন।' পিট্ বলিলেন, 'নিশ্চয়ই নহে। পার্লামেণ্টের নিয়োগ ব্যতীত কেহ যুবরাজ হইতে পারিবেন না।' পিটের জয় হইল। গ্রাটানের পার্লামেণ্ট্ তর্ক তুলিল। যিনি ইংলণ্ডের রাজ্যভার গ্রহণ করিবেন, তিনি আয়র্লণ্ডের রাজ্যভার গ্রহণ করিবেন; তাই তাহারাও এমন গুরুতর বিষয়ে তাহাদের বক্তব্য বলিতে চাহিল; তাহারা বলিল "আমরাও ঐ যৌবরাজ্যবিষয়ে পরামর্শ দিতে চাহি।" অনেক কষ্টে তাহাদিগকে ঠাণ্ডা করা হইল; কিন্তু পিট্ প্রতিজ্ঞা করিলেন,যেমন করিয়া হৌক্,আয়র্লণ্ডের পার্লামেণ্ট্ বন্ধ করিয়া দিতে হইবে।

"তাহার পর? তাহার পর যাহা ঘটিল, তাহাতে আমাদেরই জাতীয় কলঙ্ক সর্ব্বত্র বিঘোষিত হইল। ইংরেজ গভর্ণর পার্লামেণ্ট্কে বশীভূত করিয়া ফেলিলেন! গ্রাটান পার্লামেণ্ট হইতে ১৭৯৭ সালে সরিয়া পড়িলেন। সেই বশীকরণমন্ত্র কি তাহা বোধ হয় আপনারা জানেন না। লেকি তাঁহার ইতিহাসে এইরূপ লিখিয়াছেন :—

"I believe that it is scarcely an exaggeration to say that everything in the gift of the Crown in Ireland, in the Church, the Army, the Law, the Revenue, was at that period uniformly and steadily devoted to the single object of carrying the Union. From the great nobles who were bargaining for their marquisates and their ribbons; from the Archbishop of Cashel who agreed to support the Union on being promised the reversion of the See of Dublin and a permanent seat in the Imperial House of Lords, the virus of corruption extended and descended through every fibre and artery of the political system. Grattan has left on record his conviction that of the members who voted for the Union not more than seven were unbribed."

পিট।

"১৮০০ খৃঃ অব্দে আয়র্লণ্ডের পার্লামেণ্টে, গ্রাটানের পার্লামেণ্ট, আত্মহত্যা করিল। সমস্ত গ্রেট ব্রিটেনের ও আয়র্লণ্ডের আয়ের হিসাব করিয়া স্থির হইল যে আয়র্লণ্ড সমগ্র রাজস্বের পনের ভাগের দুই ভাগ টেক্স স্বরূপ ইংরাজকে দিবে। কোনও আপত্তি গ্রাহ্য হইল না। মোটেই ত তিন চার জন আপত্তি করিয়াছিলেন। লর্ড কাস্‌ল্‌রী বলিলেন,'আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি এই একীকরণের ফলে আয়র্লণ্ডের বাৎসরিক দেড় কোটি টাকা লাভ থাকিবে।'

"হায়! লর্ড কাস্‌ল্‌রী ১৮০০ খৃঃষ্টাব্দে আয়র্লণ্ডের সরকারি ঋণ ছিল দুই কোটি পঁচাশী-লক্ষ একচল্লিশ হাজার এক শত

সাতান্ন পাউণ্ড, ১৮২৬ খৃঃ অব্দে সরকারি দেনা দাঁড়াইল, চৌদ্দ কোটি দশ লক্ষ পাউণ্ড! এবং ঐ সময়ের মধ্যে টেক্স আড়াই গুণ বাড়িয়া গেল!

একজন হাতুড়ে ডাক্তারের গল্প মনে পড়িয়া গেল। রোগীর ঘাম হইয়াছে, ডাক্তার ডাকা হইল। রোগীকে দেখিয়া তিনি কিছু ঠাহর করিতে পারিলেন না; বলিলেন, 'এ সকল ব্রণ ফুস্কুড়ির চিকিৎসায় আমি সিদ্ধহস্ত নহি; তবে, একটা গুঁড়া দিতেছি, লোকটাকে খাওয়াইয়া দাও; খাইলেই হিক্কা উঠিবে; তখন আমাকে ডাকাইও; আমি হিক্কার যম।'

"পিট্ ও কাস্‌ল্‌রী এমন গুঁড়া সেবন করাইলেন যে রোগীর হিক্কা উপস্থিত হইল।

"কিঞ্চিদধিক শত বৎসর অতীত হইয়াছে। য়ুরোপের অন্যান্য দেশের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে; আয়র্লণ্ডের কমিয়াছে। ১৮০১ সালে আমাদের দেশের লোক সংখ্যা ছিল চুয়ান্ন লক্ষ; ১৯১০ সালে দাঁড়াইল চুয়াল্লিশ লক্ষ। ইংলণ্ডের লোক-সংখ্যা প্রায় চতুর্গুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে! ১৮০১ সালে ছিল প্রায় নব্বই লক্ষ; ১৯১০ সালে দাঁড়াইল প্রায় তিন কোটি ছাব্বিশ লক্ষ! ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ দেখা দিল; ১৮৪৭ ৪৮ সালের দুর্ভিক্ষে প্রায় পনের লক্ষ লোক মারা গেল; টাইমস্ পত্রিকা মনের আনন্দে লিখিল "The Celts were going with a vengeance."

"কিন্তু যে আঠার বৎসর গ্রাটানের পার্লামেণ্ট্ দেশের শাসনকার্য্যে সহায়তা করিয়াছিল, সে সময়ে দেশের শ্রী ফিরিয়াছিল। লোকে বলেন যে, আয়র্লণ্ড স্বাধীন হইবার পর অনেক বৎসর ধরিয়া দ্রুতভাবে তাহার ধনবৃদ্ধি হইয়াছিল। ১৭৮৮ সালে আয়র্লণ্ডের এমন অবস্থা যে টাকা ধার করিতে হইলে ইংলণ্ডের চেয়ে বেশী সুদ তাহাকে দিতে হইত না।

"বাণিজ্য আশাতিরিক্ত প্রসার লাভ করিল; চাষারও অবস্থা ফিরিল; পরিত্যক্ত কলকারখানাগুলি যেন নবজীবনে স্পন্দিত হইয়া উঠিল; নগরে নগরে বড় বড় সৌধ নির্ম্মিত হইল; টুপি, জুতা, বাতি, সাবান, কম্বল, কার্পেট্, পশমি ও সূতার কাপড় তৈয়ারি হইতে লাগিল।

"গ্রাটানের পার্লামেণ্টের অনেক দোষ ছিল, কিন্তু সে আমাদের নিজের পার্লামেণ্ট। দেশের পলিটিক্সের সহিত দেশের সমৃদ্ধির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে বৈ কি? আপনারা সে কথা অস্বীকার করিলে চলিবে কেন? পলিটিক্সের উপর আপনাদেরই যদি বিশ্বাস না থাকে, তাহা হইলে আপনাদের গভর্ণমেণ্টেরই বা থাকিবে কেন?

"কিন্তু ইংরাজের চরিত্রবলের প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না; সে যদি বুঝিতে পারে যে বাস্তবিকই একটা বড় ভুল করিয়া ফেলিয়াছে, তাহা হইলে সে আপনাদিগের প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিতে একটুও কুণ্ঠা বোধ করিবে না।"

* * * *

আমি উঠিয়া পড়িলাম। সাহেব ও রামকমল তর্কবিতর্ক করিতে লাগিলেন। অন্ধকার রাত্রি; বৃষ্টি পড়িতেছিল। আলোটা অদ্ধাবৃত করিয়া আমি শয়ন করিলাম। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম যে আর কখনও সাহিত্যিক-পলিটিশ্যানের সহিত বিদেশযাত্রা করিব না।

শ্রীবিপিনবিহারী গুপ্ত।

[শ্রীঅবনীনাথ মুখোপাধ্যায়ের আলোক চিত্র হইতে]

স্বর্গদ্বারে

(পুরী)

আমি স্বর্গ-দুয়ারে দাঁড়ায়েছি আজ,
সম্মুখে পারাবার,—
সে যে অযুত জিহ্বা নাড়ি' যুগপৎ
জপিতেছে অনিবার,—
"সোঽহম্ হংস" "বম্ বম্ বম"
"ওম্" "ওম্" "ওঙ্কার"!

এ কি ধেয়ানের রঙে রঙীন সাগর
বিরাজিছে মহিমায়,
যেন মৃত্যু-মথন ভস্ম আহরি'
বিভূতি করেছে তায়,
মরণের নীল বরণ হরিয়া
অমৃত রাগিণী গায়।

আজি কল্পনা-দূতী লয়ে যায় মোরে
স্মরণ-সরণী পারে,—
যত মৃত্যুবিজয়ী সাধকের সাথে
সত্যের অভিসারে,—
পুণ্যের দীপে দীপালি যেথায়
বিধাতার সেই দ্বারে।

হেথা ধেয়ান নেমেছে জ্ঞানের নয়নে
জ্ঞানে সে ডুবেছে ধ্যানে,
হেথা ধ্যানের জ্ঞানের গঙ্গাসাগর,—
একাকার ধ্যানে জ্ঞানে,—
'আমি-ও-তুমির' চক্রতীর্থ
এ সাধন-উদ্যানে।

হেথা মীরা ও নানক বাঁধিয়াছে ডেরা
কবীর পেতেছে থানা,
আর স্থাপিয়াছে মঠ শঙ্কর হেথা
ফিরিয়া তীর্থ নানা ;
স্বর্গ দুয়ার অবারিত, আর
বাধা নাই, নাই মানা ।

হেথা সমাহিত সেই যবনের ছেলে
বৈষ্ণব হরিদাস,—
নিতি ভোর হ'তে সাঁঝ, সাঁঝ হ'তে ভোর
জপে যার উল্লাস,—
গোরা দিল যারে বেলা বালুকায়
রচি' অন্তিম বাস ।

হায়, এরি কোনো ঠাঁই অমিয় নিমাই
অসীমে দিয়েছে দোল,—
ওই উত্তাল ঢেউয়ে হেরি শ্যামবাহু
আশ্লেষ-উতরোল !
স্বর্গ দুয়ার অগলহারী
বাহু লাগি' হিয়া লোল ।

আমি স্বর্গদ্বারে খোলা দেখি আজ
স্বর্গের সব দ্বার,
ওগো হের আনন্দ বাজায়ে হেথায়
দেবতা দেছেন 'বার' !
জাতি-পাঁতি-কুল মুল খোয়াল রে
প্রেমে হ'ল একাকার ।

ওই নীল-বিভ্রমে আকাশের আলো
দিকে দিকে 'দশা' পায়,
আর 'ভ্রমি' যায় বায়ু আয়ুহীন সম
মুহু মুহু মূরছায়,
ব্যাপি' ক্ষিতি অপ্ অপ্সরা সব
সরে যায়, ফিরে চায় !

একি ! অঙ্গ বিবশ— মন নিরলস—
চিদ্-ঘন-রস-পান !
করি দিবালোকে ফিঁকা আনন্দ শিখা
স্ফুরিছে জ্যোতিষ্মান্ !
মর্ত্ত্য-ভুবনে অমৃতের সেতু
নেহারি বিদ্যমান !

তাই স্বরগের এই সিংহদুয়ারে
সিন্ধু সতত জাগে,
সে যে অসীম-বিশ্ব আকাশ-দোসর
সিংহ-সোসর হাঁকে,—
অলখ্ দেবের পাঞ্চজন্য
জনে জনে জনে ডাকে ।

ওরে ! কারা পিয়ে আজো মদের মদিরা ?
কে পিয়ে মোহের ভাঙ্ ?
ওই আদি-মৃদঙ্গ বোলে তরঙ্গ
'ধিক্ তান্' 'দিগেতান্' !
দেবতার দ্বারে কে দ্বিজ ক্ষুদ্র ?
কিবা সোনা ? কিবা রাঙ্ ?

এই অসীম-সাকার — স্বপনের সেতু—
মিলনের পারাবার,—
হেথা কুণ্ঠা কিসের ? দ্বন্দ্ব কিসের ?
এ যে স্বর্গেরি দ্বার ;—
"সোঽহম্ হংস" "ওম্" "ওম্" হেথা
মিলে মিশে একাকার ।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ।

জল নিতে।

আদর্শ সমালোচনা ।

আলকুশী ।—কবিবর শ্রীযুক্ত জহুরি মোহন জোয়াদ্দার বি, এ প্রণীত। মূল্য এক টাকা, ইলিসিয়ম সংস্করণ পাচ টাকা। গ্রন্থে কবিবরের নানা বয়সের ১৯ খানি হাফটোন চিত্র আছে, তাহার মধ্যে ৫খানি তিন বর্ণের। একখানি চিত্রে কবি তৈল মাখিয়া গামছা কাঁধে দিয়া তামাক খাইতেছেন। একখানি চিত্র কবির পাঠ্যাবস্থার, পাঠশালে কবিবর ইঁটেখাড়া হইয়া আছেন এবং মুখ টিপিয়া হাসিতেছেন। চিত্রখানিতে কবির কাব্য বুঝিবার বিশেষ সাহায্য করিবে। Child is the father of man. কবিবর জীবনে অসংখ্য বাধা বিদ্রূপ সহ্য করিয়া যে যশস্বী হইবেন তাহা তাঁহার ইঁটেখাড়া অবস্থার হাস্যেই সূচিত হইতেছে।

জহুরিবাবু ইহার পূর্ব্বে কোন পুস্তক প্রকাশ করেন নাই, তবে তাঁহার হস্ত-লিখিত দুইখানি পুস্তক 'ছেঁকা' ও 'বিমান' তাঁহার বন্ধুমহলে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিল। ইনি সাহিত্যক্ষেত্রে একেবারে পাকা হাতের পরিচয় দিয়াছেন, একেবারে সব্যসাচী। তিনি কল্পনা-শরক্ষেপে যে ভোগবতী ধারা ছুটাইয়াছেন তাহা বঙ্গসাহিত্যে একেবারে অপূর্ব্ব।

বঙ্গসাহিত্যের কোন কবিই এতদিন 'আলকুশীর' কাছে ঘেঁসিতে পারেন নাই। ধন্য জহুরি বাবু, তাঁহার উদ্যম ধন্য, ধন্য তাঁহার সাহস। পুস্তকখানিতে ৪৯টি কবিতা আছে, কতকগুলি সনেট, কতকগুলি অনুবাদ, বাকি সব মৌলিক কবিতা। সমস্ত কবিতাতেই একটা উড়ু উড়ু ভাব আছে। একটি সনেট উদ্ধৃত করিবার লোভ আমরা সংবরণ করিতে পারিলাম না :—

বাস্তুঘুঘু ।

ভীষণ বৈশাখী রৌদ্রে গ্রীবা দোলাইয়া
এ ভগ্ন ভিটায় বসি' কি ভাবিছ পাখী,
চঞ্চল নয়নে প্রেম উঠে ফেনাইয়া
পুচ্ছেতে চুম্বনচিহ্ন কে দিয়েছে আঁকি'!
সেওড়া নিকুঞ্জে যাপি' কৃষ্ণা বিভাবরী;
শঙ্খ চিরুণীর সখা, পেচার সুহৃদ,
উচ্ছন্ন যাত্রীর পাণ্ডা, একি কণ্ঠ মরি!
অর্থ তোর কেবা বোঝে বিনা অর্থবিদ্।
বিচর বিচর পক্ষী হেতা মনোসুখে
খুঁটিয়া খুঁটিয়া খাও ভাব-তৃণ তুলি';
শুনিয়া ও মধুরব তোমার শ্রীমুখে
ধরার ঝঞ্চাট যাই একদম ভুলি'।
কিন্তু সদা মনে রেখো ওহে পক্ষীচাঁদ,
আছে নিষাদের শর, শিকারীর ফাঁদ।

কবিতাটি যেমন মনোজ্ঞ, তেমনই শ্রুতিমধুর; সামান্য বিষয় লইয়া, কএক লাইনে যিনি এত উচ্ছ্বাস ফুটাইয়া তুলিতে পারেন তিনি ধন্য। তবে সনেটটি ঠিক ইটালীয় আদর্শে হয় নাই, কবিবর বোধ হয় পিত্রার্ককে অনুসরণ করিতে কুণ্ঠা বোধ করিয়াছেন। দুএক স্থানে সেমিকোলনও ঠিক স্থানে পড়ে নাই, তাহাতে রসভঙ্গ হইয়াছে।

কবিবর অনুবাদে সিদ্ধহস্ত। Wordsworth এর Rainbow নামক কবিতাটির অনুবাদের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম :—

জলধনু ।

তোমায় যখন দেখি জলধনু
হৃদয় উঠে যে লাফায়ে,
এমনি আছিলে মম শৈশব-প্রভাতে
এমনি মঞ্জু কিশোর কুঞ্জশোভাতে
এমনি রহিবে জীবন গোধূলি বেলাতে
নতুবা মরিব ঝাঁপায়ে।

কি সুন্দর অনুবাদ। এক সঙ্গে কাব্য ও অনুবাদ দুই। প্রত্যেক কবিতাই যেন হ্যামিল্টনের বাড়ীর চাঁচা ছোলা হীরকখণ্ড। আমরা প্রত্যেককে এই পুস্তকখানি কিনিয়া পড়িতে অনুরোধ করি।

'সমাধি' নামক শেষ কবিতাটিতে কবি কি প্রশান্ত কি উদার দৃশ্য দেখাইয়াছেন দেখুন,—

নিশ্চল নিস্তব্ধ নির্ব্বাত প্রদেশে
বসীল বল্কল অঞ্চলে কে এসে।
গণ্ডেতে গমন্বিত গুঞ্জিত প্রতিভা,
চক্ষে ও বক্ষেতে বিম্বিত কি আভা।
লম্বিত ললাটেতে লুণ্ঠিত গরিমা
পদতলে ধিক্কৃত লাঞ্ছিত অনিমা।

মুগ্ধ সাধকবর বিজ্ঞান ধ্যানে কি ?
নীল শিলাজতু তলে যেন পিণাকী।

আমরা সকল স্থানের অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিলাম না, কিন্তু এক কালিদাস ছাড়া আর কেহই এমনভাবে ধ্যানীর গম্ভীর ভাব বর্ণনা করিতে পারেন নাই। যেমন ছন্দ মন্দ-মধুর, ভাবও তেমনই শান্তকোমল !

'আলকুশীর' কবিতাপুস্তকের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করা লণ্ডনস্থিত Indian Societyর একান্ত কর্ত্তব্য। রবিবাবুর 'গীতাঞ্জলির' অনুবাদ পড়িয়া পাশ্চাত্য জগৎ মুগ্ধ হইয়াছে। 'আলকুশীর' ন্যায় কবিতাপুস্তকের অনুবাদ পড়িলে পাশ্চাত্য সুধীসমাজ মোহিত হইবেন, কারণ ইংরেজ জাতি অতিমাত্রায় কবিতাপ্রিয়।

আলকুশী পড়িয়া প্রকৃতই মোহিত হইয়াছি। নগ্ন সরল প্রাণে এ পুস্তক পড়িতে বসিলে প্রত্যেক কবিতা মরমে গিয়া বিঁধিবে---একথা আমরা বলিতে পারি। কবি দীর্ঘজীবী হউন।

ভ্যাঁটা।—শ্রীরতনকৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য বাধাই ১॥০ দেড় টাকা। ট্রাস পাবলিসিং হাউস হইতে প্রকাশিত।

প্রথমে নামটি দেখিয়া আমরা এখানি শিশুপাঠ্য পুস্তক মনে করিয়াছিলাম ; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, এখানি গল্পের বই, পনেরটি সুলিখিত গল্পে পরিপূর্ণ।

এই বইখানির প্রধান বিশেষত্ব এই যে, ইহার ভাবে ও ভাষাতে কেমন একটা গড়ানে গড়ানে ভাব আছে। পাঠকের মন তাতে পিছলাইয়া পড়ে। ভাষা আপনার বেগে, অসরল হাস্যে দীপ্ত গৌরবে, ব্যাকরণের বাধা, অর্থের শাসন ঠেলিয়া উদ্দাম গতিতে চলিয়াছে ; পড়িতে পড়িতে মনে হয় যেন দামোদরের বাঁধভাঙ্গা স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছি। মাঝে মাঝে এমন ভাষার ঘূর্ণীপাক আছে যে, তাহা বড়ই উপভোগ্য, পাঠককে কিয়ৎক্ষণ ঘুরাইয়া একেবারে ভাসাইয়া দেয়। ইহার অধিকাংশ গল্পই আমাদের ভাল লাগিয়াছে। 'ছুঁতো হাঁড়ি' নামক গল্পটিতে লেখকের আর্ট (art) পূর্ণমাত্রায় ফুটিয়াছে। 'হাঁসুলি' দরিদ্র মুসলমান-কন্যার সুন্দর চিত্র। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা আমাদের ভাল লাগিয়াছে লেখকের 'খেপামি' নামক গল্পটি। Plotটি যেমন সুন্দর, বর্ণনা-কৌশলও তেমনই চিত্তহারী। নিম্নে গল্পটি উদ্ধৃত করিলাম :—

খেপামি।

গল্পলেখক কলম ধরিয়া গল্প লিখিতেছিল, আহার নিদ্রা নাই, কোন দিকে তাহার খেয়াল নাই।

নির্জীব নীরস কাগজ লেখকের নিপুণ লেখনীস্পর্শে একটু একটু করিয়া সজীব হইয়া উঠিতেছিল। বসন্তের বাতাসে ফুল যেমন করিয়া ফোটে, শ্যামলতা যেমন গজাইয়া উঠে, তেমনই করিয়া কাগজের শ্রীঅঙ্গে যেখানে কলম লাগিতেছিল সেইখানে সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিতেছিল, মাধুরী ঝরিয়া পড়িতেছিল।

লেখক গল্প লিখছিল আর গল্পের নায়িকার ভাষায় গড়া ফুটন্ত সৌন্দর্য্য ভাবিয়া পুলকিত হইতেছিল। আবার সেই পুলকের প্রলেপ লাগাইয়া গল্পটিকে, নায়িকাটিকে, সম্পূর্ণ করিয়া তুলিতেছিল।

আজ লেখক-শিল্পীর fountain pen যেন নন্দনবনের বিলাস-উৎস, কেবল লাবণ্য ও সৌন্দর্য্য উদ্গীরণ করেছে। কালীর প্রত্যেক ছিটায় নায়িকার দেহে লাবণ্যের ফিনকুটী উড়ছে। চকমকি ঠুকিলে যেমন ফিনকুটী উঠে, তেমনই ফিনকুটী উঠছে।

সহসা এক অনিন্দ্য রূপসী আসিয়া লেখক-শিল্পীর সম্মুখে দাঁড়াইল।

মুগ্ধ লেখক বলিল,—'তুমি কে গো তুমি কে' ?

সুন্দরী হাসিয়া বলিল,—'তুমি যাহাকে আঁকিতে চাহিতেছ আমি সেই।'

লেখক অবাক হইয়া সুন্দরীর মুখ হইতে হাসির জ্যোতিটুকু লইয়া গল্পের নায়িকার ওষ্ঠপুটে তাহা কলমের দুইটি খোচায় ফুটাইয়া তুলিল।

সুন্দরী বলিল,—'লেখক ! তুমি গল্প লেখ', আমি তোমায় গান শোনাই'। এই বলিয়া সুন্দরী মৃদু গুঞ্জনে গান আরম্ভ করিল। লেখকের মনে হইতে লাগিল এই গানের গুঞ্জনে তাহার চিত্ত-কমলের যে দলগুলি মুদিয়াছিল তাহা ধীরে ধীরে উন্মীলিত হইয়া উঠিতেছে।

লেখক উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিয়া উঠিল,—

'ওগো সুন্দরী আমার কাছে আসিয়া বসো'। সুন্দরী লেখকের কাছে আসিল। লেখক মুগ্ধনয়নে তাহাকে দেখিতে লাগিল,তাহার কাগজ কলম মাটিতে গড়াগড়ি দিতে লাগিল। সুন্দরী বলিল,—'ওগো তুমি কাজে মন দাও,আমি তোমায় গান শোনাই।

লেখক বলিল,—'তোমার গান ভাল করিয়া শুনাও, আরো কাছে এসো।'

সুন্দরী গায়িতে গায়িতে লেখকের কাছে ঘেঁসিয়া বসিল।

লেখক বলিল, -'ওগো আরো কাছে এসো।'

সুন্দরী আরো কাছে বসিল।

সুন্দরার রূপের মোহ লেখকের প্রাণে আবেশ আনিতেছিল,তাহার নিঃশ্বাসে সে মাদকতা অনুভব করিতেছিল—সে যেন ঢুলিয়া পড়িল।

সুন্দরী বলিল, 'ওগো লেখক জাগো, তোমার ছোট গল্প যে মাটী হলো।'

লেখক বলিল,—'ওগো গল্পের কথা রাখো। তুমি মুখোমুখী হইয়া বসো, তোমার ঐ বাহুর পরশ বারেকের তরে দাও'।

সুন্দরী মাথা নাড়িয়া বলিল 'না'।

লেখক পাগল হইয়া বলিয়া উঠিল,—'ওগো সুন্দরী! তোমার অধরসুধা একবার পান করাও। এসো এই বক্ষে তোমার হাতের পরশ দাও।'

সুন্দরী আর কিছু বলিল না; একটু হাসিল। তার পর ধীরে ধীরে অতি লঘুভাবে লেখকের কর্ণে হাত দিল।

লেখক বলিল,—'ওগো অমন কর কেন?'

সুন্দরী লেখকের কাণটি আর একটু জোরে টানিল। লেখক বলিল, 'সুন্দরী লাগে যে।'

সুন্দরী আর বাক্যব্যয় না করিয়া আরো জোরে কর্ণ টানিতে লাগিল। লেখক উঃ আঃ হইতে 'বাপ্‌রে' 'মা রে' অনেক করিল। সুন্দরীর বিরাম নাই, সে লেখকের কর্ণকে টানিয়া দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর করিতে লাগিল।

লেখক বিস্মিত হইয়া বলিল, 'একি! এমন কোমল কর এত কঠিন হইল কি করিয়া! আমার কর্ণ এত দীর্ঘ হইল কি করিয়া!'

লেখক সবিস্ময়ে দেখিল তাহার নিজের মূর্ত্তি বদলাইয়া গিয়াছে, কেবল দীর্ঘকর্ণে সুন্দরীর করাঘাত জ্বল জ্বল করিতেছে!

গল্পটিতে জাপানী ও ফরাসী আর্টের সুন্দর সমাবেশ আছে। তবে গল্পটিতে বোধ হয় ভাদ্রের প্রবাসীর 'পাষাণী' নামক সুন্দর গল্পটির ছায়াপাত হইয়াছে। যাহা হউক, তবুও ইহাতে লেখকের যথেষ্ট কৃতিত্ব বর্ত্তমান। বইখানি পূজার সময় উপহার দিবার উপযুক্ত।

ধুপুচি।—এখানি স্কুলপাঠ্য পুস্তক ৩য় ও ৪র্থ মানের জন্য। শীঘ্রই সেণ্ট্রাল টেক্‌স্টবুক কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইবে। মূল্য ।৵০ আনা, লেখক শ্রীপ্রহ্লাদ চন্দ্র গাই।

ইহাতে ষট্‌চক্রভেদ হইতে তন্ত্র শাস্ত্রোক্ত যাবতীয় সাধনপদ্ধতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। সুকুমারমতি শিশুগণের বোধসৌকার্য্যার্থ প্রহ্লাদ বাবু অতি সরল ভাষায় এই সকল জ্ঞাতব্য বিষয় লিখিয়াছেন। আমার তন্ত্রশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি না থাকায় সমস্ত অংশ বুঝিতে পারি নাই। কিন্তু শিশুগণ ইহাতে যে বিশেষ উপকৃত হইবে তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। পুস্তকের শেষে প্রাণায়ামের সহিত যে অঙ্গচালন-সঙ্গীত (Action Song) দেওয়া হইয়াছে সেটি যেমন সরল, তেমনই মধুর। দেখুন :—

> এরেই বলে 'পুরক', এরে 'রেচক' বলে ভাই
> এরেই বলে 'কুম্ভক' যাতে উপর দিকে যাই।
> চতুর্দ্দল পদ্ম হেথা, থাকেন 'কুণ্ডলিনী',
> এইটি 'স্বাধিষ্ঠান' এরেই 'মণিপদ্ম' গণি'।
> এই খানেতে 'অনাহত', 'বিশুদ্ধা' তার ধারে
> এই খানেতে 'আজ্ঞাচক্র' তেতাঁয় সহস্রারে।

কাতুকুতু।—শ্রীদংষ্ট্রাবিকাশ মজুমদার বি, এ, প্রণীত; মূল্য ৷৷০ আট আনা।

এখানি প্রহসন। এমন হাস্যরসের পুস্তক আর দেখি নাই—পাঠকেরা না পড়িয়াই হাসিবে। আমি ত দেখিয়াই হাসিয়া অস্থির। দংষ্ট্রাবাবু ধন্য, তিনি যে 'কাতুকুতু' দিয়াছেন, তাহাতে আবালবৃদ্ধবণিতা সকলেই হাসিবে। এখানি বিখ্যাত বিখ্যাত রঙ্গালয়ে অভিনীত হওয়া উচিত। 'কি'র খেদ নামক কবিতাটি আমাদের ভাল লাগিয়াছে।—

কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য আমরা ইহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম :—

'কি' ছিলাম আমি কেমনে হলাম 'কী'
ভেবে হাসি হিঃ হিঃ হী।
ভাগের মা এই বঙ্গভাষার
কেহ নাই বটে গঙ্গা দিবার
শ্রাদ্ধ ত তার করে প্রতিদিন
ফণি, মণি, ভারতী।
ভেবে হাসি হিঃ হিঃ হী।
সবাই জগতে হতে চায় বড়
আমি রব ছোট কা,
তোমরা সকলে বিচার করতো জী।
সেই কেলোয়াৎ যে চেঁচাতে দড়
যে লেখে কবিতা সেই কবিবর,
আমিই কেবল হ্রস্ব হইয়া
পড়িয়া রহিব ছিঃ, বিচার করতো জি।

ঘুঙ্গুর।—হারু উপাধ্যায় প্রণীত; মূল্য বারো আনা। এখানি ছোট গল্পের বহি। ৯টি, নানাবিষয়ক গল্পে পরিপূর্ণ, করুণ মস্করা, গম্ভীর চটুল ভাবে পরিপূর্ণ। ভাষা স্বচ্ছ সনীল। রস-রচনাগুলি সার্থক হইয়াছে। ইহাতে পেলারাম-অঙ্কিত তিনখানি রসচিত্র আছে। প্রত্যেক গল্পই ভেলার ন্যায় আমাদিগকে মহাভাবসমুদ্রের তীরে আনিয়া পঁহুছিয়া দেয়। একদিকে অনন্ত উদ্বেগ-ভাবসাগর, হাঙ্গর কুম্ভীরপূর্ণ রত্নাকর! অন্যদিকে পাংশুসিকতাপূর্ণ দিগন্তবিস্তৃত বেলাভূমি, পাঠকের প্রাণ ভয়ে ও বিস্ময়ে ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠে। 'কোঁড়ার ডোঙ্গা' গল্পটির প্লট অতি সুন্দর, লেখকের বর্ণনাগুণে ইহা বড়ই উপভোগ্য হইয়াছে। নায়ক চঞ্চলকুমার ও নায়িকা ধূপছায়া সাঁইতিয়া হইতে পাকুড় যাইতেছিলেন। সেই অভিশপ্ত ট্রেণে চড়িয়া কেমন করিয়া 'শাল' নদীর সেতু ভাঙ্গিয়া ট্রেণ সহিত তাঁহারা জলে পড়েন, লেখক তাহা অতি সুন্দরভাবে দেখাইয়াছেন। ভাসমান কোঁড়া গাছকে ডোঙ্গার ন্যায় অবলম্বন করিয়া কেমন নিপুণভাবে ধূপছায়া তাহার প্রেমিকের প্রাণরক্ষা করে এবং এক সাঁওতাল-কুটীরে তাহারা নিশিযাপন করিয়া কিরূপে সভ্যজগতে ফিরিয়া আসে, লেখক তাহা সুন্দরভাবে দেখাইয়াছেন। গল্পটিতে স্থানে স্থানে অনাবিল হাস্যরসের সমাবেশ আছে। বিশেষতঃ শাল নদীতে ভাসিতে ভাসিতে প্রেমিকপ্রেমিকার সরস কথোপকথন পড়িতে পড়িতে হাস্য উথলিয়া উঠে।

'ভূতের মর্ম্মব্যথা' নামক গল্পটি লেখকের প্রাণ দিয়া লেখা। নিজে অনুভব না করিয়া এমন মর্ম্মব্যথা কেহই লিখিতে পারেন না, ইহাতে পুরামাত্রায় অপরোক্ষ সহানুভূতি ও বস্তুতন্ত্রতা বিদ্যমান। আমরা প্রত্যেককেই পুস্তকখানি পড়িতে অনুরোধ করি।

'কপিঞ্জল'

উজ্জয়িনী ও কৌশাম্বী।

(গাথা)

উজ্জয়িনী হ'তে এসেছে দূত আজ, রাজার লেখা লিপি করে
চণ্ড মহারাজ বারতা পাঠায়েছে, বৎস মহারাজ তরে।
পত্র পড়ি রাজা জ্বলিয়া উঠে ক্রোধে, দূতের গায়ে ফেলে ছুঁড়ে,
'কেমনে হেন কথা আনিলি বহি দূত, বৎস নৃপতির পুরে?'
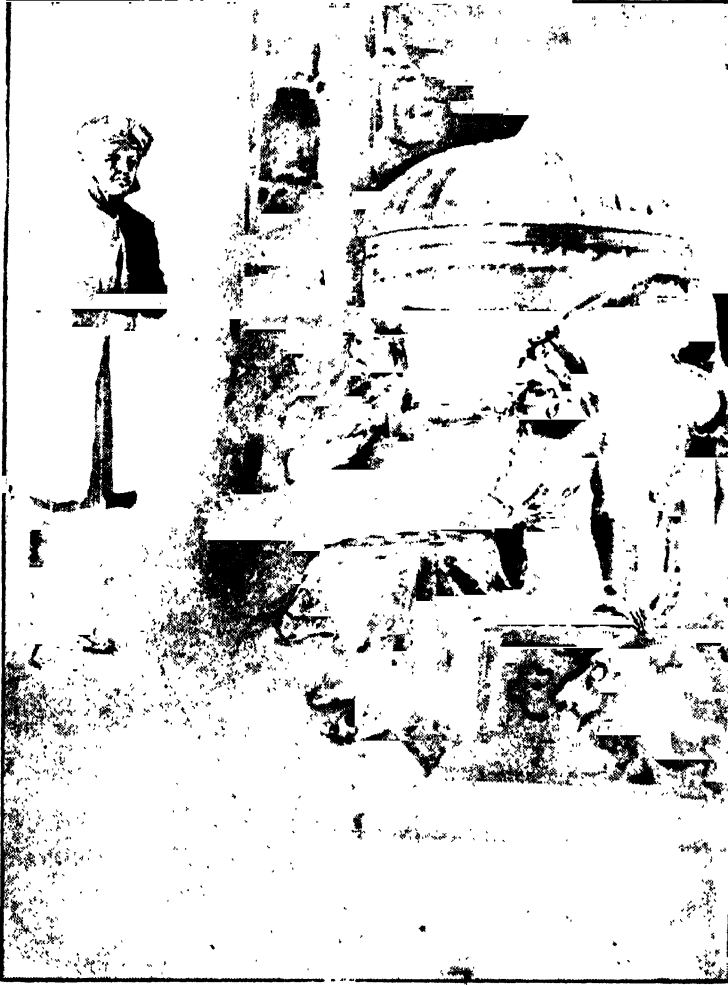
কেমনে হেন কথা আনিলি বহি দূত ?

তাহার সুতা কি না অতুল ধরাধামে, এ হেন রূপগুণবতী,
চিঠির ভাব, যেন আমারে দয়া করে, তাহার বাছিলেন পতি।
দিগ্বিজয়ী কৌশাম্বী-নৃপ আমি, আমাকে তার গৃহে গিয়ে,
অতুলনীয়া তার তনয়া-রতনেরে, করিতে হবে কি না বিয়ে ?
ছলনা করি, মোরে বন্দী করিবে সে, বুঝেছি তার কৌশলে,
বলগে, উদয়নে কন্যা দিতে হ'লে, আনিতে হবে পদতলে।
অন্তঃপুরে মোর শতেক দাসী মাঝে, রাখিয়া দিতে পারি তায়,
তাহার তনয়ারে মহিষী করিবারে, দুরাশা কেন হলো হায় ?
দর্প হেরি তার হ'লাম চমকিত, উজ্জয়িনী-নরনাথে,
বলো যে নাহি করে বিবাহ-বন্ধন, সিংহ শৃগালের সাথে।"

শুনিয়া দূতমুখে বারতা সমুদয়, মুচকি হাসি রাজা কয়,
"আচ্ছা দেখা যাবে কেমন দম্ভী সে—দর্প কতদিন রয় ?"
সচিবে কহে রাজা—"শুনেছি মহাশয়, সত্য এই নরপতি
নৃত্যগীতে নাকি নিপুণ অতিশয়—ব্যসনী মৃগয়ায় অতি ?
তাহার পরে হলো মন্ত্রীসহ ধীরে, অনেক কথা কাণে কাণে,
সে কথা গোপনীয় মন্ত্র-গৃহমাঝে,—দেশের লোক নাহি জানে।

নৃপতি উদয়ন সিংহাসনে,—তবু যেন বা কণ্টকাসনে,
অতুল বৈভবে বিজয়গৌরবে, শান্তি নাহি মনে মনে।
প্রাণের উৎসব নাহিক হায় তার, শতেক উৎসব মাঝে,
তন্ত্রী গাহে করে গাহিলা অন্তরে—গেহে না কঙ্কণ বাজে।
মণির কুট্টিম শুনিয়া শিহরে না, কনক মঞ্জীর তান,
অরুণ চরণের চুম্বে রঞ্জিত, হয় না মন্থর-প্রাণ।
ক্লান্ত বাহুযুগ রাখিতে নাই ঠাঁই, করিতে আপনারে হারা,
বারিতে শ্রমজল নাহিক সুশীতল, জীবন-জাহ্নবী ধারা।
নিয়ত রাজকাজ লাগেনা ভাল আজ, রাজা ডাকিল,—"সেনাপতি,
শিকারে যেতে হবে—তুরগ-করী রথ, সাজাও সত্বর অতি।"

হস্তী মৃগয়ায় ক্ষেপিল আজি রাজা পশিল ঘোর বনমাঝে,
পদাতি রথকরী রহিল পিছে পড়ি, ছুটায় এক, বাজিরাজে।
সহসা মেঘসম উদিল সম্মুখে সিঁদুর বিদ্যুৎ মেখে,
বিরাট্ করী এক, আসিছে দ্রুতগতি, কচালি' আঁখি শেষে দেখে।
হস্তীপ্রিয় রাজা হেরিয়া পুলকিত, হাতীর শিরে তীর ছুড়ে,
সহসা বাহিরিল শতেক সেনা তায়—যন্ত্রকরী গেল উড়ে।
রাজার চোখে ভাসে কুহেলি মোহঘোর—হিতে যে বিপরীত !—একি !
খেলা কি মায়াবীর ?—মতির ভ্রম নাকি ? নৃপতি চমকিত দেখি।
ধরিতে শরাসন সময় নাই আর, ঘেরিল আসি সেনাদলে,
অস্ত্র কাড়ি তার চড়ায়ে করীপরে উজ্জয়িনী পথে চলে।
চণ্ড মহারাজ তোরণে কহে আজ,—"অতিথি এস মোর ঘরে,
নগর সাজায়েছি প্রদীপ ফুলহারে, তোমারি আবাহন তরে।
বরণ লাগি তব ডঙ্কা তূরী বাজে—তোরণে বাজে শিঙা বাঁশী,
আচার-মঙ্গল করিছে পুরবালা, প্রাসাদে কোলাহল হাসি।
বিজয়গৌরবে আসিতে নিবেদিনু, সে কথা শুনিলে না কাণে,
বন্দী হয়ে আজ এসেছ মহারাজ, আমারি হৃদয়ের টানে।"
অতিথি এসো এসো সিংহাসনে বসো, হে নৃপ ! ক্ষমা করো মোরে,
শ্রেষ্ঠ গৃহমাঝে বসতি হোক তব—বন্দী রহ বাহু ডোরে।

হে নট কিন্নর ধন্য কর গেহ—মুখর কর বীণা-তানে,
শিকারী—তব পায় লুটুক হিয়ামৃগ, আহত সঙ্গীত-বাণে।
নৃপতি উদয়ন কহে,—"হে নৃপমণি"—অরুণ রোষে তার আঁখি,
"হীরার শৃঙ্খলে, সোণার পিঞ্জরে, পুষিবে বুলিপরা পাখী ?
ক্ষত্র নরপতি, অসহ অপমান ! ক্ষত্র নিবেদন করে,
বিদায় নাহি চাই—পরাণ নিয়া মোর, বিদায় দাও চিরতরে।"
চণ্ড কহে,—"আমি জহুরী কাঁচা নই—চিনি যে রতনের খনি,
প্রাণের চেয়ে মান অনেক বেশী দামী,—তাইত চাই নৃপমণি।"
কহিল মনে মনে,—"যুবক, দেখা যাবে, তুমি যে কত বড় বীর,
নিয়ত ধনু-তীরে কিণ কঠোর কর চিন নি কুসুমের তীর ?"

* * * *

বিষের দাহে জ্বলে নৃপতি উদয়ন, প্রাসাদ শিরে শিরে ঘুরে,
নিঠুর বিদ্রূপ করিছে যেন হাসি, সকলি এই রাজপুরে।
কপোত গৃহ শিরে সারিকা পিঞ্জরে, কহিছে বিদ্রূপ বুলি,
ভঙ্গি করি-বুক ব্যঙ্গে ভাঙে বুক, চিত্রশালে ছবিগুলি।
বন্দী যাতনায় শান্তি নাহি পায়, শান্তি শুধু সার—বীণা
গরল সরোবরে শান্তিময়ী জাগে, ভারতী সরসিজাসীনা।
কালিয় ভুজগের ফণায় বাজে যেন কালার সুমধুর বাঁশী
গহন ঘন বনে কাঁটার বোঁটা পুরি, যেন সে কুসুমের হাসি।
চরণে করি নতি আসিল নৃপসুতা, বাসবদত্তা সে বালা,
সোণার শিকলের বাঁধন পরে যেন বাধন কুসুমের মালা।
শিষ্যাপানে চাহি ভাবিল রাজা একি—ছলনা এলো পুনরায়
বীণা যে খসে পড়ে প্রাণের অন্তরে, তেজের বাঁধ ভেসে যায়।
কবচ তরবার, কিরীট মণিহার, চরণে পড়ে তার লুটে,
কাহার ফুলশরে শায়ক শরাসন রাজার হাত হতে টুটে।
নয়ন দুটি দিয়ে রূপের সুরা পিয়ে. কণ্ঠে বহে সুধা বাম
বালার হিয়াতট আঘাতি আলোড়িয়া অবশ করে' তুলে প্রাণ।
গানের সহ প্রেম শ্রবণপুট দিয়া প্রবেশে কিশোরীর বুকে,
নবীন বারি সহ ঝরিছে যেন প্রেম তৃষিতা চাতকীর মুখে।
সুপ্তি ক্ষুধাহারা নিয়ত নৃপসুতা শিখিছে গীতি সারা বেলা,
অবাক হয়ে শুধু হেরে সে নৃপতির বীণায় আঙুলের খেলা।
তরুণ মহারাজ—তাহারে বিতরিতে কলার জ্ঞান সুকুমার
হিয়ার ভাণ্ডার শূন্য করি সবি কখন দিয়াছে যে তার।
বীণার বাণী ক্রমে রণিয়া থেমে যায়, শুধুই জাগে নীরবতা,
আঁখির পানে চেয়ে নীরব ক্রমে দোঁহে, কহিছে ভাষাহীন ব্যথা।

আঁখির পানে চেয়ে নীরবে ক্রমে দোঁহে কহিছে ভাষাহীন ভাষা।
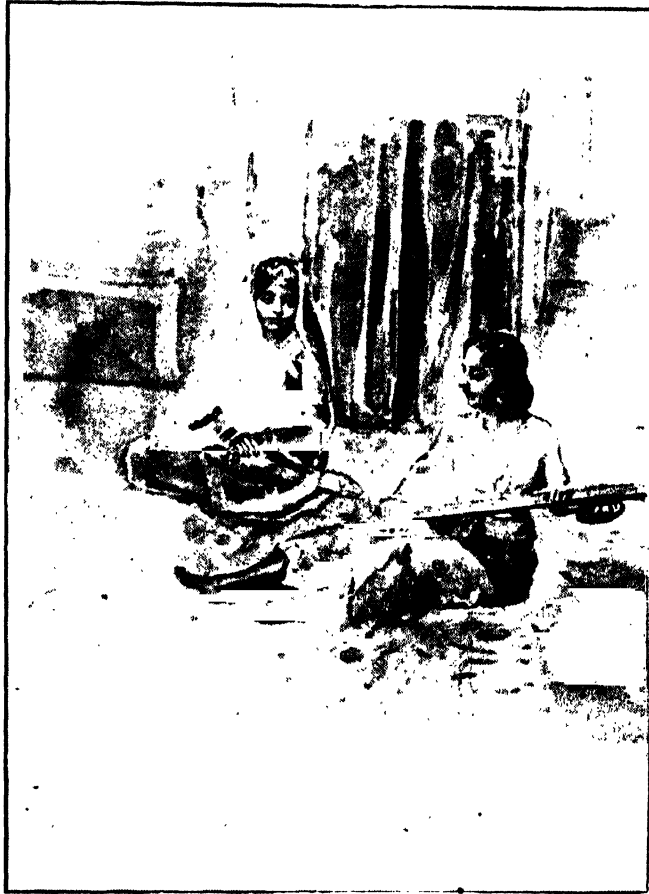
আঁধার বিভাবরী। করিণী-পিঠে চড়ি পলায় রাজা, রাজবালা,
জানেনা কেহ আর শুধুই জানে ঐ নগরীপথে দীপমালা।
নৃপতিদুহিতার প্রিয়া সে করিজায়া নগর-বাহিরের পথে,
হরষ বৃংহণে জাগাল জনগণে, অশ্বে সাদী, রথী রথে।
ছুটিল যুবরাজ হাজার সেনা সহ মত্ত করিবর পরে'
যুঝিল উদয়ন, ভদ্রাসহ যেন পার্থ একা রণ করে।

চণ্ড, গৃহচূড়ে পদাতিগণে কহে—রাখ এ রাজ্যের মান,
অশ্বী বীরে কহে হবেনা যেতে আর—কুমার যবে আগুয়ান।
পলায় যত সুতা ততই নরপতি হরষে ভাসে গৃহশিরে,
হৃদয় ছুটি তার যেন বা প্রাণপণে ঠেলিয়া দেয় করিণীরে,
নয়নালোক তার, তাদের ঘোরবনে দেখাতে পথ যেন চাহে।
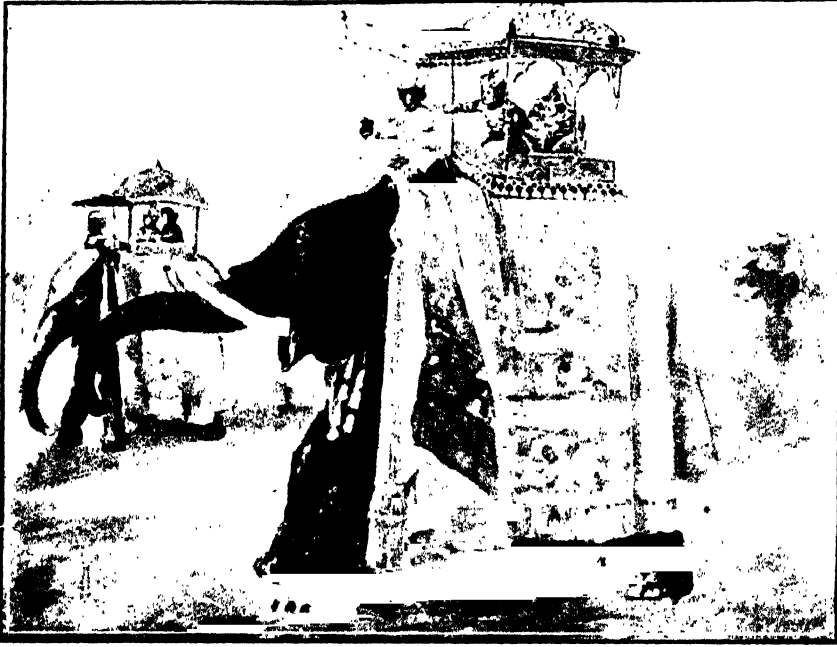
চিনিয়া করিণীরে ফিরিল করিবর,

কবচ শুভাশীস দেয় সে পাঠাইয়া শর না লাগে যেন গায়ে,
চিনিয়া করিণীরে ফিরিল করিবর,—নারীর জয় সব ঠাঁবে,
ফিরিল যুবরাজ মলিন, ভাবে হায়—ফিরে কি উত্তর দিবে ?

নৃপতি উদয়ন ক্লান্তি দূরিবারে ভীষণ সমরের শেষে
ত্যজিয়া শরাসন ধরিল বীণাবেণু, গভীর কাননের দেশে।
প্রিয়ার সহ গাহি বিজয় মঙ্গল, প্রেমের অভিনব গান,
ফিরিল রাজধানী সঙ্গে মহারাণী—মরণে ফিরে এলো প্রাণ।
উড়িল জয়কেতু, নাচিল নট নটী, ক্ষুণ্ণ রহিল না কেহ
পুণ্য রাজপুরী, শূন্য কারাগার পূর্ণ ভিখারীর গেহ।

* * * *

আবার এলো দূত উজ্জয়িনী হ'তে—বহিয়া আনি প্রিয়বাণী,
"কি কথা লিখেছেন শ্বশুর মহাশয়" নৃপতি কহে,—"শুন রাণী !"
'বৎস উদয়ন ! মিটিল সব সাধ—সকল হলো তপ আজি
'সত্যে পরিণত হইল এতদিনে আমার কল্পনারাজি।
'কেশব, তব করে সঁপিয়া মোর রমা—জীবন বিমথিত সুধা,
'পরাণ-পারাবার শান্ত হলো আজ, মিটিল অন্তর-ক্ষুধা।
'পুলকরসে আঁখি আসিছে আজি ভরে', নয়ন-গোমুখীর নীরে,
'হৃদয়-তীর্থের যাত্রী স্নান করি' তরিল মুক্তির তীরে।

'আপন সন্তান অতুল ধরাধামে আপন—সন্তান কি যে
'করুন শঙ্কর অঙ্ক আলোকিত—তখন বুঝিবেই নিজে।
'আমার সাধ যাহা দোঁহার হোক তাহা, এই ত আশীষের সার,
'ধরগো বরবধূ অপরাজেয় এই—কবচকুণ্ডল ভার।
'তোমরা গেছ চলে—নিশীথে কোলাহলে ভূষণ যৌতুকহীন,
'পাঠাই যাহা কিছু লহগো দয়া করি—মুক্ত হোক্ মোর ঋণ।
'তোমার ভ্রাতা যাহা লিখেছে মহাবাণী, তা বেশ রসিকতা ভরা,
'বন্ধু, বুকে এলে দূরের পথ দিয়ে, সুড়ং পথে দিলে ধরা।
'বিজয়-গৌরবে আসিয়া পরিণয় করিতে,—ছিল নিবেদন
'বন্দীভাবে এসে চোরের মত, শেষে করিলে হায় পলায়ন।"

শ্রীকালিদাস রায়।

প্রতিশোধ।

(সত্য-ঘটনা-মূলক)

প্রথম দৃশ্য।

[বৃদ্ধ পরেশনাথ প্রত্যূষে উপনিষদ্ পাঠ করিতেছেন। চেয়ারের উপর কার্পেটের আসনে বৃদ্ধ উপবিষ্ট। পায়ের কাছে বিধবা কন্যা গৌরী বসিয়া তাহা শুনিতেছে। সকালের লাল রোদ পশ্চিমের দেয়ালে পড়িয়া গৌরীর মুখে প্রতিফলিত হইয়াছে। বাহিরে দৌহিত্র বিমল একটা কাকাতুয়ার সহিত খেলিতেছে—তাহার শব্দ ঘরের ভিতর মধ্যে মধ্যে প্রবেশ করিতেছে।]

গৌ। বাবা, ঈশ্বরকে কি তাহলে কেউ জান্‌তে পারেন নি ?

প। জানা বল্‌তে যদি মনে কর তাঁকে সম্পূর্ণভাবে জানা, তাহলে স্বীকার কর্‌তে হবে যে কেউ জানেন নি। আমাদের জানার একটা সীমা আছে—কিন্তু তিনি যে অসীম—সীমার মধ্যে অসীমকে কি করে আবদ্ধ কর্‌বে।

গৌ। ঠিক এই রকম ভাবের একটা কবিতা আমি সেদিন পড়েছি। কবি তাতে বলেছেন যে, সসীম অসীমের সন্ধানে প্রতিনিয়ত ফিরচে। মানুষের মন ভগবানের জন্য লালায়িত।

প। কৈ, দেখি সে কবিতা।

[গৌরী শেল্‌ফ হইতে একটা বই টানিয়া]

গৌ। এই যে বাবা—

প। তুমি পড়, আমি শুনি।

[গৌরী স্পষ্টস্বরে পড়িতে লাগিল]

"ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে,
গন্ধ সে চাহে ধূপেরে রহিতে জুড়ে।
সুর আপনারে ধরা দিতে চাহে ছন্দে,
ছন্দ ফিরিয়া ছুটে যেতে চায় সুরে।

তুমি পড় আমি শুনি।

গৌ। এই লাইনটা আমার বড় ভাল লাগে —"ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে"— এই চাওয়ার মধ্যে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা নেই— এ শুধু ত্যাগ—তাই এত মিষ্টি বুঝি?

প। [অলক্ষ্যে অশ্রু মুছিয়া] হাঁ—তাই

গৌ। ভাবের আর রূপের সম্বন্ধটা আমার কাছে বড় দুর্বোধ্য ঠেকে। এর দৃষ্টান্ত বেশী দেখা যায় না। [বাহির হইতে চীৎকার]

বিমল। মাসীমা মাসীমা—শীগ্‌গির এস, ভোলা আমার আঙ্গুল কামড়ে ধরেছে।

[গৌরীর ত্রস্তভাবে প্রস্থান]

প। "ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে"—[দীর্ঘ নিঃশ্বাস]

জীবন-সংগ্রামের নীচে কি বিরাট্ ত্যাগের খেলা! মনটাকে কামনার গণ্ডী থেকে বার না কর্‌তে পারলে—[দীর্ঘ নিঃশ্বাস] কিন্তু [চিন্তা করিয়া] এর প্রয়োজনও আছে। মানুষের প্রবৃত্তিগুলাকে ঠেকিয়ে রাখ্‌তে কাজের দরকার—মনটার খোরাক্ ধ্যানের তন্ময়তায়। [চিন্তা করিয়া] ছাড়া যায় না। উদ্দামতাকে দমন করবার জন্যে এ চাই। বিচিত্র ব্যবস্থা! [পুস্তকটা টানিয়া লইয়া] "প্রলয়ে সৃজনে না জানি এ কার যুক্তি"—কবি সন্দেহ করছ—"কার" [চিন্তা] যুগ-যুগান্ত ধরে চেষ্টাতেই মানুষের ক্ষমতা নিবদ্ধ রয়ে গেল। কেউ দু' পা এগিয়ে—কেউ দু' পা পেছিয়ে—জেনেছে সবাই। তবে ঐ জানার মধ্যেই তারতম্য। এ পূজার ঘরে ধূপ গন্ধ হতে চাচ্চে—আবার শ্রেষ্ঠ গন্ধের সমাবেশ ঐ ধূপের মধ্যে। সুন্দর!

ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ
রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া।
অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ
সীমা চায় হ'তে অসীমের মাঝে হারা।
প্রলয়ে সৃজনে না জানি এ কার যুক্তি,
ভাব হতে রূপে অবিরাম যাওয়া আসা,
বন্ধ ফিরিছে খুঁজিয়া আপন মুক্তি,
মুক্তি মাগিছে বাঁধনের মাঝে বাসা।"

প। [দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া] "প্রলয়ে সৃজনে না জানি এ কার যুক্তি"—জানিনে, আমরা জানিনে।

গৌ। বাবা মুক্তি কেন বাঁধন চায়?

প। কেন জানিনে মা—চোখের সাম্‌নে দেখ্‌চি যে চায়।

[আঙ্গুলে ভিজা নেকড়া জড়াইয়া বিমলের প্রবেশ]

বি। দাদা মশাই, ভোলা আমায় কাম্‌ড়েছে।

প। তুমি তাকে নিশ্চয় জ্বালাতন্ করেছ।

বি। না, আমি কেবল তার ল্যাজে হাত বুলিয়ে দিতে গিয়েছিলাম।

প। সে বোধ হয় পছন্দ করে না যে, কেউ তার ল্যাজে হাত দেয়।

"কোন্ দিন এক দিন আপনার মনে শুধু
এক সন্ধ্যাবেলা
আমারে এমন করে ভাবিতে পারিবে যদি
বসিয়া একেলা।" ......রবীন্দ্রনাথ

চিত্রশিল্পী—শ্রীচারুচন্দ্র রায়

K. V. SEYNE & BROS.

বি। তা কেন হবে—মাসিমাকে ত সে কিছু বলে না।

প। এটা ভোলার তা হ'লে অন্যায়। কিন্তু তোমার মাসিমা যে তাকে কত আদর—কত যত্ন করে।

বি। আমিও ত তাই করতে গিয়েছিলাম।

প। বোকা ওটা বুঝতে পারেনি।

বি। আমি তাকে জব্দ করে দেব।

প। কি ক'রে?

বি। তা আমি এখন কিছু বলব না।

[গৌরীর প্রবেশ]

প। গৌরী, তোমার ভোলার উপর বিমল যে ভারি চটেছে গো।

গৌ। বিমল, বাবা, ভোলাকে বড় বিরক্ত করেছ, এখনও সে রেগে গলা আর ঝুঁটিটা ফুলিয়ে রয়েছে—একটি ছোলাও সে দাঁতে কাটেনি।

বি। রাগ আমিও ওঁর বার করে দেব এখন। দেখ আমি কি করি।

গৌ। ছিঃ লক্ষীটি, যাদু আমার, ও অবুঝ প্রাণী, ওর উপরে রাগ করতে নেই।

[রাগে গোঁ গোঁ করিতে করিতে বিমল ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল]

দাদা মুশাই, ভোলা আমায় কামড়েছে।

প। গৌরী, তুমি একটু সাবধান থেক, ও কি একটা মতলব এঁটেছে।

গৌ। দুটো অবুঝকে সাম্‌লাতে সাম্‌লাতে আমার প্রাণ গেল।

প। এই কাজ!

গৌ। পারিনে আর। [প্রস্থান]

প। [অন্যমনস্কভাবে] "ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে"। মিলিয়ে যেতে হবে। লীন হয়ে যেতে হবে। তবে সার্থক!

দ্বিতীয় দৃশ্য।

[পরেশনাথের বাড়ীর সংলগ্ন ফলের বাগান। বাগানের ফল-রক্ষক সাঁওতাল পাতার কুঁড়ের বাহিরে বসিয়া জাল বুনিতেছে]

[বিমলের প্রবেশ]

বি। আচ্ছা কালু, তুই একদিনে কটা কাঠবিড়াল মারতে পারিস্?

কা। পাঁচটা।

বি। দৎ—তুই ত সে দিনই আটটা মারলি।

কা। ওর চেয়ে আমি বেশী পারি—[চক্ষু বিশাল করিয়া] আমি পাঁচটা পারি।

বি। [আমোদ অনুভব করিয়া] আটটার চেয়ে পাঁচটা বেশী? তোর কি বুদ্ধি! আচ্ছা, তুই আমাকে তীর ছুঁড়তে শিখিয়ে দিবি? তোকে চার পয়সা দেব।

কা। ও ত খুব সোজা, এই এমনি করে [একটা ধনুকে তীর সন্ধান করিয়া] এই—এই—

বি। কালু, তুই বুড়ো আঙ্গুলে তীর ধরিস্‌নে কেন—তা জানিস?

একটা ধনুকে তীর সন্ধান করিয়া- এই—এই।

কা। জানি—আমাদের ওটা ওস্তাদকে দেওয়া আছে।

বি। এরে ঃ- তুই মহাভারত জানিস্?

কা। আমি সব জানি [একটু গর্ব্বের হাসি]—বাঁ হাতে ধনুক কড়া করে ধর,—ডান হাতে কাঁড়ের নীচে ধর—কাঁড়ের মাথা কাঠবিড়ালের মাথা এক হলে—হাত ছাড়—দেখ্‌বে কি মজা।

বি। আচ্ছা, আমি একটা লিচু পাড়ি—তুই দেখ্।

[যথানির্দ্দেশ শরসন্ধান—লিচুর গোছা মাটিতে পড়িল] [আনন্দে উচ্চ হাস্য]

কা। ও ঠিক হল না—একটা লিচু পাড়তে হবে।

বি। তুই একটা বাদুড় মারা তীর আমায় দে।

কা। না; ওতে বিষ আছে—বাবু বক্‌বে।

বি। বিষে কি হয় কালু? মরে যায়?

কা। হাঁ, হাঁ।

বি। আচ্ছা, আমায় বিষ না দেওয়া তীর একটা দে।

কা। আমি তৈরী করে দেব। [একমনে জাল বুনিতে লাগিল]

বি। [স্বগত] তুমি একটু ঘুমিয়ে পড়লে আমি কি করি, তা বুঝতে পারবে।

[গৌরীর প্রবেশ]

গৌ। বিমল, এখানে কি কচ্চ মাণিক?

বি। মাসী মা—এই দেখ, আমি কেলোর তীর দিয়ে এই থোকাটা পেড়েছি।

গৌ। বাবা! বীরপুরুষ আমার।

বি। তবে নাত কি? আমি যদি বন্দুক পাই ত খুব যুদ্ধ করতে পারি—আমি কি কিছু ভয় করি [একটা বাঁশের টুকরা তুলিয়া লইয়া বন্দুকের মত করিয়া ধরিয়া]

"এখন আসে যদি বাগ্,
আমার বড্ড হবে রাগ
বন্দুকটি ধরে
গুড়ুম্ করে,
মারব তারে।"

[গৌরীর হাস্য]

গৌ। বেলা হয়েছে—যুদ্ধ ছেড়ে এখন ভাত খেলে হয় না?

বি। মাসী মা আজ আমি নিজে খাব।

গৌ। না সোণা,—তোমার হাতের ঘা' আজো রয়েছে—সেরে গেলে নিজে খেও।

বি। [আঙ্গুলের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া] ভোলাটা কি পাজি! আমার ভারি রাগ হয়েছে। অঁঃ—আমি ওকে আদর করতে গেলাম—বদমাস্—না আমি ভাত খাবনা। তুমি বলেছিলে আমাকে এয়ার-গান্ কিনে দেবে—দেওনি।

গৌ। আমি ত কাকাবাবুকে চিঠি লিখে দিয়েছি—তিনি এলেই আন্‌বেন।

বি। তিনি যদি না আনেন?

গৌরী। নিশ্চয় আন্‌বেন—এখন বাড়ী চল। [প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য।

[তীর-ধনুক হাতে বিমলের প্রবেশ]

বি। কেলো ঘুমিয়েছে—নইলে এ তীর কি সে দিত! এস ত চাঁদ একবার দেখি কত জোর তোমার ঠোঁটে!

চারিদিক্ চাহিয়া] এইখান থেকে বসে টিপ করি—তীরের মাথা আর ভোলার মাথা—এক হলেই—ছেড়ে দেব।
কাকাতুয়ার বিমলকে দেখিয়া পাখা তুলিয়া নৃত্য এবং মুখে অস্পষ্ট আনন্দধ্বনি]

[পিছন হইতে গৌরীর প্রবেশ ও চীৎকার]

গো। বিমল বিমল—বাবা বাবা—সর্ব্বনাশ করিস্‌নে বিমল।

[চমকাইয়া বিমলের হাত হইতে তীর জোরে মুক্ত হইয়া কাকাতুয়ার বক্ষ বিদীর্ণ করিল]

গো। [কাঁদিয়া ফেলিয়া] ভোলাকে মেরে ফেল্‌লি ?

[কাকাতুয়ার মাটিতে পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতে করিতে মৃত্যু]

গো। [কাকাতুয়াকে বুকে তুলিয়া ক্রন্দন] বিমল, তুই কি কর্‌লি বাবা—এই নির্দ্দোষ প্রাণীটাকে—

[বিমল নির্ব্বাক্—তার মুখ পাংশুবর্ণ—ওষ্ঠাধর মৃদু কম্পিত]

[পরেশনাথের প্রবেশ]

প। ইস্! ভোলাকে এমন করে মেরে ফেল্‌লে কে ?

[গৌরীর মুখে অঞ্চল দিয়া বালিকার মত ক্রন্দন]

প। [দৃঢ়স্বরে] বিমল, এ বুঝি তোমারই কাজ ?

[কিছুক্ষণ সকলে স্তব্ধভাবে থাকিয়া]

গৌরী, কেঁদনা মা—প্রতিহিংসা—সয়তান এই ছোট বুদ্ধি বালককে আশ্রয় করে করাল মৃত্যুর রূপে প্রকাশ পেয়েছে ; আশ্চর্য্য আমাদের চোখে ধূলা দিয়েছে! অমঙ্গল আশঙ্কায় আমার সমস্ত দেহমন কণ্টকিত হয়ে উঠ্‌ছে। এই ঘাতপ্রতিঘাতের যে এখানেই শান্তি হল—তা' কে বল্‌বে!

গো। বাবা (কাঁদিয়া ফেলিয়া) ভগবান্ বিমলকে রক্ষা করুন।

প। বিমল—এ তীর ধনুক তুমি কোথায় পেয়েছ ?

বি। কালু দিয়েছে।

প। তার ভারি অন্যায়। তুমি কি বলে তার কাছ থেকে নিয়েছ ?

বি। কিছুনা—কালু ঘুমিয়েছিল—আমি নিয়ে এসেছি।

প। তাই বল। তুমি চুরি করে এনেছ ?

[বিমল মাথা হেঁট করিল]

গৌরী, ভোলাকে এদিকে নিয়ে এস। ওর বুক থেকে তীরটা তুলে দি—ওর যন্ত্রণার অবসান হ'ক।

[ভোলার বুক হইতে তীর তুলিতে তুলিতে—স্বগত]

কতগুলো অন্যায়ের ভিতর দিয়ে অমঙ্গলকে আস্‌তে হয়! তার বাধা অনেক—কিন্তু কেমন করে সেগুলা উত্তীর্ণ হয়—তা বুঝ্‌তে পারিনে।

[তীরটা বিমলের হাতে দিয়া]

দিয়ে এস কালুকে। [ধীরপদে বিমলের প্রস্থান] চল গৌরী—আমরা উপাসনার ঘরে যাই।—আচ্ছা বিমলকে ফিরে আস্‌তে দাও।

গো। বাবা, আমার বুকের মধ্যে ধড়ফড় করচে—এক দিনের কথা মনে পড়্‌ছে।

প। তার কারণ গৌরি—তোমার একটা ভুল। তুমি মনে করছ যে, এই যে দুর্ঘটনা, এতে তোমারও কিছু হাত আছে। তোমার মনে হচ্চে যে, উপযুক্ত পরিমাণে সতর্ক হ'লে হয়ত আজ ভোলার প্রাণটা বাচ্‌ত। আমার বিশ্বাস তা নয় কিন্তু। মানুষ যত বুড়ো হ'তে থাকে ততই নিজের ক্ষমতার উপর তার আস্থা কমে যায়। ঠিক বুঝ্‌তে পারা যায় যে, মানুষের ক্ষমতার বাইরে এমন এক শক্তিধরের হাত কাজ করছে—যার তুলনায় মানুষ কিছুই না। তাই এ বয়সে নির্ভরতা আর নিজের উপর থাকে না—আত্মসমর্পণ তখন আপনাআপনি এসে পড়্‌তে থাকে। তার মঙ্গলময় ইচ্ছার উপর নির্ভর করলে—মনটা একটুতে ক্ষুব্ধ হ'য়ে উঠে না।

বিমল এসেছে। চল আমরা যাই।

[সকলের প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য।

গো। বিমল, বাবা আমার—একবার চোখ চেয়ে দেখ—কাকাবাবু তোমার জন্য কি সুন্দর বন্দুক এনেছেন।

বি। মাসীমা, আমি যে চোক চাইতে পারচিনে—কি ক'রে দেখব ?

গো। আচ্ছা, আমি গরম দুধ এনে দিচ্ছি—খেলে চোক চাইতে পারবে।

বি। না, না, তুমি চলে যেওনা—তাহ'লে আবার ভোলা এসে আমার চোক ঠুকরে দেবে।

গৌ। ছিঃ বাবা ও সব কথা বল্‌তে নেই। তোমার কিছু ভয় নেই। এই আমি তোমার কাছে বসে রইলাম।

বি। মাসী মা, আমার বুকে একটু হাত বুলিয়ে দাও না।

গৌ। এই যে দিচ্চি বিমল।

বি। এই—এই খানটা—ঠিক কি যেন আমার বুকের মধ্যে বিঁধে রয়েছে।

গৌ। ষাট—বালাই—তুমি আবার সেরে উঠ্‌বে।

বি। মাসীমা বাগানে কাঠ-বিড়ালগুলো কি তেমনি খেলা করে?

গৌ। করে বৈকি বাবা—কেন বলত?

বি। কালুকে বলো যেন তাদের না মারে। তা হ'লে কালুর খুব অসুখ হবে।

গৌ। বিমল তোমার বুঝি ঘুম আস্‌ছে?

বি। না মাসীমা—ঘুমুতে আমি পারব না—তা হ'লে যে আমি ভয় পাই।

হে ঠাকুর দয়া কর।

গৌ। ভয় কি সোণা—আমার কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে—তুমি ঘুমাও। কিছু ভয় নেই।

বি। ও কে আস্‌চে মাসীমা?

গৌ। কৈ, কেউ না ত।

বি। [একটু হাসিয়া] আমি চিন্‌তে পেরেচি—তুমি চিন্‌তে পারনা? ওযে মা।

গৌ। তুমি স্বপন দেখেছ।

বি। মা আমাকে ডাক্‌ছে—বলছে—আয় আয় আমার কাছে এলে তোর সব অসুখ সেরে যাবে।

[গৌরীর নিঃশব্দে ক্রন্দন—স্বগত] হে ঠাকুর দয়া কর।

বি। বাবা কবে আস্‌বেন মাসীমা? তাঁকে আস্‌তে তুমি চিঠি দিয়েছ?

গৌ। [ক্রন্দন সংবরণ করিয়া] তিনি শীগ্‌গীর আস্‌বেন।

বি। [দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া] না—বাবা আস্‌বেন না। নতুন মা তাঁকে আস্‌তে দেবে না।

গৌ। তুমি অমন কর্‌ছ কেন বাবা!

বি। ডাক্তার বাবুকে বলো যে, আমি আর কোন দিন এমন কাজ কর্‌ব না—তিনি যেন আমার পেট আর কেটে না দেন।—মাসীমা আমার ঘুম আস্‌চে—আমি ঘুমাই।

[নিদ্রা]

পরেশনাথের প্রবেশ।

প। শান্ত মুগ্ধছবি দেখে মনে হচ্ছে সংগ্রাম শেষ হয়েছে। বিরাট্ সিংহাসনের উপর সর্ব্বময়ী প্রকৃতি সুন্দরী ব'সে আছেন। এখানে অবিচারের উপায় নেই। আঘাত কর্‌লে প্রতি আঘাত পেতে হবে!

গৌ। বাবা! বাবা!

প। গৌরী—গৌরী [আত্মসংবরণ করিয়া] দেখ বিমলের মুখে কি প্রশান্ত সুন্দর হাসি ফুটে উঠেছে। ওই কল্যাণের হাসি। ওরি পিছনে বিশ্বসংসার নিত্য-নিয়ত ছুটেছে। গৌরী মা, এই ত আত্মার জীবনের গণ্ডী থেকে মৃত্যুর অসীমত্বে প্রয়াণ! বিমল আজ অমৃত ধারার আস্বাদ ক'রে—অমর হয়েছে মা! তার জন্য চোখের জল ফেলে অকল্যাণ করো না।

[যবনিকা]

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

কাশী—গঙ্গাবক্ষ হইতে
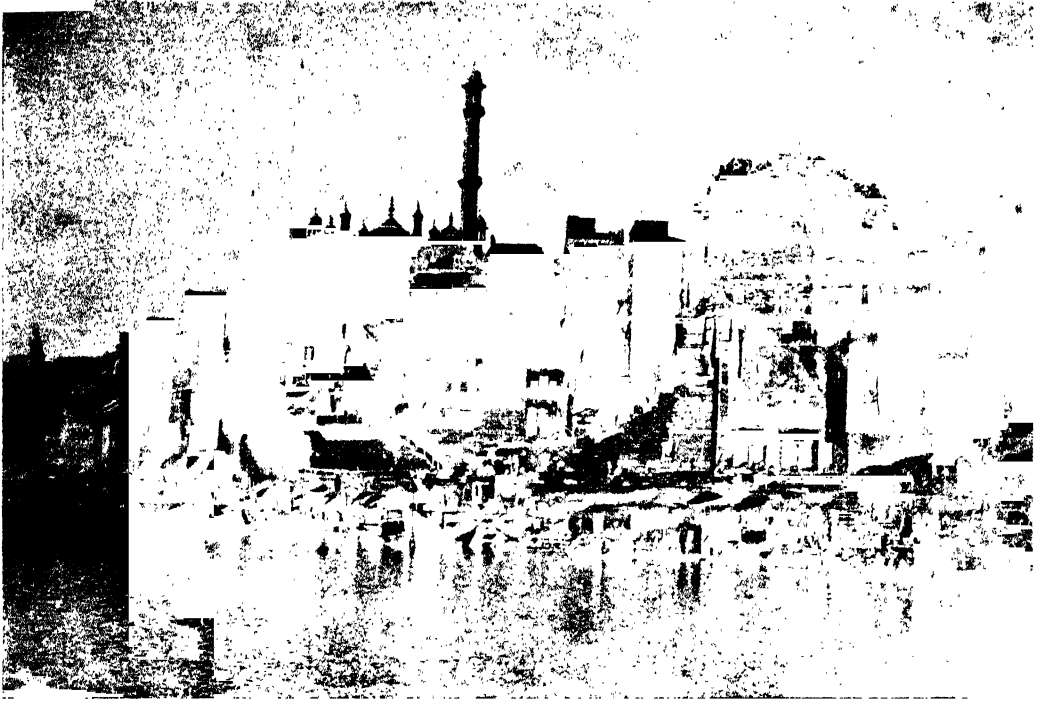
কাশীস্তোত্র।

জয় জয় কাশী অৰ্দ্ধচন্দ্ৰকায়, বেণী সুসজ্জিত
অসিবরুণায়।
পদতলে শোভে সুরধুনীধার, কটিদেশে কোটি
সোপানের হার॥

নব দিবাকর-কিরণ-মালা, মন্দির-মুকুট
দেউলে ঢালা।
দিব্যচক্ষে শিব-ত্রিশূল কাশী, জয় বিশ্বেশ্বর-
পুরী বারাণসী॥

জ্ঞান-তত্ত্বময় পুরাণের ক্ষেত্র, চির উন্মীলিত
জগতের নেত্র।
আর্য্যহৃদিগত মাধুরীতে ভরা, ত্রিযুগব্যাপক
স্রোতধারা-ধরা॥

ভুবন-সংক্ষেপ ভারতসার, ধরাতে সুধন্য
মহিমা যার।
পুণ্যাখ্যা পাপীতে যার প্রত্যাশী, জয়
অন্নপূর্ণা-পুরী জয় কাশী॥

জয় অন্নে পূর্ণা আনন্দ অবনী, ইহ-পরকাল
দারিদ্র্যনাশিনী।
হিন্দু হৃদিক্ষেত্র-উৎসাহের গতি, ব্রত-দান-ধৰ্ম্মে
নিত্য স্রোতবতী॥

ধনিক ধাৰ্ম্মিক ধীরাজগণ, দেহে মিশাইতে
করে আকিঞ্চন।
না থাকে পরশে পাতকরাশি, জয় বিশ্বেশ্বর-
পুরী জয় কাশী॥

অন্নপূর্ণার মন্দির

জয় বিশ্বেশ্বরপুরী জয় কাশী ।
শিবমোক্ষপুরী পরমার্থধাম ধরা ধন্য ভূমি ত্রিভুবন ॥
ধনী জ্ঞানী মূঢ়ে নাহি যাহে ভেদ, কোলে এসে
যায় সবে ভুলে খেদ ।
সদা সুখময় মহাশ্মশান, মরিলে মোক্ষ
তখনি দান ।
ভব যার ভাবে সদা উল্লাসী ! জয়
বিশ্বেশ্বরপুরী জয় কাশী ॥

সর্ব্ববিদ্যা, কলা, শাস্ত্র, দরশন, চিরদিন যার
দেহের ভূষণ ।
অতুল্য ভুবন এ মহীমণ্ডলে, জ্ঞানের কৌস্তুভ-
মণি-বক্ষঃস্থলে ।

জগতের চক্ষে জ্যোতি-দায়িনী, যোগী-মহর্ষি
মানস জননী ।
ভারতের ফুল্ল প্রতিভাময় জয় বিশ্বেশ্বর-
পুরী জয় জয় ॥

ত্রিপাতক তারা পুনর্জন্ম [illegible] তপোক্ষেত্র
এক দেহে ধরা ।
যার কোলে মিশে শূকর ব্রাহ্মণ, পূর্ণদেহে
ব্রহ্ম হৃদে সংস্থাপন ॥

জীবাত্মা ঈশ্বরে যুগল যায়, শিবময় পুরী
ধরণীগায় ।
ভারত ভুবন যায় বিলাসী । জয় কাশী
জয় জয় বারাণসী ॥

জয় কাশী জয় । জয় বারাণসী ॥
মহা মহাপ্রাণ জীবগণ যায় দিন অনুদিন
মিশাইছে কায় ।
চির প্রজ্বলিত মহা প্রাণশিখা যায় প্রতিরেণু
বেণু ভাগে লিখা ॥

যে ভূমি অমৃতমন্দিরসার, অনাদি অনন্ত
প্রভাব যার ।
মোক্ষ-তীর্থ চূড়া ভুবন কাশী । জয় বিশ্বেশ্বর-
পুরী বারাণসী ॥

মহাশবক্ষেত্র মহী-ধরাতলে, এ মহিমা কোথা
কার অঙ্গে জ্বলে ?
কোথা মৃত দেহে দিয়ে পুষ্প জল, পূজা করে
তারে মানবমণ্ডল ।
অন্তরে যাহার অন্তর্জলি ছেদ, দেহমুক্ত জীব
শিবে অভেদ ।
নিখিল ব্রহ্মাণ্ড তাপহারিণী । জয় জয় বিশ্বজীব-
নিস্তারিণী ॥

জয় মোহহরা চৈতন্যধারিণী, জ্ঞানদা সুখদা
মোক্ষবিধায়িনী ।
বক্ষঃস্থলে যার ত্রিকোটী অমর অলক্ষ্য প্রত্যক্ষ
জাগে নিরন্তর ॥

কাশী—দশাশ্বমেধ ঘাট

জগৎজননী অন্নদা আপনি, যেখানে খুলেছে
আনন্দ-বিপণি।
পূর্ণ ব্রহ্মরূপ যাহে বিদ্যমান, শিব যেথা
জীবে দেন আত্মদান॥

আনন্দ যাহার সচ্চিতের হাসি। মহাকাল-পুরী
জয় জয় কাশী।
জয় কাশী জয়। জয় বারাণসী॥

৺হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

হজরতের মাণিক।

১৬০০ খৃষ্টাব্দের বসন্ত কাল। সমগ্র পার্ব্বত্য প্রদেশ, নূতন লতা, নূতন পাতা, নূতন ফুলে পরিপূর্ণ। নানাজাতীয় বনকুসুমের সুগন্ধে উপত্যকার প্রত্যেকাংশই নূতন শোভা-সম্পদপূর্ণ ও মধুর সুরভিময়। গাছে ফল—নদীতে জল, বৃক্ষশাখায় ক্ষুদ্রকায় পাহাড়িয়া পাখীর মধুর কূজন। প্রকৃতির বুকে স্নিগ্ধ মলয়ের সুরভি নিঃশ্বাস। কোথাও বা বিটপীশীর্ষ আলো করিয়া ঘোর লোহিতবর্ণের পুষ্পরাশি প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে। কোথাও বা, এক বৃহৎ শিলা-খণ্ডের চারি দিক্ ঘেরিয়া বন-মল্লিকার অসংখ্য ক্ষুদ্র শাখা। রাশি রাশি পুষ্পোপহার দিয়া যেন তাহারা সেই পাষাণ স্তূপের দেহাবরণ করিয়া পাষাণের কাঠিন্যের সহিত তাহাদের কোমলতা তুলনায় পরীক্ষা করিতেছে।

এই পার্ব্বত্য প্রদেশ আফ্‌জাই জাতির অধিকারভুক্ত ছিল। দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ আক্‌বর সাহের অসিবলে, ইহার অধিকাংশই এখন মোগলের শাসনাধীনে। হজরত আলি বলিয়া এক আফ্‌জাই পাঠান, বহুদিন পূর্ব্বে এই পর্ব্বতের এক সমুন্নত উপত্যকার মধ্যস্থলে নগর-প্রতিষ্ঠা করেন। তাহার নাম ছিল "হজরৎ নগর"। লোকে কিন্তু এই নগরকে 'হজরৎ' ই বলিত।

হজরতের পাষাণময় ক্ষুদ্র দুর্গ এখন মোগলের দখলে। পাঠানের গর্ব্বিত নীল পতাকা দুর্গশিখর হইতে স্থানচ্যুত হইয়াছে। এখন দুর্গপ্রাকার-শীর্ষে মোগলের অর্দ্ধচন্দ্র চিহ্নিত রক্তবর্ণ পতাকা মোগল বাদশাহের বিজয়ঘোষণা করিতেছে। বর্ত্তমানে হজরৎ দুর্গের মালিক মোগল সেনাপতি জবরদস্ত খাঁ। হজরতের পাঠান অধিপতি মোগল-হস্তে নিহত হইয়াছেন এবং জবরদস্ত খাঁ মোগল সম্রাটের প্রতিনিধি রূপে এই নববিজিত পার্ব্বত্য রাজ্যের দণ্ডমুণ্ডের মালিক।

এই পুষ্পরাজিময় বাসন্তী সুগন্ধি-পরিপূর্ণ উপত্যকার পার্শ্ববর্ত্তী এক ক্ষুদ্র প্রান্তরপথ দিয়া একদিন একজন মোগল সৈনিক দ্রুতগতিতে, হজরৎ দুর্গের অভিমুখে যাইতেছেন। তাঁহার অশ্ব পথশ্রমে পরিশ্রান্ত। তিনি বিশেষ তৎপরতার সহিত চড়াই ও ওৎরাইময় পথগুলি অতিক্রম করিতেছেন। এই সৈনিকের অশ্বচালনার ভঙ্গী দেখিয়া বোধ হয় যে, তিনি একজন অতি সুদক্ষ অশ্বারোহী। তাঁহার পরিচ্ছদ হইতে প্রমাণ হয় তিনি একজন উচ্চপদস্থ সৈনিক।

এই অশ্বারোহীর নাম মোকারেব খাঁ। ইনি হজরৎ-অধিপতি জবরদস্ত খাঁর কনিষ্ঠ সহোদর। আকবর বাদসাহের নিকট হইতে কোন বিষয় খবর লইয়া ইনি তাঁহার জ্যেষ্ঠের নিকট যাইতেছিলেন।

মোকারেব খাঁ উপত্যকার মধ্যে সহসা একস্থানে অশ্ব-বল্গা সংযত করিয়া অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিলেন। আরোহীর ভারমুক্ত হইয়া অশ্বটা যেন একটা মহাতৃপ্তি অনুভব করিয়া আনন্দজনক হ্রেষারব করিল। মোকারেব স্নেহের সহিত অশ্বের পৃষ্ঠদেশে হস্তামর্ষণ করিয়া তাহাকে এক বৃক্ষশাখায় বন্ধন করিলেন। তৎপরে তাহার পিঠ্ চাপড়া-ইয়া গম্ভীরমুখে বলিলেন "জঙ্গী। তুমি এইস্থানে একটু স্থির হইয়া থাক।"

ভাষাহীন জন্তু সংস্কারবশে যেন সে কথা বুঝিল। সে সানন্দে একটা হ্রেষারব করিল।

মোকারেব খাঁ, সেই নাতিপ্রশস্ত উপত্যকার দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইলেন। এইস্থানে একটি ক্ষুদ্র জঙ্গল। তিনি সবিস্ময়ে দেখিলেন জঙ্গলের লতাগুল্মাদি যেন অশ্ব-পদদলিত ও স্থানে স্থানে ছিন্নবিচ্ছিন্ন। সেই কঙ্করময় মৃত্তিকার উপর অশ্বের ক্ষুরচিহ্নও বর্ত্তমান। জঙ্গলের এই বিমর্দ্দিত অবস্থা দেখিয়া মোকারেব খাঁর সহর্ষ মুখ, বিমর্ষ ভাব ধারণ করিল। তিনি জঙ্গলপার্শ্ব হইতে উপত্যকার কঙ্করময় পথে আসিয়া একবার চারিদিকে সোৎসুক দৃষ্টি-পাত করিলেন। সেই স্থানে দাঁড়াইয়া কোন দিকে কোন-রূপ শব্দ হইতেছে কি না, তাহা স্থির কর্ণে শুনিলেন। তৎপরে গভীর তূর্য্যধ্বনি করিলেন।

সেই তূর্য্যধ্বনি হইবার পনর মিনিট পরে, ছয়জন বলিষ্ঠ মোগলসৈন্য তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। মোকারেবের অর্থপূর্ণ ইঙ্গিতে তাহারা সকলেই অশ্ব হইতে নামিয়া পড়িল।

ইহার মধ্যে একজনকে সম্বোধন করিয়া মোকারেব

গম্ভীরমুখে বলিলেন—"মীর আলি খাঁ, গতিক বড় ভাল বোধ হইতেছে না।"

মীর আলি বলিল—"কেন জনাব! ব্যাপার কি?"

"এই পার্শ্ববর্ত্তী জঙ্গলের বিমর্দ্দিত অবস্থা দেখ।"

আলি খাঁ ও মোকারেব দুইজনে সেই জঙ্গলমধ্যে প্রবেশ করিল। মোকারেব একে একে তাঁহার লক্ষ্যীভূত সন্দেহের কারণগুলি আলিকে দেখাইলেন।

আলি খাঁ, বলিল "দেখিতেছি নিশ্চয়ই এই পথে অশ্বারোহী সেনা গিয়াছে।"

মোকারেব বলিল—"সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই; কিন্তু তাহাদের সংখ্যাও বড় বেশী নহে। কথা হইতেছে—এই অশ্বারোহিগণ মোগল সেনা হইলে এরূপ গুপ্তভাবে জঙ্গলের মধ্য দিয়া যাইবে কেন? আর এ সেনা যে আমাদের নহে, তাহারও বিশিষ্ট প্রমাণ বর্ত্তমান।"

"কি প্রমাণ?"

"দেখিতেছ না মৃত্তিকার উপর সুচিহ্ন-গুলিই তাহার প্রমাণ দিতেছে, এগুলি খর্ব্বকায় অশ্বতরের পদচিহ্ন।"

"মীর আলী খাঁ, গতিক বড় ভাল বোধ হইতেছে না।"

আলি খাঁ বিশেষ মনোযোগের সহিত সেই চিহ্নগুলি দেখিয়া বলিল—"জনাবালির অনুমান যথার্থ।"

মোকারেব খাঁ চিন্তিতভাবে বলিলেন—"এখন করা যায় কি? আমার জ্যেষ্ঠ একজন দুর্দ্দান্ত ও হুঁসিয়ার শাসনকর্ত্তা। অদূরেই হজরৎ দুর্গ। তাঁহার দুর্গের নিকট দিয়া এতগুলা সৈনিক চলিয়া গেল, আর তিনি কিছুই খবর রাখিলেন না—এ বড় তাজ্জব কথা।"

আলি খাঁ বলিল—"এখানে এরূপভাবে সময়ক্ষেপ করিলেত এ বিষয়ের সূক্ষ্ম মীমাংসা অসম্ভব। জনাব না হয় ধীরকদমে আসুন, আমরা একটু দ্রুত অগ্রসর হই।"

"না—আলি খাঁ তোমরাই ধীরে ধীরে এস। আমিই অগ্রসর হইতেছি।" এই কথা বলিয়া মোকারেব তাঁহার অশ্বপৃষ্ঠে উঠিয়া বসিলেন। মৃদু কশাঘাত করিবামাত্রই অশ্ব সেই বন্ধুর উপত্যকাপথে ধাবিত হইল।

মোকারেবের সঙ্গীগণও পথিমধ্যে বিলম্ব না করিয়া তাঁহার পশ্চাৎবর্ত্তী হইলেন।

(২)

দুর্গসন্নিহিত হইয়া মোকারেব খাঁ যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহার হৃদয় স্তম্ভিত হইল, প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। দুর্গদ্বারে প্রহরী মাত্র নাই। দুর্গের আশে পাশে লোক-

জন নাই। সে স্থান যেন প্রেতছবির ন্যায় নিস্তব্ধ। যাহারা ছিল তাহারা যে কোথায় চলিয়া গিয়াছে তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। দুর্গের প্রবেশদ্বার ভগ্ন ও নানা স্থান চূর্ণীকৃত। কেবলমাত্র দুইটি বৃহৎ পেরেকের উপর সেই দ্বারের কাষ্ঠ খণ্ড ঝুলিতেছে। এত বড় দ্বার এরূপভাবে ভাঙ্গিল কে?

এ ভীষণ দৃশ্য দেখিয়া মোকারেব হৃদয় কম্পিত হইল। সে ভাবিল এই জনপূর্ণ দুর্গ একবারে জনশূন্য হইল কিরূপে? এত লোকজনই বা গেল কোথায়? ব্যাপার কি? কিছুইত বুঝিতে পারিতেছি না।

নির্ভীকহৃদয় ও অসম সাহসী মোকারেব তরবারি কোষমুক্ত করিলেন। দুর্গদ্বারে প্রবেশ করিয়া চারিদিক্ দেখিতে দেখিতে দুর্গমধ্যে জবরদস্ত খাঁ যেখানে বাস করিতেন সেই দিকে অগ্রসর হইলেন। কেহ তাঁহাকে বাধা দিল না, কেহ একটা প্রশ্নও করিল না।

দুর্গপ্রাসাদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া মোকারেব খাঁ যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহার হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। তিনি সবিস্ময়ে দেখিলেন কএকটি কাষ্ঠের বাতায়ন ও দ্বারসংলগ্ন রেশমী পরদাগুলি সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন। গৃহ মধ্যস্থ তোরঙ্গ ও পেটিকাগুলি প্রচণ্ডাঘাতে চূর্ণ বিচুর্ণ ও ইতস্ততঃ বিশৃঙ্খলভাবে বিক্ষিপ্ত।

তারপর প্রতি কক্ষে অতি ভীষণ দৃশ্য। মোকারেব কল্পনায় ভাবেন নাই যে, এরূপ ভীষণ ব্যাপার তাঁহাকে চক্ষে দেখিতে হইবে। প্রতি কক্ষতল শোণিতাক্ত। প্রস্তর-মণ্ডিত দালানেরও চারিদিকে রক্তের ঢেউ খেলিতেছে। চারিদিকেই বিগতপ্রাণ বালক-বালিকা যুবক-যুবতী প্রৌঢ় ও বৃদ্ধাদের মৃতদেহ। কাহার বক্ষে এখনও শাণিত ছুরিকা বিদ্ধ রহিয়াছে। কাহারও দক্ষিণ বাহুর অঙ্গুলি-গুলি তরবারি আঘাতে উড়িয়া গিয়াছে। কাহারও মুণ্ড স্কন্ধবিচ্যুত, কাহারও স্কন্ধে দারুণ আঘাত! চারি দিকেই যেন কবন্ধ ও প্রেতপুরীর ভীষণ দৃশ্য, চারি দিকেই হৃদয়স্তম্ভনকারী বিভীষিকা!

সেই পুরীর মধ্যে জীবিত কেহই নাই, ইহলোকের কেহই নাই এখন পরলোকের।

মোকারেব এক শোণিতাক্ত কক্ষতলে দাঁড়াইয়া বিকৃতকণ্ঠে চীৎকার করিয়া বলিলেন—"যদি কেহ কোন স্থানে লুক্কায়িত থাক, এখনও বাঁচিয়া থাক—আমার কথার উত্তর দাও। আমার সম্মুখে আইস। আমি জবরদস্ত খাঁর কনিষ্ঠ সহোদর মোকারেব খাঁ। আল্লার দোহাই—তোমাদের কোন ভয়ই নাই।"

কথাগুলি মোকারেব-মুখোদ্ভূত হইয়া কেবলমাত্র কঠোর প্রতিধ্বনি করিয়া তখনই বিলয়প্রাপ্ত হইল। কেহ তাহার সম্মুখে আসিল না, কেহ তাহার কথারও জবাব দিল না।

ভয়ে, বিস্ময়ে, উদ্বেগে, মোকারেব বদনমণ্ডল ঘর্ম্মাপ্লুত। তিনি উষ্ণীষবস্ত্র-প্রান্ত দিয়া স্বেদরাশি মুছিলেন। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া সেই শোণিতাক্ত কক্ষমধ্যে কএক মুহূর্ত্তকাল স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। এ ভীষণ ব্যাপারের কোনরূপ অর্থবোধ করিতে না পারিয়া তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন।

এমন সময়ে কে যেন নিকটবর্ত্তী এক কক্ষ হইতে কাতরস্বরে বলিল—"জল দাও—জল দাও। মৃত্যু আমায় গ্রাস করিতেছে—বড় তৃষ্ণা।"

কোন্ গৃহ হইতে এই অস্ফুট কাতর আর্ত্তনাদ আসিল মোকারেব তাহা স্থির করিতে না পারিয়া পার্শ্বের এক কক্ষে প্রবেশ করিলেন। সেখানে যে ভীষণ দৃশ্য দেখিলেন তাহাতে তাঁহার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল।

মোকারেব দেখিলেন, তাঁহার প্রিয়তমা ভ্রাতৃজায়ার দেহ সেই কক্ষমধ্যে শোণিতাক্ত অবস্থায় পড়িয়া আছে। সেই বিগতপ্রাণা রমণীর রুধিরাপ্লুত বক্ষের উপর তাঁহার মৃত শিশুপুত্র। মাতা ও শিশুর অবস্থা দেখিয়া বোধ হইল—যেন জননী আত্মরক্ষার কোন উপায় না দেখিয়া আত্ম হত্যা করিয়াছেন। ইহার হস্তাবদ্ধ ছুরিকা শিশুর বক্ষও ভেদ করিয়াছে। সকল কাহিনীই এই দুইটি হত্যাকাণ্ডে পরিদৃষ্ট হইল।

অবস্থা দেখিয়া মোকারেব বুঝিলেন যে তাহার ভ্রাতৃজায়া নারীসম্মান রক্ষার জন্যই আত্মহত্যা করিয়াছেন।

তাহার কর্ণদেশের সকল অংশই ছিন্ন বিচ্ছিন্ন। কে যেন জোর করিয়া সেই সকল স্থান হইতে অলঙ্কার ছিঁড়িয়া লইয়াছে। মণিবন্ধ ক্ষত বিক্ষত—অবস্থা দেখিয়া বোধ হইল জোর করিয়া তাহা হইতে বলয় খুলিয়া লওয়া হইয়াছে।

তাঁহার সেই সুকান্তিময় বরবপুর সকল স্থানই অলঙ্কার বিহীন। হায় দুর্ভাগ্য! কে সর্ব্বনাশ করিল? তাঁহার এ আকুল প্রশ্নের উত্তর দিবার কি কেহই নাই!

সহসা আবার সেই কাতরকণ্ঠে ক্ষীণ চীৎকার উঠিল,—"জল দাও—প্রাণ যায়।"

মোকারেবের সতর্ক কর্ণদ্বয় এবার নিদ্ধারণ করিতে লাগিল—কোথা হইতে এ কাতর প্রার্থনা আসিতেছে। তাঁহার নিকট সেই দুর্গের সকল স্থানই পরিচিত। শব্দ লক্ষ্য করিয়া এক কক্ষ মধ্যে উপস্থিত হইয়া তিনি দেখিলেন,—"তাহার জ্যেষ্ঠের একমাত্র অনুরক্ত বন্ধু, বৃদ্ধ মোল্লা রক্তাক্ত অবস্থায় সেই গৃহের কোণে পড়িয়া আর্ত্তনাদ করিতেছেন। আঘাতের চোটে মোল্লা সাহেবের দক্ষিণ হস্তের তিনটি অঙ্গুলী উড়িয়া গিয়াছে। তাঁহার দক্ষিণ বক্ষঃকোটরে ভয়ানক চোট্ লাগিয়াছে। মৃত্যুর আর বেশী বিলম্ব নাই।

মোল্লা সাহেব সে অঞ্চলে একজন সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। আকবর বাদশাহ তাঁহাকে বড়ই খাতির করিতেন। নগরের কোলাহল অপেক্ষা নির্জ্জন পার্ব্বত্য-উপত্যকা, সাধনার উপযুক্ত ক্ষেত্র—ধর্ম্মালোচনার পক্ষে নিভৃত স্থান—ভাবিয়া তিনি বাদশাহের সম্মতি লইয়া এই দুর্গমধ্যে জবরদস্ত খাঁর নিকটেই অবস্থান করিতেছিলেন।

"মোকারেব, এ প্রাণ যে যায় নাই, তাহার জন্য খোদাকে ধন্যবাদ করিতেছি।"

মোকারেবকে মোল্লা সাহেব বড়ই স্নেহ করিতেন। কাজেই তাঁহার এই শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া মোকারেবের চক্ষে জল আসিল। তিনি ক্ষণ-বিলম্ব না করিয়া জলের সন্ধানে গেলেন। পার্শ্বস্থ কক্ষেই মুমূর্ষুর আকাঙ্ক্ষিত পানীয় মিলিল। তিনি জলপূর্ণ পাত্র মোল্লার মুখের কাছে ধরিলেন।

বৃদ্ধ তাঁহার জীবনের শেষ তৃষ্ণা নিবারণ করিলেন। তাঁহার প্রাণের মধ্যে যে একটা দাবদাহের প্রচণ্ড জ্বালা জ্বলিতেছিল তাহার যেন অনেকটা শান্তি হইল।

নিবিবার পূর্ব্বে দীপ যেমন উজ্জ্বল-ভাবে জ্বলিয়া উঠে, তাঁহার মুখমণ্ডল ক্ষণেকের জন্য সেইরূপ উজ্জ্বল শ্রী ধারণ করিল। সেই মৃত্যুচ্ছায়া-সমাচ্ছন্ন মুখে যেন একটা আশা ও আনন্দের ভাব ফুটিয়া উঠিল।

জলপান করিবার পর বৃদ্ধ মোল্লা একটু বললাভ করিলেন। ক্ষীণস্বরে বলিলেন,—"মোকারেব! এ প্রাণ যে এ সাংঘাতিক আঘাতেও যায় নাই তাহার জন্য খোদাকে ধন্যবাদ করিতেছি। ইতঃপূর্ব্বে জীবনান্ত হইলে হয়ত তোমায় একটা প্রয়োজনীয় কথা বলিবার অবসর পাইতাম না। যে ন্যস্ত-বিশ্বাস রক্ষার জন্য আমার এ দুর্দ্দশা

ঘটিল, তাহাও তোমায় জানাইতে পারিতাম না। শোন মোকারেব! তোমার জ্যেষ্ঠ আজ তিন দিন হইল পর্ব্বতবাসীদের বিদ্রোহ দমনের জন্য সুদূর প্রান্তসীমায় গিয়াছেন। এ দুর্গে পাঁচশত বই সেনা ছিল না—তাহার মধ্যে কেবল মাত্র পঁচিশজন মোগল সেনাকে দুর্গরক্ষার জন্য রাখিয়া বাকী সমস্ত সেনা তিনি সঙ্গে লইয়া গিয়াছেন। শুনিয়াছ ত সেই দুর্দ্দান্ত দস্যু মনসুরের জ্বালায়, এ অঞ্চলে সকলেই ব্যতিব্যস্ত। বিশক্রোশ আশেপাশের নগর ও গ্রামের অধিবাসীরা সর্ব্বদাই ভীত ও সন্ত্রস্ত। তোমার জ্যেষ্ঠ দুইবার এই মনসুরের পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিলেন কিন্তু সে শয়তানকে ধরিতে পারেন নাই; তথাপি তিনি তাহাকে ধরিবার চেষ্টাও ছাড়েন নাই। মনসুর ইহা জানিত। এজন্য তোমার জ্যেষ্ঠের উপর তাহার ভয়ানক আক্রোশ।"

চারিদিকে তাহার গোয়েন্দা নানাবেশে ঘুরিতেছে ফিরিতেছে। সে গোয়েন্দামুখে সংবাদ পাইয়াছিল—তোমার দাদা পর্ব্বতীয়দিগকে স্ববশে আনিবার জন্য প্রায় সকল সেনা লইয়া গিয়াছেন। দুর্গ অরক্ষিত। পাপিষ্ঠ এই সুযোগে আমাদের দুর্গে প্রবেশ করিয়া, পরিজনবর্গকে নিষ্ঠুরভাবে নিহত করিয়াছে। সেই পঁচিশজন সেনার মধ্যে দুইজন তোমার জ্যেষ্ঠকে সংবাদ দিবার জন্য গিয়াছে। যাহারা অবশিষ্ট ছিল তাহাদের অৰ্দ্ধেক সেই দুর্দ্দান্ত শয়তান মনসুরের হাতে বন্দী আর অৰ্দ্ধেক নিহত হইয়াছে। সেই শয়তানের নিষ্ঠুরতার ফলে অন্তঃপুরিকা ও বালক-বালিকাদের অবস্থা কিরূপ শোচনীয় হইয়াছে তাহা তুমি স্বচক্ষে দেখিয়াছ। এই দুর্গে যাহা কিছু বহুমূল্য ছিল—তাহার সবই সে লুঠ করিয়া লইয়া গিয়াছে; কিন্তু একটি জিনিস সে পায় নাই। সেই জিনিসটির অনুসন্ধানের জন্যই সে সকল ঘর দ্বার তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াছে—সমস্ত জিনিসপত্র ভাঙ্গিয়া নষ্ট করিয়াছে। তুমি হয়ত জাননা মোকারেব! কিসের অনুসন্ধানের জন্য সে এত বড় একটা নৃশংস কাণ্ড করিল? সেটি আর কিছু নয়, এই হজরত দুর্গের পূর্ব্বাধিকারীর পুরুষানুক্রমে রক্ষিত—সেই "পদ্মরাগমণি"। এই অমূল্য মণিই "হজরতের মাণিক" বলিয়া পরিচিত। আকবর বাদশাহ এই মণির লোভেই দুর্গজয় করিয়াছেন; কিন্তু সেই মণির অস্তিত্ব জানিত কেবল মাত্র তিনজন। প্রথম আমি—দ্বিতীয় তোমার জ্যেষ্ঠ—তৃতীয় তাহার পত্নী। পাঠান দুর্গাধিপতি আমায় গুরুর ন্যায় সম্মান করিত, একথা তুমি শুনিয়াছ। মৃত্যুর পূর্ব্বে আমি তার মৃত্যুশয্যাপার্শ্বে উপস্থিত ছিলাম। তিনিই আমার হস্তে সেই অমূল্য মাণিকটি দিয়া বলেন,—"ইহার মূল্য নাই, আর ইহার জন্যই আমার অমূল্য জীবন ও এই বিশাল দুর্গ হারাইয়াছি। যে ফকিরের নিকট আমার পিতামহ এই বহুমূল্য মাণিকটি পান—তিনি বলিয়া গিয়াছিলেন—ইহা যেন তোমার বংশধরগণ ব্যতীত আর কাহারও হস্তগত না হয়—এজন্য এই মণিটি আপনি এই পর্ব্বতের উত্তরাংশে যে বিশাল হ্রদ আছে তাহার মধ্যে নিক্ষেপ করিবেন।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া সেই পক্ককেশ বৃদ্ধ ফকির বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। আবার কাতরকণ্ঠে বলিলেন,—"মোকারেব! আর একটু জল দাও—"

মোকারেব পুনরায় স্নিগ্ধ বারিদানে সেই বৃদ্ধ ফকিরের জ্বালাময়ী তৃষ্ণা নিবারণ করিল।

ফকির বলিলেন,—"আমি হ্রদগর্ভে সেই পাঠান দুর্গাধিকারীর আদেশক্রমে, সেই মাণিকটি হাতে লইয়া—সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন গভীর নিশীথে, হ্রদের দিকে অগ্রসর হইলাম কিন্তু সেই মহামূল্য মাণিটিকে হ্রদগর্ভে নিক্ষেপ করিতে পারি নাই। তাহার জ্যোতি এত উজ্জ্বল যে, সেই অন্ধকারেও তাহার মধ্য হইতে উজ্জ্বল লোহিত-শিখা বাহির হইতে লাগিল। আমি ফিরিয়া আসিয়া গোপনে সেই পদ্মরাগমণি তোমার জ্যেষ্ঠকে প্রদান করিলাম। তিনি আবার নিজে তাহা না রাখিয়া তোমার ভ্রাতৃজায়াকে প্রদান করেন। পাপিষ্ঠ মনসুর বোধ হয় এই মণির কথা কোনরূপে শুনিয়াছিল। তাই সে উপযুক্ত সুযোগ বুঝিয়া এই হজরত দুর্গ আক্রমণ করিয়াছিল। তোমার ভ্রাতৃজায়া বিপদ্ উপস্থিত দেখিয়া উপযুক্ত সময়েই আমায় এই মণিটি দিয়া যান। তিনি ভাবিয়াছিলেন,—"আমি ফকির, পাপিষ্ঠ আমার উপর কোনরূপ অত্যাচার করিবে না; কিন্তু তাহা হয় নাই। সেই নিষ্ঠুর দস্যু আমাকেও ক্ষত বিক্ষত করিয়াছে। বৎস! তোমার ভ্রাতা যতক্ষণ না ফিরিয়া আসেন ততক্ষণ তুমি এই হজরত দুর্গের অধিকারী। এই বহুমূল্য "হজরতের মাণিক" তোমার। এই নাও—"

ফকির সাহেব আর বেশী কথা বলিতে পারিলেন না। তাঁহার জীবনবায়ু অবিলম্বে সেই জীর্ণ দেহপিঞ্জর ত্যাগ করিল।

মোকারেব খাঁ সেই উজ্জ্বল মাণিকটি দুই তিন বার নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিলেন, তাহার জ্যোতি অতুলনীয়। তিনি সেই মাণিকটি সযত্নে আঙ্গরাখার মধ্যে লুকাইয়া রাখিলেন।

মোকারেবের সঙ্গিগণ বহুক্ষণ পূর্ব্বেই দুর্গমধ্যে উপস্থিত হইয়াছিল। তাহারাও দুর্গের অবস্থা দেখিয়া ভীত ও বিস্মিত চিত্তে মোকারেবের প্রত্যাগমন অপেক্ষা করিতেছিল।

মোল্লার সহিত মোকারেবের যখন কথাবার্ত্তা হইতেছিল সেই সময়ে একজন সৈনিক প্রচ্ছন্নভাবে পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষের দ্বারান্তরালে থাকিয়া তাহা শুনিল। তাহার মুখ হর্ষপ্রফুল্ল হইল। মোকারেব ইহার কিছুই জানিতে পারিলেন না। মোকারেবের সঙ্গে যে আটজন মোগল সেনা আসিয়াছিল— এ ব্যক্তি তাহাদেরই একজন।

(২)

মোকারেব সেই অন্ধকারময় প্রেতপুরীতে চেষ্টা করিয়া সন্ধ্যার দীপ জ্বালিলেন। সে দীপালোক অতি ভীষণ দৃশ্য প্রকটিত করিল। মনসুরের ভয়ে গ্রামবাসীরা দূরে পলাইয়াছিল। তাহারাও সন্ধ্যার পর গ্রামে ফিরিয়া আসিল।

মোকারেব গ্রামবাসীদের জড় করিলেন। তাঁহার সঙ্গীদের ও গ্রামবাসীদের সহায়তায় মৃতদেহগুলির শেষকৃত্য করিয়া গভীর রাত্রে, চিন্তাপূর্ণ হৃদয়ে, ক্লান্ত দেহে, তিনি জ্যেষ্ঠের কক্ষমধ্যে বিশ্রামার্থ প্রবেশ করিলেন। অতীব ভীষণ ব্যাপারের স্মৃতি তাঁহাকে তখনও বিভীষিকা দেখাইতে লাগিল!

এখন কর্ত্তব্য কি? এতগুলি বহুমূল্য জীবন নষ্ট হইল। জিনিষপত্র অর্থাদি যাহা ছিল তাহাও লুণ্ঠিত হইয়াছে। তাঁহার জ্যেষ্ঠেরও কোন সংবাদ নাই। এ ক্ষেত্রে কি করা উচিত—মোকারেব তাহার কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। তিনি নিদ্রাহীন নেত্রে সমস্ত রাত্রি সেই শয়নকক্ষে কাটাইলেন।

তাঁহার সঙ্গী রক্ষীরা চেষ্টা করিয়া একটু সুবিধাজনক স্থানে আশ্রয় লইয়াছিল। তাহারাও উদ্বিগ্নচিত্তে সমস্ত রাত্রি কাটাইয়াছে। অন্তঃপুরের মধ্যে প্রবেশ করিতে তাহাদের সাহস হয় নাই। গ্রাম হইতে তাহারা যাহা কিছু খাদ্য-পানীয় সংগ্রহ করিয়াছিল তাহাতেই ক্ষুৎপিপাসা নিবৃত্তি করিয়াছে।

কালরজনী প্রভাত হইল। সেই শূন্যপুরীতে মোকারেব একা। সমস্ত রাত্রি তিনি চক্ষু বুজিতে পারেন নাই। প্রভাতে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে তিনি শয্যাত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিলেন।

প্রহরীরা তাঁহাকে সেলাম করিল। মোকারেব দেখিলেন আটজন প্রহরীর মধ্যে সাতজন আছে। একজন অনুপস্থিত। যে নাই তাহার নাম আলি খাঁ।

পাঠক এই আখ্যায়িকার প্রথমাংশেই মীর আলিখাঁর পরিচয় পাইয়াছেন।

মোকারেব তাঁহার শরীর-রক্ষী সেনাগণকে প্রশ্ন করিয়া জানিলেন,—"এই আলিখাঁ সকলের শেষে দুর্গ-প্রবেশ করিয়াছিল। রাত্রি প্রথম প্রহরের পর সে অশ্বারোহণে পর্ব্বতের উপর চলিয়া গিয়াছে।"

মোকারেব চীৎকার করিয়া বলিলেন—"বিশ্বাসঘাতকতা! বেইমানী! আলিখাঁ গেল কোথায়?"

একজন সেনা বলিল, "কি করিয়া জানিব হুজুর! সে রাত্রি এক প্রহরের পর অশ্বারোহণে কোথায় চলিয়া গেল। আমরা কোন কিছু জিজ্ঞাসা করিবার অবসর পর্য্যন্ত পাইলাম না। মনে ভাবিলাম—হুজুরালি তাহাকে কোন জরুরি কাজে পাঠাইয়াছেন।"

মোকারেব চীৎকার করিয়া বিকৃতকণ্ঠে বলিলেন,—"না—না আমি তাহাকে কোথাও পাঠাই নাই। সে নিমকহারাম হইয়াছে। অতি বিশ্বাসী পার্শ্বচর সে আমার—সে নেমকহারামী করিতে গিয়াছে।"

মোকারেব তাঁহার সঙ্গীদের বলিলেন,—"যতক্ষণ না আমি ফিরিয়া আসি, ততক্ষণ তোমরা এই দুর্গে অবস্থান কর। দস্যুরা যদিও এই দুর্গের ভাণ্ডারগৃহ লুঠ করিয়াছে, কিন্তু এখনও তোমরা তথায় প্রচুর আহার্য্য দ্রব্য পাইবে।"

আর কিছু না বলিয়া মোকারেব তাঁহার অশ্বে আরোহণ করিলেন। দ্রুতবেগে অশ্ব ছুটাইলেন। কিয়দ্দূর আসি-

বার পর দেখিলেন এক চড়াই পথ বরাবর উপরে গিয়াছে। আশে পাশে আর কোন পথই নাই। তিনি অতি ধীরে ধীরে সেই বন্ধুর পার্ব্বত্য-পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

(৩)

যে আলিখাঁর অনুপস্থিতিতে মোকারেব এতদূর বিচলিত —একবার সেই আলিখাঁর সন্ধান লইতে হইবে।

সেই গভীর রাত্রে আলিখাঁ অশ্বারোহণে পর্ব্বতে উঠিতেছে। অন্ধকারে সে পথ নির্ণয় করিতে পারিতেছে না। অনেক কষ্টে সে পর্ব্বতের উপরস্থ এক উপত্যকায় উঠিল। এই উপত্যকা বহুদূর বিস্তৃত। চড়াইএর পথ এই উপত্যকা হইতেই শেষ।

আলিখাঁ এই অন্ধকারমণ্ডিত পথ ধরিয়া প্রায় অদ্ধ ক্রোশ আসিবার পর দেখিল—সম্মুখে এক ভীষণ জঙ্গল অন্ধকারে সে গন্তব্য পথ স্থির করিতে পারিল না। তাহার বিশাল দেহ স্বেদজলে প্লাবিত। অশ্বও শ্রান্ত ক্লান্ত আলিখাঁ এক একবার মনে করিতে লাগিল,—"আর অগ্রসর হইব না—"যে পথে আসিয়াছি সেই পথেই নামিয়া যাই।" কিন্তু এই সংকল্প সে কার্য্যে পরিণত করিবার অবসর পাইল না।

সেই দুর্ভেদ্য অন্ধকারাবৃত জঙ্গল হইতে সহসা দুইজন লোক বাহির হইয়া তাহার অশ্ববল্গা ধারণ করিল। কঠোর স্বরে বলিল,—"কে তুই।"

মনসুর চক্ষুর্দ্বয় ঘূর্ণায়মান করিয়া বলিল,—"কে তুই"।

আলি খাঁ উপায়ান্তর না দেখিয়া অশ্ব হইতে নামিয়া পড়িল। ধীর ভাবে বলিল—"আমি মুসাফির।"

সেই ব্যক্তি কঠোরস্বরে বলিল,—"হতভাগ্য পান্থ, এ পথে আসিয়াছিস কেন? তোর কি মরিবার সাধ হইয়াছে?" জানিস না এ জঙ্গলে মনসুরের ভয়ে প্রেত পিশাচ পর্য্যন্ত প্রবেশ করে না।"

মনসুরের নাম শুনিয়া আলি খাঁ একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। সে ভাবিল খোদা তাহার সহায়। সে ত মনসুরের অনুসন্ধানেই যাইতেছে। উপত্যকা-পার্শ্ববর্ত্তী এই গভীর জঙ্গলের কাছে আসিয়া সে ঠিক করিতে পারিতেছিল না—কোন্ দিকে যাইবে! এখন সে বুঝিল—এই দুই জন দস্যু নিশ্চয়ই তাহাকে মনসুরের নিকট উপস্থিত করিবে। অতি সহজেই তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে।

আলি খাঁ বলিল,—"দোস্ত! মৃত্যুর ভয় থাকিলে এ পথে আসিব কেন? জঙ্গলের বাদ্শা মনসুরের কাছেই আমি যাইতেছি। এক জরুরী খবর তাঁকে দিব।

সেই দস্যু বলিল,—"কোথা হইতে তুই আসিতেছিস্?"

"হজরৎ দুর্গ হইতে।"

"হজরৎ দুর্গ হইতে?"

"হাঁ—"

"সেখানে ত কেহই জীবিত নাই। তুই কি চাস।"

"এই জঙ্গলের বাদ্শা সেই মহাপরাক্রান্ত মনসুর আলির সহিত আমি সাক্ষাৎ করিতে চাই।"

"কেন—"

"তাহা তোমাদের নিকট বলিব না। তোমরা যখন আমাকে ধরিয়াছ, তখন যে সহজে ছাড়িয়া দিবে না তাহা জানি; কিন্তু দোহাই তোমাদের আমায় এই নির্জ্জন বনমধ্যে হত্যা করিও না। যাহার জন্য মনসুর সাহেব হজরৎ দুর্গ আক্রমণ করিয়াছিলেন, আমি সেই বিষয়েরই কোন জরুরি সংবাদ আনিয়াছি।

দস্যু দুইজন গা টেপাটেপি করিল। তার পর যে প্রথমে কথা কহিয়াছিল সেই বলিল,—"জানিস্ত আগুন লইয়া খেলা করিলে অনেক বিপদ্। তুই যদি প্রাণরক্ষার জন্য কোনরূপ ছল করিয়া এ কথা বলিয়া থাকিস্ তাহা হইলে তোর আর নিস্তার নাই। আমাদের দলপতির সহিত চালাকি করিয়া এ পর্য্যন্ত কেহ প্রাণ লইয়া ফিরিয়া যাইতে পারে নাই। এখনও বিবেচনা করিয়া কথা বল্।"

আলি বলিল,—"না ভাবিয়া চিন্তিয়া, আমি এ ব্যাঘ্র-গহ্বরে আসি নাই। সখ করিয়া কে কোথায় জীবন বিসর্জ্জন দিয়া থাকে? সে সংবাদ তোমাদের নিকট বলিবার হইলে বলিতাম—মনসুর ব্যতীত আর কাহারও নিকট সে সংবাদ প্রকাশ করা নিষিদ্ধ বলিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিতেছি।"

দস্যুদ্বয় আলি খাঁর ঘোড়াটি নিকটস্থ একটি বৃক্ষে বন্ধন করিল। তৎপরে দুইজনে তাহার দুইটি হাত ধরিল। আলি খাঁকে এই ভাবে লইয়া তাহারা সেই অরণ্যানী মধ্যস্থ সংকীর্ণ পথে অগ্রসর হইল।

অদূরে দস্যুপতির শিবির। চারিদিকে মশাল জ্বলিতেছে। এক কৃষ্ণকায় ভীষণদর্শন ব্যক্তি একটি বৃক্ষ-তলে খাটিয়ার উপর বসিয়া ধূমপান করিতেছে। দস্যুরা সেই ব্যক্তির সম্মুখে আলি খাকে উপস্থিত করিয়া বলিল,—"ইনিই আমাদের দলপতি! তোর কি বলিবার আছে এঁর কাছেই বল্।"

দস্যুপতির চক্ষুর্দ্বয় লোহিতবর্ণ। বোধ হয় সে কোন-রূপ উগ্র মাদক সেবন করিয়াছে। তাহার দৃষ্টি অতি মর্ম্মভেদী, ওষ্ঠাধর স্থূল ও কৃষ্ণবর্ণ। দেহের রংও সেইরূপ।

দস্যুপতি মনসুর কিয়ৎক্ষণ অভিনিবেশ সহকারে আলির দিকে চাহিয়া চাহিয়া কি দেখিল। তাহার আশেপাশে মশালের আলো জ্বলিতেছে। সে মশালের আলো তাহার কৃষ্ণবর্ণ মুখের উপর পড়ায় অতি ভীষণ দৃশ্য প্রকটিত করিয়াছে।

দস্যুদ্বয়ের মধ্যে একজন বলিল,—"হুজুর! এ ব্যক্তি বলিতেছে—আপনার সহিত ইহার কোন বিশেষ গোপনীয় কথা আছে।"

দস্যু দলপতি মনসুর চক্ষুর্দ্বয় ঘূর্ণায়মান করিয়া বলিল,—"কে তুই! এ বনের পথ চিনিলি কিরূপে? নিশ্চয়ই তুই কোন গোয়েন্দা। এ পর্ব্বতে আমাদের ভয়ে কেহই আসিতে সাহস করে না। তুই কেমন করিয়া আসিলি? কোথা হইতে আসিতেছিস্ তুই?"

আলি খাঁ সাহসী সৈনিক হইলেও, সে দস্যুপতি মনসুরের চৌখ্‌রাঙ্গানি ও ধম্‌কানিতে মর্ম্মে মর্ম্মে কাঁপিয়া উঠিল। মনসুর যে কিরূপ পিশাচ-প্রকৃতির লোক, তাহা সে হজরৎ দুর্গের লুণ্ঠন ব্যাপারেই বুঝিয়াছিল। মানুষের জীবন লইয়া ক্রীড়া করাই তাহার অভ্যস্ত কার্য্য। আলি খাঁও বুঝিল এ ক্ষেত্রে সাহস হারাইলেই সর্ব্বনাশ হইবে! শোচনীয় মৃত্যু অনিবার্য্য!"

কাজেই সে সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিল,—"জনাব! আমি আপনার সহিত রহস্য করিতে আসি নাই। যে হজরতের মাণিকের জন্য আপনি এত কাণ্ড করিলেন হজরৎ দুর্গ শোণিতের বন্যায় প্লাবিত হইল—সেই মাণিকের সন্ধান আমি আপনাকে দিতে আসিয়াছি।

মনসুর এ কথায় অনেকটা ঠাণ্ডা হইল। আলিকে একটি বেত্রনির্ম্মিত ক্ষুদ্র আসন দেখাইয়া দিয়া বলিল,—"ঐখানে বসিয়া তোমার কথা বল।"

আলি বলিল,—"ইহাদের সম্মুখে সে কথা বলিব কি ?"

দস্যুপতি—বিকট হাস্য করিয়া বলিল,—"ইহারা আমার দক্ষিণ বাহু। ইহাদের নিকট আমার কোন কিছু গোপন নাই। স্বচ্ছন্দে বলিতে পার।"

আলি খাঁ বলিল,—"যে মাণিকের জন্য আপনি এত কাণ্ড করিলেন তাহার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।"

মনসুর একথায় যেন একটু প্রসন্নভাব ধারণ করিল। সহর্ষমুখে বলিল,—"সে মাণিক তুমি সঙ্গে আনিয়াছ কি ?"

"না—"

"তবে কেমন করিয়া তাহার সন্ধান জানিলে ?"

"সে মাণিক যাহার নিকট আছে তাহাকে আমি দেখাইয়া দিব।"

"কোনরূপ বিশ্বাসঘাতকতা করা তোমার সংকল্প নয় ত ?"

"খোদার কসম্। আপনার সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করে এ দুনিয়ায় কটা লোকের এমন সাহস আছে ?"

"ভাল কথা ; কিন্তু আমার বিশ্বাস, বিনা স্বার্থে কেউ কোন কাজ করে না। এ বিষয়ে তোমার স্বার্থ কি ?"

"মাণিকটি দেখিয়া আমার বড় লোভ হইয়াছে। আমি তাহার অধিকারীকে হত্যা করিয়া সে মাণিক লইয়া পলাইতে পারিতাম, কিন্তু বুঝিয়াছি পলাইলেও আমার নিস্তার নাই। যাহার কাছে সেটা আছে সে লোকটা অতি শক্তিশালী। তাহার সহিত আমি যুঝিয়া উঠিতে পারিব না। তাই আপনার শরণাগত হইয়াছি। আমি আপনাকে এক সহস্র মুদ্রা দিব। তৎপরিবর্ত্তে আমি সেই মাণিকটি চাই।"

মনসুর চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া কঠোরস্বরে বলিল,—"না তাহা হইতেই পারে না। আমার লোক চেষ্টা করিয়া সেই মণি উদ্ধার করিবে—আর সামান্য এক হাজার টাকা যাহা আমি এক মুহূর্ত্তে উপায় করি তাহার পরিবর্ত্তে তোমায় সেই বহুমূল্য মণিটি দিব—কথাটা অতি তাজ্জব ! তুমি নিতান্ত বেকুব ! তাই এরূপ একটা অসম্ভব প্রস্তাব মাথায় লইয়া আমার কাছে আসিয়াছ। তোমার সাহসও ত কম নয় ! ও সব বাজে কথা ছাড়িয়া দাও। আমি যা বলিব তাই তোমায় করিতে হইবে। যাহার কাছে হজরৎ মাণিক আছে, সেই লোককে তুমি কেবলমাত্র দেখাইয়া দিবে। ব্যস্—এই পর্য্যন্ত। আমার লোকেরা খুব হুঁসিয়ার। তাহার পর যা করিতে হয়, তাহারাই করিবে। এজন্য আমি তোমাকে পঞ্চাশ স্বর্ণমুদ্রা বায়না দিতেছি। মাণিকটিকে আয়ত্ত করিতে পারিলে ও মণিটা হস্তগত হইলে আরও পঞ্চাশ মুদ্রা তোমায় পুরস্কার স্বরূপ দিব।

দস্যুপতি এই কথা বলিয়া, তাহার কটিদেশনিবদ্ধ এক গেঁজিয়া হইতে পঞ্চাশটি স্বর্ণমুদ্রা একে একে বাহির করিল। তৎপরে বলিল,—"কেমন আমি যা বলিলাম তাহাতে স্বীকার আছ ?"

আলি খাঁ মনে মনে ভাবিল—"যদি ইহার কথায় সম্মত না হই, তাহা হইলে উহারা এখনি আমায় হত্যা করিবে। যথা লাভ এই একশত স্বর্ণমুদ্রা লইয়াই আমার সন্তুষ্ট থাকা ভিন্ন আর কোন উপায় নাই। হায় ! কেন এই বিশ্বাসঘাতকতা করিতে আসিয়াছিলাম ! মোকারেবের নিকট আর আমার মুখ দেখাইবার পথ নাই। আমি নিজের বুদ্ধির দোষে একবারেই পথে বসিলাম।

সে বলিল,—"আপনার কথার উপর কথা কহিবার শক্তি আমার নাই। তবে এত কষ্ট ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়া এই রাত্রে আমি আপনার কাছে আসিয়াছি, যাহা ভাল হয় তাহাই করুন।"

দস্যুপতি সেই পঞ্চাশটি মুদ্রা আলি খাঁর হাতে দিয়া বলিল,—"আমি অন্যায় বিচার করি না। নিখ্‌তির ওজনে আমার কাছে কাজ হয়। যাক্—এখন ও সব কাজ মিটিয়া গেল। বল দেখি সে "হজরৎ মণি" কাহার কাছে আছে ? ঐ মণিটার জন্যই ত আমি হজরত দুর্গ শোণিত-রঞ্জিত করিয়া আসিয়াছি।"

আলি খাঁ বলিল,—"মোকারেবের কাছে সেই পদ্মরাগ মণি আছে।"

দস্যুপতি সবিস্ময়ে বলিল—"মোকারেব খাঁ ? জবরদস্ত খাঁর ভাই।"

"হাঁ জনাব ?"

"আমি যখন দুর্গ লুঠ করিতে গিয়াছিলাম তখন ত সে ছিল না।"

"না—আপনি চলিয়া আসিবার পর মোকারেব আসিয়া পৌছিয়াছে।"

"সে সেই জহরৎ পাইল কার কাছে?"

"দুর্গে যে বৃদ্ধ মোল্লা বাস করিত, সে সেই মণি লুকাইয়া রাখিয়াছিল।"

"ঠিক—ঠিক! আমারও মনে সেইরূপ একটা সন্দেহ হইয়াছিল বলিয়া আমি ভণ্ড শয়তান মোল্লাকে একটা তরোয়ালের খোঁচা দিয়া আসিয়াছি।"

"এতক্ষণ তোমার কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি নাই, এখন করিলাম। খোদার কসম বল দেখি—তুমি যা বলিতেছ তা সত্য!"

"জনাব! আমার ধড়ে ত দুটো মাথা নাই যে, সাক্ষাৎ শমনস্বরূপ মনসুর আলির কাছে মিথ্যা কথা বলিব।"

দস্যুপতি পুনরায় পূর্ব্বকথিত গেঁজিয়া বাহির করিল। তাহার মধ্য হইতে আবার পঞ্চাশটি স্বর্ণমুদ্রা লইয়া তাহা আলি খাঁর হাতে দিয়া বলিল,—"আমি জীবনে কখনও কথার খেলাপ করি নাই। তোমার একশত স্বর্ণমুদ্রা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছি। পঞ্চাশ এই মাত্র দিয়াছি—আরও লও এই বাকী পঞ্চাশ। তোমার কাজ শেষ হইয়াছে। তুমি এখন চলিয়া যাইতে পার। আমি তোমার সঙ্গে একজন লোক দিতেছি।"

আলি খাঁ মনে মনে ভাবিল,—"খোদা মেহেরবান। এই একশত আসরফিই আমার পরিশ্রমের লাভ! একবার এ জঙ্গল হইতে বাহির হইতে পারিলে হয়। আমি অন্ততঃ এক হাজার আসরফি পাইবার আশায় এ কষ্ট সহ্য করিয়া বিশ্বাসঘাতকতা করিতে আসিয়াছিলাম। তা যখন পেট ভরিল না—তখন দু-মুখো সাপের মত কাজ করিব। আজ রাত্রে গিয়াই মোকারেবকে সাবধান করিয়া দিয়া তাহার নিকটও এইরূপে পুরস্কার লইব।"

আলি খাঁ সেলাম করিয়া বলিল,—"সাহেব! তাহা হইলে আমি এখন বিদায় পাইতে পারি। প্রার্থনা রহিল—জনাবের কাজ সিদ্ধ হইলে আমায় আরও কিছু দিবেন।"

দস্যুপতি তাহার দুই জন সহচরকে ডাকিল। তাহাদের কাণে কাণে কি বলিল। মনসুরের আদেশ প্রাপ্তি মাত্র, তাহাকে তখনই গিয়া আলিখাঁর হাত দুইটি বাঁধিয়া ফেলিল।

আলি খাঁ—সবিস্ময়ে বলিল,—"এ সব কি ব্যাপার! কৃতোপকারের এই কি পুরস্কার!"

মনসুর বলিল—"তুই শয়তান! বিশ্বাসঘাতক! আমরা বিশ্বাসঘাতককে বড় ঘৃণা করি। আমাদের এ দল বিশ্বাসের উপরই চলিতেছে। মোকারেব খাঁ তোর মনিব! তাহার নিমক খাইয়া তুই মানুষ হইয়াছিস্; কিন্তু এতবড় শয়তান তুই যে, সামান্য একশত স্বর্ণমুদ্রার জন্য বিশ্বাসঘাতকতা করিতে আসিয়াছিস্। সে "হজরৎ মাণিক" পাই আর না পাই, তাহাতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু তোর মত একটা বিশ্বাসঘাতককে দুনিয়া হইতে সরাইতে পারিলে বুঝিলাম আজ একটা কর্ত্তব্য করিলাম। আমি তোর প্রাণদণ্ডের আদেশ করিয়াছি।" কথার খেলাপ আমি করি নাই। তোর পরিশ্রমের ফলস্বরূপ এখনই একশত স্বর্ণমুদ্রা গণিয়া দিয়াছি।"

আলিখাঁর সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল। সে বুঝিল মনসুর যাহা বলিতেছে তাহাই ঠিক! হায়! হায়! কেন শয়তানের ছলনায় এ বিশ্বাসঘাতকতা করিলাম!

দস্যুপতির ইঙ্গিতমাত্রে সেই দুইজন দস্যু শাণিত কৃপাণ কোষোন্মুক্ত করিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে আলিখাঁর মস্তক স্কন্ধচ্যুত হইল। সেই উপত্যকাক্ষেত্র তাহার শোণিতে রঞ্জিত হইল। দস্যুপতির আদেশে তাহার মৃতদেহ শৃগাল-কুক্কুরের ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য সেই উপত্যকা-মধ্যবর্ত্তী গভীর জঙ্গলে নিক্ষিপ্ত হইল।

(৪)

বলা বাহুল্য সম্রাট্ আকবর সাহ এই লোকবিশ্রুত পদ্মরাগ মণির জন্যই হজরতের পাঠান দুর্গাধিপতির স্বাধীনতা হরণ করেন। তিনি দুই তিনবার দুর্গাধিপতির নিকট এই বহুমূল্য মণিটি চাহিয়া পাঠান। কিন্তু দুর্গাধিপতি তাহাতে সম্মত না হওয়ায় আকবর সাহ বলপূর্ব্বক সে মণি পাইবার চেষ্টা করেন। তাহার ফলে পুরাতন দুর্গাধিপতি নিহত ও রাজ্যচ্যুত হন। এই জবরদস্তখাঁই তাহার আদেশে দুর্গ দখল করিয়াছিলেন।

বৃদ্ধ মোল্লা যখন দেখিলেন যে, এক মণির জন্যই এই

মহাবিপ্লব ঘটিল, তখন তিনি সেই অভিশপ্ত মণিটিকে কি করিয়া হস্তান্তর করেন তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। জবরদস্ত খাঁ লোক ভাল ছিলেন। তিনি ভূতপূর্ব্ব দুর্গাধিপতির সহচর এই ধাৰ্ম্মিক মোল্লাকে কোন মতেই দুর্গত্যাগ করিতে দিলেন না। সদ্ব্যবহারে ও সম্মান-প্রদর্শনে তাঁহাকে আয়ত্ত করিলেন। মোল্লাও জবরদস্তখাঁর সদ্ব্যবহারে তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হইলেন। শেষ একদিন তিনি সেই মণিটি জবরদস্ত খাঁর হস্তে গোপনে তুলিয়া দিলেন।

মণির জ্যোতিঃ অতি উজ্জল। যুগযুগান্তর হইতে বংশানুক্রমে এই পদ্মরাগ, হজরৎ দুর্গাধিকারীদের দখলে ছিল। মণিটির মূল্য বোধ হয় বহুলক্ষের উপর। জবরদস্ত খাঁ মণিটির লোভ সংবরণ করিতে পারিলেন না। কতবার তিনি মনে ভাবিয়াছেন যে,এই অভিশপ্ত মণিটিকে আকবর সাহের নিকট পাঠাইয়া দিই। কিন্তু তাহার উজ্জ্বল জ্যোতিঃ দেখিলেই তাঁহার লোভ বাড়িয়া উঠিত। কাজেই এইটি তাঁহার নিকটেই ছিল। দুদ্দৈববশে এই অভিশপ্ত পদ্মরাগটি গৃহে রাখিবার ফলে সাবেক দুর্গাধিপতির রাজ্য গেল—প্রাণ গেল; জবরদস্তখাঁরও স্ত্রীপুত্রকন্যা গেল।

মোকারেব দেখিলেন—এ মণি কাছে রাখিলেই একটা না একটা বিভ্রাট ঘটিবে। যদি এতদিনের পর ইহা আকবর সাহকে ফিরাইয়া দেওয়া যায় তাহা হইলেও বিভ্রাট ঘটিবে। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সুনামে কলঙ্ক স্পর্শিবে—তিনি হয়ত পদচ্যুত হইবেন। এরূপস্থলে কোন দূরতম দেশে ইহা বিক্রয় করাই কর্ত্তব্য।

সে শয়তান আলিখাঁই বা গেল কোথায়? সহসা তাহার হজরৎ দুর্গ ত্যাগের কারণ কি? সে কি তাহা হইলে সম্রাট্‌কে এই মণির সন্ধান দিতে গিয়াছে! তিনি পরদিন প্রভাতে তাহার সন্ধানে গিয়াছিলেন। গভীর বন তন্নতন্ন করিয়া খুঁজিয়া বিফলমনোরথ হইয়া দুর্গে ফিরিয়া আসিয়াছেন। সেই অবধি তার কোন সংবাদই নাই।

মোকারেব খাঁ মনে মনে ভাবিলেন এই পর্ব্বতের অপর পারেই কাবুল। আফ্‌গানিস্থানের বাদ্‌শা ভিন্ন আর কেহই এ মণি রাখিতে পারিবে না। আকবর সাহের নিকট লইয়া যাওয়া অপেক্ষা এ মণি লইয়া হিন্দুস্থান ত্যাগ করাই উচিত। পথে যদি অগ্রজের সহিত সাক্ষাৎ হয়, তাহা হইলে তাহাকে ইহা ফিরাইয়া দিব। না হয়, ইহা আমারই হইবে। অদৃষ্টে যাহা ঘটে ঘটুক সেই সুদূর আফগানিস্থানেই চলিয়া যাইব। মোকারেব তারপর মনে মনে ভাবিল,—এই হতভাগ্য আলিখাঁই বা সহসা কোথায় চলিয়া গেল! সে কি তাহা হইলে দস্যু মনসুরের নিকট এই সংবাদ দিতে গিয়াছে! প্রচ্ছন্নভাবে থাকিয়া মোল্লার ও আমার মধ্যে সমস্ত কথা শুনিয়াছে! ছয়ঘণ্টাকাল ধরিয়া পাহাড়ের নানাস্থানে তাহাকে খুঁজিয়াছি—কিন্তু তাহার কোন সন্ধানই ত পাই নাই যেদিক দিয়া দেখিতেছি তাহাতেই বুঝিতেছি আগরায় ফিরিয়া যাওয়া আমার পক্ষে নিরাপদ নহে। আকবর সাহ যে কাজের জন্য আমায় এখানে পাঠাইলেন, সে কাজ ত অগ্রজের সহিত সাক্ষাৎ না হইলে মিটিবেনা।

এই সমস্ত ভাবিয়া একদিন প্রত্যুষে কাহাকেও কিছু না বলিয়া মোকারেব খাঁ অশ্বারোহণে সেই দুর্গ ত্যাগ করিল। থলিয়া ভরিয়া কিছু খাদ্য ও পানীয় লইলেন। আত্মরক্ষার জন্য তরবারি ও একখানি শাণিত ছুরিকা লইলেন—আর সেই লোক-বিশ্রুত "পদ্মরাগ" তাহার বক্ষো বসনের মধ্যে অতি সন্তর্পণে লুকাইয়া রাখিলেন।

কোন পথে কাবুলে যাইতে হয় তাহাও তাহার জানা নাই। তবে কাবুলের অবস্থান যে দিকে মোবারেক খাঁ সেই দিকের পথই ধরিলেন।

পর্ব্বতের পর পর্ব্বত, উপত্যকার পর উপত্যকা জঙ্গলের পর জঙ্গল পার হইয়া মোকারেব খাঁ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পরে শেষে তিনি এক নির্জ্জন শষ্পসম্পদময় উপত্যকা মধ্যে উপস্থিত হইলেন।

মোবারক খাঁ ক্ষুৎপিপাসা সমাকুল। থলি হইতে খাদ্য বাহির করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিলেন। নিকটে একটি ঝরণা ছিল। সেই ঝরণা হইতে জলপান করিতেন। সহসা তাহার দৃষ্টি দূরবর্ত্তী এক উপত্যকায় পড়িবামাত্র তিনি সবিস্ময়ে দেখিলেন, চারিজন অশ্বারোহী অতি দ্রুতবেগে উপত্যকা পথে ধাবিত হইতেছে।

মোকারেব কিয়ৎক্ষণ সেই স্থানে দাঁড়াইয়া স্থির দৃষ্টিতে দেখিয়া স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, সেই অনুসরণকারী সেনাগণ তাহার মোগল সেনা নহে। তাহা হইলে এই নির্জ্জন পার্ব্বত্য-পথে এত ব্যস্তভাবে কে তাহার অনুসরণ করিতেছে

তীক্ষ্ণবুদ্ধি মোকারেব খাঁ সিদ্ধান্ত করিলেন, নিশ্চয়ই উহারা সেই দস্যুদলপতি মনসুরের লোক। মনসুরের দলভুক্ত সকলেই শ্রেষ্ঠ অশ্বারোহী। তাহা না হইলে ওরূপ দ্রুতভাবে উহারা এই পর্ব্বতের চড়াইয়ের উপর উঠিতে পারিত না। নিশ্চয়ই সেই শয়তান আলিখাঁ উহাদের সঙ্গে আছে। নিশ্চয়ই আলি খাঁ তাহার ও মোল্লার মধ্যে যে সব কথা হইয়াছিল তাহা শুনিয়া অর্থলোভে মনসুরকে পদ্মরাগমণির সন্ধান বলিয়া দিয়াছে।

মোকারেব অশ্বকে জলপান করাইলেন। উপত্যকা-প্রদেশে প্রচুর তৃণ জন্মিয়াছিল—মোকারেবের ক্ষুধার্ত্ত অশ্ব আগে সেগুলি নিম্মূল করিয়া উদরপূরণ করিয়াছে। তাহার মনিবের প্রাণে যেমন একটা সজীব ও উৎসাহপূর্ণ ভাব জাগিয়া উঠিয়াছে—তাহারও সেইরূপ! সে প্রভুকে সম্মুখবর্ত্তী হইতে দেখিয়া হ্রেষারব করিয়া উঠিল। মোকারেব এ হ্রেষারবের অর্থ বুঝিয়া অশ্বপৃষ্ঠে উঠিয়া বসিলেন। দ্রুত-বেগে অশ্ব সঞ্চালন করিলেন।

এইভাবে একঘণ্টা পথ চলিবার পর দিবা অবসান হইল। তপনদেব সেই অভ্রভেদী পাহাড়ের পাশে ঢলিয়া পড়িলেন। সমস্ত জগৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন। সম্মুখের পথ আর দেখা যায় না। অশ্বও আর চলিতে চাহে না। নিরুপায় হইয়া মোকারেব এক জঙ্গলে প্রবেশ করিলেন। সে জঙ্গল অতি গভীর। তখনও প্রদোষের ছায়ায় তাহার কোন কোন অংশ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয় নাই। চারিদিকে বড় বড় শর গাছ। মোকারেব অশ্বটি লইয়া সেই শর গাছের জঙ্গলের মধ্যে লুকাইলেন; সেই বিশ্বস্ত বাহনকে বলিলেন—"জঙ্গী! এই জঙ্গলের মধ্যে চুপ করিয়া থাক, কোন-রূপ শব্দ করিও না। আমরা ডাকাতের হাতে পড়িয়াছি।"

সেই ভাষাহীন প্রাণী প্রভুর মর্ম্মকথা বুঝিল। সে স্থির হইয়া এক স্থানে দাঁড়াইল। মোকারেবও সেই জঙ্গলের মধ্যে দরী বিছাইয়া শয়ন করিলেন।

সহসা অদূরে অশ্বপদ-শব্দ শ্রুত হইল। মোকারেব প্রমাদ গণিলেন।

তাহার পর লোকের কণ্ঠস্বর শ্রুত হইল। সেই চারিজন লোক তখন জঙ্গলের পাশে উপস্থিত হইয়াছে। তাহাদের একজন বলিল—"শয়তান গেল কোথায় বল দেখি! তাহার জন্য যে আমাদের জান হয়রাণ হইবার উপক্রম হইয়াছে।"

আর একজন বলিল—"লোকটার মত হুঁসিয়ার ও পাকা সওয়ার আমি ত দ্বিতীয় দেখি নাই। এরূপ একটা লোক যদি আমরা পাই ত আমাদের অনেক বাঁকা কাজ সোজা হইয়া যায়।"

দ্বিতীয় বক্তা স্বয়ং মনসুর। মোকারেব মনসুরকে কখনও দেখে নাই। কাজেই তাহার কণ্ঠস্বর শুনিয়াও তাহাকে চিনিতে পারিল না।

একজন বলিল—"শালা শয়তান এই জঙ্গলে লুকায় নাই ত? জঙ্গলটা একবার দেখিলে হয় না?"

মনসুর বলিল—"সে নিশ্চয়ই সেই ঝরণার নিকট হইতে আমাদের দেখিয়াছে। আমরা যখন তাহাকে দেখিতে পাইয়াছি তখন সে যে আমাদের দেখে নাই ইহা অসম্ভব। সে যখন প্রাণভয়ে পলাইতেছে, তখন এত কাছে কখনই আশ্রয় লইবে না। চল্ আমরা অগ্রসর হই। হয়ত সে এতক্ষণে অনেকটা পথ চলিয়া গেল।"

তাহারা সকলেই অশ্বারোহণে অন্য পথে চলিয়া গেল। মোকারেব খাঁ হাঁফ্ ছাড়িয়া বাঁচিলেন।

সেই গভীর জঙ্গল হইতে বাহির হইয়া মোকারেব বিপরীত পথ ধরিলেন। দস্যুরা যে দিকে গিয়াছিল, সে দিকে না গিয়া, তিনি যে জঙ্গলে আশ্রয় লইয়াছিলেন তাহার পার্শ্ববর্ত্তী একটি কঙ্করময় ক্ষুদ্র পথ ধরিয়া বরাবর উত্তরমুখে চলিলেন।

(৫)

শয়তানে মানুষকে আশ্রয় করিলে তাহাকে যেমন কোন কথা কহিতে দেয় না, যে দিকে ইচ্ছা লইয়া যায়, আর সেই শয়তানগ্রস্ত হতভাগ্যও নিশ্চেষ্টভাবে তাহার অনুসরণ করে, মোকারেবের দশাও সেইরূপ হইল।

প্রাণের ভয় তাহার নাই। কারণ সে সাহসী বীরপুরুষ। তাহার ভয় পাছে বহুকষ্টে সংগৃহীত সেই বহুমূল্য মাণিকটি তাহার হস্তচ্যুত হয়। দস্যুরা যেরূপভাবে তখনও তাহার অনুসরণ করিতেছে তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায় সেই মাণিকটি হস্তগত করিতে তাহারাও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

সমস্ত রাত্রি এই ভাবে কাটিল। যখন উষার আলোক

ধীরে ধীরে বিকশিত হইতেছে, আকাশ একটু ফরসা হইয়াছে—প্রকৃতির বুকের উপর অন্ধকার অনেকটা পরিস্কার হইয়াছে, তখন সে সবিস্ময়ে দেখিল—তাহার সম্মুখে এক উচ্চ প্রাচীর। এ প্রাচীর নিশ্চয়ই কাবুল সহরের না হইয়া যায় না।

কিন্তু নগরের প্রবেশদ্বারের সমীপবর্ত্তী হইয়া সে দেখিল দ্বার বন্ধ। সম্পূর্ণ প্রভাত না হইলে, সূর্য্যালোক ধরার বক্ষে স্বর্ণ কিরণ-বৃষ্টি না করিলে যে এই তোরণ দ্বার খোলা হয় না, তাহা অতি সহজেই বুঝিল।

পথে জনপ্রাণী নাই। গাছের উপর পাখীগুলা, প্রভাত সমুপস্থিত দেখিয়া থাকিয়া থাকিয়া মধুর ঝঙ্কার করিতেছে—শীতল বাতাস যেন সঞ্জীবনী শক্তি লইয়া তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিতেছে। প্রভাত সমীর স্পর্শে মোকারেবের শ্রান্ত দেহ অনেকটা বল সঞ্চয় করিল।

সেই নগরপ্রাচীরের অদূরবর্ত্তী এক স্থানে এক চতুষ্কোণ শিলাখণ্ড পড়িয়া আছে। পথশ্রান্ত মোকারেব এই শিলাখণ্ডের উপর তাহার উষ্ণীষবস্ত্র বিছাইয়া শয্যারচনা করিল। ঘোড়াটিকে একটি গাছে বাঁধিয়া রাখিয়া সে সেই পাষাণশয্যায় শয়ন করিল।

শান্তিদায়িনী নিদ্রার মায়াময় করস্পর্শে পথশ্রান্ত মোকারেব সকল কষ্ট ভুলিয়া স্বপ্নরাজ্যে উপস্থিত হইল। এই সময় আর এক অদ্ভুত ব্যাপার উপস্থিত। মোকারেব যখন নিদ্রায় অচেতন, সেই সময়ে ঊষার সেই বিরসান্ধকারে চারিজন লোক অতি সন্তর্পণে, পা টিপিয়া টিপিয়া তাহার দিকে অগ্রসর হইল। একজন ক্ষিপ্রহস্তে তাহার মুখ বাঁধিয়া ফেলিল। তাহাদের মধ্যে যে সর্ব্বাপেক্ষা বলিষ্ঠ সে তাহার বুকের উপর বসিয়া বলিল—"শয়তান! এইবার তোর কি হয়!"

মোকারেবের নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। সে চীৎকার করিবার চেষ্টা করিল—কিন্তু পারিল না—তাহার মুখ বাঁধা।

যে তাহার বুকের উপর বসিয়াছিল সে মনসুর। মনসুর বলিল—"যখন তুই আমাদের এত কষ্ট দিয়াছিস্ তখন আমরা যে খালি মাণিকটি লইয়া খুসী হইব, তা মনে ভাবিস্ না। তোকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া এই গাছের তলায় পুঁতিয়া রাখিব।"

মোকারেব সহসা সবেগে পাশ ফিরিয়া শুইবার চেষ্টা করিলে মনসুর তাহার উপর হইতে মাটিতে পড়িয়া গেল। মোকারেব তখনই উঠিয়া দাঁড়াইল—নিজের অস্ত্র বাহির করিতে গেল—কিন্তু তাহার সময় পাইল না। একজন দস্যু পশ্চাদ্দিক্ হইতে তাহার মস্তকে তরোয়ালের বাঁটের দ্বারা ভীষণ আঘাত করিল। সেই আঘাতেই মোকারেব ভূপতিত হইল। মাটীতে পড়িবার সময় চীৎকার করিয়া উঠিল—"হত্যা—নরহত্যা! কে কোথায় আছ রক্ষা কর।"

মনসুর তখনই একখানা ছোরা বাহির করিয়া মোকারেবের বুকে বিঁধিবার চেষ্টা করিতেছে, এমন সময়ে কোথা হইতে একজন দীর্ঘকায় লোক আসিয়া পশ্চাদ্দিক হইতে তাহার গ্রীবা ধরিয়া মাটীতে ফেলিয়া দিল। মনসুর সেই লোকটার মুখের দিকে চাহিবামাত্রই বুঝিল, ইহারা কাবুলপতির সেনা। সে একা নহে। তাহার সঙ্গে আরও সাতজন লোক। সে বুঝিল আর তাহার নিস্তার নাই। কাবুলাধিপতিও যে তাহার মস্তকের জন্য এক হাজার মুদ্রা পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছেন তাহাও সে শুনিয়াছিল।

সেনারা দস্যুচতুষ্টয়কে উত্তমরূপে বাঁধিয়া ফেলিল। প্রধান প্রহরী বলিল—"কে তোরা? জানিস্ না আমাদের আমীরের রাজ্য কিরূপ সুশাসিত? তাঁহার রাজধানীর নিকটে এই নরহত্যা!"

দস্যুদের কেহই কোন কথা কহিল না। মনসুর বলিল—"পরিচয় দিতে আমরা বাধ্য নই। ইচ্ছা হয় তোমরা আমাদের আটক করিতে পার।"

একজন কাবুলী সেনা তাহার বক্ষ হইতে একটি ক্ষুদ্র বংশী বাহির করিয়া সঙ্কেতধ্বনি করিল। সেই সঙ্কেতধ্বনির কঠোর শব্দ বায়ুস্তরে বিলীন না হইতে হইতে আরও চারিজন সেনা সেই স্থলে উপস্থিত হইল। যে সঙ্কেতধ্বনি করিয়াছিল তাহাকে দেখিয়া তাহারা মস্তক অবনত করিয়া সেলাম করিল। এই ব্যক্তিই কাবুলাধিপতির প্রধান পুরীরক্ষক।

সে বলিল—"তোমাদের দুইজন এই মূর্চ্ছিত দেহ সাহজাদীর কাছে লইয়া যাও। তিনি যেরূপ আদেশ করিবেন সেইরূপ করিও। তাঁহার আদেশেই ইহার উদ্ধারের জন্য আমরা এখানে আসিয়াছি। তোমরা দুইজন আমাদের সঙ্গে থাক। এই চারিটা শয়তানকে নিরাপদে কয়েদখানায় পৌছাইয়া দিতে হইবে।

প্রহরীরা আদেশ প্রাপ্তিমাত্র মোকারেবের মূর্চ্ছিত দেহ তুলিয়া লইয়া প্রাসাদের দিকে গেল। আর বাকী ছয়জন প্রহরী সেই দস্যুদের বন্দী করিয়া তোরণদ্বার দিয়া নগরের মধ্যে প্রবেশ করিল। তখন নগরদ্বার খোলা হইয়াছে।

(৬)

"আমি কোথায় ?"

কেহ এ কথার উত্তর দিল না। মোকারেব এক সুসজ্জিত কক্ষ মধ্যে এক দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শুইয়া আছে। সে কক্ষসজ্জা রাজকক্ষের মত। কক্ষতল মর্ম্মরমণ্ডিত। ছাদের উপর বিচিত্র সোণালীর কাজ। দেওয়ালের গায়ে লতাপাতা ও ফুল। কক্ষের সর্ব্বত্রই মিনার কাজ করা।

মোকারেব কক্ষসজ্জা দেখিয়া বিস্মিত হইল। তাহার পূর্ব্বস্মৃতি ফিরিয়া আসিল। তাহার মনে পড়িল—সে এক খণ্ড পাষাণের উপর শয্যারচনা করিয়া পথশ্রান্তি দূর করিবার জন্য শয়ন করিয়াছিল। তারপর তাহাকে ডাকাতে আক্রমণ করে। তারপর আর তাহার কিছুই মনে পড়ে না।

মোকারেব আবার ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, "আমি কোথায় ?"

এক সুন্দরী আসিয়া মোকারেবের শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইল। তাহার মুখমণ্ডল উন্মুক্ত। সে পরমা সুন্দরী। সে যেন সেই তুষারমণ্ডিত, পার্ব্বত্য প্রদেশের স্বপ্নময়ী দেবী।

সে বলিল—"সাহেব! আপনার চিন্তার কোন কারণ নাই। আপনি উত্তম স্থানেই আছেন। বেশী কথা কহিবেন না। চিকিৎসকের নিষেধ।"

মোকারেব বলিল—"আমি দুইটি প্রশ্ন করিতে ইচ্ছা করি। আপনার দেবীমূর্ত্তি দেখিয়া বোধ হইতেছে—আপনি পরম করুণাময়ী। আপনি কে ? পরিচয় দিন।"

সেই রমণী বলিল—"আমি সাহজাদী জুলেখার বাঁদী—"

মোকারেব বিস্মিতভাবে অস্ফুটস্বরে বলিল—"বাঁদী! বাঁদীর এত রূপ! না জানি ইহার কর্ত্রী দেখিতে কেমন।" এই কথা শুনিয়া সেই বাঁদী যেন একটু লজ্জিতা হইল। রূপের প্রশংসা শুনিলে অনেক রমণীই এইরূপ হইয়া থাকে। বিশেষতঃ এই প্রশংসাটা যদি পুরুষের মুখে হয়।

মোকারেব বলিল—"আমি এখানে আসিলাম কিরূপে ?"

বাঁদী বলিল—"মহাপরাক্রান্ত, আফগানিস্থানের সম্রাট্ দোস্ত মহম্মদ খাঁর কন্যার করুণায় ও অনুগ্রহে। যেদিন প্রভাতে আপনাকে ডাকাতে আক্রমণ করে, সেদিন সাহজাদী জুলেখা প্রাতর্ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন। আপনি সেস্থানে মূর্চ্ছিত হন, তাহার নিকটেই তাঁহার "দেল্‌আরাম" নামক প্রমোদোদ্যান। সাহজাদী আপনার চীৎকার শুনিতে পাইয়াই প্রহরীদের আপনার উদ্ধারার্থে প্রেরণ করেন।"

মোকারেব—জোড়হস্তে উর্দ্ধদিকে চাহিয়া বলিল—"খোদা ধন্য।" তারপর সে তাহার বস্ত্রের সেই নিভৃত স্থানটি অনুসন্ধান করিল ও মহোৎসাহে বলিল—"খোদা মেহেরবান", কারণ সে মাণিকটি অপহৃত হয় নাই—যথাস্থানেই আছে। মোকারেব অশ্রুপূর্ণ নেত্রে বলিল—"যিনি এ হতভাগ্যের জীবনরক্ষা করিয়াছেন, যিনি মূর্ত্তিমতী করুণারূপে, এক আশ্রয়হীন পথিককে, আশ্রয় দিয়াছেন—সেই সাহজাদীকে কি আমি একবার দেখিতে পাইব না ?"

বাঁদী বলিল—"সময় হইলে আপনি তাহার দেখা পাইবেন। এখন আপনি বেশী কথা কহিবেন না। স্থিরভাবে থাকুন। আপনার মাথার আঘাত অতি গুরুতর। হকিমের নিষেধ যেন কোনরূপে আপনার মানসিক উত্তেজনা বৃদ্ধি না হয়।"

বাঁদী একটি পাত্রে ঔষধ ঢালিয়া মোকারেবের সম্মুখে ধরিল। মোকারেব সেই ঔষধ পান করিলেন। ঔষধের ক্রিয়াবশে অচিরকালমধ্যে নিদ্রা আসিল। মোকারেব, নিদ্রায় স্বপ্ন দেখিল—অতুলনীয়া সুন্দরী, অপ্সরোরূপিণী অনুপমেয় জুলেখা যেন তাহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া দিতেছে।

কি সুন্দর রূপ! এ রূপ যে দেবলোকে দুর্ল্লভ, এ রূপের যে তুলনা নাই। মুখ চোখ, যেন শ্রেষ্ঠ চিত্র-শিল্পীর সজীব চিত্রের পূর্ণ সাফল্য। চূর্ণ অলকার সৌন্দর্য্য কি মনোহর! রক্তোৎফুল্ল ওষ্ঠাধরবিলম্বী মৃদু হাস্যের কি একটা উন্মাদিনী শক্তি! মোকারেব মানসিক উত্তেজনা-বশে চীৎকার করিয়া বলিল—"জুলেখা—সাহজাদী! আমি

অতি হতভাগ্য! আমার প্রতি করুণা কর—আমার উপর সদয় হও।"

এই সময়ে নিদ্রিত মোকারেবের শয্যাপার্শ্বে বসিয়া সাহজাদী জুলেখা অতি মৃদুস্বরে তাঁহার বাঁদীর সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন। সহসা এই নিদ্রিত মুসাফের মুখে তাঁহার নামোচ্চারিত হইতে দেখিয়া জুলেখা লজ্জায় সে স্থান ত্যাগ করিলেন।

(৭)

ইহার পর আরও এক সপ্তাহ কাটিয়াছে। মোকারেব এখন সম্পূর্ণ সুস্থ।

একদিন আফ্‌গানেশ্বর তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন। মোকারেব পূর্ব্বেই এ সংবাদ পাইয়াছিলেন যে, বাদশা তাঁহাকে দেখিতে আসিবেন।

মোকারেব মনে মনে একটা সংকল্প স্থির করিল। সে মনোমধ্যে আলোচনা করিতে লাগিল—তাহার জীবন বহুমূল্য, কি, এই মণি বহুমূল্য! এই মণির জন্য যে তাহার জীবন বিপন্ন হইয়াছিল। এ মণি লইয়া তাহার কি হইবে? বাজারে বিক্রয় করিতে গেলে দিল্লী আগ্রা মণিকারের বিপণী ভিন্ন আর কোথাও ইহা বিক্রীত হইবে না। এত দাম দিয়া এ রত্ন কিনিতে অপরে সমর্থ হইবে না। আমার এই মণি বিক্রয় করিতে হইলে, সম্রাটের মুকিম যোধ্‌মল শেঠের গদিতেই যাইতে হইবে। যোধ্‌মলের নিকট এ মণি বিক্রয়ের চেষ্টা করিতে গেলে কথাটি আকবর সাহের কাণে উঠিবে তাহাতে তাহার জীবন বিপন্ন হইবে। তাহার স্থিরসিদ্ধান্ত এই দাঁড়াইল যে, "হজরতের মাণিক" কাছে রাখিলে যখন এত বিপদ তখন ইহাকে বিদায় করাই উচিত।

আফ্‌গানেশ্বরের অন্য সন্তানসন্ততি নাই। কেবল এই একমাত্র কন্যা জুলেখা। এই কন্যা সম্রাটের নয়নের মণি। জুলেখা পিতার অনুমতি লইয়াই এই আহত পথিকের সেবাকার্য্যে ব্রতী হইয়াছিল।

আফ্‌গানেশ্বর তাঁহার রাজ্যের প্রধান সচিবদ্বয়কে সঙ্গে লইয়া মোকারেব যে কক্ষে ছিলেন, তথায় দেখা দিলেন।

মোকারেব নতজানু হইয়া সম্রাটের বস্ত্রপ্রান্ত চুম্বন করিয়া অশ্রুপূর্ণ-নেত্রে, কৃতজ্ঞতা জানাইয়া বলিল "সাহানশা—আপনার করুণাময়ী কন্যার দয়াতেই আমার এ ছার জীবন বাঁচিয়াছে। আমি সেই করুণারূপিণী দেবীকে চক্ষে দেখি নাই, কিন্তু মনে মনে তাঁহার এক প্রতিমা চিত্র করিয়াছি! খোদার এ দুনিয়ায় তিনি দুর্লভ রত্ন। কৃতজ্ঞতা জানাইবার শক্তি আমার নাই, সামর্থ্য আমার নাই। আমি হিন্দুস্থানের সম্রাট্ আকবর শাহের অধীনস্থ একজন সামান্য সৈনিক। হজরৎ দুর্গাধিপতি জবরদস্ত খাঁয়ের কনিষ্ঠ সহোদর।

এই পরিচয়ই যথেষ্ট হইল। আফ্‌গানেশ্বর বলিলেন, "তোমার জ্যেষ্ঠ আমার বিশেষ স্নেহভাজন। তিনি হজরৎ দুর্গের ভারপ্রাপ্ত হইয়া একবার গজনীতে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যান। শুনিয়া খুসী হইলাম তুমি জবরদস্ত খাঁর কনিষ্ঠ। আরও আনন্দের কথা এই, আমার কন্যার শুশ্রূষায় আমার এক বন্ধুর সহোদরের জীবন রক্ষা হইয়াছে।"

মোকারেব আবার নতজানু হইয়া আফ্‌গানেশ্বরের বস্ত্রপ্রান্ত চুম্বন করিলেন। আফ্‌গানেশ্বর মোকারেবের হস্তধারণ করিয়া তুলিয়া তাহাকে বলিলেন—"তুমি এখন দুর্ব্বল, ঐ আসনে উপবেশন কর। আমি অনুমতি দিতেছি।"

সম্রাট্ আসন গ্রহণ করিয়া বলিলেন—"তুমি কাবুলে আসিলে কিরূপে? তোমার সঙ্গে রক্ষকমাত্র ছিল না—ব্যাপার কি?"

তখন মোকারেব খাঁ আগ্রহপূর্ণনেত্রে হজরৎ দুর্গের সমস্ত ব্যাপার আফ্‌গানসম্রাটের নিকট ব্যক্ত করিলেন। সম্রাট্ সে ভীষণ কাহিনী শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন।

তিনি উজীরকে বলিলেন—"যে চারিজন ডাকাত সেদিন কারাবদ্ধ হইয়াছে, তাহারা নিশ্চয়ই মনসুরের দলের লোক। আমার আদেশ আজই তাহাদের আবক্ষ ভূপ্রোথিত করিয়া কাবুলি কুকুর দিয়া খাওয়াও। সেই চারিজনের মধ্যে যে লোকটা খুব মোটা, খুব কৃষ্ণবর্ণ সেইই মনসুর। জবরদস্ত খাঁ ইহাকে ধরিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছিলেন। তাঁহার মুখেই আমি তাহার ঐরূপ আকৃতির কথা শুনিয়াছিলাম।"

মনোরম পরিচ্ছদে বিভূষিতা, পরমরূপশালিনী জুলেখার কমনীয় সৌন্দর্য্যে সেই কক্ষ যেন দীপ্তিময় হইয়া উঠিল। (৬৩২ পৃষ্ঠা)

মোকারেব কৃতজ্ঞচিত্তে, তাহার বক্ষো-বস্ত্র হইতে সেই পদ্মরাগমণি বাহির করিয়া আফগানেশ্বরের নিকটে ধরিল। নম্রস্বরে বলিল—"সাহানশা! এ দীন কৃতজ্ঞতা জানাইবার জন্য এই লোকবিশ্রুত মণিটি আপনাকে উপহার দিতেছে -ইহাই দেশ বিখ্যাত "হজরতের মাণিক।"

"হজরতের মাণিক! এ যে বহুমূল্য রত্ন। আমি জানি পাঁচলাখ টাকা ইহার মূল্য। বৎস! আমি তোমার এ সাদর উপহার অমূল্য মাণিক গ্রহণ করিলাম।"

আফগানেশ্বর কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিলেন। তৎপরে প্রসন্নমুখে বলিলেন—"মোকারেব, আফগানরাজ্যেশ্বর কাহারও নিকট কৃতোপকারের মূল্য গ্রহণ করেন না। দান-প্রতিদান সংসারের নিত্য ক্রিয়া। তুমি যেমন আমায় এই বহুমূল্য মাণিকটি দিয়াছ- ইহার পরিবর্ত্তে আমি তোমাকে আর একটি দুষ্প্রাপ্য রত্ন দিব। আমি তোমার বংশ-পরিচয় জানি! তুমি পবিত্র সৈয়দবংশসম্ভূত। আমার পুত্রসন্তান নাই—সিংহাসনের অধিকারী নাই। খোদা তোমাকে ঘটনাচক্রের অধীন করিয়া আমার রাজধানীতে উপস্থিত করিয়াছেন। এই জড় মাণিকের পরিবর্ত্তে আমি তোমাকে একটি জীবন্ত মাণিক দিব।

"এই মাতৃহীনা কন্যা—আমার নয়নের মণি জুলেখাকে তোমায় দিলাম।"

আফগানপতি তৎক্ষণাৎ তাঁহার উজীরকে কাণে কাণে কি বলিয়া দিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে উজীর সাহেব, জুলেখাকে সঙ্গে লইয়া সেই কক্ষমধ্যে উপস্থিত হইলেন।

মনোরম পরিচ্ছদে বিভূষিতা, পরম রূপশালিনী জুলেখার কমনীয় সৌন্দর্য্যে সেই কক্ষ যেন দীপ্তিময় হইয়া উঠিল।

সম্রাট্ মোকারেবকে স্নেহপূর্ণস্বরে বলিলেন- "এই মাতৃহীনা কন্যা—আমার নয়নের মণি জুলেখাকে তোমায় দিলাম। এর পর তুমি মনে মনে বিচার করিও "হজরতের মাণিকে"র অপেক্ষা ইহা শ্রেষ্ঠদান কি না। আমার সন্তানাদি নাই— তুমিই আমার মৃত্যুর পর এ রাজ্যের অধীশ্বর।" মোকারেব অবনত-মস্তকে সহর্ষচিত্তে আফগানসম্রাটের প্রদত্ত অমূল্য উপহার গ্রহণ করিলেন।

শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।

দ্বিজেন্দ্র-প্রয়াণ।

১

একদিন ঋষি ভরত আসিয়া
কহিলেন মৃদু-মধুর হাসিয়া
সম্বোধি গন্ধর্ব্ব দেবতাগণে,
আজি করিয়াছি এই মনোনীত,
"বঙ্গ-কাব্যকুঞ্জ" হবে অভিনীত
বৈজয়ন্তধামে নন্দনবনে।

২

দেবতা গন্ধর্ব্ব অপ্সর সকলে,
আনন্দে, উল্লাসে, অতি কুতূহলে,
চাহিলা ঋষির বদন পানে ;
কে করিবে "বঙ্গকাব্য" অভিনয় ?
কে বাজাবে কোন্ বাদ্য রসময় ?
কে তুষিবে কোন্ সঙ্গীত গানে ?

৩

মধু বাজাইবে ভেরী গম্ভীরে,
সাজিবে প্রমীলা সমর-সাজে,
বাজায়ে মুরলী যমুনার তীরে,
নাচাবে গোপিকা ব্রজের মাঝে।

৪

দীনবন্ধু খুলি রসের ভাণ্ডার
সিন্ধু-সেতারে ধরিবে গান,
কখন হাসাবে কখন কাঁদাবে
কখন ধরিবে দীপকে তান।

৫

শিখরে শিখরে করি তুঙ্গ রব
বাজাইবে হেম প্রলয় বিষাণ,
পরহিত ব্রতে দধীচি দানিবে
আপন অস্থি, আপনার প্রাণ।

৬

নবীন করিবে ডমরুর ধ্বনি,
পলাশী-প্রান্তরে মোহনলাল
গর্জ্জিবে দুর্জ্জয় কামানের সহ
দিগন্ত ছাইয়া, কালান্ত কাল।

৭

কিন্তু কে গায়িবে আজি এ সভায়
স্বদেশ সঙ্গীত ব্যাকুল প্রাণে ?
বিদ্রূপের ছলে জাগায়ে ইঙ্গিতে
কে করিবে মুগ্ধ হাসির গানে ?

৮

চিন্তিত অন্তরে ঋষি চূড়ামণি
অবনীর পানে হেলায়ে তর্জ্জনী
ইঙ্গিত করিলা পুষ্পকে তখনি,
চলিল পুষ্পক ধরার পথে ,
মর্ত্তে কবি হেথা কাব্যকুঞ্জবনে
আছিলা নিরত বিচিত্র চিত্রণে।
সম্মুখে পুষ্পক নিরখি নয়নে
লেখনী ছাড়িয়া উঠিলা রথে।

৯

ছুটিল বিমান উঠিল গগনে,
পলকে লঙ্ঘিয়া রাশি চক্রগণে,
কবিকে লইয়া পশিল নন্দনে,
সেথায় উঠিল আনন্দ রোল।
হেথা পুণ্যতোয়া জাহ্নবীর তীরে
বান্ধব মণ্ডলী সিক্ত নেত্র নীরে
শোয়াইলা শব, করুণ গম্ভীরে
উচ্চারিলা ধ্বনি "বল হরিবোল।"

১০

সেই ক্ষণজন্মা মানব অগ্রণী
নরকুল ধন্য ; মরণে যাঁহার,
পরলোকে উঠে জয় জয় ধ্বনি,
ইহলোকে লোক করে হাহাকার।

পাহাড়িয়া পাখী।

ননদ-ভাজ।

চারিটি (চারু) চিত্র।

(বঙ্কিমচন্দ্রের আখ্যায়িকাবলি অবলম্বনে।)*

বাঙ্গালীর সংসারে নববধূ বালিকাবয়সেই স্বামিগৃহে পদার্পণ করে। সেই দিন হইতে এক রকম সারাজীবন যখন তাহাকে পরের (?) ঘরে কাটাইতে হইবে, তখন তাহার বাল্যসখী সহোদরা ভগিনীর সঙ্গে দেখাশুনার সম্ভাবনা কম; বরং স্বামীর ভগিনীর সঙ্গে দেখাশুনা ঘরকরনার সম্ভাবনা বেশী। এ অবস্থায় ননদ ভাজে সখীত্ববন্ধন ঘটিলে সোণার সংসার হয়। কিন্তু বাঙ্গালীর সংসারে ননদ-ভাজের মধ্যে অহি-নকুল সম্বন্ধ, এইরূপ লোক-প্রসিদ্ধি। সংস্কৃত সাহিত্যে বা প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে কোথাও ননদ-ভাজের একত্র বসবাসের বা সদ্ভাব-সম্প্রীতির চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে বলিয়া মনে পড়ে না। পক্ষান্তরে, শাশুড়ী-ননদের হাতে গৃহস্থ-বধূর লাঞ্ছনা-গঞ্জনার কথাই প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে, প্রবাদ-বাক্যে, সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানে, ব্রত নিয়মে, ও বাস্তব জীবনে, শুনিতে পাওয়া যায়। সাধারণতঃ বিধবা শাশুড়ী বাঙ্গালীর ঘরে গৃহিণী-পণা করেন ও বধূকে অল্প-বিস্তর নির্যাতন করেন। অথবা (স্বামীর বয়োঽধিকা) নিঃসন্তানা ননন্দা গৃহের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী হইয়া বিরাজ করেন, তাঁহার বাক্য-যন্ত্রণায় গৃহস্থ-বধূ জড়সড়। আমাদের খাঁটি বাঙ্গালী-সমাজে ইহাই সাধারণ নিয়ম। (১)

সাহিত্যক্ষেত্রে দেখি———('Nectar-mouthed mother-in-law') সুধামুখী শাশুড়ী-ননদের দৃষ্টান্ত বৈষ্ণব-সাহিত্যে জটিলা-কুটিলাতে প্রকট। তবে জটিলা-কুটিলার পক্ষে এইটুকু বলা যায় যে, তাঁহারা কৃষ্ণলীলার গুহ্য তত্ত্ব বুঝেন নাই, সুতরাং তাঁহাদিগের বিবেচনায় শ্রীরাধার অপরাধ গুরুতর। কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতে দেবীকে ব্যাধ-রমণী জিজ্ঞাসা করিতেছে :—

'শাশুড়ী-ননন্দ, কিবা কৈল মন্দ, সত্য কথা কহ মোরে।'

আবার কালকেতু ফুল্লরাকে বলিতেছে :—

'শাশুড়ী-ননদী নাহি নাহি তোর সতা।
কার সনে দ্বন্দ্ব করা। চক্ষু কৈলি রাতা॥'

ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে দেবীকে জয়া পিত্রালয়ে যাইতে নিষেধ করিয়া বলিতেছেন :—

'জননীর আশে, যাবে পিতৃবাসে,
ভাজে দিবে সদা তাড়া।'

ননদের উপর ভাজের কত টান ইহা হইতে তাহা বিলক্ষণ প্রকটিত হইয়াছে। বিদ্যাসুন্দরে কবি আরও ঘোরালো করিয়া বলিয়াছেন :—'সতিনী বাঘিনী, শাশুড়ী রাগিণী, ননদী নাগিনী, বিষের ভরা।' উক্ত কাব্যে পাঁচ পুত্র নৃপতির সবে যুবজানি শুনি বটে, কিন্তু এই যুবতী ভাজদিগের সঙ্গে বিদ্যার সদ্ভাব সম্প্রীতির, সখীত্ববন্ধনের, এমন কি, একত্রবাসের কথা কোথাও উল্লিখিত হয় নাই। শেষ খাঁটি বাঙ্গালী কবি ঈশ্বরগুপ্ত পৌষ-পার্ব্বণের সুখ-সমৃদ্ধি-বর্ণনায় বলিয়াছেন :—'বধূর রন্ধনে যদি যায় তাহা এঁকে। শাশুড়ী-ননদ কত কথা কয় বেঁকে॥···বধূর মধুর খনি মুখ শতদল। সলিলে ভাসিয়া যায় চোখ ছলছল॥···প্রাণে আর নাহি সয় ননদের জ্বালা। বিষমাখা বাক্য-বাণে কাণ হ'ল কালা॥' আবার মুখরা মেঝ বৌ শাশুড়ী-ননদীর নামে স্বামি-সকাশে চুকুলি কাটিতেছে,—গুপ্ত-কবি সে চিত্রও ফুটাইয়াছেন। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে শাশুড়ী ননদের সঙ্গে বধূর কি মধুর সম্পর্ক, ননদ-ভাজে কি দারুণ ভালবাসা, তাহা এই সব উদাহরণ হইতেই বেশ বুঝা গেল।

ব্রত-নিয়মে বঙ্গবালা যে সব সাধ-আহ্লাদ করিয়া ঠাকুর-দেবতার কাছে মানত করেন, তাহার ভিতর 'শঙ্কর হেন স্বামী পাব, কার্ত্তিক গণেশ পুত্র পাব, লক্ষ্মী-সরস্বতী কন্যা পাব, ভীম-অর্জ্জুন ভাই পাব' অথবা 'রামের মত পতি পাব, লক্ষ্মণের মত দেওর পাব, লব-কুশ পুত্র পাব, সীতার

---

* কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউট হলে পঠিত। (২রা শ্রাবণ ১৩২০)। দেশপূজ্য স্যর শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

(১) কেহ কেহ বলেন এখন দিনকাল ফিরিয়াছে। এখন বধূই রণচণ্ডী। কিন্তু আজকালকার দিনেও ত সংবাদপত্রের স্তম্ভে শাশুড়ীর হস্তে বধূর নির্যাতনের মোকদ্দমার বিবরণ প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়।

মত সতী হব' এমন কি 'দশরথ শ্বশুর পাব, কৌশল্যা শাশুড়ী পাব'—এ সব সাধ আছে, কিন্তু ননদ সম্বন্ধে কোন সাধ নাই। সে যে একেবারেই বন্ধ্যাপুত্রের মত অসম্ভব! বাঙ্গালীর বিবাহ-প্রথায়, বালিকা ননন্দাকে প্রসন্ন করিবার জন্য, ননদ-পেটারি, দুয়ার-ধরুনি, ঘট-নামানি প্রভৃতি অনুষ্ঠান আছে—পাছে বড় হইয়া "ননদিনী" "রায়বাঘিনী" হইয়া দাঁড়ায়। আবার এ হেন ননদের উপর ভাজের কত প্রাণের টান তাহার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত 'ভাল কথা মনে হ'ল আঁচাতে আঁচাতে। ঠাকুরঝিকে নিয়ে গেল নাচাতে নাচাতে' ইত্যাদি ছড়ায় রহিয়াছে। (২) বৈয়াকরণের মতে ন-নন্দ হইতে যদি ননন্দর ব্যুৎপত্তি হয়, তবে ত এ নামের সঙ্গে আনন্দ আবদারের, সাধ-আহ্লাদের, সম্প্রীতি-সদ্ভাবের, কোন সম্পর্কই থাকিতে পারে না।

বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের সাহিত্যে বিকৃত বিলাতী আদর্শ আমদানী করিয়াছেন বলিয়া একশ্রেণীর সমালোচকগণ সময়ে অসময়ে তাঁহার নিন্দাবাদ করেন। এ কথা কত দূর বিচারসহ, তাহা সময়ান্তরে আলোচনা করিবার ইচ্ছা আছে। এক্ষণে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার অনন্যসাধারণ কল্পনা-বলে, বাঙ্গালী জাতির কল্যাণ-কামনায়, নূতন আদর্শে সমাজ গঠন চেষ্টায়, বাঙ্গালীর পারিবারিক জীবনে ননদভাজের স্নেহবন্ধন ঘটাইয়াছেন, অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া তুলিয়াছেন, মরুভূমিতে উৎস উৎসারিত করিয়াছেন—ইহা কি তাঁহার কম কৃতিত্ব? এই নূতন আদর্শের জন্য, প্রত্যেক বিবাহিত পুরুষের, প্রত্যেক বিবাহার্থী পুরুষের, প্রত্যেক কুলবধূর, প্রত্যেক কুলকন্যার, বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সংস্কৃত সাহিত্যে বা প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র এ আদর্শ পান নাই (৩)। সীতা, (৪) সাবিত্রী, শৈব্যা, শকুন্তলা, দ্রৌপদী, দময়ন্তী, চিন্তা ইত্যাদির ননদ ছিল না। খুল্লনা ফুল্লরা, লহনা রত্নাবতী, প্রভৃতিরও ননদ ছিল না। মনস্বী লেখক ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় পারিবারিক-জীবন সম্বন্ধে অনেক কথা তাঁহার "পারিবারিক প্রবন্ধে" বিচার করিয়াছেন, তিনিও ননদ ভাজ সম্বন্ধে কোন কথা সাক্ষাৎসম্বন্ধে বলেন নাই। সমসাময়িক আখ্যায়িকাকার কেহই এ পথে পা দেন নাই। সত্য বটে, রমেশচন্দ্রের 'মাধবীকঙ্কণ' ও 'সমাজে' এরূপ চিত্র অঙ্কিত আছে, কিন্তু রমেশচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রের পরে, এমন কি তাঁহার পরামর্শে, আখ্যায়িকা রচনা করিতে আরম্ভ করেন। কথায় কথায় যে ইংরাজী সাহিত্যের কথা তুলিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের মৌলিকতার দাবি খর্ব্ব করা হয়, সে ইংরাজী সাহিত্য হইতে এই অভিনব আদর্শ আমদানী নহে—কেন না ইংরাজ সমাজে বিবাহের পর ভাই স্বতন্ত্র, বোন স্বতন্ত্র, (৫) পিতৃগৃহে কালেভদ্রে তাহাদের দেখা হয়। বাস্তবিক পক্ষে, যে সমাজে একান্নবর্ত্তী পরিবার নাই সে সমাজে এ আদর্শের সন্ধান করাই বাতুলতা। সাধারণতঃ বিবাহিত জীবনের চিত্রও বিলাতী নভেলে প্রদর্শিত হয় না, বিবাহের মধুরমিলনে গল্পের পরিসমাপ্তি হয়। অতএব সাধারণতঃ (৬) সে সমাজে ননদভাজের একত্রবাস কবি কল্পনায়ও আসিতে পারে না। তবে ভগিনার 'সমপাঠে সহযোগী কুরঙ্গনয়নী'র প্রতি ভ্রাতার প্রেমসঞ্চার হইতেছে

---

(২) কথিত আছে, ননদ-ভাজে এক সঙ্গে ঘাটে গিয়াছিলেন; সেখানে ননদকে কুমীরে টানিয়া লইয়া গেলে ভাজ তাহার উদ্ধারের চেষ্টা ত করেনই নাই, পরন্তু পরে ফিরিয়া সে কথা বলিতেও বিস্মৃত হইয়াছিলেন, শেষে পেট ভরিয়া আহার করিয়া আঁচাইবার সময় কথাটা মনে পড়াতে এই মজাদারী ছড়ার আকারে সেই শুভবার্ত্তা শাশুড়ীকে জ্ঞাপন করিলেন!

(৩) সংস্কৃত সাহিত্যে এক সুভদ্রা সত্যভামার বেলায় ননদ ভাজের মধুর সম্পর্ক পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাহাও কেবল সুভদ্রার কুমারী কালে। বিবাহিত জীবনে সুভদ্রার সত্যভামার সঙ্গে কিরূপ সম্প্রীতি ছিল, তাহার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না।

(৪) করুণ-রসের কবি ভবভূতি করুণা-পরবশ হইয়া সীতাদেবীর ননন্দা শান্তার অবতারণা করিয়াছেন—কিন্তু তাহাও গৌণভাবে।

(৫) এক ওয়ার্ডসওয়ার্থের বিবাহিত জীবনে ইহার ব্যত্যয় দেখি। আর মেকলে ভারতবর্ষে অবস্থানকালে কিছুদিন ভগিনী ভগিনীপতির সহিত একত্র বাস করিয়াছিলেন।

(৬) বিখ্যাত East Lynne আখ্যায়িকায় ননদ ভাজের একত্রবাসের যে চিত্র দেখা যায়, তাহা সদ্ভাবের চিত্র নহে।

এবং সে ক্ষেত্রে ভগ্নী দূতী (৭) ও সখী সাজিয়া বিবাহের ঘটকালী করিতেছেন, অথবা ভ্রাতার 'সহপাঠী কেলিচর, অভেদাত্মা হরিহর' ভগিনীর প্রেমাকাঙ্ক্ষী এবং সে অবস্থায় ভ্রাতা 'দুটি প্রাণে'র মিলনের কিঞ্চিৎ সহায়তা করিতেছেন —এরূপ চিত্র ইংরাজী সাহিত্যে বিরল নহে। কিন্তু তাহার সহিত আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয়ের অনেক প্রভেদ। অতএব এই সুন্দর আদর্শ প্রচারে বঙ্কিমচন্দ্রের মৌলিকতা ষোল আনা, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। (৮)

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম আখ্যায়িকায় ননদ-ভাজের নামগন্ধও নাই। থাকিবার কথাও নহে। কেন না তাহাতে নায়ক-নায়িকার দাম্পত্য-জীবনের ইতিহাস বিবৃত নহে। ইংরাজী নভেলের ন্যায় ইহাতেও পূর্ব্বরাগ, মিলন, মিলনান্তে বিচ্ছেদ (ন বিনা বিপ্রলম্ভেন সম্ভোগঃ পুষ্টিমাপ্নুয়াৎ, The course of true love never did run smooth); আবার বিচ্ছেদান্তে নানা বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া পুনর্ম্মিলনে পরিসমাপ্তি। (অনেকে হয়ত বলিয়া বসিবেন, এ ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র ইংরাজী নভেলের অনুকরণ করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহারা স্মরণ রাখিবেন, এরূপ ব্যাপার আমাদের সংস্কৃত কাব্য-নাটকেও বিরল নহে। দৃষ্টান্তরূপে মালতী মাধবের উল্লেখ করিতে পারি।) পূর্ব্বোক্ত কারণে দুর্গেশনন্দিনী, মৃণালিনী, রাধারাণী প্রভৃতিতে ননদ-ভাজের সমাগম নাই। যে সকল আখ্যায়িকায় দাম্পত্য-জীবন-যাপনের অবসর ঘটিয়াছে অর্থাৎ আরম্ভেই বিবাহ-ক্রিয়া সমাধা হইয়াছে, সেইগুলিতেই ননদ-ভাজের অবতারণা হইতে পারে।

এই শেষোক্ত শ্রেণীর আখ্যায়িকাগুলি অনুসন্ধান করিতে গেলে দেখা যায় যে, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার দ্বিতীয় আখ্যায়িকা কপালকুণ্ডলাতেই এই নূতন আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু প্রথম প্রথম যেন তিনি একটু ইতস্ততঃ করিতেছেন। তাই লিখিয়াছেন :—'নবকুমার পিতৃহীন, তাঁহার বিধবা মাতা গৃহে ছিলেন, আর দুই ভগিনী ছিল। জ্যেষ্ঠা বিধবা, তাঁহার সহিত পাঠক মহাশয়ের পরিচয় হইবে না। দ্বিতীয়া শ্যামাসুন্দরী, সধবা হইয়াও বিধবা, কেননা তিনি কুলীনপত্নী। তিনি দুই একবার আমাদিগকে দেখা দিবেন।' (দ্বিতীয় খণ্ড পঞ্চম পরিচ্ছেদ)। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সাধারণতঃ বাঙ্গালীর ঘরে বিধবা মাতা বা বিধবা সন্তানহীনা জ্যেষ্ঠা ভগিনী গৃহের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী হন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র এ ক্ষেত্রে নবকুমারের মাতাকে ও নবকুমারের জ্যেষ্ঠা ভগিনীকে (শ্যামার নজীরে তাঁহার নাম ক্ষামা কি বামা এই রকম একটা কিছু ছিল) back-ground এ কোণঠেসা করিয়া রাখিয়াছেন, সধবা কনিষ্ঠা ভগিনীকেই আসরে নামাইয়াছেন। ননন্দা বয়োজ্যেষ্ঠা এবং পতিপুত্রহীনা বালবিধবা হইলে প্রেম-স্নেহের অভাবে অনেক সময়ে তিক্তস্বভাব হইয়া পড়েন। (অবশ্য বহুস্থলে ইহার ব্যতিক্রমও দেখা যায়)। এই বুঝিয়াই বোধ হয় বঙ্কিমচন্দ্র উক্ত শ্রেণীর ননন্দা আসরে আনিতে ইচ্ছুক হন নাই। শুধু কপালকুণ্ডলায় কেন, বিষবৃক্ষে, চন্দ্রশেখরে, আনন্দমঠে, যেখানে যেখানে তিনি ননদ-ভাজের চিত্র আঁকিয়াছেন, সেখানে সেখানেই দেখি ননন্দা সধবা ও স্বামীর বয়ঃকনিষ্ঠা। কৃষ্ণকান্তের উইলে শৈলবতী নামমাত্র উল্লেখ আছে। সুতরাং তাহা ধর্ত্তব্য নহে। কপালকুণ্ডলায় শ্যামাসুন্দরী-মৃন্ময়ী, বিষবৃক্ষে কমলমণি-সূর্য্যমুখী, চন্দ্রশেখরে সুন্দরী-শৈবলিনী ও আনন্দ-মঠে নিমাই-শান্তি (৯) ননদ-ভাজের এই চারিটি চিত্র

---

(৭) ভগ্নীদূতী ভগ্নদূতের স্ত্রীলিঙ্গ নহে। ইতি ব্যাকরণ-বিভীষিকাকারের টিপ্পনী।

(৮) প্রবন্ধপাঠের পর কেহ কেহ বলেন, মাইকেলের 'একেই কি বলে সভ্যতা' ও ৺দীনবন্ধু মিত্রের কএকখানি নাটকে ননদ-ভাজের চিত্র আছে এবং সেগুলি বঙ্কিমচন্দ্রের আখ্যায়িকাগুলির পূর্ব্বে প্রকাশিত। অতএব বঙ্কিমচন্দ্রের মৌলিকতা ষোল আনা বলা যায় না। 'একেই কি বলে সভ্যতা'য় ও 'সধবার একাদশী'তে চিত্র দুইটি অনেকটা একই রকমের; দুইটি চিত্রই তত উজ্জ্বল নহে, বড় সংক্ষিপ্ত। 'জামাই-বারিকে' সদ্ভাব নাই, ভেজের গঞ্জনা আছে। 'লীলাবতী'তে চিত্রটি উজ্জ্বল বটে। কিন্তু লীলাবতীর যতটা ভালবাসা, ভাজ ক্ষীরোদ-বাসিনীর ততটা দেখি না।

(৯) যে সকল পাঠিকা ননদ বা ভাজ লইয়া ঘর করেন, তাঁহা-দিগের এই চারিখানি আখ্যায়িকা পাঠ করা অবশ্যকর্ত্তব্য।

অবলম্বনে একটু আলোচনা করিব। সমালোচক শ্রেষ্ঠ বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনা করি এমন শক্তি আমার নাই। তাঁহারই পুস্তকের অংশগুলি উদ্ধৃত করিয়া তাঁহারই কৃতিত্ব দেখাইব—যেমন গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা। অথবা বঙ্কিম-ইলিশ মাছের তেলেই মাছ ভাজিব। রন্ধনের দোষে চোঁয়াইয়া ফেলিব কি না জানি না।

ননদ-ভাজের এই চারিটি চিত্র তুলনায় সমালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলে কতকগুলি খুঁটিনাটি সৌসাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য চোখে পড়ে। শ্যামার স্বামিভাগ্য তত সুপ্রসন্ন নহে, সে স্বামি প্রেমে এক প্রকার বঞ্চিত, স্বামি প্রেম লাভের জন্য ব্যাকুল; পক্ষান্তরে জংলা মেয়ে কপালকুণ্ডলা স্বামী চেনে না, প্রেম জানে না, সংসারের সারসুখ বুঝে না, স্বামী অথচ তাহার রূপে পাগল, তাহার প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত, তাহার প্রেমলাভের জন্য লালায়িত। ননদ ভাজের ঠিক বিপরীত অবস্থা। আনন্দমঠের নিমাইএর শ্যামার সঙ্গে অনেক অংশে মিল থাকিলেও সে স্বামি-সোভাগ্যবতী, এ বিষয়ে শ্যামার সঙ্গে তাহার সম্পূর্ণ প্রভেদ; শান্তি কপালকুণ্ডলার মতই জংলা মেয়ে ছিল, কিন্তু সে কপালকুণ্ডলার মত সংসারসুখে বীতরাগ নহে, স্বামি-প্রেমলাভে আগ্রহশূন্য নহে, পক্ষান্তরে তাহার স্বামীই (ব্রতরক্ষার জন্য) তাহাকে দূরে রাখিতে চাহে—কপালকুণ্ডলার ঠিক উল্টা। চন্দ্রশেখরে সুন্দরীর স্বামি-ভাগ্য প্রায় শ্যামারই মত; পক্ষান্তরে চন্দ্রশেখর নবকুমারের মত পত্নীগতপ্রাণ, শৈবলিনী অথচ (কপালকুণ্ডলার মত) তাঁহাকে চাহে না; কপালকুণ্ডলার সঙ্গে এইটুকু সাদৃশ্য থাকিলেও যখন উভয়ের বিতৃষ্ণার কারণ সন্ধান করা যায়, তখন দেখা যায় আকাশ পাতাল প্রভেদ। বিষবৃক্ষে কমলমণি নিমাইএর মত স্বামি-সৌভাগ্যবতী; পক্ষান্তরে নগেন্দ্রনাথ (ক্ষণিক মোহবশতঃ) সূর্য্যমুখীর প্রতি বীতস্নেহ, আর সূর্য্যমুখী তাঁহার হারান ভালবাসা ফিরিয়া পাইবার জন্য উৎকণ্ঠিত। একেবারে চন্দ্রশেখর-শৈবলিনীর ঠিক উল্টা। এ সমস্ত বিচিত্র অবস্থায় ননন্দার সখীত্ব কিরূপ মনোরম হইয়াছে, আলোচনা করিয়া দেখা যাউক।

আখ্যায়িকাগুলি পর পর যেরূপ প্রকাশিত হইয়াছিল সেই ক্রম অবলম্বন না করিয়া, ননদ-ভাজের সখীত্ব-সম্পর্ক কিরূপে স্ফুট হইতে স্ফুটতর হইয়াছে, সেই ক্রম অবলম্বন করিয়া আলোচনা করিব। কপালকুণ্ডলায় কেবল দুইটি পরিচ্ছেদে (২য় খণ্ড ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ ও ৪র্থ খণ্ড প্রথম পরিচ্ছেদ) শ্যামার দর্শন-লাভ ঘটে। প্রথমটিতে দেখি, শ্যামা বনবাসিনীকে গৃহবাসিনী করিতে, যোগিনীকে গৃহিণী করিতে, সচেষ্ট। দ্বিতীয়টিতে দেখি, সে কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে। আর একটি কার্য্যসিদ্ধির জন্য শ্যামার এবার আবির্ভাব। শ্যামার স্বামি সৌভাগ্য ঘটাইবার জন্য, ননন্দার প্রতি স্নেহময়ী মৃন্ময়ী ঔষধ আহরণার্থ নিবিড় বনে গেল; এই ঔষধ-আহরণই তাহার কাল হইল। এস্থলে আখ্যায়িকাখানিকে নিদারুণ বিয়োগান্ত উপাখ্যানে পরিণত করিতে শ্যামার প্রয়োজন। কিন্তু তাই বলিয়া আমরা শ্যামাসুন্দরীর স্বার্থপরতার দোষ দিব না—দোষ অদৃষ্টের; অথবা আরও প্রণিধান করিয়া দেখিলে বুঝিব যে, কপালকুণ্ডলার চরিত্রের ভিতর এমন একটি জিনিস বীজরূপে ছিল যাহার অপ্রতিবিধেয় পরিণতি তাহার নিদারুণ জীবনাবসান। শ্যামা 'নিমিত্তমাত্র।' পাছে পাঠক এই কথা ধরিতে না পারেন সেই জন্য পূর্ব্ব সংস্করণে বঙ্কিমচন্দ্র চতুর্থখণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে এই অদৃষ্টতত্ত্ব পরিস্ফুট করিয়াছেন, এক্ষণে সেই পরিচ্ছেদ পরিত্যক্ত।

যাহা হউক, ইহার পর আর শ্যামাসুন্দরীর দেখা পাই না। প্লটের যে বিবর্ত্তনের জন্য তাহার প্রয়োজন ছিল, তাহা সংসাধিত হইয়াছে।

এইরূপ আনন্দমঠেও কেবল দুইটি পরিচ্ছেদে (১ম খণ্ড ১৫শ পরিচ্ছেদ ও ২য় খণ্ড ২য় পরিচ্ছেদ) নিমাইএর দর্শনলাভ ঘটে। প্রথমটিতে সে জীবানন্দের সঙ্গে শান্তির মিলন ঘটাইয়া দিল। এইখানেই তাহার কর্ত্তব্য ফুরাইল। দ্বিতীয়টিতে সেই মিলন ব্যাপারের কিঞ্চিৎ আলোচনা। তাহার পর হইতে শান্তির জীবনে এমন এক পরিবর্ত্তন আসিল যে, তখন নিমাইয়ের সখীত্ব তাহার কাছে অতি তুচ্ছ পদার্থ। সেই জন্য আর আমরা নিমাইকে দেখিতে পাই না।

কপালকুণ্ডলা ও আনন্দমঠ—উভয়ত্রই দেখিলাম ননদ-ভাজের সম্পর্ক ক্ষণিক, তড়িচ্চমকের মত আমাদের হৃদয়কে আলোকিত করে, উভয়ত্রই দাম্পত্য-চিত্র এত অল্প স্থান অধিকার করিয়াছে যে, এই মধুর সম্পর্ক বিকাশের সুবিধা

অবকাশ নাই। পক্ষান্তরে চন্দ্রশেখর ও বিষবৃক্ষে দাম্পত্য-চিত্র অনেক অধিক স্থান যুড়িয়া আছে, সুতরাং উভয় পুস্তকেরই নানাস্থলে নানাভাবে আমরা সুন্দরী ও কমলমণির দেখা পাই

এক্ষণে এক এক করিয়া চারিটি চিত্রের বিশদ আলোচনা করিব।

(১) শ্যামা।

নবকুমার হিজলির জঙ্গল হইতে জংলা মেয়ে ধরিয়া আনিয়াছেন, 'বনবিহঙ্গিনী'কে সংসার পিঞ্জরে পুরিয়াছেন। পাখীকে পোষ মানাইবার জন্য, বনবাসিনীকে গৃহবাসিনী করিবার জন্য, একজন স্নেহশীলা সঙ্গিনীর প্রয়োজন। সেই প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্য শ্যামাসুন্দরীর আবির্ভাব। নামটি হয়ত আজকালকার কোমলপ্রাণ পাঠক পাঠিকার পছন্দ হইবে না, কিন্তু যাহার জন্য এই আয়োজন তাহার কাণে নামটি নিশ্চয়ই মধুর বাজিয়াছিল—কেন না কপালকুণ্ডলা অবাল্য যে দেবতার আরাধনা করিয়াছে, যে দেবতা তাহার ধ্যান-জ্ঞান, এ যে সেই দেবতারই নাম। বহুবিবাহের ফলে কুলীনদের ঘরে তখনকার দিনে অনেক সময়েই সধবা ভগিনী ভ্রাতৃ পরিবারে থাকিতেন (এখনও বিরল নহে)—শ্যামা সেই শ্রেণীর; সচরাচর বাঙ্গালীর ঘরে বিধবা ভগিনী গৃহকর্ত্রী, শ্যামা তাহা নহে পূর্ব্বেই বলিয়াছি। শ্যামা নিজে স্বামি-সুখে একপ্রকার বঞ্চিত, কিন্তু তাই বলিয়া সে ভ্রাতৃবধূকে রমণী-জীবনের সেই সারসুখ ভোগ করাইতে এক দণ্ডের তরেও নিবৃত্ত নহে। শ্যামার সঙ্গে প্রথম পরিচয়েই দেখি, সে স্বামি-প্রেমের একমাত্র ভোগদখলকারিণী না হইয়াও সদা প্রফুল্ল, ভ্রাতৃবধূর মনোরঞ্জনে, তাহাকে সাজাইতে, তাহাকে স্বামীতে অনুরক্তা করিতে, কতই না কৌশল করিতেছে। এই ত স্নেহময়ী ননন্দার প্রকৃত কায। প্রথমেই যখন এই যুবতী-যুগলকে একত্র দেখিতে পাই, তখন দেখি শ্যামাসুন্দরী ছড়া কাটিয়া পতি-পত্নীর ভালবাসার ব্যাখ্যানা করিতেছেন, সঙ্গে সঙ্গে ভ্রাতৃবধূর চুল বাঁধিয়া দিবার যোগাড় করিতেছেন। এই চুল বাঁধিয়া দেওয়া বাঙ্গালী নারী-জীবনে একটি কবিত্বময় ব্যাপার, নারীহৃদয়ের কত সোহাগ-যত্ন, কত আদর-ভালবাসা, এই সামান্য কার্য্যের ভিতর দিয়া ফুটিয়া উঠে। তাই বঙ্কিমচন্দ্র আবার বিষবৃক্ষে ও আনন্দমঠে এই দৃশ্যের অবতারণা করিয়াছেন। বাঙ্গালী জীবনের এতটুকু সূক্ষ্ম অংশও তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়ায় নাই। (রমেশচন্দ্রের 'সমাজ' এই মধুর দৃশ্যে আরম্ভ। রমেশচন্দ্রের পুস্তক অবশ্য কপালকুণ্ডলার অনেক পরবর্ত্তী)। চুল বাঁধিতে বাঁধিতে শ্যামাসুন্দরী কত আদর করিতেছেন, যোগিনীকে গৃহিণী করিবার জন্য কত চেষ্টা করিতেছেন। আমরা পাঠক-পাঠিকার স্মরণের জন্য পরিচ্ছেদটির (২য় খণ্ড ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ) কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। বাস্তবিকই এই মধুর দৃশ্য সমস্ত আখ্যায়িকাটিকে মধুময় করিয়াছে।

দ্বিতীয় খণ্ড, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ। শ্যামাসুন্দরী একটি শৈশবাভ্যস্ত কবিতা বলিতেছিলেন, যথা—

> "বলে—পদ্মরাণী, বদনখানি, রেতে রাখে ঢেকে।
> ফুটায় কলি, ছুটায় অলি, প্রাণপতিকে দেখে॥
> আবার—বনের লতা, ছড়িয়ে পাতা, গাছের দিকে ধায়।
> নদীর জল, নামলে ঢল, সাগরেতে যায়॥
> ছি ছি—সরম টুটে, কুমুদ ফুটে, চাঁদের আলো পেলে।
> বিয়ের কনে রাখ্‌তে নারি ফুলশয্যা গেলে॥
> মরি—এ কি জ্বালা, বিধির খেলা, হরিষে বিষাদ।
> পর পরশে, সবাই রসে, ভাঙ্গে লাজের বাঁধ॥
>
> তুই কিলো একা তপস্বিনী থাক্‌বি?"

মৃন্ময়ী উত্তর করিল, "কেন, কি তপস্যা করিতেছি?"

শ্যামাসুন্দরী দুই করে মৃন্ময়ীর কেশতরঙ্গমালা তুলিয়া কহিল, "তোমার এ চুলের রাশি কি বাঁধিবেনা?"

মৃন্ময়ী কেবল ঈষৎ হাসিয়া শ্যামাসুন্দরীর হাত হইতে কেশগুলি টানিয়া লইলেন।

শ্যামাসুন্দরী আবার কহিলেন, "ভাল, আমার সাধটি পুরাও। একবার আমাদের গৃহস্থের মেয়ের মত সাজ। কতদিন যোগিনী থাকিবে?"

মৃ। যখন এই ব্রাহ্মণ-সন্তানের সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই, তখন ত আমি যোগিনীই ছিলাম।

শ্যা। এখন আর থাকিতে পারিবে না।

শ্যামাসুন্দরী ও কপালকুণ্ডলা।

'বাঁধাব চুলের রাশ, পরাব চিকণ বাস,
খোঁপায় দোলাব তোর ফুল।
কপালে সীঁথির ধার, কাঁকালেতে চন্দ্রহার,
কাণে তোর দিব যোড়া দুল॥
কুঙ্কুম চন্দন চুয়া, বাটা ভ'রে পান গুয়া,
রাঙ্গা মুখ রাঙ্গা হবে রাগে।
সোণার পুত্তলি ছেলে, কোলে তোর দিব ফেলে,
দেখি ভাল লাগে কিনা লাগে॥"]

তাহার পর, অনেক দিন পরে যখন আমরা শ্যামাসুন্দরীর আবার দর্শন পাই, তখন দেখিতে পাই তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী ফলিয়াছে, 'পরশমণির সংস্পর্শে যোগিনী গৃহিণী হইয়াছে। নবকুমারের হৃদয়ভরা ভালবাসা এই পরিবর্ত্তনের মূলীভূত কারণ হইলেও, শ্যামার স্নেহ, শ্যামার যত্ন, শ্যামার প্ররোচনা, যে ইহার সমবায়িকারণ তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই পরিচ্ছেদে (৪র্থ খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ) ননদ ভাজের কথোপকথনে বুঝিলাম মৃন্ময়ী শুধু স্বামীকে কেন, শ্যামাকেও ভালবাসিয়াছে, শ্যামার ভালবাসার প্রতিদান দিতে শিখিয়াছে; 'প্রতিদানে ভালবাসা ভালবাসা পায়'। ননদের মঙ্গলের জন্য, তাঁহাকে নিজের মত স্বামি-সৌভাগ্যবতী করিবার জন্য, সে লোক-নিন্দা অগ্রাহ্য করিয়া, স্বামীর বারণ না মানিয়া, একাকিনী অন্ধকার রাত্রিতে নিবিড় অরণ্যে ঔষধ সংগ্রহ করিতে যাইতেছে। ননদ-ভাজের এই মাখামাখি গলাগলি, এই দরদে দরদ, কি মধুর, কি কোমল!

শ্যামা-চরিত্রের চিত্রণে আর একটি বিশিষ্টতা লক্ষ্য করিবেন। এই প্রথম উদ্যমেই বঙ্কিমচন্দ্র ননদ-ভাজের একত্র এক সংসারে বাসের সুমধুর কল্পনাকে মূর্ত্তি দিয়াছেন। এমনটি তাঁহার অন্য কোন আখ্যায়িকায় নাই।

মৃ। কেন থাকিব না?

শ্যা। কেন? দেখ্‌বি? যোগ ভাঙ্গিব? পরশপাতর কাহাকে বলে, জান?

মৃন্ময়ী কহিলেন, "না!"

শ্যা। পরশপাতরের স্পর্শে রাঙ্গও সোণা হয়।

মৃ। তাতে কি?

শ্যা। মেয়েমানুষেরও পরশপাতর আছে।

মৃ। সে কি?

শ্যা। পুরুষ। পুরুষের বাতাসে যোগিনী গৃহিণী হইয়া যায়। তুই সেই পাতর ছুঁয়েছিস্। দেখিবি,

(২) নিমাই।

আনন্দমঠ কপালকুণ্ডলার বহুবৎসর পরে রচিত হইলেও আনন্দমঠের নিমাই কপালকুণ্ডলার শ্যামাসুন্দরীর উন্নত সংস্করণ (improved edition); মনে হয় শ্যামা ঠাকুরাণীই জন্মান্তরে নিমাইরূপে দেখা দিয়াছেন। শ্যামাসুন্দরীর চরিত্রে যে সামান্য একটু স্বার্থপরতার ভাঁজ ছিল (স্বার্থপরতা বলিলে বড় শক্ত কথা বলা হয়—O call it by a gentler name) সেটুকু এজন্মে ক্ষালিত হইয়াছে। সেই পাপের অন্তর্দ্ধানে তাহার দুঃখেরও তিরোভাব হইয়াছে—সে এজন্মে স্বামিসৌভাগ্যবতী। ভৈরবীপুরে বাস হইলেও তাহার নাম এবার আর শ্যামাসুন্দরী নহে, প্রেমের ঠাকুর নিমাইএর নামে তাহার নাম। (শান্তি বুঝি ভৈরবীপুরের ভৈরবী?) শ্যামাসুন্দরী-কপালকুণ্ডলায় অপূর্ব্ব যোড় বাধিয়াছে, নিমাই-শান্তিতেও অপূর্ব্ব যোড় বাধিয়াছে। নিমাই নিজে স্বামিসুখ পাইয়াছে, ভ্রাতৃবধূ স্বামিসুখে বঞ্চিত তজ্জন্য সে বড় মনঃক্ষুণ্ণ। সে দাদাকে বড় ভালবাসে, বৌদিদিকেও বড় ভালবাসে। সেই বৌদিদির সঙ্গে দাদার মিলন ঘটাইতে সে বড় ব্যস্ত, বড় ব্যগ্র। প্রথম খণ্ড ১৫শ পরিচ্ছেদের শেষ অংশটি কি মধুর, কি সুন্দর! এখানেও সেই চুলবাধা, সেই বৌ সাজান—আর সেই ননদ-ভাজে গলায় গলায় ভাব।

[প্রথম খণ্ড, পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।—"হাসিতে হাসিতে নিমি বাহির হইয়া গেল। নিকটবর্ত্তী এক পর্ণকুটীরে গিয়া প্রবেশ করিল। কুটীরমধ্যে শতগ্রন্থিযুক্ত-বসন-পরিধানা রুক্ষকেশা এক স্ত্রীলোক বসিয়া চরকা কাটিতেছিল। নিমাই গিয়া বলিল, "বৌ, শীগ্‌গির, শীগ্‌গির।" বৌ বলিল, "শীগ্‌গির কিলো? ঠাকুরজামাই তোকে মেরেছে না কি, গায়ে তেল মাখিয়ে দিতে হবে?"

নিমি। কাছাকাছি বটে, তেল আছে ঘরে?

সে স্ত্রীলোক তেলের ভাণ্ড বাহির করিয়া দিল। নিমাই ভাণ্ড হইতে তাড়াতাড়ি অঞ্জলি অঞ্জলি তৈল লইয়া সেই স্ত্রীলোকের মাথায় মাখাইয়া দিল। তাড়াতাড়ি একটা চলনসই খোঁপা বাঁধিয়া দিল। তারপর তাহাকে এক কিল মারিয়া বলিল, "তোর সেই ঢাকাইশাড়ী কোথা আছে, বল।" সে স্ত্রীলোক কিছু বিস্মিতা হইয়া বলিল, "কিলো তুই কি খেপিছিস্ না কি?"

নিমাই দুম্ করিয়া তাহার পিঠে এক কিল মারিল, বলিল, "শাড়ী বের কর।"

রঙ্গ দেখিবার জন্য সে স্ত্রীলোক শাড়ী-খানি বাহির করিল। রঙ্গ দেখিবার জন্য—কেন না, এত দুঃখেও রঙ্গ দেখিবার যে বৃত্তি, তাহা তাহার হৃদয়ে লুপ্ত হয় নাই। নবীন যৌবন, ফুল্লকমলতুল্য তাহার নববয়সের সৌন্দর্য্য। বেশ নাই, আহার নাই—তবু সেই প্রদীপ্ত, অননুমেয় সৌন্দর্য্য সেই শতগ্রন্থিযুক্ত বসনমধ্যেও প্রস্ফুটিত। বর্ণে ছায়ালোকের চাঞ্চল্য, নয়নে কটাক্ষ, অধরে হাসি, হৃদয়ে ধৈর্য্য। আহার নাই—তবু শরীর লাবণ্যময়; বেশভূষা নাই—তবু সে সৌন্দর্য্য সম্পূর্ণ অভিব্যক্ত। যেমন মেঘমধ্যে বিদ্যুৎ, যেমন মনোমধ্যে প্রতিভা, যেমন জগতের শব্দমধ্যে সঙ্গীত, যেমন মরণের ভিতর সুখ, তেমনই সে রূপরাশিতে অনির্ব্বচনীয় কি ছিল! অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্য, অনির্ব্বচনীয় উন্নত ভাব, অনির্ব্বচনীয় প্রেম, অনির্ব্বচনীয় ভক্তি। সে হাসিতে হাসিতে (কেহ সে হাসি দেখিল না) সেই ঢাকাই শাড়ী বাহির করিয়া দিল। বলিল "কিলো নিমি, কি হইবে?" নিমাই বলিল, "তুই পরবি।" সে বলিল, "আমি পরিলে কি হইবে?" তখন নিমাই তাহার কমনীয় কণ্ঠে আপনার কমনীয় বাহু বেষ্টন করিয়া বলিল, "দাদা এসেছে, তোকে যেতে বলেছে।" সে বলিল, "আমায় যেতে বলেছেন ত ঢাকাইশাড়ী কেন? চল্ না এমনি যাই।" নিমাই তার গালে এক চড় মারিল,—সে নিমাইএর কাঁধে হাত দিয়া তাহাকে কুটীরের বাহির করিল। বলিল, "চল্, এই ন্যাকড়া পরিয়া তাঁহাকে দেখিয়া আসি।" কিছুতেই কাপড় বদলাইল না, অগত্যা নিমাই রাজি হইল। নিমাই তাহাকে সঙ্গে লইয়া আপনার বাড়ীর দ্বার পর্য্যন্ত গেল, গিয়া তাহাকে ভিতরে প্রবেশ করাইয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া আপনি দ্বারে দাঁড়াইয়া রহিল।]

স্বামি-স্ত্রীর মিলনের পর আর একবার (২য় খণ্ড ২য় পরিচ্ছেদ) আমরা নিমাইএর দেখা পাই। তখন নিমাই নিজের চেষ্টা সফল হইয়াছে দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া শান্তির সঙ্গে কত কথা বলিল, দু' একটা মামুলি ধরণের

রসিকতা চলিল—কিন্তু শান্তির হৃদয়ে তখন যে ঝড় বহিতেছিল, তাহার বেগ সদানন্দময়ী গৃহস্থকন্যা নিমাই সহিতে পারিল না ।

[দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 'জীবানন্দ চলিয়া গেলে পর শান্তি নিমাইএর দাওয়ার উপর গিয়া বসিল। নিমাই মেয়ে কোলে করিয়া তাহার নিকট আসিয়া বসিল। শান্তির চোখে আর জল নাই, শান্তি চোখ মুছিয়া, মুখ প্রফুল্ল করিয়াছে, একটু একটু হাসিতেছে। কিছু গম্ভীর, কিছু চিন্তাযুক্ত, অন্যমনা। নিমাই বুঝিয়া বলিল, "তবু ত দেখা হলো।"

শান্তি কিছু উত্তর করিল না, চুপ করিয়া রহিল। নিমাই দেখিল, শান্তি মনের কথা কিছু বলিবে না, শান্তি মনের কথা বলিতে ভালবাসে না, তাহা নিমাই জানিত, সুতরাং নিমাই চেষ্টা করিয়া অন্য কথা পাড়িল। বলিল, "দেখ দেখি, বউ, কেমন মেয়েটি !"

শান্তি বলিল, "মেয়ে কোথা পেলি—তোর মেয়ে হলো কবে লো ?"

নিমা। মরণ আর কি—তুমি যমের বাড়ী যাও—এ যে দাদার মেয়ে।

নিমাই শান্তিকে জ্বালাইবার জন্য এ কথাটা বলে নাই। দাদার মেয়ে অর্থাৎ দাদার কাছে যে মেয়েটি পাইয়াছি। শান্তি তাহা বুঝিল না ; মনে করিল, নিমাই বুঝি সূচ ফুটাইবার চেষ্টা করিতেছে। অতএব শান্তি উত্তর করিল, "আমি মেয়ের বাপের কথা জিজ্ঞাসা করি নাই—মার কথাই জিজ্ঞাসা করিয়াছি।"......তার পর শান্তি অনেকক্ষণ ধরিয়া নিমাইএর সঙ্গে নানাবিধ কথোপকথন করিল। পরে নিমাইএর স্বামী বাড়ী ফিরিয়া আসিল দেখিয়া শান্তি উঠিয়া আপনার কুটীরে গেল।]

নিমাই ও শান্তি।

দুইটি চিত্রেই দেখা গেল, গ্রন্থকার ননদের উপর ভাজের ভালবাসা অপেক্ষা, ভাজের উপর ননদের ভালবাসার উপর বেশী জোর (stress) দিয়াছেন। ইহা ঠিকই হইয়াছে। পরের মেয়েকে আপন করিতে হইলে ননদের তরফ হইতে বেশী বেশী ভালবাসা আসা চাই। মনস্বী ভূদেববাবু তাঁহার 'পারিবারিক প্রবন্ধে' শাশুড়ী-বধূ-সম্বন্ধে বলিয়াছেন :—"একটি পাখীকে তার কোটর থেকে আনা হইবে, তাকে পোষ মানাইতে হইবে, সে সুখ না পেলে পোষ মানিবে কেন ? যাহাতে সে আপনার কোটর ভুলে, আপনার বাপমাকে ভুলে, বাপের বাড়ী যাইতে না চায়, তাকে এরূপ করিয়া তুলিতে হইবে।" কথাগুলি বর্ত্তমান প্রসঙ্গেও অনেকটা খাটে।

(৩) সুন্দরী।

'সুন্দরী চন্দ্রশেখরের প্রতিবাসিনীর কন্যা, সম্বন্ধে তাঁহার ভগিনী, শৈবলিনীর সখী।' সম্পর্ক দূর, কিন্তু সে পর

হইয়াও আপন, আপন ননদও এত করে না। সুন্দরী ও তাহার ভগিনী রূপসী অন্বর্থনাম্নী ছিল কিনা জানি না, তবে ইংরাজীতে একটা প্রবচন আছে—Handsome is that handsome does—সে কথাটা সুন্দরীর বেলায় খুব খাটে। শৈবলিনীর জন্য তাহার স্বার্থত্যাগ, কষ্টস্বীকার, প্রাণপাত পরিশ্রম, শৈবলিনীর প্রতি তাহার অকৃত্রিম অনুরাগের পরিচায়ক। ইহার তুলনায় শ্যামার বা নিমাই এর ভাজের প্রতি স্নেহমমতা কিছুই নহে! তবে দোষের মধ্যে ঘটনাগুলি নিতান্তই romantic adventure, সাধারণতঃ বাঙ্গালীর ঘরে সেরূপ ঘটে সেরূপ নহে।

এই আখ্যায়িকায় পূর্ব্ব চুইখানির মত চুল বাঁধিয়া দেওয়ার উল্লেখ নাই বটে, কিন্তু যখন দুই সখীতে ভীমা পুষ্করিণীতে সাঁঝের বেলা গা ধুইতে জল আনিতে গিয়াছিল, তখন তাহার পূর্ব্বে যে চুলবাঁধা-পর্ব্ব সমাধা হইয়াছিল, ইহা বেশ অনুমান করা চলে। ভীমা পুষ্করিণীতে উভয়ের কথাবার্ত্তায় (১ম খণ্ড ২য় পরিচ্ছেদ) বুঝা যায়, তাহাদের সখীত্বন্ধন কত নিবিড়। তাহার পর ভীমা পুষ্করিণীতে শৈবলিনী যখন ভীমা প্রকৃতির পরিচয় দিল, তখন লরেন্স ফষ্টারকে দেখিয়া সুন্দরী শৈবলিনীকে ফেলিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল বটে, কিন্তু এ ভীরুতা বাঙ্গালীর ঘরের বৌঝীরই উপযুক্ত। আর তাহাতে যদি কিছু দোষই হইয়া থাকে, তবে শৈবলিনীর উদ্ধারের জন্য সে যে অসমসাহসিকতার পরিচয় দিয়াছিল, তাহাতে পূর্ব্ব অপরাধের পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে। ডাকাইতির রাত্রে (১ম খণ্ড ৩য় পরিচ্ছেদ) শৈবলিনীর দশা জানিয়া 'সুন্দরী বসিয়া বসিয়া সকলের শেষে প্রভাতে গৃহে গেল, গৃহে গিয়া কাঁদিতে লাগিল।' ইহাতে অন্যান্য প্রতিবাসিনীর সঙ্গে তাহার কতটা প্রভেদ, তাহা বেশ বুঝিতে পারি। তাহার পর সে শুধু কাঁদিয়াই বাঙ্গালীর মেয়ের মত নিরস্ত হয় নাই। নাপিতানী সাজিয়া (১ম খণ্ড ৪র্থ পরিচ্ছেদ) শৈবলিনীর উদ্ধারচেষ্টা যেমন তাহার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও অসমসাহসিকতার পরিচয় দেয়, তেমনই শৈবলিনীর প্রতি তাহার কতটা প্রাণের টান তাহাও বেশ জানাইয়া দেয়। শৈবলিনী যখন সুন্দরীর নির্ব্বন্ধাতিশয় অগ্রাহ্য করিয়া আত্মরক্ষার জন্য বজরা হইতে পলায়ন করিতে অস্বীকৃতা হইল, তখন সুন্দরী তাহাকে গালি দিল, তাহার মৃত্যুকামনা করিল! কিন্তু এই মর্ম্মান্তিক বাক্যের মধ্যে কতখানি ভালবাসা, কতখানি শুভকামনা নিহিত রহিয়াছে। ইংরেজ কবি প্রকৃতই বলিয়াছেন,—I could not love thee, dear, so much, loved

সুন্দরী ও শৈবলিনী।

I not honour more. আর একদিন কমলমণিকে এমনই করিয়া সূর্য্যমুখীকে গালি দিয়া চিঠি লিখিতে দেখিব। তবে সূর্য্যমুখীর অপরাধ, স্বামীর উপর অবিশ্বাস শৈবলিনীর অপরাধ তদপেক্ষা গুরুতর।

'সুন্দরী বড় রাগ করিয়াই শৈবলিনীর বজরা হইতে চলিয়া আসিয়াছিল। সমস্ত পথ স্বামীর নিকট শৈবলিনীকে গালি দিতে দিতে আসিয়াছিল।...ঘরে আসিয়া অনেক কাঁদিয়াছিল।' (২য় খণ্ড ৪র্থ পরিচ্ছেদ)। কিন্তু তখনও তাহার প্রাণের টান সমান আছে। সে ভগিনীর বাড়ী গিয়া ভগিনীপতি প্রতাপকে নানারূপ বিষদিগ্ধ বাক্যবাণে বিদ্ধ করিয়া শৈবলিনীর সন্ধানে পাঠাইল। তাহার পরে আবার রূপসীর কাছে বসিয়া বসিয়া 'আকাঙ্ক্ষা মিটাইয়া শৈবলিনীকে গালি দিল।' স্নেহময় নারী হৃদয়ের কি অদ্ভুত রহস্য!

অনেকদিন পরে সে যখন শৈবলিনীর অলীক মৃত্যু-সংবাদ পাইল, তখন সে 'নিতান্ত দুঃখিতা হইল কিন্তু বলিল, যাহা হইবার তাহা হইয়াছে। কিন্তু শৈবলিনী এখন সুখী হইল; তাহার বাঁচা অপেক্ষা মরাই যে সুখের, তা আর কোন্ মুখে না বলিব?' (৪র্থ খণ্ড ১ম পরিচ্ছেদ)।

শেষ দৃশ্যে (ষষ্ঠ খণ্ড ৫ম পরিচ্ছেদ) চন্দ্রশেখর উন্মাদিনী শৈবলিনীকে লইয়া বেদগ্রামে ফিরিলে 'অনেকে দেখিতে আসিল, সুন্দরী সর্ব্বাগ্রে আসিল।' এখানেও সেই পূর্ব্বের স্নেহ-আগ্রহ। হিন্দুর ঘরের মেয়ের শুচিবায়ু প্রবল, 'সে শৈবলিনীর কাছে গিয়া বসিল—একটু তফাত রহিল, কাপড়ে কাপড় না ঠেকে।' কিন্তু তথাপি তাহার পূর্ব্বস্নেহ অবিকৃত, সে একদণ্ডের তরেও প্রাণের সখীকে অবহেলা করে নাই। তাহার পর যখন সকল কথা শুনিল, "সুন্দরী তখন বুঝিল। কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিল। সুন্দরীর চক্ষু প্রথমে চক্‌চকে হইল, তার পর পাতার কোলে ভিজা ভিজা হইয়া উঠিল, শেষ জলবিন্দু ঝরিল। সুন্দরী কাঁদিতে লাগিল। স্ত্রীজাতিই সংসারের রত্ন। এই সুন্দরী আর একদিন কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিয়াছিল, শৈবলিনী যেন নৌকা-সহিত জলমগ্ন হইয়া মরে। আজ সুন্দরীর ন্যায়, শৈবলিনীর জন্য কেহ কাতর নহে। সুন্দরী আসিয়া ধীরে ধীরে, চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে শৈবলিনীর কাছে বসিল, ধীরে ধীরে কথা কহিতে লাগিল—ধীরে ধীরে পূর্ব্বকথা স্মরণ করাইতে লাগিল—শৈবলিনী কিছু স্মরণ করিতে পারিল না।......সুন্দরীকে মনে ছিল কিন্তু সুন্দরীকে চিনিতে পারিল না।" এইখানে আমরা স্নেহময়ী অশ্রুময়ী সুন্দরীর নিকট বিদায়গ্রহণ করি।

(৪) কমলমণি।

অনেকদিন আগে অন্য প্রসঙ্গে বলিয়াছিলাম, কমলমণি আমার favourite, আমি চিরদিনই কমলমণির গুণ-পক্ষপাতী। কমল সত্যই সোণার কমল, নারীরত্ন। স্বামি-প্রীতি পুত্রবাৎসল্য, মাতৃভাব, ভাতৃস্নেহ, ভাজের প্রতি ভালবাসা, সখীত্ব,কমল হৃদয়ের সব পাপড়িগুলিই ফুটিয়াছে। তাই সে প্রস্ফুটিত শতদল কমল (full-blown Rose)। কমলের কথা একটু বেশী করিয়াই বলিব। পূর্ব্বে তিনটি চিত্রে দেখিয়াছি, ননদের ভালবাসার উপরই গ্রন্থকার বেশী জোর দিয়াছেন, ব্যাপারটা কতকটা একতরফা গোছের। কিন্তু 'বিষবৃক্ষে' ভাজের প্রতি ননদের ভালবাসা ও ননদের প্রতি ভাজের ভালবাসা দুই দিকই উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদে আমরা কমলমণির প্রথম পরিচয় পাই। 'নগেন্দ্রের এক সহোদরা ভগিনী ছিলেন। তিনি নগেন্দ্রের অনুজা। তাঁহার নাম কমলমণি।...কলিকাতায় কমলই গৃহিণী।' প্রথম পরিচয়েই বুঝিলাম, কমল স্নেহময়ী, স্বামি-সৌভাগ্য-শালিনী। দাদার কুড়ান মেয়েকে লইয়াই তিনি নিমাইএর মত যেরূপ আদর-যত্ন করিতেছেন, তাহাতে অনুমান করিতে পারা যায়, দাদার ঘরের লক্ষ্মীর তিনি কত-দূর আদর যত্ন করেন। স্নেহ প্রীতির সঙ্গে সঙ্গে যেটুকু দুষ্টামি দেখা যায়, সেটুকু বড় মিষ্ট। যেন কমলে কণ্টক, যেন গোলাপের কাঁটা—ইংরাজ কবির কথায় A rose bud set with little wilful thorns.

ননদ-ভাজের কিরূপ সম্প্রীতি, এ পরিচ্ছেদে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাহার উল্লেখ নাই বটে, কিন্তু সূর্য্যমুখী নগেন্দ্রনাথকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহার দুইটি স্থল হাস্যোজ্জ্বল। সূর্য্য-মুখী কমলসম্বন্ধে একটু মামুলি-ধরণের রসিকতা করিয়াছেন। (আনন্দমঠে নিমাই-শান্তির বেলায়ও ইহা দেখিয়াছি)। 'কিন্তু

আজকাল দেখিতেছি, তোমার ভগিনীরই পূরা অধিকার।' 'কমল যদি আমায় বেদখল করে, আমি বড় দুঃখিত হইব না'— এ অংশটুকু হালের সংস্করণে পরিত্যক্ত। 'কমল যদি ছাড়িয়া দেয়, তবে কুন্দনন্দিনীকে আসিবার সময় সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিও।' 'কমল যদি ছাড়িয়া দেয়'—এ রসিকতাটুকু উপভোগ করিতে হইলে ইহাতে একটু শ্লেষ বা দ্ব্যর্থ (দোরোখা ভাব) আছে, সেটুকু ছাড়িলে চলিবে না।* এ সব রসিকতা আধুনিক 'মাজ্জিতরুচি' পাঠক-পাঠিকার ভাল লাগিবে না, কুৎসিত বিবেচিত হইবে। তবে ভবিষ্যতের করুণ কাহিনী ও গভীর মনোবেদনার সঙ্গে Contrast এ এই ইয়ারকি বড় মধুর।

তাহার পর একাদশ পরিচ্ছেদে সূর্য্যমুখী ও কমলমণির মধ্যে যে পত্রব্যবহার চলিল, তাহাতেই ননদ ভাজের প্রগাঢ় প্রণয়ের পূর্ণ পরিচয় মিলে। 'আমি তোমাকে আমার কনিষ্ঠা ভগিনী ভিন্ন আর কিছুই বলিয়া ভাবিতে পারিতেছি না।...তুমি আমার প্রাণের ভগিনী, তুমি ভিন্ন আর আমাকে কেহ ভালবাসে না।' ইহাতে বুঝিলাম সূর্য্যমুখী কমলকে কত ভালবাসেন। পতিপ্রাণা নারী নারীর চরম কষ্ট স্বামীর পরকীয়াপ্রীতি ও স্বামিদেবতার চরিত্রভ্রংশ দেখিয়া অসহ্য যন্ত্রণাভোগ করিতেছেন, ও একটু শান্তিলাভের আশায় স্নেহের ননদকে সেই যন্ত্রণার কথা জানাইতেছেন। সূর্য্যমুখীর মত গম্ভীরা নায়িকা মর্ম্মান্তিক মনোবেদনা প্রাণের সখী ননন্দাকে জানাইতেছেন, তাহাতেই বুঝি উভয়ের প্রীতিবন্ধন কত নিবিড়। তিনি ত স্পষ্টই বলিয়াছেন :— 'তোমার ভাইএর কথা তোমাভিন্ন পরের কাছেও বলিতে পারি না।...কি করি ভাই, তোমাকে মনের দুঃখ না বলিয়া কাহাকে বলিব? আমার কথা এখনও ফুরায় নাই · কিন্তু তোমার মুখ চেয়ে আজ ক্ষান্ত হইলাম। · তুমি কি আমাদিগকে দেখিতে আসিবে না? এই সময় একবার আসিও, তোমাকে পাইলে অনেক ক্লেশ নিবারণ হইবে।'

ইহার উত্তরে কমল যাহা লিখিলেন—'দীঘীর জলে ডুবিয়া মর। আমি কমলমণি তর্কাসিদ্ধান্ত ব্যবস্থা দিতেছি, তুমি দড়ি কলসী লইয়া জলে ডুবিয়া মর'—তাহা সাধারণভাবে পড়িলে মনে হয়, বড় কর্কশ, বড় কঠোর, নিতান্ত হৃদয়হীন অস্থানপ্রযুক্ত রসিকতা। কিন্তু সুন্দরীও একদিন শৈবলিনীকে এমনই নির্ম্মম উত্তর দিয়াছিল। এই কর্কশ, কঠোর উত্তরের ভিতর কি কোমলতা, এই নির্ম্মম বিদ্রূপের ভিতর কি গভীর সমবেদনা ও অকৃত্রিম কল্যাণকামনা!

আবার দ্বাদশ পরিচ্ছেদের শেষভাগে সূর্য্যমুখীর আর একখানি পত্রে হৃদয়ের আকুলতা, যন্ত্রণার তীব্রতা, ও কমলমণির সহিত সখীত্ব-বন্ধনের নিবিড়তার পরিচয় পাই। 'একবার এসো, কমলমণি, ভগিনি, তুমি বই আর আমার সুহৃদ্ কেহ নাই। একবার এসো।' বুঝিলাম, কমল সূর্য্যমুখীর হৃদয়ের কতখানি যুড়িয়া আছেন। চিঠি পড়িয়া স্বামিময়-জীবিতা কমলমণি শ্রীশচন্দ্রকে বলিলেন, 'সূর্য্যমুখীর বুদ্ধিটুকু খোওয়া গিয়াছে—নহিলে মাগী এমন পত্র লিখিবে কেন?' বাস্তবিকই বাক্যগুলি বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি।' কমলমণি স্বামিসৌভাগ্যশালিনী, 'চারুশীলা পতিরতা মধুরতাময়।' তাঁহার বিশ্বাস, যে নারী স্বামীকে বিশ্বাস করে না তাহার মরণ মঙ্গল।

কমলমণি মুখে একথা বলিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার আসন টলিল। তিনি আর থাকিতে পারিলেন না। পত্নীগতপ্রাণ শ্রীশচন্দ্রের সঙ্গে পরামর্শ আঁটিয়া তিনি সূর্য্যমুখীর দুঃস্বপ্ন ভাঙ্গিবার জন্য গোবিন্দপুর যাত্রা করিলেন। এমন আকুল আহ্বানে তিনি কি স্থির থাকিতে পারেন? কবি যথার্থই বলিয়াছেন :—'বাঁধন আছে প্রাণে প্রাণে, সেই প্রাণের টানেটেনে আনে, প্রাণের বেদন জানে না কে?'

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদের প্রারম্ভে আমরা কমলমণির করুণাময়ী, কৌতুকময়ী, আনন্দময়ী, আলোকময়ী মূর্ত্তির পরিচয় পাই। "গোবিন্দপুরের দত্তদিগের বাড়ীতে যেন অন্ধকারে একটি ফুল ফুটিল। কমলমণির হাসিমুখ দেখিয়া সূর্য্যমুখীরও চক্ষের জল শুকাইল। কমলমণি বাড়ীতে পা দিয়াই সূর্য্যমুখীর চুলের গোছা লইয়া বসিয়া গেলেন। অনেক দিন সূর্য্যমুখী কেশ-রচনা করেন নাই। কমলমণি বলিলেন— দুটো ফুল গুঁজিয়া দিব? সূর্য্যমুখী তাহার গাল টিপিয়া দিলেন। না! না! বলিয়া কমলমণি লুকাইয়া দুইটা ফুল দিলেন। লোক আসিলে বলিলেন—দেখেছ, মাগী বুড়া

* কমল [illegible] — ইংরাজীতে অনুবাদ করিলে আরও একটু [illegible] হয়।
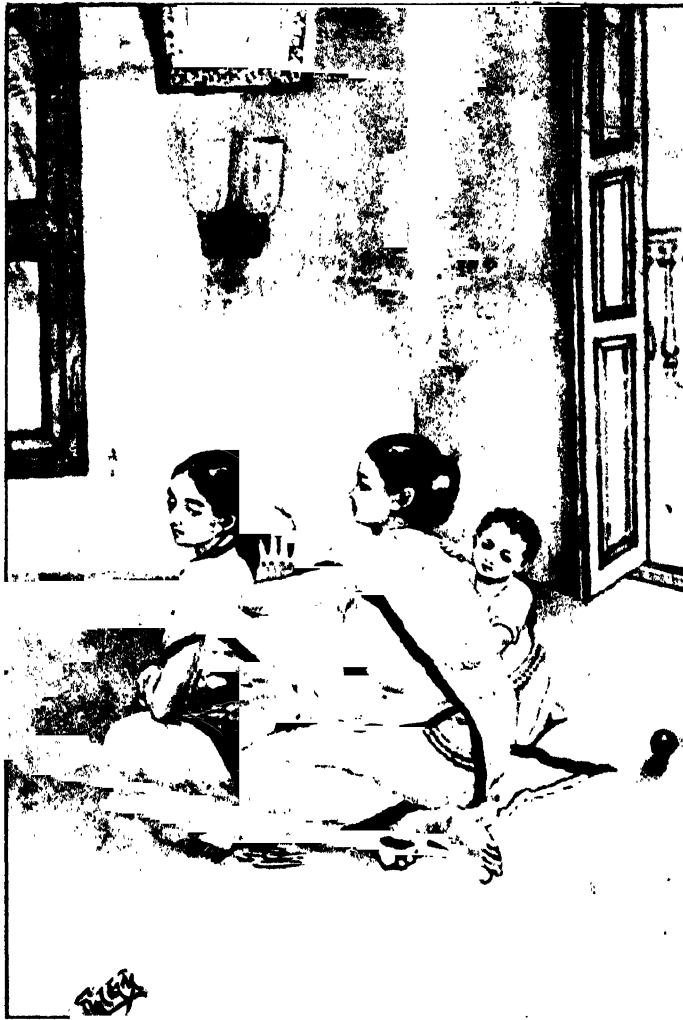
কমলমণি ও সূর্য্যমুখী।

বয়সে মাথায় ফুল পরে।" কিন্তু কমলমণি শ্যামার মত ভ্রাতৃজায়ার চুল বাঁধিয়া দিয়াই আদর-যত্ন শেষ করেন না। তিনি সুকৌশলে অথচ গভীর প্রীতি ও সমবেদনার সঙ্গে কুন্দনন্দিনীর মনের কথা বাহির করিয়া লইলেন। 'ভালবাসা কাহাকে বলে, সোণার কমল তাহা জানিত। অন্তঃকরণের অন্তঃকরণ মধ্যে, কুন্দনন্দিনীর দুঃখে দুঃখী, সুখে সুখী হইল।' কিন্তু তথাপি তিনি নিজের কর্ত্তব্য ভুলিলেন না। তিনি সূর্য্যমুখীর কণ্টক উদ্ধার করিতে, সতীন-কাঁটা তুলিয়া ফেলিতে, আসিয়াছিলেন। বিধিমত তাহার চেষ্টা করিলেন। কুন্দকে নিজের স্কন্ধে লইবার সব ঠিকঠাক করিলেন। সাধে কি বলি, সোণার কমল? গ্রহবৈগুণ্যে তাঁহার ইচ্ছানুরূপ ব্যবস্থা ঘটিল না, তাঁহার কি দোষ?

এইখানে স্নেহময়ী সমবেদনাময়ী কমলমণির দর্শন পাইলাম। আবার পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদেই (পঞ্চদশ) কৌতুকময়ী কমলমণির পরিচয় পাই। হরিদাসী বৈষ্ণবীর কাটাফোটার গান শুনিয়া কমলমণি 'সঙ্গীতে দুর্নীতি' সম্বন্ধে গম্ভীরভাবে লম্বাচৌড়া বক্তৃতা না করিয়া বলিয়া উঠিলেন 'একটি বাবলার ডাল আন্ তরে—কাটাফোটার কত সুখ, মাগীকে দেখিয়ে দিই।' আবার সপ্তদশ পরিচ্ছেদের শেষভাগে যখন সূর্য্যমুখী হরিদাসী বৈষ্ণবীর প্রকৃত পরিচয় পাইয়া কুন্দকে বিনাদোষে অপমানিত করিলেন, তখন 'কমল তাহাকে ধরিয়া শয়ন-গৃহে লইয়া গেলেন। শয়ন-গৃহে থাকিয়া আদর করিয়া সান্ত্বনা করিলেন এবং বলিলেন, ও মাগী যাহা বলে বলুক, আমি উহার একটি কথাও বিশ্বাস করি না।' এখানেও আবার সেই স্নেহময়ী করুণাময়ী কমলমণি।

হরিদাসী বৈষ্ণবী কে, তৎসম্বন্ধে যখন সূর্য্যমুখীর মনে সন্দেহ উদয় হইল, তখন তিনি পরামর্শের জন্য কমলকেই ডাকিলেন। ইহাতে বুঝি সূর্য্যমুখী কমলমণিতে কত অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ। তাহার পর কুন্দনন্দিনীর পলায়নের পর কমল সূর্য্যমুখীর অন্তরের বেদনা বুঝিয়া 'কলিকাতা যাওয়া স্থগিত করিলেন।' তিনি সূর্য্যমুখীকে কুন্দের প্রতি পরুষ-বচন-প্রয়োগের জন্য অনুতপ্ত জানিয়া অণুমাত্র তিরস্কার করিলেন না। সাধারণ বাঙ্গালীর মেয়ের মত পা ছড়াইয়া কাঁদিতে না বসিয়া (বিংশ পরিচ্ছেদ) তৎক্ষণাৎ অনুসন্ধানের উপায় নির্দ্ধারণ করিলেন। তিনি গলা হইতে কণ্ঠহার খুলিয়া লইয়া গৃহস্থ সকলকে দেখাইয়া বলিলেন 'যে কুন্দকে আনিয়া দিবে, তাহাকে এই হার দিব।' সুন্দরীর মত অবশ্য নিজেই কুন্দের সন্ধানে বাহির হইলেন না।

আবার পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদে কমলমণির দেখা পাই। তিনি পূর্ব্ব-বর্ণিত ঘটনার পরে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন, এবং কিছুদিন পরে আবার সূর্য্যমুখীর মর্ম্মান্তিক বেদনা-ব্যঞ্জক পত্র পাইলেন। সূর্য্যমুখী নারীজীবনের সার-সুখে জলাঞ্জলি দিয়া, কুন্দের সঙ্গে স্বামীর বিবাহ দিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া, কাতরতার সঙ্গে কমলমণিকে লিখিতেছেন 'তোমাকে দেখিতে বড় সাধ হইয়াছে।' আবার ননদের সহিত সেই প্রগাঢ় প্রীতির পরিচয়। আবার কমলের আসন টলিল। আবার স্নেহময়ী করুণাময়ী ননন্দা, উপেক্ষিতা, মর্ম্মাহতা ভ্রাতৃজায়ার মনোব্যথার লাঘব করিবার প্রয়াসে, গোবিন্দপুর যাত্রা করিলেন। 'অতিবাস্তে কমলমণি অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন;...দাসীরা বলিয়া দিল, সূর্য্যমুখী শয়ন-গৃহে আছেন। কমলমণি ছুটিয়া শয়ন-গৃহে গেলেন।...দুইজনে সেইখানে বসিয়া নীরবে কাঁদিতে লাগিলেন—কেহ কিছু বলিলেন না। সূর্য্যমুখী কমলের কোলে মাথা লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কমলমণির চক্ষের জল তাঁহার বক্ষে ও কেশের উপর পড়িতে লাগিল।' (ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ)। কি গভীর সহানুভূতি! সদাহাস্যময়ী আজ অশ্রুময়ী। যাঁহারা মনে করেন, যে হাসিতে পারে, সে কাঁদিতে পারে না, তাঁহারা এই দৃশ্য দেখুন, ভ্রম ঘুচিবে।

কমলমণি স্নেহবশতঃ নিজের সহোদরের দোষ দেখিতে অন্ধ হইলেন না। এ ক্ষেত্রে তিনি দাদাকেই অপরাধী করিলেন। ইহাও তাঁহার ভাজের প্রতি ভালবাসার আর একটি নিদর্শন। পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে ননদ-ভাজে যে কথোপকথন হইল, তাহা বড় মর্ম্মান্তিক, তাহার আর সবিস্তারে পরিচয় দিব না। পাঠক তাহাতেও দেখিবেন দুটি হৃদয়ের প্রীতি-বন্ধন কত ঘনিষ্ঠ। 'অন্তরে অন্তরে কমলমণি বুঝিতেছিলেন যে, সূর্য্যমুখী কত দুঃখী। অন্তরে অন্তরে সূর্য্যমুখী বুঝিয়াছিলেন যে, কমলমণি তাঁহার দুঃখ বুঝিতেছেন।' (সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ)।

গৃহত্যাগের পূর্ব্বেও সূর্য্যমুখী কমলকে পত্র লিখিয়া গেলেন। চিরদিনই ত তিনি ননন্দাকে অসহ্য মনোবেদনা জানাইয়া আসিয়াছেন। আজ কেন তাহার অন্যথা হইবে? 'আশীর্ব্বাদ করি, তোমার স্বামী পুত্র দীর্ঘজীবী হউক, তুমি চিরসুখী হও। আরও আশীর্ব্বাদ করি যে, যে দিন তুমি স্বামীর প্রেমে বঞ্চিত হইবে, সেইদিন তোমার আয়ুঃশেষ হয়।' (অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ)। একদিন কমল সূর্য্যমুখীকে লিখিয়াছিলেন, 'তুমি দীঘির জলে ডুবিয়া মর,' আর আজ সূর্য্যমুখী কমলকে লিখিতেছেন 'যেন তোমার আয়ুঃশেষ হয়।' বুঝিলাম একই সুরে দুটি হৃদয় বাঁধা, স্বামিপ্রেম উভয়েরই ইষ্টমন্ত্র।

কমলমণি গোবিন্দপুরে থাকিয়া সূর্য্যমুখীর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। তিনি স্বামীর সঙ্গে কলিকাতায় ফিরিয়া যাইতে পারিলেন না। সূর্য্যমুখী যে তাঁহার হৃদয়ের অর্দ্ধেক সড়িয়া আছেন। (ত্রিংশ পরিচ্ছেদ)। কমল এত যে কোমল হৃদয়া, কিন্তু (একত্রিংশ পরিচ্ছেদ) কুন্দকে কাছে আসিতে দেখিয়া অপ্রসন্ন হইলেন, কুন্দকে কাঁদিতে দেখিয়াও কিছু বলিলেন না, আমার কাজ আছে বলিয়া উঠিয়া গেলেন। যে সূর্য্যমুখীর সুখের ঘরে আগুন দিয়াছে, সূর্য্যমুখীর কুসুমাস্তৃত দাম্পত্যজীবনের পথে কাঁটা দিয়াছে, কমল কি তাহাকে হাসিমুখে অভ্যর্থনা করিতে পারেন? সূর্য্যমুখীকে ভাল বাসেন বলিয়াই কুন্দের উপর এত আক্রোশ; নতুবা কুন্দ জনম-দুঃখিনী কৃপাপাত্রী। (আর সেও ত ভাজ!)

ইহার পর অনেক দিন কমলের দেখা পাই না। নগেন্দ্রনাথের যন্ত্রণার ইতিহাস আছে, সূর্য্যমুখীর গৃহত্যাগের পর হইতে প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত শারীরিক ও মানসিক কষ্টের ইতিহাস আছে, কিন্তু গ্রন্থকার কমল-হৃদয়ের তীব্র জ্বালার বিবরণ দেন নাই। সে নীরব যন্ত্রণা অনুধাবন করিয়া লইতে হইবে।

তাহার পর (একোনচত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ) নগেন্দ্রনাথ সূর্য্যমুখীর সন্ধান করিয়া শ্রান্তদেহে দীর্ণহৃদয়ে শ্রীশচন্দ্রের বাসায় ফিরিলেন। 'কমল শুনিলেন, সূর্য্যমুখী নাই। তখন আর তিনি কোন ভারই লইলেন না। সতীশকে একা ফেলিয়া কমলমণি সে রাত্রের মত অদৃশ্য হইলেন। কমলমণি ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া আলুলায়িত-কুন্তলে কাঁদিতে' লাগিলেন, প্রাণের দুলাল সতীশচন্দ্রও সে ক্রন্দনের বেগ প্রশমিত করিতে পারিল না। পুত্রবাৎসল্য, স্বামিপ্রীতি, ভ্রাতৃস্নেহ, গৃহিণীর কর্ত্তব্য, অতিথিসৎকার, সবই সে শোকের বেগে ভাসিয়া গেল।

তাহার পর (ত্রিচত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ) কমলমণি

আবার গোবিন্দপুরে আসিলেন। এবার তিনি পূর্ব্বাপেক্ষাও করুণাময়ী। 'যে অবধি সূর্য্যমুখী গৃহত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন, সেই অবধি কুন্দনন্দিনীর উপর কমলমণির দুর্জ্জয় ক্রোধ; মুখ দেখিতেন না। কিন্তু এবার আসিয়া কুন্দনন্দিনীর শুষ্কমুখ দেখিয়া কমলমণির রাগ দূর হইল। তিনি কুন্দনন্দিনীকে প্রফুল্লিত করিবার জন্য যত্ন করিতে লাগিলেন।' বুঝিলাম, শোকতাপ পাইয়া কমলের কোমল হৃদয় গলিয়া গিয়া কোমলতর হইয়াছে।

তাহার পর (অষ্টচত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ) মেঘ ঝড় কাটিয়া গিয়াছে, ঘরের লক্ষ্মী ঘরে ফিরিয়াছেন, দত্তবাড়ীতে অনেক কাল পরে আবার সূর্য্যমুখী ফুল ফুটিয়াছে। সকলে গৃহের লক্ষ্মীকে "মণ্ডলাকারে বেড়িয়া মহাকলরব করিতেছে। সকলকে বেড়িয়া বেড়িয়া কমলমণি শাঁখ বাজাইতেছেন ও হুলু দিতেছেন, এবং কাঁদিতে কাঁদিতে হাসিতেছেন —এবং কখন কখন এ দিক্ ও দিক্ চাহিয়া এক একবার নৃত্য করিতেছেন।" এতদিনের পর আমরা সেই রহস্যময়ী, (ক্ষণে মেঘ ক্ষণে রৌদ্র), সেই হাস্যময়ী আনন্দময়ী আলোকময়ী কমলমণির আবার দেখা পাইলাম। আনন্দোৎসবের পরে ননদ-ভাজে নিদারুণ বার্ত্তা পাইয়া হতভাগিনী কুন্দনন্দিনীকে শেষ দেখা দেখিতে গেলেন, সে হৃদয়-বিদারক দৃশ্যের আর অবতারণা করিব না। এই মধুর দৃশ্যেই শেষ করি।

সোণার কমলের সব পাপড়িগুলি খুলিয়া দেখাইতে পারিলাম না। কেবল তাঁহার ভাজের প্রতি ভালবাসাই দেখাইলাম। ভরসা করি, বঙ্কিমচন্দ্রের কৃপায় ঘরে ঘরে সোণার কমল বা অভাব-পক্ষে নীল কমল ফুটিবে।

কমলের কথা শেষ হইলেও শেষ করিতে ইচ্ছা হয় না। কবি নহি যে কবিতা লিখিয়া কমলমণির গুণগান করিব। তাই সার্থকনামা শ্রীযুক্ত রসময় লাহা মহাশয় তাঁহার গৃহলক্ষ্মীর * গুণানুবাদচ্ছলে কমলমণির যে চিত্র ফুটাইয়াছেন, পাঠকবর্গের সমক্ষে সেই চিত্র ধরিয়া বক্তব্য শেষ করিলাম।

"তুমি যে 'কমলমণি' তোমারে লভিয়ে ধনি,
হয়েছে যে মহাধনী—এ দীন উদাসী;
তুমি ফুল্ল শতদল, প্রেমে স্নেহে ঢল ঢল,
উজলি এ হৃদি-সরঃ রয়েছ বিকাশি।
তুমি যবে ঘরে এলে, কি অমিয় দিলে ঢেলে,
এ সংসারে করে দিলে মোরে স্বর্গবাসী;
একে একে হেসে হেসে, মনোমত ভালবেসে,
নন্দন নন্দিনী দিলে নন্দন-বিলাসী।

"কি আনন্দ ঘরে ঘরে, ছেলে মেয়ে খেলা করে,
দুলাল দুলালী দোলে মুখে সুধাহাসি;
ত্রিদিবের আধ ভাষা, পশে প্রাণে ভাসাভাসা,
কাণে বাজে দূর হ'তে অমরার বাঁশী।
কি উল্লাস, কিবা হাসি, আমি বড় ভালবাসি,
কি যেন কি হয়ে যাই—কি আনন্দে ভাসি!

"তব প্রেম নিরমল দিয়াছে চরিত্রে বল,
গিয়াছে মনের তাপ, পাপ-চিন্তারাশি;
তোমার মধুর ভাসা, সুখে দুখে ভালবাসা
পেয়ে তব, অনুগত যত পুরবাসী।
সদানন্দে আছি আমি, হইয়া তোমার স্বামী,
কি যে ঢাল শান্তিধারা দুঃখ-জ্বালা নাশি'
তোমরা ঘরের লক্ষ্মী, আমিই তাহার সাক্ষী,
ওই প্রীতি-প্রস্রবণ সদা অভিলাষী।"

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

---

* তাঁহার নব প্রকাশিত 'আমোদ' নামক কবিতা সংগ্রহে।

শবরের দেবী

"বাঁধিয়াছে যেন ত্রিদিব স্বপ্ন করি শিল্পের ছল
মন্দির নহে এযে দেখি শুধু মর্ম্মর শতদল!
কৃষ্ণগাত্র প্রাচীরের মাথা উঠেছে অনেক দূর
তারি মাঝে এ কি নন্দন বনে শোভিছে ইন্দ্রপুর।
উচ্চ চূড়ায় পরশি গগন দাঁড়ায়ে সিংহদ্বার
মণিশিলা ঘাট সরসীর বুকে পড়িয়াছে ছায়া তার।
চত্বরবাহী স্তম্ভ জড়ায়ে শ্যামলা কোমলা লতা
ফুলে ফুলে যেন ঢাকা দেহে তার কঠিন মর্ম্ম কথা।
শুভ্র উজ্জ্বল কঠিন পিচ্ছল মর্ম্মরে পথ গাথা
মায়া আস্তর বিছায়ে দিতেছে বকুল নোয়ায়ে মাথা।
উপবন মাঝে দেব মন্দির মণি প্রস্তরে গড়া
গায়ে আঁকা কত সুচারু শিল্প, মরকত লতা বেড়া
প্রবাল বৃন্ত কত না পুষ্প পদ্মরাগের দল।
মণি ময়ূরের পদভরে টুটে সিত মুকুতার ফল।
শ্যাম উপবন সলিলের মাঝে মন্দির শতদল
ফুটায়েছে যেন ত্রিদিব স্বপ্ন শিল্পীর কৌশল।

অশোকের ডালে হরিদ্বর্ণ ব'সে আছে সারিশুক
রক্ত অধর কেন নির্ব্বাক—কেন দোঁহে অধোমুখ!
মাধবীকুঞ্জে স্বর্ণ দণ্ডে পুচ্ছ করিয়া নত
মেঘোদয়ে কেন ময়ূর-ময়ূরী যেন চিত্রিত মত?
চ্যূত-পল্লব আড়ালে কোকিল নীরবে লুকায়ে আছে,
হরিণ-হরিণী নিশ্চলগতি শ্যাম তৃণ-ভূমি মাঝে!
অদৃশ্যে কোথা বাজিছে করুণ যন্ত্র মিলানো সুর
স্পর্শে না তার মর্ম্মের তার মূর্চ্ছনা সুমধুর!
এ কি সুতীব্র বেদনা মাখিয়ে বাজিছে বিষাদে বাঁশী
হেন নন্দন আনন্দ হীন কি লাগি নগরবাসী?
মণি-মন্দির উচ্চ-শীর্ষে কেতন পড়েছে হেলে
দেব দেউলের দেবতা কোথায় দাওগো আমারে বলে।"
"পথিক বুঝিগো নূতন এসেছ মোদের নগরে আজ
কেন নন্দন নিরানন্দিত—পরেছে অন্ধ সাজ,—
দেবতা দেউলে শোকের সুরেতে কেন বাজে এ রাগিণী?—
শোন তবে যদি শুনিবারে চাও নিদারুণ সে কাহিনী!—

অতি সুনিবিড় আঁধারের নীড় গভীর গহন তলে
না পশে যেথায় সূর্য্য অংশু, বায়ু বুঝি নাহি চলে,
শাল্মলী আর দেবদারু দল উর্দ্ধে তুলিয়া মাথা
আলোকে বাতাসে বাধা দিতে যেন গায়ে গায়ে আছে গাথা
মানবের আঁখি পশেনি সেথায় কোন যুগে কোন কালে
অনাদি রাত্রি, অনাদি আঁধার বাঁধা যেন মায়াজালে।
একদা পবেশি শবর জনেক কি জানি কিসের কাজে
নির্গম পথ হারাইল সেই দুর্গম বনমাঝে!
মেঘ মন্দ্রিতা ঝটিকা ক্ষুব্ধা রজনী ভয়দা বেশে
পথহারা সেই পথিকের আগে সহসা দাঁড়াল এসে!
বিপন্ন তবে আশ্রয় লাগি ছুটে বন হ'তে বনে
কি শুনি কি দেখি দাঁড়াল সহসা সচকিত ভীত মনে।
বিশাল বটের কোটর হইতে বাহিরিয়া এক আলো
জ্যোৎস্নার মত শুভ্র ছটায় হাসায় বনের কালো
শঙ্কার মাঝে আশ্বাসে তবু ছুটে সে আলোক পানে
পতঙ্গ যথা বহ্নির মুখে কোন বাধা নাহি মানে!

মন্দির এক আঁকড়ি ধরিয়া যুগ্ম অশথ বট
সারা দেহ তার ঢেকে নামায়েছে হাজার শিকড় জট
জীর্ণ দেউল মণ্ডিত এক অপরূপ জ্যোতি-জালে
সেই জ্যোতি বনে কিরণ তাহার জ্যোৎস্নার মত ঢালে!
ভেসে আসে কোন অদৃশ্য হ'তে মধুর বীণার তান
ভয় ছুটে গেল দাঁড়াল শবর লুব্ধ মোহিত প্রাণ!
অজ্ঞাতে ক্রমে কখন যে গিয়ে দাঁড়াল দেউল-দ্বারে
কি দেখিল—সেথা কি পেল শবর সেই তা বলিতে পারে।
ফিরে গেল তার জীবনের গতি ঘুচে গেল সব কাজ
চিরদিন তরে আশ্রয় নিল সেই মন্দির-মাঝ!—
গ্রামে লোকালয়ে বহুদিন আর কেহ দেখে নাই তারে
দেখেছিল শুধু বৃদ্ধ জনেক একদা বনের ধারে
বনফল লয়ে বিবিধ বরণ তুলিয়া বনের ফুলে
পত্র পাত্রে কে ভরিছে বারি বন-নির্ঝর-কূলে
ধেয়ান মগ্ন তাপসের আঁখি পূজারীর মত বেশে!
জনরব হ'ল অপঘাতে মরি বনদেব বাধ শেষে!

ভুবনমোহিনী আলোক-প্রতিমা স্বর্ণ সেতার করে।

ছত্রভঙ্গ মানব বারণ দিকে দিকে গেল ধেয়ে
বিপন্ন নৃপ বাচালেন প্রাণ বনে আশ্রয় পেয়ে।
বিনষ্ট প্রায় দল-বল সহ প্রাতে নরেন্দ্ররাজ
উন্মাদ সম অধীর মূর্ত্তি এলেন নগর মাঝ
তখনি আসিল শতেক শিল্পী লয়ে তার দলবল
মাসেকে ফুটিল নগরপ্রান্তে এ দেউল শতদল।

শুভদিন ক্ষণে প্রথম যেদিন খুলিল দেউল দ্বার
শত পুরোহিত রাজাদেশে চলে লয়ে পূজা-উপচার!
পশ্চাতে ছুটি জনতার স্রোত দুয়ারে দাঁড়াল এসে
রাজ নরেন্দ্র উপনীত সেথা দীন উপাসক বেশে।
মণিমন্দিরগর্ভ গৃহেতে রত্নবেদীর পরে
ভুবনমোহিনী আলোক প্রতিমা স্বর্ণ সেতার করে।
পূর্ণচন্দ্র উজ্জ্বল আভা পড়েছে দেউল গায়
অলক্ষ্যে কত মধুর রাগিণী বাজাতেছে
কে কোথায়!
শূন্য করিয়া পুণ্য ত্রিদিবে মরতে এ কোন্ দেবী?
সুরেন্দ্র বুঝি ধন্য হইত স্বরগে ইঁহারে সেবি!
বিস্ময়ে নত কৃতকৃতার্থ মুগ্ধ নগরবাসী
অজস্রধারে চরণে ঢালিল ভকতি-পুষ্পরাশি।
সশঙ্ক নৃপ শতেক রক্ষী রাখেন সিংহদ্বারে
কোন, অনাচার মন্দির দ্বার যেন পরশিতে নারে!
পাছে কোন, পাপে চলে যান্ দেবী আশঙ্কা
সদা মনে
স্বহস্তে নৃপ নিযুক্ত তথা মন্দির মার্জ্জনে!

মহেন্দ্র-সখ নরেন্দ্ররাজ এসেছেন মৃগয়ায়
ব্যাঘ্র-বরাহ বন্য-বারণ সুগভীর বনে ধায়
মন্দ্রিত করি তন্দ্রিত বন ঘন ঘন শিঙা বাজে
বর্ম্মধারী শত সৈনিক সঙ্গে শিকার সাজে।
হেথায় কৃষ্ণ পর্ব্বত সম মেঘ দিগ্‌নাগদল
নভঃ প্রান্তর মন্থিত করে—পড়ে নভে কোলাহল!
বাহিরিল বেগে স্বর্গ-সৈন্য বাজায়ে দামামা কাড়া
কাননে আকাশে একযোগে পড়ে ঘোর শিকারের সাড়া
ঘন-বিস্ফোরে অগ্নি-অস্ত্র জ্বালি বহ্নির জ্বালা
ছিটায়ে সঘনে করকামুষ্টি, বৃষ্টি হিমানী ঢালা!

আঁধার মগন কানন-বক্ষ দ্বিগুণ অন্ধকার
কি যেন হারায়ে ক্ষুব্ধা বনানী করিতেছে হাহাকার!
অটবীর মাঝে বিটপী ঘেরা সে দেউলে আঁধার ঘোর
নিভৃত গুহার মণি নিতে তার এসেছিল কোন্ চোর?
মন্দিরদ্বারে পড়ে আছে কত আহরিত ফুল ফল
তার মাঝে পড়ি আর্ত্ত শবর রুগ্ন বিহীন-বল!
করুণ ব্যথায় কাঁদাইয়া বন কভু ফুকারিয়া উঠে
বৃথা আশ্বাসে ফুল ফল তরে পুন বনে বনে ছুটে,—
লয়ে ফুলভার মন্দির-দ্বারে প্রবেশে পূজার তরে
কোথায় দেবতা শূন্য দেউল আঁধারে গুমরি মরে।

শবর-জীবন ভুলে গেছে সে যে এতকাল তারে সেবি
অযাচিতে যেবা যাচি দেয় দেখা কোথা তার সেই দেবী !
গভীর ব্যথায় কভু মূরছায়, অতন্দ্র অনাহারে
নিশিদিন ধরি পড়ি রহে সেই শূন্য দেউল দ্বারে
উন্মাদ সম হাসে কাঁদে কভু সন্বিত হারা ছবি
শ্বাসে শ্বাসে শুধু হুকারে সঘনে "এস এস মোর দেবি !"

তান্ত্রিক এক মহাগুণী পশি একদা কানন তলে
হেরি শবরে "কেন হেন দশা" সুধাল কৌতূহলে !
উন্মাদ-সম অবোধ্য তার প্রলাপ বচন শুনি
"রমণীর প্রেমে হতাশ প্রেমিক বুঝি এটা" ভাবে শুনি !
অথবা দৈবে দেববালা কোন হেরিয়াছে বুঝি ব্যাধ
অন্ত্যজ হ'য়ে হতভাগা তবু পেতে তারে করে সাধ
হাসির সহিত জাগিল করুণা, হাত দিয়ে তার শিরে
কহিল "শবর দিব যে মন্ত্র জপ তাহা ফিরে ফিরে
কর তার ধ্যান অনন্যমনে মন্ত্রেতে বশীভূতা
মানবী বা দেবী যেই হোক আসি কবে তোরে প্রেম কথা।"
আকর্ষণীর সিদ্ধ মন্ত্র দিল গুণী শবরেরে
মুগ্ধ শবর জপি সে মন্ত্র কারে ডাকে অন্তরে ?
অতন্দ্র-চিত অনন্যমনে জাগে শুধু এক ছবি
প্রেয়সী রূপসী কেহ নয় সে যে পাষাণ-গঠিতা দেবী !
"এস মোর দেবি"—"এসেছি শবর" চমকি চাহিল আঁখি
দেবী এল তার মানবী হইয়ে নয়নে করুণা মাখি।

"তুমি মোর দেবী ?" "আমি সেই"
"কোথা পেলে ও মুখেতে বাণী ?
চক্ষে পেলে এ দৃষ্টি ?
কোমলা কেমনে হ'লে পাষাণি ?
জ্যোতি আলোকিত অচপল দিঠি ওগো কেন আজি নত ?
তুমি দেবী মোর ! সেই বটে, তবু কেন নহ তার মত ?"
"সেই আমি, তবু নহি সেই মোর পাষাণ মূরতি খানি
রাজ-নরেন্দ্র মন্দিরে আছে হ'য়ে রাজ অধিরাণী !
তব সুকঠিন মন্ত্র-সাধনে পাষাণে জেগেছে প্রাণ
মানবীর মত প্রাণময়ী আমি, এ প্রাণ তোমারি দান !"

দেবী এল তার মানবী হয়ে নয়নে করুণা মাখি।

"দাঁড়াও আবার বেদীতে তোমার আমি গো তেমনি পূজি !"
"শবর এসেছি প্রেম নিতে তব পূজাতো আসিনি খুঁজি
পাষাণের পায়ে শত পূজা ঢেলে জাগাতে পারনি যারে,
কামনা-মন্ত্রে জীবন লভিয়া এল সেই তব দ্বারে।
পূজার মন্ত্র নহে এ—যাহাতে জাগালে আমার প্রাণ
প্রতি রজনীতে প্রাণ লভি তাই দিব তার প্রতিদান,
পূজা উপচার ত্যজ ওগো প্রিয় আন প্রেম উপহার"
নিশ্বাস ত্যজি ভাবিল শবর "কোথা দেবী সে আমার।"

রাজ-নরেন্দ্র নগরী হ'য়েছে আনন্দে ওত-প্রোত
দেশ দেশ হ'তে মন্দির-মুখে ধায় জনতার স্রোত !
জ্যোতি-মণ্ডিতা পাষাণ প্রতিমা দিবসে মূরতি প্রায়
রজনীতে সেই তেজোময় মুখে নব শোভা উথলায়

গান করি তুই মাণিকের জ্যোতি নয়নে সজল আভা
উজ্জ্বল গণ্ডে কখনো পাণ্ডু, কভু আরক্ত শোভা!
প্রবাল নিন্দি অধর-ওষ্ঠ যেন কথা কয় কয়!
বিস্মিত নত ভকতিমুগ্ধ জনতা চাহিয়া রয়!
অলক্ষ্য সেই রাগিণীর মাঝে জাগে এক নব সুর
স্রষ্টার সুখ-ব্যথার মতন মূর্চ্ছনে ভরপুর।
শ্রোতার নয়নে অসীম সুখেতে আপনি অশ্রু আসে,
প্রিয়জনে কেহ টানি লয় বুকে ডেকে লয় তারে পাশে!
তন্দ্রাবিহীন নগরী রাত্রে জাগে উৎসব-রোলে,
বহু ভোগে পূজা সঘন আরতি করে পুরোহিত দলে,
চামর দণ্ড করেতে লইয়া সেবে নরেন্দ্র-রাজ
যাহার পূজায় পাষাণ-প্রতিমা প্রাণময়ী হ'ল আজ!

নিশীথে উজান আঁধার কানন শবরের সনে দেবী
মানবীর মত খেলে প্রেমখেলা মানবীর প্রাণ লভি।
ফুল তুলে দোঁহে মালা গাথি দেয় উভয়ে উভয় গলে
ফল এনে দেয় মুখে মুখে, রোষে কভু বা প্রণয় ছলে;
করে অভিমান—ভঙ্গ সে মান পুনঃ অপরের স্তবে
মুগ্ধ শবর, হেন সুখ কেবা স্বপনে পেয়েছে কবে।
তথাপি তাহার উপাসক যদি শান্তি নাহিক পায়
পূজার মতন না পায় তৃপ্তি প্রণয়ের এ খেলায়!
খিন্নশীর্ণ হেরিয়া শবরে স্নেহে হাসি কহে দেবী
"সহস্র প্রাণ ধন্য মানিছে যে পাষাণময়ী সেবি'
প্রাণময়ী হ'য়ে তোমারে সেবে যে হেন কে পেয়েছে কবে?
জড়ের পূজার অতৃপ্ত সুখ তুমিও কি চাহ তবে?"
"আনন্দরূপা দেবীরে আমার পূজায় যে সুখ কত,
সহস্রপ্রাণ অনুভবে তাহা আজিকে আমারি মত;
আমিই কেবল বঞ্চিত কেন রুদ্ধ এ কারাগারে?
যাব যেথা আছে আমার সে দেবী পূজিব আমিও তারে।"

না রাখিয়া মনে দেবীর নিষেধ শবর একদা এসে
করে ফুল ফল উপনীত হ'ল সিংহ-দুয়ার-দেশে।
প্রবেশোদ্যত হেরিয়া তাহারে রক্ষী রোধিল দ্বারে
"দেব-অঙ্গনে চাহে প্রবেশিতে হীন অন্ত্যজ আরে!
না মানে নিষেধ মূঢ় হীন-বোধ উন্মাদ বুঝি হবে!"
"ছাড় দ্বার পূজি দেবীরে আমার"—"দেবী তোর হ'ল কবে?
দূরে যা দীন অধম শবর নহে অপমান হবি
অস্পৃশ্য তোর বায়ুর পরশে রুষ্টা হইবে দেবী!
রাজেন্দ্র-কোপে জীবন রক্ষা দুষ্কর হবে তোর!"
"আমারে বাঁধিবে দেবী হরি মোর রাজ নরেন্দ্র চোর!"—
"সরে যা বাতুল আসে পূজা লয়ে শত রাজ পুরোহিত,
নাগরিক দল লয়ে উপহার, হ'ত সবে একত্রিত!
ঐ বাজে ঘন দামামা পুরীর বাহির হ'লেন রাজা
সরেনা নড়েনা এটারে দাও ত স্পর্দ্ধার মত সাজা।"
লাঞ্ছিত হয়ে ব্যথিত শবর নীরবে দাঁড়াল সরে'
পূজা বহি লয়ে নাগরিক দল প্রবেশিল মন্দিরে।

রজনীতে ব্যাধে সান্ত্বনা দিয়া ক'ন দেবী ধীরে ধীরে—
"পাষাণ প্রতিমা উপাস্য যেথা প্রস্তর মন্দিরে।
নিয়ম আচার আড়ম্বর ও নিষেধ বিধান নানা,
সেথায় পূজিতে কেন গেলে ওগো না শুনি আমার মানা!
সে পাষাণময়ী দেবীতে তোমার আমারে পাবে না খুঁজি।"
নিঃশ্বাসি ব্যাধ কহে সবিষাদে "আমি যে তাহাই পূজি!
সহস্রলোক প্রবেশিল সেথা লয়ে পূজা-উপহার,
আমার পূজার অর্ঘ্য লইতে রুদ্ধ কেন সে দ্বার?"
"রুদ্ধ হোক্ সে ক্ষুদ্র দুয়ার বদ্ধ দেউলে বলে
মন্দির তব নির্ম্মিত র'ক্ মুক্ত আকাশ তলে,
হৃদয় পীঠের মণি বেদী 'পরে র'ক্ প্রাণময়ী দেবী,
সেব্য সেবক অমরতা পাক্ উভয়ে উভয় সেবি'।
নির্ব্বোধ ওগো কি পাবে অধিক সেথায় হইার হ'তে?"
সবিষাদে কহে নিষাদ "ওগো এ আমি যে পারিনা ল'তে!
কেন বাধা পেল মোর পূজা সেথা? কিছু নাহি চাহি আর,
দাও শুধু তোমা সকলের সাথে পূজিবার অধিকার"।

পথিক আরো কি শুনিবারে চাও;—শোন তবে একদিন
সহসা দেবীর হস্ত হইতে খসিয়া প'ড়ল বীণ্
ঘন অবসাদ সন্ধ্যারি বাঁশী ধরিল বিষাদ তান
নন্দনে নিরানন্দ প্রবেশি হ'ল সব ম্রিয়মাণ।

মণি মন্দির উচ্চ শীর্ষে কেতন পড়িল হেলে !
নৃপতির সাথে শত পুরোহিত ভাসে নিতি আঁখি-জলে,
ভাবে তারা শত নিষ্ঠা আচার নিয়মে বিধানে সেবি
প্রস্তর-দেহে প্রাণ সঞ্চারি এনেছিল সেই দেবী
অন্তর্হিতা হয়েছেন তিনি পরশিয়া অনাচার
অন্ত্যজ এক শবর-শোণিতে সিক্ত সিংহদ্বার।
উন্মাদ সেই পূজিবারে তাঁরে করেছিল দৃঢ় পণ
রক্ষীর সাথে দ্বন্দ্ব করিতে হত হ'ল সেই জন !
দেবতা কোথায় হেরিতে চাহ কি ? যাও মন্দির-দ্বারে
প্রস্তরময়ী প্রতিমা দেখিবে দাঁড়ায়ে অন্ধকারে !
সন্দ উঠেছে জনরবে—বুঝি শবরেরি ছিল সবি
তারি দেওয়া প্রাণ ছিল প্রতিমার প্রমাণ দিলেন দেবী।"

শ্রীনিরুপমা দেবী
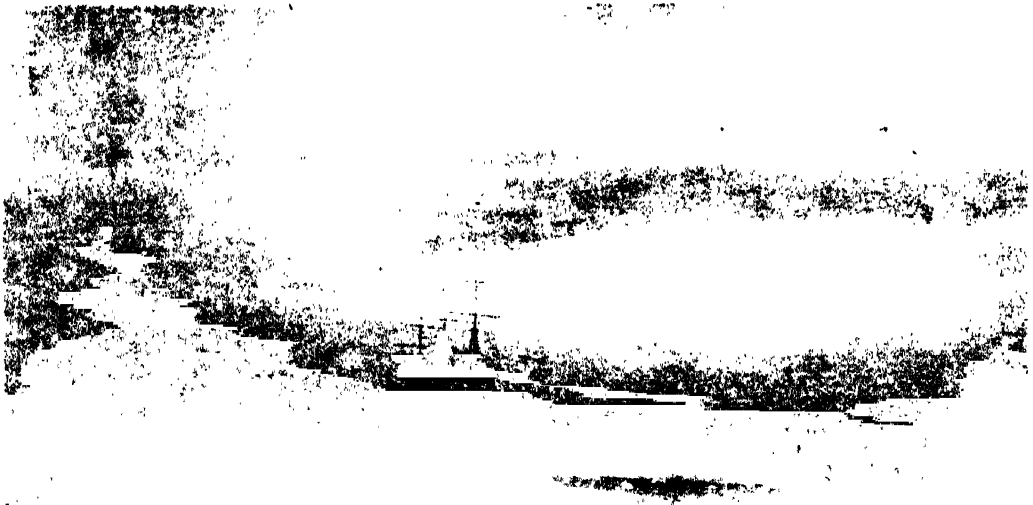
শ্রীযুক্ত আ[illegible]কুমার চৌধুরীর আলোক চিত্র হইতে।

গঙ্গা-বক্ষে

ইন্দ্রদত্ত।

১

সেই সে কালের কথা,—বড়ই সেকাল। দুই হাজার বৎসরেরও অধিক পূর্ব্বে যখন কলিঙ্গজয়ের পর মহারাজাধিরাজ অশোক এ কালের ভুবনেশ্বর এবং উদয়গিরির মধ্যবর্ত্তী প্রশস্ত মাল-ভূমিতে সৈন্যকটক স্থাপন করিয়াছিলেন, সেই সময়ের একটি দৃশ্যপট পাঠকদিগের সম্মুখে প্রথম উদ্ঘাটিত করিতেছি। মাল-ভূমিতে মহারাজের বিজয়-বাহিনীর জয়োল্লাস, এবং উহার উপকণ্ঠে খণ্ডগিরি এবং উদয়গিরিপ্রস্থে বৌদ্ধ ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদিগের নির্ব্বাণসাধনা। মহারাজচক্রবর্ত্তী অশোক যখন বিশ্বস্ত পার্শ্বচর ইন্দ্রদত্তকে সঙ্গে লইয়া কার্ত্তিকের শুক্লাষ্টমীর চন্দ্রিকাধৌত সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে করিতে ধীরে ধীরে খণ্ডগিরি আরোহণ করিতেছিলেন, তখন ঐ ক্ষুদ্র গিরির শিলায় শিলায় গুহায় গুহায় নির্ব্বাণমুমুক্ষু ভিক্ষুগণ সেই সময়েরও দুই শতাব্দী পূর্ব্ববর্ত্তী কালের মহাপরিনির্ব্বাণ-কথা ভক্তিভরে চিন্তা করিতেছিলেন। দিনের গুণে হউক, স্থানের মহিমায় হউক, প্রাকৃতিক অবস্থার ফলে হউক, কিংবা পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা-বিশেষের প্রভাববশতই হউক, মহারাজ এবং তাঁহার যুবক পার্শ্বচর অতি গম্ভীরভাবে বাক্যালাপ করিতেছিলেন।

যুবক ইন্দ্রদত্ত যখন সপ্রশ্রয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহরাজ! এত নরহত্যা না করিলে যখন চলে না, তখন কি এই দেশ-জয়-ব্রত ভারতের কল্যাণের পক্ষে নিতান্তই অপরিহার্য্য মনে করিতে হইবে?" প্রশ্নটি শুনিয়া মহারাজের সুপ্রশস্ত ললাট যেন প্রশস্ততর হইল; যুবকের প্রতি বিক্ষিপ্ত স্নেহার্দ্র দৃষ্টি জ্ঞান এবং করুণার আলোকে উজ্জ্বলতর এবং মধুরতর হইল! মহারাজ বামহস্তে একটি পলাশের শাখা অবনত করিয়া ধরিয়া সস্মিতমুখে যুবকের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "যখন প্রাণরক্ষার জন্য অস্ত্রচিকিৎসার প্রয়োজন হয়, চিকিৎসককে কি তখন রোগীর আর্ত্তনাদ শুনিয়া কর্ত্তব্য হইতে বিরত হইতে হইবে?" ইন্দ্রদত্ত কথা কহিলেন না, সপ্রশ্নদৃষ্টিতে মহারাজের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

মহারাজ কহিতে লাগিলেন, "জান না কি, সেকন্দর শাহের আক্রমণ এবং পরবর্ত্তী সময়ে গ্রীকদিগের বুভুক্ষা ভারতবর্ষের মোহনিদ্রা ভাঙ্গিয়া দিয়া নবচেতনা বিধান করিয়াছিল? নীচ স্বার্থপরতার প্রেরণায় এদেশের রাজারা যদি ভারতবর্ষকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত করিয়া ফেলে, তবে কি ভারতবর্ষ একতার বলে দৃঢ় হইয়া আত্মরক্ষা সাধন করিয়া কদাচ মনুষ্যত্বলাভে সমর্থ হইবে?"

ইন্দ্রদত্ত বলিলেন, "জানি মহারাজ! যে কল্যাণকর সঙ্কল্পে মৌর্য্যসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাতা ভারতে একচ্ছত্র রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা কদাচ কেহ বিস্মৃত হইতে পারিবে না। কিন্তু একদিনের বিজিত কলিঙ্গকে আবার যখন জয় করিতে হইল, তখন কি মনে হয় না যে, কেবল বাহুবলে বিচ্ছিন্ন ভারতকে সংযুক্ত রাখা সুসাধ্য নহে?"

মহারাজ তখন জ্যোৎস্নাস্নাত আকাশের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ব্রাহ্মণবালক! আমি স্বীকার করি যে, বাহুবলে দেশজয় করিয়া আমি দেশের লোকের শ্রদ্ধাভক্তি আকর্ষণ করিতে পারিব না; কিন্তু আমাকে ভক্তি না করিয়াও যদি সমগ্র দেশ মগধের সিংহাসনের নীচে ভয়ে অবনত থাকে, তাহা হইলেই সিদ্ধিমন্ত্রের প্রথম সোপান রচিত হইল! যাহারা এখন ভয়ে অবনত, তাহারাই আবার অভ্যাসের বশে আপনাদিগকে মগধ হইতে অবিচ্ছিন্ন মনে করিবে, এবং পরে যখন কর্ত্তব্যবুদ্ধি ফুটিয়া উঠিবে, তখন একতার মহিমা বুঝিয়া সকলেই ভক্তিভরে মগধ-সিংহাসনকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইবে। আমি অবজ্ঞাত হই, ভয়ের পাত্র হই, কিংবা যাহাই হই, ভারতের ভবিষ্যৎ সম্রাট্ ভক্তি এবং পূজার পাত্র হইবেন।"

ইন্দ্রদত্ত গদ্গদকণ্ঠে কহিলেন, "মহারাজের জয় হউক! মহারাজ স্নেহবশতঃ আমাকে বালক বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকেন, এবং বাস্তবিকও আপনার জ্ঞানগৌরবের তুলনায় আমিও আমাকে বালক ভিন্ন আর কিছু মনে করিতে পারি না। জিজ্ঞাসা করি মহারাজ! যে প্রয়োজনের জন্য বাহুবল প্রয়োগ করিতে হইল, রাষ্ট্রোন্নয়নের সেই প্রয়োজনসাধনের জন্য কি আর কোন উপযুক্ততর বল প্রযুক্ত হইতে পারে না? কালের ধর্ম্ম এবং অভ্যাসের গুণে দূর ভবিষ্যতে যে সুফল ফলিবে ভাবিয়া আমরা আশ্বস্ত হইতেছি; অচিরে

সেই সুফল লাভ করিবার জন্য কি বাহুবল ব্যতিরিক্ত অন্য কোন বল প্রযুক্ত হইতে পারে না ?”

মহারাজ পলাশের শাখাটি ছাড়িয়া দিয়া পাদচারণ করিতে করিতে কহিলেন, “ব্রাহ্মণকুমার! তুমি শ্রমণ-গুরুর নিকট বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছিলে! ক্ষত্রিয়ব্রত ধারণ করিলেও তোমার গুরুদত্ত শিক্ষা নিষ্ফল হয় নাই।”

ইন্দ্রদত্ত অবনতমস্তকে কহিলেন, “যদি বংশ এবং শিক্ষার প্রভাবের জন্য আমি প্রশংসা লাভের যোগ্য বলিয়া

মহারাজ সবিস্ময়ে একজন ধ্যানিমগ্ন শ্রমণকে লক্ষ্য করিয়া মৃদুস্বরে ইন্দ্রদত্তকে কহিলেন, 'দেখিতেছ ?'

বিবেচিত হই, তবে মহারাজের মাহাত্ম্য যে কত অধিক, তাহা ইহা হইতেই বেশ অনুভব করিতে পারা যায়। আপনার শরীরের অর্দ্ধেক রক্ত ব্রাহ্মণের এবং অর্দ্ধেক রক্ত ভারতগৌরব চন্দ্রগুপ্ত এবং বিন্দুসারের। মহারাজেরও শৈশব সুপণ্ডিত এবং ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ও শ্রমণগুরুর সহবাসেই অতিবাহিত হইয়াছিল।”

মহারাজ অশোক বুঝিলেন যে, ইন্দ্রদত্ত তাঁহাকে প্রীতির ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার নিমিত্ত একাগ্রচিত্তে অনুরোধ করিতেছেন; কিন্তু সাধারণ পাঠকেরা ইন্দ্রদত্তের একটি কথার অর্থ হয় ত ভাল করিয়া বুঝিতে পারেন নাই। মহারাজ অশোকের শরীরে যে অর্দ্ধেক ব্রাহ্মণের রক্ত ছিল, এ কথা অনেক পাঠক নাও জানিতে পারেন। মহারাজ অশোকের পিতা বিন্দুসার চম্পানগরীর এক ব্রাহ্মণ কুমারীকে বিবাহ করিয়াছিলেন, এবং সেই বিবাহের ফলেই মৌর্য্যকুলতিলক অশোকের জন্ম।

মহারাজা প্রত্যুত্তরে কোন কথা না কহিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে হইতে ক্ষুদ্র শৈলটির প্রায় ঊর্দ্ধদেশে উপনীত হইলেন। ইন্দ্রদত্ত আবার যেন কি কহিবেন বলিয়া উদ্যোগ করিতেছিলেন; মহারাজ অঙ্গুলি উত্তোলন করিয়া তাঁহাকে নিষেধ করিলেন; এবং পরে সবিস্ময়ে একজন ধ্যানমগ্ন শ্রমণকে লক্ষ্য করিয়া মৃদুস্বরে ইন্দ্রদত্তকে কহিলেন, “দেখিতেছ ?” ইন্দ্রদত্ত তেমনই মৃদুস্বরে কহিলেন, “দেখিতেছি মহারাজ, কি সুন্দর! জ্যোৎস্না অপেক্ষাও স্নিগ্ধ, শ্যামল পত্রবিচ্ছুরিত কিরণবিম্ব অপেক্ষাও মনোহর, নিস্তব্ধ নিশাকালের অম্বরাচ্ছাদিত শৈল সঙ্ঘ অপেক্ষাও প্রশান্ত!” উভয়েই দূর হইতে মনে মনে শ্রমণকে প্রণাম করিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে উভয়ের কর্ণগোচর হইল যে, শ্রমণ আবৃত্তি করিতেছেন—

ন তথ চন্দিমা ভাতি তমো তথ ন বিজ্জতি।

২

ভিক্ষুদিগের বিহারশৈল হইতে শিবিরে প্রত্যাগমনের পর মহারাজ অশোকবর্দ্ধন কি করিয়াছিলেন, জানি না; কিন্তু ইন্দ্রদত্ত শয্যায় বসিয়া বিবিধ চিন্তায় রাত্রি যাপন করিয়াছিলেন। প্রভাতে যখন ভিক্ষুগণ ভিক্ষাপাত্র এবং

K. V. SEYNE & BROS.

দণ্ড ধারণ করিয়া বিহার ত্যাগ করিতেছিলেন, ইন্দ্রদত্ত তখন তাঁহাদের নির্গমন-পথের একপার্শ্বে বসিয়াছিলেন। পঙ্গবজনাতে যে সৌম্যমূর্ত্তি শ্রমণকে দেখিয়াছিলেন, তিনি বিহার হইতে নিষ্ক্রমণ করিবামাত্র ইন্দ্রদত্ত তাঁহাকে সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন, "আপনি যদি আজ রাজশিবিরের এক প্রান্তে পদার্পণ করিয়া ভিক্ষাগ্রহণ করেন, তবে আমি কৃতার্থতালাভ করিব।" শ্রমণ অন্য কোন কথা না বলিয়া ইন্দ্রদত্তের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন, এবং তাঁহার সহিত রাজশিবিরের দিকে অগ্রসর হইলেন। শ্রমণ পথে যাইতে যাইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি পূর্ব্বে আমাকে চিনিতে?" ইন্দ্রদত্ত মহারাজের নামোল্লেখ না করিয়া যে সুযোগে তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন, অল্প কথায় তাহা তাঁহাকে শুনাইলেন।

ইন্দ্রদত্ত যখন শ্রমণকে সৈন্যনিবেশের অপর পারে রাজশিবিরের বহিঃপ্রকোষ্ঠসংলগ্ন আশ্রয়গৃহে আসন দিলেন, ভিক্ষু তখন ইন্দ্রদত্তকে মহারাজের বিশ্বস্ত পার্শ্বচর জানিয়া তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। ইন্দ্রদত্ত যখন তাঁহার পরিচয় দিলেন, ভিক্ষু তখন এমন নিবিষ্টমনে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন যে, ইন্দ্রদত্তকে বাধ্য হইয়া সঙ্কুচিতচিত্তে মুখ অবনত করিতে হইয়াছিল। শ্রমণ জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি একবার বিদিশায় গিয়াছিলে?" ইন্দ্রদত্ত বিস্মিত হইয়া উত্তর করিলেন, "হাঁ।" শ্রমণ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি বিদিশা হইতে ফিরিবার সময় মথুরায় উপগুপ্তের গৃহে গিয়াছিলে?" বিস্ময়ের উপর বিস্ময় বাড়িল; যুবক এবারেও বলিলেন—"হাঁ"। শ্রমণ ভাবিলেন যে, যুবক হয়ত তাঁহাকে সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া মনে করিতে পারেন; তাই তাঁহার বিস্ময় অপনোদনের জন্য কহিলেন "এই দীন ভিক্ষুই উপগুপ্ত"। ইন্দ্রদত্ত কহিলেন, "প্রভু! আপনি ত তখন গৃহে ছিলেন না। কি করিয়া আমার সংবাদ পাইলেন?" শ্রমণ উপগুপ্ত হাসিয়া বলিলেন—"আমি মহিন্দ এবং মিত্তার মুখে তোমার অনেক কথা শুনিয়াছি।"

আশ্বস্ত হওয়া দূরে থাকুক, এই সংবাদ শুনিয়া ইন্দ্রদত্তের মাথা ঘুরিয়া গেল! তাঁহার চক্ষের প্রফুল্ল জ্যোতি যেন ম্লান হইয়া আসিল! উপগুপ্ত তাহা লক্ষ্য করিয়া ঈষৎ চিন্তামগ্ন হইলেন, কিন্তু কিছু বলিলেন না। ইন্দ্রদত্ত মানসিক বিকার লুকাইবার প্রয়াসে অন্য কথা পাড়িলেন, এবং কহিলেন, "আপনাকে দেখিতে পাইলে মহারাজ অশোকবর্দ্ধন বড়ই আনন্দলাভ করিবেন।" শ্রমণ সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া ইন্দ্রদত্তকে বলিলেন, "মহিন্দ এ বৎসর বর্ষাগমের পূর্ব্বেই ভিক্ষুব্রত অবলম্বন করিয়াছে"। ইন্দ্রদত্ত উত্তর করিলেন, "জানি"। শ্রমণ পুনরপি কহিলেন—"গত প্রতিপদের দিন সংবাদ পাইয়াছি যে, মিত্তাও ভিক্ষুণীব্রত গ্রহণ করিবার জন্য অনুরাগিণী; কিন্তু মহারাজের আদেশ ও আশীর্ব্বাদ লাভের পূর্ব্বে দীক্ষা গ্রহণ করিবে না বলিয়া উজ্জয়িনীর প্রাসাদে অবস্থান করিতেছে।"

"অনুমতি করুন, আপনার ভিক্ষার উদ্যোগ দেখিয়া আসি" বলিয়া ইন্দ্রদত্ত ছল করিয়া দ্রুতপদে কক্ষান্তরে প্রবেশ করিলেন, এবং অস্থিরভাবে আপনার অধীরতা নিবারণের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

মহারাজ অশোক যখন বিন্দুসারের রাজত্বকালে উজ্জয়িনীর শাসনকর্ত্তা ছিলেন, তখন বিদিশার এক শ্রেষ্ঠীর কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন।* সেই হতভাগিনী যখন মহিন্দ এবং মিত্তাকে মাতৃহীন করিয়া চলিয়া গেলেন, উপগুপ্ত তখন গৃহী ছিলেন। তিনি মহিন্দের মাতার মাতুল ছিলেন বলিয়া নিজ পত্নীকে উজ্জয়িনীতে পাঠাইয়া মাতৃহীন শিশু দুইটির লালন পালনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বিন্দুসারের মৃত্যুর পর রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত হইবার সময়ে মহারাজ অশোককে যখন অভিষেকের নিয়ম অনুসারে নবপত্নী গ্রহণ করিতে হইয়াছিল, তখন ইচ্ছাপূর্ব্বক রাজমহিষীর নিকট হইতে দূরে রাখিবার জন্যই সন্তানদুটিকে উজ্জয়িনীতে রাখিয়াছিলেন। পরে যখন উপগুপ্তের পত্নীবিয়োগ হয়, তখন তিনি ভিক্ষুব্রত অবলম্বন করিয়া মথুরাতেই বাস করিতেন। যখন বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, মহিন্দ এবং মিত্তাকে দেখিবার লোকের অভাব নাই, তখন ভিক্ষুব্রত গ্রহণের সময় পাটলিপুত্রে মহারাজকে কোন সংবাদ পাঠান নাই।

* সিংহলের ইতিহাসে এবং দেশের প্রবাদে যে সম্পর্কের কথা সুস্পষ্ট জানা যায়, দুই একজন বিদেশী ভ্রমণকারীর কথায় সেই সম্পর্ক অস্বীকার করিয়া মহিন্দকে অশোকের ভাই করা চলে না।

উপগুপ্ত ইন্দ্রদত্তের চিত্তচাঞ্চল্য লক্ষ্য করিয়া তাঁহার অনুপস্থিতি-কালে আবৃত্তি করিয়াছিলেন—

চিত্তং মম অস্সবং বিমুত্তং
দীঘরত্তং পরিভাবিতং সুদন্তং ;
পাপং পন মে ন বিজ্জতি
অথ চে পত্থয়সী পবস্স দেব।

চিত্ত মোর বশংবদ বিমুক্ত স্বাধীন,
সংযত করেছি যত্ন করি বহুদিন ;
প্রবেশ করে না পাপ আমার অন্তরে,
বর্ষ, বৃষ্টি, যত খুসি, যতক্ষণ ধরে'।

এমন সময়ে স্বয়ং মহারাজ অশোকবর্দ্ধন শিবির-প্রকোষ্ঠে দাঁড়াইয়া ডাকিলেন—"ইন্দ্রদত্ত !"

৩

কলিঙ্গ হইতে পাটলিপুত্রে প্রত্যাগমনের সময় অরণ্য-প্রদেশ অতিক্রম করিতে করিতে যখন সুবর্ণরেখা নদীর অতি শীর্ণ পার্ব্বত্য ধারার তীরে শিবির সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল, ইন্দ্রদত্ত তখন উদ্ভ্রান্ত মনে নদীতীরে ভ্রমণ করিতেছিলেন। সেই স্থানটিতে সুবর্ণরেখা উজ্জয়িনীর শিপ্রা নদীর এত অনুরূপ যে, তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলেন না যে, এ শিপ্রা নদী নহে।

একদিন অপরাহ্ণ কালে শিপ্রাতটে রাজপুত্র মহিন্দ ইন্দ্রদত্তের সহিত ব্রাহ্মণ্য এবং শ্রমণধর্ম্ম লইয়া বিচার করিতেছিলেন ; এবং মিত্তা নদীতীরস্থিত বিশ্রাম-চত্বরে বসিয়া উভয়ের কথা মনোযোগপূর্ব্বক শুনিতেছিলেন। ভ্রাতা এবং ভ্রাতৃবন্ধুর কথোপকথন শেষ হইতে না হইতেই মিত্তা আসিয়া হাসিয়া বলিয়াছিল, "দাদা ! আমি ব্রাহ্মণী হইব।" সে তখন দ্বাদশ কি ত্রয়োদশ বর্ষীয়া বালিকা মাত্র।

মহিন্দ বা মহেন্দ্র যখন হাসিয়া উত্তর দিয়াছিলেন—"তোমাকে আবার কোন্ ব্রাহ্মণ বিবাহ করিবে ?" মিত্তা বা মিত্রা তখন দাদার উত্তরীয় ধরিয়া টানিতে টানিতে বলিয়াছিল, "কেন ? ইন্দ্রদত্ত আমাকে বিবাহ করিবে ? তুমি ইন্দ্রদত্তকে জিজ্ঞাসা কর। ও আমাকে কেমন ভালবাসে !" ইন্দ্রদত্তের মুখ লজ্জায় লাল হইয়া উঠিয়াছিল ; কিন্তু বালিকার সরল হাস্যে লজ্জার রেখামাত্র ছিল না। মহেন্দ্র যখন কৃত্রিম কোপ দেখাইয়া মিত্রাকে বাড়ীতে পাঠাইয়া দিলেন, তখন মহেন্দ্র নিজেই বলিলেন, "মিত্রার সরলতা এবং পবিত্রতার তুলনা নাই।" সে আজ আট বৎসর পূর্ব্বের কথা !

ইন্দ্রদত্ত স্বপ্নমগ্ন হইয়া ভাবিতেছিলেন, তিনি শিপ্রাতটে বসিয়া আছেন, এবং বিশ্রামচত্বরের সোপানে বসিয়া মিত্রা তাঁহাকে জলচর পক্ষীদিগের নাম জিজ্ঞাসা করিতেছেন, আর শিপ্রাবাতে রাজকন্যার চূর্ণকুন্তল উড়িতেছে !

মিত্রা যখন বিদিশায় মাতুলালয়ে গিয়াছিলেন, তখন তিনি বয়ঃপ্রাপ্তা। ইন্দ্রদত্ত বিদিশায় গিয়া শ্রেষ্ঠীর উদ্যান-প্রান্তে দাঁড়াইয়া কুসুমভূষিতা মিত্রাকে দেখিতেছিলেন বলিয়া একজন পরিচারিকা যখন তাঁহাকে তিরস্কার করিয়াছিল, তখন তিনি রাজকন্যার কোমল কটাক্ষে প্রীতির ধারা লক্ষ্য করিতে ভুলেন নাই। অরণ্যের প্রতিপাদপ যেন সেই পুষ্পাবরণময়ীকে তাঁহার মানসপটে আঁকিয়া দিতেছিল।

রাজকুমারী যখন তাঁহাকে সংবাদ দিয়াছিলেন যে, উপগুপ্তের অনুমতি লইয়া তিনি যেন মহেন্দ্রকে দিয়া মহারাজের আদেশের জন্য লিপি প্রেরণ করান, তখন দৈব যেন তাঁহার প্রতিকূলে ছিল। অল্পদিনের মধ্যে উজ্জয়িনীর শাসনকর্ত্তার আদেশে তাঁহাকে পাটলিপুত্রে যাইতে হইয়াছিল। সেখানে ইচ্ছাপূর্ব্বক সৈন্যদলে প্রবেশ করিয়া অল্পদিনেই মহারাজের প্রিয়পাত্র হইতে পারিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সাহস করিয়া মহারাজকে কোন কথা জানাইতে পারেন নাই। অতি অল্প সময়ের মধ্যে কলিঙ্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রাও করিতে হইয়াছিল।

মহেন্দ্র একদিন ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পক্ষপাতী ছিলেন ; কিন্তু আজ তিনি ভিক্ষুব্রত অবলম্বন করিয়াছেন। এ সংবাদ কলিঙ্গপ্রস্থে মহারাজের নিকট উজ্জয়িনী হইতে প্রেরিত হইয়াছিল ; কিন্তু মিত্তার সংসার-বৈরাগ্যের কথা কেহ বলে নাই।

ইন্দ্রদত্ত ভাবিতেছিলেন যে, যে পাখী আকাশে উড়িতেছে, তাহাকে ধরিতে পারিব না ; কিন্তু ঐ নীলাকাশের তলায় তাহার পক্ষ-সঞ্চালন দেখিব ; শিপ্রার নদীসৈকতে যখন তাহার পক্ষের ছায়া পড়িবে, তখন সেই ছায়ায় মাথা রাখিয়া

রসিব; যখন ঊর্দ্ধ গগন হইতে চারুকণ্ঠের কলধ্বনি বাতাসের স্তরে স্তরে মাধুর্য্য ছড়াইতে থাকিবে, তখন আমি পবন-পরিচালিত স্খলিত-পত্র চুম্বন করিয়া সেই সুধা আহরণ করিব।

এক একবার ভাবিতেছিলেন যে, যদি ব্রতগ্রহণের পূর্ব্বে একবার উজ্জয়িনীতে যাইতে পারি! কিন্তু কি হইবে? যে শৃঙ্খলমুক্ত, তাহাকে কি শৃঙ্খল পরাইতে যাইব? ভাবিতেছিলেন যে, যদি মহারাজ তাঁহাকে কলিঙ্গে না আনিয়া বঙ্গের অপর প্রান্তে প্রাগ্‌জ্যোতিষেরও পরপারে ডবাক রাজ্যের দুস্তর শৈলপথ দিয়া সোবর্ণভূমিতে (ব্রহ্মদেশ) পাঠাইতেন, তাহা হইলে হয়ত আর ভারতে ফিরিতে হইত না। মিত্রা বলিত যে, সোবর্ণভূমির পূর্ব্বে শাকদ্বীপ এবং তাহার পূর্ব্বে ক্ষীর-সমুদ্র! পরিব্রাজকেরা আসিয়া নাকি রাজভবনে ঐ দেশের গল্প বলিতেন।

সহসা মহারাজ আসিয়া ইন্দ্রদত্তকে ডাকিয়া সংবাদ দিলেন যে, দূত আসিয়া সংবাদ দিয়াছে যে, সোবর্ণভূমি হইতে মহাচীনের পূর্ব্ব-দক্ষিণ সীমা পর্য্যন্ত পাটলিপুত্রের আধিপত্য স্বীকৃত হইয়াছে। এ সংবাদ শুনিয়াও যখন ইন্দ্রদত্ত স্বপ্নোত্থিতের মত মহারাজের দিকে চাহিয়া রহিলেন, তখন মহারাজ কিয়ৎক্ষণ চিন্তার পর ইন্দ্রদত্তকে আদেশ দিয়া কহিলেন, "সকল দিক্‌ হইতেই দিগ্বিজয়ী সৈন্যেরা অচিরাৎ রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিবে এবং সেখানে বিজয়োৎসব হইবে। শ্রমণ উপগুপ্ত হয়ত সে সময়ে রাজভবনে উপস্থিত থাকিতে পারেন। তুমি কএকজন সৈন্য এবং প্রয়োজনমত হস্তী ও অশ্ব লইয়া আমাদের অগ্রবর্ত্তী হও, এবং যত শীঘ্র পার, যান-বাহনের উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া মিত্রাকে উজ্জয়িনী হইতে পাটলিপুত্রে আনিবার ব্যবস্থা কর।"

হঠাৎ বর্ষায় শীর্ণা পার্ব্বত্য নদীতে যেন জলধারা বহিতে লাগিল! মহারাজ লক্ষ্য করিলেন যে, ইন্দ্রদত্তের উদ্ভ্রান্ত চক্ষু প্রসন্নতা-লাভ করিতেছে। ইন্দ্রদত্ত অবনতশিরে মহারাজের আদেশ গ্রহণ করিলেন।

৪

ইন্দ্রদত্তকে উজ্জয়িনীর নব শাসনকর্ত্তার আতিথ্যগ্রহণ করিতে হইয়াছিল। অপরাহ্নে যখন প্রাচীন রাজপ্রাসাদে রাজকুমারী মিত্রার নিকট সংবাদ গেল যে, ইন্দ্রদত্ত উজ্জয়িনীতে আসিয়াছেন, তখন তিনি ইন্দ্রদত্তকে অবিলম্বে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আদেশ বা সংবাদ দিলেন। ইন্দ্রদত্ত তাঁহার বক্ষে দ্রুত রক্ত-সঞ্চালন অনুভব করিতে লাগিলেন। উজ্জয়িনীতে অগ্রহায়ণ মাসে বেশ শীত পড়ে; কিন্তু মুহুর্মুহুঃ ইন্দ্রদত্তের হাত ঘামিতে লাগিল। কি পরিচ্ছদ পরিয়া রাজকুমারী-সমক্ষে উপস্থিত হইবেন, ভাবিয়া স্থির করিতে না পারিয়া রাজভৃত্যের পরিচায়ক সৈনিকের বেশ ধারণ করিয়া গেলেন।

ইন্দ্রদত্ত প্রাচীন রাজভবনের দর্শককক্ষের দ্বারে উপস্থিত হইবামাত্রই দেখিলেন, দর্শককক্ষ এবং মন্ত্রগৃহের অন্তর্বর্ত্তী প্রশস্ত প্রকোষ্ঠে রাজকুমারী কএকজন পরিচারিকা লইয়া বসিয়া আছেন, এবং তাঁহাকে সেই প্রকোষ্ঠে লইবার জন্য একজন বৃদ্ধ ভৃত্য দর্শককক্ষের সম্মুখে অপেক্ষা করিতেছে। ইন্দ্রদত্ত তখনও গুছাইয়া ভাবিয়া উঠিতে পারেন নাই যে, ঠিক্‌ কি বলিয়া কথা আরম্ভ করিবেন; কিন্তু সহসা তাঁহাকে রাজকুমারীর পুরোভাগে নির্দ্দিষ্ট আসন গ্রহণ করিতে হইল। যাহা হউক, ইন্দ্রদত্তকে "ভদ্রে!" বলিয়া একটা শিষ্টাচারের সম্বোধন করা ব্যতীত অন্য কথা কহিতে হয় নাই, কিংবা কহিবার অবসরও তাঁহার মিলে নাই। রাজকুমারী কহিতে লাগিলেন—

"পিতার মঙ্গল সংবাদ পাইয়াছি। দাদা দুই তিন দিনের মধ্যেই এখানে আসিবেন। তিনি ভিক্ষু হইলেও তোমাকে দেখিয়া সুখী হইবেন। আমি তোমাকে দেখিয়া আজ বড় সুখী হইয়াছি। আমি নিশ্চয় জানি, তুমি আমাকে ভালবাস, এবং আমাকে দেখিয়া সুখী হইয়াছ।"

ইন্দ্রদত্ত বক্ষতটে রক্ততরঙ্গের আঘাত অনুভব করিতেছিলেন, এবং এই অত্যাশ্চর্য্য প্রগল্‌ভতায় বিস্মিত হইয়া পরিচারিকাদিগের মুখের দিকে চাহিলেন। দেখিলেন, তাহারা কাষ্ঠপুত্তলীর মত দাঁড়াইয়া রহিয়াছে; কেবল একজন পরিচারিকার চক্ষু একটু অশ্রুসিক্ত বলিয়া মনে হইল।

রাজকুমারীর মুখ প্রশান্ত, চক্ষু উজ্জ্বল এবং উচ্চারণে কিছুমাত্র জড়তা নাই। তিনি ইন্দ্রদত্তকে বলিলেন—"তুমি পূর্ব্বে আমাকে বড় ভালবাসিতে, আমাকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিলে; তুমি এখনও আমাকে নিশ্চয়ই তেমনই

ভালবাস ; না ?” প্রশ্ন শুনিয়া পরিচারিকারা কেহই মুখ অবনত করিল না ; কেবল পূর্ব্বনির্দ্দিষ্টা অদ্ধঅশ্রুসিক্তা পরিচারিকাটি এমন ভাবে মাথা দোলাইল যে, তাহাতে মনে হইল যে, সে যেন শোক করিয়া ভাবিতেছে, ভগবান্! রাজকুমারীর মাথা এত খারাপ হইল কেন ? রাজকুমারীও হয়ত ভাবিয়াছিলেন যে, কি জানি, ইন্দ্রদত্ত যদি তাঁহাকে উন্মত্তা বলিয়া মনে করেন! তাই তিনি প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করিয়াই আবার দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন—“আমি উন্মত্তা নহি, ইন্দ্রদত্ত! আমার শিক্ষয়িত্রী ভিক্ষুণীর প্রসাদে জীবনের সকল কথাই আমার কাছে তুলামূল্য। তুমি আমাকে ভালবাস ?”

ইন্দ্রদত্তের যেন বাক্‌রোধ হইতেছিল। তিনি অতি কষ্টে উত্তর দিয়া বলিলেন—“রাজকুমারী! আমি রাজভৃত্য।”

তুমি আমার স্বামী, কিন্তু বিবাহ হইবে না।

রাজকুমারী মিত্রা ঈষৎ করুণকণ্ঠে বলিলেন, “ইন্দ্রদত্ত, তুমি বীরপুরুষ ; অনায়াসেই বাসনা জয় করিতে পার। তুমি যদি বাসনা জয় করিতে, তবে লজ্জার মেঘ আসিয়া তোমার মনের সত্য কথাকে আবরণ করিত না। তোমার কম্পিতস্বরে এবং কাতরদৃষ্টিতে যে সত্য উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত হইতেছে, তুমি তাহা প্রচ্ছন্ন করিতে পারিবে না। আমি তোমার মুখরা পত্নী! চমকিও না, ইন্দ্রদত্ত! তোমাকে আমি অতিথি মনে করি নাই বলিয়াই দর্শককক্ষের বাহিরে আসন দিয়াছি। নহিলে পাদ্যঅর্ঘ্য দিয়া অতিথি-ব্রাহ্মণের সহিত কথা কহিতাম। তোমাকে এক দিন মনে মনে বরণ করিয়াছিলাম, তুমি একদিন মনে মনে আমাকে গ্রহণ করিয়াছিলে। তুমি আমার স্বামী ; কিন্তু বিবাহ হইবে না।

যে দুইজন পরিচারিকা চামর-ব্যজন করিতেছিল, তাহারা যুগপৎ ব্যজন বন্ধ করিল ; একজন পরিচারিকা শিষ্টাচার ভুলিয়া বসিয়া পড়িল, এবং আমাদের পূর্ব্বনির্দ্দিষ্টা পরিচারিকাটি দুই হস্তে চক্ষু আবরণ করিল।

ইন্দ্রদত্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, “রাজকুমারী! আপনি কি ভিক্ষুণীব্রত গ্রহণ করিয়াছেন ?” রাজকুমারী কহিলেন, “না! এই দেখিতেছ রাজপ্রাসাদ, চামরব্যজন এবং স্বর্ণাসন।” পরিচারিকারা দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিল।

রাজকুমারী পুনরপি কহিলেন—“তোমার সঙ্গে রাজধানীতে যাইবার পর পিতার অনুমতি লইয়া ভিক্ষুণীব্রত গ্রহণ করিব।”

ইন্দ্রদত্ত কথা কহিলেন না ; কিন্তু রাজকুমারী কহিলেন—“পরশ্ব দিন শ্রমণ উপগুপ্ত এখান হইতে রাজগৃহের বিহারভূমিতে যাত্রা করিয়াছেন। তিনি সর্ব্বজীবে করুণাময়। আমি যদি সংসারধর্ম্ম করি, তাহা হইলে যাহাতে তোমাকে বিবাহ করি, সেই কথা বলিতে আসিয়াছিলেন। স্বামী, তুমি আমার কল্যাণ কামনা কর। সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে, এখন তোমার পত্নীকে বিদায় দাও।”

ইন্দ্রদত্ত আমার দিকে কাতর দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে।

ইন্দ্রদত্তের অন্তরাত্মা চীৎকার করিয়া বলিতেছিল,—"মিত্তা! মিত্তা! এ কি করিলে?" কিন্তু বীর ব্রাহ্মণকুমার এই মাত্র বলিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন—"ভদ্রে! ভগবান্ আমাদের সকলের কল্যাণ বিধান করুন।"

৫

"দাদা! কালিঙ্গের* এই খণ্ডগিরি বিহারের এই স্থানেই হয়ত এমনই সময়ে মহারাজ প্রথম শ্রমণ উপগুপ্তকে দেখিয়াছিলেন।"

মহিন্দ তখন কৃত্তিকা ও মৃগশিরা নক্ষত্র লক্ষ্য করিয়া আকাশের পূর্ব্ব সীমান্তে অবস্থিত একটি অস্পষ্ট নক্ষত্রের পরিচয় লইতে চেষ্টা করিতেছিলেন। প্রশ্নের উত্তরে সংযত ভাষায় কেবলমাত্র বলিলেন,—"হাঁ সঙ্ঘমিত্তা", রাজকুমারী মিত্তা ভিক্ষুণীব্রত গ্রহণ করিয়া সঙ্ঘমিত্রা নাম পাইয়াছেন। মহিন্দ যখন এই কথার সম্পর্কে তাঁহার বন্ধুর কথা উত্থাপন করিলেন না, তখন আবার কিছুক্ষণ পরেই সঙ্ঘমিত্রা বলিলেন,—"মহারাজ স্বয়ং উপসম্পদা (দীক্ষা) গ্রহণের পর যে সকল ধর্ম্মানুশাসন প্রস্তুত করিতেছেন, ইন্দ্রদত্ত নাকি সেইগুলি যত্নপূর্ব্বক লেখাইতেছেন।" মহেন্দ্র নক্ষত্র ভুলিয়া ভগ্নীর মুখের দিকে চাহিলেন, দেখিলেন সঙ্ঘমিত্রা করুণদৃষ্টিতে আকাশের দিকে চাহিয়া আছেন।

সঙ্ঘমিত্রা কোন উত্তর না পাইয়া তেমনই আকাশের দিকে চাহিয়াই বলিলেন,—"দাদা! এখান হইতে পালিপুত্র কতদূর?" পাঠকদিগকে বলিয়া রাখি যে ঐ যুগের সাধারণ উচ্চারণে পাটলিপুত্রের নাম ছিল পালিপুত্র, এবং ঐ পালিপুত্রের নাম গ্রীকেরা পালিবোথ্ লিখিত, এবং পরবর্ত্তী সময়ে মগধের প্রাকৃত ভাষার নাম হইয়াছিল পালিভাষা।

শ্রমণ মহেন্দ্র ভগিনীর এই প্রশ্ন শুনিয়া উৎকণ্ঠিত মনে বলিলেন,—"সঙ্ঘমিত্তা! মহাকোট্‌ঠিক থেরের সেই গাথা স্মরণ কর—

"উপসন্তো উপরতো মন্তভাণী অনুদ্ধতো
ধুনাতি পাপকে ধম্মে দুমপত্তং ব মালুতো।"

সঙ্ঘমিত্তা আকুল হইয়া বলিয়া উঠিলেন,—"দাদা! দাদা! হয়ত ইহা পাপ! হয়ত ইহা মারের প্রেরণা! কিন্তু ঐ দেখ! আমি প্রতি নক্ষত্রে দেখিতে পাইতেছি যে, নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক ইন্দ্রদত্ত আমার দিকে কাতরদৃষ্টিতে চাহিয়া আছে! কে আমি, বিশ্বের সেবা কতদূর করিতে পারিব, জানি না! কিন্তু যে তাহার সমগ্র কাতর প্রাণ আমাকে সমর্পণ করিয়া সুখী হইতে চাহিতেছিল, আমি তাহার সেবা করিতে পারিলাম না! এই নক্ষত্রালোকে আমার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া দেখিয়া লও, আমি সংযম হারাই নাই, চপলতায় চঞ্চল হই নাই; কিন্তু যাহার বাসনা শুদ্ধিলাভের জন্য এই অতি ক্ষুদ্র নগণ্য প্রাণের আশ্রয় চাহিতেছিল, আমি কি শুদ্ধির কামনায় তাহার সেই সরল উদার মহৎ প্রাণকে দূরে নিক্ষেপ করিলাম! আমি নীচ ও স্বার্থপর; নহিলে

* ওড়িশার কটকপুরী প্রভৃতি তৎকালে কলিঙ্গদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

নিজের সুখসিদ্ধির প্রেরণায় পরের সুখ, পরের শান্তি উপেক্ষা করিলাম কেন? আমি বরং বহু জন্ম-জন্মান্তর ঘুরিয়া দুঃখের বোঝা মাথায় করিয়া ছুটিব, শত দুঃখে নিষ্পেষিত হইয়া হাহাকার করিব, চিরদিন মুক্তি হইতে সহস্র যোজন দূরে থাকিব, তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষতি নাই। যদি আমার সেবায় ও সাহচর্য্যে একদিন ইন্দ্রদত্তকে কামনার অতীত স্বর্গে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি!"

মহেন্দ্র স্তম্ভিত হইয়া বলিলেন,—"নারি! এ কি বলিতেছ? তোমাকে চিনিতে পারিতেছি না, বুঝিতে পারিতেছি না! ইন্দ্রদত্ত স্বয়ং ভিক্ষুব্রত অবলম্বন করিয়াছেন; তিনি সাধু এবং সংযত। আমরা যে সকল লিপি লইয়া পাণ্ড্যদেশ এবং সিংহলে যাইব, তিনি পিতার নিকট হইতে সেই সকল লিপি লইয়া আসিয়াছেন, এবং ইচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহার আগমনের বার্ত্তা পর্য্যন্ত তোমাকে শুনিতে দেন নাই; কিংবা তোমার ছায়া স্পর্শ করাও উচিত বলিয়া মনে করেন নাই।"

সঙ্ঘমিত্রা আশ্বস্তা হইয়া বলিলেন,—"এখন বুঝিতে পারিতেছি, কেন আজ নক্ষত্র-লোক উদ্ভাসিত করিয়া ইন্দ্রদত্তের দেবমূর্ত্তি আমার সমক্ষে পরিস্ফুট হইয়াছে! দাদা! তুমি ইন্দ্রদত্তকে সংবাদ দাও; তিনি নিশ্চয় আমার সঙ্গে দেখা করিবেন, শঙ্কিত হইও না; মারের সাধ্য নাই যে, এই বিহারভূমির একগাছি তৃণকেও স্পর্শ করে!"

মহেন্দ্র চলিয়া গেলেন, এবং সঙ্ঘমিত্রা ইন্দ্রদত্তের আগমন-প্রতীক্ষায় শিলাতলে আসন গ্রহণ করিলেন।

ধীরে ধীরে পূর্ব্বগগন আলোকিত করিয়া দ্বিতীয়ার চন্দ্র উদিত হইল, এবং শৈলদেশে চন্দ্রকরোজ্জ্বল বৃক্ষশ্রেণীর তলায় তলায় ছায়া পড়িল।

৬

মহেন্দ্রের সহিত কথা কহিবার পর ইন্দ্রদত্ত একাকী সঙ্ঘমিত্রার নিকট আগমন করিলেন, এবং দেখিলেন যে, যে শিলাতলে একদিন তিনি শ্রমণ উপগুপ্তকে

স্বামী! দেবতা!

দেখিয়াছিলেন সঙ্ঘমিত্রা সেই শিলাতলে বসিয়া আছেন। এ মূর্ত্তিও তেমনই সুন্দর, তেমনই মনোহর, তেমনই প্রশস্ত।

ইন্দ্রদত্তের আগমন লক্ষ্য করিয়াই সঙ্ঘমিত্রা উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং বাহু প্রসারিত করিয়া তারস্বরে ডাকিলেন,—"ইন্দ্রদত্ত!" প্রত্যুত্তরে সিংহনাদের মত শব্দিত হইল—"সঙ্ঘমিত্রা!"

সঙ্ঘমিত্রা তাঁহার প্রসারিত করদ্বয়ে চকিতের মধ্যে ইন্দ্রদত্তের করদ্বয় ধারণ করিয়া তেমনই তারস্বরে, কিন্তু অতি করুণকণ্ঠে সমগ্র জীবনের বেদনা এবং রোদন প্রতিধ্বনিত করিয়া বলিলেন,—"স্বামী! দেবতা! আজি এই ধর্ম্মের পবিত্র ক্ষেত্রে, ভগবানের লীলাগৃহে, ঐ জ্যোতিষ্কপ্রভামণ্ডিত

অম্বরতলে, ঐ দুর্লক্ষ্য নির্ব্বাণ-লোকের মহিমমণ্ডিত সীমাহীনতার মধ্যে তুমি কি চাও?"

"আমি কি চাই?"

ইন্দ্রদত্ত অতি স্থিরকণ্ঠে পরিস্ফুটস্বরে সঙ্ঘমিত্রাকে বলিলেন, "এস সঙ্ঘমিত্রা! আমরা এমনই করিয়া হাত ধরাধরি করিয়া এই পবিত্র গিরির ঐ পবিত্র শিলাখণ্ডের উপর দাঁড়াই। ঐখানে গুরু উপগুপ্তকে দেখিয়াছিলাম।" অমনই সঙ্ঘমিত্রা যে শিলাখণ্ডের উপর পূর্ব্বে বসিয়াছিলেন, তাহার উপর দাঁড়াইলেন, আকাশের চন্দ্রালোক উজ্জ্বলতর হইল, এবং নক্ষত্রের দীপ্তিরঞ্জিত নীলিমায় মাধুরী ঘনীভূত হইল।

ইন্দ্রদত্ত বলিলেন,—"সঙ্ঘমিত্রা! ভগবান্ বুদ্ধদেবের করুণায় আমিও আজ তোমার মত বাসনার নির্ব্বাণ করিয়া সুখী হইয়াছি। তোমার করুণা সর্ব্বজীবে প্রবাহিত হইবার প্রথম উদ্যমে আমাকে আপ্লুত করিয়া যাইতেছে। তোমার প্রাণ যে জীবসঙ্ঘের মিত্রতা সাধনে উৎসৃষ্ট, আমার প্রাণও আজ সেই সঙ্ঘের পদতলে! আমাদের প্রাণ সঙ্ঘের সেবায় মিলিয়া গিয়াছে,—আজ আমাদের শুভ বিবাহ, ঐ দেখ! আমাদের বিবাহের উৎসবে প্রদীপ্ত জ্যোতিষ্কগুলি নিবিয়া গিয়াছে, এবং ঐ জ্যোতিঃ ও অন্ধকার-লোকের পরপারে আমাদের বিবাহ-বাসরের জন্য নির্ব্বাণলোক উদ্ভাসিত হইতেছে।"

সঙ্ঘমিত্রা আনন্দে ভগবানের উদান গায়িয়া বলিলেন,—"সুন্দর ঐ লোক, ইন্দ্রদত্ত! আজ আমাদের শুভ বিবাহে জরামৃত্যুর অবসান হইল। সুন্দর ঐ নির্ব্বাণ-লোক, যেখানে মাটি নাই, জল নাই, বায়ু নাই, জ্যোতিষ্কের প্রভা নাই, অন্ধকার নাই!"

ইন্দ্রদত্ত বলিলেন—"সঙ্ঘমিত্রা! যেদিন এখানে গুরু উপগুপ্তকে দর্শন করিয়াছিলাম, সেদিনও তাঁহার মুখে তোমার গীত এই উদান-গাথার একটি চরণ শব্দিত হইয়াছিল। আমরা দুইজনে আজ এক সঙ্গে আবার সেই উদান গায়িয়া ধন্য হই।" উভয়ে আনন্দে লোকসেবাব্রতে দীক্ষিত হইয়া বক্ষে পরম নির্ব্বাণ ধারণ করিয়া গায়িলেন—

"যত্থ আপো চ পঠবী তেজো বায়ো ন গাধতি,
ন তত্থ সুক্কা জোতন্তি আদিচ্চো ন প্পকাসতি,
ন তত্থ চন্দিমা ভাতি তমো তত্থ ন বিজ্জতি।
যদা চ অত্তনা বেদি মুনি মোনেন ব্রাহ্মণো,
অথ রূপা অরূপা চ সুখদুক্খা পমুচ্চতি।"
নাহি জল, নাহি মাটি, নাহি তেজ, বায়ু না সঞ্চরে,
নাহি তারকার দীপ্তি, সূর্য্য নহে প্রকাশ অম্বরে—
নাহিক চাঁদের ভাতি, নাহি অন্ধকার, রাত্রি,
"আত্ম"কে জেনেছে যেবা, সেই মুনি ব্রাহ্মণ তথায়,
রূপ বা অরূপ কিংবা সুখদুঃখ তথা লয় পায়।

গান শেষ করিয়া ইন্দ্রদত্ত সঙ্ঘমিত্রাকে বলিলেন,—"সঙ্ঘমিত্রা! তোমার কামনা পূর্ণ হইল! তুমি আজ যথার্থ ব্রাহ্মণী হইলে!"

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

আগমনী।

(১)

সুপ্ত এ প্রাণে লুপ্ত করিয়া সকল দৈন্যরাশি,
প্রকাশো জননী নয়নে আমার হাসিয়া মধুর হাসি!
কর দূর যত লাজ ভয় মান,
আলোকে অমৃত আজি কর দান;
বাজাইয়া তোলো জলধির গান সকল বিলাপ নাশি'!

(২)

এসো, শরতে বঙ্গে নানান্ রঙ্গে সঙ্গে রমা ও বাণী;
এসো, সিদ্ধির পথে মঙ্গলরথে জয়দুন্দুভি হানি'!
এসো, আঁচল জুড়িয়া গগনে,
এসো, বোধন-মগন শঙ্খ-ঘোষিত
মোহন শরত-লগনে!
এসো, ভবনে!

(৩)

তব, পশ্চাতে আজি ঝরিতেছে জল ঝিরি ঝিরি ঝর ঝামর!
আজি গগনে গগনে উতলা বাতাস ঢুলাইছে মরি, চামর!
এসো, কিশলয়বাসশোভিতা!
এসো, মুঞ্জরী-আভা-উলসিত দেহ
ফুল্ল-কুসুম অমিতা!
নাশি', অসিতা!

(৪)

শত-লক্ষ-তনয়-হৃদয় গাঁথিছে, মালা যুগল চরণে,
গায়িছে সকলে সমান কণ্ঠে, তব নাম যপি' স্মরণে!
এসো, ভক্ত-হৃদয়-বাসিনি!
এসো, সরস-বিশ্ব-হৃদয়-পদ্মে
শুভ্র সুচারু-হাসিনি!
মনোবাসিনি!

(৫)

তুমি, শরত-প্রভাতে স্নিগ্ধ-সমীর-বিলাসে অরুণ-লোচনা!
এসো, শিশির-সিক্ত-শ্যামল শষ্পে কম্পিত দ্রুতচরণা!
এসো, নির্ম্মল-নভ-বিভাসে,
এসো, নদী-জলধারা-ধৌত-ধরণী
নব যৌবন বিকাশে!
এসো, বিহাসে!

(৬)

এসো, যমুনা-কাবেরী-গঙ্গা-জলধি-তরল-লহরী-ভঙ্গে,
এসো, হিমাচল সম গম্ভীররূপে করুণা-বাহিতা সঙ্গে,
এসো, শস্যের থালা সাজায়ে,
এসো, গঙ্গার ঘাটে সন্ধ্যার কালে
শঙ্খ ঘণ্টা বাজায়ে।

(৭)

এসো, অন্তরমাঝে পুলক-পরশে শিহরি'
এসো, নিখিল বিশ্বে সকল দৃশ্যে বিহরি'
পরমাশান্তি বরষি'
এসো, ভুবনে ভুবনে মনে মনে মনে
মোহন তুলিকা পরশি'
প্রাণ, সরসি!

(৮)

এসো, আশ্বিনে নব উৎসব মাঝে কল্যাণরূপে জননি!
বাধ, ধন-সুন্দর মন্থর গতি ভারতে তোমার তরণী!
এসো, বঙ্গবাসীর পরাণে,
এসো, বঙ্গনারীর প্রেম-সঞ্চিত
পুলক-পূরিত নয়ানে!
এসো, চঞ্চল-শিশু-বয়ানে!

শ্রীত্রিগুণানন্দ রায়।

আমি ও তুমি।

'আমি' বলে ওহে তুমি ভাই!
এসনা দুজনে মিলে যাই।
আমিত সকাল সাঁঝে অনন্ত কাজের মাঝে
কেবল তোমারই গুণ গাই। তবে কেন তোমারে না পাই?

কাছে ভাবি তুমি দূরে, দূরে ভাবি কাছে,
আমি যদি আগে যাই তুমি চল পাছে;
তুমি এস আগুসরি, আমি যদি ভ্রম করি
চলিতে চলিতে পিছে যাই। এ কিরূপ খেলা তোর ভাই?

নীল গগনের তারা হয়ে আছে দিশেহারা,
সারারাতি চোখে ঘুম নাই;
সারাদিন রবি জ্বলে স্বরচিত অনলে,
দেখে আমি লাজে মরে যাই।
উঠে অনাহত ধ্বনি
তুমি তোলো আমি শুনি ওহে মোর তুমি গুণমণি!
তোমারে যে গালি দিতে কথা নাহি পাই।

তুমি তুমি তুমি করি কেন আমি ঘুরে মরি?
কিছুই বুঝিতে নারি ছাই।
কেন আমি তরুবরে, কেন আমি লতিকারে
কেন আমি সমীরে কাঁদাই?
গাই মিলনের গান তবে কেন ব্যবধান?
সর্ব্বস্ব তোমারে দিয়ে নাহি পরিত্রাণ?
কেন আমি তোমারে না পাই?

'তুমি' বলে, 'আমি' ভাই আমিও তোমারে চাই।
আমিও ত দিবানিশি তব গুণ গাই!
স্বহস্তে রচেছি মালা, তুমি সে মালার গলা
মনে করি কত রূপে তোমারে সাজাই।
শুধু অদৃষ্টের ফেরে তুমি আমি থাকি দূরে;
তোমার 'আমিত্ব'টুকু কেবল বালাই।

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ।

নীলু-দা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

নীলমণির শ্বশুর একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী ছিলেন। বিবাহ দিবার সময় তাহার পিতা ভাবিয়াছিলেন—"আমার ছেলের একজন মুরুব্বি হইল।" বাস্তবিক, যদি নীলমণি বি, এ পাস করিতে পারিত এবং তাহার শ্বশুর মহাশয় জীবিত থাকিতেন,—তাহা হইলে তিনি অনায়াসেই নীলমণিকে একটা ডেপুটি করিয়া দিতে পারিতেন। কিন্তু তাহার এমনই পোড়া অদৃষ্ট—এ দুইএর একটিও ঘটিল না। তাই নীলমণি আজ মাসিক পঁয়ষট্টি টাকা বেতনের কেরাণী!

ভীমদাসের লেনে একটি ক্ষুদ্র বাড়ী ভাড়া করিয়া নীলমণি সপরিবারে বাস করে। তাহার দুইটি কন্যা, একটি পুত্র। কন্যা দুইটিই বড়—কমলার বয়স এগার বৎসর, সরলা পাঁচ বৎসরে পড়িয়াছে, পুত্র সুশীল সরলার অপেক্ষা দুই বৎসরের ছোট।

এরূপ অল্প বেতনে কলিকাতায় সপরিবারে বাস করা প্রাণান্তকর ব্যাপার। কষ্টের অবধি নাই। যে বাড়ীটিতে বাস করে তাহার অবস্থা দেখিলে চোখে জল আসে। নীচের ঘরগুলা যেমন অন্ধকার, তেমনই স্যাঁৎসেঁতে। উপরেও এখানটা ভাঙ্গা, ওখানটা ফুটা, কড়ি বরগাগুলা জীর্ণশীর্ণ; ছাদ কখন পড়িয়া যায় ঠিকানা নাই। সারাইয়া দিতে বলিলেই বাড়ীওয়ালা বলে,—ভাড়া বাড়াইয়া দিন, সারাইয়া দিতেছি।—একটি ঝি আছে—সে মাসের মধ্যে অর্দ্ধেক দিন কামাই করে। বাঁধা রেট অপেক্ষা কিছু অল্প বেতনে সে সন্তুষ্ট এবং বাজারের পয়সা চুরি করে না—এই দুইটি গুণের জন্য নীলমণি তাহাকে ছাড়াইতে পারে না। একটু দুধ—তা নীলমণির ছেলে-মেয়েগুলি চোখে দেখিতে পায় না।

দুই একটা সন্দেশ রসগোল্লা—তাহাও কালেভদ্রে তাহাদের অদৃষ্টে জুটে। গলির মোড়ের দোকান হইতে এক এক পয়সার মুড়ি কিনিয়া আনিয়া তাহারা জল খায়। নীলমণির স্ত্রীপুরুষ—দুইবেলা ডাল ভাত খাইয়াই জীবনধারণ করে।

অথচ নীলমণি লোকটি এক সময় বেশ সৌখীন ছিল। একদিন ছিল, যখন সে সস্তা কাপড় কিনিত না—সস্তা জামা জুতা—এ সকল ব্যবহার করা অপমানজনক মনে করিত। পিয়ার্স অথবা ভিনোলিয়া ছাড়া অন্য সাবান মাখিত না—গামছায় গা মুছিত না—তোয়ালে কিনিত। তাহার স্ত্রীও বাল্যকালে ধনী পিতার গৃহে প্রতিপালিত—তাহার অন্যান্য ভগিনীগণ অবস্থাপন্ন লোকেদের হাতেই পড়িয়াছে—সে বেচারীর কষ্ট সহজেই অনুমেয়। মুখটি বুজিয়া সংসারের কাযকর্ম্মগুলি করে—কিন্তু যখন নিতান্ত অসহ্য হয়—তখন স্বামীকে গঞ্জনা দেয় না—নিজে বসিয়া কাঁদে। তাহাতে নীলমণির কষ্ট কিছুমাত্র লাঘব হয় না।

আমাদের কি তেমন কপাল"—বলিয়া গৃহিণী চক্ষে অঞ্চল দিলেন।

পৌষমাস। আজ বকরিদের ছুটির জন্য আফিস বন্ধ। বেলা এগারটার সময় আহারাদি করিয়া, নীলমণি বাজারে বাহির হইবার জন্য প্রস্তুত হইল। কমলার জন্য একটি ফ্ল্যানেলের বডি কিনিতে হইবে এবং খোকার জন্য একটি গলাবন্ধ ও দুইযোড়া রঙীন সুতি মোজা। গৃহিণী বাক্স খুলিয়া চারিটি টাকা আনিয়া স্বামীর হাতে দিলেন।

নীলমণি বলিল,—"আর একটি টাকা দিতে পার্‌বে?"

"কেন?"

"সরলার জন্যে একটি মেম পুতুল কিনে আন্‌তাম।" কিছুদিন পূর্ব্বে পাড়ায় একটি বালিকার হাতে পোষাকপরা মেম পুতুল দেখিয়া, বাড়ী আসিয়া সরলা ভারি বাহানা লইয়াছিল। নীলমণি তখন বলিয়াছিল,—"আচ্ছা কাঁদিস্‌নে—মাইনে পেলে কিনে দেব।"

গৃহিণী বলিলেন,—"এক টাকা দামের একটি পুতুল কিনে দিতে পারি,এমন কি আমাদের অবস্থা? কোথা পাব?"

নীলমণি বলিল,—"একটি টাকা বই ত নয়—পার যদি ত দাও। আহা বেচারি বড় কেঁদেছিল।"

কাঁদ কাঁদ হইয়া গৃহিণী বলিলেন,—"কেঁদেছিল তাও সত্যি বটে—আর একটি টাকা বেশী কিছু নয় তাও ঠিক। মেয়েকে খেলানা কিনে দিতে কোন্‌ বাপমার অসাধ? কিন্তু আমাদের কি তেমন কপাল"—বলিয়া গৃহিণী চক্ষে অঞ্চল দিলেন।

একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া, টাকা চারিটি পকেটে ফেলিয়া, নীলমণি বাহির হইয়া গেল।

সদর রাস্তায় পৌঁছিয়া ট্রামের অপেক্ষায় মোড়ে দাঁড়াইয়া আছে এমন সময় একখানা চলন্ত সেকেণ্ড ক্লাস গাড়ী তাহার সম্মুখ দিয়া ছুটিয়া গেল। পরমুহূর্ত্তেই আরোহী মুখ বাড়াইয়া চীৎকার করিতে লাগিল—"গাড়োয়ান গাড়োয়ান থাড়া করো।"—গাড়ী থামিলে দরজা খুলিয়া এক ব্যক্তি লাফাইয়া পড়িয়া হন হন করিয়া নীলমণির নিকট আসিয়া বলিল,—"নীলুদা!"

নীলমণির নিকট আসিয়া বলিল—"নীলুদা।"

নীলমণি লোকটির মুখের পানে চাহিয়া চিনিতে পারিল না। তাহার অঙ্গে ইংরাজি বেশ—মস্তকে হ্যাট্—হাতে মূল্যবান্ ছড়ি—মুখে চুরুট। বয়স আন্দাজ বত্রিশ—দিব্য মোটাসোটা গোলগাল চেহারা—রঙ বেশ ফর্সা। চিনিতে না পারিয়া নীলমণি তাহার পানে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল।

অৰ্দ্ধমিনিট এইভাবে কাটিলে, লোকটি সকৌতুকে বলিল—"কি নীলুদা—চিন্‌তে পারলে না?—খুব লোক ত তুমি!—বড়মানুষ হয়েছ নাকি হে?—কি হয়েছ? হাকিম টাকিম কিছু হয়েছ বুঝি?"—বলিয়া সে হা হা করিয়া হাসিতে লাগিল।

মাথা দুলাইয়া দুলাইয়া তাহার সেই হাস্য দেখিয়া, নীলমণির লুপ্তস্মৃতি যেন ফিরিয়া আসিল। বলিল—"ওঃ—সুধাংশু?"

লোকটি নীলমণিকে সেলাম করিয়া বলিল,—"জি হুজুর। সেই বান্দাই বটে। ছেলাবেলা থেকে এত বন্ধুত্ব—এত ভাব—আর আজ সাফ্ চিন্‌তেই পারলে না?"

"কি করে চিন্‌তে পারব ভাই? আজ প্রায় পনেরো বছর দেখিনি। তুমি তখন রোগা ছিলে—কালো ছিলে। এখন বেশ ফর্সা হয়েছ—মোটাসোটা হয়েছ।"

"কেন মোটা হব না? পশ্চিমে থাকি, জল হাওয়া ভাল, ঘি দুধ সস্তা—কেন মোটা হব না? তুমি আছ কোথা?"

"কাছেই—১৭ নং ভীমদাসের লেনে।"

"কি কর?"

"বাঙ্গালীর ছেলের যা প্রধান অবলম্বন—কেরাণীগিরি।"

"আমি লাক্ষ্ণৌয়ে চাকরি করতাম—কিন্তু সে চাকরি ছেড়ে দিয়ে, কদিন হল কলকাতায় এসেছি। ব্যবসা করব। গ্রেট ইষ্টার্ণে আছি। আরও দু তিন দিন থাকতে হবে। সন্ধ্যা বেলা বাড়ী থাকবে?"

"থাকব।"

"সন্ধ্যার পর আসব। ওঃ—পনেরো বচ্ছর পর আজ দেখা। তোমাকেই আমার হোটেলে যেতে বল্‌তাম; কিন্তু ভাই সেখানে বড় বড় সাহেবরা থাকে কি না—তারা তোমার এই ধূতি চাদর দেখলে চটেই যাবে। আমিই আসব। কোন্ গলি বল্লে?"

"১৭ নং ভীমদাসের গলি। এই কাছেই। ঐ রাস্তাটা দিয়ে খানিক গিয়ে, ডান হাতি বড় থামওয়ালা যে একটা লাল বাড়ী আছে—তারই সামনে আমার বাসা—১৭ নম্বর।"

"আচ্ছা ভাই - এখন চল্লাম। বড্ড তাড়াতাড়ি। পরিবার নিয়ে আছ ত?"

"হ্যাঁ। তুমি আজ সন্ধেবেলা আমারই ওখানে খাবে।"

"খাব?—বেশ। রাত আট্‌টার সময় আসব।"—বলিয়া সুধাংশু গাড়ীতে উঠিয়া গাড়োয়ানকে বলিল,—"জোর্‌সে হাঁকাও।"

উপরে যে কথোপকথন লিপিবদ্ধ হইল, তাহাতে দুই তিন মিনিটের অধিক কালক্ষয় হয় নাই। সুধাংশু চলিয়া গেলে—নীলমণির মনে হইল—কএকমুহূর্ত্তের জন্য একটা উল্কাপিণ্ড যেন তাহার চক্ষু ধাঁধিয়া দিয়া অদৃশ্য হইল।

ট্রামে উঠিয়া নীলমণি ভাবিতে লাগিল,—"সুধাংশুকে দেখিয়া আর চিনিবার যো নাই! তখন রোগা ডিগ্‌ডিগে ছিল—বুকের হাড় দেখা যাইত—সে এখন কেমন মোটা সোটা হইয়াছে—মানুষের মতন হইয়াছে। পয়সাই আসল জিনিষ, পয়সা থাকিলে আমারই কি আজ এমন চেহারা থাকিত? দুইজনে একক্লাসে পড়িতাম—আমি ছিলাম সর্ব্বাপেক্ষা ভাল ছেলে—আমি প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পাশ করিয়াছিলাম—ও করে তৃতীয় বিভাগে। এফ্‌ এ—ও ত পাসই করিতে পারিল না। কনিক্‌সেকসন্ কিছুতেই উহার মাথায় ঢুকিত না। তখন কে জানিত—জীবন-পরীক্ষা-ক্ষেত্রে ও আমার এত উপরে উঠিয়া যাইবে? লক্ষ্ণৌয়ে চাকরি করিত বলিল—কি চাকরি তাহা জিজ্ঞাসা করা হয় নাই। অবশ্য কোনও বড় চাকরিই করিত। চাকরি ছাড়িয়া ব্যবসায় করিতে আসিয়াছে—দুপয়সা জমাইয়াছে—তবে ত আসিয়াছে। গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেলে আছে বলিল—সেখানে ত দৈনিক ৮।১০্ টাকা করিয়া লাগে শুনিয়াছি। সুধাংশু বড়লোক হইয়াছে।"

নীলমণি উক্তপ্রকার চিন্তা করিতে লাগিল—আর ট্রামও ধর্ম্মতলায় আসিয়া পৌছিল। চাঁদনির সম্মুখে নামিয়া নীলমণি ভাবিল—"আজ যে উহাকে খাইতে নিমন্ত্রণ করিলাম—কি খাওয়াইব?—নিজেরা রোজ যা ডাল ভাত শাক চচ্চড়ি খাই—তাহা কি উহার পাতে দিতে পারিব? বাল্যকালের বন্ধু—আজ কতদিন পরে সাক্ষাৎ হইয়াছে—সে একটা হেঁজিপেঁাজ লোকও নহে—রীতিমত খাতির করিতে হইবে ত!"—এই ভাবিয়া নীলমণি চাঁদনীতে ঢুকিয়া খোকার গলাবন্ধ ও মোজা মাত্র লইয়া বাকী টাকায় মিউনিসিপ্যাল মার্কেট হইতে দেড়সের মটন্, একটা ভেট্‌কিমাছ ও কুড়িটা কমলালেবু কিনিয়া বাড়ী আসিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

নীলমণির বাড়ীতে নীচেরতলার ঘরগুলির অবস্থা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। কোনও ভদ্রলোক আসিলে সেখানে তাহাকে বসান যায় না। উপরে দুইখানি শয়নঘর—তাহারই একখানি হইতে বিছানা মাদুর সরাইয়া, বালিকা দুটির সাহায্যে নীলমণি পরিষ্কার করিতে আরম্ভ করিল। একটা ঝাড়ু, লাঠিতে বাঁধিয়া, চারিদিকের দেওয়াল বেশ করিয়া ঝাড়িয়া ফেলিয়া, বাল্‌তি বাল্‌তি জল ঢালিয়া মেঝেটি ধুইয়া ফেলিল। দেওয়ালে স্থানে স্থানে দাগ ছিল—পাণে খাইবার চূন জলে গুলিয়া সে সমস্ত ঢাকিয়া দিল।

বারান্দার এককোণে একখানি ভাঙ্গাচোরা ক্যাম্প টেবিল বহুদিন-সঞ্চিত ধূলায় আত্মগোপন করিয়া পড়িয়া ছিল—সেই খানিকে টানিয়া আনিয়া ধুইয়া মুছিয়া ঘরের মেঝেতে স্থাপনা করা হইল। সেখানির পদচতুষ্টয় নিতান্ত নড়বড়ে হইয়া গিয়াছে—কাছে বসিয়া তাহার গাত্রে সামান্য ভর দেওয়া মাত্র ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ করিয়া বিপরীত দিকে হেলিয়া পড়ে। স্থানে অস্থানে পেরেক ঠুকিয়াও যখন বিশেষ ফল পাওয়া গেল না—নীলমণি তখন একটা দড়ি লইয়া পায়াগুলা ঘিরিয়া ঘিরিয়া খুব কষিয়া বাঁধিয়া দিল। তাহাতে টেবিলখানি কতকটা স্থির হইল। দুইখানিমাত্র চেয়ার বাড়ীতে ছিল। একখানি বেতের ছাউনি—একখানি কাঠের। বেতেরখানিতে সুধাংশুকে বসিতে দেওয়া হইবে—কাঠের খানিতে নীলমণি নিজে বসিবে এই মতলবই রহিল। টেবি

লের শোভার জন্য একখানি কাপড় আবশ্যক—বিশেষতঃ আচ্ছাদন না দিলে দড়িদড়াগুলো ঢাকে না—তাই গৃহিণীর চেক র‍্যাপারখানি তাহার উপর বিছাইয়া দেওয়া হইল।

এই সমস্ত আয়োজন করিতে চারিটা বাজিল। নীলমণি তখন গড়গড়াটি কাপড়ে ছাঁকা ছাই দিয়া উত্তমরূপে মাজিয়া, তাহার নলে গজ করিয়া, জল ফিরাইয়া রাখিল। হঠাৎ মনে হইল, সে সাহেব মানুষ—যদি তামাক না খায়? সে যে চুরট খায় তাহা নীলমণি দেখিয়াছে; সুতরাং পয়সা লইয়া নীলমণি চুরটের সন্ধানে বাহির হইল। কিন্তু পাড়ার কোনও দোকানে ভাল চুরট পাওয়া গেল না। পয়সায় দুইটা করিয়া গলায় লালসুতা বাঁধা পানের দোকানের সেই নিকৃষ্ট চুরট—তাহা কেমন করিয়া সুধাংশুর হাতে দিবে?—দূরে গিয়া ভাল দোকান হইতে চুরট কিনিয়া আনার সময়ও নাই। পাড়ার একটি চুরটসেবী উকীল ছিলেন, তাঁহার কাছে গিয়া নীলমণি পাঁচটা ভাল চুরট চাহিয়া আনিল। সেগুলি এবং একটি দেশলাই চায়ের পিরিচে সাজাইয়া টেবিলের উপর রাখিয়া দিল।

সন্ধ্যার পর পরিষ্কার কাপড় জামা পরিয়া নীলমণি বন্ধুর আগমন প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিল। আটটা বাজিয়া গেল, সাড়ে আটটা বাজিল, নয়টা বাজে, কৈ এখনও ত সুধাংশুর দর্শন নাই! ভুলিয়া গেল নাকি?—নীলমণি ও তাহার স্ত্রী উভয়েই উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল। যদি না আসে—এত খরচপত্র করিয়া আয়োজন সবই বৃথা হইবে! স্ত্রী বলিল,—"তিনি বড়লোক—উইলসনের হোটেলে সে রাজভোগ ছেড়ে কি গরীবের বাড়ীতে খেতে আস্‌বেন?"

নীলমণি বলিল,—"সুধাংশু ত সে রকম প্রকৃতির লোক নয়—অন্ততঃ আগে ত ছিল না।"

বলিতে বলিতে শব্দে ও আলোকে সচকিত করিয়া একখানি মোটর গাড়ী আসিয়া নীলমণির ভাঙ্গাঘরের সম্মুখে দাঁড়াইল। নীলমণি তাড়াতাড়ি দ্বার খুলিয়া বাহির হইয়া দেখিল—সুধাংশু নামিয়া রাস্তায় দাঁড়াইয়াছে, মোটরে উপবিষ্ট একজন ইংরাজের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছে। দুইচারিটা কথা কহিবার পর "গুডনাইট"—বলিয়া মোটরবিহারী সাহেব গাড়ী চালাইয়া দিল।

সুধাংশু তখন নীলমণির দিকে ফিরিয়া বলিল,—"ভাই বড়ই দেরী হ'য়ে গেছে! তোমরা বোধ হয় ভাবছিলে?"

নীলমণি বলিল,—"ভাবছিলাম বৈ কি। মনে করলাম বুঝি ভুলেই গেলে।"

সুধাংশু হা হা করিয়া হাসিয়া বলিল,—"তা বলবে বৈ কি! স্মৃতিশক্তি কার কত প্রখর—আজ দুপুর বেলাইত তার পরীক্ষা হয়ে গেছে"—বলিতে বলিতে উভয়ে গৃহে প্রবেশ করিল।

উপরে উঠিয়া সুধাংশু বলিল,—"নীলুদা—এই বাড়ীতে থাক কি করে?"

"কি করব ভাই—এর চেয়ে ভাল বাড়ী পাই কোথায়?"

চেয়ারে বসিয়া, সুধাংশু বলিল,—"তোমার ছেলেপিলে কটি?"

"দুটি মেয়ে, একটি ছেলে। তোমার কটি?"

সুধাংশু হাসিয়া বলিল,—"আমি ছেলে মেয়ে কোথা পাব? আমি কি বিয়ে করেছি?"

নীলমণি সবিস্ময়ে বলিল,—"আজও বিয়ে করনি? বল কি হে? বিয়ে কল্লে না কেন?"

"ফুরসুৎ পাইনি। পরের ছেলে মেয়েকেই আদর করে বেড়াই। তোমার ছেলে মেয়েদের ডাকনা, দেখি।"

নীলমণি, কমলা ও সরলাকে ডাকিয়া আনিলেন। মেয়ে দুটি আসিয়া সুধাংশুকে প্রণাম করিল। চেয়ারের দুইদিকে দাঁড় করাইয়া মিষ্ট কথায় সুধাংশু তাহাদিগকে আদর করিতে লাগিল। শেষে বলিল "তোমাদের ভাইটি কৈ?"

সরলা বলিয়া উঠিল,—"খোতা ঘুমুত্তে।"

সুধাংশু নীলমণির পানে চাহিয়া বলিল—"কি বলে?"

নীলমণি উত্তর করিল—"ও বল্‌ছে খোকা ঘুমুচ্ছে। দেখনা জয়ের পাঁচবছর বয়স হল, এখনও জিভের জড়তা ভাঙ্গল না। অন্য সব বর্গ ছেড়ে ত বর্গই বেশী ব্যবহার করে।"

সুধাংশু বলিল,—"তা হোক্, দুএক বছরে সেরে যাবে। মেয়েটি খুব চটপটে।"

"ভারি বুদ্ধি ওর। এক একটি কথা কয় যেন আন্নী

বছরের বুড়ি। এত খবর রাখে ও—মাঝে মাঝে আশ্চর্য্য করে দেয়।"

বড় মেয়েটিকে লক্ষ্য করিয়া সুধাংশু বলিল,—"যাও ত মা, তোমার বাবার একখানি ধূতি আমায় এনে দাও ত। আমি পাৎলুন ছাড়ি।"

কাপড় ছাড়িয়া বলিল—"নীলুদা কম্বল টম্বল, শতরঞ্চি টতরঞ্চি নেই?—তাই পাত না। বাঙ্গালীর ছেলে—একটু বসব, একটু গড়াব—এ চেয়ারে কি পোষায়? সারা দিন ঘুরে ঘুরে শরীরটি ভারি ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।"

টেবিল চেয়ার দেওয়ালের কোণে সরাইয়া, ও ঘর হইতে শতরঞ্চ বালিশ আনিয়া নীলমণি পাতিয়া দিল। চুরটের পাত্রটি কাছে ধরিয়া বলিল,—"খাবে?" সুধাংশু একটি তুলিয়া লইয়া, আলোকে ধরিয়া সেটি ঘুরাইতে ঘুরাইতে বলিল "তামাক টামাক রাখ না? দিন রাত চুরট খেয়ে খেয়ে আর ভাল লাগে না।"

"হ্যাঁ—তামাক আছে বৈ কি।"—বলিয়া নীলমণি বাহির হইয়া গেল।

সুধাংশু ডাকিল,—"ও কমলা—ও সরলা।"—বালিকা-দ্বয় আসিয়া সুধাংশুর কাছে বসিল। সুধাংশু বলিল,—"আমি তোদের কে হই জানিস?"

কমলা বলিল—"কাকা হন।"

সরলা বলিল—"সায়েব কাকা।"

"দূর পোড়ার মুখী! সায়েব আমার কোন্‌খানটা দেখ্‌লি?"

"না, আপনি সায়েব! উলথনের হোতেলে থাকেন।"

"সে খবরটিও পেয়েছিস্?"—বলিয়া সুধাংশু সরলার গালটি টিপিয়া দিল।

সরলা উৎসাহিত হইয়া বলিল,—"ভোঃ পোঃ কোলে বাঁথি বাদিয়ে হাওয়া গালীতে আথেন।"

একটু পরেই, গড়গড়াটি হাতে করিয়া, জলন্ত কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে নীলমণি প্রবেশ করিল। সুধাংশু বলিল,—"নীলুদা—তুমি কি নিজে হাতে তামাক সাজ্‌লে? ঝি নেই?"

"ঝি আজ আসে নি।"

"আমাকে বল্লে না কেন, আমি সাজতাম। ছোট ভাইটি থাক্‌তে—"

"তা হোক্—তা হোক্"—বলিয়া নীলমণি তামাক ধরাইতে আরম্ভ করিল। দুই চারি টান টানিয়া, সুধাংশুর হাতে নলটি দিয়া বলিল,—"খাও ধরেছে।"

তামাক খাইতে খাইতে সুধাংশু বলিল,—"নীলুদা—কোন্ আফিসে চাকরি কচ্ছ?"

"হিলারি সিম্‌সনের বাড়ী।"

"কত মাইনে পাও?"

"পঁয়ষট্টি টাকা।"

"চলে?"

"গড়গড়িয়ে চলে কি আর? কোনও রকম করে ঠেলেঠুলে চালান।"

"আর কোনও আয় নেই?"

"না।"

সুধাংশু গম্ভীর হইয়া বসিয়া তামাক খাইতে লাগিল। ক্রমে নীলমণির হাতে নলটি দিয়া বলিল,—"কত বছর চাকরি করছ?"

"এগার বছর। যে বছর বড় মেয়েটি হয় সেই বছর চাকরিও হয়েছিল। তাই ওর নাম হল কমলা।"

"মেয়ের বিয়ের জন্যে কত জমালে?"

"জমাব কোথা থেকে ভাই? পেটে খেতেই ত কুলোয় না।"

"কি করে মেয়ের বিয়ে দেবে?"

"ভগবান আছেন।"

"ভগবান ত আছেন।"—বলিয়া সুধাংশু গম্ভীর হইয়া রহিল।

নীলমণি বলিল,—"সে সব ভেবে আর কি হবে?—সে কথা যাক্। এখন নিজের কথা বল। এফ্‌ এ ফেল হয়ে সেই যে তুমি কলকাতা থেকে চলে গেলে, বল্লে বর্ম্মায় যাচ্ছি চাকরি করতে—তারপর থেকে ত তোমার কোনও খবরই পাইনি। বর্ম্মায় গিয়েছিলে?"

"হ্যাঁ, গিয়েছিলাম বৈকি। দুবছর সেখানে চাকরিও করেছিলাম।"

"কি চাকরি করতে? ছাড়লে কেন?"

টুন্ডুতে এক্‌জিকিউটিব ইঞ্জিনিয়ারের হেডক্লার্ক ছিলাম। সায়েবের সঙ্গে অবনিবনাও হওয়াতে চাকরি ছেড়ে সিঙ্গাপুরে চলে গেলাম।”

“একেবারে সিঙ্গাপুর?”

“হঁ্যা—সেখানে দিন কতক চায়ের দোকান করে ফেল হ’য়ে গেলাম। সেখান থেকে জাহাজের খালাসি হয়ে মাদ্রাজে আসি। মাদ্রাজে দিনকতক ছাপাখানায় চাকরি করে—সেখান থেকে করাচি যাই। করাচি থেকে কোয়েটা—সেখানে পাঠানেরা আমায় মেরে ফেলবার চেষ্টা করাতে পালিয়ে হোলকার এষ্টেটে গিয়ে কিছুদিন আবগারির দারোগাগিরি কায করি। তারপর সেখান থেকে লক্ষ্ণৌয়ে আসি—তালুকদার্স ব্যাঙ্কের কেরাণী হ’য়ে ঢুকি—শেষের তিন বছর হেডক্লার্কের পদ পেয়েছিলাম।”

“উঃ—অনেক ঘুরেছ বল? তা পাঠানেরা তোমায় মেরে ফেল্‌তে চেষ্টা করেছিল কেন?”

“সে অনেক কথা—ছোটখাট একটি উপন্যাস বল্লেই হয়।”

নীলমণি হাসিয়া বলিল,—“নায়িকা টায়িকা ছিল নাকি?”

“ছিল বৈকি। ওসমান বল্লে জগৎসিংহ—এ পৃথিবীতে তোমার আমার দুজনের স্থান নেই।”—বলিয়া সুধাংশু হাসিল।

“আচ্ছা, ব্যাপারটা কি হয়েছিল বল দেখি?”—বলিয়া নীলমণি সুধাংশুর কাছে ঘেঁসিয়া বসিল।

সুধাংশু প্রথমে কথা কহিল না। একটু পরে বলিল,—“ও সব এখন ভাল লাগছে না। সে সব কথা পরে বলব ভাই। তোমার অবস্থা দেখে আমার মন ভারি খারাপ হয়ে গেছে সত্যি! আচ্ছা—ও আপিসে তোমার উন্নতির আশা কি রকম?”

নীলমণি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—“মরবার সময় নাগাদ—শ খানেক টাকার গ্রেডে পৌছতে পারি।”

“বস্?”

“বস্।”

সুধাংশু কিছুক্ষণ চক্ষু বুজিয়া চিৎ হইয়া পড়িয়া রহিল। পরে উঠিয়া বসিয়া, নীলমণির হাতটি ধরিয়া বলিল,—“নীলুদা—চাকরি ছেড়ে দাও। আমার সঙ্গে চল।”

“কোথায়?”

“চাকরি ছেড়ে দাও। চাকরিতে কিছু নেই দাদা—কিছু নেই। ঐ কোনও রকমে পেটভাতায় কাটিয়া যায়। লক্ষ্ণৌয়ে আমি দুশো টাকা মাইনে পেতাম। সঙ্গে সঙ্গে একটা কারবারও আমার ছিল—গোপনে। হঠাৎ একটা দাঁও এসে পড়ল, কারবারটা থেকে হাজার পঁচিশেক টাকা পেয়ে গেলাম। চাকরি ছেড়ে দিয়ে, সেই টাকাটা নিয়ে আমি ব্যবসা কর্‌তে এসেছি। এখন, ব্যবসার একটা প্রধান জিনিষ হচ্ছে—অন্ততঃ একজন সহকারী লোক চাই—যে সম্পূর্ণ বিশ্বাসী। অন্যায় করে, ব্যবসার ক্ষতি করে, একটি পয়সা পেলে তাও নেবে না—আবার লক্ষ টাকা পেলে তাও নেবে না। আমি এই রকম একজন লোক চাই। তোমায় ছেলেবেলা থেকে জানি—তুমিই সেই লোক। তুমি এস আমার সঙ্গে।”

নীলমণি একটু ভাবিয়া বলিল,—“তা, কি ব্যবসা করছ?”

“অভ্রের ব্যবসা। একটা পাহাড় নিয়েছি তাতে অভ্রের খনি আছে।”

“কোথা?”

“ধানবাদের কাছে। ঐ যে সাহেবটি দেখ্‌লে, ওদেরই কাছে নিয়েছি। ওরাই ইজারাদার—ছোটনাগপুরের এক অসভ্য বুনো রাজার পাহাড়—তার কাছ থেকে ওরা ইজারা নিয়েছিল। বছর দুই কাযও করেছিল। এখন ওরা পাঁচবছরের মেয়াদে আমায় দর-ইজারা দিয়েছে। বছরে পনেরো হাজার টাকা করে খাজনা। লেখা পড়া হয়ে গেছে। প্রতি বছর আগাম খাজনা দিতে হবে। প্রথম বছরের খাজনা আমি জমা দিয়েছি।”—বলিয়া সুধাংশু কোটের ভিতরদিক্‌কার বুক পকেট হইতে একটি চামড়ার কেস্ বাহির করিয়া নীলমণির হাতে দিল। বলিল,—“খুলে দেখ, ওর মধ্যে রসিদ আছে।”

নীলমণি পকেট কেসটি খুলিয়া দেখিল তাহার মধ্যে পনের হাজার টাকার রসিদখানি রহিয়াছে। আর রহিয়াছে এক গোছা নোট—প্রত্যেকখানি ৫০০৲ টাকা করিয়া।

নীলমণি সেগুলি গণিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল—"ভাই, তোমার এই একরত্তি পকেটকেসে নগদ যা রয়েছে—তাতে আমার দুটো মেয়েরই বিয়ে হয়ে যায়।"

সুধাংশু বলিল,—"তা যায়। কিন্তু ওগুলি আমি চাকরি করে রোজগার করিনি ভাই—ব্যবসা থেকে পেয়েছি। চাকরির মুখে মার ঝাড়ু। ছেড়ে দাও।"

নীলমণি বলিল,—"অভ্রের খনি নিয়েছ বলছ—কেমন খনি? ভাল?"

"উঃ—চমৎকার। আমি একজন বিশেষজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ারকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে তিন চারদিন ধরে তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করিয়েছি। সে বলেছে বারমাসে বিনা ওজরে পাচ বারোং ষাট হাজার টাকার অভ্র উঠ্‌বে—যদি ছুট বাদ দিয়ে পঞ্চাশ হাজার টাকারই ধরা যায়, তাহলে পনের হাজার, আর ভাড়া পনের হাজার বাদ দিয়ে, বিশহাজার টাকা লাভ খুব হবে।"

নীলমণি ক্ষুদ্রপ্রাণী গরীব গৃহস্থ—অত বড় বড় টাকার অঙ্ক শুনিয়া তাহার মাথা ঘুরিয়া গেল।

সুধাংশু বলিল,—"কি বল নীলুদা—আস্‌বে?"

সংশয়জড়িত স্বরে নীলমণি বলিল,—"সুবিধে হবে?"

সুধাংশু বলিল,—"শোন নীলুদা—আমি প্রথম থেকেই সমস্ত কথা তোমায় খোলাখুলি বলি। মূলধন আমার—বুদ্ধি আমার—কেবল মেহনৎ তোমার। তোমায় আমি শূন্য অংশীদার করে নিতে রাজি আছি। তা না করে, একটা নির্দ্দিষ্ট বেতনও ঠিক ক'রে দিতে পারতাম—কিন্তু দুটি কারণে তা আমার মনঃপূত নয়। প্রথমতঃ—আমি এ চাইনে যে তুমি হবে আমার বেতনভোগী চাকর—আর আমি হব তোমার মনিব। দ্বিতীয়তঃ, অংশীদার হলে তুমি যেমন প্রাণপণে ব্যবসাটির উন্নতি চেষ্টা কর্‌বে—বাধা মাইনে হলে তুমি কখনই তা কর্‌বে না—পেরে উঠবে না। না—না—তুমি প্রতিবাদ কোর না—আমি মনুষ্যচরিত্র বেশ ভাল করেই জানি এই বয়সে অনেক দেখেছি—অনেক ঠকেছি—অনেক ঠেকে তবে শিখেছি। বাঁধা মাইনে হলে তুমি যে ইচ্ছা করে আলস্য করে আমার কাযে অবহেলা কর্‌বে—তা আমি বল্‌ছিনে। কিন্তু তোমার উদ্যমের উপরেই যদি তোমার লাভের তারতম্য নির্ভর করে—তা হলে তোমার উদ্যম উৎসাহ আপনিই বেড়ে যাবে।"

নীলমণি মাথা হেঁট করিয়া বলিল,—"তা, তুমি যেমন ভাল বোঝ।" নীলমণি আরও যেন কি বলিব বলিব করিল কিন্তু সঙ্কোচবশতঃ চুপ করিয়া রহিল।

সুধাংশু তাহার মনের কথা বুঝিয়া বলিল,—"সব কথা এখন থেকে পরিষ্কার হয়ে থাক্। বলেছি মূলধন আমার—মাথা আমার—তোমার মেহনৎ। সুতরাং লাভের অংশ তোমার অপেক্ষা বেশীই আমি দাবী করব। লাভের প্রতি টাকায় চার আনা তোমার, বারো আনা আমার হবে। যদি বিশ হাজার লাভ হয় তা হলে তোমার পাঁচ হাজার হল। যদি অত না হয়—দশহাজার হয়,—তাও না হয়, আটহাজারও হয়—তবু তোমার দুহাজার থাকবে। এখানকার চাকরির চেয়ে ত ভাল হবে—কি বল?"

নীলমণির মনে দুই প্রতিকূল শক্তি যুগপৎ স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিতে চেষ্টা করিতেছিল। প্রথম ধনলিপ্সা—দ্বিতীয় সংশয়বুদ্ধি। কোথায় পয়ষট্টিটাকা—আর প্রাণান্ত কর টানাটানি—আর কোথায় অজস্র স্বচ্ছলতা। আবার মনে হইতেছিল,"যো ধ্রুবাণি পরিত্যজ্য ইত্যাদি"—যাহা হউক কষ্টেসৃষ্টে দুইবেলা দুমুঠা জুটিতেছে,—এ চাকরি ছাড়িয়া, সে অভ্রের খনিতে গেলে যদি শেষে তাও যায়? ব্যবসায়ে যেমন লাভ আছে—তেমনই লোকসানও আছে। সুধাংশু ত বড় বড় লাভের অঙ্কের কথাই বলিতেছে—কি পরিমাণ লোকসান হইলে ব্যবসায়ের অবস্থা কি প্রকার দাঁড়াইবে, তাহার উল্লেখ ত একবারও করিতেছে না!

"নীলমণিকে এই প্রকার চিন্তাপরায়ণ দেখিয়া সুধাংশু বলিল,—"কি বল নীলুদা?"

"ভেবে তোমায় বলব।"

সুধাংশু উত্তেজিতস্বরে বলিল,—"নন্‌সেন্স। এত ভাবনা চিন্তা কিসের? বুকে সাহস কর—করে চাকরীর মুখে মার ঝাঁটা। সাহস নেই বলেই ত বাঙ্গালীর কিছু হয় না—কেরাণীগিরি ভরসা। তোমার কায নয়—আচ্ছা আমি বউদিদিকে জিজ্ঞাসা করি"—বলিয়া "বউদিদি—বউদিদি" করিয়া সুধাংশু খালিপায়ে রান্নাঘরের দ্বারে উপস্থিত হইল।

নীলমণির স্ত্রী তখন কমলালেবুর পায়েস চড়াইয়াছিলেন। সুধাংশু আসিতেই ঘোমটা টানিয়া দিলেন। সুধাংশু চৌকাটের বাহিরে বসিয়া নিজ বক্তব্য, রেলের গাড়ীর বেগে বলিয়া যাইতে লাগিল। ভবিষ্যতের এক পরম রমণীয় উজ্জ্বল শব্দচিত্র আঁকিয়া দেখাইল।

সকল শুনিয়া বউদিদি কমলাকে দিয়া বলিলেন,—"ঠাকুরপো আজ রাত্রিটা সময় দিন—"ওঁর" সঙ্গে পরামর্শ করিয়া কল্য যাহা হয় জানাইব"।

আহারাদির পর সুধাংশু পোষাক পরিতে পরিতে বলিল,—"কাল তাহলে কখন্ আমি জান্‌তে পারব ?"

"তোমার হোটেলে ত আমার প্রবেশ নিষেধ ?"

"এক কায কর। কাল ঠিক সাতটার সময় আমার হোটেলের সমুখে দাঁড়িয়ে থেক। আমি চা খেয়ে বেরুব। লালদীঘির ধারে বেড়াতে বেড়াতে দুজনে কথাবার্ত্তা হবে।"

"বেশ—আমি আসব।"

* * * *

পরদিন অবধারিত সময়ে নীলমণি হোটেলের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। সুধাংশুও বাহির হইয়া আসিল। নীলমণি বলিল,—"মত হয়েছে—চাকরি ছেড়ে তোমার সঙ্গেই যাব।"

দুইজনে লালদীঘির ধারে বেড়াইতে বেড়াইতে এ বিষয়ে আরও অনেক কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিল।

সুধাংশু বলিল—"আজকের দিন্‌টে আপিস থেকে কোন রকমে ছুটি নিয়ে আমার সঙ্গে বেরুতে পার ?"

"কেন ?"

"একখানা মোটর-কার কিনব—দুটো ঘোড়া কিনব —আর তোমার জন্যে গেটাকতক ইংরেজি সুট তৈরি করাতে দিতে হবে।"

নীলমণি হাসিয়া বলিল,—"আমার জন্যে ইংরেজি সুট ?"

"সেখানে কি তুমি ধুতি পর্‌তে পাবে ? সর্ব্বনাশ ! জমাদারেরা, কুলিরা তোমায় গ্রাহ্যই করবে না। সেখানে আমি বড় সাহেব—তুমি ছোট সাহেব। রীতিমত ষ্টাইলে থাকতে হবে। ভেখ না হলে কি ভিক্ষে মেলে নীলুদা ?"

"কিন্তু এখন ত আমার হাতে টাকা নেই !"

"আমার কাছে আছে। আমি দেব এখন—তোমার হিসেবে খরচ লিখে রাখব।"

বেলা বারোটার সময় বড়বাবুকে বলিয়া কহিয়া বাকী দিনটুকুর জন্য নীলমণি ছুটি লইল। সুধাংশুর সহিত ঘুরিয়া সমস্ত দিন বাজার করিল। পাঁচহাজার টাকা মূল্যের একখানা মোটরকার কেনা হইল—দুইহাজার সুধাংশু নগদ দিল—বাকী তিনহাজার, মাসে পাঁচশত করিয়া ছয়মাসে পরিশোধ করিবে কড়ার পত্র লিখিয়া দিল। বাইশ শত টাকায় একটা শাদা একটা লাল ঘোড়া কিনিল। নীলমণির জন্য যে সুটগুলি ফরমাস দেওয়া হইল, তাহারও মূল্য একশত টাকার উপর।

দিনান্তে নীলমণি বলিল,—"এখন তবে আসি ভাই। আমি কালই খনিতে চলে যাব। পয়লা জানুয়ারী থেকে কায আরম্ভ করতে হবে। তুমি কালই কর্ম্মত্যাগ পত্র দাখিল করে দিও। একমাস পরে আমার কাছে আস্‌বে। এই একখানা পাঁচশো টাকার নোট রাখ। সুটগুলোর দাম দিও—আর যা যা কেনবার টেনবার দরকার হয়—কিনে নিয়ে যেও। যাবার সময়—একটা সেকেণ্ডক্লাস কামরা রিজার্ভ করে যেও—পয়সা বাঁচাবার জন্যে নীচু ক্লাসে যেওনা যেন—খবর্দ্দার। এ পাঁচশ টাকায় যদি না কুলায়—আমায় টেলিগ্রাফ কোর—আমি আরও টাকা পাঠিয়ে দেব। এখন আমার হাতে আর বেশী নেই। বউদিদিকে আমার প্রণাম দিও। বলো সময় অভাবে তাঁর সঙ্গে আর দেখা কর্‌তে পারলাম না। ধানবাদেই আবার দেখা হবে। এখন তবে আসি ভাই—'গুডবাই।'

সুধাংশুর নবাবী কাণ্ডকারখানা দেখিয়া নীলমণি অবাক্ হইয়া গিয়াছিল। ট্রামে উঠিয়া—আজ যে প্রথম শ্রেণীতে উঠিল—কেবলই তাহার মনে হইতে লাগিল,—"কে জানে, শীঘ্র হয়ত এমন দিন আসিবে—যখন আমিও সুধাংশুর মত এইরূপ লম্বা হাতে কলিকাতার বাজারে টাকা ছড়াইতে পারিব। সুধাংশু যে বলিয়াছে, 'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ'—একথা খুবই ঠিক্।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

আবার পৌষ মাস আসিয়াছে—একটি বৎসর কাটিয়া গিয়াছে।

অপরাহ্নকাল। পাহাড়ের নিকট তাহার সেই বাঙ্গলা-

খানির পশ্চাতের বারান্দায় আরাম-কেদারায় পড়িয়া নীলমণি একখানি খনিজবিদ্যার ইংরেজী পুস্তক পাঠ করিতেছিল। তাহার স্ত্রী নিকটে একখানি চেয়ারে বসিয়া খোকার জন্য পশমের গলাবন্ধ বুনিতেছেন।

নীলমণি আর সে নীলমণি নাই। "হইবে না কেন? পশ্চিমে থাকে—জল হাওয়া ভাল—ঘি দুধ সস্তা"—সে এখন মোটা হইয়াছে—তাহার রঙ ফর্সা হইয়াছে। তাহার স্ত্রীরও আর সে চেহারা নাই। মুক্ত বিশুদ্ধ বায়ুতে ভ্রমণ করিয়া—প্রতিদিন "নাই নাই" এই দুশ্চিন্তার কবল হইতে অব্যাহতিলাভ করিয়া—এখন তাহার অকালবার্দ্ধক্য তিরোহিত—দেহখানিতে যৌবনলাবণ্য ফিরিয়া আসিয়াছে।

একজন ভৃত্য ঠেলাগাড়ীতে খোকাকে বেড়াইতে লইয়া গিয়াছে। কমলা কোমরে কাপড় জড়াইয়া একটি টিনের ঝারি লইয়া বারান্দার প্রান্তস্থিত ফুলগাছের টবগুলিতে জলসেক করিতেছে। সরলা, ঝির সঙ্গে হেডকেরাণী বাবুর বাড়ীতে বেড়াইতে গিয়াছে।

টবে জলসেক শেষ করিয়া কমলা তাহার জননীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। এই সামান্য পরিশ্রমে এই শীতেও তাহার ললাট ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিয়াছে। মা নিজ বস্ত্রাঞ্চলে তাহার ঘর্ম্ম মুছাইয়া দিয়া বলিলেন—"যাও মা, হাত-মুখ ধুয়ে কাপড় ছেড়ে ফেলগে।"

টবে জলসেক শেষ করিয়া কমলা তাহার জননীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

কমলা চলিয়া গেলে গৃহিণী বলিলেন,—"হ্যাঁগা—মেয়ের বিয়ের কথা কিছু ভাবছ? মেয়ে যে—বল্‌তে নেই—বড় হয়ে উঠ্‌ল।"—বাস্তবিক কমলা বড় হইয়া উঠিয়াছে। এই এক বৎসরে সে যেন দুই বৎসরের বাড় বাড়িয়া লইয়াছে।

পুস্তক হইতে চক্ষু উঠাইয়া নীলমণি বলিল,—"কি বলছ?"

"বলছি—মেয়ের বিয়ের জন্য একটি পাত্র টাত্র স্থির কর- মেয়ে যে যেটের বড় হয়ে উঠ্‌ল।"

নীলমণি বলিল,—"এ মাঠে পাত্র কোথা পাব বল?"

"একবার দিনকতকের জন্যে কলকাতায় গিয়ে একটু চেষ্টা কর্‌লেই পাত্র পাওয়া যাবে। তা তুমি ত এখান থেকে নড়্‌বে না।"

"আমি নড়্‌লে চলে কৈ বল! সুধাংশু যদি কলিকাতায় যাওয়া কমিয়ে—এখানে কিছুদিন স্থির হয়ে বসে—কাযে কর্ম্মে মন দেয়—তা হলে আমি যেতে পারি।"

"এবার ঠাকুরপো কলকাতায় গিয়ে এতদিন দেরী করছেন কেন? কবে আস্‌বেন কিছু খবর এসেছে

"আজই আস্‌বার কথা আছে। ষ্টেশনে তার হাওয়া গাড়ী গেছে।"

"তা হলে, তাঁকে একবার বলে কয়ে, কাজ কৰ্ম্ম বুঝিয়ে দিয়ে—মাসখানেকের জন্যে আমাদের নিয়ে কলকাতায় চল। পাত্র ঠিক হয়ে যাবেই।"

"সে ত অনেক খরচ। যাতায়াতের খরচ—তারপর সেখানে একটা বাড়ীভাড়া কর্‌তে হবে—হাতে ত বেশী টাকা নেই। আর মাসখানেক হলেই আমাদের বাৎসরিক হিসেবটা হয়ে যায়। আমার প্রাপ্য টাকাটা পেলেই—কলকাতায় গিয়ে পাত্র অনুসন্ধান করি।"

"হিসেব দেখেছ ? বছরের শেষে কত দাঁড়াল ?"

"এ বছর আমাদের প্রায় ষোল হাজার টাকা লাভ হয়েছে। আমার অংশে চারহাজার হল—তার মধ্যে হাজার দুই টাকা ত নিয়ে ফেলেছি।"

গৃহিণী ভ্রূযুগল কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন,—"দু হাজার কবে নিলে ?"

"কলকাতায় পাচশো—এখনে এই এক বছরে প্রায় দেড় হাজার। দু হাজার টাকা মাত্র এখন আমার পাওনা। অন্য সব খরচ খরচা করে দুহাজারের মধ্যে যা থাকবে সে টাকায় কি মনের মত পাত্র মিলবে ?—আর একটা বছর অপেক্ষা করা যাক্ না—আস্‌ছে বছর ফাল্গুন মাস নাগাদ হলে—মেয়ের বিয়েতে হাজার পাচেক টাকা খরচ কর্‌তে পারব।"

"তা—আসছে বছর যদি এত লাভ না হয় ?"

নীলমণি বিজ্ঞভাবে তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া বলিল,—"বেশী হবে—আরও বেশী হবে। প্রথম বছর খরচ অনেক বেশী হল—সব ব্যবসাতেই হয়—তাই লাভের অঙ্ক কম দাঁড়াল। আস্‌ছে বছর অন্ততঃ চব্বিশ হাজার লাভ দাঁড়াবে—এটা খুব আশা করতে পারি।"

"তা তুমি যা ভাল বোঝ তাই কর। কিন্তু শাগ্র সেরে ফেল্লেই ভাল কর্‌তে।"

এমন সময় ভিতরের কামরা হইতে—"বাবা বাবা" ধ্বনি উত্থিত হইল—সরলার সোল্লাস কণ্ঠস্বর। জুতা পায়ে দিয়া পট্‌পট্ করিয়া ছুটিয়া আসিয়া সে বলিল,—"বাবা সায়েব কাকা এতেথে।"

নীলমণি বলিল,—"কোথা রে ?"

"এখানে নয়। ইণ্ডিথান থেকে মোতল গালীতে ভোঃ পো ভোঃ পো কলে নিদেল বাংলায় এতেথে।"

মা বলিলেন—"তুই দেখ্‌লি না কি ?"

"হ্যাঁ—আমি থিল সঙ্গে আথিলাম কি না—তখন মোতল গালী এল। সায়েব কাকা আমায় দেখে লুমাল ঘুলুতে লাগল।"

জননী হাসিয়া বলিলেন—"তুই কি ঘুরুলি ?"

সরলা বিষণ্ণস্বরে বলিল,—"আমি কি ঘুলুব ? আমাল কি লুমাল আথে ?"—পিতার দিকে ফিরিয়া সঙ্কুচিত হইয়া নিম্নস্বরে বলিল,—"বাবা, আমাকে একখানি লুমাল কিনে দেবে ? আল একখানি মোতলকাল ?"

নীলমণি বলিল,—"এক সঙ্গে অত টাকা পাব কোথা মা ?—এখন বরং একখানি রুমাল কিনে দেব, মোটর-কার পরে হবে।"

পিতার জানু দুইটি ধারণ করিয়া আবদারের স্বরে সরলা বলিল,—"না বাবা—বেথী তাকা না থাকে, এখন বলং একখানি মোতল-কাল কিনে দাও—লুমাল পলে হবে।"

এই কথা শুনিয়া সরলার পিতামাতা হাসিয়া লুটাইতে লাগিলেন। সরলাও সেই সঙ্গে সঙ্গে হাসিতে লাগিল—কিন্তু তাহার হাসির মধ্য হইতে একটা সন্দেহ যেন উঁকি মারিতেছিল—ভাবটা যেন,—"তোমরা হাসছ যখন, আমিও না হয় হাসি—কিন্তু হাসির এমনই কি কারণ উপস্থিত হয়েছে ?"

হাসি থামিলে, গৃহিণী বলিলেন,—"আহা দিও ওকে একখানি মোটর-কার কিনে। ওকে একখানি ছোটখাট কার কত হলে হয় ?"

"দুহাজার।"

"আহা—তা দিও। সায়েব কাকার মোটর খানি দেখে মেয়ের নাল পড়ে। ও আমায় চুপি চুপি ওর মনের গোপন প্রার্থনাটি কতদিন জানিয়েছে। তোমায় লজ্জায় বল্‌তে পারত না—আজ বলে ফেল্লে।"

নীলমণি বলিল,—"আচ্ছা—এবার কলকাতা গিয়ে একখানি এনে দেব না হয়। সব টাকা তাদের একসঙ্গে দিতে হয় না—কিস্তি কিস্তি দিলেই চলে।"

সেই একদিন—আর এই একদিন। ঠিক একটি বৎসর পূর্ব্বে—এই সরলার জন্যই নীলমণি একটাকা মূল্যের একটি মেম পুঁতুল আনিতে চাহিয়াছিল—নিজেদের অবস্থা স্মরণ করিয়া গৃহিণী টাকাটি দিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

নীলমণির বাঙ্গলা হইতে সুধাংশুর বাঙ্গলাটি প্রায় অর্দ্ধমাইল ব্যবধান। সুধাংশু আসিয়াছে শুনিয়া নীলমণি তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ মানসে প্রস্তুত হইতেছিল, এমন সময় সুধাংশুর ভৃত্য একখানা পত্রসহ এককুড়ি কাঁকড়া, একশোটা কমলালেবু এবং এক টুকরি কপি প্রভৃতি তরকারীপাতি আনিয়া দাঁড়াইল। পত্রে লেখা ছিল, বিশেষ প্রয়োজন আছে, নীলমণি যেন শীঘ্র গিয়া সাক্ষাৎ করে।

কাঁকড়া কপি প্রভৃতি দেখিয়া নীলমণি স্ত্রীকে বলিল,—"তবে ভায়ারও রান্না এইখানেই কর—রাত্রে তাকে খেতে নিয়ে আসব এখন।"

গৃহিণী বলিলেন,—"তা বেশ।"

নীলমণি তখন সজ্জিত হইয়া, ছড়ি হাতে করিয়া বড় সাহেবের বাঙ্গলা অভিমুখে পদচালনা করিল।

পৌঁছিয়া দেখিল সুধাংশুর চেহারা অত্যন্ত খারাপ হইয়া গিয়াছে। তাহার মুখ বিবর্ণ, চক্ষু বসিয়া গিয়াছে, মাথার চুলগুলা অবিন্যস্তভাবে উড়িতেছে। পশ্চাতের বারান্দায় টেবিলের নিকট একখানা চেয়ারে সে বসিয়া আছে—মস্তক করতলে রক্ষিত, নিম্নের ওষ্ঠ দন্তে দংশন করিয়া রহিয়াছে।

নীলমণি জিজ্ঞাসু করিল,—"সুধাংশু, তোমার কি হয়েছে ?"

তাহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া শঙ্কান্বিত কণ্ঠে নীলমণি জিজ্ঞাসা করিল,—"সুধাংশু, তোমার কি হয়েছে ?"

সুধাংশু এতদূর বিমনা ছিল যে, নীলমণির প্রবেশের পদশব্দও শুনিতে পায় নাই। চমকিয়া উঠিয়া বলিল,—"নীলুদা এসেছ ?—বস।"

নীলমণি উপবেশন করিয়া তাহার মুখের দিকে অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। সুধাংশুকে নীরব দেখিয়া একটু অপেক্ষা করিয়া বলিল,—"ব্যাপার কি ? তোমার শরীর ভাল আছে ত ?"

"শরীর ? ভাল আছে বৈকি।"

"কি হয়েছে ?"

"বড় মুস্কিলে পড়েছি নীলুদা। বাৎসরিক খাজনা দাখিল করবার সময় এসেছে—পাঁচদিনের মধ্যে পনেরো হাজার টাকার দরকার—দাখিল না করিতে পারলে ইজারা রহিত হয়ে যাবে।"

নীলমণি বলিল,—"তা দাখিল করে দাও। ব্যাঙ্কের টাকা ত রয়েছে।"

"ব্যাঙ্কে টাকা কোথা? হাজার খানেক টাকা মাত্র আছে।"

নীলমণি আকাশ হইতে পড়িয়া বলিল,—"হাজার খানেক মাত্র!—আর সব টাকা কি হল?"

"টাকা আর কি হয়? চিরকাল যা হয়ে থাকে—উড়ে গেছে।"

"বল কি? এত টাকা খরচ হয়ে গেছে? এ বৎসর ত আন্দাজ ষোল হাজার টাকা আমাদের লাভ হয়েছে।"

"হয়েছ ত—কিন্তু টাকা ত নেই। খরচ করে ফেলেছি। লাভের টাকা, আমার নিজের যা কিছু ছিল—সবই খরচ হয়ে গেছে।"

নীলমণি স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার ও হাজারও তবে গিয়াছে! সুধাংশু যে প্রতিবার কলিকাতায় গিয়া আমোদপ্রমোদে, হোটেল-খরচে, জিনিষপত্র কেনায় অনেক টাকা উড়াইতেছে তাহা নীলমণি জানিত এবং মাঝে মাঝে এ জন্য তাহাকে ভর্ৎসনাও করিত। সুধাংশু বলিত, "স্ত্রী নেই, ছেলেপিলে নেই, আমি আর কার জন্যে টাকা জমাব ভাই?—যা পাই তাই খরচ করি—চিরকাল আমার এই দশা।"—কিন্তু সে যে এত টাকা নষ্ট করিয়াছে—লাভের সমস্ত টাকা এবং নিজের পূর্ব্বসঞ্চিত সমস্ত মূলধন উড়াইয়া দিয়াছে—তাহা নীলমণি স্বপ্নেও জানিত না। পাট্টার কঠিন সর্ত্ত—বৎসর পূর্ণ হইবার দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে পরবৎসরের দেয় খাজনার সমস্ত টাকা জমা না হইলে ইজারা রদ ও রহিত হইয়া যাইবে—তাহাও নীলমণি অবগত ছিল। সুতরাং অবস্থা যে কিরূপ গুরুতর দাঁড়াইয়াছে, তাহা সে সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিল।

সুধাংশু বলিল,—"এখন উপায় কি? পাঁচহাজার টাকা কর্জ্জ পাবার ভরসা আছে, ব্যাঙ্কে হাজার টাকা আছে—আমার নিজের কাছেও হাজার খানেক আছে—এখন আট হাজার টাকা অস্থিত। তোমার কিছু আছে?"

"বড় জোর পাঁচ শ।"

"বউদিদির কাছে কিছু নেই?"

"তার গহনাগুলো বেচ্‌লে আরও শ পাঁচেক হতে পারে।"

"বাকী থাকে সাত হাজার।"

উভয়ে কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। অন্ধকার ধীরে ধীরে পৃথিবীকে গ্রাস করিয়া ফেলিতেছে। নীলমণি অকূল পাথার চিন্তার মধ্যে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতে লাগিল। তাহার মনে হইতে লাগিল,—"হায় হায় এমন ব্যবসায়, এমন কারবার—শুধু অপরিণামদর্শীর অপব্যয়ের জন্য ভস্মসাৎ হইয়া গেল! কি হইবে—এখন উপায় কি? সুধাংশু ত অবিবাহিত—যেখানে থাকিবে, করিয়া খাইতে পারিবে। আমার এখন উপায় কি?—স্ত্রী পুত্র কন্যা লইয়া আমি এখন দাঁড়াই কোথা?—অদৃষ্ট আমার সঙ্গে এ কি ভীষণ খেলা খেলিল! চাকরিটি গেল—আবার কলিকাতায় গিয়া চাকরির উমেদারী করিতে হইবে। সম্বলমাত্র পাঁচশত টাকা—তাহা আর কত দিন খাব? কমলার বিবাহেরই বা উপায় কি হইবে?"

কক্ষের মধ্যে ভৃত্য বাতি জ্বালিয়া দিল। সুধাংশু হঠাৎ কি ভাবিয়া উঠিয়া ভিতরে গেল। টেবিলের নিকট বসিয়া একখানা চিঠির কাগজে কি কতকগুলা লিখিতে লাগিল। প্রায় কুড়ি মিনিট পরে বাহিরে আসিয়া দেখিল—নীলমণি সেই অন্ধকার বারান্দায় তখনও মাথায় হাত দিয়া বসিয়া ভাবিতেছে। সুধাংশু বলিল,—"নীলুদা—এই কাগজ খানা রাখ।"

নীলমণি বলিল—"কি কাগজ?"

"আমার উইল।"

কথাটা শুনিয়া নীলমণির বুকের ভিতরটা ছনাৎ করিয়া উঠিল। তাহার আশঙ্কা হইল—হয়ত রাত্রে সুধাংশু আত্মহত্যা করিবে। কি সর্ব্বনাশ!—তীরবেগে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল,—"উইল কি রকম? তোমার মৎলব-খানা কি?"

সুধাংশু তাহার মনের ভাব বুঝিয়া হাসিল। বলিল,—"ভয় কি নীলুদা—এ সে রকম উইল নয়। আমি হঠাৎ মরছিনে—তেমন ছেলেই নই। বস বস। আমার যা মতলব, সব বলছি।"

নীলমণি উপবেশন করিল। সুধাংশু বলিতে লাগিল,—

"টাকার উপায় যখন হল না, তখন এ ব্যবসা গুটাতে হল। আমি অন্য একটা ব্যবসার ফন্দি করছি।—কলকাতায় এ কয় দিন শুধু যে টাকা ধার পাবার চেষ্টাতেই ঘুরে বেড়িয়েছি তা নয়। যদি টাকা না যোগাড় হয়—তা হলেই বা কি করব, কোথা যাব—সমস্ত ঠিক ঠাক করে এসেছি। সিলনে খুব বড় বড় জঙ্গল আছে—প্রচুর নারিকেল ফলে। একটা বড় দেখে জঙ্গল ঠিকে নিয়ে নারিকেল পাড়িয়ে পাড়িয়ে, কতক আস্ত, আর কতক তেল তৈরী করিয়ে কানেস্তারাবন্দী করে ভারতবর্ষে চালান দেব—কতক চিনির রসে ডুবিয়ে শিশিবন্দি করে কোকেনট্ ড্রপস্ লেবেল এঁটে বিলেতে পাঠাব—সেখানকার ছেলে-পিলেরা খুব খাবে। ব্যাঙ্কের হাজার টাকা, নিজের কাছে যে হাজার টাকা আছে তা, আর ঘোড়া দুটো বিক্রী করলে হাজার দুই পাব—এই চার হাজার মাত্র এবার হল আমার মূলধন। জাহাজে ডেক প্যাসেঞ্জার হয়ে যাচ্ছি—এবার আর নবাবী নয়। ব্যয়সংক্ষেপ যতদূর করতে হয়। সুন্দর ব্যবসাটি মাটী হল ভাই! তুমি আসবার আগে—পাহাড়টার পানে আমি দেখ্‌ছিলাম আর আমার বুক ফেটে যাচ্ছিল। যাক্। যায় এবং আসে—এই হল সংসারের নিয়ম। হঁ্যা—তারপর আমার উইলের কথা। এ ব্যবসা থোক আমার কাছে তোমার দুহাজার টাকা প্রাপ্য রয়েছে। তার বদলে, আমি তোমায় আমার মোটরকারখানি দিয়ে যাচ্ছি। কলকাতায় নিয়ে গিয়ে ওখানি তুমি বিক্রী করো। আর এই বাঙ্গালায় আমার যা আসবাব পত্র আছে সেগুলি তুমি বিক্রী করবে। ওতেও হাজার খানেক টাকা হবে। কমাস ধরে আমার নিজের চাকরবাকর খনির কেরাণী জমাদার প্রভৃতি মাইনে পায়নি—ঐ টাকা থেকে তাদের মাইনে পত্তর চুকিয়ে দিও। কে কত পাবে তার একটা তালিকা আমি তোমায় দিয়ে যাব। চাকরি ছাড়িয়ে তোমায় নিয়ে এলাম—বড় আশা করেই এনেছিলাম—কিন্তু সে আশা সফল হল না। যাক্। তুমি এখন কলকাতায় চাকরির চেষ্টা করবে বোধ হয়?—আমার পরামর্শ যদি শোন—তবে চাকরি না করে একটা কোনও ব্যবসা ফেঁদ।—আর, ঈশ্বরের ইচ্ছায় যদি সিলনে নারিকেলের কাযে আমার সুবিধা হয়—আর, তুমি যদি আসতে ইচ্ছে কর—এস।"

অনেকক্ষণ ধরিয়া উভয়ে নীরবে বসিয়া রহিল। তাহার পর নীলমণি বলিল,—"কবে সিলনে যাচ্ছ?"

"কাল সকালের গাড়ীতেই কল্‌কাতা রওনা হব। সেখানে তিনচার দিন থেকে জাহাজে উঠ্‌ব।"

"তোমার বউদিদির সঙ্গে দেখা করবে না? তিনি যে তোমায় ঐ খানেই খেতে বলেছেন।"

সুধাংশু একটু ভাবিয়া বলিল,—"ভাই এটি মাফ করতে হবে। এ মুখ—এখন তাঁকে দেখাব না। যদি ঈশ্বর কখনও দিন দেন—তা হলে আবার—"

সুধাংশুর গলা ভারি হইয়া আসিয়াছিল। বাক্য শেষ করিতে পারিল না। ফোঁটা দুই চোখের জল সেই অন্ধকারে তাহার গাল গড়াইয়া, জামার আস্তিনে পতিত হইল।

নীলমণি কোনও ক্রমে বাড়ী ফিরিয়া গেল। সে রাত্রি এই ভগ্নহৃদয় হতাশ্বাস দম্পতীর কেমন করিয়া কাটিল তাহা যিনি অন্ধকারেও সমস্ত দেখিতে পান তিনি দেখিয়াছেন।

পরদিন প্রাতে নীলমণি সুধাংশুর বাঙ্গলায় গিয়া তাহার সহিত ষ্টেশনে গেল। গাড়ীতে তাহাকে তুলিয়া দিয়া মোটর লইয়া শূন্যমনে বাঙ্গলায় ফিরিয়া আসিল।

সরলা একটি পেনিফ্রক পরিয়া শুধু পায়ে বারান্দার সম্মুখে খেলা করিতেছিল। তাহার মা সজলনেত্রে রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া স্বামীর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তখন বেলা দশটা। সরলা ইতিমধ্যে কেমন করিয়া শুনিয়াছিল—তাহার কাকা মোটরখানি তাহাদিগকে দিয়াছেন—কিন্তু সে কথা বিশ্বাস করে নাই। পিতাকে একাকী মোটর হইতে নামিতে দেখিয়া তাড়াতাড়ি তাঁহার কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"বাবা, সায়েব কাকা এ মোতলখানি আমাদেল দিয়েথেন?"

উদাসদৃষ্টিতে কন্যার পানে চাহিয়া বলিল—"হঁ্যা।"

শুনিবামাত্র সরলা একমুখ হাসিয়া দুই বাহু উর্দ্ধে তুলিয়া নাচিতে নাচিতে বারান্দায় উঠিল এবং চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল,—"ওলে থোকা—ওলে দিদি—থিগ্‌গিল্ আয়—থিগ্‌গিল্ আয়—সায়েব কাকা আমাদেল মোতল-কাল্ দিয়েথেন, তল্‌বি আয়।"

সরলার এবংবিধ আচরণ দেখিয়া এত দুঃখেও তাহার পিতামাতার ওষ্ঠপ্রান্তে হাসি দেখা দিল।

* * * *

এ দিকের সমস্ত বিলি ব্যবস্থা করিয়া, ধানবাদের বাস উঠাইয়া নীলমণি সপরিবারে কলিকাতা গেল। তাহার সেই পুরাতন আফিসের বড়বাবুর হাতে পায়ে ধরিয়া, বড় সাহেবের নিকট কাঁদাকাটা করিয়া—আবার চাকরিটি পাইল, কিন্তু দণ্ডস্বরূপ সাহেব তাহার বেতন পাঁচটি টাকা কমাইয়া দিলেন।

মোটরকারখানি বিক্রয় করিয়া আড়াই হাজার টাকা পাওয়া গেল। তাহা হইতে দেড়হাজার খরচ করিয়া বৈশাখ মাসে কমলার বিবাহ হইল—বাকী হাজার টাকা সরলার বিবাহের জন্য পোষ্ট অফিস ব্যাঙ্কে জমা আছে।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

আরাধনা

বলিতে বলিতে রজকিনী পাণি নিল কবি করে ভুলে (৭০২ পৃষ্ঠা।)

চণ্ডীদাস

উথলে মধুর জলের উৎস
লবণাম্বুর তলে,
ডুব দিয়ে তুমি রসের কুম্ভ
ভরি' নিলে কুতূহলে ;
ঢালি' দিলে তাহা প্রেম-নিকুঞ্জে,
জীবন-মঞ্জরীতে ;
খুঁজে নিলে কবি, অমিয়া-ফোয়ারা
সখী রজকিনী-চিতে।

মদন মোহের পরিমল-হীনা
দেহের পিপাসাহারা,
'পীরিতি' তোমার ধ্যানের ভুবনে
হইল উদয়-তারা।
অনাদি উষার পরম বাসরে,
যে মাধুরী রূপ ধরি'
বিহরে কবির মানস-পুরীতে
চির-দিবা-বিভাবরী !

অবাক্ গুবাক-সারির তলায়,
পল্লী-দীঘির কূলে,
ছিপ হাতে লয়ে' বর্ষ দ্বাদশ
ভাবিলে কি মন-ভুলে ?
চাহিয়া থাকিতে জলের ওপারে,
ঘাসের গালিচা' পরে,
কে দিত শুকাতে শুভ্র বসন,
নেহারিতে মোহভরে।
বারটি বছর চেয়ে ছিলে কভু
কহনি একটি কথা,
ঝরিত তোমার আঁখির পাতায়
স্বরগ-নির্ম্মলতা !
এমনি করিয়া ফুরাইত দিন,
তোমার হিয়ার মাঝে
কেহ জানিত না রস-মূর্চ্ছনা,
সুধার রাগিণী বাজে !

বারটি শরৎ এসে ফিরে গেল,
একদা প্রভাত-বেলা,
কহিল রমণী— 'শুন হে ঠাকুর,
একি তব ছেলেখেলা !
একি নেশা হায় না পারি বুঝিতে !
এ কেমন মাছ-ধরা !
খালি হাতে রোজ ফিরে যাও ঘরে
তবু মুখে হাসিভরা ;
দেখি ওই হাসি সমান রয়েছে;
নাহিক জোয়ার ভাঁটা,
জানি তুমি কবি, কবির প্রাণে কি
বাজে না দুখের কাঁটা ?'

সেই হাসিরাশি উছলি' উঠিল
চণ্ডীদাসের মুখে—
'সত্য বলেছ, দুঃখের কাঁটা
বাজে না কবির বুকে।
তবু এক দুখ— কহ নাই কথা,
এক যুগ বসে' আছি,—
ছিনু যেন আমি দূরতম গ্রহে
এসে এত কাছাকাছি !
সে অনেক দিন, চাহিল কণ্ঠ
তোমার বাহুর ডোর—
গেলে "নীল শাড়ী নিঙ্গাড়ি' নিঙ্গাড়ি'
পরাণ সহিত মোর !"

রূপের 'বিন্দু-সরোবরে' ছবি'
প্রবাল অধর লাগি',
সুন্দর দু'টি আঁখির কুহকে
নহি সখি, অনুরাগী।
কামের ভস্ম ভূষণ করিয়া
ছুটি না তোমার পিছে,—
আমার তাপসী 'পীরিতি'র কাছে
অপ্সর-লীলা মিছে !
কি আর বলিব— "শুন বিনোদিনি,
সুখ দুখ দু'টি ভাই ;
সুখের লাগিয়া যে করে পীরিতি
দুখ যায় তারি ঠাঁই !"
"তোমার ওরূপ কিশোরী-স্বরূপ,
শুন রজকিনি রামি,
ও দু'টি চরণ শীতল জানিয়া,
শরণ লইনু আমি।"
'কি বল ঠাকুর ?— কহে রজকিনী,
'দুখিনী অবলা আমি,
আমার ধরম, সরম-ভরম
জানে অন্তর-যামী।
একি কথা ক্ষ্যাপা পাগলের মত ?
শুনে আমি লাজে মরি !
মাছ ধরিবার ছল করে' ছিছি,
রূপ দেখ আঁখি ভরি' !'

'ভুল বুঝিয়াছ!'—কহে দ্বিজ কবি
'ছুঁইতে চাহিনা গা,
লোমকূপে যার কোটি ক্রিমি কীট,
পীরিতি যাচে না তা!
"কপট পীরিতি আরতি বাড়ায়
মরণ অধিক কাজে,
লোক চরাচরে কুল রাখা দায়,
জগৎ ভরে গো লাজে!"
এস সখি এই পূজারির সাথে
চল প্রান্তর পারে,
'বাশুলী' দেবীর মন্দির-মুখে
প্রেম-সুখ-অভিসারে;—
ফুটিয়াছ কোন্ সাগর ফেনায়
উড়াইয়া গুণ্ঠন!
পদ্মালয়ার চরণ পরশে
রভসে উন্মগন!
তুমিই স্বর্গ, চতুর্বর্গ,
কল্প-মোক্ষফল;
ধ্রুবের বিরহ সন্তাপে তুমি
অমৃত শান্তিজল;
"তুমি গায়ত্রী, ত্রিসন্ধ্যা মম,
তুমি হও মাতা পিতা,"
তুমি উপাসনা রসের সাধনা,
এস মনোবন্দিতা।'

সাগর-বর্ণ আকাশের তলে,
দীপ্ত শারদ প্রাতে,
চলে রজকিনী প্রান্তর-পথে
চণ্ডীদাসের সাথে;
ঝরিল ভুবনে আনন্দ-রেণু,
পথ দেখাইছে কবি,
চলে রজকিনী মন্থর পদে,
হেরে উজ্জ্বল রবি।
ছাড়ি' ঘর বাড়ী চলিতেছে নারী
কাঁপে তনু থরথরি'—

থমকি' চমকি' চাহে পিছু ফিরে,
আঁখি আসে জলে ভরি;
সমতল পথ এত বন্ধুর
লাগেনি ত কোন দিন!
একি আশঙ্কা একি উদ্বেগে
ছিঁড়িল মর্ম্ম-বীণ্।
কহে সংশয় 'একি পরাজয়?
একি লাভ? একি ক্ষয়?—
ফিরিবার পথ ক্রমশ দীর্ঘ,—
এ কি প্রেম! এ কি জয়!'
চরণ হইতে সরে ক্ষিতিতল,
যা'ছিল তাই কি ভালো?
একি সুখ-ঊষা? একি মরীচিকা?
আলেয়ার হাসি আলো?
'যাবনা—যাবনা', পিছনে সহসা
কহে রামা চীৎকারি'
'ফিরাইয়া লও মন্ত্র তোমার,
পায়ে ধরি দাও ছাড়ি'।'
পুনঃ সেই হাসি ভাসিয়া উঠিল
চণ্ডীদাসের মুখে—
'সম্মুখে তব প্রীতির প্রয়াগ,
বল বাঁধ' সখি বুকে।
শিরে নীলাকাশ, দেবতার বাস,
আরতি-চন্দ্রাতপ,
তরুলতাভরা ধরণীর পীঠ
তাঁরি পূজামণ্ডপ।
সংসার যাঁর বিভূতি তাঁহার
চরণে দাও গো ডালি
যৌবন-ধন জীবন মরণ—
ঘুচিবে মনের কালী!
ভাসাও পুণ্য পাপের পসরা
মুক্ত-বেণীর নীরে—
জান না এসেছ কোন্ সাধনায়,
উতরিবে কোন তীরে।

যাও যাও ফিরে, নহ বন্দিনী,
তোমার কুটীর-দ্বারে,
ছাড় শঙ্কিতা সঙ্গ আমার
মাধুরীর অধিকারে।'

'রবে মোর ঘরে?'—কহে রজকিনী—
'কলঙ্কে ডরিব না,
কর গো শপথ, দেবতা সাক্ষী,
করিও না প্রতারণা।
এস ভালবেসে হে প্রাণ-বঁধুয়া,
জীবনে মরণে মোরে
যাবে না ছাড়িয়া দাও পাণিতল,
বাঁধিনু পীরিতি-ডোরে।
হের হের বঁধু, হিয়ার মাঝার
লইয়া আমার আঁখি—
বুক-চেরা এই শোণিতে রাঙ্গায়ে
পরাইনু প্রেম রাখী।
তোমার সাধনে আমার সাধন,
যুগ যুগান্ত ধরি'!
তোমার ধরমে আমার ধরম—'
মূরছিল সুন্দরী।

পথধূলি হ'তে বুকে তুলি' তারে
ভাবে কবি বিস্মিত—
একি কূল-ভাঙ্গা ভাবের প্লাবন!
জীবন উন্মথিত!

সে এক রজনী বড় সুন্দরী!
নদী-তীর-পথ ধরি'
শরবন ভাঙ্গি' চলে' যায় কবি,
সাথে তার সহচরী।
পাংশু আকাশে, জাফ্‌রান্‌ মেঘে
তাকায় ইন্দুলেখা,
অদূরে ভগ্ন দুর্গ-প্রাচীর
ভ্রমর-বরণে আঁকা;
গোল গম্বুজ দীর্ঘ ছায়ায়
কাঁপিছে নদীর জলে,
প্রান্তর যেন থির সমুদ্র
চন্দ্রকলার তলে—
'হের সহচরি, শোভার লহরী
বহে যায় এ নিখিলে,
একা দেখে' সুখ জাগে না পরাণে,
তুমি যদি না দেখিলে—
উদিয়াছ তুমি ওই শশী সম,
চির-বিচিত্রতম,
সমাজের ভাঙ্গা দুর্গ-তোরণে
হরিতে তামসী মম!
ওই শশাঙ্ক খণ্ড, মলিন,
কলঙ্কে বিজড়িত—
তুমি রজকিনি, পূর্ণ অমল
মণ্ডিছ মম চিত।'

রজকিনী-গৃহে হেরিয়া কবিরে,
করে লোকে কাণাকাণি,
ঘাটে মাঠে হায় রটে কলঙ্ক,
বিঁধে বিদ্রূপ-বাণী।
'কীর্ত্তি রাখিলে!'— কহে সহচরে,
করে শ্লেষ পরিহাস—
'যজ্ঞোপবীত ধরিয়া কণ্ঠে
হ'লে রজকিনী-দাস!'

নীরব হইল ধ্যানময় কবি,
চমকি' আচম্বিতে
চাহে অভিজিৎ- তারকার পানে—
যেন কা'র ইঙ্গিতে—
কল্পনা-রাণী খুলে দিল কোন্‌
স্বপনের বাতায়ন,
ঝাউ-বীথিকার ছায়া-মাস্তলে
কুহেলির আবরণ।

লোল অপাঙ্গ ভঙ্গিমাভরে,
কোন্ সুর-কিশোরী
রজনীর সেই চাঁদোয়ার তলে,
ফুকারিল বাঁশরী!—
দেখা দিল দূরে অরুণের রথ
নিশীথের মাঝ্খানে,
নীরবতা যেন মূরতি ধরিয়া
শিহরিল বাঁশীতানে!
দেখিতে দেখিতে সরে গেল সেই
কুহেলির নীহারিকা—
ফুটিল সমুখে পিতার ভবন,
প্রভাত-ভানুর শিখা—
মাতার কণ্ঠ, পিতার দৃষ্টি,—
ডাকে 'আয় ফিরে আয়,
ভুল করেছিস্, ভাঙ্গ্ সেই ভুল!
অশ্রুর ঝরণায়।
আয় ধুয়ে আয় পুণ্য-ধারায়,
আয় রে নির্ব্বাসিত,
পিতৃগণের গচ্ছিত নিধি
সুখ-মঙ্গল-হিত,—
তুই কি বুঝিবি, অবোধ বালক,
সংযমে কি সুষমা!
ফিরে আয় ঘরে ওরে অবাধ্য,
করিবে সে তোরে ক্ষমা।'
সেই মুহূর্ত্তে পশ্চাৎ হ'তে
ডাকে তারে রজকিনী—
'আর কেন দেরী? ফিরে চল ঘরে,
পোহায় যে নিশীথিনী—
'কেন ডাক মোরে? যাব কোন্ ঘরে?
ঘর কই? এ যে পথ!
পথের জোছনা ভুলায় আমারে—
কাঁপে প্রাণ-পারাবত।
এস সহচরি, এস ত্বরা করি',
দাঁড়াব না পথে আর।—
তোমাতে আমাতে তরুণ প্রভাতে,
অপার হইব পার।
কাম্য-কামের শেষ-সীমানাতে,
দুস্তর পরিখাতে,
আত্ম-দানের সান্ত্বনা-স্রোতে,
সাঁতারিব হাতে হাতে!
কল্পকালের বল্লভে স্মরি'
নিবেদিব অঞ্জলি,
সবিতা যাঁহার পঞ্চ-প্রদীপ
ধরে চির-উজ্জ্বলি!
একটি অরুণ পূর্ণ উদিত
রস অর্ণব-কূলে,—'
বলিতে বলিতে রজকিনী-পাণি
নিল কবি করে তুলে।
ঘিরিল তাহার অলকপ্রান্ত
অপরূপতম জ্যোতি,
তারকা-খচিত আকাশের পটে,
দাঁড়ায়ে রহিল সতী।
আরেক রজনী, ঝঞ্ঝা-অশনি
দেয় ঘন হুঙ্কার,
পথ পানে চেয়ে জাগে রজকিনী
বিজন কুটীরে তার,
সাজায়ে অন্ন বসিয়া আছে সে
ভুঞ্জিবে বঁধু এসে,
নিমন্ত্রিতের তৃপ্তির পরে
প্রসাদ মাঙ্গিবে শেষে।
আসে পূজা সেরে, প্রতি দিনান্তে,
আজ কেন এত দেরী!—
বাজিয়া উঠিল নীল অঞ্জনে
বরুণের রণ-ভেরী।
বাহিরে যাইতে চাহে বিরহিণী,
পদে পদে বাধা পায়,
একি প্রলয়ের শিলার সৃষ্টি,
বৃষ্টির দরিয়ায়!

নিবারে তাহারে　দিগ্-বারণেরা,
ঝটিকায় লোটে বাস,
যতবার ধায়　পড়ে আছাড়িয়া—
এস গো চণ্ডীদাস!

মন যে ছুটেছে　বাহিরের পানে,
কেমনে রহে সে ঘরে!
বঁধুর বিরহ-　আঁধারের রাশি
গ্রাসিয়াছে চরাচরে।
কড়্ কড়্ রবে　সাড়া দেয় বাজ,
ছুটিল সে দিশেহারা,
আকুলতা এসে　ধরেছে আঁকড়ি',
করিয়াছে মাতোয়ারা।
আসে আশঙ্কা,　ডাকিনী-মূর্ত্তি,
ভীম কটাক্ষে চায়,
দোলে বিভীষিকা　অট্ট হাসিয়া
ঝটিকা-হিন্দোলায়।
'বাশুলী' দেবীর　দেউলের চূড়ে
ঝলে ত্রিশূলের ফলা,
পঁহুছিল রামা　দেবতার দ্বারে
অনুরাগ-বিহ্বলা।
বড় আশা ছিল　প্রাণ-বঁধুয়ারে
নেহারিবে সেইখানে—
ডেকে ডেকে হায়　ঘুরে একাকিনী,
প্রতিধ্বনির তানে
ভরে অঙ্গন,　বিল্ব-কানন—
সুধায় সে দেবতায়,
'কোথা বঁধু মোর?　বল্ মা আমারে,
কোথায় খুঁজিব তায়!
জানিস্ সকলি,　ভুলাস নে মিছে!'—
পাষাণ-বেদীর মূলে,
নিরমাল্যের　ফুলচন্দনে
লুটাইল এলোচুলে।

*　*　*　*

পল্লী-রমণী　পূজা দিতে এল,
ফিরে গেল একে একে,
কাঁপিল না হায়　কাহারো হৃদয়,
জাগাল না তারে ডেকে।
তৃতীয় প্রহরে　ভাঙ্গিল মূর্চ্ছা,
কেঁদে ওঠে রজকিনী—
দৃক্‌পাত নাহি　কিছুতে তাহার—
ছুটিল উন্মাদিনী।
আলুথালু বেশে　ধাইল উধাও,
হাটের মধ্য দিয়া,
ব্যাপারীরা সব　ফিরিছে তখন
শূন্য পসরা নিয়া।
রক্ত উজল　চরণালক্তে
ছুটিল রুদ্ধ-শ্বাসে,—
বহু পথ ঘুরে'　পঁহুছিল শেষে
গ্রামের শ্মশান পাশে।
দেখিল অদূরে　ওঠে চিতা-ধূম,
'বেড়াগ্নি' দেয় কারে!
এ যে তারি বঁধু!　আগুনের মাঝে
দেখিয়াই চিনে তারে।
ধরিয়া হৃদয়ে　পদ-যুগ তার,
নিবিড় আলিঙ্গনে
বাঁধিল বঁধুরে—　দহিল না দেহ
পিঙ্গল হুতাশনে!
সৎকার লাগি'　চণ্ডীদাসের
শব লয়ে' প্রতিবাসী
এসেছিল যারা,　বাধা দিল মিছে,
কহে তারে সম্ভাষি',—
'কেন ডাক আর!　বঁধুয়া তোমার
মহানিদ্রার দ্বারে!
শান্তিতে তারে　দাও গো ঘুমাতে,
ডাকিও না হাহাকারে।
কালি রজনীতে　ফুরায়েছে আয়ু,
পড়িয়াছে শিরে বাজ—'

'নহে কভু নহে',—কহে রজকিনী—
'উঠ গো হৃদয়-রাজ,
এরা কি বুঝিবে 'দশা' পেয়ে তুমি
প্রেম-রসে অচেতন,
ভাবের আবেশে রয়েছ নীরব—
কথা কও প্রাণধন!
উঠ গো কান্ত, প্রিয়তম মোর',—
কহে জুড়ি' দু'টি কর,—
'উন্মীল আঁখি, ডাকে দাসী তব,
উঠ জীবনেশ্বর!
ওই দিনমণি সাক্ষী করিয়া
বাঁধিয়াছ প্রেম-ডোরে—
শপথ করেছ, জীবনে মরণে
ছাড়িয়া যাবে না মোরে।
বসি' একাসনে মিশিয়া দুজনে
নাম জপিয়াছি যাঁর,
হের গো ফুটেছে শিয়রের কাছে
চরণ-পদ্ম তাঁর!
দোলে বনমালা কণ্ঠ বেড়িয়া,
অধরে মুরলী বাজে,
এসেছেন ওই রাধিকা-রমণ
সাজিয়া মোহন সাজে;
হের বঙ্কিম ময়ূরের পাখা,
পীত-ধড়া, পীত-বাস,
মেলিয়া লোচন কর নিবেদন
জীবনের অভিলাষ।
এসেছেন ওই শোন' মঞ্জীর
মনোরঞ্জন মোর—
উঠ গো দয়িত মরম-মিত্র,
মুছাও নেত্র-লোর।
মিছে কলঙ্ক ঘুচাও বন্ধু,
জাগ গো জীবন-ধন,
জীয়াব তোমারে নাহি অভাগীর
হেন প্রেম-রসায়ন!

তোমারি দীক্ষা মন্ত্র জপিয়া
পাইব তোমারে ফিরে—
ঝাঁপ দিল রামা চিতার অঙ্কে
ভাসিয়া নয়ন-নীরে।
ভেঙ্গে গেল ধ্যান চণ্ডীদাসের,
ডাকিলেন,—'সুভাষিণি,
এস মোর সনে মধুময় পথে,
মাধবেরে ল'ব জিনি'!
সাঙ্গ আজিকে সংসার-খেলা,
এস বরাননি ধনি!
হেরিব কৃষ্ণ, জীবন কৃষ্ণ,
রাধার হৃদয়-মণি—
কেলি-কদম্ব কুঞ্জ-ছায়ায়
ধায় কালিন্দী বাঁকা,
কৃষ্ণ-চূড়ার পুষ্প-মালিকা
নবীনাম্বুদে ঢাকা,—
কোথা মুকুন্দ, দোল-গোবিন্দ
ভুবন-বন্দনীয়?
এস অনিন্দ্য নয়নানন্দ,
হে পরম রমণীয়।
নব নীলাব্জ নিন্দি' মাধুরী,
করুণাসিন্ধু নাথ,—
হৃদি মৃদঙ্গে জলধি-মন্দ্রে
মঙ্গল করাঘাত!
মধুর অধরে, মধুর বদনে,
মধুর নয়নে হাসি'
মধুর বেণুতে, মধুর রেণুতে
পরসাদ মধু-রাশি—,
বলিতে বলিতে চলে' যায় কবি
শ্রীবৃন্দাবন পানে,
প্রেম-উল্লাসে নাম বিলাইয়া
অমৃতের সন্ধানে!

শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়।

"গিরের্নিতম্বে মরুতা বিভিন্নং তোয়াবশেষেণ হিমাভমভ্রম্।"

শ্রীযুক্ত অবনীনাথ মুখোপাধ্যায়ের আলোকচিত্র হইতে।

(এই চিত্রখানি "বেলভেডিয়ার" শিল্প প্রদর্শনীতে সর্ব্বোচ্চ সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিল)

কিছুকাল পরে লাঙ্গুলটি খসিয়া গেলে যেরূপ লম্ফ ঝম্ফ করিয়া জল ও স্থলে বিচরণ করে, জামাতৃজীবও সেইরূপ প্রথমে পৈতৃকগৃহে উৎপত্তি লাভ করিয়া স্বগৃহেই বর্দ্ধিত হইয়া আইবুড়ো নামধেয় লাঙ্গুলটি খসাইয়া স্বীয় ও শ্বশুরের গৃহে মকমক শব্দে লম্ফ দিয়া বেড়াইতে থাকে। ভেকশিশু যেমন প্রায় মাসান্তে লাঙ্গুলচ্যুত হইয়া ভেকে পরিণত হয়, জামাতৃজীবের জামাতৃভাব পরিগ্রহণের সেরূপ একটা নির্দ্ধারিত কাল দেখা যায় না। স্থল ও কালবিশেষে উক্ত রূপান্তর বিভিন্ন সময়ে হইয়া থাকে; কোন কোন স্থলে অতি শৈশবে, কোন কোন স্থলে গঙ্গা-যাত্রার সময়ও হইয়া থাকে। পশুশালিকার অধ্যক্ষ ধরিত্রী যৌবনোদ্গমই ইহার প্রশস্ত কাল বলিয়া নির্ব্বাচিত করিয়াছেন, একথাও অনেককে বলিতে শুনিতে পাওয়া যায়।

ভেক গলদেশ স্ফীত করিয়া শব্দ করিলে যেরূপ আকাশে মেঘের অভ্যুদয় বিবেচিত হয়, জামাতৃজীবও সেইরূপ 'দেহি দেহি' শব্দ করিলেই বুঝিতে হয় যে, শ্বশুর মহাশয় যথাসর্ব্বস্ব বিক্রয়পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ অর্থের সংস্থান করিয়াছেন। আর শুনিয়াছি ভেক না কি অনবরত 'কে কার কড়ি ধারে, কে কার কড়ি ধারে' বলিয়া উচ্চ চীৎকার করিলেই নিঃশব্দে কদ্রুতনয় কোথা হইতে আসিয়া টুঁটিটি টিপিয়া ধরে, আর ভেক তখন 'কড়ি ন্যাও,' 'কড়ি ন্যাও,' বলিয়া বৃথা অনুনয় করে। জামাতৃজীবও প্রথমে নাকি দুনিয়াটি 'ড্যাম কেয়ার' করিয়া সদর্পে উল্লাসে নৃত্য করিতে থাকে, কিন্তু কন্যারত্ন জাত হইলেই উচ্চশির নত করিয়া, আপনাকে দায়গ্রস্ত বোধ করিয়া 'কিসে হবে পার', 'কিসে হবে পার' বলিয়া দেওয়ালে মাথা খুঁড়িতে থাকে, এবং এমন কি বৈবাহিক মহাশয়ের গৃহচারী পিপীলিকাটি পর্য্যন্তকেও; অনুনয় করিয়া থাকে; ইহাকেই বলে প্রকৃতির পরিশোধ।

জামাতৃজীব স্তন্যপায়ী শ্রেণীভুক্ত পক্ষহীন দ্বিপদ। ইহারা মেরুদণ্ডী; কিন্তু একশ্রেণীর পালিত জামাতৃজীব আছে, যাহাদের মেরুদণ্ড আছে কি না—এ বিষয়ে অনেক প্রাণি-তত্ত্ববিদ্ বিশেষ সন্দিহান্। সম্প্রতি অণুবীক্ষণ সহযোগে পারি নগরে জনৈক পশুব্যবচ্ছেদক দার্শনিক উক্ত পালিত জামাতৃজীবের শরীর মধ্যে কোথাও মেরুদণ্ডের চিহ্ন পর্য্যন্ত পান নাই। চলিতভাষায় ইহাদের নাম 'ঘরজামাই'। ইহাদের বিশেষ বিবরণ পরে বিবৃত হইবে।

উক্ত জীব হিংস্র, প্রায়ই পোষ মানে না, তবে সার্কাসে যেমন সিংহ ব্যাঘ্রও পোষ মানে, সেইরূপ শ্বশুর বা শাশুড়ীয় বিষয় থাকিলে লোভে পড়িয়া অনেক বন্যজামাতাও পোষ মানিয়া যায়। তবে সুবিধা পাইলে বশীকারকের ঘাড়টিও মটকাইয়া দিয়া কদলী প্রদর্শনপূর্ব্বক বনের জীব বনে পলাইয়া গিয়া থাকে।

জামাতৃজীব প্রায়শই মাংসাশী। পোলাও কালিয়া, পাঁটা, ফাউল, মটন, হ্যাম, ভূচর, জলচর, খেচর, উভ-চর, কোন প্রাণীই বাদ যায় না—ভূচরের মধ্যে শকট, মোটরাদিযান, জলচরের মধ্যে নৌকা জাহাজ, বয়া, খেচরের মধ্যে ঘুঁড়ি, ফানুস, বেলুন এবং উভচরের মধ্যে এরোপ্লেনই বাদ গিয়া থাকে।

উক্ত জীব স্থূলচর্ম্মী ও একশফ। চর্ম্ম এরূপ স্থূল যে, শ্যালিকার তীব্রোক্তিরূপ অঙ্কুশও গাত্রে বিদ্ধ হয় না। বিশেষতঃ পূর্ব্বকথিত ঘরজামাই নামধেয় জীব 'প্রহারেণ ধনঞ্জয়' হইলেও অবাধে সকলই সহ্য করিয়া থাকে। এক শফের, শ্রীচরণদ্বয়ে ক্ষুর আছে এবং তাহা গবাদির ন্যায় খণ্ডিত না হইয়া অশ্বাদিবৎ অখণ্ডিত। উক্ত ক্ষুরদ্বয় প্রায়ই বাঁধান হইয়া থাকে। নূতন নূতন বৎসরে দুইবার করিয়া শ্বশুর বা শাশুড়ীকে বাঁধাইয়া দিতে হয়, একবার পূজার সময়, আর একবার জামাইষষ্ঠীর সময়। যদি কোন শ্বশুর বা শাশুড়ী কোন সময় ক্ষুরদ্বয় বাঁধাইতে ভুলিয়া যান বা অক্ষমতা-প্রযুক্ত সমর্থ না হন তাহা হইলে জামাতৃ-প্রবর গুরুবেগে চাট ছোড়েন এবং 'ল্যাং' দিয়া থাকেন। তবে পশুক্লেশনিবারণী সমিতি উক্ত অক্ষম বা ভ্রান্ত শ্বশুর-শাশুড়ীকে তিন ধারা মতে ফৌজদারী সোপর্দ্দ করিতে পারেন কি না তদ্বিষয়ে ভারতগবর্ণমেণ্টের প্রধান ব্যবহার-বিৎ এড্‌ভোকেট জেনারেল মহোদয় মত দিবার জন্য সম্প্রতি আহূত হইয়াছেন, এবং পরবর্ত্তী কলিকাতাগেজেটে উক্ত মত প্রকাশিত হইবে। পাঠকবর্গ উদ্‌গ্রীব রহিবেন।

জামাতৃজীবের কতক সলাঙ্গুল ও কতক অলাঙ্গুল। অলাঙ্গুলের সংখ্যাই অধিকতর। যে জামাতৃজীবের

লাঙ্গুল আছে তাহার ঝাপ্‌টায় শ্বশুরের ত্রিকোটী পূর্ব্ব-পুরুষ পর্য্যন্ত অস্থির। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিই শুনিতে পাই নামের অন্তে কতকগুলি বিশেষ বর্ণসমাবেশে লাঙ্গুলের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। লম্বলাঙ্গুল জামাতৃজীবের চরণ ধারণ বোধ হয় ধরিত্রীর ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না, তাই বামনের তৃতীয় পদ সংস্থাপনের ন্যায় উক্ত লম্বলাঙ্গুল জামাতার ত্রিলোকব্যাপী চরণ ধারণার্থ, শ্বশুরমহাশয়ের চতুর্দ্দশ পুরুষকে মস্তক পাতিয়া দিতে হয়। বলিতে হইবে না যে, অন্যত্র লাঙ্গুল আস্ফালনই সার। অলাঙ্গূল জামাতৃজীব লাঙ্গূলবিহীন হইলেও লাঙ্গূল যে একেবারে নাই তাহা নহে। মানবের পূর্ব্বপুরুষগণের লাঙ্গূলের যেমন বহির্বিকাশ আছে, মানবের সেইরূপ লাঙ্গূলের বহির্বিকাশ না থাকিলেও, অন্তরস্থ লাঙ্গূলচিহ্ন অদ্যাপি মেরুদণ্ড-নিম্নে প্রকাশিত দেখা যায়, অলাঙ্গূল জামাতৃজীবেরও সেইরূপ বহিঃপ্রকাশিত লাঙ্গূল আছে—কাহারও বা কুলীনত্ব, কাহারও বা পৈতৃক ধন, কাহারও বা অন্তর্দগ্ধ 'বনেদি' নামধেয় মিথ্যা বংশ-মর্য্যাদা। এই সকল লাঙ্গূলের ঝাপ্‌টাও সময় সময় সলাঙ্গূল জামাতার লাঙ্গূলের সাপট হইতেও অধিক। লঙ্কেশ্বর রাবণরাজকে উচ্চ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত দেখিয়া 'যুবরাজ' অর্থাৎ অঙ্গদ বাবাজীবন যেরূপ লাঙ্গূল 'বৈদ্যুতিক 'কয়েলে'র ন্যায় পাকাইয়া তদুপরি বসিয়া প্রবলপরাক্রান্ত দশাননকেও গালি দিয়াছিলেন, উক্ত অলাঙ্গূল জামাতৃজীবও সময় সময় ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র লাঙ্গূল,অভিমান-মন্ত্রবলে দীর্ঘ করিয়া জায়া-পিতৃদেবকেও বেশ দুচারি কথা শুনাইয়া দিয়াছেন। এই প্রসঙ্গ জামাতৃবাসিষ্ঠ রামায়ণে' 'কুটুম্ব-রায়বারে' পাওয়া যায়; শ্বশ্রূ-পরিষৎ' উক্ত কেতাবের একখানি বহু প্রাচীন পুঁথি সংহল-চুম্বি সাগরের তলদেশ হইতে জনৈক শুক্তি-সংগ্রাহকের নিকট পাইয়াছেন, এবং মুদ্রিত করিয়া সাধারণে সত্বর প্রকাশার্থ আয়োজন করিতেছেন, শুনিলাম। গ্রাহকগণ সত্বর হইবেন। নতুবা বিলম্বে হতাশ হইতে হইবে।

এই জীব কোন যুগে প্রথম উৎপন্ন হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে গভীর গবেষণা অনেক হইয়া গিয়াছে। পাঠকগণ বিশেষ কৌতূহলী হইলে এসিয়াটিক সোসাইটীর রিসার্চ্চ পত্রিকাগুলি বিশেষ মনোযোগ সহকারে পাঠ করিবেন। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, মানব-সৃষ্টির বহুদিন পরে যখন সমাজ আরম্ভ হইয়াছিল, তখন হইতেই উক্ত জীবের আবির্ভাব। প্রাজাপত্য-যুগই (Petriarchal period) জামাতৃজীবের প্রথম সৃষ্টিকাল।

আবার কোন কোন বৈজ্ঞানিকের মতে অদিতিযুগ (Pre-Orion Age) অর্থাৎ ৫০০০ হইতে ৩০০০ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কালের কোন সময়ে উক্তজীব আবির্ভূত হইয়া থাকিবে। কোন কোন প্রত্নতত্ত্ববিৎ জেন্দ অবেস্তা গ্রন্থের বেন্‌দিদাদ নামক অধ্যায়ে প্রথম ফার্গাদে জরথুস্ত্রের প্রতি অহুরমজদের উক্তি দৃষ্টে বলিয়া থাকেন যে, আর্য্যগণ যখন ঐরাণাবৈজু নামক স্থানে প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করেন, তখন হইতেই উক্ত জীবের সৃষ্টি হইয়া থাকিবে। পৌরাণিক গবেষণাকারিগণ বলেন যে, দক্ষ প্রজাপতিই না কি প্রথমে একেবারে সাতাইশটির সমষ্টি করিয়া একমাত্র চন্দ্রদেবকেই উক্তজীবে পরিণত করেন; এবং তাহার পর দশম গ্রহ স্বরূপ জামাতৃজীব পদভারে ধরিত্রীকে প্রপীড়িতা করিয়া আসিতেছেন।

জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ অনুমান করেন যে, এখন যেরূপ চলিতেছে অর্থাৎ 'কন্যাদায়' নামক গুরুভার ধরিত্রীর স্কন্ধে উত্তরোত্তর যেরূপ অধিকতর বর্দ্ধিত হইতেছে, সত্বরই বসুমতী আইন-রূপ পরিগ্রহ করিয়া, অদূর ভবিষ্যতে ব্যবস্থাপক-সমিতিরূপ বিষ্ণুর নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে অবতার গ্রহণ করিয়া নিস্কৃতি দিতে অনুনয় করিবেন, এবং বসুজ মহাশয়ের বিবাহ-বিধি-প্রবর্ত্তন চেষ্টাই ইহার সূচনা করিয়া দিতেছে। বলিতে ভুলিয়াছি যে, ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন, জামাতৃজীবের উদ্ভব আরও পূর্ব্বে হইয়াছিল, এবং তাঁহারা ক্ষীরোদসমুদ্রতল ও হিমালয়পর্ব্বত খননপূর্ব্বক দুইটি অতিকায় (mammoth) জামাতৃজীবের কঙ্কাল আবিষ্কৃত করিয়াছেন। একটির নাম 'হরি' ও অপরটির নাম 'হর' দিয়াছেন এবং 'অসারে খলু সংসারে সারং শ্বশুরমন্দিরং, হিমালয়ে হরঃ শেতে হরিঃশেতে মহোদধৌ' এই উক্তিই ভূতত্ত্ববিদ্‌গণকে উক্ত আবিষ্ক্রিয়ায় সাহায্য করিয়াছিল। বড়ই অদ্ভুত ব্যাপার যে, উক্ত অতিকায় জামাতৃজীব-পুঙ্গবদ্বয় পূর্ব্বকথিত 'ঘরজামাই' নামক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত

এবং উভয়েই না কি শ্বশুরগৃহই সার করিয়া গিয়াছেন। কোন মাসিক পত্রিকায় জামাতৃজীবের প্রথম উদ্ভবকাল নির্ণয় এবং সপ্তর্ষিমণ্ডল তখন কোন্ রাশিতে ছিল, তাহার বিবরণ দেখিতে পাইলে বড়ই আনন্দিত হইব এবং ইহাতে সমুদয় জগতের বড়ই উপকার হইবে বলিয়া বোধ হইতেছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মানবাখ্য পক্ষবিহীন দ্বিপদ জীবই, উপনয়নসংস্কারান্তে দ্বিজত্ব প্রাপ্তির ন্যায়, জন্মমৃত্যুর মাধ্যমিক বিবাহ নামধেয় প্রথা বিশেষ দ্বারা জামাতৃজীবত্বে পরিণত হয়। উক্ত প্রথা বা জামাতৃজননের উপায় দেশভেদে ভিন্ন ভিন্ন।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব কালে অর্থাৎ সত্য ত্রেতা দ্বাপরে জামাতৃত্ব প্রাপ্তির অষ্ট প্রকার বিধি প্রবর্ত্তিত ছিল, যথা, ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, গান্ধর্ব, পৈশাচ, আসুর ও রাক্ষস; কিন্তু কলির মধ্যাহ্ন হইতে একপ্রকার সর্ব্বগ্রাহী বিধি প্রবর্ত্তিত হওয়ায় বেড়া ভাঙ্গিয়া সমাজের সুফলপ্রদ বৃক্ষগুলি জামাতৃজীব উদরসাৎ করিতেছে। সর্ব্বভুক্ ক্ষুদ্র সংস্করণ আধুনিক জামাতৃজীবের জ্বালায় অস্থির হইয়া অনেকে না কি ধর্ম্মান্তর পরিগ্রহ করিয়া রক্ষা পাইয়াছেন। ঊনবিংশ শতাব্দী উক্ত অস্থিপ্রজ্বালক বহুল জামাতৃজননের জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ। পালে পালে জামাতৃজীব আমেরিকার প্রান্তরবিচারী বাইসনবৎ বঙ্গক্ষেত্রে আজকাল তাণ্ডব নৃত্য করিতেছে। দুইটা এসিটিলিন ল্যাম্প, একটা ফু ফু ব্যাণ্ড, আর একটা ভিক্ষালব্ধ ল্যাণ্ডো যোগাড় করিলেই জামাতৃজীব যখন শ্বশুরমহাশয়ের সর্ব্বস্ব মায় ভোজ্যপাত্রটি পর্য্যন্তের অধিকারী হন, তখন জামাতৃজীব কেন না উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইবে? তবে পণ্ডিতবর মাল্‌থসের নিয়মানুযায়ী যখন খাদ্যোৎপত্তি অপেক্ষা খাদ্যধ্বংস অধিক পরিমাণে হইবে অর্থাৎ স্ত্রীজাতীর উৎপত্তির বিশেষ হ্রাস হইয়া 'কনের মা কাঁদে, টাকার পুঁটুলি বাঁধে' এই বিপরীত বিধির প্রবর্ত্তন হইবে, তখন হইতেই জামাতৃজীবের সংখ্যা ক্ষীণ হইতে পারে বলিয়া মনীষিগণ বিবেচনা করিতেছেন। তখন কন্যাদায়ের ভয়ে কাহাকেও ব্রাহ্মাদি ধর্ম্ম পরিগ্রহ করিতে হইবে না। পৃথিবীর অঙ্গার সত্বরই ফুরাইয়া যাইবে এই ভাবনায় অস্থির হইয়া বৈজ্ঞানিকগণ যেরূপ দ্রুতগামী জলস্রোত বা জল-প্রপাতের শক্তি বৈদ্যুতিক শক্তিতে ও তৎপরে তাপশক্তিতে পরিবর্ত্তিত করিয়া প্রতি গৃহস্থগৃহে ব্রহ্মার সরবরাহ করিবেন বলিয়া স্থিরসংকল্প হইয়াছেন, সেইরূপ সাবেকি 'কুপ কন্যা'র সৃষ্টি ও তৎসহ বিবাহ-প্রথা কোনরূপে প্রবর্ত্তিত রাখিয়া জামাতৃজীবের সংখ্যা পূর্ব্ববৎ অধিক রাখিতে ছেলের বাপেরা সচেষ্ট হইয়াছেন এইরূপ শুনা যাইতেছে।

আজকাল জামাতৃজীবগণ এত অত্যাচারী হইয়া উঠিয়াছে যে, বঙ্গভূমি ইহাদের জন্য বড়ই পাড়িত। 'বিবাহ-বিভ্রাট'-প্রণেতা অমৃতবাবু ও 'বলিদান'-প্রণেতা স্বর্গীয় নাট্য-সম্রাট্ গিরিশবাবু বহু চেষ্টা করিয়াও ইহাদের অত্যাচার প্রশমিত করিতে পারেন নাই। উক্ত মহোদয়গণ এবং কতকগুলি সমাজ-সংস্কারকগণ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কশা লইয়া তাড়া করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু কার্য্যে বড় একটা ফল হয় নাই। বিশেষতঃ কতকগুলি মিথ্যা সমাজ-সংস্কারক মুখে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বক্তৃতা করিয়া, বড় বড় সভা সমিতিতে আন্দোলন করিয়া, গৃহে আসিয়াই শুনিয়াছি ঘটকের হাতে বৈবাহিক মহাশয়ের ভদ্রাসনবিক্রয়লব্ধ মুদ্রার সদ্-ব্যয়কল্পে বহুপৃষ্ঠাব্যাপী বজেট দিয়াছেন; পাত্রীর-পিতা স্বীয় গৃহিণীকে, কন্যারত্ন প্রসবপূর্ব্বক পুন্নাম নরকত্রাণের অর্দ্ধ-ব্যবস্থা করার জন্য, বিশেষ তিরস্কৃত ও লাঞ্ছিত করায় উক্ত গৃহিণী কোপবশে অভুক্ত অবস্থায় একদিন কাটাইয়া পরদিন বহু সাধ্যসাধনার পর দুই দিনের অন্নাদি গ্রাস করিয়াছিলেন, তাহাও শুনিয়াছি।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিদ্যাসাগর মহোদয় 'বিধবা-বিবাহ' নামক নব-জামাতৃজননের আর এক বিসদৃশ উপায় উদ্ভাবন করিয়া জামাতৃজীবের সংখ্যা আরও কিঞ্চিৎ বর্দ্ধিত করিয়াছেন। তবে দোজপক্ষীয় পাত্রের সহিত তেজপক্ষীয়া কন্যার উদ্বাহ হইয়া একই জীব দুইবার বা ততোধিকবার জামাতৃত্ব প্রাপ্ত হয় হউক, তাহাতে কাহারও কোন বিশেষ আপত্তি বোধ হয়, হইবে না।

এই জীবের আকার প্রকার দেখিয়া সাধারণ মানব জাতি হইতে কোন পার্থক্য বোধ হয় না বটে, কিন্তু সমুদায় জীবশিশু যেরূপ শোভনদর্শন হয়, শিশু জামাতৃ জীবও

(অর্থাৎ নূতন জামাতৃত্ব প্রাপ্ত জীব) সেইরূপ একটু ফিটফাট গোছের হইয়া পড়েন, এবং একটু অনুধাবন সহকারে পর্য্য-বেক্ষণ করিলেই সকলে চিনিতে পারিবেন। যার কেশে কখনও চিরুণি স্পর্শ হয় নাই, সেও মস্তকের কেশগুচ্ছ দুই বা বহু ভাগে বিভক্ত করিয়া পল্লীস্থ ড্রেণের ন্যায় টেরি নামক কেশনালী কর্ত্তিত করিয়া থাকে; পককেশযুক্ত জামাতৃজীবও কলপ নামধেয় রাসায়নিক সংযোগে কৃষ্ণকচ-সম্পন্ন হন। আর যদি জৈষ্ঠমাসের শুক্লষষ্ঠী দিবসে রাজপথে অথবা কোন্নগর ষ্টেষণে অদ্ধদণ্ড দণ্ডায়মান থাকা যায় তাহা হইলে দর্শনমাত্র উক্ত জীবকে আপনারা নিঃসন্দেহ দেখিতে পাইবেন, এবং তৎক্ষণাৎ চিনিতে পারিবেন; অবশ্য নিয়ম আছে যে, সেদিন দেখিবার দর্শনি পশুশালার অধ্যক্ষগণ (মাসের প্রথম সোমবারে আলিপুরের ন্যায়) গ্রহণ করেন না।

জামাতৃত্ব ও ভারতের বর্ত্তমান রাজধানীর লাড্ডু, শুনিতে পাই একই প্রকারের; যিনি গলাধঃকরণ করেন তাহারও যে দশা—যাঁহার অদৃষ্টবশে প্রাপ্তি হয় না তাঁহারও সেই দশা। উভয়েই দুঃখে উচ্চ চীৎকার করিয়া পাড়াপড়সীর নিদ্রার ব্যাঘাত করিয়া থাকেন। তবে, 'যার বিয়ে তার মনে নাই', বলিয়া পাড়াপড়সীর যে নিদ্রার অসম্ভাব, তাহার সহিত যেন মিশাইয়া ভ্রমে না পড়েন, ইহাই পাঠকগণকে আমার অনুরোধ। বোধ হয় অনেকে শুনিয়া বিস্মিত হইবেন যে, কোন কোন ব্যক্তি জামাতৃজীবত্বপ্রাপ্তির জন্য একেবারে বিকৃত-মস্তিষ্ক হইয়াও গিয়া থাকে, তবে তাহাদের সংখ্যা অতীব বিরল। স্বর্গীয় দীনবন্ধু বাবু একটি এই প্রকারের উন্মাদকে বাগভটের নিয়মানুযায়ী সমার্জ্জনী-আঘাতে নীরোগ করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

জামাতৃজীব প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত—ভারতীয় ও বিজাতীয়। ভারতীয় জামাতৃজীব ব্যঞ্জনবর্ণের ন্যায় অপরের অর্থাৎ ঘটক বা মধ্যস্থ কাহারও, অন্ততঃ সংবাদ পত্রের সম্পাদক বা ম্যানেজার বা প্রিণ্টারের সাহায্য না পাইলে কিছুতেই জামাতৃত্ব প্রাপ্ত হন না। পুরোহিত ও নরসুন্দর মহোদয়ের সাহায্য অবশ্য ধর্ত্তব্য নহে; কিন্তু বিজাতীয় জামাতৃজীব পরমুখাপেক্ষী না হইয়া আপনারা নিজেই জামাতৃপদ গ্রহণ করেন। এ হিসাবে তাহারা স্বর-বর্ণের মত।

ভারতীয় জামাতৃজীব দুই প্রধানশ্রেণীতে বিভক্ত। (১) বন্য ও (২) পালিত।

১ম বন্য।—বন্য জামাতৃজীব অতি ভয়ঙ্কর। আমার লেখনীর সাধ্য নাই যে তাহার স্বরূপ চিত্র প্রকটিত করিতে পারি। বিনামাবগল আফিসের কেরাণীর নিকট দশটার সময়ের অবিশ্রান্ত মুষলধার ও আকটি জলমগ্ন মিউনিসিপাল-কীর্ত্তি পরিঘোষক রাজপথ ও তত ভয়ঙ্কর নয়; সারা বর্ষ আড্ডাপ্রদানকারী সুছাত্রের নিকট আগামী পরীক্ষা তত ভয়-ঙ্কর নয়; দশম বর্ষ দেশীয় কন্যার জন্য ছাপোষা দরিদ্র পিতার চিন্তাও তত ভয়ঙ্কর নয়, ডেপুটি পুঙ্গবের কাটগড়ায় কম্পমান পুলিশচালানী আসামীর অবস্থাও তত ভয়ঙ্কর নয়।

উক্ত বন্যজামাতৃ-জীবকে বশীভূত করা বোধ হয় সমুদায় পার্থিব শ্বশুরের সাধ্যাতীত। আফিসের কেরাণী শ্বশুর, বেশ দেখিয়া শুনিয়া সর্ব্বস্ব খোয়াইয়া গৃহহীন অন্নহীন ম্যাট্রি-কিউলেশন পাশ কোন জামাতৃজীবকে উচ্চদরে কিনিলেন, কিন্তু সে জীব শ্বশুরের না হইয়া স্বীয় আত্মীয়গণেরই মধ্যে বসবাস করিল। তিনি আরও ঋণগ্রস্ত হইয়া 'হার-নাকের সার্ট,' 'র‍্যাঙ্কিনের কোট, 'ডিসিনের টাইম্স', ঢাকার সূক্ষ্ম বস্ত্র, অমৃতসহরের সুন্দর শাল, প্রাইসের এসেন্স প্রমুখ (যাহা শ্বশুরের চতুর্দ্দশ পুরুষের কেহই জানিতেন না) বিলাসিতাময় দ্রব্যাদি বার মাসে তের পার্ব্বণে যোগাইতেছেন, কিন্তু জামাতৃদশমগ্রহ সদা কন্যা-রাশি ভোগ করিতে করিতেও তুঙ্গী এবং বক্র হইয়াই থাকিবেন। মন উঠিবে না। পান হইতে চুন খসিলেই শিবা-সম উচ্চনাদে কান ঝালাপালা করিয়া দিবেন; আর বন্য জামাতৃগণের একটি সধর্ম্ম এই যে, তোমার নিকট দ্রব্যাদি যতই মূল্যবান হউক না কেন, তুমি তাহাদিগকে যতই সুন্দর বিবেচনা কর না কেন, ইহাদের আত্মীয়গণের নিকট সে সকল পৌঁছিলেই তাঁহারা ছুছুন্দর সম সূক্ষ্মবদন ও কুঞ্চিত-নাস হইয়া, অগণিত মুদ্রা অপাত্রে প্রদানকারী শ্বশুরের উর্দ্ধ-তন যড়ধিক পঞ্চাশৎপুরুষকে পর্য্যন্ত কার্পণ্যদোষ-দুষ্ট বলিয়া অভিহিত করিবে। বিশেষতঃ জামাতৃজীবের মাতা অমনি ফোঁস করিয়া 'চোকখেকো' মিন্সে বৈবাহিকের শ্রাদ্ধের

ব্যবস্থা করিতে থাকিবেন। নব-প্রসূ পশুর নিকট গমন করিলেই তাহারা ফোঁস করিয়া তাড়া করিয়া থাকে, সুতরাং শিশু অর্থাৎ নব জামাতার গর্ভধারিণীতে এ নিয়মের ব্যতিক্রম হইবে কেন? তুমি এক জন লোক পাঠাইয়াই তত্ত্ব কর আর বার্ড কোম্পানির ১০টা মোটর ট্রেণেই পাঠাও, জামাতৃ-জীবের স্বজনের মনঃপূত কখন হয় না, হইবেও না।

বন্য জামাতৃজীব বহুরূপীর ন্যায় বিভিন্ন বর্ণের দৃষ্ট হয়। একস্থানে হয় ত আপনারা এক প্রকার দেখিবেন, অন্যস্থলে হয় ত অপরমূর্ত্তি—অপর বর্ণ দেখিবেন। বহুরূপীর বর্ণ লইয়া দুইটি পথিকের কলহ পদ্যপাঠ তৃতীয় ভাগে পাঠকগণ পাইয়াছেন; যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় মহোদয় আর কিছু দিন জীবিত থাকিলে চতুর্থভাগে জামাতৃবহুরূপত্ব লইয়া দুইবন্ধুর বিবাদ লিখিতে পারিতেন। নিজ গৃহে ঐ দেখুন একটি জীব নগ্নপদে আজানুবিস্তৃত কথঞ্চিৎ লজ্জাবরণকারী ত্রিমাস রজকবদনাদর্শী বিমলিন বাসে বিচরণ করিতেছেন; কিন্তু শ্বশুরমন্দিরে কুঞ্চিত কৃষ্ণপাড় পরিহিত কনকাবরণ যুক্ত পিত্তল—ওঁ শ্রীবিষ্ণু—ক্যানেডাজাত স্বর্ণের বোতামবদ্ধ শস্থ-ঘর্ষিত-দ্বিপ্লেট সার্ট সুশোভিত, পম্প-সু-পাদ ঐ জীবটাকে পূর্ব্বদৃষ্ট বলিয়া যদি আপনি সনাক্ত করিতে পারেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই মহামান্য সরকার বাহাদুর আপনাকে উচ্চ বেতন-গ্রাহী 'সি আই ডি' কর্ম্মচারিভুক্ত করিয়া লইবেন। সঙ্গে সঙ্গে থাকিলে আহার ও রুচির ভিন্নতাও পাইবেন। স্বগৃহে মাসকলাই-যুস ও ক্ষুদ্র ভৃষ্টচিঙ্গড়ি কীট যাহার মুখে অমৃত কল্প লাগিত, তাহারই নিকট ঘৃতনিঃস্যুত 'পলান্নে'ও ঘৃতাল্পতা, 'কালিয়ায়' পাকদোষ, 'চপ্ কট্‌লেট'এ বহুভৃষ্টতা দোষ লক্ষিত হয়! স্বল্পাদপি স্বল্প মিষ্টতাযুক্ত ভীমচন্দ্রনাগ তস্য ভ্রাতার শ্রেষ্ঠ সন্দেশ বহুমিষ্ট বলিয়া গলদেশ জ্বলনার্থ মুক্তকরবহুভাগ্য শ্বশুরকে ভিষগানয়নে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে। যে জামাতৃজীবকে একটা মাছি ধরিয়া খাওয়াইলেই পুঁই শাক চড়চড়ি উদরগহ্বর হইতে উদ্বমিত হইবে, সেই জীবকেই শ্বশুর-সদনে শ্যালিকার সহ কথোপকথন-কালে স্বহস্তে রাজ-ভোগ্য অশনাদির পরিচয় দিতে শুনিবেন। আর একটু আদরাপ্যায়নে ক্রটী হইলে জামাতৃজীব রাগে গর গর করিয়া স্বগৃহে পূর্ব্বক্লেশ ভোগ করিতে আসিবেন। এই প্রকার জামাতৃজীবকেই লক্ষ্য করিয়া তিন্তিড়ি-তল-বাসী কবি গাহিয়াছেন—'যম জামাই ভাগনা, তিন নয় আপনা'।

পালিত।—পালিত জামাতৃজীব সহজে পোষ মানিয়া থাকে। ইহারাই গ্রাম্য এবং তজ্জন্য গ্রাম্য মার্জ্জার, কুক্কুর, গবাদির ন্যায় তত উগ্রপ্রকৃতি নয়। তবে এই বিড়াল বনে গেলেই যেমন বন-বিড়াল হয়, সেইরূপ এ জামাতাও বহুদিন অনাদরে বনে গিয়া বন্য হইতেও পারে। পালিত জামাতৃজীবও দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত। (১ম) স্বগৃহ-পালিত, (২য়) শ্বশুর-গৃহ-পালিত। স্বগৃহ-পালিত জামাতৃ-জীব যদিও স্বগৃহে থাকেন, কিন্তু এত পোষ মানিয়াছেন যে, যাহা ইচ্ছা হয় করুন, কখনও শিং নাড়িবে না, লাথিও ছুড়িবে না। আর শ্বশুর-গৃহ-পালিত জামাতৃজীব 'পাহাড়ে প্রকাণ্ড হাতী শিকলি বাঁধা পায়,' সুতরাং 'নট্ নড়ন চড়ন' হইয়া বাঁধা জাব খাইয়া পরমসুখে পুত্র পৌত্রাদিক্রমে শ্বশুর-গৃহ ভোগদখল করিতে থাকেন। নিম্নে ইঁহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে।

প্রাণি বৃত্তান্তবেত্তৃগণ সমুদ্রের ডলফিন বা মকর এবং স্থলের ব্যাঘ্র এই দুই জীবের অস্থি ও শরীর বিন্যাসের অনেকটা সৌসাদৃশ্য অবলোকন করেন, সেইরূপ বন্য ও পালিত জামাতৃজীবের একটি অবস্থায় বিশেষ সৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। যদি শ্বশুর মহাশয়ের একমাত্র কন্যা বহু সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হন তাহা হইলে ঘোর বন্য জামাতৃজীবও পালিতবৎ হইয়া পড়ে। বহুকন্যার পিতা দরিদ্র শ্বশুরের পালিত জামাতৃজীব ও আকাশ-কুসুম উভয়ই সমান।

স্বগৃহপালিত।—স্বগৃহপালিত জামাতা ধীর, শিষ্ট, শান্ত, যেন "ও বাড়ীর বড়ঠাকুরটি' নির্ভয়ে গায়ে হাত বুলান যায়। স্বীয় অঞ্চল ধরিয়া অনবরত ঘুরেন এবং প্রাপ্তির আশা কিঞ্চিন্মাত্রও না করিয়া আবশ্যক হইলে অলক্তকরাগরঞ্জিত শ্রীচরণকমলেষু নিজের যথাসর্ব্বস্ব বিক্রয়পূর্ব্বকও 'দেহি পদপল্লবমুদারম্' বলিয়া মস্তকে পদরক্ষা করিয়াও আপনাকে শ্লাঘ্য বিবেচিত করে। উক্ত জামাতৃজীব যদি বৃদ্ধ—থুড়ি ভুলিয়া বলিয়াছি—যদি কিঞ্চিৎ বয়স্থ হন,—অস্যার্থ, যদি ডিস্‌পেপ্‌সিয়ায় ও পিত্তাধিক্যে দাঁতগুলি পড়িয়াছে, কেশগুলি শুভ্রমূর্ত্তি ধরিয়াছে ইত্যাদি ভণিতা দ্বারা বৃদ্ধত্ব

হইতে আপনাকে পরিত্রাণ দেন—আর তাঁহার গৃহিণী যদি তরুণী থাকেন, তাহা হইলে রুসিয়ার জারের ন্যায় যথেচ্ছাচার শাসনপ্রণালী অব্যাহত প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। সে জামাতৃজীব যতদূর খোঁটার চারিপাশে ঘুরিয়া চরিতে পারে, ততদূরই চরে, আর কোথাও যায় না। বহু শতাব্দী অহিফেন সেবন করিয়া নিস্তেজ দুর্ব্বলমতি চৈনিক পুরুষ দীর্ঘবেণী ছেদনান্তেও ঝিমাইতে ঝিমাইতে যদি সাধারণতন্ত্র স্বদেশে প্রচলিত করিতে পারে, কিন্তু উক্ত অধিকবয়ঃ কলপ-কৃষ্ণ-পলিত কেশ লাহা কোম্পানী কৃত কৃত্রিম শশ্রুদন্তধারী যুবায়মান (আচরণার্থে ক্যচ্ প্রত্যয়) জামাতৃজীব কখনও স্বসংসারে রমণীতন্ত্র বিপর্য্যস্ত করিয়া নরতন্ত্র প্রবর্ত্তিত করিতে পারিবেন না। অহিফেন সহ তাহারা ভার্য্যার সুমিষ্ট শাসন মজ্জাগত করিয়া স্ব স্ব স্বামিনীর ধ্যানেই পরকালের কার্য্য করিয়া থাকেন। এ প্রকার জামাতৃজীবের জামাতৃত্ব দীর্ঘস্থায়ী।

শ্বশুরগৃহপালিত।—এই প্রকার পালিতজীবকে ভাষায় 'ঘর জামাই' বলা হইয়া থাকে। ইহারা শ্বশুরের গোয়ালে বাঁধা থাকিয়া, জাব খাইয়া প্রাণ ধারণ করে। জন্তুবিশেষের ন্যায় ইহাদের ছয়টি প্রধান গুণ বিদ্যমান। বহ্বাশী কিন্তু স্বল্পসন্তুষ্ট অর্থাৎ বহু ভোজনে সমর্থ, কিন্তু শ্বশুরের সাশ্রয়-কল্পে শ্বশুরগৃহপক্ক সামান্য আহারেই পরিতুষ্ট। শ্বশুরগৃহের 'মেনু'র সহিত উক্ত জীবের রুচিও পরিবর্ত্তিত হয়। আলুভাতে ভাত আর পলান্ন সমভাবেই গ্রহণ করে। দারুণ বর্ষায় মেঘমালা দিনকর আবৃত করিয়া ধারা বর্ষণ করিলে যদি মনে মনে উক্তজীবের কিঞ্চিৎ ভৃষ্ট তণ্ডুল ভোজনে প্রবৃত্তি জন্মে, আর কনিষ্ঠ শ্যালক যদি উদরাময়ের আশঙ্কায় ভৃষ্ট তণ্ডুল ভোজনে অনিচ্ছা প্রকাশ করে, তাহা হইলে উক্ত জীব আপনার প্রবৃত্তি তৎক্ষণাৎ দমন করিয়া উক্ত ভোজ্যে পৃথিবীর সমুদয় জীবই বিসূচিকায় প্রাণ হারাইয়াছে বলিয়া রায় দিয়া থাকে। ফলতঃ, উক্ত জীব আদর আপ্যায়নের কোন ধার ধারে না, কস্মিন্‌কালে চাহে না। আর যদি কর, তাহা হইলে মস্তকে উঠিবে এবং আদরের মাত্রা একটু অধিক হইলেই বন্য হইয়া উঠিবে।

সুনিদ্র ও শীঘ্র চেতন।—নির্ভাবনায় 'বালাম' তণ্ডুলের মূল্যের কোন ধার না ধারিয়া যখন শিশু শ্যালক নিদ্রা যায় ও ক্রোড়ে করিয়া বেড়াইতে না হয়, তখন নাসিকায় সর্ষপতৈল প্রদানপূর্ব্বক বেশ নিদ্রা যায়; কিন্তু আবার শ্যালকের তাড়া বা শ্যালিকার গঞ্জনাভয়ে নিশীথে সামান্য খুটখাট শব্দে গাঢ় নিদ্রা তৎক্ষণাৎ ভঙ্গ করিয়া জলদ্দীপ করে শব্দবেধী শরবৎ, লুব্ধ-আখু-কৃত-উন্মুক্তাবরণ তণ্ডুলস্থালীসমীপে গমনপূর্ব্বক ভাণ্ডার রক্ষা করিয়া থাকে। আবার ইহারা অতিরিক্ত প্রভুভক্ত—নিমকের মর্য্যাদা সম্পূর্ণ রক্ষা করিয়া থাকে। শ্বশুর শাশুড়ী,শ্যালক শ্যালিকার কথাই ত নাই,এমন কি শ্বশুরগৃহের পাচিকাটিকে অন্নপূর্ণা জ্ঞানে ভক্তি করেন, কেননা সে লুকাইয়া কখন কখন আধখানির পরিবর্ত্তে পূরা একখানি মৎস্যখণ্ড দিয়া থাকে; ভৃত্যটির প্রতি ভক্তি, কেননা সে সময় সময় শ্বশুর-আজ্ঞাপিত খিদ্‌মৎ হইতে কথঞ্চিৎ পরিত্রাণ করে, আর ভক্তি সেই স্ফীতৈকচরণা দাসীর প্রতি, কেননা সেও বহু অনুনয়ান্তে ষষ্ঠমাসান্তে উক্ত জীবের পিতামাতাকে লিখিবার জন্য এক একখানি পোষ্টকার্ড লুকাইয়া আনিয়া দিয়া থাকে। আর তিনি শূরও বড় কম নন! অনবরত কটূক্তি ভক্ষণে বিষম শৌর্য্য প্রকাশপূর্ব্বক সক্রোধে কোন কোন সময়ে অমাবস্যা দিবসে আজ 'ভীম একাদশী' বলিয়া সমস্ত দিন বহির্বাটীতে বুভুক্ষানলে দগ্ধ হইয়াও পড়িয়া থাকেন।

এ প্রকার পালিত জামাতৃজীবের সংখ্যা স্ত্রীপদ-বসন্ত-'বাতাহতেব শিশির-শ্রী' হইয়া ক্রমাগত কমিয়া আসিতেছে। তজ্জন্য সরকার বাহাদুর আইন করিয়া যে কয়টি জীব আছে, তাহাদিগকে যত্নতঃ রক্ষাপূর্ব্বক সকলের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। প্রাণিতত্ত্ববিদ্ কুডেয়ার নাকি বলিয়াছেন যে, বঙ্গে স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা উত্তরোত্তর যতই বৃদ্ধি হইবে, পালিত জামাতৃজীবের সংখ্যাও তত বৃদ্ধি পাইবে, কিন্তু উহাদের বর্ণের ব্যতিক্রম ঘটিবে ও উহারা অধিকতর চিক্কণ হইবে।

এতদ্ভিন্ন প্রাচ্য ও প্রাতীচ্য সংঘর্ষে আর এক নূতন শ্রেণীর জামাতৃজীব উৎপন্ন হইয়া দ্রুত বর্দ্ধিত হইতেছে। ইহাদের আকৃতি ভারতীয়বৎ, কিন্তু উপরের লোম বিজাতীয়ের মত। উচ্চশ্রেণীর জামাতৃজীবের সহিত মানবের পূর্ব্বপুরুষের বিশেষ সৌসাদৃশ্য দেখা যায়, এবং জাতীয়

উন্নতির অর্থাৎ প্রতীচ্যাচারের করমর্দ্দন করিতে করিতে এই নবশ্রেণী, যতদিন না বসুমতী বিরাট্‌বপু হইতে ঝাড়িয়া ফেলেন ততদিন পর্য্যন্ত প্লেগকীটাণুব ন্যায় তর তর করিয়া বর্দ্ধিত হইবে, শুনা যাইতেছে। বর্ত্তমানকালে আলিপুর পশুশালার অধ্যক্ষ ইহাদের কএকটি নমুনা পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন বলিয়া উহাদের সম্বন্ধে অধিক বিবৃতি করিতে পারিলাম না; পাঠকগণ মার্জ্জনা করিবেন।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, পাঠকগণ যেন, লুচির থালার চারিদিকে বাটী আর তাহার চারিদিকে তারকাবৎ শ্যালিকা বেষ্টিত থাকিবার প্রলোভন ত্যাগ করিতে না পারিয়া জামাতৃজীবত্বে পুনঃ পরিণত হইতে কামনা না করেন।

শ্রীশিবচন্দ্র ঘোষ।

কাশীর প্রাচীন দৃশ্য।

বাঙ্গালী-চরিত।

১

আমরা বাঙ্গালী খাঁটি।
মোরা গৃহকোণে বীর বক্তা সুধীর
আর অতিশয় পরিপাটি ;
সবে জোছনা মলয়, ঘটায় প্রলয়
মোরা প্রেমের জাবর কাটি।
বিপদের নামে থাকি গো অটল,
কাছে এলে আঁখি করে টল্‌টল্‌,
আর স্কন্ধে চাপিলে তুলি গো পটল
ভয়েতে হইয়া মাটি।
মোরা মচকাই তবু ভাঙ্গিনা কখন
মুখের দাপটে সাটি।
আমরা বাঙ্গালী খাঁটি।

২

আমরা বাঙ্গালী খাঁটি।
মোরা হয়ে বিনিদ্র পরের ছিদ্র
সতত লইয়া ঘাঁটি,
শুধু নিজের রন্ধ্র দেখিতে অন্ধ—
নয়ন-যুগল আঁটি।
ভিখারী গরীব দীন প্রতিবেশী
সে দিকে আমরা চাহিনাক বেশী,
হায় তথাপি আমরা পূর্ণ স্বদেশী,
বাখানি দেশের মাটি ;—
আর স্বদেশের তরে কাঁদি অকাতরে,
দিশীভাবে চুল ছাঁটি।
আমরা বাঙ্গালী খাঁটি।

৩

আমরা বাঙ্গালী খাঁটি।
মোরা কুৎসা কলহ করি অহরহ,
কিছুতে বলি না 'না' টি ;—
আর ভা'য়ে ভা'য়ে ঘরে বিচ্ছেদ তরে
মন্ত্রণা কত আঁটি।
ভালগুলি রেখে মন্দ সকল
নিমেষেতে মোরা টুকি অবিকল,—
তাও মাছিমারা সে সব নকল—
তাতেই গর্ব্বে ফাটি ;
তবু নকলনবিশ বলে যদি কেহ
মাথে তার মারি চাটি।
আমরা বাঙ্গালী খাঁটি।

৪

আমরা বাঙ্গালী খাঁটি।
মোরা জীবন-তরণী সেই দিকে বাহি
যখন যে দিকে ভাঁটি ;
আর চড়ায় বাধিলে চীৎকার করি
মাথায় করিয়া গাঁ-টি।
স্বার্থ-নীতিই মোদের কেতাব,
চাই মোরা শুধু লম্বা খেতাব,
রায় বাহাদুর, রাজা, মহাতাব,
নবাব খাঞ্জা খাঁ-টি,
মোরা সকল বিষয়ে পণ্ডিত সাজি
সাধা আছে মুখে হাঁটি।
আমরা বাঙ্গালী খাঁটি।

৫

আমরা বাঙ্গালী খাঁটি।
মজলিস ক্লাবে টানি মোরা সবে
কাফি, বিস্কুট, খাঁটি ;
আর নিজের লজ্জা নিন্দা যা কিছু
দশের মধ্যে বাঁটি।
মোরা অপমান-ক্ষতে ত্বরায় মালিস
মাখাইয়া পরি হাসির পালিশ ;
আর কোলেতে টানিয়া তাকিয়া বালিস
ঘুরাই পাখার ডাঁটি।
মোরা নব্য ধরণে সভ্য চরণে
নূতন পথেতে হাঁটি।
আমরা বাঙ্গালী খাঁটি।

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক।

"বিগলিত করুণা"

শ্রীযুক্ত অবনীনাথ মুখোপাধ্যায়ের আলোকচিত্র হইতে

পাষাণী।

(১)
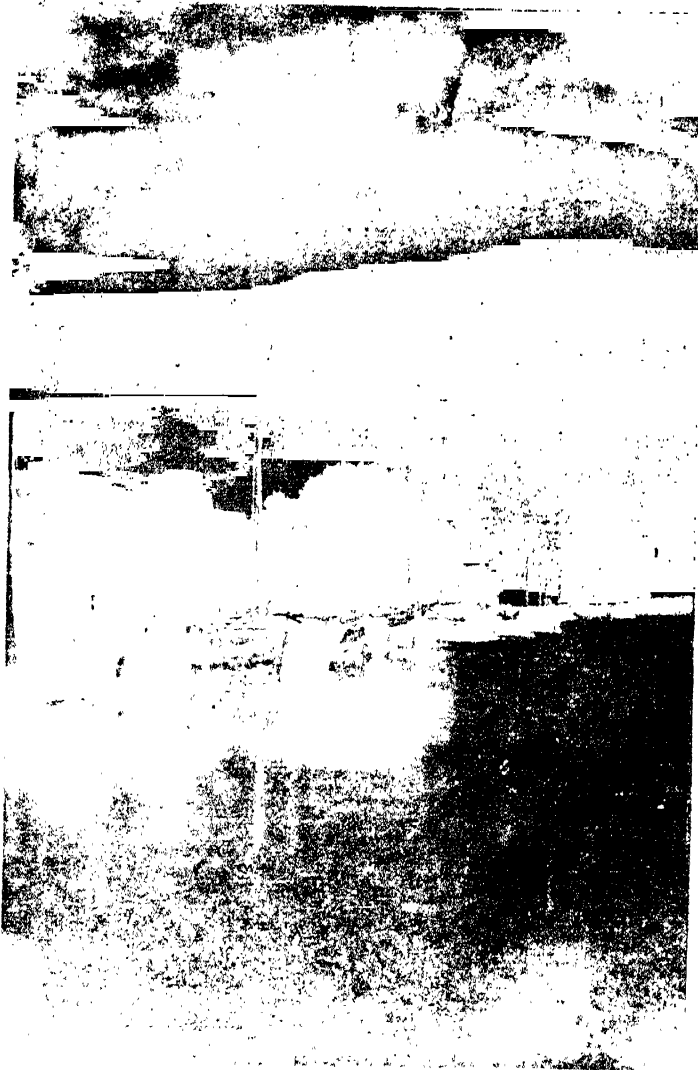
সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা, পর্ব্বতগুহাবাসী সিদ্ধ যোগী গুরুদেব। হিমালয়ের তুষার-গহ্বরের দুর্গম অন্ধকার ও নিজ্জনতা সে যশঃপ্রভাকে গোপন রাখিতে পারে নাই; তাই নানা বিদ্যার্থী, জ্ঞানার্থী, মোক্ষার্থিগণ তাঁহার চরণে আশ্রয় লইতে আসিত। তাহাতে তাঁহার বিরক্তি ছিল না; প্রার্থী কখনও তাঁহার নিকট হইতে বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিত না। সংসারবিরাগী যেমন সাধনার পথ পাইত, সংসারী তেমনই মঙ্গল-সোপান দেখিয়া যাইত; রোগীর রোগ, শোকার্ত্তের শোক সেখানে সমান শান্তি লাভ করিত।

তাঁহার ছাত্রের সংখ্যা ছিল না; যোগলব্ধ দীর্ঘজীবী সন্ন্যাসীর জ্ঞান অশেষভাবে পাত্রে পাত্রে বিতরিত হইতেছিল।

ক্রমে ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। শান্তিপ্রিয় সন্ন্যাসী মৃদু হাসিলেন; কিন্তু জ্ঞানার্থী শিষ্যেরা অধীর হইল, বলিল, "এ শিক্ষা ত পৃথিবীর সকলেই দিতে পারে; এ মোক্ষ-সোপান-তলে শিশু-শিক্ষার স্থান নাই"। তাহারা আশ্রম পরিবর্ত্তন করিল; হিমালয়ের এক উচ্চ স্থানে কঠোর লীলারন্ধ্রে, তাহারা আপনাদের শিক্ষাস্থল নির্দ্দেশ করিল। সন্ন্যাসী মৃদু হাসিলেন মাত্র। ছাত্রেরা বলিল. "আপনার দর্শন ত এখনও সুলভ, যে যথার্থ শিক্ষাকামী সে অনায়াসে এখানেও আসিতে পারে।"

তখন সন্ন্যাসী কেবল দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। তাহা সমীরণের তুল্য কোমল, ধূপ-গন্ধের তুল্য আশীষবর্ষী!

পাষাণ-বিগলিতা ভোগবতী-ধারা আশ্রমের চরণতল ধৌত করিয়া যাইত, তাহা কোথাও তুষারস্তূপে অদৃশ্য, কোথাও পাষাণবক্ষে দ্রুতগামিনী! কঠোরব্রতী শিষ্যগণের নিকট হইতে যখন সন্ন্যাসী সরিয়া আসিতেন, তখন সেই একাগ্রগামিনীর পার্শ্বে আসিয়া বসিতেন। পূর্ব্বাকাশে স্নিগ্ধজ্যোতিঃ আদিত্য-মণ্ডল, সম্মুখে বেগোচ্ছ্বলিতা সলিল-ধারা! আবেগভরে সংসারত্যাগী মহাপুরুষ গাহিয়া উঠিতেন,—

"সলিলে বহিছে তোমারি করুণা
আলোক দেখায় তোমার মুখ।"

"যাও মা করুণাপ্রবাহিনি! জগতের তৃষ্ণা দূর কর! উঠ হে তিমির-বিনাশী জ্যোতিঃ, তোমার আলোকে পৃথিবী নির্ম্মলা হউক!"

(২)

সকরুণ চক্ষে শিষ্যের প্রতি চাহিয়া সন্ন্যাসী বৃদ্ধকথিত এই মহাবাণীর যাথার্থ্য-প্রতিপাদনে উদ্যত—এই সময়ে সহসা শান্তিভঙ্গ হইল। পশ্চিমলগ্ন সূর্য্যের বিপরীত দিক হইতে দীর্ঘছায়া আসিয়া সন্ন্যাসীর চরণ স্পর্শ করিল। সকলেই সবিস্ময়ে দেখিলেন আগন্তুক অপরিচিত বালক!

শুভ্র গৌরবর্ণ সুকুমার তরুণ ব্রাহ্মণ, লুণ্ঠিত কেশজাল মধ্যে আনন্দসুন্দর বালকোচিত সারল্যময় মুখ এবং তাহারই মধ্যে দুইটি তীক্ষ্ণ জ্যোতির্ম্ময় চক্ষু। মুখে একটি পরিপূর্ণ ভক্তির আনন্দ ও উত্তেজনার সুন্দর দীপ্তি প্রকাশ পাইতেছিল। বালক আসিয়া সকলের চরণে প্রণত হইল।

আশীর্ব্বাদান্তে সন্ন্যাসী প্রশ্ন করিলেন, "তুমি কি চাও পুত্র"? উত্তর হইল "জ্ঞান"। "উত্তম, কিন্তু জ্ঞান কাহাকে বলে জান?" অকম্পিতস্বরে বালক উত্তর দিল "জানি।" সন্ন্যাসী বলিলেন, "জান? ভাল, বল দেখি তুমি জগতের বা অন্তরের কোন্ অংশকে জ্ঞান বল?"

বালক নতজানু হইয়া গুরুদেবের পদস্পর্শ করিল। তাহার চক্ষুতে স্বচ্ছ এক আলোক অস্তোন্মুখ সূর্য্যের আভায় প্রতিফলিত হইল। গদ্‌গদকণ্ঠে সে কহিল, "সমস্ত অন্তরে অন্তরে এ কাহার মৃদু পদক্ষেপ অনুভব করি? সমস্ত জগতের সমস্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে এ কাহার অস্ফুটধ্বনি শুনিতে পাই, গুরুদেব? যেদিন ঐ স্পর্শকারীর চরণদর্শন করিব, ঐ ধ্বনির শব্দবিন্যাস অর্থময় হইবে—সেই দিন কি আমার জ্ঞানলাভ সম্পূর্ণ হইবে না?"

সন্ন্যাসীর স্থির চক্ষুঃ বিস্ময়পূর্ণ। তাঁহার জ্যোতির্ব্বিদ্ শিষ্য পিনাকী আচার্য্য তাঁহার মুখের প্রতি তীব্রদৃষ্টি রাখিয়াছিলেন—উচ্চকণ্ঠে তিনি বলিয়া ফেলিলেন, "কে রে তুই অভাগীর সন্তান। এতবড় হৃদয় লইয়া কোন্ পথে—"

তাঁহার কথায় বাধা দিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন, "স্থির হও, বৎস! বিনা প্রশ্নে জ্যোতিষশাস্ত্রের বিবৃতি নিষিদ্ধ।"

"এ যে মহাসাগরের তীরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, গুরুদেব! ইহার পরও এতখানি তৃষ্ণা লইয়া ইহার জীবন শেষ হইবে?"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "জীবন শেষ? তুমি কি বলিতে চাও মৃত্যুই জীবনের শেষ? সহসাদৃষ্ট ঘটনা-জাল অতীত রহস্যের কোন্ সূত্র স্পর্শ করিয়াছে তাহা জান?"জ্যোতির্ব্বিদ্ বলিলেন, "না প্রভু, আমি বলিতেছি অদৃষ্ট—"

বাধা দিয়া গুরু বলিলেন, "স্থির হও, জ্যোতিষশাস্ত্র গোপনীয়"।

নবাগত নীরবে তাঁহাদের কথা শুনিতেছিল, এইবার সন্ন্যাসীর অদ্ধোক্তির অবসানে সে মৃদু হাসিয়া বলিল, "আমার অদৃষ্ট? আমিও তাহা জানি পিতা—দুঃখ? বেদনা? আমি কাহাকেও ভয় করি না জানিবেন, যে কোন বিপদই আসুক, আমি তাহার জন্য প্রস্তুত আছি। দুঃখ এই, সুখ কাহাকে বলে, আনন্দ কাহাকে বলে, আজও জানিলাম না! পৃথিবীর অনেক স্থান দেখিয়াছি তাহা যেন কিসের আন্দোলনে চঞ্চল—এ কি? আমি জানিতে চাই এ কি? এই কি সুখ?"

সন্ন্যাসী প্রশ্ন করিলেন, "তুমি কে বৎস?

জানি না প্রভু, কেবল জানি"—

"পিতা মাতা কে?"

"পিতামাতা কাহাকে বলে বহুদিন পরে জানিয়াছি—পরে শুনিয়াছি—সন্ন্যাসীরা, নাগা সন্ন্যাসীরা আমায় চুরি করিয়া মাতৃপিতৃক্রোড়চ্যুত করিয়াছিল।"

"তাহার পর।"

বালক মৃদু হাসিয়া বলিল, "তাহার পর আর কি, তাহাদের সহিতই বেড়াইয়াছি।"

"শিক্ষা হইয়াছে কিছু?" "ভাষা-শিক্ষা! হাঁ প্রভু, ৺কাশীধামে বহুদিন ছিলাম, ব্যাকরণ শেষ করিয়াছি!"

অপর শিষ্য প্রশ্ন করিলেন, "আর কিছু না?" বিনীতভাবে সে উত্তর করিল, "অলঙ্কার, কাব্য—কাব্য আমার অতি প্রিয়। সহাস্যবদনে সন্ন্যাসী বলিলেন, "কাব্যে সুখ আছে কি? কি অনুভব কর?"

তাঁহার চরণতলে মস্তক রাখিয়া বালক বলিল, "কি অনুভব করি? তাহা যদি জানিব প্রভু, তবে আপনার চরণতলে আসিয়াছি কেন? আমি জানিতে চাই যে, সুখের জন্য আমার অন্তর উদ্বিগ্ন হয়, তাহা প্রকৃত সুখ কি না? উহা প্রকৃত পিপাসার জল—না মরীচিকা?"

সন্ন্যাসী নীরবে তাহার মস্তকে করস্পর্শ করিলেন—অপর ছাত্রেরা বিস্মিত হইল। জ্যোতিষী দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

(৩)

দুই বৎবর অতীত হইয়া গিয়াছে।

দিনান্তের শেষ রশ্মি পশ্চিমাকাশে অপরিস্ফুট ও পূর্ব্বাকাশে পূর্ণচন্দ্রের পাণ্ডুর হাস্যে ক্রমে জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তিতে স্পষ্টতর হইতেছিল। শিষ্যকে গুরু প্রশ্ন করিলেন, "কি দেখিতেছ বৎস?"

"সৌন্দর্য্য, প্রভু।

"যথার্থ সৌন্দর্য্য?"

"যথার্থ, তাহাতে সন্দেহ নাই।"

"ইহা কি সুখকর নহে?"

বিমুগ্ধ শিষ্যের স্মরণ হইল গুরুর পাদবন্দন আবশ্যক। এবং নিজের সন্দেহাত্মক স্বভাবের প্রতি গুরুদেবের কটাক্ষও তাহাকে লজ্জিত করিল।

প্রণামান্তে নতমুখে শিষ্য বলিল, "আপনি যাহা আজ্ঞা করিবেন তাহাই সত্য, তাহাই শান্তি, প্রভু!"

হাসিয়া তিনি বলিলেন, "তাহা মিথ্যা, এ কথা ত তোমায় বহুদিন বলিয়াছি। তোমার অন্তর কি বলিল?"

উত্তর হইল,—"বড়দূর, বড়দূরে ওই সৌন্দর্য্য! আর—"

"উহাকে অন্তরে অনুভব করিলে না?"

"না"।

উভয়ে কিছুক্ষণ নীরব রহিলেন, কেবল চতুর্দ্দিকে, তন্দ্রার মত সমাচ্ছন্ন ঈষত্তরল কুহেলিকায় তাহা বিচিত্র স্বপ্নের ন্যায় মোহাচ্ছন্ন—নূতন সৌন্দর্য্যে অভিব্যক্ত।

সেই স্বপ্ন মধ্যে শিষ্যের নয়নের প্রতি স্থির দৃষ্টি রাখিয়া সন্ন্যাসী কি যেন দেখিলেন। পরে বলিলেন, "তুমি সংসারী হও, বৎস!"

"সংসার! সংসার! সংসার কি প্রভু?"

বিস্মিত শিষ্যকে করস্পর্শে স্থির করিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন, "সংসার কর্ম্মক্ষেত্র"। শিষ্য বলিল, "সেই সংসার জীবনমরণশীল কর্ম্মক্ষেত্র—?"

"হাঁ, সেই সংসারই বটে! কিন্তু বৎস মিহির, জানিও তুমি যাহা অন্বেষণ করিতেছ সংসারেই তাহা কোমলমূর্ত্তিতে প্রকাশিত, অরণ্যে তাহা জটিল, পর্ব্বতে বন্ধুর—"

"আর গুরুদেব চির অশান্তির লীলাভূমি সংসারে তাহা কমনীয়!"

"তুমি আমায় গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়াছ"?

"হাঁ, আমার গুরুদেব অরণ্যে পর্ব্বতে যাহা লাভ করিয়াছেন আমি তাহা পাইলেই সুখী হইব, সংসারের সুখস্বাচ্ছন্দ্য চাহি না।"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "তুমি জান বোধ হয় মানুষের জীবনের সহিত নির্ঝর-ধারার অনেক সাদৃশ্য আছে। উভয়েই জানে না যে, কেন তাহার সৃষ্টি—উভয়েই উদ্দেশ্যহীন-ভাবে নিরুদ্দেশ-পথে যাত্রা করে; পরে ক্রমাগত একাভিমুখে চলিতে চলিতে কোন বিশাল সাদৃশ্যের মধ্যে আপনাকে বিলীন করিয়া দেয়।"

মিহির ভ্রূকুঞ্চিত করিল। সন্ন্যাসী বলিলেন, "ভাল পুত্র বল দেখি, ঐ নদী-ধারাকে যদি তাহার বিপরীত উচ্চে অথবা উহার বৈসদৃশ স্থলে লইয়া যাইতে চাও, ও কি যাইবে?"

"আপনার অভিপ্রায় বুঝিলাম না, প্রভু! এ কথার অর্থ কি?"

"অর্থ আছে। ধর্ম্ম একই, কিন্তু মানুষের অন্তরের ক্রিয়া বা পরিণতির পার্থক্যে উহারও রূপান্তর আছে জানিও। মানুষ সকলেই এক প্রকৃতি লইয়া জন্মগ্রহণ করে না, কাহারও হৃদয় কর্ম্মে বলিষ্ঠ, কেহ স্থিরমস্তিষ্ক ধারণাশীল, আর কেহ বা উভয়েই বর্জ্জিত হইয়াও এক কল্পনাশক্তিতে স্বভাব-রাজ্যের সমস্ত ঐশ্বর্য্যকে আত্মসাৎ করে। সেই বিশাল মহাসাগর-যাত্রায় ইহারাই ক্ষিপ্রগামী—ত্বরাকামী এবং সর্ব্বথা সফলকাম।

মিহির অনন্যমনে তাঁহার কথা শুনিতেছিল; বাক্যাবসানে ধীরে ধীরে বলিল, "ইহারও অর্থ বুঝিলাম, না, আমার প্রতি ইহার কোন্ অংশ প্রয়োজ্য প্রভু?"

"তোমার হৃদয় চঞ্চল। তোমার চিন্তা সুকুমার, হৃদয় শান্তিপ্রিয় হইলেও একান্ত ঔৎসুক্যময়। অবিকৃত শুষ্ক জ্ঞানরাজ্যে এ হৃদয় অত্যন্ত ক্রিয়াহীন বৎস!"

বাধা দিয়া মিহির উঠিয়া দাঁড়াইল—দৃঢ়স্বরে বলিল, "এ কি কথা—এ কি কথা পিতঃ! আপনি কি বলিতেছেন—আমি—"

"শান্ত হও শিশু! জ্ঞানই জীবনের একমাত্র সার্থকতা—বুঝিও না, ক্রিয়াহীন জ্ঞান অপেক্ষা অজ্ঞানও শ্রেয় জানিও। শোন তুমি, আমি দেখিলাম তুমি সৌন্দর্য্যের উপাসক, কিন্তু জগতের সৌন্দর্য্যের মূলস্থান আজও দেখ নাই। যে দিন অন্তরে উহার পূর্ণাধিষ্ঠান অনুভব করিবে, সেই দিনই তোমার প্রকৃত জ্ঞানলাভ হইল জানিবে।"

আবেগময়স্বরে মিহির বলিল, "হাঁ প্রভু! এ কথা সত্য স্বীকার করি, জগতের শূন্যতাবাদে আমার তৃপ্তি হয় না, কিন্তু চেষ্টা করিলে কালে আমি এই নশ্বর পৃথিবীর আকর্ষণ হইতে আপনাকে মুক্ত করিব।"

চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন, "প্রয়োজন নাই। এই বিশাল সৃষ্টি—এই সৌন্দর্য্য ইহা কি শুধু পঞ্চভূতের মূর্ত্তিবিন্যাস? না, ইহার মধ্যে স্বর্গের শোভা মনুষ্যের দৃষ্টিগোচর হয়?"

"স্বর্গ! স্বর্গ কি প্রভু! আপনি কি বলেন নাই স্বর্গ ভক্তের কল্পনা?"

হাঁ, কিন্তু ঐ কল্পনা কেবলমাত্র সেই আনন্দরচিত—যাহা অবিকৃত সত্য।" সন্ন্যাসী মুহূর্ত্তকালের জন্য নীরব হইলেন। তাঁহার তপঃক্লিষ্ট দেহ যেন একবার কাঁপিয়া উঠিল। গুরুর বদনের মধুর ভাব লক্ষ্য করিয়া শিষ্যও পুলকিত হইল। অবশেষে তিনি বলিলেন, "শোন বৎস! দুই বৎসরে আমি দেখিলাম তোমার অন্তর উচ্চ, সুশিক্ষিত এবং সুকুমার। তোমার জন্মান্তরীণ সংস্কার তোমার হৃদয়কে যে পথে চালিত করিতেছে, তাহার বিপরীত পথে তোমাকে চালনা করা আমার প্রায় অসাধ্য। তোমার কল্পনা, মূর্ত্তি চাহে। বল পুত্র আমি মিথ্যা বলিতেছি?"

শিষ্য অধোবদন হইল। গুরু বলিলেন, "তাই বলিতেছি তুমি পৃথিবী পর্য্যটনে যাও। যে সৌন্দর্য্য, যে মাধুর্য্য, যে দয়া, মায়া, স্নেহ,—শান্তি, তৃপ্তি, ক্ষমা—বীরত্ব, পরোপকার,—অথবা জল, স্থল, তরুলতা,—দেবমূর্ত্তি, শ্মশান, সমাধি যাহা দেখিয়া তোমার ভক্তিনত হৃদয় মুগ্ধ হইবে

তাহাই তোমার দেবতা! যদি এই প্রীতি মানবকে দান করিতে পার—কৃতার্থ বোধ করিবে।"

শিষ্য বলিল, "অর্থাৎ ব্রহ্মমূর্ত্তিকে ত্যাগ করিতে হইবে। এই কি আমার পূর্ব্বজন্মের অভিশাপ গুরুদেব?"

গুরু বলিলেন, "আপনার হৃদয় তুমি আপনি বুঝ না, সতত উৎসারিত প্রীতিপ্রবাহকে তাই তপস্যায় শুষ্ক করিতে চাও,—এই কঠিন পাষাণের বক্ষে বাস তোমায় দিন দিন মৃত্যুমুখে লইয়া যাইতেছে, বাল্যে পিতৃমাতৃ-স্নেহ পাও নাই—কৈশোরে সখার সঙ্গ পাও নাই—সম্মুখে তরুণ যৌবন—যাও বৎস, এই প্রেমপ্রবণ হৃদয় লইয়া লোকালয়ে যাও!—"

মিহির আসন ছাড়িয়া গুরুর চরণে আসিয়া পড়িল। চীৎকার করিয়া কহিল—"আর না—আর না—গুরু—পিতা—আর না, আমি শুনিতে চাই না। আপনার বক্তব্য আমি বুঝিয়াছি,—আমি সন্ন্যাসের উপযুক্ত নই, এই আপনি বলিতে চান! আমি আপনার চরণে মুক্তিলাভ করিব না,—আর সংসারে যাইব! ও কথা আমি শুনিতে চাই না"—এই বলিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া সে থর থর কাঁপিতে লাগিল।

এই বলিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া সে থর থর কাঁপিতে লাগিল।

তাহাকে সান্ত্বনা দিতে দিতে গুরু বলিলেন, "ক্ষুব্ধ হইলে? আর আমার কথাও বোধ হয় তুমি সহজে বিশ্বাস করিবে না। ভাল মিহির! বল দেখি তোমাদের উত্তর-মীমাংসার রচয়িতা কে?"

অশ্রু মুছিয়া মিহির বলিল,—"কেন বেদব্যাস!"

"তাঁহার কথা বিশ্বাস্য?" মিহির বলিল, "আপনার অপেক্ষাও কি গুরুদেব?"

"নিশ্চয়! বিশেষ আমার কথার প্রমাণস্বরূপে ত বটেই। চল আজ তোমাকে তাঁহার সঞ্চারিত সুধা পান করাইব।"

উৎফুল্লভাবে মিহির বলিল, "বেদান্ত?"

"না, বেদাতীত মধুরস! শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ কি তোমার অধীত?"

"না, কথাগ্রন্থ বা পুরাণ আমি অধিক পাঠ করি নাই, ভাষ্য আছে?"

"হাঁ, চল।"

(৪)

বৎসরাধিক কাল নবীন শিক্ষায় মিহির তন্ময় থাকিল। পাঠকালে সে বার বার প্রশ্ন করিত—"গুরুদেব! রচয়িতার কি ইহাই বক্তব্য?"

পরবর্ত্তী শ্লোকে গুরু দেখাইতেন, তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহাই পরিস্ফুটভাবে বর্ণিত! শিষ্য বিমুগ্ধ হইত।

শিক্ষান্তে মিহির বলিল, "শেষ হইয়া গেল! কিন্তু আমার তৃষ্ণা ত মিটিল না"।

প্রসন্নচিত্তে গুরুদেব বলিলেন—"ইহার মাধুর্য্য এই স্থলে,—বৎস! ভগবানকেও ভালবাসিতে পারা যায় কি না?

এমনই সতৃষ্ণভাবে ঈশ্বরের প্রতি চাহিতে পারা যায় কি না?"

"যায়, এ তৃষ্ণার জ্বালা নাই, সুতরাং ইহা মোহপদবাচ্য নয়। গুরু বুঝিলেন এখনও শিষ্য মায়াবাদের-মুক্তির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াছে, উপযুক্ত ঔষধ চাই। বলিলেন,— "বেদান্তস্রষ্টা যাহাকে অচ্যুত পদবী দিয়াছেন, তুমি আমি তাহাকে মোহ বলিলে চলিবে কেন?"

মিহির নীরব, তাহার চক্ষুদ্বয় অশ্রুপূর্ণ। দেখিতে দেখিতে সন্ন্যাসীর চক্ষেও জলধারা গড়াইল। তিনি বলিলেন, "যাও বৎস, তোমার শিক্ষা শেষ, ঐ অশ্রধারা মুছিও না, ঐ নয়ন-জলে জীবনের সমস্ত মালিন্য ধৌত করিয়া সার্থকতা লাভ কর।"

গদ্‌গদকণ্ঠে শিষ্য বলিল, "একি অপূর্ব্ব সার্থকতা প্রভু! আমি তুচ্ছ কীটানুকীট—আমি সেই ত্রিজগৎপতিকে আপনার জন বলিতে অধিকারী?"

দুইজনেই স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ পরে মিহির বলিল, "সংসারে আমার কার্য্য কি, গুরুদেব?"

"সে তোমার বিবেকই তোমায় উপদেশ দিবে। আমি এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি—ঐ বিবেকবুদ্ধিকে সংযমে রাখিও।"

মিহির ধূলায় লুটাইয়া গুরুদেবের চরণধূলা মস্তকে লইয়া বলিল, "এই আশীর্ব্বাদই চাই, দেব!"

শোন দ্বিতীয় কথা, লোকালয়ে থাকিলেও অন্তরে বিজনতা রক্ষা করিও—মনুষ্য-চরিত্রে যাহা ঈশ্বর-সাদৃশ্য-স্বরূপ—মাতার স্নেহ—সন্তানের ভক্তি—নারীর পতিভক্তি, দেখিবে—প্রকৃতিতে উহার সাদৃশ্য অন্বেষণ করিও, ঈশ্বরের মূর্ত্তির অনুসন্ধান পাইবে। তাহার পর ধ্যানে দেখিও—আকৃতি ফুটিয়া উঠিবে—তিনিই তোমার দেবতা—তোমার মন্ত্র,—বিশ্ববীজ—ওঁ।"

(৫)

পরিচ্ছন্ন আলোকে উজ্জ্বল রৌদ্রে মিহির চলিয়া গেল। নিম্নে বক্রপথে যতক্ষণ তাহাকে দেখা যাইতেছিল সন্ন্যাসী তাহাকে দেখিতেছিলেন। প্রিয়শিষ্য দৃষ্টিপথের অতীত হইলে, একটি ক্ষুদ্র নিঃশ্বাস ফেলিয়া তিনি মুখ ফিরাইলেন। মুখমণ্ডল প্রসন্ন, তথাপি নেত্রপ্রান্ত যেন ঈষৎ বাষ্পাচ্ছন্ন দেখা যাইতেছিল।

কুটীরের পথে পিনাকীর সহিত সাক্ষাৎ। সে ব্যস্তভাবে বলিল, "মিহির কি আজই যাত্রা করিল, গুরুদেব?"

"হাঁ। কেন?"

"আজই? এখনই?"

"এখনই, অৰ্দ্ধদণ্ডও হয় নাই।" "চলিয়া গিয়াছে? আপনি যাইতে দিলেন?" "গেল?" "আর ফিরাইবার সময় নাই?" তাহার ব্যাকুলতা দেখিয়া সন্ন্যাসীও চঞ্চল হইলেন, বলিলেন "কেন?" বলিয়াই তিনি ঊর্দ্ধে চাহিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন।

পিনাকী বলিলেন, "সর্ব্বদ্রষ্টা! অন্তর্যামি—আপনাকে আমি কি জানাইব? সে ত দক্ষিণ মুখে গিয়াছে—একবার সম্মুখে দৃষ্টিপাত করুন দেখি? সম্মুখে দক্ষিণাকাশে কৃষ্ণ মেঘশ্রেণী, কচিৎ সূক্ষ্ম রেখায় ম্লান বিদ্যুৎ,—" সন্ন্যাসী নির্নিমেষচক্ষে সেই দিকে চাহিয়া বলিলেন, "যোগিনী!" তাহার পর জানু পাতিয়া উদ্দেশে করযোড়ে প্রণাম করিলেন, বলিলেন, "মাতৃমূর্ত্তি, ভয় পাও কেন?" "মাতৃমূর্ত্তি?" মা এখন মৃত্যুরূপা সংহারিণী নন কি?"

"সন্ন্যাসীর জীবন মৃত্যু কি পুত্র?"

পিনাকী অধোবদন হইলেন। গুরু বলিলেন, "জননী চিরকল্যাণময়ী। সন্তানের কোন ভয় নাই জানিবে।"

"তবে কি জ্যোতিষ-শাস্ত্র মিথ্যা হইবে?"

"মিথ্যা নয়,—তুমি জানিও পিনাকী, যদি বিশ্বাস-সহকারে মানুষ মৃত্যুকেও আলিঙ্গন করে তবে সে মৃত্যুও অমৃত হয়।"

বাধা দিয়া পিনাকী বলিলেন, "সে বিশ্বাস কি ইহার ছিল?" "হায়! দেবতা—আপনার হৃদয়ের নির্ম্মলতা আমরা কোথায় পাইব? জ্যোতিষ মিথ্যা নয়, এ আপনারই শ্রীমুখের বাণী।" জ্যোতিষী কাতর হইলেন। তিনি মিহিরকে প্রকৃতই ভালবাসিতেন। তাঁহাকে ব্যাকুল দেখিয়া সন্ন্যাসীও বিচলিত হইলেন,—বলিলেন, "তোমার কথায় আমিও চিন্তিত হইতেছি।"

"মিহির কি আর ফিরিতে পারে না—?"

"আর সময় কৈ?" সে এতক্ষণ পর্ব্বত উত্তীর্ণ

হইয়াছে, অনুসরণ করিলে সন্ধ্যা উপস্থিত হইবে, ততক্ষণে সে আরও দূরে গিয়া পড়িবে।"

দুই জনেই বিমর্ষভাবে নীরব রহিলেন। অনেকক্ষণ পরে সন্ন্যাসী বলিলেন, "কর্ম্মফল সত্য বৈ কি, এ বালক ত এখনও কোন কর্ম্ম করে নাই বা কর্ম্মের শরণ লয় নাই, সুতরাং সে যে আপনার অদৃষ্টপথেই চলিবে তাহার আশ্চর্য্য কি!" করুণকণ্ঠে পিনাকী বলিলেন, "সে ত কর্ম্মধ্বংসেরই আশ্রয় লইয়াছিল, আপনিই ত তাহাকে ভিন্ন পন্থা দেখাইলেন, গুরুদেব?"

"অদৃষ্টবাদে এত বিশ্বাসী হইয়া তুমিও এই প্রশ্ন কর? উহার প্রাক্তন-ফল, আমার সাধ্য কি যে তাহা মুছিয়া দিই? ভয় পাইও না। ঐ ছায়া—ঐ রেখা চিত্র দেবতার, তাহা আমি দেখিয়াছি। এ বালক সফলকাম হইবে,—তবে বলিতে পারি না যে, এই জন্মে—" বলিতে বলিতে সন্ন্যাসী

সেই গুণাতীতের অভিন্নমূর্ত্তি— আনন্দ! দেখ পুত্র দেখ!"

নীরব হইলেন। পিনাকী প্রশ্ন করিলেন,—"কর্ম্মফলের কি খণ্ডন নাই?" সন্ন্যাসী বলিলেন, "কে বলিল নাই? গত জন্মের ক্রিয়াপথে অনুসৃত এই বালকের আত্মা সৌন্দর্য্যের বিচিত্র মোহে মুগ্ধ, উহার অন্তরে চিদাভাস সৌন্দর্য্যের ছায়া মাখিয়া অতি উজ্জ্বল। আমি দেখিয়াছি, এই সৌন্দর্য্য শুধু কল্পনা সৃষ্টি করিয়াই ক্ষান্ত নয়—এ উহার জীবনে প্রভাতস্ফূর্ত্তি,—শুধু ঊষা নয়, উহার অন্তরালে বিশ্ব-প্রকাশক রবিচ্ছবির আভাষ দেখা যায়।"

শিষ্য প্রশ্ন করিলেন, "ভাল গুরুদেব! আমি যদিও এ সব আলোচনা করি নাই, তথাপি সন্দেহ হয়,—এই যাহাকে আপনি সৌন্দর্য্য আখ্যা দান করিলেন, উহা কি মায়া নয়?"

"হাঁ বৎস, উহা প্রকাশ-শক্তিস্বরূপিণী মায়াই বটে! কিন্তু কি প্রকাশ করে জান? সেই গুণাতীতের অভিন্ন-মূর্ত্তি—আনন্দ! দেখ পুত্র দেখ!"

অতি দূরে—পশ্চিম দিক্—রক্তিম-ছায়াময়, সূর্য্য-কিরণে প্রতিফলিত, তুষারময় পর্ব্বতরাজ হিমালয় তখন নানাবর্ণে খচিত মণিময় বেশধারী মহিমময় রাজমূর্ত্তিতে দণ্ডায়মান! উচ্চচূড়া অত্যুজ্জ্বল বর্ণে মুকুটরূপ ধারণ করিয়াছে! নূতন মূর্ত্তি। * * *

জ্যোতির্ব্বিদের হৃদয়ও আর্দ্র হইল। সন্ন্যাসী বলিলেন, "এ সৌন্দর্য্যের আদর্শ কোথায়? কাহার ছবি এই তুষারগাত্রে চিত্রিত? জগতের অতি ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সৌন্দর্য্য কি এক বিশাল সৌন্দর্য্যের প্রকাশ নয়? অন্তরের অনুভূতির মধ্যে যদি জ্ঞানস্বরূপে তাঁহাকে পাই তবে বাহিরের রাজস্বরূপে তাঁহাকে পাইব না কেন?"

জ্যোতিষী স্তব্ধভাবে শুনিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসী বলিতে লাগিলেন, "অন্ধকার এবং আলোক জগতে দুইটি বর্ণ, দুইটিই বর্ণ এবং পরস্পর পরস্পরের উপযোগী। দুইই সত্য। কিন্তু বৎস, দেখিতেছ অন্ধকার কৃষ্ণ, আলোক শ্বেত—অন্ধকার আবরণ, আলোক প্রকাশ; অন্ধকার রসহীনময় নিরানন্দ, আর আলোক চিরসুন্দর, সুপ্রকাশ এবং চিরপ্রফুল্ল! সৌন্দর্য্য এই জগতের আলোকাংশ। যদি তুমি

আবরণ স্বাবার না [illegible]রিয়া সৌন্দর্য্য [illegible] অনুভব [illegible] তবে কি তুমি সত্যেরই অনুভূতি লাভ করিবে না?"

পিনাকীর মুখ তখন ঈষৎ গম্ভীর। তিনি বলিলেন, "কিন্তু একটা প্রশ্ন! এই যে সৌন্দর্য্য ইহা কি সত্যই আত্ম-স্বরূপ? ইহা কি যথার্থই ঐ পর্ব্বতের নিজমূর্ত্তি? সূর্য্যালোকের সহিত উহারও সমস্ত সৌন্দর্য্য এখনই শেষ হইবে না? তখন সে কর্কশ মূর্ত্তি ত প্রস্তর ব্যতীত আর কিছুই নয়?"

গুরু বলিলেন, "অবিশ্বাসের শেষ প্রশ্নটিই উচ্চারণ করিলে? ওরে শিশু! ওরে দৃষ্টিসর্ব্বস্ব! কে বলিয়াছে যে সৌন্দর্য্য এই পর্ব্বতগাত্রে? কি দেখিলি? কি অনুভব করিলি এতক্ষণ? ওই পর্ব্বতরঞ্জিত আলোক? না বৎস! জড়ের সাধ্য কি অন্তরের দুর্গম গুহায় প্রবেশ করিয়া সেখানে আধিপত্য বিস্তার করে! যাহার আনন্দ-প্রভায় তোর হৃদয় মুগ্ধ হইয়াছিল, যাহার অনুভূতি ক্ষণেকের জন্য হৃদয় অনুভব করিয়াছিল, তাহাই সৃষ্টির বিচিত্ররূপ। আনন্দময়ী জননী প্রকৃতির মধ্যে পরম পুরুষের ছায়া। বলিতে পার কি পিনাকী, পশুদের হৃদয়ে ওই রূপানুভব শক্তি আছে কি? বহিঃসংসারের মূর্ত্তি বিকল্প জড়চিত্তেরা অনুভব করে কি? না। যদি তাহা না হয়, উহা যদি একমাত্র জ্ঞানেরই আয়ত্ত হয়, তবে ঐ জ্ঞানের অধিষ্ঠান কেন্দ্রের নাম কি?"

পিনাকী বলিলেন, "গুরুদেব ঐ কেন্দ্রের নামও মায়া! জীবের অন্তরের জ্ঞান সজ্জাময়ী মায়া!"

"নিশ্চয়! কিন্তু ঐ মায়া কি প্রকাশ করে?"

"সৌন্দর্য্য, আলোক এবং জগতের সমস্ত মধুর রস।"

"সুতরাং আনন্দ।"

"হাঁ তাহাও বটে! কিন্তু সত্যের অবিকল প্রতিকৃতি কি না, সন্দেহ।"

"সত্য-স্বরূপের, কি কি স্বরূপ, জান কি?"

"হাঁ, তিনি নিত্য এবং আনন্দস্বরূপ।"

"তবে জগতের অবিকৃত প্রকৃতির মধ্যে আনন্দের আভাস পাইলে তাহা তাঁহারই স্বপ্রকাশ নয়?"

"হাঁ, ; কিন্তু আংশিক।"—গুরু হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "নিতান্ত বালকের কথা! তিনি অচ্যুত জ্ঞান না হয় যাঁহা [illegible] কৃপা নাই, [illegible] তাঁহার অংশ [illegible] জ্ঞানগোচর শান্ত বটে তাহাতে [illegible]টুকুই ক্ষোভ তাহার প্রকাশ ত।"

পিনাকী স্তব্ধ হইয়াছিলেন। ক্ষণকাল পরে মৃদুস্বরে বলিলেন, "অত্যন্ত অভিনব! অত্যন্ত রমণীয় প্রভু! বেদও কি এই বিশ্বপ্রকৃতিরই বন্দনা?" "হাঁ! দেখিয়াছ? দেখিয়াছ কি ঐ জগৎবন্দনা? ঐ বিভিন্ন রূপে বিভিন্ন মূর্ত্তির কল্পনার মধ্যেও সেই মানবহৃদয়ান্তরালেও অনন্ত আনন্দ-রস কাহার উদ্দেশে উচ্ছ্বসিত বল দেখি?"

পিনাকী ধীরে ধীরে বলিলেন, "ভাল বুঝিতে পারি না। বরং মায়াবাদ বোধগম্য হয়, কিন্তু এই ভক্তিবাদ আমার অগম্য। যাহা সূক্ষ্মাত্মক তাহাকে সর্ব্বযোগ্য করা আমার অসাধ্য।

"সূক্ষ্মাত্মক বলিও না। তবে একাত্মক, দ্বিত্বহীন, কেমন? কিন্তু পুত্র, জানিও ইহা মাত্র তাঁহারই মায়া। ইহার কোনই উত্তর নাই যে তিনি কাহারও সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া তাহারই মধ্যে নিজে পূর্ণ। কাহারও সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া তাহারই দ্বারায় পূর্ণ। ভক্ত আপনাকে চেনে না, তাই সোঽহং উচ্চারণে অসমর্থ, সে দেবতার চরণে আপনাকে হারাইয়া জলতরঙ্গে বুদ্বুদের ন্যায় আপনাকে বিলোপ করে। ফল ত একই?"

জ্যোতিষীর দৃষ্টি-ভঙ্গীতে মনোনিবেশ গাঢ় হইয়া উঠিয়াছিল, গুরুর বাক্যাবসানে বলিলেন—"বুঝি কিছু বুঝিলাম। কিন্তু প্রভু চিনিলাম না আপনাকে! কোন্ ভাবে যে আপনি তাঁহাকে পাইয়াছেন তাহাই বুঝিলাম না! তাই আপনার কথা লইয়াই আপনার সহিত তর্ক করি।"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "গম্য স্থান যে একই বৎস। যে পথ দিয়া যাও একস্থানে উপস্থিত হইবে। ভয় কি!—

পিনাকী বুঝিলেন, গুরু সে প্রসঙ্গ পরিহার করিতেছেন। দশ বৎসর চলিয়া গিয়াছে। সন্ন্যাসীর আশ্রমে শিষ্যের সংখ্যা অধিক নহে, বৈশাখের তপ্ত রৌদ্রে নির্ঝর-বক্ষের তুষার-বিগলিত ঐ উচ্ছল কলনাদিনীর তটে প্রস্তরাসনে সন্ন্যাসী বসিয়া আছেন, এমন সময়ে সহসা মিহির আসিয়া তাঁহার চরণ-বন্দনা করিল। তাহার সর্ব্বাঙ্গে যৌবনের সুন্দর পূর্ণতা, বদনে ততোধিক সুন্দর

অনন্দর কমনীয়তা। তাহাকে দেখিয়াই বোধ হয় যেন সে কোন অভীষ্ট বিষয়ে সফলমনোরথ হইয়াছে। তাহাকে দেখিয়া গুরুও প্রসন্ন হইলেন। সাদরে তাহাকে পার্শ্বে বসাইয়া সন্ন্যাসী কুশল-বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন, "অদ্য প্রাতেই কি এখানে আসিয়াছ? মিহির মৃদু হাসিয়া বলিল, "না, আমি প্রায় এক বৎসর আসিয়াছি, প্রভু।

এক বৎসর আসিয়াছ, সে কি? আমার সহিত সাক্ষাৎ কর নাই কেন?"

মিহির বলিল—"এই ত বাহিরে আসিয়াছি! পিতা। বাহির হইয়াই ত আপনার শ্রীচরণ-দর্শনে আসিয়াছি।

বাহির হইয়া! সেকি কথা? এতদিন কোথায় ছিলে? এই যে বলিলে একবৎসর আসিয়াছি—

হাঁ তাহাই বটে। কিন্তু এই এক বৎসর আমি আমার দেবতার মূর্ত্তি-রচনায় নিযুক্ত ছিলাম—আজ তাহা শেষ হইয়াছে। তাই আপনাকে লইতে আসিয়াছি. আমার সেই মূর্ত্তি আপনাকে দেখিতে হইবে। সন্ন্যাসী সবিস্ময়ে বলিলেন-"মূর্ত্তি! মূর্ত্তি কি রে শিশু, কি মূর্ত্তি গড়্‌লি তুই?"

মিহির সন্ন্যাসীর চরণ-স্পর্শ করিয়া বলিল, "চলুন প্রভু, দেখিবেন সে কি মূর্ত্তি! কাহার মূর্ত্তি।" বিস্ময়ে সন্ন্যাসী কিছুক্ষণ নীরব থাকিলেন, পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এত দিন কোথা ছিলে, মিহির?"

"এতদিন! এতদিন সমস্ত ভারতবর্ষই ঘুরিয়া দেখিয়াছি! চীন, জাপান দেখিয়াছি, তিব্বত দেখিয়াছি! আঃ কিসুন্দর এই পৃথিবী! যদি পক্ষ থাকিত, পিতা, তবেই বোধ হয় সৌন্দর্য্য দেখিবার সাধ মিটিত।"

সন্ন্যাসী মৃদু হাসিলেন, বলিলেন, "তা কি দেখিলে? আর কি না দেখার জন্যই বা আক্ষেপ করিতেছ?"

"কি জন্য আক্ষেপ? দেখুন পিতা, এই বিশাল সৃষ্টি তাহার মধ্যে এই ক্ষুদ্র পৃথিবী, তাহার মধ্যে এই দেশটুকু! সাগর দেখিয়াছি—ক্ষুদ্র তটে অতি ক্ষুদ্র উচ্ছ্বাস মাত্র। কোথায় তাহার সুনীল জলান্তে—গভীর তলদেশ? সেখানে কি আছে? দূর হোক আঁধার তল—কোথায় তাহার বিশাল বক্ষ—তরঙ্গ-তাড়নে সদা বিক্ষুব্ধ তাহার মহান্ হৃদয়! অসীম আকাশের নীচে অসীম জলরাশি! এই মেঘস্পর্শী হিমালয়! ইহার কত-

নির্ঝর-বক্ষের তুষার-বিগলিত ঐ উচ্ছ্বল কলনাদিনীর তটে প্রস্তরাসনে সন্ন্যাসী বসিয়া আছেন।

টুকু মনুষ্যগম্য পিতা? কি দেখিয়াছি ইহার? এইটুকু ঘুরিয়াছি ইহাতেই দেশে দেশে বিভিন্ন প্রকৃতি বিভিন্ন সৌন্দর্য্যের বিকাশ। না জানি এই বিশাল পৃথিবী কত সুন্দর কত আশ্চর্য্য।"

প্রসন্নমুখে অথচ একটি ক্ষুদ্র নিঃশ্বাস ফেলিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন, "মহতের মধ্যেই সৌন্দর্য্য দেখিলে? ক্ষুদ্রের মধ্যে কিছু পাও নাই কি?"

এই বার মাটিতে লুটাইয়া মিহির গুরুর চরণধূলি লইল। আবেগরুদ্ধকণ্ঠে বলিল—"তাহাও পাইয়াছি। আপনার দয়ায় তাহাও পাইয়াছি পিতা! মহতের রূপ অন্তরে যে ছবি আঁকিয়া দিত,—আপনি ত বলিয়াছিলেন, গুরুদেব, যাহাকে আমরা দৃষ্টির অজ্ঞানে বৃহৎ দেখি—দৃষ্টির শক্তি তাহাকে ক্ষুদ্র আকারেই গ্রহণ করিয়া থাকে—তাই সেই ক্ষুদ্র ছবির সাদৃশ্য আমি সমস্ত ক্ষুদ্রতেই পাইতাম।"

বলিতে বলিতে মিহিরের চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল। সে স্তব্ধ হইয়া রহিল। প্রসন্নমুখে সন্ন্যাসী বলিলেন, "তাহার পর"—

"তাহার পর দক্ষিণ দেশে গিয়াছিলাম। সেখানে ভাস্কর্য্য—শিল্প শিক্ষা করিয়াছি, পরে আজ এক বৎসর আপনার মানসী মূর্ত্তি রচনা করিতেছিলাম—আজি তাহার শেষ হইল।"

সন্ন্যাসী আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "মূর্ত্তি কি? কাহার মূর্ত্তি গড়িলে?"

"সৌন্দর্য্যের! জগতের সমস্ত রূপরাশি বিন্দু বিন্দু করিয়া, একত্র করিয়া ঐ মূর্ত্তি গড়িয়াছি! চলুন পিতা—দেখিবেন চলুন"।

"সৌন্দর্য্যের প্রতিষ্ঠা অন্তরে কেন করিলে না? যাহাই হোক চল, দেখি তোমার মূর্ত্তি।"

মিহির উঠিয়া বলিল, "চলুন, কিন্তু আপনি আশ্চর্য্য বোধ করিলেন কেন, গুরুদেব? অন্তরের চিত্র যদি বাহিরে দেখি, তবে কি প্রাণ আরও পুলকিত হয় না?"

"হয়, বৎস! মহতের মধ্যে ক্ষুদ্র প্রাণের আভাস—আর প্রাণের মধ্যে বিশালতার অনুভূতিই—আনন্দ-স্পর্শের শেষ স্পন্দন জানিও। মূর্ত্তির মধ্যে চিন্ময়ীর মহিমা-দর্শন জীব-জন্মের সর্ব্বাধিক সুকৃতির ফল।"

বাধা দিয়া মিহির বলিল, "তবে।"

"জানি না বৎস, কেন আমার চিত্তে এ অপ্রসন্নতা উপস্থিত হইল।"

মিহির হাসিয়া বলিল, "ইহারই জন্য কি প্রভু বলিয়াছিলেন যে, "সন্ন্যাসীর জীবনের রহস্য অসীম?"

দুই জনেই হাসিলেন। সন্ন্যাসী মিহিরের সঙ্গে চলিলেন।

পর্ব্বতের নিম্ন অংশে শ্যামল শৈবাল-মণ্ডিত রক্ত-শ্বেত-পুষ্পখচিত নির্জ্জন ভূখণ্ডে মিহিরের আবাসস্থল। প্রকৃতির স্বহস্তসজ্জিত ঘনবিন্যস্ত দেবদারু তরুর নিভৃত ছায়াময় গুহাদ্বারে দুইজনে আসিয়া দাঁড়াইলেন। কি অপূর্ব্ব দৃশ্য! গুহাভ্যন্তরে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়াই সন্ন্যাসী মুগ্ধ হইয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পরে রুদ্ধপ্রায় স্বরে বলিলেন, "এ কি? এ কে, মিহির?"

সন্ন্যাসী মিহিরের সঙ্গে চলিলেন।

"আমার দেবী, পিতা!"

"নারী?"

"হাঁ, পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্য—প্রতিমা নারীমূর্ত্তিই বটে।" সন্ন্যাসী মিহিরের শেষ কথা কয়টি শুনিতে পাইলেন না। তিনি এক দৃষ্টিতে প্রতিমার দিকে চাহিয়াছিলেন। বিস্ময়-স্তম্ভিত সন্ন্যাসী দেখিলেন—শিল্প-সৃষ্টির চরম উৎকর্ষ এই মূর্ত্তিখানি! এই লাবণ্য, সৌকুমার্য্য, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের লালিত্য, মাধুর্য্য, লীলা-প্রকাশ—সমস্তই একটি বালিকার আকারে গঠিত হইলেও এ অনুপম সৌন্দর্য্য, এ দেবী ভাব-পূর্ণ মুখশ্রী, সর্ব্বোপরি এই কোন অজ্ঞাত সৌন্দর্য্যের স্বপ্নালসময় চক্ষু, পৃথিবীর রক্তমাংসসৃষ্টা নারীতে অসম্ভব। মূর্ত্তির রূপ বিচিত্র, শোভা বিচিত্র, সজ্জা ততোধিক বিচিত্র!

বিবিধ শিল্পকলায় সুসজ্জিতা প্রতিমা অপূর্ব্ব বৈচিত্র্যে সর্ব্বাগ্রে দৃষ্টি ও অন্তর আকর্ষণ করিতেছিল।

সন্ন্যাসী প্রশ্ন করিলেন, "এ মণিমুক্তা কোথায় পাইলে মিহির?" "দেশে দেশে পর্ব্বতে পর্ব্বতে নদীসাগর হইতে খুঁজিয়া খুঁজিয়া এই সকল প্রস্তর-মণি সংগ্রহ করিয়াছি।"

"ধন্য তোমার অধ্যবসায়! এ প্রতিমার নাম কি মিহির? এ তুমি কাহার মূর্ত্তি গড়িয়াছ?"

"কাহার মূর্ত্তি! কাহার মূর্ত্তি বলিব, পিতা? আমি ত কোন একের স্বরূপ চিন্তা করিয়া ইহাকে গঠিত করি নাই। জ্ঞানলাভের আশায় ধ্যানোদ্যোগে ফিরিয়াছি। সম্মুখে বিদ্যাদায়িনী বাগ্‌দেবী সরস্বতী। সমস্ত জগতের কণ্ঠোত্থিত মহান্ সঙ্গীত প্রকৃতিদিব্য বীণায় ধ্বনিত স্বর-মূর্চ্ছনা ঐ অঙ্গুলি-চালনায় বিশ্ববক্ষে সমস্ত স্বর বর্ষণ করিতেছে। সেই বাক্‌প্রকাশ-শক্তি—তিনি নারীমূর্ত্তি, আমার এই পাষাণ-প্রতিমা প্রথমেই তাঁহার মূর্ত্তির কল্পনা। পরে এই বিশ্বের অন্তরে বাহিরে প্রকাশিত সমস্ত সৌন্দর্য্য জলদেবী শ্রীমূর্ত্তি, পৃথ্বী সৃজন-প্রারম্ভে অনন্ত সাগর-বক্ষে প্রথম প্রকাশিত পূর্ণচন্দ্র-কৌমুদীবর্ণা—পারিজাত-সুরভিনিন্দিতা কৌস্তুভরত্নোজ্জ্বলা লক্ষ্মীদেবী ত্রিভুবনের সমস্ত সৌন্দর্য্য, সমস্ত ঐশ্বর্য্য সমস্ত মহিমার অভিন্নশক্তিময়ীর রূপকল্পনাই ইহার দেহ। তাহার পর! তাহার পর, গুরুদেব। প্রভাতে অরুণ-প্রমুখী ঊষা। পৃথিবীর নিত্য নূতনত্বের চির-প্রবর্ত্তক রবিচ্ছটা-কিরিটিনী ঊষা। আমার ঐ প্রতিমার নয়নে ও কিসের আলোক, প্রভু! ঐ ঊষালোক। আবার অলকাগ্রে দোদুল্যমান নেত্রপলকে ঘনীভূত স্নিগ্ধ করুণ নীলিমা, পিতা, ঐ দিবসান্ত ক্লান্তিহারিণী স্নেহসুকোমল সন্ধ্যাছায়া?"

মিহির উত্তেজনায় কিয়ৎকাল স্তব্ধ হইয়া আবার বলিল, "অন্তর্জগতে ত সমস্ত প্রবৃত্তিই নারীরূপে কল্পিতা দেখিলাম। ইবার নতজানুভঙ্গিতে ঈষদুন্নত মস্তকে মহতের শ্রদ্ধার ভাব অঙ্কিত। দক্ষিণ করপুটে রক্ত শতদল; জ্ঞান রবিকরে প্রস্ফুটিত হাস্যময় হৃৎপদ্ম। সুগন্ধময় সদ্ভাবময় অতি মনোহর শতদলপদ্ম অনন্তে নিমগ্ন সজল কোমল নয়নের সহিত একত্র ঊর্দ্ধোত্থিত, ইহাই ভক্তি! মানব-হৃদয়ের গভীর অন্ধকার-রহস্য-সলিলে একমাত্র সৌন্দর্য্য উন্মাদনার প্রস্ফুট কুসুম। বামকরতল বেদনা ভঙ্গিতে আপন বক্ষ চাপিয়া ধরিয়াছে। ইহা পৃথিবীর দুঃখে বেদনাতুরা দয়ার ছায়ায় কল্পিত। আকাশ-লগ্ন চক্ষুতে ঈষৎ নিম্নদৃষ্টির ভাব অধরপ্রান্তে ম্লান হাসির সঙ্গে চারিদিকে প্রীতি-প্রকাশক ভঙ্গীতে প্রসারিত উহা সেই সৃষ্টি-প্রারম্ভের ভগবদ্‌-ইচ্ছাশক্ত্য প্রতিমা, স্নেহ প্রেম-মমতা-স্বরূপিণী মায়া! ওই মায়া। গুরুদেব! এই মায়ার ছায়াটুকু প্রতিমার অধরে সঞ্চিত করিতে, নয়নে অঙ্কিত করিতে আমার কত দিন গিয়াছে, তাহা কি বলিব।"

সন্ন্যাসী এতক্ষণ নির্ব্বাক্ ভাবে শুনিতে ছিলেন, হঠাৎ বলিলেন, "কোন্ মায়া?"

"সেই মায়া, গুরুদেব! নরহৃদয়ে নারী রূপিণী মোহিনী মায়া। সৌন্দর্য্যে কল্পনা, দুঃখে স্মৃতি, দুঃখে বেদনা, রজনীতে নিদ্রা, দিবসে ক্রিয়া অনাহারে ক্ষুধা, আহারে তৃপ্তি, আবরণে লজ্জা সবই ত মায়া। কিন্তু শুধু তাহাই নহে, আমার প্রতিমার শুধু বহিঃপ্রকাশিনী মায়াতেই অভিব্যক্তা নহে; ওই নেত্র বিন্দু-প্রসারণে আমি মানব-হৃদয়ের চরম বৃত্তির আভাস অনুসরণ করিয়াছি। আর আর ঐ যে, গুরু, বেদনার ঈষৎ বাষ্পাচ্ছন্ন ভাব।"

মিহির নীরব হইয়া গেল। অর্দ্ধোচারিতস্বরে গুরু প্রশ্ন করিলেন, "উহা কি?"

"উহা" আপনাকে মুহূর্ত্তে সংবরণ করিয়া মিহির বলিল, "উহা, হাঁ ঐ তপ্ত অশ্রু-রেখা, গুরুদেব! পিতা! কি বলিব অন্তর্যামিন্। আপনি নারী-হৃদয়ের কোন্ লুক্কায়িত অংশও না জানেন? আপনার অমৃতময় শিক্ষাতেই আমি উহার পরিচয় পাইয়াছি। উহা, হাঁ প্রভু, উহা সেই কৃষ্ণদর্শনাভিলাষিণী অথচ স্বভাবরুদ্ধা জীবনের ও হৃদয়ের অদ্ভুত ছন্দে বেদনাতুরা গোপীর নয়নাশ্রু-স্মৃতিতেই ও-বাষ্প-জালের পরিকল্পনা।"

মিহিরের কণ্ঠ রুদ্ধ হইল, সন্ন্যাসীও তখন অশ্রুবিহ্বল। অনেকক্ষণ পরে গুরু বলিলেন, "ধন্য বৎস! তোমার সাধনা ধন্য! কিন্তু একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, তুমি স্বভাব-রুদ্ধ শব্দ প্রয়োগ করিলে কেন? আমাদের আরাধ্য ত দূরস্থ বা প্রবাসী নহেন।

প্রবাহিত বিপুলাশ্রু-সম্পাতে সন্ন্যাসীর গদ্‌গদ স্বর ডুবিয়া গেল। ক্ষীণ বাহুপাশে আপনার বক্ষস্থল আপনি চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন—"মুহূর্ত্তের অদর্শনে যে সংসার কণ্টকময় বোধ হয়, সূর্য্য অন্ধকার, চন্দ্র অজ্ঞানময় বোধ হয়—হায় পুত্র তুমি কি তাঁকে অনুভব কর নাই ?"

বলিতে বলিতে সন্ন্যাসী আত্মসংবরণ করিলেন। সেই প্রতিমাকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, "ভাবুক—পূজিতা পাষাণময়ী দেবী! তুমিও সত্যরূপিণী!" পরে মিহিরের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "মিহির, বল,—কি ভাবে বেদনা বোধ কর।"

মিহির তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, উত্তর দিতে পারিল না। সন্ন্যাসী পুনর্ব্বার প্রশ্ন করিলেন, "বল পুত্র, এ বেদনার নাম কি ?"

"এ দেবনার নাম ? নাম ? আপনি কি বলেন নাই প্রভু, ইহার নাম প্রেম !"

"প্রেম—সর্ব্বনাশ করিলে বেদনার নাম প্রেম ? আমি কি বলিয়াছিলাম প্রেম বেদনাময় ?"

"প্রভু"—মিহির বিস্মিতভাবে নিরুত্তর হইল। সন্ন্যাসী বলিলেন, "সব ভুলিলে সন্ন্যাস-ধর্ম্মে যে বেদনার নাম ঈশ্বর-বিরহ! তাহার প্রথম অবস্থায় ইহা কি ভুলিয়াছ ?"

"কিন্তু যাহার প্রথম আবির্ভাবে প্রাণ অবশ হয়, হৃদয় লালায়িত হয়, সমস্ত ইন্দ্রিয় একের অভাবে স্পৃহাহীন হয়, সেও কি সুখ ?"

"প্রাণ অবশ হয়,কারণ সে আপনার সর্ব্বস্ব-দানে আত্মত্ব-হীন, ইন্দ্রিয় লালায়িত, কেননা সে জগতের নশ্বরত্ব বুঝিয়া অনন্তের প্রয়াসী! ইন্দ্রিয় অল্প স্পৃহাহীন, কারণ সে প্রকৃত সুখের আস্বাদ পাইয়াছে তাই অন্যে বিতৃষ্ণ!—ইহাও দুঃখ ?—"

মিহির অধোমুখ হইল। সন্ন্যাসী বুঝিলেন, নিকটে আসিয়া তাহার স্কন্ধে হাত রাখিয়া বলিলেন,—"মলিন হইলে কেন পুত্র! আমার কথায় কি ব্যথা পাইলে ?"

ক্ষুব্ধভাবে মিহির বলিল, "আমি আপনার উপদেশ বুঝিয়া হৃদয়ঙ্গম করি নাই দেবতা! বোধ হয় ভ্রম করিয়াছি —আমি ভাবিয়াছিলাম গৌরীর হরপ্রীতিও এই প্রেম!"

প্রফুল্লমুখে সন্ন্যাসী বলিলেন, "নিশ্চয়! নিশ্চয়! কেন না বলিতেছ, তবে বৎস! প্রিয় শিষ্য আমার। একটি কথা—গৌরীর হর-প্রীতি যে সংসার! তুমি কি বুঝ নাই –

"বুঝিয়াছি গুরুদেব, যে এই আকাঙ্ক্ষাটুকু আমাদের সাধ্য, কারণ আমাদের সাধনার ধন যোগিজনারাধ্য দুর্লভ বস্তু, ঐ প্রীতিকে বিরহের অগ্নিশিখায় নিয়ত দগ্ধ করিয়া শেষে—" এই কথা শেষ হইল না, সন্ন্যাসী মিহিরকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "ধন্য! তুমি ধন্য মিহির! বুঝিয়াছি বৎস, তুমি যথার্থ প্রীতির স্পর্শ পাইয়াছ।

"আমি ভুল করি নাই ত ?"

"তা এ পর্য্যন্ত নয়! তবে—" "তবে কি ?"

সন্ন্যাসী একটি শ্রান্ত নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "দেখ মিহির, পূর্ব্বে তোমার মুখে "বেদনা" শব্দ শুনিয়া আমি ভীত হইয়াছিলাম—কিন্তু ভয়ের কারণ নাই, তুমি যথার্থ পথ অনুসরণ করিতেছ বুঝিয়াও ভর্ৎসনা করিতেছিলাম—কেন ? কি বলিব তোকে রে, সন্ন্যাসীর স্নেহভাজন! কেন এই মূর্ত্তি দেখিয়া আমার হৃদয় প্রসন্ন হইল না। আচ্ছা বল দেখি প্রতিমাটি প্রস্তুত কালে ইহাকে কি চিন্তায় রচনা করিয়াছিলে ?"

মিহির বলিল, "বুঝিলাম না—কি চিন্তা কি ?"

"চিন্তা ? বুঝিলে না ? নারীকে কি কি ভাবে রচনা করা যায় জান ?"

অন্যমনস্কস্বরে মিহির বলিল—"নারীকে ধারণা ?" বলিতে বলিতে তাহার কণ্ঠ মৃদু হইয়া গেল; সে বলিল, "দেবী!"

অধোমুখে শিষ্যের প্রতি চাহিয়া গুরু হাসিয়া মনেমনে বলিলেন, "বুঝিয়াছি।" প্রকাশ্যে বলিলেন, "দেবী কি বলিতেছ ? দেবীর চিন্তা কি স্পর্শ-যোগ্য ? ধারণা অর্থ, জননী, দুহিতা, গরীয়সী প্রণম্যা এবং সখী! ততোধিক জাননাকি ? প্রণয়িনী! কি ভাবে কল্পনা করিয়াছ বল ?'

মিহির নীরব। সন্ন্যাসী বলিলেন, "ইহাকে যখন ঐ মা চরিত্রের সাদৃশ্যে রঞ্জিত করিতেছিলে, তখন কি ভাবিয়াছ ? কুমার-জননী, না শিব-প্রণয়িনী ?"

মিহির কি ভাবিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "কুমার-জননী ? না—না পিতা, মাতৃমূর্ত্তির কল্পনা বুঝি আমি করি নাই। ব্রজ-গোপীর বিষাদ-সাগর আমায় ভাসাইয়া লইয়াছিল,

আমি প্রেমপ্রতিমা রাধিকার জীবনে ইহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছি। ভুল করিয়াছি কি?"

"না বৎস, তুমি কিছুই ভুল কর নাই। ভুল করিয়াছে এই বৃদ্ধ সন্ন্যাসী। মাতৃস্নেহ মানব সাধারণের জীবনের প্রথমাংশের সৃষ্টি ও পালন-শক্তির বিকাশ-শক্তি, সে শক্তির বল সকল জীবেই প্রকাশিত হয়। ঐ শক্তির স্ফুরণেই সেই চরিত্র গঠিত হয়। অর্থাৎ মানবজন্ম গ্রহণকার্য্য সফলতা লাভ করে। প্রথমে দেহ, তাহার পর হৃদয়ের স্ফুরণ! আমি মূর্খ, ভুলিয়াছিলাম যে, তুমি মাতৃ-ক্রোড়-সুখ-বঞ্চিত। মাতৃস্নেহ-অমৃত পান করিয়া অমর হও নাই। তাই ঐ দৈহিক পুষ্টি; মাতৃভক্তিশিক্ষা, মাতার কাছে নিভরপরায়ণতা, বাৎসল্যও শিক্ষা দিই নাই। প্রথমে দুগ্ধ পান না করাইয়া তীক্ষ্ণশক্তি সোমরস পান করাইয়াছি; তাহারই এই ফল—"

বলিতে বলিতে সন্ন্যাসী স্থির হইলেন। মিহির স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল—কাতরভাবে বলিল, "আমি কি বড়ই অন্যায় করিয়াছি? ইহার কি প্রতীকার নাই?"

অশ্রুপূর্ণ চক্ষে ঈষৎ হাস্যে সন্ন্যাসী বলিলেন, "কিছুই তোমার অন্যায় হয় নাই, তুমি ঠিক পথে চলিয়াছ। তবে কতটুকু ত্রুটি আছে, আমি আবার তোমায় শিক্ষা দিব। তুমি ভয় পাইও না মিহির, একটা অনর্থক ভয়ে আমি এত ভীত হইয়াছি মাত্র। তোমায় আমি বড় স্নেহ করি, তাই এ অন্যায় আশঙ্কা, নতুবা সন্ন্যাসীদের জীবনে,একটা দিন হইতে একটা জন্মের কিছুই পার্থক্য নাই। শত জন্ম সাধনায় যাঁকে পাওয়া যায়, একটা জন্মের লোকসান জন্য বৃথা শোক করা কি কর্ত্তব্য?"

মিহির চুপ করিয়া থাকিল; গুরু তাহা লক্ষ্য করিলেন। পূর্ব্বে সে এই কথা শুনিলে কাতর হইত, শত প্রশ্নে তাঁহাকে অস্থির করিত, কিন্তু আজ তাহার অন্তর কিসে পূর্ণ হইয়াছিল, গুরুর কথিত ভীতিজনক বাক্যে সে ভয় পাইল না। ইহাতে সন্ন্যাসী প্রীত হইলেন এবং একটু ভীত হইলেন। ভীতি সেই জ্যোতিষীর নির্দ্দেশে—প্রণয় দেবতা শুক্র তখন মিহিরের জীবন-পথে নিম্নাভিমুখী। সন্ন্যাসী ফিরিলেন; কিন্তু অন্তরচক্ষে দেখিলেন মানস-প্রভু শশধর তখন পরিপূর্ণ আলোকে পুষ্পবর্য্যে বিরাজিত; পুত্র বুধও অনতিদূরে মিত্রগৃহে অবস্থান করিয়া পিতার সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছে। এই উভয় গ্রহকে সন্ন্যাসী প্রণাম করিয়া সকাতরে কহিলেন—"রক্ষা কর!—রক্ষা কর প্রভো—এই বালকের চিত্তে বল দাও।—কিন্তু ও কি?—দক্ষিণে বিশাল অন্ধকার! অষ্টম কক্ষ ম্লান দিনকর রাহুর ছায়াযুক্ত!—" সন্ন্যাসী দৃষ্টি ফিরাইলেন!—

হায় মায়াত্যাগী সন্ন্যাসী! কার জন্য এ মায়া!—হায় স্বল্পায়ু বালক! কেন তাহার প্রতি স্নেহ!—সন্ন্যাসী মুহূর্ত্ত কালের জন্য এই সকল ভাবিলেন,—কিন্তু আবার পূর্ব্বভাব!

(৮)

মিহির প্রত্যহই গুরু সন্দর্শনে আসিত! সন্ন্যাসীও সযত্নে তাহাকে বিবিধ উপদেশ দিতেন। কিন্তু তিনি দেখিতেন আর কোনও নূতন শিক্ষা তাহার প্রাণস্পর্শ করিত না; যে ভাবনায় সে অন্যমনা থাকিত তাহার বিপরীত কল্পনায় সে পূর্ব্বের মত জ্বলিয়া উঠিত না। ইহাতে ভয়ের কারণ কিছুই ছিল না, শিক্ষিত মিহির সকলকে গভীর হৃদগত চিন্তা দ্বারা মধুময়ী কল্পনা পুণ্যপূত করিয়া জীবনী দান করিয়াছিল; ইহাতেই সন্ন্যাসী সর্ব্বদা শঙ্কিত থাকিতেন;—এই বালকের উপরই বা তাঁহার আকর্ষণ এত কেন? ভাবের আবেশে তাঁহার বিজয়ী চিত্তও চঞ্চল হইয়া উঠিল।

দিন চলিয়া যাইতে লাগিল। বর্ষার ঘনঘটায় উপত্যকার অন্ধকারময় সঙ্কীর্ণ বক্ষ পিচ্ছিল পথ বহিয়া সন্ন্যাসী স্বয়ং শিষ্যের কুটীরে চলিলেন, কারণ আজ তিন চারি দিন মিহির তাঁহার কুটীরে আসে নাই। ভয়ের বা চিন্তার কোন কারণ নাই, তবুও তিনি কি ভাবিতেছিলেন,—যেন কোন নির্দ্দিষ্ট দিনের নির্দ্দিষ্ট সময়ের আগমন প্রতীক্ষায় তাঁহার ভাবনাগুলি তাঁহাকে উত্তেজিত করিতেছিল। কাতর-রুদ্ধপ্রায় স্বরে তিনি বলিলেন, "না, আর না, এই বার তাহাকে লইয়া দূরে যাইব! কর্ম্মফলধ্বংসীর নামমন্ত্রের বীজদান করিয়া আজই তাহাকে ক্রিয়ায় নিযুক্ত করিব। তাহার পর মাসান্তে আবার তাহার মুক্তি, আবার সে যথেচ্ছ ভ্রমণ করিবে।—"

সহসা প্রবল বিদ্যুৎ-রেখায় দীর্ণ মেঘ কড়কড় শব্দে ডাকিয়া উঠিল!

চারিদিক আবৃত করিয়া ঘনধূমল মেঘ উচ্চ পর্ব্বতের

"হাঁ হয়! কিন্তু ওরে ও অবোধ! সে হাস্য কি পাষাণের মুখেও ফুটে না? আর যদি তোর চক্ষে নাই ফুটে, তবে আমার সাধ্য কি ফুটাই?"

"আপনার সাধ্য! আমি শুনিয়াছি আপনি মৃতদেহে জীবন দান করিয়াছিলেন।"

"তাহা মিথ্যা কথা! মৃতদেহে জীবনদান কেহ করিতে পারে না। কিন্তু সে কথা নয়, তুমি এ দুশ্চিন্তা ত্যাগ কর। বৎস! চল, আমার সহিত, আমি তীর্থযাত্রা করিব; তুমি আমার সঙ্গে চল।"

মিহির দুই হাতে শ্রবণপথ রুদ্ধ করিল। বলিল, "না—না প্রভু! গুরু! আমায় ক্ষমা করুন, আমি এই মূর্ত্তি ছাড়িয়া কোথাও যাইতে পারিব না। এই আমার সব। আপনি আমায় ক্ষমা করুন।"

"তুমি এখানে থাকিলে উন্মাদ হইবে।"—

বাধা দিয়া মিহির বলিল, "না, মরিব। ইহার মুখে কথা না শুনিলে মরিব।"

সন্ন্যাসী হাসিলেন, বলিলেন, "তাহারও আশ্চয্য নাই!"

"তবে! পিতা, তবে আপনি ইচ্ছা করিলেই আমায় এ মৃত্যুমুখ হইতে উদ্ধার করিতে পারেন—কেন করিবেন না?"

সন্ন্যাসী তখন মনে মনে মানুষের সাধ্য এবং কৃতকার্য্যতার সম্বন্ধেই চিন্তা করিতেছিলেন; এবং অনিষ্ট সম্ভাবনা স্থলে কার্য্যশক্তি প্রয়োগ প্রয়োজনীয়,তাহাই তাঁহার তাহাই ধারণা হইতেছিল। মিহিরের এই বর্ত্তমান উদ্‌ভ্রান্তির কারণ তিনিই, না তাহার নিজেরই পূর্ব্বজন্মের কৃতকর্ম্ম, ইহাতেও তাঁহার দ্বিধা আসিতেছিল। উপস্থিত ঘটনা তখন তাঁহার পক্ষে অতি সমস্যাপূর্ণ বোধ হইল। আবার মিহিরের অদৃষ্টের কথা ভাবিলেন। হায় পিনাকী, কি কুক্ষণেই এই মানবের জীবনাবর্ত্ত তাঁহার চক্ষুগোচর করিয়াছিলে! কিন্তু যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। শেষ আশাটুকুও শেষ হইয়া আসিতেছে; দণ্ডদ্বয় মধ্যে অমাবস্যা উপস্থিত হইবে! চন্দ্র তখন সূর্য্যাকর প্রণষ্ট এবং স্বয়ং শক্র গৃহাগত হইয়াছেন। সর্ব্বনাশ! আজ ইহাকে কি করিয়া রক্ষা করা যায়।

মিহির ব্যগ্রকণ্ঠে বলিতেছিল, "আমায় রক্ষা করুন, জীবন দান করুন পিতা! নতুবা আমি আত্মহত্যা করিব।"

যোগী ব্যগ্র হইয়া বলিলেন, "চল, আমার কুটীরে চল, সেইখানে—"

বাধা দিয়া মিহির বলিল, "সেখানে আমার বাসনা পূর্ণ হইবে ত?"

"এতদিন কি তোমায় মিথ্যা শিক্ষা দিলাম মিহির! বাসনাবশে পাপে উদ্যত হইলে।"

"প্রাণ যায় পিতা—অসহ্য, তাই—"

"বাসনা এমনই অদম্য তাহা বলি নাই কি? তাই দেবতাকে জগন্ময় বলিয়া শিক্ষা দিয়াছিলাম। এই জন্মে কোন্ ভাবে তাঁহাকে লাভ করিয়া শান্তি লাভ করিবে।"

"পাইয়াছি, আমি তাহাই পাইয়াছি, কিন্তু একবার একবার গুরুদেব, ঐ মুখে একটি কথা শুনিতে চাই।"

সরোষে সন্ন্যাসী বলিলেন "আমি আজই তোমার প্রতিমা চূর্ণ করিব। উহা পাষাণ মাত্র। ঐ রাক্ষসী পাষাণীকে চূর্ণ করিব।"

তখন দলিতফণ কালনাগের ন্যায় মাথা তুলিয়া মিহির গুরুর প্রতি চাহিল। তিনি বুঝিলেন আজ তাহা হইলে তাঁহার নিস্তার নাই।

অনেকক্ষণ কি ভাবিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন, "ভাল, জান কি যে, এই নারীমূর্ত্তি জীবিতা হইলে তুমি সম্পূর্ণ সুখী হইবে।"

স্থির কণ্ঠে মিহির বলিল, "সে সুখের তুলনা নাই গুরুদেব!"

"ভাল তাহাই হইবে। চল।"

মিহির লাফাইয়া উঠিল, বলিল "হইবে, দেবতা, আমার মনের বাঞ্ছা কি পূর্ণ করিবেন?"

"হাঁ, বাহিরে চল।"

আকাশে তখনও ঘনঘোরঘটায় মেঘ, কিন্তু চারি পার্শ্ব পরিষ্কার হইয়া গুহাদ্বার আলোকিত হইয়াছে। পশ্চিম দিগন্তের মেঘশূন্য বক্ষে পারদোজ্জ্বল শুভ্রালোক জ্বলিতেছে। ঊর্দ্ধগত বায়ু মধ্যাকাশের ঘন মেঘরাশি উড়াইয়া লইয়া পূর্ব্বাভিমুখে ছুটিয়াছে।

দুইজনে বাহিরে আসিলেন।

(১০)

সন্ন্যাসী বলিলেন, "তোমার কম্বল মৃগচর্ম্ম আন মিহির!"

মিহির আদেশ পালন করিল। উভয়ে বসিলে সন্ন্যাসী বলিলেন, "কম্বলে দেহাবরণ কর। অত্যন্ত শীতল বায়ু।"

মিহির, হাসিয়া বলিল, "শীত কি প্রভু? বড় উত্তাপ।" বলিয়া কম্বল তুলিয়া গায় দিল।

সন্ন্যাসীর মুখ অতি বিষণ্ণ। তিনি মধ্যে মধ্যে দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতেছিলেন। অনেকক্ষণ পরে বলিলেন "মিহির আমি যাহা করিতেছি তাহার ফল কি জানি না, যদি তোমার কোন অনিষ্ট হয়।"

বাধা দিয়া মিহির বলিল, "অনর্থক এ চিন্তা প্রভু! আমি কোন বিপদেরই ভয় করি না, এই পাষাণীকে জীবিতা না পাইলে আমার প্রাণসংশয়। নতুবা আর কাহাকে ভয়।"

ম্লান হাস্যে সন্ন্যাসী বলিলেন, "এই জীবনেরই ভয় করিতেছ? মিহির জীবন সংশয় বলিয়াই ত এ যাচ্ঞা করিতেছ?"

মিহির অপ্রতিভ হইয়া হাসিল, পরে বলিল "এখন আমার বাসনা পূর্ণ করুন প্রভু! আপনার শ্রীমুখের বাণী ত মিথ্যা হয় না।"

"স্থির হও, হইবে। কিন্তু মিহির, তখন যদি সুখী না হও।"

"সে ভয় আপনি করিবেন না পিতা।"

"ভাল, চক্ষু মুদ্রিত কর।"

সাহ্লাদে মিহির চক্ষু মুদিল।

মুহূর্ত্ত কএক অতীত। সন্ন্যাসী ডাকিয়া বলিলেন, "ওঠ মিহির!"

এতক্ষণ নির্ব্বাক্ ভাবে স্থির থাকিয়া মিহিরের নয়নে জড়তা আসিয়াছিল। সে সহসা মন্ত্রমুগ্ধবৎ চাহিয়া দেখিল, গুরু দণ্ডায়মান। তাঁহার স্বভাবস্থির, সুকোমল জ্যোতিষ্ময় নয়নে যেন ঈষৎ তীব্র কটাক্ষ; নাসারন্ধ্র শ্বাসবিস্ফারিত, হঠাৎ দেখিলে বোধ হয় ক্রুদ্ধ মূর্ত্তি।

মিহির ভীত হইয়া বলিল, "গুরুদেব, কি হইল।"

অতি স্থির স্বরে তিনি উত্তর করিলেন, "কৈ, কি আর হইবে। তোমার রচিত পাষাণমূর্ত্তি জীবিতা হইয়াছে।"

"জীবিতা হইয়াছে?"

"নিশ্চয়!"

মিহির গুরুর চরণে নত হইয়া প্রণাম করিল, বলিল, "ধন্য আমি, সার্থক আপনার শিষ্যত্ব লইয়াছিলাম।"

সন্ন্যাসী কি চিন্তা করিতেছিলেন, উত্তর দিলেন না। মিহির আবার বলিল "তবে দেখি গিয়া প্রভু!"

সন্ন্যাসী অঙ্গুলি প্রসারণ করিয়া বলিলেন, "যাও।"

তাঁহার দিকে সম্মুখ রাখিয়া মিহির পিছাইয়া গেল। ক্রমে ধীরে ধীরে সেই ভাবেই চলিয়া সে কুটীরে প্রবেশ করিল।

(১১)

নিবিড় বৃক্ষলতা বেষ্টিত কুটীরখানি ঈষদান্ধকারময়। ক্বচিৎ লতান্দোলনে চঞ্চল আলোকরেখা গৃহতলস্থ প্রস্তরে নাচিয়া বেড়াইতেছে। দ্বারপার্শ্বেই লম্বিত পার্ব্বত্যলতায় স্তবকে স্তবকে রক্তপুষ্প দুলিতেছে। কখন বায়ুবেগে ঝর ঝর ঝরিয়া পড়িতেছে। বাতাস তাহার মিষ্ট গন্ধ ছড়াইতেছে। দূর হইতে ময়ূরের উচ্চ কেকা রব ধ্বনিত হইতেছে। নিকটের নির্ঝরধারা নববর্ষার বারিপাতে মহা হর্ষে গদ গদ কল কল গান ধরিয়াছে।

মিহির কুটীরে প্রবেশ করিল। সম্মুখে চাহিতে সাহস হয় না, সে কি দেখিবে? সেই দেবী কি সত্যই আজ প্রাণময়ী? না—না—না! গুরুদেব সত্যবাদী। নিশ্চয় এই অঘটন ঘটিয়াছে। তাহার পর মিহির চাহিয়া দেখিল বেদির উপরে চরণ রাখিয়া সেই সুন্দরী উপবিষ্টা। প্রথমে কিছুক্ষণ সে অভিভূত হইল, তাহার সংজ্ঞা লুপ্তপ্রায় হইল, যাহা দেখিতেছে তাহা সত্য কি না সন্দেহ হইল।

সহসা সঙ্গীত-তরলিত বীণাধ্বনিবৎ অতি মধুর স্বরে তাহার জ্ঞানসঞ্চার হইল! প্রতিমা বলিতেছে, "তুমি কে?"

মিহির তাহার চরণতলে আসিয়া জানু পাতিয়া বলিল "কি আজ্ঞা করিতেছ দেবী?"

বেদীর উপর চরণ রাখিয়া সেই সুন্দরী উপবিষ্টা।

মুক্তাদামসজ্জিত সোপানপীঠে বসিয়া সুর-ধুনীর তরঙ্গমালা দর্শন করিব। ডাক তোমার অপ্সরাকণ্ঠ দাসীকে, সে দূরে বসিয়া বাঁশীতে রাগিণী আলাপ করুক। আর তুমি যে বলিয়াছিলে, এখানে অনন্ত বসন্তের রাজ্য, তা ভাল; তোমার মলয়কে বল যে, সে যেন বসন্ত-সন্ধ্যায় নবপ্রস্ফুটিত বনমল্লিকার সুগন্ধ আনিয়া আমার চারি পাশে ঢালিয়া দেয়।"

মিহির নীরবেই থাকিল; প্রতিমা বলিল, "আর তুমি—তুমি এখন আমায় বিরক্ত করিও না,দূরে বসিয়া আমার পানে অনিমেষে চাহিয়া থাক।"

মিহির ধীরে ধীরে তাহার নিকটস্থ হইল। বলিল, "তুমি কি জান না, দেবি, আমি সন্ন্যাসী, আমি দরিদ্র, কোথায় পাইব অমরার ঐশ্বর্য্য।"

"তবে কেন বলিয়াছিলে যে, আমায় স্বর্গের অধিক সৌন্দর্য্যময় স্থানে রাখিবে, মন্দাকিনীর জল, স্বর্গের সুধা অপেক্ষাও সুমিষ্ট বারিধারা পান করাইবে।"

"আবার সেই স্বর "তুমি কে ?"

"আমি কে ? কি বলিব ? কি বলিলে তুমি বুঝিবে যে, আমি কে ? আমি তোমার ভক্ত, আমি তোমার দাস।" মিহিরের স্বর রোধ হইল।

"আমাকে এখানে কে আনিল ?"

"আমি আনিয়াছি।"

"তুমি ? তুমিই আমায় আনিয়াছ, কিন্তু এখানে কেন আনিলে ? এ কোথায় আনিলে ?"

একথার অর্থ মিহির বুঝিল না, নির্ব্বাক্-ভাবে সেই মোহিনীর প্রতি চাহিল। দেখিল তাহার মুখে বিরক্তির চিহ্ন। মিহির নীরব থাকিল! তখন সে আবার বলিল, "চল, আর এখানে কেন ?"

বিনীতভাবে মিহির বলিল, "কোথায় যাইবে ?"

"কেন মর্ত্ত্য অলকার স্বর্গোদ্যানে চল। আমি এখন

"সে সৌন্দর্য্য! আমার হৃদয়ে, সে—অমৃত,হায়, সে অমৃত যে আমার সমস্ত জীবনের সাগরমন্থন-করা অমৃত। কেমন করিয়া তাহা তোমায় পান করাইব, তুমি তাহা যদি না অনুভব কর ?"

"তবে কি তুমি আমাকে এ ক্ষুদ্র কুটীরেই রাখিবে ?"

মিহির নীরব। প্রতিমা বলিল, "অসম্ভব, আমি ত তাহা জানিতাম না—কেন তুমি এত কষ্ট দিবার জন্য আমাকে এখানে আনিলে ?"

* * * *

সমস্ত রাত্রি সেই জীবমুক্তা পাষাণী পাষাণশয্যায় কাঁদিল। মিহির খুঁজিয়া আনিয়া পুষ্পশয্যা বিছাইয়া দিয়াছিল। তাহা তাহার মনোমত হইল না। সে অমল-ধবল, কোমল শয্যা চায়; সে রত্নসিংহাসন, চামরব্যজন, মণিদীপ, বংশী-গীত চায়। দরিদ্র মিহির তাহা কোথায়

পাইবে। অথচ সে স্তবগানে নিত্য তাহাকে ঐ সকল কথাই বলিয়া আসিয়াছে।

তাহার আনীত ফলমূলবারি সে স্পর্শও করিল না। নির্ম্মল স্বাদু জল পান করিল বটে, কিন্তু সুগন্ধ নহে বলিয়া মুখ বিকৃত করিল। তখন মিহির বুঝিল সে সর্ব্বনাশ করিয়াছে! পাষাণে প্রাণ আনিয়াছে বটে, কিন্তু হৃদয় কৈ? তাহার ব্যথাভরা প্রাণের সহিত সহানুভূতিময় ব্যথাময় হৃদয় কৈ? সংসারে সমস্ত ঐশ্বর্য্যসুখ একটি হৃদয়ের পার্শ্বে ক্ষুদ্র হইয়া যায়, একটি প্রাণ পাইয়া সব পাইলাম বোধ করে। এ প্রণয়তৃষিত অন্তর কে পাষাণকে দিতে পারে? কে বুঝাইতে পারে যে, সম্মুখস্থ প্রাণটী তাঁহার সুখের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছে? পাষাণ কেবল পূজা লইয়াছে—প্রাণ ত লয় নাই! এ আর কি করিয়া তাহাকে দিবে?—মিহির অন্তরে অন্তরে দারুণ ব্যথা বোধ করিল।

ঊষার শান্ত মুহূর্ত্তে প্রতিমা একবার চক্ষু মুদিল; মিহির লক্ষ্য করিয়া দেখিল সে নিদ্রিতা। তখন সে ছুটিয়া বাহিরে আসিল! পাণ্ডুরালোকে পর্ব্বতগাত্র কোমল শ্যামলাভ, শৈবাল-পত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তুষারকণা সেই মৃদু আলোক লক্ষ্য করিয়া যেন পূর্ব্বগগনে চাহিয়া আছে!—হিমসিক্ত তরুলতা সকলেই যেন একদৃষ্টে পূর্ব্বাকাশ লক্ষ্য করিয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া আছে! সকলেরই মুখে এক কোমল মৃদু রক্ত আলোকজ্যোতিঃ। সমস্ত রজনীর শ্রমক্লিষ্ট বিনিদ্র মিহির একদৃষ্টে সেই সকল চাহিয়া দেখিল! সকলেই যাহার প্রতি বিশ্বাসী নির্ভরশীল স্নেহপ্রার্থী, সেও কেন তাঁহারই দয়া যাচ্ঞা করিল না। যাঁহার দয়ায় এই বিশাল সৃষ্টি জীবনীযুক্ত, স্নেহপালিত, পুষ্প-ফল-হাস্যোল্লাসময়, সেও কেন তাঁহারই দয়ায় আত্মসমর্পণ করিল না!—পতঙ্গের বহ্নি মুখ-প্রবেশের ন্যায় সে এ কোথায় চলিল!—

জগৎময় কি তৃপ্তি, কি শান্তি, কি সুন্দর প্রেমপ্রবণতা! সে এ সকল বিসর্জ্জন দিয়া এ কি লাভ করিল। দৈহিক তৃপ্তি! ছি! ছি!

অতিদূরে কেদার-মন্দিরের উচ্চ চূড়া। মিহির করযোড়ে প্রণাম করিল, বলিল, "জগৎপিতা! এ অধমও কি তোমারই সন্তান নয়?"

এমন সময় কুটীরে অস্ফুট চীৎকার শোনা গেল; মিহির দৌড়িয়া সেই দিকে চলিল।

পাষাণ-বালিকা দুঃস্বপ্ন দেখিয়া জাগিয়া কাঁদিতেছে। তাহাকে দেখিয়া বলিল, "কেন তুমি আমায় এখানে আনিলে? আমি যে বড় সুখে ছিলাম সেখানে।"

ধীরস্বরে মিহির বলিল, "কোথায় ছিলে?"

"জানি না, কোথায় ছিলাম। সেখানে শুধু পুষ্পগন্ধ,—সঙ্গীতের স্বর নিত্য আমার ঘুম ভাঙ্গাইত,—কে সর্ব্বদা আমায় তাহার পূজা উপহার দিত। সে কি সেবা! দেবতাও বুঝি তাহা পায় না!—সে কি স্থান! সেখানে কত সুখ!"

মিহির বলিল, "তাহা আমারই অন্তর।"

"তবে আমায় বাহিরে আনিলে কেন?"

ভুল করিয়াছি—!—তুমি বুঝিলে না যে—"

বাধা দিয়া প্রতিমা বলিল, "না আমি বুঝিতে চাই না,—তুমি আবার আমায় সেইখানে পাঠাইয়া দাও!"

নতমুখে মিহির বলিল, "তাহাই হইবে।"

উৎসুকভাবে সে বলিল, "এখনই"।

মিহির তাহার প্রতি একবার চাহিল, বলিল, "এখনই! কিন্তু তাহার পূর্ব্বে একবার আমার হাতের নৈবেদ্য গ্রহণ কর দেবি! এই ফল একটি মুখে দাও, এই দুগ্ধ একটু পান কর। একবার আমার দিকে হাসি মুখে চাও।"

ব্যগ্রভাবে পাষাণী বলিল,—"না, না, আমি ও সকল কিছুই করিব না, আগে তুমি আমায় সেইখানে লইয়া চল!—" দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া মিহির বলিল, "তাহাই হইবে"।—

(১১)

প্রভাতে নবারুণোদয়ে গঙ্গাস্নানান্তে—সন্ন্যাসী নির্ঝর তীরে বসিয়া উপাস্যদেবের অর্চ্চনা করিতেছিলেন। প্রোথিত ত্রিশূলে সূর্য্যকিরণ জ্বলিতেছিল। সদ্যধৌত স্তূপাকার বিল্বদল ও বনকুসুমের সুমিষ্ট গন্ধ সে স্থানের বায়ুকে ভক্তিভারার্দ্র করিয়া তুলিয়াছিল। মিহির সেই পিঙ্গলজটা, গঙ্গামৃত্তিকা চর্চ্চিত দেহ, শীর্ণ গৌরবর্ণ সন্ন্যাসীর সম্মুখে দণ্ডায়মান। সে তাহার সম্মুখে ধূম্র মেঘরেখাচ্ছন্ন, স্বর্ণ-পিঙ্গল জ্যোতিঃ-বিস্তারী বালসূর্য্যের সাদৃশ্য দেখিল।

ধ্যানান্তে সন্ন্যাসী চক্ষু মেলিলেন।

শিষ্য তাঁহাকে চাহিতে দেখিয়া প্রণত হইল। করপুটস্থ পুষ্পাঞ্জলি দেবীর মস্তকে দিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন, "প্রভাতে কি প্রয়োজন বৎস ?"

মিহিরের দুই চক্ষু বহিয়া জলধারা গড়াইল ; সে উত্তর করিতে পারিল না। মৃদু হাসিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন, "তোমার বাসনা ত পূর্ণ হইয়াছে, তবে রোদন কেন ?"

"আপনি অন্তর্যামী—" বলিতে বলিতে মিহিরের স্বর আবার রুদ্ধ হইয়া গেল। অশ্রু বৃদ্ধি হইল।

সন্ন্যাসী বলিলেন, "বৎস কাঁদিও না—এ বাসনাবহ্নির জ্বালা এইরূপই প্রবল। অশ্রুজলে ও চিন্তানল ধুইয়া ফেল। কি হইয়াছে বল।"

"পিতা! আমি ভুল করিয়াছি।"

"কি ভুল ?"

তখন মিহির গত রজনীর সমস্ত বিবরণ এক এক করিয়া বলিল। শুনিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন, "তাহা আমি বুঝিয়াছি, পাষাণে প্রাণ দিলে তাহা ঐরূপই হয় ; বিশেষতঃ এ পর্য্যন্ত তোমার ধ্যান ঐ আসক্তি-ময় ভাবেই শেষ হইয়াছে, তাই ও মানসরূপিণী এত ভোগাসক্তা তুমি—জগৎ-হিতৈষিণী দয়াময়ীকে ত ডাক নাই!"

মিহির বলিল, "এখন উপায় প্রভু, এ কষ্ট ত আমার অসহ্য"।

"তুমি চাও কি ?"—

"আমি চাই পূর্ব্বে যাহা ছিল তাহাই হউক।—"

"পাষাণী আবার পাষাণ হউক ?"

"হাঁ প্রভু।"

"ভাবিয়া দেখ।"

"হাঁ দেখিয়াছি, উহাকে সন্তুষ্ট করা আমার সাধ্য নয়, অনর্থক তাহাকে যন্ত্রণা দিব কেন? নিজের সুখের জন্য—" বলিতে বলিতে মিহির আবার কাঁদিল।

তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন, "কাঁদিও না মিহির, ইহা তোমার জীবনের পরীক্ষা। এই অগ্নিশিখায় দগ্ধ হইয়া তুমি আজ পরিশুদ্ধ হইলে,—আমি আশা করি এইবার তুমি সত্যের নির্ম্মল মূর্ত্তি দেখিবে।"

মিহির উত্তর করিল না। সন্ন্যাসী বলিলেন, "কবে তুমি এ পরিবর্ত্তন চাও। আজ ?"

"আজ কি প্রভু, এখনই!"

সন্ন্যাসী হাসিলেন, বলিলেন, "ভাল, দেবতাকে প্রণাম কর।"

মিহির নত হইয়া শিবমূর্ত্তিকে প্রণাম করিল। সন্ন্যাসী তাহার মস্তক স্পর্শ করিয়া বলিলেন, "শান্তিজল লও বৎস!"—

মিহির মস্তক পাতিল, সন্ন্যাসী তাহার সর্ব্বাঙ্গে কমণ্ডলুর জল সেচন করিলেন।—

তখন শীর্ণ অঙ্গুলি তাহার ললাটাগ্রে স্পর্শ করিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, "ফিরিয়া যাও।"

মিহির কম্পিতস্বরে বলিল, "একি গুরুদেব, এ আমার কি হইল ? শরীর এত ক্লান্ত বোধ হয় কেন—"

"যে মোহে এত দিন মুগ্ধ ছিলে তাহা দূর হইতেছে—তাই আপনার বল অনুভব করিতেছ! পাষাণী যে তোমার সমস্ত শোণিত পান করিয়াছে, বৎস!"

মিহির সজলনয়নে বলিল, "তবু ইহার নাম ভোগাসক্তি, প্রভু ?"—

'হাঁ, কিন্তু বৃথানুশোচনা করিও না—গৃহে যাও, আমিও পূজান্তে যাইতেছি—"

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া মিহির চলিয়া গেল।

(১৩)

শ্বেত রৌদ্র চারিদিকে হাসিতেছে। মিহিরের কুটীরের কৃষ্ণ-পাষাণ-বক্ষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দুরূপে রৌদ্রচূর্ণ ; জ্যোৎস্না রাত্রে আকাশবক্ষে তারা খেলা করিতেছে। লতাগুচ্ছ সরাইয়া কম্পিতহৃদয় মিহির কুটীরে প্রবেশ করিল।

পাষাণছবি পূর্ব্ববৎ। সেই মর্ম্মর-প্রতিমা—সেই স্বর্ণমুক্তাময়ী অনুপমা সুন্দরী প্রতিমা পূর্ব্ববৎ পাষাণপীঠে অচঞ্চলা।

পত্রচ্যুত দুই এক বিন্দু তুষার তাহার কেশে পড়িয়াছে। নব সূর্য্যালোকে তাহা উজ্জ্বল। কএকটি শুষ্কপত্র তাহার পদতলে উড়িয়া পড়িয়াছে। অন্য দিন মিহির তাহা তুলিয়া ফেলে, আজ তাহা হয় নাই। ইহাই নূতন, নতুবা সেই মূর্ত্তি অবিকল পূর্ব্ববৎ। গত রজনীর ঘটনা মিহির স্বপ্ন মনে করিল।

সে সবলে সেই পাষাণমূর্ত্তিকে টানিল।

হঠাৎ মিহির চমকিয়া উঠিল। সে কি ভাবিতেছে! সে যে দেবতার ধ্যান করিয়া এ মূর্ত্তি রচনা করিয়াছিল। এ যে তাহার পূজিতা প্রতিমা।

মিহির উঠিয়া পাষাণ-মূর্ত্তির চরণে মাথা রাখিয়া প্রণাম করিল। প্রথমতঃ দেবী বোধে কিছুক্ষণ ভক্তিভাবে নিস্তব্ধ থাকিল। তাহার পরে আবার একটু ক্ষুদ্র অভিমান আসিল। নয়নে আবার অশ্রু দেখা দিল। এত সেবা অগ্রাহ্য করিলি। পাষাণি, তুই পাষাণীই বটে! কে তোকে দেবী বলে?

খানিকক্ষণ সে গুমরিয়া গুমরিয়া কাঁদিল। আবার মুখ তুলিয়া পাষাণীর দিকে চাহিয়া বলিল, "একবার একটি ফল মুখে দিলে না। একটিও মিষ্ট কথা বলিলে না। এত কি অপরাধ করিয়াছিলাম?"

বলিতে বলিতে আবার সে সচেতন হইল। কি ভুল, সে কাহাকে এ কথা বলিতেছে। প্রস্তর কি বেদনা বুঝে? কিন্তু দেবী কে বলিল? এতদিন সে কাহার উদ্দেশে এ পাষাণের পূজা করিয়াছে? কে তিনি? তিনিও কেন তাহার মর্ম্মবেদনায় কর্ণপাত করিলেন না?

"হে অনন্ত শক্তিধর! হে সুন্দর! সে যে তোমারই নারী-প্রকৃতিকে তোমার পাষাণ প্রতিমার অধিষ্ঠাত্রী ভাবিত। সে দয়াময়ী, স্নেহময়ী, মঙ্গলময়ী দেবী কৈ? আমার কষ্ট কেন তাঁহার প্রাণ-স্পর্শ করিল না?"

আবার সে কাঁদিতে লাগিল। বেদীতলে লুটাইয়া লুটাইয়া কাঁদিল। উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল, "দেখিলে না, বুঝিলে না, কি কষ্টে তোমায় আমি এখানে আনিয়াছিলাম। একবার আমার প্রতি চাহিলে না, একটি কথাও কহিলে না?"

সে তখন উন্মত্তের মত প্রতিমার চরণ ধরিয়া আকর্ষণ করিতে লাগিল।

"একবার এস, একবার চাহ, ওগো একটি বার দেখ

কিন্তু তাহা ত স্বপ্ন নয়।

মিহির দেখিল, গত রজনীতে সে যে শয্যা-রচনা করিয়াছিল তাহা এখনও ছিন্নভিন্নভাবে, সম্মুখে পত্রপুটে তাহার সযত্ন-আহরিত মিষ্টফল পড়িয়া আছে। সবই আছে, তাহার অতৃপ্ত বাসনারূপিণী সেই পাষাণীই আবার পাষাণ হইয়া গিয়াছে! মিহির আর ভাবিতে পারিল না। প্রতিমার পদতলে শয়ন করিয়া তাহার প্রতি চাহিয়া রহিল।

কি সুন্দর মূর্ত্তি! সে কি মাধুরীরই সন্ধান পাইয়াছিল। কি মূর্ত্তিই রচনা করিয়াছিল। কিন্তু হায় কি পাষাণহৃদয়! অথবা নারী-প্রকৃতিই এমনই দুর্জ্জেয় অবোধ্য, রহস্যময়? সংসারে মানবী-রূপা দানবীরা কি এইরূপেই নরশোণিত পান করিয়া থাকে।

নব বসন্ত।

অনসূয়া। * * চিত্ত পরিচএণ দাণিং দে অঙ্গেসু
আহরণ বিণিওঅং করেম্হ।
(অভিজ্ঞান শকুন্তলম, ৪ অ,)

K. V. SEYNE & BROS.

মুক্তিপণ।

(১)

ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে সীমান্তবাসী দুর্দ্দান্ত পাঠান জাতির সহিত ইংরেজের দাঙ্গাহাঙ্গামা সর্ব্বদা লাগিয়াই আছে। কএক বৎসর পূর্ব্বে আফ্রিদী জাতির সহিত ইংরেজের যে যুদ্ধ হইয়াছিল, সে কথা পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে। সেনাপতি সার বিণ্ডন ব্লডের অধীনে যে সকল ইংরেজ সেনানায়ক আফ্রিদীগণের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কর্ণেল লীর নাম উল্লেখযোগ্য। কর্ণেল লীর একমাত্র কন্যা মিস্ ইসোবেল লী লড়াই দেখিবার জন্য সীমান্তে পিতার নিকট গমন করিয়াছিলেন।

সে বৎসর শীতকালে মহাসমারোহে আফ্রিদী-যুদ্ধ চলিতেছিল; ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথমে ২য় সংখ্যক বেঙ্গল ল্যান্সার্স (2, Bengal Lancers) সৈন্যদল সুবিখ্যাত খাইবার পাশের পশ্চিমাংশে—সীমান্ত স্তম্ভের (Frontier post) সন্নিকটে শিবির-সংস্থাপন করিয়াছিল; কর্ণেল লী এই সেনাদলের অধিনায়ক ছিলেন। তিনি একদিন প্রভাতে তাঁহার তাম্বুতে বসিয়া লিখিতেছিলেন, এমন সময় তাঁহার প্রাণাধিকা কন্যা সুন্দরী ইসোবেল হাসিতে হাসিতে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, "বাবা, কি সুন্দর প্রভাত! পার্ব্বত্য প্রকৃতি আজ বড় চমৎকার দেখাইতেছে; আমি একটু ঘুরিয়া আসি।"

কর্ণেল লী লিখিতে লিখিতে মুখ তুলিয়া কন্যার মুখের দিকে চাহিলেন। ইসোবেল উনিশ বৎসরের মেয়ে; প্রভাত-কমলের মত সুন্দর তাঁহার মুখ, স্বর্ণাভ কেশগুলি সূক্ষ্ম পশমের মত সুকোমল, তাঁহার হাসি বড় মিষ্ট, আর তাঁহার প্রকৃতি বড়ই চঞ্চল। বাপের আদরিণী মেয়ে—কর্ণেল তাঁহার কোনও আব্দার প্রায়ই অগ্রাহ্য করিতেন না। আজও তাঁহার ইচ্ছায় বাধা দিতে কর্ণেলের প্রবৃত্তি হইল না, কিন্তু দুর্দ্দমনীয় আফ্রিদীগণ সেনা-নিবাসের চারিদিকে প্রচ্ছন্নভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে তাহা তিনি জানিতেন; ইসোবেল বেড়াইতে বেড়াইতে যদি দূরে গিয়া পড়েন, তাহা হইলে বিপদের সম্ভাবনা আছে বুঝিয়া তিনি বলিলেন, "বেল, এখানে ইচ্ছামত ভ্রমণ করা নিরাপদ নহে; যদি একান্তই বেড়াইবার ইচ্ছা হইয়া থাকে তবে একটু ঘুরিয়া এস, কিন্তু সাবধান, লাইনের বাহিরে যাইও না।"

ইসোবেল হাসিয়া বলিলেন, "ভয় নাই বাবা, আমি দূরে যাইব না। আমি কি তোমার এতই বোকা মেয়ে যে, ইচ্ছা করিয়া বিপদে পড়িব! আমি 'হাতী সাহেব'কে খানকতক বিস্কুট খাওয়াইয়া আসি।"

'হাতী সাহেব' Indus Transport Trainএর রসদবাহী হস্তী, যেন ঐরাবতের বংশধর; এরূপ বৃহৎ হস্তী সচরাচর দেখা যায় না। গজরাজের দেহ ১১ফিট ৪ইঞ্চি উচ্চ, কাল মেঘের মত তাহার রঙ্, নামটিও খুব জমকাল—সায়েন-সা। বিস্কুট ভক্ষণে সায়েনসার বড় আনন্দ। ইংরেজ সৈন্যগণের অনেকেই আমোদ দেখিবার জন্য স্বহস্তে তাহাকে বিস্কুট খাওয়াইত। ইসোবেলের ইচ্ছা হইয়াছিল তাহাকে খানকত বিস্কুট খাওয়াইয়া আসেন। ইসোবেলের মা পাকা ঘোড়সোয়ার ছিলেন, গৃহপালিত পশুপক্ষীকে তিনি বড় আদর-যত্ন করিতেন; কএক বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। কন্যার কথা শুনিয়া পরলোকগতা পত্নীর গুণের কথা কর্ণেলের মনে পড়িল; তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া একটু হাসিলেন, সে হাসি বিষাদমাখা। তাহার পর তিনি তাঁহার কার্য্যে পুনর্ব্বার মনঃসংযোগ করিলেন। চঞ্চলা ইসোবেল কুরঙ্গিণীর ন্যায় নাচিতে নাচিতে সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন।

ইসোবেল অশ্বারোহণে তাম্বুর বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার পিতার একটি বন্ধু প্রাতর্ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। এই সাহেবটির নাম মিঃ স্পেন্সার।—মিঃ স্পেন্সার উত্তর পশ্চিম সীমান্ত জেলার বিধাতৃপুরুষ- Political officer.

মিঃ স্পেন্সার ইসোবেলকে একাকিনী ভ্রমণে বাহির হইতে দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন, বলিলেন, "এমন জায়গায় কি একাকী বেড়াইতে আছে? গতরাত্রে একদল আফ্রিদী আমাদের কাছে দরবার করিতে আসিয়াছে, নিকটেই তাহারা আড্ডা লইয়াছে; এ অবস্থায় তোমাকে একলা যাইতে দিতে পারি না, চল, আমিও তোমার সঙ্গে যাই।"

ইসোবেল একথা শুনিয়া ভীত হওয়া দূরের কথা বরং

ভারি খুসী হইলেন, সোৎসাহে বলিলেন, 'আফ্রিদী আসিয়াছে? বটে!—চলুন, তাহাদিগকে দেখিয়া আসি। আমি বিলাতের কোনও কাগজে আফ্রিদীদের সম্বন্ধে একটা গল্প লিখিব। তাহা পড়িয়া বিলাতের লোক খুব তারিফ করিবে। খ্যাতিলাভের এমন সহজ উপায় আর কি আছে বলুন।"

মিঃ স্পেন্সার বলিলেন, 'হাঁ, ভাল করিয়া লিখিতে পারিলে বিলাতের পাঠকগণের নিকট ইহা একটি নূতন জিনিস হইবে বটে, লোকে রোমাঞ্চকর উপন্যাসের মত রুদ্ধ নিঃশ্বাসে, মহা আগ্রহে তাহা পাঠ করিবে। আফ্রিদীদের সম্বন্ধে তোমার অভিজ্ঞতা লাভের চমৎকার সুযোগ উপস্থিত। আটজন আফ্রিদীর চারিদিকে তোমার পিতার রেজিমেন্টের ছয়শত সৈন্য সজ্জিত রহিয়াছে। এমন সুযোগ ভিন্ন অন্য সময় আফ্রিদীদের দিকে ফিরিয়াও চাহিও না।"

ইসোবেল মিঃ স্পেন্সারের সহিত সায়েন সার নিকট উপস্থিত হইলেন।

ইসোবেল মিঃ স্পেন্সারের সহিত সায়েন সার নিকট উপস্থিত হইলেন; আফ্রিদীরাও তখন সেখানে আসিয়া 'হাতী সাহেব'কে দেখিতেছিল। দুগাছি অনতিদীর্ঘ রজ্জু দ্বারা হস্তীর পশ্চাতের পদদ্বয় দুইটি খোঁটায় আবদ্ধ ছিল। আর সে, মোটা মোটা ঘাসের আঁটি শুঁড়ে তুলিয়া মুখে পুরিতেছিল। আফ্রিদী-দূতেরা মিঃ স্পেন্সারকে দেখিয়া তাঁহার সহিত আলাপ আরম্ভ করিল। যে আফ্রিদীসর্দ্দার এই দূতদলের দলপতি হইয়া আসিয়াছিল—সে-ই তাহাদের অভিযোগের কথা বলিতেছিল।

এই আফ্রিদীসর্দ্দারের নাম চামরু। সীমান্তের অধিবাসিগণ চামরুর নামে হাড়ে কাঁপিত। পরস্বাপহরণে লুণ্ঠনে, নরহত্যায় চামরুর কুণ্ঠা ছিল না; সীমান্ত-প্রদেশবাসী কৃষকগণের ক্ষেত্রে শস্য পাকিলে, সে সদলবলে শস্যক্ষেত্রে আপতিত হইয়া সমস্ত শস্য কাটিয়া লইয়া যাইত; গ্রামবাসীরা বাধা দিতে আসিলে তাহাদের শোণিতে শস্যক্ষেত্র প্লাবিত করিত। ইংরেজের শিবির হইতে বন্দুক চুরী করিতে তাহার মত ওস্তাদ সে অঞ্চলে দ্বিতীয় ছিল না।
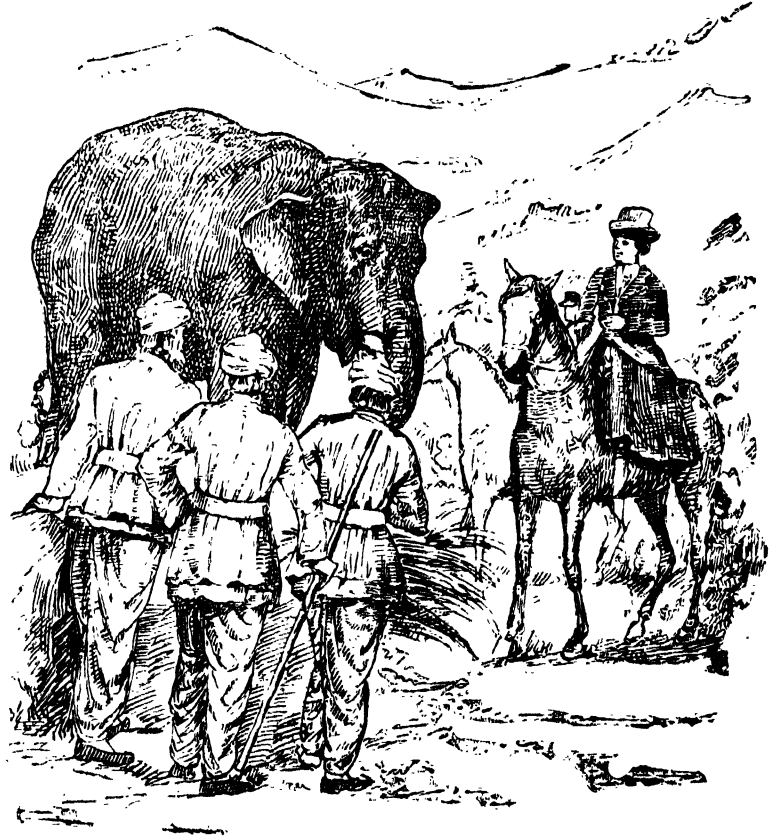
চামরুর সঙ্গে আরও সাতজন মাতব্বর আফ্রিদী দৌত্যকার্য্যে আসিয়াছিল, তাহাদের সকলেই বলবান্ যুবক, প্রত্যেকেরই দেহ অসুরের মত, তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা যে অধিক জোয়ান, তাহার বয়স সকলের অপেক্ষা অল্প—বোধ হয় ত্রিশ বৎসরের অধিক নহে। তাহার নাম আলিবাগ; আলিবাগ চামরু সর্দ্দারের একমাত্র পুত্র।—আলিবাগ ব্যাঘ্রের ন্যায় হিংস্র, আবার তাহারই মত শোণিতলোলুপ। ইংরেজ জাতিকে সে অত্যন্ত ঘৃণা করিত।

মিস্ ইসোবেল আফ্রিদীদের দিকে না চাহিয়া হাতীর সঙ্গে খেলা করিতে লাগিলেন, তাঁহার বামহস্তে অশ্বের বল্গা, দক্ষিণহস্তে চিনি মাখান 'টোষ্ট' করা পাঁউরুটি; তিনি টুকরা টুকরা পাঁউরুটি হাতীর সম্মুখে ধরিলে, সে তাহা তাঁহার হাত হইতে তুলিয়া লইয়া মুখে নিক্ষেপ করিতে

লাগিল। পাঁউরুটিখানি ফুরাইলে, মিস্ ইসোবেল সহাস্যে তাঁহার শুভ্র হাতখানি ঘুরাইয়া বলিলেন, "আর নাই! এখন কি খাইবি?"

নিরেট বোকাকে লোকে হস্তীমূর্খ বলে, কিন্তু হস্তী সম্বন্ধে এ কথা খাটে না, কারণ হাতীর মত বুদ্ধিমান জন্তু অল্পই আছে; সায়েন সার বুদ্ধি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ছিল, সে ইসোবেলের 'চালাকী' বুঝিতে পারিল, এবং শুঁড় বাড়াইয়া তাঁহার পকেটে খানাতল্লাসী আরম্ভ করিল! পকেটে কএকখানি বিস্কুট ছিল, সে তাহা বাহির করিয়া লইয়া বদনে নিক্ষেপ করিল। ইসোবেল হাসিয়া বলিলেন, "চোর!"—তাহার পর তাহার শুঁড়ে আদর করিয়া মৃদু মুষ্ট্যাঘাত করিলেন। সায়েন সা শুঁড় তুলিয়া ফোঁৎ করিয়া নাক ঝাড়িল, সেই শব্দে ইসোবেলের ঘোড়া ভয় পাইয়া লাফাইয়া উঠিল। হাতীর নাকের জলে তাঁহার পোষাক ভিজিয়া গেল।

তখন মিঃ স্পেন্সারের সহিত চামরুর তর্কবিতর্ক চলিতেছিল। সাহেবের মুখে দুই একটি অপমানসূচক কথা শুনিয়া সে অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল; তাহার চীৎকারে আকৃষ্ট হইয়া ইসোবেল সেইদিকে চাহিলেন; দেখিলেন, চামরুর ভাঁটার মত গোল চক্ষু দু'টি রাগে রক্তবর্ণ হইয়াছে; তাহার বিকট মুখভঙ্গি দেখিয়া ইসোবেলের মনে আতঙ্কের সঞ্চার হইল। ভয়ে তাঁহার মুখ শুকাইয়া গেল।

ইসোবেলকে ভীত দেখিয়া মিঃ স্পেন্সার নির্ব্বাক্ হইলেন, এবং তাঁহাকে লইয়া সেই স্থান ত্যাগ করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহাকে তাঁহার ঘোড়ার পিঠে তুলিয়া দিলেন।

ইসোবেল স্পেন্সারের করতলে পদস্থাপন করিয়া এক লম্ফে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়াছেন, এমন সময় চামরু তাহার কুর্ত্তির ভিতর হইতে একখানি তীক্ষ্ণধার বক্র ছুরি বাহির করিল, এবং বিদ্যুদ্বেগে ইসোবেলের অশ্বের পশ্চাতে উপস্থিত হইয়া, তাহার পশ্চাদ্ভাগে সেই ছুরি সজোরে বিদ্ধ করিল। ছুরির তীক্ষ্ণফলা দেহে বিদ্ধ হইবামাত্র অশ্ব যন্ত্রণায় অধীর হইয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইল, এবং পদাঘাতে পার্শ্বস্থিত স্পেন্সারকে ভূতলশায়ী করিয়া সবেগে ছুটিয়া চলিল। ইসোবেল পড়িতে পড়িতে কোনও প্রকারে সাম্‌লাইয়া লইলেন; অশ্বারোহণ-বিদ্যায় অনেক পুরুষ অপেক্ষা তাঁহার অধিক পারদর্শিতা ছিল।

সায়েন সা অদূরে দাঁড়াইয়া চামরুর কাজ দেখিয়াছিল, চামরু তাহার কিছু দূরে ছিল; সায়েন সা সবেগে কএক গজ অগ্রসর হইল; তাহার পশ্চাতের উভয় পদ যে রজ্জুতে আবদ্ধ ছিল, তাহা স্থূল হইলেও সেই আকর্ষণে জীর্ণ সূত্রের ন্যায় ছিন্ন হইল। সায়েন সা চামরুর সম্মুখে আসিয়া তাহার বিরাট শুণ্ড মস্তকের উপর উত্তোলিত করিয়া তদ্দ্বারা চামরুর মস্তকে সবেগে আঘাত করিল। সেই আঘাতে চামরুর মস্তক চূর্ণ হইল; যেন লোহার হাতুড়ীর প্রচণ্ড আঘাতে তাহার

সায়েন সা চামরুর সম্মুখে আসিয়া তাহার বিরাট শুণ্ড মস্তকের উপর উত্তোলিত করিয়া তদ্দ্বারা চামরুর মস্তকে সবেগে আঘাত করিল।

মাথার খুলি ভাঙ্গিয়া গেল। চক্ষুর নিমিষে এই কাণ্ড ঘটিল!

দলপতিকে এইভাবে নিহত হইতে দেখিয়া তাহার পুত্র ও সহচরগণ ক্রোধে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিল; স্পেন্‌সারকে ধরিতে পারিলে তাহারা সেইস্থানেই তাঁহাকে হত্যা করিত, কিন্তু স্পেন্‌সার পূর্ব্বেই অশ্বারোহণে ইসোবেলের অনুসরণ করিয়াছিলেন।—অগত্যা বৈর-নির্য্যাতনে অসমর্থ হইয়া আফ্রিদীরা নিষ্ফল আক্রোশে গর্জ্জন করিতে লাগিল এবং দলপতির মৃতদেহ একটি গালিয়ায় পুরিয়া লইয়া গিরি অন্তরালে প্রস্থান করিল। তাহাদের ধারণা হইল, স্পেন্‌সারের ইঙ্গিতেই হাতী তাহাদের সর্দ্দারকে হত্যা করিয়াছে। তাহারা প্রতিজ্ঞা করিল—একদিন এই অত্যাচারের প্রতিশোধ লইবে।

(২)

মিস্ ইসোবেল বহু চেষ্টায় আহত অশ্বকে সংযত করিয়া নিরাপদে শিবিরে উপস্থিত হইলেন। অল্পক্ষণ পরে সায়েন সার মাহুতের নিকট এই হত্যাকাণ্ডের কাহিনী শ্রবণ করিয়া কর্ণেল লী অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন। অতঃপর কি কর্ত্তব্য, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া কর্ণেল বন্ধুগণের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন।

২য় সংখ্যক বেঙ্গল ল্যান্সার্শ সৈন্যদলের রিসালদার মেজর সর্দ্দার বাহাদুর মহম্মদ খাঁ নামক পঞ্জাবী মুসলমান সেনানী কর্ণেল লীর অধীনে আফ্রিদী যুদ্ধে আসিয়াছিলেন, মহম্মদ খাঁ সাহসী বীরপুরুষ, তিনি অনেকবার ঘোর সঙ্কটে কর্ণেল লীর প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া লী তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন, কঠিন সমস্যায় তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। মহম্মদ খাঁ আফ্রিদীদের ভাল রকমই চিনিতেন, তিনি বলিলেন, "হুজুর, আফ্রিদীরা নানাভাবে আপনাকে বিপন্ন করিতে চেষ্টা করিবে; মিস্ সাহেবকেই উহারা এই অনর্থের মূল মনে করিয়া তাঁহার উপর রাগিয়া আছে; উহারা কোনও সুযোগে তাঁহার প্রতি অত্যাচার করিতে পারে। আমার বিবেচনায় মিস্ সাহেবকে আর এখানে রাখা সঙ্গত নহে; আপনি তাঁহাকে কতকগুলি প্রহরীর হেফাজাতে শিমলায় পাঠাইবার ব্যবস্থা করুন।"

মিঃ স্পেন্‌সার ও কর্ণেলের বন্ধু কাপ্তেন রেজিলাণ্ড ওয়েন (Captain Reginald Wayne) এই প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন। কর্ণেল লী এই পরামর্শই সঙ্গত মনে করিলেন।

কিন্তু ইসোবেল বাঁকিয়া বসিলেন। পিতার প্রস্তাব শুনিয়া তিনি অশ্রুপূর্ণ নেত্রে বলিলেন, "আমি অল্পদিন হইল তোমার কাছে আসিয়াছি, এখানে আমি বেশ আছি; পৃথিবীতে তুমি ভিন্ন আমার আপনার বলিতে আর কেউ নাই, মা বাঁচিয়া থাকিলে তিনি আমাকে কখনও এত শীঘ্র চলিয়া যাইতে বলিতেন না। যদি আমাকে শিমলাতেই যাইতে হয় ত, আমি এ মাসে কোন মতেই যাইব না, আমাকে মার্চ্চ মাসের শেষে সেখানে পাঠাইও।—এত সৈন্য, এত অস্ত্রশস্ত্র লইয়া যুদ্ধ করিতে আসিয়াছ, তবু আফ্রিদীগের ভয়ে অস্থির হইয়া উঠিয়াছ! লোকে বলিবে কি?"

কর্ণেল লী কন্যার আবদার অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি তাঁহাকে নিজের কাছেই রাখিলেন; কিন্তু খুব সতর্কভাবে বাস করিতে লাগিলেন। এই ঘটনার পর তিনি ইসোবেলকে একাকিনী কোথাও যাইতে দিতেন না!

একমাস চলিয়া গেল। সেই দুর্গম পার্ব্বত্য প্রদেশেও শীতের প্রভাব একটু একটু করিয়া কমিতে লাগিল। মধ্যাহ্নের রৌদ্রে পাহাড় উত্তপ্ত হওয়ায় কুচ কাওয়াজের সময় পরিবর্ত্তিত হইল। প্রত্যুষে 'প্যারেডের' সময় নির্দ্দিষ্ট হইল।

মার্চ্চমাসের একদিন প্রভাতে—'প্যারেড্' আরম্ভ হইবার কিছু পূর্ব্বে ইসোবেল প্রাতর্ভ্রমণে বাহির হইলেন; সিনিয়র সব্‌অলটার্ণ মন্‌রো (Senior Subaltern Monroe) সাহেব ইসোবেলের দেহরক্ষীরূপে অশ্বারোহণে তাঁহার সঙ্গে চলিলেন। উভয়ে আটক রোডের (Attock Road) দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলেন।

এই পথটি বেশ প্রশস্ত ও কতকটা সমতল। পথের দুই পাশের বৃক্ষশ্রেণী পথের উপর ছায়া বিস্তার করে, একটি সঙ্কীর্ণকায়া স্বচ্ছসলিলা গিরিনদী এই পথের ধারে সমান্তরালভাবে প্রবাহিত হইতেছে। মিস্ লী নানা-জাতীয় পার্ব্বত্য বিহঙ্গ-কলকণ্ঠ-মুখরিত ছায়াচ্ছন্ন নির্জ্জন পথে প্রফুল্লচিত্তে অশ্বপরিচালিত করিলেন। মন্‌রো তাঁহার

পশ্চাতে। প্রভাতের সুশীতল সমীরণ তাঁহাদের ক্লান্তি দূর করিতেছিল, এবং বনকুসুমের মধুর সৌরভ মুক্ত বায়ুতরঙ্গে ভাসিয়া আসিতেছিল।

তাঁহারা ছাউনি হইতে প্রায় একক্রোশ দূরে আসিয়া পড়িলে নদীসন্নিহিত একটি অনতিবৃহৎ গুল্মের অন্তরাল হইতে হঠাৎ 'দুড়ুম্' করিয়া বন্দুকের শব্দ হইল। সঙ্গে সঙ্গে মন্‌রোর অশ্ব গুলিবিদ্ধ হইয়া ভূতলশায়ী হইল, মন্‌রো অশ্ব পৃষ্ঠ হইতে পথিপ্রান্তে নিক্ষিপ্ত হইলেন; ঝোঁক সাম্‌লাইতে না পারিয়া তিনিও পড়িয়া গিয়া আহত হইলেন।

আহত হইয়াও মন্‌রো উঠিয়া দাঁড়াইলেন; সম্মুখে চাহিয়া দেখিতে পাইলেন, বিশ পচিশ হাত দূরে ছয়জন আফ্রিদী অশ্বারোহী ইসোবেলকে আক্রমণ করিয়াছে; ইসোবেল তাহাদের কবল হইতে মুক্তিলাভের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন এবং তাঁহার হস্তস্থিত চাবুক দ্বারা আততায়ীদের প্রহার করিতেছেন। কিন্তু ছয়জন বলবান্ আফ্রীদীর বিরুদ্ধে তিনি একাকিনী, কি করিবেন— আফ্রীদীরা চক্ষুর নিমিষে তাঁহাকে বাধিয়া ফেলিল, এবং তাঁহাকে তাঁহার ঘোড়ায় তুলিয়া ঘোড়াটিকে পাহাড়ের দিকে তাড়াইয়া লইয়া চলিল!

কয়েক মিনিটের মধ্যেই আফ্রিদীরা বন্দিনী যুবতীকে লইয়া অদৃশ্য হইল।

মন্‌রোর অশ্ব তখন মাটিতে পড়িয়া 'খাবি' খাইতেছিল; তিনি বুঝিলেন, কএক মিনিটের মধ্যেই তাহার মৃত্যু হইবে। তাঁহারও একখানি পা জখম হইয়াছিল, তথাপি তিনি ইসোবেলের উদ্ধারের জন্য খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে আফ্রিদীগণের অনুসরণ করিলেন, কিন্তু খোঁড়া পা লইয়া দ্রুতগামী অশ্বারোহীগণের সমীপস্থ হওয়া অসম্ভব। কএক মিনিটের মধ্যেই আফ্রিদীরা বন্দিনী যুবতীকে লইয়া অরণ্যের অন্তরালে অদৃশ্য হইল। অগত্যা মন্‌রো জীবন্মৃত অবস্থায় শিবিরে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক কর্ণেল লীকে এই দুঃসংবাদ জ্ঞাপন করিলেন।

এই সংবাদ গ্রহণে কর্ণেল লীর মনের অবস্থা কিরূপ হইল, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। ক্রোধে ক্ষোভে তিনি ক্ষিপ্তবৎ হইয়া উঠিলেন। শিবিরে মহাকলরব উত্থিত হইল, 'প্যারেড্' বন্ধ হইয়া গেল, এবং দশবার জন অশ্বারোহী সৈনিক ইসোবেলের উদ্ধারের জন্য পাহাড়ের দিকে অশ্ব পরিচালিত করিল; পথপ্রদর্শকরূপে মন্‌রো তাহাদের সঙ্গে চলিলেন।

আফ্রিদীরা ইসোবেলকে অপহরণ করিয়া যে পথে লইয়া গিয়াছিল, মন্‌রো-পরিচালিত অশ্বারোহী সৈনিকগণ সেইপথে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া দেখিতে পাইল, অরণ্যের অন্তরালস্থিত শ্যামল তৃণপূর্ণ অধিত্যকায় সাতটি ঘোড়া চরিতেছে। ইংরেজ সৈন্যগণ দেখিবামাত্র চিনিতে পারিল—উহাদের মধ্যে কর্ণেল লীর ঘোড়াটিও আছে।

মন্‌রো সৈনিকগণকে বলিলেন, "মিস্ লী এই ঘোড়ায় চড়িয়া আমার সঙ্গে বেড়াইতে আসিয়াছিলেন, অবশিষ্ট ঘোড়াগুলি আফ্রিদী দস্যুদের। তাহারা এই সকল ঘোড়ায় চড়িয়া মিস্ লীকে চুরী করিয়া লইয়া গিয়াছে। সকল ঘোড়াই ত দেখিতেছি এখানে চরিতেছে, কিন্তু মিস্ লী কোথায়? আফ্রিদীরাই বা কোথায় গেল?"

অশ্বারোহী সৈনিকেরা তন্ন তন্ন করিয়া চারিদিকে অনুসন্ধান করিল, কিন্তু তাহারা ইসোবেল বা আততায়ীগণের চিহ্নমাত্রও দেখিতে পাইল না। অদূরে সমুচ্চ গিরিশৃঙ্গ, গিরি পাদমূলে নিবিড়

অরণ্য; সেই অরণ্য ভেদ করিয়া পথহীন দুর্গম উপত্যকায় আরোহণ করাই কঠিন, সে দিকে অশ্ব-পরিচালন-চেষ্টা বাতুলতা মাত্র।

মন্‌রো হতাশহৃদয়ে অনুচরবর্গের সহিত শিবিরে প্রত্যাগমন করিলেন।

কর্ণেল লী উভয় হস্তে মুখ ঢাকিয়া নিঃশব্দে রোদন করিতে লাগিলেন; কেহই তাঁহাকে সান্ত্বনা দানের চেষ্টা করিল না। ইংরেজ শিবিরে বিষাদের ছায়া ঘনাইয়া উঠিল। অতঃপর কি কর্ত্তব্য কেহই তাহা স্থির করিতে পারিলেন না।

৩

চারিদিন পর্য্যন্ত অশ্রান্ত চেষ্টাতেও মিস্ লীর সন্ধান মিলিল না। কর্ণেল লীর আহারনিদ্রা বন্ধ হইল, কাজকর্ম্ম মাথায় উঠিল; তিনি পাগলের মত হইলেন। তাঁহার বিশ্বাস হইল, আফ্রিদীরা তাঁহার প্রাণাধিকা কন্যাকে অশেষ যন্ত্রণা দিয়া হত্যা করিয়াছে; ইসোবেল জীবিত থাকিলে এতদিন তাঁহার সন্ধান পাওয়া যাইত।

কর্ণেলের সহযোগী সামরিক কর্ম্মচারীগণ বলিলেন, আফ্রিদীগণ মিস্ লীকে নিশ্চয়ই হত্যা করে নাই, তাঁহাকে হত্যা করিয়া বা উৎপীড়িত করিয়া তাহাদের কোনও লাভ নাই; সম্ভবতঃ মুক্তিপণ আদায়ের আশায় তাহারা তাঁহাকে চুরী করিয়াছে।

কিন্তু চারিদিনের মধ্যেও আফ্রিদীরা কোনও সংবাদ পাঠাইল না। কেন তাহা বুঝিতে না পারিয়া কর্ণেল লী সহযোগীগণের এই অনুমানে আস্থা স্থাপন করিতে পারিলেন না।

পঞ্চম দিন অপরাহ্নে একটি আফ্রিদী যুবক অশ্বারোহণে ইংরেজের ছাউনীতে উপস্থিত হইল। ঘাঁটীর প্রহরীরা অবিলম্বে তাহাকে কর্ণেল লীর নিকট লইয়া গেল।

কর্ণেল লী আফ্রিদী যুবককে ব্যাকুলভাবে কন্যার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

আফ্রিদী যুবক বলিল, "মিস্ সাহেব ভাল আছেন। আমাদের সর্দ্দার আলিবাগ দূতরূপে আমাকে এখানে পাঠাইয়াছেন। সরকার আমাদের দাবী গ্রাহ্য করিলেই মিস্ সাহেবকে এখানে রাখিয়া যাওয়া হইবে। মিস্ সাহেবের কোনও ক্ষতি করা তাঁহার উদ্দেশ্য নহে।"

কর্ণেল লী ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "তুমি যে মিথ্যা কথা বলিতেছ না তাহার প্রমাণ কি? বর্ব্বর আফ্রিদীরা যে যন্ত্রণা দিয়া তাহাকে হত্যা করে নাই, এ কথা কিরূপে বিশ্বাস করিব?"

আফ্রিদী যুবক তাহার পাগড়ীর প্রান্ত হইতে একখানি পত্র খুলিয়া কর্ণেল লীর হস্তে প্রদান করিল। পত্রে ইসোবেলের হস্তাক্ষর দেখিয়া কর্ণেল যেন মৃতদেহে প্রাণ পাইলেন। তিনি কম্পিতহস্তে পত্রখানি খুলিয়া রুদ্ধ নিঃশ্বাসে তাহা পড়িলেন। পত্রে এইরূপ লেখা ছিল :—

"বাবা, এই কয় দিন আমাকে না দেখিয়া আপনার মানসিক অবস্থা কিরূপ শোচনীয় হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিয়া আমি বড়ই উৎকণ্ঠিত হইয়াছি। আপনি শান্ত হউন, এ পর্য্যন্ত আমি নিরাপদ্ আছি। আফ্রিদীরা আমাকে চুরী করিয়া হিন্দুকুশের সন্নিহিত একটি উপত্যকায় লইয়া আসিয়াছে। আমি যে স্থানে আছি, ইহা একটি আফ্রিদী-পল্লী। দুরারোহ পর্ব্বতের উপর দিয়া এখানে আসিতে হয়। পথ অতি দুর্গম, আপনার ফৌজ এ পথের সন্ধান করিয়া উঠিতে পারিবে, এরূপ বোধ হয় না। আর পথের সন্ধান পাইলেও এখান হইতে আমাকে উদ্ধার করিয়া লইয়া যাওয়া তাহাদের সাধ্য হইবে না; এ জন্য আফ্রিদীদের অনুগ্রহের উপরেই আপনাকে নির্ভর করিতে হইবে।

"আফ্রিদীরা আমাকে বন্দী করিলে আমি বিনা প্রতিবাদে তাহাদের সঙ্গে আসিতে সম্মত হওয়ায় তাহারা আমার প্রতি কোন প্রকার অত্যাচার করে নাই। এখানে আমার আহারাদির কিছু অসুবিধা হইতেছে বটে, কিন্তু আমি ক্ষুধাতৃষ্ণায় কষ্ট পাইতেছি না; কেবল ভবিষ্যৎ-চিন্তায় আমি অধীর হইয়াছি। এই ভীষণ পাষাণকারা হইতে কখনও কি উদ্ধার পাইব? এমন দুর্গম স্থলে কারারুদ্ধ করিয়াও আফ্রিদীরা আমার উপর কড়া পাহারার ব্যবস্থা করিয়াছে। একটি গিরিগুহা আমার কারাকক্ষরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; দুইটি আফ্রিদী স্ত্রীলোক দিবারাত্রি আমার পাহারায় আছে। আফ্রিদী সর্দ্দার বলিতেছে,

ইংরেজ সরকার তাহার দাবী গ্রাহ্য করিলেই সে আমাকে আপনার নিকট পাঠাইয়া দিবে। তাহার দাবী সঙ্গত কি না তাহা আমি জানি না; তাহা পূর্ণ করা আপনাদের পক্ষে কতদূর সম্ভব, তাহাও বলিতে পারি না। আপনার বিপন্না কন্যার প্রাণরক্ষার জন্য আপনি প্রাণপণে চেষ্টা করিবেন তাহা জানি; কিন্তু ইহাদের দাবী পূর্ণ করা আপনার অসাধ্য হইলে আপনি যে আমাকে পুনর্ব্বার দেখিতে পাইবেন, এরূপ আশা করিবেন না। এই অভাগিনী কন্যার জন্য আপনি কি সঙ্কটেই পড়িয়াছেন! আমার মনে হইতেছে মরিলেই বুঝি বাঁচিতাম, আপনিও দুশ্চিন্তা হইতে মুক্তি লাভ করিতেন।

আপনার অভাগিনী কন্যা বেলার।"

কন্যার পত্র পাঠ করিয়া কর্ণেল লী অতি কষ্টে অশ্রুসংবরণ করিলেন; কিন্তু তিনি আফ্রিদী দূতকে অন্য কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই পলিটিক্যাল আফিসার মিঃ স্পেন্‌সার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার সর্দ্দারের দাবী কি? কত টাকা পাইলে সে মিস্ সাহেবকে এখানে রাখিয়া যাইতে পারে?"

আফ্রিদী দূত বলিল, "তাঁহার দাবী কি, তাহা আমাকে বলিয়া দেন নাই; তিনি সরকারকে এই মাত্র জানাইতে বলিয়াছেন, কিরূপ বন্দোবস্তে তিনি মিস্ সাহেবকে মুক্তি দান করিবেন, তাহা স্থির করিবার জন্য ছয়জন অনুচর সহ তিনি আপনাদের ছাউনীতে আসিতে চান; কিন্তু মিস্ সাহেবকে তিনি বন্দী করিয়াছেন—এই অপরাধে যদি আপনারাও তাঁহাদিগকে বন্দী করেন, বা তাঁহাদিগের প্রতি অত্যাচার করা হয়, তাহা হইলে আমাদের দলের লোক মিস্ সাহেবের ছিন্ন মুণ্ড আপনাদের উপহার পাঠাইবে।—আপনাদের অভিপ্রায় কি জানিয়া যাইবার জন্য আমি আদিষ্ট হইয়াছি।"

মিঃ স্পেন্‌সার আফ্রিদী দূতের কথা শুনিয়া সক্রোধে বলিলেন "আলিবাগের বড় স্পর্দ্ধা! তাহার প্রাণদণ্ড না করিয়া আমরা এ সঙ্কল্প ত্যাগ করিব না। সে অধিক দিন জীবিত থাকিলে সীমান্ত প্রদেশের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত আগুন জ্বালাইয়া দিবে। রাজ্যের শান্তিরক্ষার জন্য তাহাকে ধরিয়া ফাঁসী কাঠে লট্‌কাইতে হইবে।"

আফ্রিদী দূত একথা শুনিয়া প্রস্থানোদ্যত হইয়া বলিল, "উত্তম, আমি ফিরিয়া গিয়া সর্দ্দারকে একথা জানাইব।"

দূতের এই প্রকার ধীরতায় মিঃ স্পেন্‌সারের ধৈর্য্য ধারণ করা অসম্ভব হইয়া উঠিল। তিনি সক্রোধে বলিলেন, "তুই ফিরিয়া যাইবি কোথায়?—রিসালদার মেজর! এই দস্যুর হাত পা দৃঢ়রূপে রজ্জুবদ্ধ কর। শূয়ারের গোস্ত কুত্তা দিয়া খাওয়াইব।"

রিসালদার মেজর মহম্মদ খাঁ অদূরে দাঁড়াইয়া ছিলেন; তিনি মিঃ স্পেন্‌সারকে বলিলেন, "খোদাবন্দ, এই বান্দা আফ্রিদী সর্দ্দারের দূত মাত্র; দূত অবধ্য। সাময়িক উত্তেজনার বশীভূত হইয়া দূতের প্রতি উৎপীড়ন করিলে সরকারের দুর্ণাম হইবে।"

কর্ণেল লী অধীরভাবে বলিলেন, "অগ্রে আমার কন্যার উদ্ধারের ব্যবস্থা কর। আলিবাগকে তাহার ধৃষ্টতার প্রতিফল দিতে হয়, পরে দিও।"

মিঃ স্পেন্‌সার বলিলেন, "এই বর্ব্বরদের দুর্ব্যবহারে ধৈর্য্য রক্ষা করা কঠিন। মিস্ লীর উদ্ধারের জন্য আমরা প্রাণপণে চেষ্টা করিব; কিন্তু কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা অল্প। রাস্কেলগুলা হয় ত অসঙ্গত দাবী করিয়া বসিবে।"

কর্ণেল বলিল, "কিন্তু আলিবাগের দাবী কি, সে কথা ত অগ্রে জানা আবশ্যক। নগদ টাকা ভিন্ন সে আর কি চাহিবে? আমার যাহা কিছু আছে—সর্ব্বস্ব দিয়া আমার প্রাণাধিকা কন্যাকে ফিরাইয়া আনিব; এ জন্য যদি আমাকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়—ঋণে ডুবিতে হয়—তাহাতেও আমি সম্মত।"

মিঃ স্পেন্‌সার বলিলেন, "কিন্তু কেবল টাকা পাইলেই যে দুর্ব্বৃত্তেরা মিস্ লীকে ছাড়িয়া দিবে, এমন বোধ হয় না। উহারা যদি রাজনীতিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে চায়, তাহা হইলে কিরূপে তাহার মীমাংসা হইবে? আমাদের ব্যক্তিগত লাভ লোকসানের জন্য গবর্ণমেণ্টের পলিসি পরিবর্ত্তিত হইবে না। আমাদের স্বার্থের অনুরোধে গবর্ণমেণ্ট 'প্রেষ্টিজ' নষ্ট করিবেন না।"

পোলিটিক্যাল অফিসারের কথায় কর্ণেল লী মনে বেদনা পাইলেন, তিনি ক্ষুব্ধস্বরে বলিলেন, "স্পেন্‌সার, তুমি এ প্রদেশে গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি, গবর্ণমেণ্টের 'প্রেষ্টিজ' রক্ষায় তোমার আগ্রহ আছে; কিন্তু তোমার স্মরণ রাখা উচিত, আমাকে কর্ত্তব্যপরায়ণ বিশ্বস্ত ভৃত্য জানিয়াই গবর্ণমেণ্ট আমাকে আফ্রিদীদমনে প্রেরণ করিয়াছেন; গবর্ণমেণ্টের 'প্রেষ্টিজ' যাহাতে নষ্ট না হয়—সে বিষয়ে আমারও কি লক্ষ্য নাই? তুমি যদি কন্যার পিতা হইতে, তাহা হইলে আমার হৃদয়বেদনা বুঝিতে পারিতে।"

মিঃ স্পেন্‌সার বলিলেন "তুমি আমায় ভুল বুঝিয়া অনর্থক ক্ষুব্ধ হইতেছ। মিস্ লীর উদ্ধারের জন্য তোমার যেরূপ আগ্রহ আমার আগ্রহ তদপেক্ষা অল্প নহে। যাহা হউক আমি আলিবাগ ও তাহার সঙ্গীদের অভয় দান করিতেছি, তাহাদের প্রতি কোনও অত্যাচার করা হইবে না; তাহারা এখানে আসিয়া তাহাদের দাবীর কথা প্রকাশ করিতে পারে।"

অনন্তর দূতকে সে কথা বলা হইলে সে বিদায় গ্রহণ করিল।

(৪)

কর্ণেল লীর প্রাণাধিকা দুহিতা ইসোবেল আফ্রিদী-হস্তে বন্দিনী হইবার পর এক সপ্তাহ অতীত হইল। অষ্টম দিন মধ্যাহ্ন কালে আফ্রিদী সর্দ্দার আলিবাগ ছয় জন অনুচর সহ ইংরেজের ছাউনীতে উপস্থিত হইল। দূত-মুখে সীমান্তপ্রদেশের 'পোলিটিক্যাল আফিসার মিঃ স্পেন্‌সারের অভয়বাণী শুনিয়া সে নিঃশঙ্কচিত্তে অনুচর-বর্গের সহিত তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিল। সে জানিত, তাহার অন্যায় ব্যবহারে সরকার তাহার প্রতি যতই অসন্তুষ্ট হউন, অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়া তাহার প্রতি উৎপীড়ন করিবেন না। বর্ব্বর আফ্রিদী সর্দ্দারও 'ব্রিটিশ প্রেষ্টিজের' মহিমা বুঝিত; সুতরাং ইংরেজের ছাউনীতে আসিয়া তাহাদের আকারেঙ্গিতে ভয়ের চিহ্ন মাত্র ছিল না।—স্বধর্ম্মী আফগান নরপতি আমীরের অভয়বাণীতে তাহারা আস্থা স্থাপন করিতে পারিত না; কিন্তু যতই শত্রুতা থাক, সরকারের অঙ্গীকারে তাহাদের অবিশ্বাস ছিল না।—ইহারই নাম 'ব্রিটিশ প্রেষ্টিজ' ইহাতেই ব্রিটেনিশয়ার গৌরব।

"সর্দ্দার, তুমি মিস সাহেবকে চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছ কেন?"

সেই দিন অপরাহ্ণ তিন ঘটিকার সময় পোলিটিক্যাল আফিসারের শিবিরসন্নিহিত মুক্ত প্রান্তরে আফ্রিদীগণকে আহ্বান করা হইল। কর্ণেল লীকে তাঁহার বন্ধুগণ অনুরোধ করিলেন, সভাস্থলে আফ্রিদীগণের

সম্মুখে কন্যার অমঙ্গল আশঙ্কায় তিনি যেন অধীরতা প্রকাশ না করেন। কর্ণেল লী এই অনুরোধে সম্মত হইলেন। ছাউনীতে যে কএকজন মিলিটারী কর্ম্মচারী ছিলেন, তাঁহারা সকলেই সভায় উপস্থিত হইলেন; ভারতীয় সৈনিকগণের মধ্যে কেবল মাত্র রিসালদার মেজর সর্দ্দার বাহাদুর মহম্মদ খাঁ সভায় উপস্থিত থাকিবার অনুমতি পাইলেন। সর্দ্দার বাহাদুরের অসাধারণ সাহস ও শৌর্য্য বীর্য্য কর্ত্তব্যপরায়ণতার জন্য উদ্ধতন সামরিক কর্ম্মচারীগণ হইতে রেজিমেণ্টের সামান্য পদাতিকেরা পর্য্যন্ত সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করিতেন। রিসালদার মেজর মহম্মদ খাঁ সমরকুশল নির্ভীক ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠ বীরপুরুষ; কতবার তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে বিপক্ষের অগ্নিশ্রাবী কামান বন্দুকের সম্মুখে অটল সাহসে অগ্রসর হইয়াছেন; সেই জন্যই গুণগ্রাহী গবর্ণমেণ্ট 'সর্দ্দার বাহাদুর' খেতাবে তাঁহাকে গৌরবান্বিত করিয়াছিলেন।

রিসালদার মেজর সর্দ্দার বাহাদুর সভার একপ্রান্তে দণ্ডায়মান ছিলেন। সভার কার্য্য আরম্ভ হইলে তিনি ধীরে ধীরে আলিবাগের সন্নিহিত হইলেন এবং দুইজন আফ্রিদীর সহিত নিম্নস্বরে আলাপ করিতে লাগিলেন। শ্বেতাঙ্গ মিলিটারী কর্ম্মচারীগণের কেহ কেহ ইহা লক্ষ্য করিয়া বিস্মিত হইলেন; তাঁহারা বুঝিলেন চতুর মহম্মদ খাঁ মনে মনে কোনও একটা ফন্দী আঁটিয়াছেন।

মিঃ স্পেন্সার গম্ভীর স্বরে আলিবাগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সর্দ্দার, তুমি মিস্ সাহেবকে চুরী করিয়া লইয়া গিয়াছ কেন?"

আলিবাগ বলিল, "আমার পিতা চামরু সর্দ্দার সরকারের নিকট দরবারে আসিয়া নিহত হইয়াছেন; তাঁহার মৃত্যুতে আফ্রিদী জাতি বিষম ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। সরকার যাহাতে আমাদের ক্ষতিপূরণের দাবী গ্রাহ্য করেন, তাহার পথ 'খোলসা' রাখিবার জন্য আমরা মিস্ সাহেবকে বন্দী করিয়া লইয়া গিয়াছি; কিন্তু তাঁহার প্রতি কোনও প্রকার অত্যাচার করা হয় নাই। আমরা জানি বিনা কায়দায় সরকারকে ক্ষতিপূরণে বাধ্য করিতে পারিব না।"

আলিবাগের স্পর্দ্ধায় মিঃ স্পেন্সার অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। তাঁহার মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠিল। তিনি বিশেষ চেষ্টায় আত্মসংবরণ করিয়া বলিলেন, "কাপুরুষ বর্ব্বর ভিন্ন কেহ রমণীর গায়ে হাত তোলে না। তোমাদের স্পর্দ্ধা বড়ই বাড়িয়া গিয়াছে, শীঘ্রই তোমাদের বিষদন্ত ভাঙ্গিবার ব্যবস্থা হইবে। যাহা হউক, এখন বল কি হইলে তোমরা মিস্ সাহেবকে কোনও প্রকার কষ্ট না দিয়া এখানে রাখিয়া যাইবে।"

আলিবাগ বলিল, "আফ্রিদী প্রাণভয়ে কাতর নহে, যুদ্ধেও তাহারা পরাঙ্মুখ নহে; কিন্তু বিনারক্তপাতে যদি কার্য্যোদ্ধার হয় আমরা তাহারই পক্ষপাতী। যুদ্ধ করিয়া সরকারেরও কোন লাভ নাই, কেবল সৈন্যক্ষয়, আর অর্থব্যয়! সরকারের ভাণ্ডারে টাকার অভাব নাই তাহা জানি, কিন্তু টাকার তোড়া দরিয়ায় ফেলিয়া ফল কি? এখন শুনুন আমাদের দাবী কি,—সরকার আমাকে আফ্রিদী জাতির প্রধান সর্দ্দার বলিয়া স্বীকার করিবেন, এবং আমাদের রাজ্যসীমা হইতে সিন্ধুনদের দক্ষিণ দিক্ পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগ আমাদিগকে ছাড়িয়া দিবেন। আর ক্ষতিপূরণ স্বরূপ আমাদিগকে নগদ লক্ষ টাকা দিবেন। এতদ্ভিন্ন—"

আলিবাগ আরও কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু মিঃ স্পেন্সার তাহার কথায় বাধা দিয়া অসহিষ্ণুভাবে বলিলেন, "আলিবাগ, কেন অনর্থক পাগলের মত প্রলাপ বকিতেছ? তুমি কি মনে করিয়াছ সরকার তোমার এই অসঙ্গত দাবী গ্রাহ্য করিবেন! তোমরা কি এখনও সরকারের বল বিক্রমের পরিচয় পাও নাই? সরকার ইচ্ছা করিলে তোমাদের রাজ্য—তোমাদের সমস্ত সম্পত্তি সিন্ধুনদের জলে ডুবাইয়া দিতে পারেন, আফ্রিদীজাতির চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত করিতে পারেন। কিন্তু তোমাদের ধ্বংস-সাধন সরকারের অভিপ্রেত নহে। আমি তোমাদের অভয়দান করিয়াছি বলিয়াই আমাদের সম্মুখে আসিয়া এই প্রকার বাচালতা প্রকাশে সাহসী হইয়াছ! তোমাদের মঙ্গলের জন্যই বলিতেছি, তোমরা মিস্ সাহেবকে আনিয়া এখানে হাজির কর। এ পর্য্যন্ত তোমরা যে সকল অপরাধ করিয়াছ, আমি তাহা ক্ষমা করিব; এবং ভবিষ্যতে সরকারের শান্ত শিষ্ট রাজভক্ত প্রজার ন্যায় আচরণ করিলে সরকার তোমাদের কোনও অনিষ্ট করিবেন না।"

আলিবাগ শুষ্কহাস্যে বলিল, "স্পেন্সার সাহেব! আপনি কি আমাকে বালক মনে করেন যে, মিষ্ট কথায় ভুলাইবার চেষ্টা করিতেছেন? আমাদের মঙ্গলচিন্তায় আপনাকে ব্যাকুল হইতে হইবে না; ইচ্ছা হয়, সরকার আমাদের পাহাড়ে জল ফুটাইবার চেষ্টা করিবেন। আমাদের দাবীর কথা আমি বলিয়াছি। সরকার আমাদের দাবী অগ্রাহ্য করেন, আমরা মরিবার জন্য প্রস্তুত আছি, কিন্তু মারিয়া মরিব।"

মিঃ স্পেন্সার উত্তেজিতস্বরে বলিলেন, "কি? তুমি আমাদের ভয় দেখাইতেছ?"

আলিবাগ বলিল, "আমার যাহা বলিবার ছিল বলিয়াছি, ইহাতে যদি ভয় দেখান হইয়া থাকে ত হইয়াছে।"

মিঃ স্পেন্সার দেখিলেন মিষ্টবাক্যে কার্য্যোদ্ধারের আশা নাই; অগত্যা তিনি উগ্রভাব ধারণ করিলেন, সক্রোধে বলিলেন, "আলিবাগ, আমার শেষ কথা শুনিয়া রাখ, যদি মিস্ সাহেবের প্রতি কোন রকম অত্যাচার কর, তাহা হইলে আফ্রিদীজাতির মঙ্গল নাই; নিশ্চয় জানিও—তোমাদের এক প্রাণীকেও আমি জীবিত রাখিব না। সরকার তোমাদের "আণ্ডা বাচ্চা" সকলকে একগড় করিবেন। সরকার দয়া করিয়া এখনও তোমাদের বিধ্বস্ত করেন নাই, কিন্তু আমাদের সহিষ্ণুতারও সীমা আছে;—তাই বলিতেছি, আর আমাদের উত্ত্যক্ত করিও না। অসঙ্গত দাবী পরিত্যাগ কর, সাধ করিয়া নিজের সর্ব্বনাশের পথ পরিষ্কৃত করিও না। এখনও সাবধান হও।"

আলিবাগ সগর্ব্বে বলিল, "আপনাদের কামান বন্দুক দেখিয়া যাহারা ভয়ে কাঁপিয়া মরে, তাহাদিগকে এ সকল উপদেশ দিবেন। আপনার উপদেশ শুনিবার জন্যও আমরা এখানে আসি নাই। আমাদের দাবী গ্রাহ্য হইবে কিনা তাহাই জানিতে আসিয়াছি। আমার পিতার মৃত্যুর জন্য, স্পেন্সার সাহেব, আপনারাই দায়ী; সেই দায়িত্ব হইতে আপনারা সহজে মুক্তি লাভের আশা করিবেন না। চামরু সর্দ্দারের রক্তের পরিবর্ত্তে বহু রক্তপাত হইবে, পাহাড়ে রক্তের নদী বহিবে।—পাঠান আফ্রিদী অত্যাচারের প্রতিফল দিতে জানে। চামরু সর্দ্দারের পুত্র সর্দ্দার আলিবাগ জীবন থাকিতে পিতৃহত্যা বিস্মৃত হইবে না। যেদিন আপনারা আমার বা কোন আফ্রিদীর একগাছি কেশও স্পর্শ করিবেন, সেই দিনই মিস্ সাহেবের ছিন্ন মুণ্ড আপনাদের শিবিরে উপহার পাঠাইবার ব্যবস্থা হইবে; স্পেন্সার সাহেব, আপনি আমার শেষ কথা শুনিয়া রাখুন।"

আলিবাগের কথা শুনিয়া কর্ণেল লী চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার দেখিলেন। তাঁহার শাদা মুখ নীল হইয়া গেল। তিনি অতি কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া মিঃ স্পেন্সারের কানে কানে বলিলেন, "স্পেন্সার, তুমি করিতেছ কি! এই গোঁয়ার পাহাড়ীয়া সর্দ্দারকে চটাইয়া লাভ কি? স্তোকবাক্যে উহাকে ভুলাইতে পারিতেছ না? উহাকে বল, উহার দাবী সরকারের গোচর করিবে, সে সম্বন্ধে সরকারকে বিবেচনা করিতে অনুরোধ করিবে; সরকার মালেক, সরকার যাহা করিবেন তাহাই হইবে; উহাদিগকে আশা ভরসা দিবার তোমার কোনও অধিকার নাই।—আলিবাগ টাকা চায়—আমি টাকার যোগাড় করিব; নিজে যাহা পারি দিব, অবশিষ্ট টাকা যেখান হইতে পারি—যেমন করিয়া পারি, ঋণ করিয়া দিব। আমার বেলাকে বাঁচাও; সে এখনও জীবিত আছে, কিন্তু অধিক দিন এই শয়তানের হস্তে বন্দিনী থাকিলে দুশ্চিন্তাতেই সে মারা পড়িবে। এই দুর্বৃত্ত বলিতেছে আবশ্যক হইলে তাহার ছিন্ন মুণ্ড আমাদের শিবিরে পাঠাইবে। কি সর্ব্বনাশ!"

কর্ণেল লীর অনুরোধ শুনিয়া মিঃ স্পেন্সার কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইলেন; তিনি ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "কর্ণেল, তোমার এই অধীরতা সমর্থন-যোগ্য নহে। আমরা যুদ্ধের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছি; যুদ্ধ ঘোষিত হইয়াছে, সার বিন্দন ব্লড্ অগণ্য সৈন্য লইয়া 'বাজার ভ্যালি' (Bazar Valley) আচ্ছন্ন করিয়াছে, বৃটীশ সৈন্যগণ পঙ্গপালের মত "পর্ব্বতের দুর্গম উপত্যকার দিকে ছুটিয়াছে, লুণ্ডিকোটালে মহা আয়োজনে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। এই যুদ্ধ উপলক্ষে লক্ষ লক্ষ টাকা জলের মত খরচ হইতেছে। আর ব্যক্তিগত অনিষ্টের আশঙ্কায় আমরা এই বর্ব্বরদের স্তোকবাক্যে ভুলাইয়া নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া থাকিব!—আমরা ইহাদের অন্যায় আবদারে কর্ণপাত করিয়াছি একথা গোপন থাকিবে না। খাইবারপাশ হইতে বোলানপাশ পর্য্যন্ত

(৫)

পূর্ব্বেই বলিয়াছি রিসালদার মেজার সর্দ্দার বাহাদুর মহম্মদ খাঁ সভার এক-প্রান্তে দণ্ডায়মান ছিলেন। তাঁহার মস্তকে সুবৃহৎ পাগড়ী, কোমরবন্দে কোষবদ্ধ সুদীর্ঘ তরবারি। উভয় হস্ত বক্ষস্থলে সংস্থাপিত করিয়া তিনি উভয় পক্ষের তর্কবিতর্ক শ্রবণ করিতেছিলেন। আফ্রিদী সর্দ্দারের ঔদ্ধত্যে তাঁহার সুগৌর বদন-মণ্ডলে বিরক্তি ও অধীরতার চিহ্ন পরি-স্ফুট।

মহম্মদ খাঁ তাঁহার আজানুসমুত্থিত বুটের মস্‌মস্‌ শব্দে সভাস্থল প্রতিধ্বনিত করিয়া আলিবাগের সম্মুখে উপস্থিত হই-লেন, এবং বামহস্তে তাহার কুচ্‌কুচে কালো দাড়ী সবেগে আকর্ষণপূর্ব্বক তাহার গালে 'বিরাশি শিক্কা ওজনের' এক চপেটাঘাত করিলেন! তাহার পর তাহার মুখে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "ওরে হারামজাদ, সরকারের সঙ্গে তুই লড়াই করিতে চাস্?"

মহম্মদ খাঁ আলিবাগের দাড়ি ধরিয়া এক চপেটাঘাত করিলেন।

পর্ব্বতের ঘাটিতে ঘাটিতে এই সংবাদ প্রচারিত হইবে; সিন্ধুতীর হইতে সুদূরবর্ত্তী হেল্‌মণ্ডের তটভূমি পর্য্যন্ত ভূভাগের সকল লোক শুনিতে পাইবে—আফ্রিদী সর্দ্দার আলিবাগ সরকারকে 'বেকুব' বনাইয়া নিজের জিদ্‌ বজায় রাখিয়াছে।—একথা লইয়া আন্দোলন উপস্থিত হইলে গবর্ণ-মেণ্টের কাছেই বা কি কৈফিয়ৎ দিব? না আমরা বহুদূর অগ্রসর হইয়াছি, এখন তোমার প্রস্তাব অচল।"

অতঃপর আলিবাগকে কি জবাব দেওয়া যায়, মিঃ স্পেন্‌সার তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি বুঝিলেন, আলিবাগকে কোন আশা ভরসা দিয়া বিদায় করিতে না পারিলে ইসোবেলের মৃত্যু অনিবার্য্য। আলিবাগ মিথ্যা ভয় প্রদর্শন করে নাই; অথচ উপস্থিত ক্ষেত্রে তাহাকে আশা ভরসা দেওয়াও অসম্ভব।—মিঃ স্পেন্‌সার নিস্তব্ধ; সভাস্থ সকলেই চিন্তামগ্ন। আলিবাগ শেষ জবাব শুনিবার জন্য মিঃ স্পেনসারের মুখের দিকে নির্নিমেষ নেত্রে চাহিয়া রহিল। কর্ণেল লী কন্যার অমঙ্গল আশঙ্কায় অধীর হইয়া উঠিলেন।

মহম্মদ খাঁর আচরণে সভায় হুলুস্থুল উপস্থিত হইল। আলিবাগের সঙ্গীরা ক্রুদ্ধসিংহের ন্যায় লাফাইয়া উঠিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল; মহম্মদ খাঁ আত্ম-রক্ষার জন্য কোষবদ্ধ সুদীর্ঘ তরবারি নিষ্কাষিত করিলেন। ছয়জন আফ্রিদীর ছয়খানি তীক্ষ্ণধার বক্র ছুরিকা একসঙ্গে মস্তকের উপর উদ্যত হইল! কেবল আলিবাগ নিশ্চেষ্ট-ভাবে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল; ক্রোধ ও অপমানে তাহার ভাঁটার মত গোল গোল চক্ষুদুটি আগুনের ভাঁটার মত জ্বলিয়া উঠিল, তাহার দেহের সমস্ত রক্ত মুখে আসিয়া জমিল। মুহূর্ত্তকাল নীরব থাকিয়া সে ক্রোধকম্পিতস্বরে মহম্মদ খাঁর শির লইবার জন্য অনুচরগণকে আদেশ করিল।

রিসালদার মেজরের এই প্রকার অনধিকার-চর্চ্চায় মিঃ স্পেন্‌সার অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। কর্ণেল লী ও অন্য কএকজন শ্বেতাঙ্গ সামরিক কর্ম্মচারী বিদ্যুৎবেগে অগ্রসর হইয়া মহম্মদ খাঁকে দূরে টানিয়া লইয়া না যাইলে

সভাস্থলেই শোণিতের স্রোত প্রবাহিত হইত।—কর্ণেল লী মহম্মদ খাঁকে কঠোর ভাষায় তিরস্কার করিলেন।

আলিবাগ ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল "স্পেন্‌সার সাহেব, আপনাদের এ কিরূপ ব্যবহার? আমার পিতা আপনাদের দরবারে আসিয়া নিহত হইলেন। আপনি অঙ্গীকার করিয়াছিলেন আমাদের প্রতি কোন প্রকার অত্যাচার হইবে না, আপনার অঙ্গীকারে নির্ভর করিয়াই আপনাদের ছাউনীতে আসিয়াছি, আপনাদের একজন তাঁবেদার আমার দাড়ী ধরিয়া টানিয়া আমার গালে চড় মারিল, আমার মুখে থু থু দিল! আমি এ অপমানের প্রতিফল না দিয়া ক্ষান্ত হইব না। আমি উহার সহিত লড়াই করিয়া উহার শির লইব!"

মিঃ স্পেন্‌সার বলিলেন, "রিসালদার মেজর আমাদের আদেশে তোমার অপমান করে নাই, তুমি অপমানের প্রতিফল দিতে চাও উত্তম, তাহাতে আমার আপত্তি নাই; মহম্মদ খাঁর সাধ্য থাকে—তোমার আক্রমণে আত্মরক্ষা করিবে।"

তাহার পর তিনি মহম্মদ খাঁর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "মহম্মদ খাঁ, তুমি অতিথির অপমান করিয়াছ। আলিবাগ এই অপমানের প্রতিফল প্রদানে উদ্যত হইয়াছে। তুমি তাহার সহিত যুদ্ধে প্রস্তুত আছ?"

মহম্মদ খাঁ বলিলেন, "হাঁ সাহেব, সম্পূর্ণ প্রস্তুত। কিন্তু আজ আর বেলা নাই; কাল প্রত্যূষে আমরা পরস্পরের শক্তি পরীক্ষা করিব!"

মিঃ স্পেনসার আলিবাগকে বলিলেন, "কাল প্রত্যূষে সর্দ্দার মহম্মদ খাঁর সহিত যুদ্ধ করিও। আমরাও যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া নিরপেক্ষভাবে যুদ্ধ দেখিব—আর তোমার দাবীর কথা আমি সরকারকে জানাইব, কি ফল হইবে তাহা আমার অজ্ঞাত; কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই যদি মিস্ সাহেবের কোন অনিষ্ট কর—তাহা হইলে তোমাদের মঙ্গল হইবে না একথা স্মরণ রাখিও।" অতঃপর সভা ভঙ্গ হইল।

সভাভঙ্গের পর কর্ণেল লী মহম্মদ খাঁকে বলিলেন, "আলিবাগের বয়স তোমার অপেক্ষা অল্প, তাহার শরীরে অসাধারণ শক্তি; তরবারি চালনে তাহার দক্ষতা কিরূপ—জান কি?"

মহম্মদ খাঁ বলিলেন, "জানি। শুনিয়াছি আফ্রিদী জাতির মধ্যে তাহার ন্যায় বলবান্ পুরুষ আর কেহই নাই। তাহার 'কব্জির' এত জোর যে, বেশ ভারি ও ধারালো তলোয়ার পাইলে সে এক কোপে প্রকাণ্ড ষাঁড়ের গর্দ্দান দ্বিখণ্ডিত করিতে পারে।"

কর্ণেল লী বলিলেন, "তোমার গর্দ্দান ষাঁড়ের গর্দ্দান অপেক্ষা অনেক সরু; বিশেষতঃ তুমি প্রাচীন হইয়াছ; সে তোমাকে আক্রমণ করিলে কিরূপে গর্দ্দান রাখিবে?"

মহম্মদ খাঁ সদম্ভে বলিলেন, "আমি সেই বেইমানের গোস্ত টুকুরা টুকরা করিয়া কাটিব। মিস্ সাহেবকে চুরী করিয়া লইয়া যাইবার প্রতিফল সে হাতে হাতে পাইবে।"

কর্ণেল বলিলেন, "কিন্তু তাহাতে ত মিস্ সাহেবের উদ্ধার-সাধন সম্ভব হইবে না।"

"যাহাতে সম্ভব হয়, আমি তাহাই করিব; আপনার কোনও চিন্তা নাই। আপনাকে আমার যাহা বলিবার আছে রাত্রে বলিব।"—এই কথা বলিয়া মহম্মদ খাঁ কিছু ব্যস্তভাবে কর্ণেলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন।

মহম্মদ খাঁ তাড়াতাড়ি রেজিমেণ্টের ডাক্তার ফার্গুসন সাহেবের তাম্বুতে উপস্থিত হইয়া কুর্ণিশ করিয়া দাঁড়াইলেন।

ডাক্তার ফার্গুসন প্রত্যভিবাদন করিয়া সস্মিতমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি সংবাদ সর্দ্দার বাহাদুর!—মেজাজ্ সরিফ?"

মহম্মদ খাঁ বলিলেন, "হাঁ হুজুর; আপনার নিকট একটা দাওয়াই লইতে আসিয়াছি। এমন দাওয়াই দিবেন, যাহা খাইলে ছয়, সাতজন জোয়ান গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়, সহজে তাহাদের নিদ্রা না ভাঙ্গে, অথচ দাওয়াইটা প্রাণ-হানিকর বা বিস্বাদ না হয়।—এমন দাওয়াই কি নাই?"

ডাক্তার ফার্গুসন বলিলেন, "অবশ্যই আছে, কিন্তু কি জন্য তুমি এই দাওয়াই চাহিতেছ, তাহা আমার জানা আবশ্যক। তোমার উদ্দেশ্য কি, জানিতে না পারিলে তাহা তোমাকে দেওয়া হইবে না।"

মহম্মদ খাঁ বলিলেন, "মিস্ সাহেবকে উদ্ধার করিতে হইবে।"

ডাক্তার ফার্গুসন হাসিয়া বলিলেন, "বৃটিশ ফার্ম্মাকোপিয়াতে ত দাওয়াইয়ের এ শক্তির কথা লেখে না!"

মহম্মদ খাঁ তাঁহার কাণে কাণে কএকটি কথা বলিলেন।—ডাক্তার আর উচ্চবাচ্য না করিয়া খানিকটা 'মরফাইন্' (Morphine) কাগজে মুড়িয়া মহম্মদ খাঁর হস্তে প্রদান করিলেন। মহম্মদ খাঁ ডাক্তারকে অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিলেন।

আফ্রিদীগণকে তাহাদের বাসের জন্য একটা তাম্বু দেওয়া হইয়াছিল। তাহারা তাম্বুতে ফিরিয়া একটা ডেগ্‌চিতে 'খানা পাকাইয়া' তাম্বুর মধ্যে ঢাকিয়া রাখিল; তাহার পর সকলে তাম্বুর বাহিরে আসিয়া একসঙ্গে 'নমাজ' আরম্ভ করিল। তখন শ্রান্ত তপন পশ্চিমাকাশ ও পশ্চিম গগনভেদী ধূসর গিরিচূড়া লোহিতালোকে সুরঞ্জিত করিয়া হিন্দুকুশ শৈলমালার অন্তরালে অস্তগমন করিতেছিলেন।

আফ্রিদীদের তাম্বু ইংরেজের ছাউনি হইতে কিছু দূরে গিরিপাদমূলে অরণ্যের অন্তরালে সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল। সে দিকে লোকজনের গতিবিধি ছিল না। উপাসনা-নিরত আফ্রিদীরা জানিতেও পারিল না, আলোকান্ধকারের সেই মিলন-ক্ষণে তাহাদের বস্ত্রাবাসের পশ্চাদ্বর্ত্তী অরণ্যের অন্তরাল হইতে একজন লোক মৃত্তিকায় লম্বমান হইয়া বুকে হাঁটিয়া অতি ধীরে তাম্বুর পশ্চাতে আসিল, এবং তাম্বুর একপ্রান্ত একটু ফাঁক করিয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাম্বুর ভিতরটা একবার দেখিয়া লইল; তাহার পর তাম্বুর ভিতর প্রবেশ করিয়া দুইতিন মিনিটের মধ্যে—যে ভাবে তাম্বুতে প্রবেশ করিয়াছিল, সেই ভাবেই—বাহির হইয়া গেল! অল্পক্ষণ পরে সন্ধ্যার অন্ধকারে অরণ্যে তাহার দীর্ঘদেহ মিশিয়া গেল।—আফ্রিদীরা তখনও সমস্বরে ফুকারিতেছিল, "লা-আল্লা-ইলাল্লা!"

আফ্রিদীরা নমাজ শেষ করিয়া তাম্বুতে প্রবেশ করিল, এবং ডেগ্‌চির চতুষ্পার্শ্বে চক্রাকারে বসিয়া পরম পরিতৃপ্তির সহিত ভোজন করিল; প্রকাণ্ড এক ডেগ্‌চি 'ওগ্‌রা' দেখিতে দেখিতে অদৃশ্য হইল।

সমস্ত দিনের পথশ্রমে তাহারা অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছিল; তাম্বুর মধ্যে অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত করিয়া, স্ব স্ব বন্দুক মাথার নীচে রাখিয়া ছয়জন আফ্রিদী বীর ভূমিশয্যায় শয়ন করিল; কেবল একজন মশাল জ্বালিয়া তাম্বুর দ্বারপ্রান্তে বসিয়া রহিল—তাহার উপর পাহারার ভার ছিল।

যাহারা শয়ন করিয়াছিল, কএক মিনিটের মধ্যেই তাহারা গাঢ় নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইল। যে জাগিয়া পাহারা দিতেছিল, তাহারও হাই উঠিতে লাগিল, ক্রমে তাহার চক্ষু জড়াইয়া আসিল, চক্ষু মেলিবার শক্তি রহিল না; সে বসিয়া ঢুলিতে ঢুলিতে সেই স্থানেই 'ধুপ্' করিয়া পড়িয়া গেল; মশালটা জ্বলিয়া জ্বলিয়া নিভিয়া গেল। সমস্ত রাত্রির মধ্যে তাহাদের কাহারও নিদ্রাভঙ্গ হইল না।

মধ্যরাত্রে একজন সৈনিক পুরুষ একটি 'বৈদ্যুতিক দীপ' (Electric torch) হস্তে কর্ণেল লীর বস্ত্রাবাস হইতে বহির্গত হইয়া দ্রুতপদবিক্ষেপে আফ্রিদী তাম্বুর অভিমুখে ধাবিত হইলেন এবং নিঃশঙ্কচিত্তে আফ্রিদী-শিবিরে প্রবেশপূর্ব্বক বৈদ্যুতিক দীপের সাহায্যে নিদ্রাভিভূত আফ্রিদী বীরগণের মুখ দেখিতে লাগিলেন।

তিনি রিসালদার মেজর সর্দ্দার বাহাদুর মহম্মদ খাঁ।

(৬)

পরদিন প্রভাতে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই আফ্রিদী সর্দ্দার আলিবাগের সহিত অসিযুদ্ধ করিবার জন্য সর্দ্দার বাহাদুর মহম্মদ খাঁ হাতিয়ার বন্ধ-হইয়া নির্দ্দিষ্ট স্থলে উপস্থিত হইলেন। পূর্ব্বদিন যাঁহারা সভায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের প্রায় সকলেই যুদ্ধ দেখিতে আসিলেন।

কিন্তু আফ্রিদীদের তখনও দেখা নাই; তাহারা তাহাদের তাম্বুতে পড়িয়া তখনও নাসাগর্জ্জন করিতেছিল; যুদ্ধক্ষেত্রে তাহাদিগকে অনুপস্থিত দেখিয়া মহম্মদ খাঁ মৃদু হাস্য করিলেন।

কর্ণেল লী জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাসিতেছ যে!"

মহম্মদ খাঁ বলিলেন, "আলিবাগ কাল আমার চড় খাইয়া মনের সুখে ঘুমাইতেছে! ইহা চির নিদ্রার পূর্ব্বলক্ষণ।—আমি কাল রাত্রে আপনাকে যে সকল কথা বলিয়া আসিয়াছি, আলিবাগকে তাহা বলিতে ভুলিবেন না।"

কর্ণেল লী বলিলেন, "সে কথা আমার মনে আছে।"

মিঃ স্পেন্‌সার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি কথা?"

কর্ণেল লী হাসিয়া বলিলেন, "মুক্তিপণের কথা পরে জানিতে পারিবে।"

কাপ্তেন ওয়েন বলিলেন, "সর্দ্দার বাহাদুর, আলিবাগ

তলোয়ার খেলায় ওস্তাদ খুব, কেমন নয় কি?—তুমি ত ঘা'ল হইবে না?"

মহম্মদ খাঁ বিনয় প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "সে বাঁ হাতে তলোয়ার খেলে হুজুর! খুব চমৎকার খেলোয়াড়; যাহারা কেবল ডান হাতে ভিন্ন খেলিতে পারে না—তাহারা তাহার সঙ্গে খেলায় কখন জিতিতে পারিবে না।—কিন্তু আমার কথা স্বতন্ত্র।"

কর্ণেল লী বলিলেন, "তুমি ত ডান হাত বাঁ হাত সমান চালাইতে পার। আজ দেখা যাইবে কেমন তোমার হাত চলে!—তুমি ফৌজের মধ্যে দুই হাতেই অসি চালনা শিখাইতেছ; এ শিক্ষার উপযোগিতা আছে কি না বুঝা যাইবে।"

মহম্মদ খাঁ হাসিয়া বলিলেন, "তাহা কি আর বোঝেন না হুজুর! সহজ বুদ্ধিতেই ত তা বুঝিতে পারা যায়! মনে করুন তলোয়ারখান চালাইতে চালাইতে ডান হাতখানি যখম হইয়া গেল, তখনও বাঁ হাত চালাইতে পারা যায়। কিন্তু যাহারা বাঁ হাতে তলোয়ার ধরিতে জানে না, তাহারা তৎক্ষণাৎ পরাজয় স্বীকারে বাধ্য হয়। দুইহাতে যে তলোয়ার বা বল্লম চালাইতে পারে—সে একা দু'জনের কাজ করিতে পারে,—অনেক সময় দু' জনের মোহড়া লইতে পারে।"

এইরূপ কথা হইতেছে এমন সময় আলিবাগ অনুচরবর্গের সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইল। তখনও তাহাদের নিদ্রালস ভাব দূর হয় নাই।

কর্ণেল লী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এত বিলম্ব কেন আলিবাগ? প্রভাতে তোমাদের লড়াইয়ের সময় নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা কি ভুলিয়া গিয়াছিলে?"

আলিবাগ হাই তুলিয়া বলিল, "ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম; এমন হাড়ভাঙ্গা ঘুম জীবনে কখনও ঘুমাই নাই। ঠাহর করিতেছি, পাহাড়ের জীনে আমাদের যাদু করিয়াছিল।"

কর্ণেল লী বলিলেন, "তাড়াতাড়ি লড়াই শেষ করিয়া লও; আজ দেখিতেছি আমাদের ফৌজের একজন রিসালদার মেজরের চাকরী খালি হইবে! বুড়া মহম্মদ খাঁ কি তোমার মত খেলোয়াড়ের কাছে তলোয়ার ধরিতে পারিবে?"

মহম্মদ খাঁ অদূরে দাঁড়াইয়া আছেন দেখিয়া আলিবাগ সদম্ভে বলিল, "উহার বড় গোস্তাকি! সমস্ত আফ্রিদী জাতি আমাকে দেখিলে মাথা নোয়াইয়া কুর্ণিশ করে, আর সরকারের একটা সামান্য নফর কি না আমার দাড়ি ধরিয়া চড়াইয়া দিল, আমার মুখে থুথু দিল। তোবা, আজ এই শয়তানটার গোস্ত টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া কাটিব।"

কর্ণেল বলিলেন, "ঐটি পারিবে না।—তোমার মান নষ্ট করিয়াছে, তুমি লড়াই ফতে করিয়া উহার অপমান কর। পরাজয় অপেক্ষা বীরপুরুষের পক্ষে অধিক অপমানের বিষয় কি আছে? তোমরা লড়াই করিবে, যুদ্ধে আহত হওয়াই সম্ভব, কিন্তু কেহ কাহাকেও হত্যা করিতে পারিবে না।"

আলিবাগ বলিল, "আপনি স্বীকার করিয়াছেন—আমাদের লড়াইয়ে আপনারা নিরপেক্ষ থাকিবেন, কিন্তু এখন মহম্মদ খাঁয়ের পক্ষ হইয়া কথা বলিতেছেন কেন? আপনি বুঝিয়াছেন মহম্মদ খাঁ আমার হস্তে পরাজিত হইবে; পাছে আমার হস্তে সে নিহত হয়, পাছে আপনার একটা বিশ্বাসী নফর জাহান্নমে যায়—এই ভয়ে আপনি এরকম প্রস্তাব করিতেছেন, তাহা আমার বুঝিতে বাকি নাই।"

কর্ণেল লী সহাস্যে বলিলেন, "তুমি যেমন বীর সেইরূপ বুদ্ধিমান্!—সুতরাং আমার কথা শুনিয়া বুঝিতে পারিবে আমি নিরপেক্ষ বিচারকের মতই প্রস্তাব করিয়াছি। যদি তুমি মহম্মদ খাঁর হস্তে নিহত হও, তাহা হইলে লোকে জনরব করিবে—আমরা অভয় দান করিয়া আনিয়া কৌশলক্রমে তোমাকে হত্যা করিয়াছি।—এজন্য সরকারও কৈফিয়ৎ চাহিতে পারেন; সরকারের উপর দেশের লোকেরও বিশ্বাস কমিবে।"

আলিবাগ নির্ব্বোধ নহে, সেই যুক্তির সারবত্তা বুঝিতে পারিয়া কর্ণেলের প্রস্তাবে সম্মত হইল।

কর্ণেল লী বলিলেন, "আরও কথা আছে।—লড়াই করিতে করিতে যদি কেহ তরবারি ত্যাগ করে—তখনই যুদ্ধ শেষ হইবে। তাহার পরও যে তরবারি চালাইবে তাহাকে আমি গুলি করিব। যে পরাজিত হইবে, প্রতিদ্বন্দ্বীর হস্তে তাহাকে বন্দী হইতে হইবে।"

আলিবাগ বলিল, "মহম্মদ খাঁ যদি পরাজিত হয়, তাহা লেহই তাহাকে বন্দী করিয়া লইয়া যাইতে পারিব ?"

কর্ণেল লী বলিলেন, "তাহাকে বন্দী করিয়া লইয়া যাইবার অনুমতি দিতে পারি না; সে সরকারের নফর, তাহাকে ছাড়িবার আমার অধিকার নাই। তবে তুমি মুক্তিপণ আদায় করিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিতে পারিবে।—তোমার সম্বন্ধেও ঐ কথা।"

আলিবাগ এ প্রস্তাবেও সম্মত হইল। সে ভাবিল, "মিস্ সাহেবের মুক্তিপণ পরে আদায় হইবে। শুধু হাতে ঘরে ফিরিব ? মহম্মদ খাঁকে পরাস্ত করিয়া হাজার টাকার কম তাহাকে ছাড়িব না। এমন দাঁও সর্ব্বদা মেলে না !"

(৭)

বিউগিল বাজিল। যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মহম্মদ খাঁর তরবারিখানি ওজনে আড়াই সের, প্রায় আড়াই হাত লম্বা, তাহার মুষ্টি বেষ্টনীহীন।—এই তরবারি ক্ষুরের ন্যায় তীক্ষ্ণধার; এমন উজ্জ্বল যে দর্পণের ন্যায় তাহাতে মুখ দেখা যাইত !

অলিবাগের তরবারিখানিও অতি উৎকৃষ্ট। যে তরবারির এক আঘাতে ষণ্ডের গ্রীবা দ্বিখণ্ডিত হইতে পারে, সেই তরবারির গুণের অন্য পরিচয় দেওয়া বাহুল্য মাত্র। আলিবাগের কব্জির জোর ও অসিচালনকৌশলেরও ইহা প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

আলিবাগ বামহস্তে তরবারি নিষ্কোষিত করিয়া তাহা ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিল। প্রভাত-সূর্য্যরশ্মি তাহাতে প্রতিফলিত হইয়া ঝক্‌মক্ করিয়া উঠিল।—মহম্মদ খাঁও বামহস্তে তরবারি আকর্ষণ করিলেন। দেখিয়া আলিবাগ সবিস্ময়ে থমকিয়া দাঁড়াইল। মুহূর্ত্তের জন্য তাহার মুখ ম্লান হইল।

তাহার পর উভয় অসি পরস্পরের বিরুদ্ধে পরিচালিত হইল। উভয়েরই অসিচালনকৌশল অপূর্ব্ব। অসিদ্বয়ের ঘাতপ্রতিঘাতে ক্রমাগত ঝঞ্ঝনা উত্থিত হইল; সৌরকর-প্রতিফলিত উভয় অসি বিদ্যুতের ন্যায় খেলিতে লাগিল। উভয় তরবারির ঘর্ষণে ঘন ঘন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বহির্গত হইতে লাগিল,—দর্শকগণ রুদ্ধনিঃশ্বাসে উভয় বীরের অসিসঞ্চালন নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

আলিবাগ ক্রমাগত আক্রমণেরই চেষ্টা করিতেছিল; কিন্তু মহম্মদ খাঁ আত্মরক্ষার চেষ্টা ভিন্ন প্রতি-আক্রমণের চেষ্টা করেন নাই; তিনি ধীরভাবে অপূর্ব্ব কৌশলের সহিত আলিবাগের প্রত্যেক আঘাত ব্যর্থ করিতে লাগিলেন। আলিবাগ আঘাত করিতে করিতে ক্রমে তাঁহার নিকট অগ্রসর হইল। অবশেষে আলিবাগ যখন তাঁহার অত্যন্ত নিকটে উপস্থিত হইল, তখন তিনি এমন কৌশলে তাহাকে আঘাত করিলেন যে, আলিবাগকে বিদ্যুদ্বেগে হটিয়া আসিতে হইল।—মহম্মদ খাঁ তাহার আক্রমণের প্রতীক্ষায় তরবারি অবনত করিলেন।

এবার আলিবাগ দ্বিগুণ উৎসাহে অগ্রসর হইবামাত্র মহম্মদ খাঁ চক্ষুর নিমিষে তরবারিখানি বামহস্ত হইতে দক্ষিণ হস্তে গ্রহণ করিলেন; প্রতিদ্বন্দ্বীর বামহস্তে তরবারি থাকিলে তাহাকে আঘাতের জন্য যে সকল ফাঁক খুঁজিতে হয়, আলিবাগ সেই ফাঁক খুঁজিতে গিয়া মুহূর্ত্তের জন্য অসাবধান হইল; মহম্মদ খাঁ সেই অবসরে আলিবাগের কব্জিতে তরবারির এমন আঘাত করিলেন যে, তাহার হাত হইতে তরবারি খসিয়া ঝন্ ঝন্ শব্দে মাটিতে পড়িয়া গেল।

মহম্মদ খাঁ এক লম্ফে পার্শ্বে সরিয়া গিয়া আলিবাগের তরবারির উপর দণ্ডায়মান হইলেন, এবং তাঁহার তরবারির ধারের উল্টা দিক্ দিয়া আলিবাগের ওষ্ঠে আঘাত করিলেন; সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিলেন "আর কেন আলিবাগ, পরাজয় স্বীকার কর। ভাবিয়াছিলাম তুমি সের, এখন দেখিতেছি তুমি কুত্তা। ধোপিকা কুত্তা নহি ঘরকা"—

আলিবাগ সবেগে মহম্মদ খাঁর নাকের ডগায় এমন এক মুষ্ট্যাঘাত করিল যে, তাহার নাক ফাটিয়া রক্ত ঝরিতে লাগিল।

মহম্মদ খাঁ সেই আঘাতে দুইহস্ত হটিয়া গিয়া বলিলেন, "আলিবাগ, অমি তোমাকে তরবারি ত্যাগ করাইয়াছি, তুমি পরাজিত।"

আলিবাগের কর্ণে সে কথা প্রবেশ করিল না, তখন সে উন্মত্তবৎ হইয়াছিল।—সে কএক পদ পিছাইয়া গিয়া জানু পাতিয়া বসিল, এবং আঙ্গরাখার ভিতর হইতে একটি টোটাভরা ছয়নলা পিস্তল বাহির করিয়া মহম্মদ

মহম্মদ খাঁ উভয় হস্তে মুখ ঢাকিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন।

খাঁর অভিমুখে উদ্যত করিল; তৎক্ষণাৎ ঘোড়া টিপিল।

মহম্মদ খাঁ ভীত হইলেন না; তরবারি ফেলিয়া উভয় হস্তে মুখ ঢাকিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন।

মুহুর্মুহু পিস্তলের আওয়াজ হইল, পিস্তলের মুখ হইতে ধূম ও অগ্নি শিখা নির্গত হইল; পিস্তলের শব্দে যুদ্ধক্ষেত্র প্রতিধ্বনিত হইল। ইংরেজ কর্ম্মচারিগণ ক্রোধে ও ক্ষোভে লাফাইয়া উঠিলেন। আফ্রিদীরা সোৎসাহে হর্ষধ্বনি করিয়া উঠিল।

কর্ণেল লী এক লম্ফে আলিবাগের উপর লাফাইয়া পড়িয়া তাহার মস্তকে এমন জোরে মুষ্ট্যাঘাত করিলেন যে, আলিবাগ ঘুরিয়া পড়িয়া গেল।

কর্ণেল লীর ব্যবহার দর্শনে আফ্রিদীরা ক্রোধে গর্জ্জন করিয়া উঠিল। কিন্তু মহম্মদ খাঁ তাহাতে ভ্রুক্ষেপ না করিয়া ভূতলশায়ী আলিবাগের বক্ষঃস্থলে জানুস্থাপন করিয়া তাহার উভয় হস্ত চাপিয়া ধরিলেন; বলিলেন, "তুমি আমার বন্দী, হাতে হাতকড়া দিব কি?"

আলিবাগ বলিল, "তাহার আবশ্যক নাই, আমি পরাজয় স্বীকার করিলাম।"

মহম্মদ খাঁ আলিবাগকে পরিত্যাগপূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইলেন, এবং আলিবাগের অনুচরগণকে বলিলেন, "তোমাদের সর্দ্দারকে আমি বন্দী করিয়াছি, মুক্তিপণ না দিলে উহার মুক্তি নাই; আমি উহাকে কারাগারে বন্দী করিয়া রাখিব।"

আলিবাগ গাত্রোত্থান করিয়া বলিল, "কি মুক্তিপণ চাও?"

মহম্মদ খাঁ বলিলেন, "মিস্ সাহেবের স্বাধীনতা। তাঁহাকে এখানে আনিয়া না দিলে তোমার পরিত্রাণ নাই।"

আলিবাগকে এই প্রস্তাবেই সম্মত হইতে হইল। সেই দিনই আলিবাগের তিনজন অনুচর ইসোবেলকে আনিতে চলিল।—আলিবাগ ইংরেজ-শিবিরে বন্দী রহিল।

সন্ধ্যাবসানে আলিবাগের অবশিষ্ট অনুচরেরা খানা পাকাইবার আয়োজনে ব্যস্ত হইল।

(৮)

তিনদিন পরে আলিবাগের অনুচরেরা মিস্ ইসোবেলকে সুস্থদেহে ইংরেজের ছাউনীতে লইয়া আসিল। পিতার সহিত তাঁহার মিলনের আনন্দ ভাষায় ব্যক্ত হইবার নহে। আলিবাগ মুক্তি লাভ করিয়া নিরুৎসাহচিত্তে ইংরেজ-শিবির ত্যাগ করিল।

সেই দিন সায়ংকালে মহম্মদ খাঁকে বিশেষভাবে সম্মানিত করিবার জন্য ইংরেজ-শিবিরে একটি সান্ধ্য-সম্মিলনীর অনুষ্ঠান হইল।—সেই সময় কাপ্তেন ওয়েন মহম্মদখাঁকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সর্দ্দার বাহাদুর, তুমি কি যাদু জান? আলিবাগ তোমাকে লক্ষ্য করিয়া মারিবার পিস্তল ছুড়িয়া-

ছিল, কিন্তু একটা গুলিও তোমার শরীরে বিঁধিল না! ব্যাপার কি?"

মহম্মদ খাঁ বলিলেন "সেদিন দরবারস্থলে আমি আলিবাগের দুইজন অনুচরের সহিত আলাপ করিতেছিলাম, তাহা আপনারা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। তাহারা কি কি অস্ত্র লইয়া আসিয়াছে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম, তাহাদের প্রত্যেকের নিকট বন্দুক ছোরা তরবারি আছে; কেবল আলিবাগের নিকট অতিরিক্ত একটি পিস্তল আছে। তাহাদের আহারাদির ব্যবস্থা কি হইবে, একথাও জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তাহারা বলিয়াছিল, দরবারের পর তাহারা খানা পাকাইবে এবং নমাজ শেষ হইলে আহারাদি করিবে।

"আমি দরবারের পর ডাক্তার সাহেবের নিকট ঘুমের ঔষধ সংগ্রহ করিয়া, আফ্রিদীদের নমাজের সময় তাহাদের তাম্বুর পশ্চাদ্দিক্ দিয়া তাম্বুতে প্রবেশ করি, এবং সেই ঘুমের ঔষধ তাহাদের খানায় মিশাইয়া রাখিয়া আসি। খানা খাইয়া উহারা সমস্ত রাত্রি বেহুঁস হইয়া পড়িয়া ছিল। মধ্য রাত্রে পুনর্ব্বার আমি উহাদের তাম্বুতে প্রবেশ করিয়া আলিবাগের কুর্ত্তার নীচে ছয়নলা পিস্তল দেখিতে পাই। আমি পিস্তলের টোটাগুলি খুলিয়া লইয়া নূতন টোটা ভরিয়া রাখিলাম,—সেই সকল টোটায় গুলি ছিল না।—আমি বুঝিয়াছিলাম, দারুণ অপমানে আলিবাগ আমার প্রতি জাতক্রোধ হইয়াছে; তরবারিযুদ্ধে পরাজিত হইলে সে আমাকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিবে,—গুলি করিয়া মারিবে।—সেই জন্যই আমি তাহার পিস্তল হইতে গুলি সরাইয়াছিলাম। আর সে জাগিয়া থাকিলে আমার কার্য্যসিদ্ধির সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া ঘুমের ঔষধ খাওয়াইয়া তাহাকে বেহুঁস করিয়াছিলাম। সে যখন পিস্তলের আওয়াজ করে তখন জলন্ত বারুদে আমার মুখ ঝল্‌সাইয়া না যায়, এই অভিপ্রায়ে মুখ ঢাকিয়াছিলাম।"

কাপ্তেন ওয়েন হাসিয়া বলিলেন, "তুমি প্রথম হইতেই দাবার চা'ল আরম্ভ করিয়াছিলে!"

মহম্মদ খাঁ বলিলেন, "হাঁ হুজুর, যুদ্ধটা দাবা খেলা ভিন্ন আর কিছুই নহে, বুঝিয়া চা'ল দিতে পারিলেই বাজীমাৎ! আলিবাগকে আমি আড়াই চা'লে মাৎ করিয়াছি।"

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

কীর্ত্তন

কেমন আমার প্রাণ এগোয় না
ডাক্‌তে তোমায় দয়াল নামে!
দয়া বলা কি সাজে সেথা,
যেথা বাঁধা প্রাণে প্রাণে?
পিতা, মাতা, ভ্রাতা, জায়া,
কেউ কি বলে করে দয়া,
ত্যজেও যদি নিজ কায়া,
বাঁচাইতে আপন জনে?
দয়া করা পরের 'পরে,
কেউ কি আপন্ জনে দয়া করে?
যা না ক'রে থাক্‌তে নারে,
তারে দয়া কে বাখানে?
ভালবাসার কাছে দয়া,
আলোর কাছে কালো ছায়া,
সাঁচ্চার কাছে মেকি মায়া,
এমনি প্রভেদ সবাই জানে।

শ্রীঅশ্বিনীকুমার দত্ত।

গৃহে জাপানী রমণী

পাগল সন্ন্যাসী

বিজয়ার দিনে বিশাল জনতা
মায়ের প্রতিমা-সাথে।
সাজি নানা সাজে চলেছে নাচিয়া
নগরের রাজপথে॥
"সানাই" সে মৃদু করুণ সঙ্গীত
ঢালি অবিরল কাণে
উৎসবাকাশে বিষাদের ছায়া
তুলেছে জনতা-প্রাণে॥
ছুটিছে জনতা উৎসাহবেগে
তথাপি প্রতিমা ল'য়ে,
ধরিয়াছে পথ চ'লেছে আসিয়া
যাহা ভাগীরথীতোয়ে॥
সেই পথধারে জাহ্নবীর তীরে
যুবক সন্ন্যাসী বসি'
ধুলা-ভস্ম মাখি স্রোতস্বিনী দেখি'
কাটায় দিবস-নিশি॥
সন্ন্যাস-জীবন- সহ্য সাধনায়
যুবার সুঠাম দেহে,
এখনো পারেনি আঁকিবারে লেখা;
যুবা ক্ষণে ক্ষণে কহে—
"দিয়েছি ভাসায়ে অয়ি স্রোতস্বিনী!
তোমার শীতল জলে।
সংসার-সুখের জলন্ত প্রতিমা
আমারে পাগল বলে?
আছি শুধু ব'সে দেখিবার আশে
তোমার স্রোতের ধারে।
জীবন-প্রবাহে যদি অন্য সুধা
বহে নিয়তির ফেরে"॥
অদূরে জনতা সন্ন্যাসীর চোখে
পড়িল সবেগে আসি',
অনিমিষ আঁখি নেহারি প্রতিমা
রহিল বিস্ময়ে ভাসি'॥

নেহারি নেহারি নেহারি আবার
সন্ন্যাসী আসিল ছুটি,
আগুলিল পথ প্রতিমা যাবার
প্রসারিয়া কর দু'টী॥
কহিল উচ্ছ্বাসে "সোণার প্রতিমা
কোথায় লইয়া যাবে?
জাহ্নবীর নীরে দিলে বিসর্জ্জন
কি ব্যথা পরাণে পাবে!
ঘুচিবে সে জ্বালা মাদক-সেবনে
ভেবেছ হৃদয়ে ভাই?
সিদ্ধি-ধুতুরায় সিক্ত হৃদি মম
হতেছে পুড়িয়া ছাই॥
আমারো ছিল গো এমন প্রতিমা
সকলে কহিত ভালো।
সুকোমল প্রাণে তেন তেজস্বিনী
ভুবন করিয়া আলো,
ক্রোধ মহিষীর উত্তপ্ত রুধিরে
জনমিলে হিংসাসুর,
বাঁধি মায়া-নাগে বিঁধি স্নেহ-শরে
করিত সে তারে দূর॥
আমারো ছিল গো যুগল কুমারী
প্রতিমার দুই পাশে।
এমনি কুমার" বলিয়া সন্ন্যাসী
নয়নের জলে ভাসে॥
"দিয়েছি ভাসায়ে একে একে সবে
এই ভাগীরথী-নীরে,
কতদিন তীরে রহেছি বসিয়া
চাহিল না কেহ ফিরে॥
এমন প্রতিমা আবার কখনো
দিব না ভাসাতে জলে"।
বলিতে বলিতে অশান্ত সন্ন্যাসী
পড়িল ধরণীতলে॥

সমবেত জন গণিল প্রমাদ
কি উপায় এর হবে,
ডুবিল তপন মায়ের প্রতিমা
পথে কতক্ষণ র'বে ॥
হেন কালে এক রূপসী কামিনী
জনতা করিয়া ভেদ,
আসিল সেথানে পাগল সন্ন্যাসী
করিছে পড়িয়া খেদ ॥
কহিলা যুবতী "উঠহে সন্ন্যাসী"
বীণাবিনিন্দিত স্বরে,
"শুধু ভস্ম মাখি কাটিবে না মোহ
যাও ফিরে যাও ঘরে ॥
তোমার প্রতিমা কামনা-গঠিত
আশা-স্বার্থোজ্জ্বল সাজে ;
ছিল সমুজ্জ্বল, বিসর্জ্জনে তার
নৈরাশ্য-বেদনা বাজে ॥
মোদের প্রতিমা ভুবনপালিকা
অনাদি-শকতি-ছায়া,
মন কারিকর ধারণা-কারণ
দিয়াছে তাহারে কায়া ॥
স্বভাববিরোধী সিংহ, অহি, শিখী
যাঁহার প্রভাবে চলি,
নাশিছে অসুর জগত-কল্যাণে
রমা সরস্বতী মিলি ॥

কামরূপী ছাগ কোরোধ মহিষে
লোভমেষে দিয়া বলি,
যাঁহার পূজায় পূত হয় নর
প্রবৃত্তিরে পদে দলি'॥
কামনা রহিত যে পরা শকতি
বিশ্ব চরাচরে খেলে,
প্রতিমা তাঁহার সম্মুখে তোমার,
দেখ হে নয়ন মেলে ॥
এ প্রতিমা হেরি বরষ বরষ
ত্রিদিবা যামিনী ধরি',
ত্যজিতে কামনা জগত-মঙ্গলে
আমরা প্রয়াস করি ॥
উঠহে সন্ন্যাসী ছেড়ে দাও পথ
সে প্রয়াসে দেহযোগ
ছাড়িবে কামনা পাইবে বিরাম
ঘুচিবে যাতনা-ভোগ" ॥
নিরবিল স্বর নাহিক কামিনী,
সন্ন্যাসী পাইল বল ;
দিল পথ ছাড়ি চলিল প্রতিমা
যেথা ভাগীরথী-জল ॥

শ্রীজানকীনাথ মুখোপাধ্যায়

আগমনী।

তুমি গৃহে এলে পরে,
বলিতে হোত না মোরে
তব আগমন;

পদশব্দ আঙ্গিনায়
যেন রণবাদ্য প্রায়,
বিজয়-ঘোষণ।

মুখরিত দিক্ সব,
আনন্দে উল্লাস রব
চরাচরময়,

মুক্তভাব প্রাণে নিত্য,
প্রেমে সুধু বাঁধা চিত্ত
অনুরাগে জয়।

তোমারে করিতে হ'ত,
বাধা বিঘ্ন শত শত
দূরে সরাইয়া,

আপনি আসিয়া ধরা
দিতে তুমি বিশ্বভরা
সুখ বিলাইয়া।

তেজ গর্ব্ব কিছু আর
রহিত না, একাকার,
আত্ম-বিসর্জ্জিয়া।

পশ্চিমে ডুবিলে বেলা
সাঙ্গ করি ধূলিখেলা
গৃহে আগমন,

সচঞ্চল পদধ্বনি
মৃদঙ্গ-নিনাদ গণি
হৃদয়ে তখন।

পুলকে উচ্ছ্বাসে হিয়া,
দুই বাহু প্রসারিয়া
সন্ধ্যার আরতি

করিবারে দুঁহু মিলি
স্নেহের দীপিকা জ্বালি
শরীরী মূরতি।

নাই সেই আগমন,
নাহি প্রিয়-সম্মিলন
শূন্য সব আজি;

প্রাঙ্গন উঠে না জাগি
তোমার চরণ লাগি
ঝরে অশ্রুরাজি।

নিশীথে ব্রহ্মাণ্ড ভুলে,
জীবন-দুয়ার খুলে,
প্রীতির কাহিনী

ঘুম পাড়াবার তরে,
নানা তানে নানা স্বরে
অপূর্ব্ব রাগিণী

গাহিয়া,—ঘুমাতে আর
হয় না, এ নির্ব্বিকার
নিদ্রা চিরন্তন,

গামিয়াছে আগমনী
বিজয়ার বাদ্য শুনি,
নীরব ক্রন্দন,

রাত্রি দিন জাগে প্রাণে,
আবাহন বিসর্জ্জনে
অকাল-বোধন।

শ্রীপ্রসন্নময়ী দেবী।

নিদিয়া

বাঙ্গালা অভিধান।

গত ফেব্রুয়ারী মাসের প্রারম্ভে আমি ব্যাণ্ডেল যাইব বলিয়া লুপমেলের একখানি ইণ্টারমিডিয়েট গাড়ীতে গিয়া বসি। অত্যল্প সময় পরে একটি লম্বা, ঢেঙ্গা যুবক আসিয়া আমার কামরায় উঠেন। তিনি জামালপুর অঞ্চলে যাইবেন বলিলেন। কোথায় যাইবেন বলিলেন তাহা আমার ঠিক স্মরণ নাই। তাঁহার সহিত আলাপ করিবার খুব ইচ্ছা ছিল, কিন্তু লোকটি নেহাৎ অল্প কথা কহেন। তাঁহার সঙ্গে জিনিস পত্রের মধ্যে দুইখানি খাতা ছিল। তিনি একটু অন্যমনস্ক হইয়াছেন দেখিয়া আমি তাঁহার খাতা একখানি লইয়া নাড়াচাড়া করিয়া তাহাতে যে অপূর্ব্ব দ্রব্য দেখিয়াছিলাম তাহাই অদ্য ভারতবর্ষের পাঠকবর্গকে উপহার দিব। উক্ত যুবক আমাকে একটু ছাপা কাগজ দিয়াছিলেন; সেইটা আপনাকে পাঠাইতে পারিলে ঠিক হইত। কিন্তু আমি তাহা হারাইয়া ফেলিয়াছি। সুতরাং নাচার।

ঐ খাতাখানি আগাগোড়া হাতে লেখা একখানি অভিধান। আজকাল যে রকম বাঙ্গালা অভিধান পাওয়া যায় তাহা নহে। ইহাতে প্রত্যেক কথার যে রকম অর্থ দেওয়া হইয়াছে তাহা অন্যত্র পাওয়া দুর্লভ। আর ভাল লেখকের বাক্য (sentence) উদ্ধৃত হওয়ায় মানে বুঝা অতি সুস্পষ্ট হইয়াছে। এক কথায় ওয়েব্‌ষ্টারের ধরণের অভিধান। লোকটি খাটিয়াছে খুব। বইখানি এতদিনে ছাপা হইয়া গিয়াছে মনে করিয়া গুরুদাসবাবুর দোকানে খোঁজ লইয়াছিলাম। অনুসন্ধানে জানিলাম যে, বই ছাপা হয় নাই। এ বইখানি মুদ্রিত হইলে আমাদের সকল অভাব দূরীভূত হইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস। নিম্নে একটি কথার অর্থ ঐ অভিধানে যেমন দেখিয়াছিলাম সেইরূপ দিলাম—

আর—১। এবং; ৩।

২। পরবর্ত্তী;

সে রাত্রি তথায় থাকে তবে আর দিনে।
নিজ গৃহে আইলা মহাপ্রভু লক্ষ্মী সনে॥ বৃন্দাবন।

৩। মধ্যে একটা বাদ দিয়া; অব্যবহিত পরবর্ত্তীর পরবর্ত্তী।
আর সোমবারে বিবাহে দিন স্থির হইয়াছে।

৪। পূর্ব্ব, গত, অতীত; যাহা গিয়াছে।
আর বার যখন এসেছিলুম।

৫। পুনর্ব্বার, ফের;
যে সন্ন্যাসী হইয়াছে সে কি আর গৃহী হইতে পারে? ভূদেব।

৬। অপর, অন্য কোনও, ভিন্ন প্রকার।
আমি আর রাঁধুনী আনাইতেছি। বঙ্কিম।
আর বিষ খেলে তখনই মরণ
এ বিষে জীবন শেষ।

৭। ইহার অধিক; যতদূর হইয়াছে তাহা অপেক্ষা বেশী।
আর এগিও না।

৮। যদি; কিন্তু, অপর পক্ষে, পক্ষান্তরে; বেশ, ভাল, আচ্ছা। আর বৌঠাকুরাণী যদি হুকুম দেয়?—বঙ্কিম।

৯। কখনও; কোনও কালে।
ছোট ঘরে কি আর অমন স্বভাব-চরিত্তির হয়। বঙ্কিম।

১০। ব্যঙ্গ; বিদ্রূপ, বিরক্তি, ক্রোধ, প্রেম, দুঃখ, আক্ষেপ প্রকাশ করিবার জন্য মুখের ভঙ্গী সহকারে উচ্চারিত বাক্যের মাত্রা মাত্র।
আর দশ ছিলিম তামাক মার না, আমরা বুঝি ভেসে এসেছি? বঙ্কিম।
আর, দাদাঠাকুর, সর্ব্বনাশ হয়েছে, রোজা ডাকৃতে যাচ্ছি।
আর মা গঙ্গাস্নানে যাব, মা গঙ্গা এখন শীগ্‌গীর নিলে বুঝি।

১১। এখন, উপস্থিত সময়ে।
গরুগুলার হাড় উঠিয়াছে, আর দুধ দেয় না। বঙ্কিম।

১২। (দ্বিরুক্তি—toutology) এখন; বর্ত্তমান কালে।
হরমণির ঘর পথের ধারেই ছিল।
কিন্তু এখন আর সে ঘর নাই।

১৩। ফিরাইয়া
নগেন্দ্র দেওয়ানজীকে যে পত্র লিখিতেন কুন্দ তাহাই আসিয়া পড়িত; সেগুলি পাঠ তাহার সন্ধ্যা-গায়ত্রী হইয়াছিল। দেওয়ান হীরার কাছে একথা জানিয়াছিলেন। পত্রগুলি আর চাহিতেন না। বঙ্কিম।

১৪। অথবা; কিম্বা।

গাইতে পারি আর না পারি, আমার অনেক গান সংগ্রহ আছে। (জলধর) তা আমাকে মারই কাটই আর বকই ফাঁসিই দাও, আমি এখান থেকে নড়ছিনে। (রমেশ)।

১৫। সমকালে; তথা—

হীরা জিজ্ঞাসা করিল, কে গা? আমাদের ঘরের লক্ষ্মী আর তোমার যম।—বঙ্কিম।

১৬। এ ছাড়া; এতদ্ভিন্ন।

নবকুমারের সহিত লুৎফউন্নিসার আর রুইবার সাক্ষাৎ হইয়াছিল।

১৭। কোনও বিশেষ সময়ের আগে বা পশ্চাতে পূর্ব্বে বা পরে। লুৎফউন্নিসার দেহমহিমা এখন যেমন দেখিলেন, সেরূপ আর কখনও দেখেন নাই। কুন্দ এস, দিদি, এস, আমি তোমায় আর কখনও কিছু বলিব না। বঙ্কিম।

১৮। অন্যলোক—অন্য ব্যক্তি (ষ্য)—

একের কপালে রহে আরের কপাল দহে
আগুনের কপালে আগুন। ভারত।

১৯। (বিণ) পৃথক, সম্পূর্ণ বিভিন্ন, আলাদা।

ভক্তি এক, ভালবাসা আর। বঙ্কিম।

২০। দ্বিতীয়টা, এছাড়া আর একটা।

শুনি স্মরে মহাকবি ভারত ভারত।
এমন না দেখি আর চাহিয়া ভারত। ভারত।

২১। অপরতঃ (অব্যয়)

একে কাল হৈল মোর নয়লি যৌবন।
আর কাল হৈল মোর বাস বৃন্দাবন।
আর কাল হৈল মোর কদম্বের তল। চণ্ডী।

২২। উল্‌টাইয়া।

তাহা হইল বিপরীত আর বহু অনুচিত
দৈবে করে কি দোষ তোমার। ভারত।

আমার সহিত যুবকের যে কথাবার্ত্তা হয়, তাহাতে এই মাত্র বুঝিয়াছিলাম যে, ঐ পুস্তক-প্রণয়নে তাঁহার ১২।১৪ বৎসর লাগিয়াছে। আমি যে খাতা দেখি, তাহাতে Parts of Speech অনুসারে আলাদা করিয়া মানে লেখা নাই। তাহার কারণ আমি খসড়াখানা দেখিয়াছিলাম। Rewrite করিবার সময় Parts of speech ধরিয়া মানে লেখা হইয়াছে। যে ছাপা কাগজখানি দিয়াছিলেন সেখানি আমার বাড়ীর একটা ছেলেকে নকল করিতে দিয়াছিলাম—সেই বালক উহা হারাইয়া ফেলে। নকল হইতে এইগুলি আমি উদ্ধার করিয়াছি। এই কাগজ আমি স্বেচ্ছামত ব্যবহার করিতে পারি, আমায় এ অনুমতি যুবক দিয়াছিলেন।

আর একটা অর্থ পাওয়া গেল—

ছাড়া (ক্রিয়া)

১। বন্ধন মোচন করা; বাধা ঘুচাইয়া দেওয়া।

আমায় ছাড়; হাত ছাড়।

২। মুক্তি দেওয়া, খালাস দেওয়া, বিচারের পর নির্দ্দোষ বলিয়া স্বাধীনতা দেওয়া। জজ দুইজন আসামীকে ছাড়িয়াছেন।

৩। পরিত্যাগ করিয়া দূরে যাওয়া।

তুমি ছাড়ি গেলে আমি ত্যজিব জীবন।
কৃত্তিবাস।

৪। প্রত্যাখ্যান করা, গ্রহণ করিতে অস্বীকার করা।

এমন পাত্র ছাড়িতে নাই।

৫। অতিক্রম করা, পথে যাইতে পশ্চাতে ফেলিয়া আসা।

ডানি বামে ছাড়্যা যায় কত মহাদেশ। মুকুন্দ।

৬। সঙ্গ ত্যাগ করা।

আপনার গুণে সকলকে বশ করিয়া লইয়াছেন—কেহ আপনাকে ছাড়িতে চাহে না। রবীন্দ্র।

৭। বাদ দেওয়া, রেয়াৎ করা।

তিনি কাহাকেও ছাড়িয়া কথা কহেন না।

৮। প্রার্থনা বা অনুরোধ পূরণ বা রাখিতে অস্বীকার করিলেও সে বিষয়ে জিদ করা। কিন্তু বৈষ্ণবী ছাড়ে না।

৯। কোনও প্রকার বস্তু বা মাদক দ্রব্যের ব্যবহারের অভ্যাস ত্যাগ করা। মদ ছাড়া; লাঠি ছাড়িয়াই বাঙ্গালী নির্জ্জীব হইয়াছে। বঙ্কিম।

১০। চলিতে আরম্ভ করা; গতিশীল হওয়া।

গাড়ী ছাড়া।

১১। অগ্রসর হওয়া; রওনা হওয়া।

ভোরের বেলায় ছাড়িতে হইবে, আমি ঠিক সময়ে আসিয়া হাজির হইব।

১২। নিবৃত্ত হওয়া; যত দূর করিবার তাহা করা ও

তদন্তর অদৃশ্য হওয়া। যাহার হৃদয়ে প্রবেশ করে তাহার সর্ব্বনাশ করিয়া ছাড়ে।

১৩। কোনও বস্তু পাওয়া সম্বন্ধে আপনার ন্যায্য সত্ব বা সুবিধা ত্যাগ করা বা চলিয়া যাইতে দেওয়া। ৫০০৲ অনেক টাকা; আমি অত ছাড়িতে পারিব না। বড় জোর ৫৲ ছাড়িতে পারি। এ ত মরিতে বসিয়াছে, তবে আমি টাকাটা ছাড়ি কেন। বঙ্কিম।

১৪। গর্হিতভাবে নিষিদ্ধ কোনও কাজ করিতে দেওয়া। তিনি আসিয়াছিলেন—পাহারাওয়ালা ছাড়িল না। রোজ ছাড়ে আজ ছাড়িল না কেন? বঙ্কিম।

১৫। লক্ষ্য উদ্দেশ করিয়া তাহাতে আঘাত করিবার জন্য বেগের সহিত কোনও বস্তু সেই দিকে নিক্ষেপ করা। ক্রোধে কম্পবান্ বান ছাড়ে দাশরথি। কৃত্তিবাস।

ইহার পরে অনেক Phraseএর মানে দেওয়া আছে।

একটি কথার মানে মাত্র লিখিয়া পাঠাইতে পারিব মনে করিয়া বসিয়াছিলাম। কার্য্যকালে পাওয়া গেল দুইটী কথার অর্থ। ভাবলেম, ভাল জিনিষ একলা খাইতে নাই, সকলকে দিয়া খাইব। তথা পঞ্চতন্ত্রে (—এক স্বাদু নভুঞ্জীত) আমি তাই করিলাম; এখন কথা হইতেছে যে,লেখক এই উপাদেয় বস্তু কবে মুদ্রিত করিবেন? আমাদের মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী ত বাঙ্গালা ভাষার জন্য সব করিতেছেন—তাঁহাকে ধরুন না। আর দ্বিতীয় এক ব্যক্তি, এই ভারতবর্ষের লেখক মহারাজাধিরাজ স্যর বিজয়-চন্দ্র মহাতাব বাহাদুর। মহাভারতের অনুবাদ ত এই শেষোক্তের বাটী হইতে মুদ্রিত হইয়া বিতরিত হইয়াছিল। তাঁহার পক্ষে এ পুস্তক মুদ্রণ করা মুখের একটী কথা সাপেক্ষ। আমি অবশ্য এ কথা লেখককে বন্ধুভাবে বলিলাম। তিনি যেন ইহা বন্ধুভাবেই গ্রহণ করেন। ইতি—

শ্রীগৌরীনাথ ভট্টাচার্য্য।

মুগ্ধ।

নিমেষহারা নয়ন মেলে'
ও রূপ করি পান;—
দেহ আমার শিউরে ওঠে,
উথ্‌লে ওঠে প্রাণ।
আলিঙ্গনের তরে যখন
বক্ষে চেপে' ধরি,
কি যে অসীম অতৃপ্তি এ
মর্ম্মে ওঠে ভরি'।
এ কি কুহক তোমার মাঝে?—
যতই ভালবাসি,
গভীরতর অভাব তত
বিভোর করে আসি'!
ওলো আমার লোচন-আলো,
ওরে পরশমণি,
ওগো আমার পাগল-করা
সকল সুধা-খণি,
তোমার মাঝে লুকিয়ে, তুমি
মোরে আকুল করি,
কোথায় থাক,—পাইনে দিশে;
শুধু খুঁজেই মরি!
বুক-জুড়ানো মাণিক আমার
দিবে কখন ধরা?
—সেই দুরাশে রইছি বেঁচে'
ওরে চেতন-হারা।

* * *

কতই কথা কই যে; তবু,
অনেক থাকে বাকি।
তাই ত কথা কইতে গিয়ে
অবাক্ হ'য়ে থাকি!

শ্রীদেবকুমার রায়চৌধুরী

"সুরভিস্নিগ্ধ অবনত শির আদরে ধরিয়া বুকে—
"জয় মা" বলিয়া ডাকিল বৃদ্ধ কি গম্ভীর স্নেহসুখে।"

আগমনী।

অরুণ আলোকে শুক তারকাটি তখনো যায় নি' ডুবে,
রাঙ্গা মেঘে মেঘে সোণা আলিপনা উষা দেয় নি'ক পূবে
কালির রেখায় দিক্‌পটে আঁকা নারিকেল তরু সারি,—
ছায়া তারা সহ করে টলমল সরসীর নীল বারি।
মুগুধ নয়নে কুমুদেরা দেখে মেঘ তারকার খেলা,—
কামিনীকুঞ্জে তখনো লাগে নি বনমধুপের মেলা।

রবির সোণার কাঠির পরশে জাগে নি পদ্মরাণী,
বিহগ-কণ্ঠে উঠে নি ফুটিয়া উল্লাস-কলবাণী।
ছড়ায়ে পড়ে নি দূর্ব্বাদলের নব মরকত রাগে
পদ্মরাগের মনোহর আভা বনবীথি ফাঁকে ফাঁকে।
লুকান ফুলের গন্ধ লুটিয়া তরল অন্ধকারে,
অতি মৃদু পদে ভোরের বাতাস খুঁজিয়া ফিরিছে কারে।
দুগ্ধ-ধবল ছায়াপথ ধরি স্বপন কন্যাগণ,
মায়ারথে চড়ি' কোথা চ'লে যায় খেলা করি' সমাপন।
পল্লী-বিজনে নেমে থেমে আসে ঝিল্লীর ঘুমগান,
ধরার শিথানে তারাদীপ নিবে, দিশি হয়ে আসে ম্লান।
তরুবীথি পাশে ছায়া-ছবিসম নীরব কুটীর-সারি,
রজনীর মায়ামন্ত্রে মুগ্ধ,—ঘুমাইছে নর নারী।
জোনাকি-খচিত, ঘন-পল্লব বোধন বিল্বমূলে,
মঙ্গলদীপ তখনো জ্বলিছে,—শিখা উঠে দুলে দুলে।
মণ্ডপ মাঝে ম্লান দীপালোকে দুকূল বিতান তলে,
ভুবনমোহিনী মায়ের প্রতিমা লাবণি পড়িছে গলে।
চির অভিরাম ত্রিভঙ্গ ঠাম কিবা মোহনিয়া ছাঁদ,
কোকনদ ফুটে দুটি রাঙ্গা পায়, কপালে কিশোর চাঁদ,
কমল নয়নে উছলে করুণা, অধরে অমিয় হাসি,
বরষার নব নীরদ জিনিয়া লীলায়িত কেশরাশি।
বিজয়িনী মার গরিমা ফুটেছে ইন্দু-বিমল ভালে,
সোণার অঙ্গে চমকে চপলা—আভরণ মণিজালে।
কিরণের ছটা কাঁপিছে কিরীটে—অঞ্চল ঝলমল,
আনন্দঘন মায়ের প্রতিমা মহিমায় অবিচল।
নানা প্রহরণে দৃপ্ত মূরতি,—উন্মদা বীরমদে,
ত্রিশূলবিদ্ধ অসুরে জননী হাসিয়া দলিছে পদে।
সিংহের পিঠে কমল চরণে জবায় রচিত অর্ঘ্য,
জ্বালা জুড়াবার অতুল তীর্থ, ভক্তের আশা-স্বর্গ!
কুন্দ-ইন্দু-তুষার-বরণা সুহাসিনী বীণাপাণি,
কমলবাসিনী কমলেক্ষণা চঞ্চলা রূপরাণী,
ধীর গণপতি, বীর সেনাপতি জননীর দুই পাশে,
স্নিগ্ধ দীপ্ত মাধুরী ছড়ায়ে—মন্দ মন্দ হাসে!
কোটী জনমের সাধনায় যেন মূরতি ধরেছে সিদ্ধি,
কোথায় অমরা, কোথায় অমরা, কোথা অমরের ঋদ্ধি।

ধূপচন্দন মৃগমদ বাস তখনো বাতাসে ভাসে,
দীপের চপল ক্ষীণ শিখাগুলি আরো ম্লান হ'য়ে আসে।
মেদুর সমীর নিঃশ্বসি উঠে, চরাচর অতি স্তব্ধ,—
আঙ্গিনার পরে শুনা যায় কার মৃদু মৃদু পদশব্দ ?
সৌম্য শান্ত শুভ্র শরীর যূথিকা শুক্লকেশ,
অঙ্গে অঙ্গে কিবা শুচিশোভা—শুভ্র শোভন বেশ।
ভালে চন্দন, দুলিছে কণ্ঠে পুণ্য অক্ষ-মালা,
ছল ছল ছল মুগ্ধ নয়নে কি যেন অমৃত ঢালা;
উপবীত-রেখা শোভিছে বক্ষে—কপোলে বহিছে ধারা !
মণ্ডপে পশি নাদ সুরে ধীরে ডাকিলেন "তারা তারা !"
শিহরি উঠিল আকাশ বাতাস আবেগ মধুর সুরে,
ছড়ায়ে পড়িল গভীর করুণা দূরে, দূরে—অতি দূরে !
বেদনা-কাতর মুগ্ধদৃষ্টি মুখে গদগদ ভাষ,
মার মুখপানে চাহিয়া চাহিয়া কহিলেন দেবীদাস —
"অয়ি চিন্ময়ি, তোর কাছে আর, লুকান আছে কি কথা,
জগৎ-জননী, তুই মা জানিস, ক্ষুব্ধ স্নেহের ব্যথা।
তোর মুখপানে চাহিতে চাহিতে তার মুখ মনে আসে,
তার মুখ হেরি তোর মুখছবি নয়নে নয়নে হাসে।
দু'খানি মুখের মাধুরীর খেলা—অমিয় ছড়ান হাসি,
দুইটি স্বর্গ ফুটায়ে পরাণে ঢালে কত সুখরাশি !
কেঁপে ওঠে বুক, মেতে ওঠে প্রাণ, সব হ'য়ে যায় ভুল,
মেয়ের চরণে দিতে চাহে মন,—মায়ের পূজার ফুল;
ভিতরে বাহিরে শত রাঙাছবি—দু'টি মুখপানে চেয়ে
মা যেন আমার মেয়ে হয়ে যায়, মা হয়ে হাসে গো মেয়ে।
বছর বছর তিনদিন তাই দোঁহে একঠাঁই করি,
সারা বরষের সম্বল রাখি হৃদয়-ভাণ্ড ভরি।
ওগো মা আমার—কি কহিব আর, সে সাধে সেধেছে বাদ,
বুঝিতে পারি না কি করেছি তোর শ্রীচরণে অপরাধ।
অভিমানে তাই তার মুখখানি রাখিনু আড়াল করি,
ও রাঙ্গা পায়ের হৃদিভরা ছবি পরাণের মাঝে ধরি।
হাসি হাসি আসি স্বপ্নে দেখা দিয়া ভেঙ্গেছে বালির বাঁধ,
কোথা মা আমার, তারা—তারাহার—আমার বুকের চাঁদ ?
স্নেহের ব্যথায় তনু জর জর,—কণ্ঠে এসেছে প্রাণ,—
ফিরা মা, ফিরা মা, এ মমতারাশি—দে মা রাঙ্গা পায় স্থান।"

বলিতে বলিতে টলিতে টলিতে যোড় করি' দুই পাণি,
গায়িতে লাগিল মধুরছন্দে মার বন্দনা-বাণী।
ঝরিতেছে যেন চন্দনধারা—মন্দার যেন খসে,
ভরিয়া উঠিল বিশ্বহৃদয় স্নেহ-আনন্দ রসে।
ক্ষীরোদ সাগরে উপজিল সুধা, পবনে অমিয়রাশি,
বেদনার মাঝে কি সুখ আবেশে আনন্দ উঠে ভাসি।
গেল জুড়াইয়া পরাণের জ্বালা, অমিয়া-সাগরে ডুবে,
আনন্দ শুধু ঝরিতে লাগিল মার মধুমাখা রূপে।
ঝঞ্চার সাথে যুঝিয়া যুঝিয়া সাগর হইল স্থির,
ভাব সমাহিত বিভোর চিত্ত—দু'নয়নে বহে নীর!
শুকতারা কোথা গিয়াছে ডুবিয়া—উষারাণী দেখে চেয়ে,
কিরণবালারা আসে দলে দলে উদয়-সাগরে নেয়ে।
মেঘে মেঘে মায়া, মেঘে মেঘে ছায়া, মেঘে মেঘে পদরাগ,
মেঘে মেঘে মেঘে সোনা আলিপনা চুনিপান্নার দাগ।
স্নিগ্ধ পাটল কাননের শিরে কনক রক্তরেখা,
দীঘি টলমল মুকুদ কমল ঈষৎ যাইছে দেখা,—
তীরে তরু তাল, দুলিছে তমাল—মরাল নামিছে জলে,
সপ্তঋষির পূজার পদ্ম ভেসে আসে দলে দলে।
পাখী গেয়ে উঠে, গাঁয়ে গাঁয়ে দূরে ভোরের বাজনা বাজে,
বিভাষের সুর কি সুধা ছড়ায় শোভার স্বপন মাঝে।
পঙ্কজরেণু ভাসিছে পবনে—শেফালি ঢালিছে ফুল,
সারা আকাশের তারাদলে যেন ছেয়ে গেছে তরুমূল।
ভক্তবাঞ্ছা রক্তজবার সজল প্রবালদলে,
উজল নিটোল শিশিরবিন্দু মুক্তার মত টলে।
বামভাগে রাখি বোধন-বিল্ব আঙ্গিনার পথ ধরি,'
আসিছে কিশোরী মণ্ডপপানে দশদিক আলো করি।
নবীন-নবনী-নিন্দিত তনু—অরুণ-বরণ চেলি,
মেঘ-অভিরাম কেশভারে গ্রীবা ঈষৎ পড়েছে হেলি;
স্বপন-মুগ্ধ পদ্মনয়নে দু'টি শুকতারা হাসে,
কিশোর চাঁদের কোমল হাসিটি অশোক-অধরে ভাসে,
শশাঙ্ক-লেখা শঙ্খবলয় কান্ত কোমল করে,
সিন্দূরশোভা অরুণবিন্দু ইন্দুললাট পরে।
সিঁন্দূর চুপড়ি বাম হাতে ধরি, ধীরি ধীরি পায় পায়
কিশোরী রূপের রতন-প্রতিমা মণ্ডপ মাঝে যায়।

হাসি-হাসি মুখে সুধাভরা চোকে দেবীদাস পানে চায়,
ভাবভরা মুখে আনন্দ-আলোকে ত্রিদিব-সুষমা ভায়।
অমিয়-জড়িত আধ আধ আধ করুণ কোমল ভাষে,
"বাবা, দেখ আমি এসেছি" বলিয়া হাসিয়া দাঁড়াল পাশে।
সংবিতহারা,—দু' নয়নে ধারা—সে মধুর আবাহন,
স্বপনের বাণী হেন অনুমানি ভাবঘোরে নিমগন।
আবার বাজিল সে কণ্ঠ-বীণা—রঞ্জন-রাঙ্গা হাত,
বৃদ্ধের বুক পরশি' আদরে ছড়াইল পারিজাত।
গেল ভাবঘোর বিস্ময়ভরে দেবীদাস দেখে চেয়ে,
সমুখে দাঁড়ায়ে সেই হাসিমুখে—চির আদরিণী মেয়ে,
"বাবা, দেখ আমি এসেছি।" ডাকিছে সেই মধুমাখা স্বর,
স্নেহরসে মাখা মাধুরী-প্রতিমা—রূপে আলোকিত ঘর।
"আয় কোলে আয়,—আয় বুকে আয়, আয় মা প্রাণের মাঝে,
এত পর হয়ে ছেলেরে ভুলি'যে থাকা কি মায়ের সাজে?"
সুরভিস্নিগ্ধ অবনত শির আদরে ধরিয়া বুকে—
"জয় মা!" বলিয়া ডাকিল বৃদ্ধ কি গভীর স্নেহসুখে,
"কি করুণা তোর জগৎজননি, অপরূপ তোর বিধি,
উপাসীর মুখে পরমান্ন দিলে, কাঙ্গালে মিলালে নিধি!"

শ্রীমুনীন্দ্রনাথ ঘোষ।
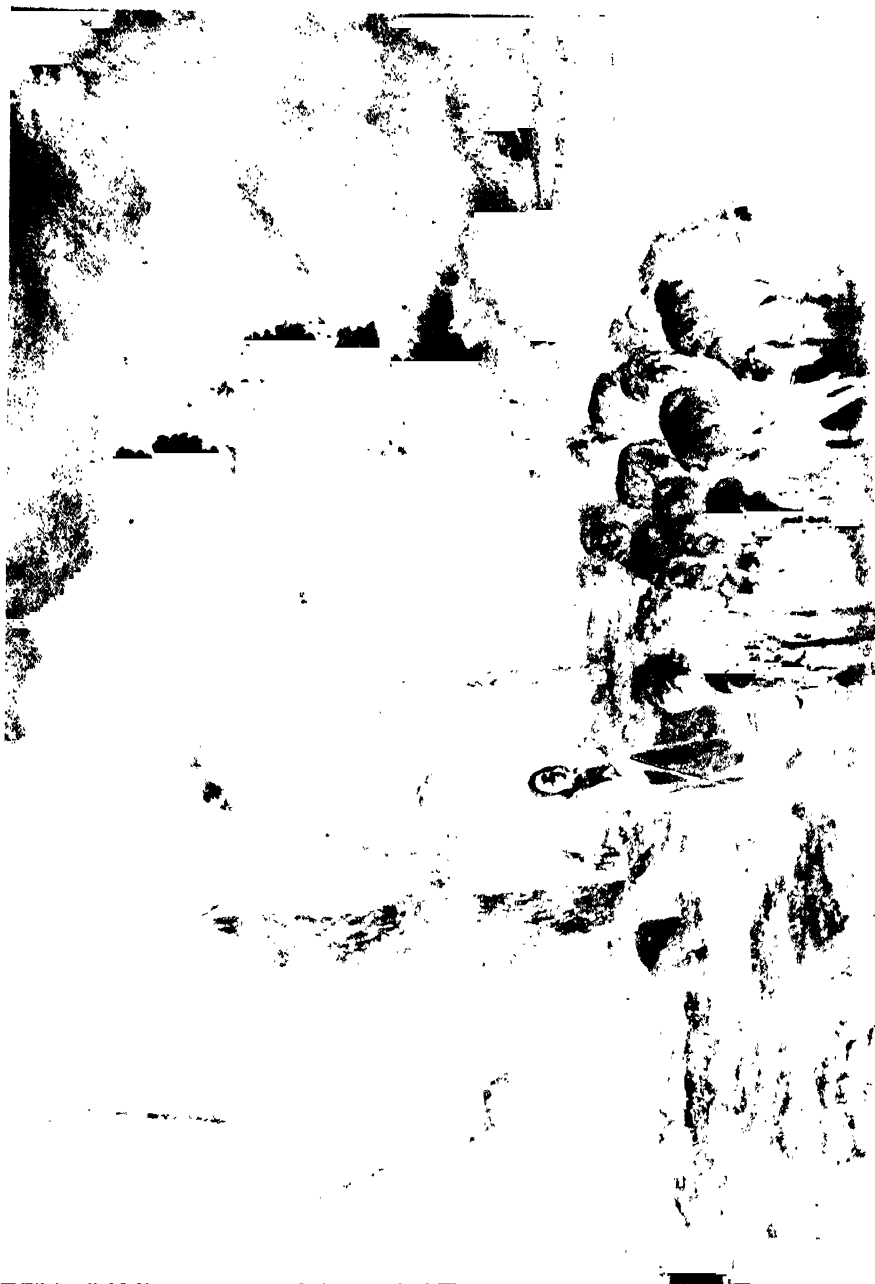
দিবাবসান।

উপন্যাস প্রকরণ।

(বায়ুপুরাণের শেষ অর্থাৎ ঊনপঞ্চাশৎ

পর্ব্বের এক লুপ্ত অধ্যায়)।

একদা ভগবান পদ্মযোনি ব্রহ্মলোকে বিরাজ করিতেছেন। চতুর্ব্বেদ চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া আছে। নিকটে বসিয়া ভগবতী দেবযানী কমণ্ডলু মার্জ্জনা করিতেছেন। সম্মুখে বাহন মরাল স্থির ভাবে বসিয়া আছে। ভগবান্ কাচিৎ অপ্সরীর গ্রীবাদেশ গঠনে ব্যাপৃত, ঘন ঘন স্বীয় বাহনের গ্রীবার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছেন ও তদ্দর্শনে দেবনর্ত্তকীর গ্রীবাদেশ গঠন করিতেছেন। ললাটে স্বেদ-বিন্দু একাগ্রতা ও পরিশ্রমের পরিচয় দিতেছে। কিয়ৎক্ষণ পরে প্রজাপতি অবনত মস্তক উত্তোলন করিলেন ও পরিশ্রমোপনোদনোদ্দেশ্যে হস্ত চতুষ্টয় পর্য্যায়ক্রমে প্রসারিত ও আকুঞ্চিত করতঃ বিজৃম্ভণ করিলেন। মরালও ইত্যবসরে একবার পক্ষ-সঞ্চালন করতঃ স্বীয় ক্লান্তিদূর করিল।

এবম্ভূত সময়ে দীননয়না, আলুলায়িত-কুন্তলা, গললগ্নীকৃতবাসা ধরিত্রীদেবী আসিয়া ভূমিষ্ঠা হইয়া তচ্চরণে প্রণতা হইলেন। পৃথিবীকে তদবস্থ দেখিয়া ভগবান্ সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন—"বৎস ধরিত্রি! স্বাগত! তোমার সর্ব্বাঙ্গীন কুশল ত? তোমার বিষাদস্তিমিত লোচন ও স্রস্তালকদাম দর্শনে স্পষ্টই অনুমান হইতেছে পুনরায় কোন বিপদ্জাল তোমাকে বেষ্টন করিতেছে। আবার কি কোন দুর্বৃত্ত অসুর তোমাকে বিধ্বস্তা করিয়া তুলিতেছে? আবার কি ক্ষীরোদসাগরতীরে যাইয়া ভগবান নারায়ণের অনন্ত নিদ্রাভঙ্গ করিতে হইবে? কি হইয়াছে সত্বর প্রকাশ করিয়া বল।"

ধরিত্রী দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া উত্তর করিলেন—"ভগবন্! নিশ্চিন্ত হউন, কোন দুর্বৃত্ত অসুর বা দানব আর আমাকে বিধ্বস্তা করে নাই। এবারে আমার সন্তানদের দুঃখে একান্ত কাতরা হইয়া আমি ভগবৎ সন্নিধানে উপস্থিত হইয়াছি।"

ভগবান্ ব্রহ্মা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি দুঃখ তোমার সন্তানদের ধরিত্রি? আবার কি কোন মন্বন্তর বা জলপ্লাবন বা অন্য কোন দৈব দুর্ঘটনা কর্ত্তৃক আক্রান্তা হইয়াছ?" ধরিত্রী বলিলেন—"না প্রভো, তাহাও নহে। এবারে এ দুর্ভাগীর সন্তানেরা এক অভিনব ও অভূতপূর্ব্ব দুঃখে কাতর হইয়াছে। তাহারা সদাই 'এ পৃথিবীর জীবন বড়ই নীরস' এই খেদ জ্ঞাপন করে ও অন্যান্য গ্রহের উপর উদাস দৃষ্টি স্থাপন করে। ভগবন্! যদি আমার সন্তানেরা আমাকে নীরস জ্ঞান করিয়া গ্রহান্তরে চলিয়া যায়, ত ইহা অপেক্ষা লজ্জা ও আক্ষেপের বিষয় আর কি থাকিতে পারে? ভগবন্! আপনি অচিরাৎ ইহার প্রতিবিধান করুন, নচেৎ আজ্ঞা করুন, আমি পুনরায় রসাতলে প্রবেশ করি বা সাগর গর্ত্তে লীন হই।"

এই বলিয়া ধরিত্রী দেবী পুনরায় দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া অধোবদনে রহিলেন।

ভগবান্ পিতামহ কিয়ৎকাল চিন্তা-মৌন রহিলেন ও তদন্তে পৃথিবীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "বসুধে! তোমার সন্তানদের রোগনির্ণয় করিতে পারিয়াছি; সত্বরেই ইহার উপযুক্ত ঔষধের ব্যবস্থা করিতেছি। তুমি নিশ্চিন্ত মনে স্বস্থানে গমন কর।"

তচ্ছ্রবনে বসুধা দেবী পুনর্ব্বার পিতামহ চরণে প্রণতা হইয়া হৃষ্টমনে প্রত্যাবৃত্তা হইলেন।

তদনন্তর পিতামহ কামধেনুকে স্মরণ করিবামাত্র দেবমাতা, সর্ব্ব-সুলক্ষণা, ঘটোধ্নী কামধেনু তৎসম্মুখে আবির্ভূতা হইলেন; ও ভগবান প্রজাপতিকে প্রণাম করতঃ সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করিলেন "হে ভগবন্, হে পদ্মযোনে, কি নিমিত্ত এই অধিনীকে স্মরণ করিয়াছেন? আদেশ করুন, ভবদ্-প্রত্যাদেশ পালন এ দাসীর যুগপৎ হর্ষ ও গৌরবের কারণ।"

পিতামহ স্মিতমুখে কহিলেন "সুলক্ষণে! তোমার বিনয়নম্র বচনাবলী তোমার পয়োধারার ন্যায়ই মধুর। এক্ষণে এক দৈবকার্য্য সাধনোদ্দেশে তোমাকে স্মরণ করিয়াছি।"

সুরভি কহিলেন "আদেশ করুন।" ব্রহ্মা কহিলেন "সম্প্রতি পৃথ্বীদেবী কিছু বিষণ্ণা হইয়া মৎসকাশে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি এই উত্তর করিলেন যে, তাঁহার মর্ত্ত্য সন্তানেরা তাঁহার
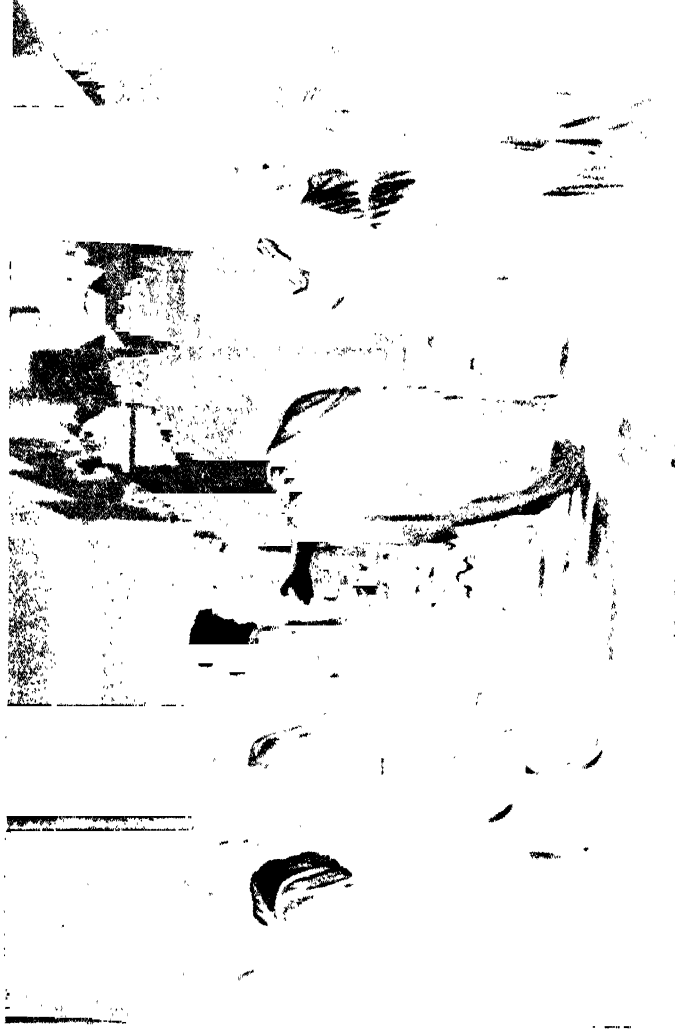
বিচার।

K. V. SEYNE & BROS

কুক্ষিস্থিত জীবনের নীরসতা হেতু গ্রহান্তরে গমন করিতে অভীপ্সা করিতেছে; ও মৎকর্ত্তৃক অচিরাৎ এতৎ প্রতিবিধান না হইলে ধরিত্রী সাগরগর্ব্বে লীন হইবার বাসনা জ্ঞাপন করিয়াছেন। অতএব ঈদৃশ দুরত্যয় প্রতিবিধানকল্পে তোমা ব্যতীত আর কাহার সাহায্য ফলপ্রদ হইবেক?”

কামধেনু বিস্ময়াপন্না হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন “ভগবন্, মৎকর্ত্তৃক ইদৃশ অভিনব অশ্রুতপূর্ব্ব রোগের প্রতিবিধন, কিরূপে সম্ভবে, তাহা এ ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগোচর।”

প্রজাপতি বলিলেন “বৎসে, শ্রবণ কর—তোমাকে মর্ত্তে রূপান্তর গ্রহণ করিয়া অবতীর্ণা হইতে হইবে।”

পিতামহের চতুর্ম্মুখ হইতে এই বাক্যগুলি বহির্গত হইতে না হইতে কামধেনু নিরতিশয় বিষণ্ণা হইয়া বলিলেন “হে পিতামহ! এ কি কঠোর আদেশ করিতেছেন? কি অপরাধে এ দাসীর প্রতি মর্ত্তবাসরূপ নির্ম্মম শাস্তি প্রচার করিতেছেন? কিরূপে আমি এই দিব্যধাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেই—”

কামধেনুকে বাধা দান করিয়া পিতামহ বলিতেন “অয়ি ভীতে, তোমার ভীতির কিছুমাত্র কারণ নাই। ধরিত্রীকে উদ্ধার করিতে স্বয়ং ভগবান চক্রপাণিকে কত কতবার ভুধামে অবতীর্ণ হইতে হইয়াছিল, তাহা কি তুমি অবগত নহ? সুতরাং এ কার্য্যে শ্লাঘা ভিন্ন আশঙ্কার কারণ নাই। আর তোমা ভিন্ন এ গুরুতর কার্য্য অপর কাহা হইতেও সম্ভবে না ইহাও সুনিশ্চিত। কামধেনু বলিলেন “ভবদাদেশ পালন করিতে এ দাসী সদাই তৎপর। তবে মর্ত্তধামের নামোল্লেখ মাত্রই এক বিষাদ ও আশঙ্কার ছায়া আমাদের চিত্তপটকে মসীময় করিয়া তুলে। সে যাহা হউক, যখন আপনার আদেশ, তখন প্রতিপালন করিতেই হইবে। এক্ষণে কি উপায়ে মৎকর্ত্তৃক মর্ত্তগণের অভিনব পীড়ার প্রতিষেধন হইবে, তাহা কৃপা পুরঃসর বিবৃত করুন।”

ব্রহ্মা কহিলেন “আমি সম্যক্ বিবৃত করিতেছি, অবহিতা হইয়া শ্রবণ কর। ধরাধামে তোমাকে উপন্যাস রূপে জন্ম পরিগ্রহ করিতে হইবে। তোমার সে মূর্ত্তিতে নববিধ রসের প্রাচুর্য্য থাকিবে। তাহা হইলে আর মানবেরা পার্থিব জীবনের নীরসতা অনুভব করিতে পাইবে না। ধরাধামে বসিয়া তোমা হইতেই সর্ব্বগ্রহের রস উপভোগ করিতে সমর্থ হইবে, আর গ্রহান্তরে যাইবার বাসনা করিবে না। তোমাকে দোহন পূর্ব্বক কখনও প্রচুর পরিমাণে বীররস, কখন করুণ রস, কখনও বীভৎস রস, এই রূপ অহরহ তাহারা অপর্য্যাপ্ত রসের সাগরে সন্তরমান থাকিবে। তোমার রস পানে বালকে যুবার ন্যায় ব্যবহার করিবে, স্ত্রী পুরুষের ন্যায় ও পুরুষ স্ত্রীর ন্যায় ব্যবহার করিবে! তোমারই প্রভাবে সর্ব্বসংস্কারশূন্য জীব সংস্কারক হইবে, কাপুরুষ বীর-ভাবাপন্ন হইবে, নররূপী পশুও গৈরিক ধারণ করিয়া সন্ন্যাসী হইবে, তস্কর সাধু হইবে ও সাধু তস্কর হইবে। আর প্রেমিক নামক এক জীবের সংখ্যা সমুদ্রতীরবর্ত্তী বালুকারাশির ন্যায়, আকাশের তারকারাজির ন্যায়, সন্ধ্যাগমে গোশালার মশকরাজির ন্যায় অসংখ্য হইয়া পড়িবে। প্রেমিকের ঠেলাঠেলিতে, হুড়াহুড়িতে সাধারণ লোকের পথ চলা দুরূহ হইবে। কুটীরবাসিনীর প্রেমে উন্মত্ত রাজপুত্র ও নিঃস্ব কবির প্রেমাকাঙ্খিনী রাজকন্যার সংখ্যা বর্ষাগমে ভেকরাজির ন্যায় সুলভ হইবে। উদরদেশে গুরুতম আঘাত প্রাপ্ত হইয়াও যাহাদের কণ্ঠনালী হইতে “ক” বর্ণ উচ্চারিত হয় না, তাহারাও তোমার প্রসাদাৎ লেখনী ধারণা করিবে ও গ্রন্থকার আখ্যা প্রাপ্ত হইবে। স্বয়ং বাগ্‌দেবী সনির্ব্বন্ধ সাধ্যসাধনার দ্বারাও যাহাদের মস্তিষ্কে কিছুমাত্র স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিতে অসমর্থা হইয়া বিষণ্ণ বদনে প্রত্যাবৃত্তা হইয়াছেন, তাহারাও তোমার প্রভাবে গদ্যে পদ্যে বিশারদ হইয়া উঠিবে। আর উল্লিখিতা দেবীর চিরপ্রথিত নিঃস্বতাও তোমার নিমিত্তই বিদূরিতা হইবে। কেন না অনেক লক্ষ্মীর বরপুত্রেরাও প্রতিপত্তি লোভে লুব্ধ হইয়া স্বীয় বিমাতাকে উৎকোচ দান করিবে। তোমার অনন্ত প্রেম-পয়োধর হইতে কোন দোহক হলাহল, কোন দোহক তথাকথিত সৌন্দর্য্যের আবরণে নরকের চিত্র, কোন দোহক ভগবান পিণাকপাণি-লাঞ্ছিত, ত্বরিতানন্দদায়ক সামগ্রীবিশেষ দোহন করিয়া যুগপৎ ভূভারহরণ ও মর্ত্তগণকে নরকের পূর্ব্বাস্বাদ প্রদান ও আনন্দ বিবর্দ্ধনও করিবে। কদাচিৎ দুই একজন তোমা হইতে অবিমিশ্র সুমধুর ক্ষীরধারাও বাহির করিয়া

লইবেন। তুমি নানা ভাবে নানা স্থানে বিরাজ করিবে। কখনও বা অভিভাবক-তাড়না-ভীত অথচ সুচতুর ছাত্রগণের কুক্ষিদেশে, কখনও বা আলস্যভার-প্রপীড়িতা দীর্ঘদ্বিপ্রহরযাপনবাসিনী, তরুণী ধনাঢ্য-বনিতার কর-কমলে বা বক্ষঃস্থলে, কখনও বা আধ-দারু আধ-স্ফটিক নির্ম্মিত মন্দিরে শোভা পাইবে। কাহারও নিকট ঘন ঘন দীর্ঘ নিঃশ্বাসোৎপাদিনী রূপে,কাহারও নিকট নিদ্রা-বিধায়িনী রূপে, কাহারও নিকট বা কালাসুর-নাশক চক্ররূপে কার্য্য করিবে। তোমার প্রভাবে একদিকে যেমন ঝটিকা, অগ্নিকাণ্ড, যুদ্ধবিগ্রহ, নরনারীহত্যা, আত্মহত্যা, দস্যুভয়, মৃতের পুনরুজ্জীবন প্রভৃতি নানা-বিধ লোমহর্ষণ ও অতিপ্রকৃত ব্যাপার নিশ্বাস প্রশ্বাস, চক্ষের নিমেষ, বায়ু সঞ্চালন প্রভৃতির ন্যায়, নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপারে পরিণত হইবে, অপরদিকে তেমনি পৌর্ণমাসী রজনী, বসন্ত ঋতু প্রভৃতি ব্যাপার প্রাবৃটকালে বৃষ্টি-ধারার ন্যায়, মরুভূমিতে বালুকারাশির ন্যায় সুলভ হইবে। অধিক কি বলিব, স্বয়ং বীণাপাণির সুধাকুম্ভ পানে বা ভগবান আশুতোষের নিমিত্ত নন্দীর স্বহস্তে প্রস্তুত দ্রব্যাদি সেবনেও কল্পনার যে উৎকর্ষ সাধিত হয় না, তোমার প্রসাদে তাহাও সাধিত হইবে। সম্পাদক নামক এক জীব তোমার পরম ভক্ত হইবে ও মাসিকপত্র নামক গোশালের স্তম্ভে তোমাকে সযত্নে আবদ্ধ করিয়া তোমার সেবা ও পূজা করিবে।"

ভগবান প্রজাপতির এই অদ্ভুত রহস্যজনক ভবিষদ্বাণী শ্রবণে দেবধেনু সুরভি সাতিশয় বিস্মিতা হইলেন ও ও প্রথম বিস্ময়াপনোদনের পর বলিলেন—"ভগবন্! আপনার বিচিত্র বাক্যাবলী শ্রবণে যুগপৎ বিস্ময় ও চিন্তা আমার হৃদয়-সমুদ্রকে আলোড়িত করিতেছে। উপন্যাসরূপে অবতীর্ণ হইয়া আমার যে সমস্ত অঘটন-ঘটন পটীয়সী শক্তির বিকাশ হইবেক—যাহা এই স্বর্গ-ধামেও এতাবৎ আমার হয় নাই,—ইহা নিরতিশয় বিস্ময়ের কথা সন্দেহ নাই। কিন্তু এক বিষয়ে আমার চিন্তার উদ্রেকও হইতেছে। আমি যে এবম্বিধ নানা প্রকার রসাল সামগ্রী উৎপাদন করিতে থাকিব, কিন্তু আমার উপযুক্ত আহার্য্যের ব্যবস্থা কই করিলেন? এ স্থানে আমি নন্দনকাননের ও বৈকুণ্ঠধামাদির প্রশস্ত ক্ষেত্রের মরকত সদৃশ উজ্জ্বল নবনীতের ন্যায় সুকোমল ও অমৃতের ন্যায় সুমিষ্ট শস্পাগ্র ভক্ষণ করিয়া থাকি। কিন্তু ভূতলে আমার উপযুক্ত অহার্য্য কি পাইব, তাহা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।"

পিতামহ স্মিতমুখে কহিলেন,—"বৎসে মাভৈঃ! তোমার উপযুক্ত আহার্য্যের ব্যবস্থা আমি ইতিপূর্ব্বেই করিয়া রাখিয়াছি। সেটুকুও যদি না পারিব, তবে বৃথাই এ সৃষ্টি-কার্য্যে ব্যাপৃত আছি। তুমি ধরাধামে অপরিণতবয়স্ক বালক বালিকাগণের ও কিশোর কিশোরীগণের নব নব মস্তক ভক্ষণ করিবে। সেগুলি এই স্বর্গপ্রসূত শস্পাগ্রের ন্যায়ই সুকোমল ও মধুর দেখিবে। তুমি সানন্দে এই নবভক্ষ্য গুচ্ছে গুচ্ছে চর্ব্বন ও রোমন্থন করিতে থাকিবে। এখন যাও বৎসে, আর কালব্যয় করিয়া লাভ নাই। আশীর্ব্বাদ করি, দৈবকার্য্য পূর্ণ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন কর।"

এতচ্ছ্রবণে কামধেনু নিশ্চিন্ত মনে পিতামহচরণে প্রণতা হইয়া তদাদেশ পালনোদ্দেশ্যে প্রস্থিতা হইলেন।

শ্রীমন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রীশ্রীশিব-শক্তি

দৃশ্য—কৈলাস।

(শঙ্কর যোগাসীন, পার্শ্বে উমা শিবপূজায় মগ্না—দূরে মদন ফুলশর নিক্ষেপ করিতেছেন ও তৎপশ্চাতে রতি ভীতা হইয়া দণ্ডায়মানা—এক প্রান্তে ব্রহ্মা ঋষিবেশে গান গাহিতেছেন—)

গীত।

রাগিণী নিশাসাগ তাল ঝাঁপতাল।

পাবকে পড়িলে মলা, কভু কি থাকিতে পারে।
যোগীর চিতবিকার, রহে না নিমেষ তরে॥
ভাবি নিজ ধৈর্য্যচ্যুতি, ধূর্জ্জটি কুপিত অতি,
কারণ অবধারণে, চাহিলেন চারিধারে।
হেরি ধৃত-ধনু দূরে, ভীত-চিত পঞ্চ-শরে,
রোষের বাড়বানল, জ্বলে মন-সিন্ধু-নীরে।
তীব্র ভ্রূকুটি ভীষণ, হেরি ত্রস্ত ত্রিভুবন,
অধীর ধরণীধর, বারিধি ভীত অন্তরে।
শান্ত শ্বেত সুবদন, হয় লোহিতবরণ,
বিস্ফারিত নাসারন্ধ্র, কাঁপে ল'য়ে ওষ্ঠাধরে।
পিঙ্গল জটার ভার, ছোটে দ্রুত বার বার,
কালফণী সহ গর্জ্জে, সংসারবিনাশী স্বরে।
প্রভঞ্জন জিনি বলে, হারায়ে' তাপে অনলে,
বহিছে ভবনিঃশ্বাস, ভবনাশ করিবারে।
লোচনত্রিতয় ভালে, কোটী ভানু সম জ্বলে,
বিজিত তড়িত-তেজ, কেহ কি সহিতে পারে।
লোকচয় অনিবার, ভয়ে করে হাহাকার,
রুদ্রকোপে বিশ্ব কাঁপে, মদনে অতনু করে॥

(ত্রিলোচনের রোষকটাক্ষ—মদনান্ত—ভুবন কম্পিত—পার্ব্বতী মূর্চ্ছিতা—ব্রহ্মার প্রস্থান—ক্রমে শঙ্করের পার্ব্বতীর দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ ও আধ রুদ্ধ ও আধ হাস্য বদনে পার্ব্বতীকে নিজ পার্শ্বে টানিয়া লইয়া গীত—)

গীত।

কীর্ত্তন।

আধ লাজ, আধ সাজ, শান্তা, সুশীলা, অমলে।
আধ মধু, আধ বধূ, শুভ্রা, সরলা, বিমলে॥
আধ গঙ্গা, আধ সিন্ধু, আধ ভানু, আধ ইন্দু,
আধ নাদ, আধ বিন্দু, স্বচ্ছ-সলিলা কমলে॥

(পার্ব্বতীকে গিরিশৃঙ্গে রাখিয়া শঙ্করের ভেরী ও ডমরু বাজাইতে বাজাইতে নিম্নে অবতরণ—ভৈরবের ভেরী-শব্দে ভৈরব ভৈরবীদলের আগমন ও শঙ্করের তাহাদের দ্বারা বেষ্টিত হইয়া তাণ্ডব নৃত্য ও গীত—)

গীত।

ঝিঁঝিট কীর্ত্তন সুর।

বাজে, বাজে, বাজে, বাজে,
হৃদয় তন্ত্রী বাজে রে,
(যবে) সাজে, সাজে, সাজে, সাজে,
মোহিনী বামা সাজে রে।
মাঝে, মাঝে, মাঝে, মাঝে,
ভামিনী মাঝে, মাঝে রে,
নাচে, নাচে, নাচে, নাচে,
মানসে রঙ্গে নাচে রে॥

(গাহিতে গাহিতে, নাচিতে নাচিতে, শঙ্করের পার্ব্বতী-সকাশে গমন ও পার্ব্বতীর সম্মুখে নতজানু হইয়া গদগদ স্বরে গীত—)

গীত।

রাগিণী খাম্বাজ-মিশ্র তাল কাশ্মিরী খেমটা।

অন্তঃসরোজে, বহিঃসরোজে,
সরোজবাসিনি, কল্যাণি,
নিরুপমা বামা, ত্রিলোচনা শ্যামা,
ভবানি, পাষাণি, ঈশানি!

ভৈরব ভৈরবীগণ গাহিলেন—

জয় শঙ্কর, শিব ঈশ্বর, ভবেশ, দেবেশ, হরে।

শঙ্কর পুনঃ গাহিলেন—

আনন্দরূপে আনন্দময়ী,
মঙ্গলালোকে মঙ্গলময়ী
সাধকপ্রাণে, পূর্ণ-প্রেমময়ী,
ভকতি মুক্তি প্রদায়িনি!

ভৈরব ভৈরবীগণ গাহিলেন—

জয় শঙ্কর, শিব ঈশ্বর, ভবেশ, দেবেশ, হরে।

(গীতান্তে শঙ্করের পার্ব্বতীর পদ-প্রান্তে শয়ন। আকাশ মার্গে কালীমূর্ত্তির আবির্ভাব। শঙ্করের নাভিদেশ হইতে পার্ব্বতীর ষোড়শী রূপে শূন্যে অৰ্দ্ধ উত্থান ও ভৈরব ও ভৈরবীগণের গীত)

গীত।

রাগিণী দেশ-মিশ্র তাল একতালা।

জ্ঞান বিরহিতা শক্তি উন্মাদিনী কালী সম।
শক্তিহীন জ্ঞান তথা শবাকার শিবোপম॥
এখনি ভীষণ স্বরে, মাখিয়া নর-রুধিরে,
কেবল মত্ত সংহারে, বিকট ক্রূর নিয়ম।
শিবে করি পরশন, হ'ল কি মূর্ত্তি মোহন,
প্রসন্ন হাস্য বদন, স্বভাব রুচির কম।
সংহারিণী বৃত্তিচয়, ক্রমে নিয়মিত হয়,
সর্ব্ব সদ্‌গুণ উদয়, নিবৃত্ত গুণ বিষম।
শক্তি জ্ঞান-যুতা হ'লে, সাধুরা সুখী সকলে,
দুঃখ যায় অবহেলে, প্রচলিত সুনিয়ম।
তাই তারা শিব সনে, বিরাজ মা নিশি দিনে,
বিজয়-হৃদয়াসনে, সবার বাসনা সম॥

শ্রীবিজয় চন্দ্‌ মহতাব্‌।

পরাজয়।

(১)

রাজকুমার বজ্রসেন বিজয়-গৌরবমণ্ডিত মস্তকে স্বীয় রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন। শত্রু পরাভূত; সমস্ত রাজ্যে শান্তি সংস্থাপিত হইয়াছে।

তখন সন্ধ্যা; পথের উভয় পার্শ্বস্থ তরুসারির দীর্ঘছায়া দীর্ঘতর হইতেছিল। দূরে এক অজানা গ্রামে দিনশেষের মঙ্গল-আরতি বাজিতেছিল।

কুমার কহিলেন, "আজ আর অধিক দূর গমন করিব না। শরীর ক্লান্ত; এই স্থানেই শিবির সংস্থাপন কর।"

পার্শ্বচর শুনিয়া যুক্তকরে কহিল, "প্রভো, অন্ত এ প্রদেশে বিশ্রাম কোন মতেই শ্রেয়ঃ নহে। এ রাজ্য মায়াময়; দূরে যে শঙ্খঘণ্টা ধ্বনি শ্রুতিগোচর হইতেছে, উহা মঙ্গলারতির নহে, উহা মায়াময়ীর বিজয়বাদ্য।"

"মায়াময়ী!" রাজকুমার হাসিলেন, "উত্তম, সে কিরূপ মায়াময়ী, তাহা অদ্যই পরীক্ষা করিব।"

পার্শ্বচরের মুখ মুহূর্ত্তে শ্বেতবর্ণ হইয়া গেল। ভয়-ব্যাকুলকণ্ঠে সে কহিল, "না কুমার না,—আপনি সে কুহকিনীর সহিত পরিচিত নহেন। সে বড় ভীষণ, বড় নিষ্ঠুর, বড়—"

"যজ্ঞদত্ত"—রাজকুমার ভ্রূকুটি করিলেন, "যাও, আমার আদেশ, এইস্থানে শিবির সংস্থাপন কর।"

পার্শ্বচর চলিয়া গেল।

(২)

সপ্তমীর চন্দ্র অস্ত গিয়াছে; সমস্ত শিবির নিদ্রিত; চারিদিকে কেবল ঝিল্লীর রব ও মেঘের গুরু গুরু গর্জ্জন।

কুমার স্বীয় পটমণ্ডপ হইতে বহির্গত হইলেন; সঙ্গে

পিতৃপ্রদত্ত তরবারি ব্যতীত আত্মরক্ষার অন্য কোন অস্ত্র নাই। কক্ষে প্রদীপ নির্ব্বাণোন্মুখ, বাহিরে রক্ষী, অর্দ্ধসুপ্তিমগ্ন। রাজকুমার শিবির ছাড়িয়া মায়াময়ীর প্রাসাদের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। শুষ্কপত্রমর্ম্মরে নিশাবায়ু তখন স্বীয় বেদনা জানাইতেছিল! বহুদূর গিয়া কুমার মায়াময়ীর তোরণদ্বারে উপস্থিত হইলেন। ভীমের বক্ষের মত দৃঢ় প্রশস্ত স্বর্ণকবাট কুমারের আগমনে আপনিই উন্মুক্ত হইল। কুমার ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

দক্ষিণ বায়ু গৃহমধ্যে চামর ঢুলাইতেছিল; কক্ষনিঃসৃত বাতাসে একটা ক্ষীণ কুন্তলকুলগন্ধ ভাসিয়া আসিতেছিল। তাহার উপর সেই সঙ্গীত—কি মোহন—সুন্দর, কি অপূর্ব্ব, কি উন্মাদনাময়!

কুমার মন্ত্রমুগ্ধবৎ মায়াময়ীর সঙ্গীত শুনিতেছিলেন। কি সুন্দর—যেন অনুপম রজতনিক্বণ—

এ কি জ্যোৎস্নাগর্ব্বিত গগন
এ কি চন্দ্রকিরণ মগন!
তারি মাঝে কেন ব্যথা বাজি' উঠে
হিয়া মাঝে মোর সঘন!

মলয় ধরণী গায়
ধীরে সে কর বুলায়,
তটিনীর কূলে চলে ধীরে ধীরে,
পালভরে তরীগণ!

ওগো সে জন গিয়াছে চলি,
আমার হৃদয় দলি,
তবু তার আশে হেথা আছি বসে,
আশা আছে তবু এখন!

কুমার দ্বারের নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন।

(৩)

ঐ ত দুখানি শুভ্ররক্তিম বাহু দেখা যাইতেছে—উহা কি এতই নিষ্ঠুর! এতই কঠিন!—ইহা কি সম্ভবপর! নিষ্কলঙ্ক শুভ্র অনাঘ্রাত কুসুমের মত যাহার তনু তাহার হৃদয় কি এতই অকরুণ—তাহার হৃদয়ে কি একটুকু দয়ামায়াও নাই!

কুমার উদভ্রান্তচিত্তে ছুটিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

সঙ্গে পিতৃপ্রদত্ত তরবারি ব্যতীত আত্মরক্ষার অন্য কোন উপায় নাই।

তখন ভয় নাই, চিন্তা নাই, সঙ্কোচ নাই। তখন হৃদয়ের রক্ত সঙ্গীতের তালে তালে নাচিতেছিল!

সহসা কক্ষমধ্যে এক অপরিচিত ব্যক্তির আগমনে মায়াবিনী একটু বিস্মিতা হইল। কহিল, "কে—কে তুমি?"

কুমার নির্ব্বাক্‌। তাঁহার দৃষ্টি মায়াবিনীর উপর নিবদ্ধ—শরীর স্থির, অচঞ্চল।

মায়াময়ী বিস্মিতা হইয়া কুমারের মুখের দিকে কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া রহিল। শিথিলমুষ্টি হইতে কনকদণ্ড সশব্দে মর্ম্মরবিনির্ম্মিত হর্ম্ম্যতলে পড়িয়া গেল। শরতের ধীর সমীরতাড়িত শুভ্র মেঘখণ্ডের ন্যায় ধীরে ধীরে নিঃশব্দে সে কুমারের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। বিহ্বল চরণ ক্রমে ক্রমে তাহাকে কুমারের নিকটে—অতি নিকটে টানিয়া আনিল; তাহার অবশ হস্ত ধীরে ধীরে উঠিয়া কুমারের হস্তে সংলগ্ন হইল; বিবশ মস্তক অতি ধীরে নামিয়া আসিয়া কুমারের

তাহার অবশ হস্ত ধীরে ধীরে উঠিয়া কুমারের হস্ত সংলগ্ন হইল

বক্ষে স্থাপিত হইল। পদ্মপলাশ-নয়ন হইতে বারিধারা গড়াইয়া কুমারের বক্ষঃস্থল নিষিক্ত করিল।

তাহার পর ধীরে ধীরে কুমারের পদতলে বসিয়া তাহার বিশাল সজল নেত্রদ্বয় উঠাইয়া তুলিয়া সে কহিল, "প্রভু, তোমারই জয় হইয়াছে। তোমার সর্ব্বজয়ী প্রেম আমার ন্যায় হৃদয়হীনাকেও বশ করিয়াছে। মায়াবিনী অপরাজিতাকে আর কেহ জয় করিতে পারে নাই। কেবল হে সর্ব্বজয়ী, হে চিরবাঞ্ছিত, তুমিই করিয়াছ। তাই আজ আমি তোমাকেই প্রভুত্বে বরণ করিলাম। আমার দর্পকলুষিত ধূলিমলিন হৃদয় গ্রহণ করিবে কি?"

কুমার কোন উত্তর দিলেন না, কেবল ধীরে ধীরে তাহাকে সযত্নে নিজবক্ষে তুলিয়া লইলেন।

শ্রীরত্নাবলী দেবী

ভারতবর্ষ।

কথা—স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায় স্বর ও স্বরলিপি—শ্রীমতী প্রতিভা দেবী।

ভূপকল্যাণ (ভূপালী)——একতালা। *

	-	১	২´	৩	০
	I| গা রা । |	সা ধ্‌ সা I	রা গা রা |	গা । গা |	সা রা গা |
(১)	যে দি ন	সু নী ল	জ ল ধি	হ ই তে	উ ঠি লে
(২)	স ০ ন্থ	স্না ০ ত	সি ০ ক্ত	ব স না	চি কু র
(৩)	শী ০ র্ষে	শু ০ ভ্র	তু ষা র	কি রী ট	সা গ র
(৪)	উ প রে	প ব ন	প্র ব ল	স্ব ন নে	শ ০ ঙ্খে
(৫)	জ ন নী	তো মা র	ব ০ ক্ষে	শা ০ ন্তি	ক ০ ণ্ঠে

	১	২´	৩	০	১
	| পা ধা র্সা I	সা র্রা । |	র্সা । র্সা |	পা গা পা |	ধা র্সা র্সা I
(১)	জ ন নী	ভা র ত	ব ০ র্ষ	উ ঠি ল	বি ০ শ্বে
(২)	সি ০ ন্ধু	শী ক র	লি ০ প্ত	ল লা টে	গ রি মা
(৩)	উ ০ র্ম্মি	ঘে রি য়া	জ ০ ঙ্ঘা	ব ০ ক্ষে	দু লি ছে
(৪)	গ র জে	অ বি ০	শ্রা ০ ন্ত	লু টা য়ে	প ড়ি ছে
(৫)	তো মা র	অ ভ য়	উ ০ ক্তি	হ ০ স্তে	তো মা র

	২´	৩	০	১	২´
	I র্রা র্গা র্রা |	র্রা র্সা র্সা |	পা ধা পা |	র্সা । র্সা I	গা পা গা |
(১)	সে কি ক	ল র ব	সে কি মা	ভ ০ ক্তি	সে কি মা
(২)	বি ম ল	হা ০ স্যে	অ ম ল	ক ম ল	আ ন ন
(৩)	মু ক্তা র	হা ০ র	প ০ ঞ্চ	সি ০ ন্ধু	য মু না
(৪)	পি ক ক	ল র বে	চু ০ ম্বি	তো মা র	চ র ণ
(৫)	বি ত র	অ ০ ন্ন	চ র ণে	তো মা র	বি ত র

	১	২´	৩	০	১
	| রা । সা I {	পা গা । |	পা ধা পা |	র্সা র্সা র্রা |	র্সা র্সা । I
(১)	হ ০ র্ষ	সে দি ন	তো মা র	প্র ভা য়	ধ রা র
(২)	দী ০ প্ত	উ প রে	গ গ ন	ঘে রি য়া	নৃ ০ ত্য
(৩)	গ ০ ঙ্গা	ক থ ন	মা তু মি	ভী ষ ণ	দী ০ প্ত
(৪)	প্রা ০ ন্ত	উ প রে	জ ল দ	হা নি য়া	ব ০ জ্র
(৫)	মু ০ ক্তি	জ ন নী	তো মা র	স ০ ন্তা	ন ত রে

---

* সঙ্গীতসঙ্ঘের বার্ষিক অধিবেশন ও পুরস্কার-বিতরণের দিন স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের "ভারতবর্ষ" গানটি সঙ্ঘের ছাত্র ও ছাত্রীগণ দ্বারা গীত হইয়াছিল। ভারতবর্ষের পাঠকপাঠিকাগণের নিকট এই নিবেদন একবার গানটি এই সুরে গাহিয়া দেখিবেন।

২´ ৩ ০ ১

I র্সা র্রা র্গা । র্গা র্গা র্পা | র্গা র্রা র্গা | র্রা । র্সা I

(১) প্র ভা ত হ ই ল গ ভী র রা ০ ত্রি
(২) ক রি ছে ত প ন তা র কা চ ০ ন্দ্র
(৩) ত ০ প্ত ম রু র উ ষ র দ ০ শো
(৪) ক রি য়া প্র ল য় স লি ল বৃ ০ ষ্টি
(৫) ক ত না বে দ না ক ত না হ ০ র্ষ

২´ ৩ ০ ১ ২´

I { র্গা । র্গা | র্পা র্পা র্পা | র্রা র্গা র্রা | র্সা র্সা র্সা } I পা ধা পা |

(১) ব ০ ন্দি ল স বে জ য় মা জ ন নী জ গ ০
(২) ম ০ ধ্য মু ০ গ্ধ চ র ণে ফে নি ল জ ল ধি
(৩) হা সি য়া ক খ ন শ্যা ম ল শ ০ স্যে ছ ড়া য়ে
(৪) চ র ণে তো মা র কু ০ ন্দ কা ন ন কু সু ম
(৫) জ গ ০ ৎ পা লি নী জ গ ০ ত্তা রি ণী জ গ ০

৩ ০ ১

| পধা র্সা র্সা । পা ধা পা | গা রা সা I

(১) ত্তা রি ণি জ গ ০ দ্ধা ০ ত্রী
(২) গ র জে জ ল দ ম ০ ন্দ্র
(৩) প ড়ি ছ নি খি ল বি ০ শ্বে
(৪) গ ০ ন্ধ ক রি ছে সৃ ০ ষ্টি
(৫) জ ন নি ভা র ত ব ০ র্ষ

(ধুয়া)

২´ ৩ ০ ১

I | সা । ধা | সা রা গা | রা গা রা | সা সা সা I

ধ ০ ন্য হ ই ল ধ র ণী তো মা র

২´ ৩ ০ ১

I সা রা গা | পা গা পা | পা ধা পা | র্সা । র্সা } I

চ র ণ ক ম ল ক রি য়া স্প ০ র্শ

২´ ৩ ০ ১

I র্গা র্গা র্গা | র্রা র্গা র্রা | র্সা র্রা । | র্সা পা পা I

গা ই ল জ য় মা জ গ ০ জ্যো তি নি

২´ ৩ ০ ১

I সা রা । গা পা পা | পা ধা র্সা র্সা । র্সা | IIII

জ গ ০ জ্জ ন নী ভা র ত ব ০ র্ষ

শ্রীমতী প্রতিভা দেবী

শান্তিরাম।

চারিবৎসর পূর্ব্বের কথা বলিতেছি। তখন আমি বি এ পাশ করিয়া এম, এ ক্লাসে পড়ি। সেই সময়ে আমি যে আঘাত পাইয়াছিলাম, তাহার ক্ষত এখনও শুকায় নাই--জীবনে শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত শুকাইবে না। যে দিন চিতার আগুনে আমার এই দেহ ভস্মীভূত হইবে, যে দিন আমার নাম চিরকালের জন্য লোপ পাইবে, সেই দিন আমার আঘাতের বেদনা ঘুচিবে—সেই দিন আমি শান্তিলাভ করিব।

ঘটনাটা চারি বৎসর পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল, কিন্তু তাহারও পূর্ব্বের কথা কএকটি না বলিলে আমার এই অকিঞ্চিৎকর জীবনের দুঃখ কাহিনী কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তাই আমার ছাত্র-জীবনের কথা অতি সংক্ষেপে বলিতে হইতেছে।

আমার বাড়ী পাবনা জিলায়। আমরা ব্রাহ্মণ। আমার পিতা সিরাজগঞ্জ অঞ্চলের একজন বড় জমিদার। এতদ্ব্যতীত আমাদের পাটের কারবারও আছে। বলিতে গেলে জমিদারীর আয় অপেক্ষা পাটের ব্যবসায়ের আয়ই আমাদের অধিক। তবে কারবারের আয় অস্থায়ী, জমিদারীর আয় এক প্রকার বাঁধা বলিলেই হয়।

আমি পিতার একমাত্র সন্তান,—তাঁহার বিস্তৃত জমিদারীর ও বৃহৎ কারবারের একমাত্র উত্তরাধিকারী। আমার পিতা কর্ণওয়ালিশের দশশালা বন্দোবস্তের আদর্শ ছিলেন না; তিনি লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন; বি এ, পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইবার পর তিনি পড়াশুনা ত্যাগ করেন এবং বিষয়কর্ম্ম দেখিতে আরম্ভ করেন। পিতামহের মৃত্যুর পর সেই জন্য তাঁহাকে বিষয় কর্ম্ম লইয়া বিশেষ বিব্রত হইতে হয় নাই! তাহার পর তিনিই পাটের ব্যবসায় আরম্ভ করেন এবং ঈশ্বরের কৃপায় তাহাতে লাভবানও হইতে থাকেন।

পিতা লেখপাড়ার আদর জানিতেন, তাই তিনি আমাকে লেখাপড়া শিখাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। আমি সামান্য কাজ চালাইবার মত লেখাপড়া শিখিয়া মা সরস্বতীর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করি, ইহা তাঁহার ইচ্ছা ছিল না। তাঁহার আশীর্ব্বাদে আমারও বিলাসের দিকে মন ছিল না, লেখাপড়া শিখিবার জন্য আমারও আগ্রহ ছিল; অন্ততঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিলাভের জন্য আমার যত্ন চেষ্টার ত্রুটী ছিল না! আমি আমাদের গ্রামের বিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া মাসিক দশটাকা বৃত্তি লাভ করিয়াছিলাম।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর আমাকে পড়িবার জন্য কলিকাতায় যাইতে হইবে, এই ভাবনায় আমাকে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছিল। আমার বয়স তখন ষোল বৎসর! পিতামাতা আত্মীয় স্বজনকে ছাড়িয়া বিদেশে বাস করিতে হইবে, ইহা আমার চিন্তার কারণ নহে। যদিও কোন দিন পিতামাতাকে ছাড়িয়া বিদেশে বাস করি নাই, কিন্তু লেখাপড়া শিখিবার জন্য যে আমাকে বিদেশে যাইতে হইবে, আমার জন্য যে সিরাজগঞ্জের পাটের আড়তে কলেজের প্রতিষ্ঠা হইবে না, তাহা কি আর আমি ষোল বৎসর বয়সেও বুঝিতে পারি নাই? সে কথা নহে। আমার রীতিনীতি আচার ব্যবহারটা একটু সেকেলে রকমের অর্থাৎ উপবীত গ্রহণের পর হইতেই আমি উপবীতের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য কি জানি কেন বদ্ধপরিকর হইয়াছিলাম। আমি যথারীতি সন্ধ্যা গায়ত্রী করিতাম, আমি যথারীতি একাদশী করিতাম, আমি জুতা পায়ে জল খাইতাম না, আমি স্নান আহ্নিক শেষ না করিয়া কোন দিন আহার করিতাম না। ব্রাহ্মণের যাহা কিছু কর্ত্তব্য, তাহা আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করিব বলিয়া মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম। কেন আমার মাথার মধ্যে এ ইচ্ছা প্রবেশলাভ করিয়াছিল, তাহা আমি জানি না। বাড়ীতে বাবা মা যে খুব হিন্দু ছিলেন, তাহা বলিতে পারি না। আজকাল যে সমস্ত আচার-ব্যবহার আমাদের হিন্দুপরিবারে, ব্রাহ্মণপরিবারে চলিত হইয়া গিয়াছে, বাবা মা সেই অনুসারেই চলিতেন; বিলাতী বিস্কুট, সোডা, লিমনেড, জ্যাম, জেলি সকলই আমাদের গৃহে প্রবেশলাভ করিয়াছিল। উপনীত হইবার পূর্ব্বে আমিও ও সকল অম্লানবদনে ব্যবহার করিয়াছি, কোন দিন কোন দ্বিধা বোধ হয়

নাই। কিন্তু তের বৎসর বয়সের সময় আমার যখন উপনয়ন হইল, আমি যখন শাস্ত্রানুসারে ব্রাহ্মণের পদবীতে উন্নীত হইলাম, তখন আমার মনে হইল যে, আমি শাস্ত্রানুসারে প্রতিজ্ঞা করিয়া, যাগ যজ্ঞ করিয়া যে ব্রত অনুষ্ঠান করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলাম, তাহা ছেলে-খেলা নহে। উপবীতের মর্য্যাদা আমাকে রাখিতে হইবে, শাস্ত্রের অনুশাসন আমাকে মানিয়া চলিতে হইবে। কেন এ ভাব আমার মনে হইয়াছিল তাহা আমি বলিতে পারি না ;—তখনও পারি নাই, এখনও পারি না।

প্রথম প্রথম আমাকে ব্রাহ্মণোচিত আচার-ব্যবহার করিতে দেখিয়া বাবা মা উভয়েই মনে করিয়াছিলেন যে, উপবীত গ্রহণের পর ছেলেদের প্রথমে ঐ রকম একটা ইচ্ছা হইয়া থাকে ; সুতরাং তাঁহারা আমার ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী প্রভৃতি দেখিয়া এবং আমার আচার-ব্যবহারের পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া আনন্দই অনুভব করিয়াছিলেন ; কিন্তু তাঁহারা যখন দেখিলেন যে, আমি ও সকল ক্রিয়াকাণ্ড ত্যাগ করিতেছি না, বরঞ্চ আমার নিষ্ঠা ক্রমেই বাড়িতেছে, তখন তাঁহারা অনেক সময়ে আপত্তি করিতেন। বাবা ত স্পষ্টই বলিতেন যে, স্নানপূজা সন্ধ্যা গায়ত্রীতে যে সময় যায়, সে সময়টা পড়া শুনায় দিলে অধিক কাজ হয় ; লেখাপড়ার সময় ওসব সাজে না। লেখাপড়া শেষ করিয়া, সংসারধর্ম্ম শেষ করিয়া বৃদ্ধ বয়সে ধর্ম্মাচরণ, পূজা, অর্চ্চনা, ব্রত, নিয়ম প্রভৃতি পালন করিতে হয়। কিন্তু তাঁহার এ যুক্তি, এ উপদেশ আমি গ্রহণ করিতে পারি নাই! যদি সন্ধ্যা গায়ত্রী না করিলাম, যদি ব্রাহ্মণোচিত আচার-ব্যবহার না রক্ষা করিলাম, তাহা হইলে যজ্ঞোপবীত ধারণ করিলাম কেন? ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিই কেন?

একদিন আমার মাতুল আমাকে বলিয়াছিলেন, "নরেন, তুই যে এত বামুনগিরি করিস্, তবে ইংরেজি লেখাপড়া করিস্ কেন? ম্লেচ্ছভাষা শিখিস্ কেন?"

আমি তখন প্রথম শ্রেণীতে পড়ি। আমি বলিলাম, "ভাষা আবার ম্লেচ্ছ কি? জ্ঞান কি সীমাবদ্ধ? সকলের ভাষাই জ্ঞানলাভের উপায় বলিয়া লইতে হয়। আমি বাঙ্গালা পড়ি, সংস্কৃত পড়ি, ইংরেজিও পড়ি। আমি ব্রাহ্মণ, আমি আমার গণ্ডী ছোট করিব কেন? আমি ইংরেজি যতদূর পারি পড়িব। তাতে আমার ব্রাহ্মণত্ব নষ্ট হইবে না।"

এই সময়ে আমি মৎস্য মাংস আহার ত্যাগ করিলাম : বাবা মা ইহাতে ঘোর আপত্তি করিলেন ; তাঁহারা বলিলেন, "মাছ মাংস আহার ত্যাগ করিলে আমার শরীর নষ্ট হইয়া যাইবে, আমি লেখাপড়া করিতে পারিব না, আমি ভয়ানক রোগে পড়িব। আমি তাঁহাদের আদেশ, উপদেশ গ্রহণ করিতে পারিলাম না। আমি ইচ্ছা করিয়া মৎস্য মাংস আহার ত্যাগ করি নাই ; কি জানি কেন আমিষ দ্রব্যের উপর আমার ঘোর বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছিল। আমার মাতুল আমাকে ঠাট্টা করিয়া বলিতেন, "তুই যে দেখ্‌ছি দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ।"

এখন তিনি বুঝিয়াছেন প্রবেশিকা পরীক্ষার পর কেন আমার চিন্তা হইয়াছিল। কলিকাতায় পড়িতে গেলে ছেলেদের সঙ্গে মেসে অথবা হিন্দু হষ্টেলে থাকিতে হইবে, তাহাদের সঙ্গে আহার ব্যবহার উঠাবসা করিতে হইবে। তাহা ত আমার দ্বারা কিছুতেই হইবে না। আমি শুনিয়াছি, কলিকাতার স্কুল কলেজের ছেলেরা যে সকল মেসে বা হষ্টেলে থাকে, সেখানে তাহারা জাতীয় আচার-ব্যবহার মানিয়া চলে না। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছি, মেসে কি হষ্টেলে গোঁড়ামি রক্ষা করিয়া চলাযায় না ; তবে অখাদ্য না খাইলেই হইল। ইচ্ছা হয় সন্ধ্যাগায়ত্রী কর, কিন্তু আসন পাতিয়া আয়োজন করিয়া শুদ্ধশান্ত হইয়া ব্রাহ্মণোচিত ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান সে সকল স্থানে একেবারেই অসম্ভব। আরও এক কথা শুনিয়াছি যে, কলেজে এত পড়ার চাপ পড়িয়া থাকে যে, ঐ সকল বাজে কাজে সময় নষ্ট করিবার উপায় থাকে না। এ কথাটা আমি মানিতাম না। ইচ্ছা থাকিলে সময়ের অভাব হয় না এবং সন্ধ্যাগায়ত্রীতে যে সময় অতিবাহিত হয়, তাহা একটু বেশী পরিশ্রম করিয়া পোষাইয়া লওয়া যায়। কিন্তু আমার প্রধান প্রতিবন্ধক আচার-অনুষ্ঠানের অসুবিধা। তাই প্রবেশিকা পরীক্ষার পর আমি বিশেষ চিন্তায় পড়িয়াছিলাম।

আমি সেই সময় একদিন বাবাকে বলিলাম যে, কলিকাতায় গিয়া আমি কোন মেসে বা হষ্টেলে থাকিতে

পারিব না। বাবাও সে কথা ভাবিয়াছিলেন ; কিন্তু তিনি কি করিবেন তাহা তখনও স্থির করিয়া উঠিতে পারেন নাই। তিনি আমার কথা শুনিয়া বলিলেন, "তাহা হইলে কি ব্যবস্থা করা যায় ?" আমি বলিলাম, "আমি একটা বাসা করিয়া থাকিতে চাই।" বাবা বলিলেন, "একেলা একটা বাসা করিয়া তুমি ছেলেমানুষ কেমন করিয়া থাকিবে ? অবশ্য খরচের কথা আমি ভাবিতেছি না ;

"তাহা হইলে কি ব্যবস্থা করা যায় ?"

মাসে না হয় তোমার লেখাপড়ার জন্য একশত টাকাই খরচ হইবে। তাহা আমি দিতে পারিব ; কিন্তু কলিকাতা সহরে অভিভাবকহীন অবস্থায় তোমার মত ছেলে-মানুষের একেলা থাকাটা অসম্ভব। এমন কে আছে যে, যাহার হাতে তোমাকে সমর্পণ করিয়া আমি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি ?"

আমি বলিলাম, "কেন, শান্তিদাদা ?"

বাবা বলিলেন, "শান্তিকাকা কি দেশ ছেড়ে তোমাকে নিয়ে কল্‌কাতায় থাক্‌তে স্বীকার হবে ?"

আমি বলিলাম, "নিশ্চয়ই হবে। তাকে আমি বলে-ছিলাম, সে তাতে খুব সম্মত। বুড়ো মানুষ, গঙ্গাতীরে থাক্‌বে, কাজকর্ম্ম বেশী নেই। তারপর সে আমাকে যে ভালবাসে, তার কাছে আমি খুব থাক্‌তে পারব।"

বাবা হাসিয়া বলিলেন, "তুমি যদি তা ঠিক ক'রে থাক, আর শান্তিকাকা যদি যেতে চায়, তবে ত ভালই হয়! তা হলে আমি সত্য-সত্যই তার হাতে তোমাকে দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'তে পারি! বেশ, তাই হবে। আমি তোমাদের সঙ্গে কল্‌কাতায় গিয়ে একটা ছোটখাট বাড়ী ভাড়া করে দিয়ে আস্‌ব! একটা রাঁধুনী বামুন আর একটা চাকরও ঠিক ক'রে দিতে হবে ; শান্তিকাকা ত সব কাজ করতে পারবে না। বুড়া মানুষ কিছু-দিন বিশ্রামই করুক। আমি তাই ঠিক করছি!"

এইস্থানে শান্তিদাদার একটু পরিচয় দিই। সে আমাদের আত্মীয় বা কুটুম্ব নয় ; কিন্তু সে আমাদের আত্মীয় কুটুম্ব অপেক্ষাও আপনার জন ; সে আমার পিতামহের আমলের ভৃত্য। ভৃত্য বলিয়া পরিচয় দিয়া তাহার অসম্মান করিলাম,—সে আমাদের গৃহদেবতা,—সে আমাদের শান্তিদাদা। সে বাবাকে মানুষ করিয়াছে, আমাকে মানুষ করিয়াছে, আমার মাকে নয়বৎসর বয়সের সময় এই বাড়ীতে আনিয়া গৃহিণীপনা শিখাইয়াছে ;—সে আমার বাবার শান্তিকাকা—সে আমার শান্তিদাদা!

তার নাম শান্তিরাম ঘোষ। আমার পিতামহ তাহাকে রংপুর হইতে আনিয়াছিলেন। শান্তিদাদার বিবাহ না কি

হইয়াছিল। আমাদের এখানে থাকিতেই তাহার বিবাহ হয়। আট নয় বৎসর পরে তাহার স্ত্রীবিয়োগ হয়, সন্তানাদি কিছুই হয় নাই। তাহার পর সে আর বিবাহ করে নাই। এ সকল আমার জন্মের পূর্ব্বের কথা। শান্তিদাদা আমাদেরই একজন। আমি ছেলেবেলায় তাহার সঙ্গে বসিয়া না কি ভাত খাইয়াছি। কায়স্থ হইলে কি হয়—সে যে আমার পিতামহের মত।

শান্তিদাদার গুণের কথা কি বলিব! বলিয়াছি ত সে আমাদের গৃহদেবতা। তাহার অনুমতি না লইয়া বাবা কোন কাজ করিতেন না, মা কোন কাজ করিতেন না। কোন মঙ্গল অনুষ্ঠান করিতে হইলে তাহার আশীর্ব্বাদ আমরা সর্ব্বপ্রথমে গ্রহণ করিতাম! কাজকর্ম্মের কথা থাকুক, শান্তিদাদার আর একটা মহৎ গুণ ছিল, সে বড় সুন্দর গান করিতে পারিত। তাহার গান শুনিয়া সকলে মুগ্ধ হইত। সে যখন নির্জ্জনে বসিয়া প্রাণ খুলিয়া গাইত—

"মন তুমি কৃষিকাজ জান না।
এমন মানব জমিন রইল পতিত
আবাদ করলে ফল্‌ত সোণা॥"

তখন যে সেই গান শুনিত, সেই তন্ময় হইয়া যাইত। সে যখন গায়িত—

"নন্দি! গিরিনন্দিনী—ত্রিনয়নের-নয়নতারা।
তারাহারা হয়ে আমি আজ, হয়েছি রে
তারাহারা।"

তখন পাষাণের চক্ষেও জল আসিত। আমি ত তখন আমার চক্ষের সম্মুখে সেই সতী—শোকাতুর পাগল মহেশ্বরকে দেখিতে পাইতাম, তাঁহার সেই হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদ, সেই মর্ম্মস্পর্শী করুণবিলাপ আমার প্রাণকে আকুল করিয়া তুলিত! আমি বৃদ্ধ শান্তিদাদার বুকে মুখ লুকাইয়া সতীশোকে পাগল ভোলানাথের জন্য অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতাম। আমার এক এক সময়ে মনে হইত, শান্তিদাদার কাছে যে শিক্ষালাভ করিয়াছিলাম তাহাই আমার জীবনপথের অপার্থিব পাথেয়। আর তাহার পর—ওগো সেই কথা বলিবার জন্যই ত,—সেই মর্ম্ম-ভেদী কাহিনী বলিবার জন্যই ত আমার ছাত্রজীবনের দুই একটা কথা বলিলাম।

কলিকাতায় আসিয়া বাগবাজারে গঙ্গাতীরে আমরা একটা ছোট বাড়ী ভাড়া করিলাম। এ স্থান হইতে প্রেসিডেন্সি কলেজ অনেক দূর বলিয়া বাবা প্রথমে আপত্তি করিয়াছিলেন; কিন্তু শান্তিদাদা যখন বলিলেন, "এই স্থানই ভাল, বুড়ো মানুষ, রোজ গঙ্গাস্নান ক'রে কৃতার্থ হব।" তখন বাবা আর আপত্তি করিলেন না! তিনি একটি রাঁধুনী বামুন ও একটি চাকর নিযুক্ত করিয়া দিয়া এবং আমাকে প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রবিষ্ট করাইয়া দেশে চলিয়া গেলেন। আমি আমার ছাত্রজীবনের দীর্ঘ পাঁচ বৎসর এই বাড়ীতেই কাটাইয়াছিলাম। বুড়া শান্তিদাদা আমার অভিভাবকরূপে বাস করিত।

শান্তিদাদা এই বুড়া বয়সে কলিকাতায় আসিয়া লেখা-পড়া শিখিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিল। আমার বামুন ঠাকুর কিঞ্চিৎ লেখাপড়া জানিত; শান্তিদাদা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তাহার নিকট হইতে বাঙ্গালা শিখিয়া ফেলিয়াছিল এবং সে রামায়ণ মহাভারত অনর্গল, পড়িয়া যাইতে পারিত। অবসর সময় কাটাইবার এই উপায় পাইয়া বুড়া বড়ই শান্তিলাভ করিয়াছিল। কিছুদিন পরে তাহার দুই একখানি শাস্ত্রগ্রন্থ পড়িবার ইচ্ছা হইয়াছিল; কিন্তু আমার এত অধিক সময় ছিল না যে, তাহাকে সংস্কৃত শিখাই। তবে তাহার পাঠের জন্য আমি শ্রীমদ্ভাগবত, গীতা, চণ্ডী প্রভৃতি আনিয়া দিয়াছিলাম। সে তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ মোটেই পড়িত না, সংস্কৃত শ্লোকগুলি কণ্ঠস্থ করিত। আমি একদিন তাহাকে বলিলাম "শান্তিদাদা! তুমি যে এই সব শ্লোক মুখস্থ কর আর আওড়াও, ইহার অর্থ ত তুমি মোটেই বোঝ না; তবে এ সব পড়েও মুখস্থ করে তোমার কি হয়?' শান্তিদাদা এ কথার যে উত্তর দিয়াছিল তেমন উত্তর আমি কোন দিন শুনি নাই। সে বলিয়াছিল, "এ সকল দেবতার মুখের কথা; ও উচ্চারণ করলেই মুক্তিলাভ হয়। ও কি মানুষে বুঝতে পারে। আমি যখন ঐ সকল মন্ত্র পড়ি, তখন আমার জ্ঞান থাকে না, আমি এ দেশেই থাকি না।"

একদিন আমি ইহার পরিচয় পাইয়াছিলাম। আমি সে দিন সন্ধ্যার সময় গঙ্গার তীরে ভ্রমণ শেষ করিয়া বাসায় আসিয়া দেখি শান্তিদাদা তারস্বরে আবৃত্তি করিতেছে,—

"কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্ মহাত্মন্ গরীয়সে ব্রহ্মণোঽপ্যাদি কর্ত্রে।"

কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্ মহাত্মন্
গরীয়সে ব্রহ্মণোঽপ্যাদি কর্ত্রে।
অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস
ত্বমক্ষরং সদসৎ তৎ পরং যৎ।

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ—
স্তমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ।

বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ
প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমোনমস্তে!

আমি স্থির নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া শান্তিদাদার এই সুন্দর আবৃত্তি শুনিতে লাগিলাম। অনেকের মুখে আবৃত্তি শুনিয়াছি, অনেক পণ্ডিতের মুখে গীতার এই শ্লোক শুনিয়াছি, কিন্তু এমন সুন্দর, এমন প্রাণস্পর্শী আবৃত্তি আমি কখন শুনি নাই। আর তাহা আবৃত্তি করিতেছে কে? যে সংস্কৃত জানে না, যে ঐ মহান্ বাণীর অর্থগ্রহ করিতে পারে না, সেই আমার শান্তিদাদা ঐ অপার্থিব শ্লোকগুলির আবৃত্তি করিতেছে। ইচ্ছা হইল ব্রাহ্মণসন্তান আমি, ঐ শান্তিদাদার চরণধূলি গ্রহণ করিয়া জীবন পবিত্র করি। চাহিয়া দেখিলাম, শান্তিদাদার গণ্ড বাহিয়া অশ্রু পড়িতেছে। ধন্য শান্তি-দাদা! ধন্য তাহার সাধনা!

আর একদিনের কথা বলি। রাত্রি তখন বারটা বাজিয়া গিয়াছে। আমি শয়ন করিয়াছি। এমন সময়ে শান্তিদাদার সুমধুর কণ্ঠস্বরে আমার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল! শান্তি-দাদা তখন বারান্দায় বসিয়া গান করিতেছে। আমি একমনে শুনিতে লাগিলাম শান্তিদাদা গায়িতেছে,—

অরূপের রূপের ফাঁদে, প'ড়ে কাঁদে
প্রাণ যে আমার দিবানিশি।
কাঁদলে নির্জ্জনে ব'সে, আপনি এসে,
দেখা দেয় সে রূপরাশি;
সে যে কি অতুল্যরূপ, নয় অনুরূপ
শত শত সূর্য্য শশী।
যদি রে চাই আকাশে, মেঘের পাশে
সে রূপ আবার বেড়ায় ভাসি;
আবার রে তারায় তারায়, ঘুরে বেড়ায়,
ঝলক লাগে হৃদে আসি।

হৃদয় প্রাণ ভ'রে দেখি, বেঁধে রাখি,
চিরদিন সেই রূপশশী;
ওরে, তায় থেকে থেকে, ফেলে ঢেকে
কুবাসনা মেঘরাশি!
কাঙ্গাল কয়, যে জন মোরে দয়া ক'রে,
দেখা দেয় রে ভালবাসি,
আমি যে সংসার-মায়ায় ভুলিয়ে তাঁয়
প্রাণ ভ'রে কৈ ভালবাসি।

এই গানটা গায়িতেছে, আর শান্তিদাদা কাঁদিয়া আকুল হইতেছে। আমি আর শয়ন করিতে পারিলাম না; ধীরে ধীরে বারান্দায় যাইয়া শান্তিদাদার কোলে মাথা দিয়া শয়ন করিলাম। দাদা আমার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল, আর গায়িতে লাগিল,—

"আমি যে সংসার মায়ায় ভুলিয়ে তাঁয়
প্রাণভ'রে কৈ ভালবাসি।"

আমার এই শান্তিদাদা মানুষ না দেবতা! আমি তাহাকে একদিনও চিনিতে পারিলাম না, একদিনও ধরিতে পারিলাম না। সুধুই জানিতাম—সে আমার শান্তিদাদা!

তাহার কথা কত বলিব—বলিয়া সে কথা শেষ করিতে পারিব না; জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাহারই কথা বলিলেও যে ফুরাইবে না।

এখন সেই দুর্দ্দিনের কথা বলিতেছি। এই যে সে বৎসর পূজার সময় বড় ঝড় হইয়া গিয়াছিল, সেই সময়ের কথা বলিতেছি। আমি শান্তিদাদাকে বলিলাম যে, এবার পূজায় বাড়ী যাইয়া কাজ নাই; পরীক্ষার বৎসর, বাড়ী গেলেই কএকদিন পড়াশুনা বন্ধ থাকে। শান্তিদাদা বলিল, "আরে ভাই, তা কি হয়! পূজার সময় বাড়ী যাওয়া বন্ধ রাখিলে কি চলে? তুমি না গেলে যে পূজাই হবে না। চল যাই, না হয় পূজার কয়দিন পরেই আবার চলিয়া আসিব।"

শান্তি দাদার আদেশ উপেক্ষা করিবার শক্তি আমার নাই। বাড়ীতে পত্র লিখিলাম। বাবা যথাসময়ে নগরবাড়ী ষ্টীমার ষ্টেসনে নৌকা পাঠাইয়া দিবেন বন্দোবস্ত হইল। বাড়ী আমাদের পাবনা জেলায়, কিন্তু যাইতে হয় অনেক ঘুরিয়া। রেলে গোয়ালন্দ যাইতে হয়; সেখান হইতে ষ্টীমারে চড়িয়া নগরবাড়ী যাইতে হয়, সেখান হইতে নৌকাযোগে দুই প্রহরের পথ গেলে, তবে বাড়ী পৌঁছিতে পারা যায়।

যে দিন আমরা কলিকাতা হইতে হইতে যাত্রা করিলাম, সে দিন কলিকাতায় খুব বৃষ্টি হইতেছিল, বাতাসও একটু প্রবলবেগে বহিতেছিল। শান্তিদাদা বলিল, "আজ গিয়ে কাজ নেই, একটু খোলসা হোক, তখন যাওয়া যাবে।" সেদিন পঞ্চমী—পূজার আর বিলম্ব নাই। আমি বলিলাম, "আজ না গেলে কি পূজা শেষ হলে যাইব? ভয় কি শান্তিদাদা, আমরা পদ্মাপারের লোক, আমাদের কি এই দুর্যোগ দেখে ভয় আছে।" শান্তিদাদা হাসিয়া বলিলেন, "আমার ত ভয় নেই ভাই, আমার কাছে যে অমূল্যরত্ন রয়েছে; তারই জন্য ভয়।" আমি বলিলাম, "তোমার এ রত্ন পদ্মায় ডুবে মরবে না, ভয় নেই।"

আমার আগ্রহ দেখিয়া শান্তিদাদা যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইল। কলিকাতা হইতে গাড়ী ছাড়িবার পর মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল, ঝড়ও হইতে লাগিল। পরদিন প্রাতঃকালে গোয়ালন্দে পৌঁছিয়া দেখি ঝড়ে গোয়ালন্দকে একেবারে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া দিয়াছে। সে এক ভীষণ দৃশ্য!

আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে তখন একখানি ছোট ষ্টীমার জগন্নাথগঞ্জ যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল; তিনদিন পরে এই ষ্টীমার যাইতেছে। আমরা তাড়াতাড়ি সেই ষ্টীমারে উঠিলাম; তখন বৃষ্টি কম হইয়াছে, ঝড়ের বেগও কমিয়া আসিয়াছে। আমরা মনে করিলাম আর জল ঝড় হইবে না।

আমাদের ষ্টীমার প্রায় বারটার সময় নগরবাড়ী পৌছিল। আমরা দুইজনে জিনিষপত্র লইয়া অতি কষ্টে তীরে নামিলাম; কিন্তু আমাদের নৌকার কোন সন্ধানই মিলিল না। ঘাটে তিনচারিখানি নৌকা ছিল; তাহাদের জিজ্ঞাসা করিয়াও কোন সন্ধান পাইলাম না। শান্তিদাদা বলিল, "ভাড়াটে নৌকায় গিয়ে কাজ নাই; আজ এখানেই থাকা যাক্। বাড়ীর নৌকা নিশ্চয়ই এসে পৌছিবে। বোধ হয় তারা ঝড়ে রাস্তায় আট্‌কে গিয়েছে।" আমি শান্তিদাদার এ কথা শুনিলাম না; আমি বলিলাম, "হাঁ; বাড়ীর কাছে এসে

তিনদিন ব'সে থাকি। না শান্তিদাদা, তা হবে না। তুমি নৌকা দেখ।"

নিতান্ত অনিচ্ছায় শান্তিদাদা নৌকা ভাড়া করিল। আমরা জিনিষপত্র নৌকায় তুলিয়া দিলাম। নৌকা ছাড়িতে একটু বিলম্ব হইয়া গেল। আমরা যখন নৌকা ছাড়িলাম তখন অপরাহ্ণ প্রায় তিনটা।

নগরবাড়ী হইতে ক্রোশখানেক পথ যাইতে না যাইতেই পশ্চিমদিক অন্ধকার করিয়া একখানি মেঘ হঠাৎ উঠিল। মাঝি বলিল, "বাবুজি, ঐ মেঘডার গতিক বড় ভাল ঠ্যাকচে না।"

এই কথা শুনিয়াই শান্তিদাদা তাড়াতাড়ি নৌকার বাহিরে গেল, আমিও তাহার সঙ্গে গেলাম। শান্তিদাদা বলিল, "ও মাঝি, মেঘখানা যে বেড়ে উঠ্‌ল। এখন উপায়।"

মাঝি বলিল, "বাঁয়ে 'কাছাড়', নৌকা ত রাখার ঠাঁই নেই। কি করি। হাওয়ায় যে 'মুখোড়' আসল।" বলিতে বলিতেই জোরে বাতাস বহিল, মেঘে আকাশ ছাইয়া গেল। আমরা তখনও পদ্মা ছাড়িয়া ছোট নদীতে প্রবেশ করিতে পারি নাই। পদ্মা তখন উন্মাদিনীর মত গর্জ্জন করিয়া উঠিল, পর্ব্বত-প্রমাণ ঢেউ উঠিতে লাগিল। শান্তিদাদা আমাকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিল, আর তারস্বরে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, "মা দুর্গে, রক্ষা কর—রক্ষা কর মা!"

"মা দুর্গে, রক্ষা কর—রক্ষা কর মা!"

মাঝিমাল্লারা অতুল বিক্রমে ঝড়ের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল; কিন্তু সকলই বৃথা হইল। হঠাৎ নৌকার হাল ভাঙ্গিয়া গেল, মাঝি ছুটিয়া নদীর মধ্যে পড়িয়া গেল। দেখিতে দেখিতে নৌকা ঘুরিয়া গেল এবং দ্রুতবেগে ঝড়ের সঙ্গে সঙ্গে ছুটিতে লাগিল।

শান্তিদাদা তখন চীৎকার করিয়া বলিল, "ভাই আর না। এস।" এই বলিয়াই বৃদ্ধ আমাকে বুকে করিয়া সেই ভীষণ পদ্মায় ঝাঁপাইয়া পড়িল।

তখন আর এক বিপদ হইল। আমাদের নাকে মুখে জল যাইতেছে, নিঃশ্বাস বন্ধ হইবার মত হইতেছে, আমরা কিছুতেই জলের উপর থাকিতে পারিতেছি না। শান্তিদাদার শরীরে শক্তি কম ছিল না, আমিও খুব শক্তিমান ছিলাম। কে কাহাকে আশ্রয় করিবে, কে কাহার হাতে আত্ম-সমর্পণ করিবে? শান্তিদাদাও আমাকে টানিতে লাগিল, আমিও তাহাকে টানিতে লাগিলাম। আমরা দুইজনেই অবসন্ন হইয়া পড়িলাম। তাহার পর সব অন্ধকার—।

যখন আমার জ্ঞানসঞ্চার হইল, তখন দেখিলাম আমি একটা চরের উপর পড়িয়া আছি। আমার শরীরের অধিকাংশ বালুকার মধ্যে সমাহিত রহিয়াছে। কথা বলিবার শক্তি অপহৃত-প্রায়! আমি সেই অবস্থাতেই মাথা তুলিয়া ডাকিলাম, "শান্তিদাদা।" তাহার পরেই আবার অজ্ঞান হইয়া পড়িলাম।

গভীর রাত্রিতে আমার পুনরায় চেতনাসঞ্চার হইল।

আমি উঠিয়া বসিলাম; আমার শরীরে যেন একটু বল আসিল। এমন সময় দূরে কোন গতিশীল নৌকার দাঁড়ফেলার শব্দ পাইলাম। মেঘে সমস্ত অন্ধকার করিয়া রাখিয়াছে কিছুই দেখিতে পাইলাম না। আমি চীৎকার করিয়া নৌকা ডাকিলাম। বার বার চীৎকার করিতে করিতে শুনিলাম যে নৌকা হইতে কাহারা সাড়া দিল। তখন একটু আশ্বস্ত হইলাম। কিছুক্ষণ পরেই একখানি নৌকা আসিয়া চরে লাগিল। নৌকা হইতে একটি ভদ্রলোক লাফাইয়া পড়িলেন। আমি চাহিয়া দেখিলাম—আমার বাবা।

আমার শরীরের অধিকাংশ বালুকার মধ্যে সমাহিত রহিয়াছে।

আমি তখন চীৎকার করিয়া বলিলাম,—"শান্তিদাদা!" তাহার পর অচেতন হইয়া পড়িলাম।

তাহার পর—তাহার এই কয় বৎসর চলিয়া গেল। শান্তিদাদার কথা আমার প্রতিদিন মনে হয়। আমি পড়াশুনা ত্যাগ করিয়াছি। যে কয়দিন বাবা মা বাঁচিয়া আছেন, সে কয়দিন ঘরে থাকিব। তাহার পর দেখিব রাক্ষসী পদ্মা আমার শান্তিদাদকে ফিরাইয়া দেয় কি না;—তাহার পর দেখিব আমার শান্তিদাদাকে সে কোন্ অতলগর্ভে লুকাইয়া রাখিয়াছে? সকলে বলে আমি পাগল হইয়া গিয়াছি। তাহারা কি বুঝিবে, আমার কি রত্ন পদ্মায় ডুবিয়া গিয়াছে। সে যে আমার পারের কাণ্ডারী। এখনও দিবানিশি তাহার সেই গান আমার কর্ণে ধ্বনিত হয়—

"ওগো, দিন ত গেল, সন্ধ্যা হ'ল
পার কর আমারে।"

শ্রীজলধর সেন।

ভারতবর্ষের আবাহন।

(কবি-সম্রাট রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ-প্রত্যাগমন উপলক্ষে)

(১)

যশোমণ্ডিত শির,
মায়ের কোলেতে এসো, ফিরে এসো
বিশ্ববিজয়ী বীর!
নাহি কোলাহল, তূর্য্যের ধ্বনি,
অশ্বের হ্রেষা, অসি ঝনঝনি,
ঘোষে না বিজয় গরজি কামান
কাঁপায়ে গঙ্গা-নীর।

(২)

নীরবে সুদূরে গিয়া,
হেলায় তুমি যে করিয়াছ জয়
লক্ষ লক্ষ হিয়া!
তোলনি বীণায় তীব্র হাহাকার,
ঢালো নাই তুমি বিষাদের ধার,
শোভা শরজালে বন্দী করিলে
প্রীতির নিগড় দিয়া।

(৩)

আনিল বিশ্ব লুটি'
ভক্তি মাখানো শুভ্র হৃদয়,
শান্ত নয়ন দুটী।
লুণ্ঠন নাহি আসে ভারে ভার,
কাঁদে না বন্দী ঘেরি চারিধার,
বিজয়মঞ্চে বাজে না বাদ্য
সেনানী ফেরে না ছুটি'।

(৪)

হে পুত্র মহাকবি,
ডাকিছে তোমারে আমার আকাশ,
আমার সোণার রবি।
ডাকিছে তোমায় আম্রকানন,
কুসুমগন্ধে অন্ধ পবন,
ডাকিছে তোমায় দোয়েল পাপিয়া
এসো স্বরগের ছবি।

(৫)

কতদিন কোল ছাড়া;
শরৎ তোমারে খুঁজিয়া ফিরিছে
ফিরে মেঘ 'জলহারা'।
দুখিনী মাতার নয়নের মণি,
নিরাশার আসা, প্রতিভার খণি,
মুছাও আসিয়া তৃসিত তাপিত
মায়ের নয়ন-ধারা।

(৬)

এতদিন ছিলে ভুলে;
নয়ন দুখানি পেতে রেখেছিনু
বঙ্গ-সাগর-কূলে।
এসো, হে বৎস লভ মঙ্গল,
মুছাই বদন দিয়া অঞ্চল,
আশীষ মাখানো সেফালি মাল্য
কণ্ঠে লহ রে তুলে।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

প্রায়শ্চিত্ত।

বহু আরাধনার ধন প্রসব করিবার অব্যবহিত পরেই যখন শোভা আমার নিকট হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিল, তখন শোকের প্রথম তীব্র আঘাতে মনে করিয়াছিলাম আমার জীবনের সব লীলাও সাঙ্গ হইয়া গেল। স্তব্ধ হইয়া যে কত দিন ছিলাম বলিতে পারি না। শোকের তীব্রতা একটু কমিলে মনে হইল শোভার আরাধনার ধন সে আমারই হস্তে সমর্পণ করিয়া গিয়াছে! মাতৃহীন শিশুর পিতা আমি, তাহার প্রতি আমার কর্ত্তব্যের কিছুমাত্র ত্রুটি হইলে ভগবানের ন্যায়দণ্ড আমার মস্তকে পতিত হইয়া আমাকে চূর্ণ করিবে! তারপর সে যে শোভার স্মৃতিচিহ্ন, সে যে তাহারই রূপান্তর মাত্র!

যেদিন সেই দশদিনের শিশু বুকে তুলিয়া লইলাম, সেই দিন হইতে সে আমাকে স্নেহের বন্ধনে এমনই বাঁধিয়া ফেলিল যে, তাহার চিন্তা ব্যতীত আমার আর কোন চিন্তা মনে স্থান পাইত না। আমি আমার আপিসের কার্য্যের সময় ভিন্ন অন্য সমস্ত সময়ই তাহাকে লইয়া কাটাইতাম। তাহাকে লইয়া যতক্ষণ থাকিতাম হৃদয়ে শান্তি পাইতাম। সে আমার দগ্ধহৃদয়ে শীতল প্রলেপ!

আমার বৃদ্ধা মাতার আমি একমাত্র সন্তান। তিনি বধূবিয়োগ-শোকাশ্রু মার্জ্জনা করিয়া খুকুর সেবায় নিযুক্ত হইলেন। সে যে তাঁহারও অনেক কামনার ধন! কত যাগ, যজ্ঞ, কত ব্রতানুষ্ঠান করিয়া, বধূকে কত মন্ত্রঃপূত মাদুলি ধারণ করাইয়া তবে যে তিনি তাহার দর্শন পাইয়াছেন! তিনি অনন্যকর্ম্মা হইয়া তাহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইলেন। বুঝি বা তাঁহার সন্ধ্যা পূজারও ব্যাঘাত জন্মিতে লাগিল। আমরা মাতা-পুত্রে খুকুর নাম রাখিলাম স্মৃতিময়ী।

খুকুকে বুকে চাপিয়া আমার চক্ষে অজস্রধারে অশ্রু বহিল (৭৮৯ পৃষ্ঠা)।

প্রতিবেশিনীগণ আমাদের গৃহে সমবেত হইলে, আমাদের শোকে সহানুভূতি প্রকাশ করিবার জন্য বলিতেন—"এমন অলক্ষণে মেয়ে আস্‌তে আস্‌তেই মাকে খেলেন।" মা আমার সেই কথা শুনিলেই শিহরিয়া উঠিয়া খুকুকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া বলিতেন, "এমন কথা বোলনা—বাছারা! ওর মত দুরদৃষ্ট কার? জন্মে মার স্নেহ পেলে না।" প্রতিবেশিনীগণ মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যাইতেন।

আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধব সকলেই আমাকে পুনরায় বিবাহ করিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। আমি সে কথা শুনিলে শিহরিয়া উঠিতাম, কোন উত্তর করিতে ইচ্ছা হইত না। আবার বিবাহ! জীবনের সকল সুখ, সকল সাধ শোভার চিতায় সমর্পণ করিয়াছি। পুনরায় বিবাহ করিয়া কি জীবনে একটা প্রহসনের অভিনয় করিব! আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে মা কখনও আমাকে পুনরায় বিবাহের কথা বলিতেন না। স্মৃতি আমার বাঁচিয়া থাক্‌, আমার আবার বিবাহের প্রয়োজন কি?

স্মৃতি ক্রমে শৈশবের সমস্ত অবস্থাগুলি একে একে অতিক্রম করিতে লাগিল। তাহার শরীর এবং মনের এই ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করিতে ২ আমার আনন্দেই দিন কাটিয়া যাইতে লাগিল। ছয়মাস বয়সে সে "বাব্‌বা" "বাব্‌বা" ডাকিতে আরম্ভ করিল। তাহার মুখে প্রথম এই মধুর সম্ভাষণ আমার কর্ণে সুধাবর্ষণ করিল। আটমাস বয়সে সে যেদিন প্রথম 'মা' শব্দ উচ্চারণ করিল, সেদিন আমার জীবনের এক বিষম পরীক্ষার দিনই গিয়াছিল। মাতৃহীনার মুখে মাতৃ সম্বোধন শুনিয়া আমার প্রাণে ঝড় বহিতে লাগিল। খুকুকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া আমার চক্ষে অজস্রধারে অশ্রু বহিল। মা আমার মুখ ফিরাইয়া অঞ্চলে চক্ষু মুছিলেন? আর ক্ষুদ্র স্মৃতি! সে তাহার চক্ষু দুটি বড় বড় করিয়া কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া তাহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঙ্গুলি দিয়া আমার চক্ষু টিপিয়া ধরিল।

তারপর স্মৃতি যখন গোল গোল হাতখানি ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া 'আয় আয়' বলিয়া চাঁদ ডাকিতে শিখিল, তখন আমাদের মাতাপুত্রের আর আনন্দের সীমা রহিল না। আমার কেবলই মনে হইত—"আমার ঘরে যেমন, এমনটি আর কাহারও ঘরে নাই—এ রত্ন যার গৃহে তার আর সংসারে দুঃখ কি?

ঠিক পূর্ণ এক বৎসর বয়সে স্মৃতি হাঁটিতে শিখিল। প্রথম প্রথম, উঠিতে উঠিতে, পড়িতে পড়িতে দুএক পা হাঁটিতে হাঁটিতে গরবিণী যখন গর্ব্বভরে আমাদের দিকে চাহিত, আর মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিত, তখন আমি ছুটিয়া গিয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া লইতাম—চুম্বনের পর চুম্বনে তাহাকে অস্থির করিয়া দিতাম। সে যেন কতই বাহাদুরীর কাজ করিয়াছে মনে করিয়া সকৌতুকে হাসিত।

২

খুকুর যখন দেড় বৎসর বয়স, তখন মা একদিন, সাত দিনের জ্বরে আমাকে একেবারে ফেলিয়া চলিয়া গেলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি আমার হাত ধরিয়া বলিলেন, "বাবা, তোমাকে আগে একদিনও অনুরোধ করি নাই—আজ মৃত্যুশয্যায় অনুরোধ করিতেছি—আবার বিবাহ করিও। নহিলে তোমার বড় কষ্ট হইবে—আর আমার দিদিমণির

তখন আমি ছুটিয়া গিয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া লইতাম।

বড় অযত্ন হইবে। তুমি পুরুষ মানুষ, ছেলেপিলে মানুষ করা সম্বন্ধে কিছুই জান না। একটি ভদ্রবংশের লক্ষ্মী মেয়ে দেখিয়া বিবাহ করিও।" আমি কি উত্তর দিব ভাবিয়া পাইলাম না, নীরব রহিলাম। মা আবার বলিলেন, "চুপ করিয়া রহিলে কেন? আমার শেষ অনুরোধ কি রক্ষা করিবে না? আমার পা ছুঁইয়া শপথ কর—বিবাহ করিবে।" মার চক্ষে অশ্রু, কণ্ঠে শেষ নিঃশ্বাস! মার পদধূলি মস্তকে লইয়া বলিলাম, "মা! চেষ্টা করিব—আশীর্ব্বাদ কর।"

মার মুখ প্রফুল্ল হইল। আমার মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, "বাবা! সুখী হও।" সেই দিন সন্ধ্যার সময় তুলসীতলায় হরিনাম করিতে করিতে মা প্রাণত্যাগ করিলেন।

মা যে আমার জীবনে কি ছিলেন, আজ মাকে হারাইয়া বুঝিলাম। শৈশবে পিতৃহীন হইয়াছিলাম, মা একাধারে

আমার পিতামাতা সব ছিলেন। মার অভাবে আজ আমি বড় অসহায়।

পদে পদে কষ্ট, পদে পদে অসুবিধা। সংসারের কিছুই জানিতাম না, অথচ এখন নিজেকেই সব করিতে হইল। সংসারের কোন রূপ অভিজ্ঞতা না থাকাতে সবই বিশৃঙ্খল হইতে লাগিল। উপযুক্ত যত্ন-অভাবে স্মৃতির বড়ই কষ্ট হইতে লাগিল। তবু মার শেষ অনুরোধ পালন করিতে পারিলাম না। মার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, "চেষ্টা করিব।" মনের সহিত সংগ্রাম চলিতে লাগিল, কিন্তু মন প্রস্তুত করিতে পারিলাম না। যখনই পুনরায় বিবাহ করিবার কথা মনে হইত, তখন সমস্ত শরীরমন শিহরিয়া উঠিত! শোভার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিব? ছি! তাহার আট বৎসরের ভক্তি, প্রীতি ও প্রেমের কি এই প্রতিদান!

মার মৃত্যুর এক বৎসর পর স্মৃতির অবস্থা এমন হইল যে, তাহার জন্য চিন্তিত হইয়া পড়িলাম। তাহার মুখে হাসি নাই, মনে স্ফূর্ত্তি নাই; সে দিন দিন ম্লান হইয়া যাইতে লাগিল। আমি যথাসাধ্য তাহার তত্ত্বাবধান করিতাম, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। সে দিন দিনই শুকাইয়া গিয়া একেবারে অস্থিচর্ম্মসার হইয়া পড়িল। ব্যস্ত হইয়া ডাক্তার ডাকিলাম; ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "কোনরূপ ব্যাধি নাই—ভাল করিয়া খাওয়া দাওয়ার যত্ন করিলেই সারিয়া যাইবে।" অনেক রকম ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা হইল, কিন্তু পথ্যগুলি প্রস্তুত করে কে? আমি যত্ন করিয়া নিজহস্তে সবই করিতাম, কিন্তু স্মৃতির বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হইল না। স্মৃতির মাতুলালয় হইতে তাহাকে লইবার জন্য তাহার মাতামহী পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাকে দূরে রাখিয়া থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব! আমার সংসারে, আর কে আছে? স্মৃতিই যে আমার সব!

তখন মার শেষ কথাগুলি মনে হইল,—"তুমি পুরুষ মানুষ,সন্তানপালনের কি জান?" ভাবিলাম সত্য কথাই ত সুকোমল নারী-হস্ত ব্যতীত এ কোমল পুষ্প ফুটাইয়া তোলা আর কাহারও সাধ্য নয়। তখন স্মৃতির মুখের দিকে চাহিয়া মনের সব দ্বিধা-দ্বন্দ্ব মিটাইয়া মন স্থির করিলাম। মনে মনে শোভার উদ্দেশ্যে বলিলাম,—"দেবি! অপরাধ মার্জ্জনা করিও। তোমার স্মৃতি ব্যতীত এ হৃদয়ে আর কাহারও স্থান নাই। তোমার স্নেহের ধনের মুখের দিকে চাহিয়াই এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছি।"

সন্তানস্নেহে মুগ্ধ আমি একবার ভাবিলাম না যে, প্রতিদান না দিতে পারিলে গ্রহণ করা মহাপাপ!

একটি বন্ধুর নিকট মনের ভাব প্রকাশ করিলাম। তিনি মহা উৎসাহ প্রকাশ করিয়া আমার পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন, —"এই ত বুদ্ধিমানের মত কথা! গৃহিণী না থাকিলে কি সংসার চলে? না নিজেরই যত্ন হয়, না বন্ধু বান্ধবদেরই সুবিধা হয়!"

আমি কোন উত্তর করিলাম না। গম্ভীর হইয়া রহিলাম। আমার মনে উৎসাহের লেশমাত্র ছিল না।

কিছুদিন পরে বন্ধুবর একদিন বলিলেন,—"তোমার উপযুক্ত একটি পাত্রীর সন্ধান পাইয়াছি। মেয়েটি প্রকাশের ভাইঝি। তাহারা অত্যন্ত দরিদ্র তাহা ত জানই, তবে তোমার ত তাহাতে আপত্তি নাই। মেয়েটি দেখিতে অপূর্ব্ব সুন্দরী নয়, তবে কুৎসিতও বলা যায় না। একটু বয়স্কা, বড় ধীর, নম্র ও সেবাপরায়ণা। এই পনর বৎসর বয়সেই ছোট ছোট ভাই ভগ্নীগুলিকে এমন যত্ন করে যে, বলিয়া শেষ করা যায় না। এই মেয়েই আমার বিবেচনায় তোমার উপযুক্ত স্ত্রী ও স্মৃতির উপযুক্ত মা হইবে। মেয়েটিকে একদিন দেখিয়া আসিবে চল।"

আমি বলিলাম,—"মেয়ে দেখিবার কোন প্রয়োজন নাই—তোমার মুখে যাহা শুনিলাম, তাহাই যথেষ্ট। তুমি সব ঠিক কর। বিলম্ব করিবার প্রয়োজন নাই।" বন্ধুবর আমার আগ্রহ দেখিয়া মুখ টিপিয়া একটু হাসিলেন। বোধ হয় মনে মনে বলিল, "এখন কেন? তখনই ত বলিয়াছিলাম।"

তারপর শরতের এক নির্ম্মল সন্ধ্যায় ভারাক্রান্ত হৃদয়ে জীবনের এই মহাপরিবর্ত্তণ সংঘটিত করিতে যাত্রা করিলাম। আর এক দিনের কথা মনে হইল, যে দিন জীবনের প্রথম যৌবনে বাদ্যরোল ও মঙ্গলশঙ্খ মধ্যে মহাসমারোহ করিয়া শোভাকে বিবাহ করিতে শোভাযাত্রা করিলাম, সেই একদিন আর এই দিন! দুই ফোঁটা তপ্ত অশ্রু নয়ন-প্রান্তে উপস্থিত হইল।

(৩)

উমার সম্বন্ধে সুধীর যাহা বলিয়াছিল, কার্য্যেও তাহাই দেখিলাম। তাহাকে গৃহে আনিয়াই স্মৃতিকে তাহার কোলে তুলিয়া দিয়া বলিয়াছিলাম, "উমা! এই নাও আমার একমাত্র স্নেহের অবলম্বন! ইহাকে যত্ন করিও। স্মৃতি ভিন্ন আমার জীবনে আর কিছু নাই।" উমা কোন কথা না বলিয়া আমার পদধূলি লইয়া মস্তকে দিয়াছিল।

তাহার পরদিন হইতে সে আমার ও স্মৃতির সেবায় নিযুক্ত হইল। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সে আমাদের পিতা পুত্রীর সেবায় কাটাইত। স্মৃতি মাঝে মাঝে রাত্রে বড় কাঁদিত। উমা সে সময়ে তাহাকে বুকে করিয়া সমস্ত রাত্রি বেড়াইত। স্মৃতিও অতি শীঘ্রই উমার অত্যন্ত ভক্ত হইয়া পড়িল। সে সমস্ত দিনই "মা" "মা" করিয়া তাহার পিছনে পিছনে ঘুরিত, আবদার করিত, জেদ করিয়া মাটিতে গড়াইত। উমা তাহার সাংসারিক ব্যস্ততার মধ্যেও তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া মাঝে মাঝে তাহার মুখচুম্বন করিত। ছয় মাসের মধ্যে আমার সংসারের শ্রী ফিরিল, স্মৃতির শ্রী ফিরিল।

উমা কিন্তু তাহার এই অক্লান্ত পরিশ্রমের প্রতিদানে আমার নিকট হইতে কিছুই পাইত না। আমার এবং স্মৃতির সেবা করিয়া সে যে তাহার কর্ত্তব্য ব্যতীত আর বেশী কিছু করিতেছে তাহা একদিনের জন্য আমার মনে স্থান পাইত না। আমার গৃহস্থালী এবং স্মৃতির জন্যই ত তাহাকে গৃহে আনিয়াছি, না হইলে আমার বিবাহের কি প্রয়োজন ছিল? তাহার ব্যবহারে কৃতজ্ঞ হওয়া দূরে থাক, মাঝে মাঝে স্মৃতির জন্য তাহাকে তিরস্কার করিতেও কুণ্ঠিত হইতাম না। সে কিছু বলিত না, তাহার বড় বড় চোখদুটি জলে ভরিয়া উঠিত। তাহার চক্ষে জল দেখিলেও আমি বিরক্ত হইয়া উঠিতাম। তাহার অশ্রুজল দিয়া আমার হৃদয় দ্রব করিয়া যেন সে শোভার স্থান অধিকার করিবার চেষ্টায় আছে, মনে হইত।

সমস্ত দিন পরিশ্রমের পর রাত্রে সে আমার পদসেবা করিয়া আমি নিদ্রিত হইলে পর শয্যার অপর প্রান্তে স্মৃতির পার্শ্বে সে শয়ন করিত। স্মৃতি আমার নিকট না থাকিলে আমার নিদ্রা হইত না।

এইরূপে দুই বৎসর কাটিল। এই দুই বৎসরে বলিতে পারিব না একদিন তাহাকে একটু আদর করিয়াছি বা একদিন তাহাকে কাছে ডাকিয়াছি। সেও আমার এই ঔদাসীন্য নীরবেই সহ্য করিয়াছে। একদিনের জন্য আমার কাছে কিছু দাবী করে নাই। তবে তাহার মুখে একদিনের জন্য হাসিও দেখি নাই। তাহার এইরূপ ম্লানমুখে ঘুরিয়া বেড়াইবার কারণ অবশ্য তখন কিছুই খুঁজিয়া পাইতাম না। আমার অর্থের অভাব নাই। তাহার অন্নবস্ত্রের কষ্ট নাই—গৃহে দাস-দাসীর অভাব নাই। শারীরিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য দিতে ত আমি একটুও কুণ্ঠিত নই। তবে এ ম্লান ভাব কেন? মাঝে মাঝে বড়ই বিরক্ত হইয়া উঠিতাম।

একদিন গভীর নিশীথে, নিদ্রাঘোরে পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন করিতে পায় কি ঠেকায় নিদ্রা ভঙ্গ হইল। আশ্চর্য্য হইয়া উঠিয়া বসিয়া দেখি, উমা আমার পদসেবা করিতে করিতে আমার পদতলেই নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছে। তাহার ঘুমন্ত মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম তাহার মুখমণ্ডল শুষ্ক, গণ্ডস্থল বড় শীর্ণ, নেত্রকোণে একবিন্দু জল! সহসা একটা অনুশোচনার ভাব হৃদয়ের মধ্যে বিদ্যুতের মত খেলিয়া গেল। এই যে একটা নারী-হৃদয়, তাহার হৃদয়ভরা প্রেম আমার চরণ-তলে ঢালিয়া দিতেছে, তাহার প্রতিদানে কিছু না পাইয়া তাহার হৃদয় কি তৃপ্ত হইতে পারে? মুহূর্ত্তের জন্য আত্মবিস্মৃত হইলাম, মুখ নত করিয়া তাহার প্রস্ফুটিত ওষ্ঠে চুম্বন করিলাম। সেই তাহার জীবনের প্রথম, সেই তার জীবনের শেষ চুম্বন। উমা চমকিয়া জাগিয়া উঠিল,—বিস্ময়বিহ্বল-নেত্রে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া, দুই হস্তে আমার পদদ্বয় ধারণ করিয়া চুম্বনের পর চুম্বনে তাহা প্লাবিত করিয়া দিল। আমি তাহাকে ধরিয়া তুলিয়া বলিলাম, "উমা! এ হতভাগ্যের গৃহে আসিয়া সুখী হইলে না।"

উমা আমার মুখ চাপিয়া ধরিল। দেখিলাম তাহার হাত অত্যন্ত উষ্ণ। কপালে হাত দিয়া দেখিলাম তাহা তপ্ত। আশ্চর্য্য হইয়া বলিলাম,—"তোমার কি জ্বর হইয়াছে?" উমা মুখ

ভিতরে গিয়াই দেখি, উমা আমার পদতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছে।

নত করিয়া বলিল "রোজই রাত্রে একটু একটু জ্বর হয়।" আমি কাতরভাবেই বলিলাম,—"এতদিন বল নাই কেন? তোমার অসুখ হইলে কি আমার কাছে তোমার ঔষধপত্রের অভাব হয়? শরীরের এইরূপ অযত্ন কেন?"

উমা নীরবে মুখ নত করিয়া বসিয়া রহিল। হৃদয়হীন আমি, বুঝিলাম না যে, সে বলিবে কেন? কাহার কাছে বলিবে? আমি একবারও তাহার দিকে ফিরিয়াও চাহি না?

ইহার পর ৩৪ দিন উমা বেশ ভালই রহিল। তাহাকে একটু যেন প্রফুল্লও দেখিলাম। কিন্তু এ ভাব বেশী দিন রহিল না। তাহার পুনরায় জ্বর হইতে আরম্ভ করিল। সঙ্গে সঙ্গে একটু কাশিও দেখা দিল। একদিন ডাক্তার ডাকিলাম। উমাকে পরীক্ষা করিয়া তিনি বলিলেন, "জ্বর অনেক দিন হইতেই আরম্ভ হইয়াছে বোধ হইতেছে। এ ভাবে বেশী দিন গেলে নানারকম আশঙ্কা আছে। রোগিণীকে আপাততঃ বায়ু-পরিবর্ত্তনে পাঠানই উচিত।"

তাঁহার কথার ভাবে বুঝিলাম উমার ব্যারামটি তিনি একটু কঠিন বলিয়াই মনে করেন। আমি উমাকে বায়ুপরিবর্ত্তনে পাঠাইবার জন্য ব্যস্ত হইলাম। তাহাকে ভালবাসিতে পারি নাই, পারিবও না। কিন্তু তাহার প্রতি আমার সকল প্রকার কর্ত্তব্য পালনে ত আমি সর্ব্বদাই প্রস্তুত।

উমা কিন্তু প্রথমে কোথাও যাইতে একেবারেই অস্বীকার করিল। কিন্তু আমি যখন দৃঢ়বাক্যে তাহাকে বুঝাইয়া দিলাম যে, তাহার মঙ্গলামঙ্গলের জন্য যখন আমি দায়ী, তখন তাহার জন্য যাহা প্রয়োজনীয় তাহা আমি অবশ্যই করিব; তখন সে নীরব রহিল।

বন্ধুবান্ধবগণ ও চিকিৎসকগণের সহিত পরামর্শ করিয়া উমাকে পুরী পাঠানই স্থির হইল। স্মৃতিও সঙ্গে যাইবে, কারণ তাহার মাকে সে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। ইহাদের তত্ত্বাবধানের জন্য আমার শ্বশুর মহাশয় ও শাশুড়ী ঠাকুরাণী সঙ্গে যাইতে স্বীকৃত হইলেন।

যাত্রার সময় নিকটবর্ত্তী হইলে উমা আমার নিকট আসিয়া, আমার পদধূলি লইয়া, ম্লানমুখে বিদায় প্রার্থনা করিল। আমি বলিলাম,—

"শরীরের যত্ন করিও—সর্ব্বদা প্রফুল্ল থাকিতে চেষ্টা করিও। স্মৃতিকে দেখিও, তাহার যেন কোন রকম

উমা…ম্লানমুখে বিদায় প্রার্থনা করিল।

প্রিয়! আমরা নির্ব্বিঘ্নে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। রাস্তায় কোন কষ্ট হয় নাই। একটু ভালই বোধ করিতেছি। কাল রাত্রে আর জ্বর হয় নাই। স্মৃতি ভাল আছে। নূতন জায়গায় আসিয়াও বড়ই আমোদে আছে। সারাদিন সমুদ্রের ধারে খেলিয়া বেড়ায়। আমার যথাসাধ্য তাহাকে যত্ন করিতেছি এবং প্রাণান্ত পর্য্যন্ত করিব একথা বিশ্বাস করিও। তুমি তাহার জন্য ব্যস্ত হইয়া শরীর মন খারাপ করিও না। তুমি কেমন আছ লিখিও। তোমার কত কষ্ট অসুবিধা হইতেছে তাহা ভাবিয়া বড় অস্থির হইতেছি। আমার প্রণাম লও। মাঝে মাঝে চিঠি লিখিও।

ইতি

তোমার উমা

উমার পত্রের উত্তরে লিখিলাম :—

উমা!

তোমার পত্র পাইয়া একটু ভাল আছ শুনিয়া সুখী হইলাম। স্মৃতির অভাবে বড় কষ্টে আছি। অন্য কোন
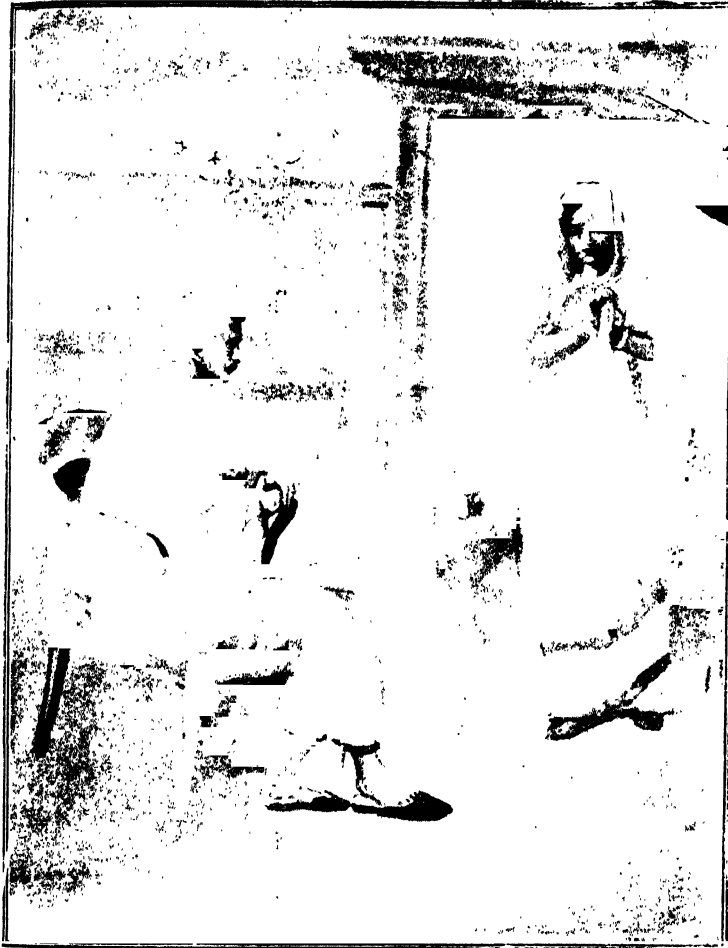
অযত্ন না হয়। সে যে আমার কি, তাহা ত জান।" উমা কোন উত্তর না দিয়া আমার মুখের দিকে চাহিল। সেই দৃষ্টিতে বুঝি তাহার নারীজীবনের সমস্ত অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা, সমস্ত বাসনা ফুটিয়া উঠিল। কিন্তু তখন ত আমি অন্ধ।

তাহাদের ট্রেণে তুলিয়া দিয়া বাড়ী ফিরিলাম। স্মৃতি এই প্রথম আমার কোলছাড়া হইল। তাহার অভাবে সমস্ত গৃহ শূন্য বোধ হইতে লাগিল। বড়ই কষ্টে দিন কাটিতে লাগিল।

চতুর্থ দিনে উমার এক পত্র পাইলাম। সে লিখিয়াছে—

কষ্ট নাই। আমার কষ্ট অসুবিধার কথা ভাবিয়া তুমি মন খারাপ করিও না। নিজের শরীরের অযত্ন করিও না। মনে রাখিও তোমার শরীর খারাপ হইলে আমার স্মৃতির অযত্ন হইবে। সর্ব্বদা পত্র লিখিবে—পত্রে স্মৃতির কথা বেশী করিয়া লিখিলে সুখী হইব। টাকার প্রয়োজন হইলে জানাইতে দ্বিধা করিবে না। আজ এই পর্য্যন্ত। স্মৃতিকে স্নেহচুম্বন দিবে। তোমার পিতামাতাকে প্রণাম দিবে। ইতি

তোমাদের—

প্রমোদ।

ইহাই উমার নিকট আমার প্রথম প্রেমপত্র!

পুরীতে গিয়া প্রথম প্রথম উমা বেশ সারিয়া উঠিল

জ্বর বন্ধ হইল—কাশিও অনেক কমিয়া গেল। আমিও নিশ্চিন্ত হইলাম।

কিন্তু একমাস ভাল থাকিয়া তাহার পুনরায় একটু একটু করিয়া জ্বর হইতে লাগিল। শ্বশুর মহাশয়ের পত্রে জানিলাম জ্বরের বেগ ক্রমশই বেশী হইতেছে ও কাশির কষ্টও অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। আর উদাসীন হইয়া থাকা চলে না। তিন দিনের ছুটী লইয়া পুরী গেলাম। গিয়া দেখিলাম উমাকে আর চেনা যায় না। পরদিন সিভিল সার্জ্জন ডাকিলাম। সাহেব উমাকে খুব ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া আমাকে অন্তরালে ডাকিয়া লইয়া বলিলেন,—তাহার রোগ যক্ষ্মায় পরিণত হইয়াছে। এই সময়ে বিশেষ রকম চিকিৎসার প্রয়োজন ও রোগিণীকে সর্ব্বদা প্রফুল্ল রাখা কর্ত্তব্য। এই সকল রোগ রোগীর মনের অবস্থার উপরই অনেকটা নির্ভর করে। ডাক্তারের কথা শুনিয়া স্তম্ভিত হইলাম। স্মৃতির অদৃষ্টের কথা স্মরণ করিয়া বড়ই কাতর হইলাম। উমাকে আরও কিছুদিন পুরীতে রাখাই চিকিৎসকের মত হওয়ায় আমি তাহার চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া কলিকাতায় আসিলাম। শ্বশুর মহাশয় ও শাশুড়ী ঠাকুরাণীকে বিশেষভাবে বলিয়া আসিলাম যে, চিকিৎসা বা সেবা-শুশ্রূষার যেন কোন রকম ত্রুটি না হয়। অর্থ বা কোন দ্রব্যের প্রয়োজন হইলেই যেন আমাকে টেলিগ্রামে জানান হয়।

উমা রোগশয্যায় বসিয়াও শ্বশুরমহাশয়ের পত্রে স্মৃতির সংবাদ দিয়া আমাকে সর্ব্বদা পত্র লিখিত। আমিও উমার নিকট মধ্যে মধ্যে পত্র লিখিতাম,—পত্রে তাহার মন সর্ব্বদা প্রফুল্ল রাখিবার পরামর্শ দিতে ভুলিতাম না। ভ্রান্ত আমি বুঝিতাম না যে, অনাদরে ও উপেক্ষায় যাহার হৃদয় তিল তিল করিয়া ভাঙ্গিয়া যাইতেছে তাহার মন প্রফুল্ল হইবে কিসে? কেবল, ঔষধ পথ্য ও অর্থব্যয়ে কি ভগ্ন হৃদয় জোড়া লাগে?

(৫)

একদিন কোন প্রয়োজনে উমার একটি দেরাজ খুলিতে হইল। দেরাজের একপার্শ্বে একখানি খাতা দেখিলাম। পাতা উল্টাইয়া দেখিলাম—লেখা রহিয়াছে "মনের কথা।" একটু নীচে নাম লেখা, "শ্রীমতী উমাবালা দেবী।"

খাতাখানা পড়িবার কৌতূহল সংবরণ করিতে পরিলাম না। বসিবার গৃহে ইজিচেয়ারে বসিয়া উমার "মনের কথা" পড়িতে আরম্ভ করিলাম। বিবাহের ৬।৭ মাস পর হইতে সে তাহার মনের কতকগুলি ভাব ইহাতে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। খাতাখানির প্রত্যেক ছত্রে ছত্রে হতভাগিনীর গভীর মর্ম্মবেদনা ও নিরাশা ফুটিয়া উঠিয়াছে। খাতাখানি হইতে কোন কোন স্থান উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।—

১লা বৈশাখ, ১৩১১।

"আমার দেবতা! তোমাকে কত ভালবাসি, তাহা কেমন করিয়া বুঝাইব? তুমি আমার সর্ব্বস্ব। তোমার চরণে স্থান পাইয়া আমার নারীজন্ম সার্থক হইয়াছে। কিন্তু বড় দুঃখ যে একদিন তোমার হাসিমুখ দেখিতে পাইলাম না। হতভাগিনীকে বিবাহ করিয়া সুখী হইলে না। আমার কর্ত্তব্য ত পালন করিবার শত চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু বোধ হয় পারি না। পারিলে কি তোমার মুখে একটুও সন্তুষ্টির চিহ্ন দেখিতে পাইতাম না? দয়াময়! আমাকে মানুষ কর। আমার স্বামীকে যেন সুখী করিতে পারি।"

১০ই আষাঢ়, ১৩১১।

"আমি সবই বুঝিয়াছি। আমার দেবতা আমার উপর প্রসন্ন হইতে পারিলেন না। তাঁহার হৃদয়ে আমার স্থান নাই—তাহা অন্যের স্মৃতিতে পূর্ণ। আমার পূজায়ও তিনি সন্তুষ্ট নন। দয়াময়! আমার মনে বল দাও; প্রভু! আমার কর্ত্তব্য যেন পালন করিতে পারি। হৃদয়ের জ্বালায় স্বামীর প্রতি, মাতৃহীন শিশুর প্রতি যেন কর্ত্তব্যের ত্রুটি না হয়।"

১৭ই আষাঢ়, ১৩১১।

প্রাণের দেবতা! এ দুঃখিনীকে ভালবাসিতে পারিলে না? যদি ভালবাসিতে পারিবে না তবে গ্রহণ করিলে কেন? তোমার দোষ দিব কি? আমারই অদৃষ্টের দোষ! শান্তিদাতা ভগবান! আমার হৃদয় বড় দুর্ব্বল, সহজেই ভাঙ্গিয়া পড়ি। আমার হৃদয়ে বল দাও, প্রভু!

১৫ই শ্রাবণ ১৩১১।

"প্রভাতে ছাগল লয়ে চলিলা খুল্লনা . ." কবিকঙ্কন।

চিত্রশিল্পী···শ্রীসুরেশ চন্দ্র ঘোষ। Reproduced in two Printings

Blocks & Printing by K. V. Seyne & Bros. Color-Engravers & Color-Printers. 60 Mirzapur Street, Calcutta

যে সুখ সংসারে আমার জন্য নয়, তাহার জন্য হৃদয় এত তৃষিত হয় কেন? না পাইলে এত কাতর হই কেন? স্বামীর ভালবাসা এ জন্মে পাইলাম না—যাহা পাইব না তাহার জন্য এত আকাঙ্ক্ষা কেন? মঙ্গলময় পরমেশ্বর! আমার হৃদয়ে বলসঞ্চার কর। আমি যেন ভাঙ্গিয়া না পড়ি।

১০ই আশ্বিন ১৩১১।

আজ আমার বিবাহের একবৎসর পূর্ণ হইল। আমার দেবতা একবারও সে কথা মনে করিলেন না। করিবেন কেন? আমি তাঁহার কে? হে পরলোকবাসিনি! তুমি যথার্থই ভাগ্যবতী। স্বামীর সমস্ত ভালবাসা নিঃশেষে ভোগ করিয়া গিয়াছ। তোমার দোষ কি? আমি পূর্ব্বজন্মে অনেক পাপ করিয়াছিলাম তাই এত কষ্ট! আমার অবস্থা দেখিয়া সুখী হইতেছ কি হতভাগিনীর দুঃখ দেখিয়া কষ্টবোধ করিতেছ জানিতে বড় সাধ হয়। তোমার স্নেহের ধনকে ত বুকে করিয়াই রাখিয়াছি, তবে কিসের অপরাধ? যদি কোন অপরাধ করিয়া থাকি, প্রায়শ্চিত্ত করিতে প্রস্তুত আছি; কিন্তু বলিয়া দিবে কে? দয়াময়! পথ দেখাও।

১লা কার্ত্তিক, ১৩১১।

ভগবান! ভগবান! আর যে পারি না। এ ব্যর্থ নারীজন্ম আর যে বহন করিতে পারি না। কি অপরাধে আমার এই শাস্তি একবার বুঝাইয়া দাও, প্রভু! মনটাকে সংযত করিতে এত চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু বুকটা যে ভাঙ্গিয়া যায়। তোমার দুঃখিনী কন্যার হৃদয়ে বলসঞ্চার কর, ঠাকুর! তাহাকে রক্ষা কর!

৭ই ফাল্গুন, ১৩১১।

এই ছয় মাস ধরিয়া এত চেষ্টা করিলাম মনটাকে ত শিক্ষা দিতে পারিলাম না। মনটাকে যদিও শাসন করিয়া লইয়া আসি, শরীর ত শাসন মানে না। শরীরটা তিল তিল করিয়া ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। ছিঃ ছিঃ। মনে এতটুকু জোর নাই? বৃথাই মানুষ হইয়া জন্মিয়াছিলাম। বাবার কাছে শুনিয়াছি ভগবান দয়াময়! আমাদের পরীক্ষা করিবার জন্য জীবনে দুঃখকষ্ট দেন। পরীক্ষায় জয়ী না হইলে পরজন্মেও এই দুঃখ! এই কষ্ট! আমি মহাপাপিনী, তাই বুঝিতে পারি না। আজ হইতে প্রতিজ্ঞা করিলাম মন খারাপ করিব না। বাবার এত যত্নের শিক্ষা কি বৃথাই যাইবে?

১৪ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩১২।

প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারিতেছি কই? বিশ্বনাথ! আমার প্রার্থনা কি পূর্ণ করিবে না? তুমি বল না দিলে আমি বল কোথায় পাইব, ঠাকুর! আমার দেবতা আমার প্রতি প্রসন্ন নাই বা হইলেন? আমার হৃদয়ের পূজা তাঁহাকে দান করিব—তিনি গ্রহণ করেন ভাল—না করেন আপত্তি নাই। প্রতিদানের আশা না করিয়া যে দান করে তাহারই জীবন ধন্য! পূজা করিয়াই যে নারীজীবনের সুখ একথা ভুলিয়া যাই কেন?

২রা ভাদ্র, ১৩১২।

না! এ জীবনে আর মানুষ হইবার আশা নাই। কিছুতেই ত মন স্থির করিতে পারিতেছি না। হৃদয়টা তিল তিল করিয়া ভাঙ্গিয়া যাইতেছে—সঙ্গে সঙ্গে শরীরটাও ভাঙ্গিতেছে। কয় দিন হইল রাত্রে একটু একটু জ্বর হয়। শরীর বড় দুর্ব্বল বোধ হইতেছে! মা কালী এইবার চরণে স্থান দিবেন কি?

৩রা কার্ত্তিক, ১৩১২।

কাল আমার জীবনে এক মহাবিপ্লব সংঘটিত হইয়াছে। কাল রাত্রে দেবতার পদসেবা করিতে করিতে, তাঁহার চরণপ্রান্তেই শ্রান্ত নয়ন মুদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিল। সহসা ওষ্ঠে সুকোমল স্পর্শ অনুভব করিয়া চমকিয়া উঠিলাম। দেখি দুঃখিনীর সর্ব্বস্ব শয্যার উপর বসিয়া আমার দিকেই চাহিয়া আছেন। এই কুৎসিতার অধরে অধর স্পর্শ করিয়া তাহার নারীজন্ম সার্থক করিয়া দিয়াছেন। পুলকে সমস্ত শরীর শিহরিয়া উঠিল। হৃদয়ের আবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহার পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া তাঁহার চরণ বার বার চুম্বন করিলাম। এত সুখ আমার অদৃষ্টে ছিল?

১৫ই কার্ত্তিক, ১৩১২।

দেবতা আমার! সর্ব্বস্ব আমার! এ কি করিলে? যে মনটাকে এত কষ্টে একটু সংযত করিয়া লইয়া আসিয়াছিলাম, ক্ষণিক করুণার বশে কেন তাহার রুদ্ধ বাঁধ আবার

খুলিয়া দিলে? তোমার চরণে কি অপরাধ করিয়াছি? যদি আবার পূর্ব্বের ভাবই অবলম্বন করিবে, তবে কেন সেদিন অভাগিনীর প্রতি এতটা করুণা প্রকাশ করিয়াছিলে? আবার হৃদয় যে ভাঙ্গিয়া যায়। নারীহৃদয় লইয়া এ কি নিষ্ঠুর খেলা খেলিতেছ? আর যে পারি না! হৃৎপিণ্ডটা লইয়া কে যেন তাহার সমস্ত শোণিত বিন্দু বিন্দু করিয়া নিঃশেষে শেষ করিয়া ফেলিতেছে! দয়াময়! ভগবান! তবে এইবার শেষ করিয়া দাও প্রভু! এই ব্যর্থ জীবন লইয়া আর বাঁচিয়া থাকিবার সাধ নাই!"

আর পড়িতে পারিলাম না। অশ্রুজলে আমার দৃষ্টিরোধ হইয়া গেল। হতভাগিনী মনের যাতনা কাহারও নিকট বলিতে না পারিয়া তাহা লাঘব করিবার এই উপায় অবলম্বন করিয়াছে! নারীহৃদয় এমন সুন্দর! সে তাহার প্রাণপূর্ণ প্রেম লইয়া আমার চরণতলে অর্ঘ্য সাজাইয়া বসিয়া আছে, আর আমি পদাঘাতে তাহা নষ্ট করিতেছি! আমার মত পাষণ্ডের জন্য তাহার সুন্দর হৃদয়খানি সে স্নেহে প্রেমে ভক্তিপ্রীতিতে পূর্ণ করিয়া, আমার পদপ্রান্তে বুভুক্ষিত তৃষিত নেত্রে চাহিয়া বসিয়া আছে, আর আমি তাহার হৃদয়ে উপেক্ষার ছুরিকা বিদ্ধ করিয়া তাহার হৃদয়ের শোণিত বিন্দু বিন্দু করিয়া পান করিয়াছি! স্বার্থপর হৃদয়হীন অন্ধ আমি, এ জ্ঞানটুকু আমার হয় নাই যে, আমি মহাপাপ করিয়াছি। তাহাকে প্রাণ দিতে পারিব না ত বিবাহ করিয়াছিলাম কেন? একটা নারীজীবন এইরূপে ব্যর্থ করিয়া দিবার আমার কি অধিকার ছিল? আমারই জন্য আজ সে মৃত্যুমুখে পতিত! আমি শুধু অত্যাচারী পাষণ্ড নই—আমি হত্যাকারী! তারপর যাহার স্মৃতি বক্ষে ধরিয়া, এই সকল গুরুতর অপরাধ করিতেছি, সেই কি পরলোক হইতে আমাকে তার চক্ষে দেখিতেছে না? কিন্তু আর নয়! আমার অন্ধ চক্ষু খুলিয়াছে। অবশিষ্ট জীবন আমি আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব। যে যত্ন আদর ও ভালবাসার অভাবে উমা আজ মৃত্যুমুখে পতিত, তাহা তাহাকে চতুর্গুণ দিয়া তাহাকে মৃত্যুমুখ হইতে ফিরাইয়া আনিতে পারি কি না দেখিব।

কতক্ষণ যে স্তব্ধ হইয়া বসিয়াছিলাম জানি না। ভৃত্যের ডাকে জ্ঞান হইল। দেখিলাম সে একখানা টেলিগ্রাম লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। শশব্যস্তে টেলিগ্রাম খুলিয়া দেখিলাম আমার শ্বশুরমহাশয়ের প্রেরিত। তিনি লিখিয়াছেন "হঠাৎ উমার অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। অবস্থা খারাপ —তোমাকে দেখিতে চাহিতেছে, শীঘ্র এস।"

কাগজখানা হস্তচ্যুত হইয়া পড়িয়া গেল। মাথাটা ঘুরিয়া গেল। পড়িয়া যাইতেছিলাম, ভৃত্য ধরিয়া ফেলিল। বুঝিলাম আমার প্রায়শ্চিত্ত এই আরম্ভ!

রাত্রের পূর্ব্বে ট্রেণ নাই। যত শীঘ্র সম্ভব স্নানাহার শেষ করিয়া আপিসে গিয়া সাহেবের নিকট ছুটি লইলাম। হাতের কাজগুলি কোনও রকমে শেষ করিয়া বাজার হইতে উমার জন্য বেদানা আঙ্গুর প্রভৃতি কিছু ফল কিনিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে বাড়ী ফিরিলাম। জিনিষপত্র বাঁধিয়া প্রস্তুত হইতে হইতে সময় হইল। সমস্ত দিন কাজের ঝোঁকে ঘুরিয়াছি, ট্রেণ ছাড়িয়া দিলে পর সমস্ত শরীর মন অবসন্ন হইয়া পড়িল। উমা কলিকাতা হইতে যাইবার দিনকার তাহার সেই তৃষিত মুখখানা মনে পড়িয়া আমার হৃদয় চূর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। হায়! এই পাষণ্ডের হস্তে না পড়িলে এই পুষ্প বৃন্তচ্যুত হইয়া পড়িত না। এখন আর সে কথা ভাবিয়া ফল কি? স্বার্থে অন্ধ হইয়া যে কার্য্য করিয়াছি, তাহার ফলভোগ করিতেই হইবে। সমস্ত রাত্রি ট্রেণে কি ভাবে কাটাইলাম বলিতে পারি না।

পরদিন সকালে ট্রেণ পুরী পৌঁছিল। কোনও রকমে জিনিষপত্রগুলি গাড়ীতে তুলিয়া বাসার দিকে রওনা হইলাম। আমার হৃদয়ে তখন সংশয়ের ঝড় বহিতেছে। বার বার মুখ বাহির করিয়া দেখিতে লাগিলাম। গাড়ীখানা বাঙ্গলার অনতিদূরে পৌঁছিলে দেখিলাম বারান্দায় বহু লোক সমবেত হইয়াছে। বুঝিলাম অবস্থা মন্দ। কিন্তু গাড়ীখানা বাঙ্গলার সম্মুখে আসিলেই আমার শাশুড়ীর হৃদয়বিদারক ক্রন্দনধ্বনি আমার কর্ণে পৌঁছিল, বারান্দায় বসিয়া পড়িলাম। হায় ভগবান! পায়ে ধরিয়া ক্ষমা চাহিবারও অবসর দিলে না!

প্রতিমা বিসর্জ্জন করিয়া আসিলাম। অনাদৃত উপেক্ষিত পুষ্প, হৃদয়হীনের পাপ-নিঃশ্বাসে অকালে ঝরিয়া পড়িয়া গেল!

স্মৃতিকে তাহার মাতুলালয়ে রাখিয়া মনস্থির করিবার জন্য দেশভ্রমণে বাহির হইলাম। কত দেশ বিদেশে ঘুরিলাম, কিন্তু বুকের চিতার আগুন নিবল না। হায় দেবি! পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবারও অবসর দিলে না! চিরকাল অনুতাপানলে দগ্ধ হইবার জন্যই রাখিয়া গেলে!

শ্রীউর্ম্মিলা দেবী।
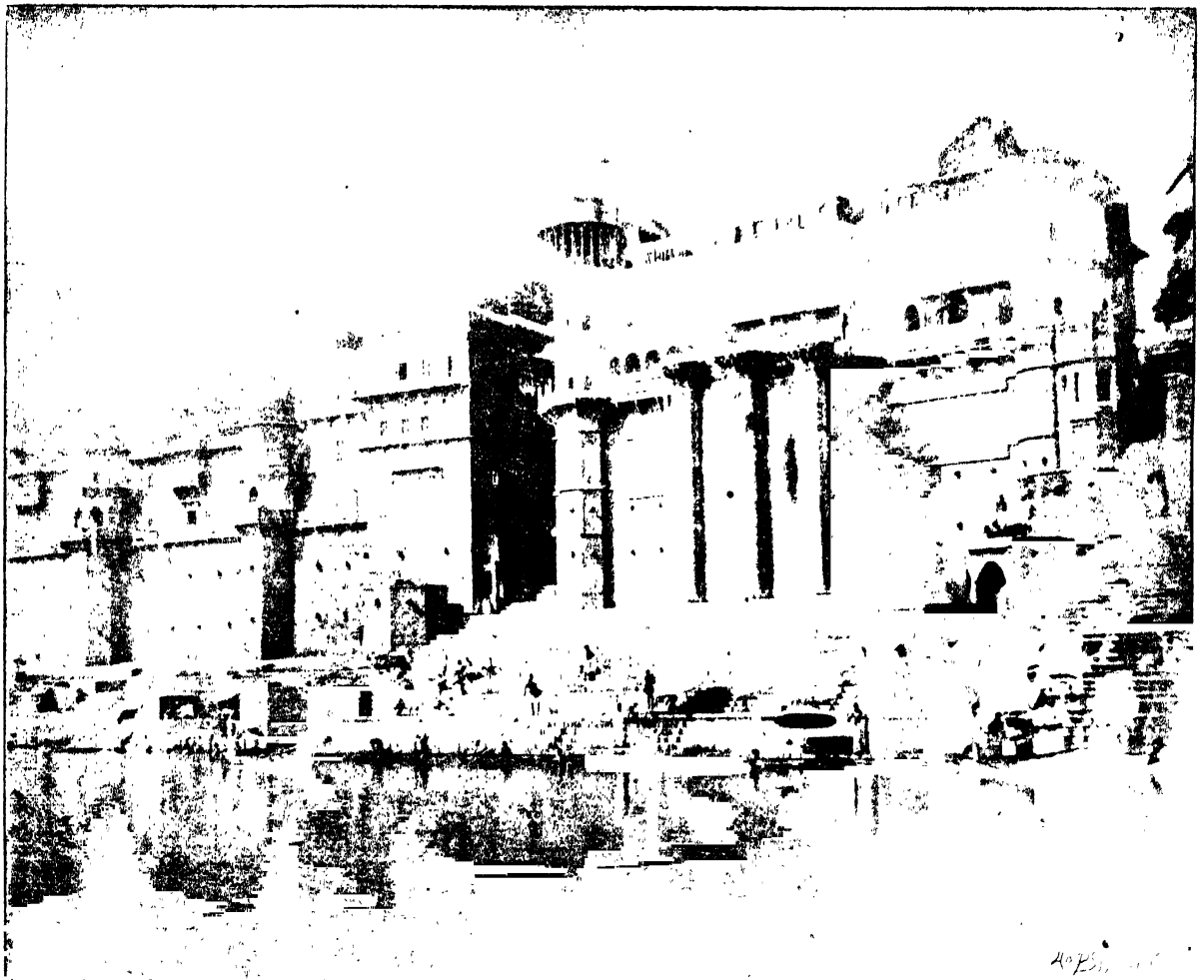
বৃন্দাবনের প্রাচীন দৃশ্য।

সাহিত্য-সংবাদ।

শ্রীমতী ঊর্ম্মিলা দেবীর নূতন কবিতা-পুস্তক 'পুষ্পহার' পূজার পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইবে।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত মহাশয়ের গল্পপুস্তক 'অনিন্দ্যা' প্রকাশিত হইয়াছে।

কবিবর শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় চৌধুরী মহাশয়ের নূতন কবিতা পুস্তক 'গৈরিক' প্রকাশিত হইয়াছে।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় এবার মালদহ-সম্মিলনীর সভাপতি-পদে বৃত হইয়াছেন।

প্রসিদ্ধ গল্প-লেখক ৺শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নূতন গল্পসংগ্রহ 'যাত্রী' প্রকাশিত হইয়াছে।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের 'কেদার রায়' প্রকাশিত হইয়াছে।

সুপ্রসিদ্ধ গল্পলেখক শ্রীযুক্ত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের নূতন গল্পের বই 'মহুয়া' পূজার পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইবে।

সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম, এ .মহাশয়ের নূতন গীতিনাট্য 'রূপের ডালি' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি, এল্ মহাশয়ের 'মুর্শিদাবাদের ইতিহাসের' দ্বিতীয় খণ্ড শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। বহু দুষ্প্রাপ্য চিত্র এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইবে।

প্রসিদ্ধ চিত্রকর শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার মহাশয় পূজার বাজারে আমাদিগকে তাঁহার নূতন পুস্তক 'অজন্তা' উপহার দিবেন। ইহাতে বহু চিত্র সন্নিবিষ্ট হইবে।

সুকবি শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় এবার পূজার বাজারে আমাদিগেকে তাঁহার নূতন কবিতাপুস্তক 'তুলির লিখন' উপহার দিবেন।

শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয়ের নূতন গল্পপুস্তক 'করিম সেখ' প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার 'কাঙ্গাল হরিনাথের' ১ম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। শেষোক্ত পুস্তকে দশখানি আলোক-চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে।

সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ও ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত হরিসাধন মুখোপাধ্যায়ের নূতন ঐতিহাসিক উপন্যাস 'নূরমহাল' প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার 'শীশমহালের' এক সুবৃহৎ হিন্দি অনুবাদও প্রকাশিত হইয়াছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন-কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বাগ্‌চী মহাশয়ের 'প্রতীচ্য-চিত্র-পরিচয়' নামে একখানি গ্রন্থ শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। বিদেশীয় বিখ্যাত চিত্রকরগণের বহু চিত্র ইহার কলেবর সুশোভিত করিবে।

২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে শ্রীসুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও
২০৩।১।১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট "প্যারাগন প্রেস" হইতে
শ্রীগোপালচন্দ্র রায় দ্বারা মুদ্রিত।

গোপা ও সিদ্ধার্থ।

শ্রীপ্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়
কর্ত্তৃক অঙ্কিত।

Colour Blocks & Printing by K. V. SEYNE & BROS. CALCUTTA
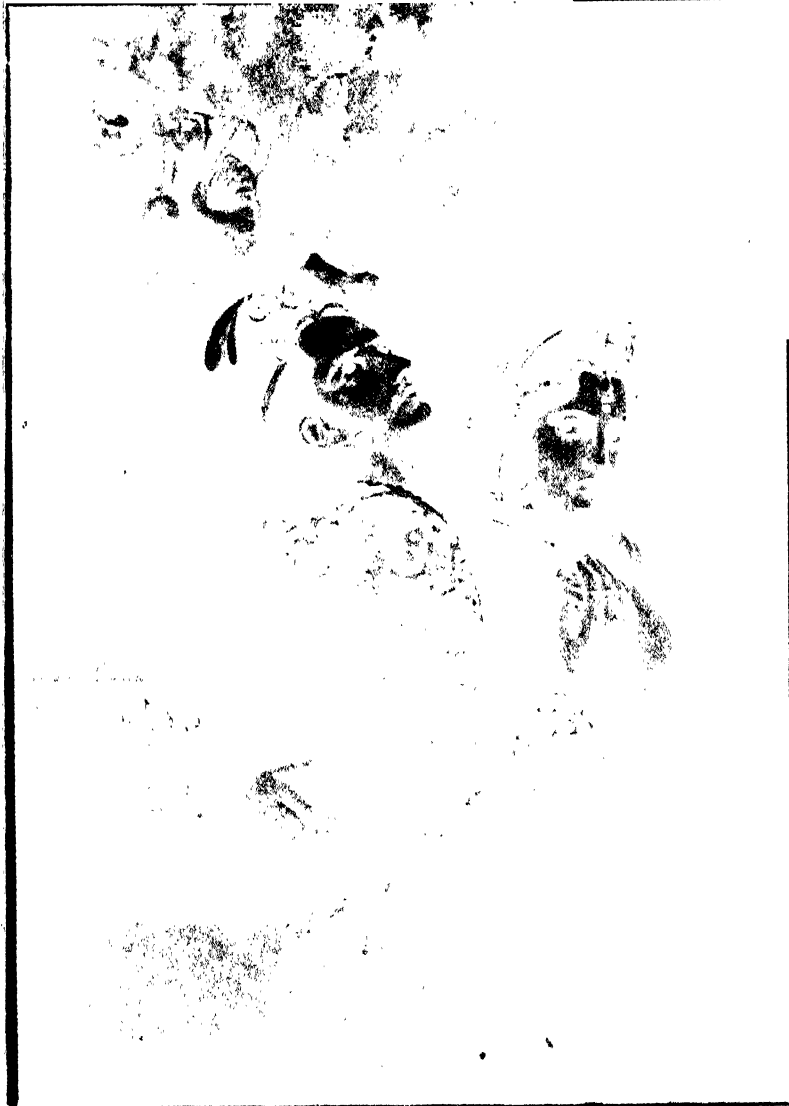
১ম বর্ষ | অগ্রহায়ণ, ১৩২০। | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

বঙ্গভাষায় বৈজ্ঞানিক পরিভাষা।

বিজ্ঞানশিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক আলোচনার প্রয়োজন সম্বন্ধে মতভেদ নাই। সাহিত্যের প্রাধান্য থাকুক বা না থাকুক, বিজ্ঞানের উপকারিতা বর্ত্তমান যুগে কেহই অস্বীকার করেন না। ভিন্ন জাতির ভাষাশিক্ষালাভ অপেক্ষা স্বজাতির ভাষায় বিজ্ঞান-শিক্ষা যে সহজ সে বিষয়েও মত-দ্বৈধ নাই। ইংরেজি ভাষাশিক্ষা করিতেই আমাদের অনেক দিন যায়, অনেক শ্রম অনর্থক নষ্ট হয়। সেই সময় অপচয়ের পর ইংরেজিতে বিজ্ঞান-শিক্ষার আয়োজন কতটা ভালমন্দ ইহার উপলব্ধি করিতে আয়াসের আবশ্যকতা নাই। অনেকে এখনও ইংরেজি ভাষা বিজ্ঞান-শিক্ষার যান স্বরূপ ব্যবহারের পক্ষপাতী; কেন যে পক্ষপাতী তাহা বুঝা যায় না। উপযুক্ত কারণ থাকিলে তাঁহারা নিশ্চয়ই এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের প্রতিবাদ করিবেন।

তবে বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় কি আমরা য়ুরোপ-প্রচলিত গ্রীক ও লাটিন-প্রকৃতিমূলক বৈজ্ঞানিক শব্দ ব্যবহার করিব—না সংস্কৃত শব্দ, ধাতু ও প্রত্যয়াদির সাহায্যে য়ুরোপ-প্রচলিত শব্দের অনুবাদ করিয়া নূতন বৈজ্ঞানিক পরিভাষার সৃষ্টি করিব? বৈজ্ঞানিক শব্দের

আমাদের স্বদেশী হওয়া অনেকেরই ইচ্ছা এবং সে ইচ্ছার ভিত্তিও নিতান্ত শিথিল নহে।

পরমশ্রদ্ধাস্পদ চিরস্মরণীয় স্বর্গগত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার বোধোদয় প্রভৃতি গ্রন্থে কএকটি য়ুরোপ-প্রচলিত শব্দের অনুবাদ করিয়া নূতন শব্দ ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। সে অর্দ্ধ শতাব্দীর কথা। আধুনিক বঙ্গ-সাহিত্যের খ্যাতনামা স্রষ্টা স্বর্গগত অক্ষয়কুমার দত্তও নূতন বৈজ্ঞানিক পরিভাষা ব্যবহারের পথ-প্রদর্শন করিয়াছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বোধোদয় ও অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের চারুপাঠ প্রভৃতি গ্রন্থ শিক্ষিত বঙ্গীয় যুবকমাত্রই পড়িয়াছেন। তাঁহাদের সমকালীন অন্যান্য গ্রন্থকারেরাও অনেক অনূদিত বৈজ্ঞানিক শব্দ ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন, পুস্তক ও প্রবন্ধাদিতে এখনও সে সকল শব্দের ব্যবহার আছে। "তাপমান", "ব্যোমজান", "অম্লজান", "যবক্ষারজান" প্রভৃতি শব্দ এখনও ব্যবহৃত হয়; কিন্তু ঘরে, দ্বারে, হাটে, বাজারে, সাধারণ কথাবার্তায় সে সকল শব্দের ব্যবহার দেখিতে পাই না। অন্তঃপুরিকাগণও তাপমান শব্দ ব্যবহার না করিয়া Thermometer শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন। "ব্যোমজান" বলিলে অধিকাংশ লোক অর্থই বুঝিতে পারিবেন না। তদ্ব্যতিরিক্ত দ্ব্যম্লজান (bioxide) প্রভৃতি শব্দ শ্রুতিকঠোর। পঞ্চাশ বৎসরেও এই সকল বৈজ্ঞানিক শব্দ প্রচলিত হইল না। Phenyle (ফেনিল) Carbolic acid (কার্ব্বলিক এসিড) বা Sulphate of Quinine (সালফেট অফ কুইনাইনের) অনুবাদের আবশ্যকতাই বা কি? শব্দ ও ভাষা মনের ভাব বিনিময়ের উপায়। বিশেষতঃ বৈজ্ঞানিক শব্দসমূহ কোন দেশের নহে, কোন জাতির নিজস্ব সম্পত্তি নহে। সাহিত্যের কথা পৃথক্, কিন্তু বিজ্ঞান সার্ব্বজনীন; সমগ্র পৃথিবীর। ফলে দেখা যাইতেছে বিজ্ঞানে জাতিভেদ নাই, ভাষাভেদ নাই এবং আমাদের দেশেও বৈজ্ঞানিকদিগের অনেকেই তাহাই মনে করেন। বঙ্গদেশেও প্রকৃতিপুঞ্জের ব্যবহারে য়ুরোপীয় বৈজ্ঞানিক পরিভাষা প্রচলিত।

কতকগুলি বৈজ্ঞানিক শব্দ আমাদের দেশে বহুকাল হইতে প্রচলিত আছে। তাহাদের পরিবর্ত্তে য়ুরোপীয় শব্দ ব্যবহার করায় কোন উপকারিতা নাই। কে বলিবে যে মেষ, বৃষ, মিথুন প্রভৃতি গ্রহগণের নাম Aries, Taurus, Gemini প্রভৃতি হউক। সৌরের পরিবর্ত্তে কি solar শব্দ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য? solar time না বলিয়া সৌর সময় বলাই ভাল বোধ হয়। সোরা বা যবক্ষারের স্থানে nitre ব্যবহার করা অতিমাত্রায় বিদেশী হইবে। স্নায়ু স্থানে nerve বা ধমনী স্থানে artery ব্যবহার করার কোন প্রয়োজন নাই। অনেক য়ুরোপীয় শব্দেরই আমাদের ভাষার সহিত সামঞ্জস্য নাই। কিন্তু যেখানে উপকারিতা ও অপকারিতা বিচারে উপকারিতা বেশী দেখা যায়, সেখানে সামঞ্জস্য বা শ্রুতিকঠোরতার দিকে দৃষ্টি রাখিলে চলিবে না। আবার এরূপ অনেক শব্দ থাকিতে পারে যাহা আধুনিক কালে অনূদিত হইলেও ভূয়িষ্ঠ ব্যবহার ও বহুল প্রচারের নিমিত্ত বঙ্গভাষায় সুন্দর স্থান পাইয়াছে। সে সকল শব্দের পরিবর্ত্তে য়ুরোপীয় শব্দের ব্যবহারের সার্থকতা নাই। ভগ্নাংশ ও দাশমিক শব্দ ত্যাগ করার আবশ্যকতা কি?

কিন্তু আমরা পুরাতন সংস্কৃত ভাণ্ডারের চিরাদৃত নামসমূহের উপেক্ষা করিতে পারি না। গণিত, দর্শন ও চিকিৎসাশাস্ত্রে অনেক বৈজ্ঞানিক শব্দের ব্যবহার আছে। সে ভাণ্ডারে আমরা এখনও সম্যকরূপে প্রবেশ করি নাই। তাহাতে কি মণিমুক্তা আছে তাহা আমরা এখনও বেশ জানিতে পারি নাই। সে শব্দ সমূহের বর্ত্তমান যুগে ব্যবহারের উপযোগিতা সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টি পড়ে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সে সকল শব্দের তালিকা ও চয়ন আবশ্যক।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সঙ্কলনের নিমিত্ত প্রথমতঃ চলিত শব্দ, দ্বিতীয়তঃ আধুনিক অনূদিত শব্দ, তৃতীয়তঃ খাঁটি সংস্কৃত শব্দ ও চতুর্থতঃ য়ুরোপ-প্রচলিত শব্দের চয়ন আবশ্যক। কেবল য়ুরোপীয় শব্দ ব্যবহার করা যাইতে পারে না। যেগুলির অনুবাদ আবশ্যক হইতে পারে সেগুলি যথাযথ গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য।

কএক সপ্তাহ অতীত হইল বঙ্গীয়-সাহিত্যপরিষৎ-মন্দিরে কেম্বেল মেডিকেল স্কুল প্রভৃতি কএকটি স্কুলের অধ্যাপকগণকে আহ্বান করা হয়। বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট য়ুরোপীয় চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষা সর্ব্বত্রই ইংরেজি ভাষায়

দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন; তৎসম্বন্ধে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কর্ত্তব্য কি ইহাই স্থির করা ঐ সভার উদ্দেশ্য ছিল। সকল অধ্যাপককেই য়ুরোপীয় বৈজ্ঞানিক পরিভাষার অনুকূল বলিয়া বোধ হইল। তাঁহারা চলিত বৈজ্ঞানিক শব্দের ব্যবহারেরও পক্ষপাতী ছিলেন। বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞান, চিকিৎসা প্রভৃতির শিক্ষা দেওয়া সকলেই উচিত বিবেচনা করিয়া বৈজ্ঞানিক পরিভাষার সঙ্কলনের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

এখন দেখা যাউক কিরূপে সঙ্কলন-কার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদিত হইতে পারে। ইহা একের বা দুই পাঁচ জনের কাজ নহে। ইহা একটি সমিতির কাজ। সেই সমিতিতে বিজ্ঞানাদি সর্ব্বপ্রকার শাখার অধ্যাপকগণের থাকা আবশ্যক। প্রত্যেক শাখার জন্য এক একটি ক্ষুদ্র শাখা-সমিতি করিতে হইবে। তাহারা প্রচলিত শব্দের, আধুনিক অনূদিত শব্দের, সংস্কৃত গ্রন্থাদিতে ব্যবহৃত শব্দের তালিকা বা সমষ্টি করিয়া য়ুরোপীয় বৈজ্ঞানিক ও শিল্প সম্বন্ধীয় কোষের সাহায্যে বঙ্গীয় পরিভাষা প্রস্তুত করিবেন। যেখানে তাহাতে কুলাইবে না, যেখানে যেখানে আধুনিক অনূদিত বা সংস্কৃত গ্রন্থাদিতে ব্যবহৃত শব্দের সামঞ্জস্য না থাকিবে, যে সকল আধুনিক অনূদিত শব্দ সমাজে আদৌ ব্যবহৃত হয় না, সেগুলি পরিত্যাগ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে য়ুরোপীয় বৈজ্ঞানিক শব্দ আমাদের নূতন কোষভুক্ত করিতে হইবে।

য়ুরোপে ব্যবহৃত বৈজ্ঞানিক শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় ব্যবহারের আপত্তির কারণ কিছুই দেখা যায় না। সুসভ্য দেশ মাত্রেই ভাষায় অনেক বিদেশীয় শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়। অন্য জাতির সহিত সংঘর্ষণের নৈসর্গিক ফল সেই জাতির ব্যবহৃত কতকগুলি কথার ব্যবহার। সেই জন্যই বঙ্গভাষায় ফিরিঙ্গী শব্দ, পারসী ও আরবী শব্দের বহুল ব্যবহার। ইংরেজি শব্দও সেই জন্য বঙ্গভাষায় এত প্রবেশ করিয়াছে। এরূপ বিদেশীয় শব্দের ব্যবহার অপরিহার্য্য। তাহা হইলে বৈজ্ঞানিক শব্দ ব্যবহারের বাধা [illegible] নূতন সৃষ্টি বা রচনা করা বহু অ[illegible] মতভেদও অবশ্যম্ভাবী। ব্যবসাবাণিজ্যে য়ুরোপীয় শব্দ ব্যবহার না করিলে অনেক অসুবিধাও আছে। য়ুরোপ ও আমেরিকায় একটি দ্রব্যের এক নাম, এদেশে অপর নাম, ইহাতে ক্ষতিরই সম্ভাবনা, লাভ কিছুই নাই। Bicarboxide of Sodaর পরিবর্ত্তে দ্যাঙ্গারক ক্ষার বলিলে য়ুরোপ আমাদের কথা বুঝিবে না, আমরাও তাহাদের কথা বুঝিতে পারিব না। য়ুরোপের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইতে, বিশেষতঃ ইংলণ্ড, জার্ম্মাণি ও ফরাসী দেশ হইতে অনেক ঔষধ এদেশে ব্যবহৃত হইতেছে। তাহাদের নাম গ্রীক বা লাটিন প্রকৃতিমূলক। সেই নামগুলিকে সংস্কৃত প্রকৃতিমূলক করিলে যে কত অসুবিধা হইবে তাহা চিকিৎসকগণই বেশ বুঝিতে পারিবেন। নূতন নামকরণের জ্বালায় সকলকে অস্থির হইতে হইবে এবং নূতন চলিবে কি না তাহাও সন্দেহ। রেলরোডের অনুবাদ লৌহবর্ত্ম বালপাঠ্য গ্রন্থেই দেখা যায়। অন্যত্র আদৌ ব্যবহার নাই। লৌহবর্ত্ম কথা অধিকাংশ লোকেরই দুর্ব্বোধ্য।

শ্রীসারদাচরণ মিত্র।

চিল্কা।

[সিন্ধুর উপকণ্ঠে সর্ব্বত্র পর্ব্বত বেষ্টিত চিল্কা-হ্রদ-দর্শনে।]

১

সিন্ধু-জননীর কণ্ঠ বাহুপাশে করিয়া বন্ধন
রজনীর শেষ যামে ওই হের নিদ্রা নিমগন
চিল্কা স্থকুমারী।
শুভ্র নেত্রে শুক-তারা চেয়ে আছে বালার বদনে,
কুঞ্চিত কুন্তলদল আশে পাশে লুটিছে চরণে,
স্নিগ্ধ নীলাম্বরী খানি উড়িতেছে উষার পবনে,
স্বচ্ছ নগ্ন বক্ষ মাঝে স্বপ্ন-উর্ম্মি মৃদু আন্দোলনে
পড়িছে বিথারি'।
নীরবে নীরদাকৃতি নভশ্চুম্বী তালীবনাবৃত
সচ্ছায় শ্যামল-কায় শৈলপুঞ্জ, মেঘ-মেদুরিত,
বিরচি' বিপুল ব্যূহ, দিক্-চক্র করিয়া বেষ্টিত,
রক্ষিছে প্রহরিরূপে প্রকৃতির নিভৃত-রক্ষিত
সে দিব্য কুমারী।
অনাঘ্রাত ঘনীভূত স্থধা যেন, ধরিয়া শরীর,
এলাইয়া আপনারে, ছড়াইয়া ধারা মাধুরীর,
রচিয়াছে কিশোরীর অপূর্ব্ব সে লাবণ্য রুচির,
নেত্র-পরশনে বুঝি হবে ম্লান সেরূপ মদির
স্বপন-সঞ্চারী!

২

সহসা বিচিত্র-পক্ষ লক্ষ লক্ষ বিহঙ্গম-রবে,
জাগি' বালা, আলু থালু দিঠি তুলি' চাহিল নীরবে।
পূর্ব্বাশার পানে ;—
অমনি পড়িল নেত্রে আধ ঘুমে আধ জাগরণে
রবির রক্তিমচ্ছবি ;—যেন মরি যাদু-পরশনে
গূঢ় মর্ম্ম-স্তর ভেদি' না জানি কি অবিদিত ক্ষণে
ফুটিয়া উঠিল বুঝি স্বপ্ন-ফুল স্মৃতি-সমীরণে
নিশি অবসানে!
শিথিলিল বাহু-বন্ধ ; ভুজ-ভঙ্গে গ্রীবা উত্তোলিয়া
বিস্ময়ে চাহিল বালা, দীর্ঘায়ত নেত্র-পুট দিয়া
সদ্য বিকশিত মরি সে মাধুরী বার বার পি'য়া
না মিটিল তৃষা তার! চিত্ত-হৃদ উঠিল নাচিয়া
কি অজ্ঞাত টানে।
মুহূর্ত্তে ভুলিয়া গেল জননীর আজন্ম যতন ;
নিমেষে কিশোর হিয়া আস্বাদিল তরল যৌবন ;
পাগলী করিল তারে নবোত্থিত প্রেমের স্বপন ;
গর্ব্ব ভুলি', সর্ব্ব ভুলি', আপনারে দিল বিসর্জ্জন,
কারে কে বা জানে!

৩

মধুর মধ্যাহ্ন তারে মধুস্রোতে করিল বিহ্বল,
দীপ্ত রবি কোটি করে স্পর্শ-স্থখে করিল চঞ্চল
যুবতীর হিয়া ;
কভু বা মেঘের খেলা শৈলচূড়ে রচে ইন্দ্রজাল,
কভু বক্ষে ফেলে ছায়া সৃজি' গূঢ় স্নিগ্ধ অন্তরাল,
প্রচণ্ড কিরণে কভু ধূম সম ধীরে গিরিমাল
ধীর পদে অপসরে, কভু তুঙ্গ তরঙ্গ বিশাল
ছুটে গরজিয়া।
তার পর,—অতি ধীরে সন্ধ্যা যবে নামে নম্র মুখে,-
দিক্ হ'তে দিগন্তরে ঢলে' পড়ে সে মথিত বুকে
অস্ত রবি, ঢালি' তার শেষ রশ্মি আরক্ত চিবুকে
সোহাগে যতনে, তবু প্রেম-গর্ব্বে মাতৃ-অঙ্কে স্থখে
রহে সে ডুবিয়া ;
রসময়ী চিল্কা-বালা সে মুহূর্ত্তে হয় রে চিন্ময়,
প্রেমের আনন্দ-স্থধা চিত্ত তার করে রে তন্ময়,
মরি সে অপূর্ব্ব-দৃষ্ট নব-ভুক্ত অমর প্রণয়
যামিনীর সারা যাম রাখে তারে সফলতাময়
স্বপ্নে নিমজ্জিয়া!

৪

মায়াময়ী প্রকৃতির তপ্ত অঙ্কে স্নেহ-রস-পানে
বর্দ্ধিত ভকত-চিত্ত ওই মত ক্রীড়া-রত প্রাণে
কিছু না জানিত ;

'বিষয়'-পর্ব্বত কত ঘিরি' সেই কুমারী-হৃদয়
কৌতূহলী নেত্র হ'তে রক্ষিবারে সদা রত রয়,
জননীর স্নেহ বিনা না বুঝিত অপর প্রণয়,
উতলা আপনা-ভোলা দিব্য প্রেম চিরমধুময়
ছিল অ-স্বাদিত।—
ছায়াচ্ছন্ন সে দুর্গম গিরি-চক্র ভেদি' অকস্মাৎ,
আমর্ম্ম করিয়া দীপ্ত, ঢালি' স্নিগ্ধ জ্যোতির প্রপাত,
চিন্ময় পুরুষ এক সমুদিল করি' আত্মসাৎ
অখণ্ড হৃদয়খানি! অভিনব ভাব-অভিঘাত
উচ্ছ্বসিল চিত;
ভুলিল জননী-স্নেহ; স্বপ্ন-মগ্ন রহি' জাগরণে
দেশকাল গেল ভুলি'; ছবি যবে লুকা'ল গোপনে,
না ভাঙ্গিল স্বপ্ন তবু; জননীরে বাঁধি' আলিঙ্গনে
সার্থক ভাবিল জন্ম; বিরহিণী মানস-মিলনে
আনন্দ-মজ্জিত!

শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী।

সামঞ্জস্য।

সমাজের অভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে চিরকালই দুইটি বিশেষ দল গঠিত হইয়া উঠিয়া থাকেন। এক দল যাহা কিছু আগের থাকে, তাহার প্রতি অতিরিক্ত পরিমাণ শ্রদ্ধা প্রকাশপূর্ব্বক তাহাকে রক্ষা করিতে বদ্ধপরিকর হন, আর একদল যাহা কিছু নূতন, তাহার প্রতি আত্যন্তিক আগ্রহে চঞ্চল হইয়া উঠিয়া তাহা প্রাপ্তির জন্য সর্ব্বস্ব পণ করিয়া বসেন। রক্ষণশীল ও উদারনৈতিক দলের এই বিরোধ আবহমান কাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে।

সম্প্রদায়ের উদ্ভব ও চরমবাদ।

সার্ব্বভৌমিকতার ভিতর যেমন একটা বৃহৎ ভাব আছে, সাম্প্রদায়িকতার ভিতর তেমনই একটা ক্ষুদ্রতা আছে। বদ্ধ ঘরের রুদ্ধ বায়ুর মতন বেষ্টন-রুদ্ধ মানবপ্রকৃতি একটা অস্বাস্থ্যকরতার বীজাণুতে ভরিয়া উঠিতে থাকে, এবং কালে তাহা দুশ্চিকিৎস্য উৎকট ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া পড়া তাহার নিশ্চিত হইয়া উঠে।

সার্ব্বভৌমিকতা

মতপ্রাধান্য-স্থাপন-চেষ্টার ভিতর একটা অস্বাভাবিক উগ্রতা আছেই। তর্কের মুখে জিতিবার ঝোঁকটাই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী হয়। আপনার মতের ভিতর মানুষ আপনাকেই প্রতিষ্ঠিত করিতে চায়, এবং সেই জন্য নিজের বিশেষ মতটি খণ্ডনের মুখে যখন পড়ে, তখন তাহাতে যাহা নাই, তাহারও আরোপ করিয়া, আপনার পরিকল্পনা দিয়া তাহার আয়তন বৃদ্ধি করিয়া থাকে; ফলে চরমবাদিত্ব অপরিহার্য্য হইয়া উঠে। একই ধর্ম্মাবলম্বী ভিন্ন ভিন্ন শাখার লোকদের একটু-খানি বিতণ্ডা শ্রবণ করিলে এ কথা যথেষ্ট প্রমাণিত হয়। যে নদী আপনার সমস্ত শক্তি প্রবাহ-মুখে অর্পণ করিয়া ধাবিত হয়, করাতের ধারের মত তাহা অবিরাম তীরকে কাটিয়া লইয়া যায় এবং কোথায় কোন্ পথে যাইতেছে, তাহা ভাবিবার তাহার অবকাশ থাকে না।

মতপ্রাধান্য স্থাপন চেষ্টা।

সামাজিক অভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন মতের সৃষ্টি হইতে থাকে এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইতে থাকে। প্রাচীন নিয়মের উপর শ্রদ্ধা একদিকে যখন প্রচুর হইয়া উঠিতে থাকে, পরিবর্ত্তনের দিকে অনুরাগ অপর দিকে তখন সুস্পষ্ট হইতে থাকে। ফলে দুই পক্ষই দুই প্রান্তদেশে গিয়া দাঁড়ায়। কিন্তু ভুল দুই তরফের গোড়াতেই থাকে এবং তাহাতে ফল যাহা হয়, তাহা আকারে বৃহৎ হইলেও ঠিক ক্ষুধা-তৃপ্তির মত রসশালী হয় না। একটা দিকের শেষ সীমায় দাঁড়াইলে অপর দিক্‌টা ভাল করিয়া দৃষ্টিগোচর হয় না, ইহা স্বাভাবিক। দুইটা দিক্‌কে ভাল করিয়া দেখিতে গেলে মাঝখানে দাঁড়াইতে হয়, এবং যে জিনিসটাকে পাইবার জন্য হাতের

চরমবাদের অসম্পূর্ণতা।

জিনিসটাকে ছুঁড়িয়া ফেলা যায়, তাহা পাইবার আগে তুলনায় কতটা লাভাংশ হাতে থাকিবে, তাহা আগে খতাইয়া দেখিতে হয়।

কিন্তু, গোল হইতেছে এই যে,আকাঙ্ক্ষিত বিষয়টি সকল সময় ইচ্ছানুরূপ রূপে পাওয়া যায় না। আজ আমাদের নিশ্চল সমাজের ভিতর যে দ্বন্দবেগটি জাগিয়াছে, আমাদের প্রবাহ-হীন অন্তর্জীবনের নদীটি যে আজ ঘাতপ্রতিঘাতে তরঙ্গ-ক্ষুব্ধ হইয়া কল্লোল-মুখর হইয়া উঠিয়াছে, আমাদের কারা-প্রাচীরের শিথিল জীর্ণাংশ পাতিত করিয়া যে বায়ুবেগ আজ ঝঞ্ঝার ঘূর্ণাতাল সৃষ্টি করিতেছে, তাহা যে আমাদের জীবনের ধারাকে বিভিন্ন দিকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া দিবে, সহজ স্বচ্ছন্দতার ভিতর স্থির হইতে দিবে না ইহাও নিশ্চিত। দেশভেদে কেবল প্রাকৃতিক তারতম্যই ঘটিয়া থাকে না।

আকস্মিক সচলতার ঘূর্ণা।

দেশভেদে কেবল তারতম্যই ঘটিয়া থাকে না, লোক-প্রকৃতিতেও ঠিক্ তাহারই অনুযায়ী বিশেষ বিশেষ উৎকর্ষ ও অপকর্ষ ঘটিয়া চলিতে থাকে। সৃষ্টির যে বৈচিত্র্য-লীলা জলে স্থলে আকাশে তৃণে লতায় উদ্ভিজ্জে স্থাবরে জঙ্গমে নিত্য নব রূপের প্রকাশ করিতেছে তাহা যে মানুষের কাছে আসিয়া থামিয়া যাইবে, এরূপ কেহ আশা করিতে পারেন না, এবং তাহা সমীচীনও হইতে পারে না; সুতরাং বিভিন্ন রুচি ও ইচ্ছার, আকাঙ্ক্ষা ও বেদনার,উল্লাস ও আনন্দের, প্রাপ্তি ও প্রকাশ একই ধারাপথে কখনও প্রবাহিত হইতে পারে [illegible] হইবার [illegible] [illegible] মঞ্জরী-[illegible] [illegible] অবনত করিয়া তোলে ও অমৃত-ফল-দানে দেশবাসীর পরম তৃপ্তি বিধান করে, তাহাকে শীতপ্রধান প্রদেশের তুষার-স্তূপের ভিতর কিছুতেই পাওয়া যাইবে না, এবং সেথানকার ফলবিশেষকে ও তরুবিশেষকে আমাদের তাপদীর্ণ রৌদ্রদাহময় ভূমিতে আমরা কিছুতেই জন্মাইতে পারিব না। নিরপেক্ষ ও আত্মনিষ্ঠভাবে পৃথিবীর খুব কম ব্যাপারই চলিতেছে। সৃষ্টি একটা বিরাট্ জালের মতন, তাহার প্রত্যেক গ্রন্থি যোজিত, প্রত্যেক সূত্র প্রত্যেক সূত্রের সঙ্গে বিজড়িত। পৃথক্, বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্রভাবে কিছুই নাই; সুতরাং আমরা যদি আশা করি যে আমাদের মানসিক ব্যাপারসমূহ এমনভাবে ঘটিয়া উঠিবে যে, তাহা এই পরস্পর-সাপেক্ষ বন্ধন-গ্রন্থির রচনাকে ছাড়াইয়া যাইবে, তাহা হইলে অসম্ভব আশা ছাড়া আর কিছু করা হয় না। সচরাচরই দেখিতে পাওয়া যায় যে, যেখানে প্রভূত পৈতৃক সম্পত্তি থাকে, সেখানে উত্তরাধিকারিবর্গ মনুষ্য-সমাজের কর্ম্মশীলতার নীতির প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা প্রকাশ করে না। মনুষ্যত্বের তুঙ্গ-শিখরের বন্ধুর পাষাণ-স্তূপকে লঙ্ঘন করিতে বিলাসের সৌকুমার্য্য কখনও সহায়তা করে নাই, বরঞ্চ সর্ব্বতোভাবে তাহার পরিপন্থী হইয়াছে। ঐশ্বর্য্যশালিনী জননীর সন্তানের মত আমাদের এই প্রাচ্য জাতি প্রকৃতির নিকট হইতে যে আনুকূল্য প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা তাহার কর্ম্ম-চেষ্টাকে সহস্র প্ররোচনায় জাগ্রত রাখিতে পারিতেছে না। তৈলহীন প্রদীপের মত তাহা আকস্মিক তেজে জ্বলিয়া উঠিলেও আবার তখনই নিবিয়া যাইতেছে। জীবনের সমস্ত প্রয়োজনীয় ব্যাপার যে তাহাকে নিজে গড়িয়া লইতে হইবে না, যে মাতৃস্নেহ সে ভোগ করিতেছে, তাহা যে তাহার জন্য সৃষ্টির অনাবৃত পথে ছায়া রচনা করিয়া আছে, সেখানে যে তাহার নিজের চে[illegible] ও নিজের উদ্যোগের কিছুমাত্র আবশ্যক হইবে না, তাহা তাহার পক্ষে বিস্মৃত হইবার মত একটা সহজ ব্যাপার বোধ হইতেছে না; সুতরাং ইচ্ছায় অনিচ্ছায় একটা নির্ভর পরায়ণতা অদৃষ্টবাদের মত তাহার মনস্তরের ভিতরে নিহিত হইয়া গিয়াছে। জীবনে তাহার তেমন কিছু কঠোরতা নাই বলিয়াই সে কঠোর হইয়া উঠিতে পারে নাই। পক্ষান্তরে, শীতপ্রধান দেশের অধিবাসীরা যে কর্ম্মশীলতার শক্তিতে সভ্য জগতের মস্তকের উপরে বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়াছে, তাহার মূলে কোনও উপদেষ্টার উপদেশ অথবা নীতিবিদের নীতি-শাসন ভূমি গঠন করে নাই, প্রাকৃতিক কঠোরতায় তাহা স্বতঃসিদ্ধরূপে স্ফূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। যাহাকে নিজের উপার্জ্জনের

দেশগত বিভেদ।

বিষয়ের পরস্পর সাপেক্ষতা।

প্রাকৃতিক আনুকূল্য ও প্রতিকূলতা।

প্রাকৃতিক গঠন।

দ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হয়, জাড্যদোষ তাহাকে কচিৎ স্পর্শ করে। কারণ, সে যে তৈরি কিছুই পাইবে না, তাহাকে সব নিজের হাতে তৈরি করিয়া লইতে হইবে,—তাহার তাগিদে সে বিরামসুখ উপভোগ করিতে পারে না। প্রকৃতির আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য তাহাকে ক্রমাগতই যুঝিতে হইয়াছে, উপায় নির্দ্ধারণ করিতে হইয়াছে, উপকরণ সৃষ্টি করিতে হইয়াছে, গোড়াতেই প্রকৃতির সঙ্গে তাহাদের যে একটা বোঝাপড়া হইয়া গিয়াছে, তাহার জের তাহাদের কস্মিন্‌কালেও মিটিতেছে না।

দুর্ভাগ্যের বিদ্যালয়ে যাহাদের শিক্ষা সাধন হয়, তাহাদের ভিতর একটা দুর্দ্ধর্ষতার বিকাশ ঘটিয়া থাকে। শস্যবিরল ক্ষেত্রে ও তুষারাচ্ছন্ন আকাশের নীচে বাস করিয়া কাঠিন্যের তাহারা একটা চরম শিক্ষা পাইয়াছিল, এবং তাহা তাহাদের মনুষ্যত্বের উপাদানকে একটা বিস্ময়কর অসাধারণত্ব দান করিয়াছিল।

দুর্ভাগ্যের শিক্ষা।

শীত-সঙ্কোচহীন আমাদের এই প্রাচ্যদেশের সঙ্গে চিরকালই তাই তুষার-প্রদেশের একটা পার্থক্য ঘটিয়া রহিয়াছে, একটুখানি শিথিলতার ভিতর তাই অনেকখানি প্রাচুর্য্য মিশিয়া তাহাকে পারিপার্শ্বিক সমস্ত জাতি হইতে খানিকটা পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছে। তাহার অশনে বসনে কথনে প্রয়োজনে অতিরিক্ততা সংযুক্ত হইয়া গিয়াছে. তাহার পরিচ্ছদে, তাহার আচারে, ব্যবহারে, নিয়মে, শাসনে, একটা অনাবশ্যক প্রাচুর্য্য সৃষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। কাব্য যখন সে লিখিতে বসিয়াছে, তখন তাহার চরণে চরণে উপমা ও অলঙ্কার ফেনিল হইয়া উঠিয়া তাহার বক্ষ্যমাণ বিষয়ের উপর দিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে, নিয়ম যখন সে রচনা করিয়াছে, তখন তাহার ঘন-সন্নিবিষ্ট গ্রন্থিজাল উদ্দিষ্ট বিষয়কে অসম্ভবরূপে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে, শাসন-বিধি যখন সে সৃষ্টি করিয়াছে, তখন শৃঙ্খলের উপর শৃঙ্খল গড়িয়াছে, প্রাচীরের উপর প্রাচীর উত্তোলন করিয়া তাহার জটিলতার মুখ্য উদ্দেশ্যকে লুপ্ত করিয়া ফেলিয়াছে। বর্ষার জলধারা-ধৌত ভূমিতে লতা যেমন প্রচুর পল্লবভারে তরুকে আচ্ছন্ন করিয়া পুষ্ট হইয়া উঠিতে থাকে, তেমনই অনুভূতির অসংযত প্রবলতা তাহাকে পদে পদে অপরিসীম প্রাচুর্য্যভারে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে। হিমপ্রধান দেশে ঠিক্ ইহার বিপরীত, তাহাদের যাহা কিছু আছে সব একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের ভিতর বদ্ধ। অর্থ-নীতি সতর্ক কৃপণের মত। সে যাহা কিছু খরচ করিয়াছে, তাহারও ভিতর তাহার মাপ জোখ সীমা সরহদ্দের কড়াক্কড় পাহারা খাড়া হইয়া গিয়াছে। বাজে খরচকে সে তাহার হিসাবের পাতা হইতে একেবারে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছে এবং অনাবশ্যককে ভুলিয়াও কোথাও একটু আমল দেয় নাই।

প্রাচ্য স্বভাব-সুলভ প্রাচুর্য্য ও আতিশয্য।

কিন্তু প্রাচুর্য্য জিনিসটা সকল সময়েই মানুষের জীবনে আনুকূল্যজনক হয় কি না তদ্বিষয়ে সন্দেহ আছে। গাছের চারা বাঁচাইয়া তুলিতে যথেষ্ট জলের দরকার হয় বটে, কিন্তু তজ্জন্য জলপ্লাবন যে তাহার জীবন-রক্ষার বিশেষ সহায়তা করে, এরূপ বলা যায় না। সমাজের অন্যায় অত্যাচার হইতে রক্ষা করার জন্য শাসনবিধি অপরিহার্য্যতঃ প্রয়োজনীয়; কিন্তু তাহা বলিয়া সে বিধিকেই একান্তভাবে কেহ চাহিতে পারে না। বাহিরে যে প্রাচীর তোলা যায় সেটা বাহিরের সীমা রক্ষার জন্যই কল্পিত হইয়াছে, তাহা স্ফীত হইয়া ভিতরের সমস্ত স্থান গ্রহণ করুক, এরূপ বিভীষিকাত্মক ব্যাপার কাহারও কাছে লোভনীয় হইতে পারে না; কিন্তু সত্য কথা যদি বলিতে হয়, তবে একথা বোধ হয় কোনও তরফ হইতে অস্বীকার্য্য নয় যে, প্রাচীন ভারত তাহার অসম্ভবরূপ স্ফীত বিধিবিধানের প্রাচীর দিয়া তাহার অভ্যন্তরস্থ অধিবাসিগণকে পিষ্ট করিয়া ফেলিবার মত অবস্থায় আজ আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, সুতরাং জগতের সমস্ত আত্যন্তিকতার যে গতি, অপরিহার্য্যতই তাহা পাইতে হইবে, আজ তাহা হইতে তাহাকে বাঁচাইবার পথ দেখা যাইতেছে না।

বিধি বিধানের আত্যন্তিকতা।

আত্যন্তিকতার অনিবার্য্য ফল।

ব্যাধির প্রথম সূচনায় চিনিয়া উঠা দুষ্কর। ভারত-

বর্ষের ধমনীতে যখন এই আতিশয্যের জ্বরতাপ মিশ্রিত হইয়াছিল, তখন হয়ত তাহার আদৌ উপলব্ধি হয় নাই, কিন্তু রোগ প্রতিকার দ্বারা নির্জিত না হইলে থামিয়া থাকে না। সুতরাং ক্রমশঃ তাহার বিকারের ঘোর আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল, এবং তাহার স্বাস্থ্যতেজ সমুজ্জ্বল চক্ষের দৃষ্টি আবিল হইতে যখন আবিলতর হইয়া উঠিতে লাগিল, তখন সে নেশার ঝোঁকেই তাহার বয়ন-তন্তু টানিয়া যাইতে লাগিল, তাহার কম্পমান লক্ষ্যভ্রষ্ট হস্তের রচিত বিকল জটিলতার দিকে ফিরিয়া চাহিবার তাহার আর অবকাশ রহিল না।

ব্যাধির বিকার।

তরুর বহুধা বিভক্ত শাখা অসংখ্য মুখে পল্লব বিস্তার করিলেও তাহার মূল যেমন গোড়ায় একটিই, মনুষ্যসমাজ তেমনই সম্প্রদায়ে, জাতিতে, বর্ণে, ধর্ম্মে, অগণ্য ভাগে বিভক্ত হইলেও মূল তাহার একটি স্থলেই নিহিত। প্রাচীন ভারতবর্ষই যে শুধু এরূপ আতিশয্য দ্বারা আক্রান্ত হইয়া শক্তিক্ষয় করিয়াছে তাহা নহে, প্রত্যেক জাতির উত্থান, পতন ও বিলোপের সঙ্গে এই একই কাহিনী গ্রথিত। গ্রীস্ ও রোম জগতের সমস্ত জাতির উপরে একদিন আপনার বিজয়-বৈজয়ন্তী উড়াইয়াছিল। দিগ্ দিগন্তরে শোনা গিয়াছিল শুধু তাহাদের অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা শব্দ—কিণাঙ্কিত ভুজাস্ফালন, উচ্চ তুর্য্যনাদ; দেশ দেশান্তর হইতে দেখা গিয়াছিল, শুধু তাহার স্বর্ণমণ্ডিত মুকুটের আলোক-দীপ্তি। তাহাদের স্পর্দ্ধিত বীরত্ব বিশ্বমানবের সমস্ত সুকুমার ভাবকে দহন করিয়া হবিপুষ্ট বহ্নির মত জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, এবং সে দহনের উগ্র তেজে আপনি ভস্মসাৎ হইয়া গিয়াছিল। . . . . . .

তরু জীবনধারণ করে ভূমির রসপুষ্ট হইয়া। যে বিশাল বনস্পতি যুগের পরে যুগের সাক্ষ্য বহন করিয়া পল্লব-প্রাচুর্য্যে দিঙ্-মুখ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, তাহা শুধু তাহার মূলকে আশ্রয় করিয়াই বাঁচিয়া আছে। যে তরুর মূল যত গভীর হয়, তাহার জীবন তত দীর্ঘ হয়। জাতি ও সমাজ এই তরুর মতই বিশ্বমানবের অসীম ক্ষেত্রে জন্মগ্রহণ করে। সেই বিশেষ জাতি ও বিশেষ সমাজ তত বেশী আয়ুসমন্বিত হইয়াছে, বিশ্বমানবের চিত্তের রসধারার গভীরতার ভিতর যাহার মূল যত বেশী বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে।

ব্রাহ্মণ একদিন উঠিয়াছিলেন মানবীয় শক্তির চরম শিখরে, এবং সাধনার শেষ সীমারেখাতে। পুত্র পিতার নিকট হইতে কি পাইয়াছে তাহা যেমন সমালোচনার অতীত, তেমনই ভারতবর্ষ ব্রাহ্মণের নিকট হইতে কি পাইয়াছিল তাহাও সমালোচনার অতীত। যে ব্রাহ্মণ মাতার মত ভারতবর্ষকে আপনার অপূর্ব্ব ধীশক্তিতে পুষ্ট করিয়াছিল, শিক্ষকের মত আপনার অধীত বিদ্যার গৌরবে গৌরবান্বিত করিয়াছিল, জ্ঞানে সমৃদ্ধ করিয়াছিল, নীতিতে অতুল্য করিয়াছিল,—তাহাকে গঠন করিয়াছিল, রচনা করিয়াছিল, নিয়মিত করিয়াছিল, নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিল, ভূষিত করিয়াছিল, কীর্ত্তিসমন্বিত করিয়াছিল—সেই অতীত ব্রাহ্মণকে আজ আমরা সমালোচনা করিতে পারি না, করিবও না। ভারতবর্ষ তাহার শ্রেষ্ঠতার তুঙ্গ শিখর হইতে অধঃপতনের যে নিম্নতম তলে আজ দাঁড়াইয়াছে, তাহার কৈফিয়ত ন্যায়তঃ ভারতবর্ষ আজ যাহার নিকট দাবী করিতে পারে, তাহার নিকটই করিতেছে।

অতীত ব্রাহ্মণ।

কৈফিয়তের দাবী।

স্বমত-প্রাধান্য স্থাপনের জন্য যখন মানুষ যুঝিতে থাকে, তখন তাহার মধ্যে খাঁটি যে জিনিষটা পাওয়া যায়, তাহাকে dogma বলা গিয়া থাকে। বৌদ্ধধর্ম্মের সঙ্গে তখন ব্রাহ্মণের প্রচণ্ড সংঘর্ষণ চলিতেছিল, এবং নিম্নভূমির মতন বৌদ্ধ ধর্ম্মের বন্যা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের উপরে স্ফীত হইয়া উঠিতেছিল। মজ্জমান ব্রাহ্মণ্য-প্রতিভা এ সময়ে যাহা অবলম্বন করিয়া বাঁচিল, তাহা সর্পে রজ্জুভ্রমের মত শঙ্কাত্মক। ব্রাহ্মণ এই সময়ে প্রাকৃতকে ছাড়িয়া অতি প্রাকৃতের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, ধর্ম্মকে বাঁচাইতে গিয়া অপধর্ম্মের সৃষ্টি করিলেন, বিধিকে রক্ষা করিতে গিয়া অবিধির নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন। ব্রাহ্মণ্য-প্রতিভার গৌরব-স্তম্ভের উপর ভারতবর্ষ এতাবৎ কাল অবলম্বিত মস্তকে দণ্ডায়মান ছিল, সুতরাং ব্রাহ্মণের পতনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের পতন ঘটিল।

স্বমত প্রাধান্যের অপচেষ্টা।

অস্তাচলাবলম্বী তপনের মত প্রভাহীন, একটা বিরাট্

শক্তির লুপ্তপ্রায় ছায়ার মত; এই ব্রাহ্মণ দোর্দ্দণ্ড প্রতাপের বিলুপ্ত ক্ষমতার মাংসাচ্ছাদনহীন কঙ্কালমাত্র; এই ব্রাহ্মণ অতুল কীর্ত্তি-সৌধের ভূপতিত ভগ্নাবশেষ,—প্রতিভার মৃত শব এই ব্রাহ্মণ—ইহারই দ্বারে জাতি আপনাকে বাঁধিয়া রাখিয়া স্থবিরের মত স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে এবং যাহা চলিয়া গিয়াছে এবং আর যাহা পাইবার নহে, সেই দূর অতীতের দিকে চাহিয়া চাহিয়া চক্ষু অন্ধ করিতেছে।

জাতীয় মুখাপেক্ষিতা।

নদীর স্রোত তীর গড়িয়া চলে, তীর নদীর স্রোতকে গড়ে না। সামাজিক অভিব্যক্তি হইতে লোকসমাজের বিধি বিধান স্বতঃ উৎপন্ন হইয়া চলিতে থাকে, এবং নদীর চির-সচল ধারার মতই তাহা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নূতন তীরভূমি রচনা করিয়া চলিয়া থাকে। জীবনের লক্ষণ গতি, ক্রিয়াশীলতা, এবং পরিবর্ত্তন তাহার অপর দিক্। কিন্তু ভারতবর্ষে সর্ব্বথা এই জীবনের লক্ষণ বর্জ্জিত হইয়া ওঠে নাই কি? তাহার সামাজিক অভিব্যক্তি তাহার বিধি বিধানকে জন্মদান করে নাই, বিধি বিধান তাহার সামাজিক অভিব্যক্তিকে সৃষ্টি করিবে বলিয়া খাড়া হইয়াছিল। কিন্তু আবহমানকাল বিশ্বপ্রকৃতিই মানুষকে শাসন করিয়াছে, মানুষ বিশ্বপ্রকৃতিকে শাসন করে নাই; সুতরাং পরবর্ত্তী ভারতের এই অসম্ভব চেষ্টাও ফলবান্ হয় নাই। তাহার সমস্ত সতর্কতা ও বিচক্ষণতাকে ফাঁকি দিয়া তাহার খাড়া তীরের পিছনে যে অন্তঃপ্রবাহী মন্থর জল-স্রোতটি শুকাইয়া গেল, তাহাকে আর সে খনন করিয়াও উদ্ধার করিতে পারে নাই।

গতি—স্বতশ্চলতা।

বৃহৎ শক্তি যখন ব্যক্তিবিশেষের স্বেচ্ছানুগ হইয়া পড়ে, তখন অপব্যবহার হইতে কচিৎ তাহাকে বাঁচান যায়। পরবর্ত্তী যুগের ব্রাহ্মণ যখন দেখিলেন আর্য্য অনার্য্য মিলিয়া সমগ্র জনপদবাসী তাঁহারই উচ্চারিত বাণীর জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, রাজন্যবর্গ হইতে দ্বারপ্রান্তাগত ভিক্ষুক তাঁহারই অঙ্গুলিধৃত হইয়া চলিতেছে, তখন কীটরূপে অহমিকা ব্রাহ্মণের চিত্ত-কোষে যে ছিদ্র রচনা করিল, অজ্ঞানতার অন্তরালে প্রতিদিন তাহার আয়তন বাড়িয়াই চলিতে লাগিল। আপনার শ্রেষ্ঠ ধীশক্তিতে জনসাধারণের দুর্ব্বল বোধকে নির্ম্মল করিয়া, দুর্লঙ্ঘ্য বিধান দিয়া তাহাদের হস্ত পদ শৃঙ্খলিত করিয়া, তাহাদের স্বতন্ত্র বিচার-বুদ্ধিকে অনুশাসনের ফুৎকার নির্ব্বাপিত করিয়া ব্রাহ্মণগণ তখন যে যুগের অবতারণা করিলেন, তাহাকে নৈতিক দস্যুতা বলিয়া অভিহিত করিলে যে খুব বেশী অত্যুক্তি করা হয়, তাহা মনে হয় না।

শক্তিমদ ও অহমিকা।

একেশ্বর প্রভুত্ব অত্যাচার ও অহমিকার নামান্তর এবং পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা তিক্ত পানীয়, খণ্ডিত গর্ব্বের আত্ম-বোধের বেদনা। বড় যখন ছোটর কাছে অক্ষমতায় নতজানু হয়, স্পর্দ্ধা যখন জীর্ণ পত্রস্তূপের মত দ্বন্দ্বের বাত্যাবেগে ছন্ন হইয়া উড়িয়া যায়,—সত্য যখন অন্তরে যত প্রকট হইয়া ওঠে বাহিরে তাহাকে স্বীকার তত অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়,—তখন সেই অসহ্য তিক্ততাকে গলাধঃকরণ করা অতিশয় দুষ্কর। ব্রাহ্মণ আপনার শক্তিহীনতা যত অনুভব করিতে লাগিলেন, সমাজের কাছে তাহার স্বীকারোক্তি ততই অসম্ভব হইয়া উঠিতে লাগিল, এবং তাহাকে সমাজের দৃষ্টি হইতে গোপন রাখিবার জন্য প্রয়াস ততই বাড়িয়া যাইতে লাগিল। প্রাচীন যুগে ব্রাহ্মণ্য-শক্তি যে অসাধারণ উচ্চ আদর্শ স্থানীয় হইয়া উঠিয়াছিল, মধ্যযুগে তাহার কিছুমাত্র অবশিষ্ট রহিল না, মিথ্যা জল্পনা ও কল্পনার ছদ্ম মূর্ত্তিকে আশ্রয় করিয়া সেই অগ্নি-দীপ্ত যুগান্তের নিঃশেষিত অবশেষ অসম্বদ্ধ প্রলাপ ও অযৌক্তিক ধারণার ভিতর বাঁচিয়া রহিল। নদীর স্রোত যখন মরিয়া যায়, প্রবাহ যখন পঙ্কাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, তখন তাহাকে পল্বলের ভিতর বদ্ধ করিয়া রাখিতে কিছুমাত্র কষ্ট হয় না। তন্দ্রাতুর নিদ্রাস্তিমিত-নেত্র ভারতবর্ষ তাহার গৌরবোজ্জ্বল দিবসের অবসানে এলায়িত শিথিল অঙ্গে তখন পদক্ষেপ করিতেছিল, সুতরাং তাহার পুরোবর্ত্তী পথচালক তাহাকে যে পথে হাত ধরিয়া লইয়া যাইতেছিল, সেই সহজ সাচ্ছন্দ্যের আরাম ছাড়িয়া নূতন পথের অনিশ্চয়তা ও দ্বিধার কঠোর দ্বন্দ্বের ভিতর আর সে প্রবেশ করিতে পারিল না।

খণ্ডিত গর্ব্বের আত্মবোধ।

ব্রাহ্মণের নায়কত্ব।

যখন যে জাতি, যে সমাজ সম্প্রদায়বিশেষ অথবা ব্যক্তি-বিশেষের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়, তখন সেই নেতার পতনে তাহাদের পতন অনিবার্য্য হইয়া থাকে। যাহারা নিজে

চলিতে পারে না, অপরে যাহাদের টানিয়া লইয়া যায়, তাহারা তাহাদের পশ্চাতের সেই পরিচালনা শক্তির অভাব ঘটিলেই নিশ্চলতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ তখন বিধি অবিধিতে মিলাইয়া, আর্য্যে অনার্য্যে মিলাইয়া আশু ও অসম্ভবে মিশাইয়া, সত্যে ও কল্পনায় জড়িত করিয়া যে একটা ধর্ম্ম খাড়া করিলেন, তাহা ধর্ম্ম কি না, তাহা ইদানীং অনেকের চিন্তনীয় বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু সেদিন সেই বিপ্লব সঙ্কুলিত রাত্রির তিমিরের মাঝখানে দাঁড়াইয়া সমগ্র ভারতবর্ষীয় সমাজ যে ধূমাচ্ছন্ন দীপের রক্তশিখা দেখাইয়াছিল, তাহাকেই তাহাদের জীবনের ধ্রুবতারা বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছিল।

ভারতের নৈতিক আকাশে এ সময়ে যে ঝড় বহিতেছিল, তাহার দাপট লাগিয়া ব্রাহ্মণের হাতের কম্পমান দীপশিখা নিভিয়া গেল, সুতরাং সেই অন্ধকারে বসিয়া ব্রাহ্মণ তখন যে জাল বয়ন করিতে লাগিলেন, তাহা প্রতিদিন জটিল হইতে জটিলতর হইয়া উঠিতে লাগিল। ব্রাহ্মণ তখন ভুলিয়া গেলেন যে, একমাত্র যোগ্যতার ক্ষমতাই বিশ্বপ্রকৃতির ও বিশ্বস্রষ্টার নিকট একমাত্র ছাড়পত্র; অতীতের দোহাই সেখানে খাটে না, বর্ত্তমানকে নিয়ন্ত্রিত করিতে বর্ত্তমানই চাই। সকলের উপরে যে থাকিতে চায়, তাহাকে সকলের উপরে থাকিবার শ্রেষ্ঠতা থাকা চাই।

জাতির শৈশব যৌবন ও বয়ঃপ্রাপ্তি।

মানুষের মত জাতিকেও শৈশব, যৌবন ও জরা এই অবস্থাত্রয়ের ভিতর দিয়া যাইতে হয়। প্রাথমিক অবস্থায় জাতি শিশুর মত চিরচাৰ্ণ প্রথা ও বিধানের হাত ধরিয়া চলে, কৈশোরে বিশ্বের ক্রীড়া প্রাঙ্গণে অপরাপর জাতিসমূহের আচার ব্যবহার উন্নতি অবনতির ভিতর বিচরণ করিয়া সে নিজের একটা স্বতন্ত্র বুদ্ধি ও বিচারকে গড়িতে থাকে, এবং যৌবন সেই গঠিত অগঠিত ভাবসমূহকে ঈপ্সিত ও অনীপ্সিত ভাব সমূহকে পূর্ণতররূপে নিজের জীবনে ব্যক্ত করিয়া তোলে। প্রথম অবস্থায় থাকে শুধু নিশ্চেষ্ট নির্ভরপরায়ণতা, দ্বিতীয় অবস্থায় জাগে দ্বন্দ্ব, সমালোচনা ও পর্য্যালোচনা, নেতি নেতি বিচার, লক্ষ্যের অনিশ্চয়তা, দ্বিধার সংশয়, গ্রহণ ও বর্জ্জনের মীমাংসাহীন দুর্ভর সমস্যা, অর্দ্ধেক সাহস ও অর্দ্ধেক শঙ্কা। তৃতীয় অর্থাৎ শেষ অবস্থায় দ্বন্দ্বে, দ্বিধায়, বিমুখতায়, অভিযোগে যে বেগ সংঘাত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, তাহা প্রাচীন জীর্ণতাকে বিদীর্ণ করিয়া তাহার শ্লথবন্ধন শৈবালচ্ছিত প্রাচীরের ক্ষয়িত ইষ্টকপুঞ্জকে ভূপাতিত করিয়া নবযুগের অবতারণা করে। দ্বিধা দূরীভূত হয়, তর্ক মীমাংসিত হয়, বিরুদ্ধবাদ খণ্ডিত হয়, সমগ্র সমাজ তখন একটা মহাসত্যের ধারণায় অনুপ্রাণিত হইয়া এক সমভূমে আসিয়া দাঁড়ায়, সমস্ত সমাজের চিত্ত তখন এক মহামিলনে মিলিত হয়।

টেনিসন লিখিয়াছেন—

"The old order changeth yielding
place to new,
And God fulfils himself in many ways
Lest one good custom should corrupt
the world."*

বিশ্বসৃষ্টির ধারা।

পরিবর্ত্তন বিশ্বসৃষ্টির অঙ্গীভূত ধারা। ভাল হোক আর মন্দ হোক, একটা নিয়ম চিরকাল স্থির থাকিতে পারে না, জগৎ সৃষ্টির নিয়মানুসারে তাহাকে বদলাইতে হইবেই। শ্রেষ্ঠত্বের জোরেও মানুষ কিছু টিকাইয়া রাখিতে পারে না। যুগে যুগে তাহাকে ভাঙ্গিয়া পুনর্গঠন করিতে হয়। এক কালের প্রয়োজন যাহা সৃষ্টি করিয়াছে, অন্যকালের প্রয়োজন তাহা মিটাইতে পারে না, বলিয়াই তাহাকে বিনষ্ট হইতে হয়। সুতরাং অতীতকে বাঁধিয়া রাখার প্রয়াস নিষ্ফল। মানুষের জীবন বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ লইয়া; তাহার সমস্ত উদ্যম ও সমস্ত শক্তি দিয়া প্রতিনিয়তই গড়িয়া লইবার জন্য জাগিয়া থাকাই মনুষ্য জীবনের প্রধান কাজ।

সংঘর্ষণ যখন উপস্থিত হয়, তখন খানিকটা নষ্ট হওয়া

* নূতনকে আসন ছাড়িয়া দিয়া প্রাচীন ধারা নিত্যকাল পরিবর্ত্তিত হয়। বিধাতার বিধি বহু বিচিত্র উপায়ে আপনার সার্থকতাকে গড়িয়া তোলে এবং বিশ্ব সংসারের গতিকে একটি মাত্র ধারার ভিতর বদ্ধ হইয়া আপনার নিশ্চলতার সৃষ্ট পঙ্কে বদ্ধ হইয়া মৃত্যুগ্রস্ত হইতে দেয় না।

অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠে। কিন্তু তজ্জন্য তাহাকেই চরম ফল বলিয়া ধরিয়া লইলে চলে না। কিছু-মাত্র ক্ষতি স্বীকার করিব না, হিসাবের খাতায় সমস্তটা জমাই বজায় রাখিব, এমন আকাঙ্ক্ষা করিলে অসম্ভব অতিশয়ের আকাঙ্ক্ষা করা হয়। যাহা প্রাকৃতিক নিয়ম তাহা বিধাতার নিয়ম, সুতরাং তাহার উপর রাগ করিলে বিশেষ কিছু ফললাভ করিবার আশা মোটেই নাই। খোদার উপর কারসাজি—সেটা নেহাৎ-ই মানুষের শক্তির অতীত।

বিনাশের ভিতর লাভের অংশ।

বর্ত্তমান যুগে নব্যভারত নানারূপে প্রাচীন ভারতকে একেবারে ছাড়াইয়া, অতিক্রম করিয়া, লঙ্ঘন করিয়া, বিসদৃশ নবীন রূপ গ্রহণ করিয়া বিশ্বমানবের সহযোগিতার ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়াছে; অনেকটা তাহার ছাঁটা পড়িয়াছে, তাহার অনেকটা বেশপরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহার নূতন বৎসরের হিসাবের খাতা গত শতাব্দীর সঙ্গে কিছুতেই আর মিলিতেছে না! নিরাপদ বন্দরের যে নিভৃত বিজন কোণটিতে ভারতবর্ষের জাতীয়-জীবন-তরীটি শাস্ত্রীয় বিধান ও অনুশাসনের অন্তরালে বাঁধা ছিল, সেখান হইতে সে আজ স্রোতের দুর্ব্বার বেগে বন্ধনবিমুক্ত হইয়া মুক্ত নদী-পথে আসিয়া পড়িয়াছে, আজ সহসা তাহার গতি কেহ নিরূপণ করিতে পারিতেছে না।

নূতন বৎসরের খাতা।

ভারতবর্ষের এই বিপুল জনসংঘ—বিগত উনবিংশ শতাব্দীতেও যাহারা বায়ুচালিত অবনমিতশীর্ষ শস্যপুঞ্জের মত শ্রেষ্ঠবর্ণের অঙ্গুলিহেলনে চালিত হইয়াছে, তাহাদের রচিত সমস্ত অত্যুক্তি ও প্রমাদকে নির্ব্বিচারে নিঃসংশয়ে পরমার্থ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে, আজ তাহারা অকস্মাৎ জাগিয়া বসিয়া দেখিতে চাহিতেছে, তাহাদের পুরোবর্ত্তী পথি-প্রদর্শক তাহাদের কোথায় লইয়া যাইতেছে—কি এ পথ, কতখানি ইহার বিস্তৃতি, কোথায় ইহার পরিসমাপ্তি। চারিদিক্ হইতে কণ্ঠস্বর আজ ধ্বনিত হইতেছে "কোথায় যাইতেছি, তাহা আজ আমাদের দেখিয়া লইতে দাও। যদি আমা-দের শক্তি না থাকে তবে আমাদের নিজেদের তাহা বুঝিয়া লইতে দাও। অন্ধের মত, পঙ্গুর মত, অপরের ধৃত যষ্টি ধারণ করিয়া অপরের প্রদর্শিত আলোকে আর আমরা পথ চলিব না!" নিজের ইচ্ছামত যে চলে তাঁহাকে স্বেচ্ছাচারী বলা হইয়া থাকে, এবং সে কিয়ৎ পরিমাণে সমাজদ্রোহীরূপে বিবেচিত হইয়া থাকে। কিন্তু স্বেচ্ছাচারের অপেক্ষাও যে স্বেচ্ছাশক্তিবিহীনতা অনর্থকর সেটা ঠিক্ বোঝা গিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। শৈশব হইতে আমরা শুনিয়া আসিতেছি "সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল", জীবনটাকে কোনও রকমে নির্ঝঞ্ঝাটে কাটাইয়া দিতে পারাটাই আমরা আমাদের জীবনের প্রধান সাধিতব্য বিষয় মনে করিয়া থাকি। কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে, মানুষের চিত্তবোধ যখন আপনার বেগ হারাইয়া অপরের খনিত পথে চলিতে থাকে, তখন তাহার জড়ধর্ম্ম গ্রহণের ফলে জড়ত্বে পরিণতি লাভ অনিবার্য্য। মাটির নীচে যে রসধারা বয়, তাহা যেমন তরুর শ্যামলতাকে চির-নবীন রাখে, তেমনি মানুষের সজীবতার মূলে, চির নবীনতার মূলে যে রসধারা নিত্য জলদান করিতেছে, তাহা মানুষের স্বাধীন চিত্তবোধের ধারা,—কর্ম্মশীলতার ধারা। যেখানে এই পুণ্যতোয়া ধারা দুইটি পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়াছে, মনুষ্যত্বের নদী সেখানেই পাবনী রূপ ধরিয়াছে। ভারতবর্ষ যখন দেখিল যে, উঠিতে বসিতে খাইতে শুইতে তাহাকে আর কোনও বিষয় কিছু-মাত্র ভাবিতে হইতেছে না, ব্রাহ্মণ তাহার মস্তিষ্ক স্বরূপ হইয়া দিব্য সে সকল ব্যাপার সমাধা করিয়া দিতেছে, তখন যদি সে নিজের অব্যবহার্য্য বিচার-বুদ্ধিটাকে আলস্যভাবে তাল পাকাইয়া অকেজো কাগজের ঝুড়িতে ফেলিয়া দিয়া থাকে, তবে তাহাকে যে খুব বেশী দোষ দেওয়া যাইতে পারে তাহা মনে হয় না। যে গুলি প্রাকৃতিক নিয়ম, তাহার উপর রাগ করা মোটেই চলে না। সুতরাং তাহা উপেক্ষা করা অপেক্ষা মানিয়া চলাই সুবুদ্ধির পরিচায়ক।

স্বেচ্ছাশক্তি ও স্বেচ্ছাচার।

মানুষের স্বাধীন চিত্তবোধের ব্যত্যয় ও তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল।

প্রাচীন ভারতের প্রথাসমূহ যদি পর্য্যালোচনা করা যায় তাহা হইলে দেখা যায় যে, ব্যক্তিত্বের বিলোপ ভারতবর্ষে কি অসম্ভব মাত্রায় ঘটিয়াছিল। এই আত্যন্তিকতা শুধু একটা অসার পরিকল্পনাকে আশ্রয় করিয়াই যে বাড়িয়া উঠিয়াছিল, এরূপ বল

ব্যক্তি ও সমাজ।

যাইতে পারে না। ব্যষ্টি যেখানে সমষ্টির বল বিধান না করে, ব্যষ্টি ক্ষুদ্র খণ্ড ও বিরুদ্ধ শক্তিপুঞ্জের সংঘর্ষণ সৃষ্টি করিয়া থাকে এবং লোকসমাজ অপরিহার্য্যতঃই তাহাতে ধ্বংসমুখে পতিত হয়। ব্যষ্টির ঐকান্তিক শক্তিসঞ্চয়ে একদিকে যেরূপ উচ্ছৃঙ্খলতার পুষ্টিসাধন এবং সমষ্টির বিনাশ সাধন হয়, ব্যষ্টির ঐকান্তিক বিলোপে তেমনি কেন্দ্র-শক্তির অভাব ও তাহার ফলস্বরূপ সমষ্টির বিলোপ অবশ্যম্ভাবী। এ দুইয়ের যে সামঞ্জস্য—ব্যষ্টিকে বিকশিত করিয়া সমষ্টিকে পরিণতি প্রদান—তাহাই সমাজের, জাতির স্থিতির মূল। জ্যেষ্ঠত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের দিকে বিগত শতাব্দীর ভারত এত ঝুঁকিয়াছিল, যে কনিষ্ঠের ও নিম্নবর্ণের স্থান সমাজে আদৌ ছিল না। "ছিল না" এ কথা বলিলে হয়ত মনুর রচিত অনুশাসন-শ্লোকের দোহাই দিবেন। কিন্তু শাস্ত্রের উপরে যে লোকাচার জয়ী হয়, আপ্তবাক্য অপেক্ষা সামাজিক প্রচলিত রীতি পদ্ধতি বলবত্তর হয়, তাহা এস্থলে স্মরণ করা উচিত। যাহা কিছু শাস্ত্রে আছে, তাহা দ্বারাই যে সমাজ আদ্যোপান্ত পরিচালিত হয় না, সমাজ যে তাহার নিজের সুবিধা ও অসুবিধা, প্রয়োজন ও অপ্রয়োজন অনুসারে আপনার স্বতন্ত্র পথ রচনা করিয়া চলে, এবং শাস্ত্রবিধি তাহাকে তাহার সেই গতিপথে তাহাকে যেটুকু আনুকূল্য প্রদান করে, সেই টুকুকেই আপনার প্রবাহের ভিতর শিলার মত অচল করিয়া রাখে, এবং অপরাংশকে আবর্জ্জনার মত কূলে নিক্ষেপ করিয়া বহিয়া যায়, ইহাও অস্বীকার্য্য হয়। সুতরাং শাস্ত্রের যে বিলীনপ্রায় অক্ষরগুলি দিনের পরে দিন কীটদষ্ট হইয়া লোপ পাইতেছে, কিম্বা পাইয়াছে, তাহার মূর্ত্তিহীন মিথ্যা নজীর দেখাইয়া বর্ত্তমানের প্রকট সত্যকে আজ আর গোপন করা যায় না। নিম্নবর্ণের নিকট উচ্চবর্ণ দেবতার মত পূজ্য, কিন্তু উচ্চবর্ণ নিম্নবর্ণকে হেয় কীটের মত পায়ের নীচে পেষণ করিয়া মারিলেও তাহাতে কাহারও কিছু বক্তব্য নাই। এইরূপে পারিবারিক সম্বন্ধের ভিতরেও একচ্ছত্র প্রভুত্ব শ্রেষ্ঠত্বের অনুগামী হইয়াছে। পিতার প্রতি পুত্রের, শ্বশুর প্রতি বধূর, স্বামীর প্রতি স্ত্রীর, জ্যেষ্ঠের প্রতি কনিষ্ঠের অশেষ কর্ত্তব্য থাকিলেও পুত্রের প্রতি পিতার, বধূর প্রতি শ্বশুর, স্ত্রীর প্রতি স্বামীর, কনিষ্ঠের প্রতি জ্যেষ্ঠের কোনও কর্ত্তব্য নাই।

শাস্ত্রবিধি ও সমাজ।

একদিন ভারতবর্ষে নারীর মর্য্যাদা ছিল। কিন্তু সে দিনের কথা আজ আর তুলিব না, সে ভারত জগতের নাট্যমঞ্চ হইতে বৃহৎ ডম্বর-দৃশ্যের মত অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। সেই গগন-বিহারী ভারত নারীর সহযোগিতা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া আজ অবশ অর্দ্ধাঙ্গে আকণ্ঠ পঙ্কে মগ্ন হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। বিধাতা নর ও নারীকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, পরস্পরের সহযোগিতায় পরস্পরের অভাব পূর্ণ করিয়া লইয়া একটা সমগ্রতাকে গড়িবার জন্য; একের বিলাপ সাধন করিয়া একটা অসম্পূর্ণ বিকলতাকে কবন্ধের মত প্রাণদান করিতে নয়। সমাজ-দেহ একটা যন্ত্রের মত। যন্ত্রের ভিতরকার যে স্থূল চাকাগুলি তাহার গতি-বিধায়ক, তাহাই যে তাহার সর্ব্বস্ব এবং অপরগুলি দৃশ্যতঃ তাহার সহিত যুক্ত না থাকায় মূল গঠন-রচনায় যে তাহার কোনও স্থান নাই, এরূপ মনে করা ভ্রম মাত্র। সুতরাং সমাজের ভিতর শ্রেষ্ঠ স্থান যাঁহারা অধিকার করিয়া আছেন, তাঁহারাই যে সমাজের গতি-বিধায়ক অংশ, এবং ঘুরিবার সময় যে তাঁহারাই ঘুরিবেন ও তাঁহাদের নিম্নস্থিত শলাকা ও সূচীগুলি—যাহার উপর তাঁহাদের বৃহৎ দেহের ভার রক্ষা হইতেছে, তাহাকে যে প্যাঁচ কষিয়া তলভাগের সহিত আঁটিয়া রাখিবেন, এরূপ কিছুতেই হইতে পারে না। হয় তাহা সমভাবে সংযুক্ত থাকিয়া ঘুরিবে, নয় ত বিরুদ্ধ চেষ্টার বিসদৃশ শক্তির সংঘর্ষণে চূর্ণ হইয়া যাইবে। জাতি ও সমাজ যে উৎস হইতে নীর পান করিয়া জীবনধারণ করিতেছে, কর্দ্দমে ও আবর্জ্জনায় তাহাকে বিষাক্ত করিয়া ব্যাধিবিকৃত জাতি মোহের ঘোরে, অপচারের কল্পনায় দেবত্বের স্বপ্ন দেখিতে পারে, কিন্তু তাহা মনুষ্যত্ব লাভের সোপান নয়। দেশের স্ত্রী-সমাজকে মানুষের অধিকার হইতে বিচ্যুত করিয়া মদমত্ত অন্ধ সমাজের আত্মপ্রসাদ-সুখ অনুভব করিবার কোনও বিঘ্ন নাও ঘটিতে পারে; কিন্তু মনুষ্যত্বের অধিকার-বঞ্চিত এই নারীই যে জাতির জননী, এবং যে অধিকার তাহার হাত হইতে কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে, তাহা যে সে তাহার সৃষ্ট জাতিকে অর্পণ

ভারতবর্ষ ও তাহার স্ত্রী সমাজ।

করিতে পারে না, তাহা জাতির স্মরণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

একজনের অধিকার যখন বাড়াইয়া দেওয়া হয়, তখন অপরিহার্য্যতঃই তন্নিম্নবর্ত্তী বহুজনের অধিকার সঙ্কোচ করিতে হয়। মূককে পীড়ন করিলে তাহার আর্ত্তনাদ কেহ শোনে না বটে, কিন্তু তাহা বলিয়া বিধাতার কাণে সে ক্রন্দন পঁহুছায় না, এরূপ কেহ মনে করিতে পারেন না। অনুষ্ঠান মাত্রেরই একটা চরম ফল আছে; আশু তাহাকে দেখা না গেলেও পরে তাহার বোঝা মাথার উপরে বহিতে হয়। শ্রেষ্ঠত্বের অত্যাচার ভারতবর্ষে ক্রমশঃই বাড়িয়া উঠিতে লাগিল, এবং পেষণ-যন্ত্রের মত তাহার গুরুভার চাকাখানা নিম্নাধিকারীর মর্ম্মসন্ধির উপর দিয়া ঘূর্ণিত হইতে লাগিল। কিন্তু যাঁতার উপরকার চাকাখানা ততক্ষণ তাহার শ্রেষ্ঠত্বের গৌরব করিতে পারে, যতক্ষণ নীচের চাকাখানা তাহাকে উপরে রক্ষা করে। নহিলে তাহারও স্থান মাটির সঙ্গে। পরস্পরের সঙ্গে যাহা যোজিত, তাহার একার্দ্ধকে বাদ দিয়া অপরার্দ্ধকে গ্রহণ একটা নিষ্ফল অসম্পূর্ণতাকে অবলম্বন করা মাত্র। সুতরাং আমাদের এই সমাজরূপ বৃহৎ যন্ত্রখানার উপরকার চাকাটির স্থূলত্ব যখন বাড়িয়া যাইতে লাগিল, তখন তাহার নীচের চাকাখানা ক্রমশঃ ভূপ্রোথিত হইয়া যাইবে, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে উপরকার চাকাখানাকেও টানিয়া মৃত্তিকাতলশায়ী করিবেই। আজ বিংশ শতাব্দীর নব্যভারত বিস্ময়ে সেই দৃশ্যের প্রতি ভীতিবিহ্বল চক্ষে চাহিয়া আছে; কিন্তু যিনি এই ভূগর্ভ-প্রবেশোন্মুখ সমাজকে মৃত্তিকাতল হইতে টানিয়া বাহির করিবেন, তাঁহাকে যুগপৎ উপরিতন ও নিম্নতন উভয় অংশকেই উত্তোলন করিতে হইবে, মাঝখানকার যোগদণ্ডকে কাটিয়া একার্দ্ধ বাহির করিলে চলিবে না। অসম্পূর্ণতার অচল পঙ্গুতাকে জীয়াইয়া মানুষের বিশ্বতোমুখী শক্তিকে তাহার কাছে বলিদান—উন্মত্ততা মাত্র।

অসামঞ্জস্য ও শ্রেষ্ঠত্বের নিপীড়ন।

দ্বিধা যদি আমাদের ভিতর জাগিয়া থাকে, দ্বন্দ্ব যদি আমাদের ভিতর আবির্ভূত হইয়া থাকে, চারিদিকের ঘাত প্রতিঘাতে যদি আমাদের নিভৃত গৃহকোণে অকস্মাৎ আজ কোলাহল ঝঙ্কৃত হইয়া থাকে,—যদি আর যেমনটি ছিল, তেমনটি ফিরিয়া পাইবার আশা না থাকিয়া থাকে,—লাভ ক্ষতির হিসাবটা যদি আজ একান্তই অস্পষ্ট দেখা যায়, তবুও আমাদের আক্ষেপে তীব্রতা মিশ্রণ করিবার কোনও কারণ নাই। কারণ আজ এ নব অব্দে আমাদের হিসাবের খাতা পরিবর্ত্তন করিতেই হইবে। বিগত অব্দের বিয়োগ রাশি যদি বর্ত্তমানের যোগসংখ্যা হইতে বৃহৎ হয়,—তবুও তাহা আজ এড়াইয়া যাওয়া যাইবে না। সঞ্চিত ধন ঘরে যদি কিছু থাকিয়াও থাকে, তবু তাহার উপরে আজ নির্ভর স্থাপন করা যাইতে পারে না, কারণ নব সঞ্চয় ব্যতীত জমার ঘর অপরিহার্য্যতঃই খালি হইয়া পড়িবে। তখন সে শূন্যতাকে ঢাকিবার কিছু পাওয়া যাইবে না।

আমাদের পিতৃপিতামহগণ আমাদের জন্য যে বিত্ত রাখিয়া গিয়াছেন, নষ্ট হইবার ভয়ে এতদিন আমরা তাহা যক্ষের ধনের মত ভূগর্ভে পুঁজি করিয়া রাখিয়া তাহাকে বিষধর সর্পের আবাস করিয়াছি; আজ আমাদের সেই ভুজঙ্গমুখ হইতে সে ধন উদ্ধার করিবার দিন আসিয়াছে; কৃপণের মত তাহার নিষ্ফল অস্তিত্বকে আঁকড়াইয়া আজ আর পড়িয়া থাকিলে চলিবে না; পাথরের উপর বাজাইয়া জগতের কাছে তাহার খাঁটি মূল্য প্রতিপন্ন করিয়া কাজে লাগাইতে হইবে। ভাণ্ডারে আমাদের যে মেকি টাকাগুলি জমিয়াছে, তাহার শূন্যসার ঔজ্জ্বল্যকেই আমাদের একমাত্র পুঁজির ধন করিয়া রাখিয়া আমাদের জীবনের কারবার আমরা কিছুতেই চালাইতে পারি না; নিষ্করুণ হস্তে সেই মিথ্যা বোঝাকে আজ আমাদের টানিয়া ফেলিতেই হইবে, ঝুঁটা মুক্তার কাল্পনিক সত্য দিয়া আমাদের জাতীয় গৌরব-লক্ষ্মীর ললাট ভূষিত করিবার বালোচিত বুদ্ধি আজ আমরা গ্রহণ করিব না। সুতরাং আজ আমাদের অন্ধকার আকাশের কোণে যে অস্পষ্ট আলোকাভাষ দেখা দিয়াছে, বিধাতার যে প্রভাত আমাদের রুদ্ধদ্বারের পশ্চাতের তমস্তূপকে দীর্ণ করিয়া আত্মপ্রকাশ করিতেছে, অভ্যস্ত আচার ও সংস্কারের সুখশয়নে সুপ্ত থাকিয়া আজ যদি আমরা তাহাকে আবাহন করিয়া ঘরে না লই, তবে আমাদের সাধ্বী লক্ষ্মী কাঁদিয়া দুয়ার হইতে

মেকি টাকা।

ফিরিয়া যাইবে, আমরা চিরদিনের মত লক্ষীছাড়া হইয়াই থাকিব।

লোক লোকান্তর সহ এই নিখিল বসুন্ধরা একটা মহান্ ঐকতান যন্ত্রের মত। সংখ্যাতীত এই তারপুঞ্জ তাহার সংখ্যাতীত দিক্ হইতে ধ্বনি প্রেরণ করিয়া যে সুরটিকে রক্ষা করিতেছে, তাহা সামঞ্জস্য। আমাদের প্রত্যেককে মনে রাখিতে হইবে যে, একটা সুরকে প্রবল করিয়া তুলিয়া অপরগুলির বিলোপ সাধন করা তাহার সমন্বয় নয়, তাহার যথাযোগ্য পরিমাণকে সমভাবে রক্ষা করাই তাহার একমাত্র সার্থকতা।

নদীবক্ষের উপর দিয়া যে জলযানটি যাতায়াত করে, তাহা শুধু তাহার নিম্নবর্ত্তী জলরাশিকেই মথিত করে না, ক্ষীণ হইলেও তাহার তরঙ্গ-বেগ সুদূরতর মূল স্পর্শ করিয়া যায়। সামাজিক নব-প্রবর্ত্তিত রীতিনীতি খানিকটা ইহারই মতন। একটা কোনও বিশেষ রীতি, একটা কোনও বিশেষ প্রথা, একটা কোনও বিশেষ পরিবর্ত্তন যখন উচ্চস্তরের ভিতর আবির্ভূত হয়, তখন তাহার তরঙ্গবেগ অপরিহার্য্যতঃই নিম্নস্তরের শেষ কিনারায় গিয়া প্রতিহত হয়। জাতি ও সমাজ এইরূপে অলক্ষিতে শনৈঃ শনৈঃ পরিবর্ত্তনের মুখে ভাঙ্গিতে ও গড়িতে থাকে। জগতের এই স্বতঃসিদ্ধ ক্রিয়াভিমুখী গতিশীলতা কিছুতেই রুদ্ধ হইবার নহে। "Perfection" অথবা সম্পূর্ণতা কল্পনার স্বপ্ন, মানুষের বাস্তব-জীবন-তরুতে সে ফল কখনও ফলিতে দেখা যায় নাই। সুখের সঙ্গেই দুঃখ, আলোর সঙ্গেই অন্ধকার, ভালর সঙ্গে মন্দ মিশাইয়া লইয়া মানুষকে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইতেছে। সুতরাং কোনও দোষ থাকিবে না, ও ত্রুটি রহিবে না, খালি নিছক ভালটিকে নীর হইতে ক্ষীরবৎ ছাঁকিয়া লইব—এরূপ আকাঙ্ক্ষা কেহ কখনও করিতে পারে না। অতএব যাহা আমরা আকাঙ্ক্ষা করি, তাহার জন্যই হস্ত প্রসারণ করিলে চলিবে না, প্রিয়ের সঙ্গে খানিকটা অপ্রিয়ের স্থান আমাদের রাখিতে হইবে, খানিকটা ক্ষমার চক্ষে চাহিয়া মার্জ্জনা করিয়া যাইতে হইবে, খানিকটা ঔদার্য্য অবলম্বন করিয়া ছাড়িয়া দিতে হইবে। মূলে আমাদের একুনের সংখ্যা যদি ঠিক থাকে, তবে তাহার ভিতর দু একটা খণ্ডিত রাশি থাকিলে তাহার কিছু হানি ঘটিবে না। তবু যে চিতার ভস্ম আজি ধূলি হইয়া ধূলির সহিত উড়িতেছে, চন্দন বলিয়া আজ আর তাহাকে ললাটে ধারণ করা চলিবে না। অশুভকে শুভ বলিয়া, অন্যায়কে ন্যায় বলিয়া, অশুচিকে শুচি বলিয়া, অনাচারকে আচার বলিয়া যে ভ্রান্তির প্রসাদ আমরা অঞ্চলে বাঁধিতেছি, আমাদের জীবন-পথ-যাত্রায় তাহা পাথেয় হইয়া আমাদের উত্তরণ করিতেছে না, শিলাপুঞ্জের মত তাহার দুর্ব্বহ ভারে আমাদের পথ চলাই বন্ধ হইয়া আসিতেছে। পরিত্যক্ত শূন্য মাঠের মাঝখানে অন্ধের মত যে নিধি আমরা মিথ্যা আগুলিয়া রহিয়াছি, তাহা ঝড়ের হাওয়ায় কোথায় যে কবে উড়িয়া গিয়াছে, তাহা আমরা জানিতেও পারি নাই।

শ্রীআমোদিনী ঘোষ

দৈন্য।

দৈন্যের মাঝারে ফেলাও আমারে
সম্পদ চাহিনা স্বামী!
তব দান—দুখ নিঙাড়িয়া সুখ
বাহির করিব আমি।

শ্রীহেমেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরী।

দুঃখ।

দুখ দিয়ে মোরে ফেলাও আমারে
সুখ ত চাহি না ভবে।
অতি দুখ মাঝে যে শান্তি বিরাজে
তাহাই লইতে হবে।

শ্রীহেমেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরী

স্থান—উজানি (কোগ্রাম)

লোচনের সমাধি মন্দির :—বখ্যাত চৈতন্যমঙ্গলের কবি লোচনদাস এই গৃহে সাধনা করিতেন। তিনি বিপুল ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া সামান্য কুটীরে আশ্রয় লইয়াছিলেন। ঐখানেই তিনি সমাধি গ্রহণ করেন। সামান্য খড়ো ঘরখানি ভাঙ্গিয়া যাওয়ায়, মহান্ত ও গ্রামবাসী ঐ মন্দিরটী নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। ঐ পুরাতন মাধবীমণ্ডপটি সাধক বৈষ্ণব কবির প্রিয় স্থান ছিল।

লোচনদাস।

(১)

অজয়ের তীরে　　রহিতেন কবি
　পর্ণ কুটীরবাসী,
লোষ্ট্র সমান　　দূরে পড়ে' র'ত
　ত্যক্ত বিভবরাশি।
বৈশাখে নব　　চম্পক হেরি
　ভাসিতেন আঁখিনীরে,
মনে পড়িত যে　　শ্যাম-সোহাগিনী
　চম্পক-বরনীরে।
মাধবী জড়ানো　　শ্যাম সহকার
　মধুর যুগল ছবি,
হেরিয়া বিভোর　　'কৃষ্ণ ধেয়ান'
　'কৃষ্ণগেয়ান' কবি।

(২)

নবঘন শ্যামে　　স্মরিতেন মনে
　হেরি নব জলধরে,
সতিমির রাতি　　মেদুর পবন
　কাঁদাত রাধার তরে।
বেদনা-বিধুর　　হৃদয় কবির
　জ্বালায়ে ভকতি-বাতি,
শ্রীরাধার সাথে,　　পথ দেখাইতে,
　রজনীতে হ'ত সাথী।
এ "ভরা বাদর　　মাহ ভাদর"
　ঘনশ্যাম বনরাজি,
নিতুই করিত　　ব্রজের ভ্রান্তি
　নব নব বেশে সাজি।

(৩)

শরৎ চন্দ্র,　　পবন মন্দ
　কুসুম-গন্ধ বনে ;
রাসের ছবিটি　　ফুটায়ে তুলিত
　ভক্ত কবির মনে।
'কুনুরে' হইত　　যমুনার ভ্রম,
　অশ্রু পড়িত ঝরি,
সুনীল গগন　　নীল বরণেরে
　রহিত নয়নে ধরি।
রামধনু পানে　　চাহি ভাবিতেন
　চূড়া ঘেরা শিখিপাখা,
মিলাইলে ধনু　　আঁখি
　হ'ত যে শিশিরমাখা।

(৪)

হিমে কমলিনী হেরি স্মরে কবি
বিরহবিধুরা রাধা,
মথুরার পানে চেয়ে চেয়ে কাঁদে
নাহি মানে কোন বাধা।
হায়, তাঁরি দুখে সমদুখী কবি
কাঁদেন সখীর ভাবে,
বুঝান তাঁহারে ধৈরজ ধর
পুন মুরারীরে পাবে।
নিশার বাঁশরী হৃদয়ে কবির
কি যে ছবি দিত আঁকি,
উতল ব্যাকুল উঠিতেন জাগি
জলে ভরে' যেত আঁখি।

(৫)

মধুমাসে হায় মাধবীরে হেরি'
মাধবে পড়িত মনে,
হেরি কিংশুক ফাগে লালে লাল
কবি হাসে মনে মনে।
আজ বিভাবরী সুখে গোঁয়াইবে
হেরি বাঞ্ছিত মুখ,
হরি-সমাগমে নিমিষে লুকাবে
শত ব্যথা শত দুখ।
কোকিল ডাকুক লাখে লাখে আজ,
মধু আজি সব মধু;
বহু দিন পর কুঞ্জে তাঁহার
ফিরেছেন শ্যামবঁধু।

(৬)

প্রাতে পাখীরবে ভয় পান কবি
'কুঞ্জভঙ্গ' স্মরি,
হারাই হারাই সদা মনে হয়
সতত উঠেন ডরি।
প্রতি গাভী হায় শ্যামলী ধবলী
মুগ্ধ কবির চোখে,
রাখাল বালক হেরিয়া বিভোর
দেখে হাসে যত লোকে।
শ্যাম ধ্যান জ্ঞান শ্যাম সুখ দুখ,
সকলি শ্যামের ছবি,
হেরি' শ্যামময় হরি অনুরাগী
সাধু বৈষ্ণব কবি।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

শ্রীশ্রী৺মঙ্গলচণ্ডীর মন্দির :—কবিকঙ্কণের চণ্ডী উক্ত শ্রীশ্রী৺মঙ্গলচণ্ডী মাতা শ্রীমন্ত সদাগরের জননী খুল্লনা পূজিতা মা মঙ্গলচণ্ডী।
"উজানিতে কফোনি মঙ্গলচণ্ডী দেবী। ভৈরবী কপিলাম্বর শুভ যাঁরে সেবি॥"
পুরাতন মন্দির ভগ্ন হওয়ায় গ্রামবাসীরা নিকটে ও দূরে চাঁদা তুলিয়া এই সামান্য মন্দিরটী করিয়া দিয়াছেন। মায়ের দশভুজা মূর্ত্তি অতি সুন্দর।

ফটোগ্রাফ দুখানি—শ্রীযুক্ত বাবু রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ মহোদয় কর্ত্তৃক তোলা।

কৃষ্ণকান্তের উইল।

কবি বায়রণ নিজ রচনার বিষয়ে বলিয়াছিলেন "যা লিখেছি তা লিখেছি। এর আর পরিবর্ত্তন করিব না।" কাহারও কাহারও মতে, যে লেখক বায়রণের মত নিজ রচনার কোন পরিবর্ত্তন বা সংশোধন করেন না, তিনি একজন শ্রেষ্ঠ রচয়িতা। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত যে ভ্রমাত্মক তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। সকল দেশে সকল সময়ে লেখকগণ নিজ রচনায় অল্পাধিক পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। কথিত আছে, একজন সেক্ষপীয়র সম্বন্ধে বলিয়াছেন "সেক্ষপীয়র কথনও এক পংক্তিও কাটেন নাই। একেবারে যাহা লিখিতেন তাহাই বরাবর থাকিত।" এই কথার উত্তরে আর একজন বলিয়াছিলেন "যদি তিনি হাজার হাজার পংক্তি সংশোধন করিতেন তাহা হইলে ভাল ছিল।" এই শেষোক্ত বাক্যটি সর্ব্বসম্মত না হইলেও পরিবর্ত্তন বা সংশোধনে যে গ্রন্থ উত্তরোত্তর উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয়, তাহার কোনও সন্দেহ নাই। পাশ্চাত্য দেশে সাহিত্য সমালোচনায় এই সকল পরিবর্ত্তন নিপুণভাবে আলোচিত হইয়া থাকে। এই আলোচনায় লেখকের মানসিক পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইয়া থাকে। লেখক প্রথমে কি ভাবিয়া একরূপ লিখিয়াছিলেন, আবার পরে অন্য কি ভাবিয়া তাহার পরিবর্ত্তন করিলেন, তাহার স্পষ্ট ইতিহাস এই আলোচনায় জানিতে পারা যায়। আর জানিতে পারা যায়, লেখকের সংশোধনচেষ্টা। লেখক নিজেই নিজের রচনায় দোষ বুঝিয়া তাহার সংশোধন করেন, কথনও বা নিজ মত পরিবর্ত্তন বশতঃ স্থলে স্থলে পরিবর্জ্জনাদি করেন। ইহাতে ক্রমশঃ গ্রন্থ উৎকৃষ্টতর হইয়া থাকে। আমাদের বাঙ্গালা সাহিত্যে অনেকে এইরূপ নিজ গ্রন্থ সংশোধিত করিয়াছেন। কিন্তু বঙ্গসাহিত্য সমালোচনায় এইরূপ পরিবর্ত্তনের ইতিহাস অনুসন্ধানের চেষ্টা এ পর্য্যন্ত লক্ষিত হয় নাই। আজ বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তের উইল' লইয়া আমরা এইরূপ পরিবর্ত্তনের ইতিহাস অবতারণা করিলাম। এইরূপ সমালোচনা বাঙ্গালা সাহিত্যে অন্যান্য গ্রন্থেরও দেখিতে পাইব, এই আশা রহিল।

'কৃষ্ণকান্তের উইল' প্রথমে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়। বঙ্গদর্শন চতুর্থ খণ্ডে ১২৮২ সালে ইহার প্রথম নয় পরিচ্ছেদ প্রকাশিত হয়। পরে বঙ্কিম বঙ্গদর্শনের বিলোপ সাধন করেন। ১২৮৪ সালে বঙ্গদর্শন পুনঃ প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। পূর্ব্বকার অসমাপ্ত 'কৃষ্ণকান্তের উইল' ১২৮৪ সালের বঙ্গদর্শনে দশম পরিচ্ছেদ হইতে প্রকাশিত হইয়া সমাপ্ত হয়। দশম পরিচ্ছেদ আরম্ভ করিয়া বঙ্কিম পাদটীকায় লিখিয়াছিলেন "বঙ্গদর্শনের চতুর্থ খণ্ডের ৪০৯, ৪৫১, ৫৬১ পৃষ্ঠা দেখ। দশম পরিচ্ছেদ পড়িবার পূর্ব্বে প্রথম নয় পরিচ্ছেদ আর একবার পড়িলে ভাল হয় না? কেন না যাহা এক বৎসর পূর্ব্বে পঠিত হইয়াছিল, তাহা স্মরণ না থাকাই সম্ভব।" ১২৮৫ সালে 'কৃষ্ণকান্তের উইল' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র সহিত পরবর্ত্তী পরবর্ত্তিত 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' দুইটি স্থলে বিশেষ প্রভেদ আছে। গ্রন্থের মধ্যে দুইটি পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। প্রথম পরিবর্ত্তন, রোহিণী-চরিত্রে, দ্বিতীয় পরিবর্ত্তন গোবিন্দলালের পরিণামে। কেন এই দুইটি পরিবর্ত্তন হইল ও ইহাতে 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে কি না, তাহাই আমাদের বিচার্য্য। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অন্যান্য পরিবর্ত্তনগুলিও সংক্ষেপে উল্লেখ করিব। এইগুলি আলোচনা করিলে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনারীতি ও নিজ রচনা সংশোধন-প্রণালীর উদাহরণ স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যাইবে।

প্রথম পরিবর্ত্তন রোহিণী-চরিত্র। বঙ্গদর্শনের রোহিণী এইরূপ। ব্রহ্মানন্দ যখন হরলালের জাল উইল আসল উইলের পরিবর্ত্তে স্থাপন করিতে অসমর্থ হইয়া হরলালকে টাকা ও জাল উইল ফেরৎ দিতেছিল, রোহিণী তখন "বেড়ার গোড়ায় দাঁড়াইয়া "সমস্ত দেখিতেছিল। ব্রহ্মানন্দ টাকা ফেরৎ দিলেন, কিন্তু রোহিণীর মনে অর্থলালসা জাগিয়া উঠিল। সে অর্থলোভে নিজে যাচিয়া হরলালের নিকট উপস্থিত হইল। বঙ্গদর্শনে আছে—

"এই কথার পর হরলাল বিদায় হইলেন। তিনি গৃহের বাহির হইলে পর একটা স্ত্রীলোক তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। হরলাল তাঁহাকে অন্ধকারে চিনিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কে ও?"

স্ত্রীলোকটি দুই হস্তে অঞ্চল ধরিয়া বলিলেন "দাসী।"

হর। কে ও? রোহিণী?

স্ত্রীলোকটি বলিল "আজ্ঞে।"

* * * *

দুই চারিটি মিষ্ট কথার পর রোহিণী জিজ্ঞাসা করিল "কাকার কাছে যে জন্য আসিয়াছিলেন তাহার কি হইল ?"

হরলাল বিস্ময়াপন্ন এবং বিরক্ত হইয়া বলিলেন "কি জন্য আসিয়াছিলাম ?" রোহিণী হাসিয়া মৃদু মৃদু শ্লোক বলিল—

"যাও যাও আর কেলেসোণা কাজ কি সোহাগ বাড়িয়ে।
শুনেছি সব মনের কথা বেড়ার গোড়ায় দাঁড়িয়ে॥"

হরলাল ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন "বটে! তোমার অসাধ্য কর্ম্ম নাই। এখন কি একটা নূতন রোজগারের পন্থা হইল ?"

রো। হইল বই কি ?

হর। কার কাছে ? কর্ত্তার কাছে এ সব কথা যাবে না কি ?

রো। রোজগার বড় বাবুর কাছেই হবে।

হর। কিরূপে ?

রো। তুমি আমাকে ঐ হাজার টাকা দিবে—আমি তোমায় উইল বদ্‌লাইয়া দিব।

হরলাল বিস্মিত হইলেন। বলিলেন "সে কি রোহিণী ?" পরে কহিলেন "আশ্চর্য্যই বা কি ? তোমার অসাধ্য কর্ম্ম নাই। তা তুমি কি প্রকারে উইল বদ্‌লাইবে ?"

রো। সে কথাটা আপনার সাক্ষাতে নাই বা বলিলাম। না পারি আপনার টাকা আপনি ফেরৎ লইবেন।

হর। ফেরৎ ? তবে টাকা আগে দিতে হবে না কি ?

রো। সব।

হর। কেন ? এত অবিশ্বাস কেন ?

রো। আপনিই বা আমায় অবিশ্বাস করেন কেন ?

হর। কবে এটা পার্‌বে ?

রো। আজিকেই রাত্রি তৃতীয় প্রহরে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।

হরলাল বলিলেন "ভাল।" এই বলিয়া তিনি রোহিণীর হাতে হাজার টাকার নোট গণিয়া দিলেন।"

পূর্ব্বোদ্ধৃত অংশটি বঙ্কিম আদ্যন্ত উঠাইয়া দিয়াছেন। উপরের এই কয় পংক্তিতে রোহিণীচরিত্র কি ঘৃণিত হইয়া উঠিয়াছে! সে আড়ি পাতিয়া কথা শুনে, অর্থলোভে জাল উইল বদল করিতে নিজে উপযাচিকা হইয়া হরলালের সহিত সাক্ষাৎ করে, নির্লজ্জার মত শ্লোক আওড়ায়, চিরদিন দুষ্কর্ম্মরতা দুর্বৃত্তার ন্যায় আগে টাকা লইতে চায়, শেষে হরলালকে রাত্রি তৃতীয় প্রহরে সাক্ষাৎ করিতে বলে। হরলালের "নূতন রোজগারের পন্থা" কথাটির মধ্যে 'নূতন' শব্দে বঙ্কিমচন্দ্রের যদি কোনও ইঙ্গিত অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে রোহিণীচরিত্রে বড়ই কালিমা পড়ে। আমরা তাহা না হয় না ধরিলাম। কিন্তু আর আর যে দোষগুলি দেখিলাম, তাহা হইতে রোহিণীকে মুক্ত করা অসম্ভব। বঙ্গদর্শনে রোহিণীচরিত্র বর্ণনা-প্রসঙ্গে বঙ্কিম লিখিয়াছিলেন—

"তাহার বয়ঃক্রম অষ্টবিংশতি বৎসর অতীত হইয়াছিল, কিন্তু তাহাকে বিংশতি বৎসর মাত্র দেখাইত।……নির্জ্জল একাদশী করিত না। পাড়ার লোকে কাণাকাণি করিত যে সে মাছও খাইত। যখন পাড়ায় বিধবাবিবাহের হুজুক উঠিয়াছিল, তখন সে বলিয়াছিল "পাত্র পাইলে আমি এখনই বিবাহ করি।"……পল্লীর মেয়েরা যেখানে লুকিয়ে লুকিয়ে গানের মজলিস করিত,রোহিণী সেখানে আখ্‌ড়াধারী। টপ্পা, শ্যামাবিষয়, কীর্ত্তন, পাঁচালি, কবি রোহিণীর কণ্ঠাগ্রে। শুনা গিয়াছে রোহিণী ছিটা ফোঁটা তন্ত্র মন্ত্র অনেক জানিত।"

এ অংশটুকুতেও রোহিণীর নির্লজ্জতা পূর্ণমাত্রায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। "পাত্র পাইলে আমি এখনই বিবাহ করি" এ কথা যে রমণী প্রকাশ্যে বলিতে পারে, তাহার নির্লজ্জতা যে চরমসীমা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাতে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই।

বঙ্গদর্শনে রোহিণীর আর এক নীচতা ছিল। উইল বদ্‌লাইবার সুবিধার জন্য এক নীচ রমণীর প্রলোভন দেখাইয়া রোহিণী কৃষ্ণকান্তের ভৃত্য হরিকে সরাইয়াছিল।

"হরি তখন মতি গোয়ালিনীর গৃহে সেই বহুবিলাসিনী সুন্দরীকে কেবল হরিমাত্র-পরায়ণা মনে করিয়া তাহার সতীত্বের প্রশংসা করিতেছিলেন, সেও রোহিণীর কৌশল। নহিলে দ্বার খোলা থাকে না।" [বঙ্গদর্শন।]

আবার ৯ম পরিচ্ছেদে ছিল "এইরূপ অভিসন্ধি করিয়া রোহিণী প্রথমতঃ হরি খানসামাকে হস্তগত করিল। হরি যথাকালে কৃষ্ণকান্তের শয়নকক্ষের দ্বার মুক্ত করিয়া রাখিয়া যথেপ্সিত স্থানে সুধানুসন্ধানে গমন করিল।"

এই ঘৃণ্য উপায় রোহিণীর আর এক পাপ।

বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত পঞ্চম পরিচ্ছেদটি গ্রন্থে আদ্যন্ত উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল ও তৎপরিবর্ত্তে একটি নূতন পরিচ্ছেদ রচিত হইয়াছিল। পুরাতন বঙ্গদর্শন সহজপ্রাপ্য নয়, সেজন্য আমরা এখানে উক্ত অংশ উদ্ধৃত করিলাম। এই অংশে রোহিণীর বাক্‌চাতুর্য্য বেশ বুঝিতে পারা যাইবে।

"সুপ্তা সুন্দরীর প্রথম নিদ্রাভঙ্গে নয়নোন্মীলনবৎ, পৃথিবীমণ্ডলে প্রভাতোদয় হইতে লাগিল। তখন ব্রহ্মানন্দ ঘোষের ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠতলে রোহিণীর সহিত হরলাল কথোপকথন করিতেছিল। যেন পাতালমার্গে, অন্ধকার বিবরমধ্যে সর্পদম্পতী গরল উদ্গীর্ণ করিতেছিল। কৃষ্ণকান্তের যথার্থ উইল রোহিণীর হস্তে।

হরলাল বলিল "তারপর, আমাকে উইলখানি দাও না।"

রো। সে কথা ত বলিয়াছি। উইলখানি আমার নিকট থাকিবে।

হরলাল তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া বলিলেন "তোমার পুরস্কার তোমাকে দিয়াছি। এখন ও উইল আমার।"

রো। আপনারই রহিল। কিন্তু আমার কাছে থাকুক না কেন? আমি ত চিরদিন আপনারই আজ্ঞাকারী। ইহা আর কাহারও হস্তে যাইবে না, বা আর কেহ দেখিতে পাইবে না।

হর। তুমি স্ত্রীলোক। কোথায় রাখিবে, কাহার হাতে পড়িবে, উভয়েই মারা যাইব।

রো। আমি উইল এমত স্থানে রাখিব যে অন্যের কথা দূরে থাকুক, আমি না দিলে আপনিও সন্ধান পাইবেন না।

হর। তোমার ইচ্ছা যে তুমি ইহার দ্বারা আমাকে হস্তগত রাখ। না? কিম্বা গোবিন্দলালের দ্বারা অর্থসংগ্রহ কর।

রো। গোবিন্দলালের মুখে আগুন। আমাকে অবিশ্বাস করিবেন না।

হর। আর যদি কোনও প্রকারে আমি কর্ত্তাকে জানাই যে রোহিণী তাঁহার ঘরে চুরি করিয়াছে।

রো। আমি তাহা হইলে কর্ত্তার নিকট এই উইলখানি ফিরাইয়া দিব। আর বলিব যে আমি এই উইল ব্যতীত কিছুই চুরি করি নাই। তাও বড় বাবুর কথায় করিয়াছি। তাহাতে বড় বাবুর উপকার কি অপকার হইবে তাহা আপনি বিচার করুন। স্মরণ করিয়া দেখুন আসল উইলে আপনার শূন্যভাগ। আমাকে থানায় যাইতে হয়, আমি মহৎসঙ্গে যাইব।

হরলাল ক্রোধে কম্পিতকলেবর হইয়া রোহিণীর হস্তধারণ করিলেন, এবং বলে উইলখানি কাড়িয়া লইবার উদ্যোগ করিলেন। রোহিণী তখন উইল তাঁহার নিকট ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, "ইচ্ছা হয় আপনি উইল লইয়া যাউন। আমি কর্ত্তার নিকট সংবাদ দিই যে, তাঁহার উইল চুরি গিয়াছে, তিনি নূতন উইল করুন।"

হরলাল পরাস্ত হইলেন। তিনি ক্রোধে উইল দূরে নিক্ষিপ্ত করিয়া কহিলেন "তবে অধঃপাতে যাও।"

এই বলিয়া হরলাল সে স্থল হইতে প্রস্থান করিলেন। রোহিণী উইল লইয়া নিজালয়ে প্রবেশ করিল।"

এই টাকা লইবার পর গোবিন্দলালকে দেখিয়া রোহিণীর মনে সুমতি ও কুমতির দ্বন্দ্ব চলিতেছিল। নিম্নোদ্ধৃত পংক্তিগুলি বঙ্গদর্শনে ছিল, পরে বঙ্কিম উহা পরিবর্জ্জিত করেন;—

"সুমতি বলিতেছেন 'এমন লোকেরও সর্ব্বনাশ করিতে আছে?'

কুমতি। হাজার টাকা দেয় কে? টাকায় কত উপকার।

সুমতি। তা গোবিন্দলালের কাছেও টাকা পাওয়া যায়। তার কাছে ঐ হাজার টাকা লইয়া কেন উই[ল] ফিরাইয়া দাও না?

(N.B. এই কথাটা সুমতি বলিয়াছিল কি কুমতি বলিয়াছিল, লেখক ঠিক বলিতে পারেন না।)

কুমতি। টাকা চায় কে? আর গোবিন্দলাল উইল বদল হইয়াছে জানিতে পারিলে টাকাই বা দিবে কেন? উইল যে বদল হইয়াছে ইহা জানিতে পারিলেই তাঁহার কার্য্যোদ্ধার হইবে। তখনই সে কৃষ্ণকান্তকে বলিবে, মহাশয়ের উইল বদল হইয়াছে। নূতন উইল করুন। সে টাকা দিবে কেন?

সুমতি। ভাল টাকাই কি এত পরম পদার্থ; কি হইবে

টাকায়? তোমার এতদিন হাজার টাকা ছিল না, তাতেই বা কি ক্ষতি হইয়াছিল? হাজার টাকা কতদিন যাইবে? হরলালের টাকা হরলালকে ফিরাইয়া দাও, আর কৃষ্ণকান্তের উইল কৃষ্ণকান্তকে ফিরাইয়া দাও।" [অষ্টম পরিচ্ছেদ]

এখন দেখা যাক্, রোহিণীর চরিত্র-পরিবর্ত্তনের কারণ কি? কৃষ্ণকান্তের উইলের চরিত্রগুলির মধ্যে রোহিণী এক প্রধান চরিত্র। রোহিণীই উইলসংক্রান্ত গোলমালে প্রধান কার্য্যকারিণী, রোহিণীই গোবিন্দলালের অধঃপতনে সহায়তাকারিণী। এত বড় একটা চরিত্রকে একেবারে নিছাঁক দুর্ব্বৃত্ততাপূর্ণ করিয়া দোষরাশির সমষ্টিরূপে আঁকিলে পাঠকবর্গের বিন্দুমাত্র সহানুভূতিও রোহিণীর দিকে থাকে না। নিপুণ লেখকের প্রধান কৌশল এই যে, পাপীর চিত্র আঁকিলে পাপের প্রতি পাঠকের ঘৃণা জন্মায় বটে, কিন্তু পাপীর প্রতি সহানুভূতি ফুটিয়া উঠে। তাই বঙ্কিম রোহিণী-চরিত্রে এরূপ পরিবর্ত্তন করিলেন যে, তাহার কলঙ্কিত জীবনের কাহিনীও আমাদের মনে সহানুভূতি জাগাইয়া দেয়। ভোগলালসাপূর্ণ তাহার অন্তঃকরণের সম্মুখে হরলাল কেন প্রলোভন উপস্থিত করিল? কেন তাহাকে বিবাহ করিবে বলিল? বঙ্কিম রোহিণীচরিত্র পরিবর্ত্তন করিয়া লিখিলেন, রোহিণী টাকার জন্য উইল বদ্‌লাইতে যায় নাই। হরলাল তাহাকে বিবাহ করিবে এই আশায় গিয়াছিল। পাছে হরলালের প্রতি এই আকস্মিক অনুরাগ বিচিত্র বোধ হয়; তাই বঙ্কিম আর একটি উপাখ্যান জুড়িয়া দিলেন। একদিন হরলাল বিপন্ন রোহিণীকে বদ্‌মাইসদের হাত হইতে উদ্ধার করেন। রোহিণী সে জন্য কৃতজ্ঞ। এই কৃতজ্ঞতাকেই অনুরাগের পূর্ব্বলক্ষণ বলা যাইতে পারে। আর যৌবনে রোহিণী সংযমে অনভ্যস্তা ছিল, তাই অত শীঘ্র তাহার অধঃপতন হইল। রোহিণী উইল চুরি করিতে গিয়াছিল, কতকটা যেন এই কৃতজ্ঞতায়, কতকটা যেন বিবাহ-লালসায়। রোহিণী হরলালের বিবাহিতা পত্নী হইতেই চাহিয়াছিল। অন্য কোনও নিকৃষ্ট সম্বন্ধ তাহার অভিপ্রেত ছিল না। পরে গোবিন্দলালের সহিত তাহার নিকৃষ্ট সম্বন্ধ কেন হইল, তাহার বিচারের স্থল এ নহে। কিন্তু তৎপূর্ব্বে রোহিণীর মন যে পাপরত ছিল তাহার প্রমাণ আমরা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত কৃষ্ণকান্তের উইলে পাই না। বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত কৃষ্ণকান্তের উইলে রোহিণীর যে ঘৃণিত চরিত্র বঙ্কিম আঁকিয়াছিলেন, তাহা পাঠকের মনে কেবল ঘৃণার পূর্ণস্রোত প্রবাহিত করিতে সমর্থ। সহানুভূতির লেশমাত্রও তাহাতে উদয় হইত না। তাই রোহিণীর কেবল পাপভরা জীবনের বদলে তাহার ক্রমশঃ অধঃপতন বঙ্কিম আঁকিয়াছেন। তাই নির্লজ্জতার পরিবর্ত্তে বর্ত্তমান তৃতীয় পরিচ্ছেদে আমরা মুখরা রোহিণীরও লজ্জাবিজড়িত ভাব দেখিতে পাই। তাই সন্তুষ্টচিত্তে নিম্নোদ্ধৃত পরিবর্ত্তিত অংশ পাঠ করি :—

"হরলাল কিছুতেই রোহিণীকে সম্মত করিতে না পারিয়া সেই হাজার টাকার নোট রোহিণীর হাতে দিতে গেল। বলিল "এই হাজার টাকা পুরস্কার আগাম নাও। এ কাজ তোমায় করিতে হইবে।"

রোহিণী নোট লইল না। বলিল "টাকার প্রত্যাশা করি না। কর্ত্তার সমস্ত বিষয় দিলেও পারিব না। করিবার হইত ত আপনার কথাতেই করিতাম।"

ঐ পরিচ্ছেদের শেষে বঙ্কিমচন্দ্র আবার লিখিলেন "হরলাল আহ্লাদিত হইয়া জাল উইল ও নোট রোহিণীর নিকট রাখিল। দেখিয়া রোহিণী বলিল, "নোট না। শুধু উইল-খানা রাখুন।"

হরলাল তখন জাল উইল রাখিয়া নোট লইয়া গেল।"

পূর্ব্বোদ্ধৃত অংশ পাঠ করিলে আমরা বুঝিতে পারি যে, রোহিণী টাকার লোভে উইল বদ্‌লান রূপ ঘৃণিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় নাই। হরলালকে বিবাহ করিবে এই আশাই তাহার ছিল। কিন্তু বঙ্গদর্শনে রোহিণী যে ভাবে চিত্রিত হইয়াছিল, তাহাতে সে অর্থলোভে পড়িয়াছিল, এ কথা স্পষ্ট-বুঝিতে পারা যায়। নোট ফেরৎ দিবার প্রসঙ্গ বঙ্গদর্শনে নিম্নলিখিতরূপ ছিল। রোহিণী কেন জাল উইল রাখিয়া-ছিল গোবিন্দলাল তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। রোহিণী বলিল "হরলাল বাবুর অনুরোধে!"

"গোবিন্দলাল অত্যন্ত অপ্রসন্ন হইয়া ভ্রুকুটী করিলেন। দেখিয়া রোহিণী বলিল 'তাহা নহে। এই কার্য্যের জন্য তিনি আমাকে এক হাজার টাকা দিয়াছেন। নোট আজিও আমার ঘরে আছে। আমাকে ছাড়িয়া দিন। আমি আনিয়া দেখাইতেছি।'......

গোবিন্দলাল বলিলেন—'আমার কথা শুন। আগে বড় বাবুর সে টাকাগুলি আনিয়া দাও। সে টাকা তোমার রাখা উচিত নহে। আমি সে টাকা তাহার কাছে পাঠাইয়া দিব।'......

রোহিণী গোবিন্দলালের অনুমতিক্রমে হরলাল দত্তের নোট বাহির করিয়া লইতে আসিল। ঘরে দ্বার রুদ্ধ করিয়া সিন্দুক হইতে নোট বাহির করিল। ধীরে ধীরে দ্বারের দিকে আসিতেছিল, কিন্তু গেল না। মধ্যস্থলে বসিয়া পড়িয়া, নোটগুলির উপর পা রাখিয়া রোহিণী কাঁদিতে বসিল।......

রোহিণী উঠিয়া, নোট গুড়াইয়া লইয়া ...গোবিন্দলালের কাছে নোট ফিরাইয়া দিল।......

গোবিন্দলাল হরলালের হাজার টাকা ডাকে ফেরৎ পাঠাইয়া দিলেন। লিখিয়া দিলেন, আপনি যে জন্ম রোহিণীকে টাকা দিয়াছিলেন তাহার ব্যাঘাত ঘটিয়াছে। রোহিণী টাকা ফিরাইয়া দিতেছে।"

রোহিণী-চরিত্র হইতে এই হীনতাটুকু অপসারিত করিবার জন্ম বঙ্কিমচন্দ্র পূর্ব্বোদ্ধৃত অংশ একেবারে উঠাইয়া দিয়াছিলেন। এই পরিবর্ত্তনে রোহিণীচরিত্রের সংশোধন হইয়াছে। বঙ্গদর্শনে চিত্রিত রোহিণী অপেক্ষা গ্রন্থে চিত্রিত রোহিণী বহুল উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে।

এই সঙ্গে আর একটি ক্ষুদ্র পরিবর্ত্তনের উল্লেখ করা উচিত। কৃষ্ণকান্ত যখন মৃত্যুশয্যায়, তখন বৈদ্য শশব্যস্তে একরাশি বটিকা লইয়া ছুটিলেন। তাহার পর বঙ্গদর্শনে ছিল—

"মনে মনে স্থিরসংকল্প অদ্য কৃষ্ণকান্তকে সংহার করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিবেন।"

বঙ্কিমচন্দ্র পরে ইহা উঠাইয়া দেন। রসিকতা হিসাবেও ইহা কিছুই নহে, অতএব অনর্থক বৈদ্যকে 'হাতুড়ে কবিরাজ' করিয়া কোনও লাভ নাই। কাজেই বৈদ্যচরিত্রটিও পরিবর্ত্তিত হইয়া উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে।

জলমগ্না রোহিণীকে উদ্ধার করিবার পর, বঙ্গদর্শনে ছিল "গোবিন্দলাল জানিতেন, যাহাকে ডাক্তারেরা sylvester's Method বলেন তদ্দ্বারা নিঃশ্বাস বাহিত করান যাইতে পারে।" পরে এটুকু উঠাইয়া দেওয়া হয়।

বঙ্কিমচন্দ্র স্থলে স্থলে গোবিন্দলাল সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, পুস্তকাকারে 'কৃষ্ণকান্তের উইল' প্রকাশের সময় তাহা পরিহার করিয়াছেন। তাহা সমীচীন হইয়াছে. কেন না পাঠক ও সমালোচক নিজেই তাহা বিচার করিবেন, গ্রন্থকারের মধ্যবর্ত্তিতার কোনও প্রয়োজন নাই। গ্রন্থকার কিছু না লিখিলেই সৌন্দর্য্য অক্ষুণ্ণ থাকিবে। পরিবর্জ্জিত মন্তব্যগুলি এই—

"জলমগ্না রোহিণীকে গোবিন্দলাল যখন উদ্ধার করিল, তখন বঙ্গদর্শনে মন্তব্য ছিল "আজি গোবিন্দলালের পরীক্ষার দিন। আজ গোবিন্দলাল পিত্তল কি সোণা বুঝা যাইবে।"

গোবিন্দলালের অধঃপতনের প্রারম্ভে মন্তব্য ছিল "গোবিন্দলালের প্রধান ভ্রম যাহা, তাহা উপরে দেখাইয়াছি। তাঁহার মনে মনে বিশ্বাস সৎপথে থাকা ভ্রমরের জন্ম, তাঁহার আপনার জন্ম নহে। ধর্ম্ম পরের সুখের জন্ম, আপনার চিত্তের নির্ম্মলতা সাধন জন্ম নহে। ধর্ম্মাচরণ ধর্ম্মের জন্ম নহে, ইহা ভয়ানক ভ্রান্তি। যে পবিত্রতার জন্ম পবিত্র হইতে চাহে না, অন্য কোনও কারণে পবিত্র, সে বস্তুতঃ পবিত্র নহে। তাহাতে এবং পাপিষ্ঠে বড় অধিক তফাৎ নহে। এই ভ্রমেই গোবিন্দলালের অধঃপতন হইল।"

অস্থানে প্রযুক্ত রসিকতা বিসদৃশ শুনায় বঙ্কিমচন্দ্র তাহা জানিতেন। তাই কন্যার দুঃখে ব্যাকুলহৃদয় মাধবীনাথের মুখে বঙ্গদর্শনে যে পূর্ব্ববঙ্গের অনুকরণে উচ্চারণ প্রযুক্ত হইয়াছিল, বঙ্কিম পরে তাহা পরিবর্ত্তিত করিয়াছিলেন

বঙ্গদর্শনে ছিল—

"মাধবীনাথ। কেমন হে বেড়াইতে যাইবে?

নিশাকর। কোথায়?

মা। জিলা জশ্-শ্-শর—

নি। জশ্-শরে কেন?

মা। নীলকুটি কিন্‌ব।"

পরে পরিবর্ত্তিত হইয়া এইরূপ দাঁড়ায়—

"মা। কেমন হে বেড়াইতে যাইবে?

নি। কোথায়?

মা। যশোর।

নি। সেখানে কেন?

মা। নীলকুটি কিন্‌ব।"

ঘটনা অসম্ভব বলিয়া বোধ না হয়, সেদিকে বঙ্কিমচন্দ্র বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন। গোবিন্দলালকে ভ্রমর শেষ যে পত্র লিখিয়াছিল, তাহার কিয়দংশ এইরূপ ভাবে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়—

"এই পাঁচ বৎসরে আমি কয় লক্ষ টাকা জমাইয়াছি। পঁচিশ হাজার টাকা আমি উহা হইতে লইলাম। পাঁচ হাজার টাকায় গঙ্গাতীরে আমার একটি বাড়ী প্রস্তুত করিব। বিশ হাজার টাকায় আমার জীবন নির্ব্বাহ হইবে।

পরে "কয় লক্ষ" স্থলে "অনেক টাকা," "পঁচিশ হাজার" স্থলে "আট হাজার," "পাঁচ হাজার" স্থলে "তিন হাজার," ও "বিশহাজার" স্থলে "পাঁচহাজার" লিখিত হয়। এ পরিবর্ত্তন সঙ্গত ও স্বাভাবিক।

আর বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত টিপ্পনীটি আমাদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সে টিপ্পনীটি রোহিণীর মৃত্যুবর্ণনার কৈফিয়ৎ। সেটি এই—

"অগ্রহায়ণ মাসের বঙ্গদর্শন বাহির হওয়ার পরে, অনেক পাঠক আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন "রোহিণীকে মারিলেন কেন?" অনেক সময়েই উত্তর করিতে বাধ্য হইয়াছি 'আমার ঘাট হইয়াছে।' কাব্যগ্রন্থ মনুষ্যজীবনের কঠিন সমস্যাসকলের ব্যাখ্যামাত্র, এ কথা যিনি না বুঝিয়া, একথা বিস্মৃত হইয়া কেবল গল্পের অনুরোধে উপন্যাস-পাঠে নিযুক্ত হয়েন, তিনি এ সকল উপন্যাস পাঠ না করিলেই বাধ্য হই।" [বঙ্গদর্শন ১২৮৪, মাঘ।]

আর প্রধান পরিবর্ত্তন গোবিন্দলালের শেষজীবনের ইতিহাস। বঙ্গদর্শনে লিখিত হয় গোবিন্দলাল আত্মহত্যা করিয়াছিলেন। রোহিণীর মূর্ত্তি যখন মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত গোবিন্দলালের সম্মুখে দণ্ডায়মানা বলিয়া প্রতিভাত, রোহিণীর "প্রায়শ্চিত্ত কর। মর।" উক্তি যখন বিকৃত-মস্তিষ্ক গোবিন্দলালের কর্ণে ধ্বনিত বলিয়া বোধ হইতেছিল, তখন নিম্নলিখিতরূপে বঙ্গদর্শনে গোবিন্দলালের পরিণাম সূচিত হইয়াছিল।

"গোবিন্দলাল উঠিলেন। উদ্যান হইতে অবতরণ করিয়া বারুণীর ঘাটে আসিলেন। বারুণীর ঘাটে আসিয়া সোপান অবতরণ করিলেন। সোপান অবতরণ করিয়া জলে নামিলেন! জলে নামিয়া স্বর্গীয় সিংহাসনারূঢ়া জ্যোতির্ম্ময়ী ভ্রমরের মূর্ত্তি মনে মনে কল্পনা করিতে করিতে ডুব দিলেন।

পরদিন প্রভাতে, যেখানে সাতবৎসর পূর্ব্বে তিনি রোহিণীর মৃতবৎ দেহ পাইয়াছিলেন, সেইখানে তাঁহার মৃত-দেহ পাওয়া গেল।"

এই আত্মহত্যা গোবিন্দলালের তৎকালীন মানসিক অবস্থায় সম্ভবপর হইতে পারে, কিন্তু আত্মহত্যায় প্রায়শ্চিত্ত হয় না। অনুতাপই পাপের প্রায়শ্চিত্ত। কলুষিত চিন্তা পরিহার করিয়া ভগবানের চরণ ধ্যানে শান্তিলাভই বাঞ্ছনীয়। তাই বঙ্কিম পরে এইরূপ পরিবর্ত্তন করিলেন—

"গোবিন্দলাল চক্ষু বুজিলেন; তাঁহার শরীর অবসন্ন, বেপমান হইল, তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া সোপান-শিলার উপরে পতিত হইলেন।

মুগ্ধাবস্থায় মানসচক্ষে দেখিলেন, সহসা রোহিণীর মূর্ত্তি অন্ধকারে মিলাইয়া গেল। তখন দিগন্ত ক্রমশঃ প্রভাসিত করিয়া জ্যোতির্ম্ময় ভ্রমরমূর্ত্তি সম্মুখে উদিত হইল।

ভ্রমরমূর্ত্তি বলিল "মরিবে কেন? মরিও না। আমাকে হারাইয়াছ, তাই মরিবে? আমার অপেক্ষাও প্রিয় কেহ আছেন। বাঁচিলে তাঁহাকে পাইবে।"

গোবিন্দলাল সেরাত্রে মূর্চ্ছিত অবস্থায় সেইখানে পড়িয়া রহিলেন। প্রভাতে সন্ধান পাইয়া তাঁহার লোকজন তাঁহাকে তুলিয়া গৃহে লইয়া গেল। তাঁহার দুরবস্থা দেখিয়া মাধবীনাথেরও দয়া হইল। সকলে মিলিয়া তাঁহার চিকিৎসা করাইলেন। দুইতিন মাসে গোবিন্দলাল প্রকৃতিস্থ হইলেন। সকলেই প্রত্যাশা করিতে লাগিলেন যে, তিনি এক্ষণে গৃহে বাস করিবেন। কিন্তু গোবিন্দলাল তাহা করিলেন না। এক রাত্রে তিনি কাহাকেও কিছু না বলিয়া কোথায় চলিয়া গেলেন। কেহ আর তাঁহার কোন সংবাদ পাইল না।

সাত বৎসরের পর তাঁহার শ্রাদ্ধ হইল।"

ভ্রমরের অনুরোধে গোবিন্দলাল ভগবানের চরণে আত্ম-নিবেদন করিলেন। অনুতাপে নির্ম্মলচিত্ত হওয়াতে শান্তি-লাভও করিলেন। পরিশিষ্টে নিম্নোদ্ধৃত কিয়দংশ সংযোজিত করিয়া বঙ্কিম তাহা দেখাইয়াছেন। বঙ্গদর্শনে ইহা ছিল না।

"ভ্রমরের মৃত্যুর বার বৎসর পরে সেই মন্দিরদ্বারে এক সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত হইল। শচীকান্ত সেইখানে ছিলেন। সন্ন্যাসী তাঁহাকে বলিলেন "এই মন্দিরে কি আছে দেখিব।"

শচীকান্ত দ্বার মোচন করিয়া সুবর্ণময়ী ভ্রমরমূর্ত্তি দেখাইল। সন্ন্যাসী বলিল "এই ভ্রমর আমার ছিল। আমি গোবিন্দলাল রায়।"

শচীকান্ত বিস্মিত, স্তম্ভিত হইলেন। তাঁহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। কিন্তু পরে বিস্ময় দূর হইল, তিনি গোবিন্দলালের পদধূলি গ্রহণ করিলেন। পরে তাঁহাকে গৃহে লইবার জন্য যত্ন করিলেন। গোবিন্দলাল অস্বীকৃত হইলেন। বলিলেন "আজ আমার দ্বাদশবর্ষ অজ্ঞাতবাস সম্পূর্ণ হইল। অজ্ঞাতবাস সমাপন পূর্ব্বক তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিবার জন্য এখানে আসিয়াছি। এক্ষণে তোমাকে আশীর্ব্বাদ করা হইল। এখন ফিরিয়া যাইব।"

শচীকান্ত যুক্তকরে বলিল "বিষয় আপনার। আপনি উপভোগ করুন।"

গোবিন্দলাল বলিলেন "বিষয় সম্পত্তির অপেক্ষাও যাহা ধন, যাহা কুবেরেরও অপ্রাপ্য, তাহা আমি পাইয়াছি। এই ভ্রমরের অপেক্ষাও যাহা মধুর,ভ্রমরের অপেক্ষাও যাহা পবিত্র তাহা পাইয়াছি। আমি শান্তি পাইয়াছি। বিষয়ে কাজ নাই, তুমিই উহা ভোগ করিতে থাক।"

শচীকান্ত বিনীতভাবে বলিল "সন্ন্যাসে কি শান্তি পাওয়া যায়?" গোবিন্দলাল উত্তর করিলেন "কদাপি না। কেবল অজ্ঞাতবাসের জন্য আমার সন্ন্যাসীর পরিচ্ছদ। ভগবৎ-পাদপদ্মে মনস্থাপন ভিন্ন শান্তি পাইবার আর উপায় নাই। এখন তিনিই আমার সম্পত্তি, তিনিই আমার ভ্রমর। ভ্রমরাধিক ভ্রমর।"

এই বলিয়া গোবিন্দলাল চলিয়া গেলেন। আর কেহ তাঁহাকে হরিদ্রাগ্রামে দেখিতে পাইল না।"

পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে প্রেমে নিরাশ হইয়া নায়ক বা নায়িকার আত্মহত্যা সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। ভিক্টর হিউগোর Toilers of the sea উপন্যাসের নায়ক মনের মত রমণীকে পরের হাতে সঁপিয়া আত্মহত্যা করিয়াছিল। আমাদের দেশের প্রকৃতি অন্যরূপ। আজকাল পাশ্চাত্য গ্রন্থাদির অনুকরণে এইরূপ আত্মহত্যা সাধারণ হইয়া পড়িয়াছে বটে, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র 'রজনী' উপন্যাসে অমর-নাথকে আত্মহত্যায় প্রবৃত্ত করান নাই। পূর্ব্বোক্ত Toilers of the sea উপন্যাসের নায়কের যে দশা, অমর-নাথেরও সেই দশা। কিন্তু অমরনাথ ভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়া শান্তিলাভ করিল, আর পূর্ব্বোক্ত নায়ক আত্মহত্যা করিয়া সকল জ্বালা জুড়াইল। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাহিত্যে এইখানে প্রভেদ। আয়েসাও প্রণয়ে নিরাশ হইয়া আত্ম-হত্যার ইচ্ছা দমন করিয়াছিল। চন্দ্রশেখরে প্রতাপের মৃত্যু আত্মহত্যা নহে—আত্মোৎসর্গ। গোবিন্দলালের পরিণাম প্রথমে বঙ্কিমবাবু যেরূপ দেখাইয়াছিলেন, তাহা পাশ্চাত্য ভাবের প্রেরণাতেই ঘটিয়াছিল। পরে প্রাচ্যভাবের অনুসরণে আত্মঘাতী গোবিন্দলালের পরিবর্ত্তে অনুতাপবিশুদ্ধহৃদয় ভগবৎপদে সমর্পিতপ্রাণ গোবিন্দলালের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। রোহিণীচরিত্র ও গোবিন্দলালের পরিণাম, এই দুইটির পরিবর্ত্তনই "কৃষ্ণকান্তের উইলে" প্রধান। আমরা কারণসহ এই পরিবর্ত্তন দুটি বিশদরূপে প্রদর্শন করিয়াছি।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল।

নানক।

বারতা শুনি কুপিত অতি রাজা;
"নৃপতি আমি আমারে ঠেলি করিছে পূজা সকলে মিলি
সন্ন্যাসীরে, রাজ্যবাসী প্রজা!
বিদ্রোহী সে সন্দেহ নাই, হেথায় তারে কে দিল ঠাঁই,
উচিত মত তাহারে দিব সাজা।"
কুপিত মনে কহিয়া গেল রাজা।

নগর-রক্ষী আদেশ শুনি রাজার,
অরুণ সম নয়ন রাঙ্গি কুটীর সাধুর দিলেক ভাঙ্গি,
তাড়ায়ে তারে দিল নদীর ওপার;
আশীষ করি হাস্তমুখে কহিল যতি "থাকহ সুখে,
আলয় আমার বসুন্ধরা অপার।"
আদেশ যবে পালিল রক্ষী রাজার।

বর্ষ পরে ফিরিয়া আসি চর
কহিল "রাজা, মিথ্যা তারে খেদায়ে দেছ নগর-পারে,
প্রজারা সেথা বেঁধেছে গিয়া ঘর।
বিপণি পথ শূন্য তোমার, মিথ্যা ভীতি হ'তেছে প্রচার,
দণ্ড দিতে লাগিছে মনে ডর।"
বর্ষ পরে জানায়ে গেল চর।

শুনিয়া রাজা প্রমাদ গণি মনে
কহিল "পুর খুঁজিয়া দ্বারী, সবার সেরা রূপসী নারী
ডাকিয়া হেথা আনহ সঙ্গোপনে;
লক্ষ মুদ্রা—কহিও তারে, যদি সে তারে বাঁধিতে পারে
নিগড় সম, কোমল বাহু সনে।"
কহিল রাজা ভাবনা শত মনে।

সাঁঝের বেলা ফিরিয়া ঘরে নানক
দেখেন চাহি, রুধিয়া দুয়ার, রমণী এক সুধার আধার
দাঁড়ায়ে আছে, কত্র মূর্ত্তি যাচক।
প্রণমি তাঁরে সুধান ধীরে, বিনয়নম্র কোমল স্বরে
"জননি হেথা কি চাও" বলি সাধক।
ফিরিয়া ঘরে দুয়ার পরে নানক!

হা হা রে সাধু শুনালে একি বাণী!
প্রাণের মাঝে কলুষ রাশি পরসে তার পড়িল খসি,
মর্ম্মকোষে শতেক কষা টানি;
খুলিয়া ফেলিল রত্ন ভূষা কুসুম সজ্জা কাতরে বৃথা,
লইল শিরে সাধুর চরণখানি—
হা হা হা সাধু কহিলে একি বাণী?

কহিল নারী ঢালিয়া নয়ন বারি,
"তার গো প্রভু তার গো মোরে, মগ্ন আমি পঙ্ক ঘোরে,
পতিতা অতি পাপিনী নারী।"
উঠায়ে তারে কহেন নানক "ধন্য সে যে ক্ষমার যাচক,
আজিকে হ'তে জননী তুমি আমারি।"
কাঁদিয়া যবে পড়িল পায়ে নারী!

প্রভাত বেলায় অর্ঘ্য লয়ে আসি
হেরিল সবে সাধুর ঘরে রমণী এক অজিন পরে,
রূপ-প্রভায় মলিন তাহার শশী।
ভূমিতে ফেলি পূজার থালি, পাড়িয়া সবে উঠিল গালি,
চলিল ফিরি বিরাগে ঢালি মসী;
ভ্রুকুটি করি যতেক নগরবাসী!

দ্বিপ্রহরে ভিক্ষা তরে নানক,
বাহির হ'লেন নগর পথে, সঙ্গিনীরে লইয়া সাথে,
ঘৃণায় সবে কহে "ছি! একি পাতক?
রমণী লয়ে ফিরিছে নিলাজ মাথায় উহার পড়েনা কি বাজ?"
হাসিয়া চাহে মুখের পানে সাধক,
দ্বিপ্রহরে পথের ধারে যাচক!

কহিল নারী যুড়িয়া তখন পানি,
"পতিতা আমি সবার হেয়, নহি ত তব স্বজন প্রিয়,
আমার লাগি ফিরিছ প্রভু টানি
কেন এ কুৎসা, মিথ্যাপবাদ, অসীম ঘৃণার তীব্র বিষাদ,
গরল হ'তে উগ্রতর বাণী।"
কহিল নারী ললাটে কর হানি।

নানক তারে কহেন তখন হাসি
"হের যে ধূলি রয়েছে পথে তুমি আমি তাহারো হ'তে,
নহি ত কারো আদর অভিলাষী;
আছিনু ভবে অকর্ম্মণ্য, তোমারে সেবি হইনু ধন্য,
জননী তুমি আমার মহীয়সী।"
কহেন তারে নানক মৃদু ভাষি।

শ্রীআমোদিনী ঘোষ।

ছিন্নহস্ত।

(শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত।)

[পূর্ব্বাবৃত্তি :—ব্যাঙ্কার মঃ ভরজারস বিপত্নীক। এলিস তাঁহার একমাত্র কন্যা, ম্যাক্সিম্ ভ্রাতুষ্পুত্র, ভিগ্‌নরী খাজাঞ্চি, রবার্ট সেক্রেটারী, ভেনলিত্যাও দ্বারবান্, ম্যালিকম মালখানা-রক্ষক এবং জর্জেট বালক ভৃত্য। তাঁহার যে বাটীতে বাস, তাহাতেই ব্যাঙ্কও স্থাপিত। একদিন তাঁহার বাটীতে নিশা-ভোজ। ভিগ্‌নরী ও ম্যাক্সিম এক সঙ্গে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিয়া দেখে খাজাঞ্চিখানার বিচিত্র কল-কৌশল-সমন্বিত লৌহ-সিন্দুকে কোন রমণীর মূল্যবান্ ব্রেসলেট্-পরিহিত ছিন্ন বামহস্ত সংবদ্ধ রহিয়াছে। এ ঘটনা তৃতীয় ব্যক্তির কর্ণগোচর না করিয়া ম্যাক্সিম ঐ সদ্য-ছিন্ন হস্তের অধিকারিণী-নিরাকরণে প্রবৃত্ত হইলেন।

রবার্ট এলিসের পাণি-প্রার্থী; বৃদ্ধ ব্যাঙ্কার কিন্তু তাহার বিরোধী রবার্টের অভিজাত বংশে জন্ম বলিয়া তাঁহার ব্যবসায়বুদ্ধি সম্বন্ধে ভরজারস্ সন্দিহান্ ছিলেন। তিনি ভিগ্‌নরীকে জামাতৃপদে বরণ করিতে ইচ্ছুক। কিন্তু তিনি কন্যার সহিত কথোপকথনে বুঝিয়াছিলেন যে এলিস্ রবার্টের প্রতি অনুরক্ত। তাই তিনি রবার্টকে স্থানান্তরিত করিবার জন্য তাহাকে স্বীয় মিশরস্থিত কার্য্যালয়ের ভার দিয়া পাঠাইবার প্রস্তাব করিলেন। সে দিন রবার্ট সে কথার উত্তর দিলেন না; কিন্তু বন্ধু ভিগনরীকে বলিলেন যে, তিনি মিসরে যাইবেন না—দেশত্যাগী হইবেন।"

কর্ণেল বেরিসকের ১৯ লক্ষ টাকা ও মূল্যবান দলিলাদি সমেত

একটী বাক্স ভরজারসের ব্যাঙ্কে গচ্ছিত ছিল। তিনি ঐ দিবস আসিয়া বলেন যে, পরদিন তাঁহার কিছু টাকার প্রয়োজন।

ম্যাক্সিম্ সায়াহ্নে ভিগনরীকে জানাইল যে, ছিন্ন-হস্ত সম্বন্ধে পুলিস-অনুসন্ধান আরম্ভ হইয়াছে। পরে দুই বন্ধু রঙ্গালয়ে অভিনয় দর্শন করিতে গেল। সেখান হইতে মধ্যরাত্রিতে ফিরিয়া ভিগনরী রবার্টের এক পত্র পাইলেন ; তাহাতে লেখা ছিল যে, তিনি সেই রাত্রেতেই দেশ-ত্যাগ করিয়া চলিলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে কর্ণেল বোরিসফ টাকার জন্য আসিলেন। ভিগনরী তাঁহাকে বলিলেন লৌহ-সিন্দুক কে খুলিয়াছে, বোধ হয় টাকা কড়ি অপহৃত হইয়াছে। তখনই ভরজারসকে সংবাদ দেওয়া হইল। তিনি ব্যাপার দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, কারণ সিন্দুকের চাবি তাঁহার নিকট থাকে। শেষে সিন্দুকের টাকাকড়ি গণিয়া দেখা গেল যে, ৫০ হাজার টাকা নাই এবং কর্ণেলের দলালের বাক্সও নাই। সকলেরই সন্দেহ হইল রবার্ট এই কার্য্য করিয়াছেন। পুলিসে সংবাদ দিবার প্রস্তাব হইল, কর্ণেল তাহাতে সম্মত হইলেন না, তিনি গোপনে অনুসন্ধান করিতে বলিলেন। তাহার পর যখন রবার্টের অনুসন্ধান করিবার কথা হইল, তখন ভিগনরী বলিল যে তিনি বিগত রাত্রিতে সহর ছাড়িয়া গিয়াছেন। সন্দেহ আরও দৃঢ় হইল। ভরজারস্ তাহার পরই গৃহমধ্যে গিয়া এলিস্কে এই সংবাদ দিল ; তাহার প্রণয়পাত্র যে চুরি করিয়া পলায়ন করিয়াছে এ কথা সে কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিল না ; সে পিতার কোলে মুখ লুকাইয়া আবেগে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িল।

দুই বন্ধু জুলস্ ভিগ্নরী ও ম্যাক্সিম্ পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে, ম্যাক্সিম সেই ছিন্নহস্তের অধিকারিণী রমণীর অনুসন্ধান করিবেন। ম্যাক্সিমের দৃঢ় বিশ্বাস যে, রবার্ট এ চুরীর কিছুই জানেন না। ম্যাক্সিম সেই দিনের কুড়াইয়া পাওয়া ব্রেস্লেট নিজের হাতে পরিয়া বাহির হইয়াছিলেন। পথে তাঁহার পরিচিত এক ডাক্তারের সহিত তাঁহার দেখা হইল। ডাক্তার তাঁহাকে সুন্দরী একটী যুবতীকে দেখাইলেন ; ম্যাক্সিম এমন সুন্দরী অতি কমই দেখিয়াছেন। তাহার পর ম্যাক্সিম কৌশলে সেই রমণীর সহিত পরিচয় করিলেন। রমণী ম্যাক্সিমের প্রকোষ্ঠে ব্রেস্লেট দেখিয়াছিলেন এবং তাহার সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলিলেন। রাত্রি অধিক হওয়ায় ম্যাক্সিম রমণীকে তাঁহার গৃহে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য তাঁহার সঙ্গী হইলেন। রমণী গৃহের দ্বারে উপস্থিত হইয়া ম্যাক্সিমকে ভিতরে ডাকিলেন না, নিজে প্রবেশ করিয়াই দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন। ম্যাক্সিমের মনে এই রমণী সম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ উপস্থিত হইল তিনি সেই জন্য বাহিরে দাঁড়াইয়া বাড়ীটি ভাল করিয়া দেখিলেন, দুইটি লোক তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া কি বলাবলি করিতেছে। জনশূন্য স্থানে এই লোক দুইটিকে দেখিয়া তাঁহার মনে ভয়ের সঞ্চার হইল। তখন কোথা হইতে তাঁহার বালক ভৃত্য জর্জেট সেখানে উপস্থিত হইল। তাহার দ্বারা একখানি গাড়ী ডাকাইয়া আনিয়া তিনি গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।]

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বর্ণিত ঘটনার পরদিবস সায়াহ্নে ব্যাঙ্কারের গৃহে প্রীতিভোজ উপলক্ষে নিমন্ত্রিতগণ সমবেত হইয়াছিলেন। অন্যবারে রবার্ট প্রীতিসম্মিলনে উপস্থিত থাকিতেন, কিন্তু এবার তিনি নাই। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত আনন্দও যেন অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। জুলস্ ভিগ্নরী সেখানে উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু হতভাগ্য বন্ধুর স্মৃতি তাঁহার মনকে পীড়িত করিতেছিল। এলিসের আসনের পার্শ্বে তাঁহার আসন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।

মসিঁয়ে ভরজারসের মনটাও আজ ভাল ছিল না। কন্যার জন্য হৃদয়ে অত্যন্ত দুর্ভাবনা হইয়াছিল। সত্য বলিতে কি, তিনি স্বীকার না করিলেও সেক্রেটারীর অভাব আজ তাঁহার মনে যন্ত্রণা দিতেছিল। রবার্ট বাড়ীর সকলেরই প্রিয়পাত্র ছিলেন। তাঁহার সহসা অন্তর্দ্ধানে সকলেই যেন ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িয়াছে। রবার্টকে অপরাধী জানিয়াও এক এক সময় তাঁহার প্রতি বৃদ্ধের হৃদয়ে অনুকম্পা ও সহানুভূতির সঞ্চার হইত। তিনি মনে মনে প্রার্থনা করিতেছিলেন, কর্ণেল বোরিসফের কবলে বেচারা কারনোয়েল যেন পতিত না হয়।

ভিগ্নরী একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া ছিলেন। এলিস চায়ের পেয়ালা লইয়া তাঁহার দিকে আসিতেছেন দেখিয়া যুবক মনে মনে শিহরিয়া উঠিলেন। যুবতী নিম্নস্বরে বলিলেন, "রবার্ট কি আপনাকেও পত্র লেখেন নাই?"

বিবর্ণ মুখে যুবক বলিলেন, "না ; সে চলিয়া যাইবার পর আর কোনও পত্র পাই নাই। শুধু সেই দিন অপরাহ্ণে কয়েকছত্র লিখিয়া পাঠাইয়াছিল।"

"কোথায় তিনি যাবেন, তা কিছু লিখিয়াছিলেন?"

"না ; কিন্তু যেখানেই যাক্ না কেন, আমায় পত্র লিখিয়া জানাইতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিল।"

"সে প্রতিজ্ঞা তিনি পালন করেন নাই? তবে কি তিনি মারা গিয়াছেন?"

বিচলিত কণ্ঠে ভিগ্নরী বলিলেন, "কি! মারা গিয়াছে?

কি ভয়ঙ্কর! না না, তাহা হইতেই পারে না। সে আমাকে বলিয়াছিল, আত্মহত্যা সে কখনও করিবে না, সে কাপুরুষ নহে।"

"আত্মহত্যা! সে কথাও কি তাঁহার মনে আসিয়াছিল?"

"সে একেবারে হতাশ হইয়াছিল, মঁসিয়ে ভরজারুসের সঙ্গে তাহার যে কথা—"

"আমার সহিত বিবাহ হইবে না, বাবা এই কথাই তাঁহাকে জানাইয়াছিলেন। সে কথা তিনি আপনাকে বলেছিলেন কি? আমার কথা কি কিছু হইয়াছিল?"

ভিগ্নরী সসঙ্কোচে বলিলেন, "রবার্টের বিশ্বাস যে, আপনার পিতার প্রস্তাবে আপনিও সম্মতি দিয়াছিলেন।"

"অর্থাৎ আর আমি তাঁহাকে ভালবাসি না, আমার শপথ ভুলিয়া গিয়াছি, এই বিশ্বাস তাঁহার হইয়াছিল, তাই তিনি আমার সঙ্গে দেখা না করিয়া চলিয়া গিয়াছেন?"

ভিগ্নরী সম্মতিসূচক মস্তকান্দোলন করিলেন।

এলিস ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "মঁসিয়ে কারনোয়েল অপরাধী, এ কথা কি আপনি বিশ্বাস করেন?"

"কখনও না। রবার্ট কখনই চোর নয়। এই ঘটনাটা রহস্যজালে আচ্ছন্ন। ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই রহস্যোদ্ভেদ হইবে। প্রকৃত অপরাধী ধরা পড়িবে, তখন—"

"আমি তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিব, আপনি কি আমার সাহায্য করিবেন?"

"আপনি আমায় যে কাজ করিতে বলিবেন, আমি সানন্দে তাহাই করিব। আমার বন্ধুর নির্দ্দোষতা সপ্রমাণ করিবার জন্ত আমি সর্ব্বদাই প্রস্তুত।"

"হৃদয়ের সহিত আমি আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। আপনার সম্বন্ধে আমার অন্যরূপ ধারণা ছিল; কিন্তু আজ একটি কথায় আমার ধাঁধা কাটিয়াছে। এখন হইতে আপনার সহিত আমার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব জন্মিল। দুজনে একযোগে কাজ করিব।"

এমন সময় ম্যাক্সিম ভরজারস্ কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

বৃদ্ধ বলিলেন, "এ কি! তুমি কোথা থেকে?"

ম্যাক্সিম বলিলেন, "জ্যেঠামহাশয়, গত বুধবারে আমি আসিতে পারি নাই বলিয়া বড়ই লজ্জিত ও দুঃখিত ছিলাম। ক্ষমা করিবেন কি?"

"আজ বুঝি তোমার কোনও কাজ নাই?"

"না না, তা নয়। এখন আমি ঘড়ীর কাঁটার মত কাজ করি। বাজে কাজে একটুও সময় নষ্ট করি না।"

"ও সব তোমার বাজে কথা। এক দিনের কাজের হিসাব দাও দেখি।"

"কাল সমস্ত দিন বই পড়িয়াছিলাম। বৈকালে স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলাম। ঘুরিতে ঘুরিতে অনেকদূর চলিয়া গিয়াছিলাম। শেষে কয়েকজন বদমায়েস আমায় খুন করিবার পর্য্যন্ত চেষ্টা করিয়াছিল।"

"এখন বুঝি পথে পথে কেবল ঝগড়া বাধাইয়া বেড়াইতেছ?"

"না, না, জ্যেঠামহাশয়, কতকগুলি গুণ্ডা আমার পেছু লইয়াছিল। সেই সময়ে আপনার বালক-ভৃত্য জর্জেট যদি না আসিয়া আমার সাহায্য করিত তাহা হইলে আমার অদৃষ্টে কি যে ঘটিত, বলা যায় না। আমার অনুরোধ, আপনি তাহার মাহিনা বাড়াইয়া দিবেন।"

"কখন এ ঘটনা হইয়াছিল?"

"তখন প্রায় রাত্রি দ্বিপ্রহর।"

ব্যাঙ্কার বলিলেন, "এত রাত্রি পর্য্যন্ত সে রাজপথে ঘুরিয়া বেড়ায় আমি তাহাকে বরখাস্ত করিব।"

"আপনি ছাড়াইয়া দিলে আমি তাহাকে নিজের কাছে রাখিব। সে পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল না। তাহার পিতামহীর কাছে সে যাইতেছিল।"

এলিস বলিলেন, "দাদা যাহা বলিতেছিলেন, আমারও তাই মত। বালকটির বেতন বাড়াইয়া দেওয়া উচিত। ছেলেটি বেশ!"

"ভিগ্নরী, তোমার কি মত? ছেলেটি ভাল করিয়া কাজ করে কি?"

ভিগ্নরী বলিলেন, "তাহার বিরুদ্ধে আমার কিছুই বলিবার নাই।"

"একটি সম্ভ্রান্ত মহিলার অনুরোধে উহাকে আমি চাকরী দিয়াছি। তোমরা সকলেই তাঁহার নাম শুনিয়া থাকিবে। আমার কাছে তাঁহার অনেক টাকা গচ্ছিত আছে। সেই

সূত্রে তিনি বালকটিকে আমার কাছে রাখিবার জন্য অনুরোধ করেন। তিনি নিজে অতুল ঐশ্বর্য্যশালিনী, অনায়াসেই বালকের ভরণ পোষণ করিতে পারেন; কিন্তু তিনি আমার কাছে উহাকে রাখিবার জন্য বলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, প্যারী নগরীতে সর্ব্বদা তিনি থাকেন না, বালকও তাহার পিতামহীকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিবে না। এই জন্য আমার কাছে থাকাই সঙ্গত। আমি তাঁহার অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারি নাই। মহিলাটির নাম কাউণ্টেস্ ইয়ালটা।"

"কিন্তু বালকটির উপর কাউণ্টেসের এত দয়া কেন?"

ব্যাঙ্কার বলিলেন, "বালকের পিতা নাকি কোন এক সময়ে কাউণ্টেসের পিতার জীবন রক্ষা করিয়াছিল। তদবধি তিনি উহাদের প্রতি প্রসন্ন।"

এলিসের শিক্ষয়িত্রী বলিলেন, "কাউণ্টেস্ কি খুব সুন্দরী?"

"এমন চমৎকার রূপ বড় দেখা যায় না।"

"বিবাহিতা?"

"ব্যাঙ্কার বলিলেন, "বিধবা সুতরাং স্বাধীনা। সম্প্রতি তিনি দিন পনেরর জন্য ইতালী দেশে বেড়াইতে গিয়াছেন!"

ম্যাক্সিম বলিলেন, "কি আশ্চর্য্য! প্যারীর সুন্দরী রমণীরা যেন জোট বাঁধিয়া এক সময়েই নগর ত্যাগ করেন!"

মঁসিয়ে ক্যামারেট নামক জনৈক নিমন্ত্রিত যুবক বলিলেন, "আপনার কথায় যেন অনুমান হইতেছে, আপনার প্রণয়িনীর বিরহ-বেদনায় আপনি কাতর।"

"আমি? কিছুমাত্র না। আমার কোনও প্রণয়-পাত্রী নাই।"

"সাবধান, কাউণ্টেস ইয়ালটা লোকের মুণ্ড ঘুরাইয়া দেন!"

শিক্ষয়িত্রী বলিলেন, "এলিস্, আজ একটু নৃত্যগীত হইবে না?"

এলিস্ ম্যাক্সিমকে বলিলেন, "দাদা, এস তোমাতে আমাতে গান করি।"

ম্যাক্সিম ভগিনীর অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিলেন না।

বিস্তৃত কক্ষের এক প্রান্তে পিয়ানোর কাছে উভয়ে উঠিয়া গেলেন। এলিস মৃদুস্বরে বলিলেন, "তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।"

"কি কথা?"

"মঁসিয়ে ভিগ্নেরীর সহিত তোমার বিশেষ বন্ধুত্ব, নয়?"

"সে আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু।"

"আমি কি তাঁহাকে বিশ্বাস করিতে পারি?"

"তোমার কথা বুঝিতে পারিলাম না।"

"মঁসিয়ে ভিগ্নেরী তাঁহার কোনও দুর্ভাগ্য বন্ধুর রক্ষা-কল্পে সাহায্য করিতে পারেন কি?"

"নিশ্চয়, আমি তাহাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি।"

"ধন্যবাদ। এখন এস, আমি বাজাইতে বাজাইতে তোমার সহিত কথা বলি, তা' হ'লে কেহ শুনিতে পাইবে না। রবার্ট নির্দ্দোষ, ইহা আমি সপ্রমাণ করিব। মঁসিয়ে ভিগ্নেরী কি অন্তরের সহিত আমায় সাহায্য করিবেন?"

"রবার্ট নির্দ্দোষ! তুমি তাঁহাকে এতই বিশ্বাস কর?

যুবতী অসঙ্কোচে বলিলেন, "তোমার সন্দেহ হয় না কি?"

ম্যাক্সিম বলিলেন, "কারনোয়েলকে কি তুমি ভালবাস?"

এলিস প্রগাঢ়স্বরে বলিলেন, "হ্যাঁ। যে মুহূর্ত্ত হইতে তিনি অন্যায়রূপে অভিযুক্ত হইয়াছেন, সেই মুহূর্ত্ত হইতে আমার প্রেম আরও গভীর হইয়াছে। তিনি ছাড়া আমি আর কাহাকেও কখনও ভাল বাসিতে পারিব না।"

"তোমার স্পষ্ট কথায় আমি প্রীত হইলাম। অবশ্য কারনোয়েলের উপর আমার নিজের কোনও বিদ্বেষ নাই। বরং তাঁহাকে আমি ভদ্রলোক বলিয়াই মনে করি। ভিগ্নেরীও তাঁহাকে অত্যন্ত ভদ্রলোক বলিয়াই জানে।"

"তিনি এইমাত্র আমায় বলিয়াছেন যে, বন্ধুর দোষ-ক্ষালনের চেষ্টা করিবেন।"

"ভিগ্নেরীর মহত্ত্ব আছে। আমি জানি, সে বড় ভাল লোক। তুমিও ক্রমে বুঝিতে পারিবে।"

"তিনি আমায় সাহায্য করিতে সম্মত, এজন্য আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।"

ম্যাক্সিম্ চিন্তিতভাবে বলিলেন, "তুমি কি সত্যই রবার্টকে নির্দ্দোষ প্রতিপন্ন করিতে কৃতসঙ্কল্প? কিন্তু কাজটি সহজ নয়।"

"তাতে কি? তাঁহার সম্মানে আমার সম্মান। তিনি আমার বাক্‌দত্ত স্বামী।"

"সত্যই কি এরূপ অবস্থায়ও তুমি তাহাকে বিবাহ করিতে?"

"নিশ্চয়ই।"

ভগিনীর সাহস ও একনিষ্ঠ প্রেম দর্শনে ম্যাক্সিম চমৎকৃত হইলেন। এলিসের চরিত্রে এত দৃঢ়তা আছে তিনি পূর্ব্বে তাহা বিশ্বাস করিতেন না। তিনি বলিলেন, "কিন্তু তোমাদের বিবাহ হওয়া অসম্ভব। রবার্ট কোন্ দেশে আত্মগোপন করিয়াছে, কে জানে? সে কখনও ফ্রান্সে ফিরিয়া আসিবে না।"

দৃঢ়স্বরে এলিস বলিলেন, "তিনি এখানেই আছেন। প্যারী ছাড়িয়া তিনি কোথাও যান নাই। আমার সহিত দেখা করিবার চেষ্টা না করিয়া তিনি কোথাও যাইবেন না। তিনি প্রতারিত হইয়াছেন। তাঁহাকে লোকে এমন ভাবে বলিয়াছে যে, আমি প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিয়াছি। সেই রাগে তিনি এ বাড়ী ত্যাগ করিয়াছেন। প্যারীতেই তিনি আছেন।"

"তাহা হইলে রবার্টের উচিত, নিজেকে নির্দ্দোষ প্রতিপন্ন করা।"

"তাঁহার স্কন্ধে যে চুরীর অপরাধ পড়িয়াছে, তিনি ত তাহা জানেন না।"

"তোমার কথাই ঠিক। জ্যেঠামহাশয় ত পুলিশে জানান নাই। কথাটা ত কেহই জানে না। ঠিক বটে! তুমি যদি আমার উপর ভার দাও, আমি তাহাকে নির্দ্দোষ সাব্যস্ত করিতে চেষ্টা করিব।"

"তুমিও আমাদের দলে আসিবে, সত্য বলিতেছ?"

"হাঁ। কিন্তু কতকগুলি প্রমাণ রবার্টের বিরুদ্ধে বড়ই প্রবল। তুমি বোধ হয় জান, সিন্দুকে ৩৪ লক্ষ টাকা ছিল, তন্মধ্যে মাত্র পঞ্চাশ হাজার টাকা চুরী গিয়াছে, রবার্টের বিরুদ্ধে ইহা একটা প্রবল প্রমাণ। সাধারণ চোরে সব টাকাটাই লইয়া যাইত।"

"রবার্ট তাহাতে দোষী হইবেন কেন?"

"সে কথা ঠিক। কিন্তু তাহাকে নিরপরাধ প্রমাণ করিতে হইলে চুরীর উদ্দেশ্যটা কি, তাহা বুঝা দরকার! পঞ্চাশ হাজার টাকা ও সেই সঙ্গে বোরিসফের একটা দলিলের বাক্স চুরী গিয়াছে।"

"রবার্টের নির্দ্দোষতা তাহাতেই বেশী সপ্রমাণ হইবে। একজন বিদেশী অপরিচিত ভদ্রলোকের কাগজপত্রে তাঁহার কোনও স্বার্থ নাই।"

"তোমার কথাও সঙ্গত। কিন্তু আমি শুনিয়াছি, কারনোয়েলের পিতা রুষিয়াস্থিত ফরাসী পররাষ্ট্রসচিবের প্রাচীন কর্ম্মচারী ছিলেন। বোরিসফ বলেন যে, রবার্ট কোনও কোনও রুষ পিতৃবন্ধুর সহিত যোগাযোগ করিয়া দলিলাদি চুরী করিয়াছে।"

"এ কথার কোনও মূল্য নাই। কর্ণেল রবার্টকে দেখিতে পারেন না বলিয়াই এ কথা বলিয়াছেন।"

"রবার্টের সঙ্গে কর্ণেলের ত কোনও শত্রুতা নাই, তবে কেন তিনি তাঁহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিবেন?"

"কর্ণেল জানেন যে, কারনোয়েল আমায় ভাল বাসেন। এদিকে কর্ণেলও আমার পাণিপ্রার্থী!"—

"তাই ঈর্ষ্যাবশতঃ প্রতিযোগীর উপর দোষারোপ করিয়াছেন? সম্ভব বটে। তুমি বোধ হয় জান যে, তিনি রবার্টের অনুসন্ধান করিতেছেন?"

"কই, তাহা ত শুনি নাই!"

"হাঁ, তিনি রবার্টের অনুসন্ধানে প্যারী ত্যাগ করিয়াছেন।"

"আমি কাল তাঁহাকে ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতে দেখিয়াছি, তিনি তবে ফিরিয়া আসিয়াছেন।"

"তবে কি কর্ণেল তাহার সন্ধান পাইয়াছেন, কিংবা তাহার অনুসন্ধান ত্যাগ করিয়াছেন?"

এলিস্ ম্যাক্সিমকে নীরব হইতে ইঙ্গিত করিল। পিতার বৃদ্ধ ভৃত্য একখানি রৌপ্যপাত্র হাতে করিয়া এলিসের কাছে আসিয়া বলিল, "পাখা ও স্মেলিংসল্টের শিশি আনিতে বলিয়াছিলেন, তাই আনিয়াছি।" এই বলিয়া সে পিয়ানোর উপরে পাত্রটি রাখিয়া অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে এলিসের দিকে চাহিল। তার পর সতর্কভাবে চাহিতে চাহিতে চলিয়া গেল।

ম্যাক্সিম্ দেখিলেন, পাখার নীচে একখানি পত্রের একাংশ দেখা যাইতেছে। ভগিনী গোপনে পত্র ব্যবহার করে ইহা ভাবিয়া ম্যাক্সিম্ হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। এলিস তাঁহার মনের কথা যেন বুঝিতে পারিলেন। মৃদু কোমল স্বরে তিনি বলিলেন, "তাঁর চিঠি।"

"আমিও তাহাই ভাবিয়াছিলাম। চাকরটা তাহা হইলে সব জানে?"

"জোসেফ্ আমায় কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছে। কারনোয়েলকে সে বড় ভাল বাসে ও ভক্তি করে। আমার মানসিক যন্ত্রণা সে বুঝিতে পারিয়া কা'ল বলিয়াছিল যে, সে আমায় তাঁহার পত্র আনিয়া দিবে। তাহার দৃঢ় বিশ্বাস যে, রবার্ট আমাকে নিশ্চয়ই পত্র লিখিবেন। এই পত্রে সব জানিতে পারিব। চিরজীবন কাঁদিব কিংবা আশা রাখিব, পত্রখানি পড়িলেই জানা যাইবে। দাদা, তুমি প্রথমে চিঠিখানি পড়।"

"সে আমি পারিব না। তোমাদের প্রেম-পত্র আমি পড়িব কেন?"

ম্যাক্সিম্ দেখিলেন, পাখার নীচে একখানি পত্রের একাংশ দেখা যাইতেছে।

"তুমি আমার মানসিক অবস্থা বুঝিতে পারিতেছ না? পাখাখানি আমায় দাও। সেই অবসরে চিঠিখানি তুলিয়া লও। তার পর লাইব্রেরী ঘরে গিয়া পড়িয়া দেখ। সঙ্কোচ করিও না। পড়িয়া যদি বোঝ কারনোয়েল নির্দ্দোষ—কেন তিনি না বলিয়া চলিয়া গিয়াছেন, তাহার সন্তোষজনক প্রমাণ যদি পাও, তাহা হইলে চিঠিখানি আমায় ফিরাইয়া দিবে। কিন্তু যদি তাহা না বোঝ, চিঠি পুড়াইয়া ফেলিও। তোমার চেহারা দেখিলেই আমি বুঝিতে পারিব, আশা আছে কি না।"

ম্যাক্সিম অসম্মতি প্রকাশ করিতে যাইতেছেন, এমন সময় এলিস উঠিয়া দাঁড়াইয়া পাখা চাহিলেন। মসিয়ে ভরজারসও তাঁহাদের দিকে আসিতেছেন দেখিয়া ম্যাক্সিম আর দ্বিরুক্তি করিতে পারিলেন না। অনিচ্ছাসত্ত্বেও তিনি পত্রখানি সুকৌশলে পকেটের মধ্যে রাখিলেন।

জ্যেঠামহাশয় বলিলেন, "ম্যাক্সিম, এখন তুমি লাইব্রেরী ঘরে গিয়া একটু বিশ্রাম করগে। অনেকক্ষণ ধূমপান কর নাই।"

ম্যাক্সিম দেখিলেন, উপায় নাই। এলিস যেরূপ ব্যাকুল ও কাতরতাপূর্ণ নয়নে তাঁহার পানে চাহিল, তাহাতে তাঁহার মন আর্দ্র হইল। লাইব্রেরী-ঘরে গিয়া তিনি পত্রখানি খুলিয়া ফেলিলেন। পত্রে লেখা ছিল:—

"ভদ্রে,—আমি আপনাকে ভাল বাসিয়াছিলাম। এখনও আমার প্রেম যায় নাই। আমার বিশ্বাস আপনিও হয় ত আমায় ভাল বাসেন। কিন্তু আপনি প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারিবেন, এই বিশ্বাস করাই আমার মহাভ্রম হইয়াছিল। আপনার পিতা আমায় বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, আপনি ধনীর কন্যা, আমি দরিদ্র। আপনি পিতার আজ্ঞাকারিণী। তাঁহার কথা সত্য। তাই আমি বিদায় লইয়াছি। জন্মের

মত ফ্রান্স ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে জননীর সমাধিমূলে একবার মাথা নত করিবার সাধ হইয়াছিল। তাই পিতৃভবনে, আমাদের গ্রামে গিয়াছিলাম। আমার শৈশবের ক্রীড়াস্থানে —জন্মস্থানে দুইদিন মাত্র ছিলাম। প্যারীতে আবার ফিরিয়া আসিলাম কেন? আমার দুর্ব্বলতায় আপনি হয় ত হাসিবেন। মনে আশা হইতেছিল, হয় ত আপনার পিতা আমায় প্রতারণা করিয়াছেন। আপনি পিতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে সাহস করেন নাই বটে, কিন্তু হয় ত আপনি আমায় বিস্মৃত হন নাই। আশা হইল, হয় ত আপনার সহিত দেখা হইতে পারে। তাই আসিয়াছি। গত রবিবারে আপনি যখন ধর্ম্মমন্দিরে গিয়াছিলেন, আমি তখন নিকটেই দাঁড়াইয়া ছিলাম। আপনাদের বৃদ্ধ ভৃত্যের সহিত আমার দেখা হইয়াছিল; তাহার হাতেই এই পত্র দিলাম। তাহার কাছে শুনিলাম, আমার নাম ভ্রমেও কেহ একবারও মুখে আনে নাই। কিন্তু আপনি কাঁদিতেছেন, যন্ত্রণা সহ্য করিতেছেন।

"তখন আপনাকে পত্র লিখিবার ইচ্ছা হইল। আপনাকে আমি দোষ দিতেছি না। আমার কাছে আপনি যে প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ আছেন, তাহা রক্ষা করুন, এ কথা আমি বলিব না। আমাদের উভয়ের মিলন হইবে না। কাহাকেও কিছু না বলিয়া সহসা চলিয়া আসিয়াছি, ইহার কোনও কৈফিয়ৎ না দিয়া যদি আমি চলিয়া যাই, তাহা হইলে আপনি আমায় ঘৃণা করিতে পারেন। আপনার ঘৃণা আমি সহ্য করিতে পারিব না। কেন আমি চলিয়া আসিলাম, তাহা জানিলে আপনি বুঝিতে পারিবেন, আমার গত্যন্তর ছিল না। আগামীকল্য বেলা ৩টার সময় আমি বয়-ডি-কেলোনের একপ্রান্তে আপনার প্রতীক্ষা করিব। শিক্ষয়িত্রীকে সঙ্গে লইয়া কি আপনি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন? দুই চারিটামাত্র কথা বলিব। আপনার শিক্ষয়িত্রী উপস্থিত থাকিবেন। আমি কোনও মন্দ প্রস্তাব করিব না। যদি আপনি না আসেন, আমি চিরতরে প্যারী ছাড়িয়া চলিয়া যাইব।"

ম্যাক্সিম আপনাআপনি বলিলেন, "বিচিত্র প্রেমপত্র! ভদ্রলোক অপরাধও স্বীকার করিতেছেন, অথচ দেখা করিতেও চাহিতেছেন। আমার গত্যন্তর ছিল না, এই কথাটাতেই তাহার অপরাধ প্রকাশ পাইতেছে। হায়, এলিস, কি নিরাশা! এখন আমি কি করি? সে আমাকে চিঠিখানি পুড়াইতে বলিয়াছিল। যদি আমি তাই করি, ড্রয়িংরুমে ফিরিয়া গেলেই, এলিস্ আমার মুখ দেখিয়া সমস্ত বুঝিতে পারিবে। তখন সহসা যদি সে অজ্ঞান হইয়া পড়ে? কারনোয়েল সম্ভবতঃ দোষী। কিন্তু তাহার বংশ-মর্য্যাদা-জ্ঞান খর্ব্ব হয় নাই। হয় ত এ ব্যাপারে কোনও গভীর রহস্যও থাকিতে পারে। পত্রের ভাষা অপরাধীর মত নয়। হায়! যদি অন্ততঃ দশ মিনিট আমি তাহার সহিত বাক্যালাপ করিতে পাইতাম!"

ম্যাক্সিমের চিন্তাস্রোতে বাধা পড়িল। মাথায় হাত দিয়া তিনি কিয়ৎকাল চুপ করিয়া রহিলেন। তারপর সহসা তাঁহার মুখে হাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিল। "বা! কাল নিরূপিত-স্থানে ওৎ পাতিয়া থাকিলে হয় না? রবার্ট আসিলে আমিই তাহার সহিত দেখা করিয়া সব কথা বাহির করিয়া লইব। যদি তাহাকে নির্দ্দোষ বুঝি, তখন উভয়ে মিলিয়া প্রকৃত চোরকে গ্রেপ্তার করিবার চেষ্টা করিব। পত্রখানি এলিসকে ফিরাইয়া দিই। শিক্ষয়িত্রী যখন উপস্থিত থাকিবেন, আর আমিও থাকিব, সুতরাং আশঙ্কার কোনও কারণ নাই।"

সেই সময়ে ডিগ্‌নরী কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার আনন হাস্যদীপ্ত।

ম্যাক্সিম বলিলেন, "কি গো বন্ধু, কিছু সুবিধা হইতেছে?"

"হ্যাঁ, কুমারী এলিসের সহিত আমার অনেকক্ষণ কথা-বার্ত্তা হইয়াছে। তিনি জানিতে পাঠাইলেন যে, তোমার ধূমপান শেষ হইয়াছে কি না, চা পান করিবে কি?"

"চল যাই।"

কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়াই ম্যাক্সিম দেখিলেন, এলিসের মুখে হাস্য; কিন্তু তাহার অন্তরালে কি আবেগ, কি উত্তেজনা আশা ও নৈরাশ্যের প্রবল দ্বন্দ্ব চলিতেছিল, তাহা তিনি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন। প্রসন্ন নয়নে চাহিয়া ম্যাক্সিম তাহার দিকে অগ্রসর হইলেন, সুকৌশলে সকলের অজ্ঞাতসারে তাহার হাতে পত্রখানি অর্পণ করিলেন। এলিস মৃদুস্বরে বলিলেন, "তাহা হইলে তুমি চিঠি পোড়াও নাই! আমি জানিতাম তিনি নির্দ্দোষ!"

"তুমি নিজে পড়িয়া বিচার করিও। আমি চিরদিন তোমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, সে কথা ভুলিও না।"

এলিস নীরবে চলিয়া গেলেন, ম্যাক্সিমও কক্ষত্যাগ করিলেন। বাহিরের দরজার কাছে বৃদ্ধ জোসেফ দাঁড়াইয়া ছিল। তিনি তাহাকে বলিলেন, "কি জোসেফ্, তাহা হইলে মঁসিয়ে কারনোয়েল প্যারীতেই আছেন?"

সে সসম্মানে বলিল, "আমি ত তা জানি না হুজুর!"

ম্যাক্সিম বুঝিলেন, তাহার নিকট হইতে কথা আদায় করিয়া লওয়া অসম্ভব।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

প্যারী নগরীর জনসাধারণ রৌদ্র উজ্জ্বল হইয়া না উঠিলে শয্যাত্যাগ করেন না। বেলা নয়টার পূর্ব্বে চা অথবা কফির দোকানে প্রায়ই জনসমাগম হয় না। পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বর্ণিত ঘটনার পর দিবস প্রভাতে জনৈক যুবক রুদে রফার পল্লীর কোনও নিম্নশ্রেণীর কফির দোকানে প্রবেশ করিলেন। দোকানে কোনও খরিদ্দার তখনও আসে নাই। যুবকের পরিচ্ছদ পরিচ্ছন্ন, কিন্তু বাহুল্য-বর্জ্জিত। স্থানটি নির্জ্জন দেখিয়া তিনি একখানি আসন গ্রহণ করিলেন।

টেবিলের উপর সেই তারিখের সংবাদ-পত্র পড়িয়া ছিল। তিনি একখানি কাগজ তুলিয়া লইয়া সংবাদ-পত্রের বিজ্ঞাপনস্তম্ভে কি খুঁজিতে লাগিলেন। সহসা একটা বিজ্ঞাপনে তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। পকেট হইতে নোটবহি বাহির করিয়া তিনি নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনটি নকল করিয়া লইলেন:—

"উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার সর্ব্ববিধ সংবাদ-বিভাগ। —যাঁহারা কৃষি, অথবা খনির কার্য্য, কিংবা বিভিন্ন প্রকার শিল্পজাত দ্রব্যের নির্ম্মাণকল্পে টাকা খাটাইতে চাহেন, তাঁহাদিগকে বিনা খরচে সমুদয় জ্ঞাতব্য সংবাদ প্রদত্ত হইয়া থাকে। অনেকগুলি কর্ম্ম খালিও আছে। পরিশ্রমী, উৎসাহী ও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি হইলে তাঁহাকে উপযুক্ত বেতন দেওয়া যাইবে। পাথেয় ও পর্য্যটন-খরচ কোম্পানী স্বয়ং বহন করিবেন। মূলধন অগ্রে দেয়। হ্যাভার, হ্যামবার্গ, লিভারপুল এবং আমেরিকার প্রধান প্রধান নগরে এই কোম্পানীর শাখা-কার্য্যালয় আছে। মঁসিয়ে ব্রায়ারের নামে দরখাস্ত করিতে হইবে। ঠিকানা, ৪৪ নং রুদে লা বায়েল এারসেন্। আবেদনের সময়, প্রত্যহ বেলা ৯টা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত।"

যুবক প্রসন্নচিত্তে বিজ্ঞাপনটি নকল করিয়া দোকান হইতে বাহির হইলেন। মাথার টুপিটি টানিয়া আরও নামাইয়া দিলেন। সে সময়ে ভরজারসের কোনও মক্কেল যদি তাঁহাকে দেখিতেন, তাহা হইলে যুবককে ব্যাঙ্কারের ভূতপূর্ব্ব সেক্রেটারী বলিয়া চিনিতে তাঁহার বিলম্ব হইত না।

কারনোয়েলের আকৃতি কয়দিনে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। আনন বিবর্ণ, নয়ন কোটরপ্রবিষ্ট, মুখমণ্ডলে বিষন্নতা ও উৎকণ্ঠার চিহ্ন পরিস্ফুট। রবার্ট কিছুদূর গিয়া বিজ্ঞাপনে বর্ণিত ৪৪ নং বাটীতে উপস্থিত হইলেন।

প্রশ্ন করিয়া জানিলেন, মঁসিয়ে ব্রায়ার ত্রিতলে থাকেন। কারনোয়েল উপরে উঠিয়া গেলেন। ঘণ্টাধ্বনি শুনিয়া একব্যক্তি দরজা খুলিয়া দিল। ব্রায়ারের নাম শুনিবামাত্র ভৃত্য তাঁহাকে অপর একটি কক্ষে লইয়া গেল। সেখানে একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক বসিয়া কাজ করিতেছিলেন। তাঁহার টেবিলের উপর কাগজপত্র স্তূপীকৃত; ঘরটি সুসজ্জিত, আসবাবপত্রগুলি নূতন ও যত্ন-সংরক্ষিত।

কারনোয়েল বলিলেন, "আপনিই কি মঁসিয়ে ব্রায়ার?"

"আজ্ঞা হাঁ। মহাশয়ের কি প্রয়োজন?"

"আজ সংবাদপত্রে আপনাদের একটি বিজ্ঞাপনে দেখিলাম যে, আমেরিকার—"

বাধা দিয়া ব্রায়ার বলিলেন, "সংবাদ জানিতে চাহেন? এখনই দিতেছি। কালিফোর্ণিয়া মেক্সিকো—"

"আমি কলোরেডোর সংবাদ চাই।"

"আপনি ঠিক সময়েই আসিয়াছেন। কলোরেডোতে আমাদের একটা খনি আছে। উহাতে আয় যথেষ্ট হইতে পারে। আপনি কি একটা চাকরী চাহেন?"

"আগে সমস্ত সংবাদ জানি, তার পর বলিব। যদি আমার মনোমত হয়, তাহা হইলে অংশ ক্রয় করিতে পারি। এমন কি, চাকরীও লইয়া তথায় যাইতে পারি।"

"মহাশয়ের নাম কি?"

"আমার নামে কি প্রয়োজন? আমি শুধু সংবাদ জানিতে আসিয়াছি।"

"ক্ষমা করিবেন, কিন্তু আমাদের কতকগুলি নিয়ম আছে, সেগুলি পালন করা দরকার। আপনি যে সংবাদ জানিতে চাহিতেছেন, উহা অত্যন্ত গোপনীয়; সুতরাং আপনার নাম না জানিয়া কিরূপে মহাশয়ের নিকট গুপ্ত সংবাদ ব্যক্ত করিব?"

"আচ্ছা শুনুন,—আমার নাম রবার্ট।"

এজেণ্ট কলম তুলিয়া বলিলেন, "ডাকনামটাও অমনই বলুন। আমাদের নিয়ম পুরা নাম লওয়া।"

অধীরভাবে কারনোয়েল বলিলেন, "হেন্‌রী রবার্ট।"

"কি কাজ করা হয়?"

"কিছুই না।"

"বাড়ী? কোথায় থাকা হয়?"

"২০৯ নং বুলেভার্দ্দ দে বাতীস্। এখন আমার জন্মস্থান কোথায় ও বয়স কত তাহাও জানিতে চান কি?"

"না মহাশয়, তা'র প্রয়োজন নাই।"

"আচ্ছা, তবে এখন সব বলুন।"

প্রৌঢ় বলিলেন, "আপনি কলোরেডোতে গিয়া অর্থোপার্জ্জন করিবেন, এ খুব ভাল কথা। আপনার যৌবন, শক্তি ও অর্থ আছে,আপনি তথায় উন্নতি করিতে পারিবেন। আমি বলিয়াছি সেখানে আমাদের খনির কাজ আছে, কাজটা খুব লাভজনক; কিন্তু নূতন প্রণালীতে আকরিক ধাতুকে বিশ্লিষ্ট করিয়া লইতে না পারিলে তেমন লাভ হইবে না, এ কথা স্মরণ রাখিবেন। আর একটা কথা, উদ্ভাবিত প্রণালী সাধারণে যেন জানিতে না পারে। সর্ব্বত্র বিশ্বাসী দালাল নিযুক্ত করা প্রয়োজন। আপনার কাছে কত টাকা আছে?"

"পঞ্চাশ হাজার টাকা। তন্মধ্যে দশহাজার টাকা আমি কাছে রাখিব।"

"কোম্পানী আপনার কলোরেডো যাইবার সমগ্র খরচ বহন করিবেন; আর মোটা বেতনও দিবেন; কিন্তু টাকাটা অগ্রিম দিতে হইবে।"

"টাকা আমার সঙ্গেই আছে; কিন্তু সমস্ত সংবাদ ভালরূপে না জানিয়া আমি আপনাদিগকে টাকা দিতে পারি না।"

ক্ষুন্নভাবে ব্রায়ার বলিলেন, "আমরাও এ কথা বলি না যে, আমাদের কোনও মক্কেল ভাল করিয়া সব না জানিয়া শুনিয়া আমাদিগকে টাকা দিবেন।"

"বেশ কথা। তা হ'লে আমি যা জানিতে চাই, সব আমায় বলুন।" আমি শীঘ্রই কাজ শেষ করিতে চাই। যাহা করিতে হইবে, শীঘ্রই করাই ভাল।"

ব্রায়ার বলিলেন, "আমাদের চেয়ারম্যানের কাছে সব কাগজপত্র থাকে, তাঁহার সহিত এ বিষয়ে আলোচনা করা দরকার।"

"কখন্ তাঁহার দেখা পাইব?"

"আজ বেলা তিনটার সময়।"

"তখন আমার সুবিধা হইবে না।"

"তা হ'লে কা'ল সকাল বেলা। না, তাও হ'বে না, কাল প্রাতে ডিরেক্টরদিগের একটা সভা হইবে। শনিবারে অংশীদিগের সভায় তাঁহার যোগদান অত্যাবশ্যক। সোমবারের পূর্ব্বে তাহা হইলে আর দেখা হইবার কোনও আশা নাই।"

"এতদিন আমি অপেক্ষা করিতে পারিব না।"

"তবে এক কাজ করুন, আজ এখনই আপনি তাঁহার বাড়ীতে গিয়া দেখা করুন। আমি একখানি পত্র দিতেছি আপনি তাঁহার ভ্যালেটকে—"

রবার্ট এ প্রস্তাব সঙ্গত মনে করিলেন না। তিনি মাথা নাড়িলেন।

ব্রায়ার একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, তবে আমার সঙ্গে চলুন। আজ তাঁহার সহিত আমারও দেখা করিবার প্রয়োজন আছে। তাঁহার গাড়ী আমায় লইতে আসিবে। চেয়ারম্যান মহাশয় ভারী কাজের লোক। বিশ মিনিটের মধ্যে জ্ঞাতব্য সকল বিষয় আপনি জানিতে পারিবেন।"

রবার্ট এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তখন ব্রায়ার বলিলেন, "আপনি একটু বসুন, আমার অনুপস্থিতিতে অন্য কোনও লোক আসিয়া ফিরিয়া না যায়, এজন্য আমি বন্দোবস্ত করিয়া এখনই আসিতেছি।"

পাঁচ মিনিট পরে টুপী হস্তে ব্রায়ার ফিরিয়া আসিলেন। বলিলেন, "চেয়ারম্যানের গাড়ী দরজায় দাঁড়াইয়া আছে।"

যে চাপরাশী দরজায় দাঁড়াইয়া ছিল, কারনোয়েল দেখিলেন সে গাড়ীর উপরে গিয়া বসিয়াছে। ভয়ানক শীত পড়িয়াছে। গাড়ীর কাচবাতায়ন তুলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। গাড়ী যখন পরিচিত রুদে সুরেসনি অতিক্রম করিতেছিল, তখন রবার্টের মনে কত কথাই উঠিতে লাগিল। সহসা কারনোয়েলের দৃষ্টি ম্যাক্সিমের উপর নিপতিত হইল। ম্যাক্সিম হাঁটিয়া যাইতেছিলেন। পাছে ব্যাঙ্কারের ভ্রাতুষ্পুত্র তাঁহাকে দেখিতে পান, এই আশঙ্কায় রবার্ট মুখ ফিরাইয়া লইলেন; কিন্তু তিনি বুঝিলেন, ম্যাক্সিমের তীক্ষ্ণদৃষ্টি তিনি এড়াইতে পারেন নাই।

গাড়ী দ্রুতবেগে চলিতেছিল। সঙ্গী রবার্টের ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "প্যারী নগরটা এমনই যে, লোকে যাহাকে এড়াইতে চায়, তাহার সম্মুখেই পড়িয়া যায়।"

রবার্ট মনে মনে বিরক্ত হইলেও এ কথার কোনও উত্তর দেওয়া সঙ্গত মনে করিলেন না।

রুদে ভিগনী নামক পল্লীর একটা বৃহৎ অট্টালিকার সম্মুখে গাড়ী আসিল। রাজপথ জনবিরল; শুধু কএকটি বালক খেলা করিতেছিল। রবার্ট অন্যমনস্ক না থাকিলে জর্জেটকে তাহাদের সহিত খেলা করিতে দেখিতে পাইতেন। বালক তাহার মনিবের ভূতপূর্ব্ব সেক্রেটারীকে তথায় দেখিয়া বিস্মিত হইল। সে শুনিয়াছিল কারনোয়েলের চাকরী গিয়াছে, তিনি কোথায় চলিয়া গিয়াছেন।

ফটকের দ্বারপথ দিয়া গাড়ী ভিতরে চলিয়া গেল। গাড়ী হইতে নামিয়া রবার্ট ব্রায়ারের অনুবর্ত্তী হইলেন। একটি সুসজ্জিত ড্রয়িংরুমে রবার্টকে বসিতে বলিয়া ব্রায়ার বলিলেন, "আমি চেয়ারম্যানকে সংবাদ দিতে যাইতেছি, আপনি একটু অপেক্ষা করুন।"

দীর্ঘাকার চাপরাশী পনের মিনিট পরে আসিয়া বলিল, "আমার সঙ্গে আসুন।"

অপর একটি কক্ষে প্রবেশ করিয়া রবার্ট দেখিলেন, ব্রায়ার বেশপরিবর্ত্তন করিয়া বসিয়া আছেন।

রবার্ট বলিলেন, "চেয়ারম্যান কোথায়?"

ব্রায়ার বলিলেন, "আপনি বসুন না।"

"কোনও প্রয়োজন নাই। চেয়ারম্যান যদি আমার সহিত দেখা না করেন, আপনার সহিত আমার কোনও প্রয়োজন নাই। আমি এখন চলিলাম।"

"কিন্তু আপনার সহিত যে আমার প্রয়োজন আছে, আপনি এখন যাইতে পারিতেছেন না।"

"কেন, আপনি বাধা দিবেন না কি?"

"নিশ্চয়ই!"

ক্রোধে রবার্টের মুখমণ্ডল আরক্ত হইয়া গেল। তিনি কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন, "আপনার কি অধিকার আছে? আপনাদের কোম্পানি বলপূর্ব্বক কলোরেডোতে কুলি চালান দেন না কি?"

"কলোরেডোর সঙ্গে আমাদের কোনও সম্বন্ধ নাই। রুদে সুরেসনি ঘটনা লইয়া আলোচনা করিব।"

রবার্ট চমকিত ও বিস্মিত হইলেন।

কঠোরস্বরে ব্রায়ার বলিলেন, "আপনার নাম হেনেরী রবার্ট কারনোয়েল। এক সপ্তাহ পূর্ব্বে আপনি মসিয়ে ভরজারসের সেক্রেটারী ছিলেন। অস্বীকার করিবেন না, আমি আপনাকে চিনি।"

গর্ব্বিতভাবে রবার্ট বলিলেন, "অস্বীকার করিব কেন? আমার নাম প্রকাশ করিতে লজ্জাই বা হইবে কেন?"

"কিন্তু আমি যখন আপনার নাম জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তখন ত আত্মগোপন করিয়াছিলেন।"

"যার তার কাছে আমার নাম বলিবার কোনও প্রয়োজন নাই। যাহা হউক, এখন শীঘ্র শীঘ্র আপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করুন। আপনার সহিত রহস্যালাপের আমার অবসর নাই।"

"আপনি কোথায় আসিয়াছেন, এখনও সে ধারণা আপনার হয় নাই।"

"কিছুমাত্র না।"

"আপনি আশ্চর্য্য করিলেন। আমি ভাবিয়াছিলাম আপনি বেশ চালাকচতুর, বুদ্ধিমান্। যাহা হউক, এখন জানিয়া রাখুন, পুলিশ কমিশনারের আদেশানুসারে আমি কাজ করিতেছি।"

"কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। পুলিশের সঙ্গে আপনাদের কোম্পানির কি সংস্রব আছে?"

"এখনও প্রতারণা? তবে শুনুন, আপনি এখন বন্দী।

বিজ্ঞাপনে যে কোম্পানির নাম দেখিয়াছেন, সে রকম কোন কোম্পানি নাই। সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়ার উদ্দেশ্যের ফাঁদ পাতিয়া অপরাধীকে ধৃত করা। আমরা জানিতাম আপনি প্যারীতে ফিরিয়া আসিবেন। সম্ভবতঃ আমেরিকার যাওয়া আপনার উদ্দেশ্য। তাই আমি এইরূপ উপায় অবলম্বন করিয়াছিলাম।"

বাধা দিয়া কারনোয়েল বলিলেন, "থাক্, বেশী কৈফিয়তের প্রয়োজন নাই। আমাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার আপনার কি দরকার, তাই বলুন।"

"সাবধান, এখন আপনি যাহা বলিবেন, সমস্তই আপনার বিরুদ্ধে যাইবে। আপনি অপরাধী, তা জানেন ত?"

"কি অপরাধ?"

রবার্ট মুষ্টি উদ্যত করিয়া ব্রায়ারের অভিমুখে ধাবিত হইলেন।

"মসিয়ে ভরজারসের বাড়ীর চুরীর অপরাধ।"

"পাষণ্ড!" রবার্ট মুষ্টি উদ্যত করিয়া ব্রায়ারের অভিমুখে ধাবিত হইলেন।

দ্বারপার্শ্বে যে ভীমকায় পদাতিক দাঁড়াইয়া ছিল, সে মাঝে আসিয়া না পড়িলে ব্রায়ার প্রহৃত হইতেন। পদাতিক কারনোয়েলের অঙ্গে হস্তোত্তোলন করিল না, শুধু প্রাচীরের ন্যায় মাঝখানে দাঁড়াইল।

ব্রায়ার বলিলেন, "ধৈর্য্য ধরুন। বলপ্রকাশে নিরপরাধ হওয়া যায় না। পাশের ঘরে আরও দুইজন লোক অপেক্ষা করিতেছে। ইঙ্গিত মাত্রেই তাহারা আসিয়া পড়িবে, তখন একা আপনি কি করিতে পারিবেন? শান্ত হ'ন।"

ক্রোধে রবার্টের নিঃশ্বাস রুদ্ধ হইবার উপক্রম হইল; কিন্তু তিনি আত্মসংবরণ করিলেন।

"মসিয়ে ভরজারসের বাড়ী চুরী হইয়াছে। বোধ হয় সে সংবাদ আপনি জানেন। প্যারীর সমস্ত লোকে সে কথার আলোচনা করিতেছে।"

রবার্ট বলিলেন, "আমি নগরে ছিলাম না। সংবাদপত্রও আমি পড়ি নাই। কোনও পরিচিত লোকের সঙ্গেও আমার এ পর্য্যন্ত দেখা হয় নাই। গত বৃহস্পতিবার রাত্রি সাড়ে এগারটার সময় আমি চলিয়া গিয়াছিলাম।"

"সেই রাত্রে, ব্যাগহস্তে আপনি তাড়াতাড়ি কোথায় গিয়াছিলেন?"

"আগে বলুন, এ প্রশ্ন আপনি কেন করিতেছেন?"

বিদ্রূপভরে ব্রায়ার বলিলেন, "বাঃ, আপনার কোনও ধারণাই নাই না কি? রাত্রি এগারটার সময় ব্যাঙ্কারের সিন্দুক অন্য চাবী দিয়া কেহ খুলিয়াছিল। আধঘণ্টা পরেই আপনি চলিয়া গিয়াছেন! এখন বুঝিয়া দেখুন, ঘটনার কি অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য!"

"কি! সিন্দুক হইতে টাকা চুরী গিয়াছে! তাহা হইলে মসিয়ে ভরজারস সর্ব্বস্বান্ত হয়েছেন? অনেক টাকা সিন্দুকে ছিল!"

"আপনি কি করিয়া জানিলেন ?"

"ব্যাঙ্কার যখন এ বিষয়ের আলোচনা করিতেছিলেন, তখন আমি উপস্থিত ছিলাম। ত্রিশলক্ষের অধিক টাকা সিন্দুকে ছিল। সেই টাকা আমি চুরী করিয়াছি ? এত টাকা যে চুরী করে, সে কি আর সে দেশে এক মুহূর্ত্তও থাকে ?"

এই যুক্তি ব্রায়ারের মনে লাগিল। তিনি বলিলেন, "আপনি ভুল বুঝিয়াছেন, আমি আপনাকে চোর বলিতেছি না। সত্য আবিষ্কারের চেষ্টা করিতেছি। আপনি ঠিক বলিয়াছেন যে, আপনি তাড়াতাড়ি পলাইবার চেষ্টা করেন নাই। কিন্তু তবু আপনি প্যারী ছাড়িয়া আপনার জন্মস্থান বৃটানিতে গিয়াছিলেন। আমরা যে গোয়েন্দা তথায় পাঠাইয়াছিলাম, সে আপনাকে দেখিতে পায় নাই।"

রবার্ট বলিলেন, "কি ! গোয়েন্দা লাগাইয়াছেন ? তাহা হইলে এখন আমার দেশের লোক সকলেই জানে আমি চৌর্য্যাপরাধে অপরাধী ?"

"না না, তা নয়। আমরা খুব সাবধানে ও গোপনে কাজ করিতেছি। আমাদের প্রেরিত গোয়েন্দাকে আপনার লোকজন আপনারই কোনও বন্ধু বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিল। তাহারা সংবাদ দেয় যে, আপনি সেখানে নাই, ট্রেণে ফিরিয়াছেন।"

"আমি একেবারে প্যারীতেই আসিয়াছিলাম।"

"বৃটানিতে কি টাকা সংগ্রহের জন্য গিয়াছিলেন ?"

"আমার পৈতৃক ভবনের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে কেহ টাকা দেয় না।"

"কিন্তু আপনার টাকা আছে, কারণ ত্রিশহাজার টাকা আপনি কারবারে খাটাইতে চাহিয়াছেন। আপনার কি ঐ টাকাই পুঁজি ?"

"আমার কাছে পঞ্চাশহাজার টাকা আছে।"

"ঐ টাকা কোথায় পাইলেন ?"

"সে কথায় আপনার কি প্রয়োজন ? ব্যাঙ্কারের ত্রিশ লক্ষ টাকা চুরী গিয়াছে, আমার পঞ্চাশ হাজারে ত আর ত্রিশলক্ষ টাকা হয় না।"

"পুলিশ আদালতে আপনি এ কথা বলিলে, ম্যাজিষ্ট্রেট বলিতেন বাকী টাকা আপনি হয় ত পৈতৃক ভবনে লুকাইয়া রাখিয়াছেন।"

ঘৃণাভরে কারনোয়েল বলিলেন, "আমি তাঁহাকে আমার বাড়ীতে খানাতল্লাসী করিতে বলিতাম।"

"ও কথা থাক্। এখন বলুন ত আপনার পঞ্চাশহাজার টাকা সমস্তই নোট না মোহর।"

"সমস্তই নোট। আপনি এসব কথা কেন জিজ্ঞাসা করিতেছেন ?"

"বলিতেছি। ব্যাঙ্কারের ঐ পঞ্চাশহাজার টাকাই চুরী গিয়াছে।"

"কি আশ্চর্য্য, ত্রিশলক্ষের মধ্যে চোর মোটে পঞ্চাশ হাজার টাকা লইল ?"

"সাধারণ চোরের এ কাজ নয়। সে জন্য আপনার উপরেই আমাদের সন্দেহ হইল।"

"কেন, আরও ত ঢের লোক সেখানে কাজ করে, তবে শুধু আমার উপর সন্দেহ হইল কেন ?"

"হাঁ কাজ করে বটে ; কিন্তু রাত্রিতে কেহ সে বাড়ীতে থাকে না। তা ছাড়া অন্য একটা চাবী দিয়া সিন্দুক খোলা হইয়াছিল। ব্যাঙ্কার বলেন তাঁহার চাবী অনেক সময় আপনি লইয়া থাকিতেন।"

"মিথ্যা কথা।"

"থাক্, চাবীর কথা ছাড়িয়া দিলেও সাঙ্কেতিক শব্দ না জানিলে সিন্দুক খোলা যায় না। আপনি সর্ব্বদা সেই ঘরে যাইতেন ; সুতরাং সে কথাটা হয় ত দেখিয়া থাকিবেন।"

"তা আমি দেখিয়াছি। শব্দটি কুমারী এলিসের নাম। সেইজন্য কি আমার উপর সন্দেহ ?"

"শুধু তা নয়। সিন্দুকে একটা কল আছে। খুলিবার কৌশল না জানিলে লোহার হাত চোরকে গ্রেপ্তার করে। আপনি সে কৌশল জানিতেন। তা ছাড়া আপনি গোপনে তাড়াতাড়ি প্যারী হইতে চলিয়া গিয়াছিলেন।"

"যথেষ্ট হইয়াছে। সামান্য পঞ্চাশ হাজার টাকার জন্য যে আমি এত বড় জঘন্য কাজ করিয়াছি, এ কথা কেহই বিশ্বাস করিবে না। ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে আমায় লইয়া চলুন। আপনার সহিত কথা বলিয়া আমি নিজেকে আর অধিক অপমানিত করিতে চাহি না।"

"বেশ, তাহাই হইবে। কিন্তু পঞ্চাশ হাজার টাকা আপনি কোথা হইতে পাইয়াছেন, তাহার সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ আপনাকে দিতে হইবে। আপনার মাসিক বেতন পাঁচ শত টাকা। তাহা হইতে দুই বৎসরে পঞ্চাশ হাজার টাকা জমাইয়াছেন, এ কথা কে বিশ্বাস করিবে?"

"মাহিনার টাকা হইতে আমি মাসে একশত টাকাও বাঁচাইতে পারি নাই।"

"তবে অত টাকা কোথায় পাইলেন?"

"সে উত্তর বিচারকের কাছে দিব। এই প্রহসন অনেকক্ষণ ধরিয়া অভিনীত হইয়াছে। আর একটি কথাও আমি আপনাকে বলিব না।"

"শুধু পঞ্চাশ হাজার টাকা নয়। সঙ্গে সঙ্গে একটা গহনার বাক্সও চুরী গিয়াছে।"

"কর্ণেল বোরিসফের বাক্স?"

"সে কথাও আপনি জানেন দেখিতেছি?"

"নিশ্চয়। কর্ণেল যখন বাক্সটী চাহিতেছিলেন, আমি সে সময় উপস্থিত ছিলাম। এক দিন সকালে আসিয়া তিনি বাক্সটি লইয়া যাইবেন বলিয়াছিলেন।"

"এ ছাড়া আপনি আর কিছুই জানেন না?"

"না, সেই দিনই আমি বাড়ী ত্যাগ করি।"

"পরদিন খাজাঞ্জি ঘরে ঢুকিয়া দেখেন যে, সিন্দুক খুলিয়া কে বাক্সটি লইয়া গিয়াছে। বিদেশী পৌছিবার ব্যয়-নির্ব্বাহের জন্য চোর পঞ্চাশ হাজার টাকাও লইয়া গিয়াছে।"

"এ অনুমান সঙ্গত।"

"কর্ণেল বোরিসফের এই ধারণা!"

রবার্ট বলিলেন, "তবে কি কর্ণেলের আদেশানুসারেই আমাকে এখানে আনা হইয়াছে?"

"তা নয়। ম্যাজিষ্ট্রেট আপনাকে এখানে আনিতে বলিয়াছিলেন। এটা কর্ণেলের বাড়ী। চলুন তাঁহার কাছে আপনাকে লইয়া যাই।"

কারনোয়েল আর দ্বিরুক্তি করিলেন না। তিনি কর্ণেলের সহিত দেখা করিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। ব্রায়ার দরজা খুলিয়া দাঁড়াইলেন, পাছে কারনোয়েল পলায়নের উপক্রম করেন, এজন্য পদাতিকও দ্বারপার্শে দাঁড়াইল। কিন্তু রবার্টের সেরূপ কোনও উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি সগর্ব্বে উন্নতমস্তকে নির্দ্দিষ্ট কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। কক্ষটি বৃহৎ ও সুসজ্জিত; কিন্তু কর্ণেল তথায় ছিলেন না।

কিছুকাল অপেক্ষা করিবার পর পার্শ্বের একটি দরজা খুলিয়া গেল। কর্ণেল বোরিসফ্ নিঃশব্দে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। যুবককে বসিতে বলিয়া কর্ণেলও আসন গ্রহণ করিলেন।

রবার্ট বলিলেন, "এখানে আপনি আমায় কেন আনাইয়াছেন, শীঘ্র বলুন?"

"কারণ আপনি নিশ্চয়ই জানেন। যিনি আপনাকে আনিয়াছেন, তিনি কি সব বলেন নাই?"

"লোকটি আমায় বলিয়াছেন যে, গ্রেপ্তারী পরোয়ানার বলে আমায় এখানে আনিয়াছেন। কিন্তু সে কথা আমি বিশ্বাস করি না। আপনার আদেশ অনুসারেই এ সমস্ত হইতেছে।"

বোরিসফ্ কএক মুহূর্ত্ত কি চিন্তা করিলেন, তারপর অতি ভদ্রভাবে বলিলেন, "বাঁকা পথে চলিয়াছেন। চৌর্য্যাপরাধ আপনি কি অস্বীকার করিতে পারেন?"

"হাঁ, আপনিই আমার স্কন্ধে উহা অনর্থক চাপাইয়াছেন।"

"শুধু আমি নই। আরও অনেকের এইরূপ বিশ্বাস। শুধু আমার কথা হইলে ভদ্রলোক ভদ্রলোকের কাছে সুবিচার পাইতেন।"

"আপনি ভুলিয়া যাইতেছেন, আমি এখন স্বাধীন নই। আমি যদি মুক্ত হইতাম, তাহা হইলে আমার নির্দ্দোষিতার প্রমাণ দিতাম। তারপর আমার উপর দোষারোপের জন্য আপনার কাছে সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ চাহিতাম; কিন্তু আপনার গৃহে আমি কোনও কথারই উত্তর দিব না।"

"আপনি ভুল বুঝিতেছেন। এই ব্যাপারের যবনিকা এইখানেই পড়িবে কি না, ইহা সম্পূর্ণ আমার ইচ্ছার উপরই নির্ভর করিতেছে।"

"ওঃ! আপনার হাতেই বিচারের ভার নাকি? আমি জানিতাম না যে, আমরা রুষিয়া রাজ্যে বাস করিতেছি।"

"তা নয়, যে দেশেই হউক না কেন, বাদী ইচ্ছা করিলেই মোকদ্দমা তুলিয়া লইতে পারেন।"

"আপনার কথার অর্থ এই যে, আমার সম্বন্ধে আপনি যদৃচ্ছা কাজ করিতে পারেন! আমার তা মনে হয় না।"

"শুনুন মহাশয়! সমস্ত শুনিলে আপনি অবস্থাটা বুঝিতে পারিবেন। আমার বিশ্বাস, আমার কাগজপত্রে যাহার দরকার, সেই আমার বাক্স চুরী করিয়াছে। প্রথমতঃ আপনার উপর আমার কোনও সন্দেহই হয় নাই; কিন্তু যখন ভরজারস্ আমাকে বলিলেন যে, আপনি তাড়াতাড়ি চলিয়া গিয়াছেন, এবং সিন্দুক খোলার কৌশল প্রভৃতিও আপনি জানেন, যে ঘরে সিন্দুক থাকে, সেখানেও আপনি যথেচ্ছ যাতায়াত করিতে পারেন, তখন আমার মনে সন্দেহ হইল। আমি বাক্সটি চাই, তাহা হইলেই সকল গোল মিটিয়া যায়। আর যা চুরী গিয়াছে তাহা অকিঞ্চিৎকর।"

বিদ্রূপভরে রবার্ট বলিলেন, "পঞ্চাশ হাজার টাকা চুরী গেল, সেটা আপনার কাছে তুচ্ছ?"

"হাঁ। মসিয়ে ভরজারস সে ক্ষতি সহ্য করিতে পারিবেন। দরকার হইলে আমি তাহার ক্ষতিপূরণও করিতে পারি। কাগজগুলি ফিরিয়া পাইলেই আমি নিশ্চিন্ত হই। আপনি যে চুরী করিয়াছেন, এ কথা আমার বিশ্বাস হইত না। আপনি পঞ্চাশ হাজার টাকার কথা না বলিলে আমি এতদূর অগ্রসরই হইতাম না।"

"আপনার ভৃত্যকে আমি বলি নাই, টাকাটা কোথা হইতে পাইয়াছি; কিন্তু আপনাকে অনায়াসে বলিতে পারি। তিন দিন হইল আমি ঐ টাকা পাইয়াছি।"

"কাহার নিকট হইতে পাইয়াছেন?"

"আমার পিতার নিকট কোনও লোক টাকা ধারিতেন। এতদিন তিনি সে ঋণ শোধ করিতে পারেন নাই। এখন তিনি সেই ঋণের টাকা পাঠাইয়াছেন।"

"তাঁহার কি নাম?"

"জানি না। একখানি খামের মধ্যে একখানি চিঠি সহ টাকাটা আমি পাইয়াছি। তিনি লিখিয়াছেন যে, আমি অসঙ্কোচে টাকা গ্রহণ করিতে পারি। চিঠিতে স্বাক্ষর ছিল না।"

"চিঠিখানি আপনার কাছে আছে?"

"নিশ্চয়ই।"

"আমাকে পত্রখানি দেখাইবেন?"

"এখন না। বিচারকের কাছে দেখাইব।"

"তা আপনি করিবেন না। কেহ এ কথা বিশ্বাস করিবে না। আমার কথা এই, যিনি টাকা লইয়াছেন, বাক্সও তিনি লইয়াছেন। আপনিই উহা লইয়াছেন, সুতরাং কাগজ আপনার কাছেই আছে। কিংবা কাগজ কোথায় কাহার কাছে আছে, আপনি জানেন। অথবা কাগজগুলি হস্তান্তরিত হইয়াছে। তাহা হইলে আপনাকে আমার সাহায্য করিতে হইবে।"

ঘৃণাভরে রবার্ট বলিলেন, "আপনি এখনও আমায় অপমান করিতেছেন?"

বোরিসফ্ সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিলেন, "আমার প্রস্তাবটি ভাল করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখুন। পুলিশ-কর্ত্তৃপক্ষ জানিতে পারিলে আপনার উদ্ধারের আশা নাই। সমস্ত প্রমাণ আপনার বিরুদ্ধে। আপনার কৈফিয়ৎ অত্যন্ত অবিশ্বাস্য। বাক্সটি লইয়া কি করিয়াছেন জানিতে পারিলেই আমি সমস্ত অনুসন্ধান বন্ধ করিয়া দিব। বিচারককে বলিব যে, আমার কাগজ ফিরিয়া পাইয়াছি। ব্যাঙ্কারকে পঞ্চাশ হাজার টাকা এমন ভাবে অর্পণ করিব যে, তিনি আমার নাম জানিতে পারিবেন না। তার পর ব্যাঙ্কারের কাছে গিয়া বলিব যে, তাঁহার সন্দেহ অমূলক, রবার্ট চুরীর ব্যাপারে সংসৃষ্ট নহেন। প্রকৃত চোর আমি খুঁজিয়া বাহির করিয়াছি। আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, আপনার উপর কাহারও বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকিবে না।"

রবার্ট গম্ভীরভাবে বলিলেন, "যিনি আমাকে এখানে আনিয়াছেন, তাঁহার মনেও সন্দেহ থাকিবে না?"

কিছুক্ষণ চিন্তার পর বোরিসফ্ বলিলেন, "সমস্ত সত্য কথা এখন প্রকাশ করিয়া বলা ভাল। যে আপনাকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছে, সে আমারই প্রধান কর্ম্মচারী।"

"তাহা হইলে আপনি এতক্ষণ মিথ্যা কথা বলিতেছিলেন? কর্ত্তৃপক্ষ এখনও এই চুরীর ব্যাপার জানিতে পারেন নাই? এতক্ষণ এখানে কেবল প্রহসন হইতেছিল? যে রাসকেল আমাকে লইয়া আসিয়াছে, সে আপনারই প্রধান কর্ম্মচারী? আর বদ্‌মাস পদাতিক আপনারই অন্যতম ভৃত্য?"

বোরিসফ্ আত্মসংবরণ করিয়া বলিলেন, "আপনি রাগ

করিতেছেন, আমারও ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিতেছে। কিন্তু আমি তাহা হইতে দিব না। আপনি বংশমর্য্যাদায় আমার অপেক্ষা হীন নহেন। আমার মতই আপনি ভদ্রসন্তান। আমার ক্রোধ উদ্দীপ্ত হইলে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আপনাকে আহ্বান করিব ভাবিয়াছেন; তাহা হইবে না। এখন তাহা হইতে পারে না। যখন আপনিই নিজেকে নির্দ্দোষ প্রতিপন্ন করিতে পারিবেন, তখন আমি আপনার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে পারি। তৎপূর্ব্বে নহে। চৌর্য্যাপরাধে যিনি অভিযুক্ত, তাহার সহিত কেহ দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন না। আমার বাক্স আপনি লইয়াছেন বলিয়া আমার সন্দেহ।"

"কাপুরুষেরা এইরূপেই আত্মপক্ষ সমর্থন করে।"

"আপনি বাজে কথা বলিয়া আসল কথাটা চাপা দিতেছেন কেন? আপনি যদি অপরাধ সহজে স্বীকার না করেন, বাধ্য হইয়া আপনাকে এমন লোকের কাছে লইয়া যাইব, যিনি আপনার নিকট হইতে কথা আদায় করিয়া লইবেন।"

রবার্ট উপেক্ষাভরে বলিলেন, "তাই করুন, মহাশয়!"

"আমি মসিয়ে ভরজারসের কাছে গিয়া বলিব, পুলিশ কমিশনার মহাশয়ের কাছে চলুন। তিনি তৎক্ষণাৎ আমার সঙ্গে যাইবেন।"

"তাই যান। আমার দেশের পুলিশ-কর্ত্তৃপক্ষের কাছে কোনও কথা বলিতেই আমার ভয় নাই।"

"আপনি জানেন না কি, নির্দ্দোষ ব্যক্তি অভিযুক্ত হইলে লোকে তাঁহাকে কিরূপ ঘৃণার চক্ষে দেখে? যদিও আপনি অব্যাহতি পান, আপনার বন্ধুবান্ধবেরা কেহই আপনার সহিত কথা বলিবেন না। মসিয়ে ভরজারসের বাড়ীরও কলঙ্ক, বিশেষতঃ ব্যাঙ্কারের কন্যা—"

"সাবধান, কুমারী ভরজারসের নাম মুখে আনিবেন না।"

বোরিসফ্ প্রশান্তভাবে বলিলেন, "আপনার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল দেখিতেছি! এইবার আমি ঠিক তারে ঘা দিয়াছি দেখিতেছি। এখন বুঝিতে পারিতেছেন, আসল বিপদ্ কোথায়? ইচ্ছা করিলে আপনি কিন্তু এ বিপদ্ হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারেন। আপনি সব কথা খুলিয়া বলুন। আমি সমস্ত গোপন রাখিব, কেহ বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারিবে না।"

"যদি আমি অস্বীকার করি?"

"তাহা হইলে হয় আমি কর্ত্তৃপক্ষের হাতে আপনাকে অর্পণ করিব, নহিলে যতদিন না আপনি স্বীকার করেন, ততকাল এখানে আপনাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিব।"

"আমি একটা প্রস্তাব করিতেছি। ভরজারসের কাছে আমায় লইয়া চলুন, আমি তাঁহার কাছে সমস্ত স্বীকার করিব।"

"ভরজারস্ আপনার কৈফিয়তে কর্ণপাত করিবেন না। তা ছাড়া তিনি আমার উপরেই সমস্ত ভার দিয়াছেন। তাঁহার সামান্য টাকা চুরী গিয়াছে, তাহাতে তাঁহার কোনও ক্ষতি হইবে না।"

"আপনি বলিয়াছেন, টাকা ও বাক্স একই লোকে চুরী করিয়াছে। আমি যদি প্রমাণ করিতে পারি, টাকা আমি লই নাই, তাহা হইলে বাক্স যে আমি লই নাই, তাহা প্রমাণিত হইবে?"

"আপনি এখনও বলিতে চাহেন, আপনি নির্দ্দোষ! দেখিতেছি সহজে আপনি কোনও কথা স্বীকার করিবেন না। কি করিব বলুন, আপনাকে আজ এখানে থাকিতে হইতেছে, আমার দোষ নাই। ভরজারসের কাছে আপনাকে কেমন করিয়া লইয়া যাইব? আমার ত কারাগারের গাড়ী নাই! পথিমধ্যে যে আপনি পলায়ন করিবেন না, কে জানে?"

"আপনার যে সকল ভৃত্য আছে, তাহারা অনায়াসে আমায় লইয়া যাইতে পারিবে। পথের লোককে অবশ্য আমি সাহায্যের জন্য ডাকিব না। আপনিও সঙ্গে চলুন না!"

"আপনার সহিত আমার যাওয়া হইতে পারে না।"

অপমানে, ক্রোধে রবার্টের সর্ব্বশরীর কম্পিত হইল। অতি কষ্টে আবেগ সংবরণ করিয়া তিনি বলিলেন, "আমি যদি শপথ করিয়া বলি, আমি অপরাহ্ণে আপনার কাছে ফিরিয়া আসিব, তাহা হইলে আপনি কি আমায় একবার ছাড়িয়া দিতে পারেন না?"

বাক্সটি কোথায় আছে যে মুহূর্ত্তে বলিলেন, তখনই আপনাকে স্বাধীনতা দেওয়া হইবে।"

"কাহারও সহিত দেখা করিবেন না, কোনও কথা বলিবেন না, এ প্রতিজ্ঞা আপনি বোধ হয় করিবেন না। সুতরাং আমিই বা কি করিয়া আপনাকে ছাড়িয়া দিতে পারি।"

"আমি ভাবিয়াছিলাম, কোনও ভদ্র-সন্তানের সঙ্গে আমি কথা কহিতেছি; কিন্তু আমারই ভ্রম। আপনি শুধুই কারাধ্যক্ষ?"

ঈষৎ হাস্যে কর্ণেল বলিলেন, "প্রতিদিন অপরাহ্ণে এই গৃহেই আপনার শয্যা প্রস্তুত হইবে, আহার্য্য এখানেই পাইবেন। আমার ভৃত্যবর্গ আপনার সমস্ত আদেশ প্রতিপালন করিবে। লাইব্রেরীতে যথেষ্ট বই আছে, আপনি ইচ্ছামত পড়িতে পারেন। ধূমপানের ইচ্ছা হইলে চুরুট আছে, লইবেন। বাক্সটি কোথায় আছে যে মুহূর্ত্তে বলিবেন, তখনই আপনাকে স্বাধীনতা দেওয়া হইবে।"

বলিতে বলিতে বোরিসফ্ কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। দ্বার রুদ্ধ হইয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

'বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি'

এই সেই বৃন্দাবন,
কালিন্দী-হৃদয়-ধন,
নিরমল নীলাম্বর-ক্রোড়-সুপ্ত নব ঘন;
এই সেই বৃন্দাবন,
চিরন্তন শ্যামধন
যেথায় মিলায়ে থাকে ভুলায়ে এ ত্রিভুবন।
কালিন্দী মিলিছে সুখে
শ্যামল বিপিন-বুকে,
শ্যামল বিপিন মিলে অমল গগন-গায়;

মনে বাসি, হেথা আমি
বনে বসি' দিবা যামি
শ্যামময় হ'য়ে থাকি এ শ্যামল একতায়।
নয়ন হেরিবে শ্যাম—
এ নয়ন-অভিরাম,
এ চিত্ত চিন্তিবে শ্যাম—এ চিত্তের চিরসাধ,
পরশে আসিবে শ্যাম—
সমীরণ অবিরাম,
শ্রবণে পশিবে শ্যাম-শ্যামা-স্রোত-কলনাদ।

হেথা কি মধুর দিবা,
নিশিতে মাধুরী কিবা,
হেথা চির পূর্ণোদয় আলোকরা কালচাঁদ ;
সে যে তৃণে তৃণে হাসে,
বারি বিম্বে বিম্বে ভাসে,
প্রতি অণুমাঝে পাতে ভুবন-জড়ান ফাঁদ ।
তরুণ অরুণে আসে,
আকাশে করুণা ভাসে,
অনন্ত আনন্দ ফুটে বিন্দু বিন্দু তারকায়,
সে যে ইন্দুমাঝে রাজে
চির-সুধা-সিন্ধু-সাজে,
মায়াভরা ছায়ারূপে ছড়ায়েছে বসুধায় ।
এইখানে সে খেলেছে,
এইখানে সে ঢেলেছে
অখিল আলস্য-হরা লাস্য-ভরা সুবিলাস ;
কালিয়ের বিষময়
হ্রদ, হৃদি-সুধালয়,
ফণীর সে কাল ফণা জীবনী আশার বাস ।
ওই মধুবন ভরি
র'য়েছে মধুর হরি,
বিধুর বিকল প্রাণে ঢালিতে শীতল ধারা ;
নিধুবনে বিধুসনে
শ্যামকান্তি বিধুধনে
হেরি হেরি হৃদিমাঝে, হ'তেছে যে হৃদিহারা ।

ওই সে কালিয় 'পরে
বংশীধারী বংশী করে,
ওই সেই গিরিধারে গিরিধারী গিরি ধ'রে ;
পুলিনে পুলিনচারী,
বিপিনে বিপিনে তারি
সে রাসবিহারী মূর্ত্তি স্ফূর্ত্তি ভরে নৃত্য করে
তমিস্র তমালতলে
সে অপূর্ব্ব নীলোৎপলে
অমিশ্র অমিয়-রাশি রাশীকৃত দলে দলে ;
অজস্র সে সুধাস্রোত
হ'য়ে আছে ওতপ্রোত
পত্রে তৃণে রেণুমাঝে অণুদলে জলে স্থলে ।
ওই যমুনার কূল,
ওই সে কদম্ব মূল,
সব আবরণ হরি ! লহ হরি' সেই স্বরে ;
প্রতি বীচি চন্দ্রকরে
রাসেশ্বর রূপ ধ'রে
ও প্রসন্ন বনপথে চলিয়াছে প্রীতিভরে ।
নীরদ-নীলিম বারি,
নীল বন সারি সারি,
নীলাম্বর-তলে সব মিলে আছে নীলিমায় ;
এইখানে নিশিদিন
এ নীলে হইয়া লীন,
মধুময় হ'য়ে রব এ মধুর মহিমায় ।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র মিত্র ।

বিচিত্র প্রসঙ্গ।

[দ্বিতীয় কল্প]

১

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এখন অনেকটা সুস্থ হইয়াছেন। আজ কথায় কথায় তাঁহাকে বলিলাম, "সম্প্রতি ডাক্তার কর্ণেল ইউ. এন. মুখার্জ্জি (উপেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়) মহাশয়ের সহিত সমাজ ও সাহিত্য সম্বন্ধে আলাপ করিতেছিলাম। কর্ণেল মুখার্জ্জি বলেন, "সমস্ত উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গ-সাহিত্যের আলোচনা করিয়া দেখিলে একটা বিষয় বেশ বুঝা যায়, পাশ্চাত্য ভাববন্যায় আমাদের সাহিত্য আমাদের সমাজ হইতে বহুদূরে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে; সমাজ রহিল একদিকে, সাহিত্য গড়িয়া উঠিল আর এক দিকে; উভয়ের মধ্যে একটা নাড়ীর যোগ নাই। সাহিত্যের মধ্যে যে সকল ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে, সে সকল কোনও কাজেই আসিল না; বিপুল হিন্দু-সমাজের প্রান্তস্থ বেলাভূমিতে আছাড় খাইয়া যেখান হইতে উদ্ভব সেই খানেই ফিরিয়া গেল; কএকটি মুষ্টিমেয় শিক্ষিতাভিমানী বাঙ্গালীকে ঘিরিয়া ফেনিল হইয়া আবর্ত্তিত হইতে লাগিল মাত্র; কেবলই উচ্ছ্বাস, কেবলই ফেনা, কেবলই আলোড়ন, কেবলই গর্জ্জন। বাঙ্গালার লক্ষ পল্লী স্তব্ধ হইয়া রহিল; রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ কি কথা বলিতে চাহিলেন, কি গান শুনাইলেন, তাহা তাহারা বুঝিতে পারিল না। এ ভাব যেন তাহাদের নয়, এ ভাষা যেন তাহাদের নিজের সুরে বাঁধা নয়; তাহাদের মর্ম্মকথা, তাহাদের কর্ম্মক্ষেত্র, তাহাদের কর্ম্মজীবন এ সাহিত্যের মধ্যে ফুটিয়া উঠিল না। মহাকাল নির্নিমেষ নেত্রে গত শতবর্ষের এই করুণ ট্র্যাজেডির অভিনয় দেখিলেন, দেখিলেন, বাঙ্গালী সন্তান Zeit Geistএর সম্মুখে, Time Spiritএর সম্মুখে, যুগধর্ম্মের সম্মুখে মাথা হেঁট করিয়াছেন; ভুলিয়া গিয়াছেন যে Zeit Geist ছাড়া আর একটা জিনিষ আছে,—Folk Geist, নারায়ণী

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

শক্তি। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত সমস্ত বাঙ্গালী সাহিত্য এই Folk Geist হইতে উদ্ভূত। উদ্যতফণা ভুজঙ্গের সম্মুখে নীড়স্থ পক্ষিশাবকের যে অবস্থা, প্রতীচ্য সভ্যতার সম্মুখে বাঙ্গালী হিন্দুরও সেই অবস্থা; সে ছটফট্ করিতেছে, কিন্তু পলাইতে পারে না।" মুখার্জ্জি সাহেব চুপ করিলেন। আমি বলিলাম,—"সুখের বিষয় এই যে, আমাদের অনেকের এখন এ বিষয়ে চোখ ফুটিয়াছে; পাশ্চাত্য ভাববন্যার প্রথম ধাক্কাটা সাম্‌লাইতে আমাদের

এক শত বৎসর লাগিল বটে, কিন্তু এই শতবর্ষও বোধ হয় ব্যর্থ যায় নাই; আমাদের সমাজের প্রান্তস্থ বেলাভূমিতে একটা পলি পড়িয়াছে। যুগধর্ম্মের সম্মুখে কে না মাথা হেঁট করে? কিন্তু—

The moving finger writes, and having writ moves on.

এই চেতনা, এই জাগরণই আমাদের নবজীবন, আমাদের Renaissance।

রামেন্দ্র বাবু বলিলেন, "কএক বৎসর পূর্ব্বে আমি যখন "মানসী" ও "প্রবাসী" পত্রিকায় আজকালকার বিদেশীয় শিক্ষাপ্রণালীর আলোচনাপ্রসঙ্গে দেশের কথা তুলিয়াছিলাম, তখন কেহই আমার কথায় সায় দিলেন না; বরং কেহ কেহ আমার মস্তিষ্কবিকৃতির আশঙ্কায় আক্ষেপ করিয়াছিলেন। আজ দেখিতেছি আপনারা অনেকেই বলিতেছেন, 'এবার ফিরাও মোরে'।"

আমি বলিলাম, "কাল রবিবাবুর সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলাম। অন্যান্য অনেক কথার পর বিলাতের সাহিত্য ও সমাজের কথা তুলিলাম। বলিলাম, 'আমাদের সাহিত্য ও আমাদের সমাজ ত আপনি বরাবরই দেখিতেছেন; বিরাট্ সমাজদেহটা কোথায় পড়িয়া রহিল, আর হাওয়ার উপরে রামধনুর মত একটা সাতরঙা সাহিত্য গড়িয়া উঠিল। আচ্ছা, বলুন দেখি, আজকালকার বিলাতের সাহিত্য ও সমাজ আপনার কেমন লাগিল? সেখানে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ভাবতরঙ্গ সাহিত্যের মধ্যে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে, এই রকমই ত আমার মনে হয়। সেখানকার সাহিত্য Folk Geist হইতে উদ্ভূত; দেশের লোক যাহা চায়, দেশের সাহিত্যের মধ্যে ভেরী বাজাইয়া তাহা ঘোষিত করিতেছে; নারীবিদ্রোহই বলুন, আর ধনি-নির্ধনের দ্বন্দ্বই বলুন, তাহাদের সাহিত্যে তাহার ছাপ পড়িতেছে। ব্যাভার্ষ্টক্ (Baverstock), এইচ. জি. ওয়েল্স (H. G. Wells), চেষ্টার্টণ (G. K. Chesterton), হিলেয়ার বেলক্ (Hillaire Be lloc), বার্ণার্ড্ শ (Bernard Shaw), ক্যাথ্রিণ টাইনান (Catherine Tynan) প্রভৃতি লেখক লেখিকারা যে সকল কথা ছোট গল্পে, উপন্যাসে, কবিতায়, সন্দর্ভে বলিতেছেন, সে সকল তাঁহাদের নিজের দেশের কথা, নিজের সমাজের কথা। এই যে সাময়িক উত্তেজনায় সংক্ষুব্ধ সমাজের সহিত সাহিত্যের নিবিড় সংশ্রব, ইহা কি সাহিত্যকে খর্ব্ব করিতেছে না?'

রবি বাবু বলিলেন,—'ইহার মধ্যেও একটা নিত্য, শাশ্বত, সনাতন সামগ্রী আছে। এদের সমাজ জাগ্রত, সাহিত্য জাগ্রত; সাহিত্যের উপর সমাজ যে রেখাপাত করিয়া যাইতেছে, সেইটাই আজ কালকার এ দেশের ইতিহাসকে জীবন্ত করিয়া রাখিবে।'

রামেন্দ্র বাবু বলিলেন, "এই বিষয়টা বেশ ভাল করিয়া আলোচনা করিবার সময় আসিয়াছে। ইংলণ্ডে উপন্যাস-সাহিত্য এখন আসর জমাইয়া বসিয়া আছে, সামাজিক ভাবপুষ্টির যথেষ্ট সাহায্য করিতেছে। Disraeli যখন উপন্যাসকে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় শক্তির অনুকূল করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন, তখন আর কেহ সে পথ অবলম্বন করিতে বড় সাহস করে নাই। এখন দেখুন সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সমস্ত কথাই উপন্যাসের ভিতর দিয়া আলোচিত হইতেছে; দেশের লোককে শিক্ষা দিবার, প্রবুদ্ধ করিবার, ইহা একটি প্রকৃষ্ট উপায়। সোশ্যালিজ্ম্, হোমরুল, নারীজাতির সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অধিকার, এ সমস্তই উপন্যাসে প্রতিফলিত হইতেছে। আমাদের দেশেও উপন্যাস অনেকখানি স্থান অধিকার করিয়া বসিয়া আছে। এখন দেখিতে হইবে, সেই উপন্যাসের ভিতর কি কি সমস্যার সমাধানের চেষ্টা হইয়াছে; আদৌ কোনও সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে কি না, বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক।

ডিস্‌রেলি।

"ছেলেবেলায় অনেক বাঙ্গালা উপন্যাস পড়িয়াছিলাম। ইদানীং রবিবাবুর রচিত উপন্যাস ব্যতীত আর কিছু পড়ি না; তাঁহার "গোরাকে" অবলম্বন করিয়া আমি আমার বক্তব্য আরম্ভ করিতে চাহি। "গোরায়" বরাবর আনন্দ পাইয়াছি; শেষটায় কিন্তু সে আনন্দ হঠাৎ নষ্ট হইয়া গেল। গোরা একজন আইরিশম্যানের

ছেলে। ঘটনাচক্রে সে একজন নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণের ঘরে প্রতিপালিত হইয়া আপনাকে ব্রাহ্মণ বলিয়াই জানিত। ভারতবর্ষের হিন্দু সমাজতন্ত্রে যাহা কিছু আছে তাহার প্রতি গোরার একটা উৎকট ভক্তি জন্মিয়াছিল; এমন কি, আমাদের ধর্ম্মে, সমাজে আচারে যে কিছু সঙ্কীর্ণতা ও অনুদারতা আছে, গোরা সে গুলিকেই আঁকড়িয়া ধরিয়াছিল; যেন ভারতের, এবং ভারতের হিন্দু সমাজের সেই গুলোই বিশিষ্ট ভাব; যেন সে গুলো না থাকিলে সমাজ টিকিবে না। গোরার এই ভাবটা এত উৎকট ও উগ্র যে, বোধ হয় খাঁটি ব্রাহ্মণের ছেলে হইলে অত উৎকট হইত না। আইরিশম্যানের ছেলে বলিয়াই তাহার এই ভাবটা অত উৎকট হইয়াছিল। হিন্দুসমাজের এই বিশিষ্টতার সম্বন্ধে, এই সঙ্কীর্ণতার পক্ষে সে যেমন ওকালতী করিয়াছে, অথবা তাহার মুখ দিয়া উপন্যাসের লেখক যেরূপ ওকালতী করিয়াছেন, সে রকম বোধ হয় আর কাহারও পক্ষে সম্ভবপর নহে। হঠাৎ একদিন সে দেখিল যে, সে হিন্দুর ছেলে নহে, হিন্দু সমাজে তাহার কোনও স্থানই নাই; যে আশ্রয় সে সম্পূর্ণভাবে আঁকড়িয়া ধরিয়াছিল, সেখানে তাহার দাঁড়াইবার স্থান নাই; তাহার সমস্ত জীবনটা যেন ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে; যেন আর তাহার কোনও কর্ম্মই নাই; সে জগতের মধ্যে নিরাশ্রয়, একাকী; যতদিন বাঁচিবে, উদ্দেশ্যহীন ও কর্ম্মহীন জীবনের বোঝা লইয়া একাকী মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিতে হইবে। একটা অত্যন্ত করুণ ট্র্যাজেডি সংঘটিত হইয়া গেল; অথচ সমাজতন্ত্রের যে সঙ্কীর্ণতার দরুণ এত বড় কাণ্ডটা ঘটিল, তাহার বিরুদ্ধে একটিও কথা বলিবার রহিল না; সে চিরজীবন ধরিয়া এইটাকেই সমর্থন করিয়া আসিয়াছে। ইটের পর ইট দিয়া চূণ, সুরকী, মসলা দিয়া যেদিন সুরম্য হর্ম্ম্যটি গড়িয়া উঠিল, হঠাৎ ভূমিকম্পে সমস্তটা চুরমার হইয়া গেল। উপন্যাসের নায়কের পঞ্জরাস্থি চূর্ণ হইয়া গেল; পাঠকেরও বুক ধসিয়া গেল; স্বয়ং লেখকেরও সেই দশা হয় নাই কি?

"গোরার এই করুণ tragedy আধুনিক হিন্দু সমাজের একটা বড় সমস্যা নহে কি? ভগিনী নিবেদিতাও ত এক

নিবেদিতা।

দিন বাহির হইতে আসিয়া কায়মনোবাক্যে হিন্দু হইয়াছিলেন; একান্তভাবে সম্পূর্ণভাবে আপনাকে এই হিন্দুসমাজের কার্য্যে নিবেদন করিয়াছিলেন। সমাজ কিন্তু তাঁহাকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে পারে নাই। লোকবিশ্রুত ডাক্তার কুমারস্বামীকেও আমরা সম্পূর্ণ আমাদের লোক বলিয়া পরিচয় দিতে পারি কি? যে জাপানী ভদ্রলোক শ্রীযুক্ত কিমুরা এখানকার সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করিতেছেন, তিনিও বহু চেষ্টায় কোনও হিন্দুর গৃহে থাকিবার স্থান পান নাই। হিন্দুসমাজে এই tragedy বোধ হয় এখন নিত্য অভিনীত হইতে চলিল। যতদিন ভারতবর্ষের চতুঃসীমায় মধ্যেই আমরা আবদ্ধ ছিলাম, ততদিন এ সমস্যাটি তত উগ্র হয় নাই। কিন্তু যে দিন হইতে বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্ক পাতাইতে হইয়াছে,সেইদিন হইতেই এই ব্যাপার চলিতেছে, পরকে আপন করিয়া লইতে পারিতেছি না; সমাজের মধ্যে এবং বাহিরে যাঁহারা আমাদের কল্যাণকামী আছেন তাঁহাদের পক্ষে এই ব্যাপারটি যে খুব ক্ষোভের কারণ হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি বাহির হইতে আসিয়া আমাদের একান্ত আপনার হইতে চায়, ব্যক্তিগতভাবে তাহাকে আমার নিজের ঘরের ভিতর আনিয়া নিঃসঙ্কোচে তাহার সহিত একত্র বসিয়া আহার পর্য্যন্ত করিতে পারি না। ইহাতে যে ব্যথা উপস্থিত হয় না এমন কথা বলি না। সমাজ-সংস্কারক ব্যথিত হন, এবং

এই ব্যবস্থার উচ্ছেদসাধনে যত্নবান্ হন ; ইহা বুঝিতে পারি। আমি কিন্তু আমাদের দেশের প্রাচীন ইতিহাসে ইহার কারণ অন্বেষণ করিয়া মনকে যেন তেন প্রবোধ দিবার চেষ্টা করি।

"এই যে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিবার প্রবল চেষ্টা, এই যে সামাজিক exclusiveness আমাদের আছে, ইহা অস্বীকার করিবার আবশ্যকতা নাই। কিন্তু কেন এমন হইল তাহা বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক ; সমাজ কেমন করিয়া গড়িয়া উঠিল, তাহার অতীত ইতিহাসটা কি, কি কি কারণে এই সকল আচার বিচার সমাজের অঙ্গীভূত হইয়াছে, সে সম্বন্ধে ঐতিহাসিক বিচার দরকার বোধ করি। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সেই বিচার করিতে হইবে, Scientific study of history আবশ্যক। আবার সেই সঙ্গে আপেক্ষিকভাবে অর্থাৎ তুলনামূলক আলোচনাও করিতে হইবে। অন্যান্য সমাজে এ রকম ঘটনা ঘটিয়াছে কি না, তাহার comparative study আবশ্যক। যদি দেখি যে, অন্যত্রও এইরূপ ঘটিয়াছে, তাহা হইলে আমাদের মনকে কতকটা প্রবোধ দিতে পারিব ; এ রকম ঘটনা সত্ত্বেও যদি অন্যান্য জাতি নষ্ট না হইয়া থাকে বা উন্নতি করিয়া থাকে, তাহা হইলে আমাদের আশা আছে। ব্যক্তিগতভাবে আমিও বলিতে চাহি যে, এই রকম করিয়া আমি মনকে প্রবোধ দিয়া থাকি। আমার নিজের এইরূপ স্বভাব দাঁড়াইয়া গিয়াছে, কিঞ্চিৎ বিজ্ঞানচর্চ্চার ফলেই হউক, অথবা আর কিছু হউক, আমার ব্যক্তিগত ঝোঁক এইরূপ দাঁড়াইয়া গিয়াছে। বিজ্ঞানচর্চায় রাগক্ষোভের স্থান নাই ; মঙ্গল অমঙ্গল, ভাল মন্দ, উচিত অনুচিত না দেখিয়া Science অন্বেষণ করিয়া কারণ-নির্দ্দেশে রত থাকে। সমাজ ব্যবস্থাপক বা সমাজসংস্কারক মঙ্গল অমঙ্গল, ভাল মন্দ, উচিত অনুচিত, তুলাদণ্ডে ওজন করিয়া দেখুন ; science, যাহা আছে তাহা কিরূপে হইল তাহা দেখিবে, পৌর্ব্বাপর্য্য নির্ণয় দ্বারা কার্য্যকারণ সম্পর্ক নিরূপণ করিত চেষ্টা করিবে, এই মাত্র। সামাজিক আচার অনুষ্ঠান জটিল না হইয়া সরল হইলে ভাল হইত, এরূপ ক্ষোভ প্রকাশের সময় scienceএর নাই। এই প্রসঙ্গে একটি গল্প মনে পড়িয়া গেল

"স্পেনের এক রাজা জ্যোতিষ অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। সৌরজগতের অন্তর্গত সূর্য্য চন্দ্র এবং গ্রহগণের গতিবিধি অত্যন্ত জটিল বলিয়া বোধ হয় ; বিজ্ঞান এই জটিলতার গ্রন্থিগুলি উন্মোচন করিতে চাহে, এবং ইহার মধ্যে সরল শৃঙ্খলা আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করে। গ্রীসদেশে টলেমি নামক এক পণ্ডিত এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া অনেকটা কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। তাঁহার বহু শত বৎসর পরে টাইকো ব্রাহি আরও একটু সরল করিয়া যে ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহা এইরূপে বুঝাইতে পারি। তিনি কল্পনা করিলেন যে, পৃথিবীকে কেন্দ্র করিয়া সূর্য্য তাহার চারিদিকে চক্রাকারে প্রদক্ষিণ করিতেছে। যেন একখানি বৃহৎ অদৃশ্য চক্র আছে, তাহার নাভি হইল পৃথিবী, আর তাহার নেমিতে অর্থাৎ পরিধিতে সূর্য্য বেড়াইতেছে। আবার সেই সূর্য্যকে কেন্দ্র অথবা নাভি করিয়া ছোট বড় আরও অনেকগুলি অদৃশ্য চাকা আছে। সেই এক একখানি চক্রের পরিধিতে বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি প্রভৃতি এক একটি গ্রহ ঘুরিতেছে। পৃথিবী এবং সূর্য্য উভয়েই যদি স্থির থাকিত, তাহা হইলে বুধাদি গ্রহের আপনাপন চক্রোপরি গতি তত জটিল দেখাইত না। কিন্তু বুধাদি গ্রহ যে সকল চক্রে ঘুরিতেছে তাহাদের নাভিস্থিত সূর্য্য স্থির না থাকিয়া নিজেও এক বৃহৎ চক্রোপরি ঘুরিতেছেন। ঘুরন্ত চাকার উপরে চাকা ঘুরিতেছে ; পৃথিবী স্বস্থানে স্থির থাকিয়া গ্রহগণের এই গতিবিধি দেখিতেছে ; কাজেই পৃথিবীর চোখে গ্রহগণের গতিবিধি অত্যন্ত জটিল হইয়া পড়িয়াছে। টলেমি (এবং তাঁহার পরবর্ত্তী জ্যোতিষীরা) এইরূপ কল্পনা করিয়া গ্রহগণের গতিবিধির মধ্যে কতকটা শৃঙ্খলা আনয়ন করিয়াছিলেন ; কিন্তু কার্য্যতঃ দেখা গেল যে গতিবিধির জটিলতার সব কথা ইহাতেও পরিষ্কার হয় না। গ্রহগুলি যে সূর্য্যকেন্দ্রকচক্রে ঘুরিতেছে, সেই চাকার উপরে আরও ছোট ছোট চাকা কল্পনা করিতে হয় ; তাহাতেও যদি না কুলায়, তাহা হইলে আরও ছোট চাকার কল্পনা করিতে হয়। পরবর্ত্তী পণ্ডিতেরা তাহাই করিয়াছেন।...এই পর্য্যন্ত শুনিয়া রাজা বলিলেন যে, বড় চাকার (cycle) উপরে ছোট চাকা (epicycle) বসাইয়া ভগবান্ জিনিষটাকে অত্যন্ত জটিল করিয়া ফেলিয়াছেন,

সৃষ্টির সময় তিনি উপস্থিত থাকিলে স্রষ্টকর্ত্তাকে সৎপরামর্শ দিতে পারিতেন।

"বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সর্ব্বত্রই চাকার উপর চাকা বসাইয়া শৃঙ্খলা ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করে। বৈজ্ঞানিক বিধাতা-পুরুষকে পরামর্শ দেন না, কেমন করিয়া জটিল না করিয়া সরল করা যাইত। পদে পদে বাধা পাইতে হয়, প্রতিহত হইতে হয়; কিন্তু বৈজ্ঞানিক ক্ষোভ প্রকাশ করেন না, বিধাতাপুরুষের জবাবদিহি চাহেন না। বস্তুতঃ এরূপ না হইলে ভাল হইত, এরূপ নির্দ্দেশ বিজ্ঞানবিদ্যার কাজ নহে; উহা বলিবার তাহার অধিকার পর্য্যন্ত নাই।

"আজকাল বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত মনুষ্যসমাজকে যন্ত্রহিসাবে দেখিতেছেন; জড়যন্ত্র নহে, জীবন্ত যন্ত্র হিসাবে দেখাই এখন রীতি। ঘড়ি, এঞ্জিন, সৌরজগৎ প্রভৃতি জড়যন্ত্র; গাছ, লতা, জন্তুদেহ প্রভৃতি জীবন্ত যন্ত্র। পিপীলিকার বা জীবাণুর শরীরের মধ্যে যে জটিলতা আছে, তাহা অত বড় সৌরজগৎটায় নাই। জীবদেহের সহিত তুলনা করিয়া মনুষ্যসমাজ-দেহকেও যন্ত্রবদ্ধ organised structure বলা হয়। জীবের যেমন জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয়, অস্থি মজ্জা প্লীহা যকৃৎ প্রভৃতি আছে, সমাজদেহেরও সেই রকম আছে। জীবদেহের প্রত্যেক অঙ্গের যেমন এক একটা কাজ বা function আছে, সমাজদেহেরও তাই। জীবদেহের মত সমাজেরও জন্ম, বৃদ্ধি, জরা, মরণ প্রভৃতি কল্পনা করা হয়। জীবন জিনিষটা কি, তাহা বলা কঠিন। হার্ব্বার্ট স্পেন্সরের definition এ কাজ চলিতে পারে। তিনি বলেন, জীবনটা আর কিছু নহে, a continuous adjustment of internal relations to external relations, পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত দেহের আভ্যন্তরীণ অবস্থার সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার অবিরাম চেষ্টা। এই যে external relations

হার্ব্বার্ট স্পেন্সার।

বাহিরের পারিপার্শ্বিক অবস্থা, আজকাল ইহাকে environment বলে। জীব অবিরত আপনাকে সেই পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে সমঞ্জস করিবার জন্য ব্যস্ত। এই অবিরাম, ধারাবাহিক চেষ্টার পরম্পরাই জীবন; এই চেষ্টার একমাত্র উদ্দেশ্য, জীবনটাকে যতদিন পারে রক্ষা করা। যে দিন এই চেষ্টার আরম্ভ, সেই দিন জীবের জন্ম হয়; যে দিন এই চেষ্টার অবসান, সেই দিন তাহার মৃত্যু। জীবনের রক্ষা, পুষ্টি, বৃদ্ধি ও উন্নতির জন্য যাহা কিছু আবশ্যক, সে সমস্তই বাহিরের পারিপার্শ্বিক জগৎ হইতে আহরণ করিয়া লইতে হয়; জল, বায়ু, খাদ্য সামগ্রী প্রভৃতি সমস্ত উপকরণই বাহ্য জগৎ হইতে গ্রহণ করা হইতেছে। অন্যদিকে জীবের environment কিন্তু ক্রমাগতই জীবকে নষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছে; রৌদ্র, বৃষ্টি, শীতাতপ, অগ্নিদাহ, ভূমিকম্প, স্বজাতীয় বিজাতীয় নানা শত্রু জীবনটাকে নষ্ট করিতে চাহে। ইহাদিগের মধ্যে কতকগুলি শত্রু জড়, আর কতকগুলি জীব; জড় শত্রু ও জীব শত্রু হইতে আত্মরক্ষা আবশ্যক। শুধু তাহাই নহে; আপনাকে শত্রুর হাত হইতে রক্ষা করিয়া, যতটা পারা যায় সেই সব শত্রুকে মিত্র রূপে পরিণত করিতে হইবে। জীবদেহের সমস্ত যন্ত্রগুলি এই উদ্দেশ্যের অনুযায়ী হইয়া গঠিত হইয়াছে; তাহা না হইলে তাহাদের কোনও সার্থকতা নাই। দুঃখের বিষয় এই যে, এই সামঞ্জস্য কোনও কালেই সম্পূর্ণ হয় না; যদি হইত, তাহা হইলে বোধ হয় জরা, মরণ, দুঃখের কোনও কারণই থাকিত না। সামঞ্জস্য নাই বলিয়াই উন্নত জীবের যত কিছু ক্লেশ; এবং বাৰ্দ্ধক্যপ্রাপ্তি ও মরণ। আবহমান কাল ধরিয়া এই সামঞ্জস্য সাধনের দিকে একটা গতি আছে, চেষ্টা আছে; কিন্তু পুরা সামঞ্জস্য হয় না। এই যে ষোল আনা সামঞ্জস্য কখনও ঘটে না, অথচ ক্রমাগত একটা চেষ্টা আছে, এইটাকেই জীবনের প্রধান লক্ষণ বলিয়া ধরিতে পারা যায়। জড়যন্ত্রের সামঞ্জস্য প্রায় ষোল আনাই দেওয়া যাইতে পারে; এমন কি সৌরজগতের এত জটিলতা সত্ত্বেও প্রায় ষোল আনা সামঞ্জস্য আছে; লাপ্লাস প্রতিপন্ন করেন যে, এত জটিলতা সত্ত্বেও সৌরজগৎ কখনও ভাঙ্গিয়া পড়িবে না। আজকালকার পণ্ডিতেরা এতটা সাহস করেন না; তাঁহারা বলেন যে, অন্যান্য জড়যন্ত্রের মত

সৌরজগৎটাও কালক্রমে একদিন অকর্ম্মণ্য হইয়া যাইতে পারে।

"জীবদেহের সামঞ্জস্যের অভাব খুব বেশী। দেহযন্ত্রের গঠনপ্রণালীর ও কার্য্যপ্রণালীর পর্য্যালোচনা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। কিন্তু যাঁহারা শারীর-বিদ্যা আলোচনা করেন, তাঁহারা জানেন যে, এই দেহযন্ত্রের মধ্যে কোনও যন্ত্রই সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ নহে। Optical যন্ত্র হিসাবে চক্ষুতে নানা দোষ বর্ত্তমান। হেলম্‌হোলজ্‌ তন্ন তন্ন করিয়া আলোচনা করিয়া বলিয়াছেন যে, যন্ত্র হিসাবে মানুষের চোখে এত দোষ বর্ত্তমান আছে যে, যদি কোনও যন্ত্রনির্ম্মাতা এই রকম একটা যন্ত্র তৈয়ার করিয়া তাঁহার নিকট লইয়া আসিত, তাহা হইলে তিনি সেটাকে কখনই গ্রহণ করিতেন না; স্পেনের সেই রাজার মত বলিতে পারিতেন যে, সৃষ্টিকালে উপস্থিত থাকিলে এ রকম যন্ত্র হইতে দিতেন না। চক্ষুর মত অন্যান্য যন্ত্রগুলাও সামান্য কারণে বিকৃত হয়, অনেক সময়ে ডাক্তার কিছুই করিতে পারেন না। পারিপার্শ্বিক অবস্থার, Environmentএর পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে জীবের দেহ-যন্ত্র সমঞ্জস রাখিতে পারা যায় না। এই যে mal-adjustment অসামঞ্জস্য, ইহাই সমস্ত ব্যাধির, সমস্ত ক্লেশের, সমস্ত দুঃখের অমঙ্গলের এবং শেষ পর্য্যন্ত মরণের হেতু।

"পারিসের পাস্তর ইন্‌ষ্টিটিউটের অধ্যক্ষ প্রসিদ্ধ জীব-বিদ্যাবিৎ মেচ্‌নিকফ (Metchnikoff) জীবদেহে নানা ব্যাধির উৎপত্তি সম্বন্ধে নূতন নূতন তথ্য আবিষ্কার করিয়া চিকিৎসাশাস্ত্রে যুগান্তর আনিয়াছেন। Bacteriology জীবাণু-বিদ্যায় তাঁহার সমকক্ষ আর কেহ নাই। তাঁহার Nature of man পুস্তকখানি সরল সুবোধ্য ভাষায় লিখিত; সকলেরই উহা পাঠ করা উচিত। ঐ পুস্তকের প্রতিপাদ্য বিষয় হইল Origin of Evil, অমঙ্গলের হেতু কি? তিনি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, মানুষের যাবতীয় অমঙ্গল বাহ্যজগতের সঙ্গে মানবদেহের পূর্ণ সামঞ্জস্যের অভাব হইতে উদ্ভূত; এই অসামঞ্জস্যই সমস্ত অমঙ্গলের, ক্লেশের, দুঃখের হেতু। দেহের সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিজ নিজ কর্ত্তব্যের কতকটা উপযোগী বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ নহে; বাহ্যজগতে কোনও রকম পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইলে আপনাদিগকে তাহার অনুযায়ী করিয়া লইবার ক্ষমতা কতকটা আছে, কতকটা নাই; বহিঃশত্রুর আক্রমণ নিরাকরণের ক্ষমতা কতকটা আছে, কতকটা নাই। আবার শরীরের মধ্যে এমন যন্ত্র আছে, যাহাদের অস্তিত্ব অনাবশ্যক; শুধু যে অনাবশ্যক তাহা নহে, অনেক সময়ে তাহারা অনিষ্ট করিয়া বসে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে,—Vermiform appendix। ইহার কোনও কাজ (function) নাই, অথচ ইহা মারাত্মক ব্যাধির স্থান; পেটের মধ্যে মোটা অন্ত্রের (large intestines) সহিত সরু অন্ত্রের (small intestines) সংযোগস্থলে ওটা আছে, জোঁকের মত ঝুলিয়া আছে; তাই উহার ঐ রকম নামকরণ হইয়াছে। খাদ্য দ্রব্য পরিপাকের পর তাহার বর্জ্জনীয় অংশ মোটা অন্ত্রের মধ্যে যাইবার সময় কখনও কখনও ঐ appendixএর মধ্যে প্রবেশ করে; তাহার ফলে মারাত্মক appendicitis ব্যারাম হয়। এই রূপ যন্ত্র আরও আছে। এই অনাবশ্যক যন্ত্রটির সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত স্পেনের রাজা কি বলিতেন?

"মানুষের সকল ভয়ের মধ্যে প্রধান ভয়—জরা ও মরণ; এই দুইটা তাহাকে যতটা অভিভূত করিয়া রাখিয়াছে, ততটা আর কিছুতে নহে। রাজপথে ভ্রমণ করিবার সময় বুদ্ধদেব

বুদ্ধ।

জরা মরণ দেখিতে পান; মানুষকে এই জরা-মরণের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার মহাভিনিষ্ক্রমণ হইল।

এই মরণটা কিরূপে এবং কেন পৃথিবীতে আসিল, এই প্রশ্নই ইহুদি ধর্ম্ম-শাস্ত্রের গোড়ার কথা। এই মরণভয়ের হাত হইতে মানুষকে রক্ষা করিবার জন্য যীশুখৃষ্ট অবতীর্ণ

খৃষ্ট।

হইয়াছিলেন। মেচ্‌নিকফ্ ঐ পুস্তকে যাবতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনা করিয়াছেন; বেদান্ত, বৌদ্ধ, খৃষ্টীয়, ইস্‌লাম ধর্ম্ম Theism, pantheism; এবং প্লেটো হইতে আরম্ভ করিয়া কাণ্ট্, হেগেল প্রভৃতি যাবতীয় দর্শনশাস্ত্রও আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, সমস্ত ধর্ম্ম এবং সমস্ত দর্শনশাস্ত্র এই মরণের ভয় নিবারণের জন্য ব্যর্থ চেষ্টা করিয়াছে। মরণভয় হইতে কিছুতেই নিষ্কৃতি নাই দেখিয়া এই সকল ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক ও দর্শনপ্রবর্ত্তক কল্পনা করিয়া লইয়াছেন যে, মানুষ মরিয়াও মরে না; দেহ নষ্ট হয় বটে, কিন্তু মানুষটা কোনও রকমে চিরকালের জন্য টিকে যায়, কিংবা জন্মান্তর পরিগ্রহ করে। তাঁহার মতে ইঁহারা সকলেই আত্ম-প্রতারণা করিয়াছেন। ধর্ম্ম বা দর্শনশাস্ত্র মানুষকে অভয় দিতে পারে না, বিজ্ঞান বরং কিছু অভয় দিতে পারে। প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ওয়াইজমান মরণ হইতে নিষ্কৃতির আশা জীবকে দেন না; অতি নিম্ন পর্য্যায়ের জীব, যাহাদের শরীর কেবল একটি মাত্র কোষে (cell) নির্ম্মিত, তাহারা

ক্যাণ্ট।

মরিতে বাধ্য নয়। কিন্তু একটু উচ্চ স্তরের জীব (যাহাদের দেহ বহু কোষে নির্ম্মিত) মরিতে বাধ্য। তাহারা মৃত্যুরূপ মূল্য স্বীকার করিয়া এই উচ্চ পদবী লাভ করিয়াছে। মেচ্‌নিকফ্ কিন্তু এতটা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন; তবে তিনিও এখন পর্য্যন্ত মৃত্যুর হাত এড়াইবার উপায় আবিষ্কার করিতে পারেন নাই, কিংবা কোনও আশা দিতেও পারেন নাই। তিনি বলেন যে, মরণটা তত ভয়ের জিনিষ নহে; কাল পূর্ণ হইলে ক্লেশহীন মরণ ভয়ঙ্কর নহে। মানুষ মরণকে ভয় করে না; জরা ও অকাল-মরণকে ভয় করে। এ দুইটা অনেকটা নিবারণ করা যাইতে পারে। এখনই কিছু কিছু সাধ্য হইয়াছে; ভবিষ্যতে আরও হইবে। মানুষের রক্তে কতকগুলা লাল ও শ্বেত কণিকা সঞ্চরণ করে; লাল কণিকা বাতাসের Oxygen লইয়া শরীরকে শোধন করে, শ্বেত কণিকা দেহকে রক্ষা করে; বাহির হইতে কোনও অনিষ্টকর দ্রব্য বা রোগের বীজ শরীরে প্রবেশ করিলেই ঝাঁকে ঝাঁকে শ্বেত কণিকা সেখানে আসিয়া সেটাকে নষ্ট ও জীর্ণ করিতে চায়। সমাজদেহের তুলনায় ইহারা পুলিশ ও সৈনিকের কাজ করে। ইহাদের স্বভাব কতকটা রাক্ষসের মত; ইহারা রোগের বীজকে খাইয়া ফেলে ও জীর্ণ করিবার চেষ্টা করে। জীব যখন যৌবন অতিক্রম করে, তখন এই সকল রক্ষকেরাই ভক্ষক হইয়া

দাঁড়ায়; বাহিরে শত্রু ধ্বংস করার সঙ্গে শরীরের tissueও ধ্বংস করে। বার্দ্ধক্যে যে শরীর ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, ও দৌর্ব্বল্যের লক্ষণ উপস্থিত হয়, ইহাই তাহার একটা কারণ। দেহযন্ত্রের সামঞ্জস্যের এই এক গোলযোগ যে, যন্ত্রের এক অংশ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আর এক অংশকে নষ্ট করিতে চায়।

"জরার আর একটা কারণেরও নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে,—উল্লিখিত মোটা অন্ত্রটা। এটা অনাবশ্যক পরিমাণে দীর্ঘ। খাদ্য পরিপাকের পর বর্জ্জনীয় অংশ এইখানে সঞ্চিত থাকে। খাদ্য দুই রকম,—জন্তুজ ও উদ্ভিজ্জ। মাংসাদি জন্তুজ খাদ্য সহজে হজম হয়, বর্জ্জনীয় অংশও অল্প; কাজেই অল্প পরিমাণ হইলেও দেহ রক্ষায় সমর্থ; উদ্ভিজ্জ খাদ্য সহজে হজম হয় না, বর্জ্জনীয় ভাগও বেশী; তাই বেশী পরিমাণে খাইতেও হয়। মানুষের পূর্ব্বপুরুষ বানর বা বনমানুষ জাতীয় ছিল, তাহারা মুখ্যতঃ উদ্ভিজ্জভোজী ছিল; তাহাদের অন্ত্রটাকে বোঝাই করিবার জন্য ও শরীর রক্ষার জন্য বেশী খাদ্য আবশ্যক ছিল; কাজেই অন্ত্র সেই পরিমাণে দীর্ঘ ছিল। মানুষ উত্তরাধিকারসূত্রে সেই দীর্ঘ অন্ত্র লাভ করিয়াছে; অথচ মানুষ জন্তুজ খাদ্য হজম করিতে পারে; কাজেই মানুষের পক্ষে অত লম্বা অন্ত্র অনাবশ্যক। মাংস সহজে হজম হয়, অল্প মাত্রায় চলে, উদ্ভিজ্জের চেয়ে পুষ্টিকর; এ সকল সত্ত্বেও কেবল অন্ত্রটাকে বোঝাই করিবার জন্য মানুষকে বহুপরিমাণে উদ্ভিজ্জ খাদ্য খাইতে হয়। কেবল যে চাল, গম, যব প্রভৃতি উদ্ভিজ্জের মধ্যে সার পদার্থ খাইতে আরম্ভ করা হয়, তাহা নহে; শাক, পাতা, তরকারি প্রভৃতি জিনিষ, যাহার অধিকাংশই বর্জ্জনীয়, শরীরপুষ্টির পক্ষে যাহা প্রায় কোনও কাজেই লাগে না, তদ্দ্বারা মোটা অন্ত্রকে বোঝাই করিতে হয়। অন্ত্রমধ্যে এই আবশ্যক আবর্জ্জনাবহন যে কেবলমাত্র ভারবহন তাহা নহে; ইহা নানাবিধ রোগেরও নিদান; জরার ইহা একটা প্রধান হেতু। অন্ত্রনাড়ীর ভিতরে নানা জীবই বাস করে। ইহাদিগের অধিকাংশই উদ্ভিজ্জ শ্রেণীভুক্ত; ইহারা সঞ্চিত আবর্জ্জনা পাইলেই একটা যেন মহোৎসবে মাতিয়া যায়। প্রচুর খাদ্য পাইয়া একটা জীবাণু হইতে কোটি জীবাণু উৎপন্ন হয়। যত সংখ্যায় বাড়িতে থাকে, ততই তাহারা একটা বিষময় পদার্থ উদ্গীরণ করিতে থাকে; বিষটা উগ্র না হইলেও অতি ধীরে ধীরে সমস্ত শরীরে বিস্তারলাভ করিয়া শরীরের অন্যান্য tissueকে ও ধাতুকে আক্রমণ করিতে থাকে। প্রধানতঃ এই সমস্ত বিষাক্ত পদার্থেরই বহুদিনের ক্রিয়ার ফলে বার্দ্ধক্যের নানাপ্রকার বিকার আসিয়া উপস্থিত হয়। যে সকল নাড়ীর ভিতর দিয়া রক্ত সঞ্চালিত হয়, সেগুলি ক্রমশঃ কাঠিন্যপ্রাপ্ত হয়; রক্ত তাহার ভিতর দিয়া জোর করিয়া ঠেলিয়া প্রবাহিত হইতে চেষ্টা করে; খুব বেশী টান পড়িলে নাড়ী ছিঁড়িয়া পক্ষাঘাত হয়; ক্রমশঃ স্নায়ুযন্ত্রের তারেরও স্থিতিস্থাপকতা নষ্ট হইয়া যায়। এইগুলি বার্দ্ধক্যের, বিশেষতঃ অকাল-বার্দ্ধক্যের সাধারণ লক্ষণ; বার্দ্ধক্যের, জরার ও অকালমৃত্যুর সাধারণ কারণ। যতদিন না ঐ অনাবশ্যক বড় অন্ত্রটা ছোট হইয়া যায়, ততদিন উহা রোগের আকর হইয়া থাকিবে। আপাততঃ এই ব্যাধির হাত এড়াইবার জন্য মেচ্‌নিকফ একটা ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। রীতিমত দধি সেবন করিলে ঐ দুষ্ট জীবাণুগুলি মরিয়া যায়; অতএব বাল্যকাল হইতে দই খাইলে বার্দ্ধক্যের ও অকাল-মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যাইতে পারে। অতএব যদি মৃত্যুভয় হইতে মুক্তি চাও, তবে বুদ্ধ, প্লেটো, খৃষ্টের বুজরুকির দরকার নাই; দই খাও।"

* * *

রামেন্দ্র বাবু চুপ করিলেন। কোথায় রবি বাবুর 'গোরা', আর কোথায় Metchnikoffএর দই খাওয়ার ব্যবস্থা। কিন্তু বিচিত্র প্রসঙ্গে কোনও কিছুরই অসামঞ্জস্য নাই। আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনিতেছিলাম। চমক ভাঙ্গিয়া গেলে দেখিলাম, সম্মুখে এক বাটী—দই নহে, চা। হায় মেচ্‌নিকফ্! তোমার বড় অন্ত্রের কথায় আমার অন্ত্রস্থ জীবাণুগুলি বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল; রক্তবহ নাড়ী ক্রমশঃ কাঠিন্যপ্রাপ্ত হইতেছিল। অনাবশ্যক বড় অন্ত্রটাকে যখন বহন করিতেই হইবে, তখন দধি অভাবে অন্ততঃ চা খাওয়াটাই প্রশস্ত।

* * * *

রামেন্দ্র বাবু পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত আভ্যন্তরীণ অবস্থার সামঞ্জস্য যদি

একেবারেই না হয়, তাহা হইলে জীবের মৃত্যু। আবার পুরা ষোল আনা সামঞ্জস্য হইলে, সামঞ্জস্য-স্থাপনের চেষ্টা থাকে না; তাহারও ফল, মৃত্যুর তুল্য, জড়ত্ব; কারণ, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, এই সামঞ্জস্যের চেষ্টার পরম্পরাই জীবনের নামান্তরমাত্র। এই ষোল আনা সামঞ্জস্য জড় পদার্থেই সম্ভব; জীবে নহে। জড়ও বোধ করি পূর্ণ সামঞ্জস্য লাভ করিতে পারে না।

"সামঞ্জস্য স্থাপিত হইলেও তাহা বেশী দিন স্থায়ী হয় না; কারণ পারিপার্শ্বিক অবস্থাটা পরিবর্ত্তনশীল। একই দেশে নানা পরিবর্ত্তন; দেশভেদে পরিবর্ত্তন ত আছেই; তদ্ব্যতীত ভূমিকম্প, জলপ্লাবন প্রভৃতি আকস্মিক পরিবর্ত্তনও আছে; ভূপৃষ্ঠের যুগব্যাপী পরিবর্ত্তন আছে। এককালে মেরুপ্রদেশেও হয়ত মনুষ্য বাস করিত; তখন য়ুরোপের উত্তর খণ্ডে সিংহ,শার্দ্দূল বিচরণ করিত। Glacial Epoch বা হিমানীযুগ আসিল; সমস্ত মহাদেশটা বরফে মণ্ডিত হইয়া গেল। আবার নূতন যুগ আসিল; সেই বরফের আস্তরণ সরিয়া গেল। এই সকল আকস্মিক পরিবর্ত্তনের সঙ্গে জীবেরও পরিবর্ত্তন হয়; নহিলে সামঞ্জস্য রক্ষা হয় না। যে সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে না পারে,সে লোপ পায়; ম্যামথ্, ম্যাষ্টডন লোপ পাইয়াছে।

"কিন্তু জীবের প্রধান শত্রু জীব। খাবার কাড়াকাড়ি করিতে সকলেই ব্যস্ত। আবার জীবের মধ্যে খাদ্য-খাদক সম্বন্ধও রহিয়াছে। আবার নূতন জীবের আবির্ভাবে অন্যান্য জীবের জীবন-প্রণালী পরিবর্ত্তিত হয়; প্রাণিবিদ্যার অনুশীলন করিলে ইহার দৃষ্টান্ত অনেক পাওয়া যায়। অষ্ট্রেলিয়ায় আগে খরগোস ছিল না। যখন উপনিবেশ স্থাপিত হয়, বিদেশী মানুষের সঙ্গে শশকও প্রবেশলাভ করে। এখন শশকের এত বংশবৃদ্ধি হইয়াছে যে, ক্ষেতের ফসল রক্ষা করা দায় হইয়া উঠিয়াছে; অন্নের জন্য শশকের সহিত মানুষের বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে।

"জীবের ব্যক্তিগত জীবনটা যেমন তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য-স্থাপনের প্রয়াস, তাহার জাতিগত জীবনটাও সেইরূপ পরিবর্ত্তনশীল environmentএর সঙ্গে সামঞ্জস্য-স্থাপনের প্রয়াস। যুগযুগান্তর ধরিয়া এইরূপ হইতেছে। ইহার ফলে নূতন নূতন জাতির উদ্ভব হয়। যে জাতি অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে পরিবর্ত্তিত করিতে পারিল, সেই জাতিই টিকিয়া গেল; যে পারিল না, সে মরিল। যে টিকিয়া গেল, সে হয় ত নূতন চেহারায় দেখা দিল, নূতন অবয়ব প্রাপ্ত হইল।

"তাহা হইলে দাঁড়াইল এই যে, বাহিরের পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্ত্তন না হইলে, জীবের আভ্যন্তরীণ অবস্থার পরিবর্ত্তন আবশ্যক নহে; জীব তখন রক্ষণশীল, Conservative। বাহিরের পরিবর্ত্তন হইলে এই রক্ষণশীলতার ব্যতিক্রম আবশ্যক হয়, Variation আসিয়া পড়ে; নহিলে সামঞ্জস্য-রক্ষা হয় না। প্রথমটাকে বলা যাইতে পারে—স্থিতিশীলতা, Principle of stability; অপরটাকে বলা যাইতে পারে—সামঞ্জস্যপ্রয়াস, liberalism or principle of adaptability। জীববিদ্যায় (Biology) প্রথমটার নাম—Heredity, বংশানুক্রম; অপরটার নাম Variation, ব্যতিক্রম। Heredityর ফলে ছেলে ঠিক বাপের মত হইত, যদি Variation ব্যতিক্রম না ঘটিত। এই দুইটি principleকে সত্য বলিয়া মানিয়া লইয়া assume করিয়া ইদানীং জীবতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতমণ্ডলী অভিব্যক্তিবাদের (Evolution) ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করেন। এই Variation কেন হয়, সে সম্বন্ধে তাঁহাদিগের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ আছে। এখানে জীববিদ্যাসংক্রান্ত কএকটি মতের উল্লেখ করা যাইতে পারে—তাহাতে বিচিত্রপ্রসঙ্গের বৈচিত্র্য বর্দ্ধিতই হইবে।

লামার্ক্।

"প্রথমেই লামার্ক্‌কে লইয়া আরম্ভ করিতে হয়। তিনি গোড়া হইতে ধরিয়া লইলেন যে, জীব আপনার চেষ্টা ও অভ্যাসের দ্বারা আপনার আভ্যন্তরীণ অবস্থা পরিবর্ত্তিত করিতে পারে; এবং সেই চেষ্টার দ্বারা যে পরিবর্ত্তন হয়, তাহা পুরুষানুক্রমে সংক্রামিত হয়। বহুযুগব্যাপী পুরুষ-পরম্পরাগত পরিবর্ত্তনের ফলে সেই জীবের আগাগোড়া বদলাইয়া যাইতে পারে; সে একটা নূতন জীব দাঁড়াইয়া যায়। কর্ম্মকার আজীবন হাতুড়ি পিটিয়া গেল; তাহার পুত্র-পৌত্রাদিও হাতুড়ি পিটিয়া জীবন কাটাইল; পরে ক্রমশঃ তাহার বংশধর শক্ত পেশী লইয়া জন্মগ্রহণ করিবে।

এই রকমে মানুষের মধ্যে একটা শক্ত পেশীওয়ালা কামার জাতির উদ্ভব হইতে পারে। জিরাফ্ Giraffe দেখিতে এককালে হরিণের মতই ছিল; হয় ত কোন বিস্মৃত Geologic যুগে বনের গাছগুলা ক্রমশঃ কিছু লম্বা হওয়ায় Giraffe গলা বাড়াইয়া গাছের পাতা খাইতে চেষ্টা করিল। প্রত্যেক পুরুষের চেষ্টার ফল পরপুরুষে সংক্রান্ত হইয়া পুরুষপরম্পরাক্রমে গলা লম্বা হইয়া গিয়াছে। যে গলা লম্বা ছিল না, বহুপুরুষের চেষ্টায় তাহা অত্যন্ত লম্বা হইয়া হরিণ জিরাফে পরিণত হইল।

২। ডারুইন্।

সমস্যাটা এই যে, জীবের যে আভ্যন্তরীণ পরিবর্ত্তন হইল, সেটা পুরুষানুক্রমে সংক্রামিত হয় কি না? কামারের শক্ত পেশী তাহার ছেলে পায় কি না? ডারুইন্ তাহা অস্বীকার করিতেন না; কিন্তু ডারুইন্ বলিলেন জীবদেহের পরিবর্ত্তনে আরও প্রবল হেতু বিদ্যমান আছে। অন্নের জন্য জীবের মধ্যে কাড়াকাড়ি ব্যাপার চলিয়াছে, কারণ অন্নের পরিমাণের চেয়ে জীবের সংখ্যাই বেশী।

ডারুইন্।

যে সমর্থ,তারই অন্ন জুটিবে; অসমর্থের জুটিবে না। প্রকৃতি যেন চালুনি হাতে করিয়া বসিয়া আছেন; যে সমর্থ সেই ছিদ্রের ভিতর দিয়া অবাধে চলিয়া যাইতেছে, যে অসমর্থ তাহাকে ঝাড়িয়া ফেলিয়া নষ্ট করা হইতেছে। প্রকৃতির এই বাছাই কাজের নাম দেওয়া হইয়াছে Natural Selection বা প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন এবং প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের হেতুর নাম দেওয়া হইয়াছে Struggle for existence বা জীবন-সংগ্রাম। যে বেশী সমর্থ সেই টিকিয়া যায়,—গায়ের জোরেই হউক, বুদ্ধির জোরেই হউক, কৌশলের জোরেই হউক, অথবা ভীরুতার দরুণই হউক। যে Variationগুলি এই প্রবল জীবনসংগ্রামে জীবের অনুকূল, সেইগুলিই টিকিয়া যায়; নূতন জাতির (Species) সৃষ্টি হয়। বহুযুগ ধরিয়া বংশানুক্রমে নানা ব্যতিক্রম হওয়ায় এক পূর্ব্বপুরুষ হইতে বাঘ ও বনবিড়াল দুইটা স্বতন্ত্র জাতি উৎপন্ন হইয়াছে। হয় ত, অন্য Variationsগুলিও হইয়াছিল; কিন্তু তাহারা প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রামে টিকিল না। যে আদিম জন্তু হইতে ইহারা উদ্ভূত, সেও লুপ্ত হইয়াছে। এখনকার বানর, বনমানুষ, ও মানুষ এখনকার environmentএর উপযোগী হইয়া আছে; যে আদিম ape হইতে ইহারা উৎপন্ন সে লোপ পাইয়াছে; হয় ত অন্যান্য শাখা-প্রশাখাও হইয়াছিল, তাহারাও টিকিল না; মাঝে মাঝে সেই সকল জন্তুর কিছু কিছু চিহ্ন মাটির ভিতর হইতে বাহির হইয়া পড়ে। প্রকৃতির এই ভাঙ্গাগড়ার কথা ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে ভাঙ্গে বেশী, গড়িয়া উঠে অতি অল্প। এই উগ্র জীবন-সংগ্রামে অধিকাংশই নষ্ট হইয়া যায়। শতকরা একটা হয় ত কোনও রকমে টিকিয়া যায় বা যায় না। জীবের উন্নতিলাভের একটা প্রধান উপায়—একটা কাড়াকাড়ি মারামারি রক্তারক্তি ব্যাপার; এবং ইহার মত wasteful বা অপব্যয়াত্মক ব্যাপার জগতে নাই। একটা জীবের একটুকু উন্নতি সাধনের জন্য লক্ষ লক্ষ জীবকে সংহার করিয়া ফেলিতে হয়। সৃষ্টিকালে উপস্থিত থাকিলে ডারুইন বিধাতাপুরুষকে সৎপরামর্শ দিতেন কি না, তাহা কোথাও বলেন নাই।

"কেন এই বংশানুক্রমের Variation হয়, ডারুইন্ সে সম্বন্ধে বড় একটা আলোচনা করেন নাই; তিনি গোড়া হইতে ধরিয়া লইয়াছেন যে, অল্পে অল্পে ধীরে ধীরে ব্যতিক্রম হইতে থাকে; ইহারই ফলে বহুযুগ পরে, বহু ধ্বংসকার্য্য সমাধানের পরে একটা নূতন জাতি (Species) গড়িয়া উঠিতে পারে। উচ্চশ্রেণীর জীবের মধ্যে Variation অবশ্যম্ভাবী, কারণ তাঁহারা স্ত্রীপুরুষ-সংসর্গজনিত। এই Variationএর একটা কারণ চোখের উপর দেখা যায়। পুংবীজ ও স্ত্রীবীজ একযোগে সন্তান উৎপাদন করে; কিন্তু পিতা ও মাতা যখন সর্ব্বাংশে একপ্রকৃতির নহে, তখন পিতা মাতা উভয়েরই ভিন্ন ভিন্ন বিশিষ্ট ধর্ম্ম সন্তানে সংক্রান্ত হইয়া সন্তানকেও পিতা ও মাতা হইতে কিছু না কিছু ভিন্নরূপ করিবে।

৩। গ্যাল্‌টন

"আরও সূক্ষ্ম ধরিয়া বলিলেন যে, সন্তান যে শুধু নিজের বাপ মায়ের ধাত (character) পায়, তাহা নহে; সে তাহার পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ প্রভৃতি যাবতীয় পূর্ব্বপুরুষেরও 'ধাত' পায়; সুতরাং এতগুলি পূর্ব্বপুরুষের বিশিষ্ট ভাব পরপুরুষে সংক্রান্ত হইয়া একটা নূতন পরিবর্ত্তন ঘটাইবে তাহাতে বিচিত্র কি?

৪। ওয়াইজমান

"লামার্ককে তুড়ি দিয়া উড়াইয়া দিলেন। তিনি বলেন,—পিতার স্বোপার্জ্জিত 'ধাত' সন্তানে সংক্রামিত হয়, তাহার কোনও প্রমাণ নাই। ডারুইনের প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনই জীবের উন্নতির কারণ। জীবের সমস্ত দেহটা বিশেষ কিছু নহে; সন্তানোৎপাদক বীজটাই দেহের সারভাগ। সমস্ত দেহ ঐ বীজটুকুকে রক্ষা করিবার জন্য ঐ বীজকর্ত্তৃকই নির্ম্মিত হইয়াছে। উহা যেন একটা কৌটা; উহার অভ্যন্তরে বীজরূপ নিধিটুকু সযত্নে রক্ষিত আছে। মৃত্যু হয় দেহের, বীজের নহে। এই বীজ (germ plasm) আপনাকে রক্ষা করিবার জন্য আপনা হইতে আপনার দেহ নির্ম্মাণ করিয়া লয়। এই দেহের একমাত্র কাজ, সেই বীজকে রক্ষা করা। জীব সেই germ-plasm মাত্র; সে অবিনশ্বর। যথাকালে জীবের বীজ (germ-plasm) আপনার কিয়দংশ বাহিরে ছুড়িয়া ফেলিয়া দেয়; সেই নিক্ষিপ্ত অংশ আবার আপনার দেহ আপনি গঠন করিয়া সন্তানরূপে পরিণত হয়। পিতার দেহাংশ পুত্র পাইল না; বীজের, germ-plasmএর অংশ পাইল। বাহ্য জগতের যত কিছু উপদ্রব, তাহা দেহাংশের উপর, বীজের উপর নহে; কেন না বীজ দেহের ভিতর গুপ্ত থাকে; কাজেই দেহের বিকারে বীজের বিকার হয় না।

সন্তান যখন পৈতৃক দেহাংশ পায় না, তখন সেই দেহের Variation তাহাতে সংক্রামিত হইতে পারে না। পিতার চেষ্টায় দেহের যে বিকার ঘটে, বীজ তাহাতেও বিকৃত হয় না। কাজেই লামার্কের সিদ্ধান্তে গোড়ায় গলদ। বাপের উপার্জ্জিত বা চেষ্টালব্ধ কোন গুণ সন্তান একবারেই পায় না। এই Germ-plasm লইয়াই বংশানুক্রম, heredity; দেহ লইয়া নহে। তবে, Variationএর একটা কারণ আছে;—সেটা দেহঘটিত নহে, germ-plasm-ঘটিত। পিতামাতার germ-plasm বিভিন্ন; এই জন্য উভয়ের সংযোগে সন্তানের germ-plasmএ variation হইয়া থাকে; বিভিন্ন germ-plasmএ উভয় বীজের সংমিশ্রণ না হইলে বংশানুক্রমের ব্যতিক্রম হইত না। ওয়াইজমান বলেন, পিতামাতা একযোগে এক বা একাধিক সন্তানের জন্ম দিয়া নিজেরা মরিতে শিখিয়াছেন; সন্তানের সহিত জীবনযুদ্ধে নিযুক্ত হওয়া কর্ত্তব্য বোধ করেন না। সন্তানের ইহাতে জীবনযুদ্ধে লাভ হইয়াছে। পিতামাতা নিজে মরিয়া বংশধরের হিত করিয়াছেন; বংশরক্ষার উপায় করিয়াছেন; মৃত্যুরূপ মূল্য দিয়া বংশরক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

৫। ডি ভ্রিস্।

"এমন অনেক সময়ে হয় যে, সন্তানে হঠাৎ খুব বেশী Variation দেখা যায়। ডারুইন্ এটাকে বড় বেশী আমলে আনেন নাই; তিনি ইহাকে প্রকৃতির খেয়াল (sport) বলিয়াছেন; প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে এই খেয়াল ডারুইনের মতে বড় বেশী কাজে আসে না। ডি ভ্রিস্ বলেন, এ গুলাকে ফেলিয়া দেওয়া চলে না; ইহারাই প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে বেশী কাজ করে; ইহাদিগকে mutateous বলা যাউক। ডারুইন্ বলেন যে, Variation অতি ধীরে ধীরে হয়; ডি ভ্রিস্ বলেন, তা নহে, লাফিয়ে লাফিয়ে হয়। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে অনুকূল হইলে, এই সকল বড় Variation স্থায়ী হইয়া যায়। এ কালে এই মতটাই ক্রমে যেন দৃঢ় হইতেছে। জীবের উন্নতি যত ধীরে হইতেছে ডারুইন্ মনে করিতেন, উহা তত ধীর নহে; উহা বরং দ্রুতই হইতেছে।

৬। মেণ্ডেল।

"এই Variationএর প্রণালী সরল করিয়া দেখাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন। একটা (species) জাতির অনেক (variety) 'জাত' থাকে; যেমন কুকুর জাতির মধ্যে নানা জাতের কুকুর আছে। দুই জাতের জন্তু কিংবা উদ্ভিদ যদি পরস্পর (Cross) সঙ্গত হয়, তাহা হইলে সন্তান

কোন্ জাতের হইবে? যে সকল ধর্ম্ম লইয়া এই জাতের পার্থক্য, তাহার মধ্যে কোনও কোনও ধর্ম্ম প্রবল হইয়া আপনাকে প্রকাশিত করে। আর কোনও কোনও ধর্ম্ম দুর্ব্বল হইয়া, আপনাকে গোপন করে। যে পুংজীব ও স্ত্রী-বীজ মিলিত হইয়া সন্তান উৎপন্ন হয়, মনে করুন তাহার প্রত্যেকের মধ্যেই এই প্রবল ও দুর্ব্বল ধাতু একটি করিয়া বর্ত্তমান আছে। প্রবলকে বলা হয়—dominant; দুর্ব্বল আত্মগোপন করে, এই জন্য তাহার নাম হইয়াছে—recessive. এখন এই স্ত্রী পুং বীজের মিশ্রণে কি কি ফল পাওয়া যায় দেখা যাউক। এখন, এই স্ত্রী পুং বীজের মিশ্রণে চার প্রকারের সম্মিলন হইতে পারে; যথা প্রথম নির্ভাঁজ প্রবল; চতুর্থ নির্ভাঁজ দুর্ব্বল; দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রবল ও দুর্ব্বলের সঙ্কর। প্রথমটির সন্তান প্রবল ধর্ম্মান্বিত হইবে; চতুর্থটি দুর্ব্বল ধর্ম্মান্বিত; দ্বিতীয় ও তৃতীয় সঙ্কর হইলেও দেখিতে প্রবলের মত হইবে কারণ প্রবলধর্ম্মই আত্মপ্রকাশ করে, দুর্ব্বল আত্মগোপন করে। মনে করুন, লোমশতা কোনও জন্তুর প্রবল-ধর্ম্ম, নির্লোমতা দুর্ব্বল-ধর্ম্ম। যদি তাহার চারিটা ছানা হয়, তাহা হইলে একটা লোমশ, একটা নির্লোম, বাকি দুইটা সঙ্কর হইলেও দেখিতে ঠিক লোমশই হইবে। ইহাদের সন্তান আবার কিরূপ হইবে? যদি সঙ্করের স্পর্শে থাকিতে দেওয়া না যায়, তাহা হইলে খাঁটি লোমশের পরবর্ত্তী পুরুষপরম্পরাও খাঁটি লোমশ, খাঁটি নির্লোমের পুরুষপরম্পরা খাঁটি নির্লোম হইবে। কিন্তু সঙ্কর লোমশ পরস্পর সহযোগে কতক খাঁটি লোমশ কতক নির্লোম ও কতক সঙ্কর লোমশ, এই ত্রিবিধ সন্তানের জন্ম দিবে। জনক জননী বাছাই করিয়া লইয়া জীব ও উদ্ভিদের মধ্যে আজকাল সন্তানোৎপাদন পরীক্ষা হইতেছে; তাহাতে মেণ্ডেলের তত্ত্ব ক্রমেই সমর্থিত হইতেছে।"

একটু চুপ করিয়া রামেন্দ্র বাবু বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"যাঁহারা মানবজাতিতত্ত্ব (Ethnology) অনুশীলন করেন, তাঁহারা জীববিদ্যার (Biology) এই সকল নিয়ম প্রয়োগ করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারেন না। কেহ কেহ মানুষকে কতিপয় Race এ বিভক্ত করিয়াছেন,—শ্বেত, পীত, লাল, কাল। কেহ কেহ মাথার খুলি দেখিয়া মানুষকে দীর্ঘ কপাল (Dolichocephallic) ও খর্ব্ব কপাল (Brachycephallic) শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। কেহ কেহ মুখের গঠন, চুলের রং, চুলের ধরণ, চোখের তারা ইত্যাদি দেখিয়া মানুষের নানা বিভাগ করিয়াছেন। এই সকল জাতির মিশ্রণে কি দাঁড়ায়, সে সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত দেখিতে পাওয়া যায়। আবার এক জাতির মধ্যেই বিভিন্ন বর্ণ-মিশ্রণের ফলাফল নির্ণয় করিতে অনেকে ব্যস্ত হইয়াছেন। আমাদের এই ভারতবর্ষে আর্য্য—কোলারীয়—দ্রাবিড়ীয় মিশ্রণ কিরূপ হইয়াছে তাহা দেখিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। হিন্দুর মধ্যে বিভিন্ন বর্ণের মিশ্রণে কি ফল হইতে পারে; একই বর্ণের মধ্যে নানা গোত্রের ও কুলের মিশ্রণে কি দাঁড়াইতে পারে; এ সকল বিষয়ে বিস্তর আলোচনা হইয়াছে। কতকগুলা স্থূলসিদ্ধান্ত প্রায় সর্ব্ববাদিসম্মত বলিয়া গৃহীত। পিতা-মাতার মধ্যে যদি রক্তসম্পর্ক খুব নিকট হয়, উভয়ের বীজ প্রায় সমানধর্ম্ম হওয়াতে Variation কম হয়; তাহার ফলে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যস্থাপনের সামর্থ্য কমিয়া যায়; সন্তানের পক্ষে ইহা মঙ্গলকর নহে। প্রায় সকল সভ্যজাতির মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, বৈজ্ঞানিক আলোচনার বহুপূর্ব্বে মানুষ আপন অভিজ্ঞতার ফলে অত্যন্ত নিকট সম্পর্কের মধ্যে বিবাহ যে অকল্যাণকর তাহা মানিয়া লইয়াছিল। আমাদের হিন্দু-সমাজ এ সম্বন্ধে যতটা সাবধান, ততটা বোধ হয় আর কোনও সমাজ নহে। এ দেশে সগোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ। অসভ্যদিগের মধ্যে exogamy প্রচলিত; তাহারা নিজের tribe বা কুলের বাহিরে অন্য কুল হইতে জোর করিয়া বা মূল্য দিয়া কন্যা লইয়া আসে। এই হইতে Marriage by Capture (হরণ করিয়া বিবাহ) এবং Marriage by Purchase (পণ দিয়া বধূ-লাভ) প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। পণগ্রহণপ্রথা অনেক সভ্য-সমাজে বর্ত্তমান। হরণ-ব্যাপরটা এখন আর নাই বটে; কিন্তু হাতী, ঘোড়া, ঢোল, লোক জন আশাশোটা লইয়া মহাসমারোহে আমাদের দেশে যে বরযাত্রপ্রথা প্রচলিত আছে, দেখিয়া মনে হয় যেন ইহা কোনও বিস্মৃতযুগের যুদ্ধ-যাত্রার শেষ স্মৃতি, (Survival) মাত্র। অন্য কুল হইতে কন্যা লইয়া আসিবার কালে উভয়ের মধ্যে বিরোধ ও সন্ধির কথা ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়। মানুষের

"এই স্বাতন্ত্র্য কথাটার অর্থ আরও পরিষ্কার হওয়া আবশ্যক; তাহাও জীববিদ্যার সাহায্যে করিতে হইবে। উচ্চশ্রেণীর জীবের পক্ষে, স্বাতন্ত্র্য কাহাকে বলে, বুঝিতে পারি; মাতৃজঠর হইতে ভূমিষ্ঠ হইবার পর আমরণ সে জীব-হিসাবে স্বতন্ত্র। উচ্চশ্রেণীর জরায়ুজ বা অণ্ডজ জন্তুর সম্বন্ধে সহজেই এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারা যায়। গাছের বীজ হইতে স্বতন্ত্র গাছ জন্মায়, কিন্তু সেই গাছের ডাল-পালা তাহার Organ মাত্র; তাহারই অংশবিশেষ; তাহারই সহিত একাঙ্গীভূত; তাহাদের বিশিষ্ট স্বতন্ত্র সত্তা আছে বলিয়া অনুমত হয় না; বৃক্ষকাণ্ড হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে তাহারা শুকাইয়া মরিয়া যাইবে; কিন্তু একটা ডাল কাটিয়া মাটিতে লাগাইয়া দিলে যদি সে শিকড় বাহির করিয়া মাটি হইতে রস লইয়া আত্মরক্ষার্থ পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য-রক্ষা করিবার চেষ্টা করে, নূতন নূতন Organ এর সৃষ্টি করে, তাহা হইলে তাহার স্বতন্ত্র সত্তা হইল না কি? কিন্তু তাহার এই স্বাতন্ত্র্যটা সম্পূর্ণ পরিস্ফুট হইল না। তাহাকে পূর্ব্ব বৃক্ষের শাখামাত্র বলিব না সন্তান বলিব। কেননা দেখুন, এমন গাছ আছে যাহার শাখা লতাইয়া ভূপৃষ্ঠে বিলম্বিত হইয়া নূতন নূতন শিকড় জন্মাইয়া মাটিকে আঁকড়াইয়া ধরে; সেই শাখার উপকার হইল, বড় গাছটারও হইল। কিন্তু এখানে কি সেই শাখাকে স্বতন্ত্র বলা যায়? এখানেও ত সেই শাখা স্বাধীনভাবে জীবনের লক্ষণ প্রকাশ করিল, অথচ তাহাদিগকে স্বতন্ত্র মনে করা যায় না কেন? কুঠারাঘাতের মত একটা আকস্মিক ঘটনায় মূল কাণ্ড হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া এইরূপ লক্ষণাক্রান্ত হইলেই বুঝি সেই শাখা স্বতন্ত্র হইবে? আবার দেখুন, বটগাছ শত শাখা বিস্তার করিয়া দণ্ডায়মান; একটি শাখাও ভূমিস্পর্শ করে না; কিন্তু সেই ডালপালাগুলার মধ্য হইতে শিকড় বাহির হইয়া ভূমধ্যে প্রবেশ করে। এখানে কি ডালগুলা স্বতন্ত্র জীব?

"একটা জীবের দেহও ত লক্ষ জীবের সমষ্টি বলিয়া মনে করা যাইতে পারে, কারণ তাহার মধ্যে অসংখ্য জীব-কোষ (cell) আছে। একটা প্রবালকে এক বলিব, না বহু বলিব? তাহার ক্ষুদ্র অংশ (coral polyp এর) কোনও কারণে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলেও তাহার স্বতন্ত্র জীবন আরম্ভ হয়; আবার নূতন করিয়া তাহার গাছের মত ডাল পালা বাহির হয়। ইহার কোন্ খানে স্বাতন্ত্র্য? জীবনের আরম্ভ ও শেষ কোথায়? Hydraকে (চারুপাঠের পুরুভুজ) যত টুক্‌রা করা যায়, প্রত্যেক টুকরাই নূতন করিয়া জীবনযাত্রা আরম্ভ করে। তবে কি এই টুক্‌রাগুলাকে স্বতন্ত্র জীব বলিব?

"কিসে স্বাতন্ত্র্য হয়? কখন্ স্বাতন্ত্র্য হয়? কেনই বা হয়? নিম্নতম এককোষক (unicellular) জীবের কথা ভাবিয়া দেখুন দেখি। একটিমাত্র কোষের (cell) মধ্যে সমস্ত জীবটি সংহত। কোষের বহিরাবরণ অপেক্ষাকৃত শক্ত; কোষের মধ্যে তরল proto-plasm। Protoplasm এর কেন্দ্রস্থ ক্ষুদ্র পদার্থটিকে nucleus বলা যায়। যেন ঐ তরল (Semi fluid) প্রোটোপ্লাজম মাঝখানে একটু জমাট বাঁধিয়া nucleus করিয়াছে ও নিজের পিঠটাকেও জমাইয়া আপনার আবরণ করিয়া লইয়াছে। যেন একটা icebag, উহার ভিতর জলপূর্ণ; মাঝে এককুচি বরফ; আর ব্যাগটাও চামড়ার বা বরফের নহে; উহাও যেন বরফেরই একটা আস্তরণ। Icebagটা বৃহৎ জিনিস; আর এই জীবকোষ অতি ক্ষুদ্র; চর্ম্মচক্ষুতে প্রায় অদৃশ্য। এই কোষ ক্রমশঃ ডিম্বাকৃতি ধারণ করে; ক্রমে ক্ষীণকটি dumb-bell এর আকার ধারণ করে; nucleusও সেই ক্ষীয়মান কটিদেশে একটু লম্বা হইতে থাকে; সহসা একদিন সেই কোষ—কটিদেশে ছিঁড়িয়া যায় এবং সেই কোষ বিভক্ত হইয়া দুইটা স্বতন্ত্র কোষে পরিণত হয়; ভিতরে দুইটা স্বতন্ত্র nucleusও হইয়া যায়; কিন্তু proto-plasm এর পরিবর্ত্তন হইল না। ইহাদের মধ্যে জনকই বা কে জন্য হইলই বা কাহার? আবার কখনও কখনও জীব-কোষের মধ্যে proto-plasm জমাট হইয়া স্থানে স্থানে দানা বাঁধিতে (Spore) থাকে; অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখিলে আঁচড়ের (Specks) মত দেখায়; যখন দানা বাঁধা সম্পূর্ণ হয়; কোষের বহিরাবরণ ফাটিয়া যায়; একটি কোষ ফাটিয়া ভিতরের দানা (Spore) চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। এক একটি দানা আবার এক এক কোষ গড়িয়া নবজীবন আরম্ভ করে। ইহাদের মধ্যে জনকই বা কে, জন্য হইলই বা কাহার? জনকের মৃত্যুই বা হইল

কখন? এই জন্যই ওয়াইজমান বলিয়াছেন যে, এক-কোষক (Uni-cellular) জীব মরিতে বাধ্য নহে। যাহারা উচ্চপর্য্যায়ের জীব, তাহারাই আপনাদিগের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিবার জন্য মৃত্যুরূপ মূল্য দিয়াছে। তাই, অত্যন্ত নিম্নশ্রেণীতে পিতা পুত্রের স্বাতন্ত্র্য, জন্ম মৃত্যুর সমস্যা বুঝিয়া উঠা দুষ্কর।

"বিভাগের দিক্ দিয়া যেমন দেখা গেল, সংযোগের দিক্ দিয়াও সেইরূপ দেখা যাইতে পারে। উচ্চশ্রেণীর জীবের মধ্যে একজনের একটা বিশিষ্ট দেহযন্ত্র আর এক-জনের শরীরে বসান' যায় না; একজনের ধড়ে আর এক-জনের মাথা বসাইয়া দেওয়া যায় না। একজনের শরীরের একটু আধটু চামড়া আর একজনের দেহে ডাক্তাররা লাগাইয়া দেন; একজনের রক্তও অন্যের শরীরে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হয়; কিন্তু বিশিষ্ট দেহযন্ত্রের (highly differentiated organs) পক্ষে এরূপ ব্যাপার অসম্ভব। দেহমধ্যস্থ এই সকল যন্ত্র (organs) আপনার কর্ম্মের উপযোগী হইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। যেখানে জীবের স্বাতন্ত্র্য খুব পরিস্ফুট, সেখানে এক জীবের উপযোগী অবয়বকে অন্য জীবের উপযোগী করিয়া লওয়া একপ্রকার অসম্ভব। গাছের গুঁড়ি অনেক সময়ে অন্য গাছের ডালকে আপনার করিয়া লইতে পারে; উৎকৃষ্ট আমগাছের ডাল নিকৃষ্ট গাছে লাগাইলে অনেক সময়ে শেষোক্ত গাছের উৎকর্ষ-সাধন হয়, কিন্তু গাছের পক্ষে ইহা উৎকর্ষের পরিচয় নহে। একটা কুকুরে অন্য কুকুরের কলম বাঁধা যায় না। খুব নিম্নশ্রেণীর দুইটা জীবকোষ মিলিয়া এক হইয়া যায়। উচ্চ-শ্রেণীতেও পুং স্ত্রীবীজের সংযোগ ব্যতীত নূতন জীবের আবির্ভাব হয় না। এই যে নূতন জীব, ইহাকে এক হিসাবে স্বতন্ত্র বলা যাইতে পারে, এক হিসাবে বলা যাইতে পারে না; তাহাকে তাহার পিতা মাতার germ-plasm হইতে বিভিন্ন মনে করা যায় না।

"এইরূপে স্বাতন্ত্র্যের মাত্রাভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। কোনও জায়গায় স্বাতন্ত্র্যরক্ষা করাটাই জীবনের অনুকূল; কোনও জায়গায় পরের সঙ্গে মিশ্রণই জীবনের অনুকূল। মোটামুটি এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, উচ্চপর্য্যায়ের জীবে স্বাতন্ত্র্য স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়; নিম্নপর্য্যায়ে সেটা অপরিস্ফুট। উচ্চশ্রেণীর জীব সহজে পরকে আপন করিতে পারে না; যদি আপন করিতে হয় তাহা হইলে তাহাকে স্বতন্ত্র থাকিতে দিলে চলিবে না। বাঘের পক্ষে ছাগলকে আত্মসাৎ করা দরকার; কিন্তু তাহাকে মারিয়া, খাইয়া, নিজের পাকস্থলীতে পরিপাক করিয়া, তাহাকে unorganised fluidএ পরিণত করিয়া নিজদেহে সঞ্চারিত করে; নিজের উপযোগী গঠন দিয়া, নূতন জীবকোষ নির্ম্মাণ করিয়া আপনার শরীরের পুষ্টিসাধন করে।

"আরও একটু খোলসা করিয়া বলা আবশ্যক। প্রথমতঃ দেখা গেল যে কতকগুলা cell (জীবকোষ) একত্র জমাট বাঁধিয়া দেহ তৈয়ার করে। এই যে জমাট বাঁধা, এই যে কোষগুলির সংহতি, হার্ব্বার্ট স্পেন্সর ইহার নাম দিয়াছেন—Integration. যতদিন স্বাতন্ত্র্য স্পষ্ট না হয়, ততদিন এই জমাট বাঁধাটাও একটু আল্গা রকম থাকে; অল্পেই বিচ্ছিন্ন হইবার সম্ভাবনা থাকে। আবার দেখা যায় যে, সমপ্রকৃতিক দুইটা দেহ মিশিয়া গিয়া (fused) সমপ্রকৃতিক আর একটা দেহ নির্ম্মাণ করে। এ অবস্থায় জনক ও সন্তানের, এবং জন্মমৃত্যুর পার্থক্যবিচার করা কঠিন; কোন্‌টা দেহ, কোন্‌টা অঙ্গ, নিরূপণ করা কঠিন; সকল কোষই (cell) তখন সমাকার, একধর্ম্মী; অর্থাৎ প্রত্যেক অঙ্গই অন্য অঙ্গের কাজ করিতে পারে; কাহারও নির্দ্দিষ্ট function থাকে না; এমন কি, জননেন্দ্রিয়ও (reproductive organ) কিছু একটা নির্দ্দিষ্ট থাকে না,—যে কোনও অঙ্গ দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আবার সমস্ত দেহটা reproduce করিতে পারে। স্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে সংহতি (integration) যখন বেশী মাত্রায় হয়, তখন দেহের ভিতরের যন্ত্রগুলা (organs) পৃথক্ হইতে থাকে; প্রত্যেক অঙ্গ অন্য অঙ্গ হইতে পৃথক্ হইয়া স্বতন্ত্র (function) কাজ পায়, এবং সেই function অনুসারে আপনাদের আকৃতি পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তন করে; স্পেন্সরের ভাষায় ইহাকে বলে—Differentiation। জীবের স্বাতন্ত্র্য যত ফুটিয়া উঠে, সে ততই বাহিরের পারি-পার্শ্বিক অবস্থা হইতে আপনাকে পৃথক্ করিয়া যেমন জমাট বাঁধে, তেমনই ভিতরেও অবয়বগুলির শ্রমবিভাগ (division of labour) দ্বারা (differentiation) হয়।

যুগপৎ এই সংহতি (integration) ও শ্রমবিভাগ (differentiation) হইতে জীবের উৎপত্তি হয়; স্পেন্সরের ভাষায় এইটাই Evolution (অভিব্যক্তি)। এই Evolution-তত্ত্ব বুঝাইবার জন্য তিনি গোটা Synthetic Philosophyর গ্রন্থগুলা লিখিয়াছেন।

"পূর্ব্বে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি যে, নিম্নতম প্রাণীতে ও নিম্নতম উদ্ভিদে যন্ত্রের (organs) পার্থক্য ও ক্রিয়ার (function) পার্থক্য হয় না; কোনও একটা ব্যক্তির দেহের evolutionএও আমরা ইহার প্রমাণ পাই। জরায়ুর মধ্যে যখন প্রথম ভ্রূণের বিকাশ হয়, তখন কোনও রকম অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পাওয়া যায় না, সকল কোষই দেখিতে এক রকম ও একধর্ম্মী; এমন কি ভ্রূণটা মানুষের কি কুকুরের বুঝা যায় না, তাহার স্বাতন্ত্র্য তখনও ফুটে নাই। ক্রমে যত উন্নতির সোপানে উঠি, ততই ক্রমশঃ সঙ্গে সঙ্গে integration ও differentiation হয়, অবয়ব (organs) গড়িয়া উঠে, তাহাদের functions নির্দ্দিষ্ট হয়, একটা অবয়ব আর একটার কাজ করিতে পারে না। কোনও একটা উন্নত জীবের দেহে একটা বিশিষ্ট অঙ্গের পরিবর্ত্তে অন্য জীবের সেই অঙ্গ দেওয়া যায় না, তেমনই দেহের ভিতরেও একটা যন্ত্রের কাজ আর একটা যন্ত্র করিতে পারে না। জীবের কোনও একটা বিশিষ্ট অঙ্গ ছিন্ন হইলে, সে আর সেটাকে গড়িয়া লইতে পারে না, সম্ভবতঃ তাহার মৃত্যু হইতে পারে। অবয়বগুলা নির্দ্দিষ্ট পৃথক্ কাজ পাইয়াছে বটে, কিন্তু সব গুলাকে একযোগে সবটার জন্য কাজ করিতে হয়; সকলে পরস্পর অবিরোধে কাজ করিবে। হাত, পা, চোখ, মুখ যদি পেটের উপর বিদ্রোহী হইয়া কাজ করে, তাহারাও মরিবে, সমস্ত individualটাও মরিবে; তাহাদের নিজের স্বতন্ত্র জীবন আছে বটে, কিন্তু তাহা সমগ্রটার জীবনের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। উচ্চশ্রেণীর প্রাণী এই সমস্ত অবয়বকে অবিরোধে ও একযোগে চালাইবার জন্য একটা যন্ত্রের বা অবয়বের সৃষ্টি করিয়াছে; সেটাকে শাসনযন্ত্র বলা যাইতে পারে; তাহার নাম—Nervous System.

"এই যে Nervous System, ইহার আর একটা কাজ আছে,—বাহিরের environment হইতে খাদ্যাদি সংগ্রহ করিয়া পুষ্টি-সাধনের জন্য, ও বাহিরের শত্রু হইতে আত্মরক্ষার জন্য যে সকল অবয়ব নির্দ্দিষ্ট আছে, এই স্নায়ুযন্ত্র সকলকে পরিচালিত ও স্বকর্ম্মে প্রেরিত করিতেছে। এই সকল কাজের জন্য বহির্জগতের সংবাদ আনিতে হয়, অতএব ইহাকে টেলিগ্রাফের, ডাকঘরের, spyএর কাজ করিতে হয়; সমস্ত জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলিকে এই সংবাদানয়নের কার্য্যে ব্যাপৃত রাখা হয়, সমস্ত কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলিকে আত্মরক্ষার ও আত্মপুষ্টির কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া রাখে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, এই যন্ত্রটা শাসন ও রক্ষণ এই উভয়বিধ ব্যাপারের সম্পূর্ণ উপযোগী। ইহাই দেহের পক্ষে গভর্ণমেণ্ট।

"উচ্চশ্রেণীর জীবের মধ্যে এই যন্ত্রটা যখন গড়িয়া উঠে, তখন তাহার স্বাতন্ত্র্যটাও খুব ফুটিয়া উঠে। এই যন্ত্রটাকে অবলম্বন করিয়া জীবের আর একটা ধর্ম্ম ফুটিয়া উঠিয়াছে—consciousness বা চেতনা। এটি জীবের স্বাতন্ত্র্যের সর্ব্ব প্রধান লক্ষণ, ও স্বাতন্ত্র্যরক্ষার জন্য জীবের সর্ব্বপ্রধান অবলম্বন হইয়াছে। এই চেতনা জীবনকে আশ্রয় করিয়া আছে বটে, কিন্তু তথাপি ইহা জীবনের অতিরিক্ত একটা কিছু জিনিষ। কেমন করিয়া ইহার উৎপত্তি হইল, বর্ত্তমান কালের বিজ্ঞানশাস্ত্র সে সম্বন্ধে একেবারে মূক। কেমন করিয়া ইহার উৎপত্তি হইল, science তাহা বলিতে পারে না বটে; কিন্তু কি উদ্দেশ্যে হইল, ডারুইনের শিষ্যেরা সে সম্বন্ধে আলোচনা করিতে পশ্চাৎপদ নহেন। দেহের ভিতরে কোনও গোলযোগ হইল কি না, বাহির হইতে শত্রুর আশঙ্কা আছে কি না, ইহা জানিবার প্রধান উপায়,—চেতনা। এই চেতনার লক্ষণ,—সুখ ও দুঃখবুদ্ধি। ভিতরের ও বাহিরের ব্যাপার অনুকূল হইলে জীবের সুখবুদ্ধি হয়, প্রতিকূল হইলে দুঃখবুদ্ধি হয়। এই সুখবুদ্ধি ও দুঃখবুদ্ধিকে অবলম্বন করিয়া কোন্‌টা হেয় এবং কোন্‌টা উপাদেয় স্থির করিয়া কাজ করা হইয়া থাকে। ইহাতে জীবন-সংগ্রামের খুব লাভ; যে রকম করিয়াই হউক জীব চেতনালাভ করিলে তাহার টিকিয়া যাইবার সম্ভাবনা বাড়িয়া গেল। চেতনা জিনিষটা প্রত্যক্ষ নয়; অপরের চেতনা তাহার অঙ্গভঙ্গী ও আচরণ দেখিয়া অনুমান করিয়া লইতে হয়। তোমার আনন্দ আমি তোমার মুখের হাসি দেখিয়া অনুমান করি, তোমার মনের শোক তোমার কান্না দেখিয়া অনুমান

করি; কোনটাই প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে পারি না। কাজেই অন্য জীবের চেতনা আছে কি না, সেটা সকল সময়ে জোর করিয়া বলিতে পারি না; একটা মোটামুটি ঠিক করিয়া লই, কোন্ জীব চেতন, কে বা অচেতন, কে বা অস্ফুটচেতন। গাছ যখন কাটিয়া ফেলি, তাহার চেতনা নাই এইরূপ অনুমান করি; কিন্তু একটা পোকা যখন ধরিতে যাই, সে পলায়ন করে; বুঝিতে পারি যে তাহার চেতনা আছে। লজ্জাবতী লতার সঙ্কোচে হয় ত এইটুকু প্রমাণ হয় যে তাহার nervous system আছে; সে respond করে, কিন্তু সে সজ্ঞানে consciously করে কি না, বলা কঠিন। মাংসাশী গাছ পোকাকে ধরিয়া হজম করিয়া আত্মসাৎ করিয়া ফেলে। এ ক্ষেত্রে তাহার যন্ত্রগুলি প্রায় জন্তুর মত খুব জটিল উপায়ে আত্মপুষ্টির চেষ্টা করে; কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটা কলের ব্যাপার হইতে পারে। ঘড়ির একটা কল নাড়িলেই টং টং করিয়া বাজিয়া উঠে। সে কি সচেতনভাবে বাজে? এই মাংসাশী গাছের প্রকৃতি হয় ত ইঁদুরকলের মত হইতে পারে। ইঁদুরের প্রবেশমাত্রেই কল তাহাকে ধরিয়া ফেলে, চাপিয়া মারে; কিন্তু কল তাহা জানিতে পারে কি?

"নিম্নতম শ্রেণীর জীবের মধ্যে Nervous systemও নাই, চেতনাও নাই। উচ্চপর্যায়ে উঠিলে ঐ দুটোকে পাওয়া যায়। যেখানে Nervous system একটা মস্তিষ্ক গড়িয়া ফেলিয়াছে, সেইখানেই চেতনা খুব পরিস্ফুট। চেতনাকে মস্তিষ্কের ধর্ম্ম বলা ভুল। সে মস্তিষ্করূপ যন্ত্রটাকে আশ্রয় করিয়া আত্মপ্রকাশ করে মাত্র। চেতনার কাজ হইল—জানা। ইহার চরম পরিণতি,—Self-Consciousness, অর্থাৎ আপনাকে জানা [দার্শনিক পরিভাষা —অহঙ্কার]।

"কেঁচো বা জোঁক আলো আঁধারের ভেদ বুঝিতে পারে, বাহিরের জিনিষের পার্থক্য অনুভব করিতে পারে, কিন্তু তাহার "আমি"-জ্ঞান হয় কি না, বলা শক্ত। আলো-আঁধার-বোধ, ঠাণ্ডা-গরম-বোধ, সুখ-দুঃখ-বোধ, শত্রু-মিত্র-বোধ, এ গুলা সব থাকিতে পারে; কিন্তু এ সকল বুদ্ধি যে আমার বুদ্ধি, এই "আমি" নামক একটা স্বতন্ত্র ও স্বাধীন অস্তিত্বের জ্ঞান, কেঁচো জোঁকের ত নাই; হাতী ঘোড়া বাঘেরও ষোল আনা জাগ্রত হয় কি না তাহা সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। মানুষের মধ্যেই বোধ হয় এই অহং-জ্ঞানের বা "আমি"র পূর্ণ পরিণতি হইয়াছে। ইহারই বলে মানুষ সমস্ত জগৎ হইতে আপনাকে স্বতন্ত্র করিয়া সেই জগৎটাকে নিজেরই জ্ঞানের ও ভোগের বিষয় এবং কর্ম্মক্ষেত্র বলিয়া মনে করে। জীববিদ্যার হিসাবে বলিতে পারি যে, এই অহং-জ্ঞানটাই জীবের স্বাতন্ত্র্যের চরম পরিণতির পরিচায়ক। দার্শনিক ঠিক উল্টা পথে চলেন। তিনি এই 'আমি'টাকে গোড়ায় স্বীকার (postulate) করিয়া লন; এবং তাহা হইতে জগৎ-ব্যাপারের বৈচিত্র্য ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করেন। আমরা দার্শনিক আলোচনা করিতেছি না; সমাজতত্ত্বের জন্য আমাদিগকে জীববিদ্যাপ্রয়োগ করিতে হইবে।

"পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে যে Heredity, Variation প্রভৃতি তত্ত্ব এখনও এত অপূর্ণ অবস্থায় আছে যে, তাহা সমাজ-বিদ্যায় প্রয়োগ করার সময় এখনও আসে নাই। তবে যেটা জীবনের সাধারণ লক্ষণ,—পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে নিজেকে সমঞ্জস করিয়া স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিবার চেষ্টা এবং এই আত্মরক্ষার ও স্বাতন্ত্র্যরক্ষার উদ্দেশ্যে জীবনসংগ্রাম ও তদ্দ্বারা জীবনের ক্রমবিকাশ, ক্রমোন্নতি ও অভিব্যক্তি, সেটাকে আমরা নির্ভয়ে সহায়রূপে গ্রহণ করিয়া সমাজ-বিদ্যার আলোচনায় প্রয়োগ করিতে পারি। জীবনের স্বাতন্ত্র্য লাভটাই উচ্চজীবের জীবনের লক্ষণ; ইহার সাহায্যে জীবন-দ্বন্দ্বে সফলতা লাভ করা যায়।

"এই সফলতা কাহাকে বলে? কেবল কি জীবের স্থিতি duration দেখিয়া ইহার পরিমাপ করা যায়? তবে কি যে যত বেশী দিন বাঁচে, সেই বেশী উন্নত ও সফল-প্রযত্ন? পরমায়ু দেখিয়া যদি জীবের উৎকর্ষাপকর্ষ স্থির করিতে হয়, তাহা হইলে মানুষের চেয়ে হাতী শ্রেষ্ঠ। শুনিতে পাওয়া যায় যে, যে ওক্‌গাছের তলা দিয়া রোমের সেনাগণ গিয়াছিল, আজও না কি তাহার দু চারিটা জীবিত আছে। তবে কি Oak গাছ সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত? শুধু পরমায়ু দেখিলে চলিবে না। এমন কি, বংশের পরমায়ু ধরিয়া পরিমাপ করিলেও চলিবে না। ভূপৃষ্ঠের স্তর উদ্ঘাটিত করিয়া না কি দেখা গিয়াছে যে অতি প্রাচীনকালে আরশোলা বর্ত্তমান ছিল; সে সময়ে মেরুদণ্ডী জীব, এমন কি মাছ পর্য্যন্ত ছিল

না। কতকাল পরে মাছ ও সরীসৃপের উদ্ভব হইল; আরও কতযুগ পরে অতিকায় ম্যামথ্ ও ম্যাষ্টডনের জন্ম হইল। এই অতিকায় জীবগুলাও লুপ্ত হইয়া গেল; আরসোলা এখনও বাঁচিয়া আছে। তবে কি আরশোলা এই সকল জীবের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ?

"কেবল পরমায়ুর উপর নির্ভর করিলে চলিবে না, অন্যান্য বিষয়ও ভাবিয়া দেখিতে হইবে। জড় পদার্থের মধ্যে বড় ছোট বিচার করিতে হইলে যেমন শুধু তাহার দীর্ঘত্ব দেখিলে চলিবে না, তাহার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতার হিসাব লইতে হইবে; তেমনই জীবনের উৎকর্ষাপকর্ষের বিচার করিতে হইলে Quantity of life বিবেচনা করিতে হয়। পরমায়ুটাকে জড়ের দৈর্ঘ্যের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে; কর্ম্মক্ষেত্রের বিস্তারকে (range of activity) প্রস্থ বলা যাইতে পারে। Oak গাছের পরমায়ু খুব বেশী বটে, কিন্তু তাহার কার্য্যের ব্যাপকতা (range) কম; সে এক জায়গায় বসিয়া ডাল পালা ফল প্রসব করে মাত্র। একটা প্রজাপতির পরমায়ু কম, কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্র গাছের চেয়ে ঢের বেশী। মানুষের ক্রিয়ার ব্যাপ্তি অপরিসীম। Intensity of Lifeকে কর্ম্মানুষ্ঠানে শ্রম, উগ্রতা ও তীব্রতাকে জড়পদার্থের উচ্চতার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। পীপিলিকা ও মধুমক্ষিকা অল্প পরিসরে মধ্যে অল্প পরমায়ু লইয়া যে intensity of life এর, কর্ম্মপটুতার পরিচয় দেয়, তাহার নিকটে মানুষও হয় ত পরাস্ত হয়; অন্ততঃ শিশুপাঠ্য গ্রন্থে মানুষের পক্ষে মক্ষিকা আদর্শস্বরূপ বিবেচিত হইয়াছে,—

'মক্ষিকা সামান্য প্রাণী, কিন্তু তারে শ্রেষ্ঠ মানি
উপদেশ লও পরিশ্রমে।'

এই তিনটি ভিন্ন ভিন্ন factor একত্র ঘাত করিয়া জীবনের সফলতা স্থির করিতে হইবে।

"মানব-সমাজে দেখিতে পাই যে, আফ্রিকা ও প্রশান্ত মহাসাগরে যে সকল জাতি বাস করে, তাহারা বহুযুগ ধরিয়া বাঁচিয়া আছে; সভ্যতর সমাজ অপেক্ষা ইহাদের পরমায়ু বেশী। কিন্তু ইহাদের কর্ম্মক্ষেত্র স্বল্পপরিসর, অর্থাৎ কাজের পরিসর (Variety) অল্প—জীবনের কর্ম্মপটুতা উগ্রতাও অধিক নহে। গ্রীসের এক একটি নগরের অধিবাসীদিগের range ও activity দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়; তাহারা Science, Arts, Philosophy, Polity প্রভৃতিতে যেরূপ জীবনীশক্তির ক্রিয়ার পরিচয় দিয়াছে, সেরূপ অন্যত্র দেখা যায় না; কিন্তু সেই নগরগুলির পরমায়ু অল্প ছিল। রোমের পরমায়ু গ্রীসীয় নগরের চেয়ে বেশী ছিল, কিন্তু গ্রীকদিগের তুলনায় তাহার কর্ম্মের ক্ষেত্র অল্প ছিল; সে শুধু শাসন ও ব্যবস্থাকার্য্যেই তাহার অধিকাংশ শক্তি ব্যয়িত করিয়াছিল, আর কিছু বড় একটা করিতে পারে নাই। ইহুদির জাতীয় জীবনের ইতিহাস হাজার খানেক বছরের মধ্যেই পর্য্যবসিত। তাহার চিন্তার rangeও যৎসামান্য; সে কেবল একটা ধর্ম্মকে অবলম্বন করিয়া নিজের স্বাতন্ত্র্যরক্ষার প্রয়াস পাইয়াছে; বেশী কিছু জগৎকে দিতে পারে নাই। কিন্তু জীবনসংগ্রামে যে চেষ্টায়, অবিশ্রান্ত কর্ম্মশীতলতার intensity'র পরিচয় দিয়াছে, তাহার নিকট গ্রীককেও বোধ করি পরাস্ত হইতে হয়।

মানুষের ইতিহাস আলোচনা করিতে বসিয়া কেবল তাহার স্বাতন্ত্র্যের মাত্রা দেখিলেই চলিবে না; তাহার উৎকর্ষাপকর্ষের বিচার করিতে হইবে।"

রাজেন্দ্র বাবু চুপ করিলেন। আমি বলিলাম, "বোধ হয় Scientific study of History সম্বন্ধে আর কিছু বলা আবশ্যক নাই।" তিনি বলিলেন, "না; এইবার আমি জীববিদ্যার উক্ত স্থূল তত্ত্বগুলি যথাসম্ভব আশ্রয় করিয়া য়ুডীয়, গ্রীক, রোমক, ও ইসলাম সভ্যতার আলোচনা করিয়া তৎপরে ভারতবর্ষের সভ্যতার তুলনামূলক আলোচনা করিব। এ কথা এখানে স্পষ্ট করিয়া বলিয়া রাখি, এটা ভাল এটা মন্দ, এটা উচিত এটা অনুচিত, এরূপ না হইয়া এরূপ হওয়া উচিত ছিল, এটাকে ভাঙ্গিয়া এটাকে গড়া উচিত, এই সকল বিচার আমার কাজ নহে। সে সাহস আমার নাই। জগৎব্যবস্থার অসম্পূর্ণতায় অন্যান্য জীবের মত ব্যথা পাইয়া থাকি; তবে সেই ব্যথায় ঔচিত্য-বিচারে আমার সাহস নাই। কি করিলে কোন্ পথে গেলে সেই ব্যথা কমিবে, সে উপদেশ দিবার ধৃষ্টতাও আমার নাই। সৃষ্টিক্রিয়ার সময় উপস্থিত থাকিলে কাহাকেও কোন পরামর্শ দিতে আমি পারিতাম না।

শ্রীবিপিনবিহারী গুপ্ত।

এন্ ক্রোসিও-অঙ্কিত চিত্র হইতে।

দাস-বিপণি।

পল্লী কবিতা।

গত ১৩০৭ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় শ্রীযুক্ত ব্রজসুন্দর সান্যাল মহাশয় "শরৎকালী" শীর্ষক একটি কবিতা প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি উহাকে গ্রাম্য কবিতা নাম দিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন—কোন্ জেলা হইতে প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহার বিবরণ দেন নাই। 'সাধনা'য় রবীন্দ্রবাবু 'রাধা-কৃষ্ণের মিলন' ও 'গৌরীর শঙ্খপরাণ' শীর্ষক দুইটি কবিতার কতক কতক উদ্ধার করিয়া একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তাহাতেও প্রাপ্তিস্থানের উল্লেখ ছিলনা বলিয়া মনে পড়ে।

আমি এ রকম দুইটি মাত্র কবিতা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি। নদীয়া জেলার কুষ্টীয়া মহকুমার কোন পল্লী-গৃহিনীর নিকট প্রাপ্ত। 'শোলোক,' ছড়া, গান, পালা ইত্যাদি অনেক রকম তাঁহার সংগ্রহ ছিল এবং মহিলা মজ্‌লিশে এই জন্য তাঁহার একাধিপত্য অক্ষুণ্ণ ছিল। রূপকথা, ব্রতকথা, তাঁহার মুখে যেমন ফুটিত এমন আর কাহাকেও মানাইত না। তবে তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা পশার ছিল নাত্‌নীমহলে। নাত্‌নীরা হাল ফেসানের, সুতরাং সময়ে সময়ে বৃদ্ধাকে বসাইয়া কতক কতক পালা লিপিবদ্ধ করিয়া লইতেন। হায়! এখনকার ভামিনীরা আর পূর্ব্বকালের মত মুখে মুখে মুখস্থ করিতে পারেন না। খাতাবদ্ধ করিয়া তবে যদি কণ্ঠস্থ হয়। যাহা হউক, তাঁহার এই রসিকা নাত্‌নীটীর খাতা উল্টাইতে উল্টাইতে এই পালা দুইটি পাইয়াছি। তাহার একটি অদ্য পাঠকদিগকে উপহার দিলাম।

এই রকম 'নাচুনে' ছাঁদের কবিতা তখন বহু পরিমাণে প্রচলিত ছিল ও পল্লীসমাজের সমস্ত গৃহেই রমণীকণ্ঠে ব্রতে, পূজায়, বিবাহে—এমন কি দৈনন্দিন গৃহকার্য্যের অবকাশ অন্তরালে মুখরিত হইয়া উঠিত। তাহার প্রমাণ সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় শ্রীমোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য তাঁহার 'নিরক্ষর কবি ও গ্রাম্য কবিতায় দেখাইয়াছেন।

এ গুলিতে ছন্দের তেমন দৃঢ় বন্ধন নাই। যেন ইচ্ছা করিয়াই উপেক্ষিত হইয়াছে। ফুলের,দলে; হ'তে ক'রে দে; কাকি, দেখি; আছে, চক্ষেতে; হাতে, মাঝে; মূলে, জাদালে; বেঁকা। ধোঁকা; এই ত ছন্দের মিল। কিন্তু আবৃত্তিকালে শ্রুতিকটু পদের সংখ্যা বড়ই কম। ভাষা অতি বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষা। বাঙ্গালীর একেবারে আট্‌-পৌরে অন্তঃপুরের ভাষা। সংস্কৃতের কাঠিন্য ও অপ্রচলিত শব্দসম্ভার নাই। বাঙ্গালিনীর ঘরের ভাষায় মান অভি-মান মিলন বিরহের লীলা কেমন অবাধগতিতে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ফুটিয়া উঠে এই কবিতাগুলি তাহার নিদর্শন।

আর একটি কথা। তখনকার সময় কবি যে ভাব ফুটাইতে চাহিতেন, তাহা বিশুদ্ধ করিবার জন্য তাঁহাদের আন্তরিক যত্ন থাকিত। বৈষ্ণব-রস-সম্মত কবিতা লেখা বহু কৃতিত্বের ফল। সামান্য রসভঙ্গে সাহিত্য হিসাবে ক্ষতি ব্যতীত ভক্তের হৃদয়ে আঘাত লাগিবার ভয় ছিল। এই কবিতাতে কি রকম রসবিশুদ্ধির সাফল্য হইয়াছে তাহা বুঝাইতে বৈষ্ণব গ্রন্থ হইতে কিছু বিস্তারিত টিপ্পনী দিয়াছি।

কৃতী মহাকাব্য-রচয়িতাদিগের পদাঙ্ক অনুসরণে কবি আমাদিগকে প্রধান ঘটনার আবর্ত্তে আনিয়া আরম্ভ করিয়াছেন—

এক কবিতা মধুর কথা কর অবধান।
যে রূপেতে সুখ শয্যায় রাই করেছেন মান॥

তৎপরে বাসকসজ্জা বর্ণনা—

একদিন রাধে, মনের সাধে, হার গাঁথিলেন ফুলের।
সুখশয্যায় সাজাইলেন, নব মল্লিকার দলে॥
যুথীজাতি, মধুমালতী, চাঁপা নাগেশ্বর।
সুগন্ধি মাধবী কুঞ্জে, বেলী থরে থর॥
ইন্দ্রকমল গন্ধরাজ, পারিজাত দল।
(ও তার) সৌরভেতে, মধুর লোভে, ভ্রমরা বিকল।
প্রাণের সখা, দিবেন দেখা, কখন্ কুঞ্জে আসি।
এই বলিয়ে পথ পানে, চেয়ে আছেন বসি॥

ওদিকে বনমালীও নিশ্চিন্ত নহেন। ব্যস্ত সমস্ত হইয়া আসিতেছেন। এমন সময়—

চন্দ্রাবলী বনমালীর পথে নাগাল পেয়ে।
সেইখানে নিশি পোহাইল আনন্দিত হ'য়ে॥

এইখানে বলিয়া রাখা উচিত যে—

গোকুলে গোকুলচন্দ্রের এই লীলা পূর্ণতম। তিনি

এখানে ধীর ললিত নায়ক। কবি বীর ললিত নায়কের ব্যবহার কবিতাটির শেষ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ রাখিয়া গিয়াছেন। গোকুলচাঁদের পূর্ণতম লীলা স্ফুরণের প্রধানা সঙ্গিনী, শ্রীরাধা ও শ্রীচন্দ্রাবলী। তন্মধ্যে শ্রীরাধা ব্যক্তযৌবনা মাত্র, সুতরাং লীলায় বামা হইয়া থাকেন। শ্রীচন্দ্রাবলী পূর্ণযৌবনা এ কারণ লীলায় মান অভিমানের ভীষণ তুঙ্গ তরঙ্গের ক্রীড়া নাই—সুতরাং তিনি দক্ষিণা, এবং তজ্জন্য ধীরপ্রগল্‌ভা ও মৃদ্বী।

শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচন্দ্রাবলীর প্রতি যে 'স্নেহ' তাহার নাম ঘৃতস্নেহ। কিন্তু শ্রীরাধিকার প্রতি স্নেহ আরও মধুর। উহাকে পদকর্ত্তৃগণ 'মধুস্নেহ' আখ্যা দিয়াছেন। স্নেহ শব্দে সাধারণ পাঠকের চমকিত হইবার প্রয়োজন নাই। প্রেম যখন চিত্তকে দ্রবীভূত করে বৈষ্ণব পরিভাষিকে তাহাকে স্নেহ কহে।

আপন পতি সুখের নিশি ক'রে জাগরণ।
প্রভাতে রা'য়ের কুঞ্জে দিলেন দরশন॥

এদিকে উৎকণ্ঠায় সমস্ত রজনী জাগিয়া প্রভাতে শ্রীকৃষ্ণকে এই অবস্থায় আগত দেখিয়া শ্রীরাধিকার অভিমান হইল।

কৃষ্ণ দেখি অধোমুখী হ'য়ে আছেন রাই।
ফিরে যেতে বল্ ললিতে আর কার্য্য নাই।

এমন সাজান বাসর বৃথায় গেল—কম দুঃখ কি? তাই
বল্‌ছে প্যারী, দুঃখে মরি, ঘুমে অঙ্গ ঢোলে।
দ্বিগুণ আগুন জ্বালাইতে এলো প্রভাতকালে॥
এলাচ যাইত্রী জায়ফল, লঙ্গের মুঞ্জরী।
কর্পূর সহিতে পান রেখেছি বাটা ভরি॥
দেখ্ ললিতে সে সব আমার, হ'য়ে গিয়েছে বাসি।
(কা'ল) মিছে আশায় একাকুঞ্জে কেঁদে পোহালাম নিশি।
সুখের নিশি দুখে গেল, হায় কি প্রমাদ।
(ললিতে) আজ হইতে মিট্‌ল আমার কৃষ্ণপ্রেমের সাধ॥
না জেনে সঁপেছি প্রাণ, নিষ্ঠুরেরি হাতে।
ভাঙ্গিল বাসা প্রেমের আশা, মিটিল আজি হ'তে॥

তাহার পর অভিমানের মাত্রা উথ্‌লাইয়া পড়িল, ভাষায় কুলাইল না একেবারে ললিতাকে সরাসর হুকুম দিলেন—

(ললিতে) ধড়া চূড়া কেড়ে নিয়ে কুঞ্জের বাহির করেদে॥

দুঃখের ক্ষোভের ও রোষের এত আধিক্য যে, এক লাইনেই হুকুম শেষ হইল।

এতক্ষণে শ্রীকৃষ্ণের মানভঞ্জনের লীলা আরম্ভ হইল। বৈষ্ণব কবি মানভঞ্জনের সমস্ত প্রকার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন যথা সাম, ভেদ, ক্রিয়া, দান, নতি, উপেক্ষা ও রসান্তর। এখন সাম সূচিত হইতেছে—অর্থাৎ প্রিয়বাক্য দ্বারা শান্ত করিবার চেষ্টা প্রয়োগ একটু চোখের জল দুচারিটা চাটু কথা ইত্যাদি—

শুনিয়ে দারুণ কথা মর্ম্ম ব্যথা কাঁদেন বংশীধারী।
(রায়ের) মান দেখিয়ে কাতর হ'য়ে বল্‌ছে বিনয় করি।
তোরা শোন্‌লো ধনি কমলিনী (আমি) যায়নি কারো পাশে
আস্‌তে পথে দৈব তা'তে ঘট্‌লো কর্ম্ম দোষে॥
উঠ্‌লো—অঙ্গজ্বালা কদমতলা শীতল পেয়ে বসি।
মনের ভ্রমে প'লেম ঘুমে, ভোর হইল নিশি॥
উঠিয়ে—চেতন পেয়ে ব্যস্ত হ'য়ে, হেথায় এলাম আমি।
বিধির পাকে কর্ম্মদোষে (রাই) বাম হইলে তুমি॥

শ্রীকৃষ্ণ জাত গোয়ালা; সুতরাং এতগুলি নির্জলা মিথ্যাকথা বলিতে তাঁহার একটুকও বাঁধিল না। বিশেষতঃ এ লীলায় তিনি ধৃষ্ট নায়ক। তিনি অন্য কান্তাসম্ভোগ-চিহ্নাদিযুক্ত হইয়াও নির্ভয় ও মিথ্যাবাদী—তিনি ধৃষ্ট। সেই জন্য এ ক্ষেত্রে তাঁহার বুকের পাটা অনেক।

রাধিকা কিন্তু ইহাতে আরও রুষ্টা হইলেন—

রাই বলে দেখ ললিতে কথার কিবা ফাঁকি।
ভাল দেখ—চন্দ্রাবলীর কঙ্কণের দাগ চিহ্ন অঙ্গে দেখি।
সিন্দূরের বিন্দু চিহ্ন আছে ললাটের মাঝে।
ওতার বসন বদল হ'য়ে গিয়েছে সাক্ষাতে কি কায আছে।

বৈষ্ণব পাঠক দেখিবেন 'মধ্যা' শ্রীরাধা এই প্রকার রোষযুক্ত নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগে অধীরমধ্যা হইয়াছেন, কিন্তু অভিমান সাগরের এ লীলা তরঙ্গ ক্ষণিক।

শোন ললিতে এই দুঃখ কি আমার প্রাণে সয়।
গলেতে কুম্ভ বেঁধে মলে ঝাঁপ দিই এই মনে লয়॥
দূর ক'রে দাও কোকিল ভ্রমর কুঞ্জে যত আছে।
কালো নামের দ্রব্য কিছু না হেরি চক্ষেতে॥

শ্রীকৃষ্ণ ত পূর্ব্ব হইতেই প্রত্যাখ্যাত হইয়াছেন। তখন—

রাই—কালো কেশ ভুরুর বেশ চন্দনে ঢাকিল।
অঙ্গে ছিল কালো তিল সব ছাপাইল ॥
যত সকল কালো বসন ত্যাগ করিলেন ধনী।
দর্পণ ধরিয়ে দেখেন কালো চক্ষের মণি! ॥

তাইত! বহির্জগতের নিদর্শন সহজেই মুছিয়া ফেলা যায়, কিন্তু ভিতরের স্মৃতি, সেই শত মিলন-বিরহের মান অভিমানতরঙ্গ তাহা কি এক ফুৎকারে মিলাইবে? তাই জ্বালার উপর জ্বালা—

হায়লো জ্বালা দারুণ কালা গলার মালা হ'লো।
ছাড়িয়ে না ছাড়ে কালা নয়ন মাঝে র'লো ॥
এই বলিয়ে ত্যাগ করিলেন হস্তেরই দর্পণ।
নয়ন মুদে অধোমুখে রহিলেন তখন ॥
মহা বিরসি, নাইকো হাসি, কথা নাইকো মুখে।
শ্যামনাগর দ্বিগুণ ফাঁপর (রায়ের) মানতরঙ্গ দেখে ॥

শ্রীকৃষ্ণ তখন অন্য পন্থা ধরিলেন। এবার নতি অর্থাৎ প্রকারান্তরে ক্ষমা প্রার্থনা। অব্যর্থ বাণ ছাড়িলেন। সেই মামুলী দাসখত যাহা প্রতি যাত্রায় কথকতায় পাঁচালীতে শ্রীরাধিকার চরণে লিখিয়া দিয়া আসিতেছেন!

ও রাই—ক'লে বা না ক'লে কথা একবার ফিরে চাও।
বদন ভারী ক'রে প্যারী (কেন) আমারে কাঁদাও ॥

তারপর একটু গদ্‌গদ ভাব—

তুমি বিনে পৃথিবীতে আর কে আমার আছে।
করিবে দয়া দিবে ছায়া দাঁড়াব কার কাছে ॥
তব লোকি (?) রসবতী বৃন্দাবন বাঁধালে।
তোমার গুণ গাইতে বংশিটি শিখালে ॥

শ্রীকৃষ্ণ আর বিলম্ব করিতে পারিলেন না, তাই তাড়াতাড়ি—

শ্যাম বনমালী কলমকালী কাগজ লয়ে হাতে।
দাসখত লিখিয়া দিলেন দ্বাপর যুগের মাঝে ॥
দ্বাপর যুগ ছেড়ে যখন কলিযুগ হ'বে।
গৌররূপ নিয়ে জন্ম নবদ্বীপের মাঝে ॥
দোল দোল দোল কমলের দোল পরিব কৌপীন।
রাধা নামে ভিক্ষা মেগে সুধ্‌বো তোমার ঋণ ॥
যুগে যুগে যত লীলা হইবে আমার।
জনমে জনমে আমি দাস হইব তোমার ॥

এখানে কবি "গৌর বাঁকা"র রূপে মুগ্ধ হইয়াছেন। "অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর ভাবকান্তি যাঁর অঙ্গে মাখা"—সেই মহানপুরুষের ধ্যানে নিমগ্ন। এই বলিয়া খত লিখিয়া রায়ের চরণে দিল।

কিন্তু এ যে শ্রীরাধিকার মান, অহেতুক হইলেও তরঙ্গ শতধারে ভাঙ্গিয়া পড়ে। এখানে ত অহেতুক। তাঁহার মান সর্ব্বদাই ললিত, অর্থাৎ কৌটিল্যযুক্ত শ্রীচন্দ্রাবলীর মানের মত উদাত্ত বা সারল্যযুক্ত নয়।

রাই এত সহজে প্রাপ্ত দাসখতের মূল্য বেশ বুঝেন, তাই—মানের ভরে প্যারী তখন বদন না তুলিল।

সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের এই দ্বিতীয় দফার চেষ্টাও ব্যর্থ হইল। নিজের চেষ্টা বিফল হইলে তখন লোকে অন্যের সাহায্য চেষ্টার সন্ধান করে।

তখন দিয়ে শিরে হাত রাধানাথ চতুর্দ্দিকে ফেরে।
কোথা বৃন্দে বৃন্দে বলে শ্যাম ডাকেন উচ্চৈঃস্বরে ॥

ব্রজলীলায় রাধিকার এত সহচরী থাকিতে শ্রীকৃষ্ণ হঠাৎ বৃন্দাকে স্মরণ করেন কেন? ব্রজলীলায় শ্রীরাধিকার সহচরী পঞ্চবিধা। তন্মধ্যে সখীশ্রেণীভুক্তা তিনজন মাত্র যথা—শ্রীবৃন্দা, শ্রীবীরা ও শ্রীবংশী। যাঁহারা রাধিকা হইতে শ্রীকৃষ্ণকে সমধিক স্নেহ করেন তাঁহারাই 'সখী।' তন্মধ্যে শ্রীবৃন্দা প্রিয়বাদিনী, সেইজন্য প্রথমে বৃন্দাকে স্মরণ হইল।

বৃন্দা বোধ হয় এতক্ষণ অন্তরালে থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণের এই নিষ্ফল চেষ্টা দেখিতেছিলেন। একটু অভিমানও হইয়াছিল, তাই দু কথা শুনাইয়া দিবার এমন সুযোগ ছাড়িতে পারিলেন না।

বৃন্দে বলেন কিহে তুমি কোথায় তুমি থাকো।
কি কারণে হেথায় এসে আমায় তুমি ডাকো ॥

দূতীর এই প্রত্যাখ্যানে—

কৃষ্ণ বলেন—চিনিবে না লো মোরে।
সকলি কপালে করে কি দোষ দিব তোরে ॥
দুখী যেমন সুখের কারণ সোণার গাছে চড়ে।
কর্ম্মপাকে পড়িয়ে যেমন ডাল ভাঙ্গিয়া পড়ে ॥
বুঝা গেল সেই সে হ'ল প্রাণ যে এখন যায়।
কি করিব কোথায় যাব না দেখি উপায় ॥

কিন্তু চতুর নায়ক বুঝিলেন বিপদ্ বড় সঙ্গীন—কথা কাটাকাটির সময় এ নয়। তাই ফস্ করিয়া আসল কথাটা পাড়িলেন—

দূতীর করে ধরি বিনয় করি বল্‌ছেন্ যদুরায়।
কমলিনী এনে দাও হে বিলম্ব না সয় ॥

বৃন্দে কিন্তু এখনও ছাড়িবার পাত্র নন্।

বল্‌ছে দূতী আজ শ্রীমতীর মান হয়েছে বড়।
তা না হ'লে বৃন্দে দূতীর সোহাগ এত বড় ?"

উপরে বলিয়াছি শ্রীবৃন্দা প্রিয়বাদিনী। শ্রীরাধিকার অষ্টবিধা সখী শ্রীবীরা প্রগল্‌ভবচনা ও শ্রীবংশী সর্ব্বকার্য্য-সাধিকা। কবি এই সামান্য কবিতায় তিন জন সখীকে আসরে না আনিয়া শ্রীবৃন্দার দ্বারাই তিন সখীর লীলা প্রকাশ করিতেছেন; প্রথমে বৃন্দাকে শ্রীবীরার মত প্রগল্‌ভা করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের বিরস বদন দেখিয়া আর থাকিতে পারিলেন না। প্রিয়বাদিনী হইলেন।

বৃন্দে বলে যদুপতি আর কেঁদনা তুমি।
যেমত রা'য়ের মান ভঙ্গ হয় এই চলিলাম আমি ॥

এইরূপে আশ্বাস দিয়া শ্রীবংশী ভাবে শ্রীবৃন্দা সর্ব্বার্থ-সাধিকা রূপে ঝমর ঝমর করিতে করিতে শ্রীরাধাকে মানাইতে চলিলেন।

পট পরিবর্ত্তন হইল।

শ্রীকৃষ্ণকে প্রত্যাখ্যান করিলে তিনি যখন চলিয়া গেলেন তখন শ্রীরাধিকার জ্ঞান হইল। বুঝিলেন একটু যেন বেশী বাড়াবাড়ি হইতেছে।

পিছু পানে চেয়ে কৃষ্ণ না দেখিয়ে।
কোথায় প্রাণনাথ ব'লে রাই পড়েছেন ঢলিয়ে ॥

হেন কালে বৃন্দা আসিয়া হাজির। প্রথমে কৃষ্ণ-প্রশংসা। মান-ভঞ্জনের ইহা তৃতীয় প্রথা। ভেদকাণ্ডের ঐশ্বর্য্য দেখাইয়া মানকারিণী যে তাঁহার কত অযোগ্য তাহা প্রকাশ করা।

(তখন) বৃন্দে আসি, কঠিন কথা কয়।
(ও রাই) ব্রহ্মার পুত্র হয়ে শ্যাম ধরেছে তোমার পায় ॥
দশে জ'পে পঞ্চ মুখে শিব করেন ধ্যান।
গোপের নারী হ'য়ে করিস্ তার সঙ্গে মান ? ॥
ধিক্ থাক্ তোর এমন মানে মরগে কমলিনী।
আজ হইতে তোমার স্থানে বিদায় হলেন তিনি ॥

শেষ লাইনে চতুর্থ প্রকার উপেক্ষাও সূচিত হইল। সার্থক দূতীগিরি বটে! রায় কবির ভাষায় "এ গোঁপ যোড়ায় দিলে চাড়া তোমার মতন অনেক পা'ব।"

এই বলিয়া বৃন্দা রায়ের মান ভাঙ্গিতে গেল।
কিন্তু এ যে দুর্জ্জয় মান, এ ত সহজে ভাঙ্গিবার নয়, তাই—

পুনর্ব্বার নীলাম্বরী দিয়ে প্যারী বদন ঢাকিল ॥
যতই সাধে ততই রা'য়ের মান ভঙ্গ নাহি হয়।

সব ভাসিয়া গেল। শ্রীকৃষ্ণ আবার স্বয়ং হা'ল ধরিলেন—
পীতবসন গলে ভূমে কেঁদে পড়েছে রসিক রায় ॥

বৃন্দা আর এক ধাপ অগ্রসর হইল। এবার নির্ভেজ গালাগালি। ভাবিল ইহাতেও যদি ঔষধ ধরে। সঙ্গে "ক্রিয়া" পঞ্চম প্রথা অর্থাৎ ভয়প্রদর্শন।

ও রাই, আমি সাধ্‌লে গাছের পাতা ঝরে।
আমি সাধ্‌লাম তবু তোমার মান না গেল দূরে ?
গাভীর বৎস প্রতিপালন করি বৃক্ষের মূলে।
সমুদ্র বাঁধাতে পারি লবঙ্গের জাঙ্গালে ॥
বৃন্দে দূতীর নাম ধরি কে ধারে মোর ছল ?
আমি জলে অনল দিতে পারি অগ্নি করি জল ॥
বাতাসে কাদা ওড়ে হেন শক্তি আছে।
বারুদ রাখিতে পারি অগ্নিকুণ্ডের মাঝে ॥
ব্রহ্মা দেবগণে নাহি বোঝে মোর বল।
আমি বৃন্দে সাধ্‌তে এলাম (তবু) তোমার মানের এত ...?

শ্রীবৃন্দাদেবীর উপরিলিখিত ছবিখানি বড় ভয়ে ভয়ে সাধারণের নিকট স্থাপন করিতেছি। ভয় হয় পাছে আধুনিক চমকপ্রদ সমালোচনার সূক্ষ্ম অনুবীক্ষণে উহা মুসলমান সাহিত্যের প্রভাব এবং মুসলমানী কেতাবের চরিত্রহীনা দাসীদিগের হিন্দুসংস্করণ বলিয়া ধরা পড়িয়া না যায়। এটা বড় কঠিন যুগ। সমালোচনার ত্রিকোণ কাচের মধ্য দিয়া আসল রশ্মি হইতে যাঁহার যে রকম ইচ্ছা সেই রকম রঙ্ দেখান যায়। এই জন্য এত ভয়!

যাহা হউক বৃন্দা তাঁহার দূতীগিরির অক্ষয় তূণ হইতে আর একটি বাণ ছাড়িলেন—

এক সোণার রাধা নির্ম্মাইয়া দিব তার প্রাণ।
আস্‌বেনা আর শ্যাম তোদের কুঞ্জে থাক নিয়ে তোর মান॥

কিন্তু রাধা জানেন এবং বৃন্দাও না জানেন এমন নয় যে দুধের পিপাসা ঘোলে মেটে না এবং রামচন্দ্র ত্রেতাযুগে পূর্ব্বে একবার এ পরীক্ষায় সফল হন নাই।

কোনই ফল হইল না। ব্যর্থ-মনোরথে দূতী ফিরিয়া গেলেন।

শ্যামের মুখ দেখে বৃন্দে দূতী কেঁদে কেঁদে কয়।
সবাই হেরব নাকো তোমার ও মুখ ওগো রসিক রায়॥
যেমন দক্ষযজ্ঞে দুর্গা বিনে পাগল শূলপাণি।
তেমনিতর হলেন তখন দূতীর মুখের কথা শুনি॥
যেমন ত্রেতাযুগে সীতার লেগে ব্যস্ত ছিলেন রাম।
মনেতে কাঁপর ভেবে ভূমেতে মূর্চ্ছা গেলেন শ্যাম॥

সর্ব্বনাশ! বৈষ্ণব কবির কি এ দৃশ্য সহ্য হয়? মহাপ্রভুর নীলাচল লীলার স্মৃতি কবিহৃদয় শতধারে উদ্বেলিত করিয়া দিল।

কবি ভাবোন্মাদে গায়িলেন—,

আহামরি বংশীধারী মদনকুঞ্জের প্যারী।
জয় রাধা শ্রীরাধা বলে শ্রীঅঙ্গ আছাড়ি॥
সে যে রাধামন্ত্র রাধাযন্ত্র রাধা ভার্য্যা জ্ঞান।
জপে রাধা পূজে রাধা রাধাপুরের ধ্যান॥
যদি রাধানাথের প্রতি রাধার দয়া না হইল।
তবে কায কি আর এ জীবনে রাখিয়া কি ফল॥
রাধা নামে প্রাণ ত্যজিব রাধাকুণ্ডের জলে।
ম'লে রাধার চরণ পা'ব সর্ব্বশাস্ত্রে বলে!॥

রমণীর বুদ্ধি প্রখরতরা, সুতরাং যতক্ষণ শ্যাম আমাদের কাঁদিয়া রাধাকুণ্ডের জল বৃদ্ধি করিতেছিলেন ততক্ষণ বৃন্দা আর একটা ফন্দী ঠাওরাইয়াছে।

বৃন্দে বলেন যদুপতি আর কেঁদনা তুমি।
যেরূপে রাধের মান ভঙ্গ হয় এই করিব আমি॥

এখানে যদুপতি সম্বোধন বড় সাময়িক। ঐশ্বর্য্য স্মরণ করাইয়া উদ্বুদ্ধ করিবার চেষ্টা।

বৃন্দা ভাবিলেন, রমণী স্বামীর সকল অবস্থাই উপেক্ষা করিতে পারেন, কিন্তু ভস্মলিপ্ত যোগীর বেশ তাঁহাদের অসহ্য হইবেই। বিশেষতঃ মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের পর হইতে বঙ্গদেশীয়া ললনারা সন্ন্যাস বেশকে ভয়ের চক্ষে দেখিয়া আসিতেছেন; কৃষ্ণকে যোগিবেশে রাধিকার নিকট প্রেরণের বন্দোবস্ত করিলেন।

অথ যোগিবেশ বর্ণন—

চূড়া ফেলে শিঙ্গা দিয়ে দিয়ে যজ্ঞের ফোঁটা।
ব্যাঘ্রচর্ম্ম পৃষ্ঠে দিয়ে শিরে দিয়ে জটা॥
বাহবা কি যোগীর বেশ হৃষীকেশ সাজ্‌লো বিলক্ষণ।
আহা বোম বোম গালবাদ্য চল্‌লো ততক্ষণ॥
আহা বোম বোম ভোলা ব'লে উত্তরিল দ্বারে।
ওলো ব্রজময়ী চারিটি ভিক্ষা দিয়া যাও আমারে॥

ব্রজেশ্বর সকল ব্রজময়ীদিগের নিকট চারিটি ভিক্ষাই চাহিয়া বেড়াইতেছেন। চতুর্ব্বর্গফল তাঁহাকে দিতে হইবে। অধিকাংশ দাতাই জটিলার মত—

ছিল বুড়া হাতে নড়ী নাম তার জটিলা।
একমুষ্টি ভিক্ষা ল'য়ে যোগীর কাছে গেলা॥

একমুষ্টি ভিক্ষা মাত্র দিতে পারেন। কেবল ভাবের ঘরে চুরী! সর্ব্বস্ব দেওয়া কি সহজ! দিবেন একমুষ্টি মাত্র ভিক্ষা, তাহাতে আবার সোর সরাবত কত—

ভিক্ষা নেওগো যোগী রায়!!

অতঃপর যোগীর উক্তি বড় উপাদেয়। বাঙ্গালার পল্লীতে বাঙ্গালিনীর মুখে হিন্দীমিশ্রিত বাঙ্গালা কি রকম হরগৌরী মূর্ত্তি ধারণ করে তাহার নমুনা,—

ভিক্ষা দেখে যোগী বলে, "শুনলো বুড়া মাই।
বিধবা মায়ের হস্তের ভিক্ষা কদাচ নাহি লেই॥

এটুকুত নির্ভাজ বাঙ্গালা; তারপর—

হাম্‌তো যোগী অনুরাগী নিষ্ঠে ভাজন নড়া। (?)
বোলাওলো তোম্‌কো পুত্রবধূ ভিক্ষাদেক হাম্‌কো থোড়া।

বুড়ী চটিয়া গেল। ভিখারীর আবার নিষ্ঠা!

বুড়ী বলে একি দেখি কা'ল ঘিরিল দেশে।
কোন নৌকা নাড়া মহৎ মাড়া এসেছে যোগীর বেশে॥

নদীবহুল বঙ্গে সেকালে একমাত্র নৌকাই সহজ ও সুলভ যান ছিল। "বেগানা" লোকের আমদানী বোধ হয় নৌকা দ্বারা হইত বলিয়া নৌকানাড়া কথার প্রয়োগ।

এ ত যোগী নয়রে কোন্ বেটা যেন কান্‌ঠা।
এই ব'লে বুড়ী ফিরল পুরী ঘাড়টা দিয়ে ঝ্যাংটা॥

কিন্তু হাজার রাগ হউক ইহারা সেকেলে গৃহিণী। অতিথি ফিরাইতে জানিতেন না। তাই—

বুড়ী গিয়ে ডেকে ডেকে কয়।
এক বেটা যোগী এসেছে তারে ভিক্ষা দিতে হয়॥

বুড়ীর এত বিতৃষ্ণা যে ভিক্ষা দাও বলিবার পর্য্যন্ত ইচ্ছা নাই।

তখন রাই আসিয়া হাজির।

তা শুনিয়াই

আটা চিনি ঘৃত মধু থাল ভরিয়া নিল।

ব্রজেশ্বরী না হইলে এমন চতুর্ব্বর্গ ভিক্ষা কে দিতে পারে? আটা চিনি ঘৃত মধু তাহাও আবার থালা ভরিয়া—সর্ব্বস্ব পরিপূর্ণ করিয়া দান!

ললিতেকে সঙ্গে নিয়ে ভিক্ষা দিতে গেল॥

হিন্দু গৃহস্থ বধুর নিখুঁত ছবি। দাসী সঙ্গে আছেন।

এখন রাধিকার

বঁধু গেছেন মনে করিয়ে সেই ভাবনায় রাই।
ত্রিভঙ্গ যোগীর সনে আড় নয়নে চায়।
বসন মুখে দিয়ে বলে ভিক্ষা নেওহে যোগী যায়।

ইহার উত্তরে যোগী রায় যে হিন্দীতে জবাব দিলেন তাহা বাঙ্গালী সহজে বুঝিবে—কিন্তু হিন্দুস্থানীদের চৌদ্দপুরুষের সাধ্য কি যে এক বর্ণ বুঝে—

আমি কি করেঙ্গা আটা চিনি কি করেঙ্গা ঘি।
তোমকো বঁধুর সঙ্গে মান করেছ মাপ করত নি॥

রাই শুনিয়া অবাক্!

তা শুনে রাই ললিতাকে ভণে।

আমি যে বঁধুর সঙ্গে মান করেছি যোগী কেমনে জানে?॥

সখীরা বংশীধারীর বাঁকা নয়নের কটাক্ষে প্রভুকে সহজেই চিনিলেন—

ললিতা বিশাখা সবার মনে উঠে ধোঁকা
ঐ দেখ্‌তো যোগীর কেন নয়ন দুটি ব্যাঁকা॥
শ্রীরাধিকার দুঃখ শতধারে উথলিয়া উঠিল—
এ ত যোগী নয়রে কইতে বুক ফাটে।
কোন্ ছার দাসীর জন্যে এত দুঃখ ঘটে॥

বৈষ্ণব সাধকগণ বলিয়াছেন অশ্রু কিংবা হাস্য মানান্তের লক্ষণ। এখানে অশ্রুতে মানের সমাপন হইল।

সহিতে না পারি জল দেখি তব চক্ষে।
এত বলি হাতধরি রাই নিল নিজ কক্ষে॥
ব্রজের ধন্য লতা ধন্য পাতা ধন্য বৃন্দাবন।
ধন্য ধন্য রাধাকৃষ্ণের এইখানে মিলন।

এই ভণিতাটি দ্বিতীয় কবিতাতেও আছে। অবকাশ পাইলে উহাও পাঠকদিগকে উপহার দিবার বাসনা রহিল।

মিলন না করিয়া বৈষ্ণব কবির মান বিরহ মাথুর গায়িবার যো নাই।

শ্রীচিত্তসুখ সান্যাল।

রাস।

হে কানাই, হে মোর কানাই!
মধুর জ্যোছনা-স্রোতে ভেসে আজি যায় চারি ঠাঁই!
তুমি এস প্রিয়তম, সে আনন্দ-প্লাবন বাহিয়া
মোর হৃদি-কুঞ্জ মাঝে! পথ চেয়ে আছে দাঁড়াইয়া
প্রেম-উন্মাদিনী রাই—আত্ম-বধূ-মিলন-কাতরা—
গাঁথিয়াছে বর-মালা, সাজায়েছে যৌবন-পশরা,
তোমারি পূজার অর্ঘ্যে, ওগো শ্যাম, ওগো নটবর!
ওই বুঝি শুনা যায় তব সুধা-মুরলীর স্বর—
ব্যাকুল পরাণ চাহে চূর্ণ করি বক্ষ-কারাগার
ছুটিতে সন্ধানে তারি—দিতে পদে আত্ম-উপহার!

নবীন শিশির-স্নাত বিশ্ব-রমা প্রকৃতি রূপসী
রচিছে মিলন-শয্যা অন্তরের অন্তঃস্থলে পশি'!
আজ শুধু জাগরণ—সারা নিশি প্রেম-অভিনয়—
কেবলি সঙ্গীত নৃত্য চুম্বনের পুলক-অক্ষয়!
নিভৃত বিহার শুধু মদিরাদ্র মান-অভিমানে,
মদনের মহোৎসব তৃষ্ণাতুর পরাণে পরাণে!
এস এস প্রেমময়! দাও দাও গাঢ় আলিঙ্গন!
তৃপ্ত হোক্ সব আশা—শান্ত হোক্ বিরহ-বেদন!!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

রূপের মূল্য।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

"রোস্তম!"

"জনাব"

"এই সেই স্থান?"

"এই সেই স্থান।"

"সুলতান আমাদের এখানেই নামিতে আদেশ করিয়াছেন? কেমন!"

"জনাবালি যা অনুমান করিতেছেন তাই ঠিক।"

"সমুদ্রের তরঙ্গ ক্রমশঃ ভীষণ হইতেছে—নৌকা আর স্থির থাকিতে পারিতেছে না।"

"আর একরশি গেলেই আমরা যথাস্থানে পৌছিব। সম্মুখে ঐ যে কৃষ্ণবর্ণ ছায়ার মত একটা অংশ দেখিতেছেন, উহাই গুর্জ্জরের তটভূমি।"

"ঐ গুর্জ্জরের তটভূমি?"

"হাঁ জনাব—"

"সমুদ্র-মেখলা গিরিকিরীটিনী গুর্জ্জরভূমির?"

হুজুরালি যা ভাবিতেছেন, তাই ঠিক।"

"যে দেশের ধ্বংসসাধন সংকল্প করিয়া, আমরা ছদ্মবেশে এ বন্দরে আসিয়াছি, এই সেই সোণার দেশ!"

"হাঁ জনাবালি—এই সেই সোণার দেশ।"

"কি সুন্দর পাহাড় এ দেশের! কেমন গর্ব্বিতভাবে তাহারা গগন-নীলিমা স্পর্শ করিতে উদ্যত। তৃণশস্প গুল্মাবৃত জঙ্গলরাশির মধ্যেও কেমন একটা সৌন্দর্য্য! কি সুন্দর চন্দ্ররশ্মি এ দেশের! চন্দ্রের জ্যোতিঃ কত উজ্জ্বল, কত স্নিগ্ধ! কি সঞ্জীবনীশক্তিময় মলয়প্রবাহ এ দেশের! এ দেশ দেখিয়া চিরতুষারময় আফ্‌গানিস্থান,যেন জাহান্নাম্ বলিয়া বোধ হইতেছে।"

নৌকা ধীরে ধীরে বন্দরের ঘাটে আসিয়া লাগিল। নৌকায় মাঝিরা হিন্দু। কিন্তু আরোহিগণ হিন্দুবেশী মুসলমান। আরোহিগণ বলিলাম, কেন না, দুই জনের বিবরণ পাঠক এখনই পাইলেন। আরও দুইজন সেই নৌকার মধ্যেই ছিল। যাঁহারা কথোপকথনে ব্যস্ত তাঁহারা বাহিরে বসিয়া মুক্ত বায়ু সেবন করিতেছিলেন।

কিন্তু ইঁহাদের মুসলমানের মত বেশভূষা ছিল না। পোষাক পরিচ্ছদ কাশ্মিরী হিন্দুদের মত। গায়ে জাফ্‌রাণ রঙ্গের ঢিলা চাপকান। সুন্দর বাবরি-কাটা চুল। মাথায় সাঁচ্চার সরু কাজ করা পাগড়ি। হেনারাগসিক্ত গুম্ফ ও শ্মশ্রুরাজি। আর বক্ষাভ্যন্তরণে লুক্কায়িত ক্ষুদ্র ক্ষুরধার তরবারি ও ইস্পাহানী ছোরা।

"ঐ গুর্জ্জরের তটভূমি?"

নৌকাচালকেরা গুর্জ্জরের মাঝি। তাহারা নীচ শ্রেণীর দরিদ্র হিন্দু। তাহাদের আরোহিগণ মুসলমান এ কথা জানিতে পারিলে কখনই তাহারা সওয়ারি পার করিয়া দিত না।

জাতিভেদগত কোন বিদ্বেষের জন্য যে তাহারা এরূপ করিত তাহা নহে। সমুদ্রমেখল গুর্জ্জরের শান্তিময় বক্ষে যাহাতে কোন মুসলমানই প্রবেশ না করিতে পারে সেই জন্য গুর্জ্জরের অধিপতি এ সম্বন্ধে একটা কঠোর রাজাদেশ প্রচার করিয়াছিলেন।

গুর্জ্জরপতির আদেশ ছিল, "যে কোন মাঝি, জ্ঞাতসারে মুসলমানকে গুর্জ্জরে আনিবে তাহার প্রাণদণ্ড হইবে।" আর স্থলপথে কাহারও সেদিকে আসিবার সম্ভাবনা নাই—কারণ চারি পাঁচটি ক্ষুদ্র সামন্তরাজ গুর্জ্জরের চারি পার্শ্বে অবস্থান করিতেছিলেন।

যে সময়ের কথা আমরা বলিতেছি—সেই সময়ে গজনীপতি সুলতান মামুদ উপর্য্যুপরি কএকবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন। গুর্জ্জরের সোমনাথপত্তনেই সোমনাথের মন্দির। মন্দিরের মালিক গুর্জ্জরপ্রদেশাধিপতি। বহুদিন হইতে সুলতান গুর্জ্জর-রাজ্যের প্রতি কঠোর দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন। কতবার তিনি স্থলপথে, গুর্জ্জরের ভিতরের অবস্থা জানিবার জন্য দূত পাঠাইয়াছেন, কিন্তু কোন দূতই ফিরিয়া গিয়া তাঁহাকে সংবাদ দিতে পারে নাই! মামুদের মনের ধারণা এই—গুর্জ্জরাধিপের সতর্ক গুপ্তচরগণ তাহাদের হত্যা করিয়াছে।

সেই জন্য মামুদ এবার তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র, জামাল খাঁ ও প্রধান সেনাপতি রোস্তম খাঁকে, দস্যুবেশে, হিন্দুর পরিচ্ছদে গুর্জ্জরে পাঠাইয়াছেন।

জামাল খাঁ ও রোস্তম আলি খাঁ, কাশ্মিরী হিন্দু ব্যবসায়ীর বেশে সিন্ধু দেশ হইতে জলপথে যাত্রা করেন। দুই দিন তাঁহাদের সমুদ্রপথে কাটিয়াছে। তৃতীয় দিনে তাঁহারা গুর্জ্জরের খাড়ীমধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন।

এই খাড়ীমুখেই তাঁহারা গুর্জ্জরের নৌকায় উঠিয়াছেন। সন্ধ্যার প্রাক্কালে তাঁহারা সমুদ্রতীরস্থ সোমনাথ বন্দরে উপস্থিত হইলেন।

রোস্তম খাঁ সুলতান মামুদের পার্শ্বচররূপে, উত্তর-পশ্চিম ভারতের অনেক স্থানে কাটাইয়াছেন। অনেক দেশের ভাষা তিনি শিখিয়াছিলেন। কাজেই গুর্জ্জরে নামিয়া তদ্দেশের ভাষানভিজ্ঞতার জন্য তাঁহাকে বিশেষ কষ্টে পড়িতে হয় নাই।

রোস্তম জামাল খাঁকে অস্ফুটস্বরে বলিলেন,—"এখন আর কোন কথায় কাজ নাই। চলুন নামিয়া যাই।"

রোস্তমের ইঙ্গিতে তাহার সঙ্গিদ্বয় নৌকার মধ্য হইতে বাহিরে আসিল। রোস্তম দুইটি স্বর্ণ-মুদ্রা মাঝিকে পুরস্কার দিলেন। এ স্বর্ণ-মুদ্রা গুর্জ্জরের—পূর্ব্ব হইতেই সংগৃহীত। তাঁহারা চারিজনেই নৌকা হইতে তীরে নামিয়া আসিলেন। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে।

সন্ধ্যার অন্ধকার সেদিন গভীর হইতে পারে নাই, কেন না একাদশীর চন্দ্র আকাশমণ্ডলের অঙ্গশোভা করিয়া হাস্য করিতেছিল। সেই সুবিমল চন্দ্ররশ্মি, গুর্জ্জরবক্ষস্থিত, সোমনাথদেবের রত্নখচিত স্বর্ণমণ্ডিত সমুচ্চ চূড়ার উপর পড়িয়া বড়ই সুন্দর দেখাইতেছিল। আর অদূরস্থ, শব্দায়মান, সমুদ্রের শুভ্র ফেনমাখা তরঙ্গরাজির উপর সেই রজতরেখা শতধারে বিস্ফুরিত হইয়া স্বপ্নরাজ্যের মনোহর দৃশ্য বিকাশ করিতেছিল।

অদূরেই সোমনাথ-মন্দির। সন্ধ্যার সময় মন্দির-মধ্যে দেবতার আরতি হইতেছে। দামামাধ্বনির সহিত ঘণ্টানিনাদ মিশিয়া এক গুরু গম্ভীর নাদের সৃষ্টি করিয়াছে। সেই গম্ভীরনাদ, বায়ুপথ চালিত হইয়া সমুদ্রের ভীষণ গর্জ্জনের সহিত মিশিয়া মহাদম্ভে শব্দহীন ব্যোমপথকে বিকসিত করিতেছে।

শঙ্খঘণ্টার শব্দ, দামামার কঠোর শব্দ, জনসঙ্ঘের কোলাহল শব্দ ক্রমে ক্রমে নিস্তব্ধ হইল। তাহার পর সুমধুর নহবৎ আরম্ভ হইল। প্রতিদিনই আরতির পর এইভাবে নহবৎ বাজিয়া থাকে। প্রথম প্রহর উত্তীর্ণ হইলেই, নগরদ্বার বন্ধ হইয়া যায়। ইহাই গুর্জ্জরের ব্যবস্থা। কাজে কাজে সেই দিনও পূর্ব্ব প্রথামত পূরবী ইমনের মধুর আলাপে, চন্দ্রালোক-প্লাবিত দিগ্‌বালাগণ পুলকিত হইয়া উঠিলেন।

এই চারিজন অপরিচিত পান্থ, সমুদ্রতীরাবস্থিত, এক সুবৃহৎ পাষাণ খণ্ডের উপর বসিলেন। দূরশ্রুতবীণাধ্বনিবৎ

সেই নহবৎ-ধ্বনি তাঁহাদের চিত্তকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিল। তাঁহাদের পথশ্রম-কাতর অবসন্ন দেহ ও প্রাণ, যেন সেই মধুরধ্বনিতে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল। শ্রম, ক্লান্তি, অবসাদ সবই চলিয়া গেল। তাঁহারা কি করিতে কোথায় আসিয়াছেন—তাহা ভুলিয়া গেলেন।

স্থানটি বড় নির্ম্মল। এইটিই সহরের শেষ প্রান্ত। সন্ধ্যার পর লোকজন বড় একটা থাকে না। সমুদ্রতীরে রাত্রে কাহারও আসিবার প্রয়োজন হয় না।

রোস্তম খাঁ বলিলেন,—"এখন জনাবের মরজি কি? চলুন সহরের মধ্যে কোন মুসাফেরখানায় প্রবেশ করি। একটা আশ্রয়-স্থান ত চাই! আমাদের জন্য বলিতেছি না, আপনারই যাহাতে কোন কষ্ট না হয়, তাহা দেখিবার জন্য আমরা সুলতান কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়াছি।

এই কথায় জামাল খাঁ—বিরক্তির সহিত বলিলেন,—"চুপ্! চুপ্ রোস্তাম! অনুচ্চস্বরে কথা কও। সুলতানের নামোল্লেখের কোন প্রয়োজনই নাই। গুর্জ্জরপতি অতি সতর্ক। হয়ত তাঁহার প্রতিনিধিগণ আমাদের অতি নিকটেই অবস্থান করিতেছে।

রোস্তম অধীন কর্ম্মচারীর হুকুমদার—তাঁবেদার। কাজেই সে চুপ করিল। জামাল খাঁ দেখিলেন, রোস্তম তাঁহারই হিতের জন্য দুকথা বলিতে গিয়া তিরস্কৃত হইয়াছে। কাজেই তিনি অনেকটা প্রসন্নভাবে বলিলেন, "আমার জন্য ভাবিও না রোস্তম।"

রোস্তম জনাবের প্রসন্নমুখ দেখিয়া একটু সাহস পাইল। বলিল,—"বিশ্রামের ত একটা স্থান চাই। দুই দিন সমুদ্রপথে কাটিয়েছি। এ কষ্ট আমাদের সহিতে পারে; কিন্তু আপনার—।"

এই কথায় জামাল খাঁ মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন,—"কেন আমি কি সৈনিক নই! তোমরা যে কষ্ট সহিতে পার আমি তা পারিব না?"

"এই সমুদ্রোপকূলে পাষাণবক্ষে শয্যা রচনা করিব। সঙ্গে আহার্য্য যথেষ্ট আছে। তোমরা শ্রান্তি দূর কর।"

"জনাবালি অন্যায় আদেশ করিতেছেন।"

"চুপ—আবার জনাবালি! ঐ দেখ রোস্তম সুনীল আকাশের নীচে কত নীল, পীত, সবুজ, শ্বেত তারকা পুঞ্জীকৃত হইয়া জ্বলিতেছে। এ দেশে তারকারও এত বর্ণ-বৈচিত্র্য!"

"জনাব—আপনি ভ্রান্ত! ঐ উজ্জ্বল পদার্থগুলি, তারকারাশি নয়। খোদা তারকাকে সমুজ্জ্বল শ্বেত বর্ণই দিয়াছেন। ওগুলি সোমনাথ মন্দিরের চূড়ার সংলগ্ন ত্রিশূলের উজ্জ্বল মণিপ্রস্তররাজি। উহার নীচে আলো দেওয়া আছে বলিয়া উহা ঐ ভাবে জ্বলিতেছে।"

"সোমনাথের ঐশ্বর্য্য এত! সোমনাথের হীরা মণিমুক্তা এত যে তাহা মন্দিরের চূড়ায় রক্ষিত! না জানি ভিতরে কি আছে। কিন্তু রোস্তম কি সুন্দর! উপরে সুনীল ব্যোমগাত্রে বিমল চন্দ্রজ্যোতি, আর সেই চন্দ্রজ্যোতি-প্লাবিত শূন্যস্তরে, মন্দিরচূড়ায় বহুমূল্য রত্নজ্যোতি! আর হেমকান্তি ত্রিশূলের উপর শুভ্র চাঁদের আলো। কি সুন্দর! রোস্তম কি সুন্দর!"

রোস্তম খাঁ মনে মনে ভাবিল, শাহজাদার এ ভাববিপর্য্যয় চিত্তবিকার, তাঁহাদের উদ্দেশ্য-সাধনের অনুকূল নহে। প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ-সম্পৎ-পরিভাবিত, নীলাম্বুবারিধিমেখল, তরঙ্গভঙ্গান্দোলিত, ভূধরমণ্ডিতা গুর্জ্জরের অফুরন্ত নৈসর্গিক শোভা তাঁহার কবিত্বময় চিত্তকে বিমুগ্ধ করিয়াছে। কাজেই সে কথাটা অন্যভাবে ঘুরাইয়া বলিল,—"জনাব! সোমনাথের ঐশ্বর্য্য বিশ্ববিশ্রুত। শুনিয়াছি, হিন্দুর এ দেবতা শূন্যগর্ভ। সেই শূন্যগর্ভের মধ্যে অসংখ্য বহুমূল্য রত্নরাজি লুকান আছে। যুগ যুগ হইতে সঞ্চিত হইয়া সে রত্নরাজি মন্দির-মধ্যে রক্ষিত। সেই রত্নরাজি হস্তগত করিবার জন্যই আপনার খুল্লতাত, মহা পরাক্রান্ত গজনীর সুলতান ভারতবিজয়ী মামুদ আপনাকে ছদ্মবেশে গুর্জ্জরের অবস্থা জানিতে পাঠাইয়াছেন।"

জমাল খাঁ তাঁহার হেনারঞ্জিত সুকোমল শ্মশ্রুরাজির মধ্যে অঙ্গুলি প্রবেশ করাইয়া দিয়া সেগুলি মৃদুভাবে আকর্ষণ করিতে করিতে চিন্তিতভাবে বলিলেন,—"রোস্তম খাঁ—"

"অনুমতি করুন হুজুরালি"!

"এই সুন্দর দেশ আমাদের ধ্বংস করিতে হইবে!—ইহার বিনাশের উপলক্ষ্য হইতে হইবে। হাস্যময়ী ধরার, অপ্সরোদ্যানে অগ্নিদাহ করিয়া তাহাকে ভস্মীভূত করিয়া

শ্মশান করিতে হইবে ? খোদা যে দেশকে এত মনের মত সোভাসম্পদ্ দিয়া সাজাইয়াছেন, সেই শান্তিময় দেশকে শোণিতাক্ত করিতে হইবে। না—না—আমি পারিব না। আমার দ্বারা এ ঘৃণিত কাজ হইবে না।"

রোস্তম খাঁ ঘোর হিন্দুদ্বেষী। সুলতান মামুদের উপযুক্ত অনুচর শাহজাদার কথায় ভঙ্গীতে সে বড়ই উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছিল; কিন্তু তাহার কোন স্বাধীন ক্ষমতা নাই, সে অধীন কর্ম্মচারী মাত্র। সুলতান মামুদের ভ্রাতুষ্পুত্র, এই বিশাল গজনীর ভবিষ্যৎ অধীশ্বর, যাঁহার উপর সুলতানের অপরিমেয় স্নেহ, অগাধ বিশ্বাস, তাঁহার কথার উপর কথা কহিবে—এমন সাহস তাহার নাই। লুণ্ঠন, যুদ্ধ, সেনানীর সুনাম ও সুযশ হিন্দুরাজ্যের ধ্বংসসাধন তাহার প্রাণের কামনা বটে, কিন্তু তাহা হইলে কি হয় সে শাহজাদার আজ্ঞার অধীন। কিয়ৎক্ষণ স্থিরভাবে থাকিয়া, রোস্তম বলিল. "এখন জনাবালির অভিপ্রায় কি ?"

জামাল খাঁ বলিলেন, "পূর্ব্বেই ত আমি বলিয়াছি রোস্তম! আমার সংকল্প পরিবর্ত্তিত হইবার নহে। এই গুর্জ্জরকে দেখিয়া অবধি আমার বড়ই স্নেহ জন্মিয়াছে। কে কোথায় কবে স্নেহের জিনিসকে ধ্বংস করিতে পারিয়াছে। যে বিজয়-বাসনা আমার খুল্লতাতকে বিচলিত করিয়াছে, যাহার উত্তেজনা-চালিত হইয়া তিনি ভারতের হিন্দুরাজ্যগুলির বার বার ধ্বংসসাধন করিয়াছেন, খোদার শান্তিময় রাজ্যে শোণিতপ্রবাহ বহাইয়াছেন, ভারতের লুণ্ঠিত ঐশ্বর্য্যে গজনীকে অলকাতুল্য করিয়া তুলিয়াছেন, সে দুর্দ্দমনীয়া বাসনা আমার প্রাণে নাই। জানি আমি তাঁর সিংহাসনের অধিকারী। কিন্তু আফ্‌গানস্থানে—প্রকৃতির প্রদত্ত বহুমূল্য উপহার যাহা আছে তাহাতেই আমি সন্তুষ্ট থাকিব। পার্ব্বত্য ক্ষেত্রে উৎপন্ন গোধূম—উপত্যকায় উৎপন্ন রসাল আঙ্গুর আমারই—আমার রাজভোগ। সূর্য্যকরোজ্জ্বল, তুষারকিরীট পর্ব্বতরাজির উজ্জ্বল দীপ্তিতেই আমি সন্তুষ্ট। আমি কোন মতেই এ রাজ্যের ধ্বংসসাধনের কারণ হইতে পারিব না—আমার বিবেক কর্ত্তব্যজ্ঞান ইহাই বলিয়া দিতেছে।

রোস্তম খাঁ এইবার নিরাশ হইয়া হাল ছাড়িল। সে ভাবিল, যে কোন কারণেই হউক, একটা অস্থায়ী উন্মত্ততা শাহজাদার মস্তিষ্কে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। তবুও সে বলিল, "তাহা হইলে এখন করিতে চান কি ?"

জামাল খাঁ প্রফুল্লমুখে বলিলেন,—"যাহা করিতে চাই তাহাত এখনই বলিলাম রোস্তম!"

রোস্তম এবার রুষ্টভাবে বলিল—"সুলতান বিদায়দান, কালে, আপনাকে যে গৌরবসূচক তরবারি দান করিয়াছেন, যে তরবারি স্পর্শ করিয়া আপনি শপথ করিয়া এ দেশে আসিয়াছেন, এইরূপ কি সেই তরবারির মর্য্যাদা রক্ষা করিবেন ?"

জামাল খাঁ বিষণ্ণমুখে, বিরক্তির সহিত বলিলেন, "স্বাধীন আফ্‌গান ক্ষেত্রে, এক স্বাধীন নরাধিপের স্নেহময় ক্রোড়ে আজন্ম পালিত হইয়াছি। দেহ বিক্রয় করিয়াছি বটে, কিন্তু চিত্ত বিক্রয় করি নাই। এ প্রাণের উপর সুলতানের পূর্ণ আধিপত্য থাকিতে পারে, তিনি হত্যা করিয়া এ প্রাণ লইতে পারেন। আমার বিগত প্রাণ দেহ ছিন্ন বিছিন্ন করিয়া কাবুলের বড় বড় কুত্তার ক্ষুণ্ণিবৃত্তির বন্দোবস্ত করিতে পারেন—কিন্তু আমার চিত্তের স্বাধীনতার উপর, বিবেকের উপর তাঁহার কোন আধিপত্য নাই। এই নাও রোস্তম! সেই পবিত্র তরবারি, যাহা সুলতান মামুদ আমার গৌরবের চিহ্নস্বরূপ, বিশ্বাসের চিহ্নস্বরূপ দিয়াছিলেন। ইহা তাঁহার পদপ্রান্তে রাখিয়া আমার নাম করিয়া বলিও—"আর আমি আফ্‌গানিস্থানে ফিরিব না। সুলতানের উত্তরাধিকারিরূপে আর আমি রাজ্যের আকাঙ্ক্ষা করি না, আমি এখন মুক্ত ও স্বাধীন। তিনি যেন পূর্ব্ব বাৎসল্যের অনুরোধে আমার এ অপরাধ ও অবাধ্যতা মার্জ্জনা করেন।"

প্রাণের আবেগে, চিত্তের উত্তেজনায় সুলতানের ভ্রাতুষ্পুত্র শাহজাদা জামাল খাঁ কাঁদিয়া ফেলিলেন। তৎপরে অশ্রুমোচন করিয়া বলিলেন—"রোস্তম! চুপ করিয়া রহিলে যে। তুমি কি মনে ব্যথা পাইলে! তুমিও একজন বীরশ্রেষ্ঠ—স্বাধীনতার ক্রোড়ে বর্দ্ধিত তেজস্বী আফগানি। হায়! রোস্তম কোথায় তোমার সে বীরত্ব-গৌরব! মনে পড়ে নাকি রোস্তম একদিন তোমার ঐ মাংসপেশীবহুল সুদৃঢ় হস্তের শক্তিতে ব্রাহ্মণের দংষ্ট্রা বিদীর্ণ করিয়া তাহাকে বধ করিয়াছিলে? নিজের অসমসাহসিকতায় সুলতানের জীবন রক্ষা করিয়াছিলে? জীবনরক্ষায় কৃতজ্ঞতাবিমুগ্ধ

সুলতান তোমায় অর্থদানে পুরস্কৃত করিতে চাহিলে বলিয়াছিলে—"আফগানেশ্বর! এ বান্দা আপনার প্রজা! প্রজার কর্ত্তব্য রাজাকে রক্ষা করা। পুরস্কারের কোন প্রয়োজন নাই।" রোস্তম কোথায় তোমার সে প্রাণের তেজ! এখন তুচ্ছ লুণ্ঠনলব্ধ অর্থের আশায় তুমি সুলতানের এক মহা অন্যায় কার্য্যের সমর্থন করিতেছ। দরিদ্র রোস্তম একদিন দর্পভরে প্রাণের যে মহত্ত্ব দেখাইয়াছিল—আজ ধনী রোস্তম তাহা দেখাইতে পারিতেছে না। হায়! কি পরিরতাপ, রোস্তম!

রোস্তম শাহজাদার এ তেজোগর্ভ বাক্যে বড়ই দমিয়া গেল। তিনি যাহা বলিতেছেন, পূর্ণ সত্য—তিলমাত্র অতিরঞ্জিত নহে। তাঁহার কথাগুলা রোস্তমের পাষাণবৎ সুদৃঢ় বক্ষের উপর বড়ই সজোরে আঘাত করিল। সে এই আঘাতে বড়ই বুকভাঙ্গা হইয়া পড়িল।

সে বুঝিল মহত্ত্বের ও ন্যায়নিষ্ঠার দিক্ দিয়া বিচার করিতে গেলে সত্যই তাহার অধঃপতন ঘটিয়াছে। কিন্তু তাহার যে গত্যন্তর নাই। সে যে কোরাণ স্পর্শ করিয়া সুলতানের সমক্ষে শপথ করিয়াছে। সে একবার মনে ভাবিল, শাহজাদা যাহা বলিতেছেন তাহাই ঠিক। সে একবার সংকল্প করিল—"না—আফ্গানিস্থানে আর ফিরিব না—শাহজাদার সঙ্গেই থাকিব! কিন্তু তাহা কি সম্ভব! বিশ্বাসঘাতকতা—প্রভুদ্রোহিতা—অধর্ম্মাচরণ! এত পাপ কি তাহার সহিবে! সহসা তাহার মনে পড়িল—ছায়ার ন্যায় সর্ব্ববিষয়ে সে সুলতানের আজ্ঞানুযায়ী হইবে। সুলতানের প্রাসাদের মধ্যে সে তাহার প্রিয়তমা, প্রাণাধিকা, বণিতা রুখিয়া বিবি, আর তাহার প্রাণের প্রাণ হৃদয়ের শোণিত একমাত্র শিশুপুত্র জিন্নত আলি তাঁহার বিশ্বাসময় কর্ত্তব্যের প্রতিভূরূপে অবস্থান করিতেছে। সুলতান মামুদ খোদার সৃষ্টিতে অতি ভয়ানক লোক। তাহাতে প্রাণের স্বাধীনতা দেখাইবার কোন উপায়ই নাই! হায়! হায়! তাহা হইলে সুলতানের শাণিত তরবারিমূলে যে তাহার স্ত্রী ও পুত্র তখনই নিহত হইবে।

এই সমস্ত মস্তিষ্কবিপ্লবকারী চিন্তায় রোস্তমের প্রাণে একটা মহা বিপর্য্যয় উপস্থিত হইল। সে অনিচ্ছায় তাহার প্রাণের মহত্ত্ব অতিপ্রিয়া পত্নী ও পুত্রের জীবনের জন্য অকাতরে বিসর্জ্জন করিল! বহুক্ষণ চিন্তার পর কঠোরস্বরে বলিল—"তাহা হইলে কি আপনার অভিপ্রায় যে আমরা অনাহারে পথে পথে ভিক্ষা করিব, বা গুর্জ্জরপতির গুপ্ত প্রনিধির হাতে পড়িয়া এই অপরিচিত দেশে ঘাতকহস্তে জীবন বিসর্জ্জন করিব।"

জামাল খাঁ গম্ভীরভাবে বলিলেন—"পথে পথে ভিক্ষা করিব কেন? "এ গুর্জ্জরের হিন্দুদের মধ্যে কি দয়া, ও আতিথেয়তার এতই অভাব! জান না কি রোস্তম, ধর্ম্মপথে থাকিলে দিনান্তেও গুর্জ্জরপতির নিকট আমাদের কথা অকপটে ব্যক্ত করিলে তিনি কখনই আমাদের অনিষ্ট করিবেন না। শুনিয়াছি হিন্দুবীর নিঃসহায় অবস্থায় শত্রুকে কখনই বিনাশ করে না। তবে কিসের ভয়, রোস্তম?

বাত্যাতাড়িত সমুদ্রবক্ষসম্ভূত চঞ্চল উর্ম্মিমালার ন্যায় বহুবিধ চিন্তা তাহার মনে উঠিল। রোস্তম নানা কথা ভাবিল। তাহার প্রাণের চিন্তা সেই সুদূর আফ্গান দেশে, গজনী সহরের প্রস্তরময় প্রাসাদের মধ্যে প্রবেশ করিল। রোস্তম মনশ্চক্ষে বিবৃত কল্পনাবলে সে যেন দেখিল, সুলতান তাহাদের এ অবাধ্যতার ও বিশ্বাসঘাতকতার সংবাদ শুনিয়া ক্রোধান্ধ হইয়া তাহার স্ত্রী ও শিশুপুত্রকে কারানিক্ষিপ্ত করিয়াছেন।

তাহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয় পুত্রকে ক্ষুধিত কুক্কুরমুখে ফেলিয়া দিবার আদেশ হইয়াছে। স্নেহময়ী পত্নীকে পুত্র হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া সর্পবৃশ্চিকপূর্ণ এক অন্ধকারময় গহ্বরে রাখা হইয়াছে। সে গহ্বরে বায়ু প্রবাহমাত্র নাই। রোস্তম এ দৃশ্য দেখিয়া একেবারে অধৈর্য্য হইয়া পড়িল। সে আর সহিতে পারিল না, বাস্তবরাজ্যে থাকিয়া কল্পনার বিভীষিকাময় লাঞ্ছনা আর সহিতে পারিল না। উন্মাদের ন্যায় ভ্রুকুটী ভঙ্গি করিয়া বলিল—'শাহজাদা।' আমায় মার্জ্জনা করুন। আপনি বিশ্বাসঘাতক হইতে পারেন, আমি পারিব না।"

"বিশ্বাসঘাতক!" অধীন সেনাপতির মুখে এই অপমানকর শ্লেষবাক্য! তিনি না সুলতানের ভ্রাতুঃপুত্র! পর্ব্বতমেখলা গজনীর ভবিষ্যৎ অধীশ্বর! রোস্তমের এ ধৃষ্টতা সহ্য করিতে না পারিয়া শাহ মহম্মদ জামাল বক্ষাবরণ হইতে ক্ষুরধার তরবারি আকর্ষণ করিয়া ব্যাঘ্রবৎ ভীষণ গর্জ্জনে বলিলেন—"শয়তান নফর! তোর এত স্পর্দ্ধা!

"যুবতী শাহজাদার হাতের কব্জি চাপিয়া ধরিল।"

একটা অন্যায় কার্য্য সমর্থন করিলাম না বলিয়া আমি বিশ্বাসঘাতক ?"

সেই অত্যুজ্জ্বল পরিস্ফুট চন্দ্রালোকে জামালের শাণিত তরবারিফলক যেন স্থিরা সৌদামিনীর মত চকমক্ করিতে লাগিল। আর একটু হইলে হয় ত একটা মহা রক্তারক্তির ব্যাপারের অনুষ্ঠান হইত, কিন্তু দৈব-প্রেরিত এক অদ্ভুত কারণবশে তাহা হইতে পারিল না।

সেই রজতধারাময়ী ধরণীর বুকে শুভ্রবসন-পরিহিতা অতুলনীয়া রূপশালিনী এক তন্বঙ্গীযুবতীর পদচিহ্ন অঙ্কিত হইল। সে সহসা পশ্চাদ্দিক্ হইতে আসিয়া সবলে শাহজাদার হাতের কব্জি চাপিয়া ধরিল। তাঁহার হস্ত ক্রিয়াহীন। তিনি নিজে বিস্ময়বিমুগ্ধ। হস্তস্থিত তরবারি সেই চাপনে ভূতলে পড়িয়া গেল। শাহ জামাল রুষ্টস্বরে বলিলেন—"কে তুমি ? আমার এ সংকল্পে বাধা দিলে ?"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

এই কথা বলিয়া জামাল খাঁ মুখ তুলিয়া একবার সেই কান্তিময়ী রমণীর জ্যোৎস্না-বিধৌত মুখের দিকে চাহিলেন। যাহা দেখিলেন, তাহাতে বিস্ময়বিমুগ্ধ হইলেন! এ গুর্জ্জরে রমণীর এত শক্তি, এত সাহস! বাহুতে এত বল! রূপ এত অফুরন্ত—এত উপমাবিহীন! এ রূপের যে মূল্য নাই!

সেই পরমাসুন্দরী রমণী, অসঙ্কুচিতভাবে চির পরিচিতার ন্যায় তিরস্কারব্যঞ্জকস্বরে বলিল—"আত্মবিবাদ কোন কারণেই ভাল নয়। আপনারা বিবাদ করিতেছিলেন কেন ?"

শাহ জামাল, এত সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর আর কখনও শোনেন নাই। দূরশ্রুত বীণাধ্বনির ন্যায় বাসন্তীসমীর-বিতাড়িত কোকিল-কাকলীর ন্যায় সে স্বর অতি মধুর। কর্ণের মধ্য দিয়া, মর্ম্মস্থলে প্রবেশ করিয়া, তাহা যেন তাঁহার উত্তেজিত প্রাণকে এক মোহময় শক্তিতে সঞ্জীবিত করিল।

শাহ জামাল প্রাণের আশা মিটাইয়া নয়ন ভরিয়া সেই রূপ দেখিলেন। দেখিলেন সে মুখ সম্পূর্ণরূপে অবগুণ্ঠন-মুক্ত। সেই আকর্ণবিশ্রান্ত নীলোৎপল তুল্য চক্ষুর অতি পবিত্র স্নিগ্ধ জ্যোতি, চন্দ্রকিরণের সহিত মিশিয়া অতি সুন্দর দেখাইতেছে। বান্ধুলীলাঞ্ছিত রক্তোৎফুল্ল সুকোমল ওষ্ঠাধর মৃদু হাস্যবিকম্পিত। সেই সুন্দর সমুন্নত দেহ যষ্টিবেষ্টনকারী, বহুমূল্য কৌষেয় বাসের চিকনের কাজের উপর চন্দ্রকিরণ পড়িয়া অতি সুন্দর দেখাইতেছে।

সেই রমণী আবার বীণানিন্দিত কণ্ঠে বলিল—"এই পবিত্র গুজরাটের শান্তিময় স্নিগ্ধ ভূমি বিদেশীয় শোণিতে অযথা রঞ্জিত না হয়, ইহাই আমার ইচ্ছা। তাই আমি

পশ্চাদ্দিক্ হইতে আসিয়া আপনার হস্তকে অসিচ্যুত করিয়াছি।"

শাহ জামাল বিস্ময়বিমুগ্ধ স্বরে বলিলেন,—"আমরা বিদেশী তোমাকে কে বলিল?"

"তাহা আপনাদের অনুষ্ঠিত কার্য্যেই প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। এ গুর্জ্জরের সকল অধিবাসীই এরূপ-ভাবে এক পবিত্রমন্ত্রে দীক্ষিত যে তাহারা সহস্র কারণ ঘটিলেও আত্মবিবাদ করিবে না। আত্মবিগ্রহজাত শোণিতধারা সোমনাথের অধিষ্ঠানক্ষেত্র কলুষিত করিবে না।"

শাহ জামাল এ কথায় চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন, "রমণি! কে তুমি?"

"আমি ভগবান্ সোমনাথের সেবিকা।"

"এরাত্রে এদিকে আসিয়াছিলেন কি করিতে?"

"সোমনাথ-মন্দিরে প্রতি পূর্ণিমায় শিবস্তোত্র গান হয়। গান শুনিয়া আমি এই পথে বাটীতে ফিরিতেছিলাম। এই সমুদ্রতীরস্থ পথ দিয়াই বাটী যাইতে হয়।"

"তুমি আমার সকল কথা শুনিয়াছ?"

"নিশ্চয়ই—"

"বলিতে পার আমরা কে?"

"এই শান্তিময় দেবভূমির মহাশত্রু।"

শাহ জামাল হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিয়া মনোভাব গোপনের চেষ্টা করিলেন—পরে দৃঢ়স্বরে বলিলেন,—"সুন্দরি! তোমার মহা ভ্রম হইয়াছে। আমরা কাশ্মিরী হিন্দু—বস্ত্রব্যবসায়ী।"

"না সাহেব! আপনি সত্য গোপন করিতেছেন। আপনি বস্ত্রব্যবসায়ী নন। তবে অস্ত্রব্যবসায়ী বটে। আপনি হিন্দু নন—মুসলমান। যে সে মুসলমান নন—হিন্দুস্থানের প্রধান শত্রু সুলতান মামুদের ভ্রাতুষ্পুত্র।"

শাহ জামাল, এ কথায় চমকিয়া উঠিলেন। তাঁহার মুখ মলিনভাব ধারণ করিল! তীক্ষ্ণ কটাক্ষশালিনী রমণী চন্দ্রালোকবিধৌত রজনীতে সে পরিবর্ত্তিত ভাব লক্ষ্য করিল।

তিনি ত্রস্তস্বরে সেই রমণীকে বলিলেন, "তোমার সঙ্গে আর কে আছে?"

"না—আমি একাকিনী।"

দেখিতেছি তুমি রূপবতী যুবতী। এ রাত্রে একাকিনী গৃহে ফিরিতেছ, আশ্চর্য্য কথা বটে।

কিছুই আশ্চর্য্যের কথা নহে। গুজরাট এখনও স্বাধীন। গুর্জ্জর রাজ্য এখনও সুশাসিত। গুজরাট এখন খাঁটি হিন্দুতে পূর্ণ। পরস্ত্রীকে, পরকন্যাকে, সকলেই মাতৃভাবে দেখে। এ মহাশক্তির ক্ষেত্র। সাহেব! এ দেশে রমণীর কোন বিপদের আশঙ্কা নাই।"

"বুঝিলাম। কিন্তু আমি তোমার পরিচয় চাহি।"

"যা দিয়াছি তাহাই যথেষ্ট। আর দিব না।"

শাহ জামাল এই দর্পিতা রমণীর তেজোগর্ভ বাক্য শুনিয়া তাহাকে মনে মনে অনেক প্রশংসা করিলেন। তৎপরে কঠোরস্বরে বলিলেন, "রমণি! তোমার সত্য পরিচয় না দিলে বিপদ্ ঘটিবে।"

"কে বিপদ্ ঘটাইবে?"

"আমি ও আমার সঙ্গিগণ।"

"আপনার কয়জন সঙ্গী আছে?"

"আরও চারিজন।"

"তাহাদের সকলেই কি তোমার মত শক্তিমান্? স্বাধীনতার লীলাভূমি আফ্‌গানস্থানে বীরেরা রমণীর উপর অত্যাচার করিতে শিক্ষিত?"

রমণীর এ তীব্র বিদ্রূপে রোস্তমের চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল। সে মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহার তরবারি কোষমুক্ত করিল। তখন রমণী ক্ষিপ্রবেগে সবলে রোস্তমের দক্ষিণ হস্তের কব্জি চাপিয়া ধরিলেন। রোস্তম সে তীব্র শক্তিময় স্পর্শের প্রভাব মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিল। মহাশক্তির শক্তির কাছে বীরত্বের অভিমান যে অতি নিষ্ফল, রোস্তম তাহা বেশ বুঝিল। তাহার হস্ত হইতে অসি স্খলিত হইয়া পড়িল।

রোস্তাম সবিস্ময়ে বলিল, "কে তুমি মা?"

সেই রমণী বীণানিন্দিত কণ্ঠে বলিল,—"পূর্ব্বেই ত বলিয়াছি আমি ভগবান্ সোমনাথের সেবিকা।"

"গুজরাটের সকল রমণীই কি এরূপ শক্তিশালিনী?"

"শক্তির অবতার মহাকাল-ভৈরব, সোমনাথ, যেখানে মহারুদ্ররূপে বিরাজিত, সংগ্রামেশ্বরী যেখানে মহাশক্তিরূপে বিরাজিতা সে দেশের অধিকাংশ রমণীই এইরূপ বটে।"

শাহ জামাল এতক্ষণ নিস্তব্ধভাবে সেই রমণীর কার্য্যকলাপ দেখিতেছিলেন। তিনি স্নেহময়স্বরে বলিলেন, "রোস্তম! এই রমণীকে ধন্যবাদ কর যে তোমার ও আমার শোণিতে এই পবিত্র সমুদ্রবারিবিধৌত বেলাভূমি কলঙ্কিত হয় নাই। এ যাত্রা আমাদের কার্য্য নিষ্ফল হইয়াছে। চল আমরা ফিরিয়া যাই।

সেই রমণী গম্ভীরভাবে বলিল,—"ফিরিয়া যাইবেন, কোথায়? আফগানিস্থানে—না, সিন্ধুদেশে?"

"আপাততঃ সিন্ধুদেশেই যাইব।"

"এ রাত্রে ত সাহেব নৌকা পাইবেন না! আর এক কথা, গুর্জ্জরের অতিথি হইয়া আপনারা যে বিনা পরিচর্য্যায় গন্তব্যস্থানে ফিরিয়া যাইবেন, তাহা হইতে দিব না।"

"তুমি কি করিতে চাও?"

"আপনারা আমার দেশের শত্রু হইলেও আমার অতিথি। আমার সঙ্গে আমার বাটিতে আসুন।"

"তোমায় বিশ্বাস কি?"

বিশ্বাস—আমার মুখের কথা! গুর্জ্জর রমণী আশ্রিত অতিথির অনিষ্ট কখনই করেন না! আপনাদের অনিষ্ট করিবার বাসনা হইলে আমি এখনই তাহা করিতে পারি।"

"কি করিয়া অনিষ্ট করিবে সুন্দরি? তুমি ত একা—"

আমার কোন শক্তিই নাই। ভগবান্ সোমনাথ নিজের শক্তিতেই গুর্জ্জরের শত্রুর মনোবাসনা বিফল করিয়া দেন। প্রত্যক্ষ প্রমাণ আপনারা এইমাত্র দেখিলেন। এখন আমার সঙ্গে আসুন।"

"তোমার অনুরোধ রক্ষা করিতে আমরা প্রস্তুত নই।"

"অতিথি অভুক্ত অবস্থায়, গুজরাট হইতে চলিয়া গিয়াছে এ কলঙ্ক সহ্য করিতেও আমি প্রস্তুত নহি।"

"যদি আমরা তোমার অনুরোধ রক্ষা না করি—আতিথ্য স্বীকার না করি?"

"আমি জোর করিয়া আপনাদের বাধ্য করাইব।"

এই বলিয়া সেই যুবতী মুহূর্ত্তমধ্যে বক্ষবস্ত্র হইতে একটি ক্ষুদ্র শঙ্খ বাহির করিয়া তাহাতে ফুৎকার প্রদান করিলেন। সেই ক্ষুদ্র শম্বুকগর্ভ হইতে যেন এক ভীম ভৈরব মহাতেজে জাগিয়া উঠিল। সেই চন্দ্রকিরণ-প্লাবিত পুণ্য বেলাভূমি সে গম্ভীর নাদে কাঁপিয়া উঠিল। সে শব্দ যেন রুদ্রাণীর ভীমভৈরব হুঙ্কার। গভীর নিশীথের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া সেই শঙ্খনাদ দিগ্‌দিগন্তে প্রহত হইল।

এক, দুই, তিন, চারি, পাঁচ, করিয়া, প্রায় পঞ্চাশৎ জন গৈরিক বস্ত্র পরিহিত, রুদ্রাক্ষ-শোভিত,অসিধারী সেনা—সেই স্থানে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের এমনই শিক্ষা দীক্ষা যে, অত লোক পঙ্গপালের মত চারিদিক্ হইতে ছুটিয়া আসিল বটে, কিন্তু তাহাদের গতি অতি সাবধানতাপূর্ণ—শব্দমাত্রবিহীন।

তাহাদের মধ্যে যে প্রবীণ, সে সেই সুন্দরীর সম্মুখে অসি অবনত করিয়া বলিল, "সন্তানদের ডাকিয়াছ কেন মা?"

রমণী সহাস্যে বলিলেন, "একবার দেখিবার সাধ হইয়াছিল—বাবা! যাও তোমরা স্বস্থানে ফিরিয়া যাও।"

মুহূর্ত্তমধ্যে যেন মায়াবলে সেই পঞ্চাশজন সৈনিক জ্যোৎস্নালোকে মিশাইয়া গেল! রমণী নির্ভীক হৃদয়া-উদ্বেগপরিশূন্যা—হাস্যময়ী। সে স্ফুরিতাধর যেন একটা গর্ব্বমাখা ভাবে পূর্ণ।

জামাল ও রোস্তম অর্থপূর্ণ কটাক্ষ বিনিময় করিলেন। রমণী তাহা লক্ষ্য করিল, কিন্তু তিলমাত্র বিচলিত হইল না।

শাহ জামাল বলিলেন, "সুন্দরি তোমার মনের ভাব বুঝিয়াছি। তুমি আমাদের বলে বাধ্য করিয়া আতিথ্য স্বীকার করাইতে চাও। বুঝিলাম ঘটনাচক্র আমাদের প্রতিকূলে দাঁড়াইয়াছে। আমরা তোমার সঙ্গে যাইতেছি। কিন্তু ইহার পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা কর—"

"কি প্রতিজ্ঞা বলুন"

"আমাদের সহিত কোনরূপ বিশ্বাসঘাতকতা করিবে না।"

"না—ভগবান্ সোমনাথ যেন আমার সেরূপ মতি না দেন।"

"আমাদের প্রকৃত পরিচয় কাহাকেও দিবে না।"

"তাহাও স্বীকার করিতেছি।"

"আর কাল সূর্য্যোদয়ের প্রাক্কালে আমাদের বিনা বাধায় বিদায় দিবে। আমাদের জন্য একখানি নৌকা ঠিক করিয়া দিবে।"

"তাহাতেও অস্বীকৃত নহি। আপনারা নিঃশঙ্কচিত্তে আমার পশ্চাদ্বর্ত্তী হউন।"

শাহ জামাল বলিলেন,"আর এক কথা, আমাদের চারিজন সঙ্গী আমাদের কাছে থাকিবে।"

"তাহাতেও কোন আপত্তি নাই।"

রোস্তম, শাহ জামালের ইঙ্গিতে সহসা বংশীধ্বনি করিলেন। যে চারিজন সৈনিক ছদ্মবেশে তাঁহাদের অনুগামী হইয়াছিল, তাহারা সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

শাহ জামাল তখন একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "চল বিবি! আমরা বড়ই শ্রান্ত হইয়াছি।"

চুম্বকে যেমন লৌহকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায়, এই মহিমময়ী রমণী সেইরূপ শাহ জামাল ও রোস্তমকে পশ্চাতে রাখিয়া নিজে অগ্রবর্ত্তিনী হইল।

কিয়দ্দূর অগ্রসর হইবার পর সেই রমণী স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আপনারা অগ্রে অগ্রে চলুন।"

শাহ জামাল ঈষদ্ধাস্য করিয়া বলিলেন, "কেন সুন্দরি! তোমার ভয় হইতেছে?"

সেই যুবতীও সহাস্যমুখে বলিল, "ভয় কাহাকে বলে, তাহা জানিলে আপনাদের সম্মুখীন হইতাম না। তবে মুসলমানকে বিশ্বাস নাই। যাহারা বীরত্বাভিমানী হইয়াও ছদ্মবেশে এক শান্তিময় নগরের সর্ব্বনাশ কল্পনায় আসিতে পারে তাহাদের পক্ষে অসম্ভব কিছুই নাই।"

এ তীব্র তিরস্কারে শাহ জামাল বড়ই অপ্রতিভ হইলেন। সেই রমণী তাহা বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, "এখন আর পথ দেখাইবার কোন প্রয়োজন নাই বলিয়া আমি পশ্চাদ্বর্ত্তিনী হইয়াছি; ভয়ে নহে। আর এক কথা, এই স্বল্পপরিসর পথে তিন জন পাশাপাশি যাওয়াও অসম্ভব ব্যাপার। আমার পশ্চাদ্বর্ত্তিনী হইবার ইহাও একটি কারণ। এই পথ যেখানে শেষ হইয়াছে, সেই স্থানই আমাদের গন্তব্য স্থান।

স্থানটি, সমুদ্র পার্শ্ববর্ত্তী শৈলমালাবেষ্টিত, সমুচ্চ-উপত্যকার একাংশ। পথটি সরল অপ্রশস্ত এবং একটি অট্টালিকার দ্বারমুখেই সমাপ্ত।

গুর্জ্জররাজ তাঁহার কন্যার সমুদ্র-দর্শন-বাসনা-তৃপ্তির জন্য এই ক্ষুদ্র প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া দেন। রাজকুমারী সকল সময়ে এ প্রাসাদে না থাকিলেও ইহার চারিদিক্ প্রহরী দ্বারা সুরক্ষিত থাকিত।

বিমল চন্দ্রালোকে সেই ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য পথ সমুজ্জ্বলিত বটে, কিন্তু দুইধারে বৃক্ষশ্রেণী থাকায় এক এক স্থান বড়ই অন্ধকারময় হইয়াছিল। সমগ্র প্রকৃতি চন্দ্রকর গায়ে মাখিয়া পরিসুপ্ত। নিসর্গবক্ষে কেবল এক বিরাট্ গাম্ভীর্য্যের ছায়াপাত হইয়াছে। পর্ব্বতের শীর্ষদেশস্থ বৃক্ষাদির শ্যামল পল্লবের উপর চন্দ্রকিরণ পড়িয়া চিক্‌মিক্ করিতেছে। বন্ধুর পার্ব্বত্য ভূমির বক্ষভেদকারী ক্ষুদ্র গিরিনদীর পবিত্র সলিলের উপর প্রস্ফুট চন্দ্রকিরণ-সম্পাতে এক নূতন শোভা বিকশিত হইয়াছে।

সকলেই ক্ষুদ্র প্রাসাদটির দ্বারে উপস্থিত হইলেন। প্রাসাদের দ্বার লৌহশৃঙ্খলিত, ভিতর হইতে আবদ্ধ। তবুও সেই দ্বারে দুইজন প্রহরী উন্মুক্ত কৃপাণহস্তে দণ্ডায়মান।

রমণী এই দ্বারসন্নিহিতা হইবামাত্রই তাহার বক্ষোদেশ হইতে সেই ক্ষুদ্র শঙ্খটি বাহির করিয়া তাহাতে ফুৎকার প্রদান করিলেন। নৈশ প্রকৃতির সেই বিরাট্ গাম্ভীর্য্য যেন সেই শঙ্খনাদে কাঁপিয়া উঠিল। চতুর্দ্দিগ্‌ব্যাপী শৈলশ্রেণীর কন্দরে কন্দরে সেই ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে ভিতর হইতে সেই শৃঙ্খলিত দ্বারও উন্মোচিত হইল।

রমণী সহসা পশ্চাৎ হইতে সম্মুখে আসিয়া শাহ জামালকে ব[illegible] "শাহজাদা! রাজপুত কখনও অতিথির অবমাননা করে না। মহাশত্রুও যদি অতিথি হয়, তাহা হইলেও সে দেবতার ন্যায় পূজনীয়। এ ক্ষুদ্র প্রাসাদ মধ্যে নিঃশঙ্কে প্রবেশ করুন!"

যে প্রহরী ভিতর হইতে দ্বার খুলিয়া দিয়াছিল, সে অবনতমস্তকে বলিল, "ইহারা কে মা?"

রমণী গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "ভৈরব! ইহারা আমাদের অতিথি। অন্য পরিচয়ে কোন প্রয়োজন নাই। আমি এখনই বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া আসিতেছি। ইহাদের পরিচর্য্যার বন্দোবস্ত করিয়া দাও।"

ভৈরব আর কোন কথা না বলিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে সেই লৌহদ্বার পূর্ব্ববৎ শৃঙ্খলিত করিল। তৎপরে শাহ জামালকে বলিল, "মহাশয়! আমার পশ্চাদ্বর্ত্তী হউন।"

শাহ জামাল ও রোস্তম উভয়েই নির্ব্বাক্! উভয়েই বিস্ময়বিপ্লুত। তাহারা আর যাহা বুঝিতে পারুক্ বা নাই

পারুক এটুকু বুঝিল যে, সেই শক্তিময়ী রমণী এক প্রখর মায়াবলে তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়াছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ভৈরব সেই ছয় ব্যক্তিকে লইয়া একটি সুবৃহৎ প্রাঙ্গণ পার হইল। প্রাঙ্গণের পরই একটি প্রবেশদ্বার। সেই প্রবেশ দ্বার সে পূর্ব্বের মত শৃঙ্খলবিমুক্ত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করিল।

ইহার পর আর একটি ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণ। এই প্রাঙ্গণের পরই একটি প্রস্তরময় অধিরোহণী। অধিরোহণী উত্তীর্ণ হইলেই কএকটি প্রকোষ্ঠ।

"রোস্তম, ব্যাপার কি, বুঝিতে পারিতেছ কি?"

প্রকোষ্ঠগুলি আলোকোজ্জ্বলও তাহাদের হর্ম্ম্যতল ভিত্তি-গাত্র মর্ম্মর-মণ্ডিত। ভিত্তিগাত্রে, রজত-দীপাধারে, স্থানে স্থানে উজ্জ্বল দীপরাজি।

গৃহের সজ্জা রাজোচিত। সেই কক্ষের মধ্যে যাহা কিছু সজ্জা ছিল, তাহার সবই বহুমূল্য। গৃহগাত্রে উজ্জ্বল মুকুর। সেই কলঙ্কহীন মুকুরগাত্রে দীপরেখা পড়াতে লক্ষ লক্ষ হীরকজ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত হইতেছে। কক্ষের নানাস্থানে রৌপ্যপাত্রে রক্ষিত পুষ্পস্তবক। কোন স্থানে বা অগুরু ও চন্দন কাষ্ঠচূর্ণ অগ্নিদগ্ধ হইয়া স্বর্গীয় সুগন্ধ বিতরণ করিতেছে।

ভৈরব সেই কক্ষগুলির মধ্যে একটিতে প্রবেশ করিয়া শাহজাদাকে বলিল, "এই কক্ষ ও ইহার পার্শ্বের কক্ষটি আপনাদের অবস্থানস্থান। আমি ভৃত্যদের পাঠাইয়া দিতেছি। আপনারা একটু শ্রান্তি দূর করুন।"

ভৈরব আর কিছু না বলিয়া সেই কক্ষ ত্যাগ করিল। শাহ জামাল তাঁহার সঙ্গী চারিজনকে পার্শ্বের গৃহে যাইতে আদেশ করিলেন! সেই কক্ষে রহিলেন কেবল শাহ জামাল আর রোস্তম!

শাহ জামাল বিমর্ষ-ভাবে বলিলেন, "রোস্তম! ব্যাপার কি বুঝিতে পারিতেছ কি?"

"কিছুই না, জনাব।"

"ইহাদের উদ্দেশ্য কি? আতিথেয়তার ছলনায়, আমাদের বন্দী করিবে না ত?"

"বন্দী হইবার আর বাকী কি? দুইটি দ্বার পূর্ব্বেই ত শৃঙ্খলিত হইয়াছে।"

"এই রমণী বোধ হয় যাদু জানে?"

"কেন—এ কথা বলিতেছেন?"

যে শাহ জামাল একটু আগে মহাশক্তিশালী সুলতান মামুদের আদেশ উপেক্ষা করিতে সাহসী হইয়াছিল, সে মন্ত্রমুগ্ধবৎ এই অপরিচিতা রমণীর বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে! অবনতমস্তকে তাহার আদেশ পালন করিতেছে।

আর কথা হইল না! ভৈরব গৃহে প্রবেশ করিল। তাহার সঙ্গে চারিজন ভৃত্য। ভৃত্যদের পশ্চাতে চারিজন দাসী। দাসীদের হস্তে, রৌপ্যপাত্রে

আহার্য্য দ্রব্য, আর ভৃত্যগণ, ছয় সুট পোষাক লইয়া আসিয়াছে।

ভৈরব বলিল, "আমাদের মাতাজীর অনুরোধ, আপনারা বেশপরিবর্ত্তন করিয়া ইচ্ছামত আহারাদি করুন। এই গুর্জ্জরের পার্ব্বত্য প্রদেশে যাহা কিছু সহজপ্রাপ্য,তাহাই সংগ্রহ করা হইয়াছে। ফল মূল,মিষ্টান্ন পিষ্টক আর দুগ্ধ ব্যতীত আর কিছুই নাই। স্বচ্ছন্দে এই স্থানে নিদ্রা যান। কল্য প্রাতে মাতাজীর সহিত আপনাদের সাক্ষাৎ হইবে।"

ভৈরব আর কিছু না বলিয়া সে স্থান হইতে চলিয়া গেল। অতিথিগণ সত্য সত্যই ক্ষুধার জ্বালায় বড়ই কাতর হইয়াছিলেন। ভৈরব যাহা কিছু আনিয়াছিল, সবই দেবভোগ্য আহার্য্য।

আহারান্তে রোস্তম শয্যায় শয়ন করিলেন। তাঁহাদের সঙ্গী চারিজন অন্য গৃহে চলিয়া গেল। জাগিয়া রহিলেন কেবল শাহজাদা শাহ জামাল।"

শাহ জামালের চক্ষে নিদ্রা নাই। তাঁহার চিত্তক্ষেত্র ব্যাপিয়া একটা চিন্তার ঝটিকা উঠিয়াছে। তিনি অনুভবেও জানিতে পারিতেছিলেন না যে, এ অদ্ভুত রমণী কে? তাঁহার পাষাণ-হৃদয় এ পর্য্যন্ত রমণীর রূপে মুগ্ধ হয় নাই—সে পাষাণ ভেদ করিয়া একটুও স্নেহবারিধারা বহে নাই, কিন্তু আজ তিনি দেখিলেন, তাঁহার পাষাণ প্রাণ যেন শতধা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। তাহার মধ্য হইতে অমৃতধারা ক্ষরিত হইতেছে।

দর্শনে মোহ, মোহে আকাঙ্ক্ষা, আকাঙ্ক্ষায় অতৃপ্তি, অতৃপ্তিতে হৃদয়ের দারুণ ব্যাকুলতা ও চিত্তের অশান্তি উপস্থিত হয়; শাহ জামালের অদৃষ্টে এ সকলই ঘটিয়াছিল। সুলতান মামুদের ভ্রাতুষ্পুত্র মহাবীর শাহ জামাল, গুজরাটে পদার্পণ মাত্রেই একবার প্রকৃতি সুন্দরীর মোহিনীরূপ দেখিয়া মজিয়াছেন, জড়প্রকৃতি তাঁহাকে উন্মত্ত করিয়া তুলিয়াছে। তারপর প্রাণময়ী প্রকৃতির বিমলরূপচ্ছায়া তাঁহার হৃদয়কে সমাচ্ছন্ন করিয়াছে। তাঁহার উদ্দেশ্য বিচলিত, প্রাণ রূপমোহের অধীন। তিনি জয় করিতে আসিয়া বিজিত হইয়াছেন, ধরিতে আসিয়া ধরা দিয়াছেন। হায়! হায়! কেন তিনি এ মায়াভূমি গুর্জ্জরে পদার্পণ করিয়াছিলেন!

কে এই রমণী! যার দেহে এত রূপ! বাহুতে এত শক্তি! বাক্যে এত মধুরতা! কে সে রমণী—যে মুহূর্ত্ত মধ্যে কথার ছলে, বাহুর বলে তাঁহার ও রোস্তমের মত বীরদ্বয়কে অভিভূত করিল।

শাহ জামাল শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া বসিলেন। বাতায়ন উন্মুক্ত করিয়া দিয়া দেখিলেন—তখনও প্রকৃতি চন্দ্রকিরণে হাস্যময়ী। তবে চাঁদ পশ্চিম গগনে ঈষৎ ঢলিয়া পড়িয়াছেন। রজনী প্রভাতের আর বিলম্ব নাই! শাহ জামাল নিরুপায় হইয়া আবার শয্যা আশ্রয় করিলেন; কিন্তু সেই সুরচিত, শুভ্র, সুখশয্যায় অঙ্গ ঢালিবামাত্র যেন বোধ হইল কে তাহাতে অনলকণা বিছাইয়া দিয়াছে।

শাহ জামাল মনে মনে ভাবিলেন,---"সুলতানের অন্তঃপুরে রূপসী রমণীর অভাব নাই। এই হিন্দুস্থান হইতেই তিনি অনেক হিন্দুকন্যাকে জোর করিয়া লইয়া গিয়া গজনীর হারেম রূপপ্রভাময় করিয়া তুলিয়াছেন, কিন্তু আজ যাহাকে দেখিলাম তার মত ত কেহই নয়।"

"কেন আমার এ মতিচ্ছন্ন অবস্থা ঘটিল! কোথায় আমার বীরদর্প! কোথায় আমার সে মন্ত্রপূত অসির গর্ব্ব! কোথায় আমার দম্ভ, তেজ, অভিমান! আমি না ভারতজয়ী সুলতান মামুদের ভ্রাতুষ্পুত্র! পর্ব্বত দুর্গ-বেষ্টিত সমস্ত আফগান রাজ্যের ভবিষ্যৎ অধিপতি! এত লঘু আমার মন! চিত্ত আমার এত শক্তিহীন! খোদা! মেহেরবান্! আমার মন হইতে এ রূপের মোহ দূর করিয়া দাও! আমায় আবার শাহ জামাল করিয়া দাও। আমায় এ মহা প্রলোভন হইতে মুক্ত কর।"

চিন্তা দীর্ঘ সময়কে যেন সংক্ষেপ করিয়া দেয়। সময় প্রকৃত পক্ষে মাপে কমে না বটে, কিন্তু যে চিন্তা করে সে সেইরূপ ভাবে। কাজেই চিন্তামগ্ন শাহ জামালও সেই কথা না ভাবিবেন কেন?

নিশা চলিয়া গিয়াছে—ঊষা আসিয়াছে। পাখী ঘুমাইয়াছিল—দিঙ্মণ্ডল সমুজ্জ্বল দেখিয়া মধুর কাকলীতে প্রকৃতিবক্ষ প্রতিধ্বনিত করিতেছে। নিশাকর অস্ত গিয়াছেন্। দিবাকর পূর্ণজ্যোতিতে দিগন্ত উদ্ভাসিত করিতেছেন! তারকাহারবিভূষিতা প্রকৃতি সুন্দরী, যেন দিবাকরের আবাহনের জন্য স্বর্ণখচিত বসন পরি-

শোভিতা হইয়াছেন। অদূরস্থ অনন্ত সলিলসম্পদময় সমুদ্রের অশ্রান্ত উর্ম্মিরাজির উপর স্বর্ণরাগময় বালার্ককিরণ পড়িয়া তাহা অতি সুন্দর দেখাইতেছে। প্রকৃতির এ অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন কিন্তু শাহ জামালের মনে তিলমাত্র আনন্দোৎপাদন করিতে পারিতেছিল না। সুখ মনে—নয়নে নয়।

শাহ জামাল শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করিলেন। রোস্তমের শয্যাপার্শ্বে আসিয়া দেখিলেন, সে নিশ্চিন্তভাবে নিদ্রা যাইতেছে। পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে তাঁহার চারিজন অনুচর ছিল তাহাদের মধ্যে যে প্রধান, সে আসিয়া বলিল, "জনাব! খোদা আপনার মঙ্গল করুন! আপনার প্রাতঃকৃত্যের জন্য ভৃত্যগণ সমস্ত আয়োজন করিয়া হুকুমের অপেক্ষা করিতেছে।"

এই কথা শেষ না হইতে হইতে ভৈরব সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। সসম্ভ্রমে মস্তকে হস্ত স্পর্শ করিয়া বলিল, "রাণীজী জানিতে চাহিতেছেন—আপনাদের কাল কোনরূপে নিদ্রার ব্যাঘাত হয় নাই ত?"

শাহ জামাল চমকিতভাবে বলিলেন, "রাণীজী! রাণীজী কে? গুর্জ্জর-রাজকন্যা?"

"হাঁ—গুর্জ্জর-রাজকন্যা—"

"তিনিই কি কাল আমাদের আশ্রয় দিয়াছিলেন?"

"আশ্রয় কে কাকে দেয়, আশ্রয় ভগবান্ সোমনাথের। বে তিনি উপলক্ষ মাত্র।"

"তাহা হইলে গতরাত্রে যিনি আমাদের সঙ্গে আসিয়াছিলেন তিনিই গুর্জ্জর-রাজকন্যা তিনিই ভারতবিশ্রুত সৌন্দর্য্যশালিনী কমলাবতী?"

"মার নাম সম্তানে ধরে না—হাঁ, তিনিই সেই।"

"তাঁহাকে আমার সম্মানপূর্ণ অভিবাদন জানাইয়া বলিও, আমরা তাঁহার আতিথ্যে বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি। আমরা বিদায় চাহিতেছি।"

"তিনি গতরাত্রে আপনাদের নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন তাহা পালন করিবার জন্যই আমাকে পাঠাইয়াছেন। আপনারা প্রাতঃকৃত্য সারিয়া প্রাতরাশ শেষ করুন। সবই পাশের ঘরে প্রস্তুত। আমি সেনাদের প্রস্তুত হইতে বলি।"

"সেনার কি প্রয়োজন!"

"রাণীজীর ইচ্ছা গুজরাট সীমান্ত পর্য্যন্ত কএকজন সেনা আপনাদের সঙ্গে যাইবে।"

"কারণ।"

"পাছে পথে আপনাদের কোন বিপদ্ ঘটে।"

"রাণীজীকে এজন্য ধন্যবাদ করিতেছি। আমরা তাঁহার মহত্বে বাধিত হইলাম।"

"রাণীজী বলেন, "যদি আপনাদের কোন বাসনা থাকে তাহাও তিনি পূর্ণ করিতে প্রস্তুত।"

শাহ জামাল এতক্ষণ অন্ধকারময় পথে চলিতেছিলেন। মোহাবিষ্ট জীবের ন্যায় প্রশ্নের উত্তর করিয়া যাইতেছিলেন। ভৈরবের কথায় তাঁহার যেন চক্ষু খুলিল। তিনি মনে মনে কি ভাবিয়া ধীরস্বরে বলিলেন, "গুর্জ্জরের আতিথেয়তাকে ধন্যবাদ করিয়া প্রস্থানের পূর্ব্বে আমি আপনাদের রাণীজীর নিকট একটি অনুগ্রহের প্রার্থী।"

ভৈরব এ সন্দিগ্ধ প্রশ্নে একটু প্রমাদ গণিল। যখন কথাটা বলিতে এত বাধ বাধ ভাব, তখন মনের উদ্দেশ্য বোধ হয় ভাল নয়। তবুও সে মনোভাব চাপিয়া রাখিয়া বলিল, "বলুন,—আপনাদের অভিলাষ কি? আমি রাণীজীকে তাহা জানাইব।"

"আমার ইচ্ছা—আমাদের প্রস্থানের পূর্ব্বে যদি তিনি নিজে আসিয়া আমাদের বিদায় দেন।"

"অসম্ভব!"

"কেন? তিনি ত কাল রাত্রে আমাদের সঙ্গে আসিয়াছিলেন।"

"সেটা কর্ত্তব্যের অনুরোধে।"

"আমরা অতিথি হইলেও আমন্ত্রিত। আমরা মুসলমান। আমাদের দেশে আমন্ত্রিত ব্যক্তিদের আমরা অতিথির অপেক্ষা সম্মান দেখাইয়া থাকি। দেখিতেছি গুর্জ্জররাণী, শিষ্টাচারের আদর্শ নন। শ্রেষ্ঠ অতিথিকে তাঁহারা অপমান করিতেও অভ্যস্ত।"

ভৈরবের মুখ এ কথায় লোহিত বর্ণ ধারণ করিল। তাহার ধমনী মধ্যে শোণিতস্রোত প্রবলভাবে বহিতে লাগিল। তাহার দক্ষিণ হস্ত অসিকোষ স্পর্শ করিল।

এই সময়ে আর এক অদ্ভুত কাণ্ড! কে যেন পশ্চাৎ হইতে ভৈরবের এ অবস্থা লক্ষ্য করিয়া দ্রুতপদে তাহার

নিকটে আসিয়া তাহার গা টিপিয়া কি ইঙ্গিত করিল। পরে মৃদুস্বরে বলিল, "স্থির হও ভৈরব! এ ক্রোধের সময় নয়।"

ভৈরব মুখ ফিরাইয়া দেখিল—তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাহার জননী—গুর্জ্জরবাসীর জননী রাজকন্যা কমলাবতী। কমলাবতীর মুখমণ্ডল অবগুণ্ঠনে আবৃত।

কমলাবতী বলিলেন, "জনাব! আপনি গুর্জ্জরের আতিথ্যে কলঙ্ক অর্পণ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তাই আমি আসিয়াছি। মনে রাখিবেন—গুর্জ্জরের রাণী আমন্ত্রিতের সহিত অশিষ্ট ব্যবহার করেন না।"

শাহ জামাল, মেঘাবৃত চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায়, সেই রূপমাধুরী দেখিলেন। সেই সুন্দর মুখখানা দেখিতে পাইলেন না; কিন্তু সেই সুন্দর দেহের চারিদিক্ হইতে যে রূপের প্রভা বাহির হইতেছে, তাহা দেখিয়া তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গেল।

কমলাবতী দৃঢ়স্বরে বলিলেন,—"আমি বেশীক্ষণ অপেক্ষা করিতে পারিব না। আমার পূজার সময় হইয়াছে। যদি আমাদের কোন ত্রুটি হইয়া থাকে তাহা হইলে মার্জ্জনা করুন। আর কখনও ছদ্মবেশে, এরূপভাবে গুর্জ্জরে প্রবেশ করিবেন না। করিলে আপনাদের সমূহ বিপদ্ উপস্থিত হইবে।"

"মনে রাখিবেন গুর্জ্জরের রাণী আমন্ত্রিতের সহিত অশিষ্ট ব্যবহার করেন না।"

এই কথা বলিয়া কমলাবতী দ্রুতপদে সে স্থান ত্যাগ করিলেন। যেন একখানা বিদ্যুৎ সেখান হইতে সহসা সরিয়া গেল। শাহ জামাল মন্ত্রমুগ্ধ।

রোস্তম বলিল, "শাহজাদা! বৃথা বিলম্ব করিতেছেন কেন?"

শাহ জামাল চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন, "চল—চল রোস্তম!"

তাঁহারা অগ্রবর্ত্তী হইলেন। ভৈরব তাঁহাদের পশ্চাতে চলিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

"কাজটা কি ভাল হইল মা?"

"মন্দই বা কি হইল ভৈরব?"

"মুসলমান আমাদের শত্রু। বিশেষতঃ যাহারা আসিয়াছিল তাহারা বাজে লোক নয়।"

"হউক তাহারা আমাদের ত অতিথি!"

"বোধ হয়, শীঘ্র একটা বিভ্রাট ঘটিবে!"

"কিসে জানিলে?"

"জামাল খাঁ নিজে গুজরাট আক্রমণ করিবে।"

"কিসে জানিলে?"

"তাহাদের কথোপকথনে বুঝিয়াছি।"

"গুর্জ্জরবাসী হীনবল নহে। কুমারসিংহের বাহুশক্তি হীন নহে। গুর্জ্জরের কোন অনিষ্টই হইবে না।"

এমন সময়ে কে একজন পশ্চাদ্দিক্ হইতে বলিয়া উঠিল, "সত্যই কমলা, গুর্জ্জর শক্তিহীন নহে।"

কমলা মুখ ফিরাইয়া পশ্চাদ্দৃষ্ট করিল। দেখিল—পশ্চাতে দাঁড়াইয়া কুমারসিংহ তাহার কথার প্রতিধ্বনি করিয়াছেন।

কমলার স্বভাবলোহিত গণ্ডস্থল কুমারসিংহকে দেখিয়া আরও আরক্তবর্ণ ধারণ করিল। কমলা বলিল, "কুমার! আমাদের বড়ই বিপদ্ উপস্থিত।"

ভৈরব সেখান হইতে চলিয়া গিয়াছে—কুমার ও কমলা দুইজনে সেইখানে। কুমার বলিল, "হউক! বিপদ! সুলতান মামুদ জীবিত থাকিতে বিপদের অভাব হইবে না। কিন্তু জানিও কমলা, আমি বিপদ্ খুঁজিয়াই বেড়াইতেছি।"

কমলা বিস্ময়বশে মুখ তুলিয়া কুমারসিংহের দিকে কঠোর দৃষ্টি করিল! বলিল, "কেন?"

কুমার বলিল, "মনে কি নাই কমলা? সোমনাথের মন্দিরে দাঁড়াইয়া কি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি! তুমিও কি স্বীকার করিয়াছ! বিপদ্ উপস্থিত না হইলে ত কুমারসিংহের বাহুর শক্তি কেহ দেখিতে পাইবে না। আর তাহা না হইলে গুর্জ্জররাজকন্যা কমলাবতী—"

"এখন ও সব সুখকল্পনার সময় নয় কুমার সিংহ! মনে রাখিও তুমি গুর্জ্জরের অভিষিক্ত সেনাপতি। বৃদ্ধ পিতা তোমার উপরই সব নির্ভর করিয়াছেন।"

"বোধ হয় কমলা! জীবন থাকিতে ন্যস্ত কর্ত্তব্যের অপব্যবহার হইবে না; কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব কি?"

"আমার কাছে তোমার কোন সঙ্কোচ নাই। স্বচ্ছন্দে বলিতে পার।"

"যুদ্ধে যদি আমার মৃত্যু হয়।"

"পরলোক আছে কুমার! সেখানে গিয়া তোমার সহিত মিলিব।"

"শুনিয়া সুখী হইলাম! আর একটা কথা।"

"কি?"

"তোমার জন্যই বোধ হয় মামুদ গুর্জ্জর আক্রমণ করিবেন?"

"কিসে জানিলে?"

"তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র জামালখাঁই সেনাপতি হইয়া আসিবে। জামালখাঁ তোমার জ্যোৎস্নাপ্লাবিত রূপ দেখিয়া উন্মত্ত। সে গুণ্ঠনের মধ্য হইতে তোমার রূপজ্যোতিঃ দেখিয়া বিমুগ্ধ।

"তুমি কি করিয়া এ কথা জানিলে?"

"ভৈরব আমায় বলিয়াছে! ভৈরব তাহাদের সঙ্গে অনেক দূর গিয়াছিল। উভয়ের কথোপকথনের মধ্যে বহুবার তোমার নামোচ্চারিত হইয়াছিল।

কথাটা শুনিয়া কমলাবতীর একটা আতঙ্ক হইল! তাহার ছার রূপের মূল্য কি এত বেশী যে, তাহার জন্য তাহার প্রাণাপেক্ষা জন্মভূমি গুর্জ্জরের সর্ব্বনাশ হইবে?"

কমলাবতী কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিয়া বলিল, "কুমার! সেজন্য ভয় করি না। রাজপুত-কন্যা আমি! প্রয়োজন হইলে আমরা চিতাগ্নিকে চন্দন-প্রলেপের ন্যায় স্নিগ্ধ জ্ঞান করি।"

কুমারসিংহ এ কথা শুনিয়া মর্ম্মে মর্ম্মে শিহরিয়া উঠিল। সে তাহার ইন্দীবর নেত্রে দুই বিন্দু অশ্রু লইয়া সে স্থান ত্যাগ করিল।

কমলাবতী সেইস্থানে দাঁড়াইয়া যুক্তকরে ঊর্দ্ধমুখে সজলনেত্রে কম্পিতহৃদয়ে বলিল, "হে স্বয়ম্ভু! হে সোমনাথ! সহস্র কমলাবতী গুর্জ্জরের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য কালস্রোতে ভাসিয়া যায় যাউক, তাহাতে কোন ক্ষতিই নাই! কিন্তু দেখিও প্রভু! কুমারসিংহ যেন গুর্জ্জরের সম্মানরক্ষা করিতে সমর্থ হয়।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সিন্ধুদেশে, সমুদ্রতীর হইতে দশক্রোশ দূরে সুলতান মামুদ এক ক্ষুদ্র নগর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান

করাচি বন্দর হইতে আট ক্রোশের মধ্যে এখনও একটি স্থান "মামুদাবাদ" বলিয়া পরিচিত। এই মামুদাবাদেই সুলতান মামুদ একটি অস্থায়ী রাজপুরী, গঞ্জ, বাজার ও একটি ক্ষুদ্র রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন।

ভারতে রাজ্য-প্রতিষ্ঠা করা সুলতান মামুদের আন্তরিক উদ্দেশ্য ছিল না। ঐশ্বর্য্যপূর্ণ ভারতকে লুণ্ঠন করিয়া, ধনরত্ন সংগ্রহ করাই তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য। ভারতের ঐশ্বর্য্য প্রবাদ বহুদিন হইতেই তাঁহার চিত্তে একটা মহা বিপ্লব ও দুষ্ট আকাঙ্ক্ষার উদ্রেক করিয়াছিল! ইতঃপূর্ব্বে ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তের নানা স্থান লুণ্ঠন করিয়া তিনি প্রচুর ধনসঞ্চয় করিয়াছেন। তাঁহার রাজধানী গজনী ভারতের ঐশ্বর্য্যে অলকাপুরীর মত শোভা ধারণ করিয়াছে; কিন্তু তখনও তাঁহার আশা পূর্ণ হয় নাই।

সোমনাথের ঐশ্বর্য্য-প্রবাদ বহুদিন হইতেই তিনি শুনিয়া আসিতেছিলেন; কিন্তু সোমনাথ-লুণ্ঠনের কোন সুযোগই তিনি পান নাই। সোমনাথ গুর্জ্জর-রাজ্যের মধ্যে অবস্থিত। গুর্জ্জরপতি—মহাপরাক্রান্ত। যাহাতে একটি মুসলমানও তাঁহার রাজ্যমধ্যে প্রবেশ করিতে না পারে, তাহার জন্য তিনি সতর্কতা অবলম্বনের কোন ত্রুটিই করেন নাই। তাঁহার সেনাপতি কুমারসিংহের বাহুবলেই গুর্জ্জর এখন সুরক্ষিত। গুর্জ্জররাজের পুত্রাদি হয় নাই, কেবল একমাত্র কন্যা এই কমলাবতী। কমলাবতী রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী, শক্তিতে—আদ্যাশক্তি। কুমারসিংহ তুমার-বংশীয় উচ্চকুলোদ্ভূত রাজপুত। সমরে কুমার চিরদিনই অজেয়। বৃদ্ধ গুর্জ্জররাজের মনের বাসনা এই কুমারসিংহকে জামাতা করিয়া এই গুর্জ্জর রাজ্য তাহাকেই সমর্পণ করিবেন। কিন্তু বহিঃশত্রু তখন গুর্জ্জরের সর্ব্বনাশের চেষ্টা করিতেছে—এজন্য গুর্জ্জর-রক্ষাই তাঁহার প্রধান চিন্তার বিষয় হইয়া পড়িল।

গুর্জ্জরের স্বাধীনতা লোপ করিতে পারিলে সোমনাথ অতি সহজেই তাঁহার করায়ত্ত হইবে ভাবিয়া সুলতান দুই দুই বার গভীর বনপথের মধ্য দিয়া গুর্জ্জরের সেনাবল ও আভ্যন্তরীণ শক্তি সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্যসংগ্রহের জন্য গুপ্তচর পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু তাহারা আর তাঁহার নিকট ফিরিয়া আসে নাই। সুলতান সিদ্ধান্ত করিলেন—নিশ্চয়ই তাহারা গুর্জ্জরবাসীদিগের হস্তে হত হইয়াছে!

এইজন্যই তিনি মামুদাবাদ প্রাসাদ হইতে সমুদ্রপথে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র, তাঁহার দক্ষিণ বাহু, তাঁহার সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ অধিকারী, শাহজাদা শাহ জামালকে, গুর্জ্জরে পাঠাইয়া দেন। শাহ জামালের সঙ্গে তাঁহার অন্যতম সেনাপতি রোস্তম খাঁও প্রেরিত হন। তাঁহারা হিন্দু-বণিকের ছদ্মবেশে বিনা বাধায় গুর্জ্জরে প্রবেশ করেন। ইহার পর যাহা কিছু হইয়াছে, পাঠক তাহা দেখিয়াছেন।

কমলাবতীর আদেশে ভৈরব, তাঁহাদিগকে এক নিরাপদ স্থানে পৌছাইয়া দিয়া গুর্জ্জরে ফিরিয়া আসিয়াছে। পথিমধ্যে সে শাহ জামাল ও রোস্তমের কথোপকথন-প্রসঙ্গে বহুবার 'কমলাবতী'র নামোল্লেখ হইতে শুনিয়াছে। তাহারা পুস্তভাষায় কথোপকথন করিতেছিল—কাজেই সে তাহার কিছুই বুঝিতে পারে নাই।

যে কমলাবতী, গুর্জ্জরের জাগ্রত শক্তি, প্রত্যক্ষ দেবী, যে কমলাবতী তাহার মা—তাহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয় জন্মভূমি গুর্জ্জরের মা—তাঁহার পবিত্র নাম এই শয়তানদের মুখে বহুবার উচ্চারিত হইতে শুনিয়া ভৈরব মনে মনে বড়ই বিরক্ত হইল! সে একবার মনে ভাবিল যে মাঝিদিগকে ইহাদের পরিচয় দিয়া নৌকা সমুদ্রে ডুবাইয়া দিই। গুর্জ্জরের দুইটি প্রবল শত্রুর জীবন্ত-সমাধি হউক! কিন্তু তাহার হৃদয়মধ্যে তখন সেই মাতৃ-আজ্ঞা মৃদু প্রতিধ্বনি করিতেছিল,—"দেখিও ভৈরব! ইঁহাদের যেন কোন অনিষ্ট না হয়। ইঁহারা গুর্জ্জরের শত্রু হইলেও আমার অতিথি!"

এই জন্যই ভৈরব মনের জ্বালা মনেই মিটাইল। সে নির্ব্বাক্‌ভাবে তাহাদের নিরাপদ স্থানে পৌছাইয়া দিয়া প্রতিবাধৎসাবৃত্তিকে দমন করিয়া গুর্জ্জরে ফিরিয়া আসিল।

মনে মনে কিন্তু সে বুঝিল, শীঘ্রই আগুন ধরিবে। সে আগুন ধরিবার অব্যবহিত কারণ, সোমনাথের লোক-বিশ্রুত ঐশ্বর্য্য নহে—কমলাবতীর রূপ। শাহ জামাল বুকের ভিতর তীব্র অগ্নিকণা পুরিয়া লইয়া গিয়াছে। সেই স্ফুলিঙ্গ বলসঞ্চয় করিলেই এক দিন ভীষণ অনর্থ উপস্থিত হইবে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

রোস্তমের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি; কিন্তু তাহার শরীরে এখনও যুবার শক্তি বর্ত্তমান। শাহ জামালকে সে বাল্যকালে কোলে করিয়া মানুষ করিয়াছে। সে আগে সুলতানের পুরীরক্ষক ছিল, এখন সেনাপতি হইয়াছে। ভারতে সে বহুবার সুলতানের বাহিনীসমূহের অধিনায়ক হইয়া আসিয়াছিল। সে হাতে-কলমে হিন্দুর বাহুর শক্তির প্রমাণ পাইয়া গিয়াছে। সুলতান মামুদ তাহাকে একান্ত বিশ্বাস করেন। শাহ জামাল ভবিষ্যৎ সুলতান, এজন্য সে তাহাকে সুলতানের মতই সম্মান করে।

শাহ জামাল, মনে মনে বুঝিলেন, রোস্তমের সহিত বিবাদ করিয়া তিনি কাজটা ভাল করেন নাই। একটা মুহূর্ত্তের উত্তেজনায় যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহা ত ফিরাইবার উপায় নাই। পথিমধ্যে নানাবিধ মিষ্ট কথায় তিনি রোস্তমকে প্রসন্ন করিলেন। রোস্তম শাহ জামালকে আন্তরিক স্নেহ করিত। তবে দুই জনেই পাঠান; দুইজনের ধমনীতে উষ্ণ শোণিতস্রোত প্রবাহমান। এইজন্য রোস্তমকে প্রসন্ন করিবার জন্য শাহ জামালকে একটু বেশী কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। ইহার একটা বিশেষ কারণও ছিল।

মামুদাবাদের নির্জ্জন কক্ষে বসিয়া রোস্তম ও শাহ জামাল দুইজনে কথোপকথন করিতেছিল। তাহারা রাজপুরীতে পৌছিয়াই শুনিল—সুলতান মৃগয়া করিতে গিয়াছেন। কাজেই তাহারা তাঁহার প্রত্যাগমন অপেক্ষায় রহিল।

শাহ জামাল বলিল,—"রোস্তম সাহেব! আমার বেয়াদবি মার্জ্জনা করিয়াছ ত?"

রোস্তম বলিল,—"জনাবের এখনও ছেলেমানুষি যায় নাই; তাই এরূপ একটা ব্যাপার ঘটিয়া গেল। যাক্—আমি সেটা মন হইতে মুছিয়া ফেলিয়াছি। আমার বুকে তরবারি প্রবেশ করাইয়া দিলেও আমি জনাবকে মার্জ্জনা করিতাম।"

শাহ জামাল বলিলেন,—"তুমি আমার অঙ্গস্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা কর রোস্তম, আমাদের মধ্যে যে বিবাদ হইয়াছিল সে কথা সুলতানকে বলিবে না।"

রোস্তম।—জীবনে কখনও মিথ্যা বলি নাই; কিন্তু আপনার জন্য তাহাও বলিব। এ সব কথা শুনিলে সুলতান আপনার উপর বড়ই ক্রুদ্ধ হইবেন, তাঁহার ক্রোধে জনাবালির বিপদও ঘটিতে পারে।

শাহ জামাল। রোস্তম! সুলতানের আদেশ পালন করিতে এখন আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ!

রোস্তম। তাহা হইলে গুর্জ্জর আক্রমণ করিবেন না কি?

শাহ জামাল। নিশ্চয়ই!

রোস্তম। দুই দিন আগে যে আপনি গুর্জ্জরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখিয়া মোহিত হইয়াছিলেন! সুলতানের আদেশের বিরুদ্ধাচারী হইয়াছিলেন!

শাহ জামাল। এখন আর আমার সে ইচ্ছা নাই।

রোস্তম। কেন শাহজাদা! কমলাবতীর জন্য?

শাহ। সত্যই তাই রোস্তম!

রোস্তম। গুর্জ্জরকে কিন্তু একেবারে ধ্বংস না করিলে ত কমলা বেগমকে পাইবেন না। একজন গুর্জ্জরীও যতক্ষণ জীবিত থাকিবে, ততক্ষণ ত আপনি নিরাপদ নহেন।

শাহ। গুর্জ্জরকে একেবারেই শ্মশান করিব! একদিন যে গুর্জ্জরের নয়নমোহন সৌন্দর্য্য দেখিয়া প্রাণের সহিত পূজা করিয়াছিলাম—এবার তাহাকে প্রেতভূমিতে পরিণত করিব।

রোস্তম। কমলা বেগম কি এতই সুন্দরী?

শাহ। তুমি অসিব্রতধারী রুক্ষপ্রকৃতির সৈনিক! তুমি সে রূপের মূল্য কি বুঝিবে রোস্তম!"

রোস্তম। হিন্দুর মেয়ে কি সহজে ধরা দেয় সাহেব!

শাহ। তবুও তাহাকে ধরিব। তাহাকে আপনার করিব। একদিন সে আফগান সাম্রাজ্যের রাজরাজেশ্বরী হইবে।

রোস্তম। অসার কল্পনা! ইন্দ্রিয়ের ঘোর বিকার! মোহের প্রবল অভিব্যক্তি! কিন্তু বোধ হয় আপনি গুর্জ্জর জয় করিতে পারিবেন না!

শাহ। কেন?

রোস্তম। কুমারসিংহ গুর্জ্জরের সেনাপতি!

শাহ। তুমি তাহাকে চেন না কি?

রোস্তম তাহার আচ্‌কান খুলিয়া শাহ জামালকে একটি শুষ্ক ক্ষতস্থান দেখাইয়া বলিল,—"কুমারসিংহ গুর্জ্জর রাজ-কর্ত্তৃক, এক সময়ে উজ্জয়িনীতে সেনাপতিরূপে প্রেরিত হয়। এই যে আঘাতের চিহ্ন দেখিতেছেন, তাহা কুমারসিংহের অসিবলেই হইয়াছে। সে আঘাত এত শক্তিময়, এত অব্যর্থ, যে তাহা আমাকে অধীর করিয়াছিল।"

শাহ। আর আমি যে কেবলমাত্র এক ক্ষুদ্র তরবারির সহায়তায় একটা জীবন্ত ব্যাঘ্রের উদর বিদীর্ণ করিয়াছিলাম—সে কথা কি ভুলিয়া গিয়াছ রোস্তম ?

রোস্তম কি বলিতে যাইতেছিল। এমন সময়ে সুলতান মামুদ সেই কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

রোস্তম ও শাহ জামালের মুখ শুকাইল। তাহারা সসম্ভ্রমে আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া সুলতানকে কুর্ণীশ করিল।

সুলতান বলিলেন,—"জামাল! গুর্জ্জরের সংবাদ কি ?"

জামাল আর একটি কুর্ণীশ করিয়া বলিল, "জাঁহাপনা! সংবাদ শুভ।"

"গুর্জ্জরপতির সেনাবল কত ?"

"আমাদের তুলনায় অতি কম।"

"গুর্জ্জর ধ্বংস করিতে তুমি কত সেনা চাও।"

"দশ হাজার।"

"দশ হাজার! অসম্ভব! তোমাকে দশ হাজার, আর রোস্তমকে পাঁচ হাজার পনের হাজার সেনা দিলে, আমার বাহুবল শিথিল হইবে।"

"গুর্জ্জর সেনা অতি সুশিক্ষিত।"

"শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, যে আফগান সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ নায়ক এখনও তাঁহার পাঠান সেনাদের শক্তিতে অবিশ্বাসী।"

"সম্রাট্ আপনার এ তিরস্কার নীরবে সহ্য করিলাম! আমি পাঁচ হাজার সেনা লইয়াই একাকী যুদ্ধক্ষেত্রে যাইতে প্রস্তুত।"

"কিন্তু পরাজয় ও অযথা সেনানাশের দণ্ড কি তা ত জান ?"

"বোধ হয় খোদার আশীর্ব্বাদে আমার সে দণ্ডভোগ করিতে হইবে না। মৃত্যু পণ করিয়া গুর্জ্জর আক্রমণ করিব। বাঁচি—জয়মাল্য গলায় পরিয়া আসিয়া সুলতানের চরণে প্রণত হইব। না পারি সেই শৈলমালাবেষ্টিত গুর্জ্জরেই আমার সমাধি রচিত হইবে।"

সুলতান শাহ জামালকে পুত্রাধিক স্নেহে পালন করিয়াছেন! কাজেই এ কথা শুনিয়া তিনি একটু মর্ম্মপীড়িত হইলেন! কিয়ৎক্ষণ চিন্তার পর বলিলেন,—"শাহ জামাল! আমি তোমায় দশ হাজার সেনাই দিব! কিন্তু রোস্তম ইহার মধ্য হইতে দুই হাজার সেনা লইয়া তোমার পার্শ্ব রক্ষা করিবে।"

"জাঁহাপনার হুকুম শিরোধার্য্য।"

"তাহা হইলে কালই যুদ্ধযাত্রা কর।"

"তাহাই করিব।"

"আর একটা কথা—গুর্জ্জরপতিকে বন্দী করিয়া আমার নিকট পাঠাইবে। জীবিত না ধরিতে পার—সেই বৃদ্ধ সয়তানের ছিন্ন মুণ্ড যেন মামুদাবাদে আসে।"

"সাধ্যমতে জাঁহাপনার আদেশ পালিত হইবে!"

"আর এক কথা—"

"অনুমতি করুন।

"শুনিয়াছি গুর্জ্জর রাজকন্যা কমলাবতী শ্রেষ্ঠা সুন্দরী। আমি তাহাকে কোলে করিব।" প্রহরিবেষ্টিত করিয়া সুলতানের পত্নীর সমযোগ্য সমাদরে তাঁহাকে এখানে পাঠাইবে! গুর্জ্জররাজকোষ লুণ্ঠিত করিয়া একটি কপর্দ্দকও না পাও, তাহাতে কোন ক্ষতিই নাই, কিন্তু এ রমণীরত্নকে আমি চাই।"

শাহ জামালের মাথায় যেন সহসা বজ্রপাত হইল! তাহার প্রাণের মধ্যে সহস্র বৃশ্চিক-দংশনের যাতনা উপস্থিত হইল! সুলতানের মুখে একি সর্ব্বনাশের কথা!

কিন্তু আর ত ফিরিবার পথ নাই। কাজেই, মনের ভিতর যে একটা প্রবল ঝড় উঠিতেছিল, তাহার শক্তি সংযত করিয়া শাহ জামাল বলিল,—

"এ বান্দা সুলতানের আদেশপালনে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে।"

সুলতান আর কিছু না বলিয়া সে কক্ষ ত্যাগ করিলেন। শাহ জামাল ঘোর চিন্তামগ্ন। একটু পূর্ব্বে তাহার

চিত্ত যে একটা অতি উজ্জ্বল আশার আলোকে প্রদীপ্ত হইয়াছিল সে আশা তখন অন্ধকারময় নিরাশায় পরিণত! তাহার সাধের সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়াছে। গুর্জ্জর-জয়ে ইতোপূর্ব্বে তাহার প্রাণে যে একটা সাহস, উৎসাহ, উদ্দীপনা আসিয়াছিল তাহা যেন ছায়াবাজির ছায়ার মত সরিয়া গেল!

শাহ জামাল মলিনমুখে নিরাশাব্যঞ্জক স্বরে ডাকিলেন,—"রোস্তম!" রোস্তমও সুলতানের মুখে এই কথা শুনিয়া বড়ই বিস্মিত হইয়াছিল। রোস্তম বিষণ্ণমুখে বলিল,—"কি জনাবালি?"

শাহ জামাল। আমি তাহা হইলে কমলাবতীকে পাইব না!

রোস্তম। স্বয়ং সুলতান মামুদ যার রূপের জন্য লালায়িত, তার রূপের মূল্য কত বেশী জনাব তা কি অনুমানেও বুঝিতেছেন না।"

শাহ জামাল মনে মনে কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিলেন। তৎপরে বলিলেন, "প্রস্তুত হওগে রোস্তম! আমার অদৃষ্টে যাহা ঘটে ঘটুক, আমি সুলতানের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিব না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

গুপ্তপ্রণিধি ভৈরব, দ্রুতপদে হাঁফাইতে হাঁফাইতে কমলাবতীর কক্ষদ্বারে দাঁড়াইয়া বিকৃতকণ্ঠে ডাকিল,—"মা! মা!"

কক্ষদ্বার আবদ্ধ ছিল! কমলা ত্বরিতপদে দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিলেন,—"ভৈরব।"

ভৈরবের মুখের অবস্থা দেখিয়া কমলা ভয় পাইলেন। ব্যস্তভাবে প্রশ্ন করিলেন, "ব্যাপার কি?"

"সর্ব্বনাশ উপস্থিত!"

"কিসের সর্ব্বনাশ?"

"মুসলমান সেনা গুর্জ্জরের অতি নিকটে।"

"সেনার পরিমাণ কত?"

"বোধ হয় বিশ হাজার!"

"বি—শ—হা—জা—র!

"হাঁ মা! বেশী হইবে ত কম নয়।"

"তাহা হইলে গুর্জ্জর রক্ষা করা যে ভার হইবে। গুর্জ্জরের সেনাসংখ্যা দশ হাজারের বেশী নয়—ভৈরব।"

"তাই ত ভাবিতেছি মা! গুর্জ্জর যা'ক্—গুর্জ্জরের সর্ব্বস্ব যা'ক্ তোমায় কি করিয়া বাঁচাইব!"

"অবোধ মূর্খ সন্তান! এখনই কি ভুলিয়া গেলি যে আমি রাজপুত রাজকন্যা! তুমিও রাজপুত! মৃত্যু ত আমাদের ক্রীতদাস! যা'ক্, শত্রু কতদূরে!"

"নগর হইতে চারিক্রোশ দূরে। সেখানে প্রান্তর মধ্যে তাহারা ব্যূহ রচনা করিতেছে।"

"পিতা কোথায়?"

"তিনি সমস্ত সেনা লইয়া এখানে আসিতেছেন। তিনি বলেন, "সোমনাথের চরণতলে থাকিয়া যুদ্ধ করিব। সোমনাথই রক্ষা করিবেন।"

কমলা উর্দ্ধনেত্রে যুক্তকরে, কাতরভাবে বলিয়া উঠিল, "ভগবান্! সোমনাথ! কি হইবে প্রভু! কি করিলে প্রভু!"

সহসা এই সময়ে কুমারসিংহ বর্ম্মাবৃত দেহে যোদ্ধৃবেশে সেই স্থানে দেখা দিলেন।

কমলাবতী কুমারসিংহের হাত দুইখানি উত্তেজনাবশে নিষ্পেষিত করিয়া বলিলেন, "কি হইবে কুমার?"

কুমারসিংহ উৎসাহপূর্ণ স্বরে বলিলেন, "কিসের ভয় কমলা! স্বয়ং স্বয়ম্ভু আমাদের পৃষ্ঠপোষক। এ সোমনাথ-পীঠে তিনি জাগ্রত মহাকালরূপে বিরাজিত। আর সাক্ষাৎ শক্তিময়ী তুমি যখন বর্ত্তমান, তখন ভয় কিসের! তুমি আমায় হাসিমুখে বিদায় দাও।"

কমলা অশ্রুপূর্ণ নেত্রে বলিল, "কুমার! কি যে বলিব, কিছুই ত বুঝিতে পারিতেছি না। কি যেন এক ভবিষ্যৎ দুর্নিমিত্ত কল্পনায় চিত্ত অধীর হইয়া উঠিতেছে। কে যেন আমার মনের মধ্য হইতে বলিয়া দিতেছে, "কুমারকে চিরদিনের জন্য বিদায় দাও। হায়! হায়! সর্ব্বনাশী আমিই এই অনর্থের মূল! কেন সেই শয়তান শাহ জামালকে আশ্রয় দিয়াছিলাম!"

কুমার বলিল, "কমলা! এ ত রোদনের সময় নয়, বিরহবিধুরতা-জনিত উচ্ছ্বাসময় আক্ষেপের সময় নয়! আমায় হাস্যমুখে বিদাও দাও কমলা! তোমার হাসি মুখের শক্তিতে আমি যে রণক্ষেত্রে একাই একশত হইব।"

কমলা আবার চোখ মুছিল! সে কিছুতেই তাহার

মনের ভাব চাপিয়া রাখিতে পারিতেছিল না। তাহার প্রাণের চারিদিক্ ব্যাপিয়া একটা অশুভ কল্পনা থাকিয়া থাকিয়া জাগিয়া উঠিতেছিল! ওঃ! সে কল্পনার অভিব্যক্তি যে অতি ভীষণ!

কুমারসিংহ স্বহস্তে কমলার সেই কমল-নেত্রদ্বয় মুছাইয়া দিল। তারপর বিষণ্ণমুখে বলিল. "কমলা! যুদ্ধে জয় পরাজয় দুইই আছে। প্রত্যাবর্ত্তন ও মৃত্যু দুইই সম্ভব! মুসলমান বিজেতাদের বিশ্বাস নাই। বিশেষতঃ আমি শুনিয়াছি তোমাকে আয়ত্ত করিবার জন্যই এই যুদ্ধ উপস্থিত। যদি কিছু বিপদ্ ঘটে, তাহা হইলে আত্মরক্ষার সময় পাইবে না। আমি আমার প্রাণের অগাধ স্নেহ প্রেম, আর সেই সঙ্গে এই বিষটুকু তোমায় দিয়া গেলাম। প্রয়োজন বুঝিলে ইহার সদ্ব্যবহার করিও। যখন শুনিবে আমি মরিয়াছি—তোমার পিতা স্বর্গগত, তখন মনে বুঝিও—দেবতাও তোমাকে রক্ষা করিতে পারিবেন না। এই হলাহলই তোমার নারী-সম্মান রক্ষা করিবে।"

কুমারসিংহ আর কিছু না বলিয়া সেই কাগজে মোড়া সাংঘাতিক বিষটুকু কমলাকে শেষ প্রেমোপহাররূপে দিয়া সে স্থান হইতে অশ্রুপূর্ণ নেত্রে প্রস্থান করিল।

"কমলাবতী কুমারসিংহের হাত দুইখানি উত্তেজনাবশে নিষ্পেষিত করিয়া বলিলেন কি হইবে কুমার?" ৮৮২ পৃষ্ঠা।

আর ভৈরব! সে কুমারসিংহকে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়াই—তাহার নিজের ডেরায় চলিয়া গেল। কুমারসিংহ নিষ্ক্রান্ত হইবার পরই সে তাহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

দিন গেল। সন্ধ্যা হইল। গুর্জ্জরসেনা পাঠান হস্তে পরাজিত। তপন দেব যেন গুর্জ্জরের পরাজয়-কলঙ্ক সহ্য করিতে না পারিয়া ক্রোধে লোহিতবর্ণ ধারণ করিয়া আকাশপ্রান্তে ঢলিয়া পড়িলেন।

প্রান্তরের চারিদিক্ ব্যাপিয়া হত, আহত, মৃতের দেহ-রাশি। কেহ মরিতেছে—কেহ মরিয়াছে—কেহ ছিন্নমুণ্ড, কেহ বক্ষোবিদ্ধ, কাহারও বা ছিন্নপদ—কাহারও বা ছিন্নহস্ত। এই সব প্রেতমূর্ত্তি ও কবন্ধরাশি লইয়া সেই বিস্তৃত প্রান্তর শোণিতরেখা বুকে ধরিয়া বিভীষিকাময় শ্মশানে পরিণত হইয়াছে।

সেদিন আর সোমনাথের সন্ধ্যা আরতি হইল না। দেব-মন্দিরের শঙ্খঘণ্টা-রবে পুরোহিতদিগের শিবস্তোত্র-পাঠের কঠোর ধ্বনিতে দিগন্ত মুখরিত হইল না। সে গুরু গম্ভীর স্তোত্রপাঠ সেদিন আর গর্জ্জনকারী

সাগর-তরঙ্গে অঙ্গ মিশাইল না। সোমনাথ শ্মশান ভালবাসেন বটে, কিন্তু এ শ্মশানে ত চিতাভস্ম নাই—আছে তাঁহার একান্ত ভক্ত গুর্জ্জরবাসীর হৃদয়-শোণিত!

রজনী ক্রমশঃ গভীর হইতেছে। সে শ্মশানক্ষেত্রে কেহ নাই। গুর্জ্জরীদের পরাজয়ে, বৃদ্ধ গুর্জ্জরপতির নিধনে, নগর মহাশ্মশান হইয়াছে! কিন্তু গুর্জ্জরসেনাপতি কুমারসিংহ কোথায়? তাহার ত কোন সন্ধানই নাই!

কমলাবতী পিতার মৃতদেহের সৎকার্য্যের ব্যবস্থা করিয়া চিতা রচনা করিয়া কুমারসিংহের মৃতদেহ অনুসন্ধানের জন্য সেই মহাশ্মশানে প্রেতিনীর ন্যায় ঘুরিতেছেন! কোথায় কুমার! কই কুমার! কেহই ত বলিয়া দেয় না!

পশ্চাতে মশাল হস্তে ভৈরব! ভৈরব প্রত্যেক মৃত দেহের মুখের কাছে মশাল ধরিতেছে—আর নিরাশপূর্ণ স্বরে মলিনমুখে বলিতেছে, "মা! এ ত নয়।"

সমীরণ যেন হাহুতাশ করিয়া বলিতেছে,—"কুমারসিংহ আর নাই।" প্রান্তরভূমির নানাস্থানে স্থিত বিটপীর শ্যামল পত্রগুলি যেন অস্ফুটস্বরে বলিতেছে, "কুমারসিংহ ত আর নাই।" চন্দ্রহীন ও মেঘশূন্য আকাশে স্তিমিত তারকা যেন বলিতেছে, "কোথায় কুমারসিংহ! কোথায় তাহাকে খুঁজিতেছ! সেত এখন আমাদের রাজ্যে!"

এমন সময়ে সেই মহাশ্মশানের ভীমান্ধকার মধ্যে দুইটি মনুষ্যমূর্ত্তি দেখা দিল। সে মূর্ত্তিদ্বয় ধীরে ধীরে ভৈরব ও কমলাবতীর নিকটে আসিল। কমলাবতী সে মূর্ত্তি চিনিলেন! ভৈরবও তাহাদের চিনিল। তাহাদের একজন শাহ জামাল, আর একজন রোস্তম!

কমলাবতী তিরস্কারপূর্ণস্বরে বলিলেন, "শয়তান্! নরাধম! কেন আমাদের এ সর্ব্বনাশ করিলি! এই কি আমার আতিথেয়তার পুরস্কার!"

শাহ জামাল এ তিরস্কারে ভ্রূক্ষেপও করিল না। সে মশালের আলোকে কমলার সেই অপ্সরোপম হেমকান্তি দেখিতেছিল! সে ত ইতঃপূর্ব্বে কমলার মুখ দেখিতে পায় নাই। তাহার বস্ত্রাবৃত, চন্দ্রালোকিত শুভ্র সৌন্দর্য্যই দেখিয়াছিল। কিন্তু এখন দেখিল সেই মহাশ্মশানে যেন এক রাজরাজেশ্বরী মূর্ত্তি—উজ্জ্বল দীপ্তিমণ্ডিতা স্বর্ণপ্রতিমার ন্যায় শোভা পাইতেছেন।

শাহ জামাল কমলার মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া চাহিয়া কিয়ৎক্ষণ প্রাণ ভরিয়া সে রূপরাশি দেখিল। তৎপরে বিকৃতস্বরে বলিল, "কি সুন্দর! তুমি কি সুন্দর! এ মহাশ্মশানে তুমি কি সুন্দর! কমলা! তুমি কি জন্য এখানে আসিয়াছ তাহা আমি অনুমানে বুঝিতেছি। তুমি চাও কুমারসিংহের মৃতদেহ! কিন্তু কুমারসিংহ ত মরে নাই। সে আহত; আমাদের শিবিরে বন্দী। এখানে খুঁজিলে পাইবে কিরূপে। আমরা এত অকৃতজ্ঞ নহি, যে তোমার আতিথেয়তার অবমাননা করিব; কিন্তু একটা কথা তোমাকে বলি। কুমারসিংহকে স্বাধীনতা দিব; কিন্তু আমি তোমাকে চাই!"

এ কথা শুনিয়া রোস্তমের নেত্রদ্বয় উচ্ছ্বলিত হইয়া উঠিল। কমলাবতীর সেই নলিন নেত্রে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দেখা দিল।

শাহ জামাল পুনরায় বলিল, "সুলতান তোমাকে বেগমরূপে চান। আমি তোমায় পত্নীরূপে চাই। কিন্তু এখন তুমি আমার করায়ত্ত—সুলতানকে ছাড়িতে পারি, যে রাজ্যে তিনি আমায় ভবিষ্যতে প্রতিষ্ঠিত করিবেন সে রাজ্যের মায়াও ছাড়িতে পারি, কিন্তু তোমায় ছাড়িতে পারি না। সংকল্প করিয়াছি আমি আফগানিস্থান আর ফিরিব না। তোমাকে লইয়া এই হিন্দুস্থানে পর্ণকুটীর বাঁধিয়া সুখে থাকিব! কমলা তোমার জন্যই আজ আমি গুর্জ্জর ধ্বংস করিয়াছি। যে গুর্জ্জর একদিন তাহার স্নেহময় আতিথ্যে আমার মত শয়তানকে সম্মানিত করিয়াছিল—আমি তার শান্তিময় বুকে শোণিতের ঢেউ তুলিয়াছি। কমলা! কমলা! একবার বল—তুমি আমার।"

শাহ জামাল কমলাকে বাহুপাশে আলিঙ্গন করিবার জন্য যেমন ধাবিত হইল, অমনই এক অলক্ষ্য স্থান হইতে বন্দুকের গুলি আসিয়া তাহার বক্ষ ভেদ করিল। শাহ জামাল সেই আঘাতে ভূপতিত হইল।

সেই আঘাতকারী শেষে সকলের সম্মুখে আসিল। সকলেই সবিস্ময়ে দেখিল স্বয়ং সুলতান মামুদ সেখানে উপস্থিত।

সুলতান বলিলেন, "শয়তান্! বিশ্বাসঘাতক! আমি তোকে না দিয়াছি কি? এ প্রাণের অগাধ স্নেহ, একান্ত বিশ্বাস, ভবিষ্যতে সাম্রাজ্য পর্য্যন্ত দিতে প্রতিশ্রুত।

মৃগয়া হইতে ফিরিয়া আসিবার পরই আমি পার্শ্বস্থিত কক্ষে লুক্কায়িত থাকিয়া তোমার সব কথাই শুনিয়াছি। তুই যে বিশ্বাসঘাতকতা করিবি ইহা জানিয়াই আমি তোকে ঐরূপ আদেশ দিয়াছিলাম। ছায়ার ন্যায় সামান্য সৈনিকের বেশে তোর অনুসরণ করিয়াছিলাম! তারপর স্বহস্তে তোর বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কার দিয়াছি।

সুলতান ক্রোধে বাহ্যজ্ঞানশূন্য—রোস্তমও তদ্রূপ। শাহ জামাল মৃত। আর ইতোমধ্যে নূতন এক বিপদ্ উপস্থিত দেখিয়া ভৈরব সেই মশালটি মাটিতে পুতিয়া রাখিয়া কমলাবতীকে লইয়া নিঃশব্দে সেস্থান হইতে চলিয়া গিয়াছে। সুলতান সবিস্ময়ে দেখিলেন, কমলাবতী ও তাহার সহচর সেস্থান হইতে অদৃশ্য হইয়াছে।

সুলতান রোস্তমকে বলিলেন, "রোস্তম! আজ আমি একটা দারুণ উত্তেজনাবশে, নিজের দক্ষিণ বাহু ছেদ করিলাম। যাহা করিয়াছি তাহা ত অনুতাপে ও ক্রোদনে ফিরাইবার উপায় নাই। তুমি এই দেহ স্কন্ধে করিয়া তুলিয়া লও। একটু অগ্রেই আমার পার্শ্বচরদের রাখিয়া আসিয়াছি। এ যাত্রা গুর্জ্জরের শাস্তি দিতে পারিলাম না। শাহ জামালের দেহ গজনীতে সমাহৃত করিয়া আবার আমরা গুর্জ্জর আক্রমণ করিব।

"কমলা, কমলা, একবার বল তুমি আমার"। (৮৮৪ পৃষ্ঠা)

রোস্তম প্রভুর আজ্ঞা তখনই পালন করিল। কিয়দ্দূরে আসিয়া সুলতান তাঁহার পার্শ্বচরদের সহিত মিলিত হইলেন। সেই মৃতদেহ অশ্বের উপর তুলিয়া লইয়া শিবিরে পৌঁছিলেন। সেখানে আসিয়া শুনিলেন যে তাঁবুতে কুমারসিংহ আবদ্ধ ছিলেন তাহা গুর্জ্জরীরা আক্রমণকরিয়া কুমারসিংহকে উদ্ধার করিয়া লইয়া গিয়াছে। বলা বাহুল্য এ সব ভৈরবেরই কাজ।

সুলতান গজনীতে আসিয়া মহাসমারোহে শাহ জামালের দেহ সমাধিস্থ করিলেন। তাহার শোকে সপ্তাহকাল সকল রাজকার্য্য ত্যাগ করিয়া কেবল অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। ইতঃপূর্ব্বে সুলতান মামুদকে কেহ কখন চোখের জল ফেলিতে দেখে নাই।

তিন মাসের মধ্যে সেই সমাধির উপর এক প্রকাণ্ড "মসোলিয়ম" নির্ম্মিত হইল। তাহার প্রবেশদ্বার-শীর্ষে স্বর্ণাক্ষরে লেখা ছিল—

"রূপের মূল্য"

শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।

সার্থকতা।

"সিদ্ধি মিলিবে সাধনার পরে" কহেন মন্ত্রদাতা ;
"আশীষ তোমার সার্থক হোক্," কহিনু নোয়ায়ে মাথা।
সলিল-সিক্ত স্নিগ্ধ শরীরে বসিনু আসন পাতি,
ঝরিয়া পড়িছে উষার আলোক নিবিয়া গিয়াছে বাতি।
সঙ্গীত তালে পশে শুধু কানে চঞ্চল নদী-গান,
ধূপের সুবাসে পুষ্পগন্ধে পূত হয়ে গে'ছে প্রাণ।
নয়ন মুদিয়া ভাবি শুধু মনে, 'বিশ্বের অধিরাজ,
হৃদয়কমলে সহস্রদলে বিরাজিত হও আজ।
তোমারি সেবায় সঁপে দিব দেহ, সঁপে দে'ছি মনপ্রাণ ;
তোমা ছাড়া মোর কামনার ধন কিছু নাহি ভগবান্"।
ঝলসি উঠিছে দেহের চর্ম্ম দারুণ রবির তাপে,
জ্বলিয়া নিবিছে উদর অনল, সঘনে শরীর কাঁপে।
শুষ্ক অধর সরসিয়া দে'ছে বরিষার বারিধারা ;
"আজো কি আমার হবেনা তৃপ্ত অতৃপ্ত আঁখি-তারা"
শীতের নিশায় শীতল সলিলে বসে আছি অবগাহি ;
"সাধনের ধন এসহে আমার, তোমারি দরশ চাহি ;—
স্নিগ্ধ পানীয় সুমিষ্ট ফল সাজাইয়া থরে থরে,
গন্ধ প্রদীপ জ্বেলে দেছি আজ তব আবাহন তরে।

আলোকের স্রোত ঢেউ তুলে বুকে, চিত করে উতরোল—
কোমল মধুর স্নিগ্ধ স্পর্শে বুকে দিয়ে গেল দোল।
শীতল বাতাসে রোমাঞ্চ ভরে শিহরিনু রহি রহি,
বিশ্ববাণীর নবীন বারতা দুয়ারে কে এল বহি।
কলকল্লোলে জাহ্নবীজলে উথলি উঠিল হাসি,
রুণু ঝুণু ঝুণু বাজিল নূপুর শ্রবণে পশিল বাঁশী।
বিশ্বপ্লাবিত রূপের প্রভায় স্তম্ভিয়া প্রাণ মন,
নটবর বেশে ভক্তে কি নাথ দিলে আজি দরশন !
নবীন নীরদ মনোহর রূপে এলে কি মুরলীধারী,
অথবা শ্যামল নবঘনরূপে রাঘব কাননচারী।
সহস্র দলে কনক কমলে জ্যোতিরূপে পরকাশি,
এলে কি লক্ষ্মী ঘুচাতে দৈন্য ছড়াতে রতনরাশি,
সুরনন্দিতা বুধবন্দিতা চির-ঈপ্সিতা মোর,
বীণা-নিনাদিনী বিশ্বজননী ঘুচাও মোহের ঘোর।
বাম করতলে অমৃত অন্ন, দক্ষিণ করে হাতা,
বিশ্বের ক্ষুধা এলে কি নাশিতে অন্নদায়িনী মাতা ?
অথবা আসিলে জননী আমার, মুণ্ডমালিনী বেশে,
ভক্তেরে দিতে ধর্ম্ম মোক্ষ,-লুণ্ঠিত এলোকেশে।
রজত ভূধর গরলকণ্ঠ এলে কি মৃত্যুঞ্জয়,
শিব শঙ্কর—চতুর্বর্গ, দীনে দিতে বরাভয়।"
ভয়ে বিস্ময়ে স্তম্ভিত দেহ—সুখস্তম্ভিত-প্রাণ,
নয়ন মেলিতে ভয়—পাছে হয় স্বপ্নের অবসান।
যে সুখবাতাসে রোমাঞ্চদেহ—বুকে যে আলোক খেলে,
যে সুধাগন্ধে ভুবন ভরেছে, সেকি মিথ্যায় মেলে ?
ধীরে ধীরে ধীরে খুলিনু নয়ন,—বিহ্বল আঁখি তুলি
এ কি নেহারিনু মূরতি ভীষণ ; করে ভিক্ষার ঝুলি ;
কঙ্কালসার কুৎসিত দেহ, কোটরে ঢুকেছে আঁখি ;
অস্থিরূপিণী রমণী কহিছে শ্বাস টানি থাকি থাকি,—
"ভিক্ষুক জনে দয়া কর দাতা, দয়া করিবেন হরি ;
তিন দিন আজ পেটে কিছু নাই—ক্ষুধা তৃষ্ণায় মরি।"
"একি প্রতারণা ?" ক্রুদ্ধ হৃদয় গর্জ্জিল রোষভরে ;
কহিলাম, "ওরে ঘৃণিত ভিখারী, হেথা হ'তে যারে সরে
সন্ন্যাসী-পাশে ভিক্ষা মাগিস্—হেথা ভাণ্ডার নাই,
দেবতার ভোগে লুব্ধ নয়ন ? লজ্জায় মরে যাই"।
কঙ্কালসার অঙ্গুলি তুলি কহিল রমণী, "ওর
কণিকা পাইলে বাঁচিয়া যাইবে ক্ষুদ্র জীবন মোর।
পারিলে না যদি হেলায় রাখিতে তাঁহার সৃষ্ট প্রাণ
ভাব কি দয়াল আসিবেন নিতে তোমার দয়ার দান ?"
ধীরে ধীরে নারী মৃত্তিকা, পরে পড়িল লুটায়ে মাথা ;
নিঃশ্বাসও বুঝি রুদ্ধ হয়েছে, অধরে স্ফুরেনা কথা।
সহসা কাহার কোমল কণ্ঠ বাজিল প্রাণের পর,
"আজিও অন্ধ-আমিত্বে ভরা ওরে গর্ব্বিত নর !
আপনারে শুধু করেছিস পূজা, ভক্তের করে ভান ?
দীন যে আমার হৃদয়ের ধন' দয়া যে আমার প্রাণ।"

বুভুক্ষু জনে দিলিনে অন্ন, তৃষিতে দিলিনে জল
তবু আপনারে ভাবিস্ সিদ্ধ—একি সিদ্ধির ফল ?"
"হৃদয় হইতে বাহিরিয়া এল একি অশরীরী বাণী
আমারি মাঝারে ছিলে কি সুপ্ত ?" জীবন ধন্য মানি!
পূজাসন ছাড়ি ত্বরিতে উঠিয়া মুমূর্ষে দিনু জল,
পদ্মপত্রে ব্যজন করিয়া—আহরিত ফুল ফল।
দেবতার তরে রেখেছিনু যাহা নিবেদিয়া দিনু পায়,
সুখ-অশ্রুতে অন্ধ নয়ন প্রেমে রোমাঞ্চ কায়!
ভূমে লুট্টাইয়া করিনু প্রণাম শত সহস্রবার,
"ভিক্ষুক পাশে ভিক্ষা মাগিছ—একি মায়া তোমার ?"

শ্রীইন্দিরা দেবী।

গীতায় গার্হস্থ্য ধর্ম্ম।

১

হিন্দু ধর্ম্মের সারতত্ত্ব, উপনিষদ গুলিতেই পওয়া যায়; এবং গীতায় উপনিষদের সারতত্ত্বগুলির একত্র সমাবেশ দেখা যায়।

গীতা হিন্দু শাস্ত্রের সার-তত্ত্ব।

সর্ব্বপোনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতাঽমৃতং মহৎ॥

সর্ব্বোপনিষদ গাভী (সদৃশ) গোপাল নন্দন (শ্রীভগবান কৃষ্ণ) উহার দোহন কর্ত্তা, পার্থ বৎস (সদৃশ), সুধীগণ ঐ দুগ্ধ (স্বরূপ গীতামৃত) পানকর্ত্তা।

এই জন্যই প্রাচীন ঋষিগণ বলিয়াছেন যে,—

"গীতা সুগীতা কর্ত্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ।" গীতা সুগীতা করা কর্ত্তব্য; অন্য বিস্তর শাস্ত্রে প্রয়োজন কি ?

জীব ও ব্রহ্মের একত্ব প্রতিপাদনই গীতার উদ্দেশ্য।" "তত্ত্বমসি"- এই মহাবাক্যের সার্থকতা সিদ্ধির উপায় নির্দ্ধারণই ইহার প্রধান লক্ষ্য। গীতা অষ্টাদশ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। তন্মধ্যে প্রথম ষড়ধ্যায়ে জীবত্ব প্রতিপাদন; দ্বিতীয় ষড়ধ্যায়ে ব্রহ্মত্ব প্রতিপাদন, এবং শেষ ষড়ধ্যায়ে জীব ওব্রহ্মের একত্ব প্রতিপাদন করা হইয়াছে।

গীতায় প্রতি-পাদ্য—জীব ব্রহ্মের একত্ব।

উক্ত প্রতি ষড়ধ্যায়ে প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি উপলব্ধির উপায় তত্তৎ অধ্যায়েই বিশদভাবে কথিত হইয়াছে। প্রথম অধ্যায়ে কর্ম্মনিষ্ঠা দ্বারা আত্মজ্ঞানের উপায় নির্দ্ধারিত হইয়াছে; দ্বিতীয় ষড়ধ্যায়ে উপাসনারূপ ভগবদ্ভক্তি নিষ্ঠা দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান-লাভোপায় সূচিত হইয়াছে; এবং তৃতীয় ষড়ধ্যায়ে জ্ঞাননিষ্ঠা দ্বারা জীব ও ব্রহ্মের একত্ব উপলব্ধির উপায় কথিত হইয়াছে। এই একত্ব উপলব্ধিই মোক্ষ লাভের উপায়। কর্ম্মকাণ্ডময় প্রথম ষড়অধ্যায়ে ত্রিগুণ কর্ম্ম পরিহার পূর্ব্বক কিরূপে "ত্বং" পদ বাচ্য কূটস্থ চৈতন্যস্বরূপ শুদ্ধাত্মার অনুভব করিতে পারা যায় তাহাই নিরূপিত হইয়াছে; দ্বিতীয় ষড়ধ্যায়ে উপাসনারূপ বিশুদ্ধ ভক্তি মার্গ দ্বারা "তৎ" পদার্থরূপ পরমাত্মার তত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে; তৃতীয় ষড়ধ্যায়ে জ্ঞাননিষ্ঠা দ্বারা "অসি" পদবাচ্য তৎ+ত্বং পদের অভেদ প্রতিপাদন হইয়াছে।

তদুপায় নির্দ্দেশ।

সুতরাং এক কথায় বলিতে গেলে গীতায় "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্যের তাৎপর্য্যই বিশদভাবে ব্যাখ্যাত এবং তদুপলব্ধি করণোপায় কথিত হইয়াছে।

কি প্রসঙ্গ উপলক্ষে এই মহাতত্ত্ব শ্রীভগবান ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, প্রথম অধ্যায় ও দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম একাদশ শ্লোকে তাহারই বর্ণনা আছে। মহাক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধার্থে কুরু ও পাণ্ডব উভয় পক্ষেরই সৈন্যদল সমবেত হইয়াছে। ভারতবর্ষীয় মহাবীর ক্ষত্রিয় রাজগণ নিজ নিজ মিত্রতানুসারে কেহ বা কুরুপক্ষে, কেহ বা পাণ্ডবপক্ষে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছেন। সকলেই নিজ নিজ শঙ্খধ্বনি দ্বারা নভোমণ্ডল ও অবনিপৃষ্ঠ প্রতিধ্বনিত করিলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুন স্বীয় শরাসন উত্তোলন পূর্ব্বক স্বীয় সারথী কৃষ্ণকে উভয় সেনার মধ্যে

গীতার অবতারণা।

রথ স্থাপন করিতে বলিলেন। রথ যথাস্থানে স্থাপিত হইলে অর্জ্জুন যুদ্ধাভিলাষী আত্মীয় স্বজনকে দেখিয়া তাঁহাদিগের বধজনিত পাপ ভয়ে ভীত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন,—

অর্জ্জুনের বৈরাগ্য।

"ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ॥"—(১।৩১)

"হে কৃষ্ণ আমি বিজয় আকাঙ্ক্ষা করি না, রাজসুখ ও চাহি না।"

"কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ! কিং ভোগৈর্জীবেতে ন বা।

যেষামর্থে কাঙ্ক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুখানিচ"॥ (১।৩২)

"হে গোবিন্দ আমাদের রাজ্যে কি প্রয়োজন? ভোগ বা জীবনে কি প্রয়োজন? যাঁহাদের নিমিত্ত আমাদের রাজ্য, ভোগ ও সুখের আকাঙ্ক্ষা।

"ত ইমেঽবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাং স্তক্ত্বাধনানি য" (১।৩৩)

"তাঁহারাই ধন প্রাণের আশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক যুদ্ধার্থে অবস্থিত রহিয়াছেন

"এতান্নহন্তু মোহন্তি ঘ্নতোঽপি মধুসুদন" (১ ৩৪)

"হে মধুসূদন আমি হত হইব, তথাপি তাহাদিগকে মারিতে ইচ্ছা করি না।

"অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ কিন্নু মহীকৃতে।
নিহত্য ধার্ত্তরাষ্ট্রান্নঃ কা প্রীতি স্যাজ্জনার্দ্দন!" (১।৩৫)

"ত্রৈলোক্য রাজ্যের নিমিত্তও যাঁহাদিগকে বিনষ্ট করিতে ইচ্ছুক নহি, তুচ্ছাতিতুচ্ছ পৃথিবীর রাজত্ব জন্য কি তাঁহাদিগকে বধ করিব? হে জনার্দ্দন, ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে সংহার করিয়া আমার কি সুখই বা লাভ হইবে?

"পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্ হত্বৈতানাততায়িনঃ
তস্মান্নার্হা বয়ং হন্তুং ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ সবান্ধবান্।
স্বজনং হি কথংহত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব!" (১।৩৬)

"আততায়ী ইহাদিগকে হত্যা করিলে আমাদিগকে পাপই আশ্রয় করিবে। অতএব সবান্ধব ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে আমরা হত্যা করিতে চাহি না। হে মাধব! যেহেতু স্বজন দিগকে হত্যা করিয়া আমরা কি প্রকারে সুখী হইব?

"যদি মাম প্রতীকারমশস্ত্রং শস্ত্রপাণয়ঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রা রণেহন্যুস্তন্মে ক্ষেমতরংভবেৎ॥" (১।৪৬)

"প্রতিকারোদ্যমরহিত ও অশস্ত্রপাণি আমাকে দেখিয়া যদি শস্ত্রপাণী ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ হত্যা করে তাহাও বরং আমার পক্ষে মঙ্গল হইবে।

"গুরূনহত্বাহি মহানুভাবান্
শ্রেয়োভোক্তুং ভৈক্ষ্যমপীহ লোকে।
হত্বার্থ কামাংস্তুগুরূনিহৈব
ভুঞ্জীয় ভোগান রুধির প্রদিগ্ধান্।" (২।৫)

"মহানুভব গুরুগণকে হত্যা না করিয়া ইহলোকে ভিক্ষায় ভোজন করা শ্রেয়ঃ; কিন্তু গুরুজনকে হত্যা করিয়া যে অর্থকাম তাহা রুধিরলিপ্ত।

অর্জ্জুনের একথা প্রথমতঃ অতীব উত্তম বলিয়া ধারণা হয়। ক্ষত্রিয় অর্জ্জুন যুদ্ধে আত্মীয় স্বজন বিনাশ দ্বারা রাজ্যসুখ ভোগাপেক্ষা ভিক্ষাবৃত্তি শ্রেয়ঃ বলিতেছেন এবং সেই জন্য যুদ্ধে অনিচ্ছা প্রকাশ পূর্ব্বক ভগবানের নিকট কাতরভাবে নিবেদন করিতেছেন যেন তাঁহাকে যুদ্ধ করিতে না হয়। এরূপ ভোগৈশ্বর্য্যত্যাগ মানবজাতির ইতিহাসে বিরল বলিলে হয়। এইজন্য অনেকের এরূপ ধারণা যে, অর্জ্জুন প্রকৃতপক্ষে পরম ধার্ম্মিক ছিলেন এবং তিনি প্রথম হইতেই এই প্রাণীহানিকর মহাসমর হইতে নিবৃত্ত ছিলেন। কেবল মাত্র কুচক্রী কৃষ্ণের কুহকে পড়িয়া পরিশেষে এই প্রাণী-বধরূপ মহাপাপকার্য্যে প্রবৃত্ত হন; কিন্তু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কার্য্যকলাপ পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে এ ভ্রম দূর হয়। তিনি প্রথম হইতেই এই মহারণের প্রতিবাদী ছিলেন। তিনি স্বয়ং যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন নাই এবং কাহাকেও যুদ্ধে প্রবৃত্ত করেন নাই। অর্জ্জুনকেও তিনি যুদ্ধ করিতে রণক্ষেত্রে আসিতে বলেন নাই। অর্জ্জুন স্বীয় রাজ্যলাভে অকৃতকার্য্য হইয়া নিজ পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞানুসারে দুষ্ট দুর্য্যোধনাদিকে দমনার্থ যুদ্ধে স্বয়ং প্রবৃত্ত হইয়া আসিয়াছিলেন। অর্জ্জুনের পূর্ব্বোক্তিতে প্রথমতঃ মনে হয় যেন, তাঁহার মনে প্রকৃত বৈরাগ্যের উদয় হইয়াছে; কিন্তু তাঁহার জীবনের পূর্ব্বকৃত কার্য্যাবলি পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে এ প্রকার বৈরাগ্যের কোন কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। যে কারণে তিনি যুদ্ধ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে চান তাহা কেবলমাত্র আত্মীয় স্বজনবধপাপ ভয়ে। তিনি রাজ্যৈশ্বর্য্য লাভাশা

উহার প্রকৃত কারণ।

একেবারে পরিত্যাগ করেন নাই। কেবলমাত্র পাপভয়ে উহার একমাত্র উপায় এই অনিবার্য্য যুদ্ধ হইতে বিরত হইতেছেন। ইহাকে প্রকৃত বৈরাগ্য কোন মতে বলা যায় না। কেবলমাত্র "ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রের" স্থান মাহাত্ম্যে তাঁহার মনে এই বাহ্য বৈরাগ্যে উদ্রেক হইয়াছে। সর্ব্বদর্শী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বুঝিলেন যে অর্জ্জুন কেবলমাত্র সাময়িক উত্তেজনা বশতঃ বৈরাগ্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছেন বটে, কিন্তু উহা প্রকৃত আন্তরিক বৈরাগ্য নহে। উহা ক্ষণস্থায়ী বাহ্য উত্তেজনা মাত্র। যাহাতে এই সাময়িক মোহ অপনীত হইয়া প্রকৃত বৈরাগ্য অর্জ্জুনের চিত্তে উদ্রেক হয়, ভগবান্ তাহারই উপদেশ অর্জ্জুনকে দিলেন। তাই তিনি অর্জ্জুনকে স্বীয় কর্ত্তব্য স্মরণ করাইয়া দিলেন। অর্জ্জুনের স্বীয় কর্ত্তব্যকর্ম্ম যুদ্ধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনের সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। তাহা হইলে ভগবান্ তাঁহাকে তদনুরূপ উপদেশ দিতেন। অর্জ্জুন স্বধর্ম্মকে অধর্ম্ম ভাবিয়া মহাভ্রমে পতিত হইয়াছেন। ভগবান্ গীতার উপদেশে তাঁহাকে প্রবুদ্ধ করিয়াছিলেন মাত্র। যুদ্ধে প্রবৃত্তি প্রদান করা তাঁহার উদ্দেশ্য নহে। অর্জ্জুনের যথন এই সাময়িক মোহ নিবৃত্তি হইয়া গেল, অমনি তিনি স্বধর্ম্ম পালনে প্রবৃত্ত হইলেন।

"নষ্ট মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত
স্থিতোঽস্মি গত সন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব।" (১৮।৭৩)

"অর্জ্জুন বলিলেন হে অচ্যুত! তোমার কৃপায় আমার মোহ নষ্ট হইয়াছে, আত্মজ্ঞানরূপ স্মৃতি লাভ করিয়াছি, আমার সমস্ত সংশয় তিরোহিত হইয়াছে। এক্ষণে তোমারই উপদেশানুরূপ কার্য্য করিব।

অর্জ্জুনের এই শোকের কারণ অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারা যায় যে, উহা প্রথমতঃ ভীষ্মাদির মৃত্যু নিমিত্ত (১।৩২-৩৩) এবং দ্বিতীয়তঃ তিনিই এই প্রকার ভীষ্মাদি বধের কর্ত্তা হইবেন এই অহং জ্ঞান। (১।৩৪-৩৫)

অর্জ্জুনের পক্ষে যুদ্ধের কর্ত্তব্যতা।

সত্ত্বগুণের সাময়িক উদ্রেকে অর্জ্জুন হিংসাদির পাপ উপলব্ধি করিয়া ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্মযুদ্ধ পরিত্যাগ করিতেছেন; কিন্তু যুদ্ধে হিংসা অন্যের পক্ষে পাপ হইলেও অর্জ্জুনের পক্ষে তাহাই ধর্ম্ম। ইহা যিনি মহাভারত-যুদ্ধের আদ্যন্ত পর্য্যালোচনা করিবেন তিনিই সবিশেষ উপলব্ধি করিবেন। এ যুদ্ধ অর্জ্জুনকে চেষ্টা করিয়া ব্যবস্থা করিতে হয় নাই। কৌরবগণেরই দুষ্ট চক্রান্তে এই যুদ্ধ উপস্থিত। ধর্ম্মতঃ স্বপক্ষ সমর্থনার্থ এই যুদ্ধে তিনি প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এজন্য এ যুদ্ধ ধর্ম্মযুদ্ধ। এ যুদ্ধে বিরত হইলে তাঁহার স্বধর্ম্মত্যাগজনিত পাপ হইবে; এবং তাঁহার ভুবনবিখ্যাত কীর্ত্তিলোপ হইবে। এ যুদ্ধে জয় হইলে যশঃ ও কীর্ত্তি ও রাজ্যলাভ, এবং পতন হইলে স্বর্গলাভ। এ কথাই শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে উপদেশ দিয়াছেন,—

"স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্য নবিকম্পিতুমর্হসি।
ধর্ম্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে॥
যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতং।
সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্॥
অথ চেত্ত্বমিমং ধর্ম্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি।
ততঃ স্বধর্ম্মং কীর্ত্তিঞ্চ হিত্বা পাপমবাপস্যসি॥
অকীর্ত্তিঞ্চাপি ভূতানি কথয়িষ্যন্তি তেঽব্যয়াম্।
সম্ভাবিতস্য চাকীর্ত্তির্মরণাদতিরিচ্যতে॥
* * * *
হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ॥ (২।৩১—৩৭)

"হে অর্জ্জুন, স্বধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে তোমার কম্পিত হওয়া কর্ত্তব্য নহে। কেন না ধর্ম্মযুদ্ধব্যতীত ক্ষত্রিয়ের পক্ষে অন্য শ্রেয়ঃ আর নাই। মুক্তস্বর্গদ্বার স্বরূপ সদৃশ যুদ্ধ যাহা আপনা হইতেই উপস্থিত হইয়াছে সুখী ক্ষত্রিয়েরাই ইহা লাভ করিয়া থাকে। আর যদি তুমি এই ধর্ম্মযুদ্ধ না কর, তাহা হইলে স্বধর্ম্ম ও কীর্ত্তি পরিত্যাগে পাপযুক্ত হইবে। লোকে তোমার চিরস্থায়ী অকীর্ত্তি ঘোষণা করিবে। সমর্থ ব্যক্তির অকীর্ত্তি অপেক্ষা মৃত্যু ভাল।......হত হইলে স্বর্গ পাইবে, জয়ী হইলে পৃথিবী ভোগ করিবে। অতএব হে কৌন্তেয়, যুদ্ধে কৃতনিশ্চয় হইয়া উত্থান কর।" অতএব ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম্মবুদ্ধিতে যুদ্ধ করিবে। তাহা হইলে গুরু ব্রাহ্মণ-বধজনিত পাপ তোমাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না।

এতদ্ভিন্ন অনাত্মজ্ঞানই অর্জ্জুনের এই শোক দুঃখের অপর প্রধান কারণ। অর্জ্জুনের অন্তঃকরণ এক্ষণে জীব-

ভাবে পরিপূর্ণ। তিনি মনে করিয়াছেন তিনি ভীষ্মাদি বধের কর্ত্তা হইবেন; এজন্য ভগবান তাঁহাকে সবিশেষ জীবতত্ত্ব বুঝাইয়াছেন। ইহাই "সাংখ্য যোগ"। উপনিষদের প্রতিপাদ্য সমস্ত পরমাত্মার নাম "সংখ্যা"। তদ্বিষয়ের সম্যক জ্ঞানই "সাংখ্য"।

অনাত্মজ্ঞান অর্জ্জুনের মোহের কারণ।

সেই জ্ঞান এই :—

"ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্ব্বে বয়মতঃপরম্॥" (২।১২)

"দেহাদি ব্যতিরিক্ত আত্মা আছে; এবং সেই আত্মা এ জন্মের পূর্ব্বেও বর্ত্তমান ছিল এবং শরীরের ধ্বংসের পরেও বর্ত্তমান থাকিবে।

"দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা॥
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি॥" (২।১৪)

"মরিলেই আবার জন্ম আছে। এবং দেহান্তরপ্রাপ্তি কৌমার যৌবন ও জরার ন্যায় একই ব্যক্তিরই অবস্থান্তর মাত্র।

"মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণ সুখদুঃখদাঃ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাং স্তিতিক্ষস্ব ভারত॥" (২।১৩)

"সুখ দুঃখাদি, ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ জনিত। যতক্ষণ ঐরূপ সংযোগ থাকে ততক্ষণ উহারা থাকে। উহারা অনিত্য। সহ্য করিলেই ফুরাইবে।

"নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।" (২।১৬)

"নিত্য আত্মার এই অনিত্য সুখদুঃখাদি স্থায়ী হইতে পারে না।

"অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি।" (২।১৭)

"আত্মা অবিনাশী।

"অজোনিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণঃ।" (২।২০)

"আত্মা অজ, নিত্য, শাশ্বত, পুরাণ।

"নিত্যঃ সর্ব্বগত স্থাণু অচলোঽয়ং সনাতন" (২।২৪)

"আত্মা সর্ব্বগত স্থাণু, অচল, সনাতন,

"অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে" (২।২৫)

"আত্মা অব্যক্ত, অচিন্ত্য, অবিকারী; অর্থাৎ জীবের উৎপত্তি বিনাশ নাই, আদ্যন্ত নাই, বিকার বিক্রিয়া নাই; জীব সর্ব্বব্যাপী এবং অপ্রমেয়।

এই সকলই পরব্রহ্মের লক্ষণ। অতএব ব্রহ্মের লক্ষণ দ্বারা জীবকে লক্ষিত করিয়া ভগবান ইঙ্গিতে জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যই উপদেশ দিলেন।

"নায়ং হন্তি নহন্যতে" (২।১৯)

"আত্মা কাহাকেও বধ করে না এবং কাহার কর্ত্তৃক নিহত হয় না।

তবে কি জন্য শোক?

আবার যদি আত্মাকে অনিত্য বলিয়া স্বীকার করা যায় তাহা হইলে যাহা অনিত্য তাহার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী এবং তুমি বধ না করিলেও রাজগণ মৃত্যুমুখে পতিত হইবেই। তাহাদের মরণ নিবারণ কাহারও সাধ্য নহে। উহা অপরিহার্য্য। তবে কেন শোক করা?

"অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসেমৃতম্।
তথাপি ত্বং মহাবাহো নৈনং শোচিতুমর্হসি॥
জাতস্য হি ধ্রুবোমৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্য্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি।" (২।২৬ ২৭)

শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে পূর্ব্বোক্ত তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী করিবার জন্য তদুপায় স্বরূপ নিষ্কাম কর্ম্ম-যোগের অবতারণা করিলেন। তৎকালে বৈদিক কাম্য কর্ম্মই শ্রেয়োলাভের একমাত্র উপায় বলিয়া পরিগণিত হইত। এজন্য পাছে অর্জ্জুন মনে করেন যে, কাম্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানই কর্ম্মযোগ, সেই জন্য ভগবান বলিলেন,—"কাম্য কর্ম্ম-যোগ নহে—তাহার বিরোধী।"

তজ্জ্ঞানোপায়।

কাম্যকর্ম্ম পরিত্যাগ।

"দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম বুদ্ধিযোগাদ্ধনঞ্জয়।" (২।৪৯)

তিনি কাম্যকর্ম্মের বা কর্ম্মাসক্তির নিন্দা করিয়াছেন এবং কর্ম্মকাণ্ড বেদকে লক্ষ্য করিয়া অর্জ্জুনকে বলিলেন,—

"ত্রৈগুণ্য বিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।" (২।৪৫)

"হে অর্জ্জুন বেদসকল ত্রৈগুণ্য বিষয়। তুমি নিস্ত্রৈগুণ্য হও।

আর কর্ম্মবাদ-মীমাংসকদিগকে ইঙ্গিত করিয়া যথেষ্ট নিন্দাবাদ করিয়াছেন,—

"যমিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতিবাদিনঃ॥
কামাত্মানঃ স্বর্গপরাঃ জন্মকর্ম্মফলপ্রদাম্।
ক্রিয়াবিশেষ বহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি॥

ভোগৈশ্বর্য্য প্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥" (২।৪২-৪৪)

"হে পার্থ! অবিবেকিগণ এই শ্রবণ রমণীয় জন্মকর্ম্ম-ফলপ্রদ, ভোগৈশ্বর্য্যের সাধনভূত ক্রিয়া বিশেষবহুল বাক্য বলে, যাহারা বেদবাদরত, "তদ্ভিন্ন আর কিছুই নাই" যাহারা ইহা বলে, তাহারা কামাত্মা, স্বার্থপর, ভোগৈশ্বর্য্যে আসক্ত এবং এই কথায় যাহাদের চিত্ত অপহৃত তাহাদের বুদ্ধি সমাধিতে সংশয়বিহীন হয় না। কাম্যকর্ম্মিগণের মোক্ষ হয় না, বরং পতন হয়,এ কথাও তিনি বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই।

"ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্র লোকমশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেব-ভোগান্॥
তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না গতাগতং কামকামা লভন্তে॥" (৯।২০-২)

"কর্ম্মপরায়ণ সোমপায়ী যাজ্ঞিকেরা পাপহীন যজ্ঞের দ্বারা স্বর্গ প্রার্থনা করে। তাহারা তাহার ফলে পুণ্য ইন্দ্র-লোক প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গে দিব্য দেবভোগ ভোগ করে।

"সেই বিশাল স্বর্গলোক ভোগ করিবার পর তাহারা পুণ্যক্ষয় হইলে পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে ফিরিয়া আসে। এই জন্য সকাম সাধক কর্ম্মকাণ্ডের অনুসরণপূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ সংসারে যাতায়াত করিতে থাকে।

কাম্যকর্ম্ম যে বন্ধনের কারণ ভগবান তাহাও বলিয়াছেন,—
"যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ" (৩।৯)।

"যজ্ঞার্থে যে কর্ম্ম তদ্ভিন্ন অন্য কর্ম্ম বন্ধনের কারণ।

তিনি আরও বলিয়াছেন যে, দেবতাগণের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিলে মোক্ষ প্রাপ্তি হয় না; কারণ দেবতাকে ভজিলে দেবতাকেই পাওয়া যায় মাত্র, ভগবানকে পাওয়া যায় না।

"যান্তি দেবব্রতা দেবান্
পিতৄন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা
যান্তি মদ্ যাজিনোঽপি মাম্॥" (৯।২৫)

"যাহারা দেবতা ভজনা করে তাহারা দেবতাকে পায়, যাহারা পিতৃদিগের ভজনা করে তাহারা পিতৃদিগকে পায়; যাহারা ভূতগণের ভজনা করে, তাহারা ভূতগণকে পায়; কিন্তু যাহারা আমাকে ভজনা করে তাহারা আমাকেই পায়।

"দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি॥" (৭।২৩)

"দেবতার আরাধনা করিলে দেবতাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়; কিন্তু আমার ভক্ত যাহারা, তাহারা আমাকেই পায়।

দেবতাগণেরও পতন আছে।

"আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন" । (৮।১৬)

"হে অর্জ্জুন ব্রহ্মাদি সমস্ত লোক হইতে জীবের পুনরাবর্ত্তন হয়।

কেবল মাত্র ভগবানকে পাইলেই তবে মোক্ষ।

"মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে" (৮।১৭)

"হে অর্জ্জুন আমাকে পাইলে পুনঃ জন্ম হয় না।

"মামুপেত্য পুনর্জ্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ॥" (৮।১৫)

"মহাত্মগণ আমাকে পাইয়া দুঃখের আলয় অনিত্য পুনর্জ্জন্ম প্রাপ্ত হন না; কারণ তাঁহারা পরম সিদ্ধি অর্থাৎ মুক্তিলাভ করেন।

যজ্ঞার্থে কর্ম্ম

ভগবান স্বর্গাদিলাভের জন্য সকাম যজ্ঞানুষ্ঠানের বিরোধী হইলেও যজ্ঞমাত্রেরই বিরোধী নন; বরং তিনি যজ্ঞের যথেষ্ট প্রশংসাও করিয়াছেন,—

"যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তোমুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণং॥" (৩।১৩)

"যে সজ্জনগণ যজ্ঞাবশিষ্ট ভোজন করেন, তাঁহারা সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হন। যাহারা কেবল আপনার জন্য পাক করে, সেই পাপাত্মেরা পাপ ভোজন করে।

"নায়ং লোকোঽস্ত্যযজ্ঞস্য কুতোঽন্য কুরুসত্তম।" (৪।৩১)

"হে কুরুসত্তম! যজ্ঞহীন ব্যক্তির পরলোকের কথা দূরে থাকুক, ইহলোকও নাই।

শ্রীভগবানের মতে স্বর্গাদিলাভ জন্য সকাম যজ্ঞানুষ্ঠান নিন্দনীয়; কিন্তু দেবতাপোষণ জন্য এবং সংসারচক্র প্রবর্ত্তন জন্য যজ্ঞের অনুষ্ঠান জীবের অবশ্য কর্ত্তব্য।

"সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্তিষ্টকামধুক্ ॥
দেবান্ ভাবয়তাঽনেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ ॥
ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈর্দত্তান প্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্‌ক্তে স্তেন এব সঃ॥
(৩।১০-১৩)

"পুরাকালে প্রজাপতি প্রজাগণের সহিত যজ্ঞের সৃষ্টি করিয়া বলিলেন, "ইহার দ্বারা তোমরা বর্দ্ধিত হইবে, ইহা তোমাদিগের অভীষ্ট ফল প্রদান করিবে; তোমরা যজ্ঞের দ্বারা দেবতাদিগকে সংবর্দ্ধিত কর; দেবগণ তোমাদিগকে সংবর্দ্ধিত করুন। পরস্পর এইরূপে সংবর্দ্ধিত করিয়া পরম শ্রেয়ঃ লাভ করিবে, যজ্ঞের দ্বারা সংবর্দ্ধিত দেবগণ যে অভীষ্ট ভোগ তোমাদিগকে দিবেন, তাঁহাদিগকে তদ্দত্ত (অন্ন) না দিয়া যে খায়, সে চোর।"

দেবগণ নানাপ্রকার জগতের হিতসাধন করিতেছেন। মানুষেরও তাঁহাদের প্রত্যুপকার করা উচিত। যজ্ঞই তাহার প্রকৃষ্ট উপায়। সুবৃষ্টি প্রভৃতি প্রাকৃতিক ব্যাপার সুশৃঙ্খলে নিষ্পন্ন হওয়ার উপায় যজ্ঞানুষ্ঠান।

"অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জ্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জ্জন্যোযজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ॥
কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষর সমুদ্ভবম্
তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যযজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥
এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং নানুবর্ত্তয়তীহ যঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামোমোঘং পার্থ স জীবতি ॥"
(৩।১৪ ১৬)

"অন্ন হইতে ভূতসকল উৎপন্ন; পর্জ্জন্য হইতে অন্ন জন্মায়; যজ্ঞ হইতে পর্জ্জন্য জন্মে; কর্ম্ম হইতে যজ্ঞের উৎপত্তি। কর্ম্ম ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত জানিও; ব্রহ্ম অক্ষর হইতে সমুদ্ভূত; অতএব সর্ব্বগত ব্রহ্ম নিত্য যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত। এইরূপ প্রবর্ত্তিত চক্রের যে অনুবর্ত্তী না হয়, সে পাপজীবন ও ইন্দ্রিয়ারাম, হে পার্থ সে অনর্থক জীবন ধারণ করে।

এই প্রকার সকাম যজ্ঞের বিশেষ বিবরণ ৪র্থ অধ্যায়ের ২৪-২৯ শ্লোকে কথিত হইয়াছে। উহা উদ্ধৃত করা নিষ্প্রয়োজন।

এই প্রকারের সকল কর্ম্মীরাও "যান্তি ব্রহ্ম সনাতনং" (৪।৩০) সনাতন ব্রহ্মকে লাভ করেন; কারণ যিনি যে ভাবে ভগবানের উপাসনা করেন না কেন, তিনি সেই ভাবেই তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ করেন।

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্"।

আর এক শ্রেণীর জ্ঞানবাদীরা কর্ম্মের বন্ধনযোগ্যতা ও কর্ম্মফলের ভঙ্গুরতা প্রভৃতি দোষ দর্শন করিয়া এক কালে কর্ম্ম বর্জ্জন উপদেশ দিয়াছেন,—

কর্ম্মত্যাগ উচিত নহে।

"ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে
কর্ম্ম প্রাহুর্ম্মনীষিণঃ।" (১৮।৩)

কোন কোন মনীষী কর্ম্ম দোষযুক্ত বিধায়ে বর্জ্জনীয় বলিয়া থাকেন। গীতার মত ইহার বিপক্ষে। গীতার মতে কর্ম্মাসক্তি যেমন দোষের অকর্ম্মাশক্তিও সেইরূপ দোষের।

"কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি।"
(২।৪৭)

"কর্ম্মে তোমার অধিকার। কিন্তু ফলে কদাচ নহে। তুমি কর্ম্মফল হেতু হইও না। অকর্ম্মে তোমার আসক্তি যেন না হয়।

ফলাকাঙ্ক্ষা করিও না, কিংবা কর্ম্মত্যাগে আসক্ত হইও না। কর্ম্ম করিবে। ইহাই তোমার বিশেষ অধিকার। ইহাই গীতার উপদেশ।

কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিলেই নৈষ্কর্ম্ম্যলাভ হয় না। কর্ম্মত্যাগেই সিদ্ধি হয় না।

"ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সন্ন্যাসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি॥" (৩।৪)

সম্পূর্ণ কর্ম্মত্যাগ জীবের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। কারণ কর্ম্ম না করিয়া জীব এক দণ্ডও থাকিতে পারে না। প্রকৃতির গুণের তাড়নায় তাহাকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও কর্ম্ম করিতে হয়।

কর্ম্মত্যাগ অসম্ভব।

"ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ॥" (৩।৫)
"প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কি করিষ্যতি" (৩।৩৩)

"প্রাণিগণ প্রকৃতিরই বশ, নিগ্রহ কি করিবে?

"ন হি দেহভৃতা শক্যংত্যক্তুং কর্ম্মাণ্যশেষতঃ" (১৮।১১)

"দেহধারী জীব কখন নিঃশেষে কর্ম্মত্যাগ করিতে পারে না।

কর্ম্মত্যাগেই যে সিদ্ধি ঘটে না, তাহার প্রমাণ স্বরূপ ভগবান বলিলেন,—

"কর্ম্মেন্দ্রিয়ানি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥" (৩।৬)

"কর্ম্মেন্দ্রিয় সকল সংযত করিয়া "কর্ম্ম করিব না" বলিয়া বসিয়া থাকিলেও ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয় মনে আসিয়া আপনিই উদয় হইতে পারে। তাহা হইলে তাহা মিথ্যাচার মাত্র। তাহাতে সিদ্ধির কোন সম্ভাবনা নাই।

কর্ম্মত্যাগ করা যায় না এবং কর্ম্ম ত্যাগ করিলেও সিদ্ধি নাই। সুতরাং কর্ত্তব্য কি? গীতার উপদেশ এই যে—

"নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়োহ্যকর্ম্মণঃ।
শরীর যাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্ম্মণঃ॥" (৩।৮)

কর্ম্ম করিতে হইবে।

"হে অর্জ্জুন তুমি নিয়ত কর্ম্ম করিবে। অকর্ম্ম হইতে কর্ম্ম শ্রেষ্ঠ। কর্ম্ম না করিলে তোমার জীবন যাত্রা নির্ব্বাহেরও সম্ভাবনা নাই।

কর্ম্মের বন্ধন।

সত্য বটে সাধারণতঃ কর্ম্ম বন্ধনের কারণ; কিন্তু এরূপভাবে কর্ম্ম করা যাইতে পারে যে, কর্ম্ম করিলেও তজ্জনিত বন্ধন ঘটিবে না। এই-রূপ কর্ম্মের কৌশলকে "কর্ম্মযোগ" বলে।

"যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্" (২।৫০)

তন্নিবারণোপায়

এই কর্ম্মযোগ আরম্ভ করিবার উপায়ও গীতায় নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। তাহা এই—

ফলাকাঙ্ক্ষা বিসর্জ্জন।

ফলাকাঙ্ক্ষা বিসর্জ্জন দিয়া কর্ম্ম করিতে হইবে।

"কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন" (২।৪৭)

"তোমার কর্ম্মে অধিকার কদাচ ফলে নহে।

"তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ॥" (৩।১৯)

"অতএব ফলকামনা শূন্য হইয়া কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন করিবে। পুরুষ অসক্ত হইয়া কর্ম্ম করিলে মুক্তিলাভ করে।

"অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।
সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ॥"

"কর্ম্মফলের আকাঙ্ক্ষা না করিয়া কর্ত্তব্য বোধে যিনি কর্ম্ম করেন, তিনিই সন্ন্যাসী, যোগী, নিষ্কর্ম্মী বা নিরগ্নী ব্যক্তি নন। কিন্তু ফলের আকাঙ্ক্ষা না থাকিলে কর্ম্ম করিব কেন? এই ভ্রম সম্ভাবনায় ভগবান বুঝাইলেন যে,—

"যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগমুচ্যতে॥" (২।৪৮)

"হে ধনঞ্জয়! যোগস্থ হইয়া সঙ্গ ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম কর। সিদ্ধি ও অসিদ্ধিকে তুল্য জ্ঞান করিয়া (কর্ম্ম কর)। (এইরূপ) সমত্বকে যে যোগ বলে।

উহার উপায়।

পূর্ব্বে ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য যে কর্ম্ম তাহাই বিহিত হইয়াছে। এক্ষণে সেইরূপ কর্ম্ম করায় তিনটি বিধি নির্দ্দিষ্ট হইল।

১ম—সিদ্ধি ও অসিদ্ধি তুল্য জ্ঞান।

প্রথম—সিদ্ধি ও অসিদ্ধিকে তুল্য জ্ঞান অর্থাৎ কর্ম্মসিদ্ধি এবং কর্ম্মের অসিদ্ধিকে তুল্যজ্ঞান করিতে হইবে। ফল সিদ্ধিতে হর্ষত্যাগ এবং ফলের অসিদ্ধিতে বিষাদত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করিতে হইবে।

২য়—অহঙ্কার বর্জ্জন।

দ্বিতীয়—সঙ্গ ত্যাগপূর্ব্বক কর্ম্ম করিবে; অর্থাৎ আমি কর্ত্তা, এই অভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক কর্ম্ম করিবে। প্রকৃতিই প্রকৃত কর্ত্তা জানিবে।

"প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥" (৩।২৭)

"প্রকৃতির গুণের দ্বারা সমস্ত কর্ম্ম সিদ্ধ হইতেছে; কিন্তু যে অহঙ্কারে বিমূঢ় সেই আপনাকে কর্ত্তা বলিয়া মনে করে।

"তত্রৈবং সতি কর্ত্তারমাত্মানং কেবলং তু যঃ।
পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বান্ন স পশ্যতি দুর্ম্মতিঃ॥" (১৮।১৬)

"এরূপ স্থলে যে ব্যক্তি আত্মাকে কেবল কর্ত্তারূপে দেখে সেই দুর্ব্বুদ্ধি সম্যক্ দেখিতে পায় না।

"প্রকৃত্যৈব চ কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্ব্বশঃ।
যঃ পশ্যতি তথাত্মানং অকর্ত্তারং স পশ্যতি॥" (১৩।২১)

'যিনি যাবতীয় কৃতকার্য্য সর্ব্বপ্রকারে প্রকৃতি কর্তৃক

সম্পাদিত হইতেছে এবং আত্মাকে অকর্ত্তা দেখেন, তিনিই সম্যক্ দর্শন করেন।

"নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ।

*   *   *

ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্ত ইতি ধারয়ন্॥" (৫।৮৯)

"তিনি (কর্ম্ম করিবার সময়) মনে করিবেন যে, আমি কিছু করিতেছি না * * * ইন্দ্রিয়সকল স্ব স্ব বিষয়ে অধিষ্ঠিত রহিয়াছে মাত্র।

যাঁহারা এইরূপে প্রকৃতিকেই কর্ত্তা বলিয়া অনুভব করেন এই প্রকার জ্ঞানী ব্যক্তি নির্ব্বাণের অধিকারী হন; কারণ তিনি রাগদ্বেষ হীন, সমস্ত ইন্দ্রিয় তাঁহার বশ—এ কারণ বিষয় ভোগেও তাঁহার শান্তির ব্যাঘাত হয় না।

"রাগদ্বেষ বিমুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।

আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি॥" (২।৬৪)

"যস্য নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।

হত্বাপি স ইমান্ লোকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে॥" ১৮।১৭

"যাঁহার "আমি কর্ত্তা" এই ভাব নাই, যাঁহার বুদ্ধি নির্লিপ্ত তিনি সমস্ত লোকহননরূপ কর্ম্ম করিলেও তৎ কর্ম্ম করেন না এবং বদ্ধ হন না।

তৃতীয় যোগস্থ হইয়া কর্ম্ম করিতে হইবে; অর্থাৎ ঈশ্বরে সমস্ত কর্ম্ম সমর্পণ করিতে হইবে। ঈশ্বরোদ্দিষ্ট বা ঈশ্বরার্থেই কর্ম্ম করিতে হইবে। তাঁহারই উদ্দেশে ও তাঁহারই কার্য্য সাধন জন্য, জগতের হিত-সাধনার্থ কর্ম্ম করিতে হইবে। যজ্ঞার্থেই কর্ম্ম।

তৃতীয়—যোগস্থ হইয়া কর্ম্ম করা।

"যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।

তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্ত সঙ্গঃ সমাচর॥" (৩।)

"ঈশ্বরোদ্দিষ্ট ভিন্ন যে সকল কর্ম্ম তাহা কেবল কর্ম্মফল ভোগের জন্য বন্ধন মাত্র। অতএব অনাসক্ত হইয়া কেবল ঈশ্বরোদ্দেশ্যেই কর্ম্ম করিবে। তাঁহার অভিপ্রেত কার্য্য সম্পাদন, তাঁহার নিয়ম প্রতিপালনই একমাত্র কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

সুতরাং ভগবান বলিলেন;—

"ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।

নিরাশীর্নির্ম্মমো ভূত্বা যুদ্ধস্ব বিগতজ্বরঃ॥" (৩।৩০)

"আমাতে সমস্ত কর্ম্ম সমর্পণ করিয়া অধ্যাত্ম জ্ঞানদ্বারা নিস্পৃহ, মমতাশূন্য ও শোকশূন্য হইয়া যুদ্ধ কর।

"চেতসা সর্ব্বকর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরঃ।

বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব॥" (১৮।৫৭)

"চিত্তদ্বারা সকল কর্ম্ম আমাতে সমর্পণ করিয়া বুদ্ধিযোগ আশ্রয়পূর্ব্বক মৎপরায়ণ ও মচ্চিত্ত হও।

"যৎকরোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।

যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥" (৯।২৭)

"যাহা করিবে, যাহা ভোজন করিবে, যাহা যজন করিবে, যাহা দান করিবে, যাহা তপস্যা করিবে, তৎসমুদয়ই আমাতে অর্পণ করিবে।

যিনি এইরূপে কর্ম্ম করিতে পারেন, তাঁহার কর্ম্ম আর কর্ম্ম থাকে না অকর্ম্ম হইয়া যায়। তাঁহার পক্ষে কর্ম্মানুষ্ঠান ও কর্ম্মসন্ন্যাস উভয়ই তুল্য।

"গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিত চেতসঃ।

যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে॥" (৪।২৩)

"কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ।

স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু সযুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ॥" (৪।১৮

এইরূপে গীতায় কর্ম্ম ও অকর্ম্ম, কর্ম্মানুষ্ঠান ও কর্ম্মসন্ন্যাসের অদ্ভুত সামঞ্জস্য বিধান করা হইয়াছে। কর্ম্মযোগ ও কর্ম্মসন্ন্যাস উভয়ই শ্রেষ্ঠ বলিলেও কর্ম্মসন্ন্যাস অপেক্ষা কর্ম্মযোগই শ্রেষ্ঠ।

"সন্ন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ।

তয়োস্তু কর্ম্মসন্ন্যাসাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে" ॥ (৫।২)

যিনি প্রকৃত কর্ম্মযোগী তাঁহার কিছুই কর্ত্তব্য নাই, কিছুই অপ্রাপ্য নাই, কিছুই কামনার বস্তু নাই—কাহার উদ্দেশ্যে তিনি কর্ম্ম করিবেন।

কর্ম্মযোগীর কর্ম্ম নাই।

"যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।

আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে" ॥

নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন।

ন চাস্য সর্ব্বভূতেষু কশ্চিদর্থ ব্যপাশ্রয়ঃ॥ (৩।১৭-১৮)

সেজন্য তাঁহার কর্ম্মের আকাঙ্ক্ষা নাই; তথাপি

তাঁহাকে জগতের হিতের জন্য কর্ম্মযোগ অবলম্বনপূর্ব্বক সতত কর্ম্ম করিতে হইবে; কেন না তাঁহার ন্যায় ব্যক্তিগণ যদি কর্ম্ম না করেন তাহা হইলে সাধারণ লোকে তাঁহাদের দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইয়া কর্ম্ম করিতে বিরত হইবে; কর্ম্ম হইতে বিরত হইলে স্বধর্ম্মচ্যুতি নিশ্চিত।

তথাপি লোক-হিতার্থে কর্ম্ম করিবে।

"তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তোহ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ॥
কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ॥
লোক-সংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্ত্তুমর্হসি॥
যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥" (৩।১৯-২১)

ভগবান্ নিজের কর্ম্মানুষ্ঠান সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন,—

ভগবান্ও এ জন্য কর্ম্ম করিয়া থাকেন।

"ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন। নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি॥
যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥
উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহম্।
সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ॥" (৩.২২—২৪)

"ভগবানের কোনও প্রয়োজন নাই, কোনও বিকার নাই, সুখদুঃখ কিছুই নাই; অতএব তাঁহার কোনও কর্ম্ম নাই। তথাপি তিনি কর্ম্ম করিয়া থাকেন; কারণ তিনি যদি কর্ম্ম না করেন তাহা হইলে মনুষ্য সকলে তাঁহারই পথানুবর্ত্তী হইয়া কর্ম্ম হইতে বিরত হইবে। এরূপ অবস্থা ঘটিলে সামাজিক বিশৃঙ্খলতা অবশ্যম্ভাবী, এবং তজ্জন্য প্রজা-ক্ষয়ও নিশ্চিত।

অতএব,—

"সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত।
কুর্য্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষু লোকসংগ্রহম্॥" (৩২৫)

"অবিদ্বানেরা যেরূপ ফল-কামনা করিয়া কর্ম্ম করিয়া থাকে বিদ্বানেরা সেইরূপ লোকরক্ষার্থে ফলকামনা পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করিবেন।

এই প্রকারে কর্ম্ম করিলে সর্ব্ব বন্ধনমুক্ত হইয়া জ্ঞান-লাভ করা যায়।

"নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎস্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি।" (৪।৩৮)

"ইহলোকে জ্ঞানের ন্যায় শুদ্ধিকর আর কিছুই নাই। মুমুক্ষু ব্যক্তি কর্ম্মযোগে সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া আপনা হইতেই আত্মজ্ঞান লাভ করে।

এরূপ কর্ম্ম-দ্বারা জ্ঞান লাভ হয়।

জ্ঞানাগ্নি সমস্ত কর্ম্মরাশিকে ভস্ম করে।

"যথৈধাংসি সমিদ্ধোহগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।
জ্ঞানাগ্নি সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা॥" (৪.৩৭)

"যেমন প্রজ্বলিত হুতাশন কাষ্ঠসমুদয় ভস্মাবশেষ করে, সেইরূপ জ্ঞানাগ্নি সমুদয় কর্ম্ম ভস্মীভূত করিয়া থাকে।

নিখিল কর্ম্মের পরিসমাপ্তিই জ্ঞানে।

"সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে।" (৪।৩৪)

এই জ্ঞান দ্বারাই সর্ব্ববিধ পাপ উত্তীর্ণ হওয়া যায়।

"অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ।
সর্ব্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি॥" (৪।৩৬)

"যদ্যপি তুমি সকল পাপী অপেক্ষা অধিক পাপী হও, তথাপি সেই জ্ঞানরূপ ভেলা দ্বারা অনায়াসে সমস্ত পাপ হইতে উত্তীর্ণ হইবে।

এই জ্ঞান কি প্রকার?

"সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥
যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বং চ ময়ি পশ্যতি।" (৬.২৯-৩০)

"যিনি সর্ব্বভূতস্থ আত্মাকে এবং আত্মার সর্ব্বভূতকে দর্শন করেন

যিনি আমাকে সর্ব্বত্র এবং সর্ব্বভূতকে আমাতে দর্শন করেন,—

"যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি" (৪।৩৫)

যদ্দ্বারা সমস্ত ভূতকে আপনাতে এবং পরিশেষে ভগবানে দর্শন করা যায় তাহাই প্রকৃত জ্ঞান।

তল্লাভোপায়—

এই জ্ঞান লাভের উপায় কি?

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া॥
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥" (৪।৩)

"প্রণিপাত, প্রশ্ন ও গুরু সেবা দ্বারা সে জ্ঞান লাভ

করিবে। তত্ত্বদর্শী জ্ঞানীরা তোমাকে তাহার উপদেশ প্রদান করিবেন।

"শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি॥" (৪।৩৯)

জ্ঞানে মোক্ষ।

যে ব্যক্তি গুরূপদেশে শ্রদ্ধাবান্, গুরু-শুশ্রূষাপরায়ণ ও জিতেন্দ্রিয়, তিনিই জ্ঞান-লাভ করেন। ঐ জ্ঞানেই মোক্ষ লাভ হয়।

এরূপ জ্ঞান-লাভ হইলে তবে কর্ম্ম-সন্ন্যাস বা কর্ম্ম-ত্যাগ সম্ভব।

কিন্তু কেবল মাত্র জ্ঞানলাভ দ্বারা মোক্ষ প্রাপ্তি হয় না। শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বেই বলিয়াছেন,

"বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ।
বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ॥"

"যাঁহাদের চিত্ত সংযত এবং যাঁহারা ঈশ্বর-পরায়ণ তাঁহারাই জ্ঞান দ্বারা পূত হইয়া আমাকে পায়। গীতোক্ত ধর্ম্মের মর্ম্ম এরূপ নহে যে, কেবল মাত্র জ্ঞান দ্বারাই সাধন সম্পূর্ণ হয়। জ্ঞান ও কর্ম্মের উভয়েরই সংযোগ চাই। কেবল কর্ম্মে নহে, কেবল জ্ঞানেও নহে। কর্ম্মেই আবার জ্ঞানের সাধন হয়—কর্ম্ম দ্বারা জ্ঞানলাভ হয়। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"আরুরুক্ষোর্ম্মুনের্যোগং কর্ম্মকারণমুচ্যতে।
যোগরূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে (৬।৩)

"যে মুনি জ্ঞানযোগে আরোহণ করিতে ইচ্ছুক, কর্ম্মই তাঁহার সহায়। আর তাহাতে যিনি আরোহণ করিয়া-ছেন কর্ম্মত্যাগই তাঁহার সহায়।

ইহার অর্থ এই যে কর্ম্মযোগ ভিন্ন চিত্তশুদ্ধি হয় না, এবং চিত্তশুদ্ধি ভিন্ন জ্ঞানযোগে পৌঁছান যায় না। কর্ম্মদ্বারা জ্ঞান-লাভ হইলে কর্ম্মত্যাগ করিতে পারিলেও ত্যাগ করা অনুচিত। এ কথা পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে। জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়েরই সংযোগ এবং সামঞ্জস্য চাই।

"যোগসংন্যস্তকর্ম্মাণংজ্ঞানসংছিন্নসংশয়ম্।
আত্মবন্তং ন কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়॥ (৪।৪১)

"হে ধনঞ্জয়, যোগদ্বারা কর্ম্মসকল যিনি ঈশ্বরে সমর্পণ করিয়াছেন এবং জ্ঞান দ্বারা সকল সংশয় ছেদন করিয়াছেন কর্ম্মসকল সেই আত্মজ্ঞ ব্যক্তিকে বদ্ধ করিতে পারে না।

হিন্দুশাস্ত্রানুসারে বাল্যে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন এবং তৎপরে যৌবনে গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করিতে হয়। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে গুরুগৃহে বাসকালে জ্ঞানার্জ্জন করিতে হয়

প্রচলিত হিন্দু ধর্ম্মের সহিত গীতোক্ত ধর্ম্মের বিরোধ নাই।

এবং গৃহস্থাশ্রমে জ্ঞানার্জ্জনের পর সংযত-চিত্তে কর্ম্ম করিবার নিয়ম। গীতোক্ত মতে কিন্তু অগ্রে কর্ম্ম দ্বারা চিত্তশুদ্ধি লাভ এবং তৎপরে জ্ঞানোপার্জ্জন করিতে হয়। এতদুভয়ের আপাততঃ বিরোধ বোধ হইলেও বাস্তবিক পক্ষে কোন বিরোধ নাই। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে কেবল মাত্র জ্ঞানোপার্জ্জন হয় না। চিত্তশুদ্ধির উপযোগী কর্ম্মও করিতে হয়; কিন্তু মানুষের জীবনে এমন এক দিন আসিয়া উপস্থিত হয়, যখন কর্ম্ম করিবার শক্তি বা প্রয়োজন থাকে না এবং জ্ঞানও উপার্জ্জিত হইয়াছে। হিন্দুশাস্ত্রে তৎকালে বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বনের ব্যবস্থা আছে। তখন উপযুক্ত পুত্রের হস্তে গৃহপরিজনের ভার অর্পণ করিয়া সংসার হইতে সরিয়া ঋষিমুনি-সেবিত কোন নির্জ্জন তপোবনে আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক অনন্যমনে ঈশ্বরোপাসনা করিবার বিধি আছে। সন্ন্যাসের স্থূলমর্ম্ম কর্ম্মত্যাগ। ইহাও যে মুক্তির উপায় এ কথা ভগবান্ও স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, যিনি জ্ঞানযোগে আরোহণ করিয়াছেন তাঁহার পক্ষে কর্ম্মত্যাগই সহায় (৬।৩)। এখানেও গীতোক্ত

প্রকৃত জ্ঞানীই কর্ম্মত্যাগের অধিকারী।

ধর্ম্মের সহিত প্রচলিত হিন্দু ধর্ম্মের কোন বিরোধ নাই। সংসারাশ্রমে কর্ত্তব্য কর্ম্ম উপযুক্তরূপে নির্ব্বাহ করিলে পর জ্ঞান পরিপক্ক হয়। তখনই সন্ন্যাস-গ্রহণের ব্যবস্থা।

প্রকৃত জ্ঞানীর লক্ষণ।

এইরূপ পরিপক্ক জ্ঞানীর অবস্থা ভগবান এইরূপে বিবৃত করিয়াছেন;

"নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ।

* * * *

ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্ত ইতি ধারয়ন্॥" (৫।৮-৯)

"কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি।
যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গংত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে॥" (৫।১১)

"ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।" (৫।১০)

"যোঽন্তঃ সুখোঽন্তরারামস্তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ।"(৫।২৪)

তিনি কর্ম্ম করিলেও মনে করেন আমি কিছুই করিতেছি না—ইন্দ্রিয়গণই স্ব স্ব বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতেছে,

তিনি কর্ম্মফলে আসক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রহ্মে কর্ম্মফল সমর্পণপূর্ব্বক শরীর, মন ও মমত্ব বুদ্ধি বর্জ্জিত হইয়া ইন্দ্রিয় দ্বারা কর্ম্মানুষ্ঠান করেন। আত্মাতেই তাঁহার আরাম, আত্মাতেই তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি।

তিনি—

"সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥
যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বং চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥
সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে॥
আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ" (৬।২৯-৩২)

তিনি সকল ভূতে আত্মাকে ও আত্মাতে সকল ভূতকে অবলোকন করেন। তিনি ভগবানে সকল বস্তু ও সকল বস্তুতে ভগবানকে দর্শন করেন, তিনি ভগবানকে সর্ব্বভূতস্থ মনে করিয়া ভজনা করেন এবং আপনার সুখ দুঃখের ন্যায় সকলের সুখ দুঃখ দর্শন করেন।

এইরূপ জ্ঞানী যিনি তিনি কর্ম্ম ত্যাগ করিতে অধিকারী।

"যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে॥" (৬।৩)

যোগারূঢ় যিনি তাঁহার পক্ষে কর্ম্মত্যাগই সহায়। তিনি কর্ম্ম করিলেও পদ্মপত্রের জলের ন্যায় তাঁহাতে পাপ লিপ্ত হয় না।

কর্ম্ম তাঁহাকে বদ্ধ করে না।

"লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা।" (৫।১০)

তিনি পরিশেষে মোক্ষ প্রাপ্ত হন।

"লভন্তে ব্রহ্ম নির্ব্বাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ।" (৫।২৫)

সেই তত্ত্বদর্শীরাই মোক্ষ লাভ করিয়া থাকেন।

তিনি মোক্ষ লাভে অধিকারী

"অভিতো ব্রহ্মনির্ব্বাণং বর্ত্ততে বিদিতাত্মনাম্॥" (৫।২৬)

সেই আত্মজ্ঞগণ ইহকাল ও পরকাল উভয়ত্রই মোক্ষ লাভ করেন।

"যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ।
সুখেন ব্রহ্ম সংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে॥" (৬।২৮)

নিষ্পাপ যোগী এই প্রকারে মনকে সর্ব্বদা বশীভূত করিয়া অনায়াসে ব্রহ্মসাক্ষাৎজনিত সর্ব্বোৎকৃষ্ট সুখ প্রাপ্ত হন।

কর্ম্ম ও সন্ন্যাসের সামঞ্জস্য।

এইরূপে গীতায় কর্ম্মত্যাগ ও কর্ম্মকরণ এতদুভয়ের সামঞ্জস্য দেখান হইয়াছে। কর্ম্মত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাস-গ্রহণ গীতার উপদেশ নহে। গীতার মতে কর্ম্ম করাই যখন জীবের পক্ষে অবশ্যম্ভাবী, তখন কর্ম্ম এমন ভাবে করিতে হইবে যেন তাহাতেই সন্ন্যাসের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহাই গীতোক্ত নিষ্কাম কর্ম্ম। নিষ্কামভাবে কর্ম্ম করিতে হইবে। কাম্য-কর্ম্মত্যাগই সন্ন্যাস।

"কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ" (১৮।২)

"পণ্ডিতেরা কাম্যকর্ম্ম ত্যাগকেই সন্ন্যাস এবং সকল প্রকার কর্ম্মফল ত্যাগকেই ত্যাগ কহিয়া থাকেন।

অতএব নিষ্কাম কর্ম্মই সন্ন্যাস। নিষ্কাম কর্ম্মত্যাগ সন্ন্যাস নহে।

আর কর্ম্মহীন সন্ন্যাস নিকৃষ্ট সন্ন্যাস।

"সন্ন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ।
তয়োস্তু কর্ম্মসন্ন্যাসাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে॥" (৫।২)

কর্ম্মত্যাগ ও কর্ম্মযোগ উভয়ই মুক্তির কারণ; কিন্তু তন্মধ্যে কর্ম্মযোগই শ্রেষ্ঠ।

আর—

"সন্ন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ।
যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি॥" (৫।৬)

"কর্ম্মযোগ ব্যতীত সন্ন্যাস দুঃখপ্রাপ্তির কারণ, কিন্তু কর্ম্মযোগযুক্ত ব্যক্তি সন্ন্যাসী হইয়া অচিরাৎ ব্রহ্মলাভ করেন।

জ্ঞান লোভাপায়।

পূর্ব্বোক্তরূপ যিনি জ্ঞানী, মোক্ষলাভ করিতে হইলে তাঁহার কতকগুলি অনুষ্ঠানের প্রয়োজন। তাহাই গীতায় "ধ্যানযোগ" বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ধ্যান, জ্ঞানবাদীর অনুষ্ঠান। এই ধ্যানযোগের লক্ষণ এই অধ্যায়ে দেওয়া আছে। তাহা সংক্ষেপতঃ এই:—"যে অবস্থায় চিত্ত যোগানুষ্ঠান দ্বারা নিরুদ্ধ হইয়া উপরত হয়, যে অবস্থায় বিশুদ্ধান্তঃকরণ দ্বারা আত্মাকে অবলোকন করিয়া আত্মাতেই পরিতৃপ্তি হয়, যে

অবস্থায় অতীন্দ্রিয় আত্যন্তিক সুখ উপলব্ধ হয়, যে অবস্থায় অবস্থান করিলে আত্মতত্ত্ব হইতে পরিচ্যুত হইতে হয় না, যে অবস্থায় উপস্থিত হইলে গুরুতর দুঃখও বিচলিত করিতে পারে না।" ইহা সাধারণতঃ ভগবান্ পতঞ্জলি-প্রদর্শিত অষ্টাঙ্গযোগপ্রণালী। পাতঞ্জলি দর্শনমতে যোগের চরম অবস্থায় পুরুষের স্বরূপে অবস্থান হয়।

"তস্মিন্নিবৃত্তে পুরুষঃ স্বরূপপ্রতিষ্ঠঃ অতঃ শুদ্ধো মুক্ত ইত্যুচ্যতে" (১।৫ সূত্রের ব্যাসভাষ্য)

এই অবস্থায় প্রকৃতি আর পুরুষের দর্শন হয় না। পুরুষ তখন স্বতন্ত্র হন এবং নির্ম্মল জ্যোতিঃস্বরূপে অবস্থান করেন।

"গুণা ন পুরুষস্য পুনর্দৃশ্যত্বেনোপতিষ্ঠন্তে, তৎপুরুষ কৈবল্যম্, তদা পুরুষঃ স্বরূপমাত্রজ্যোতিরমলঃ কেবলী ভবতী" (৩।৫৫ সূত্রের ব্যাসভাষ্য)

কিন্তু এইরূপ উপায় দ্বারা সিদ্ধিলাভ করা অতি তীব্র বৈরাগ্যবান্ পুরুষ ব্যতীত অন্যের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠা কঠিন। এই জন্য ভগবান্ পতঞ্জলি বলিয়াছিলেন,—

"ঈশ্বর প্রণিধানাদ্বা" (১।২৩)

ঈশ্বর প্রণিধানদ্বারা অর্থাৎ বিশেষভক্তি সহকারে ঈশ্বরের আরাধনা ও সিদ্ধিলাভের প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

এই উপায় পূর্ব্বকথিত উপায় অপেক্ষা সহজ।

ভগবান্ গীতায় এই উপায়ই শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ঈশ্বর-প্রণিধানরূপ ভক্তিযোগের সাধনা করিলে সমস্ত বাধা বিমুক্ত হইয়া নির্ব্বিঘ্নে মোক্ষলাভ করা যায়, ইহাই গীতার মত।

এই জন্য যোগিগণের মধ্যে ভক্তই প্রধান। ভগবান্ বলিয়াছেন ভক্তই প্রধান। ভগবান বলিয়াছেন—

"যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমোমতঃ" (৬।৪৭)

"যোগীদিগের মধ্যে যিনি মদ্গতচিত্ত হইয়া কেবলমাত্র আমাকেই আরাধনা করিয়া থাকেন তিনি সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

অতএব গীতার মতে জ্ঞানযোগী যিনি, তাঁহাকে সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে প্রকৃত ভক্ত হইতে হইবে।

এইরূপে ভগবান্ গীতার প্রথম অধ্যায়ে আত্মতত্ত্ব বা জীবতত্ত্ব নির্দ্দেশ পূর্ব্বক "ত্বং" পদ নিরূপণ করিয়া সেই জ্ঞানলাভোপায় স্বরূপ কর্ম্মযোগ এবং তৎসঙ্গে কর্ম্ম সন্ন্যাস ও সাঙ্গোপাঙ্গ যোগতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়া দ্বিতীয় ষড়ধ্যায়ের প্রতিপাদ্য বিষয় "তৎ" পদার্থ নিরূপণ করিবার সূচনা করিয়া রাখিলেন।

শ্রীরাধারমণ মুখোপাধ্যায়।

জগুয়া।

১

জগুয়া যেদিন কাঁদিতে কাঁদিতে খগেন্দ্রবাবুর বাসা বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল, ঠিক তাহার ছয়দিন পূর্ব্বে, হতভাগ্যের জননী তাহাকে নিঃসহায় অবস্থায় ত্যাগ করিয়া স্বর্গে চলিয়া যান। খগেন্দ্রবাবু তখন গঞ্জমের অন্তর্গত বারম্পুরে কর্ম্মোপলক্ষে অবস্থিতি করিতেন। জগুয়ার দুর্দ্দশার কথা শুনিয়া সহানুভূতিকাতর কোমল-অন্তর খগেন্দ্রবাবুর স্ত্রী মহামায়া, তাহাকে অন্তঃপুরে ডাকিলেন; কাছে বসাইয়া মাতৃস্নেহে জগুয়ার শোকসন্তপ্ত হৃদয়কে সিক্ত ও আচ্ছন্ন করিয়া দিলেন। তখন জগুয়ার বয়স দশ বার বৎসরের অধিক নয়। সেই অবধি জগুয়া মহামায়ার নিকট রহিয়া গেল। তার প্রায় সকল কথা মহামায়া বুঝিতে পারিলেন না। খগেন্দ্রবাবু একদিন একখানি তেলুগু প্রথম-ভাগ কিনিয়া আনিয়া বলিলেন, "এ বইখানি

সমাধি-পার্শ্বে

মার্গারেট মরে কর্কলীর মর্মচিত্রাবলম্বনে শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র পালিত কর্তৃক অঙ্কিত

পড়িতে শেখ, তা হ'লে জগুয়ার সব কথা বুঝিতে পারিবে।" 'হরপ' দেখিয়াইত মহামায়া হাড়ে হাড়ে চটিয়া গেলেন; বলিলেন, "যেমন কথার ছিরি, তেমনই অক্ষরের চেহারা; পোড়া কপাল আর কি? খেয়ে দেয়ে ত আর কাজ নেই এই 'ঘোড়দৌড়ে ভাষা' শিখি।" এ অঞ্চলের লোকেরা অত্যন্ত তাড়াতাড়ি কথা বলে; সেই নিমিত্ত মহামায়া এদের ভাষাকে ঐরূপ আখ্যা দিয়াছিলেন।

খগেন্দ্রবাবু মৃদু হাসিয়া উত্তর করিলেন, "এটা তোমার অন্যায়; কোন ধর্ম্মের যেমন নিন্দা করা উচিত নয়, তেমনই কোন ভাষারও নিন্দা করা কর্ত্তব্য নয়।"

"আমি ত আর পণ্ডিত নই যে, ভাষাতত্ত্ব আলোচনা করতে বসেছি, আমার ভাল লাগে না তাই বল্‌চি।"

খগেন্দ্রবাবু রসিকতা করিয়া ও মহামায়াকে রাগাইবার জন্য বলিলেন, "আজ বাজারে যে রাশি রাশি "কমলাপান্ত" এসেছিল কি আর ব'লব। আমাকে একটুখানি "পালু" দিতে পার? যদি না থাকে তবে না হয় একটুখানি "নীলু"ই দাও;

"এই বইখানি পড়তে শেখ, তা হলে জগুয়ার কথা সব বুঝতে পারবে।"

'নীলু', পালু' শুনিয়া মহামায়া রাগে গর গর করিতে লাগিলেন; বলিলেন "এ পাপ কথাগুলা কি না বল্লেই নয়?"

জগুয়ার সব কথা মহামায়া বুঝিতে না পারিলেও বালকের নিষ্কলঙ্ক নয়নের মধ্য দিয়া কৃতজ্ঞতার যে নীরব ভাষা বিকসিত হইত, তাহার প্রতি বর্ণ মহামায়ার সরল অন্তরে প্রতিফলিত হইত।

যখন প্রবাসের সঙ্গীহারা দীর্ঘ দিনগুলি, গিরিশিরে ছুটাছুটি করিয়া সায়াহ্নে রক্তিমাভ বিশাল জলধিগর্ভে ডুবিয়া যাইত, যখন নির্জ্জনতা সর্ব্বদিক্ হইতে তাঁহাকে গ্রাস করিবার উপক্রম করিত—প্রবাসের অপরিচিত পাখীগুলিও দূর দূরান্তরে মেঘের কোলে মিশিয়া যাইত, তখন মহামায়া দেখিতেন, তাঁহার সমস্ত হৃদয় একটা অনন্ত অভাবের পশ্চাতে রোদন করিয়া ফিরিতেছে—এখানকার কোন কিছুর ভিতর তিনি যেন শান্তি বা তৃপ্তি খুঁজিয়া পাইতেন না। তখন অবলম্বন-বিহীন অন্তর প্রবলভাবে জগুয়াকে নিকটে টানিয়া লইত। তাহার মধ্যে যেন মহামায়ার সকল অভাব, সকল অতৃপ্তি অদৃশ্য হইত। জগুয়া নিকটে বসিলে মহামায়ার দৃষ্টি যেন ফিরিয়া আসিত। মনে হইত যেন এমনই একটা কিছুর অভাব তাহাকে পীড়ন করিতেছিল।

জগুয়ার সহিত গল্প করিয়া মহামায়া বেশ আনন্দ অনুভব করিতেন। জগুয়া মহামায়ার কথার অর্থ সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিত না। জগুয়া এত স্নেহ মমতা কোন দিনই পায় নাই, পাইলেও তাহা বুঝিবার শক্তি তখন তাহার ছিল।

না; কিন্তু মহামায়ার কথার বিশেষ করিয়া অর্থসংগ্রহ করা তাহার পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার হইলেও সেই সকল কথা তাহার অনুভূতিতে এমন একটু কোমল মধুর আঘাত করিত, যাহাতে সে নিজেকে মহামায়ার পুত্রের অপেক্ষা কম বলিয়া ভাবিবার অবসর পাইত না। সংসারের সকল কাজ ত্যাগ করিয়া সে মহামায়ার আদেশ পালন করিবার নিমিত্ত সর্ব্বদা আগ্রহ প্রকাশ করিত। অনেক সময় খগেন্দ্র বাবু ডাকিয়া তাহার সাড়া পাইতেন না; সুতরাং তিনি অত্যন্ত চটিয়া যাইতেন। খগেন্দ্রবাবুর ক্রোধে জগুয়া বড় ভয় পাইত না। মহামায়া যদি কোন দিন কোন কারণে অধিক কথাবার্ত্তা না বলিতেন, তবে জগুয়া সে দিন সকল দিক্ যেন শূন্য নিরীক্ষণ করিত। তাহার সহিত যে পৃথিবীর একটা গুরুতর সম্বন্ধ ও সংযোগ রহিয়াছে, তাহা সে সম্পূর্ণ-রূপে বিস্মৃত হইত। সে দিন কাহারও সহিত সে কথা বলিত না। গৃহের এক কোণে নীরবে বিমর্ষভাবে বসিয়া থাকিত। মাতৃহারা বালকের অন্তর সেদিন মায়ের জন্য আকুল হইয়া কাঁদিয়া উঠিত। সে কত কি ভাবিত। ভাবিতে ভাবিতে সকল উৎসাহ হারাইয়া কেমন উদাস দৃষ্টিতে সে চাহিয়া থাকিত। শত সহস্র ডাকে কেহ তাহার সাড়া পাইত না। আকাশে মেঘ ভাসিয়া যাইত, সে তাহাই দেখিত, মনে করিত কোন গতিকে যদি সে মেঘের নাগাল পায়, তবে—আর এখানে থাকিবে না; মেঘদের সঙ্গে তার মায়ের কাছে চলিয়া যাইবে। অভিমানভরে এমন অনেক অলীক কল্পনা তার শিশু-মস্তিষ্কে জমাট বাঁধিতে থাকিত।

মধ্যাহ্নে রৌদ্রদগ্ধ প্রবল বাতাস যখন গাছের ফাঁকের ভিতর দিয়া, পাহাড়ের শিরশ্চুম্বন করিয়া, নির্জ্জনতার মধ্যে চাঞ্চল্যের উদ্রেক করিয়া তুলিত, তখন মহামায়া ধীরে ধীরে ঘরের বাহিরে আসিয়া উপবেশন করিতেন। জগুয়াকে দুই একবার ডাকিয়া সাড়া না পাইলে, অধীর হইয়া পড়িতেন, তাঁহার অবসাদ মুহূর্ত্তে দূর হইয়া যাইত। তারপর যখন দেখিতেন তাঁহারই গৃহের বারান্দার এক কোণে সে ঘুমাইয়া রহিয়াছে, তাহার নয়নকোণে অশ্রু জমিয়াছে, কম্পিত অধর-পল্লবে কত করুণ আবেদন আগ্রহে সঞ্চিত রহিয়াছে, তখন মহামায়ার স্নেহপ্রবণ অন্তর বিগলিত হইত; তিনি করুণ করস্পর্শে, মৃদুকণ্ঠে ডাকিতেন, "জগুয়া, ওঠ্ ওঠ্, এত অবেলা পর্য্যন্ত কি ঘুমাতে আছে?" জগুয়া সে স্পর্শে ও আহ্বানে পুলকিত হইয়া উঠিত। তখনই সে পুত্রের মত আব্দার করিয়া ক্ষুধার অভিযোগ উপস্থিত করিত। জগুয়ার এই সব আব্দার মহামায়ার হৃদয়ের অজ্ঞাত অভাবটা অনেক পরিমাণে পূরণ করিতে লাগিল। মহামায়া হাতে এই সব কাজ পাইলে মনে মনে যে বড় খুসী হইতেন, তাহা বাহিরে প্রকাশ না করিলেও তাঁহার জননী-সুলভ আচরণগুলি বড় মধুরভাবে সংসারের সকল অনুষ্ঠানের মধ্যে পরিস্ফুট হইয়া উঠিত। সন্ধ্যার সময় তুলসীতলায় রীতিমত প্রদীপ পড়িত, ঠাকুর দেবতাগুলি অনেক পূজা ও আদর লাভ করিতে আরম্ভ করিল। ইদানীং অতিথি ভিখারিগুলিও মহামায়ার করুণা হইতে বঞ্চিত হইত না। মহামায়া শক্ত কথা বড় কাহাকেও বলিতেন না। খগেন্দ্রবাবু বিশেষভাবে লক্ষ্য করিলেন যে, মহামায়ার প্রকৃতিতে একটা পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। কোথাও একটুখানিও উদ্ধতভাব দৃষ্ট হয় না—হাস্যপরিহাসচঞ্চল মহামায়া, দয়াদাক্ষিণ্য-প্রদায়িনী দেবী মহামায়ারূপ পরিগ্রহ করিয়াছেন,—খর-প্রবাহিনী মন্দাকিনী মন্থরগমনা যমুনাসুন্দরীর রূপ ধারণ করিয়াছে। এই পরিবর্ত্তনের মূলে তিনি দেখিলেন, জগুয়া। এই নিরাশ্রয় তেলুগু বালকটির সুখ দুঃখের উপর মহামায়ার হর্ষ-বিষাদ অনেকখানি নির্ভর করিতেছে।

মহামায়া জগুয়াকে যেমন ভালবাসিতেন, তেমনই তিরস্কারও করিতেন। এক দিন সে রাগ করিয়া খায় নাই। চাকরের এরূপ অভিমান বা রাগ করিবার যে কোন অধিকার নাই, জগুয়া সে কথা মোটেই বুঝিত না। মহামায়া খুব গম্ভীর হইয়া তাহাকে তাড়না ও তিরস্কার করিলেন। বলিলেন, "লক্ষ্মীছাড়া অমন করে উপোস্ কল্লে যে অসুখ করবে, তখন তোকে দেখ্‌বে কে?"

জগুয়া উত্তর করিল, "কেন তুমি!"

"আমার ভারি গরজ—তুই ইচ্ছে ক'রে রোগ করবি, আর আমি তোর সেবা ক'রব,—না?"

"আমি ত আর বল্‌চি না—কেউ আমার সেবা করুক্।"

এমনই করিয়া মহামায়ার প্রবাসের দিনগুলি বেশ এক রকম কাটিতে লাগিল। জগুয়া মহামায়ার নারীহৃদয়কে জননীর করুণায় জাগাইয়া তুলিতে কোন দিক্ হইতে অপূর্ণ রাখিল

রাখিল না। জগুয়া দেখিল মহামায়া তাহার জননী,—মহামায়া ভাবিল জগুয়াই তাহার একমাত্র সন্তান। এই 'মা ও ছেলে' সম্বন্ধটি উভয়েরই অজ্ঞাতসারে উভয়েরই অন্তরে ধীরে ধীরে বদ্ধমূল হইতেছিল, তাহা কেহই বুঝিতে পারে নাই।

(২)

আরও কএক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। জগুয়া মহামায়ার সমস্ত হৃদয়ের পুত্রস্নেহ অধিকার করিয়া বসিয়াছে। পূর্ব্বে পূর্ব্বে মহামায়া দেশে যাইবার জন্য স্বামীকে অনেক পীড়াপীড়ি করিয়াছিলেন; কিন্তু যে দিন হইতে জগুয়া তাহাদের সংসারে পথহারা পথিকের মত আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল—সেই দিন হইতে এই বালক যাদুকরটি মহামায়াকে এমন এক অভিনব মায়ার ফাঁস পরাইয়া দিল যে, মহামায়া দেশের কথা বড় তুলিতেন না। যখন তিনি ভাবিতেন, দেশে যাইতে হইলে এই মাতৃহীন বালককে ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে, তখনই জগুয়ার নিঃসহায় অবস্থা স্মরণ করিয়া, তাঁহার করুণ হৃদয় কাঁদিয়া উঠিত। কোন দিন মহামায়া ভাবিতেন, এই বিদেশী বালকটি কেন এত করিয়া তাহার অনুগ্রহ ভিক্ষা করে। কেন কথা না কহিলে সে অমন বিমর্ষ হইয়া পড়ে। আবার মনে হইত—না, তার দোষ কি? তাকে না দেখিলে আমিও যে থাকিতে পারি না। জগুয়া ছেলেটি বড় ভাল—। আহা, ওর মা যদি বেঁচে থাকৃত, তা হ'লে কি আর এত কম বয়সে ওকে চাকরী কত্তে দিত।

মহামায়ার নিকট জগুয়া আব্দার ও অভিমান না করিলে যেন তার দিন যাইত না। সে দিন খগেন্দ্র বাবু—হাসিতে হাসিতে ব্যঙ্গস্বরে বলিলেন, "তোমার দেখ্‌চি কপাল ভাল—বিনা কষ্টে কি না এত বড় পুত্রলাভ।"

মহামায়া কথাটা শুনিয়াও শুনিলেন না। কৃপণকে কেহ তাহার গুপ্ত-অর্থের সন্ধান বলিয়া দিলে বা তাহার উল্লেখ করিলে সে যেমন চমকিয়া শঙ্কিত হইয়া পড়ে, সে কথায় মোটেই কাণ দেয় না—অন্য কথার উত্থাপন করে, এ ক্ষেত্রে ঠিক তাহাই হইল—মহামায়া বেশ একটুখানি গম্ভীরভাব ধারণ করিলেন, কোন উত্তর দিলেন না।

এখন অনেক খুঁটিনাটি লইয়া আজকাল খগেন্দ্রবাবু ও মহামায়ার মধ্যে মাঝে মাঝে অভিমানের অভিনয় চলিতে আরম্ভ হইল। এই সকল ব্যাপারের মূলে জগুয়াই প্রবল হইয়া দাঁড়াইল।

একদিন কি একটা সামান্য বিষয় লইয়া খগেন্দ্রবাবু জগুয়াকে তিরস্কার করিলেন। সে দিন সে রাগ করিয়া চলিয়া গেল। মহামায়া ইহার কিছুই জানিতেন না; সুতরাং জগুয়াকে যখন অনেক বেলা পর্য্যন্ত দেখিতে পাইলেন না, তখন তাঁহার অত্যন্ত ভাবনা হইল। খগেন্দ্র বাবুকে বলিলেন, "জগুয়া আসে নাই, কোথায় গেল? একবার ডাক্‌তে পাঠাও।" জগুয়ার প্রতি এতটা স্নেহ খগেন্দ্রবাবু মোটেই পছন্দ করিতেন না; সুতরাং বেশ একটুখানি বিরক্তি দেখাইয়া বলিলেন—"ভাল পাপ এসে জুটেচে। বেটা চাকরী কর্‌তে এসে, ছেলের বাড়া আদুরে হয়ে বসেছে।" কথাগুলির ভিতর মহামায়ার প্রতি যে একটি প্রচ্ছন্ন তিরস্কার নিহিত ছিল, তাহা যে মহামায়া না বুঝিলেন তাহা নহে; কিন্তু তিনি সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না; বরং কাতরকণ্ঠে অত্যন্ত ধীরভাবে উত্তর করিলেন, "তুমি ত জান, আহা বেচারীর কেউ নাই। ছেলেমানুষ কোথায় হয় ত ঘুমিয়ে পড়েছে। বেলা দুপুর হয়ে গেল, কখন খাবে? তোমার পায়ে পড়ি, একজন কাউকে পাঠাও।"

খগেন্দ্রবাবু ক্রোধভরে উত্তর করিলেন, "পেটের জ্বালা এমন নয়,—জ্বালা ধরলেই এসে হাজির হবে এখন, বাবুকে আর ডাক্‌তে হবে না।"

এবার মহামায়া কোন উত্তর দিলেন না। রাগিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

খগেন্দ্রবাবু বিছানায় শুইয়া শুইয়া মহামায়া ও জগুয়ার কথা ভাবিতে লাগিলেন।

(৩)

বৈশাখ মাসের শেষ; অত্যন্ত গরম পড়িয়াছে। আকাশ পরিষ্কার, নির্ম্মেঘ। সম্প্রতি জলের কোন সম্ভাবনা নাই। খগেন্দ্রবাবু কাছারী হইতে একটু সকাল সকাল সেদিন চলিয়া আসিয়াছেন। মহামায়া ঘরের মেঝেয় বসিয়া তাঁহার জন্য ফল ছাড়াইতেছিলেন। জগুয়া পাখা লইয়া খগেন্দ্রবাবুকে বাতাস করিতেছে। এমন সময় খগেন্দ্রবাবু

বলিলেন, "জগুয়া, তুই এখন যা, আর বাতাস করতে হবে না।" সে মহামায়ার দিকে চাহিয়া গৃহ হইতে চলিয়া গেল।

খগেন্দ্রবাবু জলযোগের পর তামাক খাইতে খাইতে বলিলেন, "আস্‌ছে মাসে একবার দেশে যাব মনে করেছি। ঐ সময় পথে তোমাকে পুরী দেখিয়ে নিয়ে যাব, কেমন?"

মহামায়া এমন একটা প্রশ্নের জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। মহামায়ার আনন্দোৎফুল্ল মুখখানি সহসা বিষাদ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। জগুয়ার কথাই যে তাঁর সব চেয়ে বেশী ক'রে মনে হয়ে উঠ্‌ল। সুতরাং তিনি স্বামীর কথার কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। নথ দিয়া নথ খুঁটিতে খুঁটিতে অনেকক্ষণ পরে বলিলেন, "এখন কি যাওয়া নিতান্তই প্রয়োজন? সুমুখে বর্ষাকাল, দেশে ম্যালেরিয়া—"

"না, আস্‌চে মাসেই যেতে হবে।"

"তা হ'লে জগুয়া কি আমাদের সঙ্গে যাবে?"

খগেন্দ্রবাবু অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া মৃদু হাসিলেন। পূর্ব্বের মত গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন, "ও কি বাঙ্গলা দেশের পাড়াগাঁয়ে থাক্‌তে পার্‌বে? আর তার কাকাই বা পাঠাবে কেন?"—বলিয়া পান চিবাইতে লাগিলেন।

মহামায়ার এক সঙ্গে অনেকগুলি চিন্তা জাগিয়া উঠিল। আর একবার ধীরস্বরে বলিলেন, "দিন কতক পরে গেলে হ'ত না?"

মহামায়া: জগুয়ার কাপড় জামা বাক্সে গুছাইতেছেন; জগুয়া: দাঁড়াইয়া দেখিতেছে।

খগেন্দ্রবাবু মহামায়ার অবস্থা দেখিয়া বহু কষ্টে হাসি চাপিয়া বলিলেন, "না"।

মহামায়া আর কিছু না বলিয়া ধীরে ধীরে সেখান হইতে উঠিয়া গেলেন। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আর সেদিকে আসিলেন না। জগুয়ার কথা ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার নয়ন পল্লব সিক্ত হইল।

(৪)

বৈকাল বেলা, আকাশে বেশ একটু একটু করিয়া মেঘ জমিতেছিল। মহামায়ার মনটা বড় ভাল ছিল না। ঘরের কোণে একটা বিড়াল শিকারের চেষ্টায় ওত পাতিয়া বসিয়াছিল। খাঁচার মধ্যে ময়না এক একবার এদিক ওদিক করিতেছিল; মধ্যে মধ্যে শান্ত হইয়া বসিতেছিল। আবার নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া ডাকিয়া উঠিতেছিল, "জগুয়া, জ—গু—য়া"। মহামায়া অনেকক্ষণ ধরিয়া একটা কাজ খুঁজিতেছিলেন। অন্য কোন কাজ না পাইয়া, তোরঙ্গ খুলিয়া জগুয়ার জন্য কাপড় জামা বাছিয়া বাছিয়া গুছাইতে

আরম্ভ করিলেন। ভাল ভাল খেলানাগুলি সব একত্র করিলেন।

সবুজ রংয়ের গায়ের কাপড় জগুয়া বড় পছন্দ করিত, তাই তিনি দশটি টাকা পৃথক্ করিয়া তুলিয়া রাখিলেন। তাহাকে আরও কি কি দিয়া যাইবেন এই সকল চিন্তায় তাঁহার হৃদয় ভরিয়া উঠিল।

মহামায়া সেদিন জগুয়ার জন্য বিশেষ করিয়া মাছের অম্বল রাঁধিলেন। জগুয়া তাঁহার হাতের অম্বল খাইতে অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিত। অম্বল হইলে তাহার আর কোন তরকারীর বড় প্রয়োজন হইত না; কিন্তু এত সব করিয়াও মহামায়া মনকে বুঝাইতে পারিলেন না। জগুয়াকে ছাড়িয়া তাঁহার দেশে থাকা সম্পূর্ণ অসম্ভব ও নিতান্ত অন্যায় বলিয়া মনে হইতে লাগিল। তিনি মনে করিলেন, জগুয়া কি আমাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিবে? কেন পারিবে না, সে ত আমার কেউ নয়! তাই কি? তবে আমিই বা তাহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিব না কেন? 'না, না, আমি কিছুতেই পারিব না, বেচারী যদি কাঁদিয়া বলে, 'মা, আমি কোথা থাক্‌ব?' মহামায়া আর ভাবিতে পারিলেন না। তাঁহার চক্ষে অশ্রু দেখা দিল।

এমন সময় জগুয়া আসিয়া দেখিল মহামায়া আজ অত্যন্ত গম্ভীর। তিনি তাহার দিকে তেমন স্নেহনেত্রে অন্যান্য দিনের মত ফিরিয়া তাকাইলেন না। এ পরিবর্ত্তন জগুয়ার দৃষ্টি এড়াইল না। সে মনে করিল নিশ্চয় কি একটা বিভ্রাট ঘটিয়াছে। মহামায়ার মুখের ভাব দেখিয়া কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতেও তাহার সাহস হইল না। ময়নাটা তাহাকে ভ্যাংচাইয়া ডাকিল 'জ—গুয়া'।

জগুয়া জানিত এ ক্ষেত্রে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে মহামায়া উত্তর দিবেন না। সুতরাং সে বলিল, "মা, বড় খিদে পেয়েচে?"

মহামায়া তাড়াতাড়ি খাবার দিলেন।

"হাঁ্যরে, এতক্ষণ কোথায় ছিলি? কাল বাবুর সঙ্গে দোকানে গিয়ে একখানা সবুজ রংয়ের গায়ের কাপড় কিনে আনিস্।"

"কেন মা, কি হবে?"

"তোকে দিয়ে যাব। দেখ্, আমায় চিঠি দিস্। যখন যা দরকার হবে, তখনি লিখে পাঠাস্, জান্‌লি?" তারপর মহামায়া আর কিছু বলিতে পারিলেন না। বিচারকের ফাঁসির আদেশ দেওয়া অপেক্ষা এই কথাগুলি উচ্চারণ করিতে মহামায়ার হৃদয় অধিকতর ব্যথিত হইয়া উঠিল। তাঁহার নয়ন অশ্রুসমাচ্ছন্ন হইয়া আসিল।

ময়না চীৎকার করিয়া উঠিল, "ও ময়না, পড় দেখি—ও কে এসেচে চিনিস্?"

কেহ তখন তাহার কথায় সাড়া দিল না দেখিয়া সে অভিমান ভরে খাঁচার এক পার্শ্বে গিয়া বসিয়া ঘরময় বাটী হইতে খাবার ছড়াইতে লাগিল। জগুয়াকে দেখিলে ময়না রাগিয়া যাইত।

জগুয়া ব্যাপার বুঝিতে পারিল না। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত মহামায়ার মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া উত্তর করিল, "কাকে চিঠি লিখ্‌ব? কেন লিখ্‌ব মা?" তৎক্ষণাৎ বলিল, "আমি যে লিখ্‌তে জানি না।"

মহামায়া মনে মনে ভাবিলেন, সে কথা ত ঠিক। ও ত, লিখতে জানে না। বলিলেন "আমরা যে, এখান হ'তে চলে যাচ্চি জগুয়া—তুই কি জানিস্ না?—তুই কি আমাদের সঙ্গে যাবি?"

জগুয়া কিছু না ভাবিয়া তাড়াতাড়ি ব্যাকুলস্বরে বলিল, "কেন মা, আমি কেন যাব না?"

"তোর কাকা, তোকে কি আমাদের সঙ্গে যেতে দেবে?"

"তবে আমি কোথায় থাক্‌ব?"

মহামায়া কি উত্তর দিবেন ভাবিয়া পাইলেন না।

সে দিনটি মহামায়ার বিশেষ করিয়া স্মরণ হইতেছিল, যেদিন জগুয়া কাঁদিতে কাঁদিতে প্রথম তাঁহার নিকট আসে, দশ বৎসরের বালক তাহাকে মা বলিয়া সম্বোধন করে। সেইদিন হইতে সে যে তাহার স্নেহ মমতায় ধীরে ধীরে পালিত ও বর্দ্ধিত হইয়াছে। তার হর্ষ বিষাদ, আনন্দ উল্লাস, সুখ দুঃখ সব যে মহামায়ার অজস্র স্নেহধারায় পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে, সুতরাং জগুয়াকে যে এরূপ প্রশ্ন করিবার সম্পূর্ণ অধিকার তিনিই দিয়াছেন। এখন তাঁহাকেই ত উত্তর দিতে হইবে, সে কোথায় থাকিবে?

মহামায়া দৃঢ়স্বরে মনে মনে বলিলেন, "হয় জগুয়া

আমাদের সঙ্গে যাবে, নয় তাকে ছেড়ে দেশে যেতে পারব না।" প্রকাশ্যে বলিলেন, "তুই সে দেশে থাকতে পারবি?"

"তুমি পারবে?"

"সে যে আমার দেশ।"

"তবে আমারও দেশ।"

প্রথম প্রথম বারমপুর আসিয়া মহামায়ার যে পর্ব্বত-গুলিকে নির্ম্মম ও কর্কশ বলিয়া মনে হইত, আজ কোন্ যাদুকরের স্পর্শে তাহাদের মধ্যে শোভা বিকশিত হইয়া উঠিল তাহা সে ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিত না। অভাব ও অবসাদের মধ্য দিয়া দীর্ঘ নির্জ্জনতা অনুক্ষণ তাহাকে কাতর করিয়া তুলিত বলিয়া যে দেশ ত্যাগ করিবার জন্য তিনি অস্থির হইয়া পড়িয়াছিলেন, জগুয়ার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে সেই দেশের উপর এত মমতা হইল কেন? জানিনা কোন্ মনোমোহনের মোহন সঙ্গীতধ্বনিতে —কোন্ মায়ামোহে সেই দেশকে সকল শক্তি দিয়া আঁকড়িয়া ধরিতে ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন।

এই সংবাদ শুনিবার পর হইতে জগুয়া নীরবে ক্রন্দন আরম্ভ করিল। সে কাহার সহিত কথা কহিল না, কিছু খাইল না।

প্রভাতের অরুণালোকের উপর সহসা বরষার নিবিড় মেঘ ঘনাইয়া আসিল।

(৫)

তার পর ছয় সাত বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। খগেন্দ্রবাবু দেশের দিকে বদলী হইয়া আসিয়াছেন। মহামায়ার সহিত জগুয়াও আসিয়াছে। মহামায়ার স্নেহে জগুয়ার সম্পর্ক এখানে ঠিক ভৃত্যের মত নয়। সে তাহাদের সংসারে সুখদুঃখে সমান অংশী। জগুয়া যখন সুদূর দেশের কথা কখনও কখনও স্মরণ করিত, তখন সে বেশ স্পষ্ট করিয়া সে দেশের কথা অনুভব করিতে পারিত না। সে যে দেশে জন্মিয়াছে সে দেশের প্রতি যে তাহার একটা অন্তরনিহিত অবিচ্ছিন্ন বন্ধন, আকর্ষণ আছে—তাহার যে একটা মাতৃস্নেহের অটুট শ্রদ্ধা ও ভক্তির মঙ্গল-সংযোগ চিরবিদ্যমান রহিয়াছে, সেটা সে মহামায়ার অনাবিল স্নেহ ও মমতায় সর্ব্বদাই আচ্ছন্ন দেখিত। মহামায়ার নারীত্বের মধ্যে জননীত্ব এই জগুয়াকে লইয়া পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল। সুতরাং উভয়ের হৃদয়ের ভিতর পুত্রের বা জননীর অভাব কোনখানেই কেহ অনুভব করিত না।

রান্নাঘরের রকের উপর বসিয়া মহামায়া তরকারী কুটিতেছেন, জগুয়া নিকটে বসিয়া গল্প করিতেছে, কি কি রান্না হইবে তাহার সংবাদ লইতেছে। পূজার সময় তাহার কিরূপ জুতা জামা হইবে তাহারও কথা চলিতেছিল। মধ্যে মহামায়ার একবার অসুখ করিয়াছিল, জগুয়া আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া সেবা করিয়াছিল। তেঁতুল তলার বড় বড় সিঁদরমাখা পাথরগুলিকে লুকাইয়া লুকাইয়া সে গড় করিত, জোড় হাত করিয়া বিড় বিড় করিয়া অশ্রুসিক্তনয়নে মহামায়ার জন্য প্রার্থনা করিত। জগুয়ার অসুখ বিসুখ করিলে, মহামায়া এই ঠাকুরের পূজা দিতেন ও তাহাকে প্রণাম করিতে আদেশ করিতেন; সুতরাং বিদেশী বালকের ধারণা হইয়াছিল, এঁরা মন্দিরে বা বাড়ীতে না থাকিলেও এঁরা যে খুব বড় দেবতা, অসীম শক্তিশালী, সে বিষয় সন্দেহ নাই।

খগেন্দ্রবাবু দেখিলেন বড় বাড়াবাড়ি হইয়া পড়িতেছে। পূজার সময় একখানি কাপড় দিলেই যথেষ্ট, তা নয়—তাকে জামা দাও, জুতা দাও, কেন এ সব আমি দিতে যাই? তাই ত লোকে নানা কথা বলে। এই সব ব্যাপার লইয়া মহামায়ার সহিত খগেন্দ্রবাবুর একটু আধটু খিটিমিটি যে না চলিত তাহা নয়।

একদিন জগুয়ার কাপড় লইয়া মহামায়া বেশ একটুখানি অভিমান করিলেন। বলিলেন, "তোমায় টাকা দিতে হবে না, আমি দিব।"

খগেন্দ্রবাবু চটিয়া বলিলেন, "চাকর আবার কোথায় বাবু সাজে? এ সব আস্কারা দেওয়া আমি একেবারে পছন্দ করি না।

কথাগুলি মহামায়ার অন্তরে আঘাত করিল।

জগুয়া দূরে দাঁড়াইয়া সে সকল শুনিল। মনে মনে কত কি ভাবিল, তারপর মহামায়ার দিকে চাহিতেই তাহার রুদ্ধ অভিমান গর্জ্জিয়া উঠিল।

সে কাপড়, জামা, সব ত্যাগ করিয়া সেই মুহূর্ত্তে গৃহ হইতে চলিয়া গেল। বেচারী কোন দিন ভাবে নাই যে, তার এ অন্যায় আব্‌দার শুনিবার নিমিত্ত মহামায়া ভিন্ন এ জগতে আর কেহ নাই। এই ব্যবহারে খগেন্দ্রবাবু অত্যন্ত রাগিয়া উঠিলেন। ক্রোধকম্পিতস্বরে বলিলেন, "দেখ্‌লে, কত বড় আস্‌পর্দ্ধা! কাপড় জামা ফেলে দিয়ে, লাট সাহেবের মত গট গট্‌ করে, চলে গেল। মনে ভেবেচে, এখনি ওকে ডেকে এনে বাপু বাছা বল্‌বে?"

মহামায়া বলিলেন, "তুমি ওকে যতটা বাবু মনে কর—ও তা নয়—পরের ছেলে, কেউ নেই, তাই অভিমান আব্দার আমাদের উপর না কর্‌লে—কার উপর করে, বল—নইলে ওর যে মনুষ্য-জীবনটা বৃথা হ'য়ে যায়? তাই অবুঝের মত মাঝে মাঝে ক্ষেপে উঠে। এটা ওর পক্ষে খুব স্বাভাবিক নয় কি? ন'বছরের ছেলে, মা-মরা ছেলে, কাঁদিতে কাঁদিতে যেদিন তোমার কাছে এসেছিল, তখন ত তাড়িয়ে দিতে পার নাই।"

"বেটার কেউ ছিল না, তাই দয়া ক'রে রেখেছিনু, এই না অপরাধ?"

"অপরাধ টপরাধ ও সব কথা বল্‌চ কেন! এখনও ওর কেউ নেই। তোমার দয়া তখন যে কারণে হ'য়েছিল, এখনও সে কারণের কিছু পরিবর্ত্তন হয় নাই। দয়া, স্নেহ করা হয় বলেই—, না ও অতটা রাগ করে, আব্দার করে, অভিমান করবার সাহস করে। ও মনে ভাবে, এটা যেন ওর নিজের বাড়ী, আমরা যেন ওর আপনার জন।"

"এতটা হতো না, কেবল তোমার আস্কারা পেয়ে ও বেড়ে উঠেচে? তুমি সকল কথা জান না, পাড়ার লোকে এ সব ব্যাপার নিয়ে বিদ্রূপ ক'রে বলে, 'চাকর চাকরের

"চাকর আবার কোথায় বাবু সাজে?" (৯০৬ পৃষ্ঠা।)

মত থাক্‌বে', সে কথা যে তারা অন্যায় বলে তা বল্‌তে পারি না। নন্দকাকা সেদিন ঘাটে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বলছিলেন, 'অমন বাবু চাকর রাখ্‌লে, আমাদের চাকর বাকর রাখা দায় হ'য়ে পড়্‌বে। চাকর নয় ত, যেন নন্দদুলাল।'

মহামায়া স্বামীর কথায় বাধা দিয়া বলিলেন, "বাড়ীর ছেলে আদুরে হবে না ত কি? আমাদের আশ্রয়ে যে আছে, তার কপালে কি চাকরের টিকিট মেরে দিতে হবে? এ সব কথা বলা বড় অন্যায়।"

খগেন্দ্রবাবু গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিলেন। কোন উত্তর দিলেন না।

বৈকালে জগুয়া ফিরিয়া আসিল। ফুলগাছগুলির গোড়া অল্প অল্প নিড়ান করিয়া দিল। পুষ্করিণী হইতে জল আনিয়া তাহাদের গোড়ায় ঢালিল। বাড়ী ঘর, দ্বার সমস্ত পরিষ্কার করিয়া ফেলিল। কাহারও আদেশের জন্য মোটেই অপেক্ষা করিল না। সে যখন এমন করিয়া জোর করিয়া সংসারে তাহার দাবী সাব্যস্ত করিতে আরম্ভ করিল; সকল গালাগালি অপমান বিস্মৃত হইয়া মহামায়ার নিকট আসিয়া উপবেশন করিল, তখন মহামায়া অনেকক্ষণ তাহার মুখের দিকে অনিমেষনয়নে চাহিয়া রহিলেন। দেখিলেন সেখানে কিছুমাত্র অসন্তোষের চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই। সে যেন তাহাদের একজন হইয়া গিয়াছে—এরূপ ভাবিতে তার কিছুমাত্র দ্বিধা হয় না। সে এ সংসারে কিছুতেই কোন দিক্‌ হইতে আপনাকে চাকর ভাবিতে পারে না। তিনি মনে মনে বলিলেন, "আর কেনই বা সে এমনটা ভাববে? চাকর হইয়া ত কেহ জন্মায় না—? তবে কেন লোকে তাকে চাকর বল্‌বে?"

(৬)

বকুলগঞ্জের সকলেই কিন্তু জগুয়ার মত একজন বিশ্বাসী, পরিশ্রমী, চাকর পাইবার নিমিত্ত খগেন্দ্রবাবুর মনে মনে ঈর্ষা করিতেন। প্রকাশ্যে খগেন্দ্রবাবুর নিকট জগুয়ার যথেষ্ট নিন্দা করিতেন। জগুয়া একদিকে যেমন একটু স্বাধীন ছিল, কিন্তু অন্য দিকে তার কাজকর্ম্মের তুলনা ছিল না। সংসারের সকল কাজের মধ্যেই জগুয়ার পরিশ্রম পরিদৃষ্ট হইত। বাড়ীখানি দর্পণের মত ঝকঝকে করিয়া রাখিত। কোনখানে একটুও আবর্জ্জনা জমিতে পাইত না।

সে দিনরাত্রি পরিশ্রম করিয়া বাগানের আগাছাগুলি পরিষ্কার করিয়া তাহার স্থলে নানাবিধ শাক সব্‌জি বুনিয়া —নানা রকম ফলের গাছ রোপণ করিয়া বাগানের শোভা সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছিল। গৃহপ্রাঙ্গণে বহুবিধ ফুলের গাছ বসাইয়া অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য সম্পাদন করিয়াছিল। এই সকল কাজকর্ম্ম দেখিয়া অনেকেই জগুয়াকে অধিক বেতন দিবার প্রস্তাব করিয়া তাহাকে খগেন্দ্রবাবুর বাড়ী হইতে ছাড়াইয়া আনিবার জন্য বহুবার চেষ্টা করিয়াছিল। জগুয়া হাত [illegible] কোনদিন মাহিনা লয় নাই। টাকার কি মূল্য থাকি আকর্ষণ আছে তাহার এমন অভাব কোনদিন আসে নাই যাহাতে সে এরূপ প্রলোভনের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারিত, সুতরাং সে এই সকল কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারিত না। সে বাড়ীতে আসিয়া মহামায়ার নিকট বলিত, "মা আমায় ওরা চাকর রাখ্‌তে চায়, বেশী মাহিনা দেবে বলে।" বলিতে বলিতে সে রাগিয়া একেবারে বালকের মত চুপ করিয়া বসিত। মহামায়া জগুয়ার অন্তর বিলক্ষণ বুঝিতেন। উক্ত প্রস্তাব বেচারীর অন্তরে অত্যন্ত ব্যথা দিয়াছে জানিয়া তাহাকে অনেক করিয়া বুঝাইতেন—আদর করিতেন। বলিতেন, "বল্লেই বা চাকর, তাতে ক্ষতি কি!" মহামায়া বলিয়াছে—ক্ষতি নাই, তবে নিশ্চয় ক্ষতি নাই—ভাবিয়া সে তখন আনন্দে গলিয়া যাইত।

জগুয়া যখন অমন করিয়া সমস্ত সংসারটিকে আপনার অধিকারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল—তখন খগেন্দ্রবাবু তাহার উপর অত্যন্ত চটিয়া গেলেন। একদিন সামান্য কারণে মহামায়ার উপর অভিমান করিয়া একখানি নূতন থালা ক্রোধভরে উঠানে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিতে উহা ভাঙ্গিয়া দুইখানা হইয়া যাইল। খগেন্দ্রবাবু তখন বাড়ীর মধ্যে ছিলেন। এই অন্যায় আচরণে সে দিন তিনি আর রাগ সামলাইতে পারিলেন না। তাহাকে দুই এক ঘা উত্তম মধ্যম ব্যবস্থা করিলেন। সে ছুটিয়া পলাইয়া গেল। সেদিন কিন্তু সে আর বাড়ী ফিরিল না। মহামায়ার প্রথমটা জগুয়ার উপর রাগ হইয়াছিল। কিন্তু যখন বেলা পড়িয়া আসিল—আহারের সময় উত্তীর্ণ হইল, তবুও জগুয়া আসিল না, তখন তাঁহার ক্রোধ অদৃশ্য হইয়া গেল। তিনি বারবার সদর দরজায় গিয়া জগুয়ার অপেক্ষায় দাঁড়াইলেন। বাগানের ধারে গিয়া কতবার জগুয়ার অন্বেষণ করিলেন; কিন্তু সেদিন কোথাও তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। ক্রমে সূর্য্যদেবের কিরণ ক্ষীণপ্রভ হইয়া ধরণীর বক্ষঃ হইতে গাছের মাথায় গিয়া ঠেকিল। রাখালেরা গরু লইয়া গৃহে ফিরিল। কুলবধূরা পুষ্করিণী হইতে কলসী ভরিয়া জল লইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। তুলসীর মূলে গৃহিণীরা প্রদীপ দেখাইল। মন্দিরে, দেবালয়ে শঙ্খ-ঘণ্টা-ধ্বনি হইল—অন্ধকার ধীরে ধীরে ঘনাইয়া আসিল, কিন্তু তবুও জগুয়া গৃহে ফিরিল না।

জগুয়ার প্রতি মহামায়ার স্নেহ ক্রমেই খগেন্দ্রবাবুকে

বিদ্রোহী করিয়া তুলিল। সে বার মহামায়া বিস্তর অনুনয় বিনয় করিলে তবে জগুয়াকে তিনি প্রকাশ্যে ক্ষমা করিলেন; কিন্তু তাহার সামান্য ত্রুটী পাইলেই বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিবেন, ঠিক করিয়া রাখিলেন।

জগুয়ার কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন দেখা গেল না। সে যদি নিজেকে কোন দিন খগেন্দ্রবাবুর ভৃত্য বলিয়া মনে ভাবিতে পারিত, তাহা হইলে খগেন্দ্রবাবুর আচরণ তাহাকে বহু পূর্ব্বেই সতর্ক ও সাবধান করিয়া দিত।

কিন্তু এরূপ চিন্তা কোন দিন তাহার মাথায় মোটেই আসিত না; সুতরাং আপনাকে সংশোধন করার একবারেই প্রয়োজন আছে এমনটাও সে মনে করিতে পারিত না। এখন হইতে তাহার তুচ্ছ ত্রুটিগুলি খগেন্দ্রবাবুর চক্ষে বেশ বিশেষত্ব লইয়া দেখা দিতে আরম্ভ করিল।

সেদিন বৈকালে খগেন্দ্রবাবু একখানি পুস্তক পড়িতেছেন; উঠানের একপার্শ্বে একটা কুকুর শুইয়া আছে; মহামায়া পাশে বসিয়া কি একটা বুনিতেছেন। জগুয়া কোথায় গিয়াছিল,—বাড়ীতে ছিল না। একটু পরেই সে আসিয়া পড়িল, এবং আসিয়াই একখানি বড় ইঁট ছুড়িয়া অকারণ কুকুরটিকে প্রহার করিল। কুকুরটা ঘেউ ঘেউ করিতে ২ সেখান হইতে পলাইল।

খগেন্দ্রবাবু পুস্তক হইতে চক্ষু তুলিয়া বলিলেন, "কেন তুই ওকে মারলি? তুই মনে ভেবেচিস্‌' কি?

"এত ক'রে উঠান পস্‌কের ক'রে গেনু, উনি আরাম শোবেন বলে নাকি?"

খগেন্দ্রবাবু চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "আবার উত্তর দেওয়া হচ্চে—বেটার লজ্জা নেই!" তারপর মহামায়ার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "জগুয়াকে আর আমাদের রাখা পোষাবে না, ওর মাইনেপত্র চুকিয়ে বাড়ী পাঠিয়ে দাও। ও পাপের আর এখানে থাকা চল্‌বে না।"

মহামায়া তখন কোন উত্তর দিলেন না। খগেন্দ্রবাবু পুনরায় বলিলেন, "দেখ, মহামায়া, আমি কোন কথা শুনতে চাই না, আসল কথা আমি ওকে রাখ্‌ব না।"

মহামায়া ধীরে ধীরে সেখান হইতে উঠিয়া গেলেন। তাঁহার চক্ষে বোধ হয় জল আসিয়াছিল। খগেন্দ্রবাবু তাহা দেখিতে পাইলে ব্যাপার যে, আর গুরুতর দাঁড়াইত সে বিষয় সন্দেহ নাই।

মহামায়া চলিয়া গেলে খগেন্দ্রবাবু আরও রাগিয়া গেলেন। সব কাজের অপেক্ষা যেন জগুয়াকে তাড়ানই তাঁহার শ্রেণী হইয়া পড়িল।

(৭)

বৈশাখ মাস। কয় দিন হইল বসন্ত বিদায় লইয়া পল্লীভবন হইতে চলিয়া গিয়াছে। চারি দিকে এখনও তাহার অনুরাগ প্রকৃতির নবীনতার মধ্যে অনুরঞ্জিত রহিয়াছে। উৎসব-গৃহে এখনও বসন্ত-সংগীতের শেষ রেশ বেশ মিলাইয়া যায় নাই। আকাশে এখনও নীল মেঘের উপর বসন্তের আবীর দাগ ধুইয়া যায় নাই। কোকিল এখনও পত্রচ্ছায়ায় বসিয়া কুহু রবে দিক্ মুখরিত করিতেছে। এই সময় নন্দবাবুর বাড়ীতে একটি বিবাহ উপস্থিত হয়।

এই বিবাহ উপলক্ষে নন্দবাবু খগেন্দ্রবাবুকে ডাকিয়া বলিলেন, "ওহে খগেন, তোমার চাকরটাকে আজ সন্ধ্যে বেলা তামাক টামাক দিতে ব'লে দাও। ভদ্রলোকেরা আস্‌বেন, যাতে খাতির টাতির হয় সে দিকে দৃষ্টি রেখ, তোমায় আর বেশী কি বল্‌ব বল?"

খগেন্দ্রবাবু জগুয়াকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন, "আজ নন্দকাকার বাড়ী বিয়ে আছে, তুই সেখানে যা, কাজ কর্ম্ম দেখে শুনে কর্‌বি; সকলকে তামাক টামাক দিবি, বুঝ্‌লি?"

নন্দবাবুর উপর জগুয়ার পূর্ব্ব হইতে রাগ ছিল। তাঁহাকে সে নানাকারণে দেখিতে পারিত না। একবার নন্দবাবু তাহাকে অধিক মাহিনা দিয়া রাখিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন; সুতরাং জগুয়া খুব স্বাভাবিকভাবে উত্তর করিল, "আমি তামাক সাজতে পার্‌ব না। আমি কি চাকর যে, পরের বাড়ী গিয়ে তামাক সাজ্‌ব?"

খগেন্দ্রবাবু রাগিয়া উঠিলেন; বলিলেন, "এখনি তুই বাড়ী থেকে বের বলচি, পাজি ব্যাটা।"

জগুয়ার মনও তখন অভিমানে পূর্ণ হইয়াছিল।—এত দিন পরে সহসা যেন আজ তার কেমন অপমান বোধ হইল। বেচারী আর কোন কথা বলিল না। রাগ ও অভিমান করিয়া তখনই সে বাড়ী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল বটে, কিন্তু মনে মনে ভাবিল, মহামায়া একটু পরে তাহাকে ডাকিয়া আনিবে; কিন্তু সে আর কিছুতেই

আসিবে না। ইতোপূর্ব্বে সে একদিন খগেন্দ্রবাবুর নিকট প্রহার পর্য্যন্ত খাইয়াছিল; কিন্তু তাহাতে সে কিছুমাত্র অসন্তুষ্ট হয় নাই বা অপমানিত মনে করে নাই। আজ নন্দবাবুর বাড়ী তাহাকে চাকরের মত তামাক সাজিতে হইবে, এ হীনতা সে কিছুতেই সহ্য করিতে পারিবে না। কথাটা মনে করিতেও তার ঘৃণা হইতেছিল, সত্য সত্যই সে বাড়ী ফিরিল না। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইল। তাহার মাথার ভিতর একসঙ্গে নানা চিন্তা আসিয়া তাহাকে উদ্ভ্রান্ত করিয়া তুলিল। তখন সে ধীরে ধীরে গ্রামের পরিত্যক্ত এক চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া আশ্রয় লইল। অল্পক্ষণ পরেই সে ঘুমাইয়া পড়িল। বিবাহ বাড়ী উৎসব-আনন্দের কোলাহল ক্ষীণতর হইয়া তাহার ঘুমঘোরের মধ্যে যেন মহামায়ার করুণ আহ্বানের মত শুনাইতেছিল। ভোরের বাতাসে যখন সানাইএর মৃদুমধুর রাগিণী অল্প অল্প শোনা যাইতেছিল, জগুয়া কি স্বপ্ন দেখিয়া তন্দ্রাবস্থায় বলিয়া উঠিল, "হাঁ, মা তুমিই বল, আমি কি চাকর যে, যার তার তামাক সাজ্‌ব, জল তুল্‌ব? আমি যে, তোমার ছেলে, তুমি যা বল্‌বে তাই কর্‌ব।" এই সময় পার্শ্বের জানালা হইতে একটি বালক উচ্চ হাস্য করিয়া বলিয়া উঠিল, "ওরে কানাই, দেখ্‌বি আয়, আমাদের খেলাঘরে কে ঘুমাইয়া কত কি বক্‌ছে"। তাহাদের কথাবার্ত্তায় জগুয়ার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। সে উঠিয়া দেখিল তখন সকাল হইয়া গিয়াছে। তখন সে অন্যমনস্কভাবে তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল।

এখনই তুই বাড়ী থেকে বেরো বলছি! (৯০৭ পৃষ্ঠা)

(৮)
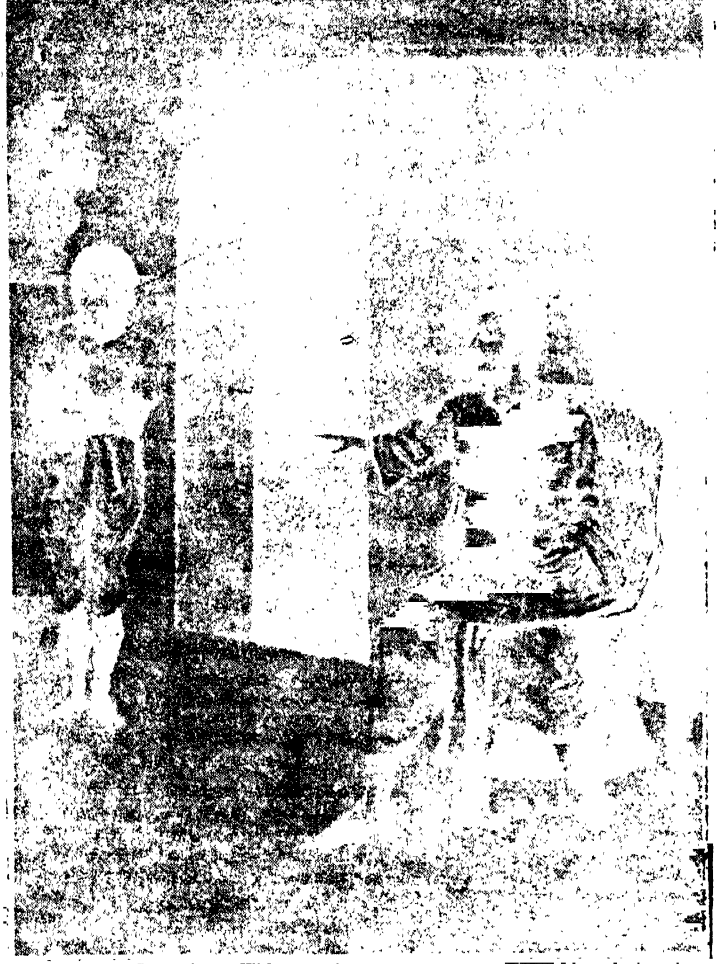
শ্রাবণ মাস। সন্ধ্যার অনতিকাল পূর্ব্ব হইতেই অন্ধকার নিবিড় কাল মেঘের জাল ফেলিয়া চতুর্দ্দিক্ আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎস্ফুরণের সঙ্গে সঙ্গে চক্রবালে সূর্য্যাস্তের সুবর্ণরেখার ক্ষীণ ম্লান আভাটুকু অল্প অল্প দেখা যাইতেছিল। শ্যামল বনরাজির অভ্যন্তরে নিবিড় অন্ধকার আরও ঘনাইয়া আসিতেছিল; মহামায়ার সুবর্ণোজ্জ্বল মুখকান্তির উপর বিষাদছায়া পড়িয়া যেন সমস্ত সংসারটি অন্ধকার করিয়া রাখিয়াছিল।

তিন মাস জগুয়া আর আসে নাই। সে কোথায় চলিয়া গিয়াছে। মহামায়া পুত্রহারা জননীর মত উদাসীন

হইয়া কত কি ভাবেন। খগেন্দ্রবাবুকে আর জগুয়ার কথা একবারও বলেন না। খগেন্দ্রবাবু দেখিলেন, মহামায়া অত্যন্ত অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছেন। সে উৎসাহ, সে হাসি, সে বিদ্রূপ আর কিছুই নাই। কোন প্রকারে যেন তিনি সংসারে নিজেকে থাপ খাওয়াইতে প্রয়াস পাইতেছেন। কোন কোন দিন মহামায়া দুই ঘণ্টার অধিক কাল জানালার ধারে গিয়া পথের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া থাকেন। মুখ ফিরাইয়া অঞ্চলে নয়নাশ্রু মুছেন। এক এক দিন আহারের স্থানে উপবেশন করিয়া কি ভাবিয়া তখনই উঠিয়া পড়েন, আর আহার করেন না। খগেন্দ্রবাবু এই সকল ভাবান্তর লক্ষ্য করিলেন। জগুয়া থাকিতে যতটা তার উপর রাগ হইত, এখন আর ততটা রাগ নাই। এক একবার মনে মনে আশঙ্কা হয়, সে বিদেশী এ অঞ্চলে তাহার কেহ নাই—হয় ত কেহ বিশ্বাস করিয়া তাহাকে কাজ না দিতেও পারে, তাহা হইলে সে কি না খাইয়া মরিবে? তাহাকে মারিবার জন্যই কি আমি সঙ্গে করিয়া এ বাঙ্গালা মুলুকে নিয়ে এসেছিনু। মহামায়া যদি খগেন্দ্রবাবুর সঙ্গে ভাল করিয়া কথাবার্ত্তা বলিতেন, জগুয়ার জন্য পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের মত অনুরোধ উপরোধ করিতেন, তাহা হইলে হয় ত খগেন্দ্রবাবু জগুয়ার জন্য এতটা ভাবিতেন না। ভিতরে ভিতরে খগেন্দ্রবাবু জগুয়ার সন্ধান একবার করিয়াছিলেন; কিন্তু কোন সংবাদই পান নাই। সে কথা মহামায়ার নিকট প্রকাশ করিতে তাঁর সাহস হয় নাই।

ইহার কিছু দিন পরে খগেন্দ্রবাবু অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়িলেন। দুই ক্রোশ দূরে ডাক্তারের বাড়ী। রোগ ক্রমে বাড়িয়া উঠিল। তখন দুই বেলা ডাক্তারের নিকট যাওয়া প্রয়োজন হইয়া পড়িল। পাড়ার লোকেরা দুই এক দিন করিয়া যখন বুঝিলেন ব্যারাম কঠিন, সারিতে অনেক দিন লাগিবে, তখন কেহ বড় একটা দেখা দিতেন না। মহামায়া পয়সা দিয়া লোক পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিলেন, কিন্তু ডাক্তার তাহার সকল কথা বুঝিতে পারিত না। মহামায়ার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। খগেন্দ্রবাবু একদিন বিকারের ঘোরে বলিয়া উঠিলেন, "মহামায়া, তুমি অত ভেবনা—আমি একবার সেরে উঠি, তারপর এদেশে আর থাক্‌ব না। জগুয়া যদি একবার ডাক্তাকে ডেকে আন্‌ত।"

মহামায়া বহু কষ্টে কান্না চাপিয়া রাখিতে চেষ্টা করিলেন, পাছে চোখের জল পড়িলে স্বামীর অমঙ্গল হয়; কিন্তু তাঁহার বুকের বেদনায়, তাঁহার আঁখিপল্লব সিক্ত না হইয়া থাকিতে পারিল না—ডাক্তার আসিবার কথা ছিল, কিন্তু তিনি আসিতে পারেন নাই। এ কয়দিন মহামায়া তাঁহাদের একজন প্রজা ঠাকুরদাসকে ডাক্তারের বাড়ী যাতায়াতে বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন; কিন্তু সে নিরক্ষর, সকল কথা ঠিক করিয়া বলিতে পারিত না। অনেক সময় অনেক কথা মনেও রাখিতে পারিত না। ডাক্তার ইহাতে বড় রাগ করিতেন। দশখানি গ্রামের ভিতর তিনি একমাত্র পাস-করা ডাক্তার; সুতরাং ম্যালেরিয়া অভিশপ্ত পল্লীগ্রামে তাঁহার অপরাহ্নের পূর্ব্বে কোন দিন আহার হইত না। এরূপ ক্ষেত্রে তাঁহার সকল বাড়ী প্রতিদিন যাওয়া একরূপ অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল।

ঠাকুরদাস আবার গত রাত্রি হইতে জ্বরে পড়িয়াছে; প্রতিবাসীদের সাক্ষাৎ একরূপ নাই বলিলেই চলে। মহামায়া কি করিবেন, ভাবিয়া পাইলেন না। আজ জগুয়ার অভাব তাঁহাকে বিশেষ করিয়া বেদনা দিতে লাগিল। মনে মনে জগুয়ার উপর অত্যন্ত অভিমান হইল।—তার কি মায়া দয়া নাই? আজ তিন মাস চলে গেছে, তা একটিবারও কি সংবাদ নিতে নেই—পেটের ছেলে হ'লে কি সে এমন নিশ্চিন্ত হ'য়ে থাক্‌তে পার্‌ত?

এই সময় আবার খগেন্দ্রবাবু বলিলেন, "জগুয়া, তুই কার কথা শুনিস্‌নি—আমি সেরে তোর জামা কাপড় কিনে দিব।" এ কথায় মহামায়ার চক্ষে জল আসিল। তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন, "জগুয়া ত এখানে নাই—তুমি কার সঙ্গে কথা বল্‌চ?"

মুহূর্ত্ত মধ্যে খগেন্দ্রবাবুর জগুয়ার কথা আগা গোড়া স্মরণ হইল। তিনি অর্দ্ধনিমিলিত নেত্রে মহামায়ার মুখের দিকে চাহিলেন; সে দৃষ্টি অপরাধীর দৃষ্টির মত। তারপর পাশ ফিরিয়া শুইলেন। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আর একটিও কথা বলিলেন না।

সেদিন সারাদিন বৃষ্টি পড়িতেছিল। সন্ধ্যা হইতে বৃষ্টি আরও জোরে হইতে লাগিল। মহামায়া অনেক চেষ্টা

করিলেও সে ভীষণ জলে, তিন ক্রোশ পথ কাদা ভাঙ্গিয়া কেহ বাড়ীর বাহির হইতে স্বীকার করিল না। বৈকাল হইতে খগেন্দ্রবাবু মোটেই আর কথা বলিলেন না। মহামায়া অনেকবার ডাকিলেন, কিন্তু তিনি সাড়া দিলেন না।

রাত্রে মহামায়া দুর্ভাবনায় অস্থির হইয়া পড়িলেন। তিনি বাগানের দিকে জানালার ধারে গিয়া দাঁড়াইলেন। ঝম্ ঝম্ করিয়া বৃষ্টি পতনের শব্দ হইতেছিল। মাঝে মাঝে মেঘগর্জ্জনে দিগন্ত কম্পিত হইয়া উঠিতেছিল। মহামায়ার সে দিকে দৃষ্টি ছিল না। তিনি ভাবিতেছিলেন, আজ যদি জগুয়া থাকিত, তবে কি আর সে জল ঝড় মানিত, না লোকের খোসামোদ করিয়া হুতাশ হইতে হইত।

ঠিক এই সময় বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিল, সেই ক্ষণস্থায়ী আলোক-রশ্মিতে মহামায়া দেখিলেন তাঁহাদের বাতায়নের নিম্নে যেন কে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। জানালার দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া ভিজিতেছে। মহামায়ার চোর বলিয়া প্রথমে আশঙ্কা হইল; কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইল জগুয়া নয় ত? নিশ্চয় জগুয়া, জগুয়া না হ'য়ে যায় না। তিনি ডাকিলেন, "কেরে দাঁড়িয়ে ভিজ্‌চিস্? জগুয়া না কি?"

ক্ষীণস্বরে কি উত্তর আসিল, জলের শব্দে মহামায়া বুঝিতে পারিলেন না, তবে সে এক পদ সরিল না, তেমনই দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া জানালার দিকে চাহিয়া ভিজিতে লাগিল।

মহামায়া সেই নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে তাহাকে চিনিলেন, সে আর কেউ নয়, তাঁহার জগুয়া। তিনি অধীরকণ্ঠে ডাকিলেন, "ওরে জগুয়া শীগ্‌গির আয়, তোর বাবুর বড় অসুখ।" তারপর তিনি তাড়াতাড়ি লণ্ঠন হাতে করিয়া দরজা খুলিয়া দিতে নীচে নামিয়া গেলেন।

খগেন্দ্রবাবু ক্ষীণকণ্ঠে ডাকিলেন, "হাঁরে জগুয়া, এতদিন কি রাগ ক'রে থাক্‌তে হয়—?"

এ কথা মহামায়া সিঁড়িতে নামিতে নামিতে শুনিতে পাইলেন।

দ্বার খুলিয়া মহামায়া দেখিলেন—জগুয়া। তার সমস্ত শরীর দিয়া জল গড়াইতেছে। সে কি ভয়ানক রোগা হইয়া গিয়াছে। মাথার চুল দীর্ঘ হইয়া পিঠের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। মহামায়াকে দেখিয়া জগুয়া একবারে কাঁদিয়া তাহার পায়ের তলায় লুটাইয়া পড়িল। একটিও কথা বলিল না। মহামায়াও কাঁদিয়া ফেলিলেন; বলিলেন, "উপরে চল, তোর বাবুর বড় অসুখ।"

জগুয়া মহামায়ার পশ্চাতে পশ্চাতে উপরে আসিল। খগেন্দ্রবাবুকে দেখিয়া

"ওগো, জগুয়া এসেছে, তুমি তাকে ডাকছিলে কেন?" (৯১১

স্তম্ভিত হইয়া গৃহের মেঝের উপর বসিয়া পড়িল। তাহার নয়ন হইতে অশ্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

মহামায়া জগুয়ার হাত ধরিয়া স্বামীকে বলিলেন, "ওগো, জগুয়া এসেচে, তুমি তাকে ডাকছিলে কেন?"

খগেন্দ্রবাবু ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলেন। বলিলেন, "ওকে খেতে, দাও খেতে দাও, বড় রোগা হ'য়ে গেছে।"

জগুয়া সেই অন্ধকার রাত্রিতে বৃষ্টির মধ্যে ভিজিতে ভিজিতে তেঁতুল তলায় মহামায়ার নির্দ্দিষ্ট পাথরের দেবতা-গুলির নিকট গিয়া অশ্রুসিক্তনয়নে, তার বাবুর জন্ম কাঁদিয়া পড়িল। গভীর রাত্রে ফিরিয়া আসিয়া সে মহামায়ার হাতে একটি ফুল দিল। মহামায়ার মুখ হইতে কি জানি কেন আকাঙ্ক্ষার ভাব দূর হইয়া গেল।

শ্রীফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

"মেঘ ও রৌদ্র"

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসুর আলোক-চিত্র হইতে।

বিজয়া।

১

সেই—সে যে কত যুগ আগে,
খিন্ন রাজা বিষয়-বিরাগে—
সুরথ ত্যজিলা গেহ—
নাহি সেথা প্রীতি স্নেহ,
সকলেই স্বার্থপর আত্মসুখ মাগে;
তাই বনবাসী ভূপ,
প্রেমে গড়ি অপরূপ,
পূজিলা মানসী মা'রে নব অনুরাগে,
বিজয়ার মহোৎসবে,
বনে পেলে সখা সবে,
ভক্তি প্রীতি স্নেহ সেথা মা'র বরে জাগে।

২

আর—এক শুভ বিজয়ায়,
সিন্ধুতীরে কনক-লঙ্কায়,
শ্রীরাম করিলা পূজা,
মহাশক্তি দশভুজা,
মেগে নিলা শক্তি সিদ্ধি সে অভয় পা'য়;
বানর-রাক্ষস-সনে,
প্রাণভরা আলিঙ্গনে,
পুলকিত রঘুনাথ বিজয়া নিশায়;
বিনাশি অজেয় অরি,
জানকী উদ্ধার করি,
লভিলা বাঞ্ছিত ফল মা'র করুণায়!

৩

আজি সেই বিজয়া আবার,
জীবনের শত তপস্যার—
ক্ষুদ্র আমি প্রাণ ভরি,
পূজিয়া পরমেশ্বরী,
করিলাম বিসর্জ্জন সে প্রতিমা তাঁর!
এবে এস বন্ধুগণ!
স্নেহাস্পদ! গুরুজন!
লহ প্রীতি, লহ স্নেহ, লহ নমস্কার;
মহাপূজা-অবসানে,
মিশি যাব প্রাণে প্রাণে—
ত্রিশ কোটি এক হ'য়ে, আশীর্ব্বাদে মা'র!

৪

আজি কেহ ছোট বড় নাই
সবে সবাকার বোন ভাই,
মায়ের সন্তান সবে,
কেবা কার "পর" রবে,
তাই আজি ভব ভরা সবারি সবাই,
শরতের নীলাকাশে
উজল চন্দ্রমা হাসে,
ওর কাছে উচ্চনীচ শত্রুমিত্র নাই,
অমনি নির্ম্মল প্রাণ
মা' যদি করেন দান,
মরমের ভালবাসা মরতে বিলাই।—
কর মা আনন্দময়ি,
সন্তানে ইন্দ্রিয়জয়ী,
জীবন সংগ্রামে দুর্গে! এই বর চাই,
তোমারি অনন্ত বিশ্ব,
সকলি মঙ্গলদৃশ্য,
মুহূর্ত্ত বুঝিয়া যেন হীনতা হারাই।

৫

আমরা কাহারা?—কহি তবে,
আর্য্যকুলে জন্মিয়াছি ভবে!
সেই যে উদার প্রাণ,
সত্যধর্ম্মে দীপ্তিমান্,
ভক্তি-প্রীতি-কর্ম্মময়, বিনীত গৌরবে;
কঠোর—কুলিশ তুল্য
কোমল—কুসুম ফুল্ল,
সুশীল, সংযমী, সাধু, দেবোপম সবে!

তার রক্তে জন্মিয়াছি ভাই,
পরাপর বোধ যার নাই,

ধর্ম্ম যার লোকহিতে,
উপার্জ্জন দীনে দিতে
গৃহ যার দেবালয় চির শান্তি-ঠাঁই ;
সুখ যার আত্মত্যাগে,
তৃপ্তি যার বিশ্ব যাগে,
অক্ষয় অমর রূপ জরা মৃত্যু নাই—
সে পবিত্র মহাবংশে,
জন্ম লভি দেব-অংশে,
পশুর অধম মোরা, লাজে ম'রে যাই !
তাই বুকে বল করি,
পূজিনু পরমেশ্বরী,
মা' দিলা "বিজয়া" বর, আর ভয় নাই।

৭

তবে আজি শুভ বিজয়ায়,
অসঙ্কোচে তোরা হেথা আয়,
যে আছিস্ দুখী, দীন,
অভাগা শকতিহীন,
আঁখি যার ছল ছল, শত উপেক্ষায় ;
মা'রে যদি ভালবেস,
আমার কুটীরে এস,
সোদর সোদরা হ'য়ে শুভদা নিশায় ;

৮

আজি আর পর কেহ নাই—
আমরা ত সবারি সবাই ;
সকলে সে পূতবংশে
জন্মিয়াছি দেব-অংশে,
হীনতা নীচতা আজি মা'র বরে নাই ;
পূজিয়াছি বিশ্বেশ্বরী
লইয়াছি ভিক্ষা করি,
বিশ্ব প্রীতি—তাই আজি সবারি সবাই,
এই মুক্তি—এই স্বর্গ,
বিজয়ার অপবর্গ,
ভারত-সন্তান মোরা আর কিবা চাই ?

শ্রীনীরকুমার-বধ-রচয়িত্রী

নরওয়ে ভ্রমণ।

কএক বৎসর অতীত হইল আমি কোন বিশেষ কর্ত্তব্যের অনুরোধে গ্রীষ্মকালে ইংলণ্ডে গিয়াছিলাম। তখন লণ্ডনে অনেকের মুখেই শুনিতাম যে, এত দূর আসিয়া "নরওয়ের মত রম্য স্থানটি না দেখিয়া দেশে ফিরিয়া যাওয়া বড়ই আপসোষের বিষয়, কিন্তু সে সময় বন্ধুজনের এ সকল কথায় কর্ণপাত না করিয়া শীতের পূর্ব্বেই দেশে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছিলাম।

ইহার বৎসর দুই পরে আবার ইংলণ্ডে যাইতে মানস করিলাম। এবার কিন্তু নরওয়ে দেখাই আমার এত দূর দেশে যাওয়ার মুখ্য উদ্দেশ্য। অনেকে বলিতে পারেন যে, স্বদেশে এত দেখিবার স্থান থাকিতে বিদেশ, বিশেষতঃ সাত সমুদ্র তের নদী পারে যাওয়ার আবশ্যকতা কি? কথাটা খুবই সত্য এবং স্বদেশের দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখিবার আগে আমাদের মনে এই বিদেশ ভ্রমণের ইচ্ছাটা যে বড়ই অস্বাভাবিক এবং লজ্জাকর তাহাতে আর সন্দেহ কি? তবে কথাটা তলাইয়া দেখিলে অনেকেই হয় ত বুঝিতে পারিবেন যে, আমাদের দেশে আজও স্ত্রীলোকের পক্ষে, সকল জায়গায় যাতায়াত তত সহজ ও সুবিধাজনক হয় নাই। অনেক স্থলে ত এক রকম অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। এজন্য ইচ্ছা সত্ত্বেও অনেকের কোথাও যাওয়া ঘটে না। কিন্তু য়ুরোপের প্রায় সকল স্থানেই সকল রকম যাত্রীদের সুখ ও সুবিধার জন্য বেশ সুবন্দোবস্ত রহিয়াছে। এমন কি একজন প্রাপ্তবয়স্কা রমণীও নির্ভয়ে একাকিনী দূরদেশে যাতায়াত করিতে পারেন, তাহাতে তাঁহার কোনরূপ অবমানিত বা লাঞ্ছিত হওয়ার কোনই আশঙ্কা নাই। এই সব কারণেই নানা দিক্ চিন্তা করিয়া স্বদেশ

ভ্রমণের ইচ্ছা আপাততঃ স্থগিত রাখিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। মনে মনে কিন্তু ভাবিতাম যে, একটা সখের খাতিরে এত অর্থ ব্যয় করা সঙ্গত কি না!

তারপর আর এক ভাবনা হইল যে. আমার খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা মোটেই পাশ্চাত্য দেশ-ভ্রমণের উপযোগী নয়, এ অবস্থায় কি করা কর্ত্তব্য জানিবার জন্য মনকে তাগিদ্ করাতে, সে এ সকল তুচ্ছ বিষয় গ্রাহ্য করিবে না এবং সম্ভবতঃ সকল অসুবিধা ভোগ করিতেও কুণ্ঠিত হইবে না বলিয়া কথা দিল। দৈব দুর্বিপাক ব্যতীত আপনার স্ফূর্ত্তি রক্ষায় কখনও বীতস্পৃহা দেখাইবে না এরূপ স্থির-সংকল্প জানাইল। তখন আমি আশ্বস্ত হইয়া যাত্রার দিন ধার্য্য করিলাম, এবং "City of London" নামক জাহাজে টিকিট্ কিনিয়া একেবারে নিশ্চিন্ত হইলাম। ক্রমে যখন শুনিলাম যে, আমাদের কএক জন আত্মীয় ও বন্ধু এই জাহাজের যাত্রী হইয়াছেন, তখন এই সুদূর পথের দীর্ঘ দিনগুলি কথাবার্ত্তায় কাটিবে ভাল, বুঝিলাম।

তারপর, নির্দ্দিষ্ট দিনে নির্দ্দিষ্ট সময়ে জাহাজ-ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হওয়া গেল। তখন আমাদের ভক্তিভাজন এবং স্নেহাস্পদ প্রিয়জন যাঁহারা আমাদিগকে বিদায় দিতে আসিয়াছিলেন তাঁহাদিগের সকলের শুভ ইচ্ছা এবং স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে সেই সর্ব্বমঙ্গলদাতার স্নেহাশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া যে পাথেয় সঞ্চয় করিলাম, তাহা রাজারাজড়ার ঐশ্বর্য্যকেও তুচ্ছ করিবার স্পর্দ্ধা রাখে দেখিলাম। বস্তুতঃ এই মহা সম্বল সঙ্গে না থাকিলে কেবল আপনার থলের টাকা বৃষ্টি করিয়া এই দূরত্বের সঙ্গের দুশ্চিন্তা, বিয়োগের সঙ্গের বিষাদ সাম্‌লাইবার সাধ্য আমার ছিল কি?

পথে বিশেষ কোন দুর্যোগ হয় নাই বলিয়া লণ্ডনে পৌঁছিতে আমাদের বিলম্ব হয় নাই। সেখানে তখন আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর ছিলেন, সুতরাং তাঁহার বাড়ীতেই গিয়া রহিলাম। তাঁহার বড় কন্যাও আমাদের সঙ্গে নর-ওয়ের যাত্রী হইবেন জানিয়া মনে বড় আহ্লাদ হইল। কেননা জানা শুনা এবং মনের মত সঙ্গী না জুটিলে দেশ-ভ্রমণের সুখ পুরামাত্রায় উপভোগ করা যায় না।

যাত্রীর সংখ্যা অধিক বলিয়া তিনমাস আগে থাকিতেই নরওয়ের টিকিট্ কিনিবার জন্য P. A. O. কোম্পানী তাগিদ্ পাঠাইল এবং সেই অনুসারে "Mantua" নামক জাহাজে আমাদের তিন জনের টিকিট্ কিনিয়া রাখা হইল। জুলাই মাসেই সেখানে যাইবার উপযুক্ত সময়। কেননা সেপ্টেম্বর হইতে সেখানে আর বড় চন্দ্রসূর্য্যের মুখ দেখা যায় না, ক্রমাগত বরফ পড়ে আর অসহ্য শীতে মানুষকে একেবারে জড়সড় করিয়া ফেলে।

১১ই জুলাই আমাদের জাহাজ ছাড়িবার দিন। ঘাটে আসিয়া দেখি, সারি সারি অনেক জাহাজ টেম্‌স্ নদীতে নঙ্গর করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। দেখিয়া সহসা নিজেদের জাহাজখানা চিনিয়া লওয়া একটু মুস্কিল হইবে ভাবিলাম। কিন্তু যাত্রীর দল সম্মুখীন হইবামাত্র সেই বৃহদাকার ভাসমান গৃহ অভ্যাগত সকলকে সসম্ভ্রমে আহ্বান করিতে লাগিল। তৎপর একেবারে আপনার বক্ষের মধ্যে সকলকে স্থান দান করিয়া আত্মীয়তার পরাকাষ্ঠা দেখাইল। সভ্য দেশের ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ কেন যে ইহাদিগকে কোমলাঙ্গীগণের দলভুক্ত করিয়া গিয়াছেন সহসা তাহার কোন সুযুক্তি খুঁজিয়া পাইলাম না, এবং অদ্যাবধি ইহা আমার পক্ষে এক দুর্ভেদ্য রহস্য হইয়াই রহিয়া গিয়াছে। অথবা কেবল শারীরিক সামর্থ্য সকল সময় আভ্যন্তরিক বলের পরিচায়ক নহে। ললিত অঙ্গেও অনেক সময় প্রচণ্ড প্রভুশক্তির প্রাদুর্ভাব দেখা যায়।

জাহাজের কর্ম্মচারীদের কার্য্যের সুশৃঙ্খলতা এবং সুবন্দোবস্ত দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। কোথাও "রা" শব্দটি নাই; যেন কোন অচিন্ত্য শক্তির সাহায্যে সুকৌশলে সকল কাজ সুসম্পন্ন হইয়া যাইতেছে। আমরা জাহাজে উঠিয়াই আপন আপন ক্ষুদ্র কুটরীর তল্লাসে মনোনিবেশ করিলাম। ছয়শত ষাট্‌টি কেবিনের মধ্য হইতে নিজেদের নম্বরের কেবিন বাহির করিয়া লওয়া একটু যেন শ্রমসাধ্য হইয়া পড়িল। নানা পথে বহুবার যাতায়াত করিবার পর আমাদিগের বাসকুটীরের উদ্দেশ পাওয়া গেল এবং তাহার অভ্যন্তরে প্রবেশ মাত্র চিরপরিচিত জিনিষপত্রের সন্ধান পাইয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। তখন আমি আর আমার ভ্রাতুষ্পুত্রী বিছানার উপর বসিয়া একটু আরাম উপভোগ করিতে লাগিলাম।

জাহাজ ছাড়িতে প্রায় বেলা বারটা বাজিল। এবং

নরওয়ে—নিশীথে সূর্য্যালোক।

সেই সঙ্গে মধ্যাহ্ন ভোজনেরও ঘণ্টা পড়িল। আমরা তাড়াতাড়ি উঠিয়া হাতমুখ ধুইয়া ভোজনাগারের উদ্দেশ্যে রওনা হইলাম। কিন্তু আমরা দুইটি ক্ষুদ্র প্রাণী এই প্রকাণ্ড জলযানের উদর রূপ ব্যূহ ভেদ করিয়া গন্তব্য স্থানে পৌছিতে পারিব এমন আশা করিতে পারিলাম না, কাজেই সহযাত্রীদিগের অনুসন্ধানে ব্যস্ত হইলাম। তখন কিন্তু সহসা কাহারও সাক্ষাৎ পাওয়া গেল না, শেষে মনে পড়িয়া গেল যে, আহ্বান মাত্রই আহারের জন্য অগ্রসর হওয়া ইংরেজি সভ্যতার বিরুদ্ধ। অগত্যা কি আর করি, ত্বরিত গতিতে কিছু সংযত হইয়া চলিতে লাগিলাম। তখন অনেক রামা বামার দর্শন পাইয়া তাহাদিগের অনুসরণ করিয়া অবশেষে গন্তব্য স্থানে গিয়া পৌছিলাম। দ্বার দেশেই বিপুল দেহধারী এক শ্বেতাঙ্গ কর্ম্মচারী দণ্ডায়মান ছিলেন। তিনি শিষ্টাচারের বশবর্ত্তী হইয়া সস্মিতমুখে আমাদিগের পথপ্রদর্শক হইলেন এবং আমাদিগকে নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌছাইয়া দিয়া সসম্ভ্রমে বিদায় লইলেন। আমরা তখন নিজ নিজ কেদারায় বসিয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখি একেবারে লোকে লোকারণ্য। তাইত! দেশ দেখিবার সখটা তবে অনেকেরই আছে। এইটি মনে মনে চিন্তা করিয়া বড় আনন্দ পাইলাম। অন্যদিকে আবার, সহযাত্রিগণ নির্ণিমেষ নেত্রে এই তিনটি কৃষ্ণকায় জীবকে নিরীক্ষণ করিয়া কেহ বা হাস্যরসে কেহবা বিস্ময়রসে অভিভূত হইয়া পড়িতেছেন। ভারতবর্ষ হেন সুদূর স্থান হইতে কি আকর্ষণে এই ত্রিমূর্ত্তির এস্থানে আগমন, বুঝিবা 'ইহাদের সমস্যা ইহাই এখন'। যাক্ তারপর আহারান্তে যখন উঠিয়া দাঁড়াইলাম, তখন আবার আমাদিগের পরিচ্ছদ পরিদর্শনে এবং বিশ্লেষণে, আমাদিগের আকৃতি ও প্রকৃতির বিশেষত্ব নিরূপণে, শ্বেতাঙ্গিনীগণ যেন একেবারে সভ্যতার সকল সীমা অতিক্রম করিয়া যাইতে লাগিলেন। আমরা তখন নিরুপায় দেখিয়া উপরের ডেকে গিয়া আশ্রয় লইলাম। ক্রমে ক্রমে সেখানেও পিপ্ড়ার ঝাঁকের মত সকলে আসিয়া সারি বাঁধিয়া জমা হইল। তখন কিন্তু আমরা নদী ছাড়াইয়া অতল জলধিগর্ভে ভাসমান এবং সেই কারণেই বিনা দুর্য্যোগেও আমাদের বৃহৎ জলযান কিঞ্চিৎ দোদুল্যমান এবং তৎসঙ্গে আরোহীদিগের মধ্যে অধিকাংশেরই বিশেষতঃ তনুমধ্যাগণের মস্তক বিঘূর্ণিত, নেত্রদ্বয় নিমীলিত, দেহযষ্টি আনত, কর কখন প্রকম্পিত এবং চরণযুগল জড়িত হইয়া পড়িল। তখন তাহাদের বাক্‌রোধ, সর্ব্বাঙ্গে পীড়াবোধ এবং বিধাতার বিধানে বিরোধ উপস্থিত হইল। এইরূপে উপরে অনন্ত আকাশ আর নীচে অতল জল দেখিতে দেখিতে ক্রমশঃ উত্তরদিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

আমাদিগের যাত্রার তৃতীয় দিন হইতেই প্রকৃতিদেবীর ভাবগতিক কিছু বিভিন্ন দেখা যাইতে লাগিল। নিয়মিত সময়ে নিয়মিত কাজ করা যেন আর তাঁর হইয়া উঠে না। সন্ধ্যার আবির্ভাবের কাল উপস্থিত, অথচ আকাশ হইতে সূর্য্যদেবকে সরাইবার কোনই উদ্যোগ বা ব্যবস্থা তাঁর নাই। এদিকে দিনমণিও দেবীর আদেশ বিনা এক পাও নড়িতে পারেন না। আর লজ্জাবতী সন্ধ্যার ত কথাই নাই; তিনি অন্ধকারের আবরণ ছাড়া আসিয়া দেখা দিতে একেবারেই নারাজ; সে ত জানা কথা। ক্রমে যখন আটটা বাজিতে চলিল, অথচ অন্ধকারের নাম গন্ধও নাই, তখন আমরা ভাবিলাম এ তবে বাস্তবিকই "Land of mid-night sun" তার আর ভুল নাই। স্থানবিশেষে লীলাময়ীর বিচিত্র লীলাখেলা দেখিয়া বিস্মিত ও চমৎকৃত হইতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পরে সূর্য্যদেব যেন পশ্চিমদিকে ঈষৎ হেলিয়া পড়িলেন, তাঁর দীপ্ত রশ্মি যেন ক্রমে নিস্তেজ হইতে লাগিল। তবে কি তিনি অস্তাচলে অন্তর্হিত হইবার উপক্রম করিতেছেন? তাই বটে! তবে তাঁহার এ উদ্যোগে প্রায় প্রহরেক কাটিয়া গেল। তখন আমাদের দেশে রাত্রি দশটা হইবার কথা।

আজ সন্ধ্যা সুন্দরীর একি বেশ! কৈ সে নীলাম্বরী কৈ? ভালে সে সিন্দুর-বিন্দু কৈ? অপাঙ্গের অঞ্জন কৈ? চরণে অলক্তকরাগ কৈ? কিছুই কি নাই? এই কি অভিসারের আয়োজন? অথবা অন্তরের পূর্ব্বরাগের উন্মেষে কে কবে অঙ্গরাগ করিয়াছিল? তাই আজ মুগ্ধা সন্ধ্যা শোভন পীতাম্বরের পবিত্র বিন্যাসে, আর বিম্বাধরের সেই বিমোহন হাসির বিকাশেই বল্লভকে ভুলাইতে বসিয়াছেন। এ প্রসাধনের আড়ম্বর নাই কিন্তু মাধুর্য্য আছে, সৌখীনতা নাই কিন্তু মাদকতা আছে। ক্রমে সে পূর্ব্বরাগের স্নিগ্ধ শুভ্র শোভা গাঢ় অনুরাগের আরক্ত আভায়
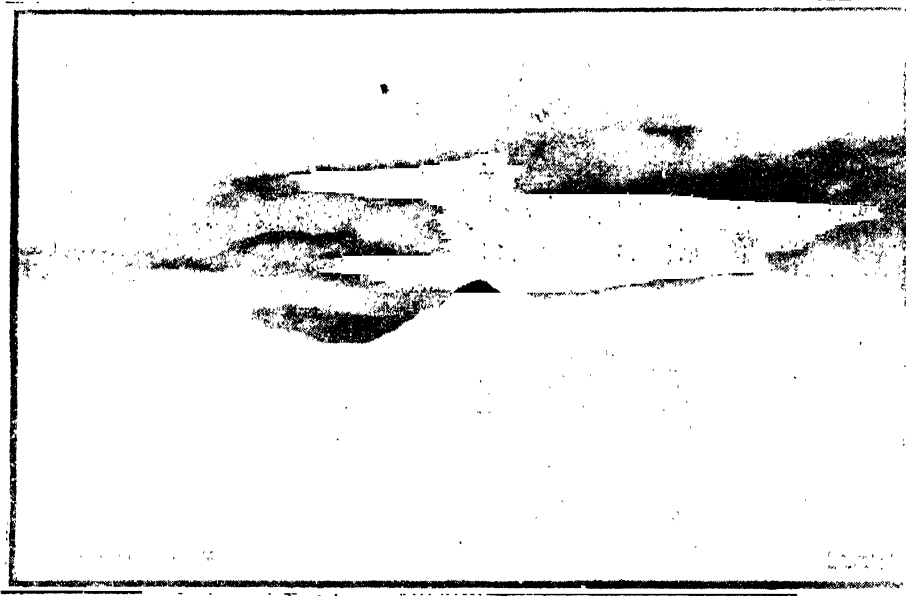
নরওয়ে সমুদ্রের দৃশ্য।

রঞ্জিত হইয়া উঠিতে লাগিল। এ কি অপূর্ব্ব দৃশ্য! এই নির্গমন ও আগমনের অন্তরালে এত সময় কাটে, আগে তা কখনও দেখি নাই। ইহাকেই ইংরেজিতে twilight বলিয়া থাকে।

চিত্ত যখন প্রেমের আবেশে বড় চঞ্চল, অপেক্ষার উৎকণ্ঠা তখন ভারি অসহ্য হইয়া উঠে; তাই প্রিয়-সমাগম বুঝি ভাগ্যে আর ঘটে না ভাবিয়া ভীতা সন্ধ্যা কিছু ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িল, দেখিয়া অংশুমালীর চিত্ত-বিভ্রম ঘটিল! তিনি আর আপনাকে লুক্কায়িত রাখিতে পারিলেন না। অসময়ে আসিয়া যেই দেখা দিলেন অমনই মানময়ীও দুর্জ্জয় মানের দায়ে একেবারে অদৃশ্য হইয়া পড়িলেন! তখন কবির উক্তি মনে পড়িল;—

"অনুরাগবতী সন্ধ্যা দিবসস্তৎপুরঃসরঃ।
অহো দৈবগতি শ্চিত্রা তথাপি ন সমাগমঃ॥

তাই ত! অনন্তকাল ধরিয়া একি লুকোচুরী চলিয়াছে! বিধির একি বিধান! কেন এ অবিচার, কে বুঝিবে?

তার পরের দিনের ব্যাপার আরও চমৎকার! আমরা যখন সূর্য্য আর সন্ধ্যা লইয়া বড়ই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িতেছি, তখন প্রকৃতি দেবী তাঁহার আর এক ইন্দ্রজাল বিস্তার করিতে আরম্ভ করিলেন। ছিলাম আমরা অপার অতল জলে ভাসমান! এ আবার কোন্ মায়াপুরীতে আসিয়া সহসা উপস্থিত হইলাম। এ যে সাগরও নয় সরিৎও নয়, হ্রদও নয়, দীর্ঘিকাও নয়। নরওয়ের যে Phyods এর কথা শুনিয়াছিলাম, এ বুঝি তবে তাই। সহযাত্রিগণ প্রায় সকলেই দূরবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্যে এই অদৃষ্টপূর্ব্ব শোভা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ফিয়ড্ এর দুই পার্শ্বে উচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী কালের অপরিমেয়তা প্রমাণের নিমিত্তই যেন স্থিরভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এই পর্ব্বতসমূহের আবার বিশেষত্ব এই যে, ইহারা বৃক্ষলতাদিতে সমাচ্ছন্ন নয়। ইহারা কেবলই পাষাণে গঠিত, অথচ যেন আপনাদিগের বিশালতার গৌরবেই গৌরবান্বিত হইয়া মস্তক উন্নত করিয়া আছে। কোথাও আবার এ পাষাণ-দেহ ভেদ করিয়া তরতরবাহিনী নির্ঝরিণী বহিয়া যাইতেছে। হিমাচলের বক্ষঃস্থলে দাঁড়াইয়া এ শোভা অনেকেই দেখিয়াছেন, কিংবা বড় বড় হ্রদে ছোট ছোট জাহাজে চড়িয়া অনেকে এই সকল পর্ব্বতীয় দৃশ্য দুই এক ঘণ্টা কাল উপভোগ করিয়া থাকিবেন। কিন্তু জলপথে হাজার দেড়
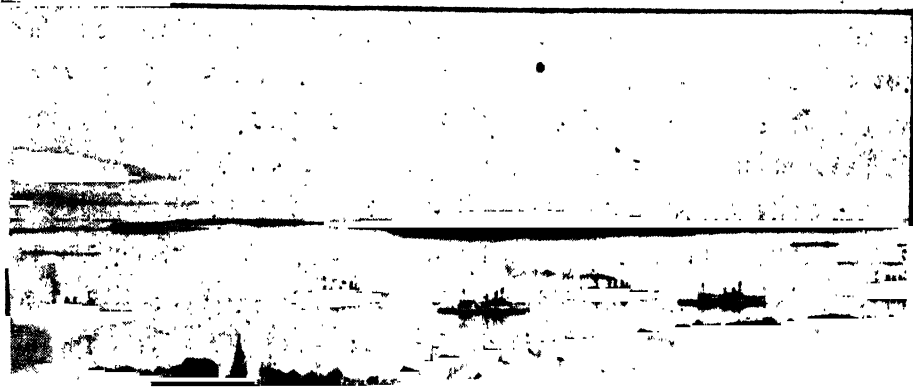
সমুদ্র হইতে মোল্ডীর দৃশ্য।

হাজার আরোহী লইয়া একখানা প্রকাণ্ড জাহাজ আর কোন পার্ব্বত্য প্রদেশের মধ্য দিয়া যাতায়াত করিতে বোধ হয় পৃথিবীর অন্য কোথাও দেখা যায় না।

এই ফিয়ড্‌গুলি যত গভীর তত প্রশস্ত নয়। এই জন্য বিচক্ষণ নাবিকের সাহায্য ব্যতীত এ স্থলে চলাচল সম্ভব নয়। এক এক স্থান এত সংকীর্ণ যে, দূর হইতে মনে হয় বুঝিবা আর অগ্রসর হওয়া যাইবে না। প্রতিমুহূর্ত্তেই আশঙ্কা হইতেছিল, কখন্ বা পাহাড়ের গায়ে লাগিয়া জাহাজখানা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়! আমাদের জলযান কখনও পাশাপাশি কখনও বা সোজা সুজী আবার কখনও বা সর্পগতিতে গমন করিতেছিল। এইরূপে যতই উত্তরাভিমুখ হইতে লাগিলাম, ততই ক্রমে শৈত্য অনুভব করিতে লাগিলাম। তখন অল্প উচ্চতায়ও গিরিশৃঙ্গ তুষারাবৃত দেখা যাইতে লাগিল, যেন শুভ্র বস্ত্রখণ্ড সকল কেহ বিস্তৃত করিয়া রাখিয়াছেন। সেদিন আহারের সময় অতিবাহিত হইয়া যাইতেছে অথচ সেদিকে কাহারও ভ্রূক্ষেপ নাই। একি তন্ময়তা! এ কোথায় আসিলাম! কোথা হইতেই বা আসিলাম! আর মনে পড়ে না। দুই দিকে চাহিয়া দেখি, চক্ষু আর ফিরাইতে পারি না। ক্রমে উচ্চ হইতে উচ্চতর শৈলশ্রেণী দেখা যাইতে লাগিল। আমরা যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম, ততই যেন অচল হইয়াও এই মহীধরগণ মহানুভব পুরুষের মত সরিয়া সরিয়া আমাদিগের যাতায়াতের স্থান করিয়া দিতে লাগিল। বিদেশী অতিথির প্রতি এই বিচেতন বস্তুরও এবংবিধ শিষ্টাচার দেখিয়া যেন বিস্মিত হইয়া গেলাম।

এইভাবে অসংখ্য গিরি অতিক্রম করিয়া কুক্ কোম্পানী কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট প্রথম গন্তব্য স্থান-moulde এ গিয়া পৌঁছিলাম। তখন বড়ই দুর্যোগ! আকাশে ঘনঘটা আর নীচে ঝড় ঝাপ্টা! কিন্তু ব্যবসাদার কোম্পানীর ত আর দেবতার কোপ কটাক্ষ মানিলে চলে না। নির্দ্দিষ্ট সময়ে নির্দ্দিষ্ট স্থান পরিভ্রমণ করাইয়া বিজ্ঞাপিত কালে আবার সকলকে প্রত্যাবর্ত্তন করাইতেই হইবে, পূর্ব্ব হইতেই এরূপ বিজ্ঞাপন যাত্রীদিগের গোচরার্থ দেওয়া হইয়া থাকে। অন্যথা, যে কেহ ফিরিতে বিলম্ব করিবে, তাহাকেই যূথচ্যুত জন্তুর মত সেই ঘোর অজ্ঞাত দেশে অনিচ্ছায় অধিষ্ঠান করিতে হইবে। সুতরাং এ অবস্থায়, এই দুর্দ্দিনে নূতন স্থানের নব দৃশ্যই দেখিতে চাই, কি নিশ্চিন্ত মনে যথাস্থানেই বসিয়া থাকি, সকলেরই এই এক মহা সমস্যা

দাঁড়াইল। কুক্ কোম্পানীর ভেরী অতি কর্কশস্বরে সকলকে কূলে যাইতে আহ্বান করিতে লাগিল; কিন্তু তাহাতে বড় কেহ কর্ণপাত করিলেন না। কেবল কএকজন তরুণী শ্বেতাঙ্গী গৌরাঙ্গী তাঁহাদিগের বয়সোচিত অদম্য উদ্যমের বশবর্ত্তিনী হইয়া আপন আপন মনোমত সঙ্গীকে সঙ্গে লইয়া এক ক্ষুদ্র তরণীর সাহায্যে উত্তাল তরঙ্গ ভেদ করিয়া তীরে যাইতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু বিধি বিবাদী হইলে, বিঘ্ন-বিপত্তি এড়ায় কার সাধ্য? তবে নবীন উৎসাহের চেষ্টারও বিরাম নাই। কিন্তু ক্রমে তাঁহাদের সকল কলকৌশল ব্যর্থ হইল। তরঙ্গের ক্রমাগত আঘাতে বিক্ষুব্ধ বিতাড়িত হইয়াও সে ক্ষুদ্র তরণী এক পাও অগ্রসর হইবার বাসনা জানাইল না। এ যেন মুগ্ধা নববধূর চারিত্র্যবৃত্তি অবলম্বন করিল দেখিয়া আর হাস্য সংবরণ করা গেল না। অগত্যা ক্ষুণ্ণ মনে নবীনারা ফিরিয়া আসিলেন। এ যাত্রার মত এ স্থান দেখিবার আশা পরিত্যাগ করিয়া আমাদের mantua সেই ফিয়ড্ হইতে বাহিরে আসিয়া আবার সাগরের সঙ্গ লইল।

এবার একটু লম্বা পাড়ি। তিনদিন তীরের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই। যতই উত্তরে যাইতে লাগিলাম ততই কেবলই দিনের আলো। লণ্ডন ছাড়িয়া অবধি রাত্রির মুখ বড় দেখি নাই। তা ছাড়া সন্ধ্যা আসিয়া যে একটু উঁকিঝুঁকি মারিত, এখন সে পালাও বন্ধ বলিলেই হয়। এ কি দেশ! সকাল নাই, বিকাল নাই, রাত্রি নাই, নক্ষত্র নাই, অন্ধকার নাই অন্ধকারের আভাসও নাই। আকাশে 'এক ভানু' বিরাজ করিতেছেন। সকলেরই আলোতে যেন কি রকম অরুচি ধরিয়া গেল। শীতের দেশ সূর্য্যের উত্তাপ ভাল লাগিবারই কথা; কিন্তু তা বলিয়া চব্বিশ ঘণ্টা, কারই বা তাপ সয়? ঘড়ীর কাঁটার হিসাবে যখন চতুর্থ দিনের দেখা পাওয়া গেল, তখন আবার এক ফিয়ড্‌এ আসিয়া পড়িলাম। দুই দিকে পাহাড়ের গায়ে ঘর বাড়ী রাস্তা ঘাট দেখিয়া প্রাণটা জুড়াইল। আবার দূরবীক্ষণ হাতে লইবার ধুম পড়িয়া গেল। আরামকেদারা ছাড়িয়া সকলেই আবার চট্‌পট্ আসা যাওয়া করিতে লাগিল। মুখের ভাব দূরে গিয়া কৌতূহলের হৃষ্টতায় পরিপূর্ণ হইল। যথানিয়মে সকলে পান আহার করিয়া দিনান্তের ঘড়ীর দিকে চাহিয়া দেখিল প্রায় এগারটা, অর্থাৎ আমাদের দেশের তখন রাত্রি দুই প্রহর। আশে পাশে কোথাও আর কৃত্রিম আলো দেখা গেল না। আস্তে আস্তে সকলেই আপন আপন কেবিনের আশ্রয়ে যাইতে বাধ্য হইলেন। নিয়ম-লঙ্ঘনের ভয়ে আমরাও সে পথই অনুসরণ করিলাম। কিন্তু রাত্রির অন্ধকার ভিন্ন ঘুমাইব কি করিয়া? সময় মত দিবানিদ্রার ত কিছু কসুর হয় নাই? তবে এখন উপায়? ভাবিলাম যদি পুস্তক পড়িতে পড়িতে ঘুমটা আসে। বিনা প্রদীপেই ঘণ্টা খানেক পড়া গেল, তখন আমাদের পরিচারিকা আসিয়া অসময়ে আমাদিগের অধ্যয়নে এ হেন অভিনিবেশ দেখিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিল, "মহাশয়ারা পরদাগুলি ভাল করিয়া টানিয়া দিয়া শুইয়া পড়ুন। আর বসিয়া থাকিবেন না"। আমরাও "তথাস্তু" বলিয়া শয্যাশায়িনী হইলাম এবং নিদ্রাদেবীও সহজেই দয়া করিলেন। হঠাৎ জাগিয়া দেখি ভানুদেবের আর কাণ্ডাকাণ্ড বোধ নাই বা সময় অসময় জ্ঞান নাই। তিনি আমাদের মুখের উপর তীক্ষ্ণ রশ্মিজাল ফেলিয়া দিয়া মহা উৎপাত করিতেছেন। আবার পরদার আড়ালে থাকিয়া আমাদের এই বিড়ম্বনা দেখিয়া যেন আর হাস্য সংবরণ করিতে পারিতেছেন না। আমরা বিদেশী লোক। হেথাকার লীলাখেলা কি বুঝিব, ঘুম ভাঙ্গিয়া রৌদ্রের মুখ দেখিলেই অনুমান করিয়া লই যে, বেলা অনেক হইয়াছে। আজও ঘুমের ঘোরে কোন্ আলোর দেশে যে আসিয়াছি সে কথা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিলাম। কাজেই চট্‌পট্ উঠিয়া আমার ভ্রাতুষ্পুত্রীকে ডাকি। তুলিয়া দুইজনে স্নানাদি সমাপ্ত করিয়া প্রাতরাশের আশায় প্রস্তুত হইয়া ঘণ্টাধ্বনির অপেক্ষায় বসিয়া গল্প করিতে লাগিলাম। "কৈ কারো ত সাড়া-শব্দ পাওয়া যাইতেছে না!" এই ভাবিয়া পরিচারিকাকে ডাকিবার উদ্দেশ্যে দেয়ালের বৈদ্যুতিক ঘণ্টা বারংবার টিপিতে লাগিলাম। কোন ফল হইল না, তখন একটু বিরক্তি বোধ হইল। তাইত! 'কালা আদ্‌মীকে' বুঝি এরা 'কেয়ারই' করে না। আচ্ছা! বক্‌সিসের বেলা বোঝা পড়া আছে। এরূপে সেই বেতনভোগী ভৃত্যের উপর অযথা বাক্যব্যয় করিয়া

ধাঁ করিয়া ঘড়ী খুলিয়া দেখি, ওমা! কি হবে! তিনটাও যে বাজে নাই! তখন দুইজনে একচোট খুব হাসিলাম। তারপর করা কি? পরদা সরাইয়া দেখি আমাদের দেশের এক প্রহর বেলার মত রৌদ্রের তেজ! আর কি শোওয়া পোষায়? শুইলেও যে চোখ বোজা দায়। তখন কঠোর তপস্যার ফলে নিদ্রাদেবী করুণা করিলেন, আমরাও সেদিনকার মত বাঁচিলাম। এবার একেবারে আহারের আহ্বানের সঙ্গে গাত্রোত্থান করা গেল। ভোজনের আয়োজন করিতে করিতে আমাদিগের গত রাত্রের অথবা দিনের সমস্ত ব্যাপার আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিয়া আশে পাশের সকলকে হাস্যরসে কিঞ্চিৎ অভিভূত করিলাম।

আহারান্তে সকলেই প্রথম সিঁড়ির উপরে দেয়ালে নোটিস্ পড়িবার জন্য ঝুঁকিয়া পড়িলেন। তাহাতে লেখা জাহাজ আছে "সম্প্রতি ট্রম্সম নামক স্থানে, পৌছিবে এবং যাহারা পারে নামিতে ইচ্ছা করেন, প্রস্তুত হউন।" জাহাজের গতি ক্রমেই শিথিল হইতে লাগিল এবং তাহাতেই অনুমান করা গেল যে আমাদের গন্তব্য স্থান নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। বড় জাহাজ হইতে তীরে নামিবার জন্য টেনভার (অর্থাৎ ছোট ছোট ষ্টিম্ লান্স্) আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই থাকিত। খেয়া পারের মত যাত্রীরা উহা দ্বারা পার হইত। জাহাজ ভিড়িবামাত্র আমরা তিনজনে প্রথম দলের সঙ্গেই নামিলাম এবং ৩০।৪০ খানা লেণ্ডো গাড়ী আমাদের অপেক্ষায় আছে দেখিয়া তাহা হইতে নিজেদের নম্বরের গাড়ী খুঁজিয়া বাহির করিয়া তাহাতে উঠিয়া বসিলাম। ঘোড়াগুলি চড়াই রাস্তায় অনায়াসেই চড়িতে লাগিল। তখন মনে হইতেছিল যে, এ মর্ত্ত্যধাম ছাড়িয়া বুঝি কোন দেবলোকে গমন করিতেছি। সেদিন আকাশ মেঘশূন্য। এই বাহিরের জ্যোতিঃ আজ যেন অন্তর মধ্যে প্রবেশ করিয়া সেখানকার সকল অন্ধকার দূর করিয়া দিয়া এক অপূর্ব্ব আনন্দে মাতাইয়া তুলিল। আজ আর ক্ষুদ্রতা সেখানে তিষ্ঠিতে পারিতেছে না, হিংসা দ্বেষের আর স্থান নাই। আজ এই ক্ষুদ্র মানবহৃদয়কে যেন এক মহান্ ভাবে মহীয়ান্ করিয়া তুলিয়াছে। আজ সে দিব্যচক্ষু লাভ করিয়া যেন সকল অদৃশ্য বস্তুর সন্ধান পাইয়াছে, সে আর সীমাতে আবদ্ধ থাকিতে চাহিতেছে না। তাহার দিব্য কর্ণ আজ চরাচর সকলের আহ্বান জানিতে সমর্থ হইয়াছে। আজ অদ্রিরাজি হস্তপ্রসারণপূর্ব্বক আমাদিগকে আসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতেছে। আর কলকল-বাহিনী নির্ঝরিণী প্রগল্‌ভা রমণীর মত আমাদিগের কুশল জিজ্ঞাসা করিতেছে। আমরা প্রকৃতি-দেবীর ইঙ্গিত মত এক নিভৃত কক্ষে গিয়া তাহার আতিথ্য স্বীকার করিলাম। চারিদিকে হাসির লহরী কর্ণে প্রবেশ করিতেছে, আর ভাবিতেছি আমরা দীন ভারতবাসী, আমাদের ত এত আনন্দ করা অভ্যাস নাই! কোন্ তপস্যার ফলে এ রাজ্য দুঃখের বার্ত্তা জানে না? এ দেশে মেঘ নাই, বৃষ্টি নাই, অন্ধকার নাই, অমাবস্যাও নাই। এত প্রাণভরা হাসি আর আকাশভরা আলো ত আর কখন দেখি নাই। এখানে প্রকৃতি-সুন্দরীর এই থরথর কম্পন কি শৈত্য নিবন্ধন, না সাত্ত্বিক ভাবের নিদর্শন, সহসা বুঝিতে পারিলাম না। আজ বুঝিলাম

"বিশ্ব সাথে যোগে যোগে যেথায় বিহর,
সেইখানে যোগ আমার সাথে তোমার"।

তাই এই দেশীয় ভাষার অজ্ঞতা হেতু এতদিন যে বড় বিরত ছিলাম, আচম্বিতে যেন সে বাঁধ খুলিয়া গেল। আজ ভাষার বিভিন্নতায়ও মনের ভাব ব্যক্ত করা কঠিন হইতেছে না। মানুষ যাহা বোঝে না, আজ উদ্ভিদ্ জঙ্গম তাহা বুঝিয়া আমাদিগকে কত আদর করিতেছে, কত আশীর্ব্বাদ করিতেছে, কত কথা জানাইতেছে! ভাষা যেখানে মূক, অন্তরের ভাব সেখানে মুখর, শরীর যেখানে নিশ্চল স্পন্দহীন, আত্মার সেখানে গতি বড় দ্রুত। এ কাহার লীলা? এ কোন্ দিব্য শক্তির প্রভা? (ক্রমশঃ)

শ্রীমতী বিমলা দাশগুপ্তা।

মিলন।

১

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতের অহিফেন লইয়া চীনের সহিত ইংলণ্ডের যে যুদ্ধ হইয়াছিল তাহাতেই চীনের দুর্ব্বলতা সপ্রকাশ হইয়াছিল। তখনই বুঝা গিয়াছিল, চীনের অধঃপতন হইয়াছে—সংস্কার বা সর্ব্বনাশ অবশ্যম্ভাবী। তাহার পর ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে চীনের সহিত যুদ্ধে জাপান জয়ী হইল। চীন আবার ভূমি ও অর্থ দিয়া অপমানিত অস্তিত্ব রক্ষা করিল। সেও য়ুরোপীয় শক্তিপুঞ্জের মধ্যস্থতায়। জাপানের সহিত যুদ্ধ মিটিল; কিন্তু রুশিয়ার রাজ্যলাভ-লালসা নিবৃত্ত হইল না। রুশিয়া আর্থার বন্দরে জাঁকিয়া বসিল। তখন য়ুরোপীয় শক্তিপুঞ্জ কালনেমীর লঙ্কাভাগের মত চীনে স্ব স্ব প্রভাব অনুসারে বাটোয়ারার উদ্যোগ করিলেন। তখনই চীন আপনার অবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে সচেষ্ট হইয়াছে। বক্সার-বিদ্রোহে তাহারই পরিচয় পাওয়া যায়। যে মাঞ্চুরাজবংশ চীনে রাজত্ব করিতেছিল—যাহারা চীনবাসীকে পদানত করিয়া তাহাদিগকে পরাধীনতার চিহ্নরূপে বেণীধারণে বাধ্য করিয়াছিল—বক্সার-বিদ্রোহ সেই মাঞ্চুবংশের বিরুদ্ধে চীনবাসীর যুদ্ধোদ্যম—জাতীয় বিপ্লব। কিন্তু নেতৃবৃন্দের কার্য্যের দোষে য়ুরোপীয় শক্তিপুঞ্জ সে বিপ্লবের স্বরূপ-নির্ণয়ে অসমর্থ হইয়া তাহা য়ুরোপীয় শক্তির বিরুদ্ধে অনুষ্ঠান মনে করিলেন। ফলে সেই শক্তিশালী শক্তিপুঞ্জের সমবেত চেষ্টায় বক্সার-বিদ্রোহ অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইল। বক্সার-বিপ্লব-বহ্নি নির্ব্বাপিত হইল; কিন্তু চীনবাসী-দিগের মনের অগ্নি নির্ব্বাপিত হইল না—ধূমায়িত হইতে লাগিল। চীনে পাশ্চাত্যশিক্ষার ব্যাধিমূলক স্বাধীনতার প্রভাব মনে পড়িল—চীনের জীর্ণ প্রাচীরের মত তাহার জীর্ণ প্রথা ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। মাঞ্চুরাজবংশের উপর লোকের অশ্রদ্ধা বাড়িতে লাগিল। প্রাসাদে পারিষদ-পরি-বেষ্টিত রাজ-পরিবার ঘটনাস্রোতের গতিনির্ণয়ে অসমর্থ হইলেন। তাহার পর রুশিয়ার সহিত যুদ্ধে জাপান জয়ী হইল। প্রাচ্য ভূখণ্ডে নূতন চেতনার চিহ্ন প্রকাশ পাইল। আপনার শক্তিতে সন্দিহান্ প্রাচীর আত্মশক্তিতে প্রত্যয় জন্মিল। পারস্য, তুরস্ক, চীন সকল দেশেই সংস্কার-চেষ্টা দেখা গেল। যে অহিফেন-সেবনের ফলে জাতিটি নিস্তেজ হইতেছিল, চীন সেই অহিফেনের ব্যবহার বন্ধ করিতে বদ্ধ-পরিকর হইল। মাঞ্চুরাজপরিবারের উপর লোকের অশ্রদ্ধা আর বাধা মানিল না। দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিদ্রোহানল জ্বলিয়া উঠিল। চীন প্রজাতন্ত্র-শাসন ঘোষণা করিল। চীনবাসীরা অধীনতার চিহ্ন-বেণী কাটিয়া ফেলিল।

২

বিপ্লবের উদ্দেশ্য যতই ভাল হউক না কেন—তাহার কার্য্যপ্রণালী কখনও শান্তিস্নিগ্ধ—প্রীতিপ্রদ হয় না। তাহার হস্ত রক্তসিক্ত—তাহার নিঃশ্বাসে বহ্নিশিখা—তাহার চরণ-স্পর্শে শস্যশ্যাম দেশে দুর্ভিক্ষের দারুণ দাবানল জ্বলিয়া উঠে। শান্তিশৃঙ্খলাসুন্দর শাসনপ্রণালী তাহার গম্য হইলেও সে অত্যাচার অনাচারের কঙ্করকণ্টকিত পথে গম্য স্থানাভিমুখে অগ্রসর হয়। চীনের বিদ্রোহেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম লক্ষিত হয় নাই।

১৯১১ খৃষ্টাব্দে বিপ্লববহ্নি যখন হ্যানকিং অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল, তখন দূরে তাহার রক্তশিখা দেখিয়া সহরের ম্যাজিষ্ট্রেট ম্যাণ্ডারিন শঙ্কিত হইলেন। এ বহ্নি নির্ব্বা-পিত করা তাঁহার সাধ্যাতীত। তিনি আপনার জন্য ও আপনার নবপরিণীতা পত্নীর জন্য চিন্তিত হইলেন। তিনি অল্পদিন পূর্ব্বে একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির —(টেঙটাই) কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার পত্নীর মত সুন্দরী হ্যানকিং সহরে আর ছিল না। শেষে তিনি স্থির করিলেন, পত্নীকে লইয়া সাংহাই সহরে পলায়ন করিবেন। তিনি রাত্রির অন্ধকারে পলায়নের বন্দোবস্ত করিবার জন্য বাহির হইলেন।

৩

ম্যাণ্ডারিন পলায়নের বন্দোবস্ত করিয়া যখন গৃহে ফিরিতেছিলেন তখন সহরের অপর দিকে কোলাহল শ্রুত হইল। বিপ্লবতন্ত্রী সৈন্যদল সহরে প্রবেশ করিয়াছে।

ম্যাণ্ডারিন ব্যস্ত হইয়া গৃহে চলিলেন। গৃহদ্বারে আসিয়া তিনি দেখিলেন, তাঁহার গৃহ শত্রুগণ কর্ত্তৃক অধি-কৃত! সেনাপতির আদেশে শত্রু সৈন্যদল তাঁহাকে বন্দী

করিল। আপনার গৃহে ভৃত্যের কক্ষে তিনি শৃঙ্খলিত অবস্থায় রাত্রিযাপন করিলেন।

প্রভাতে সেনাদল তাঁহাকে নগরের বিচারালয়ে লইয়া গেল। পূর্ব্বদিন তিনি যে বিচারালয়ে অপরাধীর দণ্ডবিধান করিয়াছেন, সেই বিচারালয়ে বিচারে তিনি বিনা অপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন।

সৈনিকগণ তাঁহাকে ডক্কাস্তম্ভে লইয়া গেল। তাঁহাকে প্রাঙ্গণ-প্রাচীরে বাঁধিয়া ছয়জন সৈনিক বন্দুক তুলিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইল। সেনাপতি শেষ আদেশ দিলেন। ছয়টি বন্দুক হইতে এক সময় সশব্দে অগ্নিরেখা ও গুলি বাহির হইল। ম্যাণ্ডারিনের রজ্জুবদ্ধ দেহ সম্মুখ দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল।

৪

সেইদিন হ্যানকিং সহরে মাঞ্চুরাজার কর্ম্মচারী প্রভৃতি আর কয়জন লোককে গুলি করা হইল।

অপরাহ্নে সৈন্যগণ কয়জন শ্রমজীবীকে ধরিয়া আনিল। শবগুলিকে গাড়ীতে বোঝাই করিয়া তাহারা সহরের বাহিরে প্রান্তরে ফেলিতে লইয়া গেল।

শবগুলি প্রান্তরে ফেলিয়া শ্রমজীবিগণ শবগাত্র হইতে পোষাক খুলিতে লাগিল। তাহারা জানিত, তাহারা এ কাজের জন্য পারিশ্রমিক পাইবে না। যাহাদিগকে গুলি করা হইয়াছিল—তাহারা কেহই দরিদ্র নহে, সুতরাং তাহাদের বেশ মূল্যবান্। শ্রমজীবীরা যখন পোষাক খুলিতেছিল তখন ম্যাণ্ডারিন চক্ষু মেলিলেন। তিনি মরেন নাই—মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে চক্ষু মেলিতে দেখিয়া এ উহার দিকে চাহিল।

ম্যাণ্ডারিন ব্যাপারটা বুঝিলেন, শ্রমজীবিগণকে বলিলেন, "দেখ আমি হ্যানকিং সহরের ম্যাণ্ডারিন—আমি দরিদ্র নহি। তোমরা যদি একটা কাজ কর, তবে আমি তোমাদিগকে আমার যথাসর্ব্বস্ব দিব।"

একজন শ্রমজীবী জিজ্ঞাসা করিল, "কি করিতে হইবে?"

ম্যাণ্ডারিন বলিলেন, "আমি সাংহাই সহরে পলাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলাম, পলাইতে পারি নাই। তোমরা যদি আমাকে সঙ্গে লইয়া সাংহাই সহরে হাঁসপাতালে দিয়া আইস, তবে আমি যেখানে আমার ধনরাশি লুকাইয়া রাখিয়াছি তাহার সন্ধান দিব। আমি চলচ্ছক্তিরহিত, তাই তোমাদিগকে সঙ্গে যাইতে বলিতেছি। আমার যাইবার সব বন্দোবস্ত ঠিক আছে।"

শ্রমজীবীরা সম্মত হইল।

সেই দিনই রাত্রির অন্ধকারে শ্রমজীবীরা ম্যাণ্ডারিনকে লইয়া সাংহাই রওনা হইল। তথায় হাঁসপাতালে পৌঁছিয়া তিনি শ্রমজীবীদিগকে তাঁহার অর্থের সন্ধান দিলেন।

হাঁসপাতালে ম্যাণ্ডারিনের একখানি হাত ও একখানি পা কাটিয়া ফেলিতে হইল।

ছয়মাস হাঁসপাতালে থাকিয়া অঙ্গহীন, অর্থহীন, গৃহহীন ম্যাণ্ডারিন যখন বাহিরে আসিলেন তখন তাঁহার দিনপাতের উপায় নাই।

৫

বিপ্লবতন্ত্রীদিগের সেনাপতি ম্যাণ্ডারিনের গৃহেই বাসা লইয়াছিলেন। যে পিশিতপিণ্ডকে আমরা মানুষ বলি, তাহার পশুপ্রকৃতি শিক্ষায়, শঙ্কায়, শাসনে সংযত থাকে বটে; কিন্তু অবসর পাইলেই তাহা আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। রক্তের আস্বাদ পাইলেই ব্যাঘ্রের হিংস্রস্বভাব যেমন প্রবল হয়, অত্যাচার অনাচারের সুযোগ পাইলেই মানুষের পশুপ্রকৃতি তেমনই প্রবল হইয়া উঠে। যুদ্ধকালে বিপ্লবের সময় তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। তখন পুরুষের ধন প্রাণ এবং রমণীর মান কিছুই নিরাপদ্ থাকে না। চীনেও বিপ্লবকালে তাহাই হইয়াছিল। সে অবস্থায় সেনাপতি স্বয়ং ম্যাণ্ডারিন-পত্নীর রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহার গৃহে বাসা না লইলে ম্যাণ্ডারিন-পত্নীকে কি লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইত বলা যায় না। কিন্তু সেনাপতির লালসাকলুষিত অভিপ্রায় তাহার সে লাঞ্ছনা-ভোগ-পথ রুদ্ধ করিল।

পত্নীকে পতির শোচনীয় মৃত্যু সংবাদ দিয়া সেনাপতি যখন সেই রোরুদ্যমানা শোকাতুরা—যুবতীকে আপনার পত্নী করিতে চাহিল, তখন ঘৃণায় ও ক্রোধে তাহার হৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠিল। সেই নরপশুকে নিহত করিয়া মৃত্যুর পথে স্বামীর সহযাত্রী হইবার ইচ্ছা তাহার হৃদয়ে আত্মপ্রকাশ

করিল। যুবতী একখানি ছুরিকা তুলিয়া লইল। কিন্তু তাহার কম্পিত হস্ত হইতে ছুরিকা পড়িয়া গেল।

সেনাপতি তাহা লক্ষ্য করিল। যুবতী বন্দী হইল।

৬

বন্দী হইয়া যুবতী যখন প্রতি মুহূর্ত্তে অত্যাচারের আশঙ্কা করিয়া দীর্ঘ দিন ও দীর্ঘতর রাত্রি কাটাইতেছিল সেই সময় প্রথম আগত সেনাদল স্থানান্তরিত হইল।

যুবতী মুক্তি পাইল। সে স্বাধীনতা পাইল বটে; কিন্তু তখন সে স্বামী, গৃহ, অর্থ সবই হারাইয়াছে। তাহার পিতা তখন সপরিবারে পলায়িত। যুবতী তাহার কোনও সন্ধান পাইল না। তাহার স্বামীর কোন বন্ধু দয়াপরবশ হইয়া তাহাকে আশ্রয় দিলেন। সেই গৃহে যুবতী আপনার ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবিতে লাগিল। ছয়মাস কাটিয়া গেল।

ছয় মাস পরে হ্যানকিং সহরে শান্তি সংস্থাপিত হইলে যুবতীর আশ্রয়দাতার একজন বন্ধু তাঁহার সংবাদ লইতে আসিলেন। তিনি কিউকিয়াং সহরের সর্ব্ব প্রধান মহাজন। তিনি বন্ধুগৃহে যুবতীকে দেখিলেন - তাহার পরিচয় পাইলেন। যুবতীর অর্থ ছিল না; কিন্তু রমণীর পক্ষে যাহা অর্থ অপেক্ষা অধিক মূল্যবান সেই রূপের অভাব ছিল না।

মহাজন যুবতীকে বিবাহ করিয়া কিউকিয়াং সহরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। আজন্ম সুখলালিতা যুবতী কিছুদিন দারুণ দুঃখভোগের পর আবার সুখের মুখ দেখিতে পাইল।

৭

মহাজনের সহিত যুবতীর বিবাহের এক বৎসর পর ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে কিউকিয়াং সহরে বিপ্লববহ্নি জ্বলিবার সম্ভাবনা দেখিয়া মহাজন আপনার পত্নীকে সাংহাই সহরে পাঠাইয়া দিলেন।

যুবতী একবার এই সাংহাই সহরে পলাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহার পর হইতে তাঁহার জীবনে কি সব বিস্ময়কর ঘটনা ঘটিয়াছে। সেই কথা ভাবিতে ভাবিতে তিনি অন্যমনস্কভাবে রাজপথ দিয়া সহরের পশ্চিম ধারের দিকে যাইতেছিলেন। পথে একজন ছিন্নবাস অঙ্গহীন ভিক্ষুক ভিক্ষা চাহিল। যুবতী ভৃত্যের নিকট হইতে ব্যাগ লইয়া ভিক্ষুককে একটি মুদ্রা দিতে যাইতেছে এমন সময় ভিক্ষুক বলিল, "তুমিও আমাকে চিনিতে পারিলে না? আমি যে তোমার স্বামী!"

যুবতী ভিক্ষুকের মলিন মুখের দিকে চাহিলে তাহার পর মূর্চ্ছিতা হইল। মুদ্রাগুলি ছড়াইয়া পড়িল।

জীর্ণবাস ভিক্ষুকের নিকটে রাজপথে বহুমূল্য বেশধারিণী যুবতীকে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িতে দেখিয়া রাস্তায় লোক জমিয়া গেল—পাহারাওয়ালাও আসিল।

যুবতী যখন সংজ্ঞা লাভ করিল, ভিক্ষুক তখন চিত্তচাঞ্চল্য জয় করিয়াছেন। তিনি যুবতীকে বলিলেন, "আমার অদৃষ্টে যাহা ছিল হইয়াছে। আমি তোমার সুখের পথে কণ্টক হইব না। তুমি আমার জন্য জীবন দুঃখময় করিও না।"

যুবতী কাঁদিতে কাঁদিতে ভিক্ষুককে আলিঙ্গন করিয়া বলিল, "তাহা হইবে না।"

সে মহাজনকে সকল কথা জানাইবার জন্য সহযাত্রী কর্ম্মচারীকে কিউকিয়াং সহরে পাঠাইয়া দিল। স্বয়ং সাংহাইতেই রহিল।

* * * * * *

অল্পকাল মধ্যেই এই বিস্ময়কর বার্ত্তা সহরে প্রচারিত হইল। তখন চীনবাসী ও য়ুরোপীয় সকলে মিলিয়া যে অর্থ সংগ্রহ করিয়া দম্পতীকে দিল তাহাতে তাহারা কখন দারিদ্র্য-দুঃখ ভোগ করিবে না। যাহারা দম্পতীর জন্য অর্থ দিয়াছিল তাহাদিগের মধ্যে কিউকিয়াং সহরের সেই মহাজনের অর্থের পরিমাণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

মঙ্গলগ্রহ।

আমরা পৃথিবীতে থাকিয়া কেবল চক্ষুর্দ্বারা মঙ্গলগ্রহটিকে যে প্রকার দেখিতে পাই, আর্য্যঋষিগণ সেই দৃশ্যমান্ রূপের উপর কল্পনার সাহায্যে পৌরাণিক গাথার রচনা করিয়াছেন। খালি চক্ষুর্দ্বারা মঙ্গল গ্রহের বর্ণ জ্বলন্ত অঙ্গারের ন্যায় দেখা যায়। সুতরাং ঋষিগণ উহা অগ্নিময় ভাবিয়াছেন।

পরাশর ঋষি বলেন, পূর্ব্বকালে প্রজাপতি সৃষ্টিমানসে নিজের তেজঃ হইতে নির্গত অগ্নির দ্বারা হোম করিয়াছিলেন। সেই হোমাগ্নি পৃথিবী পরিভ্রমণ করিয়া পার্থিব অগ্নির সহিত মিলিত এবং ঊর্দ্ধে উপস্থিত হইয়াছিল। এজন্য আর্য্য জ্যোতিষ শাস্ত্রে উহাকে 'প্রাজাপত্য' এবং 'ভৌম' বলা হইয়াছে। ভূমিপুত্র, ভূমিসুত, অঙ্গারক, লোহিতাঙ্গ, মঙ্গল প্রভৃতি নামে ঐ গ্রহটি পুরাণাদি শাস্ত্রে বর্ণিত। ব্রহ্মার আদেশে ভৌম ভূচক্রে বিচরণ করিতে করিতে বক্রাণুবক্র গতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। লিঙ্গপুরাণমতে মঙ্গল অগ্নির পুত্র, বিকেশীনাম্নী পত্নীর গর্ভে জাত। ইনি লোহিতাঙ্গ এবং যুবা। *

গ্রীক এবং রোম্যান জাতীয়েরা মঙ্গলকে দেব-সেনাপতি বলিয়া জানিতেন, এবং তাঁহারা মঙ্গল গ্রহের বর্ণনা যে প্রকার করিয়াছেন, দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়, অথবা ইন্দ্রপুত্র জয়ন্তের সহিত তাহার অনেকটা সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হয়। সর্ব্বদেশ হইতেই মঙ্গল গ্রহ অঙ্গারবৎ দৃষ্ট হয়, সুতরাং উহার নাম অঙ্গারক হইয়াছে।

বিজ্ঞান মতে মঙ্গল সূর্য্য হইতে উৎপন্ন। আধুনিক জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতগণ সকলে একমত হইয়া বলিতেছেন, যখন পৃথিবীর উৎপত্তি হয় নাই, যে সময়ে এই পার্থিব ভূত সমষ্টি সবিতাদেহ মধ্যে সূর্য্যাঙ্গ স্বরূপে অবস্থান করিতেছিল, যে সময়ে মঙ্গলের কক্ষাপর্য্যন্ত সূর্য্যের বিস্তার ছিল, হার্সেল নেপচুণ, শনি, এবং বৃহস্পতি গ্রহের উৎপত্তি তখন হইয়াছে মাত্র, কোনও অজ্ঞাত কারণে সেই সময়ে একটা মহাপ্রলয় কাণ্ড হইয়াছিল। বৃহস্পতি এবং মঙ্গলের মধ্যবর্ত্তী অপর একটা গ্রহ ছিল। খুব সম্ভবতঃ সেই গ্রহটি কোনও দৈব বিপাকে চূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। কেহ কেহ বলেন, কোনও ধূমকেতুর সহিত সংঘর্ষ হওয়াতে উক্ত গ্রহটি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। পৃথিবীর কোনও শাস্ত্রেই এই প্রলয়কাণ্ডের বর্ণনা নাই। কেমন করিয়া থাকিবে? পূর্ব্বে বলিয়াছি, সেই সময়ে পৃথিবীর জন্ম হয় নাই। যে কারণে নেপ্চুণ, হার্সেল, শনি প্রভৃতির উৎপত্তি হইয়াছিল, পুনর্ব্বার সেই কারণ-জনিত অপর একটি ছোট চক্র সূর্য্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ক্রমশঃ উহা মঙ্গলগ্রহরূপে আকাশমার্গে অবস্থিত হইল। এই গ্রহটির আকৃতি পৃথিবী অপেক্ষাও ছোট হইল। বর্ত্তমানকালেও আমরা দেখিতেছি, মঙ্গলগ্রহ পৃথিবীর ⅙ মাত্র। যে সময়ে মঙ্গলগ্রহ সূর্য্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিল, তখন পৃথিবী সূর্য্যের অঙ্গমধ্যে অবস্থিতি করিতেছিলেন, একথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

কত যুগযুগান্তকালে মঙ্গলগ্রহ জীবের বাসোপযোগী হইয়াছে, তাহা ঠিক করিয়া বলা যায় না। তবে কোটি কোটি বৎসর নিঃসন্দেহই অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। এই সকল অতীতকালের কথা চিন্তা করিলে মানুষের বুদ্ধি স্তম্ভিত হইয়া যায়, আর মানুষ আমরা যে সেই অনন্ত জীবনের অনন্ত স্রোত মধ্যে একটা ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র বুদ্বুদের ন্যায় জন্মিতেছি, এবং মরিতেছি, একথা বুঝিতে পারি।

আমরা এই পৃথিবী হইতে দূরবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা চন্দ্রবিম্বটি যে প্রকার দেখিতে পাই, মঙ্গলগ্রহের উপরিভাগও দূরবীক্ষণ দ্বারা প্রায় সেই প্রকারই সুস্পষ্ট দেখা যায়। অন্যান্য গ্রহ অপেক্ষা মঙ্গলগ্রহ পৃথিবীর নিকটেই অবস্থিত। দুই বৎসর, একমাস, এবং ঊনবিংশ দিবসে মঙ্গলগ্রহ একবার পৃথিবী এবং সূর্য্যের সমসূত্রপাতে অবস্থিত হয়, এবং সেই সময়েই সর্ব্বাপেক্ষা আমাদের নিকটে আসে। সেইকালে উহা পৃথিবী হইতে দেখিবার সুবিধা হয়।

মঙ্গলগ্রহের বর্ণ প্রায় অগ্নির ন্যায় অরেঞ্জ দেখায়। পৃথিবী হইতে দূরত্বানুসারে উহার উজ্জ্বলতা কখনও কম, এবং কখনও অধিক হইয়া থাকে। কোনও সময়ে ইহার ঝিক্ ঝিকে আলোকও দেখা যায়, কিন্তু একটু বড় আকারের দূরবীক্ষণ দ্বারা ঐ গ্রহটি দেখিলে, উহার আলোক আর কম্পিত দেখায় না।

* অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়, এম্, এ, এফ্, আর, এ, এস্ বিদ্যানিধি কৃত "আমাদের জ্যোতিষ।"

চন্দ্র, শুক্র, এবং বুধ গ্রহের ন্যায় সূর্য্যের আলোক দ্বারাই মঙ্গলগ্রহ আলোকিত হয়; এই বিষয়টি প্রমাণিত করিতে বৈজ্ঞানিকদিগের বহু ক্লেশ হইয়াছে। বুধ, শুক্র, এবং চন্দ্রের যে সকল কলাচিহ্ন দেখা যায়, মঙ্গলগ্রহের তেমন কলা নাই।
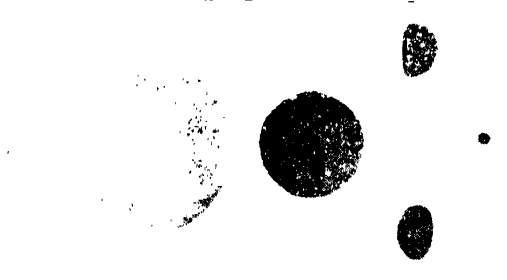
পৃথিবী হইতে মঙ্গলগ্রহের বিভিন্ন আকৃতি।

পৃথিবী হইতে মঙ্গলগ্রহের এই কয় প্রকার আকৃতি দেখা যায়। পৃথিবীর নিকটবর্ত্তী হইলে ১ চিত্রানুযায়ী সম্পূর্ণ গোলাকার, এবং বিশেষ উজ্জ্বল দেখিতে পাওয়া যায়।

২ চিত্রানুযায়ী আকৃতি যে সময়ে দেখায়, মঙ্গলগ্রহ পৃথিবী হইতে মাঝামাঝি দূরে থাকে। ঐ সময়েও উহা ঠিক গোলাকার দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সময়ে মঙ্গল পৃথিবী এবং সূর্য্য মধ্যস্থ হইয়াও অপেক্ষাকৃত দূরে অবস্থিত হয়। ৩, ৪, সংখ্যক চিত্রেই মঙ্গলগ্রহের কলাচিহ্ন দেখান হইল। যে সময়ে ঐ প্রকার কলাচিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়, সেই সময়ে উহা সূর্য্য হইতে ৯০° দূরে দেখায়। দূরবীক্ষণ দ্বারা দেখিলে, ঐ সময়ে উহাকে শুক্লা ত্রয়োদশীর চন্দ্রের মত প্রায় ⅓ অংশ ছায়া দেখিতে পাওয়া যায়। এই সময়ে দেখিলে নিঃসন্দেহরূপে বুঝিতে পারা যায় যে, উহা সূর্য্যেরই আলোক দ্বারা আলোকিত। মঙ্গলগ্রহ যে সময়ে পৃথিবী হইতে বহু-দূরে অবস্থিত হয়, সেই সময়ে উহার আকৃতি ৫ চিত্রানুযায়ী ছোট দেখায়, কিন্তু তখনও উহা সম্পূর্ণ গোলাকার দৃষ্ট হয়।

শুক্র এবং বুধগ্রহের কক্ষা পৃথিবীর কক্ষার অভ্যন্তরে থাকায় ঐ দুইটি গ্রহকে দুইবার সূর্য্যরশ্মিমধ্যে অস্তমিত এবং প্রকাশিত দেখা যায়। কিন্তু মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি প্রভৃতি গ্রহের কক্ষা পৃথিবীর কক্ষার বাহিরে বলিয়া উহাদিগকে একবার অস্তমিত এবং উদিত দেখায়।

পার্শ্বস্থ চিত্রে সূর্য্যকে মধ্যস্থলে রাখিয়া পৃথিবী এবং মঙ্গলের দুইটি পৃথক্ পথ দেখান হইয়াছে। মঙ্গল এক অবস্থায় থাকিলে, উহা পৃথিবীর খুব নিকটে থাকে, এবং রাত্রি দুই প্রহরের সময় উহা মাথার উপর খুব উজ্জ্বল দেখা যায়। মঙ্গল দুই অবস্থায় উহাকে সূর্য্য রশ্মির মধ্যে উহাকে অস্তমিত দেখায়। (মঙ্গল ২) অবস্থায় থাকিলে সূর্য্য হইতে ১৫৯,০০০, ০০০ মাইল, এবং পৃথিবী হইতে ২৫৬,০০০,০০০ দূরে থাকে।

(মঙ্গল ১) অবস্থায় সূর্য্য হইতে ১৩২, ০০০, ০০০ মাইল এবং পৃথিবী হইতে ৩৫, ০০০, ০০০ মাইল ব্যবধান থাকে। মঙ্গল গ্রহের নিজ কক্ষার গতি কোনও সময়ে দ্রুত, মধ্য, স্তম্ভিত এবং বক্র দেখায়।

সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিবার কালে মঙ্গল প্রতি ঘণ্টায় ৫৪,০০০ চুয়ান্ন হাজার মাইল গমন করিয়া থাকে। মঙ্গলের ব্যাস ৪১১৩ মাইল, প্রায় পৃথিবীর ব্যাসের অর্দ্ধেক। আমাদের চন্দ্র অপেক্ষা মঙ্গল ৭গুণ বড়। যে সময়ে মঙ্গল সূর্য্যের ঠিক বিপরীত, অর্থাৎ ৭ম স্থানে থাকে, তখন রাত্রিকালে উহা দেখিবার বড় সুবিধা হয়।
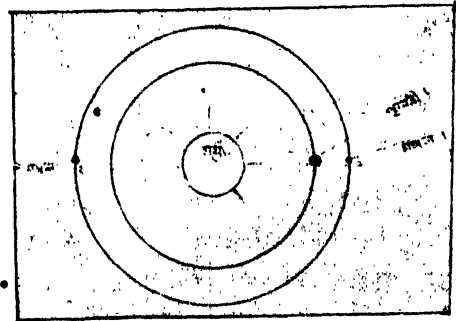
সূর্য্যমণ্ডল।

যে দূরবীক্ষণে ৫০০ অথবা ৬০০ গুণ বড় দেখায়, সেই প্রকার যন্ত্র দ্বারা মঙ্গল গৃহ দেখিলে, বুঝিতে পারা যায়, মঙ্গল গ্রহ প্রায় গোলাকার, বিশেষতঃ উহার অভ্যন্তরে লোহিত এবং সবুজ বর্ণের নানাবিধ চিহ্নসকল দেখা যায়। যে সকল চিহ্ন লোহিত বর্ণের দেখায়, সেইগুলি সম্ভবত বৃক্ষ-সমষ্টি অথবা বনভূমি হইবে। আমাদের এই জগতের অধিকাংশ বৃক্ষ-পত্র সবুজ বর্ণ হইয়া থাকে। জ্যোতির্ব্বিদ্

পণ্ডিতগণের মত এই যে মঙ্গল গ্রহের অধিকাংশ বৃক্ষপত্রের বর্ণ লোহিত হয়। তাঁহাদের এ কথা বলিবার হেতু এই যে, ঐ সকল লাল বর্ণ যে স্থানে দেখায়, নিয়মিতভাবে তাহাদের বর্ণেরও কিছু কিছু পরিবর্ত্তনও দেখা যায়। বৎসরান্তে পার্থিব বৃক্ষসকলের পুরাতন পত্রসকল পতিত হইয়া নব পত্রের শোভা বসন্ত কালে হইয়া থাকে। সেই প্রকারে মঙ্গলগ্রহেরও বসন্ত কালে নব পত্রে বৃক্ষ সকলের শোভা হয়, সেই কারণেই ঐসময়ে মঙ্গল গ্রহবিম্বে লোহিত বর্ণের বড় শোভা দেখিতে পাওয়া যায়। আরও একটি লক্ষণ দ্বারা বুঝা যায় যে, মঙ্গল গ্রহের উপরিভাগে কৃষিকর্ম্মও হইয়া থাকে।

কোনও স্থানে আদৌ লাল বর্ণ ছিল না, কিন্তু দুই তিন মাসের মধ্যেই ক্রমশঃ অনেকদূর পর্য্যন্ত ঈষৎ লোহিত বর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। আবার কিছুকাল পরেই সেই লোহিত বর্ণটুকু অন্তর্হিত হইয়া যায়। পুনর্ব্বার বসন্তকাল আসিলে, সেই স্থান লোহিত বর্ণের দেখায়। সেই সকল পরিবর্ত্তন নিয়মিতভাবেই ঘটিতেছে। এই সকল দেখিয়া জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ বলিয়া থাকেন, নিয়মিত ঋতু পরিবর্ত্তনের সময় ঐ সকল বর্ণের আবির্ভাব এবং তিরোভাব, মঙ্গলগ্রহের উপরিভাগে কৃষি কর্ম্মেরই সূচনা করিতেছে। বৈজ্ঞানিকেরা এই লক্ষণানুসারে বলিয়া থাকেন, মঙ্গলবাসী জীবসকল যে প্রকারেরই হউক, তাহারা আমাদের মতই কৃষিকর্ম্ম দ্বারা নানাবিধ খাদ্য-সামগ্রী উৎপন্ন করিয়া থাকে। যে স্থানে পূর্ব্বে লাল বর্ণ ছিল না, সেই ভূমিখণ্ডে লোহিত বর্ণের শাকাদি উৎপন্ন হইলেই তাহা লাল বর্ণের দেখায়, আবার ঐ সকল উৎপন্ন শস্য মঙ্গলবাসীরা গৃহে লইলেই তৎস্থানে লাল বর্ণের অভাব হয়।

মঙ্গলগ্রহের উচ্চভূমি সকলই প্রায় লোহিত বর্ণের দেখায়। কতকগুলি স্থানে নিয়মিতভাবে ঐ বর্ণের আবির্ভাব ও তিরোভাব দৃষ্ট হয়। আর অধিকাংশ নিম্নভূমি হইতে সবুজবর্ণের বিকাশ হয়। স্যার্ জন্ হার্সেল, পলিমিন্, লক্‌ইয়ার্, প্রক্‌টার্ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ ঐ সবুজ বর্ণের বিকাশ দেখিয়া কৃতনিশ্চয় হইয়া বলিয়াছেন, ওগুলি সমুদ্র। অতএব, মঙ্গলগ্রহের অবস্থা অনেকটা এই পৃথিবীরই মত। উহাতে সমুদ্রও রহিয়াছে। কোনও বৈজ্ঞানিক বলিয়াছেন, ওগুলি সমুদ্র না হইতেও পারে। তাঁহারা বলেন, ঐ সকল নিম্নভূমি হইতে যে সবুজবর্ণ দেখা যায়, উহা লাল বর্ণের সহকারী বর্ণের ভ্রান্তিজ্ঞান মাত্র, * উহা বস্তুতঃ জল নহে। ঐ সকল পণ্ডিতেরা আরও বলেন, মঙ্গল গ্রহের যে স্থানে লাল বর্ণ দেখা যায়, তাহা বৃক্ষ সমষ্টি হইতেও পারে, অথবা লাল বর্ণের প্রস্তরও হইতে পারে। বৃক্ষই হউক, অথবা প্রস্তরই হউক, উহা মঙ্গলগ্রহের উচ্চভূমি হইতে দেখায়, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। সবুজবর্ণগুলি অপেক্ষাকৃত নিম্নভূমি, সেখানে সূর্য্যালোক বড় প্রবেশ করিতে পারে না, এ কারণ তাহা ছায়া বলিয়া, ছায়াস্থান হইতেই সহকারী বর্ণের ভ্রান্তি পরিলক্ষিত হয়।

মঙ্গলগ্রহ। উত্তর ও দক্ষিণকেন্দ্রে তুষারময় উজ্জ্বল ভূমি।

কিন্তু আধুনিক সকল প্রধান বৈজ্ঞানিকগণ সবুজবর্ণগুলিকে সমুদ্র বলিতে বাধ্য হইয়াছেন। তাঁহারা প্রমাণ স্বরূপ বলেন যে, মঙ্গলগ্রহের উত্তর এবং দক্ষিণ কেন্দ্রস্থানে দুই গোলাকার অত্যুজ্জ্বল শ্বেতবর্ণ ভূমিখণ্ড দেখা যায়, ঐ শ্বেতভূমিখণ্ডদ্বয় মঙ্গলগ্রহের মেরুপ্রদেশস্থ তুষারময় স্থান। আমাদের এই পৃথিবীতেও মেরুসন্নিহিত স্থানে ঐ প্রকার তুষারাবৃত বহু দেশ রহিয়াছে। মঙ্গলগ্রহের ঐ তুষারাবৃত স্থানে সূর্য্যরশ্মি পড়িয়া ঐ প্রকার শ্বেতবর্ণ দেখা যায়। অতএব, মঙ্গল গ্রহে যে জল আছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এই জন্যই সবুজবর্ণগুলি সমুদ্র হইবারই অধিক সম্ভাবনা।

যদি কিছুকাল পর্য্যন্ত দূরবীক্ষণ দ্বারা মঙ্গলগ্রহটি দেখা যায়, অল্পকাল মধ্যেই উহার কিছু কিছু পরিবর্ত্তন বুঝিতে

* লেখক-কৃত চিত্রবিদ্যা নামক পুস্তক দ্রষ্টব্য।

দুই দিবসে উহাকে অস্তমিত, এবং আবার দুই দিবস পরে ঐ চন্দ্রটিকে উদিত দেখা যায়। পৃথিবীর চন্দ্রটির সহিত তুলনা করিলে, উহাকে কি অপূর্ব্ব ব্যাপার বলিয়া বোধ হয়!

ফোবস্ নামে অপর চন্দ্রটি এক অহোরাত্রি মধ্যে তিনবার মঙ্গলকে বেষ্টন করেন; সুতরাং সেই চন্দ্রটির পশ্চিম দিকে উদয়, এবং পূর্ব্ব দিকে অস্ত হইয়া থাকে। একটু চিন্তা করিলে ইহা বুঝিতে পারা যায়। মঙ্গলগ্রহের চন্দ্র দুইটির ব্যাপার ভাবিয়া দেখিলে, ইহা বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, রাত্রিকালে মঙ্গলগ্রহের আকাশমণ্ডলে দুই চন্দ্রের খুবই শোভা হইয়া থাকে।

মঙ্গলগ্রহের অবস্থা যতদূর বুঝিতে পারা গিয়াছে, এবং বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা ঐ গ্রহ সম্বন্ধে যে সকল মতামত প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা সংক্ষিপ্তভাবে সে সকল কথাই লিখিলাম। এক্ষণে আরও একটি বিষয় বলিতে বাকী আছে। সেই বিষয়ে এখনও বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে মতভেদও আছে।

আধুনিক অনেক জ্যোতির্ব্বিদ্ বলেন, খুব বৃহদাকার দূরবীক্ষণ দ্বারা মঙ্গলগ্রহকে দেখিলে, ঐ গ্রহের উপরিভাগে বহুদূর বিস্তৃত কতকগুলি জল প্রবাহ দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ জলপ্রবাহগুলি পূর্ব্বতন জ্যোতির্ব্বিদেরা দেখিতে পান নাই। ঐ সকল জলপ্রবাহ আধুনিক সময়েই প্রস্তুত হইতেছে। এই পৃথিবীর মানচিত্রে উনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীতে যে ভাবে রেলবিস্তার হইতেছে, মানচিত্র গুলিতে রেলওয়ে লাইনের বিন্দুযুক্ত চিহ্ন সেইরূপ আছে। হইতেছে। আমরা এই পৃথিবীতে থাকিয়া মানচিত্রবৎ মঙ্গলগ্রহের আকার দূরবীণ দ্বারা যাহা দেখি, সেই দৃশ্যমান মানচিত্রের উপর ঈষৎ হরিদ্বর্ণের কতকগুলি রেখা নূতন অঙ্কিত হইতেছে।

কোনও জ্যোতির্ব্বিদ্ বলেন, উহা ভ্রান্তিদর্শন মাত্র তাঁহারা বলেন, "কৈ আমরা ত উহা আমাদের বৃহদাকার দূরবীক্ষণে দেখিতে পাই না।"—ইহার উত্তরে অপর পক্ষীয় জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতেরা মঙ্গলগ্রহের ফটোগ্রাফ প্রকাশ করিতেছেন, ঐ সকল ফটোগ্রাফে উপরোক্ত চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। সুতরাং যাঁহারা ঐ চিহ্নগুলি পূর্ব্বে অস্বীকার করিতেন, তাঁহারা আপন দূরবীক্ষণের দৃষ্টিশক্তির প্রতি সন্দিগ্ধ হইয়াছেন। আধুনিককালে লেন্স নির্ম্মাতারা কাচখণ্ড সকল এমনই সুকৌশলে নির্ম্মাণ করিতেছেন যে, পূর্ব্বাপেক্ষা দূরবীক্ষণ সকল উৎকৃষ্ট হইতেছে। পূর্ব্বকার বহুমূল্য দূরবীক্ষণে যে সকল ব্যাপার প্রত্যক্ষ করা যাইত না, এক্ষণে অল্পমূল্যের দূরবীক্ষণেও তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। তথাপি এখনও মঙ্গলগ্রহের ঐ সকল নূতন চিহ্নের প্রতি কোনও কোনও প্রধান জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতের সন্দেহ আছে। কিন্তু অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা ঐ চিহ্ন সকল স্বীকার করিতেছেন।

আমরাও মনে করি, পৃথিবীর অবস্থার সহিত মঙ্গল গ্রহের যখন অনেক সৌসাদৃশ্য আছে, তখন উহাতে জীবের আবাস থাকাই সম্ভব।

পৃথিবীর অনেক পূর্ব্বে মঙ্গলগ্রহের উৎপত্তি হইয়াছে, সন্দেহ নাই, বিশেষতঃ মঙ্গলের আকৃতিও পৃথিবী অপেক্ষা ছোট। এই দুইটি কারণে ইহা এক প্রকার নিশ্চয় করিয়াই বলা যাইতে পারে যে, পার্থিব উত্তাপ অপেক্ষা মঙ্গলের উত্তাপাংশ অনেক কমিয়া গিয়াছে। গ্রহাঙ্গের উত্তাপানুসারেই বৃষ্টি বর্ষার অল্পত্ব অথবা আধিক্য হইয়া থাকে। সুতরাং ইহাও একপ্রকার নিশ্চয় বলিতে পারা যায় যে, এই পৃথিবীর মত বৃষ্টি বর্ষা মঙ্গলগ্রহে আর হয় না। বৃষ্টি না হইলে, শস্যাদির উৎপত্তি কেমন করিয়া হইবে? শস্যোৎপত্তি করিতে না পারিলে মঙ্গলবাসী জীবগণ বাঁচিবে না, সুতরাং ঐ জগতে এক্ষণে জল সেচনাদি দ্বারা কৃষিকর্ম্ম হইতেছে, এই প্রকার অনুমান বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা করিয়াছেন। তাঁহারা একপ্রকার কৃতনিশ্চয় হইয়া বলিতেছেন যে, মঙ্গলগ্রহের উপরিভাগে কতকগুলি সুবিস্তৃত জল প্রবাহ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। উহা ঐ গ্রহবাসী জীবগণের দ্বারা বিশেষ নৈপুণ্য এবং কোনও প্রকার আশ্চর্য্য কৌশলে প্রস্তুত হইতেছে। ঐ সকল জলপ্রবাহ পূর্ব্বে দৃষ্ট হইত না, উহা নিতান্তই একটা আধুনিক ব্যাপার।

মঙ্গলগ্রহের বিষুবরেখার নিকটবর্ত্তী ৬০ অংশ মধ্যেই ঐ সকল খাল প্রস্তুত হইতেছে। পৃথিবী হইতে দূরবীক্ষণ দ্বারা মঙ্গলগ্রহের সকল দিকই বেশ দেখা যায়। ঐ সকল খাল মঙ্গলগ্রহের চারিদিকেই হইতেছে। এমন কি, এক

একটা খাল ধরিয়া গ্রহটিকে বেষ্টন করিয়া আসিতে পারা যায়। ঐ খালগুলি দীর্ঘে ১২,০০০ মাইল, এবং প্রস্থে কোনও কোনও স্থলে উহা ৫০ মাইলও হইতেছে। এমেরিকার "লোওএল আবসারভেটরি" হইতে মঙ্গলগ্রহের যে মানচিত্র প্রস্তুত হইয়াছে, স্যার রবার্ট বল্ এল্ এল্ ডি এফ্ আর এস্ কৃত জ্যোতিষ গ্রন্থ হইতে আমরা নিম্নলিখিত চিত্রটি লইয়াছি।

মঙ্গলবাসী ইন্‌জিনিয়ারগণ ঐ সকল খাল কি জন্য করিতেছে? এখান হইতে উপস্থিত সেটা কেবল আঁচা আঁচি মাত্র। কেহ বলিতেছেন, গ্রীষ্মকালে মেরুপ্রদেশস্থ তুষার পর্ব্বত সকল দ্রব হইলে, সেই গলিত জলরাশি বন্যার মত প্লাবিত হইয়া মঙ্গলগ্রহের উপরিভাগের শস্যাদির বিশেষ অনিষ্ট করিতে পারে। এই জন্যই মঙ্গলবাসী জীবগণে সকলে একত্রে অদ্ভুত নৈপুণ্য-সহকারে উপরোক্ত বিশাল জল-প্রবাহের সৃষ্টি করিতেছে। উহা দ্বারা তাহাদের মহদুপকারের সম্ভাবনা, তাহা বুঝা যায়।

মঙ্গলের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে ঐ খালসমূহ করিবার উদ্দেশ্য কি? বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা বলেন, যে কারণে আমাদের পৃথিবীর বিষুবনের নিকটবর্ত্তী ভূমিখণ্ডসকল উর্ব্বরা, এবং কৃষিকার্য্যের উপযোগী, মঙ্গলগ্রহের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশও সেই কারণেই কৃষিকর্ম্মের উপযোগী। যন্ত্রাদি দ্বারা পরিমাণ করিয়া পাওয়া যাইতেছে যে, মঙ্গলগ্রহের বিষুবরেখা হইতে ৬০° অংশ উত্তর এবং দক্ষিণব্যাপী প্রদেশেই ঐ সকল নূতন খাল প্রস্তুত হইতেছে। ইহাতে মঙ্গলবাসীদের বিশেষ সুবিধা, প্রথমতঃ ভূমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি। ঐ সকল জল-প্রবাহের অন্তর্বর্ত্তী সুবিস্তৃত ভূমিখণ্ড সকলে জল সেচনাদির সুবিধা হইতেছে। দ্বিতীয়তঃ, ঐ সকল জলপথে মঙ্গল গ্রহবাসীদের যাতায়াতেরও বিশেষ সুবিধা হইতেছে।

মঙ্গলগ্রহের উপরিভাগে কৃষিকর্ম্মের চিহ্ন পাওয়া যাইতেছে, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি; কিন্তু বৃষ্টিবর্ষা কমিয়া যাওয়ায় কেবল জল সেচনাদি দ্বারাই শস্যসকলের উৎপত্তি করিতে হইতেছে। সম্ভবতঃ ঐ ছোট গ্রহটিতে জীবসংখ্যার এতই বৃদ্ধি হইয়াছে যে, হয় ত, সকল জীবের আহার্য্যবস্তু সম্যক্ পরিমাণে মিলিতেছে না। যাহাকে Struggle for life অর্থাৎ বাঁচিয়া থাকিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করা বলে, মঙ্গলবাসী সকল জীব একত্র হইয়া তাহা করিতেছে। তাহারা অদ্ভুত বল, অদ্ভুত বুদ্ধি, এবং কোনও আশ্চর্য্য শক্তি বলে ঐ সকল জলপ্রবাহের উৎপত্তি করিতেছে। পার্থিব স্থপতিবিদ্যায় যাঁহারা কৃতী, সেই সকল ইন্‌জিনিয়ার্‌গণ ভাবিয়া চিন্তিয়া ঠিক করিতে পারিতেছেন না যে, কেমন করিয়া, অতি অল্পকাল মধ্যে, ঐ প্রকার বিশাল জল-প্রবাহের সৃষ্টি হইতেছে। মঙ্গলগ্রহাঙ্গে ঐ সকল রেখাপাত কি প্রকার দেখায়, তাহাও সংক্ষিপ্তভাবে আমরা লিখিলাম।

প্রতিদিন দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, মঙ্গলগ্রহের কোনও নির্দ্দিষ্ট ভূমিতে খাল নাই। অকস্মাৎ একদিন দেখা গেল যে, প্রায় ৬।৭ হাজার মাইলের উপর একটি অতি সূক্ষ্ম রেখা পড়িয়াছে। তারপর, দুই মাসের মধ্যেই প্রায় ৪০ মাইল প্রস্থ এবং ছয় হাজার মাইল দীর্ঘ এক খাল হইয়া গেল। পৃথিবীতে থাকিয়া আমরা দুই মাসের মধ্যে ঐ প্রকার একটা কেনাল্ প্রস্তুত করিতে পারি কি? মঙ্গলবাসীদিগের এই সকল অদ্ভুত কার্য্য দেখিয়া কোনও কোনও ভাবুক মাঙ্গলিকদিগকে দৈবশক্তি সম্পন্ন বলিয়াছেন।

পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতে হইলে, আমাদের মহা সমুদ্র

পায় হইতে হয়। কিন্তু স্থলপথে রেলওয়ে আমাদের বহু-দূর বহন করিতেছে। ইহা এই কলিকালেও মানবের ভূতাধিপত্যের পরিচায়ক। জল, অগ্নি সংযোগে বাষ্পরূপ প্রাপ্ত হইলে 'অযুত নাগের' অপেক্ষাও বলশালী হয়; সুকৌশলে পার্থিব মানবেরা তাহার সম্যক্ উপযুক্ত ধাতুময় দেহ সৃষ্টি করিয়া সেই মহাভূতকে ভৃত্যের ন্যায় খাটাইয়া লইতেছে। মঙ্গলবাসীদের রেলওয়ে আছে কি না, তাহা আমাদের উপস্থিত বুঝিবার উপায় নাই। তবে একটা কথা আমরা অনুমান করিতে পারি।

মঙ্গলগ্রহের খুব নিকট দিয়া যে চন্দ্রটি প্রায় ৮ ঘণ্টায় মঙ্গলকে বেষ্টন করিতেছে,তদ্বারা মঙ্গলের উপরিস্থ সমুদ্র এবং সরিৎ সকলে প্রবল জোয়ার এবং ভাঁটা হইতেছে কিনা ?—এ প্রশ্নের উত্তর, অবশ্যই হইতেছে। সেই কারণে ইহাও আমরা বুঝিতে পারি যে, মাঙ্গলিক জল প্রণালীসমূহে জল স্রোত প্রবলবেগে ধাবিত হইতেছে। এই জল স্রোত এক ঘণ্টা মধ্যে তিন শত ক্রোশ চলিতেছে। ঐ প্রকার প্রবল স্রোত যদি আমাদের এই পৃথিবীতে থাকিত, তাহা হইলে আমরাও একখানা ছোট নৌকায় বসিয়া অনায়াসে বহুদূর অতিক্রম করিতে পারিতাম। হয় ত, মঙ্গল-গ্রহের নাবিকবিদ্যারও সেইপ্রকার উৎকর্ষ হইয়াছে। কিছুকাল গত হইল, সংবাদ-পত্রাদিতে প্রকাশিত হইয়াছিল, মঙ্গলবাসী জনগণ আমাদের সহিত কোনও প্রকার সংবাদাদি প্রেরণের চেষ্টা করিতেছে বায়ুস্তরের উপরিভাগে কোনও প্রকার তারহীন টেলিগ্রাফের মত কম্পন বুঝিতে পারা যাইতেছে। কিন্তু উহা পার্থিব বৈদ্যুতিক স্রোতবশতঃ কম্পন হওয়াই সম্ভব। মঙ্গলগ্রহবাসী বৈজ্ঞানিকগণ পৃথিবীর দিকে তারহীন টেলিগ্রাফ প্রেরণ করিতেছে, কিন্তু আমরা তাহাদের ভাষা অথবা সঙ্কেত বুঝিব কেমন করিয়া ?

বিশ্ব-নির্ম্মাণ-ব্যাপার পর্য্যালোচনা করিয়া আমরা বুঝিতে পারি যে, এতটা জগতের সহিত অপর জগতের কোনও প্রকার সংবাদাদি অদান প্রদান বিশ্বনিয়ন্তার অভিপ্রেত নহে। যাঁহারা কামানের গোলার মধ্যে বসিয়া চন্দ্রলোকে অথবা মঙ্গলগ্রহে যাইতে চাহেন, তাঁহারা বৈজ্ঞানিক স্বপ্ন দেখিতেছেন মাত্র।

শ্রীআদীশ্বর ঘটক।

আমার চশ্‌মা।

(১)

সোণা রূপোয় কেমন গড়া, আমাদের এই চশ্‌মা জোড়া,
তাহার মাঝে আছে 'পেবল্' সকল চোখের সেরা ;
ওসে, পাথর দিয়েই তৈরি সেটা ধাতু দিয়ে ঘেরা।

কোরস্—

এমন চশ্‌মা কোথাও খুঁজে পাবেনাক জানি,
সকল দেশের পূজ্য সে যে আমার চশ্‌মাখানি॥

(২)

ভাল খাঁটি চশ্‌মা ছাড়া, কোথায় আঁখি উজল ধারা,
কোথায় এমন খেলে আলো এমন নকল চোখে !
ও তার ঝিক্‌মিকিতে আমোদ বাড়ে, মাথায় খেয়াল ঢোকে !

কোরস্—

এমন চশ্‌মা কোথাও খুঁজে পাবেনাক নাক জানি,
সকল দেশের পূজ্য সে যে আমার চশ্‌মাখানি॥

মুমূর্ষু দশরথ

চিত্রশিল্পী—শ্রীযুক্ত ভবানী চরণ লাহা কর্তৃক অঙ্কিত।

(৩)

এত পালিস 'পেবল্‌' কাহার, কোথায় এমন চোখের বাহার,
কোথায় এমন নাকের লাগাম কাণের সাথে মেশে!
এমন নাকের উপর ছেলে বেলায় চশ্‌মা কাহার দেশে!

কোরস্‌—

এমন চশ্‌মা কোথাও খুঁজে পাবে নাক জানি,
সকল দেশের পূজ্য সে যে আমার চশ্‌মাখানি॥

(৪)

বিদ্যাকুঞ্জে চোখ্‌টি ঢাকি,' বেঞ্চে বেঞ্চে ব'সে থাকি,
গুল্‌জারিয়া আসি বাড়ী পুঞ্জে পুঞ্জে গিয়ে;
মোরা, বিছানতে ঘুমিয়ে পড়ি চশ্‌মা চোখে দিয়ে।

কোরস্‌—

এমন চশ্‌মা কোথাও খুঁজে পাবেনাক জানি,
সকল দেশের পূজ্য সে যে আমার চশ্‌মাখানি॥

(৫)

চশ্‌মা জোড়ার এত স্নেহ, কোথায় গেলে পাবে কেহ!
ওগো তোমায় দিবস রাতি তাই ত নাকে ধরি;—
যেন, চশ্‌মা জোড়া চোখে রেখে চশ্‌মা চোখেই মরি!

কোরস্‌—

এমন চশ্‌মা কোথাও খুঁজে পাবেনাক জানি,
সকল দেশের পূজ্য সে যে আমার চশ্‌মা খানি॥

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

বানরীর অদ্ভুত শক্তি।

চাণক্য পণ্ডিত বলিয়াছেন, সত্য হইলেও অসম্ভব কথা কাহারও নিকট ব্যক্ত করিবে না। আমাদের এই তর্ক-যুক্তি ও অবিশ্বাসের যুগে, কোনও অসাধারণ বিষয়ের বৃত্তান্ত বলিতে গেলে, প্রথমেই আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার নিকট উপ-হাসাস্পদ হইতে হয়। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, এক উপহাস ব্যতীত আমাদিগকে তজ্জন্য অন্য কোনও গুরুতর লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয় না। কিন্তু প্রাচীনকালের ও মধ্যযুগের য়ুরোপে, প্রচলিত জ্ঞান, সংস্কার ও বিশ্বাসের-বিপরীত কোনও কথা বলিলে, বক্তাকে বহু নির্যাতন সহ্য করিতে হইত। হয় ত, তিনি কারাবদ্ধ হইতেন, অথবা প্রাণদণ্ডেও দণ্ডিত হইতেন। প্রাচীনকালে আমাদের দেশে এরূপ বর্ব্বরতা ছিল না বটে; কিন্তু কবিকঙ্কণের চণ্ডীপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, ধনপতি দত্ত ও তাঁহার পুত্র শ্রীমন্ত "কমলে কামিনী"রূপ অদ্ভুতদর্শনের বিষয় প্রকটিত করিয়া সিংহলরাজ্য কর্ত্তৃক কারাগারে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে সুসভ্য ইংরাজ-রাজের "পেনাল্‌কোডে" এই-রূপ অদ্ভুতদর্শনের প্রচার কোনও অপরাধের মধ্যে গণ্য নহে বলিয়া আজ চাণক্যপণ্ডিতের উক্ত নীতিটি অমান্য করিতে সাহসী হইলাম।

যে বিষয় বা ঘটনা প্রত্যক্ষ করা যায়, তাহা কদাপি অসম্ভব হইতে পারে না। অসম্ভব হইলে, তাহা সম্ভূত হয় কিরূপে? "অসম্ভব" না বলিয়া তাহাকে "অসাধারণ" বলিলে কোনও দোষ হয় না। যাহা অসাধারণ, যাহা আমাদের প্রত্যক্ষীভূত নহে, এবং যাহা আমাদের সহজ জ্ঞান, বুদ্ধি ও সংস্কারের অতীত, তাহাকেই আমরা অস-ম্ভব বলিতে ইচ্ছুক হই। কিন্তু জ্ঞান, বুদ্ধি ও সংস্কার,

আমি তাহার কথায় অবিশ্বাস করিয়া কেবল হাসিলাম। পরদিন প্রভাতে আমি গৃহে বসিয়া মোকদ্দমার কাগজপত্র দেখিতেছি, এমন সময়ে আমার এক ভ্রাতুষ্পুত্র সেই ফকীর ও বানরের কথা তুলিয়া বলিল "ফকীর তার বানর নিয়ে এই দিকে যাচ্ছে, আপনি দেখ্‌বেন কি ?" কৌতূহল পরবশ হইয়া আমি ফকীরকে ডাকিতে বলিলাম। ফকীর প্রাঙ্গণের এক পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলে, আমি দেখিলাম তাহার বানরীটি সাধারণ রকমের একটি বানরী; তাহার আবার প্রকারে কোনও বিশেষত্ব নাই। বানরী একটি শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিল; তাহার এক প্রান্ত বানরীর গলদেশে সংযুক্ত, এবং অপর প্রান্ত ফকীরের হস্তে ন্যস্ত। ফকীরটি মোসলমান এবং বাঙ্গালী। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, তাহার বাড়ী মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত একটি গ্রামে। ফকীর বলিল, "আপনি মনে মনে যে প্রশ্ন করিবেন, বানরী ইঙ্গিতে তাহা বলিয়া দিবে।" ফকীরের উপদেশ মত আমি বানরীর সম্মুখে পাঁচটি পয়সা ও পাঁচটি সুপারি রাখিলাম এবং দুইটি সুপারি স্বতন্ত্র রাখিয়া তন্মধ্যে একটিকে "সুফল" এবং অপরটিকে "কুফল" মনে মনে স্থির করিলাম। বানরী আমার সম্মুখে আসিয়া বসিল। ফকীরের হাতে শৃঙ্খলের এক প্রান্ত ন্যস্ত ছিল বটে ; কিন্তু বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম সে শৃঙ্খলটিকে "লোল" করিয়া ধরিয়াছে এবং বানরীর নিকট হইতে প্রায় তিন হাত পশ্চাতে বসিয়াছে। সুতরাং সে যে বানরীকে কোনও প্রকার সঙ্কেত করিবে, তাহার সম্ভাবনা ছিল না। এক একবার সে শৃঙ্খল ছাড়িয়া দিয়া বানরীকে স্বাধীনভাবে বিচরণও করিতে দিয়াছিল।

বানরী আমার সম্মুখে আসিয়া বসিলে, মানুষ যেরূপ মানুষের সহিত কথা কয়, আমিও বানরীকে সেইরূপ সম্বোধন করিয়া বলিলাম, "আমি কি মনে করেছি বল ; আর তার সুফল কি কুফল হ'বে তাও জানাও।

বানরী আমার সম্মুখে আসিয়া বসিল

বানরী সুফল ও কুফল জ্ঞাপক সেই দুইটি সুপারির মধ্যে সুফলজ্ঞাপক সুপারিটি উঠাইয়া আমার হাতে দিল এবং ফকীরের পার্শ্ব হইতে তাহার যষ্টি উঠাইয়া লইয়া তাহা আপনার ঘাড়ের উপর রাখিয়া দুইচারিপদ অগ্রসর হইল ; পরে তাহা তির্য্যক্‌ভাবে ধরিয়া তাহার এক প্রান্ত দ্বারা মৃত্তিকা খনন করিতে লাগিল। আমি ফকীরকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এই সঙ্কেতের অর্থ কি ?" ফকীর বলিল, "আপনি কোনও জমীজায়গা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছেন। বানরী ঘাড়ে লাঠি লইয়া গরুর স্কন্ধে জোয়াল দেওয়ার এবং লাঠির এক প্রান্ত দ্বারা মাটী খুঁড়িয়া জমীতে লাঙ্গল দেওয়ার কথা আপনাকে জানাইল।" আমি বলিলাম, "আমার প্রশ্ন ঠিক্

অনুমিত হইয়াছে।" ফকীর আমায় জিজ্ঞাসা করিল "আপনি সুফল, না কুফলের সুপারি পাইয়াছেন?" আমি বলিলাম, "সুফলের সুপারি পাইয়াছি।" পরে বানরীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কত দিনের মধ্যে সুফল পাইব?"

বানরী কোনও দিকে না চাহিয়া এবং ইতস্ততঃ না করিয়া তৎক্ষণাৎ এক একটি করিয়া তিনটি সুপারি উঠাইয়া ভূমিতে রাখিল, পরে কএকটি পয়সা উঠাইয়া ভূমিতে রাখিল এবং পরিশেষে তিন বার ডিগ্‌বাজি দিল! আমি ফকীরকে এই সঙ্কেতের অর্থ জিজ্ঞাসা করিলাম। ফকীর বলিল"বানরী, বলিতেছে যে, তিন দিন পরে আপনি সুফল পাইবেন; কিন্তু আপনার কিছু অর্থব্যয় হইবে এবং বানরী ডিগ্‌বাজি দিয়া জানাইতেছে যে, আপনার শেষে জয়লাভ হইবে।"

তিনদিন পরেই আমার মোকদ্দমার দিন ছিল বটে; কিন্তু ধার্য্য দিনে যে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইবে, তাহার সম্ভাবনা অল্প ছিল। ছয় মাস ধরিয়া মোকদ্দমার দিন পড়িতেছিল। বিশেষতঃ উভয় পক্ষেরই অনেক সাক্ষীর এজাহার হইবে। এই কারণে, আমি মনে করিলাম, তিন দিন পরে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি না হইয়া সম্ভবতঃ তিন মাস পরে হইবে।

আর একটি প্রশ্ন ঠিক্ করিয়া আমি অন্য দুইটি সুপারি লইয়া তন্মধ্যে একটিকে সুফল ও অপরটিকে কুফল বলিয়া মনে মনে স্থির করিলাম। বানরী এবারও সুফলের সুপারি আমার হাতে তুলিয়া দিল। আমি বানরীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমি কি বিষয়ের প্রশ্ন করিয়াছি?"

বানরী দুই হস্ত দ্বারা তাহার অঙ্গ মার্জ্জনা করিল। ফকীর বুঝাইয়া বলিল, "আপনি নিজের দেহ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছেন।" আমি বানরীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "দেহ সম্বন্ধে কিরূপ প্রশ্ন?" বানরী ভূমিতে শয়ন করিয়া আমার দেহের যে স্থানে বেদনা হইয়াছে, তাহার দেহের ঠিক্ সেই অংশটি দেখাইয়া দিল। আমি বিস্ময়ে অবাক্ হইলাম। আমার দেহের সেই স্থানেই প্রকৃত প্রস্তাবে ব্যথা হইয়াছে। বাড়ীর অধিকাংশ লোকই সেই ব্যথার কথা জানিতেন না। বানরী কিরূপে জানিল?

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,"এই রোগ কতদিনে সারিবে?" বানরী দক্ষিণ হস্তদ্বারা নিজের দেহের বাম স্কন্ধ হইতে বক্ষের উপর দিয়া একটি চিহ্ন অঙ্কিত করিল এবং নিজের পদদ্বয় হইতে ধূলা লইয়া খাইল। পরে, দুই হস্ত দ্বারা একটি গোলাকার পদার্থের সঙ্কেত করিয়া তাহার উপর জল ঢালিবার অভিনয় করিল এবং হস্ত দ্বারা গণ্ডুষের সঙ্কেত করিয়া তাহা মুখে স্পর্শ করিল।

ফকীর আমাকে বুঝাইল বলিল, "বানরী বলিতেছে, আপনি ব্রাহ্মণের পদরজঃ প্রত্যহ খাইবেন এবং শিবের মাথায় জল ঢালিয়া প্রত্যহ স্নানজল খাইবেন। তাহা হইলেই আপনার রোগ সারিয়া যাইবে।"

বলা বাহুল্য, বানরীর এই সঙ্কেতে আমি যারপর নাই বিস্মিত হইলাম।

আমি মনে মনে তৃতীয় প্রশ্ন করিলাম। বানরী কিয়ৎক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া সুফলের সুপারি আমার হাতে উঠাইয়া দিল এবং ঘরের দিকে চাহিয়া তাহা দেখাইতে লাগিল।

ফকীর বুঝাইয়া বলিল, "আপনি ঘরবাড়ী প্রশ্ন করিয়া থাকিবেন। আপনি হয়ত একটি নূতন বাড়ী প্রস্তুত করিতে চান। বানরী বলিতেছে, তাহা প্রস্তুত হইবে; কিন্তু বিলম্বে।"

উত্তর শুনিয়া আমি অতীব বিস্মিত হইলাম। আমি ঐরূপ প্রশ্নই করিয়াছিলাম!

মানসিক প্রশ্ন করিতে বিরত হইয়া আমি বানরীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমার কয়টি ছেলে মেয়ে?"

বানরী এক একটি সুপারি উঠাইয়া পাঁচটি সুপারি ভূমিতে রাখিল এবং একটি ছোট মেয়ের কাছে গিয়া তাহার দেহ স্পর্শ করিল। পরে আবার একটি মাত্র সুপারি উঠাইয়া তাহা ভূমিতে রাখিল, এবং একটি ছোট ছেলের কাছে গিয়া তাহার দেহ স্পর্শ করিল।

ফকীর এই সঙ্কেতের অর্থ বুঝাইবার পূর্ব্বেই আমি তাহা বুঝিতে পারিলাম। আমার পাঁচটি কন্যা ও একটি পুত্র, তাহাই বানরী বলিল।

আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম "আমার পুত্র কি একটিই?"

বানরী এই প্রশ্ন শুনিয়া যেন আমাকে তিরস্কার করিবার জন্যই দন্ত খিচিমিচি করিয়া আমার দিকে তাড়া করিয়া আসিল। পরে, একটি করিয়া দুইটি সুপারি ভূমিতে

"আমার কয়টি ছেলে মেয়ে?" (৯৩৩ পৃষ্ঠা)

আমিও আবার ঐ প্রশ্ন করিলে, সে এক একটি করিয়া তিনটি সুপরি রাখিয়া এক টুক্‌রা কাপড় মাথার উপর টানিয়া মুখ আবৃত করিল।

বানরীর উত্তর ঠিক্ হইল। আমার তিনটি কন্যা বধূরূপে তখন শ্বশুরালয়ে ছিল।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "এখানে আমার যে দুইটি মেয়ে আছে, তাহা-দিগকে দেখাইতে পার?"

ছয় বৎসর বয়স্ক সন্তোষবালা ও তিন বৎসর বয়স্কা বেবী, দশবারটি ছেলে মেয়েদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন স্থলে দাঁড়াইয়াছিল। বানরী চিরপরিচিতের ন্যায় সন্তোষের অঞ্চল ধরিয়া আমার কাছে টানিয়া আনিল; তার পর বেবীর কাছে গিয়া তাহার মস্তকের ঝুঁটি ধরিয়া তাহাকেও আমার কাছে লইয়া আসিল!

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমার পুত্র এখানে আছে?"

বানরী ঘাড় নাড়িল ও ফকীরের যষ্টি উঠাইয়া উত্তরদিকে তাহা দেখাইল এবং তৎক্ষণাৎ তাহা ফেলিয়া দিয়া ভূমির উপর অঙ্গুলিদ্বারা হিজিবিজি দাগ টানিতে লাগিল।

ফকীর বুঝাইয়া বলিল, "আপনার পুত্র এই স্থান হইতে উত্তর দিকে আছে এবং সেখানে লেখা পড়া শিখিতেছে।"

বানরীর উত্তর সত্য। আমার পুত্র সেই সময়ে আজিম-গঞ্জে ছিল এবং বিদ্যালয়ে পড়িতেছিল। আজিমগঞ্জ বাঁকুড়ার উত্তরদিকেই অবস্থিত।

বানরীকে এইরূপ আরও কএকটি প্রশ্ন করিয়া যথার্থ উত্তর পাইলাম।

বেবী এক টুক্‌রা শসা খাইতেছিল, তাহা দেখিয়া বানরী ফকীরকে কি যেন অনুরোধ করিতে লাগিল। ফকীর

রাখিয়া একটি সুপারি উঠাইয়া লইল এবং ভূমিতে শয়ন করিয়া নয়ন নিমীলিত করিল।

এই অভিনয় দেখিয়া আমার এবং মহিলাগণেরও হৃদয় অতিশয় ব্যথিত হইয়া পড়িল। ভাবিলাম, হায় কেন আমি এই প্রশ্ন করিলাম? জ্যেষ্ঠ পুত্রটি কএক বৎসর পূর্ব্বে পরলোক গমন করিয়াছে, তাহাই বানরী দেখাইয়া দিল। তাহার তিরস্কারের অর্থ আমি মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিতে পারিলাম!

দাসী জিজ্ঞাসা করিল,"বাবুর মেয়েরা সকলে কি এখানে আছে?" বানরী তাঁহার কোনও উত্তর দিল না; পরে

বলিল, "যদি শসা থাকে, এক টুক্‌রা দিন; বানরী শসা খাইবে।"

বানরীকে তৎক্ষণাৎ শসা দেওয়া হইল। শসা খাইয়া সে জল খাইতে চাহিল। তৎক্ষণাৎ একটি পাত্রে জল দেওয়া হইল, তাহা সে পান করিল।

ফল খাইবার জন্য আমি বানরীকে কিছু পয়সা দিলাম; তাহা সে হাত পাতিয়া লইল। তৎপরে ফকীরকেও উপযুক্ত রূপে পুরস্কৃত করিয়া তাহাকে বানরীর ইতিবৃত্ত জিজ্ঞাসা করিলাম। তদুত্তরে ফকীর বলিল:—

"আমার পিতামহ ফকীর ও সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। আমাদের বাড়ীর কাছে কোনও পীরের একটি দরগা আছে। এই বানরটি আমার পিতামহের বানরী এবং ইহার বয়স প্রায় ষাট্‌ বৎসর হইবে। তাঁহার এইরূপ আরও কএকটি বানর-বানরী ছিল। এখন কেবল দুইটি বাঁচিয়া আছে। শুনিয়াছি তিনি দরগার নিকটে একটি কূপ খনন করিয়া তাহার মধ্যে বানর শিশুদিগকে একুশ দিন রাখিয়া দিতেন এবং তাহাদের আহার্য্য স্বরূপ দরগার কিছু মাটি কাগজে মুড়িয়া প্রত্যহ কূপে ফেলিয়া দিতেন। একুশ দিন পরে বানরশিশুকে উত্তোলন করা হইত। দুইচারিটিকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যাইত; যে দুই একটি বাঁচিয়া থাকিত, তাহাদের মধ্যে এইরূপ শক্তি হইত।"

ফকীর আমাকে যাহা বলিয়াছিল তাহাই এই স্থলে লিপিবদ্ধ করিলাম।

তিন দিন পরে মোকদ্দমা হইবে [illegible] দিনে কাছারীতে উপনীত হইলাম। সাক্ষীদের ইজাহার দেওয়া হইল; উকীল মোক্তারেরা কাগজপত্র দাখিল প্রস্তুত হইলেন। মোকদ্দমাটি যাহাতে আপোষে মিটিয়া যায়, তজ্জন্য আমি গত ছয়মাস ধরিয়া বহু চেষ্টা করিয়াছিলাম; কিন্তু কৃতকার্য্য হই নাই। জজ্‌সাহেব মোকদ্দমা ধরিতে প্রস্তুত, এমন সময়ে অপর পক্ষের উকীল আসিয়া আপোষের প্রস্তাব করিলেন এবং কিছু নগদ অর্থ পাইলেই তাঁহারা দাবী ত্যাগ করিবেন, তাহা জানাইলেন। সেই দিনই বানরীর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে মোকদ্দমা আপোষে মিটিয়া গেল।

উপরে বানরীর অদ্ভুত শক্তি সম্বন্ধে যে বৃত্তান্ত লিখিত হইল, তাহার একটি বর্ণও অতিরঞ্জিত বা মিথ্যা নহে। আমি সেই অবধি এই অদ্ভুত ব্যাপার সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া থাকি, কিন্তু কোনও সন্তোষজনক মীমাংসায় উপনীত হইতে পারি নাই। পাঠকবর্গের মধ্যে কেহ যদি এই অদ্ভুত সমস্যার সমাধান করিতে পারেন, তাহা হইলে আমি নিরতিশয় সুখী হইব।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস।

ইসিপতন-মিগদাব

মানবগণ দিন দিন সভ্যতামঞ্চে অধিরোহণ করিতেছে। এইরূপ আজকাল সভ্য জাতির মত। ইহাতে মতদ্বৈধ আছে। পুরাকালের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে কিঞ্চিৎ পরিমাণে ইহার খণ্ডন সাধিত হইতে পারে। যে জাতি যত অসভ্য তাহাদের কার্য্যপ্রণালী ততোধিক বর্ব্বরোচিত সন্দেহ নাই। আমাদের দেশে পল্লীগ্রামে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে,———"চাচি যত গিন্নী, তার চালেই আছে চিহ্নি;" অর্থাৎ গৃহকর্ত্রীর কার্য্য-সুশৃঙ্খলতার নিদর্শন তাহার গৃহমার্জ্জন কার্য্যেই লক্ষিত হইয়া থাকে। এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে যত বুদ্ধিমান্‌ ও সুসভ্য তাহার কার্য্যদ্বারাই তাহা সূচিত হইয়া থাকে। এই নিয়মটি কেবল ব্যক্তির বেলায় প্রযোজ্য নহে; ইহা সমগ্র সমাজ এবং জাতির উপরও আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হয়। অদ্য আমরা এই বাক্যটির সার্থকতা সম্পাদন জন্য বৌদ্ধ-যুগের ঋষিপত্তন তীর্থের পর্য্যালোচনা করিব। আমরা পাঠক পাঠিকাগণকে বর্ত্তমান প্রবন্ধে প্রাচীন কালের ভাস্কর শিল্পাদির বিবরণ সমুপস্থিত করিয়া তৎকালের মনুষ্যগণের মার্জ্জিত বুদ্ধির নমুনা প্রদর্শন করিব। বর্ত্তমান শতাব্দীর জ্ঞানগর্ব্বিত মনুষ্যগণের দর্প চূর্ণ করিবার জন্যই বোধ হয় নিখিলপতি ঋষিপত্তনের ন্যায় শিল্পচাতুর্য্যের প্রধান কেন্দ্রস্থল ভূমধ্যে প্রোথিত করিয়া দ্রব্য সমূহ অব্যাহত রাখিয়াছেন। এই সকল দেখিয়া শুনিয়াও নির্ব্বোধ মানব গর্ব্বের দাসত্ব

করিতে ত্রুটি করে না। যাহা হউক, এই সমুদায় বিষয় এস্থলে আলোচ্য নহে।

ঋষিপত্তন বৌদ্ধদিগের একটি প্রধান তীর্থস্থান। এই স্থান বারাণসীর সাড়ে তিন মাইল উত্তরে অবস্থিত। ইহাও বারাণসীর ন্যায় অতি পুরাতন স্থান। ইহার পূর্ব্বের নাম "ইসিপতন" বা "ঋষিপত্তন"। প্রমাণং যথা,—"অথ সা বসমুপনায়িকসময়ে পঞ্চ পচ্চেকবুদ্ধে নন্দমূলক পব্ভারতো ইসিপতনে ওতরিত্বা নগরে পিণ্ডায় চরিত্বা ইতিপতনং এব গন্ত্বা বসমুপনায়িক কুটিরা অথায় হথকম্মং পরিয়েসন্তে দিস্বা তা দানিয়ো তাসং অত্তনো সামিকে............ ....বারভিক্খং পথ:পস্থং।"—

পরমত্থদিপণী– ৫৫ থেরী, ১৪০ পৃষ্ঠা।

তদবধি ইহার নাম "মৃগদাব" হয়। আমরা এই সম্বন্ধে মূল পালীগ্রন্থ হইতে কতিপয় অংশ উদ্ধৃত করিলাম।

"ভগবা বারানসিয়ং বিহরতি ইসিপতনে মিগদায়ে, তেন খো পন সময়েন বারানসিয়ং সদ্ধাসম্পন্নস্স কুলস্স পুত্তো নন্দিকো নাম উপাসকো অহোসি।" বিমানবথু রেবতী বিমানবন্ননা।

একটি চক্রের উভয় পার্শ্বে দুইটি মৃগ দণ্ডায়মান। ইহাই "ধর্ম্মচক্র" বলিয়া খ্যাত। বুদ্ধদেব এই ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করিলে বহুস্থানে ইহা মোহর রূপে ব্যবহৃত হইত। সারনাথে বহু কর্দ্দম-নির্ম্মিত মোহরে এই চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমান সময়ে তীব্বতের দালাইলামা এইরূপ মোহরাঙ্কিত চিহ্ন ব্যবহার করেন। এক কথায় বলিতে গেলে সারনাথ

১৯০৪—০৫ খ্রীষ্টাব্দে ধ্বংসাবশেষ খননের দৃশ্য।

পঞ্চপ্রত্যেকবুদ্ধ হিমালয় পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিয়া এই স্থানে সমুপস্থিত হইয়া তিনমাস অতিবাহিত করিতেন। সেই হইতেই ইহার অর্থ ঋষিগণের অবতরণ অথবা তাঁহাদের বাসভবন হইল। অতঃপর বুদ্ধযুগে ইহার নাম মিগদাব (The Deer Park) বলা হইত। কথিত আছে এই স্থানে ভগবান্ বুদ্ধদেব মৃগরূপ ধারণ করিয়া একটি হরিণী ও তাহার শিশুর জীবন রক্ষা করিবার জন্য প্রাণপাত করিয়াছিলেন।

বৌদ্ধধর্ম্মের আদিস্থান। এই স্থানেই বুদ্ধদেব তাঁহার বহু তপস্যালব্ধ ধর্ম্মের সারতত্ত্ব দুঃখ-নিবৃত্তি এবং নির্ব্বাণলাভের পরম উপায় তাঁহার পঞ্চ সহচরের নিকট সর্ব্বপ্রথমে প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহা বুদ্ধদেবের ধর্ম্মচক্র-প্রবর্ত্তন নামে খ্যাত।

কেহ কেহ বলেন, হিন্দুগণের প্রধান-তীর্থ বারাণসীধাম ইহার অতি সন্নিকটবর্ত্তী না হইলে এইস্থান এতদূর বিখ্যাত

অশোক-নির্ম্মিত স্তম্ভ ও তাহার সম্মুখবর্ত্তী মহাবিহারের পার্শ্বদ্বার।

হইয়া উঠিতে পারিত না। কথাটি বিলক্ষণ সত্য। ভগবান শাক্যসিংহ বোধিবৃক্ষতলে বহু বৎসর তপস্যা করিয়া নবজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া সারনাথে সর্ব্বপ্রথমে আগমন করেন। সে কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। হুয়েন্থ-সাং বলেন, যেস্থানে বুদ্ধদেব সর্ব্বপ্রথমে ধর্ম্মবক্তৃতা করিতে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন তথায় একটি স্তম্ভ স্থাপন করা হইয়াছিল। ইহার উপরে সিংহের মূর্ত্তি এবং সুদীর্ঘ অনুশাসন আছে। সারনাথে এই অনুশাসন বাহির হওয়ায় মহারাজ অশোকের একটি প্রধান কীর্ত্তি কেবল ভারতসাম্রাজ্যে কেন বিশ্বমাঝে প্রচারিত হইল। একটি 'বেল' বা বাতিদানের উপর ধর্ম্মচক্র প্রতিষ্ঠিত। তাহার উপর একখানি গোলাকার রেকাবী। তদুপরি চারিটি সিংহ দণ্ডায়মান আছে। ইহার সমুদায় অংশকে একত্র যোগে "ধর্ম্মচক্র" বলে। এই সকলের বিবরণ ক্রমশঃ প্রদান করিব।

পূর্ব্বে যাহাকে "মৃগদাব" বলিত, এখন তাহাকেই সারনাথ বলে। উহা পূর্ব্বে বারাণসীর অঙ্গীভূত ছিল। কালক্রমে নদীর গতি পরিবর্ত্তিত হওয়ায় উক্ত স্থান বারাণসী হইতে সাড়ে তিন মাইল দূরে গিয়া পড়িয়াছে। অধিকন্তু প্রাচীনবৌদ্ধ গ্রন্থে সারনাথের অধিক উল্লেখ না করিয়া বারাণসীরই উল্লেখ করা হইয়াছে। অধুনা আমরা বিভিন্ন জাতক হইতে বারাণসীর পৃথক্ নামসমূহ নিম্নে প্রদান করিলাম,—

"অয়ং বারাণসী উদয়-জাতকে সুরুন্ধ নগরং নাম জাতং। চুল্লসুত সোমজাতকে সুসম্পনং নাম, সোননন্দ জাতকে ব্রহ্ম বদ্ধনং নাম, খণ্ডহাল জাতকে পুপ্ফ বদ্ধনং নাম। ইমিস্মিং পন যুবঞ্জয় জাতকে রম্মনগরং নাম অহোসি।"

যুবঞ্জয় জাতক।

এইস্থানে ভগবান বুদ্ধদেব পূর্ব্বজন্মে মৃগরূপ ধারণ করিয়া বিচরণ করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থে এই কথার প্রমাণ পাওয়া যায়।—

'-ভগবা বারাণসিয়ং বিহরতি ইসিপতনে মিগদায়ে……।"

বিমানবত্থু রেবতী বিমানবন্ননা।

অতঃপর সারনাথের খনন কার্য্য বহুদিন ধরিয়া চলিয়াছিল। সেই জন্য বহু দর্শনীয় দ্রব্য লিখিত হয় নাই। *

* বিগত ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে মদগ্রজ শ্রীযুক্ত আশুতোষ রায় ও জনৈক খ্যাতনামা উকিলের সঙ্গে আমি সর্ব্বপ্রথম সারনাথ দর্শনে গমন করি।

সেই সকল বিবরণ কোন পত্রিকাতেই পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয় নাই। অদ্য আমরা ক্রমে ক্রমে তাহারই উল্লেখ করিব। যে সকল মূর্ত্তি ভূমধ্যে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে তন্মধ্যে অধিকাংশই বুদ্ধদেব ও বোধিসত্ত্বের, তাহা আবার ধ্যানস্তিমিত; কোনটি পদ্মাসনে, কোনটি বীরাসনে, কোনটি বা বজ্রাসনে, কেহবা রাজাসনে উপবিষ্ট। এই সকল মূর্ত্তি দর্শন করিলে সকলেরই মনে ভক্তির উদ্রেক হইয়া থাকে। এই মূর্ত্তিগুলির কোনটিই ভূমি হইতে অধিক উচ্চ নহে। ভারতবর্ষে বা ভারতের বহির্ভাগের অপর কোন স্থানের বৌদ্ধ মূর্ত্তি এই স্থানের ন্যায় ভাবব্যঞ্জক নহে। মূর্ত্তিগুলি যেন জীবন্ত বলিয়া বোধ হয়। এই মূর্ত্তির সম্মুখে আগমন করিলে যেন সকল শোক দুঃখ ভুলিয়া যাইতে হয়। এমন সুন্দর ভাবভঙ্গীপূর্ণ অভ্যাসনে অর্দ্ধস্তিমিত নেত্রে উপবিষ্ট মূর্ত্তিসমূহ দর্শন করিলে যেন ক্ষণকালের জন্য পৃথিবীর মায়ামমতা এবং আমার আমিত্ব বিস্মৃত হইতে হয়।

জগৎসিংহের স্তূপ-সন্নিকটে প্রাপ্ত বুদ্ধমূর্ত্তি।

যে "ধর্ম্মচক্রের" আভাষ কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে প্রদান করিয়াছি তৎসম্বন্ধে নিম্নে আরও কিঞ্চিৎ প্রদান করিব। এই ধর্ম্মচক্রের কারুকার্য্য এমন সুন্দর ও মনোরম যে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ না করিলে আর তাহা অনুভব করা যায় না। ইহার সমগ্র অংশ মসৃণ প্রস্তরে প্রস্তুত। অনেকটা দেখিতে ঠিক যেন মার্ব্বেল প্রস্তরের ন্যায়। কিন্তু বর্ণ শ্বেত নহে—ঈষৎ হরিদ্রাভ। তাহা আবার কৃষ্ণ বিন্দুতে পরিপূর্ণ, এমন মনোহর প্রস্তর অত্যল্পই দৃষ্ট হয়। শিল্পকলায় সুপণ্ডিত জনৈক ব্যক্তি বলেন, এই চক্র ও সিংহের গঠনপ্রণালী এমন সুন্দর যে পুরাকালে জগতীতলের কোন স্থানের ইহার সহিত তুলনা হইতে পারে না।

ইহার গঠনপ্রণালী ভূমণ্ডলে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। * হালিকারনেসাস (Halicarnasus) নামক স্থানে যে প্রকার সিংহের কেশর দেখিতে পাওয়া গিয়াছে

"ডন ও ডন সোসাইটির ম্যাগাজিনে" ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে আমাদের ভ্রমণ বৃত্তান্ত প্রকাশিত হয়। অধুনা আর সে সমুদায় উল্লেখ করিলাম না।—লেখক।

* A. R. of the Archaeological Survey of India, 1904-5 p. 36. The Capital is illustrated in plate XX of the Report.

এই স্থানের সিংহের কেশরেও তদ্রূপ শিল্প-চাতুর্য্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। তথাকার সিংহ এক্ষণে বিলাতের যাদুঘরে রক্ষিত হইয়াছে। যাহা হউক, সারনাথের ধর্ম্মচক্রে একটি বিশেষ উপদেশ পাওয়া যায়। তাহাতে মঠাধ্যক্ষকারিগণকে বিশেষ সাবধান করিয়া দিতেছে। "যদি কেহ ভগবান বুদ্ধদেবপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্মসংক্রান্ত বিষয় হইতে স্খলিত হন, তবে তাঁহার (তিনি ভিক্ষু বা ভিক্ষুণী হউন) এই সমাজ হইতে দায়িত্বপূর্ণ কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া অবসর গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য।" উক্ত আদেশ অনুশাসনে দৃষ্ট হয়। এই স্তূপের মধ্যে যে সকল অনুশাসন প্রাপ্ত হওয়া করিয়া থাকেন তাঁহাদের এইগুলি অধ্যয়ন করিতে বিশেষ আনন্দ হইবে।

এইরূপে বারাণসীর বৌদ্ধ উন্নতির অধঃপতন দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যেই সংঘটিত হইয়া থাকিবে। মুসলমান আক্রমণকারিগণ এই সময়েই সারনাথের অধঃপতন দেখিয়াছিলেন। কীর্ত্তিধ্বংস অতি ভয়ঙ্কররূপে সাধিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান চিহ্ন দেখিলেই সে সকল বুঝিতে পারা যায়। বাক্যটি হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য দু'চারিটি দৃষ্টান্ত প্রদান করিব। অট্টালিকাদির দেয়াল চূর্ণীকৃত, স্তম্ভ বিধ্বংসিত মূর্ত্তিগুলি বিকলাঙ্গীকৃত, ছাদের কড়িগুলি ভস্মীভূত এবং খাদ্যদ্রব্য
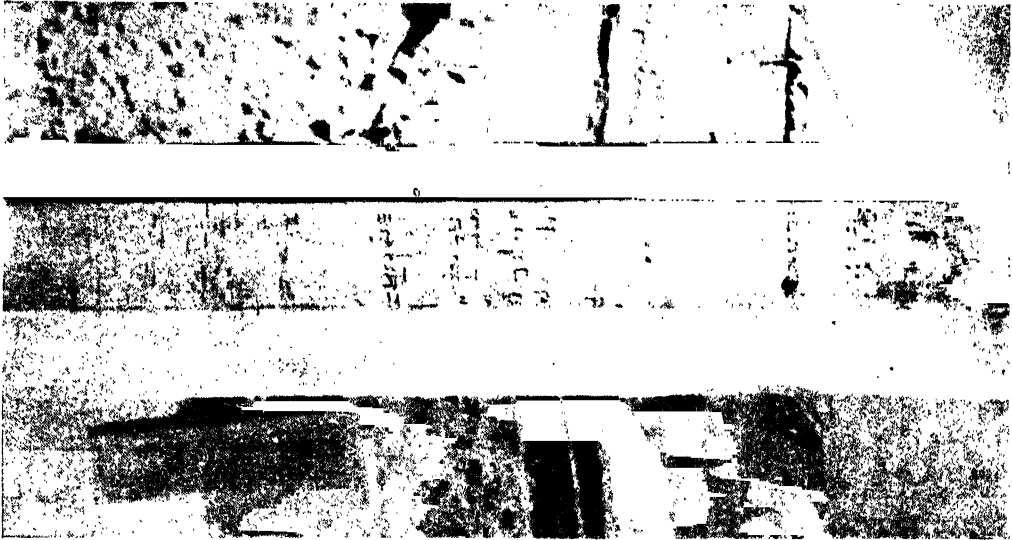
প্রথম কণিষ্কের সময়ের স্তম্ভ-লিপি (৮১ খৃঃ)।

গিয়াছে তন্মধ্যে রাজা কণিষ্কের দুইখানি অনুশাসন আছে। কণিষ্কের রাজধানীর বহুদূরে বারাণসী ক্ষেত্রে রাজা কণিষ্কের সংস্রব এই প্রথম দৃষ্ট হইল। অপর একজন অপরিজ্ঞাত রাজা অশ্বঘোষ। তাঁহার দুইখানি অনুশাসন এই স্থানে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এই অনুশাসনগুলির সময় নির্দ্দেশ করিতে হইলে তৃতীয় খ্রীষ্টাব্দ হইতে দ্বাদশ শত খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ধরা যায়। এই অনুশাসনের ভাষা প্রাকৃত, এবং ইহার লিখিত অক্ষরসমূহের বহু পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে বলিয়া তাহা পাঠ করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। যে সকল ভারতীয় ছাত্র অট্টালিকা প্রভৃতির গাত্রে লিখিত লিপির বিষয় আলোচনা সকল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত, প্রভৃতি দর্শন করিলে এই প্রাসাদতুল্য নগরীর ধ্বংসকার্য্য যে অতি ভয়ঙ্কররূপে সংঘটিত হইয়াছিল তাহা সহজেই অনুমিত হয়। মহারাজ অশোকের পূর্ব্বে কোন নৃপতির কীর্ত্তিচিহ্ন এই স্থানে দৃষ্ট হয় না। ইহা নিতান্ত বিস্ময়ের কথা বলিতে হইবে; পরন্তু ভারতীয় বিখ্যাত রাজন্যবর্গের কীর্ত্তিকলাপাদি ভারতবর্ষের প্রাচীন স্থানসমূহে অল্পবিস্তর লক্ষিত হইয়া থাকে।

সারনাথের কীর্ত্তিকলাপ দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে নষ্ট হয় নাই। এ কথা যথার্থ। এই স্থানের সুবিস্তীর্ণ প্রাসাদগুলি তাহার মধ্যবর্ত্তী সুমহান্ মূর্ত্তি সমূহ ও অন্যান্য দ্রব্যাদি

আক্রমণকারিগণ দ্বারা যে প্রকারে চূর্ণীকৃত হইয়াছে তাহার কোন কালেই পরিপূরণ হইবে না। তথাকার বিকলাঙ্গ মূর্ত্তিগুলির কোন প্রকারে পুনঃসংস্কার করা সম্ভবপর নহে। অধিকন্তু তথাকার ধর্ম্মসভার পূর্ণ সংস্কার-করণ এক প্রকার অসম্ভব। কিন্তু এই স্থানের কীর্ত্তি বংশপরম্পরায় চলিয়া আসিয়াছে। উহা আর কাহারও স্মৃতিপথ হইতে অপসারিত হইবার নহে। লোক চলিয়া যায়, কিন্তু কীর্ত্তি পড়িয়া থাকে। ইহাই কালের নিয়ম। আক্রমণকারিগণের হস্ত হইতে, এই স্থান রক্ষা পায় নাই বটে, কিন্তু যে কীর্ত্তি থাকিয়া গিয়াছে তাহার স্খলন কে করিতে পারে? উহা মানব-ইতিহাসে এক চিরস্থায়ী চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে।

এই স্থানের ১৫৮৮ খ্রীষ্টাব্দের লিখিত একখানি পারসী অনুশাসনে দেখিতে পাওয়া যায় হুমায়ুন ও আকবর বাদশাহ একবার এই শ্মশানভূমি পরিদর্শন করিতে আগমন করিয়াছিলেন। চৌখণ্ডী স্তূপের উপরে এই পারসী অনুশাসন বিদ্যমান রহিয়াছে। এই স্তূপ অষ্টকোণবিশিষ্ট। ইহা সারনাথের দক্ষিণ-ভাগে অবস্থিত। এই ভগ্নাবশেষ স্তূপের সম্মানার্থে এবং স্বীয় পিতার দর্শনীয় স্থান বলিয়া সম্রাট্ আকবর এই অনুশাসনটি লিখিয়া গিয়াছিলেন। অপর একজন প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত বলেন, বৌদ্ধগয়ায় যে প্রকার স্তূপ দর্শন করিয়াছি সারনাথের বৃহৎ ধামেক স্তূপ পরিদর্শন করিয়া আমার বোধ-গয়া বলিয়া ভ্রম জন্মিয়াছিল; কিন্তু এই স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্তূপের সংখ্যা অসংখ্য। আখরোটের আকারবিশিষ্ট দুই বা তিন ইঞ্চি উচ্চ বহু মৃত্তিকাস্তূপ বিদ্যমান রহিয়াছে। সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ, বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বৃহৎ বৃহৎ স্তূপের মধ্যে এই প্রকার ক্ষুদ্র স্তূপ দৃষ্ট হয়। মৃত্তিকার মোহরে সেইগুলি পরিবেষ্টিত।*
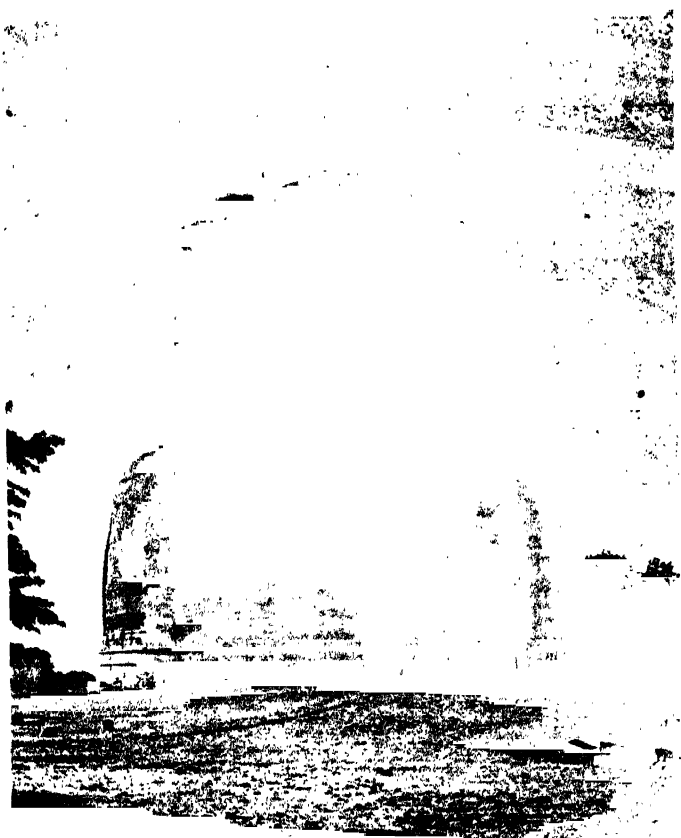
ধামেক স্তূপ।

কিন্তু এই সকল অধুনা পরিদৃষ্ট হয় না। জগতে এক প্রকারের অনেকগুলি জিনিস থাকিলে কেহ তাহার আদর করে না। ইহা মানুষের রীতি। সেই জন্যই বোধ হয় এই স্থানের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্তূপগুলি রক্ষা করিবার জন্য কেহ যত্ন করে নাই। জোনাথান ডানকান নামক একজন ইঞ্জিনিয়ার যখন বরুণানদীর উপর প্রস্তরসেতু প্রস্তুত করাইতে ছিলেন, তখন তাঁহার আদেশে সারনাথ হইতে ৪৮টি মূর্ত্তি এবং আরও কারুকার্য্যযুক্ত বহু প্রস্তর নদীর তেজ হ্রাস করিবার জন্য এবং সাঁকো তৈয়ারীর সুবিধার জন্য ঐ নদীগর্ভে নিক্ষিপ্ত হয়। দ্বিতীয় সাঁকো বাঁধিবার সময় (যাহাকে লোকে লোহসাঁকো বলে) সারনাথের ভগ্ন অট্টালিকা হইতে পঞ্চাশ, ষাট (৫০।৬০) গাড়ী প্রস্তর নদী-

* Cunningham's Mohabodhi p. 46.

গর্ত্তে ঢালিয়া দেওয়া হয়। এইরূপে বহুকীর্ত্তি অনাদরে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। সারনাথ স্তূপের অনতিদূরে যে ময়দান রহিয়াছে তন্মধ্যে বহুমূর্ত্তি এবং লতাপত্রযুক্ত প্রস্তরখণ্ড ইতস্ততঃ পতিত রহিয়াছে। এই চিত্র আমি স্বয়ং দর্শন করিয়াছি। এইরূপ কত রত্ন যে তথাকার ভূমধ্যে প্রোথিত রহিয়াছে, তাহা কে বলিতে পারে?

কাহারও অধীনে কোন দ্রব্য থাকিলে সে তাহার প্রকৃত মর্ম্ম অবগত হইলেও আদর করিতে জানে না। চলিত কথায় একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে,—"দাঁত থাকিতে কেহ দাঁতের মর্ম্ম জানে না।" যখন বার্দ্ধক্য আসিয়া শরীর জীর্ণ শীর্ণ করিয়া ফেলে এবং দন্তরাজি ক্রমশঃ পতিত হইয়া চর্ম্ম লোল হইতে থাকে, তখন লোকে শরীররক্ষার মর্ম্ম বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয়। তজ্জন্যই বলিতে ছিলাম এমন শিল্পচাতুর্য্যপূর্ণ স্থান প্রাপ্ত হইয়াও আমরা তাহার আদর করিতে শিক্ষা করি নাই। ইহা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে। পৃথিবীর লোকে কত অর্থব্যয় করিয়া এই প্রকার দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া থাকে, আর আমরা সেই তৈয়ারী জিনিষ হাতে পাইয়া তাহা চরণদ্বারা দূরে নিক্ষেপ করি। এইগুলি আমাদের স্বল্পবুদ্ধির নিদর্শন।

সারনাথের মূর্ত্তিগুলির কিঞ্চিৎ বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল। এই স্থানে উল্লেখযোগ্য একটি সুবিশাল বোধিসত্ত্বের মূর্ত্তি আছে। ইহা একখণ্ড লোহিত প্রস্তরে প্রস্তুত। তাঁহার মস্তকোপরি একটি প্রস্তর-নির্ম্মিত বৃহৎ ছত্র রহিয়াছে। উহার ব্যাস অন্যূন আট বা দশ ফিট হইবে; কিন্তু এমন সুন্দর মূর্ত্তিটি মস্তকশূন্য ও বিশাল ছত্রটি খণ্ডীকৃত। এই মূর্ত্তিটি ভূমধ্য হইতে তুলিবার সময় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, এইরূপ শুনা যায়। ইহার নিকটেই এক ক্ষুদ্র যাদুঘর স্থাপন করা হইয়াছে। তথায় ঐ মূর্ত্তি, ছত্র প্রভৃতি বহুদ্রব্য রক্ষিত আছে। উক্ত ছত্র লোহিত বর্ণের প্রস্তরে প্রস্তুত। বোধিসত্ত্বের মূর্ত্তিটি দণ্ডায়মান অবস্থায় ছত্রের নিম্নে অবস্থিত; কিন্তু এখন আর সেরূপ নাই। ভাঙ্গিয়া চুরিয়া একপ্রকার কিম্ভূত কিমাকার হইয়া পড়িয়াছে। যে বেদীর উপর বোধিসত্ত্ব দণ্ডায়মান আছেন এবং দীর্ঘদণ্ডের উপর ছত্র অবস্থিত রহিয়াছে সেই বেদী এবং দণ্ডের গাত্রে কুষন (Kushan) অক্ষরে (character) দুইটি অনুশাসন-লিপি লিখিত আছে। এই অনুশাসনের উপক্রমণিকা সম্বন্ধে একটি গল্প আছে। তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল:—ভগবান বুদ্ধদেব বারাণসীতে অবস্থানকালে যেস্থানে অধিকাংশ সময় ভ্রমণ করিতেন, তথায় তাঁহার কীর্ত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য বালা নামক জনৈক বৌদ্ধসাধু বা ভিক্ষু একটি বিশাল বেদিযুক্ত দণ্ডায়মান বোধিসত্ত্বের মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া পূর্ব্বকথিত বৃহৎ ছত্রটি বুদ্ধদেবের নামে উৎসর্গ করেন। উহা হেমন্ত ঋতুর তৃতীয় মাসের দ্বাবিংশতি দিবসে এবং মহারাজ কণিষ্কের রাজত্বের তৃতীয় বর্ষে স্থাপিত হয়। কণিষ্ক ৭৮ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাহা হইলে উক্ত ঘটনা ৮১ খ্রীষ্টাব্দে সম্পন্ন হইয়াছিল, বুঝিতে হইবে। বিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক ঈত্-সিং সপ্তম শতাব্দীতে যখন ভারতবর্ষে আগমন করেন, তখন তিনিও মৃগদাবে গমনযোগ্য উন্মুক্ত রাজপথ দর্শন করিয়াছিলেন; সুতরাং এই সকল ব্যাপার যে অতি অল্প দিনের নহে তাহা বলাই বাহুল্য।

সঙ্ঘারাম বিহার।

এখানে সঙ্ঘারাম বিহার নামে একটি সুবৃহৎ মন্দিরের ভগ্নাবশেষ বাহির হইয়াছে। উক্ত বিহার প্রায় ১২৪ হস্ত উচ্চ হইবে। চীন পরিব্রাজক ফাহিয়াম বলেন, এই মন্দিরের অগ্রভাগে সুবর্ণনির্ম্মিত আম্রবৃক্ষ ছিল। তাহাতে সুবর্ণফল ফলিত। মন্দিরের মধ্যে বুদ্ধদেবের তাম্রমূর্ত্তি বিরাজিত। এই স্থানেই প্রথম ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তিত হয়। তিনি তথায় "ধর্ম্ম-চক্র-মুদ্রায়" উপবিষ্ট ছিলেন। এই মন্দিরের চারিপার্শ্বে এবং ইহার কিঞ্চিৎ দক্ষিণে "জগৎসিংহ স্তূপের" চতুর্দ্দিকে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবমন্দির ও বৃহৎ ও ক্ষুদ্র স্তূপ ভূমধ্য হইতে বাহির হইয়াছে, ও বিবিধ লতাপত্রমণ্ডিত প্রস্তরফলক ও দেববিগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে; তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রায় ৪৭০টি হইবে। এই লতাপত্রের প্রত্যেকটি বিভিন্ন প্রকারের। এই সকল বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দর্শন করিয়া পরিশ্রম করিতে পারিলে একখানি প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধে সুবৃহৎ বিবরণীপূর্ণ পুস্তক লিখিত হইতে পারে। সময়ান্তরে তাহা

আলোচিত হইবে। রাজা কণিষ্কের সময় হইতে এক প্রকারের মূর্ত্তি প্রস্তুত হইয়া আসিতেছে। তাহার সকলগুলিই যেন বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি বলিয়া ভ্রম জন্মে। বাস্তবিক পক্ষে সকলগুলিই এক মূর্ত্তি নহে। প্রত্যেকটিই মস্তক মুণ্ডিত উষ্ণীষ বা টিকিশূন্য ব্রহ্মচারী বা যতি সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া মনে হয়। ঐরূপ মূর্ত্তি প্রস্তুতের স্রোত গুপ্তরাজগণের সময় পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। তখনও ইহার কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। যে সময়ে উত্তর ভারতবর্ষে অসংখ্য বুদ্ধ,বোধিসত্ত্ব, তারামূর্ত্তি ও অন্যান্য বহুহস্ত ও বহুমস্তকবিশিষ্ট স্ত্রীমূর্ত্তি বুদ্ধদেবের মূর্ত্তির সন্নিকটে সংস্থাপিত হইতে থাকিল, তখনই এক প্রকার বৌদ্ধমূর্ত্তি প্রস্তুত রহিত হইয়া গেল। তৎকালপ্রচলিত বহুমূর্ত্তি তথায় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। বিহারদেশে উত্তর-দক্ষিণ ভারতীয় বৌদ্ধমন্দির সমূহে সকল প্রকার মূর্ত্তির সমবায় দ্বারা উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে এক প্রকার সৌহৃদ্য স্থাপিত হইয়াছিল। সেই জন্যই বোধ হয় সকল প্রকার মূর্ত্তির একত্র সমাবেশ দৃষ্ট হয়। বিখ্যাত চীনভ্রমণকারী হুয়েন্থ সাং বলেন, সারনাথে ১৫০০ বিদ্যার্থী বৌদ্ধ পুরোহিত "হীনযান" পন্থানুযায়ী ধর্ম্মশাস্ত্র (Little Vehicle) অধ্যয়ন করিতেন। তিনি উত্তর মঠধারিগণের (Northern Churchএর) কথা কিছুই উল্লেখ করেন নাই। তিনি "মহাযান" (Greater Vehicle) পন্থা সম্বন্ধে কোন প্রকার আলোচনাই করেন নাই। তাহাতে অনুমান হয় হুয়েন্থ-সাংএর প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পরে তথায় উক্ত প্রথার আলোচনা হইত। তথাকার মূর্ত্তি দেখিয়া "মহাযান" প্রথার আলোচনার প্রমাণ পাওয়া যায়। উক্ত ভ্রমণকারীর সময়ে তথায় মহাযান প্রথা প্রবর্ত্তিত হইলে অবশ্য তিনি তাহার উল্লেখ করিতেন। অতএব আমাদের ধারণা বোধহয় ভ্রমাত্মক নহে।
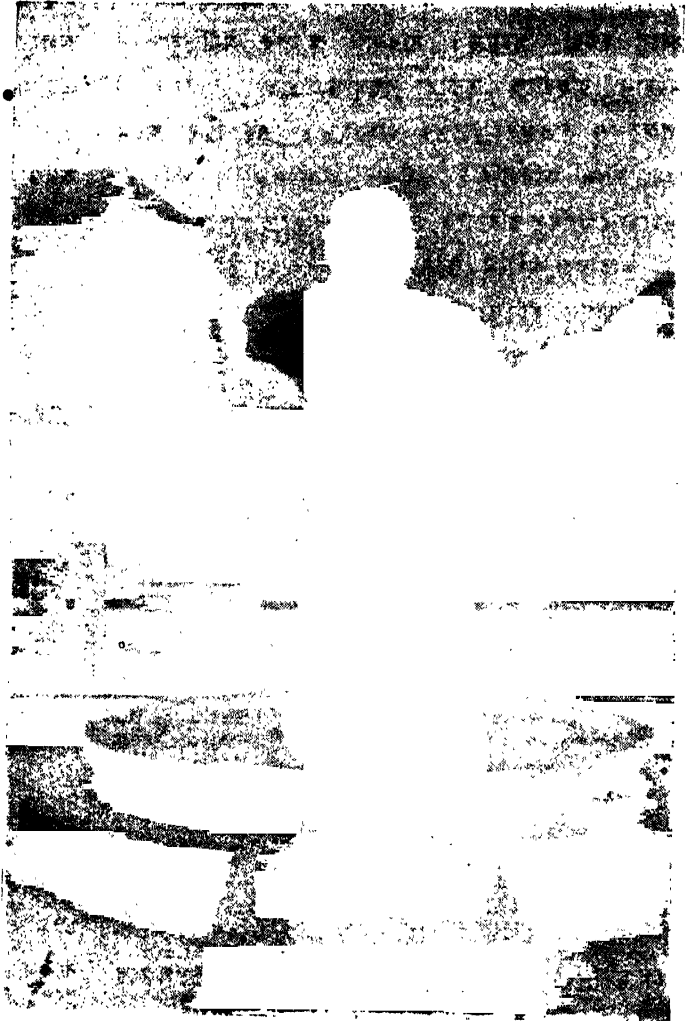
প্রথম কণিষ্কের তৃতীয় বর্ষের বৃহৎ বোধিসত্ত্ব মূর্ত্তি।

পূর্ব্বে এই স্থান অতীব মনোহর ছিল। তদ্বিষয়ে জনৈক চীন ভ্রমণকারী বলেন, "কবে আমি পুণ্যক্ষেত্র ভারতবর্ষে গমন করিয়া সারনাথ তীর্থ দর্শন করিয়া জীবন সার্থক করিব।" তখন সারনাথকে মৃগদাব বলা হইত। চীনের ন্যায় গিরিগুহাপূর্ণ দুর্লঙ্ঘ্য স্থানেও ভারতবর্ষে হইতে মৃগদাবের মাহাত্ম্য এবং মনোহারিত্বের বর্ণনা পৌঁছিয়াছিল। এই স্থান তৎকালে কি প্রকার বিখ্যাত ছিল, ইহাই তাহার প্রমাণ। চীন ভ্রমণকারিগণের বর্ণনানুসারে আমরা দুইটি বিষয় উপলব্ধি করিতে পারি। তাঁহাদের কথিত স্থানসকলের অধিকাংশই অন্বেষণ করিয়া প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সুতরাং হয়,—(১) সেই সকল স্থান অধুনা লুপ্ত

বা ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়া গিয়াছে; অথবা—(২) তাঁহাদের বর্ণনা সত্য নহে। যাহা হউক, হুয়েন্থ-সাং যে সকল অট্টালিকার বিষয় বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তাহার কতক-গুলির সঙ্গে বর্ত্তমান প্রাসাদের আংশিক মিল দেখিতে পাওয়া যায়; সুতরাং তাঁহাদের লিখিত বিবরণসমূহ ভ্রমাত্মক, এ কথা বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয়। ধম্মেকস্তূপ মহারাজ অশোক প্রস্তুত করিয়াছিলেন। বিষয়টি হুয়েন্থ সাংএর বাক্যের সহিত বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্য আছে। অধুনা ধর্ম্মচক্রের স্থান নির্দ্দেশ সম্বন্ধে তাঁহার বাক্যের সমতা দৃষ্ট হইতেছে না। তিনি অশোকের স্তূপের সহিত জগৎসিংহের স্তূপের গোল করিয়াছেন। বাস্তবিক পক্ষে তাহা নহে। অশোকের স্তূপের অনতি-দূরেই জগৎসিংহের স্তূপ দৃষ্ট হয়। তাঁহার বর্ণনা অনুসারে ধম্মেকস্তূপকেই তিনি "মৈত্রেয়ী" স্তূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এইরূপে তাঁহার সকল বিষয়েরই গোলযোগ হইয়া গিয়াছে। অতএব তাঁহার বর্ণনা পাঠ করিয়া কোন বিষয়েরই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সুকঠিন।
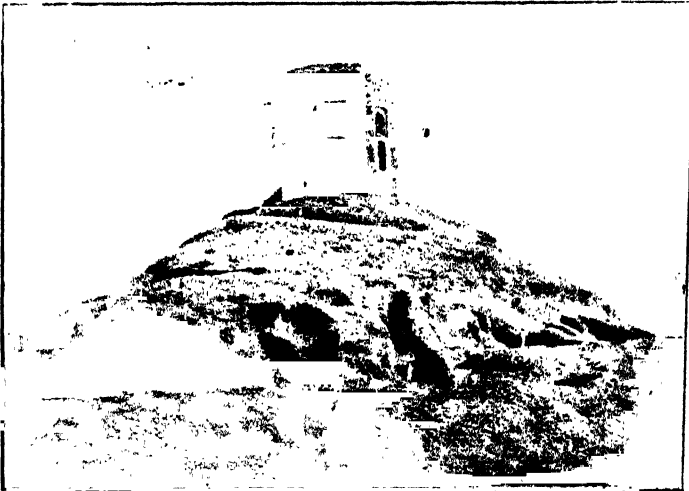
চৌখণ্ডী-স্তূপ।

যাহা হউক, অবশিষ্ট বিষয় কএকটির বর্ণনা করিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিব। এই স্থানে একটি স্তূপের চারিধারে রেলিংএর বেড়া দেওয়া আছে। সেই রেলিং একখানি প্রস্তর দ্বারা তৈয়ারী করা হইয়াছে। ইহা কম আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। যিনি এই কার্য্য উদ্ধারের জন্য নেতৃরূপে বর্ত্তমান ছিলেন সেই মার্সেল সাহেব বলিতেছেন, "ইহা এমন সুন্দরভাবে প্রস্তুত করা হইয়াছে যে,ইহার কোন অংশের দোষ ধরিবার উপায় নাই। এক কথায় দ্রব্যটি নিখুঁত হইয়াছে। মৌর্য্যরাজগণের কার্য্য যে প্রকারে নির্দ্দোষ-শূন্য বলিয়া প্রমাণীত হইয়াছে, ইহাও সেই শ্রেণীর অন্তর্গত। যে গ্রীসদেশে এথেনবাসিগণের শিল্পচাতুর্য্য এবং ভাস্করকার্য্য অতি মনোহর বলিয়া জগৎবিখ্যাত, তাহাও এই স্থানের শিল্পচাতুর্য্যের নিকট পরাভব স্বীকার করিয়াছে।" পাঠক-পাঠিকাগণ ইহাতেই বুঝিয়া লউন,উক্ত শিল্পকলা কোন্ শ্রেণীর অন্তর্গত হইতে পারে। এই রেলিংএর মধ্যবর্ত্তী স্তূপের চারিপার্শ্বে চারখানা অধিরোহণী; তাহার প্রত্যেকটিতে। ৪।৫টি করিয়া সিঁড়ি আছে। প্রত্যেক অধিরোহণী এক একখানি প্রস্তরে গঠিত। উহার চতুর্দ্দিকে গাড়ীবারান্দা।

মৃত্তিকাভ্যান্তরে প্রাপ্ত দ্রব্যসমূহ :—

তামাকু সেবনের কলিকা, হুঁকা, ছোট কলসী, মালসা, প্রদীপ, প্রভৃতি মৃত্তিকানির্ম্মিত দ্রব্যপ্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এই সকল দ্রব্য বহুশত বর্ষ পর্য্যন্ত ভূমধ্যে প্রোথিত থাকিলেও তুলিবার সময় ভাঙ্গিয়া যায় নাই। ইহাতেই বুঝিতে হইবে প্রাচীন কালে মৃত্তিকানির্ম্মিত দ্রব্যগুলি পর্য্যন্তও কেমন শক্ত করিয়া প্রস্তুত করা হইত। এতদ্ভিন্ন দ্বারপাল, বৌদ্ধমূর্ত্তি, নর্ত্তক, নর্ত্তকী, দাসদাসী, মুটে মজুর নানাজাতীয় স্ত্রীমূর্ত্তি, মৃত্তিকা নির্ম্মিত শীলমোহর,বিবিধ পুষ্প, লতাপত্রযুক্ত প্রস্তরফলক, মল্লগণের খেলা এবং উহা দেখিবার জন্য দর্শক-বৃন্দ কেহ দণ্ডায়মান হইয়া কেহ বা উপ-বেশন করিয়া আছে, এই সকল ভূমধ্যে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এক্ষণে মল্লগণের ক্রীড়া সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলিব। একটি খোলা জায়গায় দর্শকগণ সভা করিয়া বসিয়া যায় এবং তাহার সম্মুখভাগে দুই অথবা তিনজন মল্ল বীরসাজে সজ্জিত হইয়া লৌহবর্ম্ম পরিধান করিয়া বৃষ, মহিষ, সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি জন্তুর সহিত লড়াই করিয়া থাকে। প্রত্যেকে এক একটি জন্তু লইয়া ক্রীড়া

করে। ইহাতে অনেক সময়ে ক্রীড়াকারীরই মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। এইরূপ ক্রীড়াকে গ্রীসে গ্লাডিয়েটরের খেলা বলিত। এই ক্রীড়া প্রদর্শন জন্য যে প্রকার পরিচ্ছদে সজ্জিত হইতে হয় তাহার নমুনা এই স্থানের প্রস্তর মূর্ত্তিদ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে। এই খেলা গ্রীস ও রোমে (ইতালি) বিলক্ষণ প্রচলিত ছিল। কিন্তু ভারতবর্ষেও এই খেলার চলন ছিল। তাহা এই স্থানের মূর্ত্তি দেখিলেই প্রমাণ পাওয়া যায়। কতিপয় সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে ভারতের একটি বৃহৎ নগরে ও তৎসন্নিকটবর্ত্তী প্রদেশের সমাজ চিত্র কিরূপ ছিল তাহার প্রমাণ এই স্থানের অন্যান্য মূর্ত্তিগুলি হইতে কিয়দংশ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহা হইতে তৎকালের লোকের নৈতিক চরিত্র বিশেষভাবে বুঝিতে পারা যাইতে পারে। এখানে যোগী এবং সাধু মহাত্মগণের যোগাভ্যাস

সরি সারনাথ ধ্বংসাবশেষের দৃশ্য।

সম্পন্ন করিবার জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুহা প্রস্তুত করা হইয়াছিল।

তথায় একটি অট্টালিকার ভিত্তি ইষ্টকনির্ম্মিত দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। তাহা দেখিয়া প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। ইহরে লতাপত্রমণ্ডিত চিত্রবিচিত্র কার্য্য অতি মনোহর বলিয়া নিকটবর্ত্তী যাদুঘরে সুযত্নে রক্ষিত হইয়াছে। এগুলি স্বাভাবিক অবস্থায় না থাকিলেও উহা যে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, ইহাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট।

পয়ঃপ্রণালী—

তৎকালে পয়ঃপ্রণালীর সুবোন্দবস্ত ছিল। এই স্থানে তাহার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। সেই প্রাচীনকালে ভূমধ্য দিয়া ড্রেনের ব্যবস্থা (Underground drainage) ছিল। উহা আজ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান রহিয়াছে। ইহা নিতান্ত আশ্চর্য্যের বিষয় বলিতে হইবে। ইহা হইতেই সেই লোকে কিরূপে সভ্য ছিলেন এবং তাঁহারা কি প্রকার সময় পূর্ত্ত-বিস্তার আলোচনা করিতেন, তাহা সহজেই অনুমেয়। এতদিনের কথা, তথাপি উক্ত ড্রেনের কোন প্রকার অবস্থান্তর ঘটে নাই। উহা দর্শন করিলে যেন অল্পদিন প্রস্তুত করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। এই স্থানের প্রকাণ্ড দেবমন্দিরে জল সরবরাহ করিবার জন্য এই প্রয়ঃ-

প্রণালী প্রস্তুত করা হইয়াছিল বলিয়া উপলব্ধি হয়। এই মন্দিরের উত্তরভাগে যে সরোবর আছে তথা হইতে উক্ত মন্দিরে জল সরবরাহ করিবার জন্য পূর্ব্বোক্ত ড্রেণের সংযোগ ছিল। তাহাও অধুনা দৃষ্ট হয়। যে সকল স্থান হইতে অট্টালিকাদি খনন করিয়া বাহির করা হইয়াছে তাহার উত্তর-পূর্ব্ব কোণে এই ড্রেণ বর্ত্তমান রহিয়াছে। তৎকালের একটি কূপও আজকাল স্বাভাবিক অবস্থায় আছে।

অশোক-স্তূপ।

পূর্ব্বে যে অশোকস্তূপের কথা বলিয়াছি, তাহা অপর স্তূপ অপেক্ষা বৃহৎ; এবং এই স্তূপই সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। চীন ভ্রমণকারী হুয়েন্থ সাং বলেন, "এই স্তূপ মৃত্তিকা হইতে প্রায় ৬৭ হস্ত উচ্চ; কিন্তু "পূর্ব্বে ইহা অন্ততঃ ১৩৪ হস্ত উচ্চ ছিল। এক্ষণে ভূমধ্যে প্রোথিত হইয়া গিয়াছে।"

খননের সূত্রপাত—

সারনাথের অপূর্ব্ব দ্রব্যাদি এবং প্রত্নতত্ত্বপূর্ণ রহস্যময় বিষয়ের মর্ম্মোদ্‌ঘাটন প্রায় অষ্টাদশ খৃষ্টাব্দের শেষ পর্য্যন্ত কেহ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। অবশেষে কাশীরাজ চৈৎ সিংহের দেওয়ান জগৎ সিং ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে, তাঁহার জগৎগঞ্জ নামক নগরী নির্ম্মাণার্থে ধম্মেকস্তূপ হইতে অনুমান তিনশত হস্ত পশ্চিমে একটি স্থান খনন করাইয়া ইষ্টক প্রস্তুত করিতে ইচ্ছা করেন। ভগবৎ কৃপায় উক্ত স্থান হইতে প্রচুর পরিমাণে ইষ্টক প্রভৃতি বহির্গত হইতে থাকে। দেওয়ান জগৎ সিং একটি নব নগরী প্রস্তুতোপযোগী ইষ্টক সংগ্রহ করিয়া উক্ত নগরীতে (জগৎগঞ্জে) সেই সকল প্রেরণ করেন। উহার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল। কিয়দ্দূর খনন করিতে করিতে ক্রমশঃ প্রকাণ্ড অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ বহির্গত হইয়া পড়ে। ইহাই হইল খননের সূত্রপাত। ঐ স্থানে একখানি প্রস্তরফলক উদ্ধৃত হইয়াছিল। তদুৎকীর্ণ অক্ষরমালা হইতে তদানীন্তন গৌড়রাজ মহীপাল ১০৮৩ সংবতে বা ৯৪৯ শকে বর্ত্তমান ছিলেন, পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। আদিশূর এই বৌদ্ধপাল বংশের শেষ রাজাকে পরাভূত করিয়া গৌড়ের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন।

অনুশাসন।

সারনাথের প্রোথিত অট্টালিকাদি হইতে ত্রিংশতাধিক অনুশাসন প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে বালার উৎসর্গীকৃত ধর্ম্মচক্রের বেদিকায় সর্ব্বাপেক্ষা সারপূর্ণ দুইটি অনুশাসন আছে। এ কথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। মহারাজ অশোকের স্তম্ভে যে অনুশাসন আছে তাহাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অবশিষ্টগুলি ততদূর উল্লেখযোগ্য নহে। ইহার মধ্যে কতিপয় অনুশাসন মহাত্মা বুদ্ধদেবের ধর্ম্মোপদেশপূর্ণ। অধিকাংশই ভক্তগণ দ্বারা উৎসর্গীকৃত। এই সকল অনুশাসনের মধ্যে একটি ললনা বুদ্ধদেবের মন্দিরে প্রদীপ উৎসর্গ-প্রসঙ্গে অনুশাসন প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম "পরমোপাসিকা সুলক্ষণা।" প্রত্যহ সন্ধ্যাবেলা তিনি ভগবান বুদ্ধদেবের মন্দিরে প্রদীপ জ্বালিয়া দিতেন। তাঁহার কামনা পূর্ণ হওয়ায় তিনি পূর্ব্বোক্ত অনুশাসন লিখিয়া দিয়াছিলেন।

চৌখণ্ডীস্তূপ

পূর্ব্বে যে চৌখণ্ডীস্তূপের কথা বলিয়াছি তাহার প্রকৃত প্রকরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল। সিদ্ধার্থ যখন বৌদ্ধত্ব প্রাপ্ত হন নাই, কেবলমাত্র ধ্যানস্তিমিত ছিলেন। তখন পাঁচজন লোক তাঁহার শিষ্য হয়। বহুবর্ষ কষ্টসাধ্য জপতপে অতিবাহিত করিয়া তিনি আর শারীরিক কষ্ট সহ্য করিবেন না, স্থির করিয়া পূর্ব্ব রীতি সকল একবারে পরিত্যাগ করিলেন। তখন সেই পঞ্চ শিষ্য তাঁহাকে পরিহার করিয়া বারাণসী ধামে চলিয়া যান; ইহাতে তিনি কিছুমাত্র মনঃক্ষুণ্ণ না হইয়া স্বভাবের শান্তি-নিকেতন নির্জ্জন উরুবিল্বগ্রামে বোধি বৃক্ষতলে গমন করিয়া ঘোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। ঐ স্থানই এখন বুদ্ধগয়া বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। অবশেষে নবজ্ঞান লাভ করিয়া তিনি কাশীধামে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তখন সেই পঞ্চশিষ্য তাঁহার প্রকৃত জ্ঞানের আভাষ প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। এই শিষ্যত্বগ্রহণ ব্যাপারে যে স্তূপ প্রস্তুত করা হইয়াছিল তাহাই চৌখণ্ডীস্তূপ নামে খ্যাত। হুমায়ুন বাদসাহের নাম

চিরস্মরণীয় করিবার জন্য আকবর এই স্তূপের উপরিভাগ ভগ্ন করিয়া ইহার মস্তক মুসলমান আদর্শানুসারে পুনঃ গঠিত করেন এবং উহার গাত্রে পারসীলিপি খোদিত করিয়া দেন। এই সকল কথা পূর্ব্বেই কথঞ্চিৎ উল্লিখিত হইয়াছে। ঐ লিপির মর্ম্মার্থও যথাস্থানে প্রদত্ত হইয়াছে। অতএব তাহার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। আকবর বলেন, এই চৌখণ্ডীস্তূপ তাঁহারই দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছে। পরন্তু তাঁহার কথার উপর আমরা আস্থা স্থাপন করিতে পারি না। কারণ পরিব্রাজক হুয়েন্থ-সং যে প্রকার বর্ণনা করিয়াছেন তাহার সহিত এই স্তূপের কোনপ্রকার অসমতা দৃষ্ট হয় না; সুতরাং আকবর বাদসাহের বহুশত বৎসরের পূর্ব্বের কথাই অধিক বিশ্বাস্য বুঝিতে হইবে। তবে আকবর বাদসাহ উক্ত স্তূপের মস্তকটি গঠিত করিয়াছিলেন একথা বিশ্বাস করা যাইতে পারে। ঐ লিপিও তাঁহারই খোদিত, সন্দেহ নাই। মুসলমান বাদসাহগণ হিন্দুর প্রাধান্য বিলোপ বাসনায় এইরূপ বহুস্থানের মন্দিরের চূড়া ভগ্ন করিয়া মুসলমানী ধরণে প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন। গৌড়, পাণ্ডুয়া সারনাথ, বারাণসী প্রভৃতি বহুস্থানেই ঐরূপ কাণ্ড দৃষ্ট হয়! যাহা হউক, বুদ্ধদেব পঞ্চশিষ্যের নিকট সর্ব্বপ্রথম ধর্ম্মবক্তৃতা করিয়াছিলেন। এই বক্তৃতা সমগ্র জগতের বৌদ্ধগণ অত্যন্ত সম্মানপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বে যে ধর্ম্মচক্রের কথা উল্লিখিত হইয়াছে তাহার অনতিদূরে একটি স্তম্ভ দৃষ্ট হয়। তাহার গঠনপ্রণালী ও মসৃণতা বর্ণনাতীত। মৃত্তিকামধ্যে বহুশতাব্দী প্রোথিত থাকিয়া বর্ণের বা মসৃণতার কোনরূপ পরিবর্ত্তন হয় নাই। উহা একখানি স্ফটিক প্রস্তরে প্রস্তুত এবং তাহা কৃষ্ণবর্ণাদি বিন্দুতে পূর্ণ। সারনাথের দ্রব্যাদির ইহাই বিশেষত্ব। কোন প্রস্তর দ্বিখণ্ড নহে। সকল দ্রব্যই প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত এক একখানি প্রস্তরে গঠিত। "প্রভুর প্রভু যিনি তাঁহার কার্য্যাবলী এবং কীর্ত্তিকলাপ প্রকাশচ্ছলে এই স্তম্ভ বিনির্ম্মিত হইয়াছে।" ভগবানের ধর্ম্মবার্ত্তা জগতব্যাপী তাহাই সেই স্থানের অনুশাসনে লিখিত আছে। উক্ত অনুশাসনের ভাব কি মহান্ এবং নির্ম্মাতার হৃদয় কত উচ্চ তাহা সকলেই উপলব্ধি করিতে পারেন। ভ্রমণকারী হুয়েন্থ-সং বলেন, তাঁহার সময়ে এই স্তম্ভ প্রায় ৪ হস্ত দীর্ঘ ছিল।" ধর্ম্মচক্র এবং সিংহ প্রভৃতি পৃথক স্থানে রক্ষিত হইয়াছে। দুইটি সিংহ একস্থানে অপর দুইটি অন্যস্থানে রহিয়াছে। স্তম্ভের উপর দুইটি অনুশাসন আছে। তন্মধ্যে প্রথমটি সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। এইটি ব্রাহ্মী অক্ষরে লিখিত। ইহার প্রথম চারি ছত্র নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তাহা আর উদ্ধার করিবার উপায় নাই। শেষ সাত ছত্র পাঠ করা যায় এবং তাহার অক্ষরগুলি বিলক্ষণ পরিস্কৃত। উক্ত অনুশাসনের মর্ম্ম এইরূপ:—মহারাজা অশোকের আদেশ,—"যদ্যপি কোন ভিক্ষু বা ভিক্ষুণী বুদ্ধদেবের উপদেশ লঙ্ঘন করেন বা ধর্ম্মবিরোধ উপস্থিত করিয়া পৃথক হইয়া পড়েন, তাহা হইলে তাঁহার হরিদ্রাবর্ণের পরিচ্ছদ কাড়িয়া লওয়া হইবে, এবং তৎক্ষণাৎ মঠ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হইবে।" অপর দুইটি অনুশাসন তত উল্লেখযোগ্য নহে। তন্মধ্যে একটিতে নিম্নলিখিতরূপ সময় নির্দ্দিষ্ট আছে:—রাজা অশ্বঘোষর চতুর্ব্বিংশতি বর্ষ রাজত্বকালে হেমন্ত ঋতুর দশম দিবসে এই অনুশাসন লিখিত হয়।

ধম্মেক স্তূপের সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হইয়াছে এক্ষণে আরও কিছু বলিব। গৌতম বুদ্ধ একদা এই মন্দিরে বসিয়া শিষ্য বৃন্দকে আহ্বান করিয়া এইরূপ ভবিষ্যৎ বাণী করেন:—ঐ যে অদূরে আমার শিষ্য মৈত্রেয়কে দর্শন করিতেছ সে পঞ্চ সহস্র বৎসর পরে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া বৌদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইবে।" বুদ্ধদেব যে স্থানে এই ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারিত করিয়াছিলেন সেই স্থান পবিত্র জ্ঞানে একজন ভক্ত শিষ্য তাঁহার স্মৃতি চিরস্মরণীয় করিবার জন্য এই ধম্মেক স্তূপ অথবা ধর্ম্মের স্তূপ বা স্থান বা মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। ইহা অনুমান চারি অথবা পঞ্চ শতাব্দীর কথা। এই স্থানের অধিকাংশ কীর্ত্তিই মুসলমান আক্রমণকারীগণ বিনষ্ট করিয়াছিল; কিন্তু চৌখণ্ডী ও ধম্মেক স্তূপ তাহারা নষ্ট করিতে পারে নাই। এই দুইটি স্তূপ ধ্বংস হয় নাই বলিয়াই পণ্ডিতেরা কতিপয় প্রত্নতত্ত্বের মীমাংসা করিতে সমর্থ হইয়াছেন। সেই জন্যই লুপ্ত রত্নের বৃত্তান্ত আমরা অবগত হইয়া আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করিতেছি। যেন মনে হইতেছে জনৈক বিচক্ষণ বাগ্মী অতীতের স্মৃতি প্রকাশ করিয়া তাঁহার দেশ-

মধ্যযুগের পূজার্থীদের স্তূপ।

বাসীর হৃদয় নবোৎসাহে উৎফুল্ল এবং বলীয়ান্ করিয়া তুলিয়াছেন।

সারনাথের পথ—

এক্ষণে সারনাথ গমন করিবার রাস্তার কথা কিছু বলিব। মহা পুণ্যক্ষেত্র বারাণসীর মধ্য দিয়া উত্তরদিকে একটি সরল রাস্তা চলিয়া গিয়াছে। উহা বরুণা নদীর পুরাতন সাঁকোর উপর দিয়া চলিয়াছে। ইহার নিকটে বারাণসীর দিকে নদীর সন্নিকটে মুসলমানগণের এক বড় "ইদ্‌গা" বা পূজার স্থান আছে। পুরাতন অট্টালিকা ভঙ্গ করিয়া ঐ "ইদ্‌গা" প্রস্তুত করা হইয়াছে। ইহার নিকটে একটি প্রকাণ্ড মন্দির আছে। তাহা আম্রপত্র দ্বারা মণ্ডিত। ইহাকেই "লাট ভঁইরো" বলে। হিন্দুগণ ইঁহাকে পূজা করিয়া থাকেন। লাট অর্থে ছড়ি ও ভঁইরো অর্থে পুলিসের প্রধান কর্ম্মচারী বা কোতয়াল বুঝায়। এই কোতয়াল যেন পুত্রপৌত্রাদিক্রমে কোতয়ালগিরি করিয়া আসিতেছেন। কথিত আছে ইঁনিই শিবের রাজধানীর কোতয়াল। হুয়েন্থ-সং বলেন, "আমি বারাণসী সহর ত্যাগ করিয়া যেমন কিছু দূর উত্তরমুখী হইয়াছি, অমনি একটি প্রকাণ্ড স্তূপ অবলোকন করিলাম। সেই স্তূপই এক্ষণে মুসলমানগণের "ইদ্‌গা" রূপে পরিণত হইয়াছে। এক্ষণে উহাই মুসলমানগণের "উপাসনা মন্দির"। স্তূপটি ১১ হাত উচ্চ মৃত্তিকার উপর প্রস্তুত করা হইয়াছিল। ইহা রাজা অশোকের দ্বারা প্রতিষ্ঠাপিত হইলে অবশ্য ইহাতে কোনরূপ অনুশাসন থাকিয়া যাইত। তবে ইহা যে উচ্চভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহার নিম্নে কতদূর পর্য্যন্ত যে মন্দিরের সীমা রহিয়াছে, তাহা খনন না করিলে জানিবার উপায় নাই। উক্ত ভ্রমণকারীর বাক্য সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলে অশোকের অনুশাসন উচ্চবেদীর গাত্রে সংলগ্ন থাকিবার সম্ভাবনা। যাহা হউক সেই প্রকাণ্ড রাজপথ ধরিয়া চলিতে আরম্ভ করিলেই গন্তব্যস্থানে সমুপস্থিত হওয়া যায়। যাঁহারা এখনও পর্য্যন্ত সারনাথে গমন করেন নাই, তাঁহাদের অবিলম্বে তথায় সমুপস্থিত হইয়া এই সকল অভিনব বস্তু দর্শন করা কর্ত্তব্য।

শ্রীগণপতি রায় বিদ্যাবিনোদ।

পদান্ত "ই"।

আমাদের বাঙ্গলা ভাষার আলোচনা আজকাল একটু বেশ ভাল রকম হইতেছে। ছাত্রমহলে বাঙ্গলার আদর যখন হইয়াছে তখন ক্রমে ক্রমে বাঙ্গলা ভাষার সর্ব্বত্র আদর হইবে। বাঙ্গলা ভাষায় কতকগুলি ছোট খাট কার্য্য এক একটি অক্ষর দিয়া করা হয়। তন্মধ্যে হ্রস্ব "ই" একটি। পদের অন্তে বসিয়া এই হ্রস্ব "ই" কত কার্য্য করে তাহা নিম্নে দেখান হইতেছে :—

১। কোনও পদের অন্তে বসিলে সেই পদ কর্ত্তৃক বাক্য কার্য্য বিশেষ করিয়া করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করে। প্রধানতঃ, বিশেষতঃ।

তা বল্‌ন বলতেই (প্রধানতঃ, মুখ্যতঃ—"ই" কাটিয়া লিখিয়া দাও মানে সুগম হইবে) আজ এসেছি। প্রভাত-কুমার। তিনি এই জন্যই (প্রধানতঃ) কৃষ্ণকান্তের কাছে আসিয়াছিলেন। বঙ্কিম।

২। ই=মাত্র; তৎক্ষণে; সঙ্গে সঙ্গে; একটুও দেরী না হইয়া বা করিয়া বলিতেই কাশীবাসিনীর চক্ষু দিয়া দর দর ধারায় অশ্রু বহিল। প্রভাতকুমার। ও পাপ মলেই বাঁচি। বঙ্কিম। একটু নিরিবিলি পেলেই যাব।

৪। ই—বরং,বাঞ্ছনীয়; শ্রেয়ঃ। তাই ভাল ছিল। এটা নাই দেখিতাম।

৫। ই—নিশ্চয়; অবশ্য; নিঃসন্দেহ; যাহাতে মতদ্বৈধ নাই। যাহা না হইয়া যায় না। এ কথা সে বলবেই বলবে; যাবেই যাবে। জানিয়েছ ভালই করিয়াছ। [যাবেই যাবে, ইত্যাদিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা।—স্থির-নিশ্চয়তা বুঝায়।

৬। ই—আদৌ; মোটে; মাত্র বা পরিমাণ।

এই দ্বিধাভাবে কিছুই বলিল না, চুপ করিয়া রহিল।

৭। অন্য কোনও বস্তু,ব্যক্তি নহে; স্বয়ং; নিজে; স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া। নইলে আমিই তোমায় দিতাম না; নিজেই (?) জানি না। তিনি নিজেই গেলেন (এখানেই Redundant); তুমিই বলেছিলে।

৮। অবিলম্বে; এখনই, তখনই। ডাকলেই আসে। (এক হিসাবে ইহাও একার্থজ্ঞাপক)

৯। হইতে; আরম্ভ করিয়া। সে এখনই এত দুষ্ট; বাছুরটাকে এখনই বেঁধো না।

১০। প্রত্যেক; সকলে। Without exception. চুরির জিনিষই বড় মিষ্টি; অসময়ে সবাই মরে। যা বলিবেন তাই পারিব।

১১। সমানভাবে।

আমি উভয়েরই আজ্ঞাকারী।

১২। অভিন্ন; আদৌ পার্থক্য নাই। সেই মুখ সেই বুক সেই নাক কাণ। ভারত।

১৩। শুধু; একমাত্র; কেবলমাত্র।

এক আঁচড়েই বুঝা গেছে; মার্‌তই জান ভুলাতে শিখ নাই।

১৪। নিম্নলিখিত স্থলে "ই"র অর্থ কি ?—অমনই; ? নিলেই হ'ল আর কি? ধরলেই হল? গরীব মানুষ দুপয়সা এলেই ভাল?

১৫। শ্লেষ করিবার জন্য মুখভঙ্গীর সাহায্যার্থ "ই"। বড় কর্ম্মই করেছ! কতই যেন দেখেছেন শুনেছেন। করলেই পারেন যেন।

বসেই আছেন—বসেই আছেন।

১৬। সত্য সত্য; যথার্থতঃ। ধ্রুব।

মত্তেইত এসেছি। একদিন তলবত পড়বেই; একদিন যেতেই ত হবে। জন্মিলেই মর্ত্তে হবে। (৫এর সঙ্গে প্রভেদ আছে?)

১৭। সত্ত্বেও;

জেনেই ত বলেছি।

১৮। বরাবর; বহুকালাবধি।

খেটেই যাচ্ছি খেটেই যাচ্ছি } একদিনও ত মুখে একটা
করেই যাচ্ছি করেই যাচ্ছি } ভাল কথা শুন্‌লাম না।

১৯। সদা সর্ব্বদা, বেশী ভাগ সময়; প্রায়শঃ। পিস্তল ভরাই থাকিত। ভাল কাপড় বাক্সেই থাকিত গায়ে উঠিত না—

২০। মধ্যে;

সেই রাত্রেই ফিরে এসেছে। দুদিনেই টাকাগুলা উড়াইয়া দিবে-দেখ।

২১। পূর্ব্ব হইতে। আপনার ভাগ্যে কেমন সৎ, তাত দেখ্‌লেন। জানাই আছে। (দীনবন্ধু)

২২। অন্যায় বা অসঙ্গত জিদ।

কায থাক্ কর্ম্ম থাক্ ইচ্ছা থাক্ বা না থাক্, তবু বসিতেই হইবে। রবীন্দ্র।

২৩। ই…ই = পক্ষান্তরে; দুই বা ততোধিকের অন্যতর বা অন্যতম—

সে বৈষ্ণবীই সাজুক আর বাসদেবই সাজুক, সে বাড়ীর ভিতর দন্তস্ফুট হইবে না—

২৪। পূরা, সমুদায়; (ই = ভোর) কিন্তু Redundant বলিয়া মনে হয়।

একি সমস্ত রাত্রিই (রাত্রি ভোর) কেঁদেছ নাকি? বাবু কিছু ব'লেছেন?

২৫। একমাত্র;

গৃহ-বিসংবাদ

সদা অনর্থের হেতু ত্রিজগতী মাঝে
বিপদের কালে মনোমিলনই সম্পদ। (হেমচন্দ্র)
একতাই মর্ত্তে মানব-সম্বল।"

বীরের স্বর্গই যশঃ, যশই জীবন (স্বর্গ is identical with যশঃ এইরূপ অর্থ না?) হেমচন্দ্র।

তুইই কেবল বিনয়বাবু বিনয়বাবু করিস্ (রবীন্দ্র) ('ইর পর কে'বল অনাবশ্যক বটে, তবুও কেবলটা তুই এর উপর খুব বেশী জোর দিয়া থাকে)

২৬। নিম্নলিখিত স্থলে "ই"র মানে লেখা বড় মুস্কিল।—

এখন মরিতে বসিয়াছি-লজ্জাই বা এ সময়ে কেন করি? লজ্জাই বা কিসের? মরাই না হয় যাবে—তার বেশীত কিছু না।

মরণেই (একমাত্র?) আমার সুখ—কিন্তু যদি তাকে না দেখিয়াই মরিলাম তবে মরণেও দুঃখ। যদি এ সময়ে একবার তাহাকে দেখিতে পাই, তবে মরণেই (অন্য কিছুতে নহে?) আমার সুখ। বঙ্কিম। যে দিক্ দিয়াই দেখ- মদে কোনও দোষ নাই।

আচ্ছা না হয় সোমবারই হ'ল।

কদিনই যে ছিলেন না।

যত দিন না গায়ের বেদনা আরাম হইল, তত দিন কাজে কাজেই ব্রাহ্মণের গৃহে থাকিতে হইল। বঙ্কিম।

প্রসাদপুর হইতে অল্পটাকাই (মাত্র) আনিয়াছিলেন।

যা হয় তাই লিখিলেই বা অধিক কি ক্ষতি হইবে? বঙ্কিম।

চুরি করেই দেখা যাক্ না কেন?—খেয়েই না হয় ফেল্‌লে।—

শ্রী অ—না—ব।

মন্ত্রশক্তি। *

[পূর্ব্বাবৃত্তি—রাজনগরের জমিদার, কুলদেবতা গোপীকিশোরের প্রতিষ্ঠাতা উইল সূত্রে তাঁহার বিশাল জমিদারী দেবত্র এবং অধ্যাপক জগন্নাথ তর্কচূড়ামণি ও তৎকর্ত্তৃক মনোনীত ব্যক্তিকে সেবায়েৎ নিযুক্ত করেন। তর্কচূড়ামণি মৃত্যুকালে তাঁহার নবাগত ছাত্র অম্বরনাথকে স্বীয় পদে মনোনীত করিয়া যান। এই ব্যবস্থায় অসন্তুষ্ট হইয়া পুরাতন ছাত্র আদ্যনাথ টোল ছাড়িয়া সেই গ্রামস্থ দূর-সম্পর্কিত জ্ঞাতি বৃন্দাবনচন্দ্রের বাড়ীতে বাস করিতে লাগিল। বৃন্দাবন অতি ভাল মানুষ, তুলসীমঞ্জরী তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের যুবতী ভার্য্যা। আদ্যনাথ তুলসীর দ্বারা জমিদার-কন্যা রাধারাণীর নিকট অম্বরনাথের অযোগ্যতা জ্ঞাপন করিবার চেষ্টা করিলে, সে সে প্রস্তাবে কর্ণপাত করে না। আদ্যনাথ গোড়া হইতেই অম্বরনাথের উপর বিরক্ত ছিল, এই নিয়োগে সে তাহার শত্রু হইয়া দাঁড়াইল। অম্বরনাথ কিন্তু হৃদয়বান্ পরোপকারী; সেই জন্য আর সকলেই তাহাকে শ্রদ্ধা করিত ও ভালবাসিত। পুরোহিত নিযুক্ত হইয়া সে যখন প্রথম দিন পূজা

* এতদিন ভ্রমক্রমে 'বাণী' স্থলে 'রাণী' ছাপা হইয়াছিল। পাঠক-পাঠিকাগণ অনুগ্রহ করিয়া 'রাণী শব্দগুলি 'বাণী' বলিয়া পাঠ করিবেন।

করিতে গেল, তখন দেবতার ঐশ্বর্য্য দেখিয়া ক্ষুব্ধ হইল—"দেবতার নামে এ ঐশ্বর্য্যের খেলা কেন?" ভাবিয়া সে আকুল হইল। জমিদার হরবল্লভ বাবুর একমাত্র পুত্র রমাবল্লভ; রাধারাণী রমাবল্লভের একমাত্র কন্যা। রাধারাণীর বিবাহ দিবার জন্য ঠাকুরদাদা যে বর স্থির করিলেন, তাহা রাধারাণীর পিতার মনোমত হইল না। হরবল্লভ রাগ করিয়া নাতিনীর বিবাহ-প্রসঙ্গ ত্যাগ করিলেন। তাহার কিছু দিন পরেই হরবল্লভ মারা গেলেন; তিনি উইল করিয়া গেলেন যে, ১৬ বৎসর বয়সের মধ্যে রাধারাণী যদি উপযুক্ত বরে সমর্পিত না হয় তাহা হইলে দেবত্র সম্পত্তি ব্যতীত আর সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী রাধারাণী হইবে; আর তাহা যদি না হয়, তবে বিষয় দূর সম্পর্কীয় এক জ্ঞাতি পাইবে, রামবল্লভ কেবল মাসিক বৃত্তি পাইবে। কিন্তু উপযুক্ত বরও মেলে না, রাধারাণীরও বিবাহ হয় না, তবে ষোল বৎসর বয়স হইবার বিলম্ব আছে। রাধারাণী গোপীকিশোর বিগ্রহের সেবায় আত্মসমর্পণ করিয়াছিল। বালক—পুরোহিত অম্বরনাথের পূজা তাহার মনের মত হইত না, সে বিরক্ত হইত, কিন্তু পুরোহিতকে সে কথা মুখ ফুটিয়া বলিতেও পারিত না, কারণ সে বিশেষ কোন ত্রুটি দেখিতে পাইত না।]

সেইদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে তুলসীমঞ্জরী বাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। নানা কথার পর পুরোহিতের কথা তুলিলেন। বাণরী সে সম্বন্ধে মঞ্জরীর সহিত আলোচনা করিবার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু মঞ্জরী বার বার ঐ কথা বলাতে বাণী এমন দুই একটি কথা বলিলেন যাহাতে মঞ্জরী বুঝিয়া গেলেন যে, অম্বরনাথের আসন টলমল করিতেছে।

তাহার পর স্নানযাত্রা আসিল। এই সময়ে একমাস ধরিয়া পুরোহিত অম্বরনাথকে কথকতা করিতে হইবে। অম্বরনাথ বড়ই বিপদে পড়িলেন, তিনি ত কখন কথকতা করেন নাই। কিন্তু উপায় নাই। তিনি কথকতা আরম্ভ করিলেন; তাহা কাহারও তেমন ভাল লাগিল না। সকলেই এমন কি বাণীও নিন্দা করিতে লাগিলেন। জমিদার মহাশয় অম্বরনাথকে ডাকাইয়া বিশেষ মনোযোগের সহিত কথকতা করিবার উপদেশ দিলেন। অম্বরনাথ যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া প্রায় পনরদিন কথকতা করিল; কিন্তু তাহা শুনিয়া কেহই সন্তুষ্ট হইল না।

তাহার পর একদিন অম্বরনাথ পূজা শেষ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, তখন বাণী পূজার স্থানে গিয়া দেখেন, ঠাকুরের পাদমূলে রক্তজবা ফুল পড়িয়া রহিয়াছে। সর্ব্বনাশ! তাহার পর তিনি আদ্যানাথকে ডাকিয়া কথকতা করিতে বলিলেন। আদ্যনাথ স্বীকৃত হইয়া চলিয়া গেল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

মধ্যাহ্নে জমিদারের তলব পাইয়া অম্বর সেখানে হাজির হইল। সবেমাত্র নিদ্রাভঙ্গে উঠিয়া রমাবল্লভ সেই তিাকা বালিস টানিয়া সোজা হইয়া বসিয়াছেন, এমন সময় অম্বর গিয়া নমস্কার করিল। প্রতিনমস্কার ও আসন দিতে আদেশ-প্রদানান্তে রমাবল্লভ কহিলেন,"শুনিলাম তুমি পূজার্চ্চনা যথাবিধি করিতে পার না। অভিযোগ শুনিতে শুনিতে আমি ত গেলাম।"

অম্বরনাথের পদতলের মৃত্তিকা ঈষৎ কাঁপিয়া উঠিল। অভিযোগ! কে করে? তিনিই কি? সে নতমস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল। ভৃত্য আসন দিয়া গিয়াছিল, বসিবার কথা মনে হইল না। কি ত্রুটি হইয়াছে! কোন্ ভুলের জন্য এ অভিযোগ? স্পষ্ট করিয়া কি কিছু বলিয়া দিবেন?

রমাবল্লভ চিরদিন বিষয় চর্চ্চা করিয়া আসিতেছেন; সংসারের লোক চিনিতে যে অভিজ্ঞতার প্রয়োজন, সেটুকু প্রায় তিনি আয়ত্ত করিয়াছিলেন। দোষীকে দোষী বলিলেই সে যে লাফাইয়া মারিতে আসিবে, এই অনতিক্রমণীয় নিয়মের ব্যত্যয় আর কখনও দেখিয়াছেন, একথা তাঁহার মনে পড়ে না। তাই অপরাধ আরোপের পরও পুরোহিতকে নম্রভাবে নীরব থাকিতে দেখিয়া তিনি কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়াছিলেন। সেই বিস্ময়ে পুনঃ পুনঃ অকর্মন্যতার শত ত্রুটির উল্লেখে ঝালা পালা হইয়া উঠায় অম্বরনাথের উপর তাঁহার যে বিরক্তি জন্মিয়াছিল, তাহারও অনেকখানি কমিয়া গেল। তখন তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা গরম স্বরে বলিলেন, "পুঁথিটুথি গুলা একটু দেখিয়া শুনিয়া লইও।" রাধারাণী বাবার আমল হইতে দেবসেবা দেখিতেছে, সে পূজার ত্রুটি সহ্য করিতে পারে না। আর আমিও বলি, সেটা উচিতও নয়। আচ্ছা, তাহা হইলে এখন এস। তোমার কাজকর্ম্ম থাকিতে পারে। আর যেন এ সকল অনুযোগ না শুনিতে হয়। নমস্কার।"

অম্বরের মনে তখন এই প্রশ্নটা উঠিয়া মুখে ফুটিতে চাহিতেছিল, "কি দোষ, কি ত্রুটি, বলিয়া দিলে ভাল হইত যে।" কিন্তু এ প্রশ্নে একটা প্রচণ্ড গর্ব্ব প্রকাশ পাইবে বলিয়া সে প্রশ্নটা জিহ্বায় ফুটিতেছিল না। প্রভু যখন বলিতেছেন—পুঁথি দেখিও, তখন নিশ্চয়ই সেখানে সে এই অমীমাংসিত প্রশ্নের উত্তর লিখিত আছে, দেখিতে পাইবে। নিশ্চয়ই একটা মস্ত ভুল লইয়া সে ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক কাজে ফাঁকি দিতেছে বই কি। নহিলে তিনি কথাটা

বলিলেন কেন? সে তাঁহাকে প্রতি-নমস্কার করিয়া বিনীতস্বরে কহিল, "যে আজ্ঞা, আমি ভাল করিয়া পুঁথি দেখিব।"

অম্বরনাথ চলিয়া গেলে জমিদার বাবু কিছুক্ষণ সেই দিকেই চাহিয়া রহিলেন, তারপর দৃষ্টি সরাইয়া আনিয়া আপন মনে কহিলেন, "আমি ত ছেলেটিকে মন্দ দেখি না, নরম সরম আছে। বাণীর কিন্তু ও দুচক্ষের বিষ! ছাড়াইতে পারিলেই ভাল হইত, কিন্তু আমার ত হাত নয়। কারু জন্য আমি রাধারাণীর মনে কষ্ট সহিতে পারিনে, সেই যে আমার সর্ব্বস্ব!"

"যে আজ্ঞা, আমি ভাল করিয়া পুঁথি দেখিব।"

সে দিন অপরাহ্নে অম্বরনাথ সংশয়পূর্ণ চিত্তে মৃদু চরণে ঠাকুরদালানে গিয়া দেখিল তাহার অধিকৃত মঞ্চাসন অপরে অধিকার করিয়া লইয়াছে। স্ফীত বক্ষে টগর ফুলের মালা পরিয়া কণ্ঠস্বর কখনও পঞ্চমে কখনও সপ্তমে চড়াইয়া, কখনও ভৈরবীতে কখনও বেহাগে, কখনও কখনও বা ললিত রাগিণীতে উঠাইয়া নামাইয়া হাসাইয়া কাঁদাইয়া নদীতরঙ্গের মত অবলীলায় বাহির করিয়া দিতেছে। সে আত্মনাথ। সে দিন কথকতার মণ্ডপে যেন অগ্নিপরীক্ষা চলিতেছিল; কথক কথার স্রোতে প্রাণের স্রোত ঢালিয়া দিতে চাহিতে ছিলেন। কথকতার বিষয় ছিল অভিমন্যু-বধ। ক্ষমতাশালী বক্তা সেই অতি করুণ প্রাণস্পর্শী মর্ম্ম-বিদারী দৃশ্যাবলী করুণরসসিক্ত ভাষায় অঙ্কিত করিতেছিলেন। ছন্দে, তালে সে ভাষা নৃত্যনিপুনা নর্ত্তকীর লীলা-নর্ত্তনের ন্যায় নাচিয়া চলিতেছিল; ভাবসৌন্দর্য্যে সজল শ্যামল নবীন মেঘমন্দারের মতই স্তব্ধকারী অনির্ব্বচনীয় আনন্দস্রোত প্রতি বক্ষে জমাইয়া তুলিতেছিল। করুণার মন্দাকিনীধারা পাষাণ ভেদ করিয়া ছুটিতেছিল। সে ভাষা প্রাণস্পর্শী, স্বর অনন্য-সাধারণ। বীর বালকের অতুল সাহস, অমিত পরাক্রম শ্রোতৃদলকে উত্তেজিত করিয়া যেন রণক্ষেত্রে টানিতেছিল। তারপর সে কি উৎকণ্ঠা, কি বিপুল উদ্বেগ! শ্বাস বুঝি কণ্ঠের মধ্যে চাপিয়া আসে! সপ্তরথী আসিয়া একা অসহায় বালককে একসঙ্গে ঘিরিল।

কি পাষণ্ড! পিশাচ! দন্তে দন্তে নিষ্পেষিত ও হস্ত দৃঢ়মুষ্টি-বদ্ধ হইয়া গেল। প্রতিকার নাই! ইহার প্রতিকার কি নাই? ধিক্, যদি না ওই অন্যায়কারী শত্রুপক্ষ দলিত করিয়া সপ্তরথীর লৌহ-নিগড়-মধ্য হইতে সোণার হরিণটিকে উদ্ধার করিয়া আনিতে পারা যায়, তবে শতাধিক এই জীবনে। কিন্তু হায় কিছু উপায় হইল না, অন্যায় সমরে ভারতের ভবিষ্য-রবি অকালে অস্তমিত হইয়া গেল। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মাতুল, পিতা সব্যসাচী, পিতৃব্য মহাবল ভীম, যার সহায়, সে আজ অসহায় অনাথভাবে সপ্তরথীর সপ্তশরে শোণিতরঞ্জিত বিক্ষতাঙ্গে বসুধা আলিঙ্গন করিল। হায়, কোথা সুভদ্রা জননি! তোর অঞ্চলের নিধি যে আজ চির-বিদায়-গ্রহণোদ্যত, তুই একবার জানিতেও পারিলি না? মা বধূ উত্তরে! সর্ব্বানন্দময়ী বালিকা-বয়সেই আজ তোর সকল সুখের অবসান হইতে চলিল, দেখিয়া যা।

দর্শকদল নীরবে অশ্রুমোচন করিতেছিল; কোন কোন পুত্রশোকাতুরা জননী হৃদয়ের আবেগ সংবরণ করিতে না পারিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছিলেন। বাণী নীরবে চক্ষু মুছিয়া কথকের মুখের দিকে চাহিল। সে মুখে কোন পরিবর্ত্তন লক্ষ্য হইল না। চিত্রকরের তুলি যেমন চিত্রের মুখে ভাব প্রদান করে, বর্ণসমাবেশে ইন্দ্রালয়ে নন্দনকানন রচনা করে, কিন্তু নিজে সে ভাবসম্পদের ধারও ধারে না। যে এতগুলা লোকের বক্ষতলে এতখানি শোকস্মৃতি জাগ্রত করিতেছিল, সে নিজে যেন তাহার মধ্যে ধরা ছোঁয়াও দেয় নাই। সে বিস্মিত হইল, কিন্তু কথকের শক্তি দর্শনে প্রীত হইল।

সে দিন কথাশেষে সঙ্গীত হইয়া সভা ভঙ্গ হইল। সেই তাললয়যুক্ত সুস্বর ও সঙ্গীতের উদ্দীপনা সঙ্গীত শেষ হইলেও বাণীকে অনেকক্ষণ অবধি মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিল। গীতটি ভক্তিরসে সরস। ভ্রাতৃরূপে পরিকল্পিত শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে সদ্য-পুত্রশোকাতুরা সুভদ্রার গীত। গীতটির মর্ম্ম এইরূপ সুখের উচ্চতম তুঙ্গশৃঙ্গে স্থাপন করিয়া দেখিলে, এবার কি তমসাচ্ছন্ন অতল দুঃখগহ্বরতলে নিক্ষেপ করিয়া দেখিতে চাহ, তোমার ভদ্রা এই অসীম বেদনার অগ্নিজ্বালা সহিয়া তোমার বিস্মৃত হয় কি না? হে কৃষ্ণ! হে যদুনাথ! সীতা, রাধা, সবার জন্যই ত এই পরীক্ষার অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত করিয়াছিলে। তবে জানিয়া শুনিয়া আজ আবার এই হীনাদপি হীনার জন্য এ আয়োজন কেন, শুনি হে অন্তর্যামিন্! জান না কি, তোমার দেওয়া এ জীবনের সকল আলোকও যদি নিবিয়া যায়, তথাপি তোমার আলো এ জীবন হইতে নিমেষের তরেও নিবিবে না। তুমিই আমার অভিমন্যু, তুমিই আমার অর্জ্জুন, তুমিই আমার বাসুদেব, তুমিই আমার আমি-পদবাচ্য অহং-জ্ঞান, তুমিই আমার সব, আমার সবই তুমি প্রভু!

কি সুন্দর! কি সুন্দর! বাণীর দুই নেত্র হইতে শিশির-নির্ম্মল অশ্রুধারা তাহার সুকোমল আরক্ত গণ্ডতলে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। যথার্থ—ইহা যথার্থ। আমি কি তোমায় আমার জন্য ভাল বাসি? তোমার জন্য তোমায় ভাল বাসি না? তবে স্বার্থ অভিমান লইয়া কেন তোমার দ্বারে গিয়া দাঁড়াই? কেন পাইতে বিলম্ব হইলে, পাওয়া জিনিস খোয়া গেলে তোমার উপর বিশ্বাসবিহীন হইয়া পড়ি? হে নাথ! হে প্রাণনাথ! অমনই দৃঢ় বিশ্বাস, ওই একনিষ্ঠ ভক্তি, প্রেম দাও। আর কিছুই চাহি না। সঙ্গীতের শেষ কম্পন বৃহৎ খিলানের মধ্যে বিলীন হইয়া গেল। ইহার পরেও কিছুক্ষণ কেহ বাক্যোচ্চারণ করিল না। চন্দন-মাল্যাদি বিভূষিত নূতন কথক তাম্রঘট-হস্তে মহিলামণ্ডপে প্রবেশ করিয়া কহিলেন, "মাজননীরা, শান্তিজল লউন, ওঁ শ্রীবিষ্ণুঃ"।

অন্য দিন শান্তিজল গ্রহণ করাইতে কথকঠাকুরের এখানে পদধূলি পড়ে না। আজ এ নূতন কথকের বিবেচনা বুদ্ধি দেখিয়া বর্ষীয়সীগণ খুসী হইয়া কাপড় দিয়া চরণাবৃত করিয়া বলিলেন, "দাও বাবা, দাও। আমার এই নাতনী-টেকে একটু ভাল করে মন্তর বলে টলে দিওত বাপ্। মেয়েটা বড় ভুগচে; যদি তোমার ঐ শান্তিতে আরাম হয়, পুরোহিত শান্তি-পাঠ করিতে করিতে বাণীর মুখে তীক্ষ্ণ-নেত্রে চাহিতেছিলেন। তাহার নত মুখে আশা ও আনন্দের ছায়ার মধ্যেও একই গভীর বিচলিত ভাবের চাঞ্চল্য স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল। তাহাকি সেই শোণিত-স্রোত-রক্ত সরস্বতীকূলে বিশাল কুরুক্ষেত্রের বক্ষঃস্থলে অশ্ব হ্রেষা-নাদ-শব্দিত অসি-ঝনঝনায়িত ভীষণ রণভূমে শত্রুসৈন্য-বেষ্টিত শিশুর অসহায় বীরকুমারের স্মৃতি-ব্যথা! অথবা সেই পট্ট

লক্ষ্য-শিক্ষা

চিত্রশিল্পী···শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র পালিত।

"মা বাণী, শান্তিজল নিন মা!"

উচ্চবংশে জন্ম!" বাণীর মুখ রাঙা হইয়া উঠিল। আত্ম-নাথ যেন কি কুহক জানে। একটু লজ্জার সহিত বাণী কহিল, "আপনিও ভক্তিতে কম নহেন। কি মিষ্ট আজি-কার কথাগুলি শুনিলাম। দিনটা যেন সার্থক হইয়া গেল।"

আত্মনাথের সর্ব্বশরীর পুলকে শিহরিল। সে তখন মনের আনন্দ চাপিয়া স্বভাবসিদ্ধ গম্ভীরমুখে উত্তর দিতে গেল, কিন্তু পারিল, না। সহসা হাসিয়া বলিল "আপনি সুখী হয়েচেন ত, তাতেই আমার শ্রম সার্থক হল। ভক্তি—ভক্তির আমি কি জানি?" তবে হাঁ, এ কথা মানি যে,বট-বীজটি ক্ষুদ্র হইলেও তার মধ্যে প্রকাণ্ড মহীরুহের শক্তি নিহিত আছে। যদি একবিন্দুও যথার্থ ভক্তি মনের কোণেও জাগ্রত থাকে, তবে তাহা হইতেই প্রেমসমুদ্র উথলিয়া উঠিতে পারে। যথার্থ ভক্তিতে ভগবানের কাছে আপনাকে বাঁধা দিতে হইবে। সেই ধ্যান সেই জ্ঞান, সেই চিন্তা। তাঁহার সেবায় প্রাণ মন সর্ব্বস্ব সমর্পণ করা চাই। যদি প্রভুর প্রতি নিমেষের অব-হেলা ঘটে, এ প্রাণ সেইক্ষণেই পরিত্যাগ করিব এমনই দৃঢ় নিষ্ঠা চাই। শুধু তাঁহাকে লইয়া খেলার সাধ মিটাইলে চলিবে না। এখন শান্তিজল লউন, আমি বিদায় হই।"

বাণী নীরবে মাথা নত করিয়া দিল, আত্মনাথের কথা-গুলার মধ্যে যে খোঁচাটাছিল, সেটা তাহাকে বিঁধিতেও ছাড়ে নাই।

শিবিরাভ্যন্তরবাসিনী সুখলালিতা সদ্যোবিধবা বালিকা উত্তরার গভীর দুঃখে সহানুভূতি? আত্মনাথ কহিলেন, "মা বাণী! শান্তি জল নিনমা!"

বাণী বিস্মিত হইয়া মুখ তুলিল। কথা থামিয়া গিয়াছে, সে এতক্ষণ কিছুই জানিতে পারে নাই। এতক্ষণ সে মন্ত্রমোহে আচ্ছন্নবৎ ভাবিতেছিল, কি বিশ্বাসের দৃঢ়তা, কি অকৃত্রিম প্রেম! আমি কবে অমন হইব! মুখ তুলিয়া দেখিল সম্মুখে আত্মনাথ। ঈষৎ অপ্রতিভ হইয়া কহিল. "দিন।" আত্মনাথ একটু ইতস্ততঃ করিয়া চলিল। আপনার মত ভক্তিমতী কাহাকেও দেখি নাই। ধন্য আপনার

নবম পরিচ্ছেদ।

পূজা-পদ্ধতি "সৎকর্ম্মমালা এবং উপাসনা-খণ্ড" পাঁতি পাঁতি করিয়া খুঁজিয়াও অম্বর তাহার দেবার্চ্চনার ভ্রম বাহির করিতে পারেন নাই। আচমন হইতে প্রণাম-মন্ত্র সবই তো তাহার মনে গাঁথা রহিয়াছে, অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়া যায়। তবে? নিতান্ত দুঃখিতচিত্তে পুঁথি কয়খানি মলিনবস্ত্রে বাঁধিয়া সযত্নে যথাস্থানে রক্ষা করিয়া সে নদীর তীরে একবার ঘুরিয়া আসিল। বর্ষার শ্যামলতায় পৃথিবী সরস হইয়া উঠিয়াছে। নদীর নির্ম্মল জল ঈষৎ পঙ্কিল, কিন্তু মহত্বের গৌরবে অচপল। সে চিত্ররেখার বাঁধাঘাটে জলের ধারে বসিল। ঘাট জলশূন্য ছিল। কিন্তু সেই নববর্ষার সজল মেঘগৌরব পরপারের গোলার্দ্ধের গাঢ় কৃষ্ণতার মধ্যে মধ্যে কদম্বের বিচিত্র বর্ণশোভা কিছুই তাহার ভাল লাগিতেছিল না। মন কেবলই বলিতেছিল, "কি ত্রুটি ঘটিতেছে কে বলিয়া দিবে?"

পরদিন পূজা করিতে যাইবার সময় মহেশ মণ্ডলের বেড়ার ধার হইতে মহেশের কণ্ঠ শোনা গেল, "দাদা-ঠাকুরগো, ফুলকটা নিয়ে যাবে না?" "আচ্ছা দিয়া যা। অম্বর দাঁড়াইয়া মহেশের নিকট হইতে কদলী পত্রে আবৃত জবা কয়টি গ্রহণ করিয়া ঠাকুরবাড়ী চলিল।

সেদিন মন্দিরমধ্যে একটু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। বাণী আজ পূর্ব্বস্থানে নাই। ঘরে প্রবেশ করিয়াই অম্বরের প্রথম মনে হইয়াছিল আজ শুধু উহারই নয়, মন্দির—সে বিকার নির্ভুল আয়োজনেও আজ যেন কি ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে। কিন্তু না, তাহার ভুল; বাণী প্রতিমার পার্শ্বে নাই বটে, কিন্তু সে মন্দির ত্যাগ করে নাই, সে আসনের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া আছে।

অম্বর গৃহে প্রবেশ করিল। সে তাহার দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইল; তাহার হস্তস্থিত পত্রপৃষ্ঠ লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "উহাতে কি?" এরূপভাবে জিজ্ঞাসিত হওয়ায় এবং স্বভাব-বশেও কতকটা বটে, অম্বর একটু সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছিল; সে মৃদুস্বরে বলিল, "ফুল" "ফুল! কি ফুল? ফুল আপনার বহিয়া আনার দরকারই বা কি? থালায় যে ফুল আছে, উহাই ত পড়িয়া থাকিবে!"

অম্বর বিষম অপ্রতিভ হইয়া গেল, ঘাড় হেঁট করিয়া সে কোন মতে উত্তর করিল, "সেজন্য নহে; একজন লোক ভক্তি করিয়া দেয়, তাই ফিরাইতে পারি না। যদি—"

বাধা দিয়া বাণী জিজ্ঞাসা করিল "কি দেয়?" "মহেশমণ্ডল বলিয়া একজন—"

"সে কি! শূদ্রের ফুল! কি ফুল ওগুলা, দেখি?"

অম্বর পাতার মোড়া খুলিয়া ফেলিল। ফুটন্ত রক্তজবা সম্মুখস্থ মসৃণ মর্ম্মর ভিত্তিগাত্রে প্রতিবিম্বিত হইয়া যেন একমুষ্টি আবির ছড়াইয়া দিল। দুই পদ পিছাইয়া গিয়া বাণী ডাকিল "পুরুতঠাকুর!" অম্বর বিস্ময়ে বিমূঢ় হইয়া গিয়াছিল; সে কেবল চোখ দুইটা উন্মীলিত করিল। "পুরুতঠাকুর! তুমি অতি মূর্খ, তা জানিয়াও কোন মতে সহিতে ছিলাম। কিন্তু আর নহে। যাও, তুমি এ মন্দির হইতে এখনি যাও। কাল বাবা তোমায় সাবধান করিয়া দিয়াছেন, আবার আজ সেই কাজই তুমি করিতে আসিলে! যাও, আমার ঠাকুর না হয় অমনই থাকিবেন,সেও ভাল,তবু অমন পূজা আমার চাই না।"

নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ অম্বরনাথ কিছুক্ষণ সেইভাবেই দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার অপরাধটা যে কি এতক্ষণে সে বুঝিয়াছে। শূদ্রের ফল-গ্রহণের শাস্তি ভুলিয়া গিয়া আবার শূদ্রের ফুল গ্রহণ করিয়াছে, এমনই সে আহাম্মক! আবার শ্যামের অঙ্গে শ্যামার প্রিয়চিহ্ন লিখিতে আসিল! হায় মূর্খ! তোর অপরাধ কে ক্ষমা করিতে পারে?

বাণী তখন ক্রোধে গর্জ্জিতেছিল। সে অম্বরকে তদবস্থা দেখিয়া ভাবিল বোধ হয় মূর্খ পুরোহিতটা এখনই নিজের ত্রুটি স্বীকার করিয়া তাহার কাছে ক্ষমা চাহিয়া বসিবে! না! আর পারা যায় না। ইহার হাত এড়াইতেই হইবে। বিশেষতঃ কল্যকার সুভদ্রা-সঙ্গীত তখনও কাণের মধ্যে প্রাণের তন্ত্রিতে রিম্‌ঝিম্ করিয়া বাজিতেছিল। আশুনাথের তুলনায় অম্বর! চন্দ্রের কাছে খদ্যোতিকা! সে বাহিরে আসিয়া দাসীকে ডাকিয়া আদেশ দিল, আহ্ ঠাকুরকে ডাকিয়া আন্। বলিস্ যেন স্নান করিয়া পূজার জন্য তৈরি হইয়া আসেন।"

শূন্য মন্দিরের মর্ম্মর-বক্ষে লুকাইয়া পুরোহিত দেব-

চরণোদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া নূতনের জন্য আসন ছাড়িয়া দিল।

কারাগার হইতে বাহির হইবার জন্য বন্দীর মনে আগ্রহের সীমা থাকে না; কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় মুক্তির হুকুম আসিলে সেই কঠোর স্মৃতিপূর্ণ আশ্রয়টির জন্য চিত্ত এক-বারও অন্ততঃ পীড়িত হইয়া উঠে। দেবালয় হইতে বিতাড়িত অম্বরের মনেও আজ তেমনই একটা বিচ্ছেদদুঃখ সঞ্চারিত হইতেছিল। দুঃখ! না, ইহাকে ঠিক দুঃখ বলিতে পারা যায় না। যেখানে মানুষের সুখ নিহিত থাকে, দুঃখ শুধু সেইখানেই। সুখের অভাবেই দুঃখ। তবে কি তাহার সেখানে সুখের কিছু কারণ বর্ত্তমান ছিল? রন্ধনশালার গৃহে আসিয়া করলগ্ন কপোলে বহুক্ষণ চিন্তা দ্বারা সে এ কথার সম্পূর্ণ ঠিকানা করিয়া উঠিতে পারিল না। সুখ! বুঝি কিছুই ছিল না! কই? সেই দেবগৃহে বিলাস-প্রাচুর্য্য কোলাহলের মধ্যে ধ্যানের মন্ত্র-বিস্মৃতির ব্যথায়ই ত সে এতদিন পীড়া-বোধ করিয়াছে। সুখ ইহার মধ্যে কোথায় ছিল? তবে কি পৌরহিত্যের সম্মানহারা হইয়া সে দুঃখিত হইয়াছে? ভগবান্ রক্ষা কর! বড়লোকের পুরোহিত হইবার আশা বা সাধ তাহার মনের কোণেও ত কখনও উঁকি পাড়ে নাই। ঘরের ক্ষুদ্র শালগ্রাম শিলাটুকুর মধ্যে নির্জ্জনে নিরিবিলি বসিয়া "সহস্রশীর্ষ পুরুষের" প্রতিষ্ঠা করাতেই তাহার পূজাসুখ! অত বড় জাঁকাল মন্দির, তাহার কাছে রাজপ্রাসাদের মতই প্রবেশ-কুণ্ঠায় দুরধিগম্য; তবে এ ব্যথাটুকু কিসের? ইহা অপরের মর্ম্মবেদনার পাত্র হওয়ার লজ্জাও হইতে পারে, না হয় গুরুর বিশ্বাস রক্ষা না করিতে পারারও ক্ষোভ হওয়া কিছু আশ্চর্য্য নয়! সেই সঙ্গে সে একটা অনুভূত পূর্ব্ব তীব্র আনন্দও সেই মুহূর্ত্তে অনুভব করিল। আর একজনের ন্যায় সঙ্গত অধিকারের মধ্যে সে যে আসিয়া দাঁড়াইল, তাহা মিটিয়া গেল। ইহাতে সে মনে আনন্দ অনুভব করিল। বেশ হই-য়াছে, এইবার অধ্যাপনার অযোগ্য ভারটুকু হস্ত-স্খলিত হইলেই সে নিশ্চিন্ত মনে শাপমুক্ত নক্রের মত অহিংস্র আত্ম-শরীর গ্রহণ করিতে পারে। সে মন্দিরোদ্দেশ্যে উৎফুল্ল মানসদৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। ভক্তিভারনতা মন্দিরচারিণী প্রসন্ন-দৃষ্টিতে নূতন পুরোহিতের ক্রটিহীন সাড়ম্বর পূজা দর্শন করিতে করিতে আনন্দপরিপ্লুত হইতেছেন। সে তখন শান্তচিত্তে নিজকার্য্যে মনোযোগী হইল।
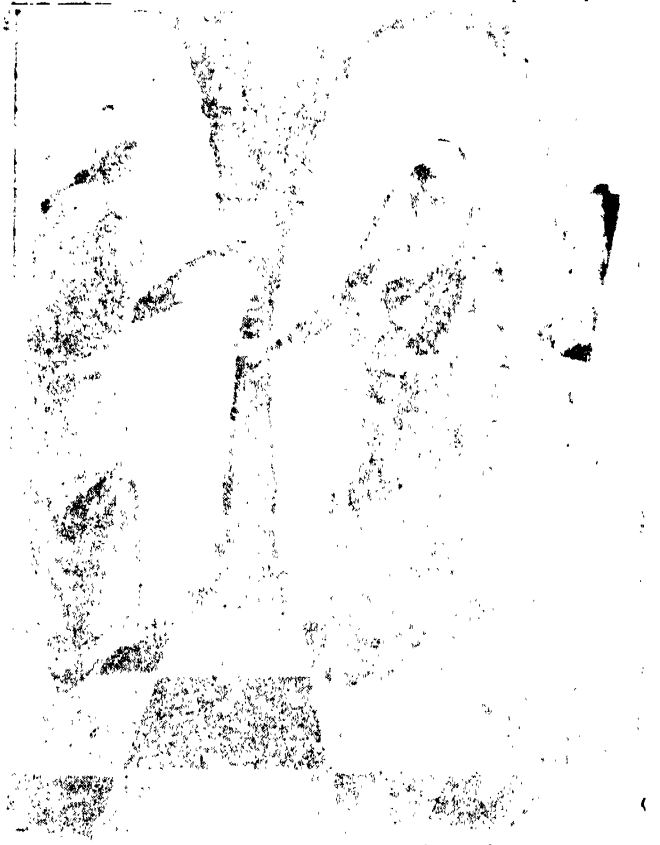
"যাও, তুমি এ মন্দির হ'তে এখনই যাও!"

দশম পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে অম্বরনাথের অধ্যাপনারম্ভের প্রারম্ভেই তাহার চতুষ্পাঠীর ছাত্রবৃন্দের মধ্যে অনেকেই অধ্যয়ন পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিল। যে কয়জন অবশিষ্ট ছিল, তাহাদের লইয়াই এ কয়মাস কোনমতে কাজ চলিতে-ছিল। আর এখানে তেমন পাঠ-কোলাহল নাই; চতুষ্পাঠীর

প্রাণস্বরূপ আম্রনাথের দলই চলিয়া গিয়াছে। তাহার সেই সঙ্গে কোলাহল পরিহাস সকল দিকেই ভাটা পড়িয়া গিয়াছে। এ ঘটনায় অনেকেই দুঃখিত; দুএকটি নিরীহ প্রকৃতির ছেলে কেবল নিশ্চিন্ত হইয়া বিনা বাধায় আহার নিদ্রা সম্পন্ন করিতে করিতে হাঁফ ফেলিয়া বলিতেছিল, "দস্যুগুলা গিয়াছে, বাঁচাইয়াছে।" যে কয়জন তিষ্ঠিয়া রহিল, সে কয়টি ছেলের মধ্যে অনেকেই আজকাল অধ্যাপকের উপর পূর্ব্বের চেয়ে অনেকখানি যেন প্রসন্ন হইয়া আসিয়াছিল। তাহারা এখন পাঠ লইবার কালে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ভূমিলগ্নচক্ষে চাহে না; অধ্যাপকের সঙ্গে কথা কহিতে হইলে নিজেরাই কহে, একজনকে মধ্যস্থ মানে না। আবার কখন কখনও তাঁহার কাছে গিয়া দুরূহ বিষয়গুলা বুঝাইয়াও লইতে দেখা যায়। তবু এখনও প্রায় সবারই বক্ষে গুপ্ত আগ্নেয়-গিরি অগ্নি-নিঃশ্রব প্রতীক্ষা করিয়াছে! ঈর্ষা জিনিষটা এতই ভয়ানক!

যেদিন অম্বরের পৌরোহিত্য ফুরাইল, সেদিন দ্বিপ্রহরে সে যখন খানকত পুরাতন পুঁথি খুলিয়া কি একটা খোঁজা-খুঁজি করিতে ব্যস্ত ছিল, সেই সময় একটি ছাত্র একখানা বটতলার ছাপা জীর্ণ পুঁথি হাতে করিয়া গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিল। ছাত্রটির নাম সুধাকর। সুধাকর হরিবল্লভ-চতুষ্পাঠীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা মেধাবী ও বিনীত যুবক। অধ্যাপক পদারূঢ় হওয়ার পূর্ব্বে ও পরে এই ছেলেটির নিকটেই একমাত্র সহপাঠী ও অধ্যাপকের প্রীতি ও শ্রদ্ধা অম্বরনাথ লাভ করিয়া আসিয়াছে। সুধাকর আসিয়া কাছে বসিল, বলিল, "ব্যস্ত আছেন কি? আমার কিছু বুঝিয়া লইবার ছিল।" "বেশ ত, প্রশ্ন কর।" সুধাকর পুঁথির মসীলিপ্ত অস্পষ্ট ছাপার অক্ষরে দৃষ্টি স্থাপন করিয়া কহিল, "বুদ্ধিসিদ্ধন্তু তদসৎ" এস্থানটা কিরূপ গোল ঠেকিতেছে। একটু বুঝাইয়া দিন দেখি।"

অম্বর পুঁথি উঠাইয়া রাখিয়া সম্মুখে একটু সরিয়া বসিল। তারপর অধ্যাপক ছাত্রে খুব ঘটা করিয়া আলোচনা হইতে লাগিল। ঘট পট, মৃত্তিকা তন্তু কুলালচক্র কুম্ভকার প্রভৃতি কার্য্য, কারণ-উপাদান সমুদয় ঘনঘন আলোচিত হইতে হইতে বিশ্বজগতের সৃজন পর্য্যন্ত হইয়া গেল। কথায় কথায় অনেক দূর আসিয়া পড়িলে একটা তর্ক উঠিল, আত্মা 'গুণ-পদার্থ' হইতে পারে কি না? ন্যায় বলিয়াছেন, আত্মা অচেতন ও আকাশের ন্যায় গুণবিশিষ্ট; দ্রব্যরূপ অচেতন হইলেও চৈতন্য গুণের সত্ত্বা হেতু আত্মাকে সচেতন বলা যায়। কিন্তু আত্মা ধর্ম্মাধর্ম্মের কর্ত্তা এবং সাংসারিক সুখদুঃখের ভোক্তা। এই হেতু তিনি পরমেশ্বর হইতে বিভিন্ন।" ন্যায়ের এই যুক্তির বিরুদ্ধে অম্বর সসঙ্কোচে নিজের স্বভাবসিদ্ধ বিষণ্ন হাসি হাসিল, "অজ নিত্য শাশ্বতোয়ংপুরাণঃ। ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে" সেকি এই গুণপদার্থ?" "কেন নয়?" "কেন নয়? আনন্দময়-কোষ সুষুপ্তিকালে পঞ্চ কোষের মধ্যে অবশিষ্ট থাকে। পঞ্চকোষের মধ্যে তাহাই প্রথম। তাই তাহাকে আত্মা বলা হইয়া থাকে। চেতন প্রভৃতি তাঁহারই গুণ। অতএব ইঁহাদের মতে আত্মা চেতন-গুণবিশিষ্ট অচেতন পদার্থ। কিন্তু শ্রুতি আত্মার অচেতনত্ব সুখ লইয়া দুঃখাদির ভোক্তৃত্ব পুনঃ পুনঃ অস্বীকার করিয়াছেন। পঞ্চ-কোষ যেস্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ শরীর লইয়া, ইহার যথেষ্ট প্রমাণ সাংখ্য, পাতঞ্জল ও বেদান্তকার দিয়াছেন, "আনন্দ-প্রতিবিম্ব-চুম্বিত-তনুবৃত্তি স্তমোজ্ৃম্ভিতাস্বাদানন্দময়ঃ প্রিয়াদিগুণকঃ স্বেষ্টার্থলাভোদয়ঃ" হইতে "নৈবায় মানন্দময়ঃ পরাত্মা ইত্যাদি" ইহার বিপরীত প্রমাণ। সুধাকর জিজ্ঞাসা করিল, এ সকল কোন্ প্রমাণের অন্তর্গত? "কোন্ প্রমাণের" "কেন আপ্ত।" "আপ্ত! কিন্তু শুনিয়াছি শঙ্করাচার্য্যকে অনেকে প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধ বলিয়া থাকেন। আমি অবশ্য জানি না; কারণ শঙ্কর সম্বন্ধে আমার জ্ঞান কিছুই নাই। কিন্তু শুনিয়াছি, তিনি নাকি মায়াবাদী, তিনি ব্রহ্মবাদও স্বীকার করেন নাই?"

অম্বরের শান্তমুখে ঈষৎ বেদনার চিহ্ন প্রকটিত হইল। সে একটু বেগের সহিত উত্তর করিল, "তাঁহার সমালোচনা করিবার কি আমরা যোগ্য যে, তাঁহাকে বিচার করিব? তিনিই না বৌদ্ধধর্ম্মপ্লাবন হইতে এই ভারত-ভূমিকে উদ্ধার করিয়াছিলেন? তিনিই না সংস্কৃত ভাষায় দেবদেবী-গণের যত সুললিত স্তবমালার রচয়িতা?"

সুধাকর এইরূপ চিন্তা করিল; পরে বলিল, "তা সত্য, 'নিত্যানন্দকরী' বলিয়া যে প্রকৃতি-মাতার স্তব করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার দেবী-ভক্তির অভাব দেখা যায় না। কিন্তু সে দিন আম্রনাথ ঠাকুরের চতুষ্পাঠীতে বেদান্তশাস্ত্র

সম্বন্ধে এক পণ্ডিতের সহিত বিচার হইতেছিল। আমিও সেখানে উপস্থিত ছিলাম। শুনিলাম আক্কঠাকুর শঙ্করাচার্য্যের তত্ত্বকে নাস্তিকবাদ বলিয়া প্রমাণ করিয়াছিলেন। শঙ্কর বহুস্থানে "ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তে হ্যনিত্যো ভোগবস্তুনি" প্রভৃতি পদপ্রয়োগ দ্বারা ব্রহ্মাকেও অনিত্য ও মায়াকল্পিত বলিয়াছেন।

অম্বর প্রতিবাদ করিল না, করা উচিত নয় বিবেচনা করিল বলিয়াই তাহাতে নিবৃত্ত রহিল, মনে মনে বলিল, "এ সকল বিষয় লইয়া তর্ক না তোলাই ভাল। এই জন্যই ত শাস্ত্রে বিশেষতঃ বেদান্তশাস্ত্রে আছে শিষ্য অর্থাৎ যে সম্পূর্ণরূপে শাসন স্বীকার, করিয়াছে তাহাকে ভিন্ন অপরের কাছে বেদান্তমত প্রচার করিতে নাই। তাহাকে নীরব দেখিয়া সুধাকর ভাবিল হয়ত তাহার মন্তব্য অধ্যাপককে ব্যথিত করিয়াছে। তাই একটু লজ্জিত হইয়া ক্রটি স্বীকারের ভাবে সে বলিয়া ফেলিল, "আক্কঠাকুর নিজের মনের বিরুদ্ধে লাঠি চালাইতেও গররাজি নহেন। তাঁর কথা আমি ধরি না। আপনি তা হ'লে আপনার ঈশ্বরের একত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন?"

অম্বর কহিল, "আত্মাও ঈশ্বরের? না আত্মাও পরমাত্মার বল। আমি কি স্বীকার অস্বীকার করিব? বেদ বেদান্ত উপনিষদ্ গীতা এই অখণ্ডসত্য প্রমাণ করিতেছেন যে—" অম্বরের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই নবীনমাধব গৃহে প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কোন অখণ্ডসত্য প্রমাণ করিতেছেন?" হঠাৎ তৃতীয় ব্যক্তির আগমনে দুজনেই একটু থতমত খাইয়া গিয়াছিল। সুধাকর প্রথমে বিস্ময়ভাব সামলাইয়া লইয়া অম্বরের উত্তর দিবার পূর্ব্বেই বলিয়া উঠিল, "এমন কিছুই নয়, আমি এই পড়াটুকু জানিয়া লইতেছিলাম।" নবীন মুখ টিপিয়া একটুখানি হাসিল, বলিল, "পড়া জানিতেছিলে, সে ত বেশ করিতেছিলে। তাহাতে 'এমন কিছুই নয়' বলিয়া ঢাকা দিবার দরকার কি? তোমার গুপ্ত বিদ্যা ত কাড়িয়া লইব না। ঠাকুরমশায়, কি প্রমাণের কথা বলিতেছিলেন, বলুন না। চুপ করিলেন কেন? হইলইবা সুধাকর আপনার ছাত্র অর্জ্জুন, তা বলিয়া দুর্য্যোধনেরও কি শুনিতে সাধ যায় না? কিসের কথা হইতেছিল?"

সুধাকর অধ্যাপকের জন্য ভীত হইতেছিল। সে সহসা উত্তপ্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, "কি একশবার প্রিয়ছাত্র,

নবীনমাধব গৃহে প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কোন অখণ্ড সত্য প্রমাণ করিতেছেন?"

প্রিয়ছাত্র কর ?" এই সময়ে অম্বর ধীরস্বরে উত্তর করিল, "আমাদের অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে কথা হইতেছিল। সুধাকর আত্মার একত্ব অস্বীকার করায় আমি তাহাকে বুঝাইতেছিলাম যে বেদান্ত উপনিষদাদিগ্রন্থ এই অদ্বৈতবাদ প্রতিপালন করিয়াছেন এবং ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য –"

"তিনি যে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ ছিলেন। তাঁর বাক্য অত্যুক্তি নহে—"অম্বর অতি মৃদু হাসিল,—"শঙ্কর শঙ্করসাক্ষাৎ" আর বৌদ্ধ হইলেই বা ক্ষতি কি? বুদ্ধ-শিষ্যগণের বুঝিবার ভ্রমে যে নিরীশ্বরবাদ স্থাপিত হইয়া দেশের ক্ষতি করিতেছিল, তাহা খণ্ডনই হইয়াছে ?"

নবীন মাধবের চোখ মুখ রাঙ্গা হইয়া উঠিল, "বুদ্ধের প্রতিও আপনার অগাধ ভক্তি দেখিতেছি যে ? আপনার মতিটা ত আম্যদের মত মূর্খের কাছে ধারণা করাই দুরূহ। বৈষ্ণব হইয়া শাক্তাচার গ্রহণও করিয়া থাকেন। ন্যায় পড়াইতে বসিয়া বেদান্তের যুক্তি টানিয়া আনিয়া, তাহা খণ্ডনচেষ্টাও করেন। আবার বুদ্ধমতকেও আস্তিক মত বলিতে আপত্তি নাই। আপনি তা হ'লে আত্মার বহুত্ব স্বীকার করেন না ?"

"বহুত্ব না একত্ব।"

অধ্যাপকের নিকট আমরা শিষ্যত্ব স্বীকারে অপারগ। তৃণাদপি তৃণ তুল্য প্রাণী হইয়া বামনের চাঁদ ধরিবার সাধের মত এতবড় স্পর্দ্ধার কথা! এই কথা কাণে শুনিলেও পাপ হয়। আজই ইহার বিহিত করা প্রয়োজন।" নবীনমাধব রাগে ফুলিয়া আটখানা হইয়া চলিয়া যায় দেখিয়া সুধাকর তাহার উত্তরীয় ধরিল, "আরে দাদা, শুধুশুধু চটে গেল যে। শোন না—" "আমি তোর মত খোসামুদে নই। ভণ্ডের সংস্রবে থাকিতে ঘৃণা করি। এখনই জমিদার বাড়ী চলিলাম। আঁ্যা, আত্মা এক এই ? কৃমিকীট মানুষ ও সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরে ভেদ নাই! মহাভারত! অশ্রাব্য! এ গর্ব্বিত প্রলাপ অশ্রাব্য।"

সেই দিনই রামবল্লভ অম্বরকে ডাকিয়া বলিলেন, "ঠাকুর! বড় দুঃখিত হলাম, কাল আমার কাছে অঙ্গীকার করিয়া গেলে আজই সে প্রতিশ্রুতি রাখিতে পারিলে না? রাধারাণী তোমায় পূজা করিতে দিতে অসম্মত। টোলের ছাত্রেরা তোমার নিকট পড়িতে চায় না। আমি একা আর কাহার সহিত যুঝিব, তার চেয়ে উইলের নিয়মানুসারে এখন অন্য লোক নিয়োগ করাই ভাল কি বল?" নতমুখে অম্বর উত্তর করিল "যে আজ্ঞা।"

রামবল্লভ নালিশী ফরিয়াদীর জ্বালায় ত্যক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। সে আপত্তি করিল না দেখিয়া খুসী হইলেন। বলিলেন, "তোমার দোষ নাই, তুমি ত তোমার অক্ষমতার বিষয় জানাইয়াছিলে ?"

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅনুরূপা দেবী।

মালদাহ-সাহিত্য-সম্মিলন

সভাপতির অভিভাষণ। *

সমবেত সাহিত্যসেবী ও সাহিত্যানুরাগী ভদ্রমণ্ডলী!

অদ্য আমরা মালদহ-সাহিত্য-সম্মিলনের প্রথম অধিবেশনে সম্মিলিত; ভাষা-জননীর মন্দির-দ্বারে আজ আমরা পূজার অর্ঘ্য লইয়া উপস্থিত। আজ আমাদিগের বড় আনন্দের দিন। এই আনন্দের দিনে আপনারা আমার ন্যায় নগণ্য সাহিত্য-সেবীকে সেই আনন্দের, সেই পরামৃতের অংশভাগী করিয়া আপনাদের উদার হৃদয়ের ও মহানুভবতার যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহা ব্যক্ত করিবার ভাষা আমার নাই। আর আজ আপনারা নিজগুণে যে পদে আমাকে বরণ করিয়াছেন, আমি জানি যে, আমি সে পদের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত; তবে আমার ইহা গ্রহণ করিবার পক্ষে এইটুকু কৈফিয়ৎ দিলে বোধ হয় যথেষ্ট হইবে যে, বাঙ্গলার প্রাচীন রাজধানী মালদহবাসীদের—বৈষ্ণবকুলতিলক শ্রীরূপ-

* মালদহ-সাহিত্য-সম্মিলনের প্রথম অধিবেশনেপঠিত।

সনাতন-অধ্যুষিত বৈষ্ণবতীর্থ মালদহজেলার সম্ভ্রান্ত সাহিত্যসেবীদিগের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে পারি এরূপ শক্তি মাদৃশ বৈষ্ণবদাসানুদাসের নাই।

আজ আমরা ছোটবড়-নির্ব্বিশেষে সকল সন্তান মাতৃ-মন্দিরে মার অলক্তকরাগরঞ্জিত চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিতে এই মালদহ জেলায় সমবেত হইয়াছি। আসুন সকলে মিলিয়া সমস্বরে বলি :—

"আজি গো তোমার চরণে জননি,
আনিয়া অর্ঘ্য করি মা দান
ভক্তি-অশ্রু-সলিল-সিক্ত শতেক ভক্ত
দীনের গান।

* * * *

চাহি না'ক কিছু তুমি মা আমার,
এই জানি কিছু নাহি জানি আর
তুমি গো জননি হৃদয় আমার,
তুমি গো জননি আমার প্রাণ।"

প্রাণময়ী, সর্ব্বার্থসাধিকা, আশাতোষিণী ভাষা-জননীর চরণে প্রণত হইয়া এক্ষণে কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইব। এই যে আমরা এখানে সমবেত হইয়াছি—মাতার পূজার দ্বারে অর্ঘ্য লইয়া উপস্থিত হইয়াছি, ইহার পরিকল্পনা আধুনিক যুগে ফরাসী রাজধানী পারী নগরীতে প্রথম সূচিত হয়। ফলে ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে International Oriental Congress নাম দিয়া এক বিরাট্ সাহিত্য-সম্মিলনের প্রথম অধিবেশন হয়। ফ্রান্সের এই মহদ্দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত হইয়া লণ্ডন, সেণ্ট্ পিটার্স্‌বর্গ, ফ্লোরেন্স্, বারলিন, লীডেন প্রভৃতি প্রদেশ অদ্যাবধি এই সাহিত্য সম্মিলন-ব্যাপারটার রীতিমত সাময়িক অনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছে। আট বৎসর পূর্ব্বে (১৩১২ বঙ্গাব্দে) আমাদের বাঙ্গালাদেশে বাঙ্গালী জাতির মধ্যে কএকজন বাণীর কৃতী সন্তানের চেষ্টায় এইরূপ একটা সাহিত্য-সম্মিলনের আয়োজন হইয়াছিল। আমাদের কপালের দোষে সে বৎসর সম্মিলনের সমস্ত আয়োজন পণ্ড হইয়া যায়। তারপর ১৩১৪ বঙ্গাব্দের কার্ত্তিক মাসে কাশিমবাজার রাজবাটীতে সাহিত্য-সম্মিলনের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয়। সেই বৎসরই উত্তরবঙ্গে উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের সুচনা হয়। ফলে কাশিমবাজার, রাজসাহী, ভাগলপুর, ময়মনসিংহ, চুঁচুড়া, চট্টগ্রামে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের এবং রঙ্গপুর, বগুড়া গৌরীপুর, মালদহ, কামরূপ ও দিনাজপুরে উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের অনুষ্ঠান হয়। গতবর্ষে শ্রীহট্টেও একটি প্রাদেশিক সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। মালদহবাসিগণ, আজ মালদহ সাহিত্য-সম্মিলনের অনুষ্ঠান করিয়া, সাহিত্যিক জ্ঞানবিস্তার ও বঙ্গভাষার অনুশীলন করিবার যে শুভসূচনা করিয়া দিয়াছেন, মঙ্গলময়ের মঙ্গলাশীষে তাহা ফলপ্রসূ হউক এবং এই সম্মিলন যেন দেশের ও দশের উপকার করিয়া ধন্য হইতে পারে, দেশে সৎসাহিত্যের প্রচারকল্পে সহায় হইতে পারে, আর জ্ঞান ও নীতি শিক্ষার দ্বারা চরিত্রবলে বলীয়ান্ করিয়া ভবিষ্যতের আশাস্থল সমাজের মেরুদণ্ডস্বরূপ যুবক-সম্প্রদায়কে সমাজের কল্যাণকল্পে স্বদেশ-হিতব্রতে দীক্ষিত করিতে পারে।

এক্ষণে এইরূপ সম্মিলনের প্রয়োজনীয়তা আছে কি না দেখা যাউক। জ্ঞান জাতি বা ব্যক্তির ভিতর সীমাবদ্ধ থাকিলে বদ্ধজলের ন্যায় কালে দুষ্ট হইয়া পড়ে। জ্ঞান বেগবান্ নদের ন্যায় সমাজের স্তরে স্তরে প্রবাহিত না হইলে মানবের উপকারে আসিতে পারে না। জ্ঞান-বিস্তার করিতে হইবে; এই প্রচারকার্য্য একের দ্বারা বা এক সমাজের দ্বারা সম্ভবপর হইতে পারে না—সম্মিলিত চেষ্টায় এই কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারে। তাই বঙ্গের বরেণ্য কবিবর রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,—"নির্ম্মাণ-কার্য্যে ব্যক্তিগত চেষ্টা অপেক্ষা সমবেত চেষ্টাই অধিক সাফল্য লাভ করে। সকলের সামর্থ্য সমান নয়, সকলেই যে-কাযে শক্তি নিয়োজিত করে, তাহা হইতে খুব বড় একটা ফললাভ করা যায়। এই নির্ম্মাণ-কার্য্যই সাহিত্য-সম্মিলনের প্রকৃত কর্ম্মক্ষেত্র;" এবং এই উদ্দেশ্যেই "বঙ্গের সমুদয় সাহিত্য-সেবীকে একস্থানে সম্মিলিত করিয়া বাঙ্গলা সাহিত্যের শক্তি ও সামর্থ্য সম্বন্ধে আলোচনা করাই এইরূপ সম্মিলনের মুখ্য উদ্দেশ্য।" "চোরে চোরে মাসতুতো ভাই" প্রবাদ বাঙ্গলা দেশে বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে; কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, কএক বৎসর পূর্ব্বে সমব্যবসায়ী সাহিত্যরথদিগের ভিতর মনোবিবাদ ও মতান্তরের পরিণতি এরূপ দাঁড়াইয়াছিল যে, সমালোচনার নামে ব্যক্তিগত বিদ্বেষবহ্নি উদ্গীরিত হইত। অনেকস্থলেই ইহার কারণ ছিল—সহানুভূতির অভাব, সাহিত্যসেবীদের

ভিতর প্রাণের স্পন্দনের অভাব—প্রীতির অভাব। এক্ষণে এই আট বৎসরের মেলামেশার দরুণ স্বকপোলকল্পিত অনৈক্য অনেকটা দূর হইয়াছে, ভাবের আদানপ্রদানের একটা সমতা হইয়াছে। এইরূপ অশেষ কল্যাণকর সম্মিলনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বোধ হয় বেশী করিয়া বলিতে হইবে না।

এ কথাও আবার স্বীকার করিতে হইবে যে, মনীষা সহযোগিতার ধার ধারে না। সে বলদৃপ্ত নদের ন্যায় পর্ব্বত ভেদ করিয়া, উপলখণ্ড বিচূর্ণ করিয়া আপনার গন্তব্যপথ নির্দ্ধারণ করিয়া লয়; কিন্তু সেও সাগরসঙ্গম-অভিলাষে ছুটিয়া থাকে। মহামনীষীদের অন্তরাত্মাও সেইরূপ জনসঙ্ঘের ভাবের মিলনপ্রয়াসী। মনীষীরা গগন-চুম্বী কুতুবমিনারের ন্যায় স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া দণ্ডায়মান থাকিলেও তাঁহারা সম্মিলিত জনসঙ্ঘ-শক্তির ফল। দেশে ইট কাঠ পাথর সমস্তই ছিল, স্থপতিগণ চেষ্টা করিয়া সেগুলি সংগ্রহ করিয়া কুতব-মিনার গড়িয়াছে। তাহাদের পশ্চাতে অজ্ঞাতনামা হিন্দু নরপতিই হউন, আর কুতুবুদ্দীন আইবকই হউন এক-জনকে খাড়া হইতে হইয়াছে, সে আপনি দাঁড়াইতে পারে নাই।

এক্ষণে কোন্ পথে কার্য্য করিলে সম্মিলনের এই সকল মহদুদ্দেশ্য—সৎসাহিত্যের প্রচার, জ্ঞানের প্রচার, ভ্রাতৃ-ভাবের বৃদ্ধি ও প্রীতি-সংস্থাপন, সমাজ ও জাতীয়তা-রক্ষণ—বজায় রাখিয়া চলিতে পারা যায় দেখা যাউক :—

১। সমস্ত প্রাদেশিক সম্মিলন দেশীয় সম্মিলনীর সহিত সহযোগিতায় এক উদ্দেশ্য লইয়া কার্য্য করিলে আমরা অধিক কৃতকার্য্য হইব।

২। সমস্ত প্রদেশেই যাহাতে লিখিত ভাষার ঐক্য থাকে তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। বিভিন্ন প্রদেশে লিখিত ভাষার কোন প্রকার প্রভেদ বাঞ্ছনীয় নয়।

৩। বাঙ্গলা ভাষার পুরাবৃত্তেতিহাস-সঙ্কলন-বিষয়ে প্রত্যেক প্রাদেশিক সম্মিলনী উপকরণসংগ্রহকল্পে সম্পূর্ণ সাহায্য করিবেন; যথা, স্থানীয় প্রবাদ-বাক্য, ব্রতকথাদি, কবি, পাঁচালী, গীত প্রভৃতি, কবি বা সাহিত্যিকদিগের জীবন-বৃত্তান্ত রচনাদি, পুরাতন দেবালয়ের ইতিহাস, প্রস্তর বা ধাতুফলকাদির বিবরণ, প্রসিদ্ধ লোকদিগের জীবন-বৃত্তান্ত, নানা প্রকার কিংবদন্তী প্রভৃতি সংগ্রহ।

৪। বিভিন্ন ভাষা হইতে অনুবাদ করিয়া বাঙ্গালা ভাষায় গ্রন্থ-প্রচার। ইংরেজি ভাষা হইতে ত অনুবাদ নূতন কথা নয়; এক্ষণে ভারতবর্ষের বিভিন্নদেশীয় ভাষায় সদ্‌গ্রন্থ প্রচারিত হইতেছে, সেই সকল গ্রন্থ হইতে রত্নরাজি আহরণ করা কর্ত্তব্য। বাঙ্গালাভাষার অনেক পুস্তক আজ-কাল হিন্দীভাষায় অনূদিত হইতেছে, কিন্তু আমরা হিন্দী-ভাষায় প্রচারিত অনেক উল্লেখযোগ্য আবশ্যক পুস্তকের সংবাদ পর্য্যন্ত রাখি না। তমিড়ভাষার শত শত উৎকৃষ্ট গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ একান্ত প্রয়োজন। সম্প্রতি জৈনসম্প্রদায়ের বহু সদ্‌গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে ও হইতেছে। তদ্ভিন্ন ওড়িয়া, গুজরাটী, মারাঠী ভাষায় লিখিত উৎকৃষ্ট পুস্তকসকলের অনুবাদ আবশ্যক।

৫। বাঙ্গালাভাষায় কেহ কোন নূতন পুস্তক প্রণয়ন করিলে, যদি তাহা দ্বারা সাহিত্যের প্রকৃত পরিপুষ্টি হয়, যদি তাহা দেশীয় সাহিত্যের মঙ্গলদায়ক হয়, তাহা হইলে ব্যয়ভার বহন করিয়া সম্মিলনের তাহা প্রচার করার ব্যবস্থা করা উচিত।

৬। দেশে যাহাতে সমদর্শী অভিজ্ঞ সমালোচকের লেখা প্রচারিত হয়, তাহার জন্য চেষ্টা করা উচিত। সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে সমালোচনায় একদেশদর্শিতা বা অনুরোধ-পরতন্ত্রতা-ব্যাপার দেশ হইতে বিদূরিত হইতে পারে, তাহার চেষ্টা করা একান্ত কর্ত্তব্য।

৭। বাঙ্গালা-সাহিত্যের অনেক বিভাগে পারিভাষিক শব্দের বিশেষ অভাব আছে। দেশীয় সম্মিলনী বা বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সহিত একযোগে পরামর্শ করিয়া যাহাতে সেই সকল পারিভাষিক শব্দ সঙ্কলন ও প্রচারের সহায়তার ব্যবস্থা হয় তাহার চেষ্টা প্রার্থনীয়।

৮। স্থানীয় দুঃস্থ সাহিত্যসেবিগণকে উৎসাহ-প্রদান ও তাঁহাদের প্রণীত পুস্তকাবলীর প্রচারের চেষ্টা।

৯। বৎসরের মধ্যে একবার মাত্র এইরূপ সম্মিলনের সঙ্ঘটন ব্যতীত সাহিত্যিকগণকে লইয়া প্রতিমাসে সাহিত্যানু-শীলনের ব্যবস্থা করিলে সম্মিলনের মহদুদ্দেশ্য-সাধনের দিকে কার্য্যতঃ অগ্রসর হওয়া সহজ হইয়া পড়িবে।

অতঃপর, সাহিত্যের সহিত সমাজের কি সম্বন্ধ তাহাই বুঝিতে চেষ্টা করিব। মসিয়ে ফাগুয়ে (M. Faguet) বলেন:—

"ফরাসী বিপ্লবের অব্যবহিত পূর্ব্বে ফরাসী সাহিত্য বিলাসের সাহিত্য ছিল। সে সাহিত্য সমাজ-মত-দ্যোতক ছিল না; সে সাহিত্যের প্রভাব ফরাসী-সমাজের নিম্নতম স্তর পর্য্যন্ত প্রবেশ করে নাই। তাহার পর বিপ্লবের সূচক যে সাহিত্য-সৃষ্টি ফরাসীদেশে হইয়াছিল, তাহা খ্রীষ্টান সাহিত্য নহে। ভলটেয়ার, রুসো, ডিড়েরো প্রভৃতি মনীষী লেখকগণকে কোনক্রমে খ্রীষ্টান বলা যায় না। বরং তাহাদের লেখার প্রভাবে খ্রীষ্টান ধর্ম্মের খণ্ডন হইয়াছিল; খ্রীষ্টান সমাজের উচ্ছেদ সাধন করা হইয়াছিল। তথাপি কিন্তু বলিতে হয়, যে ফরাসী-সাহিত্য প্রায় পাঁচ শত বৎসরের খ্রীষ্টান সভ্যতার ফলে, সহস্র বৎসর কালের খ্রীষ্টান ধর্ম্মমত সাধনের পরিণতির স্বরূপ, সে ফরাসী ভাষার মজ্জাগত খ্রীষ্টান ভাব ভলটেয়ার, রুসোর লেখাতেও একেবারে মুছিয়া ফেলিতে পারে নাই। এক দিনে ভাষার সৃষ্টি হয় না; যুগ-যুগান্তরের চেষ্টায় একটা ভাষা পূর্ণাঙ্গ হইয়া ফুটিয়া বাহির হয়; যুগ-যুগান্তরের মতবাদ, ভাব, ধ্যান, ধারণা ভাষার স্তরে স্তরে বিন্যস্ত থাকে; যে সকল স্তর-বিন্যস্ত ভাব-রাশিকে একটা বিপ্লবের ফুৎকারে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। ফরাসী-বিপ্লব ধ্বংসের বিপ্লব হইলেও, ভলটেয়ার রুসোর মতন অমানুষ প্রতিভাশালী ধ্বংসাবতার অবতীর্ণ হইলেও ফরাসী-সাহিত্যকে উহার ধর্ম্মের বেদী হইতে তাঁহারা কেহ নামাইতে পারেন নাই।" * ফরাসী-সাহিত্য সমালোচনা করিয়া মসিয়ে ফাগুয়ে নিম্নলিখিত তিনটি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন:—

"(১) যাহা জাতির সাহিত্য, তাহা জাতির মেদমজ্জার সহিত জড়িত;—তাহা জাতির সকল স্তরে সঞ্চারিত,—উচ্চতম হইতে নিম্নতম পর্য্যন্ত সকল লোকেই পরিব্যাপ্ত।

(২) যাহা জাতির সাহিত্য, তাহা জাতির অতীত পারম্পর্য্যের সহিত সম্বদ্ধ—মালা-গ্রথিত পুষ্পশ্রেণীতুল্য।

(৩) যাহা জাতির সাহিত্য, তাহা জাতির সমাজধর্ম্ম-বর্জ্জিত হইতে পারে না; তাহা জাতির ভাষানিহিত ধর্ম্মকে উল্লঙ্ঘন করিতে পারে না।" *

এই অবিসংবাদিত সত্যগুলি সকল সাহিত্য সম্বন্ধে প্রযুজ্য। সমাজের সকল স্তরে প্রবেশ লাভ করিতে না পারিলে সাহিত্য কখনও স্থায়ী হইতে পারে না। বাঙ্গালার পুরাতন সাহিত্য স্থায়ী হইবার কারণ বাঙ্গালী মাত্রেই তাহার ভাবগ্রহণে ও রসবোধে সমর্থ। ভাবের অস্পষ্টতা কোথাও দেখা যায় না। প্রাণের ভাষায় লিখিত ভাবগুলি সমাজমুকুরের প্রতিচ্ছবি। তাই এখনও নিরক্ষর কৃষক দাশরথি, নিধুবাবু, রামপ্রসাদ, কাঙ্গাল হরিনাথের গান গাহিয়া আনন্দ অনুভব করে,—আপনাদের জ্বালা ভুলিয়া আত্মহারা হইয়া যায়। তাই বলিতেছিলাম শুধু শিক্ষিতদিগের জন্য সাহিত্যের সৃষ্টি হইলে সে সাহিত্য কখনও স্থায়ী হইবে না। ভাব ও ভাষার অপূর্ব্ব মিলনে নব-প্রয়াগের সৃষ্টি করিয়া যাহাতে সকলে অবগাহন করিয়া মোক্ষলাভ করিতে পারে, সেইরূপ করা প্রত্যেক সাহিত্যিকেরই কর্ত্তব্য।

গভীর পরিতাপের সহিত বলিতে হইতেছে, আজকাল কএকজন শক্তিশালী লেখক য়ুরোপের আদর্শে গঠিত নূতন ভাব-পরম্পরার পসরা আনিয়া আমাদিগের সাহিত্যে উপঢৌকন দিতেছেন; কিন্তু সেগুলি ঠিক আমাদিগের জাতীয়তার সহিত সমঞ্জসীভূত হয় না। আমাদিগের অতীতের ভাবপরম্পরার সহিত সম্মিলিত হইতে পারে না; দৃষ্টান্ত-স্বরূপ ধরুন, যদি কোন শক্তিশালী লেখক চাকরের বা সহিসের প্রভুপত্নীর প্রতি প্রেমের বিষয় চিত্রকরের তুলিকার ন্যায় উজ্জ্বলবর্ণে অঙ্কিত করেন, তাহা হইলে মনোবিজ্ঞানের দোহাই দিয়া চাকর বা সহিসের প্রভুপত্নীর প্রতি প্রেম যে সম্ভবপর হইতে পারে না তাহা বলিবার ক্ষমতা কাহারও নাই; কিন্তু—ভারতবর্ষে চাকর বা সহিস প্রভুপত্নীকে মাতৃভাবে ভিন্ন অন্যভাবে দেখিতে জানে না। সে আপনাকে পুত্র বলিয়া জানে। সে দাসত্ব করিতে আসিয়া নম্রতাকে এতটা নিজের স্বভাবগত করিয়া লইয়া উপস্থিত হয় যে, প্রভুপরিবারের মহিলাগণের প্রতি তাহার মাতৃভাব ও ভগিনীভাব ব্যতীত অন্য কোন ভাব উপস্থিত হইলে সে আপনাকে পাপী বলিয়া গণ্য করে। য়ুরোপীয় ব্যক্তিগত

* সাহিত্য, আশ্বিন ১৩২০।

স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা ভারতবাসীর স্বপ্নের অতীত। ভারতের চাকর বা সহিস আপনার দীনতায়—হীনতায় আপনি ম্রিয়মাণ, তাহার হৃদয়ে এ ভাবের সৃষ্টি নূতন; য়ুরোপে এরূপ সম্ভবপর হইতে পারে; কারণ, সেথানে সাম্যভাবই (equality) প্রধান। এরূপ গন্ধহীন বিলাতী কণ্টকবৃক্ষের আমদানি করিলে সংসাহিত্যের পুষ্টি হইতে পারে না। তাই মনীষী ফাগুয়ের সহিত আবার বলি—

যাহা জাতির সাহিত্য, তাহা জাতির অতীত পারম্পর্য্যের সহিত সম্বদ্ধ হইবে; এ কথা ভুলিলে চলিবে না।

তিনি আরও বলিয়াছেন,—"ভাষা কেবল সাহিত্যের উপাদান নহে, উহার সর্ব্বাঙ্গ জাতির পদচিহ্নে অঙ্কিত। ভাষা সমাজের অভিব্যঞ্জনা; এই অভিব্যক্তি বিহঙ্গ-কলরবের ন্যায় ব্যোমপথে মিশাইয়া যায় না, সাহিত্যের মর্ম্মরগাত্রে চিরদিনের জন্য অঙ্কিত থাকে। ভাষা সাহিত্যের সৃষ্টি করে, আবার সাহিত্যের আশ্রয়ে ভাষা আত্মরক্ষা করে। মানুষের ভাষা আছে, সে ভাষায় সাহিত্যের সৃষ্টি হয়, সে সাহিত্য সনাতন হইয়া থাকে। তাই মানুষ—মানুষ, নির্ভাঁজ পশু নহে। পশুর স্মৃতি নাই, স্মৃতির অক্ষয় মঞ্জুষা নাই; তাই পশুর উন্নতি নাই, স্থিতি নাই, বিকাশ নাই। মানুষের স্মৃতি আছে, স্মৃতির অক্ষয় মঞ্জুষা সাহিত্য আছে; তাই মানুষ নরদেবতা হইয়াছে, পরে আবার হইতেও পারিবে। সাহিত্যের সৃষ্টি ধর্ম্মের উপাদানে হইয়া থাকে। সে ধর্ম্ম প্রথম স্তরে, বিভীষিকার উপাসনা, সৌন্দর্য্যের আরাধনা মাত্র। ইহার পর স্তরে স্তরে মানুষ যেমন উন্নীত হয়, তদনুসারে মানুষের সাহিত্যও আকারান্তরিত হয়। এই অসংখ্য স্তর-বিন্যস্ত সাহিত্য বিশ্বমানবতার ইতিহাস—দেবত্বের উন্মেষ-কাহিনী।" * বহুদিন পূর্ব্বে আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ প্রবীণ সাহিত্য-ধুরন্ধর শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় লিখিয়াছিলেন :—

"হিন্দু এবং য়ূদী বহুনির্য্যাতনেও কেবল ধর্ম্মবলে এখনও জীবিত আছে। * * * য়ূদী কোন্‌কালে বাস্তদেশ হইতে বিতাড়িত হইয়াছে, তাহার উপর, কত উৎপীড়ন উপদ্রব মাথায় রহিয়াছে, এখনও রহিয়াছে, তবু মরে নাই; কেবল মরে নাই নহে, জগতের মধ্যে সুন্দর, সুশ্রী, উন্নতদেহ, দীর্ঘজীবী, বলিষ্ঠ, প্রফুল্ল, ধনশালী, কলানিপুণ জাতি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। কেন, তাহারা স্বধর্ম্ম-পরায়ণ এবং সদাচারনিষ্ঠ বলিয়া।" এ কথা যে খুব সত্য তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। ধর্ম্ম যেরূপ ব্যক্তিকে, জাতিকে ধারণ করিয়া থাকে, ভাষাকেও সেইরূপ ধারণ করিয়া থাকে। বাঙ্গালার প্রাচীন সাহিত্যের প্রসার ও পুষ্টি ধর্ম্মের ভিতর দিয়া হইয়াছে, অর্ব্বাচীন সাহিত্যের কোন কোন স্থলে ইহার ব্যতিক্রম যে হয় নাই তাহা বলিতে পারা যায় না, তবে সে সকল সাহিত্য আমাদের মর্ম্মস্পর্শী হয় নাই—ঐগুলি হৃদয়ে ক্ষণস্থায়ী ভাবের হিল্লোল তুলিতে পারিলেও, স্থায়ী আনন্দ দিতে পারে না। সুকুমারমতি যুবকযুবতী-দিগের নিকট মানবীয় প্রেমের কবিতা ভাল লাগিতে পারে, উত্তরকালে তাহারাই আবার প্রেমময় রাধাকৃষ্ণের প্রেম ব্যতীত অন্যরূপ প্রেমের কবিতা পাঠ করিতে নাসিকা কুঞ্চিত করেন। তাই বলি সনাতন-ধর্ম্মরূপ মহীরুহকে বেষ্টন করিয়া যে সুকুমার কলালতা বর্দ্ধিত হইয়া উঠে, তাহাই কল্পান্তস্থায়ী হইয়া থাকে। আর যে কবির বীণার ঝঙ্কারে হৃদিরঞ্জনের মধুময় চিত্র নয়ন-সম্মুখে পরিস্ফুট হইয়া উঠে, তিনি আমাদের হৃদয়-আসন চিরকালের জন্য অধিকার করিয়া থাকেন।

আজকাল একটা ধুয়া উঠিয়াছে, ধর্ম্মের সহিত সাহিত্যের কোন সংস্রব নাই। বাঙ্গালা-সাহিত্যে ছোটগল্প-লেখক-দিগের মধ্যে কএক জনের লেখা হইতে ইহা বেশ বুঝিতে পারা যায় এবং তাঁহারা আকার-ইঙ্গিতে কথাটা বুঝাইয়া দিতে চান—গল্পগুলিকে কলা-হিসাবে দেখিতে হইবে। Art is for art—কলা, কলার জন্য। তাহাতে আবার ধর্ম্মের সংস্রব কি? গল্পগুলির উদ্দেশ্য জানিবার কোনই প্রয়োজনীয়তা নাই। মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ থাকিলেই হইল। এই সকল লেখকের নিকট স্থান-কাল-পাত্র বিবেচনার বিষয়ীভূত নয়। ইহারা লোকলোচনের সম্মুখে কিম্ভুত-কিমাকার চিত্র দেখাইতে পারিলেই আপনাদিগকে ধন্য মনে করেন, কিন্তু ইহাদিগকে কি করিয়া বুঝাইব যে, সকল চিত্রই সকল লোকের গোচরীভূত করা যায় না।

* সাহিত্য, আশ্বিন ১৩২০।

এখন এ Art বা ইহার প্রতিশব্দই 'কলা' সম্বন্ধে ঋষি-প্রতিম টলষ্টয় তাঁহার "What is Art" পুস্তকে আলোচনা করিয়া যাহা বলিয়াছেন তাহা এই :—Art বা কলা মানবের কার্য্যকারী শক্তির (human activity) ফলস্বরূপ। উদ্দেশ্য ব্যতীত ইহার অন্য সার্থকতা নাই। মানবের উন্নতি বা অবনতির যতটুকু ইহা সহায়ক হইবে, ততটুকু ইহাকে ভাল বা মন্দ বলিব। কলাবিৎ আপনার ভাব-প্রেরণা অন্যে যদি সঞ্চারিত করিতে পারেন, তবেই তিনি কৃতার্থন্মন্য হন। অঙ্গ-সঞ্চালন, রেখা, বর্ণ, শব্দ ও বাক্য-সমন্বয়ে কলাবিৎ অন্যের হৃদয়ে ভাবের লহর তুলিতে পারেন। এইরূপে কলাবিৎ সমভাবের প্রেরণায় বিশ্ব-সংসারকে আপনার করিয়া থাকেন। "Art is a means of union among men, joining them in the same feelings." তা হইলে কেবল-মাত্র 'সঞ্চরণ' বা 'সংক্রমণ'-শক্তিই কি কলার লক্ষণ? অস্বাভাবিক উপায়ে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াও পারিপার্শ্বিক অবস্থার গুণে ইহা এরূপ হইয়া পড়িয়াছে যে, পল্লীবাসীর নিকট, প্রতিবাসীর নিকট, এমন কি আত্মীয়ের নিকট হইতে সহানুভূতি বলিয়া জিনিষটা আমরা আর পাই না। অবশ্য আমি সহরের কথাই বলিতেছি। এরূপ স্থলে টলষ্টয় বলিয়াছেন,—"The business of art lies just in this—to make that understood and felt which, in the form of an argument, might be comprehensible and inaccessible."—এটি খাঁটি সত্য। তর্ক করিয়া যখন মানবকে বুঝাইতে পারা যায় না, তখন তুলিকার একটি রেখায়, একটি অঙ্কনে, একটি বর্ণসম্পাতে, কবিতার একটি ছত্রে, তক্ষণশিল্পীর একটু খোদাইকার্য্যে ভাবের লহর ছুটাইতে পারা যায়; তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, কলাবিৎই তিনি—যিনি মানবহৃদয়ে সমভাবের লহর তুলিতে পারেন—যিনি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া বিশ্বমানবপ্রাণে সমানভাবে কার্য্য করিতে পারেন। যদিও কলা-সমালোচক-গণ (Art-critics) প্রায় একবাক্যেই বলিয়া থাকেন,—কলাবিদ্যার সার্ব্বজনীনতা (universality) একরূপ অসম্ভব, তথাপি আমরা টলষ্টয়ের সহিত একবাক্যে বলিব, কলার সার্ব্বজনীনতা অসম্ভব হয় হউক—যেখানে দেখিব কলা সার্ব্বজনীন আদর্শের যত নিকটবর্ত্তী হইতেছে ততই তাহা উচ্চাঙ্গের বলিয়া মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিব। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে—কলা বিশ্ব-মানবকে একসূত্রে গ্রথিত করিবার প্রয়াসী (Art unites men). আর বিশ্বমানবকে ভাবের লহর দ্বারা গ্রথিত করিতে হইলে যে সকল ভাবরাশি মানবকে পশু হইতে পৃথক্ করিয়াছে, মানবকে দেবত্বে উন্নীত করিয়াছে, মানবের কল্যাণকল্পে সহায়তা করিয়া আসিয়াছে, সেই সকল ভাবের দ্বারাই এ কার্য্য সমাধা হইতে পারে। এই ভাব-পরম্পরাকে তিনি নৈতিক সংস্কার (Religious perception) আখ্যা দিয়াছেন।

বাস্তবিক যাহা দর্শনে, শ্রবণে, ধ্যানধারণায় হৃদয়ে ধর্ম্মভাবের উন্মেষ করিয়া দেয়, যাহা আমাদিগকে ক্ষুদ্রত্ব ভুলাইয়া দিয়া মহত্ত্বের দিকে টানিয়া লয়, যাহা চরিত্রকে উন্নত করিয়া দেয়, মানব হৃদয়ে দেবভাবের স্ফুরণ করিয়া দেয় তাহাই শুদ্ধ কলা; তাহাই শুদ্ধকলা—যাহা ভ্রাতৃপ্রেমের বন্ধনে জগৎকে একসূত্রে গ্রথিত করিতে চায়—যাহা বুঝাইতে চায় দেশ-কাল-পাত্রের গণ্ডী ছাড়াইলে, সংস্কারের গণ্ডী ছাড়াইলে, মানব এক বিশ্বপিতা প্রেমময়ের সন্তান। কিন্তু যদি প্রশ্ন করা হয় পবিত্র ধর্ম্মভাব কি করিয়া বুঝিব। বিবেকের বাণী শুনিলেই এ প্রশ্নের সহজ সমাধান হইবে। টলষ্টয়, বলিতেছেন নৈতিক সংস্কার (Religious perception) ইহা ঠিক করিয়া দিবে। তাঁহার মতে,—

"The religious perception is the consciousness that our well-being, both material and spiritual, individual and collective, temporal and eternal, lies in the growth of brotherhood among men—in their loving harmony with one another.

তাঁহার নৈতিক সংস্কার (Religious perception) বিশ্বমানবের ভিতর প্রীতির অচ্ছেদ্য বন্ধনে বৰ্দ্ধিত হইয়া থাকে। পরিশেষে তিনি প্রমাণ-প্রয়োগ দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, কলা (Art) বুদ্ধি হইতে ভাবের দ্বার দিয়া বিশ্বমানবকে একতার সূত্রে গ্রথিত করে, প্রচলিত

পদ্ধতি ও অত্যাচার সমূহকে বিনাশ করিয়া জগতে ভগবানের রাজত্ব—প্রেমের রাজত্ব স্থাপন করে। "The destiny of art in our times is to transmit from the realm of reason to the realm of feeling the truth that well-being for men consists in being united together and to set up in place of the existing reign of force, that kingdom of God *i. e.*, of love, which we all recognise to the highest aim of human life."—তাহা হইলে Art বা কলায় যে কোন উদ্দেশ্য নাই, এ কথা বলিলে চলিবে কেন। Art is for art এ কথার অর্থ আমরা বুঝিতে পারি না—টলষ্টয়ের সাহায্যে বুঝিতে পারি নাই; বরং যাহা বুঝিয়াছি তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। আবার তাহা বলি:—উদ্দেশ্য ব্যতীত ইহার অন্য সার্থকতা কিছু নাই (*Art does not exist for its own sake*). মানবের উন্নতি বা অবনতির যতটুকু উহা সহায়ক হইবে ততটুকু ইহাকে ভাল বা মন্দ বলিব।

অধুনা বাঙ্গালা মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত গল্পগুলির কোন কোনটিতে Artএর দোহাই দিয়া যে কদাচারের সৃষ্টি হইতেছে, অভিনব উৎকট ভাবের লহর ছুটিতেছে, বিলাতী প্রেমের পূতিগন্ধময় উদ্ভট চিত্র প্রকাশিত হইতেছে, ঘৃকারজনক অনুবাদ বাহির হইতেছে, তাহা আমাদিগের জননী, ভগিনী, গৃহিণী ও কন্যাদিগের হস্তে কোনমতেই দিতে পারা যায় না। কর্ত্তব্যানুরোধে গল্পলেখকদিগের মধ্যে অধুনা যিনি শিরোমণি, ব্যারিষ্টার-প্রবর শ্রদ্ধেয় প্রভাতবাবুর নিকট আমি একটু অনুযোগ করিব। তিনিই আজকাল গল্পলেখকদিগের আদর্শস্থল। তাঁহার লেখনী হইতে সমাজের বিকৃতি বা উৎকট চিত্র কখন দেখি নাই। তাই পূজার সংখ্যা "মানসী" পত্রিকায় যখন তাঁহার 'লেডি ডাক্তার' গল্প পড়িলাম, তখন স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। প্রভাতবাবুর নাম দেখিয়া মর্ম্মাহত হইলাম। ফাঁদ পাতিয়া যুবক ডেপুটী-সত্যেন্দ্র-মৃগ ধরিবার চিত্র—তাঁহার নিকট হইতে আমরা চাহি না; চাহি না তাঁহার নিকট হইতে লেডী ডাক্তার ও তাহার পরিচারিকা কামিনীর কথোপকথন। আপনারা একটু শুনুন,—

"শেষে সুবালা বলিল—"দেখ্ কামিনী—পোর্টের সে বোতলটায় কিছু আছে?"

"আছে। এখনও আধবোতল আছে।"

"খানা সাজিয়ে, সে বোতলটা টেবিলের উপর রেখে দিস্। ওকে বলেছি, তোমার লিভার খারাপ হয়েছে। যা তা একটা কিছু ওষুধ বলে মিশিয়ে, খানিকটা পোর্ট খাইয়ে দেব। আজ যা হোক একটা হেস্তনেস্ত করে নিতে হবে।"

কামিনী বলিল—"তা রেখে দেব। কিন্তু খুব সাবধান, বুঝলে? শেষকালে একেবারে হাতছাড়া না হয়ে যায়—সেই অখিল শীলের বেলায় যেমন হয়েছিল।"

"যা যা তোর আর উপদেশ দিতে হবে না"—বলিয়া সুবালা বাহিরে আসিল।"

এ চিত্র কি হিন্দু রমণীর হস্তে দিতে পারা যায়?

প্রভাতবাবুর অক্ষয় লেখনী-মুখে কখন এরূপ কদর্য্যচিত্র ফুটিয়া উঠে নাই, তাই এইটি দেখিয়া কএকটা অপ্রিয় সত্য বলিতে হইল। শাস্ত্রের শাসন "মা ব্রুয়াৎ সত্যমপ্রিয়ং" মান্য করিয়া এ ক্ষেত্রে চলিতে পারিলাম না বলিয়া দুঃখিত।

এইবার আমরা ভাষা সম্বন্ধে দু'এক কথা বলিব। পরমারাধ্যা চিরাদৃতা আমাদের শ্বেতশতদলবাসিনী বঙ্গ-ভারতীর অঙ্গে নব্যসাহিত্যিক-চিকিৎসকদিগের ছুরিকাঘাত দেখিয়া প্রত্যহই আমাদের চক্ষু দিয়া জলধারা বহির্গত হইতেছে। জানি না কবে কোথায় এ শবব্যবচ্ছেদের ছেদ পড়িবে। মা আমার শবের মত পড়িয়া আছেন—এই সকল চিকিৎসকের অস্ত্রোপচারে মা আমার ক্ষতবিক্ষতা। অক্ষয়—বিদ্যাসাগর—ভূদেব—বঙ্কিম—কালীপ্রসন্ন-প্রমুখ সাহিত্যমহারথদিগের সাধনার ধন—বড় আদরের ধন—তাঁহাদের প্রাণাপেক্ষা গরীয়সী জননীর এ দুর্দ্দশা দেখিয়া বোধ হয় তাঁহারা স্বর্গ হইতেও অশ্রুপাত করিতেছেন। হায়! হায়! জানি না কবে কোন্ রাসায়নিক প্রবরের সিদ্ধমলমে মার আমার ক্ষত অঙ্গ জোড়া লাগিয়া আবার পূর্ব্বশ্রী ফিরিয়া আসিবে! এখনও ভারতগগনের চির-উজ্জ্বলরবি রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যগগন আলোকিত করিয়া রহিয়াছেন—এখনও আমরা বঙ্কিম-মণ্ডলের শেষজ্যোতিষ্ক

অক্রূরচন্দ্রের দিকে চাহিয়া আছি—সাহিত্যধুরন্ধর পণ্ডিত-প্রবর হরপ্রসাদের দিকে চাহিয়া আছি—তাঁহারা কি ইহার প্রতীকারের চেষ্টা করিবেন না? আমাদের বিশ্বাস তাঁহারা মনে করিলে এই অত্যাচারের শেষ যবনিকা পড়িবার বিলম্ব হইবে না। যাহা হউক, সুখের বিষয় সুকবি সুপণ্ডিত ব্যারিষ্টরপ্রবর প্রমথ চৌধুরী মহাশয় বীরবিক্রমে প্রবল যুক্তিদ্বারা ভাষা-জননীকে রক্ষা করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া বীরবল নামে এই সকল নব্য-সাহিত্যরথকে আহবে আহ্বান করিয়াছেন। জানি না তিনি, শ্রদ্ধেয় ললিত কুমার বন্দোপাধ্যায় বা তাঁহার ন্যায় অন্যান্য সাহিত্যরথেরা এই কার্য্যে কতদূর সফলকাম হইবেন। নব্যলেখকেরা বলিয়া থাকেন বাঙ্গালা ভাষার যখন ব্যাকরণ নাই, আইনকানুন নাই, তখন কাহার কথা শুনিয়া আমরা চলিব! বেশ কথা!

বঙ্গভাষার উৎপত্তি আলোচনা করিলে জানিতে পারা যায়, সংস্কৃত ভাষাই ইহার জননী। জননীর স্ত্রীধন হইতে যাহা পাওয়া যায় তাহা জননীর স্ত্রীধনের আইনানুসারে চলিয়া থাকে। এ ক্ষেত্রে তাহা না হইবার কারণ কি? যখন আমরা সংস্কৃতের অনুসরণ করিব, তখন তাহার নিয়ম না মানিয়া চলিব কেন? সংস্কৃত শব্দের সহিত দেশজ শব্দ মিলাইয়া গুরুচণ্ডালী দোষের সৃষ্টি করির কেন? নব্য-লেখকদিগের লেখনী পাঠ করিয়া মনে হয়, তাঁহারা যেন ইচ্ছা করিয়া নূতনত্বে আমাদিগকে চমৎকৃত করিয়া দিবার প্রলোভনে একটা নূতনের সৃষ্টি করিতে চান। অবশ্য প্রতিভা বা মনীষা ভাষার শব্দসম্পদ্‌বৃদ্ধি মানসে নূতনের সৃষ্টি করিবেই করিবে—ভাষাকে বলশালী করিবেই করিবে; কিন্তু তাই বলিয়া শোথের ন্যায় মাংসবৃদ্ধি বলের পরিচায়ক নহে। দুই চারিটা উদাহরণ দিয়া আমার বক্তব্যটা একটু বিশদ করিতে চাই:—

"বসন্ত কুসুমফুলের গাঢ় রঙে তরুণীদের শাড়ী ওড়না রঙাইয়া দিত, সন্ধ্যামণির হৃদয় পিষিয়া চরণ রঙাইত, হেনার পাতার রস গালিয়া হাত রঙাইত। আর মধুর হাসি, প্রিয়বচন, চটুল চাহনি দিয়া হৃদয় রঙাইতে চেষ্টা করিত—রূপসীদের হৃদয় তাহাতে রঞ্জিত কি না কে জানে। কিন্তু তরুণীদের আফিম ফুলের মতো রাঙা মাদক ঠোঁট দুখানি, ডালিমফুলের মতো গাল দুটি, শিউলি রঙা বসন আর মেহেদি রাঙা চরণ নিজেদের সকল লালিমা জড়ো করিয়া বসন্তর তরুণকোমল হৃদয়খানি শোণিত রঙে রঙাইয়া তুলিতেছিল।"

এই স্থলে ছয়বার 'রঞ্জ' ধাতুর বিকৃতি ত দেখিলেন। ইহা ইচ্ছাকৃত বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। আর 'লালিমা' শব্দের ন্যায় 'হরিতিমা,' 'ম্লানিমা,' 'শ্যামিমা' প্রভৃতি অজ্ঞাত-পূর্ব্ব উদ্ভট শব্দ অবাধে সাহিত্যে চলিতে সুরু করিতেছে। আর এই কয়ছত্রে দুইবার 'মত' ও একবার 'জড়' শব্দ ওকার-সংযোগে লিখিত হইয়াছে। অবশ্য উচ্চারণগত বানান্ (Phonetic spelling) যখন উহার যুক্তরাজ্যেও চলিতেছে না, তখন যে এই সংরক্ষণশীল বাঙ্গালাদেশে চলিবে সে ধারণা আমাদের নাই। আর যখন জেলায় জেলায়, গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে, নগরে নগরে উচ্চারণবৈষম্য দৃষ্ট হয়, তখন একস্থলের উচ্চারণ লিখিত ভাষায় চালাইলে চলিবে কেন? সাহিত্যে এ ভেদনীতি সমর্থন করা যায় না। যদি বলেন অভিমতার্থক 'মত' ও তুল্যার্থক 'মত' শব্দের প্রভেদ করিবার জন্য শেষের শব্দে 'ও'কার সংযোগ করা হয়, তাহা হইলে কাল, ভাল, বল, মন ইত্যাদি কথায় 'ও' সংযোগ করিয়া লেখা হয় না কেন?

অবশ্য এই সকল ইচ্ছাকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি তাহা আপনাদের ন্যায় সাহিত্যমার্ত্তের বিবেচ্য। আবার দেখুন:—

"একদিন যখন সন্ধ্যাবেলায় গাছে গাছে ফুলের দেয়ালি সাজিতেছিল, যখন দক্ষিণ বাতাস বিরহ মূর্চ্ছিতের নিশ্বাসের মতো থাকিয়া ফুলের বনে শিহরণ হানিতেছিল, যখন ফুলের গন্ধে মাতাল হইয়া কোকিল, পাপিয়া প্রলাপ বকিতেছিল, যখন হাজার দীপের শিখার মাঝে ফোয়ারার জল তরল হীরার মালার মতো গড়িয়া পড়িতেছিল ইত্যাদি—"

এখানে আপনারা "বনে শিহরণ হানিতেছিল" এ কথার রসগ্রহণ করিতে পারিলেন কি? তরলহীরার মালা যে কিরূপ পদার্থ তাহা আমরা কল্পনায় আনিতে পারি না।

আবার শুনুন:—

"ঘৃণাভরে ফুলগুলি সব পদাঘাতে ছড়াইয়া দিয়া
উদ্যত অশনির মতো বলিল "কী !—"

ইংরেজিতে যাহাকে transferred epithet বলে "উদ্যত অশনি" তাহারই দৃষ্টান্ত। আপনারা যদি এরূপ প্রয়োগ শিষ্ট বলিয়া মনে করেন, তবে চালাইতে পারেন; কিন্তু আমার বিশ্বাস আপনারা "সকল লোকের বিস্মিত অবিশ্বাস অগ্রাহ্য করিয়া" চালাইতে কিছুতেই রাজি হইবেন না। উচ্চারণভেদে যদি 'কি' দীর্ঘত্বলাভ করে, তবে অন্য শব্দে এরূপ প্রয়োগ হয় না কেন?

আপনারা কি "অবিনয় ক্ষমা" কখন শুনিয়াছেন? যদি না শুনিয়া থাকেন—তবে শুনুন।"

"কুরূপ দেখিয়া অবহেলা করিয়াছি, ইহার লজ্জা আজ তাহার দয়ায় দারুণ হইয়া উঠিয়াছে—তাহাকে এইরূপ লোলুপে অবিনয় ক্ষমা করিতে বলিয়ো।"

প্রাণের যে কতটা যাতনায় নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও এই মক্ষিকাবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইয়াছে, তাহা অন্তর্যামীই জানেন; আর মাতৃভাষাসেবীদের ভাষার দিকে অবহিত হইবার জন্য যে এই পন্থা অবলম্বন করি নাই, তাহাও বলিতে পারি না।

ভাষা, জননীর শরীর। এবার জননীর প্রাণের কথা—ভাবের কথা একটু বলিব। যাহা সমাজের, যাহা দেশের, যাহা দশের নীতি ও স্বাস্থ্যের সহায়ক ও পরিপোষক এইরূপ ভাবের চিত্র সকলের সমক্ষে আদর্শরূপে ধারণ করাই আমাদের কর্তব্য। বিশ্বমানবের ভাণ্ডার হইতে—প্রকৃতির ভাণ্ডার হইতে সদ্ভাবসমূহ সমাহরণ করিয়া দেশের নিকট উন্মুক্ত করিয়া দিতে হইবে—ভাবের লহর ছুটাইতে হইবে—সমপ্রাণতার বন্যা বহাইতে হইবে—ভগীরথের ন্যায় ভ্রাতৃত্বের মন্দাকিনী ছুটাইতে হইবে। দেখিতে হইবে এমন ভাবের চিত্র, কাব্য বা কলায় ফুটাইয়া তুলিব না—যাহা মাতা পিতা, ভ্রাতা ভগিনী, পুত্র কন্যা ও দয়িতার নিকট প্রকাশ করিতে পারা যায় না। আর একটি কথা মনে রাখিতে হইবে, বিদেশের ভাবের চারাগুলিকে আমাদের স্থানকালপাত্র-উপযোগী করিয়া, সমাজ ও ধর্মের আলোক ও বাতাসের সাহায্যে বর্দ্ধিত করিতে হইবে।

এইবার কবিতা সম্বন্ধে একটা কথা বলিব। আধুনিক কবিদিগের কতকগুলি কবিতা আমরা ঠিক বুঝিতে পারি না। বঙ্গের রবীন্দ্রনাথ বিদেশ হইতে Mystic কবিতার চারা আনিয়া সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বাঙ্গালা দেশে যেদিন প্রথম রোপণ করিলেন,—যেদিন তিনি "সোণার তরী" প্রথম ভাসাইলেন, জানি না সেদিন বাঙ্গালার সুদিন কি দুর্দিন। তারপর যখন,

"দিনের শেষে ঘুমের দেশে
ঘোম্‌টা পরা ঐ ছায়া
ভুলালরে ভুলাল মোর প্রাণ।
ও পারেতে সোণারকূলে আঁধারমূলে
কোন্ মায়া
গেয়ে গেল কাজ ভাঙানো গান।"

গায়িলেন,—শেষ 'খেয়া'য় পাড়ি দিলেন—সেইদিন হইতে তাঁহারই চরণে শরণ লইয়া বঙ্গের আধুনিক কবিকুল ছুটলেন। রবীন্দ্রনাথের এই শ্রেণীর কবিতা চেষ্টা করিয়া কল্পনার বিমানে চড়িয়া কতকটা বুঝিতে পারিলেও, ইঁহাদের কবিতা, কল্পনার 'এরিওপ্লেনে' চড়িয়াও বুঝিবার সামর্থ্যে কুলায় না। উর্বর বাঙ্গালাদেশের মাটির ও আবহাওয়ার গুণে অল্পদিনের মধ্যে সহস্র সহস্র অস্পষ্ট দুর্বোধ্য কবিতার সৃষ্টি হইল। এই শ্রেণীর কবিতায় ভাষার শিঞ্জিনী আছে, নূপুরের গুঞ্জন আছে, কিন্তু প্রাণ মাতিতে চায় না—ভাব কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিতে চায় না। ভাবের অভাবে, প্রাণের অভাবে এগুলি যন্ত্রচালিত পুত্তলিকার ন্যায় শব্দ করিতে পারে, সত্য। এই সকল Mystic কবিতা দেহী আত্মার সহিত—চিরসুন্দর পরমাত্মার সংযোগমূলক বলিয়া কোন কোন সমালোচকের মুখে শুনিয়া থাকি; কিন্তু আমরা এগুলিতে যোগের কিছুই দেখিতে পাই না—দেখি বিয়োগ—ভাবের অভাব।

ইতঃপূর্ব্বে বহুবার সাহিত্যশব্দের প্রয়োগ করিয়াছি, এখন সাহিত্য-শব্দে কি বুঝা যায়, তাহা দেখিবার চেষ্টা করিব।

সাহিত্য-শব্দটি সংস্কৃত। সংস্কৃত ভাষায় সাহিত্য-শব্দটি যে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহা হইতে বেশী কিছু বুঝিবার উপায় নাই। সংস্কৃতে প্রধানতঃ তিনটি অর্থে

সাহিত্য শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। (১) যাহা কোন কিছুর সঙ্গে ব্যবহৃত হয় তাহাই সাহিত্য। (২) মেলন। (৩) মনুষ্যকৃত শ্লোকময় গ্রন্থবিশেষ। এই শেষোক্ত হিসাবে ভট্টি, মাঘ, ভারবি প্রভৃতি গ্রন্থ সংস্কৃত সাহিত্য নামে পরিচিত—কিন্তু বেদ, স্মৃতি, বেদাঙ্গ প্রভৃতি সাহিত্য-নামের অন্তর্গত নয়। ইংরেজিতে "literature" বলিলে যেমন অনেক জিনিষ বুঝায়, বাঙ্গালায় সাহিত্য-শব্দেও আমরা জাতিবিশেষ-প্রসূত সমষ্টি-উদ্দিষ্ট লিপিবদ্ধ চিন্তারাশি বুঝিয়া থাকি। সমস্ত লিখিত গ্রন্থাদিকে আমরা সাহিত্য বলিয়া থাকি। গ্রন্থবিশেষে গ্রন্থকারের চিন্তা ও কল্পনা, উদ্যম ও আশার বিকাশ হইয়া থাকে। প্রত্যেক দেশের গ্রন্থ-সমষ্টিতে দেশের চিন্তা ও কল্পনা, উদ্যম ও আশার উন্মেষ দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়াই গ্রন্থসমষ্টিই সাহিত্য। কিন্তু সাহিত্যের উদ্দেশ্য ধরিয়া অথবা জাতীয় গ্রন্থসমষ্টি আলোচনা করিলে অনেক গ্রন্থই এই পর্য্যায় হইতে খসিয়া পড়িবে। সাহিত্যের একটা সীমা বা গণ্ডি আছে। সেই সীমা বা গণ্ডির অন্তর্ভূত প্রদেশই সাহিত্যের রাজ্য। এই সাহিত্য-সাম্রাজ্যের সীমা নির্দ্দেশ করিতে হইলে আমাদিগকে প্রথমেই দেখিতে হইবে, জাতীয় চিন্তা ও কল্পনা, আশা ও উদ্যমের স্থান কতটুকু। গ্রন্থরাজ্যের যতটুকুতে জাতীয় চিন্তা ও কল্পনা, আশা ও উদ্যম বেশ পরিস্ফুট হইয়াছে, ঠিক ততটুকুই সাহিত্য-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া বুঝিতে হইবে। তাহা হইলে, সকল গ্রন্থই ত সাহিত্যের মধ্যে স্থান পাইতে পারে না। গদ্যও সাহিত্য পদ্যও সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞানও সাহিত্য—তবে কথা এই যে, এই সকলের মধ্যে সাহিত্যের উদ্দেশ্য বর্ত্তমানে থাকা চাই; নহিলে গদ্যই বলুন, পদ্যই বলুন, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞানই বলুন, কিছুই সাহিত্য নামে অভিহিত হইতে পারে না। আর্ত্তের দীর্ঘশ্বাসে, প্রণয়ীর প্রেমোচ্ছ্বাসে, বীরের উদ্দীপনায়, ভক্তের ভক্তিসাধনায় কখন্ কোন্ মুহূর্ত্তে ভাষার উদ্ভব হইয়াছে কে বলিবে? কে বলিবে কেমন করিয়া দেশ, কাল ও অবস্থাভেদে মনের ভাব ব্যক্ত করিবার জন্য ভাষার উৎপত্তি? এইমাত্র জানি একের মনের ভাব অন্যের নিকট ব্যক্ত করিবার জন্যই ভাষা। আমাদের এই উদ্দেশ্য যত সহজে যত অল্পায়াসে সংসাধন করিতে পারা যায়, ততই আমাদের ভাষা সার্থকতার দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। যে জাতির কবি, গায়ক, লেখক, ভাবুকের কাব্য-গীত-রচনা-চিন্তাস্রোত যত বহিয়াছে, সে জাতির ভাষার কলেবরও তত পুষ্টিলাভ করিয়াছে। ভাষার প্রকৃতি, গতি, স্থিতি, বিকাশ ও বিরাম যদি বুঝিতে হয়, তাহা হইলে সর্ব্বাগ্রে ভাষার উদ্ভব ও কলেবর-পুষ্টি বুঝিতে হইবে। আমরা বাঙ্গালী, বাঙ্গালা আমাদের ভাষা। যে ভাষায় আমরা প্রথম 'মা' বলিতে শিখিয়াছি, যে ভাষায় আমরা আমাদের সুখ-দুঃখের কাহিনী ব্যক্ত করিতে শিখিয়াছি, যে ভাষায় আমাদের প্রাণের ভাবসমূহের দ্যোতনার প্রকৃষ্ট অভিব্যঞ্জনা, যে ভাষার পদলালিত্য অন্যান্য ভাষার আদর্শ-স্থানীয় হইতে পারে, সেই বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃতি, গতি, স্থিতি, বিকাশ ও বিরাম বুঝিতে হইলে আমাদিগকে সর্ব্বাদৌ বঙ্গভাষার উৎপত্তি ও কলেবরপুষ্টি বুঝিতে হইবে। বাঙ্গালাভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে আজ আমি এ ক্ষেত্রে কোন মতের উত্থাপন করিব না। বঙ্গভাষার উৎপত্তি লইয়া অনেকে অনেক উৎকট ও উদ্ভট মতের অবতারণা করিয়াছেন ও করিতেছেন। বঙ্গভাষার ভাষাতত্ত্ব ও ব্যাকরণ আলোচনার সময় এখনও আসে নাই। যতদিন না আমরা বাঙ্গালাভাষায় প্রচলিত শব্দাবলী সংগ্রহ করিয়া তাহাদের ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করিতে সমর্থ হইব, ততদিন বঙ্গভাষার উৎপত্তি নিরূপণ করিবার চেষ্টা করা বৃথা। বাঙ্গালা ভাষার প্রণালী বিশুদ্ধ যে শব্দ সংগ্রহ বা অভিধান-সঙ্কলন করিতে হইবে তাহাতে অধুনা প্রচলিত বা ইতঃপূর্ব্বে প্রচলিত সকল শব্দের অর্থ, ব্যুৎপত্তি এবং ইতিহাসের বিশিষ্ট বিবরণ থাকা চাই। তাহা হইলে আমরা ব্যাকরণের উপকরণ সংগ্রহ করিতে পারিব। কিন্তু এ কার্য্যে অগ্রসর হইতে হইলে আমাদিগকে প্রথমেই বঙ্গীয় প্রাচীন সাহিত্যের সম্যক্ আলোচনা করিতে হইবে। প্রাচীন সাহিত্যের কোন্ বীজ কত দিনে ক্রম-বিকশিত হইয়া নবীন সাহিত্যের শাখাকাণ্ডে পরিণত হইল ঐতিহাসিকের চক্ষে ইতিহাসের আলোকে তাহা ভাল করিয়া বুঝিয়া লইতে হইবে। সমালোচক ঐতিহাসিকের চক্ষে প্রাচীন কাব্যাদি না পড়িয়া স্তাবক বা উপাসকের চক্ষে ঐ সকল গ্রন্থ পড়িলে চলিবে না। প্রাচীন সাহিত্যের ভাব, ভাষা, ছন্দোবদ্ধ শব্দবিন্যাস,

রচনা-পদ্ধতির সম্যক্ আলোচনা করা চাই। ব্যাকরণ ভাষার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিশ্লেষণ, অস্থি, মজ্জা, মেদ, মাংস, শিরা, স্নায়ু প্রভৃতির পরীক্ষা। এই পরীক্ষা সুসিদ্ধির নিমিত্ত প্রাচীন সাহিত্যের পরিজ্ঞান থাকা আবশ্যক। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে রচিত যে কোন ভাষার ব্যাকরণ অধ্যয়ন করুন, দেখিবেন পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় সেই ভাষার প্রাচীন সাহিত্যপাঠের লক্ষণ সুস্পষ্ট রহিয়াছে। ভাষার প্রাচীন কাব্য গীত রচনা চিন্তার পরিজ্ঞান না থাকিলে সে ভাষার ব্যাকরণ-সঙ্কলন সর্ব্বথা অসম্ভব। যাহাকে ভাষাবিজ্ঞান বলে, সে বিজ্ঞানের অস্তিত্ব প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত। সুতরাং প্রাচীন সাহিত্যালোচনা যে অবশ্যকর্ত্তব্য তাহা আমাদিগকে বেশী করিয়া বুঝাইয়া বলিতে হইবে না।

এক্ষণে আমি সংক্ষেপে প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য সম্বন্ধে দুই চারিটা কথা বলিয়া আমার বক্তব্যের উপসংহার করিব।

বৌদ্ধযুগে পালবংশীয় রাজাদিগের সময় হইতে বোধ হয় বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রথম প্রচার আরম্ভ হয়। ধর্ম্মঠাকুরের মাহাত্ম্যপ্রচারই সেই সকল সাহিত্যের লক্ষ্যস্থল। গানের পালা সাজাইয়া সেই গান গাহিয়া সাধারণের মধ্যে সেই ধর্ম্মঠাকুরের মাহাত্ম্য প্রচার করা হইত। যোগীপাল, মহীপাল, মাণিকচাঁদ, রমাইপণ্ডিত, ঘনরাম, ময়ূরভট্ট, রূপরাম, খেলারাম, মাণিকরাম, প্রভুরাম, সীতারাম, রামদাস আদক প্রভৃতি অনেকেই ধর্ম্মের গানের পালাকর্ত্তা ছিলেন। তদ্ব্যতীত ডাকের কথা, খনার বচন সাহিত্যাকারে লোক-শিক্ষার বেশ দুইটি সোপান ছিল। ডাকের কথা ও খনার বচন ধর্ম্মঠাকুরের মহাত্ম্য জ্ঞাপক গানের পালা নহে। উহা প্রচলিত ও সাধারণের সহজবোধগম্য ভাষায় পদ্যে রচিত ছোট ছোট ছড়া। তাহাতে রাজনীতি বাণিজ্যনীতি স্বাস্থ্যনীতি, ধর্ম্মনীতি, কৃষিনীতি, সমাজনীতি ইত্যাদি যাবতীয় জ্ঞাতব্য ও শিক্ষিতব্য বিষয় ছোট ছোট কথায় শিক্ষা দেওয়া হইত।

অনেক সময় অমঙ্গল নিবারণ হইতে মঙ্গলের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ধর্ম্মবিশ্বাসের মতভেদ হইতে ধর্ম্মের সঙ্কীর্ণতাজনক সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি এবং সেই সাম্প্রদায়িক মত প্রচারকরণে দেশে সাহিত্যের আবির্ভূত পদাবলী, পৌরাণিক উপাখ্যান, পাঁচালী ও কথকতা ইত্যাদির উদ্ভব হইয়া থাকে। প্রবল বৌদ্ধমতের খরস্রোতকে মন্দীভূত করিবার নিমিত্ত সেন-বংশীয় রাজাদের শাসনকালে প্রচারিত ধর্ম্মঠাকুরের আবরণে আবৃত করিয়া নূতন শৈবমত প্রচারের চেষ্টা হইল এবং সেই উদ্দেশ্যে রামকৃষ্ণ দাস কবিচন্দ্র শিবায়ন রচনা করিলেন। পরে তাঁহারই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া রাম রায় ও শ্যাম রায় 'মৃগব্যাধ সংবাদ', রতিদেব 'মৃগলুব্ধক', রঘুরাম রায় 'শিবচতুর্দ্দশী', ভগীরথ 'শিবগুণমাহাত্ম্য', হরিহর-সুত 'বৈদ্যনাথ মঙ্গল' রচনা করেন। এই সকল গ্রন্থও ক্রমশঃ ধর্ম্মের গানের মত গীত ও শ্রুত হইয়া শৈবমতটা একপ্রকার বেশ প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল।

ধর্ম্মবিবাদ সকল দেশে সকল সময়েই আছে। য়ুরোপে এই ধর্ম্মবিবাদ উপলক্ষে কত রক্তপাত হইয়াছে। সুখের বিষয় ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতে যুদ্ধক্ষেত্রে শোণিতপ্রবাহ না বহিয়া সাহিত্যের প্রবাহ ছুটিয়াছে।

শৈবমত প্রচারিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর শাক্ত সম্প্রদায় মাথা নাড়া দিয়া এক নূতন স্রোত প্রবাহিত করিলেন। বসন্তরোগ ও তাহার চিকিৎসা উপলক্ষ করিয়া শীতলাদেবীকে বসন্তের অধিষ্ঠাত্রীরূপে খাড়া করিয়া তাঁহার মাহাত্ম্য-বর্ণনা ও পূজা-অর্চনার জন্য শীতলামঙ্গল বা শীতলা-গানের সৃষ্টি হইল। ক্রমে শাক্ত সম্প্রদায় বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হইয়া বহুবিস্তৃত হইয়া পড়িল এবং ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থকার পালার আকারে ভিন্ন ভিন্ন শক্তির আবিষ্কার ও প্রচার করিতে লাগিলেন। কবিবল্লভ দৈবকীনন্দন প্রভৃতি 'শীতলা-মঙ্গল' বা 'শীতলা-মাহাত্ম্য' প্রচার করিলেন। কিছুদিন পরেই, হরিদত্ত বিজয়গুপ্ত প্রভৃতি ৬০ জন পালাকর্ত্তা মনসাদেবীকে সর্পভয়নিবারিণীরূপে খাড়া করিয়া মনসা-মাহাত্ম্য বর্ণনাচ্ছলে 'বিষহরির গান' বা 'পদ্মাপুরাণ' নামে মনসামঙ্গল রচনা করেন। মনসামঙ্গলের মধ্যে নারায়ণদেব-রচিত চাঁদ সদাগর ও বেহুলা লখিন্দরের কাহিনী বিশেষরূপে বিদিত। মনসামঙ্গলের পরই মঙ্গলচণ্ডীর গান বা চণ্ডীমঙ্গল নামে খ্যাত শুভচণ্ডীর গান বা শুভসূচনীর (সুবচনীর) কথা প্রচলিত হইল। দ্বিজ জনার্দ্দন, কবি

কঙ্কণ, বলরাম, কবিরঞ্জন, মুকুন্দরাম প্রভৃতি অনেকেই চণ্ডীমঙ্গলের রচয়িতা; চণ্ডীমঙ্গলের পরই কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর কথা। নায়কনায়িকার উপাখ্যান ছলে আদ্যাশক্তি মহাকালীর মাহাত্ম্য-বর্ণনাই কালিকামঙ্গলের প্রধান বিষয়। গোবিন্দ দাস, কৃষ্ণরাম দাস, রামপ্রসাদ সেন, রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র, অন্ধ কবি ভবানীপ্রসাদ, নিধিরাম কবিরত্ন প্রভৃতি অনেকেই কালিকামঙ্গলের রচয়িতা। বহুশক্তিরূপিণী আদ্যাশক্তি মহামায়ার ধাত্রী-রূপকে ষষ্ঠীদেবীরূপে কল্পনাপূর্ব্বক কৃষ্ণরাম, কবিচন্দ্র ও গুণরাজ ষষ্ঠীমঙ্গল রচনা করিয়া ষষ্ঠী-মাহাত্ম্য প্রচার ও ঘরে ঘরে ষষ্ঠীপূজার প্রচলন করেন। তাহার অব্যহিত পরেই গুণরাজ খান, শিবানন্দ কর, রণজিৎ দাস প্রভৃতি অনেকেই কমলামঙ্গল বা লক্ষ্মীচরিত্র করিয়া কমলা-মাহাত্ম্য প্রচার করেন। সঙ্গে সঙ্গে অমনই দয়ারাম দাস ও গণেশমোহন সারদামঙ্গল বা লক্ষ্মীমাহাত্ম্য প্রচারে অগ্রসর হইলেন। কমলা-মঙ্গল রচয়িতাদের মধ্যে জগমোহন মিত্র ও সারদা-মঙ্গল রচয়িতাদের মধ্যে দয়ারাম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

স্ব স্ব বিদ্যাবুদ্ধি-প্রকাশের সুযোগ কোন সম্প্রদায়ই ছাড়িয়া দেন নাই। চণ্ডীমঙ্গল, কালিকামঙ্গল যখন প্রচারিত হইল, তখন গঙ্গামঙ্গলই বা বাকী থাকে কেন। মাধবাচার্য্য, দ্বিজ গৌরাঙ্গ, দ্বিজ কমলাকান্ত, দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি মঙ্গলকর্ত্তৃগণ গঙ্গামঙ্গল রচনা করিয়া গঙ্গামাহাত্ম্য প্রচার করিলেন। গঙ্গামঙ্গলের মধ্যে দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়-রচিত গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী সমধিক প্রসিদ্ধ। সাহিত্য-জগতে, বৌদ্ধ, শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব প্রভৃতি সম্প্রদায়ের ন্যায় সৌর-সম্প্রদায়ও সাহিত্যের পুষ্টিসাধন পক্ষে কিছু কিছু সাহায্য করিয়াছেন। দ্বিজ কালিদাস ও দ্বিজ রামজীবন বিদ্যাভূষণ সূর্য্যের পাঁচালী লিখিয়া কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন।

ধর্ম্মবিবাদের ন্যায় রাজনৈতিক উদ্দেশ্যও সাহিত্যোৎকর্ষ সাধন পক্ষে অনেক সহায়তা করিয়াছে। মুসলমান রাজত্ব-কালে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সংঘর্ষ না ঘটিয়া যাহাতে একটা প্রীতির ভাব সংস্থাপিত হয় সে জন্য মুসলমান রাজপুরুষেরা হিন্দু সমাজের আচার ব্যবহার ও হিন্দু শাস্ত্র এবং ধর্ম্ম অবগত হইবার জন্য যত্নবান্ হইয়াছিলেন। হিন্দুগণ তাঁহাদের সকল কার্য্যেই রামায়ণ, মহাভারত বা ভাগবতের দৃষ্টান্ত দিয়া চলিতেন; সুতরাং সর্ব্বাগ্রেই তাঁহাদের ঐ দিকেই লক্ষ্য পড়িল এবং উপযুক্ত লোক দিয়া ঐ সকল গ্রন্থের অনুবাদ করাইয়া সাধারণের মধ্যে প্রচার করাইতে লাগিলেন। এই সময় হইতেই বাঙ্গালা সাহিত্যের অনুবাদ-শাখার আরম্ভ হইল। কৃত্তিবাস, অদ্ভুতাচার্য্য, অনন্তদেব, দ্বিজ রামপ্রসাদ, রঘুনন্দন গোস্বামী প্রভৃতি রামায়ণ অনুবাদ করেন। বিজয় পণ্ডিত, সঞ্জয়, কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীকর নন্দী, কাশীরাম দাস, নন্দরাম দাস, ষষ্ঠীবর প্রভৃতি অনেক মহাত্মাই মহাভারতের অনুবাদ বা ভারতবর্ণিত বিষয় অবলম্বনে বহুকাব্য রচনা করিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। বিজয় পণ্ডিতের মহাভারতখানি মহাভারত মধ্যে সর্ব্বপ্রাচীনত্বের গৌরব করিতে পারে। সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহের সময় বিজয় পণ্ডিতের 'বিজয়পাণ্ডব-কথা' বা "ভারত-পাঁচালি" প্রণীত হয়।

রামায়ণ মহাভারতের ন্যায় শ্রীমদ্ভাগবতের অনুবাদ করিয়া ভাগবতের অনুবর্ত্তী হইয়া বহুসংখ্যক গ্রন্থরচনাদ্বারা অনেকে বঙ্গসাহিত্যে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে গুণরাজ খাঁন মালাধর বসু একজন। তাঁহার অনু-বাদের নাম 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' বা 'শ্রীগোবিন্দ-বিজয়'। গুণরাজ খাঁর পর রঘুনাথ ভাগবতাচার্য্য সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবতের অনুবাদ করেন। তাঁহার অনুবাদের নাম 'শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিণী।' কবিচন্দ্রের 'কৃষ্ণমঙ্গল' ভাগবত অনুবাদের সর্ব্বপ্রধান গ্রন্থ। এতদ্ব্যতীত ভবানন্দ 'হরিবংশ' এবং সঞ্জয় বিদ্যাবাগীশ 'ভগবদ্গীতা' অনুবাদ করেন।

কেবল গীত রচনা দ্বারা সাহিত্যের পুষ্টিসাধন রামপ্রসাদ সেন, কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য, দেওয়ান রঘুনাথ রায়, নব-দ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ও তদ্বংশীয় শিবচন্দ্র, শম্ভুচন্দ্র, কুমার শরচ্চন্দ্র ও মহারাজ শ্রীশচন্দ্র, নাটোরাধিপতি মহারাজ রামকৃষ্ণ, দাশরথি রায়, রামদুলাল সরকার, কালী মীরজা, সৈয়দ জাফর খাঁ প্রভৃতি সাহিত্যজগতে অনেক খ্যাতিলাভ করিয়া গিয়াছেন।

বৌদ্ধ, শৈব, শাক্ত, সৌর, বৈষ্ণব, সকলেই সাহিত্য-সেবা করিয়াছেন, কিন্তু বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের পূর্ব্ববর্ত্তী সাহি-ত্যিকেরা সাহিত্যের লালন-কার্য্য করিয়াছেন। বৈষ্ণব

মহাপ্রভুরা সেই সাহিত্যের হাতে খড়ি দিলেন। বৈষ্ণব যুগে বাঙ্গালা সাহিত্য লালনের অবস্থা অতিক্রম করিয়া তাড়নার অবস্থায় পদার্পণ করে। বাস্তবিক বাঙ্গালা-সাহিত্যের বর্ত্তমান উন্নতির অবস্থা বৈষ্ণবদিগেরই অনুগ্রহে। বৈষ্ণব কবিদিগের রসমাধুর্য্যময়ী লেখনী হইতে যে মধুর কোমলকান্ত অমৃতময়ী কবিতাধারা নিঃসৃত হইয়াছে, আজিও তাহা সহৃদয় ব্যক্তিগণের তৃপ্তি দান করিতেছে। জয়দেব যে পথ দেখাইয়া গিয়াছেন, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি সেই পথেরই অনুসরণ করিয়া, সাহিত্যকানন চিরবসন্ত আমোদে ভর-পুর করিয়া রাখিয়াছেন।

এই যে সাহিত্যের কথা বলিয়া আসিলাম, ইহার সঙ্গে আমাদের অদ্যকার সঙ্কল্পিত মালদহ-সম্মিলনের কি সম্পর্ক তাহা একটু দেখাইতে চেষ্টা করিব। প্রথমতঃ সাহিত্যের ভিতর দিয়া আমরা কি শিখিতে চাই তাহা দেখা আবশ্যক। আমরা যে দেশের মানুষ সেই দেশটা কেমন ও কি ছিল তাহা জানা চাই; তাহার পর সেই দেশের মানুষগুলি কেমন, পূর্ব্বে কিরূপ ছিল এবং পরেই বা কেমন হইতে পারে তাহা জানা আবশ্যক। বোধ হয় এই দুইটা বিষয় ভাল করিয়া জানিতে পারিলে আর বড় বেশী কিছু জানিবার বাকী থাকে না। এই দুই বিষয় জানিতে গেলে আমাদিগকে সাহিত্যের আশ্রয় লইতেই হইবে, আর অন্য পন্থা কিছু নাই। দেশ বা দেশের লোক কেমন ছিল তাহা যদি জানিতে হয় তবে খুঁজিতে হইবে—তৎসম্বন্ধে পূর্ব্বে কোথায় কে কি লিখিয়া পড়িয়া রাখিয়া গিয়াছেন। ইহা হইতেই আমাদের প্রাচীন সাহিত্য, প্রত্নতত্ত্ব ও সমাজ-তত্ত্বের গবেষণার কথা আসিয়া পড়ে। ত্রিকালদর্শন নামে একটা বিদ্যা এক সময়ে ভারতবাসীর অধিকৃত ছিল বলিয়া শোনা যায়; কিন্তু এখনকার যুগে ত্রিকালদর্শী কেহ আছেন কি না আমার জানা নাই। থাকিলে তাঁহাকে স্তব তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট ভূতভবিষ্যৎ সমস্ত জানিয়া লইতাম। তাহা যখন হইবার সম্ভাবনা নাই, তখন আমাদের খুঁজিতেই হইবে। আমরা মালদহ-সাহিত্য-সম্মিলনে সম্মিলিত হইয়া সেই খুঁজিবার পথ নির্ণয় করিয়া লইব। মালদহ জাতীয়-শিক্ষাসমিতির উদ্যোগে এই সম্মিলন আহূত হইয়াছে। আদৌ পথ পাওয়া যাইবে কি না তাহার আশ্বাস দিবার জন্য সেই শিক্ষা সমিতি পূর্ব্ব হইতেই সেই পথনির্ণয়কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছেন। তাঁহারা অনুসন্ধান-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া মালদহের প্রাচীন সাহিত্য ও ইতিহাস সম্বন্ধে যে সকল তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন তাহার কতকটা বিবরণ আপনারা অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি মহাশয়ের পাণ্ডিত্য-পূর্ণ অভিভাষণে শুনিয়াছেন এবং বিস্তৃত বিবরণ এখন অন্যান্য কৃতী পুরুষের মুখে শুনিতে পাইবেন; সুতরাং সে সকল বিষয় সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এখন বেশী কিছু নাই, তবে আমি যে কথা বলিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেছি তাহা এই,—

মালদহ একটি পুরাতন স্থান। মুসলমান-রাজত্বের প্রাক্কালে যে বহুবিস্তৃত বরেন্দ্ররাজ্য ভারতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছিল, যাহার প্রভাবে বৌদ্ধ সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থান মগধকে ধ্বংসমুখে পতিত হইতে হইয়াছিল, সেই বরেন্দ্র-রাজ্যের অতি প্রবলতম অংশ এই মালদহপ্রদেশ। তৎপরে মুসলমান-সাম্রাজ্য স্থাপিত হইলে পাঠানদিগের বাঙ্গালা-দেশের মধ্যে এবং মোগলাধিকারের বাঙ্গালাদেশের মধ্যেও মালদহপ্রদেশের প্রয়োজনীয়তা বড় কম ছিল না। আর যদি বৌদ্ধযুগ পূর্ব্বকালের পৌণ্ড্রবর্দ্ধনাদির খোঁজ করিতে হয়, তাহা হইলেও মালদহকে একেবারে ভুলিলে চলিবে না।

গৌড় ও পাণ্ডুয়ায় পুণ্ড্র ও বরেন্দ্রর অতীত কাহিনীর কথা—যাহা আমি স্বদেশী ও বিদেশীর নিকট শুনিয়া আসিতেছি—সেই সকল তোতাপাখীর কণ্ঠস্থ বুলি আর আপনাদের নিকট বলিয়া আপনাদের মূল্যবান্ সময় নষ্ট করিব না। আপনাদের নিকট সে সকল গৌরবময়ী স্মৃতির কথা আমরা শুনিতে আসিয়াছি। বিস্মৃতির অতল তল হইতে যে সকল রত্ন আপনারা আহরণ করিয়া রাখিয়াছেন, তাহাই দেখিতে আসিয়াছি। দেখিতে আসিয়াছি, গৌড় ও পাণ্ডুয়ার ভগ্নাবশেষ,—গৌড়ের বারদুয়ারী মস্‌জিদ যাহার গম্বুজগুলি শত বৎসর পূর্ব্বে ক্রেটন সাহেব সুবর্ণ-পত্র দ্বারা মণ্ডিত দেখিয়াছিলেন। গৌড়ের সিংহদ্বার "দখল দরওয়াজা" ও গড়বন্দী প্রাসাদ, নবাব হোসেন শাহ ও নসরৎ শাহের সমাধিস্থান, ফিরোজামিনার গৌড়স্তম্ভ, কদমরসুল মস্‌জিদ, তাঁতিপাড়া মস্‌জিদ, লুটন মস্‌জিদ, প্রাসাদের পূর্ব্ব ও পশ্চিম-

দ্বার "লুকাচুরি" ও "কোতয়ালি দরওয়াজা; এক কথায়, দেখিতে আসিয়াছি—প্রাচীন পাঠানকীর্ত্তি মুসলমান গৌড় বা লক্ষ্মণাবতী ও তাহার উত্তরাংশে অবস্থিত হিন্দু গৌড় বা প্রাচীন রাজধানী "রমাবতীর" ভগ্নাবশেষ। আর দেখিতে আসিয়াছি—বৈষ্ণবদিগের মহাতীর্থ রামকেলি, প্রেমের অবতার বাঙ্গালার ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গদেবের পদধূলিতে যে স্থান পবিত্রীকৃত হইয়াছে, সেই স্থান দেখিতে আসিয়াছি, যে স্থানে আমাদের প্রাণগোরা বিশ্রাম করিয়াছিলেন, সেই কেলিকদম্বমূল দেখিতে আসিয়াছি। দেখিতে আসিয়াছি শ্রীরূপসনাতন-সেবিত সেই মদনমোহন ঠাকুর, 'রাধা-কুণ্ড', 'শ্যামকুণ্ড' শ্রীরূপ গোস্বামী খনিত, "রূপ সাগর"-দীর্ঘিকা; আর দেখিতে আসিয়াছি শ্রীপাট গয়েশপুর যে স্থানে আম্রকাননে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র শ্রীবীরভদ্র গোস্বামিপ্রভু কেশবছত্রীর পুত্র দুর্ল্লভ ছত্রীর আতিথ্য গ্রহণ করেন। এই কেশব ছত্রীর নিকট ইতঃপূর্ব্বে গৌড়ে মহাপ্রভু আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন।

আর পাণ্ডুয়ায় দেখিতে আসিয়াছি—আসানসাহী দরগা, সেলামী দরগা ও বাইশ হাজারী দরগা, নূর কুতুব আলামের দরগা, সোনা মসজিদ, একলখী মসজিদ, জগতের সর্ব্বা-পেক্ষা বৃহৎ আদিনা মসজিদ।

ইতিহাস-চর্চ্চার জন্য মালদহ জেলা প্রসিদ্ধ। মালদহ রিয়াজ-উস্-সলাতিন-প্রণেতা ঐতিহাসিক গোলাম হোসেনের জন্মস্থান ও কর্ম্মস্থান। শতবৎসর পূর্ব্বে এই স্থান হইতেই তিনি বাঙ্গালীকে স্বাধীনভাবে ইতিহাস প্রণয়নে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন। গোলাম হোসেন শিষ্য-পরম্পরায় ইতিহাস আলোচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার শিষ্য আবদুল করিম ও তৎশিষ্য মৌলবী ইলাহি বক্স ইতিহাসের চর্চ্চা, ইতিহাস আলোচনার একটা ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন।* আমি মানস-নেত্রে দেখিতে পাইতেছি, মালদহ সহরে যেখানে দাতব্য-চিকিৎসালয় রহিয়াছে, সেই স্থান গোলাম হোসেনের জন্মস্থান বলিয়া, আর সহরের উত্তরাংশে "মীর চক" নামক স্থান—যেখানে তিনি চিরনিদ্রায় সমাহিত আছেন—সেই স্থান বাঙ্গালীর ভবিষ্যতে ঐতিহাসিকদিগের তীর্থক্ষেত্ররূপে পরিগণিত হইবে। তাহার পর পঞ্চদশ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু পরলোকগত রাধেশচন্দ্র শেঠ মহাশয় বাঙ্গালার পুরাতন রাজধানী গৌড় পাণ্ডুয়ার অতীতকাহিনী—বাঙ্গালার সুখদুঃখের কথা—বাঙ্গালীর অতীত গৌরব-বিবরণ সর্ব্বপ্রথম আমাদের নিকট বিবৃত করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন। তাঁহার আজীবন পরিশ্রমলব্ধ ঐতিহাসিক তথ্যগুলি মাসিক পত্রিকার অঙ্ক হইতে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইতে দেখিলে আন্তরিক সুখী হইব। আমার বোধ হয় তিনিই প্রতিথযশাঃ ঐতিহাসিক-বরেণ্য শ্রদ্ধেয় অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়কে গৌড় ও পাণ্ডুয়ার ইতিহাস আলোচনায় প্রথম প্ররোচিত করেন। তাঁহার পর মৈত্রেয় মহাশয় অক্লান্ত পরিশ্রমে অনুসন্ধিৎসার বর্ত্তিকা লইয়া অন্ধ-কারময় ঐতিহাসিক গুহার অন্তর্নিহিত রত্নরাজি উদ্ধার করিয়া নূতন তথ্যের আবিষ্কার করিয়া—আপনিও ধন্য হইয়াছেন, আমাদিগকেও ধন্য করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় কর্ম্মবীরের সাধনায় পাশ্চাত্য জগৎ মুগ্ধ—পরিশেষে তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি "বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতি"র গঠন। তাঁহারই চেষ্টায়, কুমার শরৎকুমারের বদান্যতায় ও সভ্যগণের অক্লান্ত পরিশ্রমে বাঙ্গালার ইতিহাসের কএক পৃষ্ঠা উজ্জ্বল হইয়াছে, নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়া সত্যের মাহাত্ম্য প্রচারে সহায় হইয়াছে—"গৌড়-রাজমালা" ও "লেখমালা"র আবির্ভাব হইয়াছে। "বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি" জগতের নিকট সপ্রমাণ করিয়া দিয়াছে যে, বিজ্ঞানানুমোদিত উপায়ে ইতি-হাসের আলোচনা করিতে বাঙ্গালী জানে, উপকথা ও প্রবাদের ভিতর দিয়া ইতিহাসের সারমর্ম্মটুকু গ্রহণ করিতে পারে!

মালদহের কথা ভাবিতে গেলেই মনে পড়িয়া যায়, জ্ঞানবৃদ্ধ পণ্ডিত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নাম। তিনি "গৌড়ের ইতিহাস" দুই খণ্ডে প্রকাশ করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করিয়াছেন। তাঁহার পর আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু কর্ম্ম-যোগী ইতিহাসের একনিষ্ঠসাধক হরিদাস পালিত মহাশয় 'আদ্যের গম্ভীরা' লিখিয়া বাঙ্গালায় ধর্ম্ম ও সামাজিক ইতি-হাসের একাংশ উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছেন। ভবিষ্যতে যাঁহারা সমাজ ও ধর্ম্মের ইতিহাস লইয়া আলোচনা করিবেন তাঁহারা পালিত মহাশয়ের প্রদর্শিত মার্গে বিচরণ করিয়া সুফল লাভ করিবেন, এ কথা মুক্তকণ্ঠে বলিব।

মালদহ জেলার মধ্যে সাহিত্যালোচনা করিয়া যাঁহারা

যশের মন্দিরে প্রবেশলাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী ও শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ঘোষ মহাশয়ের নাম সর্ব্বাগ্রে মনে পড়িয়া যায়। ইঁহারা আমাদের সাহিত্যের সেবা করিয়া আমাদের ধন্যবাদের ভাজন হইয়াছেন।

পরিশেষে একজন নীরব সাধক—একজন কর্ম্মযোগীর অক্লান্ত পরিশ্রম ও সাধনার সিদ্ধিলাভের কথা বলিব। মূর্ত্তিমান বিনয়—বিনয়কুমারের কথা আপনারা সকলেই জানেন। তিনি ইংরেজি সাহিত্য ও ইতিহাসে সুপণ্ডিত। তিনি মাতৃভাষার সাধনা করিয়া আজ, বাঙ্গালীর নিকট বরেণ্য হইয়াছেন, তাঁহার পুস্তকাবলী সাহিত্য-সমাজে আদৃত হইয়াছে; কিন্তু সে সকল কথা আজ আমি এখানে তুলিব না; তাঁহার অক্ষয়কীর্ত্তি—"মালদহ-জাতীয়-শিক্ষা-পরিষৎ"। ১৩১২ সালে যখন প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালীর অসম্পূর্ণতা অনেকেই প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়া কলিকাতায় "Bengal National Council of Education" সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তখন জেলায় জেলায় জাতীয় শিক্ষা-পরিষদেরও সৃষ্টি হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে অনেকগুলিরই অকালে অস্তিত্ব-লোপ হইয়াছে, কিন্তু সুখের বিষয় বিনয়কুমার সরকার, বিপিনবিহারী ঘোষ, কৃষ্ণচন্দ্র সরকার প্রমুখ কর্ম্মিগণের চেষ্টায় ও সাধনায় মালদহ শিক্ষা-পরিষৎ আজিও সগর্ব্বে দণ্ডায়মান রহিয়াছে; কত দুঃস্থ বালককে শিক্ষাদান করিয়া সমাজে প্রকৃত মানবের সৃষ্টি করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই, ব্যাবহারিক জ্ঞান শিক্ষা দিবার জন্য এই জেলার কএকজন ছাত্রকে য়ুরোপ ও আমেরিকায় পাঠাইয়া শিক্ষিত করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছে। এই পরিষৎ মালদহবাসীর চিন্তাস্রোতকে বাঙ্গালা সাহিত্যের ভিতর দিয়া প্রবাহিত করাইয়া যে কল্যাণের সূচনা করিয়াছে তাহা আশাপ্রদ। আশা করি, কালে "মালদহ-জাতীয়-শিক্ষা পরিষৎ" মহীরুহে পরিণত হইয়া ফলপুষ্পভারে নত হইয়া বঙ্গীয় সাহিত্য কানন আমোদিত করিয়া রাখিবে।

আর আজ যে স্থানে এই সভা আহূত হইয়াছে, সেই কলিগ্রাম জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রাণস্বরূপ সাহিত্যানুরাগী জমিদার শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র সরকার মহাশয়কে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিতেছি না। তিনি একাধারে কমলা ও বীণাপাণির বরপুত্র। এই কলিগ্রামের উন্নতিকল্পে তাঁহার মহতী চেষ্টা, তাঁহার প্রাণপণ পরিশ্রম যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া এই বিদ্যালয়রূপে আমাদের নয়নসম্মুখে দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

এইরূপে সর্ব্বকালে সকল দিক্ হইতেই যখন মালদহ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া বঙ্গের ইতিহাসে সর্ব্বপ্রকারে বিশেষ প্রয়োজনীয় স্থান হইয়া রহিয়াছে, তখন ইহার উত্থান-পতনের ইতিহাস এবং ভবিষ্যতের উন্নতির উপায় চিন্তা করা আমাদের কর্ত্তব্য।

মালদহবাসী মালদহের জন্য গবেষণায় প্রবৃত্ত হইবেন, ইহার জন্য উপরোধ, অনুরোধ বা সঙ্কল্প আবশ্যক করে না। ইহা স্বতঃসিদ্ধ কথা। কিন্তু মালদহের কি ছিল জানিলে যখন বাঙ্গালীর একাংশের ইতিহাস জানা যায় তখন মালদহের গবেষণায় সমস্ত বাঙ্গালীর আগ্রহ হওয়া আবশ্যক। মালদহ-বাসী কাজ করিয়া সাফল্যের মুখ দেখিতে পাইয়াছেন। তাহার ফলাফল আজ আমাদের সম্মুখে ধরিতেছেন, আমরা তাঁহা-দিগের সহিত সমান আগ্রহ দেখাইয়া যদি তাঁহাদের গবেষণার ফলগুলিকে আদর করিয়া লই, তবেই না মালদহের এই সাহিত্য-সম্মিলন সর্ব্বতোভাবে সফল হয়। মালদহ যাহা করিয়াছেন, যাহা আমাদের দিতেছেন, তাহা আমাদের আদর্শ হউক, আমরা মালদহের আদর্শে অপরত্র এইরূপ সম্মেলন-অনুষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা করি। জাতীয়-শিক্ষা সমিতি কাহারও সাহায্য না লইয়া স্বক্ষেত্রে স্বাধীন চেষ্টায় স্বকার্য্য করিয়া যাইতেছেন। এই স্বাবলম্বন অতিমাত্র প্রশংসার বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু যেমন ব্যক্তি-সমষ্টি লইয়া সমাজের গঠন হয়, তেমনই এই মালদহের ন্যায় কর্ম্মিদল সকল জেলায় স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র গড়িয়া উঠুক এবং ক্রমশঃ সে সকলের সমবায়ে বিপুল বঙ্গসমাজের গঠন সম্পূর্ণ হউক। কোথায় কি সূত্রে কেমন করিয়া তাহা হইবে, তাহার জন্য আমাদিগকে ভাবিতে হইবে না। সমস্ত বঙ্গের সাহিত্য-চেষ্টা যাহাতে একীভূত হয় আজ বিশ বৎসর হইল তাহার স্থান ভগবৎ-কৃপায় গঠিত হইয়াছে। যেমন মালদহের জাতীয় শিক্ষাসমিতি আশা করেন—মালদহের প্রত্যেক ব্যক্তি মালদহের সাহিত্য, ইতিহাস ও সমাজতত্ত্বের গবেষণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া মালদহের কাজ সম্পন্ন করুক; তেমনই বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ আশা

করেন, কেবল মালদহ কেন, বঙ্গের সমস্ত জেলার মালদহ সাহিত্যালোচনা-সমিতির ন্যায় সমিতি হইয়া সমগ্র বঙ্গের কার্য্য সুসম্পন্ন করিবার জন্য দেশের সমস্ত বিচ্ছিন্ন স্বাধীন শক্তিকে একত্র করিয়া এক বঙ্গের নামে সংহত শক্তি প্রয়োগের ব্যবস্থা করুক। মালদহ-শিক্ষা-সমিতির কার্য্য মালদহে নিবদ্ধ থাকুক, কিন্তু সে কেবল স্বাধীনতার দোহাই দিয়া কেবল স্বাতন্ত্র্যের মহিমা দেখাইবার জন্য সমস্ত বঙ্গের সংহত চেষ্টায় যোগ দিবে না অথবা তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিবে, ইহা যেন হইতেই পারে না। এরূপ বিসদৃশ কল্পনাও বোধ হয় মালদহ-শিক্ষা-সমিতির লক্ষীভূত নয়। মালদহ যেমন সমস্ত মালদহ জেলাকে একত্র করিয়া এক ক্রিয়া ও এক উদ্দেশ্যে বদ্ধ করিতে প্রয়াসী—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎও তেমনই সমস্ত জেলাকে পরিষদের নামে একত্র করিয়া এক ক্রিয়া ও এক উদ্দেশ্যে বদ্ধ করিতে প্রয়াসী। অনেকে বলিবেন এ সকল অবান্তর কথার অবতারণা কেন? একটু প্রয়োজন হইয়াছে বলিয়াই এই সকল কথা বলিতে বাধ্য হইলাম। বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন হয়—সমস্ত বঙ্গকে লইয়া। উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলন হয়—সমস্ত উত্তরবঙ্গকে লইয়া। আবার সেই উত্তরবঙ্গের মধ্যে এক প্রান্তে মালদহ-সাহিত্য-সম্মিলনের অনুষ্ঠান। ইহা যেমন কর্ম্মপ্রবণতার লক্ষণ, তেমনই স্বাধীনতার নামে বিচ্ছিন্নতাবর্দ্ধনের লক্ষণ। অনেকেই প্রশ্নপূর্ণ দৃষ্টিতে এই সকল ব্যাপার লক্ষ্য করেন। সুরসিক অমৃতলাল বসু একদিন বলিয়াছিলেন—"এক কলিকাতার মধ্যেই অতঃপর "ঠনঠনিয়া সম্মিলন", "বড়বাজার-সম্মিলন", "চৌরঙ্গী-সম্মিলন" ঘটিবে। মনুষ্য-চরিত্রের অভিনয়কলাকুশল সুরসিক রসরাজ দূরভবিষ্যতে দৃষ্টি রাখিয়া যে ইঙ্গিত করিয়াছেন, এই সম্মিলনের সভাপতির পদে বৃত হইয়া সে দিক্ হইতে আমি দৃষ্টি একেবারে সঙ্কুচিত করিতে পারিলাম না বলিয়া এ সকল কথার অবতারণা করিয়াছি। এই ক্ষুদ্র-বৃহৎ স্থানব্যাপী সম্মিলনগুলির সহিত যে কোথাও দ্বন্দ্ব নাই, তাহা বলিয়া দেওয়া বোধ হয় আমাদের পক্ষে অসঙ্গত হইল না।

মালদহবাসীদের আজ বড় আনন্দের দিন—জননী বঙ্গভাষার মন্দির-প্রতিষ্ঠার পুণ্যাহ, সাধকের প্রেমাঞ্জলি দিবার দিন। আজ শত ভক্ত অর্ঘ্য লইয়া মাতৃমন্দিরদ্বারে দণ্ডায়মান। আসুন আমরা সকলে মাতার বন্দনা করিয়া নববলে বলীয়ান্ হইয়া মাতৃভাষার সেবাকল্পে জীবন উৎসর্গ করি। আজ আমরা আমাদের স্বার্থপরতা ভুলিতে আসিয়াছি। ভুলিতে আসিয়াছি, আমাদের ক্ষুদ্রতা—আমাদের নীচতা। আসুন আমরা অচ্ছেদ্য অটুট দিব্য প্রেমের বন্ধনে ভ্রাতৃভাবে সকলের সহিত আবদ্ধ হইয়া মাতৃভাষার সেবা করি; কারণ, কথাই ত আছে "দশে মিলে করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ।"

কবির সহিত বলি—মায়ের চরণে ফুলমালা দেরে জড়ায়ে
মায়ের ভাষায় আপনার দেরে ছড়ায়ে
দিশে দিশে, দেশে বিদেশে,
আজি স্পন্দিত নিমেষে।"

আর মালদহবাসী কর্ম্মীদের সাধনায় আমার বোধ হয় এই সুন্দর মাতৃমন্দির-দ্বারে প্রতিবৎসর বাঙ্গলাদেশের সাহিত্যিকগণ সমবেত হইয়া আপনাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করিবেন, —আপনাদের হৃদয়ে নববলের সঞ্চার করিয়া দিবেন। আসুন এক্ষণে আমরা কর্ম্মফলের দিকে না চাহিয়া—কর্ম্মফল শ্রীভগবানে অর্পণ করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হই।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ।

আমার য়ুরোপ-ভ্রমণ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

য়ুরোপের স্থলপথে এই আমার প্রথম ভ্রমণ। এ কয়দিন ত জাহাজে চড়িয়া আসিলাম। এখন বৃন্দিসি হইতে নেপল্‌সে যাইবার সময় আমি য়ুরোপের স্থলপথ দেখিবার প্রথম অবকাশ পাইলাম। গাড়ীর মধ্য হইতে বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখি দুইপার্শ্বে সুন্দর সুন্দর শস্যক্ষেত্র, ফলের বাগান রহিয়াছে। ভারতবর্ষে যেমন দুই খণ্ড জমির মধ্যে 'আল' থাকে, এখানে তাহা দেখিলাম না; এখানে সেগুলি সুন্দর পথে পরিণত হইয়াছে। ইহাতে গমনাগমনের বেশ

সুবিধা হয়। ইটালির দক্ষিণাংশের ক্ষেত্রসকল দেখিলে সহসাই মনে হয় যে, এ দেশে মদ ও তৈলই জন্মে, আর কিছুই হয় না। ইটালির দক্ষিণাংশ, সুধু দক্ষিণাংশ কেন সমস্ত ইটালি দেশেই লোকেরা সহরে বা সহরতলীতেই বাস করিয়া থাকে। বৃন্দিসি হইতে নেপল্‌সের পথের মধ্যে আমি কোথাও একখানি গ্রাম বা একটা পল্লী দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। চারিদিকে বিস্তৃত শস্যক্ষেত্র ও উদ্যান এবং তাহারই মধ্যে দূরে দূরে এক একটা গোলাবাড়ী;—গ্রাম বা পল্লী মোটেই নাই। এই কারণেই বোধ হয় সহরগুলির লোকসংখ্যা অধিক।

বৃন্দিসি হইতে যাত্রা করিয়া প্রথমেই আমরা যে সহর দেখিলাম তাহার নাম বারি (Bari); ইহা এড্রিয়াটিক সাগরের তীরস্থ একটি বন্দর, লোকসংখ্যা বড় কম নহে—প্রায় লক্ষাধিক লোকের বাস। বৃন্দিসি অপেক্ষা বারিই প্রধান বাণিজ্য-বন্দর। এই বন্দরের সম্মুখেই সমুদ্রের অপর পারে, তুরস্কের উপকূলে আর একটি বন্দর আছে; তাহার নাম এণ্টি-বারি (Anti-Bari) অর্থাৎ উল্টা বারি।

ফগিয়া হইতে আমরা উত্তর-পশ্চিম দিকে যাইতে লাগিলাম এবং আমরা যখন বোভিনো পার হইয়া গেলাম, তখন হইতেই জিয়েন্নিন্ পর্ব্বতের মধ্যে আসিয়া পড়িলাম। আমাদের গাড়ী এই পর্ব্বত ভেদ করিয়া চলিতে লাগিল; কএকটি সুড়ঙ্গও আমাদের পার হইতে হইল।

তাহার পরই আমরা বেণেভেণ্টো নামক ক্ষুদ্র সহরটি দেখিতে পাইলাম। এই সহরটি ঠিক একখানি ছবির মত এই ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর নির্ম্মিত। সহরের গীর্জ্জাঘরই সকলের অপেক্ষাই অধিক শোভাময় বলিয়া বোধ হইল এবং সেইটিই উক্ত সহরের সর্ব্বোচ্চ অট্টালিকা। এই বেণিভেণ্টো সহরে ও তাহার নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহ হইতে এবং বসিলিকাটা প্রদেশ হইতে প্রতি বৎসর দলে দলে ইটালীয়ানগণ আমেরিকায় কাজ করিতে যাইয়া থাকে। দেশে তাহারা কাজ করিয়া যে অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারে আমেরিকায় গেলে তাহা অপেক্ষা অধিক উপার্জ্জন হইয়া থাকে, এই আশায় প্রলুব্ধ হইয়াই তাহারা ঘরবাড়ী ত্যাগ করিয়া এই দূরদেশে চলিয়া যায়। এই স্থানের গাছগুলি বড়ই সুন্দর। একে গাছগুলিই ভাল, তাহার উপর আবার সেগুলিকে কাটিয়া ছাঁটিয়া আরও সুন্দর করিয়া দেওয়া হইয়া থাকে।

তাহার পর যখন আমরা কাসেরটা উপত্যকায় উপস্থিত হইলাম, তখন দূরে সেই অগ্নেয়গিরি বিসুবিয়স আমাদের দৃষ্টি-

বিসুবিয়স।
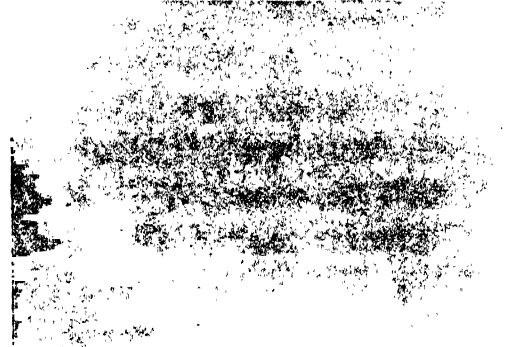
পথে পতিত হইল। তখনও সেই গিরির শিখরদেশ হইতে ধূম বাহির হইতেছিল। আমার জীবনে আর কখনও আগ্নেয়গিরি দর্শন ঘটে নাই, আমি এক দৃষ্টিতে বিসুবিয়স দেখিতে লাগিলাম। আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি তাহার এক মাস পূর্ব্বেই বিসুবিয়সের অগ্ন্যুৎপাত হইয়া গিয়াছে। এখনও তাহার চিহ্ন রহিয়াছে, এখনও সেই মহাদৈত্যের ক্রোধের শান্তি হয় নাই। এখনও তাহার শিখর দেশ হইতে ধূমরাশি বহির্গত হইতেছে। কে বলিতে পারে, হয় ত এখনই সে আবার সংহারমূর্ত্তি ধারণ করিতে পারে। কাসেরা হইতে কিছুদূরেই বোর্ব্বো রাজগণের পুরাতন প্রাসাদ অবস্থিত। আমরা গাড়ী হইতেই সেই রাজপ্রাসাদ দেখিতে পাইলাম। গাড়ী আর একটু অগ্রসর হইলেই আমরা আর একটি অতি সুন্দর পয়ঃপ্রণালী দেখিলাম, বোর্ব্বো-বংশীয় একজন রাজা ক্ষেতে জলসেচনের জন্য এই পয়ঃপ্রণালী প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তার একটি বিষয় বিশেষভাবে আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছিল; আমি রেলপথে যাইতে যাইতে যতদূর দেখিতে পাইলাম, তাহাতে বেশ বুঝিলাম যে, এ দেশের লোক কৃষিকার্য্যে বিশেষ পারদর্শী; কারণ এই সুদীর্ঘ পথের মধ্যে আমি সামান্য একখণ্ডও পতিত ভূমি দেখিতে পাই-

লাম না। জমি সর্ব্বত্র সমতল নহে, অনেকস্থানই বন্ধুর; অনেক স্থানই পর্ব্বতসঙ্কুল; কিন্তু এ দেশের লোক একটু জমিও পতিত ফেলিয়া রাখে নাই। ইহাতেই বুঝিতে পারা যায় যে, এ দেশের কৃষকগণ কেমন শ্রমশীল।

এইবার আমরা নেপল্‌স সহরে পৌঁছিব। দূর হইতে নেপল্‌স সহর অতি সুন্দর দেখাইতে লাগিল। অদূরেই সেই

নেপল্‌সের দৃশ্য।

বিসুবিয়স আগ্নেয়গিরি এখনও ধীরে ধীরে অগ্ন্যুদগার করিতে-ছেন, এখনও তাঁহার গাত্র বহিয়া গলিত ধাতুদ্রব্য পড়িতেছে, এখনও চারিদিকে ভস্মরাশি স্তূপাকারে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। এ দৃশ্য সত্যসত্যই ভয়ানক।

আমরা অপরাহ্ণ পাঁচটার সময় নেপল্‌স সহরে পৌঁছি-লাম। সহরের বাহিরে অবস্থিত 'রয়েল ব্রেষ্টার' নামক হোটেলে আমাদের আবসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছিল। এই হোটেলটি অতি মনোরম স্থানে নির্ম্মিত হইয়াছিল। হোটেলে যাইবার সময় আমাদিগকে রাজপ্রাসাদ, সেণ্ট ফ্রান্সিস এ সিনি ভজনালয় এবং অনেকগুলি বড় বড় সওদাগরের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অট্টালিকার নিকট দিয়া যাইতে হইয়াছিল। আমরা চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম যে, সহরটি অতি সুন্দর; অনেক সুদৃশ্য অট্টালিকা এই সহরের শোভাবর্দ্ধন করিতেছে, রাজপথগুলিও বেশ প্রশস্ত; তাহার পর পথিপার্শ্বে বা উদ্যানমধ্যে গ্যারিবল্ডি, ম্যাটসিনি ও ভিক্টর ইমানুয়েলের প্রস্তরনির্ম্মিত মূর্ত্তিসকল দেখিতে পাইলাম। এই আজি সর্ব্বপ্রথম য়ুরোপের একটি বড় সহর দেখিলাম। এই প্রথম দৃষ্টান্তস্থলের সৌন্দর্য্য আমাকে নিরাশ করিতে পারে নাই। এই সহরে বৈদ্যুতিক আলো, ও বৈদ্যুতিক ট্রাম আছে। আমি অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম যে, শুধু নেপলস সহর বলিয়া নহে, ইটালীর সামান্য গ্রামেও বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা আছে। ইহাতেই বুঝিতে পারা যায় যে, এ দেশ কতদূর উন্নত হইয়াছে এবং এখানে যাতায়াতের সুবিধা কত অধিক। নেপল্‌স সহর বলিয়া নহে, ইটালীর সকল স্থানেই অট্টালিকাসকল প্রধানতঃ প্রস্তরনির্ম্মিত। আমরা বৃন্দিসী হইতে নেপল্‌স পর্য্যন্ত পথে যে সকল অট্টালিকা দেখিলাম, এবং নেপল্‌স সহরেও যাহা দেখিলাম, তাহার প্রায় অধিকাংশই 'তুফা' নামক প্রস্তরে নির্ম্মিত। এই 'তুফা' প্রস্তর ঠিক আমাদের দেশের 'বেলে' পাহাড়ের মত; ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে চুণারে যে পাথর পাওয়া যায়, এই পাথরগুলি ঠিক সেইরূপ।

হোটেলে পৌঁছিয়া আমাদের গৃহস্থালী গোছাইয়া লইতে অধিক সময় লাগিল না। তাহার পরেই ভোজনের পালা। আহার শেষ হইলে আমরা কিঞ্চিৎ বিশ্রামের আয়োজন করিতেছি, এমন সময়ে শুনিলাম যে, আমাদের হোটেলে ইটালিয়ান 'টারান টেলা' নাচ হইবে। ভাল কথা

রকম বাদ্যযন্ত্র লইয়া দলের লোকেরা আসিয়া উপস্থিত ছিল। তাহার পর নাচ গান আরম্ভ হইল। গানগুলি বেশ লাগিল, নাচও মন্দ নহে, পোষাক পরিচ্ছদও বিচিত্র। নেপ্‌লস্‌ অঞ্চলেই নাকি এই প্রকার নাচ দেখিতে পাওয়া যায়।

বহুপথ রেলের গাড়ীতে ভ্রমণ করিয়া সে দিন আমরা বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম; সেই জন্য সকাল সকালই শয্যা আশ্রয় করিলাম। কিন্তু তাই বলিয়া পরদিন প্রাতঃকালে আমাদের শয্যাত্যাগের বিলম্ব হয় নাই; আমরা প্রাতঃকালেই সহর-ভ্রমণে বাহির হইলাম। তাড়াতাড়ি প্রাতরাশ শেষ করিয়া আমরা রাস্তায় উপস্থিত হইলাম। আমরা প্রথমেই 'মসিও-নাজিও লেন' দেখিতে গেলাম। এখানে ইটালীর লব্ধপ্রতিষ্ঠ ভাস্করগণের নির্ম্মিত প্রস্তরমূর্ত্তি-সকল রক্ষিত হইয়াছে। গ্রীক ও রোমানদিগের সময়ের অত্যুৎকৃষ্ট মূর্ত্তিসকলও সংগৃহীত হইয়া এখানে রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইটালীর মধ্যে যেখানে যাহা উৎকৃষ্ট পাওয়া গিয়াছে, বিশেষতঃ পম্পিয়াই নগরের ভস্মস্তূপের মধ্য হইতে যে সকল উৎকৃষ্ট প্রস্তরমূর্ত্তি ও অন্যান্য দ্রব্য পাওয়া গিয়াছে, তাহা এই স্থানেই রাখা হইয়াছে। এখানে সুধু যে প্রস্তরমূর্ত্তি প্রভৃতিই রক্ষিত হইয়াছে তাহা নহে, পুরাতন গ্রীক ও ইটালীর কাচ-নির্ম্মিত দ্রব্যাদি, তাম্র নির্ম্মিত অলঙ্কার-সমূহ, মণিমুক্তা ও রন্ধনের বাসনাদিও এই স্থানে সযত্নে সংগৃহীত হইয়াছে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কাচাধারের মধ্যে পুরাতন পম্পিয়াই সহরের কত আশ্চর্য্য ও সুন্দর দ্রব্য সকল রহিয়াছে। পম্পিয়াই নগর ধ্বংস হইবার সময় যাহা যেমন অবস্থায় ভস্মরাশির নিম্নে সমাহিত হইয়াছিল, বহু শতাব্দী পরে তাহা উত্তোলিত হইয়া এই স্থানে আনীত হইয়াছে। এ গুলি দেখিলে আশ্চর্য্য বোধ হয়। কতকাল পূর্ব্বে পম্পিয়াই নগর ভস্মস্তূপের নিম্নে অদৃশ্য হইয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে সেই স্থানের ভস্মরাশি অপসারিত করিয়া যাহা যেমন অবস্থায় ছিল, ঠিক সেই অবস্থাতেই পাওয়া গেল। বহু শতাব্দী পূর্ব্বে পম্পিয়াই নগর কেমন সমৃদ্ধ ছিল, তখনকার লোকের আচার-ব্যবহার, পোষাক পরিচ্ছদ কেমন ছিল, তাহাদের রীতিনীতি কেমন ছিল, এতকাল পরে তাহার চিত্র যথাযথ প্রত্যক্ষ করিয়া মনে অতুল আনন্দের সঞ্চার হইল। আমি এই স্থানের সমস্ত কক্ষই ঘুরিয়া দেখিলাম; কিন্তু আমি ত এ সকল সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ নহি; কাজেই আমি উপর উপরই দেখিলাম। যাঁহারা বিশেষজ্ঞ তাঁহারা না জানি এই সকল দ্রব্য দর্শন করিয়া কত তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিতেন। আমি এ সকলের সম্বন্ধে কোন প্রকার গবেষণা করিয়া অনধিকার চর্চ্চায় ধৃষ্টতা-প্রদর্শন করিতে সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক। তবে আমি এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, ঐ মিউজিয়মে আমি যে সমস্ত প্রস্তরমূর্ত্তি দেখিয়াছিলাম তাহার মধ্যে মিনারভা, ভিনসকালি পাইগাস্‌, জুনোফার্নিস, এপোলো, কার্ণনিল টোরা, টোরো ফারনিস্‌ ও ফারনিস্‌ হারকুলিসের মূর্ত্তি আমার নিকট অতি সুন্দর বলিয়া বোধ হইয়াছিল। এখানে পুরাতন পম্পিয়াই নগরের যে অংশ এখন বাহির হইয়াছে, তাহার একটা ছোটখাট আদর্শ রক্ষিত হইয়াছে; পম্পিয়াই দেখিতে যাইবার পূর্ব্বে এই আদর্শটি দেখিয়া গেলে আসল স্থান দেখিবার অনেক সুবিধা হয়। এই মিউজিয়মের একটি কক্ষে পম্পিয়াই আমলের অন্যান্য দ্রব্য ও বহুমূল্য চিত্রাদি সজ্জিত আছে। এই সকল দেখিলে সেই বহুদিন পূর্ব্বের পম্পিয়াই-নগরবাসীদিগের বিলাসিতা ও হীনচরিত্রের প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়; অবশ্য সত্য কথা বলিতে গেলে বর্ত্তমান সময়েও পৃথিবীর দুই চারিটি সভ্যতাভিমানী দেশে এই প্রকার বিলাসিতা ও চরিত্রহীনতার দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্থানে আর একটি দ্রব্য দেখিলাম, তাহা কতকগুলি প্রদীপ ও দীপাধার। এগুলি দেখিয়া ভারতবর্ষের তান্ত্রিকগণের ব্যবহৃত দ্রব্যাদির কথা মনে হয়। এই মিউজিয়মের গৃহটি নিয়াপলিটান রাজাদিগের আমলে সৈন্যগণের বাসস্থান ছিল। এই স্থানের নিকটেই একখানি বড় দোকান আছে; সেই দোকানে এই মিউজিয়মে রক্ষিত সমস্ত দ্রব্যের আলেখ্য কিনিতে পাওয়া যায়।

এই স্থান হইতে বাহির হইয়া আমরা "দি চার্চ অব্‌ সেণ্ট জেনুয়ারিয়স" নামক সুপ্রসিদ্ধ ভজনালয় দেখিতে গিয়াছিলাম। এই সেণ্ট জেনুয়ারিয়স পূর্ব্বতন খৃষ্টীয় আমলের একজন মহাত্মা ছিলেন এবং তিনি ধর্ম্মের জন্য শোণিত দান করিয়াছিলেন। তাঁহাকে লোকে নেপ্‌লস্‌ নগরের অধিষ্ঠাতা দেবতা বলিয়া পূজা করিত। আমরা ইটালীতে যতগুলি ভজনালয় দেখিয়াছি তাহার মধ্যে এইটি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও সুন্দর। ইহার আভ্যন্তর-ভাগের কারুকার্য্য ও সাজসজ্জা বড়ই মনোরম। এই ভজনালয়ের সম্মুখভাগ নূতন করিয়া নির্ম্মিত হইয়াছে। কুড়ি বৎসর ধরিয়া ইহা নির্ম্মিত হয় এবং অতি অল্পদিন পূর্ব্বেই ইহার নির্ম্মাণ-কার্য্য শেষ হইয়াছে। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে এই ভজনালয় নির্ম্মিত হইয়াছিল। তাহার পূর্ব্বে এই স্থানে এপোলোর মন্দির ছিল, এখনও এই স্থানে গ্রীক পুরাণবর্ণিত অনেক দেবদেবীর মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমান ভজনালয়ের অভ্যন্তরভাগে যে কএকটি স্তম্ভ দেখিলাম, সেগুলি, শুনিলাম, পুরাতন এপোলো মন্দিরেরই স্তম্ভ। শুনিলাম ইটালীর অনেক খৃষ্টীয় ভজনালয়ই পুরাতন মন্দিরের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আমার মনে হয় খৃষ্টীয়ানগণ ইচ্ছা করিয়াই এই কার্য্য করিয়াছিলেন। পুরাতন দেবদেবীর উপাসনাকে বর্জ্জিত করিয়া খৃষ্টানধর্ম্ম যে দিগ্বিজয়ী হইয়াছে, সেই বিজয়গৌরব ঘোষণার জন্যই সে সময়ের খৃষ্টীয়ানগণ দেবমন্দিরসকল সমভূম করিয়া

...স্থানে খৃষ্টীয় ভজনালয়সকল নির্ম্মাণ করিয়া- ... এই ভজনালয়ের অভ্যন্তরভাগে ভিত্তিগাত্রে যে চিত্র দেখিলাম তাহা নিপুণ চিত্রকরগণের অঙ্কিত; ...সত্যসত্যই অতুলনীয়। চিত্রগুলি দেখিলে মার্ব্বেল-...নির্ম্মিত মূর্ত্তি বলিয়া সহসা ভ্রম হইয়া থাকে। চিত্র-...গণের পক্ষে ইহা সাধারণ গৌরবের কথা নহে। এই ... যে কয়কটি দেবদূতের চিত্র আছে তাহা ইটালীর ...নামা চিত্রকর ডোমেনিচাইনোর অঙ্কিত।

এই ভজনালয়ের পার্শ্বেই মহাত্মা সেণ্ট জেনুয়ারিয়সের ...ধি-মন্দির এবং এই মন্দিরে একটি বোতল রক্ষিত ...ছে। সেণ্ট জেনুয়ারিয়স যখন ধর্ম্মের জন্য হৃদয়ের ...শণিত দান করিয়া প্রাণত্যাগ করেন, সেই সময়ে সেই ...শোণিত সংগ্রহ করিয়া না কি এই বোতলের ভিতর রক্ষিত হইয়াছিল। ইটালীর দক্ষিণ অঞ্চলবাসী অশিক্ষিত লোকেরা এই পুরাতন কাহিনী শ্রবণ করিয়া ভক্তিভরে অবনতমস্তক হয় এবং তাহারা বলিয়া থাকে মহাত্মা সেণ্ট জেনুয়ারিয়সের দিব্যাত্মা এখনও এই নগরকে রক্ষা করিতেছে। যে দিন ঐ মহাত্মা প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই দিন এখানে মহোৎসব হয়, সেই দিনে ঐ বোতলের শোণিতকে উত্তপ্ত করা হয় এবং সেই উপলক্ষে সমাগত সহস্র সহস্র যাত্রিবৃন্দ ...নেক টাকা, বস্ত্রদ্রব্য, নানা পূজোপকরণ এই মন্দিরে উৎসর্গ করিয়া থাকে। এই উপায়ে অনেক মন্দিরেরই যথেষ্ট আয় হইয়া থাকে। এখানে একটি প্রস্তরে খোদিত নরমুণ্ড একটা ভিত্তিগাত্রে খোদিত আছে; ভজনালয়ের লোকেরা দর্শকগণকে ও অনভিজ্ঞ রোমান ক্যাথলিক গ্রামবাসীদিগকে এই মুণ্ডটিকে সেকালের কোন সাধুর লিখিত যিশু খৃষ্টের মস্তক বলিয়া পরিচিত করিয়া থাকে। এই মুণ্ডের সম্মুখে মশাল বা কোন আলো নড়াইলে বোধ হয়, যেন ঐ মুণ্ডের চক্ষু দুইটির পর্দ্দা একবার পড়িতেছে, একবার উঠিতেছে। যে এই মুণ্ডটি নির্ম্মাণ করিয়াছিল সে এই প্রকার দৃষ্টিবিভ্রম ঘটাইবার জন্যই অতি সুকৌশলে চক্ষু দুইটি নির্ম্মাণ করিয়াছিল। কিন্তু অশিক্ষিত ধর্ম্মপ্রাণ সাধারণ লোকে কি আর সে কথা বোঝে? তাহারা এই ব্যাপারকে অলৌকিক বলিয়া মনে করে, মন্দিরের লোকেরাও অর্থলাভের আশায় এই ব্যাপারের অলৌকিক ব্যাখ্যাই করিয়া থাকে; এবং তাহার ফলে যাত্রীরা এখানেও পূজা দেয়, দর্শনী প্রদান করে—মন্দিরের যথেষ্ট অর্থাগম হয়। এ সকলই পুরোহিতগণের কীর্ত্তি।

প্রাতঃকালে বাহির হইয়া এই দুইটি স্থান দেখিতে দেখিতেই বেলা হইয়া গেল। তখন অন্যত্র গমন না করিয়া আমরা সে বেলার মত হোটেলে ফিরিয়া আসিলাম।

শ্রীবিজয়চন্দ্‌ মহ্‌তাব্‌।

ভারতবর্ষ।

কথা—স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। সুর ও স্বরলিপি—শ্রীঅমরেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী।

রাগিণী মিশ্র——তাল একতালা।

২			৩			০			১		
I সা	মা	-।	মা	মা	-।	মা	গা	পা	মা	মা	-। I
ভা	র	ত্	আ	মা	র্	ভা	র	ত্	আ	মা	র্
ভ	গ	ব	দ্	গী	তা	গা	হি	ল	স্ব	-	য়ং
আ	০	র্য্য	ঋ	ষি	র্	অ	না	দি	গ	-	ভী	র্
ভা	র	ত্	আ	মা	র্	ভা	র	ত্	আ	মা	র্
চ	খে	র্	সা	ম্	নে	ধ	রি	য়া	রা	খি	য়া

২			৩			০			১		
I পা	ধা	ণা	মা	রা	-।	মা	পা	সা	ধা	-।	ধা I
যে	খা	নে	মা	ন	ব্	মে	লি	ল	নে	০	ত্র
ভ	গ	বা	ন্	যে	ই	জা	তি	র	স	০	ঙ্গে
উ	ঠি	ল	যে	খা	নে	বে	দে	র	স্তো	০	ত্র
স	ক	ল	ম	হি	মা	তৌ	০	ক	খ	০	র্ব্ব
...	ডী	কে	ন্	সে	ই	ম	হা	আ	দ	০	র্শ

২ ৩ ০ ১

I ধা র্সা র্সা | -া র্সা র্রা | র্সা র্রা র্সা | ণা ণা ণা I

ম হি মা | য় তু মি | জ ০ ন্ম | ভূ মি মা
ভ গ ব | ৎ প্রে মে | না চি ল | গৌ ০ র্
ম হ কি | মা তু মি | সে তা র | ৎ তু মি
দুঃ ০ খ | কি য দি | পা ই মা | তো মা য়্
জা গি ব | নূ ত ন্ | ভা বে র | রা ০ জ্যে

২´ ৩ ০ ১

I ধা ণা ধা | পা মা মা | রা মা রা | সা ণ্‌া ণ্‌া I

এ সি য়া | য় তু মি | তী ০ র্থ | ক্ষে ০ ত্র
যে দে শে | য় ধূ লি | মা খি য়া | অ ০ ঙ্গে
ন হি কি | আ ম রা | তাঁ দে র্ | গো ০ ত্র
পু ০ ত্র | ব লি য়া | ক রি তে | গ ০ র্ব্ব
র চি ব | প্রে মে র্ | ভা র তু | ব ০ র্ষ

২´ ৩ ০ ১

I সা রা মা | মা মা মা | মা মপা ধা | ধা ধা ধা I

দি য়া ছ | মা ন বে | জ গ ৎ | জ ন নী
স ০ ন্ন্যা | সী যে ই | রা জা র | পু ০ ত্র
তা দে র | গ রি মা | স্মৃ তি র্ | ব ০ র্ণে
য দি বা | মি ল য়্ | পা য়্ এ | জ গ ৎ
এ দে ব | ভূ মি র্ | প্র তি ভূ | ণ প রে

২´ ৩ ০ ১

I পা ধণা ণা | ণা ণা ধা | র্সা র্সা র্সা | র্সা -া র্সা I

দ ০ শ | নে উ প | নি ষ দে | দী ০ ক্ষা
প্র চা র | ক রি ল | নী তি র্ | ম
চ লে যা | ব শি য়্ | ক রি য়া | উ
ভু ০ শু | হ য়্ এ | মা ন ব | বং ০
আ ছে বি | ধা তা র | ক রু ণা | বৃ ০ ষ্টি

২´ ৩ ০ ১

I র্সা র্রা ণা {ণা ণা ণা | ণা র্সধা ধা | ধা ধা ধা I

দি য়া ছ | মা ন বে | জ্ঞা ন্ ও | শি ল্ প
যা দে র | ম ০ ধ্যে | ত ক্ষ ণ | তা প স্
যা দে র | গ ০ রি | মা য়্ এ | অ তী ত
যা দে র | ম হি মা | ম য়্ এ | অ তী ত
এ ম হা | জা তি র্ | মা থা র | উ প রে

২ ৩ ০ ১

I ধা ণা পা | পা মা মা | রা মা ণা | ণা -া ণা }I

ক ০ র্ম | ভ ০ ক্তি | ধ ০ র্ম | শি ০ ক্ষা
প্র চা র | ক রি ল | সো ০ হং | ধ ০ র্ম্ম
তা রা ক | থ ন ই | ন হে যা | তু ০ চ্ছ
তা দে র | ক খ নো | হ বে না | ধ্বং ০ স
দে রে দে | ব গ ণ | পু ০ ণ্য | বৃ ০ ষ্টি